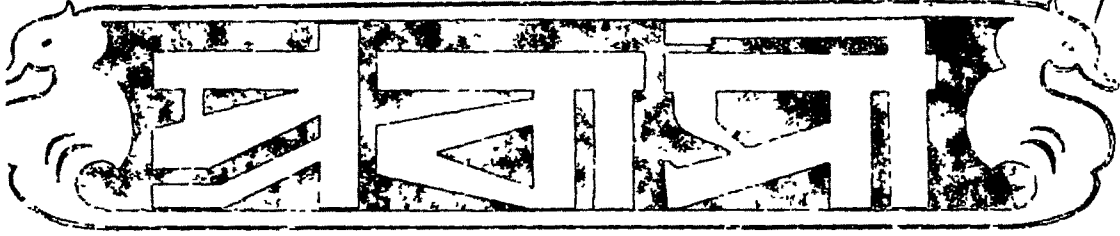


CUB - H04316-58-PR30131



“স্ত্যাম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নাথমাস্তা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৬শ ভাগ }
২য় খণ্ড }

কাঙ্ক্ষিক, ১৩৪৩

১ম সংখ্যা

পরিণোধ

(নাট্যগীতি)

ববানুনাথ ঠাকুর

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত “পরিণোধ” নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষ্যে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপাব অঙ্করে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব বলে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

১

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

গামা

এখনো কেন সময় নাহি হোলো

নাম-না-জানা অতিথি,

আঘাত হানিলে না ছুয়ারে

কহিলে না, দ্বার খোলো।

হাজার লোকের মাঝে

রহেছি একেলা যে,

এসো আগার হঠাৎ আলো

পরান চমকি' তোলো ॥

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে

জানি না কাঁদি কাহার তরে ॥

চরণ সেবার সাধনা আনো,

সকল দেবার বেদনা আনো,

নবীন প্রাণের জাগর মন্ত্র

কানে কানে বোনো ॥

রাষ্ট্রপথ

প্রবীর্ণ

রাজার আদেশ, ডাই,

চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,

কোথা ভারে পাই ?

যারে পাও তারে ধরো

কোনো ভয় নাই ॥

বহুসেনের প্রবেশ

প্রবী

ধর ধর ঐ চোর ঐ চোর ।

বহুসেন

নই আমি, নই নই নই চোর ।

অস্থায় অপর্যবে

আমারে কেহো না কাঁদে ।

নই আমি নই চোর ।

প্রবী

ঐ চটে ঐ চোর ঐ চোর ।

বহুসেন

এ কথ দিখা অতি বোর ।

আমি পরদেখী

হেথা নেই স্বজন বহু কেহ মোর

নই চোর, নই আমি, নই চোর ।

আমা

আহা মরি মরি

মহেন্দ্রনির্দিত কাস্তি উন্নতদর্শন

কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন

কঠিন শৃঙ্খলে শীঘ্র যা লো সহচরী,

বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,

গ্রামা ডাকিতেছে তারে । বন্দী সাথে ল'য়ে

একবার আসে যেন আমার আলয়ে

দয়া করি ।

P30131

সহচরী

সুন্দরের বন্ধন নির্ভুরের হাতে
 ঝুচাবে কে ;
 নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে
 মুছাবে কে ।
 আশ্রের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বনুন্ধরা,
 অস্থায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,
 প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে ছর্ব্বলরে,
 অপমানিতের কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে ।

প্রহরীদের প্রতি

আমা

১৬- তোমাদের এ কী ভ্রান্তি,
 কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি
 প্রহরী মরি মরি,
 এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে ?
 দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে ।
 বন্দী করেছ কোন্ দোষে ?

প্রহরী

চুরি'হয়ে গেছে রাজকোষে
 চোর চাই যে ক'রেই হোক ।
 হোক না সে যেই কোন লোক ;
 নহিলে মোদের যাবে মান ।

আমা

নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ
 ছুই দিন মাগিছু সময় ।

প্রহরী

রাখিব তোমার অতুলনয় ।
 ছুই দিন কারাগারে র'বে
 তার পর যা হয় তা হবে ।

বনুসেন

এ কী খেলা, হে সুন্দরী,
 কিসের এ কোতুক ।

কেন দাঁও অপমান ছুখ,
মোবে নিয়ে কেন
কেন এ কৌতুক ।

শ্রামা

নহে নহে নহে এ কৌতুক ।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ অলঙ্কার
ন'পি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে । তব অপমানে
মোর অন্তরাঙ্গা আজি অপমান মানে ।

বঙ্কদেব

কোন্ অবাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমির রাত্রি ভেদি'
ছদ্দিন ছর্যোগে,
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি ।
অচেনা নিশ্চয় ভুবনে
দেখিছু এ কী সহসা
কোন্ অজ্ঞানার সুন্দর মুখে সাস্বনা হাসি ॥

—০—

২

কারাগর

(শ্রামার প্রবেশ)

বঙ্কদেব

এ কী আনন্দ

হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ ।
ছুখ আমার আজি হোলো যে ধন,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত সুগন্ধ ।
এলে কারাগারে

রজনীর পারে উষা সম,
মুক্তিরূপা অগ্নি, লক্ষ্মী দয়াময়ী ।

শ্রামা

বোলো না বোলো না আমি দয়াময়ী ।
মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা ।

এ কারা-প্রাচীরে শিলা আছে যত

নহে তা কঠিন আমার মতো ।

আমি দয়াময়ী,

মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা ।

বজ্রসেন

জেনো প্রেম চিরঞ্চনী আপনারি হরষে ।

জেনো প্রিয়ে

সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে ।

কলঙ্ক যাহা আছে

দূর হয় তার কাছে,

কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে ।

শ্রামা

হে বিদেশী এসো এসো । হে আমার প্রিয়,

এই কথা স্মরণে রাখিয়ো,

তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি

হে হৃদয়স্বামী

জীবনে মরণে প্রভু ॥

বজ্রসেন

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দৌহারে

বাঁধন খুলে দাও দাও দাও ।

ভুলিব ভাবনা পিছনে চাব না

পাল তুলে দাও দাও দাও ।

প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল

হৃদয় ছলিল ছলিল ছলিল

পাগল হে নাবিক

ভুলাও দিগ্‌বিদিক

পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥

শ্রামা

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে

নিয়ো না নিয়ো না সরায়ো ।

জীবণ মরণ সুখ দুখ দিয়ে

বন্ধে ধরিব জড়ায়ে ॥

অলিত শিখিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গৌঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়িয়ে ॥

বিকারে বিকারে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে ছুয়ারে ছুয়ারে,
তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ৈ ॥

৩

বঙ্গসেন: ৬ শ্রুমা

(তরগীতে)

শ্রুমা

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী ।
ভীরে বসে যায় যে বেলা মরি গো মরি ॥
ফুল ফোটানো সারা করে
বসন্ত যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি ॥

জল উঠেছে ছলছলিয়ে ঢেউ উঠেছে ছলে,
মরমরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুণ্যে,
শূন্যমনে কাথায় তাকাস
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি ॥

বঙ্গসেন

কহ কহ মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে ।
অগ্নি বিদেশিনী,
তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী ।

জামা

নহে নহে নহে । সে কথা এখন নহে ।

ঐ রে তরী দিল খুলে ।

তোর বোঝা কে নেবে তুলে ॥

সামনে যখন যাবি গুরে,

ধাক্ না পিছন পিছে পড়ে,

পিঠে তারে বহিতে গেলে

একলা পড়ে রইবি কুলে ॥

ঘরের বোঝা টেনে টেনে

পারের ঘাটে রাখলি এনে

তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হোলো গেলি ভুলে ।

ডাক্রে আবার মাঝিরে ডাক্,

বোঝা তোমার যাক্ ভেসে যাক্,

জীবনখানি উজাড় ক'রে

সঁ পে দে তার চরণমূলে ॥

বঙ্গসেন

কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত

কহ বিবরিয়া,

জানি যদি প্রিয়ে

শোধ দিব এ জীবন দিয়ে

এই মোর পণ ॥

জামা

নহে নহে নহে । সে কথা এখন নহে ।

তোমা লাগি যা করেছি

কঠিন সে কাজ

আরো সুকঠিন আজ

তোমারে সে কথা ।

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,

ব্যর্থ প্রেমে মোর মস্ত অধীর ।

মোর অল্পনয়ে তব চুরি অপবাদ

নিজ 'পরে ল'য়ে সঁ পেছে আপন প্রাণ ।

এ জীবনে মম প্রগো সর্বোত্তম
সর্বোচ্চ মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া ॥

বক্তৃতা

কাদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পবি না শাস্তি ।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষ নীড় বজ্র আঘাতে ।
কোথা তুই লুকাবি মুখ যত্ন আধারে ॥

শ্রীম

ক্ষমা করো নাথ ক্ষমা করো ।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর ।
তুমি ক্ষমা করো ।

বক্তৃতা

এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিছি ধিকৃত । কলঙ্কিনী
ধিক নিঃশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী ।

শ্রীম

তোমার কাছে দোষ করি নাই
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে ;
তিনি করিবেন রোষ
সহিব নীরবে ।
তুমি যদি না করো দয়া
স'বে না স'বে না স'বে না ॥

বক্তৃতা

তবু ছাড়িবি নে মোরে ।

শ্রীম

ছাড়িবি না ছাড়িবি না ।
তোমা লাগি পাপ নাথ,

ভূমি করো মর্শ্বাঘাত ।

ছড়িব না ।

(ক্রমাক্কে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা)

(নেপথ্যে)

হায়, এ কি সমাপন !

অমৃতপাত্র ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ ।

এ ছলভ প্রেম মূল্য হারালো, হারালো,

কলঙ্কে অসম্মানে ॥

৪

পাখিক বয়সী

সব কিছু কেন নিগ না, নিগ না

নিগ না ভালোবাসা ।

আপনাতে কেন মিটল না যত কিছু স্বপ্নের

ভালো আর মন্দে ?

নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা

সাগর হৃদয়ে গহনে হয় হারা,

ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো

প্রেমের আনন্দে রে ॥

(প্রস্থান)

বজ্রসেন

ক্ষমিতে পারিলাম না যে

ক্ষমো হে মম দীনতা —

পাপী রন-শরণ প্রভু ।

মরিছে তাপে মরিছে লাজে

প্রেমের বলহীনতা,

ক্ষমো হে মম দীনতা ।

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে প্রেমের আমি হেনেছি

পাপীয়ে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি,

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে

যে-অভাগিনী পাপের ভারে

চরণে তব বিনতা,

ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না

আমার ক্ষমাহীনতা ॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে

মরণ-লোক হ'তে নূতন প্রাণ নিয়ে ।

নিষ্ফল মম জীবন,

নীরস মম ভুবন

শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে ॥

(নূপুর কুড়াইয়া লইয়া)

হায় রে নূপুর,

তার করণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনশূর ।

নীরব ত্রেন্দনে বেদনাবন্ধনে

রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ স্মমধুর ।

তোর স্বাক্ষরহীন ধিকারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

(শ্রাম্যাব প্রবেশ)

শ্রাম্যাব

এসেছি প্রিয়তম ।

ক্ষমো মোরে ক্ষমো ।

গেল না গেল না কেন কতিন পরাণ মম

তব নিষ্ঠুর করুণ করে ।

বজ্রসেন

কেন এলি, কেন এলি কেন এলি ফিরে—

যাও যাও চলে যাও ।

(শ্রাম্যাব প্রণাম ও প্রস্থান)

বজ্রসেন

ধিক্ ধিক্ ওনে মুগ্ধ,

কেন চাস্ ফিরে ফিরে ।

এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন

এ যে মোহবাস্পঘন কুস্মাটিকা,

দীর্ণ করিবি না কি রে ।

অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে

নিদারুণ বিষ,

লোভ না রাখিস্

প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে ॥

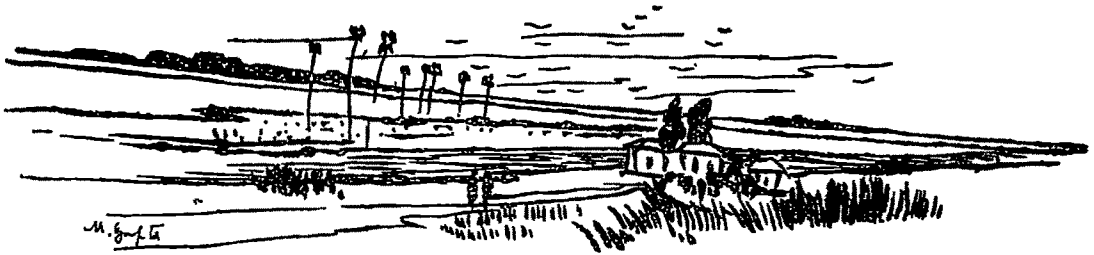
নির্ম্মম বিচ্ছেদ সাধনায়
 পাপ ক্লানন হোক,
 না করো মিথ্যা শোক,
 ছুঃখের তপস্বী রে,
 স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন,
 আয় বাহিরে
 আয় বাহিরে ॥

(নেপথ্যে)

কঠিন বেদনার তাপস দৌহে,
 যাও চিরবিরহের সাধনায়,
 ফিরো না, ফিরে না, ভুলো না মোহে ।
 গভীর বিষাদের শাস্তি পাও হৃদয়ে,
 জয়্যা হও অস্তব বিজ্রোহে ॥
 যাক্ পিয়াসা, ঘুচুক ছরাশা,
 যাক্ মিলায়ে কামনা কুয়াশা ।
 স্বপ্নমাবেশবিহীন পথে
 যাও বাঁধন-হারা,
 তাপ-বিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে ॥

আখিন, ১৩৪৩

শান্তিনিকেতন



একটি রাত্রির পাঠাভ্যাস

শ্রীমদ্রামায়ণ

টং—

দেয়ালঘড়িতে সাড়ে ন'টা। এখনও অস্তিত আড়াই ঘণ্টা। ঘণ্টা-আড়াই পরে বাবার ঘরের আলো নিববে, নীলার হাতের পেনাল-কোঠ বইটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠবে তাকের উপর। তার পর আঁধারে আঁধারে বাবার বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে পা টিপে-টিপে...। কিন্তু থাক এখন সে-সব; সে ত বারোটার আগে কোনক্রমে নম্র—পৃথিবী লয় হয়ে গেলেও নয়।

রোয়াকের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, কুয়াশাময় রান জ্যোৎস্না। নীলারি বেরিয়ে এসে রাস্তাব মোড় অবধি বার-দুই পায়চারি করল। লোক-চলচল নেই। আর আশ্চর্য্য,—এ কি অভাবিত কাণ্ড—বাবাব উপরের ঘরে আলো ত জ্বলছে না! ব্যাপারটা কি তা হ'লে? রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ ক'রে অশোক-কাকাদের বাড়ীর গান ও খেলের আওয়াজ আসছে। সংকীর্ণ এখনও উত্তাল বেগে চলেছে। মা পেছেন, ইদানীং প্রায় রোজই গিয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত নাফায়ত পান ক'রে আসেন। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বয়স খাঁর সবচেয়ে বেশী, ভগবৎ-পদে অল্লা মতি থাকা একান্ত ভাবে খাঁর আবশ্যক, তিনি কিছুতে এক-পা নড়বেন না, গান শুনলে তাঁর মাথা ধরে—তা সে যে-গানই হোক। বরদা তাই ঘরে বসে এই সময়টা মজেলের কাগজ-পত্র দেখেন। কিন্তু আজ এ হ'ল কি? অশোক-কাকা সন্ধ্যার সময় একবার এসেছিলেন, তিনিই টেনে-ইঁটড়ে নিয়ে এই অঘটন ঘটালেন নাকি? বলা যায় না, সন্সারে ত কত আশ্চর্য্য ব্যাপারই নিয়ত ঘটছে।

অন্তএব নীলারি িঃক্বে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। তাই-ই বটে। বাবার ঘর অন্ধকার, দরজা ভেজানো। আচ্ছা, হঠাৎ যদি দরজা খুলে যায়—এবং ছ-স্ট স্বদীর্ঘ সেই দেহ-ছারা চোখের সামনে উদয় হয়—

—নীলে!

—আজ্ঞে, বই আনতে যাচ্ছি—

—তা বুঝেছি। বইয়ের পাখনা বেরিয়েছে—খন-তখন উপরে উড়ে আসে। বলি, এগ্জামিনের তারিখটা মনে আছে ত? গেল-এগ্জামিনে নিজের পাখা বেরিয়েছিল, হোস্টেল খুঁজে শ্রীমানের পাখা মেলেনা; হোস্টেল ছাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে এসাম ত এবার বই উদ্ধতে আরম্ভ করেছে।

বাদাম-গাছের ফাঁক দিয়ে দরদালানে টুকরো-টুকরো অনেক জ্যোৎস্না পড়েছে। এই জ্যোৎস্না-রাত্রি লোকে পেনাল-কোঠ মুখস্থ ক'রে কাটায়। গভীর নিশ্বাস ফেলে নীলারি শোবার ঘরে ঢুকল। সেখানে আরও মহা মারাত্মক ব্যাপার,—এই জ্যোৎস্না-রাত্রি কোন কোন লোক নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কাটায়!

উমা ঘুমচ্ছে। নীলারির পড়া শেষ না-হওয়া অবধি শান্তভী এই ঘরে বউ আগলে থাকেন, আজ তিনি নেই, কেউ নেই,—চারিদিক চুপ চাপ,—পাতলা নীল লেপ মুড়ি দিয়ে চোপের ছ-জোড়া পাগড়ি মুদিত ক'রে উমারানী ঘুমচ্ছে। ঘুমের ভান নম্র—সত্যকার ঘুম। শিম্বরের খানিবাটা দূরে একটা অস্পষ্ট দীপ। নীলারি ফিসফিস ক'রে ডাকল—উমা, উমারানী—

ঘুম পেলে উমা আর এক মাহুষ। সে পাশ ফিরে পাশ-বালিশটা টেনে আরও আঁটসাঁট হয়ে গুল। হাতের সোনার চুড়ি ঝিনঝিন করে বেজে উঠল। নীলারি এক টানে লেপ সরিয়ে মুখের কাপড় টেনে কেহ-তেই—

—কে? কে? কে বে?—

এবং ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পাশের সেই অন্ধকার ঘর থেকে এল—কি হয়েছে, বউমা?

সর্বশেষ, স্বয়ং বরদাকান্ত। বরদা ব্যস্ত হয়ে চোঁচাতে লাগলেন—আমি আসছি, বোন ভয় নেই, বউমা—আমি আসছি।... দুন্ডোর, আমার খড়ম গেল কোথায়?

উমা উঠে দুলল; ঘুম উড়ে গেছে। পাগড়ী নীলারি

পালাবার পথ খোঁজে। পথ একটি মাত্র, দালানের ভিতর দিয়ে। সেই পথেই খটখট করে খড়ম ক্রতবেগে আসছে। নীলাজি ব্যাকুল হয়ে বলল—উমা, বলো যে স্বপ্ন দেখছিলেন... কিছু নয়। ঐ এসে পড়লেন যে! শিগুগির বল বে একটা বেরাল—এখানে ঠর আসতে হবে না—

উমা বলতে গেল, কিন্তু গলা কাঠ হয়ে গেছে, শব্দ বেরয় না। চৌকাঠের কাছাকাছি খড়মের আঙুরাজ প্রত্যাসয়। বিছানার ওধারে পড়ে আছে পাশ-বালিশ—এক মুহূর্ত মাত্র—নীলাজি চক্ষের পলকে সেই বালিশের পাশে গুটিহুটি হয়ে পড়ল, গায়ের উপর আগাগোড়া লেপ চাপিয়ে দিল।

বরদা ঘরে ঢুকে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

উমা ততক্ষণে সামলে নিচ্ছে। আর, স্বপ্নের সামনে তার কিন্তু তেমন ভয়ও করে না। বলল—স্বপ্নে দেখলাম, চোর এসেছে—

বরদা রাগে কেটে পড়লেন।—সব দোষ তোমার শান্তদায়ী। এখনও তিনি কীর্জন গুনছেন, পুণ্যের বস্তা বয়ে আনবেন। ঘরে এক ফোটা বউ, একলাটি দরজা খোলা—চোর ত আসবেই—

মুহূর্তে উমা বলল—সত্যি সত্যি ত আসে নি, বাবা। স্বপ্ন দেখলাম; তার পর ভেগে উঠে দেখি, চোর নয়, বেরাল—

কিন্তু বরদার রাগ পড়ে না। বললেন—আসে নি, আসতে পারত। গিন্নির আঁকেলটা কি, বল দেখি—

উমা বলল—এবারে দরজা দিয়ে শোব। মা কিরে এলে তখন খুলে দেব। আমার ভয় করবে না—আপনি যান, বাবা। ঘুমুচ্ছিলেন—মিছিমিছি জাগিয়ে দিলাম।

—কিছু না, কিছু না। রাতে কি ঘুম হয়! দেয়ালের ধাবে একটা জলচৌকি ছিল; সেটা টেনে নিয়ে বরদা বেশ এঁটেএঁটে বসলেন। বলতে লাগলেন—ঘুম না হাতী। শরীরটা একটু খারাপ লাগছিল, তাই আলো নিবিয়ে একটু চোখ বুঁজেছি—অমনি সাক্ষীর জ্বানবন্দীগুলো বিলবিল করে যেন মাথার মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। আজকের শেষ কাছারীতে যে মামলাটা হ'ল, সে এক দাঁচ্ছতাই ব্যাপার। রোসে—চুপুট নিরে আসি, তার পর ব'সে ব'সে গল্প করব—

বরদা বেরিয়ে যেতে নীলাজি এক টানে লেপ ছুঁড়ে ফেল উঠে বসল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল—তোমার দোষ?

বিশ্বাসে চোখ বড় বড় করে উমা বলল—আমার?

—একশ বার। তুমি টেটিয়ে উঠলে কেন?

উমা বলল—বারে। আমি কি জানি, যে তুমি। আমি ত ঘুমিয়ে ছিলাম—

অবীর কণ্ঠে নীলাজি বলল—কেন ঘুমোও? সে-ই ত দোষ।

—আর নিজে চোরের মত এসে মুখের কাপড় টানবেন, সে কিছু দোষ হয় না?—

—দোষই বটে, উমারাগী। নীলাজির স্বর ভারী হয়ে উঠল।—তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করেছে, তারই ত এই শাস্তি হচ্ছে—

রাগে রাগে সে ঘর থেকে বেরুল। অবার তখনই ঘিরে আসতে হ'ল। উপায় নেই,—পালাবার পথ নেই। এবারে বরদার ঘরের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে, সামনের দিকে মুখ ক'বে তিনি যোজা পরছেন। এমন সময় মাছি উড়ে গেলেও তাঁর নজর এড়ায় না।

নিশ্বাস ফেলে বরদা বসে নীলাজি বলতে লাগল—তোমার ত কোন ক্ষতি হ'ত না, উমা। আমি একটা বার শুধু চোখের দেখা দেখে চ'লে যেতাম। বাবাকে ডেবে এ ছুতোগ কেন ঘটালে?

কিন্তু উমারাগীর অহুতাপ নেই। বরদা মনে হয়, অবস্থাটা সে উপভোগ করছে, যেন সে টিগিটিপি হাসছে। বাড় নেড়ে অপরূপ ভঙ্গিমা ক'বে বলল—ঘুমুই আর নরে থাকি, চোখের দেখা দেখতে বিসে আটকান, গুনি। ছুতোগ ত ভারি! নিজে লেপের তলে দিবি অল্লাম ক'রে আছেন, আমি এদিকে শীতে হিহি ক'রে মরি—

নীলাজি বলল—এ বাড়ীতে আর লেপ নেই কিনা—লেপ-মুড়ি দিতে তাই এ ঘরে এসেছি!

অবিক বলবার অবকাশ হ'ল না; অন্য ক'রে ঠিক শিকল পড়ল। অর্থাৎ ভাল রকম প্রস্তুত হয়ে দরজা নিয়ে বরদা গল্প করতে আসছেন।

কাতর অন্তরের দৃষ্টিতে নীলাজি বলল—সংক্ষেপে সে-রা,

—দোহাই তোমার। নইলে লেপ চাপা পড়ে দম আটকে
ওর নীচে ঠিক ম'রে থাকব।—

বরদা এসে কৈকিল্লতের ভাবে বললেন—চুফট পেলাম,
কিন্তু দেশলাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তার পর শীত-শীত
করতে লাগল, তাই জামা-টামা এঁটে এলাম। একটু
দেরি হয়ে গেছে,—ভয় কচ্ছিল না ত ?

উমা ভাঙ্ছিলোর ভাবে বলল—নাঃ—ভয় কিসের ?
আপনি শুয়ে পড়ুন গে বাবা, আমার ভয় করে না।

বরদা কথা কানে তুললেন না, নিশ্চিন্তে চৌকির উপর
বসলেন। উমা গুটিব্রটি হয়ে খাটে বসেছে। বরদা বললেন
—হ্যাঁ মা, লেপটা গায়ে তুলে ব'সো। পাশ-বাগিশের
উপর চাপিয়ে রেখেছ কেন ?

উমা বলল—বড্ড গবম।

—বল কি ? একগাদা গায়ে চাপিয়েও আমার শীত
যাচ্ছে না—আর তোমার গরম ? তার পর তাকিয়ে
তাকিয়ে লক্ষ্য ক'রে বললেন—উঁহু, ঐ যে কাঁপছ। শীত
লাগছে বুঝতে পারছ না।

বরদা উঠবার উপক্রম করলেন। কিন্তু তার আগেই
তড়িৎদেগে উমা এসে তাঁর কাছে মেজের উপর ব'সে পড়ল।
যে ব্যস্তবাগীশ মানুষ—কিছু বিশ্বাস নেই—হয়ত নিজেই লেপ
তুলতে যাবেন। উমা বলল—শীত নয়ত, বাবা। ভয়-ভয়
করছে তারই কাঁপুনি। চোখ বুজলেই দেখছি, সেই
বেয়াল—বাঘের মত বড় বড় চোখ। আমি আর শোব
না, আপনাব সঙ্গে ব'সে ব'সে গল্প করব।...আচ্ছা, আজকে
কাছারীতে কি মামলা ক'রে এলেন, সে কথা ত বললেন না
কিছু।

এ কৌশল কেবল উমা নয়, পাড়ার ছোট ছেলেটা
অবধি জানে। মামলার গল্প বরদাকান্তকে একবার ধরিয়ে
দিতে পারলে আর রক্ষা নেই। বরদা আরম্ভ করলেন—সে
কি বলবার মত কিছু ? বাজে একটা চুরির কেস—আমি
এক রকম উপষাচক হয়ে বিনি-পয়সায় আসামীর তরফে
দাঁড়ালাম। হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—আইনে
যা-ই থাক, আমি বলব এ কিছুতে অস্ত্রায় নয়। রসগোল্লার
ছাঁড়ি ছিল কাচের আলমারীতে ; দোকানে কেউ ছিল না—

লোকটা তিন দিন খেতে পায় নি, কাচ ভেঙে একটা মিষ্টি
পাল দিতে যাচ্ছে, অমনি তাকে ধ'রে পুলিশে চালান
ছিল—

উমা বলল—যা-ই হোক, চুরি ত বটে—

বরদা বলতে লাগলেন—হোক চুরি। পেটে আগুন
জ্বলছে, সামনে খাবার সাজানো,—বলি, মুনি-শ্রমি ত কেউ
নয়। আমি তাই হাকিমকে বললাম, আমি হ'লে—

উমা প্রশ্ন করল—আপনি হ'লে কি কবতেন, বাবা ?

বরদা বললেন—আমি হ'লে পুলিশ না-ভেঙে রসগোল্লার
ছাঁড়ি তার হাতে তুলে দিতাম। আহা বেচারি, যত খুশী
খেয়ে নিক। দোকানদার বেটাদের দমামায়া নেই—

উমা মুহূ হেসে বলল—আপনার মত হ'ত যদি সবাই—

লেপের নীচে অনন্তশয্যা থেকে নীলাম্বর ইচ্ছা করতে
লাগল, বেরিয়ে এসে উমার মুখ চেপে ধরে এবং বাবার মুখের
উপর দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে—আজ্ঞে না—আপনিও কম
নন। আপনি হ'লে চোবকে জগদল পাখর চাপা দিয়ে
দ্বিতন—

গল্পে বাধা পড়ে গেল। সৌদামিনী এলেন। পিছনে
চাকরের হাতে হারিকেন।

বরদা হেসে বললেন—ও গিন্নি, পুণ্ডির বোকা বয়ে
আনতে পারলে ? না—হারানচন্দোর আছে বুঝি সঙ্গে !
গন শেষ হয়েছে ?

সৌদামিনী বললেন—কেন, আমার জন্তে কি কাজ
আটকে আছে, শুনি ?

—কি কাজ ? উমাকে দেখিয়ে বরদা বলতে
লাগলেন—এই যে বউমা, পরের বাড়ীর এক ফোঁটা মেয়ে,
একা একা প'ড়ে আছেন—কে পাহারা দেয় ?

সৌদামিনী হাসিমুখে একবার উমার দিকে চাইলেন।
বরদার কাছে স'রে এসে নীচু গলায় বললেন—তোমার
বব্বা ভাল। বউ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, পাহারা দেবে
পাড়ার লোকে ?

বরদা ভ্রষ্টকী ক'রে বললেন—ছেলেব বয়ে গেছে। তার
বল এগুজামিন...কত পড়াশুনো। সে আমার ছেলে—
অকর্ম্মা আড্ডাবাজ ত নয় ?

সৌদামিনী হেসে ফেললেন।—ছেলে না পারে, বাপে ত পাহারা দিচ্ছে। সে-ই বেশ।...তুমি এখন যাও দিকি। নীলুর উপরে আসবার এখনও দেরি আছে, ততক্ষণ আমরা একটু ঘুমিয়ে নিই—

বরদা চলে গেলে বিছানার দিকে সৌদামিনীর নজর পড়ল। আশ্চর্য হয়ে বললেন—এ কি বউমা, এ ঠিক হারানোর কাণ্ড! দিগ্গজ এক বালিশ এনে খাট জুড়ে রেখেছে—শুবি কোথায়?

উমা তাড়াতাড়ি বলল—সুয়েই ত ছিলাম। পাশ-বালিশে শোওয়া আমার অভ্যাস। কিছু অস্ববিধে হবে না—

সৌদামিনী স্তনলেন না।—না, হবে না বইকি? আর একটা ছোট পাশ-বালিশ দেব এখন...দাঁড়া, এটা আলমারির মাথায় তুলে দিই—

বলতে বলতে দেখা গেল, পাশ-বালিশ স্বয়ংই উঠে দাঁড়িয়েছে। সৌদামিনী অবাক হয়ে বললেন—নীলু!

নীলারিচি চোখে জল আসবার মত। কিন্তু সে-জল এক মুহূর্তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল; সে বজ্রাহতের মত দাঁড়াল। হায় রে, বিপদের কি শেষ নেই! বরদা চুকটের কোঁটা ফেলে গিয়েছিলেন, সেটা নিতে মন্থর পায়ে আবার এসে চুকলেন। ছেলেকে দেখে দৃষ্টি কুঞ্চিত হয়ে এল। বললেন—এরই মধ্যে পড়াশুনোর ইস্তফা দিয়ে এলে? ক'টা বেজ্ঞেছে?

নীলারিচি জড়িত কণ্ঠে বলল—বারোটা—

—কক্ষণো নয়। এগারটা সাত—তার সিকি মিনিট বেশী নয়। পড়তে গেলেই ঘড়ি তোমার ঘোড়ার মত ছুটতে থাকে। যাও—নীচে যাও—

সৌদামিনী বাধা দিয়ে উঠলেন—না, নীচে নয়। নীচে বড় মশা—শেষে ম্যালেরিয়ায় ধরুক। পড়তে হয়, এখানে বসেই পড়ুক—

বরদা বললেন—কোথায় মশা? ছেলেকে নীর গুল করতে চাও যে। আমরা কাজকর্ম ক'রে থাকি,—মশাটপা ত দেখি নে—

মায়ের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে এক পলক তাকিয়ে নীলারিচি বলল—রাতের উপদ্রবটা বেশী হয় কি না—

বরদা বললেন—তা হ'লে আমার ঘরে ব'সে পড় গে। বারোটা বাজতে এখনও বাহান্ন-তিপায় মিনিট। চিট্টি-এ চাপটার আজ শেষ করতেই হবে। কোনখানে আটকে গেলে আমি বুঝিয়ে দেব। সে ভালই হবে—নয়?

বরদা সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। নীলারিচি মাথা নেড়ে কাতর কণ্ঠে সায় দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ—

সৌদামিনী রুখে উঠলেন—আমার হবে না। ও আলো জ্বলে ব'সে ব'সে সমস্ত রাত পড়বে, আলো থাকলে আমার ঘুম হয় না—

বরদা বললেন—তুমি এখানে ঘুমোও। পড়া হলে গেলে তার পব যেও। রোজই হচ্ছে, আজ নতুন মাছ হলে গেলে নাকি!

সৌদামিনী জেদ ধরে বসলেন—রোজ হচ্ছে ব'লে আদ হবে না। শরীর আমার ভেঙে পড়ছে। স্বাবার যে এক-ঘুমের পর ছুটোছুটি করব, সে পেরে উঠব না; তাতে তোমার ছেলের পড়া হোক আর না-ই হোক—

—মুন্সিল! কি করা যায়। বরদা চিন্তিত ভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলেন।—তা হ'লে বউমাকণ্ড নিয়ে চল। নীলে এখানে পড়ুক। বারোটা বাজলে উনি আসবেন—

সৌদামিনীর তাতেও আপত্তি।—না, বউমা যাবে না। তোমার সঙ্গে আজ অনেক কথা রয়েছে, নোঁমা গেলে হলে না।

অতঃপর বরদার আর ধৈর্য থাকল না। রাগ ক'নে বললেন—হবে না ত কি হবে? পরের মেয়েকে সন্তি সন্তি ত একটা ঘরে একলা ফেলে রাখা যায় না—

সৌদামিনী প্রস্তাব করলেন—নীলুকে বল, সে যদি—

—সে কি ক'রে হবে? ওর এগ্জামিন। বলতে সৌদামিনীর পরে একটু কক্ষণও হ'ল। অবোধ মেয়ে-লোক—বোঝে না এগ্জামিন কি—এবং পনাল-কোড ভি বস্ত!—ঘাড় নেড়ে বরদা বললেন—সে আমি কিছুতে পারব না। এগ্জামিন সামনে, ওকে আমি বলব কোন্ হিসেবে একটা কাণ্ডজান আছে ত?

অল্পক্ষণ তরল কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন—আছে নাকি? থাক, হুঁতবনা ঘুচল। তিনিই তখন ছেলেকে ডেকে বললেন—নীলু, বাবা, তুই আজকের রাতটা এখানে ব'সে পড়।

বউমা একটা কথাও বলবেন না, খাটে ঘুমিয়ে থাকবেন
অস্থবিধে হবে?

হেলে খুব মাতৃভক্ত বলতে হবে। ঘাড় নেড়ে তখনই
রাজী। বরদা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বুঝেছ
ঠিক ক'রে বলছ?

নীলাত্রি বলল—আজ্ঞে, কোন অস্থবিধা হবে না—

—হবে না, কি ক'রে বল? এখন নেই, পরেও ত হ'তে
পারে? তুমি কি দৈবজ্ঞ হয়ে বসেছ? বরদার ধারণা
নিতান্ত চক্কলজ্ঞায় ছেলে মায়ের কথা ঠেলতে পারছে না
যেতে যেতে আবার মুখ ফিরিয়ে উপদেশ দিলেন—টেঁচিয়ে
পড়; টেঁচিয়ে পড়লে খুব মনঃসংযোগ হয়। আমি ও-ঘর
থেকে শুনব। চিটি আজ রপ্ত ক'রে ফেলতেই হবে। কাক
আমি ওর থেকে জিজ্ঞাসা করব—

ওরা চলে যেতেই নীলাত্রি দরজায় খিল এঁটে বাঁচল।
উমা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়ে আবার চোখ বুজছে।

—উমারাগী?

—উ—

নীলাত্রি বিছানার ধারে এসে অল্পনয় আরম্ভ করল—
লক্ষীটি, চোখ মেল। দেখ, কি চমৎকার রাত! একটি বার
চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ—

উমাও বলল—চমৎকার।

—কি?

—আজকের রাত—

—তোমার মুখ ত এদিকে; এদিকের দরজা জানালা
বন্ধ—

উমা চোখ মেলে স্বামীর একাগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে
খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বলল—রাত্তির বেলা বদ
ঘরই ত খাসা—

—ঘুমোবার মজা হয়—না?

উমা বলল—আচ্ছা, ঘুমের 'পরে তোমার অত রাগ
কেন, বল ত? নিজের ঘুমোবার জো নেই—বই মুখস্থ করতে
হয়—অন্তের ঘুম দেখলে তাই হিংসা হয়—না?

নীলাত্রি গম্ভীর হয়ে বলল—এমন রাত্রি 'ঘুমনে
অপরাধ—

চপলকণ্ঠ উমা বলল—তোমার পেনাল-কোডে এসব
লেখা রয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ!—এবং ঘুমলে কি শাস্তি ত!-ও রয়েছে। শুনবে?

উমা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—রুকে কর, মশাই। এখন
নয়—কাল বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁকেই শুনিয়ে
দিও—

দরজায় করাঘাত। বাইরে থেকে বরদা ডাকছেন—
নীলে, নীলে—

প্রদীপ উল্কে নীলাত্রি তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়ে
বা মনে এল টেঁচিয়ে আশ্রিত করতে লাগল। সর্বনাশ,
গোলমালের মধ্যে পেনাল-কোড ত উপরে আনাই হয় নি—
আইনের কোন বই-ই নেই—খুঁজতে খুঁজতে কলুঙ্গির কোণে
মিলল, মায়ের আবেছড়া মহাভারতখানা। সেইটা সাগনে
নিয়ে সে প্রাণপণ চীৎকারে আইনের ধারা মুখস্থ ক'রে
চল।

আরও বিস্তর ডাকাডাকির পর মনোযোগী ছাত্র দবজা
থলে দিল। বরদার প্রসন্ন মুখ, ছেলের পাঠ অভ্যাস
বাইরে থেকে কিছু কিছু তাঁর কানে গিয়েছে নিশ্চয়। তিনি
সোজা উমার খাটের কাছে গিয়ে ডাকলেন—অ বউমা,
বউমা, ঘুমচ্ছ ত?—দেখতে এলাম।

ঘুমন্ত লোকে কথা বলে না; অতএব উমার জবাব
পাওয়া গেল না। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বরদা ছেলের দিকে
ঢেয়ে বললেন—বাঁড়ের মত ত চোঁচাচ্ছ। শুয়ে-শুয়ে
তাই মনে হ'ল, মা-লক্ষ্মীর ঘুমের অস্থবিধে হচ্ছে না ত?

নীলাত্রি বলল—তবে মনে মনেই পড়ি—

বরদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে বললেন—না, না—তাতে
কাজ নেই—আগাগোড়া মুখস্থের ব্যাপার, ও কি মনে মনে
পড়ার কাজ? বিশেষ, যখন কোন রকম অস্থবিধা হচ্ছে
না—কিন্তু সাবধান, সাবধান! পরের মেয়ে এসেছেন,
গিয়ে নিন্দে-মন্দ না করেন। ঘুমের ব্যাঘাত না হয়,
সেটা দেখবে।

নীলাত্রি বলল—তা দেখছি বইকি। ঐ ত—খুব
অসাড় হয়েই ঘুমুচ্ছে—

—তোমার বা কাণ্ডজ্ঞান, তোমার উপর আমি ভরসা
করি কি না। আবার এসে আমি খবর নিয়ে যাব—

মনের বিরক্তি গোপন করে সহজ হয়ে নীলাজি বলল—
নীতের দিনে বার-বার কষ্ট ক'বে আসবার দরকার
কি, বাবা ?

বাপ অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।—কষ্ট হয়, আমাব হবে।
তোমার তাতে ক্ষতিটা কি শুনি ? পরের মেসে এসেছে,
আমার নিজের মেসে নেই—তাকে একটু যত্নাশ্রিত করব,
তাতে তোমার হিংসে হয় বুঝি ?

তাড়াতাড়ি কৈফিয়তের ভাবে নীলাজি বলল—মানে,
বার-বার ছুয়োব খোলা—পড়াই মনঃসংযোগেব একটু ইয়ে
হয় কি না—

এতক্ষণে বরদার নজর পড়ল, দালানেব দিক্কার
জানলাগুলোও বন্ধ। বললেন—সমস্ত এঁটে দিবে অন্ধকূপ
ক'রে রেখেছ। তাই ঘর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি না
তোমার বাব-বার ছুয়োর খুলতে হবে না বাপু, জানলা খুলে
রাখ—আমি বাইরে থেকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'বে যাব—

উমা নির্ঝিকার নিবীহ মাগুখটিব মত প'ড়ে আছে ;
এবং সে যে ঘুমোয় নি, কোন দিক্ থেকে তার কোন প্রমাণ
পাওবা যাবে না। নীলাজির কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে
কেমন সন্দেহ হ'ল, চাপা হাসির প্রবাহে গুঠ তার একটু একটু
নড়ছে এবং চোখজুটো মিটমিট করছে। অথচ এর
প্রতিকার নেই। সূচ পড়বার শব্দও খোলা জানলার পথে
বাবার শব্দভেদী কানে গিয়ে পৌঁছবে, এবং যে-কোন মুহূর্তে
জানলায় উদয় হয়ে তিনি প্রাণ করবেন—চিঠি শেষ হ'ল ?

নীচের ঘব থেকে সে পেনাল-কোডখানা নিয়ে এল।
উমার শিয়রের দিকে খানিকটা দূরে টেবিল টেনে আনল।
তার পর যথাসম্ভব উমার কর্ণবিবর লক্ষ্য ক'রে আকাশভেদী
কণ্ঠে পড়া শুরু কবল। ঘুমোব ঘোবে উমা পাশ ফিরল,
পড়া আরও তীব্র হ'ল ; ঘুমের ঘোবেই বোধ করি হুগোব

হাতখানা কানের উপর চাপা দিয়ে এসে পড়ল, বিপুলতব
উৎসাহে নীলাজি আরও গলা চড়িয়ে দিল।

জানলার ওদিকে এসে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—
নীলু, কি আরম্ভ করেছিস ? বাড়িহুঙ্ক কাউনক ঘুমুতে দিবি
নে ?

নীলাজি একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখে মুহূর্তে
বলল—বাবা যে বললেন—

—ওঁর কি, একটা কিছু বললেই হ'ল ! মা-লক্ষীর জন্ত
এদিকে দরদ উথলে ওঠে,—আরে, এ পড়াই যে মরামাহুয
ডাক ছেড়ে জেগে ওঠে—

বরদাও সঙ্গে এসেছিলেন। বিরক্ত ভাবে তিনি
বললেন—আবাব ওর এগ্জামিন, সেরা দেখতে
হবে ত ?...তা নীলে, বরঞ্চ যতটা পড়েছ এ-ন মনে মনেই
আবৃত্তি কর। চিঠি-এর কত দূর ?

নীলাজি বলল—আজ্ঞে, রপ্ত হয়ে গেছে—

সৌদামিনী বললেন—আবার জানলা খুলে দিয়েছিস
কেন রে, নীলে ? চোখে আলো গিয়ে লাগছে ; ঘুম হচ্ছে না !

নীলাজি বলল—বাবা যে বললেন—

বরদা সদয় হয়ে বললেন—তা নীলে, এ-ন বরং জানলা
বন্ধ করেই পড়। ওঁর যখন ঘুম হচ্ছে না—ওঁব শরীরটে
আজ ভাল নেই—

সশব্দে জানলা বন্ধ হতেই বরদা মনো আনন্দ আব
গোপন রাখতে পারলেন না। হেসে হাত-মুৎ নেড়ে বলতে
লাগলেন—দেখছ গিন্নি, একবার ফেল হয়ে তোমার ছেলের
কি রকম পড়াশুনোয় চাড় হয়েছে ! বারোটা কখন বেজে
গেছে, পড়তে পড়তে তা হ'লই নেই। আমি আবার
ওদিকে চুবি ক'রে ঘড়ির কাঁটা পনের মিনিট পেছিয়ে
বেখেছিলাম। নীলে এবার ঠিক পাস হয়ে যাব—

সংস্কৃতসাহিত্যের পাখী ও তাহার নামতালিকা

শ্রীসত্যচরণ লাহা

আমাদের সংস্কৃতসাহিত্যে পাখীর এমন ভূরি ভূরি নাম পাওয়া যায়, অনেক সময় তাহাদের অল্পবিস্তর পরিচয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, শুধু যে সাহিত্যের উপাখ্যানগুলির মধ্যে বর্ণিত নায়কনায়িকার সঙ্গে তাহাদের কাহিনী ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকিলেও কবিকল্পনা হিসাবে লিপিতাৎপরের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ সেই পরিচয় বাস্তব হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন গণ্য করিতে হইবে এমন কিছু কথা নাই, পক্ষি-বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এ-সম্বন্ধে কালিদাসসাহিত্যে প্রকৃতি-বিশ্লেষণতত্ত্ব লইয়া গবেষণায় পূর্বে আমি দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি—এই সমস্ত পাখীর নাম ও তৎসম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় বিপুল সংস্কৃতসাহিত্যের স্তরে স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে গ্রথিত হইয়া আছে, তাহাদের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে ও স্বরূপনির্ণয়ে আমরা একেবারে উদাসীন, তাই তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা এত অধিক। আমাদের শাশ্বত ধর্ম্মগ্রন্থে, বেদে পুরাণে, নীতিশাস্ত্রে, কাব্যনাটকে, বৈদ্যক, জ্যোতিষ ও কোষগ্রন্থমধ্যে প্রচুর পাখীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত পরিচয়ের ধ্বংসশৃঙ্খল একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক আলোকপাতে তাহাদের সারবস্তুনির্ণয়ের চেষ্টা কখনই অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। পরন্তু প্রতীচ্যে, এমন কি প্রাচ্যে, শাবা সভ্য জগৎ জুড়িয়া বিজ্ঞানের যে গবেষণা ও আন্দোলন চলিতেছে ভারতবর্ষের প্রাক্তন শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা হইতে তাহার সহযোগী কোন উপকরণ শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানোন্নতিকল্পে যোগাইতে পারা যাইবে না? পক্ষিতত্ত্বজিজ্ঞাসাব উপাদান-হিসাবে মনে হয় আমাদের সংস্কৃতসাহিত্য মন্বন কবিতা এইরূপ পাখীর নামতালিকা ও পরিচয় সংগ্রহের প্রয়াস পাইবার প্রকৃষ্ট সময় উপস্থিত।

আধাসাধ্য এই কার্য সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া এইরূপ সংগ্রহপ্রচেষ্টার ফলে আমি যতটুকু কৃতকা

হইতে পারিয়াছি তাহাতে যে তালিকাগঠনের সুবিধা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি; বর্ণনাক্রমিকভাবে তালিকাটি সজ্জিত করা যাইতেছে। আপাততঃ ইহা প্রাথমিক বা provisional হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। তালিকার নামগুলি সম্বন্ধে অনেক স্থলেই স্পষ্ট ধারণা আমাদের সহজ হয় না; প্রামাণ্য কোষগুলিতে এই সমস্ত নামের উল্লেখ প্রায় নাই, কখন কখনও হয়ত মাত্র একটি কোষগ্রন্থেই কোন পাখীর নাম দেখা যায়, অল্প বহু, তাহাতে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠে এবং পাখীর সংস্কৃত নামগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়া পক্ষিবিজ্ঞানের দিক্ হইতে তাহাদের স্বরূপনির্ণয় বিষয়ে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এই সকল জটিল ক্ষেত্রে হঠাৎ কোন ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিতে গেলে বিষম ভুলভ্রান্তিই সম্ভাবনা, তাই পুনর্বিচার ও দীর্ঘ আলোচনার অবকাশসাপেক্ষে আমি মন্তব্যপ্রকাশে বিরত रहিলাম। তালিকাভুক্ত নামগুলির মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক ও সন্দেহের নিরাকরণ হইয়া স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছিতে পারা গিয়াছে তাহাদের স্বাধাধ পরিচয়হিসাবে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নামগুলি লিপিবদ্ধ করিতে কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করি নাই।

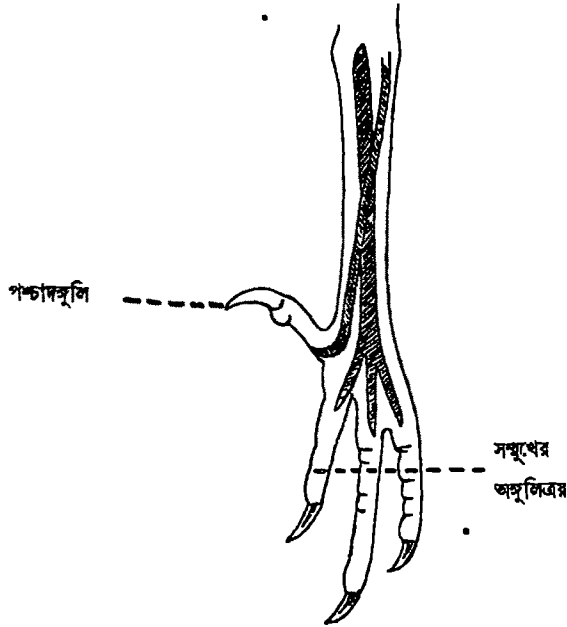
অকিঞ্চন—ময়ূর।

অর্গোক—পাখীর সাধারণ সংজ্ঞা। এই অর্থে “নগৌকা” শব্দও ব্যবহৃত হয়। অমরকোষে পাখীর ২৭টি সাধাধ সংজ্ঞার অন্ততম বলিয়া ইহার নির্দেশ আছে।

বৃক্ষ বা পর্বতবাসে অভ্যস্ত পাখী।

বিশেষার্থদ্যোতক হিসাবে বৃক্ষশাখাশ্রয়ী দণ্ডবাসনিপুণ পক্ষী; পক্ষিবিজ্ঞানে একপ একান্ত বৃক্ষবাসে অভ্যস্ত পাখীরা বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত এবং তজ্জন্ত একটি স্বতন্ত্র বর্গভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়; Passeres অথবা Perching bird আখ্যায় তাহা অভিহিত। পদ ও পদাঙ্গুলির গঠনবৈচিত্র্যে

বৃক্ষশাখা সহজে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলাফেরার যে সুবিধা আছে তাহাতে ভূচর অথবা জলচারী বিহঙ্গ হইতে তাহাদের প্রভেদ প্রধানতঃ সূচিত হয়,—পায়েব এই বৈশিষ্ট্যকে passerine লক্ষণ বলে। পায়েব চারিটি অঙ্গুলির মধ্যে তিনটি পুরোভাগে এবং একটি পশ্চাতে এমনভাবে বিস্তৃত যে সামনের অঙ্গুলিগ্রন্থ পশ্চাদিকে গুলফনিম্নে বঁকাইয়া সমান্তবালভাবে এবং পশ্চাদঙ্গুলিটি পুরোভাগে হেলাইয়া



দৃঢ়রূপে ভালপালা আঁকড়াইয়া ধরা সহজ হয়। পায়ের প্রধান মাংসপেশীরয়ের একটি ত্রিখাভিভক্ত হইয়া সম্মুখের তিনটি অঙ্গুলিতে এবং অপর পেশীটি সোজাহুজি পশ্চাদঙ্গুলিতে এমনভাবে মিশিয়াছে যে তাহাতে সামনের ও পশ্চাতের অঙ্গুলিগুলির বিপরীত মুখে সন্নিবেশ সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

অগ্নিচূড়—কুঙ্কট, বনকুঙ্কট। ইহার যে চূড়া বা শিখা দেখা যায় তাহা অবশ্য গুংগক্ষীটার মাত্র, তজ্জন্তু ‘শিখাণ্ডিক’ এমন কি ‘শিখী’ নামও অন্ত্যন্ত নামের সঙ্গে পাওয়া যায়। এই শিখা অনাবৃত মাংসপিণ্ডবিশেষ, তাহাতে কোন লোমশ বা পতত্রের আচ্ছাদন নাই; শিখার বর্ণ অগ্নির জ্বায় বলিলে বিশেষ দোষ দেখা যায় না, যেহেতু বনকুঙ্কটের comb বা চূড়ার বর্ণ পক্ষিভস্মেব দিক্ হইতে বিরূত হইয়াছে—

brick red to scarlet red। এই পরিচয় হইতে ‘অগ্নিচূড়’ ‘তাম্রচূড়’ ‘স্বর্ণচূড়’ প্রভৃতি আখ্যান্ডিলি বার্থকতা কতকটা উপলব্ধি হয়।

অগ্নিসহায়—কপোত, বনকপোত, ঘূঘু।

রাজনিকটুতে ইহাব কিঞ্চিৎ পরিচয় ও ক্ষেপটি নামান্তঃ পাওয়া যায়,—

জ্যং কপোতঃ কোকদেবো ধূমরো ধূম্রলোচনঃ।

দহনোহগ্নিসহায়ন্ত ভীষণো গৃহনাশনঃ।

সহজে প্রতীয়মান হয় যে এই পাখী অগ্নিভস্মাঙ্গী। ঘূঘু সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ সংস্কার আছে, পারাবত সম্বন্ধে কিন্তু নয়, বরং পারাবতের যে ‘ঘরপ্রিয়’ আখ্যা দেখা যায় তাহা হইতে ‘গৃহনাশনের’ বিপরীত ভাব ব্যক্ত হয়।

‘বন্তপারাবত,’ ‘wild pigeon’ (কোন কোন অভিধানে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে) ইত্যাদি পরিচয় এই কারণেই গ্রহণ করা চলে না।

কপোত শুধু পারাবতকে বুঝায় না, বিহগাস্তর অর্থাৎ ঘূঘুকেও নির্দেশ করে;—পারাবতঃ কপোত জ্যং কপোতে বিহগাস্তরে” ইতি বিধঃ।

‘অগ্নিসহ’ শব্দ ‘ধূম্রবর্ণ পারাবত’ অর্থে ‘বিশ্বকোষে’ পাওয়া যায়। এই শব্দ ‘অগ্নিসহায়’ের সমার্থবাচক বলা যাইতে পারে, তাহাতে ‘ধূম্রবর্ণ পারাবত’ অর্থ করিলে অসমীচীন বিবেচিত হয়।

অগ্রজ—কাকবিশেষ; ভাসপক্ষী (বৈদ্যকশবসিদ্ধ)।

অজারক—“বিহগাস্তর” (নানার্থার্থবসংক্ষেপ), পক্ষি-বিশেষ।

অজারচূড়ক—প্রত্যহ পক্ষীদিগেব অহন্তম। চরকের টাকাকার গজাধর ইহাকে বলবুল বলিয়াছেন।

অজির—তিস্তির (বৈদ্যকশবসিদ্ধ)।

অজু—বৈজয়ন্তীতে পাখীর ৩০টি সাধারণ সংজ্ঞার অন্ততম বলিয়া ইহাব উল্লেখ আছে।

অজুবাক—পক্ষী (নানার্থার্থবসংক্ষেপ)।

অজুষ—পক্ষিসাধারণ (নানার্থার্থবসংক্ষেপ)।

অচলুষ্টি—কোকিল।

অজয়—হংস।

অজাল—কোকিল (বৈদ্যকশবসিদ্ধ)।

আটি—বৈদ্যকশব্দসিদ্ধি গ্রন্থে এই শব্দ দেখা যায় এবং ইহার অর্থ লিখিত হইয়াছে—“শরারিপক্ষিণি। হলা।” প্রকৃতপক্ষে হলায়ুধে ‘আটি’ শব্দ পাওয়া যায়, ‘আটি’ নহে। বিশ্বকোষেও এইরূপ ভুল উক্তি করা হইয়াছে।

অণ্ডজ—পক্ষিসাধারণ।

অণ্ডক—টিট্টিভ। বৈজ্ঞানিক নাম *Lobivanellus indicus* (Boddaert)। বোধ করি পাখীটার প্রস্তুত ভিষের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ এই নামকরণ হইয়াছে। মৎপ্রণীত “জলচারী” গ্রন্থ (১৯৩৫) হইতে ইহাব কিঞ্চিৎ পরিচয় (৫৩-৫৪ পৃ.) উদ্ধৃত হইল,—

“ভূমিতল সমতলস্থিত ভিষগুলির নিকটে কাহাকেও আসিত দেখিলে সে (টিট্টিভ) চঞ্চল হইয়া উঠে; ছলে কোশলে আগন্তুক সেখান হইতে দূরে লইয়া বাইবার জন্ত সে বিচিহ্ন ভঙ্গীতে কখনও উড়িতে থাকে, কখনও বা ভূমিতে অবতরণ করিয়া কষ্টযন্ত্রে ও গতি-ভঙ্গীতে পথিককে প্রলুব্ধ করিয়া অন্যত্র লইয়া বাইবার চেষ্টা করে। পক্ষতন্ত্রের টিট্টিভী বখন ভিষ এসব করে নাই, তখনই তাহার হুসিদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে কেমন করিয়া অণ্ডগুলিকে সর্বগ্রাসী সমুদ্রের ববল হইতে রক্ষা করা যায়। সাগরতরঙ্গে ভিষ বখন ভাসিয়া গেল, তখন দেবতার শরণাপন্ন হইয়া তাহার উদ্ধারসাধন করা হইল। পক্ষের নখা হইলেও বোধ করি ইহার মধ্যে টিট্টিভচরিত্রের একটি বিচিহ্ন রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।”

অতায়ী—গৃহস্থত্বের কৃষ্ণমিশ্রকৃত ভাষ্যে এই শব্দ দেখা যায়—অর্থ দেওয়া আছে ‘চিহ্ন’। বাস্তবিক বিষ্ণু ‘অতায়ী’ শব্দের প্রয়োগ এই অর্থে প্রসিদ্ধ।

অতিচর—পক্ষিভেদ (বৈদ্যকশব্দসিদ্ধি)।

অতিজাগর—নীলক্ৰৌঞ্চ; রাজনিষট্টুতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়—“নীলক্ৰৌঞ্চস্ত নীলাঙ্কো দীর্ঘগ্রীবোহতিজাগরঃ”। এই পরিচয় হইতে দীর্ঘ গ্রীবা এবং দেহের নীলবর্ণ ইহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। ‘অতিজাগর’ বকের সাধারণ লক্ষণ মাত্র, সকল বকই প্রায় সম্ভ্রায় এবং অতি প্রতুষে দিবালোকের আবির্ভাবের প্রাক্কালে জাগরুক থাকিয়া আহাৰ্য্য সন্ধান করে।

গোড় দেশের ‘কৌচ বক’ বলিয়া রাজনিষট্টুর টীকায় ইহার পরিচয় দেওয়া আছে; কিন্তু এই অত্যন্ত সাধারণ বকের বর্ণ নীল নয়, গলদেশও বিশেষরূপে দীর্ঘ এবং বলা

সলে না। বিশ্বকোষে এই ‘অতিজাগর’ বিহ্বকে ‘কোয়া বক’ বলা হইয়াছে। ‘কোয়া বক’ কিন্তু ‘ওয়াক বক’র নামান্তর মাত্র, এবং যদিও ইহার দেহের অল্পবিস্তর ধূসরতা নীলাভ প্রতীয়মান হয়, তথাপি এই বিহ্ব অস্ত্রাঙ্গ বনের তুলনায় ‘দীর্ঘগ্রীব’ আদৌ নয়। ‘হুঁড়ো বক’র সঙ্গেও এই কারণে ‘নীলক্ৰৌঞ্চ’র সাম্যনিরূপণ হয় না, যদিও ইহার আকৃতি অত খ্যাবড়া নয় এবং ইহার দেহবর্ণের ভাস্বর হরিৎ আভার মধ্যে কিঞ্চিৎ নীল-ধূসরের সমন্বয় অন্বিনীত।

বকবংশের মধ্যে দীর্ঘ গ্রীবা *Ardea*-গণভুক্ত বকদিগের বৈশিষ্ট্য,—সাধারণতঃ এই বকেরা ‘কক’ বা ‘কাঁক’ নামে পরিচিত। যে কাঁকের বৈজ্ঞানিক অভিধা *Ardea cinerea* Linn. সাধারণ ইংরেজের নিকট সে *Blue Heron* অথবা *Grey Heron* নামে খ্যাত। ভাস্কর্য ইহার দেহাংগ-বিশেষে প্রাধান্য লাভ করিতে দেখা যায়। ‘অতিজাগর নীলক্ৰৌঞ্চ’র সঙ্গে ইহার স্বরূপনির্ণয়ে বোধ করি বাধা হয় না।

মনিষ্যর উইলিয়ম্‌স্‌ব অভিধানে ইহার *Black Curlew* বলিয় যে উল্লেখ আছে তাহা আপত্তিজনক বিবেচনা করি; প্রথমতঃ দেহের বর্ণসম্বন্ধে যাহা নীল বা নীলাভ তাহা কখনই কালো হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ক্রৌঞ্চ বা বকবিশেষকে *Curlew* বলিলে পক্ষিতত্ত্বের দিক্ হইতে বিষয় ভুল করা হয়।

অতুহ—দাতুহ, ডাহক বা ডাকপাখী। বৈজ্ঞানিক নাম *Amaurornis phoenicurus* (Pennant)। চরকের মতে ইহা প্রতুদ পাখীদের অন্ততম।

আভিধানিক অর্থ—‘অতিশয়বিতর্ক’ অর্থাৎ অত্যন্ত কলরবকারী বিহ্ব। মেদিনীকোষে ইহাব পরিচয় আছে—“কালকর্ষ খগে পুমান্”—কালে অর্থাৎ বর্ষাকালে কর্ষ অস্য, বর্ষাকালে যাহার কর্ষধ্বনি বেশী শুনা যায়। ইহার যে-কয়টি নামান্তর (যথা দাতোহ, কালকর্ষ, মাসঙ্গ, শিতিকর্ষ, কাচটুর) শব্দরত্নাবলীতে প্রদত্ত আছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা আমার “জলচারী” গ্রন্থে (১৯৩৫) দ্রষ্টব্য (১৫-১৭ পৃষ্ঠা)।

ইহা ‘নীলকর্ষ খগ’কেন্দ্র বুঝায়; ‘অতুহা’ দ্রষ্টব্য।

অত্যা—“নীলকণ্ঠ খগে স্বয়ং” (নানার্থার্থবসংক্ষেপ)
পুংলিঙ্গ ও ত্রীলিঙ্গে নীলকণ্ঠ বিহঙ্গ বা ময়ূরকে
বুঝায়।

অধর—জলপক্ষিবিশেষ (নানার্থার্থবসংক্ষেপ)।

অধ্বগক্ষমী—পক্ষী (বৈদ্যকশব্দসিদ্ধ)।

অনন্তু—চাতক।

অনিমক—কোকিল।

অম্বগ—পাখীর সাধারণ সংজ্ঞা।

অম্বভাস—কাকবিশেষ (বৈদ্যকশব্দসিদ্ধ)।

অম্বলাস—ময়ূর।

অম্বলাস্যা—ময়ূর।

অনেকজ—পক্ষী।

অম্বকাক—কাকাকার পক্ষী। পানকোড়ি (বৈদ্যকশব্দ-
সিদ্ধ)।

বিজ্ঞান নদীর কূলে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান নদীর কূলে

কল্পনা দিয়ে বাঁধিয়াছি ঘর, সাজাই স্বপন-কূলে।

স্বমুখে বহিছে দূর দিগন্তে উছল লহরী-দল

গানে গানে তারা আকাশ-বাতাস করি তোলে চঞ্চল,

দিবস রজনী ভবি ওঠে গানে, ভরি ওঠে সারা হিয়া

জীবন হেথায় কুসুম-কোমল, আলোক-মধুর, প্রিয়া।

সৌরভে নিঃশ্বসি

আমাদের ঘিরি পাপুড়ির মত দিনগুলি যায় খসি।

সন্ধ্যা সে যায় চলি

মুঠিতে ছড়ায় কালো-কুসুম মুখ চাদেদো ছলি।

আঁখি মেলি চাঁদ থমকি দাঁড়ায়, পলায়েছে প্রিয়া তাব

খঁসে পড়ে গেছে স্নেহবসনার কটিব তাঁর হাব।

এমনি করিয়া সন্ধ্যা-সকাল চলিছে প্রেতের খেলা

ফুল-পাখা মেলি দ্রুত উড়ে যায় দিনরাত ছুই বেলা।

নাহি কোন কলরব—

ঢেউয়েব ওপার সুনীল আকাশে মিলায়ে গিয়েছে সব।

হেথায় মোহিনী মায়া,

দিকল বিত্তরে মদির আলোক, রাজি মোহিনী ছায়া।

উষার হাসির অমিষ-পিয়াসে দিবস ছুটিয়া চলে,

কে জানে কোথায় দূর দিগন্তে মিলায় গগন-ভলে!

দিন চলে যেতে সন্ধ্যা সে নামে, রাঙা মেঘে গা এলায়,

বুকের বসন টুটিতে অমনি হেসে চায় ছলনায়।

জলের মুকুরে তাব

এলানো শাড়ী ব রঙ-ছায়া পড়ে ক্ষুবে ঘোঁরন-ভার।

শুধু স্বপনের রাশি

শ্রোতের কুসুম দূর হতে আসি কোথা দূরে যায় ভাসি।

জীবনের তাপ নিবিয়া গিয়ছে, সোনালী মেঘের পুতী

ভাঙিছে গড়িছে কে যেন মাথাবী মনো আকাশ জুড়ি,

আপন খেলালে মণি-রতনের রচিছে ইন্দ্ৰজাল,—

চিরমুগ তার বহে সম্পদ, জানে মায়া তিরকাল ;—

আমি বিশ্বস্র-ভরে

শুধু হেবি কত বরণ-বিলাস আঁকিছে নে থবে থরে!

P30131

ডাক-হরকরা

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার ডাকে চলিয়াছে।

প্রাণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—তাহার উপর আকাশে দুর্ঘোষ ; মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তারানাই—সাধারণ অন্ধকাবন মধ্যে থাকে যে স্বপ্ন স্বচ্ছতা তাহাও নাই—ঘন মেঘের কালো ছায়ায় প্রগাঢ় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবী যেন হারাইয়া গিয়াছে। চারি পাশে শুধু অজস্র সঞ্চারমান জোনাকীর দীপ্তি জ্বলে আর নেবে—জ্বলে আর নেবে যেন অসীম অনন্ত গাঢ় মৃত্যু-পরিব্যাপ্তির মাঝখানে ক্ষণস্থায়ী জীবনদীপ্তি জ্বলজ্বলান্তরের মধ্য দিয়া বিকাশ পাইয়া পাইয় চলিয়াছে।

অকস্মাৎ রাস্তার একটা কাদা-ভরা গর্তে গরুর গাড়ীখান পড়িয়া একটা ঝাঁকুনি খাইতেই ডাক্তারের চিন্তার ঘোঁকাটিয়া গেল। চারি পাশে জলভরা মাঠে ব্যাঙের চীৎকার—আশেপাশের বৃক্ষপল্লবের মধ্যে ঝাঁঝির ডাক—তাহারই সঙ্গে গরুর গাড়ীখানার চাকার বিনাইয়া বিনাইয়া কায়ার স্বরের মত একটি সঙ্কল্প দীর্ঘ শব্দ বেশ শোভন ভাবেই মিশিয় গিয়াছে। বাস্তার পাশের গাছগুলির পাতায় পাতায় জল বরিতেছে টপ্‌টপ্‌—টপ্‌টপ্‌। ডিক্টে বোর্ডের পাকা রাস্তা হুড়িপাথরের কঠিন বন্ধুবতার উপর দিয়া গাড়ীখানা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ডাক্তার একদৃষ্টে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল। দূরে যেন একটা জোনাকী অনির্বাক দীপ্তিতে জ্বলিতেছে, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সেটা এই দিকেই আসিতেছে।

ডাক্তার গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল—ওটা কি আলো অটল ?

বর্ষার রাতে অটল যুমে ঢুলিতেছিল—সে একবার জোর করিয়া চোখ খুলিয়া দেখিয়া বলিল—কে জানে মশায় ! অঁই—অঁই—ই—গরুকে কি বলতে হয় বল দেখি বলিয়া গরু দুইটিকে একবার তাড়না করিয়া আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিল।

হা আলোই ওটা, ক্রমশঃ দীপ্তিটা উজ্জলতব হইয়া উঠিতেছে—বিন্দুর আকার হইতে ক্রমশঃ আকারে বড় মনে হইতেছে। আলোটা দ্রুতবেগে এই দিকেই আসিতেছে ! ডাক্তার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই দুর্ঘোষ মাথায় করিয়া কে এমন ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে ! রোগীর বাড়ীর লোক নয়ত !

ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্—মুছ ঘণ্টার শব্দ ডাক্তারের কানে আসিল। ডাক্তার হাঁকিল—কে ? কে ? কে আসছে ?

উত্তর আসিল—ডাক ! সবকার বাহাদুরের ডাক ! ডাক-হরকরা আমি।

বলিতে বলিতে লোকটি নিবটে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টা-ধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, লোকটির হাতের আলোতেই ডাক্তার দেখিল—বঁটে, কালো, আধা-বহসী এক জোয়ান কাঁধের উপর মেলব্যাগ বুলাইয়া সমান একটি তাল বজায় রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। তাহার মাথায় ছোট একটি মাথালী, একহাতে একটা বল্লম—ওই বল্লমটারই ফলার সঙ্গে বুলানো ঘণ্টা ঝুন্ ঝুন্ শব্দে বাজিতেছে।

ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কে রে, দীহু ?

দীহু ডোম ডাক-হরকরা, মেলবাণার, সাত মাইল দূরবর্তী আমদপুর স্টেশন হইতে ডাক লইয়া চলিয়াছে হরিপুর পোষ্ট আপসে।

সচল দীহু উত্তর দিল—আজ্ঞে হা।

—কতটা বাজি হ'ল বল দেখি দীহু ?

—আজ্ঞে তা বাত ভেঙে এসেছে—তিন পহর গড়িয়ে এল আর। দীহুর কথা শেষ অংশের সাড়া আসিল গাড়ীর পিছন দিক হইতে। মেলবাণার সমান বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কথা বলিতে বলিতেই সে গাড়ী অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঘণ্টার শব্দ ক্রমশঃ মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল, আলোব শিখাটা ক্রমশঃ আবার পরিধিতে হ্রাস পাইয়া বিন্দুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

অটল কখন জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ডাক্তার বাবু—ওই বস্তার ভেতরে কি থাকে ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিল—চিঠি রে, চিঠি ! কত দেশ-দেশান্তরের খবর, বুঝিলি ? এই এক-শ ছ-শ পাঁচ-শ কোশ দূরে যা-সব ঘটেছে, সেই সব খবর ওই ব্যাগের মধ্যে থাকে ।

অটল নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল—দেশ-দেশান্তরের খবর ! কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিল না । অবশেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—উঃ সাথে বলে বায়ের আগে বাত্মা ছোটো ।

বায়ুরও আগে বাত্মা নাকি ছুটিয়া চলল ! ডাক্তার পিছনের অঙ্গকারের দিকে চাহিয়া ঐ কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে ডাক-হরকরার সন্ধান করিতে চেষ্টা করিল । কটার শব্দ আর শোনা যায় না, অসংখ্য খজোৎ দীপ্তির মধ্যে ডাক-হরকরার আলোক জোনাকীর আলোর মতই ক্ষুদ্র হইয়া হারাইয়া গিয়াছে । ডাক্তার অটলকে বলিল—বায়ের আগে বাত্মা ছোটো ! কথাটি বেশ, অটল !

ডাক্তারের গাড়ী অঙ্গকার পথ ধরিয়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল ।

* * *

ডাক-হরকরা তাহার অভ্যস্ত নিদ্রিষ্ট গতিতে ছুটিতে ছুটিতে চলিতেছিল । হাতের হারিকেনটার শিখা দ্রুত গমনের জন্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধোঁয়ায় চিমনীটাকে প্রায় কালো করিয়া তুলিয়াছে । দীর্ঘ হাতে বস্ত্রমটা বেশ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ । মাথায় মাথালীটা দড়ি দিয়া চিবুকে বাঁধা—মাথালীতে শুধু মাখাই বাঁচিয়াছে—দীর্ঘর সমস্ত শরীর জলে ভিজিয়া গিয়াছে । হঠাৎ বৃষ্টিটা জোরে নামিল ।

দীর্ঘ কিন্তু সমান বেগে চলিতেছিল—এই ছুটিয়া চলাটা তাহার বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে । তাহার কাঁধে সরকারী ডাক, পথে তাহার এক মিনিট বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, হুকুম নাই । গতি পর্যন্ত শিথিল করিতে পাইবে না । ডাকবাবু বলেন—এক মিনিটের ফেরে হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে দীর্ঘ ।

দীর্ঘর বুকটা শব্দায় কেমন শুব-শুব করিয়া উঠে । আবার একটু গৌরবও অল্পভব করে ।

তাহাদের পাড়ার নোটন ডোম চৌকিদারি কাজ করে, দীর্ঘ তাহাকে বলে—এ বাবা তোমাদের চৌকিদারি কাজ নয় যে, ঘরে শুয়েই জানলা থেকে ছুটো হাঁক মেলেই খালাস, চাকরি হয়ে গেল ! এ হ'ল সরকারী ডাকের কাজ—এক মিনিট দেরি হ'লেই—বাস—হাতে হাতকড়া !

আজ সাত বৎসর দীর্ঘ ডাক-হরকরার কাজ করিতেছে ; প্রত্যহ রাত্রে সে ডাক লইয়া যায়—লইয়া আসে, কিন্তু কোন দিন তাহার এক মিনিট বিলম্ব হয় নাই । স্বয়ং সে-বার পুল ভাঙিয়া এক দিন কলিকাতার ডাকগাড়ী আসে নাই—এক দিন পথে মালগাড়ী ভাঙিয়া রাজা বন্দু হওয়ায় পশ্চিমের ডাকগাড়ীর আসিতে পাঁচ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘ ঠিক সময়ে যায়—ঠিক সময়ে আসে ।

শ্রাবণ-রাত্রির আকাশে মেঘ যেন জমাট অঙ্গকার, মধ্যে মধ্যে সে অঙ্গকার বিদীর্ণ করিয়া অঙ্গগব-জিহবার মত বিদ্রাৎ-রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া খেলিয়া যাইতেছিল । সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মেঘের গম্ভীর মুহু গর্জন—দূরের লাইনের পুলের উপর ডাকগাড়ীর শব্দেব মত দীর্ঘর মনে হয় । অকস্মাৎ একটা স্তম্ভী নীল আলোকে দীর্ঘর চোখ যেন বলসিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ কঠোর বজ্রধ্বনিস্তে সমস্ত যেন থন থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল । মুহূর্তের জন্ত ত্রাসে বিহ্বল হইয়া দীর্ঘ বলিয়া উঠিল—রাম—রাম—রাম !

দূবে কোথায় বাজ পড়িয়াছে ! মুহূর্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘ আবার তাহার অভ্যস্ত গতিতে ছুটিয়া চলিল । বস্ত্রমের কটা বাজিতে আরম্ভ করিল—ঝুন—ঝুন—ঝুন—ঝুন ।

ডাকঘরে যখন সে পৌছিল, তখন ভোর হইয়াছে । মেঘাচ্ছন্ন আকাশেব পুঞ্জিত মেঘস্তর পরিষ্কার রূপে চোখে সন্মুখে ছুটিয়া উঠিয়াছে । ডাক নামাইয়া দিয়া দীর্ঘ একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল—উঃ বাজ যা আজ একটা পড়ল বাবু—সাতীন বাজ । বাপরে—বাপরে ! পোষ্টমাস্টার বলিলেন—ওঃ বিছানাতে থেকেই আমি লাঞ্ছিত উঠেছিলাম দীর্ঘ ।

তার পর দীর্ঘর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এ—ভিক্রে গিয়েছিঁস যে রে—এ্যা । দাঁড়া বাবা, ইনশিওর-রেজিস্ট্রীগুলো দেখে নিয়ে তোর ছুটি করে দিই—তুই বাড়ী গিয়ে কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল !

দীঘ বলিল—তামাক দেন কেনে একটুকু, সাজি একবার। উঃ বড় কাঁপুনি লেগেছে মশায়।

অন্তঃপুর পোষ্টমাষ্টার ইনশিওর-রেজিস্ট্রী লইয়া বসিলেন, পিয়ন চিঠিগুলির উপরে খট্ খট্ শব্দে ছাপ মারিতে আরম্ভ করিল, দীঘ আপন মনে তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল। তাহার শীত করিতেছিল, কিন্তু উপায় নাই—ডাক না মিলিলে তাহার ছুটি হইবে না।

—কই হে কাগজখানা দাও দেখি, যুদ্ধের খবরটা একবার দেখি! ইহাবই মধ্যে এই ভোরেই জনকন্ডেক লোক পোষ্টপিসের দ্বারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কালী বাবুর সংবাদপত্রের সংবাদেব জন্ত উৎকট নেশা—তিনি হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আর ছিল গোবিন্দ রায়। লোকটি স্কুল-মাষ্টাব, তাহার নেশা যত ফ্রি-স্ম্যাম্পেলের উপর। ‘বিনামূল্যে’ দেখিলেই গোবিন্দ রায় সেখানে চিঠি লিখিয়া বসিবে। জার্জেন্টী হইতে বিনামূল্যে সে তাহার কোম্পি তৈয়ারী কবাইয়া আনিয়াছে। সে প্রত্যহ আসে, পাছে তাহার স্ম্যাম্পেল গোলমাল করিয়া অল্প কেহ লইয়া লয়! আর আসিয়াছিল আঁকাবাঁকা হাতেব লেখা সিটির জন্ত কম জন যুবক। প্রোট বমানাথ চাটুজ্জেও আজ আসিয়াছিল—দূর দেশে তাহার জামাইয়ের খুব অসুখ; চাটুজ্জে উৎকণ্ঠিত হইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। প্রত্যেকখানি চিঠির ঠিকানা পিয়ন পড়িয়া শেষ কবে—এ দিকে চাটুজ্জে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, এ চিঠি তাহার নয়।

ইনশিওর-রেজিস্ট্রীর কাজ শেষ হইয়া গেল, দীঘর এবার ছুটি, সে বাড়ী চলিল। হাতে তাহার খান-হুই রঙীন খাম—কাহার ছেঁড়া চিঠির ফেলিয়া দেওয়া খাম—সে-কয়খানা ফে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল।

পোষ্টমাষ্টার বসিলেন—গরুর ঘাস দিতে এত দেরি কবিস কেন দীঘ! একটু সকালে সকালে দিল।

ডাকবাবুর গরুর জন্ত ঘাস দীঘকে দিতে হয়।

—তাই আনব। বলিয়া দীঘ চলিয়া গেল।

পথে রমানাথ চাটুজ্জেব বাড়ীতে তখন মেয়েদেব বুক-ফাটা কান্নার বোল উঠিয়াছে। সে ধ্বনির মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা-স্পর্শে এই প্রভাতেও আবহের আকাশ ঘন কাদি-কাদি করিতেছিল।

দীঘ চলিতে চলিতেই একবার আপন মনে বলিল—
আহ!

* * *

বাড়ীতে আসিয়া পাঁচ বছরের মেয়ে লক্ষ্মীর হাতে খাম দুইখানি দিয়া দীঘ বলিল—কেমন খাম এনেছি দেখ লক্ষ্মী! কেমন ছবি, আবার কেমন সু-বাস উঠছে দেখ! বেলাত থেকে এসেছে চিঠি।

লক্ষ্মী খাম দুইখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিল—চিঠি কি বাবা?

—কালি দিয়ে কাগজে সব নেকা থাকে মা!

—কি নেকা থাকে বাবা?

—ভূমি কেমন আছ—আমি ভাল আছি—

—আর?

আর কি থাকে—দীঘর মনে সেটা জোঁগাইল না, সে চূপ করিয়া রহিল।

মেয়ে আবার প্রশ্ন করিল—আর?

অকারণে বিরক্ত হইয়া দীঘ এবার বলিল—জানি না মা। আবার কি থাকবে?

লক্ষ্মী শান্ত মেয়ে—বাপের বিরক্তি দেখিয়া সে আব প্রশ্ন করিল না, খাম দুইখানি লইয়া চলিয়া গেল।

দীঘ জীকে প্রশ্ন করিল—নেতাই কোথা, মাঠে গিয়েছে?

নেতাই দীঘর একমাত্র পুত্র। জী বলিল—জানি না বাপু, কাল সন্জ্জেতে সেই বেরিয়েছে—এখনও ফেরে নি। সারা বাত আখড়াতে মদ খেয়েছে, আর ঢোল বাজিয়ে সব চেঁচিয়েছে। দু-বার আমি ডাকতে গেলাম-ত, আমাকে তেড়ে মারতে এল।

দীঘর মেজাজ গরম হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল—লবাবের বেটা লবাব, হারামজাদা, আমাব রোজকারে খাবেন আর টেরী ফাটিয়ে লবাবি করে বেড়াবেন। তাকে আমার ঘর ঢুকতে দিও না বাঁল দিচ্ছি—হ্যাঁ!

নেতাইয়ের মা বলিল, সে ভূমি বাঁলো বাপু, আমি লাবব।

দীঘ উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে আরও ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—কেনে লাববি কেনে শুনি?

—ব'লে কে মার খাবে বাপু? ছেলের চোখ যেন লাল
হুঁচ—আর লাটাই ঘোরা হয়ে ঘুরছে।

দীহু চীৎকার করিয়া উঠিল—মারবে। সে হারামজাদা
কত বড় মরদের বেটা দেখে লোব আমি!—বলিয়া
সে কোদালী ও ঘাস কাটিবার জন্ত কাশ্বে ও বুড়ি
লইয়া মাঠে যাইবার জন্ত উঠিয়া পড়িল। জী পিছন
হইতে ডাকিয়া বলিল—এই দেখ, নিজের করণটা একবার
দেখ—খাওয়া নাই কিছু নাই, মরদ চললেন রাগ করে। খেয়ে
যাও বলছি। সারা রাত দোড় দিয়ে হাঁটা—।

দীহু ফিরিল, বলিল—ট্যাঁক ট্যাঁক করা তোর এক
স্বভাব! দে তাই মদের ভাঁড়টা বার করে দে—ওই
খেয়েই যাই এখন। যে জল সমস্ত রাত—জমির আল-টাল
আর কি আছে? সময়ে না দেখলে খাবি কি ধুমসী!

দীহুর জী স্থলাঙ্গী। জী বলিল—এই দেখ, গতর খুঁড়ে
না বলছি। মদের ভাঁড়টা স্বামীর হাতে দিয়া কিন্তু ফিক করিয়া
হাসিয়া বলিল—তা বাপু, গতর যদি একটুকুন বমে ত বাঁচি।

নিঃশেষে ভাঁড়ের মদটুকু পান করিয়া দীহু বাহির হইয়া
গেল। ডাক লইয়া ফিরিয়া প্রাতঃকালে এটুকু তাহাব না
হইলেই নয়। সে বলে, এ আমার চা।

ঘটা-দুয়েক পরে কর্দমাক্ত দেহে, মাথায় বুড়িতে এক
বোকা ঘাস ও আঁচলে এক আঁচল কই-মাগুর মাছ লইয়া সে
বাড়ী ফিরিল। মাঠে মাছগুলি সে ধবিয়াছে। বাড়ীর
বাহির হইতেই সে শুনিল তাহার 'লবাবপুত্ৰ' নিতাই বেশ
জড়িত স্বরে উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়া দিয়াছে—

হার কি কটিন রোগ উঠছে ওলাউঠে—

লোক মরিছে অসম্ভব।

মাছ পাইয়া দীহুর মেজাজ বেশ খুশী হইয়া উঠিয়াছিল—
আর খালি-পেটে মদের নেশাটাও আজ জমিয়াছে ভাল।
সে ছেলেকে কোন কটু কথা বলিল না, ঘরে ঢুকিয়া বেশ
হাসিয়া বলিল—গানের ছিবি দেখ দেখি বেটার। তাই
একটা ভাল গান গা রে বাপু।

বলিয়া সে নিজের আরম্ভ করিল—

ওরে আমার কাল মেঘে ভোবনও করেছে আলো।

নিতাই বলিয়া উঠিল—থাম থাম বাপু, ঘাঁড়ের মত
আর চেষ্টায়ে না তুমি। আমি গাই, শোন—

দীহু অত্যন্ত চট্টিয়া গেল, সে গান থামাইয়া বলিল—রাব
তোর গান। বলি—আমার কথাব জবাব দে দেখি আগে।
মাঠ বাস নাই কেনে শুনি?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে নিতাই জবাব দিল, ধু—রো—
মাঠ গিয়ে কি হবে? মাঠ গিয়ে কে কবে বড়নোক হস্লে
শুনি।

দীহু অবাক হইয়া গেল।

নিতাইয়ের কথা তখনও শেষ হয় নাই, লে বলিতেছিল—
এই একরাশ ধান বেচলে তবে তোর একটা টাকা।
ধু—রো—মাঠ গিয়ে কি হবে?

নিতাইয়ের মা বলিল—ওসে লবাবের বেটা লবাব, খুৎ
বে মুখে টাকা দেখাইছিস, বলি একটা পদ্মসা কখনও
এনেছিস তুই।

নিতাই ট্যাঁক খুলিয়া ঠং করিয়া একটা টাকা ছুঁড়িয়া
ফেলিয়া দিল—যেন নিতান্ত ডুচ্ছ বস্ত্র মেটা। তার পর
বলিল—ওই লে—ফের যদি টিকটিক বরবি ত বুঝতে
পারবি।

মা তাহার অবাক হইয়া গেল। দীহু কিন্তু গম্ভীর
স্বরে বলিল—তুই টাকা কোথা পেলি রে নেতাই?

হি হি করিয়া হাসিয়া নিতাই উত্তর দিল—রাজার
মাগিক কোথা পায়?

দীহু গম্ভীরতর স্বরে বলিল—হাসি-তামস নয় নেতাই।
বল, তুই টাকা কোথা পেলি।

নিতাই বিরক্তিমুখে উঠিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া
যাইতে যাইতে বলিল—মর তুই ওইখানে বক বক করে,
হ্যা।

দীহু উঠিয়া পিছন পিছন দূরার পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে
ডাকিল—নেতাই, শোন, শুনে যা, ফিরে আস বলছি।

নিতাই তখন গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া আধুড়ায়
চলিয়াছে,

পীরিতি হল শূল সখি, পীরিতি হল শূল।

ও—আমি বলিলে উঠিতে লারি আবার হাতে ধ'মে তুল গো।

দীহু ফিরিয়া আসিয়া দাওয়ার উপর অগ্রসর গম্ভীর মুখে
বসিয়া রুহিল। নিতাইয়ের স্বভাবের ভাব-ভিত্তিক তাহার
বেশ ভাল লাগে না। তাহার শোষক-পরিচ্ছদের বাহার

ও বিড়ি-সিগারেটের প্রাচুর্য দেখিয়া দীর্ঘ সন্মেল করিত জীকে—সেই বোধ হয় নিতাইকে গোপনে পয়সাকড়ি দিয়া থাকে। কিন্তু আজ পুরা একটা টাকা এমন তাম্বিল্য-ভরে ফেলিয়া দেওয়ায় দীর্ঘর চিত্ত সন্নিবৃত্ত হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে সে শঙ্কিত না হইয়া পাবিল না।

জী বলিল—মুড়ি দিয়েছি খাও। খেয়ে একটুকুন গড়াও। বিছানা ক'রে দিয়েছি। ঘাস আমি মাঠারবাবুব বাড়ীতে দিয়ে আসছি।

দীর্ঘ জীকে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, নেতাই টাকা কোথায় পেলে বল দেখি ?

জী বলিল—ভালা মানুষ তুমি বাপু! ওই নিয়ে তুমি ভাবতে কসলে ? বেটাছেলে—কোথাও হয়ত পেয়েছে।

দীর্ঘ কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পাবিল না।

অপরাত্নে আহারের সময় পিতাপুত্রে আবার সাক্ষাৎ হইল। তখন দীর্ঘর মনের নেশা কাটিয়াছে, কিন্তু নিতাইয়ের চোখ তখনও লাল। দীর্ঘ নিতাইয়ের আপাদ-মস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। দীর্ঘর চোখ জুড়াইয়া গেল। ভরা-জোয়ান হইয়াছে নিতাই। স্বন্দর সুগঠিত সবল দেহখানি কে যেন কালো পাখব কুঁদিয়া তৈয়ারী করিয়াছে। সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা অস্থির চঞ্চলতা খেলা করিতেছে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে নিতাই আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে। দীর্ঘ পরিতুষ্ট চিত্তে স্নেহাত্মক কণ্ঠস্বরে বলিল—এইবার ত জোয়ান হয়েছিস নেতাই, এইবার একটা কাজে-কর্মে লেগে যা। ডাকঘরের কাজেই লেগে পড়। নতুন ডাকঘর হচ্ছে আবাব রামলগরে—এই ফাঁকে লেগে যা।

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ঢের লোক আছে তোরা কাজ করবার। উ-কাজ আমি লারব। বাবা: সারা পথ ধুকুর-ধুকুর ক'রে ছোট্টা—উ কি মানুষে পারে ?

নিতাইয়ের মা বলিল—বেনে, তোরা বাবা পারে—অর তুই পারবি না কেনে ? তোরা বাবা কি মানুষ লয় না কি ?

নিতাই বাপের মুখের দিকে চাহিল—উ একটা অস্ত্র ছুত। লইলে ঠা:—!

দীর্ঘ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—লইলে কি ?

—যাও—যাও ব'কো না বেশী তুমি। বুদ্ধি থাকলে এতদিন বড়নোক হয়ে যেতে তুমি কোন্ দিন।

—তার মানে ?

—মানে আবার কি ? বললাম, তুমি ভেবে দেখো কেনে ! বলিয়া নিতাই হাত মুখ ধুইয়া শিস দিতে দিতে চলিয়া গেল। দীর্ঘ নির্বাক স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

জী বলিল—হতভাগা উ কি বললে বল দেখি ?

দীর্ঘ সে-কথার কোন উত্তর দিল না—তাহার আর সময় ছিল না, সে বল্লম-পেটি মাথালী ও লঠন লইয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক যাইবার সময় হইয়াছে।

* * *

ঝুন-ঝুন-ঝুন-ঝুন।

ডাক-হরকরা যুদ্ধভালে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়াছে। এই গতি তাহাকে ববাবর সমান ভাবে বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পথে এক দণ্ড বিশ্রাম করিবার উপায় নাই, গতি শিথিল করিবার উপায় নাই, সামান্য বিলম্ব ঘটিলে কি হইবে দীর্ঘ কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ভয় হয়। তাহার উপর পথে কোথায় গুভারসিয়ার হয়ত লুকাইয়া আছে, কোন জঙ্গলের মধ্যে কিংবা কোন গাছের ডালে বসিয়া ডাক-হরকরার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। সামান্য একটু শৈথিল্য দেখিলেই সে রিপোর্ট করিয়া বসিবে, সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে জরিমানার ছকুম আসিয়া পড়িবে।

দীর্ঘ একবার মাত্র জরিমানা দিয়াছে। গতি-শৈথিল্যের দ্রষ্টব্য নয়, পথে সে বিশ্রামও করে নাই, তবুও তাহাকে জরিমানা দিতে হইয়াছে। তখন সে নূতন কাজে ভক্তি হইয়াছে, বয়সও তাহার তখন অল্প। গুভারসিয়ারকে সে ঠকাইয়াছিল। সেদিন যে পথে গুভারসিয়ার লুকাইয়া থাকিবে এ-সংবাদ হরিপুরের পিয়ন তাহাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছিল—দীর্ঘ আজ সাবধান, পথে আজ থাকবে। কে থাকিবে সে-কথা দীর্ঘ পিয়নের ক্র-নৃত্য দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছিল। পথে সে সতর্কদৃষ্টি রাখিয়াই সেদিন আসিতেছিল। সেদিন চাঁদিনী রাত্রি—পৃথিবী যেন ক্ষুধে স্নান করিয়া উঠিয়াছে।

স্বন্দীপুরেব বুড়া-বটতলার অল্প দূরে আসিয়া দীঘুর মনে হইল গাছের একটা ডাল যেন অল্প অল্প ছলিতেছে। তরুণ দীঘুর তরল চিত্তে দুইবুজি জাগিয়া উঠিল, সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া মাঠের পথে নামিয়া পড়িল। গাছটাকে পাশে খানিকটা দূরে ফেলিয়া স্থানটা সন্তর্পণে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বল্লমের ফটাটা সে হাতের মুঠোব মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল, ফটারও কোন শব্দ হইল না। তাব পর ও-পাশে আবার পাকা রাস্তা উঠিয়া ষ্টেশনে ছুটিল। সেদিন খুব একচোট হাসিয়া সে আপন মনেই বলিয়াছিল—থাক বাবান্ন পথেব পানে তাকিয়ে গাছের ওপর বসে।

গুভাবসিয়ার এদিকে গাছের উপর বসিয়া ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল। নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল তবু মেল-বাণার আসিল না দেখিয়া সে চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে নিজেই ছুটিতে ছুটিতে হরিপুবে পোষ্টাপিসে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে আসিয়া তাহাব চিন্তার পরিমাণ বিগুণিত হইয়া উঠিল, কোথায গেল মেল-বাণাব। সে আবার আমদপুর ষ্টেশন বগুনা হইল। দীঘু তখন সেখানকার ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই হরিপুবে ফিরিয়া আসিতেছে। গুভাবসিয়ার রিপোর্ট করিয়া বসিল। মিথ্যা বলিলে দীঘুব জরিমানা হইত না, বরং গুভাবসিয়ারেরই লম্বনা হইত, কিন্তু দীঘু মিথ্যা বলিতে পারে নাই। পিয়ন তাহাকে বার-বার বলিয়া দিয়াছিল—তুই বলবি, আমি ঠিক গিযেছি জঙ্কুর, ইন্টিশানের টাইম দেখুন—আবাব ঠিক সময়ে ফিরেছি—এখানকার টাইম দেখুন। গুভাবসিয়ার বাবু হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

দীঘু চিন্তিত মুখে উত্তর দিয়াছিল—তা আজে কি ক'রে বলব আমি ?

স্বন্দীপুরের বটতলাব নিকট আসিয়া দীঘুব প্রায়ই কথাটা মনে পড়ে। সে অল্প একটু হাসে। আরও কতবার এইখানে গুভাবসিয়ারের সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। জঙ্কলের মধ্য হইতে এখনও কোন কোন দিন কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ডাক-হরকরা ?

দীঘু উত্তরে প্রশ্ন করে—‘টায়ের’ ঠিক আছে বাবু ?

জঙ্কলের ভিতর হইতেই উত্তর আসে অথবা হাসিতে হাসিতে গুভাবসিয়ার রাস্তার উপর আসিয়া বলে—ঠিক

আছে রে। তোর কিন্তু এক দিনও দেরি হ'ল না দীঘু।

ডাক-হরকরা কিন্তু দাঁড়ায না, গুভাবসিয়ারেব এ ছলটুকুও সে জানে। সে তাহাকে অভিক্রম করিয়া চলিয়াই যায়, তাহার বর্শাব ফলার বাঁধা ঘট। বুন বুন শব্দে বাজিতেই থাকে।

বুন-বুন-বুন-বুন! আজও দীঘু নিয়মিত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছিল। গুভাবসিয়ারের কথা মনে পড়ায় নিতাইয়ের চিন্তা ছলিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রাবণের অন্ধকাব রাত্রি—আজও আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। তারকাদীপ্তিহীন মেঘলা আকাশ যেন অন্ধকারের মধ্যে মাটির বুকে নামিয়া আসিয়াছে। দীঘুর হাতের আলোটা ধোঁয়ার কালিতে অন্ধ চক্ষুর মত জ্যোতিহীন পাণ্ডুর।

অন্ধকার বটবৃক্ষের তলদেশ হইতে একটি মাঝুখ আসিয়া পথের উপর দাঁড়াইল। দীঘু প্রশ্ন কবিল, ‘ওপরস্যাব’ বাবু!

উত্তরে লাঠির আঘাতে তাহার হাতের লণ্ঠনটা চুরমার হইয়া গেল। ডাকাত! ডাক লুটিতে আসিয়াছে!

মুহুর্তে দীঘু ক্ষিপ্ত গতিতে সরিয়া দাঁড়াইয়া হাতের বল্লমটা উঁচু করিয়া ধরিল।

—খবরদাব, সরকারেব ডাক!

—এই দেখ, বস্তাটা দাও বলছি।

দীঘুর হাতেব বল্লমটা থর থর কবিয়া কাঁপিয়া উঠিল; সে বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিল—কে—নেতাই ?

নিতাই ধাঁ করিয়া দীঘুর কম্পিত হস্ত হইতে বল্লমটা কাড়িয়া লইল। পরমুহুর্তে সে বাঁপ দিয়া মেল-ব্যাগের উপর শিকারী পশুর মত লাফাইয়া পড়িল। দীঘু পড়িয়া গেল, মাথাব মাখালীটা গড়াইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তবুও দীঘু সবলে মেল-ব্যাগ নিজের বুকেব মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সবনাশ হবে নেতাই—কালাপানি—ফাঁসি হয়ে যাবে!

নিতাই ক্ষুধার্ত পশুর মত ব্যাগটা ধরিয়া টানিতেছিল—টানিতে টানিতেই হিংস্রভাবে সে বলিল—তখন বললে না কেনে—বলে বেখে দিলাম এমন ক'রে! দাও বলছি, রাতারাতি দেশ ছেড়ে পালাব চল।

দীঘল এবার উচ্চকণ্ঠে চীৎকার কবিতা উঠিল—জাকাত—
জাকাত।

নিতাই বিপুল হিংস্রতায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সহসা একটা আলোকরশ্মির আভাসে গাঢ় অন্ধকার
ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চমকিয়া উঠিয়া নিতাই সেই
দিকে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল
আলো দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ আলোর
প্রভাৱ স্থানটা প্রদীপ্ততর হইয়া উঠিতেছে। সে এবার শেষ
চেঁচা কবিল, হাতের লাঠিটা ফুডাইয়া লইয়া সজোরে দীঘল
মাথায় বসাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে ফিন্‌কি দিয়া কাল একটা তরল
ধারা ছুটিয়া বাহির হইয়া দীঘল মুখখানাকে বীভৎস কবিতা
তুলিল। দীঘল কাতর স্বরে চীৎকার কবিতা উঠিল—বাবা
গোঃ আলোটা অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, নিতাই
ব্যস্তভাবে আব একবার ব্যাগটা খুঁজিয়া আকর্ষণ করিল—
কিন্তু দীঘল জ্ঞান তখনও লুপ্ত হয় নাই, অগত্যা নিতাই
ব্যাগটা ছাড়িয়া দিয়া ছুটিয়া অন্ধকারেব মধ্যে মিশিয়া গেল।

আলোটা একটা বাইসিক্লেব আলো। আবোহী পথিক
বক্তার দীঘলকে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার আবণ্ড করিল।
অন্ধকার দুর্ব্বোধের মধ্যেও মাহুবেব প্রয়োজনের শেষ নাই,
পথে পথিকের পথচলার বিবাম নাই, কিছুক্ষণ পবেই দূবে
মাহুবেব সাড়া আসিল—কে সাড়া দিল।

* * *

দীঘল জ্ঞান হইলে সে দেখিল, প্রকাণ্ড একটা পাকা ঘবে
একখানা লোহাব খাটের উপর সে শুইয়া আছে—মাথায়
ভ্যানক যন্ত্রণা—কপালে হাত দিয়া অনুভব করিল, কাপড় দিয়া
মাথাটা তাহার বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহার খাটের পাশেও
সারি সারি লোহাব খাটে আবণ্ড কত লোক শুইয়া
আছে। দীঘল বুঝিল এটা হাসপাতাল। সে পূর্বে কয়বার
গহবে আসিয়া হাসপাতাল দেখিয়া গিয়াছে।

ধীরে ধীরে দীঘল সব মনে পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরই পোষ্টাপিসের সুপারভিটেন্ট সাহেব
আসিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—এই যে জ্ঞান হইয়াছে
তোমার ?

দীঘল তাঁহাকে চিনিত, কিন্তু সে তাহার মুখ-পানে ফ্যাল
ফ্যাল কবিতা চাহিয়া রহিল শুধু। সাহেব বলিলেন—খুব

বাহাদুর তুমি! সরকার তোমার ওপর খুশী হয়েছেন।
তুমি যে নিজের মাথা দিয়েও সবকারেব ডাক বাঁচিয়েছ এর
জন্তে তুমি রিওয়ার্ড—মানে পুরস্কার পাবে।

দীঘল তবুও নির্ঝাঁক।

সাহেব তাহাব গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন—কত জন
ছিল তাবা—কাউকে তুমি চিনতে পেয়েছ ?

দীঘল এবার ঝর ঝর কবিতা কাঁদিয়া ফেলিল।

সাহেব নিজে পাখাটা লইয়া বাতাস দিয়া বলিলেন—
ভয় কি, কাঁদছ কেন তুমি? কোন ভয় নেই, শীগ্গির ভাল
হয়ে যাবে তুমি। ডাক্তার বলেছেন কোন ভয় নেই
তোমার।

তিনি নিজে ক্রমাল দিয়া তাহাব চোখ মুছাইয়া দিলেন।
তার পব বলিলেন—আচ্ছা, স্থস্থ হবে ওঠ তুমি, আমি
আবাব আসব—রোজ এসে তোমাৰ দেখে যাব। ওবেলায়
কল পাঠিয়ে দেব আমি।

দীঘল অকস্মাৎ যেন বলিয়া উঠিল—হজুর!

—কিছু বলবে আমায়, কি বলবে বল ?

দীঘল অতিকণ্ঠে বলিল—হজুর আমার ছেলে—।

—তোমাৰ ছেলে, তোমাৰ ছেলেকে তুমি দেখতে চাও ?

দীঘল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল—কহিল হ্যাঁ হজুর!

—আচ্ছা। সাহেব চলিয়া গেলেন।

তাহার পর আসিল পুলিশ। পুলিশের বড়সাহেব
নিজে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন।
তিনি কিন্তু ডাক-সাহেবের মত এত সহজে দীঘলকে নিষ্কৃতি
দিলেন না। তিনি বার-বার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—
কাউকেই তুমি চিনতে পার নি ?

দীঘল উত্তর দিল—অন্ধকার হজুর!

—কত জন ছিল তারা ?

ভাবিয়-চিন্তিয়া দীঘল আবাব বলিল—অন্ধকার হজুর—!

—আচ্ছা কি রকম দেখতে বল ত ? খুব জোয়ান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভদ্রলোক—কি ছোটলোক ?

দীঘল চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল—সে কি
বলিবে? কাহার নাম সে করিবে? মিথ্যা করিয়া অল্প
কাহাবও নাম—দীঘল শিহরিয়া উঠিল!

সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীহকে লক্ষ্য করিতেছিলেন ; তিনি বলিলেন—দেখ, তুমি তাদের জ্ঞান, চিন্তে পেরেছ ; বল তুমি, সে কে ?

দীহ বিবর্ণ মুখে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সাহেব এবাব বস্ত-চক্ষু হইয়া বঠোর স্বরে বলিলেন—বল !

দীহ বিশ্বলের মত চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বলিল—
হজুর, আমার ছেলে নেতাই।

সাহেব বিশ্বয়ে হতবাক হইয়া গেলেন না, তবুও সামান্য বিস্মিত না হইয়াও পারিলেন না, বলিলেন—সে তোমার ছেলে ?

রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে উপরেব দিকে মুখ তুলিয়া দীহ বলিল—
হাঁ হজুর।

—আব ? আর কে ?

—আর কেউ না।

পুলিস বিস্ত্র নিতাইকে পাইল না। সেই রাত্রি হইতেই নিতাই নিক্রদেশ। তাহাব উদ্দেশ্য কবিত্তে পুলিস উঠিয়া-
পড়িয়া লাগিল।

* * *

তাব পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল—এগার বৎসর। দীহ আজও ডাক-হরকবার বাজ করিতেছে। অন্ধকারে জ্যোৎস্নাশ, বাদলে বর্ষায়, চরস্ত শীতের রাত্রে এখনও সে তেমনই কোমবে পোটি বাঁধিয়া বল্লম-আলোহাতে ডাক লইয়া যায় আসে। এখনও তেমনই তাহার ঘড়ির কাঁটার মত গতি।

নিতাই কিন্তু সেই যে নিক্রদেশ হইয়াছে আজও তাহার কোন সম্মান মেলে নাই। সবকারের মূল্যে নরকজ থানায় থানায় নাকি তাহাব আকৃতিব বিবরণ দিয়া ছলিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু কোথায় নিতাই !

দীহর জী সময় সময় ঘবের মধ্যে অতি যুছস্ববে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদে ; দীহ বাড়ীতে থাকিলে নির্বাক হইয়া বাহিরে দাওয়ার উপর দুই হাতে মাথা ধরিয়া মাটির দিকে চাহিয়া থাকে। সাক্ষনাও দিতে পারে না—বিরক্তি প্রকাশও করে না।

পাড়াপড়শীরা দীহব নাম দিবাছে যুজিষ্টিব। তাহাদেব অশিক্ষিত জড়তাবুদ্ধি জিহবায় তাহারা বলে—যুজিষ্টিব।

লজ্জাব দীহর মাথাটা নোবাইয়া আস। মাথা হেঁট করিয়া পাড়ার পথে সে যাওয়া-আসা করে। পোষ্টাপিসেও তাহার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে। যে-সেহ নুতন ডাকববু কি ডাকসাহেব আসেন তিনিই জিজ্ঞাসা করেন—দীহ কে ?

দীহ মাথা হেঁট কবিয়া আসিয়া সেলা- কবিয়া দাঁড়া। সেদিন সে অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত রুদ্ধ হই- উঠে, অকারণ পিখনদেব সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া বসে। সেদিন তাহান্দেব বাসন মাজিয়া দেয় না, ডাক-বাবুব গরুর ঘাস আসে অত্যন্ত কম।

পিখন বলে—এত গরম ভাল নব বে, নুখলি !

সেদিন কার্তিক মাসেব একটি স্বল্প শীতকাতব রাত্রি। কার্তিক মাসেই শীত এবার ঘন হইয়া আসিয়াছে। দীহ ডাক লইয়া নির্দিষ্ট সময়েই আমদপুর পোষ্টাপিস হাজির হইল। এই আমদপুরেই বেলওয়ে স্টেশন, এখানসাব পোষ্টাপিসেই আবাব ডাক লইয়া দীহ হরিপুব ফিরিলে। ডাক ফেলিয়া দিয়া সে তাহাব নির্দিষ্ট চটখান। বিছাইয় বাবান্দায় শুইয়া পড়িল। আপ-ডাউন মেলট্রেন চলিয়া গলে ডাক লইয়া তাহাকে আবাব রওনা হইতে হইবে। পাশে আরও কয়েক জন মেল-বাণাব শুইয়া আছে। তাহাবা গল্প করিত- ছিল ওভাবসিয়ারকে লইয়া। জরিমানা প্রত্যক্ষ কারণ এই লোকটি কখনই ভাল লোক নব এই তাহাদের প্রতিশ্রুতি ছিল। ওদিকে দুই জন বোধ হয় ঘনের স্বপ্ন-দুঃখের কথা কহিতেছিল।

ওদিকে স্টেশনে আপ-মেলেব কটা বা-জয়া উঠিল।

দীহ বিরক্ত ভাবে বলিল—একটুকু যুমো বাপু নব ! পশ্চিমাব ডাকগাড়ী কটা হবে গেল। কলকাতাব গাড়ী এলেই ত আবাব সেই তল্লী কাঁধে তোল।

এক জন ব্যক্ত করিয়া যুছস্ববে বলিল—চুপ চুপ, ধর্মসুস্তু যুজিষ্টিব রেগেছে !

চাপা হাসির গুঞ্জনর শব্দে দীহ স্তব্ব হইয়া গেল। সে কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিল। মনে পড়িল গেল নিতাইকে ! নিতাই মরিয়া গেলে দীহ এত দিন হয়ত তাহাকে ভুলিত ! জীবন্ত মাল্লব হারাইয়া যাওয়ার চেয়ে সে শতগুণে ভাল ; এ যে প্রতিশ্রুতিতে মনে হয় আজ সে আসিব ; দিন ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় কাল সে আসিব !

সকলের চেয়ে বড় আক্ষেপ দীঘর—নিতাইয়ের সন্ধান সে করিতে পাইল না। সেদিন এক জন যাত্রী এই ট্রেনেই একটা আনি হাবাইয়া সমস্ত রাত্রি পথের ধূলা বাঁটিয়া খুঁজিয়াছে। আর একটা মানুষ—!

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। সে ঘুম ভাঙিল তাহার পিয়নদের ডাকে। ডাউন মেলট্রেন চলিয়া গিয়াছে—ঘরের মধ্যে বিভিন্ন পোষ্টাণ্ডিসের জন্ত ডাক বাঁধ হইতেছিল। হরকরারা আপন আপন পেট বন্ধন লগ্নন লইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। প্রস্তুত হইয়া দীঘর তামাক সাজিতে বসিল। ওদিকে ছোকরাবা একটা আশুন জালাইয়া হাত-পা গরম করিতে বসিয়াছে।

ঘরের ভিতর হইতে পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—ওঃ দীঘর! আক্কে কাতে তোর কে আছে রে? এঁা—ইনশিওর ক'রে টাকা পাঠাচ্ছে!

দীঘর আশ্চর্য হইয়া গেল, বলিল—সি আজে কোথা বটেন?

—ওঃ সে জাহাজ ক'বে যেতে হয় রে সমুদ্রের পেরিয়ে। কাকি মূলুক সে, মানুষে সেখানে মানুষ খায়, প্রকাণ্ড বড় বড় বন, সিংহ গজার বাঘ-ভাল্লুক ভর্তি সে সব।

দীঘর আবও বিস্মিত হইয়া বলিল—আজে সে দেশের নামই আমি শুনি নাই কখনও!

—দাঁড়া দাঁড়া কে পাঠাচ্ছে দেখি!...এ যে দেখছি সাউথ আফ্রিকান ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী—জাহাজ-কোম্পানী দেখছি। ওঃ এ যে অনেক টাকা রে—সাড়ে পাঁচশ টাকা।

দীঘর অবাক হইয়া ভাবিতেছিল। সহসা সে বলিল—আজে দেখি বাবু একবার।

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—দেখে আর কি করবি বাবা, একেবারে হরিণুব পোষ্টাণ্ডিসেই গিয়ে নিবি।

ডাক বাঁধিয়া দীঘর কাঁধে তুলিয়া দিয়া দীঘরকে তিনি বিদায় করিয়া দিলেন। আকাশে শেষরাত্রির জ্যোৎস্না তখন ফোলাটে হইয়া আসিয়াছে—চাঁদ পাণ্ডুর, 'সাত ভাই' তারাগুলি আর ডুবিল বলিয়া, শেষরাত্রির বাতাসে যেন হিম বরিতেছে। দীঘর জনহীন পথে চলিয়াছে—ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্! চলিতে চলিতে সে ভাবিতেছিল—কোন দেশ-

দেশান্তর হইতে জাহাজ-কোম্পানী তাহাকে টাকা পাঠাইল কিসের জন্ত?

অল্প টাকা নয়—সাড়ে পাঁচশ টাকা—উঃ সে কত টাকা! ব্যাগটা যেন দীঘর ভারী মনে হইতেছিল। সহসা দীঘর খেয়াল হইল—একি, সে নিশ্চয় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে যে! সে আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে পথের কোনখানে কতদূর আসিল বুঝিতে পারিল না, কিন্তু মন তাহার দেশ-দেশান্তরের এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গেল। কে সে কোম্পানী? কিসের জন্ত তাহাকে এত টাকা পাঠাইয়াছে সে? সে যেন দেখিতেছিল বিশাল অন্ধকার অরণ্য—বাঘ সিংহ ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে কোম্পানী কই—দীঘর তাহার পিছনটা দেখিতেছে—সে যেন পিছন কিরিয়া বসিয়া আছে!

সহসা তাহার মনে হইল—ওই কোম্পানী তাহার নিতাই নয়ত? নিতাই হয়ত দেশান্তরে পলাইয়া গিয়া অগাধ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছে! পাকা বাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া, চাকর—! কল্পনাব গভীর অরণ্যে মুহূর্তে গড়িয়া উঠে বাবুদের চুণকাম-করা পাকা বাড়ীর মত বাড়ী!

দীঘর সর্বশরীর ধর ধর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হিম-শীতল রাত্রির শীতলত্ব সেই শেষ প্রহরেও সে ঘনত্ব হইয়া উঠিল কাঁধেব কাগজের বস্তা যেন সোনার বোঝাই বস্তার মত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে! একটি পরম উত্তেজিত মুহূর্তে কাঁধ হইতে ব্যাগটা ধপ করিয়া মাটির উপর ফেলিয়া সে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাহার পাশে দাঁড়াইল—চোখ দুইটা যেন জ্বলিতেছিল! বুকের মধ্যে উৎকর্ষার পরিমাণ হয় না, স্বপ্নপিণ্ডটা শরবিদ্ধ পশুর মত যেন ছটফট করিতেছে! দীঘর ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে—এইখানেই ব্যাগটা টুকু টুকু করিয়া ছিড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া লয়!

পর-মুহূর্তে সে আবার ব্যাগটা ঘাড়ে তুলিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, প্রাণপণে ছুটিল।

এ কি—পাখীরা কল কল করিয়া ডাকিয়া উঠিল যে! ভোর কি হইয়া গেল না কি? কই আকাশে 'ভুঙ্কো' তারা কই? কিন্তু দীঘর যে এখনও অনেক পথ বাকী! এই ত

বোল মাইলের পাথর সে পার হইল! এখনও যে ভিন মাইল পথ তাহাকে বাইতে হইবে।

দীহু যখন হরিপুর পোষ্টাপিসে পৌঁছিল তখন বেলা সাড়ে সাতটা—প্রায় আড়াই ঘণ্টা দেরি হইয়া গিয়াছে। পোষ্ট-মাষ্টার, পিয়ন, সংবাদপ্রার্থীর দল উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। দীহু শ্রান্ত ক্লান্ত ভাবে ব্যাগটা ফেলিয়া দিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহাব মুখের দিকে চাহিয়া পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—এত দেরি কেন হ'ল রে?—একি, তোর কি অসুখ ক'রেছে দীহু?

দীহু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—ডাকটা কেটে ফেলেন বাবু!

—আচ্ছা—আচ্ছা ব'স, শীগুগির তোর ছুটি ক'বে দিচ্ছি।

ডাক কাটিয়া পোষ্টমাষ্টার বলিলেন—এ কি রে, তোর নামে যে একটা ইনশুর দীহু। টাকাও ত কম নয়, সাড়ে পাঁচ—। ও এ যে আফ্রিকা থেকে আসছে দেখি!

দীহু কথা কহিতে পারিল না, শুধু হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, সে হাত তাহার থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া বলিলেন—দাঁড়া একটু, জমা ক'রে নি।

পিয়ন বলিল—আমাদের কিন্তু পাঁচ টাকা দিতে হবে, মিষ্টি খাব।

দীহু নির্ঝক। জমা করিয়া লইয়া পোষ্টমাষ্টার বলিল—এইখানে একটা টিপ ছাপ দে ত দীহু, হ্যা—নে এই নে।

খামখানা হাতে লইয়া দীহু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল—জাহাজের ছবি আঁকা স্বন্দর খাম, ছাপা হরফে নাম লেখা।

মাষ্টার বলিলেন—দে, দেখি খুলে।

সম্পূর্ণে ছুরি দিয়া খামখানা কাটিয়া সর্বাগ্রে তিনি নোট কয়খানা দেখিয়া বলিলেন—নে ঠিক আছে সব। এ নোট আবার তোকে ভাঙতে হবে। এই যে চিঠিও রয়েছে!

চিঠিখানা তিনি মনে মনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ওদিকে পিওন ডাক বিলি করিতেছিল—

পরম কল্যাণীয়া—জগত্তারিণী দাসী হুড়িগ্রাম।

রামলাল বন্ধ্যোপাধ্যায়—এই বাঁড়ুজ্ঞে মশায়—চিঠি।

এটা আবার হিন্দী—কি—? ডাংখান হরিপুর। সু—সুখন চোবে।

বীহু বলিল—বাবু!

বাবু ভাবিতেছিলেন, কি বলিবেন! নিজাইয়েরই সংবাদ, নিজাই সেখানে জাহাজে খালানীর কাজ করিত, সে মারা গিয়াছে। কোম্পানী তাহার অস্তিত্ব-নির্দেশ মত তাহার সঞ্চিত অর্থ দীহুকে পাঠাইয়াছে।

দীহু আবাব প্রশ্ন করিল—বাবু!

—কি লিখেছে বেশ বুঝতে পারছি না রে। আচ্ছ নিজাই কে? নিজাই ত তোব সেই ছেলে?

—হ্যা-হ্যা-হ্যা—কেমন আছে সে—কেশা আছে?

পোষ্টমাষ্টার নীরবে মাথা নত করিয়া রহিলেন অনেক ক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দীহু বলিল—নিজাই নাই!

পোষ্টমাষ্টার নীরব হইয়াই রহিলেন। দীহুও মাটির দিবে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া মধ্য মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা জল মাটির বুকে ঝরিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া বাইতেছিল। কত কথা এলোমেলো ভাবে তাহার শোকাভূত মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সবই নিজাইয়ের কথা।

পোষ্টমাষ্টার অপরাধীর মত বলিলেন—আনন্দ ক'রে চিঠিটা খুললাম দীহু, কিন্তু শেষ আমিই তেকে এই খবরটা দিলাম।

দীহু চমকাইয়া উঠিল—তাহাব মনে পড়িল—সে নিজেই ত চিঠিখানা আনিয়াছে!

থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—উঃ, এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ নিজ মত সে বহিয় আনিয়াছে। কত—কত—কত—সংখ্যা হয় না! মনে হইল আজও পর্যন্ত যত রোদনধ্বনি সে শুনিয়াছে সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে!

সে চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল

—আমি আর কাজ করব না বাবু, কাজে জবাব দিলাম।

✓ রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন

(১৭৯৭—১৮১৪)

শ্রীরমাশ্রমাদ চন্দ

রামমোহন রায়ের বয়স যখন প্রায় সাড়ে চব্বিশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা রামকান্ত রায়, ১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর (১২০৩ সনের ১২শে অগ্রহায়ণ) তারিখে সম্পাদিত একখানি বন্টনপত্রের দ্বারা, নিজের প্রায় সমস্ত ভূসম্পত্তি তিন ভাগে বিভাগ করিয়া তিন পুত্রকে দান করিয়াছিলেন। মধ্যম পুত্র রামমোহন রায়ের ভাগে লাকুড়পাড়ার বাড়ীর অর্দ্ধাংশ, কলিকাতা জোড়াসাঁকো পুকুরসহ একখানি বাড়ী, এবং ২০ বিঘা জমি পড়িয়াছিল। বাঁটোয়ারার প্রায় ২ মাস পরে, ১৭৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (১২০৩ সনের ভাদ্র মাসে), রামমোহন রায় নিজের পরিবার (wives) লাকুড়পাড়ার বাড়ীতে, মাতা তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে, রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়া বিষয়কর্ষ আরম্ভ করিয়াছিলেন।* বাঁটোয়ারার পূর্বে রামমোহন রায় কি কাজ করিতেন, এবং বাঁটোয়ারার পরে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কি কাজ কবিতেন তাহা আমরা জানি না। পরবর্তী কালে তিনি কোম্পানীর কাগজ বেচ-কেনা করিতেন, এইরূপ প্রমাণ আছে। সুতরাং অনুমান হয় কোম্পানীর কাগজের কাববাব তাঁহার বরাবরই ছিল।†

* গুরুপ্রসাদ রায়ের জবানবন্দী; তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। অতীত আদালতের কাগজপত্রের মত মহামান্য হাইকোর্টের কাগজপত্রের সহি বোহরের নকল না লইলে তাহা প্রকাশ করা যায় না। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদারকে গোবিন্দপ্রসাদ বন্যাস রামমোহন রায় এবং দুগা দেবী বন্যাস রামমোহন রায় এই দুই মোকদ্দমার স্বহস্তলিখিত নকল লইয়া প্রকাশিত করিবর অনুমতি দিয়াছেন। এই লেখক ডাক্তার মজুমদারের সহিত হাইকোর্টে গিয়া এই সকল নকল মিলাইয়া লইয়াছেন। মহামান্য হাইকোর্টের ওরিন্জিনেল বিভাগের রেজিষ্টার এ এল কলেট সাহেব (M. A. C. Collet) এবং বেকর্ড কিপার শ্রীযুক্ত হুস্টনলেন্দ সেনগুপ্ত এই কার্যে আনুগত্যিক যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

† গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দী; বর্ষ প্রশ্নের উত্তর। গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দী; বর্ষ প্রশ্নের উত্তর।

কলিকাতায় আসিয়া বিষয়কর্ষ আরম্ভ করিয়া রামমোহন রায় এত দ্রুত এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে বৎসরেক পরে তিনি কোম্পানীর সিভিল কর্মচারী মাননীয় এণ্ড্রু রামসেকে (Honorable Andrew Ramsay, a Civil Servant) ৭৫০০ সাত হাজার পাঁচ শত টাকা ধাব দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।* তাঁর পর, ১৭৯৯ সালের ১৫ই জুন (১২০৬ সনের ৩রা আষাঢ়) তিনি গঙ্গাধর ঘোষের নিকট হইতে ৩১০০ তিন হাজার এক শত টাকা মূল্যে গোবিন্দপুর তালুক, এবং আপনার খুড়তুত-ভাই রামতল্ল রায়ের নিকট হইতে ১২৫০ বার শত পঞ্চাশ টাকা মূল্যে রামেশ্বরপুর তালুক, খরিদ করিয়াছিলেন।†

দুই তিন বৎসরের মধ্যে রামমোহন রায়ের বিষয়কর্ষে এত উন্নতি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, তিনি কি উপায়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বযোগ উপস্থিত হইলে কিছুই অসম্ভব নহে। বাঁটোয়ারার পূর্বে নিজের উপার্জিত বা পিতৃদত্ত কিছু মূলধন হয়ত তাঁহার ছিল। ৪৩৫০ টাকা মূল্য দিয়া রামমোহন রায় যে দুইখানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন, তাহার বার্ষিক মুনাফা দাঁড়াইয়াছিল ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা।‡ সুতরাং এই দুইখানি তালুকই তাঁহার বৈষয়িক উন্নতির মূল হইয়াছিল।

* গোলোকনারায়ণ সরকারের জবানবন্দী।

† রাজীবলোচন রায়ের বরাবরে রামমোহন রায়ের ফাসি কবাল। বাংলা-পত্ৰগমেন্টের রেকর্ড-বিভাগের মৌলবী আজিজুর রহমান খাঁ-সাহেব ফাসি দলীলের পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

‡ রাজীবলোচন রায়ের জবানবন্দী। বেচারাম সেনের জবানবন্দী।

মহানশিম-ব্রহ্ম শূকদাসমুখ্যপাশ্চাত্যমহানশিম-
বাবাবব্রহ্ম।

১৩৪৩, ১৩৪৩, ১৩৪৩

নিমিত্ত-আবাজীব মোচনরায় কম-একবার নামা পণ্ডিত-
কাক-আজি আমি আপনকার অনুমতি গ্রহণ ও আপনকার
চাকর্য নাট্যরামশ্রবণের মোচনকে পরগণে চতুর্কোণে ওনাট
চাবিকপূর মোচনকে পরগণে জাহানাবাদ জেহরনাটের মানরজমা
মবনলা ২১৮৬৮-১১৮ একুইস হাজার আশ্রম ও আশ্রমের চক্কি বারজমা
উনিশশতাব্দী ৪০০ চাবিকাজের একটাকা সিলকা পান যা রামমোহনরায়
তানুজদার হস্তে মন ১২০৬ মানব ৭ পৌষ কোবানাকরিয়া অশ্রাব
আপন নাম আপনকার বিনমিত্ত খবিরকরিয়াম একে জেহরনাটের মানরজমা
দান বিকোর অবিকারী আপন আমের সহিত কিম্বা আমার ওয়ারিমারের
সহিত কিছু এনাফা নাই কোন মিছা দাওয়া আমি দেখাতেকরি কিম্বা
কেহকরে স্রাবাভিন এক মিছা ওতদার্থে একবার পণ্ডিতমিথিবা দিলাম
ইতি মন ১২০৬ বারমণ্ডল্যমান ওবিত্য ৭ মাতৃপীপৌষ।

২১১৮

বাকীজবাজমিহ
মণ্ডল্যমান
৭ কাশ্যমান

শ্রীমন্তজবাজমিহ
মণ্ডল্যমান

আবাজীব
মণ্ডল্যমান

১৭২৯ সনের শেষভাগে রামমোহন রায় পাটনা, বারাণসী এবং অত্যাশ্রয় দূর দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এমন উন্নতিশীল কারবার আরম্ভ করিবার পরে কেন যে রামমোহন রায় এই সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা বলা সহজ নহে। তাঁহার অল্পপস্থিতে যাহাতে তালুক দুইখানির শাসন-সংরক্ষণের কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারে তজ্জন্ত তিনি উহা রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে সাফ কবালা করিয়া দিয়াছিলেন। এই কবালা পারস্য ভাষায় লিখিত (১ নং চিত্র)। কিন্তু রামমোহন রায় এই দলীলে বাংলায় নাম দস্তখত করিয়াছেন—

শ্রীরামমোহন রায়

সাকিম লাঙ্গুড়পাড়।

পরগণে বায়ড়া—

এই দলীলে রামমোহন রায়ের পিতামহ মৃত ব্রজবিনোদ রায়ের নাম আছে, এবং দুইখানি তালুকের মোট সদর জমা লেখা আছে ২১৮৬৮৮১২, এবং নামতঃ মূল্য ৪০০১। এই দলীলের তারিখ ১২০৬ সন, ৭ই পৌষ (১৭২৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর)। বিনামদার রাজীবলোচন রায় রামমোহন রায়ের বিশ্বাসভাজন বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিবাস ছিল চন্দ্রকোণা পরগণার অন্তর্গত জাড়া মৌজায়। চন্দ্রকোণা সেকালে বর্দ্ধমান (এখন মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত।

রামমোহন রায় যখন বিদেশ-ভ্রমণে যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না। সুতরাং বিদেশে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তালুক দুইখানি যাহাতে তাঁহার ভগিনীর একমাত্র পুত্র, তৎকালে দশ-এগার বৎসর বয়স্ক, গুরুদাস মুখোপাধ্যায় পাইতে পারে এই জন্ত রামমোহন রায় রাজীবলোচন রায়ের দ্বারা গুরুপ্রসাদের বরাবরে একখানি একরার-পত্র লেখাইয়া লইয়াছিলেন (২ নং চিত্র)। এই একরার-পত্রে লিখিত হইয়াছে—

“মহামহিম শ্রীযুক্ত গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরাবরে। লিখিতঃ শ্রীরাজীবলোচন রায় কস্ত একরার নামা পত্রমিদং কাঞ্চাৎ আগে আমি আপনকার অহুমতি ক্রমে ও আপনকার টাকায় লাট রামেশ্বরপুর মোতালকে

পরগণে চন্দ্রকোণা ও লাট গোবিন্দপুর মোতালকে পরগণে জাহানাবাদ জে দুই লাটের সদর জমা মবলগে ২১৮৬৮৮১২ একুইস হাজার আট সত আটসটি তক্কা বার আনা উনিস গণ্ডা ৪০০১ চারি হাজার এক টাকা সিক্কা পণে শ্রীরামমোহন রায় তালুকদার হইতে ১২০৬ সালের ৭ই পৌষে কোবালা করিয়া আমার আপন নামে আপনকার বিনামীতে খরিদ করিলাম এই দুই লাটের মালিক ও দান বিক্রীর অধিকারী আপনী আমার সহিত কিছা আমার ওয়ারিসানের সহিত কিছা এলাকা নাই কোন মিছা দাওয়া আমি ইহাতে করি কিছা কেহ করে সে বাতিল এবং মিথ্যা এতদার্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২০৬ বার সত ছয় সাল তারিখ ৭ সাতএকী পৌষ।”

এই দলীলের সাক্ষীগণের মধ্যে এক জন, শ্রীনন্দকুমার শর্মা, সাং রঘুনাথপুর। ইনিই স্বপ্রসিদ্ধ নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। এই একরার-পত্র সম্পাদিত হইবার পরের বৎসর রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

অল্পপস্থিতে তালুকরক্ষার এবং উত্তরাধিকারের এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ১৮০০ সালের আরম্ভেই বোধ হয় রামমোহন রায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। কত দিন তিনি বিদেশে ছিলেন তাহা জানা যায় না। বোধ হয় ১২০৮ (১৮০১—১৮০২) সনে তিনি কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। এই বৎসর গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কলিকাতার তহবিলদার নিযুক্ত হইয়াছিল। গোপীমোহনের জবানবন্দীতে ১৮০১ হইতে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রামমোহন রায়ের কলিকাতার কারবারের কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কলিকাতায় রামমোহন রায়ের স্থায়ী দপ্তর বা গদি ছিল। ১২০৯ সনে (১৮০২ সালে) রামমোহন রায়ের আদেশমত গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় টমাস উডফোর্ড (Thomas Woodforde) নামক কোম্পানীর এক জন সিভিল কন্সটারীকে ৫০০০ পাচ হাজার টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই উডফোর্ড সাহেবের সহিত পরিচয়ের ফলে রামমোহন রায়ের চাকরী আরম্ভ হইয়াছিল। উডফোর্ড সাহেব ঢাকা-জালালপুরের (ফরিদপুরের) অস্থায়ী কালেক্টার

নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৮০৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।* রামমোহন রায় উডফোর্ড সাহেবের সঙ্গে বা উডফোর্ড সাহেবের আহ্বানে ঢাকা-জালালপুর গিয়াছিলেন। ঢাকা-জালালপুরের কালেক্টরীর দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র ১৮০৩ সালের ৭ই মার্চ পদত্যাগ করায় উডফোর্ড সাহেব রামমোহন রায়কে ঐ তারিখেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।† উডফোর্ড সাহেব ঐ সালের ১৪ই মে অস্থায়ী কালেক্টরের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, ঐ তারিখেই রামমোহন রায়ও দেওয়ানের পদ ত্যাগ করিয়া বোধ হয় কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ১৮০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় বন্ধমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ঢাকা-জালালপুর হইতে ফিরিয়া রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার একেশ্বরবাদী (Unitarian) পাত্রি বন্ধু আডাম (William Adam) সাহেব লিখিয়াছেন, “রামমোহন রায় কথাপ্রসঙ্গে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ স্বরে আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন তাঁহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন প্রাণবায়ু বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা একান্ত ভক্তিতে ‘রাম’ ‘রাম’ বলিয়া স্বীয় ঈশদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন।”‡ রামমোহন রায় কলিকাতায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।§

উডফোর্ড সাহেব ১৮০৩ সালের ১১ই আগষ্ট মর্শিদাবাদের আপিল-আদালতের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।¶ রামমোহন রায়ও বোধ হয় উডফোর্ড সাহেবের সঙ্গে মর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন, এবং সেইখানে তুহফ-উল-মুহাফিদ্দীন নামক একখানি ফার্সি পুস্তিকা

প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কত দিন মর্শিদাবাদে ছিলেন তাহা আমরা জানি না। সম্ভবতঃ ১৮০৫ সালের মে মাসে তিনি তাঁহার এক জন প্রধান বন্ধু এবং সহায় জন ডিগবীর চাকরী গ্রহণ করিয়া রামগড় যাত্রা করিয়াছিলেন। ডিগবী সাহেব ১৮১৭ সালে লণ্ডনে রামমোহনের কৃত “কেন” উপনিষদের এবং “বেদান্তসারের” (Abridgment of Vedant) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, ১৮০১ সালে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। ১৮০৫ সালের ২ই মে ডিগবী সাহেব রামগড়ের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ১৮০৭ সালের শেষ পর্যন্ত রামগড়ে ছিলেন।* এই সময় রামমোহন রায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। এই আড়াই বৎসরের মধ্যে তিন মাস কাল রামমোহন রায় রামগড়ের ফৌজদারীর সেরস্তাদারের কার্য করিয়াছিলেন। বাকী সময় তিনি কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন? রংপুর হইতে ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত (O. C. 8 February 1810, No. 9) একখানি চিঠিতে ডিগবী সাহেব প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন, যখন আমি যশোহরের অস্থায়ী কালেক্টর ছিলাম, তখন রামমোহন রায় খাস-মুন্সীরূপে আমার সঙ্গে ছিলেন। রামমোহন রায় বোধ হয় আগে উডফোর্ড সাহেবের এবং পরে ডিগবী সাহেবের খাস-মুন্সীর পদে বরাবর নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার খাস-মুন্সীর এক কাজ হয়ত ছিল সাহেবকে ফার্সি ভাষা শিক্ষা দেওয়া। ডিগবী সাহেবের চিঠিপত্র পাঠ করিলে বুঝা যায়, খাস-মুন্সী সাহেবের আফিসের কার্যেও সহায়তা করিতেন। সেকালে ফার্সি ছিল আদালতের চলিত ভাষা, এবং আমলাদিগের মধ্যে খুব কম লোকেই ভাল ইংরেজী জানিত। সুতরাং যে-সকল সাহেব কৰ্মচারী ভাল ফার্সি জানিতেন না, তাঁহাদিগকে হয় আমলাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত, আর ন-হয় বিখ্যাত খাস-মুন্সীর সহায়তায় কার্য নির্বাহ করিতে হইত। কালেক্টরের খাস-মুন্সীরূপে রামমোহন রায় কালেক্টরীর সকল বিভাগ সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ১৮০৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর

* Board of Revenue, Mis. 8 February, 1803, No. 63.

† Board of Revenue, Mis. 11 March, 1803, No. 23.

‡ S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta 1913, p. 8.

§ তারিখসেবীর জেরার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন।

¶ Dodwell and Miles, *Alphabetical List of the Bengal Civil Servants, London*, 1839। এই তালিকাভুক্ত টমাস উডফোর্ডের বিবরণ অসম্পূর্ণ। তিনি যে এক সময় ঢাকা-জালালপুরে কার্য করিয়াছিলেন এই তালিকায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

* Dodwell and Miles। রামগড় হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত; এক সময় ঐ জেলার প্রধান নগর ছিল।

ডিগবী সাহেব যশোহরের অস্থায়ী কালেক্টরের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিন সপ্তাহ পরে (১৮০৮ সালের ১৫ই জাছুয়ারী) ভাগলপুরের রেজিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস ভাগলপুরে কাজ করিয়া আবার তিনি যশোহরে বদলী হইয়াছিলেন, এবং ১৮০৯ সালের ৩০শে জুন রংপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডিগবী সাহেবের সঙ্গে রামমোহন রায় যশোহর, ভাগলপুর এবং শেষে রংপুর গিয়াছিলেন।

১৮০৩ হইতে ১৮০৯ সালের মধ্যে রামমোহন রায় চারি খানি পত্তনী তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১২১০ সনে (১৮০৩-০৪ সালে) তাঁহার নায়েব জগমোহন মজুমদারের দ্বারা তিনি বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত লান্দুড়পাড়া তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। বোধ হয় ইহার কিছু কাল পরে, উক্ত মজুমদারের যোগে, ৭২৫ টাকা মূল্যে ভুরহুট পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নামক পত্তনী তালুক খরিদ করা হইয়াছিল। ১২১৫ সালে (১৮০৮-০৯ সালে) রামমোহন রায় রাজীবলোচন রায়ের নামে জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত বীরলোক নামক পত্তনী তালুক, এবং ১২১৬ সনে (১৮০৯-১০ সালে) ঐ পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর নামক পত্তনী তালুক খরিদ করিয়াছিলেন।* গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের কর্মচারী এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমায় তাঁহার পক্ষের সাক্ষী বেচারাম সেন তাঁহার জবানবন্দীতে এই চারিখানি তালুকের সদর-জমা এবং মূল্যের এই প্রকার হিসাব দিয়াছেন—

তালুকের নাম	সদর-জমা	মূল্য
লান্দুড়পাড়া	প্রায় ৬০০	—
শ্রীরামপুর	১৮০০	১৩০০
বীরলোক	১৬০০০	১১০০০
কৃষ্ণনগর	৫০০০	৭১০০

তার পর বেচারাম সেন বলিয়াছেন, এই চারিখানি তালুক হইতে রামমোহন রায় মোট পাঁচ-ছয় হাজার টাকা মুনাফা পাইতেন। বেচারাম সেন কিছু দিন রামমোহন রায়ের দপ্তরের মোহরের কার্য করিয়াছিলেন, এবং তাহার পূর্বে রাজীবলোচন রায়ের দপ্তরের মোহরের ছিলেন।

* রামমোহন রায়ের জবাব।

স্বতরাং এই সকল বিষয়ে খবর পাইবার তাঁহার সুযোগ ছিল। কিন্তু মুনাফার হিসাব দেখিতে গেলে বেচারাম সেন তিনখানি তালুকের যে-মূল্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অত্যধিক বলিয়া মনে হয়। রামমোহন রায়ের জবাবের সহায়তায় বেচারাম সেনের একটি ভুল সংশোধন করা যাইতে পারে। এই জবাবে উক্ত হইয়াছে, রামমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে শ্রীরামপুর তালুক সিকা ৭২৫ মূল্যে খরিদ করা হইয়াছিল। বেচারাম সেন বলিয়াছেন শ্রীরামপুরের মূল্য ১৩০০ টাকা। রামমোহন রায়ের জবাবে আর তিনখানি তালুকের মূল্য উল্লিখিত হয় নাই। কৃষ্ণনগর এবং শ্রীরামপুর তালুকের মূল্যের টাকা দেওয়া সম্বন্ধে বেচারাম সেন বলিয়াছেন, এই টাকা সাক্ষীর (বেচারাম সেনের) সাক্ষাতে লান্দুড়পাড়া হইতে বর্দ্ধমানে পাঠান হইয়াছিল (money was despatched to Burdwan from Langulparah in the presence of him this deponent)। বীরলোক তালুকের মূল্যের টাকা সম্বন্ধে বেচারাম সেন বলিয়াছেন, “আমার সাক্ষাতে জগন্নাথ মজুমদার কতক টাকা রামমোহন রায়ের নগদ তহবিল হইতে (partly out of the funds in his hands belonging to the said Rammohun Roy) দিয়াছিলেন, এবং কতক টাকা রামমোহন রায়ের নামে ধার করিয়া দিয়াছিলেন।” (partly with money which he borrowed on the credit of the said Rammohun Roy)।

১৮০৯ সালের ২০শে অক্টোবর ডিগবী সাহেব রংপুরের স্থায়ী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০৯ সনের নবেম্বর মাসের গোড়ায় রংপুরের কালেক্টরীর দেওয়ানের পদ খালি হওয়ায় ডিগবী সাহেব রামমোহন রায়কে ঐ পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া ঐ নিয়োগ অমুমোদন করিবার জন্ত ৫ই নবেম্বর রেভিনিউ বোর্ডকে একখানি চিঠি লিখিয়া ছিলেন। এই চিঠিতে রামমোহন রায়ের যোগ্যতার এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—

A man of very respectable family and excellent education; fully competent to discharge the duties of such an office, and from a long acquaintance with him I have reason to suppose

he will acquit himself in the capacity of Dewan with industry, integrity and ability" (O. C. 14 December 1809, No. 23.)

রামমোহন রায় "অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং সুশিক্ষিত ; এই পদের কার্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ যোগ্য ; এবং দীর্ঘকালের পরিচয়ের ফলে আমি অতুমান করিতে পারি যে তিনি শ্রমশীলতার, সততার এবং যোগ্যতার সহিত দেওয়ানের কার্য সম্পাদন করিবেন ।"

এই পত্রের উত্তরে বোর্ড ডিগবী সাহেবের সুপারিশ অনুসারে রামমোহন রায়ের নিয়োগ মঞ্জুর না করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ইনি কাহার অধীনে কোন্ কোন্ সরকারী চাকরি করিয়াছেন এবং কে তাঁহার জামীন হইবে । উত্তরে ডিগবী সাহেব রামমোহন রায়ের অভিজ্ঞতার যে বিবরণ দিলেন তাহাতে বোর্ড সন্তুষ্ট হইলেন না ।* রামমোহন রায় যে ১৮০৩ সালের ৭ই মার্চ হইতে ১৪ই মে পর্যন্ত ঢাকা-জালালপুরের কালেক্টরীর দেওয়ানের কার্য করিয়াছিলেন এই কথা ডিগবী সাহেব উল্লেখ করিয়াছিলেন না । বোর্ড রামমোহন রায়কে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত রাখিতে অসম্মত হওয়ায় ডিগবী সাহেব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারীর চিঠিতে (8 February, 1810, No. 9) সেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ডিগবীর এই কড়া চিঠির উত্তরে বোর্ড তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "বোর্ড তাঁহার লিখনভঙ্গীর (style

of addressing them) তীব্র নিন্দা করেন (greatly disapprove) এবং ভবিষ্যতে বোর্ডের প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে বোর্ড তাহা ক্ষমা করিবেন না" (O. C. 8 February 1810, No. 10) ।

১৮১৪ সালের ২০শে জুলাই পর্যন্ত, প্রায় পাঁচ বৎসর কাল, ডিগবী সাহেব রংপুরের কালেক্টর ছিলেন, এবং এই পাঁচ বৎসর রামমোহন রায় রংপুরে বাস করিয়াছিলেন । রামমোহন রায়ের কলিকাতার তহবিলদার গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়া গিয়াছেন, বিদেশে চাকরী করিবার সময় রামমোহন রায় সময়-সময় আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতেন, কিন্তু তিনি দুইবার মাত্র লাঙ্গুড়-পাড়া গিয়াছিলেন । রামমোহন রায় যখন রংপুরে ছিলেন তখন তাঁহার ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় একাদিক্রমে চারি বৎসর তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন ।† রংপুরে ১৮১২ সালের ১৪ই জানুয়ারী গুরুদাস রামমোহন রায়কে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক সাফ কবালা করিয়া দিয়া ছিলেন । এই কবালা ফার্সি ভাষায় লিখিত (৩ নং চিত্র) । এই কবালার এক জন সাক্ষী শ্রীমদকুমার শর্মা, সাকিম পালপাড়া । এই নন্দকুমার শর্মা অবশ্য পূর্বোক্তলিখিত নন্দকুমার বিজ্ঞানদার । সুতরাং দেখা যায়, ইনিও রামমোহন রায়ের সঙ্গে রংপুরে ছিলেন । গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত কবালায় তাঁহার পিতা শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের নাম আছে । ১৮১২ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখেই এই কবালাখানি রেজেষ্টারী করা হইয়াছিল । ইহাতে ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্টার জন্ ডিগবীর স্বাক্ষর আছে ।

১৮১২ সালের চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে রামমোহন রায়ের অগ্রজ জগমোহন রায় পরলোকগমন করিয়াছিলেন ।‡ গুরুদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন, তিনি রংপুর থাকিতে জগমোহন রায়ের মৃত্যু ঘটয়াছিল, এবং তাঁহার পিতা পত্নীদ্বারা তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইয়াছিলেন । জগমোহন রায়ের মৃত্যুসময়ে গুরুদাস মুখোপাধ্যায় যখন রংপুরে ছিলেন, তাঁহার মাতুল রামমোহন রায়ও তখন রংপুরে ছিলেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সম্ভব । সুতরাং

* ১৮০৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ডিগবী সাহেব বোর্ডকে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন সেই মূল চিঠির (O. C.) পৃষ্ঠে B. C. স্বাক্ষরযুক্ত, তৎকালে বোর্ডের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ক্রিম্প (Crip) সাহেবের পেন্সিলে লিখিত এবং বর্তমানে লুপ্তপ্রায় দুইটি মন্তব্য আছে । ইহার একটি মন্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন— "I understand that the man recommended by Mr. Digby was formerly in the confidential employ of Mr. Woodforde when acting collector of Dacca-Jallalpoore. I have also heard unfavourable mention of his conduct as seristadar of Rangur." উক্ত বোর্ড সাহেবের confidential employ অর্থ তাঁহার খাস মুদীপিরি । ফৌজদারীর সেরস্তাদার তেহিনিউ বোর্ডের অধীনে ছিল না । সুতরাং বোর্ডের নিকট সেরস্তাদারের আচরণ সম্বন্ধে খবর পৌছা সম্ভব নহে । ডিগবী সাহেবের চিঠির উত্তরে বোর্ড তাঁহার নিকট এই মন্তব্যের নকল পাঠান নাই, এবং তিনিও ইহার উত্তর দিবার অবকাশ পান নাই । সুতরাং ক্রিম্প সাহেবের মন্তব্যে উল্লিখিত গুণাবলি সন্দেহ নহে ।

† গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দী ।

‡ গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জি ।

জগমোহন রায়ের জীবন সহমরণ রামমোহন রায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এই প্রবাদ অমূলক মনে করিতে হয়।* জগমোহন রায়ের এক জ্যেষ্ঠ, গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মাতা, অন্ততঃ ১৮২১ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং এই সালের ১৩ই এপ্রিল স্বপ্রিয়-কোটের একুইটি-বিভাগে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। সেকালে রামমোহন রায়ের পক্ষে সত্যীদাহ প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব ছিল না। এইরূপ প্রত্যক্ষীকৃত কোন ঘটনার কথিত বিবরণ হইতে হয়ত এই প্রবাদের উৎপত্তি।

১৮১৪ সালের ২০শে জুলাই রংপুরের কালেক্টরের কার্যভার ত্যাগ করিয়া, দীর্ঘ ছুটি লইয়া, ডিগবী সাহেব ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছিলেন। বোধ হয় এই সময়েই রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই ১৮১৪ সালে তিনি কলিকাতায় দুইখানা বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন : একখানি এলিজাবেথ ফেল্ডহাইকের নিকট হইতে ২০৩১৭ টাকা মূল্যে ক্রীত চৌরঙ্গীতে দোতলা বাড়ী এবং আর একখানি ফ্রানসেস মেগুসের নিকট হইতে ১৩০০০ টাকা মূল্যে ক্রীত সিমলায় দোতলা বাড়ী এবং বাগান। এই সিমলার বাগানবাড়ীই রামমোহন রায়ের মণিকতলার স্বপ্রসিদ্ধ বাগানবাড়ী। ১৮১৪ সালে, মণিকতলার এই বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রামমোহন রায় তাঁহার জীবনের মহাব্রত, ব্রহ্ম-উপাসনার প্রচার, আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর মাত্র ১২ বৎসর পরে, ১৮৪৫ সালে, কিশোরীচাঁদ মিত্র ‘কলিকাতা রিভিউ’ (Calcutta Review) পত্রে তাঁহার একটি নাতিদীর্ঘ (pp. 355—393) জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই জীবনচরিতে মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, রামমোহন রায় রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেবের আফিসে মোহরের (clerk) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তার পর—

By serving in this capacity, he is said to have

* নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, “মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত,” চতুর্থ সংস্করণ ২৬-২৭ পৃ.। রাজনারায়ণ বসু এই প্রবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ইহা শুনিয়াছিলেন তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসুর নিকট।

realized as much money as enabled him to become a Zemindar with an income of Rs. “ten thousand a year.” If this assertion be true, it must raise in the mind a strong suspicion of the moral character of this extraordinary man. (P. 364.)

“কথিত আছে রামমোহন রায় এই চাকরী করিয়া এত টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন যে তদ্বারা দশ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী খরিদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহা এই অসাধারণ পুরুষের মততা সম্বন্ধে আমাদের মনে গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক করা করিয়া পারে না।”

আমরা এই প্রস্তাবে রামমোহন রায়ের তালুক খরিদের যে বিবরণ দিয়াছি তাহা হইতে দেখা যাইবে, রামমোহন রায় গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর নামক দুইখানি তালুক হইতে বার্ষিক ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা মুনাফা পাইতেন। এই দুইখানি তালুক তিনি খরিদ করিয়াছিলেন রংপুরে চাকরী আরম্ভ করিবার দশ বৎসর পূর্বে, ১৭৯৯ সালের ১৫ই জুন। আর যে চারিখানি পত্তনী তালুক হইতে তিনি বার্ষিক পাঁচ-ছয় হাজার টাকা মুনাফা পাইতেন তন্মধ্যে তিনখানি খরিদ করিয়াছিলেন রংপুর যাওয়ার পূর্বে, এবং একখানি (কৃষ্ণনগর) খরিদ করিয়াছিলেন ১২১৬ সনের অর্থাৎ ১৮০৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষার্ধ্বে হইতে ১৮১০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধের মধ্যে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ডিগবী সাহেব ১৮০৯ সালের ৩০শে জুন রংপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অবশ্য জুলাই মাসে রংপুর পৌছিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যদি ডিগবীর সঙ্গে সঙ্গে রংপুর গিয়া থাকেন তবে তাঁহার রংপুরে কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই হয়ত কৃষ্ণনগর তালুক খরিদ করা হইয়াছিল, অথবা রংপুর যাওয়ার পরে, ৯ মাসের মধ্যে, খরিদ করা হইয়াছিল। পূর্বোক্ত বেচারাম সেনের জবানবন্দী হইতে আমরা জানিতে পারি, কৃষ্ণনগর তালুকের মূল্যের টাকা লাঙ্গুড়পাড়ার তহবিল হইতে বর্দ্ধমানে পাঠান হইয়াছিল। তালুক হইতে যে টাকা আদায় হইত তাহাই প্রধানতঃ লাঙ্গুড়পাড়ার তহবিলে জমা হইত। রংপুরে কয়েক মাস চাকরী করিয়াই রামমোহন রায় লাঙ্গুড়পাড়ার তহবিলে যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন সেই টাকার দ্বারা কৃষ্ণনগর

তালুক খরিদ করা হইয়াছিল এইরূপ অল্পমান করা কর্তব্য নহে। রামমোহন রায়ের কলিকাতার তহবিলদার গোপী-মোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন, “রাম-মোহন রায় বিভিন্ন সময়ে রংপুর হইতে কলিকাতায় টাকা পাঠাইয়াছেন” (Rammohun Roy at different times sent sums of money from Rungpoor to Calcutta)। লাক্কুডপাড়ার তহবিলে তালুকের টাকাই জমা হইত এবং তালুকের উদ্ধৃত টাকা হইতেই এই চারি খানি পত্তনী তালুক খরিদ করা হইয়াছিল, এইরূপ অল্পমান করা সম্ভব।

তার পর প্রশ্ন উঠিতে পারে, ১৮১৪ সালে ৩৩৩১৭ টাকা মূল্যে কলিকাতায় দুইখানি বাড়ী খরিদ করিবার টাকা রামমোহন রায় কোথায় পাইয়াছিলেন? তাঁহার বেতনের টাকা এবং কলিকাতার তহবিলের টাকা যদি বাদও দেওয়া যায়, তথাপি ১৮১০ হইতে ১৮১৩ এই চারি বৎসরে বার্ষিক ১১০০০ মুনাকার তালুক হইতে তেত্রিশ হাজার টাকা উদ্ধৃত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। ছয়খানি তালুক ছাড়াও রামমোহন রায়ের পিতৃদত্ত খুচরা সম্পত্তি ছিল। এইরূপ সম্পত্তি হইতে যেমন রাধানগরে রামলোচন রায়ের সংসার-খরচ চলিতেছিল, তেমন লাক্কুডপাড়ায় রামমোহন রায়ের সংসারখরচও বোধ হয় চলিয়া যাইত। সুতরাং রংপুরের চাকরীর আয়ের উদ্ধৃত টাকা হইতে রামমোহন রায় কোন সম্পত্তি খরিদ করিয়াছিলেন এইরূপ অল্পমান করা অনাবশ্যক, এবং চাকরীর সময় তিনি ঘুষ লইতেন এইরূপ কল্পনার অবকাশ নাই।

কলিকাতায় আসিয়া প্রচারকার্য পরিচালন করিবার জন্ত রামমোহন রায় অনেক টাকা ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিন জন অধ্যাপক—তান্ত্রিক নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, বৈদান্তিক শিবপ্রসাদ শর্মা, এবং স্মার্ত্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৫ সাল হইতে তিনি অবিরত নানা ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনি-টেরিয়েন মিশনে তিনি এক কালে ৫০০০ দান করিয়াছিলেন।* ১৮১৭ সাল হইতে সর্বদাই তাঁহার মামলা-

মোকদ্দমা লাগিয়া ছিল। কিন্তু তাঁহার আয় বোধ হয় কোন দিনই মাসিক ১০০০ টাকার বেশী ছিল না। সুতরাং কলিকাতায় তাঁহার আয় হইতে ব্যয় বেশী হইতেছিল এইরূপ অল্পমান করা যাইতে পারে। ১৮৩০ সালের ২ই জানুয়ারীর (১২৩৬ সনের ২৭শে পৌষের) ‘সমাচার দর্পণে’ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল—

“ইশতেহার।—স্বাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

“সন ১৮৩০ সালে আগামি ৩১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার টাল কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলামঘরে নীচের লিখিত স্বাবরধন পবলিক অয়েন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সকলার রোড শিমলার মানিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান বাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুঠরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুলাম ও বাবুচিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

“এক ১৫ বিঘ জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনট বৃহৎ পুকুরী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্য গভর্নমেন্ট হোস হইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পহঁচান যায়।

“ঐ বাটী ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণ দিগে হুকেশের স্ট্রিট নামে রাস্তা পূর্ব দিগে সকলার রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তর পশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

“ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।”

এই নীলাম ইস্তাহারে রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়ীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই ইস্তাহার পাঠ করিলে বুঝা যায়, ১৮৩০ সালের গোড়ায় রামমোহন রায়ের আর্থিক অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। দেশের হিতসাধনের জন্ত অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি বোধ হয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং ঋণ পরিশোধ করিবার জন্ত বাগানবাড়ী নীলামে উঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা রামমোহন রায়ের ১৮ বৎসরের (১৭৯৭—১৮১৪) আয়ের যে হিসাব দিয়াছি তাহা হইতে দেখা গিয়াছে, তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশী আয় হইয়াছিল ১৭৯৮ এবং ১৭৯৯ সালে। তার পর তিনি পাটনা, বারাণসী এবং অত্যাশ্রয় দূর দেশ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেন যে উডফোর্ড এবং ডিগবী সাহেবের থাস-মুন্সীর চাকরী লইয়া বার বৎসরকাল

* S. D. Collet, *op. cit.*, p. ৪৭.

† শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, প্রথম খণ্ড, ১৩২ পৃঃ।

জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। তিনি যদি কলিকাতায় থাকিয়া নিজের কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচার কাজ করিতেন, এবং আর যে কারবার চলিতেছিল তাহা এবং তালুকদারী নিয়ে দেখাশুনা করিতেন, তবে বোধ হয় তাঁহার আরও বেশী আয় হইত। যদি কেহ বলেন, ভবিষ্যতে কালেক্টরীর দেওয়ানী পদ লাভের আশায় তিনি খাস-মুন্সীর চাকরী লইয়াছিলেন, বোর্ডের ১৮১০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠি সেই আশা চিরতরে ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। তথাপি মান-অভিমান ত্যাগ করিয়া * তার পরও রামমোহন রায় সাড়ে চারি বৎসর কাল ডিগবী সাহেবের খাস-মুন্সীর চাকরী করিতে সম্মত হইলেন কেন? অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া রামমোহন রায় বার বৎসর চাকরী করিয়াছিলেন এই কথা বলিতেই হইবে। তাহার উপর, নিজের সমস্ত বিষয়কর্ম কর্মচারীদের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া, অনেকটা বিপদও ঘাড়ে লইয়াছিলেন। আমাদের অনুমান হয়, এই ত্যাগস্বীকার করিয়া, এই বিপদ মাথায় লইয়া, রামমোহন রায়ের বিদেশে চাকরী করিতে যাওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিল, তিনি পরে কলিকাতায় আসিয়া যে মহাব্রত অনুষ্ঠান করিবার স্বপ্ন করিয়াছিলেন তজ্জন্তু নিজেকে প্রস্তুত করা, এবং গোণ লক্ষ্য, কলিকাতা হইতে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকায় যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল চাকরীর বেতনের টাকার দ্বারা কতক পরিমাণে তাহার পূরণ করা।

রামমোহন রায়ের জীবনের মহাব্রত সাধনের জন্তু অর্থ এবং বিদ্যা এই দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখিয়াছি বাটোয়ারার পর অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অর্থসঞ্চয়ের সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদ্যার মধ্যে সংস্কৃত, ফার্সি, আরবী তিনি আশৈশব অচুশীলন করিয়াছিলেন।

* ১৮১০ সালের ৩১শে জানুয়ারীর চিঠিতে ডিগবী সাহেব Boardকে লিখিয়াছেন,

"Being thoroughly acquainted with the merits and abilities of Rammohun Roy, it would be very repugnant to my feelings, to be compelled so far to disgrace him in the eyes of the natives as to remove him from his present employment." (O. C. 8 February, 1810, No. 9.)

বাকী ছিল, এবং বিশেষ আবশ্যক ছিল, ইংরেজী বিদ্যা। ১২ বৎসর কাল সাহেবদিগের চাকরী করিয়া রামমোহন রায় জ্ঞানরূপে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ডিগবী-সাহেব পূর্বোল্লিখিত "কেন" উপনিষদের এবং "বেদান্ত সারের" ইংরেজী অনুবাদের মুখবন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

"At the age of twenty-two [really twenty-four, i. e. in 1796] he commenced the study of the English language, which not pursuing with application, he five years afterwards [1801], when I became acquainted with him, could merely speak it well enough to be understood upon the most common topics of discourse, but could not write it with any degree of correctness. He was afterwards employed as Dewan, or principal native officer, in the district in which I was for five years Collector in the East India Company's Civil Service. By perusing all my correspondence with diligence and attention, as well as by corresponding and conversing with European gentlemen, he acquired so correct a knowledge of the English language as to be able to write and speak it with considerable accuracy. He was also in the constant habit of reading the English newspapers, of which the continental politics chiefly interested him."†

এই ইংরেজী বচনে বন্ধনীর মধ্যে যে কয়েকটি কথা আছে তাহা মিস্ কলেট যোগ করিয়া দিয়াছেন। ডিগবী সাহেবের সংস্কার ছিল, রামমোহন রায় ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। মিস্ কলেট অত্যন্ত প্রমাণ অনুসারে স্থির করিয়াছেন, রামমোহন রায়ের জন্ম হয় ১৭৭২ সালের মে মাসে। উভয়ের মতে রামমোহন রায়ের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল ১৭৯৬ সালে। এই সালের ১লা ডিসেম্বর রামকান্ত রায়ের বসন্তপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল। বাটোয়ারার পূর্বাধিই বোধ হয় রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতে এবং ইংরেজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে, ১৮০১ সালে, ডিগবী সাহেবের সঙ্গে যখন তাঁহার প্রথম আলাপ হয়, তখন তিনি ইংরেজীতে কথাবার্তা চালাইতে পারিতেন, কিন্তু শুদ্ধ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারিতেন না। রামমোহন রায়ের ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল যখন তিনি ডিগবী সাহেবের চাকরী লইয়া তাঁহার আফিসের

† Collet, op. cit. P. 15.



সুলতানা .

শ্রীকালীকঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কাগজপত্র নিয়মমত পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সর্বদা মনোযোগ-সহকারে এই সকল কাগজপত্র পড়িয়া, ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িয়া, এবং সাহেবদিগের সহিত ইংরেজীতে আলাপ করিয়া তিনি অবশেষে ইংরেজী ভাষায় পাবদর্শিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের অর্থ সম্বন্ধে যেমন, বিজ্ঞা সম্বন্ধেও তেমনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি অগ্ৰবাদ না হউক, অমূলক সংবাদ, প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

“But we would have it distinctly understood that his English writings do not furnish legitimate criterion of his English knowledge.”

“আমরা চাই যে (লোক) পরিষ্কাররূপে বুঝিবা রাখুক যে তাঁহার (রামমোহন রায়ের) ইংরেজী পুস্তকগুলি তাঁহার ইংরেজী জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় দেয় না।”

রামমোহন রায়ের নামে চলিত ইংরেজী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকৃতপ্রস্তাবে কাহার রচনা, এই সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া-মিত্র মহাশয় একটি মাত্র প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন—

“It had been remarked by those who came into contact with him that he wrote English much better than he spoke it.”

অর্থাৎ তাঁহার রামমোহন রায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার বলিয়াছেন যে, তিনি যেকোন ইংরেজী বলিতেন তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল ইংরেজী লিখিতেন, এবং এই প্রমাণের উপরে লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রামমোহন রায়ের নামে প্রচারিত ইংরেজী রচনা অন্ত্রে লিখিয়া বা সংশোধন করিয়া দিতেন। রামমোহন রায়ের বিনামায় ইংরেজী লেখক বা তাঁহার রচনার সংশোধক সম্বন্ধে মিত্র-মহাশয়

* Calcutta Review, vol iv, 1845, p. 364.

† ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী লেখক বলিয়া যশস্বী আরও অনেকে ইংরেজী বলেন যেকোন, লেখেন ভার চেয়ে অনেক ভাল। ইহাঁদের ইংরেজী কে লিখিয়া দেয়?

ঐযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সদাৰ্ণ রিভিউ’তে রামমোহন রায়ের বহু ভাল ইংরেজী লিখিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে বহুতর যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—প্রবাসীর সম্পাদক।

একবার বহুবচন (European friends) এবং আর একবার একবচন (intelligent and educated friend) ব্যবহার করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের প্রথম ইংরেজী পুস্তিকা, বেদান্তসারের ইংরেজী অমুদ্রা (Abridgment of Vedanta) ১৮১৬ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারীর গভর্ণমেন্ট গেজেটে (Government Gazette-এ) সমালোচিত হইয়াছিল; অর্থাৎ ১৮১৫ সালের শেষভাগে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র এই পুস্তিকার মুখবন্ধটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই।

যখন এই মুখবন্ধ লিখিত হইয়া ছিল তখন কোন ইউরোপীয় বন্ধু বা পণ্ডিত যে রামমোহন রায়ের সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। স্মৃতবাৎ ইংরেজী বেদান্তসারের মুখবন্ধটি রামমোহন রায়ের নিজের রচনা, এবং তিনি ভাল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন, এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য। ডিগবী সাহেবের পূর্বোক্ত অভিমত এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে।

ইংরেজী শিখিবার জন্তই কি রামমোহন রায় উডফোর্ড সাহেবের এবং ডিগবী সাহেবের খাস-মুন্সীব চাকরী লইয়া বার বৎসর এক প্রকার অন্ত্রাতবাস করিয়াছিলেন? ইংরেজী বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-অর্থলাভ ভিন্ন আর কি লাভের জন্ত যে তিনি কলিকাতার পশার ফেলিয়া এতকাল মফস্বলে চাকরী করিয়াছিলেন তাহা এখন বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু ১৭৯৭ হইতে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন যে তাঁহার পরবর্তী জীবনে অল্পাধিক মহাত্রতের জ্ঞান-আরম্ভ উদ্যোগপূর্বক এই কথা স্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ ১৮১৪ সালের জুলাই মাসে ডিগবী সাহেব ছুটি হইয়া বিলাত চলিয়া গেলে, রামমোহন রায় বেকাব হইয়া কলিকাতায় আসিয়া অগত্যা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে এবং নাহুবাদ বেদান্তদর্শন এবং উপনিষৎ ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না। প্রচারক এবং সংস্কারক রামমোহন রায়ের জীবনের সহিত তাঁহার বৈষয়িক জীবন অচ্ছেদ্য সূত্রে সম্বন্ধ বহিয়াছে। পরজীবনের কথা উপেক্ষা করিয়া পূর্বজীবনের ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে ভুল না হইয়া পারে না।

আশ্বিনের প্রবাসীর শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪৫	২	২৮	১৭২২	১৭৭২
৮৪৭	১	১১	ষ্টেণ্ডফোর্ড	সানফোর্ড
”	”	”	Stanford	Sanford
৮৪৯	২	২১	Bursoo	Bursoot
৮৫০	১	৩০	১৮০৪ সালের ১৫ই কি	১৮০৫ সালের
			১৬ই ফেব্রুয়ারী	১৬ই ফেব্রুয়ারী
৮৫২	২	১৫	“পাথ্যপ্রদান”	“পাথ্যপ্ৰদান”

খুড়ীমা

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাঁড়িয়া বসিয়া অন্ধ কবিত্তেছি।
বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। বর্ষা-বাদল না হইলে
বিনোদ-মাষ্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি
বাদলাই নামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার
ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা
লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং
আমার দিকে চাহিয়া ফিক্ করিয়া হাসিল। আজও মনে
আছে লোকটার গায়ে একটা ময়লা চিট্ কামিজ, খালি পা,
রুক্ষ চুল। বহুস বৃষ্টিবার উপায় নাই, অন্তত আমার
পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-
মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে
পারেন না বলিয়া এত দিন ছিলাম মামাব বাড়ীতেই।
এ-গ্রামে আমি আসিবাছি বেশী দিন নহ। যখন চলিয়া
গিয়াছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাষ্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর ?

লোকটা উঠানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া
বলিতে গেলাম—আমুন না ওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাষ্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—
কি চাই পরেশ ? লোকটা আর একবার কেমন এক ধরণের
হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরণের হাসা উচিত ছিল
তেনন নহ—যেন নিজেব প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক
হাসি হাসিতেছে। ছেলেমানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা
অসংলগ্ন ধরণের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জ্যাঠাতো ভাই শীতল বাড়ীর ভিতর হইতে
চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

এই যে পরেশ-কাকা কোথা থেকে ? কোথায় ছিলেন
এত দিন ?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটি মুড়ি আনিয়া
লোকটার কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। আমি অবাক
হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সন্ধান
করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন,
এমন সময় লোকটা একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদা'র
দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকীগুলি একবার
রাইট্-ম্যাভার্ট-টার্ণ করিয়া ঘুবপাক খাইয়া উঠানময়
কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে কি একটা
দুর্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার স্বরে—

গুগ্‌লি কিছুক ঝা—

খোদার ঢাল গামছাব বাঁধি

গুগ্‌লি কিছুক ঝা—

গুগ্‌লি কিছুক—

গুগ্‌লি কিছুক—

তখনও সে ঘুবপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন
সময় আমার জ্যাঠামহাশয় দুর্লভ রায়—তিনি অত্যন্ত
রাশভারী ও কড়া মেজাজের লোক—বাড়ীর ভিতর হইতে
চণ্ডীমণ্ডপের পাশে উঠান হইতে অন্তরে ঘাইবার দরজায়
দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে টেচামেচি করে দুপুর-
বেলা ? ও পাগ্‌লাটা ? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেন
ও-রকম করে ফেললে যে বড়—বদমায়েসী করবাব আর
জায়গা পাও নি ?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া
কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পবে তাহাকে সঙ্গে করে একটা খাড়া
দিয়া বলিলেন—বেরোও এখান থেকে, আর কোনদিন
দরজায় ঢুকেছ ত মেরে হাড় গুঁড়ো করবো—আমার
বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়ের খাড়ার বেগে রোগা ও পাতলা
লোকটা খানিক দূর ছিটকাইয়া গিয়া কাদাম-পিছল

উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবার থুথু ফেলিল—রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠানের দরজায় জড় হইয়াছিল—লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমাব মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েবই মুখ্যো-বাড়ীভব ছিলে। পশ্চিমে কোথায় ঘন চাকুরী করিত, বয়স বেশী নয় এই মাত্র পচিশ। হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথা খরাপ হওয়ার দরুন চাকুরী ছাড়িয়া আসিয়া পথে পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিবার ক্ষেত্র নাই, সে যে-বাড়ীর ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্ম করে, এখানে কেহ থাকে না, উম্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্যন্ত দেখায় নাই। পাগল পরের বাড়ী ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেখে না, মাঝে মাঝে মার-ধরও পায়।

এক দিন নদীর ধারে পাখীর ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় এক জন সন্ধান দিয়াছিল গাং-শালিকের অনেক বাসা গাঙের উঁচু পাড়ে দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াও পাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপবও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন ছায়া নামিয়াছে। বাড়ী কিবিত্তে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাভলার স্থানে গ্রামের প্রহ্লাদ-বলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কে বসিয়া আছে।

ভয় হইল। ভূত নয়ত ?

একটু আগাইয়া গিয়া ভাল করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘবের মেজ্ঞেতে স্থানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাতুর পাতিয়া চূপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—একটা পয়সা আছে কাছে ?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া স্বাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলম। আনি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্যন্ত মার খাইয়াছে ছড়া মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একত্রি দগুদগে ঘা, বায়ে মাছি বসিতেছে, পাশে একটা মাটির মানুষ কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জম্বলের মধ্যে আছেন কেন কাকা ? আসবেন আমাদের বাড়ী ? আচ্চন, স্থানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, স্থান বুঝি, এ ত আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ী রয়েছে, দোমহলা বাড়ী। দু-হাজাব টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিগিন সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরি করে টাকা জমাই নি ভেবেছিস ?

কত করিয়া খোসামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাত্র ছাড়িয়া কিছুতে উঠিল না।

ইহার কিছু দিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামার আসিয়া তাহাকে হুগলী লইয়া গিয়াছে।

দুই বৎসর পরে আমার উন্ময়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পঙ্কিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচ করিয়াছিল।

কি স্থানর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগল অবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা ধুলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতে পারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে সারবর্ণ, মুখজী স্থান্দর, দেখিয়া খুশী হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অল্ল্যাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীর মেয়ে। বৈকালে আমাদের গ্রামে বেঁ লইয়া পরেশ-কাকার আসিবার কথা—মনে আছে খুব ঝড়-ঝুটি হওয়ার দরুন বরবধুর পৌছিতে এক প্রহর রাজি হইয়া গেল। আলো জালিয়া বরণ হইল। এনিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধুর মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম—এসব অঞ্চলে এমন স্থান্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই

একবাক্যে বলিল বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছু দিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরে আবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকাদের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ীর সকলে তখন কি-একটা ছুটিতে বাতী আসিয়াছে। অনেক আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীয়া বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরি-পাড় শাড়ী পবনে, আমাদের স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গডানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মত মুখশ্রী।

আমরা সামনের উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে ছিলাম। পরেশ-কাকার বৌ ওখানে বসিয়া থাকিতে সেদিন আমার যেন উৎসাহ বিগ্ৰহ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়ীমাকে খুশী করি। সে কি লাফাংপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চোঁচামেচি স্কন্ধ করিয়া দিলাম হঠাৎ। গায়ে যেন দশ জনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ীর ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল? বেশ চোখ-ছুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর পাবু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—জাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদে ছুটাছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন ভা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসের যে লজ্জা!

গিয়া প্রথমেই এক প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নাম কি? পাবু? ভাল নাম কি?

লজ্জা ও সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাপীরত—

তিনি বলিলেন—বাঃ বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড় ত? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাঞ্জে আনন্দে আমার বোধ হয় ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের দেবী কি রূপকণ্ঠার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়?

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ী রোজ যাইতে

আরম্ভ করিলাম, দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীয়ার সঙ্গে। আমার বয়স তখন বারো, খুড়ীয়ার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তাঁর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বিবাহের পব-বৎসর গ্রামে থবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরীস্থলে আবার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই হইল বাপের বাড়ী। পাগল হইবার সংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। খুড়ীয়ার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই, খুড়ীয়ার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার আশ্রয় প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড় ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়ীতেই ছিলেন, তিনি পত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীয়ার আসিবার সংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও চেহারায় দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি স্নেহময়, বিদ্যুতের মত রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তবে হাসিয়া খুড়ীয়ার সামনে মেজের উপর বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—আপনি ভাল ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভাল থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু।

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীয়ার জন্ত দুঃখ হইল। অভাগিনী খুড়ীমা।

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসে বসো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালবাসে—না? বাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি। পাবু, এ গাঁয়ে তোঁর মত ভালবাসে না কেউ আমায়।

লক্ষ্য রাডা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিতাম।
ভেরো বছরের ছেলে কি কথাই বা জানি।

—কলকাতা দেখেছ পাবু?

—না, কে নিয়ে যাবে?

—আচ্ছ, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বেশ আমাদের বাড়ী গিয়ে থাকবে, কেমন ত?

—কবে যাবেন খুড়ীয়া? শ্রাবণ মাসে? না, এখন কিছু দিন থাকুন এখানে। যাবেন না এখন।

—কেন বল ত?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিতাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশী উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্ত খাবার কবিতা রাখেন, কোন দিন মোহনভোগ, কোন দিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে দেন। অনেক বকম ব্রত করিতেন, তাঁর ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পরমাই কত জমা হইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাসনটোতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীয়ার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কত আবেলতাবেল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীয়া বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই পড়ে শোনা দিকি? ভারি ভাল লাগে আমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে। তোর গলার স্বর ভারী মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার ‘নিমাই-সন্ধ্যাস’ পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ায় একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং বেশ ভাল গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কখনো হেরিব না নাথ,
সেখা হবে মনে মনে।
আমার নিশীথ স্বপনে এসে।
এস তত্ত্বা অবরপে।

খুড়ীয়া প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও ত?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীয়াকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রান্ন-বাড়ীর বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম—কি জানি বাপু জানি নে, ও সব কলকেতার কাণ্ড। সোয়ামী যার পাগলাগারদে, তার এত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসেব, অত পাতাকাটাঁব বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশীই বা আসে কোথা থেকে! কবে ঢং, কবে শাড়ীম বং—না বাপু, আমার ত ভাল লাগে না—তবে আমরা সেকলে বুজ্জ-হাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান ত জানি নি?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অল্প অল্প লোবের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুবি লাগাইয়া বিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদের বলি—না, তোরা জান ন। তোমাদের মিথ্যা কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীয়া ভাল—খুব ভাল।

কিন্তু যাহারা বলে তাহা বা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বন্স অনেক বেশী। কাজেই চুপ কবিতা থাকিতাম।

তাঁহাব চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে, তাহা নয়। কেবল এক দিনের তাঁর অপূর্ণ কোঁতুকোজ্জল হাসিমুখ গভীর ভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল। যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কোঁতুকপ্রিয়া, হাস্যমুখী স্নানরী ত্রুণীকে চোনের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঞ্চপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজ্জেন্গাছ, ঝোপরাপ পঞ্চপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীয়া ও আমি ছাদে দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—দু-জনেব কেহই আর যে কখনও পঞ্চপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাং খুড়ীয়া বিস্ময়ে ও কোঁতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, ঝাখ ঝাখ—রায়েদের নিমগাহে একটা পাত্রেও রাখে নি, শুধু গুড়ি আর ভাল, এমন কাণ্ড ত কখনও দেখি নি—ও মাগো!

বলিয়াই কোঁতুকে ও আনন্দে বালিবার মত খিল খিল

করিয়া হাসিমা উঠিলেন। তাঁব এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শবৎ পড়িল। আমাদের নদীৰ দু-ধাবে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু স্তম্ভ মেঘখণ্ড বাদামবনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদের সায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরীশ-জ্যাঠাদেব বড় আমবাগানের উপর দিয়া শুভবঙ্গপুরেব মাঠেব দিকে কোথায় উড়িয়া যায়... বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত স্বক করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাণিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই বহিয়া গেলেন। পবেশ-কাকাও পাংগলাগাবদ হইতে বাহির হইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ী তাঁর ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নাম শান্তিবাম, বঙ্গ চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালই। অল্প দিনের জন্ত এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে সে কুটুম্ববাড়ী ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, বাইলেই অল্প দিনের মধ্যে ফিবিয়া আসিয়া আবাব কিছু কাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তাঁব নামের সঙ্গে খুড়ীমার নাম জড়াইয়া একটা কুখ্যা লোকে রটনা করিতেছে। এক দিন দুপুয়ের পরে খুড়ীমাদের বাড়ী গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পৈপেতলার জানালার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শান্তিরাম বাহিরেব রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আশ্বে আশ্বে এক-মনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তিব স্ববে বলিল—কি পাব, দুপুরবেলা বেডানো কি? পড়াশুনো করো না? যাও এখন যাও—

আমি শান্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমাব দুঃখ হইল যে খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি ভখনই ওদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটা কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও খুব কমাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর ভেমন করিয়া পাই না; শান্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই,

অসময় নাই, ছাদে কি সিঁড়িব ঘবে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প কবিতোছে—আমাব যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শান্তিবামের কথার উপব কোন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ান্ন-পাড়ান্ন যে-কথা রটনা হইতেছে তাহা আমার কানে প্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, খুড়ীমার উপর আমার ইহার জন্ত কোনই রাগ নাই, যত রাগ শান্তিরামের উপর। সে দেখিতে ফর্সা বটে, বেশ শহুরে-ধরণের গোছালো কথাবার্তা বটে, সৌখীন সাজপোষাকও করে বটে, কিন্তু হয়ত তাহার সেই ফিটফাটের সাজগোজের দরুনই হোক, কিংবা তাহার শহুর-অঞ্চলের বুলিব জন্তেই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমি কেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভাল না। বালক-মনেব ভাল লাগা না-লাগার মূলে অনেক সময়ই কোন যুক্তি হয়ত থাকে না কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে বালকদেব ধারণা বড়-একটা ভুল হয় না।

এক দিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রাণায় সর্ব্ব চৌধুরী ও কালীময় বাঁড়ুয়ে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটিমাছ-মারা ছিপ-হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকে দেখিয়া উহার কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম। সর্ব্ব চৌধুরী বলিল—তাই ত ছোড়াটা যে আবাব এখানে।

কালীময় জ্যাঠা বলিলেন—বল, বল, ও ছেলেমানুষ কিছু বোঝে না।

সর্ব্ব চৌধুরী বলিল—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমবা এমন হাতে দিতে পারি নে। একটা মিটি ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন হয়ে উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরীর স্থানে, আর ওই শান্তিরাম না কি ওর নাম—ওকে শাসন করে দিতে হয়।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—শাসনটাসন আর কি—ওকে এ-গ্রাম থেকে চলে যেতে বলো। না যায়, আচ্ছা ক'বে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরী ছেড়ে আসবে এখন.

কুটুম্ব শাসন করতে ? সে যখন বাড়ী নেই তখন আমরাই অভিব্যবক।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়ীটাও নাকি বড় বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—তাই ত শুনছি। বয়েসটা ধারাপ কিনা ? তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময়-জ্যাঠা আমাকে যতই বোকা ভাবুন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহার হস্ত খুড়ীমাকে কোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে একথা আমি বলিতে পারিব না—কোন মতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরের সংসারের শাস্তি নষ্ট করিতে ? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না ? এত দিন কুটুম্ববাড়ী পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও ত হওয়া উচিত ছিল।

ইহাব কিছু দিন পরে আমি কাকার বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিব বলিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মাকে ছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান হবে আসবে, কত বড় চাকুরী করবে ! মনে থাকবে ত খুড়ীমার কথা ?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলবো না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—সত্যি বলছি ভুলবি নে কখনও পাবু ?

জোর গলায় বলিলাম—কখনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সম্মল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যি বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতে হইল বাবার কড়া

হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন্ ভয়ানক বিপদের মুখে কেলিয়া চলিয়া যাইতেছি আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম ? মান ছদ্ম-সাত পরে গরমের ছুটিতে বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-এক বান খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের কাহারো চাকদায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে—ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহন ইত্যাদি। আরও একবার ফার্স্ট ক্লাসে পড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমা'র সঙ্গে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি কেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এসব। কিন্তু এসব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার ত মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক, এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতন কি আছে, তা নয়। আমার মনের সঙ্গে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিছু খুব সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় ত হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল। খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এখনও কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটা বি কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে গাড়ী আসিলেই কত বার ভাবিয়াছি এই সব জায়গায় কোথাও হয়ত খুড়ীমা আছেন। নামিয় কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপস্ট্রী সহিত তাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি

নাই কোন দিন। কেন, তাহা জানি, বোধ হয় বাল্যে কাচরাপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা হইতেই এই অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার একটা কারণ আছে। আমার মনে একথা কে-যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। সে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়া ফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান তাঁকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসারজানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধে হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নতন ভালবাসা, নতন মুখ, নতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনের অভি-মুখুর হাসি ক্রীণ স্বতিতে পর্যাবসিত হইল, কত নতন মুখের নতন হাসিতে দিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনে এককমই হয়। এক দিন যাহাকে না দেখিলে বাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ এক দিন দেখা গেল তাহার নামটাও আজ মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই গুলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-জন্মের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবানই রাখিয়াছেন।

কিন্তু জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কত কাল চলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চপালও আর কখনও তার গারে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিমগাছটি এখনও আছে। বেশী দিনের কথা নয়—বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়েদের বাড়ী জমাজমি সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটার নজর পড়িতে কেমন অস্বস্তিক হইয়া গেলাম। বহু দিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা। পরক্ষণে দুইটি অশ্রুত ব্যাপাব ফিলিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের এক হান্তমুখী বালিকার তৌতুক ও আনন্দের উজ্জ্বলিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলঙ্কিতে মনটা এমন একটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল যে দলিলের আলোচনার কোন উৎসাহ খুঁজিয়া গাইলাম না, দেখিলাম, খুড়ীমাকে ত এখনও ভুলি নাই।

বয়সে হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠার-উনিশ বছর বয়সে ছিল খুড়ীমার। কি ছেলেমানুষই ছিলেন!

মাছঘের মনে মাছঘ এই বকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বাঁধিপথ বহিয়া কত নববধু গ্রামে আসিয়াছেন, স্নিহাছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছর আগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিশ্বতা হতভাগিনী তরুণী বধুটি আজও এই গ্রামে বাঁচিয়া আছেন।

ভীকু প্রেম

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রয়েছে কাছে কাছে

তবুও মনে পাছে

হারাই এই ভয় নিতি,

আঁচলখানি দিবে

মাটির দীপটিরে

আড়ালে রাখিবাব রীতি।

এমনিতরো হয়

দ্বিধায় দিন যায়

যে জন প্রাণে পায় প্রীতি

কত বা ফোটে হাসি,

অশ্রুজলে ভাসি

কত বা ভোলে সব গীতি।

নিম্ন দেশে সওয়া বৎসর



তিব্বতী পরিবার



সদ্বাস্ত তিব্বতী পুরুষ



বিচিত্র শিরোভূষণে তিব্বতী রমণী



তিব্বতী রমণী স্নাতা কাটিতেছে

[রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]



তিব্বতী রমণী



তিব্বতী রমণীর বিচিত্র শিরোভূষণ



বিচিত্র শিরোভূষণে সজ্জিত তিব্বতী রমণী



তিব্বতী মাতা-পুত্র

[রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ]

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৬

তিব্বতের বিখ্যাত তান্ত্রিক কবি ও সিদ্ধপুরুষ জে-চুন-মিলা-রে-পাংব নিৰ্জ্জনবাসেব স্থান বলিয়া লপ্-চী ভোটিয়া-দিগেব নিকট অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডুক্পা লামা ঐখানেই তাঁহার শেষজীবন নিৰ্জ্জনবাসে অতিবাহিত করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু লপ্-চীব পথেব লা (গিরিসঙ্কট) তুমার-পাতে দুৰ্গম বলিয়া কিছুদিনের মত যাত্রা স্থগিত বহিল। কুতীতে বাসস্থান বসতি সবই ভাল; বিশেষতঃ লবণ-ক্ষেত-বিক্ষেপ্তা অনেক দুবদ্বাস্তর হইতে আসিয়া ভীড় কবিযাছে, স্ততবাং সেখানেই আরও কিছু দিন তাঁহার বিশ্রাম করা প্রয়োজন হইল। কুতী পৌছিবাব পবদিনই আমি আমাব পথপ্রদৰ্শক ও সাথীকে নেপালী তের মুহব (৫।১০) দিয়া বিদায় দিলাম। তাতপানী পর্যন্ত আসাব অল্প তাহাব পাবিশ্রমিক চাব মুহর ধাৰ্য্য হইয়াছিল, স্ততবাং ঐ হিসাবে তাহার প্রাপ্য আট মুহর মাত্র এবং তাহাই তাহার নিজেব হিসাবে যথেষ্ট। আশাধিক দক্ষিণা পাওষায় অতি সন্তুষ্টচিত্তে প্রচুর লবণ কিনিয়া সে দেশে ফিৰিয়া গেল।

বৰ্ষা আগন্তপ্রায়; এই সময়েব পূৰ্বেব দুই তিন মাস কাল কুতীর পথঘাট লোকে ভবা থাকে। নেপালীব চাউল, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্য লইয়া আসে এবং ভোটায়েব দল ভেড়া বা চমবীব পৃষ্ঠে লবণ বোঝাই করিয়া আনে। কুতীতে অনেক নেপালী সওয়াগবেব দোকান আছে, তাহাবা শস্য ও লবণ দুই-ই কিনিয়া রাখে, কেহবা বিনিময়ে সোডা শস্য বা লবণ গ্রহণ করে। লবণ ভিন্ন ভোটায়েবা সোডাও বিক্রীত-জন্য আনে; এই সকল পদার্থই তিব্বতের কয়েকটি হ্রদের জ্বলে পাওষা বায় এবং এগুলির উপর শুষ্কও নিৰ্দ্ধাবিত আছে। কুতীব এই বিবাট হাটে নেপালীরা যে-কোন ঘবে আশ্রয় লইয়া থাকে কিন্তু ভোটায়েদের ভেড়া ও শত শত চমবীব পালেব সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তবেই থাকিতে হয়।

আমি যেদিন কুতী পৌছিলাম সেই দিনই কয়েক জন

নেপালী ব্যবসায়ী শীগচীর (টশী-লু-পো) পথে কুতীতে আসিল। এই পথে শীগচী-লাসা-যাত্রী নেপালীবা ঐখানেই ঘোড়-ভাড়ার ব্যবস্থা কবে। ভাড়া টশী-লু-পো পর্যন্ত ৪০-৪৫ সাং (তখন ১—দেড় সাং)। এক ঘোড়ায় অত দুব যাওবা যায় না, পথে কয়েকবার ঘোড়া বদল করা প্রয়োজন। এই ভাড়ায় ঘোড়া বদল মায় খাওয়া থাকাব ব্যবস্থা সবই ঘোড়-ওয়ালা কবে। আমিও আমাব নদী এই সওয়াগবেব দলের সঙ্গে যাইবাব অনেক চেষ্টা কবলাম কিন্তু তাহাবা রাঁচী হইল না। চারি দিকেই নিবাণ হইলাম, এদিকে ডুক্পা লামাব পূজায লোকের সমাগম বাড়িয়াই চলিল। চাউল, “খাতা” ও অল্পমূল্য মুহর ক্রমেই স্তূপাকাব ধারণ কবিতে লাগিল, মাংস ও ভিষও নিবেদন হইতে থাকিল।

২০শে মে ডুক্পা লামার নিকট “জোঙ-পোন” (জেল-ম্যাক্সিষ্টেট) মহাশয়েব তলব আসিল। সঙ্গীব দলেব কেহ কেহ আমাকেও ঐ সঙ্গে যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন “আমরা বলিব তুমি লদাখী”। কিন্তু আমাব কি আব কাজ নাই তাই “আম্ব যাঁড়, অ-মায় গুঁতো” এই উদ্দেশ্যে বাইব? স্ততবাং ডুক্পা লামাব দলে আমি যাই নাই। জোঙ-পোন্ আগেই ডুক্পা লামাব নাম শুনিয়াছিলেন, স্ততবাং বিশেষ খাতিব কবিলেন লামা মহাশয়ও ভাগ্য-ভবিষ্য গণনা ও মন্ত্র-পূজাপাঠ করিলেন সন্ধ্যাব সময় দল ফিৰিয়া আসিল। শুনিলাম এখন এক জন মাত্র জোঙ-পোন্ আছেন, অল্প জন মৃত, তবে তাঁহাব বিধবা সম্প্রতি কিছু কাজকর্ম দেখেন। এখনও অল্প জোঙ-পোন্ নিযুক্ত হন নাই। তিব্বতে প্রতি গ্রামে প্রধান (গোবা) আছে এবং প্রতি অঞ্চলে ইহাদের উপর জোঙ-পোন্ থাকে, (জোঙ অর্থে কেল্লা এবং পোন্ অর্থে অধ্যক্ষ বা প্রধান কর্মচারী) এবং এই জোঙ সাধারণতঃ পাহাড় বা টিলাব উপর স্থাপিত হয়। কুতীব নিকট সেকপ পাহাড় না-থাকায় কেল্লা নীচের ভূমিতে স্থাপিত।

ছোট ও বড় প্রদেশ হিসাবে জোড়-পোন পদেরও স্তরভেদ আছে এবং প্রতি জোড় দুই জন অধ্যক্ষের অধীনে থাকে যাহাদের মধ্যে এক জন গৃহস্থ ও অন্য জন সাধু-সন্ন্যাসী। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়, যেমন এখন কুতীতে হইয়াছে। জোড়-পোনের উপরে সাক্ষ্য দালাই লামাব গভর্নমেন্ট : স্ত্রায় ও ব্যবস্থা এই দুই ব্যাপারেই জোড়-পোনের যথেষ্ট অধিকার, এমন কি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এক-একটি রাজা বলিলেই হয়। ইহাদের নিয়োগ লাসা হইতেই হয় এবং অধিকাংশই দালাই লামার কৃপাপাত্রগণের আত্মীয় বা প্রেমাস্পদ। এখন যে জোড়-পোনের স্থান শূন্য তাহার বিরুদ্ধে এই প্রদেশের প্রজাগণ লাসায় আবেদন করে। দরবার তাহাদের দুঃখগাথা শুনিয়া বিরূপ হইয়াছেন এই শুনিয়া ঐ জোড়-পোন লাসার নদীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন এইরূপ শুনিলাম।

নেপাল-সরকারের নিয়ম অল্পসারে ভোটদেশে বাণিজ্যের জন্য যাইতে হইলে নেপালী ব্যবসায়ীদের নিজ নিজ পত্রীকে দেশে ছাড়িয়া যাইতে হয়। এই জন্ত প্রায় সকল নেপালী ব্যবসায়ীর ভোটারী জী রক্ষিত থাকে এবং আশ্চর্যের বিষয় তাহারা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য হয়। তিব্বতের স্থানে স্থানে নেপালীদের বিশেষ অধিকার অল্পসারে নেপালের প্রজাদের বিচার নেপাল-সরকার-নিযুক্ত বিচারক করে। এইরূপ বিচারকের নেপালী নাম 'ডিঠা'; কেরোং, কুতী নীগর্চা গ্যাকী ও লাসায় নেপাল-সরকারের ডিঠা আছে। লাসায় সহকারী ডিঠা ও নেপাল রাজদূত আছে, গ্যাকীতেও রাজদূত আছে। ইহাদের বিচারে ভোটারী জীর গর্ভজাত নেপালীর পুত্র নেপালের প্রজা, কন্তা তিব্বতের প্রজা। এইরূপ সম্ভানের নেপালী নাম "খচরা"। তাহাদের মাতাপিতার সম্পত্তির উপর এই সম্ভানদেরও কোন অধিকার থাকে না—পিতা যেখানে বাহা দেখে তাহাই তাহারা ভোগদখল করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সত্ত্বেও ইহারা নেপালী পিতা ও পতির কারবারের ঝরুপ সহায়তা করে তাহা আশ্চর্যজনক।

* * *

৩০শে মে পর্যন্ত আমি অগ্রসর হইবার কোনই উপায় করিতে পারিলাম না। কুতীর নিকটস্থ নদীর পুলের পাশে রাহাদারী (লম্-ইক্ অর্থাৎ পাসপোর্ট) দেখিবার লোক

আছে, নদী পার হইবার পথও য়া-লেপ্-এ পুনর্বার রাহাদারী দেখাইতে হয়। যখন এই সব ঘাটি পার হওয়ার কোনও উপায় দেখিলাম না তখন ঠিক করিলাম মঙ্গোলীয় ভিক্ষু হুবতি-প্রজ্ঞকে বলিয়া দেখি তিনি যদি কিছু করিতে পারেন। তিনি তখন কুতীতেই ছিলেন, তাহাকে বলিলাম “আপনি আমাদের সঙ্গে লইয়া চলুন।” তিনি মহা খুশী হইয়া বলিলেন, “আমি কাল লম্-য়িক আনিব এবং আমরা কালই এখান হইতে যাত্রা করিব।” তিনি ত নিশ্চিন্ত মনে একথা বলিলেন কিন্তু আমার ঘোর সন্দেহ ছিল কাজটা এতই শোভা হইবে কি না। আমি এক জন ভারতীয় “সাধু-বাবা”কে প্রায়ই দেখিতাম, যিনি দুই মাস বাবং এখানে অটকহিয়া আছেন, আগে যাওয়া বা ফেরা কোনটাই করিতে পারিতেছেন না। বাহা ইউক্, একবার চেষ্টা করায় ঘোষ কি ?

সেই রাত্রে এক নেপালী সওদাগরের গৃহে ভূত-প্রেত ত্রিতাড়ন ও ভাগ্য প্রসন্ন করার জন্য পূজা-পাঠ করিতে ডুক্পা লমার আমন্ত্রণ হইয়াছিল, আমি সেখানে চলিলাম। অনেক জীপুরুষ বাল-বনিতার ভীড়ের মধ্যে এ-ব্যাপারের আয়োজন হইল। মন্ত্র-জন্তুর হাড়ের বীণ, যুখ নরকপালের ডমরু ইত্যাদি ভয়াবহ উপকরণ লইয়া শিশু ডুক্পা লামা পূজায় বসিলেন।

যুত-দীপের ক্ষীণ আলোক ক্ষীণতর করা হইল, পূজারী কনুকে পর্দায় ঘেরা হইল। তাহাদের ঋষভ-কর্ষের যুগ্মগীত মন্ত্রোচ্চারণ, ক্ষণে ক্ষণে ডমরুর নিনাদ ও তাহার সঙ্গে সর্বোচ্চ শক্তির করুণ কন্দনের শব্দের মত হাড়ের বীণের স্ব-এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া মন্ত্রমুগ্ধ না হওয়া দুহু। পূজা অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত চলিল, তাহার পর সম্ভবত মণ্ডলীকে পূজা-জলে অভিষেক করিলে পরে সকলে শ্রীয়ার আয়োজন করিতে গেল।

৩১শে মে প্রত্যুষেই আমি যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় হস্ত-পাদ্রি একত্র করিতে লাগিলাম ও হুবতি-প্রজ্ঞকে লম্-য়িকের চেষ্টায় রওয়ানা করাইয়া দিলাম। সে সময় আমার কাছে ষাট বা সত্তর টাকা মাত্র ছিল, তাহার মধ্যে ত্রিশ টাকার নোট আলাদা রাখিয়া বাকী টাকায় কিছু মশপত্র কিনিলাম, কিছু ভাড়াইয়া ভোটারী টকা সংগ্রহ

করিলাম। টাকায় নয় টকা দর পাওয়া গেল, যদিও মুদ্রা প্রায় সবই অর্ধ-টকা পাইলাম। শীতের ভয়ে চার টাকায় একটি ভাতীয় কঞ্চিক কিনিলাম, মাথার আবরণ হিসাবে ডাম্‌গ্রামের সঙ্কনের কাছে পীতবর্ণ পশমের টুপী উপহার পাইলাম। কিছু চিঁড়া, চাউল, চীনা চা, সন্তু ও মশলা ইত্যাদিও কিনিলাম, কিন্তু এর পর নিজের সকল বোঝা নিজের কাঁধেই বহিতে হইবে সেজন্য সবই অল্প পরিমাণে লইলাম। ডুকপা লামা আমাকে পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলেন, ইতিমধ্যে স্মৃতি-প্রজ্ঞা আমাদের দু-জনার জন্ত ছাড়পত্র লইয়া আসিলেন। দুই মাসের ঘনিষ্ঠতার পর বিদায়ের সময় আমি ও সঙ্গীদের সকলেই মিত্রবিরোগের দুঃখ অল্পভব করিলাম। ডুকপা লামা অতি সহৃদয়তার সহিত আমার মঙ্গলকামনা করিলেন এবং চা ও কিছু কিছু অন্নাত্ম দ্রব্য উপহার দিলেন।

মোট বহিবার বাকের মধ্যভাগে মালপত্র বাঁধিয়া পিঠে করিয়া, হাতে লম্বা লাঠি লইয়া তীর্থযাত্রীর বেশে বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা দুই জনে কুতী হইতে রওয়ানা হইলাম। অল্পক্ষণেই পুল পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলাম ছাড়পত্র-পরীক্ষক সেখানে নাই। পুল সাধারণ কাঠ পাতিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে, তাহা পার হইতেই চড়াই আরম্ভ হইল। বোঝা-স্বাক্ষে জীবনে এই প্রথম চলিতে হইতেছে স্তত্রায় চড়াইয়ের কষ্টের কথা আর কি বলিব! মাঝে মাঝে কেবল মনে হইতেছিল যে প্রত্যেক মানুষেরই এই অভয়াস রাখা উচিত। অল্প চড়াইয়ের পবই আমরা কোসী নদীর দক্ষিণবাহিনী মুখ্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চড়িতে লাগিলাম। পথ সাধারণ চড়াইয়ের, বোঝাও বিশ-পঁচিশ সেরের অধিক নহে, তবুও অল্পদূর বাইতেই কাঁধ ও জঙ্ঘার বিষম ব্যথা আরম্ভ হইল। স্মৃতি-প্রজ্ঞা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সেরের বোঝা কাঁধে অন্নান-বদনে গল্প-গুজব করিতে করিতে চলিতেছিলেন, আমার তখন কথা বলা দূরে থাক কথা শোনাও বিরক্তিক্রমক মনে হইতেছিল। নদীর কুলের উপত্যকা চওড়া কিন্তু কোথাও বৃক্ষের চিহ্নমাত্র নাই। পথের ধারে এক-আধটি ঘরও দেখা বাইতেছিল—ঠিক যেন পাথরের স্তূপ—এবং দু-চারটি শস্তের ক্ষেতও এখানে-ওখানে ছিল।

ডাম্‌গ্রামের সঙ্কনের লপ-টী বাইবার কথা ছিল,

সকালেই তিনি বাহির হইয়াছিলেন, আজ তাঁহাব টঙ্গী-গড়ে থাকিবার কথা। স্মৃতি-প্রজ্ঞা পতামর্শ দিলেন যে আজ আমাদেরও সেখানেই থাকা ভাল। সন্ধ্যা-নাগাদ কর-কো-লিঙ মঠ (গুহা) দেখা দিল। গুহার আগে এক ছোট গ্রামে বোঝা বহিবার লোকের ধোঁজ করিলাম কিন্তু পাওয়া গেল না, স্তত্রায় গুহার চলিয়া গেলাম। গুহার বাহিরের কপ অতি সুন্দর, সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিক্ষুর ব্যবস্থা আছে। বোঝা বাহিরে রাখিয়া আমরা দেবদর্শনে চলিলাম। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব এবং অশ্রুত নানা দেবদেবীর স্মনব মূর্তি, নানা প্রকারেব স্মনর বর্নরঞ্জিত চিত্রপট ও ধ্বজা প্রভৃতি অথও দীপের আলোকে প্রকাশিত ছিল। মঠে জে-চুন-মিলার সম্মুখে স্থাপিত ছড় (কাঁচা মদ) দেখিয়া আমি স্মৃতি-প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইহা ত গে-লুক-পা (পীতটুপীযুক্ত লামা-সম্প্রদায়) প্রৌর মঠ, তবে এখানে মদ কেন?” তিনি বলিলেন জে-চুন-মিলা সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধপুরুষ ও দেবতাদিগের ভোগে গে-লুক-পা সম্প্রদায়ও মদ্যের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের নিজেদের ইহা পান করা নিষিদ্ধ। মন্দিরেব বাহিবে আসিয়া দেখিলাম আমাদের জন্ত চা আসিগাছে; মন্দিরের অন্ধনে বসিয়া দু-চার পেয়ালার চা পান করিলাম। ভিক্ষুগণ আমার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করায় স্মৃতি-প্রজ্ঞা, লাসার ডেপুটি গুহা ও আমি লদাখের নাম করিলাম। আমরা বলিলাম যে গ্য-গরু (ভারতবর্ষ) দোর্ডে-দন (বজ্রাসন, মধ্যযুগ হইতে সংস্কৃত লিপিলেখে বুদ্ধগয়ার এই নাম প্রচলিত) তীর্থ দর্শন করিয়া আমরা লাসায় ফিরিতেছি।

আমি এ-সময় অত্যন্ত ক্লান্ত। সবসুদ্ধ কুতী হইতে পাঁচ মাইল মাত্র আসিয়াছি তবুও আমার পক্ষে এক পাও চলা দুঃসাধ্য মনে হইতেছিল। এমন সময় ওখানে টঙ্গী-গড়-এর এক বালক বলিল ডাম্‌গ্রামের ‘কুশোক’ (ভদ্রলোক) টঙ্গী-গড়ে বিশ্রাম করিতেছেন স্মৃতি-প্রজ্ঞা তৎক্ষণাৎ ওখানে বাইতে চাহিলেন, আদিও ভাবিলাম সেখান হইতে কাল হয়ত মোট বহিবার মোট পাওয়া বাইবে এবং এই আশায় বাইতে স্বীকার করিলাম। মঠেই সন্ধ্যার অন্ধকার আরম্ভ হইয়াছিল, আমরা সেই বালকের পিছু পিছু চলিলাম। নদীর কিনারা ঘরিয়া কিছু দূর গিয়াই পুল পাওয়া গেল এবং পর হওয়া গেল। আরও

কিছু পরে চমকিত, তাহাতে বুঝিলাম এবার গ্রামের নিকট আসিয়াছি। খানিক পরে কুকুরের ডাকে বুঝিলাম গ্রাম আরও নিকটে। কিন্তু শুনিলাম আমাদের গন্তব্যস্থল আরও দূরে। শেষে কোনক্রমে ডাম্‌গ্রামের সঙ্কনের বিশ্রামস্থানে পৌঁছাইলাম।

তিনি সে সময় লোহার চুল্লীতে আগুন দিয়া পাতলা খিচুড়ী রন্ধনে ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেখিয়া অতি প্রসন্ন হইয়া তাড়াতাড়ি বিছানা বিছাইয়া দিলেন। আমি ত বোঝা ফেলিয়া সটান শুইয়া পড়িলাম। চা তৈয়ার ছিল, থুপা (খিচুড়ী)-ও অল্পক্ষণ পরে প্রস্তুত হইল, তখন উঠিয়া দুই তিন পাত্র গরম গরম থুপা খাইয়া একটু “ধাতস্থ” হইয়া চা পান করিতে করিতে পরদিনের “প্রোগ্রাম” ঠিক করিতে লাগিলাম। স্বমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, “লপ-চী” মহাতীর্থ (চা-ছেন-বো), উহা জে-চুন-মিলার সিদ্ধ-স্থান, চলুন আমরাও ইহার সঙ্গে ওখানে যাই।” লপ-চী যাইতে হইলে আমাদের সোজা রাস্তা ছাড়িয়া উচ্চ লা (গিরিসঙ্কট) পার হইয়া পূর্ব দিকে তুষা কোসীর ঘাটিতে যাইতে হইবে, পথে একটি জোড়ও পড়িবে। সেখান হইতে আবার দুইটি লা পার হইলে তবে পুনরায় আমাদের গন্তব্য ভিত্তরী যাইতে পারিব। এই সব বাধাবিঘ্নের কথা ভাবিয়া আমার মন ত ওদিকে কোন মতেই যাইতে চাহিতেছিল না, কিন্তু সে কথা বলিচা নাস্তিকতার পরিচয় দেওয়াও কঠিন! পরে যখন তাঁহারা আমার বোঝা বহিবার লোকের ব্যবস্থা করিবেন বলিলেন, তখন আমার আর আপত্তির উপায়ই বা রহিল কোথায়? শেষে রাজী হইলাম, এক স্থির হইল কাল খাওয়ার পবই যাত্রা করা যাইবে।

পরদিন পূর্বকথামত বিপ্রহরে রওনা হওয়া গেল। আমার খালি-হাত, স্ততরাং মহানন্দে চলিতে লাগিলাম। পথক্রমেই চড়াইয়ের দিকে চলিল, বট্টা দেড়-দুইয়ের পর চুপ্‌চাপ্‌ বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পরিচ্ছদ পশমী হওয়ায় ভোটারেরা বৃষ্টিতে ক্রম্বেপও কবে না, স্ততরাং আমরা চলিতে থাকিলাম। কিছু দূরে এক জায়গায় পথ বক্র ও ঢালু পর্বতপার্শ্বে উপর দিয়া গিয়াছে, সেখানের মাটি নরম এবং মধ্যে মধ্যে মাটি ও পাথরের রাশি খসিয়া সশব্দে কয়েক শত ফুট নীচের খাদে পড়িতেছে। আমার ত এই দৃশ্যে

হৃৎকম্প আরম্ভ হইল, কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, “আমিও না এই মাটি-পাথরের সঙ্গে নীচের খাদে চলিয়া যাই।” সঙ্গীরা বোঝা-স্বন্ধে বেপরোয়া চলিতে থাকিলেন, পশ্চাতে পড়িতে দেখিয়া এক জন আমাকে তাঁহাব হাত ধরিতে বলিলেন কিন্তু আমি নিজেকে নির্ভয় বলিয়া পরিচিত করিতে চাহি, স্ততরাং বিনা সাহায্যেই “প্রাণ হাতে ক’বে” কোন প্রকারে পার হইলাম। আমার ভৌতিক জুতা বিশেষ টিলা হওয়ায় একটু ভয়ের কারণ ছিল, কেননা তাহাতে পা হড়কাইয়া যাইবাব সম্ভাবনা। আরও উপরে উঠিতে বৃষ্টির বিন্দুব বদলে এলাচ-দানার মত ছোট ছোট নরম বরফ পড়িতে লাগিল। আমরা সে-সব গ্রাস না করিয়া চলিয়া বেলা দুইটার সময় লসেতে (লার নীচে থাকিবার জায়গা) পৌঁছিলাম। এখন বরফ পেঁজা-তুলার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের আকারে পড়িতেছিল। সঙ্গীদের কতক চমরীর ঘুঁটের সন্ধানে মাঠে ছুটিলেন, অন্তেরা পাথবে দড়ি বাঁধিয়া ছোলদারী তাম্বু দাঁড় করাইবাব চেষ্টায় ব্যস্ত হইলেন। এ জায়গাটা প্রায় চৌদ্দ-পনর হাজার ফুট উঁচু, কাজেই নীত খুব, উপবন্ধ ক্রমাগত তুষারপাত হওয়ায় শৈতের আধিক্য বাড়িয়াই চলিয়াছিল। কোনপ্রকারে ছোলদারী দাঁড় করাইয়া তাহার ভিতর ঘুঁটের আগুন জ্বালান হইল। আমরা সবাই চারি দিকেশিয়িয়া বসিলাম, ঘুঁটেতে বাতাস দিয়া আগুন জ্বালাইয়া চা-স্বন্ধ জল চড়াইয়া দেওয়া গেল। চারি দিকের জমি তুষারে ঢাকিয়া গেল, মাঝে মাঝে ছোলদারীর ঢাল নাড়াইয়া বরফের রাশি ফেলিতে হইতেছিল। আগুনও যেন নীতে আড়ষ্টপ্রায়—অত উচ্চে জল ফুটান দুঃস্থ নহে, কিন্তু ফুটন্ত জলের উত্তাপ অল্প—অতি কষ্টে চা প্রস্তুত করা গেল। চা যদিবা হইল, তাহাতে মাখন দিয়া মদন করে কে? প্রত্যেকের পেয়ালায় মাখনের টুকরা ফেলিয়া তাহার উপর গরম কাল চা ঢালিয়া দেওয়া হইল। কুশোক (ভদ্র পুরুষ) তাঁহার কাছে যে ছোট বিস্কুট ও কমলালেবুর মিঠাই ছিল তাহা সকলকে দিলেন। আগুনের এই অবস্থায় থুপা বন্ধন অসম্ভব, স্ততরাং অন্তেরা সত্ত্ব খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলেন, আমি চায়ের মধ্যে চিড়া ফেলিয়া খাইলাম।

চতুর্দিক অন্ধকারে ঘিরিয়া আসিল, কুশোক তাঁহার লণ্ঠন জ্বালাইয়া আমাকে “বোধিচর্যাবতার” হইতে পাঠ

করিতে বলিলেন। আমার কাছে উক্ত পুস্তকের সংস্কৃত ভাষার সংস্করণ ছিল এবং তাহার তিব্বতী অনুবাদের সমস্ত শ্লোক কুশোকের কণ্ঠস্থ ছিল। আমি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ও তাহা ভাঙা ভোটার ভাষায় অনুবাদ কবিত্তে লাগিলাম, কুশোক ভাবার্থ বুঝিয়া তিব্বতী শ্লোক আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ধর্মচর্চা করার পর সকলেই সেই ছোলদারীর নীচে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া পড়িলেন। শৈত্যের প্রভাবে অস্বাভ জনমণ্ডলীর কাপড়ের দুর্গন্ধ পাইলাম না বটে, কিন্তু সকালে উঠিয়া বুঝিলাম যে আমার কাপড়ের মধ্যে কয়েক শত উকুন আশ্রয় লইয়াছে। কাপড়-চোপড়ে খুঁজিয়া অনেকগুলি বাহিরও করিলাম। সারারাত বরফ পড়িয়াছে দেখিলাম, ছোলদারীও বহুবার ঝাড়িতে হইয়াছে শুনিলাম।

প্রাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কাল ঘে-ভূমি নগ্ন ছিল আজ তাহা এক ফুটের অধিক পুরু তুষারের আবরণে আচ্ছাদিত। তুষারস্তূপ গলিয়া একটি ক্ষীণ ধারা নীচের দিকে বহিতেছে, সেখানে গিয়া মুখ হাত ধুইলাম। আগুনের জ্বলন্ত ঘুঁটে পাওয়া অসম্ভব, স্ততরাং চাদরের আশা ছাড়িয়া বিষ্কুট ও কমলালেবুর মিঠাই খাইয়া প্রা তরাশ শেষ করিলাম।

স্মৃতি-প্রজ্ঞ নীচে উপরে চারি দিকের তুষারস্তূপ দেখিয়া বলিলেন, “এখানেই এত বরফ, উপরের লা নিশ্চয়ই আরও তুষারাবৃত, এদিকে তুষারপাত সমানে চলিয়াছে, স্ততরাং আমাদের লপ্-চী যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত।” আমি ত তাহাই চাই। কুশোকের কাছে বিদায় লইলাম, তাঁহাকে লপ্-চী যাইতেই হইবে। পুনরায় নিজের বোঝা কাঁধে কবিয়া নীচের দিকে চলিতে লাগিলাম। পথও তুষারাবৃত, তবে উৎরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফের আবরণী পাতলা হইয়া আসিল। শেষে তুষার-রহিত ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম, এখানে টুপ্-টাপ্-বৃষ্টি চলিয়াছে। এইরূপে ভিজিতে ভিজিতে বেলা দশটায় আমরা টশী-গঙে ফিরিয়া আসিয়া, সেখানকার গোবার (মোড়ল) গৃহে আশ্রয় লইলাম। গোবা আমাদের আশ্বাস দিলেন যে পরদিনের গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবার জন্ত ভারবাহী লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাদের দু-জনেরই জুতার ভলা হিঁড়িয়া

গিয়াছিল, গোবার ছেলেকে কিছু পয়সা দিয়া তাহাও মেরামত করাইয়া লইলাম। এইরূপে ২২২ জন সেখানেই কাটিয়া গেল, দিনের বেলা চমরীর ছুন্দের ঘোলে নতুন মাখিয়া খাইলাম, রাত্রে স্মৃতি-প্রজ্ঞ ভেড়ার চর্বি দিয়া খুপা রাখিলেন। পরে শুনিলাম কুশোকের দলের কয়েক জন বরফের মধ্যে রাস্তা খুঁজিয়া ন পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। স্মৃতি-প্রজ্ঞ বলিলেন আমরা গেলে আমাদেরও ঐ দশা হইত।

চা-সন্তু খাইয়া, ভারবাহীর পিঠে মালপত্র চাপাইয়া, ২২২ জন সকাল ৭-৮টার সময় আমরা রওয়ানা হইলাম। ভারবাহীর পক্ষে এক মণ দেড় মণ বোঝা তুলু, স্ততরাং আমি খালি-হাত এবং স্মৃতি-প্রজ্ঞের বোঝাও খুবই হালকা, রাস্তাও বরাবর উৎরাই চলিয়াছে। বেলা এগারটার মধ্যেই আমরা জর্গ-লিঙ গ্রামে পৌছিলাম। স্মৃতি-প্রজ্ঞ চতুর্থবার এই পথে ফিরিতেছেন, এই জন্ত পথের পাশের বসতিগুলিতে স্থানে স্থানে তাঁহার পরিচিত লোক ছিল। এখানেও মোড়লের গৃহেই আমাদের স্থান হইল। গৃহকর্ত্তী পক্ষাশোদ্ধবয়স্কা, তাহার স্বামীর বয়স অনেক কম। তিব্বতে এই ব্যাপার খুবই সাধারণ। আমি ত প্রথমে এই দম্পতীর পতি-পত্নী সম্বন্ধ বুঝিতেই পারি নাই, যখন দেখিলাম পুরুষটি জীর চুল খুলিয়া তাহা খোওয়া ও চাও প্রদেশের ধনুকাবার শিরোভূষণে তাহার সংবরণে সাহায্য করিতেছে, তখন জিজ্ঞাসা করায় আসল সম্বন্ধ জানিলাম।

স্মৃতি-প্রজ্ঞ বৈদ্য, তান্ত্রিক এবং ভাগ্যগণনায় গুটু, তিনি চা পানের পর গ্রামের ভিতর চলিলেন। কিছুক্ষণ পবে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম তিনি পক্ষাশ বৎসর বয়স্কা এক বয়স্কা স্ত্রীলোককে সন্তান লাভের জন্ত যন্ত্রদান করিতে যাইতেছেন। তিনি ভোটার অক্ষর লিখিতে পারেন না, স্ততরাং আমাকে প্রয়োজন। শুনিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম, বলিলাম, “প্রোটার উপরও আপনি আপনার বিদ্যার পরীক্ষা করিতে চাহেন?” তিনি বলিলেন, “ওখানে হাসিও না যেন, ধনী স্ত্রীলোক,

উপস্থিত কিছু সন্তু মাখন লাভ হইবেই এবং যদি তীর লাগিবা যায় তবে ভবিষ্যতের জন্য একটি উত্তম সম্মানও হইবা থাকিবে।” আমি বলিলাম, “তীর লাগিবার কথা তুলিবা যান, তবে, হাঁ, উপস্থিত দেখা ভাল।” সেখানে গিয়া দরজা পার হইতেই এক মহাকায় কুকুর শিকল নাড়িয়া গর্জন আরম্ভ করিল। বাড়ীর এক ছোট ছেলে তাহার কাপড়ে কুকুরের মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলে তবে আমরা তাহাকে পার হইয়া উপর-তলার সিঁড়িতে উঠিতে পাবিলাম। সম্মতি-প্রজ্ঞ গৃহ-পত্নীকে ঔষধ-যন্ত্র ও পূজা-মন্ত্র দিলেন, আমাদের সের-দুই সন্তু, কিছু চর্কি ও চা দক্ষিণা জুটিল। ঘবে কিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে সন্ধ্যা লোক লইয়া পথে অগ্রসর হওয়া গেল। গ্রামের কাছেও বৃক্ষেব চিহ্ন নাই, ক্ষেতগুলিতে সবে মাত্র চাষ আরম্ভ হইয়াছে। লাল পশমের গুচ্ছে সজ্জিত বিশালকাষ চমরীতে হল টানিতেছে; কোথাও কোথাও চাষী হলকর্ষণের সঙ্গে গান জুড়িয়া দিয়াছে। দ্বিপ্রহরে য়া-লেপ্ পৌছান গেল, গ্রামের অল্প নীচেই প্রাচীন লবণের ঝিল শুকাইয়া আছে। য়া-লেপে পূর্বনো আমলের চীন দুর্গ আছে, কিছু দূরে নদীও পাশেও কাঁচা দেওয়ালবৃত্ত কেল্লার ভগ্নাবশেষ আছে। চীন-সাম্রাজ্যের প্রভুত্বের সময় য়া-লেপের দুর্গে কিছু সৈন্য থাকিত, এখনও সরকারী লোকজন সেখানে আছে কিন্তু দুর্গে স্ত্রীহীন দেখা যায়; ঘব, দেওয়াল সবই মেরামতের অভাবে জীর্ণ।

এক পরিচিত গৃহস্থের ঘরে চা-পান ও সন্তু-ভোজন করা গেল। সম্মতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে বুদ্ধগথার প্রসাদী কাপড়ের টুকরা দিলেন। এই স্থানে লম্বিক (ছাড়পত্র) লওয়া হয়, ইহার পর আর পাসপোর্টের হাজিরা নাই, সেই জন্য এক জন পরিচিত লোকের হাতে সেগুলি যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবার ভার দেওয়া গেল। গ্রাম ছাড়িয়া বাহিরের পথে আসিবা মাত্র একটা প্রকাণ্ড কুকুর হাড়-চিবান ছাড়িয়া আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। এই সব শৈত্যাদিক্যের দেশের কুকুরের গায়ে শীতকালে লম্বা লোমের নীচে নরম পশম জন্মায় বাহাতে উহাদের শীতের প্রকোপ লাগে না। গ্রীষ্মকালে সেই লোম ও পশম সাপের খোলসের মত বরিয়া পড়ে, এই কুকুরটারও সেই রকম “খোলসছাড়া” অবস্থা ছিল। যাই হোক, আমরা তিন জন লোক ছিলাম, কাজেই কুকুরে কি ভয়? য়া-লেপ্ হইতে প্রায় তিন মাইল পথ চলিবার পর দক্ষিণ হাতে লে-শিঙ্ ভোঙ্গা শুধা নামক ভিক্ষুীদের বিহার দেখা গেল। এখানে নদীর ধাৰা অতি ক্ষীণ, কিছু দূর যাইয়া আমরা নদী পার

হইয়া অল্প পারে চলিয়া আসিলাম। এ দিকে দূর-বিস্তৃত ক্ষেত্রের সারি; ছোট ছোট নালী-দ্বারা আনীত নদীর জলে সেচকার্য চলিতেছিল। আরও কিছু দূর গিয়া আমরা থো-লিঙ্ গ্রামে পৌছিলাম। এই গ্রামটিতে বিশ-পঁচিশ ঘর লোকের বাস এবং ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তের-চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চ। তর্গো-লিঙ্ হইতে যে-লোক আনা হইয়াছিল তাহার এই গ্রামে পৌছাইয়া দিবারই কথা ছিল। সে প্রথমে তাহার পরিচিত এক গৃহে আমাদের লইয়া গেল, সেখানে রাজকর্ণটারী বা উচ্চপদস্থ লোকেরা আসিয়া থাকেন শুনিয়া আমার থাকা যুক্তিবৃত্ত মনে হইল না। পরে সম্মতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক ঘরে যাওয়া গেল, সেটি গ্রামের মধ্যভাগে স্থিত। সেখানে কতকগুলি জীপুস্বয় রৌদ্রে বসিয়া সূতাকাটা ও তাঁত চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল, সম্মতি-প্রজ্ঞকে দেখিয়া “জু-দনজ” (আগন্তকের অভ্যর্থনা) করিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ভিতর হইতে পরিচিত কয়েক জন লোক বাহিরে আসিলে পবে আমাদের থাকিবার স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল। বাড়ীটি দু-তলা, চতুর্দিকে কুর্নি, মধ্যে ঘোঁরা বাহির হইবার জন্য মাটির ছাদে বড় ছিদ্র আছে।

সম্মতি-প্রজ্ঞ গৃহকর্ত্রীকে কিছু চা তৈয়ারী করিবার জন্য দিলেন। গৃহকর্ত্রীর মুখ হাত কাপড়চোপড়—সকলেরই উপর মোটা কাজলেব মত তেলকালির এক স্তর জমিয়া ছিল। সে বহুমুখ-চুল্লীর উপর জল ও চা চড়াইয়া ভেড়ার নাদির ইন্ধনে বাতাস দিয়া আঁচ তুলিল। চা ফুটিতে আরম্ভ করিলে তাহাতে অল্প ঠাণ্ডা জল দিয়া নামাইয়া লম্বা কাঠের স্লেঞ্চায় ঢালা হইল। সম্মতি-প্রজ্ঞ এক ডেলা মাখন দিতে, মাখন ও লবণ চায়ে দিয়া বার আট-দশ মন্বন-দণ্ড চালাইতেই চা মাখন ও লবণ মিশ্রিত হইয়া সন্ধেন পানীয়ে পরিণত হইল। চা-মন্বনের পাত্রটি এক মুখ বন্ধ (অল্প মুখের ঢাকনির মধ্য দিয়া মন্বন-দণ্ড চলে) দুই আড়াই হাত লম্বা পিচকারীর মত। মন্বনীটি পিচকারির মত উপর নীচে চালাইলে ভিতবে সজোরে হাওয়া যাওয়ায় পিচকারির নগুর মুখের গোল চাকতিতে তরল চা ও মাখন আলোড়িত হইয়া সবই দ্রুত মিশিয়া যায়।

এখান হইতে যাইবার পথে আমাদের থোঙলা (থোঙ নামক গিরিসঙ্কট) পার হইতে হইবে। ভারবাহী লোক লম্বা অপেক্ষা ঘোড়ায় যাওয়াই শ্রেয় মনে হইল, এবং সেই জন্য এখান হইতে লঙ-কোর পর্যন্ত যাইবার জন্য আঠার টঙ্কায় (দুই টাকায়) দুটি ঘোড়া ভাড়া করা হইল।

ক্রমশঃ

বাংলা বানান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে তার একটা অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে—এইখানে সেটা উপস্থাপিত করি। যথোচিত আলোচনা দ্বারা তার চরম মীমাংসা প্রার্থনীয়।

হ-খাতু খা-খাতু দি-খাতু ও শু-খাতুর অল্পজায় তাঁরা নিম্নলিখিত ধাতুরূপের নির্দেশ করেছেন—

হও, হয়ো।

খাও, খেও।

দাও, দিও।

শোও, শুয়ো ॥

দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র আকারযুক্ত খা- এবং ইকারযুক্ত দি- ধাতুতে ভবিষ্যৎবাচক অল্পজায় তাঁরা প্রচলিত থেয়ে এবং দিয়ে বানানের পরিবর্তে খেও এবং দিও বানান আদেশ করেছেন। অথচ হযো এবং শুয়ো-র বেলায় তাঁদের অন্তমত।

একদা হয় খায় প্রভৃতি ক্রিয়াপদেব বানান ছিল হএ, খাএ। “করে” “চলে” যে নিয়মে একারান্ত সেই নিয়মে হয় খায়ও একাবান্ত হবার কথা—পূর্বে তাই ছিল। তখন খা, গা, চা, দি, ধা প্রভৃতি একাক্ষরের ধাতুপদের পবে য়-র প্রচলন ছিল না। তদনুসারে ভবিষ্যৎবাচক অল্পজায় য়-বিযুক্ত “ও” ব্যবহৃত হতো।

এ নিয়মের পরিবর্তন হবার উচ্চারণগত কারণ আছে। বাংলায় স্ববর্ণের উচ্চারণ সাধারণত হ্রস্ব, যথা খাএ, খাও।

কিন্তু অসমাপিকায় যখন বলি খেএ (খেয়ে) বা ভবিষ্যৎ অল্পজায় যখন বলি খেও (খেয়ে) তখন এই স্ববর্ণের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়। খাও এবং খেও শব্দে ওকারের উচ্চারণে প্রভেদ আছে। সন্দেহ নেই এ সকল স্থলে শব্দের অন্তঃস্বর আপন দীর্ঘ স্বরকার জন্ত য-কে আশ্রয় করে।

একদা করিয়া খাইয়া শব্দের বানান ছিল, কবিআ, খাইআ। কিন্তু পূর্ব স্বরের অন্তঃস্বর্তী দীর্ঘ স্বর য-যোজকের অপেক্ষা রাখে। তাই স্বভাবতই আধুনিক বানান উচ্চারণের অনুসরণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শুধো হয়ে শব্দে একথা স্বীকার করেছেন, অন্তঃ কবেন নি। আমার বিশ্বাস এ-নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

আমরা যাকে সাধু ভাষা ব'লে থাকি বিশ্ববিদ্যালয় বোঝে তার প্রচলিত বানানের রীতিতে অত্যন্ত বেশি হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছুক নন। নতুবা খাইয়া খাইয়া প্রভৃতি শব্দেও তাঁরা প্রাচীন বিধি অনুসারে পরিবর্তন আদেশ করতেন। আমার বক্তব্য এই যে, যে-কারো সাধুভাষায় করিয়া হইয়া বলিযো খাইযো চাহিযো বানান স্বীকৃত হয়েছে সেই কারণে চলিত ভাষাতেও আছে। দিযেছে শব্দে তাঁরা যদি “এ” স্বরের বাহনরূপে য-কে স্বীকার করেন তবে দিয়ে শব্দে কেন য-কে উপেক্ষা করবেন? কেবলমাত্র দি- এবং খা-খাতুর য অপহরণ আমার মতে তাদের প্রতি অবিচার করা।



দুটি দিন

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্বৰ্গ ও মৰ্ত্যের মাঝখানে—একদিন
দেখা হ'ল তার সাথে, যেন স্বপ্নলীন
একখানি স্থপতি। চিনি চিনি করি
চিনিলাম—সে যে প্রেম। দিবা বিভাববী
মেশে বর্ণচ্ছটামর আকাশের পটে ;
দাঁড়াইয়া জীবনের সেই সন্ধ্যাতটে
গুধাইয় তাবে, “আজি হৃদয় দেবত’
স্বৰ্গ হ’তে হেথা কেন ?” শুনি সেই কথা
মুখ তুলে চায় প্রেম মুদ্র হাসি হেসে ;
অনন্ত রহস্য যেন সে কৌতুকে এসে
যোগ দেয়। তার কথা শোনে শশী ববি।
করিল উত্তর প্রেম, “জ্ঞান না কি কণি,
স্বৰ্গ পিতা, মৃত্যুই যে মা আমার ?
থেকে থেকে মা’র কাছে ছুটে আসি ; তার
শ্রামাঙ্গিনী মৃতি, তাব শ্রামল অঞ্চল,
মায়াভরা মুখখানি, অশ্রু-ছলছল
দুটি চোখ—ভালবাসি, বড় ভালবাসি।
স্বৰ্গের প্রাসাদ ত্যজি ছুটে ছুটে আসি
মায়েব কুটাবে তাই বাব বার ; হায়,
জাগে যেথা যুগ যুগ চির-প্রতীক্ষায়
দুখিনী জননী একা দূর বনবাসে,
—কবে আসি আপনার সিংহাসনপাশে
নিরে যাবে রাজা তার ! আমি দু-স্বপ্নেব ;
উভয়ের আমিই বন্ধন, তা কি টেব
পাও নাই এত দিনে কবি ?” জানি, জানি,
কি আনন্দময় গ্রন্থি তুমি দিলে টানি
স্বৰ্গ ও মৰ্ত্যের মাঝে ! তব আগমনে
হৃদয় চমকি ওঠে তাই ক্ষণে ক্ষণে
স্বৰ্গের আভাস পেয়ে। যেয়ো না হৃদ্ব,
মৰ্ত্যে এস মানবের প্রেমের ঠাকুর,
তুমি আমাদেরি থাক !

আর এক দিন।

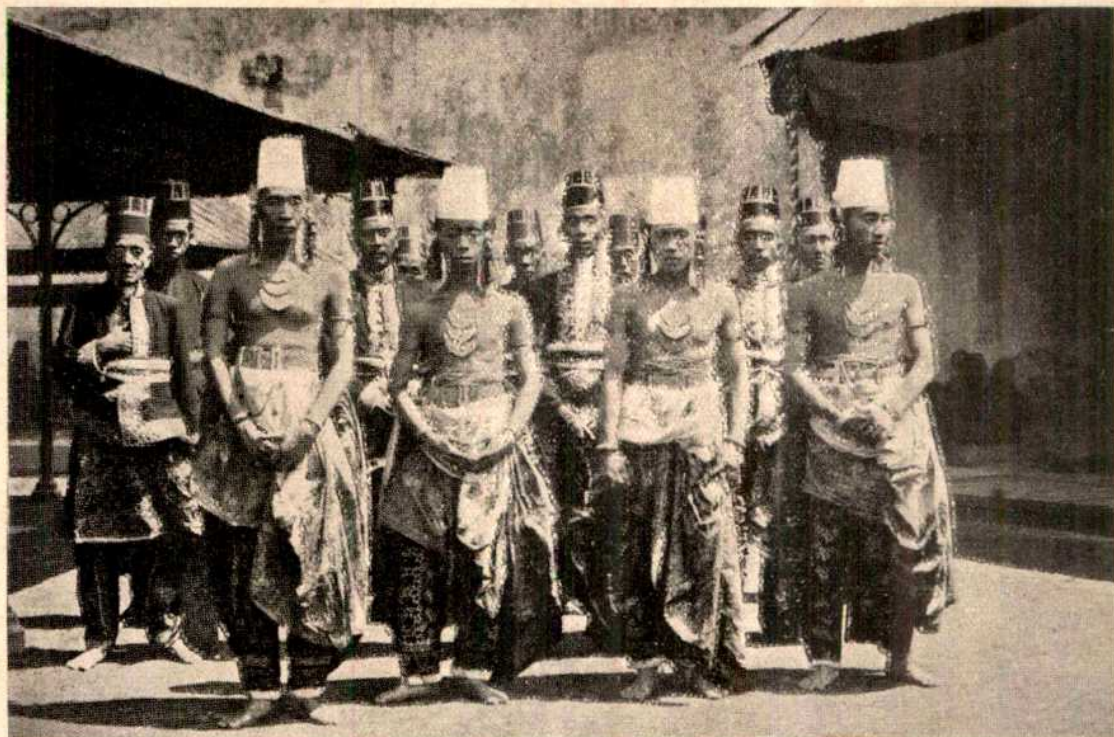
সে স্বপ্নের স্মৃতি কবে হয়ে গেছে ক্ষীণ,
যুগান্তর কেটে গেছে, বুঝি জন্মান্তর ;
কত বন্যা বয়ে গেছে জীবনের পর।

কোথা প্রেম, কবি অন্বেষণ। বনে বনে,
মনে মনে খুঁজে কেবে তারে জনে জনে
পৃথিবীব নবনারী। হয়ত আভাসে—
শারদ আকাশে আর বসন্ত-বাতাসে,
গোধূলির সূর্যাস্ত-আভাস, চন্দ্রালোকে,
এর মুখপানে চেয়ে, ওর দুটি চোখে
মুহূর্তেব পরিচয় পাষ একবার।
মৃতি ধরে নাই প্রেম মৰ্ত্যে কতু আব।

আকাশ নির্মল, শুধু গুটি কত তার।
অপরূপ নীলিমায় হয়ে গেছে হারা ;
প্রাবিত জ্যোৎস্নাব স্রোতে কোথা ভেসে যায়
হৃদয়েব তরী ! কে-বা তারে নিবাবিতে চায় ?
এমন সময়—দেখি দূবে একাকিনী
অচকিতা, অচঞ্চলা, চিববিরহিণী,
মুখে হাসি, চোখে জ্যোতি, কি লাগণ্য বাবে
অঙ্গে অঙ্গে, মাখাময়ী, নীলায়বে
ঢাঙ্কা তরু, নিধকান্তি শ্রামলা হৃন্দবী
বহুক্ষরা চলে অভিসাবে। আজি, মরি,
দীর্ঘ বিরহেব বুঝি হ'ল অবসান ?
এসেছে এসেছে তার রাজার আহ্বান।

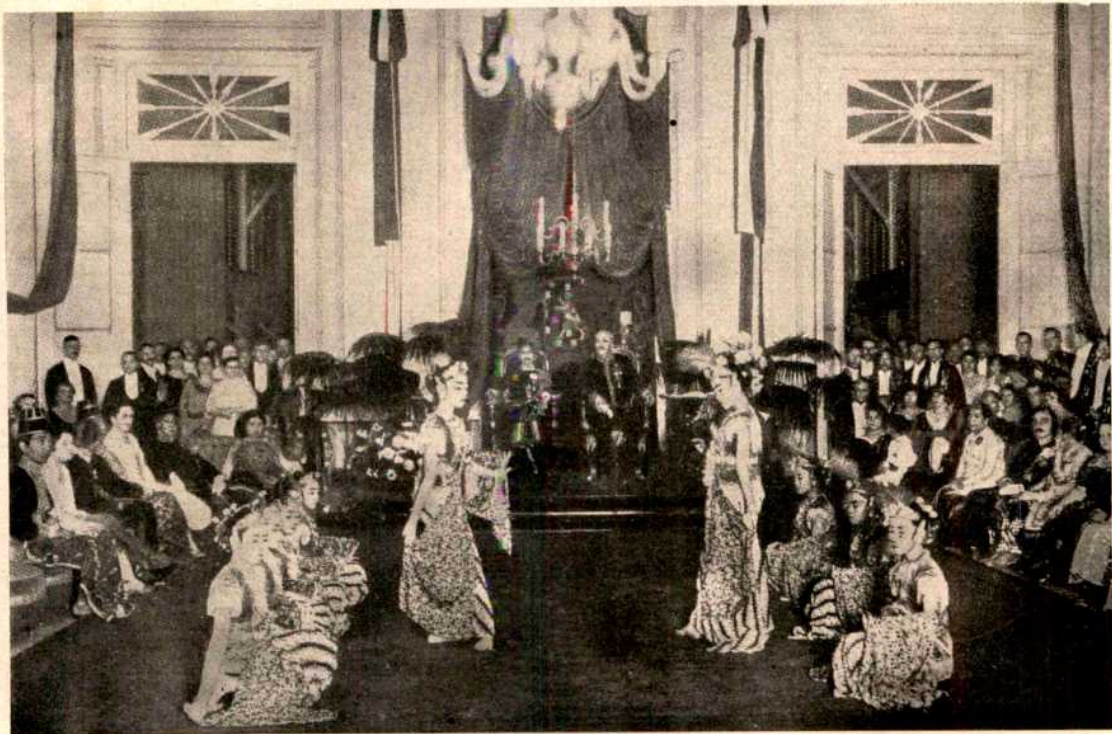
খেমে যায় কালস্রোত। গতিহীন রাতি।
কে-জানে কে-যেন কোথা, কোন্ স্বপ্নসাধী
দেখালো অঙ্কুরি তুলি ইন্দিতে আমায়,—
আকাশ চলিয়া পড়ে অনন্ত জ্যোৎস্নায়,
হৃদয় গলিয়া যায় অপূর্ব আবেগে ;
যামিনীর প্রাণ হ'তে কোন্ স্রব জেগে
পূর্ণ করি সর্ব শূন্য সাবাটা। অন্তব
উর্দ্ধ, অধঃ, চতুর্দিক, অবনী অথব,
শেষহীন, সীমাহীন,—সৌন্দর্যের পাষ
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে মুগ্ধ মুচ্ছনার।
শেষ হৃদয়, হৃদয়-নাকো, সেই বাঁশী বাজে
মধু-মিলনের বাঁশী। আর তাব মাঝে
ফুলশয্যা পাতা, ফুলের সজ্জায সাজ।
স্বপ্নিতা ধরণী আর ধরণীব রাজা।

জাভায় বিবাহ-উৎসব



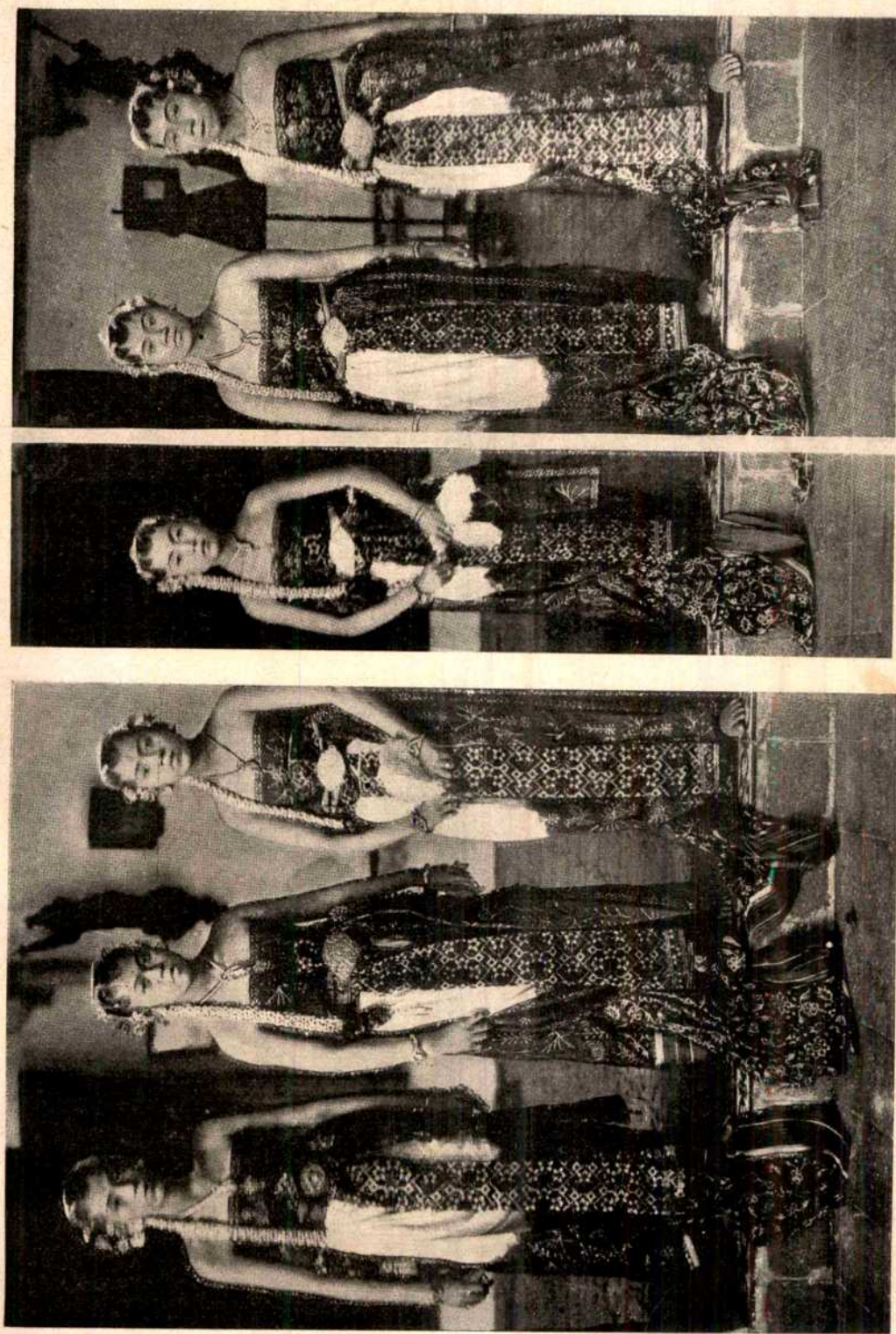
উপরে : মাহুচর ও স্তম্ভিত বরগণ

নীচে : ওলন্দাজ রাজপুত্রের নিবাসে রাজকন্যাগণ



উপরে : রাজকন্যাগণ চতুর্দোলায় ওলন্দাজ রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন

নীচে : উৎসবে রাজকুমারীদের নৃত্য

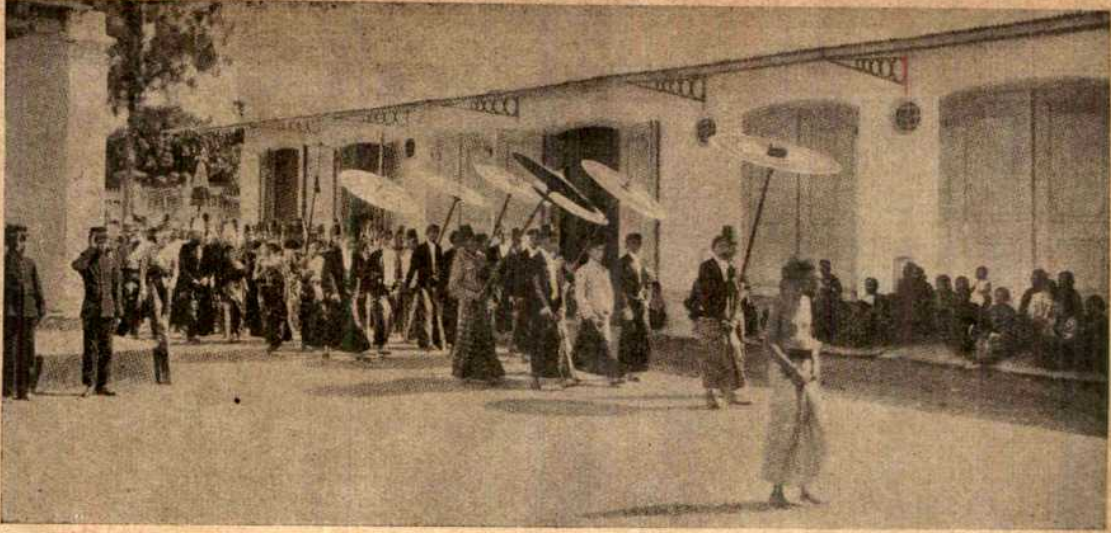


বিচিত্রবেশে জাভা-শ্রবণের রাজা সুহুজনের নবোতা কন্যাপণ
[১৯৩৩ পৃষ্ঠার চিত্রগুলি "এশিয়া"র সৌজগ্রে মুদ্রিত]



উপরে : নৃত্যসভায় বালিধীপের নর্তকীগণ

নীচে : বালিধীপের রমণী, ধান ভানিতেছে [শ্রী অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত চিত্র



জাতার রাজকুমারীদের বিবাহের শোভাযাত্রা

জাতায় বিবাহ-উৎসব

[উৎসবের দেশ জাভা-ও বালি-দ্বীপে প্রকৃতি নবযৌবনময়ী, তারই অঙ্গনে নিত্য বিচিত্র উৎসবের রচনা। এমন কি, অস্ত্রোষ্টি-সংকারও সেখানে উৎসবের বিষয় বলে পরিগণিত।

জাভা ও বালির উৎসবাবলীর প্রধান উপজীব্য হ'ল নাচ—এই নাচের অধিকাংশকেই নৃত্যনাট্য বলা চলতে পারে—ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বহু কাহিনী ও চরিত্র অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে এই নৃত্যনাট্যে নাচের ভাষায় ছন্দে ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়ে থাকে।

বিবাহ-অনুষ্ঠান অবলম্বন করে সকল দেশেই উৎসবের ক্ষেত্র রচিত হয়ে থাকে; বিদেশীয় ভ্রমণকারিণীর স্মৃতিলিপি থেকে সংকলিত জাভা-শুরকর্তার রাজা সুসুহননের ছয় কন্যার বিবাহ-অনুষ্ঠানের এই বিবরণ থেকে জাতায় এই উৎসবের প্রকৃতির আভাস পাওয়া যাবে, সেই উৎসবের অমুখ্য রূপে জাতার নৃত্যনাট্যের স্বল্প পরিচয়ও আছে।]

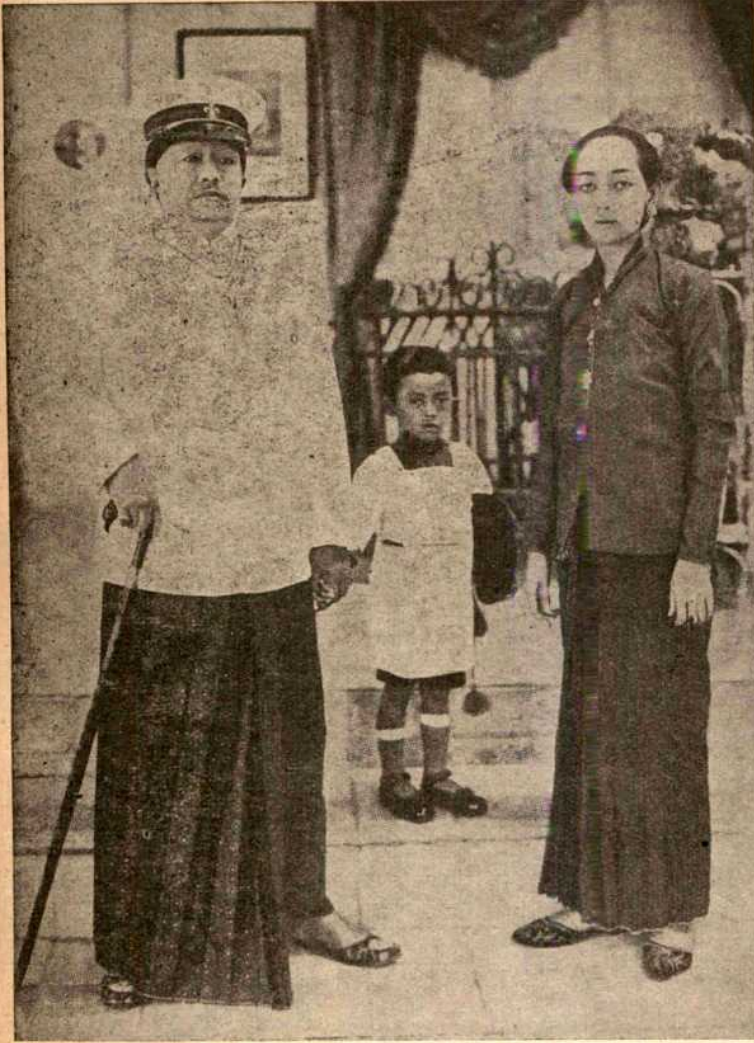
জাতায় বিবাহ-অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা বরের, বধূর নয়; রাজকুমারীরা তাই উৎসব-অঙ্গনে দেখা পর্য্যন্ত দেবেন না। নানা বিচিত্র প্রাচীন প্রথার সমাবেশে এই মঙ্গল-অনুষ্ঠান সুসম্পূর্ণ।

প্রাসাদদ্বারে স্ববেশ সৈন্যদল উত্তীর্ণ হয়ে আমরা অবশেষে একটি অভ্যর্থনা-কক্ষে পৌঁছলুম, রাজার সহোদরেরা সেখানে আমাদের স্বাগত-সম্ভাষণ জানাবার জন্ত অপেক্ষা করছেন, তীক্ষ্ণ, অভিমান-প্রদীপ্ত তাঁদের কাস্তি, পরিধানে বাটিকের

কাজ-করা বসন, তাঁদের শিরস্ত্রাণ কর্ণভূষা ও অদ্বুরীয় থেকে মণি-মাণিক্যের ছাতি বিচ্ছুরিত।

আমাদের দলের মহিলাদের স্থান হ'ল অন্তঃপুরে—সেখান থেকেই আমরা উৎসব-দর্শনের স্বেযোগ পাব। রাজাস্তঃপুরিকাদের সঙ্গে প্রীতিসম্ভাষণ বিনিময়ান্তে আসন গ্রহণ করবামাত্র মধুর 'গামেলান' বাজ আরম্ভ হ'ল, আর তারই সঙ্গে রাজা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের নানা কীর্তিকাহিনীর সঙ্গীত। অবশেষে রাজা উৎসবস্থলে প্রবেশ করে সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। বিবাহের প্রধান পুরোহিত ও রাজসভাসদ-গণ উপবিষ্ট, ক্রমশ এক এক করে বিবাহের বরেরাও এসে সমবেত হলেন—উত্তরাদ্ধ অনারুত, সাজসজ্জায় তেমন বৈচিত্র্য নেই, নেই কোন মণি-মাণিক্যের ছটা—বিনীতবেশেই এসেছেন বধূলাভের সম্মান স্বীকার করে নিতে। প্রধান আচার্যের শাস্ত্রাচাশাসন-পাঠ সমাপ্ত হ'লে বিবাহার্থীরা এক এক করে সাঁঠাঙ্গে ও করজোড়ে রাজার সম্মুখে প্রণত হলেন; এই প্রণতিদ্বারাই তাঁরা রাজকুমারীদের পাণিপ্রার্থনা জ্ঞাপন করছেন। যাজ্ঞা স্বীকৃত হয়ে গেলে তাঁরা বিনীতভাবে সভাস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

উৎসবের এই অঙ্গসমাপ্ত হ'লে পার্টিরাণীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের পালা। দর্শন-গৃহে রাণী তাঁর সখীর দলে পরি-



জাভা-শ্রমিকের রাজা হুসুতন ও তাঁর পাটরাণী

বেষ্টিত হয়ে আছেন, উজ্জ্বল সুবর্ণময় বসনভূষিতা,—জাভার নানা কাহিনী দেয়ালে রেশমে চিত্রিত ও খচিত। রাণীর বসন-ভূষণে অলঙ্করণে প্রাচীন পদ্ধতির প্রভাব এত বেশী যে প্রাধান্যমানের মন্দিরে খোদিত মূর্তির কথাই তাঁকে দেখে আমাদের বার-বার মনে হচ্ছিল। বাল্যে ভাতার কাছে, যৌবনে স্বামীর আশ্রয়ে চিরদিনই তিনি প্রাসাদ-পালিতা, তার বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সন্ধীর্ণ; আমার কথা চীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করে এসেছে শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাণী বললেন, ভগবান,

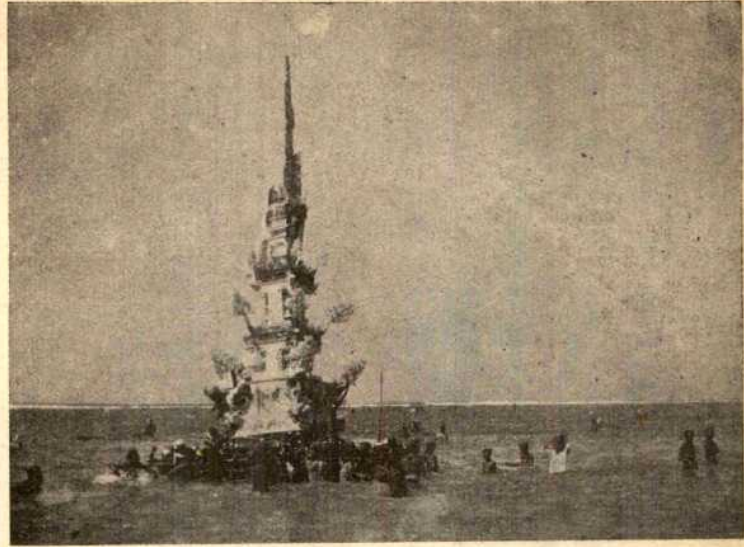
আমারও যেন পরজন্মে সে-ভাগ্য হয়—পরজন্মে আমি যেন বিদেশীর ঘরেই জন্ম নিয়ে আসি।

প্রাসাদের পূর্ব শেষ করে আমরা ওলন্দাজ রাজপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর আবাসস্থলে গেলাম। স্থানীয় প্রথা অনুসারে, নবোঢ়া রাজকুমারীরাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন; আমরা তারই প্রতীক্ষায় আছি, এমন সময় উদ্যানবাটিকার সম্মুখে জনতার পদধ্বনি শোনা গেল, দীর্ঘ-মশালবাহী শত শত লোকের জনতা। দ্বার খুলে দেওয়া হ'ল, জাভার ছায়ানাট্যের পুতুলের মতন সজ্জিত বহু মশাল-বাহী প্রথমে প্রবেশ করল, তাদের অনুসরণ করে প্রবেশ করল বিচিত্র বেশে সজ্জিত বহু জাভানীয়, তাম্রপাত্রে শিশু বোধিতরূক বহন করে। তার পর বহু শত জাভানীয় বীরকে পুরোভাগে নিয়ে এল প্রথম-রাজকন্যার পাঙ্কী, গালায় ও সোনায়ে বিচিত্র কাজ করা; সেই পাঙ্কীতে সখিপরিবৃত্তা রাজকন্যা ব'সে, যেন কোন মন্দিরবেদী থেকে দেবী-

প্রতিমাকে কে তুলে নিয়ে এসেছে। পাঙ্কী থেকে নেমে এসে কন্যা রাজ-কুলোচিত গান্ধীর্থের সঙ্গে রাজপুরুষকে নমস্কার নিবেদন করলেন। এর পর অস্থপৃষ্ঠে এলেন বর ও তাঁর পিতা। বর আর এখন দীনবেশে সজ্জিত নন, বীরবেশে রাজোচিত ঔষধ্য ও সজ্জায় বধূকে নিয়ে যেতে এসেছেন। ক্রমে ক্রমে ছয় জন রাজকন্যা ও বরই এসে পৌঁছলেন, আর এল অশ্বারোহীরা দল। উপস্থিত সকলকে পানীয় পরিবেষিত হবার পর বরবধুরা বিদায় নিলেন, তাঁদের অনুসরণ করে বিচিত্র শোভাযাত্রাও অন্তর্হিত হয়ে গেল।

বিবাহ-উৎসবের সকল অলুষ্ঠান এখনও শেষ হয় নি। উমুক্ত নিশীথাকাশের তলে উৎসব-অঙ্গনে সূর্য্যবংশীয়েরা সমবেত হয়েছেন, অথারোহণে বরগণ ও পাক্কীতে বধূরা এলেন। বধূরা নিজ হাতে তাঁদের স্বামীদের পা ধুইয়ে দিলেন, তার পর দেব-মন্দিরের পুরোহিত সেই জল দিয়ে বরবধূর ললাটে কি মঙ্গল-চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিলেন। এই অলুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে গেলে বরবধূরা পুনরায় উৎসবস্থল থেকে প্রস্থান করলেন।

এর পর চলল অভাগতদের প্রীতিভোজনের পালা, বিচিত্র আহাৰ্য্য ও নানা মধুর পানীয়ের সমাবেশে।



বালিহীপে অলুষ্ঠানক্রিয়া : দাহাবশেষ ভস্ম দারময় মন্দিরে বহন করিয়া শোভাযাত্রাস্তে সমুদ্রে বিসর্জন দিতেছে
[শ্রীঅঙ্কিতকুমার মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত চিত্র]

উৎসব-অঙ্গনের এক কোণে পুনরায় গামেলান বেজে উঠল, রাত্রির কোন্ রহস্যকক্ষ হ'তে দীপদবিক্ষেপে রাজকুমারীরা সভাস্থলে প্রবেশ করলেন, অতীতের স্বপ্নস্বপ্নের মত—তলু দেহ ঈষৎ চঞ্চল, চরণতল মাটি ছোঁয় কি না—ছোঁয়—এমন পারিপাট্যের সঙ্গে সাজ ক'রে এসেছেন যেন অঙ্গের গতি কোন-ক্রমে বাধা না পায়। মুহূর্তের জ্ঞান সিংহাসনের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে থেকে আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে রাজাকে প্রণতি জ্ঞাপন করলেন, লীলায়িত তাঁদের প্রতি অঙ্গ, বহুকালের কলাবিদ্যা তাঁদের রক্তধারায় সঞ্চারিত, কত শিল্পীর সৌন্দর্য্য-স্বপ্ন তাঁদের দেহলীলায় পুঞ্জিত, স্বদূর অতীতের শিল্পধারা তাঁদের ভঙ্গীতে যেন পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ক্রমশ গামেলানের বাণ আরও মধুর আরও মনোহর হ'য়ে উঠল; পুষ্পের দল যেমন ক'রে বিকশিত হয়ে ওঠে যেন তারই রূপ অলুষ্ঠান ক'রে রাজ-কুমারীদের নৃত্যলীলা আরম্ভ হ'ল, উন্নত তাঁদের দৃষ্ট শির, মধুর মুখশ্রীতে কোন ভাব-বৈগুণ্যের চিহ্নমাত্র ধরা পড়ে না, দীর্ঘ পশ্চাত্তর চোখের উপর আনমিত—কেবল দেহলীলায় বিরহ-মিলন-প্রেম, হৃদয়ের কত বেদনা-বাসনা উদ্বেলিত। অস্থিরচিত্ত অর্জুনের প্রতি রাজকুমারীর প্রণয়-নিবেদনের

আখ্যায়িকাকে অবলম্বন ক'রে এই নৃত্য রচিত—ভারতবর্ষের এমন কত পৌরাণিক কাহিনী অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে আজও জাভায় প্রচলিত আছে। এই নৃত্যের একটিমাত্র অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত অনাবশ্যক বা অতিরিক্ত নয়, অঙ্গের একটি ভঙ্গী সহজেই অপর একটি ভঙ্গীতে মিলিয়ে যায়, দৃষ্টিকে পীড়িত করে না।

ক্রমশ এই নৃত্যের শেষ হ'ল, রাজকুমারীরা অস্তহিত হলেন। এবার আর একটি তরুণীর নাচের পালা—তার সমস্ত অঙ্গ স্ববর্ণময় বসনে আবৃত, অনাবৃত কণ্ঠদেশ ও বাহুতে মণি-মাণিক্যের ছটা। এই বালিকা রাজবংশোদ্ভবা নয়, নর্তকী মাত্র, প্রেমলীলার ক্রীড়নক। তার কপোলে ঈষৎ রক্তিম; ফুল রক্তাধরে নীরব প্রেমের বেদনা প্রস্ফুট। নম্রভাবে সভাস্থলে প্রবেশ করে সে রাজসিংহাসনের সামনে আভূমি নত হয়ে পড়ল, বাগধারিণিও ক্রমশ আরও মৃদু হ'য়ে উঠল। রাজার মন্তক-হেলনে নৃত্যের অন্তিমতি লাভ ক'রে নর্তকী গাত্রোত্থান ক'রে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ ক'রে দিল; তার দেহগ্রন্থি যে স্বভাবের কোনও বাধা মানে এমন মনে হ'ল না, এমনই বিচিত্র তার



দেবালয়ের পথে বালিদ্বীপের মহাদেব-সেবিকা
[শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত চিত্র]

অঙ্গলীলা। অবশেষে এক সময় এই নৃত্য-বিলাস পরিসমাপ্ত হ'ল, নৃত্যশ্রমে ক্লান্ত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা মাটির 'পরে লুটিয়ে পড়ল।

এর পর বালকদের বানর-নৃত্যের পালা, রাজা স্তম্ভহননের বালক ভাতৃপুত্রদের হুম্মান ও তার বানর সঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য; তার পর রাজ্যলাভ-নৃত্য—স্থলতানের চার পুত্র, বিভিন্ন মাতার অঙ্কে একই দিনে তাঁদের জন্ম—অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সিংহাসনের অধিকার-প্রতিষ্ঠায় তাঁরা যত্নবান, এই কাহিনীটি নৃত্যাভিনয়ে বর্ণিত হ'ল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর অতীত হয়, এইবার উৎসব-শেষের পালা; রাজারাণী স্বর্ণদৌলায় প্রস্থান করলেন, বর-বধূরাও অন্তর্হিত, উৎসব-অঙ্গন ক্রমে নির্জন হয়ে এল, আমরাও প্রাচীন জাভার স্মৃতিসৌরভ-ব্যাকুল এই রূপকথার পুরী থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন



গন্ধের গন্ধ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

স্বগন্ধি—যা তুমি আমারে বন্ধু, দিয়েছিলে উপহার—
শেষ হয়ে গেছে, প'ড়ে আছে থালি শিশি;
—তাও বুঝি নাই,—কে কবে কোথায় করিয়াছে অধিকার,
জঞ্জাল-মাঝে গিয়েছে সে কবে মিশি!

থস্—না, হেনা—না, অজানা সে কোন্ শপ্পের মুহূর্ত্ত—
ছিল,—তাও আর পড়েনাক ভাল মনে;

শুধু থেকে-থেকে গন্ধে-ভরা সে অতীতের ইতিহাস
সুদূর স্মৃতিটি জাগায় ক্ষণে-ক্ষণে!

কোথা তুমি আজ, কোথায় বা আমি—কোন দূরান্ত দূরে,
—সবই গেছে, শুধু আছে গন্ধের গন্ধ!
ভালবেসে-দেওয়া উপহারটুকু,—আছে যা হৃদয় জুড়ে,
এ-শেষ-জীবনে জেগে থাক্ সে আনন্দ!

অলখ-বোরা

ত্রিশাস্তা দেবী

পূর্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকল্পা শিবু ও স্বধাকে লইয়া থাকেন। স্বধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাটির গকর গাড়া চড়িয়া এবারেও তাহার রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও মিনিসা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাহার বিবধা দিগি স্বরধুনীর খুব ভাব। স্বরধুনী সংসারের কত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরঙ্গী। বাগের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আশ্বাসবাক্য। পূজার পূর্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে স্বধার মিনিসা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাহার বৃত্তান্তে মহামায়া ও স্বরধুনী চক্রে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃস্বা, কিন্তু শোকের উলসীয়ে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাহার শরীর অত্যন্ত ধারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাহার শরীরের একটা দিক্ অস্থির হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিগি স্বধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন।]

৮

মহামায়াব শরীর আর কিছুতেই ভাল হয় না। হৈমবতী একলা সমস্ত সংসারের কাজ পারিয়া উঠেন না। লুচি ভাজিতে গেলে বেলিয়া দেখ কে? মাছ কুটিতে গেলে উনানের আগুন উদ্ধায় কে? কাজকর্মে বড় বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িয়াছে। স্বধা প্রায় এগার বছরের মেয়ে হইল, তাহাকে কাজেকর্মে টানিয়া আনিতে তবু হৈমবতীর অনেক-খানি সূরাহা হয়; কিন্তু ছোট খোকার পিছনে অষ্টগ্রহর ছুটিতে ছুটিতেই তাহার দিন কাটিয়া যায়, সে হৈমবতীকে সাহায্য করিবে কি করিয়া? খোকা এক বছর পার হইয়া গিয়াছে, টলিয়া টলিয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া চলা ও সংসারের সমস্ত জিনিষ উন্নত ভৈববের মত দুই হাতে টানিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করাই তাহার কাজ। সংসারটা পাছে একলাই সে রসাতলে পাঠাইয়া দেয় তাই সতর্ক প্রহরীর মত স্বধা এই ক্ষুদ্র কাল-পাহাড়কে বন্দী করিবার ক্ষমীতে দিনরাত ব্যস্ত।

আজ সে খাট হইতে পড়িয়া গিয়া ত্রাড়া মাথাটা আমের আঠির মত ফুলাইয়া বসিয়া আছে, তাই স্বধা তাহাকে লইয়া

বড় বিব্রত। পিছন পিছন দৌড়াইতে স্বধা খুব পারে, কাবণ সেটা যেমন খোকাকে আগলানো তেমন স্বধারও একটা খেলা। কিন্তু এই দুর্দান্ত দম্ভা ছেলেটাকে সারাদিন কোলে করিয়া বেড়ানো কি তাহাব মত ছেলেমাছুষে সাধ্য? খোক কোলের ভিতরই এমন জোরে জোবে ঝাঁকি দিয়া খাড়া হইয়া উঠে যে দাঁড়াইয়া থাকিলে স্বধা স্বদ্ধ সেই ধাক্কাষ পড়িয়া বাইবাব যোগাড় হয়। অথচ ঐ তালের মত ফোলা মাথাটা লইয়া উহাকে আজ ত আবার দস্তিপনা করিত দেওয়া যায় না?

স্বধা হৈমবতীর শরণ লইল। “পিসিমা, খোকনকে যদি তুমি রাখ, তাহলে তোমার সব কাজ আমি করে দেব। ওর সঙ্গে বৃদ্ধ কবতে আর আমি পারছি না।”

পিসিমা বালিস্বদ্ধ ভাঙা ধোলা উনানে বসাইয়া তাহার উপর কুচি দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া খই ভাজিতেছিলেন। তত্ত্ব ধোলায় শুভ্র বেলফুলের মত মোটা মোটা ধইগুলো ভোক্ত-বাজির মত এক মুহূর্তে রাশি রাশি ফুজিয়া উঠিতেছিল। তাহাবই মধ্যে বাঁ হাতে লোহার চোঙাটা ধরিয়া পিসিমা তাহার ভারি গাল দুটি আরও ফুলাইয়া উনানে ছুঁ পাড়িতে-ছিলেন। কাঠের উনানের ধোঁয়ায় ও আগুনের তাতে তাহার মুখখানা গোলাপ ফুলের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। স্বধার কথা শুনিয়া পিসিমা বলিলেন, “হ্যাঁ তোমাকে আর আমার কাজ করতে হবে না। তুমি যাব ত কলকাতায় মেমসাহেব হতে! এই বড়ী পিসির সঙ্গে খই ভাজতে কি তোমার বাপ মা তোমায় এখানে রেখে দিলে যাবে?”

ছোট খোকা কোল হইতে ছাড়া না পাইয়া তখন সজো-র স্বধার ঘন চুলের মুঠি ও কানেব পার্শ্ব মাকড়ি দুই হাতে ধরিয়া টানিতেছে। এক হাতে চুল ও কান ছাড়াইতে ছাড়াইতেই স্বধা বলিল, “কোথায় যাবে সবই, পিসিমা?”

পিসিমা আধপোড়া খড়ের বিঁড়ার উপর ধপাস কনিয়া গরম ধোলাটা নামাইয়া বলিলেন, “আসর ঘরে মশাল দেই

টেকশিলে চাঁদোয়া! তোমার বাপ এই পাড়াগাঁয়ের চালই চালাতে পাবছেন না, বৌ এক বছর শয্যাশায়ী। এখন চলেছেন ছেলেমেয়েকে ইংরেজীদানা শেখাতে। কে সেখানে সংসার ঠেলবে বাপু? খেয়ে পাবে ছেলেপুলেগুলো বেঁচে ছিল সেইটাই বড়, না না-খেয়ে ইংরিজী শেখা বড়?”

স্বধা বিস্মিত হইয়া পিসিমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের কলিকাতা-বাইবার কথা একটা আবছা আবছা কিছুদিন হইতে সে শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া শুনে নাই। যাই হোক, পিসিমা যখন এত রাগ করিতেছেন তখন নিশ্চয় তাঁহার মনে বেদনা লাগিবার মত কিছু হইয়াছে।

স্বধা ভয়ে ভয়ে বলিল, “তা গেলেই বা কলকাতায়। আমি ইস্কুলে ভর্তি হলেও কাজ কবতে পাবব। তুমি আমায় একটু একটু করে সব শিখিয়ে নিও। ভাত নামাতে ত আমি শিখেছি। মা না পারেন, আমরা দুজনেই কাজ কবব।”

হৈমবতী সরোষে বলিলেন, “আমি যাব কিনা সেখানে তোমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ করতে? আমি যে এখানে তোমাদের আঁধার ঘর আলো করে বসে থাকব।”

স্বধার মনটা বড় মুড়াইয়া গেল। সে বলিল, “কেন পিসিমা, তুমি যাবে না কেন?”

হৈমবতীর স্বর হঠাৎ নরম হইয়া আসিল। খই ভাঙ্গা রাখিরা শিল-নোড়া হলুদ সরিষা টানিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, “সবাই ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গেলে চলে কি মা? এখানে যে সাতভূতে আড্ডা করে নরক স্তলজ্ঞার করে তুলবে। এত দিনের গড়া সংসার অমন করে কি কেউ জলে যেতে দেয়? এই আগলে যক্ষি হয়ে আমায় বসে থাকতে হবে।”

পিসিমার উত্তরে স্বধার মন খুলী হইল না। সংসারে তাহাবাই যদি কেহ না রহিল তবে সে-সংসারকে এত করিয়া বুক দিয়া আগলাইয়া বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন? সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার বুদ্ধি স্বধার তখনও হয় নাই। সে মনে করিল এটা পিসিমার এ-সংসারের প্রতি মমতা যাত্র। মমতা তাহারও আছে কিন্তু প্রাণহীন স্বরত্নাবের

প্রতি মমতার জন্ত প্রাণের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন প্রিয়জনদেব সে ছাড়িতে পারে না। নহিলে আজন্মের পরিচিত এই স্নেহনীড় ছাড়িবার কথা শুনিয়া তাহারই কি বুকের শিরা-উপশিবার টান লাগিতেছে না? জন্ম অবধি এ-গৃহেব আবেষ্টন যে তাহার দুই চোখে মায়া-অঙ্গন পরাইয়া দিয়াছে। কেমন করিয়া ইহাকে ফেলিয়া সে নতুন জগতেব মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে? এত বছর-বছর পূজাষ মামার বাড়ী বেড়াইতে যাওয়া নয়! এ এক লোক হইতে অন্য লোকে প্রয়াণ! ছোট খোকাকে দুই হাতে কোলের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠের উপব বসিয়া পড়িয়া স্বধা বলিল, “পিসিমা, আমরা বুঝি আর এ-বাড়ী ফিরে আসব না!”

হৈমবতী হলুদমাখা হাতখানাই মুখের উপর তুলিয়া তর্জনী উঁচাইয়া বলিলেন, “ঘাট, ঘাট, ও কথা কি বলতে আছে? বাড়ী এক-শ বার আসবে। তবে চন্দ্র যে কলকাতাতেই চাকরি নিয়ে বসেছেন। এখন কি আর হট করতেই ঘরে এসে বসা যাবে? পরের গোলাম, ছুটি না পেলে এক পা বাড়াবাব সাধ্য নেই। তার উপর তোমাব মাঘের চিকিচ্ছে, তোমাদের ইস্কুলমিস্কুল কত কি! বুড়ী দিসিকে কি তখন আর মনে পড়বে যে দু-বেলা দেখতে আসবি?”

হৈমবতী এমন স্নেহকোমল স্বরে ত কখনও কথা কহেন না? তাঁহার কথা শুনিয়া স্বধার চোখে জল আসিয়া গেল। সে চোখের জল সামলাইয়া লইয়া বলিল, “আমি জলখাবারের পয়সা জমিয়ে তোমায় নিয়ে যাব পিসিমা; তুমি মাঝে মাঝেও কি যেতে পারবে না?”

ছোট খোকা কোল হইতে নামিয়া পড়িয়া অশ্রুমনস্ক হৈমবতীর শিল হইতে এক খামচা হলুদ তুলিয়া লইয়া বলিল, “পাকো।”

স্বধা খোকার পিঠে সাদরে মুছ একটা চড় দিয়া হাসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মনের ভিতর তাহার হাসিটা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইল না। সে মনটাকে হাক্স করিবার জন্ত শিবুর খোঁজ করিতে লাগিল। তাহার মনের অল্প বয়সের গাভীখটাকে হাসি ও খেলাব মলয়হিল্লোলে উড়াইয়া দিবার জন্ত ছোট ভাই শিবু ছাড়া আর ত তাহাব দ্বিতীয় সঙ্গী ছিল না।

মহামারা সংসারের কাজে ক্রমশঃই অপটু হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া ছেলেমেয়ের পড়াশুনার ভারটাই বেশী করিয়া নিজে টানিয়া লইতেছিলেন। স্বধা যতক্ষণ ছোট খোকার দৌরাণ্ড লইয়া ব্যস্ত থাকে, মহামারা ততক্ষণ শিবুর মানসিক উন্নতিব চেষ্টা মন দেন। খাণ্ডাদাওয়ার পর খোকন শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে স্বধা তাহার বালি কাগজের খাতা, আখ্যানমঞ্জরী, উপক্রমণিকা, সুতাতোলা কুমাল ও মিহি চুলের দড়ি ইত্যাদি লইয়া মায়ের কাছে আসে। হয়ত আজ এতক্ষণে শিবুর পড়া হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া স্বধা আসিয়া দেখিল, মেয়ের উপর ‘বোধোদয়’ ও ‘নব ধাবাপাত’ গড়াগড়ি যাইতেছে, শিবু স্নেটখানা বকের উপর চাপিয়া চিৎ হইয়া মা’র কোলে মাথা রাখিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার হাত্তোজ্জ্বল অনিন্দ্যস্বন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। মা শিবুকে গল্প বলিতেছেন। বুড়ো ছেলেব এখনও মা’র কোলে শুইয়া গল্প শোনার সখ মিটে নাই।

স্বধা ছোটখোকাকে মেঝেতে ছাড়িয়া দিয়া দূর হইতে শুনিতে লাগিল, গল্প ত নয়, মা কি সব ছড়া বলিতেছেন :-

“হাড় হ’ল ভাজা ভাজা মাস হ’ল দড়ি
আমবে ভাই সাগরজলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।”
“ভাত কড় কড় ব্যনন বাসি দুখ বিড়ালে খায়,
তোমার খেলাবার সাথী উপবাসী যায়।”

মা কেন আজ এই সব ছড়া বলিতেছেন? স্বধা মনে করিয়াছিল মা হয়ত শিবুকে সাত বউয়ের গল্পের

“সাত বৌএর সাত আসকে, খড়কের আগায় ঘি
খুঁত খুঁত খুঁত করছ কেন খেতে লারছ কি?”

ছড়া শুনাইতেছেন। তাহা ত নয়, মা’রও মন চঞ্চল হইয়াছে, তাই এই সব বিচ্ছেদব্যথার কল্পনায় তাঁহারও মনে ব্যস্ত দিয়া উঠিয়াছে। হৈমবতী স্বধার খেলার সাথী নন, তবু স্বধার মনে হইল তাহার যখন তাঁহাকে এই শূন্যগৃহে ফেলিয়া দিয়া দূরে চলিয়া যাইবে, তখন আনন্দনা পিসিমার ভাত ব্যঞ্জন এমনই অবহেলায় পড়িয়া নষ্ট হইবে, তিনি উপবাসী বলিয়া মানসচক্ষে স্বধা শিবু খোকার প্রিয় মুখগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবেন। সন্ধ্যাতবক্ষ্যতা শিশুবধুর মত তাঁহারও প্রিয়জনবিরহে সাগরজলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিবে।

এই কল্পনায় স্বধার আর ভাল লাগিল না। সে বলিল, “মা, খোকনের ঘুম এসেছে, ওকে তুমি একটু দেখো। শিবু, চল মুখ্যেবাঁধেব ধারে অনেক চক্‌কি পাথর দেখে এসেছি, কুড়িয়ে আনি গে।”

শিবু ভডাক করিয়া মা’র কোল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বই দুইটা ধরেব ছাদ পর্যন্ত ছুঁড়িয়া দিয়া আবার লুফিয়া লইল। তাহার পর সাঁওতালদের সুরে—

“বাবুদের কলাবাগানে,

গুলো, আমার গোলাপকাটা ফুটেছিল চরণে।”

গাহিতে গাহিতে স্বধাকে টানিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া শিবু সানন্দে স্বধার চুলের মুঠি ধবিয়া টানিয়া বলিল, “দিদি, জান আমরা কলকাতা যাব? দু-জনেই ইচ্ছা করে ভক্তি হবে।”

স্বধা গম্ভীর বিষম মুখ করিয়া বলিল, “তোমার ভাল লাগছে?”

শিবু দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, “ভাল? আমার ইচ্ছে করছে এখুনি হুটমানেব লকা যাত্রার মত এক লাঞ্চে কলকাতায় গিয়ে পড়ি।”

স্বধা বলিল, “ভাগ্যে ভগবান তোকে লেজটা দিতে তুলে গিয়েছিলেন। না হ’লে তুই সাক্ষাৎ হুটমানের মত গাছের ডাল থেকে আর নামতিস না। কলকাতা যাবার জন্তে যে এত স্বেপেছিস, সেখানে কি এমন আমগাছ আর পেয়ারা গাছের ডালে বঁসে থাকতে পাবি? পিসিমা বলেছেন সে ভারী শহর, সেখানে শুধু রাস্তা বাজার আর বাড়ী, গাছপালা কিছু নেই।”

শিবু বলিল, “আগাগোড়াই নতুন রকম দেশ, তাহলে ত আরোই মজা।”

কিন্তু সম্পূর্ণ নূতনব কল্পনায় স্বধার মন ভরিল না। ভোরবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার চিরপরিচিত শিরীষ ফুলের গাছের পিছনে আকাশ বাড়ী করিয়া স্বর্ষ কলসের মত সূর্যের উদয় যদি না দেখিতে পাওয়া যায়, যদি মেঘে মেঘে সাত রঙের ফাগ ছড়াইয়া সন্ধ্যাব সূর্য ঐ ছায়াপৃষ্ঠ শৈলমালার পিছনে না অস্তহিত হয়, তবে কিসের সে কলকাতা? গুল্ল পক্ষের মাঝ রাত্রে অন্ধকার ঘরে যখন ঘুম ভাঙিয়া যাইবে তখন পুত্র পাড়ের ঝাঁকড়া কালো

নিম্ন গাছেব অন্তরালে খালার মত চাঁদটিকে ধীরে ডুবাইয়া যাইতেও কি সেখানে দেখা যাইবে না ? দিনরাত্রির সন্ধিক্ষণে এই যে রূপদ্রাতি মনকে ভুলাইয়া দেয় ইহাকে ছাড়িয়া জীবনের আনন্দ যে অর্ধেক হইয়া যাইবে। স্বধা ত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। তাহার কতখানি যে পড়িয়া থাকিবে এই স্থলকাণ্ড মহা গাছের ডালে ডালে শাদা বকব শোভায় আর এই পাহাড়ে পথের ধারে ভীমকায় কালো কালো পাথরে তাহা কে জানে ? এই পুরুষের পাড়ে পাড়ে চকমকি কুড়াইয়া আগুন জালিয়াছে, জোড়ের ক্ষীণ জলধাবান পা ডুবাইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে যে স্বধা ও শিব কত দিনের পব দিন, তাহারা ত ঐ সকল বিগত দিনের ভিতর দিয়া এইখানেই রহিয়া গেল ; তাহাদের কতটুকু যাইতে পারিবে ইহাদের ফেলিয়া ?

সমস্ত নয়ানজোড় যেন আজ ম্লান মুখে স্বধার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সজীব নির্জীব সচল অচল সকলের মুখে স্বধার মনের বেদনার ছায়াই ম্লানিমা আনন্দ দিয়াছে। ইহারা যে স্বধার পবম আত্মীয়। কলিকাতার সৌধমালা ও তাহার স্তম্ভ অধিবাসীবা কি নয়ানজোড়ের মত এই পল্লীবাসিনী ছোট্ট স্বধাকে আপনার বলিয়া বুকের ভিতর টানিয়া লইবে ?

স্বধা বলিল, “মজা ত ভারি ? ওখানকার আমরা কিছু জানি না, সবাই আমাদের পাড়াগেয়ে বলবে। তুই ভাই সাবধান, লোকের সামনে যা-তা বলে বসিস না। লেকে যদি শোনে যে আমিও তোর সঙ্গে ডাঙাগুলি খেলি আর কোমর বেঁধে গাছে উঠি তাহলে কিন্তু শহরের মেয়েরা ভয়ানক হাসবে।”

শিব বুদ্ধ অল্পট্ট দেখাইয়া বলিল, “হাসল ত বয়েই গেল। যারা ডাঙাগুলি খেলতে আর গাছে উঠতে পারে না তার ত ভারি মেয়ে, তা আবার পরকে দেখে হাসবে।”

কিন্তু স্বধা বুঝিয়াছিল যে শিব বাহাই বলুক, তাহা হইবে বীরশ্রুতি শহরের নারীশ্রেণীর কাছে গৌরবের জিনিষ নয়। তাহাদের অতিপ্রিয় খেলাগুলি তাহাদের নিজেদের যতই মনোহরণ করুক, বাহিরের লোকের চোখের কাছে চাড় করাইয়া সেগুলিকে পরের হাসির ও অবজ্ঞার বাণে বিদ্ধ করিতে সে পারিবে না। স্বধা ও শিব ছেলেখেলায়

এই নয়ানজোড়েই শেষ করিয়া যাইতে হইবে। শিব ছেলেমানুষ, হয়ত আবার নতুন খেলায় মাতিবে, কিন্তু স্বধার শৈশব তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য লইয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিবে। অসুখ্যম্পত্তা কুলবধুর মত সে শৈশব নিজের পরিচিত গম্ভীর বাহিরে অমধ্যমার ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই সমস্ত নয়ানজোড় জুড়িয়া দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া তাহার শৈশব ধূলি-মাটি-জলে যে স্বর্গ তিলে তিলে রচনা করিয়াছে তাহা যে এখানে অতলম্পর্শ শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে, তাহাকে টানিয়া তোলা ত যায় না। এই যে ঘরের জানালার ধারে সবুজ ঘাসের মাঠ এ কি শুধু মাঠ ? এ ত রত্নাকর অনন্ত জলধি, ওই জানালায় বসিয়া একটা ভাঙা ঘড়ির স্প্রিং লইয়া এই মহাসমুদ্র হইতে স্বধা ও শিব কত রাশি রাশি নীলকান্ত মণি ও পদ্মরাগ মণি তুলিয়া ঘব বোঝাই করিয়াছে। কলিকাতার কেহ কি একথা বিশ্বাস করিবে ? তাহারা শুনিবে স্বধাদের পাগল গারদের পথ দেখাইয়া দিবে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহাদের মনেব চোখ নাই তাহারা ই অপরকে পাগল ভাবে। এই চোখের দৃষ্টি স্বধাই তাহারা ই ফেলিবে এখান হইতে চলিয়া গেলে। সে কি আর কলিকাতায় গিয়া জানালার ধারে এই ঐশ্বর্যশালী মহাসমুদ্রকে কোনও দিন খুঁজিয়া পাইবে ?

স্বধা বলিল, “সেখানে ত আমরা আলাদা আলাদা ইচ্ছা ভেঁটি হব। তুই আর আমি একলা আর কখন খেলব ভাই ? আমাদের সব খেলা নষ্ট হয়ে যাবে। অজ্ঞদের সঙ্গে ত আর এসব খেলা হবে না। গল্পগুলো যে আমবা চালা-ছিলাম তার কি হবে ? বিক্রম চন্দ্রের সবাইকার কথা ত একেবারে শেষ করে দিতে হবে ? এখনও ওদের কত গল্প বাকি, ওরা ত মোটে বুড়ো হতে পেল না, আগেই সব ফুরিয়ে যাবে ?”

বেপরোয়া ভাবে শিব বলিল, “তাতে কি ? তেমন ক’বে শেষ করব না। যত ভাল ভাল জিনিষ আছে, সোনার বাড়ী, রূপোর বরণা, যেত হস্তী, গজমোতি, সব ওরা রোজ পেতে লাগল, এই রকম ক’রে শেষ করব।”

স্বধা হঠাৎ স্বধা বলিল, “তাহলেও আমরা ত ওদের ভুলে যাব। আমরা ত ওদের আব বড় করব না, সাজাব না, কিছু না।”

উপায় নাই। সে দুঃখ মানিয়া লইতেই হইবে। শিবু তাহাতে দমিবে না।

এই বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বর স্বধা ও শিবুর মানস পুত্র। ঐ স্ববিত্তীর্ণ ধানক্ষেতের ধারে আমগাছতলায় কালো পাথরের চিবির উপর তাহাদের দুই জনের প্রকাণ্ড দুই রাজ্য। চোখে দেখিতে ঐ পাথরের চিবিটা মাত্র, কিন্তু সে রাজ্য এত বড় যে মাপিয়া শেষ করা যায় না। ধনে ধান্যে ঐখানে রাজ্য উচ্ছলিয়া পড়িতেছে। বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বরের অপসার মত স্তন্দরী বাণী, অশোকবনের চেড়ীর মত ভয়ঙ্করী দাসী, ভীমের মত বল-শালী সেনাপতি, অর্জুনের মত রূপগুণবান পুত্র, কিছুই অভাব নাই। স্বধা ও শিবু এই দুই রাজ্যের বিধাতা। তাহাদের আশীর্বাদে বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বরের ধন সম্পদ অর্থ সামর্থ্য সকলই না-চাহিতে বরিয়া পড়ে। কিন্তু তাহাদের জীবনধারা মহাভারতের যুগেই আবদ্ধ নয়। স্বধা ও শিবু অনন্তরূপে আধুনিক যুগে বিচরণ করিবার বরও তাহাদের দিয়াছে। তাহারা ইচ্ছা করিলে পুষ্পক বথে চড়ে, ইচ্ছা করিলে মোটর ইঁকাইতেও পারে। অতীত ও বর্তমান পৃথিবীর কোনও স্থান হইতে ইহাদের বঞ্চিত হইতে স্বধারা দেয় নাই। ‘অসম্ভব’ বলিয়া কথা তাহাদের জীবনে নাই। কেবল একটি জিনিষ স্বধা ও শিবু তাহাদের দ্বিতে চায় না, নগ্নানজোড়ের এই বাস্তব মানুষগুলার কাছে স্বধারা উহাদের বাহির হইতে দেয় না। উহারা দুই ভাইবোন ছাড়া পাছে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি বিক্রমদের কথা শুনিয়াও ফেলে, তাই বিক্রম-চন্দ্রেশ্বরের রাজ্যের ভাষা বাংলা ভাষা নয়। সে নৃতন ভাষা স্বধারাই গড়িয়া দিয়াছে। কত সময় আর পাঁচ জনের কাছে এই ভাষা বলিয়া ফেলিয়া স্বধারা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রক্ষা যে, কি কথা হইতেছে বাহিরের পাঁচজন তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। স্বধারা চুপি চুপি এ-রাজ্যে প্রবেশ করে, চুপি চুপি কিরিয়া আসে, কেহ জানিতে পারে না। কাব্যে সঙ্গীতে রূপে সে দেশ বলমূল করিতেছে। কিন্তু নগ্নানজোড়ের এই নিদ্রিত আমতলা ছাড়িয়া কলিকাতার কলকোলাহলের ভিতর এ-রাজ্য কি আব প্রতিষ্ঠিত হইতে পাইবে? বিক্রম ও চন্দ্রেশ্বর খেয়াল হইলে আধুনিকতা করে বটে; কিন্তু কলিকাতার ভীড়ের ভিতর উগ্র সভ্যতার মাঝখানে তাহারা

নৃতন রাজ্য গড়িতে চাহিবে না। এই বিপুল বৈভব সমেত তাহাদের রাজ্য দুটি এইখানেই ফেলিয়া স্বধাদের চলিয়া যাইতে হইবে মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে। এই পড়াগায়ে স্বধা শিবুদের অনাদরে অম্বল তাহারা একদিন নিশেষে ইহলোক হইতে ঝরিয়া যাইবে। তাহাদের ভাগ্যবিধাতারাও সেদিন তাহাদের জন্ত আর শোক করিতে আসিব না।

স্বধা মনে কবিতাছিল, মাঠে ঘাটে শিবুর সঙ্গে খেলা কবিতা সে তাহার নবজাগৃত বিরহব্যথাকে তুলিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহা হইল না, খেলার ভিতরও সকল কথা ঐ ব্যথার স্থানটিকেই ছুঁইয়া যায়। ইহার চেয়ে বাড়ী যাওয়াই ভাল। মনটা ত কোথায়ও স্থির হইতেছে না। অস্বস্থতা মাঝখানেও মা’র কাজকর্ম ব্যবহারের ভিতর যে একটা অক্ষল শান্তি ব্রী আছে তাহার কাছে বসিলেও অস্ত্রব মন শস্ত হয়।

ছোট খোকা এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যা নিশ্চয় বসন্তপ্রকাশিত তাহার হেঁড়া বস্ত্রি গ্রন্থবলীটি লইয়া মেঝের উপর পা ছড়াইয়া পড়িতে বসিয়াছেন। দেবীচৌধুরাণী ও বিষবৃক্ষের গল্প তের-চৌদ্দবার তাহার পড়া হইয়া গিয়াছে, স্বধারাই ত তিন-চার বার শুনিয়াছে, তবু এখনও প্রত্যহ দুপুরে সেই বইখানা লইয়া বসিতে মা’র অভ্যুত্তি নাই। কাছে বসিলেই মা “ও পি, পি, লক্ষ্মণ পোড়াব যুধী,” কিংবা দিবা ও নিশার গল্প পড়িয়া শুনাইতে রাজি। পিসিমা মেঝের উপরেই জাঁচল বিছাইয়া শুধু মাথাটুকু তাহার উপর রাখিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সারাদিনের পরিশ্রমের পর একবার শুইলে তাহার চোখে ঘুম নামিতে দেবী হয় না।

৯

যাত্রার আয়োজন চলিতেছে। চরকাঁছ কলিকাতায় আর একটু বেশী মাহিনায় একটা ইন্সুলেরই কাম্ব পাইয়াছেন। তাই নগ্নানজোড়ের ঘববাড়ী হৈমবতী ও ফাঙ্কর ভরসায় রাখিয়া দিয়া তাহারা কলিকাতা ঘাওয়াই স্থির করিয়াছেন।

মহামায়া বলিয়াছিলেন, “দেখ, ঠাকুরঝিও বলছেন, আমারও মনে হয় এই সামান্য আয়ে কলিকাতায় গিবে আমাদের টানাটানিতে পড়তে হবে, এখানেও দেখাশুনোর

অভাবে আশ ক'মে যাবে। তার চেয়ে এখানেই একরকম ক'রে চ'লে যেত। নাইবা গেলাম ?”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “এমনিতেই তোমার চিকিৎসা-ক-দু-আড়াই বছর দেবী হয়ে গেল, আর যদি দেবী ক'র তাহলে আমার নিজের উপর সমস্ত শ্রদ্ধা চ'লে যাবে। খানিকটা আলস্য আর খানিকটা অভাবে যেটা হয়েছে তার প্রতিকার যেটুকু হাতে আছে না ক'রে ছাড়তে আমি পারব না। অনিশ্চিত মন্দ আশঙ্কায় নিশ্চিত ভাল চেষ্টাটা ছাড়া উচিত নয়।”

মহামায়া কিছু বলিলেন না, রোগ সারিতেছে না বলিয়া সর্বপ্রথমে তিনিই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই ভ্রম মনে মনে নিজেকে স্বামীর ও সংসারের নিকট অপরাধী ভাবিয়া নীরবেই রহিলেন।

পুরাতন ঝি চাকরদের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। করুণা ঝি মহামায়ার দুই ছেলেমেয়েকেই মানুষ করিয়াছিল। খোকারও অনেক কাজ সে করে। তবে মহামায়ার শরীরে অল্পস্থ হওয়াতে সংসারের কাজে ও তাঁহার সেবার অনেক সময় তাহার চলিয়া যায়। এখন তাহাকে ঠিক ছেসের-ঝি আর বলা চলে না।

স্বধাকে সে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসিত। স্বধাকে ছাড়িয়া সে থাকিবে কেমন করিয়া? কলিকাতা যাত্রার কষ্ট শুনিয়াই সে বলিল, “স্বধা রাণী, রাডা বব এসে তোমায় পাখী ক'রে নিষে চ'লে যাবে আর ইদুরমাটিতে তোমার পা-দুখানির ছাপ নিয়ে আমরা চোখের জল ফেলব, এই কথা ভেবে আমার বুকেটা দুক দুক করত, কে জানত তার আগেই তুমি এমন ক'রে চ'লে যাবে। এত রতনজোড় নয় যে গরুবগাড়ীতে যাব, তেঁতুলডাঙা নয় যে সাত কোশ ইঁটব। কলকাতার রাস্তা আমি জন্মে চিনি না, রেলগাড়ীকে বড় ভবাই।”

শিবু পিছন হইতে গান করিয়া উঠিল,

“কলগাড়ী বাতাসে নড়ে না,”

মহামায়া বলিলেন, “কলগাড়ী যাতেই নড়ুক, তুই অকারণে মানুষকে জ্বালাতন করিস নে।”

শিবু বলিল, “করুণা দিদি এইবার রোজ প্রাণভরে যুগাক ধাঁদার চরণায়ত খেতে পারবে, আর ত বাবা তাকে বকতে আসবেন না।”

করুণা বলিল, “পৈতে হ'লে তোমারই চম্ভামিত খেতাম দাদা, তা ত তুমি হতে দিলে না। এত বড় বাস্তব-সন্তান কোথায় পেতাম ?”

শিবু বলিল, “তুমি না আমার ভিক্ষে-মা হবে বলেছিলে, তবে আবার চম্ভামিত খেতে কি ক'রে ছেলের পায়ের ?”

করুণা বলিল, “আমি গরীব তাঁতির মেয়ে, আমার কি ধনদৌলত আছে দাদা, যে এমন সাধ পূর্ণ করব ?”

মহামায়া বলিলেন, “সাধ ত একদিকে পুরেইছে, ছেলেকে মা বলাতে পারলে না, কিন্তু মেয়ে ত আমাব ভোগায় মা'র বাড়ী ক'রে তুলেছে।”

শিবু বলিল, “দিদি যা বোকা, এখনও থেকে থেকে করুণাদিদিকে মা ব'লে বসে।”

বাস্তবিকই সুধার করুণা সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা ছিল। এই ধর্মাক্রান্ত শীর্ণকায়্য তান্ত্রবর্ণী বরুণার স্বল্পবাস মূর্তি সুধার আজন্ম-পরিচিত বলিয়া কিনা জানি না মাতৃমূর্তিরই একটি ছায়া বলিয়া মনে হইত। শিশুকালে করুণার হাতে ছাড়া আর কাহারও হাতে সে থাইতে চাহিত না। একদিনের জন্ত করুণা বাড়ী যাইতে চাহিলে মহামায়ার ভাবনা হইত, ‘মেয়েটা বুঝি না খেয়েই মারা যাবে।’ হৈমবতীর হাতেব ভাতের গ্রাস ঠেলিয়া দিলে তিনি রাগিয়া বলিলেন, “মেয়ের তোমাব পছন্দকে বলিহারি বলি বউ, না রইল পিসি রইল পণ্ডে, ঐ করুণী তাঁতিবুড়ীর হাতে ছাড়া তাঁর মুখে অন্ন রোচে না।”

শুনিয়া মহামায়া বলিলেন, “কি করব, একেই ওটার পাওয়া কম, তার উপর বামনাই কলিয়ে ওকে ত শুকিয়ে নাখতে পারি না। ওর যা রোচে তাই থাক গে।”

হৈমবতী বলিলেন, “রুচি না আরও কিছু! সব ওই তাঁতিমাসীর বজ্জাতি। চাকরি বজায় রাখবার জন্তে মেয়েটাকে বশ করেছে। আমি হ'লে দু-দিন উপোষ দিয়েও ও বদ্ব্যয় ছাড়াতাম।”

এই তর্কাতর্কি শুনিয়া সুধা নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জা পাইত, কিন্তু তবু করুণার মায়া কাটাইতে পারিত না। বেচারী করুণা তাহার মুখে মা ডাক শুনিতে ভালবাসিত বুঝিয়াই সুধা বড় হইয়াও কত সময় লুকাইয়া তাহাকে ‘মা’

বলিয়া ডাকিয়াছে। এই জন্ত যুগাক-দাদা তাকে কত ক্ষেপাইত।

করুণা বলিল, “মা, সংসারে আর আমার মায়া নেই। ছেলে বল, মেয়ে বল, সবাই টাকার বশ। টাকা না দিতে পারলে ছেলেও মুখে লাথি মারবে। তাদের অচ্ছেদ্য ভাত আমি খেতে চাই নে। তোমার ভাত এতদিন খেলাম, বাকি ক’টা দিনও যদি খেতে পেতাম তার কি ব্যবস্থা হয় না?”

মহামায়া বলিলেন, “সেখানে দুখানা আট হাত দশ হাত ঘর বাছা, তার ভেতর তোকে নিয়ে আমি-কোথায় রাখব? আপনি পাশ ফিরতে জ্বালা পাব না, পবকে দুখ দিতে নিয়ে যাব কেন?”

করুণা বলিল, “আহা, তবে কেন মা এ সোনার সংসার ছেড়ে সীতের বনবাসে যাচ্ছ?”

শিবু শুনিয়া বলিল, “মা, আমি তোমার জন্তে সাত মহলা বাড়ী ক’রে দেব। দুখানা ঘরে তুমি কখনো থাকবে না। তুমি ঘরজোড়া খাটে যত খুশী পাশ ফিরবে।”

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, “টাকা কোথায় পাবি রে?”

শিবু বলিল, “কেন? হাটে নোট ভাঁজতে দেব। করুণা দিদি টাকা নিয়ে আসবে।”

সুধা বলিল, “আর নোটগুলো কি গাছ থেকে পড়বে?”

শিবু হার মানিবার ছেলে নয়। সে বলিল, “ও, ভারি ত নোট, অমন আমি ঢের বানাতে পারি।”

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন “তবেই হয়েছে। একেবারে সাতমহলে মায়ে পোয়ে বন্দী হব।”

দুপুর বেলা পুরানো পাড়ের রঙীন স্ত্রী তুলিয়া হৈমবতী বুড়া আঙুলে বাঁধিয়া পাক দিতেছিলেন। গল্পের শব্দ পাইয়া কাছে আসিয়া হৈমবতী বলিলেন, “বাসা বাড়ী কি আর বাড়ী? পরের কাছে হাত জোড় ক’রে থাকা! এ বলছে দূর দূর উঠে যেতে হবে, সে বলছে দূর দূর উঠে যেতে হবে। মাল্লের মান সম্বন্ধ থাকে না ওতে। আমি আব কি বলব বল? আমার কথায় ত কেউ চলবে না? স্থখ থাকতে সব ভূতে কিলোচ্ছে।”

মহামায়া ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, “আদত দোষ ত আমার ঠাকুরঝি! তুমি অকারণ অশ্রুর উপর রাগ করছ কেন?”

মা যে কোনও বিষয়ে দোষ করিতে পারেন একথা মা’র মুখে শুনিয়াও শিবুর বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত মানহানি হইত সে রাগিয়া বলিল, “মা, তুমি কিছুই জান না। অস্থ-করলে কখনও কারুর দোষ হতে পারে না।”

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, “সে টুকুন বুঝি বাছা! কিন্তু আমারই জন্তে যে সমস্ত সংসারটা ওলটপালট হতে চলল এটা কি আর দোষের চেয়ে ছোট কথা?”

হৈমবতী বলিলেন, “ধাক্কা, ছেলেপিলের কাছে বাশ মায়ের দোষগুণ বিচার করতে হবে না। ওরা কচিকাঁচ, অত-কথার মানে কি জানে? যা, তোরা যা দিখি, আপন চরকায় তেল দিগে যা।”

শিবু বলিল, “ও বুঝতে পেরেছি, আমি চ’লে গেলেই মাকে বুঝি তুমি বকবে?”

পিসিমা ধমক দিয়া বলিলেন, “বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপারা চক্কর, উনি এলেন আমায় শাসন কবতে। কে কার নাড়ী কেটেছিল রে?”

এবার আর শিবুর সাহসে কুলাইল না। সে সেখান হইতে এক দৌড় দিয়া আমবাগানে পলাইল। গাছে কচি কচি আম ধরিয়াছে, যদি কিছু দুপুরবেলা একেলার জন্ত সংগ্রহ করা যায়।

হৈমবতী ও মহামায়া বরুণাকে লইয়া সিঁচুক খুন্দিয়া বাসন বাছিতে বসিলেন। হাঙ্কা দেখিয়া কাঁসা-পিতলের কিছু বাসন কলিকাতা লইয়া যাইতে হইবে। যে সন্ধ্যা বাসনের সঙ্গে তাঁহার মা-ঠাকুরমার স্মৃতি জড়িত, সেগুলি হৈমবতী সযত্নে আলাদা করিয়া রাখিলেন, “এ সব সত কালের জিনিষ বাসাবাড়ীতে নিবে গিবে কাজ নেই, কে কোথায় ভেঙে ছড়িয়ে নষ্ট করবে।”

নন্দ সম্পর্কে ত বড়ই, বয়সেও অনেক বড়, কাজেই মহামায়া তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলিতেন। হৈমবতী যাহা বাছিয়া দিলেন মহামায়া তাহাই করুণার হাতে দিয়া নিজের ঘবে পাঠাইলেন। নিজের পছন্দ ও মতামত প্রকাশ করিলেন না।

পাড়াগাঁয়ে কাঠের বাস পাওয়া যায় না, ছোটবড়

ঝুড়িতে বাসনকোশন বসাইয়া কাপড়ে বাঁধা হইল। মহামায়াব টিনের ট্রাকে স্খা ও শিবুর সামান্য কাপড়চোপড় কাচিয়া কুচিয়া তোলা হইল। শহরে দেশে কাপড়-চোপড় যে বেশী লাগে এবিষয়ে মা ও পিসিমা-ব গল্প শুনিয়াই স্খা কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহঁর আটপৌরে চারখানা শাড়ীর উপর আব মাত্র দুখানা ডুরে ও দুখানা নীলাশ্বরী শাড়ী। একবার পিসিমা সখ করিয়া একখানা গুলবাহার শাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলেন, সেইখান-ই একমাত্র জমকালো শাড়ী। দাদামহাশয় তিন বৎসর আগে যে চন্দ্রকোণাব চৌখুপী শাড়ী দিয়াছিলেন সেখানা স্খার ছোট হইয়া গিয়াছে। এই পাঁচখানা তোলা কাপড়ে শহরে স্খাব মান থাকিবে কিনা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। তবে মা'ব চেয়ে ত স্খার মান বেশী নয়। মাও ত পাঁচ-ছয়খানা মাত্র ভাল কাপড় লইয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনেই চলিয়াছেন। তাঁতিনীরা শহবে কি আর কাপড় বেচিতে আসে না? পূজার সময় ব্যাপারীরা কলিকাতাতেও নিশ্চয় যায়। তাহাদের কাছে দুই-একখানা ডুরে কি চেনি মা দবকাব বুঝিলে ঠিক কিনিয়া দিবেন। এ সামান্য জিনিষ লইয়া মাখা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

হৈমবতী সখাকালে এবং পরেও কিছুদিন কলিকাতা শহবে ছিলেন। স্খার কাপড়চোপড় গুলাইবার সময় তিনি বলিলেন, “দেখ বৌ, শহরে সব বাগ্‌রার উপর শাড়ী বেজিয়ে পবে, তাতে আবার সেপ্‌টিপিন। তোমাদের ত বাগ্‌বাও নেই, সেপ্‌টিপিনও নেই, লোকের কাছে খেলো হবে না ত।”

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, “দু-গজ কাপড় কিনে স্খার জন্মে বাগ্‌রা ক'রে দিলেই হবে। আমার হুড়ো বসে ও-সবে কাজ নেই।”

হৈমবতী বলিলেন, “তবে এইখানেই ক'বে দাও না। একেবারে প'বে বাবে, নইলে সেখানে পরের দেশে শেখার নাম হবে। আর ঐ লোহার সেপ্‌টিপিনগুলো যেন মেয়েকে পবিও না। একটা সোনাব ক'রে দিও।”

মহামায়া বলিলেন, “আমাদের ছোট বউ বলছিল যে সেখানে পাশি মাকড়ি পরাব রেওয়াজ এখন আর নেই, এখন সব বল ইয়ারিং পরে। স্খাব মাকড়ি জোড়া ভারি আছে, ভেঙে ঢুল আব সেপ্‌টিপিন দুই হবে এখন।”

দু-গজ মার্কিন কাপড় কেনা হইল। কিন্তু মা ও পিসিমা দুইজনেই আধুনিক পরিচ্ছদ সন্ধান প্রায় অজ্ঞ। সেপ্‌টিকোট্টা বাগ্‌রার সঙ্গে কোন্‌খানে স্বতন্ত্র তাহা তাঁহাদের জানা নাই। কিন্তু ঐ সামান্য ব্যাপারে হৈমবতী ভীত হন না, তিনি কাপড়ের টুকরাটার দুই মুখ জুড়িয়া পাশ বালিশের খোলের মত সেলাই করিয়া একটা কাপড়ের পাড় পবাইয়া কার্য সমাধা কবিলেন। এই হইল স্খার আধুনিক সজ্জায় হাতে ঝড়ি। তবে আপাততঃ লোহার সেপ্‌টিপিনই পবিতে হইল, কারণ নয়ানজোড়ে তখন জাপানী গিণ্টির ব্রোচ পাওয়া বাইত না।

সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে মহামায়া ভষে ভয়ে বলিলেন, “আমাদের ত সব ব্যবস্থাই হ'ল; কিন্তু ঠাকুবাবি এই পাড়াগাঁয়েব দেশে ঐ ছেলেটাকে সখল ক'রে পড়ে থাকবেন, এইতেই যা ভাবনা।”

হৈমবতীর দর্পে ঘা লাগিল। তিনি যেন জলিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আনন্দি বামুনীর মেয়ে হেমি বামুনী ভ্রম ডর কাউকে কবে না। আমার মা ডাকাতের মুখে জুন্‌ডো ঠেসে দিয়াছিলেন, আমার ঠাকুমা বগাঁব হ্যাঙ্কামেব সময় সারা গায়ে একলা ছিলেন, আতুড়ের ছেলে নিষে। গাছ পালিয়ে গিষেছিল, এক ঘটি জল দেবার লোক ছিল না, তবু তিনি ভয় পান নি।”

মা-ঠাকুরমার শৌর্যে হৈমবতী আপনাব বর্ষ গড়িতে চাহিলেও তাঁহার চোখেব কোণটা হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ কিরাইয়া আপনাকে সামলাইয়া লইলেন।

কথা ঘুরাইয়া মহামায়া বলিলেন, “তোমার সাহসেব কথা কি আর জানি না ভাই? তার কথা হচ্ছে না। অস্থখ-বিস্থখের উপর ত মাছষেব হাত নেই, সেই ভাবনাটাই আসল।”

হৈমবতী বলিলেন, “তোমরা নিজেরদের সামলিও তাহলেই আমার অনেক উপকার হবে। আর ভাবনার কোনও কাবণ নেই।”

মহামায়া হৈমবতীব দুর্জয় অভিমানের পূর্বাভাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নন্দনের কাছে ভাবপ্রবণতা প্রকাশ

করিবার সাহস তাঁহার ছিল না ; তিনি কোনও রকম দবদ দেখাইবার চেষ্টা করিলেন না, চুপ করিয়াই রহিলেন।

শাল ফুলের মধুর গন্ধে সমস্ত নয়ানজোড় ভরিয়া উঠিয়াছে, শিরীষ ফুল গাছ ভরিয়া যেন আকাশেব দেবতাব গায়ে চামর দোলাইতেছে, পলাশের বগে বন আলো হইয়া উঠিয়াছে ; এমনই দিনে হৈমবতীর দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারই হাতে ঘবঘার সঁপিয়া চন্দ্রকান্ত জী পুত্র কণ্ঠা লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। সেই লখা মাঝির খড়পাতা গরুর গাড়ী, সেই বনের ভিত্তব রাঙা সিঁথির মত পথ, পথে আনন্দসহরী লইয়া বৈষ্ণব ভিক্কু গান করিতেছে “নিতাই আমার গৌর।”

মহামায়া আঁচলে আজও হৈমবতী সিঁথুর-কোটা বাঁধিয়া দিলেন, সুধাদের জন্ত দিলেন কদমা ও টানালাডু ; কিন্তু এবার

ত বতনজোড়ে আমার বাড়ী যাওয়া নয়, যন্ত্রবন্তে আশাষ এ দূর ষ্টেশনের পথে যাত্রা। ঘরঘার, গবাই: মুকুর, ঘবের আসবাব, রান্নাঘরের শিলনোড়া ষাতা সবই যেন পিছন হইতে ডাক দিতেছে,—শিবু, সুধা, ফিরে এস।

শিবু হাসিয়া সুধা কান্দিয়া তাহাদের ফেলিয়া চলিয়া গেল। পলাশের রঙে আলো বস্ত্রপথে শিবুর হাতচটুল কণ্ঠের গান পিছনে রণিত হইতে লাগিল,

“জাম ফুল নাই ঘরে,

ছোটো ভালুক হুকুর হুকুর হবে।”

মহামায়া বলিলেন, “আর এদেশে ওদা করব না ; যেখানে যাব সেইখানেই খুঁটি গড়ে বসব। কেবল গড়া আর ভাঙা, গড়া আর ভাঙা, মন এতে সায় দো না।”

(ক্রমশঃ)

ওমরের প্রতি

শ্রীশ্রীলকুমার মজুমদার

হে কবি তোমার গানে যে ক্রন্দন-স্বর
রশ্মি রশ্মি উঠি করিছে বিধুব
উভলা মানবহৃদি—কোথা তা'র মূল
নাহি জানি মোরা আজি ; বিরহ-ব্যাকুল
তোমার মানসপটে ভাসে কার ছবি,
পারস্তের কোন্ দূর দিনাস্তের রবি
রঞ্জিত করিল বিশ্ব গোধূলি-আভাষ,
বিশ্বতির তমোগর্ভে তা'বা লুপ্ত, হায় !

জানি শুধু দেবরোষে স্নান, ছিন্নদল
লুপ্তিত ধরণীবক্ষে সৌন্দর্য-কমল ;
একে একে দল তা'ব করিয়া চমন,
সিক্ত করি অশ্রুনিরে, করেছ বমন
একখানি প্রেমহাব মর্ষস্বতি ঢালা ;
স্বরভি করিছে বিশ্ব কবিগীথা মালা।

ইরাণের উপবনে কোন্ সে তরুণী
নিরেছিল নিখিলের সব ধন লুটি,
হাস্তে কা'র পুষ্পশোভা উঠেছিল ফুটি
মুখর মঞ্জীব কা'র ছন্দে তব স্তনি ;
নিবিড় প্রেমের জাল দিয়েছিল বুনি
বিভোল পরাণে তব কা'ব আঁখি ছুটি,—
কাহার বিরহে কবি বক্ষ তব টুটি
বস্ত্রাধারা উঠে জাগি—জানি ওগো গুণী।

মানসস্বন্দরী সে যে, অতুল্য ভাবিনী ;
অস্তুর বাহিরে তার মিলে না সঙ্কান,
সীমার বন্ধনে-কতু দেয় না সে ধরা
কতু কানে পশে না যে তাহাব কি ঙ্গণী
আঁখি কতু দেখে নাই সে রূপ-বিতান—
তাই বুঝি গান তব মর্ষলোরে ভরা।

বর্ষামঙ্গল

পূর্ণিমা স্তব

সমুৎপত্তস্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি স্বাতজ্জুতানি সন্তঃ।
মহাঋতস্ত নদতো নভস্বতো স্বাশাঃ আপঃ পৃথিবীং তর্পরন্তঃ।
মেঘবায়ুময় দিকসকল একত্র হইয়া উৎপত্তি হউক, বাতপ্রেরিত
মেঘসকল ঘন নিবিড় হইয়া উঠুক, গর্জ্জনরত মহাবৃষভের নিনাদেব
মতো নদিত হইয়া মেঘসমূহের ধাবা পৃথিবীকে ভৃগু করুক।
সমীকবষ গায়তো নভাস্ত্রপাং রেগাসঃ পৃথগ্ উদ্ভিষন্তাম্
বর্ষস্ত সর্গা মহরন্ত ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তাম্ স্বীকথো ব্রিষকপাঃ।
(হে মরুদগণ) গানবত আমাদের নবনে মেঘাভবব আজ
প্রত্যাক করাও। ধাবাস্রোতের বেগ আজ নানা দিকে উচ্ছলিত
হইয়া ধাবিত হউক। উচ্ছ্বাসের পব বর্ষণের উচ্ছ্বাস আজ পৃথিবীকে
মহনীর করুক। বিষকপ বীকথসকল আজ নানা বিচিত্ররূপে
আবির্ভূত হউক।

উদীরবত মরুতঃ সমুদ্রতস্
স্বো বো অর্কো নভ উ.পাতয়াধ।
মহাঋতস্ত নদতো নভস্বতো
স্বাশা আপঃ পৃথিবীং তর্পরন্তঃ।

হে মরুদগণ, সমুদ্র হইতে (মেঘসকলকে) উর্দ্ধে প্রেরণ করো,
দীপ্তিমং জলময় মেঘসকলকে উর্দ্ধে প্রেরণ কর। গর্জ্জনরত
মহাঋতের নিনাদেব ন্যায় নদিত হইয়া মেঘসমূহের ধাবা
পৃথিবীকে-ভৃগু করুক।

সঃ বোহন্তঃ স্ত্রধানর উৎসা অজগরা উত।
মরুন্তিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্ত পৃথিবীমহু।

উদারধাবা উৎসসকল অজগব সর্পের মতো দিকে-দিকে ধাবিত
হইয়া তোমাদের সম্ভৃগু করুক। মরুদগণ কর্তৃক প্রচ্যুত মেঘসকল
পৃথিবীর-উপব-বর্ষণ করুক।

মহান্তঃ কোশমুদচাভিসিক্ সবিদ্যন্তঃ ভবতু স্বাত্ স্বাতঃ।
তস্বতাং যজ্ঞঃ বহুধা ব্রিস্বষ্টা আনন্দিনীদোষধরো ভবন্তঃ।

হে পূর্ণিমা, (সমুদ্র হইতে) তুমি মহা জল সঞ্চয়কে উত্তোলিত
কর। (বিষ) অভিবিক্ত কর, বিদ্যাতে বিদ্যাতে ও বজ্রায় আকাশ
হইয়া বেল। দিকে দিকে প্রভূতভাবে মুক্ত জলধারা যজ্ঞকে বিস্তার
করুক। ওষধিসমূহ আনন্দিত হইয়া উঠুক।

গান*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চলে ছলছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়
কিনারায় কিনারায়।
ওকে মেঘের ডাকে ডাকিল সুদূরে
আয় আয় আয়।
কূলে প্রফুল্ল বকুল বন
ওকে করিছে আবাহন,
কোথা দূরে বেণুবন গায়—
আয় আয় আয়।
ভীরে ভীরে সখি,
ঐ যে উঠে নবীন খান্ধ পুলকি।

* এই লেখাগুলি কবিতা নয় এগুলি গান পাঠসভায় এদের স্থান নয়, গীতসভায়
এদের আবাহন; সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো-নেভা প্রদীপের মতো ॥ রবীন্দ্রনাথ

কাশের বনে বনে
ছলিছে ক্ষণে ক্ষণে
গাহিছে সজল বায়—

আয় আয় আয় ।

আঁধার অন্ধরে প্রচণ্ড ডম্বর
বাজিল গম্ভীর গরজনে ।
অশথ পল্লবে অশাস্ত হিলোল
সমীর-চঞ্চল দিগজনে ।
নদীর কল্লোল, বনের মর্মর
বাদল-উচ্ছল নির্ঝর ঝঝর
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে,
শ্রাবণ সন্ন্যাসী রচিল রাগিনী ।
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধ মদিরা
অজস্র লুঠিছে ছরস্তু ঝটিকা ।
তড়িৎ শিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া,
ভস্মার্ত্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া,
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব
মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া ॥

ঐ মালতীলতা দোলে দোলে,
পিয়াল তরুর কোলে
পূব হাওয়াতে ।
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা
ফিরি আপন ভোলা,—
মোর ভাবনা কোথায় হারা
মেঘের মতন যায় চলে ॥
জানি নে কোথায় জাগে
ওগো বন্ধু পরবাসী
কোন্ নিভৃত বাতায়নে ।
সেধা নিশীথের জলভরা কণ্ঠে
কোন বিরহিণীর বাণী
তোমাতে কী যায় বলে ॥

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ-উৎসব



বৃক্ষরোপণ-উৎসবে আশ্রমবালিকাগণ মঙ্গলশঙ্খ ও মাঙ্গল্যাদ্রকাদি বহন করিয়া উৎসবস্থলে চলিয়াছেন
[শ্রীজ্যোৎস্না চক্রবর্তী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]



উপরে : বৃক্ষরোপণ ও জলাশয়প্রতিষ্ঠা উৎসবে রবীন্দ্রনাথ
নীচে : মান্দল্যদ্রব্যবাহিনী আশ্রমবালিকাগণ

আসীন : পণ্ডিত শ্রীক্ষিত্তিমোহন সেন মন্ত্রপাঠ করিতেছেন
চতুর্দোলায় বাহিত তরুশিশু

[শ্রীজ্যোৎস্না চক্রবর্তী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ]

I - - পা পা । পা পধা যা মা I পা পা পা ধা । না না সী - I
 ০ ০ সে থা নি শি০ থে র জ ল ভ রা ক নু ঠে ০

I - - - - । সী -রী -সী সী I সী -পা পা পা । গুধা - পা - I
 ০ ০ ০ ০ কো নু বি -র হি ০ গী র বা ০ গী ০

I পা ধা পা - । পধা - পা পা I মা -পা যা - । জা রা সা - II II
 তো মা রে ০ কি ০ যা য় ব ০ লে ০ ০ ০ "ঐ" ০

[বর্ষামঙ্গলের অপর দুইটি পাদের স্বরলিপি এখানে প্রকাশিত হইবে।]

জলোৎসর্গ

জল-প্রশস্তি : বৈদিক

আপো হি ঠা ময়োভুবন্তা ন উর্ধ্বে দধাতন ।

মহে রণায় চক্ষসে ।

হে জল যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদেরকে
 অন্নলাভের যোগ্য কর, মহৎ ও মনসীয়ে দৃষ্টিলাভের যোগ্য কর ।

বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীন্

আপো অস্মান্ মাতরঃ স্তন্থয়ন্ত ।

সর্ববিধ দোষ ও মালিন্যদূরকারী এই জল মাতার ন্যায়
 আমাদের পবিত্র করুক ।

বা আপো দিব্যা উত ই প্রবন্তি

খনিজিমা উত বা স্বয়ংজাঃ ।

সমুদ্রার্থী বা স্তচরঃ পাবকাস্তা

আপো দেবীরিহ মাম্ অরন্তঃ ।

দ্ব্যলোক হইতে বাহা অবতীর্ণ, অথবা বাহা (ভূতলে) প্রবহমান,
 অথবা বাহা (ভূগর্ভ হইতে) খননের দ্বারা প্রাপ্ত বা বাহা
 স্বয়মুচ্ছসিত, সর্ববিধ জলেই শেষ অর্থ (লব্ধ্য) সমুদ্র, অস্ত্র এবং
 তাহা শুচি দীপ্তিমান ও পাবক; সেই দিব্য জল আমাকে রক্ষা
 করুক ।

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্ত পীতয়ে

শং যোবতি প্রবন্ত নঃ ।

আপঃ পৃথীত ভেবজ্ঞং ব্রহ্মণ্যং তমে মম

জ্যোক্ত্য চ স্বর্ঘ্যং দৃশে ।

শং ন আপো ধনন্যাঃ শমু সন্তনুগ্যাঃ

শং নঃ খনিজিমা আপঃ শিবা নঃ সন্ত বার্বিকীঃ ।

এই দিব্য জল আমাদের ইষ্টকল্যাণ হউক, পানের জন্য
 কল্যাণম্বর হউক, ইহা আমাদের জন্য মঙ্গল ও আরোগ্য বহন
 করিয়া আয়ুক ।

হে জল, আমার শরীর হইতে সর্ব রোগ দূরে রাখ, আমার

শরীরস্থ সর্ববোগেব ভেবজ্ঞ (আরোগ্যকারী) হও, আমি যেন
 চিবকাল জীবিত থাকিয়া স্বর্ঘ্যকে দেখিতে পাই ।

জলহীন কঠিন দেশোদ্ভব জল আমাদের কল্যাণকর হউক,
 সমস্ত প্রদেশের জল আমাদের কল্যাণকর হউক, খননের দ্বারা
 প্রাপ্ত জল আমাদের কল্যাণকর হউক, স্বর্ণ সংগৃহীত জল আমাদের
 কল্যাণকর হউক ।

পুত্রং পৌত্রম্ অভিতর্পয়ন্তীবাপো নধুমতীবিমাঃ ।

আপো দেবীভুভয়া স্তর্পয়ন্তঃ ।

এই অমৃতময় জল যেন আমাদের পুত্র পৌত্রদের অভিতৃপ্ত করে ।
 এই দিব্যজল আমাদের (পূর্বপব) উভয় ভ্রাতাকে ভূপ্ত করুক ।

জল-উৎসর্গ : তান্ত্রিক

উৎসর্গঃ সর্বভূতেভ্যো মর্য়ৈতচ্ছমুত্তমম্ ।

ভূপ্যন্ত্য সর্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ ॥

আমি সর্বভূতের উদ্দেশ্যে এই উত্তম জল উৎসর্গ করিলাম ।
 ইহাতে স্নান পান ও অবগাহন করিয়া সর্বপ্রাণী পবিত্র হউক ।

সামান্যং সর্বজীবেভ্যো ময়া দত্তং মৎস জগাম্ ।

সুপ্রীযন্ত্যঃ সর্বভূতা নভো-ভূ-ত্যয়বাসিনঃ ॥

সর্বজীবের জন্য সমান ভাবে আমি এই জল উৎসর্গ কবিতছি ।
 নভো-ভূ-তোয়বাসী সর্বভূত ইহা পানে উত্তম ভূক্তি লাভ করুক ।

মৎপবে কোটিকুলজা সন্তুষীপনিবাসিনঃ ।

সর্কে তে স্থখিনঃ সন্ত মদনস্তেন জলেন বৈ ॥

আমাব পবে কোটি কুলজগণ ও সন্তুষীপনিবাসী সকল লোক
 আমাব প্রদত্ত এই জলে সুখী হউক ।

প্রীযন্ত্যঃ মমজা নিত্যং প্রীযন্ত্যঃ ভূমিগাঃ ষগাঃ ।

লতাবনস্পতিবৃক্ষাঃ প্রীযন্ত্যঃ জলবাসিনঃ ॥

কীটানি পতঙ্গা যে চান্যে দৃষ্টাচ্চৈশ্চ প্রাণিনঃ ।

ভূতা বৈ ভাবিনঃ সর্কে প্রীযন্ত্যঃ সর্বজন্তবঃ ॥

এই জলে মানবগণ নিত্য প্রীতি লাভ করুক, ভূমিগ ও ধগগণ
প্রীতি লাভ করুক, লতা বনস্পতি বৃক্ষ ও জলবাসী জীবগণ সকলেই
ভৃষ্টি লাভ করুক।

কীট, পতঙ্গ, ও অন্য যে সব দৃষ্ট ও অদৃষ্ট প্রাণী, বাহা বা জল্লাত
কবিয়াছে ও জল্লাত করিবে এমন সর্ব জন্তুই এই জলে প্রীতিলভ
করুক।

পুষ্করিণীকে প্রণতি

শুভা, সুভদ্রা, পুষ্টিং বা প্রাণনা পদ্মমালিনীম্।

সর্বশাস্তিঃ নমস্কৃত্যঃ সর্বকল্যাণকারিণীম্।

শুভা, সুভদ্রা, পোষণদায়িনী, প্রাণনা, পদ্মমালিনী, সর্ব-
শাস্তিপ্রদা, সর্বকল্যাণকাবিণী (পুষ্করিণীকে) আমবা নমস্কাব করি।

অভিভাষণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজকের অস্থিষ্ঠানস্থিতির শেষভাগে আছে আমার
অভিভাষণ। কিন্তু যে-বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হ'ল,
তার পরে আমি আর কিছু বলা ভাল মনে করি না।
সেগুলি এত সহজ এমন সুন্দর এমন গম্ভীর যে- তার কাছে
আমাদের ভাষা পৌছয় না। জলের শুচিতা, তাব সৌন্দর্য,
তার প্রাণবস্তুর অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল
উৎসের মত উৎসারিত।

আমাদের মাতৃভূমিকে সুন্দরা সুন্দরা ব'লে স্তব করা
হয়েছে। কিন্তু এই দেশেই যে-জল পবিত্র কবে সে স্বয়ং
হবেই অপবিত্র পঙ্কবিলীন, যে করে আবোগ্য বিধান সেই
আজ রোগের আকর। দুর্ভাগ্য আক্রমণ করেছে আমাদের
প্রাণের মূলে, আমাদের জলাশয়ে, আমাদের শস্তক্ষেত্রে। সমস্ত
দেশ হয়ে উঠেছে তৃষার্ত মলিন কয় উপবাসী। আমি বলেছেন—
হে জল, যেহেতু তুমি আনন্দদাতা, তুমি আমাদের অন্নলাভের
যোগ্য কব। সর্ববিধ দোষ ও মালিন্য দূরকারী এই জল
মাতার হায়ে আমাদের পবিত্র করুক।—জলের সঙ্গে সঙ্গে
আমাদের দেশ আনন্দের যোগ্যতা, অন্নলাভের যোগ্যতা,
রমণীয় দৃশ্যলাভের যোগ্যতা প্রতিদিন হারিবে ফেলছে।
নিজের চারি দিককে অমলিন অন্নবান অনাহার করে রাখতে
পারে না যে বর্ধরতা, তা রাজারই হোক আব প্রজারই
হোক, তার মানিতে সমস্ত দেশ লালিত। অথচ একদিন
দেশে জল ছিল প্রচুর, আজ গ্রামে গ্রামে পানের তলায়
কবরস্থ যুত জলাশয়গুলি তার প্রমাণ দিচ্ছে, আর তাদেরই
প্রেত মারীর বাহন হয়ে মারছে আমাদের।

দেশে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও রাষ্ট্রচিন্তা আলোড়িত। কিন্তু
আমাদের দেশাস্থবোধ দেশের সঙ্গে আপন প্রাণাস্থবোধের
পরিচয় আজও ভাল করে দিল না। অল্প সকল লজ্জার
চেয়ে এই লজ্জার কারণকেই এখানে আমরা সব চেয়ে ছুখকর

ব'লে এসেছি। অনেক দিন পরে দেশের এই প্রাণাস্থিক
বেদনা-সম্বন্ধে দেশের চেতনার উদ্রেক হয়েছে। ধরণীর
যে অস্ত-পুরগত সম্পদ, যাতে জীবজন্তুর আনন্দ, যাতে তার
প্রাণ, তাকে ফিরে পাবার সাধনা আমাদের সকল সাধনাব
গোড়ায়, এই সহজ কথাটি স্বীকার করবার শুভদিন বোধ
হচ্ছে আজ অনেক কাল পরে এসেছে।

যে জলকষ্ট সমস্ত দেশকে অভিভূত করেছে তার সব
চেয়ে প্রবল দুঃখ মেয়েদের ভোগ করতে হয়। মাতৃভূমির
মাতৃস্থ প্রধানত আছে তার জলে,—তাই মনে আছে,
আপো অস্মান্ মাতরঃ শুদ্ধমস্ত। জল মায়ের মত
আমাদের পবিত্র করুক। জলাভাবে দেশে যেন মাতৃস্থের ক্ষতি
হয়, সেই ক্ষতি মেয়েদের দেয় বেদনা। পদ্মাতীরের পল্লীতে
থাকবার সময় দেখেছি চার পাঁচ মাইল তফাৎ থেকে
মধ্যাহ্ন-রৌদ্র মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুর উপব দিয়ে মেয়েবা
বারে বারে জল বহন করে নিয়ে চলেছে। তৃষিত পথিক
এসে যখন এই জল চায় তখন সেই দান কী মহার্ঘ্য দান।

অথচ বারে বারে বজা এসে মারছে আমাদের দেশকেই।
হয় মরি জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। প্রধান কারণ এই,
যে, পলি ও পাকে নদীগর্ভ ও জলাশয়গুলি বহুকাল থেকে
অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট
পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই। এই কারণে
যথোচিত আধার অভাবে সমস্ত দেশ দেবতার অবাচিত
দানকে অস্বীকার করতে থাকে, তারই শাপ তাকে ডুবিয়ে
মারে।

আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাতীর্ণ নিজেদের ক্ষুদ্র
সামর্থ্য অল্পসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর
করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে এক জনের নাম
করতে পারি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্বন্ধের

বিশ্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম কবেছেন, অনেকেই তা জানেন। বছকাল পূর্বে রামপুরের জমিদার ভুবনচন্দ্র সিংহ ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামবাসীদের জল দান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার যে কী রকম ছিল তা অল্পমান করতে পাবি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পাঁচশি বিঘে জমি নিয়ে।

সেই ভুবনচন্দ্র সিংহের উত্তরবংশীয় দেশবিখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁর পূর্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় কীর্তি গ্রামকে ফিরে দেবার জন্য নিঃসন্দেহ তাঁর কাছে যেতুম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, স্বয়ং গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জনশক্তিসমবানের দ্বারা এই যে জলাশয়ের উদ্ধার ঘটেছে তার গৌরব আরও বেশী। এই রকম সমবেত চেষ্টাই আমরা সমস্ত দেশের হয়ে কামনা করি।

এখানে ক্রমে শুষ্ক ধূলি এসে জলরাশিকে আক্রমণ

করেছিল চার দিক থেকে। আত্মমাতিনী মাটি আপন বৃকের সরসতা হারিয়ে রিক্তমূর্তি ধারণ করেছিল। আবার আজ সে দেখা দিল স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। বছরা অনেকে অক্লান্ত যত্নে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন আমাদের এই কাজে। সিউড়ির কর্তৃপক্ষীয়েরাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের শক্তির অল্পপাতে জলাশয়ের আয়তন অনেক খর্ব করতে হয়েছে। আয়তন এখন হয়েছে একুশ বিঘে। তবু চোখ জুড়িয়ে দিয়ে জলের আনন্দরূপ গ্রামের মধ্যে অবতীর্ণ হ'ল।

এই জলপ্রসার সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের আভাষ রঞ্জিত হয়ে নূতন যুগের হৃদয়কে আনন্দিত করবে। তাই জেনে আজ কবিরাজ থেকে একে অভ্যর্থনা করছি। এই জল চিরস্থায়ী হোক, গ্রামবাসীকে পালন করুক, ধরণীকে অভিষিক্ত করে শস্তদান করুক। এর অঙ্গশ্রম দানে চার দিক স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক।

বৃক্ষরোপণ

মধুমন্মলা মধুমন্ অগ্রম্ আসাম্
মধুমন্ মধ্যা বীক্ষণা বভূহ।
মধুমন্ পর্ণ মধুমন্ পুষ্পম্ আসাম্
মধোঃ সত্যজ্ঞা অমৃতস্ত ভক্ষঃ ॥

ইহাদের মূল মধুময়, অগ্রভাগ মধুময়, এই বীক্ষণের মধ্যভাগও হইয়াছে মধুময়। ইহাদের পর্ণ মধুময়, পুষ্পও ইহাদের মধুময়। এইখানেই অমৃতবসেব পান ও অমৃতের উপভোগ।

উত্তানপর্ণে স্বভগে দেবজ্ঞতে সহস্বতি।

যথা নঃ স্মনা অপ্রো যথা নঃ স্মফলা ভূহঃ ॥

উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত ও সমুখিত তোমার সকল পর্ণ। তুমি সৌভাগ্যেব হেতুভূতা, সর্বজরী তোমার শক্তি। হে দেবপ্রেরিত বীক্ষণ, আমাদেব নিকট তুমি স্মফলা হও, তোমার সহিত আমাদেব অমৃতবসেব প্রীতিব যোগ হউক।

পুষ্পবতীঃ প্রস্মবতীঃ কলিনীবফলা উত।

সমাতর ইব হুত্ৰাম্ অস্মা অবীষ্টসাতয়ে ॥

পুষ্পে প্রবোহে ইহাবা ঐশ্বর্যবতী; ফলবতীই হউক আশ-ফলাই হউক, সম্মিলিত মাঙ্গল্যের মতো ইহাবা আপন স্নেহস্বন্দর্যেব এই মানবকে সকল দৈন্য ও হীনতা হইতে মুক্ত করুক।

যত্রাশ্বা ন্যগ্রোধা মহাবৃক্ষা শিখণ্ডিনঃ।

যত্র বঃ প্রেমা হরিতা অর্জুনা উত যত্রাঘটাঃ কর্কর্যঃ সর্বদন্তি ॥

যেখানে শোভন চূড়াবিশিষ্ট অশ্বখ বট প্রভৃতি মহাবৃক্ষবিরজিত সেখানেই শোভা পাইতেছে হরিত ও শুভ্র সব দোলা, সেখানেই একতানে বাজিতেছে সব বংশী ও মন্দিরা।

বাত্রী মাতা নভঃ পিতা অশ্বমা তে পিতামহঃ।

হে বৃক্ষ, বাত্রি তোমাদের মাতা, নভ তোমাদের পিতা, প্রেম ও আলোকেব দেবতা তোমাদের পিতামহ।

অসদ্ ভূম্যাঃ সমভবৎ তদ চাম্ এতি মহৎ ব্যচ।

শতেন মা পবি পাহি সহস্রোভি বক্ষ মা ॥

যাহা ছিল না, পৃথিবীর অন্তর হইতে তাহা হইল আবির্ভূত তাহাবই মহাবিস্তার চলিয়াছে ছালেকের দিকে। শতভাবে তুমি আমাকে পবিপালন কর, সহস্রভাবে আমাকে অভিধক্ষণ কর।

উজ্জ্বহীক্রে স্তনয়ত্যভিক্রমন্ত্যোষধীঃ।

হে ওষধিগণ, মেঘ স্তনিত হইতেছে, আকাশের অভিক্রমণ চলিয়াছে, এখনই তো তোমাদের উর্দ্ধদিকে মাথা তুলিয়া সমুখিত হইয়া উঠিবার সময়।

সর্বঃ সমগ্রা ওষধীর্বোধন্ত ব্রহ্মসো মম ॥

এই সমগ্র বিধ ওষধি আমার শাপীকে আজ উদ্বোধিত করুক।

দেবান্তে চীতিম্ অবিনন্ ক্রমাণ উত বীক্ষণঃ।

চীতি তে বিধে দেবা ভলিন্ ভূম্যামধি ॥

হে বীক্ষণগণ, দেবগণ জানেন তোমাদের অন্তরেব চিন্ময় সঞ্চয়নে, ব্রহ্মবিদগণ জানেন তোমাদের বেঁটে নিগূঢ় সঞ্চয়ের রহস্ত। এই ভূমি উপর (স্বর্গ হইতে অপকণ) তোমাদের সেই সঞ্চয়ের রহস্ত একমাত্র বিশ্বদেবগণই পারিয়াছেন নব্বিতে।

[উপরে মুদ্রিত বিভিন্ন অমৃতষ্টানের মন্ত্রগুলি শ্রীযুক্ত ক্ষিত্তিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক সংকলিত ও বস্তুনিষ্ঠ।]

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবগুলিকে এখানকার শিক্ষাধারাব একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপেই গণ্য করা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে যথার্থ আত্মীয়তাবোধ জন্মালে যে মানুষ একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং পবিত্র সৌন্দর্য্যানুভূতি লাভ কবতে পারে, এই সত্যটি এখানকার আশ্রমে স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে নদী পুকুর শুকিয়ে যায়, গাছপালাব সবুজ শোভা আর থাকে না, জীবজন্তু হাঁপিয়ে ওঠে। তার পবে যখন এক দিন বর্ষা আসে মেঘের সমাবোহ নিম্নে, তখন যেন প্রকৃতিব চাব দিকে নবজীবনের সাড়া পড়ে যায়। বৃষ্টিব স্নিগ্ধ স্পর্শে যুতপ্রায় লতাগুল্য অকস্মাৎ সজীবিত হয়ে ওঠে, শীর্ণ নদীত্রোতে আসে প্রাবন, মাঠে মাঠে শস্যের ক্ষেতে স্নগ্ন আর আনন্দদানের আয়োজন চলে পূর্ণ উত্তমে। বর্ষারন্তে প্রকৃতির সাজগোজের অন্ত থাকে না; রূপে, বসে, বর্ণে, গন্ধে নবযৌবন লাভ ক'বে আমাদের প্রাচীন পৃথিবী আবার তরুণীর বেশ ধারণ কবেন। প্রকৃতিব দিকে আমাদের হৃদয়কে যদি অবরুদ্ধ ক'বে না রাখি, তবে নববর্ষার এই স্বতউৎসারিত আনন্দ অতি সহজে আমাদের অন্তর্ভুক্তিতেও সঞ্চারিত হ'তে কিছুমাত্র ইতস্তত কবে না। শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গল এই আনন্দানুভূতিকই অর্ঘ্যদান করতে চায়।

এবারকার বর্ষামঙ্গলে একটু নুতনত্ব ছিল। চিবপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে এবার উৎসব অহুষ্ঠিত হ'বেছিল আশ্রমের বাইরে নিকটবর্তী ভুবনডাঙা গ্রামে। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোচ্ছাবের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটিকে খনন ক'বে নির্মল জলের সম্বল কিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল-উৎসবে একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। তাই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়েছিল।

এই জলাশয়ের তীরেই উৎসব-প্রাক্কণের একপ্রান্তে শান্তিনিকেতনের আর একটি দান প্রতিষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগত পুত্র, এই আশ্রমের সর্বজনপ্রিয় ছাত্র মুক্তিদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (মল্লু) উদ্যোগে ভুবনডাঙাতে ১৩২৪ সালে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাব মৃত্যুব পর বিদ্যালয়টি বালকপ্রতিষ্ঠাতাব স্বতিবক্ষার্থ “প্রসাদ-বিদ্যালয়” নামে পরিবর্তিত হয়ে শ্রীযুক্ত বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অর্থসাহায্যে এবং শ্রীনিকেতনের তত্ত্বাবধানে এখনও গ্রামবাসীদের বিদ্যাদানকার্থে ত্রতী আছে। তাই এবারকার বর্ষামঙ্গল-উৎসব এই বিদ্যাদানের স্মৃতি এবং জলদানের প্রচেষ্টাব সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আশ্রমের বাইরে, অথচ, আশ্রমের কর্মক্ষেত্রের গণ্ডী ব মধ্যেই, অহুষ্ঠিত হয়ে একটি বিশেষ মর্যাদালাভ কবেছিল।

“বৃক্ষরোপণ” এই উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। কষেকটি শিশুবৃক্ষকে বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অভিনন্দিত ক'রে এই উপলক্ষ্যে রোপণ করা হয়, যেন তাবা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়ে আমাদের ফলদান, ছায়াদান এবং আনন্দদান করে।

৭ই ভাদ্র সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি তেঁতুল-চারার সম্বন্ধে চতুর্দোলায় স্থাপন করা হ'ল—তাবাই ত উৎসবপতি। দুই জন লোক সেই চতুর্দোলা বহন ক'বে চলল পূর্বোভাগে, আশ্রমবালিকারা নৃত্যগীতসহযোগে অহুসবণ করতে লাগল পশ্চাতে। তাবের কাবও হাতে মঙ্গলশঙ্খ, কাবও হাতে ধূপধূনা চন্দন, কেউ থালায় সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফুলের মালা, কেউ বা জলের পূর্ণকুম্ভ। আশ্রমের সীমা ছাড়িয়ে স্থবিত্তীর নূতন জলাশয়, তাব উঁচু পাড দিয়ে শোভাযাত্রা চলল ভুবনডাঙাতে উৎসব-প্রাক্কণ অভিমুখে। নীচে জলের ভিতবে তাব ছায়া কম্পমান, তাইনে বহুদূর বিস্তৃত সবুজ শস্যক্ষেত, প্রভাতের আলোবাতাস জেগে উঠল গানে গানে—

“সরবিজয়ের ক্ষেতন উডাও শূন্যে
হে প্রকল প্রাণ।
ধুলিয়ে ধন্য কর ককণার পুষ্পা
হে কোমল প্রাণ।”

গ্রামবাসীদের উৎসাহেব অন্ত নেই, সারারাত জেগে
তাবা মণ্ডপ সাজিয়েছে, পুকুরের জলে চাব দিকে হাঁড়ি
ভাসিয়ে তাব ভিতরে বসিয়েছে নিশান। সেগুলো নেচে
নেচে ছলছে বাতাসে, আকাশে বর্ষণক্ষান্ত মেঘ।

উৎসব-প্রাক্ণে এসে চতুর্দোলাসহ শিশু গাছগুলোকে
বাধ হ'ল মাটিতে, মেয়েরাও তাদের আনীত মাস্কলিক
দ্রব্যগুলো রাখল চার দিকে সাজিয়ে। আশ্রমবাসী এবং
অতিথিগণ এসে সমবেত হয়েছেন। কবি ষেত বস্ত্র, ষেত
উত্তরীয় এবং ষেত শশ্ররাশিতে শোভিত হয়ে বসেছেন তাঁর
আসনে—সম্মুখে বিশাল জলাশয়ের বুকে কাঁচা রোদেব
মায়া।

গ্রামের ছুটি ছোট মেয়ে এসে কবিকে মাল্যচন্দনে
ভূষিত ক'বে অর্ঘ্যদান করল। গান শুরু হ'ল—

“আর আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালকতরুণ,
মানবের মেহ-সঙ্গ নে
চলু আমাদের ঘরে চলু।”

গুনতে গুনতে মনে হচ্ছিল, তরুণশিশু এবং আমাদের
ঘরের শিশুগুলি যেন এক হয়ে মিশে গেল। উভয়ের অক্ষুণ্ণ
প্রাণের মধ্যে যে একই প্রকাশেব আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দ,

এই সহজ সত্যটি অন্তরে এনে প্রবেশ কবল অত্যন্ত
স্পষ্টভাবে।

তার পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিত্তিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় বৈদিক
মহাধাবা তরুণশিশুগুলিকে অভিনন্দিত করার পর কবি একটি
কমণ্ডুর জলধারা তাদের সাদবে অভিষেক করলেন।

“বৃক্ষরোপণ” অহুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে জলাশয়-প্রতিষ্ঠাবৎ
উৎসব আরম্ভ হ'ল। এই উপলক্ষ্যে নির্বাচিত বৈদিক
মন্ত্রগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সমরোপযোগী হয়েছিল।
জলের আনন্দরূপ এবং মাতৃকপের সহজ বর্ণনার পশ্চাতে
তি গভীর অহুভূতি, কল্পনা ও সৌন্দর্য্যবোধ! সর্বশেষে
কবি তাঁর মধুব কণ্ঠে নব-উৎসারিত জলকে অভিনন্দিত
কবে একটি অভিজ্ঞতা দ্বারা উৎসবকে সুসম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত
করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,
ভূবনভাঙাব অধিবাসিবৃন্দ এই জলাশয় প্রতিষ্ঠার একটি
হৃদয়স্থ স্বতন্ত্র নিদর্শন করেছেন

সেই দিন বাজেই গ্রন্থাগারের বারান্দায় নাচগানের
আয়োজন হয়েছিল। কবি অনেকগুলি বর্ষার কবিতা আবৃত্তি
ক'রে সকলেব আনন্দ বর্ধন করেন। বাজে উৎসবশেষে
সকলেই এই অহুভূতিটি মনে নিষে ফিরলেন যে, বর্ষা
এসেছে তার পুঞ্জিত মেঘেব ছায়া বিস্তার ক'রে—শুধু
আকাশের কোণে নয়, আমাদের অন্তরলোকেও।



যাত্রী—শিল্পী শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

বর ও নফর

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[এই চরিত্রগুলির নিবিড়তর পরিচয়ের জন্য ১৮৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে "বরযাত্রী" গল্পটী একবার পড়িয়া লইলে ভাল হয়।]

১

গনশা বলিল—“আমার ক-ক-কপালে পরের স্বস্তর-বাড়ী গিয়ে স্থখ লেখা নেই। সে-বারে কালসিটের তিলুর বরযাত্রী হয়ে গিয়ে ওই হ'ল; পরন্তু মামীর বাড়ী গেছলাম। মা-মামী ডেকে ডেকে তেইশ জনকে পেননাম করালে,—জিন জন কাউ; সেখানে অত গুরুজন আছে জানলে ওদিক মাড়াতাম না। কো-কোমরের ফিক ব্যাখাটা এলা আউড়ে উঠেছে...”

ত্রিলোচন প্রশ্ন করিল—“কাউ মানে?”

“তি-তিনটে তাদের মধ্যে দাসী ছিল; মানে, ঘাড় তুলে দেখবার ত আর ফুরসৎ ছিল না।

কে. গুপ্ত বলিল—“ভিড় জিনিষটা তুটবেলেব মাঠেই ভাল মশায়;—গাডীতে বলুন, স্বস্তরবাড়ী-কুটুগবাড়ীতে বলুন...”

গোরাচাঁদ বলিল—“নেমস্তয়র বল—বড্ড অস্থবিধের পড়তে হয়।”

রাজেন জিজ্ঞাসা করিল—“তোর নিজের বিয়ের কি হ'ল র্যা গনশা? মামা বলে কি?”

গনশার মুখটা অদ্ভুত ভাবে বিকৃত হইয়া পড়িল। একটু পরে সংক্ষেপে বলিল—“কুষ্টির মিল হ'ত গু-গু-গুষ্টিব মিল হয় না; ওরা বলে এক, মামারা বলে আব। বিয়ের কথা হচ্ছে, কিন্তু বো-বোয়েব কথা চাপা পড়ে গেছে।

ঘোঁংনা বলিল—“আসলে ওব মামারা ঠাউরেছে, এর মধ্যে একটা চাকরি-বাকরি হ'য়ে গেলে দাঁও মারবে। গ্যাজেট মিলে ত সেদিন গিছিলি, কি বললে?”

গোরাচাঁদ বলিল—“ভিড়ের কথা যদি বললি ত আমার স্বস্তরবাড়ী ভাল।—বউ, স্বাস্ত্রী, খুড়শাস্ত্রী; একটি শালী,

শালা আর শালাজ; পিসেমশাই বলে ডাকবে, তাব জন্তে শালাজের একটি ছেলেও দিবেছেন ভগবান,—মানে যে-ক'টি দরকার ঠিক সাজান, ফালতু ভিড় পাবে না। বাজেরমারীর মধ্যে এক স্বস্তর—তা সে-বেচারি সন্ধ্যের পর আপিম খেয়ে পড়ে থাকে—নিশ্চিন্দ।”

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, বোধ হয় সবাই মনে মনে গোরাচাঁদের কথাগুলি রোমন্থন করিতে লাগিল। একটু পরে গোবাচাঁদ আবার বলিল—“শিগ'গির একবাব যেতে লিখেছে; শাস্ত্রী অনেক দিন দেখে নি কি না।”

বাজেন প্রশ্ন করিল—“কবে যাচ্ছিস?”

“বাবা বলছে এটা মলমাস; ক'টা দিন যাক, তার পর।”

গনশা বলিল—“বে-বেটা ছেলের আবার মলমাস।

তুই ত আর স্বামীর ঘর করতে যাচ্ছিস না।”

বাজেন শিস দেওয়া আরম্ভ করিয়াছিল, থামাইয়া বলিল—“আমি ত বুঝি স্বস্তরবাড়ী যাব—ঠিক যখন কেউ ভাববে না যে জামাই আসছে। তাহ'লেই ত যার জন্তে যাওয়া তাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাব। বলা নেই, কওয়া নেই, হট ক'রে গিয়ে পড়লাম—বো বোধ হয় তখন গা ধুয়ে উঠে কালো চুলে রাঙা গামছা জড়িয়ে জল নিংরোচ্ছে...”

গনশা বলিল—“ঘুম থেকে উঠে—ক-কড়াইমুড়ি চিবাতেও ত পারে, নযত মুখ ভেঙে বগড়া করতে কারও সন্দেহ...”

গোরাচাঁদ বাজেনের মত কবি না হইলেও বাজেনের কথাটা তাহার মনে লাগিল।—নূতন বিবাহ ত। একটু হুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—“কিন্তু তা'তে খাওয়া-দাওয়ার একটু অস্থবিধে হয়, জোগাড়স্বস্ত্র কিছু থাকে না কি না, আর আমার স্বস্তরবাড়ী একটু আবার পাড়া-গাঁ-গোছেরও।”

ত্রিলোচনের নববিবাহের রসচেতনায় একটু আঘাত

লাগিল। বিবস্ত্রভাবে বলিল—“তোব শুধু খ্যাটেব চিন্তা গোরা। বিয়ে না দিবে কাকা যদি তোর একটা হোটেলের ওষেটােবের চাকরি ক’বে দিত ত...”

গোরাচাঁদ বলিল—“গন্শা কি বলিস্—যাব একবার কাউকে কিছু না জানিয়ে?”

গন্শা অশ্রুমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, বলিল—“চ-চল না।

সকলেই একজোটে বলিয়া উঠিল—“চল না, মানে?”

গন্শা উত্তর করিল—“আম্মো তাহলে একবার দেখে আসি গোরার খণ্ডরবাড়ী।”

গোরাচাঁদ একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, গন্শার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—“চল মাইবি; আমার বন্ধু জানলে তারা...”

গন্শা বলিল—“হ্যা, তোর বন্ধু হ’য়ে গিয়ে বাইবেব চালের বাতা। শুণি, আর তোর আপিমখোর খণ্ডবেব বক্তার শুনি।”

বাক্সেন প্রশ্ন করিল—“তবে?”

“ভাবছি চা-চাকব সেজে গেলে কেমন হয়।”

ত্রিলোচন একটু অশ্রুমনস্ক ছিল; বোধ হয় বিনা খবরে খণ্ডরবাড়ী যাওয়াব কথাটা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আব সবাই উল্লসিতভাবে বলিয়া উঠিল—“গ্যাও হু, উঃ।”

মৌন্যনা বলিল—“যাবি যে গোরা, বাড়ীতে কি বলবে? দু-দিন থাকবে ত?...তুই-ই বা কি বলবি?”

রাজেন বলিল—“গোরা বলবে—আমাদেব কারুর জন্তে মেবে দেখতে গেছল কোথাও।...তোর শালীব বয়স কত বে গোরা?”

কে. গুপ্ত বলিল—“আব গণেশ বাবুব বললেই হবে চাকরি খুঁজছিলেন।”

গন্শা বিরক্ত হইয়া বলিল—“চা-চাকরি কি হারান গাই-গরু মশাই যে তিন দিন ধ’রে দিন নেই রাত নেই খুঁজতে থাকবে?...ব’লে দিলেই হবে একটা কিছু; মা-আমাদেব তো খুম হচ্ছে না গন্শার ভাবনা।

২

সঙ্গে চাকর যাইতেছে, গোরাচাঁদের মনে একটা মন্ত

লোভেব উদ্রেক হইয়াছিল, ‘সন্ধ্যা-সাজাব’-এর নিকট পৌছিয়া সেটাকে আর চাপিয়া বাধিতে পারিল না; বলিল—“যখন দু-জনেই যাচ্ছি গন্শা, কিছু গলদাচিড়ি, দার্কিলিঙের কপি, কড়াইছাটি আর নৈনিতাল-আলু নিয়ে গেলে হ’ত না!—আব কিছু মিষ্টি। মানে তোহ খাবাব না কষ্ট হয়, একটু পাড়াগাঁ-গোছের জাযগা কি না। আমরা পৌছুবও সেই যাব নাম আটটা—বাত হয়ে যাবে।”

গন্শা বলিল—“কিন্তু গাড়ীব আর মোটে আধঘণ্টাটাক দেবি।”

যাহোক, বাজারটা একেবারে হাতেব কাছে, কেনাই ঠিক হইল। আন্দাজের একটু বেশী সময়ই লাগিল। গোরাচাঁদ তরকাবির ঝুড়িটা লইল। গন্শা খাবাবের ইাড়িটা। তাহার পর ক্ষিপ্ততার জন্ত গন্শা ঘে-বাসটাঘ উঠিয়া বসিল, কতকটা ক্ষিপ্ততার অভাবেও, কতকটা ঝুড়িটাব জন্তও গোরাচাঁদ সেটা ধবিতে পারিল না। দুইট ‘ষ্টপ’ পাব হইয়া যাওয়াব পর গন্শা সেটা টের পাইল। ফিরিয়া আসিতে, গোরাচাঁদকে খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং গায়ের ঝাল মিটাইতে আরও খানিকটা সময় গেল। ষ্টেশনে প্রায় ইপাইতে ইপাইতে প্লাটফর্মের চুকিয়া গন্শা জিজ্ঞাসা করিল—“ভা-ভানদিকেরটা না বাঁদিকেরটা র্যা গোবে?”

পাশাপাশি দুইটা গাড়ী দাঁড়াইয়া। চুকিয়াব সময় প্লাটফর্মের নম্বর দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে; সন্দেহ আছে বুঝিলে গন্শা আবার পাছে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে সেই ভয়ে গোরাচাঁদ পরিণাম চিন্তা না কবিয়াই বলিল—“না, বাঁদিকেরটা।”

গাড়ীতে ভিড় ছিল একটু। একেবারে ভিতরের দিকে এক কোণে গিয়া দুই জনে একটু জাযগা পাইল। গোরাচাঁদ চুপড়িটা উঠাইয়া বাস্তের এক কোণে রাখিল; গন্শাব হাত হইতে ইাড়িটা লইয়া চুপড়ির মধ্যে ফসাইয়া দিল।

ক’দিন বৃষ্টি হয় নাই, বেশ গরম পড়িয়াছে; তায দৌড়া-দৌড়ি, তাহার উপব ভিড়। গন্শা ঠেলিয়া ঠুলিয়া আসিয়া প্লাটফর্মের উপর পাযচারি কবিত্ত লাগিল। একটি বৃদ্ধ যাত্রী বলিল—“ফাটো বেল হয়ে গিয়েছে বাপু।”

গণেশ দোরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ প্রশ্ন করিল—“বাওয়া হবে কনে?”

“সিঙ্গুর।”

“সিঙ্গুর।—সে ত বাবা তারকেশ্বরের লাইন। এ গাড়ী ত নয়; ঐ সামনেরটা।”

গনশা কতকটা অবিস্থানে, কতকটা উষ্মেণে বলিল—“কে বললে।”

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল।

বৃদ্ধ বোধ হয় একটু রগচটা; বলিল—“কেউ বলে নি; তুমি উঠে এস। ওতে যাবে না, শেবে এটাও হাতছাড়া করবে, গাঁটের পরশা দিয়ে যখন টিকিট কিনেছ... উঠে পড়।”

হুইস্‌ল্‌ দিয়া গাড়ী ষ্টার্ট দিল। গনশা চীৎকার করিয়া বলিল—“গোরা, শি-শি-শিগিরি নেমে পড়; বলছে...”

গোরাচাঁদের খটকা লাগিয়াই ছিল একটু; “কে বলছে? — কে বলছে র্যা?”—বলিতে বলিতে হস্তমস্ত হইয়া, লোকদের পা মাড়াইয়া, মোট ডিঙাইয়া আসিয়া কোন মতে নামিয়া পড়িল। গনশা চোখ রাঙাইয়া বলিল—“ত-তবে যে তুই বললি—বান্ধিকেরটা।”

গোরাচাঁদ চলন্ত গাড়ীটার দিকে চাহিয়া বলিল—“যা: চুপড়িটা গেল ছেড়ে, হাঁড়িহুদু! হায়, হায়...”

একটু অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—“মশাই! চুপড়িটা ফেলে দিন না এদিকে—ঐ বাঁকে রয়েছে—উত্তুর দিকে—মানে পূর্ব দিকের উত্তুর—মানে উত্তুর কোণটার আর কি...”

গনশা দাঁতমুখ খিঁচাইয়া বলিল—“ছোট-ছোট, দৌড়ো দিল্লী পর্যন্ত ঐ বলতে বলতে...”

পাশের গাড়ীর প্রথম বেল পড়িল। এক জন রেল-কর্মচারী একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; গনশা জিজ্ঞাসা করিল—“এটা তারকেশ্বরের লাইনেব গাড়ী ত স্তার?”

“হ্যা, শিগ্গিরি উঠে পড় গিয়ে।”

ভুলের সমস্ত সম্ভাবনা এড়াইবার জন্ত গোরাচাঁদ প্রশ্ন করিল—“যে তারকেশ্বরের লাইনে সিঙ্গুর আছে—?”

গনশাও উত্তরটা শুনিবার জন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটা ধমক খাইয়া দুই জনে তাড়াতাড়ি গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গনশা প্লাটফর্মের দিকের বেক্‌চায় বসিয়াছিল; গোরাচাঁদ পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিতে করিতে

বলিল—“গলা বাড়িয়ে দেখ্ ত গনশা—খাবারের ভেজারটা আছে কাছেপিটে?—বেশ খানিকটা ছুটোছুটি, তব্বাণি হ’ল কিনা।”

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, হুইস্‌ল্‌ দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গোরাচাঁদ ব্যাগটা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—“সে চুপড়িটা এতক্ষণ বোধ হয় লিলুফা পেরিয়ে গেল—হাঁড়িহুদু! একটাও যে মুখে ফেলে দেব এমন ফুৎসং হ’ল না।”

যাহোক, গাড়ীটার গতিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দু-জনেরই মনমর: ভাবটা কাটিয়া গেল। গনশা, চাকরের মুখে মানায় এই রকম ভাব ও ভাষার একটা গান ধরিল—“পরান যদি লিলেই বে প্রাণ ...।” সেটা জমিয়া উঠিতে কোলের কাছে যখন একটু ভায়গা খালি হইল, গোরাচাঁদ গিয়া সেইখানটিতে বসিল। প্রথম গুণ্‌গুন্ করিয়া গানে একটু বোগ দিল, কিন্তু গনশার তোলামির জন্ত কোরাসে অস্থবিধা হওয়ায়, গাড়ীর বাহিরে স্রুত বাড়াইয়া শুধু তবলা বাজাইতে লাগিল।

গাড়ী রিষড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে এক দল বরষাজী নামিল। খানিকটা উল্লসিত চোচামেচি, এসেমের, জুইয়ের গোড়ের গন্ধ; চেলিপরা, কপালে চন্দনের ফুটকি-দেওয়া বর ১০০-গনশার গানটা মুহু হইতে হইতে খামিয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া খানিকটা গেলে বলিল—“হ্যা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তোর শা-শা-শালীর বয়স কত র্যা গোরা? মানে যদি বিয়ের যুগি হয় ত শিবপুরে পাত্তোরটাত্তোর দেখি; একটা ভদ্রলোকের উপ্‌গার ক’রতে পারা মস্ত একটা ভাগ্য কি না।”

গোরাচাঁদ বলিল—“বৌয়ের ষোল যাচ্ছে, এ কান্তিকের সাতরয় পড়বে; শালী হ’ল দু-বছর তিন মাসের ছোট—তাহ’লে...”

গনশা হিসেবের গোলমালের দিকে না গিয়া বলিল—“বটুইন্‌ তেরো এণ্ড চোদো। হেলথ্‌ কেমন?”

“বৌয়ের চেয়ে ভালই ব’লতে হবে। বৌটা ম্যালেরিয়ায় বন্ড ভুগলো কিনা; একেবারেই হাড়িসার হ’য়ে গিয়েছিল, খস্মি বলতে হবে পান্নালাল ভাক্তারকে—যাকে বলে মড়া মাম্বু চাঙ্গা ক’রে...”

গনশা প্রশ্ন করিল—“দে-দেখতে কেমন?”



আত্মনিমগ্না
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

গোবাচাঁদ একটু লজ্জিতভাবে ধমক দিয়া বলিল—“হাঃ ;
আহা, উনি যেন দেখেন নি, তবে যে বললি সেদিন—গোরা,
তিল্লুর বোয়ের চেয়ে তোব বোয়ের বটো...”

গন্শা আর বিরক্তি চাপিতে পারিল না—“তোরা
শালীর কথা জিগ্যেস করছি, না, স্রেফ বোঁ—বোঁ
ক’রে...”

গোরাচাঁদ অপ্রতিভ হইয়া বলিল—“তাই বল্। আমি
এদিকে ভেবে সারা হচ্ছি গণেশ জেনেশনেও ও-কথা
জিগ্যেস ক’বছে কেন। শালী হচ্ছে যাকে বলে... ই্যা
হুন্দরীই...”

“লেখাপড়া কেমন? ক-কথা হচ্ছে কেউ জিজ্ঞেস
ক’রলে আবার খুঁটিয়ে বলতে হবে কিনা। নইলে বলবে—
খুব খোঁজ রাখেন ত মশাই।”

“ছাই লেখাপড়া, ওর চেয়ে বোঁ অনেক পড়েছে ; কিন্তু
মুখের কাছে দাঁড়াও দিকনি শালীর।”

গন্শা হাসিয়া বলিল—“সত্যি নাকি?” মুহূ হান্তেব
সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঢুলাইয়া কি চিন্তা কবিল খানিকটা, তাহার
পরে ধীরে ধীরে জিলোচনের বিয়ের সেই হিন্দী গানটা
ধরিল—“মুহা পক্ষ সোড়রি, সোড়রি...”

শেওড়াফুলিতে পৌঁছিতে গোরাচাঁদ বলিল—“তোরা
খিদে পায় নি গন্শা?—সে চুবড়িটা বোধ হয় ঐতক্ষণ চন্দন-
নগরে—তোরা কি আন্ডাজ হয়?”

গন্শা বলিল—“তেষ্টা পাচ্ছে বটে, একটা লেমনেড হ’লে
হ’ত।”

গোবাচাঁদ বলিল—“তুই তবে তাই খা, ঐ ভেগারটা
আসছে ; আমি দেখি নেমে যদি খাবারটাবার পাওয়া যায়
কিছু।”

গন্শা ধমক দিয়া উঠিল—“গ-গ-গদ্ব ভ কোথাকার ;
আর একটুখানি সহি ক’রে থাকবে তা নয়, পথে যা-তা
খেয়ে পেট ভরাচ্ছে।”

কথাটা গোরাচাঁদের খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হইল।
প্রকাশ করিয়া বলিল—“ঠিক বলেছিস গন্শা, পাড়াগাঁয়ের
রাত হ’লেও জামাইমাঝুষ পৌঁছেছে, বত দূব সাধ্য করবেই
তারা,—একটা মস্ত আফ্রাদের কথা ত। কিছু না হ’লেও
পুঙ্খবের মাছ আর গরুর দুধটা ত আছেই। আমিও তাহলে

একটা লেমনেডই খাই এখন ; খিদেটা জলে চাপা রইল
তাতে কোন ক্ষতি হবে না, কি বলিস।”

লেমনেড ছিল না, দু-জনে দুটা সোডাই পান করিল।
গন্শা একটা ঢেতুর তুলিয়া বলিল—“চা-চাপা কি। খিদে
একেবারে শান দেওয়া রইল।... মাছ যদি তেমন ওঠে ত
একবার কালিয়া রেঁখে দেখাই গোরে। পাড়াগাঁবে কিন্তু
আবার চাকবের রান্না থাকে না যে।

গন্শা উল্লসিত হইয়া বলিল—“রান্নাঘরের মোহ-
গোড়ায় বসে তুই বাথলে বে না কেন শালাজকে,—সেই
রাঁখে কিনা। এক টিলে দুই পাখী মারা হবে, গল্পও করতে
থাকবি আবার শালী, বোঁ সবাই থাকবে... তারা ভাববে
জামাইবাবুর চাকর, ওটার কাছে আবার লজ্জা। চাকরবাবু
যে এদিকে শিবপুরের ডাকশাইটে গণেশরাম।...”

দুই জনেই সজোরে হাসিয়া উঠিল।

সিঁহুরের আর দেরি নাই। গাড়ীর এদিকটায় তাহার
মাত্র দুই জনে বসিয়া। গন্শা উঠিয়া জামাকাপড় ছাড়িয়া
একটা ময়লা ধুতি ও একটা ঘুষ্টি-দেওয়া ফরসা পিরন
পরিল, মাথার টেরিটা মুছিয়া ফেলিয়া কানে একটা ফিটী
গুঁজিয়া দিল। জামাকাপড় এবং ক্যামিসের ছুতা-জোড়াটা
গোরাচাঁদের ছোট্ট স্ট্রুটসেটায় গুছাইয়া ফেলিল ; তাহার
পর হঠাৎ চোখ দুইটা টায়া করিয়া লইয়া গোরাচাঁদের
দিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিল—“দা’ ঠা উর।”

দুই জনে আবার একচোট হাসিয়া উঠিল।

৩

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় গাড়ী সিঁহুরে
পৌঁছিল।

গল্প কবিতা করিতে টেশনের বাহিব হইয়া দু-জনে
চলিতে আবস্ত কবিল। বোয়ের কথা শালী-শালাজের
কথা, খাওয়ার কথা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, গোরাচাঁদ
বলিল—“ই্যা, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি যে। এদিকে
এসেও পড়েছি অনেকটা ;—তোকে কি ব’লে ডাকব রা
স্বস্তরবাড়ীতে? মানে বোঁটা আবার তোরা নাম জানে
কিনা।”

হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে চারি দিকে চাহিয়া বলিল—“এ কোথায় এলাম র্যা গনশা—এ যে অনেক ভদ্রলোকের বাড়ী।

গনশা বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ব্যস্ত স্বরে প্রশ্ন করিল—“তুই কি বা-বাগদিপাড়া, কেওড়া-পাড়া খুঁজছিলি?”

বেশ অদ্ভকার। গোরাচাঁদ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চারি দিকে দেখিতে দেখিতে বলিল—“সে কথা নয়, মানে স্বস্তরবাড়ীটা এক টেরে কিনা, নিজ সিঁজুর ছাড়িয়ে খানিকটা ভেতরের দিকে—বাড়ীঘর, কি মোকানপাট ত নেই সেদিকে...চল আবার ইন্ট্রিশনে...গল্প করতে করতে একেবারে উল্টো রাস্তায় এসে পড়েছি; এদিকটা ত আমার জ্ঞাতি পিস্বস্তরের বাড়ী।”

“ন-হয় পিস্বস্তরের বাড়ীই রাতটা কাটাবি চল না, সকালে তখন ”

গোরাচাঁদ শিরিয়া উঠিল; বলিল—“ওরে বাব্বা! তারা ত চায়ই তাই। টের পেলে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে রাতারাতি কাজ সাফাই করে লাস শুন্ করে ফেলবে। জমি নিয়ে স্বস্তরের সঙ্গে ভয়ঙ্কর খুনে মোকদ্দমা চলছে কিনা। ওবা ত চায়ই কেউ একবার আত্মক এদিক-বাগে; জামাই পেলে ত লুফে নেবে...”

গনশা তাড়াতাড়ি তাহাকে টানিয়া লইয়া ফিরিল। খুবই চট্টা গিয়াছিল, কিন্তু ষ্টেশন না পৌছান পর্যন্ত কিছু বলিল না। ষ্টেশনের কাছে আসিয়া খুব একচোট গালিগালাজ করিল গোরাচাঁদকে। আবার ঠিক রাস্তা ধরিয়া দুই জনে বাইতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে দুই তিন জায়গায় খবর লইয়া যখন বুঝিল যে ঠিক রাস্তাতেই বাইতেছে তখন মনের রাগটা এবং পিস্বস্তরের আতঙ্কটা অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল। যখন বুঝিল কাছে আসিয়া পড়িয়াছে গনশার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কথাবার্তাও সরস হইয়া আসিল। সাহস পাইয়া গোরাচাঁদ বলিল—“তুই ত এসব বলে ঠাট্টা করছিলি শুধু, আমার এদিকে নাড়ী জলে গেল খিদের, রাতও হয়ে গেল বড়।”

“ন-রাড়ী কি আমারই জলছে না? দেখছি কালিয়াটা আর হবে না রাস্তিরে। যদি বড় মিরগেল গুঠে ত দিক্

ভেজ্জেই দিগ্ আপাতত; লুচি ত করবেই,—শেষ মিরগেল মাছের পেটিভাজা আর লুচি...”

গোরাচাঁদ একটা ঝোলটানা-গোছের শব্দ করিয়া বলিল—“দুটোই বড় শুকনো হয়ে গেল; তা রাতটা কাটুক ঐ ভাবেই, সকালে তখন...বোকে বরং বলব দুখটাকে নষ্টকিরে করে...হাতে একটা আত্মা ইঁট তুলে নে ত গনশা—এসে গেছি—আমি এই বাঁশের আগালেটা বাগিয়ে ধরছি...”

গনশা দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—“কেন ফা, আবার কি?”

“কুকুরটা বড় রোখা। রাস্তিরে কেউ এলে ধরে নেয় তোর কিংবা পিস্বস্তরের বাড়ীর কেউ; দাঁকার পর থেকে ওদের ওপর বড় চটা কিনা। ঐ, ডাকতে আরম্ভ করেছে!...তুই যে খান-ইট তুলে নিয়েছিল—একেবারে যেঁতো হয়ে যাবে যে!...আর বাবা—বাবা—চ্যা-চ্যা... আমি রে, তোদের জামাইবাবু...আচ্ছা বাড়ী একেবারে নিশ্চিন্ত কেন বল ত গনশা?”

“যুমিয়েছে নিশ্চয়, রাত দশটা হয়ে গেল...”

গোরাচাঁদ বলিল—“যুমলে কুকুরটার এ রকম ডাকেও যুম ভাঙবে না?”

দুই জনে কুকুরটাকে আটকাইতে আটকাইতে বাহিরের উড়ানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন এক জন ভিতর-বারান্দা থেকে জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—“কে? কে র্যা বাবা?”

গোরাচাঁদ বলিল—আমি,—শিবপুর থেকে আসছি।”

সেই রকম নিজালু স্বরে প্রশ্ন হইল—“কি দরকার—রাত ছপুরে?”

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর গোরাচাঁদের মুখে টপ করিয়া জোগাইল না। গনশা বলিল—“না—দ-দরকার তেমন কিছু নেই...তবে ইনি—তোমার গিয়ে ল-দাদাঠাকুর এ বাড়ীর জামাই।”

গোরাচাঁদকে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“বাড়ীটা ঠিক ত?—জামাই আবার একটা গালাগাল কিনা...”

ওদিকে আর কোন সাড়া নাই। লোকটা যুমাইয়া পড়িয়াছে নিশ্চয়—যুমের মধ্য হইতেই প্রশ্ন করিয়াছিল।

দুই জনে কুহুরটাকে কখন তাড়না, কখন খোশামোদ করিতে করিতে বারান্দার খোলা বকে উঠিয়া গেল। গোরচাঁদ লোকটাকে লক্ষ্য করিয়া একটু চড়া গলায় বলিল—“জামাই মানে—শিবপুরের জামাই গোবর্চাঁদ আমি ; সঙ্গে এ গন্থ... আমার চাকব—”

গন্থা কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল—“হু-দুখীরাম।”
“আমার চাকব দুখীরাম। তুমি কে কথা কইলে ?”
সেই নিম্নালু স্বর একটু ধমকের স্বরে প্রশ্ন করিল—“বলি তুমি কে ?”

গোরচাঁদ হতাশ হইয়া গন্থাব দিকে চাহিয়া বলিল—
“বললাম ত একচোট সব খুলে। কি গেরো বল ত।”

একটু থামিয়া গলা আর একটু চড়াইয়া বলিল—“বাবা, এখনও চিনতে পারছিস না জামাই বাবুকে ?...সেই লুচি খেতিস হাত থেকে...”

গন্থা বলিল—“পিস্বশ্বুরের বাড়ীর লোক নয় রে বাবু...”

এবার ঘরের ভিতর হইতে ভারী গলার প্রশ্ন হইল—
“বাইবে কে ব্যাডব-ব্যাডব কবছে ? কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে...”

গোরচাঁদ গন্থাকে বলিল—“শ্বশুর ! আপিমের ঘুম কি না, ঠিক ধরতে পারছে না।”

চোঁচাইয়া বলিল—“বাবা, আমি আপনাদের গোরচাঁদ, শিবপুব থেকে আসছি।”

“কে, বাবাজী ? এস বাবা, এস এস...নিধে। এই বেটা হারামজাদা, পড়লে আর হুঁস থাকে না। রকে জামাই দাঁড়িয়ে যে...”

তাড়া খাইয়া নিধিরাম ধীবে ধীবে উঠিয়া পড়িল। বা-হাতে কালিপড়া লালচৈমটা লইয়া দুয়ার খুলিল, তাহার পর আলোটা তুলিয়া ধরিয়া, চোখ পিট্-পিট্ করিতে করিতে টানা জড়িত স্ববে কহিল—“তাই ত, জামাই-বাবু যে। এস, এস, আস্তোজ্ঞে হোক, পেয়ার হই।

তা, বলা নেই কণ্ডা নেই—যেন গিয়ে বিনি মেঘে বজ্রাঘাত... বা, কি সৈভাগ্য।...ওটি কে ?”

গন্থা বলিল—“আমি দাঠাউবের নক্ষর নিধু-দা ; গড় করি।”

8

তিন জনে ঘরে আসিল। গোবর্চাঁদ শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া সামনের একটা পাখা-মচ্চান চেয়ারে, প্রতি মুহূর্তেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় নতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। গন্থাও খুব ভক্তিতে পায়ের ধুলা লইয়া নীচে উবু হইয়া বসিল। নিধু ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে লগিল।

শ্বশুর খানিকটা নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অশ্রু-বোধ হওয়ায় গোরচাঁদ প্রশ্ন করিল—“অপনি—আপনারা ভেমন আছেন ?”

কোন উত্তর হইল না।

গন্থা ইসারায় তাগাদা করিল, হাতের কাছে অন্য কোন প্রশ্ন না পাওয়ায় গোরচাঁদ ভিজ্জাসা করিল—
“এবাবে এদিকে—এবাবে এদিকে বিষ্টি কোন হ'ল ?”

নডনচড়ন পর্যন্ত নাই। গন্থা আবার তাগাদা করিল, গোরচাঁদ ভীতভাবে হাত নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—“চটে যায়।”

আবার খানিক ক্ষণ নিরুৎসাহ। একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলে শ্বশুর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—“হু...গোরচাঁদ এসেছ, না ?”

গোরচাঁদ ব্যাকুলভাবে এববার গন্থার দিকে চাহিয়া টপ্পর কবিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“তাই ত।”—আবার খানিকটা চুপচাপ, শুধু গোরচাঁদের চেয়ার-সামলানার কাঁচ-কাঁচ শব্দ হইল হুই-তিন বার।

নিধিরাম তামাক সাজিয়া দিয়া এক পাশ বসিল।

হুঁকাব কয়েকটা টান দিয়া গোরচাঁদের শ্বশুর একটু মোক্ষা হইলেন। বলিলেন—“ভখন থেকে চুপ ক'বে তই ভাবছি। ইয়ারে নিধে, বাড়ীর সব বিষ-বাড়ী নেমন্তন্ন গিয়ে ব'সে রইল, জামাই থাকে কি ?”

নিধিরাম কলিকাটির দিকে অর্দ্ধমুদ্রিত, সতৃষ্ণ নয়ন নাইয়া ছিল, নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিল—“সেই কথাই ত ভাবছি।”

গোরচাঁদের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। গন্থা একটু থগা, তবু তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল সেও হতভম্ব হইয়া

গিয়াছে। দুই জনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া স্বস্তর কি স্থির করে সেই প্রত্যাশায় একটু চুপ করিয়া বহিল। আরও খানিক ক্ষণ তামাক টানিয়া নিধিরামের দিকে হাঁকাটা বাড়াইয়া স্বস্তর বলিলেন—“ভাবিয়ে তুললে যে!—উপোস ক’রে থাকবেন?”

নিধিরাম কলিকাটা পাক দিয়া হাঁকা হইতে থলিতে থলিতে বলিল—“রামঃ, সে কি হয়?”

“উপায়?”

নিধিরাম পরম ভক্তিমূর্তি বলিল—“মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—“বাবা আছেন।”

গনশা গোরাচাঁদের পানে ঠোঁটটা কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া মাথা নাড়িল—অর্থাৎ আর কোন আশা নাই।

“আমি বলি—” বলিয়া গোরাচাঁদ কি বলিতে বসিতেছিল, নিধিরাম হাসিয়া বলিল—“তুমি যা বলবে বুঝতেই পারছি দাঁঠাকুর,—খবর দিয়ে আসতে পার নি ব’লে আর খুব রাত হুঁপে গেছে ব’লে পথে—শেওড়াফুলিতে খেয়ে এসেছে—এই ত?—শুনছেন জামাইবাবুর কথা কৰ্ত্তা?”

নেশাটা চট্টিয়া যাইতেছে, জামাইয়েব হাঙ্গামা ন মিটাইলে অব্যাহতি নাই; বুদ্ধ মিটিমিটি করিয়া হাসিয়া বলিলেন—“দ্যুৎ, সে তুই-আমি করতাম ব’লে কি ও ছেলে-মানুষেবাও করবে?—না, সেটা উচিত হ’ত?”

—অর্থাৎ সেইটাই উচিত হইত, এবং যদি না হইত থাকে ত কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলেমানুষ বলিয়াই হয় নাই।

গনশা গোরাচাঁদ বিমূঢ় ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওষি কবিল। গোবাচাঁদ কি উস্তর দিতে যাইতেছিল; পেটুক মানুষ, পাছে বেমানান কিছু বলিয়া বসে সেই ভয়ে গনশা তাড়াতাড়ি বলিয়া দিল—“আজ্ঞে, বললে বিশ্বাস যাবেন না,—দাঁঠাকুর সত্যই খেয়ে এসেছেন।”

গোরাচাঁদ গনশাব দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া, মরিয়া হইয়া আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটা ঢেকুর ঠেলিয়া বাহির হইল। তবু ঘটাসম্ভব সামলাইয়া লইয়া বলিল—“আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা সোডা...”

গনশা তাহার দিকে একটা জ্বকুট করিয়া, মুখ ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—“ভি-ভিন গণ্ডা রসগোল্লা, গোয়াটারু কুরি সিদ্ধা মিগিয়ে পোখানেক মিহিানা...”

গোরাচাঁদ হতাশভাবে চাহিয়া ছিল, তাহার মুখের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গনশা বলিল—“শেষে আমি বললাম—দাঁঠাকুর; একটা সোডা খেয়ে নাও; তাঁরা ত সেখানে খাবার জন্তে জেদাজেদি করবেনই...”

নিধিরাম বলিল—“কবব না জেদাজেদি?—ঘরের জামাই এলেন, বাঃ!”

গনশা ক্রমাগত চোখ-টেপানি দিতেছে। আর কোনও আশা নাই দেখিয়া গোরাচাঁদ নিরুৎসাহ কণ্ঠে যতটা সম্ভব জোর দিয়া বলিল—“দুখীবামের কথা শুনে আমি বললাম—হাজার জিদ করলেও আমি আর খেতে পারব না। শেষকালে কি মারা যাব?”—বলিয়া চোটা করিয়া আর একটা ঢেকুর তুলিল।

স্বস্তর নিধিরামের নিকট হইতে কলিকাটা লইয়া বলিল—“আমার কিন্তু বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না। নিধে কি বলিস?”

হাঙ্গাম-পোহানোর ভয়ে নিধিরাম অনেকটা সামলাইয়া আনিয়াছে, আবার কাঁচিয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—“অবিশ্বাসের ত হেতু দেখছি না, কৰ্ত্তামশাই; লোতুন জামাই মিছে কথা বলবেন কি?”

“তাই ত!” বলিয়া বুদ্ধ আরও খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন—“আমি বলি কি নিধে, জামাইকে না-হয় নেমস্তম্ব-বাড়ী নিয়ে যা না কেন, ততক্ষণ আমাতে আর...এটির নাম কি?”

গোরাচাঁদ উৎসাহভরে বলিল—“ক্ষুদিরাম।”

“আমাতে আর ক্ষুদিরামে ব’সে ব’সে গল্প করি না হয়। ..বেহাই বেহান-ঠাকুরগাঁও আছেন কেমন ক্ষুদিরাম?”

“বেশ আছেন”—বলিয়া গনশা তাড়াতাড়ি বলিল—“আজ্ঞে, আমি ত জ্ঞা-জ্ঞান থাকতে দাঁঠাকুরকে একলা ছেড়ে দিতে পারব না;—এই সাপখোপের দেশ! কৰ্ত্তাবাবু বললেন—দুখীরাম ম-মলমাস—ছেলেটা একলা যাচ্ছে, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকবি—খ-খ-খবরদার...”

গোরাচাঁদ হাসিবার চেষ্টা কবিতা বলিল—“নিধু খুব বিচক্ষণ লোক গন...দুখীরাম, ও আবার ঝাড়ফুঁকও জানে। ভোর কোন ভাবনা নেই; নিশ্চিন্তি হুঁপে বাবার সঙ্গে গল্প বর। কথা হচ্ছে খিদে ত একেবারেই নেই, কিন্তু শান্তভী

ঠাকরুণকে দেখবার জন্তে প্রার্থনা কেমন আইটাই কবছে ; অনেক দিন পায়ের ধুলো নিই নি কিনা ।”

গনশা ভিতবে ভিতবে জলিয়া থাক হইতেছিল, গোরাক্ষীদের দিকে একটা উগ্র কটাক্ষ হানিয়া সংযতভাবে কহিল—“বি-বিনি পায়ের ধুলোয় যখন চারটে মাস কাটালে চোখ কান বুজে, তখন আর একটা কি ছোটো ঘণ্টা কেন রকমে কাটাও না দাঁড়াউর ; যা-ঠাকরুণ ত এক্ষনি নেমস্তর খেয়ে ফিববেন,—ছিচরণ সজে নিয়ে ..”

শুভর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—“সে আজ সমস্ত রাত আসবে না,—তাবা কেউ না ; সম্পর্কে আমাব নাতনীর বিঃ কিনা, গিন্নী বাসব জাগাবে...ওকি !—ধর—ধর ”

শেষ আশা একটু ছিল, শাড়ীর ; সেটুকুও যাওয়ায় গভীর নিরাশায় শরীরটা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়ায় গোরাক্ষী ভাঙা চেয়ার হইতে আছাড় খাওয়ার দাখিল হইয়াছিল, গনশা, নিধিরাম ধরিয়া ফেলিল ।

শুভর বলিলেন—“আহা, ঘুম ধরেছে ।”

নিধিরাম বলিল—“চাপ খাওয়া হয়েছে কি না ।”

শুভর উঠিয়া বলিলেন—“তবে বাবাজী চল, দুর্গা ক্রীষ্ণর ব'লে শুয়েই পড়বে চল । থিদে যখন নেই-ই বলছ, শুধু প্রশ্ন করবাব জন্তে কোশটাক পথ ভেঙে মাঝরাতে গিয়ে কি দরকার ? ওঠ, তাহ'লে । দুখীরামকে না-হয় গোটা-করেক খইচুর এনে দোব ?”

গনশা উত্তর দেওয়ার আগে গোরাক্ষী প্রতিহিংসাবে বলিল—“না, না ; খাওয়ার ওপর খেয়ে একটা কাণ্ড করে বসবে শেষে ; ওর ভরসায়ই বাবা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, মলমাস অগ্রাহ্য করে ।”

গনশাব পানে না চাহিয়া শুভরের পিছনে পিছনে ভিতরে চলিয়া গেল ।

৫

প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক আরও কাটিল । গোরাক্ষী ভিতর বাড়ীতে ক্ষুধাব জ্বালায় এবং খাদ্য সম্বন্ধে হতাশায় বিছানাতে পড়িয়া এগাশ-ওগাশ করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের দুধাবের কাছে গনশা ডাকিল—“দাঁড়াউর ।”

গোরাক্ষী উত্তর দিতে যাইতেছিল, নিধিরামের গলার

আওয়াজ শুনিল—“ঘুমে এলিয়ে পড়েছেন, আব তুলে কাজ নেই । তুমি তাহ'লে এই দোর-গোড়ায় শুয়ে থাক দুখীরাম ভাই ; আমি যাই কর্তার কাছে এই সতরঞ্চি রইল ।”

নিধিরাম চলিয়া গেলে গনশা ভিতর-বাড়ীর কপাট বন্ধ করিয়া যখন ফিবিয়া আসিল, গোরাক্ষী দীর্ঘে দীর্ঘে ডাকিল—“গনশা ।”

“জেগে আছিস্ !” বলিয়া গনশা দুধার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল ।

গোরাক্ষী চিচি কবিয়া বলিল—“ঘুমুতে পারছি না ভাই, আব সাহসও হচ্ছে না । এসা থিদে গনশা ! মনে হচ্ছে ঘুমলে আর ওটা হবে না, জামাইকে ওদেব সকালে টেনে বের ক'বতে হবে ।”

গনশা মশার কামড়ে চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—“চাকর সেজে এলে আবাব মশারি দেবে না মনে ছিল না বে—উ !—তার ওপর দু-বেট আক্ষিমখোরের বক্তার !—নেশা চটে গেছে কিনা ..”

গোরাক্ষী বলিল—“তাও যেমন ভগবান দয়া করে ভুল গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়েছিলেন,—যদি তেখে দিতেন পেটটা খালি থাকলে পুড়ে যাওয়ার মত জ্বলা করে রে—জানতাম না ।...নিধেটা কি ধড়িবাজ দেখেছিস্ ?”

“দুটোই থিদে মরছি, অথচ কেমন বলিয়ে নিলে—খেয়ে এসেছি ! না-মা ব'লকে আর মান থাকত না ।”

খানিকটা চুপচাপ গেল । তাহার পর গনশা মাথাটা মশারির মধ্যে গলাইয়া দিয়া পূর্বের চেয়েও চাপা গলায় বলিল—“গোরে, এক মতলব বের করেছি ; ভাবছি রাজী হবি কিনা ; তোব আবাব শুভরবাড়ী কিনা...”

গনশার মতলব বের করায় কত বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়, গোরাক্ষী পরম আগ্রহে বলিয়া উঠিল—কি মতলব র্যা গনশা ?”

“বুড়ো সেই খইচুরের কথা ব'লেছিল..”

“দিয়েছে না কি ?”—বলিয়া গোরাক্ষী মশারি জড়াইয়া এক রকম পড়-পড় হইয়া নামিয়া গনশার সামনে দাঁড়াইল ।

গনশা বলিল—“দেয় নি ; তবে—তবে বাড়ীতেই ত আছে...”

গোরাচাঁদ গনশার দিকে একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকিয়া একেবারে গলা নামাইয়া বলিল—“চুবি ?”

গনশা উপবে নীচে মাথা নাড়িল।

গোরাচাঁদ ঝোলটানার শব্দ করিয়া বলিল—“কেই না দেখছে !... আর এসা চমৎকার খইচুর এখনকার গনশা ; সন্দেহ রসগোল্লা ফেলে...”

“ভাঁড়ার-ঘব কোনটে জানিস ?”

গোরাচাঁদ আবার ভাঁড়ার-ঘর চিনিবে না—তাও স্বপ্নরবাড়ীর। বলিল—“উঠানেব ওদিকে রান্নাঘরের পাশে ... হ্যাঁ রে গনশা, আমার ত একটা-আধটাঘ হবে না ক’মে গেলে ওরা সব টের পেয়ে যাবে না ত যে জামাই বাস্তবে উঠে এই কাণ্ডটি...”

“গা-গ-গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ! আগে চল আলো নিয়ে, যদি তালা দেওয়া থাকে ত আবার—”

গোরাচাঁদেব বুকটা যেন ধসিয়া গেল ; ভীত, নিরাশ-দৃষ্টিতে বলিল—“তাহ’লে ?”

“স্ন না, ইডিয়ট !” বলিয়া গনশা তাহাকে একটা ঠেলা দিল। বালিশের তলা হইতে দেশলাইটা লইল।

প্রদীপ লইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইতে গোরাচাঁদ বলিয়া উঠিল—“তোরাই মতলবের ওপর আমার এক মতলব এসে গেল গনশা,—রান্নাঘরটাও অমনি একবার দেখে নিলে হয় না ? কপাল যেমন তাতে যে কিছু পাব... তবু ধব যদি ওবেলার ভাজা মাছটা-আশটা ”

গনশা বলিল—“হ্যাঁ চল ; কখন কখন জল দিয়ে পাস্তা ক’রেও রাখে মেঘেবা—খুব তোয়াজ বোঝে কিনা,—নেমস্ত্রয় খেয়ে শরীরটা গবম হবে ”

উঠান পার হইয়া বকে উঠিয়া গোরাচাঁদ উৎফুল্ল ভাবে বলিল—“তালা দেওয়া নেই রে গনশা ! ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে চাইলেন !”

ভগবান সত্যিই মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। ঘরে প্রবেশ করিতেই দুই জনে দেখিল—সামনে একটা শিকের টাডান একটা বেশ বড় সাইজের হাঁড়ি, তাহার উপর একটা জাম-বাটি, তাহার উপর একটা কড়া ; পাশে আর একটা শিকের একটা পিড়লেক কড়া।

একটা বিড়াল উনানেব পাশে বসিয়া ছিল, ইহাদের দেখিয়া লাফাইয়া জানালায় উঠিয়া বসিল।

গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি গিয়া পিতলের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বাহির কবিয়া লইল, উল্লাসে চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—“দুধ রে গনশা—মিষ্ণু !”

গনশা বলিল—“নামা !”

চঞ্চল হাতে নামাইতে গিয়া একটু সরস্বত দুধ ছলকিয়া গোরাচাঁদের কপালেব উপরটায় পড়িয়া গেল। ঝাঁ-হাতে সরটি মুছিয়া মুখে দিয়া গোরাচাঁদ বলিল—“বেশ মোটা সর রে। দুটো বাটি পাওয়া যেত ”

গনশা বলিল—“আগে হাঁড়ির শিকেরটা দেখে নে। .. এই রে তোয় কপালে কড়ার কালি লেগে গেল যে !”

সৌন্দর্যের দিকে গোবাচাঁদেব খেয়াল ছিল না। “ঠিক বলেছিস,—দুধটা শেষ পাতের জিনিষ কিনা”—বলিয়া কপালটা ডান হাতে মুছিয়া অস্ত্র শিকারীর দিকে অগ্রসর হইল।

গনশা বলিল—“আমি ধরছি শিকেরটা ; তুই একটা-একটা ক’বে পাড়। আবার জামায় হাতটা মুছলি বুঝি ?—এ, ভূত হয়ে গেলি যে !”

গনশা শিকের একটা দড়ি ধরিল। গোরাচাঁদ উপরের কড়াটায় আঙুল ডুবাইয়া বলিল—“ঝোল, গনশা !” আঙুলগুলি চালাইয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল—“মাছের ঝোল !”

আর তর সহিতেছিল না, গোটাকতক মাছ বাহির করিয়া মুখে ফেলিয়া আনন্দের চোটে গনশার হাতটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল—“পুঁটিমাছের টুক মাইরি !”

গনশার উচু-করা মুখে জল আসিয়াছিল, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—“তাহ’লে হাঁড়িতে নির্বাণ পাস্তা আছে ; জামবাটিটা দেখ ত। ... আমার হাত ধরতে গেলি কেন ?—দেখ ত—আমায়ও বাদব বানিয়ে ছাড়লি।

বিড়ালটা জানালায় উপব ডাকিল—“মিউ !”

গোরাচাঁদ বলিল—“তাড়া ত বেটাকে !... ভাগীদার জুটেছেন !”

গনশা বলিল—“না, না, আমি এক মতলব ঠাউরেছি,—

যাবার সময় সব ফেলে-ছড়িয়ে বেড়ালটাকে ধরে বন্ধ ক'বে যাব।”

“তোমার এতগুলো মাথায় খেলে, মাইরি!” বলিয়া গোরচাঁদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল, তাহার পর বলিল—
“ঠিক ক'রে ধরিস্ আমায়; হাতটা কাঁপছে।”

৬

কড়াটা বাঁ-হাতে একটু তুলিয়া জামবাটির মধ্যে হাত দিতে যাইবে এমন সময় বাহিরের রকের একোণটায় বাঘা উৎকট স্ববে ঝাঁউ ঝাঁউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। একে আচমকা, তাষ চোবের মন, দুই জনেই একসঙ্গে চমকিয়া উঠিল এবং তাহাদের হস্তদ্ব্যুত দড়ি ও কড়াটা কাঁপিয়া গিয়া কড়াটা ঝাঁকিয়া প্রাণ অর্ধেকটা অঘলের মাছ আর ঝোল হড় হড় করিয়া গোরচাঁদের মাথার উপর পড়িয়া গেল। গন্শা একটা লাফ দিয়া পিছনে সরিয়া গেল, কিন্তু তবু সে নিতান্ত বাদ গেল এমন নয়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দরজাব নিকট হইতে আগ্নায়জ আসিল—“বাঘা, আমরা সব; থাম।”

ঝোলে-বোঁজা চোখে কোন রকমে পিট পিট করিয়া চাহিয়া গোরচাঁদ দেখিল গন্শা চোখ দুইটা বড় করিয়া তাহাব দিকে চাহিয়া আছে; অতিমাত্র ভীত চাপা স্বরে বলিল—“আমার সম্বন্ধী—শিবু-দা।”

গন্শা জিজ্ঞাসা করিল—“উপায়।”

আগ্নায়জ অগ্রসর হইতে লাগিল—বিধে-বাড়ীর চর্চা। সবাই রকে উঠিল। শিবু বাহিরের দুয়ারের কড়া নাড়িয়া ডাকিল—“বাবা, ও বাবা!...নিধে...দু-জনেই নিঃসাড়...এই নিধে।”

কর্তার গলারই উত্তর হইল—“এলি তোরা? জামাই এসেছেন।”

দুয়ার খোলার শব্দ হইল। প্রবেশ করিতে কবিত্তে শিবু প্রশ্ন কবিল—“আমাদের গোবচাঁদ?—কখন এল?”

গন্শা ফিস্ ফিস্ কবিয়া ডাকিল—“গোবে।”

গোরচাঁদ কাঠ হইয়া গিয়াছে; একবাব নিজের অন্তর্নিহিত শবীরটা দেখিয়া বিহ্বলভাবে গন্শার পানে চাহিয়া রহিল।

সদর-দুয়ারে কবাঘাত হইল। গোরচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল—“কি কববি বল ত গন্শা? কাপড়-জামাটা ছেড়ে...”

গন্শা বলিল—“পাগল!—সময়ই বা কোথায়? আর স্ট্রট্‌কেসটাও বাইরে।”

ঘন ঘন করাঘাতের সঙ্গে তাগাদা হইল—“গোরচাঁদ দোর খোল হে!”

“জামাইবাবু!”

গন্শা অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া বলিল—“পালাতে হবে গোবে,—খিড়কিটা কোন্ দিকে বন্ধ ত?”

এত বিপদেও গোরচাঁদের এসম্ভাবনাটা মনে হয় নাই; চব্বম বিশ্বস্বেব সহিত নলিল—“পা-লা-তে হবে? খণ্ডববাড়ী যে!...আর সত্যিই ত, তা না হ'লে...”

বাহিরে শোনা গেল—“নিধে, তুই ওদিক থেকে একটু হাঁক দে ত। শালা যেন কুস্তুর! আর চাকরটাই বা কি রকম! দোর খোল হে!”

জোর কড়ানাড়ার শব্দ হইল কপাটে দু-একটা লাথিরও ঘা পড়িল।

এমন সময় যেখানটা কুকুর ডাকিয়া উঠিয়াছিল সেখানটায় নিধিবামের শব্দিত কণ্ঠ শোনা গেল—“দাদাবাবু, রান্নাঘরে আলো দেখছি যে! মা-ঠাকরুণ জ্বলে বেখে গিয়েছিলেন না কি?”

“কই না!...হে বাবা তারকেসব!!”—মেয়ে-গলাব কাঁপা আগ্নায়জ হইল।

খানিক ক্ষণ একেবারে চুপচাপ। শিবু নিধিবামের কাছে আসিয়া বলিল—“সত্যিই ত! আর দু...”

গোরচাঁদ এক হুৎকারে আলোটা নিবাইয়া দিল।

গন্শা বলিল—“কি করলি?—গদা!”

“নিবিয়ে দিলে—চোর!—চোর!!...বাবা জেনেসুনে চোর চোকালে বাড়ীতে!...নিধে?”

“দেখলাম জামাই—সেই রকম মুখচোখ, কথাবার্তা; দিবি প্রণাম করলে...”

“তবে আর কি!—প্রণাম করলে!...শিগ্গির খিড়কি আগলোগে নিধে; নিশে বাঙ্গীকে হাঁক দে—ও রতনের মা...ও সামন্ত—সামন্ত!”

একটু দূরে বনের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসিল—
“এজ্ঞে !”

“শিগ্গিব এস—সড়কিটা হাতে করে—হুশালা চুকেছে।”

“এলাম। সটকায় না যেন, একসঙ্গে গাঁথব। বতনের মা, তোব সেই কাটারিটা নিষে বেরো।”

গন্শা আর গোরাচাঁদ ঘর ছাড়িয়া উঠানের মাঝামাঝি জুড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, গোরাচাঁদ, একসঙ্গে গাঁথার কথায় একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

আওয়াজ হইল—“নিষে !”

“আমি এই খিড়কিতে—বাধাকে নিয়ে।”

গন্শা চারি দিকে চাহিয়া নিরাশ ভাবে বলিল—“কি করা যায় ?...”

তাহাব পর হঠাৎ গোবাটাঁদের পায়ের নিকট হইতে একটা আদ্য-ইট কুড়াইয়া লইয়া বলিল—“হয়েছে—চল খিড়বির দিকে ; তুইও পিড়েটা তুলে নে।”

গোরাচাঁদ শঙ্কিত ভাবে বলিল—“খুন ক’বে পালাবি নাকি—নিধেকে ?”

গন্শা বলিল—“আর বাধাকে...কয়ত কি খু-খু-খুন হবো—সামস্তর সড়কিতে ?...কোনটে খিড়কি ?—এগো।”

কি হইত বলা যায় না, কিন্তু এই সময় কুকুরটা হঠাৎ নিধিরামের নিকট হইতে উদ্ধৃৎসে কি একটা তড়া করিয়া রান্নাঘরের পিছনে গেল এবং সেখানে থাকা গাড়িয়া বসিয়া উচুমুখে প্রবল সোবগোল লাগাইয়া দিল।

শিব একটু লক্ষ্য করিয়া বলিল—“আবার রান্নাঘর চুকেছে ; সব এই দিকটা চলে এসো—এখনও আছে শালার ; নিধে আষ দিকিন্, সামস্ততে আব তোতে পাঁচিল ডিজির ওঁদকে পড়।...বাধা ঠিক চোখে-চোখে রাখবি ঐ ভাবে।”

বাধা রাখিতেও ছিল,—কালো বিড়ালের মত শব্দ আর তাহার নাই। বাধাহীন খিড়কিতে নিধিরামের পা

থবু থবু করিয়া কাঁপিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া আঁ সবিক্রমে বলিল—“হ্যা, ওঠ ত সামস্ত খুঁড়ো ; সড়কিটা ধরে থাকি তত ক্ষণ...”

গন্শা ও গোরাচাঁদ গিয়া খিড়কি ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ছি যেই বুলিল নিধিরাম সরিয়া গিয়াছে, দোর খুলিয়া অ আন্তে বাহির হইল। গন্শা খুব সন্তর্পণে শিকলটা তুঁ দিল। খুব অন্ধকাব ঝোপঝাপ। গোরাচাঁদ অগ্রসর হই হাতটা পিছনে করিয়া গন্শার জামা ধরিয়া খুব চাপা গ বলিল—“আয়, একটু ঘুরে গিয়ে সদর বাস্তা।... সব নি, ওরা বাড়ী নিয়েই থাকবে একটু।”

এত বিপদেও বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তাহার এ দীর্ঘশ্বাস পড়িল। বলিল—“একটা রাতও কাটল না।”

গন্শা কালসিটেব ব্যাপারটা স্বরণ কবিয়া শুধু এক প্রশ্ন করিল—“পানাপুতুর নেই ত ?”

* * *

শিবপুরে ষ্ট্রামার-জোটির রেলিঙে হেলান দিয়া মুখো হইয়া দাঁড়াইয়া—রাজেন, জিলোচন, কে. গুপ্ত, গন্শা ও গোরাচাঁদ। রাজেন প্রশ্ন করিল—“তার পর, গোরেব স্বা বাড়ী কেমন লাগল গন্শা ?”

জিলোচন প্রশ্ন করিল—“এক বাস্তির থেকেই চলে এলি বড় ?”

গোরাচাঁদের মনটা অপ্রসন্নই ছিল, একটু ব্যঙ্গের ব উত্তর করিল—“সস্তরবাড়ী এক রাস্তিবের বেশী থাকলে থাকে নাকি ?”

গন্শা কুটা না কি একটা দাঁতে কাটিতেছিল ; গা দিকে চাহিয়া বলিল—“আসতে কি দি-দ্ধিতে চাষ। অনে-কটে...”

আর শেষ করিতে পারিল না। কথাটা বাড়ী ঘে করিয়া আটকানোর সঙ্গে এমন মিলিয়া গেল যে আপনিই তাহার গলার মাঝপথে বাধিয়া গেল।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

পূর্ব পরিচয়

[মানুষের মন উপজাতিটির বৈশাখ হইতে আধুনিক পর্য্যন্ত গল্পাংশ নিয়ে দেওয়া হইল। ইহাব পর হইতে উপজাতিটির নামকরণ হইল "ত্রিবেণী"।]

ধনী জমিদার শচীন্দ্রনাথ শ্রাবশে ত্রিবেণীর কুস্তমেলায় তাব হুমরা পত্নী কমলা ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে বহু অমুসন্ধানের পর হতাশ-ভয়চিন্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লগনে পৌঁছেই জরে বেহাশ হয়ে পড়ে। লগনে পালিত পিতৃহীন চাকুরীজীবী পার্কেতা অক্সাঙ্গ সেবায় তাকে সুস্থ করে এবং বিবাহিত না জেনে তাকে ভালবাসে: সুস্থ হয়ে কুতজ্ঞ শচীন্দ্র তাকে নিজের দুঃখের ইতিহাস বলে এবং কুন্তিতচিন্তে তার প্রেমগ্রহণে অক্ষমতা জানায়। পরে শচীন্দ্রের অনুরোধে পার্কেতা ভারতবর্ষে ফিরে কমলার স্মৃতিকল্পে এক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুরী।

এদিকে বৎসরের পব বৎসর নারীপ্রতিষ্ঠানের চক্রে আবর্তিত কার্যপকপনায় পার্কেতার মন এক এক সময় শান্ত হয়ে পড়ে, তবু তার অন্তর্নিহিত প্রেমের মোহে শচীন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে দূবে যেতে পারে না। শচীন্দ্রের অন্তরে কমলার স্মৃতি ক্রমে নিশ্চিন্ত হয়ে আসে, তবু জীব প্রতি একনিষ্ঠতায় অত্যন্ত তার চিন্ত পার্কেতার এতক্ষণ জীবন্ত প্রেমের প্রভাবকে জোব করে অধীকার করে অথচ পার্কেতার প্রতি কুতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার হৃদয়ে তাব আকর্ষণ বেড়ে চলে। এই ধর্মের আলোয় "তার চিন্ত দোলায়মান।

প্রবাগ থেকে মাতাল উপেক্ষনাথ কমলাকে ধাক্কা দিয়ে কলকাতায় এনে তার বাড়ীতে বন্ধ করে এবং অত্যাচারে বশীকৃত করবার চেষ্টা করে। একদা এহারে জর্জবিত্ত কমলা পাশের বাড়ীতে নন্দলাল ও তার স্ত্রী মালতীর আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে পড়ে এবং বহুদিন কঠিন পীড়ায় অজ্ঞান থেকে তাদের সেবায় বেঁচে ওঠে কিন্তু সমস্ত নামের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। নন্দা শিক্ষিত ব্যবসায়ী। স্বভাবতীক। কমলের রূপে আকৃষ্ট। প্রাণপ্রণ চেষ্টাতেও নিজেকে বেশে আনতে না পেরে এখন লোভাতুরচিন্ত। কমলা এই দুর্দৈব থেকে মালতী ও নিজেকে বাঁচাবার জন্তে এক হাসপাতালে নামের কাজ শিখতে যায়। সেখানে ডাক্তার নিখিলনাথের সহায়ত্ব ও সাহায্য লাভ করে। এদিকে গ্রেহরী সরলা মালতী কমলার পুত্র অজ্ঞানকে তার নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের সব স্নেহইচ্ছা উজ্জ্বল করে ভালবেসেছে—কমলাও তাব নিজের বোনেরই মত। এ বাড়ীতে কমলাকে নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোৎস্না।

নিখিলনাথ পাঠ্যাবস্থায় বিদ্যবীমলে যোগ দিয়ে জেল খেটেছিল। এখন পরিবর্তিত জনহিতব্রতী। একদা বিদ্যবী মেয়ে সীমার আস্থানে শ্রীরামপুরে গিয়ে তার পূর্ব নায়ক সত্যবানকে এক পোডো বাড়ীতে স্মৃতকল্প অবস্থায় দেখে। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে তার অসাধারণ বলে মনে হয়। তার সেবা, একাকী তার কুজুসাধনের নিষ্ঠা দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সত্যবানের মুখে পুলিশের গুলিতে তাদের

দলেব সকলের মৃত্যু, নিজে আহত অবস্থায় সীমাব সাহায্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বনে জঙ্গলে, পরিত্যক্ত কুটীবে গালিষে বেড়ানোর ইতিহাস, সীমার বীরত্ব এবং বেশপ্রীতির কথা শুনে এবং নিজের চোখে তাব শ্রান্তিহীন একনিষ্ঠতা দেখে তার প্রতি অমুসন্ধ হয়।

বিদ্যবের আশ্রমে এতগুলি মহামূল্য প্রাণকে বিসর্জন দেওয়ায় মৃত্যুকালে অমুসন্ধ সত্যবান সীমাকে এই আশ্রম থেকে বাঁচাবার জন্তে নিখিলনাথকে বলে।

নন্দলাল হাসপাতালে আশ্রয় হিসাবে কমলার সঙ্গে প্রবেশই দেখা করতে যায় এবং তাব বিকৃতচিন্তের আক্রোশ একদা নিখিলনাথ সম্বন্ধে কমলাকে অপমান করে এবং তারই সঙ্কেতে কিছুদিন তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

৩৩

"ওগো স্তনছ? জ্যোৎস্নাদিকে কতকাল দেখি নি বল ত? একবার তাকে নিয়ে আসবে এই শনিবারে?"

কথাটা শুনে যেত সহজ নন্দলালের কাছে কথাটা তত সহজ নয়। নিখিলনাথ সম্বন্ধে সেদিনকার সেই কুৎসিত উজির পর কমলার কাছে যাওয়া এক দিক দিয়ে তাব পক্ষে যেমন লজ্জাকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এক দিকে কমলার এই বিরূপতা তার মনটাকে তিক্ত করে ভুলেছে। তার নিজের বাসনার উত্তেজনার কমলার প্রতি তার মনেব ভাব প্রায় ক্রোধেব পর্য্যায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জ্যোৎস্নার মনে কি কুতজ্ঞতা বলে কোন বস্তু নেই? বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে "কুতজ্ঞতা" বলতে নন্দ উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করে নি।

নন্দলালের মনের চিন্তার এই ধারা কিছু দিন তার মনটাকে কমলার প্রতি ক্রোধে উত্তপ্ত করে রেখেছিল। কিন্তু অনেক দিন অতিবাহিত হলেও এখন সে অপব পক্ষ থেকে কোন উত্তেজনার সাড়া পেল না এবং দিনের পব দিন ধীবে ধীরে তার চিন্তেব উত্তাপ স্তিমিত হয়ে এল এখন সে আবার কেমন করে জ্যোৎস্নাব বিশ্বাস ফিরিয়ে পাবে তারই উপায় চিন্তা করতে লাগল।

কিছু দিন খোঁচাকে সে চাকবের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল—নিজে ওপথ মাড়াল না। তার পর আরও কিছু দিন সে নিজে গিয়ে দরোয়ানের কাছে দিয়ে এবং নিয়ে আসতে লাগল। কমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার হুঁসাস তাব হ'ল না। তা ছাড়া তার ব্যবহার যে অহতাশঘটিত এবং লোভের

পর্যায়ভুক্ত নয় এমনটি দেখানোরও ভাব তার মনে ছিল। জ্যোৎস্নার মনের অবস্থাটা কি, তা না-জানতে শেরে আড়ালে খোকাকে প্রশ্ন করতে লাগল। বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারল না। মনে মনে জ্যোৎস্নার মনোভাব জানবার জন্তে সে ছটকট করতে লাগল।

জ্যোৎস্নাকে সে অনেক দিন দেখে নি। তার মনেও তাকে দেখবার ইচ্ছা কিছু কম ছিল না। নিজের বাড়ীতে অনলে সে হুযোগ সহজে ঘটেতে পারে বটে, কিন্তু জীব সামনে আছে অশোভন কিছু ঘটে কিংবা তার চেয়েও বিপদের কথা জ্যোৎস্না যদি ওর কাছে কোন কথা ফাঁস করে দেয় তবে আর মুখ দেখাবার আশ্রয় থাকবে না। কোন কথা যে সে স্ত্রে প্রকাশ করবে না এ-সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিত ধারণা তার মনের মধ্যে অবস্থ ছিল। জ্যোৎস্নাকে সে বত দূর দেখেছে তাতে ব্যস্ত হয়ে অশোভন কিছু করবার মত চপলতা যে তার নেই এ সে জানত; তাই তার মন কমলের প্রতি কতকটা কৃতজ্ঞও ছিল বটে—তবু ভয়ও তার ঘুচে চায় না—জীলোক—!

এমন সময় মালতী এক দিন তাকে বললে—কতদিন ভাবে আন নি বল ত? আজকাল তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ। দ্বিদির আর তেমন করে খোজধরই কর না। তোমাদের সবই নতুন নতুন।

—তুমি আমার ‘নিতাই নব’—কি বল?

মালতী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—ঢ়! আর রসিকতায় কাজ নেই। বড়ো বয়সে ঢ় বাড়াচ্ছে। সমস্ত দিনরাতের মধ্যে চোখে দেখবার জো নেই, তার আবার কথা!

—গুগো সেও তোমারই জন্তে। কাজের চাপে সময় করে উঠতে পারি কই? আর কটা বছর সবুর কর, তবু পর বুঝলে কি না—হেঁ হেঁ—

—বুঝছি গো সব। ব্যবসা ছুনিয়াতে ত কেউ আঁহ করে না, সবাই যেন দিনরাত পাগলের মত হেঁ হেঁ করে বেড়ায়, না?

—দেখো আগছে বছর, যখন গাড়ী কিনব। তখন যেখানে খুশী—

মালতী আবার ঝাঁজিয়ে উঠল—গাড়ী-গাড়ী বাড়ী-বাড়ী করে দেহটা কি করেছ একবার দেখতে গাও? একটা শক্ত ব্যায়রাম-সায়রাম না হয়ে পড়লে তোমার বনস্বামনা ত সিদ্ধি হবে না। রাতদিন ঘুরে ঘুরে শেষে যদি বিছানায় পড়ে থাক তখন কি হবে বল ত? ও-সব আমি শুনতে চাই নে। তুমি দ্বিদির শনিবারে নিয়ে আসবে কি না তাই বল।

—তোমার দ্বিদির আনতে ত এখন লোকের দরকার

হয় না। তিনি ত এখন স্বাধীন জেনানা, লিখে দ আসতে। লোকের অভাব হবে না গো।

নন্দলাল আনতে গেলে কমলা যে আসবে না; এক রকম নিশ্চয়ই জানত। তা ছাড়া, সেদিনের পর গতিক না বুঝে কমলার কাছে বাগ্গার সাহস সে সক্ষম পারছিল না। তবু মনের ঝাঁজটুকু সামলাতে পারলে

মালতী বললে—ও আবার কি কথার ঢ়? কেন, বুঝি আর একটু সময় করে গিয়ে নিয়ে আসতে পা ওগো একটু সময় দিলে তোমার ব্যবসা একেবারে পড়বে না।

—ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকতে ব্যবসা কেল পড়া কি কথা? কিন্তু তুমি কখনও যাবে না আর সে যদি রাগ না আসে ত আমি গেলেই কি আসবে?

—আমি জানি না বাপু; ঘরসংসার সামলে, খে নিয়ে আমার ফুরহু কোথায় বল ত?

—তা বটে, এত আর ব্যবসা নয়। আধ কটা না খা চাকরবাকর সব ঘর-সংসার লুটপাট করে রসাতলে দেবে

—দেবেই ত? না সত্যি, তুমি যাও দ্বিদিরকে বলে-কয়ে নিয়ে এস।

—সে আমি পারব না। তোমার দ্বিদিরকে পার গিয়ে নিয়ে এস—আমি বড়জোর সঙ্গে যেতে পারি।

অনেক বাকবিত্তার পর সেই কথাই ঠিক হ'ল। বার সকাল-সকাল করে নন্দ জী এবং খোকাকে জ্যোৎস্নাকে আনতে যাবে।

৩৪

সেদিন নন্দলাল চলে যাবার পর কমলাকে এই ক বিচলিত করে তুলেছিল যে পৃথিবীতে তার এই অ জীবনের কি আবশ্যক আছে। তার বেঁচে থাকায় কোন উপকারে সে এল। খোকনের জন্তে সংসারে জীবনধারণের যে দায়িত্ব তা যে কোনও দিন সে পেতে নিজের উপর তুলে নেবার অবকাশ পাবে সম্ভাবনা সে দেখতে পেল না। সন্তানহীন মালতীর থেকে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে বাগ্গার যে নিষ্ঠুর তার মাতৃস্নেহে বার্ষবে। অথচ নন্দলালের গৃহে তার স চিরকাল প্রতিপালন করতে হবে এ চিন্তা তার পক্ষে চিন্তের এই নিরুপায় উদ্বেগের উদ্বেজনায় তার মনে লাগল যে মৃত্যু ব্যতীত এর বুঝি কোন সমাধান তার জীবনের উপর, তার অভিশাপগ্রস্ত রূপের উপর দ্বিদ্ধার জন্মে গেল। কিছু দিন তার মন যে কর্মপ্রা মধ্যে শান্তিলাভ করেছিল সে শান্তি তার মন থেকে

গেল। তার নিদারুণ এই যন্ত্রণার মধ্যে এমন একজন লোকের কথা সে ভাবতে পারে না যার কাছে হৃদয়ের ভার মোচন করে এই আত্মঘাতী চিন্তা থেকে সে নিষ্কৃতি পায়। মালতী তাকে ভালবাসে বটে, কিন্তু তারই স্বামীর বিরুদ্ধে তার কাছে সে নালিশ জানাবে কোন লজ্জায়। তা ছাড়া তাদের নিরাময় নিশ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যে জেনে শুনে সে এই সর্বনাশের বীজ বপন করবে কেমন করে। তবে সে কি করবে? এই নূতন সর্বনাশ থেকে মালতীকে এবং নিজেকে বাঁচাবে কেমন করে?

দিনে রাত্রে তার স্বস্তি অস্বহিত হবে তাকে পীড়িত করতে লাগল। কয়েক দিন খাওয়াদাওয়া একরকম সে পরিত্যাগ করলে। শুধু মুখে কিছু রোচে না বলে নয়; নিজের হৃদপন্থে দুর্ভাগ্যকে নিষ্কৃত করবার অস্ত্র কোনও সহজ উপায় চিন্তা করে উঠতে পারে নি বলে। আত্মহত্যা করার সাহস বা উদ্যম তার ছিল না কিন্তু আত্মনিগ্রহের চেষ্টাকে তার অস্বাভাবিক অকারণ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে সে যে এক প্রকার আত্মবিনাশের আত্মদান পায় তার থেকে নিজেকে সংযত করতে সে চায় না। এমনি করে করে একদা সভাই সে পীড়িত হয়ে পড়ল।

নিদারুণ মাথাব্য যন্ত্রণা। যন্ত্রণায় যেন সে পাগল হয়ে যাবে ক্রমে সে-যন্ত্রণা এত বেড়ে উঠল; এমন ক'বে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'বে আনতে লাগল যে তার মনে হ'ল এর থেকে তার বুদ্ধি আর নিষ্কৃতি হবে না; এবার সে বাঁচবে না; এবং এ কয়দিন যে-মৃত্যুকে তার বরণীয় বলে মনে হয়েছিল তারই আতঙ্কে তার সমস্ত মন যে এমন অভিভূত হয়ে পড়তে পারে এর রহস্য কে নির্ণয় করবে? তার স্বামীর মুখ সে কোন দিন আর দেখতে পারে না এই চিন্তায় তার হারানো স্বামীর জন্তে অনেক দিন পরে তার নিরুদ্ধ অশ্রুশাশি উদ্বেল হ'বে উঠল। বোর নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে কেমন করে যে তার স্বামীকে কিরে দেখবার আশা বেঁচে ছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়। এই নিঃসহায় অবস্থায় তার মনে নিখিলনাথের কথা জেগে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ হ'ল যে নন্দ সম্ভবত অশেষধনের চেষ্টা থেকে ইচ্ছা করেই বিরত থেকেছে; এবং নিখিলনাথকে জানালে এতদিন একটা উপায় হতেও পারত। এতদিন নিখিলনাথকে জানায় নি বলে তাব অলুশোচনা হ'ল এবং নিখিলনাথকে কোনও স্বেচ্ছায় সমস্ত কথা খুলে বলবে বলে মনে মনে সংকল্প করলে।

৩৫

সীমা তার কাঙ্ক্ষণ সমাধা করে রোগীর রাত্রের পথ্য প্রস্তুত ক'বে নিয়ে হলঘরে ফিরে এল। তখন নিতান্ত শান্ত হয়েই বোধ হয় সত্যবান চুপ করেছে—এবং খোলা

দরজার মুক্তপথে বাইরের ঘনকণ্ঠ নিরেট অন্ধকারের উপর তার নিনিমেষ দৃষ্টি রেখে রোগীর পাশে শুক হয়ে বসে আছে নিখিলনাথ। মনে হয় যেন তার তীক্ষ্ণ স্মৃতিশ্রী দৃষ্টির নিম্নত একাধি চেষ্টায় সে ঐ অন্ধকার কালো পাথরটার মধ্যে ছোট একটু ছিদ্রপথ সৃষ্টি করতে চায়, আনন্দময় অনন্ত আলোকের একটি মাত্র রশ্মিরেখাও যার অবকাশে তার দিশাহারা চিস্তের মধ্যে মুক্তি লাভ করতে পারে।

সীমা এসে পথ্যটি বোগীব মাথার কাছে সযত্নে ঢেকে রাখল। পিঁপড়ের ভয়ে একটা কেরোসিন তেলের জ্বালা দিয়ে বিছানার চারিপাশ পরিষ্কার করে মুছে নিলে। টুকি-টাকি সব গোছগাছ করে রেখে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

নিখিলনাথ বসে মনে মনে এই মেয়েটির নিরবচ্ছিন্ন কণ্ঠের বিরামহীন ধারাব কথা আলোচনা করছিল। ক্লান্তি যেন এই মেয়েটির অপরিচিত অথচ কোনো আতিশয্য বা সঙ্কেচ এর কোনো কাজের সৌষ্টবতে কুটিত করে না। ও যেন শান্তিত তীরের মত—তেম্নি তীক্ষ্ণ, তেম্নি ক্ষিপ্ত, তেম্নি সঙ্গীহীন, তেম্নি লক্ষ্যপথে অমোঘ গতি বোধ হয় তেম্নি ভয়ঙ্কর। কোন্‌ মন্ত্রে সত্যবানের হাতের জ্যামুক্ত এই অগ্নিবাণকে সম্বরণ করে জীবনের অমৃতরসস্রাব্য শান্তির পথ সে দেখাবে? বিচ্ছুরিত বিদ্যাবহিক বিগলিত করে তাকে সে ধারাবর্ষণে পবিত্র করবে কোন্‌ মন্ত্রমন্ত্রে? সত্যবানের উপর অসহায় অভিমানে তাব মন বিজ্রোহ করে উঠতে চাইলে। সীমাকে এমন একান্ত বিপদের মধ্যে নিঃসহায় ফেলে রেখে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে সত্যবানের এই মুক্তিকে তার স্বার্থপরের মত বোধ হ'তে লাগল। সীমার প্রতি অপরিণীম কল্পণায় তাব হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল এবং সীমাকে এই সর্বনাশ থেকে, এই মৃত্যুর পথ থেকে, এই মহেশ্বের উন্নততা থেকে উদ্ধার করবার জন্তে মনে মনে বারবার সে প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণ করতে লাগল। সে এই প্রতিজ্ঞার স্বত্রে, তার নিজেরই গোপন অবগাঢ় মনের বাসনার প্রেরণায়, নিজের অগোচর সত্যবানেরই ইচ্ছা যে প্রতিপালন করতে চলেছে একথা তার মনে রইল না।

এমন সময় একটা পুঁটলী-হাতে পাশের ঘর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। মন্ডলা কাপড় হাঁটু উপর গাছকোমর করে পরা, ফতুয়ার উপর একটা গামছা জড়ানো, মাথায় একটা টোকা। সেই স্বল্প আলোকে নিখিলনাথ মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখল। কলেজে-পড়া শব্দজ্ঞান বর্ণনা তার মনে পড়ে গেল “ইয়মহিকমনোজ্ঞা বন্ধলেনাপি তন্নী” এবং অকারণেই সে অন্ধকায়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সীমা মাথার টোকাটা খুলে ফেলে কাছে এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে বললে, “চলুন আপনাকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি।” তার মুখে অনাবশ্যক লজ্জা বা অস্বাভাবিকতাব

আভাসমাত্র ছিল না। এই অর্ধপরিচিত পুরুষটিকে যে জীর্ণনোচিত কোনরূপ সঙ্কোচের ব্যঞ্জনা যথিত করা আবশ্যিক, তার নিতান্ত ভাববিহীন মুখে তার কোনো চিহ্নমাত্র নাই। ব্যাপারটা সামান্যই কিন্তু নিখিলনাথের পৌরুষ আজ দ্বিতীয়বার যেন লুক্কালকের মত তিবন্ধার লাভ করলে। অকারণেই সে নড়েচড়ে সংযত হয়ে বসল।

ঠিক সেই সময় দারুণ যন্ত্রণায় সত্যবানের শরীরটা চক্ৰলিত সাপের মত মোচড় দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। দুই জনই এক সঙ্গে তার উপর ঝুঁকে পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণায় সত্যবানের চোখ সেই প্রায়াক্ষকার শূন্যকে যেন ছুঁড়ে ছুটে বরতে চায়,—ছুটো জলন্ত গুলি যেন, বন্দুকের নলব মুখে এসে আটকে গেছে। নিখিলনাথ তার ভাস্করী জীবনের বহু মৃত্যুদৃশ্যের অভিজ্ঞতাব মধ্যেও যন্ত্রণার এমন বীভৎস এমন প্রকট মুষ্টি কখনও দেখে নি। কি করবে কিছুই দিশা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হাতে তার পকেট-কেস বার করে আবার একটা ইন্ডেক্সের আয়োজন করতে লেগে গেল।

নিখিল কম্পিত হাতে সব ঠিকঠাক করে রোগীব দিকে যখন মন দিলে তখন রোগীব দেহ স্থির হয়েছে। সীমা নিঃশব্দে শুক হয়ে বসে আছে অসহায় দু-খানা হাত সত্যবানের গায়ে মাথায় অকারণে রেখে। তার সমস্ত ভঙ্গীটির মধ্যে স্নেহের অভিব্যক্তি যেমন পরিস্ফুট নিজেকে অবিচলিত রাখার ভাব তেমনি স্থম্পষ্ট। বোগীব শান্ত মুখের দিকে চেয়ে নিখিলের বুকা ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি সে হাতটা নিয়ে তার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করলে—স্টেথস্কোপটা বার করে বারবার মৃদু আশায় পরীক্ষা করতে লাগল। হায় নেই, নেই, কোথাও সেই দীপ্ত শিখার ক্ষীণতম বশ্মিরেখাও চোখে পড়ে না। ভাস্কার হলেও সত্যবানের এই বীভৎস মৃত্যু সে যেন কিছুতেই মনে মনে স্বীকার করে নিতে পারছে না। কিছুতেই মনে বিশ্বাস যেন হয় না যে অভবড় একটা দাবানল দগ্ধ করে নিবে গেছে। চীৎকার করে তার একবার ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছে “সত্যদা”—যদি এই ঘনাক্ষকার নিশীথের দূরতম দিগন্ত থেকেও একটা উত্তর পায়। তবু অসহায় বেদনায় চূপ করেই সে বসে রইল। সীমার দিকে চাইতে তার সাহস হয় না। কেমন করে সে ঐ মেয়েটিকে জানাবে যে, যে-মহাপ্রাণের দীপ্তিকে সে সৌদামিনীর মত বৃকে করে দেশ থেকে দেশান্তরে স্থির রেখে—সে আজ স্থিতিমত। এখন তার বর্ষণের পালা স্বরূপ হবার দিন এসেছে!

কতক্ষণ সে চূপ করে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসেছিল তার মনে নেই। ইঠাৎ সীমার হাতের স্পর্শে সে চমকে ডাকলে “সত্যদা!” অতর্কিতে মনে হয়েছিল বুঝি সত্যবানেরই হাত। সীমা তৎক্ষণাৎ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে

নিঃশব্দ থাকতে ইঙ্গিত করলে। দূরে বাইরে কোথায় একটা আলোবা দগ্ধ করে জ্বলে উঠে আবার নিবে গেল। মুহূর্তের মধ্যে উঠে গিয়ে সীমা ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিলে। অতি অল্পক্ষণ, দু-মিনিটও না-হতে পারে,—তবু মৃত সত্যবানের পাশে বসে তার মনে হতে লাগল সময় যেন নিজের আবার একই জায়গায় ক্রমাগত পাক খাচ্ছে; কিছুতে আর এগোতে পারছে না। বিশ্বাসে এমন কি ভয়ে সে শুক হয়ে রইল। এবং এক সময়, কল্পনাতেই বোধ হয়, কিসের একটা শব্দ অনুভব করে সে মৃতদেহের পাশ থেকে নিজের অজ্ঞাতে সরে বসল। যে-সত্যবান এতক্ষণ তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় ছিল, ইতিমধ্যেই তার মনের অগোচরে সে অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

অল্পক্ষণ পরেই সীমা এসে তাকে বাইরে নিয়ে এল এবং শব্দমাত্র না করে অন্ধকার বনের দিকে অগ্রসর হ'ল। নিখিল আশ্চর্য হয়ে ভাবলে “সীমার কাছে এই মৃত্যুসংবাদ অপরিজ্ঞাত আছে।” সে সীমাকে ধামিয়ে বললে “এখন যাব না সত্যদাকে ছেড়ে।” সীমা তার কানেক কাছে মুখ নিয়ে বললে “বিপদ আছে—একটুও দেবী কবা চলবে না” বলে তার হাত ধবে দৃঢ়পদে বনপথে প্রবেশ করলে। এই মেয়েটির আদেশ যে অগ্রাহ্য করা চলবে না তা মনে মনে অনুভব করে নিখিল অগত্যা বিনা বাকাব্যে তার অনুসরণ করতে লাগল। তাব কেবলই মনে হতে লাগল “সত্যদা একলা পড়ে রইল। মৃতদেহেব প্রতি—সত্যবানের মত মহাত্মার প্রতি—এ যে অসম্মান!”

একটা অপরিণত মেয়ের অস্থূলপরিচালনায় সে তার কর্তব্য পরিত্যাগ করে পলায়ন কবেছে এই কথা চিন্তা করে সে যেমন বিস্মিত হ'ল নিজের প্রতি বিরক্তও হ'ল ততোধিক। সে বারবার নিজেকে সংহত ক'বে নিয়ে এই পলায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু ফলে সে কল্পনায় নিজের মনে সীমাব সঙ্গে অকারণে তর্কবিতর্ক করতে করতে তাবই কোমল হস্তের অব্যাহত আকর্ষণে অগ্রসব হ'য়ে চলল অন্ধকার বনভলের নানা চক্রপথে।

কতক্ষণ তার এমনি করে কত পথ চলেছে নিখিলের তা খেয়াল নেই। এক ঘণ্টাও হতে পারে—কিন্তু তার যেন মনে হয় অল্পক্ষণই হবে—চলতে চলতে তাবা বন থেকে বেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল। নিঃশ্বাস যেন এতক্ষণ অবরুদ্ধ ছিল। অকস্মাৎ মুক্ত বাতাসে এসে সহজে শ্বাস গ্রহণ করতে পেয়ে সে নিজের মধ্যে নিজেকে অনুভব কবলে। রাস্তা উঠে সে তার এতক্ষণের অহতপ্ত চিন্তাকে মুক্তিদান করলে। বললে “সত্যদাকে এমনি করে ফেলে যেতে আমার মন চাইছে না। চল কিরে বাই।”

সীমা নিখিলের হাতটা মুক্ত করে দিয়ে শুক কঠিন স্বরে বললে, “কিরে যাবেন? কোথায় যাবেন কিরে? আর এক

মুহুর্ত দেবী করলেও আপনাকেই কিরিয়ে আনতে পারা যেত না। তা ছাড়া, তাঁকে ত ফেলে যাচ্ছি না। তিনি আমার সঙ্গেই আছেন এ অল্পভূতি যদি আমার স্পষ্ট না থাকত তা হ'লে কি তাঁকে ফেলে চলে আসতে পারতুম? তিনিই আমাকে এখনও চালাচ্ছেন। একথা মুখের নয়। তাঁর দেওয়া কাজের ভার কাঁধে নিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। নইলে আসবার দরকার ছিল না।”

নিখিলনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল এই মেয়েটিই এই নিরুপস্থিতা দেখে। এই মেয়েটিকেই কেমন করে মৃত্যুসংবাদ জানাবে এই ভেবে আবার সে মনে মনে সঙ্কুচিত হচ্ছিল।

সীমার বাইরের আচরণ লক্ষ্য করে নিখিলনাথের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে তার অন্তরে কি শ্রোত বইছে। যে-দেহটাকে পুনর্জীবন দান করবার জন্তে এই কয় মাস ধরে সে অসাধ্য সাধন করেছে অন্যায়সে তাকে সত্যিই জীবনবাসের মত পরিত্যাগ করে সে চলে এল কেমন করে। মনে পড়ল সে-মুগে তারাও প্রাণপণে গীতার শ্লোক মুখস্থ করেছে “বাসাংসি জীবানি যথা বিহায়”, কিন্তু এমন ক'বে কেউ যে জীবনের সত্যে তাকে পরিণত করতে পাবে তা তাব কাছে সম্পূর্ণ অভিনব বোধ হ'তে লাগল। সত্যদাব আদেশ যদি প্রতিপালন করতে হয় তবে এই মেয়েটিকে তাদের জন্তুগৃহ থেকে বক্ষা করতে হবে তাবেই। কিন্তু এ যে কি কঠিন ব্যাপার তা সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। ভবু তার এই চিন্তাধারার অন্তরালে, সমস্ত সম্পদ বিপদের দুঃসহ সমস্যার সমাধানের অবকাশে এই জনশূন্য প্রান্তর, এই নক্ষত্রখচিত অন্ধকার এবং অনন্ত আকাশের বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যে এই যে ছোট্ট একটুখানি সান্নিধ্য, সমস্ত জনতাপূর্ণ কোলাহলময় জগৎ থেকে নিঃসঙ্গ নিবিড় এই যে দুঃজনের নির্ভরপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তার মাধুর্যটুকু তাকে আবিষ্ট ক'বে তুললে। অল্প একটু স্পর্শ, সামান্য একটু নিবেদনের তৃষ্ণায় তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠতে চাইল; কিন্তু কোন প্রকার প্রগল্ভ আচরণের আঘাতে ঐ সমাহিতচিত্ত নারীকে সে তার গভীর মনোলোকের সমাধি থেকে তার নিজের চঞ্চল ভাবলোকের মধ্যে উত্তীর্ণ করার চেষ্টাকে এক প্রকার চপলতা ক'রেই যেন নিজেকে সংযত ক'রে রাখলে।

অনেক ক্ষণ চলার পর একটা পাকা রাস্তায় উঠে সীমা কথা কইলে। তার কণ্ঠ রসলেশহীন। বললে “একথা নিশ্চয় আপনাকে বলার দরকার নেই যে আজকের ঘটনাকে আপনার জীবনের পাতা থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে দিতে হবে; নইলে আপনার বা আমার কাকুরই মজলের সম্ভাবনা নেই। এ-পথ আপনার অপরিচিত নয়, হুতরাং আপনাকে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র। আবার

যদি কখনও আপনার শরণাপন্ন হ'তে হয়, আশা করি সেদিন আজকেরই মত আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হব না।” তার পর অল্প একটু শ্রমে বললে “আর আমার কিছু বলবার নেই। আপনি এই রাস্তা ঘরে সোজা মাইল দুই গেলেই স্টেশন পাবেন। নমস্কার।”

নিখিলনাথ এতক্ষণ নিজের স্বপ্নে বিভ্রমের ছিল। সীমার কথার ভঙ্গীতে অকস্মাৎ যেন একটা কষাঘাতে সম্পূর্ণ জাগ্রত হ'ল। ব্যাকুল হয়ে বললে, “তুমি, তুমি যাবে না? তুমি কোথায় যাবে? ক্রোলা, এই রাস্তা তোমায় ছেড়ে দিতে পারব না। তুমিও স্ন।”

এই বৃহৎ বালকটির ধূঁতায় অবাক হয়েই যেন কয়েক মুহুর্ত নিখিলের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটি রেখে সীমা বললে “নষ্ট করবার বেশী সময় এখন আমার নেই। আমি এখন কোথায় যাব সে-ধরনের বোঝার অধিকারও আমার নেই। আর বৃথা সময় নষ্ট করে অযথা নিজের বিপদ বাড়াবেন না।”

নিখিলনাথ নিজের দুর্বলতা অনুভব ক'রে নিজের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে প্রাণপণ বলে নিজেকে আশ্বস্ত ক'রে নিলে এবং চেষ্টাকৃত সহজ দৃঢ় বশে বলতে লাগল “সত্যবানের অজ্ঞা প্রতিপালনের ভার আমারও উপর কিছু আছে। মৃত্যুশয্যায় তিনি সনির্বন্ধে যে-ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন আচরণ আমাকে তা বহন করবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকেও আমি অল্পবোধ কবছি যে বারবার বিপদের ভয় দেখিয়ে অযথা আমাকে আমার কর্তব্যচ্যুত করবার চেষ্টা ক'বে কোন ফল নেই। সত্যবানের আজ্ঞাভেঁই তোমার স্বর রাখবার অধিকার আমার আছে।”

সীমা হেসে বললে “সত্যবান কি আপনাকে আনার উপর স্পাই নিযুক্ত ক'রে গেছেন নাকি?”

“না, স্পাই তোমার পিছনে যাতে অর না লাগে তার চেষ্টা করবার ভার দিয়ে গেছেন।”

“অর্থায়?”

“অর্থায়, এ-পথের থেকে তোমাকে ত্রিস্ত করবার ভার আমাকে দিয়ে গেছেন।”

সীমার মুখে একটা বিরক্তি ও প্রায়-অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল, বললে “আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবেন। কিন্তু আজ আমার সময় নেই ভাঙারবার। পথে সময়মত আমার ঠিকানা জানাব না-হয়, আপনার নীতিনিদ্রালয়ের পুঁচিপত্র নিয়ে যাবেন তখন। কি বলেন? এর পর দেবী করলে আর গাড়ী ধরতে পারবেন না কিন্তু। নমস্কার।” বলে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না ক'রে কাঁচা রাস্তা বেয়ে সে ফিরে গেল।

এই মুষ্টিমেয় বালিকাটির অবিচলিত দৃঢ়তায় এক প্রকাব

অসহায় ভাবেই নিখিল কিছুক্ষণ সেখানে স্তম্ভিত হয়ে অন্ধকারে পঁড়িয়ে সীমার প্রত্যাগত ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে রইল। ছায়া সেই আবছা আধারে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, ক্রমে তাকে চোখের আলোয় আর প্রত্যক্ষ করা গেল না কিন্তু নিখিলনাথের অন্তরের অস্পষ্ট অন্ধকারের সীমান্তবেশে সে যেন কিছুতেই উত্তীর্ণ হ'তে পারল না।

৩৬

এই কর্মজালের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার কথাটি কেমন ক'রে পার্বতীর কাছে উপস্থিত করবে, শচীন্দ্র এই চিন্তায় আবিষ্ট হ'য়ে কপালের উপর নিজের বাহু গ্রস্ত ক'রে আবার আরাম-চোয়ারে শুয়ে পড়ল। পার্বতী একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। শচীন্দ্রের এমন ভাব-বলক্ষণ তার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল না, স্বভাব ঠিক কি কারণে সে অকস্মাৎ এমন চিন্তাকুল হয়ে উঠতে পারে তা বুঝতে না পারলেও শচীন্দ্র যে কোন একটা বিশেষ কথা তাকে বলতে গিয়ে সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল এইটুকু বুঝতে তার দেবী হয়নি।

সে নিজের গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে “আপনার কিছু বলবার আছে মনে হচ্ছে—যেটা বলতে আপনি বাধা পাচ্ছেন। যদি আশ্রম-সংক্রান্ত কিছু হয় তবে আপনি নিঃসঙ্কোচে বলতে পাবেন। কারণ ইচ্ছে ক'রে না হ'লেও দোষজ্ঞাটি সহজেই হ'তে পারে। তাছাড়া নির্জনে, এই চক্রে আবদ্ধিত কার্যপরম্পরা, মিনের পর দিন সম্পন্ন ক'রে যেতে মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অবলাদ আসে তা আমি স্বীকার করছি—”

শচীন্দ্রের মনটা যে স্বরলোকের বীণার স্বরে এই সন্ধ্যার তমসান্বিত মোহময় মায়াজালের প্রভাবে রণিত হচ্ছিল সেখানে সহসা কঠিন বস্তুজগতের আঘাত পেয়ে সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পার্বতীকে খামিয়ে বললে “এ-কথা কেন বলছ পার্বতী! এই সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানকে তুমি যে ভাবে গ'ড়ে তুলেছ পৃথিবীতে অল্প কোন মেয়ের পক্ষে তা কখনই সম্ভব হ'ত না। আমার কতটুকুই বা শক্তি ছিল যে একে আমি রূপ দিতে পারতুম। সম্পূর্ণ তোমারই শক্তিতে এমনটা যে সম্ভব হয়েছে তার ভিতরকার রহস্টটুকুই আমার কাছে পরমাস্চর্যের বস্তু। সেই পরমাস্চর্য অভিনবতার কাছে আমার কুণ্ঠিত চিন্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে তোমাকে ছোট করে তৈরি চাই নে। কিন্তু কেন বল ত? এই নির্বাসনের আত্মবিলোপী অন্ধকারের মধ্যে তোমার এমন অমূল্য জীবনকে বলি দিতে বসেছ? প্রতি মুহূর্তে এতে আমার মন অপরাধে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে; আজ সেই কথাই তোমাকে বলবার চেষ্টা

করছি। এই অন্ধরূপ থেকে জোর ক'রে না বেরিয়ে পড়লে তোমার পরিজ্ঞান নেই।”

পার্বতী চুপ ক'রে রইল। শচীন্দ্রের কথা পার্বতীর বুকের ভিতর যে কি আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে শচীন্দ্রের উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে তার ধারণা করবার অবসর ছিল না। ধানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে আবার স্বরূপ করলে “পার্বতী, তোমার অভাব এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে কতদূর কৃতিকর তা আমি জানি। তবু আমি এই কালের ষাটায়, তোমার জীবনটাকে চূর্ণ হ'য়ে যেতে দিতে পারি না। স্বার্থপরতারও একটা সীমা থাকা উচিত।”

সম্প্রতি শচীন্দ্রের অন্তরে অন্তরে পার্বতী সম্বন্ধে তার পূর্বতন সহজ বন্ধুতার পরিবর্তে যে একটা ভাবপ্রবণ ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কের আভাস ঘনিয়ে উঠেছে এ-কথা পার্বতীর কাছে সম্পূর্ণ অস্পষ্ট না থাকলেও সম্পূর্ণ অগোচরও ছিল না। তবু শচীন্দ্রের আজকের এই চাক্ষুস্যের সত্যক রূপটি তার নিজের বিস্ময় চিন্তের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হ'ল না।

পার্বতীর চিন্তে নানা সন্দেহ আশা-নিরাশার দোলায় আশা-বাণী করতে লাগল। কিন্তু শচীন্দ্রের মনের কথা ঠিকমত কল্পনা করতে না পেরে শান্ত কণ্ঠে তর্কের স্বর মিশিয়ে বললে “দেখুন, মানুষের জীবন কার কি ভাবে সার্থক হয় তা কি কেউ ঠিক বলতে পারে? আমার শক্তি দিয়ে জগতের মঙ্গল কাজে যদি কিছুমাত্র সহায়তা হ'য়ে থাকে ত সেই কাজের মধ্যে দিয়েই আমি কি সার্থক হই নি? আপনার অর্থ, আপনার অন্তরের প্রেরণা, এমন কি আপনার মৃত পত্নীর প্রতি আপনার যে অক্ষয় প্রেম, তাজমহলের মত কি তা এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সার্থকতা লাভ কবে নি?” কথাটির মধ্যে অনিচ্ছাকৃত একটা যুহু তত্ত্বতা ও জ্ঞেয়ের আভাস ছিল কি না কে জানে। কিন্তু শচীন্দ্র সেটুকু কল্পনা করেই বোধ করি একটু তর্কের উত্তেজনা মিশিয়ে বললে, “হয়ত করেছে। কিন্তু...”

“এর মধ্যে কিন্তু কোথাও নেই শচীন বাবু। যে অনগ্রনিষ্ঠ প্রেম আপনাকে এই কাজে অগ্রপ্রেরণা দিয়েছে সে একমাত্র আপনাকেই সম্ভব—এটাই কি আপনি মনে করেন? ছোটখাটো হ'লেও প্রত্যেক মানুষই নিজের শক্তি অমুসাবে জগতে এই তাজমহল গ'ড়ে চলে। মহত্তর কিছু করবার প্রেরণা তারা তাদের প্রাণ থেকেই পায়।”

শচীন্দ্র তার তর্কের স্বরে অন্তরের কোন্ডের আভাস পেয়ে একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ছিল। তার পর ধীরে ধীরে শান্ত গভীর স্বরে বললে “পায়। কিন্তু তাদের পিছনে থাকে তাদের সার্থক প্রেমের অমৃত উৎস। চিরদিন তাজমহলের মরীচিকা গড়ে তুলতে আমি তোমাকে দিতে

পারব না। এব থেকে তোমাকে আমি ছুটি দিতে চাই পার্বতী।”

জ্ঞান হাসিতে পার্বতীর মুখটা বিকৃত হয়ে এল। কষ্টে নিজেকে সঞ্চরণ করে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললে “ছুটি দিলেই কি ছুটি পাওয়া যায়? ছুটি নিলে আমি থাকব কি নিয়ে বলুন ত?” কথাটা বলেই সে নিজের প্রগলভতায় নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল এবং সেটা চাপা দেবার জন্য হঠাৎ চেঁচাব ছেড়ে উঠে বললে “কিন্তু তম্বালোচনা ক’রেই কি আজকের রাতটা আমাদের কাটবে নাকি? উঠুন, যা হয় ছুটি মুখে দিয়ে নিন। নইলে অনেক রাত ক’রে খেলে আবাব আপনার ইজম হবে না।” বলে সে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

শটীশ্র সেখানে ইঞ্জি-চেয়ারে চুপ করে পড়ে ভাবতে লাগল। পার্বতীর কথাগুলোর মধ্যে তার বার্থ জীবনের যে গভীর নিরাশাপূর্ণ বেদনার স্বর বেজে উঠেছিল তার মধ্যে শটীশ্রের প্রতি কি একটা অভিমানের আভাস ছিল না? শটীশ্রের মনটা নিজের সঙ্গে যেন কোন মতে বোঝাপড়া ক’রে উঠতে পারছিল না। আবার তার মনের মধ্যে এই দুর্ভেদ্য সমস্তা অল্প রূপ নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে লাগল। তার মন কি সভাই এখনও কমলের মুদ্রাস্বয়ী স্বতিকে আশ্রয় ক’রে চলেছে তার অনন্ত ব্যাক্য? যেখানে এক দিন সে পরিপূর্ণতার মধ্যে ফিরে পাবে তাকে? না, এ শুধু পত্নীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করায় অভ্যস্ত তার মন কিছুতেই তার এত দিনের অভ্যাসকে অস্বীকার করতে পারছে না? উদ্ভ্রান্ত শিবের মত কমলার স্বতিকঙ্কাল বহন ক’রে বেড়ানোর লৌকিক মূল্যের ভিক্ষাপাত্র এবং আত্মবিমোহনের নাগপাশ কি তার সমস্ত সত্যকে সমগ্র অন্তরাত্মাকে আবিষ্ট ক’রে ফেলেছে এত দিন ধরে? সে তাব অন্তরেব ধ্যানলোকে তার নিরুদ্ধিষ্টা পত্নীর মুখ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু সেই বিরাট তাবা-খচিত জ্ঞান অন্ধকারেব পটে কোথাও তাকে যেন সে খুঁজে পেল না। সে বিশেষ ক’রে জীবনীর গন্ধাতীবের সেই শেষ দৃষ্টের মাঝখানে তার হারানো জীব কোঁতুলোদীপ্ত ছবিখানি মনের মধ্যে আঁকতে চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু সেই বিপুল চলচ্চল শোভাব্যাক্রার ভিড়ে সে যেন এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে গেল। সে তাব মনের দৃষ্টিকে স্বদূর অতীতের মধ্যে প্রসারিত ক’রে দিয়ে পড়ে রইল। কিন্তু তার পত্নীর প্রতিকৃতি তার চিত্তপটে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টার মধ্যে সে-মুখ হারিয়ে হারিয়ে গেল। এমনি ক’রে বহুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টায় হতাশ হয়ে এই ব্যর্থতাকে কমলাব স্বতি থেকে বিচ্ছিন্নতা বলে কল্পনা ক’রে তার উত্তেজিত মস্তিষ্কের চিন্তাপ্রোতকে ফিরিয়ে ভবিষ্যতের গৃহ রচনায় প্রবৃত্ত করলে এবং সেই গৃহে পার্বতী সহজ আনন্দে দীপ্তিময়ী কল্যাণীরূপে

বিরাজ করছে, এমনি একটা সুখচ্ছবিকে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগল। অনেক ক্ষণ চুপ করে এই চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থেকে এক সময় অকস্মাৎ সচেতন হ’য়ে দেখলে যে বহু চেষ্টাতেও এতক্ষণ যার ছবি সে ফোটাতে পারে নি সেই অর্ধবিস্মৃত নাবী কখন তার সমস্ত কাল্পনিক ভবিষ্যৎকে মুছে ফেলে দিয়ে সুপরিচিত বাস্তব গৃহচিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট হ’য়ে উঠেছে। সে আর চুপ ক’রে বসে থাকতে না পেরে বারান্দায় উঠে পায়চারি কবতে লাগল। একবার মনে করলে পার্বতীর কাছে যায়, গিয়ে বলে “পার্বতী, এমনি ক’রে তুমি নিজেকে আবদ্ধ রেখে আমাকে বেঁধে না। তোমার উশ্বজ্ঞ মূল্য দিতে আমি অক্ষম। আমার এই দুর্গহ নিয়ে আমাকে একলা দুঃখ ভোগ করতে দাও।” কিন্তু সে কিছুতেই মন স্থির ক’রে উঠতে পারলে না। তার পায়ের শব্দ পেয়ে পার্বতী এসে নিশব্দে অন্ধকারে দরজা ধবে চুপ ক’রে ভাবতে লাগল। শটীশ্রের এই অস্থিরতার কারণ সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে ভরসা পায় না। তার নারীস্বলভ সহজ অল্পভূতি দিয়ে যে সন্দেহ তার অন্তরে বেজে ওঠে তাকে তার আনন্দভবা দুরাশার মধ্যে কিছুতেই আমল দিতে চায় না। আশা-আশঙ্কা-আকাজ্জিকার উত্তেজনায় তার হৃদয়ের মধ্যে রক্তপ্রোত উত্তাল হ’য়ে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের নিস্তৃত শয়ন কক্ষে বিছানার উপর বালিশটাকে বুকে প্রাণপণ বলে চেপে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

অনেক ক্ষণ পরে সে বারান্দায় ফিরে এল; দেখলে, শটীশ্র বারান্দার একটা থাম ধরে স্থির হয়ে পরপারে ক্লবক-কুটারের সেই অচঞ্চল রশ্মিরেখার দিকে নির্নিমেমে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতী ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল এবং কিছু না বলে চুপ করে তার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মনের স্বগভীর অন্তরালে অশ্রুর যে-উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইছিল তাকে অন্তরের মধ্যে প্রাণপণ বলে চেপে ধীরে ধীরে সে অভ্যস্ত স্নেহে চিন্তাতাপক্লিষ্ট শটীশ্রের একখানি হাত তার হাতে তুলে নিলে। স্নেহাভিব্যক্তির এই কোমল স্পর্শের মধ্যে এই চিরবঞ্চিত নারীর তাকে সান্ধনা দেবার গভীর কক্ষাটুকু শটীশ্রের মনে এসে একটা অল্পশোচনার মত আঘাত করলে এবং নিজের দুর্বলতায় সে মনে মনে লজ্জা অনুভব করতে লাগল। পুরুষের যে আত্মসমাহিত দৃঢ়তা যে আত্মপ্রত্যয় নারীর নিকটে তাকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, তার সহজ আত্মদানের প্রতিষ্ঠাভূমি করে, নিজের মধ্যে সেই অবিচলিত পৌরুষের দৈন্ত অনুভব ক’রে মনে মনে সে নিজেকে তিরস্কার করলে “না, এমনি ক’রে পার্বতীর নিরাশ্রয় মনের উপর তার নিজের পীড়িত চিন্তের ভার সে চাপতে দেবে না। হয় সে

পার্কভীকে তার অবলম্বনরহিত শূন্যতা থেকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে টেনে নেবে; না-হব তাকে নিশ্চিন্ত মুক্তি দান করবে। এমনি ক’রে নিজের প্রতি করুণায় পার্কভীকে পীড়িত হতে দেবার তার কোন অধিকার নেই।” এবং এক সময় ভূমিকামাত্র না-ক’বে অতি ধীরে পার্কভীর হাত থেকে হাতটা মুক্ত ক’রে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে “চল, খেতে যাই।” যদিও শচীন্দ্রের ব্যবহারের বা স্ববে কোন রুঢ়তা প্রকাশ পায় নি তবু এই সামান্য একটু ভঙ্গী এবং তাব কণ্ঠস্বরের অত্যন্ত শান্ত স্বাভাবিকতায় পার্কভী একটু আশ্চর্য হ’ল এবং কেন জানি না কেমন যেন একটু আঘাত পেল। তবু সে নিজেকে সংযত রেখে প্রায় স্বাভাবিক গলায় “এক মিনিট অপেক্ষা করুন” বলে ঘবের দিকে চলে গেল এবং টেবিল সাজাবার নানা কাজে ব্যস্তভাবে নিজেকে ব্যাপৃত ক’রে দিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজেকে যেন কাজের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চাইলে।

হাতখানা অমন ক’রে টেনে নেবার ইচ্ছা শচীন্দ্রের ছিল না; তবু তার অনতিপূর্বে মুহূর্তে নিজের মনের যে দুর্বলত এবং দ্বিধা তার অন্তর্নিহিত পৌরুষ অবমানিত হয়েছিল এই হাত ছাড়িয়ে নেওয়াটা বোধ কবি তারই অনিচ্ছাকৃত মূঢ় প্রতিক্রিয়া।

পার্কভী যে একটু আহত হয়ে চলে গেল এই বোধ শচীন্দ্রকে মনে মনে অস্বচ্ছন্দ ক’রে তুললে। সে এক প্রকার অতৃপ্ত হয়েই পার্কভীর আহ্বানের অপেক্ষা না ক’বে এক-বারে খাবার ঘরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ’ল।

ঘরটি ছোট। মাঝখানে একটা টেবিল সাদা ধববনে চারদিকে ঢাকা। টেবিলের উপর ছ’বাতির একটা শেড জ্বলছে। খাবার সরঞ্জাম সব সাজানো হয়ে গেছে। পার্কভী কি একটা গবম করবার জন্তে মাটিতে একটা ঠোঙে স্পিরিট জ্বলে সামনে বসে আছে। আগুনের এবং বাতির আলোর তাকে অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। শচীন্দ্র দেখলে যে একদৃষ্টে সেই ক্রীড়ারত অগ্নিশিখাটুকুর দিকে চেয়ে তার চোখের জল যেন বাধা মানছে না। অত্যন্ত অল্পশোনায়ে তার মনটা ভবে গেল, এবং এক মুহূর্তে পার্কভীর কৈশোরের দুঃখের ইতিহাস থেকে স্বল্প ক’রে প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ঘটনা প্রচ্ছন্ন গভীর বেদনার রূপ নিয়ে যেন তাব আছে অকস্মাৎ জ্বলন্ত-হবে উঠল। নিজের অপেক্ষাকৃত সহনীয় বিবহবেদনাকে এই পীড়িত নীরব স্নেহশালিনী নীরর দুঃখের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো স্বার্থপরতাব নামাস্তব কলই মনে হতে লাগল। পার্কভীর অশ্রুস্রাব মুখের দিকে এসে শচীন্দ্রের চিত্তের সমস্ত অবরুদ্ধ স্নেহ করুণা প্রীতি কৃতজ্ঞতা

উদ্বেল হবে উঠে ভাবরসবগ্নায় তার হৃদয়ের বিচারক্ষেত্রের জ্বলন্ত ছবিগুলিকে প্রাবিত ক’রে একাকার ক’রে দিয়ে গেল। সেই ভাববগ্নার আবেগে তার অন্তরের হৃদয়োচ্ছ্বাসকে সে প্রেম বলেই মেনে নিলে। এই জটিল চিন্তার তবঙ্গাবাতে বিপর্যস্ত তার চিত্ত নিজেকে বিশ্লেষণ করবার বৈধ্য আর স্বীকার করতে চাইলে না। অল্পক্ষণ পূর্বে সে যে তার পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠতার অভিমানে আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করছিল সে কথা তাব মনে রইল না।

ঘরে ঢুকে পার্কভীর কাছে এসে বললে, “আমাকে ক্ষমা কব পার্কভী—”

পার্কভী এত নিবিষ্ট হয়ে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল যে হঠাৎ শচীন্দ্রের আগমনে সে চমকে একটা অব্যক্ত শব্দ ক’রে উঠল। তার পব নিজেকে সামলে নিলে। শচীন্দ্রের কথাব মধ্যে থেকে তার অহুঙ্কল চিত্তের দক্ষিণ পবনের স্নিগ্ধতা যেন তাব ললাটকে এসে স্পর্শ করলে। চোখ মোছবার কোনো চেষ্টা না ক’বে মুহূর্তে হেসে আস্তে আস্তে বললে ‘নটি ব’ধ’; বলে উঠে, হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশে-উদ্ভূত শচীন্দ্রের মুখের উপর একটা হাত চাপা দিয়ে হাত ধ’বে তাকে একটা চেঁচাবে নিয়ে বসাল।

শচীন্দ্র নিজের আনন্দ এবং উজ্জ্বলিত অহুঙ্কল হৃদয়ের প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ পার্কভীর হাতটা মুখের উপর চেপে ধরলে। পার্কভী বাধা দিলে না—শচীন্দ্র মুঠোর মধ্যে তার নবম হাতটুকু নিয়ে আদব ক’রে ধ’রে বইল।

শচীন্দ্রের এই আত্মনিবেদনের ইঙ্গিতে পার্কভীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু তার অশ্রুজলের করুণায় বিগলিত শচীন্দ্রের এই নিবেদন তার সম্মোহিতপ্রায় আত্মমর্যাদাকে সচেতন ক’রে তুললে; এবং ধীরে অতি ধীরে অথচ জ্বলন্ত নিশ্চয়তার ভঙ্গীতে, কোনো কথা না বলে, সে নিজের হাতটা মুক্ত ক’রে নিয়ে নিবে-বাওয়া ঠোঙটা জ্বালাবার চেষ্টায় গিয়ে শচীন্দ্রের দিকে গিছন ফিরে বসল।

শচীন্দ্রের পুরুষের মন বাধা মানতে চায় না। তার নিবেদিত প্রেমকে স্বীকার না-করার স্বব্যক্ত ইঙ্গিতে তার আত্মাভিমান অনাহত রইল না এবং তার প্রেম যে অবিমিশ্র প্রেমই, কোন একটা অকাটা প্রমাপের দ্বারা তা জানিয়ে দিতে তার মনটা উদ্ভূত হয়ে উঠল। কিন্তু পার্কভীর মুখের দিকে চেয়ে সে চূপ ক’বে গেল। পার্কভীর স্নেহশীলতার অন্তরালে যে একটি আত্মসমাহিত দৃবদ্ব তাকে সর্বদা ঘিরে থাকত সেই ব্যবধান শচীন্দ্রের মনে শাসিতচপল বালকের মত একটা সলজ্জ সঙ্গম জাগিয়ে কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশের চপলতা থেকে তাকে নিবৃত্ত ক’বে রাখলে। (ক্রমশঃ)



সিংহলের উৎসব : কাণ্ডি-নৃত্য বা 'উদারানাটুম'

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

সিংহলের কাণ্ডি-নৃত্যের ছবি যখন প্রথম দেখি তখন খুব আশ্চর্য্য লেগেছিল নর্তকদের দাঁড়াবার কায়দা ও হাত-পায়ের বিচিত্র ভঙ্গী দেখে। এর পূর্বে উচ্চাঙ্গের পুরুষ-নৃত্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কেবল মণিপুর ও উত্তর-ভারতের কয়েকটি নাচের সঙ্গে পরিচয়

সঙ্গে অভিনয় উপলক্ষ্যে সিংহলে গিয়ে কাণ্ডির বীরোচিত পুরুষ-নৃত্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এ-বছর শান্তিনিকেতনের এক সিংহলী বন্ধুর নিমন্ত্রণ পেলাম, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও শান্তিনিকেতনের নাচ শেখাবার জন্ত। রাজী হলাম, ভাবলাম সে-দেশের বিখ্যাত পুরুষ-নাচও এই সুযোগে শিখে আসব।



রূপার মুকুট-পরা 'নাইয়াণ্ডি'-নর্তক
শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত



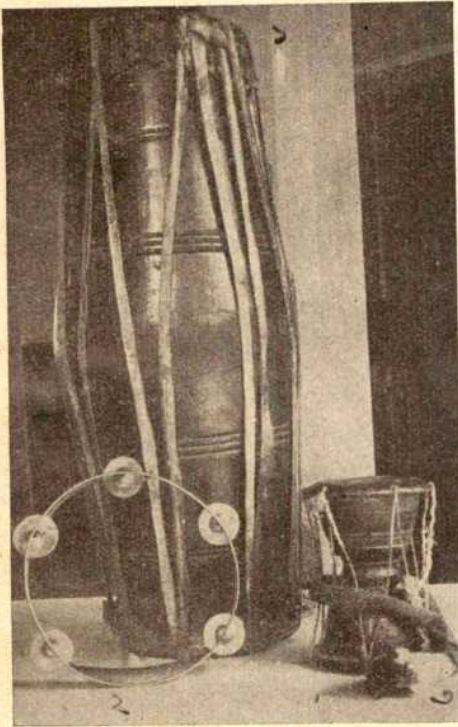
'নাইয়াণ্ডি'-নর্তক
শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত

ছিল। সিংহলের এই ছবিতে নর্তকদের দেহের ভঙ্গীতে বীরোচিত নৃত্যের আভাস পেয়েছিলাম। তার পরে দক্ষিণ-ভারতের পুরুষ-নৃত্য 'কথাকলি' শেখার সুযোগ হয়। কিন্তু তখনও সিংহলের সেই নর্তকদের ছবির কথা মন থেকে যায় নি। ১৩৩৪ সালে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের

বর্তমানে আমাদের দেশে নৃত্য-সম্বন্ধে অনেকে জানতে ইচ্ছুক ও মনোযোগী হয়েছেন, সিংহলের নৃত্যের কথা সম্ভবত সকলের চিত্তাকর্ষক হ'তে পারে।

সিংহলী ভাষায় এই নৃত্যের নাম 'উদারানাটুম'। বর্তমানে এই নাচটি এ-দেশের শ্রেষ্ঠ নৃত্য বলে সিংহলীরা মনে করে। ইংরেজী-শিক্ষিত অধিবাসীরা একে কাণ্ডি-নাচ নামে সর্বত্র

প্রচার করেছেন। বর্তমানে সিংহলের মধ্যপ্রদেশের শহর কাণ্ডির নামেই এই নৃত্য পরিচিত; এই শহরের নামেই প্রদেশটিও কাণ্ডি-প্রদেশ নামে পরিচিত। এই প্রদেশেই এই সম্প্রদায়ের নর্তকদের প্রধান সমাবেশ-স্থল। কাণ্ডিতে বুদ্ধের দন্ত-মন্দির আছে, শহরটি বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থ-স্থান। এইখানেই সিংহলের শেষ নরপতির রাজধানী ছিল। প্রাচীন কালের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবগুলি আজও বেঁচে আছে। দলে দলে নাচিয়েরা আসে গ্রাম থেকে, উৎসবে যোগ দিতে।



কাণ্ডি-নৃত্যের বাস্তবস্থ

১। 'বেড়ু' ২। 'পাস্তুর' ৩। 'উডেকি'

বর্তমানে সিংহলের গানের বিষয় জানতে গিয়ে দেখতে পাই—অতি সাধারণ চাবীর গান, গরুর গাড়ীর গান, নৌকার গান, ছেলে-ভুলানো গান অথবা নাচের সঙ্গে জড়িত গান, তা ছাড়া আর কোন প্রকার গান নেই বললেই হয়; এগুলি প্রায় সবই একগোত্রীয়—পল্লীসঙ্গীত বা লোকসঙ্গীত জাতীয়, অতি সাধারণ কথা ও সাধারণ মিষ্টি স্বর। সে-দেশের তামিলদের ভিতর দক্ষিণ-ভারতের

কণীটি সঙ্গীতের চলন আছে খুবই, তবে সে-দেশের বৌদ্ধদের ভিতর এই গান বেশী আমল পায় না, তারা উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতকেই পছন্দ করে বেশী। উত্তর-ভারত থেকে কিছুকাল পূর্বে এদেশের বৌদ্ধ যুবকদের চোঁটায় থিয়েটারী গানের আমদানী হয়েছিল খুব। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের বাংলা গানের প্রতি বিশেষ ভাবে তারা যত্ন নিচ্ছে।



পাস্তুর নৃত্য

লেখক ও তাঁহার নৃত্য

নাচের এখনও অতটা দূরবস্থা আসে নি। এদেশে অনেক-গুলি প্রাচীন নৃত্যধারা আজও অশিক্ষিত জনসাধারণ সচল রেখেছে। তার ভিতর কাণ্ডির নাচই প্রসিদ্ধ। এ-নাচ যে এ-দেশেরই উৎপত্তি তা মনে হ'ল না; এর সূত্রপাত হয় দক্ষিণ-ভারতের নাচ থেকে।

এই নাচের প্রথম সূত্রপাত করেন গজবাহ নামে নরপতি, খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে। তাঁর রাজধানী ছিল অতুরাধাপুরে। ইনি দক্ষিণ-ভারতের চোল-রাজকে এক বার পরাজিত করেন; তারই স্বীকৃতি-স্বরূপ চোল-রাজ বার শত বন্দী ও সেদেশের পট্টিনী দেবীর অর্থাৎ দুর্গার পায়ের সোনার মল গজবাহকে উপহার দেন। গজবাহ রাজধানীতে ফিরে এসে দক্ষিণ-ভারত-বিজয়ের স্মৃতি-স্বরূপ একটি উৎসব প্রচলিত করেন, ও পট্টিনী দেবীর মন্দির স্থাপনা ও তাঁর পূজা প্রচার করেন। তামিল-বন্দীর মধ্যে নর্তকশ্রেণীর ঘারা ছিল, তাদের প্রতি আদেশ হ'ল নৃত্যে গানে এই উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে। আজকালও এই উৎসব কাণ্ডিতে চলে আসছে সেই বীরের স্মৃতিপূজারূপে।

ক্রমে এই নাচ উৎসবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, সিংহল-বাসীরাও এ-নাচে দক্ষ হয়ে উঠল। এ-নাচ বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গরূপে দেখছি, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত

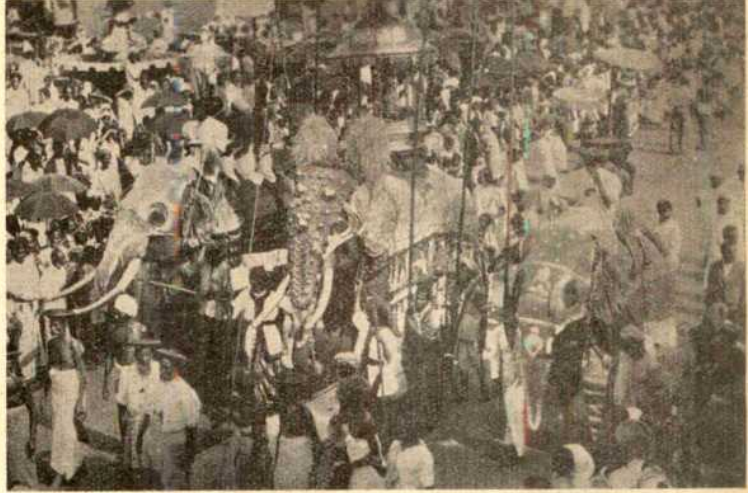
এ-নাচের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ ছিল না। সেই সময় পোলানাকুম্মার রাজা বিজয়বাহু সর্বপ্রথম এই নাচকে বৌদ্ধ উৎসবের অঙ্গীভূত করেন। রাজা নিজেও এ-নাচ খুব পছন্দ করতেন। সেই শতাব্দীতে পরাক্রমবাহু নামে আর এক নরপতি এ-নাচে বিশেষ করে উজোগী হন, তাঁর চেষ্টায় রাজপরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই নাচের চর্চা রাখতেন। রাজা নিজেও স্বদক্ষ নর্তক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশেষ করে পুরুষদের এ-বিষয়ে উৎসাহিত করেন। বর্তমানে ডম্বর-হাতে নাচ কাণ্ডি-নাচের একটি প্রথা।

এর প্রথম চলন করেছিলেন এই রাজা স্বয়ং। নাচের আরও পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক গোলযোগে এই নাচ আর তেমন উৎসাহ পায় নি; চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাণ্ডি-নাচকে রাজা বিজয়বাহু আবার সজীব করলেন, সব নাচিয়েদের একত্র করে। সব প্রাচীন উৎসবদির তিনি পুনঃপ্রচলন করলেন। কিন্তু সেই রাজার মৃত্যুর পর আর সে রকম উৎসাহ দেবার লোক ছিল না। তখন দেশে পর্তুগীজদের আধিপত্য, তাদের জালায় স্থির হয়ে কেউ রাজধানী গড়বার স্বযোগ পায় না। নাচিয়েরাও রাজাদের উৎসাহ বা সাহায্য না পেয়ে নিরাপদ স্থানে থাকবার ইচ্ছায় মধ্য-প্রদেশ কাণ্ডিতে আশ্রয় নিল। সেখানে নিজেরা কোন রকমে নাচের প্রতি নিজেদের ভালবাসার চানে এই নাচকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই সময় থেকে এই নাচ সম্পূর্ণরূপে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। তারাই ‘বেরোয়া’ নামে লোকের কাছে পরিচিত।

বহুকাল পরে দ্বিতীয় বিমলধর্মাস্থা ধর্মের প্রচারে উজোগী হন ও বুদ্ধের দন্ত-মন্দির স্থাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার নাচিয়েরা এসে তাতে যোগ দিল।

পুনরায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কীর্তিশ্রী খুব উৎসাহের সহিত ধর্মকার্যে মন দিলেন। তিনিই নতুন করে ভিক্ষুসংঘ ইত্যাদি স্থাপনা, মন্দির-রচনা প্রভৃতি করলেন। কীর্তিশ্রী রাজা গজবাহুর দক্ষিণ-ভারত-বিজয় উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করলেন,



কাণ্ডি-পেরহেরার শোভাযাত্রা; হাতীগুলির পিছনে এক দল নর্তক

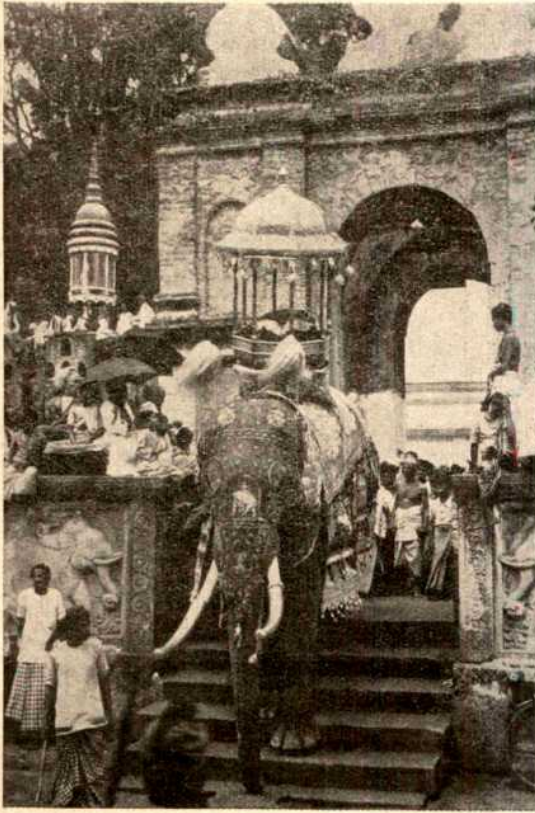
পট্টিনী দেবীর মন্দির স্থাপনা করলেন। বর্তমান কাণ্ডিতে যতগুলি বৌদ্ধ উৎসবের চলন আছে তার পুনঃপ্রবর্তক এই রাজা। তাঁরই উৎসাহে নাচিয়েরাও আবার নাচের চর্চায় মনোযোগ দেয়, তার পর থেকে ধর্ম-উৎসবাদি ও নাচ-গান নিকিঁয়ে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

এই নর্তক-সম্প্রদায়ের সকলেই বৌদ্ধ এবং এদের নাচ বৌদ্ধ উৎসবের সঙ্গে জড়িত হলেও অনেক উৎসবে হিন্দু দেব-দেবীর প্রার্থনার দেখা যায়। কাণ্ডিতে বুদ্ধদন্ত-মন্দির ছাড়া আরও তিনটি মন্দির আছে, একটি পট্টিনীদেবীর (হুর্গা), একটি নাথ-দেবতার (মহাদেব), একটি কাতারগামার (কাণ্ডিক) ও অপরটি বিষ্ণুর। বৌদ্ধরা এই দেবতাদেরও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করে। পট্টিনী দেবীর এদেশে আগমনের কথা আগেই বলা হয়েছে, অত্র দেবতারাও এসেছিলেন এইরূপ নানা অবস্থায় পড়ে।

আগেই বলেছি, সিংহলের কাণ্ডি-প্রদেশের বেরোয়া জাতই এ-নাচের চর্চা করে থাকে। রাজা কীর্তিশ্রীর পরে কোন রাজাই জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচার করবার

আর চেষ্টা করে নি। তার ফলে হ'ল এই, অগ্ন্যস্ত্র সম্প্রদায় মনে করতে লাগল, এ-উৎসব-সংক্রান্ত নাচ বেরোয়াদেরই জন্তে। সাধারণে একে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিল এই কারণে। অগ্ন্যস্ত্র প্রাচীন নাচও বর্তমানে ছরবছর্য্য এসে ঠেকেছে। কিন্তু বৌদ্ধ উৎসবের কল্যাণে কাণ্ডি-নাচ তার মান বাঁচিয়ে আছে।

কাণ্ডি-নাচে অভিনয়ের ভাগ নেই বললেই হয়। মনে হয় ছন্দোবদ্ধ নাচটাকেই এরা বড় করে দেখেছিল; তবে নাচের সব অঙ্গ মিলিয়ে দেখলে একটা প্রচণ্ড বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। সব নাচগুলিই গানের স্বরে তালে খুব পাকাপাকি ভাবে বাঁধা, কোন গৌজামিল বা অনাবশ্যক জিনিষ নেই।



মন্দিরের বহির্ভাগে বুদ্ধদন্ত-পেটিকাবাহী হস্তী

এক-একটি গানের নামে এ-নাচগুলির পরিচয়। এই ভাবেই আঠারটি গান আছে; এগুলির নাম এরা দিয়েছে 'বম্ম'। যেমন;

দাহক (শাঙ্খের গোল দাগ), গজ, তুরঙ্গ, উরগ, মুঘল (খরগোশ);

উরুস (দ্বিপল পাখী), বৈরুডি (প্রসিক্ত মণি), হুমা (হুমান), মমুরা (মমুর), শ্রাউল (মুরগী), সিংহাদিপতি (সিংহ), অসদৃশ (কোন দেবতার নাম) কীরলা (সমুদ্রের পাখী), মণ্ডুক, ইনাডি (কাশ-জাতীয় পুষ্প), স্বরপতি, গণপতি ও উদার (গর্বিতা রমণীর অহঙ্কার)।

এই যে আঠারটি নাম দিলাম, এর কতকগুলি তৈরি হয়েছিল জন্তুর চলন বা ভঙ্গি অনুকরণ করে—উপরে সেগুলির নাম দেখে তা বোঝা যাবে। অগ্ন্যস্ত্র তৈরি হয়েছিল তাদের গুণ-ও রূপ-বর্ণনা নিয়ে; যেমন স্বরপতি, গণপতি, উদার ইত্যাদি।

বম্ম-এর আবার চারটি ভাগ—'তানম্', 'কবিয়ে', 'কাস্তেরম্' ও 'আড়াউবা'। তানম্ হ'ল ঠিক উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের তেলনার মত। তাতে কোন কবিতার কথা নেই, কেবল তা না না, তা নে না এই প্রকারের কতকগুলি শব্দ তালের সঙ্গে গাওয়া হয়। সব তানম্-এর পদক্ষেপ, দেহভঙ্গি ও হস্তচালনা প্রায়ই এক প্রকারের। এর পরে আরম্ভ হয় 'কবিয়ে'। এই অংশে পূর্বের তানম্-এর স্বরের সঙ্গে কথা বসানো থাকে। এই কথাগুলিতেই গানের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায়। এই অংশের নাচের ভঙ্গিতে এক নাচের সঙ্গে অপর নাচের কিছু প্রভেদ বোঝা যায়। এদেশে নাচিয়েরা নিজেই গান গেয়ে নাচে। 'কবিয়ে' শেষ হয় ছোট-একটি তালের তেহাই বাজনার সঙ্গে। এই ছোট তেহাইয়ের অংশের নাম এরা দিয়েছে 'কাস্তেরম্'। তার পরেই আরম্ভ হয় 'আড়াউবা', অর্থাৎ সেই গানের তালের তোড়া ও পরণ ইত্যাদি। এই ভাবে একটি 'বম্ম' সম্পূর্ণ হ'লে, আবার আর একটি 'বম্ম' আরম্ভ করে। কাণ্ডি-নাচের গানে যে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে তা নয়। গ্রাম্য সঙ্গীতের ধরণের অল্প-পরিসর স্বরের মধ্যেই লাইনের পর লাইন এক ভাবে গেয়ে যায়। তবে একটি বম্ম-এর সঙ্গে অপর বম্ম-এর স্বরে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। বর্তমানে গানের প্রতি নজর এই নাচিয়েরা ততটা দেয় বলে বোধ হয় না। কোন রকমে তালে গেয়ে গেয়ে যেতে পারলেই এরা সন্তুষ্ট। তবে মনে হয়, আরম্ভে গানগুলি সম্ভবতঃ আরও সুন্দর ছিল। এখানে আমি একটি সম্পূর্ণ বম্ম-এর নমুনা তুলে দিলাম, তাতে আমার উপরের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হ'তে পারে। এই বম্মটির নাম 'বৈরুডি', উত্তর-ভারতের দাদরা তালে রচিত।

‘তানন্’

তানানে তানেনা তানেনা তানা
তানানে তানাতে তানানে তানা
তানেনা তানা তানেনা তানা
তানেনা তানা তান্দে না তান্দে
না নাম্ ॥

‘কবিয়ে’

অগয় বদন কবি বরণ, রত্নয়দনে কল রচনা
মট উরণ নোব মেদিনা মহতুগে অবসর রাগেনা
সমাব ॥

ইন্দ্র দেবীন্দু বড়িনাদিন, কেহেতু বিমনা বেকনিতিন
এমবিমনা দেবীবড়িনা, কেহতুদদক কোই বড়িতি
কমাবা ॥

বিমনা সমগা কেহেতুগণ, ইন্দ্র দেবীন্দুতুতি বেমিনা,
মেমবরণ কল এহেনা পাতাল বৈরুডি বন্নমেব ॥
ওবিনা মেসব তুল পেমিনা, কবিয়েনেতুব বরণবরণা
কলজুদন নেতাওবিনা, উগতুগে বল বেদি মেকাদা
পমাবা ॥

গানটির অর্থ নীচে দিলাম। নর্তকেরা দর্শকদের গানে
জানাচ্ছে,

“ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আমার মনের কথা আপনাদের জানাচ্ছি—
এ নাচের আনন্দ ও সৌন্দর্য উপভোগের সামর্থ্য সকলের হয় না, যাঁরা
জ্ঞানী তাঁদের পক্ষেই তা সম্ভব।

ভগবান ইন্দ্র পথে যেতে “কেহেতু”র নাচ দেখে আনন্দ পান, ও
নৃত্যের দ্বারা তিনি তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেন—তারই নাম পাতাল
বৈরুডি বন্নম্ ॥

আমি আজ যে-নাচ দেখাতে যাচ্ছি, সে-নাচ ভগবান ইন্দ্রর সেই
আনন্দের নাচ। আশা করি এতে সকলে আনন্দ পাবেন।

সব বন্নম্-এর কবিয়ে-অংশে, এই ভাবে কি করে সেই
নাচের আরম্ভ হ’ল, কি তাল ব্যবহার হচ্ছে, কি ভাবে
নাচতে হবে, সে সব বিষয়েরই আলোচনা হয়।

‘কান্তেরম’

+ * + *
তাং তারেকিটাকুন্নাং তারেকিতা কুন্নাং দোং
+ * +
রাজেন্ জিবুন্না তা ॥

‘আড়াউবা’

+ + +
তাকরোম্ দাং গাজি জিবুন্না তাকরাজিকরা
+ + +
তাতা জিকরা তাকরোম দাং গাজি জিবুন্না
+ + +
তা জিৎতারে কিটা কুন্নাং তা ॥

এই ভাবে বন্নম্গুলি প্রায় সব তালেই রচিত হয়েছে;
কাণ্ডালী, দাদরা, কাঁপতাল, রূপক, তেণ্ডা ইত্যাদি

আরও কয়েক প্রকারের। যে কোন বন্নমে, ‘আড়াউবা’
সব সময় যে একটিই হবে তার কোন কথা নেই, বড় বড়
নর্তকেরা “আড়াউবা”য় বহু প্রকারের তালের নৃত্য করে
থাকে।



‘নাইয়াতি’-নৃত্য

নর্তকেরা এ-নাচ বাইরে মূল আকাশের তলে দল বেঁধে
নাচে। সাধারণত এক-এক দলে পাঁচ-ছয় থেকে আরম্ভ করে
আরও বেশী লোক থাকতে দেখা যায়। কয়েকটি কারণে
এ-নাচ ঘরে হ’তে পারে না। এক কারণ, এ-নাচ অত্যন্ত
শ্রমসাধ্য, তাই বন্ধুঘরে অল্পক্ষণের মধ্যেই নর্তকেরা
ক্লান্ত হয়ে পড়ে; এর জন্ম ঘেরূপ প্রশস্ত ঘরের
প্রয়োজন তাও পাওয়া কঠিন, এবং সঙ্গে যে-বাজনা
ব্যবহৃত হয় তার শব্দ অত্যন্ত কড়া, কোন রন্ধমঞ্চ
বা গৃহের উপযোগী একেবারেই নয়। সাধারণত
নাচিয়েদের সঙ্গে দু-জন বাজিয়ে থাকে। এই বাজনার
উচ্চ শব্দে নাচিয়েরা খুব উৎসাহিত হয়, ঘণ্টার পর

ঘট। নেচেও কোন কষ্ট বোধ করে না। যন্ত্রটির নাম 'বেড়ে'। শোনা যায়, এটি তামিলদের 'বরবাদ্য' নামে বাদ্যযন্ত্রের অপভ্রংশ। আকারে প্রায় উত্তর-ভারতীয় পাখোয়াজের মত কিন্তু শব্দের পার্থক্য আছে অনেক; দক্ষিণ-ভারতের 'কথাকলি' নৃত্যের বাজনা 'মাদলম'-এর মত অবিকল দেখতে।



'নাইয়াণ্ডি'-নৃত্য

এই কাণ্ডি-নাচের তিনটি ভাগ আছে। প্রথমটির নাম 'নাইয়াণ্ডি', খালি-হাতে নাচ। এই পদ্ধতিটিই শ্রেষ্ঠ। এতে আমরা নাচের ভঙ্গির বৈচিত্র্য পাই বেশী। নাচের সময় হাত-পা ও দেহ সব যেন এক হয়ে নাচতে থাকে, এইটাই বিশেষ করে চোখে পড়ে। এ-কথাটা একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার।

ভারতের অনেক নাচে দেখা যায় হাতের ভঙ্গি বা মূর্তীর আধিপত্য বেশী, আবার কোন কোন নাচে দেখি পায়ের নানা প্রকার তালের কাজ দেখানোই নাচিয়েদের

প্রধান চেষ্টা। অবশ্য এ-বিষয়ে মণিপুরের কাজ অল্প রকমের; তারা হাত-পা ও দেহ সকলের ভিতর একটা সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে-নাচে লালিত্যের



'নাইয়াণ্ডি'-নর্তকদল

প্রতি বোঁক বেশী। কাণ্ডি-নাচের মধ্যে সেইখানে আমরা পাই হাত-পা ও দেহের সামঞ্জস্য, এবং তার সঙ্গে প্রচণ্ড বেগ ও পুরুষোচিত বীর্যের প্রকাশ।

দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম হ'ল 'উডেক্কি' নাচ। উডেক্কি বা 'ডম্বরু' এক হাতে ধরে অপর হাতে বাজিয়ে নাচতে হয়। এতে ভঙ্গির কিছু নূতনত্ব পাই না—পায়ের চলন ও ভঙ্গি নাইয়াণ্ডি নাচের অনুরূপ, গানগুলিও এক। এই ডম্বরু দক্ষিণ-ভারতের একটি অতি প্রাচীন যন্ত্র। এটি সেখান থেকেই সিংহলে গিয়েছিল বলে সকলে একমত।

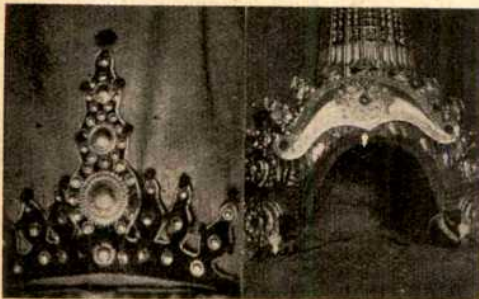
তৃতীয় নাচটির নাম 'পান্তুরু'। পান্তুরু হচ্ছে পিতলের একটি চেপ্টা দেড় ইঞ্চি চওড়া রিং। তাতে অনেকগুলি ছোট ছোট পিতলের জোড়া চাকতি লাগানো, ঝাঁকুনি দিলেই রম্ রম্ শব্দ হয়। নাচের সময়, দুই হাতে, বাজনার তালে, কখনও ঝাঁকুনি দিয়ে, কখনও শূন্যে তুলে লুফে ধরে বাজাতে হয়। এই নাচেও পায়ের কাজ অবিকল নাইয়াণ্ডি নাচের মত।

আজকাল সিংহলে এই নাচ দেখবার বিশেষ সুযোগ

বৌদ্ধ উৎসবগুলিতে। নর্তকেরা কোন-না-কোন বৌদ্ধ মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট। সাধারণত তারা চাষবাস করে, উৎসবের ডাক পেয়ে একত্র হয়। এই উৎসবগুলির কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা গেল। উৎসবের নাম এদের ভাষায় ‘পেরহেরা’—‘অবিরুদ্ধ পেরহেরা’, ‘বৈশাখ পেরহেরা’, ‘পোষম পেরহেরা’, ‘কাণ্ডি পেরহেরা’, ‘কারচি পেরহেরা’ ও ‘আলুট্ট-সাল পেরহেরা’।

‘অবিরুদ্ধ পেরহেরা’ হ’ল নববর্ষের উৎসব; বাংলা নববর্ষের সঙ্গে দুই-এক দিনের পার্থক্য হয়।

‘বৈশাখ পেরহেরা’ হ’ল এ-দেশের সব চেয়ে বড় উৎসব, এই উৎসব হয় বৈশাখী পূর্ণিমার দিন, এই দিন ভগবান বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধত্ব ও নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধদের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব স্বয়ং ঐ দিনেই সিংহলে এসেছিলেন। এই সময় দেশের গ্রামে নগরে রাস্তাঘাট বাড়ীঘর সাজিয়ে, মেয়ে-পুরুষ দলে দলে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ে। ধনীরা রাস্তায় খাবার বিলি করে, বৌদ্ধরা বাড়ীর সামনে বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প অবলম্বন ক’রে মূর্তি ছবি টাঙিয়ে রাখে। দলে দলে নরনারী ও শিশুরা দর্শনপ্রার্থী হয়ে মন্দিরে যায়, নর্তকেরা সেদিন নাচে গানে মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত ক’রে তোলে।



নর্তকের রপোর পয়না

রপোর মুকুট

তৃতীয় উৎসব হ’ল—‘পোষম পেরহেরা’। অশোক-পুত্র মহিন্দ অমুরাধাপুরের নিকটবর্তী ‘মহিন্তালে’ পাহাড়ে, রাজা

‘দেবানম্পিয়াতিসসা’কে যেদিন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন, সেই শুভ দিনকে স্মরণ করার জন্তই এই উৎসব। এর প্রধান আড্ডা অমুরাধাপুর; সেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর ভিড় হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি এই উৎসব হয়।



সিংহলের একটি প্রাচীন নৃত্য : মুখোস-নাচ

ভাদ্রমাসে কাণ্ডিতে যে পেরহেরা হয় তার খুব নাম। বিদেশে ‘কাণ্ডি পেরহেরা’র খবর লোকে খুব জানে। এটি হ’ল কাণ্ডি-নাচিয়েরদের বিশেষ উৎসব। পূর্বেই বলেছি এ-উৎসবের আসল উপলক্ষ্য হচ্ছে রাজা গজবাহুর বিজয় উৎসব। এই পেরহেরায় মিছিল বের হয় খুব চমৎকার। তার জাঁকজমকে দেশী বিদেশী সকলেই মুগ্ধ। বহু সংখ্যক হাতী, লোকজন, ও নাচিয়েরা দলে দলে এই মিছিলে থাকে। কাণ্ডি-নাচের ভাল কিছু দেখতে হ’লে এই হ’ল উপযুক্ত উৎসব।

এর পরে হেমন্তকালে উৎসব হয়—আমাদের দেশের দীপালি উৎসবের মত, প্রায় সেই সময়েই পড়ে। তখন মন্দিরে মন্দিরে হাজার হাজার বাতি জালানো হয়; পূজাও হয়ে থাকে। এই উৎসবের নাম ‘কারচি’।

আমাদের দেশের নবান্নের মত এ-দেশেও নতুন ধানের একটি উৎসব হয়। প্রথম গৃহীরা নতুন চাল মন্দিরে উৎসর্গ করবে,—পরে সব একসঙ্গে রান্না ক’রে পুরোহিত তা দেবতার

প্রসাদ ক'রে সকলকে বিলিয়ে দেন। এই নাচের নাম 'আলুটসালু'।

কাণ্ডি-নাচিয়েদের ভিতর মুখোমুখি ব্যবহারের রীতি নেই। এ-দেশের অতীত পুরাতন নৃত্যের মধ্যে মুখোমুখি ব্যবহার খুব দেখা যায়। আলোচ্য নর্তকেরা ব্যবহার করে মাথায় রূপোর মুকুট, বুকে সুন্দর পুথির গহনা, কোমরে কাপড়ের বিচিত্র ভাঁজের উপরে রূপোর কাজ-করা ঝকঝকে কোমরবন্ধ, হাতে থাকে মোটা পিতলের বালা। ব্যয়বাহুল্যের জন্য রূপোর মুকুটটা সব নাচিয়েরা ব্যবহার করতে পারে না।

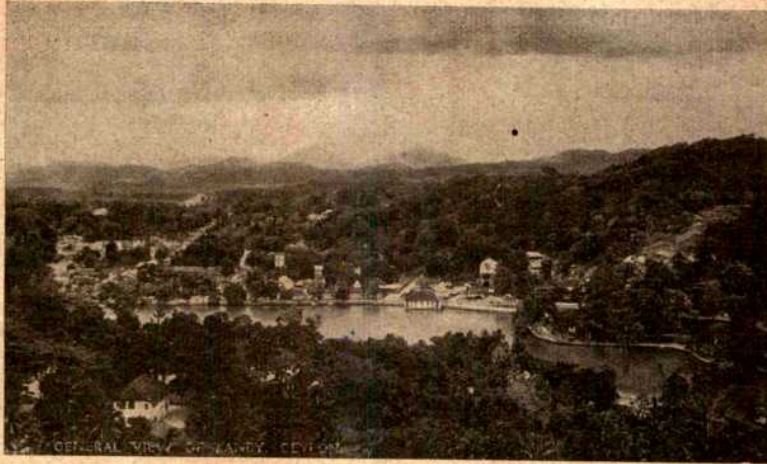
এই নাচের ঐতিহাসিক উৎপত্তির কথা পূর্বেই বলেছি। এবার নাচিয়েদের মুখে এই নাচের উৎপত্তির যে গল্প শুনেছি তাই লিখে শেষ করি।

এ-দেশের প্রাচীন নাচিয়েদের বিশ্বাস, ভগবান মহাব্রহ্ম 'তদ্' 'জিৎ' 'তোম্' 'নাম্' এই কয়টি তালের শব্দ

প্রথম উচ্চারণ করেন। বিশ্বকর্মা তাঁর মুখ থেকে এই শব্দ কয়টি শুনে, তাই নিয়ে তিনি বজ্রিশ রাগের সৃষ্টি করেন ও নয়টি নয় প্রকারের নাচ তৈরি করেন; নাচের উপযোগী ছুটি বাঁশ-যন্ত্রও তৈরি করলেন, একটির নাম 'বেড়ে' অপরটি 'ডাকি'। পরে ঈশ্বরের সামনে এই নিয়ে নাচ-গান ক'রে শোনািলেন। তখন "মহু" অথবা "মহাসম্মত" পৃথিবীর রাজা হয়ে রাজত্ব করছিলেন। বিশ্বকর্মা, ঈশ্বর ও অতীত দেবতারা গন্ধর্ব্ব সহ তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে এই নাচ তাঁকে দেখান। নরপতি সেই নাচ বিশ্বকর্মার কাছ থেকে পেয়ে পরে পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

নাচের আরম্ভে যে-বন্দনা গান হয়, তার সাধারণ অর্থও এই গল্পটিকে প্রকাশ করে :

ভগবান বিশ্বকর্মা নাচের সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বরকে দেখান, তাঁরা উভয়েই মর্ত্যে মানুষের কাছে তার প্রচার করেন। পৃথিবীর অধিপতি মহাসম্মত এই নাচ গ্রহণ করেন। সেই দেবতাদের নমস্কার, তাঁরা এ-নাচকে তাদের আশীর্বাদ দ্বারা রক্ষা করেন।



কাণ্ডি শহরের সাধারণ দৃশ্য
লেকের উপরে ছোট বাড়ীটির পিছনে দস্ত-মন্দির

ফিনল্যান্ড



ফিনল্যান্ডের প্রধান শহর হেলসিনকির একটি উৎস : সিদ্ধু-সিংহ পরিবেষ্টিত।
কুমারী হেলসিনকি সমুদ্রতল হইতে উঠিতেছেন



ফিনল্যান্ডের প্রাচীন রাজধানী টুর্কু শহর—প্রচলিত সুইডিশ নাম ওবো শহর



হেলসিনকি, দক্ষিণ-বন্দর

ফিনল্যান্ডের চিঠি

শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

...উড়ো জাহাজ এইমাত্র ফিনল্যান্ডের ঘাটে এসে পৌঁছল। থেকে, তাদের প্রতিনিধি ছুপুরবেলা আমাকে নিয়ে ঘুরবে, বাল্টিক সাগরের জল রোদ্দুরে ঝলমল করছে, এখন সকাল আভিষ্য দেবে।

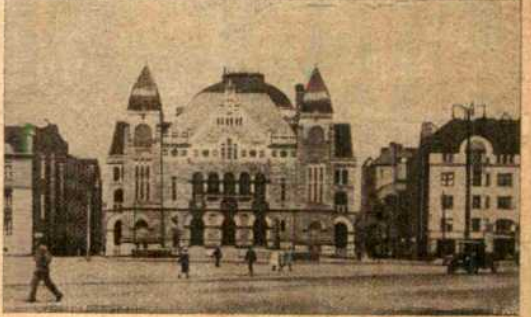
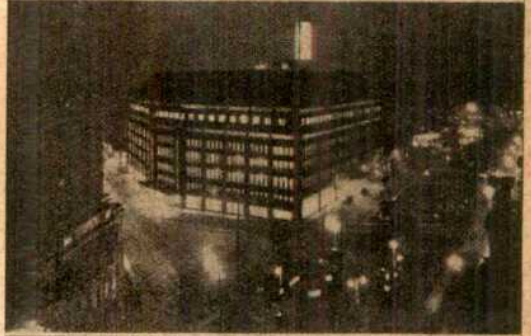
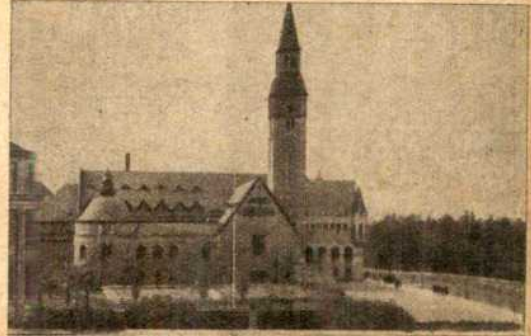
আটটা। ওবো-শহরে নেমেছি—ষট্টি-কয়েক থাকব, তার পর ট্রেনে ক'রে হেলসিংকোরস্ যাব। কি সুন্দর দেশ! হাওয়া আলো এখন ঠিক আমাদের দেশের মত—ঠিক রকমের ঠাণ্ডার স্পর্শ, আকাশ নিম্নল নীল।

হেলসিনকি, ফিনল্যান্ড



ফিনল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার সিবিলিয়স
আধুনিক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-প্রণেতার অমৃতম

ট্রামে ক'রে শহরের বাগানে একটা কাফেতে এসে বসেছি—সামনে ছোট্ট অরা নদী, ছোট্ট ছোট্ট নৌকা, মোটর-বোট ভাসছে, ওপারে বাগানবাড়ী, এপারে ঘাসের তট, বাগানে ফুল ফুটেছে। এখনও কেউ আসে নি এই কাফেতে থেতে,—ভাষা ত বোঝা অসাধ্য, তাই হাত পা নেড়ে বোঝালাম, কফি আর প্রাতরাশ চাই। এখনই আনবে। তার পর ছোট্ট শহর ঘুরে দেখব। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যার্থী-পরিষদে খবর দিয়েছে সুইডেন



জাশনাল মিউজিয়াম
বৃহত্তম দোকান ঘর
জাশনাল থিয়েটার

বহুকাল থেকে মনে স্বপ্ন ছিল ফিনল্যান্ড দেখব—এত দিনে সার্থক হ'ল। অরণ্য, হ্রদ এবং দ্বীপের এই দেশ—

নানা জাতি নানা ভাষার আদিম মিশ্রণ এখানে ; শীতকালে বরফে সমস্ত জীবন-সংসার বন্দী হয়ে থাকে, তখন ধূসর-শুভ্র মেরুর প্রকাশ পাইন-বন থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত। বাকী সময় প্রাণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্য, গ্রামে শহরে নূতন কালের হেলসিনাক, ফিনল্যান্ড



সম্মতি-দান
রেলওয়ে স্টেশন
পার্লমেন্ট-সৌধ

আনন্দিত আত্মপ্রকাশ। রাশিয়া এবং সুইডেনের দুই প্রান্ত এসে ঠেকেছে ফিনল্যান্ডের সীমানায়, এদের সভ্যতায় তার পরিচয়। অথচ ভাষায় ব্যবহারে শিল্পে এদের সম্পূর্ণ স্বাভাব্য এবং আধুনিক কালে এরা দ্রুত এগিয়ে গেছে।

জীবনযাত্রার ব্যবস্থায় এরা কারও চেয়ে কম নয়—সুইডেনের মত এখানেও ইলেকট্রিসিটি যুগান্তর এনেছে ; এদের মাছের ব্যবসা, কারুশিল্পের প্রচলন বিজ্ঞানকে ব্যবহারে লাগিয়েছে। হায় রে ভারতবর্ষ ! এখনও দেশে বহু লোক ভাবছে বিদেশী-তাড়িয়ে কোন মতে পাড়াগাঁর ডোবায়, মন্দিরে, ম্যালেরিয়ায় অভিভূত হয়ে থাকতে পারলেই মোক্ষলাভ হবে ! বিদেশীর হাত হ'তে নিষ্কৃতি যে-প্রবল জাগ্রত বুদ্ধির যোগে সম্ভবপর হবে সেই বুদ্ধি জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দূরে রাখে না, সে-বুদ্ধি পাণ্ডা পুরোহিতকে দূর করে পঞ্জিকা পুড়িয়ে জ্ঞানের উন্নত গগনে নূতন কালে আপনাকে জানতে চায়। হয়ত সেই চেতনা আমাদের দেশে আজ সক্রিয় হয়ে উঠছে, কিন্তু দেশের কাগজে তার তেমন পরিচয় পাই না, দেশের সাহিত্যেও তার সহজ আগ্রহ দেখি না। ফিনল্যান্ডের সামান্য সাধারণ কার্টুরে বা মাঝি যে-স্বাধীনতাকে প্রাত্যহিক অভ্যাসে, চিন্তায় স্বীকার করতে চায়, আমাদের দেশী বহু নেতা বা শিল্পদল তাকে অস্বীকার করে চক্রান্ত এবং মিথ্যা আন্দোলনের যোগে রাষ্ট্রিক মুক্তি কামনা করছেন।

জহরলালের মত মনস্বী নেতা ছল'ভ, আশা করা যায় তিনি কিছু পরিমাণে দেশের মন বদলাতে পারবেন। সুভাষ বাবুকে ত শাসনতন্ত্র বন্দী করেই রাখল। বাংলা দেশে নূতন মননের নেতা আজ কোথায় ? হয়ত কলেজ স্কোয়ারে বাংলার গ্রামের কোণায় এখানে-ওখানে তাঁরা জাগছেন—তাঁরা যেন ফিনল্যান্ডকে মনে রাখেন ! অর্থাৎ আগামী ভারত-সভ্যতাকে নূতন যুগের চোখে, পৃথিবীর মানুষ জাতির আত্মীয়রূপে চেয়ে দেখেন। তবেই ভারতবর্ষ রাষ্ট্রে, লোক-ব্যবহারে, আধ্যাত্মিক সত্যবোধে জীবন-কর্মে মুক্ত হবে।

আমার এই পশ্চিম-ভ্রমণ তীর্থযাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে—তীর্থযাত্রা, কিন্তু আপন আত্মীয়মণ্ডলীর মহলে মহলে আনা-গোনা। যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম তাতে জীবন সার্থক হ'ল, জানলাম, স্বীকার করলাম, মানুষের পৃথিবীতে এসে প্রাণকে ভালবাসলাম। প্রাণের জয়গান শুনলাম দ্বীপে দ্বীপে, বন্দরে বন্দরে, কত নিভৃত জুড়ুর লোকালয়ে। দুঃখ, অজ্ঞায় অসত্যকে ছিন্ন করে দেশে দেশে এই ওঙ্কার উঠেছে জীবন-যাত্রার—কত সঙ্কায় কত লোকের বাড়ীতে, উৎসবে, নিভৃত আলাপে মনে মনে বলেছি 'এই ত পেয়েছি' ! আজ স্বদেশে

ফেরার কালে ভাবছি, কি ভাবে দেশের আলোয় লোকালয়ে পুনর্জীবনের সুরে শব্দ প্রাণের এই আহ্বান, প্রাণের এই স্বীকৃতি। আর কিছু নয়, জীবন থেকে বিদায় নেবার আগে দেশে শুনতে চাই সত্যের সুরে স্বাধীনতার সঙ্গীত, যেন দেখতে পাই এখনকার নবীন বাঙালীর জীবনে মানব-সংসারের বিশ্বভূমিকা।

অনেক সময়েই ভিড়ের মধ্যে থাকি, হোটেল, মিটিং, নিমন্ত্রণ-পার্কে, অল্প সময়ে অনেক কিছু করতে হয়, তাই হুড়োহুড়ি অনিবার্য।...সুইডেনে আশ্চর্য সমাদর পেয়েছি; হামবুর্গের প্রকাণ্ড কনফারেন্সের কাগজপত্র ছবি হয়ত এত দিনে পৌছেছে। কি বিরাট আয়োজন—একমাত্র জার্মান জাতিই এমন নিপুণ, সুন্দর ব্যবস্থা করতে পারে। জার্মানদের আধুনিক রাষ্ট্রিক ব্যবহারে বহু অত্যাশ্চর্য প্রবল হয়ে রয়েছে, কিন্তু ওদের ভিতরকার বীর্ঘ্য মরে নি—কনফারেন্সের প্রতি পালায় তার পরিচয় পেয়েছি ওদের অকৃত্রিম সৌজন্তে, বুদ্ধির প্রসন্ন নির্মল প্রকাশে, জ্ঞানের গভীরতায়। সমস্ত শহর জুড়ে এই Welt-Congress-এর উৎসব—সে যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার তা আরও বই ছবি যখন বেরবে তখন জানা যাবে।

সময় পেলে উড়োপথের বিবরণ লিখব—আকাশযাত্রীর ভারতীয় চোখে পশ্চিমদেশ দর্শন! কি আরামে ঘুরেছিলাম কি বলব! এখন এই বাণ্টিকের ছোট্ট জাহাজও বেশ লাগছে—এর কবিত্ব অল্প রকম। এক পৃথিবীর জীবনে কতখানি ধরে!



বিদ্যবিজ্ঞানে প্রবেশিক-লান্ডের উৎসবে ছাত্রীগণ

• যেন একা

শ্রীশুধীরচন্দ্র কর

মিশিয়া আছে সবার মাঝে অথচ যেন একা,
সকল কাজে লেগে-না-লাগা সে ছুটি করলেখা।

আড়ে আড়ে সে নিরীলা থাকে,
জানি না আর কে জানে তাকে,
তবে কি জানি কোন্‌ সে ফাঁকে
কারে কে দেখে দেখা!

হয়ত কিছু দেখিতে ক্ষীণ, রঙেও কিছু কালো,
দেখিলে তারে ভাবিতে পারো এমনই কি বা ভালো!

চোখে লাগিবে অনেক ভুল,—
কেন সে এঁটে বাঁধে না চুল,
জামার হাতা কাঁধে আঁতুল,—
ওই বা কোথা শেখা!

জেনে-না-জানি অবহেলায় আঁচল ফেলা পিঠে,
দেখে-না-দেখা তাকানোটুকু দেখ না আধ-দিঠে!
মুখচাপা সে ভাবের ত্রোল

বুঝিতে যদি বাধে বা গোল,
চেয়ো না, মন রেখো অটল;
নাই ত কিছু ঠেকা!

কিছু না, তবে স্বরটি মিঠে কথাটি টানা-টানা,
—হয়ত ক্রমে উঠিবে মনে এমনি কথা নানা।

ইচ্ছা হবে,—দেখি আবার,
শুধু দেখাতে দোষ কি আর!
ছায়া ত রবে আঁখির পার
আদর নিরপেক্ষা!

দেখিতে হয় দেখো তখনো; দেখ তোমরা কত!
আমরা শুধু জানিতে চাই, সে কি দেখার মত?

চোখে চোখে ত নাই আঁটক;
শত হ'লেও অবলা লোক,

—একটু তাই রাখিয়ে চোখ,—
মনে না কাটে রেখা ॥



ঐশ্বর্য



জীবাণুর আলো

মানুষ এ পর্যন্ত যত রকমের আলোক উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আলো অপেক্ষা উত্তাপের ভাগই বেশী। কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত আলোকের প্রায় চৌদ্দ আনাই উত্তাপে বাজে খরচ হইয়া যায়। মোটের উপর আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা কাঙ্ক্ষারী ভাবে কৃত্রিম ঠাণ্ডা আলোক উৎপাদন করিতে কৃতকার্য হন নাই। অথচ স্বাভাবিক উপায়ে জাত বিভিন্ন রকমের ঠাণ্ডা আলো অহরহ আমাদের নজরে পড়িয়া থাকে। জোনাকী, কেঁচো ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ অতি স্নিগ্ধ আলো প্রদান করিয়া থাকে। দার্জিলিঙের কোন কোন অঞ্চলে দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীরের চতুর্দিক হইতেই এক প্রকার উজ্জ্বল স্নিগ্ধ, নীলাভ আলোক নির্গত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে অনেকে এই আলো কাজে লাগাইয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকায় অগ্নিমক্ষিকা নামে জোনাকী-পোকার মত উজ্জ্বল আলোপ্রদানকারী এক প্রকার বড় বড় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম অধিবাসীরা কয়েকটি পোকা একত্র রাখিয়া অন্ধকারে সেই আলোতে কাজকর্ম করে। আমাদের দেশেও জোনাকী-পোকা ফাংনায় আটকাইয়া রাত্রির অন্ধকারে অনেককে ছিপে মাছ ধরিতে দেখিয়াছি।

এই সব কীটপতঙ্গের শরীর-অভ্যন্তরস্থ আলোবিকীরণকারী কোষ হইতে নির্গত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেণুসমূহের মধ্যে লুসিফেরিণ নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। এই লুসিফেরিণই আলোক প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তৎসঙ্গে লুসিফারেজ নামে এক প্রকার 'এন্জাইম' আলোক উৎপন্ন করিতে সহায়তা করে। স্নাইচ টিপিলে যেমন আলো জলিয়া উঠে, সেইরূপ ঘর্ষণ বা অগ্নি কোনরূপ আলোড়নের ফলে এন্জাইম আলো জালিয়া দেয়। এই জাতীয় জান্তব আলো জলিবার জন্ত অক্লিঞ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়।

কীটপতঙ্গ ব্যতীত কোন কোন ফুল এবং ব্যাঙের ছাতা হইতেও আলোক নির্গত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলের বনে জঙ্গলে স্নিগ্ধ নীলাভ আলোপ্রদানকারী গাছপালাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক প্রকার আণুবীক্ষণিক ছত্রাক-সৃষ্ট গাছপালার আলোক

উৎপাদনের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। আমাদের দেশের আলোবিকীরণকারী গাছপালা সন্ধ্যা প্রায় চৌদ্দ-পনের বৎসর পূর্বে প্রবাসীতে আলোচনা করিয়াছিলাম।

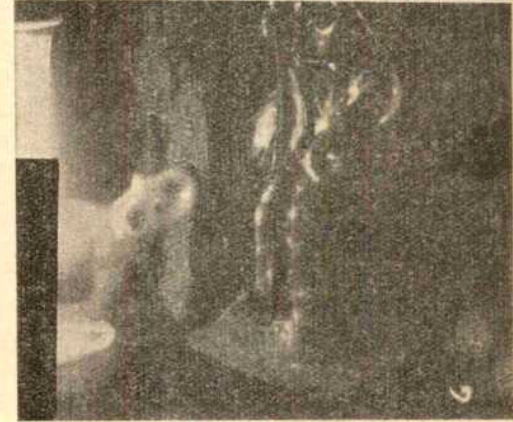
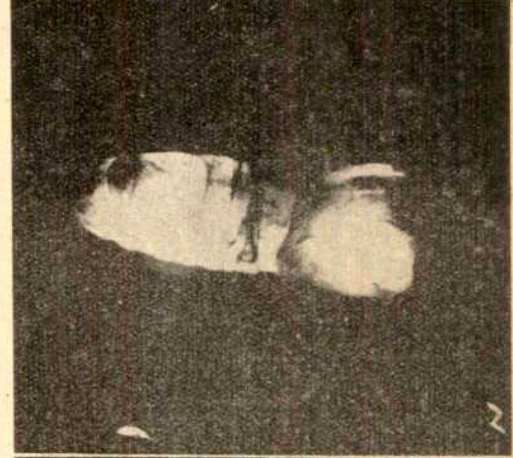
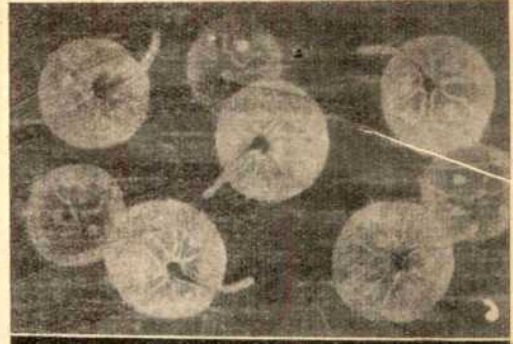
এতদ্ব্যতীত সমুদ্র ও নদীর মোহানায় নোনা জলে অন্ধকারে এক প্রকার আলো দেখিতে পাওয়া যায়। সাগরের উপকূলে স্কন্দরবন অঞ্চলের নদীনালা জলের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এইরূপ আলোর খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। একটু জোরে বাতাস বহিলে বা জল একটু আলোড়ন করিলেই যেন তরল অগ্নির মত জলিয়া উঠে।

উত্তাপবিহীন স্বাভাবিক আলোর কথা বহু প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ অবগত ছিল। কিন্তু তাহারা এই আলোক-উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ধারণ করিতে না পারিয়া ইহাতে দৈবশক্তির সন্মিলন আরোপ করিত। সমুদ্রের মধ্যে জাহাজের মান্ডলের উপর সময়ে সময়ে 'সেট এল্মোজ্ ফায়ার' নামে এক প্রকার নীলাভ বৈজ্যতিক অগ্নিস্কু-লিঙ্গ বিকীরিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা মনে করিত কাষ্টর ও পোলাক্স নামে আমাদের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত দুই যমজ দেবতা এই অগ্নি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অত্যুচ্চ পিরামিডের শীর্ষদেশে উঠিয়া হাত উঁচু করিয়া তুলিলে ঋতু-বিশেষে সময় সময় শরীরের মধ্যে সূচ বিধিবার মত এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ক্ষীণ আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকে তদ্রূপবাসী আরব পথ-প্রদর্শকেরা, পিরামিড-গহ্বরে সমাহিত মৃতের আত্মার কোন অলৌকিক ক্রিয়া বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু সমুদ্রজলে আলোর খেলা সন্ধ্যা প্রাচীনেরা বিশেষ কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। এমন কি হোমারের মত কবি, যিনি সাগরের উত্তাল তরঙ্গরাজির জীবন্ত বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, তিনিও সাগরোপরি এই অদ্ভুত হৃদয়গ্রাহী আলোর খেলার কথা উল্লেখ করেন নাই। ডারউইন দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের আলোর মনোমুগ্ধকর বিচিত্র লীলা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—অন্ধকার রজনীতে একদিন যখন আমাদের জাহাজ চলিতেছিল তখন সমুদ্রজলে এক অপরূপ দৃশ্য চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তখন অল্প অল্প স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতেছিল। দিবার বেলায় চেউএর মাথায় যেসব সাদা

ফেনা দেখিতে পাওয়া যায়, যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দিকেই সেই ফেনাগুলি যেন এক প্রকার স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। আমাদের জাহাজের সম্মুখভাগের দিকে চাহিয়া মনে হইল, জাহাজ যেন তরল অগ্নিরাশিকে দুই ভাগে কাটিয়া অগ্রসর হইতেছে। আর পিছনে চাহিয়া মনে হইল, যেন আকাশের ছায়াপথের মত অখণ্ড অধিকতর উজ্জ্বল আলোর পথ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় চতুর্দিকে সর্বত্রই যেন এই অপূর্ণ আলো সমুদ্রজলে ফুটিয়া উঠিতেছে। দিগন্তের আকাশও যেন কিছুদূর পর্য্যন্ত এই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য অবর্ণনীয়।

সমুদ্রজলের এই প্রাকৃতিক আলোর উৎপত্তির কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত রহস্যবৃত্তই ছিল। অবশ্য এই বিষয়ে আজও কতকগুলি সমস্তা সূক্ষ্মীমাসিত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতেরা মনে করিতেন সমুদ্র দিনের বেলায় সূর্য্যকিরণ শোষণ করিয়া লয় এবং রাত্রি-বেলায় সেই আলো বিকীরণ করিবার কালে নিশ্চত আলোক দৃষ্টিগোচর হয়।

রবার্ট বয়েল প্রতিপাদন করিলেন যে, পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য বাতাস ও জলের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ঘর্ষণের ফলেই এই আলোর উৎপত্তি। বিংশ শতাব্দীতেও কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে সমুদ্রজলের ফস্ফরাসই আলোক-উৎপত্তির কারণ। কিন্তু সমুদ্র-জল বা অল্প কোথাও ফস্ফরাসের নিরবচ্ছিন্ন পৃথক অস্তিত্ব দেখা যায় না। যৌগিক পদার্থ হইতেই ইহা পাওয়া যায়। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে দুই জন ইটালীয়ান প্রফেসরই সর্বপ্রথম সমুদ্রজলে আলোক-উদ্ভির প্রকৃত কারণ নিদ্রারণ করেন। এড্রিয়াটিক সমুদ্রের জল পরীক্ষা করিয়া তাহারা তাহাতে আলোবিকীরণকারী এক প্রকার আণুবীক্ষণিক-জীবাত্মক সন্ধান পাইয়াছিলেন। তৎপরে অসংখ্য বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফলে কালক্রমে সমুদ্রজলবিহারী আলোবিকীরণকারী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও বহুপ্রকারের জীব ও জীবাত্মক অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমুদ্রজলে আলোক উৎপত্তির প্রধান কারণ সাধারণতঃ ‘নক্টিলুকা মিলিয়ারিজ’ নামে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক জীবাত্মক। মাইক্রোস্কোপের নীচে এই জীবাত্মককে দেখিতে যেন এক টুকরা গোলাকার জেলীর মত পদার্থ। পাশাপাশি ভাবে ইহাদের শরীর এক ইঞ্চির ৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। শরীরের একদিকে খাঁজকাটা। সমগ্র পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া পাতার ন্যায় কতকগুলি শিরা-উপশিরা ছড়াইয়া আছে। গর্ভের মত স্থান হইতে সেজের ন্যায় একটি উপাদ্ধ বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই সেজ আন্দোলন করিয়া উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর



- ১ নক্টিলুকা মিলিয়ারিজ : ইহাদের শরীর হইতে নির্গত আলোকে সমুদ্রজল আলোকিত হইয়া থাকে
- ২ চিড়িমাছের মধ্যে আলোক-বিকীরক জীবাত্মক জন্মাইবার পর অক্সিজেন-প্রয়োগে অন্ধকারে গৃহীত ছবি
- ৩ কাচের পাত্রে রক্ষিত চিড়িমাছ হইতে আলো নির্গত হইয়া পার্শ্বের মূর্তির উপর পড়িয়াছে। সেই ক্ষণে আলোকে বহুক্ষণ অপেক্ষার পর অস্পষ্ট ছবি ফুটিয়াছে

[কটোগ্রাফ লেখক-কর্তৃক গৃহীত]

আধুনিক প্রাণীদ্বিগকে লেজের গোড়ার দিকে মুখের কাছে ঠেলিয়া দেয়। জেলীর পুণ্ডের বহিরাবরণস্থিত প্রোটোপ্লাজম হইতে আলো নির্গত হয়। নকটিলুকা পরিণত বয়সে উপনীত হইলে পাশাপাশি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ভাগ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবাত্মতে পরিণত হয়। তাহারা আবার কালক্রমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বংশ-বিস্তার করিতে থাকে। কাজেই আকস্মিক কোন বিপদ না ঘটিলে ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বলিতে গেলে স্বাভাবিক মৃত্যু ইহাদের নাই। পরীক্ষার্থ অমুকুল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ইহাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখা চলে। এ অবস্থায় যদি কোন কারণে আলো বিকীরণ না করে তবে এক ফোঁটা সুরাসার বা ক্ষীণবীৰ্য্য অল্প ফেলিয়া দিলেই ইহারা উত্তেজিত হইয়া ওঠে এবং আলো বিকীরণ করিতে থাকে। জীবাত্মমিশ্রিত জল স্নাতি কাগজে ছাঁকিয়া লইলে, সেই কাগজ হইতে এত আলো পাওয়া যাইবে, বাহার সাহায্যে ৮৯ ইঞ্চি দূর হইতেও অনায়াসে বইয়ের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জীবাত্মপূর্ণ জলের মধ্যে সহজ-উত্তেজক খাম্বোমিটার দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উহাতে উত্তাপের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু ইহাদের শরীরে কি করিয়া আলোর উৎপত্তি হয় তাহা আজও নির্দিষ্টরূপে জানা যায় নাই। স্থলজ কীটপতঙ্গ এবং বিভিন্ন জাতীয় মৎস্তের মধ্যে যে আলো দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্নায়ুস্থরের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই আলো যৌন ব্যাপারের সহায়ক; কিন্তু নকটিলুকার শরীরের মধ্যে স্নায়ুজালের অস্তিত্ব নাই। তাহাদের চক্ষুও নাই, এমন কি যৌন পার্থক্য পর্য্যন্ত নাই।

মেক্সপ্রদেশ হইতে উষ্ণ প্রদেশ পর্য্যন্ত সাগর মহাসাগরেই এই আলোর দৃশ্য দেখা যায়, প্রশান্ত মহাসাগরের জলে কোন কোন স্থানে এত অধিক নকটিলুকা দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই জলে অবগাহন করিলে প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত সর্বশরীর আলোকময় দেখায়; অষ্টেণ্ডের সমুদ্রজলেও এই জীবাত্ম এত অধিক পরিমাণে বিস্তারিত যে সমুদ্রের উপকূল-ভাগের ভিজা বালুকারাশিকে রাত্রির অন্ধকারে অলস্ত লাভার মত প্রতীয়মান হয়।

সমুদ্রজাতীয়া দেখিয়াছেন, রাত্রির অন্ধকারে ভারত-সমুদ্রের কোন কোন স্থান এই জীবাত্ম আলোকে বিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্রের মত দেখায়। সমুদ্রের জলে এই জীবাত্ম ব্যতীত গভীর জলের নিম্নতম প্রদেশে অনেক রকমের মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শরীর হইতে বৈদ্যুতিক আলো আবার কাহারও কাহারও শরীর হইতে ঠাণ্ডা আলো নির্গত হইয়া থাকে। ইহারাও

দলে দলে বিচরণ করিয়া স্থানে স্থানে সমুদ্র জল আলোকিত করিয়া তোলে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন রকমের মাছ ও জলচর পাখীর মাংসে প্রচুর পরিমাণে একপ্রকার আধুনিক জীবাত্ম জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের শরীর হইতেও নীলাভ আলোক নির্গত হয়, ইহাদিগকে সাধারণতঃ 'ব্যাক্টিরিয়াম ফস্ফোরেসেন্স' বলে। নোনা জলের চিংড়ি-মাছের শরীরে প্রায়ই এই জাতীয় আলোপ্রদানকারী জীবাত্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মরিবার প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা পরে মিঠা জলের চিংড়ি মাছের দেহে কমবেশী আলো-বিকীরণকারী জীবাত্ম জন্মিতে দেখা যায়। সময় সময় নোনা জলের চিংড়িমাছের শরীর হইতে এত অধিক পরিমাণ আলোক নির্গত হয় যে দশ-বার ইঞ্চি দূর হইতেও তাহার সাহায্যে অন্ধকারে বইয়ের অক্ষর পড়িতে পারা যায়। এই আলো-বিকীরণকারী মাছ হইতে দুই-চারিটি জীবাত্ম তুলিয়া লইয়া, বিশেষভাবে প্রস্তুত 'এগার-এগার' বা ভাতের মণ্ডের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে, উপযুক্ত উত্তাপে সে-স্থলে তাহারা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ইহারা বংশ-বিস্তার করে, কাজেই যে-পাত্র 'এগার-এগার' রাখিয়া জীবাত্ম ছাড়িয়া দেওয়া হয়, দিন দুইয়ের মধ্যেই সে-পাত্রটি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চিংড়িমাছ মরিবার প্রায় আট-দশ ঘণ্টা পরে আলো দেখা দিতে শুরু করে, অন্ধকারে রাখিয়া যে-কোন সময়েই যে-কেহ এই আলো প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আলো অমুজ্জ্বল হইলে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োগে ইহার উজ্জ্বল্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ছবির ফটোগুলি সবই মাছের আলোতে তোলা। চিংড়ি মাছের আলো-বিকীরণ শুরু হইবার প্রায় দু-তিন ঘণ্টা পর মাছের আলোতেই অন্ধকার ঘরে ফটো লওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ, শরীরের মধ্যস্থলে ও মাথার কাছেই বেশীর ভাগ জীবাত্ম জন্মিয়া থাকে। লেজ ও মুখের প্রান্তভাগ নিশ্চয়।

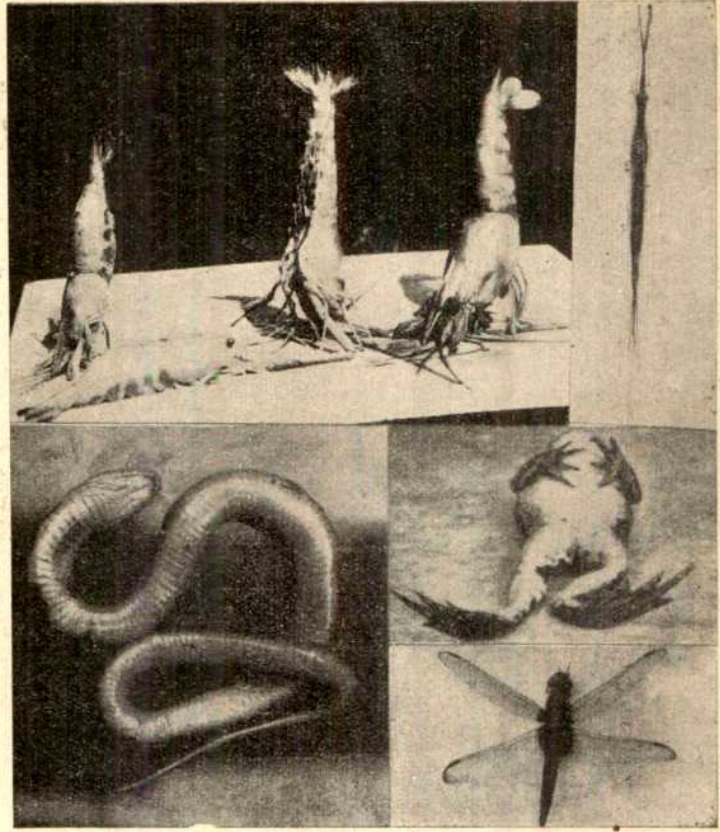
চিংড়িমাছ ব্যতীত গাছ ও ইলিসমাছ বাসি করিয়া রাখিলেও সময় সময় আলোবিকীরণকারী জীবাত্ম জন্মিতে দেখা যায়। হাঁস ও মুরগীর মাংস রাখিয়া দিলেও সময় সময় ঐরূপ নীলাভ আলো জ্বলিতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের সম্মোহিত অবস্থা

আকস্মিক ভয় অথবা স্থানবিশেষে অতর্কিত আঘাতের ফলে মানুষকে যেমন কোন কোন অবস্থায় সম্মোহিত হইতে দেখা যায়, নিম্ন শ্রেণীর কোন কোন প্রাণীর মধ্যেও অতর্কিত ভয় বা আঘাতের ফলে অমূরুপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ভয়ের কারণ ঘটিলে মাকড়সারা সাধারণতঃ ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু অতর্কিতভাবে

ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কোন কোন জাতীয় মাকড়সার বুদ্ধিবৃত্তি লোপ পাইয়া যায়, তখন হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা অসাড়ভাবে মৃতের জায় পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ বা পাগুলিকে একত্র করিয়া শরীরের উভয় দিকে লম্বালম্বিভাবে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত খড়কুটার মত নিষ্পন্দভাবে অবস্থান করে। পাতীহাসকে হঠাৎ চিং করিয়া দিলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন একটা সাময়িক জড়তা আত্মপ্রকাশ করে; এই অবস্থায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্দভাবেই অবস্থান করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ায় 'টনি-ফ্রগমাউথ' নামে এক প্রকার কাঠ-চোকুরা-জাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। হঠাৎ কোন রূপ ভয় পাইলে ইহার বসিবার ডালের সমান্তরালে শরীর সোজা করিয়া দেয় এবং কাঠের মত নিজীবভাবে অবস্থান করে। দেখিয়া গাছের অংশ-বিশেষ বলিয়াই ভুল হয়। 'মরোসাস' নামে এক প্রকার রাত্রির কাঠিপোকর উপর হঠাৎ তীব্র আলোক নিদ্রাপ করিলে ইহার এমনভাবে শক্ত ও অসাড় হইয়া পড়ে যে, শত চেষ্টা করিয়াও উহাদিগকে শুদ্ধ কাঠি ব্যতীত জীবন্ত প্রাণী বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। সাপ যখন ফণা বিস্তার করিয়া সোজা হইয়া

ওঠে, তখন কৌশলক্রমে মাথার পিছন দিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থুব জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলেই একেবারে অসাড় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় সাপকে সম্পূর্ণ মৃতের জায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ব্যাঙকে পিছনের পায়ে ধরিয়া হঠাৎ চিং করিয়া ফেলিলেই সে মড়ার মত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিষ্পন্দভাবে পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশীয় জলজ কাঠিপোকাকে ঘাড়ের কাছে হঠাৎ আঘাত করিলে হাত পা গুটাইয়া সে এক খণ্ড কাঠির মত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিজীবভাবে অবস্থান করে। চিড়িমাছকেও এই রূপে সন্মোহিত করা যাইতে পারে। চিড়ির লেজের দিক হইতে পিঠের উপর দিয়া মাথা পর্য্যন্ত একটু জোরে চাপ দিয়া উন্ট দিকে কয়েক বার আঙুল বুলাইলে দেখা যায় যে উহার শরীরের



শ্বেধক-কর্তৃক গৃহীত চিত্র

সন্মোহিত প্রাণী

- উপরের সারি : চিড়িমাছের পিঠের উপর উন্টভাবে আঙুল টিপিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে।
সামান্য আঘাতে মৃতবৎ কাঠি-পোক।
নীচের সারি : জোরে ঝাঁকুনি দেওয়ার ফলে মৃতবৎ সাপ।
হঠাৎ চিং করিয়া ফেলায় মৃতবৎ ব্যাঙ।
নিষ্পন্দ ফড়িঙ।

মাংসপেশীগুলি শক্ত ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। তখন সে আর মোটেই নড়াচড়া করিতে পারে না। এ-অবস্থায় চিড়িকে দাঁড় করাইয়াই হউক বা হেলানো ভাবেই হউক যে-কোন রকমে রাখিয়া দিলে ঠিক সেই ভাবেই অবস্থান করিবে। বিভিন্ন জাতীয় ফড়িঙের মধ্যেও এরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ফড়িঙকে অত্যন্তভাবে ধরিয়া চিং করিয়া রাখিয়া দিলে সে একেবারে মৃতের জায় অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকিবে। চিং করিয়া ফেলিবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে ইহাকে যে-কোন অবস্থায় দাঁড় করাইয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাদের এ-অবস্থা অতি স্বল্পকালস্থায়ী।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভীকু

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সেদিন অকস্মাৎ
উদ্‌দাম হ'ল মনের পবন,
কাঁপায়ে তুলিল শান্ত ভবন,
জাগিল বাক্সা, বন উপবন নিমিষেতে ধূলিসাৎ ।
অস্তর মাঝে জাগে বর্কর,
শান্তির মাঝে প্রলয়ের ঝড়,
সহসা রুদ্ধ নটেগের যেন স্থলিত চরণপাত !
কেই বা মানিবে শাসনের মানা,
পক্ষীশাবক মেলিতেছে ডানা,
স্থির সরোবর সহসা হইল অস্থির জলপ্রপাত ।
শুমরি গুমরি মনের মাঝারে
ভীকু মন আর রহিতে না পারে,
ছিড়িয়া বাহির হ'ল একেবারে, সমুখে তিমির-রাত ।
সেদিন অকস্মাৎ ।

হ'ল যে অনেক কাল—
ঘুমজড়া চোখে তটে হানে কর,
হেলিয়া পড়েছে তপন প্রথর,
মাগরের জলে জেগেছিল ঝড়, উদ্‌দাম উত্তাল ।
ঢেউয়ের শিখরে ঢুলেছিল তরী,
বলেছিল মন, বাঁচি কিবা মরি,
ভেবেছিল মনে, সঞ্চয় যত জীবনের জঞ্জাল !
সারিদল বেঁধে গগনের গায়
গগনবিহারী পাখী উড়ে যায়,
অকূল মাগরে ব্যাকুল বাতাসে ফুলে উঠেছিল পাল ।
চলিতেছিলাম কোথায় না জানি,
গুনি নাই পিছে কারো কানাকানি,
সমুখে আলোক দেয় হাতছানি পিছে মায়া-তমোজাল !
হ'ল সে অনেক কাল ।

আজি নিস্তেজ বেলা,
সহসা টুটেছে রৌদ্রের মায়া
ঘনায় দু-ধারে কালো কালো ছায়া,
পিছন সমুখে ধরে যেন কায়া, এ এক নূতন খেলা ।
যে স্নেহ-প্রীতির ফেলে এত পিছে
চোখে দেখি তার সমুখে জাগিছে,
মাগরে কখন ডুবিয়াছে তরী সার হ'ল ভাঙা ভেলা !

বসিয়া বসিয়া শুধু দিন গণি,
মাছুষই হয়েছে নয়নের মণি,
মাছুষের প্রীতি মাছুষের স্নেহ, মাছুষের অবহেলা ।
বাহিরের ঝড় বহিছে বাহিরে
তটিনী ছুটেছে সাগরে চাহি রে,
ঘরেই আমাদের ঘিরিয়া বসেছে বহু বাসনার মেলা ।
আজি নিস্তেজ বেলা ।

তোমরা ক্ষমিও মোরে,
সেদিন বুঝিতে পারি নি কেবল
নয়ন থাকিলে বুকে থাকে জল,
যদিও জগৎ চলচকল বাঁধা পথে সেও ঘোরে ।
বন্ধু, সেদিন পারি নি বুঝিতে
আমি পথহারা আমারে খুঁজিতে,
নিশীথ-তিমিরে সায়াক্ষ মোর খুঁজিছে আমারই ভোরে ।
ধূমকেতু সেও ফিরে ফিরে আসে,
ধরার আকাশ সে কি ভালবাসে ?
স্নেহের ভিক্ষা মাগিছে মৃত্যু জীবনের দোরে দোরে ।
ভেসেছিল তরী যে-বাঁধন ছিড়ে
তারই টানে তটে এল ফের ফিরে
ভরসা পাই না অজানা তিমিরে ছিড়িতে সে মায়া-ভোরে ।
তোমরা ক্ষমিও মোরে ।

শয়ন-শিয়রে মম
ছলিছে আমার রজনী দিবস
কতু চকল কতু বা বিবশ,
আলোকদীপ্ত কতু দিক্ দশ, কতু স্থনিবিড় তম
ঢেকে রাখে মোরে ছুটি ডানা দিয়া,
অকারণ ভয়ে উঠি শিহরিয়া,
জানি না বুঝি না তবু বার-বার, বলি, নমো নমো নমঃ ।
প্রলয়-বাক্সা গগনে গগনে,
প্রদীপ জলিছে আমার ভবনে,
নির্ভর স্থখে ঘুমায় তাহারা যারা মোর প্রিয়তম ।
জানি একদিন বাক্সার বায়ে
শয়নঘরের প্রদীপ নিবায়
চোরের মতন শঙ্কিত পায়ে আসিবে সে নির্দম
শয়ন-শিয়রে মম ।

মণ্ডল-বাড়ী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দিদিমার সঙ্গে মামার বাড়ী যাইতেছিলাম।

আমাদের গ্রামকে আমরা বলি শহব। পাকা ইটের রাস্তা,—অন্ধকার রাস্তাতে বাস্তায় মিটমিটে কেরোসিনের আলো জ্বলে, অনেক কোঠাবাড়ী, নিত্য বাজার বসে, বড় স্কুল, পোষ্ট আপিস এমন কত কি যাহা দিদিমাদের ওই মাইল দুই দূরের পাড়াগাঁথানিতে নাই। আমাদের শহর হইতে ওই পাড়াগাঁয়ে যাইবার দুটি পথ। এক মাঠের ভিতর দিয়া, অত্রটি কতকগুলি ছোট বড় আমবাগানের মধ্য দিয়া বিলের ধারে গিয়া পড়িতে হয়। বিলকে চক্রাকাবে বেঠন করিয়া একেবারে মামাবা ঘে-ঘাটে স্থান করিতে আসেন সেইখানে উঠিতে হয়।

দিদিমা এ-পথে আসিতে চান না। আমাদের শহরের আমবাগানের শেষপ্রান্তে—বিলের উঁচু পাড়ে কয়টি বড় বড় অশ্বখগাছ যেখানটা দিনের আলোকে সর্কক্ষণই ঢাকিয়া আছে, পথ অসমতল—একটু অসাবধান হইলে গাছের শিকড়ে প্রাণই হোঁচট খাইতে হয়—ওইখানটার কাহাদের বউ নাকি এক বাদল-সন্ধ্যায় জল আনিবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল। পড়িয়া সে আর উঠিতে পারে নাই। তার পর গীরপুরের এক অসতর্ক পথিক—এমনি অনেক অলৌকিক কাহিনী স্থানটিকে একাকিনী কোন পল্লীনারীর যাত্রাপথকে স্বর্গম করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার পূর্বে মামার বাড়ী গিয়াছি দিদিমার কোলে চাপিয়া—আজ চলিতেছি ইঁটিয়া। দশ বছরের যে-বালক জুতা পায়ে দিয়া ছোট কোঁচা দোলাইয়া, সৰু একগাছি ভাঁটের বেত দিয়া দু-ধারের ঝোপঝাড় ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে আগে আগে চলিয়াছে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে বাধা দিতে বৃদ্ধা দিদিমার সাহসে কুলায় নাই। গ্রীষ্মকালের বেলা, সূর্য্য ডুবিতে বহু বিলম্ব। স্বতন্ত্রা নিঃশব্দেই চলিয়াছি।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্বে সেই অশ্বখগাছের সারি, সেই বন্ধুর পথ, শিকড়-ওঠা রাস্তা। যে-কাহিনী মামার বাড়ী প্রত্যেকের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, দূরে থাকিয়া যে-কাহিনীকে উপকথার মতই মনোময় লাগিয়াছে—আজ হঠাৎ তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া, কি জানি কেন, মনে হইল, ওই ঘন পত্রের ছায়ায় স্থপ্ত অন্ধকারে চারি দিকে বনঝোপের ঈষৎ আন্দোলনে বাতাসের রহস্যময় শব্দশনানিতে সে-কাহিনী আর শুধুই কৌতূহলের বস্তু হইয়া নাই।

চলার গতি থামাইয়া দিদিমাকে ডাকিব ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের ঝোপ নড়িয়া উঠিতেই দেখি,—এক কালো মুষ্টি। চীৎকার করিবার পূর্বেই দিদিমা পিছন হইতে হাঁকিলেন—কে রে, গিরে নাকি?

মুষ্টি বাহির হইয়া হাসিয়া বলিল,—হা-মা-ঠাকরোণ। এনাবে বুঝি লিয়ে এসেছে? উঃ বাবুর যা ভয়! শউবে বটে! দিনকতক রাখ ইখানে—ডর থাক।

—তুই এখানে কি করছিলি?

—কাঠের লেগে আইলাম।—একটু বগ মা-ঠাকরোণ, তোমাদের আগুয়ে দিই।

—না বে না, তুই কাঠ গুছিয়ে নিয়ে আয়। এত বেলা রয়েছে—এই ত এসে পড়লাম।

ঘাটের ধারে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম।

প্রকাণ্ড বহুদূর বিস্তৃত মাঠ—একেবারে নীল আকাশের কোলে মাথা বাখিয়াছে। কোথাও বনরেখা নাই, অস্পষ্টতা নাই। মাঠের বৃক্ক শ্রামল শস্তের তরঙ্গায়িত রূপ, মনে হয় সে-রূপ শস্তের নয়—মাঠের। সাদা রুক্ষ মাঠ হইলে দৃষ্টির লক্ষ্য অত দূর প্রান্তে পৌঁছিত না। মাঠকে বৃত্তাকারে বেঠন করিয়া কালো জল ভরা বিল। অল্পই চওড়া—গভীরতা আছে। কেমন ছোট ছোট পানকোড়ি অনবরত ডুব দিতেছে, আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলাম,—

পানকোড়ি পানকোড়ি ডাফা ওঁসে—

তোমার শাণ্ডী বলে গেছে বেগুন কোটসে।

কত লাল, সাদা পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, পদ্মের পাতাগুলি জলের উপর কেমন চক্ চক্ করিতেছে—ইচ্ছা করে উঠাব একখানি তুলিয়া আনিয়া ভাত খাইতে বসি। এদিকে হাঁটু-জলে দাঁড়াইয়া ‘হিস্’ ‘হিস্’ শব্দে ধোপাবা পাটের উপর কাপড় আছড়াইতেছে। ধোপানীরা ঢালু তীরের উপর কাপড় শুকাইতে দিয়া উনানে কি সিদ্ধ করিতেছে। কতক-গুলি কালো কালো লোক কষ্টির ছিপ জলে ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। পাশে তাহাদের ছোট খালুইয়ে কত রকমের ছোট ছোট মাছ!—পা আব চল না।

দিদিমা অনবরত হাত ধরিয়া টানিতেছেন।

—বেলা যে গেল, চ! এখনও পোয়াটাক পথ।

টানিতে টানিতে তিনি বুনাপাড়ার মধ্যে আনিয়া তুলিলেন।

এই গাঁ—নাম নবিপুর। ধুলাভরা পথ, এবপাল
কিগধর ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। পথের দু-ধারে বন-
ঝোপ—কতকগুলো কুকুর শুইয়া আছে। বুনোদের নোংরা
খড়-গুঠা চালা, ভাঙা দাওয়া; তেমনই ময়লা ‘টেনা’ পরিয়া
গোল হইয়া বসিয়া জটলা করিতেছে—তাস পিটিতঃ
আর তামাক টানিতেছে। দিদিমাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—
কি গো ঠাকুরোণ, লাতি বটেক ?

আরও খানিকটা আগাইয়া পাইলাম কুমোরশাড়া।
সারি সারি হাঁড়ি সাজানো। পোয়ানে আগুন জালিবার
উত্তোগ চলিতেছে—যত রাজ্যের কাঠের পালা তানিয়া
সাজাইয়া রাখিয়াছে। তার পরেই ওই বড় তেঁতুলগছটা।
ওইখান হইতে একদোড়ে আমার বাড়ী যাওয়া যায়। মনে
আছে পূর্বে এই তেঁতুলগছতলায় আসিয়াই দিদিমার
কোল হইতে নামিয়া পড়িতাম। নামিয়াই দে ছুট। বল-
বাড়ীর মোড় হইতে মামাবাড়ীর দোব পর্যন্ত রাস্তাটিতে
দিব্য এক হাঁটু ধুলা। ধুলার মধ্যে পা ঘষিতে ঘষিতে হুবে
উচ্চৈঃস্বরে ইকিতাম,—‘কু’। তার পর দৌড় আর
‘বস’ ‘বস’ শব্দ। এমন ধুলা উড়িত যে বুড়া দাদামহাশয়
দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া স্নেহভরে আমার কান ছুটিতে
অল্প একটু দোলা দিয়া বলিতেন—গুগো, শহর থেকে
তোমাদের ধুলাভরা মালপাড়া এল। এখন নাইছে ধুইয়
শালাকে মাছ ক’রে নাও।

বলিতাম—হঁ, আপনি ত পাড়ারগেয়ে।

—পাড়ারগেয়ে! আচ্ছা শালা, বল দেখি তোদের
শহরে এমন ধুলা আছে ?

—হঁ, অনেক।

—তোদের শহরে শেয়াল ডাকে ?

—কত।

—তোদের বাড়ীর পাশে হালুম ক’রে বাঘ বেরোন।

—বেরোয়ই ত।

—এই এত বড় বড় গাছ আছে ?

—আছেই ত।

—দূর শালা—শহরে ছুত।

বুড়া হাসিতে হাসিতে ধুলাহুই আমায় কোলে
তুলিয়া লইলেন। লইয়াই চুম্বা একটি নহে—অনেকগুলি।

...এখনও তেঁতুলগাছ তেমনই ঝোপভরা, কনুপাড়ার
মোড়ে তেমনই প্রচুর ধুলা। আমি তত শিশু নছি,
শহর কি অল্প অল্প বুঝি। ধুলায় ছুটিবার লোভ আছে,
করসা কাপড় ময়লা হইবার ভয়ও আছে। পথের শেষে
কান ধরিয়া যিনি কোলে তুলিয়া লইলেন, তিনি কেবল
নাই। থাকিলে বলিতাম, শহরে ধুলা নাই, শেয়াল নাই,
বাঘ নাই, বনজঙ্গল নাই। ও-সব নাই বলিয়াই ত শহর

—শহর! কিন্তু আশ্চর্য কেহ আর ‘শহর’ বলিয়া ঠাট্টাও
করে না।

* * *

মামাদের অনেক শিষ্যসেবক আছে। তাহাদের অধিকাংশই
চাষী। গরিব—চাষ-আবাদ করিয়া বৎসরের অন্ন-
সংস্থান করিয়া থাকে। জমিদারের প্রাপ্য মিটাইয়াও হয়ত
বৎসরের শেষে কিছু উদ্ধৃত্ত থাকে, কিন্তু রোগের আতিশয্যে
সেটুকু ভরসা তাহাদের নাই। চৈত্রে যেমন খাজনার
তাগাদায় সতর্ক নাযেব প্রজামহলে শাসনের বিভীষিকা
জাগাইয়া তোলেন, ভাতের রৌদ্রে পাতা পচিয়া ম্যালেরিয়া
তেমনই নিয়মিত ভাবে হানা দেয়। চাষীর ঘর, হিসাব
বলিয়া বালাই নাই। যদি বা এসব বাঁচাইয়াও কিছু
জমিল ত কিসে খরচ করিবে যেন উহা বা ভাবিয়াই পায়
না। ঘটা করিয়া সত্যনারায়ণের সিমি দেয়, বউদের রাঙা-
পাড় কাপড় আসে, নবান্নের আয়োজন, পৌষপার্বণের ধুম,
গাছ-প্রতিষ্ঠা এবং গুরুদেবের প্রণামীতে খরচ করিয়া তবে
উহারা নিশ্চিন্ত হয়।

পরের দিন দুপুরবেলা দিদিমা তাড়াতাড়ি খাইয়া,
উঠিয়াই একখানি ফরসা কাপড় পরিলেন। গায়ে একখানা
নামাবলী জুড়াইয়া মামীমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—
বউ, আস্ত রইল—একটু নজর বেখো। কাল আমি ফিরে
এলে ওকে দিয়ে আসবো।

মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কি গোসাই-চরে
চললেন ? মণ্ডল-বাড়ী বুঝি ?

দিদিমা উত্তর দিলেন—হঁ। তাদের ছেলের ভাত—
পরশ হাটে লোক এসে খবর দিলে। জ্বলেই গিয়েছিলাম,
হঠাৎ মনে পড়ল। তাহলে যাই।

আমি দিদিমার জ্বাচল ধরিয়া কহিলাম—যাব।

—যাবি ? কোথায় রে ? এই দেখ ছেলের অস্ত্রায়
কথা। সে যে অল্প পাড়াগাঁ—

—হঁ, পাড়াগাঁ ? আর এ বুঝি শহর ?

—হাঁটতে হাঁটতে মাজা খসে যাবে। বালির বাস্তা,
বন—

—তা হোকআমি যাব।—বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া
দাঁড়াইলাম।

দিদিমা বিষম মুখে মামীমার পানে চাহিয়া বলিলেন—
বউ—

মামীমা বলিলেন, আদব দিবে মাথাটি খেয়েছেন—
শুনল ত কথা ! যে বাঘ পথের ধারে—গিয়ে দেখুক না
মজা !

বাঘের দোহাই কার্যকরী না হওয়াতে অগত্যা দিদিমা রাজি হইলেন।

পাড়াগাঁর পথ চলিতে দু-ধারে অনেক কিছু নজরে পড়ে। সে-সব দিকে না-চাহিয়া চলিবাব আনন্দেই দৌড়াইতে লাগিলাম।

দিদিমা ষাশক্তি-পা চালাইয়া চৌচাইতে লাগিলেন—ওরে থাম, থাম, বাঁ-দিকে—বাঁ-দিকে। আবার আম-তলায় দাঁড়া। দেখ, দেখ, প'ড়ো আম মুখে দিলে? ওরে-ও আশু—

আশু তখন আমার মিষ্টেষে পূর্ণতোষ, কে শোনে নিষেধবাণী। সময় থাকিলে কি ফলসাগাছের পাকা ফলের পানে চাহিয়া চূপ করিয়া থাকিতাম? মাঠের জামগাছগুলি কত নীচু! কি খ'লো খ'লো পাকা জাম উহার প্রত্যেকটি শাখায়। কিন্তু এ-সবের লোভ করিতে গেলে আজ আর মণ্ডল-বাড়ী পৌছান যাইবে না। ফিবিবার মুখে দেখা যাইবে।

কটাখানেক চলিয়া গঙ্গার তীরে খেয়াঘাটে পৌছিলাম। দিব্য বাবু-বিছানো তীর—কেমন ঢালু হইয়া গঙ্গার ভিতর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। শেয়াফুল-কাঁটা দিয়া যেবা দু-ধারের জমি—মেলাই পটলের ফুল ফুটিয়াছে, ছোট ছোট পটল ধরিয়াছে—কি চমৎকার! হাতের নাগালে থাকিলে গোটা-কতক গটল তুলিয়া দিদিমাকে দেখাইয়া বলিতাম, 'দেখ, কেমন সত্যিকাবের গটল!'

মাঝি নোকা আনিলে আমরা নোকায় উঠিলাম। একটা লোক ছাগল লইয়া উঠিতে সে কি নাকাল! জল দেখিয়া ছাগলটার যা 'প্যা'-'প্যা' ডাক। অল্প লোকগুলি বিরক্ত হইয়া বলে—আং, কানেব পোকা বার করলে যে!

লোকটা অপ্রতিভ ভাবে ভাঙা কাঁঠালের ডালটা ছাগলের মুখে ধরিয়া বলে—কি করি মশায়, গিয়েলাম পানপাড়ার হাটে—ন-সিকেষ যায়—এত বড় খাসী। গোপাল মরার কাছ থিকে ধার চেয়ে কেনলাম।

—তা গাঁতে নিষেছ—জোয়ার পো। কোববানিতে জুং দেবে। লোকটা হাসিতে হাসিতে গল্প জুড়িয়া দিল।

হঠাৎ মাঝি চৌচাইয়া উঠিল—এই খোঁকা বাবু—পানিমে হাত দিয়ে না,—কুস্তীর আছে।

দিদিমা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—সব তাতে দুটু মি, হাত ওঠা।

আমি হাতখানি অল্প তুলিয়া চূপি চূপি বলিলাম, কই কুমীর? আবার স্রোতের বিপরীত দিকে হাত নামাইলাম। গঙ্গার ঠাণ্ডা জল—কেমন হাতে উপর দিয়া স্রোত কাটিয়া চলে! বেশ একটা 'কল' 'কল' শব্দ হয়। খানিক স্বপ্ন রাখিলে হাত ব্যথা হইয়া উঠে। কালো জল

হাতেব ঠেলায় সাদা কাচের মত জলিয়া উঠে, এক খাবলা খাইয়া দেখি, বেশ মিষ্ট! কিন্তু জল তুলিতে গেলে অঞ্জলিতে অল্পই উঠে। পা-দুখানি ডুবাইতে পারিলে...কিন্তু ওদিকে দাঁড় ধরিয়া মাঝি চাহিয়া আছে—এ-দিকে দিদিমা আমার একখানি হাত ধরিয়া ঠায় বসিয়া আছেন। যেন কয়েকদিকে নৌকাব চাপানে হইয়াছে।

ওপাণের মত এপার সমতল নয়। আমাদের শহরের দোতলা-সমান উঁচু পাড়, নীচে দাঁড়াইয়া উপবে চাওয়া যায় না। পাড়ের ও-পাশেই একটা মন্ত আমগাছ শিকড় বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দিদিমা সেই দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন—ওই মণ্ডলদের বাগান। চ—উপরে আর উঠবো না, একেবারে ওদের ঘাট দিয়েই যাই।

ধাবে ধাবে মিনিট-দুই হাটমাই ঘাট পাওয়া গেল। তালগুড়ি দিয়া সিঁড়ি করা। ঘাটের কিনারে বসিয়া একটি কালো বউ বাসন যাক্ষিতেছিল। আমাদের দেখিয়া ডান হাতেব মাঝখান দিয়া মাথার ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিল।

দিদিমা তাহাব পানে চাহিয় বলিলেন—কে, কেদারের বউ?

বউটি মাথা হেলাইয়া বলিল—হাঁ, মা-ঠাকরোণ। খোকাটি কে?

—নাতি।

—ও। চন্দ্রদের বাড়ী 'ভাতে' এলে বুঝি? বাঃ দিব্যি খোকা। একটু দৌড়িয়ে যাও—মা-ঠাকরোণ—জলে হাতটা ধুয়ে একটা পেঁয়াম করি।

—থাক, থাক, জন্ম-এম্বোজী হয়ে বেঁচে থাক।...হুঁ—কালও আছি। যাব? যাব কইকি। কেদার ভাল ত? বলিতে বলিতে আমাকে লইয়া দিদিমা উপরে উঠিলেন। সেখান হইতে মণ্ডল-বাড়ী কতদূরই বা! এই বাগান-সংলগ্ন বাড়ী—ছেঁচার বেড়া দিয়া ঘেরা—সারি সারি কয়েকখানা চালা। চালার ওধাবে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিতেছে; বয়স্কা গৃহিণীর শাসনের স্বর, কাঠি-চেলাইবার শব্দ—ছেলেদের কলরবের সঙ্গে যিশিয়া বাড়ীখানিকে বেশ সজীব করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য, দিদিমাদের গাঁয়ের চেয়েও এই অজ-পাড়াগাঁয়ে বন কোথায়, ধুলাই বা কই? এ-ধারে ও-ধারে যে ধারেরই চাও—খালি মাঠ। কোথাও কুমড়ালতায় ভরা, কোথাও ফুটি তরমুজ রানীকৃত বিছানো, কোথাও সবুজ চারা ধানগাছের গালিচা পাতা, কোথাও বা কলাবাগান। বেড়ার ধাবে কেমন ঝিঙের হলদে ফুল ফুটিয়াছে, লাল নট শাকের জমিখানি ঠাস বুনানিতে ভরা। না, চমৎকাব গ্রাম এই গৌসাইচর। •

বাড়ীর মধ্যে ঘে-ঘরখানির দাওয়ায় আমরা বসিলাম তাহা সবচেয়ে উঁচু এবং পূর্ব-দুয়ারী। বাড়ীর অন্তঃস্থ ঘরগুলি হইতে পৃথক; দিব্য নিকানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিমা-দর্শনকালে চারি দিকে যেমন ভিড় জমিয়া উঠে, আমাদের ঘিরিয়া তেমনই এক দল ছেলেমেয়ে বউ ফাল ফাল করিয়া চাহিয়া আছে। কৃষ্ণকায় কালো বয়স্কা এল্ট বউ পিতলের কানা-উঁচু একখানা খালা আনিয়াছেন, গজাজ-ভরা মাজা চক্চকে ঘটি আনিয়াছেন, নতুন শুকনা গামছাও একখানি তাঁহার কাঁধে রহিয়াছে। আমাদের পাষেব কাছ বসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিলেন, দেখাদেখি স্নেহ সমবেত জনতা আমাদের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল।

যেটুকু ধূলা পাষে জমিয়াছিল, স্তম্ভগুলি লোকের করস্পর্শে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। তার পর দিদিমা একখানি পা টানিয়া বউটি সেই কানা-উঁচু পিতলের খালা উপর রাখিলেন এবং ঘটির জল দিয়া পা ধোয়াইয়া দিগে লাগিলেন। ধোয়ানো শেষ হইলে নতুন গামছা দিয়া পা মুছিয়া নিজের আঁচলে সংক্বে মুছাইয়া দিলেন। তার পর আমার পানা। আমি নিজে পা ধুইব বলাতে বউটি বলিল—ওমা সে কি কথা! আমাদের ছিচরণের চন্মামেস্ত দেবা না বাবা? তা কি হয়? নকী গোপাল একটু খির হয়ে বসে আপত্তি বুঝা।

উভয়ের যৌত পানোদকে খালা ভরিয়া উঠিল। অতঃপর ছেলে বুড়া মিলিয়া সেই ময়লা জল পরম পরিচৃষ্টিতে মাথায় ঠেকাইয়া খাইয়া ফেলিল—যেমন করিয়া আমরা দেব-দেবীর চরণামৃত পান কবি। কে জানে, ইহারা আমাদের দেবতা মনে করিয়াছে বুঝি।

প্রথম পর্ব মিটিলে বউটি করজোড়ে বলিল—কি সেবা হবে, মা? ঘরে ভি-ময়লা মজুদ, তরকাবির মধ্যে পটল আছে, ভাল মিষ্টি ত নেই।

দিদিমা বলিলেন—মিষ্টি কি হবে না, ঘরেব গুড় আছে ত?

বউটি ঘাড় নাড়িল—হঁ, খাঁড় (আকের) গুড় আছে।

—গুড়ই হবে।

—আর মা, তোমার আড়ী (রাঙা গরু) বিইয়েছে—আমি গাঙে একটা ডুব দিয়ে এসে গাই ছুইবো। হেই মা একবারটি উঠে দেখ না—বিছানা-জিনা সব ঠিক আছেন কিনা। সেই পোষ মাসে এয়েলে কেচেবুচে তুলে আকলাম।

—হেমা, খোকার নাম কি?

—আশু।

—রাস্তা? তা বেশ, বড় মেয়ের ছেলে বুঝি? দিবি খোকা—আজপুতুর।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁলা বউ, তোমার দেগরের বিয়ে দিবি কবে?

—আর মা, বলিয়া বউ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, মোমর্ন্ত বয়েস—বাড়ী আসে না আস্তিরে। এত চেষ্টা-চরিত্তির—মরদ একবার ইধারে মাথা চালে, একবার উধারে। স্বব আরও একটু নামাইয়া বলিল, জানই ত সেরভী জেলেনীকে, শুনিছি গাছচালা জানে—মাছষ বশ কববে তার আর আশ্চর্য্য কি। বলিয়া বউ গালে হাত দিল।

দিদিমা বলিলেন—আচ্ছা আজ আহুক, আমি বুলবো।

—বলো, মা, বলো, তোমাদের আশীর্ষে যদি মতি-গতি ফেরে। মোদের মা ইঁকাই মেয়ে গুঠে। তোমার বড়ছেলের ছস্কুই ত গুই। বলে, বউ—নাঙল ধববো কোন্ হাতে? গুয়োটা যদি কখাটা শোনে ত মোদের মোয়াড়া নেয় কে? নেখন। বলিয়া কপালে হাত দিয়া একটি নিখাস ছাড়িল।

আর দুটি বউ—মেজ এবং সেজ—পাশে বসিয়াছিল। রং কালো হইলেও বড় বউয়ের মত রোগা নহে, বেশ মোটা-সোটা। হাতে কপার পৈছা, রূপার খাডু, কপালে উঙ্কি। দিদিমা মেজটির পানে চাহিয়া বলিলেন—পৈছে নতুন হ'ল বুঝি?

মেজবউ আহলাদে একমুখ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল—হেমা, আর দিদির গোটি।

বড়বউ হাসিয়া উঠিল—মুখে আগুন মোর, বলতে তুলে গিছি মা। এই গোটি মা, গেলবার কোঠা (পাট) বেচে কিছু হয়েলো; তোমার ছেলে বললে, কে কি নেবা বল? আমি বললাম, বয়স ভারি হয়েছে গোটি দ্যাও, মেজোরে দ্যাও পৈছে! সেজ সাধ ক'রে নিলে খাডু।

—তা বেশ হয়েছে। গতর হুখে থাক, ভোগদখল কর। তা কর্তাদের কি হ'ল?

—কার আর কি হবে মা! ন-কস্তা কিনেলে ছাইকেল। ও ত মারমুখো—সে-ও তেরিয়া। মাথা-ফাটাফাটি হয় ব'লে বললাম—হয় ধার হোক ছেয়ের ছাইকেল গুঠে দ্যাও। উই দ্যাখ, মা—ঠ্যাং ভেঙে চালের বাতায় ঝোলছেন উনি।

—ও মা গো, এক গাদা টাকা নষ্ট করলি? তোরা চাষ করবি—তোদের এ-সব মতিগতি কেন?

—নন্নাটের নেখন। বলিয়া বড় বউ খানিক চুপ কবিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

দিদিমা কি কথা বলিবার আগে মেজবউ বলিল—এস মা, ঘর দেখবা।

দিদিমার সঙ্গে আমিও উঠলাম।

পূবে অল্প একটু মোড় ফিরিতেই দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড এক দাওয়া। দাওয়ায় এক সারিতে চাবি খানি ঘর। ঘর-গুলিতে দেখিবার এমন বিশেষ কিছু নাই। চুকিবার দুয়াব বিচিত্র আলিপনায় ভরা। সাদা পিটুলি-গোলার ধারায়, হলুদের আর লাল সিঁদুরের ছাপে চৌকাঠ বিচিহ্নিত।

ঘরের মাটির দেওয়ালেও হলুদ আর সাদা পিটুলির আঁক। কড়ির আলনা, কুলুকাঁতে মাটির পুতুল; পেতে, ধামা, কুলা, ধান ও আনাঙ্গপাতিতে ঘর ভর্তি। একখানা করিয়া তক্তাপোষ পাতা। আর যে কি আছে ভাল করিয়া নজরে পড়ে না। ঘরের ঐ একটি মাত্র দরার, জানালা নাই, কিন্তু গ্রীষ্মকাল হইলেও ঘরের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা। কোন ঘরে নম্বা-করা কাঠের সিন্দুক আছে, কোন ঘরে জলচৌকীর উপর বাক্সকে সাদা কাঁসার বাসন সাজানো। কাঁধা বালিশগুলি পরিষ্কার। মাটির হইলেও ঘরের মধ্যে বা দাওয়ায় কোথাও ধূলা জমিয়া নাই বা কোথাও ভাঙাচোরা নহে। পশ্চিমের দাওয়া একটু দূরে—সেখানিতে রান্না চলে। উত্তরে গোয়াল-ঘর। বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান, কোথাও জঞ্জাল জমিয়া নাই, একটা দুর্কাও অস্বরিত হইতে পায় না। কেবল আমাদের পূর্ব-দরারী ঘরের দাওয়ার পাশে মাটির মধ্যে স্বাস্থ্যবান এক তুলসীগাছ—প্রভাতের জলসিঞ্চনে পরিপুষ্ট ও সন্ধ্যার দীপালোকে দীপ্তিময়।

ঐশ্বৰ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য দিবার স্পৃহা এ-বাড়ীর কোথাও নাই। অথচ নিঃশব্দে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে ঐশ্বৰ্য্য ছাড়া কি-ই বা বলিতে পারি। প্রকাণ্ড উঠানে বড় মরাইটি ঘিরিয়া যে চারিটি ছোট মরাই রহিয়াছে উহার কোনটিতে মৃগ, কোনটিতে কলাই বা মুহুর। ঘরের দাওয়ায় শুপীকৃত আলু, পেঁপাজ, সরিষা, ছুটি, কাঁকড় ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর কোন দ্রব্যটিরই বা অভাব? বলদ ছাড়া আট-দশটি গাভী, ছোট গোয়ালে কতকগুলি ছাগলও ডাকিতেছে। এইমাত্র পুকুর হইতে জোড়া-দশেক হাঁস ‘প্যাক’ ‘প্যাক’ শব্দ করিতে করিতে উঠানের উপর দিয়া গোয়ালের পাশে দক্ষাঘেরা কুঠিবিতে গিয়া ঢুকিল।

রান্নাঘরের পাশে ঢেঁকিঘর। দমাদম শব্দে ঢেঁকি পড়িতেছে। কাল ছেলের ভাত, আনন্দ-নাড়ুর চাল কোটা হইতেছে। এত ক্ষণ দিদিমা আসেন নাই বলিয়া এই সমস্ত কাজে পূর্ণোদ্যমে উহার লাগিতে পারে নাই। একছুটে বাহিরটাও দেখিলাম।

প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সামনে হাল, লাঙল এবং ধানদুই গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে। দাওয়ায় বসিয়া মূনিষজন তামাক টানিতেছে, আর সামান্য কথাই হাসির ঢেউ তুলিতেছে। বাড়ীর লাগাও পুকুর। আমাদের দেশে ডোবা বলি—উহার বলে পুকুর। জ্যৈষ্ঠের দিন বলিয়া হাঁটুভোর জল উহাতে আছে। তবু শোনা গেল এ-অঞ্চলে উহাই নাকি বড় পুকুর। অনেকগুলি ফাস্তনেই ছুটিকাটা হইয়া যায়—চৈত্রে জলবিন্দুও খুঁজিয়া মিলে না। পুকুরপাড়ে কয়েকটা নাবিকেল ও তাল গাছ। নারিকেল গাছগুলিতে তেমন তেজ নাই। নোনা জমি না হইলে স্বলন নাকি তেমন হয় না।

চাষাদের ছেলেগুলি যেমন কালো তেমন রোগা, কিন্তু

কথাবার্তাতে অকপট। বেশ একটু গ্রাম্য টান আছে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন অনেক গাছ চিনাইয়া দিল বাহার অভিজ্ঞতা লইয়া শহরের আশ্চর্য্যরী ছেলেগুলিকে অনাধাসে ঠকাইয়া দিতে পারি।

খেজুর গাছ দেখাইয়া বলিল—শীতকালে আসিলে পেট-ভোর রস খাওয়াইয়া দিতে পারিত, এখন মাঠে কি-ই বা আছে। তখন ক্ষেতে ক্ষেতে মটবস্তুটি, ছোলায় শুঁটি, আক প্রচুর পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়িলে এত বড় বড় শাকালু বাহিব হয়। মূল্য তুলিয়া খাইতেও কম মজা নহে। ছোট কাঁকড়া গাছগুলিতে কেমন সুন্দর কুল পাকিয়া থাকে। এখন খালি ছুটি আর তবমুজ।

মাঠের মাঝে বসিয়া তরমুজ ভাঙিয়া খাইলাম। কি মিষ্ট, কেমন ঠাণ্ডা জল। কতক খাইলাম, কতক ফেলিলাম। এমন করিয়া প্রকৃতি মা'র কোল হইতে জিনিষ উঠাইয়া লইয়া খাইতে বা ভুঞ্জি। কাপড়ে ধূলা লাগিয়াছে, তরমুজের জল মুখ বাহিয়া জ্বালা ভিজাইয়া দিয়াছে, চলিতে চলিতে পা-ব্যথা হইতেছে, সন্ধ্যা অভ্যাস—তবু এই অজানা সীমাহীন মাঠে অজানা সঙ্গীর সঙ্গে কলরব করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে এতটুকু আশঙ্কা, ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, এমনি কবিতা সারা রাজি সারা বাঁঠখানিতে ঘুবিয়া বেড়াই, এমনি করিয়া অনর্গল বকিয়া যাই, ভূমি হইতে খাদ্যকণা খুঁটিয়া খাই, আর না-ঘুমাইয়া ওই তারাতারা আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকি।

* * *

কিরিয়া দেখি, আমাব খোঁজে চারি দিকে হলখুল পড়িয়া গিয়াছে। লণ্ঠন জালিয়া কর্তারা বাহির হইতেছেন, সোরগালে কান পাতা দায়। দিদিমা কেবল ‘হায়’ ‘হায়’ করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে হৈ হৈ কবিতা উঠিল। আলো ফেলিয়া কর্তা বা ছেলেগুলিকে ধরিয়া প্রহার দিল—আর কি সে অকথ্য গালাগালি! বড়কর্তা আমাকে দু-হাতে মাথার উপর তুলিয়া একবারে বাড়ীর মধ্যে দিদিমার সম্মুখে আসিয়া বলিল—কেমন গা মা-ঠাকুরোণ, ইনিই-ত? এনাব জন্তে ছেলেগুলোকে আজ খুন করলাম না, নইলে চাষার আগ (রাগ) জানই ত।

দিদিমা আমায় খুব খানিকটা বকিলেন; কি কবিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্চেষ্টে সে বকুনি হজম কবিলাম। বাহিরে রৌদ্রাশ্রয়মান বালকগুলির বেদনায় বুকটা কেমন মোচড় দিয়া উঠিল। আহা! আমারই জন্ত ত বেচারীরা মার খাইল।

বড়কর্তা দাওয়ার উপর বসিল। জোয়ান চেহারা, কিন্তু বড় কর্কশ। কালো দৈতোর মত ঝাঁকড়া চুলে ভবা মাথা, মস্ত গৌরব, চণ্ডা হাত, কথাগুলি পর্য্যন্ত মিষ্ট নহে। দিদিমা দিবা হাসিয়া কথা কহিতেছেন, আমি মুখ কিবাইয়া অন্ত দিকে চাহিলাম।

—রোবলে মা, এবার ভূঁই কিছু বেরিয়ে (বাড়াইয়া) নেলাম। ষোল বিঘেষ আলুর চাষ দেব ভাবছি। নীসে অয়েছে, অল্প অয়েছে—বলে ভাবনা কি, বোঝলে ম। ভান্ডরের পাটে কিছু প্যালাম—তোমার বউবো বললেন পৈচে চাই, গোট চাই, খাডু চাই। বললাম, নে বিট তোদের গকেই যাক। খড়কুটো বেচে কিছু জমেলো, ন-কর্ষা ছাইকেল কিনলেন। কলুইয়ে এবার যা নভি হয়েছেন—খোকাব ভাতে ঘটা ত হোক।—তার মর আশ, আমন ধান আছে, গুড় আছে, পাট আছে; মন করছি একটা মন্দির পিতিষ্টে করবো, বুঝলে মা। গানের অবস্থা দেখলে ত। উনি আমাদের বাগানের আখখানা নিয়েছে, আসছে বার্ষ্যে বাকিটুকু থাকবেন না। তাই ভাবছি কোশটাক দূরে ওই হিজুলীতে গিয়ে এবার চালা বাঁধবে। বাপ-পিত্তেমোর ভিটে, বুঝলে মা, তা দেবতাব মন্দির মনিষিতে কি করতে পারে। তেনাবা দিয়েছে—তেনারই নিক।—বলিমা মণ্ডল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দিদিমা বলিলেন—ভাল ক'বে পূজো-আচ্ছা দে, দেবতা মুখ তুলে চাইবেন বইকি।

—হুস্তোরি দেবতা! ও স্মৃন্দিরা কারও ভাল দেখতে পারে! গেল বার হেঁই নি জোড়া-পাঁঠা? অক্কে (রক্ত) মাটি ভিক্ষে জবজবে। জট্টিতে পূজো খেলেন অর আঘাড়ে বাগানে ঢোকলেন। হুস্তোরি দেবতা!

—এবারেও ভাল ক'বে পূজো দে, বাবা।

—দেবই ত। ওই গোয়ালে চারটে পুরুষ্ট কালো পাগ, দেখি—বেইমানি কাণ্ড! পূজো খেয়েও যদি বাগান পান বোঁক ধরেন ত নাতি মেয়ে এই ছাউনি উপড়ে ওই হিজুলীতে গিয়ে ওঠবে—দেখব ওনার জাবিজুরি কত।

—তা হাঁরে, আগে নবার বিয়েটা ত এ ভিটে থেকে দিয়ে যা।

মণ্ডলের গলার স্বর অগ্রহে উত্তেজিত হইল—তোমার বললে নাকি কিছু! করবে বিয়ে?

—করবে না, বয়েস ত হয়েছে।

—বয়েস-কাল বলেই ত ওনার ছড়ান্দর জোগাড় ক'র একেছি। গুয়োটা শোনে কই?

—ছি! ভাইকে ও-কথা বলতে আছে?

—সাথে বলি, আগে পিতি জলে যায়। বলবো কি মা-ঠাকরোণ—নিতাইয়ের অমন মেয়ে—ন গণ্ডা পণে দিত চায়। স্মৃন্দি বলে, না।

—মেয়েটির বয়েস কত?

—একটু বেশীই—এই ন পেরিয়ে দশে পড়েছে। ভাই কি ওই বিটিমের মত গায়ের অং, যেন কেনডাষ্ট্রব দুগুণে পিতিয়ে।—

—ওই মেয়েই ঠিক কব, আমি মত করাবো। এই সাত

এসে আমার প্রণাম ক'রে গেল। বিয়ের কথা বলতে বললে—দাদারে ব'লো—আমি রাজী।

—জ্যা, আজী? ও হারামজাদী মাগী, দেখ কত নেই—দুয়দাম ঢেঁকিতে পার দিচ্ছেন!

—ওবে মাগী—ইদিকে আয়—আজ তোরই এক দিন কি আমারই এক দিন। তুই আমার জানাস নি।

ঢেঁকিশাল হইতে উত্তর হইল—মর ভাগাড় মর—মা-ঠাকরোণ অয়েছেন না? তোর কি একটু নজ্জা নেই—হাযা-খেকো! ওনার সামনে কি গাঁ মাথায ক'রে বলবো, ও গো—তোমার ভাই পিতি গিলবে গো গিলবে।

মণ্ডল আর কিছু না বলিল দিদিমার পায়ের উপর শুইয়া পড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ, বাঁচলে মা-ঠাকরোণ।

—তা, চম্—ছেলের কি নাম রাখিল?

—পুঠাউব বললেন, আমনিবাস।

—রামনিবাস! তা বাপু, যা তোদের মুখে বেরোয় এমন নাম রাখলেই ত হ'ত।

—কিন্তু মা-ঠাকরোণ—উনি যে হয়েছেন আমার মত। এমনি কোঁদা কোঁদা (মোটা-সোঁটা) নবদুব্যোদল গ্রাম।

দিদিমা হাসিতে লাগিলেন।

দিদিমা সারা রাত্রি জাগিয়া আনন্দনাডু ভাজিলেন। ঘোড়লরা কয় ভাই দাওয়ায় বসিয়া কত কি বকিতে লাগিল। বউয়েরা এ-ঘর ও-ঘর ছুটাছুটি করিয়া কায়ফরমাস খাটিতে লাগিল। ছেলেরা নাডু খাইয়া খানিক ছটাপাটি করিল, তার পর দাওয়ায় উপর পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। গরম লুচি, পটল-ভাজা, এক বাটি দুধ ও মিষ্ট খাইয়া আমিও আমাদের নির্দিষ্ট ঘরখানিতে শুইলাম। অজানা জাফা, একলা বহুক্ষণ ঘুম আসিল না। ভাবিতে লাগিলাম, বেশ জাফা, স্থল নাই, পড়ার তাড়া নাই, সমবাহুবর্তিতায় ছুটাছুটি করিতে হয় না। সকালে উঠিয়াই ছেলেরা ছোট্টে মাঠে—সারা দিন খেলিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা পাইলে ক্ষেতের ফল তুলিয়া খায়, পুকুরের জলে বাঁপ খায়, জুপুবে ভাত খাইতে বসে, না ঘুমাইয়া আবার ছোট্টে মাঠে—কত দূর—যেখানে নীল আকাশ জমির কোলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কেহ বারণ কবিতে নাই, বকিতে নাই। খালি সাদা মাঠ আর খোলা আকাশ; ছায়া নাই, তাপ নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই। বলা বাহুল্য, গ্রীষ্মের অপরাহ্নটুকু বেড়াইয়া এই শিশু ভাবটুকু চিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইয়াছে।

* * *

পরদিন সকালে উঠিয়া যে আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, সারা গ্রামখানি আজ ঘোড়ল-বাড়ী পাতা পাড়িবে। প্রকাণ্ড এক তাগাড় কাটা হইল—একসঙ্গে

আট-দশটি হাঁড়ি চাপিতে পারে। সুনীলাম মণ-কন্ঠে চাল রায়া হইবে। মোড়লদের একখানি বড় ঘর খালি করিয়া এ-খার ও-খার কলাপাতা বিছাইয়া দিল—পাতার উপর ফরসা চাদর পাতিল—উহার উপর ভাত ঢালা হইবে। ভাল চালিবার জন্য প্রকাণ্ড দুইটা জ্বালা আনান হইল। রামায়ণে পড়িবাছিলাম, ছয় মাস অন্তর জাগিয়া কুস্তকর্ণ এমনই আহাৰ কবিয়া থাকেন। আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, না জানি কোন্ কুস্তকর্ণের জন্য চাষ-গাঁয়ের এই বিপুল আয়োজন।

বাহা হউক, ভোজের সময় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এত-এক জন লোক বাহা খাইতেছে তাহা দেখিবারই মত। শুধু ভাত শুধু ভাল তিন-চার থালা দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল—তরকারি পাতে পড়িতেছে ত কথাই নাই। আর সে কি তরকারি খাওয়ার ঘট! আমাদের বাড়ীতে দশ-বার জন দু-বেলায় যে এক কড়াই তরকারি খাইয়া থাকে উহার। এক-এক জনে অনায়াসে সেই পরিমাণ তরকারি খাইয়া বলিতেছে, আমা যা হয়েছেন উত্তম। আর এতটু হজুনি দেও ত মা-ঠাকরোণ।

সন্ধ্যা হইতে আব ফটাখানেক দেরি আছে—এমন সময় দ্বিদিমা বলিলেন—আশু, জামাকাপড় পরে নে, আজই আমরা যাব।

মোড়লরা কি যাইতে দেয়।

—হেই মা তোমার ছুটি পায়ে পড়ি—আর একটা দিন থেকে বাও। সেবা হ'ল না, বহু হ'ল না—ছিচবণে ছুটো কথা হ'ল না। হেই মা—

পুনরায় শীঘ্র আসিবার আশ্বাস দিয়া দ্বিদিমা বিদায় লইলেন। বড় মোড়ল আমায় কাঁধে চাপাইয়া কহিল—চলেন থোকাবাবু। কাঁধে উঠিতে কেমন লজ্জা বেশ করিতে লাগিল, কিন্তু মোড়ল নাছোড়বান্দা। খেয়র নৌকায় চাপাইয়া আমাদের প্রণাম করিয়া মোড়ল বলিল, আবার আসবা ঠাকুর। শীতকালে খেজুর অস, পাটালি গুড় খাওয়াবো। ওরে কানাই সঙ্গে যা। এই নুণ আধ মণ কলুই আধ মণ আর আনাজগুলো মা-ঠাকরোণের বাড়ী পৌছে দে গা। এই গাঁঠরিটা নে—বস্তোর আছে। কুমড়া ছুটে দেতাম—তা, মা কি বইতে পারবা ?

—খুব পারবো।

—তবে হেই মাঝিভাই দাঁড়া—একদোড়ে কুমড়া ছুটা এনে দেই।

মোড়ল ছুটিয়া চলিয়া গেল ও ছুটা বড় বিলাতী কুমড়া আনিয়া নৌকার উপর রাখিয়া পুনরায় প্রণাম করিল। —আর মা, এই পাঁচটা টাকা আমাদের দেবতাকে পূজো দিও গো। তোমাব মদনগোপাল ভারি জাগন্ত দেবতা

গো। সেবার ওনারে মানত ক'রে একগাছ কাঁটাল হয়েলে। কিন্তু এমনি আলিস্যি ধরলো, বাই-বাই ক'রে যেতে পাবলাম না। সেদিন মোরে স্বপনে বললেন, তোর কাঁটাল খাওয়াচ্চি নে ব্যাটা, দেখ শেয়ালে খেয়ে গেছে। ওমা, সন্ধ্যাকালে উঠে দেখি—বড় আটটা কাঁটাল শেয়ালে আর কিছু আথে নি গো। মনে মনে ঠাকুরের কাছে নাক-কান মললাম।

মোড়লের কথা মনেই নোকা ছাড়িল।

লোকটা দেখিতে কুশী হইলো কি হয় মনটি ভারি সাদা।

* * *

দ্বিতীয় বাব যখন মণ্ডল-বাড়ী যাই—সে পাঁচ বছর পরের কথা। দ্বিদিমা বুড়া হইয়াছেন—একা যাইতে কষ্ট হয়, আমাকেই সঙ্গী লইলেন। মামার ছেলের বড় ছরসু—বুড়ীর পিছনে লাগিয়াই আছে। বুড়া হইলেই ভুলভ্রান্তি মাহুকের পদে পড়ে। সেই ভুলের স্বৰূপে উহার। এমন ঠাট্টা কনে বাহাতে দ্বিদিমা সময়ে সময়ে কাঁদিয়া ফেলেন। সেই জন্য দ্বিদিমা উহার সঙ্গে লইতে চান না। আমার ছুটি অবশ্য দুই দিন। আজ গিয়া কাল সকালে কিরিতে পাবিব। স্বতরাং রাজী হইলাম। আবও গঙ্গাব ধারে সেই পাঁচ বছর আগে দেখা গ্রামখানি কল্পনায় বেশ একটু রং ধরাইতেছিল।

সমস্ত পথ এবং পারবাটা সহস্র এমন বদলাইয়া গেল কেন ? পাঁচ বছরে অনেক বং ফিকা হইয়াছে—রূপের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পথের ধূলায় মন ভ্রষ্টসম হইয়া উঠিতেছে।

পার হইয়া বলিলাম—গঙ্গাব ধারে ধারে চল, দ্বিদিম, সেই শেকড়-বার-করা আমগাছটার ধার দিয়ে উঠবো।

দ্বিদিমা হাসিলেন—আ আবার কপাল! সে আম-বাগান কি আব আছে—গঙ্গার মধ্যে। মোড়লরা এক কোশ দুবে উঠে গিয়েছিল, গঙ্গায় এমন কোপ সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

মুহুর্তে সমস্ত গ্রাম-সৌন্দর্য মলিন হইয়া গেল। এখনও আধ কোশ ধূলা ভাঙিয়া হাঁটিতে হইবে।

কি আর করি পারে উঠিয়া হাঁটিতে লাগিলাম।

সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আছে, মাঠে প্রচুর ধান ফলিয়াছে। অগ্রহায়ণের অল্প যু অপরাহ্নে মাঠে মাঠে সোনার সূর্য্যবশ্মি। ফিঙে পাখীর কাকলি ধানভরা ক্ষেতের উপর আশীর্বাদেব মত ভাসিয়া চলিয়াছে। চানী বসিয়া তামাক টানিতেছে আব এই পবন সম্পদভরা ক্ষেতের পানে চাহিয়া গুন-গুন করিয়া গান গাহিতেছে।

আমার মন বছর-পাঁচেক পূর্বে মোড়ল-বাড়ীর চাল-ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া ঘুরিতেছে। কোথায় সে কোলাহল ? সম্পন্ন হুসহৃদ গৃহস্থালীব শতমুখোৎসারিত জীবন-চাপল্য ? কোথায় সন্ধ্যার তবল অন্ধকার তুলসী-মঞ্চের স্নিগ্ধ দীপালোকে উপবের নক্ষত্রভরা আকাশের

মতই স্বকোমল হইয়া উঠিবে—দীপের আলোয় দিদিমা কখন পাতিয়া বসিবেন—আর সম্মুখে পুরাণ-কাহিনী শুনিতে ভক্তিমতী পত্নীনাথীরা শুদ্ধ বাক্যে করজোড়ে আঁচলে পা চাকিয়া বসিবে? শত বকমের সরল প্রশ্ন—নির্ব্ব দ্বিতার প্রকাশ বাহাতে পরিস্ফুট—তেমন ধারা প্রশ্নে দিদিমার কাহিনীকে তাহার শতবার বাধা দিতে থাকিবে। দিদিমা বিরক্ত হইবেন, আবার হাসিয়া বাধাপ্রাপ্ত কাহিনীর স্বত্র ধরিয়া অগ্রসর হইবেন।

বহুদূর হাঁটিয়া অবশেষে মোড়ল-বাড়ী পাইলাম।

এতটা সন্ধ্যা স্থানে উহাদের কেমন যেন থাপছাড়া বোধ হইল। কুঠুরিগুলি তেমনই দক্ষিণমুখী, কিন্তু আয়তনে ছোট—দাওয়া সন্ধ্যা। দাওয়ায় ও ঘরে তেমন মৃগ কলাই বা ধান চালের ছড়াছড়ি নাই;—ছোট গোয়াল-ঘর। হাঁসেব ‘প্যাক’ ‘প্যাক’ শব্দ বা ছাগলের তীব্র ধ্বনি শুনিলাম না। ঢোঁকশালে সেই বড় ঢোঁকিটাই আছে, উঠানের মরাই সন্ধ্যায় ও আয়তনে কমিয়া গিয়াছে। কতটুকুই বা উঠান। আমাদের পূর্বদুয়ারী ঘরটি তেমনই আছে;—আলনার গুরু জন্তু অস্পর্শিত শয্যা, গুরুব ব্যবহারোপযোগী জিনিষগুলি স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা। তেমনই পদ্মপ্রকাশনের আয়োজন ও পানোদকগ্রহণ।

কিন্তু বড় বউয়ের মুখের হাসি স্তিমিতপ্রায়। রুগ্মমুখে কতকগুলি শিবা প্রকট হইয়াছে। মেজ ও সেজ বউ আর তেমন স্বাস্থ্যবতী নাই। হাতে পৈছা, খাদু সবই আছে, কেবল বিশ্বাস চাহনিতে ও ধীরমুহুর চসনে এমন একটি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা পূর্ব সম্পদের ভগ্নশ্রী মাত্র।

ততগুলি প্রফুল্লমুখ ছেলেও দেখিলাম না।

ছেলেগুলি অতিরিক্ত রুগ। দেহের কালো রং কেমন যেন ফ্যাকাসে, মুখগুলি জ্যোতিহার। রুগ, দুর্বল; তেমন করিয়া উঠানে লাফাইতে ত পারেই না, কথা কয় কেমন গম্ভীর ভাবে—মাথা নাড়ে বিজ্ঞেব মত। এ কোন্ মণ্ডল-বাড়ী দিদিমা আমার আনিয়া ফেলিলেন? একটি ছেলেকে পরিচিতবোধে কহিলাম—বড়ী না? মাঠে যাবি? ছেলোট মাথা নাড়িয়া বলিল—না গো ঠাকুর; ঠাণ্ডি লাগবে। কাল সন্ধ্যাকালে যাব, মোদের যে ম্যালোয়াবী হবেছে।

বলিলাম—বেশ ত, বেশী দূর কেন, ওই মাঠটাতে একটা খেজুরগাছ দেখলাম—রস খেয়ে আসি চ।

—ও যে গছুরদের গাছ, অসের জন্তে জান দেব, ঠাকুর। কাল উই যে গো-ভাগাড়ের মাঠ—হোথাকে মোদের গাছ আছে, তোমারে অস খেইযে আনবো, ঠাকুর।

—কেন, এসব জমি তোদের নয়?

—মোদের জমি আন্দেক গেল গাঙে, আন্দেক আবাদ হয় না। বাবা আসতেছে—পনারে হুদোও গা।

মোড়ল, না তাহার শীর্ণ কঙ্কাল? কেবল পৌফজোড়াটি আর বড় চোখ দুটিতে তাহাকে চেনা যায়।

কাছে আসিয়া কহিল—কি ঠাকুর, অস খাবা? আচ্ছা। সেই আলে ঠাকুর, দু-বছর আগে আসতে পারলে না। পেরাণ ভরে অস খাওয়াতাম। মা-ঠাকুরোণ, ভাল?

—হী, ভাল। সবই শুনেছি, তা বাবা, একটু মন দিয়ে কাজকর্ম কর।

—হাত্তোরি মন! দেবতার বাদ—মানুষে কি করতে পারে। গাঙে ঘর গেল, জমি গেল, ভেবেলাম মরুক গে—ভাই কটা ত আছে—বুকের জোঁর নোকসান পুইষে নেব। তা এমন থানে এলাম মা-ঠাকুরোণ—বোগের জালায় জেরবার। ভিটে ছেড়ে এসে ছোটো মাসও গেল না—বিরের যুগ্ম সোমন্ত ভাইটা ওলাওঠায় অক্কা পেল। শোক সামলে উঠতে-না-উঠতে ছোট মলেন গিলে জরে। তার পর দেখছ ত, আগার জর, মেজটার জর, বউগুলো ধুকছেন, বাচ্চাগুলো মরমর—এ হাবাতের জারগার মাখায় মারি বাঁটা। রোগে মাছুরে নড়ে বসতে দেয় না, খাটবে কোথেকে?

—আহা!

—আবার সন্ধ্যাশ্রী এয়েছেন। মণ্ডলের ভিটে বড় মিঠে কিনা—এয়েছেন। আর দুটো বছর সবুর করবেন না, দেখ নি ত বার্ষিকালে। ভিটে যায়-যায়। মরণ হয় ত বাঁচি মা, নইলে বাস উইটে যাই কোথায় বল ত?

—তাই ত, এবাব না হয় বেলেডাকায় যা। দেবতার কোপ!

—কোপ! কোপ কিসের! পূজো পান না। পাঁঠা যে কত দিয়েছি—অস্তে মাটি লাল হয়ে গেছে।—তা নয়, আমাদের খাবে—সন্ধ্যাশ্রীর ঝোঁক। তা খা, পাঁঠা আর দিচ্ছি নে—আমাদের খা। উ-হ-হ—আবার বুঝি কাঁপুনি এলেন। বউরে বউ—কাঁথা থানা দে, বড্ডা শীত—কাঁথাথানা দে। ওরে ভুবন রে—ভুবন, ওই পাচ্ছিমের মাঠ থেকে ঠাকুরের জন্তে এক কলসী অস এনে দিস। উ-হ-হ—বড্ডা শীত—অস এনে দিস রে, অস এনে দিস।

মোড়ল কাঁথার মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

খানিক পরে সেজবউ আসিয়া দিদিমার কাছে বসিল ও ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

দিদিমা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হালা হাসছিস যে?

সেজবউ হাসিতে হাসিতে বলিল—মা-ঠাকুরোণ, একটা বখার জবাব দাও ত। আসকে পিটে গড়বাব সময় যদি কেউ বলে,



কুটার
শ্রীললিতমোহন সেন
চিত্রাধিকারী শ্রীমতীজগল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাধা শুঁড়ি বকের পাক
যেমন শুঁড়ি তেমনি থাক।

তাহলে সে কথা ফলে ?

—ফলে বইকি। ওষে পিঠে-খারাপ-করা মস্তব।

—কলে ? ফলে ?—হি-হি-হি-।—দিদি বলে মিছে কথা। ফলেই ত।

সাধা শুঁড়ি বকের পাক—
যেমন শুঁড়ি তেমনি থাক।

বলেলাম, ফলে গেল।—এককে বারে কাঁচা পিঠে—ভ-ভ-ভেতে চাল। যেমন খাওয়া, অমনি মা ওলাবিবি এচেন। উঃ মাগো।

হঠাৎ তীব্র একটা চীৎকার করিয়া সেজবউ সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

মেজবউ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হ'ল, মা ?

পিঠে খাওয়ার কথা বলছিল।

মেজবউ বলিল—কি একটা ছড়া বলে। যাক, তুমি বলেছ ত মা, মিথ্যে কথা।

হতভম্বের মত দ্বিদিমা বলিলেন—তা ত জানি না, মা, বললাম সত্যি মস্তব।

মেজবউ কপালে করাঘাত করিয়া কহিল—সকল্যাপ কবেছ, মা। ন-দ্যাওব যেদিন মরেন, তাব আগেব দিন ছেল পিঠে-পার্কণ। বড়দি পিঠে ভেজেলো কাঁচা-কাঁচা, ওই আবাস্ত্রী নাকি চুপি চুপি পিঠে-খারাপ-করা মস্তব পড়েলো। দ্যাওর এল মাঠ থেকে, বলে বড্ডা ধিনে—পিঠে দে। বড়দি বললো দ্যাড়া ভাল পিঠে ভেজে নিই। শোনলে না মা, সেই কাঁচা পিঠে গুড় দিয়ে থেলে। সেই আভিরে ভেদবমি—

আঁচলে চোখ মুছিয়া মেজবউ বলিতে লাগিল—দ্যাওর ম'লে—সেজবোর হ'ল মাথা খারাপ। যাকে পাষ হুঁষায়, হ্যাগা সত্যি ? মস্তব ফলে ? আমরা বলি, না।

—তাই ত বউ, আমি ত কিছুই জানি নে। দেখ, তোবা ভাল ক'রে ঠাকুরের পূজো দে, তোদের ভিটে ব'দলে দেখছি নানান খানা লেগেছে। ওখানে ত রোগ-যোগ ছিল না, এখানে এসে একি !

—তুমি পায়ের ধুলো দাও, মা-ঠাকরোণ—সব যেন বজায় থাকে। ইদিকে ভাইরে মার-ধোর গাল দেভেন—কিন্তুক সে মরার পর সব-বাই হুপ্‌ভাড়া হয়েছে। ওই দেখ মা, ভাড়া ছাইকেল ফেলেন নি—চালের বাতায় গোঁজা অয়েছেন।

নহা ওদিক হইতে বমির শব্দ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বউয়ের গলা,—এই ক'টি কক্‌কড়ো ভাত—নবুর অস দিয়ে খেয়ে ফ্যাল গো খেয়ে ফ্যাল। দ্রুত আত (ব্রাত) গো। সাবানিন টো-টো ক'রে মাঠে ঘোরা, জাও—খেয়ে ফ্যাল।

—হু হারামজাদী—ওয়াক্। কাঁথা দে উ-হ-হ—চেপে ধর—ওয়াক্—

মেজবউ বলিল—আত উপসী থাকা কি ভাল, মা-ঠাকরোণ ? ওনার বড্ডা জ্বাকেরে ধাত—থেনেই ওয়াক। আমাদের ওনারা জ্বর এলেও চাড্ডি খায়। সারা দিনে গভর-জল-করা ছেরোম, না খেয়ে কে পারে, মা ?

* * *

নদীর মত এই পরিবাবেও ত্রাণ ধরিয়াছে। চারি দিকে কাঁকা মাঠ, বাড়ীর নীচে থরশোতা গালা, আলো হাওয়ার অপ্রতুলতা কোথাও নাই, তথাপি রোগের বীজ কোথা দিয়া যে গ্রামেব মাটিতে অঙ্কুরিত হয়, কে বলিবে ?

পরের দিন সকালে মাঠে মার্চে বেড়াইলাম। মাঠ বহু-দূর বিস্তৃত—মৃগ, কলাই, মটর অজস্র ফলিয়াছে। হুপক ধানের ভায়ে গাছগুলি মাটির পানে হেলিয়াছে, শিস্ দিয়া গান গাহিয়া ককালসার ক্লম চাই মাঠে মাঠে ফিরিতেছে। প্রভাতের সূর্য সোনার রৌদ্র ঢালিয়া উহাদের অভিনন্দিত করিতেছেন। কিন্তু ভিন্ন গাঁবে মোড়লদেব জমি অল্পই। ফনি-মনসার বেড়া-দেওয়া প্রকাণ্ড মাঠ—পূর্ববঙ্গের কোন মুসলমান প্রজা আসিয়া জমা বইয়াছে। তার কোলে ফল-ভায়ে হুসমুদ ভুঁই সাঁওতালদের। সাঁওতালরা মজুর খাটিতে এদেশে আসিয়াছিল, আজ জমি বাঁধা রাখিয় টাকা ধার দিয়া মহাজন হইয়াছে। স্বাস্থ্য ভাল, জমিতে দিবারাজ লাগিয়া থাকে—সে-সলটি দিলে টাকা আসে তাহা উহার ভাল রকমই জানে।

মোড়লদের জমি একটু দূরে ; খাটুনির অভাবে ফসল ভাল হয় নাই। না হউক, জমিদারের খাজনা মিটাইয়া যাহ থাকিবে পরিবারেব গ্রাসাচ্ছাদন তাহাতে অনায়াসে হইবে।

ছিন্নবিছিন্ন জমিগুলির পান চাহিয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল। মাঠে আর ভাল লাগিল না।

ফিরিয়া আসিয়া দ্বিদিমাকে বলিলাম, বাড়ী চল।

—খাওয়া-দাওয়া না ক'বে গেলে ওরা হুঁশু করবে। বুঝিলি ?

বলিলাম—তবে শীগু'গির নীশু'গির রাঁধ, আমার ভাল লাগছে না। এখনও মোড়লদের কয়েকটি হুস্তবতী গাভী আছে, ঘরে নলেন খেজুর গুড় আছে—দিদিমা পায়স রাঁধিলেন। ছেলে বড় গরিভুপ্তি করিয়া খাইল।

বড়বউ বলিল—মা, তোমাদের এক আশা—কেমন ভূম ভূর ক'রে গোন্দ বেরুচ্ছে। আর আমরা আঁধি গরুর জাব। পোড়া কপাল।

আজ আর বড় মোড়লের জর আসে নাই। পেট ভরিয়া পায়স খাইয়া বলিল—চল খোকাবাবু, তোমারে কাঁবে ক'রে ঘাটে পৌঁছে দেই। আজ গায়ে অনেক বল হয়েছে।

বলিলাম—না, থাক। আমি বেশ হেঁটেই যাব।

হাসিয়া মোড়ল বলিল—বড় হয়েছেন কিনা, নঙ্কা। নোকের কাঁধে চেপে যেতে বড় নঙ্কা করে, নয় গা? বলিয়া হো হো কবিয়া হাসিতে লাগিল।

এবারও মোড়ল মুগ্ধ, কলাই, লাউয়ের বোঝা নৌকার চাপাইয়া দিয়া গেল। প্রণামীর টাকা দিল, কাপড় দিল এবং হাসিমুখে বলিল—মা-ঠাকবোণ গো, এবার যখন আসবা তখন উই বেলেভাডায় গিয়ে উঠিছি দেখবা। সবনানী কি মোদের ধল বাঁধতে দেবেন গা!

বলিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, ওই ককান্সার কর্কশ চেহাবাব লোকটি কাঁদিত্তেছে।

* * *

আরও কয়েক বছর পবে যোবাব মণ্ডল-বাড়ী যাই সে-বার বেলেভাডায় গিয়া উঠিয়াছিলাম। বেলেভাডায়ও গঙ্গা মণ্ডল-বাড়ীর নিয়ে পাড় ভাঙিতেছিল। কিন্তু গঙ্গাকে ভয় করিবার উহাদেব অবশিষ্ট কিছু ছিল না। ছোট একখানি বাগান—অর্ধেকটা তাহাব গঙ্গাগর্ভে—বাকি অর্ধেকটায মোড়লদের বাসগৃহ। বাসগৃহ ত বাসগৃহ! মাত্র ছোট দুখানি ঘরের কোলে ফালি একটু দাওয়া। সর্কার উঠান—মরাইয়ের চিহ্ন নাই, গরু ছাগলের ডাক শোনা যায় না—এমন কি ছেলে-ময়ের কোলাহলও শুনিলাম না।

বিধবা বডবউয়েব কোলে পাঁচ বছরের এক ক্লয় ছেলে মণ্ডল-বংশের শেষ আশা-প্রদীপ! বড় এই বংশের উপব দিয়া ভাল ভাবেই বহিয়া গিয়াছে—মহীকহ উৎপাটিত হইয়াছে, ছিন্নশাখা অর্দ্ধমৃত এই শিশুতরুমাত্র ধুকিতেছে!

হুঙ্কা দিদিমার পায়ে পড়িয়া মোড়ল-বউ কত দুঃখের কান্নাই কাঁদিল। সে-সব বিলুপ্ত গৌরবের করুণ কাহিনী এখানে পুনরুক্তি করিয়া কি-ই বা লাভ?

সন্সারে রোগ আছে, মৃত্যু আছে, আরও অনেক বিপদ আছে। মণ্ডল-পরিবাবে একে একে সে-সবের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পবীক্ষার শেষ এখনও হয় নাই,—এই ক্লয় শিশু ও বিধবা রক্ষয়িত্রী তার সাক্ষ্য। গঙ্গাগর্ভে উচ্চ পাড় ভাঙিয়া পড়িয়া যেদিন মণ্ডলদের ভিটাটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে সে-দিন অতীত ইতিহাসেব পৃষ্ঠা উন্টাইয়া কেহ আর নয়ন অশ্রুসিক্ত করিবে না।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মোড়ল-বউ ছেলেকে বিছানায়

শোয়াইয়া দিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জালিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম আর শেষ হয় না। মণ্ডল-বংশের স্থায়িত্ব ও এই সন্তানের আয়ু প্রার্থনা করিয়া মণ্ডল-বউ তুলসীতলায় মাথা কুটিতে লাগিল। বহুক্শ প্রার্থনাব পর বউ সেই প্রদীপ তুলিয়া লইয়া আমবাগানেব মধ্য দিয়া গঙ্গাব কূলে গিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ উঁচু কবিয়া বউ দেবীকে সকাতির মিনতি জানাইতে লাগিল—হেই মা, মুখ তুলে চা। ফিরে যা ফিরে যা। ভিটেটুকুতে আর নোভ করিস নে মা, মুখ তুলে চা। বাড়ী ফিরিয়া বউ শাখে বার-কতক ছুঁ দিল।

সন্ধ্যা দেখানো শেষ করিয়া দিদিমার কাছে আসিয়া বলিল ও ক্লয় কষ্টে কহিল—মা গো, নিত্মি দেবতাকে বলি, ভিটেটুকু বজায় রাখ—বংশধরকে বাঁচা। ই মা, এত কি মহাপাতকী মুই যে মোদের কতা শোনবেন না!

দিদিমা বলিলেন—শুনবেন বইকি মোড়ল-বউ।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে খেয়া পাব হইতেছিলাম। দুটি ছোট পুঁটুলি কোলের উপর রাখিয়া মণ্ডলদের ভিটার পানে চাহিয়া ছিলাম। কাঠাখানেক (আড়াই সেব) মুগ ও ছোলা আধ কাঠা;—দিদিমাও লইবেন না—মোড়ল-বউও ছাড়িবেন না—অনেক কান্নাকাটি অল্পনল্প-বিনয়ে দুটি পুঁটুলি ও খেয়া-পারেব পয়সা লইতে হইয়াছিল।

নৌকার উপব বসিয়া অনেকে অনেক কথা বলিতেছিল। এমন সময় দূরে আমবাগানের মধ্যে প্রদীপেব আলো দেখা গেল। শীর্ণকায় মণ্ডল-বউয়ের মূর্তি চোখে পড়িল না—প্রদীপটি বারকয়েক আন্দোলিত হইল মাত্র। নদী-দেবতার কাছে নিত্যকার সাক্ষ্য প্রার্থনা বহিয়া যে দীপশিখা আশ্র-বন্যভাস্তরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে তাহার অন্তরালে তপঃক্লিষ্টা মঙ্গলপ্রার্থিনী বধূটিকে মনে পড়িল। দীপের আলোয়—যিনি নদীর প্রসন্নতা যাগিয়া বাস্তুদেবতাব স্থিতি কামনা কবিত্তেছেন এবং শব্দের মঙ্গলধ্বনি তুলিয়া উজ্জ্বল দেবতার চরণে বংশধরের আয়ু ভিক্ষা করিত্তেছেন।

কে এক জন সেই দিকে চাহিয়া বলিল—বউটার পূজো মা গঙ্গা নিয়েছেন। দেখ নি, এখারে চড়া পড়তে আবস্ত হয়েছে।

দেবী প্রদীপের আরতি গ্রহণ করিয়াছেন, দেবতা কি মঙ্গলশব্দের ডাক শুনিতে পাইবেন?



শরশয্যা

বনফুল

শবীরের সমস্ত রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।

অজ্ঞাতসারেই হাতের মুষ্টি দুইটি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—
নাসারক্ত, স্ফীত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল এতনই
যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই তাহার মুণ্ডটা ছিড়িয়া
ফেলি। স্বপ্নের বিষয় হউক, দুঃস্বপ্নের বিষয় হউক, মুণ্ড হাতের
কাছে ছিল না। ছিল খবরের কাগজটা। সেখানা ছিড়িয়া
ফেলিলে লাভ নাই। নারীধর্ষণকারী অক্ষতই হইয়া
যাইবে।

...ইহার কিন্তু একটা প্রতিকার কর। প্রয়োজন... দেশের
নারীর এই লাঞ্ছনা যদি নীরবে সহ্য করিয়া চলি, তাহা হইলে
আমার পৌরুষেব মূল্য কি? ...সমস্ত ছাত্রজীবন নানাবিধ
ব্যায়াম করিয়া হাতের গুলি ও বুকুর ছাতি বাড়াইয়াছি...
কলেজের স্পোর্টে সকলের সেরা ছিলাম... কিন্তু শবীরে
শক্তি সংগ্রহ করিয়া কি লাভ যদি নারীসেব মর্যাদা না রক্ষা
করিতে পারি?

ইত্যাকার নানাবর্ণ যুক্তি মনের মধ্যে তারত্বের চাকার
করিয়া ফিরিতে লাগিল। করিলে কি হইবে—উপস্থিত
কিছু করিবার উপায় নাই—এক উঠিয়া বসা ছাড়া। তাহাই
করিলাম। উঠিয়া বসিলাম এবং জানালা দিয়া ভ্রুকুটিকটল
মুখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বাহিরেও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। আকাশে মিটি-
মিটি তারা জ্বলিতেছে। মনে হইল সমস্ত আকাশের দক্ষত-
গুলি আমাদের ছরবস্থা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।
অন্ধকারে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে ওগুলো। তালগাহ না
প্রোত্তের দল! আমরা কি ভূতের রাজ্যে বাস করিতেছি! ...
দূরের পাহাড়টা অন্ধকারে মনে হইতেছে যেন একটা বিরাট
হিংস্র প্রাগৈতিহাসিক জন্তু—ঘাপ্‌টি মারিয়া বসিয়া আছে—
সুযোগ পাইলে সমস্ত দেশটার ঘাড়ে লাকাইয়া পড়িবে।

আবার খবরের কাগজটা খুলিয়া পড়িলাম। এক জন
অসহায় নারীকে প্রকাশ্য দিবালোকে... ছি, ছি, ভানিতেও

সমস্ত অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। দেশে কি পুরুষ নাই—
সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায়—বহু সম্ভরণশীল,
ব্যায়ামশীল, লক্ষ্যশীল বীরপুরুষদেব ছবি দেখি—ফুটবল, হকি
খেলার সময় সমস্ত দেশের যৌবন চঞ্চল হইয়া ওঠে অথচ
সেই দেশে এখনও নারীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার হন
অবারিত ভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে! আমরা জীবিত
না মৃত! অভিজ্ঞতের মত বসিয়া রহিলাম। ...সাঁৎ কবিত্ব
একটা শব্দ হওয়াতে চমকাইয়া উঠিলাম। পাশের লাইনে
আর একটা গাড়ী আসিয়াছে। তন্দ্রা আসিয়াছিল, ভাঙিয়া
গেল। মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম যে-স্টেশনে নামিব তাহা
নিকটবর্তী হইয়াছে। স্টেশনের আলো দেখা যাইতেছে।
এ-দেশে আর কখনও আসি নাই। চাকুরীর চেষ্টা ঘন
ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। শঙ্কর-মহাশয় তাঁহার পবিত্র
একটি লোককে পত্র দিয়াছেন—তিনি চেষ্টা করিলে চাকুরী
জুটিতে পারে।

২

এই শহরে ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই। বিহাবেন
একটি শহর। রাজিও বেশ অন্ধকার। শঙ্কর-মহাশয়ের
পরিচিত সেই ভদ্রলোককে যদিও আমি চিনি, কিন্তু এই
অন্ধকার রাত্রে এই অপরিচিত শহরে তাঁহার বাসা খুঁজিয়া
বাহির করা সহজ নহে। স্টেশনে খোঁজ করিয়া শুনিলাম
শহরের ভিতর একটি হোটেল আছে। ঠিক করিলাম—
হোটেলের রাজিবাস করিয়া সকালে ভদ্রলোকের খোঁজ
করিব। একটি এককব সহায়তায় উক্ত হোটেলের আসিয়া
পৌছান গেল। হোটেলের মালিক দেখিলাম বেশ
সদাশয় ব্যক্তি। তিনি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা
করিলেন—দ্বিতলের একটি কুঠরি দিলেন এবং সদাশয়তার
আতিশয্যে একটি দড়ির খাটিয়াও দিলেন। বৎসামাল

আহার করিয়া সেই খাটিয়া আশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

৩

আবার কুরুক্ষেত্র-সমব বাধিয়াছে।

নাবীধর্ষণকারী কুরুগণের সহিত নারীরক্ষণকারী পাণ্ডবগণের ঘোর যুদ্ধ। স্বভাবতই পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার সহানুভূতি যথেষ্ট। সুতরাং আমাব পাণ্ডবপক্ষে থাকার কথা। কিন্তু কি রকম পাকেচক্ষে পড়িয়া আমি ভীষ্মদেব হইয়া পড়িয়াছি। দ্রোণদী-ধর্ষক দুঃশাসনের মোসাহেবি করিতে হইতেছে। একটি ঘুসিতে মোহান্বিত ধৃতবাস্ত্রের নাসিকা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার প্রবল বাসনাকে অপূর্ণ কোশলে বাৎসল্যরসে রূপান্তরিত করিয়া ক্রমাগত হেঁ হেঁ হেঁ করিতেছি। অত্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতিকর ব্যাপার।... সহ্য সমস্ত অপমানের যেন অবসান হইয়া গেল। আব দুঃখোদনকে দেখিয়া দৈত্য হাঙ্গুল হাঙ্গুল হইবে না— দুঃশাসনকে বাহবা দিয়া পিঠ চাপড়াইতে হইবে না— ধৃতবাস্ত্রের মনস্তপ্তি করিবার প্রয়োজন নাই। এইবাব মৃত্যু সন্নিকট। স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া শরশয্যা শয়ন করিয়াছি। শবশয্যা ফুলশয্যা নহে। তীক্ষ্ণ শরের সহস্র ফলাব উপর দেহভার রক্ষা করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিতেছি। প্রতি রোমকূপে মৃত্যুর আগমনবার্তা ঘোষিত হইতেছে।...সহ্য মনে হইল আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছি না। কানের পাশে, বগলেব নিম্নে অসহ্য যন্ত্রণা! স্বপ্ন ও পৃষ্ঠ দেশেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট।... তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। টটটা জ্বলিয়া দেখি সমস্ত বিছানায যেন তিসি বিছান রহিয়াছে! অগ্নি তিসি ছাবপোকা! দেওয়াল বাহিয়া সাবি সাবি আরও নামিতেছে। সর্বনাশ! বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঘর ছাড়িয়া বাইব কি না ভাবিতে লাগিলাম।...অন্তত স্বপ্নটার কথাও মনে হইতে লাগিল। আর একবার বিছানা ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।...একেবারে অকৌহিলী!

৪

• কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জানালা দিয়া বাহিরে চাহিলাম।

বাহিরে চাহিবা মাত্র কর্তব্য অচিরেই স্থির হইয়া গেল। আমি দ্বিতলের কুঠরি হইতে দেখিতে পাইলাম ঠিক নীচের গলিটাতে চেক-কাটা লুপ্তি-পবা একটি গ্যাট্টোগোষ্ট-গোছের লোক একটি বাড়ীর জানালায় উকি দিয়াই চোরেব মত সরিয়া গেল। যে-জানালায় লোকটা উকি দিয়া সরিয়া গেল, সেই জানালা দিয়া আমিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। আমাব বিতলের ঘর হইতে সহজেই তাহা সম্ভব। দেখিলাম একটি যুবতী শয়ন করিয়া আছে—পবনে একটি আধ-ময়লা কাপড়—কোলের কাছে একটি শিশু। যবে আর কেহ নাই।...চকিতের মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদটা মনে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভিতর প্রচণ্ড বেগে একটা বিভ্রান্ত-প্রবাহ বহিয়া গেল। লোকটাকে শিক্ষা দিতে হইবে!—সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে—এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহা জীবনে সে আর কখনও ভুলিবে না। আমার ব্যায়াম-করা শরীরের প্রতি পেলী আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে দ্বিতল হইতে অবতরণ করিয়া উক্ত গলিতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকটা আবার জানালার কাছে গিয়া স্তম্ভপূর্ণে উকি দিতেছে। রাস্কেল!

সর্বদা জ্বলিয়া গেল।

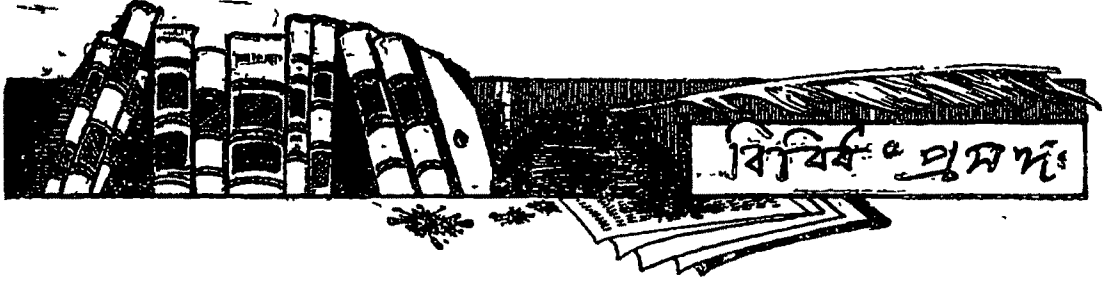
কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেলাম। একটি চপেটাঘাতেই বৎসকে ঠাণ্ডা করিয়া দিব। আমার পদশব্দ পাইয়াই লোকটা চমকিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে চড় না মারিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম। আশ্চর্য্য কাণ্ড! কিন্তু উপায় কি। ইনিই আমার স্বপ্তরের পবিচিত ব্যক্তি এবং আমার ভরসাস্থল। উত্তম চপেটাঘাত কুতাজলিপুটে পরিণত করিয়া মুখে বিনীত শ্রদ্ধার ভাব ফুটাইয়া বলিতে হইল, “আপনাব কাছেই এসেছি—বিমল বাবুব জামাই আমি।”

ভক্তলোক রসভঙ্গ হওয়াতে বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “ও,—বিমল আমাকেও লিখেছে। কোথা উঠেছ তুমি?”

“ওই হোটেল—”

“আচ্ছা—কাল সকালে দেখা ক’রো—”

কিরিয়া আসিবা সেই শরশয্যা শয়ন করিলাম।



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রধানতঃ বাংলা ভাষার সাহায্যে গৃহীত হইবে এবং তজ্জন্তু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষাও দেওয়া হইবে প্রধানতঃ বাংলা ভাষার সাহায্যে, এইরূপ নিয়ম হওয়ায় শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোকদের মধ্যে বাংলায় চর্চা বাড়িবে। বাংলা লিখিবার চেষ্টাও বাড়িবে। ইহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিবার এবং বাংলা বানান সম্বন্ধে একটি বহুস্তন-গ্রন্থ রীতি প্রবর্তিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির সাহায্য করিয়াছেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় যোগ্য লোকদের দ্বারা নানা বিষয়ে ছোট ছোট বাংলা পুস্তক লিখাইবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে—যদি বাস্তবিক বিদ্বান ও স্নেহকদের উপর কাজটিব ভার পড়ে।

ইহা সুসম্পন্ন হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি হইবে না, বরং আর্থিক লাভ হইতে পারে। যাহাতে লাভ আছে এরূপ পুস্তক প্রকাশের চেষ্টা ব্যবসাদার পুস্তক প্রকাশকেরাও করিতে পাবেন, এবং বস্তুতঃ অনেক সভ্য দেশে তাহা করিয়াও থাকেন।

কিন্তু পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি কাজ আছে, যাহা আমাদের বাংলা দেশের প্রকাশকেরা করিবেন না, একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ই করিতে পারেন—অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়েরই করা উচিত। তাহা, নানা বিদ্যা সম্বন্ধে বৃহৎ বাংলা পুস্তক লিখাইয়া প্রকাশ করা। আপাততঃ এরূপ কাজে আর্থিক লাভ হইবে না—বহু বৎসর হইবে না; বরং

ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু কাজটি না হইলে, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা ভিন্ন সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে বাংলা সাহিত্য অপুষ্টি থাকিষা যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কালক্রমে প্রবেশিকা হইতে উচ্চতর সকল পরীক্ষাই বাংলায় সাহায্যে লইবার নিয়ম করিতে হইবে, সুতরাং সকল বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাও বাংলার সাহায্যে দিতে হইবে। তখন আমাদের পূর্বোন্নিখিত নানা বিদ্যার বৃহৎ বাংলা বহিষ্ঠুলি কাজে লাগিবে। এখন হইতে সেরূপ বহি না লিখাইলেও, কলেজপাঠ্য পুস্তকরূপে ব্যবহারের নিমিত্ত তখন কতকটা এরূপ পুস্তক লিখাইতে হইবে। তখন তদ্রূপ পুস্তক প্রকাশ লাভজনক হইবে বলিয়া ব্যবসাদার প্রকাশকেরা এরূপ কাজে হাত দিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা বিষয়ে ছোট ছোট বহি লিখাইয়া প্রকাশ করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার সংবাদ বন্ধের ও বন্ধের বাহিবেব প্রধান প্রধান কাগজে প্রচারিত হইয়াছে, সকলে প্রশংসাও করিয়াছেন; আমরাও করিতেছি। কাজটি সুসম্পন্ন হইলে বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর প্রশংসা পাইবেন।

“বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ”

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিকল্পনাটির আলোচন উপরে করিলাম, তাহা অল্প সভ্য দেশের পক্ষে অসাধারণ ব নূতন নহে, সাধারণ ব্যাপার মাত্র। শুধু পরিকল্পনা হিসাবে বাংলা দেশের পক্ষেও উহা নূতন নহে। উনিশ বৎসর তিন মাস পূর্বে আমরা “বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ” নাম দিয়া এরূপ একটি পরিকল্পনা ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর ৪২২-৪২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে লেখা হইয়াছিল :—

বর্তমান যুগে সকল সভ্য জাতির সমবেত চেষ্টায় জ্ঞানের বিষয়সকল ব্যাপ্তি, গভীরতা ও সূক্ষ্মতার দ্রুত উন্নতিলাভ করিতেছে। এই জ্ঞান জনসাধারণের পক্ষে হৃদয় করিবার জন্য ইউরোপীয় ভাষার অনেক

স্বাধীনতা আছে। প্রতি বিষয়ে নবতম ভাষ্যে পূর্ণ পণ্ডিতদের উপস্থিতি এই ছাড়া, সরল ভাষায় সাধারণ বোধগম্য প্রণালীতে রচিত অচল আধুনিক উচ্চজ্ঞানপ্রদ অনেক ছোট পুস্তক ও পর্যায়বদ্ধ গ্রন্থাবলী সর্বত্রই পাওয়া যায়। তদুপরি পণ্ডিতেরা সাংসারিক লোক ও শ্রমজীবীদের অবসরকালীন শিক্ষার জন্য সরল ভাষায় বিবিধ্যা-প্রসারিত বক্তৃতা (University Extension Lectures) প্রদান করিয়া এই সব নব জ্ঞান কলেজের বাহিরে বিতরণের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই নাই। অথচ, ইউরোপীয় দেশগুলির অপেক্ষা ভারতবর্ষের পক্ষে নবোদ্ভবশালী জ্ঞানের অধিকার অধিকতর আবশ্যিক; কারণ ইহারই অভাবে ভারতের জনসাধারণ ইউরোপের অনেক পদাতে পড়িয়া আছে। ভারতীয় দেশীয় ভাষায় সাহিত্য অনেক স্থলে এখনও মধ্যযুগের ইউরোপকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ভারতকে বিশেষ চেষ্টা অবলম্বনের মধ্যে দীর্ঘ কালের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, নচেৎ বর্তমান যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রামে নব্যজ্ঞান জ্ঞানের মধ্যে বঞ্চিত ভারতীয় জনসাধারণ যুগান্ত প্রাপ্ত হইবে। জ্ঞানই শক্তি; সেই শক্তি সরল মাতৃভাষায় রচিত সংগ্রহের দ্বারা ভারতবর্ষ সঞ্চারিত করিতে হইবে। জাতীয় মুক্তি এই পথে।

এই জন্য বাঙ্গলায় ও পূর্বে অন্যান্য ভাষায় “বিবিধ্যা-সংগ্রহ” নামে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশের কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা Pome University Library [হোম যুক্তিসিদ্ধি লাইব্রেরী] এবং Cambridge Manuals of Science and Literature-এর [কেম্ব্রিজ ম্যানুয়ালস্ অব সায়েন্স এন্ড লিটারেচারের] আদর্শে রচিত হইবে।

অতঃপর মুদ্রিত হইয়াছিল এই পরিকল্পনাটির
নিরূপণ

(১) প্রতি গ্রন্থ মূল পাঁচক অক্ষরে ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২০০ হইতে ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইবে।

(২) প্রতি গ্রন্থের শেষে দুই এক পৃষ্ঠা ছোট অক্ষরে শ্রেণীবিভাগ করা প্রমাণপঞ্জী (bibliography) দিতে হইবে।

(৩) প্রতি গ্রন্থের মূল্য বাবো আনা হইবে।

(৪) সকল বিষয়ের নবোদ্ভাবিত তথ্য সকল এই গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হইবে। গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী সাধারণ বাঙ্গলা শিক্ষিত লোকদের বোধগম্য হইবে। দীর্ঘ সমস ও কঠিন সংস্কৃতমূলক শব্দ অথবা প্রাদেশিক ভাষা যথাসম্ভব বর্জনীয়।

(৫) সম্ভবমত বিদেশী শব্দের বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু যে সব বিদেশী শব্দ আমাদের নিকট অধিকতর সহজ হইয়াছে বা যে-সকল ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বাঙ্গলা ভাষায় গ্রহণ কবাই শ্রেয়, এই গ্রন্থাবলীতে তাহাই বঙ্গাকারে লিপিত হইবে; তাহার দ্রুত বোধ সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইবে না।

(৬) অধ্যক্ষসমিতি এই গ্রন্থাবলীর সর্বস্বত্বাধিকারী হইবেন। তাহারা গ্রন্থকারকে দুই শত টাকা পারিশ্রমিক দিয়া প্রতি গ্রন্থের কপি-রাইট কিনিয়া লইতে পারিবেন, এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা পাইবেন।

(৭) প্রতি বিভাগের লেখকগণ সেই বিভাগের সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থ রচনা করিবেন এবং প্রত্যেক গ্রন্থ সংশোধন ও পৰিবর্তন কবিত্তে উক্ত সম্পাদকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে।

(৮) “বিবিধ্যা-সংগ্রহ” ছয় বিভাগে বিভক্ত হইবে, এক স্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান সম্পাদক, উপস্কেতা ও কার্যানির্বাহক রহিবেন।

বিভাগগুলি ও তাহাদের সম্পাদকগণ :—

(ক) দর্শন (সম্পাদক ডাক্তার ব্রজেননাথ শীল এবং ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)।

(খ) বিজ্ঞান (সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ)।

(গ) ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি (সম্পাদক শ্রীযুনাথ সরকার)।

(ঘ) সাহিত্য, সাহিত্যের ইতিহাস এবং ভাষা (সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী)।

(ঙ) কলা (সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(চ) শিক্ষাবিজ্ঞান (অস্থায়ী সম্পাদক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ইহার পর ইতিহাস-বিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যুনাথ সবকার দিয়াছিলেন

ইতিহাস বিভাগ—গ্রন্থাবলী

১। ভারতবর্ষের অভিব্যক্তি—যুনাথ সবকার।

২। হিন্দুযুগের ইতিহাস—

৩। মুসলমান যুগের ”—

৪। ব্রিটিশ যুগের ”—রমেশচন্দ্র মজুমদার।

৫। বৈদিক সমাজ ও সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ জগৎ—বিদ্যুশেখর শাস্ত্রী এক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

৭। দ্রাবিড় সভ্যতা—বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

৮। বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। মারাঠা ” —সুরেন্দ্রনাথ সেন।

১০। শিখ ” —

১১। সিপাহী বিদ্রোহ—

১২। ভারতের বাণিজ্য, প্রাচীন ও নব্য ইউরোপীয়—

১৩। ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস—

১৪। ভারতীয় মুদ্রা—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। ভারতীয় অর্থনীতি—যুনাথ সরকার।

১৬। অশোক—কালিদাস নাগ এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৭। আকবর—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮। আওরাজীব—যুনাথ সরকার।

১৯। চৈতন্য—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

২০। রামমোহন বার—অজিতকুমার চক্রবর্তী।

২১। প্রাচীন মিশর—

২২। ” বাবিলন—

২৩। চীন—

২৪। জাপান—

২৫। গ্রীস—

২৬। আলেকজান্দার—

২৭। রোম (সীজারের মৃত্যু পর্যন্ত)—

২৮। রোমক সাম্রাজ্য (১৪৫৩ পর্যন্ত)—

২৯। ইংলণ্ড (১৬০৩ পর্যন্ত)—

৩০। ” (১৬০৩—১৯১৭)—

৩১। ফ্রান্স—

- ৩২। ইউরোপে নবযুগ (১৪৫৩—১৬১৭) —
- ৩৩। আধুনিক ইউরোপ (১৮৪৮ হইতে) — কিরণশঙ্কর রায়।
- ৩৪। আমেরিকা —
- ৩৫। নেপোলিয়ন —
- ৩৬। ব্রিটিশ উপনিবেশ —
- ৩৭। খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস —
- ৩৮। মুহম্মদ ও আব্বাসীয় খালিফাগণ —
- ৩৯। ইসলামীয় জগৎ—মিশর, স্পেন ও তুর্কী —
- ৪০। পারস্য —
- ৪১। এসিয়ার গ্রীক সাম্রাজ্য —
- ৪২। গ্রীক সভ্যতা, আলেকজান্দারের পরবর্তী — কালিদাস নাগ।
- ৪৩। ঐতিহাসিক প্রণালী — রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৪৪। ভারতের অবস্থা — রাখালদাস চন্দ্রোপাধ্যায়।
- ৪৫। প্রাচীন ভূগোল —
- ৪৬। ইউরোপে আবিষ্কারের যুগ, (১৪০০—১৬০০) —
- ৪৭। লিপিতত্ত্ব — হনীতিকুমার চন্দ্রোপাধ্যায়।
- ৪৮। ভারতের বাহিরে হিন্দু সভ্যতা —
- ৪৯। ইউরোপীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ —
- ৫০। শাসনতত্ত্ব (Political Philosophy) —
- ৫১। ভারতের প্রাচীন ভূগোল (অভিধান) —
- ৫২। দ্বারসীবিম্ব (১৭৮২—১৭৯৬) — কিরণশঙ্কর রায়।

বহুনাথ সরকার, সম্পাদক।
টিকানা—সোরাধপুর পোষ্ট,
পাটনা জেলা।

এই পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে ১৩২৪ সালের প্রাবণের
প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল :—

ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্যা ব্যক্তির সহযোগিতায়
“বিবিকিত-সংগ্রহ” প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে
বৃহত্তম অধ্যাপক বহুনাথ সরকার প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় দিয়াছেন।
তাহার বিভাগের কতকগুলি পুস্তক লিখিবার ভার ইতিমধ্যেই কেহ কেহ
লইয়াছেন। তন্মিত্ত অস্ত্রাধ্য বিভাগেও কেহ কেহ স্বতঃপ্রসূত হইয়া
পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন।

কাজটি যেমন কঠিন, আংশিক ভাবে করিয়া তুলিতে পারিলেও
বঙ্গদেশের পক্ষে তেমনই হিতকর হইবে। এই জন্ত উদ্যোগীরা যোগ্য
ব্যক্তিগণের সাহায্য পাইবার আশা করেন। এখন কাগজ অশ্রান্ত
দ্রুম্য * কিন্তু “শুভ্র শীতল” নীতি অনুসরণ করিয়া তাহারা ক’ল
সত্য হইবাব অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত দু-একখানি বহি প্রকাশিত করিতে
চেষ্টা করিবেন।

দুঃখের বিষয় এই গ্রন্থাবলীর কোন পুস্তক প্রকাশিত
হয় নাই; লিখিত হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু
সেজন্ত উদ্যোগীদের মধ্যে কাহাকেও দোষ দিবার নিমিত্ত
এই বিষয়টি বিশ্বস্তিৎ গহ্বর হইতে টানিয়া বাহির করি নাই।

এই পরিকল্পনাটির বৃহত্তম খাশাদের নাম যুক্তিত হইয়াছিল,
উহা কার্যে পরিণত না হওয়ার জন্ত তাহাদের মধ্যে কেহ

দায়ী ছিলেন বলিয়া অন্ততঃ আমি অবগত নহি। এই
পরিকল্পনাটি হয়ত এখনও কাহাবও-না-কাহারও কাজে
লাগিলে প্রীত হইব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিতে চাহিয়াছেন,
তাহার সংবাদ বন্ধ ও বন্ধের বাহিরে প্রচারিত হইয়াছে।
কিন্তু উনিশ বৎসর আগেকার এই পরিকল্পনাটির সংবাদ
প্রবাসী ছাড়া আর কোন কাগজে বাহির হয় নাই কেন, তাহা
বলা কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় যাহারা চালান, তাহারা যেকপ
বিধান ও খ্যাতিমান, সেইরূপ খ্যাতিমান ও বিধান লোকদের
নামের উল্লেখ এই পরিকল্পনাটি বৃহত্তম ও দেখা যায়।
অবশ্য সংবাদপত্রমহলে এইরূপ একটা দৃষ্টব আছে বটে, যে,
কোনও সম্পাদক একটা ভাল কিছু করিলে বা করিতে চাহিলে
অল্প অনেক সম্পাদক তাহার খবরটা শর্যন্ত অনেক সময় ছাপেন
না। কিন্তু আলোচ্য পরিকল্পনাটি যে একমাত্র, প্রথমতঃ,
প্রধানতঃ, বা অংশতঃ প্রবাসী-সম্পাদকের মস্তিষ্কপ্রসূত,
এমন কোন কথা উহার বৃহত্তম ছিল না। স্ততরাং অল্প
সম্পাদকদের এই বিষয়টির আলোচনা বা উল্লেখ করিবার
পক্ষে কোন বাধা ছিল না।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অকৃতজ্ঞ সম্বন্ধে যাহা
অস্পষ্ট ভাবে মনে আছে, তাহা না বলিলে সত্যের
অপলাপ হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে। আমার সেই
অস্পষ্ট স্মৃতিটি এই, যে, কাজটি আনি করা ইয়া লইব এইরূপ
একটা অলিখিত উচ্চ সর্ভ (understanding) ছিল।
অবশ্য, আমি তাগিদ না-দিলে কেহ কিছু করিবেন না,
এরূপ কোন সর্ভ ছিল না। আমি কেজ্ঞস্থলে তাগিদ দি
নাই, ইহাও মনে পড়িতেছে। স্কারণে তাগিদ দি নাই,
তাহার জন্ত ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দায়ী নহেন। সেই
কারণ আমার একটা ধারণা। তাহা আমি সত্য বলিয়া
মনে করি। তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যদি করিতাম,
তাহাতে সার্বজনিক কোন হিত সাধিত হইত না।

রামমোহন রায় স্মৃতিসভা

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে
রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। প্রতি বৎসর ঐ তারিখে
ভারতবর্ষের অনেক স্থানে তাহার স্মৃতিসভা হইয়া থাকে।

* তখন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল।—প্রবাসীর সম্পাদক

এ বৎসরও হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সভার অধিবেশন হউব বা না-হউক, তাহাতে রামমোহন রায়ের কোন হিত বা অহিত হয় না। আমরা যদি বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন তাঁহাকে স্মরণ কৃতজ্ঞতার ও শ্রদ্ধার সহিত করি, তাহা হইলে আমাদের উপকার হয়।

এই বৎসরের সভাগুলি সংবাদের একটি বিশেষত্ব বা অসম্পূর্ণতার কারণ আমবা স্থির করিতে পারি নাই। অল্প অনেক জায়গায় যেমন স্মৃতিস্তম্ভ হইয়াছিল, তেমনই গত বৎসরেও মত কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলেও সভা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার কোন দৈনিক কাগজে এই সভার এক পংক্তি বিপোর্টও দেখিতে পাই নাই, যদিও বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের অল্প অনেক রামমোহন-স্মৃতিস্তম্ভ সংবাদ বাহির হইয়াছে।

রামমোহন রায়ের চাকরী-গ্রহণের কারণ

প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমাশ্রীচন্দ্র রামমোহন রায়ের বৈয়াক্য জীবন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাঁহার চাকরী-গ্রহণের কারণ আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার অল্পমান এইরূপ, যে, অল্প কারণ বাহাই থাকুক, তিনি শাসন, বিচার, খাজনা নির্ধারণ ও আদায় প্রভৃতি নানা সরকারী বিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্তও চাকরী লইয়া থাকিবেন তাঁহাব জীবনের ঘটনাবলী শ্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ডে ইতস্ততঃ গতিব মত ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। তিনি জীবনে কি কবিবেন, তাহা আগে হইতেই ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়া থাকিবেন। ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল বিষয়ে সংস্কার সাধন তিনি জীবনের ক্রত বলিয়া মনে মনে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। রাষ্ট্রের নানা বিভাগের কার্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতিরেকে তাঁহার সংস্কার সাধন করা যায় না। সেই জ্ঞান যে তাঁহার ছিল, তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়িলে তাহা জানা যায়। বিলাতী পার্লামেন্টের অবগতির জন্ত তিনি এ-দেশের বিচার-বিভাগ, খাজনা-বিভাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রশ্নোত্তর বচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ভ্রমরহিত ছিল। আমার অল্পমান, ঐরূপ জ্ঞানলাভ

তাঁহার চাকরী গ্রহণের, একমাত্র বা প্রধান না হইলেও, অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

রামমোহন রায়ের বিচার

আগে আগে লাইব ও ওয়ারেন হেস্টিংস সম্বন্ধে ইংরেজরা যে-সব বহি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দোষের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর যে-সব বহি লিখিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিতে দোষ কালনের ও চাপা দিবার চেষ্টা আছে। ইহার কারণ, ইংরেজরা স্বদেশের প্রসিদ্ধ লোকদিগকে ভাল লোক বলিয়া জগতের কাছে উপস্থিত করিতে চায়।

আমরা আমাদের দেশের কোনও প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির দোষ চাপা দিবার পক্ষপাতী নহি। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে কেবল অল্পমান করা যায়, প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই, সেখানে মন্দটাই অল্পমান করিবার রীতি সমর্থনযোগ্য মনে কবি না। মন্দটারই অল্পমান মক্ষিকারূপে মাত্র।

রমাশ্রীচন্দ্র বাবু প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় (৩২ পৃষ্ঠার পাদটীকায়) মিঃ ক্রিম্পের একটা মন্তব্যে উল্লিখিত শোনা কথা ধর্তব্য নহে বলিয়াছেন। কিন্তু, ধরুন, যদি তাহা বোর্ডের চিঠিতেই থাকিত, তাহা হইলেও তাহা হইতে রামমোহনের কোন একটা দোষই কেন কল্পনা বা অল্পমান করা হইবে? রামমোহনের জীবনচবিতের আলোচক ২ পাঠকেরা জানেন, যেমন সৌজন্য সেইরূপ আত্ম-সম্মানবোধ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। কোনও ইংবেজের চাকরী করেন বলিয়া তাঁহার উদ্ধত, অশিষ্ট, বা অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করিবার বা অবৈধ গর্হিত আদেশ পালন করিবার লোক তিনি ছিলেন না। সেকালের (এবং একালেরও) সব ইংরেজ কর্মচারী ডিগ্‌বী সাহেবের মত ভদ্র ও সদাশয় ছিলেন না। অল্প রকমের কোন ইংবেজ কর্মচারী রামমোহনের স্বাধীনচিত্ততা ও আত্মসম্মানবোধের জন্তই তাঁহার সম্বন্ধে ‘প্রতিকূল উল্লেখ’ (“unfavourable mention”) করিয়া থাকিতে পারেন, ইহা কি হইতে পারে না?

রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক ভারতীয় ইংরেজ কর্মচারীদের অনেকের যে একটা উদ্ধত বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভাব ছিল, তাহা তৎকালীন সময়-সচিব (military

secretary) কর্ণেল ইয়াঙের প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেসামরিক

রামমোহন সম্বন্ধে লিখিত ১৮২৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের চিঠি হইতে জানা যায়। কর্ণেল ইয়াং লিখিয়াছিলেন :—

"His (Rammohun Roy's) whole time almost has been occupied for the last two years in defending himself and his son against a bitter and virulent persecution which has been got up against the latter nominally—but against himself and his abhorred principles in reality—by a conspiracy of his own bigoted countrymen; protected and encouraged, not to say instigated, by some of our influential and official men who cannot endure that a presumptuous 'Black Man' should tread so closely upon the heels of the dominant white class, or rather should pass them in the march of mind."

তাত্পর্য। গত দুই বৎসর রামমোহন রায়ের সমস্ত সময় অতি তাঁর ও বিজ্ঞপ্তি উৎপাদনের বিকল্পে আপনার ও আপনার পুত্রের পক্ষ সমর্থন গিয়াছে। এই উৎপাদন নামক তাঁহার পুত্রের বিকল্প হইলেও ইহা বক্তব্য তাঁহার ও যুগ্মপদবিবেচিত তাঁহার স্বাধীন মতসমূহের বিরুদ্ধেই হইয়াছিল। ইহা তাঁহার কতকগুলি পরমভাসিহ্ন ধর্ম্মীয় যত্নবাসীর চক্রান্তের বল; তাহার আশ্রয়িত দেশবাসী (অর্থাৎ ইংরেজ) প্রভাবশালী কতকগুলি সরকারী কর্মচারীর আশ্রয়প্রাপ্ত, তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত—বলিতে গেলে—প্ররোচিত হইয়া এই (মোকদ্দমা রূপ) উৎপাদন চালাইয়াছে। এই ইংরেজের সহ করিতে পারে না, যে, এক জন 'ব্ল্যাক' কালো আদমী প্রভুত্বশালী বেসামরিকের এত সম্মান সম্মান হইতে, অথবা বরং, সত্য বলিতে গেলে, মানসিক অগ্রগতিতে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে।

ইহাব পর কর্ণেল ইয়াং লিখিয়াছেন, যে, নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম আদালতে বুদ্ধ করিয়া রামমোহন বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের বলে এবং স্ত্রীর তাঁহার পক্ষে ছিল বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে।

কর্ণেল ইয়াং যে-সময়ে এই চিঠি লিখিয়াছিলেন, তখন রামমোহন রায় চাকরি করিতেন না এবং নানা বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া ভাবতীর্থ ও ইংবেজ সমাজের অনেকের বিবাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বালক ছিলেন বলিলেও বলে, তখনও স্বাধীন মত প্রকাশ করার তাঁহার পিতা ও অন্য অনেকে ভারতবর্ষে ও তিব্বতে তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। চাকরি কবিবার সময় তাঁহার এই স্বাধীনচিন্তা ছিল না বা তাহা তিনি প্রকাশ করিতেন না, মনে করিবার কোন কারণ নাই। স্ত্রীর এইরূপ অসুস্থ্য কবা অসম্ভব নহে, যে, কোন উপরওয়াল ইংবেজ কর্মচারীর তাঁহার প্রতি অসন্তোষের কারণ, তাঁহার স্বাধীনচিন্তা ও তাঁহার আত্মমর্যাদাসূচক উন্নত মস্তক ও ঋজু যেরূপদণ্ড।

বঙ্গের জন্ম অকৃত সরকারী কাজ

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে গবর্নমেন্ট ভাষাকার অধিবাসীদের জন্ম ঘাড়া করিয়াছেন ও করিতেছেন, বাংলা দেশেও জন্ম তাহা করেন নাই ও করিতেছেন না। অথচ বঙ্গেও সেই সকল কাজের প্রয়োজন আছে এবং বঙ্গ গবর্নমেন্ট অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা কম রাজস্ব আদায় করেন না, বরং বেশীই করেন।

বঙ্গের বাহিবে অন্য অনেক প্রদেশে গবর্নমেন্ট শিক্ষার জন্ম—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম—যত ব্যয় কবিয়াছেন ও করেন, বাংলা দেশে গবর্নমেন্ট তত ব্যয় করেন নাই ও করিতেছেন না।

পঞ্জাব, আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, বোম্বাই ও মাদ্রাজে গবর্নমেন্ট কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যবস্থার নিমিত্ত কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। বঙ্গে তাহাব তুলনায় কিছুই করেন নাই বলিলেও অতুষ্টি হয় না। অথচ বাংলা দেশ কৃষিপ্রধান এবং বঙ্গে—বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গে—জলসেচনের বন্দোবস্ত একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষার জন্ম ও জলসেচনের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সরকারী ব্যয়ের তালিকা আমবা আগে আগে দিয়াছি। সেই জন্ম এখন দিলাম না। পরে অব্যবহিত দিতে পারি।

বহু পূর্বে হইতে যে-যে দিকে অগ্রগতি প্রদেশে অধিকতর সরকারী ব্যয় হইতেছে, তাহাব দুটি দৃষ্টান্ত দিলাম। সম্প্রতি আবও কয়েকটি দিকে অগ্রগতি প্রদেশে যেরূপ ব্যয় হইতেছে, বঙ্গে তাহা হইতেছে না। তাহার তিনটি দৃষ্টান্ত দিব।

কৃষিকার্যে ও কোন কোন কুটুম্বশিল্পে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রযুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত কম ব্যয় ও অল্প সময়ে কাজ হইতে পারে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে গ্রাম-অঞ্চলেও সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক শক্তি জোগাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে—কোথাও কোথাও ইতিমধ্যেই হইয়াছে। এই বন্দোবস্তটি সম্পূর্ণ করিবার জন্ম আগ্রা-অযোধ্যা গবর্নমেন্ট ঋণ লইতেছেন ও তাহা শোধ কবিবারও ব্যবস্থা কবিয়াছেন। বঙ্গেও এই প্রকাব বন্দোবস্ত আবশ্যক। কিন্তু সরকার এ-বিষয়ে উদাসীন। কোন বড় জমীদার নিজের জমীদারী অস্তিত্ব দু-একটা গ্রামেও সম্ভাব্য বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিবার আয়োজন করেন না? সব জমীদার ততো দরিদ্র, ঋণগ্রস্ত বা

দেউলিয়া নহেন? গবয়েন্ট যে কিছু করিতেছেন না, তাহা গবয়েন্টের দোষ বটে, কিন্তু শুধু গবয়েন্টের দোষ দেখাইলেই দেশেব উন্নতি হইবে না।

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে নানা রকম ফল জন্মে। কিন্তু অনেক ফল এরূপ, যে, সেগুলি পাকিবার পর বেশী দিন রাখা যায় না, এবং পাকেও কেবল দু-এক মাসের মধ্যে। যদি ফলগুলি স্বাভাবিক টাটকা অবস্থায় দীর্ঘতর কাল রাখিবার উপায় হয়, তাহা হইলে যে-যেখানে সেগুলি জন্মে তথাকার লোকেরা অনেক দিন তাহা খাইতে পায় এবং যেখানে জন্মে না সেখানেও বিক্রীর জন্য প্রেরিত ও রক্ষিত হইতে পারে। সবাই জানে, গরমে ফল শীঘ্র পাকে ও শীঘ্র পচে। যদি খুব ঠাণ্ডা জায়গায় ফল রাখা যায় তাহা হইলে পাকা ফলও শীঘ্র পচে না। বরফদ্বারা ঠাণ্ডা রাখিবার ভাণ্ড, বায়ু বা অল্প রকম পাত্র এবং কক্ষ থাকিলে ফল নষ্ট হয় না। উত্তর-ভারতের নানা স্থানে এই প্রকারে শৈত্যদ্বারা ফল টাটকা রাখিবার (অর্থাৎ কোল্ড স্টোরেজেব) বন্দোবস্ত হইতেছে। বঙ্গেও অনেক ভাল ফল জন্মে এবং আরও বেশী জন্মিতে পারে। বঙ্গে কিন্তু এরূপ কোন ব্যবস্থা হইতেছে না।

বাংলা দেশ অল্প সব প্রদেশের চেয়ে অস্বাস্থ্যকর ও ক্ষয়িক্ণ। অতএব, এখানে অল্প সব প্রদেশের চেয়ে অধিবাসীদের চিকিৎসার উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত হওয়া উচিত—অস্তুতঃ অল্প যে-কোন প্রদেশের সমান ত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত ও আবশ্যিক। কিন্তু বঙ্গে তদ্রূপ কোন বন্দোবস্ত নাই। বোম্বাই গবয়েন্ট সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, যে, নির্ধারিত কয়েকটি গ্রামসমষ্টিতে প্রত্যেক তিন-চারটি গ্রামের জন্য এক-এক জন পাস-কবা ডাক্তার থাকিবেন এবং গবয়েন্ট তাঁহাকে মাসিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা ভাতা দিবেন। ডাক্তার সপ্তাহের এক-একটি নির্দিষ্ট দিনে এক-একটি গ্রামে যাইবেন। তা ছাড়া তিনি দর্শনী লইয়া রোগী দেখিতেও পারিবেন। তাঁহার আয় বেশী না হইলেও এইরূপ আয়েও পাস-করা অনেক ডাক্তার কাজ করিতে বাজী হইবেন। বাংলা দেশের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যিক। এখানেও পূর্ববর্ণিত আয়ে কাজ করিবার ডাক্তার পাওয়া যাইবে। মেডিক্যাল কলেজের পাস-কবা

কোন ডাক্তারই বেকার বা প্রায়-বেকার নহেন, বলা যায় না। মেডিক্যাল স্কুলগুলি হইতে পাস-করা ডাক্তারদের মধ্যে বেকার বা প্রায়-বেকার লোক হয়ত আরও বেশী আছেন। অথচ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে—এমন কি অনেক শহরেও—বিনা চিকিৎসায় কত লোকের যে মৃত্যু হয়, তাহাব গণনা হয় নাই। অবশ্য, খুব ভাল চিকিৎসকের চিকিৎসা সত্ত্বেও অনেক রোগী মরে বটে। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, চিকিৎসা হয় না বলিয়া এমন অনেক রোগী এখন মারা পড়ে, চিকিৎসা হইলে বাহারা বাঁচিত। ভদ্রভাবে জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট ন্যূনতম একটা আয়ের আশা পাইলে অনেক ডাক্তার পল্লী-গ্রামে যাইতে রাজী হইবেন। বাহারা ভবিষ্যতে আয়ের আশা এখন শহরেই বসিয়া আছেন।

আমরা এই প্রসঙ্গে কেবল এলোপ্যাথীর ডাক্তারদের কথাই বলিলাম, কেন-না সবকারী সাহায্য কেবল এলোপ্যাথী মতেব চিকিৎসকদিগকেই এখন দিবার সম্ভাবনা আছে।

সরকার কিছু না-করিলেও সমবায়-সম্ম দ্বারা এক-একটি গ্রামসমষ্টির চিকিৎসাব ব্যবস্থা হইতে পারে, ইউনিয়ন বোর্ড-গুলিব দ্বারাও হইতে পারে। ধনী জমিদার ও ব্যবসাদারেরাও ইহা করিতে পাবেন—কেহ কেহ হয়ত করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মত অনুসারে সুশিক্ষিত কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও নিযুক্ত করিতে পারেন।

“বর্নাকুলার” মানে কি দাস-ভাষা?

সেদিন ভাবতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় মাদ্রাজের মিঃ সত্যমুর্তি এবং আরও কোন কোন সদস্য এই প্রশ্ন করিলেন, ও তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্কও করিলেন, যে, যেহেতু “বর্নাকুলার” (Vernacular) মানে দাসদের ভাষা, অতএব গবয়েন্ট ভারতবর্ষীয় নানা ভাষা বুঝাইতে ডাকঘরের গাইড ও অন্যান্য বহিতে ও শিক্ষা-বিভাগের রিপোর্ট আদিতে ঐ শব্দ কেন ব্যবহার করেন ও কেন উহার ব্যবহার রহিত করিবেন না। ঐ তর্কবিতর্ক মৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহার রিপোর্ট এখানে দেওয়া অনাবশ্যক।

আশ্চর্য্যের বিষয়, সরকারী ইংরেজ বা ভারতীয় সদস্য কেহই এ কথা বলিলেন না, যে, “বর্নাকুলার” শব্দটি দাস-

ভাষা অর্থে ইংরেজীতে ব্যবহৃত হয় না। ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নহে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হওয়ায় আমাদের এই সন্দেহ হইল, যে, আমরা ইহার প্রকৃত অর্থ এত দিন জানিতাম না, ও সেই জন্য দেশী ভাষা অর্থে ইহা অগণিত বার ব্যবহার করিয়াছি। তাই অভিধান দেখিতে হইল।

সকলের চেয়ে নূতন প্রামাণিক বড় ইংরেজী অভিধান—
অন্ততঃ অত্যন্ত নূতনতম প্রামাণিক বড় ইংরেজী অভিধান—
১৯৩৪ সালে প্রকাশিত “Webster’s New International Dictionary, Second Edition”। ইহাতে Vernacular শব্দটি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

Vernacular, adj. [L. vernaculus born in one’s house, native, fr. *verna* a slave born in his master’s house, a native, of uncert. origin.] 1. Belonging to, developed in, and spoken or used by, the people of a particular place, region, or country; native; indigenous;—now almost solely of language; as, English is our vernacular tongue; hence, of or pertaining to the native or indigenous speech of a place; written in the native, as opposed to the literary language; as, the vernacular literature, poetry; vernacular expression, words, or forms.

Which in our vernacular idiom may be thus interpreted. *Pope*.

2. Characteristic of a locality; local; as, a house of vernacular construction. “A vernacular disease.” *Harvey*.

3. Of persons, that use the native, as contrasted with the literary, language of a place; as, vernacular poets; vernacular interpreters.

Vernacular, n. The vernacular language, esp. as a spoken language; one’s mother tongue; often the common mode of expression in a particular locality or, by extension, in a particular trade, etc.

ওয়েবস্টার শব্দটির ইংরেজী যে-কয়টি অর্থ দেওয়া হইয়াছে ‘দাস-ভাষা’ তাহার একটিও নহে। বরং অর্থ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, “as, English is our Vernacular tongue,” “যেমন, ইংরেজী আমাদের বর্ণাকুলার ভাষা।” আমেরিকান বা ইংরেজের দাস নহে। শব্দটির অর্থ দাস-ভাষা হইলে আমেরিকান বা ইংরেজ কোন কোষকার এরূপ দৃষ্টান্ত দিউন না।

শব্দটির সঙ্গে দাসের সম্পর্ক কেবলমাত্র এইটুকু যে, উহার ব্যুৎপত্তি স্থলে বলা হইয়াছে, যে, উহা বেনা (Verna) হইতে উৎপন্ন যাহার মানে ‘নিজ প্রভুর গৃহে জাত দাস,’ ‘নেটিভ,’ কিন্তু তাহার পরেই বলা হইয়াছে, ইহার উৎপত্তি অনিশ্চিত।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি যাহাই হউক, প্রলিত অর্থ কি তাহাই দেখিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত অল্পকণ্ড অভিধানও দেখিলাম, শব্দটিব দাস-ভাষা অর্থ পাইলাম না। ব্রিটিশান শব্দটি প্রথমতঃ অবজ্ঞাসূচক ছিল, কোয়েকার শব্দটি বিদ্রোহসূচক ছিল। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে এখন অজ্ঞা ও বিদ্রোহের ভাব জড়িত নাই। বইবেলের ল্যাটিন অনুবাদকে ইংরেজীতে ‘ভলগেট’ (Vulgate) বলে। এই কথাটি এবং ‘নীচ’ ‘অভদ্র’ যাহাব মানে সেই ‘ভলগার’ (Vulgar) কথাটির উৎপত্তি একই ল্যাটিন কথা হইতে। কিন্তু সে কারণে কেহ ভলগেট শব্দের অব্যবহার ইচ্ছা করে না।

একটা ইংরেজী কথার মানে লইয়া এত কথা লিখিবার কারণ এই, যে, বাংলা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুলকারী শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতিতে উহার ব্যবহার রহিত করিবার চেষ্টা হইতে পারে—মিঃ সত্যমুর্তি বলিয়াছেন রাষ্ট্রাঙ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার ব্যবহার রহিত হইয়াছে। বঙ্গেও রহিত হইলেই যে কোন ক্ষতি আছে তাহা বলিতেছি না। কিন্তু একটা কথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া নম্র ও শক্তির অপব্যয় কবিবার সার্থকতা দেখিতেছি না। মাতৃভাষা বুঝাইতে একটা কথা চলিত আছে। থাক্ না!

পি ই এন্ অস্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাতাহাতির উপক্রম

আমাদের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, পি ই এন। P. E. N.) লেখকদের সভ্যগণ্যাপী একটি ক্লাব। Poets and Playwrights (কবি ও নাট্যকার), (Editors and Essayists (পত্রিকাসম্পাদক ও প্রবন্ধলেখক), এবং Novelists (উপন্যাসিক)—এই সকলের আদ্য অক্ষর লইয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহার শাখা ও প্রশাখা আছে। তাহার বৃত্তান্ত দিয়া লিখিয়াছিলাম “এই ক্লাবের উদ্দেশ্য সকল দেশের লেখকদের মধ্যে ও মৈত্রী স্থাপন। তাহার দ্বারা সকল দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও মৈত্রী স্থাপনের সহায়তা হইতে পারে।” তাহা যে-সব কারণে হইতে পারিতেছে না, তাহার উল্লেখ করিয়া সংবাদ দিয়াছিলাম, যে, এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় দক্ষিণ-আমেরিকার আর্জেণ্টাইন সাধারণতন্ত্রের রাজধানী

বোয়েনোস আইরাস নগরে এই ক্লাবেব অন্তর্জাতিক কংগ্রেস হইবে। তাহাতে যোগ দিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া ও অধ্যাপক কালিদাস নাগ গিয়াছেন। শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া আগেই গিয়াছিলেন। অধ্যাপক নাগ পরে একটি জাপানী জাহাজে কোলোম্বো হইতে যান। তাহাতে তাঁহার দু-জন জাপানী সহযাত্রীও ঐ কংগ্রেসে যাইতেছিলেন। এশিয়ার এই তিন জন প্রতিনিধির ছবি দিয়া ব্রাজিলের রাজধানী রীও-ডে-জানিরোব “স্রোব” নামক কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছে। ঐ দেশের ভাষা স্পেনিশ। তাহা জানি না। নামগুলি হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখিত বলিয়া অনুমান করিয়া কয়েকটি বাক্য তুলিয়া দিতেছি।

O representante dos intelectuaes da India ao Congresso dos P. E. N. Clubs é o Sr. Kalidas Nag, professor de Historia Universal da Universidade de Oalcuttá e secretario do P. E. N. Club do seu país. E' tambem, jornalista, director do "India and World", que se edita em Oalcuttá.

E' amigo particular de Tagore, cuja obra estudou e analysou, surgindo dahi um livro, que tem o nome do grande poeta, o maior da India.

O Sr. Nag, que se dedica mais á poesia que á prosa faz nessa obra estudo completo e magnifico da personalidade de Tagore.

Elle proprio considera esta obra o seu mais perfeito trabalho.

Como acima dissémos, o Sr. Kalidas Nag é o secretario do P. E. N. Club de Oalcuttá e seu representante no congresso a realizar-se na capital argentina.

Do P. E. N. Club de Oalcuttá e presidente o poeta Tagore.

এই কংগ্রেসটিতে সাহিত্যিক নানা বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা। কিন্তু আভকাল ‘সন্ধ্যা’ জগতে রাষ্ট্রনীতির প্রাদুর্ভাব এত বেশী এবং ইউরোপের অন্ততঃ কয়েকটি জাতির মন সেই কারণে এমন অশান্ত ও উত্তেজিত হইয়া আছে, যে, আমরা এদেশে থাকিয়াও খবরের কাগজে দেখিয়াছি, বোয়েনোস আইরাসের এই লেখক-কংগ্রেসেও হাতাহাতির উপক্রম হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত হইটালী ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের মধ্যে। এ-বিষয়ে আমরা বোয়েনোস আইরাস হইতে প্রাপ্ত একটি ব্যক্তিগত চিঠি হইতে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

• “এই কংগ্রেস মসীজীবীদের আড্ডা। এসে দেখি, মসীযুদ্ধও ক্রমশঃ গড়িয়ে আসিযুদ্ধে পরিণত হবার জোগাড়।

কারণ ইতালী ও ফ্রান্সের মধ্যে রাজনৈতিক গোল এত পাকিয়েছে, যে, সেটা এই সাহিত্যের আখড়ারও বিশেষ আশঙ্কার কারণ হয়েছে। ইতালীর প্রতিনিধি ও ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক Jules Romains-র মধ্যে এমন ব্যাপার হ’ল, যে, তার পূর্ব দুই দলের গুপ্তার গুপ্তগোল শেষ duel লড়ায়ে (ধেবথ যুদ্ধে) না দাঁড়ায়। সকলের মাথা বোঝাই হয়ে আছে পলিটিক্স দিয়ে। আর্জেন্টাইনের লোকেরা সবাই মাথা ঠাণ্ডা বেখে অবশ্য তাঁদের কর্তব্য করে যাচ্ছেন ও আমাদের খুবই স্বস্তি করছেন।

স্বামী বিজয়ানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্র গড়েছেন, তার কর্মীরা (এদেশীয় অবশ্য) চমৎকার খাটি মানুষ।

এখানে ভোব না হতেই টেলিফোন। কারণ হোটেলের ঘরের এক পাশে বাঁধা রেডিও আছে—সব প্রোগ্রাম শোনাচ্ছে। তার উপর কোন অল্প পাশে। চা খেয়েই কংগ্রেসে ছোটা। বারোটা একটায় ফিরে মধ্যাহ্নভোজ এবং তার মধ্যেই যত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। সন্ধ্যা ছটায় আবার কংগ্রেসেব অধিবেশন ও রাত নটায় ফিরে যাওয়া ও আবার লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আদি। এর মধ্যে দু-বার বক্তৃতা দিতে হয়েছে, কাল রবিবার এখানকার ব্রডকাস্টিং স্টেশন আমায় বিশেষ বক্তৃতা দেওয়াচ্ছে। বহু সহস্র লোক, যাবা কোন কালে এই কংগ্রেসে ঢুকবে না ও ভারতে আসতে পাবে না, তাদের অতীত ও বর্তমান বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বলব এবং কবি রবীন্দ্রনাথ এবং অল্প লেখক ও লেখিকাদের প্রশংসা করব। ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসে বক্তৃতা দেব। সেখানেও বাংলা-সাহিত্যের নাম প্রচার হবে। ১৫ই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ আছে। ভাবতবর্ষের আর্ট ও প্রাকৃতিক সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে। ইংরেজীতে ও স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদেব ব্যবস্থা হয়েছে। ১৬ই এখানে শেষ দিন বোটারী ক্লাবে নিমন্ত্রণ কবেছে। সেখানেও কিছু বলতে হবে।”

ভাবতবর্ষের বর্তমান অবস্থা যাহাই হউক, ভারতবর্ষকে অসভ্য বলিয়া মনে কবিরা, মনে করিবার ভান করিয়া ও সেই বর্ণনা কবিরা যে-সব লোকের লাভ হয় বা হইতে পারে, তাহারা ভিন্ন অল্প সব বিদেশীর মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সন্মমের ভাব আছে এবং তাহাব গৌরব সম্বন্ধে কৌতুহল

আছে। সেই জন্তু ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে, বোয়েনোস আইরাসের খবরের কাগজগুলি অল্প সব দেশ ও দেশের প্রতিনিধিদের চেয়ে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশী কথা লিখিয়াছে। শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াভিয়া ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, মহিলা, বিদেশীদের কাছে যাহা হিন্দুয়ানী তাহাতে নিপুণ, শাড়ী পরেন, এবং কপালে লাল টিপ পরেন। সুতরাং যেমন সিনেমা 'তারকা' (Film Star)-দিগকে জনতা ঘিরিয়া বেড়ায় ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়, শ্রীমতী ওয়াভিয়াকেও সেইরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। স্থানীয় নেশন ("La Nacion") নামক একখানি কাগজ ত তাঁহার কপালের টিপটিকে 'অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক' (a symbol of inner vision) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে! তিনি বক্তৃতাও কয়েকটি করিয়াছেন—ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ ও স্পেনিশে।

বঙ্কের প্রতিনিধিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক বক্তৃতা ও স্থানীয় বামমুখ্য শতবার্ষিকীতে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বক্তৃতার পর স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইল—"India easily leading", "ভারতবর্ষ সহজেই সবার আগে চলেছে"। প্রবাসীর সম্পাদক ভারতীয় পি ই এনের অগ্রতম সহকারী সম্পাদিত রূপে নিজের যে বক্তব্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহা স্থানীয় কাগজ-গুলিতে স্পেনিশ ভাষায় অনূবাদিত হইয়া বাহির হইবে।

আগেই লিখিয়াছি, এই অন্তর্জাতিক কংগ্রেসে হাত-হাতির উপক্রম হইয়াছিল। তাহা সন্দেহও ইহা সমুদয় গবর্ণর-ও জাতিকে সন্মোদন করিয়া একটি অহরোধপত্র সকল প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধের নিন্দা ও কুফল বর্ণনা করা হইয়াছে, গত মহাযুদ্ধের দ্বারা কোন জাগতিক সমস্তার সমাধান হয় নাই বলা হইয়াছে, "ধর্ম"-সম্বন্ধীয় যুদ্ধের বিভীষিকা বর্ণিত হইয়াছে, এবং সকলকে সর্ব-প্রযত্নে যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্ররোচনার বিমোখিতা করিতে অহরোধ করা হইয়াছে। এই কংগ্রেসে সমবেত লেখকেরা নিজে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল মানুষের পৈত্রিক সম্পদ রূপ সভ্যতাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন।

গান্ধী জয়ন্তী

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের আরও এক বৎসর পূর্ণ হইল। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া তাঁহার জীবনের মহাব্রত পালন করিতে থাকুন।

তাঁহার সকল মতের ও সকল কাজের সমর্থন সকলে করেন না,—আমরাও করি না। কিন্তু কাহারও সঙ্গে মতের না মিলিলেই অকপটে তাঁহার প্রশংসা করা যায় না, বরং নিন্দা করাই উচিত বা স্বাভাবিক, ইহা আমরা মানি না। সকল মানুষের মত এক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। বাস্তবিক বলিতে গেলে সকলের সব মত এক হওয়া উচিত নয়, স্বাভাবিক নয়। জ্ঞান অপরিমীম, সত্য অপরিমীম। সব জ্ঞান কেহ আয়ত্ত করিতে পারে ন, সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি কেহ বরিতে পারে না। সকলেরই জ্ঞান, সকলেরই সত্যোপলব্ধি অগাধিক অসম্পূর্ণ। এই জন্তু কেহ যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সত্য যতটুকু উপলব্ধি করিয়াছেন, অন্তরের লব্ধ জ্ঞান ও অন্তরের উপলব্ধ সত্যের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিতে পারে।

মতের মিল থাক বা না থাক, মানুষের উদ্দেশ্য কি, চেষ্টা কিরূপ, নিষ্ঠা কেমন, চরিত্র কিরূপ, বিবেচনা করা আবশ্যিক

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মহাত্মা গান্ধী যে ভারতবর্ষে আমাদের জাতিতে জয়গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গৌরবের বিষয় বলিয়া অস্বত্ব হইবে।

তিনি আয়ৌবন সত্যের অলঙ্কারে ও আচরণে এবং নিজের ও অন্য মানুষের হিতকর পরিভ্রম জীবন যাপনে ব্যাপ্ত আছেন। মধ্যে মধ্যে ভুল—খুব বড় ভুল—তিনি করিয়াছেন; কিন্তু ভুল স্বীকারও করিয়াছেন। এরূপ অকপটে ভ্রমস্বীকার কয় জন মানুষের করে?

পবিত্র সংসদ জীবন লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি যে সাধনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় নিজের যে-সব দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া এরূপ ভ্রান্ত ধারণা হওয়া উচিত নহে, যে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। বিবাহিত জীবনে সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ ও ধারণা যাহা, তদনুসারে তিনি তাঁহার জীবনের প্রথম অংশের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। সেই রূপ আদর্শ অনুসারে নিজ নিজ জীবনের বিচার ও সমালোচনা অন্তরে করেন না বলিয়া এবং তিনি

করিয়াছেন বলিয়া, তিনি কোন বয়সেই উচ্ছ্বল ছিলেন এমন মনে করা উচিত নয়—মনে করিলে ভুল হইবে এবং তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

এরূপ ভুল যে কেহ করেন না, এমন নয়। এইরূপ ভুল করিয়া এক যুবক তাঁহাকে চিঠি লেখায় তিনি তাহার চিঠি হইতে “হরিজন” কাগজে আবশ্যক অংশ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্র ভাবে উত্তর দিয়ছেন :—

“Whatever over-indulgence there was with me, it was strictly restricted to my wife.....I awoke to the folly of indulgence for the sake of it even when I was twenty-three years old, and decided upon total *Brachmacharya* in 1899, i. e., when I was thirty years old.”

অধিকাংশ লোক রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়াই মহাত্মা গান্ধীর জীবন আলোচনা বা তাহাতে দৃষ্টিনিষ্কষণ করেন। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি নূতন কি করিয়াছেন? কংগ্রেসের উপর তাঁহার প্রভাব এবং দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর তাঁহার প্রভাব সর্বাভিভাবী হইবার পূর্বে, কোন কোন মননশীল ভারতীয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের উপায় সম্বন্ধে যেসকল মতই গোষণ করিয়া থাকুন, ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক কর্মীদের ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মত এই ছিল, যে, ইংরাজদের জায়বুদ্ধি জাগাইয়া তুলিতে পারিলে ও তাহাদের দয়া হইলে তাহারা ভারতবর্ষকে কিছু পৌর ও রাষ্ট্রীয় অধিকার দিবে। আরও একটা মত ছিল। তাহা কিন্তু ছাপায় অসকোচে প্রকাশ পাইত না। তাহা এই, যে, যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইবে। গান্ধীজি এই উভয় মতের কোনটাই সমর্থন না করিয়া বলিলেন, স্বাবলম্বন দ্বারা, আত্মনির্ভর দ্বারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে হইবে, কিন্তু তাহা সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা নহে—আত্মিক শক্তির (soul force) প্রয়োগ দ্বারা, অহিংস অসহযোগ ও প্রতিরোধ দ্বারা, অপবকে আঘাত না—করিয়া নিজেই সর্ববিধ দুঃখ বরণ ও সহ্য করিয়া অখচ অস্ত্রায় আদেশের পদানত না হইয়া, স্বরাজলাভ করিতে হইবে। এই নীতি জয়যুক্ত হয় নাই, সত্য কথা। কিন্তু ইহার প্রচারে ভারতবর্ষের অগণিত লোকের মনে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছে—আশার উল্লেখ হইয়াছে, ভয় ভাঙিয়াছে, সাহসের আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক

পুরুষ ও নারী যে স্বয়ং অহিংস থাকিয়া সকল দুঃখ—মৃত্যু পর্যন্ত—সহ্য করিতে প্রস্তুত, তাহা আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছে।

অগণিত লোকের এই মানসিক পরিবর্তন মহাত্মা গান্ধীর কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়।

এ পর্যন্ত যত পরাধীন জাতি স্বাধীন হইয়াছে, তাহারা যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইয়াছে, ইহা মোটের উপর সত্য। স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ, এই মত সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, যুদ্ধ যে উদ্দেশ্যেই করা হউক, তাহাতে হিংসা নিষ্ঠুরতা চল কপটতা আছে ও থাকিবে; হতব্যাং মানবপ্রেমের সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই, তাহা সর্বোচ্চ ধর্ম্য নহে, নীতিসঙ্গত নহে। এই জন্য নানা দেশে নানা মননশীল ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের এমন একটি উপায় অনুসন্ধান করিয়াছেন যাহা ধর্ম্যনীতিসঙ্গত এবং যাহা যুদ্ধের পরিবর্তে অবলম্বিত হইলে ফলপ্রসূ হইবে। আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়ম জেমস ইহাকে “মর্যাল সব্‌টিটিউট ফর ওয়ার” বলিয়াছেন। গান্ধীজি এবং তাঁহার মতাবলম্বীরা মনে করেন, অহিংস এবং, আবশ্যক হইলে, মরণশস্ত্র, প্রতিরোধ সেই উপায় উচ্চতম নৈতিক ও ধার্মিক আদর্শের সহিত যাহার সামঞ্জস্য আছে এবং যাহা ফলপ্রসূ। গান্ধীজি ও তাঁহার সহকর্মীরা প্রথম চেষ্টায় অভীক্ষিত ফল পান নাই বটে; কিন্তু উপায়টির যে ধর্মের ও মানবপ্রেমের সহিত বিরোধ নাই, তাহা স্বীকার্য।

বলা বাহুল্য, যে, মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর সর্বত্র স্বায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা চান। এ বিষয়ে তিনি জগতের অল্প শান্তিকামীদের সহচর ও সমকক্ষ।

গান্ধীজি ভারতবর্ষে পূর্ণস্বরাজ চান। পূর্ণস্বরাজের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও পূর্ণস্বরাজের রূপ নির্দেশ তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক আকাঙ্ক্ষা উদ্দেশ্যের পূর্বেও বন্ধে হইয়াছিল। জীৱনবিদ্য যোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ পূর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা লাভের জন্য গান্ধীজি যেসকল উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, বঙ্গীয় নেতারা সেসকল উপায় নির্দেশ করেন নাই।

অহিংস ভাবে আইনলঙ্ঘন করিতে হইবে, গান্ধীজির

এই মতের সহিত আরও কতকগুলি মতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যেমন, সরকারী আদালতের সাহায্য না লওয়া, সবকারী চাকুরি না-করা, সরকারী আইন অমুসারে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি যেন-নব কাজ কবে সেই সব কাজ নিজেরাই করা, সরকারী বা সরকারের অল্পমোদিত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষার পরিবর্তে নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে যাহা ‘গঠনমূলক’ (constructive) তাহা রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীব অসহযোগ আন্দোলনের আগে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। কেবল শিক্ষার দিকে রবীন্দ্রনাথ ত এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেনই (এবং তাহা আংশিক ভাবে এখনও চলিতেছে), অন্যেরাও যত্ন করিয়াছিলেন। তাহাব ফলে এখন যাদবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চলিতেছে।

“কারাবরণ করিতে হয় করিব, দেহ শৃঙ্খলিত হয় হইবে, কিন্তু অন্যায় সহ্য করিব না, অথচ অহিংস থাকিব, আঘাতের বিনিময়ে আঘাত করিব না,” এইরূপ আদর্শ রবীন্দ্রনাথের স্ট্রট ধনঞ্জয় বৈবাগীর চরিত্রে অনেক দিন হইতে রহিয়াছে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Everything is fair in love and war; অর্থাৎ প্রণয়ের ব্যাপারে ও যুদ্ধে উদ্দেশ্যসিদ্ধি জন্য সব কিছু করা চলে, কিছুই “অবৈধ নহে। তেমনই আরও একটা এইরূপ ভ্রান্ত মত পৃথিবীর সব দেশের প্রায় সব রাজনৈতিকদের মধ্যে চলিত আছে, যে, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ, মিথ্যাসূচন, ছল চাতুরী, প্রতিজ্ঞাত্যজ, বিশ্বাসঘাতকতা—কার্য্যসিদ্ধির জন্য এ সবই করা চলে। “শঠে শাঠ্যম্ সমাচরেৎ” উক্তি এইরূপ মত হইতে উদ্ভূত। গান্ধীজি বলিলেন, বলিয়াছেন, বলেন,—না, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেও সত্যের অমুসরণ করিতে হইবে, ধর্ম্মনীতির (ethicsএর) উচ্চতম আদর্শ রক্ষা করিতে হইবে, অবপট হইতে হইবে, হিংসাঘেযের পরিবর্তে মানবপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, লোভ ত্যাগ করিতে হইবে।

তিনি রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মাঙ্গুত কবিতো চাহিয়াছেন। ধর্ম্ম শব্দটি সচরাচর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়েব অল্পাধিক্যের ও মতসমূহের সমষ্টি বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। তিনি সে অর্থে রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম্মাঙ্গুত করিতে চান নাই। ধর্ম্মের

সাববস্ত যে আধ্যাত্মিকতা, সত্যিকতা ও স্নানীতি, রাষ্ট্রনীতিকে তাহারই অঙ্গুত করিতে চাহিয়াছেন।

গান্ধীজীব আন্দোলনেব পরোক্ষ প্রভাবে, নাবীদের অবরোধ যে-যে প্রদেশে ছিল ও আছে, সেখানে উহা শিথিল হইয়াছে।

সামাজিক বিষয়ে তিনি বাণ্যবিবাহবিরোধী, অসবর্ণ বিবাহের অবিরোধী ও আবশ্যক বত তাহার সমর্থক, এবং বিধবা-বিবাহেবও সমর্থক।

অস্পৃশ্যতায বিশ্বাস থাকিলে ও তদনুযায়ী আচরণ থাকিলে হিন্দু ও হিন্দু সমাজ টিকিবে না, তাহার এই বিশ্বাস ও উক্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন, কিন্তু প্রচলিত আকারের জাতিভেদ মানেন না। বর্ণাশ্রম ত এখন নাই, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার আশাও নাই। হতরাং গান্ধীজীব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বিশ্বাস ও জাতিভেদে অবিশ্বাস—এই উভয়েব মধ্যে যুদ্ধ প্রভেদ, থাকিলে, বুদ্ধিবার চেষ্টা না করিলেও চলে। ব্রাহ্মসমাজ অনেক আগে হইতে জাতিভেদে, হতরাং অস্পৃশ্যতা, অবিশ্বাসী।

চরখা ও খাদি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী যাহা বলেন, তাহা সকল দেশের ও কালের জন্য অস্বাক্ষর না হইলেও, ভাবত-বর্ষের গ্রাম অঞ্চলে তাহাব খুব প্রয়োজন ও কলোপধায়কতা আছে। ইহা অনেকের ঘরে বসিয়া উপার্জনের পথ খুলিয়া দিয়াছে। খন্দের ব্যবহারে মাহুনের চালচলন সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর হয়। ইহা ধনী ও নিধনকে বাহ্যতঃ সমশ্রেণীস্থ করে। ধনী মহিলারা ইহা ব্যবহার করিলে দরিদ্র মহিলাদিগকে পূজাপার্কণে উৎসবে বিবাহ-সভায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতে হয় না। ইংরেজী শিক্ষাব প্রচলনে এবং নানা বিজাতীয় পরিচ্ছদ ও বিলাসপ্রবোর প্রাচুর্য্যাবে আমাদের দেশে একটা নূতন রকম জাতিভেদ আসিয়াছে ও তাহা ভারতীয় মহাজাতিগঠনের একটা প্রধান বাধা। আগেকার মহাপণ্ডিত সংস্কৃতের অধ্যাপক ও নিরক্ষর চাষা যতটা স্বভাবের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধে মিশিতে পারিতেন, এখনকার ইংরেজী-জানা হালকা-শনের পরিচ্ছদ পরিহিত মাহুয তেমন করিয়া তাঁহাদের নিরক্ষর বা বাংলানবীস স্বদেশ-বাসীদের সহিত মিশিতে পারেন না। স্বভাবতঃ পরিচ্ছদে সব শ্রেণীর লোক এক রকম হইলে শেবোক্ত ব্যক্তিদের

প্রথুমোক্ত ব্যক্তিদেব সহিত মিশিতে ভয় সঙ্কোচ কিছু দূর হইতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী “পাড়াগেঁয়ে” হইয়াছেন ও অন্ত সকলকে “পাড়াগেঁয়ে” করিতে চান। কিন্তু তাহা ভাল অর্থে—জীবনের অনাড়ম্বরতা, সবলতা, সরসতা, হৃদয়তা, পরস্পরের প্রতি প্রতিবেশীভাব তিনি রাখিতে চান। দূর করিতে চান গ্রামের অপরিচ্ছন্নতা, নোংবামি, জলস্রলবাতান কলুষিত কবিবাব অভ্যাস, চাষের সময় ছাড়া অন্ত সময়ে লোকদের বেকাব অবস্থা ও আলস্ত, উপার্জনের নানা উপায়ের অভাবে দারিদ্র্য, এবং অজ্ঞতা।

ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই, যে, সকলেই নিজের নিজের ধর্মে থাকুন ও তাহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ অনুসারে চলুন। কোন ধর্মের লোকদের ধর্মাস্তর গ্রহণ করা বা কোন ধর্মে লোককে ধর্মাস্তর গ্রহণ করান তিনি পছন্দ করেন না। তিনি হিন্দু। মৃষ্টিপূজা বিগ্রহপূজা আদিকে তিনি প্রতীক-পূজা মনে করেন। কিন্তু ইহাকে যে তিনি হিন্দু ধর্মে শ্রেষ্ঠ কপ মনে করেন না, তাহাব প্রমাণ এই যে, তিনি বলিয়াছেন, তিনি মৃষ্টিপূজা করেন না এবং দেবমন্দিরে কোন বিগ্রহ দেখিলে তাঁহার ভক্তি হয় না। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বর্তমান বৎসরের ৩৮ অক্টোবর তারিখে “হরিজন” কাগজে লিখিয়াছেন :—

“Hinduism is ever evolving. It has no one scripture like the Quran or the Bible. Its scriptures are also evolving and suffering additions.”

তাৎপর্য। হিন্দু ধর্ম চিরবিবর্তনশীল, বরাবর ইহার ক্রমবিকাশ হইতেছে। কোরান বা বাইবেলের মত ইহার কোন একটি মাত্র শাস্ত্র নাই। ইহাব শাস্ত্রগুলির বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ হইতেছে এবং তাহাতে নূতন জিনিষ সংযুক্ত হইতেছে।

১. অধ্যাপক শশীভূষণ দত্ত

গত মাসে ৮৬ বৎসর বয়সে শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এত বৎসর পূর্বে অধ্যাপকের কাজ হইতে অবসর লইয়াছিলেন, যে, তাঁহার যে-সব ছাত্র জীবিত আছেন, তাঁহারাও বৃদ্ধ এবং অনেকে তাঁহাব পূর্বেই পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সাত্তিশ মেরাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাস করেন। তাঁহার পূর্বে তাঁহার মত বেশী নম্বব কোন ছাত্র পান নাই। কথিত আছে, এই

পরীক্ষায় তাঁহার উত্তরগুলি একপ নিভুল ও যথাযথ হইয়াছিল, যে, পরীক্ষক-বোর্ড দীর্ঘকাল তাহা আদর্শ উত্তর রূপে বক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। যদিও দর্শনে তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তথাপি অন্ত নানা বিজ্ঞাত্তেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। সেই জন্য তিনি ভিন্ন ভিন্ন কলেজে দর্শন, ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সংস্কৃত এবং গণিতেরও অধ্যাপকতা কৃতিত্বের সহিত কবিয়াছিলেন। তিনি কিছু কাল একটি ডিবিজনেব স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন। অনেক বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া তিনি পেন্সান গ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রেরা যেমন তাঁহাব বিজ্ঞাবস্তাব গুণে জ্ঞানলাভ করিত, তেমনি তাঁহার মত সাধু ব্যক্তিব সম্পর্শে আসিয়া উন্নত জীবন লাভে সমর্থ হইত। অবসর সময়ে তিনি আয়ুর্বেদ, এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা প্রণালীর অনুশীলন করিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। লোক-হিতসাধন তাঁহাব প্রিয় কার্য ছিল। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত আধোবন-যুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর তাহাব সভাপতি ছিলেন। তিনি গবর্নমেন্টের কর্মচারী ছিলেন, স্বতরাং কখনও কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দেন নাই। কিন্তু আমরা জানি, তিনি দেশের পরাবীনতা অনুভব করিয়া বিশেষ বেদনা বোধ করিতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভক্তিবাজন আমেরিকান ভাবতবন্ধু আচার্য সাণ্ডল্যাণ্ডের বাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধগুলি তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন ও তাঁহার মতের অনুমোদন করিতেন। তিনি অনাড়ম্বর, মিষ্টভাবী, অল্পভাবী ও নম্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের ভারত প্রত্যাবর্তন

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ হুড়ি বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে গোপনে আমেরিকা চলিয়া যান। গোপনে যাইবাব কাবণ, গবর্নমেন্ট সর্কসাধাবণের অজ্ঞাত কোন কাবণে তাঁহাকে অন্তরায়িত কবিত্তে (ইণ্টার্ন করিত্তে) চাহিয়াছিলেন।

এত দিন তিনি দেশে ফিরিতে পারেন নাই, কেননা ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে আসিবার অনুমতি দেন নাই। এখন অনুমতি পাইয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের মাঝা-

মাঝি তিনি দেশে পৌঁছিবেন। আমেরিকায় থাকিতে তিনি ভারতবর্ষীয় জাতীয় কংগ্রেসের আমেরিকান শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৬শে তারিখে আমেরিকার সহিত ভারতবর্ষের রেডিওতে কথোপকথনের যখন প্রথম ব্যবস্থা হয়, তখন তাঁহার উদ্যোগে আমেরিকার



শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোক এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তাঁহাদের শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনিও রেডিওযোগে কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর, তাঁহার এবং শ্রীযুক্ত রামলাল বাজপাইয়ের ফোটোগ্রাফও আসিয়াছিল।

শৈলেন্দ্র বাবুর নিবাস যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী গ্রাডুয়েট। তিনি বি-এসসি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং ১৯১৫ সালে এম-এসসিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গবেষক ছাত্র রূপে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। অতঃপর তারকনাথ পালিত বৃত্তি পাইয়া তিনি উচ্চতর

শিক্ষালাভার্থ আমেরিকা যাইবার আয়োজন করেন। কিন্তু গবন্মেণ্ট তখন তাঁহার পাসপোর্ট (বিদেশ যাইবার অল্পমতি-পত্র) কাড়িয়া লন এবং তাঁহাকে বন্দী করিবার হুকুম হয়। এখন তাঁহার বয়স ৪৪। তাঁহাকে গবন্মেণ্ট যে-সর্ব্বৈ ও যে-প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশে আসিতে অল্পমতি দিয়াছেন, তাহা কৌতুক্যবহ। সরকার বলিয়াছেন, তাঁহার অতীত কার্যকলাপের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে তত দিন কোন মোকদ্দমা হইবে না যত দিন তিনি আইনানুগ ভাবে চলিবেন এবং গবন্মেণ্ট-বিপর্য্যাসক কোন প্রচেষ্টায় আবার গিয়া না-পড়িবেন। তিনি যে আগে এরূপ কোন প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত ছিলেন, সর্ব্বসাধারণ তাহা অবগত নহে, এবং তাঁহাকে কিংবা অন্য কাহাকেও গবন্মেণ্ট বিনা বিচারে ও বিনা প্রকাশ্য অভিযোগে বন্দী করিয়া রাখিতে সমর্থ।

দক্ষিণ-আফ্রিকার সম্ভাবজ্ঞাপক প্রতিনিধিবর্গ

দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে মিঃ হফমেয়ার প্রমুখ একদল খেত প্রতিনিধি ভারতবর্ষের প্রতি সম্ভাব জানাইতে এদেশে



মিঃ হফমেয়ার

আসিয়াছেন। বোম্বাই হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় জায়গায় তাহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে। তাহারাও অনেক ভাল কথা বলিতেছেন। তাহাদের সরলতায় অবিশ্বাস করিতেছি না, এবং ইহাও জানি, যে, উচ্চপদস্থ কোন সরকারী কর্মচারীর সদিচ্ছা থাকিলেও স্বশাসক দেশের লোকমতের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করিতে পারেন না। তাহা হইলেও, দক্ষিণ-আফ্রিকার যে-সকল প্রতিনিধি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাহারা যদি এই দেশের লোকদিগকে ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া যান এবং স্বদেশে গিয়া তত্রত্য ভারতীয়দিগের প্রতি ন্যায্য জনমত ও জনমনোভাব উৎপাদনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহাদের এদেশে আসা ও এদেশের লোকদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা লাভ করা বৃথা হইবে না।

প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ

আরবেরা প্যালেস্টাইনের প্রধান অধিবাসী। কিছু ইহুদীও বরাবরই সেদেশে ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ইহুদীদের কিছু সাহায্য পাইয়া ও আরও অধিক সাহায্য পাইবার আশায় এবং প্যালেস্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার একটি প্রধান ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ গবর্নেন্ট ঐ দেশটিকে ইহুদীদের শাসনালয় হোম বা জাতীয় বাসভূমি বলিয়া ঘোষণা করেন। লীগ অব নেশ্যন্সে ব্রিটেনের প্রভাব খুব বেশী। লীগের নিকট হইতে ব্রিটেন প্যালেস্টাইনের ম্যাণ্ডেট পান অর্থাৎ তাহার অভিভাবক হন। তাহার পর হইতে প্যালেস্টাইনে দলে দলে ইহুদী আসিয়া বসবাস করিতেছে। তাহারা অবশ্য এখনও আরবদের চেয়ে সংখ্যায় খুব কম আছে। কিন্তু তাহাদের আগমন যদি অবাধে চলিতে থাকে, তাহা হইলে কালক্রমে তাহারা সংখ্যায় আরবদের সমান, এমন কি, তাহাদের চেয়ে অধিক হইতে পারে। ইহুদীদের শিক্ষা, উদ্যম, অর্থবল আরবদের চেয়ে বেশী। এই জন্ত আরবদের ভয় হইয়াছে, যে, দেশটা কালক্রমে আর প্রধানতঃ তাহাদেরই স্বদেশ না থাকিয়া প্রধানতঃ ইহুদীদেরই স্বদেশ হইয়া যাইতে পারে। তাহাদের অশান্ত ভাবের ও বিদ্রোহের ইহা একটা কারণ। এরূপ সংবাদও

পাওয়া যাইতেছে, যে, ইতালী আরবদিগকে উদ্ধারিত হইতেছে ও সাহায্য দিতেছে বা দিবার আশা দিয়াছে।

ইহুদীদের আগমনে দেশটির সম্পদ বাড়িয়াছে। আরবদেরও আর্থিক উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের একটা আপত্তি এই, যে, ইহুদীরা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন, এবং প্রাচ্যভাবাপন্ন প্যালেস্টাইনে পাশ্চাত্য ভাব আসিয়া একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাইতেছে। এরূপ বিপ্লব কোন দেশের লোকই চায় না। আমাদের ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্য সংস্পর্শে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটতেছে এবং আরও ঘটবে। কিন্তু এরূপ পরিবর্তন বা বিপ্লবের যে সবটাই মন্দ, তাহা নহে। প্যালেস্টাইনের আরবরা যদি স্বাধীন হইত এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে অল্প সব সভ্য দেশের সমকক্ষ হইতে চাহিত, তাহা হইলে স্বাধীন অবস্থাতেও তাহাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে কিছু কিছু লইতে হইত। স্বাধীন তুরস্ক, স্বাধীন আফগানিস্তান, স্বাধীন ইরান পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, এমন কি সামাজিক, অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। পোষাকে তো তুরস্ক ঠিক ইউরোপীয় দেশগুলির মত হইয়াছে। অতএব, ইহুদীরা প্যালেস্টাইনে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমদানী করিতেছে বলিয়া তথাকার আরবদিগের বিদ্রোহ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

প্যালেস্টাইনে আরবদের অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ আছে বলিয়াই যে সেখানে আগন্তুক ইহুদীরা বসবাস করিতে পাইবে না, ইহাও বুদ্ধিসঙ্গত নহে। কারণ, মুসলমান ধর্মের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্বে হইতে প্যালেস্টাইন ইহুদী ও খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র দেশ এবং সেখানে তাহাদেরও তীর্থ আছে।

ঐতিহাসিক যে-কারণ বা কারণসমষ্টিতেই হউক, ইহুদীরা বহু শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও তথায় বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের পক্ষে একটি “জাতীয় বাসভূমি” আকাঙ্ক্ষা করা অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। প্রাচীন কালে প্যালেস্টাইন তাহাই ছিল, এবং কিছু ইহুদী বরাবরই সেখানে বাস করিয়া আসিতেছে। সুতরাং প্যালেস্টাইনকেই তাহাদের “জাতীয় বাসভূমি” করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। জার্মেনী ও অল্প

কোন কোন দেশে ইহুদীরা উৎপীড়িত হইতেছে ও সাধারণ পৌর অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহারা কোথাও জায়গা পাইবে না, এমন হইতে পারে না। প্যালেষ্টাইনে এখনও লক্ষ লক্ষ আরব ও ইহুদীর স্থান হইতে পারে। ইহুদী আসিলেই আরব বেদখল হইতেছে, এমন নয়।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা যে-ভাবে প্যালেষ্টাইনের আরবদের পক্ষ ধর্মসম্প্রদায়ের দিক দিয়া অবলম্বনপূর্বক আন্দোলন করিতেছে, স্বাধীন তুরস্ক, আফগানিস্তান ও ইরান তাহা করে নাই। ইরাক, সৌদী আরবদেশ ও ট্রান্সজর্ডান তো প্যালেষ্টাইনের আরবদিগকে মারামারি কাটাকাটি ছাড়িয়া দিতে ও ব্রিটেনের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিতে অনুরোধ করিতেছে।

ভারতবর্ষের মুসলমানরা এক সময় খিলাফৎ আন্দোলন করিয়াছিলেন ও তাহাতে কংগ্রেসও যোগ দিয়াছিলেন। তাহার ফল অজানা নাই। তুরস্কের সুলতান খলিফা ছিলেন। তুরস্ক সাধারণতঃ ইহুদী সুলতানকেও রাখে নাই, খলিফাও রাখে নাই। অতঃপর দেশের মুসলমানদের কোন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ধর্মের দিক দিয়া উত্তেজিত হওয়া এবং সেই উত্তেজনা ও আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগ দেওয়া স্বফলপ্রদ হইতে পারে না, স্বতরাং বাঞ্ছনীয় নহে।

ভারতীয় মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল প্যালেষ্টাইন সপক্ষে বড়লাটের কাছে একটি অনুরোধপত্র দাখিল করেন। বড়লাট তাহার জবাবও দিয়াছেন। তিনি ঐ প্রতিনিধিদের বক্তব্য বিলাতের মন্ত্রীদের কাছে নিজের মতামতসহ পাঠাইয়া দিবেন। তাহার বেশী কিছু করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই।

ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিরা এদেশের সকল মুসলমান-দলের প্রতিনিধি কিনা জানি না। তাঁহারা প্যালেষ্টাইনের আরবদের মত, প্যালেষ্টাইনে তাহাদের দেশের ব্যবস্থা তাহাদেরই করিবার অধিকার (self-determination) চান, অর্থাৎ তথাকার আরবদের স্বাধীনতা চান। আমরাও প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতার পক্ষপাতী—শুধু প্যালেষ্টাইনের কেন, সকল দেশেরই স্বাধীনতার পক্ষপাতী। এবং এই “সকল” দেশের মধ্যে আমরা ভারতবর্ষকেও একটি দেশ বলিয়া ধরি। উক্ত ভারতীয় মুসলমান-প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে কাহাকেও কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের আত্মভাগ্যনিয়ন্তৃত্ব (self-determination) দাবী করিতে শুনি নাই। তাহার কারণ কি এই, যে, ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ এবং প্যালেষ্টাইনে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ? আরও একটা কারণ কি এই, যে, ভারতবর্ষে মুসলমানেরা যোগ্যতা বা লোকসংখ্যার অনুপাতে যত চাকরি ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যতা পাইতে পারিতেন, গবর্নমেন্টের অফিসে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী চাকরি ও সদস্যতা পাইয়াছেন?

প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অনেক সৈন্য পাঠাইয়াছেন এবং তথায় সামরিক আইন জারি করিয়াছেন। অতঃপর জেনিভায় লীগ অব নেশ্যন্সের অভিভাবকত্ব কমিশনের (Mandates Commission-এর) এক অধিবেশনে, ব্রিটেন আরবদিগকে কেন ঠাণ্ডা করিতে পারে নাই, তাহার কড়া সমালোচনা হইতেছে।

ভারতবর্ষে ও বিদেশে সংবাদপত্রের কাটতি

কিছু দিন ধরিয়া বিলাতী ডেলি এক্সপ্রেস ও ডেলি হেরাল্ড নিজেদের কাটতি লইয়া মসীযুক্ক করিতেছিলেন। উভয়েই বলিতেছিলেন, আমাদের কাটতি পৃথিবীতে সব কাগজের চেয়ে বেশী—প্রতিদিন কুড়ি লাখের উপর। কিন্তু জাপানের খবরে উভয়কেই অ-বাক করিয়াছে। “দি ওয়ার্ল্ডস্ প্রেস নিউস” (“The World’s Press News”এ) লিখিত হইয়াছে, যে, জাপানের ওসাকা মাইনিচি প্রতাহ ত্রিশ লক্ষ এবং তাহার ভগিনী তোকিও মাইনিচি প্রতাহ চব্বিশ লক্ষ কাটতির দাবী করেন। জাপানে নিতান্ত শিশু ছাড়া স্ত্রী-ও পুরুষজাতীয় সকলে লিখিতে পড়িতে পারে। এই জন্ত কাগজের কাটতি বেশী।

আমাদের দেশে আনন্দবাজার পত্রিকা অর্ধ লক্ষের উপর কাটতি দাবী করেন। ইহা অপেক্ষা বেশী কাটতি অতঃপর কোন ভারতীয় ইংরেজী বা দেশী ভাষার কাগজের আছে বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে অ-রাষ্ট্রনৈতিক গভীর বিষয়ের আলোচনায় পূর্ণ মাসিক কাগজেরও খুব কাটতি হয়। আমেরিকার আচার্য্য সাণ্ডার্সগের সম্পাদিত “দি যুনিটেরিয়ান” মাসিকপত্রের কাটতি ছিল তিন লক্ষ।

আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক পড়িতে লিখিতে জানে না, ও তাহার উপর গরীব। এবং তদুপরি পয়সা দিয়া না-কিনিয়া কাগজ পড়ার ফ্যাশন সচ্ছল অবস্থার অনেক লোকের মধ্যেও প্রচলিত।

নারীশিক্ষা সমিতি

শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বহুর নেতৃত্বে নারীশিক্ষা সমিতি ১৭ বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় ও মফস্বলে নারী-শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্ত প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন। সমিতির আয় বাড়িলে আরও অনেক কাজ ইহার দ্বারা হইতে পারে। কলিকাতার বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বিধবা মহিলারা যে শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা স্বাবলম্বনে সমর্থ হওয়ায় তাঁহারা ইহা উপকৃত হন।

তাহা নহে, বঙ্গের সর্বত্র প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়সমূহে যে যথেষ্ট শিক্ষারীতির অভাব অনুভূত হয়, সেই অভাবও কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হয়। হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা এত বেশী, তাঁহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিবার প্রয়োজন এত অধিক, এবং বঙ্গে বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এরূপ একান্ত আবশ্যক, যে, নারীশিক্ষা সমিতির বার্ষিক আয় যদি কয়েক লক্ষ টাকা হইত, তাহা হইলেও তাহা অধিক হইত না।

কলিকাতায় ছাত্রীনিবাস

ছাত্রীদের কলেজে শিক্ষালাভের রীতি বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু মফস্বল হইতে যে-সকল ছাত্রী কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তাঁহাদের থাকিবার সমুচিত ব্যবস্থা নাই। এই অভাব দূর করা আবশ্যক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে মন দিয়া উচিত কাজ করিয়াছেন। পরলোকগত বিহারী লাল মিত্র জ্ঞানীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে বার্ষিক ৪৮০০০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস নিশ্চিত হইবে।

ইহা নিশ্চিত হইলে ইহার তত্ত্বাবধানের ভাল বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

প্রাপ্তবয়স্ক অনূঢ়া অনবরুদ্ধা কন্যা সমস্যা

বঙ্গে বাল্যবিবাহ ও নারীদের অবরোধ চিরাগত প্রথা। এখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে এবং অবরোধ-প্রথাও ক্রমশঃ কমিতেছে। এই জন্ম প্রাপ্তবয়স্ক অনূঢ়া অনবরুদ্ধা কন্যাদের কি কি পারিবারিক ও সামাজিক নিয়ম মানা উচিত এবং অন্তদেরও (বিশেষতঃ পুরুষদের) তাঁহাদের সম্বন্ধে কি প্রকার নিয়ম ও শিষ্টাচার পালন করা কর্তব্য, হিন্দুসমাজের নেত্রীবর্গের ও নেতাদের তাহাতে মন দেওয়া আবশ্যক। বাঙালী খ্রীষ্টিয়ান সমাজে ও ব্রাহ্মসমাজে এ-বিষয়ে কিছু অলিখিত নিয়ম থাকিলে তাহা জানা ভাল। কিন্তু মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট প্রভৃতি ভারতবর্ষের যে-সকল প্রদেশে অবরোধপ্রথা কোন কালে ছিল না, এবং যে-যেখানে বঙ্গেরই মত বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইতেছে, তথায় কিরূপ আদবকায়দা আছে, তাহা জানা আরও আবশ্যক। এই সকল প্রদেশে শিক্ষিত বাঙালী পুরুষ ও মহিলারাও আছেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজকে জানাইতে পারেন।

মেয়েরা যে শিক্ষা পাইতেছেন তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্য। পাশ্চাত্য সমাজের চালচলনের সহিত তাঁহারা পাশ্চাত্য উপন্যাস নাটক ও গল্পের মধ্য দিয়া পরিচিত হইতেছেন ও তাহার প্রভাব তাঁহাদের উপর পড়িতেছে। পাশ্চাত্য অনেক

পাপ, মোহিনী কুরীতি ও অন্য অনেক জিনিষ তাঁহারা জানিতেছেন, বাহা তাঁহারা (এবং আমাদের বালকেরাও যুবকেরাও) না জানিলে মঙ্গল হইত। সিনেমার মধ্য দিয়াও অনেক অবাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞান তাহাদের হইতেছে। এই সকল কারণে আমাদের দেশের চিরন্তন সংযম, সাদৃশ্যতা ও পবিত্রতার আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাখা কঠিন হইতেছে। অতীত কালে এদেশে উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও পাপ ছিল না, এমন নয়। কিন্তু সংযম সাদৃশ্যতা ও পবিত্রতার আদর্শও ছিল ও তাহা খুব উচ্চ ছিল, এবং অগণিত লোকের জীবনে তাহা অনুসৃতও হইত।

কোন বয়সের নারীদিগকেই পিঞ্জরের পাখী করিয়া রাখা সুরীতি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ নহে। স্বাধীনতা সকলের জন্যই চাই। কিন্তু সংযম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা স্বাধীনতার যোগ্য হওয়া ও থাকা আবশ্যক। যেহেতু অনেক পুরুষ উচ্ছৃঙ্খল, অতএব অনেক নারীকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে, সাম্যের অর্থ ইহা নহে। প্রত্যুত সকল পুরুষকেই চরিত্রবান হইতে হইবে।

বেকার সমস্যা ও গবন্মেণ্ট

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অনেকেই বেকার। গবন্মেণ্ট মনে করেন, অনেকে বেকার থাকায় সম্ভাসক বা বিভীষিকা-পন্থী দলের নেতাদের নিজেদের দলে লোক জুটাইবার সুবিধা হয়। ঠিক তাহা হয় কিনা, সে-বিষয়ে আমরা কিছু জানি না; কিন্তু হওয়া অসম্ভব নয়। গবন্মেণ্ট বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য বাহা করিতেছেন, তাহা আমরা মোটেই যথেষ্ট মনে করি না, কিন্তু অযথেষ্ট বাহা করিতেছেন তাহাও সম্পূর্ণ মূল্যহীন মনে করি না। গবন্মেণ্টের এই রূপ চেষ্টায় যদি বেকারদের সংখ্যা কিছু কমে, এবং এই উপায়ে যদি পরোক্ষ ভাবে বিভীষিকা-পন্থার আকর্ষণ কিঞ্চিৎ কমে, তাহা সম্ভবের বিষয় হইবে।

বাংলা-গবন্মেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন সে-বিষয়ে বঙ্গের সরকারী শিল্প-বিভাগ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কতকগুলি যুবককে কোন কোন শিল্প শিখান হইতেছে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসায়ীরা যাহাতে নূতন ও উন্নত ধরণের উপায় অবলম্বন দ্বারা নিজ নিজ শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহাদিগকে সে-বিষয়ে সাহায্য দিবার নিমিত্ত শিল্প-বিভাগ একটি গবেষণাগার খুলিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পব্যবসায়ীদিগকে আর্থিক সাহায্য ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কতগুলি ব্যবসা কি পরিমাণ সাহায্য পাইয়াছেন, জানি না। এই ব্যবসাদারদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধামত বাজারের সন্ধান দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কতকগুলি যুবক সাবান, ছুরি, কাঁচি,

ছাতার বাঁট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। কোন কোন স্থানে নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে শিখান হইতেছে। এইরূপ কতকগুলি সামগ্রী প্রস্তুত করিতে কতকগুলি যুবক শিক্ষা করায় কোথাও কোথাও শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে বহুসংখ্যক লোকের উপার্জনের পথ খুলিয়াছে। কাঁচা মাল কোথায় পাওয়া যায়, তাহার সন্ধানও শিল্পবিভাগ দিয়া থাকেন। শিল্পবিভাগের এইরূপ চেষ্টার বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়।

রামমোহন রায়ের মূর্তি

গত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতার প্রধান নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার শেষ ইংলণ্ড প্রবাসকালে তাঁহার নেতা ও বন্ধু রামমোহন রায়ের একটি আবক্ষ মূর্তি তখনকার প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন গিবসনের দ্বারা নির্মাণ করাইয়া পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাঠাইয়া দেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাহা নিজের বেলগাছিয়া উদ্যানে স্থাপিত করিবেন এই ইচ্ছা জানান। কিন্তু ইংলণ্ডেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ও ঋণ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, এবং মূর্তিটির বিষয় কাহারও

বড় মনে ছিল না। পরে ইহা মহাশি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ গৃহে রক্ষা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করা হইবে, তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার পরিবারবর্গ ইহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ২১১-সংখ্যক ভবনে শিবনাথ স্বতীমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছে। আমরা ইহার একটি ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত করিলাম।



রামমোহন রায়ের মূর্তি

ছাভিক্ষ

বঙ্গে ছাভিক্ষ লাগিয়া আছে। উত্তর-ভারতে বহুপ্রদেশে কত্কা হওয়ায় সেখানেও নানা স্থানে ছাভিক্ষের মত হইয়াছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কোথাও কোথাও ছাভিক্ষ হইয়াছে। হৈমন্তিক দাশ্র না হওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গের যে-সব জেলায় ছাভিক্ষ হইয়াছে, সেখানে লোকের কষ্ট চলিতে থাকিবে। তাহার পরও যে নিরপেক্ষদের সচ্ছল অবস্থা হইবে এমন নয়। তাহাদের দুঃখের কিছু উপশম হইবে মাত্র।

বঙ্গের দশ বারটি জেলায় অন্নকষ্ট ও বজ্রাভাব হইয়াছে।

আমরা সর্বত্র সাহায্য দানের কাজ চালাইবার মত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব না এবং আমাদের সব জায়গায় কম্বীও নাই। ইহা জানিয়া আমরা কেবল বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি কেন্দ্রে যথাসাধ্য সাহায্য দিবার চেষ্টা করিতেছি। এবারকার দুর্ভিক্ষে টাকা অতি সামান্যই আসিয়াছে। পুনরুন্নয়ন সাহায্য পাঠাইতে সদাশয় ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

গত ১২শে সেপ্টেম্বর প্রসিদ্ধ সংগীতবেত্তা পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষীয়



বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

প্রাচীন সংগীতবিজ্ঞা ও হিন্দুস্থানী রীতির সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার শ্রম ও কৃতিত্ব অসাধারণ। হিন্দুস্থানী সংগীত শিখাইবার নিমিত্ত তিনি লক্ষ্মীতে মরিস কলেজ এবং গোয়ালিয়রে সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

নারীনিগ্রহের বিরুদ্ধে মহিলাদের সভা

গত ১২শে আশ্বিন কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটির হলে শিক্ষিতা মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হয়। বাংলা দেশে নারীহরণ ও নারীর উপর পাশবিক ও পৈশাচিক অত্যাচারের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে সমবেত মহিলারা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অত্র মহিলাদের মত শহরের শিক্ষিতা মহিলারাও নারীনিগ্রহের বেদনা ও অপমান অনুভব করেন। তাঁহারা যে দলবদ্ধ ও স্বশৃঙ্খল ভাবে আপনাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই বা নারীনিগ্রহের প্রতিকারচেষ্টা করেন নাই, তাহার সমস্ত দোষটা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপান উচিত নয়। সামাজিক প্রথা বন্ধের নারীদিগকে দীর্ঘ কাল কেবলমাত্র অন্তঃপুরিকা করিয়া পদ্ধি করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই কালক্রমে নারীদের দুঃখদুরীকরণ-কার্যে ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

মহাবোধি সোসাইটি হলের সভায় মহিলাগণ বন্ধে নারী-হরণ ও নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার দমন করিবার জন্ত গবন্মেণ্টের নিকট কঠোরতর আইন ও বিশেষ ব্যবস্থার দাবী করেন। কড়া আইন, কড়া আইনের সমুচিত প্রয়োগ এবং পুলিশ ও শাসক কর্মচারীদের উপর বিশেষ আদেশ যে অত্যাচরক, সংবাদপত্রে ও জনসভায় অনেক দিন হইতে তাহা বলা হইতেছে। গবন্মেণ্ট একেবারে উদাসীন আছেন, বলা যায় না বটে, কিন্তু যথোচিত মনোযোগীও হন নাই। আর কালবিলম্ব না করিয়া বিশেষ ভাবে মনোযোগী হওয়া গবন্মেণ্টের কর্তব্য।

খোর্দ-গোবিন্দপুরের মোকদ্দমার দ্বিতীয় বার বিচারে সেশন জজের রায় সন্মুখে মহিলারা বলিয়াছেন :—

“এই মোকদ্দমায় অপরাধীদিগকে যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহাদের অপরাধের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইয়াছে। এই জন্ত এই সভা আশা করিতেছে, যে গবন্মেণ্ট সেশন জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়া অত্যাচারীদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা দ্বারা বন্ধের নারীদের মানসন্ত্রম রক্ষা করিবেন।”

মহিলাদের এই মত সান্তিশয় গ্রাহ্য। এই মত অনুসারে কাজ করা গবন্মেণ্টের কর্তব্য।

আর একটি প্রস্তাবে মহিলারা বলিয়াছেন :—

“জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত নারীই নারী, এবং যাহারা অত্যাচার করে তাহারা অত্যাচারী। এ-ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বা জাতির কথা উঠিতেই পারে না। হতরাস আমরা এই সভায় নারীদিগের পক্ষ হইতে দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিতেছি, যে, অত্যাচারী কর্তৃক নারীর উপর অত্যাচার ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোনক্রমেই সম্ভব নহে।”

কোন গ্রামপরাণ বিবেচক ব্যক্তিরই এ-বিষয়ে অত্র মত থাকিতে পারে না। অত্যাচারী হিন্দু হইলে সমগ্র বাঙালী সমাজের লজ্জার বিষয়—বিশেষ করিয়া হিন্দু

বাঙালীদের লজ্জার বিষয়; অত্যাচারী মুসলমান হইলেও সমগ্র বাঙালী সমাজের লজ্জার বিষয়—বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমানদের লজ্জার বিষয়। বস্তুতঃ অত্যাচারী মালুমগুলি কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক তাহা ভাবাই অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক; তাহারা সমুদয় ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট।

ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের বক্তৃতা

গত ২১শে সেপ্টেম্বর লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বলেন, যে, ১৯৩৫ সালে যে ভারতশাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রণীত হইয়াছে, তাহা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয়ের সম্মিলিত বিজ্ঞতার ফল। এইরূপ কথা তিনি দিল্লীতে তাঁহার প্রথম রেডিও বক্তৃতাতেও বলিয়াছিলেন। তাহা যে সত্য নহে, ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে এবং কংগ্রেসের ও লিবার্যাল বা মডারেট দলের নেতাদের মন্তব্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল—দেখান হইয়াছিল, যে, কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা বা লিবার্যাল দলের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ঐ আইনের প্রণেতারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টেরই বাছাই-করা অতিবড় নরমপন্থী অতিবড় রাজভক্তি-ব্যাপ্যারী অতিবড় সাম্প্রদায়িক চাইদেরও কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও, লর্ড লিনলিথগো আবার ঠিক সেই কথাই বলিয়াছেন! ইহারা ভ্রমের অতীত, এবং ভারতবর্ষের কাহারও কোন কথার মূল্য ইহাদের কাছে নাই যদি তাহা তাহাদের কথার প্রতিফলিত বা সমর্থক না হয়।

ভারতবর্ষ না-কি প্রতিনিধিতত্ত্ব শাসনপ্রণালী পাইয়াছে!

আলোচ্য বক্তৃতাটিতে লর্ড সাহেব বলিয়াছেন প্রকৌতুক আইন দ্বারা ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিতত্ত্ব প্রণালী অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন (“representative self-government”) দেওয়া হইয়াছে। বাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রতিনিধিতত্ত্ব শাসনপ্রণালী কিনা, তাহা প্রথমে বিচার্য।

ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এখন ভারত-সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩৪ কোটি। তাহার মধ্যে ৮ কোটি লোক দেশী রাজ্যসমূহে বাস করে। এই আট কোটি লোককে নূতন আইন প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার অধিকার দেয় নাই। সুতরাং তাহাদিগকে অর্থাৎ ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে মোট যত লোক বাস করে প্রায় তাহাদের সমানসংখ্যক লোককে, এই আইন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। ইহার নাম প্রতিনিধিতত্ত্ব শাসনপ্রণালী!

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ ও দেশী রাজ্যসমূহ লইয়া সমগ্র

ভারত। এই সমগ্র ভারতের জন্ত একটি সম্মিলিত ব্যবস্থাপক সভা (Federal Legislature) থাকিবে। উভয়ের মোট সদস্যসংখ্যা হইবে ৬৩৫। ইহার মধ্যে দেশী রাজ্যসমূহ হইতে আসিবে ২২২ জন সদস্য, বা এক-তৃতীয়াংশের অধিক। অর্থাৎ যে দেশী রাজ্যসমূহের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের মোট লোকসংখ্যার সিকিরও কম, সেই দেশী রাজ্যসমূহ হইতে আসিবে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক সদস্য! তাহারা যদি তথাকার অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হইত তাহা হইলেও কথা ছিল। কিন্তু তাহা হইবে না। এই এক-তৃতীয়াংশের অধিক ২২২ জন সদস্য দেশী রাজ্যগুলির রাজা মহারাজা নবাব প্রভৃতি জনকতক লোক মনোনীত করিবেন, এবং তাহারা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের রেসিডেন্ট প্রভৃতির প্রভাবাধীন। এই রাজা মহারাজা প্রভৃতিকে এত ক্ষমতা দিবার কারণ, তাহারা দৈবরশাসক (autocrats) এবং ভারতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের দৈবিতার (autocracy) সমর্থন দ্বারা ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকদের স্বরাজ্যলাভ-প্রয়াসে বাধা দিতে পারিবেন।

অতএব, ভারতবর্ষকে কিরূপ প্রতিনিধিতত্ত্ব শাসনপ্রণালী দেওয়া হইতেছে তাহা উপরে লিখিত কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

তাহার পর, শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করুন।

ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভার দুই কক্ষে ব্রিটিশ-ভারতের সদস্য থাকিবেন ৪০৬ জন। এই ৪০৬ জনের ৪০৬টি আসনের মধ্যে ১৮০টিকে জেনারেল অর্থাৎ সাধারণ আসন বলা হইয়াছে। সেইগুলির অধিকারী হইবেন হিন্দুরা ও তাহাদের সঙ্গে সম্মিলিত বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি। ব্রিটিশ-ভারতে শুধু হিন্দুরাই সমগ্র লোকসংখ্যার মোটামুটি শতকরা ৭০ জন (হিন্দুদের সঙ্গে সংযুক্ত বৌদ্ধ প্রভৃতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম)। এই শতকরা ৭০ জনকে প্রকৃত কোন প্রতিনিধিতত্ত্ব প্রণালীতে শতকরা ৭০টি আসন দেওয়া উচিত হইত। কিন্তু নূতন আইন তাহা দেয় নাই! ইহাদিগকে শতকরা ৪৪-৩টি আসন দিয়াছে। যদি এমন হইত, যে, হিন্দুরা ভারতবর্ষে শিক্ষায় বুদ্ধিবিদ্যায় সার্বজনিক হিতকর কার্য সম্পাদনে ব্যবসাবাগিজে ধনশালিতায় সর্বাধম, তাহা হইলেও বা তাহাদিগকে এত কম আসন দানের পক্ষে কিছু বলিবার থাকিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ভারতবর্ষে শিক্ষা, বুদ্ধিবিদ্যা, সার্বজনিক কার্যে উৎসাহ, ব্যবসা-বাগিজে দক্ষতা ও ধন বাহাদের আছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই সর্বাধিক। সুতরাং কি সংখ্যা-বহুলতায়, কি উল্লিখিত কারণে, হিন্দুদের শতকরা ৭০টি আসন চায়া পাওনা। অথচ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে শতকরা ৪৪-৩টি মাত্র! ইহারই নাম প্রতিনিধিতত্ত্ব শাসনপ্রণালী!

হিন্দুদিগকে এই প্রকারে বঞ্চিত করিবার কারণ, তাহারা অধিক পরিমাণে স্বরাজ্যাকামী এবং স্বরাজ্যের অর্থ ব্রিটেনের প্রভুত্বলোপ বা হ্রাস এবং তজ্জনিত নানা দিকে স্বার্থের ক্ষতি।

এই আজব প্রতিনিধিত্ব শাসনপ্রণালীর আরও বাহার আছে। ইহাতে মুসলমান হইবে মুসলমানের প্রতিনিধি, হিন্দু হইবে হিন্দুর প্রতিনিধি, খ্রীষ্টিয়ান হইবে খ্রীষ্টিয়ানের প্রতিনিধি, জমিদার হইবে জমিদারের প্রতিনিধি, ইত্যাদি; কিন্তু সব ধর্মসম্প্রদায় ও সব শ্রেণীর লোককে লইয়া যে মহাজাতি বা নেশন, তাহার প্রতিনিধি কেহই হইবে না। বস্তুতঃ ভারতীয়দের জাতীয়তা বা নেশনত্ব অস্বীকার করাই এই আইনটির একটি প্রধান কীর্তি। অথচ বলা হইতেছে, এই আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের লোকদিগকে প্রতিনিধিত্ব শাসনপ্রণালী দেওয়া হইতেছে।

নূতন ভারতশাসন আইনে স্বশাসনের রূপ

লর্ড লিনলিথগো বলিয়াছেন, নূতন ভারতশাসন আইন দ্বারা ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিত্ব শাসনপ্রণালী অল্পযায়ী স্বশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আইনটির প্রতিনিধিত্ব শাসনপ্রণালী কি প্রকার তাহা দেখাইয়াছি। উহা ভারতবর্ষকে স্বশাসন দিতেছে কিনা, তাহা এখন বিচার্য।

স্বশাসক দেশসকলের চূড়ান্ত ক্ষমতার পীঠস্থান থাকে সেই সেই দেশেই। যেমন ব্রিটেনের আছে লণ্ডনে, ফ্রান্সের আছে প্যারিসে, আমেরিকার আছে ওয়াশিংটনে, জাপানের আছে তোকিওতে। কানাডা দক্ষিণ-আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হইলেও রাষ্ট্রীয় শক্তির সারবস্তু যাহা তাহা তাহাদের আছে—ব্রিটেন তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে কিছু করাইতে পারে না; এবং তাহাদেরও এই সারবস্তু সম্বন্ধীয় চূড়ান্ত ক্ষমতার পীঠস্থান তাহাদেরই স্বদেশে আছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষমতার পীঠস্থান লণ্ডন—দিল্লী নহে, সিমলা নহে। ভারতশাসন আইনের সামান্য পরিবর্তন করিতে হইলেও তাহা ভারতবর্ষে কোথাও করা যাইবে না, ৬০০০ মাইল দূরবর্তী লণ্ডনে তাহা হইবে।

স্বশাসক দেশসমূহের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েন তৎপ্রকারই কোন ব্যক্তিবিশেষ কিংবা তৎপ্রকারই কোন লোকসমষ্টি। কিন্তু ভারতবর্ষের চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি-বিশেষের বা কোন ভারতীয় লোকসমষ্টির হাতে নাই, আছে ব্রিটেনে ব্রিটিশ প্যারলিমেণ্টের হাতে। নূতন ভারতশাসন আইনের সামান্যতম পরিবর্তনও একমাত্র ব্রিটিশ প্যারলিমেণ্টই করিতে পারে, ভারতবর্ষের কেহ পারে না।

স্বশাসক দেশসমূহ নিজেদের উচ্চতম কর্মচারীদিগকেও নিজেয়াই নিযুক্ত বরখাস্ত অবসৃত উন্নমিত অবনমিত পুরস্কৃত তিরস্কৃত ইত্যাদি করিতে পারে। ভারতবর্ষ গবর্নর জেনারেলকে বা প্রাদেশিক গবর্নরদিগকে নিযুক্ত ইত্যাদি করিতে তো পারেই না, নূতন আইন অত্যাচারেও পারিবে

না; অধিকন্তু যে-সব সাধারণ সিভিলিয়ান জজ ম্যাজিস্ট্রেট কলেক্টর হন, পুলিশ সাহেব হন, জেলার ডাক্তার সাহেব হন, শিক্ষা-বিভাগের বড় বড় কর্তা হন, জলসেচন-বিভাগের বড় বড় কর্তা হন, তাহাদেরও নিয়োগ আদি ভারতবর্ষীয় কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে থাকিবে না। সব করিবেন লণ্ডনে ভারতসচিব বা ভারতে ইংরেজ বড়লাট। সিভিলিয়ান প্রভৃতির নামে মাত্র দেশী মন্ত্রীদের তাঁবেদার হইবেন। মন্ত্রী বেচারারা তাহাদের বেতন বাড়ান কমান পদচ্যুতি ইত্যাদি তো করিতে পারিবেনই না, বদলী পর্যন্ত করিতে পারিবেন না। মন্ত্রীদের বেতন কমান বাড়ান, মঞ্জুর না-মঞ্জুর করা, তাহাদিগকে অপসারিত করা, এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সমূহের সাধ্যায়ত্ত। নূতন আইনে তাহা থাকিবে না, মন্ত্রীর সম্পূর্ণরূপে গবর্নরের অধীন হইবেন।

কানাডাকে, অষ্ট্রেলিয়াকে, দক্ষিণ-আফ্রিকাকে, আয়ারল্যান্ডকে ব্রিটিশ প্যারলিমেণ্ট যেরূপ আইন দ্বারা স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিল, নূতন ভারতশাসন আইন সেরূপ কোন বিধি নহে। ইহা সেরূপ কোন স্বায়ত্তশাসন দেয় নাই। শুধু তাই নয়। ব্রিটেনের ভক্ত ও পক্ষসমর্থক কাহারও ইহা বলিবারও উপায় নাই, যে, এই আইন একবারে এখনই স্বায়ত্তশাসন না দিয়া থাকিলেও ইহার জোরে ভারতবর্ষ দাপে দাপে ক্রমশঃ স্বরাজ্যসৌধে আরোহণ করিবে। কারণ, এই আইনের কোথাও এমন কোন কথা নাই, যে, ভারতীয়েরা ভবিষ্যতে অধিকতর ক্ষমতা পাইবে, কোথাও এমন একটি ধারা নাই বাহার প্রভাবে ভারত অধিকতর ক্ষমতা পাইতে পারিবে, এমন কোন সর্ব নাই যাহা পূরণ করিলে স্বরাজ্য পাওয়া যাইতে পারিবে। এক কথায়, এই আইন স্বরাজ্য-প্রদাতা আইন নহে, ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের দ্বারা প্রাপ্য স্বরাজ্যের আইনও ইহা নহে।

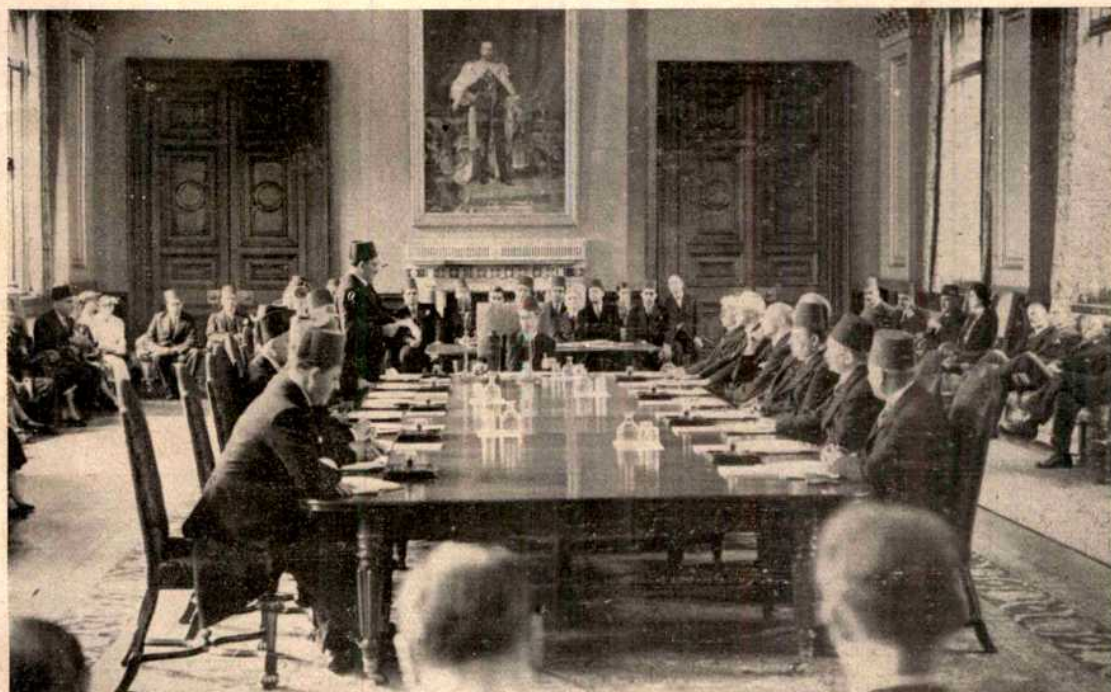
ভারতবর্ষকে ইহা কি ক্ষমতা দিয়াছে—অথবা ঠিক বলিতে গেলে কি ক্ষমতা দেয় নাই, সে-বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

স্বশাসক দেশসমূহ আত্মরক্ষার মালিক। তাহারা জলে স্থলে আকাশে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং করে। সেই উচ্চ অধিকার ও কর্তব্য তাহাদেরই। ভারতবর্ষের স্থল-সৈন্যদলের কর্তা ভারতবর্ষ নহে, ব্রিটেন। প্রধান সেনাপতি, ছোট ছোট সেনানায়ক ও অন্ত্র সামরিক অফিসারদের নিয়োগ ব্রিটেনের বা ব্রিটেনের রাজপুরুষদের হাতে। প্রধান ও অপ্রধান সামরিক অফিসাররা প্রায় সবাই ব্রিটিশ। সামরিক বিভাগটা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্পূর্ণ অধিকার-বহিভূত। নামমাত্র রণতরী সামান্য যাহা আছে, আকাশ-বুদ্ধের সামান্য ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহার উপরও ভারতীয়দের কোন হাত নাই।

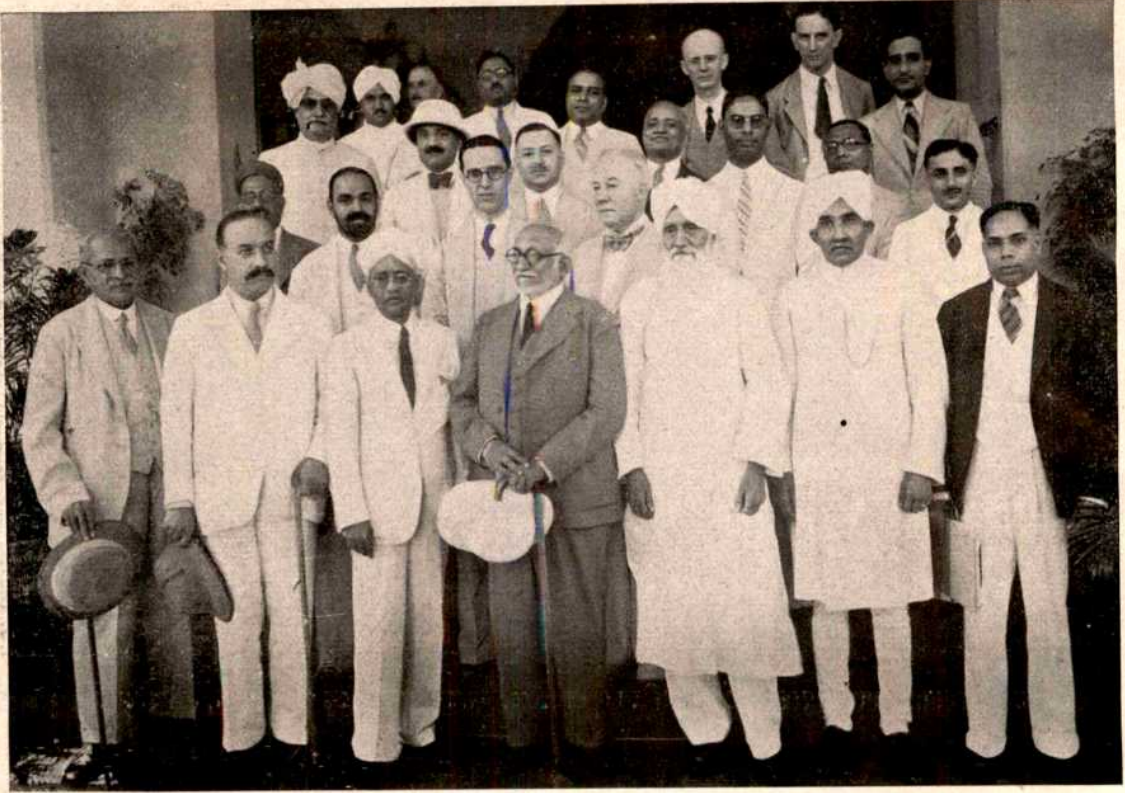
অতএব স্বশাসনের একটি প্রধান অঙ্গ ভারতীয়দের নাই।



প্যাৰ্লেষ্টাইনে আৰব বিদ্ৰোহ : টেল-আবিবৰ কাৰাদ্বাৰে আৰব বন্দীদিগকে খানাতল্লাস কৰা হইতেছে।



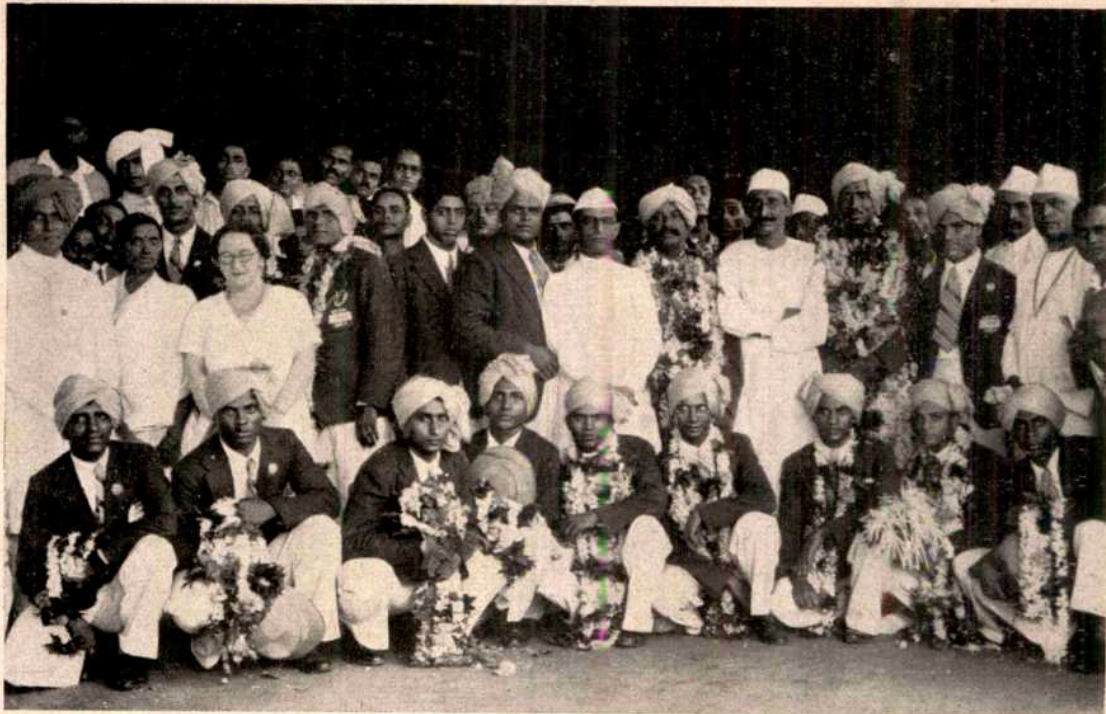
ইঙ্গ-মিশৰ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ ; নাহাশ পাশা বক্তৃতা কৰিতেছেন।



বোম্বাইয়ে দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী-সম্মিলন : ফেডারেশন-সম্পর্কিত প্রশ্নাদির আলোচনার জগুইহারা সম্মিলিত হইয়াছেন



বোম্বাইয়ে বণিক-পরিষৎ দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধিবর্গকে সন্মিলন করিতেছেন



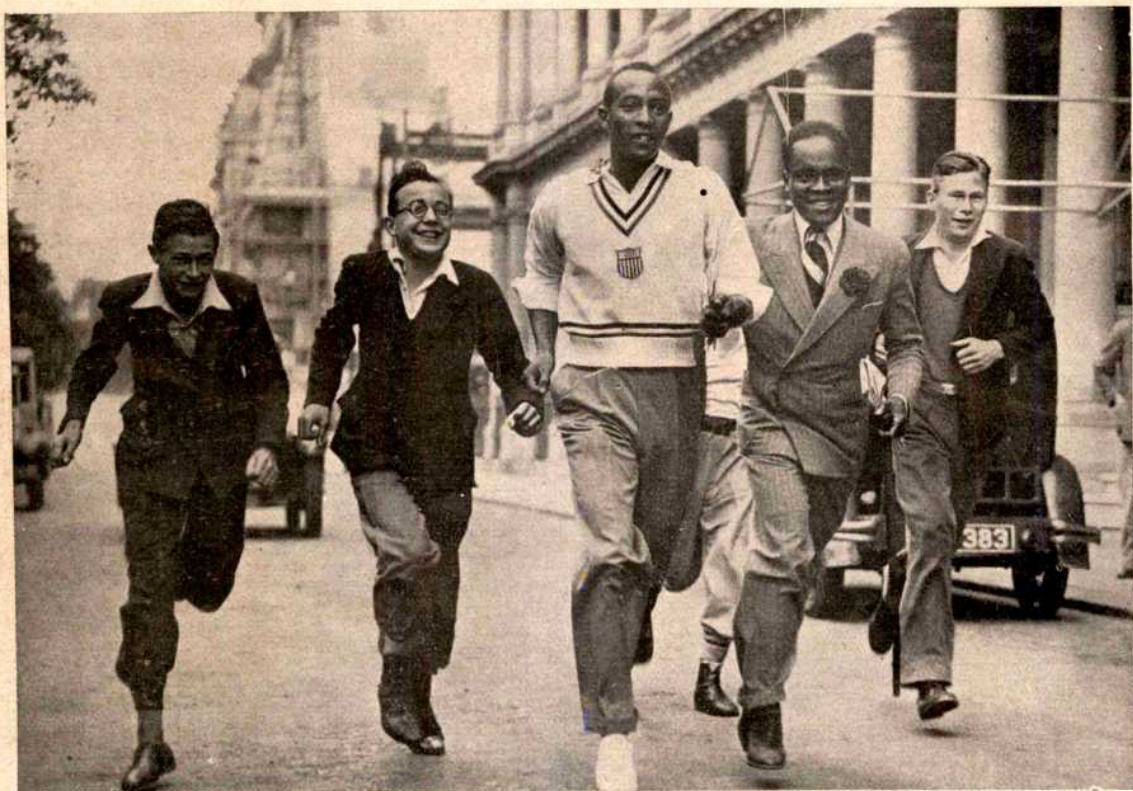
বালিন ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা হইতে সম্প্রতি প্রত্যাপ্ত অমরাবতী হুজুমান-বায়ামশালার সভাগণ :
কে এক নরীম্যান (মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান) : ইহাদের সংবর্দ্ধনা করিতেছেন



গোয়া বন্দর । জর্মন গবর্নেন্ট প্রাচ্যে নাৎসিবাদ প্রচারের কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এই বন্দর পটু গীজ গবর্নেন্টের
নিকট হইতে কিনিয়া লইবেন শোনা গিয়াছে



হারি রিচমণ্ড ও ডিক মেরিল বিমানযোগে আটলান্টিক পাড়ি দিতে যাত্রা করিতেছেন ;
জনতা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে ।



বিগত ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দৌড়ে স্বর্ণপদক-বিজ়েতা, “কালো চিতা” (ব্ল্যাক প্যান্থার) জেসি
আওয়েলস লওনে স্বাক্ষর-প্রার্থী ছাত্রদের সহিত স্বীয় দৌড়ের নৈপুণ্য দেখাইতেছেন ।

পুলিস-বিভাগও কার্যতঃ ভারতীয় মন্ত্রীদেব অধীন থাকিবে না। কোন মন্ত্রী পুলিশের গোপনীয় কথা জানিবার অধিকারী হইবেন না।

অর্থাৎ ভারতীয় লোকপ্রতিনিধিরা যত ইচ্ছা বকুন, সৈনিক ও পুলিশ-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ লোকটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে থাকিবে। তাহাদের মতামতের কোন ভোয়াকা না রাখিয়া তাহারা রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবে।

স্বশাসক দেশের একটা প্রধান অধিকার ও কর্মচারীদিগকে লোকমত অনুসারে চালাইবার প্রধান উপায় রাজস্বের উপর ক্ষমতা। অর্থাৎ স্বশাসক দেশে লোকপ্রতিনিধিদের মত অনুসারে ট্যাক্স বসে, বাড়ে, কমে, উঠিয়া যায়, এবং ট্যাক্সদাররা লব্ধ অর্থ কি ভাবে খরচ করা হইবে, তাহাও লোক-প্রতিনিধিরা স্থির করেন। কিন্তু ভারত-গবন্মেণ্টের রাজস্বের শতকরা ৮০ টাকার ননভোটবল, অর্থাৎ গবন্মেণ্ট তাহার ব্যয় সম্বন্ধে লোকপ্রতিনিধিদের মত লইতে বাধ্য নহেন। বাকী শতকরা কুড়ি টাকার ব্যয় ভোটবল অর্থাৎ লোকপ্রতিনিধিদের সম্মতিসাপেক্ষ হইলেও, গবর্নর-জেনারেলকে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ভোটবল খরচগুলিও তিনি লোকপ্রতিনিধিদের অসম্মতি সঙ্গেও করিতে পারিবেন। অর্থাৎ ভারত-গবন্মেণ্টের রাজস্বের শতকরা ৮০ টাকার উপর লোক-প্রতিনিধিদের কোনই ক্ষমতা নিশ্চয়ই থাকিবে না, বাকী ২০ টাকার উপরও ক্ষমতা থাকা না-থাকা গবর্নর-জেনারেলের মঞ্জির উপর নির্ভর করিবে।

প্রদেশগুলির রাজস্ব সম্বন্ধেও ব্যবস্থা অনেকটা এইরূপ।

অতএব নূতন ভারতশাসন আইন আমাদিগকে সেইরূপ স্বশাসন দিয়াছে, যেমন এক জন গৃহস্থামী তাঁহার সর্বস্বের উপর অধিকার ব্যক্তিবিশেষকে এই বলিয়া দিয়াছিলেন, “সর্বস্ব তোমার, কেবল চাবিটি আমার।”

বিদেশের ও বিদেশীদের সহিত মিত্রতা ও যুদ্ধবিগ্রহ আদির কথাবার্ত্তা চালান এবং চুক্তিসন্ধি প্রভৃতি করা স্বশাসক দেশের একটি প্রধান অধিকার। এ সব বিষয়ে ভারতবর্ষের লোক-দের তো কোন অধিকার থাকিবেই না, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি, ভারতীয়দের বিদেশযাত্রা ও তথায় বসবাস এবং বিদেশীদের ভারতে আগমন ও এখানে বসবাস ইত্যাদি বিষয়েও আমাদের কোন অধিকার থাকিবে না।

খ্রীষ্টিয় ইংরেজ ধর্মযাজকদের বেতনাদির উপরও আমাদের কোন হাত থাকিবে না! অর্থাৎ প্রধানতঃ অখ্রীষ্টিয়ান কবদাতাদের টাকা হইতে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম ও ধর্মযাজকদের পুষ্টি সাধিত হইতে থাকিবে।

মুদ্রাবিনিময়ের দর, স্বর্ণমান, রৌপ্যমান, নোটের প্রচার বাডান কমান, বাণিজ্য-শুল্ক বসান উঠান কমান বাডান, দেশী লোকদের মূলধন ও দেশী লোকদের দ্বারা চালিত পণ্যব্রব্যের

কারখানায় সরকারী সাহায্য দান, ইত্যাদি কাজ স্বশাসক দেশের লোকপ্রতিনিধিদের মত অনুসারে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে তাহা হইবে না।

রেলওয়ের দ্বারা শুধু লোকদের যাতায়াত নহে, দেশের পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং স্বাস্থ্যের সহিতও ইহার সম্পর্ক আছে। স্বশাসক দেশসমূহের রেলগুলি সেই দেশেরই কল্যাণার্থ বিদ্যমান। ভারতবর্ষের রেল সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। ভবিষ্যতে অবস্থা আরও পারাপ হইবে। কারণ, রেলওয়ে-বিভাগের উপর লোকপ্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না—ক্ষমতা হ্রস্ত হইবে একটি স্ট্যাটিউটারি রেলওয়ে বোর্ডের উপর। তাহাতে ইংরেজদেরই প্রভুত্ব থাকিবে।

সমুদ্রপথে যাতায়াতের উপায়ও পরহস্তগত হইয়াই গিয়াছে। উহাকে স্বহস্তগত করা নূতন আইন স্বদূরপর্যন্ত করিয়া দিয়াছে।

আকাশযান সম্পূর্ণ গবন্মেণ্টের ক্ষমতার অধীন।

ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক অনুমোদিত যে-কোন আইন গবর্নর-জেনারেল বা গবর্নরের সম্মতিসাপেক্ষ হইবে। সম্মতি না দেওয়ার, প্রতিবেদন করিবার অধিকার তাহাদের থাকিবে। ইহার কোন প্রতিকারের উপায় আইনে নাই।

গবর্নর-জেনারেল ও গবর্নর নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে অডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন।

অতঃপর এমন একটি ক্ষমতা গবর্নর-জেনারেলকে দেওয়া হইয়াছে, যাহা ইংলণ্ডে রাজারও নাই। গবর্নর-জেনারেল ও গবর্নরেরা ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি ব্যতিরেকে, ব্যবস্থাপক সভার অসম্মতি বা আপত্তির বিরুদ্ধে স্বয়ং স্থায়ী আইন করিতে পারিবেন। এই সব আইন ঠিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সহযোগে প্রণীত আইনেরই মত বলবৎ ও কার্যকর হইবে।

ইহার নাম স্বায়ত্তশাসন! গবর্নর-জেনারেল-আয়ত্ত ও গবর্নর-আয়ত্ত শাসন বলিলে অধিকতর অর্থ হইত।

সর্বশেষে বক্তব্য এই, যে, গবর্নর-জেনারেল আবশ্যিক মনে করিলে সমগ্রভারতে নূতন আইনে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগের কার্যের বৈরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত বা অংশতঃ রদ করিয়া সমুদ্র বা কোন কোন বিভাগ চালাইবার ক্ষমতা নিজের হাতে লইতে পারিবেন। প্রাদেশিক গবর্নরদিগকেও তাহাদের নিজ নিজ প্রদেশে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

অর্থাৎ এই তথাকথিত স্বায়ত্তশাসন-প্রদায়ক আইন প্রণয়ন করিয়া ব্রিটিশ পালেমেন্ট স্বায়ত্তশাসন তো ভারতীয়-দিগকে দেনই নাই, অধিকন্তু প্রধান শাসকদিগকে তাহাদের বিবেচনায় সঙ্কটসময়ে স্বৈরশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন।

পূজার ছুটি

শারদীয় পূজা উপলক্ষে প্রবাসী-কাৰ্যালয় ৪৪১ কাৰ্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর হইতে ১৭ই কাৰ্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কাৰ্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

প্রজাপতির লুকোচুরি

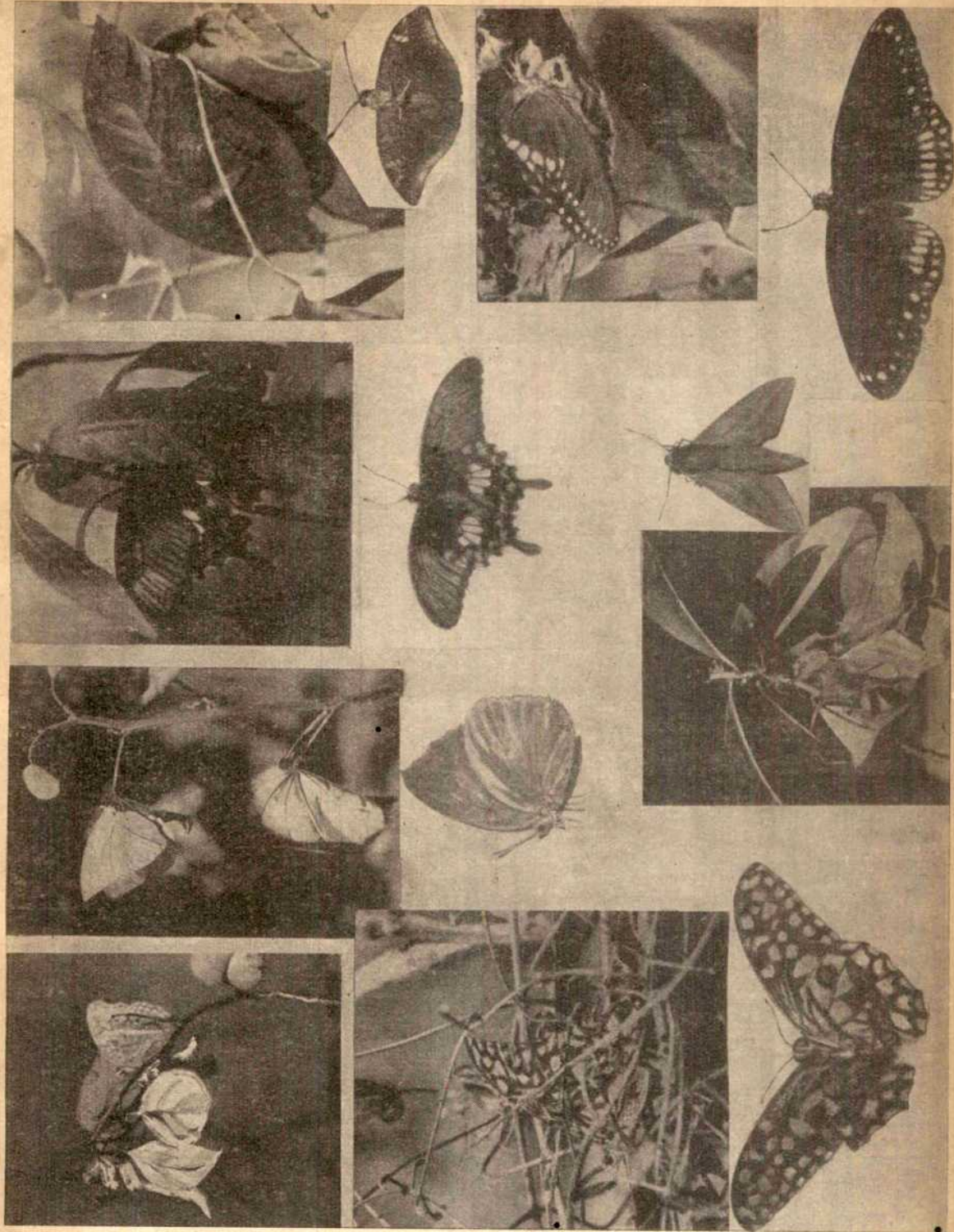
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পাখীরাই সাধারণতঃ কীটপতঙ্গের প্রধান শত্রু। পাখী এবং অণ্ডাণ্ড শত্রুদের আক্রমণ এড়াইবার জন্য কীটপতঙ্গ-জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা বহুল পরিমাণে অনুকরণপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পাখীকে সাধারণতঃ ফড়িং বা প্রজাপতিকে আক্রমণ করে না। বাদলা-পোকা আকাশে উড়িবার মতো যেমন বিভিন্ন জাতীয় পাখীরা তাহাদিগকে ধরিয়। খাইবার জন্য আকাশ ছাইয়া ফেলে, ফড়িং ও প্রজাপতির বেলায় তাহার বিপরীত ঘটনাই পরিলক্ষিত হয়। ফড়িং ও প্রজাপতির পাখীদের আশেপাশে নির্ভয়ে উড়িয়া বেড়ায়। ফড়িংদের পুরস্কারের মধ্যে অবশ্য শত্রুতা যথেষ্ট; সুযোগ পাইলেই সবল দুর্বলকে আক্রমণ করিয়া খাইয়া ফেলে। কিন্তু প্রজাপতিদের মধ্যে সেরূপ কোন শত্রুতা নাই। তথাপি কোন কোন জাতের প্রজাপতির মধ্যে অদ্ভুত অনুকরণপ্রিয়তা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য প্রজাপতিদের স্বাভাবিক শত্রু যে একেবারেই নাই তাহা নহে। টিকটিকি, গিরগিটি, কোন কোন জাতের মাকড়সা ও পিপীলিকা সুযোগ পাইলেই ইহাদিগকে ধরিয়। খাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের অপকৃপ সৌন্দর্য ও বর্ণবৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া মানুষেরাও ইহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। বোধ হয় এই স্বাভাবিক শত্রুদের কবল হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন কোন জাতের প্রজাপতি ডানা মুড়িয়া গাছের পাতার অনুকরণ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বা দুর্গন্ধ ছড়াইয়া শত্রুকে পশ্চাদ্ধাবন হইতে নিবৃত্ত করে। আমাদের দেশীয় ‘মথ’-জাতীয় এক প্রকার খেত প্রজাপতি ঠিক পাখীর বিষ্ঠার অনুকরণ করিয়া থাকে। এই প্রজাপতিদের আকৃতি-প্রকৃতি অতি অদ্ভুত; দেখিতে ঠিক পাতলা টিসু কাগজের মত। ডানার পৃষ্ঠদেশে দুই প্রান্তে দুইটি কালো ফোঁটা আছে। মনে হয় যেন দুটি চোখ। ইহারা ডানা মেলিয়া পাতার গায়েব সঙ্গে এমন ভাবে লাগিয়া থাকে যে সূর্যনির্দিষ্ট আকৃতি সত্ত্বেও, বিশেষ মনোযোগ করিয়া না দেখিলে পাতার উপর চূর্ণের দাগের মত মনে হয়, ক্রমবিবর্তনের ফলেই হয়ত প্রজাপতির এই প্রকার অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ‘হয়ত’ বলিলাম এই জন্য যে,

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখিয়াছি—কোন কোন জাতের মাকড়সারা পিপীলিকার হুবহু অনুকরণ করিয়াও শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। আশেপাশে বিভিন্ন জাতের মাকড়সা থাকাসত্ত্বেও কোন কোন কুম্মীরে-পোকা, বাছিয়া বাছিয়া ঠিক একই রকমের বহুসংখ্যক পিপড়ে-মাকড়সা শিকার করিয়া তাহাদের গর্ভের মধ্যে রাখিয়া দেয়। ইহা হইতেই সন্দেহ জন্মে, প্রজাপতির অনুকরণপ্রিয়তাও সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক কি না।

পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যেই নির্দিষ্ট বিশ্রাম-স্থল উপভোগ করিবার এবং সেই সময়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বিবিধ প্রকারের সুরক্ষিত বাসস্থান নির্মাণ করিয়া তাহাতে আত্মগোপন করিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। যে-সকল প্রাণী বাস-স্থান নির্মাণ করে না তাহারাও নির্দিষ্ট বিশ্রাম উপভোগ করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদের আশে-পাশে অহরহ যে-সকল প্রজাপতি দেখিতে পাই তাহারা কেহই বাসা বাঁধে না; কিন্তু নিরুপদ্রবে অবসরকাল কাটাইবার জন্য আত্ম-গোপনোপযোগী বিশ্রামস্থল বাছিয়া লয়। ইহার ফলে সুরক্ষিত বাসগৃহ না থাকিলেও অপেক্ষাকৃত অনাবৃত স্থানে থাকিয়া ইহারা মানুষ বা অণ্ডাণ্ড শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশের কয়েক প্রকার সাধারণ প্রজাপতির বিশ্রামকালীন আত্মগোপন কৌশলের বিষয় আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে সচরাচর এক প্রকার দানা প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ডানা প্রসারিত করিলে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাশাপাশিভাবে দুই ইঞ্চিরও কিছু বেশী লম্বা হয়। ডানার উপরিভাগ দুধের মত সাদা; কিন্তু উভয় ডানার সংযোগস্থল হইতে কতকটা অংশ ঈষৎ হলুদে। ডানার নিম্নভাগ নীলাভ ফিকে সবুজ। উড়িবার সময় সাদা দিকটাই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। উড়িতে উড়িতে কখনও অল্প সময়ের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে উহারা সাধারণতঃ যমজপত্রসম্বিত গাছের পাতার উপর আধাআধি ডানা মেলিয়া বসে। পাতার রঙের সহিত ইহাদের গায়েব রং ও আকৃতি এমন ভাবে মিলিয়া যায় যে, অতি নিকটে থাকিয়াও ইহাদিগকে গাছের পাতা বলিয়া ভুল হয়। কিন্তু



ভর পাইলে, অথবা রাত্রিবাস করিবার সময় উড়িয়া গিয়া গাছের উঁচু ডালের পাতার উপর ডানা মুড়িয়া বসে। তখন পাতার রঙের সহিত এমন ভাবে মিলিয়া থাকে যে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাশাপাশিভাবে প্রায় তিন ইঞ্চি, সাড়ে-তিন ইঞ্চি লম্বা ফিকে হলদে রঙের এক প্রকার প্রজাপতিকে সর্বদাই ফুলে-ফুলে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাদের ডানার উপরে ও নীচে বড় বড় কতকগুলি কালো ফোঁটা আছে। ডানার এই বর্ণ-বৈচিত্র্যে বহুদূর হইতে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিশ্রাম করিবার সময় ইহারা পত্রবিরল লতার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ডানার গুটাইয়া এই জাতীয় লতার মধ্যে অবস্থানকালে লতার আঁকাবাকা উঁচুগুলির সঙ্গে মিলিয়া প্রজাপতির গায়ের রেখাগুলি এমন একটা দৃষ্টি-বিভ্রম উৎপাদন করে যে উহার মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা থাকা সত্ত্বেও প্রজাপতি লুকাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না।

এদেশের বনে জঙ্গলে 'লো-ফোঁটা' বা রক্ত-তিলক নামে ঘোর কালো রঙের এক প্রকার বড় বড় প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রজাপতির নিম্ন-ডানার প্রান্তভাগে অন্ধচন্দ্রাকার কতকগুলি রক্তবর্ণ ফোঁটা সারবন্দীভাবে অঙ্কিত থাকে, নিম্নভাগের ডানার মধ্যস্থলে পাশাপাশিভাবে কয়েকটি সাদা দাগ আছে। দিনের বেলায় ক্ষণিক বিশ্রাম করিবার সময় এবং রাত্রিকালে এই প্রজাপতিরা অন্ধকার ঝোপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ঝোপের মধ্যে গাঢ় সবুজ রঙের পাতার উপরই ইহারা বসিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্রজাপতিদের ডানার নিম্নভাগের রং ফিকে এবং নিম্নভ হইয়া থাকে এবং বসিবার সময় ডানা ভাঁজ করিয়া রাখে; কাজেই সহসা কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। কিন্তু এই রক্ত-তিলক প্রজাপতিদের ডানার নীচের দিক উপরের দিক অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। যে-কারণেই হউক, ইহারা ডানা ভাঁজ করিয়া বসে না; 'মথ'-জাতীয় প্রজাপতিদের মত ইহারা ডানা মেলিয়াই বিশ্রাম করে। কাজেই পৃষ্ঠদেশের অমুজ্জ্বল অংশই বাহিরের দিকে থাকে। অন্ধকার স্থানে গাঢ় রঙের পাতার উপর বিশ্রাম করিবার ফলে ইহারা অনায়াসে শত্রুর চোখে ধুলি নিক্ষেপ করিতে পারে।

আর এক প্রকারের কালো রঙের প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ক্ষুদ্রতর ডানা দুইটির প্রান্তভাগে সারবন্দীভাবে কতগুলি সাদা ফোঁটা থাকে। এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং নিম্ন ভাগের রং অপেক্ষা অনেক হালকা ও অমুজ্জ্বল। গাছের যে-সব পাতা শুকাইয়া কালো হইয়া কুলিয়া থাকে, এই প্রজাপতিরা সেই সব পাতার গায়ে বসিয়া অতি সহজে আত্মগোপন করিয়া থাকে।

এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি লম্বা হলদে রঙের এক প্রকার প্রজাপতিকে দলে দলে উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা বিশ্রাম-সময়ে এক প্রকার ফিকে হলদে রঙের পাতাওয়ালা ছোট ছোট গাছের ডালে ডানা মুড়িয়া বসিয়া থাকে। হঠাৎ দেখিয়া ইহাদিগকে সেই গাছের পাতা বলিয়াই মনে হয়।

দেড় ইঞ্চি দুই ইঞ্চি লম্বা 'মথ'-জাতীয় এক প্রকার প্রজাপতিকে গাছের পাতার উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অধিকাংশ সময়ই ইহারা বসিয়া কাটায় এবং মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে ডানা নাড়িয়া থাকে। প্রায়ই ইহাদিগকে আমগাছের উপর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের গুটার রং আমপাতার মত গাঢ় সবুজ এবং শরীর ত্রিকোণাকার, গুটাগুলি আমপাতার গায়েই কুলিয়া থাকে। পাতা ও গুটার রং এক হওয়াতে কদাচিৎ নজরে পড়িয়া থাকে। এই প্রজাপতির পৃষ্ঠদেশের রং ধূসর কিন্তু তলদেশ হালকা ধূসর বা গোলাপী রঙের। এই প্রজাপতিরা যখন পাতার উপর বসিয়া বিশ্রাম করে তখন পৃষ্ঠদেশই নজরে পড়ে এবং পাতার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙের বিশেষ কোন পার্থক্য বাঁধিতে পারা যায় না। ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে পাতার উপর বসিয়া থাকিলে ইহারা মোটেই নজরে পড়ে না।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা 'মথ'-জাতীয় পতঙ্গদের গায়ের রং সাধারণতঃ অনেক ক্ষেত্রেই ধূসর বা অমুজ্জ্বল বাদামী হইয়া থাকে। ইহারা ছোট ছোট গাছের শুষ্কপত্রের উপর নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে। তখন শুষ্ক পত্রের রং ও 'মথের' রং এমন ভাবে মিলিয়া থাকে যে সহজে ইহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না; মনে হয় যেন শুষ্ক পত্রেরই একটা ছিন্ন অংশ আটকাইয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে এই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর পতঙ্গের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে রং মিলাইয়া নির্ভ্রমে অবস্থান করিবার কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

চিত্রপরিচয়

উপরের সারি (বা দিক হইতে) : হলদে রঙের প্রজাপতি ডালের গায়ে পাতার ভাঁজ বসিয়া আছে। কাঞ্চনফুলের পাতার উপর সাদা প্রজাপতির বিশ্রাম—পাতার আকৃতি ও রঙের সহিত প্রজাপতির সৌম্যদৃশ্য বর্তমান (তন্নিম্নে, সাদা প্রজাপতি, সাধারণ ভাবে)। ঝোপের পাশে কালো রঙের পাতার মধ্যে রক্ততিলক প্রজাপতির আত্মগোপন (তন্নিম্নে, রক্ততিলক প্রজাপতি, সাধারণভাবে)। 'মথ' জাতীয় ধূসরবর্ণ প্রজাপতি পাতার উপর বসিয়া আছে (তন্নিম্নে, ঐ 'মথ'-জাতীয় প্রজাপতি)।

বা দিকে উপর হইতে দ্বিতীয় চিত্র : পাতার ঝোপে কালো

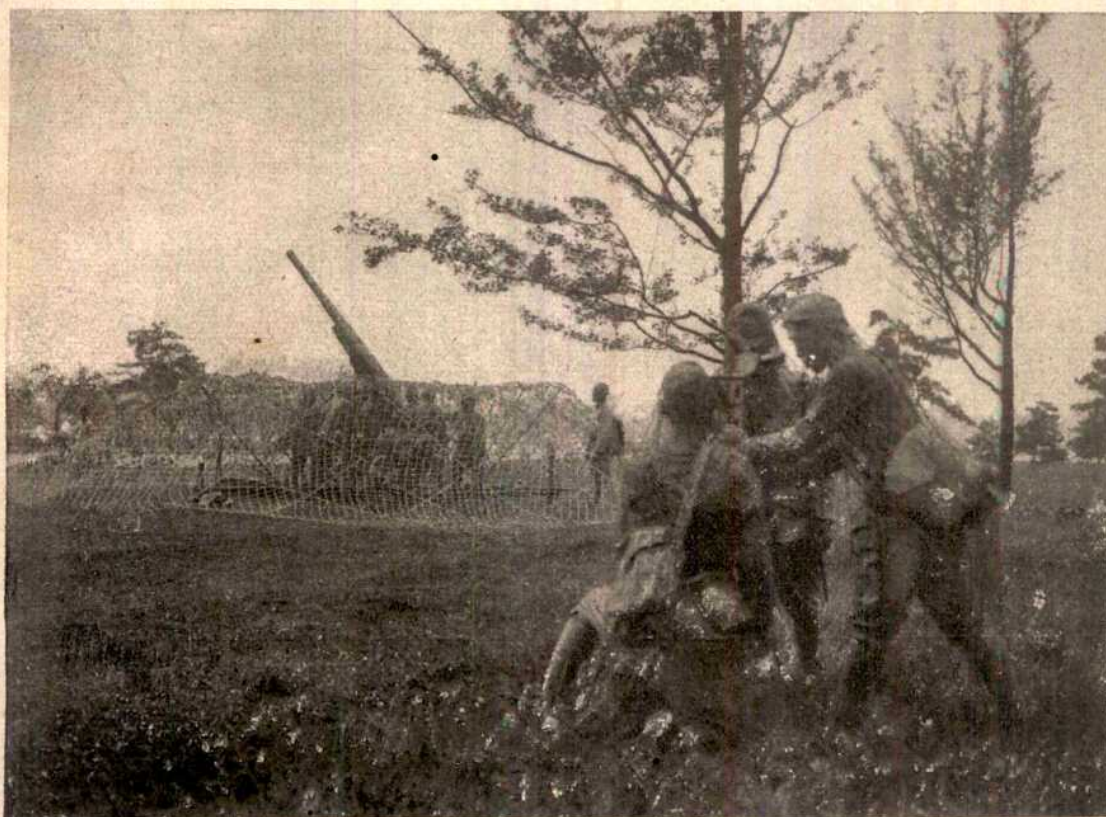
ফোঁটাওয়ালা হলদে প্রজাপতির : আত্মগোপন (তন্নিম্নে, ঐ প্রজাপতি, সাধারণ অবস্থায়)।

ডান দিকে উপর হইতে তৃতীয় চিত্র : সাদা ফোঁটাওয়ালা কালো প্রজাপতি শুষ্ক পত্রের সহিত ডানা মিলাইয়া আছে (তন্নিম্নে, ঐ প্রজাপতি সাধারণ অবস্থায়)।

নিম্নের সারির মধ্যভাগের চিত্র : ক্ষুদ্র ডানাওয়ালা 'মথ'-জাতীয় পতঙ্গ গাছের শুষ্ক পত্রের সঙ্গে রঙ মিলাইয়া আছে (তৎপার্শ্বে, ঐরূপ পতঙ্গ, সাধারণ অবস্থায়)।



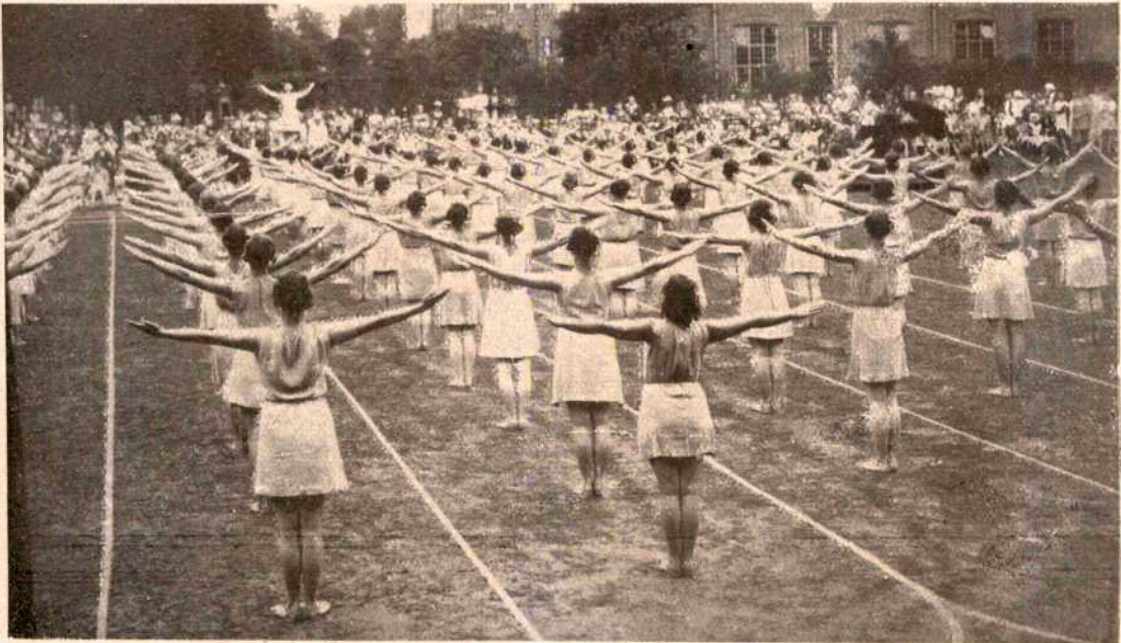
বিমানযোগে আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জগা জাপানে দেশবাসীকে প্রস্তুত করা হইতেছে। বিমানযোগে নিষ্কিন্ত বোমায়
প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কিরূপে নির্বাপন করিতে হইবে, জাপানের রমণীগণ তাহা শিক্ষালাভ করিতেছেন



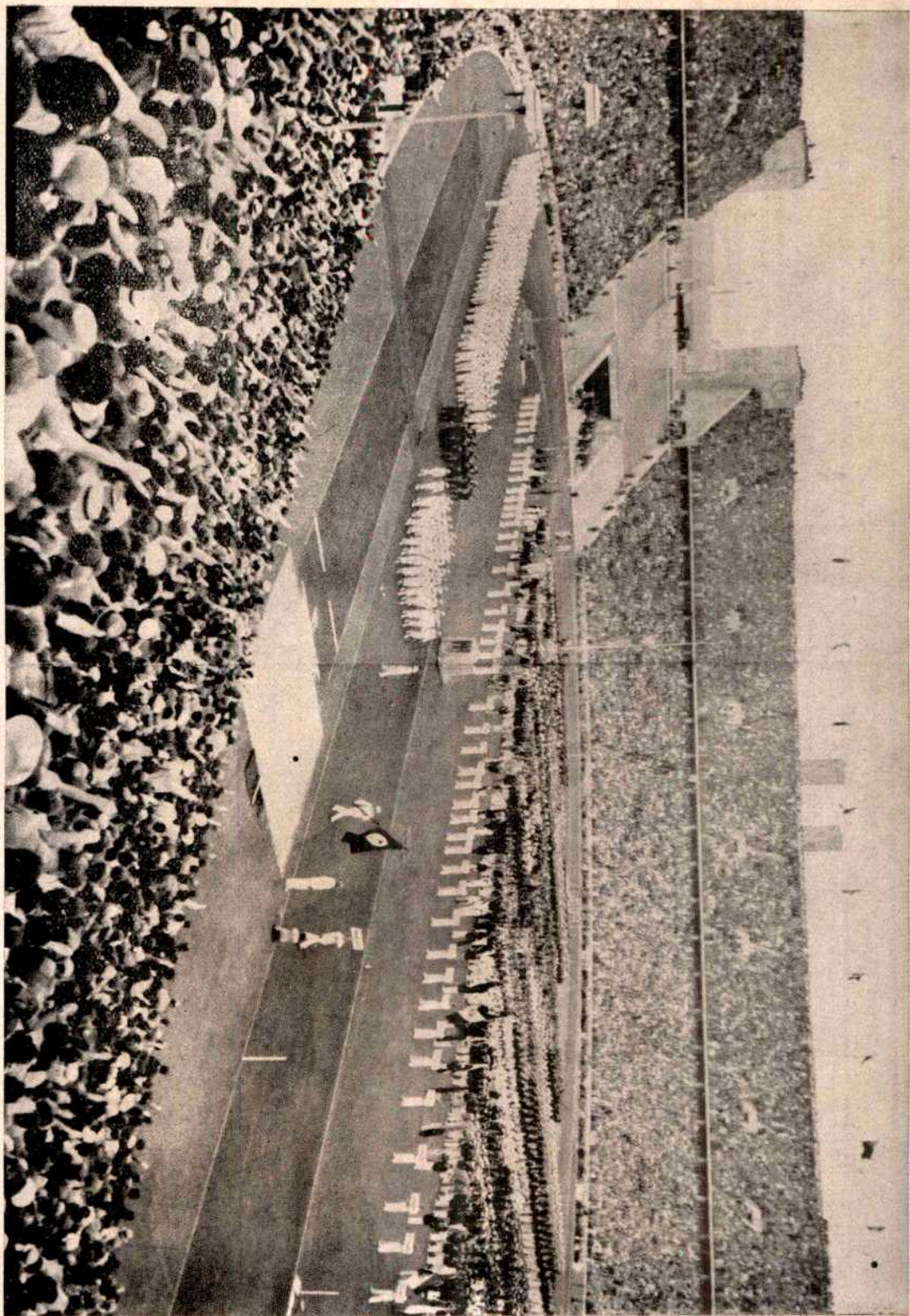
কল্পিত শত্রুসমূহ বিমানের অপেক্ষায় বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধক বন্দুকধারীগণ



বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধে শিক্ষিত জনসাধারণকে জাপানের প্রিন্স হিগাসিকুনি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন

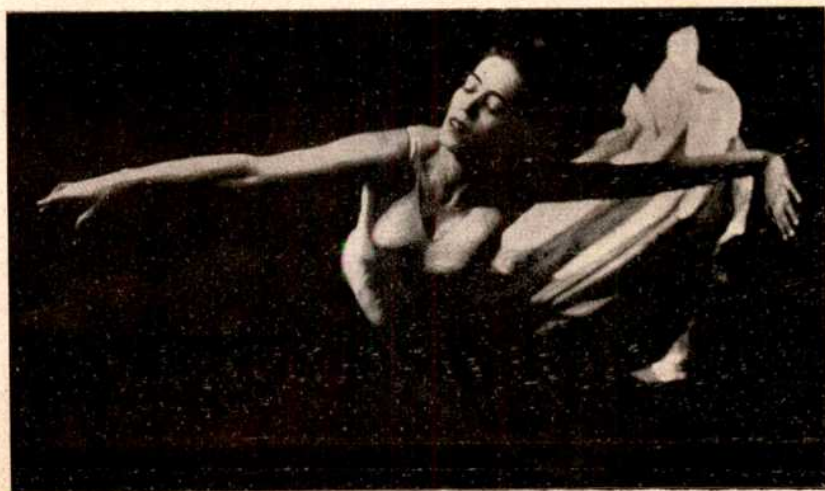


ইংলণ্ডের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামচর্চা

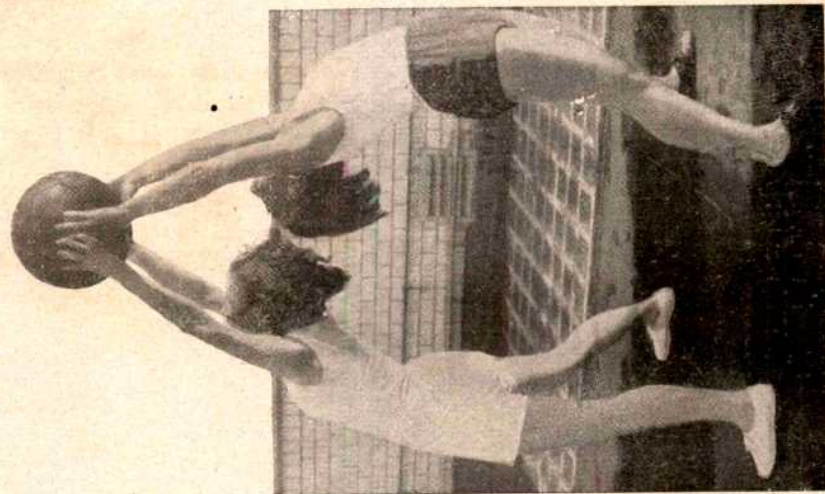


কিডনাঙ্গা

জাশ্বেনীতে ওলিম্পিক ক্রীড়া-সংশ্লিষ্ট নতাবলা : জাশ্বেনীক প্রামাণ্যের অবসর-বিনোদন



মেরী উইগম্যান



শ্রমিক-তরুণীদের ক্রীড়া



মারিয়ান ভোগেলস্‌



বিদেশ

সুদান

সুদানে রাষ্ট্রাধিকার কাহার?

আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব অধিপতি আমান-উল্লা পরাবীন ভারত-সরকারের সহিত কোনও সন্ধি স্থাপন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—তিনি সন্ধি স্থাপন করিলেন ভারতাবিধিপতি ইংলণ্ডের সহিত। কিন্তু শক্তিশালী ইংলণ্ডের অধিপতি তুরস্কের সোলতানের অধীন মিশরের খেদিবের সহিত সুদান সম্পর্কে এক চুক্তি করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, আর এই চুক্তিবলেই ইংলণ্ড আজ সুদানের শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। তারপর মহাব্যবসার কালে মিশর তুরস্কের সহিত সম্পর্ক-শূন্য, ইংলণ্ডের 'রক্ষিত' বা আশ্রিত রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হইল (১৯১৭); তৎকাল তুরস্ক কোন বাধা উপস্থিত করিতে পারে নাই। কতিপয় বৎসর পর (১৯২২) কয়েকটি বিশেষ অধিকার আপন আয়ত্তাবাহীনে রাখিয়া মিশরকে 'স্বাধীন' রাষ্ট্র বলিয়া ইংলণ্ড ঘোষণা করিল, তদ্ব্যতীত সুদানের শাসনাধিকার একটি। কিন্তু মিশর সুদানে তাহার স্বাধীন অধিকার দাবী করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই।

সুদান-সমগ্র সম্পর্কে তুরস্ক সম্পূর্ণরূপে নীরব। তুরস্কের সোলতানকে উপেক্ষা করিয়া খেদিব বা প্রতিনিধির সহিত চুক্তির মূল্য কতটুকু, তাহার সার্বভৌমিকত্ব উপেক্ষা করিয়া খেদিব পরাজয়ে সোলতান হওয়ারান্তে মিশররাজের সুদানের দাবী অব্যাহত আছে কিনা—তুরস্ক এ-সকল প্রশ্ন কখনও উত্থাপন করে নাই। এজন্য প্রশ্ন উঠিতে পারে—ইংলণ্ড কিংবা মিশর কেহই আজ মনে করিতেছে না। সুদান-সমগ্র আজ এই দুই জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

যদি সুদানের উপর মিশর অধিকার প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে, তবে মিশর এক বিরাট মরুভূমিতে পরিণত হইবে। বিতীয়তঃ মিশর ক্ষুদ্র, সুদান বৃহৎ; মিশরের কৃষকগণের পক্ষে স্বদেশ অতি ক্ষুদ্র, সুদানে তাহাদের বিস্তৃত কর্ষক্ষেত্র পাওয়া যাইবে। তাই সুদানের উপর তাহার দাবী মিশর ত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

মিশরের এই প্রয়াস সর্বদা শাস্ত্র পথ অনুসরণ করে নাই; একবার কতরূপে সেবা দিয়াছিল (১৯২৪); কিন্তু এ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল, ফলে সুদানের শাসনব্যাপারে মিশরের যে নামাঙ্ক অধিপত্য ছিল তাহাও হার পাইল—মিশরের সৈন্যবাহিনী আর সুদানের কোন দূর্গ নাই, মিশর-বাসীর এখন সামান্য কেরানীগিরি বা অগাধ নগণ্য পদে রাজকাণ্ডে নিযুক্ত হয় মাত্র। অথচ মিশর হইতে সুদানের বায়ু নির্বাহের জন্ত ৭৫০,০০০ মিশরীয় পৌণ্ড সাহায্য গ্রহণ করিতে ইংরেজ অংশীদার কুণ্ঠিত নহেন। শুধু তাহাই নহে, নীল-(রূ. ও খেত) নদের উপর সুবৃহৎ সেতু, সুদান বন্দর নীল-লোহিত সাগর ও এল-ওবেইদ রেলপথ—মিশরের অর্থ সাহায্য না পাইলে ইহার কোনওটি নির্মিত হইত কি? ইহা হইতে যে আয় হয় মিশরকে তাহার কোন অংশ দেওয়া হয় কি? মূলধন প্রত্যর্পণ দূরের কথা—সামান্য ক্ষণও দেওয়া হয় না।

ইঙ্গ-মিশর চুক্তির প্রধান সর্ব এই যে, মিশরাধিপতি, সুদানের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রীমণ্ডলের মনোনীত ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করিতে হইবে। অতরাং এই নিযুক্ত করিবার অধিকারে মিশররাজের সুদানের উপর অধিপত্য খীকৃত হইলেও তাহা নিরঙ্কুশ নিযুক্ত নহে, ক্ষমতা এত পর্ব ও সীমাবদ্ধ যে সে-অধিকার প্রকৃত পক্ষে নামসর্বশূন্য মাত্র। শুধু তাহাই নহে, মিশরের কোন আইন সুদানে প্রযোজ্য নহে, কোন বৈদেশিক দূত বা কনসাল মিশর সুদানে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সুদানে ইংলণ্ড ও মিশর—উভয় দেশের জাতীয় পতাকা উড়ানোমান হইবে। অতর্কাতিক-ব্যবহারশাস্ত্রবিদ কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে সুদান একা ইংলণ্ড বা মিশরের সম্পত্তি নহে, এই দুই শক্তির যৌগবিশিষ্ট। যদি তাহাই হয় তবুও সুদানে মিশর ও ইংলণ্ডের সমানাধিকার। কিন্তু মিশর স্বরাষ্ট্রো-অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, সুদানে তাহার দাবী স্থপতিষ্ঠ করিবে কিরূপে?

মিশরে আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সুদানে দাবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলিতেছে। কারণ প্রথমটির প্রতিষ্ঠা বিতীয়টির উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। মিশরের ভূমিসম্পদ নির্ভর করে একমাত্র নীলনদের উপর; সুদানের কর্তৃত্ব যিনি অধিকার করিবেন, তিনি নীলনদের জল নিয়ন্ত্রিত করিবেন। মিশর এই অর্থ সাহায্য করিলেন কেন? কারণ মিশরবাসীদের বিশ্বাস যে সুদান মিশরের বিস্তৃত ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মিশরের ওয়াহিদুল দলের প্রতিষ্ঠাতা জগলুল পাশা তাই অকুণ্ঠিত ভাষায় দাবী করিয়াছিলেন—সুদান আমাদের, তাহা আমাদেরকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই দলের বর্তমান নেতা নাজমুদ্দীন পাশা যখন প্রথম ইংলণ্ডে সন্ধির আলোচনা করিয়াছিলেন (১৯০০) তখন সুদান-সমগ্র সম্পর্কে ইংলণ্ডের মনোভাব বৃদ্ধিতে পারিয়া দাবী কমাইয়া এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রস্তাবিত সন্ধিপত্র অল্প-মোদনের এক বৎসরের মধ্যে সুদান-সমগ্র সম্পর্কে চরম সীমাংসা আলোচনা করার প্তির করিতে হইবে অথবা ইংলণ্ড যদি এই নির্দিষ্ট কাল অল্প বলিয়া মনে করেন তবে সুদানে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বাধিকার পুন্যায় প্রবর্তন করিয়া তৎপরে, কোন সময় নির্দিষ্ট ন করিয়া, এই আলোচনা চলিবে। ইংলণ্ড এ-প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হয় নাই। তবে ইংলণ্ড অল্পগ্রহ প্রকাশ করিয়া সুদান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন—মিশরের নিকট সুদানের স্ব-রূপ আছে মিশরীয় ও ইংলণ্ডীয় বিশেষজ্ঞগণ এ প্রশ্ন আলোচনা করিবেন এবং যদি ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি একবৎসর ভাল ভাবে চলে তবে সুদানে মিশরের এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য রাখা যায় কিনা সে প্রশ্ন ইংলণ্ড 'সহানুভূতিসম্পন্ন ভাবে' আলোচনা করিবেন।

ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কি ইংলণ্ডীয় কি মিশরীয় কেহই সুদানে প্রবেশ বা বসবাস করিবার ব্যবস্থা পায় না, কিন্তু এই অনুমতি লাভের জন্ত যে সকল সর্ব পূরণ করিতে হয় তাহা উভয়ের পক্ষে এক নহে। পূর্বোক্তিতে সর্ব ইংলণ্ডের দৃঢ় আগ্রহ দেখিয় নাহাস পাশা ঐ সকল বিষয়ে আর বেশী উচ্চবাচ্য করেন নাই, তবে এক দাবী করিলেন যে সুদানে মিশরবাসীর অবাধগমনের অধিকার থাকিবে। ইংলণ্ড এ-প্রস্তাবেও সন্তুষ্ট হয় নাই ফলে সন্ধি আলোচনা ফাঁসিয়া যায়।

ক্যাল কেমি কেম - কেশ প্রসাধনী

যুৱতি সংযুত
মহাভূস্মরাজ কেশ তৈল

চুল ঘন কালো করে
ও
যান্ত্রিক শীতল
হাথে



ভূঙ্গল

গন্ধরাজের
স্বগন্ধযুক্ত
বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল
কেশ বর্দ্ধন
করে



কোকোনল

শুভ্র হৃগন্ধি
লাইম জুস মিসারিং
কেশের পারিপাট্য সাধন
করে



লাইজু

কেশমার্জন ও
মাথামস্মার জন্ত
হৃগন্ধি "শ্যাম্পু"
বা
সাবানের নির্যাস



শিলট্রেস

চামেলিগন্ধ
বিশুদ্ধ
তিল তৈল
শীতল ও
প্রীতিকর



তিলেল

মিষ্ণু যুৱতি
বিশুদ্ধ ক্যান্টার অয়েল
টাকপড়া
রোধ করে



কাষ্টরেল

ক্যালকাটা কেমিক্যাল বালিগঞ্জ কলিকাতা

সম্প্রতি নতুন করিয়া ইংলও ও মিগরে যে সন্ধি হইয়াছে তাহাতে নির্ধারিত হইয়াছে যে হুদান ইঙ্গ-মিশরীয় প্রথম চুক্তি বলেই শাসিত হইবে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন্মাসের পর অংশীদারেরা যে সকল নাযা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল—এখন তাহা লাভ করিল, সন্ধির প্রথম ও প্রধান লাভ ইহাই।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

বিদেশে ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র-সম্মেলন

গত ১৮ই জুলাই হইতে ২২শে জুলাই চেকোজোভাকিয়া-প্রাগ শহরে প্রবাসী ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র-সম্মেলনের যষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তৃত্তা-প্রসঙ্গে বলেন :

“ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভারতবর্ষের কোন প্রকৃত প্রতিনিধি নাই। আমাদের সম্মিলন বিদেশে এই ভারত-পরিচয়ের ভার গ্রহণ করিতে পারে। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের কথা, বর্তমান আশা ও আদর্শের কথা, আঘাত-সংগ্রামের কথা, বিদেশে সম্যক প্রচারের ও অস্বকূলা জনমত গঠনের ভার আমাদের লইতে হইবে।”

সম্মিলনে সংগঠনমূলক অনেক প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সপ্ততিবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে আনন্দ-স্মৃচক একটি প্রস্তাবও সম্মিলনে গৃহীত হয়।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়→



ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মাঝলা জয়ের

নির্ভুল প্রমাণ

কুমারের জীবন-বীমা সম্পর্কে ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্ট।

স্মৃতির

জীবন-বীমার আর একটি সার্থকতা প্রমাণিত হইল।

আপনিও

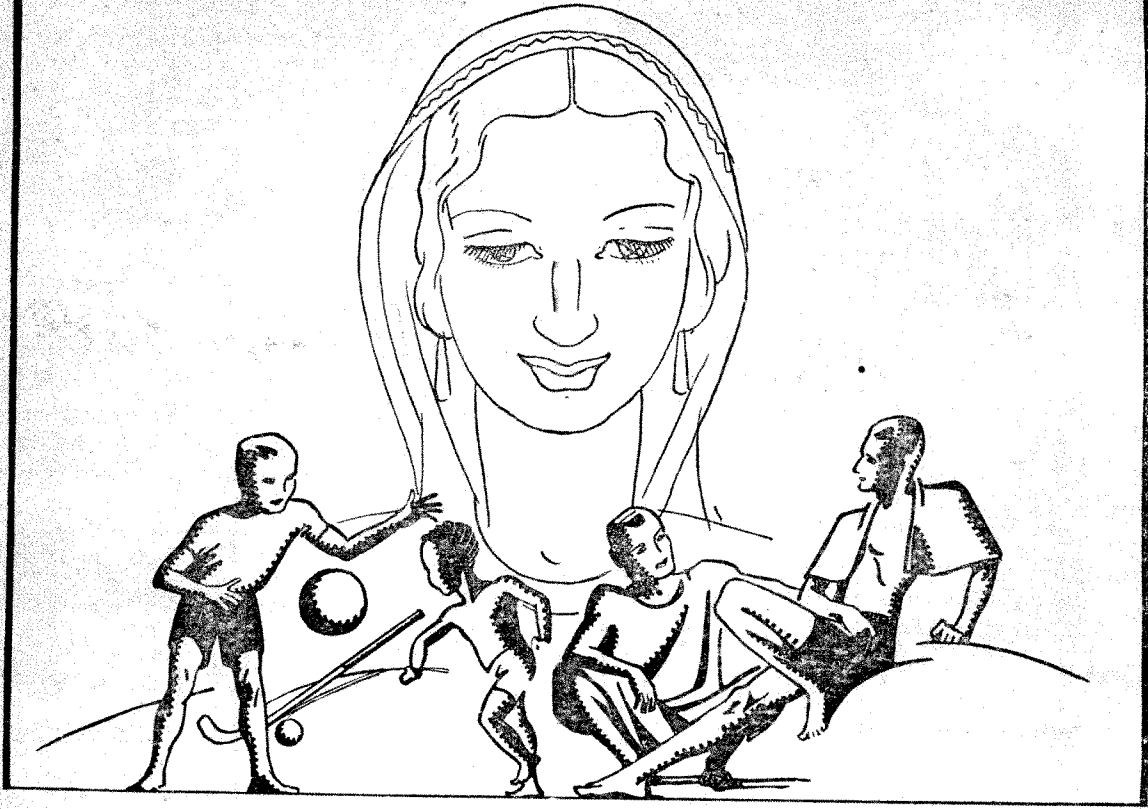
বাংলার উন্নতিশীল ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স ও রিয়াল প্রপার্টি কোম্পানীতে

অনিচ্ছা বীমা করুন!

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।

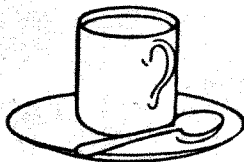
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব আপনারই



ছেলেমেয়েরা নিজেরা যতটা মনে করে, তার চেয়ে অনেক বেশী তারা আপনার মুখাপেক্ষী, তারা খুব ভাড়াভাড়া বড় হয়ে উঠছে হয়তো, তবু এখনো তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব আপনারই। এখন যে সব স্ব-অভ্যাস তাদের মনে বদ্ধমূল ক'রে দেবেন সেইগুলিই তাদের সব চেয়ে কাজে লাগবে, যখন তারা বড় হয়ে সংসার-সংগ্রামে নামবে।

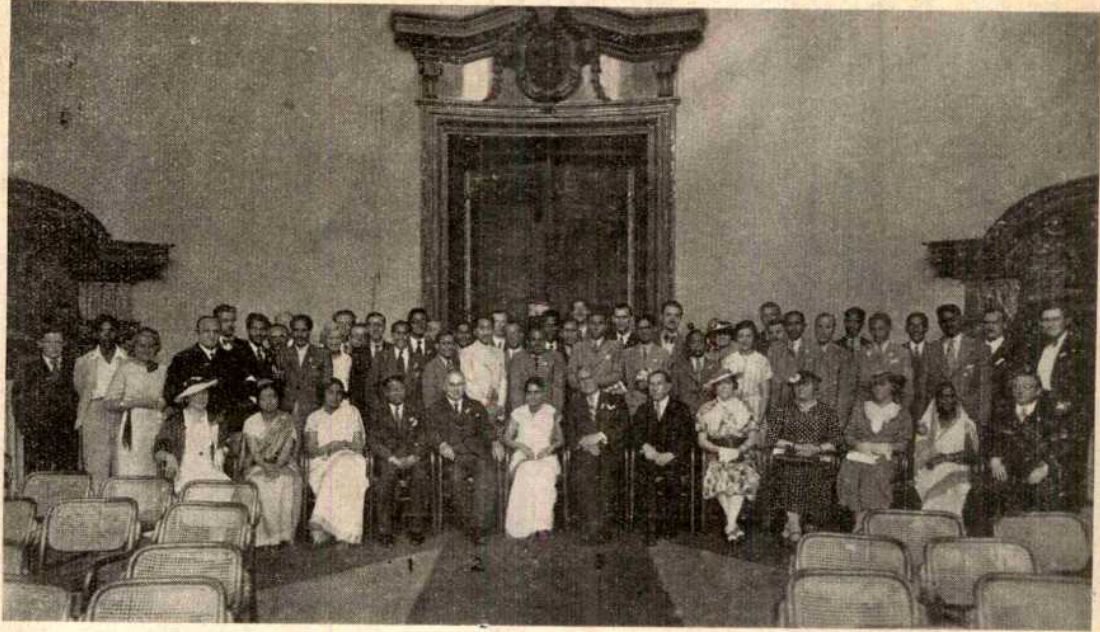
সংসারের যারা আদর্শ কর্তা, তাঁরা সব সময়ই ছেলেমেয়েদের মনে ব্যায়াম, খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে ভালো ধারণা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাদের ভেতরে চা পানের অহুসার বাতান যে ভাল একথা তাঁরা জানেন। এই বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর পানীয় পান ক'রে তাদের শরীর ও মনের উন্নতি হচ্ছে—পরে বয়স হ'লে এ অভ্যাসে তাদের নিশ্চয়ই উপকার হবে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



টাক্কা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চাষের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা



ভারতীয় ও সিংহলী ছাত্র-সম্মিলন : ১। শ্রীনিহাররঞ্জন রায়, ২। ডাঃ বাক্সা, আগের মেয়র, ৩। অধ্যাপক লেজান

শারদীয়া আনন্দ বর্ধনে শ্রেষ্ঠ সন্তার ল্যাড্‌কো প্রসাধন দ্রব্যাদি

সুগন্ধ
ক্যাপ্টার অয়েল

সুগন্ধ
গ্লিসারিন সোপ

*

কুন্তলা

*

মনোহর
লাইম জুস গ্লিসারিন

গন্ধ-তৈল

ল্যাড্‌কো
ক্রিম :: স্নো

ইত্যাদি ভাল দোকান মাত্রই পাইবেন

ল্যাড্‌কো • কলিকাতা



নরওয়ে অসলোতে সান্ধীর কাঠগড়ায় ট্রটস্কি



রুশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিটভিনক

গ্রহস্থের নিত্য বন্ধু—সর্বদা কাছে রাখিবেন

- ১। অমৃতবিন্দু—ফোঁটাকয়েক সেবনে পেটের ব্যথা ভাল করে, ঘ্রাণে সর্দি সারে ও মালিশে বেদনা দূর করে।
- ২। বালকামৃত—শিশুদের পেট ব্যথা, বদহজম ইত্যাদি সর্ববিধ পেটের রোগে একমাত্র বন্ধু।
- ৩। ক্যাম্পাস্প—“সানলেট” সেবনে মাথাধরা, মাথাব্যথা, গা-হাত-পা কামড়ান প্রভৃতি যাবতীয় বেদনা দূর করে।
- ৪। ক্লোরাজল—রোগবীজনাশক ও দুর্গন্ধ নিবারক, পানীয় জল শোধক আশ্চর্য ঔষধ।
- ৫। ডারমশ—কাটা, হাজা পোড়া ইত্যাদি ঘায়ে ও চর্মরোগে উত্তীর্ণ অব্যর্থ মলম।
- ৬। ফেব্রোকুইন—(“সানলেট” বটিকা) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর নাশ করিতে অদ্বিতীয়।
- ৭। পেনোবাম—সর্বপ্রকার আঘাত ও বাত জনিত বেদনানাশক আশু ফলপ্রদ আশ্চর্য মলম।
- ৮। সেলিকুইন—(“সানলেট”) ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিশোধক, সর্দিজ্বর উচ্ছেদক বটিকা।
- ৯। সান-ল্যাক্স—চকলেট-মিশ্রিত ও সুস্বাদু মুহু বিরেচক বটিকা; শিশুরাও সহজে ব্যবহার করেন।
- ১০। টাইকোমির্নট—(“সানলেট”) পেট-কামড়ানি, বদহজম, ইত্যাদি পেটের রোগে আশুফলপ্রদ বটিকা।

Sun Chemical Works

54, EZRA STREET, POST BAG NO. 2.
CALCUTTA

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থা হইতেই ভারতবর্ষের চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য বিষয়ক সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রশংসনীয় অনুসন্ধান সাধনা দেখাইয়া আসিতেছেন। তিনি অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান দ্বারা এই সকল বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভবিষ্যতে তাহার সমধিক কৃতিত্বের সূচনা করে। কয়েক মাস পূর্বে তিনি ব্রহ্মদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ ও অনুসন্ধান করিয়া তথায় কয়েক শতাব্দী আগে আগত বাঙালী উপনিবেশিকদের মন্ডান পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয়। এত আগেকার বাঙালী ব্রহ্মদেশে আছেন তাহা আমরা জানিতাম না। কয়েকদিন পূর্বে কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কাছে জয়পুর রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত পারালাল দাস বলিতেছিলেন, তিনি একবার জয়পুরে একদল ব্রহ্মদেশীয় বাঙালী পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা কতকটা ব্রহ্মদেশীয় হইয়া পিয়াছে। তাঁহারা প্রায় ২০০-২৫০ জন তীর্থ দর্শন করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন : চতুর্দশ অধিবেশন

প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন আগামী বড়দিনের অবকাশে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের কাণ্ড্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। সম্মেলনের কাণ্ড্যালয় বর্তমানে সি।৫৪, হিঙ্গু ; পোঃ হিঙ্গু, রাঁচি, এই ঠিকানায় অবস্থিত। সম্মেলন-সংক্রান্ত পত্র বাবহার এই ঠিকানায় করিতে হইবে।

রাঁচি অধিবেশনে প্রবাসী বাঙালীর চিরহিতৈষী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একাধিক সপ্ততিতম বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করা হইবে এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হইবে বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশনের মূল ও বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিত্ব করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মূল ও সাহিত্য—রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিক—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

(প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর সম্পাদক)

অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ পিএইচ-ডি।

(লক্ষ্মী বিধবিদ্যালয়)

সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু। (সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বারাগমী।)

ইতিহাস, বৃহত্তর-বঙ্গ ও নৃত্য—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়,

এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি। (লক্ষ্মী বিধবিদ্যালয়)

মহিলা বিভাগ—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।

অবশিষ্ট বিভাগগুলির সভাপতি নির্বাচিত হইলে বিজ্ঞাপিত হইবে।

শ্রীমলিনীকুমার চৌধুরী,

সহকারী সম্পাদক, প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন

চতুর্দশ অধিবেশন, রাঁচি।



বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়

এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙালী রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সংযুক্ত-প্রদেশে আিয়া ইনি আলিগড়ে ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৮০ সালে ইনি মুনসেফ হন এবং নানা শহরে নানা পদে ক্রমান্বয়ে লাভ করিয়া ১৯০৭ সালে কানপুরে ছোট আদালতে জজরূপে অবসর গ্রহণ করেন এবং এলাহাবাদে স্থায়ীভাবে বাস করেন। ইহার পরলোক গমনে এলাহাবাদের ও এই অঞ্চলের বাঙালী ও অ-বাঙালী সমাজ বিশেষ সমুত্তপ্ত।

ভ্রমসংশোধন

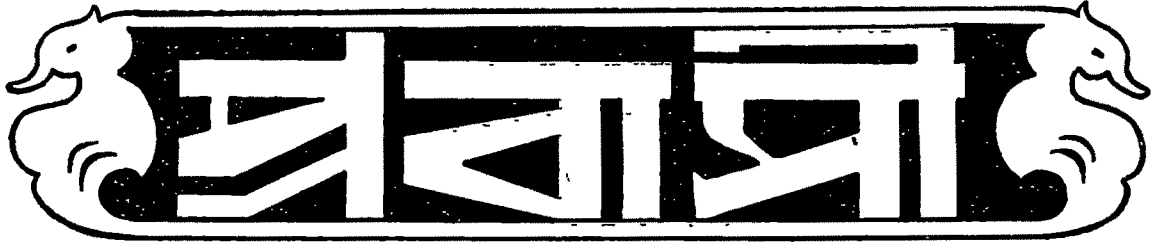
আমাদের প্রবাসীতে অন্ধ্রদেশ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, কোকানাদার ডাক্তার বৃষ্ণম্যার পুত্র বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে শিক্ষানবীস আছেন। ইহা ভ্রম। সেখানে তাহার কাজ শিবিবার কথা হইয়াছিল বটে; কিন্তু তিনি কলিকাতার অস্ত্র একটি রাসায়নিক কারখানায় প্রবেশ করেন।



দারবর্তিনী

শ্রীমদভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



“সত্যম্ নিবম্ হৃদয়ম্”

“নাম্মায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৬শ ভাগ }
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

{ ২য় সংখ্যা

ঘট ভরা

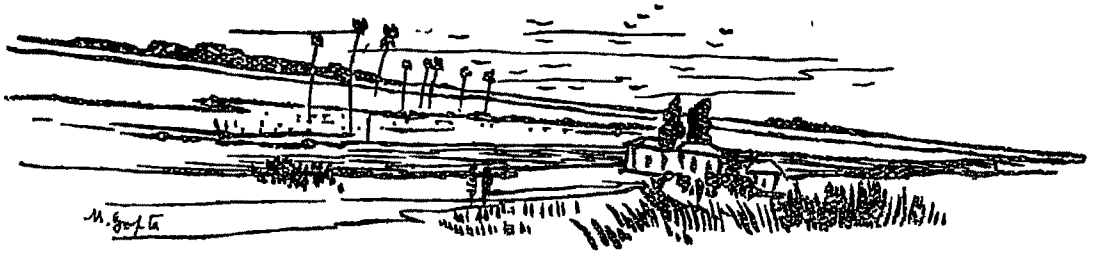
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“শেষ সপ্তকে” সাতাশ-সখ্যক এই কবিতাটি হিন্দোহীন গল্পে প্রকাশিত হয়েছে,
প্রথমে সেটা মিলহীন পড়ছন্দে লেখ হয়েছিল। তাবই পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে
পাঠানো হ’ল। শান্তিনিকেতন ২৪শে আশ্বিন ১৩৪৩

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকল পেতে রাখি
ঝরণাখরার নিচে।
বসে থাকি একটি খারে
শেঙলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
সবুজ দিনে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝরঝরানির নব ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে জ্বল শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ বায় পেরিয়ে
বেগনি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ঐ হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,

বলদ ছুটোর পিঠে বোকাই
 শুকনে কাঠের ভাঁটি ;
 রুসুঝুসু ঘণ্টা গলায় বাঁধা ।
 বরবরানি আকাশ ছাপিয়ে
 ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
 পথহারানো দূর বিদেশে ।

রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রং,
 উঠল সাদা হয়ে ।
 বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে ।
 বেলা হ'ল, ডাক পড়েছে ঘরে ।
 ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়
 “দেখি করলি কেন ?”
 চুপ ক'রে নব শুনি ;
 ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
 উপচে-পড়া জলের কথা
 বুঝবে না ত কেউই



নারী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আত্মশক্তি। এই সেই শক্তি যি জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

পৃথিবীকে জীবের বাসযোগ্য করবার জন্তে অনেক ক্লম গেছে ঢালাই পেটাই করা মিস্ত্রীর কাজে। সেটা আধখানা শেষ হ'তে-না-হ'তেই প্রকৃতি স্বক করলেন জীবসৃষ্টি। পৃথিবীতে এল বেদনা। প্রাণসাধনার সেই আদিম বেদনা প্রকৃতি দিয়েছেন নারীর রক্তে, নারীর হৃদয়ে। জীব-পালনের সমস্ত প্রযুক্তিজাল প্রবল ক'রে জড়িত ক'রেছেন নারীর দেহ মনের তন্তুতে তন্তুতে। এই প্রযুক্তি স্বভাবতই চিন্তবৃত্তির চেয়ে হৃদয়বৃত্তিতেই স্থান পেয়েছে গভীর ও প্রশস্ত ভাবে। এই সেই প্রযুক্তি, নারীর মধ্যে যা বন্ধনভাঙ গাঁথছে, নিজেকে ও অন্তকে ধরে রাখবাব জন্তে প্রেমে বেহে সৰুসর খেঁচে। মানব-সংসারকে গড়ে তোলবার বেঁচে রাখবার এই আদিম বাঁধুনি। এ সেই সংসার যা সকল সমাজের সকল সভ্যতার মূলভিত্তি। সংসারের এই গোড়াকার বাঁধন না থাকলে মানুষ ছড়িয়ে পড়ত আতঙ্ক-প্রকার-হীন বাষ্পের মত; সহ্য হ'য়ে কোথাও মিলনক্ষেত্র স্থাপন করতে পারত না। সমাজবন্ধনের এই প্রথম কাজটি মেয়েদের।

প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া গভীর গোপন, তার স্বতঃপ্রবর্তনা দ্বিধাবিহীন। সেই আদি প্রাণের সহজ প্রবর্তনা নারীর স্বভাবের মধ্যে। সেই জন্ত নারীর স্বভাবকে মানুষ রহস্যময় আখ্যা দিয়েছে। তাই অনেক সময়ে অকস্মাৎ নারীর জীবনে যে সংবেগের উজ্জ্বল দেখতে পাওয়া যায় তা তর্কের অতীত—তা প্রয়োজন অল্পসারে বিধিপূর্বক খনন করা জলাশয়ের মত নয়, তা উৎসের মত, যার কারণ আপন অহেতুক রহস্যে নিহিত।

প্রেমের রহস্য, মেহের রহস্য অতি প্রাচীন; এবং দুর্গম। সে আপন সার্থকতার জন্তে তর্কের অপেক্ষা রাখে না।

যেখানে তার সমস্তা সেখানে তার দ্রুত সমাধান চাই। তাই গৃহে নারী যেমনই প্রবেশ ক'বেছে, কোথা থেকে অবতীর্ণ হ'ল গ্রহিণী, শিশু যেমনই কোলে এল, মা তখনই প্রস্তুত। জীবরাজ্যে পরিণত বুদ্ধি এসেছে অনেক পরে। সে আপন জায়াগা খুঁজে পায় সন্ধান ক'বে, যুদ্ধ ক'বে। দ্বিধা মিটিয়ে চলতে তার সময় যায়। এই দ্বিধার সঙ্গে কঠিন হৃদয়েই সে সবলতা ও সকলতা লাভ করে। এই দ্বিধা-ভরজের ওঠা-পড়ায় শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, সাংঘাতিক ভ্রম জমে উঠে বার বার মানুষের ইতিহাসকে দেয় পর্য্যন্ত ক'রে। পুরুষের সৃষ্টি বিনাশের মধ্যে তলিয়ে যায়, নতুন ক'রে বাঁধতে হয় তার কীর্তির ভূমিকা। পালটিয়ে পালটিয়ে পরীক্ষায় পুরুষের কৰ্ম কেবলই মেহ পরিবর্তন করে। অভিজ্ঞতার এই নিত্য পরিক্রমণে যদি তাকে অগ্রসর করে তবে সে বেঁচে যায়, যদি ভ্রষ্ট-সংশোধনের অবকাশ না পায় তবে জীবন-বাহনের ফাটল বড় হয়ে উঠতে উঠতে তাকে টানে বিলুপ্তির কবলের মধ্যে। পুরুষের রচিত সভ্যতার আদিকাল থেকে এই রকম ভাঙা-গড়া চলছে। ইতিমধ্যে নারীর মধ্যে প্রেমসী, নারীর মধ্যে জননী প্রকৃতির দৌতো স্থির প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপন কাজ ক'রে চলেছে। এবং প্রবল আবেগের সংঘর্ষে আপন সংসারের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ড করেও আসছে। সেই প্রলম্বাবেগ যেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রলয়লীলারই মত, বড়ের মত, দাবদাহের মত, আকস্মিক, আত্মঘাতী।

পুরুষ তার আপন জগতে বারে বারে নতুন আগন্তুক। আজ পর্য্যন্ত কতবাব সে গ'ড়ে তুলেছে আপন বিধি বিধান। বিধাতা তাকে তার জীবনের পথ বাঁধিয়ে দেন নি; কত দেশে কত কালে তাকে আপন পথ বানিয়ে নিতে হ'ল। এক কালের পথ বিপথ হয়ে উঠল আর এক কালে, উলটিয়ে গেল তার ইতিহাস। করলে সে অন্তর্ধান।

নব নব সভ্যতার উলটপালটের ভিতর দিয়ে নারীর

জীবনের মূলধারা চলেছে এক প্রশস্ত পথে। প্রকৃতি তাকে যে হৃদয়-সম্পদ দিয়েছেন নিত্য কৌতূহলপ্রবণ বুদ্ধির হাতে তাকে নূতন নূতন অধ্যবসায়ে পরখ করতে দেওয়া হয়নি। নারী পুরাতনী।

পুরুষকে নানা দ্বারে নানা আপিসে উমেদারিতে যোয়। অধিকাংশ পুরুষই জীবিকার জন্তে এমন কাজ মানতে বাধ্য হয় যার প্রতি তাব ইচ্ছার তার ক্ষমতার সহজ সম্মতি নেই। কঠিন পবিত্রমে নানা কাজের শিক্ষা তার করা চাই—তাতে বাবো আনা পুরুষই যথোচিত সফলতা পায় না। কিন্তু গৃহীকপে জননীকপে মেয়েদের যে কাজ, সে তার আপন কাজ, সে তার স্বভাবসম্মত।

নানা বিঘ্ন কাটিয়ে অবস্থার প্রতিফলতাকে বীর্ঘের দ্বারা নিজের অহুগত করে পুরুষ মহত্ব লাভ করে। সেই অসম্মারণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ পুরুষের সংখ্যা অল্প। কিন্তু হ্রয়ের রসধাবায় আপন সংসারকে শস্তাশালী করে তুলেছে এমন মেয়েকে প্রায় দেখা যায় ঘরে ঘরে। প্রকৃতিব কাছ থেকে তারা পেয়েছে অশিক্ষিতপটুত্ব, মাধুর্যের ঐশ্বর্য তাদের হাজে লাভ করা। যে মেয়ের স্বভাবের মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সহজ রসটি না থাকে কোনো শিক্ষায় কোনো কৃত্রিম উপায়ে সংসাবক্ষেত্রে সে সার্থকতা পায় না।

যে সম্বল অনান্যসে পাওয়া যায় তার বিপদ আছে। বিপদের এক কারণ অস্ত্রের পক্ষে তা লোভনীয়। সহজ ঐশ্বর্যবান দেশকে বলবান নিজের একান্ত প্রত্নোজনে আত্মসাৎ করে রাখতে চায়। অল্পবয়সে দেশের পক্ষে শাধীন থাকা সহজ। যে পাখী ডানা স্থলর ও কণ্ঠস্বর মধুর তাকে খাঁচায় বন্দী করে মানুষ গর্ব অনুভব করে; তার নৈন্দর্য সমস্ত অরণ্যভূমির একথা সম্পত্তি-লোলুপরা ভুলে যায়। মেয়েদের হৃদয়-মাধুর্য ও সেবানৈপুণ্যকে পুরুষ স্বর্দীকাল আপন ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে কড়া পাহারায় বেড়া দিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বীচন-মানা প্রবণতা আছে, সেই জন্তে এটা সর্বত্রই এত সহজ হয়েছে।

বস্তৃত জীবপালনের কাজটাই ব্যক্তিগত। সেটা নৈর্বস্তিক তত্ত্বের কোঠায় পড়ে না—সেই কারণে তার আনন্দ বৃহৎ ভবের আনন্দ নয়; এমন কি মেয়েদের নৈপুণ্য যদিও

বহন করেছে রস, কিন্তু সৃষ্টির কাজে আজও যথেষ্ট সার্থক হয় নি।

তাব বুদ্ধি, তার সংস্কার, তাব আচরণ নির্দিষ্ট সীমা-বদ্ধতাব দ্বারা বহু যুগ থেকে প্রভাবাধিত। তার শিক্ষা তার বিশ্বাস, বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ স্বেযোগ পায় নি। এই জন্তে নির্বিকারে সকল অপদেবতাকেই সে অমূলক ভয় ও অযোগ্য ভক্তির অর্ঘ্য দিয়ে আসছে। সমস্ত দেশ জুড়ে যদি দেখতে পাই তবে দেখা যাবে এই মোহমুহতার ক্ষতি কত সর্ব্বনেশে, এর বিপুল ভার বহন করে উন্নতির দুর্গম পথে এগিয়ে চলা কত দুঃসাধ্য। আবিলবুদ্ধি মৃত্যুতি পুরুষ দেশে যে কম আছে তা নয়, তারা শিশুকাল থেকে মেঘের হাতে গড়া এবং তারাই মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে অত্যাচারী। দেশে এই যে সব আবিল মনের কেন্দ্রগুলি দেখতে দেখতে চারি দিকে গড়ে উঠছে, মেয়েদের অল্প বিচার-বুদ্ধির উপবেই তাদের প্রধান নির্ভর। চিন্তেব বন্দীশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, এবং প্রতিদিন তাব ভিত্তি হুয়ে উঠছে দৃঢ়।

এদিকে প্রায় পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে। আধুনিক এশিয়াতেও তাব লক্ষণ দেখতে পাই। তার প্রধান কারণ সর্ব্বত্রই সীমানা-ভাঙার যুগ এসে পড়েছে। যে-সকল দেশ আপন আপন ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক প্রাচীরের মধ্যে একান্ত বদ্ধ ছিল তাদের সেই বেড়া আজ আর তাদের তেমন করে ঘিরে রাখতে পারে না,—তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। স্বতই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়েছে, দৃষ্টিসীমা চিরাত্যন্ত দিগন্ত পেরিয়ে গেছে। বাহিরের সঙ্গে সংঘাতে অবস্থান পরিবর্তন ঘটছে, নূতন নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে আচার-বিচারের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

আমাদের বাল্যকালে বরের বাইরে যাতায়াতের আবশ্যকে মেয়েদের ছিল পাল্কির যুগ। মানী ঘনে সেই পাল্কির উপরে গড়ত ঘোঁটাটোপ। বেথুন স্থলে যে মেয়েরা সব-প্রথমে ভর্তি হয়েছিলেন তাব মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আমার বড়দিদি। তিনি দ্বারখোলা পাল্কিতে ইস্কুলে যেতেন, সেদিনকার সম্ভ্রান্তবংশের আদর্শকে

সেটা অল্প পীড়া দেয় নি। সেই একবছরের দিনে সেমি-পর্যটী নিলজ্জতার লক্ষণ ছিল। শালীনতার প্রচলিত রীতি রক্ষা করে রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

আজ সেই ঢাকা পাল্কির যুগ বহু দূরে চলে গেছে। মুদ্রপদে যায় নি, ক্ষতপদেই গেছে। বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিবর্তন আপনিই ঘটেছে—এ নিয়ে কাউকে সভানমিতি করতে হয় নি। মেয়েদের বিবাহের বয়স দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল, সেও হয়েছে সহজে। প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তাব তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূবে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।

এই যে বাইরের দিকে ব্যবহারের পরিবর্তন এ তো বাইবেই থেকে যায় না। অম্লব-প্রকৃতির মধ্যেও এর কাজ চলতে থাকে। মেয়েদেব যে মনোভাব বদ্ধ সন্সারের উপযোগী, মুক্ত সংসাবে সে তো অচল হয়ে থাকতে পারে না। আপনিই জীবনের প্রশস্ত ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার মন বড় করে চিন্তা কবতে বিচার করতে আবশ্য কবে। তাব পূর্বতন সংস্কারগুলিকে যাচাই করাব কাজ আপনিই সুরু হইতে থাকে। এই অবস্থায় সে নানা বকম ভুল কবতে পারে, কিন্তু বাধার ঠেকতে ঠেকতে সে ভুল উত্তীর্ণ হইতে হবে। সঙ্গী সীমায় পূর্বে মন কে-বকম কবে বিচার করতে অভ্যস্ত ছিল সে অভ্যাস আঁকড়ে থাকলে চাবি দিকের সঙ্গে পদে পদে অসামঞ্জস্য আনতে থাকবে। এই অভ্যাস-পরিবর্তনে দৃশ্য আছে বিপদও আছে, কিন্তু সেই ভয় কবে আধুনিক কালের শ্রোতকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

গৃহস্থালির ছোট পরিধির মধ্যে মেয়েদেব জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। একন্তে তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিল না বলেই একদিন জীশিক্ষা নিয়ে এতই বিরুদ্ধতা এবং গ্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। তখন পুরুষেরা নিজে যে-সব সংস্কারকে উপেক্ষা করত, যে-সব মত বিশ্বাস করত না, যে-সকল আচরণ পালন কবত না,

মেয়েদেব বেলায় সেগুলিকে সমস্তে প্রশংস দিয়েছে। তার মূলে তাদের সেই মনোবৃত্তি ছিল, যে-মনোবৃত্তি একেশ্বর শাসনবর্তাদেব। তারা জানে অজ্ঞানের, অন্ধ সংস্কারের আবহাওয়ায় যথেষ্ট-শাসনের সুযোগ বচনা করে, মনুষ্যোচিত স্বাধিকার বিসর্জন দিয়েও সন্তুষ্টচিত্তে থাকবার পক্ষে এই মুক্ত অবস্থাই অল্পকূল অবস্থা। আমাদের দেশের অনেক পুরুষেব মনে আজও এই ভাব আছে। কিন্তু কালের সঙ্গে সংগ্রামে তাদের হার মানতেই হবে।

কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের ক্ষেত্র এই যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই যে মুক্তসংসারের জগতে মেয়েরা আপনিই এসে পড়ছে, এতে করে আত্মরক্ষা এবং আত্মসম্মানের জন্তে তাদের বিশেষ কবে বুদ্ধির চর্চা বিদ্যার চর্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠল। তাই দেখতে দেখতে এর বাধা দূর হয়ে চলেছে। নিরক্ষরতার লজ্জা আজ ভ্রমমেয়েদের পক্ষে সবলের চেয়ে বড় লজ্জা; পূর্বকালে মেয়েদেব ছাতা জুতো ব্যবহারের যে লজ্জা ছিল এ তার চেয়ে বেশি; বাটনা-বাটা কোটনা-কোটা সম্বন্ধে অনৈপুণ্যেব অখ্যাতি তার কাছে কিছুই নয়। অর্থাৎ গাহস্থ্য বাজারদরেই মেয়েদেব দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারেও যোলো আনা খাটছে না। যে-বিদ্যাব মূল্য সার্কভৌমিক, যা আশু প্রয়োজনের ঐকান্তিক দাবী ছাড়িয়ে চলে যায়, আজ পাজীর মহাবর্তা যাচাইয়ের জন্তে অনেক পরিমাণে সেই বিদ্যার সন্ধান নেওয়া হয়।

এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

প্রথম যুগে একদিন পৃথিবী আপন তন্তু নিঃসারের কুশাশয় অবগুষ্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশেব গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি কবতেই পারে নি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশেব পথ পেল। তখনই সেই মুক্তিভে আরম্ভ হ'ল পৃথিবীর গৌরবের যুগ। তেমনি একদিন আত্ম-জন্মালুতার ঘন বাষ্পাবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অভ্যস্ত কাছেব সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিল। আজ তা ভেদ করে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করছে, যা মুক্ত আকাশের, যা সর্বলোকের।

বহু দিনের যে-সব সংস্কার-জড়িমাঝালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল, যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কেটে যায় নি তবু তার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মত প্রাচীন বঙ্গস বাদের তারাই জানে।

আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেঁয়সে বিধেব উন্মুক্ত প্রাক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই হৃৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লক্ষ্য, তাদের অকৃত্যর্থতা।

আমার মনে হয় পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে। অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থা-ভাব ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার বাস্তবত্ব, অর্থনীতি, সমাজশাসনতত্ত্ব গড়েছিল পুরুষ। মেয়েবা তার পিছনে প্রকাশহীন অন্তরালে থেকে কেবল করেছিল ঘরের কাজ। এই সভ্যতা হয়ে ছিল এক-বোঁকা। এই সভ্যতায় মানবচিন্তার অনেকটা সম্পদের অভাব ঘটেছে; সেই সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ভাণ্ডারে কুপণের জিন্মায় আটকা পড়ে ছিল। আজ ভাণ্ডারের দার খুলেছে।

তক্ষণ যুগের মানুষহীন পৃথিবীতে পুরুষের উপর যে অরণ্য ছিল বিস্তৃত, সেই অব্যবহৃত লক্ষ বৎসর ধরে প্রতিদিন সূর্য্যভেজ সঞ্চয় করে এসেছে আপন বৃক্ষরাজির মজ্জায়। সেই সব অব্যবহৃত ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়ে রূপান্তরিত অবস্থায় বহুযুগ প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই পাতালের দ্বার যেদিন উদঘাটিত হ'ল, অকস্মাৎ মানুষ শত শত বৎসরের অব্যবহৃত সূর্য্য-ভেজকে পাখুবে কষলার আকাবে লাভ করল আপন কানজ, তখনই নতুন বল নিষে বিশ্ববিজয়ী আধুনিক যুগ দেখা দিল।

একদিন এ যেমন ঘটেছে সভ্যতাব বাহিবের সম্পদ নিষ্ক, আজ তেমনই অন্তরের সম্পদের একটি বিশেষ খনিও আপন সঞ্চয়কে বাহিরে প্রকাশ করল। ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিধেব মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে মানুষের সৃষ্টিশীল চিন্তে এই যে নতুন চিন্তের যোগ, সভ্যতায় এ অ্যার-একটি ভেজ এনে দিলে। আজ এর ক্রিয়া প্রত্যক্ষে অপ্রভবলক্ষ চলছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসাম্যহীন্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবাব লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প বার বার ধাক্কা লাগাচ্ছে পুরাতন সভ্যতার ভিত্তিতে। এই সভ্যতায়

বিপত্তির কারণ অনেক দিন থেকে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল অতএব ভাঙনের কাজ কেউ বন্ধ করতে পারবে না। এবটি মাত্র বড় আশ্বাসেব কথা এই যে, কল্যান্তের ভূমিকায় নতুন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে—প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই। তাদের মুখের উপর থেকেই যে কেবল ঘোমটা খসল তা নয়—যে-ঘোমটার আবরণে তারা অধিকাংশ জগতের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল সেই মনের ঘোমটাও তাদের খসছে। যে-মানবসমাজে তারা জন্মেছে, সেই সমাজ আজ সকল দিকেই সচল বিভাগেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দৃষ্টির সম্মুখে। এখন অন্ধসংস্কারের কারখানায় গড়া পুতুলগুলো নিয়ে খেলা করা আর তাদের সাজবে না। তাদের স্বাভাবিক জীবপালিনী বুদ্ধি কেবল ঘরের লোককে নয় সকল লোককে রক্ষার জন্তে কাম্যমনে প্রবৃত্ত হবে।

আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতা-দুর্গের ইটগুলো তৈরি করেছে নিবস্তুর নরবলির হস্তে; তারা নির্মমভাবে কেবলই ব্যক্তিবিশেষকে মেরেছে কোনো একটা সাধারণ নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে; ধনিকেব ধন উৎপন্ন হয়েছে শ্রমিকের প্রাণ শোষণ ক'বে; প্রতাপশালীর প্রতাপের আগুন জালানো রয়েছে অসংখ্য দুর্ব্বলে; রক্তের আহুতি দিয়ে, রাষ্ট্রস্বার্থের রথ চালিয়েছে প্রজাদেব তাতে রক্তবৃদ্ধ ক'রে এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প। শিকারের আমোদকে জয়ন্ত ক'রে এ সভ্যতা বধ ক'বে এসেছে অসংখ্য নিরীহ নিরক্ষর প্রাণি; এ সভ্যতায় জীবজগতে মানুষকে সকলের চেয়ে নিদারুণ ক'রে তুলেছে মানুষের পক্ষে এবং অস্ত্র জীবের পক্ষে। বাঘের ভয়ে বাঘ উদ্ভিগ্ন হয় না, কিন্তু এ সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে মানুষের ভয়ে মানুষ কম্পাধিত। এই রকম অস্বাভাবিক অবস্থাতেই সভ্যতা আপন মূলল আপনি প্রসব করতে থাকে। আজ তাই হুহু হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ভীত মানুষ শাস্তির কল বানাবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত কিন্তু কলের শাস্তি তাদের কাজে লাগবে না, শাস্তিব উপায় যাদের অন্তরে নেই। ব্যক্তি-হনকারী সভ্যতা টিকতে পারে না।

সভ্যতা-সৃষ্টির নতুন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপধারণ করে তবে এবারকান এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই

আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্তনকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন নৃত্য করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্বীরা। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির ফুল। সেই যুগের অধিকার লাভ করতে হ'লে মোহমুক্ত মনকে

সর্বতোভাবে প্রস্তুত যোগ্য করতে হবে, অজ্ঞানের জড়তা এবং সকল প্রকার কাল্পনিক ও বাস্তবিক ভয়ের নিয়গামী আকর্ষণ থেকে টেনে আপনাকে উপরের দিকে তুলতে হবে। ফললাভের কথা পবে আসবে—এমন কি, না আসতেও পারে, কিন্তু যোগ্যতা লাভের কথা সর্বাগ্রে।

২ অক্টোবর ১৯৩৩

শান্তিনিকেতন

[নিখিলবদ মহিলাকর্য়াসম্মিলন উপলক্ষ্যে লিখিত]

সেকালের উৎসব

শ্রীযোগেশ্বরকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই বৃদ্ধ বয়সে, যখন হৃদয় অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন সর্বাগ্রেই আমার মনে হয় যে, বাঙালীর জীবনের, বাঙালী সমাজের রসধারা যেন অতি ক্ষুদ্র শুক-ইয়া বাইতছে। আমরা বাল্যকালে বা যৌবনে, দেশে স্ক্রেনে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, 'আজকাল যেন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। বয়স-দোষে হ্রাস আমাদের রসাত্মকত্বিত অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু সেকালের মত আমোদ-প্রমোদের সার্বজনীন উপাদানও ত এখন আর দেখিতে পাই না। সেকালে লোকে এমন নিমজ্জিত-অনিমজ্জিত, রবাহৃত-অনাহৃত সকলকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করিত, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না। হ্রাস মক্ষস্থলে, পল্লীগ্রামে এখনও সেইরূপ ভোজে 'দী-তা-ভুজ্যতাং' হইয়া থাকে, কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে এক মক্ষস্থলের অনেক শহর অঞ্চলেও সেরূপ 'ঢালাও' খাওয়ান আজকাল এক প্রকাব উঠিয়াই গিয়াছে। পঁচিশ জন লোককে নিমজ্জণ কবিলে যে এক শত লোকের মত আয়োজন করিতে হয়, তাহা এখন কম জন গৃহস্থ বা ধনবান মনে করেন? সেকালে সবই যেন অপরিমেয় ছিল, একালে সমস্ত ব্যাপারই যেন বাজেট করিয়া—মাপকাঠিতে মাপিয়া করা হয়। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, এক শত লোককে নিমজ্জণ করিলে

লোকে এক মণ ময়দা, এক মণ মিষ্টান্ন, এক মণ দধি এবং তদনুরূপ তরকারির আয়োজন করিতেন। অথচ তাঁহারা জানিতেন যে, এক মণ ময়দার লুচি এক শত ব্যক্তি ভোজন করিয়া শেষ করিতে পারে না। তথাপি তাঁহারা যে একরূপ আয়োজন করিতেন, তাহার কারণ, তাঁহারা মনে করিতেন যে, এক শত লোককে নিমজ্জণ করিলে অন্ততঃ তিন শত জন সেই আহাৰ্য্য ভোজন করিবে। আর আজকাল লোকে ভোজের আয়োজন করে, নিমজ্জিত ব্যক্তির সংখ্যা হিসাব কবিয়া। কুড়ি জনের স্থানে পঁচিশ জন লোক যদি ভোজ-বাটীতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গৃহস্থামীকে বিষম বিপদে পড়িতে হয়, কারণ, তিনি কুড়ি জনকে নিমজ্জণ করিয়া সেই কুড়ি জনের উপযুক্ত আহাৰ্য্য প্রব্যই প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। সেকালের লোকে এইরূপ সঙ্কীর্ণতাকে ঘৃণা করিত।

অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, সেকালে লোকের অবস্থা যেরূপ সচ্ছল ছিল, একালে সেরূপ নাই, সেই জন্যই লোকে ভোজ প্রভৃতি ব্যাপারে ততটা উদারতা দেখাইতে পারে না। কিন্তু তাহা নহে, সেকালের লোকের প্রাণ ছিল, তাহার স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও পরকে খাওয়াইতে পারিত। এখন লোকের সে প্রাণ নাই। সেকালে আমরা দেখিয়াছি, এক জন দরিদ্র গৃহস্থের সংসারেও তিন-চারি জন দূরসম্পর্কীয়

আত্মীয় বা আত্মীয়্য বাস করিত এবং ঐ সকল আত্মীয় বা আত্মীয়্যারা আপনাদিগকে পরের গলগ্রহ বলিয়া মনে করিত না, কারণ, গৃহস্থামী বা গৃহস্থামিনী সেই সকল আত্মীয়স্বজনকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহাদিগকে নিজ পরিবারভুক্ত অবশ্যপোষ্য বলিয়াই মনে করিতেন। আর একালে দেখিতে পাই যে, বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থও জ্ঞী এবং পুত্র-কন্তা ব্যতীত অন্য সকল আত্মীয়কেই পর বলিয়া মনে কবেন, জ্ঞী-পুত্র-কন্তা লইয়াই তাহাদের ‘পরিবার’, ইহার বাহিরের অন্য সকলেই পর। “আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের পাড়াতে মাসিক একশত টাকা আয়শালী লোকের সংখ্যা তিন-চারি জনের অধিক ছিল না, এখন ঐরূপ বিস্তারিত লোকের সংখ্যা কুড়ি জনের নূন নহে। কিন্তু সেকালে সেই তিন-চারি জন ভ্রাতৃলোকের বাটীতে যত জন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বা আত্মীয়্যাকে দেখিয়াছি, এখন এই কুড়ি জন ভ্রাতৃলোকের বাটীতে তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যাও দেখিতে পাই না। শুনিয়াছি ইউরোপীয় সমাজে “ক্যামিলি” বলিলে কেবল স্ত্রী ও পুত্র-কন্তাকেই বুঝায়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতৃকায় প্রভৃতি “ক্যামিলি” অন্তর্গত নহে। এই পাশ্চাত্য প্রথা ক্রমে আমাদের সমাজে প্রবর্তিত হওয়াতে আমাদেরও ‘পরিবার’ ঐ জ্ঞী-পুত্র-কন্তাতেই পরিণত হইয়াছে। বৃদ্ধ পিতামাতা এখনও আমাদের সমাজে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন সত্য, কিন্তু আরও কিছু দিন পনে যে তাহারা পরিবারের তালিকায় স্থান পাইবেন না, তাহান লক্ষণও নানাভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। রেল-কোম্পানী, কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত, রেল-কর্মচারীর বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং বিধবা মাসী, পিসীকে সেই কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদিগকে বিনা মাগুলে ট্রেনে ভ্রমণের ‘পাস’ দিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, রেল-কোম্পানী, কর্মচারীদিগের পিতা মাতা এবং বিধবা আত্মীয়দিগকে পাস দেওয়া বন্ধ করিয়া, উহার যে রেল-কর্মচারীর পরিবারভুক্ত নহেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন। একালে আমরাই যখন আমাদের পারিবারিক গণ্ডী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতেছি, তখন রেল-কোম্পানীই বা করিবেন না কেন? সেখানে বাঙালী যেমন পাঁচ জন আত্মীয়কে লইয়া এক সংসারে বাস করিতেন, সেইরূপ গল্পীবাসীদিগকে লইয়া মধ্যে মধ্যে উৎসবও

করিতেন। উৎসব অর্থেই পরিচিত-অপরিচিত, নিমন্ত্রিত-অনিমন্ত্রিত সকলকে লইয়া আনন্দ উপভোগ করা। কেবল জ্ঞী-পুত্র-কন্তা লইয়া কোন উৎসব হয় না। উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সকলকে আনন্দ বিলাইতে হয়, এই কথা সেকালের সকলেই মনে করিত। বাঙালী হিন্দুর বাটীতে পূজা-পার্বণের অভাব নাই; “বারমাসে তের পার্বণ” বাঙালীর বাটীতেই হইত। বঙ্গদেশে দেবদেবীর বত ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গঠন করিয়া পূজা হয়, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে সেরূপ হয় না। দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক, সরস্বতী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা ত আছেই, তাহার উপর রক্ষাকালী, ব্রহ্মা, গণেশ, ভুবনেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতির মূর্তি গঠন করিয়াও অনেক স্থানে পূজা হইত, এখনও কোন কোন স্থানে হইয়া থাকে। এই শেখোক্ত দেবদেবীদিগের পূজা সাধারণতঃ বারোয়ারিতে অর্থাৎ সকলের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া হইত।

আমরা যে-সকল দেবদেবীর পূজার কথা বলিলাম, তাহার মধ্যে একমাত্র দুর্গাপূজাই উৎসব নামে অভিহিত হইত, অন্য কোন পূজাকে লোকে উৎসব বলিত না, কিন্তু অন্য পূজাকে উৎসব নামে অভিহিত না করিলেও সেই সকল পূজা প্রকৃতপক্ষে উৎসবেই পরিণত হইত। দুর্গাপূজা তিন দিন ব্যাপী এবং অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য, সেই জন্য সেকালে যাহারা দুর্গাপূজা করিতে না পারিতেন, তাহারা কালীপূজা, কার্তিকপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি করিতেন। এই সকল পূজা অনেক পল্লীতে বারোয়ারিতেও হইত। এখনও অনেক স্থানে বারোয়ারিতে জগদ্ধাত্রী, কার্তিক, সরস্বতী এবং কালী পূজা হইয়া থাকে।

পঞ্জিকাতে এই সকল পূজার দিন নির্দ্ধারিত থাকে। কিন্তু আবাব অনেক পূজা আছে, যাহার উল্লেখ পঞ্জিকাতে থাকে না; লোকে স্থবিধা বুঝিয়া যে-কোন সময় সেই সকল পূজা করিত। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, চন্দননগরে, জগদ্ধাত্রীর প্রকাণ্ড প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পাঁচ ছয় স্থানে তিন দিন ধরিয়া পূজা হইত। মধ্যে ঐরূপ বড় প্রতিমা মাত্র দুইখানি হইত, এই দুইখানিই বাজারে দোকানদারদিগের নিকট হইতে টাকা লইয়া করা হইত। ইহার পর বাগবাজারের

জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর কনিয়া বাজারের প্রাতিমার সমান করা হইলে মোটের উপর তিন-খানি বড় প্রতিমা হইল। ১৩৪১ সালে বাজারের চাউলপণীর বারোয়ারির কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতানৈক্য হওয়াতে চাউল-পটীর বারোয়ারি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বাজারে দুইখানির পরিবর্তে তিনখানি বড় প্রতিমা হইতেছে।

চন্দননগরে এই বারোয়ারিতে জগদ্ধাত্রী-পূজা এক শত বৎসরেরও পুরাতন। বাজারের বারোয়ারি পূজার টাঁদ ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ লভ্যাংশ হইতে দিয়া থাকেন। যেখানেই বাজারে বারোয়ারি পূজা হয়, সেখানেই এই উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হয়। পূজার জন্ত পৃথক রক্ষিত ঐ লভ্যাংশ দেবতার 'ব্রতি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাগবাজারের বারোয়ারির উৎপত্তি সম্বন্ধে এক কৌতুককর ব্যাপার আছে। এক শত বৎসরেরও পূর্বে, চন্দননগর বাগবাজারে ঈশ্বর দাস নামে এক সূত্রধর বাস করিত। সে একটু কৃপণস্বভাব ছিল। তাহার বন্ধুরা তাহার কিছু অর্থব্যয় করাইবার উদ্দেশ্যে, জগদ্ধাত্রী-পূজার কয়েক দিন পূর্বে, একটি ছোট জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বাজিকালে ঈশ্বর দাসের বাটীতে রাখিয়া আনে। গৃহস্থামীর অজ্ঞাতসারে তাহার বাটীতে এইরূপ প্রতিমা রাখাকে লোকে "ঠাকুর কেলা" বলে। কোন গৃহস্থের বাটীতে এইরূপ "ঠাকুর ফেলিলে" গৃহস্থকে সেই ঠাকুর পূজ করিতে হয়, না করিলে পাপ হয় এবং চাই কি সেই গৃহস্থের অমঙ্গলও হইতে পারে, লোকের এইরূপ ধারণা ছিল। অশিক্ষিত ঈশ্বর দাস কিন্তু পাপের ভয় বা পারিবারিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা না করিয়া সেই বাজিতেই প্রতিমাকে সমিহিত পুষ্করিণীতে বিসর্জন করিল, কেহই জানিতে পারিল না। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিমা-নিষ্কোপকারী বন্ধুরা যখন দেখিল যে, ঈশ্বর দাসের বাটীতে প্রতিমা নাই, তখন তাহারা প্রতিমার অন্বেষণ করিতে লাগিল। অবশেষে সেই পুষ্করিণী হইতে সেই প্রতিমার কঙ্কাল অর্থাৎ খড়-জড়ান কাঠামো বাহির হইল। বাহারা ঘড়ব্ব করিয়া প্রতিমা নিষ্কোপ করিয়াছিল, তাহারা, প্রতিমার পূজা না হইলে তাহাদেরই অমঙ্গল হইবে মনে করিয়া প্রত্যেকে কিছু কিছু টাকা দিয়া সেই প্রতিমার সংস্কার করিয়া পূজা করাইল। ইহাব পর হইতে প্রতি বৎসরই বাগবাজারে বারোয়ারিতে জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়া আসিতেছে।

চন্দননগরে এই বারোয়ারি পূজা ব্যতীত আরও অনেক-গুলি বারোয়ারি পূজা হইত। তন্মধ্যে গড়ের বাজারে রাজরাজেশ্বরী পূজাতেই সর্বাঙ্গাঙ্গ অধিক জাঁক হইত। এই পূজা উপলক্ষে গড়ের বাজারে কয়েক দিন ব্যাপী মেলা হইত। প্রতিমার সম্মুখে আটচালাতে তিন-চারি দিন যাত্রা, পাচালি, কবির লড়াই হইত। প্রতিমার উভয় পার্শ্বে গ্যালারি বা বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর শ্রোপদীর স্বয়ম্বর, দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, ইন্দ্রজিৎ-বধ, এবং কৃষ্ণলীলার বিবিধ দৃশ্য পুতুল গড়িয়া দেখান হইত। সে-সকল পুতুল ছোট নহে, এক জন মানুষের আকৃতির সমান করিয়া নির্মাণ করা হইত। শুনিয়াছি কৃষ্ণনগর হইতে শিল্পী আনাইয়া ঐ সকল মূর্তি নির্মাণ করা হইত। ঐ সকল পৌরাণিক বিষয় ব্যতীত, পথের ধারে ছোট ছোট দরমাব ঘর বাঁধিয়া নানা প্রকার সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রও পুতুল নির্মাণ করিয়া দেখান হইত। কোনটাতে এক জন নব্য যুবক, যুবতী পত্নীকে স্বন্ধে লইয়া বৃদ্ধা জননীর কেশাকর্ষণ পূর্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে; কোনটাতে এক জন গণিকা একটা ভূপতিত মাতালের মুখে পদাঘাত করিতেছে, এইরূপ কত দৃশ্যই থাকিত। ঐ গড়ের বাজার নামক পল্লীতেই আমাদের স্কুল অবস্থিত ছিল। আমরা প্রত্যহ স্কুলে যাইবার সময় এবং স্কুলের ছুটির পর ঐ সকল সং দেখিবার জন্ত আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার দাঁড়াইয়া থাকিতাম। মনে আছে, এক বৎসর, চন্দননগরের একটা সামাজিক ব্যাপার ঐ বারো-য়ারিতে সং গড়িয়া দেখান হইয়াছিল। চন্দননগর মানকুণ্ডার খাঁ-বাবুরা বিশেষ ধনশালী ছিলেন। তাহারা ধর্ম্মানুগ ও দানের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাহারা জাতিতে শৌণ্ডিক, সেই জন্ত কোন সদব্রাহ্মণ তাহাদের দান গ্রহণ করিতেন না বা তাহাদের বাটীতে জল গ্রহণ করিতেন না। তাহারা এক বার কি একটা কাণ্ড উপলক্ষে, রূপার ঘড়া বিতরণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় কয়েক জন লোভী ব্রাহ্মণ, রূপার ঘড়ার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া গোপনে সেই ঘড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সেই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িলে সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা হয়। এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতও নাকি সেই দান গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়া-ছিলেন "উপটোকনে দোষ নাস্তি"। পর বৎসর গড়ের বাজারে বারোয়ারিতে এই ঘটনা উপলক্ষে একটা সং দেওয়া হইল—কয়েক জন ব্রাহ্মণ রূপার ঘড়া হাতে করিয়া দণ্ডায়মান আর

তাহাদের বন্ধুত্ব লেখা—“উপটোকনে দোষ নাশি”।

এইরূপ বারোয়ারি পূজা চন্দননগরে বৎসবে বিভিন্ন সময়ে পাঁচ-ছয় স্থানে হইত। এখন চন্দননগর হাটখোলায় ভুবনেশ্বরী ব্যতীত অন্য কোন পল্লীতে আর জাঁকালো বারোয়ারি পূজা হয় না। কোন কোন পল্লীতে বারোয়ারিতে সরস্বতী বা কার্তিক পূজা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যাত্রা, পাঁচালি প্রভৃতি হয় না, সেই পূজা এক দিনেই শেষ হয়। তাহাকে উৎসব বলা যাইতে পারে না। দেশে হরিজন-আন্দোলন প্রবর্তিত হইবার ফলে অনেক গ্রামে ঘেরূপ বারোয়ারিতে টাঁদা করিয়া সার্বজনীন পূজা হইতেছে, চন্দননগরেও সেইরূপ হরিজন-পল্লীর বারোয়ারিতে একখানি সার্বজনীন দুর্গাপূজা গত কয়েক বৎসর হইতে হইতেছে। হরিজনদিগকে প্রতিবার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াইবার জন্তই কয়েক জন সংস্কারকামী উচ্চবর্ণ ভদ্রলোকের চেষ্টাতেই এই পূজা হইতেছে; ইহার মূল সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা। সেকালে ঘেরূপ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের জন্ত বারোয়ারি পূজা হইত, ইহা সেরূপ পূজা নহে।

আমাদের দেশে দুর্গোৎসব ব্যতীত আরও দুইটি উৎসব প্রচলিত ছিল, বোধ হয় এখনও কোন কোন স্থানে আছে। তন্মধ্যে একটি নন্দোৎসব, দ্বিতীয়টি ক্ষ্ম্মৎসব। নন্দোৎসব জন্মাষ্টমীর পরদিন হইত। নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে পরদিন ব্রজপুরবাসী গোপগণ আনন্দে মত্ত হইয়া উৎসব করিয়াছিল; তাহারই স্মৃতিচিহ্নরূপ নন্দোৎসব প্রবর্তিত হয়। দ্বাপর যুগে, ব্রজবাসী গোপগণ কুরুপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল জানি না, কিন্তু আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের পাড়ায় ঠাকুর-বাটীর প্রাঙ্গণে খানিকটা জায়গা খুঁড়িয়া জল ঢালিয়া কাঁদা করা হইত, ঠাকুরবাড়ীর পূজক সেই কাঁদার মধ্যস্থলে একটা বুনা নারিকেল কেঁচিয়া দিতেন, আর সেই পাড়ার বালক ও যুবকগণ সেই নারিকেল লইবার জন্ত কাঁড়াকাড়ি এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁদাতে গড়াগড়ি দিয়া একেবারে ভূত সাজিত। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার এইরূপ কাঁদা-মাখা মাখির পর সকলে মিলিয়া সেই নারিকেল লইয়া স্নান করিতে যাইত। স্নানান্তে সকলে পুনরায় সেই

ঠাকুর-বাটীতে সমবেত হইলে, পূজারী-ঠাকুর সকলের হস্তে দেবতার প্রসাদ কিছু কিছু মিষ্টান্ন প্রদান করিতেন। প্রাতঃকালের উৎসব এইরূপে শেষ হইত।

তাহার পর অপরাহ্নে “বাধাই” বাহির হইত। এই বাধাই শব্দের উৎপত্তি কি তাহা আমি জানি না। বাধাই শোভাযাত্রা বা মিছিল। কলিকাতায় চৈত্র-সংক্রান্তির দিন ঘেরূপ জেলেপাড়ার সং বাহিব হয়, বাধাইও সেইরূপ গীত-বাদ্য-প্রহসন-সংবলিত একটি মিছিল। এই মিছিল আট দশ দলে বিভক্ত হইত। প্রথম দুই-তিনটা দলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ্যে গীতবাদ্য হইত। তাহার পর একটা দলে সামাজিক ব্যঙ্গকৌতুক, কোন দলে কোন পৌরাণিক নাটকের একটা গভীরের অভিনয়, কোন দলে মাতাল, কোন দলে উড়িষ্যাব কলহ প্রভৃতির অভিনয় হইত। এই বাধাই বাহির হইত চন্দননগরের বৈদ্যপোতা নামক পল্লী হইতে। ষে-পথ দিয়া বাধাই যাইত, সেই পথ লোকে লোকার্ণব হইত। সেই পথের পার্শ্বে ষে-সকল গৃহস্থের বাস, তাঁহাবা বাধাই দেখাইবাব জন্ত পূর্ব হইতে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিজ নিজ বাটীতে আনাইয়া রাখিতেন। এই বাধাইমধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ছিলেন ৮ ননীলাল মুখে-পাখায়। তিনি ষে-দলে থাকিতেন, সেই দলেব চতুর্দিকে ভীষণ জনতা হইত। কারণ, তিনি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া এবং নানা প্রকার অজ্ঞানতা সহকারে নৃত্য করিয়া বিলম্ব হস্তরসের সৃষ্টি করিতেন। তাঁহাব ছড়ার নমুনা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তিনি মুখে মুখে কিরূপ ছড়া বাঁধিতেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জন্ত—

“আনন্দে ছাইল ব্রজপুত্রী

পোলক হাতে নরলোকে এসেছেন হরি।

বিইয়েছে বিদ্বুটে কালো যশোদা হস্তরী

কেউ বলে পাঁড়াকের বাচ্চা কেউ বা বলে পরী।

পাঁত খিচিবে আছেন রাণী, খেয়ে বালের গুঁড়ি।

নন্দ রাজা এনে দিলে তেঁতুল এক বুড়ি

শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করাতে স্বর্গ হইতে দেবতারা মানবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিশুরূপী হরিকে দেখিতে আসিয়াছেন, সকলেই কিছু কিছু উপহার আনিয়াছেন, যথা—

“কেউ এনেছে ছানাবড়া কেউ এনেছে গজা

কেউ এনেছে শেরী স্তাম্পন কেউ এনেছে গাঁজা।” ইত্যাদি।

বেলা ২টা ২৥ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১০টা ১১টা পর্যন্ত নানা পল্লীভিত্তিক দিয়া বাধাই পথে পথে বেড়াইত।

তাহার পর ফল্গুনসব বা দোলযাত্রা। পাঁচ জনে না মিলিলে হোলিখেলায় আনন্দ হয় না, তাই দোলযাত্রাও উৎসব বলিয়া গণ্য। বাংলা দেশ অপেক্ষা উত্তর-ভারতে অর্থাৎ বেহাৰ, যুক্তপ্রদেশ, রাষ্ট্রপুতানা প্রভৃতি স্থানে হোলিখেলায় অনেক অধিক জাঁকজমক হয়। সেকালে বঙ্গদেশেও হোলিখেলায় আমোদ বড় অল্প ছিল না। আমবা বালাকালে দেখিয়াছি, অশিক্ষিত-শিক্ষিত, ইতর-ভদ্র, দরিদ্র-ধনী সকলেই রং মাখিয়া ও মাখাইয়া আমোদ-প্রমোদ উদ্ভূত হইত। পল্লীর সর্বজনশ্রদ্ধাভাজন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত দোলের দিন রং মাখিয়া সংসাজিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; আবার বৃদ্ধদেব খেত কেশ লাল হইয়া যাইত। আজকাল দেখিতে পাই, ইংরেজী-শিক্ষিত যুবকগণ গায়ে রং মাখিতে ঘৃণা বোধ করেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে, এইরূপ আবার বা রং লইয়া মাতামাতি করা বর্বরতার চিহ্ন, কেননা ষ্ঠোত্তরগণ ইহাকে বর্বরতা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইউরোপীয়গণ আমাদের কোন প্রথা বা আচার-ব্যবহারকে বর্বরতা বলিলেই কি সেই প্রথা বর্বর হইবে এবং সেই প্রথাকে পরিবর্জন করিতে হইবে? ইউরোপীয় সমাজের “বল” নৃত্যও ত আমাদের নিকট অভ্যস্ত রুচিবর্গিত এবং বর্বর বলিয়া মনে হয়। অষ্টাবতবৎসরমণীদিগের পরপুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া সম্প্রদায় নৃত্যকে প্রাচ্যদেশবাসীরা বর্বরতার চরম বলিয়াই মনে কবে। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং মুসলমানের দৃষ্টিতে এই প্রকার নৃত্য স্ত্রীলতাবর্জিত ও বিকৃত রুচির পবিচারক বলিয়াই মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আফগানিস্থানের বোন ভূতপূর্ব যুবরাজ ইউরোপে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য লন্ডনের রাজপ্রাসাদে “বল”-নৃত্যের আয়োজন হইয়াছিল। নৃত্য আরম্ভ হইবাব কিছু পূর্ব আফগান-যুবরাজ রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলে তাঁহাকে সম্মানে নৃত্যসভাতে লইয়া যাওয়া হইল, কিন্তু তিনি নৃত্যসভাতে প্রবেশ করিয়াই নৃত্যপরায়ণা রমণীদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়াই সলজ্জে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্তর্য্যামন করিলেন। তাঁহার এই আচরণে সকলে অতিমাত্রায়

বিস্মিত হইয়া নৃত্যরক্ষ পরিভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, যেখানে সম্রাট মহিলারা অসম্মত পরিচ্ছদে উপস্থিত থাকেন, সেখানে কোন ভদ্রলোকের থাকা কি উচিত? আফগান-যুবরাজের এই মন্তব্য শুনিয়া সে-সময়ে ইংলণ্ডে বেশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। এক দল লোক যুবরাজের এই মন্তব্যকে একান্ত নজরত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। উচ্চপদস্থ ধর্ম-যাজকগণ যুবরাজের মন্তব্যের সমর্থন করিয়াছিলেন। আবার অন্য দল এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধসভা আফগান, পাশ্চাত্য সভ্যতার মহিমা উপলব্ধি কবিত্তে অসমর্থ বলিয়াই আফগান-যুবরাজ ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আফগান-যুবরাজের মন্তব্য শুনিয়াও ইংরেজ জাতি “বল”-নৃত্য পরিবর্জন করেন নাই। কোন প্রথা বিদেশীয়ের দৃষ্টিতে বিসদৃশ বোধ হইলেই যে সেই প্রথাকে ত্যাগ করিতে হইবে, ঐরূপ যুক্তি অর্থহীন।

অন্য চম্পা বৎসর পূর্বে আমাকে বিষয়কার্থ উপলক্ষ্যে কলিকাতার বড়বাড়ারে, মাড়োয়ারী মহাজন-দিগের গদীতে বা কার্যালয়ে যাতায়াত করিতে হইত। তাঁহাদের মধ্যে এক-এক জন অভ্যস্ত গম্ভীরপ্রকৃতি অর্থাৎ “রাসভারি”。 লোক ছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে বা তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইত না। কিন্তু দোলের দিন দেখিয়াছি, তাঁহাদের সেই গুরুগম্ভীর প্রকৃতি যেন অন্তর্হিত হইয়া যাইত; তাঁহারাও বং লইয়া বালকের মত ছুটাছুটি লাফালাফি করিতেন, সেদিন তাঁহাদের লঘু-গুরু, অধমর্ণ-উত্তমর্ণ জ্ঞান লোপ পাইত, যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন, তাহাকেই আবার ও রঙে লাল করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু পরদিন তাঁহারা ইখন গদীতে বসিয়া বিষয়কর্মে ব্যাপ্ত হইতেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিলে, কেহই বলিতে পারিত না যে, ইহারা ই পূর্বদিন রং লইয়া মাতামাতি করিয়াছিলেন।

যখন আফ্রিকায় ব্যার-বুদ্ধ হয়, তখন আমি কলিকাতার কোন ষ্ঠোত্তর বণিকের আপিসে কার্য করিতাম। লেডী-স্মিথ নামক স্থানে ইংরেজ-বাহিনী ব্যারদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে আমাদের আপিসের প্রত্যেক ষ্ঠোত্তর কর্মচারীর মুখে ঐরূপ বিষাদের ছায়া পতিত হইয়াছিল যে, দেখিলে মনে হইত,

তাঁহাদের কোন আত্মীয়স্বজন হয়ত লেডীস্মিথে অবস্থ হইয়াছেন। আমি দুই-এক জন সাহেবকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম যে, যখন তাঁহাদের কোন আত্মীয় বন্ধু অবস্থ হইয়াছেন নাই, তখন তাঁহারা এত বিষয় হইয়াছেন কেন? উত্তরে এক জন সাহেব বলিয়াছিলেন, লেডীস্মিথ শত্রুপক্ষের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতে ইংরেজ জাতিব মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের বিবাদের কারণ; যদি তাঁহাদের ভ্রাতা বা পুত্র যুদ্ধে নিহত হইতেন, তাহা হইলে বিবাদের পরিবর্তে গৌরব বোধ করিতেন। সেই সময় আমাদেব আপিসে মিঃ ডেন্জারফীল্ড (Mr. Dangerfield) নামক এক সাহেব কার্য্যধারক ছিলেন। তাঁহার মত খিটখিটে এবং বদমেজাজি লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি; আনন্দের কখনও তাঁহাকে হাসিতে দেখি নাই। অনেকের মতল থাকিতে পারে যে ব্যার-মুন্ডের সময় “ইংলিশম্যান” সংবাদ পত্রের আপিস হইতে প্রত্যহ চারি-পাঁচ বার করিনা ক্রোডপত্র বা অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইত। সেই সকল অতিরিক্ত সংখ্যায় কেবল তারযোগে প্রাপ্ত যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশিত হইত। এক দিন দেখিলাম, আপিসের দ্বারবান একখান অতিরিক্ত সংখ্যা “ইংলিশম্যান” আনিয়া ডেন্জারফীল্ড সাহেবেব হাতে দিয়া চলিয়া গেল। সেই অতিরিক্ত সংখ্যাগুলি থামের মধ্যে থাকিত; সাহেব থাম ছিঁজিয়া কাগজে দৃষ্টিপাত মাত্র এক বিকট গর্জন করিয়া এক প্রকাণ্ড লম্ব প্রদান করিলেন এবং দৌড়াইয়া বড়সাহেবের কক্ষ প্রবেশ করিলেন। ঐহার মুখে কখনও হাসি দেখি নাই বা ঐহাব মুখে কখনও মিষ্ট কথা শুনি নাই, সেই ভীষণকর্ন ডেন্জারফীল্ড সাহেবের বালকোচিত চপলতা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হইলাম। ক্ষণকাল পরে অল্প এক জন সাহেব বড়সাহেবের কক্ষ হইতে আসিয়া আমাদের বসিলেন, “টেলিগ্রাম আসিয়াছে, লেডীস্মিথ ব্যারদিগের অবস্থ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাই বড়সাহেব আজ আপিস বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন, আপনাবা বাড়ী যান।” আমরা তখন মিঃ ডেন্জারফীল্ডের গর্জন এবং উল্লম্বনের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আরও বুঝিলাম যে, জীবিত জাতির শোক বা আনন্দ বোধের বৈকল্য আছে, আমাদের মত মৃত জাতির তাহা নাই; আমরা শোক প্রকাশ করিতেও

জানি না, আনন্দ প্রকাশ করিতেও পারি না। তাই শোক-সভাতে গিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট পরিচিত লোকের সহিত খোস-গল্প করি, আর উৎসবে যোগদান করিয়াও সাময়িক অভাব-অভিযোগ, অশান্তির বিষয় আলোচনা করি। সেকালে বাড়ালীর মধ্যে প্রাণ ছিল, তাই তাঁহাদের নানা প্রকার উৎসবও ছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি যে সেকালে বারোয়ারি পূজার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল, এবং প্রায় সকল বারোয়ারিতেই যাত্রা, পাঁচালি, কবি, তবজা প্রভৃতি হইত। অনেক স্থলে কথকতাও হইত। সেকালের যাত্রার মধ্যে একমাত্র গোপাল উড়ের দল ব্যতীত সকল যাত্রাতেই পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইত। দাশবধি রায়ের পাঁচালির মধ্যে দুই-চারিটা পালা সামাজিক ব্যাপার অবলম্বনে রচিত, অবশিষ্ট সমস্ত পালাই পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। কথকতার সমস্ত পালাই পৌরাণিক। এই সকল যাত্রা, পাঁচালি এবং কথকতার দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যেরূপ উপদেশ এবং ধর্মভাবের প্রচার হইত, সেরূপ আর কিছুতেই হইত না। সেকালের যে-কোন পল্লী-গ্রামের অশিক্ষিত কৃষক বা শ্রমিক রামায়ণ-মহাভারতের গল্পাংশ মুখে মুখে বলিতে পারিত। এখন যেরূপ “শিশু-রামায়ণ” “শিশু-মহাভারতের” সাহায্যে বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যান প্রচার করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, সেকালে এরূপ ছিল না। যাত্রাওয়ালা এবং কথকেরাই লোকশিক্ষক ছিলেন, তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের মুখে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেকালের প্রাচীন-প্রাচীনারা বালক-বালিকাদিগকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইতেন। সুতরাং সেকালের উৎসবে যে কেবল “দ্বীয়তাং তুজ্যতাং” হইত তাহা নহে, উৎসব উপলক্ষে যাত্রা এবং কথকতা দ্বারা লোকশিক্ষারও সহায়তা হইত, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব প্রচারিত হইত।

এই সকল যাত্রা এবং কথকতা প্রভৃতি প্রায়ই বারোয়ারি-তলার আটচালায় হইত, কোন কোন স্থানে ধনবানদিগের বহির্বর্টার প্রশস্ত অঙ্গনেও যাত্রা বা কথকতা হইত এবং তাহার ব্যয়ভাব গৃহস্থামীরাই বহন করিতেন, সেরূপ গ্রামবাসীকে চাঁদা দিতে হইত না। বারোয়ারির আট-

চালাতেই হউক আর ধনবানের অন্ধনেই হউক, যাত্রা বা কথকতা প্রভৃতি শ্রবণের জন্য সকলের পক্ষেই অব্যাহতি দ্বার ছিল : বাহার ইচ্ছা, জীপুষ্ক, ইতবভ্রনির্কির্শেষ সকলেরই তথ্য গমনের অবাধ অধিকার ছিল। যাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে নিমন্ত্রণপত্র বা কার্ড ছাপান হইত ন। যেখানে কথকতা হইত, সেখানেই কেবল ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রদেব জন্ত পৃথক আসনের ব্যবস্থা হইত। কারণ, সকলের ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকে এক আসনে বসিয়া শাস্ত্রকথা শ্রবণ করিতে নাই। জীলোকদিগের বসিবর স্থান পৃথক এবং চিকের অন্তরালে হইত। যাত্রা উপলক্ষে কোন কোন স্থানে চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হইত, কথকতা উপলক্ষে অবশ্য এত লোকের সমাগম হইত না। কথকতা কোন কোন স্থানে একাদিক্রমে এক মাস, তিন মাস বা ছয় মাস ধরিয়া হইত, সাধারণতঃ এক মাসের কমে কোথাও হইত না। যাত্রা বড়জোর দুই দিন বা তিন দিন হইত। এক দিন যাত্রাতে যে অর্থবল্য হইত, সেই অর্থে এক মাস কাল কথকতা হইতে পারিত। যাত্রা অপেক্ষা কথকতা ঘন ঘন হইত, কারণ কথকতা বৈ কেবল বাবোয়ারি-তলাতে হইত তাহা নহে, অনেক মধ্যবিত্ত-শালী গৃহস্থের বাটীতেও হইত। বাটীতে রামায়ণ, মহাভারত বা শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের অল্পাংশ করা। সেকালের লোকে ধর্ম্মাচরণ বলিয়া মনে করিতেন; এমন কি অনেক অনাথা দরিদ্র বিধবা চরকায় স্ততা কাটিয়া বা অন্তের বাটীতে শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিত, তাহার উদ্ধৃত্ত অংশ “কথা” দিয়া ব্যয় করিত। অনেক স্থলে একরূপ হইত যে কোন গ্রামে এক জন কথক কোন গৃহস্থ কর্তৃক এক মাসের জন্য নিযুক্ত হইলেন। সেই এক মাস অতীত হইতে না-হইতে অল্প এক গৃহস্থের কোন বৃদ্ধা প্রস্তাব করিলেন যে আরও পাঁচ দিন কথকতা হউক, তিনি সেই পাঁচ দিনের ব্যয়-ভার বহন করিবেন। আবার সেই পাঁচ দিন শেষ হইতে না-হইতে এক জন কৃষক, কথকঠাকুরকে আরও তিন দিন কথকতা করিবার জন্য অছরোধ করিলে আরও তিন দিন কথা হইল। এইরূপে অনেক সময় কথক-মহাশয়ের। এক মাসের জন্য কোন গ্রামে গমন করিলে তিন-চারি মাসের কমে সেই গ্রাম ত্যাগ করিতে পারিতেন না। যাত্রা

শুনিবার জন্য মঞ্চস্থলে অনেক দূরবর্তী গ্রাম হইতেও লোক-সমাগম হইত, কিন্তু কথকতা শুনিবার জন্য লোকে গ্রাম ছাড়িয়া অল্প গ্রামে বড় যাইত না। সেই জন্য, যাত্রা অপেক্ষা কথকতার স্থানে লোকসমাগম অনেক অল্প হইত এবং শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী হইত। সেকালে কথকদিগের “উপরি-পাওনা” তাঁহাদের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক অপেক্ষা অনেক অধিক হইত। কথকদের পারিশ্রমিক সাধারণতঃ দৈনিক দুই টাকা হইতে তিন টাকা ছিল। কোন কোন খ্যাতিমান কথকের পারিশ্রমিক দৈনিক পাঁচ-সাত টাকাও ছিল। কিন্তু অধিকাংশ কথকের আয় উপরি-পাওনা হইতেই বেশী হইত। কথকেবা কথা কাঁহার সময় মস্তকে ও গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিতেন। কথা আরম্ভ হইবার পর কোন শ্রোতা, বেদীতে ষংকিষ্টিং রক্ততথ্য অর্থাৎ টাকা দিয়া প্রণাম করিলে কথক-ঠাকুর স্বীয় মস্তকেব বা গলদেশের পুষ্পমালা খুলিয়া আশীর্বাদী-স্বরূপ সেই প্রণত ব্যক্তিকে প্রদান করিতেন। তাহার পরও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই টাকা, আধূলি বা সিকি দিয়া কথকে প্রণাম করিত, কারণ, কথকের মুখে শাস্ত্রকথা বিনা দক্ষিণায় শুনিতে নাই, সেই জন্য কথকে কিছু প্রণামী দিবার প্রথা ছিল। আমাদের কোন আত্মীয় এক মাস আশী হইতে এক শত টাকা পারিশ্রমিক লইয়া কথকতা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই এক মাসে প্রায় দেড় শত টাকা প্রণামী পাইলেন। ইহার উপর বস্ত্র, অলঙ্কার, সিঁদা এবং মিষ্টান্ন যে কত পাইলেন তাহার সীমা ছিল না। এই সকল দ্রব্য কথকেরা অবাচিত উপহার রূপে পাইলেন। বস্ত্রহরণের দিন কথক-ঠাকুরকে বস্ত্র (শাড়ী) দেওয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশনের দিন বা শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষার দিন, লক্ষণ-ভোজনের দিন নানা প্রকার ভোজ্য সামগ্রীয়া সিঁদা দেওয়া এবং দুর্কাসার পারণ দিনে নানাবিধ মিষ্টান্ন উপহার দেওয়া সকলে অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া মনে করিত। শুনিয়াছি, কোন কোন ধনবতী মহিলা, কথক-ঠাকুরকে বেনারসী শাড়ী এবং নানা প্রকার অলঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বেদীতে বসাইয়া কথা শুনিতেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল বস্ত্র ও অলঙ্কার কথক-ঠাকুরেরই প্রাপ্য হইত।

যাত্রা বা থিয়েটারে অভিনয় করা অপেক্ষা কথকতা করা

অত্যন্ত কঠিন কার্য। প্রথমতঃ যিনি কথকতা করিবেন, তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণে এবং নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা প্রয়োজন। “কথা” কহিবার সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে আলোচ্য শাস্ত্র ব্যতীত উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি বিবিধ ধর্মপুস্তকের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে হয়। এই সকল ব্যাখ্যা বাহাতে নিভূল হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। কারণ শ্রোতাদের মধ্যে যদি কেহ সংস্কৃত বা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি কথকের ভুল ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন। থিয়েটার বা যাত্রায় অভিনেতাদিগের পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের কথা বিষয় কঠিন করিতে পারিলে এবং তাহা যথোপযুক্ত হাবভাব সহ আবৃত্তি করিতে পারিলেই অভিনেতার কর্তব্য শেষ হয়। তাহার পর যাত্রা বা থিয়েটারে কেহ রাজার ভূমিকায়, কেহ রাণীর ভূমিকায়, কেহ বিদুষকের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে বা আসরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু কথক-ঠাকুরকে একাই সমস্ত ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতে হয়। তাঁহাকে পুরুষ ও নারী উভয়েরই কর্তব্যের অনুকরণ করিয়া কখনও রাজা আবার কখনও বাণীর কথা বিষয় বলিতে হয়। তাঁহার বক্তৃতাতে বীররস, রৌদ্ররস, কল্প রস প্রভৃতি সকল রসেরই সমাবেশ করিতে হয়। কল্প রসের অবতারণা করিয়া শ্রোতাদিগের নয়নে অশ্রুর প্রবাহ বহাইতে হয়, আবার পরক্ষণেই হাস্তরসের অবতারণা করিতে হয়। তাঁহার কথা শুনিয়া যখন শ্রোতার হৃদয় করিতে থাকে, তখন তিনি সহসা ভক্তিরসায়ক গান গাহিয়া সকলেব চিত্ত আকর্ষণ করেন। এইরূপে তাঁহাকে এক কী সকল চরিত্রেরই অভিনয় করিতে হয়। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গান করিতে হয়, সেই জন্ত তাঁহার স্বকণ্ঠ হওয়া আবশ্যিক। আবার রাগরাগিণী সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। সন্ধ্যাবর্ণনায় পূর্ববী ও মূলতান, নিশীথ-বর্ণনায় বেহাগ, শম্ভরা, জয়জয়ন্তী এবং প্রভাত-বর্ণনায় ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর আলাপ করিয়া শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে হয়।

হুতরাং কথকের কার্য যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। সেকালে এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন কথক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাইত। এইরূপ শিক্ষাব সহিত আনন্দ বিভবণের ব্যবস্থা অত্র কোন সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমাদের সমাজে কে-সকল অনিষ্টকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে, সেকালের যাত্রা এবং কথকতার প্রতি লোকের অনাসক্তি অগ্রতম। যাত্রা এবং কথকতা সেকালে উৎসবের অঙ্গ-স্বরূপ ছিল। শর্করামণ্ডিত তিলক ঔষধ-বাটিকা যেকপ লোকে আগ্রহ সহকারে গলাধঃকরণ করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন ও ব্যাধির প্রতিকার করে, সেকালের যাত্রা ও কথকতা সেইরূপ জনসাধারণকে অনাবিল আনন্দ প্রদান করিত, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্মবুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতাব করিত, তাহাদের চরিত্র গঠন করিত। আমাদের মনে হয় যে, পৌরাণিক যাত্রা এবং কথকতার পুনঃপ্রবর্তনে সমাজ-নেতৃগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এখনও যে বাংলাতে কোন উৎসব নাই, তাহা নহে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, সেকালের মত একালের উৎসবে লোকের আত্মরিকতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না। সেকালের লোকে যেমন আমোদে উন্মত্ত হইতে পারিত, প্রাণ খুলিয়া উচ্ছ্বাস করিতে পারিত, একালের লোকে সেরূপ পাবে না। একালের লোকে এই আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা হারািয়া আপনাদের অক্ষমতাকে সভ্যতা নামে অভিহিত করিবাব চেষ্টা করে। একালের লোক থিয়েটার, বায়স্কোপ বা টকিতে যে অর্থব্যয় করে, তাহাতে অনেক কথক ও যাত্রাওয়ালার জীবিকা নির্বাহিত হইতে পারে। অবশ্য থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি যখন এদেশে আমদানী হইয়াছে, তখন উহা দেশে থাকিয়াই যাইবে, হাজার চেষ্টা করিলেও উহা দেশ হইতে যাইবে না। কিন্তু উহাদের সাহায্যে লোকশিক্ষার বিস্তার না হইয়া যদি বিপন্নীত ফল হয়, তাহা হইলে আমাদের একান্ত দুঃখগায়ী বলিতে হইবে। থিয়েটার সিনেমার পরিচালক-গণের দৃষ্টিও এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।



কুপণের স্বর্ণ

ত্রীনীতা দেবী

রমাপতির যে আবার কোনও দিন বিবাহ হইবে এ দুরাশা তাহাব আত্মীয়-স্বজন কাহারও ছিল না। বন্ধু-বন্ধবে বহুদিন তাহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। আব তান্ত্রের এখন রমাপতির ভাবনা ভাবিবার অবসরও নাই, রুচিও নাই। বাড়ীতেই প্রত্যেকের একটি, দুইটি, কোনও দুর্ভাগ্য ব্যক্তির বা ততোধিক অবিবাহিতা কন্যা বসিয়া আছে, তাহাদের বিবাহের ভাবনা ভাবিবে, না প্রৌঢ় রমাপতির ভাবনা ভাবিবে? ভাবিবার দিন যখন ছিল তখন বন্ধু আত্মীয় কেহই ভাবিতে কট করে নাই, কিন্তু রমাপতির কোনই গ ছিল না, কাজেই বিবাহ হইল না।

রমাপতি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। বাপ দেশে জমিদার বাড়ী রাখিয়া গিয়াছেন, কলিকাতায়ও রাখিয়া গিয়াছেন ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা এবং খান-দুই পাকা বাড়ী। ছেলে-মেয়ে অনেকগুলিই তাহার হইয়াছিল, কিন্তু বাঙালী-সংসারের যেমন নিয়ম, তাহার অর্ধেকগুলি শিশুকালেই চলিয়া গিয়াছে। বুড়া যত্নপতি মরিবার সময় রাখিয়া গেলেন, দুই ছেলে গণপতি আর রমাপতি, আর তিন মেয়ে, সরলা, তরলা আর বিমলা। মেয়ে তিনটিরই বিবাহ তিনি দিগা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেঙ্গ-মেয়ে তরলা ইহারই মধ্যে আবার বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বিধবা হইয়া, সঙ্গে একটি ছেলে। অল্প দুই বোন স্বামীর সংসারেই সুখে দুখে দিন কাটাইতেছে।

যত্নপতির বৃদ্ধা গৃহিণী বাতে একেবারে পঙ্ক, নড়িয়া বসিবার সাধ্য তাহার নাই। কাজেই বিধবা কন্যাকে দেখিয়া তিনি দিনে দশবার চোখে ঝাঁচল দেন বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করেন যে তরি না থাকিলে দিনান্তে নুড়ী মায়ের গলায় জলবিন্দুও পৌছিত না। সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধব তিনি, বি-সাকরের হাতে জল খাইতে ত পারেন না? ঘরে একটা বউ নাই যে দুইটা বাঁধিয়া দিবে, বা এক খটি জল-অগ্রসর কবিয়া দিবে।

কিন্তু বউই বা নাই কেন? যত্নপতি যখন মারা গেল

তখন বড় ছেলে গণপতির বয়স সাতাশ আর রমাপতির পঁচিশ। পড়াশুনা তাহাদের শেষ হইয়াছে, স্বাস্থ্য এই বয়সের পাঁচটা ছেলের যেমন হয় তেমনই, বাপের যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি আছে, তবু ঘরে বউ আসে নাই কেন? ছেলে-দের তেমন বদনামও ত কিছু নাই? আর বদনাম থাকিলেই কি হিন্দুব সংসারে পুরুষ মাহুষের বিবাহ আটকায় নাকি? তবু তরি না বাঁধিয়া দিলে তাহাব বিধবা মাতার খাওয়া হয় না কেন? অবশ্যই তাহার কিছু কারণ আছে।

গণপতি কিঞ্চিৎ সাহেবী মেজাজের মাহুষ। বাড়ীর সাবেকী চালচলন, সনাতনপন্থী আবহাওয়া তাহার একেবারে ভাল লাগে না। বাপ থাকিতে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না। যতই আড়ালে তাঁহাকে ওল্ড ফসিল (old fossil) বলিয়া গালি দেওয়া থাক না কেন, সামনাসামনি তাঁহার অর্ধেক থাকিত করিয়া চলিতে হয়। এ যে দায়ভাগের দেশ, এদেশে পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্ণ না বলিয়া উপায় কি? কলমের এক আঁচড়ে পথে বসাইয়া দিতে পারে যে? স্তত্রাং বিলাত যাইবার ইচ্ছা গণপতিকে মনেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং ঘরে মাছের বোল এবং আলু-পটোলের ভালুনা দিয়াই দম্ভোদর পূর্ণ করিতে হইত। অবশ্য পয়সা-কড়ি যখনই হাতে আসিত, তখনই বাহিরে গিয়া সে নানাভাবে মুখ বদলাইয়া আসিত। বিবাহ সম্বন্ধেও তাহার রুচি ছিল আধুনিক রকম। মেমসাহেব বিবাহে তাহার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, যদি মেমসাহেবের আপত্তি না থাকে, কিন্তু হায় হতভাগ্য, একথা সে বলিবে কাহার কাছে? তাহার মত মনোবৃত্তি ত এ-বাড়ীতে আর একটা কাহারও নাই। জীলোকগুলিকে ত সে মাহুষের মধ্যেই ধরিত না, কারণ তাহারা সকলেই শাড়ী পরে, এবং শুধু মাত্র শাড়ীই পরে। বাপ ত মূর্ত্তিমান সনাতন ধর্ম, এবং ভাই রমাপতি একে বোকা তায় দারুণ কুপণ। মেমসাহেব বাড়ীতে আসিলে কি পরিমাণ পয়সা খরচ হইবে তাহা ভাবিলেই আতঙ্কে তাহার

চোখ কপালে উঠিয়া যায়। এ হেন মানুষের কাছে আধুনিক ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়া কোনও লাভ নাই, কারণ আধুনিক জিনিষ মাজেরই এই দোষ যে তাহা ব্যয়সাপেক্ষ।

সরল, তরলা এবং বিমলা তিনজনেবই অতি-বালিকা-বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। এমন কি বিমলা একটু বেশী কালে ছিল বলিয়া তাহার বাবা-মা ন-বৎসর পূরিতে-না-পূরিতে তাহাকে গোবীন্দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বেশী বয়স হইয়া গেলে এ-মেয়ে আবার কেমন দাঁড়াইবে তাহা কে জানে, সকাল সকাল পার-করিয়া দেওয়াই ভাল। এখন গোলগাল মোটা-মোটা আছে, একরকম পাঁচজনের সামনে বাহির কবা যায়।

বলা বাহুল্য, পুত্রদের জন্তও কৰ্ত্তা-গৃহিণী এইরকম কন্যেই খুঁজিতেছিলেন। ছেলে যত বড়ই হউক, মেয়ে বাল্যে বৎসরের বেশী বয়সের হইবে না, ইহাই ছিল তাহাদের পণ। ঐ দেখিতে দেখিতে ভাগবট হইয়া উঠিবে বিধেব জল গাত্র পড়িলেই, তাহা হইলেই আর ছেলেদের পাশে অসাজস্ব দেখাইবে না। ছেলেরাও যে দেখিতে দেখিতে বান্ধকের দিকে আরও ধানিক অগ্রসব হইয়া যাইবে, তাহা অব তাহাবা ভাবিতে রাজী ছিলেন না। ধাতী মেয়ে আনিয়া মোটে বাগ মানানো যায় না, ইহা গৃহিণী বহুব্রাব স্বক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাহাবা সর্বদাই বাপের বাড়ীর দিকে বেশী টানে, ছেলেকে নিজের পিতামাতার বিরুদ্ধে চলিতে প্ররোচনা দেয়, এবং স্বামী-স্বামী-স্বামীকে কেবলমাত্র স্বামী-স্বামী-স্বামীই ভাবে। খাল কাটিয়া এমন কুমার ডাকিয়া আনাব তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

কিন্তু দুই ছেলেই বিবাহে নারাজ। গণপতির বিবাহ কবিতো আপত্তি নাই যদি বউ তাহার পছন্দমত হয়, কিন্তু সে-কথা বাপ-মাতার কাছে তুলিতে সাহস হয় না। অতএব বিবাহ পরে কবিবে বলিয়া সে ক্রমাগত পিছন হাঁটিতে লাগিল। রমাপতির কোনও রকম বিবাহই পছন্দ ছিল না, সে তাই মা-বোনের কাছে তারস্ববে আপত্তি জানাইতে লাগিল। বড় ভাইয়ের বিবাহ না হইলে ছোট জনের হইতে পারে না, কাজেই তখনকার মত রমাপতির উপর খুব বেশী চাপ পড়িল না। কৰ্ত্তা যত্নপতি যদি আরও কিছুকাল টিকিয়া যাইতেন, তাহা হইলে দুই ছেলেকেই

কানে এরিয়া সংসারে ঢুকাইয়া যাইতেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কক্ষিৎ অসময়ে তিনি চলিয়া যাওয়াতে গণপতি এবং রমাপতির স্বাধীনতাব পথে আর কোনও অন্তরায় রহিল না, দুজনেই হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। বাপের প্রয়োজন তাহাদের বহুদিন চুকিয়া গিয়াছিল, তাহার জোর কবিয়া বাঁচিয়া থাকার কেহই বিশেষ ভাল চক্ষে দেখিত না। গণপতি এখন ইচ্ছামত চলিতে-ফিরিতে পারিবে, এবং রমাপতি হাতে টাকা পাইয়া সেই টাকা সম্ব্যমত বাড়াইয়া সিদ্ধক ভর্তি করিতে পারিবে। বাপের বিষয়-আশয় নগদ টাকা, কোথায় কি আছে সবই তাহার নন্দদর্পণে ছিল। তিনি যে টাকা ঠাটাইবার কোনও ব্যবস্থাই করেন না, ইহা রমাপতির মোটেই ভাল লাগিত না। তাহা ছাড়া বাপের নানা রকম অপব্যয়ও ছিল, তাহারও রমাপতি সমর্থন করিত না। তিনি দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে বাহায্য করিতেন, তীর্থে যাইতেন, এবং পূজাপার্বণ করিতেন। ইহার কোনও একটাবও প্রয়োজনীয়তা রমাপতি স্বীকার করিত না। কতকগুলো অলস লোককে বসিয়া থাওয়াইয়া কি লাভ? ইহাও আলস্তের প্রশ্ন দেওয়া মাত্র। একটা দেশ আর একটুকু চেয়ে পবিত্র যে কি করিয়া হয়, তাহাও রমাপতি ভাবি-পাইত না। মাটি বা জল বিশ্লেষণ কবিয়া কোনও শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন ত পাওয়া যায় নাই, তবে অনর্থক পরসা খরচ করিয়া ছুটাছুটি কেন? আজকাল বারোয়ারি বা সার্বজনীন পূজা প্রতি পাড়ায় হয়, তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় কবিতোও কেহ ছাড়ে না, তবে আবার খরচ করিয়া বাড়ীতে এ স্বাদাম করা কেন? তাহার ভাগের টাকা এইভাবে নষ্ট-ছয় করিয়া নষ্ট করায়, সে পিতার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল।

শ্রাদ্ধ-শান্তি ঘটা করিয়াই হইল, রমাপতিব আপত্তি সম্বন্ধে। বাড়ীর সবক'টা মানুষ একদিকে টানিলে, একলা রমাপতি কি করিয়া ঠেকায়? তার শ্রাদ্ধের ব্যাপারে বেশী প্রতিবাদ করাটা ভালও দেখায় না।

কিন্তু পরদিনই সে কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগিয়া গেল। গণপতির কাছে গিয়া বলিল, “দেব দাদা, আমাদের দুজনের মোটে মতে মেলে না, আমাদের আলাদা আলাদা থাকাই ভাল।”

কাজ করিবার নামে গণপতির মাথায় বাজ পড়িত। সে মহা ব্যস্ত হইয়া বলিল, “কেন রে, আমি ত তোর কোনও কথায় থাকি না, তুই যা খুশী কর না কেন? আবার অলদা হাতে গেলে নানা হ্যাপাম, খরচও আছে কিছু। ঘর ত বউ-ঝি কারও নেই, আলাদা সংসার যে করব, তা চালাবে কে?”

রমাপতি বলিল, “আমার সংসার আমি নিজেই চলাব, কোনও বউয়েব দরকার হবে না। মেয়েমানুষ না হলে সংসার চলে না এ অতি বাজে কথা, তাবা যেমন অবসরী তেমনি অগোছাল। তোমার যদি না চলে তুমি না-হয় মাকে আর ভবিকে নিয়ে যাও।”

তাহাতে গণপতির আরও বেশী আপত্তি ছিল। তরিকে না-হয় ধমক দিয়া থামানো যায়, কিন্তু মাকে ত আর ধমক দিয়া কাজ হইবে না? তিনি ছেলের আধুনিকতা কিছুতেই সঙ্গ করিতে রাজী হইবেন না, এবং মেম বউ বাড়ীতে আসিলে বাতের ব্যথা উপেক্ষা করিয়াই বাড়ী হইতে শহির হইয়া যাইবেন। কাজেই সে বলিল, “অত হ্যাপা আমি পোয়াতে পারব না বাপু, ওরা তোমার কাছেই শার। আমি হস্ত দুদিন পবে বিলেত চলে যাব, তখন ওদের দেখবে কে? আমি বরং কিছুদিন হোটেলে গিয়ে থাকব।”

সেই রকম ব্যবস্থাই হইল। গণপতি হোটেলে ভাল দেখিয়া ঘর ভাড়া করিয়া উঠিয়া গেল এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া মহানন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার ভাগে গড়িল জমানো টাকার অর্ধেক, কলিকাতার বাড়ী একখানা এবং দেশের বিষয়ের অর্ধেক। রমাপতি লইল কলিকাতার পৈত্রিক বসত বাড়ী, ব্যাকের টাকার অর্ধেক, দেশের স্থিতির অর্ধেক। মা, বোন এবং ভাগ্নেটি বে তাহার ঘাড়ে পড়িল, তাহাতে তাহাকে বিশেষ কাতর বোধ হইল না। কারণ বাবা মারা যাইবার পব মা লাইফ ইনশুরেন্স আফিস হইতে বিশ হাজার টাকার একখানি চেক পাইয়াছিলেন, এবং তরলাও নিঃশ ছিল না। তাহাব ছেলেটি বড় হইলে বাপের বিষয় পাইবে, এখন অবশ্য খুড়া জ্যাঠা তাহাকে সমস্ত মাসহারা দিয়াই নিশ্চিন্ত আছেন। মা একে বৃদ্ধা ত্রায় বিধবা, ক’টা টাকাই বা তিনি খরচ করিতে পারিবেন? ভুলাইয়া ভালাইয়া টাকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার

রমাপতিকেই লইতে হইবে। তরলার অবশ্য এখন হাতে খুব বেশী পয়সা আসে না, কিন্তু বাহা আসে তাহাতে তাহাদের নিজেদের খরচ চলিয়া যায়, রমাপতির তহবিলে টান পড়ে না। সুতরাং তাহারা থাকায় রমাপতির ক্ষতি কিছু নাই, লাভ এই পর্যন্ত যে বাড়ীতে রাধুনি বা ঝি রাখিতে হয় না, সব কাজই তরলা করে, খালি বাজারটা রমাপতিকে কবিয়া আনিতে হয়। দুইটি জীলোকই বিধবা, তাহাদের নিজেদের জন্য রাধিতেই হইবে, না-হয় সেই সঙ্গে রমাপতি আর কান্নকেও দুই মুঠা রাধিয়া দিল? নিরামিষ খাইতে রমাপতির কিছুমাত্র আপত্তি নাই, তাহাতে পয়সা কম খরচ হয়। নিরামিষ অবশ্য বোজ তাহাকে খাইতে হইত না, কান্নর জন্য তরলা প্রায়ই মাছ কিনিত, এবং রমাপতিও তাহার অংশ পাইত। বাড়ীর সামনে দিয়া ভোব বেলা জেলে-জেলে নীতে ঝুড়ি ভর্তি মাছ লইয়া বাজারের পথে দৌড়িয়া চলে, পাডার লোকে তাহাদের ডাকিয়া মাছ কেনে। সুতরাং নিজে বাজার হইতে মাছ না আনিলেও রমাপতি তরলার এই বাজে খরচ নিবারণ করিতে পারে না। ভাল খাইতে তাহার ভালই লাগে, কিন্তু যখনই মনে করে যে এইটুকু তৃপ্তির জন্য কতগুলি পয়সা তাহাব জলে গেল, তখনই মনটা হাহাকাবে ভরিয়া উঠে। কিন্তু এই সব অব্যুত জীলোকদের সঙ্গে পারিয়া উঠা ভার, ছেলেটা একখালা ভাত না খাইলেই তাহাদের কাছে জগৎটা ফাঁকা হইয়া যায়। গোড়ায় এত বেশী মাছ ভাত খাইলে পরে যে মন ভাতও না ছুটিতে পারে, একখা হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বুঝানো যাইবে না।

বছর চার-পাঁচ ত দিব্য কাটিয়া গেল। মা আরও অর্থকর এবং বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন, কান্ন এখন স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা ভিন্ন রমাপতির সংসারে বেশী কিছু পরিবর্তন ঘটে নাই। রমাপতির ষণ পাড়া ছাপাইয়া দিকেবদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সকাল বেলা পাবতপক্ষে কেহ তাহার নাম করে না। ভোরে উঠিয়া প্রথম তাহার মুখ দেখিলে পাড়াপ্রতিবেশীর আশঙ্কার অবধি থাকে না। কিন্তু তাহাতে রমাপতির বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই। ব্যাকের খাতার অঙ্কটি এবং বাড়ীর লোহার সিল্লকে বন্দী সোনাকুপা জহরতের কাড়ির ছবিটি মনে যখন তাহাব ভাসিয়া উঠে, তখন নিঃশল আনন্দে তাহার হৃদয় প্রাণিত হইয়া যায়। ছনিয়ার মানুষ

কে তাহাকে কি ভাবিল না-ভাবিল তাহাতে তাহার কাণাকড়িও আসিয়া যায় না।

গণপতিও সুখে আছে। সে সত্যই বিলাত গিয়াছিল এবং সেখান হইতে একটি মেম বিবাহ করিয়া আনিয়াছে। কাজেই সেও এখন ধবায় স্বর্গস্থলের অধিকারী। মেমটি কাহার সন্তান, কোথা হইতে আসিল, স্বভাবচরিত্র বিদ্যাবুদ্ধি কিরূপ তাহা কেহই জানে না, গণপতিও জানে কি না সন্দেহ। তবে সে গাউন পরে, ঘাড় পর্যন্ত চুল ছাঁটে, মুখে গায়ে প্রচুর পরিমাণে রং মাখে এবং সাবান লিগারেট খায়। এমন মহীয়সী রমণী সম্বন্ধে আর কিছু অহসঙ্কান করিবার মত সাহস বোধ হয় গণপতির আব কুলায় নাই। মা বোন এবং রমাপতি ভয়ে সেদিকেই ঘেঁষে না। মা এবং তরলার ভয় পাছে জাতি যায়, রমাপতির ভয় পাছে মেমসাহেবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে গেলে পয়সা খরচ করিতে হয়। কাজেই দুই ভাই পূবাপুরিই আলাদা হইয়া গিয়াছে।

এমন সময় মহা বিপদ উপস্থিত হইল। তরলা-শরীরটা দিনকতক ভাল যাইতেছিল না কিন্তু সনাতা রীতি অনুসারে সে তাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া মহানন্দে স্নানাহার করিয়া চলিতেছিল। একবার মাত্র ত পোড়া পেটে দুইটা অন্ন পড়ে, তাহাও কি রোগের অছিল। বাদ যাইবে নাকি? কিন্তু বোগটি তাহাকে সহজে ছাড়িবে না, একেবারে পাড়িয়াই ফেলিল, শেষে এতটা বাড়িয়াই হইল যে রমাপতিকেও বাধ্য হইয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে হইল। অবশ্য গোটা পাঁচ বেয়ারিং পোষ্টকার্ড লিখিয়া সে তরলার চিকিৎসার জন্য তাহার ভাস্থবের নিকট হইতে এক শত টাকা আদায় করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং গোটা পঞ্চাশ টাকা বোনের চিকিৎসায় খরচ করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। যে কয়দিন সে বিছানায় পড়িয়া থাকিবে, স কদিনই সে ভাত খাইবে না, এবং রাজে যে আধারের আন্দাজ দুধ এক চুমুকে পার করে তাহাও বন্ধ থাকিবে। ইহাতেও কিছু সাশ্রয় হইবে।

কিন্তু ডাক্তার আসিয়া বোগিগীকে ভাল কন্ডিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “টাইফয়েড্। এঁর খুব ডল নর্সিং (nursing) দরকার, এ রকম হ’লে ত চলবে না।”

রমাপতি মুখখানা কথাসম্বল কাতর কবিতা বলিল, “কে ওসব করে বলুন? বাড়ীতে লোক কই? মায়ের ত দশা দেখছেন, তাঁকেই কে দেখে তাব ঠিক নেই। ওর ছেলে ত ঐ টুকু, আব আমাকে ত সাবান লিগারেট কাঙ্গে ব্যস্ত থাকতে হয়।”

রমাপতিকে ডাক্তার উত্তমরূপে চিনিতে। তিনি বলিলেন, “তাই ব’লে ত নর্সিংয়ের অভাবে রুগী মা বা যেতে পারে না। ঘরে লোক না থাকে বাইরের থেকে ডেকে আনুন। কলকাতার শহবে নর্সের অভাব নেই। আব এই রকম ভাবে ছোঁয়া লেপা করলে আপনাদেরও যথেষ্ট বিপদেব সম্ভাবনা। ছেলেটিকে মোটে এ ঘরেই ঢুকতে দেবেন না, ও বাইবে আপনাব কাছে থাক।”

নর্স! যাহারা দিনে পাঁচ টাকা দাবী করে, এবং দুইবার চা-কটি এবং দুইবার মাছ-ভাত খাইতে চায়? শুনিবামাত্র রমাপতি মাথায় হাত দিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ডাক্তার বলিলেন, “অত ব্যস্ত হ’লে কি চলে মশাই? অস্থখ-বিস্থখ কার বাড়ীতে না হচ্ছে? এখন মনে জোর ক’বে কাজে লাগতে হবে।”

রমাপতি অক্ষুট স্বরে বলিল, “আমি বড় গরীব ডাক্তার বাবু, নর্সের ঘে অনেক খাই?”

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “বোগে পড়লে গরীবকেও পয়সা খরচ করতে হয়। নর্স আমি এনে দেব এখন ওবেলাই, আপনাকে শূঙ্কতে যেতে হবে না।”

রমাপতি অধিকতর কাতর হইয়া বলিল, “তারা যে সবাই খ্রীষ্টান, মা তাদের ঘরেই ঢুকতে দেবেন না, তারি তাদের হাতে জলও খেতে চাইবে না।”

ডাক্তার বলিলেন, “এই আর এক ফ্যাসাদ বাধালেন দেখি। হিন্দু নর্স আবার কোথায় পাই? আচ্ছা দেখি, ঘোরাঘুরি করলে মিলতেও পারে।” বলিয়া রমাপতিকে আব কোনও আপত্তি উত্থাপনের অবসর মাত্র না দিয়া তিনি বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নর্স খ্রীষ্টান মুসলমান যাহাই হউক রমাপতির তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না যদি সে টাকা দাবী না করিত। কে বা তাহার ধর্মের খোঁজ করিতে বসিয়া আছে? মা ত

কানে একেবারে শোনেন না এবং চোখেও প্রায় কিছুই দেখেন না। স্বভাবা যাহাকে হউক ধবিয়া আনিয়া নৈকম্য কুলীন-কন্যা বলিয়া তাঁহার কাছে চালাইয়া দেওয়া যায়। তরলা জরের ঘোরে অজ্ঞান, নসের ঠিকুজী-কোণী দেবির মত ক্ষমতা তাহার নাই। কাহ্ন ওসবের ধার ধারে না, মা সারিয়া উঠিলেই সে বাঁচে। কিন্তু অত টাক্স যে খরচ হইয়া যাইবে? কিন্তু লোক না হইলেই বা চল কিরূপে? টাকা খরচের ভয় রমাপতির অত্যধিক বটে, কিন্তু প্রাণের ভয়ও সে কিছু কিছু করে। টাইফয়েড ব্যাপারটি ত কম নয়, সব কয়জনকে চাপিয়া ধরিলে কাহাবও আর নিস্তার থাকিবে না। তরলা শুইয়া ত সন্সার অচল হইয়াছে। রমাপতি আর কাহ্ন বাজারের খাবার কিনিয়া খাইয়াছে, রমাপতির মা শুধু দুধ আর ফল খাইয়া আছেন। জীলোকেরও যে জগতে প্রয়োজন আছে, তাহা রমাপতি এইবার স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

দুপুরবেলাটা আজও বাজারের খাবার কিনিতে হইল। কাহ্নর পেট কামড়াইতেছে, সে বেশী কিছু খাইতে চাহিল না, কাজেই রমাপতি তাহাব ভাগটা রাখে কাজে লাগাটবার আশায় তুলিয়া বাখিল। তরলা জরের বোবে অত্যন্ত, সে নিশ্চয়ই কিছু খাইতে চাহিবে না, কাজেই তাহার অল্প কোনও ব্যবস্থার প্রয়োজন হইল না। বুড়ী মা একটু জ্বোলো দুধ খাইয়া খানিক বক্ বক্ করিয়া থামিয়া গেলেন। মুখে একটাও দাঁত নাই, তাঁহাকে অল্প খাবার কিনিয়া গিয়াই বা লাভ হইবে কি?

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বাবু গাড়ীটা আবার দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রমাপতি তাড়াতাড়ি টুটী গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ডাক্তার নামিলেন আগে এবং তাঁহার পিছন পিছন নামিল একটি মাঝবয়সী জীলোক। তাহার হাতে একটি বড় কেবিসেব ব্যাগ। এই তাহা হইলে নর্স? আর রক্ষা নাই। রমাপতির গায়েব রক্ত হিম হইয়া আসিল, সে ব্যাকুল চোখে ডাক্তারের দিকে চাহিয়া রলিল।

ডাক্তার তখন কিছু না বলিয়া সোজা রোগিগীষ ঘবে ঢুকিয়া গেলেন, জীলোকটিও তাঁহার পিছন পিছন চলিল। ব্যাগটা একটা জানালার উপর নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এঁরই অস্থখ বুঝি?”

ডাক্তার বলিলেন, “হ্যাঁ, এর চুলটুলগুলো আঁচড়ে পরিকার কব, আব বিছানা কাপড়চোপড়ও বদলে দাও, বড় সব নোংরা হয়ে রয়েছে।” তাহাব পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “এই একে নিয়ে এলাম আব কি? পাস-করা নর্স নয়, তবে রোগীর কাজ মোটামুটি জানে। দেখিয়ে দিলে সবই করতে পারবে। আপনাদের যে আবার হাজার হাজার, খ্রীষ্টান চলবে না, হেন তেন। এ হিন্দুরই মেয়ে। কোথায় কি আছে ব’লে-ট’লে দিন।” বলিয়া তিনি রোগিগীকে পবীক্ষা করিতে লাগিয়া গেলেন।

জীলোকটির বয়স বছর ত্রিশ হইবে। রং বেশ পাকা কালো, স্বপুষ্টি দোহারা চেহারা। মাথায় চুল বেশী নাই। হাত খালি, পবনে সাদা নরুনপাড়ের ধুতি আর সাদা একটা ব্লাউসের মত কি। রমাপতির দিকে চাহিয়া বলিল, “এঁর কাপড়চোপড়, বিছানার চাদর এসব কোথায়? বদলে দিই।”

রমাপতি তরলার বাস্তব বিছানা সব দেখাইয়া দিল। বোনের আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া কাপড়চোপড় কিছু কিছু বাহির করিয়াও দিল। তাহার পর ডাক্তারের পিছন পিছন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ডাক্তার ত বসিলেন প্রেস্ক্রিপশন্ লিখিতে। রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, “ওঁকে কত ক’রে দিতে হবে? ওঁর নাম কি?”

ডাক্তার মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, “মাস-হিসাবে হ’লে মাসে ত্রিশ টাকা, দিন-হিসাবে হ’লে কিছু বেশী পড়বে। ওঁর নাম সরযু সেন।”

ত্রিশ টাকা! খানিকক্ষণ রমাপতির মুখ দিয়া আব কথা বাহির হইল না। তাহার পর বলিল, “খেতে দিতে হবে ত?”

ডাক্তার চটয়া বলিলেন, “তা আপনার বাড়ী কি না খেয়ে কাজ করবে মশায়?”

রমাপতি বলিল, “না না, না খেয়ে কাজ করবে কেন? তবে রান্নাবান্না সব আমার বোনই করত কিনা, এখন কি ব্যবস্থা হবে তা ত ভেবে পাচ্ছি না।”

ডাক্তার প্রেস্ক্রিপশন্ টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া বলিলেন, “সে যা হয় আপনি করবেন। নসের ব্যবস্থা

করলাম বলে রাধুনীর ব্যবস্থাও আমি করতে পারব না। চললাম এখন, ঢের রুগী এখনও বাকি আছে।” বলিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

রমাপতি দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরের দিকে চলিল। আজ আগাগোড়া সবই মন্দ। ভালর মধ্যে শুধু এই যে ডাক্তার তরলাকে বালির জল ভিন্ন আর কিছু থাইতে হলে নাই। নবাবী রকম পথের ব্যবস্থা দিয়া গেলে বেচারী রমাপতিকে আজ ধনেপ্রাণে সারা হইতে হইত। কিন্তু বালির জলই বা করে কে? রমাপতিকে কি শেষে এই আসে হাত পুড়াইয়া রাখিতে বসিতে হইবে? নসরতাকে বলিয়া দেখিলে কেমন হয়? চট্টিয়া উঠিবে না তা? নসরতী স্ত্রী-জাতীয় হইলেও, ঠিক জ্বীলোকের মত ব্যবহার তাহাদের নঙ্গে করা চলে কি না সে বিষয়ে রমাপতির যথেষ্টই সন্দেহ ছিল।

কালু তখন বাহিরের ঘবে তক্তপোষের উপর বসিয়া ছলিয়া ছলিয়া নামতা মুখস্থ কবিতোছে। সময় কাটাইবার ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর উপায় সে বেচারী আর কিছু ভাবিয়া পায় নাই। রমাপতি অন্তরে গিয়া তরলার ঘরের ভিতর একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। সরষু সেন নসরত হইলেও জ্বীলোকের মতই কাজ করিতেছে। তরলার বিছানাটা পরিষ্কার করিয়াছে, কাপড়চোপড় বদলাইয়াছে, চুলও বোধ হইল ঝাঁচড়াইয়া দিয়াছে। ঘরটাও যেন অনেকখানি পরিচ্ছন্ন বোধ হইতেছে, সে কি ঝাঁটও দিয়াছে নাকি? তাহা হইলে উত্তম ধরাইয়া বালি সিঁদ্ধ করিতে বলিলে মারিতে নাও আসিতে পারে। রমাপতি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

এ-বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইট নাই, কেরোসিনের ল্যাম্পই জলে। তরলার ঘর প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, সরষু রমাপতির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আলো কোথায়?”

রমাপতি তক্তপোষের তলায় অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল একটি চিম্নী-ভাঙা হারিকেন লণ্ঠন রহিয়াছে। আরও বলিল, “উপরে উঠবার সিঁড়ির পাশে বোতলে তেল আছে।”

নসরত লণ্ঠনটা টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর এক টুকরা ছেঁড়া শ্রাবাড়ার সাহায্যে চিম্নীটাকে পরিষ্কার করিতে লাগিল। রমাপতির খুবই ইচ্ছা করিতে লাগিল, মায়ের

ঘরের ও নিজের ঘরের লণ্ঠন দুইটাও আগাইয়া দেয়, কিন্তু প্রথম দিন অতখানি ভয়সায় কুলাইল না। সরষু চিম্নি পরিষ্কার করিয়া, তেল ভরিয়া, আলো জ্বলাইয়া ঘরে ঢুকিয়া গেল। বুড়ীর ঘরের আর রমাপতির ঘরেব আলো অসঙ্কটই রহিয়া গেল। রমাপতি লণ্ঠন দুইটি জ্বলাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আবার বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। কালু তখনও পড়া করিতেছে।

বাহির হইতে নসরত আবার জিজ্ঞাসা করিল, “বালি কি করা হয়েছে? কোথায় আছে? আর আপনার মা জল চাইছেন, আমি কি তাঁকে জল দেব?”

রমাপতিকে আবার উঠিয়া আসিতে হইল। সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, “বালিটা যদি ক’র নেন, রাধুনীটার অস্থখ করেছে বলে চলে গেছে। মায়ের ঘরেই ত জল আছে, আমি দিচ্ছি।”

সবু গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা তাই নাকি? তা আমাকে আগে বলেন নি কেন? এতক্ষণে হয়ে যেত। বসেই ত আছি তখন থেকে। আমি জল গড়িয়ে দিচ্ছি, আমার হাতে থাকেন কি না তা ত জানি না, তাই জিগুগেখ করছিলাম।”

মাল্লমটা ত বেশ ভালই বোধ হইতেছে; রমাপতি যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারাত বৈষ্ণ, এই জ্বীলোকটিকেও তাহাই বোধ হইতেছে। ইহার হাতে জল থাইতে মায়ের আপত্তি হইবে কেন? তবে ভাব্‌কার মত থাক।

সে সরষুকে রান্নাঘরের দরজাটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, “ঐ যে রান্নাঘর, এখন অবধি ট্রেনে ঝাঁচ পড়ে নি। সকালে বাজারের খাবার কিনে খেতে হয়েছে। আপনি উত্তুনট ধরান, আমি মাকে জল দিয়ে আসছি। কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে সব ওখানেই আছে।”

মা এতক্ষণ নিজের ঘরে আপন মনে বকবক করিতেছিলেন। “চার পহর বেলা গড়িয়ে গেল, এখন অবধি মুখে এক ফোঁটা জল পড়ল না। তরি মবেহিস্ নাকি? যেন আমায় ভুলে আছে। ওরে ও মুখপোড়া রমা, তোরা সব গেলি কোথায়?”

রমাপতি ঘবে ঢুকিয়া বলিল, “যাব আর কোন্ চুলোয়, বাড়ীতেই আছি। কার বা মুখে জল পড়েছে? তরি ত

কাল থেকে জ্বরে অজ্ঞান, কে কার পিণ্ডির ব্যবস্থা করে ?
এই নাও জল ।”

মা জলের ঘটি হাতে করিয়া বলিলেন, “তুই দিলি ?
তোমর ত আচার-বিচার কিছু নেই। তিনকাল গিয়ে
এককালে ঠেকেছে, এখন যার তার হাতে খাব ? তরির
আবার জ্বর হ’ল ? ছুটো চাল ভাল সেদ্ধ করে কে ?”

রমাপতি চট্টিয়া বলিল, “আচ্ছ কেবল নিজের তালে।
আর আচারের ভাবনা ভাবতে হবে না, যা হাতের কাছে
পাচ্ছ, গেল। তরি বলে মবছে, সে আসবে তোমার চাল
ভাল সেদ্ধ করতে ।”

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাকে কে দেখছে ?”

রমাপতি বলিল, “ডাক্তারবাবু এক জন নর্স নিয়ে
এসেছেন, সেই দেখছে ।”

মায়ের হাত হইতে জলের ঘটিটা ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেল,
ঘরের মেঝেতে ঢেউ খেলিতে লাগিল। তিনি চীৎকার
করিয়া উঠিলেন, “ওমা কে-খায় যাব গো ! খীরিষ্টানের
হাতে খাবে নাকি আবাসী শেষে ? আমার ঘরে ফের কেউ
না ঢোকে তা ব’লে দিচ্ছি, আমি তাহলে মাথা খুঁড়ে
মরব ।”

রমাপতি মাকে টানিয়া জলপ্লাবন হইতে সরাইয়া
বসাইয়া দিল। বিবস্ত্র ভাবে বলিল, “খ্রীষ্টান নয়, খ্রীষ্টান
নয়, তোমাকে টেচিয়ে পাড়া মাথায় কবতে হবে না। হিন্দুর
মেয়ে, বৈদ্যের মেয়ে, তুমিও ত তাব হাতে জল খেতে পার।
কাল থেকে তাই খেতে হবেও, না-হয় ত শুকিয়ে থেক।
আমি ত আব কাজকর্ম ফেলে তোমায় আগলে বসে থাকতে
পারব না ?”

মা বলিলেন, “হ্যাঁ হিঁদুর মেয়ে, হিঁদু ত কাঁদছে।
তাহলে নর্সের কাজ করবে কেন ?”

এই বেয়াকল বুড়ীর সঙ্গে বকিয়া লাভ নাই, রমাপতি
বাহির হইয়া চলিয়া গেল। পেটে আগুন ধবিলে মা ঠিক
খাইবেন সরষুর হাতে, তখন আর অত বিচার থাকিবে না।

সরষু বালি জাল দিয়া আনিয়া রোগিণীকে খাওয়াইল।
তাহার পর বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া
জিজ্ঞাসা করিল, “আর সকলের রাতে খাওয়ার কি ব্যবস্থা
হবে ?”

রমাপতি বিব্রত ভাবে বলিল, “তাই ত ভাবছি।
বাজার থেকে খাবার কিনে আনব ?”

নর্স বলিল, “না না, বাজারের খাবার ভারি খারাপ
জিনিষ, ওসব খাবেন না। এক জন ত অস্থখে পড়েছে,
বাকিদের হলে মহা মুশ্কিল হবে ।”

রমাপতি বলিল, “তাহলে ?”

নর্স বলিল, “উহুনে আঁচ ত দেওয়াই আছে, আমিই
ছুটো চাল ভাল সেদ্ধ করে নিচ্ছি। ভাঁড়ারে সব
আছে ত ?”

রমাপতি মহোৎসাহে বলিল, “এই ত পরশু এক মাসের
ভাঁড়ার আনলাম, সবই আছে নিশ্চয়। আলু পটোলও
আছে ।” ভাগ্যে হিন্দু নর্স আনার প্রস্তাব সে করিয়াছিল,
না হইলে এ সুবিধাটুকু ত হইত না।

সরষু চলিয়া গেল। তরলা ঘুমাইতেছে, তাহার কাছে
বসিবার তখন দরকার নাই। ষ্টা দেড়েকের ভিতর সে
খিচুড়ী রাঁধিয়া ফেলিল, আলু পটোলও ভাজিয়া লইল।
তাহার পর কাছ ও রমাপতিকে ডাকিয়া আনিয়া খাইতে
বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার মা কি খাবেন ?”

রমাপতি খাইতে খাইতে বলিল, “তিনি ছুখ ছাড়া রাধে
কিছু খান না, আপনি খেয়ে নিন ।”

সরষু রান্নাঘরে ঢুকিয়া নিজের খাবার বাড়িতে লাগিল।
রমাপতি খাওয়া শেষ করিয়া নিজের এঁটো থালা-গেলাস
উঠাইয়া লইয়া কলতলায় ধুইতে চলিল, দেখামেধি কাছও
তাহাই করিল। সরষু রান্নাঘর হইতে জিজ্ঞাসা করিল,
“ঝিও নেই বুঝি ?”

রমাপতি আমতা আমতা করিয়া বলিল, “সেটাও বাড়ী
চলে গেছে ।”

সরষু আর কথা না বলিয়া খাইতে লাগিল। তাহার
পর রান্নাঘরের বাসন ধুইয়া, ঘর পরিষ্কার করিয়া, তরলার
ঘরে গিয়া ঢুকিল।

রমাপতি সকালেই উঠে। কিন্তু উঠিয়া দেখিল নর্স
তাহারও আগে উঠিয়াছে। ঘর-দোর ঝাঁট দিয়াছে, এবং
উছন ধরাইয়া রান্নাও চড়াইয়াছে। দেখিয়াই রমাপতির
চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। হাজার হউক হিন্দুর মেয়ে ত ?
নর্সের কাজ করিলে কি হয় ? ঘরকরনার কাজ নিশ্চয়ই

সব জানে, এবং কবিতাও তাহার কিছু আপত্তি নাই।
খালি মাসে ত্রিশ টাকা মাহিনা যদি না চাহিত।

সরযু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “চা খান নাকি আপনারা ?
আমি কিন্তু খাই।”

রমাপতি বলিল, “না খাই না, তা আপনি নিজেব স্বস্তে
করুন।”

নর্স বলিল, “তাহলে কয়েক পয়সার চা এনে দিন, তিনি
দুধ ঘরেই আছে।”

রমাপতি ব্যস্ত হইয়া বলিল, “দুধ আবার কোথা থেকে
এল ?”

সরযু বলিল, “কেন আপনাদেব গয়লানী ত দিয়ে গেল,
বললে রোজ এক সের করে দুধ আপনারা বাবেন।
আপনার বোনকে ছানার জল দিতে হবে ডাক্তারবাবু’লে
গেছেন, তাই দুধটা আমি বাখলাম।”

রমাপতিব শনির দশা ধরিয়াকে, না হইলে এত উৎসাহ
তাহার উপরে কেন ? এক সের দুধ ? মাসে ছ’সাতটা
টাকা ? তরি হতভাগী নিজের টাকা কয়টা এমনই করিয়াই
জলে দেয়। নিজেব দুধ চাই, ছেলের মাছ চাই, যেন সব
নবাব খাজা খায়ের নাতী নাতনী। বলিল, “এক সেব দুধই
কি ছানার জল করতে লাগবে ?”

নর্স বলিল, “তা নাও লাগতে পাবে, দুবাব দিলে স্বাধ
সেইই হবে। খোকা দুধ খায় না ?”

খোকা ত কত। গৌর বাহির হইবার বয়স হইতে
চলিল। রমাপতি বলিল, “নাঃ, অতবড় ছেলের আবার
দুধের দবকাব কি ? দুবেলা ভাতই ত খাচ্ছে।” নর্স মাহুষ
চেনে, সে আব কথা বাড়াইল না।

দিনটা মোটের উপর ভালই গেল। নর্স ঘরের সব
কাজই করিতেছে, তবে যে কাজের জন্ত তাহাকে আনা,
সেইটাই প্রায় বাদ পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে রমাপতি
আপত্তি নাই। হিন্দুঘরেব বিধবা, চট কবিতা মরিতে না।
মুখে জল ত পড়িতেছে, ঔষধও পড়িতেছে, আবাব কি চায়
তরল ? রাত্রে একটা মাহুষও ঘরে থাকে তাহাকে আগ-
লাইবাব জন্ত। ঐ ঢের।

আজ সরযু সব ঘরের লঠনই পবিত্তার করিয়া জালিয়া
দিল। তরলা ভাল থাকিতে রমাপতি যতটা আরামে ছিল,

তাহা ত ইহার কাছে প্রত্যাশা করা যায় না ? এ রমাপতিব
এঁটো বাসন মাজে না, কপড় কাচে না, বিছানাও করিয়া
দেয় না। এতগুলি টাকা ত লইবে। কিন্তু যেমন রমাপতি
কপাল। নইলে তরি হতভাগী বা টাইফয়েড বাধাইবে
কেন ? বিপদের উপর বিপদ, সেইরাগেই রমাপতি
কোমরের বাতটা চাগাইয়া উঠিল। এ-গোষ্ঠীর সকলেরই এ-
বোগ অল্পবিস্তব আছে, রমাপতিব মা এবং সে নিজে
বিস্তরের অধিকারী। সাবারাত যন্ত্রণায় ছটফট করিয়া
সকালের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কাল হতভাগা এককাড়ি
গিলিতে জানে, কিন্তু তাহাকে নিয়া কাণাকড়ির উপকারের
প্রত্যাশা নাই। সারারাত মামার কাতরোক্তি সম্পূর্ণ
অগ্রাহ্য কবিতা সে মহানন্দে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

সকালে একটু বেলা কবিতা উঠিয়া সে সরযুকে বলিল,
“আজ আর ভাত খাব না, বড় বাতে ধরেছে।”

সরযু বলিল, “ও মা, আমি ত চাল চড়িয়ে দিয়েছি,
জানি না ত ? তা যাক্ গে, আপনাকে দুখানা ঝটি করে দেব
কি ?”

তা খাইবে বইকি ? পকের পয়সা কিনা ? রমাপতি
বলিল, “ভাতটা জল দিয়ে রাখবেন, কাল খাবে এখন। ও
পান্তা ভাত খুব ভালবাসে। ঝটি আমার চাই না, আমি মুড়ি
খাব এখন। তরি কেমন আছে ?”

সরযু বলিল, “একটু ভালই বোধ হচ্ছে। এই যে চা-টা
খেয়ে টেম্পারেচার নেব এখন। বোধ হয় চোদ্দ দিনেই জ্বর
ছেড়ে যাবে, খুব শক্ত টাইপের নয়।”

কিন্তু চোদ্দ দিনে ছাড়িল না, একশ অবধি গড়াইয়া গেল।
একটু সেবাস্ত্রব্য করিলে হস্ত আরও আগে সারিতে
পারিত, কিন্তু করে কে ? রমাপতি নিজেকে লইয়া ব্যস্ত,
আব সবসু সমসার লইয়া ব্যস্ত। হামাই তাহাকে দুবার করিতে
হয়। একবার মাছের রান্না, একবার নিরামিষ, বৃদ্ধাব জন্ত
তিনি বাধ্য হইয়া এখন সরযুর হাতেই খাইতেছেন। সরযুকে
দেখিলে ত বিধবাই মনে হয়, কিন্তু মাছ ত দিব্য খায়।
পাছে পলায়ন করে ভাল খাইতে না পাইলে, এই ভয়ে
রমাপতি মধ্যে মধ্যে মাছ কিনিয়া আনিতে বাধ্য হয়।

তবেলা ত সারিয়া উঠিল, অর্দ্ধাং জবটা ছাড়িয়া গেল।*তবু
ও হতভাগী বিছানা ছাড়িয়া উঠে না, কথা বলিলে জবাব দেয়

না, মহা মুন্সিল। কতকাল আর এভাবে চলবে? এখন উঠিয়া পড়িয়া নিজের কাজকর্মের ভাব নিয়ে গ্রহণ করিলে রমাপতি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কান্নাব জ্যাঠামহাশয়ের বাছ হইতে যে একশ' টাকা অদ্বায় করিয়াছিল, সরষুর মাহিনা ত্রিশ টাকা দিয়া দিলে, তাহাব আব অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই, রমাপতির নিজের পরসায় যদি হাত না পড়ে।

ভক্তাব সেদিন আসিতেই রমাপতি জিজ্ঞাসা করিল, “ভক্তাব বাবু, জব ত ছাড়ল, কিন্তু এ যে ওঠেও না, হাঁটেও না, কত দিন আর এভাবে চলবে? গরীবের ঘর, কাজকর্ম করতে হবে ত?”

ভক্তাব বলিলেন, “আগে বাঁচুক মশায়, তারপর কাজকর্ম। এ ত সহজ রোগ নয়, সারলেও বেশীর ভাগ চিরকালের মত একটা না একটা উপসর্গ রেখে যায়। এঁর ত বোধ হচ্ছে ডান দিকটা অবশ্য হয়ে গেছে।”

রমাপতি আশ্বিনাদ করিয়া উঠিল, “কি সর্বনাশ, কতদিন এমন থাকবে?”

ভক্তাব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তা কি বলা যায়! সময়ে সেরেও যেতে পারে,” বলিয়া অতি অবিবেচকের বহু প্রশংসা কবিলেন।

আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল। তরলা উঠিয়া কাজ কবিবাব কোনও লক্ষণই দেখাইল না। সরষু আসিয়া বলিল, “দেখুন, ইনি ত সেবে উঠেছেন, মানে নসের আর কোবও দরকার নেই, কি দিয়েই কাজ চলতে পারে। আমার মাইনেটা যদি দিয়ে দেন ত আমি চলে যাই, আমার আর একটা ‘কল’ এসেছে।”

রমাপতির মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সরষু চলিয়া গেলে উপায় হইবে কি? কি ত দুহাতে পয়সা চুরি কবিবে, বাড়ীর জিনিষপত্রও যে না চুরি করিবে তাই বা বলা যায় কিরূপে? তাহার উপর সে রান্না কবিবে না, একটা রাধুনীও রাখিতে হইবে। সর্বনাশ, খাইছাই তাহারা রমাপতিকে পথে বসাইয়া দিবে।

সে কাতরভাবে বলিল, “আরও দিনকতক থাবুন, তারি সেরে উঠুক।”

সরষু বলিল, “ওঁর সারতে এখন ঢের দেরি, ন-মাস

হ’তে পারে, বছর ঘুরে যেতে পারে। তত দিন আমি এখানে শুধু শুধু থাকলে লোকে বলবে কি? আপনিই বা অত পয়সা খরচ করবেন কেন? একটা যিয়েই যখন চলে।”

তাই ত, মাসে ত্রিশটা করিয়া টাকা! এমন কোনও উপায় হয় না যাহাতে বিনা খরচে ইহাকে রাখা যায়? সারারাত ভাবনায় রমাপতির ঘুম হইল না। উপায় ত সে ভাবিয়া পাইল, কিন্তু সরষুর কাছে বলিতে যে লজ্জা করে?

কিন্তু বলিতেই হইল। কারণ তাহার পরদিনও সরষু মাহিনা চাহিতে আসিল। রমাপতি মবিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, “এ মাসে দিচ্ছি, কিন্তু পবের মাস থেকে আর দিতে পারব না।”

সরষু গালে হাত দিয়া বলিল, “ওমা, তা মাইনে না দিলে আমি থাকব কেন?”

রমাপতি বলিল, “এই, আমি বলছিলাম কি—যে একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, যাতে মাইনে লাগে না?”

নস বলিল, “সে আবার কি?”

রমাপতি ঘামিতে ঘামিতে বলিল, “এই ধর আমি যদি আপনাকে বিয়ে করি, তাহলে ত—”

সরষু বলিল, “তা মাইনে লাগবে না বটে। তা আমি বিধবা মেয়ে, আমায় বিয়ে করলে সমাজে খাটো হ’তে হবে না?”

রমাপতি বুক ফুলাইয়া বলিল, “বয়েই গেল, সমাজের আমি খাই না পরি?”

পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল, দুটো ভাইই অপদার্থ। একটা আনিল মেম, আর একটা করিল বিধবা বিবাহ। রমাপতি কিন্তু আনন্দে দিশাহারা। বউ ঘরের কাজ ত করিবেই, উপরন্তু নসিং-জানা বউ, বাতের শুশ্রূষাও ভাল মতে করিবে।

কিন্তু দুই দিন পরে বউ যখন মায়ের ঘরের লোহার সিন্দুক খুলিয়া এক গা গহনা পরিয়া আসিল, তখন রমাপতি ব্যস্ত হইয়া বলিল, “প’রো না, অতগুলো প’রো না, সোনা ক্ষয়ে যাবে।”

সরষু বলিল, “হঁ, পরব আবার না। ক্ষইবে ব’লে এয়োজী মাহুষ গহনা পরব না? অত কিপ্টেমী চলবে না।”

রমাপতি দেখিল সব সুখস্বপ্নেরই অবসান আছে।

“চণ্ডীদাস-চরিত”

(৭)

হেন মতে কিছুদিন চণ্ডী রাসমণি ।
সাধন প্রসঙ্গে রহে দিবস রজনী ॥
যদিও সমাজ তাহে নাহি ভাবে আন ।
তত্রাপি নকুল সবে ভ্রলই ব্রহ্মান ॥
নকুল চণ্ডীর হয় সমাজ-সুহৃৎ ।
মহামানী বিচক্ষণ বহুশাস্ত্রবিৎ ॥
নর মধ্যে চণ্ডীর কর্ণেব কিবা ফল ।
আদৌ তা বুঝিতেন তিনিই কেবল ॥
হেথায় রোহিণী নিশি জাগে অভিসারে ।
প্রায় উঠি যায় কোথা কেহ না ঠাউরে ॥
একদিন বুঝিতে পারিল দয়ানন্দ ।
কোথা যায় বলি তার মনে হইল সন্দ ॥
কিছু না বলিয়া কতু তাহার পশ্চাতে ।
চলিলেন দয়ানন্দ সবার অজ্ঞাতে ॥
আজি তোরে না বধিয়া না কিবির ঘর ।
এই কথা বোহিণী কহিলা অন্তঃপুর ॥
ভাবে তবে দয়ানন্দ এই কথা শুনি ।
কি হেতু কাহারে বধ করিবে রোহিণী ॥
মাঝে মাঝে ক্ষেও ক্ষেও ডাকে ক্ষেপাল ।
হুঙ্কারে কুকুর ফিবে পালে পাল ॥
নির্ভয়ে এলায়ে কেশ চলিছে রোহিণী ।
গজেন্দ্র-গমনে যথা নগেন্দ্র-নন্দিনী ॥
বরাবর যায় চলি পবন-গমনে ।
কত বড় বড় ঘর রাখিঞা দক্ষিণে ॥
উপনীত হইল শেষ রাজ-দরবারে ।
হেথা সেথা করি দেখে ভিতর বাহিরে ॥
তথা হতে গেল চলি বাগানবাড়ীতে ।
উকি-ঝুঁকি মারি তবে পাইল দেখিতে ॥
ধ্যানমগ্ন রহে রাজা উত্তর-হামীর ।
এক তীক্ষ্ণ খড়্গ রামা করিল বাহির ॥

যেমন করিবে রাজ-অঙ্গে খড়্গাঘাত ।
দয়ানন্দ ছুটি গিঞা ধরে দুট হাত ॥
কব কি রোহিণী বলি মুখশানে চায় ।
চমকি রোহিণী তবে সরিঞা দাঁড়ায় ॥
তখন সে দয়ানন্দে কিছু না শ্লিষ্য ।
তথা হতে দ্রুতবেগে আইসা চলিয়া ॥
২৩৮] কিছু দূর আসি কহে পিতৃ-হস্তা জনে ।
অবশ্য কর্তব্য মোর বধিতে গবাণে ॥
কেন ধর্ম নষ্ট মোর কবিলে হামিন্ ।
যাক আজ কিন্তু তারে বাঁচাবে কদিন ॥
দয়ানন্দ কহে তুমি কুলবর্তী নারী ।
কেমনে ধরিবে প্রাণ নর-হত্যা করি ॥
রোহিণী ক্রিয়সা কহে চাহি প্রতিশোধ ।
তাহে দুর্বলতা মাত্র পাপ-পুণ্য-বোধ ॥
যদ্যপি বধিতে আমি না পারি তাহারে ।
রাজধর্ম ক্ষমিবে না জন্ম-জন্মান্তরে ॥
এক পক্ষে হঞা আমি অতিবলহীন ।
আর পক্ষে হই কিন্তু কুলিশ-কঠিন ॥
রাজার নন্দিনী আমি কহি তব আগে ।
তুঁই মম প্রতিহিংসা সদা মনে জাগে ॥
যেক্ষণে জনকে মোর কাটিলা হামীর ।
সেই মত কাটিয়া পাড়িব তার শির ।
বক্ষে ধরি তার পর চরণ তুমার ।
সংসার করিব এই প্রতিজ্ঞা আমার ॥
দয়ানন্দ বলে ওহো কি বলিস ক্ষেপী ।
রাজ্যারে নাশিলে দেশ উঠিবে যে ক্ষেপি ॥
রোহিণী কহিলা স্তন হৃদয়-বেদতা ।
অর্গে থাকি কি আদেশ করিহেন পিতা ॥
যাই যাই থাক বাবা স্নেহে স্বর্গপুরে ।
আজ কিম্বা কাল আমি বধি হামীরে ॥

এত বলি রোহিণী হইলা অন্তর্দ্বান ।
 বসি পড়ে দয়ানন্দ হঞে হতজ্ঞান ।
 কিছু ক্ষণ পরে উঠি চলে ধীরে ধীরে ।
 উপনীত হইল গিঞা শয়ন-মন্দিরে ॥
 হেথা প্রভু চণ্ডীদাস বসিঞা ধ্যানেতে ।
 সকল বৃত্তান্ত তিনি পারিলা জানিতে ॥
 ধ্যান-ভঙ্গে উঠি তবে চলিলা সশর ।
 রাজ-অস্ত্রপুরে যথা হামীর-উত্তর ॥
 ধীরে ধীরে চক্ষু মেলি দেখে নৃপমণি ।
 সমুখেতে চণ্ডীদাস ভক্ত-চুড়ামণি ॥
 দণ্ডবত্ নমি রাজা কহিলা তখন ।
 হেনকালে কেন প্রভু হেথা আগমন ॥
 উত্তরিলা চণ্ডীদাস কি কহিব আর ।
 বড়ই বিপদ রাজ্য সমুখে তুমার ॥
 নিশি-যোগে আসে যায় নারী একজন ।
 চোবাঘাতে তুমার সে বধিতে জীবন ॥
 নারী বলি কহু তারে না ভাবিহ হীন ।
 গুপ্ত ভাবে অস্ত্রপুরে থাক কিছু দিন ॥
 বিন্মত না হও রাজা খুব সাবধান ।
 এত বলি চণ্ডীদাস হইলা অন্তর্দ্বান ॥
 ভাবিতে লাগিল তবে হামীর রাজন ।
 কি হেতু নাশিবে মোরে কেবা সেই জন ॥
 নিত্য কর্ম হয় যার পর-উপকার ।
 তাহাব মরণে বাঞ্ছা হয় তবে কার ॥
 প্রাণ-ভয়ে থাকি যদি অন্তর-মহলে ।
 বাঁচিয়াও মরা আমি হব যে তা হলে ॥
 কিন্তু যদি হেনমতে ঘটে তিরোভাব ।
 মরিয়াও অমর হব মোর লাভ ॥
 নিত্য আমি রব হেথা ধ্যানেতে মগন ।
 যায় যাবে যাক তাহে আমার জীবন ॥
 এত ভাবি নর-রায় বসি সেই স্থানে ।
 নিত্য কর্ম করে নিত্য নির্দ্বিকার মনে ॥
 একদিন ধ্যান-মগ্ন আছে নরমণি ।
 ধীরে ধীরে গিঞা তথা পশিলা রোহিণী ॥

২৪/]

যেমন মারিবে খড়্গ নৃপতির মাথে ।
 কে ছুটি ধরিল হাত পশ্চাৎ হইতে ॥
 চেয়ে দেখে চণ্ডীদাস আছে ধরি হাত ।
 রোহিণীর শিরে যেন হইল বজ্রাঘাত ॥
 চণ্ডীদাস কহে কৃষি আরে হতভাগী ।
 রাজ-অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত করিবি কি লাগি ॥
 কুলের কামিনী তুই এমন রাক্ষসী ।
 এই দোষে হস্ত তোর পড়িবে যে খসি ॥
 কোন্ দোষে কহ তব কহিলা রোহিণী ।
 ভবানীরে কইল বধ এই নৃপমণি ॥
 বেশ ত আছেন তিনি সিংহাসনে বসি ।
 কই তার হাত ছুটি পড়ে না ত খসি ॥
 জনকে যেদিন রাজ্য করিল নিধন ।
 তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ ॥
 বয়েস পর্য্যন্ত যার না দেখিলা মুখ ।
 ভাস্কর স্বস্তর পর সবার সমুখ ॥
 হেন মাতা কইলা যবে চিতা-আরোহণ ।
 তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ ॥
 রাজ-কন্ডা হঞে আমি দাসী-বৃত্তি করি ।
 কৃত লাখী খেওঁছিহু রাজ-পদে ধরি ॥
 হত বা না হত কহু উদর-পূরণ ।
 তখন কোথায় তুমি ছিলে হে ব্রাহ্মণ ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার কি ছিল না সেকালে ।
 কি আছে রাজার ধর্ম্ম কর্তব্য লজ্জায়ে ॥
 রাজ-কন্ডা আমি এই রাজ্য-অধিকারী ।
 হামীরে নাশিব কিছা দিব দূর করি ॥
 পিতৃ-সিংহাসনে মোর বসিব এখন ।
 ইথে কি অধর্ম্ম তুমি দেখিছ ব্রাহ্মণ ॥
 হামীর-উত্তর কহে করি যোড়পাশি ।
 ব্রাহ্মণ রাজার কন্ডা তুমিই বোহিণী ॥
 এস মাগো রাজলক্ষ্মী বস সিংহাসনে ।
 তোরে রাজা করি আমি বাইব যে বনে ॥
 ধর ম' মুটুক পর মস্তকে তুমার ।
 রাজ-রাজেশ্বরী তুমি লহ রাজ্যভার ॥

দ্বিয করি বলি কিন্তু শুনে থাক 'কানে ।
 তোর পিতৃহত্যা এই হামীব না জানে ।
 চমকি উঠিঞা তবে কহিলা রোহিণী ।
 মোর পিতৃ-হত্যা তুমি জান না নৃমণি ।
 কে দিলা তোমায় তবে এই রাজ্য-ভাব ।
 কে করিল হত্যা কহ পিতাবে আমার ।
 রাজা কহে পিতা ভব ভবানী-ধোয়াত ।
 সামন্ত রাজার বংশ কবিঞা নিপাত ।
 বসিয়াছিলেন এই সিংহাসনোপরি ।
 ছুরন্ত সামন্ত জাতি দিলা দূব কবি ।
 লোকমুখে শুনি মা গো কিছু দিন পরে ।
 বৈশাখের অগস্ত্যোৎসব এ রাজ-দরবারে ॥
 ছন্দ-বেশে আসিঞা সামন্ত বার জন ।
 কৌশলে করিলা তোর পিতার নিধন ।
 এ রাজ্যেব হুঞা তারা সম-অধিকারী ।
 মাসে মাসে হয় রাজা এক জন কবি ।
 তাহাতে না হয় দেখি রাজ্যের স্ফোর ।
 মোরে কহা দিঞা এক দিলা রাজ্যভার ॥
 জাতে ছত্রী হই আমি ছিলাম পশ্চিমে ।
 মাতুল-আশ্রমে মোর বারানসী ধামে ॥
 চণ্ডীদাস প্রভুর সে পরশি চরণ ।
 সঙ্ক্ষেপে কহিলু এই সত্য বিবরণ ॥
 কর মা বিচার তুই নিজ স্বার্থ ছাড়ি ।
 কে কাহার রাজ্য তবে লঞ্চেছিল কাড়ি ॥
 শুনিঞা রোহিণী তবে হাস্য করি বলে ।
 রাজ্য কাড়াকাড়ি লঞ্চে বিচার না চলে ॥
 কাড়াকাড়ি বিনা রাজ্য কে কোথায় পায় ।
 সমরে নইলে কাড়ি নাহি দোষী তায় ॥
 কিন্তু রাজ্য চোরাবাতে লয় বেবা কাড়ি ।
 না করি তাহার হিংসা কেবা ধৈর্য ছাড়ি ॥

জানি আমি তুমি রাজা ধার্মিক স্বজন ।
 পরমপণ্ডিত তুমি অতি বিচক্ষণ ॥
 প্রতিজ্ঞা করিঞা তেঁঞি কহি মহাভাগ ।
 এ রাজ্যের দাবী আদ্রি করিলাম ত্যাগ ॥
 যদি হত্যা-পাপ না পরস্র এই ভূমে ।
 ২৪৮] স্থখে রাজ্য কর রাজা বংশ-অহঙ্কমে ॥
 কিন্তু তায় বলুণ্ডিত হলে এই মাটি ।
 মরিবে সকল রাজা করি কাটাকাটি ॥
 দিলাম এ রাজ্যে আমি এই অভিশাপ ।
 দেখি শুনি দাও রাজা যত্নরূপে রাঁপ ॥
 এত বলি নমি বামা চন্দ্রের চরণে ।
 অদৃষ্ট হইলা এবে সহস্র বদনে ॥
 চণ্ডীদাস মুখপানে চাহি নররায় ।
 কহিলেন কহ দেব কি বরি উপায় ॥
 উত্তরিল চণ্ডীদাস কহে সতুর্বেদ ।
 ব্রহ্ম-বধে প্রায়শ্চিত্ত ব্রহ্ম-অধমেধ ॥
 কিন্তু কলিযুগে তাহা ন হয় শোভন ।
 কব রাজা নব-রাজি হরি-সংকীর্জন ॥
 সর্ব পাপ হয় দূর মাত হরিনামে ।
 বলি গেলা চণ্ডীদাস আশন আশ্রমে ॥
 এই মতে করি রাজা বহু আয়োজন ।
 নব-রাজি করিলেন হরি-সংকীর্জন ॥
 থাইলা অসংখ্য দ্বিজ বৈষ্ণব ভিথারী ।
 আইলেন নররায় বহু ভীর্থে ফিরি ॥
 গয়াভোজ্য দিঞা তবে বসিলেন পাটে ।
 নিয়োজিলা বিপ্র কত বেন-চণ্ডী-পাঠে ॥
 এইরূপে ব্রহ্ম-বধ-পাপ-বিমোচনে ।
 থাকেন হামীর রায় হবষিত মনে ॥
 রাম-পূর্বমার আর বেনী দেরি নাঞি ॥
 চলিলেন বিষ্ণুপুবে চণ্ডীদাস রাই ॥
 আবার হেরিব বাঁকা মন-মোহন ।
 শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ হইল আনন্দ মগন ॥

৩৫) বৈশাখ মাসেব অগস্ত্যযাত্রাব দিন, অর্থাৎ ১লা বৈশাখ । ইহার
 পূর্বদিন চড়ক হইয়াছিল । সেদিন ভবানী-ধোয়াৎ খঞ্জরের আঘাতে
 নিহত হন । দ্বাদশ সামন্ত রাজ্যেব অধিকারী হইয়া এক এক মাসে এক
 এক জন রাজা হইত ।

বিষ্ণুপুত্র বনগ্রাম বাজার মাথা ।
 মল্লেশ গোপাল-সিংহ নিবসেন যথা ॥
 চলে তথা চণ্ডীদাস চতুর্দোলে চড়ি ।
 সঙ্গে রামী রামরূপ ফুলচাঁদ ছড়ি ॥*
 রামরূপ ফুলচাঁদ মল্লরাজ-দূত ।
 নৃপতির প্রিয় অতি জাতিতে রত্নপুত্র ॥
 শঙ্খনাদ করি তবে যত পুরবাসী ।
 চণ্ডীর মস্তকে ফুল ছুড়ে রাশি রাশি ॥
 কেহ করে জঙ্ঘরনি কেহ গুণ গায় ।
 এইরূপে চণ্ডীদাস হইলা বিদায় ॥
 মল্লরাজ-পুরে তবে উপনীত হন ।
 নগরের শোভা দেখি প্রফুল্লিত মন ॥
 অবিশ্রান্ত যাতায়াত করে নর নারী ।
 সারি সারি শোভে কত দোকানী পসারী ॥
 কত শত দেবালয় স্বর্ণ উচ্চ-চূড়া ।
 প্রবাল মুকুতা মণি মাণিক্যেতে জড়া ॥
 বড় বড় বাপী কত না যায় বর্ণন ।
 প্রকাণ্ড পরিখা গড় করেছে বেষ্টন ॥
 আশ্রয় তাল তমাল বিশাল তরু-রাজি ।
 মনোমত করি যেন রাখা আছে সাজি ॥
 অদ্ভুত সুদীর্ঘ এক প্রাচীরেতে বেড়া ।
 রাজ-অট্টালিকা শোভে ধরি উচ্চ চূড়া ॥
 ঢোল ঢঙ্কা বাজে কত শব্দ নহবত ।
 কেহ নাচে কেহ গায় বাজায় সঙ্গত ॥
 বার্তা পেয়ে মল্লরাজ বাহিরে আইসে ।
 কবপুটে প্রণাম করিলা চণ্ডীদাসে ॥
 কহিলেন আজি মম অতি সুপ্রভাত ।
 ঘরে বসি পাইছ তেজি প্রভুর সাক্ষাৎ ॥
 কৃপা করি অন্তঃপুরে করুন গমন ।
 মহিষী করিবে তব চরণ দর্শন ॥
 হাসি কহে চণ্ডীদাস স্তন নরমণি ।
 পুর মধ্যে কারো কভু নাহি যাই আমি ॥

তবে যদি পাই দেখা মদন-মোহন ।
 অবশ্যই অন্তঃপুরে করিব গমন ॥
 ২৫/] রাজা কহে থাকে মুক্তা শুক্লির ভিতরে ।
 কিন্তু সে কি জানে মুক্তা কত গুণ ধরে ॥
 কত রত্ন গর্ভে সিদ্ধ করিবে ধারণ ।
 জানে কিসে রত্ন কত যতনের ধন ॥
 আছে বটে মল্লপুরে সে অমূল্য ধন ।
 আমি কি চিনিব তায় হঞ্জে নরাধম ॥
 একাত্মা সে চণ্ডীদাস-স্রীবাধা-বল্লভ ।
 তব ইচ্ছা হলে সে ত নহে অসম্ভব ॥
 মোর পাশে থাকেন যে রূপে যবে তিনি ।
 দেখাইব আমি তাঁরে লইবেন চিনি ॥
 ভূমিও আইস মা গো রাই রাসমণি ।
 তব আগমনে আমি বহুভাগ্য মানি ॥
 এইরূপে পরস্পর করি সম্ভাষণ ।
 রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে করিলা গমন ॥
 ছিলা রাণী স্থির-নেত্রে দাঁড়ায়ে প্রাঙ্গণে ।
 প্রণাম করিলা তবে দৌহার চরণে ॥
 সসম্মানে যুগচন্দ্র পাজিলেন তিনি ।
 তাহাতে বসিলা প্রভু চণ্ডীদাস রামী ॥
 তাড়াতাড়ি করে কেহ চরণ খালনে ।
 কেহ ছুটাছুটি করি তাক্ষর-আনে ॥
 আশ্বে ব্যস্তে আসি কেহ চামর ঢুলায় ।
 বসি কাছে কত কথা কহে নররায় ॥
 বালক বালিকা বহু ফিরে দলে দলে ।
 অসংখ্য রমণী রহে অন্দর-মহলে ॥
 আবার কহিলা রাজা কে আছ হোথায ॥
 তামাকু সাজিয়া পুন আনহ স্বরায় ॥
 চণ্ডীদাস হাস্যমুখে কহিলা তখন ।
 কোথা মল্লেশ্বর তব মদন-মোহন ॥

৩৬) প্রায় ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে এদেশে তামাক চলিয়াছে । গল্প আছে,
 মদন-মোহন বালক-বেশে তাহার ভক্ত রাজা বীর-হাবীরের নিমিত্ত
 কলিকার তামাক সাজিতেন । বোধ হয়-কুকসেন গল্পটি জুড়িয়া দিয়াছেন ।

* হুড়ি-দার।

রাজা কহে এর মধ্যে আছেন যে তিনি ।
 অন্তর্গামী তুমি প্রভু লহ তারে চিনি ॥
 পুরমধ্যে তিনি মোর স্নেহের সন্ততি ।
 রণক্ষেত্রে হন তিনি মোর সেনাপতি ॥
 রাজ-কাজে মন্ত্রী তিনি বিপদের বন্ধু ।
 তিনিই তরণী মোর তরিবারে সিদ্ধ ॥
 বসিলেন চণ্ডীদাস ধ্যানস্থ হইঞে ।
 আইল বালক এক তাম্রকূট লঞে ॥
 কলিকা না লয় কেহ থাকে সেহ ধরি ।
 মাঝে মাঝে দেয় ফুক কলিকা উপরি ॥
 দেখিল তখন চণ্ডী মেলিঞা নয়ন ।
 কলিকা ধরিঞা রাহে মদন-মোহন ॥
 প্রভু প্রভু বলি তবে উঠে অকস্মাত ।
 রাণী কোলে হস্ত করি উঠে জগন্নাথ ॥
 মহিবীর পদে চণ্ডী মুবছি পড়িল ।
 অজ্ঞান হইয়া পড়ে যে যেথায় ছিল ॥
 মোহ ভাজি চণ্ডীদাস কহিলা তখন ।
 কোথা যা যশোদে তব সে নীল-রতন ॥
 বহুভাগ্যবান রাজা বহু ভাগ্য তোর ।
 একবার যে মা তাবে ধরি বুকে মোবণ ॥
 বহুপুণ্যফলে আমি কইলু আগমন ।
 এই তোর বিষ্ণুপুর নব বৃন্দাবন ৩৭ ॥
 রাণী কহে প্রভু আমি অতিজ্ঞানহীন ।
 না হেরি নয়নে তারে আর কোন দিন ॥
 আজি রাই চণ্ডীদাস পুর-পদার্পণে ।
 প্রত্যক্ষ করিলু আমি মদন-মোহনে ॥
 জ্ঞান-শূন্য ছিহু তেঁই নাহি জানি আমি ।
 কোল হতে কতক্ষণ গিঞাছেন আমি ॥
 আবার বসিলা চণ্ডী মুদিয়া নয়ন ।
 হৃদয়-মাঝারে হেরে মদন-মোহন ॥

সর্বদা হইল ক্ষণে কটকিত তায় ।
 সিন্ধু হইল বক্ষস্থল নন্দনারায় ॥
 নিকটে বসিঞা তবে হাই রাসমণি ।
 ২৫৮] কর্ণমূলে বার বার করে হরিধ্বনি ॥
 ক্রমে ক্রমে চণ্ডীদাস পাইলা চেতন ।
 চেতন পাইঞা করে আশ্রয়স্বরূপ ॥
 কিছু ক্ষণ পরে প্রভু কহিলা রাজন ।
 বিশ্রাম করিব আমি কোথায় আশ্রম ॥
 একটি সুরম্য স্থান গড়ের বাহিরে ।
 নির্দিষ্ট করিলা রাজা আশ্রমের তরে ॥
 তথা রামী চণ্ডীদাস থাকে মনস্থখে ।
 যখন যা চান তাঁরা আনি দেয় লোকে ॥
 দিনরাত যাতায়াত কবে নরনারী ।
 কিন্তু সবে দেয় গালি বহু নিন্দা করি ॥
 দয়ানন্দ-সরস্বতী বিষ্ণু-শিরোমণি ।
 মহানন্দ-উপাধ্যায় যত মহামানী ॥
 কার্য না বুঝিয়া তাঁর উঠলেন চটে ।
 শুনিলে চণ্ডীর নাম গর্জি দিঞা উঠে ॥
 একদিন গেলা সবে রাজ-সম্মিথানে ।
 কহিলা অনেক কথা যা আইলা মনে ॥
 অন্তরে হাসিয়া রাজা কহিলা তখন ।
 উচিত তা হলে হয় পরীক্ষা এখন ॥
 করহ যেমতে পার পরীক্ষা তাহার ।
 পশ্চাত্ত যা হয় আমি করিব বিচার ॥
 এত কহি মনে মনে হসি নরপতি ।
 কহিলেন প্রভুপদে এ মোব মিনতি ॥
 প্রকাশ মহিমা তব সবার সমুখে ।
 লেগে যাক চূণকালী স্বাকার মুখে ॥
 প্রকাশ্যে কহিলা রাজা নাও সবে এবে ।
 কর গে পরীক্ষা তায় পার যেই ভাবে ॥
 যে আজ্ঞা বলিঞা তবে সবে চলি গেল ।
 পরীক্ষার পথ তারা খুজিতে লাগিল ॥
 কেহ কহে রামীরে লুকাইয়া রাখ কোথা ।
 কেহ কহে তা হলে না রবে কারো মাথা ॥

৩৭) বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাধীর শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হইয়া
 বিষ্ণুপুরকে নব বৃন্দাবন করিয়াছিলেন । বাজের নাম ও নিকটস্থ গ্রামের
 নাম বৃন্দাবন হইতে লইয়াছিলেন ।

আসিয়াছে যত বার চণ্ডীদাস রামী ।
 রাজ্যব অপার ভক্তি দেখিয়াছি আমি ।
 তার মধ্যে বামীরে অধিক ভক্তি তার ।
 না করিবা তাব প্রতি কোন অত্যাচার ।
 কেহ কহে সেই ভাল আইলে বাহিবে ।
 রামীরে ধরিয়া কোন ঘরে রাখ পুরে ।
 তার স্থানে বেঞ্চা এক করুক গমন ।
 রামী-কণ্ঠে করুক সে প্রেম-আলাপন ।
 দেখিব গোপনে কিবা করে চণ্ডীদাস ।
 এই কথা শুনি দেয় সকলে সাবাস ।
 একদিন সম্মতকালে রজক-ঝিয়ারী ।
 গিঞাছেন কোথা কিন্তু না আইলা কিরি ।
 ধ্যান-ভঙ্গে চণ্ডীদাস রাই বলি ডাকে ।
 যাই বলি পড়ে সাড়া কিছু দূর থেকে ।
 চণ্ডীদাস কহে রাই হইল যে রাস্তা ।
 বেঞ্চা কহে রামী-কণ্ঠে তাহে কিবা ক্ষতি ।
 কিন্তু এক নিবেদন করিহু তুমাবে ।
 গিঞাছিহু আমি আজি লাল-সরোবরে^{৩৮} ।
 স্তন দেব কত নারী রূপেতে বিজলী ।
 নাগর ধরিঞা বৃকে করে জল-কেলি ।
 দেখিঞা আমার মন হয় উচাটন ।
 সর্বাগ্রে আমারে তুমি দাও আলিঙ্গন ।
 চণ্ডীদাস কহে এ কি আশ্চর্য ঘটনা ।
 তুমি সেই রামী কিবা আরো কোন জনা ।
 ৬৭] সঙ্কীর্ণনী দিঞা রাই-বাঁচালি যে মোরে ।
 ভুজঙ্গিনী হয়ে সে কি দংশিবার তরে ।
 দেখালি স্বর্গের শোভা নন্দন-কানন ।
 এখন করাতে চান নরক-দর্শন ।
 সে চক্ষু যে বহুদিন হারাঞেছি রাই ।
 কেমনে তুমার তবে বাসনা পুরাই ।
 পূর্ণিমা কহিলা হাসি শুন মহাশয় ।
 পূর্ণ কর বাহা মোর বিলম্ব না সয় ।

জ্ঞান নাকি চণ্ডীদাস রমণীর আশা ।
 পূর্ণ না করিলে তার ঘটে কি দুর্দশা ।
 চণ্ডী কয় জ্ঞান আমি ক্লীব হয় সে বা ।
 চিব-ক্লীব চণ্ডীর তাহাতে ভয় কিবা^{৩৯} ।
 হেন কালে রাসমণি বাতি লঞা হাতে ।
 পশিলা আশ্রমে তবে আসি কোথা হতে ।
 পূর্ণিমা পলাঞে গেল ছুটিঞা বাহিরে ।
 দেখিলেন রাসমণি কিছু পাশে ফিরে ।
 কহিলেন চণ্ডীদাসে দেখিলাম একি ।
 চণ্ডী কহে তোর মুখে এ প্রশ্ন সাজে কি ।
 হইল দুপুর রাস্তা তবু দেখা নাই ।
 হায়রে আমার এমনি গুণমণি রাই ।
 রামী কহে কত জন না বুঝি কারণ ।
 অবরুদ্ধ করি মোরে রাখে এতক্ষণ ।
 চণ্ডী কহে এই সেই তারি পরিণাম ।
 বড়ই অদ্ভুত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম ।
 দিতে পারি রূপণেও দাতা-কৰ্ণ নাম ।
 জামাতার অন্নদাসে বলি ভাগ্যবান ।
 শিব-ভুল্য হলেও এ বলা বড় দায় ।
 ছুটির নিকটে মান রবে কিবা যায় ।
 এইরূপে রাজ-স্থানে লইলে বিশ্রাম ।
 অবশ্য তাহাতে মোর কিছু ক্ষতি নাই ।
 কিন্তু সেটা আমার কর্তব্য নাহি হবে ।
 এই হেতু কিছু শিক্ষা দিব আমি সবে ।
 রামী কহে সত্য কিন্তু আশ্চর্য্য চাই ।
 নইলে হবে স্থল-উপস্থানের লড়াই^{৪০} ।
 চণ্ডী কহে বাসলীর যা ইচ্ছা তা হবে ।
 তজ্জাপি উচিত মোর শিক্ষা দেণা সবে ।
 এত কহি হইলেন ধ্যানেতে মগন ।
 রাসমণি নীরবেতে করিলা গমন ।

৩৯) (মহাভারতে) অন্নলোকে অর্জুন উর্বশীকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া পাশে ক্লীব হইয়াছিলেন । বিরটিভবনে অর্জুন বৃহল্লা ।

৪০) মহাভারত আদিপর্বে (২০৯-২১২ অঃ) হনু ও উপহনু অত্যন্ত বলশালী এক-রূপ-ধর দুই ঠোতা ভ্রাতা ব্রহ্মার বরে ব্রৈলোক্য-বিজয়ী হইয়াছিল । তাহাদের নাশের নিমিত্ত ত্রিলোক্য প্রেরিত হইলে তাহাকে পাইবার জন্য দুই ভ্রাতা কল্লুক্ষে নিহত হয় ।

৩৮) এই সরোবরের প্রচলিত নাম লালবাড় । বিষ্ণুপুরের ললস্রী ঠাকুরের নামে বাজের নাম । বিষ্ণুপুরে সাতটি বাজ বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ

সেখায় পড়িল ফুল বাসলীর পদে ।
 বুঝিলেন মাতা চণ্ডী পড়েছে বিপদে ॥
 ধরিলেন করে স্ত্রীমা খড়্গ খরসান ।
 মল্লরাজ-পুরে গিঞা হইলা অধিষ্ঠান ॥
 পূর্ণিমার মুখে শুনি নির্ঘাস বারতা ।
 সকলে পাইল বড় অস্তরেতে ব্যথা ॥
 সরস্বতী কহে সবে স্তন সর্বজন ।
 অদ্য রাত্রে কারো যদি ঘটে মরণ ॥
 চুপে চুপে আশ্রমে দুইঞে সেই শবে ।
 রাখি আসি প্রহরায় রব মোবা সবে ॥
 ডাকি ভূপে দেখাইঞে কব চণ্ডীদাস ।
 অর্থ-লোভে হে রাজন কবিয়াছে নাশ ॥
 উপাধ্যায় কহে সেটা সম্ভব কি হবে ।
 অর্থে লোভ চণ্ডীর যে কত না সম্ভবে ॥
 রামী সঙ্গে ছিলা তার বড়ই প্রণয় ।
 এ কথা বলিলে কিছু সজত বা হয় ॥
 সরস্বতী কহিলেন সেটা হবে পবে ।
 রোগীর সন্ধান এবে কব ঘরে ঘরে ॥
 অদ্য রাত্রে একাজ নিশ্চয় হুণ্ডা চাই ।
 ২৬৭/ পুনঃ পুনঃ কহি সবে দিলেন বিদায় ॥
 সারাদিন সবে মিলি ফিরি হেথা সেথা ।
 মরণ-উন্মুখ বোগী না দেখিলা কোথা ॥
 দয়ানন্দ-ঘরে সবে আইলা তখন ।
 কহিল কোথাও রোগী নাহি এক জন ॥
 সরস্বতী বলে তবে কি হবে উপায় ।
 আজ নয় কাল হবে কহে উপাধ্যায় ॥
 পুনঃ কহে দয়ানন্দ দুইয়ের কৌশল ।
 যত শীঘ্র পড়ে ধরা ততই মঙ্গল ॥
 হেন কালে ছুটাছুটি আসি এক নাবী ।
 কাঁদিয়া কহিল কর্ত্তা আইস স্মরা করি ॥
 আচম্বিতে খোঁকার কি হইল নাহি জানি ।
 ঝলকে ঝলকে রক্ত কবিতোছে বমি ॥
 খোঁকা দয়ানন্দেব সে একই সন্ধান ।
 পঞ্চম বর্ষীয় শিশু দেখিতে স্ত্রীমাম ॥

ছুটি গিঞা সবে মিলি দেবিলা তখন ।
 চিরদিন তরে খোঁকা মূলেছে নয়ন ॥
 দয়ানন্দ কাঁদি উঠে বক্ষে কর হানে ।
 হুশীল হুশীল বলে ডাকে ঘন ঘনে ॥
 উঠিল কান্নার রোল কে কাঁবে সামান্দে ।
 কাঁদে মাতা উচ্চরোলে শব লঞা কোলে ॥
 উপাধ্যায় শিবোমণি দিতেছে সান্ধনা ।
 কি বলিছে কি বুঝিছে কানেই শুনে না ॥
 কহে পরে উপাধ্যায় দয়ানন্দ ডাকি ।
 জ্ঞান-বুদ্ধ তুমি ভাই তবে কর একি ॥
 বাঁচা-মরা সকলই ঈশ্বরের হাত ।
 তার স্তন্য তুমি কি করিব আশ্রয়ত ।
 স্তন বলি এক কথা অই শব লঞে ॥
 রাখি চল চুপে চুপে চণ্ডীর আলয়ে ॥
 সাবা রাত সবে মিলি রব প্রহরায় ।
 প্রভাত হইলে ডাকি দেখেব রাজায় ॥
 তাব পব ফলাফল দেখিব কি হয় ।
 পুত্র ত গেছেই তবে শত্রু হোক ক্ষয় ॥
 দয়ানন্দ ধীরে ধীরে দিলা তবে সায় ।
 সেই মত করি সবে বহে প্রহরায় ॥
 তখনি কবিলা গ্রামে সর্বত্র প্রচার ।
 হাবাঞে গিঞাছে দয়ানন্দের কুমার ।
 উঠিলা সে কথা তবে নৃশতির কানে ॥
 সরল-হৃদয় রাজা সত্য বলি মানে ॥
 কেহ কহে বোধ হয় কেন কপালিআ ।
 পালাইঞা গেছে সেই নালকে লইঞা ॥
 কেহ কহে এতক্ষণ হুণ্ডা গেছে বলি ।
 কেহ কহে কিম্বা কেহ মাঝিয়াছে ফেলি ॥
 গহনা তাহার অঙ্গে ছিলা বহু জানি
 এই হেতু অসম্ভব নহে প্রাণহানি ॥
 শিশুর জননী যত শয্যা-স্তরে গিঞা ।
 আছে কি না আছে শিশু দেখে পরীক্ষিঞা ॥
 চিন্তায় আকুল সবে কেহ না যুমান ।
 এই রূপে নিশি তবে হইল অবসান ॥

অলখ-বোরা

ত্রিশান্তা দেবী

পূর্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকান্ত শিবু ও সখাকে লইয়া থাকেন। সখা শিবু পূজার সময় মহামায়া সঙ্গে সামান্য বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির পরর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহার রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষণচন্দ্র ও দ্বিবা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাহার স্মিতা দ্বিবা হরধূরীর খুব ভাব। হরধূরী সসারের কত্রী কিন্তু অস্তুরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক অস্বস্তিবাহু। পূজার পূর্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সখার দ্বিবা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুতে মহামায়া ও হরধূরী চক্রে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অস্তুসেবা, কিন্তু শোকে উদাসীন্দ্রে ও অশ্রুচের নিষম গালনে তিনি আপনাদের অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার শিষ্য পুত্রের জন্মের পর হইতে তাহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিষ্টাঙ্গ দ্বিবা হরধূরীর হাতেই মাহুয হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রী চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সখার মন বিরহ-ব্যবল হইয়া উঠিল। পিঙ্গিনাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও পঙ্কিত মন সখা মা বাব ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল।]

(১০)

এই কলিকাতা! এ যে একটা সম্পূর্ণ নূতন পৃথিবী! নয়ান-জোড়ের সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের ভিতর তাহার সেই গোনা কয়টি মাহুয, আবার আরও কত দূরে তেঁতুলডাঙা গ্রামে তাহাদেরই আশ্রয়-পরিচিত আর কয়েকটি মাংস মাহুয! আর এখানে এ কি? মাগো, এ যে গুনিয়া শো করা যায় না। হাওড়া স্টেশনে ট্রেন হইতে নামিবার প-গন্ধার পোল পার হইয়া এত পথ আসিতে বতগুলা মাহুযে-অবিশ্রাম শ্রোত দেখা গেল সখা সারা জীবন খরিয়াম ও এতগুলি মাহুয দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। পৃথিবীতে এত অসংখ্য মাহুয তাহার এত কাছে ছিল, অথচ তাহার জীবনেই স্মরণীয় দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোনও পরিচয় সে পায় নাই, ভাবিতেই বিশ্বমে মন ভরিয়া উঠে। আর 'শুধু কি মাহুয? বত না মাহুয, তার দুগুণ যেন বাড়ী। সার

পৃথিবীতেই এত যে বাড়ী থাকিতে পারে তাহা সখার ধারণা ছিল না।

স্টেশন হইতে একটা ভাড়াটে গাড়ীর মাধ্যম বাস বিহান্না ঝুড়ি ঝোড়া চাপাইয়া পাড়ি দিতে হইল—সেই প্রায় খালের ধারে। কলিকাতা শহরের এক মোড় হইতে আর এক মোড় একদিনেই পাব,—সখাদের নবজাগ্রত বিশ্বয় এত বড় ক্ষেত্রে যেন দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে লাগিল। একে ত গাড়ীটা ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া অন্ধক জিনিষ চোখে পড়ে না, তাহাতে ভিতরেও বালতি কুঁজো হাঁড়ি-কুঁড়ির ভীড়ে নিবন্ধ হইয়া বসা যায় না; শিবু উদ্বেজিত মন এত রকম বাধা ও বন্ধন মানিয়া চলিতে চাহিতেছিল না। সে বলিল, “মা, আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়ে হাঁটি। দু-দিক্ ত দেখতে পাচ্ছি না। বড় তাড়াতাড়ি পথ পাব হয়ে যাচ্ছে।”

মা বলিলেন, “গাড়ী থেকে একবার নামলে মাত্রের তোড়ে কোথায় তলিয়ে যাবি, তোকে যে আর খুঁজেই পাব না রে। তার চেয়ে আজ গাড়ীতেই চল, তার পর অন্ত দিন হেঁটে দেখিস এখন, কলিকাতা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।”

শিবু চঞ্চল হইয়া বলিল, “না, আজকেই দেখব। অল্প দিন ত অনেক পরে হবে।”

সে দরজা খুলিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়ে আর কি? শিবুর চাকলের হোয়াচ যেন ছোট খোকর মনেও সঞ্চারিত হইয়া গেল। ঘড় ঘড় করিয়া সারি সারি ট্রাম গাড়ী ঢং ঢং কটা বাজাইয়া ছুটিতেছে দেখিয়া সে শিশি-বোতল বোঝাই বালতিব ভিতরেই দুই পা নামাইয়া বন্ধি ভঙ্গিতে কোনও প্রকারে দাঁড়াইয়া নাচ শুরু করিয়া দিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “পাগলারা সব ক্ষেপে গেছে।”

মহামায়া বলিলেন, “ক্ষেপে না? সভ্য জগৎটা ত তুমি জন্মের এতদিন দেখতে দাও নি। আখমরা গল্পের পাল

আর নেংটিপরা সাঁওতালের ভীড় ছাড়া আর ত কিছু গুণের দেখা অভ্যাস নেই।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “সে ত ভালই হয়েছে। জন্মাবধি এই গদ্য পৃথিবী দেখা থাকলে এর ভিতর কোনও আনন্দের খোরাক খুঁজে বার করা শক্ত হত।”

গাড়ী হইতে নামিতে না পাইয়া শিবু প্রাশ্বেব সাহায্যেই তাহার কোঁড়ুলটা মিটাইবার চেষ্টা শুরু করিল। রাতার এ-মোড় হইতে ও-মোড় পর্যন্ত বাসা বাড়ী দেখিয়া সে বলিল, “মা, এখানে সব বাড়ী এমন এক সঙ্গে জোড়া দেওয়া কেন? বাগান নেই, মাঠ নেই, একটা পুকুরও নেই। লোকের চান করে না, বাসন মাজে না?”

মা বলিলেন, “সবই করে, বাসায় চল, দেখতে পারি। ঘরের ভিতর পুকুর তালাবন্ধ আছে।”

বাস্তার ধারে সারি সারি দোকান ঘবে চেনা অচেনা কত যে অসংখ্য জিনিষ তাহার ঠিক নাই। খাওয়া পরা আর শোওয়া, মানুষের জীবনের এই ত সামান্য তিনটি উদ্দেশ্য, তাহাব জন্ত এমন অজস্র ব্যবসজ্ঞারের কি প্রয়োজন হুখা ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিন্তু তবু প্রশ্ন করিয়া বোকা বনিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কাবুলীনের দোকানে শুপাকারে মেওয়া ও ফল, দিল্লীওয়ালার দোকানে জরির জুতা ও জবির টুপি, খেলনার দোকানে ঠিক মানুষের মত বড় বড় খোকা পুতুল, বাজনার দোকানে বড় বড় গ্রামোফোনের চোঙা, ফুটপাথের উপর নানারঙের কাচের বাসন ও অচেনা পরিচ্ছদ, এগুলি সবই মানুষের জীবন-যাত্রায় কোনও সাহায্য করে, না তামাসা করিয়া কেহ সাজাইয়া রাখিয়াছে বোঝা শক্ত। মেওয়া দেখা হুখার অভ্যাস নাই, ফলও সে যা দেখিয়াছে তাহা ত তাহান্না গাছ হইতেই পাড়িয়া খায়, তাহার কোনটারই এমন চেহারা নয়; গ্রামোফোনের চোঙার কাছাকাছি কোনও জিনিষের সঙ্গেও হুখাশিবুর কখনও পবিচয়ই হয় নাই। মাংসের দোকানে ছালছাড়ানো আস্ত জীবদেহ দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়া হুখার রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধে এমন আঘাত লাগিয়াছিল যে ভবিষ্যৎ জীবনে সে কখনও মাংসের দোকানের সম্মুখে চোখ ঝুলিত না। কাচের বাসন দেখিয়া শিবু শু চীৎকার করিয়া উঠিল, “মা দেখ, দেখ, কাচের আচার

বাটি বানিয়েছে, থালা বানিয়েছে। ওতে কি কেউ খায় নাকি?”

মা বলিলেন, “সাহেবরা খায়। তোদের মত পাড়া-গোঁয়েরা খায় না।”

কাঁসা পিজলের বাসন, তক্তাপোষে বিহানা মাদুর ও কাপড় গামছাব উপরে মানুষের যে আঁকিছুর কেন প্রয়োজন হয় ভাবিয়া হুখা নিজেই মনের বাঁছে কোনও সন্ততর পাইতেছিল না। নিজেই অজ্ঞ ভাবিতে তাহার আত্মসম্মান খুব যে ক্ষুণ্ণ হইল তাহা নয়, তবু গণবাসীদের মস্তিষ্কের উপরে তাহার প্রভা একটু কমিষ্ট গেল এই অনর্থক প্রয়োজন সৃষ্টিব বিপুল বাহিনী দেখিয়া

রাস্তাজোড়া নিরেট বাড়ীর মাঝে মাঝে চার্টলের মত সর সর গলি। হুখা জিজ্ঞাসা করিল, “এর ভিতর দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় বাবা? ওদিকটা ত দেখা যায় না।”

শিবু বলিল, “জান না? এতে বলে হুড়ম্। আমার বইয়ে ত আছে।”

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, “ন, একে হুড়ম্ বলে না, একে বলে গলি।”

ক্রমে বাড়ীর উচ্চতা ও ঠাসাঠানি একটু কমিয়া আসিল। মাঝে মাঝে দুই-চারিটা পোড়ো ভূমি ও জীর্ণ থালার বস্তু দেখা যায়। আকাশ গাছপালা দবই এখন কিছু কিছু চোখে পড়ে। এ আর একেবারে চট মোড়া বড়বাজারের কণ্ঠ নয়।

এইখানেই একটা গলির মুখে গাড়ীটা দাঁড়াইয়া পড়িল। হুখা ও শিবু উদ্গ্রীব হইয়া বাহিরের দিকে চাছিল। প্রকাণ্ড একটা লাল রঙের বাড়ী, একদিকে বড় বাস্তু, একদিকে গলি। বাগান উঠান নাই বটে, কিন্তু রাস্তার টিপরেই প্রতি তলায় বড় বড় বারান্দা, সেখানে বসিলে সব পথটা দেখা যায়। সামনেই তিন ধাপ খেতপাথরের সিঁড়ি, ফুটপাথের থেকে উঠিয়া খেতপাথরে বাঁধানো বারান্দায় ঢোব হইয়াছে। এমন পাশিশ-করা পাথর শিবু কখনও দেখে নাই, হুখু এই কারণেই বাড়ীটা তাহাব অত্যন্ত পছন্দ হইয়া গেল। গাড়ী হইতে প্রায় লাফাইয়া পড়িয়া সে বারান্দাটায় চড়িয়া দাঁড়াইল। দরজাটায় সজোরে ধাক্কা দিল, বেশ নম্রাকাটা দবজা কিন্তু কেহ খুলিয়া দিল না। মহামায়া ভাকিয়া

বলিলেন, “ওরে বোকা, পরের দরজা ঠেঙিয়ে ভাঙিস না।”

শিবু মা'র কথায় নিরাশ হইয়া প্রাণের স্বরে বলিল, “কেন, এটা ত আমাদের বাড়ী?”

মহামায়া বলিলেন, “হ্যাঁ, তুমি যে লাখ টাকা দিয়ে কিনেছ।”

গলির দিক্ দিয়া পৈতা গলায় একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান ছাড়া মাথা বাহির করিয়া আসিয়া বলিল, “এই দিকে বাবু, এই দিকে। ভাড়া-ঘর এখানে।”

গলির দরজা খুলিয়া গেল; একেবারে চৌকাট হইতেই সোজা দোতলায় উঠিবার সজীর্ণ সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, দরজায় দুমিনিট অপেক্ষা করিবার জন্তও এক হাত স্থান নাই। এ-সিঁড়ির বাঁক আরম্ভ হইবার মুখেই একদিকে রান্নাঘর ও অপর দিকে পাশখানা, তাহারই পাশে খাবার ঘর। একটুও স্থানের অপব্যয় নাই, মানুষের স্তম্ভিবা-গ্রস্ত হইবার কোনও অবকাশ নাই। সামনের কালোপাড়া দেওয়া খেতপাথরের বারান্দা দেখিয়া শিবু যেমন হুঁই হইয়াছিল, এই অন্ধকার খাঁচা দেখিয়া তাহার মন তেমনই মুগ্ধিলা গেল। মাথার উপরের ছাদ পর্যন্ত এত নীচু যে লম্বা মানুষ হাত তুলিয়া দাঁড়াইলে ছাদে হাত ঠেকিয়া যায়। সূখা বিস্মিত চোখে ছাদের দিকে তাকাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবার মুখের দিকে চাহিল। চন্দ্রকান্ত ছোট খোকা-ক মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া তাহাকে ছাদে ঠেকাইয়া দিয়া বলিলেন, “তোমরা ভগ্নাংশের সিঁড়ির অঙ্ক শিখেছ ত? নীচে একতলা, তারপর সিঁড়ি ভেঙে দেড়তলা, তার পর সিঁড়ি ভেঙে দোতলা, বুঝলে?”

দেড়তলা হইতে সিঁড়িটা গোল খামেব মত সোজা দোতলা ছাড়াইয়া একেবারে তিনতলায় গিয়া একটুখানি চাতালের উপর শেষ হইয়াছে। সিঁড়ির গায়ে দুই পাশেই মাঝে মাঝে দরজা, কিন্তু সেগুলির গায়ে সবস্বয়ে পেকেব মারা। বুঝা যায় এই সিঁড়ি দিয়া এই সব পথে ঢোকা নিষিদ্ধ। তিনতলায় দুইখানি মাত্র ঘর আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের ভিক্ষায়ের মত একটুখানি খোলা ছাদ। ছাদে দাঁড়াইলে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সকল দিকেই ঘর দেখা যায়, কিন্তু সে ঘরগুলির অধিবাসী স্বতন্ত্র। ঘরে ঘরে

জানালায় কাছে ছোট বড় নানা মাপেব মানুষের কুতূহলী দৃষ্টি দেখিয়া শিবু মহামায়ার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল, “এটা কাদের বাড়ী মা? এত মানুষ চারধারে। এদের সঙ্গে আমরা থাকব কি ক'রে?”

মহামায়া বলিলেন, “ও সব আলাদা আলাদা বাসা রে, কলকাতায় এইরকমই হয়।”

সূখা ও শিবু ছাদের আলিশার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া বুড়া আঙুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহাদের এই উপর নীচের চারখানা ঘরে যদিও দৃষ্টি আশে পাশের সকলেরই পড়ে, তবু সশরীরে উপস্থিত হইবার নিষ্কটক পথ কাহারও নাই। বোঝা গেল, এগুলি ভিন্ন ভিন্ন এলাকা। এ বাড়ীর কর্তা কেত পাথরে মোড়া অংশ নিজে রাখিয়া খিড়িকির সিঁড়ি দিয়া কিছু অংশ ভাড়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আশে পাশের অনেক বাড়ীতেই সেই রকম বন্দোবস্ত। স্ততরাং ভাড়াটে অংশগুলি সব পবম্পরের খুব গায়েব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তার উপর খিড়িকির দিক্ বলিয়া বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটে সকলেরই শোঁচাগারের ভীড় এই দিকে বেশী।

বাহিরের নতুন জগৎটা যতক্ষণ দেখিতেছিল ততক্ষণ তাহার অভিনববে বিশ্বয়ের খোবাক বেশী ছিল বলিয়াই তাহাতে শিবুর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু গৃহের আবেষ্টনে বিশ্বয় বেদনারই কারণ হইয়া উঠিল। বাহিরে যেমন অপরিচয়েই আনন্দ, ঘরের ভিতবে তেমনই পরিচিতের স্পর্শেই শাস্তি ও বিশ্রাম। যে-গৃহকে সূখারা আক্সর বাড়ী বলিয়া জানে তাহাকে এই বিশ্বয়লোকের ভিতর কোথায়ও এক বিন্দু খুঁজিয়া না পাইয়া দুইজনেরই মন বিষন্ন হইয়া পড়িল। দিনের পর দিন ইহারই ভিতর তাহারা কাটাইবে কি করিয়া?

কিন্তু শিবু সহজে দমিবার পাত্র নয় বলিয়া ছোট চাতালের উপর স্তূপীকৃত বিছানার গায়া বসিয়া পড়িয়াই গান ধরিয়া দিল,

“দস্তি কলহেতাব শহর, অষ্ট পহর

চলতি আছে টেরাম গাড়ী।

নামিয়ে গাড়ীর থনে ইষ্টিশানে, মনে মনে আমেজ করি,

আইলাম কি গণি মিঞার রংমহালে

. ডাহার জিলায় বস্ত্রাল ছাড়ি।”

মহামায়া শ্রান্ত দেহখানি একটা তক্তাপোষের উপর ঢালিয়া দিয়া হাই তুলিয়া বলিলেন, “ঠাকুরঝি থাকলে এরই ভিতর একটা শৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পাবতেন। আমি ত একেবারে কাজের বাব। স্বধা, দেখ্ দেখি মা, বাচ্চাটা বে অস্ততঃ একটু কাগজ টাগজ জেলে দুখটুকু গিলিয়ে দিতে পাবিস্ কিনা। এর পর আবার দুখ পাব কিনা তাই ব কে জানে।”

একটা মেলিন্স ফুডের বোতলে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ জমাগত গাড়ীর নাড়া পাইয়া পাইয়া প্রায় ঘোল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মাখন-ভাসা দুখটা বালুতির ভিতর হইতে বাহির করিয়া স্বধা বলিল, “এটা কি ভাল আছে মা! খোকনের যদি অস্থখ করে এটা খেয়ে।”

মহামায়া খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “তবে দেখ্ যদি টিনেব বাস্লে ফুড্ টুড্ কিছু থাকে। আমার ত বাছা পা দুটো এমন অবশ হয়ে গেছে যে টেনেও তুলতে পারছি না।”

টিনের বাস্লে খুঁজিতে হইল না। স্বধাদের কথাবার্তা পিছন হইতে শুনিতে শুনিতে যে প্রসন্নমুষ্টি ভক্তলোক উঠিতে-ছিলেন তিনি বলিলেন, “থাক্ থাক্ খুকী, আমি টাট্কা দুখ এনেছি। ছাতাটা খুঁজতে খুঁজতে এত দেরী হয়ে গেল যে ষ্টেশনে আর হাজিরা দিতে পারি নি। আমার অপরাধ মার্জনা করবেন।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “ছাতি-হারানোর পর্ক আর আপনার এ-জীবনে মিটল না।”

সে কথার উত্তর না দিয়া ভক্তলোক বলিলেন, “নুতন বাড়ীতে উঠুন টুহুন কিছু আছে কি খুকী? দুখটা ত জাল দেওয়া হয় নি।”

শিবু মাঝখান হইতে ফোড়ন দিল, “দিদির নাম ত খুকী নয়, ও স্বধা।”

ভক্তলোক বলিলেন, “বাঃ, দিব্যি ত মিষ্টি নামটি তোমার, আমার সঙ্গে মিলও আছে, আমার একটুখানি ঝাঁকিয়ে স্বধীন্দ্র। আর কাজেও আমি তোমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, ফুড্ তৈরি করতে পারি না মনে করহ? আমি ভাতও রাঁধতে পারি। একদিন তোমাদের রেষ্টে খাওয়াব।”

স্বধা গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু নীরবে এমন করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে সেও রাজি হইল না, বলিল, “ওঃ, ভারি ত, ভাত ভাল মাছের ঝোল, কুলের অস্থল, সবই আমি রাঁধতে পারি। আপনি মাকে জিগ্গেশ বন্ধন।”

মহামায়া বলিলেন, “তা ও সত্যিই বলেছে। আমি ত অকর্মা একশেষ, মেয়ে কিন্তু আমার খুব কাজের। ছেলেটাকে ত ওই মানুষ করলে।”

শিবু বিচক্ষণ বিচারকের মত মুখ করিয়া বলিল, “মেয়ে মানুষরা ত সবাই রান্না করে, কিন্তু বাবু ত আর করে না। বাবা ত কিছু রাঁধতে পারেন না, খালি খান।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “সত্যি, এমন অনধিকারচর্চা আমার করা উচিত নয়, তবে শিবুও বিবর্তনের কল্যাণে এ বিষয়ে পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব যে হয়েছে তা বলতে পাবি না। হুতরাং জয়টাকাটা স্বধীনবাবুবই প্রাপ্য।”

স্বধা বলিল, “দুখের বাসনটা দিন, আমি কাগজ জেলে গরম কঁরে ফেলি একপোষা, নইলে খোকা ভীষণ চোঁচাবে।”

স্বধীনবাবু বলিলেন, “আপ্তন জালতে গিয়ে কাপড়ে যেন ধরিয়ে বোসো না, সাবধান।”

স্বধা হাসিয়া বলিল, “কি যে বলেন, আমি কি কচি খুকী।”

শিবু বলিল, “দিদি বারো পুরে ভেরোয় পা দিয়েছে, আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, খোকনের চেয়ে সাড়ে-ন’ বছরের।”

স্বধীন্দ্রবাবু বলিলেন, “তুমি ত দেখছি খুব ভাল আঁক কষতে পার, না খোকা।”

শিবু বলিল, “খুব ভাল পারি না, দিদিই বেশী ভাল পারে, তবে আমি মিশ্র যোগ বিয়োগ শিখেছি, আব ইঙ্কুলে ভর্তি হলে আরও অনেক শিখে ফেলব। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ আমি দিদির চেয়ে ভাল করতে পারি।

‘রে রে বক নিশাচব আয় রে সখর।

এত বলি ডাকে ভীম বীর বুকোদর।’

আপনি মুখস্থ বলতে পারেন।”

স্বধীন্দ্রবাবু ভীত মুখ করিয়া বলিলেন, “নাঃ, ও সব বিত্তে আমার নেই। তবে খাওয়ার পরীক্ষা যদি নাও ত বুকোদরের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমিও পারি।”

সুখা একটুখানি হাসিয়া বলিল, “তাহলে শিবুর সঙ্গেই আপনার নামের মিল বেশী, ও এত বেশী গেলে যে পিসিম গুকে ভীমসেন বলেন।”

শিবু বলিল, “সে বাপু, আমি খাবই। আমি বিধবা হলে মোটেই পিসিমার মত একাদশী করব না।”

সুখীন্দ্রবাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, “এইবার শিবু-বাবু ঠকে গেছে, পুরুষ মানুষে কি বিধবা হয়?”

পরাজয়ের লজ্জায় শিবুর স্বন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মহামায়া বলিলেন, “ও ডেঁপো ছেলটাকে আপনি আর আঙ্কারা দেবেন না। আমার ঘর-সংসারের ব্যবস্থা কি করলেন তাই আগে বলুন। আপনার উপরই ত আমার সব ভরসা। আমি ত কুটো ভাঙতেও পারি না, লোক না হলে খেটে খেটে মেয়েটার জিভ বেরিয়ে পড়বে।”

সুখীন্দ্রবাবু একটু লজ্জিত হইতে বলিলেন, “লোক ঠিকই তৈরি আছে, আমি খবর দিতে একটু দেরী করে ফেল-ছিলাম তাই এখন এসে উঠতে পারল না। ভোর বেলা ঠক আসবে। আর সন্ধ্যা বেলা আমার বাড়ী থেকে আপনাদের জন্তে ষংসামাস্ত্র কিছু খাবার আসবে। ইতিমধ্যে স্থায় সাহায্য পেলে বাকি কাজগুলো আমি করে দিতে পারি।”

স্থাপও যে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না তাহা বুঝাইবাব জন্ত ডুরে কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া বিছানার গাধার উপর দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দড়ির গিট খুলিতে লাগিল। বিছানার পুলিন্দাব ভিতর হইতে বিছনা-পদবাচ্য নয় এমন বহু জিনিষ বাহির হইয়া পড়িল। ছাতা-লাঠি, বাঁটা, তোয়ালে, ধুতি, শাড়ী, বাহা কিছুই সঙ্গীর্ণ আয়তনের আধারে ঠাই পায় নাই, সবই নির্ঝিঁড়ারে ক্রীক্ষেত্রের যাত্রীর মত এখানে একাসনে বসিয়া পড়িয়াছে। সেইগুলিকে বাছাই করিয়া সুখা বিছানাগুলোকে ঝাড়িয়া তক্তাপোষের উপরে তুলিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “রন্ধনবিদ্যায় আমার অপহৃত সর্বজনবিদিত হলেও জল তোলায় আমার খ্যাতি আছে। তোমাদের শৃঙ্খলিত গন্ধাদেবীর কারাগৃহটি কোথায় বলে শ্রীশ্র, জল আমি সবটাই তুলে আনি।”

শিবু বলিল, “আমি ওকাজ করতে পারি,” বলিবাই

বালতির গর্ভ হইতে বাসনকোশন সব মেয়ের নামাইয়া সে জলপাত্র যোগাড় করিতে লাগিল।

একটা শুল্লগর্ভ বালভিকে অবলম্বন করিয়া পাড়াইতে গিয়া ছোট খোকা সেটাকে নিজের মাথার উপরই উপুড় করিয়া দিল। মহামায়া সমস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, “ছেলেটাকে একটা খাটের খুরোর সঙ্গে বেঁধে রেখে বাপু, তোমরা কাজকর্ম কর, নইলে গড়িয়ে ও ত সদর রাস্তায় গিয়ে পড়বে।”

বালতির ভিতরের অন্ধ কারাগার হইতে খোকন কাদিয়া বলিতে লাগিল, “আমা তুপি খুলে দাও।”

সুখীন্দ্রবাবুর সাহায্যে সেদিনকার মত আহাব-নিগ্রার ব্যবস্থা হইয়া গেল। তিনি বিদায় লইবার সময় সংসারচক্রের আবর্তনে যতখানি সহায়তা তাঁহার পক্ষে করা সম্ভব সবই করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া বন্ধু-পরিবাবকে আশ্বস্ত করিয়া গেলেন।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাইয়া পিসিমার কঠিন কোমল মুখখানির কথাই বার বার স্থখার মনে পড়িতেছিল। মৃগাক দাদাকে একলা ভাত বাড়িয়া দিয়া পিসিমা হয়ত আজ জলও না খাইয়া মেঝের উপরই শুইয়া পড়িয়াছেন। হয়ত শুল্লগ্রায় বাড়ীতে বিনিদ্র চক্ষে স্থখারই মত রাত্রির গ্রহর গুনিতেছেন।

ঘরের আলো নিবিয়া গিয়াছে। অপরিচিত আবেষ্টন অন্ধকার আকাশের অতি ক্ষীণ তাবার আলোকে আরও অপবিচিত অনন্ত রহস্যময় মনে হইতেছে। সুখা কি পিসিমার ঘরের মাচার উপর আজ বিছানা করিয়া ঘুমাইয়াছিল, তাহার পর একলা পাইয়া আরব্য উপত্যাসের দৈত্য, চীন রাজকুমারী বেতুবর মত ঘুমন্ত স্থখাকে শয্যা সমেত আকাশপথে উড়াইয়া আনিয়াছে? অর্দ্ধ ঘুমে অর্দ্ধ জাগরণে সমস্ত পৃথিবীর বিচিত্র পরিবর্তনশীল রূপ দেখিতে দেখিতে সুখা এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? পূর্ব দিকের আকাশের গায়ে আকাশস্পর্শী একটি শুভ্র মুখ হইতে ঘন কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়া প্রকাণ্ড অস্পষ্ট সন্ন্যাসের মত বাঁকিয়া বাঁকিয়া উর্দ্ধপথে কোথায় গিয়া মিলাইয়া বাইতেছে। এখনই হয়ত আরব্য উপত্যাসের দৈত্যের মতই স্পষ্ট রূপ ধরিয়া স্থখাকে আবার পিসিমার কোলের কাছে লইয়া গিয়া নামাইয়া দিবে, অথবা এ তাহার বিদায়-

ছবি, হয়ত তাহার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, সুধাকে রাতি-শেষে উঠিয়া নতুন জগতে নতুন পথ, নতুন বন্ধনের সম্মুখে ঘুরিতে হইবে।

(১১)

সারি সারি ডেল-কলের ধুমোদগারী চিম্নীর পাশে ধূম-পঙ্কিল আকাশের নীচের এই খাঁচাব মত বাড়ীটিতে নতুন কবিতা সঙ্গার শুরু হইল। চিম্নীর গায়ে মাঝে মাঝে দুই-চ-ইটি তাল ও নারিকেল গাছ দেখা যায়, আর কুলি ব্যারান্সর একটা পাকা বাড়ীর সামনে একটা পুকুরে অষ্ট প্রহর মজুতের ছেলেরা স্নান করে ও ঝাঁপাই জোড়ে। এই দুইটি জিনিষই পুরাতন পৃথিবীর একটুখানি আমেজ লাগিয়া আছে, নহিলে ইহাকে পাতালপুরী কি নাগলোক বলিলেও সুধার অন্ধাশ হইত না। বাস্কীর মাথার ঠিক উপরেই বোধ হয় এই কলিকাতা শহর, তাই সারাদিনরাত্রিই ঘর বাড়ী এমন ধর খর করিয়া কাঁপে। পথে অহরহ যে ভারী ভারী গাড়ী-গুলি চলে তাহারাই যে মাতা ধরিত্রীর বুকে এমন শিরণ তুলে তাহা বুঝিতে সুধাও কিছু দিন সময় লাগিয়াছিল।

জনবিরল নয়ানজোড়ে যেটুকুও বা মাহুঘের সঙ্গ পাওয়া যাইত, এখানে তাহার সিকিও পাওয়া যায় না। উর্দিমুখের বেলাভূমিতে বসিয়া নিঃসঙ্গ মাহুঘ সারাদিন সমুদ্রের নিচিরা রাগিণী শুনিলেও যেমন তাহার ভাষা বুঝে না, এ অনেকটা সেই রকম। ভোর হইতে কত বিচিত্র শব্দতরঙ্গই যে কানের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় তাহার ঠিক নাই, কিন্তু এ বিশাল নগরীর অষ্টপ্রহরের ভাষা বুঝিতে সময় লাগে। গলির তিস্তের বাড়ী, রাজপথের জীবনলীলা চোখে পড়ে না, কিন্তু ধ্বনি জানাইয়া দেয় একের পর এক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নৃশ্রেণের পটক্ষেপ হইতেছে। ভোরবেলা ঘুম চোখ হইতে ছাড়িবার আগেই ভৈলহীন রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি ও এক বোঝা বসন আছড়ানোর মত ধাতব আর্ন্তনাদে সুখস্বপ্নের শেষ বেশটুকু মিলাইয়া যায়; তাব পর নিকটে শোনা যায় পিচকারীর ক্রলর বঝার শব্দ আর দূর হইতে কানে আসে সুদীর্ঘ অলস সিক সুরে কত বাঁশির আকাশ-কাঁপানো ডাক। মহামায়া বাঁশির শব্দেই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিতেন “ঐগো, তোমাদের শ্রামের বাঁশি বাজল।”

সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া রাজপথের অগণ্য বিচিত্র যানবাহন তাহাদের বিচিত্র ভাষায় সশঙ্কিত পথিককুলকে সতর্ক করিতে করিতে চলিয়াছে। কেহ ভারী গুরুগম্ভীর গলায় থাকিয়া থাকিয়া বলে “ঢং ঢং”, কেহ একটানা ছন্দে গাহিয়া চলিয়াছে “বম্ বম্ বম্ বম্”, কেহ ক্ষীণ মুহুর্তে একটি ঘুঙুর বাজাইয়া চলিয়াছে “টুংটাং, টুংটাং,” কেহ বড় মাহুঘের ত্রুঙ্ক ছকাবাব মত শব্দবার তীব্র গর্জন করিয়া ঝড়ের বেগে চলিয়া যাইতেছে, কেহ চপল বালকের মত অর্ধেক ডাক অসমাপ্ত রাখিয়াই দৌড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের চলার হ্রস্ব ও দীর্ঘ তাল, তাহাদের বাণীব তীব্র ও মধুর স্বর মনে নানা ছবি জাগাইয়া তুলে কিন্তু সে তুচ্ছগামিনী বাস্পবাহিনীদের ত চোখে দেখা যায় না।

গলিতে বমণীর স্মৃতি কর্তৃক ডাকিয়া বলে, “মা-আ-টি লিবি গো-ও,” কিন্তু পৃথিবীতে মাটির মত স্থলভ জিনিষবে এমন কবিতা ইাকিয়া বেড়াইবার কি প্রয়োজন আছে শহর নবাগতা সুধা বুঝে না। পুরুষের কণ্ঠ বলে “বাপ্ ডাওয়ালা—আ,” “বডি-জামা-সেমিজ” “জয়নগরেই মেয়া।” অন্ন-বস্ত্রের কথা না বুঝিয়া উপায় নাই, বুঝিতেই হয়। হঠাৎ শুনা যায় শিশুকণ্ঠ উত্তেজিত হইয়া চীৎকার কবিতা, “নখি, নট্, কিচ্ছু;” তাহার। যে পৃথিবীর অনিত্যতার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছে না এ কথা বুঝা অত্যন্ত সহজ, কিন্তু তবু প্রকৃত তথ্য অনাবিক্ততাই থাকিয়া যায়।

সন্ধ্যাবেলা আশেপাশের নানা বাড়ী হইতেই গানের স্বর ভাসিয়া আসে। মেসের ছেলেবা গায়, “যদি এসেছ এসেছ বঁধু হে দয়া করে কুটারে আমারি।” বাড়ীওয়ালান বাড়ী হইতে কলের স্বর আসে,

“আহা, জাগি পোহাইল বিভাবরী,

অতি ক্লান্ত নয়ন তব, সুন্দরী।”

গলির ওপাশের বাড়ীর মেয়েরা ওস্তাদজীর সহিত গলা মিলাইয়া গায়, “আজু শ্রাম মোহলীন বাঁশরি বাঁজায়ে কে ?” সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজের ছড় বাজার দিয়া উঠে। গান শুনিয়া শিবুর দিল খুলিয়া যায়, সেও গঙ্গাজলের টাকে চড়িয়া দুই হাতে টাক পিটাইব মেসের ছেলেরের ভঙ্গীতে বাহিতে শুরু করিয়া দেয়,

“যদি পরাণে না জাগে সেই আকুল পিয়াসা,
পায়ে ধরি, ভাল বেসো না।”

মহামায়া রাগ করিয়া বলেন, “লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, অব
গান খুঁজে পাস্ না? তোব বাবা যে রোজ সকালে গান
করেন তার একটা শিখতে পারলি না, সবার আগে ঐ
মেসের ছেলেদের গানগুলো মাখাষ ঢুকল।”

শিব বলে, “ওদের গান ভেঙাতে আছে, বাবাব পান
ভেঙাতে নেই।”

স্বধার কানে মহানগরীর বাণী দিনরাত্রি আসিত্তেছে
কিন্তু সে বাণীর সহিত তাহার বাণীর আদান-প্রদান নাই।

মহামায়া হাঁটিতে চলিতে কষ্ট পান, তাই পাড়ার মেয়েদের
সঙ্গে ভাব করা হয় নাই, পাড়ার মেয়েরাও কেবল স্বধার
মত ছেলেমানুষকে দেখিয়া বেশী আসিবার আগ্রহ দেখেন
না। সুধা গৃহিনীদের সঙ্গে কথা বলিতে ত লজ্জাই পায়;
কিশোবীদেরও পাউডার-শেভিত মুখ, চণ্ডা বড়ী কিতা
ফাঁস বাঁধা বিহুনি এবং ফাঁপানো এলো খোঁপার পারিপট্ট
দেখিয়া কাছে যাইতে ভরসা হয় না। মহামায়া বলেন বাট,
“হ্যারে, ইস্কুলে টিফুলে ভর্তি হবি, এইসব মেয়েদের একটু
জিগেস করিস, কোথায় কেমন পড়াশুনা চড়ায়?”

সুধা বলে, “সে সব আমি পারব না, তোমরা যেখানে
হয় ভর্তি করে দিও।”

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মেয়েকে ফিরিষ্ট
ইস্কুলে দেবে নাকি গো, খুব কায়দাদুরস্ব ইংরিজী বলতে
পারবে। বাড়ীওয়ালার মেয়েরা ত যায়ই, সেই সাক্ষ
পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি।”

মহামায়া বলিয়াছিলেন, “না বাপু, আমাব গরীবের
অত ঘোড়া-রোগে কাজ নেই। গোছা গোছা টাকা মাইনে
পোষাক, গাড়ী ব’লে গুনবে কোথা থেকে? তুমি একটু
ইস্কুলের পব পড়িও টিড়িও, তাহলেই যা সাদা-মাটা শিখবে
তাইতেই আমাদের গেরস্তর ঘর চলে যাবে।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “কিন্তু যে গেরস্তর বাড়ী যাবে তার
যদি মন না ওঠে?”

মহামায়া বলিলেন, “না ওঠে নিজের ঘরের ভাত বেশী
ক’ব খাবে, তাই ব’লে ঈশ্বর ক’রে আমি এখন থেকে
পরের মন ষোগাতে পারব না।”

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, “তবে ত তুমি ভারি বাঙালীর
মেয়ে! মেয়ে জন্মাবার দিন থেকে বেয়াই জামাইয়ের মন
বুঝে যদি না চললে তবে কলিযুগে জন্মালে কি করতে?”

মহামায়া বলিলেন, “অত গোলামী আমার দ্বারা হবে
না বাপু; আমার মেয়ে আমার থাকবে, কারুর গবজ
পড়ে ত সে আপনার গরজেই নিতে আসবে।”

চন্দ্রকান্তের আয় কম, মহামায়ার নজরও সেকলে,
কাজেই মেয়েকে সাধারণ দেশী ইস্কুলেই দেওয়া ঠিক হইল।
তবে এই কয়টা মাস বাড়ীতে ইস্কুলের মত গড়িবা পিটিয়া
লইয়া একবারে ইংরেজী বৎসরের গোড়াতেই ছেলেমেয়ে
দুইজনকে স্কুলে দেওয়া হইবে। সাত-আট মাসে মহামায়ার
চিকিৎসাও একটু অগ্রসর হইতে পারিবে। কচি ছেলেটাকে
ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া সুধা যদি সারাদিনেব মত বিদ্যাচর্চা
করিতে চলিয়া যায় তাহা হইলে চিকিৎসকের কথামত ত
মহামায়া একচুলও চলিতে পারিবেন না। এই ত চার হাত
মাচাব মত বাড়ী আর এই গড়ানে সিঁড়ি, ছেলে একবার
গড়াইতে শুরু কবিলে মন্থাক্রান্তি আর থাকিবে না। তা
ছাড়া এক পা ত এখানে সোজা বাড়াইবার জো নাই, নাওয়া,
খাওয়া, জল তোলা, ফাইফরমাস সব কাজেতেই কেবল সিঁড়ি
আর সিঁড়ি। এই ক’টা মাসে যদি ভগবান একটু মুখ
তুলিয়া চাহেন তখন না-হয় নিজেরই কোনও রকমে সিঁড়ি ভাঙা
যাইবে। এখন অন্ধের হাতের নড়ি কাড়িয়া লওয়ার মত
সুধাকে সরাইলে মহামায়া ত একবারে অচল।

এখানে আসিয়া সুধা শিবু সে শৈশব-স্বপ্ন স্মৃতিয়া
গিয়াছে। পুরুষ জাতি বলিয়া যে ভিন্ন জাতি আছে, তাহাদের
খেলাধুলাও যে জীজ্ঞাতির খেলাধুলা হইতে ভিন্ন, শিবু
কলিকাতায় আসিয়া অকস্মাৎ তাহা আবিষ্কার করিয়া
ফেলিয়াছে। দিদিব সঙ্গে কাল্পনিক মহাসমুদ্র হইতে
কাল্পনিক মুক্তা প্রবাল সংগ্রহে আর তাহার উৎসাহ নাই;
গলির ভিতরেই পাড়ার ছেলেদের অতি বাস্তব একটা
সাইকেল হইতে বার দশেক আছাড় খাইয়া হাঁটু ও কনুই ক্ষত-
বিক্ষত করিয়া একান্ত নিজস্ব একটা সাইকেল সংগ্রহ করিবার
জন্ত সে দিবারাত্রি মার পিছনে লাগিয়াই আছে। অবসর
সময়ে হাইজম্প লং-জম্প প্রভৃতি তাহার যাবতীয় নবাজিত
বিদ্যায় সে যে পাড়ার কান্ডারও অপেক্ষা ছোট নয় তাহাই

মহামায়াকে বুঝাইতে গিয়া দিদির সঙ্গে খেলাধুলার তাহা আর সময়ই হয় না।

মহামায়া বলেন, “বাপু, ছেলটাকে তুমি ভাঙা বছরেই ইচ্ছুক ভর্তি করে দাও, হাই-জম্প ক’রে ক’বে ত আমার বাব্ব পের্টরা সব গুঁড়িয়ে গেল, তার উপর আবার স্বধীন-বাবু একটা ভালের মত ফুটবল কিনে দিখে একেবারে সোনফ সোহাগা হয়েছে। পরের দরজা জানালা কাচ ভেঙে যে নির্মূল কচ্ছে, তার দাম দেব কোথা থেকে?”

চন্দ্রকান্ত বলেন, “নিতো ত পারি আমাদেরই ইচ্ছুক; কিন্তু পাছে হেডমাষ্টারের ছেলের নমুনা দেখে ইচ্ছুক স্কুল বিগড়ে যায় তাই সাহস হয় না।”

মহামায়া বলিলেন, “তবে তুমি একটা ছাড়াখোর পালোয়ান বেখে দাও, সকালে উঠেই সাত শ’ বার কান ধরিয়ে ‘উঠ বোস’ করাবে, তাহলে আর ছেলের এত খিঁকিপন করবার জোর থাকবে না।”

শিবু বলিল, “ডনবৈঠক ত? তা করলে ত আমায় আরও জোর বাড়বে। আজই রাখ না পালোয়ান।”

মহামায়া বলিলেন, “তবে তোকে একটা ঘানি গাছে যুতে দেব, আমার পয়সাও রোজগার হবে, জিনিষও নষ্ট হবে না।”

শিবু বলিল, “আচ্ছা, তাই দিও, কিন্তু এখানে ঘানিগাছ বসাবার ত জায়গা নেই, তাহলে আবার নয়ানজোড়ে ফিরে যেতে হবে।”

বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই হাট-কোর্ট-প্যাণ্ট-পরা নতুন নতুন ডাক্তার আসিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে তাহাদের দুই-তিনটা করিয়া চামড়ার ও ষ্টিলের বড় বড় বাক্স। একঘণ্টা ধরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহাবা মহামায়াকে পরীক্ষা করে, বাইবার সময় প্রতিদিন সাবান গরম জল দিয়া হাত ধুইয়া পকেটে এক মুঠা টাকা পুরিয়া অনেকগুলো দুর্বোধ্য কথা বলিয়া ও এক টুকরা সাদা কাগজে ওষুধ লিখিয়া হাতমুখে ব্যস্ত দ্রুত গতিতে গাড়ীতে গিয়া উঠে, কিন্তু মহামায়ার যুগ্ম ক্রমশই শীর্ণ বিষন্ন হইয়া আসে। একজন চিকিৎসকের কথামত দুই-এক সপ্তাহ বিছানায় শুইয়া থাকিয়া তিন-চার বোতল ওষুধ শেষ করিয়াও যখন মহামায়ার কোনও বাহ্য উন্নতি দেখা যায় না, তখন চন্দ্রকান্ত ক্রিষ্ট মুখে আরও একজন

বিশেষজ্ঞকে লইয়া আসেন। এবারও সেই বড় বড় বাক্স, সেই হাত ধোয়া, টাকা গোনা, ওষুধ লেখা, বন্দিদা মহামায়াকে আরও বন্দীকরণ, কিন্তু কিছুই হয় না, অবশ্য অঙ্গ স্ববশে আসে না।

মাখায় কড়া ইত্নী করা সাদা কুমাল বাঁধিয়া সুশুভ্র বিলাতী পোষাক-পরা নস দিন রতক আনাগোনা করিয়া সাদা এনামেল-করা গামলা, ডুস, রবারবাগ, স্পঞ্জ, তোয়ালেতে ঘর ভরাইয়া দিল, ক্ষুদ্র রান্নাঘরে মাস খানেক খাওয়া-দাওয়াব চেয়ে গরম জলের আয়োজনই বেশী হইল, তবু মহামায়ার দুর্বল অঙ্গে বস্তুর জোয়ার ফিরিয়া আসিল না। কালো মোটা হিন্দুস্থানী দাই চোখে দড়ি বাঁধা চশমা ও গায়ে পেট বাহির-করা জামা পবিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যহ মহামায়াকে তৈল স্নান করাইল, ঘরের মেঝে মাছুর ও বালিশ তৈল-পঙ্কিল হইয়া উঠিল কিন্তু সেও মহামায়ার পদক্ষেপ অবাধ করিতে পারিল না একখানি ঘরের এক-খানি মাত্র তক্তার উপর তাহার ওঠা-বসা, ঐ টুকুতেই তাহার অধিকার ক্রমে সর্ধর্ভতর হইয়া আসিতে লাগিল।

ছোট খোকা আসিয়া হাত ধরিয়া টানে, “মা, পা পা, চল।” মা খোকাকে টানিয়া বিছানাঘ তুলিয়া লন। খোকার চঞ্চল দেহেব সতেজ রক্তস্রোত তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না, সে কোল ছাড়িয়া ছড় মুড় করিয়া মাটিতে নামিয়া পড়ে। মহামায়া বিছানা হইতেই তাহার জামার পিছনটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করেন, “সুখা, সুখা, ধর দস্যুটাকে, আমায় স্কন্ধ নইলে টেনে ফেঁলে দেবে।”

সুখা ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে লইয়া যায়। মা’র ঘরে ডাক্তার নর্সের ভীড়, এদিকে ইচ্ছুলের বেলা বহিয়া যায়, ঠিক ঠিক উচু বুঁটি বাঁধিয়া লাল গামছা হাতে করিয়া বলে, “দিদিমণি, বাজারেব পয়সা দাও না গা, বাবুর আপিসের বেলা হয়ে গেল, উল্লে এতগুলো কল্লা পুড়ে থাক হয়ে যাবে, বায়ুন-দি বকে ভূত ঝাড়া ক’রে দেবে।”

পয়সা ত সুখার কাছে থাকে না, নয়ানজোড়ের মত খানের কারবারও নাই যে বাহাকে তাহাকে এক পাই ধান চালিয়া দিয়া মাছটা দুখটা ঘোগাড় হইবে। সে গিয়া দরজার কাছে দাঁড়ায়। মহামায়া বুঝিতে পারেন কিসের প্রয়োজন,

শয্যা হইতেই চক্ষু হইয়া বলেন, “বান্ধটা ওরই হাতে ঝা করে দাও না গা, যা পারে ওই দেবে খোবে।”

নীলের উপর সোনালী লাইন-কাটা হাত-বান্ধটা বাঁধিয়া দিয়া চক্ষুকান্ত বলেন, “মা মণি, এবার তুমি ব. আমরা ছেল, খাওয়া পরাব ব্যবস্থা যা হয় করো।”

স্বধা কিকে ভয়ে ভয়ে বলে, “কত দিতে হবে?” কিলে-যে কত দাম সে ত কিছু জানে না।

ঝি হাত নাড়িয়া বলে, “টাকা একটা ফেল দাও না, ষ কিবে তা ত আর আমি খেয়ে ফেলব না? হিসেব কুল নিও এখন। একটা পয়সাও যদি গরমিল হয়, তখন আমা গলায় গামছা দিয়ে আদায় করো।” ঠিকা রাঁধুনী এক গল্প পান-দোক্তার রসে মুখ ভর্তি করিয়া অল্প ই করিয়া অস্পষ্ট ভাষায় বলে, “দিদিমণি, যাহোক একটা কিছু কুটে বেটে দাও না গা, স্বত্ব নি কি ঝাল ঝোল কিছু ততক্ষণ চড়াই।”

স্বধা ষটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসে। বুড়ি শ্রুত। আলু আর পেঁয়াজ ছাড়া কিছু নাই। স্বধা কুট্টা দিয়া বলে, “এইটে ততক্ষণ পোস্ত দিয়ে রাঁধ।”

রাঁধুনী বন্ধার দিয়া উঠে, “হ্যা, নটায় ভাত সে, আবার বসে বসে পোস্ত বাঁটব, এত আমার গতর কুলোবে না। ও সব ছুটির দিনে হবেখন। আজ অন্ন ভাজাভুজি কবে দি, বাবুকে আপিসে বেরোতে হবে ত।”

স্বধা ভীতভাবে বলে, “আচ্ছা, আমি পোস্তটুকু বেঁট দিচ্ছি, তুমি শুধু ভাজা দিয়ে বাবাকে ভাত দিও ন। একটুখানি কেবল খোকাকে ধব।” রাঁধুনী মৃগটা শ্রব করিয়া বলিল, “এমন অনাছিটি দেখি নি ম, তান বামুনের মেয়ে, ছেলের ধাই হওয়া কি আমাব কাজ? দাও পোস্তটা আজ আমিই বেঁটে নি, কাল থেকে ঝি মাস্ট্রিক বাজারে বাবার আগে বাটাঘসা সব করে যেতে বলত। উনি নবাবের নাতনী করুক্ষু করে বাজার করতে চলত, আর আমি মবি এখানে হাত পা ছেঁচে।”

চক্ষুকান্ত তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া ইস্থলে যাইবর সময় বলিয়া যান, “মামণি, তোমার মাকে দেখো। আর পিসিমাকে একটা চিঠি লিখতে ভুলো না।”

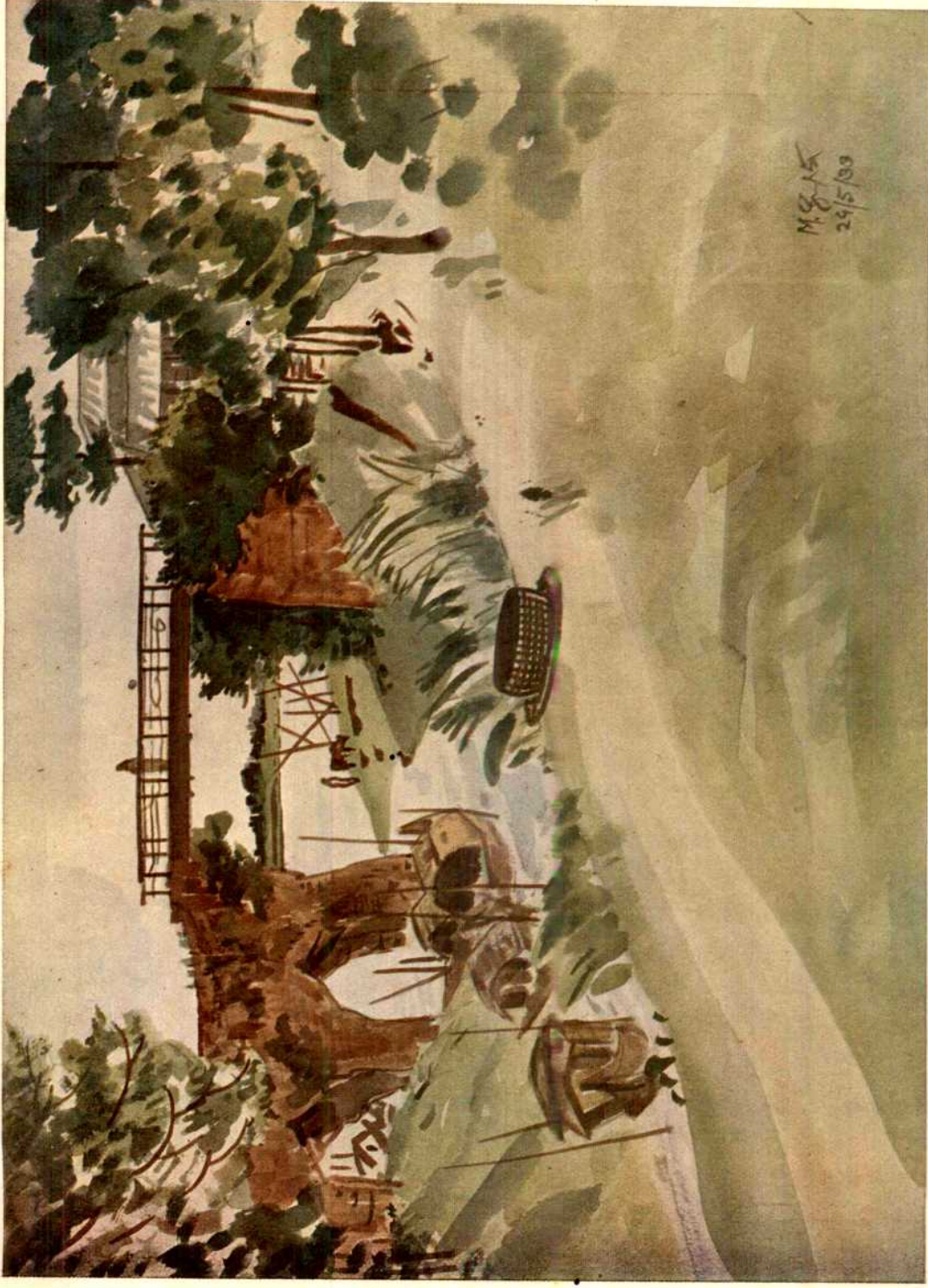
চক্ষুকান্ত চলিয়া যান, স্বধা খোকাকে কোলে কন্যা জানালা হইতে দেখায়

ঝি রাঁধুনীর তবু নয় না, বলে, “দিদিমণি, নেয়েখেয়ে নাও নাগা, আমাদেবও তু মানবের পেট, বাড়ী গিয়ে রোঁখে বেড়ে তবে ত খাব। এইখানে এগারটা বাজিয়ে দিলে তোমার পেটে হাত বুলিয়ে কি আমাদের পেট ভববে?” স্বধা সজ্জ হইয়া উঠে; সে ইহাদের ভয় করে। ইহার যেন ঠিক বস্ত্র জঙ্ক, কখন কোন্ দিক দিয়া কি খুঁ ধরিয়া যে আক্রমণ করিবে তাহার ঠিক নাই। করুণা ঝি মত মমতা ইহাদেব কাছে আশা করা যায় না, কিন্তু আব একটু কম প্রথরা হইলে কি চলিত না? স্বধার অবস্থা বুঝিয়া মহামায়া মাঝে মাঝে বলেন, “হ্যাগা, তোমবা সারাক্ষণ ছেলেমানুষের পিছনে টিক টিক কর কেন বল ত? তোমবা যেন মূনিব, ওই যেন ঝি।”

ঝি একহাত জিভ কাটিয়া বলে, “অমন কথা মুখে এনো-না মা, কচি ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে তুলতে হবে ত, তাই বলি, নইলে কথা কিসের? আমাদের ছোট লোকের গলা, মিষ্টি কথাও ক্যার ক্যার করে।”

স্বধাকে বলে, “দিদিমণি, মা'ব কাছে লাগিয়েছিলে আমাদের নামে? এই কলকতা শহরে চোন্দ বছর গতর খাটাচ্ছি, কেউ বলতে পারবে না যে ননীর মা কাকর এক আখলাচুরি কবেছে কি কাউকে গাল মন্দ করেছে। তোমাদের সংসারের মাথা নেই, তাই পাচ রকম কথা কহিতে হয়, সেটা কি আমাব দোষ বাছা?”

স্বধা তর্ক করিতে ভয় পায়। দোষ যাহারই হউক, ননীর মা আব বামুনদি যদি সপ্তমে গলা তুলিয়া সকল দোষের জন্ত স্বধাকেই আসামী স্থির করিয়া দেয়, স্বধার ক্ষীণ কণ্ঠের আপত্তি সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে না। তা ছাড়া হাত-বেড়ি বাঁটা বালতি আছাড় দিয়া তাহার যদি সমস্ববে বলে, “দাও, আমাদের হিসেব মিটিয়ে দাও,” তাহা হইলে স্বধা এ সংসার ঠেলিবে কি করিয়া? বামুনদির অগ্নি-বধিণী দুষ্টি আর ননীর মা'র অমৃত-নিশ্যন্দিনী বাণী বরং সঙ্কর করা যায়, কিন্তু খোকনের মুখে ছব না উঠিলে, মা'ব স্নানের জল না জুটিলে, শিবুর পেটে ভাত না পড়িলে সে সঙ্ক করিবে কেমন করিয়া? কাজকে সে ভয় পায় না। কিন্তু এত কাজ একলা কি করা যায়? খোকনকে কোলে করিয়া বসিতে হইলেই ত পৃথিবীর সব কাজ বন্ধ? তবু ত তাহারই



বিক্রমপুর-তালতলীর পুল
 শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত
 চিত্রাবিকারী শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীমণী প্রেস, কলিকাতা

মধ্যে হুগায় এক দিন নদীর মা'র কামাই আছে ; সেদিন শিবুর জিম্মায় থোকাকে দিয়া পোড়া বাসন মাজিতে স্বধার হাতে কড়া পড়িয়া যায়। বামুনদি ব্রাহ্মণ-কড়া, বাসন মাজিলে তাঁহার সম্মান থাকে না, বড় জোর বাজারটুকু তিনি করিতে পারেন।

নয়ানজোড়ের সেই স্বধা এই সামান্য কয়টা মাসে এত ধর-সংসারের ভাবনা ভাবিতে শিখিল কি করিয়া, মনে করিয়া সে আপনি বিন্মিত হইয়া উঠে। পিসিমা যদি হঠাৎ কলিকাতায় আসিয়া পড়েন তাহা হইলে স্বধার রকম-সকম দেখিয়া তাহাকে হয়ত চিনিতেই পারিবেন না। শিবুটা যে ছেলেমানুষ সেই ছেলেমানুষই থাকিয়া গেল। কিন্তু স্বধার যেন সাত-আট মাসে সাত-আট বৎসর বয়স বাড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ বাবা একথা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, “স্বধার ঐ কাঁচা মনে রং ধরতে অনেক বছর লাগবে।”

সন্ধ্যায় থোকার চঞ্চল হাত পা যখন ঘুমের কোলে এলাইয়া পড়ে, বি-রাধুনির কাংসকণ্ঠমুখর গৃহ একটু নীরব হইয়া আসে, তখন চন্দ্রকান্ত গৃহে ফিরিয়া দেখেন দিনের খেলার শেষে হয়ত শিবু দিদির সঙ্গে সুর করিয়া পড়িতেছে,

“ওরে তোরা কি জানিস কেউ,

জলে উঠে কেন এত ঢেউ,

তার দিবস রজনী নাচে,

তার চলেছে কাহার কাছে।”

নয়ত তাঁহারই মুখে শোনা মেঘদূতের শ্লোকে সুরচিত সুর যোজনা করিয়া দুইজনে আবৃত্তি করিতেছে ‘আষাঢ় প্রথম দিবসে’। অর্থ তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতেছে না কিন্তু পদলালিত্য ও ধ্বনির বাক্য তাহাদের সমস্ত মনটা মাতাইয়া তুলিয়াছে। স্বধা ছলিয়া ছলিয়া বলিত, শিবু কথার তালে তালে তুড়ি দিয়া নাচিত।

ক্রমশঃ

আলোচনা

বাংলা বানান

শ্রীরাজশেখর বসু

গত মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি জানিয়েছেন—বিখ্যাতালয়-কৃত বানানের নিয়মে হ-ধাতু আর শু-ধাতুর অনুজ্ঞায় ‘হয়ো, শুয়ো’ রূপ বিহিত হয়েছে, অথচ খা-ধাতু আর দি-ধাতুর বেলায় য বাদ দিয়ে ‘খেও, দিও’ করা হয়েছে। এই অসংগতির কারণ আমি যেমন বুঝি তা নিবেদন করছি।

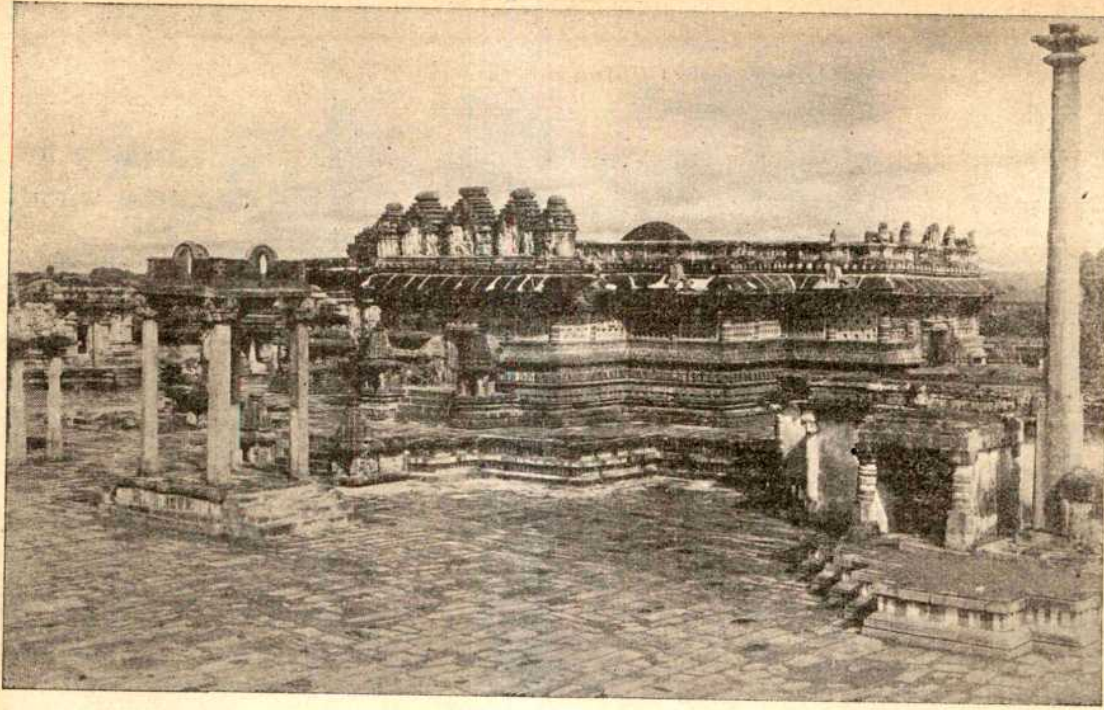
‘করিয়া’ আর ‘করিয়া’-র বর্ণগত উচ্চারণভেদ অতি অল্প। উচ্চারণ বিশেষ করবার জগুই কালক্রমে আ স্থানে যা হয়েছে এমন মনে হয় না। প্রাচীন ‘মোআ’ আধুনিক ‘মোয়’ হওয়ায় উচ্চারণের কিছুমাত্র স্থবিধা হয় নি। বোধ হয় অ লেখার চেয়ে য লেখা সহজ সেজগুই স্থানে-অস্থানে য এসে পড়েছে।

‘হয়ে, শুয়ে’ বানানে য-এর প্রয়োজন আছে, য বাদ দিয়ে ‘হও, শুও’ লিখলে অস্বাভাবিক উচ্চারণ আসে না। কিন্তু ‘খেয়ে, দিয়ে’ না লিখে ‘খেও, দিও’ লিখলে য-এর অভাব টের পাওয়া যায় না। অনেকে ‘খেয়ে, দিয়ে, করিয়ে’ লেখেন, কিন্তু ‘খেও, দিও, করিও’ প্রভৃতি বানানও বহুপ্রচলিত।

শেখর বানানগুলি অপেক্ষাকৃত সরল, উচ্চারণের বিরোধী নয়, অনভ্যস্তও নয়, অতএব মনে নিলে দোষ কি? অনাবশ্যক বর্ণ যেখানে যতটুকু বাদ দিতে পারা যায় ততটুকুই লাভ।

‘করিয়া, খাইয়া’-তে য অনাবশ্যক, ‘মোয়া, খাওয়া’-তে একবারেই ভুল। এই রকম শব্দে য স্থানে অ চালাতে পারলে বানান সরল ও শুদ্ধ হয়। কিন্তু অভ্যাস এতই প্রবল যে যুক্তি হেরে যায়। অতএব রক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই। যথা—(১) যদি উচ্চারণের জগু আবশ্যক হয় তবে য থাকবে, যেমন ‘হয়ো, শুয়ো’। (২) যেখানে কায়েন হয়ে বসেছে সেখানে অনাবশ্যক বা ভুল হলেও য আপাতত থাকবে, যেমন ‘হইয়া, হওয়া’। (৩) যেখানে য এখনও সর্বসম্মত হয় নি সেখানে তাকে আর প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত, যেমন ‘দিয়ে’ করিয়ে’ না লিখে ‘দিও, করিও’। (৪) নব্যগত বিদেশী শব্দে—যার বানান এখনও খুব পাকা হয় নি—য-এর অপপ্রয়োগ যথাসাধ্য বর্জনীয়, যেমন ‘সোজাওয়াটার’ না লিখে ‘সোজাওয়াটার’।

আমরা যদি ভবিষ্যতে আর একটু সংস্কারমূলক হতে পারি তবে হয়ত অ-বর্ণের একটা শুলেখা ছাঁদ প্রচলিত হবে, তখন ‘মোআ, খাওয়া’ লিখতে কষ্ট হবে না, আর য-ঘটিত অসংগতিও দূর হবে।



মহেশ্বর-বেলুরের সূর্যর কেশব মন্দির

সুন্দর কেশব

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

১

বাসস্তিকা: দেবী শক্তির প্রতীক, চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তি—জৈন-গণের উপাস্ত।

সঙ্গপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের সাল ভক্তশ্রেষ্ঠ, তাঁহার গৃহে দেবী বাসস্তিকা প্রতিষ্ঠিত। কুলদেবী, নিত্য তাঁহার পূজা হয়।

একদিন সাল দেবীর পূজায় বসিয়াছেন, জৈন যতি তাঁহার অন্তঃস্থানে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছেন—অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জনে উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেবীপূজায় এ কি বিঘ্ন! আশ্চর্য্যকারণও যে উপায় নাই; জৈনগণ অহিংসাবাদী, দেবীর পূজায় পশুবলির বিধান তাঁহাদের নাই, সুতরাং মন্দিরে পশুবলির কোন অস্ত্রও নাই। দণ্ডধারী যতি সালর হস্তে তাঁহার দণ্ড প্রদান করিয়া আঘাত করিতে আদেশ করিলেন—পয় সাল; আঘাত কর, সাল। লোক বলে, এক আঘাতেই শার্দূলের ভবলীলা শেষ হইল। কিন্তু জৈন ভক্ত

জীবহত্যা করিয়াছেন, এক জৈন যতি তাহার সহায়ক—এ কল্লনাও জৈনগণের পক্ষে অসম্ভব, তাই তাঁহারা বলেন যে, দণ্ডাহত ব্যাঘ্র পলায়ন করিল।

বীৰ্য্যবানে পূজাদান কৃতজ্ঞতার বিধান, সালকে বীরস্বের মর্যাদা প্রদান করিতে সঙ্গপুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী পল্লী সমূহের কৃতজ্ঞ অধিবাসীবৃন্দ পশ্চাৎপদ হইল না।

কিন্তু দক্ষিণা গ্রহণে সালর অধিকার আছে কি? এ শার্দূল-দ্বন্দ্বে তাঁহার কৃতিত্ব কি? তাঁহার হস্ত আঘাত করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই আঘাতের মূল্য কি? শক্তিময়ী বাসস্তিকা দেবীর রূপা না হইলে কি আঘাত সফল হইত? যতির মন্ত্রপূত দণ্ড, ইহাতে শক্তি আবির্ভূত না হইলে—সামান্য দণ্ডের ক্ষমতা কতটুকু?—সাল উপলক্ষ্য মাত্র।

সাল যতির পদতলে সমস্ত অর্থ স্থাপন করিয়া করবোধে নিবেদন করিলেন—কি করিতে হইবে, আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী বলিলেন—কৃতজ্ঞ জনগণের স্বেচ্ছাদত্ত বীরপূজার

অর্থা উপেক্ষা করিও না, গ্রহণ করিয়া গণদাস হও, গণের রক্ষায় এ অর্থ নিয়োজিত কর, সৈন্ত সংগ্রহ কর।

যতির উপদেশ শিরোধার্য, সাল সৈন্ত সংগ্রহ করিলেন। পৌরজন পুনরায় তাঁহাকে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল, তাঁহাকে প্রধান বলিয়া নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে সালের প্রভাব বাড়িল, তাঁহার অধিকারও বিস্তৃতি

ইতিহাসে এই বংশ হুয়সাল বংশ নামে বিখ্যাত।

জনশ্রুতি একুপ।

২

বিভিদেব রাজা সালর বংশধর, তিনি পিতৃপুরুষের ধর্ম-ত্যাগ করিয়া হইলেন বৈষ্ণব। ধর্মাস্তর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে



মন্দিরে নারীমূর্তি

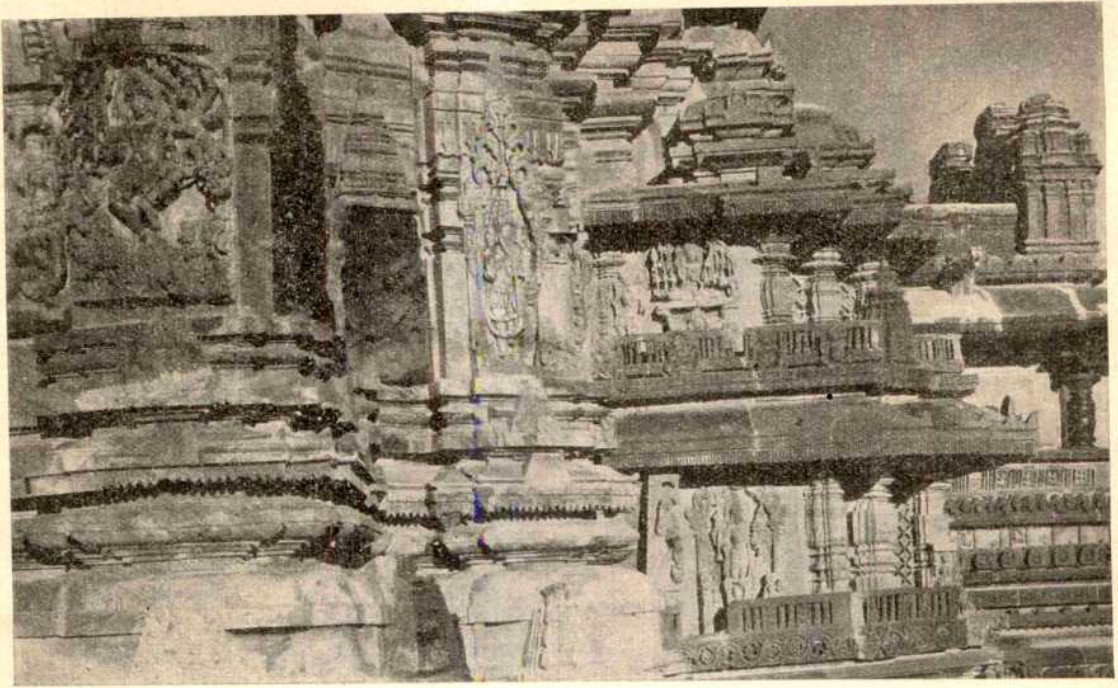
লাভ করিল। অল্পকালমধ্যেই সাল এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেন। সঙ্কপূর বড় ক্ষুদ্র—ইহার অনতিদূরে দ্বারসমূহে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। নরশাদুল-দ্বন্দ্ব হইল তাঁহার কুলচিহ্ন। যতির আদেশ “পয় সাল”—তাহা হইতে এই নবীন রাজবংশের নাম হইল পয়সাল বংশ। জনগণের মুখে এই নামের রূপান্তর ঘটিল; ভারতবর্ষের



মন্দিরে নারীমূর্তি

তিনি নূতন নাম গ্রহণ করিলেন—মুকুন্দপদারবিন্দবন্দনা-বিনোদন; ইতিহাসে তিনি বিষ্ণুবন্ধন নামে খ্যাত।

বিভিদেব জৈনধর্ম ত্যাগ করিলেন কেন? জৈনগণ বলেন, ইহা রাণী লক্ষ্মীদেবীর ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার ফল! বিভিদেব স্বয়ং জৈন হইলেও রাণী লক্ষ্মীদেবী ছিলেন হিন্দু। জৈনধর্মের প্রতি তাঁহার মন প্রসন্ন ছিল না। রাজা তাঁহার ধর্ম অবলম্বন করুন, এ আকাজক্ষা রাণীর মনে জাগিল।



হুন্দর কেশব মন্দির-গাত্রেয় কারুকাৰ্য্য

জৈনধৰ্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব রাজার মনে জাগ্রত করি-
বার তিনি প্রয়াস পাইলেন। রাজাকে বলিলেন,
জৈন শ্রমণগণ আপনাকে অবজ্ঞা করেন। আপনি দেশের
রাজা, কিন্তু শ্রমণগণের অস্পৃশ্য।

সত্যই কি তাই? দেশের রাজা, ধৰ্ম্মের রক্ষক, তিনি
অস্পৃশ্য! একদিন পরীক্ষা হইল। রাণীর কথাই সত্য,
শ্রমণগণ রাজার স্পৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না।

শ্রমণগণ বলিলেন—কোন প্রকার অঙ্গহানি যাহার
হইয়াছে, তাহার স্পর্শে ভোজ্যবস্তু অশুচি হয়, শ্রমণগণের
তাহা গ্রহণ করিতে নাই—জৈনধৰ্ম্মের অনুশাসনে তাহা
নিষিদ্ধ। রাজা অঙ্গহীন, সমরক্ষেত্রে অজ্ঞাধাতে তাহার
এক অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়াছে, স্তবরাং—

রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। দেশের ও ধৰ্ম্মের রক্ষার জন্ত,
শরণাগত আৰ্ত্তজনের সাহায্যের জন্ত, রাজ্য-বিস্তারের
জন্ত রণতরঙ্গে বাঁপ দিতে হয়, শত্রু করে অস্ত্রের আঘাত—সে
ত বীরত্বের পুরস্কার, তাহার জন্ত যুগা? হিন্দুগণ ত
কখনও এরূপ করেন না, ক্ষত্রিয়দেহে অস্ত্রলেখায় বীরের
মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাজা জৈনধৰ্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

জৈনগণ বাহাই বলুন না কেন, সকলে এ-কাহিনী বিশ্বাস
করেন না। অনেকে বলেন যে, জৈন শ্রমণগণের প্রতি ক্রোধ
বশতঃ নহে, বৈষ্ণবধৰ্ম্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়াই রাজা জৈনধৰ্ম্ম
ত্যাগ করেন, আর ইহার মূলে ছিল শ্রীরামানুজাচার্য্যের
প্রভাব।

রাজার কথা অস্বস্ত হইলেন। লোকে বলিল যে, তিনি
ভূতশ্রিত হইয়াছেন। কঠোর আরোগ্যের জন্ত তিনি জৈন
শ্রমণগণকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টা
ব্যর্থ হইল। তখন রাজা শ্রীরামানুজাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন।
তিনি রাজকুমারীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিলেন। কৃতজ্ঞ
রাজার উপর শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রভাবের এই প্রথম
রেখাপাত। তারপর হইল জৈন শ্রমণগণের সহিত
শ্রীরামানুজাচার্য্যের ধৰ্ম্মবিষয়ে এক মহা বিতর্ক-সমর।
প্রকাশ্য সভায় অষ্টাদশ দিবস এই বিতর্ক চলিল। অবশেষে
শ্রীরামানুজাচার্য্য হইলেন জয়ী, শ্রমণগণ হইলেন
পরাজিত।

ইহার পরই রাজা বিভিদেব শ্রীরামানুজাচার্য্যদেবকে
গুরুত্ব বরণ করিয়া বৈষ্ণবধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

৩

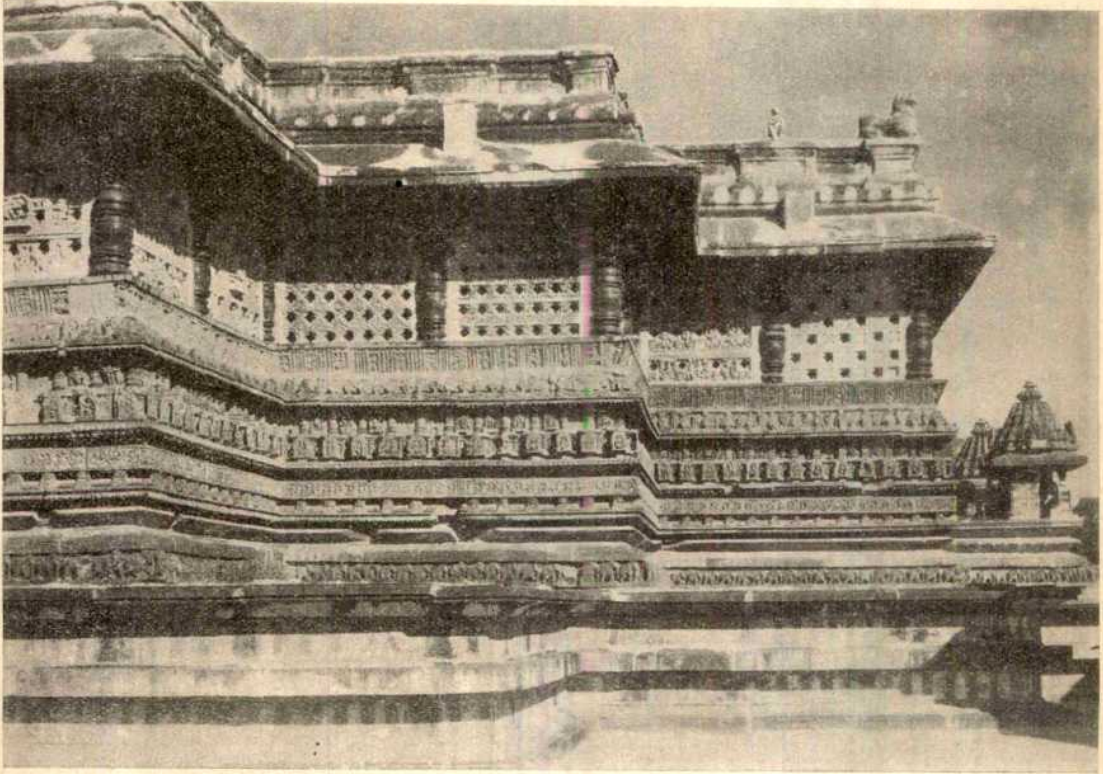
হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, যে, মানবের প্রেমে ভগবান মাঝে মাঝে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্যের ধূলায় নামিয়া আসেন। কিন্তু সকল সময় তিনি একই মূর্তি ধারণ করেন না। তিনি যখন ধৈ-মূর্তিতে অবতীর্ণ হন, ভক্ত হিন্দু সেই মূর্তির প্রতীক পূজা করেন। এমনই একটি প্রতীক-মূর্তি ব্রহ্মা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দান করিলেন। ভক্ত নৃপতি চন্দ্রদ্রোণ-পর্বতে এক রথে তাহা স্থাপন করিলেন। ভগবান বুঝি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, বুঝি-বা ইহাকে তাচ্ছিল্য বলিয়া মনে করিলেন—তিনি বিষ্ণুবর্দ্ধনের নিদ্রানিমীলিত নয়নে স্বপ্নে আবিভূত হইয়া আদেশ করিলেন—লোকালয়ে মন্দির নির্মাণ করিয়া আমাকে স্থাপিত কর।

এ কি প্রত্যাদেশ! হয়সাল নৃপতি গুরু রামানুজাচার্যের শরণাপন্ন হইলেন, তাহার নিকট এই অপূর্ব স্বপ্নকাহিনী বিবৃত করিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার—গুরুও স্বপ্নে এইরূপ নির্দেশ লাভ করিয়াছেন।

আর সন্দেহের অবকাশ নাই। রাজা কালবিলম্ব করিলেন না; তিনি চন্দ্রদ্রোণ-পর্বতে গমন করিলেন। তথায় এক সন্ন্যাসীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইল। তাহারই ব্রহ্মদেব রাজা বিগ্রহকে পর্বতে হইতে সমভূমিতে আনয়ন করিলেন।

মন্দির কোথায় নির্মিত হইবে? কেন, রাজধানী দ্বারসমুদ্রে। কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায় অন্যরূপ। তিনি পুনরায় নিদ্রাভিভূত রাজার নয়নে উপস্থিত হইলেন।

ঋষি ঋগ্যজুঃ সমগ্র জগতের বাবতীয় পবিত্র নদ-নদী-হ্রদ-সরোবর হইতে জল আপন কমণ্ডলুতে সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রদ্রোণ পর্বতে আগমন করিয়াছিলেন। তথায় ঐ কমণ্ডলু হইতে যে বারি পতিত হইয়াছিল—পবিত্র বদরীনদী তাহার পুত প্রবাহ। এই বদরী হেমবতী নদীতে তহু মিলাইয়াছে। হেমবতী শিবসোহাগিনী হৈমবতীরই সলিল-রূপ। এই বদরী-হেমবতী-সদ্বর্মেয় অনতিদূরে, বদরীতীরে, মাতৃভক্ত গুরুদেবের অমৃতকলস হইতে এক বিন্দু রস পতিত হইয়াছিল।



মন্দির-গাজের কার্য

ভগবান আদেশ করিলেন—এই পবিত্র স্থানে আমার স্থাপিত কর।

বিশ্বয়ের উপর বিশ্বয়—এইবার রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, অমরলোকের স্থপতি।

মন্দির নির্মিত হইল, মহাসমারোহে বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল। এই স্থানের নাম বেলাপুর বা বেলুহর, বর্তমানে বেলুর।



হুন্দর কেশব

বিগ্রহের পরিকল্পনা ও নির্মাণ, মন্দিরের স্থান নির্বাচন, পরিকল্পনা ও নির্মাণ—ইহার কোনটিকেই মানবকল্পনা-প্রসূত বলিয়া ভক্তগণ বিশ্বাস করেন না।

৪

অপূর্ব মন্দির, স্থাপত্যকলার চরম উৎকর্ষ!

প্রাচীরবেষ্টিত বিস্তৃত সমতল আয়তন। তন্মধ্যে উচ্চ ভিত্তিভূমি—নক্ষত্রাকার। তদুপরি, ভিত্তিভূমির সহিত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নক্ষত্রাকারে এই মন্দির নির্মিত। নক্ষত্র চিরভাস্বর, তাই কি এই পরিকল্পনা?

মন্দির পূর্বদ্বারী। ভূমি হইতে ভিত্তি ও ভিত্তি হইতে মন্দিরতোরণ পর্যন্ত দুই শ্রেণী সোপান। সোপানপাথে হয়সাল নৃপতির কুলচিহ্ন। তবে, সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। রাজা সাল ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন না, যুদ্ধ করিতেছেন এক কেশরীর সহিত। সিংহকে লোকে পশুরাজ বলে। রাজায় রাজায় যুদ্ধই শোভন, সমযোগ্য বীর সনে সদা রণ ক্ষত্রিয়ের সাধ। ব্যাঘ্র হিংস্র, বলবান হইলেও তাহার রাজ-মর্যাদা নাই—তাই বুঝি এ পরিবর্তন।

প্রতি সোপানপাথে প্রস্তরগঠিত রথচক্রাতপ। চক্রাতপের নিম্নে হস্তিযুথ—যেন করীশিরেই রথচক্রাতপ দণ্ডায়মান।

মন্দিরের তোরণ অতি উচ্চ, দুই পার্শ্বে দুই স্তম্ভ, একটির পাদদেশে মদন ও অপরটির পাদদেশে রতি—যেন দুই প্রহরী। প্রেমের, সৌন্দর্যের, স্থির-যৌবনের প্রতিমা, মন্দিরের দেবতার যোগ্য দ্বাররক্ষী। স্তম্ভের শিরোভাগে একটি পৌরাণিক দৃশ্য—ভগবান নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদারণ করিতেছেন। তন্নিম্নে নারায়ণের বাহন গরুড়, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মকর।

দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে নানা দৃশ্য খোদিত। দক্ষিণপার্শ্বে একটি ফলকে রাজসভার দৃশ্য; সভার মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসিয়া রাজা ও রাণী—নিশ্চয়ই বিযুবর্দ্ধন ও লক্ষ্মী-দেবী। রাজার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে বিকশিত কুসুম—রাজার শৌর্যের ও উদারতার দ্যোতক। তাঁহাদের চারি পার্শ্বে পারিষদ, পুরোহিত, শাস্ত্রালোচনাপরায়ণ পণ্ডিতগণ, আজ্ঞাবহ কর্মচারীবৃন্দ ও রক্ষীবর্গ। রাজসভায় শাস্ত্রালোচনার সময় রাণীর স্থান রাজার পার্শ্বেই—অন্তঃপুরের রুদ্ধ অলোচনে নহে। এই ফলকের নিম্নেই অপর ফলকে সিংহযুথ চিত্রিত, কোন সিংহ উদগ্র, আক্রমণোন্মুখ, কোনটি বা নিত্যনির্ভরে উপবিষ্ট। সিংহ-পুষ্ঠে বীৰ্য্যবান সৈনিক। স্বতন্ত্র ফলকে হইলেও এই চিত্র রাজ-সভা-দৃশ্যেরই অন্তর্গত। শক্তিমান হয়সাল নৃপতি সত্যসত্যই কেশরীকে তাঁহার সৈন্তগণের বাহনে পরিণত করিতে

পারিয়াছিলেন একরূপ মনে করিবার কারণ নাই। হিংস্র পশু দমনে বংশের প্রতিষ্ঠাতা সালর সফলতা এবং হৃদয়ালু নৃপতিগণের পরাক্রমের পরিচয়ের জগুই এই চিত্র।

এই রাজসভা-দৃশ্যের উর্দ্ধে এক স্তূপোভিত ফলকে মধ্যস্থলে নারায়ণ, উভয় পার্শ্বে চামরব্যাজকগণ। এক পার্শ্বে গরুড়, অপর পার্শ্বে হনুমান, দুই ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক সম্মুখভরে দণ্ডায়মান।

দ্বারের বাম পার্শ্বেও অল্পরূপ তিনটি ফলকে তিনটি চিত্র—নিম্নে সেই সিংহবাহিনী, মধ্যস্থলে সেই রাজসভা, তবে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন নছেন, বোধহয় তাঁহার পুত্র নরসিংহ। উর্দ্ধভাগে নারায়ণ—এবার নর-সিংহরূপ। বীর্ঘবান রাজা নারায়ণের এই রূপেরই অল্পরূপ ছিলেন, তাই এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ অল্পমান অব্যোক্তিক নহে।

এই ত্রিকলকের সমবায়—উর্দ্ধে নারায়ণ, মধ্যে রাজা, নিম্নে প্রহরী সৈনিক—একটি সম্পূর্ণ চিত্র। এই চিত্রের পর একটি স্তম্ভ, তারপর ত্রিকলকে বিভক্ত অল্পরূপ আর একটি চিত্র। এইরূপে দ্বারের উভয় পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া দশটি চিত্র। ইহা ব্যতীত পাঁচটি করিয়া দশটি নানা মুদ্রা-চিত্র। এ ক্ষেত্রেও এক একটি স্তম্ভ চিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। এইরূপে পূর্বদিকস্থ প্রাচীরগাত্রে সর্বগুণ্ড বিংশতি স্তম্ভ। স্তম্ভের শিরশোভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুইটিতে শক্তির আধার দুর্গামূর্তি, অপর অষ্টাদশটিতে এক একটি নারীমূর্তি—নারীজীবনের নানা কার্যের স্মৃতি। কোন নারী দর্পগহস্তুে প্রসাধনে রত, কোন নারী বা হোলিখেলায় মত্ত, কেহ বা বিহঙ্গমকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছেন। নারী যেএকান্তই অবলা নহেন, হোলি ও মৃগয়া উভয় ক্রীড়াতেই সমান দক্ষতার সহিত হস্তচালনা করিতে সক্ষম, ভারতবাসীর নিকট মূর্তিগুলি তাহাই করিতেছে।

এই পূর্বদ্বারই মন্দিরের প্রধান দ্বার, মথ্য তোরণ।

৫

দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্ব দূর হইতে দেখিতে একই রূপ ও পূর্ব দিকের দ্বার—অঙ্গন হইতে ভিত্তিভূমি, ভিত্তিভূমি হইতে মন্দিরের পাদদেশ, সেই সোপানশ্রেণী।

কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইলে প্রাচীরগাত্রে চিত্রাবলীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য প্রতীয়মান হয়। প্রত্যেক চিত্রের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নহে।

উত্তর দ্বার ‘স্বর্গদ্বার’ ও দক্ষিণ দ্বার ‘শুদ্ধদ্বার’ নামে অভিহিত। চিরতুষারধবল হিমালয় দেবগণের প্রিয় আবাসভূমি, তাই কি হিমালয়াভিমুখী দ্বার ঐ নামে পরিচিত? দক্ষিণে অনার্য্য দানবগণের বাস, দানবগুণ্ডর নামে দক্ষিণ দ্বারের নামকরণ কি ইহারই ইঙ্গিত? এই সকল দ্বারের রক্ষী মদন ও রতি নহেন, প্রকৃত দ্বারপাল।



সিংহনিধনে উজ্জত সাল

প্রাচীরগাত্রে, উল্লসিত স্তম্ভে নানা মূর্তি কেবলই কি শোভার আকার? তৎসমুদয় প্রাচীন ভারতের ভারতবাসীর রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ—এ সকল সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দেয় না? রাজসভায় অথবা মল্লক্রীড়াভূমিতে রাজা ও রাণীর একত্র সমাবেশ কি একান্তই নিরর্থক? সাধারণতঃ পত্নীর স্থান পতির বাম পার্শ্বে—রাজসভায় রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে রাণীর অবস্থিতি কি শিল্পীর খেয়াল

মাত্র ?—সে যুগের নারী-মর্যাদা সন্দেহে সামান্য ইঙ্গিতও কি ইহাতে নাই ?

নারী-জীবনের কত চিত্রই না প্রদর্শিত হইয়াছে ! কোথাও দেখি এক নারী বিচিত্র ভঙ্গিমায়ে আপনার রূপমাধুরী প্রকাশ করিতে ব্যস্ত, কোথাও বা নারী চিত্রলেখনে রত। এক নারী বসনমধ্যে জ্যোতি দর্শনে ব্যাকুল হইয়া বসন উন্মোচন পূর্বক আপনাকে ঐ ভয়াবহ জীব হইতে মুক্ত করিতে ব্যস্ত, অপর এক নারী বসন হইতে বশিষ্ঠ ভূমিতে নিপাতিত করিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। কিন্তু নারীহৃদয়ের ভয়-প্রবণতার এই চিত্র প্রদর্শন করিয়াই শিল্পী ক্ষান্ত হন নাই। এক নারী পুরুষোচিত বেশে তীর হস্তে দণ্ডামমান, এক নারী এক বিহঙ্গমকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতেছেন, অপর এক নারী মুগয়া হইতে ফিরিতেছেন ; তাহার পশ্চাতে অতুচ্চরের স্বন্ধে দণ্ডে বিলম্বমান তাহার শিকার, নিহত মুগ ও সারস। এ সকল কি শিল্পীর কল্পনামাত্র—সে যুগের নারীজীবনের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই ?

ঐশ্বর্যশালী সম্রাট হইতে দীনতম ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকল ভারতবাসীর চিত্রে উত্তরাঙ্গ অনাবৃত দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত। আধুনিক কোর্টের অতুল্য আভাষিত গাত্রাবরণ আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। গাত্রাবরণের উপর এক কটিবন্ধ—আধুনিক পুলিশের বা সৈনিকের পোষাক।

৬

অর্দ্ধনারীধর—ভগবানের রূপ-কল্পনায় হিন্দু মনোবৃত্তির বিচিত্র বিকাশ ! ভগবান কি শুধু পুরুষ ? শুধু নারী ?

এ বিভেদ-জ্ঞান হিন্দু ভক্তের মনে জাগে না—একই আধারে ভগবান পুরুষ ও নারী।

দ্বিহস্তপরিমিত উচ্চ বেদীর উপর এই বিগ্রহ স্থাপিত। সখিপরিবৃত এই মূর্তি প্রায় একটি মাহুয়ের সমান উচ্চ। চতুর্ভুজ—উজ্জ্বলিত দুই করে শঙ্খ ও চক্র, নিয় দুই করে গদা ও পদ্ম। বদনমণ্ডলের একাংশে পুরুষোচিত গাভীর্ঘ, অপর্যাংশে নারীজনোচিত কোমলতা ; বক্ষের একাংশ প্রশস্ত, অপর অংশ স্তূঠাম ও উন্নত।

৭

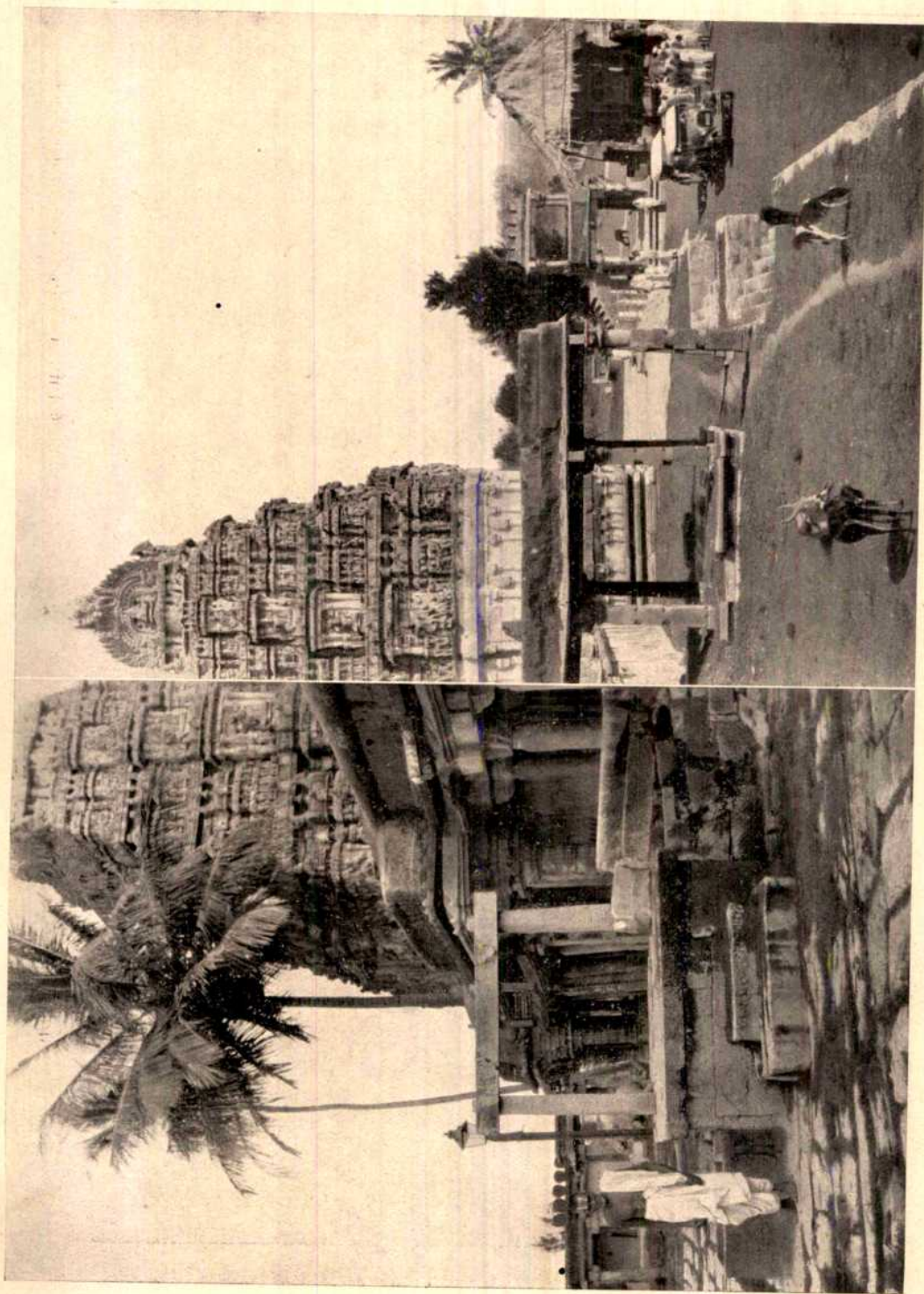
ভগবানের বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ভক্ত তাহার বিশেষ নামকরণ করিয়া থাকেন—ভক্ত বিষুবর্দ্ধনও তাহাই করিলেন। নারায়ণের রূপায় তিনি আজ সৌভাগ্যবান, তাই তাহার নাম দিলেন—বিজয়-নারায়ণ ! কিন্তু এ বিজয় কিসের ? ইহা কি রাজার সামরিক শক্তিরই জয়দর্প, না, জৈন-ধর্মের উপর হিন্দুধর্মের বিজয়-ঘোষণা ?

হয়সাল-সাম্রাজ্য আজ অতীত গৌরবের একটা স্থথস্মৃতি মাত্র। এই মন্দিরের বিগ্রহকে প্রণিপাত করিয়া হয়সাল নৃপতি আর রণযাত্রা করেন না, জৈনধর্ম বড় কি বৈষ্ণবধর্ম বড়—হয়সাল-রাজসভায় আজ আর সে-বিতর্ক উঠে না। মন্দিরের দেবতাও আজ আর বিজয়-নারায়ণ নামে অভিহিত নহেন।

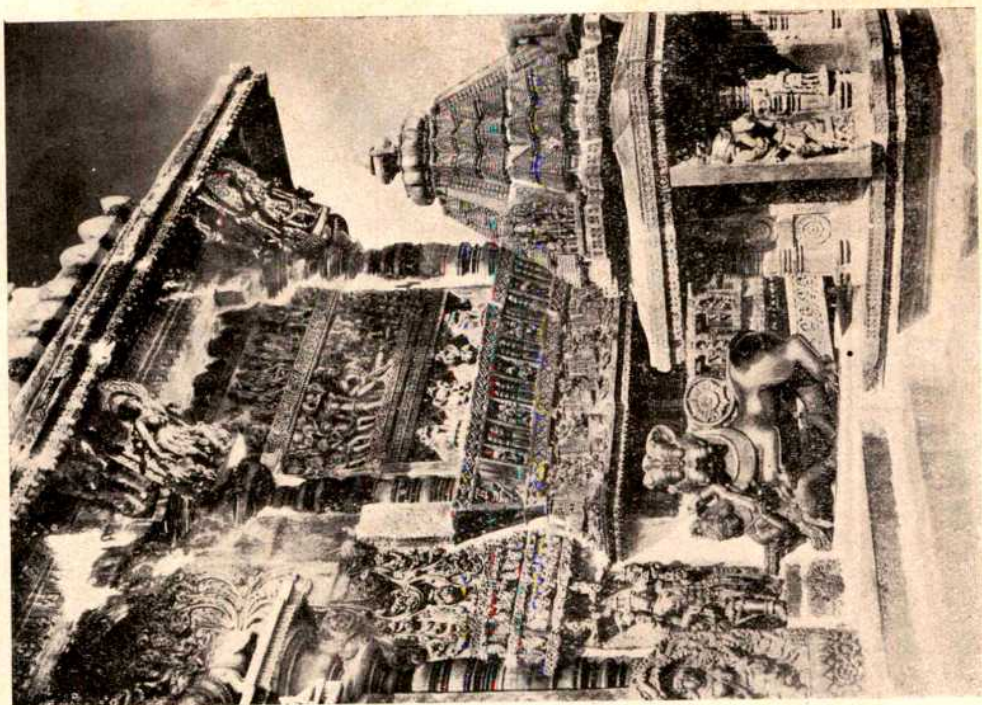
আজ তিনি মনোহর সুন্দর-কেশব।



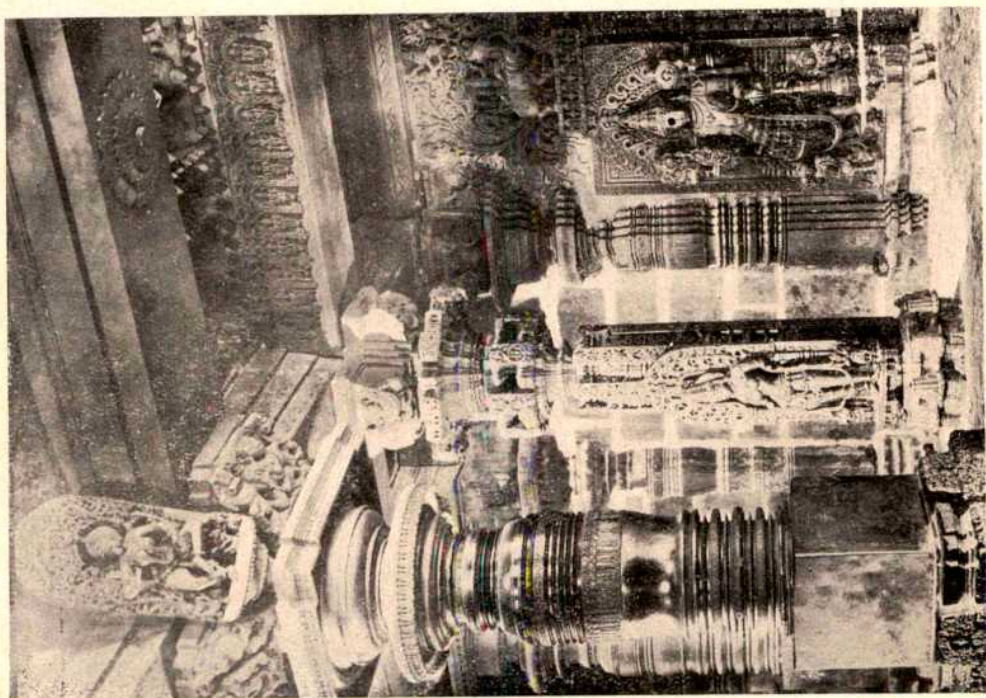
বেলুরের মন্দিরবলী ; সন্নিকটে অমৃতসরোবর



মহেশ্বর-বেলুর মন্দিরের দৃশ্য



মন্দিরের সোপানপ্রান্তে সিংহনিধনরত সালর মূর্তি



মন্দিরের বেষ্ম-দ্বারের একটি অংশ

প্রবন্ধনা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

প্রজাপতি-সংহিতার আধুনিকতম সংস্করণে লেখা হইয়াছে,—
প্রয়োজন বুঝিলে মেয়ে অসাবধান হইয়া হাতের ক্রমাগতি
ফেলিয়া দিবে; ছেলে সেটি সাবধানে তুলিয়া ধরিয়া দাস-
গৌরবের অভিনয় করিয়া বলিবে—“আপনার ক্রমাগতি...”

মেয়ে সেটি গ্রহণ করিয়া বলিবে—“থ্যাক্স”, অর্থাৎ
ধন্যবাদ। ছেলে প্রবল কুষ্ঠার সহিত বলিবে, “নীড্ নট্
মেনশন”, অর্থাৎ উল্লেখ ক’রে লজ্জা দেবেন না।

ইহার পর ছ-জনে না-চাহিবার চেষ্টা করিয়া আর একবার
সলজ্জ ভাবে চাহিয়া ফেলিবে।

অতঃপর সংহিতাকার নিজেই কর্ণক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়া
স্থানকালপাত্র হিসাবে ব্যবস্থা করিবেন।

বিমলেন্দু কলিকাতার একটি কলেজে তৃতীয় বাৎসরিক
শ্রেণীর ছাত্র। একদিন কলেজের প্রাঙ্গণে ঐ শ্রেণীর নবাগতা
ছাত্রী অর্চনা রায়ের ক্রমাগতি কুড়াইয়া দিবার তাহার একটু
স্বযোগ ঘটয়া গেল। বিমলেন্দু ছেলেটি বুদ্ধিমান, বুলিল
দুখ্যোগের মত স্বযোগও কখনও একা আসে না। সে তর্কে-
তর্কে রহিল এবং এক সপ্তাহের মধ্যে আরও তিনটি অল্পরূপ
স্বযোগ দৈব অথবা তাহার পুরুষকারের বলে ঘটয়া গেল।
চতুর্থ দিবসে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধন্যবাদাদির পরও সিঁড়ি দিয়া উপরে
উঠিতে উঠিতে কিছু অতিরিক্ত আলাপ হইল।

বিমল প্রশ্ন করিল—“আপনার কোন্ ইয়ার ক্লাস?”

জানা জিনিষ লইয়া এ-রকম অজ্ঞ সাজিতে গেলে মনের
কথাটি বড়ই স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অর্চনা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর
দিতে পারিল না, একটু লজ্জিত হইয়া মুখটি ঘুরাইয়া লইল।

তখন বিমলেন্দুও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল—
“ও, ঠিক ত। আপনাকে আমাদের থার্ড ইয়ারেই কোন
কোন ক্লাসে যেন ছ-একবার দেখেছি বলে মনে হচ্ছে...”

কথাটাকে একটু টানিয়া সত্য রূপ দেওয়া যায়। যত ক্ষণ

ক্লাস চলে প্রতি মিনিটে বিমলেন্দু অর্চনাকে ছ-একবার দেখে।

ব্যাপারটা অর্চনার এমন কিছু অবিকিতও নয়; কিন্তু
আশ্চর্যের বিষয়, এই মিথ্যার প্রতিবাদ করা ত দূরের
কথা, সামান্য অবিখ্যাসের ভাবও দেখাইল না।

বিমল দু’টা সিঁড়ি উঠিয়া আবার প্রশ্ন করিল—“আপনার
রোল নম্বর?”

অর্চনা উত্তর করিল—“সাতাশী।” সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নও
করিল—“আপনার?”

বিমলেন্দুর দুই আঙুলে-ধরা নোটবুকের সিঁড়িতে পড়িয়া
গেল, সেটা কুড়াইয়া লইয়া বলিল—“অষ্টাশী।”

অর্চনা স্বধু একটু স্তব্ধকৃত করিয়া বলিল—“ও।”
—তাহার এ অসামান্য কথাটি যেন মোটে জানাই ছিল না।

মিথ্যাকে আমরা প্রবন্ধ-বক্তৃত্যে যতই লাঞ্ছনা করি না
কেন, এ-সব ক্ষেত্রে কার্য অগ্রসর করিয়া দিতে অমন বস্ত্র আর
নাই। দিব্য একটি নির্বিকল্প প্রচ্ছন্নতার আড়াল দিয়া যেন
দপণে উভয় উভয়ের মনটি দেখিয়া লইল।

তাহার পরদিন বিমলেন্দুর ঐখ্য ও অধ্যবসায়ের জন্ত
আবার ছ-জনের হঠাৎ সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হইয়া গেল।
বিমল নমস্কার করিয়া বলিল—“আজ দেখছি যে আপনারও
বড্ড লেট হয়ে গেল, আমি ভাবলাম বুঝি আমার একারই
দেবী হ’ল।”

অর্চনা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাতঘড়ি-
টার দিকে চাহিয়া বলিল—“হ্যাঁ, বেশ ন্যা; একটা মারফোরারী
ম্যারেজ প্রসেন্ডনের জন্তে গাড়ীটা আটকা পড়ে গেল। প্রায়
আধ ঘণ্টা ধরে নিরুপায় ভাবে টাড়িয়ে থাকা—সে যে কি
বিড়ম্বনা...”

বিমল বলিল—“সে আর বলতে?.. আমারও খানিকটা
দেবী হয়ে গেল। পনের মিনিট দেবী, প্রফেসার গুপ্ত নিশ্চয়
প্রজেক্ট করবেন না; যাব কিন ভাবছি, এমন সময়
আপনাকে দেখে কতকটা ভরসা হ’ল।”

অর্চনা উঠিতে উঠিতেই একটু সলজ্জ হাসির সহিত জিজ্ঞাস্ব নেত্রে চাহিল। বিমলেন্দু একটু হাসিয়া বলিল—
“মানে, তিনি লেডি-ষ্টুডেন্টের অসম্মান করতে পারবেন না ত ? ... তার পরেই আমার রোল নম্বর—প্রেক্ষেষ্ঠ না করে উপায় থাকবে না।”

অর্চনা এই ফন্দির জন্ত মুখ ঘুরাইয়া হাসিতে গিয়া একটু ছলিয়া উঠিল। আরও দুইটা সিঁড়ি উঠিয়া কিন্তু সে হাড়া মুখটা গম্ভীর করিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল। বিমল মুখ তুলিয়া চাহিতে, বলিল—“তার দয়ার স্ববিধা নেওয়া হবে, তার চেয়ে একটা পার্সেন্টেজ হারান ভাল। এ-পিরিয়ডটা কমনলম্বে গিয়ে বসতে যাচ্ছি। আপনি ত ক্লাসে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবেন,—আপনাদের—স্কলারদের ত আবার এ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে কড়াকড়ি অনেক...”

বিমলেন্দু সে-কথার উত্তর না দিয়া, অর্চনার চেয়েও মৃদু গম্ভীর করিয়া অতি-বড় ধার্মিকের মত বলিল—“ঠিক বলেছেন,—তার প্রিন্সিপলটা ভাজান আমাদের উচিত হবে না। না, চলুন, আমিও তা হ’লে কমনরুমে গিয়ে বসি।”

এইরূপে প্রফেসার গুপ্তের প্রতি অন্ত্রায় করিয়া ফেলিবার ভয়ে দুইজনে নামিয়া কমনরুমে গিয়া বসিল।

অবশ্য কমনরুমে বিশেষ কিছু কথাবার্তা হইল না। কাহণ উভয়েই, প্রফেসার গুপ্ত সেই পিরিয়ডে যে-বইখানি পড়াই-তেছেন সেইটি খুলিয়া বসিল। বিমলেন্দু দশ-বারো বার খুব সম্ভবপণে দৃষ্টি বাঁকাইয়া রেখিল, অর্চনা প্রচণ্ড মনোযোগেব সহিত পাঠে নিরত। অর্চনাও পাঁচ ছয় বাব চকিতের জন্ত বই হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, বিমলেন্দু বইয়ের সঙ্গে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিলেও চলে। কেউ কাহাবও ব্যাঘাত করিল না। সত্যই ত, তাহারা গুপ্ত-সাহেবের প্রিন্সিপল ভাঙিবে না বলিয়া না-হয় ক্লাসে যাব নাই, তাহা বলিয়া পড়ায় ঝাঁকি দেওয়া ত তাদের ঈর্ষ্য নয়।

সুধু, পিরিয়ড শেষ হইলে উঠিয়া দাঁড়াইতে বিমলের একটা রীতিনীতি পড়িল। যেন কত যুগের জন্তই না বিবাহ লইতেছে এই ভাবে একটি নমস্কার করিয়া ব্যথিত কর্তে বলিল—“আচ্ছা, তা হ’লে আসি, মিস্ রায়। আপনাদের ত ছুটি এ-পিরিয়ডে?”

অর্চনা বলিল—“হ্যাঁ, এর পরের পিরিয়ডে আমার হিষ্টি।”

টেবিলের উপর বই-খাতার তাড়াটা ঠুকিতে ঠুকিতে বিমল বলিল—“আমার এ-পিরিয়ডে ফিলসফি।...ভাবছি ছেড়ে দেব; ছেড়ে দিয়ে হিষ্টিই নেব।”

হঠাৎ ফিলসফির উপর এত বিরাগ কেন, আর হিষ্টির উপরই বা এত টান কিসের, সে-সম্বন্ধে কিছু বলিল না।

অর্চনাও অবশ্য জিজ্ঞাসা করিল না।

২

সপ্তাহখানেক পরের কথা।

বিমলেন্দু এবং অর্চনা একটি বেঞ্চের দুই প্রান্তে বসিয়া আছে; মাঝখানে দুই জনের বই।

কলেজের বেঞ্চ নয়।...বেঞ্চের সামনেই একটু দূরে একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারা গোল হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। মাথার উপরে একটি হলদে ফুলের মাঝারি-গোছের গাছ, তাহাব ঘন ছায়াটা জলের গায়ে তুলি বুলাইতেছে। কিনারা হইতে হাত-দুয়েক পরেই গুটিকতক রাঙা কল্লারের গুচ্ছ,— দুইটি ছুটিয়া পরস্পরের পাগড়িতে জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গুপ্তাবের বেঞ্চে একটা পশ্চিমা, বোধ হয় মালী, দিবানিজ্রা সারিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিল।

আজ কলেজে কি-একটা কারণে হঠাৎ ছুটি হইয়া গেছে, ইহার দুই জনে বাসায় ফেরে নাই এখনও।

বিমলেন্দু বলিল—“তোমার মধ্যে আমার বা সবচেয়ে ভাল লাগে অর্চনা, তা তোমার এই বিজ্ঞোহ। তোমায় বুঝতে দিই নি—মেসে-কলেজ ছেড়ে তুমি ষে-দিন আমাদের কলেজের ফটক পেরিয়েছ সেই দিন আমি তোমায় আমার মনের মধ্যেও প্রস্থায় অভ্যর্থনা করে নিয়েছি।”

অন্ত রকম কথা হইতেছিল।—প্রফেসরদের পড়ানো—শেলী, কীটস্, ছইট্‌ম্যান, রবীন্দ্রনাথ—আই-এর চেয়ে বি-এ-তে বিমলেন্দুর আরও ভাল রেজাল্ট করিবার সম্ভাবনা...এর মধ্যে একটু বিরতি দিয়া হঠাৎ বীররসের অবতারগায় অর্চনা একটু যেন লজ্জিত হইয়া গেল।

বিমলেন্দুর ভাবের ঘোর লাগিয়াছে, একটু থামিয়া

বলিল—“আসল কথা হচ্ছে, তোমার এ-এ্যাটিটিউডটুকু আমার জীবন-স্থপের সঙ্গে বড় মিলে গেছে।—যা-কিছু পুরাতন, যুগজীর্ণ—ব্যক্তিগত রুচিতে, সামাজিক আচারে বা ধর্মের ছদ্মনামে—সে-সমস্তর বিরুদ্ধেই আমার অভিযান, আমি সে-সমস্তকেই ষা দেব। এ-অভিযানের পথে যারা আমার সঙ্গী, আমার কমরেড, তাদের ওপর যে আমার কত শ্রদ্ধা, তা প্রকাশ করে বলবার ভাষা নেই, অর্চনা।”

শেষ পর্যন্ত অর্চনাকেও কথাগুলো স্পর্শ না-করিয়া পারিল না; মেয়ে হইলেও, এই যুগের মেয়ে ত—এই যুগের অগ্রগতি মেয়ে? বলিল—“আমি বিদ্রোহের কথা বলতে পারি না বিমলবাবু, তবে মেয়েদের জন্তে আলাদা ব্যবস্থাতে আমার মন সায় দিল না; কলেজের মধ্যেও যেন মোগল-হারেমের রুদ্ধ হাওয়ার গুমটে আমি হাঁপিয়ে উঠলাম; আমার জীবন-দেবতা আমায় এই পথ দেখিয়ে দিলেন, আমি পা বাড়াতে দ্বিধা করলাম না। আমি বিদ্রোহী কিনা জানি না, তবে আমি যে দ্বিধা-সঙ্কোচ চলে আপনাদের সঙ্গে এসে দাঁড়লাম, এটা করলাম আমি চিরদিনের বঞ্চিত, সমগ্র নারীর অভিযোগ হিসেবেই..”

বলিতে বলিতে মুখটা তাহাব দীপ্ত হইয়া উঠিল।

এ-ভাবটা কিছ বৈশীক্ষণ স্থায়ী হইল না—হুইবার কি কথা? ফাস্তনের হাওয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে যেমন একটা চৈতীর হুকা বহিয়া যায় এও সেই রকম।

একটু পরে আবার অর্চনার দৃষ্টি নরম হইয়া আসিল। একটু যেন অভিমানের স্বরে অল্পযোগ করিল—“আপনারা আমাদের কতই না বঞ্চিত করছেন দেখুন ত!—এই চমৎকার নীল আকাশ, মুক্ত হাওয়া, জল-স্থলের এই কত রকম সৌন্দর্য, চারিদিকের কত বিচিত্র জীবন,... পুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের নালিস কি...”

বিমলেন্দু হঠাৎ বাধা দিয়া প্রতি-অল্পযোগের স্বরে বলিল—“আমি বঞ্চিত করেছি অর্চনা?”

অর্চনা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল; বলিল—“না, আপনার কথা বলছি না; আপনি ত আমায় এর সন্ধান দিয়ে নিয়েই এলেন, আমি বলছি সাধারণ স্ত্রীজাতি আর পুরুষের কথা। ভাবুন ত আমাদের মেয়েরা কতটা বঞ্চিত থাকে!”

বিমল বলিল—“তারা হচ্ছে কর্ণেও থাকেন অনেকটা।”

“কেন?”

“ধর, তুমি ত রোজ এখানে একবার করে আসতে পার; কই, আসবে?”

অর্চনা একটু হাসিয়া বলিল—“কলেজ কামাই হবে যে।”

বিমল বলিল—“আমি পারি,—যদি এ-রকম পরিপূর্ণ সৌন্দর্য পাই অর্চনা। বরং কলেজে বসেই আমার মনে হয় আমি এখান থেকে কামাই করছি।”

“পরিপূর্ণ” কথাটার উপর জোর দিল এবং পরে বলিল—“তোমরা বীধন ভালবাস অর্চনা; হাজার সৌন্দর্যের জগৎও বীধন কাটাতে নারাজ।”

আর একটু পরে সামনের পুণ্ড্রবকের উপর নজর রাখিয়া বলিল—“বোধ হয় তোমরা নিজের মধ্যেই পরিপূর্ণ বলে সন্তুষ্ট এবং তৃপ্ত থাক।”

অর্চনা মুখ ঘুরাইয়া লইল, তেমন ভাবেই প্রশ্ন করিল—“সবাই কি?”

—তাহাব উদ্দেশ্য ছিল বলা—“সবাই কি সন্তুষ্ট থাকে?”

বিমলেন্দুর মনের স্বর আরও উঁচু পর্দায় বাঁধা; চোখাচোখি না-থাকায় সাহসের সহিত বলিল—“অসন্তুষ্ট তুমি ত নিশ্চয়।”—তাহার অর্থ ছিল—“তুমি ত নিজের মধ্যেই নিজে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ।”

অর্চনা বইগুলো কোলে তুলিয়া লইল; বিমলেন্দুর কথাটাকে নিজের মনোগত প্রশ্নের উত্তর ভাবিয়া একটু হাসিয়া বলিল—“আপনি ভুল বলছেন বিমলবাবু।”

বিমল একটু জেদের সহিত বলিল—“না, বলছি না ভুল, অর্চনা; কোথায় তোমার অপূর্ণতা, বল—কিসে?”

অর্চনা নিজের ভ্রমটা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় রাঙিয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা করিয়া, বিমলের দিকে একবার মাত্র সাহিয়া বলিতে পারিল—“কোথাকার কথা যে কোথায় এসে পড়ল।.....উঠবেন না?—আমার গাড়ী বোধ হয় কলেজে এসে গেছে এতক্ষণ।”

৩

বিমলেন্দু ডাকিল—“কচি!”

নূতন কাহাকেও ডাকিল না, সে আজকাল অর্চনাকে

এই ভাবে ডাকিতেছে; এ-শ্রেণীর লোককে যদি অমৃত দেওয়া হয় ত সেটাকেও স্বর্গীয় কবিতা লইয়া ছাড়িবে।

সেই জলের ধাবের জায়গাটি। শেষের দিকের দুইটি পিরিয়ডে ছুটি ছিল, সব-শেষের পিরিয়ডে প্রফেসর বোস হঠাৎ অস্থির হইয়া পড়েন।

আজ ছয় দিন পরে; কিন্তু এই ছয় দিনে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অর্চনা হইয়াছে রুচি। রুচি প্রবল হইলে বিমলেন্দু কখনও ‘অরুচি’ বলিয়াও ডাকিয়া ফেলিতেছে বিমল দর্শনশাস্ত্র ছাড়িয়া ইতিহাস লইয়াছে, আজ এখানে আসার ইতিহাসটুকুও এই ব্যাপারটির সহিত জড়িত অর্চনার নিকট হইতে পুৰাতন নোটগুলি টুকিয়া লইবে, তাই দুইজনে এই নিরবিচ্ছিন্ন আশ্রয় করিয়াছে।

অর্চনা নোটের পাতা উন্টানর মাঝে থামিয়া উত্তর করিল—“কি?”

বিমলেন্দু প্রত্যুত্তর কিছু দিল না। জড়াজড়ি করিয়া সে রাঙা কল্লার দুইটি ছিল তাহার। আর নাই; সেই শূন্যতা-টুকুর দিকে চাহিয়া রহিল।

অর্চনা নোটের পাতা আরও খানিকটা এদিক-ওদিক উন্টাইল। তাহার পর মৌনতার ‘অস্বস্তি’ কাটাইবার জন্তই বোধ হয় প্রশ্ন করিল—“গ্রীষ্মের ছুটির আগে যে-সোশাল পার্টি হবে তাতে আপনি কোন পার্টি নিবেন না কেন বিমল বাবু? অত করে বললে সবাই.....”

বিমল ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল—“ত্মিও একথা জিজ্ঞাসা করে তবে জানবে রুচি?”

অর্চনা একটু চিন্তা করিল,—আবাব নোটের পাতা উন্টাইতে উন্টাইতেই তাহার পর একটা পাতা আঙুল দিয়া মুড়িয়া ধরিয়া বলিল—“বুঝলাম না।”

“বিচ্ছেদটা কি একটা উৎসব রুচি?”

অর্চনা প্রথমটা বুঝিতে পারিল না, তাহাব পব কথাটির অর্থ তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাহার মনটিকে ভারাক্রান্ত করিয়া দিল, সে মুখ ফিরাইয়া একদিকে চাহিয়া রহিল। সত্যই ত, এই গ্রীষ্মাবকাশের বীর্ষ তিনটা মাস আর যাহার কাছেই উৎসব স্থচিত করুক—অসম্ভবতঃ এ-কলেজের দুইটি প্রাণীর কাছে যে করে না, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে?.....ওদের সবার সামনে প্রিন্সপালের

সঙ্গে মিলন—সেই মিলনকেই ওরা আয়ত্ত করিতেছে এই উৎসবের দ্বারা। ওরা যে নাম দিয়াছে ‘বিদায়-অভিনন্দন’ ওটা ভুল—ওদের বিদায়ে দুঃখ নাই বলিয়াই এটা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু যে-দুজনের পক্ষে এ-বিদায় সত্যই বিদায়—এই অবকাশ যাহাদের মধ্যে শতাবধি দিনব্যাপী শতযুগের দাহন আনিবে তাহাদের কি উৎসবের অবসর আছে?.. অর্চনার আশ্রয় বোধ হইল যে, এদিকটা ভাবে নাই কেন এবং যে এই ভাবনায়ই মুহূর্তমান, তাহার সামনে একটু অপ্রতিভ হইল।

সেদিন দু-জনে বাহিবে-বাহিবে কথা আর বেশী কিছু হইল না, তবে দু-জনের মনের মধ্যে যে-সমস্ত কথা নিঃশব্দে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল সে-সব একই প্রকৃতির।

কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইয়া গেল। জলের ও-খারটায় সবুজ ঘাসের উপর দু-একটি করিয়া সাহেবদের ছেলেমেয়ে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল, তাহাদের ‘আয়া’ আর ‘বয়’-রা মোড়ার উপর বসিয়া গল্প করিতেছে। দু-জনে উঠিল। কথার অভাব হইয়া পড়িয়াছে আজ, অথচ উঠিবার সময় যে দীর্ঘশ্বাসটুকু পড়িল সেটাকে ঢাকিতে কিছু বলিতেই হয় যেন।

অর্চনা সামনের একটি কল্লারের কুঁড়ির দিকে চাহিয়া বলিল—“আচ্ছা, কলেজ যখন খুলবে তখনও এ-সব ফুটতে থাকবে?”

বিমল বলিল—“কি জানি রুচি? তিন মাস একটা যুগ যে।”

সে-রাত্রে অর্চনার নিদ্রা হইল না। কিন্তু সে ত আর কালিদাসের যুগেব মেয়ে নয় যে, বিরহের স্মৃতিতে শূন্য পরিবর্তন করিয়া বীণার তার বাঁধিতে বসিয়া যাইবে।

সকালে উঠিয়া ছোট ভাই প্রবীরকে ডাকিয়া বলিল—“বীৰ, তোমার বইগুলো নিয়ে এস ত; যে-রকম অমনোযোগী হ’য়ে উঠছ দিন দিন.....”

প্রবীর ছেলেটি ভাল, ইংরেজী পড়া বেশ ভালই দিল। ইতিহাস আনিতে বলা হইল; বেশ সন্তোষজনক উত্তরই দিল। অর্চনা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—“মুখস্থ

করবার গুলো ত একরকম চালিয়ে দিলে, অন্ধ নিয়ে এস ত দেখি।”

সহজ অন্ধে আটকাইবে না বুঝিয়া, বেশ বাছা বাছা গোটাঁকতক অন্ধ দিল। তাহাতে বেশ মনের মত ফল পাওয়া গেল। ভিতরে ভিতরে ভাইয়ের উপর খুশী হইয়া অর্চনা প্রকাশে রাগতভাবে বলিল—“আমি জানি কিনা,—দেখছি এদিকে বেশ গা ঢেলে দিয়েছ।”

অভিভাবক ঠাকুরদাদা। নামজাদা উকিল ছিলেন। লোকে বলে বড় পাকা মাথা। ছিল বোধ হয় এক সময়, এখন সেটি সম্পূর্ণরূপে নাতনীর হাতে সমর্পণ করিয়া নির্বাপিত জীবন যাপন করিতেছেন। গঙ্গাস্নান, কালীঘাট, ও ভাইটামিন আর পরমাযুতসে আলোচনার অবসরটা বিভক্ত।

অর্চনা বলিল—“ঠাকুরদা, বীকুর অবস্থা দেখেছ ?—অন্ধেতে ও ডাহা ফেল করবে; এই সামার-ভেকেশ্যনের পরেই ওদের পবীক্ষা, মাস তিনেকও নেই। নিজের মোটেই সময় নেই যে দেখি; কি যে হবে.....”—বড়ই চিন্তাশ্রিত ভাবটা।

বীকুর ডাক পড়িল। আসিলে ঠাকুরদাদা বলিলেন—“অন্ধটা ঠিক তৈরি নেই শুনি। তুমি রোজ রাত্তিরে আমার কাছে এসে বসো ত এরিখ্‌মেটিকটা নিয়ে।”

অর্চনা একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল—“হ্যাঁ, তুমি আবার ঐ কর। একে ভাল ঘুম হয় না রাত্তিরে; তার ওপর আবার ওর সঙ্গে বঁকে বঁকে...আমি বলছিলাম একটা না-হয় টিউটর রেখে দাও না।”

টিউটর সম্বন্ধে ঠাকুরদাদার চিরকালই আপত্তি; বলেন, ও ত বাজারের নোটের সামিল—শুধু হাত-পা আছে, চলে বেড়ায় এই যা তর্কাৎ। কাল পর্যন্ত অর্চনারও এই মত ছিল। গত রাত্রি হইতে বদলাইয়াছে। বলিল—“বরাবর না হয়, অন্ততঃ তিন মাসের জন্য একটু সামলে দিক্ তার পর.....”

ঠাকুরদাদা চিন্তিতাবে বলিলেন—“টিউটর ?...তা তুমি যখন বলছ...নিজে মেক্-আপ্ করে নিতে পারবে না বীকুর তুমি ? সেই হ'ত ভাল—আস্বচেষ্টা...”

বীকুর উৎসাহভরে উত্তর দেওয়ার আগেই অর্চনা বলিল—

“না, পারবে না।”—এমন জোরের সহিত বলিল যে বীকুর চুপ করিয়া রহিল।

“তা হ'লে দেখ...তোমাদের মাষ্টার কেউ রাজী হবেন বীকুর ?”—তিন মাসের জন্যে ?—জিজ্ঞাসা করে দেখবে আজকে ?”

বীকুর উত্তর দিবার আগেই অর্চনা আবার জোব দিয়া বলিল—“না না, হবে না বাজী : শুলেব মাষ্টারদেব বাঁধা টুইশ্চন থাকে।”

বীকুর আবার চুপ করিয়া গেল। ঠাকুরদাদা বলিলেন—“হয়েছে।—তোমাদেব কলেজের কোন ছেলে পাওয়া যাবে না ? জিজ্ঞাসা কবে দেখো না, সামনে তিন মাসের ছুটি পড়ে রয়েছে।”

“তুমি কথাগুলো একটু ভেবে বল ত ঠাকুরদা। আমি জিজ্ঞাসা করতে যাব,—আমার সেখানে কাব সঙ্গে জানা-শোনা ?”

“তবে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবে ? দাঁড়াও, আমি না-হয় দেখি হুঁচার জনকে জিজ্ঞাসা করে।”

ঠাকুরদাদার হাতে গেলেই ত বেহাত হইল। কলেজে এতটা অপরিচয়ের ভাবটা দেখান ভাল হইল না। একটু চিন্তা করিয়া অর্চনা বলিল—“বোসো ঠাকুরদা, এক কাজ করা যাবে, একটা বিজ্ঞাপনের মত লিখে পিণ্ডনকে দিয়ে আমাদের কলেজের নোটিস-বোর্ডে টাঙিয়ে দেব'ধন। যারা চায় তোমার সঙ্গে দেখা করুক, তুমি বেছে নিও।”

“তুমিও থাকবে ত ?”

“না, আমার দ্বারা হবে না।”

“থাকলে ভাল হ'ত। লোক বাছা একটু শক্ত কিনা।”

৪

লোক বাছা একটুও শক্ত হইল না, কাবণ অত বড় কলেজের মধ্য হইতে একটিমাত্র ছেলে আনিয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিল। তিনি ইঞ্জি-চেরারে ফেলান দিয়া কাগজ পড়িতেছিলেন। ছেলোট বাবাব্বায়া উঠিয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল—এই কি উমেশবাবুর বাড়ী ? তাঁব সঙ্গে—মানে, তিনি...”

“...আমিই উমেশবাবু, কি বরকার আপনার ?”

“আমাদের কলেজের নোটিশ-বোর্ডে একটা এডভার-টাইজমেন্ট...”

ঠাকুরদাদা উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—“ও, ই্যা ই্যা, ঠিক, আমার চাই একটা টিউটর। কোন্ ইয়ারে পড়েন আপনি?”

ছেলেটি একটি ঢোক গিলিয়া বলিল—“খার্ড ইয়ারে।”

বেশ ছেলেটি।—দীর্ঘ, সবল চেহারা; শাদা, ছিমছাম পরিচ্ছদ; মুখে বেশ একটি বুদ্ধির দ্ব্যতি। একটা আঙ্গেন লইয়া আসিয়াছে; কিন্তু কোথাও একটুও হীনতার ভাব নাই, হৃদ একটু সলজ্জ বলিতে পারা যায়।

বৃদ্ধের ভাল লাগিল, বলিলেন—“বহুন, বহুন ঐ চেয়ারটায়। খার্ড ইয়ারে পড়েন। তা হলে ত আমাদের অর্চনাব সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়।”

ছেলেটি অজ্ঞের মত একটু জ্ব কুঞ্চিত করিল মাত্র, যেন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছে।

“চেনেন না? ক’টি ফিমেল স্টুডেন্ট খার্ড ইয়ারে?”

ছেলেটি জ্ব দুইটি একটু তুলিয়া বলিল—“ও, মিস্ রাত্রের কথা বলছেন? তিনি কি এই বাড়ীতেই...”

“আমার নাতনী কিনা। এই ত ছিল একটু আগে।.. অর্চু!”

প্রবীর আসিয়া বলিল—“দিদি এইমাত্র গাড়ীতে ক’রে বেরিয়ে গেল।”

“কোথায় গেল হঠাৎ?..যাক, আলাপ হবেই। ই্যা, কলেজে আর আলাপ হবে কি ক’রে?—অত সময় ত পাওয়া যায় না।...এই ছেলেটি আপনার ছাত্র। তোমার মাষ্টার মশাই, বীক; প্রণাম কর।...কি নাম আপনার?”

“বিমলেন্দু দত্ত।”

“খার্ড ইয়ার—বি-এসি?”

“আজ্ঞে না, আর্টস।”

“কি কি সাজেট নিয়েছেন?..আর সাজেটের জন্তে ত ভারি বাধা?—ছাত্র আপনার মোটে কিঞ্চৎ ক্লাসে ত পড়ে।”

“ম্যাথমেটিক্স আর হিস্ট্রি।”

“অর্চু রও ত এই কবিনেট্রন।”

বিমলেন্দু চোখ তুলিয়া সামনের গাছটার ডগায় অভ্যস্ত মনোযোগের সহিত কি-একটা দেখিতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলেন—“দেখ এ-সুগ আর সে-সুগ!—শ্রামবাজারের মেয়ে-স্কুল খুলল;—মাইলখানেক পথ ঘুরে কলেজে গেছি—একটু পাশ দিয়ে যাবার লোভে। আর এরা এক ক্লাসে পড়ে—এক কবিনেট্রন—নাম পর্যন্ত জানে না।—ভালই।” এ-সুগের এ-বেচারীরা একটু লাজুক বেশী। মেয়েরা যতই বাহির হইয়া আসিতেছে, ইহার ততই যেন সঙ্কচিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িতেছে।

অথচ শরীরের চর্চাও করে সব পূর্বের চেয়ে বেশী; পুরুষালি ভাব আছে,—ইঞ্চি-ইঞ্চি করিয়া সযত্নে বুকের ছাতি বাড়ান—চওড়া ছাতি চিতাইয়া দাঁড়ায়। এই ছেলেটি গুদেরই টাইপ। বেশ ভাল লাগিতেছিল বিমলেন্দুকে। নতুন পরিচয় হিসাবে কথাবার্তা একটু বেশীই হইল বরং,—টুইশনের পরিধির বাহিরেও গড়াইয়া গেল।

“অনাস নেওয়া হয়েছে?..অর্চু নিলে না, মেয়েছেলের অতটা দরকারও নেই।”

“আজ্ঞে ই্যা, ম্যাথমেটিক্স।”

“হু; ম্যাথমেটিক্সে। আর অনাস।—হাই এডুকেশনের যা অবস্থা। প’ড়ে লোক ক’রবে কি।..আপনার উদ্দেশ্যটা কি? ঠিক করেছেন কিছু?”

“দেখি, কম্পিউটিভ এগজামিনেশন দেওয়ার ইচ্ছে আছে কোন-একটা।”

বিমলেন্দুর আর বাহাই দোষ থাক, আত্মজ্ঞানাবাটা নাই। কথাটা নিজের কানেই একটু গালভরা শুনাইল বলিয়া জুড়িয়া দিল, “কোন রকম ব্যাকিং-এর জোর নেই কিনা যে এমনি চাকরি-বাকরি কোথাও পেতে পারব...”

বাং, বেশ ছেলে, ঠাকুরদাদার উত্তরোত্তর এর সাহচর্য্যটি বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছিল—প্রজাপতি কি অবতীর্ণ হইলেন বৃদ্ধের মধ্যে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু একটু কুণ্ঠাও হইতেছিল। অবশেষে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন—“ই্যা, স্টুডেন্ট-কেরিয়ার ভাল হলে ও-মিকেই চেষ্টা করা ভাল।”

মুখের দিকে একটু সপ্রশ্ন নেড়ে চাহিলেন; কিন্তু কোন

উত্তর না পাইয়া সোজাহুজিই জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার ম্যাট্রিক, আই-এ-তে কোন প্লেস্ ছিল?”

বিমল একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করিল—“আজ্ঞে না, প্লেস্ কোন ছিল না, তবে...”

একটু থামিয়া বলিল—“ম্যাট্রিকে একটা ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, আই-এ-তেও পাচ্ছি একটা স্কলারশিপ, তবে ঠিক প্লেস্ থাকা বলা যায় না।” বলিয়া মাথা একটু নীচু করিল।

“বড় আনন্দ হ’ল শুনে। অল্-ইণ্ডিয়া কম্পিটিশনে যাবেন। ওদিকে আমাদের বাঙালীর ছেলেরা বেশী এগচ্ছে না; ঠিক হচ্ছে না এটা।...বীক, তোমার মাস্টারমশাইকে চা’টা এনে দাও...অল্-ইণ্ডিয়াতেই দেবেন। কই, আমরা ভিন-চার স্কেনেবেঞ্চে ঘে-জায়গাটা হাসিল করলাম বাঙালী জাতটার জন্তে, আপনারা তা রাখতে পারছেন কই?”

বিমলেন্দু লজ্জিতভাবে কহিল—“আজ্ঞে, অপবাদটা আপনারেব দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত নয়, তবে কারণ ত একটা নয়—জ্ঞানেনই ত?”

“তা হোক, তবু আপনারেব মত ভাল ছেলেদের এ বিষয়ে জাতেব প্রতি একটা কর্তব্য আছে। না, চেষ্টা করতে হবে; আমি আপনার রেজার্ণ্ট ওয়াচ করতে থাকব।”

হাসিয়া বলিলেন—“আপনি বোধ হয় ভাবছেন—আমি করতে এলাম মাস্টারি, আমার উপর এ আবার কোথেকে এক মাস্টার জুটে গেল রে বাবা! কি জানেন? ব’সে ব’সে কাগজে দেশের দুঃখ-হুর্দিশার কথা প’ড়ে বড় দমে যেতে হয়। বড়ো হয়ে আর বেশী ঘোরা-ফেরা, সভা-সমিতি চল না যে এ নিয়ে একটু চর্চা ক’রব; তাই একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেছে—ইয় ম্যান্ কাউকে কাছে পেলেই...”

বীক চা-জলধাবার লইয়া আসিল। অনেকরকম কথা হইল; নানান রকম খবর রাখে ছোলাটি, আর যাহা বলে—নিতান্ত ভাল-ভাসা নয়। তাঁর সময় ঠাকুরদাদা বলিলেন—“তা হ’লে আপনি পড়তে আরম্ভ করে দিন যত শীঘ্র পারেন। ছাত্র আপনার অঙ্কে একটু কাঁচা, ঐদিকটা একটু একটু ক’রে হেল্প ক’রে যাবেন। আমি আবার বেশী কোটিং পছন্দ করি না। হ্যাঁ, টার্মসের কথা...”

এমন সময় বাড়ীর গাড়ীটা কটক পার হইয়া গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে অর্চনা।

সে ভাবিয়াছিল, এতক্ষণে বিমলেন্দু নিশ্চয় চলিয়া গিয়া থাকিবে। তাহাকে ঠাকুরদাদার সহিত বারান্দায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সন্কোচে—দুঃস্বপ্নের নিকটই সন্কোচে—গাড়ী হইতে নামিতে পা উঠিতেছিল না। কিন্তু তখন তাহার আর ফিরিবার পথ নাই।

ঠাকুরদাদা উৎফুল্ল ভাবে বলিয়া উঠিলেন—“এই-যে অর্চুও এসেছে। নেমে এস। ইনিই বীকর টিউশনের জন্ত এসেছেন।...কোথায় ঘুরছিলে অর্চু, তুমি?—এত সকালেও ঘেমে উঠেছ, মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে।...চেন বোধ হয় এঁকে? তোমাদের ক্লাসেই পড়েন।...কি-যে বেশ নামটি বললেন আপনার?”

নিজের নাম বলা যে অবস্থাবিশেষে এত শক্ত বিমলের তাহা জানা ছিল না। গলার বাহের এলোমেলো অক্ষর-শুলা কোন রকমে শুছাইয়া বলিল—“বিম্—বিমলেন্—হু।”

হাতেব কুমালটা কপালের ঘবের উপর চাপিয়া অর্চনা-অজ্ঞের মত অন্ধ কুক্ষিত করিয়া দাঁড়াইল,—একটু পূর্বে বিমল নিজে যেমন দাঁড়াইয়াছিল,—কোনমতেই মনে পড়িতেছে না নামটা।





কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভবানীচরণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও
গ্রন্থপঞ্জী সহিত পুনর্মুদ্রিত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়সাহা চরিত্র—রাজীবলোচন
মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত রাজীবলোচনের
সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহিত পুনর্মুদ্রিত। দুস্তাপ্য গ্রন্থমালা ১ ও ২। ব্রজেন
পারিষিৎ হাউস, ২৭১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। ১৩৪৩। প্রত্যেক
পুস্তকের মূল্য এক টাকা মাত্র।

বঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই অবগত আছেন যে, বঙ্গালী দেশে ঊনবিংশ
শতাব্দীর অন্ত্যস্ত কীর্তির মধ্যে, গদ্য-সাহিত্যের যশ ও একটি প্রধান
কীর্তি। বঙ্গালী গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গালীর গর্ব করিবার যে জাতীয়
অধিকার আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া এই সাহিত্যের কোনও হুপহিচিৎ
ঐতিহাসিক গ্রন্থই লিখিয়াছেন, “বর্তমান কালের অপরাধের ভাষ্যের
আধ্যাত্মিকতার কথা দূরে থাকুক, অনেক প্রতিষ্ঠাপন বিশেষী ভাবেরও
এইরূপ বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও ঐচ্ছ্যপানী গদ্য-ভক্তি ও সাহিত্য নাই, একই
বলিলে অত্যাতি হইবে না।”-এই গদ্য-সাহিত্যের গঠনের যুগ ছিল
ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধ। সেই যুগের যে-সকল রচনা বর্তমান বঙ্গালী
গদ্যের ভিত্তিপ্রস্তান করিয়াছে, তাহা আধুনিক সময়ে একান্ত দুস্তাপ্য।
সেই যুগ তাহাদের সহিত সাধারণ বঙ্গালী পাঠকের পরিচয় নাই বলিয়া
চলে। গর্ব করিবার বিষয় হইলেও, এই নূরুল রচনার উদ্ভাবন ও
পুনর্মুদ্রণ সম্বন্ধে এ-পর্ধ্যস্ত কেহই বিশেষ বক্তৃতা করেন নাই। শুধু দুস্তাপ্য
নহে, হয়ত কিছু দিন পরে এই রচনাগুলি একেবারেই ভুল হইয়া
বাইবে। উল্লিখিত ‘কলিকাতা কমলালয়’ পুস্তকের প্রথম সংস্করণের
মাত্র দুইটি কপি এ পর্ধ্যস্ত পাওয়া গিয়াছে; এক রাজীবলোচন
মুখোপাধ্যায়ের পুস্তকের প্রথম সংস্করণের কেবল একটি মাত্র কপি
কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং
এক সময়ে এই দুইটি রচনাই বঙ্গালী গদ্য-রচনার অন্ততম পথ-প্রদর্শক
হিসাবে যথেষ্ট প্রভাব-বিস্তার ও সমাদর লাভ করিয়াছিল। বঙ্গালী
গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগের এই রচনাগুলির নিখুঁত পুনর্মুদ্রণ
বঙ্গমূল্যে প্রচারের সংকল্প কবির শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়
সাহিত্যসেবী বঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।
এ-পর্ধ্যস্ত দুই বাসের মধ্যে এই গ্রন্থমালার উল্লিখিত দুইটি পুস্তক ছাপা
হইয়াছে, কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যে আরও ১৩ খানি পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে এই যুগের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য
রচনা ক্রমশঃ বঙ্গালী পাঠকমাত্রের অধিগম্য হইবে।

এই যুগের সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া ব্রজেননাথ
যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দেওয়া অন্যতরক।
গত যুগের সাহিত্য ও ইতিহাসের যে-সকল উপকরণ প্রতিদিন নষ্ট হইতে
হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে ব্রজেননাথের অনুসন্ধান
ও পরিশ্রম বঙ্গালী দেশের শিক্ষিত সমাজেও হলত নহে। সেই অনুসন্ধান

ও পরিশ্রমের ফলে, গত যুগের বিস্তৃতপ্রায় সাহিত্য-প্রচেষ্টার সহিত আজ
বঙ্গালী পাঠকের পরিচয় লাভ ঘটতেছে, তাহা কম সৌভাগ্যের
কথা নহে।

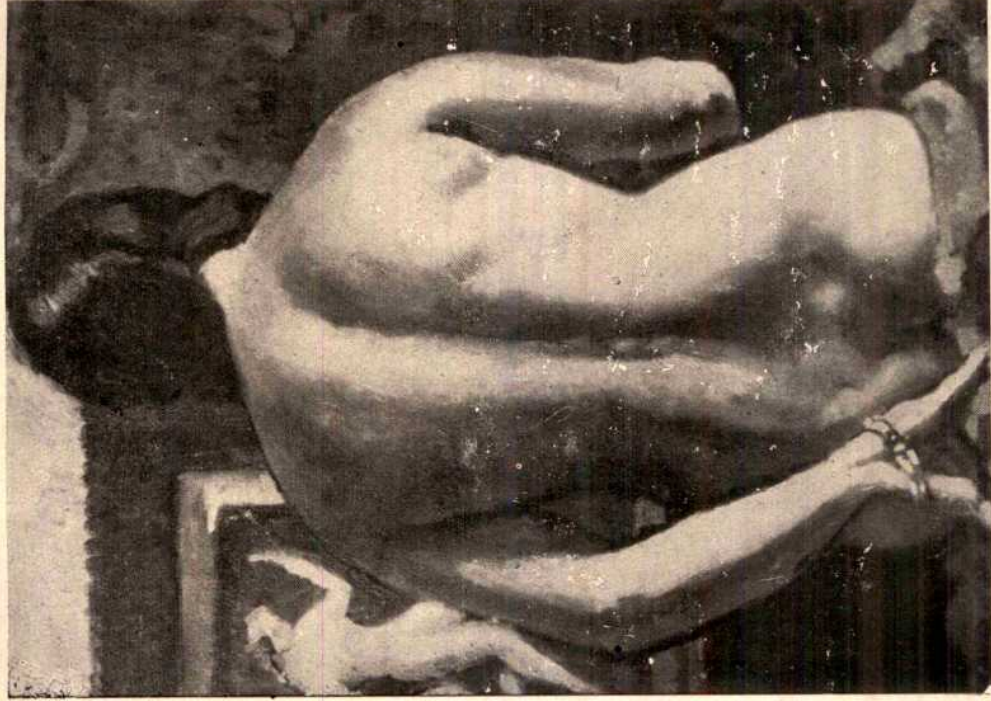
রাজীবলোচনের রচনা কোর্ট উইলিয়াম কলেক্টরের আনুকূল্যে
১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে জৈরামপুরের ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।
পাণ্ডুরী উইলিয়াম কেরীর অধীনে তিনি উক্ত কলেক্টরে বঙ্গালী বিভাগের
এক জন পণ্ডিত ছিলেন, এবং কেরী সাহেবের উৎসাহে এই পুস্তক রচিত
ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ষাঁহারাই এই যুগের সাহিত্য-রচনার ইতিহাস
লিখিয়াছেন, তাহারাই রাজীবলোচনের বচনার যে একটি বিশিষ্ট স্থান
ছিল তাহার নির্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে এই
পুস্তকের খুব বেশী মূল্য না থাকিলেও, সেই যুগের রচনার নিদর্শন হিসাবে
ইহার মূল্য অধিকার করা যায় না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক।
প্রথমে রামমোহন রায়ের ‘সম্মানকৌমুদী’ পত্রিকার সম্পাদন করিয়া,
পরে তাহার সহিত সহমরণ-নিবারণ সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ার তিনি
রামমোহনের পক্ষ ত্যাগ করেন। উক্ত আলোচনের বিবরণে
রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যে ‘ধর্মসঙ্গ’ স্থাপন করিয়াছিল, তাহার অগ্রণী
ও সম্পাদক হইয়াছিলেন ভবানীচরণ। তিনি কলুটোলার একটি
মুদ্রাশ্রম স্থাপন করিয়া আচার্যনিষ্ঠ হিন্দুদের যুগ্মপ্রবন্ধরূপ ‘সমাদার-
চন্দ্রিকা’ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সূদে সূদে বহু
শতাব্দে টিকা-টিলনী সমেত পুঁথির আকারে ভুলট কাগজে মুদ্রিত করিয়া
প্রচার করেন। কেবল রামমোহন রায়ের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে অথবা
স্থিতিশীল সমাজ-সংস্কারক হিসাবে নহে, গ্রন্থকার যুগ্মশেখ ও সাংবাদিক
হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইতিহাসে
ভবানীচরণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

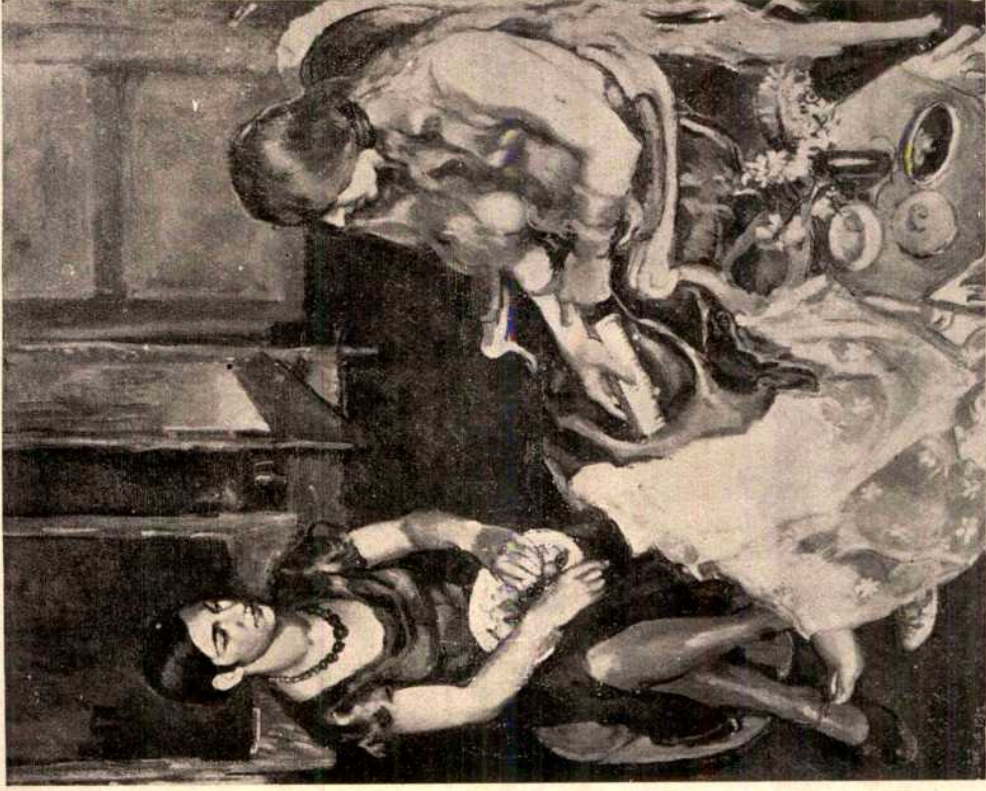
ভবানীচরণের রচিত বা সম্পাদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে ‘কলিকাতা
কমলালয়’ এক (প্রথমখণ্ড শব্দী—এই ছদ্মনামে লিখিত) ‘নবাব বিলাস’
সেই যুগের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল উল্লিখিত হইবে। প্রথম
গ্রন্থখানি বর্তমান দুস্তাপ্য গ্রন্থমালার পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; দ্বিতীয়-
খানিরও পুনর্মুদ্রণের সংকল্প রহিয়াছে। পুনর্মুদ্রিত পুস্তকের ছপিকার
ব্রজেননাথ এই বিস্তৃতপ্রায় গ্রন্থকারের ও তাহার গ্রন্থাবলীর যতটুকু
পরিচয় অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই
সংস্করণের মূল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়—প্রদ্বোক্তবহুল কলিকাতার রীতিবর্ণন
এক ভদ্রপক্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গালী সমাজের যে চিত্র
ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা কেবল রস-বচনা হিসাবে নহে, ঐতিহাসিক
আলোচ্য হিসাবেও মূল্যবান। ব্যক্তিগতপূর্ণ সামাজিক চিত্র রচনার
ভবানীচরণের ‘কলিকাতা কমলালয়’ ও ‘নবাব বিলাস’, ‘আলালের ঘরের
হুলাল’ ও ‘হতোম পোঁটার নক্সার’ অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক।

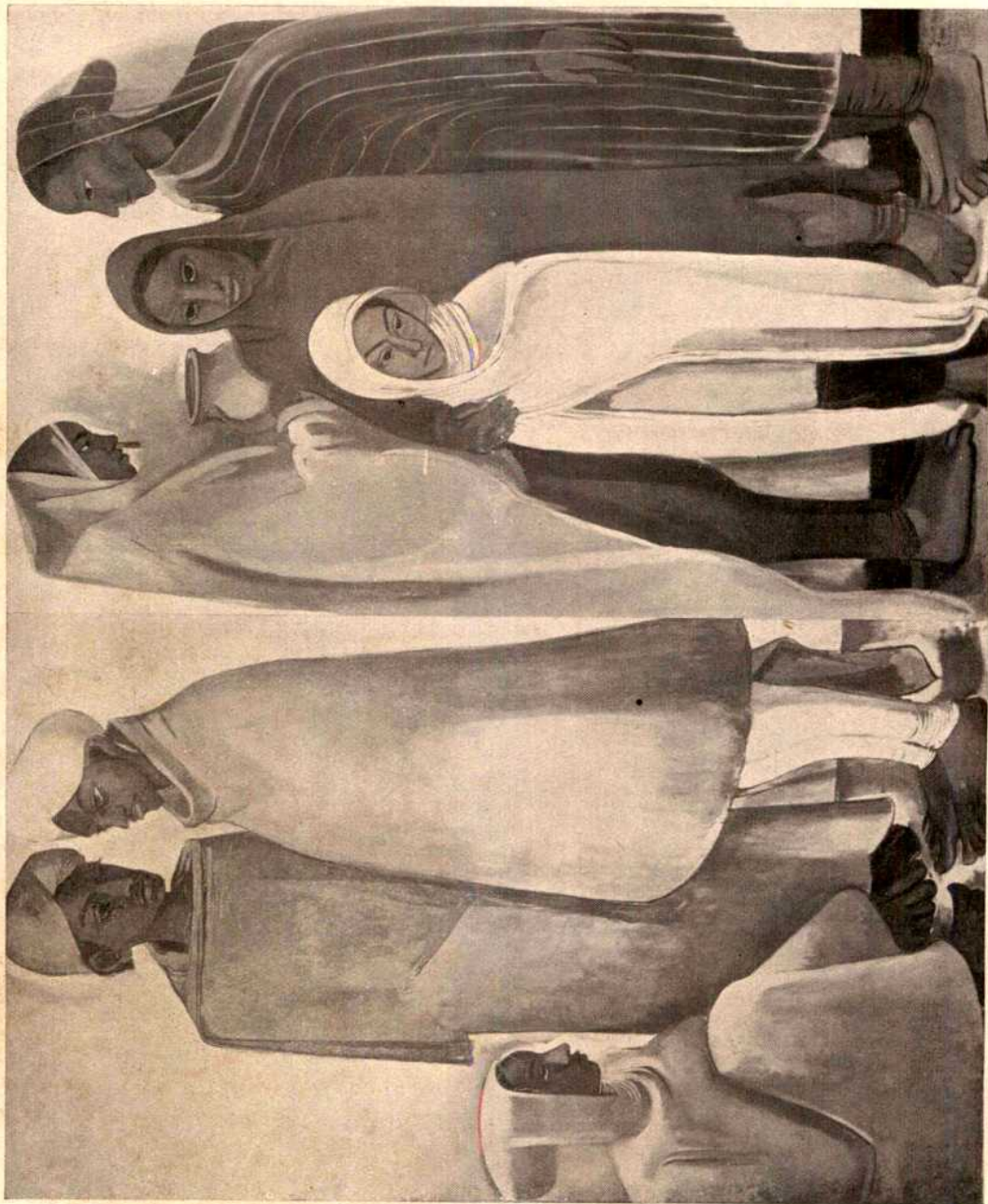
শ্রীমতী অমৃত শেরগিল-অঙ্কিত চিত্রাবলী



মূর্তি



ভুদ্ধি



ପାଞ୍ଚତା ସମ୍ମିଳିତ

ଗ୍ରାମବାସିନୀ

আর একটি কথা। পুনর্মুদ্রিত পুস্তক বাহাতে নিভুল হয়, তাহার জন্ত যথেষ্ট যত্ন করা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পৃষ্ঠায় প্রথম সংস্করণের পত্র-সংখ্যাও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের ছাপার নমুনা ও টাইটেল পেজের প্রতিলিপিও মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রী সুশীলকুমার দে

জাপানে-পারস্তো—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিহভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই গ্রন্থের 'জাপানে' অংশটি পূর্বে 'জাপান-যাত্রী' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল। 'পারস্তো' অংশ সাময়িক পত্র হইতে সংগৃহীত। এবারে প্রথম ইহা গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে।

১৯০২ সালে পারস্তরাজ্যের নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ যখন সত্তর বৎসর বয়সে বায়ুযানে পারস্ত যাত্রা করেন তখন বাংলা দেশে সকলে তাঁহার শুল্লপথ ভ্রমণ ও পারস্য ভ্রমণের কথা শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। প্রবাসী ও বিচিত্রা পত্রে এই কাহিনীর আশায় অনেকে চাহিয়া থাকিতেন। বাঁহারা গল্প শুনিতে চান তাঁহাদের আশা না মিটিলেও পারস্যকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি এই প্রবন্ধগুলিতে এসিয়া ও ইউরোপের মানব জাতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর চিন্তাধারার বহু পরিচয় দিয়াছেন। পারস্যবিষয়ক তথ্যও ইহাতে অনেক আছে। বাংলায় পারস্যের কথা বেশী নাই। স্মরণীয় বইখানির একটি বিশেষ মূল্য আছে।

ছন্দ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিহভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

১৩২১ সাল হইতে ১৩৪২ সাল পর্যন্ত ২১ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ ছন্দ সম্বন্ধে যত কিছু আলোচনা করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকে একত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রবন্ধের সংখ্যা সাত-আটটির বেশী নয়, কয়েকখানি পত্রও তাহার উপর আছে। ইহাতে পদ্য ছন্দ ও গব্য ছন্দ দুই বিষয়েই আলোচনা আছে। বাংলা দেশে ছন্দের জাল বুনিতে যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবিশ্রাব্যার্থীরা সকলে তাঁহার এই বইখানির সমাদর করিবেন আশা করা যায়। বাঁহাদের যথোলিঙ্গা নাই, রসপিপাসা আছে, তাঁহারাও ইহার আদর করিবেন নিশ্চয়।

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—বানী প্রেমবনানন্দ লিখিত। উদ্বোধন কাথালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

“রামকৃষ্ণ পরমহংস যে-দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-দেশের ছেলেমেয়েদের জন্ত” তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর মুখে শোনা কুড়িটি ছোট ছোট গল্প এই বইখানিতে আছে। গল্পগুলি শিশুদের আনন্দের সঙ্গে পড়িতে ও পরকে পড়িবার সুনামইতে দেখিয়াছি। গল্পগুলি নীতিমূলক ও চিত্তাকর্ষক। গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য আছে, ভাষা শক্ত নয়। বইখানিতে সাতখানি বড় ছবি ও অনেকগুলি ছোট ছবি আছে।

শ্রীশান্তা দেবী

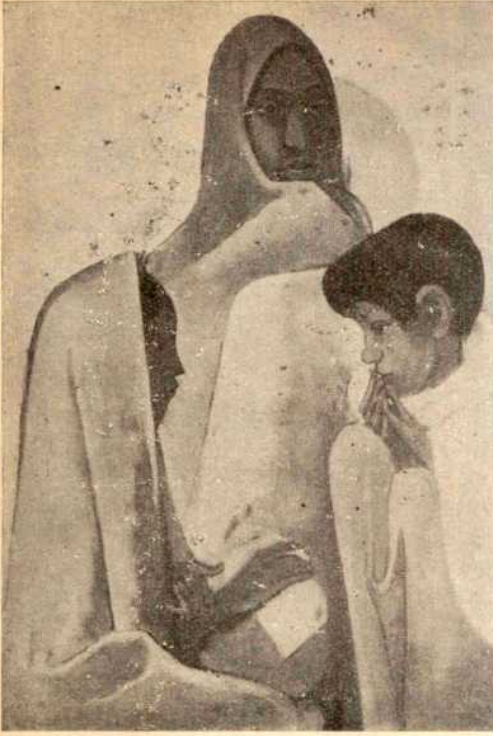
শিল্পী শ্রীমতী অমৃত শেরগিল

চিরকাল রসপিপাসুদের মনে আনন্দ সঞ্চার করবে, চিত্ত-বস্তির ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবে, শিল্পের কোন ক্ষেত্রেই এমন উচ্চাঙ্গের শিল্পশক্তি নারীপ্রকৃতির পক্ষে একেবারেই সম্ভব কিনা, সে বিরোধসঙ্কুল আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েও এ-কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সহজ সৌন্দর্য্যবোধ নারীচিহ্নের অঙ্গাদ্বী; সেই সৌন্দর্য্যবোধ ব্যয়িত হয় সাধারণত তাঁদের পরিবেশকে রমণীয়, দৈনন্দিন কর্ম্মকে মধুর করে তুলতে; তাঁরাই ত গৃহদীপ, অমর্ত্য শ্রীর প্রতিকূপ মর্ত্যালোকে। নারীর এই সহজ শ্রীজ্ঞানই পরিব্যাপ্ত হয় নানা ব্যবহারিক কারুকর্মে, অলঙ্কারে; আমাদের দেশেও মেয়েদের নিপুণ হাত অনেক কাল অপকূপ কারুরচনায় পটু ছিল, এখনও সে-দক্ষতার চিহ্ন সম্পূর্ণ কোঁপ পেয়ে যায় নি।

চিরন্তন মহিমার ঘোঁষা হোন বা না-হোন, আধুনিক যুগে মেয়েরা চিত্র ও মূর্তি-রচনায় পুরুষের সমান স্থান অর্জন করতে ব্রতী। বিদেশে শ্রীমতী লরা নাইট চিত্রশিল্পীরূপে বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন। আমাদের দেশেও শ্রীমতী সুনয়নী দেবী, শ্রীমতী প্রতিমা দেবী, শ্রীমতী স্বকুমারী দেবী ও অনেক তরুণী শিল্পীর রচনায় আমাদের শিল্প সমৃদ্ধ হয়েছে—বারাস্তরে সে-কথা আলোচ্য। ভারতবর্ষের মহিলা শিল্পীদের মধ্যে সম্প্রতি যিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন



ভারতমাতা



ভিথারী

সেই শ্রীমতী অমৃত শেরগিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইখানে আলোচ্য।

পঞ্চাবের এক সমৃদ্ধ ও অভিজাত পরিবারে ১৯১৩ সালে শ্রীমতী শেরগিলের জন্ম। উত্তরজীবনে যারা শিল্পীরূপে বিখ্যাত হয়েছেন, সাধারণত বাল্যেই তাঁদের শিল্পাহুরাগ অল্পবিস্তর পরিষ্কৃত হ'তে দেখা যায়; শ্রীমতী শেরগিলের বেলাও তার ব্যত্যয় হয় নি। চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্ম ১৯২৪ সালে তাঁর পিতামাতা তাঁকে ক্লোরেন্সে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর কাছে নীরস মনে হয়েছিল, তাই অল্পদিন পরেই তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯২৯ সালে শ্রীমতী শেরগিল শিল্পশিক্ষার জন্ম পুনরায় বিদেশ যাত্রা করেন ও প্যারিসে গিয়ে এ'। শোমিয়ের প্রতিষ্ঠানে পিয়ের ভাইয়ঁয়ার শিক্ষাধীনে কিছুকাল থাকেন এবং পরে বিখ্যাত শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একোল দে বোজার-এ অধ্যাপক লুসিয়া সিমোঁর কাছে তিনবৎসর শিক্ষালাভ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষার্থী। এইখানে ছাত্রাবস্থায় তিনি ক্রমাগত তিন বৎসর চিত্র-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৩২ সালে প্যারিসে এ'। সালোতে শ্রীমতী শেরগিলের “মূর্তি” চিত্র প্রদর্শিত হয় ও শিল্প-সমালোচকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পর বৎসর তাঁর “তরুণী” চিত্র প্রদর্শিত



শ্রীমতী অমৃত শেরগিল

হ'লে তিনি এ'। সালোর সদস্তপদে মনোনীত হন—এই পদে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয়। অগ্ন্যাহু সম্ভ্রান্ত কলা-প্রতিষ্ঠানেও তিনি চিত্র প্রদর্শন করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রে শিল্পচর্চা করছেন।

শ্রীমতী শেরগিলের যে-চিত্রগুলি মুদ্রিত হ'ল তার মধ্যে তাঁর চিত্রকলার ক্রমপরিণতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। “মূর্তি” ও “তরুণী” চিত্র, অন্ধনরীতি, বিষয়বস্তু ও ভাবে, সম্পূর্ণই বিদেশী; তাঁর অন্ত্যাহু চিত্রে তাঁর স্বকীয়তা পরিষ্কৃত। ভারতবর্ষের জীবনের নানা দৃশ্যই বর্তমানে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। ভারতবর্ষের দুঃখদৈন্যের রূপটিই তাঁর আধুনিক চিত্রে বিশেষ ক'রে পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে। সমৃদ্ধির মধ্যে পালিত হয়েও শ্রীমতী শেরগিলের নারীচিত্রকে দেশের এই দৈন্যপিড়িত রূপটি বিশেষ ভাবে স্পর্শ করেছে। অন্ধনপদ্ধতি যে-দেশেরই হোক, তার ভাববস্তুর সঙ্গে যদি দেশের হৃদয়ের স্পর্শ না থাকে তা হ'লে যে কোন শিল্পসাধনাই সার্থক হ'তে পারে না, একথা তিনি জানেন এবং তাই জ্ঞানতই তিনি চিত্রপটে দেশের বেদনাময় করুণ দিকটাকেই রূপায়িত করে তুলবার ভার নিয়েছেন।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৭

পর দিন সন্ধ্যে লোক লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রওয়ানা হইলাম। এই নিষিদ্ধ বনস্পতিহীন দেশে, কোসী নদীর ক্ষীণধারা ধারা চারিদিকের মুক্তিকাময় পর্বতের মধ্য দিয়া বহিতেছিল। স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত গৃহ ও গ্রামের চিহ্ন পাওয়া গেল, কোন-কোনটার বাহিরের দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে। মনে হয়, পূর্বকালে এই উপত্যকায় বিস্তৃত লোকবসতি ছিল, নদীর ধারাও নিশ্চয় এখন অপেক্ষা অনেক পৃষ্ট ছিল, নহিলে এত ক্ষেতের সেচ চলিত কি প্রকারে? আগের গ্রামে শুনিয়াছিলাম, পূর্ব বৎসর এই খোঙলার পথে দুইজন যাত্রীকে কাহারো খুন করিয়াছিল। ভোটদেশে মাল্লুষের প্রাণের মূল্য কুকুরের অপেক্ষাও কম, রাজদণ্ডের ভয়েও লোকের প্রাণরক্ষা হয় না। স্মৃতি-প্রজ্ঞা এ-বিষয়ে বিস্তর মন্তব্য করিলেন।

উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতেছিল, এইভাবে আমরা গিরিসঙ্কটের নীচে লহসেতে (বিশ্রামের স্থল) পৌঁছিলাম। সেখানে পাহাড়ের ওপর হইতে আসিয়া কতকগুলি লোক চা প্রস্তুত করিতেছিল। পথচলার কালে ভোটদেশে ভাথী (হাত-পাখা ও কুলা জাতীয় বাতাস করিবার উপায়) অত্যাবশ্যক জিনিষ, ইহার সাহায্য ব্যতীত ভিজা ঘুঁটে ইত্যাদি দ্বারা আগুন জালানো অসম্ভব। আমাদের ভাথী ছিল না, সুতরাং আমরা অল্প আগন্তুকদের চায়ের সঙ্গে আমাদের চা মিলাইয়া দিলাম। ঘোড়াগুলিকে চরিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং আমরা চা ও গল্পে জমিয়া গেলাম, শুনিলাম লা (গিরিসঙ্কট) এখন তুষারশূন্য। লোকগুলির মুখের বর্ণ পুরাণে আমার মত, তিব্বতের উচ্চঘাটপথে চলিবার সময় শরীরের যে-অংশ অনাবৃত থাকে তাহা ঐরূপ কালিমাখা হয় এবং সেই রং প্রায় দেড় সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে।

আবার ঘোড়ার পিঠে যাত্রারস্ত্র করা গেল, এবার চড়াই

খুব বেশী নহে কিংবা অল্পের পিঠে থাকার দরুণ তত বেশী মনে হয় নাই। ঘাটের পথ ক্রমেই সরু হইতে থাকিল, শেষে নদীর ধার মাত্র রহিল যাহারও স্থানে স্থানে—কোথাও বা অনেকখানি—পুরাণে বরফের স্তরে ঢাকা ছিল। পথ নদীর এপার-ওপার হইয়া শেষে দক্ষিণ পার্শ্বের পর্বতের গায়ে গোলকধাঁধার চক্রের মত বক্রভাবে উপরে চলিল। ঘোড়াগুলি মাঝে মাঝে নিজে নিজেই যাইতেছিল, কারণ এত উপরে হাওয়ার স্তর অত্যন্ত পাতলা। শেষে অদূরে কালো সাদা পীতাম্ব কাপড়ের পতাকা দেখা গেল, বুঝিলাম লার শিখর নিকটেই। ভোটদেশে প্রত্যেক লা কোন দেবতার স্থান, সুতরাং দেবতাকে সম্ভট রাখার জন্য লার শিখরের কাছে লোকে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়ে। আমরাও নামিলাম এবং স্মৃতি-প্রজ্ঞা ও অল্প ভোটদিয়েরা ‘শো শো শো’ বলিয়া দেবতার জয়ধ্বনি করিলেন। শিখর হইতে সুদূর দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত হিমাচ্ছাদিত হিমালয়ের পর্বতমালা দেখা গেল। অল্পদিকেও পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সেগুলি তুষারমণ্ডিত নহে, তবে উপত্যকার আশেপাশে স্থলে স্থলে বরফ ছিল। আমার ঘোড়াটি ছিল অলস, তাহাকে প্রহার করা আমার দ্বারা হইল না, সুতরাং আমি সকলের পিছনে পড়িলাম। পথে লোকজন নাই, মাঝে মাঝে আশেপাশের বসতি হইতে পথের ঠিকানা লইতে লইতে, অল্পদের প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পরে আমি লঙ্কোর পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার দেবী হওয়ায় স্মৃতি-প্রজ্ঞা অত্যন্ত চট্টিয়া গেলেন।

লঙ্কোর তিউরীর বিশাল উপত্যকার শিরোভাগস্থিত ছোট গ্রাম। এখানকার গুমা (বিহার) এককালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, ‘তঞ্জুর’ের কিয়দংশ এখানই সংস্কৃত হইতে ভূটিয়া ভাষায় অনুবাদিত হয়। (বৌদ্ধ ত্রিপিটকের তিব্বতী অনুবাদের নাম ‘কঞ্জুর’ এবং তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং ঐ



রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও তাঁহার সঙ্গী

সম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক সংগ্রহের নাম 'তজ্জুর')। প্রাচীন বিহারের দেওয়াল এখনও পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান, বিহার প্রথম গোৰ্খা-ভোটযুদ্ধে গোৰ্খাদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং তাহার পর ইহার আর পুনর্নির্মাণ হয় নাই। প্রাচীনকালের ভিক্ষুদের বংশধরগণ এখনও এই গ্রামে আছে এবং তাহারা একটি ছোট মন্দিরও নির্মাণ করিয়াছে। ইহা ভোটদেশের প্রাচীনতম সম্প্রদায় নিগ্-মা-পা (পুৱাতন) মতাবলম্বী। এই সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে স্থাপিত, একাদশ শতাব্দীতে কর্-মুগ্-পা সম্প্রদায়ের আরম্ভ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্ক্যা-পা ও যোড়শ শতাব্দীতে গেলুক্-পা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই চারিটিই তিব্বতের প্রধান বৌদ্ধ সম্প্রদায়। স্মৃতি-প্রজ্ঞ ৬ই জুন তারিখেও নড়েন না দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে তিনি এই যাত্রায় কিছু অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টাও দেখিতেছেন যাহাতে লাসায় গিয়া অনটন না হয়। তাঁহাকে আমি বলিলাম যে যদি তিনি শীঘ্র লাসা রওয়ানা হইতে এবং পথে দেরী না করিতে রাজী থাকেন, তবে

লাসায় পৌঁছিয়া আমি তাঁহাকে পঞ্চাশ টকা দিব। তিনি তাহাতে স্বীকার পাইলেন।

পরদিন ৭ই জুন, যাত্রা করা স্থির হইলেও দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বৃথা লোকের আশায় বসিয়া রহিলাম। পরে লোক পাওয়া গেল না এবং শেষে নিজের বোঝা নিজের পিঠে বাঁধিয়া, সঙ্গে কিছু শুকানো মাংস ও মাখন পাথেয় লইয়া দুইজনে পথে নামিয়া পড়িলাম। লঙ্কোর হইতে তিওরী চার-পাঁচ মাইল দূর, কিন্তু সেখানকার কেবলা যেন খুবই নিকটবর্তী দেখাইতেছিল, হয়ত হাওয়া পাতলা ও পরিষ্কার হওয়ায় এই ভ্রম হইতেছিল। যদিও এই অধিত্যকা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চে, তবুও নিম্নলি রৌদ্রের মধ্যে চলিতে বিশেষ গরম লাগিতেছিল। প্রান্তরে ঘাস স্থানে স্থানে কুশের মত গজাইয়াছে, সেখানে ভেড়া গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পশু ভিন্ন অনেক জড়লী গাধা ও কিয়াং দেখিলাম। এদিকের কুকুর খুব বড় ও হিংস্র, সেইজন্য আমি গ্রামে যাইতে ইতস্ততঃ করিতাম। রৌদ্রে চলিতে চলিতে পিপাসা পাওয়ায় স্মৃতি-প্রজ্ঞ ও চা খাইবার প্রস্তাব করিলেন। সামনেই ছোট ছোট ঘরে ভরা একটি গ্রাম দেখা গেল। সেখানকার এক গরীব বৃদ্ধ তাহার কুটারে আমাদের লইয়া গেল এবং চায়ের ব্যবস্থা করিল। বৃদ্ধ আমার সাথীর সঙ্গে অল্প কথার প্রসঙ্গে সঙ্-গে-ওপা-মে (অমিতাভ বুদ্ধ) সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। ভোটিয়েরা টশী-লামাকে অমিতাভ বুদ্ধের অবতার বলিয়া মানে, এইজন্য ইহাকে অমিতাভ বুদ্ধ নামেও ডাকে। সে যখন শুনিল যে তিনি চীনদেশে রহিয়াছেন ও ফিরিবার আশা নাই তখন সে অতি কাতরভাবে বলিল, “কি তিনি তিব্বত ছাড়িয়া গেলেন নাকি?” সাধারণ তিব্বতীদের মধ্যে এইরূপ সরলবিশ্বাসী অনেক আছে। ইতিমধ্যে অপরিচিত লোক দেখিয়া কুকুরের দল দ্বার ঘিরিয়া ফিরিতে লাগিল, গৃহপতি লাঠি লইয়া তাহাদের তাড়াইলেন।

চা পান করিতে করিতে স্মৃতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, “নিকটস্থ গ্রামের শেকর্ বিহারে চাষ চলিতেছে। সেখানকার প্রধান ভিক্ষু নম্-সে আমার পরিচিত, গেলে পরে পথের জন্ত কিছু মাংস ও মাখনের সংস্থান হইতে পারে এবং বোঝা বহিবার লোকও পাওয়া যাক্কে পাবে।” শেষের কথাটা আমার মনোমত ছিল, স্মৃতি-প্রজ্ঞ আমিও গে-লোও (ভিক্ষু) নম্-সের



লঙ্কোর-তিউরীর দৃশ্যাবলী

সঙ্গে দেখা করিতে রাজী হইলাম। চা-পানের পর আমরা ঐ মঠের দিকে চলিলাম, গ্রাম হইতেই তাহা দেখা যাইতেছিল। বেচারী বুদ্ধ আমাদের কুকুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত জলের ধার পর্য্যন্ত আসিল। মঠের চারিদিকেও কয়েকটা বড় কুকুর বাঁধা আছে দেখিয়া আমরা দূর হইতেই চীংকার করিয়া ডাকাজাকি করায় একজন লোক

বাহির হইয়া আসিল এবং কুকুরের মুখ হইতে আমাদের আগলাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। গে-লোঙ নম্-সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আগন্তুকদের দেখিয়াই বলিলেন, “এই যে! সোগ্-পো (মদোল) গে-লোঙ (ভিক্ষু) আসিয়াছেন।”

নীচে রন্ধনশালায় আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হইবার পর

আমাদের সামনে চা ও সন্তুর পাত্র রাখা হইল, আমার সন্তু তে রুটি ছিল না, কেবল চা পান করিলাম। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া দেখিলাম শেকর গুহার জায়গীরের আয়বায় হিসাব চলিয়াছে। মুনিম-মহাশয় হাড় ও প্রস্তরখণ্ড গুলিয়া রাখিতেছেন এবং পুনর্বার গুলিয়া সেগুলি পৃথক পৃথক পাত্রে সাজাইতেছেন। তাঁহার এই হিসাবের ধরণ আমাদের কাছে হাস্যকর ঠেকিতে পারে, কিন্তু আমাদের ঐক্যপ হিসাবের প্রণালী শিখিতে বেশ কিছুদিন লাগে, সন্দেহ নাই।

চা-পানের পর আমরা দ্বিতলে ভিক্ষু নম-সের নিকট গেলাম। তিনি পরম আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আজ বিশেষ পূজায় ব্যস্ত ছিলেন, পূজাকক্ষ মূর্তিতে ও তোমা-য় (সন্তু ও মাখনের নানাবর্ণ বলিপিণ্ড) সুসজ্জিত ছিল। তিনি আবার চা পান করিতে অমরোধ করায় সুন্দর গন্ধা-যমুনা (তাম্রের উপর রৌপ্য) থালের উপর আসল চীনা পেয়ালায় চা আসিল এবং আমরা গ্রহণ করিলাম।

আমার কক্ষে কজুরের পুস্তকাগার ছিল, সেখানকার এক প্রাচীন হস্তলিখিত কজুর আমি খুলিয়া দেখিতেছিলাম। এই মহামূল্য গ্রন্থ শতাব্দিক খণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহার এক-এক ওজন খণ্ডের দশ সেরের অধিক। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, “তোমাকে যদি এই পুস্তক দেওয়া হয়, তবে তুমি কি ইহা লইয়া যাইবে?” আমি বলিলাম, “অতি আনন্দের সহিত।”

সুমতি-প্রজ্ঞ প্রথম দিনই বলিয়াছিলেন যে, এই গ্রামে তাঁহার পূর্বপরিচিত বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং সেইজন্ত আমাকে দুই-এক দিন থাকিতে হইবে। পরদিন সেই কাজে তিনি বাহির হইলেন, আমি পুস্তক দেখা ও অল্পস্বল্প পড়ায় ব্যস্ত হইলাম। দ্বিপ্রহরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজই যাত্রা করিতে হইবে, স্মরণ্য সেই দিন ৮ই জুন দ্বিপ্রহরের পর আমরা দুই মাইল দূরে তিওরীর মুখে চলিলাম। সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, পুরানো জোঙ-পোন (জিলাধীশ) তাঁহার পরিচিত, স্মরণ্য তাঁহার গৃহেই থাকিবেন। আমি ইহাতে বাধা দিতে তিনি বলিলেন, “তোমার ভয় কিসের? এখানে কেহই তোমায় গ্য-গর-পা (ভারতীয়) বলিয়া চিনিবে না।” তিওরী পর্বতমালা হইতে বিচ্যুত একটি পর্বতশৃঙ্গের উপর একটি প্রাচীন কেলা বে-মেরামত অবস্থায় আছে যাহাতে এখনও কিছু সৈন্ত থাকে। এই পর্বতমূলেই তিওরী গ্রাম, গ্রামের আয়তন কুতী অপেক্ষা অধিক। এখানে নেপালী দোকান-পাট নাই, তবে পূর্বের চীনাদের সন্তানেরা এখনও কেহ কেহ এখানেই আছে। পুরানো জোঙ-পোনের গৃহ গ্রামের এক প্রান্তে, আমরা সেখানেই গেলাম। তিনি সুমতি-প্রজ্ঞকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার পিঠের বোঝা নামাইলেন, পরে তাঁহার চাকরেরা আমার বোঝাও নামাইয়া লইল। সেই অঙ্কনেই গালিচা বিছানো হইল, সঙ্গে

সঙ্গে গরম চায়ের পাত্র ও ছুরি স্বস্তি শুকানো মাংসও হাজির হইল। আমার সম্বন্ধে জোঙ-পোন মহাশয় কেবলমাত্র এই প্রশ্ন করিলেন, “ইনি ত লদা-পা (লদাখ-বাসী) না?” এই বলিয়া তিনি নিজের হাতে শুকানো মাংস কাটিয়া দিতে লাগিলেন। আমি সে মাংস খাইতে অসম্মত হওয়ায় সুমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, “ও সব মাংস দেশ থেকে এসেছে, লদাখে সিদ্ধ না করিয়া (অর্থাৎ না রাঁধিয়া) মাংস খাওয়া হয় না।” মাংস খাওয়া শেষ হইতে হইতে নতুন জোঙ-পোন মহাশয় আসিলেন এবং তাঁহার জন্ত রূপার পাত্রে মদ আনা হইল। আমার সম্বন্ধে কি করিয়া সন্দেহ হইতে পারিত যে আমি সেই ভারতীয়দের দলে যাহাদের অনেক বন্ধুবান্ধব ভোটদিয়দের আতিথ্যের অসদ্যবহার এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরেজদের নিকট তিব্বতের গুপ্ত রাজনৈতিক ব্যাপার সকল ব্যক্ত করিয়াছিল? যে কারণে এখন ভোটদিয়দের সর্বদাই তাহাদের নিকট সর্কোপেক্ষা পবিত্র ভূমির অধিবাসীদের সম্বন্ধে আশঙ্কিত ও সন্দেহ হইয়া থাকিতে হয়।

আমাদের গৃহস্থামী বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পেয়ালার পর পেয়ালা চলিতে লাগিল। লোকে বলে, “কারণ”ই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্নীসহ বীণা বাজাইতে বাজাইতে মিত্রগোষ্ঠীমিলনে চলিলেন, চাকরদের উপর আমাদের ভোজন শয়নের ব্যবস্থা করার আদেশ হইল। আমার শয়নস্থল পাকশালাতেই নির্দিষ্ট হইল, সেখানকার তত্তাবধান এক অনীর (ভিক্ষুণী) উপর অর্পিত ছিল। ভোটদেশে পরিবারের সকল ভাই মিলিয়া এক পত্নী গ্রহণ করাই প্রথা, এই জন্ত সকল স্ত্রীলোকের বিবাহ সম্ভব নহে এবং অবিবাহিতাদের মধ্যে অনেকে চুল কাটাওয়া অনী হইয়া, হয় মঠে আশ্রয় লয়, নয় ঘরে থাকিয়া যায়। আমাদের এই অনী সাক্ষাৎ মহাকালী ছিল, শরীরের উপর এত পুরু কাল কাজলের স্তর ইহার পূর্বেও আমি কাহারও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই। ঐ কালো মুখমণ্ডলে চক্ষুর স্বেত পরিবেষ্টিত রক্তাভ দৃশ্য বর্ণনার অতীত। দেখিলাম থুকপা-পাকের সময় হাতায় করিয়া নিজের হাতে তাহা ঢালিয়া সে লবণ পরীক্ষার জন্ত চাখিয়া দেখিল, এবং তাহার পরই পরনের চোগায় হাত মুছিল! এইমাত্র রক্ষা যে, তিব্বতে ভোজনসামগ্রীর দেওয়া-নেওয়া বা তৈয়ারী করা সবই হাতা-চামচে চলে, হাতে ছোঁওয়ার ব্যাপার খুবই কম।

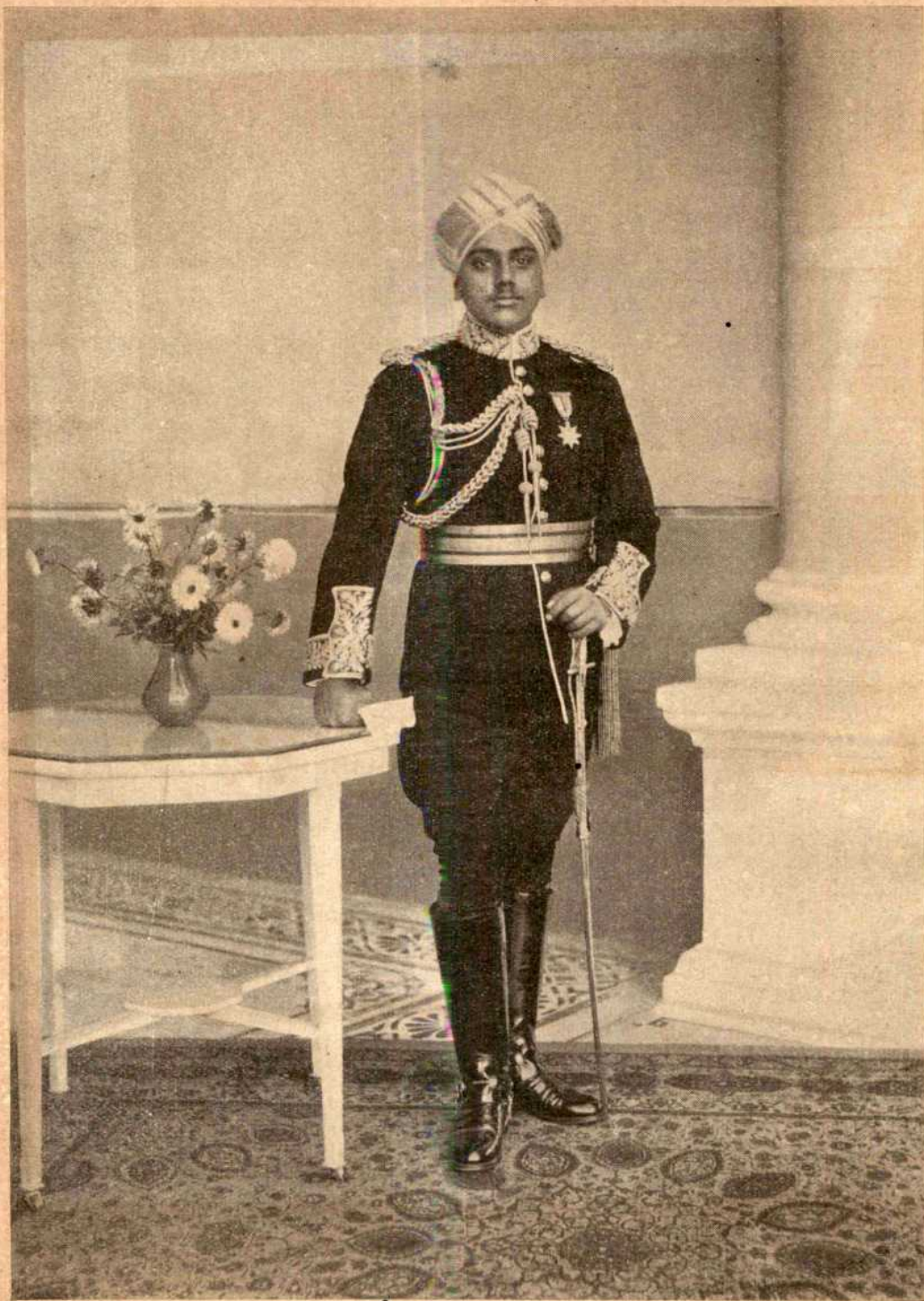
থুকপা-চা পানভোজনে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তত ক্ষণ গৃহস্থামী বীণা বাজাইতে বাজাইতে ফিরিয়া আমাদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। সুমতি-প্রজ্ঞ কথায়-কথায় লাসা যাইতে বলায় তিনি বলিলেন “কি করি, চাম (চাম-কুশোক=উচ্চশ্রেণীর মহিলা) যাইতে রাজী নহেন।” পরে কিন্তু আমি লাসায় থাকিতে থাকিতেই এই

দম্পতি ভোঁটায় নববর্ষের সময় লাসায় গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা ছিলেন সাধারণ পরিচ্ছদে, কেননা লাসায় অনেকেই রাজপুরুষের লোলুপদৃষ্টির ভয়ে নিজ অবস্থার কম চালে থাকেন—এবং আমি ছিলাম লাল রেশমে মোড়া পোস্তিন (বহুমূল্য পশমযুক্ত চর্মের পোষাক) ও বুট পরিহিত। পরস্পরকে চিনিবার পর তিনি আমাকে লদাখী বলিয়া সম্বোধন করায় আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলি এবং তাঁহার আতিথ্যের জন্ত বহু ধন্যবাদ দিই। এই ভূতপূর্ব জোঙপোন মহাশয় অনেক খচ্চরের মালিক এবং সেগুলির সাহায্যে কুতী ও লাসার মধ্যে মাল সরবরাহের ব্যাপারে নিযুক্ত। পরদিন আমরা যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে তিনি আমাদের আরও দু-চার দিন থাকিতে অছরোধ করিলেন। আমরা রাজী না-হওয়ায় তিনি পাথের রূপে চা, সন্তু, মাংস চর্বি ও মাখন ইত্যাদি দিলেন। ভারবাহী পাওয়া গেল না, সুতরাং প্রাতরাশের পর বোঝা নিজের পিঠে বাঁধিয়া রওয়ানা হইতে হইল; রক্ষা এই যে পথে চড়াই ছিল না।

আমরা ফুঙ নদীর দক্ষিণ কিনারা ধরিয়া পূর্বদিকে চলিতেছিলাম, সেদিকে আশপাশের পাহাড়গুলি খুবই ছোট ছোট। কয়েক ঘণ্টা চলিবার পর নদীর বামদিকে শিব-রীর পাহাড় দেখা গেল। তিব্বতের অধিকাংশ পাহাড় মাটিতে ঢাকা, কিন্তু এই পাহাড় প্রান্তরময়, এই বৈশিষ্ট্যের জন্ত কিয়দন্তী আছে যে, এই পাহাড় গ্যা-গর (ভারত) দেশীয়, এবং সেইজন্য ইহা লোকচক্ষুতে অতি পবিত্র। এখন ইহার পরিক্রমার সময়, সুতরাং অনেক যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া পরিক্রমা করিতেছে। এখানকার পরিক্রমায় (পথে) চিত্রকূটের মত স্থানে স্থানে অনেক মন্দির আছে। আমরা আটটায় যাত্রারন্ত করিয়া দ্বিপ্রহরে গ্রামে পৌঁছিলাম এবং তৎক্ষণাৎ চা-পানের যোগাড় করিলাম। একে তো পথশ্রান্ত ছিলাম তাহার উপরন্তু চা-পানে ও গল্পে অনেক দেবী হইয়া গেল এবং ইহাও শুনিলাম যে পরের গ্রাম বহু দূর। এই কারণে আমরা সেখানেই থাকা স্থির করিলাম কিন্তু সন্ধ্যার সময় গৃহস্থানী জানাইল যে তাহার ঘরে স্থানের অভাব। সে গ্রামের মধ্যে অত্যা এক বাড়ীতে আমাদের পাঠাইয়া দিল, সেখানে মাত্র দুইটি কক্ষ। একটিতে এক ভিখারী রোগশয্যা পড়িয়াছিল, সুতরাং অল্পটিতে আমরা আশ্রয় লইলাম। অন্ধকার হইবার মুখে স্মৃতি-প্রজ্ঞ বলিলেন, “আমাদের এখানে থাকা ভাল নয়; এ-গ্রাম চোরে ভর্তি, সুতরাং রাত্রে টাকাকড়ির লোভে আমাদের উপর আক্রমণ

হইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব যে এই কারণেই আমাদের এখানে চালান করা হইয়াছে। আমি এ-কথায় আপত্তি না করিয়া স্মৃতি-প্রজ্ঞের সঙ্গে গিয়া গ্রামের মধ্যে এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় লইলাম। সেই গৃহে আরও দুইজন অতিথি ছিলেন। তাঁহারা শিব-রী পরিক্রমা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছিলেন। এবার খুব ভীড়, তাঁহাদের কাছে এই কথা শুনিয়া স্মৃতি-প্রজ্ঞের মনও পরিক্রমার জন্ত উন্মুখ হইতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, “এইবার সোজা লাসায় চলুন, সামনের বৎসরে আমরা দুইজনেই নিশ্চিন্তমনে পরিক্রমা করিতে আসিব।” সেই সঙ্গে আমি আগন্তুকদের একজনকে কিছু পরমা দিয়া বলিলাম যে তাহা যেন আমাদের তরফে শিব-রী রেন-পো-সে-তে নিবেদন করা হয়। এই গ্রামে একটি অতি সুন্দর পিস্তলের বজ্রযোগিনী মূর্তি দেখিলাম, শুনিলাম ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, যখন লোকে চারি দিকে পলাইতেছিল, এই গ্রামবাসী কোন ভোঁটায় সিপাহী ইহা লুট করিয়া আনে। বস্তুতঃ ঐ যুদ্ধে ইংরেজের সেনা অপেক্ষা ভোঁটায় সেনাই বেশী লুটপাট করিয়াছিল।

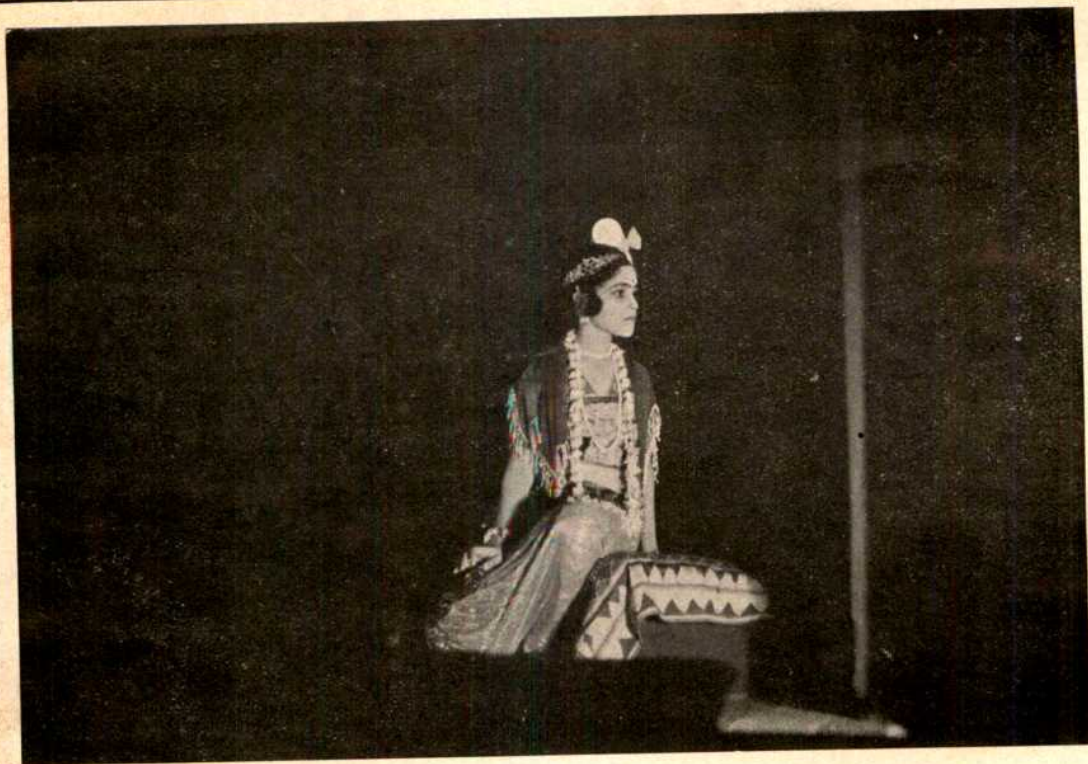
পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া হইয়া আমরা দশটার সময় সম্মুখস্থ গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে প্রথম যে-গৃহে গেলাম তাহা স্মৃতি-প্রজ্ঞের পছন্দ না-হওয়ায় তাহার পরিচিত লোকের ঘরে বাইতে হইল। এই গ্রামে অনেক বড় বড় কুকুর ছিল এবং যেখানে আমরা আশ্রয় লইলাম সেখানে এক বিশালকায় কালো কুকুর দ্বারে বাধা ছিল। আমাদের সঙ্গে এক বালক আগে আগে পথ দেখাইয়া বাইতেছিল তাহার পর স্মৃতি-প্রজ্ঞ এবং শেষে আমি ছিলাম। আমাদের দেখিবামাত্র কুকুরটা ডাকাডাকি ও লাফালাফি আরম্ভ করিল, কাছে বাইতে সে ঝটকা দিবা শিকল ছিঁড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্মৃতি-প্রজ্ঞ অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিতে গেল, ইতিমধ্যে বাড়ীর লোকজন আসিয়া পড়ায় তিনি রক্ষা পাইলেন। শিকল ছিঁড়িয়াছে দেখিয়া বালক ও আমি বাহিরে পলায়ন করিলাম, পরে ঘরের লোকজন আসিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেল। আমাদের পলায়নে স্মৃতি-প্রজ্ঞ অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন বটে—এবং বিরক্ত হওয়ার কারণও যথেষ্ট ছিল—কিন্তু তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল যে তিনি চৌদ্দ বৎসর ভোটদেশে থাকায় কুকুর সন্ধ্যাে নির্ভয়তা পাইয়া ছেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, দেহের অল্পপাতে কুকুরের সাহস বা তেজ হয় না।



গোয়ালিয়রের নবাভিষিক্ত মহারাজা জিয়াজী রাও শিন্দে .



শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক কলিকাতা আশুতোষ হলে “পরিশোধ” নৃত্যাভিনয়ে অভিনয়মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ
[শ্রীরামনারায়ণ সিন্ধুকর্তৃক গৃহীত চিত্র ও তাঁহার সৌজন্তে মুদ্রিত]



শ্রীমা : “কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি...এমন করে কি ওকে বাঁধে ?”



বজ্রসেন : “অত্যাশ্রয় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে নই আমি নই চোর ।”
[শ্রীরামনারায়ণ সিং কর্তৃক গৃহীত চিত্র ও তাঁহার সৌজন্তে মুদ্রিত]

রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত “লেখন”

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

কবিতা, গল্প, প্রবন্ধলেখা এবং দেশের দাবী মেটাবার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছে স্ব-লেখন (autograph) সেবার যে দাবী আসে প্রতিদিন, তাকে নেহাৎ ছোট বঁলে উপেক্ষা করা চলে না। শুধু স্বাক্ষর দিয়ে তাঁর নিষ্কৃতি নেই, সেই সঙ্গে কবিতাও চাই ছুঁচার লাইন। এই ছুরন্ত দাবীর ফলে কত ছোট ছোট কবিতা যে রচিত হয়েছে, তার কোন হিসেবই নেই। তার মধ্যে মাত্র কতকগুলি “লেখন” নামক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। “লেখন”র ভূমিকায় কবি বলেছেন—

“পাখার কাগজে কুমালে কিছু লিখে দেবার জন্যে লোকের অনুরোধে এর উপস্থিতি। তার পরে স্বদেশে ও অন্ত দেশেও তাগিদ পেরেছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলো জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতেব অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে কেন, ক্রতলিখিত ভাবের মধ্যেও থরা পড়ে।”

এই “ক্রতলিখিত ভাব”গুলি বাংলা-সাহিত্যে প্রথম উপভোগ্য বস্তু হিসাবে চিরকাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।

বড় বড় ঘটনার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর সামান্য ব্যাপারে অনেক সময়ই লোকের চরিত্র বেশী প্রস্ফুট হয়। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সামান্যকে সামান্য বঁলে তুচ্ছ করা যায় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই কথাটি প্রযোজ্য। কবির নিজের ভাষায় বলতে গেলে, “স্বল্প সেও স্বল্প নয় বড়েকে ফেলে ছেয়ে”। রসসৃষ্টির জন্য সব সময়ই যে বৃহৎ আয়োজন করতে হয়, এমন নয়, ইতস্তত-ছড়ানো টুকরো লেখতে “ক্রতলিখিত ভাবে”র ভিতর দিয়েও কবি আপনার সম্পদ পরিচয় রেখে যান। রবীন্দ্রনাথের ছোট লেখাগুলি পড়লেই এর সত্যতা দৃষ্টব্য হয়।

এই ছোট ছোট কবিতাগুলির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য এদের এত ভাল লাগে। এখানে আটসাঁট বাধুনি, কথার সর্বাঙ্গ সীমার মধ্যে ভাববিস্তারের সুযোগ একেবারে

নেই বললেই চলে। সকল রকম বাহ্যিক অলঙ্কার আড়ম্বরের লোভ পরিপূর্ণভাবে বর্জন করে অত্যন্ত সংক্ষেপে শুধু মর্মগত রসটি দেখা চাই। এইরূপ বহনের মধ্যে লেখককে সফল হতে হলে তাঁর অত্যন্ত পাকা হাত, সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং গভীর অনুভূতি থাকা চাই, নতুবা রচনাগুলি শুধু তদ্ব্যবহার ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা। রবীন্দ্রনাথের লেখনগুলি যে এই পর্ধ্যায়ে পড়েন, সে-কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না, ব্রহ্ম দিয়েই অনুভব করা যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে, কবিতাগুলির মধ্যে একটি অপূর্ব ব্যঙ্গনা আছে। কথা তার সীমাকে অত্যন্ত সহজে ছাড়িয়ে গেছে, পড়লেই মনে হয় যে যা বলা হয়েছে, আসলে যেন বলা হ’ল তার চেয়ে অনেক বেশী।

মিলন নিশীথে ধরনী ভাবিছে

চাঁদের কমন ভাষা,

কোনো কথা নাই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

তিন লাইনের ছোট একটি কবিতা, কিন্তু এর গুটিকয়েক কথা আমাদের মনে যে-ছবি এঁকে দেয়, তার সৌন্দর্য্য এবং অন্তর্লীন ভাবাবেগের যেন আর শেষ নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে আজ পর্যন্ত কত জামগায় কত লোকের অটোগ্রাফের খাতায় এই ধরণের কত ছোট ছোট কবিতা যে লিখে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সে-গুলিকে একত্র সংগ্রহ করতে পানলে নিঃসন্দেহ সকলেরই উপভোগ্য হ’ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, “লেখন” প্রকাশ ছাড়া এরূপ প্রচেষ্টা আর কখনও হয় নি। সম্প্রতি এই জাতীয় তাঁর কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, পাঠকবর্গকে তারই পরিচয় দিতে চাই।

খাতনামা ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ও লেখন সংগ্রহ করে অটোগ্রাফের খাতা বোবাই করা ইদানীং একটা নেশাও সংস্কারগত অভ্যাসের মত অনেকের কাছে দাঁড়িয়ে গেছে।

কথার মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের এই দীন প্রার্থনা যে কবিচিত্তকে
স্পর্শ কবেছে, তার পরিচয় পাই অনেক জায়গায়—
নামাবলীর খাতা তোমার বচন জড়ো করে,
স্বাক্ষরিতের কোন্ পরিচয় থাকে তাদের মাঝে ।
অলস হাওয়ায় অশোক ফুলেব পাপড়ি ধুলায় ঝরে,
তাই কুড়িয়ে লাগাও কেন সাজি ভরার কাছে ।

শুধু অক্ষব ডোরে
নাম কি রাখিব ধ'রে,
নামজাদা হব খাতার পাতায়,
কে রবে সে আশা ক'রে ?

বাজে কথার মুষ্টিদানেব লাগি
কেন সবার দ্বারে বেড়াও মাগি ।

লেখা আসে দলে দলে, বসে তার মেলা
কেহ আসে, কেহ যায়, কেহ করে খেলা ।
আখরেতে বাসা বাঁধে ভাষা দিয়ে গাঁথা ।
যে লেখে সে কোথা থাকে পড়ে থাকে খাতা ।

বাজে কথার ঝুলি,
যতই কেন ভর্ত্তি কর
ধুলিতে হয় ধুলি ।

রেখে দেবার নয় যা তারে রাখো
তা নিয়ে মিছে আমারে কেন ডাকো ।
খাতাব পাতে আমার নাম ধরে
বাঁধিতে চাও ক্ষৌণ স্মরণ-ডোরে ।

এই খাতাখানা নামের ভিড়ের মাঝে
পাতে অঞ্জলি অক্ষর ভিক্ষার
এ নিরর্থক সঞ্চয়নের কাজে
জমা করিতেছে কেন এত খিঙ্কার !

নানা লোকের নানা নামের
নানা লেখার মধ্যে
আমার লেখার কবর দিলেম
ছুই লাইনের পত্তে ।

খাতার পাতায় নামের বিষম ভিড়,
সেখা কোথা পাবো নামের নিভৃত নীড় ।

হেমস্তের শুকপাতা
বসন্তে কি দেয়না উড়ায়ে
ঝরে-পড়া বাক্য যত
রাখিবে কি খাতায় কুড়ায়ে ?

ব্যর্থ আবর্জনার তরে
লোভ রাখিতে নাই
তুচ্ছ যাহা তাহার ভিড়ে
সত্য না পায় ঠাই ।

কথা কুড়িয়ে খাতার পাতা ভরা
সত্য নিয়ে এ শুধু খেলা করা ।

নিতেছ কুড়িয়ে যা'-তা',
কথার আবর্জনায় কেবলি
ভরিয়ে তুলিছ খাতা,
এ কেমন খেলা হোলো,
বুদ্বুদুলো জড়ো ক'রে ক'রে
ফেনা উচু ক'রে তোলো ।

জীবনপথের তরুণ যাত্রী যখন এসে কাছে দাঁড়াষ, তখন
কবির মনে পড়ে যায়, আজ তিনি জীবনের সায়াছে উপনীত,
এই মাটির বাসার ভিত্তি তাঁর ভাঙছে, সেতারে যে স্বর
ধরেছিলেন, আজ তা থেমেছে শমে এসে—

তুমি বাঁধছ নূতন বাসা,
আমার ভাঙছে ভিৎ,
তুমি খুঁজছ লড়াই, আমার
মিটেছে হার জিৎ ।

তুমি বাঁধছ সেতারে তার,
থামছি শমে এসে ।

চক্ররেখা পূর্ণ হোলো
আরম্ভে আর শেষে ।

এই লেখনগুলি যারা দাবী করে, তাদের নাম বা নামের
অর্থ থেকে কতকগুলির উৎপত্তি—

হৃদয়ে লতায়ে আছে
নীরব মিনতি
ফুটাক পুজার ফুলে
করণ বিনতি ।

নিরুত্তম অবকাশ শূন্য শুধু
শান্তি তাহা নয়,
যে কর্মে রয়েছে সত্য
তাহাতে শান্তির পরিচয় ।

জীবন-দেবতা তব হে গো রী, তোমার দেহে মনে
আপন পুজার ফুল আপনি ফুটাক সযতনে ।
মাধুর্য্যে সৌরভে তারি দিবারাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি, এই আমি আশীর্ব্বাদ করি ।

ঋণ হ'ল বটে শ্রাস্ত
পাণ্ডুর কুশ মেঘ ক্লাস্ত,
বন ছেড়ে মনে এল নীপ-রেণু-গন্ধ
অধিকার ক'রে নিল কবিতার হৃদ ।

আপনারে নিবেদন সত্য হয়ে পূর্ণ হয় যবে
সুন্দর তখন মুক্তি লভে ।

মাধবী নিজেই দেয় রূপে, গন্ধে, বর্ণ-মহিমায়,
নিজেই সুন্দর ক'রে পায় ।

রবির প্রথম স্বাক্ষর-করা বাণী
পূর্ব গগনে অরুণ দিয়াছে আনি ।
সোনার আভাসে তরুণ প্রাণের আশা
প্রভাত আকাশে প্রকাশিল তার ভাষা ।

তপনের অরুণ সারথি
শুভ্র দীপ্ত-পারাবারে
লুপ্ত করে আপন-রে
শেষ করি উবার আঁরতি ।

যা পায় সকলি জমা করে,
প্রাণে এ লীলা রাত্রিদিন
কালের তাণ্ডবলীলাভরে
সমলি শূন্যেতে হয় লীন ।

শান্তা, তুমি শান্তি ন'শেষ ভয় দেখালে মোরে,
সই-করা নাম করবে আদায় ঝগড়া করার জোরে ?
এই তো দেখি বঁটি হাতে শিউলিতলায় যাওয়া
আপনি যে ফুল ঝরিয়ে দিল শরৎপ্রাতের হাওয়া ।

শান্তা নামক উপরিউক্ত মেয়েটি কবিকে ভয় দেখিয়ে
চিঠি লিখেছিল যে, অটোগ্রাফ না দিলে সে তাঁর সঙ্গে
ঝগড়া করবে । শান্তিপ্রিয় ভীকু কবির বশত-স্বীকারে
কাহিনী চিরবালের মত মুদ্রিত হয়ে রইল শান্তা নামক বাংলা
দেশের একটি মেয়ের খাতায় ।

কৌতুহলে লেখা একটি ছোট্ট কবিতা—

নাম কালো লেখা নাই অজানা খাতায়,
মোর নাম লিখিলাম তাহারি পাতায় ।

আশীর্ব্বাদী কবিতাগুলির যে মহান গাভীর
গভীরতা, তা অতুলনীয়—

অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হ'তে প্রতিক্ষণে করিয়ো মার্জনা।

জীবনে তব প্রভাত এল নব অরুণ-কান্তি,
তোমারে ঘেরি মেলিয়া থাক শিশিরে ধোওয়া শান্তি।
মাধুরী তব মধ্যদিনে শক্তিরূপ ধরি
কর্মপটু কল্যাণের করুক দূর ক্লান্তি।

আলো নবজীবনের নির্মল দীপিকা,
মর্ত্যের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা।
আঁধার গহনে রচো আলোকের বীথিকা,
কল-কোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা।

ভজন-মন্দিবে তব পূজা যেন নাহি রয় থেমে,
মাহুযে কোরো না অপমান।
যে ঈশ্বরে ভক্তি কর হে সাধক, মাহুযের প্রেমে
তাঁরি প্রেম করো সপ্রমাণ।

বাহিরের আশীর্বাদ কি আনিব আমি
অন্তরের আশীর্বাদ দিন অন্তর্যামী
পথিকের কথাগুলি
লভিবে পথের ধূলি
জ্বল করিবে পূর্ণ জীবনের স্বামী।

জন্মদিনে লিখে দিয়েছিলেন দু-জনকে—
জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য,
রূপ মহিমায় হোলো মহীয়ান সূর্য্য তারার তুল্য।
দূর আকাশের পথ যে আলোক এনেছে ধবার বক্ষ
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখে তোমারে বেঁধেছে
সখ্যে,
দূর যুগ হ'তে আসে কত বাণী ক'লেব পথের যাত্রী,
সে মহাবাহীরে লয় সম্মানী তোমার দিবস-রাত্রি।

জন্মদিনে রহিল নাম লেখা,
মৃত্যুপটে রবে কি তার রেখা?

কবিতার অর্থ পেয়ে উৎসারিত হইছিল দুটি কবিতা—
আমার আপন ভালো লাগায়
রচি আমার গান,
তুমি দিলে তোমার আপন
ভালো লাগাব দান।
মোর আনন্দ এমনি ক'রে
নিলে আঁচল পেতে
তোমার আনন্দেতে।

সঙ্গীতের বাণীপথে
ছন্দে গাঁথা তব নমস্কৃতি
জাগাল অস্তবে মোব
প্রেমরসে অভিবিক্ত গীতি।
বসন্তে কোকিল গাহে
অলঙ্কিত কোন্ তরুশাখে
দূর অরণ্যের পিক
সেই সুরে তারে ফিরে ডাকে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে, তাব আনন্দ
এব. সৌন্দর্য্যেব বিচিত্র প্রকাশকে যে অস্তবেব সঙ্গে কত
ভাববাসেন, তার অঙ্গস প্রমাণ “স্বর্গ হইতে বিদায়” প্রভৃতি
বড় বড় কবিতাতে আছে, কিন্তু এখানেও সে পরিচয়ের
অভাব নেই—

সময় আসন্ন হোলে
আমি যাব চলে,
হৃদয় রহিল এই শিশু চারাগাছে
এর ফুলে, এর কচি পল্লবের নাচে
অনাগত বসন্তেব আনন্দের আশা রাখিলাম,
আমি হেথা নাই থাকিলাম।

যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে
স্বর্গের হারে আঁকা,
আমি ভালবাসি মাটির ধরায়
প্রজাপতিটির পাখা।

প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তাবোধ কবি
রবীন্দ্রনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টিতে যা অতি-
সাধারণ একটি নৈসর্গিক ঘটনা, তাকে তিনি এমন সুন্দরভাবে
ফুটিয়ে তোলেন যে, মনে হয়, তার মর্মকথা, তার অন্তর্নিহিত
রহস্য সব ধরা পড়ে গেল। প্রকৃতির গোপন কক্ষে যে-সব
রসের খেলা চলেছে, তিনি ইসারায তার ইঙ্গিতটুকু দিয়ে
যান—

হাসিমুখে শুকতারার লিখে গেল ভোররাতে
আলোকের আগমনী আঁধারের শেষপাতে।

কহিল তারা জ্বালিব আলোখানি
আঁধার দূর হবে না-হবে,
সে আমি নাহি জানি।

এগুলি ছাড়া মহুগুজীবনের নানা গভীর তরঙ্গ অভ্যন্তর
সহজে ছুঁচার লাইনে ফুটিয়ে তোলাব দৃষ্টান্তও আছে—

বাহির হ’তে বহিয়া আনি সুখের উপাদান,
আপনা মাঝে আনন্দের আপনি সমাধান।

বাতাসে নিবিলে দীপ
দেখা যায় তারা,
আঁধারেও পাই তবে
পথের কিনারা।
সুখ-অবসানে আসে
সন্তোষের সীমা,
ছুখ তবে এনে দেয়
শান্তির মহিমা।

যে আঁধারে ভাইকে দেখিতে নাহি পায়
সে আঁধারে অন্ধ নাহি দেখে আপনায়।

The darkness which conceals
the other's face
Conceals one's own true self.

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম ভেঁ
লিখে নাহি রাখে।

কি পাই কি জমা বরি
কি দেবে, কে দেবে,
দিন মিছে কেটে যায়
এই ভেবে ভেবে।
চলে ত যেতেই হবে,
কি যে দিয়ে যব,
বিদায় নেবার আগে
এই কথা ভাবে।

যা রাখি আমার তরে, মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।

আজ গড়ি খেলাঘর কাল ভারে ভুলি,
খুলিতে যে লীলা তারে মুহূর্ত দেয় খুলি।

জীবন সংযত করে যা তাহার শ্রেয়
মরণেরে পার হবে এই নে পাথর।

লেখনগুলির ব্যঙ্গনা-শক্তি বখ পূর্বে বলেছি। এখানে
তার একটি অতুলনীয় নিদর্শন রয়েছে—

দিল কাঁকি,
তবু রাখি আশা,
গেল পাখি,
তবু বাকি বাসা।

বহিয়া কথার ভার চলেছি কোথায়,
পথে পথে খঁসে পড়ে হেথায় হোথায়,
পথিকেরা কিছু কিছু লয় তাহা তুলি
বাকি কত পড়ে থাকে, লয় তাহা ধুলি।

কবির চির-নবীন অন্তরে বারুক্যেব স্ববিরতা কোন দিন
ছায়াপাত কবতে পাবে নি। কিন্তু এই “নবীন” যে ধ্রুব,
প্রশান্ত এবং সংযত, ক্ষণস্থায়ী “নূতনে”র উদ্গাদনা তাতে নেই,
একটি ছোট্ট কবিতাতে তা পরিষ্কৃত হয়েছে—

নূতন সে পলে পলে অতীতে বিলীন,
যুগে যুগে বর্তমান সেই ত নবীন।
তৃষ্ণা বাড়াইয়া তোলে নূতনের সুরা,
নবীনের চির-মুখা তৃপ্তি করে পুরা।

রূপে ও অরূপে গাঁথা এই ভুবনের আঙিনায় যেখানে হবি
ও গানের নিত্য কানাকানি চলেছে, কবি সেখানে বসে
আছেন কোন্‌ ধ্যানে মগ্ন হয়ে, ছন্দের সঙ্গীতে তিনি কোন্‌
গোপন কথাটি ঝঙ্কৃত করে তুলতে চান, তার আভাস পাই
আমরা কয়েকটি কবিতায়—

রূপে ও অরূপে গাঁথা এ ভুবন খানি
ভাবে তারে সুর দেয়, সত্য দেয় বাণী।
এসো মাঝখানে তার,
আনো ধ্যান আপনার
ছবিতে গানেতে যেথা নিত্য কানাকানি।

আকাশে বাতাসে ভাসে, অতলের নির্জনে নির্বাকে
গুপ্ত রহে, পাই নাকো ছুঁতে,
ছন্দের সঙ্গীতে তারে ধরিবারে কবি বঁসে থাকে
ধরা যাহা দেয় না কিছুতে।

ক্লান্ত মোর লেখনীর এই শেষ আশা
নীরবের ধ্যানে তার ডুবে যাবে ভাষা।

প্রকাশ যখন সফলতায় সার্থক, তখন তা সহজেই আমাদের
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার প্রারম্ভ থাকে ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ,
কিন্তু পূর্ণতাব জগৎ যে অশান্ত ক্রন্দন তার বৃকে গোপনে
উচ্ছ্বসিত, কবি তাকে আপন মনে অনুভব করতে চান, যদিও
আমাদের মনোযোগ সহজে সেদিকে যায় না। ধরণীর আনন্দ
ও প্রাণের উৎস সঞ্চিত আছে স্থধ্যালোকে, রবির আশীর্বাদ
কুঁড়িকে ফোটায় ফুলে, অক্ষুরকে উদ্‌বাটিত করে বনস্পতিরূপে।
কবি রবীন্দ্রনাথও কি তাঁর আকাশের মিতার মত আপন
অসীম অল্পভূতির আলোক ও জীবনীশক্তি দিয়ে মাহুষের
প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তার উদ্ভিন্ন শতদলে বিকশিত
করে তুলতে চান?

যে ফুল এখনো কুঁড়ি
তারি জন্মশাখে
রবি নিজ আশীর্বাদ
প্রতিদিন রাখে।

এখনো অক্ষুর যাহা
তারি পথপানে
প্রত্যহ প্রভাতে রবি
আশীর্বাদ আনে।

ফুলের কলিকা প্রভাত-রবির
প্রসাদ করিছে লাভ,
কবে হবে তার হৃদয় ভরিয়া
ফলের আবির্ভাব।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা শুষ্ক হয়ে ছিল রাত্রি দিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতে বাক্যহীন শুভ্রতায় লীন
সে তুমার নিখরীণী রবিকরস্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিছে অস্তুহীন আনন্দের গীতা।

কল্লোল-মুখর দিন ধায় রাত্রিপানে
উচ্ছল নিব্বার চলে সিঙ্কুর সন্ধানে।
বসন্তে অশান্ত ফুল পেতে চায় ফল
স্তব্ধ পূর্ণতার পানে চলিছে চঞ্চল।

নীতিজ্ঞ বলুন ভালো, গালি বা পাড়ুন,
লক্ষ্মী যবে আসুন বা যথেষ্টা ছাড়ুন,
মৃত্যু চেপে ধরে যদি অথবা পাসরে
শ্রাব্য পথ হতে ধীর এক পা না সরে।

খেয়াল হ'লে কবি যে আবার অন্তরে কবিতা অনুবাদ
করতেও বসেন, তাব ছুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করা
যাক—

“নিন্দিত নীতিনিপুণ যদি বা স্ববস্ত
লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্ত যুগান্তরে বা
শ্রাব্য পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।”

একটি কবাসী কবিতার অনুবাদ—

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

[রবীন্দ্রনাথের এইরূপ লেখন-সংগ্রহ বাঁহাধের নিকট আছে তাঁহার
আমাদের নিকট তাহা পাঠাইলে উহা সাংগ্রে প্রবাসীতে মুদ্রিত হইবে—
প্রবাসীর সম্পাদক]

সুচাঁদ ডাক্তারের বিভূতি

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

ডাক্তার সুচাঁদ অধিকারী থানা লোক, থানা ডাক্তার; যেমন
তাঁর রোগলক্ষণজ্ঞান, তেমনই তাঁর হাতযশ; তাঁর উপর,
মিষ্টমুখে কথা বলা তাঁর এমনই স্বভাবগত রুচি যে, মাছুষ
তৃপ্ত না হইয়া পারে না—এই গুণের জন্তই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি
তাঁহাকে দেখিলেই রোগ-যন্ত্রণার মাঝেও ঋণিক আশ্রয়
পায়। তবে ডিজিট তাঁর চার টাকা—গোফ পাকিতেই
এক টাকা পড়িতেই তিনি ডিজিট বাড়াইয়া ডবল করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহাকে আমাদের কর্মক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ করিবাব পূর্বে
তাঁর মত লোকের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হইবার হেতুটা জানান
চাই।

পুনর্ব্বহু সোমের বাবা জন্মেজয় সোম সন্ধ্যার পর হঠাৎ
শয্যাগ্রহণ করিলেন। সেদিন অক্ষয়তৃতীয়া—অত্যন্ত শুভ-
দিন। কয়েক স্থানে তাঁর শুভ হালখাতার নিমন্ত্রণ ছিল।
টানাটানিব সংসারে ধারকর্জ্ব হয়ই—হাত পাতিয়া নগদ না
হোক, কাপড়ের দোকানে, বাসনের দোকানে, গহনার দোকানে

হয়ই। লাল বড়ব পোষ্টকার্ডে ছাপান নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া
জন্মেজয় বৎ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন না, খাতার বাকির
পরিমাণের ষে-উল্লেখ কালো কালিতে করা ছিল সেই দিকে
খানিক চাহিয়া থাকিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ
করিলেন। কিন্তু হালখাতার নিমন্ত্রণ পাইলে দোকানে
উপস্থিত হইয়া কিছু দিতেই হইবে—ইহাই পদ্ধতি, এবং দেনা-
দারের ধর্ম্মাস্তর্গত কর্তব্য। স্বতবাং পুঞ্জির ভিতর হইতে
তিনি টাকা—পুঞ্জির বহুৎ একটা অংশ—তুলিয়া লইয়া
জন্মেজয় সন্ধ্যার পূর্বেই রওনা হইলেন... দোকানে বসিয়া
বিস্তর সদালাপ মুখে করিলেন এবং কানে শুনিলেন—
হাসিলেনও; অবশেষে কিছু জলযোগও করিলেন—

এবং সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া শয্যাগ্রহণেব পূর্বে ক্লান্ত
ভাবে বলিলেন,—শরীরটা ভাল নেই; আমি শুলাম।
রায়ে কিছু খাব না।

জন্মেজয়ের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—একটু দুধ—
—উঁ হঁ। বলিয়া জন্মেজয় গিয়া শয়ন করিলেন।

“শরীর ভাল নেই”—বলিয়া শয্যাগ্রহণ জন্মেজয়ের আজ নূতন নয়। অল্পস্থ মাথুঘেঁত মত অকস্মাৎ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িতে তিনি যেমন অভ্যস্ত, “ভাল আছি” বলিয়া পরক্ষণেই উঠিয়া পড়িতেও তিনি তেমনই প্রস্তুত।

কাজেই আজ, অক্ষয়তৃতীয়ার সন্ধ্যায়, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলে ব্যস্ত হইবার কারণ কেহ দেখিলেন না।

কিন্তু পূর্বের অল্পস্থতার মত তাঁর আজকার অল্পস্থতা কাল্পনিক ত নয়ই, অল্পস্থায়ীও নয়—সকালবেলা তাহা জ্ঞান গেল, এবং জানিবামাত্র নিঃসন্দেহ হইতে হইল। দেখা গেল, তিনি জরে বেহুঁস হইয়া আছেন।

চিকিৎসার জ্ঞান ব্যস্ততার সহিত ডাকা হইল কবিরাজ মহাশয়কে। ব্যস্ততা যতই থাক, সর্বাগ্রে মনে পড়িবে কবিরাজ মহাশয়কেই—কারণ, তিনি সস্তা। দরকারী জিনিষ সস্তায় যেখানে পাওয়া যায়, সর্বাগ্রে সেই দিকে ঘোড়ানই বাহাদের পক্ষে সম্ভব, জন্মেজয় সগোষ্ঠী তাহাদেরই একজন।

একটি টাকা দিলেই কবিরাজ মহাশয় সন্তুষ্ট হইবেন। অর্থাৎ ডাক্তারীর জাঁক আর চাকচিক্যের তুলনায় তাহাকে খাটো করিয়া তুলিয়া লোকে তাহাকে উহাতেই সন্তুষ্ট হইতে শিক্ষা দিয়াছে। ভিজিট এবং তখনকার মত ঔষধের মূল্য, এই দুইয়ের বাবদ একটি টাকাই তাহার প্রাপ্য।

কিন্তু তাই বলিয়া, অর্থাৎ সস্তা এবং অল্পেই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য বলিয়া মহীতোষ কবিরাজ বিজ্ঞ কমনু। ...সাদা কাপড় লাগান ছাত্রাটা চলে টাঙাইয়া তিনি বোগীব কাছ গেলেন, এবং রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—বান্ধ পক্ষাবাত। কঠিন বোগ। এখন প্রবল জ্বর রয়েছে—এই জ্বর হ্রাস পাওয়ার সময় সাবধান। স্নায়ুশূলী নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে। তবে ঔষধ আমি দিচ্ছি। ভয় কার্টেন্ডেও কার্টেন্ডে পারে এ-যাত্রা। ...বলিয়া স্ফুটন্ত ঔষধ দিয়া এবং ভিজিট ও ঔষধের মূল্য বাবদ একটি টাকা লইয়া তিনি নিদারুণ নিঃশেষে প্রস্থান করিলেন।

থলে মাড়িয়া ঔষধ রোগীব মুখে দেওয়া হইল—রোগী তাহা গলাধঃকরণ করিলেন; কিন্তু কবিরাজের উক্তি যে অতুক্তি নয়, আশা যে তিনি দেন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধ করিয়া জন্মেজয়ের আপনার লোকগুলি কত যে ভয় পাইল তাহা বলিবার নয়।

ছলছল চক্ষে পুনর্বর্ষ বলিল,—মা, ডাক্তার ডাকি ?

মা বলিলেন,—এই ত কবরেজ দেখে গেল। একটা দিন দেখবি নে ?

—মা বল তাই করি।

—আমি বলি দেখ একটা দিন। কবরেজী ঔষধ ত একেবারেই মিথ্যে নয়। ডাক্তারের যে খরচ ঢের। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজেদের অপ্রচুর অবস্থাটা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করিয়া সংজ্ঞাহীন স্বামীর দিকে চাহিয়া নিপ্পলক হইয়া রহিলেন...অতঃপর বস্তব্য আর কিছু আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

কিন্তু ডাক্তারকেই ডাকিতে হইল।

মধ্যাহ্নে জন্মেজয় চোখ খুলিলেন; সচেতন দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে তাকাইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঔষধ দিচ্ছ নাকি ?

গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, জবাব দিলেন গৃহিণী—মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, ঔষধ দেওয়া হইতেছে।

জন্মেজয় বলিলেন,—আর দিও না...হরিনাম শুনাও।—বলিয়া কিসের জ্ঞান যেন উৎস্রব হইয়া তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—পুনর্বর্ষ কাঁদিয়া বাহির হইয়া গেল, রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিলেন।

জন্মেজয় আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; বলিলেন,—আমার শিয়রে বসে কে রে ?

—আমি।

—অমলা ?

—হ্যাঁ, বাবা।

—আর পাখা করিস নে। হরিনাম শোনা।

অমলা পাখা বন্ধ করিয়া তার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন কেমন বোধ করছ ?

জন্মেজয়ের কোন অঙ্গ সাড়া দিল না—প্রশ্নটি তিনি শুনিতেই পান নাই বোধ হয়।

কিন্তু জন্মেজয়কে এই অপরিণত সময়ে হরিনাম কেহ শুনাইল না; পুনর্বর্ষ খরচের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া

তাহারা দু-জনা বসিয়া আছে—সে নড়িতে অশক্ত; দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি মাংসময় প্রেতাস্থার মত যেন অভিশাপ-মুক্ত হইতে অনভ্যস্ত মূর্খায় অজ্ঞাতের আরাধনায় বসিয়াছে...

অর্থাৎ নিজেকে একান্ত নিরুপায় এবং আহারনত হুঁচাদকে তার বিলী মনে হইতে লাগিল।

তা হোক, হুঁচাদের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সহজ পরিপাক হইবে বলিয়া হুঁচাদ প্রতিটি গ্রাস বত্রিশ বার চিবাইয়া কাঁচাগোলা কটি শেষ করিলেন—তার পর যুথ ধুইয়া ফেলিয়া চায়ের কাপ তুলিয়া লইলেন, এবং কতবার যে গলাখাঁকারি দিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

চুমুক দিয়া দিয়া অল্পে অল্পে চা-পান চলিতে লাগিল .. এবং পুনর্বর্ষের মনে হইতে লাগিল, সময় চলিতেছে না, চা শেষ হইবে না...তাহার পিতা মূর্খ।

কিন্তু অসম্ভব কল্পনা করিলে চলিবে কেন? হুঁচাদের চা-পান অচিরেই শেষ হইল।

হুঁচাদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

বলিলেন,—একটুখানি একা বস; আমি চট কংরে বাড়ীর ভেতর থেকে কাপড় বদলে জামাটা পরে আসি। ভদ্রলোক ত! তেমনই সেজে বেরুতে হবে।—বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি উঠানে নামিলেন...

পুনর্বর্ষ বলিল,—যে-আজ্ঞে।

হুঁচাদ অন্তঃপুরে অদৃষ্ট হইতেই পুনর্বর্ষ উঠিয়া দাঁড়াইল—হঠাৎ যেন সে ছিটকাইয়া উঠিল। সময়কে এত দীর্ঘ, মাহুষকে এমন অসহ্য, আর নিজেকে এমন ক্ষিপ্ত আগে কখনও তার মনে হয় নাই...সহিস্কৃত্যের পরীক্ষায় টিনে টানে যেন ছিঁড়িয়া যাইতে যাইতে তার বৃথাই মনে হইতে লাগিল, এই যন্ত্রণার স্মৃতি চিরজীবী হইয়া রহিল, এবং এই অবহেলার প্রতিশোধ লইতেই হইবে।

পুনর্বর্ষ স্তব্ধ হইয়া একই স্থানে খালি দাঁড়াইয়াই ছিল ..

“এখনও ঢের রোদ রয়েছে।”—বলিয়া হুঁচাদ কাপড় বদলাইয়া এবং জামা পরিয়া, অর্থাৎ ভদ্রলোক সাজিয়া, বাহির হইলেন।

বেলা তখন সাড়ে তিনটের পর প্রায় পাঁচটা।

পথে পরিচিত লোকের কাছে কুশল-বার্তা দিতে দিতে

এবং লোকের কুশল-বার্তা লইতে লইতে হুঁচাদ পুনর্বর্ষের সমভিব্যাহারে রোগী জনৈক্যের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন .. পথের শেষ তথা আলাপের শেষ আছেই।

হুঁচাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান একত্র করিয়া রোগ পরীক্ষা করিলেন—আশা দিলেন—চার টাকা ভিজিট লইলেন এবং চারখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন...

হুঁচাদ কিন্তু ধস্তাধস্ত।

প্রতি দাগ দেড়-আনা হিসাবে দাম দিয়া তিন শিশিতে ষোল দাগ ঔষধ আনিয়া পুনর্বর্ষ পিতাকে সেবন করাইয়াছে...সর্বদা মালিশ করিবার জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা হুঁচাদ করিয়াছিলেন তাহাও যথাসাধ্য মালিশ করা হইয়াছে—

এবং সম্ভবতঃ তাহারই ফলে সকালবেলা দেখা গেল, বোগীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে—একেবারে অসাড় নিশ্চীবতা তেমন নাই; দু-চারিটি কথা কহিতেছেন; এমন কি, খানিক পথ্য ও ডালিমের রস পান করিলেন। কিন্তু তাঁর গায়ের উত্তাপ কমে নাই বলিয়াই রাজলক্ষ্মী অহুমান করিলেন—গায়ে হাত দিয়া তাহাই মনে হইতেছে।

সমস্ত দিনটা ভাল ভাবেই কাটিল...সন্ধ্যার পর হঠাৎ দু-চারিটি কথা তুল বলিলেও সে ঘোরটা কাটিয়া যাইতে বিলম্ব হইল না।

কিন্তু সন্ধ্যা উপস্থিত হইল ভোরের দিকে। রাজলক্ষ্মীর আতঙ্কের অবধি ছিল না—দুঃস্বপ্ন হইয়া তিনি স্বামীর অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন; ভয়ে ভয়ে পা ছুঁইয়াও পরীক্ষা করিতেছিলেন, ঠাণ্ডা না গরম!...ভোরের দিকে স্বামীর গায়ে হাত দিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন; মনে হইল পা ঠাণ্ডা। গায়ের উত্তাপ ঢের কম।

রাত্রি তখন পৌনে চারটে—গ্রীষ্মের রাত্রি প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই।

পুনর্বর্ষকে মা শুইতে পাঠাইয়াছিলেন; তাহাকে ডাকিয়া তুলিলেন...

পা ঠাণ্ডা শুনিয়া সে উজ্জ্বল হুঁচাদের কাছে ছুটিল।

প্রথমবার সুচাঁদের সাক্ষাৎ আমরা পাইয়াছি ; এইবার দ্বিতীয়বার পাইব, কিন্তু বিলম্ব আছে।

সুচাঁদের বাড়ীটা একটু দূরে—

পুনর্কল্প দোড়াইয়া যখন সেখানে পৌঁছিল তখন উষার আলোক ফুটিয়াছে ; কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে, সুচাঁদ তখন বুঝাইয়া নাই—অত ভোরেই তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। তিনি এদিকেও খুব সাবধানী আব নিষ্ঠাবান।

এক ভাক্কেই সাড়া দিয়া সুচাঁদ দ্বিতলের শয়ন-প্রকোষ্ঠ হইতে জানিতে চাহিলেন,—কে ?

—আমি পুনর্কল্প। শীগগির আসুন ত একবার। বাবার অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না। পা যেন ঠাণ্ডা মনে হ'ল।—বলিয়া পুনর্কল্প হাঁপাইতে লাগিল।

সুচাঁদ জানালায় আসিলেন ; বলিলেন,—শুনলাম। চল যাচ্ছি। মুখে একটু জল নিয়েই যাচ্ছি, চল। ভোরও ত হচ্ছে এল। ১০০ আধ ঘণ্টা অন্তর দু'বার লাল গুণ্ধটা দাও গিয়ে ; তা করতেই আমি পৌঁছে যাব।

দোড়াইয়া সাধ্যসাধনা করার সময় পুনর্কল্পের নাই। “যে—আজ্ঞে”—বলিয়া সে চলিয়া আসিল।

কিন্তু লাল রঙের ঔষধে রোগীর অবস্থান্তর ঘটিল না, একই ভাবে রহিল...

উহারাই বুদ্ধি করিয়া গরম জল বোতলে পুরিয়া হাতে পায়ে সেক দিতে লাগিল। এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিল—সুখোদয় কখন হইয়াছে তার ঠিক নাই—মুখে একটু জল নিতে ত এত বিলম্ব হইবার কথা নয়।

পুনর্কল্পকে তার মা আবার পাঠাইলেন...

এবার সুচাঁদ অন্তঃপুরে নাই ; দেখা গেল, এবার ‘ডিম্পেলারী ক্রম’ আলো করিয়া তিনি বসিয়া আছেন—এমন লজ্জিত শ্রোভন পরিবেশে পুনর্কল্প আগে কখনও কাহাকেও দেখে নাই। সুচাঁদ বুড়ো মায়া ; ঘর আলো কবিয়া বসিয়া থাকিলেও তাঁর নিজস্ব দীপ্তি থাকা সম্ভব নয়—আছে তাঁর নাৎনীর, এবং তাহাকেই কোলে করিয়া সুচাঁদ বসিয়া আছেন বলিয়া, পুনর্কল্প অল্পভব করিল সেই জন্তই, ঘর আলোকিত হইয়াছে...

খুব দাহুর কোলে এলাইয়া পড়িয়া নানান আলাপ করিতেছে—

পুনর্কল্প যাইয়া দরজায় দোড়াইতেই সুচাঁদ সহসা ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—এই উঠেছি, দাদা। এই মেয়েটি কত যে বাজে গল্প করছে তার ঠিক নেই—কিছুতেই অঙ্ক ছেড়ে নামবে না।—বলিয়া সুচাঁদ খানিক হাসিলেন—তাহার দক্ষণ তাঁলাকে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইল

তারপর খুব দিকে মুখ নামাইয়া তিনি সাধনয়ে বলিলেন,—নামো, খুঁ। কত রুগী তেড়ে আসছে দেখছ না। এত এত টাকা আনব ; সব তোমায় দেব। আর আঙুর কিনে আনব। আর সেই মাতালের পুতুলটা। মনে আছে ত ? চাবি দিলে কেমন ঘাড় নেড়ে নেড়ে সে মাতালের মত করে। তোমার জন্তে নিশ্চয় কিনে আনব, যত দামই হোক।

খুব কান পাতিয়া প্রতিশ্রুতি প্রতীতি শুনিল ; কিন্তু উত্তর দিল বিদ্রোহীর মত ; বলিল,—নামব না, তোমার সঙ্গে যাব ; আঙুর কিনে সেই দোকানে বসেই খাব আর, পুতুল আমি নিজে কিনব

সুচাঁদ হতাশ হইয়া বলিলেন,—দেখলে হে অদ্ভুত আব্দার মেয়েটার ৭০০ তুমি যাও, সেক দাও গে। আমি উঠেছি...

সুচাঁদের মুখের কথা শেষ না হইতেই পুনর্কল্প প্রস্থানোত্ত হইল।

—কেমন ?

মা বলিলেন,—তেমনি। একবার চোখ মেলেছিলেন ; বললেন, ভাল আছি। ডাক্তার আসছে ?

—হ্যাঁ।

কিন্তু কই ডাক্তার ? আরও তিন কোয়ার্টার গেল... ভাগনে দেবব্রতকে পুনর্কল্প ছুটাইয়া দিল—সে খবর পাঠাইল এবং বলিল যে, ডাক্তারবাবু বাহির হইয়াছেন...

ডাক্তারবাবু বাহির হইয়াছেন শুনিয়াও আর দেরি করা চলিল না—মুহুর্তের বিলম্বে সর্বনাশ কত দ্রুত আর কত অনিবার্য হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখাই জানেন।

দ্বিতীয় অবলম্বন কবিরাজ—

পুনর্কল্প কবিবাজেব কাছে গিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইল—তার সর্কাজ তখন দৌর্য্যলো কাঁপতেছে...

কবিরাজ নির্ঝিন্দে পুনর্কল্পের কথাগুলি শুনিলেন, তার পব ভ্রম্ভী করিলেন, এবং তার পর বলিলেন,—শেষ সময়ে আমার দিগে আর কি কাজ, বাবা? বেশী টাটার আর গুণধাম ডাক্তারকেই ডাক—দেখ যদি সে পাবে।

কবিরাজ মহাশয় কথা বলেন বেশী। পূর্বোক্ত কথার পর না থামিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন,—আম্বুর্কেন্দ্রক তুচ্ছ করেই ছারেখারে গেলে। ঋষিকৃত ব্যবস্থা আর ঔষধ তোমাদের মনঃপূত হ'ল না, হ'ল গিগে বলিত্তী বিব। তবে, এই তিনটি বড়ি দিচ্ছি, একটি টাকা দাম; দাঁচটা নগদই চাই।—বলিয়া বড়ি দিলেন।

নগদ দামে ঋষিকৃত ব্যবস্থা অম্বুসারে প্রস্তুত ঔষধ অর্পণ তিনটি বড়ি লইয়া পুনর্কল্প চলিয়া আসিল। কিন্তু তার অস্ত্র্যামী জানিলেন, আশা নাই।

দেবব্রত খবর আনিয়াছিল, হুচাঁদ ডাক্তার রওনা হইয়াছেন। রওনা তিনি হইয়াছেন—কথাটা মিথ্যা নয়; নান্দী খুককে অক্লান্ত করিয়া এবং কাঁদাইয়াই তিনি বাহির হইয়াছেন...

ডাক্তার হুচাঁদ অধিকারী কেবল পেশাদার ডাক্তার ন'ন—তিনি জনসাধারণের স্বস্থ ও অক্লান্ত বন্ধু, অকপট হিতৈষী, তাব উপর তিনি সদালাপী; তার উপর তিনি গৃহস্থ; এবং তার উপরেও তিনি পবিচ্ছন্ন ভদ্রলোক; এবং তারও উপরে তিনি সর্কদাই অকাতরচিত্ত।

তিনি অকাতর চিন্তে বাহিব হইয়াছেন—লক্ষ্য রোদীর বাড়ী, কিন্তু পথে দেখা হইল পীতবাস পোদ্দারের সঙ্গে। পীতবাসের “বিশুদ্ধ ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের দোকান” আছে।—দেখা পাইতেই পীতবাস সসহমে প্রণাম করিয়া একেবারে বিগলিত হইয়া গেল...বলিল,—দোকানে এবটু পায়ের ধুলা পড়বে না, ডাক্তারবাবু? উত্তম মিহি পুনো চাল এসেছে। আপনার নাম ক'রে দু-বস্তা সরিয়ে রেখেছি। অনেক খদ্দেরকে কিরিয়ে দিয়েছি; বলি, ডাক্তারবাবুকে না শুদিয়ে ছাড়ছি নে।

—ভাল বটে ত?

পীতবাস আহত এবং তার চোখ বিশ্বয়ে বিস্ফারিত হইল, বলিল,—আপনার সঙ্গে তক্ষকী!...নিজের মুখে কি আর বলব, ডাক্তারবাবু! দোকানদারের কথা দাঁড়ায় কখনও? দয়া ক'রে স্বচক্ষে দেখবেন চলুন।

—দরকার ত ছিল হে। চল, দেখিগে। বলিয়া হুচাঁদ পীতবাসের দোকানে গিয়া উঠিলেন, এবং পীতবাসের অম্বুরোধে জুতা খুলিয়া বসিলেনও।

পীতবাস চালের রূপে গুণে যেন দিশেহারা হইয়া চাল দেখাইল; চাল মিহি এবং পুবাভন বটে—হুচাঁদ পছন্দ করিলেন...তার পর দর লইয়া যে কথাবিশি হইল তাহা তুচ্ছ; পীতবাস দু-আনা কমেই রাজি হইল, এবং ক্ষতিবীকারের কারণও সে প্রকাশ করিল; বলিল,...ওতেই দিলাম, ডাক্তারবাবু। ডাক্তারকে হাতে রাখতে হবে ত। আপনার হাতেই আয়। বলিয়া ধন হইয়া হাসিতে লাগিল।...বলিল,—আমারই লোক দিয়ে আসবে।

চাউল জ্বয়ের ব্যাপারটা চুকাইয়া হুচাঁদ এইবার উঠিবেন; উঠিতে তিনি যাইতেছেন, কিন্তু এমন সময় তাঁর চোখে পড়িল রামকমল ভাঙারী—স্বর নরুণ আয়না চিক্কা প্রভৃতির হাতবাক্স লইয়া সে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে...

হুচাঁদের হাত আপনি উঠিয়া গও স্পর্শ এবং ঘর্ষণ করিল—তিনি অম্বুভব করিলেন যে, দাড়ি বাড়িয়াছে।

পীতবাস তাহা দেখিল—

আম্বুপ্রদ ডাক্তার বাবুকে হুলভে চাউল বিক্রয় করা ছাড়া অন্য উপায়েও সে তুষ্ট করিতে চাহে; কাজেই প্রয়োজনের বেশী চীংকার করিয়া সে রামকমলকে ডাকিয়া দিল...এবং রামকমল প্রয়োজনের বেশী যত্ন লইয়া সম্রাস্ত ডাক্তারবাবুর উষ্মত্ব শ্রম মোচন করিয়া দিল—তাহাতে সে সময় নিল অনেকটা। স্বরে অত শান আর দাড়িতে অত জল দিবার দরকার ছিল না।

অন্তঃপর বিশুদ্ধ ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের দোকানে হুচাঁদের আর না বসিলেও চলিত—তাঁর নিজের কাজ শেষ হইয়াছে; কিন্তু ওদিককার হরিসাধন মজুমদার আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নহে—

ডাক্তার বাবু নিকটেই পীতবাসের দোকানে বসিয়া আছেন শুনিয়া পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাইতে সে আশ মাইল

রাস্তা ছুটিয়া আসিল। হরিশাধনের জামাই লোকনাথের কঠিন রোগ হইয়াছিল। লোকনাথ কলিকাতায় থাকে—রোগ জন্মিয়াছিল কলিকাতাতেই; কিন্তু কলিকাতার ডাক্তারগুলি এমন অর্কাটীন যে, রোগ চিনিতেই পারে নাই—চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হওয়া ত অনেক দূবের কথা; অথচ—হরিশাধন রাগ করিয়া বলে—পেটুলান পরার সখটুকু আছে!

সুচাঁদের প্রতি হরিশাধনের পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধা অশেষ, বিশ্বাসও অগাধ...

সে জামাইয়ের বাপ মায়ের নিষেধ কর্পাপাত না করিয়া এমন কি তাদের অপমান করিয়াই, জামাইকে এখানে আনিয়া সুচাঁদেব হাতে সমর্পণ করিল—

বলা বাহুল্য, সুচাঁদ তাহার মৃগরক্ষা করিয়াছেন, এবং কলিকাতার ষাবতীয় পেটুলান-পবা চিকিৎসকের মুখে চুপ-কালি লেপন কবিতা দিয়াছেন—অর্থাৎ লোকনাথ সম্পূর্ণ আবোগ্য লাভ করিয়া গত পরশ অন্নপথ্য করিয়াছে।

কাজেই হরিশাধন দৌড়াইয়া আসিয়া সুচাঁদের পদগুলি লইয়া মাথায় দিল; কিন্তু সুচাঁদেব পায়ে আদৌ ধূলী না-থাকায় হরিশাধনের চুলে ধূলী লাগিল না...

সুচাঁদ প্রফুল্লকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন,—জামাই কেমন আছে?

হরিশাধন গদগদ হইয়াই আসিয়াছিল; আরও গদগদ হইয়া বলিল,—ভাল আছে। ভাগ্যে আপনার হাতে দিয়েছিলাম—আমার মেয়েটির শাঁখা-সিঁদুর বজায় থাকল।

হরিশাধনকে বিচলিত দেখিয়া সুচাঁদ বলিলেন,—সে-কথা থাক্।... রোগের মূল ছিল পেটে, মাথায় নয়। পেটের চিকিৎসায় আমাদের আয়ুর্বেদ খুব সক্ষম।—বলিয়া তিনি আয়ুর্বেদ এবং ঔষধোপাধিকার মিশ্রিত করিয়া এমন অনেক গুঢ় কথা বলিতে লাগিলেন যে, না বলিলেও চলিত; এবং যাহা শুনিয়া পীতবাস, রামকমল এবং হরিশাধন প্রভৃতি একটা অজ্ঞাত জিনিষের অদ্ভুত ক্ষমতার সহিত পরিচয়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তার পর সুচাঁদ বলিলেন,—আচ্ছা, উঠি এখন। রুগীর বাড়ী যেতে এবটু তাড়া আছে।

পীতবাস বলিলেন,—ও, তবে ত উঠতেই হয়। কিন্তু আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না।

সুচাঁদ এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া একটু হাসিলেন, তার পর উঠিয়া রওনা হইলেন।...

খানিক এদিকেই পূর্বকথিত এবং প্রতিশ্রুত আঙুরের দোবান। সুচাঁদ সেই দোকানে দাঁড়াইলেন... এক বাস্ক আঙুরের ভিতর হঠাতে সন্তর্পণে একটি আঙুর তুলিয়া লইয়া তিনি মুখে নিক্ষেপ করিলেন... মিষ্ট বিদ্যা কথায় কিছা টুকু তাহা ঠিক কবিতেনা পারায় আব এটি বাস্ক লইয়া তাহারও একটি চাখিয়া দেখিলেন—মিষ্ট লাগিল... আঙুরের সেই বাস্কটি তিনি দবদস্তব পূর্বক ক্রয় করিলেন...

দোবানীর চিন্তাকুল প্রবেশ উত্তবে তিনি জানাইলেন, আঙুরের প্রয়োজন গৃহস্থ কোন্‌ও বোগীব জন্ত নহে।—আঙুরের বাস্ক আনিবেন বলিয়া থুবুকে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন আসিয়াছেন! সুতরাং আঙুর লইতেছেন।

আঙুর কেনা হইল—

সেই আঙুরের বাস্ক হাতে করিয়া এবং আপামর বহু লোকের শরীরগত স্থপ-স্থিতির তন্মাস লইতে লইতে যখন সুচাঁদ পুনর্কহর বাবাকে দেখিতে পুনর্কহরের বাড়ীর সম্মুখবর্তী হইলেন তখন বেলা প্রায় এগারটা।

সুচাঁদের লাল রঙের ঔষধে এবং কবিরাজের বটিকায়, ঋষি-নির্দিষ্ট নগদ বটিকায়, ফল হয় নাই; কাজেই সুচাঁদ যখন জন্মেজয়কে দেখিতে আসিলেন তখন বাশ কাটিয়া আর দড়ি পাকাইয়া মাচা প্রস্তুতের বাশ্য ক্রতবেগে এবং অস্তঃপুরে ক্রন্দন নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে...

সুচাঁদ ৎমকিয়া দাঁড়াইলেন—

পুনর্কহর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিবল মুখে অগ্রসর হইয়া গেল—

সুচাঁদও বিমর্ষ মুখে তাঁর কর্তব্য করিলেন; বলিলেন,—ঘটবে বলেই যে-সব ব্যাপার একটা চূড়ান্ত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় ধার্য হইয়া আছে, মৃত্যুই তাব মধ্যে সব চাইতে অনিবার্য—তা ত জান।... আচ্ছা, এখন আসি। বলিয়া তিনি স্ত্রোমন নির্বিকারভাবে আসিয়াছিলেন ঠিক তেমনি নির্বিকারভাবে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সূচাদের ঐ কথায় এবং তাঁর বাণীয়া দেখিয়া পুনর্কল্প চোখে বেশী করিয়া জল আসিল—তাহার মনে হইল, সবাই যা জানে তাহারই কৃত্রিম পুনরুজ্জীবিত করিয়া লোকটা ঘন ধাপ্পা দিয়া গেল।

পিতাব মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ ছেলেকে করিতেই হইবে। পুনর্কল্প পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন, এবং তদন্তে ব্রাহ্মণ এবং জাতি ও বন্ধু ভোজনের আয়োজন করিয়াছে—আয়োজন অল্পবল; বড় জোর দেড়-শ লোক। তাহাতেই তাহাকে ঋণ কবিত্তে হইল।

নিমন্ত্রিতের ফর্দ প্রস্তুত হইয়াছে—ব্রাহ্মণের মারফৎ নিমন্ত্রণ প্রেরিতও হইয়াছে :

পুনর্কল্প সোমের পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ, জাতি ও বন্ধু ভোজনে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল—সাড়ে নটায় ভোজ—দয়া করিয়া ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, ডাক্তার সূচাঁদ অধিকারীকে নিমন্ত্রণ কর। হইয়াছে; ব্রাহ্মণ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে নিমন্ত্রণ তাঁর প্রাপ্য।

সাড়ে নটায় ভোজ—

সাড়ে নট কি গরমের দিনে বেশী রাত্রি? তা নয়। কিন্তু তার বেশী দেবী হইলে নিমন্ত্রিত সম্মানবর্গ বিরক্ত হইতে পারেন—তাঁহারা বিরক্ত হইলে বিষম লজ্জার কারণ হইবে। পুনর্কল্প তাই তাতাতাড়ি কবিত্তেছে।... নিমন্ত্রিত-গণ শুভাগমন করিয়া বসিবার স্থান এবং আসনের অভাবে পাছে দাঁড়াইয়া থাকেন এই ভয়ে সে সন্ধ্যা না-লাগিতেই বৈঠকখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন কবিল; তার পর লম্বা-চওড়া সতবন্ধি এবং তার উপর লম্বা চওড়া চাদর বিছাইয়া দিল, এবং তার উপর কয়েকটা তাকিয়া-বাগিচা রাখিয়া দিল—আলমসেই গা ছাড়িয়া দিয়া নিমন্ত্রিতগণ আশ্রয় উপভোগ করিবেন—কারণ, নিমন্ত্রিত অতিথি নারায়ণতুল্য পূজ্য।

সাড়ে নট বাজিতে এখনও ঢের দেবী—পুনর্কল্প দেয়াল-বাড়িতে এখন মাত্র সাতটা পর্য্যন্ত।

এইবার আলোব ব্যবস্থা—

চাহিয়া-আনা সুরুৎ টেবিল ল্যাম্পটা জালিয়া দিয়া পুনর্কল্প নিখোস ফেলিয়া বাঁচিল—অনেক আগেই এদিককার বন্দোবস্তটা সমাধা হইয়াছে...

এখন লুচি-তরকারির দিকটা এক বার তদারক করা দরকার—ভাবিয়া সেই উদ্দেশ্যে ঘরের বাহির হইতে চৌকাঠের বাহিরে পা দিয়াই পুনর্কল্প চমৎকৃত হইয়া গেল... সূচাঁদ অধিকারী তাঁর সেই নাতনীটির হাত ধরিয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন—মুঠি খুব সৌম্য—খুব বেশ সাজিয়া আসিয়াছে; দেখিয়াই পুনর্কল্প অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া ঘন সম্মুখে বিস্মৃত স্থানের সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, অর্থাৎ বলিল,—আমুন আমুন। খুকি, কেমন আছ?

খুকী কথা কহিল না—

পুনর্কল্পই পুনর্কল্প বলিল,—ভেতরে এসে বসুন ডাক্তার বাবু। আজ কি সৌভাগ্য আমার।

অতিশয় সূচাঁদ সহৃদয়তার সহিত হাসিয়া সূচাঁদ সৌভাগ্যের কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন; বলিলেন,—সৌভাগ্য কি হে। এ যে কর্তব্যের ফাঁদ; ধরা দিতেই হবে। পরম্পরের ডাকে যে লৌকিকতা রক্ষা না করে তাকে কি অসামাজিক বলা হবে না? কর্তব্যের দায়ই হচ্ছে সবার উপর অনিবার্য।

কি যে সবার উপর অনিবার্য নয় তাহা ধারণা করিতে না পারিয়াও পুনর্কল্প কৃতার্থ হইয়া বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সূচাঁদ বলিলেন,—ভদ্রলোকের নেমস্তন্য আর আদালতের সমন একই রকম—হাজির আমায় হতেই হবে। না-আসাটাই অস্বাভাবিক।... একটু আগেই এলাম। এসেই নেহাৎ খেতে বসা ভাল দেখায় না।... দেবী আছে বুঝি?

পুনর্কল্প বলিল,—অল্পই। ওরে, পাখা দে; ব্রাহ্মণের হাঁকো আন; আর ভেতর থেকে পান নিয়ে আয় এক ডিস।



তত্ত্ব ও বাঙালী

ঐতিহ্যাহরণ চক্রবর্তী

অনেকের ধারণা—তত্ত্বশাস্ত্রের সহিত বাংলা দেশের সম্বন্ধ কেবল ঘনিষ্ঠ ভারতের অন্ত কোন প্রদেশের সহিত সেকণ নহে। বাংলা দেশেই তত্ত্বশাস্ত্রের উৎপত্তি—এই দেশেই এই শাস্ত্রের আচার পরিপুষ্ট লাভ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বীভৎস ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল—বাংলার বাহিরে তাত্ত্বিক উপাসনার প্রচলন থাকিলেও তাহা অতি বিরল ও নগণ্য—এইরূপ মতবাদ দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলার তথা বাঙালীর গৌরবখ্যাপনের উদ্দেশ্যই যে এই মতবাদের মূল কারণ তাহা বলিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, নিকৃত তত্ত্বশাস্ত্রের বীভৎসতা ও কদৰ্শতার কলঙ্কের বোঝা বাঙালীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া অন্ত প্রদেশ বাঙালীর নিকে চাহিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া থাকেন। বাঙালীও অস্বীকার্য সত্য বোধে এই দুঃপনয় কলঙ্কের ভার নিরুপায় ভাবে অপ্রতিবাদে মূগ্ধ করিয়া থাকে।

আমি প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে তত্ত্বের বিকৃত আচারই ইহাব মূল ও মুখ্য আদর্শ নহে—ইহার গূঢ় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক রহস্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।* এই কারণেই বাংলার এবং বাংলার বাহিরের অনেক তাত্ত্বিক সাধকেব পুণ্যস্থতি আজ পর্যন্ত নানাস্থানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্তৃক বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইয়া থাকে।† তাত্ত্বিক ধর্ম তথা তাত্ত্বিক সাধকের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য নহে। এই আদর্শ ভাল হউক বা মন্দ হউক, এই ধর্ম (মায় ইহার বিকৃত ও বীভৎস আচার) যে কেবল বাংলা দেশের চতুর্সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে—ভারতের সর্বত্রই যে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতে বাংলা দেশের ত্রায় (অথবা তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে) প্রচলিত রহিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা। অবশ্য ইহা দেখাইবার জন্ত কষ্ট-কল্পনা বা

অহুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না—প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় প্রমাণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

মূল তত্ত্বগুলির মধ্যে কোন খান্নির কত অংশ কবে কোন দেশে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কোন কোন তত্ত্বের অংশবিশেষে বাংলা ভাষার বা বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন থাকিলেও তাহা হইতে সমস্ত গ্রন্থখান্নির বঙ্গীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। এমন হইতে পারে, এই সব অংশবিশেষ কালক্রমে বাংলা দেশে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে কেবল এই ব্যাপার হইতেই এমন কথাও বলা চলে না যে এই সকল গ্রন্থ ও ইহাদের মধ্যে প্রতিপাদিত আচারাদি কেবল বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিল। কোন গ্রন্থ কোন দেশে প্রচলিত বা কোন দেশে অপ্রচলিত তাহা জানিবার উপায় দুইটি। প্রথমতঃ, সেই সেই গ্রন্থ কোন কোন দেশে ও কোন কোন অক্ষবে পাওয়া যায় তাহার অহুসন্ধান করা। এইরূপ অহুসন্ধান বর্তমানকালে বিশেষ বঠিন নহে। ভারতের নানা প্রদেশের পুথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই অহুসন্ধান ব্যাপারে সেগুলির উপযোগিতা অতুলনীয়। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে—নিবন্ধগ্রন্থের আলোচনা। বিভিন্ন প্রদেশে নানা সময় মূল তত্ত্বগ্রন্থ অবলম্বনে নানা বিধে তত্ত্বশাস্ত্রের রহস্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বহু নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কোনও গ্রন্থে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত মূলতত্ত্বের নাম আলোচনা করিলেই বুঝা যায় সেই গ্রন্থের রচয়িতার দেশে কোন কোন গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এক এক প্রদেশের নিবন্ধগ্রন্থগুলিতে উদ্ধৃত মূল-তত্ত্বের নামের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে সেই সেই প্রদেশে প্রামাণিক বলিয়া পরিচিত মূলতত্ত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নানা প্রদেশে প্রচলিত সমস্ত নিবন্ধগ্রন্থে—অন্ততঃ প্রচলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলিতে—উদ্ধৃত এইরূপ মূল-তত্ত্বের তালিকা প্রস্তুত হইলে তত্ত্বগুলির ব্যাপকতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় ধারণ করা সম্ভবপর হইবে—

* প্রবাসী—১৩৪১, শ্রাবণ, পৃঃ ৫৫০-৫৭২।

† 'বাংলার শাস্ত্র সাধক'—দেশ (শাস্ত্রীয় সংখ্যা, ১৩৪০)।

তত্ত্বনামেব দোহাই দিয়া যে সমস্ত অর্বাচীন ও তল্পমতবিরোধী গ্রন্থ বালক্রমে প্রচলিত হইয়াছে সেগুলি এই উপায়ে বরা পড়িবে। অবশ্য, নিবন্ধগুলি প্রকাশিত না হইলে এইরূপ তালিকা প্রণয়ন করা কষ্টকর। তবে যে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবলম্বনে এই তালিকা প্রস্তুত করিলেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত নানা প্রদেশের সে সমস্ত পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় কোন প্রদেশেই তন্ত্র, আগম বা মন্ত্রশাস্ত্রের পুথির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে আৰম্ভ করিয়া ত্রাশোর পর্বন্ত যে সমস্ত স্থানের অযোধ্যা, কাশী, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা প্রভৃতি) পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে সর্বত্রই স্থানীয় বা স্থানান্তরের অক্ষরে লিখিত প্রাচীন অগ্রাচীন বহু তন্ত্রের পুথি পাওয়া যায়। এই সকল পুথি নাগরী, বাংলা, উড়িয়া, শারদা, নেওয়ারী, দাক্ষিণাত্যের গ্রন্থ প্রভৃতি ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের লিপিতে লিখিত। উত্তর-ভারতের নানা স্থান হইতে এশিয়াটিক সোসাইটীতে যে সহস্রাবিক তন্ত্রের পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যেই 'গ্রন্থ'-ব্যতীত অন্য সমস্ত লিপির পুথিই পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির অক্ষর বেশ প্রাচীন এবং অপরগুলির অক্ষর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কয়েকখানি অতি প্রাচীন পুথিও ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

এই পুথিগুলিই বাংলার বাহিরে তন্ত্রচর্চার একমাত্র প্রমাণ নহে। বাংলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে হুগে হুগে নানা তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সারা ভারতে পরিচিত ও আদৃত। কাশ্মীরের অভিনবগুপ্ত, দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর রায়, লক্ষণ দেশিক ও রাঘব ভট্ট প্রভৃতির নাম ও গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের তান্ত্রিকসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্যের রচিত বলির প্রসিদ্ধ প্রপঞ্চসার ও লক্ষণ দেশিকের শারদাভিলক আজ পর্যন্ত সমস্ত ভারতে তান্ত্রিক অহুষ্ঠান নিয়মিত বরিতেছে—ইহাদের নিদেশ অনুসারেই তান্ত্রিক কৃত্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ছুইখানিকেই বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবহার করা হয়। সকল প্রদেশেই ইহাদের পুথি পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতবর্গ ইহাদের নানা টীকাটীপনী রচনা

করিয়া সাধারণের মধ্যে ইহাদের প্রচারের পথ স্বগম করিয়া দিয়াছেন। অবশ্য বাংলা দেশকে কেবল অন্ত দেশের গ্রন্থের উপরই নির্ভর করিতে হইত না বা হয় না। বাংলার নিজস্ব গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দেব তন্ত্রসার সর্বপ্রসিদ্ধ—বাংলার বাহিরে হুদুর নেপাল পর্বন্ত ইহার আদরের পরিচয় পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটীতে ইহার যে কয়খানি পুথি আছে তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নেপালে প্রচলিত নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত। বাংলার বাহিরের অক্ষরে লিখিত এইরূপ আরও কয়েকখানি বঙ্গীয় নিবন্ধগ্রন্থের পুথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উড়িয়া অক্ষরে লিখিত পূর্ণানন্দেব তত্ত্বানন্দতরঙ্গিনী ও গ্রন্থক্সরে লিখিত কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের শ্রামাসপর্ষাবিধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্ণানন্দেব ত্রীতত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত ঘটচক্রনিরূপণ ত নিখিল ভারতপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের অন্ততম।

সুপ্রসিদ্ধ এই সকল গ্রন্থ ছাড়া এমন আরও বহু গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে যাহাদের প্রসিদ্ধি মাত্র কোনও স্থানবিশেষের বা সমাজবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শত শত এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নেপালের মহারাজ প্রতাপ সিংহ কৃত বিশাল গ্রন্থ পুষ্কর্ষার্ণব, নেপালের মহারাজ ভূপালেন্দ্রের ময়ী নবমী সিংহকৃত তত্ত্বচিন্তামণি, দাক্ষিণাত্যের ত্রিনিবাস ভট্টকৃত শিবার্চনচন্দ্রিকা, ত্রিনিবাসেব পৌত্র জনার্দন কৃত শিবার্চনচন্দ্রিকার মন্ত্র-চন্দ্রিকা নামক সাব সংগ্রহ, বোম্বাই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্মার্ত কমলাকর কৃত মন্ত্রকমলাকর ও শাস্তি রত্নাকর, অহিচ্ছত্রের মহীধর কৃত সুপরিচিত মন্ত্রমহোদধি, মিথিলাব নরসিংহ ঠাকুর কৃত তারাতন্ত্রিহুর্ধারব, উড়িষ্যার লক্ষ্মীধর কৃত শৈবকল্পদ্রুম, দানোবর হরিকৃত তত্ত্বচিন্তামণি ও যন্ত্রচিন্তামণি, বাবেল বংশের মহারাজকুমার জেত্র সিংহ কৃত ভৈরবার্চ-পারিজাত, বৃন্দেল বংশের রাজা দেবীসিংহের অন্তরোধে তাঁহার গুরুপুত্র শিবানন্দ গোস্বামী রচিত সিংহ-সিদ্ধান্তবিন্দু, ত্রীচক্রের আদর্শে নিহিত ত্রীবিদ্যানগরের রাজা লক্ষণ দেশিকের বিবোবী প্রোচনেবের পুত্রের অহুবোধে প্রগল্ভাচার্যের শিষ্য কতর্ক রচিত বিদ্যার্ণবতন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থবাণের মধ্যে অনেকে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পুরুষাভ্যুত্থানে নানারূপ তান্ত্রিক গ্রন্থ রচনা করিয়া তান্ত্রিক



এবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাগদত্তা
শ্রীঅজিতকৃষ্ণ গুপ্ত

উপাসনার রহস্য জগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক বংশের একজনকে একখানি গ্রন্থই হযত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অল্প গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ অবস্থায় অপ্রকাশিত পুথির আকাবে কোন প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারে বা ব্যক্তিবিশেষে গৃহ-কোণে লোকচক্ষুর অন্তবালে অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শাবদাতিলক নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা লক্ষণ দেশিকের স্বল্প পরিচিত তারাগ্রন্থী ও শাবদাতিলকের প্রখ্যাত টীকাকার রাঘব ভট্টের তালীতন্ত্র এবং তাঁহার পৌত্র বৈদ্যনাথ কৃত ভুবনেশীকল্পলতা প্রভৃতি নাম করা যাইতে পারে। বাংলাব বাহিরে তন্ত্রের প্রচলন প্রতিপাদন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—তাই ইচ্ছা করিয়াই এস্থলে বাংলা দেশের কোন গ্রন্থের নাম কনা হইল না। কেবল এই কথা বলা দরকাব যে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ বাংলা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে এবং বর্তমানে অপ্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে।

এই সকল গ্রন্থ ও বিশেষ করিয়া নানা তান্ত্রিক কৃত্যের ছোট ছোট পদ্ধতির পুথি হইতে বিভিন্ন প্রদেশের তান্ত্রিক আচারের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য প্রকটিত হয়। বাঙ্গালার তান্ত্রিক সমাজে বা তন্ত্র-গ্রন্থে যে সমস্ত অন্তর্ধান ও দেবতার উপাসনার প্রচলন বা উল্লেখ আছে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অন্তর্ধান ও বেশী দেবতাব নিয়মিত উপাসনার উল্লেখ বাংলাব বাহিরের তন্ত্র-গ্রন্থে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বাংলাব কেবল কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, শিব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র দেবতাব তান্ত্রিক উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে বাংলাব বাহিরে পুরুষ ও স্ত্রী দেবতাব বহু বিভিন্ন রূপের উপাসকের উল্লেখ আছে। কোনও বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতা-বিশেষের সাময়িক পূজা অবশ্য বাংলা দেশেও অপ্রচলিত বা নিষিদ্ধ নহে। তবে, বালামুখী, চণ্ডী, গায়ত্রী, রাজ্ঞী, কুজিকা, বটুকভৈরব, গণেশ, শ্রমহংস, কাশ্মীবে প্রচলিত সারিকা প্রভৃতি দেবতার নিয়মিত উপাসনার বিধান—এই সকল দেবতাব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ইষ্টদেবতারূপে ইহাদিগকে পূজা করিবার প্রথা বাংলা দেশে নাই, বাংলাব বাহিরে আছে—এশিয়াটিক সোসাইটী মাস্ত্রাজ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী প্রভৃতি স্থানের তান্ত্রিক পুথি আলোচনা

করিলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বামাচারের বীভৎস অন্তর্ধান এবং মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি আপাততঃ ঘৃণ্য কৃত্যও কেবল বাংলা দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে—বাংলাব বাহিরেও এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে। বামাচারের মত খণ্ডন কবিয়া কাশীনাথ নামক এক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—তাহার প্রতিবাদকল্পে বামাচার-সিদ্ধান্তসংগ্রহ নাম দিয়া একখানি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের একখানি পুথি মাস্ত্রাজ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে আছে। পঞ্চ মকার সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া মদ্যপ্রয়োগ ও মদ্যেব পান্ডবন্দনা সম্বন্ধে, বিদ্যুত বিধান অবদ্বীয় একাধিক পুথির মধ্যে যেমন পাওয়া যায়, বাংলা দেশে তেমন দেখা যায় কি না সন্দেহ।

বস্তুতঃ, তন্ত্র-শাস্ত্রের উৎপত্তি যেখানেই হউক না কেন কয়েক শত বৎসর যাবৎ ইহা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে। বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলিতে যাহা বুঝায় তান্ত্রিক অন্তর্ধান তাহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও বিরলপ্রচার হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। পার্শ্বাণিক ও তান্ত্রিক ব্রত-পূজাই আজকাল অনেক স্থলে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ফলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিবর্ণের বৈদিক উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা তান্ত্রিক দীক্ষার ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাদির ব্যবস্থা আছে। এই দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে কোনরূপ তান্ত্রিক উপাসনাব কাহাবও অধিকার হয় না। আবার দীক্ষা গ্রহণ না করাও সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় না। কেবল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকই যে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণে অধিকারী তাহা নহে, আচাণ্ডাল পুরুষ ও স্ত্রী সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে—এবং তথাকথিত নীচ বর্ণের মধ্যেও কেহ কেহ এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণাদির দ্বারা নিত্য সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। সারা ভাবভাবের এই এক নিয়ম। তবে কে কোন্ দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত, কে কোন্ দেবতার উপাসন তাহা প্রকাশ কবিবার বিধান তন্ত্র-শাস্ত্রে নাই। সম্প্রদায়ের লোক ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর সকলেরই নিকট ইহা অজ্ঞাত। তবে মোটামুটি ভাবে আমবা কাহাকেও শৈব, কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাকেও শাক্ত বলিয়া জানি। ইহুদার কেহই কোন প্রদেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহেন—সারা ভারতবর্ষে

ইঁহারা ছড়াইয়া রহিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইঁহাদের উপাসিত দেবতার মন্দির ও তীর্থস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার বাহিবে যে সমস্ত শাক্তদেবতার মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—গয়ার গয়েশ্বরী ও মঙ্গলাগোবী, পাঞ্জাবের কাঞ্চড়া দেবী, গৌবীকুণ্ডের দশভূজা, চিত্তাপুরীর ছিন্নমস্তা, নেপালের গুহেশ্বরী, বোম্বাইর পার্বতীশৈলের পার্বতী, মহালক্ষ্মীর মহালক্ষ্মী, বোম্বাইনগরের অধিষ্ঠাত্রী মুখাদেবী, বিজ্জাচলের বিজ্জাবাসিনী, উজ্জয়িনীর সমীপবর্ত্তী ইটবীপের পাষণময়ী কালী, হরিদ্বারের মারাদেবী ও চণ্ডী,

কান্ধীরের ক্ষীর ভবানী এবং মানস সরোবরের ভীষণাকৃতি দশভূজা। বাংলার প্রসিদ্ধ শক্তি মন্দির-গুলিতে অনেক অবাতালী শাক্তকে বসিয়া পূজা ও জপ-তপ করিতে দেখা যায়। তবে বাংলার বাহিরে মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা দেবতার যজ্ঞ নামক তান্ত্রিক প্রতীকের পূজাই বেশী প্রচলিত বলিয়া মনে হয়। অনেকের ঘরেই শক্তি বা অন্ত দেবতার যজ্ঞ সাদরে বক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে। শাক্ত উৎসব বাংলা দেশেও যেমন আছে বাংলার বাহিরেও সেইরূপ। বাংলার দুর্গোৎসব বঙ্গের বাহিরে নবরাত্র একই শক্তিপূজা উপলক্ষ্য করিয়া।

মাতা-পুত্র

শ্রীরাম-প্রসাদ চন্দ

১৭২৬ সালের ১লা ডিসেম্বর রামকান্ত রায় তাঁহার স্বাবর সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করিয়া তিন পুত্রকে দান করিবার পর, এবং ১৮০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রামকান্ত বাঘের পরলোকগমনের পর, জগমোহন এবং রামমোহন দুই ভাইএর জ্যৈষ্ঠ-পুত্রগণ মাতা তারিণী দেবীর তত্বাবধানে লাঙ্গুড়াপাড়ার বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। দুই ভাইই আপন আপন তহবিল হইতে সমান অংশে এই একাদম্বর্ত্তী পরিবারে ভরণপাষণের ব্যয়ভাব এবং ঐ বাড়ীতে তারিণী দেবীর অমুষ্টিত নিতানৈমিত্তিক দেব-সেবার ব্যয়ভার বহন করিতেন। যত দিন রামমোহন রায় বিদেশে চাকরি করিতেছিলেন তত দিন বোধ হয় তিনি বিনা ওজরে তারিণী দেবীর দেবসেবায় ব্যয়ভার আংশিক রূপে বহন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি পৌত্তলিকত দমন করিতে এবং ব্রহ্মোপাসনা প্রচাৰ করিতে ব্রতী হইলেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্বয়ং পৌত্তলিকতার অহুষ্ঠান, অর্থাৎ লাঙ্গুড়াপাড়ার বাড়ীর নিত্য-নৈমিত্তিক দেবসেবার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না।

কলিকাতা আসিয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত কবিবার জন্ত রামমোহন রায় “বেদান্তগ্রন্থ”, “বেদান্তসার” এবং সাংখ্যবাদ উপনিষৎ মুদ্রিত এবং বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, অহুষ্ঠানের জন্ত “আত্মীয় সভা” স্থাপন করিলেন। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসের “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা”য় প্রকাশিত “ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ” নামক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে—

১৭৩৭ শকে (১৮১৫—১৮১৬ সালে) রাজা মানিকতলার উজান-গৃহে আত্মীয় সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার বজ্রতলার বাটীতে সভা হইত, তৎসময় কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াবিত্ত ভবনে সভা হইয়া পুনর্বার মানিকতলার উজানে আরম্ভ হইয়াছিল।

সারাক্ষকালে আত্মীয় সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইত, কিন্তু ক্ষেপাখ্যায় নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বিশ্র কো পাঠ করিতেন ও গোবিন্দবালা ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত ষারিকানাথ ঠাকুর তথায় সময় সময় উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মহুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামবৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়, দবাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং নন্দনমোহন মহুমদার ইঁহারা প্রচাৰিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা কপ পরম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন।

১৮১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের “মিশনরী রেজিষ্টার”

নামক পত্রিকায় আত্মীয় সভার এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

তিনি (রামমোহন বায়) তাঁহার ধর্মমত অনেক দূর প্রচার করিয়াছেন, এবং অনেক উচ্চ বর্ণের হিন্দু তাঁহাব সহিত বোম্ব দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মত সমর্থন করেন। ইহারা আপনাদের মতকে সভা বলেন এবং কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করেন। তন্মধ্যে একটি নিয়ম, যিনি মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করিবেন না, তিনি এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন না। এই সভার একজন সভ্য মুখের কথায় মূর্ত্তি পূজা ত্যাগ করিয়া থাকিলেও, বাড়ীতে অনেক দেবমূর্ত্তি রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার দুইটি বড় মন্দির আছে। সভা তাঁহাকে এইরূপ আচরণ করিবার অসম্মতি দিয়াছেন; কারণ দেবসেবার জন্ত দিল্লীর বাহাদুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত কিছু জমী তাঁহার আছে। এই সকল দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিলে এই জমী তাঁহাব হস্তচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে। কেহ কেহ বলেন, রামমোহনের শিষ্যসংখ্যা প্রায় পাঁচ শত; এবং ইহাও কথিত হয় যে এই দল শীঘ্র এত প্রবল হইবার আশা করা যায় যে রামমোহন রায় তাঁহার মত প্রকাশে ঘোষণা করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ফলে জাতিচ্যুত হইবেন। এত দিন তিনি জাতি ত্যাগ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ধর্ম্মাঙ্গিকে তিনি শীঘ্র স্বমতাবলম্বী করিবার ভরসা করেন তাঁহাদের সহিত নিসনের বাধা হইবে। ব্রাহ্মণগণ দুইবার তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সতর্ক থাকার কৃতকার্য হইয়া নাই। লোকে এই কথাও বলে যে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত (baptized) হইয়া অনেক বন্ধু সঙ্গে লইয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিতে ইচ্ছা করেন। সেখানে যাইয়া ক্রিয়াশীলতার জন্ত কোনও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে বৎসর অভিযাত্রিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য।*

এই লেখক মনে করিয়াছিলেন, রামমোহন রায় খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আত্মীয় সভায় তদনুরূপ উপাসনা হয়। কিন্তু তিনি আর যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এই লেখক মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে আত্মীয় সভার যে নিষেধের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে হয়। ১৮১৫ সালের শেষ ভাগে, বা ১৮১৬ সালের প্রথম ভাগে, প্রকাশিত বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদের (*Abridgment of Vedant*-এর) মুখবন্ধে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত বিচার বুদ্ধির এবং অকপট মনোবৃত্তির নির্দেশ অনুসারে এই পথ গ্রহণ করার আমি আমার কতিপয় আত্মীয় বন্ধনের বিরক্তির এবং নিদার ভাঞ্জন হইয়াছি। ইষ্টদেব বৃক্ষসার প্রবল, বর্ত্তমানে প্রচলিত পূজা পার্বণের সহিত ইষ্টদেব সাংসারিক হবিধা জড়িত আছে।†

* Mary Carpenter, *Last Days of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1915, pp. 81-82.

† By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahmin, have exposed myself to the complaining and reproaches of some of my relatives, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depend on the present system.

এই উক্তি পাঠ করিলে মনে হয়, ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় পুস্তক-পুস্তিকায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজেও মূর্ত্তিপূজা ত্যাগ করিয়াছিলেন। লাক্ষুড়পাড়ার বাড়ীতে রামমোহন রায়েব নামে সম্বল করিয়া এবং তাঁহার ব্যয়ে নিত্য মূর্ত্তি পূজা হইত। সুতরাং রামমোহন রায় যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তখন লাক্ষুড়পাড়ার বাড়ীতে অস্ত্রদ্রোহের সূত্রপাত হইল। এই অস্ত্রদ্রোহের এক পক্ষ হইলেন বাড়ীর কর্ত্তামাতা, আর এক পক্ষ ধর্ম্মসংস্কারকামী পুত্র।

কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন লাক্ষুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার উদ্ভোগ কবিত্তে লাগিলেন। এই বাড়ীর নিজ অর্দ্ধাংশ তিনি ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করিলেন। রঘুনাথপুত্র গ্রামে তাঁহাব খরিদা পত্তনী কৃষ্ণনগরে তালুকব মধ্যে এক চাপে বার বিঘা জমী ছিল। এই জমী প্রজার হাত হইতে ছাড়িয়া লইয়া তিনি কতকাংশে বাগান করিলেন, এবং কতকাংশে নূতন পাকা বাড়ী নির্মাণ করিলেন। ১৮১৬ সালের শেষ ভাগে এই বাড়ী বাসের উপযোগী হইয়াছিল, এবং ১৮১৭ সালের মাঘ (জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ী-ফল্গুন) মাসে রামমোহন রায়ের পরিবাসবর্গ লাক্ষুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরের এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ী ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে গোবিন্দপ্রসাদ বাবের পক্ষের সাক্ষী বেচাবাম সেন বলিয়াছেন (১৬ প্রশ্নের উত্তর)—

লাক্‌ড়পাড়ার বাড়ী ছাড়িয়া রঘুনাথপুরের বাড়ী বাঙালীর অব্যবহিত কারণ, মাতা তারিণী দেবীর সহিত রামমোহন রায়ের বিরোধ। সেই সময় সাক্ষী (বেচাবাম সেন) বিনাশী রামমোহন রায়ের চাকরী করিতেছিল এবং সেই সূত্রে কি অবস্থা—একটি কারণে রামমোহন রায় লাক্ষুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারিয়াছিল।*

মূল জবানবন্দীতে (examination-in-chief) চতুর্দশ প্রশ্নের উত্তরে বেচাবাম সেন বলিয়াছেন, তারিণী দেবীর দেবসেবার জন্ত জগমোহন এবং রামমোহন উভয়ে কতক জমীজমা (certain lands) নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন (were set apart)। এই সকল সম্পত্তিই আয় হইতে তারিণী দেবী দেবসেবা নির্বাহ করিতেন। ১২১৮ সনে (১৮১২ সালে) জগমোহন বাবের মৃত্যুর পূর্বে হইতে ১২২৩

* Saith that his immediate cause of removal was a dispute which he had with his mother Tariny Dabi saith he this deponent was at that time living in the service of the defendant Rammohun Roy by which means he became acquainted with the circumstance of the removal of the said Rammohun Roy and the cause thereof.

সন (১৮১৬ সালের শেষ) পর্যন্তও এইরূপে উপন্ন জন্মালি তহবিল হইতেই তাবিণী দেবীর ভরণ-পোষণ এবং দেবসেবা চলিত। রামমোহন রায় দেবসেবার খবচ বন্ধ করিয়া দেওয়াতেই বোধ হয় মাতাপুত্র বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাদের সমসময়ে তিনি নপরিবারে রঘুনাথপুত্রের নতুন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। বেচারাম সেনের এই কথা কথায় মাতা-পুত্রের বিবাদের সম্ভাবজনক বিবরণ পাওয়া যায় না। আত্মীয় সভা স্থাপনের সমসময়ে সম্ভবতঃ রামমোহন রায় দেবসেবার খবচ বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া ছিলেন। বেচারাম সেনের কথা অনুসারে মনে হয়, ১৮১৬ সালের শেষ পর্যন্তও তিনি এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করেন নাই। রামমোহন রায়ের পরিবার রঘুনাথপুত্রের উম্মি গেল, এবং তিনি দেবসেবার টাকা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে, মাতা-পুত্রের বিবাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিল। বেচারাম সেন রামমোহন রায়ের বাড়ী মোকামে মোহরের-গিরি করিত। জেরার উত্তরে বেচারাম বলিয়াছেন—

Saith that he was discharged from the said service on the third of Agrann in the year one thousand two hundred and twenty four owing to this deponent having sided with the Complainant Govindaprasad Roy in a matter regarding their caste in which they differed but that he was not discharged for any misconduct in service saith that about four or five days after he was discharged from the service of the defendant he entered the service of the complainant.

১২২৪ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ (১৮১৭ সালের ১৭ই নবেম্বর) সে উক্ত চাকরি (রামমোহন রায়ের দপ্তরে মোহরেরগিরি) হইতে বরখাস্ত হইয়াছিল। কারণ জাতি সম্বন্ধে বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের সহিত (রামমোহন রায়ের) যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে এই সাক্ষী (বেচারাম সেন) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। সে কোন অন্যায় আচরণের জন্য পদচ্যুত হইয়াছিল না। বিবাদের চাকরি হইতে পদচ্যুতি ৪৫ দিন পরেই সে বাদীর চাকরি লইয়াছিল।

জাতি সম্বন্ধে বিবাদ অর্থ অবশ্য দলাদলি। গোবিন্দ-প্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের সহিত দলাদলি কবিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে একঘরো করিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের রঘুনাথপুত্রের বাড়ীতে অগ্রান্ত হিন্দুর বাড়ীর মত দেবসেবা হইত না, শম্ভ ঘণ্টা বাজিত না। বোধ হয় এই অপবাদই দলাদলির উপলক্ষ হইয়াছিল। গোবিন্দ-প্রসাদ রায় গ্রামে খুড়াকে একঘরো করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন, এবং কলিকাতায় স্থগ্নিম কোর্টের একইটি বিভাগে খুড়ার নামে ১৮১৭ সালের ২৩শে জুন এক শুকতর মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার আর্জির মূল কথা পূর্ন-প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দ-প্রসাদ রায় তাঁহার আর্জিতে লিখিয়াছেন, তাঁহার পিতা

জগমোহন রায়েব মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ছিল ১৫ বৎসর বা ঐরূপ (an infant of the age of fifteen years or thereabout)। স্ততরাং দলাদলির এবং মোকদ্দমা রুজু করিবার সময় গোবিন্দপ্রসাদ রায়েব বয়স হইয়াছিল মাত্র ২০ বৎসর। এইরূপ অপরিণতবয়স্ক এবং অনভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে রামমোহন রায়েব মত প্রবল এবং প্রভাবশালী খুড়ার সঙ্গে স্বেচ্ছায় এমন বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না। লালুড়পাড়া বাড়ীর কর্তা ছিলেন তাঁহার মাতামহী তাবিণী দেবী। তারিণী দেবীর অল্পমতি এবং সহায়তা ব্যতীত গোবিন্দপ্রসাদ রায় কখনই এইরূপ দুর্ব্ব কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। রামমোহন রায় স্বয়ং স্পষ্টাক্ষেপে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায় তারিণী দেবীকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষী মান্ত কবিয়াছিলেন। তাবিণী দেবী জবানবন্দী দিতে আসিলে তাঁহাকে জেরা করিবার ক্ষমতা রামমোহন রায় ১৮১৯ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর স্থগ্নিম কোর্টে কতকগুলি প্রশ্ন (interrogatories) দাখিল করিয়াছিলেন। ভ্রমধ্যে একাদশ প্রশ্নটি এই—

Eleventh interrogatory—Have you not had serious disputes and differences with your Son the Defendant Rammohun Roy on account of his religious opinions and have not instigated and prevailed on your grandson the complainant to institute the present suit against the defendant; as a measure of revenge, because the said defendant hath refused to practice the rites and ceremonies of the Hindu Religion in the manner in which you wish the same to be practiced or performed? Have not you and the complainant and other members of your family estranged yourself and themselves from all intercourse with the Defendant on account of his religious opinions and writings? Have you not repeatedly declared that you desire the ruin of the defendant and that there will not only be no sin but that it will be meritorious to effect the temporal ruin of the Defendant, provided he shall not resume or follow the religious usages and worship of his forefathers? Have you not publicly declared that it will not be sinful to take away the life of a Hindoo who forsakes the idolatry and ceremonies of worship, usually practiced by

persons of that religion? Has not the Defendant in fact refused to practice the rites and ceremonies of the Hindoo religion in respect to the worship of Idols? Have not you, and the complainant and others of defendant's relations had several meetings and conversations on this subject and declare solemnly on your oath, whether you do not know and believe that the present suit would not have been instituted if the Defendant had not acted in religious matters contrary to your wishes and entreaties and differently from the practices of his ancestors? Do you not in your conscience believe that you will be justified in giving false testimony and in doing everything in your power to effect the ruin of the defendant and to enable the complainant to succeed in the present suit, inasmuch as the defendant has refused to continue the worship of Idols? Did you not since the commencement of this suit make a personal application to the defendant at his house in Simulea in Calcutta for the grant of a piece of land that the profits thereof might be applied towards the worship of an idol and did not the defendant offer you a large sum of money to be distributed in charity to the poor, but refuse to contribute in any manner to the encouragement of the worship of idols? Were you not on that occasion exceedingly displeased with the defendant and did you not then express your displeasure and threaten the defendant for having refused to comply with your request? Declare &c.

ধর্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া আপনাদের সহিত আপনাদের পুত্র, এই মোকদ্দমার বিবাদী, রামমোহন রায়ের গুরুতর বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল কি না? যে বীতিতে আপনি বিবাদীকে হিন্দুধর্মের পূজা-পার্ব অমুষ্ঠান করিতে বলেন সেই রীতিতে সে তাহা অমুষ্ঠান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত আপনি আপনার শোঁত বাদী (গোবিন্দপ্রসাদকে) এই মোকদ্দমা রুজু করিতে প্ররোচিত করিয়াছেন কি না? ধর্মবিষয়ক মতামতের এক রচনাবলীর জন্ত আপনি, এই মোকদ্দমার বাদী, এক আপনাদের পরিবারের অন্তর্গত সকলে, বিবাদীর সহিত সকল প্রকার আহার ব্যবহার ত্যাগ করিয়াছেন কি না? বিবাদী যদি তাহার পূর্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়াকাণ্ড এবং পূজা-পার্ব অমুষ্ঠান

না করে তবে আপনি বিবাদীর সর্বনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, এই কথা, এবং বিবাদীর সর্বনাশ করিলে অধুনা পাপ হইবে না বরং পুণ্য হইবে, এই কথা আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন কি না? আপনি কি একান্তে ঘোষণা করেন নাই যে, যে হিন্দু হিন্দুগণের দ্বারা বরাদ্দ আচরিত মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে তাহাকে হত্যা করিলে পাপ হইবে না? বিবাদী কি প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্তিপূজা সম্বন্ধীয় হিন্দু ক্রিয়াকর্ম অমুষ্ঠান করিতে অস্বীকার করেন নাই? আপনাদের মোকদ্দমার বাদীব (গোবিন্দপ্রসাদের) এবং বিবাদীর অন্তর্গত আত্মীয় বর্গগণের মধ্যে কি এই বিষয় লইয়া অনেক বৈঠক এবং কথাবার্তা হইয়াছে? আপনি শপথ করিয়া বলুন, আপনি জানেন কি না এবং বিশ্বাস করেন কি না, বিবাদী যদি ধর্ম বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায়ের এবং অনুরোধ-উপরোধের বিদ্রোহে কাঁচ না করিত এবং পূর্বপুরুষগণের আচারের অন্তর্গত না করিত, তবে এই মোকদ্দমা রুজু হইত না? আপনি কি মনে মনে বিশ্বাস করেন না যে, যেহেতু বিবাদী মূর্তিপূজা চালাইতে অস্বীকৃত হইয়াছে, হতরায় বিবাদীকে সর্বস্বান্ত করিবার জন্ত এক বাদীকে এই মোকদ্দমার জমী করিবার জন্ত আপনাদের মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করা চাযনরত? এই মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার পর আপনি কি বিবাদীর সিমলা বাড়ীতে বসিয়া আসিয়া মূর্তি পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য বিবাদীকে একশত জমী দান করিতে অনুরোধ করেন নাই? বিবাদী কি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য আপনাকে অনেক টাকা দিতে চাহে নাই, কিন্তু গোত্রলিকতা প্রভৃতি দিবার জন্য কোন প্রকার দান করিতে কি সে অস্বীকৃত হয় নাই? সেই ঘটনার সময় আপনি কি বিবাদীর প্রতি বিশেষ অসন্তোষ হইয়াছিলেন না, এবং বিবাদী আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া আপনি কি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন না, এবং বিবাদীকে কি ভৎ প্রেছাইয়াছিলেন না?

ইংরেজী বেদান্তসারের মুখবন্ধে এবং বেচারাম সেনের জ্ঞানবন্দীতে যে বিবাদের আভাস পাওয়া যায়, এখানে রামমোহন রায় নিজে তাহা প্রমাণভাবে খোলাসা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে স্বধর্ম ত্যাগের তুল্য অপরাধ নাই। এই অপরাধে পিতামাতা পুত্রকে “ভাজ্যপুত্র” (disinherit) করিতেন। রামমোহন রায়কে আর “ভাজ্যপুত্র” কহিবার উপায় ছিল না। তারিণী দেবী স্বধর্মত্যাগী পুত্রের তাহার ষোপাঙ্কিত সম্পত্তির অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত পৌত্র গোবিন্দপ্রসাদের দ্বারা স্প্রিট কোর্টের একইটি বিভাগে এই মোকদ্দমা রুজু কবাইয়াছিলেন।

মাতা-পুত্রের এই বিরোধে সংবাদ সেকালে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, এক ইউরোপীয় সমাজেও পৌছিয়াছিল। কলিকাতার টাইমস পত্রের সম্পাদক মসিমে দাকোস্তা (D'Costa) ১৮১৮ সালের ৮ই নবেম্বর লিখিয়াছিলেন—

সকলেই জানে, রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার (ধর্ম এবং সমাজ) সংস্কারের সকল উদ্দেশ্যের প্রবল বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রবাদের সভ্যতা সমগ্রাণ করে। তাঁহার কেহই, এমন কি তাহার স্ত্রীও, তাহার সহিত কলিকাতা অধিবেশন চাহেন না। এই নিমিত্ত তাহার বর্ধমানে (তৎকালে গুলী জেলায়) যেখানে বাস করেন সেখানে রামমোহন রায় কদাচিৎ গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তাহার তাঁহার ভাতৃপুত্রের শিক্ষাব তত্ত্বাবধান সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টি বিবাহ করিয়াছেন। হিন্দুদিগের গোষ্ঠিকভাষ্যসের ডেপুটি রামমোহন রায় যেকণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার ধর্ম্মজ্ঞ মতাও অবিকৃত তাহার বিরুদ্ধাচরণে সেইকণ আগ্রহ প্রকাশ করেন।*

রামমোহন রায় যদি ভাতৃপুত্র গোবিন্দপ্রসাদের শিক্ষার ভার পাইতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কলিকাতায় আনিয়া তাঁহাকে ইংরেজী পড়াইতেন। সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমার সকল ইংরেজী কাগজপত্রেই গোবিন্দপ্রসাদের বাংলা দস্তখৎ দেখা যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে গোবিন্দপ্রসাদ ইংরেজী জ্ঞানিতেন না। বামমোহন রায়ের পক্ষে গোবিন্দপ্রসাদের শিক্ষাব ভার নিজে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা, এবং তারিণী দেবীর পক্ষে তাহাতে আপত্তি করা, দুইই স্বাভাবিক। সুতরাং দাকোস্তার এই সংবাদ অবিবাস কবা যায় না। মাতা-পুত্র উভয়ের মত বিভিন্ন হইলেও, মন একই রূপ উপাদানে গঠিত ছিল। উভয়ের মনেবই প্রধান অঙ্গ ছিল, গভীর বিশ্বাস এবং বজ্রদূত সংকল্প। এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন মাতা-পুত্রের মধ্যে যখন ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন সেই বিরোধ যে শেষ পর্য্যন্ত গড়াইবে ইহাতে বিশ্বাসের কিছু নাই।

উপবে উদ্ধৃত তারিণী দেবীর জেরার একাদশ প্রশ্নের শেষ ভাগ পাঠ করিলে দেখা যায়, মোকদ্দমা ক্ষুদ্র হইবার পর তাবিণী দেবীর মন একটু নরম হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং কলিকাতায় সিমলার বাড়ীতে আসিয়া রামমোহনকে বলিয়াছিলেন, “আচ্ছা, তুমি নিজে মূর্ত্তি পূজা না-ই বা করিলে; তুমি দেবসেবাব জন্ত কিছু সম্পত্তি দান কব।” মোসলমান নবাব এবং বাদসাহগণ ক্ষরমান সম্পাদন করিয়া এইরূপ অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মাতার এই প্রার্থনায় রামমোহনের মন গলিল না। তিনি দরিদ্রদিগকে দান করিবার জন্ত অনেক টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু মূর্ত্তিপূজার জন্ত স্বেচ্ছা তুমি দিতে সম্মত হইলেন না। সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা চলিতে লাগিল।

এই যুগে সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করা বহু ব্যয়সাধ্য এবং সর্ব্বস্বাস্তকর ছিল। ১৮২২ সালের ৩১শে অক্টোবরের

(১২৩৬ সালের ১৬ই কার্তিকের) “সমাচার দর্পণে” লিখিত হইয়াছে—

পত সোমবার ইতিবা গেজেটে লেখা আছে যে বর্তমান টর্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিম কোর্টে বিচারহওনার্থ কেবল পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্বে টর্মের আরম্ভকালে বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না। হিন্দু লোকেরা এখন ভুক্তভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অধিতীষ সুপ্রিম কোর্টের পণ্ডিত যে ৮মুদ্রাঙ্ক বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিম কোর্টে প্রার্থিত হইয়াছেন তাহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের শ্রমণে আইসে যে ইহার পূর্বে সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমা করণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিম কোর্টে অমুকের দুই তিনটা এন্ট্রির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেকণ সন্ত্রম প্রাপ্ত হইতেন আমাদের বোধ হয় যে মুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সন্মান প্রাপ্ত হইতেন না।*

সুপ্রিম কোর্টের একুইটাতে মোকদ্দমা করিয়া এক পক্ষে গোবিন্দপ্রসাদ রায় এবং তারিণী দেবী, এবং অপর পক্ষে বামমোহন রায়, যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না। দুই বৎসর মোকদ্দমা চালাইবার পর, ১৮১৯ সালেব ২৪শে আগষ্ট, গোবিন্দপ্রসাদ রায় কোর্টের নিকট আবেদন কবিতাছিলেন, তাহার অবস্থা তখন এমন কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাঁহাকে পপার (দরিদ্র) রূপে মোকদ্দমা করিতে না দিলে তিনি আর মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেন না। এই আবেদনের সমর্থনে গোবিন্দপ্রসাদ রায় ঐ তাবিখে একিডেবিট করিয়াছিলেন যে, তাহার আয় দেনা পরিশোধ কবিবাব পর তাহার একশত আর্কট টাকা মূল্যের সম্পত্তি, পরিধানের কাপড়-চোপড় এবং বিছানাপত্র ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।† কোর্ট প্রথমতঃ গোবিন্দপ্রসাদের আবেদন মঞ্জুব কবিতা তাহাকে পপার রূপে (অর্থাৎ সবকারী ব্যয়ে) মোকদ্দমা চালাইবার অল্পমতি দিয়াছিলেন। তারপর রামমোহন রায় যখন সাক্ষীসাবুদ দিয়া দেখাইলেন যে তখনও গোবিন্দপ্রসাদের বার হাজার টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি এবং ১৬৯০ টাকা কর্জ লাগান আছে তখন কোর্ট সেই অল্পমতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। ইহার পর গোবিন্দপ্রসাদের এটর্নি এবং ব্যাবিষ্টার আর কোর্টে উপস্থিত হয় নাই, এবং শুনানীর দিন সওয়াল জবাব করে নাই। হযত তখন

* It is known that every member of his family verifies the proverb, by opposing with greatest vehemence all his projects of reform. None of them, not even his wife, would accompany him to Calcutta; in consequence of which he rarely visits them in Bordonan, where they reside. They have disputed with him even the superintendence of the education of his nephews; and his fanatical mother shows as much ardour in her incessant opposition to him, as he displays in his attempts to destroy the idolatry of the Hindoos.” Mary Carpenter, *op. cit.* p. 54.

* শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সংবাদ পত্রে সেকালের কথা”, প্রথম খণ্ড, ১১৫ পৃ: (সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত)।

† Saith that he this Deponent is not after payment of all his just Debts worth the sum of one hundred Arcot Rupees in the world save and except the wearing apparel and bedding of him the Deponent.

গোবিন্দপ্রসাদের এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণের হস্তে ব্যাবিষ্টারের ফি দিবার উপযোগী নগদ টাকা ছিল না। আমরা মোকদ্দমার বিবরণে দেখিতে পাইব, সওয়াল-জবাবে গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের ব্যাবিষ্টারের কিছু বলিবারও ছিল না। এই মোকদ্দমায় গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে তারিণী দেবীকে সাক্ষী মান্ত করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাকে হাজির করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ সপিনা জারি করা হইয়াছিল। তারিণী দেবী জবানবন্দী দিতে উপস্থিত হইবেন এই আশঙ্কায় রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে জেরার প্রশ্নও দাখিল করা হইয়াছিল এই কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাবিণী দেবী জবানবন্দী দিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহার কারণ কি? আবার কি তাঁহার মন নরম হইয়াছিল? কিন্তু এইরূপ অল্পমান করিবার কারণ নাই। তারিণী দেবীর সাক্ষ্য না দিবার এক কারণ হইতে পারে, তিনি শপথ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার কঠিন মন যে তখনও নরম হয় নাই তাহার প্রমাণ, গোবিন্দ প্রসাদের মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার এক বৎসর তিন মাস পবে, তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী ১৮২১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে সুপ্রিম কোর্টের একুইটীতে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আর একটি মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন।^{১০} তারিণী দেবীর অল্পমতি ব্যতীত এই মোকদ্দমা রুজু করা হইতে পারিত না। গোবিন্দপ্রসাদ রায় দাবী করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের অধিকৃত গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বর নামক দুই তালুকে তাঁহার পিতাব উত্তরাধিকার স্বত্রে প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ। গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গা দেবী নিজের ধরিদা সম্পত্তি বলিয়া এই দুইখানি তালুকের বোল আনাই দাবী করিয়াছিলেন। ১৮২১ সালের ৩০শে নবেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দুর্গা দেবীর দাবী ডিসমিস করিয়াছিলেন। তারপবে তারিণী দেবীর এবং তাঁহার অল্পগত দুর্গা দেবী এবং গোবিন্দ-প্রসাদের আব কোন মোকদ্দমা করিয়া রামমোহন রায়ের কতক সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবার উপায় ছিল না। এই দুইটি মোকদ্দমার ফলে গোবিন্দপ্রসাদ বোধ হয় নিশ্চয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং এখন চাকরীর জন্ত খুড়ার শরণাগত হওয়া ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। ১৮২১ সালে ডিগবী সাহেব বর্ধমানের কালেক্টর নিযুক্ত

হইয়াছিলেন। ১৮২২ সালের ১৬ই নবেম্বর তারিখে বোর্ড অব রেভিনিউর সেক্রেটারী বরাববে লিখিত একখানি চিঠিতে ডিগবী সাহেব লিখিতেছেন, তিনি গোবিন্দপ্রসাদ বায়কে আবগারী মহালের তহশীলদার মনোনীত করিয়াছেন, এবং ষারিকানাখ ঠাকুর তাঁহার জামীন হইতে সম্মত হইয়াছেন। সুতরাং হুড়া ভাইপোর মিলন ঘটয়াছিল। কিন্তু মাতা-পুত্রের পুনর্মিলন কখনও ঘটয়াছিল কি? ডাক্তার কার্পেন্টারের লিখিত রামমোহন বায়ের জীবনচরিতে মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ বিষয় এই বিবরণ আছে—

“রামমোহন রায়ের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁহার বিব্রূতচরণ করিয়াছিলেন। স্বার্থপর মন্ত্রণাধীনগণের পরামর্শানুসারে তাঁহার মাতা তাঁহার যোরতন শত্রুতাচরণ কবিয়াছিলেন। রামমোহন বায়েব জীবনের প্রথম ভাগে তাঁহার মাতা অসুস্থমতি বহিষ্য পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসেব প্রভাবে তিনি পুত্রের যোরতন শত্রুগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন কিন্তু মতান্তর প্রতি বিশেষ অনুভূতি প্রদর্শন করিতেন। স্নেহাচ্ছন্ন নয়নে তিনি (রামমোহন) আশাবাদগকে বলিয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি য আচরণ করিয়াছিলেন তৎক্ষণ অমৃত্যু করিয়াছিলেন। যদিও তিনি (মাতা) জানিতেন রামমোহনের মত ই সত্য, তিনি গোষ্ঠলিত পাচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারেন নাই। শেষবার জগন্নাথ তাঁর যাত্রায় পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, “রামমোহন, তোমার কথাই সত্য। আমি অবলা নারী। এই সকল আচার-অনুষ্ঠান আমাকে শাস্তি দান করে; এই বৃদ্ধ বয়সে আমি ইহা-দিগকে ত্যাগ করিতে পারি না।” জগন্নাথ স্তব্ধে তাঁহার বৃত্তা ঘটয়াছিল। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া তারিণী দেবী এই সকল কর্ম অনুষ্ঠান করিতেন। (জগন্নাথ যাত্রাকালে) তিনি কোন পরিচারিকা সঙ্গে লইতে সম্মত হইবেন নাই। পথে তাঁহার আহারের বা আরামের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাও করিতে সেন নাই। জগন্নাথে উপস্থিত হইবা তিনি শ্রীমন্দিরে খাদ্য দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই খানে (জগন্নাথে তিনি জীবনের অবশিষ্টকাল (তদধিক না) হটক প্রায় একবৎসর কাল) অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইহাণীং আশাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মাতা (উভয়ের মধ্যে) যে সকল ঘটনা ঘটয়াছিল তাহার জন্ত গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বর যে এক অদ্বিতীয়, এবং হিন্দু কুসংস্কার যে বিফল, এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।”^{১১}

এই বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, সুপ্রিম কোর্টেব মোকদ্দমায় যে ক্ষতি হইয়াছিল তৎক্ষণ রামমোহন রায় যত না দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মমত যে তাঁহার মাতাকে বেদনা দিয়াছিল তৎক্ষণ্য তিনি দুঃখিত ছিলেন ততোধিক। মাতার জেরার জন্ত রামমোহন রায় যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা পাঠ কবিলে তাঁহার মনের বিবক্তির

* Mary Carpenter, *op. cit.*, pp. 9-10. অনুবাদ টিক শব্দানুগত নহে, ভাবানুগত।

যে-পরিচয় পাওয়া যায়, কালে তাহা লোপ পাইয়াছিল, এবং মাতার প্রতি স্বাভাবিক মমতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পাঁচ বৎসরব্যাপী দলাদলির এবং বহুব্যস্তাধ মোকদ্দমার পর তারিণী দেবী অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রামমোহনকে তাঁহার ধর্মমত পবিত্র করিতে বাধ্য করা অসাধ্য; হুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ আত্ম-প্রকাশের অবকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুত্রের নিকট ক্রটি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে সাঙ্ঘনা দিরাছিলেন। কিন্তু এই সংসর্গে বাস করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বরাবরই মাতুল রামমোহন রায়ের অঙ্গুগত ছিলেন। গুরুদাস এবং রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠত ভাই রামতল্ল রায়—এই দুইজনে বোধ হয় রামমোহন রায়ের ধর্মমতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন সুপ্রিম কোর্টের একুইটি বিভাগে গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমা চলিতেছিল, তখন, ১৮১৮ সালের ২৭শে আগষ্ট, রামমোহন রায় নিজপক্ষেব সাক্ষীদিগের জন্ত প্রশ্নমালা (interrogatories) দাখিল করিয়াছিলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে এই সকল সাক্ষীকে কোর্টে হাজির করিয়া হলপ করান হইয়াছিল। প্রশ্নমালাব সঙ্গেই হলপের বিবরণ আছে। এই বিবরণে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রামতল্ল রায়, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় এই চারিজন সাক্ষীর প্রত্যেকের সম্বন্ধে এই মন্তব্য লিখিত আছে—

This witness was not sworn in the ordinary way but in the manner declared by him to be the most binding on his conscience and admitted to be so by the Court Pundit by whom the oath was administered.

এই সাক্ষীকে প্রচলিত রীতিতে হলপ করান হয় নাই, কিন্তু যে রীতির হলপ তাঁহার বিবেকে একান্ত বলীভূত করিতে পারিবে বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন সেই রীতিতে তাঁহাকে হলপ করান হইয়াছিল।

কোর্টের যে পণ্ডিত হলপ করাইয়াছিলেন তিনি ইহা মানিয়া লইয়াছিলেন।

গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমার নথীতে রামমোহন রায়ের জবাব (answer of the defendant) পাওয়া যায় না। দুর্গা দেবী বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমায় রামমোহন রায় ১৮২১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর যে জবাব দাখিল করিয়াছিলেন তাহার শেষভাগে লিখিত আছে—

This answer was taken and the abovenamed Defendant Rammohun Roy was duly sworn to the truth thereof according to his faith this 3rd day of September 1821.

The Defendant in addition to the ordinary mode of swearing for a person of his caste and condition held in his Hands at the time the Vedant.

অর্থাৎ রামমোহন রায় জবাব দাখিল করার সময় নিজের ধর্মবিশ্বাসানুসারে হলপ করিয়াছিলেন। এতদ্বিধ তখন তাঁহার হাতে “বেদান্ত” ছিল।

যে ধর্মবিশ্বাসানুসারে রামমোহন রায় স্বয়ং হলপ করিয়াছিলেন, গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, রামতল্ল রায় প্রভৃতিও বোধ হয় তদনুসারে হলপ কবিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ কবিয়াছিলেন।

দুর্গা দেবী মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার পূর্বে গোবিন্দপ্রসাদও খুড়ার আশ্রয় লইয়াছিলেন। তারিণী দেবী তখন চিরতরে লাজুড়পাড়ার বাড়ীর দেবসেবা ত্যাগ করিয়া জগন্নাথ যাত্রা করিলেন। তিনি সঙ্গে কোন পরিচারিকা লইলেন না, এবং বোধ হয়, পুত্রকে পথের সুবিধার জন্ত কোন ব্যবস্থাও করিতে দিলেন না। প্রায় ভিখারিণীর বেশে জগন্নাথ গিয়া, মন্দিরে ঝাড়ু দেওয়ার ব্রত পালন করিয়া, বৎসরের পরে তিনি বৈষ্ণব সেই মহাতীর্থক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিলেন। রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার মাতা তারিণী দেবীর বিরোধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা।



ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

পূর্ব পরিচয়

দ্বনী জমিদার শচীন্দ্রনাথ প্রয়াগে ত্রিবেণী ব্রহ্মসেলার তার হস্তরী পত্নী কমলা ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে বহু অমুসন্ধানের পর হতাশ-ভগ্নচিত্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লগনে পৌঁছেই অরে বেহেশ হ'য়ে পড়ে। লগনে পালিত পিতৃহীন চাকুরীজীবী পার্কার্ভী অন্ত্রান্ত সেবায় তাকে হ্রস্ব করে এক বিবাহিত না স্ত্রেনে তাকে ভালবাসে। পরে শচীন্দ্রের অমুরোধে পার্কার্ভী ভারতবর্ষে ফিরে কমলার স্মৃতিকল্পে এক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করে। প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুরী।

এদিকে বৎসরের পর বৎসর নারীপ্রতিষ্ঠানের চক্রে আবর্তিত কার্যপকস্পরাব পার্কার্ভীর মন এক এক সময় শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তবু তার অন্তর্নিহিত প্রেমের মোহে শচীন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে দূরে যেতে পারে না। শচীন্দ্রের অন্তরে কমলার স্মৃতি ক্রমে নিশ্চল হ'বে আসে, তবু প্রীতির প্রতি একনিষ্ঠতার অত্যন্ত তার চিন্ত পার্কার্ভীর প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রেমের প্রত্যেক জোরে ক'রে অধীকার করে অখণ্ড পার্কার্ভীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সূত্রে তার আকর্ষণ বেড়ে চলে। এই জ্বলের আন্দোলনে তার চিন্ত দোলায়মান।

প্রয়াগ থেকে বাতাল উপলক্ষনাথ কমলাকে কীকি দিয়ে কলকাতায় এনে তার বাড়ীতে বস্তু করে এবং অত্যাচারে একদা পাশের বাড়ীতে নন্দলাল ও তার স্ত্রী মালতীর আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে পড়ে। কট্টিন পাড়ায় সমস্ত নামের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। নন্দ কমলের রূপে আবুত। কমলা এই দুইদিক থেকে মালতী ও নিজেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে এক হাসপাতালে নাসের কাজ শিখতে যায়। সেখানে ডাক্তার নিখিলনাথের সহায়ত্ব ও সাহায্য লাভ করে। এদিকে স্নেহময়ী সরলা মালতী কমলার পূজা অঙ্কনকে তার নিঃসন্তান মাছুসলের সব প্রেইটুকু উজ্জাদ ক'রে ভালবেসেছে—এ বাড়ীতে কমলাকে নাম দেওয়া হয়েছে জ্যোৎস্না।

নিখিলনাথ জনহিতব্রতী। একদা বিদগ্ধী মেয়ে সীমার শাহানে শ্রীরামপুরে গিয়ে তার পূর্ব নামক সত্যাবানকে এক পোড়ো বাড়ীতে যুক্তকর অবস্থায় দেখে। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে তার অসাধারণ বলে মনে হয়। সত্যাবানের মুখে পুলিশের জলিতে তাদের দলের সকলের মৃত্যু, নিজে আহত অবস্থায় সীমার সাহায্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, বনে জঙ্গলে, পরিত্যক্ত কুটারে পালিয়ে বেড়ানোর ইতিহাস, সীমার বীৰ্য এবং দেশপ্রীতির কথা শুনে এক নিজের চোখে তার শ্রান্তিহীন একনিষ্ঠতা দেখে তার প্রতি অমুরজ হয়।

বিদগ্ধের আশ্রমে এতগুলি মহায়ুগ্য প্রাপকে বিসর্জন দেওয়ার বৃত্তাকালে অমুতপ্ত সত্যাবান সীমাকে এই আশ্রম থেকে বাঁচাবার ক্ষেত্রে নিখিলনাথকে বলে।

নন্দলাল হাসপাতালে আত্মীয় হিসাবে কমলার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যায় এবং তার বিকৃতচিত্তের আক্রমণে একদা নিখিলনাথ সবক্ষে

কমলাকে অপমান করে এক তারই সন্ধ্যাতে কিছুদিন তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

মালতীর বহু সাধ্য সাধনার পর মালতীর সঙ্গে সে কমলের হাসপাতালে গেল।

কমলা ডাক্তারীয় মাখার যন্ত্রণাব পীড়িত হয়ে পড়েছিল।

সত্যাবানের মৃত্যু। পথ দেখিয়ে নিখিলকে নিয়ে সীমার পলায়ন এবং নিখিলের অমুনয় সন্ধ্যাও কট্টিন হু-র নিখিলকে স্টেশনের পথ দেখিয়ে উদ্ভুক্ত প্রান্তরে রেখে সীমার বনের মধ্যে প্রবেশ।

শচীন্দ্র মনে মনে বহু তোলপাড়ার পর পার্কার্ভীর প্রতি করুণাত্তেই বোধ করি, তার প্রতি তাব উদ্ভ্রান্ত চিন্তের প্রথম নিবেদনের স্টেশার উচ্চাস প্রকাশ করতে উদ্যত হল কিন্তু পার্কার্ভীর সামনে সে চপলতা করতে মনে বাধা পেয়ে নিবৃত্ত হল।

৩৭

খাওয়া-দাওয়ার পর লঞ্চে ফিরে যাবার পথে পার্কার্ভী তাকে বললে, “আপনি কেন আজ এত বিচলিত হয়েছেন? আপনার কাছে আমার এই অরুণোষ যে এরকম মন নিয়ে কোন কিছু ভেবে স্থির করবেন না। তাতে ফল ভাল হয় না। নিজেকে সম্পূর্ণ বোঝাবার অবসর বা অবস্থা মাল্লবের তখন থাকে না, যখন—”

শচীন্দ্রের মন আবার কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে লেগে গেল, “দেখ, যে-কথা আজ আমি প্রকাশ করতে চেয়েছি সে-কথা আজকের বিচলিত মন নিয়ে আমি ভাবি নি। আমি অনেক দিন থেকেই যা নিয়ে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করছি তাকেই তোমার কাছে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে ঠিকমত পারি নি, কিন্তু জানি সে তুমি এরকম ক'রে বুঝে নিয়েছ।”

পার্কর্ভী বাধা দিয়ে বললে, “বুঝেছি বলেই আপনাকে প্রায় দিতে আমার বেধেছে। আপনি সম্পূর্ণ শাস্ত হয়ে চিন্তা করবার অবসর নিন। আমি আমার প্রতি আপনার করুণার অবকাশে আপনার চিরদিনের দুঃখের কাবণ ঘটতে দেব না। তা ছাড়া আমার পক্ষেও—” বলে সে থেমে গেল।

পার্বতীর কথাগুলির মধ্যে আহত অভিমানের নীরস্তা এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল যে শচীন্দ্রের অভিমানকে তা আঘাত না করে পারল না। তবু একটু শুষ্ক পরিহাসের হাসি মুখের উপর টেনে এনে সে বললে, “দুঃখের কারণই ত এতদিন ছিল, নিজের প্রতি নিষ্করণ ছিলুম বলে। আজ তাবই প্রতিকার করতে চাইছি। এখন কক্ষাটা তোমার উপর, না, আমার নিজের, তাই আজ পরখ ক’বে দেখতে চাই। নইলে দেখেছ না—”

পার্বতী স্পষ্টই দেখলে যে শচীন্দ্রের চিত্ত আজ তার কথা গভীর ভাবে গ্রহণ করবার অবস্থায় নেই। সে আজ সকল কথাকেই লঘুতাব স্পর্শে আপাত মনোরম করে তুলতে চায়; এবং যে-প্রেম একপ্রকার নিবেদন করাই হ’লে পেছে তাকে মজুর-ভাবে কথাটাকে আপাতত চাপা দিয়ে বিদায় নিয়ে যাওয়া তার অভিপ্রায়। সে শচীন্দ্রের কথা অসম্পূর্ণ রেখে তাকে বাধা দিয়ে বললে, “আপনি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেন নি। দিনে দিনে তিলে তিলে ধীর স্বাতি আপনাদের সমস্ত জীবন সমগ্র অস্তিত্বকে পূর্ণ করেছে, সার্থক করেছে, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানেই তার মহা অবসান ঘটল এমন মিথ্যা কথা আপনি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করবেন না; আমাকেও না।”

শেষ কথাগুলিতে শচীন্দ্রকে যেন কণাঘাত কবলে। সে চূপ করে চলতে লাগল। নিজের বাচালতা ও লঘুপ্রায় নিজেকে এমন মূল্যহীন করাতে নিজের উপর তার বিরক্তিব আর সীমা রইল না। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে মনে আন্তরিক সমস্ত ঘটনা সে পর্যালোচনা করে দেখলে এবং নিজের প্রেম যে সে সম্প্রতি করে নিবেদন করে নি এই কথা তার অভিমানমূঢ় চিত্তে যেন কথঞ্চিৎ সাস্থ্য দান করলে। পার্বতীর উক্তির সূত্রে যেন সে আপাতমুজিব পথ খুঁজে পেল। সে নিজেকে এই বলে বোঝাল যে, পার্বতীর কথাই ঠিক। সত্যিই পার্বতীর দুঃখদৈন্তপূর্ণ বঞ্চিত জীবনের প্রতি কক্ষাতেই তার এই ‘রজ্জুপ্রম’। হয়ত কৃতজ্ঞতাবেই সে প্রেম বলে মনে করছে। হয়ত পার্বতীর গুণের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতিত্বকে সে প্রেম বলে তুল কবেছে। নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখলে, সে তার নিকৃষ্ট পত্নীর স্বভাবকে চিরজাগ্রত রাখার চেষ্টায় তিলে

তিলে পলে পলে নিজের সমস্ত বিস্ত সমস্ত শক্তি সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করে চলেছে। দেখলে যে এই দীর্ঘ চার-পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ-ভিন্ন তার অন্য কাজ ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না; এই প্রতিষ্ঠানকে সুন্দর সম্পূর্ণ করবার প্রয়াস ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। সে আরও দেখলে, এই নাবী—যার প্রতি আকর্ষণকে সে আজ প্রেম বলে কল্পনা করছে—এই নারীও সেই বৃহৎসজ্জের সমিধ মাত্র; দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচে সে তাকে এই যজ্ঞে বলি দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। যে-স্বাতি এত বৃহৎ হয়ে তার সমস্ত জীবনকে ওত-প্রোত রূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে তার জীবন থেকে বাদ দেবে কোন উপায়ে?

এমনি করে নিজেকে বুঝিয়ে বিদায় নিয়ে সে লঞ্চে গিয়ে উঠল।

পার্বতীর দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট করে উপলব্ধি কবার মত মন তার স্বচ্ছ ছিল না। চিন্তা সে সূক্ষ্মভাবেই করত, কিন্তু সে-চিন্তা ছিল একদেশদর্শী। পার্বতীর মনের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলে তার চিরবিধুর চিত্তের শান্তি এবং শ্রাস্ত নয়নের নিদ্রা হরণ করে নিয়ে তাকে তার শূন্য গৃহে এবং শুষ্ক কর্মক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে গেল, শচীন্দ্রের আত্মপ্রতারণিত আত্মকেন্দ্রাহণ চিত্তে তার খবর পৌঁছল না। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিন্তা না করে নিতান্ত সহজ ভাবে নিজের দিকে দৃষ্টিপাত কবলেই এ-কথা তার কাছে সম্প্রতি থাকত না যে, চার বৎসর পূর্বে তার পত্নীকে স্বরণ করে যে-উদ্যোগ সে আরম্ভ করেছিল তার পত্নী সেই বিপুল আয়োজনের অন্তরালে একদিন নিশ্চিহ্ন-সমাধি লাভ করেছে। কত দিনেব পর দিন অভিবাহিত হয়েছে, কমলা তাব মনের স্বতিপটে ছায়াপাত মাত্র করে নি; কমলাপুরী হয়েছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার স্থটি এবং সেই স্থটির প্রত্যেক বর্গইকি তার চিত্তে পার্বতীর জীবন্ত প্রত্যক্ষতায় পবিপূর্ণ।

নিজের গৃহকোটরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে একটা অসীম শূন্যতা একটা অপূর্ণাহত বিস্ততা পার্বতীর সমস্ত বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। শয়নকক্ষেব তপ্ত আবেষ্টন পার্বতীর কাছে মৃত্যুপারের নিখাসনিরোধী সমাধিগৃহেরব মত মনে হ’তে লাগল। ক্রতপদে বারান্দায় বেরিয়ে সে

শচীশ্বরের পবিত্রতায় তার নিত্য আশ্রয়দাত্রী আরামকেদারার চিত্রিত এসে এলিয়ে পড়ল।

শচীশ্বরের সাগ্রহ আত্মনিবেদনের উচ্ছ্বাসকে রূঢ় ভাষাতে সংযত করে তার নিজেরই উন্মুখ বুদ্ধিস্থিত চিত্তকে যে সে বঞ্চিত করেছে সে-কথা তার মনে এল না। ঐ যে বিরহ-বিধুর বৃহৎশিশু নিতান্ত নির্ভরপরায়ণ হৃদয়টিকে নিয়ে একান্ত ব্যাকুল বিশ্বাসে এসে তার হৃদয়-বাতায়নে তার স্নেহের আশ্রয় আকাজ্ঞা করে বড় আশায় তার দিকে হাত বাড়িয়েছিল মৃদু অনাথের মত শচীশ্বরের সেই মুখের ভাবখানা পার্শ্বতীর প্রেমার্জ চিত্তকে পীড়িত করতে লাগল। তার নিজের আচরণ তার কাছে অহঙ্কারপ্রসূত কৃত্রিম আত্মসম্মানের অভিনয় বলে মনে হ'ল। শচীশ্বরের গভীর স্নেহের বাস্তব স্পর্শ যেন সে হৃদয়ের মধ্যে অল্পভব করলে। তার অল্পতপ্ত চিত্ত মনে মনে শচীশ্বরের ব্যথিত মুক্তিকে কল্পনায় তার কাছে টেনে নিয়ে স্নেহে সমাদরে তার মাথার চুকে চেপে ধরে যেন বারম্বার সাক্ষ্য দিতে লাগল। উচ্ছ্বসিত অশ্রুশাশি বাধা মানতে চাইল না এবং মনে মনে সে সংকল্প করলে যে এমন বেদনাপীড়িত চিত্তে শচীশ্বরের সে বিদায় নিয়ে যেতে দেবে না। ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে হাসিমুখেই সে শচীশ্বরের বিদায় দিয়ে আসবে; জানিয়ে আসবে যে তার মনের তিস্ততা দূর হ'য়ে গেছে, তার মনে আর কোন সংশয় নেই।

ভোরের দিকে চেয়ারের উপরেই তার ক্লান্ত মাথাটা হেলিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালের রোদের রূঢ় আঘাতে চোখ মেলে যখন তার ঘুম ভাঙল, লক্ষ তখন গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছে। মনটা তার অত্যন্ত ত্রিয়মাণ হ'য়ে গেল, কিন্তু কাল রজনীর অল্পতাপের তীব্রতা তার মনের মধ্যে যেন স্থান পেল না। শচীশ্বরের প্রতি তার আচরণের রুদ্ধতা তার মনে বেদনার সঞ্চার করলেও তার গোপনতম চিত্তের নিভৃত্তে যেন একটা অল্পমোদনের স্বর তার ব্যথিত হৃদয়কে সাক্ষ্য দিতে লাগল।

পার্কতীরী নিজেই এই অলস কল্পনাময় ভাববাজ্যের অবসার থেকে জোর করে ছিনিয়ে তার দৈনন্দিন কর্ম-জীবনের নীবন্ধ অনবসরের মধ্যে টেনে নিয়ে উপস্থিত করলে। মনে মনে বললে, “না, শান্তিপূর্ণ রসোত্তপ্ত গৃহবিলাস আমার

জন্ত নয়; আমৃত্যু এই সমাধিগহ্বরে বসে মৃতদেহে জীবন-সঞ্চারের ব্রত আমার। দুর্বল হ'লে আমার চলবে না।”

ভোরবেলা লক্ষ ছেড়ে বাবার সময় শচীশ্বরের অভ্যাসমত সে লঙ্কের বারানায় এসে দাঁড়াল। আকাশে শুকতাবা তখন স্নান হয়েছে, আকাশ উজ্জ্বল হ'তে দেবী নেই। আসন্ন আলোকোচ্ছ্বাসের পূর্ববর্তী স্ফুটতিমিরাবরণে জলস্থল আকাশের উপর যেন একটা অশাড়তার মোহ। গ্রামের প্রান্তবর্তী ঘাটটুকু যখন ছাড়িয়ে গেল তখন শচীশ্বরের মনটা হঠাৎ বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। কালকের বিদায়-সম্ভাষণের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিদারণ-রেনা প'ড়ে গিয়েছে। সেই কথাটাই সে তার মনের মধ্যে সার হাত একটা চাপা স্বপ্নের মত ঝেঁতে বসেছিল, এতক্ষণ সে কথা মনে হয় নি। প্রতিবারকার বিদায়ের মধ্যে আগামী বারের মিলনের আশা নিয়ে তারা দূরে যায়। তার সঞ্জীবনীশক্তি তাদের সমস্ত কর্মক্ষেত্রকে প্রাণে, আনন্দে, সৌন্দর্যে একে অন্নের কাছে আরও মধুভর নিকটতর করে তোলে। পার্কতীরী শেষ কথার কোন উপযুক্ত প্রত্যুত্তর সে দেয় নি; অথচ তার ব্যবহারে পার্কতীরীকে আঘাত করেছে অল্প নয়। বিদায়-মুহুর্তে পার্কতীরী বেদনাবিবর্ষ মুখ, এবং হাত না বাড়িয়ে “শুভ বাই” বলার ভঙ্গীটা স্বরণ করে তার মনটা পীড়িত হ'তে লাগল। এতক্ষণে নিজের আচরণের বিসদৃশতা অল্পভব সে করতে পারলে। বুঝতে পারলে যে, উচ্ছ্বাসের আবেগে পার্কতীরীকে প্রেম-নিবেদন করাও চলে না, আত্মরক্ষার্থে সাধু সাজাও তার কাছে নিশ্চয়োজন। অর্থাৎ যাই হোক, পার্কতীরী সঙ্গ আচরণে লঘুতা চলবে না। পার্কতীরী সমাজ নেই, কোন মিথ্যা আচারের আবরণ তার আবশ্যক করে না। তার সঙ্গ ব্যবহারে খাটি হওয়া চাই। সেই শক্তি মনের মধ্যে তাকে পেতেই হবে—তা সে পার্কতীরীকে গ্রহণ করার দিক থেকেই হোক বা তাকে প্রত্যাখ্যানেই হোক। এখনই লক্ষ ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্কতীরী কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে তার মনটা যেন সুস্থ হয় এমনি ডান মনে হ'তে লাগল।

নদীর তীরে তীরে গ্রামের ঘাটে তখন ভোরের জাগরণ শুরু হয়েছে। সেই সহজ সরল স্বচ্ছ নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার অনাময় শান্তি তার মনকে অকাবশে ব্যথিত করে তুললে। বিক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত জলরাশি বিদীর্ণ করে লক্ষ তখন পূর্ণ বেগে

ছুটে চলেছে। একান্ত অসহায় বন্দীভাবে শচীন্দ্র সেই বিধূনিত ফেনপুঞ্জের দিকে চেয়ে নিশ্শব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

৩৮

নিখিলনাথ কিছু দিন কমলের কোন সংবাদ নিতে পারে নি। তার চিত্ত সীমার চিন্তায় এমন নিবিষ্ট ছিল যে নিতান্ত অবশ্যকর্তব্য ছাড়া সে হাসপাতালের আব করও সংবাদ নেবার অবসর পায় নি। আজ কমলের পীড়ার সংবাদে সে নিজের এই আবিষ্টতা প্রথম লক্ষ্য করলে এবং লক্ষিত হয়ে তাকে দেখতে গেল। মনোবোগ দিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করলে এবং নাস বিন্দুকে ডেকে মাথায় বরফ দিতে উপদেশ দিয়ে, একটা ঘুমের গুণ্ধ লিখে দিয়ে সে চলে গেল।

কিছুদিন যাবৎ নিখিলের নিজের মনও বিশেষ চিন্তা ও উদ্বেগে পীড়িত ছিল। সেই যে অন্ধকার আকাশের তলে সীমাকে সে অসীম বিশ্বের অন্তরালে কোথায় বিসর্জন দিয়ে এসেছে, তার পর এই ক-মাস অতীত হতে চলল বহু অল্প-সন্ধানও সে তার সংবাদ পায় নি।

যে নিবিড় স্পর্শটুকু সীমা তার কোমল করপল্লবের আকর্ষণে তাব অন্তরের মধ্যে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দিয়ে গেল, সে তার অন্তরের সুপ্ত প্রেমের রক্তকমলকোরবকে শতদলে পরিণত করেছে। সে যে সত্যবানের হাতের বান একথা তার কাছে বাহু মাত্র, সে যে সীমার হাতের হৃদয় প্রত্যাখ্যান এই কথাটাই তার পুরুষের চিন্তকে অধিকতর মথিত করেছে। নারীহৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তারের যে স্বাভাবিক চিবস্তন প্রাকৃতিক নিয়ম তারই ব্যত্যয়ে আজ তার চিত্ত এই দুঃস্বপ্ন মেয়েটির প্রতি উদ্ভিন্ন আগ্রহে প্রধাবিত; সর্বনাশের ঝোড়ো হাওয়ায় ছিন্ন-পাল ভয়তরী নিয়ে যে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে অজল সমুদ্রে পাড়ি দিল, হায় রে, তাকে তোনু যুতহীন প্রেমের জীবনতরীর সাহায্যে সে কিরিয়ে আনবে?

নিখিল চলে যাবার পব বিন্দুকে আলোটা নিবিষ্মে দ্বিত অল্পরোধ করে, কমল চুপ করে পড়ে রইল। রাত্তিরে খামখেয়ালী চিন্তা পঞ্চপালের মত তার সমস্ত সংজ্ঞারাজ্য জুড়ে অকারণ চাক্ষু্যে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। তার ঘুম কোথায় ছুটে গেল এবং গভীর রাত্রিতে এক সময়ে অত্যন্ত অকারণে তার নিজের মস্তিষ্কের দ্রুত প্রবাহিত রক্তপ্রোতের

উত্তেজনায়ে সে বিছানা থেকে নেমে ঘরের মধ্যে পাঁচচারি করতে লাগল। হঠাৎ পায়ের শব্দে জেগে বিন্দু উঠে বললে, “ওমা, ওকি ভাই, কি চাই? আমাদের ডাকলে না কেন? যাও, শোও গে, আমি দিচ্ছি। কি চাই বল ত?”

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মিত ফিরে পেয়ে বুঝতে পাবলে যে চিন্তার উত্তেজনায়ে সে উঠে পড়েছিল; এবং কোন প্রকার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ সহসা সংগ্রহ করতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি বললে, “দু-একটা বিস্কুট কি একটু মিষ্টী যদি দাও, একটু জল খাব। হঠাৎ কেমন খিদে পেয়ে গেছে, মনে হচ্ছে।” কথাটা সত্য নয় এবং কমলের পক্ষে আহাবের চেষ্টা তখন প্রায় অত্যাচারের সামিল, তবু তাকে বিন্দুর সঙ্কল্পসংগৃহীত সেই কষ্টরোধকারী শুষ্ক বিস্কুটখণ্ড জলের সাহায্যে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করতাই হ’ল,—এবং নিদ্রাব এই অবস্থা স্বরণ করে এত কষ্টেও তার হাসি এল।

বিন্দু বললে, “যাক, তবু দু-দিন পবে মুখে একটু হাসি ফুটল। যা মুখ করেই ছিলে। মাথাটা একটু কমেছে, না?”

কমল বললে, “হ্যাঁ ভাই, মিছিমিছি তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম। যাও শোও গে, আব কিছু দরকার হবে না। দরকার মত ওটুকু আস্তে আস্তে খাব’খন।”

জ্যোৎস্না কতকটা স্থূহ বোধ করছে কল্পনা করে বিন্দু আবার স্বস্থানে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

চিন্তার কূল পাওয়া যায় না। নন্দলালের অল্পতাপ-বিড়ম্বিত পত্র তাকে কোন সাঙ্গনার পথ দেখায় না। এখনও কিছুদিন হাসপাতালের শিক্ষাকালেব অবশিষ্ট আছে। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হ’লে এই সময়টুকু তাব কোনক্রমে অতিবাহিত করা ছাড়া উপায় নেই। তার সন্তানের ভবিষ্যৎ এবং তার নিজের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্বাধীনতার পথ এ ছাড়া সে কিছু চিন্তা করে উঠতে পারে না। তা ছাড়া মালতীর সম্বন্ধে তার কর্তব্য অত্যন্ত জটিল। যে-দেহের আবেষ্টনে সে তার সন্তানকে পুত্রাধিক স্নেহে বেঁধে রেখেছে তার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করবার মত নিষ্ঠুরতা চিন্তা করতে তার করণায় শুধু নয়, তার কৃতজ্ঞতায় বাধে। অথচ কোন প্রকার সম্বন্ধ-সূত্র রক্ষা করে নন্দলালের বিভ্রান্ত চিন্তের প্রবল উন্মুখীনতা থেকে সে যে কেমন করে নিজের শান্তি

এক মালতীর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করবে তার উপায় সে খুঁজে পায় না।

চিন্তায় শ্রান্ত হয়ে অনেক রাত্রে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরবেলার দিকে অত্যন্ত একটা দুঃস্বপ্নের বোর ভেঙে জেগে উঠে দেখলে যে ঘুমের মধ্যে কান্না তার বালিশ ভিজে গেছে। বহুকাল পরে সে স্বপ্নের মধ্যে তার স্বামীকে দেখেছে। সে স্বপ্ন স্পষ্ট নয়। নিতান্তই এলো-মেলো। জেগে উঠে সব কথা সে পরিষ্কার মনেও আনতে পারে না—তবু সেই অর্দ্ধস্পষ্ট স্বপ্নের স্মৃতিতে তার মন যেন বস্তুজগতের স্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। কি যে তার অর্থ তাও সে বুঝতে পারে না, তবু কেন তার বুক ভেঙে কান্না উথলে উঠতে চায় তা সে বোঝাবেই বা কাকে। জীবনে স্বপ্নের দিন যার কাছে স্বপ্নের মত হয়ে এসেছে, তার কাছে জীবনের মূল্য এমন কি থাকতে পারে যার অভাবে স্বপ্নের ছুরাশা তাকে দুঃখ দিতে পারে। তবু যে কান্না কেন রোধ করা যায় না, তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তার স্বামীর যে-মুখটা প্রাণপণ চেঁচাতেও সেই প্রদোষাঙ্ককার ভেদ করে সে স্পষ্ট দেখতে পায় নি, অথচ যার অসহায় বেদনার ছবি তার চোখের উপরে স্পষ্ট ভাসছে সেই রূপবিহীন অপরাধ মুখখানা তার অন্তরের এতদিনকার সঞ্চিত প্রেমার্ঘ্য বিরহকে যেন সজীব করে তুলেছে।

৩২

সেদিন শনিবার। কমল দুপুরের দিকে অনেকটা হুস্থ বোধ করছিল। কাজে অকারণে অল্পপস্থিত হওয়া তার স্বভাবের মধ্যে ছিল না। নিখিলনাথ হাসপাতাল পরিদর্শনের অবসরে তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ কি, আপনি আজই কাজে এলেন যে? একটু বিশ্রাম নেওয়াই আপনার উচিত ছিল। মাথার যন্ত্রণাটা গিয়েছে ত?”

মাথার যন্ত্রণা কম হলেও তখনও ছিল। কিন্তু সে কথা না বলে সে হেসে বললে, “আপনি আমার জন্তে অনেক করেছেন। আমরা দুঃখী মানুষ, নিজেকে নিয়ে নাড়াগাড়া করলে আমাদের দুঃখও কমে না; তার চেয়ে কাজকর্মের মধ্যে অনেকটা শান্তিতে থাকি।”

অপরাত্নের দিকে কমল ঘরে কিরে গুয়ে পড়েছিল অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ করে। গুয়ে গুয়ে সে তার হৃদয়

মস্তিষ্কে প্রাণপণ চেঁচায় জাগ্রত করবার চেষ্টা করছিল যদি কোনমতে কাল রাত্রে দেখা স্বপ্নের স্মৃতি তার স্বামী বা দেশের কোন নাম স্মরণে আনতে পারে। চিন্তায় চিন্তায় সে অধিকতর ক্লান্ত হয়ে পড়ল—তবু কোন ক্ষীণতম রশ্মিও সে সেই বিস্তৃতির অন্ধকারে দেখতে পেল না। নিখিলনাথকে কি উপায়ে সাহায্য করার স্মৃতি সে জোগাবে, যদি তার স্মৃতিকে সে পুনরুজ্জীবিত না করতে পারে?

চুপ করে গুয়ে গুয়ে আকাশ-পাতাল নানা চিন্তায় সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলে মালতী খোকাকে নিয়ে। “ও কি দিদি, গুয়ে যে? এ কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার? মা গো, চোখ গর্ভে ঢুকে গেছে যে—অস্থব্ব কবেছে!”

মালতী হেসে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তারপর খোকাকে কোলে টেনে নিষে বললে, “ন তেমন কিছু না, আজ দিন কয়েক একটু মাথার অস্থব্ব করছিল। তা এখন কমে গেছে।” বলে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বললে, “উঃ, কতদিন দেখি নি তোমাকে ভাই! সে ব্লাউসটা পরেছিলে ত? এখানে ঠিকমত স্মৃতি পাই না, তার ওপর কাজের চাপ, কোনরকমে একটা করে দিলুম। এখনও ভাল করে শিখতেই পারি নি।”

“চমৎকার হয়েছে। ওদের বাড়ীর বউ ত বলছিল সাদেব-বাড়ীও এমনতর হয় না।”

“হ্যাঁ, ওর চেয়ে কত ভাল ভাল হয়। খোকন ত সেদিন তোমার নিল্লে কবেছিলুম বলে কোমর বেঁধে লেগে গেল তার মাসীর গুণবর্ণনায়। এটিকে কিন্তু আবার তোমার অত্যাচারের সব নালিশও চলছিল তার আগে,—‘খালি খালি দুখ খাওয়ায়, ভগ্নুর সঙ্গে রাস্তায় যেতে দেখ না!’ আব আমি যেই বলেছি ‘মাসি ভারি দুষ্ট, না রে?’ আর যাবি কোথায়!”

মালতী তৎক্ষণাৎ খোকনকে কোলে টেনে একটা মস্ত চুমু দিয়ে বললে, “তা ভাই সত্যি, চাকর-বাকরের সঙ্গে আমার যেতে দিতে ভয় করে। এই সেদিন পুঁটির মা বলছিল কার খোকাকে সেদিন তাদের পুনো চাকরে ভুলিয়ে নে গিয়ে না কি গয়না লোডে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। মা গো শুনে আমি ত ভয়েই মরি। তা ভাই

দিই নে ব'লে তোমার ভগ্নীপতি বকাবকি করে। তা তরুণ
গে, ওদের কি এসব বুদ্ধি আছে? এদিকে নিজের ভয়
কিন্তু সাড়ে বোল আনা। রাস্তিরে একখানা টেংগেবাপ
আহুক দিকি নি; অমনি ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে'খন।
ভয়ে মাথার জানলা খুলে শোবে না—না কি খোঁচা মারবে।
দেখ দিকি ভাই কাণ্ড।”

গলা টেপাব কথায় কমলের মনটাও ছ্যাৎ ক'রে উঠেছিল;
কিন্তু নন্দলালের কথা শুনে হেসে বললে, “ব্যবসায়ী মানুষ
কি না—তাই চোরের ভয়।”

“ছাই ব্যবসা, ব্যবসা-ব্যবসা ক'রে রাস্তির-দিন নাওয়া-
খাওয়া বন্ধ করলে। না কি বাড়ী হবে, মোটর হবে। খ্যাঁটা
মার অমন বাড়ীর মুখে। আগে প্রাণে বাঁচবে তা'পরত
বাড়ী-গাড়ী? কদিন থেকে বলছি যে জোছনাদিকে একটু
নিয়ে এস, তা সময়ই হয় না। বলে 'তুমি না গেলে সে
আসবে কেন?' তা ভাই, সাতরাস্তি ঠেকিয়ে আমার
নিঃশেষ ফেলতে অবসর কই। খোকার দুখটা পর্যন্ত কেউ
ঠিকমত জাল দিতে পারে না। ষে-দিকটা না দেখবে সে
দিকটাই ছিটি নষ্ট ক'রে বসে থাকবে। তা আমি না এলে
কি আর হয় না? তা ও কিছুতে শুনবে না। ওরও
আবার সময় হয় না। কত ক'রে ব'লে কয়ে আস্ত নিয়ে
এসেছি।”

“ওমা এতক্ষণ বল নি কেন ভাই? একটু চা-টা ব'রে
পাঠিয়ে দি।”

“না না, সেসব কিছু করতে হবে না। তোমার যা
চোরা হয়েছে! এখন চল দিকিন্ বাড়ী গিয়ে যত খুশী
চা খাইও'খন।”

“না ভাই, এখন আমার বাড়ী যাওয়া হবে না। সামনেই
পরীক্ষা—একে ত ক'দিন পড়াশুনা কিছুই করতে পারি নি।
তাতে এখন সময় নষ্ট করলে সব দিক নষ্ট হবে।”

এসব কথা মালতী শুনতে চায় না। পরীক্ষার মূল্য তার
কাছে কিছুই নেই। জ্যোৎস্নার শরীর খারাপ, তাকে রুখে
সে যেতে কিছুতেই রাজি নয়। কমল মহা বিপদে পড়ে
গেল। নন্দলালের গৃহে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হয়ে প্রবেশ
করতে চায় না। সেখানে নন্দলালের অব্যাহত গতি।
নন্দলালের প্রতি রূঢ় আচরণ ক'রে একটা উদ্ভেজনাও সৃষ্টি

করতে তার স্বভাবে বাধে। যদিও এ-কথা তার বিশ্বাস
ছিল যে স্বভাবভীর্ণ নন্দ তার গৃহে তার জীব উপস্থিতিতে
কোন প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি সহসা করতে ভরসা পাবে না,
তবু ইচ্ছাপূর্বক সে বিপদের সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলতে
রাজী নয়। কিন্তু এসব কথা মালতীকে সে বোঝাবে কেমন
ক'রে। ঐ যে স্নেহশীলা নিঃসন্দ্বিগ্নচিত্ত সরলা জীলোকটি
নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের বিপদকে আহ্বান করছে, তাকে
তার বিপদেব বার্তা জানিয়ে তার জীবনের স্বখশান্তি সে হরণ
করতে পারবে না।

অনেক তর্ক-বিতর্ক অচল-অলুপযোগের পর কমলা বললে,
“আচ্ছা, দেখি ভাই যদি ছুটি পাই। নিখিলবাবুর অহুমতি
না নিয়ে ত যাবার জো নেই। হাসপাতালের কাজে ক্ষতি
হয় কি না।”

মালতী বললে, “কি ভাই হাসপাতালের কাজ? মানুষ
ম'লেও কি কাজ করতে হবে না কি? এ যে আপিসেব বাড়ী
হ'ল। না না ও সব হবে না। আমি এখুনি তোমার ভগ্নী-
পতিকে গিয়ে বলছি—ও সব ঠিক ক'রে দেবে'খন।”

কমল ব্যস্ত হয়ে বললে, “না ভাই, তার দরকার নেই।
আমি দেখছি কি করতে পারি। ওঁকে মিছামিছি আর
কষ্ট দিও না।”

মালতী কিছুতেই শুনলে না। সে বাইরের ঘরের দিকে
চলে গেল।

কমল হতাশ হয়ে ভাবলে, “দেখা যাক্ অদৃষ্টে আবার কি
আছে?” কিন্তু তবু তার মনটা শান্ত রইল না। সে জোর
করে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলে যে নন্দলালের অহুতাপ
নিশ্চয় আন্তরিক। যে-নন্দলাল তাকে তার নিদারুণ দুর্দশা
থেকে উদ্ধাব ক'রে তার আজকের ভক্ত অবস্থায় এনে উপস্থিত
করেছে তার প্রতি এই রকম অভ্যুত্থিত মনোভাব পোষণ
করার দরুণ সে নিজেকে নিন্দা করলে। কিন্তু মনের অস্বস্তি
তার মনে কাঁটা হয়ে রইল।

মালতী বাইরের ঘরের দরজায় গিয়ে দেখলে যে একজন
সাম্বেবমত লোকের সঙ্গে তার স্বামী কথাবার্তা কইছেন।
মালতী এসে অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টায় নন্দব নজরে
পড়ে গেল এবং সে তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললে, “কি, যাবে
বাড়ী?” সে ইচ্ছে ক'রেই জ্যোৎস্নার কথা জিজ্ঞেস করলে

না। মালতী বললে, “যাব কি করে? জ্যোৎস্নাদিব শরীরটা ভারী খাবাপ হয়েছে। তা যেতে বলছি ত বলে, নিখিলবাবু ছুটি না দিলে যেতে পারবে না। তুমি একটু ব’লে কয়ে ছুটি ক’রে নাও না। নিখিলবাবুকে কি পাওয়া যাবে না?”

নিখিলনাথের নামে নন্দর জ্ঞান বুদ্ধি হইয়া উঠেছিল সে বললে, “পাওয়া যাবে না কেন? ঐ ত এসে জ্যোৎস্নার জগ্রে ব’সে আছে।” মালতীর মনে নন্দর ঐ উগ্র মন্তব্যের কটু রসটুকু গিয়ে পৌঁছল না। যেটুকু জ্ঞান সে সম্প্রতি ব্যাঙ্কল, তার বাইবে তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া খুব তীক্ষ্ণ থাকে না। সে অল্পনয় করে বললে, “তবে বল না গো একটু; দু-দিন ছুটি কি আর দেবে না? ওর শরীরটা খারাপ, দু-দিন একটু বাড়ী গিয়ে ঘুরে আসুক। একটু বলে দেখ না?”

জ্যোৎস্নাকে বাড়ী নিয়ে যাবার আগ্রহ নন্দরও কিছু কম হওয়ার কথা নয়—হুতরাং নিখিলের প্রতি মনে মনে ঈর্ষপুষ্ট হ’লেও সে অগত্যা গিয়ে জ্যোৎস্নার বাড়ী যাওয়ার দরবার নিখিলকে জানালে।

নিখিলনাথ বললে, “হ্যাঁ, তা বেশ, দু-দিন বাড়ী গেলে ও’র মনটাও প্রফুল্ল হবে।”

মালতী দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। ছুটির পরোয়ানা পেয়েই সে ছুটে উপবে জ্যোৎস্নার নিকট গিয়ে হাসতে হাসতে সব জানালে। বললে, “উঃ, ভারী মান বাড়ানো হচ্ছিল। উনি চলে গেলে হাসপাতালে একেবারে তালচাচি পড়বে।”

কমল আর কিছু বললে না। তার নিজের অন্তঃকরণেই কখনই সুপ্রসন্ন থাকে না, এই তার আর একটা প্রমাণ: মাত্র মনে ক’রে ক্ষুণ্ণমনে প্রস্তুত হ’তে লাগল। নিখিলনাথ এনেছেন অথচ তাঁর সঙ্গে যে তার বড় দরকার ছিল, তা সম্প্রতি তাকে মূলত্বীয় বেখেই যেতে হ’ল। মনটা তার ভাঃ হয়ে রইল এবং ক্ষণে ক্ষণে তাব চক্ষু সজল হয়ে উঠতে চাইল, নিজের অদৃষ্টের উপর অভিমান।

গাড়ীতে তুলে দিয়ে কমলের দিকে নন্দর চাইতে কেমন সন্ধ্যা বোধ হতে লাগলে। একই গাড়ীর মধ্যে মুখেমুখী হয়ে বসে যাওয়ার চিন্তাটা তার কাছে ক্রটিরোচন বোধ হ’ল না। সে মালতীর দিকে চেয়ে বললে, “আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। তোমরা যাও; আমার ফিরতে সম্ভব হবে।”

কমল তৎক্ষণাত্ বৃষ্টিতে পাবল যে নন্দলাল তার সঙ্গে একত্র এক গাড়ীতে যেতে সন্ধ্যা বোধ করছে। তাতে একটু স্বস্তিও অনুভব করলে। একবার ভাবলে যে সে অল্পরোধ করে। কিন্তু নিজেকে কিছুতেই প্রস্তুত ক’বে উঠতে পারলে না। শুধু সন্ধ্যাচন্দ্র, তাব একটু আশঙ্কাও ছিল মনে, যে এই অল্পরোধে নন্দকে সে তার চিঠিসম্পর্কে ভুল বুঝতে সাহায্য করবে এবং নন্দর স্পর্ধার পথ উন্মুক্ত ক’বে দেওয়া হবে।

মালতী বললে, “দেখ কাণ্ড, এখন আবার কোথায় যাবে? এই ত বললে যে আজ বিকেলে তোমার কোন কাজ থাকবে না। জানি নে বাপু, যত নেই কত যুটিয়ে নেওয়া।”

অল্প পক্ষ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে নন্দ মালতীর ব্যগ্রতার কোনো সুবিধে নিতে ভরসা পেল না। আব কথা কাটাকাটি না ক’বে সে গাড়োষনকে বাড়ী যেতে হুকুম করলে। কমল মনে মনে খুবই লজ্জা পেতে লাগল তবু মুখ ফুটে কথা বলতে পারলে না।

মালতী আবার প্রসন্ন চিত্তে তার সঙ্গে গল্প শুরু করে দিলে। বেশীর ভাগই খোকার কথা—ঘর-সংসারের কথা। “নতুন বাড়ীটার একটু জমি আছে। তা ভাই একটা গল্প কেনার কথা বলেছি, বলে যে গল্প হবে। হ্যান্ডাম। পাবি নে বাপু, গল্পলাব সঙ্গে রোজ লড়াই করে। পয়সা দিয়ে কতকগুলো জল গেলা।”

গল্পের বিষয় এক জায়গায় আবদ্ধ নয়। গল্পের কথা শেষ না-হতেই খোকার নতুন মাষ্টারের গল্প—(যোগাযোগ কোথায় তা কে জানে।)—মাষ্টারের বাড়ী পূর্ববঙ্গে; খোকা তার কি মজার নকল করে—বাড়ী গেলে শোনাব-খন। এই বকম নানা কথা বলতে বলতে বলে, “ও কি ভাই, চুপ ক’রে রইলে যে? মাষ্টার কষ্ট হচ্ছে বুঝি?” ব’লে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

কমল তড়াতাড়ি বলে, “না, না, তুমি গল্প করছ, তাই শুনি।” মালতী আবার উৎসাহে গল্প শুরু করে—“আজ-কাল খোকা সব খায়।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলের মন থেকে উদ্বেগ যেতে চায় না। নন্দ এবাব কেমন ব্যবহার করবে তাই ভাবে। ভাবে, বাড়ীতে মালতীর সামনে সাহস করবে না। আবার ভাবে,

অকারণেই হয়ত এসব ভাবছে। হাসপাতালে তাল তার জায়গায় সরোজিনী যাবে। বড় চঞ্চল। সেই মাড়োয়ারীর ছেলেটিকে হয়ত তেমন সাবধানে যত্ন কববে না। কি স্বন্দর ছেলেটা, আহা তার মা কাঁদছিল। চলে আসা ভাল হয় নি। নিখিলবাবু ত ছুটি না দিলেই পারতেন, আমার বুঝি আর পড়ার ক্ষতি হয় না। নিখিলবাবু ত এসেছিলেন; একটাও কথা বলা হ'ল না তাঁর সঙ্গে। কিছু সরকারে এসেছিলেন কি? আজ কিছুদিন তাঁকে কি রকম অগ্রমনস্ক দেখাচ্ছে। রোগা হয়ে গেছেন। কেবল যত রাজ্যের কাজ ঘাড় পেতে নিলে কি মাস্তবের সন্ধ্যা? আচ্ছা, ওঁর কিসের ভাবনা? সরোজিনী বলছিল, ক্ষিতীশ গুপ্ত না কি বলেছে মাস কয়েক আগে কে একজন মেয়ের সঙ্গে বিবাহে বেরিয়ে গিয়ে মাঝরাজে ফিরেছেন। দারোয়ান না কি বলেছে

‘সামেব গাড়ী নিয়ে যায় নি।’ ক্ষিতীশ গুপ্তটা ভারি বদ। ওঁকে হিংসে করে নিশ্চয়। সরোজিনীর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ওই বাঁদরটার সঙ্গে যত আড্ডা। ডাক্তারের কত জরুরী কাজ থাকে। তোদেব অত মাথাব্যথা কেন? আচ্ছা, মেয়েটি কে? হঠাৎ সচেতন হয়ে শোনে মালতী গল্প ক’রে চলেছে, “ওঁর ভাই ঐ কি একরকম হয়েছে। ব্যবসা ক’রে মাথাটা গেল। রাজে ঘুম নেই। এক-এক দিন জেগে দেখি, উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে। আগের চেয়ে রাগও বেড়েছে। আমি বলি এমন টাকা দিয়ে হবে কি?” ইত্যাদি। কমল ভাবে যেখানেই যাবে, সে একটা অশান্তির স্থিতি কববে। এমন জীবন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে আর নরক কি হ’তে পারে? গাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় থামল। (ক্রমশঃ)

বঞ্চিত ক’রে বাঁচালে

শ্রীবিমলা:শুপ্রকাশ রায়

প্রশস্ত পালঙ্কে উপর শুভ্র চাদর পাতা, আর তারই উপর এসে পড়েছে শুভ্রতর চন্দ্রকিরণ। হিরণ ও রমেশ আধ-শোয়া অবস্থায় তাঁদের দিকেই তাকিয়ে আছে,—শরতের হাল্কা মেঘে এই গেল ঢেকে, আবার ঐ মুখ রেখিয়েছে ওখানে।

“কি স্বন্দর!” রমেশ বললে।

হিরণ চুপ কবে বইল। একটু আগেই রমেশ গ্রানোফোনে কয়েকটা রেকর্ড চালিয়েছে, তারই একটা গানের রেশ হিরণের কানে এখনও বাজার দিচ্ছে, “আলো ছায়া দোলা—আলো ছায়া দোলা।” তারই তালে তালে হাল্কা মেঘ চাঁদকে নিয়ে নৃত্যে মেতেছে ঐ। হিরণকে নিরুত্তর দেখে রমেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, “কি ভাবছ হিরণ? তুমি রোজ এই রকম বসে বসে কি ভাব বল ত?”

হিরণ একটু অগ্রমনস্ক হয়ে জবাব দিলে, “আমার জীবনটার কথা ভাবছি।”

রমেশ উৎসাহভরে বললে “হ্যাঁ, তোমার জীবনটাও আজকের এই জ্যোৎস্নার মত স্বন্দর।”

“হ্যাঁ, তা কেন?”

“তবে কি?”

হিরণ আবার চুপ ক’রে রইল একটু গম্ভীর হয়ে। তাদের বাথলোথানার অদূরে শোণ নদীর উদাস-মুহুর স্রোত চলেছে চাঁদের ছবি বুকে ক’রে কখনও দোলাচ্ছে ছবিকে, কখনও ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—ছবি ভেঙে চুরমার। আকাশের চাঁদ ও জলের চাঁদ, দুটোকেই দেখছে হিরণ অলস দৃষ্টিতে।

“বললে না?” হিরণের একখানি হাত তুলে নিয়ে রমেশ জিজ্ঞাসা করলে। হিরণ তার হাতটা ছাড়াবার একটু চেষ্টা করলে কিন্তু শক্ত মূঠোর বিরুদ্ধে বেশী জোর না ক’রে বললে, “আচ্ছা, তুমি যে এই বিদেশ থেকে হঠাৎ গিয়ে আমাকে বিয়ে ক’রে আনলে, একটুও ভয় করল না তোমার?”

“ভয়! বিয়েতে আবার ভয় কি?”

শুধু হাসির সঙ্গে হিরণ জবাব দিলে, “বিয়েতেই ত সব চেয়ে বেশী ভয়।”

একটু থেমে আবার বললে, “আচ্ছা, আমাব যে আগেই একটা বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তার খবর রাখ ?” বিস্ময়মুগ্ধ রমেশের মুঠো হঠাৎ শিথিল হয়ে যাওয়াতে হিরণের হাতখানি পড়ল খসে। হিরণ ফিক্ করে একটু না হেসে পারলে না। বললে, “এই না ‘ভয় কি’ বলে আশ্বালন করছিলে।”

বমেশ আবার ভরসা পেয়ে ছুই বাহুতে হিরণকে বেঁধে ক'রে বললে, “কেন তামাসা কর ফিক্ ?”

হিরণ আবার গম্ভীর হয়ে বললে, “আমাব আগে একটা বিয়ে হয়েছিল শুনে আঁতকে ওঠ, আব তুমি ত দিব্য দ্বিতীয় বার আমাব বিয়ে ক'রে নিয়ে এলে।”

রমেশ অপ্রস্তুত হয়ে হিরণকে ছেড়ে দিয়ে বললে, “আমাব প্রথম পক্ষের কথা সকলেই জানে—আমি লুকোই নি ত, আর তুমি হঠাৎ এখন বললে কিনা—”

হিরণ জবাব দিলে, “আর আমাব প্রথম পক্ষের কথা কেউ জানে না—তাই আমিও লুকিয়ে রাখবার স্বযোগ পেয়েছি ? না ?

“ফের তামাসা ?”

“তামাসা নয়, সত্যি।”

মেঘের বিয়ে ঠিক হতে যত দেরি হয়ে যায়, বাড়ীর লোকদের কথাবার্তায় বিবাহের জল্পনা যতই বেশী ক'রে চলে থাকে, মেঘের মনের মধ্যে ভাবী সংসারের বিচিত্র কল্পনা ততই প্রবলতর হয়ে ওঠে। তরুণীর উর্বর মনের উপর অলক্ষ্য ও প্রত্যক্ষ বিবাহ-প্রস্তাবনার সলিলসেচনে অকুরোদগত সুখকল্পনা একটি বিশিষ্ট আকারে - শিশুবৃক্ষরূপে পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। হিবণের আশা ছিল, কোনও একটি তরুণ চিত্তের প্রথম প্রণয়-আহ্বানে তার যৌবন-সায়র উথলে উঠবে, নারীজয়ানভিষ্ম তরুণ হৃদয়ের প্রথম স্পর্শ সাবা দেহমনে শিহরণ জাগিয়ে তুলবে। সে কি অনির্কচনীয় আনন্দ ! তার পর স্বামীর ঘব। পূর্বে যা হয়ত ছিল নিতান্ত বিশৃঙ্খল—রাশি রাশি জিনিষ-পত্র আসবাব-পোষাক ইত্যন্তঃ

বিক্ষিপ্ত—সবই তার নিপুণ হস্তেব স্পর্শে সুবিন্যস্ত হয়ে উঠবে। গৃহসংলগ্ন পতিত জমি হয়ত থাকবে বন্যজন্মে আচ্ছাদিত, তাকে সে সুন্দর উত্তানে রূপান্তরিত করবে। একা স্বামী নয়,—তার উচ্ছ্বসিত প্রেমপ্রীতি উপচে পড়বে পূর্ণ-গৃহ স্বামীর আত্মীয়পরিজনদের উপর।

সে-সুখকল্পনার ইমারৎ পরবর্তী প্রচণ্ড বাস্তবের আঘাতে বিধ্বস্ত। কিন্তু এ-বাস্তবকে হিরণ স্তব্ধ বলে নিতে পারলে না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সেই যে কল্পনার কুমাবকে সে মন সমর্পণ করেছিল সে ত এই বিশৃঙ্খল রমেশ হতে পাবে না। তার কল্পনার প্রিয়তমাকে যে যা দান করেছে, সেই হয়েছে তাব চিন্তাদান। তাব পর যে এই বিবাহ এ অতি মিথ্যা,—প্রতারণা। এ গৃহ, এ গৃহস্থালী পূর্ব হতেই আব এক নারীব করস্পর্শে নিষঙ্গিত, গৃহস্থালী হৃদয়ে ধেনারী বিরাজ ক'রে গেছে একদিন। এখানে হিবণকে আহ্বান কবা শুধু ত গৌরবদানের অভাব নয়, অপমান।

বমেশেব কাছে হিরণ সংশ্লেষে কিছু কিছু বলে এই কল্পনা-বাস্তবের প্রচণ্ড বিপর্যয়-ব্যথা, বমেশ সান্না দিতে যায়, কিন্তু কোন ফল হয় না।

হঠাৎ হিরণ বললে, “এক বার তোমাব না বলেছিলাম অঞ্জলিকে কিছু দিনের জন্তে আমাবেব এখানে এনে রাখতে, তাব কি হ'ল ?”

অঞ্জলি রমেশের পূর্ব পক্ষের জালিকা। রমেশের মনে হ'ল—“কি ছেলেমানুষ এই হিরণ”, প্রকাশে বললে, “অঞ্জলি আর এখানে আসবে কেন হিরণ ?”

“কেন আসবে না ?” হিবণ অশ্রু হয়ে প্রশ্ন করলে।

রমেশ কি উত্তর দেবে ভেবে পারি না। হিরণই আবার বলতে থাকে, “তার দিদি থাকতে আনতে পারত আর এখনও ত আমি তার দিদি হয়েই এসেছি এখানে, বোনকে আমি আনতে পারি না ?”

রমেশ এবার জবাব দেয়, “সত্যি ত তুমি তার দিদি নও, তার দিদির জায়গায় তোমাব চোখে দেখলে তার চোখে যে জ্বল আসবে তা বোঝ না ? তাক কষ্ট দিয়ে লাভ কিছু আছে ?”

“তোমাব তো একটুও কষ্ট হয় নি ববং আনন্দই হয়েছে দেখছি তোমাব জীব জায়গায় আমাব এনে বসাতে।”

২

হিরণ তার জেদ ছাড়ে না। রমেশকে একখানা গম্বনা গাড়িয়ে আনতে হ'ল। রমেশ অগত্যা বললে, “যদি গম্বনাটা পাঠাবেই, বাড়ীর ঠিকানায় না পাঠিয়ে অঞ্জলির স্কুলের ঠিকানায় পাঠাও।”

“কেন?”

“বাড়ীতে পাঠালে স্বপ্নরমণাই জিনিষটা পিয়নের কাছ থেকে নেবেনই না, কিরিয়ে দেবেন। আব স্কুলে পাঠালে অঞ্জলি নিজেও নিতে পারে। ও তখন থাকবে স্কুলে কিনা দুপুরে যখন পার্শেল নিয়ে যায় পিঙ্ক।”

স্কুলের ঠিকানাতেই উপহার গেল। সঙ্গে হিরণ বিখে দিলে, আমায় হয়ত তুমি চিনবে না, আমি তোমার বিধি হই, বোনকে আদর ক'রে এক খানা গম্বনা পাঠালাম, প'নো। আর তোমায় একবার আসতে হবে আমাদের কাছে, সুবিধা হ'লেই তার ব্যবস্থা করব।

“আচ্ছা, তুমি যে বললে অঞ্জলির বাবা গম্বনা কিরিয়ে দেবেন—কেন বল ত?” দিন তিনেক পরে রমেশকে ভাত বেড়ে দিয়ে হিরণ জিজ্ঞাসা করলে। রমেশ সংক্ষেপে জবাব দিলে, “আমি আবার বিয়ে করেছি বলে।”

“আবার-বিয়েকে’ তিনি খুব ঘৃণা করেন?”

রমেশ বলে ফেললে, “তা করবেন বই কি—কিন্তু নাক ও-সব কথা, তুমি খেতে কসবে না?”

“না, আমি একটু পরে বসব। আচ্ছা, অঞ্জলি জিনিষ ফেরাবে না ত?”

“তা কি ক'রে বলি। তোমার যে কি-এক খেয়ল। এ-খেয়াল কেন হ'ল?”

হিবণ কথা না ব'লে চুপ করে রইল।

‘কেন হ'ল!’—সাগর-ধোয়ানী শাস্ত প্রবাহিণী হঠাৎ প্রাক্ষিপ্ত প্রপাতে পরিণত হলে প্রতিহত বারিরাশি আবর্ভ সৃষ্টি করবেই, নিকটকে দূবে নিষ্কেপ করতে চাইবে, দূরকে অজ্ঞানাকে প্রবল টানে গ্রহণ করতে হাত বাড়াবে। খণ্ড প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই খণ্ডসৃষ্টির তাণ্ডবলীলা।

বিকালে রমেশ আপিস হতে ফিরতেই হিবণ বললে, “অঞ্জলি পার্শেলটা ফেবায় নি, এই দেখ তার সই-করা রসিদ এসেছে।”

“দেখি” বলে হাত বাড়িয়ে রমেশ রসিদটা নিয়ে অঞ্জলির সইটার উপর অনেক ক্ষণ তাকিয়ে রইল। হিরণ বললে, “কি হ'ল? অত কি দেখছ অবাক হয়ে?”

“দেখছি অঞ্জলির হাতের লেখা এক বছরেই অনেক বদলে গেছে।”

হিরণ তার রসনা-ছিলায় একটা শাগিত শর-সংযোজনব উত্তোগ করছে, এমন সময়ে দেউড়ীর সামনে একখানা গাড়ী এসে থামল এবং একটি অল্পবয়স্কা বিধবা নেমে এল। হিরণ রমেশকে জিজ্ঞাসা করলে, “কে গো?”

রমেশ মেয়েটিব দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললে, “কি জানি—চিনতে ত পারছি নে।”

মেয়েটি একটু সঙ্কোচের সঙ্গে কাছে এসে হিরণকে প্রণাম করে বললে, “আমি অঞ্জলি, দিদি।”

হিরণ রমেশের দিকে তাকিয়ে বললে, “ভবে যে তুমি বলছ চিনতে পারছ না।”

রমেশ অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, হাতের লেখা না-হয় বদলেছে, চেহারা স্বস্থ কি বদলাতে পারে।

৩

স্কুলের কর্তৃপক্ষ মেয়েটিকে নিয়ে বড় মুন্সিলেই পড়েছে। আজ সাত দিন তার মামাতো ভাই এসে তাকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়ে বোর্ডিঙে থাকবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ক'রে গেছে, অথচ টাকা দেবার কথা ছিল তার পরদিনই এসে, কিন্তু আর দেখা নেই। যে-বাড়ীঘ ঠিকানা দিয়ে গেছে, সেখানে লোক গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছে যে, সে-বাড়ী ছেড়ে সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। মেয়েটিও জানে না। কাজেই তার উপরই উৎপীড়ন স্রুহ হয়েছে, বলা হচ্ছে তাকে যে, সে অন্ত কোন আত্মীয়ের কাছে চলে যাক। কিন্তু তার আর কোনও আত্মীয় আছে বলে তার জানা নেই। ছোট থাকতেই পিতৃমাতৃহীন সে। মামা তাকে পালন ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বছরখানেকের মধ্যেই আবার মামার কাছে ফিরে আসে বিধবা হয়ে। কিন্তু কপাল এমন যে মামাও আর বেশী দিন রইলেন না। তাঁর মৃত্যুর পরই দাদা ও বৌদি দু-জনেই স্তার ওখানে থাকাকা ভার বোধ

করতে লাগল। এবং তার পরই এই স্থলে চালান দেওয়া। এই ত সক্ষিপ্ত ইতিহাস তার।

সে-দিন ভোর হ'তেই সে ভাবছে, এমন কপাল নিয়েও মানুষ জন্মায়। তার শেষ এই আশা হয়েছিল যে এই স্থলটায় কিছু লেখাপড়া আব কিছু হাতের কাজ শিখে নিজের সংস্থান সে নিজেকে কোন রকমে করে নিতে পারবে। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা! কাল যে বকম কড়া করে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলেছেন—তার ইচ্ছা হচ্ছে যে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, যেদিকে দু-চোখ যায় সেই দিকে চলে যায়।

স্থল বসতে ক্লাসে গিয়ে ডেস্কে উপর মাথা লুকিয়ে প্রথম ঘণ্টা দিলে কাটিয়ে। দ্বিতীয় ঘণ্টার প্রারম্ভে আপিস-ঘরে তার ডাক পড়ল। সেখানে যেতেই প্রধান শিক্ষয়িত্রী একটা পোষ্টকার্ড ও ইন্সপেক্টর-পার্শেল তার হাতে দিয়ে বললেন, “এ তোমার ?”

সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা প'ড়ে মনে মনে অবাক হ'ল কিন্তু প্রকাশে বললে, “হ্যাঁ।”

সই করে পার্শেলটা নিয়ে চলে গেল একেবারে নিজের ঘরে। গিয়েই সেটাকে খুলে দেখলে এক ছড়া সোনার হার। চিঠিটা আবার পড়লে, একবার না, বার বার। অবাক কাণ্ড। তার যে এমন স্নেহময়ী দিদি একজন জগতে আছে তা ত জানা ছিল না। এমন স্বধামাখা চিঠি ও সোনার হার। পিতৃ-ও মাতৃ-কুলের ভালপালার নিকট দূর আত্মীয় খুঁজে কিছুই ঠাহর করতে পারলে না। যাই হোক, এটা ঠিক যে এই যে দিদি তার, সে অনেক কাল তার কোনও খবরই বাথে না। বিদেশে অনেক দিন আছে নিশ্চয়। নইলে তাকে হাব পাঠায় এতদিন পরে ? ভাব যে কপাল গুড়েছে সে খবর দিদির কাছে যায় নি। হা-গলায় ঝোলাবার কি আর দিন আছে তার ? দিদির প্রেরিত হাব তার কাছে আজ অর্থহীন, কিন্তু তার যে স্নেহ আহ্বান তার কাছে যাবার জন্তে সেইটেই তাকে নাড়া দিলে। আজ যখন পৃথিবীর সকলে তার প্রতি বিমূখ, এই দুর্দিনে দিদির আশ্রয় তাকে প্রলুব্ধ কবে তুললে। তীব্র সঙ্কটেব সৃষ্টি যদি একটা অদম্য আশা জড়িত হবার সুযোগ পায়, তবে দুয়ে মিলে দুর্বল ও অর্ধাটীনকেও কোথা হতে প্রবল শক্তি ও স্বতীক্ল বুদ্ধি এনে সহায়রূপে প্রদান করে। কি করে একা

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল সে, সেকন্নার দোকানে হাবছড়া বাঁধা রেখে টাকা ধার কবলে, তার পব ট্রেনে এসে ঠিক গাড়ীতে চড়ে একেবারে ঠিক ‘দিদি’ব বাড়ীতে গিয়ে হাজির—সে-সব বর্ণনা করতে গেলে আলাদা একটা গল্প হয়ে ওঠে।

৪

যে অঞ্জলি বায়ের উদ্দেশ্যে হাবছড়া প্রেরিত হয়েছিল শিক্ষয়িত্রী তাকেই প্রথমে ডেকে পোষ্টকার্ড ও পার্শেলটা দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বলেছিল, “সব আমার না।”

সে মনে করেছিল, ঐটুকু বলাতে জিনিষটা প্রেবিকাব কাছেই ফেরৎ যাবে। কিন্তু তার জানা ছিল না যে আর একজন অঞ্জলি রায় কয়েকদিন আসে তার নীচের ক্লাসে এসে ভর্তি হয়েছে এবং বোর্ডিঙে আছে। শিক্ষয়িত্রী তখন এই নূতন অঞ্জলি রায়কে ডাকেন।

তার পর যখন তার পলায়নবার্তা প্রচারিত হয়ে গেল, পুরাতন অঞ্জলি এসে বললে, তারই ছিল পার্শেলটা—তার গ্রহণ করবার ইচ্ছা ছিল না তাই অমন করে বলেছিল। স্থল হ'তে তৎক্ষণাৎ চিঠি গেল হিবনের কাছে এই মর্মে যে, তাঁর প্রেরিত পার্শেল ভুল মেয়ে সই করে নিয়ে পালিয়েছে এবং তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেই গুলিসে খবর দেওয়া হবে। কিন্তু হিরণ তার উত্তরে স্থলের কর্তৃপক্ষকে জানাল যে ভুল মেয়ে পার্শেল নেয় নি—তার বোন্সই পার্শেল পেয়েছে এবং সে-বোন এখন তাবই কাছে আছে—সুতরাং কারুর কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনার কারণ নেই।

হিরণ ভাবলে এই হ'ল ভাল তার ভালবাসার ভাণ্ড উজাড় করে দেবার একটি পাত্র ভগবান জুটিয়ে দিলেন, যে সতিাই ভালবাসাব ভিখারী। স্বামী-স্বদয়রঞ্জন করবার প্রবৃত্তি জাগে নি তার, গৃহস্থালীতে মন বসে নি, বাগান সাজানোর কাজে সে নিজেকে নিযুক্ত করে নি, আজ একাধারে এই বিধবা দুঃখিনীর উপর সব সাধ বোঁটার একটা উগ্র আগ্রহ এসে ভর করলে। এমনভাবে ববলে যে সমাজেব সংস্কার ভেঙে তাকে কুমারীর বেশে সজ্জিত করে তুললে। একজন আশ্রয় ও ভালবাসা পেয়ে খুশী, অপর দিয়ে খুশী।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় রমেশের এক পুরাতন বন্ধু এসে হাজির, কি গ্লোশন কথা কহিতে। বাইবের

ঘরে রমেশ তার কাছে যেতেই হিরণ গিয়ে দরজায় কান পেতে রইল—কি এত গোপন কথা। যা শুনে তে হিরণের অন্তরে নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। রমেশের এই বন্ধু অবিনাশের সঙ্গে রমেশের শ্যালিকা অঞ্জলির বিবাহ-প্রস্তাব এসেছে। অবিনাশ অঞ্জলির সম্বন্ধে একটু খোঁজ-খবর নিতে এসেছে। দুই বন্ধুর মধ্যে দ্বিবিধ বন্ধন রসালোপ জমে উঠেছে হিরণ আর স্থির থাকতে পারলে না। প্রলয়ঙ্কর খেয়াল মেয়েদের মনে গজিয়ে উঠতে বোধ হয় পলকের বেশী সময় লাগে না। চট্ ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে নমস্কার ক'রে সে অবিনাশকে বললে, “এই যে, আপনি কখন এলেন?”

অবিনাশ কোন কথা বলবার আগে রমেশ সোৎসাহে বলে উঠল, “অবিনাশের যে বিয়ে ঠিক হচ্ছে অঞ্জলির সঙ্গে।”

“তাই নাকি? শুনিছি। তুমি একবার অঞ্জলির কাছে যাও ত ভেতরে, আমি অবিনাশ বাবুর কাছ থেকেই শুনি স্থবরের ব্যাপারটা।”

রমেশ ভিতরে চলে গেল এবং অবিনাশ অবাক হয়ে হিরণের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল। হিরণ হাসি চাপতে না পেরে বললে, “অঞ্জলি যে এখন আমাদের এখানেই আছে তা বুঝি উনি বলেন নি আপনাকে এতক্ষণ? আচ্ছা, আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।” বলেই হিরণও চলে গেল। ভিতরে গিয়েই রমেশকে প্রেমার ক'রে আড়ালে নিয়ে হিরণ বলতে লাগল এক বিপুল ষড়যন্ত্রের কথা। তার প্রস্তাবনার মর্ম এই যে, অবিনাশের সঙ্গে এই বিবাহ অঞ্জলির বিয়ে দিতে হবে, তার প্রধান যুক্তি—অবিনাশ বিপ্লবীক এবং হিরণ বিধবা। আশ্চর্য প্রকাশ করলে—রমেশ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে বলে না অঞ্জলির পিতা বিস্মিত ছিলেন, এখন আবার নিজের মেয়েকেই কি ক'রে একজন বিপ্লবীকে হাতে সঁপে দিতে উদ্যত।

মন্ত্রপড়ার মত সমস্ত বিধান রমেশকে পড়িয়ে দিয়ে হিরণ বললে, “এইবার যাও, অবিনাশ বাবু অনেকক্ষণ একলা বসে আছেন। অঞ্জলির ভার সম্পূর্ণ আমার উপর রইল। তুমি ও-দিকটা সামলিয়ে।”

রমেশ অবিনাশের সঙ্গে আবার কিছুক্ষণ কথা কয়বার পর

হিরণ ও তার পিছনে অঞ্জলি, দুজনে দুই হাতে কিছু জলযোগের আয়োজন নিয়ে এসে হাজির।

“এর নাম অঞ্জলি রায়, অবিনাশ বাবু,” হিরণ বললে। অবিনাশ এতটা ভাবে নি। স্বপ্ন দেখছে কিনা সন্দেহ হ'ল।

* * *

অবিনাশের কাছে যখন রহস্য উদ্ঘাটন করা হ'ল তখন তার মনটা এই অঞ্জলিতে এতটা খুঁকেছে যে এ-বিবাহে আর আপত্তির কারণ রইল না।

অবিনাশের সঙ্গে দ্বিতীয়-অঞ্জলির বিয়ে হয়ে যাবার কিছু দিন পরে প্রথম-অঞ্জলির এক চিঠি এল হিরণের নামে।—

প্রিয়তমকে

দ্বিদি, যখন আপনার স্নেহোপহার ঘূর্ণাভরে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তখন জানতাম না আপনার মূল্য। আপনাকে সত্যিই চিনি নি তখন। *** আজ কৃতজ্ঞতার আমার মাথা আপনার পায়ে লুটোতে চাইছে কিন্তু লজ্জায় তা পারছি না। আমার জীবনের কত বড় দুর্ভাগ্যকে যে আপনি দূর কবলেন তা আপনি যেমন বোঝেন আমিও তেমনি বুঝতে পারছি। আমার ক্ষমা ক'রে আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি

আপনার স্নেহের বোন
অঞ্জলি

হিরণ চিঠিখানাকে একবার পড়ে শেষ করেছে—চোখের কোলের সঞ্চিত অশ্রুকে মুছে আবার পড়তে যাবে, এমন সময় রমেশ এসে পড়তেই সে ওখানাকে ছমড়ে মুড়ে ফেললে।

“কার চিঠি দেখি?” রমেশ জিজ্ঞাসা করলে।

“দেখতে হবে না।” সাক্ষ জবাব।

হিরণের মুঠোর ফাঁক দিয়ে দু-চারটে অশ্রু দেখতে পাচ্ছিল রমেশ। বললে, “কার জীবনের দুর্ভাগ্যের কথা আবার লেখা রয়েছে?”

হিরণ দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, “মেয়েদের ব্যথা মেয়েরাই বোঝে—তোমরা কেউ-ই তা বোঝ না, তোমাদের স্তনেও কাজ নেই।”

সঙ্কুচিত নারী-হস্তাক্ষর পুরুষের দৃষ্টি এড়াতে হিরণের মুঠোর ঘোমটার আর একটু মুখ ঢাকল।

কালিম্পাও থেকে গ্যাংটক

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

এবার এপ্রিল মাসে যুনিভার্সিটির দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হওয়া মাত্র হাঁফ ছেড়ে লক্কৌ থেকে পাড়ি দিলাম বাংলার পানে; প্রকৃত উদ্দেশ্য, দিন কয়েক আত্মীয়বন্ধুদের কাছে থেকে, হিমালয় ও আসামের যে-সব প্রান্তে পূর্বে যাওয়া হয় নি সেগুলি এবার দেখে আসব। বহরমপুরে গিয়ে স্থির করে ফেললাম আগে কালিম্পাও যেতে হবে, কারণ সেখান থেকে সিকিম যাওয়াও সহজ। দার্জিলিং পূর্বেই দেখা হয়েছে, তা ছাড়া আজকাল সেখানে যেতে হলে আবার পাসের হাঙ্গামা আছে। সেই জন্য দার্জিলিং যাওয়ার কথা মনেও আসে নি। তখন কিন্তু জানতাম না যে, কালিম্পাও যেতে হলেও পুলিশের পাস লাগে, জানা থাকলে লক্কৌ থেকেই পাস জোগাড় করে নিয়ে যেতে পারতাম। বিশেষ ভাবনায় পড়া গেল। দেখলাম, পাসের জন্য অপেক্ষা করতে হলে কয়েক দিন বুখা বিলম্ব হয়।

ইতিমধ্যে শুনলাম বহরমপুরের পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি ভদ্র লোক। ভাবলাম, তাঁর সঙ্গে সোজাসুজি একবার দেখা করেই আসি, দেখি তিনি কি বলেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয়ের বাড়ী গেলাম সকালে। অল্পক্ষণ কথাবার্তার পব যখন চলে এলাম তখন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তৃপ্তি যত না হয়েছিল, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম শ্রদ্ধাঙ্গদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত একজন অমায়িক ও সহৃদয় পুলিশ-অফিসারের সহিত আলাপ করে।

পাস পেয়ে পর দিন সকালেই যাত্রা করলাম। বাজে রাণাঘাটে দার্জিলিং-মেল ধরে ভোরে যখন শিলিগুড়ি পৌঁছালাম তখন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণক্লাস্ত আকাশ, আর পাহাড়ে ঠাণ্ডা বাতাস জানিয়ে দিলে যে, সমতল ভূমির তাপাধিক্য হতে এবার নিষ্কৃতি পাব। প্লাটফর্মেরই আমার পাস দেখতে হ'ল। দেখলাম, পুলিশ-কর্মচারীদের খুব কড়া নজর, পাস না দেখিয়ে বাড়ালী ছেলেদের পরিত্রাণ লাভ অসম্ভব। যাক,

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলে যখন স্টেশনের বহির্ভাগে এলাম তখন দেখি কালিম্পাওগামী সব ট্যাক্সিস্ট্রাই ভর্তি। মহা মুঞ্চিল, তখন ছোট লাইনের ট্রেন ছাড়-ছাড়, ট্রেনে যাওয়াও আর সম্ভব নয়।

তল্লিঙ্গা নিয়ে এক রকম হজরত হয়েই দাঁড়িয়ে আছি, ইতিমধ্যে এক ট্যাক্সিওয়ালা ডাকলে, “বাবুজী, ইয়ার আইয়ে, ফ্রাণ্ট সিট খালি হ্যায়, ছা রুপিয়া নো।” কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ীভিত্তর তিনটি স্ত্রীবেশা নেপালী মহিলা। তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি, তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবে হিন্দীতে আমাকে বললেন, “আমরা গোটা ট্যাক্সিই রিজার্ভ করেছিলাম, তবে আমাদের একজন সঙ্গীর নাওয়া হ'ল না, আপনি আসতে পারেন এই গাড়ীতে, ট্যাক্সিওয়ালা ছ'টাকা চাইছে, আপনি পাচ টাকাই দেবেন, বুখেন?” “না” বলবাব কোন কাবণ ছিল না, তাই চট করে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসলাম।

গাড়ী চলল দ্রুতবেগে পিচ-ঢালা বাস্তার উপর দিয়ে অনেক দূর। দু-পাশে নিবিড় শালবন, সমস্ত সরকারী সম্পত্তি। মাঝে মাঝে কাঠবোঝাই গরুর গাড়ী মন্থর গতিতে চলেছে। মহিলারা ফলস্বরে বিশৃঙ্খলাপ করছিলেন, তাঁদের উচ্চ হাসি নির্জন পথের নীরবতাকে যেন নিঃস্বরভাবে আঘাত ক'বছিল। অজানা অচেনা মনোহর পার্শ্বত পথ দিয়ে চলেছি, সাথী অনাখীয়া তিনটি পাহাড়ী মেয়ে—সুন্দরী, রসিকা, আলাপনীষ। মনে হচ্ছিল, তিনটি পর্বত তনয়া আমার মত নিঃসঙ্গ গাহকে যেন হিমাচলের বৃকে সাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্যই আজ আবির্ভূত।

কয়েক মাইল সমতল পথ অতিক্রম করে আমবা চড়াইয়ের মুখে যখন এসে পৌঁছালাম তখন অদূরে ধরাতোতা তিস্তা নদীর উপত্যকা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। আমাদের ডান দিকে এঁকে-বঁেকে ধেনো-শিমলাসজ্জিতা তিস্তা প্রচণ্ডবেগে ছুটেছে, অজস্র উপলব্ধি তার গতি রোধ করে

উঠতে পারছে না, পাশ দিয়ে মানুষের তৈরি রাস্তা নদীর সাথে সাথে যেন ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চার দিকে ঘননিবিড় বিন্ধ্যশ্রিত অরণ্যানী, অদূরে হিমালয়ের উন্নত মস্তক যেন নীচের ক্ষুদ্র মানুষের দিকে অহুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সিভোক যেখানে এসে তিস্তা য় মিশেছে সেখান থেকে কালিম্পঙের প্রায় সমস্ত পথটাই তিস্তার পাশ দিয়ে গিয়েছে। পাহাড় নদী ও বন, এই তিনের সংমিশ্রণে যে-অপরূপ নৈসর্গিক ঐক্যতানের সমাবোধ দেখলাম তা শুধু কান্দীরেই দেখা যায়।

মোটরে বসে শুধু মনে হচ্ছিল, ট্রেনে গেলেই ভাল হ'ত, কাবণ রেলপথ নদীব একেবারে কাছ দিয়ে পাতা হয়েছে, মোটরের রাস্তা অনেকটা উঁচুতে। ট্রেন থেকে নদী আরও ভাল করে দেখা যায়। তবে দুঃখের বিষয়, রেল কালিম্পঙ অবধি নেই, এর শেষ স্টেশন গিয়েল-খোলা থেকে আবার অনেকটা মোটরে যেতেই হয়, সে-জন্ত, এবং ট্রেনে গেলে অনেকটা সময় বুখা মট হয়, সে-জন্তও, সাধারণতঃ লোকে মোটরেই যাওয়া-আসা করে।

তিস্তা ও রিয়াং নদীর সংযোগ স্থল—এ-প্রান্তের বিশিষ্ট বাণিজ্য-ও রেল-কেন্দ্র। রিয়াং থেকে বৈজ্ঞানিক রজ্জুপথ সোজা কালিম্পঙ অবধি গিয়েছে, ভারী মাল এতে খুব তাড়াতাড়ি ও সস্তায় পাঠানো যায়। আর এর ছাড়া এ-দেশের গরীব কুলি-মজুর গাড়েয়ানদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। আমার এক সহযাত্রী বললেন, “ইংরেজ এই বজ্জু-পথ গরীবের ক্রটি মারবার জন্তই এনেছে, তাদের সর্বনাশ হোক!”

তিস্তা ব্রিজ অবধি রাস্তা চড়াই বেশী নয়। নদীবক্ষে কান দিয়ে যেতে হয় ব'লে, দু-দিকেই হুউচ পর্বত মনে হয় যেন বিরাট প্রাচীরের মত পথকে আগলাচ্ছে।

পর্বতগাজে রৌদ্রছায়ায় খেলা সব সময়েই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেশীভাগই সংরক্ষিত সরকারী বন দেখা গেল, কোথাও কোথাও পাহাড়ীবা জঙ্গল কেটে পাহাড়ের গায়ে কি বিস্ময়জনক দৈর্ঘ্য ও কৌশলেব সহিত চাষ করছে ও প্রকৃতির সহিত অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তা দেখলে চমকিত হতে হয়। অল্পস্থল আবেষ্টনে এই সব প্রকৃতি

পাহাড়ীরা মাটি থেকে সোনা ফলাতে পারত, তা বুঝতে দেবী লাগে না। কত মজুব, চাষা, গাড়েয়ান পথে যেতে যেতে দেখলাম, কান্নর মুখ দেখলে মনে হয় না এদের অভাব কি মর্যাস্তিক। সকলের মুখেই একটা অবর্ণনীয় উৎসাহ দেখেছি। তারা সানন্দে ও কৌতুহলপরবশ হয়ে প্রত্যেক নবাগতকে নিরীক্ষণ করে শিশুজ্ঞানোচিত উৎসাহের সহিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ত মোটর দেখলেই ছুটে আসে, আর এমন সবল গাঙ্গীর্ষের সহিত সেলাম করে যে, দেখে না হেসে পারা যায় না। বয়স্ক বাবা টুপি পরে তারাও অতি ভদ্রতার সহিত ইংবেজী কায়দায় টুপি তুলে সেলাম করে। একটা সিগারেট উপহার পেলে এরা খুশি হয়ে যায়। ভীষণ সিগারেটপ্রিয় এরা।

তিস্তা-ব্রিজ এসে গাড়ী দাঁড় করিয়ে বিহারী ড্রাইভার চায়ের দোকানে ঢুকল—তখন বাধ্য হয়েই নেমে পড়লাম। সহযাত্রীরাও চায়ের দোকানে গেলেন। অন্তরমনস্ক হয়ে কেরো-কম্ব্রীটের তৈরি সুবৃহৎ ব্রিজের অসাধারণ গঠন দেখছি, ইতিমধ্যে কানে এল, “আপনার পাস দেখাবেন ত।” কিরে দেখি, এখানকার পুলিশ-ইন্সপেক্টার মহাশয় আমার পাশে দাঁড়িয়ে। পাসের উপর দস্তখত করে আমাব কালিম্পঙ যাওয়াব উদ্দেশ্য, সেখানকার ঠিকানা প্রভৃতি সব তাড়াতাড়ি জেনে নিলেন। লোকটি কিন্তু অতি ভদ্র। তিস্তা-ব্রিজের কাছে ছোট একটি বাজার এবং পল্লী আছে, অদূরে সরকারী কর্মচারীদের কয়েকটি সুদৃশ্য বাঙালো দেখলাম। এখান থেকে একটি সরু মোটরের পথ ঘুম হয়ে দার্কিলিঙ গেছে—আর একটি বেশ বড় রাস্তা গ্যান্টক অবধি তৈরি হয়েছে; তৃতীয় পথ এখান থেকে উপরে উঠেছে কালিম্পঙ পর্যন্ত। পথের প্রকৃত চড়াই এইখানেই আরম্ভ হয়। এক-এক জায়গায় রাস্তা এমনই খাড়া উঠেছে যে, নীচের খানেক দিকে তাকাতে বীতিমত ভয় হয়। ড্রাইভার বললে, “মাঝে মাঝে মোটর-দুর্ঘটনা যে হয় না, তা নয়।”

দুই হতে কালিম্পঙ পাহাড়ের আকৃতি ও ছোট-বড় বাগানবাড়ীগুলি বেশ সুন্দর লাগে। মোটর প্রথমে বাজারে গিয়ে থামল একটি প্রকাণ্ড মূদীখানার স্মৃতি; বুঝলাম, সন্ধিনীবা দোকানীর আত্মীয়। তাঁরা হাসিমুখে বিদায় নিলেন—অল্পক্ষণের আলাপ, তবু মনে হচ্ছিল যেন কত দিনের

চেনা। তার পর ড্রাইভার আমাকে “হিল-ভিউ” হোটেলে এনে নামিয়ে দিলে। এইখানেই থাকব বলে আগেই স্বত্বাধিকারী মিষ্টার ব্যানার্জিকে (অর্থাৎ বাঁদুজ্যো-মশায়) লিখেছিলাম; হোটেলটির অবস্থান ভারি সুন্দর, প্রশস্ত হাতা, চারদিকে অজস্র ফুল ও ফলের গাছ, নিম্নে সুবিশাল উপত্যকা, আর দূরে উচ্চ গিবিচুড়া। হাতাব ভিতর এসেই দেখলুম একটি তরুণবয়স্ক ভদ্রলোক বাগানের গাছপালা পরিদর্শনে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন, অলাপে বুঝলাম ইনিই হোটেলের মালিক। দুঃখের সহিত তিনি জানানেন যে কোন ভাল কামরা এখন খালি নেই, তা নইলে তিনি কখনও আমাকে ফেরাতে চাইতেন না। ফিরে আসছি, তখন হঠাৎ কি ভেবে তিনি বললেন, “দেখুন, আপনাকে এই দুপুরে ফিরে যেতে দেব না, আমন, দোভলায়, একটি ঘর আমার বাবার জন্ত রিজার্ভ করা আছে, তিনি কোন্ দিন আসবেন ঠিক নেই, আগনি আপাততঃ সেই ঘরটি নিন।” আমি যেন বর্ডে গেলাম।

বাঁদুজ্যো-মশায় অতি চমৎকার আমদে লোক, ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীজয়প্রোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। উচ্চশিক্ষা গেয়ে দিন-কতক চাকরী করেছিলেন, কিন্তু চাকরীর ইনিতা ইনি বরদাস্ত করতে পারেন নি বলেই কালিম্পাওে আশ্রয় কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করছেন সপরিবারে। অতিথিদের প্রতি তাঁর ব্যবহার সরল ও অকপট। তাঁর হোটেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, অল্প হোটেলের মত এখানে খাওয়া-দাওয়ার শ্রেণী-বিভাগ নেই। হোটেলের স্বশৃঙ্খল পরিচালনে যে গার্হস্থ্য আড়ম্বল্লীনতা ও সামঞ্জস্য দেখে তৃপ্তি অনুভব কবেছিলাম, তা অনেকাংশে বন্দ্যোপাধ্যায়-জায়ার সুগৃহীণীপণ্যর জন্তই সম্ভব হয়েছে, তা এখানে না বললে সত্য গোপন করা হবে।

কালিম্পাও সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এইবার বলব। এটি ছোট্ট অখচ সুন্দর জায়গা; কিন্তু এব জীবনশৃঙ্খ, নিষ্কেন্দ্র ও নীরস ভাবটা প্রথম প্রথম বড়ই চোখে ঠেকে। কোথাও কোনরূপ কোলাহল বা জনতা দেখা যায় না, বাজারটি পর্যন্ত শান্ত। সপ্তাহে দু-দিন মাত্র এক প্রশস্ত ময়দানে হাট বসে, তখন সকলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ফলমূল আনাঙ্গ ইত্যাদি

কিনে রাখে। হাটের দিন কিন্তু নিকটবর্তী আন্ড্রাসমূহ হ’তে বহু পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষের সমাগম হয়। তখনকার দৃশ্য বিচিত্র ও মনে রাখবার মত। শহরের গিউনিম্পালিটি নেই বলেই বোধ হয় এখনও পথঘাটে আলোর কোন ব্যবস্থা নেই, সন্ধ্যার পর টর্চ না নিষে বেরলে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়, কারণ বাজারটুকু ছাড়া আর সব জায়গাই অন্ধকারময়। আমোদ-প্রমোদের কোন বন্দোবস্ত নেই—সিনেমা-থিয়েটারও নেই। বাঙালীদের জন্ত একটি ছোট পাঠশালা আছে শুনেছিলাম। বৈজ্ঞানিক আলোক সরবরাহর এখনও ব্যবস্থা হয় নি, তবে বোধ হয় শীঘ্রই হবে। জলের কল আছে ও এখানকার জল বেশ ভালই। সর্বোচ্চ চূড়ায় অবস্থিত জলাশয় হতে সর্বত্র নলদ্বারা জল নেওয়া হয়, জলও পাওয়া যায় প্রচুর, জলের ট্যাক্সও স্তন্যময় বেশী নয়। এখানকার বাজারে কয়েকটি বাঙালী বোতল আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিরও বাজারে প্রাধান্য নেই।

এখানকার বিশেষত্ব কয়েকটি খুব ভাল লাগল। বাজার ছাড়া আর কোন জায়গাই ঘিঞ্জি বা নোংরা নয়। সমস্ত ছোটবড় বাথলাব চার পাশে প্রশস্ত বাগান আছে, তা ছাড়া রাস্তাগুলিও বেশ ফাঁকা, বড় ও পরিষ্কার। স্বাস্থ্যসেবীর পক্ষে এটি আদর্শ স্থান, এর তুলনায় অন্ততঃ দার্জিলিং বহুগুণ ঘিঞ্জি ও অপরিষ্কার। এখান থেকে হিমালয়ের হুবারশৃঙ্খগুলি দার্জিলিংয়ের চেয়ে ভালরূপে ও দিবের বেলায় অনেক ক্ষণ দেখা যায়, কারণ এখানে কুয়াশার আভিমান্য নেই। দার্জিলিং শিলঙ প্রভৃতির চেয়ে এখানে অল্প খরচায় থাকা যায়। শিলঙের মত প্রত্যেক রাস্তায় এখানে মোটরে যাওয়াও চলে, এ-সুবিধা দার্জিলিং, মসুরী, সিমলা প্রভৃতি স্থান নেই।

দর্শনীয় স্থানের ভিতর এখানকার চৌবাস্তা উল্লেখযোগ্য। চারটি পিচ-ঢালা বাস্তাব সংযোগস্থল এটি, একে শহরের কেন্দ্র-স্থান বলা যায়। সকালে সন্ধ্যায় এখানে জনসমাগম হয়, তবে বলে রাখা উচিত যে, অল্পাত্ম পার্কট শহরের জনপ্রিয় ‘ম্যালের’ সহিত এর তুলনা করা চলে না। কালিম্পাওের চৌবাস্তা নিতান্ত সাদাসিধা হিন্দুস্থানী ধরণের, এখানে বিলাতী দোকান বা হোটেলও নেই—সাহেববন্দার ভিডও তাই হয় না। বাঙালী মহিলারাও এখানে সন্ধ্যায় বায়ুসেন্নন করেন না। তবে চৌবাস্তার উপর মহারানী ভিক্টোরিয়ার

ছোট কিন্তু ভারি হৃদয় একটি স্থিতিমন্দির আছে, অনেকটা তিব্বতীয় রীতিতে গঠিত, মন্দির প্রতিমূর্তিটি অতি সুন্দর।

কালিম্পাঙের প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে ডক্টর গ্রেহাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনাথ কিরিকি ছেলেমেয়েদের আশ্রম। শহরের অনেক উচুতে অনেকটা জাঘগা সবকার এই আশ্রমের স্রষ্টা দিয়েছেন। এখানে ছেলেমেয়েদের ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের থাকবার জন্য অনেকগুলি সুস্বাদু অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, স্কুল, গির্জা, খেলার মাঠ, হাসপাতাল প্রভৃতি সবই আছে। আশ্রমের নিজস্ব আধুনিক ধরণের গোশালা, চাষের জমি ও বাগান দেখবার জিনিষ। ছেলেদের পালা করে সেখানে কাজ করতে হয়, যাতে তারা স্বাবলম্বী ও শ্রমবীর হতে পারে। আশ্রম বাজার থেকে ষ্ঠেই দূরে, তাই ট্যাক্সি করে এক দিন সকালে গেলাম। পথে কয়েকটি বৌদ্ধ-‘গুম্ফা’ বা মঠ দেখলাম, সবই আধুনিক ও বৈশিষ্ট্যহীন, লামাদের দেখেও বিশেষ শ্রদ্ধা হ’ল না। ডক্টর গ্রেহামের আশ্রমে যেতে হ’লে কালিম্পাঙের সর্বোচ্চ পাহাড়ে উঠতে হয়—উপর থেকে নীচের শহর ও দিগন্তবিস্তৃত অরণ্যসঙ্কুল উপত্যকার দৃশ্য ভারি মনোরম লাগে। আশ্রমের গির্জাগুলির গঠনসৌন্দর্য চিত্তাকর্ষক, আগন্তুকদের ভিতরে গিয়ে দেখতে দেওয়া হয়। এই আশ্রমটির বিশ্বয়জনক প্রসার ও পৃথিবীজোড়া খ্যাতি সম্ভব হয়েছে ঋষিভুল্য প্রতিষ্ঠাতার অনন্তসাধারণ অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের জন্য। স্তন্যাম অর্থাভাবে অনাথ শিশুদের সংখ্যা এখন আগের চেয়ে কম, তবু এখনও পাঁচ শ-র বেশী ছেলেমেয়ে এখানে আছে।

গ্যাংটক দেখবার ইচ্ছা গোড়া থেকেই ছিল, তবে একা যেতে মন চাইছিল না। সৌভাগ্যবশতঃ সঙ্গী জোগাড় হতে কিন্তু বিলম্ব হয় নি। হোটেলের আরও দু-জন আমারই মত সিকিম দেখবার জন্য সমুৎসুক ছিলেন। আমার প্রস্তাবে তাঁরা সানন্দে যেতে বাজি হলেন। একজন পার্শী ভদ্রলোক, মিষ্টার দেশাই, সিঙ্গার সেলাই কল কোম্পানীর স্থানীয় হিসাবপরীক্ষক; আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক বাঙালী, দত্ত-মহাশয়, তিনি কলগেট-পামঅলিভ সোপ কোম্পানীর লাম্যমান প্রতিনিধি। দুজনেই বেশ অমায়িক লোক, তাই তাঁদের মত সঙ্গী পাওয়ায় গ্যাংটক-যাত্রা খুবই প্রীতিকর হয়েছিল।

একটি বাঙালী ট্যাক্সি-চালকের গাড়ী যাতায়াতের জন্য ঠিক করা হ’ল। আমরা সকালে জলযোগ করে বেরিয়ে পড়লাম। বাঁদুজ্যো-মশায় সঙ্গে দিয়ে দিলেন দুপুরে খাওয়ার প্রচুর লুচি, তবকারী, ডিম ইত্যাদি এছাড়া তাঁকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানালাম। তিনি ও তাঁর ছেলে ও মেয়ে ডাকঘর অবধি আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ছেলেটি ত কেঁদেই অস্থির, সে গৌঁ ধরল আমাদের সঙ্গে যাবেই। অনেক কষ্টে তাকে বাঁদুজ্যো-মশায় ভুলিয়ে, শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

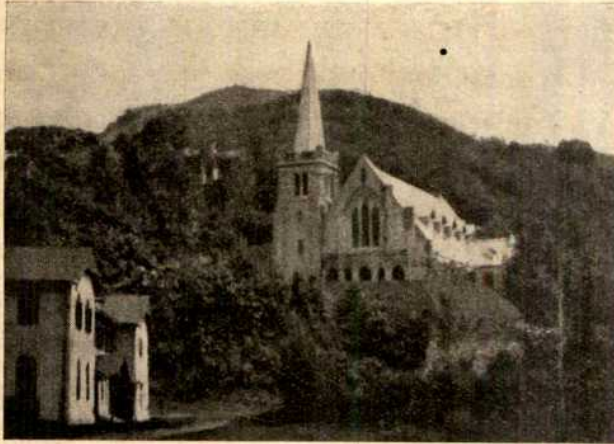
তিস্তা-ব্রিজ অবধি ঢালু পথে নেমে এসে আমরা গ্যাংটকের পথ ধরলাম। একদিকে কলম্বনা তিস্তা ভীমবেগে প্রধাবিতা, আর জলের প্রায় পাশাপাশি পথ গিয়েছে নিবিড় অরণ্যানীর গা ঘেঁসে, দু-দিকে গগনচুম্বী স্বাপদসঙ্কুল শৈলরাজি—মাঝে মাঝে ছোট-বড় বরষা পথের তলা বেয়ে তিস্তায় এসে মিশছে। কত রকম যে অপরিচিত গাছপালা ও উদ্ভিদ দেখা গেল তা আমার মত অবৈজ্ঞানিকের বোঝা অসম্ভব। হিমালয়ের এ দিকটা সত্যিই অপূরণ্য নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বনবিহঙ্গের কলকাকলি, তিস্তার উচ্চ নিনাদ, ও পর্বতের মৌন গান্ধী—সব মিলে মনকে যেন প্রতিমূর্ত্তিতে সমাহিত করে দেয়। শিলিগুড়ি থেকে আসবার সময়ে তিস্তার এত কাছ দিয়ে যাই নি, গ্যাংটকের পথ তাই আরও সুন্দর লাগল।

বেলা দশটা নাগাদ রংপু-ব্রিজ পৌঁছালাম—এইখানে ব্রিটিশ-ভারতের সীমানা। রংপু নদীর ওপারে সিকিম-রাজ্যের আরম্ভ। রংপু-ব্রিজের ধারে সরকারী পুলিশের ঘাঁটি আছে, এইখানে পুলিশ আমাদের পাস দেখতে চাইলে। বড় মুন্সিলে পড়লাম—আগে থেকে একেবারেই জানা ছিল না যে, সিকিম যেতে হ’লে বাঙালীদের পাস নিতে হয়, তাই পাসের কোনরূপ ব্যবস্থা করা হয় নি। মিঃ দেশাই ত নিজের কার্ডে লিখে দিলেন যে তিনি পার্শী বলে তাঁর পাস রাখার দবকার হয় নি। দত্ত-মহাশয় ও আমি অবশেষে বুঝি করে আমাদের কালিম্পাঙ আসার অল্পমতিপত্র দেখিয়ে কোনরূপে রেহাই পেলাম। নদীর ওপারে রংপু পল্লী, সেখানে সিকিম পুলিশ এক প্রকাণ্ড খাতা এনে হাজির করল—আমরা নাম-ধাম, যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখে দিলাম।

খাতায় বাঙালীর নাম খুবই অল্প চোখে পড়ল, পাঁচ-সাতটির বেশী নয়।

রংপু-র বাজার বেশ বড়, এখানে মিঃ দেশাই কোম্পানীর কাজে খানিকক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমরা দু-জন রংপু-র ধারে গিয়ে স্বচ্ছ জলে মুখ-হাত ধুয়ে বাজার ঘুরে এলাম।

রংপু-র পর রাস্তা ভাল নয়—স্থানে স্থানে মেরামত চলছে দেখলাম। এক জায়গায় একেবারে নদীর ধারে পাহাড় ধমে পড়ায় অতিকষ্টে মোটর নিয়ে যেতে হ'ল। পথে এক দল কালো পোষাক-পরা পাহাড়ী দেখলাম, নানান ধরণের বাজনা নিয়ে চলেছে। কোতুল হওয়ায় তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম। তারা ত আনন্দের সহিত আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে। শুনলাম তারা সিকিমের দরিদ্র প্রজা, রাজদর্শনের জন্ত গ্যান্টক যাচ্ছে, মহারাজার স্বমুখে গানবাজনা ক'রে তাদের রাজভক্তি জানাবে। দত্ত-মশায় তাদের বাজনা বাজাতে অত্বরোধ করাতে তারা



ডক্টর গ্রেহাম-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের এক দিক

তৎক্ষণাৎ তাদের বড় বড় ভেঁপুতে এমন জোরে ছুঁ দিলে যে আমাদের কানে তালা লাগবার উপক্রম হ'ল। তাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও বাজনার যথেষ্ট প্রশংসা ক'রে আমরা বিদায় নিলাম।

তার পর গাড়ী সিংটাম নদীর ধারে সিংটাম-বাজারে এসে থামল। প্রকাণ্ড বাজার, এখানে ডাকঘর, হাসপাতাল সবই আছে। এ-অঞ্চলে সিংটাম বুদ্ধি পল্লী, তবে বাজারে মাড়োয়ারীদেরই প্রাধান্য চোখে পড়ল। সিংটামের পর কমলালেবুর বাগান দেখা গেল। গাছে তখন খুব ছোট ছোট ফল ধরেছে। সিকিম থেকে কমলালেবু প্রচুর রপ্তানী হয়,



কালিম্পাওর চৌরাস্তা

সেজন্তু এর চাষ এ-দেশে খুব বেশী হয়। সিংটাম নদীর ধার দিয়ে অনেক দূর পথ গেছে, তিস্তার মত রমণীয় না হ'লেও মন্দ নয়। বেলা বারোট্টা নাগাদ গ্যান্টক পৌছানো গেল।

গ্যান্টকে কোথায় বিশ্রাম করব ভাবছি, এমন সময় মিঃ দেশাই বললেন, ডাকবাংলোই ভাল। সেখানেই বাওয়া হ'ল। ডাকবাংলোটি অতি সুন্দর, চারি ধারে মনোহর উদ্যান, অজস্র গোলাপ, আর কত রকমের ফুল। মন তৃপ্তিতে ভ'রে গেল। ভূটিয়া গৌকিদারও বেশ ভদ্র, আমাদের খুব খাতির করলে, অবশ্য পুরস্কার পাওয়ার আশায়। সেখানে আমরা আরামে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করলাম, গেলাস প্লেট চামচ প্রভৃতি সবই চৌকিদার

দিলে। বিশ্রামের পর বেরনো গেল। প্রথমে স্থির হ'ল ডাকঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে হবে, কারণ এখানকার নামাঙ্কিত চিঠি পেয়ে আত্মীয়বন্ধুগণ নিশ্চয় চমৎকৃত হবেন। ছোট ডাকঘর, পোষ্টমাষ্টারটি তরুণ সিকিমী,

খুবই ভদ্র—দোহাত কলম কাগজ প্রভৃতি সবই আমাদের দিলেন ও ডাকঘরের ভিতর আমাদের সাদরে বসানেন। অল্পদিন হ'ল খবরের কাগজে পড়েছিলাম, এভারেট-বাহ্রীদের অনেকগুলি চিঠি চুরি যাওয়ায় এই পোষ্টমাষ্টারটিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এখানে বলা দরবার ঘে, গ্যাণ্টক পোষ্ট-অফিস অবধি মোটের ডাক ঘাঘ, সেপান থেকে তিব্বতের চিঠিপত্র পায়ে-হাঁটা পথে পাঠানো হয়, বাজেই কেমন করে যে এভারেট-বাহ্রীদের চিঠি অন্তর্হিত হ'ল তা দুর্বোধ্য নয়। আমরা অবশ্য দূর হতে ডাকঘরের এক কোণে এভারেট-বাহ্রীদের স্মৃপীকৃত চিঠি দেখেছিলাম, সবগুলিতেই বিমান-ডাকের ছাপ ছিল।



তিস্তা-ব্রিজ

ডাকঘর থেকে আমরা রাজপ্রাসাদ অভিমুখে গেলাম। পথে টাউন-হল ও একটি সুন্দর সরকারী পার্ক দেখা গেল। রাজপ্রাসাদ দেখে কিন্তু নিরাশ হলাম—মোটাই জঁকালো নয়, সাধারণ বড়লোকের বাড়ী যেমন হয়ে থাকে, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। অবশ্য ভিতরে আমরা যেতে পারি নি, কারণ মহারাজা তখন প্রাসাদে ছিলেন। প্রাসাদের খুব কাছে গ্যাণ্টকের প্রসিদ্ধ কাষ্টনির্মিত গুফা দেখলাম। এটি বিশাল ত্রিতল অট্টালিকা, তিব্বতীয় আকারে প্রস্তুত। প্রধান লামার সহিত দেখা হ'ল না, তিনি তখন তিব্বতে; অত্যাচ্ছ লামারা আনন্দের সহিত আমাদের সমস্ত গুফাটি দেখালেন, এমন কি, আমরা প্রধান লামার শয়ন-কক্ষ অবধি বাদ দিই নি। শয়নবক্ষে কিন্তু সস্তা বিলাতী পর্দা ও বিলাতী ধরনের

আসবাব চতুর্দিকের তিব্বতীয় আবেষ্টনের ভিতর ভারি খাপছাড়া ও দৃষ্টিকটু লাগল। সভ্যমণ্ডলের সমস্ত দেয়ালে বুদ্ধের জীবনী চিত্রিত হয়েছে, সবই তিব্বতীয় ও কতকটা জাপানী রীতিতে আঁকা। এর অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য ও অঙ্কন-কৌশল দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঠাঁরা দার্জিলিঙ গেছেন তাঁরা ঘূমের প্রকাণ্ড গুফা দেখেছেন কিন্তু গ্যাণ্টকের গুফা তার চাইতে ঢের বড় ও সুন্দর।

এখানকার স্কুলে জন-কয়েক বাঙালী শিক্ষক আছেন শুনে আমরা আগ্রহের সহিত স্কুল দেখতে গেলাম। স্কুলটি বেশ বড় ও অনেক ছেলে পড়ে মনে হ'ল। হেডমাষ্টার ইংরেজ, অত্যাচ্ছ শিক্ষক এদেশীয়, তার মধ্যে মাত্র তিন জন বাঙালী। তাঁদের মধ্যে দু-জনের সহিত দেখাশুনা হয়েছিল, তাঁরা বললেন, বাঙালী শিক্ষক আর নেওয়া হয় না। তাঁরা অনেক পূর্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন বলেই টিকে আছেন, তাঁরা বন্দ থেকে অবসর গ্রহণ করলে আর এখানে বাঙালীর পক্ষে চাকরি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। স্কুল দেখে আমরা বাজারে এলাম। বাজার খুব বড় নয়, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সর্বত্র যা দেখেছি এখানেও সেই মাড়োয়ারী-প্রাধাচ্ছ লক্ষ্য করলাম। বাজারের উপরেই একটি মেয়েদের স্কুল দেখা গেল। তখন একটি ইংরেজ-মহিল মেয়েদের নাচ শেখাচ্ছিলেন। অনেকগুলি বড় বড় মেয়ে তালে তালে ঘুরে ঘুরে এক সঙ্গে পা ফেলছে

কত ভঙ্গীতে, মনে হ'ল সেটা যুরোপীয় গ্রাম্য নৃত্য। রেসিডেন্ট-সাহেবের বাসস্থানও দেখা গেল। গ্যাণ্টকের সর্বোচ্চ শিখরে তাঁর জন্ম এক প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী নির্মিত হয়েছে; এটি রাজপ্রাসাদের চাইতেও সুস্থী।

বৈকালে আমরা কালিম্পঙ-অভিমুখে ফিরলাম। সন্ধ্যার আবছা আলোয় বিজলীমুখরিত পাহাড় ও বনের স্নানায়মান শ্রামলিমা নীরবে দেখতে দেখতে যখন রংপু পৌছলাম, তখন মিঃ দেশাই বললেন, তাঁকে একটি সেলাইর কল এইখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। মোটর একটি কুটারের স্রুখে দাঁড়াল, মিঃ দেশাইয়ের নেপালী সহকারী ডাক দিতেই একটি স্নানমুখী পাহাড়ী তরুণী বেরিয়ে এল। দু-জনে নেপালী ভাষায় কি কথা হ'ল বুঝলাম না। মিঃ

দেশাই রক্ষভাবে সহকারীকে ইংরেজীতে বললেন, “বুখা দেবী ক’র না, কলটি নিয়ে এস।” ব্যাপার কি জানতে চাইলাম। মিঃ দেশাই যা বললেন তা শুনে মেয়েটির জ্ঞান ভারি দুঃখ হ’ল। ওর স্বামী কিস্তিবন্দী ক’রে কলটি নিয়েছিল, কিন্তু দু-এক মাস কিস্তির টাকা দেওয়ার পর কয়েক মাস কিছুই দেয় নি, যা উপার্জন করে, মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। স্ত্রীপুত্রকে অর্ধেকদিন আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। কলটি গেলে তাও জোটা অসম্ভব। রাত্রে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। ভ্রমণের সমস্ত আনন্দ যেন মুছে গিয়েছিল মেয়েটির কান্না দেখে।



কালিম্পাঙের গুফা।



গ্যাংটক থেকে হিমালয়ের দৃশ্য

কালিম্পাঙ হ’তে ফেরবার আগে একদিন এক মাড়োয়ারীর লোমের গুদাম দেখতে গেলাম। এখানে ঐরূপ সবস্বল্প গোটা দশেক গুদাম আছে। তার মধ্যে দুই-একটি বাদে সব গুলিই মাড়োয়ারীদের। লোমের আমদানি-রপ্তানি কালিম্পাঙের প্রধান বাণিজ্য। তিব্বতের মেঘ-ছোন এখানে পরিকৃত হয়ে বৈজ্ঞানিক রজ্জুপথে রিয়াং অবধি পাঠানো হয়।

সেখান থেকে কলকাতা হয়ে বেশীর ভাগই আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়। গুনলাম প্রায় দু-লক্ষ মণ লোম প্রতি বৎসর এখান থেকে মাড়োয়ারীরা রপ্তানি করে। এই ব্যবসা সম্পূর্ণ তাদের করতলগত এবং এ থেকে তারা বিস্তর পয়সা রোজগার ক’রে থাকে। তাদের উত্তম ও অধ্যবসায় সভাই প্রশংসনীয়। দেখে দুঃখ হ’ল যে বাঙালী এই সব কাজ করতে অপারক। লোমের গুদাম দেখে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই পেলাম। শতাব্দিক পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ কি দক্ষতা ও ক্ষিপ্ততার সহিত লোম বাহাই করছে, দেখে অবাক হতে হয়। দিনমজুরী কিন্তু চার-পাঁচ আনার বেশী নয়। লোম রঙ অল্পসারে সাধারণতঃ চার ভাগে পঙ্কিত হয়—ধূসর, সাধারণ শুভ্র, অতি শুভ্র ও কৃষ্ণ। ত’র পর কলে গুজন-হিসাবে গাটবন্দী হয়। একটি বড় গুদাম করতে হ’লে অন্তত এক লক্ষ টাকা মূলধন আবশ্যক গুনলাম। কাজেই মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই ব্যবসায়ে হাত দেওয়া বঠিন। বাবুজ্যো-মশায় বলেছিলেন, তিনি অনেক বাঙালী ও বড়লোককে এই লাভজনক কাজে আহ্বান বরেছিলেন, কিন্তু ছপের বিষয় তাঁর চেষ্টা এখনও সফল হয় নি।

মনিপুর যাব ঠিক করেছিলাম ব’লে কালিম্পাঙে দিন-বয়েকের বেশী থাবতে পারি নি, বিস্তর যে ব-দিন ছিলাম বাবুজ্যো-মশায়ের সৌজন্য ও অতিথি-সৎকারে ত্রুটি খুঁজে



ডক্টর গ্রেহাম-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের একটি অটালিকা

পাই নি। আসবার দিন দত্ত-মশায় সঙ্গী হলেন। ট্যাক্সি করে সাগ্রহে ও বিশ্বয়ের সহিত যা দেখেছি, বিদায়কালে সেগুলি
ছপুয়ে আমরা শিলিগুড়ির দিকে রওনা হলাম। চেনা গন্ধে যেন নিশ্চিন্ত ও বৈচিত্র্যহীন লাগল। মাহুঘের মনটাই এমন
প্রত্যাবর্তন কালে মনটা উন্মনা হয়ে ছিল। আসবার সময় নিত্য-নূতনের প্রয়াসী।

দূরের বন্ধু

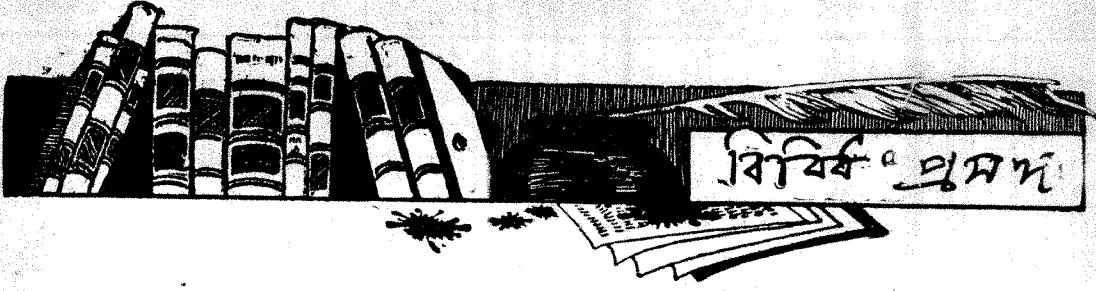
শ্রীরাধারাণী দেবী

আকাশ ধরারে বাহ-বন্ধনে রেখেছে ঘিরে
তবুও ধরণী তারি বিচ্ছেদে কাঁদিয়া ফিরে।
পরশে পৃথিবী গগন-চরণ দিগন্তরে,
ভাসে তা কেবল দূর-পথিকের নয়ন'পরে।

কাছের পাছ ভাবে,—দু-জনার বিরহ কেন ?—
ধরা ও আকাশে মহা ব্যবধান রয়েছে যেন !

দৌহে দৌহা হতে সুদূর,—ওদের তাই এ-লীলা !
মাগরে মরুতে প্রান্তরে দূরে—গোপনে মিলা।





নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে বঙ্গমহিলাদের সভা

বঙ্গে যে বহুসংখ্যক নারী পৈশাচিকভাবে নিগ্রহীত হইতেছেন, তাহার প্রতিরোধকল্পে কি করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনার নিমিত্ত, শ্রীমতী মোহিনী দেবী, শ্রীমতী অম্বরূপা দেবী, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, শ্রীমতী কিরণ বসু, শ্রীমতী লাভণালতা চন্দ ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর আহ্বানে, গত ১২শে আশ্বিন কলিকাতায় মহাবোধি সোসাইটির হলে বাঙালী মহিলাদের একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমতী সরলাবালা সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি বলেন :

বাংলা দেশে নারীর উপর যেরূপ অত্যাচার চলিতেছে, অল্প দেশে এইরূপ হইলে তথাকার লোকেরা পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙালী জাতি, বিশেষভাবে বাংলার নারীর, একেবারে নিশ্চল। বাংলা দেশ যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। বোর্ড গোবিন্দপুরে একটি নারীর উপর যে অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, তাহা কি বাংলার নারীজাতির কলঙ্ক ও অপমান নহে ?

আজকাল দেশব্যপী অনেক বুদ্ধি পাইয়াছে, এবং বুদ্ধি পাওয়াও উচিত; হুতরাং পল্লীগামের নারীদের উপর অত্যাচারে যদি বাংলার নারীদের প্রাণ কাঁদিয়া না উঠে এবং এইরূপ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্ত যদি তাহারা বন্ধপরিকর না হয়, তাহা হইলে নারীজাতির পক্ষে অধিকতর লজ্জার বিষয় আর কি আছে! দিনের পর দিন যখন এইরূপ হইতেছে, তখন দেশের নারীদের এই বিষয় সচেতন হওয়া উচিত এবং অন্তরের সহিত এই প্রশ্নের সমাধানের জন্ত যত্নবান হওয়া উচিত।

ইহার পর এই সভায় নিম্নমুদ্রিত চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(১) এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বাংলা দেশে যেরূপ দিনের পর দিন অসহায় নারীদের উপর দারুণ পৈশাচিক অত্যাচার হইতেছে, তাহার জন্য গবর্নমেন্টের বিশেষভাবে কঠোরতর শাস্তির বিধান করা উচিত এবং যেখানে দলবদ্ধভাবে অত্যাচার হয়, সেখানে যে যে গ্রামের লোকের দ্বারা এইরূপ অত্যাচার সম্বন্ধিত হয়, সেই সেই গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা (পিউনিটিভ ট্যাক্স) ধাৰ্য্য করা হউক এবং পুলিশ বাহাতে এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণের জন্য বিশেষ সতর্কভাবে নিজ কর্তব্য সাধন করে, সেজন্য তাহাদের উপর সরকারের বিশেষ আদেশ দেওয়া উচিত। অপর পক্ষে এই সভা গ্রামে গ্রামে বাহাতে নারীদের রক্ষার জন্য রক্ষিদল সন্নিবিষ্ট হয়, সেজন্যও দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছে।

(২) বোর্ড গোবিন্দপুরে আমাদেরই একটি ভগ্নী, বাংলা মায়ের এক দুর্ভাগিনী কন্যা, কায়ীসী ও বহু সন্তানের জননী কুমুমকুমারীর উপর যে

অমানুষিক, নিরাজ্ঞ ও পৈশাচিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেরূপ দুঃসাহসের সহিত প্রকাশ্যভাবে দলবদ্ধ হইয়া এই অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া প্রত্যেক নরনারীই স্তম্ভিত হইবেন। এই মোকদ্দমায় অপরাধীগণের প্রতি যে-দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অপরাধের তুলনায় নিতান্ত সামান্য হইয়াছে। এজন্য এই সভা আশা করিতেছে যে, গবর্নমেন্ট ইহার বিরুদ্ধে আপীল করিয়া অত্যাচারীদের যথোচিত দণ্ডবিধানের দ্বারা বাংলার নারীগণের মান-সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হউন।

(৩) বাংলা দেশের প্রত্যেক রমণী তাহাদের ভগ্নীগণের উপর যে সকল অত্যাচার হইতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়া, কলিকাতায় ও মক্শলে, পল্লীতে পল্লীতে, ইহা নিবারণের উপায় নির্ধারণের জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা ও আন্দোলন আরম্ভ করিবেন এবং যদবধি না এই অত্যাচার নিবারিত হয়, তদবধি দৃঢ়ভাবে প্রতিকারের চেষ্টা করিতে থাকিবেন। এই সভা বাংলার দেশের ভগ্নীগণের নিকট সনির্বন্ধভাবে ইহাই অনুরোধ করিতেছে।

(৪) জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সমস্ত নারী মাজেই নারী, এবং বাহারা অত্যাচার করে তাহারা অত্যাচারী; হুতরাং এখানে সমুদায় বা জাতির প্রমত্ত উদ্ভিগেতে পারে না। হুতরাং আমরা এই সভায় নারীগণের পক্ষ হইতে দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছি যে, নারীর উপর অত্যাচারী কর্তৃক অত্যাচার-ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোনমতেই সঙ্গত নহে।

বাহারা এই প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করেন ও সমর্থন করেন তাহাদের কাহারও কাহারও বক্তৃতার কোন কোন অংশের তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন :

আজ ১৫ বৎসর হ'ল এই পাপ বুদ্ধি হওয়ায় এই পাপ দূর করবার জন্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এই পাপ দূর করবার জন্যে বাঙালীকেই বন্ধপরিকর হ'তে হবে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যুবকগণের দ্বারা রক্ষীর দল সংগঠন করে ভূর্ভূতদের অত্যাচার দমন করবার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা আর রক্ষা নেই, কেহই আর নিরাপদে বাস করতে পারবে না। বাংলার পল্লীতে আমাদের ভগ্নীদের মধ্যে ভীষণ ক্রাসের সঞ্চার হয়েছে। কোন্ দিন কোন্ পরিবারের মেয়ে, বধূ, মার সর্বনাশ হবে, তার কিছুই ঠিক নাই। এই অরাজক অবস্থার প্রতিবিধান না করলে আর রক্ষা নেই। গত ১৫ বৎসর গবর্নমেন্টেরই গণনা অনুসারে দেখা যায়, দশ হাজারেরও বেশী নারী নিগ্রহীত হয়েছে। গবর্নমেন্ট তার দমনের জন্য কি করেছেন? এতদিন ত কিছুই করেন নি, এ-বৎসর মাত্র বোম্বাঘাত-দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। গবর্নমেন্ট ঠগীর অত্যাচার নিবারণ করেছেন, গঙ্গাদাগরে সন্তান নিক্ষেপ বন্ধ করেছেন। আর নারীর উপর

এই অত্যাচার নিবারণ করবার কি তাঁদের উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য নাই? দেশে সন্ত্রাসনবান দমনের জন্তে গবয়েন্ট অর্ডিন্যান্স, নির্বাসন, সংশোধিত কোজদারী আইন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেছেন। বাংলার নারীজগৎকে নিরাপদে নিশ্চিন্ত মনে আপনার গৃহপরিবারে বাস করতে সমর্থ করবার জন্যে গবয়েন্টের যে কর্তব্য আছে-তা কবে সাধন করবার জন্যে বন্ধপরিকর হবেন? আমাদের মনে হয়, যেখানে একপা নির্ধ্যাতন হয় সেখানে পিউনিটিভ পুলিশ হাপন করা উচিত।

নারীনির্ধ্যাতনের যে-সব ভয়াবহ পৈশাচিক নারকীয় ঘটনা ঘটছে, তাই নেই যে তার পৈশাচিকতা ভাল করে বলি; তাই নেই ফেমেনের অব্যক্ত ক্ষোভ, রোষ প্রকাশ করে বলি। শিশুদের বুক লাগি মেরে তাদের অজ্ঞান ক'রে মাকে তাদের কোল থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা, এই সব নারকীয় কাহিনীর কথা সকলেই আমরা জানি; কিন্তু আনন্দ দিব্য আরামে আহার বিহার ক'রে, নারী সমিতির মিটিং ক'রে বেড়াই। কেন যে পাগল হয়ে ছুটে বেরিয়ে যাই না এই সব পৈশাচিক ঘৃণা ঘটনা দমন করবার ব্যবস্থা করতে, তা জানি না। কেন ছুটি না দেশের লোককে এ বিষয়ে সচেতন করতে? মন একেবারে অসাড়, জড় হয়ে পড়েছে তাই বৃথি নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটাই। কিংবা হয়ত ভাবি ওদিক ত এ পাড়ায়েই হয়, আমাদের তাতে বাধা ঘাণাবার কি দরকার? এই যদি আমাদের মনোভাব হয়, তবে ধ্বংস অনিবার্য।

শ্রীমতী শান্তা দেবী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় ইহার পোষকতা করিয়া বলেন, প্রত্যেক নারীর কাছে একটি ছোরা থাকা আবশ্যিক।

বঙ্গের কংগ্রেসদলভুক্ত পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে বড় এবং কারাগারের অভিজ্ঞতাশালিনী শ্রীমতী মোহিনী দেবী দ্বিতীয় প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন, এবং নিখিলভারত নারীসম্মেলনের সম্পাদিকা শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত ইহার সমর্থন করেন।

শ্রীমতী রমা দেবী বর্ধক তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। তিনি বলেন :

একদিন ভারতের ইতিহাসেই দেখতে পাওয়া গিয়েছে, অসামান্য রূপশ্রী চিতোরের রাণী পদ্মিনী তাঁর রূপের নেশাকে বিক্রয় দিয় অগ্নিশিখার রূপকে ছারখার করে ফেলেছিলেন, পাছে পরের হাতে দেখকে বিক্রিয়ে দিতে হয়। তাঁরই সঙ্গে বহু নারী দিলে আপনাকে বিসর্জন আত্মদগ্ধনকে বাঁচিয়ে রাখতে।

আমরা নিজেদের শিক্ষিত এবং সভ্য বলে গর্ব ক'রে থাকি; শুধু গর্ব করা নয় সেই সঙ্গে তাইই গোহাই দিয়ে সমাজের বৃকের উপর নানা ভাবে বিচরণ করি। কিন্তু সত্যই কি আমরা কোনও মহৎ আদর্শকে গ্রহণ করবার মতন নিজেদের এবং সমাজকে প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছি? বলতে লজ্জা এবং ঘৃণায় মাথা নত হয়ে যায় যে আজও নারীসম্মাদা রক্ষার জন্য নারীকে আশ্রয় খুঁজতে হয়, নিবেদন জানাতে হয় সভ্য সমাজের দ্বারে গিয়ে, তবু প্রতিকার হয় না।

ভারতের নারীজাতির মহা-স্মিলনীর বৈরীকে দেশের সন্ত্রাস্ত ঘরের শিক্ষিতা ধনী মহিলারা উপস্থিত থাকা সঙ্গেও নারীহরণের প্রতীকার করা তাঁরা যুক্তিসঙ্গত বা বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন নি। বাংলায় ঘরের

সামান্য শিক্ষিত হিন্দু রমণী বাংলার নির্ধ্যাতিতা নারীদের করণ কাহিনী বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্মুখে প্রতিকারের আশায়। ভারতের মহা-স্মিলনীর খারা সভা, তাঁহার অবিকাংশ ধনী-ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাঁরা দীন দরিদ্র অসহায়দের খোঁজ রাখেন খুব কমই। কাজেই এই স্মিলনীর উদ্দেশ্যের বার্থার্থ সার্থকতা হওয়া সম্ভব নয়, যতদিন না তাঁরা ঐ অসহায় দীন-দুঃখীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের অত্যাচার-অভিযোগ মেটাতে সমর্থ হবেন।

আরও আশ্চর্য্য মনে হয়, এত বড় পাশবিকতা। ঘটা হচ্ছেও আজ বাংলায় বা ভারতের মুসলমান শিক্ষিত সমাজে এমন নারী অথবা পুরুষ নেই কি, নারী এর প্রতিকারের জন্ত প্রতিকার অথবা চেষ্টা করতে পারেন? যদি থাকেন, তবে আজ তাঁরা নীরব কেন? নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে জাতিভেদ, ধর্ম, হিংসা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

বাংলায় পাশবিক আচরণের আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবক আমায় বলেছিলেন, “হিন্দুর অত্যাচার মুসলমান অপেক্ষা অনেক বেশী।” তাঁর এই ধারণা ভুল হলেও আমি এই কথা বলতে আজ বাধ্য হচ্ছি যে, সংখ্যার তুলনা না করে যদি আমরা কার্যটির পানে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব যে, হিন্দু-মুসলমানে কিছু আসে যায় না। যে কার্য ঘটে যাচ্ছে তা গর্হিত এবং অশ্রায় কিনা, সেই দেখে বিচার করাটাই কর্তব্য বলে মনে করি। হিন্দুই করুক বা মুসলমানই করুক, কার্যটি যে অত্যন্ত জঘন্য এবং নীচতার পরিচায়ক সে-বিষয় কোন সমাজই আজ, আশা করি, অস্বীকার করবেন না, এবং এই পাপ-প্রবৃত্তির নেশা দিবের পর দিন যে নিয়ম গতির দিকে চলেছে, তাও শিক্ষিত মুসলমান সম্ভ্রায়, আশা করি, বিবেচনা ক'রে দেখবেন। অশ্রায়কে অশ্রায় বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে লজ্জার কারণ থাকে না, বরং তাকে না-মানাটাই কাপুরুষতায় চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রীলোকের প্রতি এই যে ঘোরতর অত্যাচার, এই প্রতিবাদ-রূপে আজ আমরা এইখানে উপস্থিত হয়েছি, রাগ-বা বিদ্বেষ-বশে মিলিত হই নি। মিলিত হয়েছি নিজেদের আত্মমর্যাদা ইজ্জত রক্ষার অভিপ্রায়ে, মিলিত হয়েছি অদম্যব আঘাত ও বেদনায় জর্জরিত হয়ে।

যে শাসকের একচ্ছত্র শাসনের গুণ্ডীর মধ্যে আজ আমরা নারীরা বাস করছি, সেই শাসকের নিকট দাবী করতে এসেছি সুবিচার এবং সতর্কতার সূক্ষ্ম দ্বার সাহায্যে নারীজাতি তাদের আত্মদগ্ধন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে রেখে শাস্তিতে বাস করতে পারে।

আর চাই শিক্ষিত মুসলমান সম্ভ্রায়ের সচেতন মনোভাব। তাঁরা আজ ভুলন তাঁদের আত্মাভিমান, ভুলে যান তাঁদের জাতাভিমান। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর নারীর ইজ্জত ও আত্মদগ্ধন রক্ষার্থে তাঁদের শক্তি নিয়োগ করুন। তবেই তাঁদের সংশ্লিষ্টার মহত্ত্ব ও সার্থকতা।

আজ নারীদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ, তাঁরা এই কার্যে সহায়তা করতে অগ্রসর হোন, সাড়া দিন, যদি আজ তাঁরা এই বাধা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে থাকেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বর্ধক সমর্থিত হয়।

চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া শ্রীমতী অচ্যুতপা দেবী বলেন :

আজ আমরা এখানে যে-কাজের ভণ্ডে সমবেত হয়েছি, অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এর অনেক পূর্বেই আমাদের সে-কাজ করা উচিত ছিল। মানুষের-তখনই সব চাইতে বড় বিপদ এসে যায়,

যখন সে আত্মবিস্মৃত হয়। বিবিধ হলেও বরং কোন মতে চললেও চলতে পারেন, কিন্তু আত্মবিস্মৃতির এসময় টিকে থাক অসম্ভব। আমাদের এদেশের মেয়েদের এখন সেই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা ভুলতে ভুলতে ভুলেই গেছি যে, যে-কোন নারীর অপমানে অত্যাচারে অবিচারে আমাদের প্রত্যেকেরই অংশ আছে, এর সঙ্গে আমাদের প্রতি জনেরই মান-মর্যাদা জড়ানো। না, আমরা তা ভাবি না। যেমন বাড়িতে একটু কঠিন যন্ত্রণাকর রোগে যদি কেউ বৎসরের পর বৎসর ধরে শুগতে থাকে, তার যন্ত্রণা জালা সর্বত্র চোখে দেখে বাড়ীর ছোট ছোটের মত মন কঠিন হয়ে ওঠে। সপার্কদাহী নারীধর্মের হুসখান পেতে পেতে তেমনি আমাদের অতি-অভ্যন্তরীণ ফলে আমাদের মনের কাছে থেকে এর ভয়াবহতা অনেক দূরে চল গেছে। এমনই হয়। হীনতার অবস্থানে বহুদিন থাকতে থাকতে মানুষের মনের সমুদয় সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ তাকে হীন করে দেয়। একদিন যে মশা মারতে পারত না, সম্ভবতঃ একদিন হয়ত সে অনায়াসে নররক্তপাত করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের অবস্থাও অনেকটা তাই হয়েছে। যে দেশের স্বামী পত্নীহরণকারীকে দণ্ড দেবার জন্ত দণ্ডকার্য্য থেকে বেরিয়ে কল্লভা গিরি-পর্বত নদনদী অতিক্রম করে অত্যাচারীর সমুদ্রপরিবেষ্টিত দ্বীপনিবাসে পৌঁছে তাকে উচ্ছেদ করে ছেড়েছিলেন, সেই দেশের স্বামীপুত্র বাপ-ভাইরা আজ জড়পুত্রলিকা হয়ে মা-বোন-মেয়ের নিকট লাজনা সহিষ্ণুতার সঙ্গেই সহ্য করে যাচ্ছেন। তাদের ঘরের মা-বোন-মেয়েরাও বেশ সহজভাবেই তা সমর্থন করে চলেছেন। কোন গোলমালই নেই। মা-বোনেরা যদি জিদ করেন, পুরষরা কি এতখানি কাপুরুষ হয়ে থাকতে পারে? পশুমানসলোভ কসাইয়ের চাইতেও অধম নারীমানসলোভ কি তা হলে নিশ্চিন্ত চিত্তে এমন করে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে নিতে পারত? গবয়েন্ট না হয় বিদেশী গবয়েন্টই, তাই বলে কি এমন গিলে হাতে এদের জন্ত শিখিল দণ্ড ধারণ করে অর্দ্ধনিশ্চেষ্ট থাকতে পারতেন? যাদের বিপদ, তাদেরই এখন থেকে অবহিত হতে হবে। তা না হলে সত্যাকার কাজ হবে না। গবয়েন্টকে বিশেষভাবে এজন্ত অনুরোধ চারিদিক দিয়েই জানাতে হবে। পত্নীশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, মেয়েদের মানসিক উন্নতি ও নৈতিক বলাধান যাতে হয়, তার জন্ত গ্রামে গ্রামে সুব্যবস্থা করবার আয়োজন মেয়েদের খুব চেষ্টা করেই করতে হবে। নৈতিক শিক্ষা নরনারী উভয় পক্ষেই যাতে হয়, শহরের স্কুলকলেজে তার ব্যবস্থা এবং গ্রামে গ্রামে তার বন্দোবস্ত সম্ভবলব্ধ নারীদের পক্ষ থেকেই করতে হবে। আর সবার উপর এই নারীসম্মেলনকে হিন্দুমুসলমান শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পরিবার থেকে মহিলাদের সমভাবে গঠিত করে তুলতে হবে। কাউন্সিলে পঞ্চাঙ্গ জনৈক মুসলমান ভ্রতলোক বলেছেন, ‘নারী-ধর্ম ব্যাপারটাকে হিন্দুরা হিন্দু-মুসলমান বিষয়ের আলোতে বড় করে দেখছেন, আসলে এটা এত বড় কিছু নয়।’ একি অজুত মনোভাব? কোন শিক্ষিত ভ্রতলোক, তাঁর ধর্মমত তাঁর স্টোপুরুষকে যে নাম দিয়েই ডাকতে শেখাক, এমন কথা ভাবতে পারলেন কি করে? অখচ সরকারী হিসাবে পাওয়া যায়, ধর্মিতা নারীর মধ্যে মুসলমান নারীদের মধ্যে বেশী। অতএব হিন্দু মুসলমান বলে নয়, মোটের উপর এদেশের আবহাওয়াই দৃষ্টি হয়ে গেছে। গায়ের চামড়া হয়ে গেছে মোটা। মেয়েদের চন্দ্রণায় প্রশ্ন কীদে না, গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে না। নিজেদের পরম কর্তৃত্বটাকে চরম ব্যবস্থায় নরম করে ফেলে শিক্ষিত মুসলমান নেতার নিশ্চিন্ত হলেন, আর হিন্দুরা হয়ত ভাবলেন, “এই পথ ধরে আবার হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-বন্ধি যদি উৎপন্ন হয়। যেতে দাও।” চমৎকার সমস্যা! এখন যাদের বিপদ, সেই হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের একচিহ্নিত হয়ে ভাবতে হবে, কঃ পছা? শুধু ভাবলে হবে না, ভেবে উপায় নির্ধারণ করতেও হবে। আমার মনে হয়, আমাদের সামনে এই সমস্যাটিই সর্বপ্রধান হয়ে দেখা

দিচ্ছে। মুসলমান শিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে একটি সম্মিলিত মহিলা-সভা তৈরি কর এবং একযোগে পত্নীগ্রামে গিয়ে মেয়েদের হিতর আশ্ব-রক্ষার জন্ত দৈনিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্ত উপদেশ প্রদান, স্কুল বা পাঠশালা সংস্থাপন ইত্যাদি বার্থ জনহিতকর কাজ হাতে কলমে করা। শুধু শহরের হলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলেই হবে না, কাগজে লিখলেও না। তবে, এ-দুটির আবশ্যকতাও নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীমতী প্রভাময়ী মিত্র এই চতুর্থ প্রস্তাবটির সমর্থন এবং শ্রীমতী বিভাবতী মুখোপাধ্যায় ইহার পোষকতা করেন।

শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন :

গব্বন্টের নিকট আবেদন-নিবেদন দ্বারা কোন ফল হইবে না এবং এইরূপ আবেদন-নিবেদন তিনি পছন্দও করেন না। বাংলা দেশে এই নারীনিষ্ঠ্যাতনের মূল রহিয়াছে পুরুষের কাপুরুষতা ও নারীর ভীলতা। যত দিন পুরুষের কাপুরুষতা ও নারীর ভীলতা দূর না হইবে, তত দিন এই নারীনিষ্ঠ্যাতনের কোন প্রতিকার হইবে না। নারীদের নিজেদের বীর হইতে হইবে, এবং স্বতন্ত্র, স্বামী ও ভাইদের বীর করিতে হইবে। বাঙালী নারীদের কর্তব্য হইতেছে সাহসের সাধনা করা। পৌরুষ কথাটি শুধু পুরুষের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নহে, নারীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সভার উদ্দেশ্য সাধন করিবার নিমিত্ত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাহার কার্যবিবরণ জানিতে পারি নাই। পূজার ছুটি শেষ হইয়াছে। এখন সকলে মিলিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

মহিলাদের এই কনফারেন্সের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাষ্ঠিক সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছিল। আবশ্যক বোধে বিস্তৃততর বৃত্তান্ত দেওয়া হইল।

নিখিল-ভারত নারীসম্মেলন

নারীরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী আগামী ডিসেম্বর মাসে একটি নিখিল-ভারত নারীসম্মেলনের উদ্যোগ করিতেছেন। কুচবিহারের রাজমাতা ইন্দিরা মহারাণী তাহার সভানেত্রী হইবেন, কাগজে এইরূপ দেখিলাম।

নিখিল-বঙ্গ মহিলাকর্মীসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ

গত ২৫শে ও ২৬শে আশ্বিন কলিকাতার আলবার্ট হলে শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ্র প্রমুখ মহিলাদের উদ্যোগে নিখিল-বঙ্গ মহিলাকর্মীসম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীমতী মোহিনী দেবী অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী এবং শ্রীমতী নিখিলললিতা ঘোষ সম্মেলনের সভানেত্রীর কর্তব্য যথাযথরূপে সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলেন। প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় মানবসভা ও নারীদের সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত



শ্রীমতী মোহিনী দেবী

হইয়াছে তাঁহার বক্তব্য মূলতঃ তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জ্ঞান মহিলাসম্মেলনে তাঁহার সমুদয় বক্তৃতাটির অতুলন দিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা যথাযথ অতুলিত হয়ও নাই। শেষের দিকে তিনি বলেন :

প্রজারা যাতে আপনাদের হীন অবস্থা বুঝতে না পারে এবং প্রতিবাদ না করে—সেজন্য একেধর রাজারা যেমন প্রজাকে জ্ঞান দিতে কুষ্ঠিত হয়, তেমনি একেধর আধিপত্য বজায় রাখবার জন্তই পুরুষেরা নারীদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করে এনেছে এবং মৃত্যুর জগদল পাথর মেয়েদের উপর চাপিয়েছে। এতে পুরুষেরা ঠকেছে। কারণ, আজ যে আমরা দেশকে উন্নতির পথে, সামনের দিকে টানতে চাচ্ছি, তা বাধা দিচ্ছে এই মৃত্যু ও অজ্ঞতা আমাদের মেয়েদের মধ্যে। এ পুরুষেরই কৃতকর্মের ফল।

নারীদের জগদ্ব্যাপী জাগরণ সম্বন্ধে তিনি বলেন :

একটা সৌভাগ্যের কথা এই যে, আজ সমগ্র পৃথিবীর মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে এসেছে। প্রাচ্য মহাদেশের সর্বত্র এই জাগরণ দেখা দিয়েছে। সকলেই বুঝতে পারছে যে, মেয়েদের পিছনে ফেলে রেখে সমগ্র দেশের ক্ষতি হয়েছে। দেখেছি পারস্তে রাজশাসনের নূতন আইন হয়েছে—যাতে মেয়েরা শিক্ষা এবং স্বাধীনতা লাভ করে নিজেদের সৌরবময় স্থান অধিকার করে। জাপানে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমানভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছে। সেখানকার বীরস্বনাদের কীর্তি সম্বন্ধে পুরুষেরা হতচেহন। চীনের মেয়েরা দেশকে বাঁচাবার জন্ত ঘরের গুঁড়ি পেরিয়ে এসেছে। মা যেমন সন্তানকে বাঁচাবার জন্ত বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পশ্চাৎপদ হয় না, সেই রকম মেয়েরা যখনই দেখেছে যে তাদের ভাই

পুত্র সন্তান বিপন্ন তখনই তাদের স্বাভাবিক ধর্ম পরিত্যাগ করে রণাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়াতে কুষ্ঠিত হয় নি। স্পেনে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোক। এ-কথা বললে ভুল হবে যে, তা-হ'লে কি তারা নারীধর্ম পরিত্যাগ করে পুরুষের চিত্তবৃত্তি ধার করে কাজ চালাচ্ছে? ধারে কোন বড় কাজ চলে না। মেয়েদের মেয়েই থাকতে হবে—এটা বিধাতার বিধান। কিন্তু এ-কথাও বল ভুল ও অশ্রদ্ধেয় যে মেয়েরা কেবল গৃহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে।



শ্রীমতী নির্মলিনী ঘোষ

সভা জিনিষটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। সেই কাজে নারীদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :



শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ্র

যে নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়ে পুরুষের সভ্যতা রক্তপাশে চলেছে, সেটা আজ টলমল করে উঠেছে। পাঁচাত্তম শতাব্দী, যেখানে এই সভ্যতার বড় কেন্দ্র, সেখানে এই বিনাশের শক্তি এত উগ্র হয়ে উঠেছে যে, আজ বড় মনীষীরা সন্দেহ করছেন যে, বর্তমান সভ্যতা বিনাশের পথে চলেছে—তার কারণ কি? কারণ এই সভ্যতা একপেশে, এর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। এটা পুরুষের, নারীর স্থান এতে নেই। এই যে নিষ্ঠুরতার উপর গড়া পুরুষের সভ্যতা, এ টিকতে পারে না। আজকের দিনে তার হিসাব-নিকাশের পালা পড়েছে। আর ঠিক এই সময় মেয়েরা বাইবে এসেছে। যদি সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে না বায়—যদি এ টিকে থাকে—তবে এখন থেকেই মেয়েদের দাবিদার হুক হ'ল। মেয়ে আর পুরুষের মিলে যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠবে তাতে রীচবার মন্ত্র দিতে হবে মেয়েদের। পুরুষের চিন্তাবৃত্তির এক নারীর স্রবণবৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে—তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা। তার উদ্যোগ হচ্ছে এতদিনে। মেয়েরা এতদিন তাদের স্বাধীনতা, স্বর্ভা, অজ্ঞতা, অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। সেই মেয়ের এখন যদি বলে যে, সমাজ ও সভ্যতার স্বত্বতে তাদের কাজ করন্ত হবে—তবে তাদের তা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতা দূর করতে হবে। যেখানে অজ্ঞতা—সেখানে তোমাদের জায়গা দিও না। অজ্ঞতের দিনে তোমাদের জাগতে হবে। বুদ্ধিকে উজ্জ্বল, কর্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে হবে; কেননা নতুন যুগ এসেছে। এ-কথা আর বলতে পারবে না যে, তোমরা বোকা, মুট, মূর্থ, অকেজো। একথা বলতে লজ্জা কোরো যে তোমরা, স্নায়ুজের নারীরা অবনত। অগতের আহ্বান তোমাদের এসেছে। হৃদয়বৃত্তি সমস্ত আবেজনা তোমাদের তুচ্ছ করতে হবে এক জ্ঞানের বুদ্ধির বীজিতে তোমাদের উজ্জ্বল হতে হবে। যদি তোমরা বোকা হও, দেখবে আর কেউ কখনও তোমাদের অপমান ও অগ্রদ্বা করতে পারবে না।

শ্রীমতী মোহিনী দেবীর অভিভাষণ

মহিলা কর্মী সম্মেলনে তাঁহার প্রাথমিক অভিভাষণ নানা কথার মধ্যে শ্রীমতী মোহিনী দেবী অন্ত কোন কোন দেশের নারীদের কৃতিত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন :

বিগত সভ্যগ্রহে ভারতব নারীবৃন্দও তাঁদের কর্ণশক্তি, ইংসাহ ও প্রাণশক্তির যে পরিচয় দিয়েছেন সে তা আপনাদের অবদিত নেই। আপনাদের নিকটে আমার এই নিবেদন যে বাংলা দেশের এই প্রাণশক্তিকে কর্ণপথে অগ্রসর করে দিতে সাহায্য করুন। আমাদের সর্ব সক্ষমতাস্থিতে যদি দলবদ্ধ হয়ে আমরা দাঁড়াই তাহলে এমন কোন কমতা আছে যে আমাদের বাধা দিতে সমর্থ? আমাদের অত্যাচারের প্রতিকারে আমরা অসহায়, আমাদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে আমরা অপারাজ? আজ সমস্ত কুটারশিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা সজীব হই বতহুর সাধ্য বিদেশী দ্রব্য বর্জন না করলে এই শিল্প পুনরুজ্জীবিত হবে না।

আমাদের কর্তব্যের কথা বলতে গেলেই সর্বপ্রথমে মনে পড়ে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে কত অসহায় নারীর নিগ্রহের মর্শ্বস্ত্র কাহিনী। এ আমাদের বড় লজ্জা, বড় কেলনা। কেন আমরা এর প্রতিকারহীন কলঙ্কের কালিমা স্বপ্নে বেড়াই? দুর্ভাগ্য সকল দেশে সকল বৃন্দেই অত্যাচারের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, সবদের স্বেচ্ছাচারিতায় হুটল লাহনা ভোগ করে কিন্তু বাংলা দেশের নারীরা তাদের অবলা নাম সার্বিক করতে যেমন শোচনীয় নিগ্রহ সহ্য করেন, এমনটি আর জগতের কোথাও দেখা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের সংবারাঞ্জ এ কাহিনীতে ভরপুর।

কিন্তু আমাদের দেখিকে কি দৃষ্টি আছে? ধোঁয়াগোবিন্দপুরের ঘটনার পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা আমাদের নেই? হুতরাং এর আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। বীর 'অবলা উদ্ধার' করতে 'নারীরা' সমিতি গঠন করেন, তাঁদের ধন কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করে বাংলা দেশের নারীশক্তিকে এ কথা জানাই যে, এর স্বাধীনতার দায় হতে তারা নিজেদের মুক্ত করুন, নিজেদের আত্মরক্ষার পথ নিজেরাই বেব করুন, সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন এনে পরিবাসের আবহাওয়া বদল করে, নারীর দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রদানে দুর্বৃত্ত দলন করুন, যাতে নারীনিগ্রহ আর সম্ভাব্য না হয়ে থাকে। ভুলবেন না যে, নারীনিগ্রহকারী জাতি নেই, ধর্ম নেই। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, সে নরপশু। তাদের হাত হতে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হলে নিজেদেরই বলসকর করতে হবে।

শ্রীমতী নির্মলনলিনী ঘোষের অভিভাষণ

মহিলা কর্মী সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীমতী নির্মলনলিনী ঘোষ তাঁহার সাবগর্ভ ও মননশীলতাপরিচায়ক অভিভাষণের গোড়ার দিক বলেন :

আমাদের সম্মুখে আজ বহু সমস্যা জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সকল সমস্যার যদি এভাবে চলি, আমাদের আচরণে ভীকতা প্রকাশ পাবে। কত যে দুঃখ আমাদের চারিদিকে ঘুরে উঠেছে দিনে দিনে, তার অন্ত নেই। এদেশে এমন মানুষ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রয়েছে, তাদের আর নেই, বয় নেই, শিক্ষা নেই, খাদ্য নেই মাথা গুলবার পর্যাপ্ত স্থানটুকু পর্যাপ্ত নেই। জীবন তাদের কাছে দুর্ব্বল অভিলাষ। বৃত্ত্য তাদের কাছে অসহনীয় দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রাম আজ তা সাত লক্ষ স্থানের সামিল। সেই স্থানে অসহনীয় বাতনাব মধ্যে বার্তা জীবন বাপন করে, মানুষের চাইতে কবালের সঙ্গেই তাদের সাধুই বেশী।

'কাল ভি ধাব'—এই চুচিন্তা অগণিত মানুষের মনের উপরে জগদল পাখরের মত অহরহ চেপে আছে। রাত্তার রাত্তার দুর্ভাগ্য বেকারের দল অবশ্যই আর বিষয় চিন্তা নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; খেতে না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ চুরি করে জেলে বাচ্ছে, নরত পতিতাস্থে ঘলে নাম লেবচ্ছে।

দুঃখের শেষ এইখানেই নয়। আমাদের জীবনের গতি পথে পথে বাধাগ্রস্ত। এক সঙ্গে মিলে সভ্যসমিতি করা বিশৃঙ্খলক—একশ চুরাশিল ধারা রয়েছে বুনো মহিষের মত শিং উচিয়ে। মনের কথা মুখ ফুটে বলতে গেলে আইন চোখ রাঙায়, কলমের আগায় লিখতে গেলে জরিমানা দিতে হয়, বই বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কার-প্রাকার শুধু আমাদের ক্ষেত্রে আটকে রাখবাব জন্তে তৈরি হয় নি; আমাদের মনকে বেধে রাখবাব জন্তে প্রাচীরের অভাব নেই। কর্তারা বতটুকু ইচ্ছা করেন শুধু ততটুকু খোরাক সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের মনের আঙিনায় এসে পৌঁছতে পারে। বা কর্তাদের অভিপ্রায় নয়, তা জানবার কোন অধিকার নেই আমাদের। প্রেষ্টারের পরোয়ানা দেখিয়ে পুলিশ যখন আমাদের ছেলেমেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আব বিনা বিচারে তাদের আটক করে রাখে, নাগিল জানাবাব কোন স্থান খুঁজে পাই না। আমাদের অবস্থা ক্রীতদাসের মতই শোচনীয়। আমরা বেঁচে নেই, টিকে আছি।

আমাদের পরাবীৰ্য্যতা কেবল রাজনীতির আর অর্থনীতির কেন্দ্রেই নীতিবদ্ধ নয়। সমাজের অর্থহীন নিরক্ষর-কামুনগুলিও লক্ষ্য লক্ষ মানুষের জীবনকে পঙ্ক করে রেখেছে। আজ কোটি-কোটি নরনারায়ণ সমাজে অঙ্গুষ্ঠ হয়ে আছে। সাধারণের কৃপা তারা ছুঁতে পায় না, মক্ষিদের দরজা তাদের সুখের উপরে বন্ধ হয়ে যায়, ইন্দুলে তাদের জেলেমেয়েরা গড়তে গেলে বর্ণ-হিন্দুরা আপত্তি জানায়।

যে অর্থহীন বিধিনিষেধ অঙ্গুষ্ঠতার আধিপত্যকে আজও অঙ্গুষ্ঠ রেখেছে, সেই বিধিনিষেধের অস্ত্রই অবরোধ-প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। পক্ষীর অন্তরালে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বাসের বাপন করতে হয় বৈচিত্র্যহীন কাজের মধ্যে—খাওয়ার পাবে রাখা, আর রাখার পরে খাওয়া ছাড়া বাসের অন্য কর্ম নেই, বৃহত্তর জগতের বিশাল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে বাপন করে বলিনীর আভিগম্য জীবন, তাদের দুর্ভাগ্য সত্যই অপরিণীম।

এই যে জগৎ-জোড়া দুঃখ—যার মূলে রয়েছে মানুষের দুর্দমনীয় ক্ষমতাশ্রিততা আর উৎকট অর্থলোভ—এই দুঃখের অবসান ঘটানো একেবারেই অসম্ভব নয়। মানুষের দুর্দমনীয়তা পৃথিবীকে নরক করে তুলেছে। মানুষকেই ভালবাসা তাকে স্বর্গ করে তুলবে। মানুষের ভীড়তার উপরেই অভ্যাস ধাঁড়িয়ে আছে; মানুষেরই দুর্জয় সাহস তার অবসান ঘটাবে।

কিন্তু কেবল পুরুষকে দিয়ে এই নুতন জগৎ সৃষ্টির কোন আশা নেই।

বঙ্গ-মহিলাদের কর্তব্য।

বঙ্গে পুরুষদের কর্তব্যের যেমন অস্ত্র নাই, মহিলাদের কর্তব্যেরও তেমনই অস্ত্র নাই। মহিলারা নানা প্রকারে দেখাইয়াছেন, যে, সাহসের অভাবে যে তাঁহারী কোন কাজ করিতে অসমর্থ এমন অপবাদ তাঁহাদের সকলকে দেওয়া চলে না। এই জন্ত আমবা বাহা বলিতে যাইতেছি; বঙ্গনারীগণ সকলেই ভীক্স একরূপ ভ্রান্ত ধারণা বশত তাহা বলিতেছি না, আশা করি-মহিলারা তাহা বিশ্বাস করিবেন। আমাদের বক্তব্য, আপাততঃ কিছু কাল মহিলারা রাষ্ট্রনীতিঘটিত কাজ পুরুষদের হাতে রাখিয়া দিউন। মহিলারা এখন কিছু কাল বালিকাদের ও নারীদের অজ্ঞতা দূর করিবার এবং মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

বঙ্গের নারীগণকে একরূপ অনুরোধ করিবার কারণ ইহা নহে, যে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বা জাতীয় জীবনের সর্বজনীন উন্নতির জন্ত আবশ্যক অজ্ঞাত সার্বজনিক কার্যেব ক্ষেত্রে পুরুষেরা একাই এখন যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন বা কখনও করিতে পারিবেন। পুরুষেরা একা এখন তাহা করিতেছেন না এবং কখনও করিতে পারিবেন না। নারীদের সাহায্য আবশ্যক হইবে। কিন্তু নারীদের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা অতি

অল্প হইতেছে। মহিলারা নিজে এই কাজে যথেষ্ট সময় ও শক্তি নিয়োগ না করিলে নারীসমাজের অজ্ঞতা দূর হইবে না, এবং অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তিও বাড়িবে না। তাঁহাদের অজ্ঞতা দূর না হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবেন না।

আমরা ইহা জানি ও বুঝি, যে, কোন দেশেই রাষ্ট্রশক্তি সকল বয়সের সকল পুরুষ ও নারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অকপট সমর্থক না হইলে এবং একরূপ শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যথেষ্ট রাজস্ব ব্যয় না করিলে, সে দেশে কি পুরুষদের কি জীলোকদের মধ্য হইতে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা যায় না এবং ইহাও সত্য, যে, কোন দেশের গবর্নেন্ট স্বজাতীয় না হইলে এবং সেই দেশের অধিবাসীরা স্বশাসক না হইলে, সেখানে রাষ্ট্রশক্তি শিক্ষা বিস্তারে উল্লিখিত ভাবে অক্ষম হয় করে না। কিন্তু আমাদের দেশে কবে জাতীয় গবর্নেন্ট স্থাপিত হইবে, কবে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা চলে না। আমাদের নিজের চেষ্টায় যতটা হয়, ততটা আমাদের করিতে হইবে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, কি পুরুষ সমাজে কি নারীসমাজে, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা স্বরাজ্যলাভের চেষ্টা যেকপে যতটা সাফল্যলাভের সম্ভাবনার সহিত হইতে পারে, অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা হইতে পারে না।

একরূপ বলিবার অর্থ ইহা নহে, যে, সকলে আগে মই বিধান হউন, তার পর রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্মী হইবেন। ইহা আমরা জানি, যে, নিরক্ষর বা পুস্তকগত বিজ্ঞান অতি অল্প অধিকারী কোন কোন লোকও রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু এসব ব্যতিক্রমস্থল ছাড়িয়া দিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, অন্ততঃ সাধারণ লিখনপঠনের ক্ষমতা এবং ভূগোল, ইতিহাস ও হিসাবের সাধারণ জ্ঞান সকলের থাকিলে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে চেষ্টার সাফল্য অধিক হইবার সম্ভাবনা।

রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্তই জ্ঞান আবশ্যক এমন নয়। জীবনের সকল রকম কাজের জন্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন—গৃহস্থালীর কাজের জন্তও দরকার।

শিক্ষিতা মহিলারা বিশেষ করিয়া নারীশিক্ষার বিস্তারে মনোযোগী হইলে, আরও এই একটি সুবিধা হয়,

সেই প্রত্যেক-অন্তঃপুরে গিয়া, তাঁহারা-জ্ঞানবিস্তারের-প্রয়োজন বুঝিয়া-দিতে পারেন ; পুরুষেরা তাহা পারেন না ।

জাপানের শিক্ষার অবস্থা

জাপানের পরদেশলোলুপতা, কোন স্বাধীনতাপ্রিয়-ছাত্র-পরায়ণ ব্যক্তি সমর্থন করেন না । কিন্তু তাহা-ইহেও জাপানের পরাক্রমে সকলে বিস্মিত । পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও জাপানের কৃতিত্ব সকলকে আশ্চর্য্যায়িত করিয়াছে । জাপানের পরাক্রমের-ও-শিল্পবাণিজ্যে কৃতিত্বের একটি প্রধান কারণ তথাকার শিক্ষাপ্রণালী-ও সকলের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার । নিত্যশিশু-ও-হাবা-ভিন্ন জাপানে সবাই লিখিতে পড়িতে পারে ।

প্রাথমিক শিক্ষা-লাভ করিবার বয়সের মত বালকবালিকা জাপানে আছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা সাড়ে নিয়ানকই জন, অর্থাৎ হাজারকরা ৯৯ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে । আর ভারতবর্ষে ? বঙ্গে ?

৬৪ বৎসর পূর্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আবহ্রিক প্রাথমিক শিক্ষা (কম্পালসারি প্রাইমারী এডুকেশন) প্রবর্তিত হয় ।

বাংলাদেশে কোম্পানীর রাজত্বের গোড়ার দিকে, মদন গরমেন্ট শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার গ্রহণ করেন নাই সেই সময়ে সাধারণ লেখাপড়া-জ্ঞান-এখনকার চেয়ে শতকরা অধিক লোকের ছিল । মেইটামুটি এক শত বৎসর আগেকার এতাদ্য সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট-ইহাতেইহা জানা যায় ।

গবর্ণমেন্ট শিক্ষার ভার নিজেব-হাতে লইবার আগে যদি দেশের লোকে সাধারণ লিখনপঠনক্ষমত্বের বিস্তার এখনকার চেয়ে বেশী করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন কেন শিক্ষার বিস্তার করিতে পারিবেন না ?

নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসম্মেলন

গত ২৬শে আশ্বিন কলিকাতার প্রজ্ঞানন্দ পার্কে নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় । কলিকাতার ও মফস্বলের প্রায় ছয় শত ছাত্রপ্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন ।

ইহার অভ্যর্থনা সমিতির নেত্রী শ্রীমতী অনিলা দাসগুপ্তা

তাঁহারা অভিভাবণে অত্যান্ত কথার মধ্যে বলেন,

ছাত্রছাত্রীদের কার্য্যাবলীর রাজনৈতিক দিকটা বিশেষ আশা প্রদ নহে । চারিদিকে অর্ডিন্যান্স, সাম্রাজ্য-আইন, নিষেধায়ক আদেশ প্রভৃতির ছড়াছড়ি । পরিশেষে জনরক্ষা আইনের আকস্মিক আকির্ভাব আশাদিগকে মুহাশান করিয়াছে । অনেকে বলেন, রাজনীতি আলোচনা ছাত্রবৃন্দের উচিত নহে ; কিন্তু যেখানে ছাত্রছাত্রীবৃন্দের কার্য্যবলাপ নিয়ন্ত্রণ ও সোধ করিবার ক্ষমতা এক বিশিষ্টবেধের ছড়াছড়ি সেখানে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি বর্জন করা সম্ভব নহে । ছাত্রছাত্রীদের সোটা দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে ; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহাদের রাজনীতি আলোচনা করিবার প্রয়োজন ও অধিকার আছে । ছাত্রছাত্রীগণকে রাজনীতি আলোচনা করিতেই ইহা এক-ধাধারা প্রকৃত দেশহিতৈষী তাহাদিগকে সমর্থন করিতে হইবে ।

ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতির আলোচনা করা অবশ্যই উচিত ।

জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ভার ছাত্রসমাজের গ্রহণ করিতে হইবে এক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে ।

এখন বাঁহারা স্কুল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাদিগকে জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের ভার, তাঁহারা প্রস্তুত হইবার পর, গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাঁহারা প্রস্তুত হইবার পর, তাঁহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি । প্রাপ্তবয়স্ক-যে-সকল লোক ছাত্র নহেন, তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যে-ভাবে ব্যাপৃত-হন এবং তাহাতে-যতটা সময় ও-শক্তি নিয়োগ করেন, ছাত্রছাত্রীদের সেই-ভাবে উহাতে ব্যাপৃত হওয়ার-ও তাহাতে-ততটা সময় ও-শক্তি নিয়োগ করার আমরা সমর্থন করি না ।

অন্যকর্ম্মা রাজনৈতিক কর্ম্মী কতকগুলি সব দেশেই থাকি আবশ্যক । ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে তাহা অধিকতর আবশ্যক । ছাত্রছাত্রীরা পঠদশায় অবশ্য এইরূপ অনন্যকর্ম্মা রাজনৈতিক কর্ম্মী হইতে পারেন না ; কারণ তখন জ্ঞানার্জন ও চরিত্রগঠন তাঁহাদের প্রধান কাজ । রাজনৈতিক কর্ম্মীদের মধ্যে বাঁহারা অনন্যকর্ম্মা রাজনৈতিক কর্ম্মী নহেন, ছাত্রছাত্রীরা তাঁহাদের মত কতক সময় রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ও-কাজে দিতে পারেন । এই সব কর্ম্মীদের মধ্যে বার্ষিক ব্যারিষ্টার উকিল-ডাক্তার-কৃষিজীবী-পণ্যশিল্পী-শ্রমিক প্রভৃতি যেমন নিজের নিজের বৃত্তির কাজ করেন এবং তাঁহারা উপর রাজনৈতিক কাজ করেন, ছাত্রছাত্রীরাও সেইরূপ নিজেদের

জ্ঞানার্জনের কাজ সম্পূর্ণরূপে করিয়া অবশিষ্ট সময় ও শক্তি রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় এবং রাজনৈতিক কাজে দিতে পারেন—শুধু দিতে পারেন না, দেওয়া তাঁহাদের কর্তব্য। না দিলে ছাত্রাবস্থার পরে তাঁহারা ভবিষ্যতে পৌরজ্ঞানপদ সর্ববিধ কর্তব্য (সমুদয় সিভিক ও পলিটিকাল কর্তব্য) সাধন করিতে প্রস্তুত হইয়া না-থাকায় তাহা করিতে পারিবেন না।

শ্রীমতী অনিলা দাসগুপ্তা তাঁহার অভিভাষণে বলেন, যে, সাম্প্রদায়িকতা প্রত্যেক প্রগতিকামী ছাত্রছাত্রীর একান্ত পরিভ্রাজ্য। ধর্মসম্প্রদায়সমূহের গোঁড়ামিপ্রসূত ঝগড়াবিবাদ হিংসাদেষ ও সন্ধীর্ণ স্বার্থাঘেষণ ছাত্রছাত্রীদের এবং তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরও বর্জনীয়। আর এক রকমের দলাদলিও ছাত্রছাত্রীদের বর্জনীয়। তাহা রাজনৈতিক দলাদলি। ইহার মানে এ নয়, যে, তাহাদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত থাকিবে না। তাহা থাকা অনিবার্য। কিন্তু তাহাদের বয়সে মনটা প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের চেয়েও বেশী মুক্ত প্রশস্ত ও উদার থাকা আবশ্যক। নতুবা তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে সত্যের উপলব্ধি ও অল্পভব করিতে পাবিবে না। কংগ্রেসের সব মতই ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত, উহার প্রত্যেক নেতার সব মত ও কাজই ভাল বা মন্দ, কিংবা উদারনৈতিক দলের ও তাহার প্রত্যেক নেতার সব মত ও কাজ ভাল বা মন্দ—ছাত্রছাত্রীদের মনের ভাব এরূপ হওয়া উচিত নহে।

ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনদ্বন্দ্বে যাহা বা অবতীর্ণ হন, তাঁহাদের ও তাঁহাদের পক্ষসমর্থক অবৈতনিক ও বেতনভোগী কর্মীদের মনের ভাব বিশেষ করিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে। এইজন্য নির্বাচনকর্মঘটকে কাজে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিযুক্ত করা ও তাঁহাদের তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

ছাত্রসম্মেলনে শরৎচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসম্মেলনে সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার অভিভাষণে অন্তান্ত কথার মধ্যে বলেন,

• স্বাক্ষরিত নিরক্ষরতা প্রভৃতি চিরন্তন সমস্যার তিনি আলোচনা করিতে চাহেন না। কারণ, জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সব সমস্যার সমাধান হইবে না।

প্রত্যেক বৃহৎ সভায় প্রত্যেক নেতার অভিভাষণে দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার আলোচনা একান্ত আবশ্যক নহে। কিন্তু জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে দারিদ্র্য সমস্যার ও নিরক্ষরতা সমস্যার সমাধান হইবে না, ইহা তাঁহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার যথেষ্ট কারণ মনে করি না। জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এগুলির সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না, ইহা সত্য। কিন্তু কিছু সমাধান ত হইতে পারে? জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধায় ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে কালযাপন করিবে, এবং ক্ষুধিত ও নিরক্ষর অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা বাহ্যনীয় হইতে পারে না। মানবিক শক্তিতে যতটা সম্ভব আমরা দেশের ততটা ভাগ্যান্বিত হইবার আগেও দেশের কিছু দারিদ্র্য দূর নিশ্চয়ই করিতে পারি। তাহা সত্য না হইলে, বর্তমান স্বদেশী প্রচেষ্টাটা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন মনে করিতে হয়, নানাবিধ কারখানা ও কুটীরশিল্পের বর্তমান আয়োজনেরও কোন সার্থকতা থাকে না; কারণ দেশে এখনও জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

দেশে জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত করা আমরাও একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। যতটা মনে পড়ে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার আগে হইতে এই লেখক তাহা আবশ্যক মনে করিত। কিন্তু আমরা ইহাও মনে করি, যে, মানবজীবনের অল্প সব দিকে প্রগতির জন্ত যেমন নিরক্ষরতা দূর করা আবশ্যক, দেশে জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত প্রচেষ্টার জন্তও তেমনিই উহা আবশ্যক।

এবং নিরক্ষরতাদূরীকরণ-কার্যে ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাহাদের অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণপরিচয় হইয়াছে, এরূপ অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা পর্যন্ত নিরক্ষরতাদূরীকরণ-কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। তাহারা তাহা করিলে যে স্বফল লব্ধ হয়, তাহা আমরা সাক্ষাৎভাবে অবগত আছি। তবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য, যে, রাজনীতির আলোচনায় ও রাজনৈতিক কাজে যে উদ্বেজনা-উদ্ভাদনা আছে, নিরক্ষরতাদূরীকরণের কাজে তাহা নাই। কিন্তু তথাপি ইহা একান্ত আবশ্যক কাজ। মানুষ যেমন কেবল চার্টনী খাইয়া সুস্থ সবল হইতে ও থাকিতে পারে না, তেমনি কেবল উদ্বেজনা-উদ্ভাদনার

খোঁরাকে স্বস্থবল জাতি গঠিত হইতে পারে না। রাজ-
নৈতিক আলোচনা ও কাজ কেবল উদ্ভূত-উন্নাদনাময়,
কিংবা উহা বিন্দুমাত্রও অনাবশ্যক, এরূপ বলা বা ইঙ্গিত করা
আমাদের উদ্দেশ্যবাহিত। জাতীয় গবর্নেন্ট প্রতিষ্ঠিত
হইবার আগেও যে নিরক্ষরতাদূরীকরণচেষ্টা একান্ত আবশ্যক,
আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলেন,

যে সমস্ত গুরুতর সমস্যা আশু দেশের সমুখে উপস্থিত, সেইগুলি
সর্ব-ভাবতী হইলেও, বাংলার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ
গবর্নেন্ট এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, কারণ উহার
চেষ্টার কোন সত্য সহায়ত্ব নাই। কিন্তু উহাতে হতাশ হইবার
কিছুই নাই। কারণ বাংলাব জাতীয়তার তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে;
এবং এই বিশ্বাস বাংলার যুবশক্তির উপর তাঁহার যে বিশ্বাস ভাষা
হইতেই উদ্ভূত। স্বস্তি দীর্ঘনির্ভর ও অস্বস্তাপের দ্বারা দেশের
সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাধি উপশম করা যাইবে না। একমাত্র দেশের
যুবকরাই এই সব সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ। যুবকদেরই
কর্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে, মুক্তির ব্যক্তি প্রচার করিতে হইবে, সংগ্রামে
অবতীর্ণ হইয়া দেশকে পরিচালিত করিতে হইবে।

আমরা আজ রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ
করিতে চলিয়াছি। কংগ্রেসেব অহিংস আন্দোলন বহুকাল ধাবৎ চলিয়া
আসিয়াছে; কংগ্রেস বর্তমানে আমাদের কার্যকলাপে এক স্তর পরিবর্তন
সাধন করিয়াছে। কংগ্রেসের সাফল্যের জন্ত চেষ্টা করা বাংলার
যুবকদেরই কাজ। কংগ্রেসকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কি কি
আবশ্যে সজ্জ হইতে হইবে, বাংলার যুবকবল তাহাও অবগত আছে।
আপনারা সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হউন। অহিংস নৈতিকের পক্ষে
সাম্রাজ্যবাদীর ব্যাটন, বুলেট ও সঙ্গীনের সমুদীন হইতে হইলে য় সমস্ত
মানসিক ও নৈতিক গুণ প্রয়োজন, সেই সমস্ত গুণ আপনারা অমুশীলন
করুন। অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের প্রয়োজনেব ভাড়া ও ভবিষ্যতের
আশা আপনারাঙ্গিকে সজীবিত রাখিবে।

বসু মহাশয় যে ছাত্রছাত্রীদিগকে অহিংস সংগ্রামের সৈনিক
হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন, তাহার জন্ত আবশ্যক
সমস্ত মানসিক ও নৈতিক গুণের অমুশীলন করিতে বলিয়া-
ছেন, এই উপদেশ সর্বতোভাবে অমূল্যগীয়।

ইহা সম্ভাষণের বিষয় যে বঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানের
বুধেন, যে, তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। তাঁহাদের
সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবের চতুর্থ অংশে বলা হইয়াছে,
যে, একটি নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসমিতি গঠন করিতে হইবে যাহার
অন্ততম উদ্দেশ্য হইবে ছাত্রদিগকে পৌরজানপদ জীবনের জন্ত
প্রস্তুত করা ("to prepare the students for citizenship")।

বসু মহাশয় বলিয়াছেন, "একমাত্র দেশের যুবকরাই এই

সব সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ," "কংগ্রেসের সাফল্যের
জন্ত চেষ্টা করা বাংলার যুবকদেরই বাজ।" যাহারা এই সব
সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ, কংগ্রেসের সাফল্যের জন্ত চেষ্টা
করা যাহাদের কর্তব্য, যুবকেরা তাহাদের অন্তর্গত নিশ্চয়ই
আছেন। কিন্তু যত দায় যুবকদেরই এবং একমাত্র যুবকেরাই
সব কিছু করিতে সমর্থ, ইহা আমরা মনে করি না। প্রৌঢ়দের
ও বৃদ্ধদেরও কিছু কিছু কর্তব্য আছে, এবং কিছু কাজ
করিবার, পরামর্শ দিবার ও পরিচালনার ভার লইবার শক্তিও
তাহাদের আছে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যুবক সম্পূর্ণরূপে বয়সের
উপর নির্ভর করে না। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ যুবক অনেক দেখিতে
পাওয়া যায়। আবার চিরতরুণ্যশালী উত্তমশীল বৃদ্ধও দুই-
চারি জন থাকিতে পারে।

বসু মহাশয় সম্ভবতঃ যুবক ও ছাত্র সম্পূর্ণ সমার্থক রূপে
প্রয়োগ করেন নাই। কারণ, তিনি যুবকদিগকে যে ভাবে
দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন, ছাত্রাবস্থায়
ছাত্রছাত্রীদিগকে সে ভাবে আত্মনিয়োগ কবিত্তে হইলে
তাহারা নামে মাত্র ছাত্রছাত্রী থাকে। প্রস্তুতির প্রয়োজন
তাঁহার অভিভাষণে ও সম্মেলনের একটি অভিভাষণে স্বীকৃত
হইয়াছে।

শাস্তি সময়ে অহিংস সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুতিব প্রয়োজন
অস্বীকৃত হইবে না। বিপ্লবে ও সশস্ত্র সংগ্রামেও যে প্রস্তুতির
প্রয়োজন, তাহা চীনে ও স্পেনে প্রমাণিত হইতেছে।

চীনের যুবকেরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত অতি-
মানব সাহস, দুঃখসহিষ্ণুতা ও পৌরুষের সহিত জাপানের
বিরুদ্ধে লড়িয়াছে। এই সব গুণে তাহারা জাপানীদের চেয়ে
বিন্দুমাত্রও নিকৃষ্ট নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জাপানী সৈন্যদের
মত তাহাদের যুদ্ধশিক্ষা না-থাকায়, এবং চীনেব যুদ্ধায়োজন
জাপানের সমান না-হওয়ায় চীনকে পরাস্ত হইতে
হইয়াছে। কিন্তু হাবিয়া হারিয়া চীন যুদ্ধ শিখিতেছে, যুদ্ধের
আয়োজনও করিতেছে। অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে
তাহা না ঘটিতে পারে।

স্পেনে এখন যাহাবা বিদ্রোহী তাহারা সরকারী প্রশিক্ষিত
সেনানায়ক ও প্রশিক্ষিত সাধারণ নৈনিক ছিল। এখন যাহারা
স্পেনের গবর্নেন্টের সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক, তাহারা

দুইবিদ্যায় তেমন শিক্ষা পায় নাই। বিদ্রোহীদের জয় হইয়া চলিবার ইহা একটি কারণ। অস্ত্র কারণ, তাহার ইটালী, জার্মানী ও পোর্টুগালের সাহায্য পাইতেছে।

‘বিনাবিচারে বন্দী’ কথা সম্বন্ধে শরৎবাৰু বলেন,

দেশের বহু-স্বক-স্বভাৱী আশ্রয়-বিচারে আটক, এইরূপ অসহায় দেশবাসী কি করিয়া পীড়নশূলক আইনগুলির কথা ভুলিয়া বাইতে পারে। এই সমস্ত আইন,—এই সমস্ত বন্দাইনী আইন,—শুধু দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দেশবাসীকে এই দেশ আইনের প্রতিরোধ করিতে হইবে; তত দিনই এই প্রতিরোধ-কার্য চালাইতে হইবে, যত দিন না দেশের লোক যে আচরণকে অপরাধজনক বলিয়া মনে না করেন, গবর্ণমেন্টও তাহাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিবেন না।

ইহা আমাদের অবশ্যকর্তব্য।

সাংস্কারিক রীটোরার বিরুদ্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, বলা বাহুল্য আমরা তাহা সমর্থন করি। অনেক আগে হইতে আমরা এরূপ কথা বলিয়া আসিতেছি।

বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন,

এই সমস্যা শিক্ষিতদের মধ্যে বেকর বিপুল আকার গ্রহণ করিয়াছে অশিক্ষিতদের মধ্যেও সেইরূপ। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই সমস্যা সমাধানের জন্য আজ পর্যন্ত কি করিয়াছেন? শ্রীবৃত্ত বহু বলেন যে,—ভারতগবর্ণমেন্ট বেকারদের জন্য আজ পর্যন্ত কিছুই করেন নাই। সম্রাট বালা গবর্ণমেন্ট ৫৮ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন এই সমস্ত লোক অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি ক্যাটরী স্থাপন করিবে। কিন্তু পূর্বে হইতেই তাহাদের মালের কটুটি হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা তদ্রূপ অগ্রিম মূল্যও পাইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়—এই সমস্ত ক্যাটরী দ্বারা বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা সত্যি রহিয়াছে। কিন্তু বাংলা গবর্ণমেন্ট এতদিন শুধু উপাসনাতায় ও অকস্মিক ক্যাটরীরাছে। শ্রীবৃত্ত বহু বলেন যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর দুঃখকষ্টই তদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছে।

‘স্বাধীনতালাভ না-হওয়া’ পর্যন্ত দেশের আর্থিক উন্নতি করা সম্ভব নয়—ম্যাজিনিস এই বাণী দেশ-স্ব-সম্প্রদায় স্মরণ রাখিবে।

এই বাণীর সত্যতা বাস্তবনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির পরস্পরসাপেক্ষতা সম্বন্ধে জ্ঞানবান্ কোন মননশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টা বাহারা চালাইবেন, তাহাদিগকেও কার্যক্ষম থাকিবার মত গ্রাসাচ্ছাদন পাইতে হইবে। বেকার অবস্থায় অবলাদ আসে, কেহ কেহ আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। (যদিও তাহা করা কাহারও উচিত নয়)। অতএব স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা চালাইতে হইবে, এবং কিছু উপার্জনের চেষ্টাও করিতে হইবে।

রাজবন্দীর আত্মহত্যা

এক মাসের মধ্যে নবজীবন ঘোষণা সম্বন্ধে গাঙ্গুলী আত্মহত্যা করিলেন। দেওলীতে এবং বিনা বিচারে বন্দী আটক রাখিবার অস্ত্র শিবিরে আগে আরও আত্মহত্যা হইয়াছে। ঠিক কি-কি কারণে বন্দীরা আত্মহত্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। কিন্তু এই অল্পমান সত্য মনে করা যাইতে পারে, যে, বন্দীদের কারাজীবন-কল্পন শেষ হইবে; সে বিষয়ে কোন নিশ্চয় না-থাকায় নৈরাশ্র তাহাদিগকে আত্মহত্যা প্রবৃত্ত করিয়াছে, এবং এই নৈরাশ্র একটি কারণ।

‘গবর্ণমেন্ট বলিয়া’ থাকেন, তাহাদের হাতে এই সব বন্দীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। তাহাদের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিনা বিচারে বন্দীদিগকে দোষী মনে করিতে পারি না। কিন্তু যদি তাহাদের কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও এইরূপ অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্ত কারাদণ্ড প্রায়সঙ্গত হইতে পারে না।

এই সকল বন্দী যাহা করিয়াছে বলা হয়, সেইরূপ ক্রাজের জন্ত অস্ত্র অনেক লোকের আদালতে প্রকাশ্য বিচারও নির্দিষ্ট কালের জন্ত কারাবাসের হুমকি হইয়াছে। যাহারা বিনাবিচারে বন্দী তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রমাণ আছে তাহা অপেক্ষা, যাহারা বিচারান্তে দণ্ডিত হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নিশ্চয়ই বলবত্তর। কারণ, যাহাদের বিরুদ্ধে বলবত্তর প্রমাণ আছে, পুলিশ তাহাদিগকে আদালতে বিচারার্থ আনে, যাহাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ প্রমাণ নাই কিংবা সন্দেহ ব্যতীত কোন প্রমাণই নাই, তাহাদিগকে বিনাবিচারে বন্দী করা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অপরাধের প্রমাণ প্রমাণ যাহাদের বিরুদ্ধে আছে তাহাদের শাস্তি হইতেছে নির্দিষ্ট কালের জন্ত কারাবাস, কিন্তু যাহাদের বিরুদ্ধে তেমন প্রমাণ নাই তাহাদের শাস্তি হইতেছে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত কারাবাস; অর্থাৎ গুরুতর অপরাধে লঘুতর দণ্ড, এবং লঘুতর অপরাধে গুরুতর দণ্ড। ইহা কি প্রায়সঙ্গত?

সরকারপক্ষের লোকেরা বলিতে পারেন, বিনাবিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকে ছাড়িয়া দিলেই তাহারা আরার রাজদ্রোহ বা রাজদ্রোহের চক্রান্ত করিবে; সেই জন্ত

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু যাহারা বিচারান্তে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহারা নির্দিষ্ট কাল কারাবাসের পর খালাস-পাইবার পরে যে আবার বেআইনী কিছু করিবে না তাহার কি গ্যারান্টি আছে? বলাবাইতে পারে, তাহারা জেলে কষ্ট পাইয়াছে, তাহা স্বরণ করিয়া আর আইন ভঙ্গ করিবে না। কিন্তু বিনাবিচারে বন্দীরাও ত আটক থাকা কালে বহু দুঃখ ভোগ করে; তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে সেই সব দুঃখের স্মৃতি তাহাদিগকে আইন ভঙ্গ হইতে কেন নিবৃত্ত রাখিবে না? এবং যে-কেহ আইন ভঙ্গ করিবে, তাহাকে দণ্ড দিবার পথ ত খোলাই আছে।

অতএব বিনাবিচারে যাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া খুবই উচিত।

উচ্চতর ও উচ্চতম সরকারী কর্মচারীরা অনেকে বলিয়া থাকেন, কে বলে কাহাকেও বিনা বিচারে বন্দী করা হইয়াছে? এক এক জন জজ বা দুজন জজ একত্র অনেক বন্দীর বিরুদ্ধে প্রমাণ দেখিয়াছেন, তাহারা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদিগকে আটক করা হইয়াছে। এখানে দুটি প্রশ্ন উঠে। আদালতে প্রকাশ্য বিচার হইলে উভয় পক্ষেই উকীল-ব্যারিষ্টারদের দ্বারা সাক্ষ্য ও প্রমাণ সব পরীক্ষিত হয়। এইরূপ সাহায্য পান বলিয়া জজেরা ঠিক বিচার করিতে পারেন। তাহাতেও মধ্যে মধ্যে তাহাদের ভ্রম হয়। সুতরাং এক জন বা দুজন জজ উকীল-ব্যারিষ্টারদের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণশূন্য দেখিলেই তাহাতে সুবিচার হইতে পারেন না। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে, বিনাবিচারে বন্দী প্রত্যেকেরই বিরুদ্ধে নথী এইরূপে জজদের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে বা হয় কি? কোন-কোন অত্যাচারী রাজপুরুষ বলিয়াছেন, আমি স্বদৃচ্ছাক্রমে কোন-কোন নথী দেখিয়াছি, এবং তাহাতে বন্দীদের অপবাদ সম্বন্ধে নিশ্চন্দ্র হইয়াছি। হাজার লোকের মধ্যে কয়েক জনের নাড়ী টিপিয়া জবাব লক্ষণ যদিই বা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাকী সকলের বা অধিকাংশের জবাব হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে কি?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক সময় এলাহাবাদের গবর্নমেন্ট কলেজের মিউর সেন্ট্রাল কলেজে অধ্যাপক ছিলেন।

তাহার পর তিনি স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। গবর্নমেন্টের চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি কিছুকাল কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও আইন-চ্যান্সেলার ছিলেন। গত ২১শে অক্টোবর ১৯৪৭ সাল বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এক জন বিখ্যাত থিয়সফিক্যাল ছিলেন, মিসেস এনী বেসান্টের সহযোগিতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মত প্রচারের চেষ্টা করিতেন। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। যদি তিনি নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা আত্মচরিত লিখিয়া গিয়া থাকেন এবং যদি তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহা বহুত্যাগপূর্ণ ও পাঠযোগ্য হইবে। তিনি বিদ্বান ও মিষ্টালাপী ছিলেন।

ছাত্রসমাজ ও স্বাধীনতা প্রচেষ্টা

মুনাইটেড প্রেস নিয়ন্ত্রিত সংবাদ দিয়াছেন।

চিঠির এই নবেম্বর।

অজু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল জি এস এন আচার্য মহাস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যে স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ছাত্রেরা কি ভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারে? তাহার উত্তরে মহাস্বামী লিখিয়াছেন:—

“পাঠে কোন ব্যাঘাত না জন্মাইয়া ছাত্রেরা দরিদ্রনারায়ণের জন্য ও তাহাদের নামে দিনে অন্ততঃ আশ ফটা করিব অনারসেই স্নাতক পাঠে পারি এবং এই ভাবে যত নগণ্যই হউক ন কেন, দেশের সম্পদ কিছু বাড়াইতে পারে, এবং এতদ্ব্যতীত, যাহাদের শিক্ষার সহিত কোন পরিচয় নাই এক সারা বৎসরে যাহারা জানে না যে পোট ভরিয়া বাগুরা কাহাকে বলে; সেই লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সহিত ছাত্রেরা জীবন্ত যোগস্বত্ব স্থাপন করিতে পারে।”

দরিদ্র জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করা এবং তাহাদের দারিদ্র্য দূর করা, ছাত্রদের জন্ত মহাস্বামী এই দুটি কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন। এবং এই কর্তব্য পালন তাহারা তাহাদের জ্ঞানলাভ চেষ্টার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া করিবে, মহাস্বামীর অভিশ্রম এইরূপ, ইহা বুঝা যাইতেছে।

আণ্ডামানে রাজনৈতিক বন্দী

গবর্নর সেনার্যালের শাসনপরিষদের অন্ততম সভ্য সর্ব হেনরী ক্রেকের মতে আণ্ডামান দ্বীপ রাজনৈতিক কয়েদীদের স্বর্গ। “স্বর্গলাভ” তাহাদের সেখানে হইতে কাহারও কাহারও হইতেছে বটে, কিন্তু দ্বীপটা যে তাহাদের পক্ষে ভূস্বর্গ নহে, তাহা ভারত-গবর্নমেন্টের মনোনীত দুজন দর্শকের কথায়

প্রমাণিত হইতেছে। ভারত-গবর্নেন্ট দুই বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় ও দুই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থাপক সভার দুজন সদস্যকে আশ্রামানে দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। সর্ব মোহম্মদ হামিন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য তথাকার বাসগৃহ ও অন্তর্বিধ ব্যবস্থার ভাল দিকটা কথাসম্ভব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হয়, যে, আশ্রামানের রাজনৈতিক জেল ভূষণ নহে। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তাহার সবাই দেশে ফিরিয়া আসিতে চায়। অবশ্য সব জাযগার রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব বন্দীই মুক্তি চায়। কিন্তু আশ্রামানের রাজনৈতিক বন্দীরা যে দেশে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহা খালাস পাইয়া দেশে আসার কথা নহে। তাহার বন্দী অবস্থাটা দেশেই কাটাতে চায়, আশ্রামানে নহে। সেখানে তাহার স্বাস্থ্য পাইলে, দেশের জেলের নরকভোগ কেন করিতে চাহিবে ?

চট্টগ্রামের অজ্ঞান লুণ্ঠন করার জন্য যাহারা বন্দি হইয়া আশ্রামানে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়া ও তাহাদের চালচলন কথাবার্তায় সর্ব মোহম্মদ হামিনের চমক লাগিয়াছে। তাঁহার মতে,

"They were well-dignified, well-mannered, well-disciplined and talked only on points. They put forward only one demand; that was repatriation."

তাৎপর্য। তাহার আত্মসম্মান, শিষ্টাচারসম্পন্ন, এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রিত। তাহার কেবল প্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছিল। তাহার কেবল একটি দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিল; তাহা দেশে পুনঃপ্রেরিত হওয়া।

রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্যে অবস্থা ও অত্যন্ত অসুস্থ-অভিযোগ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। দৈনিক খাদ্যের অবস্থার চেয়ে মানসিক খাদ্যের একান্ত অপ্রাপ্ততা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

দ্বিতীয় দর্শক রায়জাদা হুসরাজ মহাশয়ের কয়েকটি বাক্য মাত্র উদ্ধৃত করিব।

"The health of the political prisoners compared unfavorably with that of ordinary convicts. Out of 316 politicals, 75 have lost five pounds in weight. They suffer from influenza, cold and bronchitis. ... There is also scarcity of water."

"Among the 316 political prisoners in the Andamans, there were only five interviews with relatives during the last five years. Practically there are no interviews, no change in the environment, no

new faces, no exercises, no recreation. In fact the prisoners appear more to be buried alive in the little jail compound."

তাৎপর্য। অন্য বন্দীদের সঙ্গে ভুলনার রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্য খারাপ। ৩১৬ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ৭৫ জনের প্রত্যেকের আড়াই সের ওজন কমিয়াছে। তাবা ইনফ্লুয়েন্স, সর্দি ও ব্রঙ্কাইটিসে ভোগে। ... জলের চরিত্র্যতাও আছে।

৩১৬ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আত্মীয়-বন্ধনের সহিত কেবল ৫টি সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। কার্যতঃ, কোন সাক্ষাৎকার নাই, পরিবেষ্টনে কোন পরিবর্তন নাই, কোন নতুন মুখ তথায় দৃষ্ট হয় না, কোন ব্যায়াম নাই, অবসর-বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নাই। কষ্টতঃ, বন্দীরা জেলের ছোট হাতার মধ্যে জীবন্ত সমাধিপ্রাণিত বলিয়াই মনে হয়।

স্বভাবচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য

কার্সিয়ঙে অবরুদ্ধ অবস্থায় স্বভাববাবুর স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে। মুক্ত অবস্থায় তিনি ও তাঁহার ভ্রাতার চিকিৎসার বেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, সম্ভবতঃ তাহা হইতেছে না। বেরূপ ব্যবস্থা হইলেও, আরোগ্যলাভের যে একটি প্রধান উপায় মানসিক স্বাস্থ্য, তাহা অবরুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া না-দিলে তাঁহার পক্ষে স্বাস্থ্যলাভ দুর্ঘট।

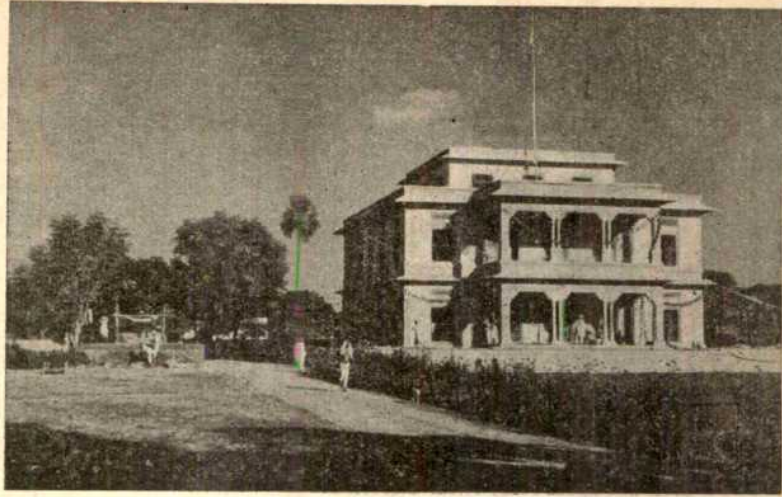
স্বভাববাবুকে কংগ্রেস-সভাপতি করিবার প্রস্তাব

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত খারে প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, স্বভাববাবুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা হউক। গবর্নেন্ট তাঁহাকে ছাড়িয়া না-দিলে তিনি সভাপতির কাজ করিতে পারিবেন না বটে; তথাপি তাঁহার নির্বাচন দ্বারা বুঝা যাইবে, দেশের লোক তাঁহাকে কিরূপ বিশ্বাস করে ও সম্মানাই মনে করে। তিনি এইরূপ সম্মানের উপযুক্ত। এই সম্মান অনেক আগেই তাঁহার পাওয়া উচিত ছিল।

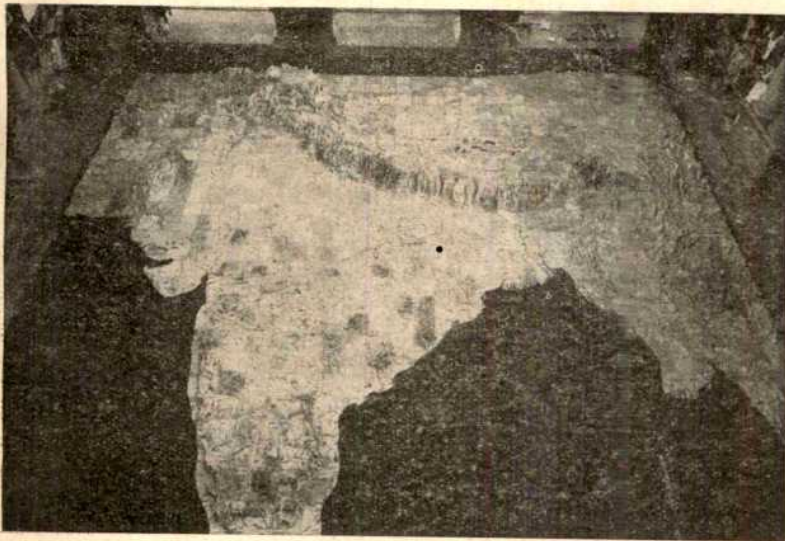
ভারতমাতা-মন্দির উদ্বাটন

কাশীতে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ গুপ্তের উৎসাহ, উদ্যোগ ও ব্যয়ে ভারতমাতা-মন্দির উদ্বাটন হইয়াছে। ইহা নূতন রকমের প্রতিষ্ঠান। ইহাতে ভারতবর্ষকে জননীরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার কোন মূর্তি বা চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই,

হইয়াছে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতিষ্ঠা। এই মানচিত্র মন্দির-প্রস্তর-নির্মিত, সমতলভূমিতে রক্ষিত। ইহা হইতে অল্প মানচিত্রের মত ভারতবর্ষের আকৃতি বুঝা যায়, এবং পাহাড়পর্বত নদনদী প্রভৃতি কোথায় কোথায় আছে তাহা জানা যায়। অদিকন্তু ইহা উচ্চাচত্বজ্ঞাপক; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ, অধিত্যক, উপত্যকা, সমতলভূমি, নদীগর্ভ, প্রভৃতির আপেক্ষিক উচ্চতা ও নিম্নতা ইহা হইতে জানা যায়। ইহা নির্মাণ করাইতে গুপ্ত মহাশয় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ



ভারতমাতা-মন্দির



ভারতবর্ষের মন্দির মানচিত্র

ধর্মেরই লোক আসিতে এবং নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ভগবদুপাসনা ও প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষের এই মন্দির মানচিত্র এই দেশের বিশালতা, প্রাচীনতা, ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দর্শকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে। নানা স্থানের সহিত তৎসমুদয়ের ঐতিহাসিক স্থিতি জড়িত। সেই সকল পূর্বকথা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মানচিত্রটি দেখিলে মনে পড়িবে।

করিয়াছেন, এবং যে অট্টালিকাটির মধ্যে ইহা রাখা হইয়াছে, তাহার নির্মাণের ব্যয় সমেত তাঁহার এক লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা ও উদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধী পৌরোহিত্য করেন। অজ্ঞাত বহু কংগ্রেস-নেতা ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু, পারসী, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাদের নিজ নিজ শাস্ত্র হইতে বচন আবৃত্তি করেন। এখানে সকল

লাহোরে হরিজন কনফারেন্স

লাহোরে নিখিলভারত হরিজন কনফারেন্স স্থির করিয়াছেন, যে, হরিজনরা হিন্দুই থাকিবেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা ত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্ত এবং অস্পৃশ্যতা দূর করিবার নিমিত্ত যে দেশব্যাপী চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা প্রীত; কিন্তু হিন্দু সমাজসংস্কারের মন্দির গতিতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট। এই



মহাত্মা গান্ধী মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন

অসন্তোষ ভিত্তিহীন নহে। জাতিভেদের ও অস্পৃশ্যতার দাসত্ব হইতে আপনাদিগকে যথাসম্ভব মুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা হিন্দুদিগকে সনির্বন্ধ অহরোধ জানাইয়াছেন, বাহাতে তাঁহারা স্বাধীনতার সংগ্রামে তাঁহাদের স্বদেশবাসীদের পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারেন।

স্পেনে যুদ্ধের অবস্থা

স্পেনে বিদ্রোহীরা রাজধানী মাদ্রিদে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু অল্প অনেক শহর ও প্রদেশ এখনও তথাকার গবর্নেন্টের হাতে আছে। যুদ্ধের অবসান এখনও হয় নাই, হইবে না।

বর্তমানে স্পেনের বিদ্রোহীরা পোর্টুগ্যাল, জার্মেনী ও ইটালীর সাহায্য পাইতেছে। শেষ পর্যন্ত যদি তাহারা জয়ী হয়, তাহা হইলে ইউরোপে ইটালী, জার্মেনী, স্পেন ও পোর্টুগ্যাল এই চারিটি প্রদেশ ফাসিষ্ট হইবে। রাশিয়া আছে বৃহৎ সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক দলের অধিকার



শ্রীশিবপ্রসাদ দত্ত

কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী দল। ফ্রান্স কতকটা সমাজতান্ত্রিক। ব্রিটেন ঠিক কোন দলের নহে। এখানে ফাসিষ্ট আছে, সোশ্যালিষ্ট এবং কম্যুনিষ্টও আছে; কিন্তু সকলের চেয়ে বড় দল এখন টোরিদের—যারা এখন তথাকার গবর্নেন্ট নামধেয়।

ইউরোপে একটা খুব বড় যুদ্ধ আসন্ন মনে হইতেছে, তাহাতে ব্রিটেন কোন দলে যাইবেন, সে বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান নানা জনে করিতেছেন।

চলন্ত চিত্রপ্রদর্শনী

লক্ষ্মী কলাবিদ্যালয়ে (লক্ষ্মী আর্ট স্কুলে) শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তথাকার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রাঙ্কনৈপুণ্য প্রবাসীর পাঠকগণ অবগত আছেন। তাঁহার কয়েকটি চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি ভারতীয় চিত্রকলার সহিত ভারতবর্ষের নানা নগরের লোকদিগের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মী কলাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের অঙ্কিত মোট তেষ্ট্রিখানি ছবির



চলন্ত প্রদর্শনীর একখানি চিত্র



শ্রী রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়



চলন্ত প্রদর্শনীর অপর একখানি চিত্র

চলন্ত প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। এলাহাবাদ, নাগপুর ও বোম্বাইয়ে ছবিগুলি দেখান হইয়াছে; হায়দরাবাদেও এই চিত্রপ্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। যেখানে যেখানে ছবিগুলি দেখান হইয়াছে, তথায় অনেক ছবি সংবাদপত্রের ও দর্শকদের প্রশংসা পাইয়াছে। রামেশ্বরবাবুর সংগ্রহে অসিতকুমার হালদার, বীরেশ্বর সেন, ললিতমোহন সেন, বি এন জিজ্ঞা, প্রণয়রঞ্জন রায়, এইচ এল মেট, কিরণময় ধর, এস সি ঢোল, রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, এস সেনরায়, বি দয়াল, বি পি মিট্রল, সুখবীর সিং, তারাদাস সিংহ, এস এন নৌটিয়াল, আর সি ছুবে, জাফর হুসেন, ভবানীচরণ গুই, পি এন ভার্গব, পি বাবুজো, ঈশ্বর দাস, ভি বি নাগর এবং এস আর বৈশের আঁকা ছবি আছে। কয়েকটির ক্ষুদ্র প্রতিলিপি আমরা দিতেছি।

আজমীরে নিখিল-ভারত সংগীত কন্ফারেন্স

গত অক্টোবর মাসে আজমীরে নিখিল-ভারত সংগীত কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের বহু প্রসিদ্ধ সংগীতবিদগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বাংলা দেশ হইতে সঙ্গীত সম্মিলনীর সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীমতী



সঙ্গীত সম্মিলনী ঐকতানবাদক দল

সমুখ হইতে প্রথম সারি : অমিয় ভট্টাচার্য, হৃদীর চক্রবর্তী, ধ্রুব চক্রবর্তী। দ্বিতীয় সারি : কণিকা মিত্র, মাধবী দাস, অরুণকী সেন। তৃতীয় সারি : আরতি দাস, রেণুকা মোদক। চতুর্থ সারি : গীতশ্রী গীতা দাস, গীতশ্রী ঈশা গুহ। পঞ্চম সারি : অন্নপূর্ণা সেন, মন্দিরা গুপ্ত, এলা দাস। ষষ্ঠ সারি : অসীমা দাস, অরুণা সেন, অশিমা বহু, বলবুল রায়। শেষ সারি : বি এম গুণ, মিহির ভট্টাচার্য, রাখাল মজুমদার।

প্রমদা চৌধুরীর নেতৃত্বে উহার ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী কনকারেন্সে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে গীতশ্রী শ্রীমতী ঈশা গুহ, গীতশ্রী শ্রীমতী গীতা দাস এবং শ্রীমতী আরতি দাস কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত অমিয়-কান্তি ভট্টাচার্যের সেতার বাদন, শ্রীমতী রেণুকা মোদকের নৃত্য এবং শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ঐকতান বাদকদলের যত্নসংগীতে দক্ষতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী অমলা নন্দী প্রভৃতিও কনকারেন্সে গিয়াছিলেন।

চীন ও জাপান

জাপান চীনের কাছে কয়েকটি দাবী পাঠাইয়াছে। সেগুলি ঠিক কি এখনও প্রকাশ পায় নাই। অনেকে মনে করেন, দাবীগুলির মানে জাপানকে চীনের আরও কয়েকটি প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বলা। কিন্তু চীন যুদ্ধের জগ্ন আগেকার চেয়ে অধিক প্রস্তুত। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে বিস্তারিত সৈন্য মজুত রাখিয়াছে এবং ব্রাডবটকে এরোপ্লেনও পাঠাইয়াছে অনেক। চীন এই সকলের সাহায্য পাইবে চীনের নিজের এরোপ্লেনের সংখ্যাও এখন কম নয়। সুতরাং জাপান এখন কিছু চাহিলেই পাইবে মনে হয় না। যুদ্ধ বাধিতে পারে।

প্যালেস্টাইনের অবস্থা

প্যালেস্টাইনেই আরবদের বিদ্রোহের এবং বৃহৎ ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু অশান্তি এখনও আছে। তদুপরি আরব উচ্চতর কমিটি ব্রিটিশ রয়্যাল কমিশনকে বয়কট করিয়াছে এই কারণে, যে, ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে বাহির হইতে ইহুদীদের আগমন এখনও বন্ধ করে নাই।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে রংগীতে হইবে। মূল সভাপতি এবং বিভাগীয় সভাপতিদিগের নাম অজ্ঞাত দৃষ্ট হইবে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল, এম-এল-সি, মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে ও তাঁহার সহকর্মীদিগের সহযোগিতায় এই অধিবেশনের সমুদয় বন্দোবস্ত উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া আমাদের আশা আছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় ভারতবর্ষের অগ্রতম প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ। ছোটনাগপুরের কয়েকটি প্রধান আদিম জাতির সম্বন্ধে ইংরেজীতে তিনি যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের বাহিরেও নৃতত্ত্ববিদগণ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন। বাংলাভাষাতেও তিনি প্রবাসীতে নৃতত্ত্ববিষয়ক বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ছোটনাগপুরের আদিম জাতিরা তাঁহাকে তাহাদের বন্ধু বলিয়া মনে করে। তাঁহার নেতৃত্বে অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।



শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়

... মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতি ঐহারা মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে এবং নিজ নিজ বিজ্ঞান পারদর্শী বলিয়া সুবিদিত।

রাঁচী স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে এবং ইহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে ছোটনাগপুরের ঐষ্টব্য অনেক জিনিষ আছে। সংস্কৃতির ও স্বদেশহিতৈষণার অমুরাগী ব্যক্তিদের পক্ষে রাঁচী প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ ও গ্রন্থকার পরলোকগত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সংগীতজ্ঞ পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাসস্থান বলিয়া ঐষ্টব্য। রাঁচির ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় শিক্ষামুরাগীদের ঐষ্টব্য। শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের বৈঠকখানা নৃতত্ত্বের মিউজিয়াম বলিলেও চলে।

বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মিলন-সাধনের প্রতিষ্ঠান এই প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। আগে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে যে বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনীর

বার্ষিক অধিবেশন হইত, কয়েক বৎসর তাহা আর না হওয়ায় এখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনই বাঙালী সাহিত্যিকদিগের সম্মিলিত হইবার একমাত্র সভা।

বঙ্গে জবাহরলাল

শান্তিনিকেতনে ও কলিকাতায় কংগ্রেসের বর্তমান অধিনায়ক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর যে উৎসাহপূর্ণ ও বিপুল সঞ্চর্জন হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকৃত দেশভক্তকে বাঙালী কিরূপ ভালবাসে তাহা বুঝা যায়, এবং কংগ্রেসের স্থানও বাঙালীর হৃদয়ে কিরূপ তাহাও বুঝা যায়। এই সঞ্চর্জনার অনেকটা সাময়িক উচ্ছ্বাস হইলেও, ইহার স্থায়ী প্রভাবও কার্যক্ষেত্রে অমুভূত হইবে, আশা করা যায়। স্বদেশসেবকের প্রকৃত সঞ্চর্জন দেশের উন্নতির জন্য তাঁহারই মত লাগিয়া যাওয়া। তাঁহার সকল মত আমরা গ্রহণ না-করিতে পারি, তাঁহার কার্যপ্রণালীও সর্ব্বাংশে আমরা অনুসরণ না-করিতে পারি, তথাপি যথাসক্তি তাঁহার মত নিঃস্বার্থ, নির্ভীক ও আত্মোৎসৃষ্ট হইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে।

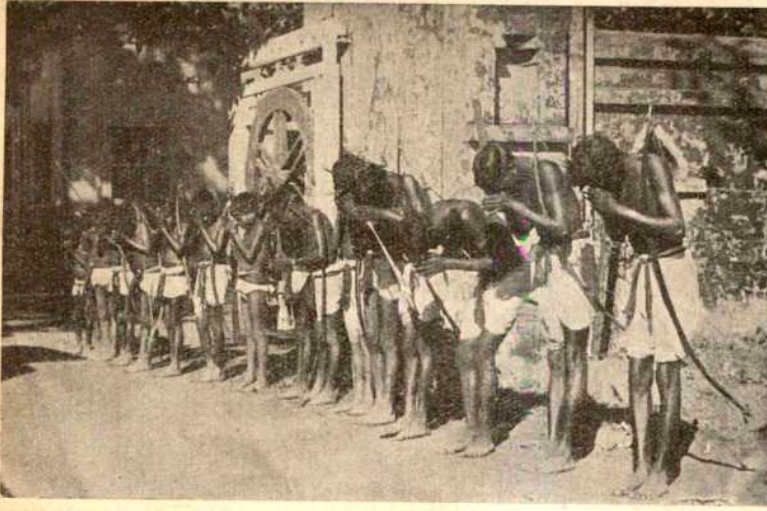
রবীন্দ্রনাথ ও জবাহরলালের কথোপকথন

গব্বরের কাগজে বাহির হইয়াছে, শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত জবাহরলালের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী কথোপকথন হইয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ও স্যাডভান্সের ছবি ছুটিতে জবাহরলালকে শ্রোতারূপে দেখা যায়। ভারতবর্ষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস-অধিনায়কের কি কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বুঝা কোঁতুল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্ব্বসাধারণ উপকৃতও হইতেন।

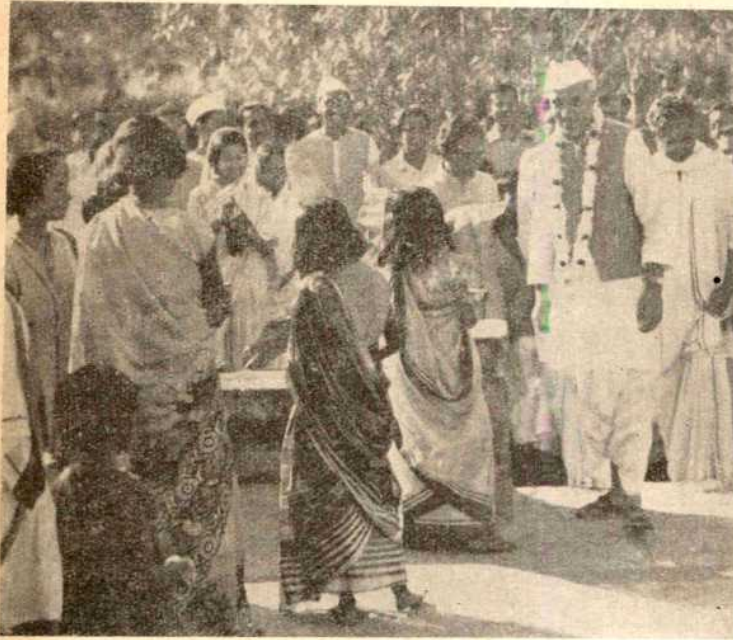
মহাত্মা গান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দেশী বিদেশী বহু ব্যক্তি দেখাসাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিতও সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর সহিত এইসব সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত ও অনুলেখন রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন লিখিয়া রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।

কলিকাতায় জবাহরলালের বক্তৃতা

জবাহরলাল যত জায়গায় যাইতেছেন, সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অনেক বক্তৃতা করিতে হইতেছে। কলিকাতাতেও অনেক



শ্রীনিবেশনে নীওতাল রতীবালকগণ কর্তৃক পণ্ডিত জবাহরলালের অভ্যর্থনা



শ্রীনিবেশনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুকে মালাচন্দনদান

বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। কোন একটি বক্তৃতাতেই কেহ নিজের সব মত প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ, কোন বক্তৃতাই এনসাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষ নহে। সুতরাং কোন বক্তৃতায় যাহা বলিতে বাকী থাকে, তাহা বক্তার মত বটে কিনা, সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইলে তাহার অন্য সব বক্তৃতাও পড়া আবশ্যক। এই জন্ম প্রসিদ্ধ

ব্যক্তিদের প্রধান প্রধান বক্তৃতা তাহাদের দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক

নিখিল-বঙ্গ মহিলা

কর্মীদের প্রতি জবাহরলাল

অন্য অনেক সভা সমিতির মত নিখিল-বঙ্গ মহিলা কর্মী-সংঘ কলিকাতায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সঞ্চর্চনা করেন। তাহাদের অভিনন্দনপত্রের উত্তরে পণ্ডিতজী যাহা বলেন, তাহার কিয়দংশের তাৎপর্য্য নীচে দিতেছি।

দেশের উন্নতি যদি করিতে হয় তবে প্রথমে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। স্ত্রীজাতিকে সুশিক্ষিতা করিয়া তোলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। স্ত্রীজাতিকে বাদ দিয়া কখনই দেশের উন্নতি হইতে পারে না। দেশের কাব্যে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই সমান অংশ দিতে হইবে। নারীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই আমাদের প্রধান কার্য্য। মেয়েরা যদি লেখাপড়া না শেখে, তবে তাহারা কখনও স্বস্থানকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারে না।

নারীদের শিক্ষিত করিয়া তোলাকে পণ্ডিতজী অবশ্যকর্তব্য ও প্রধান কাজ বলিয়াছেন, ইহা শিক্ষিতা মহিলারা লক্ষ্য করিবেন।

স্বাধীনতালাভ প্রচেষ্টায় নারীদের কৃতিত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,

আজ দেশের সমুখে সকলের চেয়ে বড় কথা স্বাধীনতা অর্জন। হৃদয়ের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়াছেন; কলে

দেশের লোকের মেয়েদের প্রাতি শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে তাহারা নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়াছে।

বিনাবিচারে যাহারা অবরুদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন,

বাংলার শতসহস্র যুবক আজ বিনাবিচারে অবরুদ্ধ। ইহাতে যাহারা বেশী কষ্টভোগ করিয়াছে, তাহারা স্ত্রীলোক; কারণ আজ যাহারা

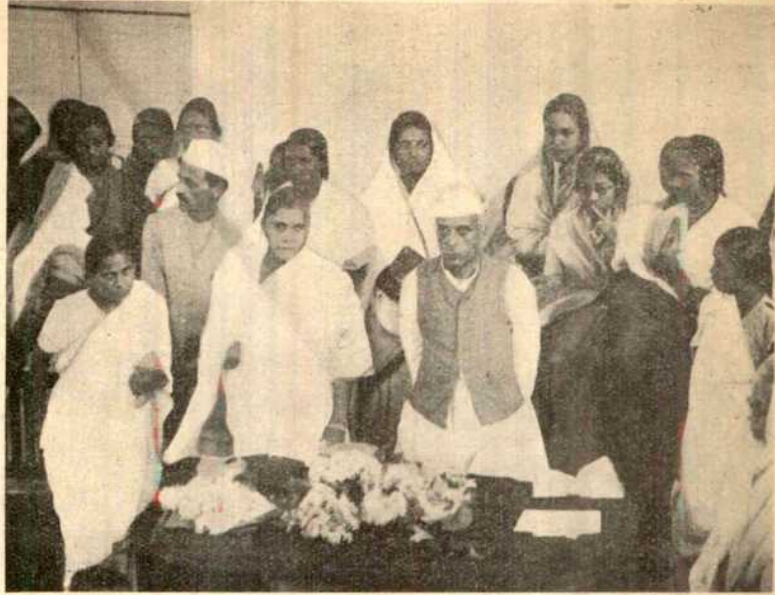
অবরুদ্ধ এবং নির্ধ্যাতিত, তাহারা তাহাদের স্বামী, ভ্রাতা অথবা পুত্র। ইহার জন্ত হায় হায় করিয়া লাভ নাই, আপনাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের এ অবস্থা দূর করিতেই হইবে। সেজন্ত আপনারা অন্তরের সহিত এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করুন।

বন্ধে কেবল যে পুরুষেরা বিনাবিচারে বন্দীকৃত হইয়াছে তাহা নয়। বহুসংখ্যক পুরুষ অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় অল্প নারীদেরও বন্দীদশ ঘটিয়াছে।

পরদা-প্রথা ও অগ্রাণু সামাজিক কুব্যবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন,

আর একটি কাজ আপনাদিগকে করিতে হইবে। তাহা হইতেছে—পরদা-প্রথা, সামাজিক কুব্যবস্থা ও শাসন হইতে নিজেদের মুক্ত করা। যত দিন না আপনারা এই সমস্ত বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারেন তত দিন আপনাদের পূর্ণতা আসিবে না। আপনাদের জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিতে হইবে। আইন অমান্য করিবার আন্দোলনে হাজার হাজার নারী পরদার বাহিরে আসিয়া পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সংগঠনশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বীকৃতির নিকট আমার অবরোধ তাহারা যেন আবার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত না হন। যদিও পরদা-প্রথা এখনও আছে, কিন্তু আর বেশী দিন তাহা থাকিতে পারেন। স্বাধীনতার সংগ্রাম আপনাদিগকে একাই করিতে হইবে, ইহাতে আপনারা পুরুষের কোন সাহায্য পাইবেন না। পুরুষেরা এই কার্যে হয়ত বাধা দিবে, কারণ এই সমাজ পুরুষের সমাজ। স্বতরাং দুইটি কাজ আপনাদের সম্মুখে আছে, এক স্বরাজ এবং দ্বিতীয় স্বাধীনতা। তার পর, যারা গরীব, যারা বেকার যারা শ্রমিক—তাহাদের প্রতিও আপনাদের কর্তব্য আছে। আমি নিখিল-বন্দ মহিলা কন্যা সম্বন্ধে এই কার্যের জন্ত আহ্বান করিতেছি।

পরদা-প্রথাও বিশেষ করিয়া নারীদের পক্ষে অনিষ্টকর ও অস্ববিধাজনক। অগ্রাণু কুপ্রথা বিবর্তে সংগ্রামে নারীরা বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান পুরুষসমাজের, অন্ততঃ অধিকাংশের, সাহায্য পাইবেন না, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য তাহারা পাইবেন। ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীনতার এই সংগ্রাম আইন অমান্য করিবার আন্দোলনের বহু পূর্বে হইতে নানা কুৎসা ও অগ্রবিধ উৎপীড়নের মধ্য দিয়া কার্য্য আসিতেছে।



কলিকাতায় মহিলাদিগের সভায় পণ্ডিত জব্বারলাল; তাহার দক্ষিণে বখাক্রমে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী লাবণ্যালতা চন্দ্র

বিনাবিচারে অবরোধ এবং মানসিক ক্ষতি ও অবসাদ

পণ্ডিতজী তাহার কলিকাতার একটি বক্তৃতায় বঙ্গের শত শত ব্যক্তিকে বিনাবিচারে বন্দী করার ফলে বঙ্গের যে মানসিক অবসাদ ও ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা অতীব সত্য কথা। অবরুদ্ধ যুবক ও তরুণীরা স্বাধীন থাকিলে দেশের মানসিক সম্পদ বাড়াইতে পারিতেন, তাহাদের দ্বারা মননশীলতা ও মনশ্চিন্তা অগ্রসর হইত। ইহা যে বাধা পাইয়াছে, তাহাই বঙ্গের মনোবিকারের একমাত্র ক্ষতি নহে। বঙ্গের কেবল কতকগুলি মানুষের দেহই (এবং মনও) যে অবরুদ্ধ ও শূল্লিত হইয়াছে, তাহা নহে। বঙ্গের সকল পুরুষের ও নারীর মনের পায়ে বেড়ি ও হাতে হাতকড়ি লাগান হইয়াছে। আমরা ভয়ে ভয়ে কথা বলি, ভয়ে ভয়ে চলি—যে গোয়েন্দা নয় তাকেও গোয়েন্দা মনে করি। ভয়ে ভয়ে খবরের কাগজে লিখি, বহি লিখি, ব্যক্তিগত চিঠি লিখি (কারণ, কাহার কোন চিঠি যে ডাকঘরে খোলা হইবে না, তাহা কেহ জানে না); স্বতরাং আমরা ভয়ে ভয়ে চিন্তা করি, কল্পনা করি। চিন্তা ও কল্পনার ডানা বাধা বা কাটা পড়িয়াছে।

প্রত্যেক দেশেরই উদীয়মান পুরুষসমাজ ও নারীসমাজ তাহার প্রধান সম্পদ। কারণ, এই উত্তীর্ণ বয়সের ছেলেরা ও মেয়েরা বয়োবৃদ্ধদের চেয়ে সাহসী, শক্তিশালী, আশাশীল,

উৎসাহশীল এবং বাঁচিবেও অধিকতর বৎসর। অধিকন্তু, যেমন রাগিঃ অবসানের পূর্বে ঘরের আধারের মধ্যেও মায়ের কোলের শিশুরা আলোর সন্ধান পাইয়া কাকলি করিয়া উঠে, তেমনি স্বস্থ প্রকৃতির যুবজন জগতে নব উষার আবির্ভাব বৃদ্ধদের চেয়ে আগে অনুভব করিতে পারে। কিন্তু মুক্তির বার্তা কেবল তাঁরাই পায়, যারা স্বয়ং মুক্ত। বক্ষে যুবসমাজের কয়েক সহশ্রের দেহমন পিঞ্জরাবদ্ধ, অবশিষ্টদের মন ভয়ে আড়ষ্ট ও শৃঙ্খলিত—কারণ যুবজনই বিশেষ সন্দেহভাজন।

তথাপি আশা করি, আমাদের যুবজন মানবাত্মার আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতার গুণে তাহাদের মনের উপরের চাপটিকে পরাস্ত করিতে পারিবে।

লাহোরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন

লাহোরে হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে, করবীর পীঠের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ডক্টর কূর্ভকোটি তাহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি আদি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মঠগুলির একটির প্রধান আচার্য্য ও সম্মানীয়। হিন্দুর নানা শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহার ফুৎপট আছে। তন্ময় তাঁহার পাশ্চাত্য দর্শন আদিরও জ্ঞান আছে। তিনি জ্ঞানবান্ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। সেই জন্ত তিনি তাঁহার অভিভাষণে যে-সকল উদার মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত তাঁহার সকল মতের আলোচনা সংক্ষেপে হইতে পারে না, এবং তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে আমরা একমতও নহি।

বিশাল হিন্দু সমাজে নানা জনের নানা মত। এই সমাজের যে সকল লোক পরমত-অসহিষ্ণু তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন, শঙ্করাচার্য্যের মত ধর্মসম্বন্ধীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এক জন সুপণ্ডিত হিন্দু কিরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বিরোধী। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যদি অস্পৃশ্যতা বর্জন না করেন, তাহা হইলে তিনি অস্পৃশ্যদিগের হিন্দু সমাজের স্বতন্ত্র একটি শাখা প্রতিষ্ঠাতেও রাজী, তাহারা শিখ হইলেও তিনি রাজী; এবং জৈন বৌদ্ধ শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষজাত ধর্মাবলম্বী সকলকেই তিনি হিন্দু মনে করেন। লাহোরের শিখদের শ্রীগুরুসিংহ সভা তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া উপলক্ষ্যে আপনাদিগকে বিশাল হিন্দু সমাজের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন।

আচার্য্য কূর্ভকোটি হিন্দুধর্মের কতকগুলি বিশেষত্বের উল্লেখ করেন। খ্রীষ্টিয়ানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরাণের মত হিন্দু মতের বিশেষ করিয়া কোন একটি শাস্ত্র নাই, কোন ক্রীড নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম যিশু খ্রীষ্টকে,

মুসলমানদের ধর্ম মোহাম্মদকে যে স্থান দেয়, হিন্দুদের ধর্ম বিশেষ কোন একজন মানুষকে সে স্থান দেয় না—হিন্দু ধর্ম পৌরুষেয় নহে, ইহা অপৌরুষেয়। এই জন্ত ইহা সনাতন ধর্ম। মহাত্মা গান্ধীও কতকটা এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার কতকগুলি কথায় ভারতীয় স্বাভাবিকেরা (অর্থাৎ গ্রামাশ্রমিকেরা) মায় দিতে পারিবেন না। বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া সেইগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

“Hindusthan is primarily for the Hindus, who live for the preservation and development of Aryan culture and Hindu dharma.”

“In Hindusthan the national race, religion and language ought to be that of the Hindus.”

“The religion, race and language of the majority community of a State (of Hindus in Hindusthan) shall be the national religion, race and language in every part and in every province of the State, even if the majority community in the State happens to be in a minority in a particular province.”

তাৎপর্য্য। “হিন্দুস্থান প্রথমতঃ (মুখ্যতঃ, আদৌ) হিন্দুদের জন্য, আর্য্যসংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের রক্ষা ও বিকাশের নিমিত্ত যাহারা জীবন ধারণ করে।”

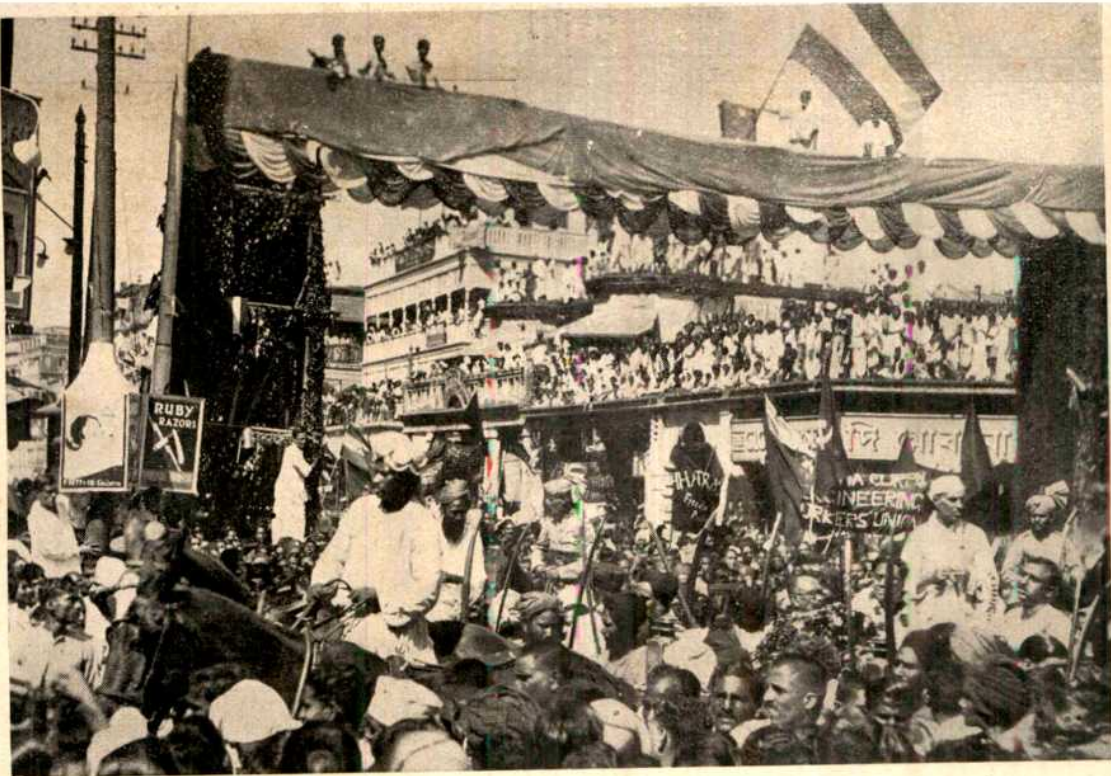
“হিন্দুস্থানে হিন্দুদের রেস (‘জাতি’) ধর্ম ও ভাষাই জাতীয় রেস, ধর্ম ও ভাষা হওয়া উচিত।”

“কোনও রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশে ও প্রদেশে সেই রাষ্ট্রের সংখ্যাভূমিত সম্প্রদায়ের (হিন্দুস্থানে হিন্দুদের) ধর্ম, রেস ও ভাষা সেই রাষ্ট্রের ধর্ম, রেস ও ভাষা হওয়া উচিত—সেই রাষ্ট্রের কোনও প্রদেশে ঐ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইলেও সেখানেও।”

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রীতি অনুসারে রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই। আগে কোন কোন রাষ্ট্রের এক একটা ধর্ম ছিল বটে। যেমন ব্রিটেনে ও আয়ারল্যান্ডে খ্রীষ্টীয় ধর্মের ইংলণ্ডীয় শাখা রাষ্ট্রীয় ধর্ম (state religion) ছিল, তুরস্কে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল। এখন কিন্তু ব্রিটেনের বা তুরস্কের কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই। রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্মমত ও সব ধর্মমতের লোক সমান, এবং রাষ্ট্র সকলেরই জন্ত।

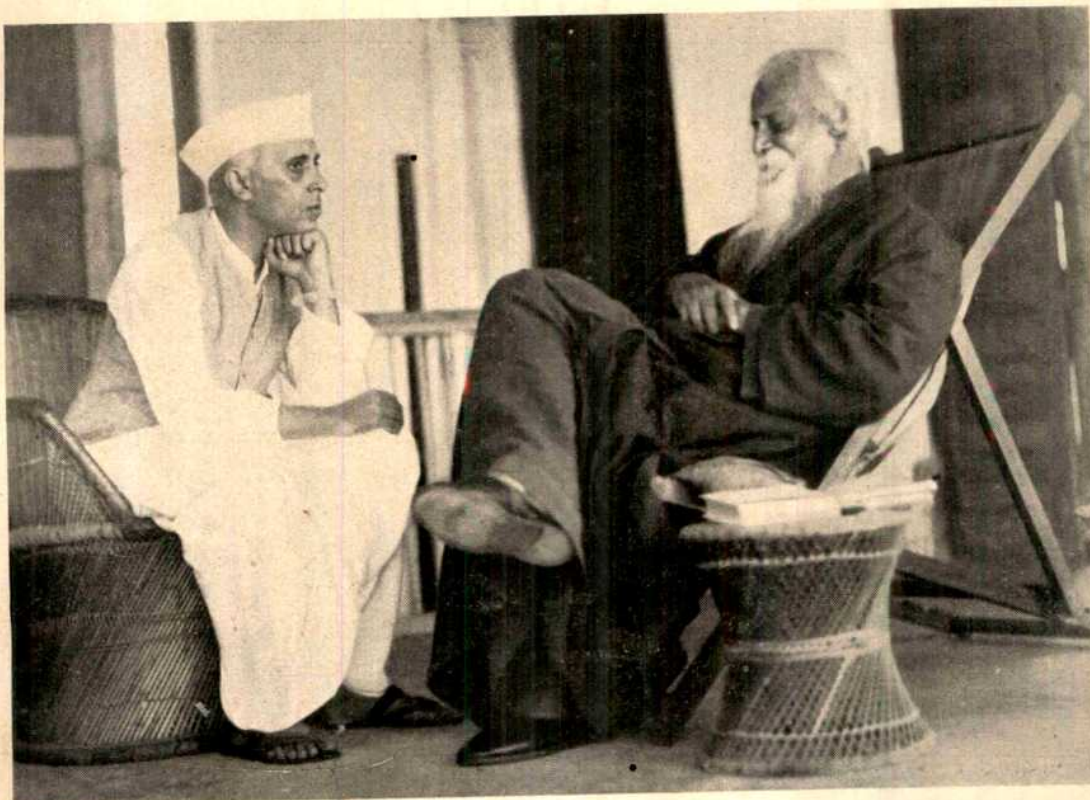
নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে “আর্য্য” বলিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র রেস নাই। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অবিমিশ্র “আর্য্য” সংস্কৃতি নহে, যদিও প্রধানতঃ ইহা ভারতীয়। ইহার মধ্যে দ্রাবিড় এবং অল্প “অনার্য্য” সংস্কৃতি মিশিয়াছে ও মিশিতেছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে সব হিন্দু এক রেসের নহে, হিন্দু সম্প্রদায়ে নানা রেসের মিশ্রণ হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান অনুসারে কোনও সভ্য দেশে কোন অবিমিশ্র রেস আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। যদি বলা হয়, হিন্দুদের ভাষাই ভারতবর্ষ-রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া উচিত, তাহা হইলে হিন্দুদের

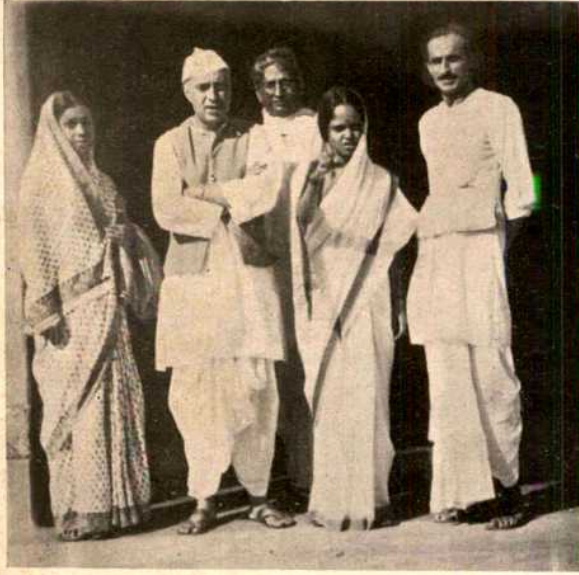


কলিকাতায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর অভ্যর্থনায় শোভাযাত্রা

[ভারত ফটোটাইপ]



ত্রি নিকেতনে পণ্ডিত জবাহরলাল ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন



শ্রী নিকেতনে জবাহরলাল
বাম হইতে: শ্রী স্বচেতা কৃপালনী, জবাহরলাল, শ্রী কালীমোহন
ঘোষ, শ্রী নন্দিতা কৃপালনী, আচার্য কৃপালনী



গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী ও
আবদুল গফুর খাঁ



- মাদ্রাজের নিকটে মাংখালমে জবাহরলাল নেহেরু হিন্দী প্রচার সভার নবনির্মিত গৃহের দ্বারোন্মোচন করিতেছেন

সেই ভাষাটি কোন্ ভাষা? ভারতীয় হিন্দুরা প্রদেশভেদে হিন্দী, উর্দু, বাংলা, তেলুগু, পাঞ্জাবী, তামিল, মরাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, সিন্ধী, মলয়ালম, কন্নড়, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। ইহাদের মধ্যে সবগুলি “আর্য্য” ভাষাও নহে—দ্রাবিড় ভাষাও কয়েকটি আছে। হিন্দী-উর্দুকে হিন্দুস্থানী নাম দিয়া যদি ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করা হয়, তাহা হইলেও উহা ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও মানসিক আদানপ্রদানের ভাষা হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাগুলি লোপ পাইবে না—সেগুলিই সেই সেই প্রদেশে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইতে থাকিবে। হিন্দী বা উর্দু বা হিন্দুস্থানী অবিমিশ্র “আর্য্য” ভাষাও নহে।

আচার্য্য কুর্ভকোটি তাঁহার অভিভাষণে অবশ্য একথাও বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষ-রাষ্ট্র হিন্দু-রাষ্ট্র হইলেও এখানে সংখ্যালঘুসম্প্রদায়গুলির সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তৎসমুদয় লীগ অব্ নেশন্সের সংখ্যা-লঘুসম্প্রদায়সমূহবিষয়ক ব্যবস্থা অনুসারে সংরক্ষিত হইবে।

হিন্দুদের একটি বিশেষত্ব আমরা স্বীকার করি, এবং সেই বিশেষত্ব অনুসারে তাহারা ঠিক যে অর্থে ভারতবর্ষীয় ও ভারতভক্ত, অ-হিন্দু কোন সম্প্রদায় সে অর্থে ভারতবর্ষীয় ও ভারতভক্ত নহে। এই বিশেষত্বটি এই যে, হিন্দুরা কেবল রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী বলিয়াই ভারতীয় নহে, তাহারা ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতিতেও ভারতীয়। ভারতবর্ষের প্রতি তাহাদের ভক্তি ও আনুগত্য (অর্থাৎ লয়্যাল্টি) কেবল রাষ্ট্রীয়, বা অর্থনৈতিক (অর্থাৎ জীবিকার বা প্রাসাচ্ছাদনের), নহে, তাহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, ভাষাসম্বন্ধীয় এবং সাংস্কৃতিকও (cultural) বটে। তাহাদের ধর্ম্ম ভারতবর্ষজাত, ভাষা মূলতঃ ভারতীয় এবং সংস্কৃতি ভারতীয়। তাহাদের প্রাচীন (classical) ও “পবিত্র” ভাষা ভারতীয়। অ-হিন্দু ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়-গুলি সম্বন্ধে এই সব মন্তব্য খাটে না। তথাপি রাষ্ট্রের চক্ষে সকলেই সমান।

এই সাম্যটি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে মানিতে হইবে, তেমনই সংখ্যালঘু অ-হিন্দুদিগকেও মানিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক আপনাদের ধর্ম্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারেন এবং তাহা মনে করিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। অ-হিন্দু কাহারও ইহা মনে করা উচিত নয়, যে, “যেহেতু আমার ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব, আমার মত অনুসারে হিন্দুর ধর্ম্মাচ্ছাদন নিয়ন্ত্রিত হইবে।” এরূপ দাবী অসঙ্গত, অত্যাচার ও অযৌক্তিক। কোনও অায়পরাধ রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রনিয়ন্তার এরূপ দাবী মানা উচিত নয়। ইহা এখন কেহ মানিলেও ইহা টিকিবে না।

বর্তমান ব্রিটিশনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র হিন্দুকে অ-হিন্দুর নিম্নস্থানীয়

করিয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দু ইহা মনে মনে ও কথায় মানিতেছে না, কাহ্যতও এরূপ অত্যাচার ব্যবস্থা টিকিতে পারে না।

আচার্য্য কুর্ভকোটি ও তাঁহার মতাবলম্বী ব্যক্তির। যে ভাবে হিন্দুদের নেতৃত্ব, প্রাধান্য বা প্রমুখতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, জাহা সমীচীন নহে।

হিন্দুরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী। দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষে, সার্বজনিক হিতসাধনে এবং লোকহিত-ব্রততায় তাঁহারা যদি অল্প কোন সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় না হন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ হিন্দু ভারতবর্ষই হইবে ও থাকিবে। কোনও সাম্রাজ্যিক বা জাগতিক শক্তি তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

হিন্দু মহাসভার লাহোর অধিবেশনের দুটি ঘটনা দুঃখকর। একটি সভাপতির অভিভাষণের কোন কোন অংশে সহিত মতের মিল না-থাকায় কতকগুলি প্রধান হিন্দুর প্রতিবাদ ও সম্মতুল আগ্রহ; দ্বিতীয়টি, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের পণ্ডিত রাধাকান্ত মালবীয প্রভৃতি প্রতিনিধিদিগকে প্রতিনিধি বলিয়া গণনা না-করা এবং তজ্জনিত হান্ধা।

গোয়ালিয়রে নূতন মহারাজার অভিষেক

গোয়ালিয়র রাজ্যের বর্তমান মহারাজা জিয়াজী রাও শিল্পে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাঁহার অভিষেক উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে তিনি প্রজাদের জন্ত প্রধানতঃ যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তাহার তালিকা দিতেছি।

(১) গ্রামসমূহের উন্নতির জন্ত এক কোটি টাকা দান।

(২) কৃষিজীবীদের দেয় ৬০ লক্ষ টাকা খাজনা মাফ।

(৩) ভাল বৃষ ও বীজ কিনিবার জন্ত কৃষকদিগকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দান।

(৪) মহারাজাকে অভিজাত সম্প্রদায়ের দেয় এক বৎসরের তনুকা মাফ।

(৫) তাহার। চারি বৎসরের মধ্যে রাজ্যকে তাহাদের বজ্রী দেয় শোধ করিলে ক্ষম লাগিবে না।

(৬) গোয়ালিয়র কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীকে মহারাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলবন্ত কোঠা নামক প্রাসাদ দান।

(৭) শিবপুরী ও মোরেনা নগর দুটির জন্ত জল-সরবরাহের কারখানার ব্যবস্থা মঞ্জুর।

(৮) উজ্জয়িনী, শাজাপুর, মাণ্ডসার, শিবপুরী ও মোরেনার জন্ত পয়ঃপ্রণালীর পরিকল্পনা মঞ্জুর। শিক্ষা প্রজাবর্গের সকলের অধিগম্য করা হইবে।

ভূতপূর্ব মহারাজা মাধব রাও শিন্দে গোয়ালিয়র রাজ্যে জলসেচনের ব্যবস্থার জন্ত তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা, এক কোটি বাট লক্ষ রেলওয়ের জন্ত, তিন কোটি নব্বই লক্ষ সরকারী রাস্তা ও ইমারতের জন্ত, এবং কৃষক ও কৃষির সাধারণ উন্নতির জন্ত সাতাইশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্ত্রি রাজ্যের ব্যবসাবাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের উন্নতির জন্তও বিস্তর টাকা খরচ করিয়াছিলেন।

কুস্ত গোয়ালিয়রে জলসেচন ব্যবস্থার জন্ত তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সহিত বৃহৎ বঙ্গের সামান্য জলসেচন ব্যয় দুঃখের সহিত তুলনীয়।

—

হরিজনদিগকে ধর্ম্মান্তর লওয়াইবার চেষ্টা

লাহোরে নিখিলভারত হরিজন কনফারেন্সে হরিজন প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুই থাকিবেন, হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাঁহারা ত্যাগ করিবেন না; কিন্তু তাঁহারা হিন্দুসমাজের দ্রুত সংস্কার চান। অতীতকালে, সংবাদ রটিয়াছে, ব্রিটেন হইতে খ্রীষ্টিয়ান পাদরীরা আসিতেছেন এবং মিশর হইতে মুসলমান মৌলবীরা আসিতেছেন হরিজনদিগকে যথাক্রমে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান করিবার জন্ত। পরে অবশ্য গবন্মেণ্টের নিকট হইতে আদেশের প্রায় সমান বিজ্ঞপ্তি পাইয়া মিশরের মুসলমান মিশন ভারতবর্ষ আসা বন্ধ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক কারণে যিনি যে ধর্ম্মই গ্রহণ বা যে ধর্ম্ম ছাড়িয়া অগ্নি ধর্ম্ম গ্রহণ করুন, তাহাতে অস্ত্রের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু হরিজনদিগকে যে-যে যুক্তি ও প্রভাব দ্বারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাইবার চেষ্টা হইবে, অতীতে যদ্বারা তাহাদিগকে অহিন্দু করা হইয়াছে, তাহা বহু পরিমাণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

হরিজন-প্রতিনিধিরা হিন্দু ছাড়িবেন না বলিয়াছেন বটে, কিন্তু হরিজনদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, শিক্ষার স্বযোগের অভাব, চিকিৎসার স্বযোগের অভাব, এবং সামাজিক লাজনা এত অধিক যে, তাহাদের নেতারা বাহাই বলুন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা বিশেষ সহায়ভূতি, ত্রায়পারায়ণতা ও সমাজহিত-বিতার সহিত হরিজন সমস্তাসমূহের সমাধানে মনোযোগী না হইলে বহু হরিজনকে ধর্ম্মান্তরে লইয়া যাওয়া খুব কঠিন হইবে না। যে পরিমাণে হরিজনেরা অ-হিন্দু হইবে, সেই পরিমাণে শুধু যে হিন্দুসমাজ হীনবল হইবে তাহা নহে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বাভাবিকতার বাস্তবিক ও সভ্য সামর্থ্যদিগের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে।

—

বোম্বাইয়ে “ধর্ম্ম” গুণ্ডামি

• গুণ্ডামির সহিত ধর্ম্ম শব্দটির একত্র প্রয়োগ শোচনীয় ও

লজ্জাকর। কিন্তু অনেক লোক গুণ্ডামি ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ দেখিতে পায় না বলিয়া তাহা করিতে হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে হিন্দুদের মারুতির মন্দির ও ভজনমণ্ডপ এবং তাহার নিকট মুসলমানদের মসজিদ অন্ততঃ এক শত বৎসর হইতে আছে। উভয়ের সান্নিধ্য এতদিন হিন্দুমুসলমানের বিরোধের কারণ হয় নাই; অথচ হিন্দুরা হিন্দু ছিল, মুসলমানেরা মুসলমানই ছিল। সম্প্রতি এই সান্নিধ্য রক্তপাতের কারণ হইয়াছে। সংক্ষেপে ব্যাপারটির ইতিহাস এইরূপ।

যে অঞ্চলে মন্দিরটি ও মসজিদটি আছে, সেখানে রাস্তার উন্নতির জন্ত মিউনিসিপালিটির কিছু জায়গার দরকার হয়। মসজিদের কর্তৃপক্ষ জায়গা দিতে নারাজ হন। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ এই সর্ত্তে পুরাতন সভ্যমণ্ডপের জায়গাটি দিতে রাজী হন যে ভয় এই মণ্ডপের পরিবর্তে মন্দিরের অগ্নি দিকে মিউনিসিপালিটি একটি মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া দিবেন। মিউনিসিপালিটি এই সর্ত্তে রাজী হইয়া প্রাচীন মণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া জায়গাটি নিজেদের কাজে লাগান। পরে যখন সর্ত্ত অল্পসারে নূতন মণ্ডপটি নির্মাণ করিয়া দিবার কথা হয়, তখন মিউনিসিপালিটির মুসলমান সভ্যরা তাহার বিরোধিতা করেন।

মসজিদের কর্তৃপক্ষ বলেন, হিন্দুদের ভজনমণ্ডপ নির্মিত হইলে তথাকার ভজনে তাঁহাদের নামাজের ব্যাঘাত হইবে (গত এক শত বৎসর কিন্তু ব্যাঘাত হয় নাই!)। তাহাতে হিন্দুরা নামাজের সময় বাদ দিয়া অগ্নি সময়ে ভজন করিবার প্রস্তাব করেন। মুসলমানদের তাহাতেও মত হয় নাই, ভজনমণ্ডপ তাঁহারা হইতেই দিবেন না। অতঃপর মিউনিসিপালিটি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্ত পুলিশ মোতায়েন করিয়া মণ্ডপ নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। তার পর উভয় পক্ষের মধ্যে দাঙ্গা, গুলুহত্যা, অতর্কিত হত্যা, গৃহদাহ, দোকানপাট লুট ইত্যাদি চলিতে থাকে। তাহা প্রায় দমিত হইয়াছে, মণ্ডপও নির্মিত হইয়াছে, এখন মুসলমানদের দাবী এই, যে, ভজনের সময়টা নামাজের সময়টা বাদ দিয়া নির্দ্ধারিত হউক!

হিন্দুরা ও খ্রীষ্টিয়ানেরা কিন্তু কখনও বলেন না, যে, তাঁহাদের পূজা অর্চনা সন্ধ্যা আরতি উপাসনার সময় বাদ দিয়া মুসলমানদের নামাজের আজান দেওয়া হউক এবং মুসলমানদের মরমের ঢাকের বাদ্য বাজান হউক।

—

দেশী নৃপতিদের ফেডারেশনে যোগদানে দ্বিধা

দেশী রাজ্যগুলির নৃপতিরা এখন অনেকে ফেডারেশনে ঢুকিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইতস্ততঃ করিয়া, বিলম্ব করিয়া কি লাভ? ফেডারেশনে ত ঢুকিতেই হইবে? অর্থাৎ কর্তার ইচ্ছায় কক্ষ। অপর অনেকে বুঝিয়াছেন, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট ব্রিটিশ ভারতের

লোকদিগকে স্বরাজ দিতে চান না—যাহাতে দিতে না-হয় তাহা দেশী রাজাদের দ্বারা করাইতে চান।

দেশী রাজারা এমন সব সর্বের প্রস্তাব করিতেছেন, যাহা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিলে তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্যে পুরা স্বৈর নৃপতি থাকিবেন, অথচ ব্রিটিশ ভারতের কাজে মোড়লী করিতে পারিবেন। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদিগকে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কোন চূড়ান্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক; দেশী রাজারাও নিজেদের প্রজাদিগকে কোন চূড়ান্ত অধিকার দিতে চান না। এ-বিষয়ে উভয় পক্ষের বেশ মিল আছে। অধিকন্তু দেশী রাজারা এ পর্য্যন্ত যতটা ক্ষমতা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তার বেশী কিছু ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক।

বাঙালীর নিষ্পত্তি মুদ্রণযন্ত্র ও অন্যান্য কল

হাবডায় শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের কারখানায় ট্রেডল মুদ্রণযন্ত্র, ওজনের ছোট ও বড় কল, পাট বুনিবার তাঁত প্রস্তুত হইতেছে, এবং বিক্রয়ও হইতেছে। আশা করি, তিনি কাপড় বুনিবার তাঁত এবং ছাপাখানার বড় বড় যন্ত্রও নির্মাণ করাইতে পারিবেন।

মিঃ জিন্নার আশ্পর্দা

নানা অজুহাতে মিঃ জিন্না তাঁহার দলের কমিটি হইতে বঙ্গের মুসলমানদের অগ্রতম নেতা মৌলবী ফজলুল হকের নাম কাটিয়া দিয়াছেন। বাঙালী মুসলমানেরা অগ্র যে কোন প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী লোকও অনেক আছেন। অথচ তাঁহারা অগ্র প্রদেশের মুসলমানদের মুকব্বিয়ানা চান ও সহ করেন। তাহাতেই শেখোক্তাদের ঔদ্ধত্য ও আশ্পর্দা বাড়ে।

ময়মনসিংহে কাপড়ের কল

ময়মনসিংহে একটি কাপড়ের কল স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গে আরও অনেক কাপড়ের কলের আবশ্যক।

বাকুড়া ও বীরভূম জেলায় বেশ ভাল তুলা উৎপন্ন হইতে পারে; তথায় কাপড়ের কলও হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস

লীগ অব নেশন্সে প্রতিনিধির বদলে আবশ্যকমত কাজ করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস জেনিভা গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছেন,

ভারতবর্ষকে লীগকে অত্যন্ত বেশী টাকা দিতে হয়, লীগের কোমিসিও কোন ভারতীয় নাই, কোন উচ্চ পদে ভারতীয় নাই, যে অল্পসংখ্যক ভারতীয় লীগে চাকরী করেন, তাঁহাদের বেতন কম, ভারতবর্ষ স্বশাসক দেশ নহে, ইত্যাদি। এসব কথা সত্য কিন্তু নূতন নয়। এগুলির বিশেষত্ব কেবল এই যে, একজন গবর্ণমেন্ট-মনোনীত ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিতেছেন।

কংগ্রেস ও বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন

প্রথমে বাংলা, পরে পঞ্জাব ও তৎপরে মধ্যপ্রদেশ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ভারতশাসন আইন বর্জন আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারেন। পণ্ডিত জবাহরলালের কলিকাতা আগমনের পর বন্দী কংগ্রেস কমিটি যে পরিবর্তিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও মন্তকবেষ্টনপূর্বক নাসিকা প্রদর্শন প্রণালী অনুসারে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন কংগ্রেসের পক্ষে বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতশাসনের নববিধানে ব্যয়বৃদ্ধি

ভারতবর্ষের উচ্চতম, উচ্চতর ও উচ্চ রাজকর্মচারীরা যত বেতন পায়, ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী ধনশালী কোন দেশেও সেইরূপ কর্মচারীরা তত বেতন পায় না। তাহার উপর এইসব কর্মচারীদের নানাবিধ ভাতা আছে। ভারতশাসনের নববিধানে ব্যয় আরও বাড়িবে। শুধু বঙ্গেই নানা কর্মচারীর নানাবিধ ভাতা প্রভৃতিতে বার্ষিক ৬,৩৭,৩০০ টাকা খরচ বাড়িবে! প্রাদেশিক হাইকোর্ট-গুলিরও উপরে যে ফেডার্যাল কোর্ট হইবে, তাহার প্রধান বিচারপতি মাসিক ৭০০০/- ও অগ্র বিচারপতিরা মাসিক ৫৫০০/- টাকা বেতন পাইবেন। ইহাদের পেম্যানাদির বরাদ্দও খুব দরাজ রকমের।

ভারতবর্ষের হিমালয় জগতে সর্বোচ্চ পর্বত। স্বতরাং অগ্নি সবও সর্বাধিক না হইলে মানানসই হয় না। সেইজন্ত ভারতবর্ষ দারিদ্র্যে দিগ্বিজয়ী, বিদেশী কর্মচারীদিগকে বেতন দানে সর্বাভিভাবী, এবং দারিদ্র্যের দারুণ্য ও বেতনের উদ্ধৃত্য বৈসাদৃশ্যও হিমালয়বৎ।

বোম্বাইয়ে আবার দাঙ্গা ও রক্তারক্তি

বর্তমান অগ্রহায়ণ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ কলিকাতা হইতে দূরে লিখিত। আজ ২৬শে কাষ্টিক লেখা শেষ করিবার পর কলিকাতা হইতে দৈনিক কাগজ পাইয়া তাহাতে

দেখিলাম, বোম্বাইয়ে আবার দাঙ্গা ও রক্তারক্তি আরম্ভ হইয়াছে। গভীর পরিতাপের বিষয়।

সম্পাদকতা করিতেন। তাঁহার সৌজন্মের জ্ঞান তাঁহার সহিত কথোপকথন স্বথকর হইত।

চাকরীর বৃহত্তম দাঁও ভারতে !

অক্সফোর্ডের ছাত্রদিগকে সেদিন লর্ড হালিফাক্স (ভূতপূর্ব লর্ড আর্কউইন) বলিয়াছেন, “There is no bigger job to work for an Englishman anywhere than in India !” অর্থাৎ ইংরেজের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় চাকরীর দাঁও ভারতবর্ষে। ভারতীয়ের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় দাঁও কোথায়? বিদেশে ত নয়ই, স্বদেশেও নয়। ভারতে ইংরেজাধিকৃত প্রত্যেক চাকরীর জন্ত কিরূপ যোগ্যতা আশ্রয় আমরা জানি না। সুতরাং সব চাকরীর কথা বলিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, এদেশে ইংরেজাধিকৃত অধিকাংশ চাকরী ভারতীয়েরা উত্তমরূপে করিতে পারে। সুতরাং লর্ড সাহেবের কথার মানে এই, যে, বিদেশগুলির মধ্যে তত্তৎদেশের লোকদিগকে বঞ্চিত রাখিবার সর্বাপেক্ষা অধিক সুযোগ ভারতবর্ষে।

বিশেষজ্ঞের আমদানী

মোটামোট। বেতনে কত বিশেষজ্ঞের আমদানী যে ভারতে হইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? এই বিশেষজ্ঞদের ব্রিটিশ হওয়া চাই। যে-সব বিষয়ে ব্রিটেন শ্রেষ্ঠ নহে, যেমন কৃষিকাৰ্য্যে, তাহার বিশেষজ্ঞও ব্রিটিশ হওয়া চাই। যদি তাঁহাদের রিপোর্ট অনুসারে কাজ হইত, তাহা হইলেও বা কথা ছিল। কিন্তু তা প্রায়ই হয় না।

বঙ্গে বাঁশের উন্নতির চেষ্টা

বঙ্গে কি প্রকারে বাঁশের উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় সম্বন্ধে সরকারী অনুসন্ধান হইতেছে। বাঁশ নানা কাজে লাগে। আরও অনেক কাজে লাগিতে পারে। জাপানীরা খুব সম্ভ্রা ও খুব সুন্দর নানারকম নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ বাঁশ হইতে প্রস্তুত করে। বঙ্গেও সেইরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া দেশে ও বিদেশে তৎসমুদয়ের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

গত কার্তিক মাসের গোড়ায় বৃন্দাবন যাইবার পথে শোন ঈষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেশনে হঠাৎ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মত সাহিত্যিক ও অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মৃত্যুতে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে টেলিগ্রাফ ও বহুমুখী

অচল হিমাচল চলেন !

সুইজারল্যান্ডের অধ্যাপক হাইম (Prof. Hyme) নামক একজন ভূতত্ত্ববিৎ ভারতপ্রমণে আসিয়াছেন। তিনি বহু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ও প্রায় এক হাজার ফটোগ্রাফ লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া হিমাচল সমতলের দিকে আসিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত কুড়ি মাইল নামিয়াছেন।

আমেরিকার দেশপতি নির্বাচন

দেশপতি রুসভেট পুনরবার খুব বেশী ভোট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দেশপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসারে দেশের শাসনযন্ত্রের সংস্কার সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্ত দেশের অধিকাংশ লোক তাঁহার পক্ষে। এই কারণে, ধনিক শ্রেণী অশুশ্রল ও দলবদ্ধ ভাবে তাঁহার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন।

সার্বজনীন দুর্গা পূজা

এ-বৎসর সার্বজনীন দুর্গা পূজা পূর্ব পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক স্থানে হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে দুর্গার পূজা আগে ব্রাহ্মণরাই করিতেন এবং অঞ্জলিদানও কয়েকটি জাতের লোকেরাই করিতেন। এখন যে নানাস্থানে হিন্দুসমাজের সকল জাতিই উভয় অর্চনানে যোগ দিতে পারিতেছেন, সাম্যবোধবিস্তারের এই বাহ্যপ্রকাশ যুগলক্ষণ।

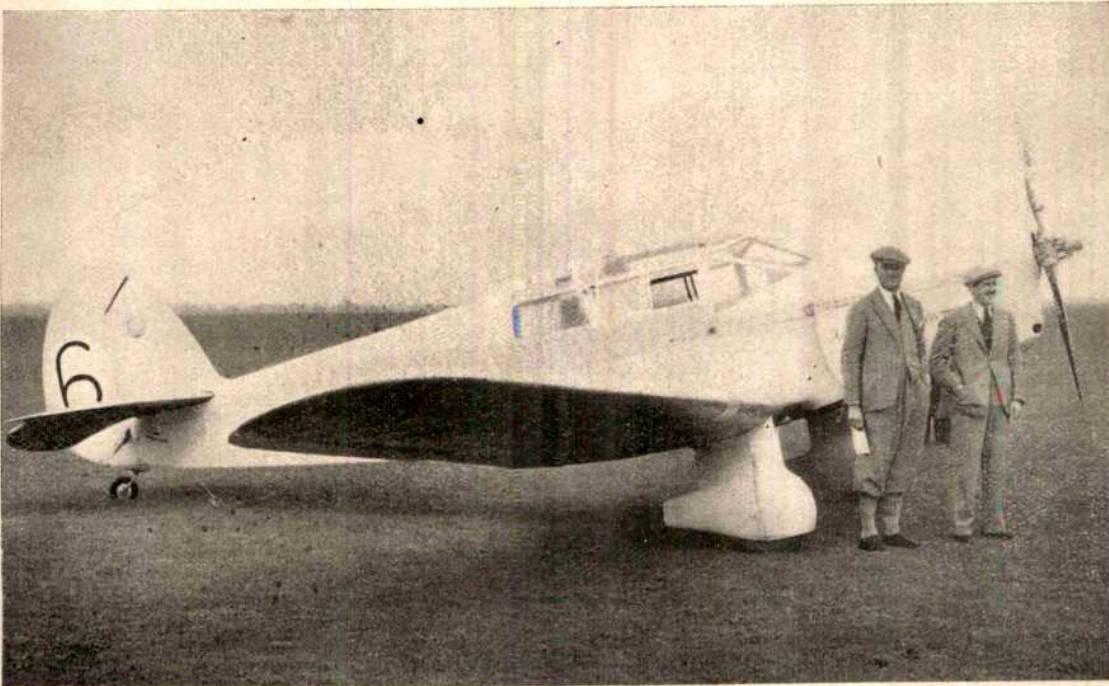
বিজয়া

অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন, পরদারাপহারী রাবণ পরাজিত ও নিহত হইবার পর রামচন্দ্র যে শক্তিপূজা করিয়াছিলেন, বিজয়ার অনুষ্ঠান সেই জন্মোৎসব সমাপনের স্মারক। ষাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বর্তমান কালের নারীহরণ দমন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বিজয়ার উৎসব করেন কিনা আত্মপরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারিবেন।

বিজয়ার একটি নিপুণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পড়িয়াছি। সেই ব্যাখ্যা অনুসারে আগমনী ও বিজয়া একটি রূপকের আরম্ভ ও শেষ। আগমনী মানবাত্মায় ঐশী শক্তির ক্ষুরণ এবং বিজয়া মানবমনের কুপ্রবৃত্তির উপর ঐ শক্তির জয়লাভ সূচনা করে। ষাঁহারা এই ব্যাখ্যা সত্য মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে আগমনী ও বিজয়া সার্থক হইয়াছে কিনা, তাঁহারা তাহা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন।



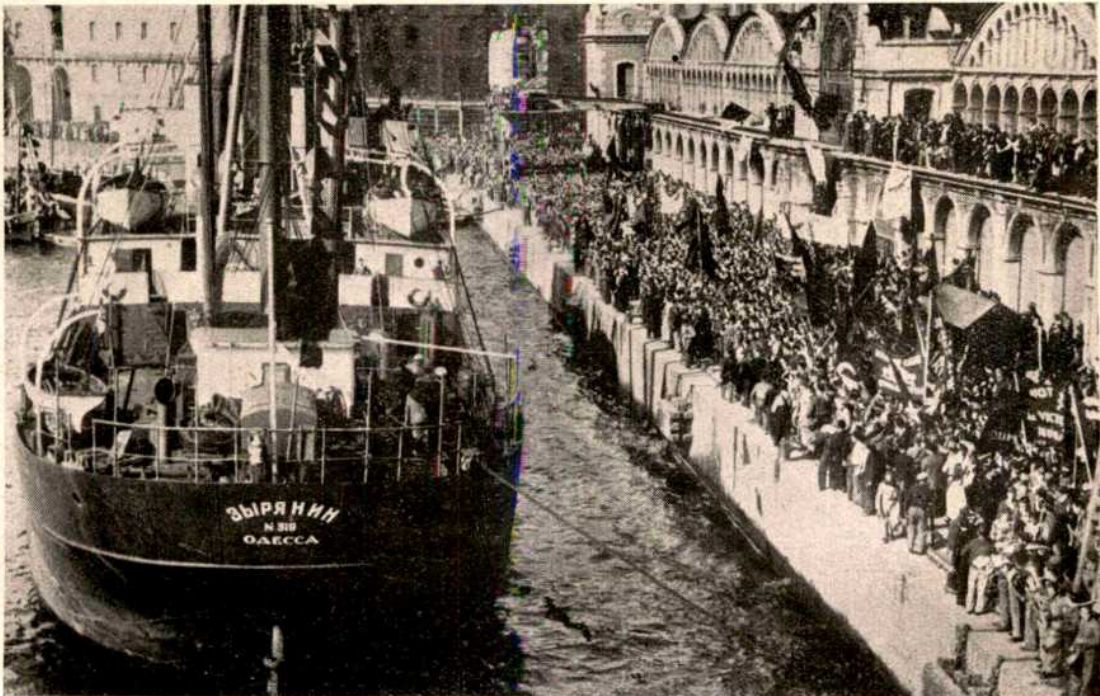
জাৰ্মানীৰ ৰণসজ্জা—নুৰেমবৰ্গে টাঙ্ক-শোভাযাত্ৰা



লণ্ডন-জোহানেসবাৰ্গ বিমান-প্ৰতিযোগিতায় দশ হাজাৰ পাউণ্ডৰ পুৰস্কাৰ বিজেতা সি. ডব্লু. স্কট ও তাঁহাৰ সঙ্গী। •
ইহাৰা ৫২, ফুট। ৫৬ মিনিট ৪৮.২ সেকেণ্ডে ৬১৫৪ মাইল পাড়ি দিয়াছিলেন।



৭১ দিনের বন্দীদশার পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক স্পেনের বিদ্রোহীদের মুক্তি



রাশিয়া হইতে স্পেন-সরকারের সাহায্যের নিমিত্ত খাচ্ছব্র্যের আমদানি



বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ। সোভার বোতল ও প্রস্তরথণ্ডে রাজপথ সমাকীর্ণ।



লণ্ডনে ফাসিষ্ট ও তাহার বিরোধী দলে দাঙ্গা।



উপরে : প্যারিসে কমুনিষ্ট-ফাসিষ্ট সংঘর্ষ

নীচে : লণ্ডনে ফাসিষ্ট শোভাযাত্রার প্রতিবাদের ফলে কলহের দৃশ্য



বাংলা

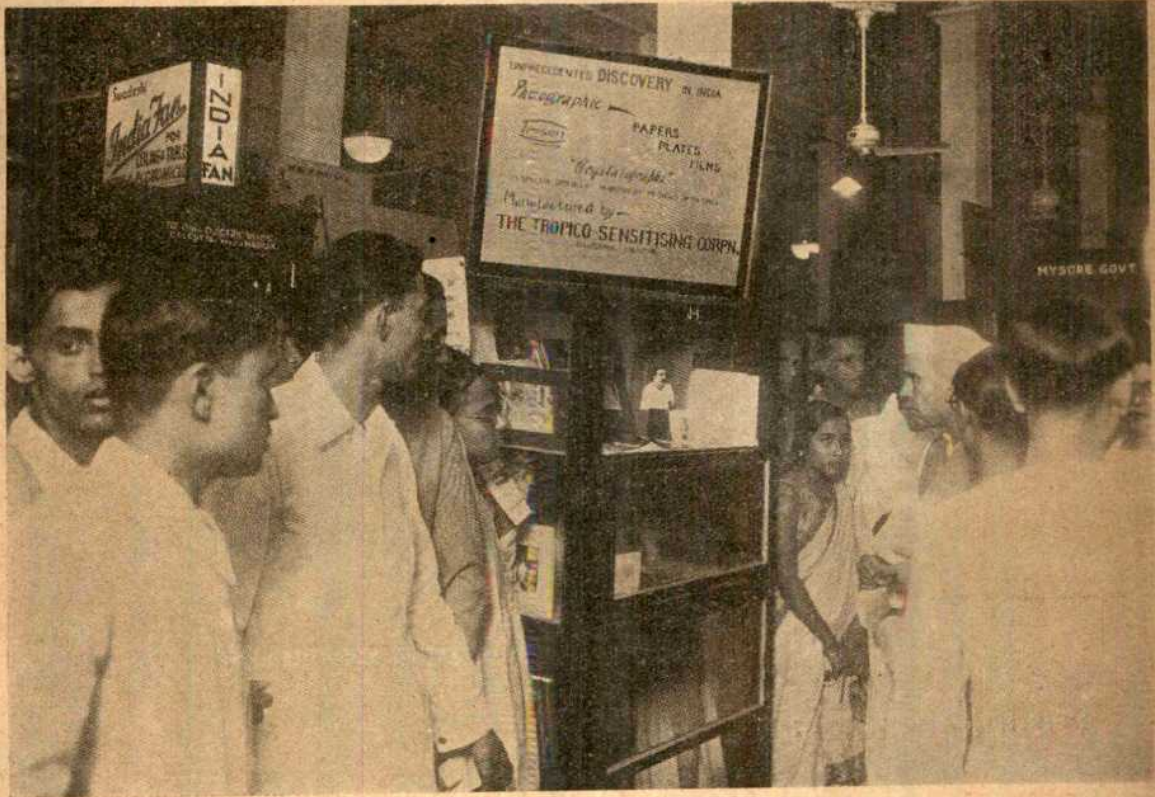
বঙ্গের একটি নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান

প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রায় ৩০১৩৫ লক্ষ টাকার ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম আমদানি হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত, এই সকল সরঞ্জাম এ দেশে প্রস্তুত হইবার কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি 'ট্রিপিকো-সেন্টিটাইজিং কর্পোরেশন' কলিকাতায় পি৪৫২ রাসবিহারী এভিনিউতে এই সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিয়াছেন। ইহাদের প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে দেশবাসীর সমর্থনযোগ্য। সম্প্রতি :পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কলিকাতা কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক

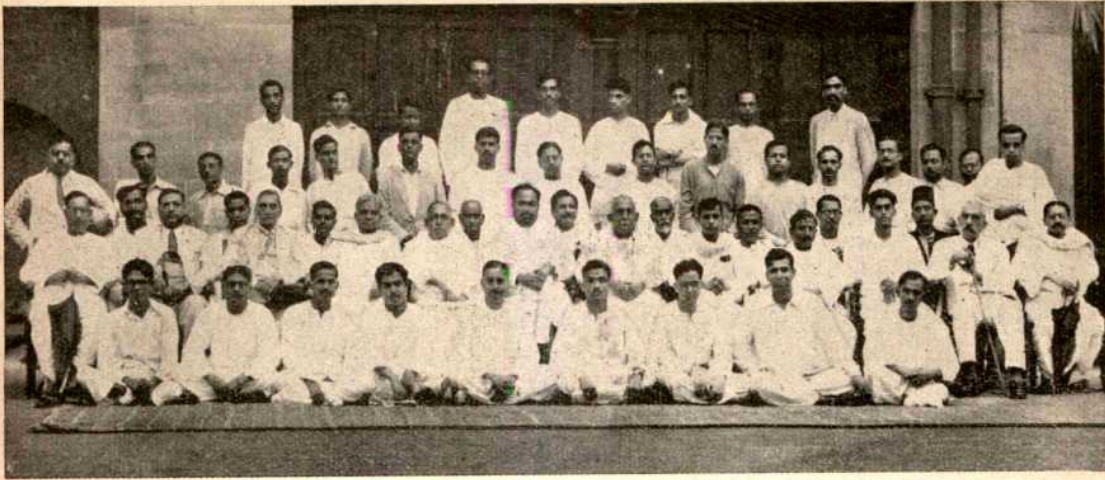
প্রদর্শনীগৃহে ইহাদের প্রস্তুত ফটোগ্রাফের সরঞ্জাম দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় লাইব্রেরী সমিতি

গত ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গৃহে বঙ্গীয় লাইব্রেরী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন কুমার মুনীন্দ্রসেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় বঙ্গে পুস্তকাগারের প্রদার ও বৃদ্ধির আবশ্যিকতার কথা আলোচনা করেন। শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আজিজুল হক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, গ্রামের পুস্তকাগারের উপযোগী পুস্তক-নিরীক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বড়োবা-রাজ্যে সকলেই বিনামূল্যে পুস্তকাগারের সদ্যবহার করিতে পারে। কলিকাতায় এইরূপ



কলিকাতা কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক প্রদর্শনীগৃহে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু 'ট্রিপিকো-সেন্টিটাইজিং কর্পোরেশন'-কর্তৃক প্রস্তুত ফটোগ্রাফের সরঞ্জামাদি পরিদর্শন করিতেছেন।



বন্দীয় লাইব্রেরী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন

ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু গ্রামে গ্রামে এইরূপ ব্যবহার প্রবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেশ ও বিদেশে কৃতী বাঙালী

বাবুড়া-নিবাসী শ্রীঅরবিন্দ সিংহ পেক্ট, বার্ষিক প্রভৃতি লক্ষ্যে

বিশেষ শিক্ষালার্ঘ্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনস্থ বন্দীয় ব্রতচারী সমিতি প্রভৃতি অস্থানীয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রেজিষ্টার রায় চন্দ্রনাথ মিশ্র

ম্যালেরিয়ার “মহৌষধ” নানা প্রকার আছে

কিন্তু

সাবধান!

যা’ তা’ বাজে ঔষধ সেবনে দেহের অপকার সাধন করিবেন না!

এপাইরিনা

ম্যালেরিয়া আদি মর্কপ্রকার জ্বরের

সুপারীক্ষিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ মহৌষধ।

ব্যবহারে কোন প্রকার কুফল নাই।

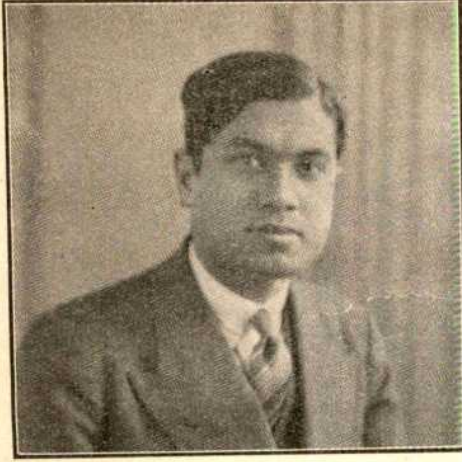
“এপাইরিন”

যে সকল উপদানে প্রস্তুত, তাহা

বিশ্বব্যাপ্ত চিকিৎসকমণ্ডলীর অমুমোদিত।

সকল বড় এবং ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন।

ল্যাড্‌কো • কলিকাতা



শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

ডক্টর অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রাধিকামোহন বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯৩৩ সালে বিদেশ যাত্রা করেন এবং শেফিল্ডে ও লণ্ডন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব টেকনোলজিতে কুয়েল টেকনোলজি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। অতঃপর তিনি জার্মেনীতে হানোভার টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ও ডিপ্লোমা লাভ করেন। ভারতবর্ষের কয়লা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন।



শ্রীহরেশচন্দ্র গুপ্ত

সর্বতোভাবে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স লিমিটেড

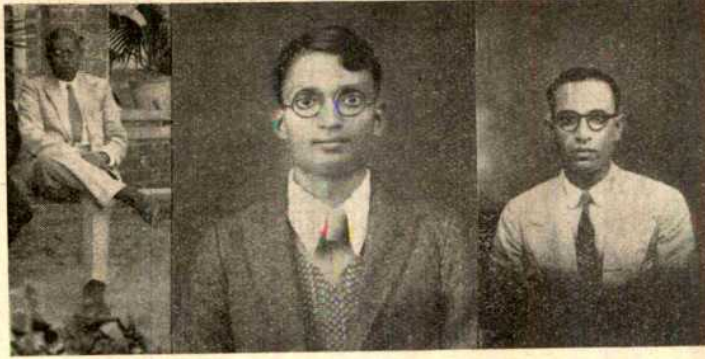
বাঙ্গালীর মূলধন

বাঙ্গালী শ্রমিক

বাঙ্গালী পরিচালনা

বাঙ্গালীর উৎসবে, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের জব্যাদি ব্যবহারই বাঞ্ছনীয়

ঢাকেশ্বরীর সূতা, শাড়ী, ধুতি
সুবিখ্যাত ও সমাদৃত



সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীশুপ্রসন্ন সেন

শ্রীগিরিজানাথ সেন

যুক্ত-প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল রায় শ্রীশুরেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বাহাদুর মহাশয় সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ডাকবিভাগের অস্বাভাবিক মহাসভার অবিরোধন উপলক্ষে মিশরে তিনি ভারতসরকারের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিয়াছিলেন। স্বীয় কার্যদক্ষতায় তিনি এই উচ্চপদের অধিকারী হইয়াছিলেন।

জার্মেনীর ডয়টশে অ্যাকাডেমি হইতে আন্তোব-মুখোপাধ্যায়-বৃত্তিপ্রাপ্ত শ্রীশুপ্রসন্ন সেন এম-এসসি ঢাকা-বিদ্যবিদ্যালয়ের পূর্বতন ছাত্র। তিনি ভারতীয় আবহতত্ত্ববিভাগে এক জন প্রধান পর্যবেক্ষক ছিলেন।

ডাঃ গিরিজানাথ সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত ১৯৩২ সালে এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৩৪ সালে উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ বিদেশ গমন করেন এবং এল-আর-সি-পি ও এম-আর-সি-এস উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি এক-আর-সি-এস উপাধিও লাভ করিয়াছেন। ডাঃ সেন জয়পুর-প্রবাসী সংসারচন্দ্র সেন সি-আই-ই এম-ডি-ও মহাশয়ের পৌত্র ও অবিনাশচন্দ্র সেন সি-আই-ই মহাশয়ের পুত্র।

আসন্ন শীতের আকাজক্ষিত প্রসাধন

ক্যালকেমিকোর

লা-ই-জু

প্রকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত লাইম-জ্যুস মিশ্রিত



খেলো
মত
সাবান

জিনিসের
তেলে
ভাসে না!

— লা-ই-জু —

কেশ প্রসাধনে—

... .. চুলের স্বাভাবিক বর্ণ
রক্ষা করে।

... .. কেশের পারিপাট্য
সাধন করে।

... .. কুস্তল কবরী ও
বেণীর শ্রীবৃদ্ধি করে।

— লা-ই-জু —

সাধারণ প্রসাধনে—

... .. মুখে মাথলে মুখমণ্ডল
কোমল ও মৃদু রাখে।

... .. হাতে পায়ে মাথলে
হাত পা ফাটে না।

... .. ক র্ক শ কে শ পা শ
কমনীয় করে তোলে!

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বালিগঞ্জ :: কলিকাতা

পরলোকে প্রবাসী বাঙালী

টাটা আররণ ও ষ্টীল ওয়ার্কসের ভূতপূর্ব প্রধান ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ঘোষ-মহাশয় বহু ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সদস্য ও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই পৌষ (ইংরাজী ১৭শে, ২৮শে, ২৯শে ডিসেম্বর) রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন হইবে।

নিম্নলিখিত মনীষিগণ বিভিন্ন বিভাগের সভাপতির আদান অলঙ্কৃত করিবেন :— মূল ও সাহিত্য—রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডি.লিট। শিক্ষা-পাঠাগার ও সাংবাদিক—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী ও মর্ডার রিভিউর সম্পাদক। ইতিহাস, বৃত্তান্ত বঙ্গ ও নৃত্য—শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (লক্ষে) বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (লক্ষে) বিশ্ববিদ্যালয়।

সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু (বারাণসী)। মহিলা বিভাগ—শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী। বিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র (সাম্বলস কলেজ কলিকাতা)। দর্শন—ডাঃ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মোহন দত্ত (পাটনা কলেজ) শিল্প—(নাম পরে বিজ্ঞাপিত হইবে)।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রবাসী এবং মাতৃভূমির বাঙালীজগৎ

একটা মহামিলনের ক্ষেত্র। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রত্যেক বাঙালীর গুণাগুণ প্রাণীকৃত। প্রত্যেককে পৃথক পত্র দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া অর্থ্যনা সমিতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলার ও বাংলার বাহিরের প্রত্যেক বাঙালীকে রাঁচি অবিবেশনে যোগ দিবার জ্ঞাত আমন্ত্রণ করিতেছেন। সম্মেলনের প্রাথমিকভাবে প্রতিনিধিগণের চাঁদা পাঁচ টাকা ধার্য হইয়াছে। ছাত্র-প্রতিনিধিগণের চাঁদা তিন টাকা মাত্র। প্রতিনিধিগণের বাসস্থান ও আহাৰাদির ব্যবস্থা স্থানীয় অর্থ্যনা সমিতি করিবেন। মহিলা প্রতিনিধিগণকে কোন চাঁদা দিতে হইবে না। প্রতিনিধিগণ বিছানা প্রভৃতি সঙ্গে আনিবেন। প্রতিনিধিগণের নাম ঠিকানা ও দেয় চাঁদা যত শীঘ্র সম্ভব সম্মেলনের কার্যালয়ে পাঠান প্রয়োজন।

সম্মেলনে পঠনীয় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং প্রবাসী বাঙালীগণের হিতকর প্রস্তাবাদি আগামী ৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে সম্মেলনের কার্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক আলোচনা বা আলোচনা সম্মেলনের উদ্দেশ্য বহির্ভূত।

যথা সময়ে সংবাদ পাইলে প্রতিনিধিদের সযত্নে রেল বা বাস স্টেশনে প্রেরণাসেবকরণ উপস্থিত থাকিবেন। প্রতিনিধিগণ যে ট্রেনে বা বাসে রাঁচি পৌঁছিবেন তাহা অর্থ্যনা সমিতির কার্যালয়ে জ্ঞাপন করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সম্মেলন সংক্রান্ত আর কিছু তথ্য জানিতে হইলে অর্থ্যনা সমিতির কার্যালয়ে পত্র লিখিতে হইবে। ইতি—

শ্রীকালীশরণ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

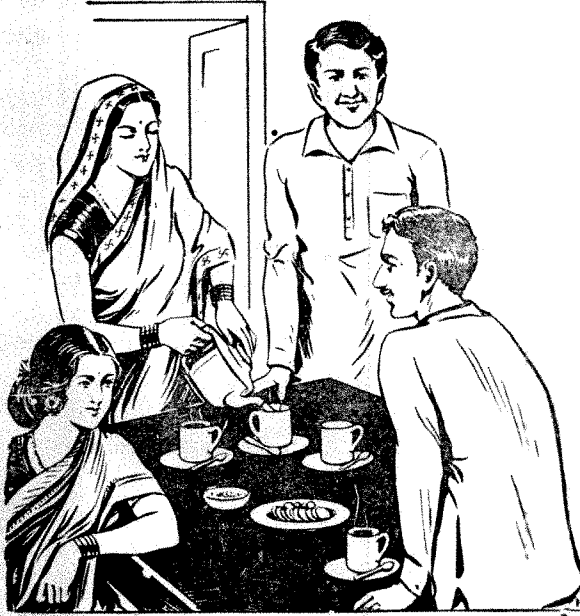
স্বাস্থ্যের নিত্য বন্ধু—সর্বদা কাছে রাখিবেন

- ১। অমৃতবিন্দু—ফোঁটাকয়েক সেবনে পেটের ব্যথা ভাল করে, জ্বাণে সর্দি সারে ও মালিশে বেদনা দূর করে।
- ২। বালকামৃত—শিশুদের পেট ব্যথা, বদহজম ইত্যাদি সর্ববিধ পেটের রোগে একমাত্র বন্ধু।
- ৩। ক্যাকাস্প—“সানলেট” সেবনে মাথাধরা, মাথাব্যথা, গা-হাত-পা কামড়ান প্রভৃতি যাবতীয় বেদনা দূর করে।
- ৪। ক্লোরাজল—রোগবীজনাশক ও দুর্গন্ধ নিবারক, পানীয় জল শোধক আশ্চর্য ঔষধ।
- ৫। ডারমশ—কাটা, হাজা পোড়া ইত্যাদি ঘায়ে ও চর্মরোগে উত্তীর্ণ অব্যর্থ মলম।
- ৬। ফেব্রোকুইন—(“সানলেট” বটিকা) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্বর নাশ করিতে অদ্বিতীয়।
- ৭। পেনোবাম—সর্বপ্রকার আঘাত ও বাত জনিত বেদনানাশক আশ্চর্য মলম।
- ৮। সেলিকুইন—(“সানলেট”) ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিশোধক, সর্দিজ্বর উচ্ছেদক বটিকা।
- ৯। সান-ল্যাক্স—চকলেট-মিশ্রিত ও স্বচ্ছ বৃহৎ বিরেকক বটিকা; শিশুরাও সহজে ব্যবহার করেন।
- ১০। টাইকোমিট—(“সানলেট”) পেট-কামড়ানি, বদহজম, ইত্যাদি পেটের রোগে আশ্চর্য মলম।

Sun Chemical Works

54, EZRA STREET, POST BAG NO. 2,
CALCUTTA

আপনার অধিকার — আপনার গৌরব



নিজের সংসারে আদর্শ গৃহিনী হওয়া সহজ কথা নয়। খুঁটি নাটি সাত সত্তেরো এত সব কাজ গৃহকর্ত্রীকে করতে হয়, পুরুষদের কাছে যার জ্ঞান কোনো বাহবা পাওয়া যায় না;—পুরুষদের সে সব চোখেই পড়ে না। কিন্তু সবাই জানে যে সংসারে এমন অনেক কাজ আছে, যা করা বিশেষ করে মেয়েদেরই গর্বের বিষয়। তার মধ্যে প্রধান হল চাষের নিত্যকার অল্পটান—মেয়েরাই যার অধিষ্ঠাত্রী। বৃষ্টিমতী মেয়েরা তাই বাড়ীর লোকেরদের সেই ‘আনন্দের পাত্র’টি বিতরণ করতে সব সময়ই সচেষ্ট।

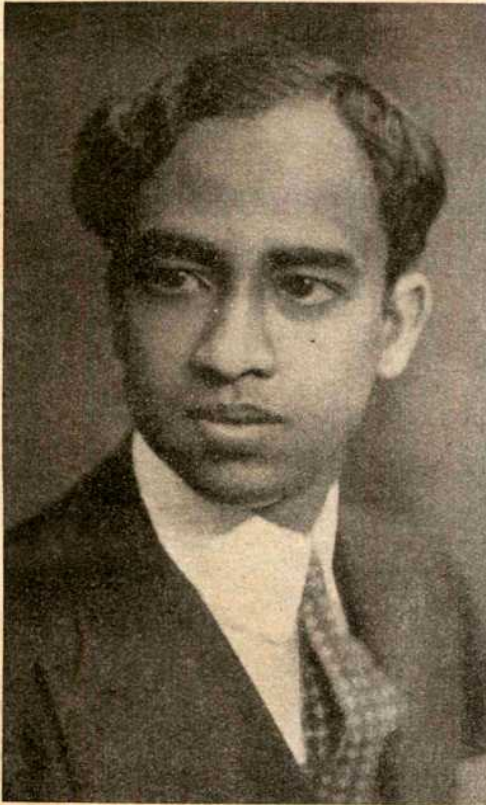
এই স্বাস্থ্যকর পানীয় সংসারে শান্তি ও আনন্দ নিয়ে আসে।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



টাক্কা জল কোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্ত এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি যোগান।

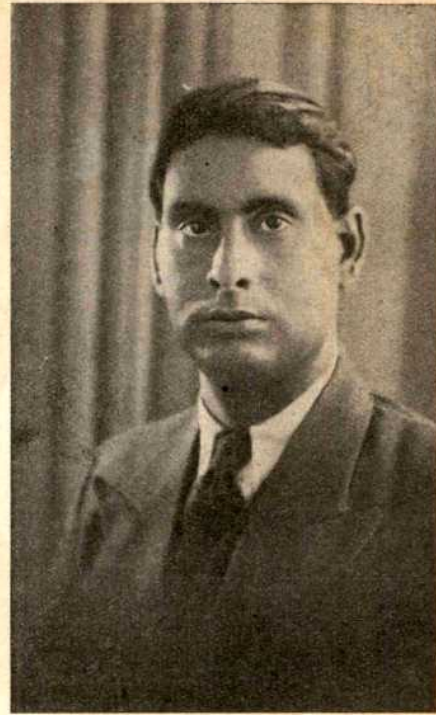
দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা



শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নন্দী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিলাভ করিয়া ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড গমন করেন। ম্যাক্লেট্টার ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ডক্টর কেনার, এফ-আর-এম-এর অধীনে ভারতীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ১৯৩৪ সালে পিএইচ-ডি উপাধিলাভ করেন। অতঃপর ১৯৩৫ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ডক্টর রবিন্সন, এফ-আর-এম-এর অধীনে ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ চক্রবর্তী কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষাসমাপনান্তে বেঙ্গল কেমিকালের বায়োকেমিক্যাল লেবরেটরীতে ভাইটামিন সম্বন্ধে গবেষণায় ব্রতী হন। তৎপর তিনি জার্মানী গিয়া গটসেন বিশ্ববিদ্যালয়



শ্রীপূর্ণেন্দুনাথ চক্রবর্তী

হইতে রসায়নশাস্ত্রে পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবিভাগে গবেষক ও অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

দেওঘরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণশতবার্ষিকী উৎসব

গত ২৯শে অক্টোবর হইতে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত দেওঘরে স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে সপ্তশতী হোম, শোভাযাত্রা, ছাত্রপণের নানাবিধ ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদি প্রদর্শন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক “ভারতীয় ধর্মের ক্রম অভ্যুত্থান” নামক ছায়াচিত্র যোগে বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উৎসবের শেষ দিনে প্রায় দুই হাজার দরিদ্রনারায়ণের অন্নাদির দ্বারা সেবা করিয়া উৎসবের কার্য সমাপ্ত হয়।

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিকের প্রবাসীতে “সংস্কৃত সাহিত্যের পাখী ও তাহার নামতালিকা” প্রবন্ধে ২০ পৃষ্ঠায় বামস্তম্ভের তৃতীয় লাইনে “প্রকৃতপক্ষে হলান্থে ‘অটি’ শব্দ পাওয়া যায়, ‘অটি’ নহে” স্থলে “প্রকৃতপক্ষে হলান্থে ‘অটি’ শব্দ পাওয়া যায়, ‘অটি’ নহে” হইবে।

গত কার্তিকমাসের প্রবাসীর ১৭৬ পৃষ্ঠায় “প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সংঘলন : চতুর্দশ অবিবেশন” শীর্ষক বিবরণীতে সঙ্গীত-বিভাগের

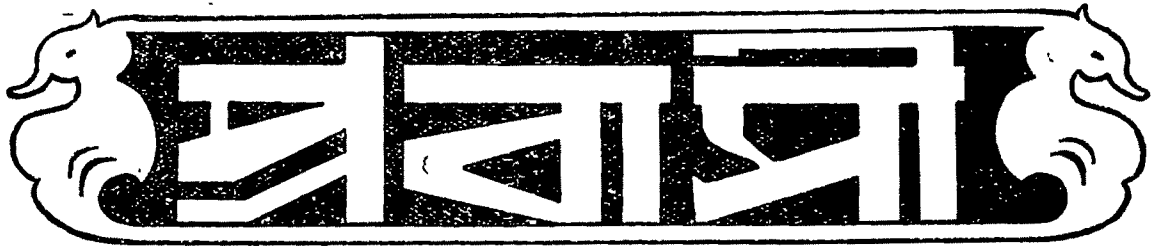
সভাপতির নাম ভুলক্রমে শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ নামটি শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসু হইবে।

গত মাসে বোয়েনোন আইরাসে পি এন্ কংগ্রেসের বৃত্তান্ত প্রদান উপলক্ষে উদ্ধৃত কয়েকটি বাক্যকে আমরা স্পেনিশ লিখিয়াছিলাম। অধ্যাপক ডক্টর স্বরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন, তাহা পোচু পীজ। এই ভ্রম সংশোধনের জন্য আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞ।



কুণাল ও কাঞ্চন
শ্রীচিন্তামণি কর

প্রবালী প্রেস, কলিকাতা



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”
“নাম্মাস্মা ত্বেহীনেন লভ্যঃ”

৩৬শ ভাগ }
২য় খণ্ড }

পৌষ, ১৩৪৩

{ ৩য় সংখ্যা

ভাইদ্বিতীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকলের শেষ ভাই

সাত্ত ভাই চম্পার

পথ চেয়ে বসেছিল

দৈত্যকম্পার।

মনে মনে বিধি মনে

কবেছিল মন্ত্রণ

যেন ভাইদ্বিতীয়

পাশ্বে সে নিমন্ত্রণ।

যদি জোটে দরদী

ছোটো-দি বা বড়ো-দি

অথবা মধুরা কেউ

নাগ্নীর rank-এ,

উঠিবে অনন্দিয়া,

দেহ প্রাণ মন দিয়া

ভাগ্যেরে বন্দিবে

সাহস্রাদে thank-এ।

এল তিথি দ্বিতীয়া,
 ভাই গেল ত্রিতীয়া,
 ধরিল পাক্ক-দিদি
 হাতা বেড়ি খুস্তি,
 নিরাসিষে আমিষে
 রেঁষে, গেল ঘামি' সে,
 বুড়ি ভ'রে জমা হ'ল
 ভোজ্য অগুস্তি ।

বড়ে খালা কাংসের
 মৎস্য ও মাংসের
 কানার কানার বোঝা
 হস্বে গেল পূর্ণ ।

সুজ্ঞান পোলায়ে
 প্রাণ দিল দোলায়ে,
 লোভের প্রবল স্রোতে
 লেগে গেল ঘূর্ণো ।

জমে গেল জনতা,
 মহা তার ঘনতা,
 ভাই-ভাগ্যের সবে
 হ'তে চায় অংশী ।

নিদারুণ সংশয়
 মনটারে দংশয়
 বহু ভাগে দেয় পাছে
 মোর ভাগ ধ্বংসি' ।

চাখ বেখে ঘণ্টে
 অতি মিঠে কণ্ঠে
 কেহ বলে, দিদি মোর,
 কেহ বলে,—বোন গো,

দেশেতে না থাক্ যশ,
 কলমে না থাক্ রস,

রসনা তো রন বোঝে
করিয়ো স্মরণ গো।

নিদিটির হাঙ্গ
করিল ঐ ভাষ্য

পক্ষপাতের তাহে
লক্ষ্যে দিল লক্ষণ,

ভয় হ'ল মিথ্যে,
আশা হ'ল চিন্তে,

নির্ভাবনায় বসে
ব'রলাম ভক্ষণ।

লিখেছি কবিতা
সূরে ত'ল শোভিতা—

এই দেশে সে দেশ
বঁচতে ও মরতে।

ভেবেছি তখনি
এ কি হচ্ছে বকুনি ?

আজ ত'র মশটা
নেরেছি যে ধরতে।

যদি জন্মান্তরে
এ দেশেই টান ধরে

ভাইরূপে আন বার
আনে যেন দৈব,

হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন,
স্বাধর্মি চন্দন

ভগ্নী হবার নয়
নৈবচ নৈব।

আসি যদি ভাই হয়ে,
হা রয়েছি তাই হয়ে,

সোরমোল পুড় যাবে
হলু আর শঙ্খে,

জুটে যাবে বুড়িরা
 গিসি মাসি খুড়িরা
 ধুতি তার সন্দেশ
 দেবে লোকজনকে ।

বোন্টার ধ'রে চুল
 টেনে তার দেব ছল,
 খেলার পুতুল তার
 পায়ে দেব দলিয়া ।

শোভ তার কে থামায়,
 চুমো দেবে মা আমায়,
 রান্ধুসি বলে তার
 কান দেবে মলিয়া ।

বড়ো হ'লে, নেব তার
 পদখানি দেবতার,
 দাদা নাম বলতেই
 আশি হবে সিক্ত ।

ভাইটি অমূল্য,
 নাই তার তুল্য,
 সংসারে বোনটি
 নেহাৎ অতিরিক্ত ॥

ভাইবিত্তীরা

১৩৪৩



বাংলা বানান

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধ্বনিসঙ্গত বানান এক আছে সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায়। আর কোন ভাষায় আছে কিছ ছিল কি না জানি নে। ইংরেজি ভাষায় যে নেই অনেক দুঃখে তার আমরা পরিচয় পেয়েছি। আজও তাব এলেকায় ক্ষণে ক্ষণে কলম ছুঁচট খেয়ে ধমকে যায়। বাংলা ভাষা গন্ধ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে, কিন্তু ধ্বনিটা তার স্বকীয়। ধ্বনিবিকারেই অপভ্রংশের উৎপত্তি। বানানের জোয়ারই বাংলা আপন অপভ্রংশ চাপা দিতে চায়। এই কারণে বাংলা ভাষার অধিকাংশ বানানই নিজের ধ্বনিবিরোধী ভুল বানান। আভিজাত্যের ভান করে বানান আপন স্বর্গ লঙ্ঘনের চেষ্টা করাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সেটা পরম দুঃস্বপ্ন হয়েছে। যে রাস্তা রেল-পাড়া রাস্তা, তার উপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় যদি বুক ফুলিয়ে জেদ করে বলি আমার গোরুর গাড়িটা রেলগাড়িই, তা হলে পথযাত্রাটা অচল না হতে পারে, কিন্তু স্থবিধাজনক হয় না। শিশুদের পড়ানোয় ষাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন বহুলা পাঠশিক্ষার প্রবেশ-পথ কি রকম দুর্গম। এক বানের রাস্তায় আর-এক বানকে চালাবার দুশ্চেষ্টাবশত সেটা ঘটেছে। বাঙালী শিশুপালের দুঃখ নিবৃত্তি চিন্তায় অনেকবার কোনো এক জন বানান-সংস্কারক কেমাল পাশার অভ্যুদয় কামনা করেছি। দূরে যাবারই বা দরকার কি, সেকালের প্রাকৃত ভাষাব কাত্যায়নকে পেলেও চলে যেত।

একদা সংস্কৃত পণ্ডিতেরা প্রাকৃতজ্ঞদের বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছিলেন। সেই অবজ্ঞার অপবান দুঃখ আজও দেশের লোকেব মনের মধ্যে রয়ে গেছে। আমাদের সাহিত্যভাষার বানানে তার পরিচয় পাই। বাংলা ভাষাকে যে হরিজন পঙ্ক্তিতে বসানো চলে না তার প্রমাণ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক কুলজির থেকেই আহরণ করা যথেষ্ট হয় নি। বর্ণপ্রলেপের যোগে সর্বত্র প্রমাণ করে দেবার চেষ্টা ক্রমাগতই চলেছে। ইংরেজ ও বাঙালী মূলত

একই আৰ্যবংশোদ্ভব বলে হারা কথষ্টে সাঙ্ঘনা পান নি তাঁরা হাটকোট পাবে যথাসম্ভব সাক্ষ্য বৈষম্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছেন এমন উদাহরণ আমাদের দেশে ছলভ নয়। বাংলা সাহিত্যের বানানে সেই চাক্ষুষ ভেদ ঘোচাবার চেষ্টা যে প্রবল তার হস্তকর দৃষ্টান্ত দেখা যায় সম্ভ্রান্তি কানপুর শব্দে মূর্দ্ধণ্য গবেষ আবোপ স্কে। ভষ হচ্ছে কখন কানাই-এর মাথায় মূর্দ্ধণ্য গ সঙ্কিনেব খোঁচা মারে।

বাংলা ভাষা উচ্চারণকালে সংস্কৃতের সঙ্গে তার ধ্বনির ভেদ ঘোচানো অসম্ভব কিন্তু লেখকর সময় অক্ষরের মধ্যে চোখের ভেদ ঘোচানো সহজ। অর্থাৎ লিখব এক পড়ব আর, বাল্যকাল থেকে দণ্ডপ্রয়োগের জোরে এই কুচ্ছসাধন সাহিত্যিক সমাজপতিরা অনান্যসাই চালাতে পেরেছেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সংস্কৃত জ্ঞানভেদ এই সংবাদটা ঘোষণা কববার জন্তে তাঁদের চিঠিপত্র প্রভৃতিতে বাংলা শব্দে বানানের বিপর্যয় ঘটানো আবশ্যক বোধ করেন নি। কেবল যত গল্প নর হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার ব্যবহার সম্বন্ধেও তাঁরা মাতৃভাষার কৌলীজ লক্ষণ সাবধানে বজায় রাখতেন না। আমরা বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের দাবী করে থাকি কৃত্রিম মলিলের জোরে। বাংলায় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ-বিকার ঘটে নি এমন দৃষ্টান্ত অত্যন্ত ছলভ। “জল” বা “ফল”, “সৌন্দর্য” বা “অরুণ” যে তৎসম গন্ধ সেটা কেবল অক্ষর সাজানো থেকেই চোখে ঠেকে, ওটা কিন্তু বাঙালীব হাটকোটপরা সাহেবিরই সমতুল্য।

উচ্চারণের বৈষম্য সম্বন্ধে শব্দের পুরাতত্ত্ববর্তিত প্রমাণ রক্ষা করা বানানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এমন কথা অনেকে বলেন। আধুনিক ক্ষাত্রবংশীয়রা ক্ষাত্রধর্ম ত্যাগ করেছে তবু দেহাবরণে ক্ষাত্রইতিহাস রক্ষাব জন্তে বর্ম পুরে বেড়ানো তাদের কর্তব্য এ উপদেশ নিশ্চয়ই পালনীয় নয়। দেহাবরণে বর্তমান ইতিহাসকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ইতিহাসকেই বহন করতে চেষ্টা করার দ্বারা অল্পপযোগিতাকে

সর্বদা প্রশ্ন দেওয়া হয়। কিন্তু এ সকল তর্ক সঙ্গত হোক অসঙ্গত হোক কোনো কাজে লাগবে না। কৃত্রিম বানান একবার চ'লে গেলে তার পরে আচারের দোহাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওঠে। যাকে আমরা সাধুভাষা ব'লে থাকি সেই ভাষার বানান একেবারে পাকা হবে গেছে। কেবল দস্তান-য়ের স্থলে মূর্দ্ধণ্য-এ-য়ের প্রভাব একটা আকস্মিক ও আধুনিক সংক্রামকতারূপে দেখা দিয়েছে। বিহবিদ্যালয় সেটোরও মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন, এখন থেকে কর্ণওয়ালিসের কর্ণে মূর্দ্ধণ্য-এ-য়ের খোঁচা নিষিদ্ধ।

প্রাকৃত বাংলা আমাদের সাহিত্যে অল্প দিন হ'ল অধিকার বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে। তার বানান এখনো আছে কাঁচা। এখনি ঠিক করবার সময়, এর বানান উচ্চারণ-যেঁসা হবে, অথবা হবে সংস্কৃত অভিধান যেঁসা।

যেমনি হোক, কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটা কোনো আদর্শ স্থির ক'রে দেওয়া দরকার। তাব পরে বিনা বিতর্কে সেটাকে গ্রহণ ক'বে স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারবে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সে কাজ ক'রে দিয়েছেন—ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় ব্যাপারটাকে অনিশ্চিত ক'রে রাখা অনাবশ্যক।

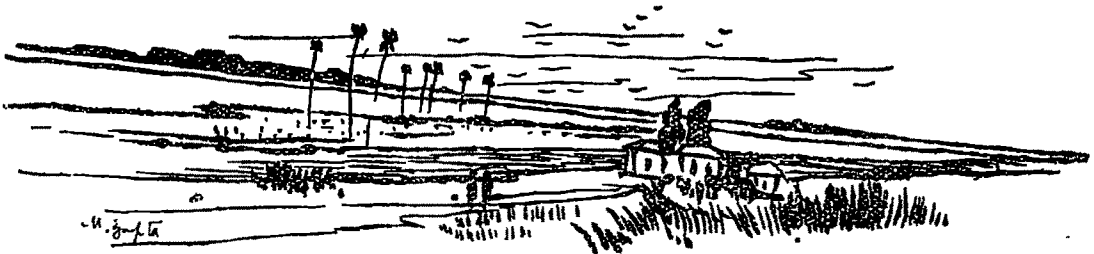
বাংলা ক্রিয়াপদে য-র যোগে স্বরবর্ণ প্রয়োগ প্রচলিত হবে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধিসভা কোথাও বা য রক্ষা করেছেন কোথাও বা করেন নি। সে স্থলে সর্বত্রই য-রক্ষার আমি পক্ষপাতী এই কথা আমি জানিয়েছিলাম। আমার মতে এক্ষেত্রে বানানভেদের প্রয়োজন নেই বলেছি বটে, কিন্তু বিদ্রোহ করতে চাই নে। যেটা স্থির হয়েছে সেটাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি তবু চিরাভ্যাসকে বর্জন করবার পূর্বে তার তবক্ষেব আবেদন জানাবার বোঁক সামলাতে পাবি নি। এইবাব কথাটাকে শেষ ক'রে দেব।

ই-কারের পরে যখন কোনো স্বরবর্ণের আগম হয় তখন উভয়ে মিলে য ধ্বনির উদ্ভব হয় এটা জানা কথা। সেই নিয়ম অনুসারে একদা খায়া পায়া প্রভৃতি বানান প্রচলিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই কেতাবী সাধু-বাংলায় হইষা করিয়া প্রভৃতি বানানের উৎপত্তি। ওটা অনবধানবশত হয় নি এইটে আমার বক্তব্য।

হয় ক্রিয়াপদে হঅ বানান চলে নি। এখানে হয়-এর “য়” একটি লুপ্ত এ-কাব বহন করছে। ব্যাকবণ বিধি অনুসারে হএ বানান চলতে পারত। চলে নি যে, তার কারণ বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে শব্দের শেষবর্ণ যদি স্বরবর্ণ হয় তবে দীর্ঘস্বব হ'লেও তার উচ্চারণ হ্রস্ব হয়। হ্রস্ব এ এবং য-র উচ্চারণে ভেদ নেই। এই অন্ত্য এ স্বরবর্ণের উচ্চারণকে যদি দীর্ঘ করতে হ'ত তাহ'লে য যোগ করা অনিবার্য হ'ত। তাহ'লে লিখতে হ'ত হয়ে, হএ লিখে হয়ে উচ্চারণ চলে না।

তেমনি থাও শব্দের ও হ্রস্বস্বর, কিন্তু থেও শব্দের ও হ্রস্ব নয়—সেই জন্তে দীর্ঘ ওকারের আশ্রয় স্বরূপে য-র প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এ তর্কও অবাস্তব। আসল কথাটা এই যে ই-কারের পরবর্তী স্বরবর্ণের যোগে য-র উদ্ভব স্বরসন্ধিব নিয়মাহুয়ারী। বেআইন বেআড়া বেআক্কেল বানান সঙ্গত কারণ এ-কাবের সঙ্গে অন্ত্য স্বরবর্ণের মিলনে ঘটক দরকার করে না। বানান অনুসারে থেও এবং থেয়ো উচ্চারণের ভেদ নেই এ কথা মানা শক্ত। এখানে মনে রাখা দরকার থেয়ো (থাইয়ো) শব্দের মাঝখানে একটা লুপ্ত ই-কার আছে। কিন্তু উচ্চারণে তার প্রভাব লুপ্ত হয় নি। লুপ্ত ই-কার অন্তর্য ও উচ্চারণ-মহলে আপন প্রভাব রক্ষা ক'রে থাকে সে কথার আলোচনা আমার বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে পূর্বেই করেছি।



তারানাথ ভাট্টিকের গল্প

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরানো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে এখানে কি? চল চল, জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় স্ত্রী।

হাত দেখানোব ঝোক চিরকাল আছে। সন্জিকার ভাল জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ীর গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতির্বিদ্যোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়।

গ্রহশাস্তির কবচ তত্ত্বোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আস্থন ও দেখিয়া বিচার করুন।

বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ী।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ী?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মশায় বাড়ী আসছেন?

ভিতর হইতে খানিক ক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তার পর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিক ক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য জ্ঞানিয়া সে আবার বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ তাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা ত্বেচ্ছি, তোমার জ্যোতিষী পাণ্ডনাদ্বারের ভয়ে দিনরাত দাজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে আত্মর পাণ্ডনাদ্বার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে নাবে। আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তত্তপোষের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেসিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রশ্ন কবিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশী হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের ক্লুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধৃষ্টতা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নীচের চোয়ালের গড়ন বৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড় ও উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আঙ্গুপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশী। আর ইহাব চোখের কোণেব কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ বর্তটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এমন তাহার যেন অনেকখানিই হান-হিয়া গিয়াছে, এই ধরণেব একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্ট মনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-এ সাতাশ সাল, ঐ পনরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে

ত হয় না; আপনার হ'ল কেমন ক'রে, এরকম ভ দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ কবিতা আপনার দিন মনে ছিল এই জন্ত যে আমাব জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তা ব কোন অবকাশ নাই।

তাব পর বৃদ্ধ বলিল—আপনাব দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার জীবন শরীর বর্তমানে বড় খাপ খাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্তবড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটাব কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্ধনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন আগে কলুটোসা স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবাব সময় পাঁচখানা নোটরুদ্ধ মনিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থর্ট-রীজি জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন কবিতা বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাঙ্গা। যাই হোক সাধারণ হাত-দেখা গণকের মত মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্ট কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার সেখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যে যাইতাম তাহা নহ, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুব সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছু দিন তন্ত্রসাধনা করিবার কলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া

করবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাড়াইয়া থাইতে সুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, বোড়দোড়, ফাটকা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ীর ভীড়ে শনিবার সন্ধ্যা তাহার বাড়ীর গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে সুরু কবিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সা দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল, বোড়দোড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনী বহুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ককির সাজিয়াছে, তাবানাথ ত সামান্ত গণ্যকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ বাহা পয়সা করিয়াছিল পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্তৃরের গ্রায় উবিয়া গেল, এনিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারী প্রভৃতি মহৎ গুণবাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চবিত্রে না থাকতে সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। •

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যস্ত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই?

আমার মত গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পবে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। স্ততরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিখা কবে বেখে যাব, লোকে দেখবে তাবানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতেব আঙলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিবে কান জোর কবে চেপে চিৎ হয়ে একমনে শুয়ে থাক। বিহুদিন অভ্যাস করলেই

চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নীচে একটা গাছের তলায় ছুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পবীরা তাই বলে দেবে। ভাল করে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যাস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আব না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথের ঘাটে বড় একটা শোনা ত যাইই না, দৈনন্দিন জীবন খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তাহা ত কোন দিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তাবানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুর্বাতন একখানা তুলোঁট কাগজের পুঁথির পাতা উন্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—চল বেলেঘাটাতে এক জন বড় সাধু এসেছেন। দেখা করে আসি। খুব ভাল তান্ত্রিক শুনেছি। তারানাথের স্বভাবই ভাল সাধু সন্ন্যাসীর সন্ধান কবিতা বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কৰ্ম্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম তিনি আমাকে যে কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম কবিতাই তিনি বলিলেন—পকেটে ক্রমাল আছে? বার করে দেখ।

ক্রমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভর ভর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, ক্রমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাক্ষীর সন্ধান আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধু বাবাজী তান্ত্রিক শক্তির সাহায্যেই আমার ক্রমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর ত বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

কিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ লোকটা নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই কলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই এ পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত কবিতো ত অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে মধ্যে এক জন লোক দূর হইতে আমাব ক্রমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করি—তাহাব পিছনেও ত একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance—এব গোটা সমস্তানই ওব মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্পনটিজম্, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমাব উপর তত ক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যত ক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সামিধ্য হইতে দূরও আমাব উপর যে হিপ্পনটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও ত আর এক গুরুতব সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বড়ীতে গিয়া বসিলাম। তাবানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও ত সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্ন শ্রেণীর তন্ত্র এক ধবংগর যাত্র, যাকে তোম= বলো ব্ল্যাক্ ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও জিনিবেই চর্চা যে না করেছি তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি শুনেলে পরে বিশ্বাস করবে না। এক জনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হুজম করত। কিছুদিন আগে =লকাতায় তোমরাও এ ধরণের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জ্বিতে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধবংগের তন্ত্রচর্চার শক্তি। ব্ল্যাক্ ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নাম-করা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালবাসতেন, আমাদের বাড়ী এনেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রাইই বলতেন—তুই চোখের মাঝখানে ভুকতে একটা জ্যোতি আছে, ভাল বরে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস

দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবিলাম—চন্দ্রদর্শনের মত নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম কি ধরণের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মত। প্রথম এতদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ীর পিছনে পেয়ারাভায়া বসে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘটাখানেক চয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠত না, হুপার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল। নীল, লিক্লিকে একটা শিখা আমার কপালের মাঝখানের ঠিক সামনে, খুব স্থির, মিনিট খানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু সন্ন্যাসী ও ষোণ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়ীতে আর মন টেকে না, ঠাকুরমার বাস্তু ভেঙে এক দিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

এক দিন অহল্যা বাগ্নের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখনও উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে নিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অশ্রুতিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু ত কতই দেখি। রূপ করে আছি, সাধুবাবাজী জল ভরে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হুত্বে আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীরা বাড়ী কোথায়?

আমি বললাম—বঁকুড়া জেলায়, মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তার পর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অস্থমনস্ক হয়ে গেলেন। তার পর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান? আমাদের গ্রামে সান্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থ-পন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ীঘর, দরজায় হাতী বাঁধা থাকতে শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব ধারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্যালের নাম ত কখন শুনি নি। সন্ন্যাসীকে সসন্ময়ে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বচেস আর কতটুকু। তুমি জানবে কি করে। খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে ত?

খেয়াঘাট। রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্ কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবে পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্যাল-বেরই কোন্ পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি করে জানলেন?

বিশ্বয়ের স্বরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা জানেন অনেক দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ-পিতামহের মুখে দেখা যায় তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না। তার পর খুব শান্ত, স্নেহে কোঁতকের স্বরে বললেন—বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ী ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। 'এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন।

বললাম—এমন নির্ভর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—গুর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস নি, ছাড়তে পারবিও নি। তুই ছেলেমানুষ, নিকোঁধ। কিছু বোঝবার বয়স হয় নি। যা বাড়ী যা। মা বাগের মনে কষ্ট দিস নে।

কথা শেষ করে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূর গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছি?—

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি স্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন

লাভ হবে না। তোকে সঙ্গার করতেই হবে। তোর সান্না
নেই অস্ত্র পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ
করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আব সাহস করলুম না তাঁর অঙ্গসরণ করতে, কি একটা
শক্তি আমার ইচ্ছা সঙ্গেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে
আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে
চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গতির
মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলে নিই, অনেক দিন পবে বাড়ী ফিরে এসে
দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ
সাম্যালের কোন হৃদিস মেলাতে পারলাম না। সাম্যালের
বাড়ীর ছেলেছোকরার দল ত কিছুই বলতে পারে না।
ওদের এক সরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন,
তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ী এলেন। কথায়
কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ,
আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা
খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা
ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব সখ ছিল, অনেক নষ্ট
করে নানা জায়গায় ইঁটা ইঁটা করে বংশের কুলজী নোগড়
করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে
আমাদেরই বংশে রামরূপ সাম্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির
প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ
করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি
বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড়ভাই ছিলেন
রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি
সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি।
অন্ততঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে
বেখান্না জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহুত নদী ছিল। খুব প্রবাহিত
ছিল। বড় বড় কিস্তী চলতো। কোন্ নৌকা একবার সেই
মন্দিরের নীচের ঘাটে মারা পড়ে বলে ওর নাম লা-ভাড়ার
খেয়াঘাট।

প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—ই,

জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া
আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত
হয়েছিল লা-ভাড়ার খেয়াঘাটের ওপরে। কেন বল ত,
এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হল? বইটাই
লিখছি না কি?

ওদেব কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ়
বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে কাশীর সেই
সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি সন্ন্যাসী নিজেই। কোন
অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে
আছেন।

বাড়ী থেকে কিছুদিন পবে আবার সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধান
বেরই। বীবভূমের এক গ্রামে সুনাম সেখানকার শ্রমানে
এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী।
পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারের শ্রমানে। ছেঁড়া
একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, নেমন মথলা কাপড়চোপড়
পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো হল। আমাকে দেখেই
সে গেল মহা চটে। বললে—নৈরো এখান থেকে, কে
বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওব আলুখালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে
ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—
মা, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন, অনেক দূর থেকে
এসেছি, দয়া করুন আমার ওপরে। পাগলী টেচিয়ে
উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি—

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্রমানে, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি
মারবে টারবে নাকি—পাগল মাছুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন
চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পর দিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ দূর হ, নৈরো এখান থেকে—

তার পবে রেগে আমার মারলে এক লাথি। বললে—
ফের যদি আসিস, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই,
আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পালাষ পড়ে প্রাণটা
যাবে দেখছি কোনদিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মুহূ হাসি-হাসি মুখ, আমার যেন বলছে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাগ যাস আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্নটপ্প সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমুষ্টি হয়ে আশানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হবোছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই ত আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ড চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে আমি বুঝলাম তখনই সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক আমাব মনে হ'ল ভেতবে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘবের কর্তার মত—তার সে হকুম পালন না ক'রে যেন উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে এসে বিরক্ত করিস বল ত? তোব ঘাবা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সমস্যাে এখনও পূর্বো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিল, তার ওপর আবার বাঘুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার। বল্ কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্তে বড় বৌতুল হ'ল। এর আগে লোকেব মুখে শুনে এসেছি সাধুন্যাসীরা যা চাওয়া যায় এনে দিতে পাবে। কলকাতার গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য বলে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য

ব্যাপার করলে। আশানের কতকগুলো পোড়াকলা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিবে বললে—এই নে খা ক্ষীরের বরফি—

আমি ত অবাক। ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মত খিল্ খিল্ ক'রে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমাব মনে হ'ল এ ত দেখছি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কলা মুখে দেব—হিঃ হিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ক্ষেববার পথ নেই, অনেক দূব এগিয়েছি। দিলাম সেই কলা মুখে পূবে, যা থাকে কপালে। পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিশ্বাস ভিতাব কলার টুকরো মুখ থেকে বার ক'বে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

রাগে দুঃখে আমাব চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বন্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েচে।

পাগলী হাসি খামিয়ে বিজ্রপের স্বরে বললে—খেলি রাবড়ি মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্তে এসেই আশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূব হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না বলে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষরাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার বিছানায় শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস নে। আসিস আজ, রাগ করে না হিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

য'হোক, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় বাছ করলে না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মুষ্টি ভারী প্রসন্ন। বললে—আবার এসেছিল দেখছি। আচ্ছা নাছোড়-বান্দা ত তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে?

দিনে অপমান করে বিদেয় করে আবার রাত্রে গিয়ে আনতে বল। এ রকম হয়রান করে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক ম বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখছি না পরীক্ষা ক'বে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমার তুই মেয়ে ফেল গলা টিপে মেয়ে ফেল। তাব পর আমার মৃতদেহের ওপর বসে তোকে সাধনা কবতে হবে। নিয়ম বলে দেব বাজাব থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চন্দ্র-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ কবে ঝিকি চীংকার করে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক টোক মন আর দুটো চালভাজা দিবি। ভোর-বাত পর্যন্ত এমনি মড়াব ওপব বসে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেই মাহুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'বে না। ভয় পেলে সমস্ত ত নিখা হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হাবাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কপ শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিছু মাহুষ খুন করা আমার দিয়ে হবে না। আর তুমিই না আমার জন্তে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিনি কেন মুখপোড়া, বেরো দূর হ—

আবও নানা বকম অলীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—বাগ করছ কেন। একটা মাহুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত করে ভেড়িয়ে বললে—ভদ্র লোকের ছেলে। ভদ্র লোকের ছেলে তবে এপল এসেছিস কেন বেও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্র সাধনা ভদ্র লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কটমিষ্ট চাদর পরে হোসে চাকুবি কর গিয়ে—বেবো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিশের হাঙ্গামা কথাটা ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বন্ধ উদ্ভাদ। এব কাছে এসে শুধু এত দিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আব কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে ওকে বিদুষী বলে সন্দেহ হয়।

সেই দিন থেকে কিন্তু পাগলী আমার ওপব প্রসন্ন হ'ল বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আব জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেল গালাগাল দিয়েছি কিছু মনে করিস নে। ভালই হয়েছে। তুই সাধনা কবতে চাস নি। ও সব নিয় তন্ত্রের সাধনা ওতে মাহুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মাহুষ ম'রে বেহুশ হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আবও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মাহুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশী। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মাহুষ ছিল না, মাহুষ মরে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ষকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভাল-মন্দ দুই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন তা বলা যায় এবা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করা বিপদ আছে। অসাধন তুমি যদি হয়েছ তোমাকে মেয়ে ফেলতে পাবে।

অবাক হয়ে ওব কথা শুনছিলাম। এসব কথা আব কখনও শুনি নি। এব মত পাগলের মুখেই এ-কথা শাঞ্জে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ এক দিকে কতকগুলো শিমূল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতাব কাঠকবলা আব একটা কলসী জলের ধানে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজান্তাবে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও বলে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরণের কথা।

—এক ধরণের অপদেবতা আছে, তাকে তাদের বলে হাঁকিনী। তাবা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মাহুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া বলে পদার্থ নেই তাদের। পুস্তর মত মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশী। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশী হয় ব'লে যাদের বেশী দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভাল, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস নে তাই রাগ করিস।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহলে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মাহুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশী ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেঁসে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আর আমার করবে, যা করবাব তা করেছে। তাব কাছে না গিয়ে থাকবাব শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বললে বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যার পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বট-তলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটা ঘোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই ত! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সন্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই ত! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ঘোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী বয়েছে লুকিয়ে। সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ঘোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে চলে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকাব নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটিব রকম-সকম আমার ভাল ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমার কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস ব'স।

বললাম—তুমি ও-রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমার কোন ভয় দেখিও না। তোমায় যখন মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন তবে। তুই সে-রকম নস। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই

তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। অসনে শিগগির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। তত দিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা বলে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্ শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোন কালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে বনে সাধনা করব একজনাও করি নি। কিন্তু রাজী হলাম। পাগলীও প্রস্তুত। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যাব কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন সন্ধ্যায় পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকুড়ের মধ্যে একটা ঘোল-সতের বছরের মেয়ে মড়া বেধে আছে। কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়

ও বললে, তোলা মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেবড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি আমার জ্ঞান ছিল না। মড়ার পুরে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেট টেনে তুলে ফেলি।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর বসে তাকে সাধন করতে হবে—ভয় পাবি নে ত? ভয় পেয়েছি কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চীৎকার করে উঠলাম মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ঘোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাৎ নেই।

পাগলী বললে—টেঁচিয়ে মরছিস কেন, ও আপন। আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গায়ে লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে সন্ধ্যা থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অল্পটান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যার পর থেকেই আমি শবেব ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্ধশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমাব বিশ্বাস হয় নি যে এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখে, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। বিজ্ঞান আশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরব, অন্ধকারে চিবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আঁ দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক ত কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক আশানে একা টাটকা মড়ার ওপর বসে সে শেয়ালের ডাকে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউবে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আব একটা ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। হতবাক তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল আশানের নীচে নদীজল থেকে দলে দলে সব বৌ-মাহুঘর উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে গোঁমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় শারো। দলে দলে—একটা ছোটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভাল করে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চার পাশে একটাও বৌ নয়, সব কবুত পাখী, বীবভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মাহুঘর মত।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হ'ল গেল—তাই বল। হরি হরি! পাখী!

চিন্তাটা আমাব সম্পূর্ণ শেষও হয় নি।—পরক্ষণেই আমার চার পাশে মেয়ে। গলায় কারা থলু থলু হেসে উঠল।

হাসির শব্দ আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জন্ম গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখী নয়, সবাই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই এক যোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারিদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে চাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে নিকটে, ভাইনে বাঁধে, অঙ্ককারের মধ্যে সালা সালা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় বোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটে, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়বার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পিছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া করে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমন কঙ্কালগুলো হড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি শুপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহায্য দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ-আশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেবো ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? বা হোক, সব রকম ব্যাপারের জন্তে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শব্দসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ঘোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমার তোমাব পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের ত শুনেছি অনেক সাধনা করেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি...বললাম—আমাব মহা সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন। আমার জীবন ধন্য হ'ল...মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাভামরী সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি ত জানি নে কোন সাধনা কি রকম। পাগলী আমাব যেমন বলে দিয়েছে, তেমনি কবছি।

—বেশ, মহাভামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'বো না। আমি যখন দেখা দিবেছি, তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাভামরী ভৈরবীকে দেখে নি—অতি বিকট তার চেহারা। তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর করে বললাম—সাধনা কবে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমাব মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পাবলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।...যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাভামরীকে চেন না? আমাবেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যোষ পথের নাম শোন নি তব্বে? পাষাণদলনের জন্তে ওই পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মজ্জে দিব্যোষ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম তবে আমি কি খুবই পাষাণ?

বালিকা খিল খিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্ভ্রাদায় রক্ষার জন্যে...অত ভয় কিসের! আমি না তোকে লাথি মেরেছি? আশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি? তোকে পরীক্ষা না করে কি সাধনার নিয়ম বলে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাভামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এই সময় ধ্বংসবর্ধনের উপর বসে আছি তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

ধ্বংসবর্ধনের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাৎ নেই। একই মুখ, একই রং, একই বস্ত্র।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিল কি? আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ ধরে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখে প্রকাশ করেই বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই আশানের পাগলীও না কি?

একটা বিকট বিজ্ঞপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিত্রে ফেঁড়ে চোচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরককালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্ভাস নৃত্য স্বরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালেব হাড়, কোনটার বুকের পাঞ্জরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হ'ল উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক ঠক শব্দ

হঠাৎ আবাসের এক প্রান্ত ঘন জাঁড়িয়ে গিয়ে গেল কাগজের মত, আর সেই ছিন্নপথে ঘন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মত আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারি পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারিদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মত রাঙা মেঘে ছেয়ে গেল, তার নীচে চিল শকুনি উড়েছে সেই গভীর রাতে। শেয়ালের চীৎকার ও নরককালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকী সব জগৎ নিস্তব্ধ, স্থিতি নিরুপ।

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীট আমার দিকেই ঘন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মত জ্বলন্ত দু-চোখে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিজ্ঞপ মিশ্রিত সে ত্রিভীষণ ক্রুর দৃষ্টি। সে পুতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাল, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশ গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমার নিষ্ঠুর ভাব হজা করতে চায়।

যে শবটার ওপর বসে আছি—সেই শবটা চীৎকার কবে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাতে এমনি হয়—আমায় খুন করে মোঁব ফেলেছে বলে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি! এই আশানে ৫৬ বছর... কাকই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পূবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী বসে মুহু মুহু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে...সেই বটতলায় আমি অব পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিম ঝিম করছে।

বললাম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মত্তজপ ছেড়ে দিলি। দূর ওসব হাঁকিনীদেন মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুমি ষোড়শীকে চেন না, ষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

এবং দেবী ব্রাহ্মরী তু মহাষোড়শী স্বন্দরী।

ক'হাদি সাধনা ছিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতরের সাধনা। তুই তার জানিস কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দেহস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে। আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মত চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না, তার পরেই মনে পড়ল পাগলীর কথাও কি একটা ভাব সঙ্গে ঘন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাব্য ভাল। শেষকালে নে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিলি তিনি মহাভারতী মহাভৈরবী—তুই তাঁর ভেজ সঙ্ক ববুতে পারনি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তার পরে সে হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে—
মুখপোড়া বীদর কোথাকার। উনি দেখা পাবেন ঠিকববীদের।
আমি যাদেব নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদেব
নিষে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেঙ্কি
দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে বসে আছিস
বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায় এখন
যে সাবারাত সাধনা করে আসন ছেড়ে এলি? এই ত
সবে সন্ধ্যা—!

—জ্যা!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক।
সত্যিই তো সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে
পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের
দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙাষ তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল,
ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক,—সব আমার
ভ্রম!

হতভম্বের মত বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর
মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিষে নিচ্ছিলাম। তোর
মধ্যে সে-জিনিষ নেই, তোর কর্ম নয় তত্ত্বের সাধনা। তুই
আর কোন দিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও
আব দেখা পাবি নে।

বললাম—একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি ত
অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেঙ্কি নিয়ে থাক কেন?
উচ্চতত্ত্বের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে দিব না।

বুঝি নে। মহাষোড়শী, মহাভামরী, ত্রিপুরা এঁরা মহাবিদ্যা।
ত্রক্ষশক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—
আমার পূর্বজন্মও এমনি কেটেছে—এ-জন্মও গেল।
গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব
বকে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে
পারবি নে বেশী দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আঙ্গ ৪০ বছরের কথা। আর যাই
নি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোন
দিন।

তখন চিন্তাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমাব মনে
হয় যে পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ
ছিল না সে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্মে পাগল
সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্রাণে মশানে ঘুরে বেড়াত—
তুমি আমি সামান্য মাতৃষে তার কি বুঝব? যাক
নে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে
পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা
ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে
পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস, চিনিয়ে দেব।
দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বহুনি থামিবে না,
যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বাবটা
বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ
বাকী। তারানাথের কথা বিশ্বাস কবিয়াছি কিনা
জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব

বর্ষারাত্রির অন্ধকারে

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

বর্ষারাত্রির সঘন ঝিল্লীরণিত অন্ধকারে
অনেক দিন আগেকার পুরনো কথা মনে পড়ে।
মনে পড়ে—একটি তন্দ্রাজড়িত নিবিড় মিলন-প্রতীক্ষা—
বাইরেব সীমাহীন নির্জনতায় ছুটি প্রাণীর
দুর্লভ মনোবিনিময়ের অবসর।
আজ বর্ষারাত্রির সব কিছুকে ছাপিয়ে

সেই স্নন্দব মুহূর্তগুলি
অনেক দিনের ওপাব থেকে মনের মধ্যে জেগে উঠেছে।
মনে হয়, যা হারিয়ে যায়
তাকে পাওয়ার মত আনন্দ আর কি?
জীবনের সান্নিধ্য বিরহনিশার মধ্যে
এই চকিত বিদ্যুদীপ্তি
একটি সার্থক মিলন-অনুভূতি ঘনিয়ে আনে।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী

শ্রীরমাঃসাদ চন্দ

১৮১৭ সালের প্রথম ভাগে (২৭শে জাহুয়ারী) রামমোহন রায় সপরিবারে লাজুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রত্ননাথ-পুরের নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পাঁচ মাস পরে, জুন মাসের ২৩শে তারিখে, তাঁহার ভাইপো গোবিন্দ-প্রসাদ রায় স্বয়ং বাদী হইয়া এবং খুড়া রামমোহন রায়কে প্রতিবাদী করিয়া স্থগিত কোর্টের একুইটা বিভাগে পাঁচ লক্ষ টাকা তারদাদে একটি মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। বাদী গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষে আর্জি (Bill of Complaint) দাখিল করিয়াছিলেন কোর্সিল (ব্যারিষ্টার) ফার্গুসন সাহেব (R. Cutlar Fergusson) এবং তাঁহার সহকারী ছিলেন এটর্নি স্কট (Wm. Scott) সাহেব। গোবিন্দপ্রসাদের আর্জির মর্ম এই—

লাজুড়পাড়া নিবাসী মৃত রামকান্তরায়ের তিন জী। জ্যেষ্ঠা জী, অনেক দিন হয় পরলোকগতা হুভদ্রা দেবী, নিঃসন্তান। ছিলেন। মধ্যমা জী তারিণী দেবীর দুই পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাদীর পিতা মৃত জগমোহন রায়, এবং দ্বিতীয় প্রতিবাদী রামমোহন রায়। রামকান্ত রায়ের কনিষ্ঠা জী রামমণি দেবীর একমাত্র পুত্র, এবং রামকান্ত রায়ের পুত্রগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, রামলোচন রায়। বাংলা ১২০৩ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণে (খ্রীষ্টীয় ১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বরে) সম্পাদিত বাংলা ভাষায় লিখিত একখানি দলীলের দ্বারা রামকান্ত রায় তাঁহার কতক স্বাবর সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাঁটোয়ারা অল্পসারে জগমোহন, রামমোহন এবং রামলোচন নিজ নিজ হিঁসা দখল করিয়াছিলেন। রামকান্ত রায় কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচন রায়কে রাধানগরের পৈত্রিক বাড়ীর নিজ অংশ দান করিয়াছিলেন, এবং জগমোহন ও রামমোহনকে লাজুড়পাড়ার বাড়ী দান কবিয়াছিলেন। বাঁটোয়ারার পব রামলোচন রায় পৃথক হইয়া গিয়া রাধানগরের বাড়ীর নিজ অংশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু

বাঁটোয়ারার অব্যবহিত বা অল্পকাল পরেই (immediately or shortly after) রামকান্ত রায়, এবং তাহার অপর দুই পুত্র, জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায়, পুনরায় একত্রিত হইয়াছিলেন (re-united), হিন্দু পরিবারের মত একত্রবাস করিয়াছিলেন (lived together as an Hindoo family), এবং বাংলা ১২১০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে (খ্রীষ্টীয় ১৮০৩ সালের মে-জুন মাসে) রামকান্ত রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে, আহাির সম্বন্ধে এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে একত্র এবং অবিভক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাংলা ১২১৮ সনের চৈত্র মাসে (খ্রীষ্টীয় ১৮১২ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে) জগমোহন রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় অবিভক্ত একান্তবর্তী হিন্দু পরিবারের মত একত্র বাস করিয়াছিলেন। বাঁটোয়ারার পব রামকান্ত রায় নিজের এবং জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই তিন জনের একমালি তহবিলের টাকা দিয়া বিনামায় গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর নামক দুইখানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। খরিদের সময় হইতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই দুই খানি তালুক রামকান্ত রায়, জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই তিন জনের একমালি সম্পত্তি (joint property) ছিল। রামলোচন রায় একান্তবর্তী পরিবারের সহিত পুনরায় মিলিত না-হওয়ায় একমালি সম্পত্তির অংশ পাইবার অধিকারী ছিলেন না।* রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পব জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় একযোগে রামকান্ত রায়ের স্বাবর অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির সহিত তৎকালে রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামীকৃত গোবিন্দপুর

* রামলোচন রায় ১২১৬ সনের পৌষ মাসে (১৮০৯ সনের ডিসেম্বর অথবা ১৮১০ সালের জাহুয়ারী মাসে) পরলোকগমন করিয়াছিলেন। রামলোচন রায়ের একমাত্র পুত্র হরগোবিন্দ রায় ১২২০ সনের ভাদ্র মাসে (১৮১৩ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে) পরলোকগমন কবিয়াছিলেন।

এবং রামেশ্বরপুর তালুকের তাঁহার অংশেরও মালিক হইয়াছিলেন। সদর জমা বাদে এই দুই তালুকের বার্ষিক মুনাফা ছিল প্রায় ১৫০০০ টাকা। বামকান্ত রায়ের মৃত্যুর কিছুকাল পরে জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই দুইখানি তালুক ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বিনামায় কালেক্টরীতে নামজারি করাইয়াছিলেন। বামকান্ত রায় জীবদ্দশায় এজমালি তহবিল হইতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর রামমোহন রায় এইরূপ অনেক খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে য়াননীর এণ্ড্রু রামসে (Andrew Ramsay) সাহেবের নিকট হইতে আসল ১১০০০ এবং সুদ এবং টমাস উতফোর্ড (Thomas Woodforde) সাহেবের নিকট হইতে আসল ৬০০০ এবং সুদ আদায় করিয়াছিলেন। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এজমালি তহবিলের টাকা হইতে নিম্নলিখিত পস্তনী তালুকগুলি খরিদ করিয়াছিলেন—

(ক) বর্ধমান জেলার জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত কুঙ্কনগর তালুক। রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ। মূল্য প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।

(খ) উক্ত জেলার এবং উক্ত পরগণার অন্তর্গত বীরলোক তালুক। রাজীবলোচন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ। মূল্য প্রায় বাট্ হাজার টাকা।

(গ) উক্ত জেলার বায়ড়া পরগণার অন্তর্গত লাজুড় পাড়া তালুক। রামলোচন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ।

(ঘ) উক্ত জেলার ডুরহট পরগণার অন্তর্গত ঐরামপুর তালুক। মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা।

এজমালি তহবিলের টাকা হইতে জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় জাহানাবাদ পরগণার রঘুনাথপুর মৌজার অন্তর্গত এজমালি প্রায় ষোল বিঘা জমীর উপর বাগান এবং বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন। এই বাগান বাড়ীর মূল্য প্রায় নয় হাজার টাকা।

জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় জাহানাবাদ পরগণার কুঙ্কনগর মৌজার মধ্যে প্রায় তিন শত বিঘা

নিজ ব্রহ্মোত্তর জমী খরিদ করিয়াছিলেন। মূল্য প্রায় ছয় হাজার টাকা।

জগমোহন রায়ের জীবদ্দশায় জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় উভয়ে একত্র এই সকল সম্পত্তির ভোগ-দখলকার ছিলেন। এই সকল সম্পত্তি মুনাফার টাকার দ্বারা উভয়ে এজমালি সম্পত্তি অনেক বাড়াইয়াছিলেন। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর সময় এজমালি সম্পত্তির মূল্য দাঁড়াইয়াছিল পাঁচ লক্ষ টাকা বা ততোধিক। তন্মধ্যে নগদ আশি হাজার টাকা ছিল। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর, দুই ভাইয়ের স্থাবর অস্থাবর এজমালি সকল সম্পত্তির নিজের এবং তৎকালে প্রায় পনব বৎসর বয়স্ক বাদী গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষ হইতে রামমোহন রায় দখলকার ছিলেন। এই সকল সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র এবং জমাখরচাদি তখন রামমোহন রায়ের হস্তগত হইয়াছিল। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর অল্প কাল পরে রামমোহন রায় এজমালি তহবিলের টাকার দ্বারা বিশ হাজার টাকা বা এইরূপ মূল্যে কলিকাতার অন্তর্গত চৌরঙ্গীতে একখানি দোতলা বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন, এবং তের হাজার টাকা বা এইরূপ মূল্যে কলিকাতার অন্তর্গত সিমলায় একখানি দোতলা বাগান-বাড়ী খরিদ করিয়াছিলেন। জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে বাংলা ১২২৩ সনের ১৬ই মাঘ পর্যন্ত (খ্রীষ্টীয় ১৮১৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত) বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের সহিত লাহুড়পাড়ার বাড়ীতে অভিন্ন হিন্দু পরিবারের মত (as an undivided Hindoo family) বাস করিয়াছেন। এই সময়ে বা ইহার কাছাকাছি সময়ে বাদী আবিষ্কার করিয়াছেন যে রামমোহন রায় বাদীকে এজমালি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা নিজ নামে কবালা করাইয়া লইয়া বর্ধমান জেলার কালেক্টরীতে নিজ নাম জারি করিয়াছেন। বাদী এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিবার পরে প্রতিবাদী রামমোহন রায়কে স্থাবর সম্পত্তির বাদীর প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া দিতে এবং অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব করিয়া বাদীর প্রাপ্য অংশ দিতে অগ্ররোধ করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় বাদীর অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। সুতরাং বাদী একইটি আদালতের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যে, আদালত একমালি হাবর সম্পত্তির বাটোয়ারা সম্পাদন করিয়া বাদীকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ দেওয়াব্য ব্যবস্থা করুন; অহাবর সম্পত্তির হিনাব-নিকাশ করিয়া বাদী-প্রতিবাদীর দেনাপাওনা মিটাইয়া দিন; এবং হাবর অহাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সকল দলীল-দস্তাবেজ আনিয়া আদালতে গচ্ছিত রাখুন।

বাদীর আবেদন দাখিল হওয়াব তিন মাস পরে, ১৮১৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর, রামমোহন রায় তাঁহার জবাব দাখিল করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের পক্ষে এটির্বি ছিলেন বেঞ্জামিন টার্নার (B. Turner) এবং ব্যারিষ্টার ছিলেন কম্পটন (H. Compton) সাহেব।* ১৮১৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী বাদীর পক্ষ হইতে সাক্ষীর জবানবন্দীর জন্ত প্রমাণমালা দাখিল করা হইয়াছিল, এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বাদীর দুইজন সাক্ষী, বেচারাম সেন এবং কৃষ্ণমোহন ধারার নামে সপিনা (subpoena) বাহির হইয়াছিল। বাদীপক্ষের এই দুইজন সাক্ষী ১৮১৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কোর্টে হাজির হইয়া হলপ করিয়াছিল (sworn)। তার পর ৫ই মার্চ তারিখে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে বেচারাম সেন এবং কৃষ্ণমোহন ধারাকে জেরা করিবার জন্ত প্রমাণমালা দাখিল করা হইয়াছিল। ২৬শে এবং ২৮শে মার্চ বেচারাম সেনের মূল জবানবন্দী হইয়াছিল এবং ৯ই এপ্রিল জেরা হইয়াছিল। বেচারাম সেন বাদী গোবিন্দ-প্রসাদের পক্ষে প্রথম এবং প্রধান সাক্ষী। সুতরাং তাহার জবানবন্দী কতকটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা অবশ্যক। জবানবন্দীর সময় বেচারাম সেনের বয়স ছিল প্রায় ৫০ বৎসর। সে আদৌ রাজীবলোচন রায়ের দপ্তরের মোহরের চাকরি করিত এবং রাজীবলোচন রায়ের কর্মচারিগণের এবং লোকজনের সঙ্গে লাভুড়পাড়ায় রামকান্ত রায়ের বাড়ীতে বাস করিত। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ

বৎসর পর হইতেই সাক্ষী ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া আসিতেছিল। মূল জবানবন্দীতে বেচারাম সেন নিজের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলে নাই। জেরায় তাহাকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—

তুমি বাদীর (গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের) কি প্রকার কাজ বা চাকরি কর এবং তজ্জন্ত কি পারিতোষিক পাও?

এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে কাগজপত্র এবং সাক্ষী জোগাড় করিবার জন্ত বাদী কি তোমাকে বর্ধমানের পাঠায় নাই, অথবা তুমি কি বাদীর সঙ্গে বর্ধমানে যাও নাই?

তুমি কি বাদীর সঙ্গে পুনঃ পুনঃ তাহার সলিসিটরের আফিসে এবং কুমার* সিংহ চৌধুরীর বাড়ীতে যাও নাই?

তুমি কি কুমার সিংহ চৌধুরীর নিকট হইতে বাদীর দাবীর সম্বন্ধে কাগজপত্র সংগ্রহ কর নাই?

তুমি কি বাদী এবং কৃষ্ণমোহন ধারার সঙ্গে সর্বদা সাক্ষী এবং প্রমাণ খুঁজিয়া বেড়াও না?

কুমার সিংহ চৌধুরী কি কলিকাতার একজন বদমায়েস নহে? মোকদ্দমার দালাল এবং হুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমার পরিচালক বলিয়া কি তাহার বদনাম নাই? এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তুমি কি তাহার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা কর নাই?

তুমি কত বৎসর মাসিক ২০০ বেতনে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের মোহরের কার্য করিয়াছ?

১২২৫ সালের চৈত্র মাসে (১৮১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে) তুমি কি কোন অপরাধের জন্ত এই চাকরি হইতে বরখাস্ত হও নাই? কি কারণে তুমি প্রতিবাদীর চাকরি ছাড়িয়াছিল?

প্রতিবাদীর চাকরি ত্যাগের অনতিকাল পরেই কি তুমি বাদীর চাকরি গ্রহণ কর নাই, এবং এই মোকদ্দমা পরিচালনে সহায়তা করিবার কোন প্রস্তাব কর নাই? কেবল এই মোকদ্দমার পরিচালনের জন্তই কি তোমাকে চাকরিতে রাখা হয় নাই?

তুমি যখন প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের চাকরি গ্রহণ কর, তখন কি সম্ভাবে কাজকর্ম করিবে এইরূপ অঙ্গীকার

* মোকদ্দমার নথীতে রামমোহন রায়ের মূল জবাব পাওয়া যায় না। জজদিগের ডিক্রীতে এই জবাবের সারাংশ নিবন্ধ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ বাদীর সাক্ষী প্রমাণ আলোচনা করিয়া পরে বিবাদীর জবাব ও সাক্ষী প্রমাণের কথা উত্থাপন করিব।

* রামমোহন রায়ের জেরার মধ্যে এই ব্যক্তির নাম বানান করা হইয়াছে Umer Singh এবং বেচারাম সেনের জেরা সাক্ষ্যে বানান আছে Comar Sing।

করিয়া প্রতিবাদীর বরাববে কবুলিষৎ লিখিয়া দাও নাই? সেই কবুলিষৎখানি এখন কোথায় আছে?

জেরার উত্তবে বেচারাম সেন বলিয়াছে, সে ৫- মাস্কি বেতনে ১২১৫ সন হইতে ১২২৩ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত (১৮১৭ সালের ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত) রামমোহন রায়ের দপ্তবে মোহরেরগিরি করিয়াছে। জাতি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে বাদী গোবিন্দপ্রসাদেব সহিত প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের যে মতভেদ অর্থাৎ দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সে বাদীব পক্ষ সমর্থন কবায় ১২২৪ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত কব। হইয়াছিল। চাকরি লইবাব সময় সম্ভাবে কাজ কবিতে অঙ্গীকার করিয়া সে প্রতিবাদীকে কবুলিষৎ লিখিয়া দিয়াছিল। বামমোহন রায় বেচারাম সেনের এই কবুলিষৎ স্ত্রিগ্রিম কোর্টে রাখিল করিয়াছিলেন, এবং মোকদ্দমার নথীর মধ্যে এখনও তাহা আছে। এই কবুলিষতের পাঠ যতদূর উদ্ধার করিতে পারিয়াছি সেকালের দলীলের নমুনাস্বরূপ তাহা এখানে উদ্ধৃত করিব—

“মহামহিম শ্রীমুত বামমোহনরায় মহাশয়
বরাবরেম্

লিপিক্ত শ্রীবেচারাম সেন

সে
দা
হ
(স্বা) বেচারাম সেন
দা
হ

কশু কবুলাতি পত্রমিদং সন ১২২১ সালান্বে লিখন্ কার্খানঙ্কণে পবগণে জাহানাবাদ তরফ কুম্ভনগর ও গয়রহ মহাশয়েব পত্তনি তালুক ও নিজ...তরফ মজকুরের তিহিব মুহরের গিরি কার্খ আমাকে মোকরব কবিলেন...সীতে মোকরর হইলাম ডিহি মোকামবব উক্ত হাজের থাকীয়া সকল কার্খের আনঞ্জাম (আঞ্জাম) দিব মহাশয় তিহিব কাগজপত্র জখন জাহা তলব করিবেন তৎখনাত মহাশয় ববাবর দাখিল করিয়া দিব বে আইন কোন কার্খ করিব না জদি বে আইনী কোন কার্খ করি তাহাতে কেহ আদালতে আমার নামে নালিশ করে তাহার জবাব দেহি আমার জিহ্মা (জিহ্মা) এবং আদালতের খরচ পত্র যাহা হইবেক তাহা আমি নিজ আদায়ে দিব সবকারের সহিত

এলাখা নাই মহাশয়ের হুকুম শেস্তায় কোন কার্খ করি সে মনঞ্জর (মঞ্জুব) নহে যাহে আনা। মাফেক বরাদ্দ পাইব আনার চাকবিব মাল জাগেন রাধানগর সাকিনের শ্রীমখুব-মোহন বসো কে দিব এতদার্থে আপনা খুসীতে চাকরি কবুল করিয়া কবুলাতি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২২১ বার শও একুইষ সাল তা ১০ পৌষ

ইসাদি

শ্রীবামহবি মিজ শ্রীছনিরাম মিজ শ্রীমদনমোহন বশো
সাং রাধানগর সাং রাধানগর সাং রাধানগর
পং জাহানাবাদ

বেচারাম সেন যে জেবার উত্তরে বলিয়াছে ১২১৫ সনে সে রামমোহন রায়ের দপ্তবের মোহবেব নিযুক্ত হইয়াছিল এই কথা ভুল। কবুলিষতে দেখা যায় তাহার এই পদে নিয়োগের প্রকৃত তারিখ ১২২১ সনের ১০ পৌষ (১৮১৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর)।* চাকরি হইতে ববখাস্তেব তাবিখ সম্বন্ধে বেচারাম সেনেব উক্তির মধ্যে বিবোধ রহিয়াছে। সে একবার বলিয়াছে, ১২২৩ সনেব ৩রা অগ্রহায়ণ পর্যন্ত সে চাকরি করিয়াছে, এবং আবাব বলিয়াছে, ১২২৪ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ সে পদচ্যুত হইয়াছিল। জেরার প্রশ্নমালায় বেচারাম সেনের ববখাস্তের তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১২২৩ সনেব চৈত্র (১৮১৭ সালের মার্চ-এপ্রিল)। এই তারিখই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রামমোহন রায়ের পরিবাব লাজুড়পাড়ার বাড়ী ছাড়িয়া রঘুনাথপুরের বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছিল ১৮১৭ সালেব ২৭শে জ্যৈষ্ঠয়ারী। তার পবই সম্ভবতঃ মাতা-পুত্রের বিবাদ ঘনীভূত হইয়াছিল, এবং দলাদলি আরম্ভ হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের পরিবার লাজুড়পাড়ার বাড়ী থাকিতে দলাদলির অবকাশ ছিল না।* সুতরাং ১৮১৭ সালের জ্যৈষ্ঠয়ারী মাসের পবে দলাদলির এবং বেচারাম সেনের ববখাস্তের সম্ভাবনা। মোকদ্দমা রুজু হইবার পূর্বেই সম্ভবতঃ দলাদলি আরম্ভ হইয়াছিল এবং বেচারাম সেনের চাকবি গিয়াছিল।

চাকরি যাওয়ার চাব-পাঁচ দিন পরেই বেচারাম গোবিন্দ
*বেচারাম সেন বোধ হয় রামমোহন রায়ের চাকরি লইবার পূর্বে রাজীবলোচন রায়ের চাকরি করিত।

প্রসাদের চাকরি লইয়াছিল। জেরার উত্তরে বেচারাম সেন বলিয়াছে, চাকরি লইয়া সে গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে মোকদ্দমা চালাইবার সহায়তা করিবার প্রস্তাব করে নাই, এবং এখনও তাহাকে কেবল মোকদ্দমা চালাইবার জন্য চাকরিতে রাখা হয় নাই। গোবিন্দপ্রসাদ রায় তাহাকে সংবাদ বহন, জিনিষপত্র খরিদ, খাজানা আদায় প্রভৃতি নানা প্রকার সাধারণ কার্যে নিয়োগ করে। সে কলিকাতায় বাদী গোবিন্দপ্রসাদের বাসায় থাকে এবং তাহার সঙ্গে বর্তমানে গিয়াছে। এই মোকদ্দমার কাগজপত্র এবং প্রমাণ সংগ্রহেব জন্য বেচারাম সেন বর্তমানে গিয়াছিল, এবং বাদীর সহিত সে পুনঃপুনঃ মিলিসিটরের অফিসে যায়। সে বাদীর সহিত কখনও কুমারসিংহ চৌধুরীর বাড়ী যায় নাই, এবং কুমারসিংহ চৌধুরীর নিকট হইতে বাদীর দাবীর সমর্থনের জন্য কোন কাগজপত্রও সে পায় নাই। কুমারসিংহ চৌধুরী তাহার স্বজাতীয় বলিয়া সাক্ষী (বেচারাম সেন) তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে, কিন্তু কোন বিশেষ কাজে তাহার নিকট যায় না। সে শুনিয়াছে কুমারসিংহ চৌধুরী দুই লোক, এবং স্প্রিম কোর্টের মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করার জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছে। বাদীব এবং কৃষ্ণমোহন ধারার সঙ্গে সে কখনও টাকা দিয়া সাক্ষী প্রমাণ জোগাড় করিতে যায় নাই।

বেচারাম সেনের জেরার প্রশ্ন ও উত্তর হইতে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আনীত মোকদ্দমা সন্দেহে কতকগুলি সংবাদ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই মোকদ্দমার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিল কুমারসিংহ চৌধুরী নামক একজন দাগী মোকদ্দমার দালাল এবং মোকদ্দমার প্রধান তদ্বিরকারক ছিল কৃষ্ণমোহন ধারা। গোবিন্দপ্রসাদ কৃষ্ণমোহন ধারাকে সাক্ষী মানিয়া ছিলেন। কৃষ্ণমোহন যে সাক্ষী দিতে হাজির হইয়া হলপ করিয়াছিল এই কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। জেরার প্রশ্নে দেখা যায়, কৃষ্ণমোহন ধারা আদৌ জগমোহন রায়ের, এবং পরে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের, সরকারের এবং খিদমতগারের কাজ করিত।

মূল জবানবন্দীতে বাদীর চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে বেচারাম সেন বলিয়াছে, “সে জানে, বাঁটোয়ারার পর রামকান্ত রায় তাহার তিন পুত্র হইতে পৃথক এবং বিভক্ত ছিলেন এবং যুক্ত পৃথক বরাবরই পৃথক এবং বিভক্ত ছিলেন। ...সাক্ষী

বলে বাঁটোয়ারার বৎসর অর্থাৎ ১২৩০ সন হইতে ১২২৩ সন পর্যন্ত প্রতিবাদী রামমোহন রায় এবং জগমোহন রায়, এবং জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রতিবাদী এবং বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায় আহার সন্ধ্যাে অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সম্পত্তি বরাবরই পৃথক ছিল। বর্তমানে সাক্ষী (বেচারাম সেন) গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের কার্যে নিযুক্ত থাকায় তাহার খাতাপত্র দেখিয়া এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াছে।”

বেচারাম সেনের এই উক্তিভে বাদী গোবিন্দপ্রসাদের দাবীর মূল উৎপাটিত হইয়াছে। আর্জিতে বাদী পিতৃস্বর্গে উত্তরাধিকারীস্বর্গে যে সকল তালুক অর্দ্ধাংশ দাবী করিয়াছেন, বেচারাম সেন মূল জবানবন্দীতে বলিয়াছে, সে যতদূর জানে, সেই সকল তালুক রামমোহন রায়ের নিজের টাকায় খরিদ করা হইয়াছিল এবং তাহার নিজেরই দখলে আছে। জগমোহন রায়ের সম্পত্তি যে বরাবরই পৃথক, তিনি যে পৃথক সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন, পৃথক কাঁচার করিয়াছেন, তাহার লেনা-দেনা যে বরাবর পৃথক ছিল বেচারাম সেন এই সকল কথাও তাহার জবানবন্দীতে স্পষ্টাক্ষর বলিয়াছে।

এখানে দেখা যাইবে, বেচারাম সেনের জবানবন্দী বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জির বিরোধী এবং প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের অনুল্ল হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতে পাবেন, রামমোহন রায় অথবা তাহার পবম হিতৈষী রাজীব-লোচন রায় বেচারাম সেনকে হাত করিয়াছিল বলিয়া সে এইরূপ বিপরীত কথা বলিয়াছিল। এইরূপ অসম্মান কবা অসঙ্গত। বাদী গোবিন্দপ্রসাদের আর্জির মোসাবিদায় খুব কৌশলেব পরিচয় পাওয়া যায়। কুমারসিংহ চৌধুরীর মোকদ্দমা সাজাইবার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। সম্ভবতঃ তাহারই উপদেশ মত আর্জি লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বাদীপক্ষ আর্জির অনুল্ল একখানি কবালা বা পাট্ট-কবুলিয়ৎ বা খত-খাতা বা অন্য কোন প্রকার এক টুকরা কাগজও দাখিল করিতে সমর্থ হইয়াছিল না। এইরূপ কাগজপত্রের অভাবে বেচারাম সেনের পক্ষে বাদীর দাবী সমর্থন করা সাধ্য ছিল না। কৃষ্ণমোহন ধারার পক্ষেও বাদীর দাবী সমর্থন করা সম্ভব হইবে না বলিয়াই বোধ হয় তাহার জবানবন্দী কবান হইয়াছিল না। বেচারাম সেনের জবানবন্দীর পুর একবৎসর কাল বাদী পক্ষ অন্য কোন সাক্ষী তলব দেয়

নাই। ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রতিবাদীর সাক্ষীগণের জবানবন্দী আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৮১৯ সালের মে মাসে শেষ হইয়াছিল। বাদীপক্ষ প্রতিবাদীর সাক্ষীগণের জেরার প্রশ্নমালা দাখিল করিয়াছিল না, সুতরাং জেরাও করে নাই।

১৮১৮ সালের ১লা অক্টোবর বাদীপক্ষ আরও নয়জন সাক্ষীর নামে সপিনা বাহির করিয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী শেষ হইয়া গেলে, ১৮১৯ সালের ১১ই জুন বাদী এক্সিডেবিট করিল, সে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এই সকল সাক্ষীকে হাজির এবং জবানবন্দী করাইতে পারে নাই। বাদী আরও বলিল, হীরারাম চট্টোপাধ্যায়, বিপ্রদাস রায়, সভাচন্দ্র রায় এবং তারিণী দেবী বিশেষ দরকারী সাক্ষী (material witnesses)। ইহাদের জবানবন্দী না হইলে সে নিরাপদে এই মোকদ্দমার সওয়াল জবাবের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারেন না (he cannot safely proceed to a hearing in this suit) এই চারি জন সাক্ষী বাদীর, বাদীর পিতার, এবং পিতামহের পারিবারিক এবং বৈষয়িক ব্যাপারের সহিত (with the family affairs and transactions) সুপরিচিত। আর এক মাস সময় পাইলে বাদী এই সকল সাক্ষীকে হাজির করিয়া জবানবন্দী করাইতে পারিবে। সুতরাং তাহাকে আর এক মাসের সময় দেওয়া হউক।

১৮১৭ সালের ২৩শে জুন মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছিল, এবং দুই বৎসর ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল। আর অধিককাল বিলম্ব করা কোর্টের অভিপ্রেত ছিল না। তথাপি কোর্ট বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে এক মাসের অবকাশ দিলেন। ১৮১৯ সালের ১২ই জুন বাদী পক্ষ ১৭ জন সাক্ষীর নামে সপিনা বাহির করিল। এই ১৭ জন সাক্ষীর মধ্যে অভয়চরণ দত্ত, কৃষ্ণপ্রসাদ পণ্ডিত, রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গুরুপ্রসাদ পণ্ডিত এই পাঁচ জন মাত্র ২ই জুলাই কোর্টে হাজির হইয়া হলপ করিয়া ছিল। প্রার্থিত মিয়াদের এক মাস অন্তে, ১৮১৯ সালের ১৩ই জুলাই, বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়, রামধন মুখোপাধ্যায় এবং মটুক সরদার এই তিনজনে মিলিয় আর এক এক্সিডেবিট করিল। গোবিন্দপ্রসাদ রায় পূর্বে এক্সি-

ডেবিটের মত এই এক্সিডেবিটে বলিল, হীরারাম চট্টোপাধ্যায়, বিপ্রদাস রায়, সভাচন্দ্র রায়, তারিণী দেবী, নবকিশোর রায়, নিমাই রায়, রামধন ডিগ্রী, রঘুবীর ডিগ্রী এবং পতিতপাবন চক্রবর্তী এই নয় জন এই মোকদ্দমার দরকারী সাক্ষী। ইহারা সকল অবস্থা অবগত আছেন। ইহাদের জবানবন্দী না হইলে বাদী এই মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। সুতরাং ইহাদিগকে হাজির করিবার জন্ত আরও দুই মাস সময় দেওয়া হউক। কোর্ট এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করিলেন।

রামধন মুখোপাধ্যায় সপিনা জারি করিবার জন্ত লান্ড-পাড়া অঞ্চলে গিয়াছিল। সে তাহার এক্সিডেবিটে বলিয়াছে, বাদীর অনুরোধে মটুক সরদারকে লইয়া সে কলিকাতা হইতে সপিনা জারি করিতে গিয়াছিল। সে প্রথম গিয়াছিল কৃষ্ণনগর। সেখানে গিয়া শুনিতে পাইল, সপিনা এড়াইবার জন্ত অনেক সাক্ষী পলায়ন করিয়াছে। সেখানে কেবল অভয়চরণ দত্তের উপর সে সপিনা জারি করিতে সমর্থ হইল। ২৬শে জুন কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া রামধন ডিগ্রীর উপর সপিনা জারি করিবার জন্ত সে খোটালপাড়া গিয়াছিল। রামধন ডিগ্রী তখন খোটালপাড়ায় তাহার রেশমের কুঠীতে (his silk factoryতে) ছিল না। তার পরদিন সে খোটালপাড়া হইতে জয়পাড়া-কৃষ্ণনগর গিয়া রামধন ডিগ্রী এবং রঘুবীর ডিগ্রীর সাক্ষাৎ পাইল এবং তাহাদের উপর সপিনা জারি করিল। তখন এই দুই ব্যক্তি কাটি শালের (?) লাঠি দিয়া রামধন মুখোপাধ্যায়কে এবং মটুক সরদারকে খুব মারপিট করিয়াছিল, এবং রঘুবীর ডিগ্রী সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে ছকুম দিয়াছিল, মূল সপিনা কাড়িয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেল। মূল সপিনা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মটুক সরদার ছেঁড়া সপিনা কুড়াইয়া আনিয়াছিল। এখনও তাহা মোকদ্দমার নথীর মধ্যে দেখা যায়।

১৮১৯ সনের জুন মাসের সপিনা পাইয়া যে পাঁচজন সাক্ষী হাজির হইয়াছিল তন্মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভয়চরণ দত্ত এই তিন জনের জবানবন্দী করা হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লান্ড-পাড়ার বাড়ীর পুরোহিত ছিল এবং জবানবন্দীর সময় তাহার বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। মূল জবানবন্দীতে, দ্বিতীয়

প্রশ্নের উত্তরে, সে বলিয়াছে, রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালে এই পরিবারের বৈষয়িক বিদ্য-ব্যবস্থা (affairs and concerns)-জানিবার তাহার বিশেষ কোন উপায় ছিল না এবং সে জানেও না। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছে, বাঁটোয়ারার পক্ষে কিস্তি ব্যবস্থা করিয়া (on what terms) যে রামমোহন রায় এবং জগমোহন একত্র বাস করিত তাহা সাক্ষী জানে না। এই সকল পক্ষের কাহাবও পুনরায় মিলিত হইবার. কথা সে কখনও শোনে নাই (saith that he never heard of any reunion between any of the parties)।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও গ্রামে পৌরোহিত্য করিত। জবানবন্দীর সময় তাহার বয়স ছিল ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মূল জবানবন্দীতে, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে, রামচন্দ্রও বলিয়াছে, রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালে রায়-পরিবারের আভ্যন্তরীণ বৈষয়িক অবস্থা (affairs and concerns) জানিবার তাহার কোন উপায় এবং সুযোগ ছিল না (he had not the means and opportunity) এবং সে জানেও না। তথাপি রামচন্দ্র বাদীর পক্ষ টানিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে। রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছে, সে শুনিয়াছে যে প্রথমতঃ রাজীবলোচন রায় কৃষ্ণনগর এবং বীরলোক নামক দুইখানি পত্তনী তালুক খরিদ করিয়াছিল, এবং তাহার দুই-তিন বৎসর পরে রামমোহন রায় রাজীবলোচন রায়ের নিকট হইতে এই দুইখানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছে, সে জানে, জগমোহন রায়ের জীবদ্দশায় কৃষ্ণনগর এবং বীরলোক তালুক এই পরিবারের দ্বারা (by the family) খরিদ করা হইয়াছিল, এবং সাধারণতঃ লোকে মনে করিত (generally considered) এই দুইখানি তালুক জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই উভয়ের একমালি সম্পত্তি (joint property)। কিন্তু জেরার উত্তরে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খোলাসা করিয়া বলিয়াছে, সে বাদী-প্রতিবাদীর এক তাঁহাদের পিতার বা ভ্রাতার বিষয়ক, কারবার বা সম্পত্তি সম্বন্ধে কিছু জানে না (he is not acquainted with

the concerns dealings transactions or the property)।

জবানবন্দী দেওয়ার সময় বাদীর অপর সাক্ষী অভয়চরণ দত্তের বয়স ছিল প্রায় ৭২ বৎসর। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে পর্যন্ত (up to within ten years of his death) অভয়চরণ দত্ত দশ বৎসরের অধিককাল রামকান্ত রায়ের চাকরি করিয়াছিল। অভয়চরণ সাধারণভাবে বলিয়াছে, বাঁটোয়ারার পূর্বে রামকান্ত রায় পুঞ্জগণের সহিত যেমন একায়ে একত্রে বাস করিতেন, বাঁটোয়ারার পরেও তাঁহাব পরিবার লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে একায়ে একত্র বাস করিত। অভয়চরণ দত্তকে বোধ হয় জেরা করা হইয়াছিল না। মোকদ্দমার নথীতে তাঁহাব প্রদত্ত জেরার উত্তর পাওয়া যায় না। মূল জবানবন্দীতে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে অভয়চরণ বলিয়াছে—

সে জানে না, কিন্তু সে শুনিয়াছে যে রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় গঙ্গাধর ঘোষ এবং রামতল্লু রায় গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিল। কিন্তু কখন অথবা কোথায় অথবা কিরূপে (at what sale) অথবা কাহার টাকায় অথবা কাহার নিমিত্ত (on whose account) যে এই দুইখানি তালুক খরিদ করা হইয়াছিল তাহা সাক্ষী শোনে নাই অথবা অন্য উপায়ে জানিতে পাবে নাই।”

“ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলিয়াছে যে সে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের মাতার নিকট হইতে শুনিয়াছে, রামতল্লু রায় এবং গঙ্গাধর ঘোষ গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিল। সাক্ষী বলে যে প্রতিবাদীর মাতা বলিয়াছিলেন যে তিনি অল্পমান করেন উহা বেনামী খরিদ। সাক্ষী বলে যে এই আলাপের এক এই সংবাদ পাওয়ার দুই-তিন মাস পরে (পুনরায়) প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের মাতা সাক্ষীকে বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় রামতল্লু রায়ের এবং গঙ্গাধর ঘোষের নিকট হইতে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিলেন।”

রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভয়চরণ দত্ত বাদীপক্ষের এই তিন জন সাক্ষীর কাহাবও জবানবন্দী. প্রকৃতপ্রস্তাবে বাদীর অস্বকুল নহে। ১০ই জুলাইয়ের এফিডেবিট প্রার্থিত দুই মাস সময়ের মধ্যে

অর্থাৎ ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাদী আর কোন সাক্ষী হাজির করিতে পারিল না। সুতরাং ১৫ই সেপ্টেম্বর সে আবার প্রার্থনা করিল তারিণী দেবী, জগন্নাথ মজুমদার, রাধানাথ চৌধুরী এবং রামনিধি পাল এই চারি জন দরকারী সাক্ষীকে (material witnesses) হাজির এবং জবানবন্দী করাইবার জন্ত আরও পনের দিন সময় দেওয়া হউক। এই তৃতীয় বারের চেষ্টার ফলেও বাদীপক্ষ কোন দরকারী সাক্ষী হাজির করিতে পারিল না। চতুর্থবার সময়চাহিতে সাহস করিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য, বাদী গোবিন্দপ্রসাদের পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী দিল না কেন, এবং যে কয়জন জবানবন্দী দিল তাহারাও বাদীর দাবী সমর্থন করিল না কেন। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হইতে পারে, প্রতিবাদী রামমোহন রায় বাদীর মানিত সকল সাক্ষীকে বশীভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বশীকরণ অসম্ভব। আমরা কাগজ পত্রে দেখিতে পাইব, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় এবং সভাচন্দ্র রায় জগমোহন রায়ের হিতকারী ছিলেন এবং সকল অবস্থাই জানিতেন। ইহাদের মত সাক্ষীকে বশীভূত কবা সহজ নহে। অন্যান্য সাক্ষী সম্বন্ধে বলা বাহিষ্যে পক্ষে, তখন দলাদলি চলিতেছিল, এবং বাদী পক্ষ নিজের দলের লোকই সাক্ষী মানিয়াছিল। প্রতিবাদীর পক্ষে এককালে বেদলের এতগুলি লোককে বশীভূত কবা সম্ভব মনে হয় না। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ও দরকারী সাক্ষীগণকে হাজির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন নাই। যে সাক্ষী সপিনা পাইয়া হাজির না হয়, তাহাকে হাজির করিবার জন্ত মাল জোক কবিরাব নিষম ছিল। ১৮১৯ সালের ১৭ই জুন স্থপ্রিম কোর্টের বেজিস্টার সার্টিফিকেট দাখিল করিয়াছিলেন যে রামভদ্র রায়, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, তারিণী দেবী, বিপ্লবপ্রসাদ রায়, এবং সভাচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মাল জোকের পরওয়ানা বাহিব করা হয় নাই। অস্ত্র কোন সাক্ষীর বিরুদ্ধে যে জোকের পরওয়ানা বাহিব করা হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ নাই। যথাযোগ্য তথ্যের অভাবই সাক্ষীগণের গরহাজিরের প্রধান কারণ। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মানিত সাক্ষীগণের জবানবন্দী না দেওয়ার আব এক কারণ হইতে পারে, বেচারাম সেন প্রভৃতি বাদীর যে চারিজন সাক্ষী জবানবন্দী দিয়াছিল তাহাদের মত বাদীর অন্যান্য সাক্ষী ও বাদীর দাবী সমর্থন করিতে প্রস্তুত ছিল না; অর্থাৎ তাহারা

মনে কবিত, বাদীর দাবী সমর্থন করিতে গেলে মিথ্য কথ বলিতে হয়; তাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত ছিল না।

বাদীর মাতামহী তারিণী দেবীও সাক্ষী দিলেন না। তাহাকে জেরার জন্ত দাখিল করা প্রশ্নে রামমোহন রায়ের পক্ষে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তিনিই বাদীর দ্বারা মোকদ্দমা করাইয়াছেন।* তবে তিনি কেন সাক্ষী দিতে সম্মত হইলেন না? এদেশে এখনও অনেক হিন্দুর সংস্কার আছে, একান্ব-বর্ষী পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষের উপাধিকৃত এবং নিজ নামে খরিদ-করা সম্পত্তির অংশ ঐ পরিবারভুক্ত অন্ত্যস্ত্রৈবও প্রাপ্য। সম্ভবতঃ এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, স্বধর্মভাগী পুত্রকে শাস্তি দিবাব জন্ত, তারিণী দেবী এই মোকদ্দমা করাইয়াছিলেন। কিন্তু মোকদ্দমার আর্জিতে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। যদি তারিণী দেবী আর্জির কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেন, এবং তদনুসারে সাক্ষ্য দেওয়াইতে চাহিতেন, তবে তিনি বাদীর সাক্ষী অভ্যুতরণ দপ্তকে বলিতেন না, “রামমোহন রায় রামভদ্র রায়ের এবং গন্ধাধর ঘোষের নিকট হইতে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিলেন”; তিনি বলিতেন, “তাহার স্বামী বামকান্ত রায় এই দুইখানি তালুক পুত্র রামমোহন রায়ের নামে বিনামায় খরিদ করিয়াছিলেন।” পূর্বোক্ত বোচারাম সেনের জেরার প্রশ্নে দেখা যায়, প্রতিবাদী পক্ষ মনে করিত, এই মোকদ্দমায় বাদীপক্ষের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিল কুমারসিংহ চৌধুরী। এক শ্রেণীর দারিদ্রজ্ঞানশূন্য দুষ্ট স্বভাব মোকদ্দমার দালাল আছে, যাহাদের ব্যবসাই হইতেছে কোন প্রকারে মামলা বাধাইয়া দিয়া টাকা উপায় করা। কুমারসিংহ চৌধুরী বা আর কোন দালাল গোবিন্দপ্রসাদের আর্জির মোসাবিদার উপদেষ্টা ছিল। গোবিন্দপ্রসাদ যাহাদিগকে সাক্ষী মান্ত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বোধ হয় আর্জির মূল কথা বুঝিতে পারিত না, এবং আদালতে হলপ করিয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার অভ্যাস ছিল না। তাহারা আসিয়া সাক্ষ্য দিল না। গোবিন্দপ্রসাদের দাবী প্রমাণিত হইল না। তাহার যে কয়জন সাক্ষী জবানবন্দী দিতে দাঁড়াইল, তাহারাও বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিল।

* প্রবাসী, ১৩৪৩, অগ্রহায়ণ, ২৬৬ পৃ:।

প্রস্তুতি

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈশবেব লীলানন্দে জীবনসিদ্ধুর বালুতটে
যাহারে লভিয়াছিছ একদিন একান্ত নিকটে,—
স্বপ্নসহচরী মোর,—আজিকাব কর্ণ-কলরোলে
আমারে ভূলায়ে রেখে সে কখন কোথা গেল চলে
পারি নি জানিতে ; মোর আজন্মের আত্মার আত্মীয়া
আমার নশ্বের সঙ্গী,—আমার মর্মেব চিবপ্রিয়া,
আমার স্নেহের সাথী—আমার ব্যথার ব্যথী মিতা,—
ছেড়ে গেছে অকল্পণা সখী মোর আমার কবিতা ।

পাবে যারা যাবে বলি খেয়াঘাটে হয়েছিল জড়
তারো মোরে দিল ডাক । আপনার মনে হ'ল বড়,
বিজ্ঞ বলি হ'ল মনে । বাঁশি ফেলি দ্রুত এমু ছুটে ।
অসংশয় দৃঢ়পদে দেখিলাম তবনীতে উঠে
সম্মুখে জ্বলিছে জল তরল অনলে তরঙ্গিয়া !
সাথে ছিল কি না ছিল সাথী মোর দেখি নি কিরিয়া ।
যাত্রা ক্রমে হ'ল স্তব্ধ ; যাত্রীদল পুছে পরস্পরে
এ উহার পরিচয় । কেহ বা কহিল গর্বভবে
ওপারের রাজপুবে চলেছে সে নৃপতির ডাকে ।
কারো বাণিজ্যের কড়ি খোয়া গেছে দুর্দিনে বিপাকে
উদ্ধার করিবে তারে ওপারের পণ্যবীথিকায় ।
কারো হাতে খর খড়া—কারো মৃণু মণ্ডিত শিখায়,—
কারো বা খনিজ কবে, কারো শজ্জ,—কারো শাজ্জবাজি ;
সবাই চলেছে কাজে । অপ্রস্তুত অকাজের কাজী,—
অকস্মাৎ হ'ল মনে,—আমি কেন ইহাদের মাঝে ?
আমি কোথা কি করিব ? পরিচয় জিজ্ঞাসিলে লাজে
পিছে ফিরে চাহিলাম ; অশ্রুভারে পূর্ণ হ'ল আঁখি
সে নাই,—সে আসে নাই । “মিথ্যাবাদী—দিতে চাস থাকি”
পাটনী গর্জিয়া উঠে, “এখনি পারের কড়ি দেখা ।”

দেখালেম শূন্য হস্ত,—কহিলাম, “আসিয়াছি একা,
তোমরা ডাকিয়াছিলে,—আসিয়াছি, কবি নি সংশয় ;
পিছনে এসেছি কেলে মোর অর্থ, মোর পরিচয় ।”
কেহ বা দ্বিভার দিল,—কেহ বা পুছিল ব্যঙ্গ হাসি,
“কি তুমি শিখেছ কাজ ?” “আমি কবি ।” “কোথা তব বাঁশি ?
কণ্ঠে তব গান কই ?” কহিলাম তিত্তি অশ্রুনারে,
“বাঁশি আসিয়াছি কেলে যাত্রাপথে দূর সিদ্ধুতীরে ;
ছড়ামে এসেছি গান গিরিমল্লিকার বান বনে
তালতমালের কুঞ্জে ; সহসা আসিতে অন্তমনে
স্ব আসিয়াছি ভুলে,—উপলবিছানো উপকূলে
আজন্ম-বান্ধবী মোব কবিতারে আনিয়াছি ভুলে ।”
শত কণ্ঠে অট্টহাসি,—শত চক্ষে জাগিল সন্দেহ,
হেন অসম্ভব কথা বুঝি কতু কহে ন'ই কেহ ।

তার পর গেছে চলি, দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি কত,
নিত্য নব অপমান সহিয়া চলেছি ভান্ডারত
হৃদয় দিগন্তে চাহি সীমাহীন মহানিষ্কাজে
আন্দোলিত তরীবক্ষে । অন্ধকার গিগনতলে
আজি ঝঙ্কা জাগিয়াছে তিমির-নিবিড় পুঞ্জমেঘে ;
উন্মত্ত প্রলয়বায়ু গর্জিয়া ছুটেছে অন্ধ-বগে,—
নাচিছে উত্তাল উর্ধ্ব,—তারি মাঝে ডুবে তরীখান ।
সবাই লেগেছে কাজে ; কি করিব আমি নাহি জানি ।
দেহে মোব শক্তি নাই,—এ দুর্দিনে হব কর্ণধার ;
কণ্ঠে মোর মজ্জ নাই—কত দুবে কোথা আছে পার
তাহার সন্ধান দিব, শুনাইব আশার রাগিণী ।
তরঙ্গে তবঙ্গে আজি ছল্লারিছে হিন্সর নাগিনী,
হাতে মোর বাঁশি নাই ! সাথে মোর সাথী নাই মিতা ;
অসময়ে ছেড়ে গেছে অভিমানী অ-মাঝ কবিতা ।

ত্রিবেণী

ত্রিভূবনময় রায়

৪০

নন্দের বাড়ী গিয়ে কমলের অস্থখের কিছুই উপশম হ'ল না। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'বে, গল্পগাছা করবার চেষ্টা ক'রে সে শ্রান্ত হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মালতী জিজ্ঞেস করাতে বললে, “একটু শুয়ে নি। অমায় ডেকে না, আজ আব কিছু খাব না।”

মালতী ব্যস্ত হয়ে বললে, “বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে কুঁঝি। ওমা, এতক্ষণ বল নি কেন ভাই? ইস, চোখ দুটে যে জাল হয়ে উঠেছে! চল, বিছানা করে শুইয়ে দিই গে। একটু বরফ দেবে মাথায়?”

কমল লজ্জিত হয়ে বললে, “না না, তেমন কিছুই না। একটু ঘুমলেই সেরে যাবে।”

মালতী শোনে না। তাকে জোব ক'বে খালি খাট থেকে উঠিয়ে পাশের ঘরে বিছানা ক'রে শুইয়ে দেয়। ত্রিস্ত হযে বলে, “দেখ দিকি নি ভাই, উনি এই সময় ক্লেথায গেলেন। একজন ডাক্তার ডাকা উচিত। ভগলুকে বরং একবার হাসপাতালে পাঠিয়ে দি, নিখিল বাবুকে ডেকে নিয়ে আসুক।” কমল ব্যস্ত হয়ে বলে, “না না, ও কিছুই নয়। একটু ঘুমলেই সব সেরে যাবে, দেখো। ও রকম আমার বোজ হয়।”

সন্ধ্যার খানিকটা পরে নন্দলাল বাড়ী ফিরল। কিন্তু বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহলে যেতে তার পা উঠল না। সেইখানে ব'সেই সে উপায় চিন্তা করতে লাগল যে, কমলের বিরূপতা বাঁচিয়ে কেমন ক'রে তার কাছে নিজেকে নিয়ে উপস্থিত করবে। নিতান্ত কিছুই ঘটে নি এমনই ভাবে ব্যবহার করা যায় কিন্তু যেখানে সত্যিই কিছু ঘটেছে সেখানে সে-ভাবটা বজায় রাখা তার পক্ষে দুর্ভব।

এমন সময় মালতী এসে জ্যোৎস্নার পীড়ার সংবাদ দিলে। অস্থখের সংবাদে আত্মীয়ের যেমন উদ্বিগ্ন হবার কথা, নন্দব মুখে ঠিক সে-রকম উদ্বেগের ভাব দেখা গেল না। একটা আশা, কেন এবং কিসের তা কে জানে, গোপনে গোপনে

তার মন থেকে যেন একটা দৃষ্টিভাব মেঘ কাটিয়ে দিতে লাগল। কিসের এই আশা? জ্যোৎস্নার কাছে এই অস্থখের হুত্রে আত্মীয়ের স্বাভাবিক হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হ'তে পারার স্বযোগ হবে এবং মাঝখানের এই কয় দিনের মানিটা বিনা চেষ্টায় দূব হ'য়ে যেতে পারবে এই ভেবে? না, এই স্বযোগে জ্যোৎস্নার বিমূখ চিত্তকে অস্থকল করবার স্বযোগ পেতে পারে এই ভেবে, কে জানে? কিন্তু তার পীড়ার সংবাদে যে সে অতিমাত্র বিচলিত হয়ে পড়ল এমন বোধ হ'ল না। বললে, “ভগলুকে দিয়ে ববক আনিয়ে মাথায় আইস-ব্যাগ দাও; আমি যাচ্ছি একটু কাজ সেরে।” ব'লে অকারণে একখানা মোটা খাতা খুলে মনোযোগের সঙ্গে পাতা ওলটাতে লেগে গেল।

মালতী বললে, “তোমাব খাতাটা একটু রাখ ত। দিন রাত ঐ নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জো হ'ল। একটা ডাক্তার-টাক্তার ডাকা দরকার না কি?”

এখনই অন্দরে গিয়ে জ্যোৎস্নার কাছে তাব ব্যাকুল চিত্তের উদ্বেগ প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রবল হ'লেও, মালতীর কাছে সে একরকম উপেক্ষার স্বরেই বললে, “হ্যাঁ, একটু কি মাথা ধরেছে, তাই আবার ডাক্তার ডাক। তোমাদের যত বাড়াবাড়ি।”

“বাড়াবাড়ি আবার কি? অস্থখ করলে লোকে ডাক্তার ডাকে। সে কাংরাবার মেঘে নয়, তাই চুপ ক'বে পড়ে আছে। আমার অমনটা হ'লে আমি ত চেষ্টায়েই বাড়ী মাথায় করতুম। তা যা হয় কব, আমি চললুম।”

নিতান্ত অগত্যের ভাবে নন্দ উঠে বাড়ীর ভিতর গেল।

একটা মটকার চাদরে আবক্ষ আবৃত হয়ে কমল শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে নিদ্রিত ব'লেই মনে হয়। কেবল তাব আকৃতি ললাটে যন্ত্রণার চিহ্ন পরিষ্কৃত। মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘশ্বাসে সেই আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার উক্ত বাস্পকে যেন নিঃসৃত দিচ্ছে।

নন্দ মালতীকে কানে-কানে জিজ্ঞেস করলে, “জ্বর আছে নাকি?” ইচ্ছাসঙ্কেপে কপালে হাত দিয়ে সহজ ভাবে সে বৌগিকে পরীক্ষা কবতে ইতস্তত করছিল।

মালতী বললে, “জানি নে। তুমি দেখ না কপালে হাত দিয়ে।”

নন্দ নিতান্ত কর্তব্যের খাতিরেই পা টিপে কাছে গিয়ে তাব কপাল স্পর্শ করলে। কমল চোখ চেয়ে নন্দকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথা খাপড় দিয়ে উঠে বসল। মালতীও দিবে চেয়ে বললে, “কেন ভাই মিছে ব্যস্ত হচ্ছে। ও আমায় কিছুই নয়। অমন প্রায়ই হয়। একটু ঘুমলেই সেরে যাবে ত বললাম। মিছিমিছি তুমি বড় ব্যস্ত হও।”

মালতী গোলমাল করে বলতে লাগল “না, কিছু নয় রগের শির ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো লাল জ্বাফুলের মত হয়েছে—কিছু নয়। কিছু নয় ত, কিছু নয়। তুমি চুপ করে শোও ত। আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসলে কেন? এখন আমাদের এখানে এসেছ, আমবা যা বলব তাই শুনতে হবে। কিছু নয় নয় করে চেহারা কি হয়েছে দেখতে পাও?”

নন্দ এব মধ্য কি বলবে কিছুই ঠিক করতে পারেনা। কেমন করে সে নিজের অসুস্থতা তাব প্রকাশ করে তাব সেবা করবার সুযোগ লাভ করবে তাও ভেবে উঠতে পারেনা। এটুকু সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে তাব উপস্থিতি জ্যোৎস্না কাছের স্বস্তিকর নয়। স্তরাতঃ অগত্যা সে যথাসম্ভব সহজ গলায় আইস-ব্যাগ দেবার উপদেশ দিয়ে মনে মনে লুপ্ত হয়েই বেরিয়ে বৈঠকখানায় চলে গেল।

জ্যোৎস্নাকে যে সহজে আয়ত্ত করতে পারবে না, তা তার অজানা ছিল না। কিন্তু জ্যোৎস্না যে তার প্রত্যেকটি নিরাপদ গতিবিধি সম্বন্ধেও এতটা সজ্ঞান থাকবে এতে তার বিরক্তির সীমা বহিল না। পুরুষ-অভিভাবকবিহীন একটা জীলোক যে সম্পূর্ণ পুরুষ-সম্পর্কহীন চিন্তে চিরকাল অতিবাহিত করতে পারে, এ তার ধারণার মধ্যে আসেই না। এ সে বিশ্বাসই কবতে পারে না। তবে কে? কে তার মনকে এমন করে আবদ্ধ করেছে যে সে তার বিপুল অন্ধকাবময় ভবিষ্যতের বিরুদ্ধেও এমন কবে তার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে? বিশেষতঃ তার সঙ্গে প্রেমের এই গোপন বিনিময়ে যখন

তাকে কোন পরিবর্তন বা বিপর্যয় কিংবা বৃহৎ ভাগ্যস্বীকার করতেও হচ্ছে না। তার সন্তানকে সে এতদিন সন্তান-নির্কর্ষিতবেই পালন করে এসেছে; এবং চিরদিন তাব স্নেহেব আশ্রয়ে থেকে নিরাময় নিঃসঙ্কোচেই তাকে মাহু্য করে তুলতে পারবে। বৎস তব মনের দিক থেকে তার দাবীই জন্মাবে—এখনকার মত নয়। তাহলে তাকে পরামর্শভাজীর অবনতি অনুভব করতে হবে না। তবে কেন তাব এই বিরুদ্ধতা? কেন, কেন, কেন,—ভাবতে গিয়ে নিখিলনাথ সম্বন্ধে সন্দেহ তার জন্ম বিশ্বাসে পরিণত হতে লাগল। সে মনে মনে বহলে “না, এমনই করে ডাক্তারের হাতে ছেড়ে দিতে পারব না। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। তা নইলে ডাক্তারকে একবার দেখে নেব।”

সেদিন বাত্রে কমলের মাথার স্বপ্না খুবই বেড়ে উঠল। সে মনে মনে বহুবার নিখিলনাথের কথা ভাবলে। কিন্তু নন্দলালের সেদিনকার কুৎসিত ইচ্ছিতের পর সে নিখিলনাথের কথা উচ্চারণ করতে সক্ষম বোধ করতে লাগল। নিজেই সে নিজের চিকিৎসার হু-এবটা মামুলি গুণ ও ব্যবস্থার কথা বলে শ্রান্ত হয়ে পড়ে রইল।

সমস্ত দিন সন্সারেব নানা বজ্রাট পোহানর পর রাত্রে মালতী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ত। তবু সে প্রথম বাজিটা প্রাণপণে রোগীর সেবার নিম্নেব রাখলে। কমলের বারংবার অসুস্থরোধ সন্দেহ সে পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। কিন্তু তার পরিশ্রান্ত চোখ দুলে এল; এবং দু-একবার যখন শ্রান্ত হাতের পাখাটা ঘূমের চুল খেয়ে রোগীর গায়ের উপর পড়তে শুরু হ’ল তখন সে বুঝলে যে খানিকটা না ঘুমিয়ে নিলে আর বসা চলে না।

মাঝে মাঝে বরফ ভেঙে আইস-ব্যাগটা করে দেবার উদ্দেশ্যে নন্দলাল ঘরে এসে রোগীব সংবাদ নিচ্ছিল মালতী তার কানে-কানে বলল, “তুমি একটা পাখাটা ধর, আমি খানিকটা না গড়িয়ে নিয়ে ঘেন পারছি না।”

নন্দলাল বিনা বাক্যব্যয়ে পাখাটা তার হাত থেকে নিয়ে মালতীকে পাশের ঘবে গুতে পাঠিয়ে দিলে।

দ্বয় নিস্তক নিরুন্ম। টবিলের উপব স্নেহেব বাতিটা নীল কাগজ দিয়ে শিরে দেওয়া হয়েছে। এই

ছাটি ব্যক্তিকে যেন আড়াল ক'বে সমস্ত বাড়িতে স্থিতির পর্দা টানা। কমল বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিল কিংবা যন্ত্রণাতেই তার চেতনা ধানিকটা আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। সে নিঃশাড় হয়ে পড়ে আছে। নন্দলাল এক হাতে ব্যাগটা ধরে অন্য হাতে ধীবে ধীরে পাথর বাতাস কবছে। আব নিম্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে কমলের মুখের দিকে। ঐ একটুখানি অসহায় স্ত্রীলোক, কি তার শক্তি তা সে বুঝে উঠতে পারে না। তবু তাকে আর্ত্ত করা এত কঠিন! তার সমস্ত শক্তি কেন যে এমন অসহায় হয়ে পড়ে, কেন যে তাব পুরুষের অকুণ্ঠিত বল অনায়সে প্রয়োগ করতে পারে না, তাই ভেবেই সে অবাক হচ্ছে। ভাবতে ভাবতে সে যেন নিজেকে আর ধবে রাখতে পারে না। তাব মন তার দেহকে জাগিয়ে তুলছে কোন উপায়ে ওর নাগাল পাবার জন্যে। তবু কোন রকম অভ্যস্ত আচরণ করতেও যেন তার হাত সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছে। এখনই কোন একটা রুঢ় আঘাতে আবাব সে তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে না ধূলিসাৎ করে। তা ছাড়া মালতী পানের ধরে।

কপালের চুলগুলো বরফেব জলে ভিজে উঠেছে। সে পকেট থেকে রুমাল বেব ক'রে আস্তে আস্তে মুছে নিলে। কমল চুপ ক'রেই পড়ে রইল। এই সেবার একাগ্রতাব ইতিহাসটুকু বুঝি তার কাছে গোপনই রইল। নিখিলনাথ কি তার মত ক'রে ওব কথা ভাবতে পাবে? তার কাছে ওব মূল্য কতটুকু? একটা নাসের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ কবা ছাড়া তার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কি দাম্পত্য জুঁদেব থেকে সে ওকে রক্ষা কবেছে সে কথা কি ওর একবারও মনে হয় না? আজ সে কার জোবে এই জায়গায় এস দাঁড়িয়েছে? তার অপবাধ কি? ভালবাসা কি অপরাধ? জ্যোৎস্নাকে সে ভালবাসে। ভালবাসেই ত। আজ তার এই যন্ত্রণাব সময় সে যে নিজাইীন রাজি তার সেবার নিজেকে একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত করেছে, এ কি শুধু সে আশ্রিত ব'লে? কখনই না; সে তাকে ভালবাসে। তার আজকেব যন্ত্রণা একটু উপশম করতে পারলেও সে তৃপ্তি পাবে। মাথার যন্ত্রণাব বড় কষ্ট। তার নিজের একবার হয়েছিল—রক্ত-ছুটো যেন ক্ষেটে পড়ছিল সেদিন। মাথাটা একটু টিপলে বোধ

হয় একটু আরাম হ'ত। একটু টিপে দিলে ক্ষতি কি? কিন্তু যদি জেগে ওঠে, যদি বিরক্ত হয়। কই, চুল মুছে দেবাব সময় ত কিছু বলে নি। দিই না। একবারের সাফল্যে নন্দর মনের জড়তা এবং ভীকৃতা অনেকটা দূর হয়ে তাকে দ্বিতীয়বার অগ্রসর হওয়ায় যেন সাহস দিলে। সে ব্যাগটা সরিয়ে রেখে কপাল এবং রগটা ধীবে ধীরে জলে দিতে লাগল।

কমল ঘুমোয নি। কতকটা যন্ত্রণাব জন্তোণ বটে এবং কতকটা ওষুধেব আবেশেণও বটে, সে আচ্ছন্নের মত প'ড়ে ছিল। বাহ্য ব্যাপারে তাব মস্তিষ্ক চালনা কববার মত ক্ষমতা তার ছিল না; তাই কপালের জলটুকু মুছে নেবার সময় সে বড় একটা খেপাল কবে নি। মালতী যে বিশ্রাম কবতে গিয়েছে এ-কথার ঠিকমত ধারণা তার ছিল না। তাই সে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েই নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। কারও সেবা সহজে গ্রহণ করা যদিও তার স্বভাববিরুদ্ধ তবুও আজ সেবাটাও তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক এবং কাম্য বোধ হচ্ছিল। সে নিশ্চীব হয়ে পড়ে মালতীর সেবা ভেবেই এই স্নেহেব অত্যাচারটুক উপভোগ করছিল।

নন্দলালের হাতেব প্রথম স্পর্শই সে সচেতন হয়ে তার বোধশক্তিকে সচেতন ক'রে তুললে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত তার বিশ্বাসই হয় নি যে নন্দলাল সহসা এ-প্রকার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হতে পাবে। তার সেবাদক্ষ মনে এ-কথাটাও জাগল যে, রোগীর প্রতি স্বাভাবিক কক্ষণায়ত্ত নন্দলাল এইটুকু করতে পারে। একজন মানুষকে কেন সে এমন কুৎসিত রূপ দেবার চেষ্টা কবছে? এ কি প্রবৃত্তি তার! নন্দলালের অহুতাপ যে সত্যিই আন্তরিক এই রকম কল্পনা ক'বে সে এই সেবা সহ কবাব সক্ষম মনে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অন্তর তাব কোনমতেই সায় দিতে চাইল না। নিজের সঙ্গে এই রকম বোঝাপড়া করতে তাব যেটুকু বিলম্ব হ'ল নন্দলালের শোভাতুর চিন্তে তা অনেকখানি আশাব সঞ্চার করলে। কমল কিন্তু চোখ খুলতে বা জাগরণের কোন লক্ষণ প্রকাশ করতে পারল না। সজ্ঞানে সহজ ভাবে নন্দলালের দুঃসাহসকে সে প্রশংসা দিচ্ছে, নন্দলালেব মনে এই স্পর্ধার উদ্বেক করতে তার শীলতায় বাধা পেতে লাগল। সে কাঠ হয়ে প'ড়ে রইল। নিজের

এবং নন্দর সঙ্গে সে যে এই প্রতাবণাটুকু করলে সেইটাই তার বিপদ থেকে আনলে। দুর্বৃত্তকে দমন করতে হ'লে তার প্রশ্রয় পাবার উপাযটাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা বুদ্ধির কাজ। নইলে তার সাহসকে দুঃসাহসে এবং আকাঙ্ক্ষাকে স্পর্ধায় পরিণত করে নিতে সাহায্যই করা হয়। অল্পক্ষণ পবে গভীর পরিতাপেব সঙ্গে তার তুল সে বুঝতে পাবল।

নন্দলালের অঙ্গুলির গতিভঙ্গীতে তার দুশ্চেষ্টার আভাস অল্পভব করে তার সমস্ত সত্তা যেন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ওর হাত যেন প্রকাণ্ড ক্রোদাক্ত মাকড়সার মত তার সমস্ত দেহটাকে কটকিত করে তুলছে—সে যেন জাল বুনছে তার সমস্ত অদৃষ্টের চতুর্দিকে। তার সমস্ত দেহটা বিদ্রোহ করে উঠতে চাচ্ছে। তীব্র বিদ্বেষের অল্পভূতিতে তার স্বর্ণা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বৃকের মধ্যে জ্বপিণ্ডটা এঞ্জিনের মত আছাড় খাচ্ছে—মাথাব মধ্যে রক্ত চলছে রেলের চাকার আবর্তনেব গতিতে। সমস্ত চেতনা সংহত হয়ে স্পর্শাত্মক মায়ে পর্যাবসিত হয়েছে, এবং সেই ভ্রূত্বুতি তাব সমস্ত দেহকে গৌণ করে ললাটক্ষেত্রে নন্দলালের অঙ্গুলির মস্তুর কস্পিত গতিবিধি অল্পসরণ করে ফিরছে।

সহসা তার কপালের উপর একটা ভয়াবহ উষ্ণ নিঃশ্বাস অল্পভব করে সে আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে দেখলে—তাব মুখের অভ্যন্তর নিকটে একটা মুখ—নন্দলালের মুখ,—তার লোভাতুর নেত্রের ক্ষুধার্ত সেই দৃষ্টি। অকস্মাৎ তার মনে হ'ল, ও যেন একটা লোলুপ নেকড়ে বাঘ, তেমনই নির্ময়, তেমনই বীভৎস, তেমনই ভয়ঙ্কর। এই আতঙ্কেব চমক থেয়ে সে নিজের অজ্ঞাতে “ও মা গো” বলে চৈচিয়ে উঠে দুই হাতে নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করে ফেললে।

কতক ভয়ে কতক বাসনার আবেগে নন্দলাল এব হাতে তাব মুখ চেপে ধরলে এবং সহসা এক মুহূর্তে তার মুখ উপর পড়ল।

এই দুর্দান্ত বিভীষিকার দুঃসহ ক্রোদসিক্ত সর্বাস্পর্শটান কবল থেকে বিপুল বলে সে যে কেমন করে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তা তার মনে নেই। দেহ তাব বেতসপত্রের মত কস্পিত হচ্ছে, আর এক মুহূর্তের মধ্যে যেন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে; ঘরের বাইরে যাবার জন্যে ছুটে সে দরজার দিকে গেল।

দুশ্চিন্তার জঞ্জাই হোক বা তাব স্বামীকে সেবা থেকে মুক্তি দেবার ইচ্ছাতেই হোক, মালতীর সে-রাগ্রে নিজা গাঢ় হয় নি। কমলের প্রথম অশ্রুজোই সে উঠে পড়ে ছুটে এই ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, এবং সমস্ত দৃশ্যটি যেন তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষ ঘটনা বলে বিশ্বাস হ'তে চাইল না। তার চোখের সম্মুখে সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। ঐ দুর্দান্ত রক্তবাসলোলুপ জানোয়ারটা যে তার স্বামী, তা যেন সে ধারণার মধ্যে আনতে পারছে না। সে আবার ছুটে ঘর থেকে বেবিরে পাশেব ঘরে গিয়ে মেঝেব উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। তাব কাছে এক মুহূর্তে সমস্ত স্বর্থ-সম্পদ, ঐশ্বর্য-সংসার, সব নিঃশব্দ হয়ে গেল।

মালতীকে দেখেই নন্দলালের ঘনটা এক নিমেষে শিকারের প্রবৃত্তি থেকে ভয়ের অশ্রুকার গুহায় গিয়ে প্রবেশ করলে। ভীক নন্দলালেব চিন্তে পৌঙ্কষেব প্রবলতা বলে কোন বস্তু ছিল না। নিজের গতিতে সমাজ এমন কি মালতীর স্বণাব বিরুদ্ধে যে সে নিজের বাসনার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহ করে দাঁড়াবে, এমন মেরুদণ্ডের শক্তি তার নেই। সমস্ত দিকেব নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে বিস্মৃত না করে গোপনে যেটুকু উপভোগ করা যায় সেইটুকুর উপরেই তাক লোভ। সমস্ত নিরাময় সংসারযাত্রায় একটা ঘোরতর বিপ্লবের সম্ভাবনায সে মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কি করলে এর আশু প্রতীক্য কবা যায় তার কোন যুক্তি তার উদ্বেজিত মস্তিষ্কে যেন প্রবেশ করতে চাইল না; এত অকস্মাৎ যেন দিশাহারা হয়েছে সে ছুটে কমলের পায়ের কাছে পড়ে দুই হাতে তার পা চেপে ধরে রোদনোন্মুখ কস্পিত স্বরে বলতে লাগল “আমায় ক্ষমা কর। আমি বিদ্রোহ পাবণ্ড—আগি পণ্ড। পণ্ড ব'লেই আমাকে ক্ষমা কর কোন পাপ তোমায় স্পর্শ করে নি। তুমি আমায় ক্ষমা কর।” নিদারুণ মানসিক স্বর্ণাঘাত কমলের তখন স্বাস হো। হবার মত মনে হচ্ছে। কিন্তু সে-স্বর্ণাঘাত চেয়েও এই লোকটার স্বর্ণিত ক্ষমাভিক্ষাব নিল্লঙ্ঘ দুঃসাহস তার অসম্ব বোধ হ'তে লাগল। কোন রকমে সে ছুটে ঘরের বাইরে বেরিয়ে চলে গেল; এবং ঝঞ্জাস্কর নিরাশ্রয় সমুদ্রের মত এক খণ্ড কাঠের টুকরো নিমজ্জমান লোকে যেমন করে ছ'ড়িয়ে ধবে, পাশেব ঘরে ছুটে

গিয়ে সে অজ্ঞকে তেমনই ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরে “মা, মাগো” বলতে বলতে উদ্বেল হয়ে কাঁদতে লাগল।

এত আঘাতের মধ্যেও যে মালতী তার স্বামীর কর্তৃত্বর স্তনে আবার উৎকর্ষ হয়ে তার কথা শুনতে পারে, তা ভারলে অবাক হ'তে হয়। দুঃখের নিরতিশয় বেদনাব পীড়ন সত্ত্বেও সে তার স্বামীর কথার আশ্রয়ে হাতের উপর তর দিয়ে অল্প উচু হয়ে শুনতে লাগল, “আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। কোন পাপ” ইত্যাদি।

প্রথমবার পাশে ঘরে ঢুকে নন্দকে ছত্রিশোন্মুখ দেখে স্বভাবতই তার মন কমল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাব স্বামীর এই শেষ কথাগুলোতে সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে কমল সম্পূর্ণ নির্দোষ। এবং আপনিই তার মনেব বেদনা অনেকটা যেন লঘু হয়ে এল। তার একমাত্রকে যে অস্ত্রে গ্রাস ক'বে নেয নি, জীলোত্তের পক্ষে তা নিতান্ত অল্প সাধনার কারণ নয়। তা ছাড়া মালতী ইংবেজী-সাহিত্যচারী আধুনিকদের সূক্ষ্ম দাম্পত্য-তত্ত্ব অভিজ্ঞ নয়। অতএব পুরুষেব জীব প্রাতি পাল্টা কর্তব্যনীতির বিচার সম্বন্ধে তার মতামত নিদারুণ রকমের কঠিন ছিল না। যেখানে তার দুর্লভ্য অভিমান নিয়ে দুঃসরিজ স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে একাকিনী জাপন বাপন করবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত ছিল, সেখানে সে মাত্র ক্রোধে উত্তত হয়ে রইল। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কমলের উজ্জ্বলিত ক্রন্দনে, তার অভিশপ্ত দুঃখময় জীবনের প্রাতি করুণায়, মালতীর স্বভাবপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ চিত্তের এই ক্রোধের উতাপ কখন এক সময় শান্ত হয়ে এল। সে ধীরে ধীরে উঠে কমলের পাশে গিয়ে বসল এবং বোধ করি এক রকম স্বামীর অপবাদেরই অল্পতপ্ত হয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে নীবেবে সাধনা দিতে লাগল।

সত্যবানের মৃত্যুতে সীমার মন নৃশংস ভবিষ্যতের নিষ্ঠুরতার উপর অসহায় আক্রোশে আহত বশিষ্ঠের অন্ধ পুচ্ছের মত উত্তত হয়ে ছিল; প্রতিহিংসার মূঢ় উত্তেজনায় তার চিত্ত পরিপূর্ণ; তবু নিখিলনাথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন আবার বনের মধ্যে প্রবেশ

করলে তখন সেই প্রথম তার নিজেকে সত্যই নিরাশ্রয় নিঃসহায় ব'লে মনে হ'তে লাগল। তার দাদার আকর্ষণে সে যে-দলের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই একে একে নিজের নিজের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের কর্তব্য পালন ক'বে চলে গেল। মুমূর্ষু সত্যবানও তার আশ্রয়স্বরূপ ছিল। শুধু তার বুদ্ধি বা পরিচালনা-শক্তির জ্ঞান নষ্ট—সত্যবানের মৃতকল্প দেহটাকে রক্ষা ক'রে বেড়ানোর অচিন্ত্য বিপদেব সঙ্গে যুদ্ধ করাও যেন তার অসহায় নির্জিক্ত দেশের আত্মমর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার সমান—এই কাজটি তার মনকে তার অস্তিত্বকে অল্প আশ্রয় দেয় নি। আর আজ! সে সর্বস্বহারার মত—সহায়হীন সশলশূণ্য, আশ্রয় মাত্র তার অন্তরের অনির্বাক্য দেশপ্রীতি। তারও স্পষ্ট রূপ তার ভাই তার সঙ্গীদেব মৃত্যুর রূপে ঢাকা প'ড়ে, জাগিয়ে রেখেছে তার হৃদয়ে একটা জালাময় জিহ্বাসা মাত্র। তার না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে সংযম।

নিখিলনাথকে নক্ষত্রখচিত স্তর আকাশের তলে যে একাকী পবিত্যাগ করে চলে এসেছে, প্রদোষাঙ্ককারে স্নাত দিগন্তবিস্তৃত মহাপ্রান্তরের ফুলে পরিত্যক্ত সেই একক নিখিলনাথের নিঃসঙ্গতা তাব নিঃসহায় চিত্তে একটা অবোধ বেদনার মত ধীরে ধীরে তার অজ্ঞাতে তাকে আচ্ছন্ন ক'বে ধবলে। নিখিলনাথের সত্তেজ উন্নত মহৎব্যঞ্জক মূর্তির অন্তরালে যে করুণামণ্ডিত ব্যাকুল অন্তবাসীকে তাব বিদায়ের মুহূর্তে সীমা অপমানের আঘাত করে এসেছে, নিখিলনাথের সেই স্নেহকরণ মুখশ্রী এই বনানীর নিবিড় অন্ধকার পটে তার অল্পতপ্ত মনের সামনে ভেসে উঠল। তার অকারণ রূঢ়তার জন্তে অল্পতপ্ত চিত্তে সে নিজেকে তিবন্ধার করলে।

তবু তাকে থামলে চলবে না। পূর্ণ ক'রে তুলতে হবে তাব দাদার অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে, সত্যবানের দুর্ভিক্ষ সাধনাকে। কিন্তু কি সেই সাধনার প্রকৃতি তা সে জানে না—তার বাইরের বহিরূপ সে দেখেছে মাত্র এবং সেই রূপেই তাব তরুণ হৃদয় প্রদীপ্ত। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে তীব্র, কিন্তু স্বাধীনতার রূপ তার কাছে স্পষ্ট নয়। তাই তাব দাদা এবং তার সঙ্গীদেব মৃত্যুতে যে প্রতিহিংসার আশ্রয় তাব চিত্তে বহিমান হয়েছিল, দেশ এবং স্বাধীনতার

প্রতীক স্বরূপ তাকেই সে অন্তরে মেনে নিলে এবং তার সহায়তীন অস্তিত্বের সমস্ত উপটৌড়মান অবসাদকে দূতবলে দূর করে দিয়ে সে বেবিয়ে পড়ল আপন কর্তব্যে। তার চিন্তে সংশয়মাত্র রইল না যে, সে দেশেরই মঙ্গলের জহু দেশেরই মুক্তির জন্ত তার ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ কবতে চলেছে প্রতিহিংসাই যে তাকে তার এই দারুণ পন্থায় দেশোদ্ধারে অল্পপ্রেরণা দান করছে, নিজেকে এমন করে বোঝাবার ঐশ্বর্য তার ছিল না। অনাহাবে অনিচ্ছায় অসহায় নিরাশ্রয়ভাবে ঘুরে ঘুরে সীমা অবশেষে কলকাতার নিজের কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে পড়ে কতবার সে নিখিলনাথের কথা ভেবেছে। সামান্য আহার-সংস্থানের জন্ত যখন তাকে ছদ্মবেশে ভিক্ষারস্ত্রি অবলম্বন করতে হয়েছে, তখন কতবার ভেবেছে সে নিখিলনাথের কথা; কিন্তু যাবে সে নিজের উদ্ধৃত ধুটতায় উপহাস কবে চলে এসেছে, দীন ভিখারিণীর মত তার কাছে যেতে সীমা বারংবার সঙ্কোচে বাধা পেয়েছে। তবু এই অদর্শনের মধ্যেও নিজের অন্তরলোকে নিখিলনাথ চিন্তার মধ্যে দিয়ে তার নিকটে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চার-পাঁচ মাস পূর্বের কথা। এখন অনিন্দিতা দেবী “নাবীভবনে” তাকে সীমা বলে কেউ জানে না। তার চতুর্দিকে এই কয়মাসেই অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একত্রিত হয়েছে। অধিকাংশই কলেজের ছাত্র ও ছাত্রী। সীমান পূর্বপরিচিত রঙ্গলালের সাহায্যে সে নানা প্রতিষ্ঠান গতে তুলেছে।

রঙ্গলাল ছিল মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। পূর্বে সে তাদের দলের বাইবের সীমান্তপ্রদেশে পরিচিত ছিল। তখনও সীমা এই দলে প্রবেশ করে নি। তার দাদাব সন্তো রঙ্গলালের পরিচয়ের সূত্রে বরাহনগরে সে তাদের বাড়ীতে যাতায়াত করত। তখন রঙ্গলালের কাজই ছিল সীমাকে আতঙ্ক-পন্থায় অল্পপ্রাণিত করতে চেষ্টা করা। তার নিজের মা ও বাবার যত্নে একদিন অকস্মাৎ তার চিন্তা পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং বহুদিন সীমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় নি।

সীমা তাকে অনেক কষ্টে আবিষ্কার করলে এবং রঙ্গলাল

সীমার প্রধান কর্মকর্তা রূপে দেশের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান থেকে বেছে উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহে লেগে গেল।

সীমা এই সকল কাজের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকত না। নানা স্থান পরিবর্তনের পর সম্প্রতি তার নিজের আন্তান ছিল দমদমেব একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে। এই আন্তানাটি মাত্র চার-পাঁচ জন ব্যতীত অল্প সকলের অপরিচ্ছাদিত ও অনধিগম্য ছিল। অধিকাংশ তরুণ কর্মীর সঙ্গে সীমার কোন পরিচয় ছিল না এবং সীমা বা তার সঙ্গীদের কোন সন্ধান তাদের দেওয়া হত না।

নারীভবন-সংক্রান্ত একটি বিদ্যালয়ে সে নিয়মিত অধ্যাপনা করত এবং সেখানে খাতায় নাম লিখিয়ে অনিন্দিতা দেবী “অন্টেন্সিবল মীনস্ অব্ লাইভলিহুডের” ব্যবস্থা কবতেন। একমাত্র এই নারীভবন-পরিচালনাতেই তার হাত ছিল; এবং এই প্রতিষ্ঠানটিব সঙ্গে তার মূল কর্ম-প্রবাহেব সে কোন যোগ রাখে নি।

এমনি করে তাদের কাজের ক্ষেত্র যেমন প্রসারিত হতে লাগল অর্থের প্রয়োজনও তেমনই বেড়ে চলল। এই অর্থের অনটনের সূত্রে একদা বহুকাল পর সে নিজেকে অনিন্দিতা দেবীর ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিখিলনাথের হাসপাতালের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। দরওয়ান এবারে তাকে লম্বা একটা সেলাম জানিয়ে তৎক্ষণাৎ নিখিলনাথের কক্ষে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে। দরওয়ান যে তাব ছদ্মবেশ সন্দেহও তাকে চিন্তে পেরেছে, এতে সীমার মনটা একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

৪২

নিখিলনাথ যা শুনলে তাতে মোটামুটি কতকটা সন্তুষ্ট এবং অনেকটা পরিমাণে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, “আমার সাহায্যত অর্থসাহায্য কবতে আমি নিশ্চয়ই ক্রটি করব না। মাহুকের কল্যাণসাধনের জন্ত তোমার এই উদ্যম যাতে সফল হ'তে পারে তা করতেও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।”

সীমা মনের কথাটা চেপে রেখে বললে “মাহুকের কল্যাণেব জন্তে আমার মাথাব্যথা নেই ডাক্তারবাবু, আমি দেশেব স্বাধীনতা চাই; তা বই আর কিছুতে আমাব আবশ্যক নেই।” নিখিলনাথ একটু হেসে বললে, “বেশ ত, যাদেব জন্ত

স্বাধীনতা কামনা কবছ তারাও ত মানুষ। তাদের কল্যাণ সাধন করলেই মানুষের কল্যাণ হ'ল বই কি ?”

সীমাব মনে নিখিলকে প্রতারণা করে তার অর্থ নিতে বাধ্যছিল। সে একটু ঝাঁজ দিয়ে বললে, “আপনি কি মনে করেন এইসব লোকের আপাত-দুর্গতি আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে? কতকগুলো মানুষকে চিরদাসত্বের মধ্যে আরামে রাখায় কোন পৌরুষ আছে কি? আমি অস্ত্র উদ্দেশ্যে এসব করেছি।”

নিখিলনাথ তার মুখের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু হয়ে চাইলে। চারিদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে সীমা বললে, “এই ভিজে কাঠিগুলোর যেটার মধ্যে এতটুকু ‘ফুল্লি’ জীবিত আছে তাকেই আমি জালিয়ে তুলতে চাই।”

তার পর নিখিলনাথের মুখের দিকে চেয়ে তার ভাবখানা দেখে একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, “আমি জানি আমি যা করতে যাচ্ছি আপনি তা পছন্দ করবেন না। তবু এ-ব্রত আমাকে সাধন করতেই হবে—নইলে আমার নিস্তার নেই। মৃতকল্প লোকগুলোকে নিশ্চিন্তে মবতে দিয়ে তাদের হিতসাধন করবার পরিহাস করা শুধু কাপুরুষতা নয়—নিষ্ঠুরতা।”

নিখিলনাথ স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে রইল। সত্যবানের শেষ অনুরোধ তার কানে এসে বাজতে লাগল, “শুকে তুই দাবানল থেকে বাঁচ।” কিন্তু কি ক'বে! কি ক'রে এই আশুন নেবাবে? কোন উপায় যেন সে ভেবে উঠতে পারে না। এইটুকু তার বুঝতে দেয়নি হয়নি যে কোন স্বকুমার প্রলোভনে সে সীমাকে ফেরাতে পারবে না। তবে সে কি করবে?

নিখিল থেমে থেমে বললে, “আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার ঐ নিদারুণ পক্ষা ছেড়ে দিয়ে জনসেবা—”

“সেই জন্তেই ত এগুলোর দরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া দেশে যেসব ছেলেমেয়ের মধ্যে এতটুকু প্রাণ বা মনুষ্যত্ব আছে তাদের নিরাপদে আত্মান ক'রে একত্র করবার আর কি উপায় আছে বলুন ত? এই সেবার আত্মানেই সেই জ্যান্ত ছেলেমেয়েগুলোকে সহজেই এক জায়গায় পাব, তাই ত এত সব কাণ্ডকারখানা। নইলে দেশের মানুষ-

গুলোর মধ্যে প্রাণের আশুন বধন নিবে এল, তখন সাড়ম্বরে জনহিত করবার মত সখ আমার নেই।”

এতক্ষণ নিখিল মনে মনে যে আশা তার অন্তকারের মধ্যে দূরতম নক্ষত্রের আলোকের মত পোষণ করেছিল তাও যেন সহসা নিবে গেল। সে কি করবে? কেমন ক'রে সে সীমাকে বাঁচাবে? এমন ভয়ানক কাজে সে তাকে কেমন ক'রে সাহায্য করবে! তা সে কিছুতেই পারবে না। তবু তাকে তার নিসঙ্গ সর্বনাশের বেড়াঙ্গালের মধ্যে সে কেমন ক'রেই বা পরিত্যাগ করবে?

নিখিলের মুখ দেখে তার মনের কথাটা অল্পভব ক'রে সীমা একটু লজ্জিত হ'ল। সেই সঙ্কোচটাকে জোর ক'রে তাড়াবার জন্তে সীমা হেসে বললে, “আপনাকে সব স্পষ্ট ক'রে খুলে বললাম, আপনি এখন আপনার নীতিবিদ্যালয়ের উপদেশমালা বেব কবতে পারেন।” বলে নিজের মনকে চাপা দেবার জন্তে, যেন কি একটা রসিকতা করেছে এইভাবে জোর করে হাসতে লাগল।

নিখিল প্রথমে তাকে সত্যবানের কথা বলে নিরস্ত কববার চেষ্টা করলে। বললে, “সত্যদা অনেক মিনতি ক'রে তোমাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত হ'তে বলে গেছেন। সেই মৃত মহাত্মাকে কি তোমার অসম্মান করা উচিত?”

“মৃত মহাত্মার জীবন্ত অবস্থায় তাঁর কাছে যে দীক্ষা পেয়েছি তার চেয়ে বড় আমার কাছে কিছু নেই। মৃত্যুর দবজা থেকে তিনি যা বলে গেছেন, তাতে জীবিতের রসদ জোগানো যাবে না।”

“তিনি বলে গেছেন ‘প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়, প্রাণ নিলে নথ’—এটা জীবিতের জন্তেই, মৃতের জন্তে বলেন নি।”

“মানুষ হত্যা করাব সখ আমার নেই। আজ কোন মন্ত্রে এই হীনতা থেকে আমাদের মুক্তি দিন, কাল দেখবেন তুলসীব মালা হাতে ক'রে সান্ত্বিক হয়েছি। এ সবই আপনি আমার চেয়েও ভাল ক'রে বোঝেন; তবে কেন একজন মহৎ লোকের মৃত্যুসময়ের বিপর্যস্ত মনের কথা ব'লে তাঁকে ছোট করছেন?”

নিখিল দেখলে যে সত্যবানের কথা ব'লে তাকে নিরস্ত

করবাব চেষ্টা করা বুঝা। সত্যবানের অনেক দিনের শিক্ষা সীমার অন্তরে গভীরভাবে প্রবেশ কবেছে; সত্যবানের যুত্য়-কালীন একদিনের উক্তি তাকে উৎপাটন করবে তার সম্ভাবনা কম। তখন সে তর্ক স্বক করলে; বললে, “এমনি ক’রে একটা ছোটো পাঁচটা খুন ক’রে দেশকে মুক্তি দান কববে, এর চেয়ে বাতুলের কথা কিছু হ’তে পারে না। ওতে শুধু দেশের লোককেই বিপর্যস্ত ক’বে তাদের হৃৎকের উপরে দুর্দশার কারণ ঘটানো ছাড়া আর কোন উপকার হবে না।”

“একটা দেশের উপর লড়াই চললে এর চেয়ে অনেক দুঃখদুর্দশা সে-দেশের লোককে ভোগ করতে হয়। হতরাং আপাত-দুঃখটাকেই বড় ক’রে দেখবাব কোন আবশ্যক নেই। ভয়েতে সব কিছু মেনে নেবার নিদারুণ উদ্বেগহীনতা থেকে তাদের নির্ভয়ে মাথা তুলে অস্ত্রায়ের বিক্রমে সোজা হয়ে দাঁড়াবার তেজ দিতে চাই আমরা।”

“অস্ত্রায়ের বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি একটা নৈতিক বল। সেটাকে একটা পশুশক্তির মত করে জাগাতে গেলে সেই নৈতিক বলেরই মহামুত্য় ঘটবে। কুহুরকে মারলে সে তেড়ে আসে কামড়াতে। আরও জোরে মারলে পারলে সে পালায়—কারণ, পশুশক্তি সে-ক্ষেত্রে যে মারে তার বেশী; কাবণ, পশুশক্তির উপরে যে কথা, যা দিয়ে সে মার খেয়েও নিজেকে অস্ত্রায়ের কাছে হার মানতে দেবে না, কুহুরেব তা নেই। তার শক্তির সীমা ঐ পর্যন্ত। কিন্তু নৈতিক বলের ত কোন সীমা নেই, তাই তাকে ক্রুশে বিন্দু ক’রে মারলেও সে জয়লাভ করে; তাকে মশাল ক’রে পুড়িয়ে মারলেও সে মরে না, হাতীর পায়ের তলায় ফেললেও না। নিতান্ত উত্তেজিত না-হয়ে এই কথাটা যদি ভেবে দেখে যে একটা যুক্তকল্প ঘোড়াকে চাবুক মারলেই তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না, তাহলে এই কোটি কোটি দুর্দল, নিরস্ত্র মুঢ় ভাইবোনদের সম্বন্ধে তোমার করুণা হবে। সত্যদা বলেছিলেন যে ‘হাজার বছরের চাপে যার শিরদাঁড়া ভুয়ে পড়েছে তার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আসবে কোথেকে? সেই ঝাঁক শিরদাঁড়ার রীতিমত চিকিৎসা চাই আগে, তা নইলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে’। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একথা যদি ভুলে যাই, তবে ক্রোধেব

বিলাসে নবহত্যার পাপেই লিপ্ত হ’তে হবে, আর কিছু হবে না।”

সীমা চুপ করে থাকে। তাব মনেব মধ্যে প্রতিহিংসাব আশুনে নিখিলনাথের কথাগুলো পুড় ছাই হয়ে যায়। সে উত্তেজিত হয়ে নিখিলনাথকে ‘বিলাতী মোহগ্রস্ত’ বলে খোঁচা দেয়। নিখিলনাথ চুপ ক’রে শোনে। ও কথার কোন জবাব দেয় না; তবু সীমার অশ্রদ্ধায় তার মন ব্যথায় ভরে ওঠে। সীমা ক্রুদ্ধ মনে ভাবে, এমনি ক’রে ভাবতে গিয়ে চিরকাল আমার কাপুরুষ হয়ে রইলাম। স্বাধীনতার মুখ আমরা কোনকালেই দেখতে পাব না। চিরকালটা যে তার জীবিতকালেই রাজ সীমাবদ্ধ নয়, তা তার মন মানতে চায় না। ভাবতে চায় যে, এমন বিপ্লব উপস্থিত করবে যে যার বড়ে দেশেব সমস্ত দুঃখ দৈন্ত হীনতা একদিনে উড়ে যাবে এবং নিজ হাতে নিজেদের স্বত্বসম্পন্ন স্বাধীনতাব রাজপ্রাসাদ আলাদীনের প্রদীপের মত এনে প্রতিষ্ঠিত করবে। তার উত্তেজিত মনের এই নাটকীয় কল্পনাকে সে মনে মনে দেশহিতেব আসনে প্রতিষ্ঠিত ক’রে এক প্রকার তৃপ্তি পায়, আশ্বস্ত্রাসাদ লাভ করে। উত্তেজনার বিলাসে তার মনেব পক্ষে অপেক্ষাকৃত জটিল দুঃখ শাস্ত বিচাবণালী পছাকে স্থির হয়ে চিন্তা করবার বৈধ্য তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। শাস্ত ধীবতাকে সে কাপুরুষতা বলে মনে মনে ঘৃণা কবতে থাকে। তবু একলা বঁসে বঁসে নিখিলের প্রতি নিজের উত্তপ্ত চিত্তেব দুর্বাক্যের কথা স্মরণ ক’রে সে লজ্জিত হয়।

নিখিলনাথের সমস্ত শাস্ত অল্পপজ্ঞত ধারাবাহিক জীবনযাত্রায় দেশের মঙ্গলসাধনের চেষ্টা তার উত্তেজিত চিত্তে যেন প্রহসন বলে মনে হয়। সীমা চায় সে-ক্ষেত্র থেকে তাকে সবলে উৎপাটন ক’রে দুঃখ মুত্য়পথযাত্রার দুর্দ্বর্ষ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে মুক্তি দিতে। নিখিলনাথকে সে ফিবে পেতে চায় তার কর্মক্ষেত্রের সঙ্গীতপে; বুদ্ধিব উপর যে আলোকসম্পাত কববে, হৃদয়ে যে শক্তি সঞ্চার করবে, নিজের প্রাণের অমিত প্রার্থ্যে দুর্লভ্য বিপত্তিকে যে ধূলিসাৎ ক’বে দেবে। নিখিলনাথের শাস্ত ধীবতাকে সে উদাসীনতা বলে মনে ক’রে তীব্র আঘাতে তাকে চেতিয়ে তুলতে চায়—কিন্তু তাকে দিনের পর দিন অশান্তি তার বেড়ে চলে। (ক্রমশঃ)

ভারতে পল্লী-উন্নয়ন কার্য

শ্রীযতীশকুমার মজুমদার, এম্-এ, পি-এইচ্‌ডি, বার-এট্‌-ল

ভারত পল্লী-প্রধান ও পল্লী-প্রাণ। পূর্বে ভারতের পল্লী-গুলির যে শ্রী-সম্পদ ভারতকে “সোনার ভারত” নামে পরিচিত করিয়াছিল তাহার বহুলাংশই এক্ষণে নষ্ট হইয়াছে। আজ যে ভারতের হুং-হুঙ্কার ব্যাপার এত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূলে পল্লীগুলির প্রতি লোক-ও জন-মতের ঐদাসীন্দ্ৰ ও ইহার উন্নয়নে নিশ্চেষ্টতা। এই ঐদাসীন্দ্ৰ ও নিশ্চেষ্টতার ফল বহুকাল হইতে সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত হইয়া এক্ষণে এক বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ইহা যে এক ভয়াবহ ব্যাপার তাহা এক দিকে দেশের লোক যেমন এক্ষণে বুঝিয়াছেন, গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষও তাহা বুঝিতেছেন, এবং ইহা নিবারণে যে উভয়েরই এক প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তাহাও তাঁহাদের নিকট প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাই এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে পল্লী-উন্নয়নের কথা ও তাহা বিধানের চেষ্টা এক দিকে যেকণ দেশের নেতাদের আদর্শ হইয়াছে, অপর দিকে গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষও তাহাতে অবহিত হইয়াছেন। ইহা যে দেশে পক্ষে পরম কল্যাণের বিষয় সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য।

যদিও ব্রিটিশ শাসনাধীনে কতকগুলি সহর প্রভৃতিব উদ্ভব হইয়া অনেক ভারতীয়ের এক অভূতপূর্ব ভাগ্যোন্নতি ও সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু ইহার দ্বারা পল্লীগুলির উন্নয়ন সাধিত বা তাহাব সাধনকার্যে যদি সহায়তা না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার জ্ঞান ভারতকে শ্রী-সম্পদশালী বলা যায় না, এবং কালে বা পরিণামে পল্লীবাসীদের এই চরম দুঃবস্থা যেমন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের অবস্থাকে অভিভূত করিতে পারে, তেমনি অপর দিকে ইহা ভারতের স্বাধীন-সমৃদ্ধি পথেও বাধা বা কটক-স্বরূপ হইতে পারে। এক্ষণে ভাবতে যে অর্থনৈতিক সমস্তা বা পরিস্থিতিব উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে দেশের নেতারা ও গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষও ইহার ষাধার্থ্য বেশ অল্পভব করিতেছেন বলা যায়। সেই জ্ঞান সকলেই দৃষ্টি এক্ষণে এই দিকে এত পতিত হইয়াছে। যাহা হউক, এ

বিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে ভারতে এক্ষণে কি কার্য হইতেছে তাহার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

যদিও ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন উদ্ভবের প্রারম্ভ হইতেই দেশেব নেতাদের ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতে রাজকর্তৃপক্ষেরও প্রজ্ঞা প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতির দিকে দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি যে-ভাবে এই দিকে কি দেশের নেতাদের, কি রাজ-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে তাহার এক বৈশিষ্ট্য আছে বলা যায়। কি ভাবতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে, কি গভর্নমেন্টের রাজ্যশাসননীতিতে এক্ষণে রায়ত প্রভৃতিদের অবস্থোন্নতি বা এক কথায় পল্লী-উন্নয়নের প্রতি যে দৃষ্টি পতিত হইয়াছে দেখা যায় তাহার স্থান শীর্ষে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এবং এ-কথা উল্লেখ করিলে উপযুক্তই হইবে যে, এ-বিষয়ে বর্তমান কংগ্রেস নেতারা অগ্রণী হইয়া যে জনমত জাগ্রত কবিত্তে সমর্থ হন তাহাতে এক দিকে যেমন দেশের নেতা প্রভৃতিরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, তেমনি অপর দিকে গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষও এ-বিষয়ে অধিকতর অবহিত হইয়াছেন। এক্ষণে কংগ্রেস ও গভর্নমেন্ট পক্ষ হইতে ভারতের পল্লী-উন্নয়ন কার্য কিরূপ চলিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক।

প্রথমে কংগ্রেসের প্রচেষ্টার কথা ধরা যাক। গত কয়েক বৎসর হইতে কংগ্রেস ভারতের পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে যাহা করিয়াছেন তাহার বিষয় অল্পবিস্তর অনেকেই অবগত আছেন। কংগ্রেসের দ্বায় দেশের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই দিকে অধিকতর দৃষ্টি-ব্রত করা যে এক অতি উপযুক্ত ও প্রশংসনীয় কার্য সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য। মহাত্মা গান্ধী কিছু কাল পূর্বে যে তিলক স্বরাজ ফণ্ড তুলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উক্ত কার্য সাধনার্থ মজুত রাখায় কংগ্রেসের এ-বিষয়ে অধিক কার্য করিবার

স্বযোগ ও সজ্জিত হয়। কিন্তু অনেকেই মনে করিয়া থাকেন যে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাজনৈতিক ব্যাপারেই অধিকতর জ্ঞাত থাকায় এ-বিষয়ে যতটা কার্য হইবার সম্ভাবনা ছিল বা লোকে আশা করিয়াছিল তাহা হয় নাই। পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে কংগ্রেসের কার্য যে যথেষ্ট বা আশানুরূপ হয় নাই তাহার প্রমাণ পরে গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভাবত গ্রাম-উন্নয়ন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইতেই বেশ পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি যখন রাজনীতিক্ষেত্রে হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল পল্লী-উন্নয়ন কার্যেই নিয়োজিত করিবেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার উক্ত গ্রাম-উন্নয়ন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। তিনি ইহার জন্ম ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অনেক অর্থও সংগ্রহ করিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা দেশে হইতে যে প্রায় লক্ষ টাকা উঠিয়াছিল সে-কথা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে। এই সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় হইয়াছে বর্ধা (Wardha) সহরে। শেঠ যমুনালাল বাজাজ ইহার জন্ম একটি প্রকাণ্ড বাড়ী ৩ ৪৫ বিঘা জমী এক কালে দান করিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশে এই সঙ্ঘের কার্য খাদি-প্রতিষ্ঠান মারফতই চলিতেছে। উক্ত গ্রাম-উন্নয়ন সঙ্ঘ প্রথম বার্ষিক কার্য-বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, উক্ত সঙ্ঘ এক্ষণে প্রধানতঃ গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যগোষ্ঠীতে তাহাদিগকে উপযুক্ত আহাৰ্য্য দানের ব্যবস্থাতে মনোযোগী হইয়াছেন। ইহার দ্বারা কুটীর-গিল্লেরও প্রকারান্তরে সাহায্য করা হইবে। সঙ্ঘ গুড় প্রস্তুত নাবিকেল-ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত, কাগড় কাচা সাবান প্রস্তুত, চামড়া কষ করিয়া তাহা হইতে জুতা তৈরি করা, সযা শিমের চাষ, প্রভৃতি কার্যে লোককে উৎসাহ দান করিতেছেন। এই সঙ্ঘের কার্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিরূপ চলিতেছে তাহার বিষয় আলোচনা না করিয়া আমাদের বাংলা দেশে ইহা কিরূপ চলিতেছে তাহার বিষয় দুই-চারি কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। প্রবাসী-গত বৎসরের ফাস্তন সংখ্যায় খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রধান-কর্মকর্তা সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে এ-বিষয়ের খবর পাঠকবর্গ পাইয়াছেন। বাংলা দেশে পল্লী-উন্নয়ন কার্যে এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি কি করিতেছেন তাহা

যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার পুনরুক্তি এখানে নিম্নয়োজন। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রতিষ্ঠানটি যে-ভাবে কতকগুলি গ্রামকে কোন কোন বিষয়ে সাবলম্বী করিতে ও কুটীর-শিল্প প্রভৃতির উন্নয়ন মনোযোগী হইয়াছেন তাহা উপযুক্ত ও প্রশংসনীয়ই হইয়াছে।

উপরে পল্লী-উন্নয়ন কার্যে কংগ্রেসের প্রচেষ্টার কথা বলা হইল, এক্ষণে উক্ত কার্যে গভর্ণমেন্টের প্রচেষ্টার কথা সংক্ষেপে কিছু বলিব, কারণ এক্ষণে সকলেই দেখিতেছেন যে কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন অবশ্য এ-কথা বলিলে ভুল হইবে যে, পূর্বে এ-বিষয়ে গভর্ণমেন্টের কোনও চেষ্টা ছিল না, কারণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে বাষত প্রভৃতিদের অবস্থানোতিবন্ধে গভর্ণমেন্ট-কর্তৃপক্ষ ভারতে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই অবহিত ছিলেন। তবে এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্বে এ-বিষয়ে গভর্ণমেন্টের যতটা মনোযোগ ব চেষ্টা ছিল তাহাপেক্ষা এক্ষণে তাহা অনেক গুণ বদ্ধিত হইয়াছে। এরূপ বদ্ধিত হইবার কারণও আছে। আমি গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতের পল্লীগুলির দুঃখ-হুর্দশা বা শ্রীহীনতার জন্ম ভারতীয় জনমতের ঔদাসীন্দ্যও দায়ী। এ-কথা কেবল ভাবতের পক্ষে নহে, স্বাধীন দেশের পক্ষেও সত্য, জনমতই জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রক্ষাকর্তা। এবং বলা যায় যে এক্ষণে কংগ্রেস সেই জনমত দেশে জাগ্রত করিয়া রাজকর্তৃপক্ষকে দেশের এই গঠনমূলক কার্যে অধিকতর অবহিত করিয়াছেন। তার পর আর একটি কথাও আছে। অনেক ভারতীয়দের এত দিন মনোভাব ছিল যে, লোকের সকল অভাব-অভিযোগ নিবারণ করা বা তাহার উপায় অবলম্বন করার কর্তব্য প্রধানতঃ গভর্ণমেন্টেরই, ইহা ভ্রান্ত। এমন কি ইংলণ্ডেও সত্য স্বাধীন দেশেও দেখা যায় যে, জনহিতকর অধিকাংশ কার্য বা ব্যাপারে লোকেরাই প্রথম অগ্রণী হন, এবং গভর্ণমেন্ট পরে অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। কাজেই আমাদের দেশেও যে অল্পকণ উদ্যোগবিশেষ আবশ্যকতা আছে সে-বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, কংগ্রেস এক্ষণে দেশের এরূপ এক গঠনমূলক কার্যে অগ্রসর হইয়া দেশীয় পক্ষে যে এই কর্তব্যের

অবহেলা নুব করিয়া এক উপযুক্ত কর্মই করিয়াছেন তাহার বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহাদেব উদ্ভাবিত স্কীম বা উপায় কোন কোন ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট গ্রহণ কবিয়া কার্যকরী করিতেও প্রস্তুত। তাহাব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমবা পাই। হয়ত কেহ কেহ অবগত থাকিতে পারেন যে, দেশবন্ধু দাশ তাঁহাব জীবিতকালে বাংলাব গ্রামগুলি হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে স্কীম প্রস্তুত কবেন, বাংলা গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ তাহা উপযুক্ত বোধে গ্রহণ কবিয়া যে বহুল অর্থ প্রতি বৎসর এই নিমিত্ত ব্যয় করিয়া থাকেন ও তাহাব জন্য দেশবন্ধুর প্রতি নিজেদেব ঋণ স্বীকারও কবিয়া থাকেন, তাহা হইতেই উক্ত বাক্যের যথার্থ্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, এ-বিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া এক্ষণে পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বাংলা-গভর্নমেন্টের কার্য কোন পথে ও কি ভাবে উদ্ভূত হইয়া চলিতেছে তাহাব বিষয় কিছু বলা যাক।

সকলেই অবগত আছেন যে পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে এক্ষণে ভারতের প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলি যে ব্যাপক ও অধিকতর চেষ্টা চলিতেছে তাহা সম্প্রতি ভাবতের কেন্দ্র-গভর্নমেন্ট এতদর্থে যে প্রায় দুই কোটি টাকা নিজ তহবিল হইতে দান করিয়াছেন তাহার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। এই দান হইতে বাংলার ভাগ্যে মোট ৩৪ লক্ষ টাকা পড়িয়াছে। ভারতের কেন্দ্র-গভর্নমেন্টেব এই দান মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম-উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রতীতির পর ঘোষিত হওয়াব অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, কংগ্রেসের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইবাব জন্য গভর্নমেন্ট এই কার্যে অবহিত হইয়াছেন, ইত্যাদি। যাহা হউক, এখানে এই রাজনীতিক প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা করা আমাব উদ্দেশ্য নহে, তবে বাস্তবিক কংগ্রেসের এই জনহিতকর কার্য যদি গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষকে উক্ত কর্মে অধিকতর অবহিত কবিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে গভর্নমেন্টের লক্ষিত হইবাব কোন কারণ নাই এবং এ-বিষয়ে কংগ্রেসের নিকট নিজেদের ঋণ স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। তবে এই ধারণা লোকের মনে হইলে বোধ হয় খুবই দুঃখের কারণ হইবে যে, গভর্নমেন্ট উক্ত কর্মের দ্বারা কংগ্রেসের কার্যকে নষ্ট কবিতে চাহেন, কারণ ভারতের দ্বায় বিশাল দেশে ও যেখানে লোকের দুঃখ-দুর্দশাও অতি প্রবল,

স্থানে কোনও এক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিশেষ কিছু হওয়া কখনও সম্ভব নহে। এক দিকে গভর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে তাঁহাদের অর্থ ও সামর্থ্যই এই কার্যে যথেষ্ট তাহা যেমন ভ্রান্ত, সেইরূপ অপব দিকে যদি কংগ্রেসের বা দেশের লোক মনে করেন যে গভর্নমেন্টের সাহায্য ব্যতীত তাঁহাদের চেষ্টাই এ-বিষয়ে যথেষ্ট, তাহাও সেইরূপ ভ্রান্ত। বাস্তবিক কেবল দেশের মঙ্গলের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া যদি উভয়ে এক-যোগে কার্য করেন তবে ত সর্বাপেক্ষা উত্তমই হয়, আর তাহা না হইলেও যদি উভয়েব লক্ষ্য একমাত্র দেশের হিতের প্রতি নিহিত থাকে তাহা হইলেও শুভফল অধিকতর প্রসূত হয়। বাস্তবিক উভয় পক্ষেবই দৃষ্টি যদি প্রধানভাবে একমাত্র দেশের মঙ্গলের উপরই স্তম্ভ থাকে তাহা হইলে পরস্পরেব উপর এই ব্যাপাব লইয়া সন্দেহের কারণ থাকে না ও তাহা দেশের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলেরই কারণ হয়।

পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে ভারতের চারি দিকে এক্ষণে যে ব্যাপক উদ্যম চলিতেছে তাহাব সকলগুলির বিষয় আলোচনা না করিয়া বাংলা দেশে যে কার্য হইতেছে সংক্ষেপে তাহার মূল ভাব ও বিষয় আলোচনা করিলে গভর্নমেন্টের নীতির ও কার্যের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে। গত বৎসর বাংলা-গভর্নমেন্ট কেন্দ্র-গভর্নমেন্ট গ্র্যান্ট হইতে যে ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন তাহা পল্লী-উন্নয়নের নানা ব্যাপারে কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার বিবরণ গভর্নমেন্ট-প্রকাশিত নানা রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়, এবং তাহা পাঠকবর্গেরও নিকট অবিস্তিত নহে। কেন্দ্র-গভর্নমেন্ট হইতে উক্ত ১৬ লক্ষ টাকা পাইয়া বাংলা-গভর্নমেন্ট উহা ব্যয়ের যে স্কীম করেন তাহা গত বৎসর জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হয় ও তাহা লইয়া কাউন্সিলেও আলোচনা হয়। পল্লী-উন্নয়নের কোন কোন ব্যাপাব ব্যপদেশে গভর্নমেন্ট কত টাকা ব্যয় করিতে চাহেন তাহার একটি তালিকাও প্রকাশিত হয়, যাহার বিষয় পাঠকবর্গের এখনও স্মরণ থাকিতে পারে। এই তালিকায় দেখা যায় পল্লীগুলির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি নানা ব্যাপারের উন্নতিসাধনকল্পে গভর্নমেন্টের কার্য নিবন্ধ হয়, এবং ইহার জন্য উক্ত প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কি কি ভাবে উক্ত অর্থ নানা ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়াছে তাহার প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণই সংবাদপত্রাদিতে

প্রকাশিত হওয়ায় তাহার পুনরুদ্ধার নিশ্চয়োজ্ঞ মনে করি। এই বৎসর বাংলা-গভর্নমেন্ট পল্লী-উন্নয়ন কার্যের জন্ত যে আরও ১৮ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন তাহার ব্যয়ের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি এখনও প্রকাশিত না হইলেও ইহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে এই অর্থ যথেষ্ট না-হওয়ায় উহা অনেকগুলি ব্যাপারে ব্যয়িত হওয়া অপেক্ষা কয়েকটি বাছা বাছা নির্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে, যাহাতে ইহার দ্বারা সেই সেই ব্যাপারে যথেষ্ট উপকার সাধিত হইতে পারে। এই বিষয়ে জনসাধারণ ও দেশের নেতাদের একটি প্রধান কর্তব্য—কর্তৃপক্ষকে জানান কোন্ কোন্ বিষয়ে পল্লীগুলির অভাব-অভিযোগ সর্বাপেক্ষা অধিক ও যাহা নিবারণের আবশ্যিকতাও সর্বাগ্রে। স্বার্থের বিষয় এই যে, জনসাধারণ এক্ষণে গভর্নমেন্টের এই প্রচেষ্টায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা-কর্মচারীদের সহিত এ-বিষয়ে সহযোগ করিতেছেন।

এ-কথা সকলেই অগ্রভব করেন বা বুঝেন যে, বাংলার জায় এক বিশাল দেশে গভর্নমেন্ট প্রদত্ত উক্ত অর্থ পল্লী-উন্নয়ন কার্যের জন্ত অল্প বা অযথেষ্ট। এ-কথা যেমন জনসাধারণ অগ্রভব করেন, তেমনই গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষও তাহা অবগত আছেন। এবং এইরূপ অর্থদান যখন কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট হইতে প্রতি বৎসর পাইবার আশা নাই তখন কেবল অর্থের দ্বারা উক্ত কার্য যথেষ্ট হওয়াব সম্ভাবনা কত অল্প। সেই জন্ত গভর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষ এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাহা হইতেছে পল্লীবাসীদের স্ব-স্ব গ্রামের উন্নতি বা সংস্কারকার্যে স্বতঃপ্ররোচিত ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া ত্রুটি হইবার জন্ত প্রেরণা দান বা উদ্বোধন। জেলা কর্মচারীরা স্ব-স্ব জেলার প্রধান প্রধান লোকদের সহিত মিলিত হইয়া খাল-পুকুরিগী খনন, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতির ছাত্র কার্য নিজেরা স্বহস্তে করিয়া পল্লীবাসীদের প্রেরণা দান বা উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। তাহার উপর যাহাতে পল্লীবাসীদের উদ্যম এ-বিষয়ে অধিকতর প্রাণবান ও গতিশীল হয়

তাহার জন্ত পুরস্কার প্রদান করিয়া এক প্রতিযোগিতাও স্থাপন করিয়াছেন। ইহা “আদর্শ গ্রাম প্রতিযোগিতা” নামে বিদিত। এই উপায়ের দ্বারা গভর্নমেন্ট-কর্তৃপক্ষ বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিকল্প কার্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহারও বিবরণ সংবাদপত্রগুলিতে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হওয়ায় এখানে তাহার পুনরুদ্ধার নিশ্চয়োজ্ঞ। বাস্তবিক গভর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষের এই নূতন উপায়ের দ্বারা পল্লীবাসীরা নিজেরদের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া যে অপবেদ অপেক্ষা না রাখিয়াই স্ব-স্ব পল্লীব যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারিবে সে-বিষয়ে আশা বলাই বাহুল্য, এবং যিনি এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাঁহাকেও সমুদ্র প্রশংসা দান করিতে হইবে। এক্ষণে দেশের অন্তর্গত পল্লী-উন্নয়ন কার্যে ত্রুটি হইয়াছেন তাঁহাদের পল্লীবাসীদের স্বকর্তব্যবোধে উক্তকণ উদ্বুদ্ধ করার উপায়টি বিশেষ অনুকরণীয়। অর্থের সাহায্য অপেক্ষা ইহাব দ্বানাই পল্লী-উন্নয়ন কার্য বহুল পরিমাণে অধিকতর সম্ভব হইবে।

যাহা হউক, উপসংহারে আমরা বলিতে চাহি যে, যখন একেবারে অর্থ ব্যতীত কোন কার্যই সম্ভব নহে, তখন কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টই হউন বা প্রাদেশিক গভর্নমেন্টই হউন পল্লী-উন্নয়ন কার্যের জন্ত অধিক অর্থ মজুত রাখিবার কর্তব্যটি ভুলিবেন না, এবং তাঁহাদের উচ্চ কর্মচারীরা এক্ষণে যেভাবে পল্লীবাসীদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিতেছেন তাহা হইতেও নিবৃত্ত হইবেন না। কারণ, যে কারণই হউক, গভর্নমেন্টের জনপ্রিয়তার যেভাবে লাঘব ঘটয়াছে তাহা দূর কবিবার উপরিউক্ত কর্মই প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। লোকেরা যদি দেখেন ও বুঝেন যে রাজকর্তৃপক্ষ বাস্তবিকই তাঁহাদের স্ব-স্ব স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত এক্ষণে দেশীয় লোক অপেক্ষা অধিকতর উন্মুখ ও আগ্রহশীল তাহা হইলে ইহার দ্বারা সহজেই তাঁহারা যেরূপ জনসাধারণের চিন্তা জয় করিতে পারিবেন, তেমনি অপর দিকে দেশীয় নেতাদেরও প্রশংসাজ্ঞান হইতে পারিবেন।



বাউল-পরিবার
শ্রীমৈত্রী স্ত্রী

অসাধারণ

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কলিকাতার উপকণ্ঠে একখানি ছোট একতলা বাড়ী। জরাজীর্ণ, বার্ককোর অবসাদে মুহমান। সংস্কার অভাবে স্থানে স্থানে ধ্বংসিয়া গিয়াছে। বাহির হইতেই গৃহস্থামীর ঔদাসীন্য চোখে পড়ে। ভাঙাচোবা ইটের ফাঁকে ছোট-মাঝারি বহুবিধ জানা-অজানা গাছ জন্মিয়াছে। বাড়ীর সম্মুখ ভাগেই একখানি বাগান; কিন্তু অল্প, অল্পদূরে সেখানে কাঁটা-শাক দেখা দিয়াছে প্রচুর পরিমাণে। গোটাকয়েক পেঁপেগাছও দেখা যায়।

সময় বাত্মি প্রায় এগারটা। একটি শীর্ণকাষা জীলোক পলকহীন চোখে বাহিরের ক্লম রাস্তার প্রতি চাহিয়া আছে। চোখে মুখে আশঙ্কামিশ্রিত ব্যাকুল ভাব। চেহারা এক সময় ভালই ছিল, বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে ছিল একটি স্নিগ্ধ কমনীয় ভাব। কিন্তু রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মাংসের একান্ত অভাব দেখা দিয়াছে তার দেহে। কপালের শিরাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট, গায়েব বং সাদা—চক্ষু কোটরে কিন্তু অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে সজ্জ্বত বস্ত্রপশুব দ্বায় হিম্ম। মেজাজ খিটখিটে—একটুতেই চট্টা উঠে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও বাটিয়াছে পরিবর্তন।

সারা বাড়ীতে মানুষ মাত্র দু-জন—স্বামী এবং জী। স্বশাস্ত ও রাণী। ছেলেপিলে নাই। হইবার আশাও দেখা যায় না। বয়স গড়াইয়া গিয়াছে। যদিও এ-বয়সে হয়, কিন্তু রাণী তাহা স্বীকার করে না। তা ছাড়া ওর মতে তাদের ঘরে শিশুসন্তানের আবির্ভাব না-হওয়াই মঙ্গলজনক।

স্বশাস্ত নিয়মিত আপিস করে একটা সপ্তদ-গরী কোম্পানীতে। বেতন সামান্য, কোন রকমে কায়ক্রেপে নিজের মর্যাদা বাঁচাইয়া চলিবাব মত। নিরিবিলা লোক—আপিস এবং বাড়ী এই দুই হইল তার ছনিয়ার স্থানির্দিষ্ট সীমারেখা। কথা সে অত্যন্ত কম বলে—চলাফেরা হইতে আরম্ভ করিয়া তার কথা বলা পর্যন্ত ক্লটন-বাঁধ। এর

এতটুকু ব্যতিক্রম আজ দু-বছরের মধ্যে রাণীর চোখে পড়ে নাই।

রাণী অশাস্ত চরণে এ-ঘর ও-ঘর করিতেছিল।...সেই কোন সন্ধ্যারাত্রে সে রান্নাবান্না করিয়া বসিয়া আছে, আর আজই কিনা তাঁব যত রাজ্যের কাজ দেখা দিয়াছে। আশ্চর্য্য লোক বাহা হউক!—এমন লোক লইয়া মানুষের সংসার চলে কি করিয়া?

দীর্ঘ দুটি বছরের একঘেয়ে ইতিহাস রাণীর চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। চিন্তাধারা তার অল্প পথ ধরিয়া চলে। কলিকাতা শহর...রাণী ভাবে...প্রতি মুহূর্তে কত রকম বিপদের...কথাটা সম্পূর্ণরূপে ভাবিয়া দেখিতে গিয়া সে বাবুদার শিরিয়া ওঠে। তার দুর্বল মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তের দাপাদাপি শুরু হয়।

জ্যোৎস্না বাত। ও-পাশের বড় পেঁপেগাছটার ছায়া আসিয়া আঙিনায় পড়িয়াছে। সেই দিকে সহসা দৃষ্টি পড়িতেই রাণী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু স্বশাস্ত আসিল না। রাণী ভাবে, কিরিয়া আসিলে বেশ শক্ত দু-কথা শুনাইয়া দিবে। মরণ তার নাই, নইলে এ-রোগেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে। কপালে এমন দুর্ভোগ না থাকিলে...বাহিরে ডাক শোনা গেল,—শুনছ, দবজাটা খুলে দাও না।

বাণী যেন প্রস্তুত হইয়া ছিল এমনই ভাবে মুখ করিয়া উঠিল,—আজকের রাতে আর না ফিরলেই পারতে! কিন্তু দরজা খুলিয়া দিয়াই সে বদলাইয়া গেল। বলিল, আচ্ছা বাড়ীতে যে একটা রোগা লোক প'ড়ে বয়েছে সে কথা কি একবারও ভেবে দেখতে হয় না? একে ভুগছি রোগের জ্বালায় তার ওপব আবার জ্বোটাচ্ছ নানা উপসর্গ। আমাব কথা না-হয় ছেড়ে দিলাম—মেয়েমানুষ—কিন্তু এমনি অনিয়মে নিজের শরীর টিকবে কি ক'রে শুনি? এ সাধারণ কথাটা তুমি বোঝ না কেন?

এ-প্রশ্নেব পাণ্টা উত্তব ইচ্ছা করিলে স্বশাস্ত অনায়াসে

দিতে পারিত, কিন্তু সে সেদিক দিয়া গেল না বরং কথাটা তাব এক প্রকার মানিয়াই লইল এবং ধীরে ধীরে কপাটটা অর্গলরুদ্ধ করিয়া যুদ্ধকণ্ঠে কহিল, রাত একটু বেশী হয়ে গেছে। কি করি, স্থপ্রিয় কিছুতেই ছাড়লে না।

রাণী নির্লিপ্ত গলায় কহিল, তাও কি কখনও হয়! থাক না বাড়ীতে একটা রুগী জী! একটু থামিয়া সে পুনশ্চ কহিল, নাও, এবারে খেয়েদেয়ে আমাষ রেহাই দেবার ব্যবস্থা কর। কত আর বইব এ রোগী শরীর নিয়ে।

স্থশাস্ত ভীত কণ্ঠে কহিল, কোন কথাই তুমি শুনবে না তা আমি কি করব। ঠিকে কি একটা রেখে দিলাম—তুলে দিলে। কারণ দেখালে, দু-জনার দু-খানা বাসন বইত নয়। বোগী শরীর নিয়ে খেটে মরবে অথচ আমার প্রত্যেক কাজে জোর করে দেবে বাধা। তোমার এই খামখেয়ালীর সন্তাই ত এত কষ্ট পাচ্ছে।

রাণী ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠে উত্তর করিল, রাত দুপুরে বড় যে উপদেশ দিচ্ছ দেখছি, কিন্তু, জিজ্ঞেস করি, সব দিকে দৃষ্টি আছে তোমার? যার কিছুই বোঝ না তা নিয়ে জ্বালাতন ক'রো না।—আমাব শুম পেয়েছে।

স্থশাস্ত জিজ্ঞাসা কবিল, তোমার রাতের গুণ্ধটা খেয়েছ? উত্তরে রাণী মাথা নাড়িল, কহিল, গুণ্ধ খেয়ে বখন কোন কিছুই হচ্ছে না তখন অনর্থক আর শরীরের ওপর এ জ্বলুম কেন? আচ্ছা তুমিই বল না, এ রোগে ডাক্তার-বন্ধিই বা কি ক'রবে আর গুণ্ধ খেয়েই বা কি হবে? তাব চেয়ে কোন হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।

স্থশাস্ত কোন কথা কহিল না, নিঃশব্দে জীব মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। রাণী পুনশ্চ কহিল, দিনরাত তোমায় বলছি কিন্তু আমার কথায় কান ত দেবেই না বরং আরও বেশী করে করবে মাথামাখি। এতে যে নিজেরই ক্ষতি করছ এ সহজ কথাটাও তুমি স্বীকার করবে না।

একটা উত্তরের আশায় রাণী উৎকর্ষ হইয়া ওঠে। স্থশাস্ত নীরব, রাণীর এই উক্তির মধ্যে সে এক বিন্দুও সত্য খুঁজিয়া পায় না। বোঝে সে যে ইহা তার মুখের কথা মাত্র। স্বামীকে একটু বাজাইয়া দেখিবার উৎকর্ষ ইচ্ছা মাত্র।

স্থশাস্ত বহবার চেষ্টা করিয়াছে তাকে রাঁচি পাঠাইতে। ওখানে রাণীর এক ভাই পাগলা-গাবদের ডাক্তার। কিন্তু

সে কোনমতেই রাজি হয় নাই। ওর মতে রাঁচির আবহাওয়ায় তাব শরীর কিছুতেই জোড়া লাগিবে না বরং ভাঙিয়া পড়িবে। মাঝুষের প্রকাশ্য অবহেলা সে বরদাস্ত করিতে পারিবে না। তার মনে অশান্তির স্রষ্টা করিবে যাহা বায়ুপরিবর্তনের পক্ষে মোটেই অনুকূল হইবে না। তার চেয়ে কে-কটা দিন সে বাঁচিয়া থাকিবে অল্প এক পা নড়িবে না। এ যেন তার প্রতিজ্ঞা। ওর দুর্বলতা যে কোথায় স্থশাস্তর তাহা অজ্ঞাত নহে, তাই চেষ্টা করিয়াই সে নীরব থাকে, পাছে অজ্ঞানিত ভাবে কোন আঘাত করিয়া বসে এই আশঙ্কায়।

স্থশাস্ত যুদ্ধকণ্ঠে কহিল, কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে আমার চলে কি করে রাণী? কত বড় অপদার্থ যে আমি তা কি তোমার জানতে বাকী আছে? তবুও বার-বার ঐ এক কথা শোনাবে।

বাণী নীরব।

স্থশাস্ত পুনশ্চ কহিল, কতগুলো বাজে চিন্তা করে তুমিও মিছে কষ্ট পাও, আমায়ও দুঃখ দাও। মোট কথা, তোমার অল্পটো খাওয়াটা আমি চাই নে। কিন্তু এ-বিষয় আলোচনা করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে। তাব চেয়ে তুমি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নাও।

বিস্মিত কণ্ঠে রাণী প্রশ্ন করিল, আর তুমি?

তার বিস্ময়ে স্থশাস্ত লজ্জিত হইল, সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল, আমার তেমন খিদে নেই...তা ছাড়া স্থপ্রিয় কিছুতেই ছাড়লে না।

রাণী কিছু সময় নীরবে কি ভাবিল। কহিল, যা খুশী করো, আমি কেন মিছে ভাবতে যাই।...আর তাই ত ভাবি, আজকাল খেতে বসে আর হাত চলে না কেন! আমাব রান্নায় সত্যি যদি তোমার অল্পটো খেতে থাকে তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেই হয়—আর হেঁসেলে যাব না। আমারও হাড় জুড়বে তোমারও হয়ত দুটো ভাল খাওয়া জুটবে।

স্থশাস্ত বিস্মিত হইল না। এমনই বৃথা তিরস্কার আজকাল প্রায়ই তাহাকে শুনিতো হয়। ওর মনের বিকৃত চিন্তাধারা আজকাল এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতেছে। এই উপায়েই বাণী আজকাল তাহাকে ব্যথা দেয়। কোন দিক

দিয়া স্বামীর সামান্ত ক্রটিও তার অসহ্য। রাণীর ব্যবহারে হৃশাস্ত কখনও প্রতিবাদ করে না বরং পাশ কাটাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতেও অব্যাহতি নাই। মুখের উপর সোজা ভাষায় রাণী বলিয়া ওঠে, দেহে তার ছুরারোগ্য ব্যাধি আশ্রয় লইয়াছে বলিয়াই তার এই তুচ্ছতাচ্ছল্য...

নিজের কথা রাণী সব সময় ভাবে। তার সঙ্গ যে প্রত্যেক মাহুষের পক্ষেই পরিত্যাজ্য এ-কথাও সে ভাল করিয়া অনুভব করে। তথাপি সে মনের দুর্বলতা গোপন রাখিতে পারে না। স্বামীর নিকট হইতে নিজেকে তফাৎ রাখিতে রাণী চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু তার আত্মা সায় দেয় নাই। যত্ন তার অবধারিত...সে আসিতেছে জ্ঞত...রাণীর কানে সে ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে...সে মরিয়া হইয়া ওঠে...তুলিয়া বাধ নিজের কথা, হৃশাস্তর কথা...তার স্কন্ধেব কথা।

রাণী মুখ তুলিয়া হৃশাস্তর প্রতি চাহিল। কহিল, কাল শেষবাত্রে ঘুমিয়ে পড়িছিলুম। জেকে দাও নি তাই উঠতে হ'ল বেলা। সকালে আপিস কবতে গেলে ছুটি ভাতে ভাত খেয়ে, ভাবলুম, আমাকে দিয়ে স্বপ্নস্বচ্ছন্দ্য ত যথেষ্টই পাচ্ছ। ও-বাড়ীর চাকরকে ব'লে-ক'য়ে একটু মাংস আনালাম কিন্তু বার জন্তে এত ভাবনা তিনি এলেন বন্ধুবাড়ী থেকে ভুরিভোজন ক'রে। রাণী লম্পদে প্রস্থান করিল।

হৃশাস্ত এ-অভিযোগেরও কোন উত্তর দিল না। বন্ধুর সহিত আজই তাব দেখা হইবে,—সেও না খাওয়াইয়া ছাড়িবে না,—আর এমন দিনেই কিনা রাণীর বেয়াল হইবে তাকে ভাল কবিয়া খাওয়াইবার, এ-সংবাদ সে পূর্বে পায় নাই। সে ভবিষ্যৎদর্শী নহে কিন্তু রাণী যখন বাঁধা-ভাতে জল ঢালিয়া মিনিট-কয়েকের মধ্যে ফিবিয়া অসিয়া শয্যা আশ্রয় লইল তখন আর হৃশাস্ত চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, অস্থব্র অনেকরই হয় কিন্তু তাইতেই যে এমন পাগল হ'তে হবে তার কোন কথা নাই। এই যে না-খেয়ে শুয়ে পড়লে এতে ছুঃ কি শুধু আমিই পাব, না কষ্ট তোমারও হবে?

রাণী মুখ করিয়া উঠিল, যাও যাও, তোমাকে আর বেশী

মাথা দেখাতে হবে না। কাল থেকে নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিও, হৈসেলে আমি আর যাচ্ছি নে। এ-সব পাগল নিয়ে তোমার চলবে না। বাণী পাশ ফিরিয়া গুইল। অনেক সাধ্যসাধনারও আর তাব সাড়া পাওয়া গেল না।

বিস্তৃত প্রান্তঃকালে উঠিয়াই বাণী নবোদ্যমে লাগিয়া গেল সামসাবিক কাজে। অথচ হৃশাস্ত সারারাত ঘুমাইতে পারে নাই। একটা অব্যক্ত ব্যথা অল্পক্ষণ তাহাকে গীড়া দিয়াছে। গত রাত্রে ঘটনাব জন্ত সে নিজেকেই সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিয়াছে। কি এমন অন্ত্য হইত একটা মিথ্যা বলিলে। জীব-দন্ত আহাৰ্য কিছু সময় নাড়াচাড়া করিয়া শারীরিক অস্থস্থতার নিদর্শনে না-হয় উঠিয়া পড়িত। হৃশাস্ত নিম্পলক চোখে চাহিয়া থাকে, দেখে, কেমন করিয়া দুখানি ক্ষীণ দুর্বল হাতে রাণী পরম আগ্রহে স্বামীর ভোজের ব্যবস্থা করিতেছে। কি অদ্ভুত তার ভূষা, তার মনের খেয়াল। একটি বেলা নিজের হাতে রাঁধিয়া সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে না পারিলে প্রবল অভিমান তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। হৃশাস্ত বাধা দেয় নাই। জীব কোন কাজে বাধা দিয়া তার আত্মতৃপ্তির ব্যাঘাত সে ঘটাইবে না। তাই সে নির্লিপ্ত... তাই সে অনাসক্ত।

শহরের নির্জন প্রান্তে অসহায় অনাথ বাড়ীখানিতে এই যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম এক স্তম্ভ পথ ধরিয়া স্বতন্ত্র গতিতে অগ্রসর হইতেছে, এ খবর কজন রাখে? অথচ প্রতিদিন দু-বেলা ঠিক এমনি করিয়াই চলিয়া আসিতেছে আজ দীর্ঘ দুটি বছর ধরিয়া। এমনই হাসি-অশ্রু, মান,-অভিমানের একটি উদাস আবহাওয়া সহিত হৃশাস্ত নিজেকে চমৎকার মানাইয়া লইয়াছে। বিরক্তি নাই, অবসাদ নাই। দম-দেওয়া ঘড়ির স্তম্ভ ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ সে পরিত্যাগ করিয়াছে—কি জানি জীব ছুরারোগ্য ব্যাধির বীজাণু যদি তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। কেন সে অপব দু-জনা স্তম্ভ সবল মাহুষের সর্বনাশ করিতে যাইবে?

বাণীকে সে শ্রদ্ধা কবে—ভালবাসে। সাধারণের কাছে সে বাতিল হইয়া গেলেও হৃশাস্তব কাছে সে পবিত্র নারী—তার সহধর্মিণী। আহা, বচারা রাণী! ঐ ক্ষীণ

অসমর্থ দেহ লইয়াও তাহার সখকে কতখানি সচেতন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন বোঝে না। ওর আন্তরিকতার কোন মূল্যই তাহারা দিতে চায় না। রাণীকে তাহাবা পাগল আত্মা দিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহাকেও তাহাবা অবিবেচন-পূর্ণ বিচারবুদ্ধি দেখিয়া। রাণীকে নাকি তাহার ত্যাগ করাই উচিত—তাহাকে না হইলেও অন্ততঃ তাহার সংসর্গ। কিন্তু সুশাস্ত সে-কথায় কান দেয় নাই। তাহাকে কেমন নোয়ায় পাইয়াছে।

বাণী শয্যার আশ্রয় লইয়াছে। আগুি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সুশাস্ত তাহা টের পাইল কিন্তু তাহাকে না দেখা গেল ব্যস্ত হইতে, না কোনপ্রকার নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে। নীরবে হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া জ্বর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া সে উপবেশন করিল। যেন এমনি একটি ঘটনার সহিত তাহার জীবনের কোথাও সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। সুশাস্ত নির্বাক, সংসাবে তাহার বন্ধন নাই তাই সে এমন উদার, তাই সে নিজের সখকেও এমন চেতনহীন। এই ত জীবন, তাহার যৌবন-স্বপ্নের একটি স্থল পরিণতি। আত্মীয়স্বজন একে একে প্রায় সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্ষয়-রোগগ্রস্তা জী লইয়া বসবাস করিবার ক্ষমতা আজ সে সকলের কাছেই অপরাধী।

সুশাস্ত পরম স্নেহে জ্বর কপালের উপর একখানি হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আবার জ্বর দেখা দিয়াছে ?

কণ্ঠস্ববে নাকি তার হতাশার স্বর, অন্ততঃ রাণীর তাহাই মনে হইল। সে হাসিল বড় করুণ হাসি। কহিল, জ্বর ত আজ আমার দশ-বারো দিন থেকেই দেখা দিয়াছে।

সুশাস্ত শাস্ত কণ্ঠে কহিল, অথচ আমায় এক দিনের জন্তেও তা জানাও নি—জানান দরকারও মনে কর নি।

রাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, জানিয়েই বা কি হ'ত ? মিছে তোমায় ব্যস্ত ক'রে তোলা বইত নয় !

সুশাস্ত দীর্ঘ গম্ভীর হইয়া গেল।

রাণী তাহাই লক্ষ্য করিল এবং করিয়াই কহিল, মিছে তুমি আমার ওপর রাগ করছ। সুশাস্তর একখানি হাত সে নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইল। উভয়নীরব।

অনেকখানি রক্তবমনের ফলে রাণী আজ অত্যন্ত দুর্বল

হইয়া পড়িয়াছে। কথা বলিতে তার মোটেই ভাল লাগিতে-ছিল না কিন্তু তথাপি সে কহিল, আমার এত কাছে তুমি আর এস না।

সুশাস্ত বিস্মিত হইল। রাণীর মুখে আজ নূতন স্বর।

রাণী পুনশ্চ কহিল, আমি বড় স্বার্থপর, শুধু নিজের কথাই ভাবতে শিখেছি কিন্তু এবারে বোধ হয় আর বাঁচব না। রাণীর চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুশাস্ত ধীরে ধীরে জ্বর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। রাণী নিশ্চেষ্টে পড়িয়া রহিল।

ভাঙা মেঘের ফাঁকে আখানা চাঁদ দেখা দিয়াছে। দূরে কতকগুলি কুকুর একসঙ্গে চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে। রিক্শ গাড়ীর শব্দ হইল, ঠং। সন্ধ্যার পরে এ-রাস্তায় গাড়ীঘোড়া বড়-একটা চলে না।

রাণী ডাকিল, সুশাস্ত বুঁকিয়া পড়িল। বলিল, থাক কথা ক'রো না। রাণী মৃদুকণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, কেন কথা না বলবার কি হ'য়েছে আমার ? একদিনেই আর কিছু মরছি নে। তুমিও যেমন, মরণ কি ছেলেখেলা ? কালকেই হয়ত দেখবে যেমনকার তেমনি। আবহাওয়াটাকে সে একটু হাঙ্কা করিয়া লইতে চায়। সুশাস্ত কথা কহিল না।

—তুমি কি রাগ করলে নাকি ? রাণী কহিল, বেশ ত কথা না-হয় আর বলব না, কিন্তু না খেয়ে দেয়ে এমনি ক'রে ব'সে থাকলে চুপ ক'রেই বা মাহুষ থাকে কি ক'রে ? দুটি ভাতে-ভাত সেদ্ধ ক'রে নিলে হ'ত না ? ক্লান্তিতে তার দু-চোখ বুজিয়া আসিল।

এমনি করিয়াই সুশাস্তর দৈনন্দিন জীবন। মস্তুর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। অনভিজ্ঞ হাতে নিজেকে রাখিয়া থাইতে হয়। জ্বর পথের ব্যবস্থাও সে নিজ হাতেই করে। একদিন মাত্র সে ডাক্তার ডাকিতে সমর্থ হইয়াছিল। আর্থিক অনটন পদে পদে বাধার সৃষ্টি করিতেছে। অন্তর গুমরাইয়া ওঠে ভাষাহীন আবেগে, কিন্তু চোখের সম্মুখে এমনি করিয়া বিনা চিকিৎসায় রাণী ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—ইহাও অসম্ভব। সুশাস্ত মরিয়া হইয়া ওঠে। ভবিষ্যতের চিন্তা সে মন হইতে কাড়িয়া ফেলে।

সাত পুরুষের বাস্তবতা সে বিক্রয় করিয়া কেসিল।
অন্ততঃ প্রাণ ভরিয়া সে কিছুদিন মৃত্যুর সহিত লড়াই করিতে
পারিবে। খানকয়েক ভাড়াচোরাইটের জুপের পরিবর্তে
আত্মার ভূমিসাধনা কি বড় কম কথা।

দিনকয়েক ধরিয়া জীবন-মৃত্যু লইয়া চলিল প্রচণ্ড নঃগ্রাম,
কিন্তু মৃত্যু যাহাব জলাটে আঁকিয়া দিয়াছে তাহার
বিজয়বার্তা, মানুষের চেষ্টা তার কি করিতে পারে।

হুশান্ত ভাবে তাহার বিগত জীবনের প্রত্যেকটি চঞ্চল
মুহূর্তের জীবন্ত ইতিহাসের কথা। রাণীকে সে বিবাহ
করিয়াছে পনের বছর পূর্বে। ছোট্ট মেয়েটি লাল চেলি
পরিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুকের মধ্যে তাহার
আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। তার পরে বিবাহ-বিদায়...
সবগুলি অতীতই সমাপ্ত হইল। তখন কে জানিত, এই
কটা সামান্য গৌনা বছরের মধ্যেই আবার নতুন করিয়া
বিদায়ের বাঁশী বাজিয়া উঠিবে।

রাণীর চোখের দৃষ্টি এক সময় অভ্যস্ত প্রখর হইয়া
উঠিল। স্বামীর দেহে যেন কুৎসিত অকালবার্দ্ধক্য আসিয়া
দেখা দিয়াছে। স্বামীকে এত কুৎসিত সে ইতিপূর্বে আর
কখনও দেখে নাই। সে শিহরিয়া ওঠে, মুহূর্তে বলে—দেহের
গতি দিন দিন কি হচ্ছে তোমার। আমি স্বার্থপর, কোন
দিকে না হয় আমার দৃষ্টি নেই, কিন্তু নিজের ভাল যে অবু
সেও বোঝে।

হুশান্ত মুহু মুহু হাসিতে থাকে।

রাণী পুনশ্চ বলে, আমার পাগলামিকে প্রভু দেওয়া
তোমার উচিত হয় নি।

—তোমার গুণু খাবার সময় হয়েছে, আমি অসহি।
হুশান্ত চলিয়া গেল।

রাণী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে—চোখের
কোণ বাহিয়া তাহার জলের ধারা নামিয়া আসে।
হয়ত তাহারই অবিবেচনা এবং অজ্ঞায় জেদের জন্ত
স্বামীর দেহ দিন দিন এমন শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।
হয়ত তাহার কালব্যাদি কথাকাটা ভাবিতে গিয়াও রাণী
বারংবার শিহরিয়া ওঠে, অথচ হুশান্ত তার অবধি
নাই।

দিনকয়েক পরে—

হুশান্তর বাল্যবন্ধু শুভ্রাংগ আসিয়া উপস্থিত। বড়
চাকুরে—বছর-কয়েক ধরিয়া ন্যাদিল্লীতে আছে। সম্প্রতি
দেশে আসিয়াছে ভরীর বিবাহ দিতে। হুশান্তর নিকট
আসিবার ইহাই একমাত্র কারণ। বাহিরের ঘরে হুশান্ত
চুপচাপ বসিয়া ছিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ভ্রমমাণ,
হুশান্তর কালো দাগ চোখের নীচে সুস্পষ্ট। সহসা শুভ্রাংগর
উচ্চ কণ্ঠের আহ্বানে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। শুভ্রাংগ
কহিল, বাড়ীখানাকে রীতিমত এক আশ্রম গড়ে তুলেছ
যে শাস্ত। সামনের অমন বাগানখানা,—অবশিষ্ট রয়েছে
কতকগুলো আগাছা।

হুশান্ত স্নান হাসিল। কহিল, ব'স শুভ্রাংগ।

শুভ্রাংগ আসন গ্রহণ করিয়া পুনশ্চ কহিল, তোমার
নিজের শরীর ত তেমন সুবিধে ঠেকছে না। অস্থবিস্থ
যাচ্ছে নাকি? বৌ কোথায়? ছেলেপিলে কাউকে
দেখছি নে ত?

ইহার উত্তরেও হুশান্ত হাসিল। শুভ্রাংগ বরাবরই
একটু বেশী কথা বলে।

—হাসছ? শুভ্রাংগ জিজ্ঞাসা করিল।

—না হেসে কি করি? হুশান্ত কহিল, ছেলেপিলে ছিল
কবে যে তাদের কথা জিজ্ঞাসা করছ? আর তোমার
বৌদি আছেন ওঘরে—শয্যাশায়ী। কিন্তু এসব কথা পরে
হবে—তুমি এ-সময় হঠাৎ কলকাতায়? ছেলেমেয়ে
সব ভাল আছে ত? মিষ্ট কড় বড় হয়েছে?

শুভ্রাংগ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই জেজ্ঞেই আসা, এ-মাসে
মিষ্টুর বিয়ে। চল বৌদির সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।
সময় একেবারে নেই বললেও চলে।

—একটু বসবে না? এখনই উঠবে? হুশান্ত কহিল।

শুভ্রাংগ কহিল, বাধ্য হয়েই উঠতে হচ্ছে, নইলে আজ
কত বছর পরে দেখা সে আমি ফলে গেছি মনে কর?।
মাসখানেকের ছুটি নিয়েছি, এর পরে ঢের সময় পাওয়া
যাবে। শুভ্রাংগ এক প্রকার জোর করিয়া হুশান্তর হাত
ধরিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল।

স্বামীর সহিত শুভ্রাংগকে দেখিয়া রাণী শায়িত অবস্থায়
মাথার কাপড়টা ঈষৎ টানিয়া দিল।

শুভ্রাংগ মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছেন যে আপনি। আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে এসুম যে, মিস্টার বিয়েতে আপনাকে ধরে নিয়ে যাব—দিনকয়েক আগের মত হৈ হৈ করব, আর এই সময় আপনি—একটু থামিয়া পুনশ্চ কহিল, তাছাড়া আপন-র রান্নার আমি এক জন কত বড় ভক্ত ছিলাম তা নিশ্চয় আপনি ভোলেন নি, সেদিক থেকেও এক প্রচণ্ড লোকসানের মধ্যে পড়ে গেলাম। কিন্তু অস্থখটা কি? বলিয়া শুভ্রাংগ স্বশাস্ত্রের প্রতি মুখ ফিরাইল।

—ওঘরে চল—স্বশাস্ত্র কহিল। রাণীর মুখে স্নান স্নান হাসি।

পাছে রাণীর হুমুখেই শুভ্রাংগ একটা কাণ্ড করিয়া বসে এই আশঙ্কায় স্বশাস্ত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বাহিরের ঘরে আসিয়াও শুভ্রাংগ একই প্রশ্ন করিল।

নির্লিপ্ত গলায় স্বশাস্ত্র কহিল, যম্মা।

যম্মা! শুভ্রাংগ চমকিত হইল। বলিল, অথচ একে নিয়ে এমন সহজ ভাবে মাখামাখি করছ? কোন স্বাস্থ্যবর জাহ্নগায় পাঠালেও ত পারতে?

—ইচ্ছে করলেই পারতাম না—পক্ষসার অভাব, তা ছাড়া তোমার বৌদির অজ্ঞা যাবার ইচ্ছে নেই। ওর মতে আগার তাতে অস্থবিধের শেষ থাকবে না—স্বশাস্ত্র কহিল।

—তার মানে? উনি ত একেবারেই বাতিল হয়ে গেছেন। ওঁর সংসর্গও যে প্রত্যেক মানুষের কাছে দুঃখ। শুভ্রাংগ ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে উত্তর করিল।

স্বশাস্ত্র স্নান হইয়া উঠিল। একটু আস্তে কথা বল শুভ্র, রাণী শুনতে পাবে। একটু থামিয়া একটু হাসিয়া সে পুনবায় কহিল, আমার কথা আলাদা, সাত-আট দিন পূর্বেও আমি ওরই হাতের বামা খেয়েছি।

শুভ্রাংগ উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, খুব বাহাদুরি করেছ—এ যে কতবড় ছোঁয়াচে রোগ তা বুঝাব মত বয়স এবং অভিজ্ঞতা তোমার নিশ্চয় হয়েছে।

স্বশাস্ত্র শাস্ত্র সংযত কণ্ঠে কহিল, সে কি আমি বুঝি না, কিন্তু তবুও দেখ, সকলেই আমায় উপদেশ দিতে আসে। তোমাদের মত স্বস্থ বিচার-লিপ্সা যদি আমার ন-প্ঠাকে তা বলে আমায় অবিচার করো না। আমার সব চেয়ে

বড় দুঃখ যে সকলেই আমায় ভুল করে—তারা বোঝে না যে ওকে সামান্য অবহেলা কবতেও আমি কত বেশী ব্যথা পাই।

একটু থামিয়া স্বশাস্ত্র কহিল, রাণীর কথা তুমি ছেড়ে দাও শুভ্র—মরণের যাত্রী, কটা দিন আর বেঁচে আছে। আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনে তোমার বৌদির কোন অস্তিত্বই ছিল না। মনে কর আশ্রিত কেউ নেই—কেবল তুমি আর আমি মুখোমুখি বসে গল্প কবছি। রাণীকে নিয়ে অনর্থক তোমরা ব্যস্ত হয়ে না—এ আমার অহরোধ।

অত্যধিক উত্তেজিত কণ্ঠে শুভ্রাংগ কহিল, বিয়ে শুধু তুমিই কর নি—আমরাও করেছি।

স্বশাস্ত্র নীরব।

শুভ্রাংগ অপেক্ষাকৃত সংযত কণ্ঠে কহিল, না-হয় মেনে নিলাম সকলেই অত্যাচার করে, কিন্তু এর থেকে এক সময় তুমি নিজেও যে আক্রান্ত হ'তে পার সে-কথা একবার ভেবে দেখেছ কি?

স্বশাস্ত্র উদাসীন চোখে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কহিল, আমি স্থবিধাবাদী নই। তা ছাড়া ভেবে দেখেই বা লাভ কি?

শুভ্রাংগ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

স্বশাস্ত্র বলিয়া চলিল, যাকে তোমরা এড়িয়ে চল আমি তাকে কোল দিয়েছি। আমার জীব ব্যাধি আমাকেও আক্রমণ করেছে।

শুভ্রাংগ ক্ষণকালের জ্ঞান হারা হইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়া উঠিল, জীব কালব্যাপিটাও তোমার আধাআধি ভাগ ক'রে না নিলে চলত না এমনি পত্নীভক্তি!

—তুমি ঠাট্টা করছ শুভ্র, কিন্তু আমার মত অবস্থায় পড়লে বোধ হয় প্রত্যেক মানুষই এ-কাজ ক'রে থাকে। রাণীর জ্ঞানে আমি যা করেছি এবং করছি তা মোটেই বেশী নয়। সবাই ওকে ত্যাগ করেছে—তুমিও যাবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ। আমি তোমাকে দোষ দিই না, কিন্তু যে ওর দেহের চাইতে অন্তরের সমাদর করতে চায়, তাকে অন্তত তোমাদের উপহাসের সীমাব বাইরে সরিয়ে রেখে।

শুভ্রাংগ বারেকের তরে একবার তাব হাত-বড়ি উপর

দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিল, বারোটার মধ্যে আমায় স্বহৃদ্যে
সঙ্গে দেখা করতে হবে। আজকে আমি চললাম শান্ত—
সময়মত দেখা হবে। অনাবশ্যক কৈফিয়ৎ।

স্বশাস্ত বুঝিল যে পুনরায় দেখা করিবার মত সময় আর
তার হইবে না।

সুভাষ শুভপদে প্রস্থান করিল। ভগ্নীর বিবাহে নিমন্ত্রণ
করিতে পর্যন্ত সে ইচ্ছা করিয়া তুলিয়া গেল। তার প্রস্থান-
পথের প্রতি ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া স্বশাস্ত নিজের
মনে কথা কহিয়া উঠিল, একটি মুহূর্ত্ত দেরি কবতে
পারলে না! সাংসারিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি এতই
সচেতন! ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করছে, ওর আর
কি?

ইতিমধ্যে কোন্ অবসরে যে রাণী দেবাল ধরিয়া বসিয়া
আসিয়া তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহা স্বশাস্ত টের

পায় নাই, কিন্তু সহসা সেই দিতে বৃষ্টি পড়িতেই সে লাফাইয়া
উঠিল, একি! তুমি! তুমি কখন উঠে এলে?

রাণী ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল—মুখ দিয়া তার একটি
কথাও ফুটিল না। দুই চোখে নীলব ভৎসনা।

স্বশাস্ত উঠিয়া আসিয়া তাহারে ধরিয়া কেলিতেই রাণীর
মাথাটা তার কাঁধের উপর হেলিয়া পড়িল।

স্বশাস্ত বুঝিল, এই নীরবতার অন্তরালে কতখানি তৃপ্তির
কান্না সে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

অত্যন্ত সাবধানে স্বশাস্ত রাণীর হাত দেহটি কোলে
তুলিয়া লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল।

আর সুভাষ এতক্ষণে ঠাণ্ডা-শান্ত্য পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া
বীচিল এই দু্যুত আবহাওয়া হইতে নিজেকে এত সহজে
মুক্ত করিতে পারিয়া।

সাঁতারের কথা

‘ক্রল’ বা ছন্-পাড়ি

ত্রিশাহি পাল

আজকাল সব দেশেই সম্ভরণকারীরা ‘ক্রল’ বা ছন্-পাড়িকে
সর্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকেন, কারণ এই ধরনের পাড়িতে
অতি নীচ জরাজগতি লাভ করা যায়। এই ‘ক্রল’ বা ছন্-পাড়ি
নানা শ্রেণীর, যথা আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান, চার-পদী
(Four beats) ও ছয়-পদী (Six beats) ইত্যাদি।
কে বা কাহারা এই সকল ছন্-পাড়ির আবিষ্কার করিয়াছেন
এখানে আমি তাহার আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র
ইহাদের সাধারণ নিয়ম ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ব্যাখ্যা
করিব।

সাঁতারের প্রচলন কোন বিশেষ দেশে আবদ্ধ নহে।
সাঁতারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পৃথিবীর সকল দেশেই মোটা-
মুটি এক ধরনের, দেশভেদে বিশেষ কিছু যে না থাকিতে
পারে এমন নহে, কিন্তু মূলতঃ সাধারণ রীতি এক এবং
অভিন্ন।

এই সকল আমেরিকান, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি ছন্-পাড়ির
মধ্যে কোন্ শ্রেণীর ছন্-পাড়ি ভাল, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ
আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমেরিকান ছন্-পাড়িতে
বেশী জরাজগতি লাভ করা যায়। কারণ এই পদ্ধতিতে হাত-
পা পরিচালনার মধ্যে কোন মিলন সঙ্গ হয় না। পদ্মের
গতি সর্বদা জরাজগত থাকতে শরীর জলের উপরই ভাসিয়া থাকে
এবং সাঁতার অতি সহজেই অগ্রসর হইতে পারেন। আবার
কেহ কেহ বলেন অষ্ট্রেলিয়ান ক্রল হাত ও পায়ের গতি
মুহূর্ত্তের জ্ঞান থাকিয়া যাওয়ায় সম্ভরণকারীর শরীর জলের
সমতল রেখার সামান্য নিম্নে নামিয়া যায় এবং গতিবেগও
সামান্য প্রতিহত হয় বটে, কিন্তু হ্রাস হইতে নষ্টপত্তি পুনরায়
ফিরিয়া আসে এবং সাঁতার ভ্রমণে অনেক দূর পর্যন্ত
সাঁতার, ক্রটিও ক্লান্তিবোধ করেন না। অতঃপক্ষে কেহ
কেহ উক্ত দুই প্রকার সম্ভরণ-কৌশলের মাঝামাঝি ব্যবস্থা,

অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলের হাতের পাড়ি ও আমেরিকান ক্রলের পায়ের কৌশল একযোগে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। মোট কথা, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে কোনটি উৎকৃষ্টতম বা কোনটিতে বেশী ফল লাভ হয় তাহা সঠিক নির্ধারণ করা কঠিন।

আমার বিবেচনায় সাঁতারু নিজের দেহের গঠন অনুযায়ী পাড়ি নির্বাচন করিবেন। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, দুই জন সাঁতারুর মধ্যে সাঁতারের বাহ্যতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ কিছু-না-কিছু পার্থক্য থাকিয়া যায়। ইহার কারণ দৈহিক গঠনের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

যাহাদের হাতের শক্তি বেশী ও পা অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাঁহারা হাতের গতিবেগ বাড়াইয়া ও পায়ের গতিবেগ কমাইয়া পাড়ি অভ্যাস করিলেই ভাল ফল পাইবেন। এইরূপ স্থলে চার-পদী বা ছয়-পদী দুই-পাড়ি অবলম্বন করাই

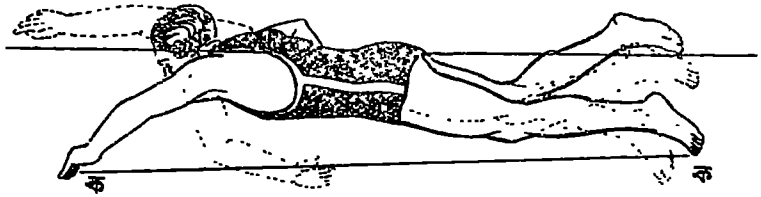
সমীচীন, কারণ এই সকল পাড়িতে পায়ের চারিটি বা ছয়টি আঘাত হাতের পাড়ির সহিত এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে, যাহাতে এইরূপ চারিটি বা ছয়টি পায়ের আঘাত দ্বিতে সাঁতারুর বিশেষ কোন কষ্ট বোধ হয় না, পরন্তু যাহাদের পায়ের শক্তি বেশী ও হাতের শক্তি অপেক্ষাকৃত কম তাঁহারা আমেরিকান বা অষ্ট্রেলিয়ান ক্রলের কৌশলগুলি অভ্যাস করিলেই সফল পাইবেন।

আমেরিকান ক্রল

আজকাল যত রকম আধুনিক দুই-পাড়ি প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে আমেরিকান দুই-পাড়িই সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। এই পাড়ি শিক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থী প্রথমতঃ ১ নং চিত্রানুযায়ী দেহকে জলের উপর ঋজুভাবে ভাসাইয়া মাথার অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে ডুবাইয়া হাতের কনুই দুইটি ঈষৎ ঠিকাইয়া স্বল্পনিষ্কেপের সহিত চক্রাকারে মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া একই ভঙ্গীতে পরিবর্তিত ভাবে হাত দুইটি পেটের তলদেশ দিয়া উল্লম্বদশের শেষ পর্যন্ত সজোবে টানিবেন। প্রতি পাড়ি শেষ করিয়া হাত দুইটি ঋজু হইতে সম্পূর্ণ ভাবে উপরে উঠাইয়া পুনরাব পূর্বোক্ত নিয়মে

জলে নিষ্কেপ করিতে হইবে। এই পাড়িতে সাঁতার কাটিবার সময় সমস্তরণকাবী দেহকে হেলাইবেন না, দেহ জলের উপর ঋজুসম্ভব সমান্তরাল ভাবে অর্থাৎ যাহাতে মাথা, নিতম্ব ও গুলফদ্বয় সহজভাবে ঝলপুঠেব এক ইঞ্চি উপরে থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। কেবলমাত্র নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য হাত-পাড়ির সহিত মাথা সামান্য ঘুরাইতে হইবে।

এই পাড়িতে হাত ও পায়ের কোন মিল নাই, অর্থাৎ ১ নং চিত্র অনুযায়ী বাম হস্তের সহিত বাম পদ (ক—ক) এবং দক্ষিণ হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া সাঁতার



১। আমেরিকান 'ক্রল'

কাটিতে হইবে। কেবলমাত্র জাহ্নবয় সামান্য ভাঙিয়া জম্বা শক্ত রাখিয়া পা দুইটি ৬-৮ ইঞ্চি ব্যবধানে সোজা ও পরিবর্তিত রূপে উপর-নীচ করিয়া সাঁতারু নিজের সুবিধামত এমনভাবে জলে আঘাত করিবেন যাহাতে পদদ্বয়ের ক্রিয়ারা স্বাভাবিক অগ্রগতি লাভ হয়। আমেরিকান দুই-পাড়ির বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গতিবেগ মুহূর্তের জন্যও হ্রাস হয় না, কারণ পদদ্বয় অনবরত উপর নীচে পরিচালনার জন্য দেহ ডুবিয়া যায় না।

অল্প দূর অর্থাৎ ৫০ হইতে ৪০০ মিটার পথ পর্যন্ত সাঁতারের প্রতিযোগিতায় এই পাড়ি বিশেষ সাহায্যকারী হয়। প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে সাঁতারু নিজের ক্ষমতানুযায়ী প্রথমতঃ এক দমে ৩০ হইতে ৪০ মিটার পর্যন্ত ঘাইবেন, পরে প্রতি ৩ কিংবা ৪ মিটার অন্তর পূর্বোক্ত নিয়মে মাথা ঘুরাইয়া দম লইতে পাবিলেই ভাল হয়।

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রল

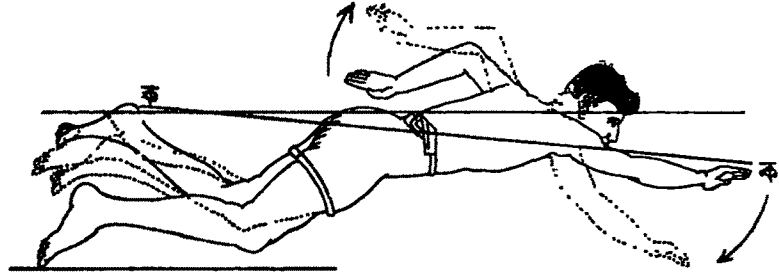
অষ্ট্রেলিয়ান দুই-পাড়ি শিক্ষাকালে শিক্ষার্থী "প্রাথমিক শিক্ষার" নিয়মাবলম্বনে অর্থাৎ (২ নং চিত্রানুযায়ী ক—ক) দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ এবং বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ



পুকুর-ঘাটে
শ্রীশান্তিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

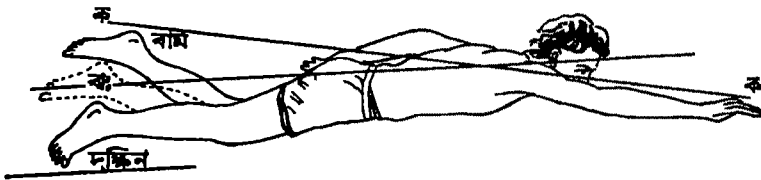
পদ মিলাইয়া অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের টান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম পদের কাজ শেষ করিয়া এবং বাম হস্তের টান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পদের কাজ শেষ করিয়া পরিবর্তিত ক্রমে পাড়ি শেষ করিবেন। হাত-পাড়ি দিবার সময় হাত দুইটি দেহের কত ইঞ্চি পার্শ্ব দিয়া টানিতে হইবে তাহা সঠিক ভাবে বলা কঠিন, কারণ ইহা নির্ভর করে সাঁতারুর দেহের গঠনের উপর, আর দেহের গঠন সব সাঁতারুর যখন এক নয় তখন এ-সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম লিপিবদ্ধ করা যায় না। তবে যত দূর সম্ভব হাত দুইটি পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে শিক্ষার্থী তাঁহার সুবিধামত পেটের তলদেশ দিয়া টানিবেন। ইহাই অস্ট্রেলিয়ান ছন্দ-পাড়ির বিশেষত্ব। অস্ট্রেলিয়ান ছন্দ-পাড়িতে দেহ একটু গড়াইয়া ডুবিয়া যায় এবং গতিবেগও সামান্য প্রতিকৃত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় না বরং নষ্টশক্তি পুনরায় লাভ করা যায়। এই ধরনের সাঁতারে হাত-পাড়ি ও নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য সাঁতারু নিজের সুবিধামত আমেরিকান ছন্দ-পাড়ির শেখোক্ত নিয়ম-গুলি পালন করিতে পারেন।



২। অস্ট্রেলিয়ান 'ক্রল'

দুইটি ছোট ছোট আঘাত দিবেন। আরও স্পষ্ট ও বিশদ করিয়া বলিতেছি—যদি প্রথমে দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদের মিল রাখিয়া সাঁতার আরম্ভ করা হয় (৩ নং চিত্র ক-ক) তাহা হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দক্ষিণ হস্তের টান শেষ করিয়া বাম হস্তের টান আরম্ভ করিবার পূর্বে যেন দক্ষিণ ও বাম পদের দুইটি অতিরিক্ত ও মুহূ আঘাত পড়ে। এই নিয়মে বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া সাঁতার আরম্ভ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাম হস্তের টান শেষ করিয়া দক্ষিণ হস্তের টান আরম্ভ করিবার পূর্বেই পূর্বোক্ত নিয়মে বাম ও

দক্ষিণ পদের দুইটি অতিরিক্ত ও মুহূ আঘাত পড়ে। স্মরণ রাখিবেন, যেন পায়ের আঘাত দিবার সময় কোন ক্রমেই জ্বাধ্বন্য না ভাঙিয়া যায়। জ্বাধ্ব দুইটি সহজ ভাবে ভাসাইয়া রাখিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে



৩। সিন-বিট্‌স্ 'ক্রল' বা ছয়-পদী ছন্দ

ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সাঁতারুগণ জগতের সম্ভরণ-ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিতে পারিবেন। আর সম্ভরণের সময় সীমা ভঙ্গ করাও এই পাড়ির সাহায্যে সম্ভবপর বলিয়া আমার ধারণা।

আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রলে দক্ষিণ

গুল্কদ্বয় যেন সর্বদাই অন্তত চারি ইঞ্চি জলের নীচে থাকে। কেবলমাত্র উভয় হস্তের পাড়ি শুরু করিবার সময় পায়ের প্রথম আঘাত দুইটি একটু জোরে করা প্রয়োজন। বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পদদ্বয় পরিচালনার সময় যাহাতে অবশ্য দেহের শক্তি ক্ষয়

করা না হয় এবং যথাসম্ভব সহজ ও সরলভাবে পদদ্বয় পরিচালনা করা হয়।

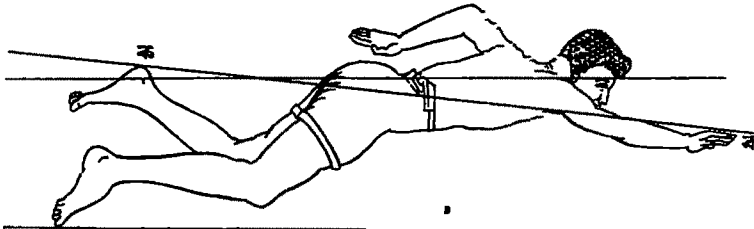
শিক্ষার্থী প্রথমতঃ সাঁতারের সময় ৩ নং চিত্রায়মান দৈর্ঘ্যে যথাসম্ভব স্বল্পভাবে জলপৃষ্ঠে ভাসাইবেন। এই পাড়ির বিশেষত্ব এই যে, শিক্ষার্থীকে হস্তদ্বয় স্বল্পের দক্ষিণ প্রায় সমকোণ রাখিয়া অথচ হস্ত-পরিচালনার সময় পূর্বোক্ত আমেরিকান জলের স্তায় মাথার উপর দিয়া না সুাইয় স্বল্প-নিষ্ক্ষেপের সহিত সহজভাবে সোজাসুজি জলে নিষ্ক্ষেপ করিতে এবং জলের ভিতর হাত দুইটি আমেরিকান ফ্র্যাংকো স্টায় পেটের তলদেশ দিয়া উল্লম্বের শেষ পর্যন্ত টানিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে সাঁতার কাটবার সময় প্রতি হাত-পাড়িতে দেহ কিঞ্চিৎ গড়াইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে গতিবেগ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

পাড়ি

হস্ত	...	...	না
দক্ষিণ	...	...	বাম, দক্ষিণ ও বাহ
বাম	...	...	দক্ষিণ, বাম ও দক্ষিণ

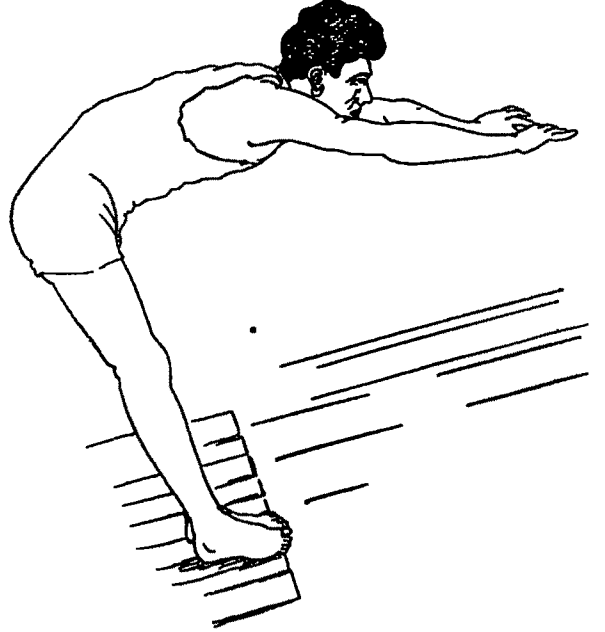
ডবল ওভার-আর্ম বা দোহাতি-পাড়ি

এই পাড়ি শিখিবার সময় শিক্ষার্থী পূর্বোক্ত প্রাথমিক বা অস্ট্রেলিয়ান ফ্র্যাংকো-পাড়ির নিয়ম অনুসরণ করিবেন। পূর্বোক্ত পাড়ি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে ইহাতে জলপৃষ্ঠে পদদ্বয় বাইশ হইতে পঁচিশ ডিগ্রী পর্যন্ত জলপৃষ্ঠে নিষ্ক্ষেপ করিতে এবং পদদ্বয়ের ক্রিয়ার সময় জল ভাঙিয়া হোঁ কাঁচি-পাড়ির ভঙ্গীতে জলেব নিয়ে পরিবর্তিতরূপে সজোরে আঘাত করিতে হইবে। এই দোহাতি-পাড়িতে সাঁতার কাটবার সময় সমস্তরূপকারী হাত দুইটি স্বল্পের সহিত জোবে নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেহকে উভয় দিকে কিঞ্চিৎ গড়াইয়া

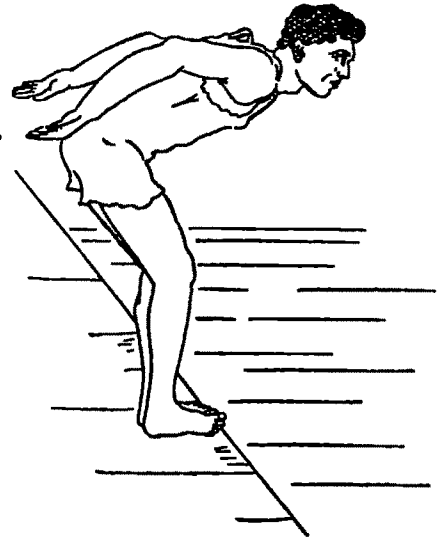


৪। 'ডবল ওভার-আর্ম' বা দোহাতি পাড়ি

লইয়া বাইবেন। স্থূলকায় ব্যক্তিব পক্ষে এই পাড়িই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়।



৫। বাস্পাতোগ : প্রথম ভঙ্গী

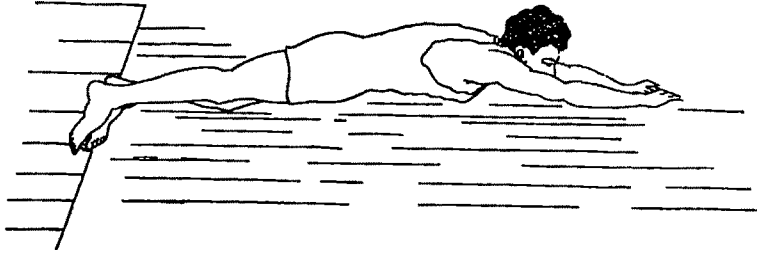


৬। বাস্পাতোগ : দ্বিতীয় ভঙ্গী

বাস্পাতোগ (স্টার্ট)

বাস্পাতোগের সময় প্রতিযোগী সর্বদাই সঙ্কেতকারীর দিকে দৃষ্টি রাখিবেন এবং সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেতকারীর

হাতের পিস্তলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া
মকের প্রান্ত ভাগে ১ নং চিত্রানুযায়ী
পদদ্বয় যুক্ত করিয়া এবং আঙুলে ভর
দিয়া চিবুকের সোজা হুজি ছুই হাত
দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করিয়া মনে মনে
১, ২, ৩ বলিবেন। প্রতিযোগী ইহা
অবশ্যই মনে রাখিবেন যে, ২ এবং ৩



৭। বাম্পোয়োগ : তৃতীয় ভঙ্গী

গুণিবার অবকাশে হাতের ভঙ্গী ২ নং

চিত্রানুযায়ী করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের শব্দের এক-
চতুর্থাংশ সেকেন্ডের পূর্বেই ৩ নং চিত্রানুযায়ী
জলপৃষ্ঠের উপর দিয়া দেহকে গড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে
বাম্পপ্রদান করিতে হইবে, পিস্তলের আওয়াজ যেন
জলস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রুত হয়। এই বাম্পোয়োগ-প্রণালী

কিছু দিন দশ-পনের বার করিয়া অভ্যাস করা উচিত। তাহা
হইলে প্রতিযোগিতার জন্ত বিশেষ কষ্টভাগ কবিত্তে এবং
বেগ পাইতে হয় না। অল্প দূরত্বে প্রতিযোগিতায় জয়-
পবাজ্য অনেকাংশে নির্ভর করে এই বাম্পোয়োগের
কৌশলের উপর।

আমাদের খাদ্য

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীনীলরতন ধর

ফরাসী-বিপ্লবের কিছু পূর্বে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এক জন বিখ্যাত
ফরাসী বৈজ্ঞানিক আন্তোয়ান লাবোয়সিয়ে বলিয়াছিলেন,
জীবন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। তাহার কথা স্মরণ
করিলে তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করা
কর্তব্য। তিনি রসায়নশাস্ত্র ও দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক।
তিনি বলেন, আমরা বাহ্য আহার কবি, দেহাভ্যন্তরে তাহা
গায়বীয় অম্লিজেনের সহিত সম্মিলিত হইয়া যে রাসায়নিক
প্রক্রিয়ার স্বজন হয়, তাহার উপর জীবের জীবন নির্ভর
করে। এই প্রক্রিয়া হইতে জীবদেহে উত্তাপ ও শক্তি
সমুৎপন্ন হয়।

সকলেই জানেন যে রেলের ইঞ্জিন চালাইতে কয়লা
পাড়াইতে হয়, মোটরচালনের জন্ত পেট্রলের আবশ্যক
হয়, উত্তাপ সমুৎপন্ন করিতে কয়লা বা এই জাতীয় পদার্থের
দাহন প্রয়োজন। এই দহনকার্য কয়লার সহিত বায়বীয়

অক্সিজেনের সংমিশ্রণে সম্পন্ন হয়। বাতাস না হইলে
কয়লা বা পেট্রল পোড়ান যায় না।

আমাদের খাদ্যে কয়লা-জাতীয় পদার্থ (কার্বন)
বর্তমান। চিনি, ভাত, গুড়, ডিম প্রভৃতিতে সলফিউরিক
এসিড যোগ করিলে সহজেই কয়লা (কার্বন) পাওয়া
যায়। এই কার্বন বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত মিলিত
হইয়া দেহের উত্তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। আভ্যন্তরীণ
এই দহন-প্রক্রিয়া (অক্সিডেশন) কয়লা বা অন্তর্বিধ অগ্নি
ও পেট্রল ইত্যাদির দহনের অনুরূপ। কাণ উভয় স্থলেই
উত্তাপ ও শক্তি এবং কার্বনিক এসিড গ্যাস সৃষ্টি হয়।
এই আভ্যন্তরীণ দহন-প্রক্রিয়ার উপর জীবনীশক্তি নির্ভর
করে। জীবের জন্ম হইতেই এই প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয়, ইহার
অবসানেই জীবনের অবসান।

আমাদের খাদ্য নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :—

- (ক) কার্বোহাইড্রেট—ভাত, আলু, চিনি, রুট প্রভৃতি।
 (খ) প্রোটিন—ডাল, ছোলা, মাছ, বাস, দুধ, ডিম।
 (গ) ফ্যাট—ঘি, তেল, মাখন, ননী, দুধ।
 (ঘ) ফল (Fruit)—লৌহ ও চূর্ণবিশিষ্ট পদার্থ।
 (ঙ) রস
 (চ) ভিটামিন বা জীবপ্রাণ।

প্রতিদিনের খাদ্য সমষ্টির পরিমাপ :—

পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক জন স্বাস্থ্যবান লোকের প্রত্যহ ২০০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরী (calories) বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। কার্বোহাইড্রেট—(আলু, চিনি, ভাত ইত্যাদি) তিন পোয়া হইতে এক সের; প্রোটিন—(মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি) ২½ ছটাক; (৪০০—৫০০ ক্যালরী); ফ্যাট—(ঘি, তেল ইত্যাদি) ১½ ছটাক, ৬০০ ক্যালরী আহাৰ্য হইতে উপরিউক্ত পরিমাণ ক্যালরী সমুৎপন্ন হয়।

কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট হইতে দেহে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, প্রোটিন বা নাইট্রোজেন বিশিষ্ট পদার্থ হইতে আংশিক ভাবে উত্তাপ সৃষ্টি হয় ও দেহের ক্ষয় পূরণ করে।

জীবনেহে শতকরা ৬০ ভাগ জলীয় পদার্থ বর্তমান। এই কারণে আহাৰ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। বার্লকো শরীরের জলীয় ভাগ হ্রাস হইলেও কোন সময়েই ৫৭।৫৮ ভাগের কম হয় না।

খাদ্যে লৌহ-জাতীয় পদার্থের বর্তমানতা হেতু বায়বীয় অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়তা হয়। গাঢ় ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় এবং অল্প পরিমাণে লৌহসংশ্লিষ্ট পদার্থ থাকায়, ইহা আমাদের একটি দৈনিক আহাৰ্য্যবস্তু হওয়া আবশ্যক।

দুধ এবং ইহা হইতে প্রস্তুত ছানা, পনীর, দই, বোল প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে অতি উপাদেয়। ইহাতে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ও উপকারী খাদ্য-উপাদান ও অত্যাবশ্যক খাদ্য—কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যোত্তম ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' বর্তমান। ভিটামিন খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদনে (অক্সিডেশনে) সহায়তা করে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

টোম্যাটোতে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং লেবু

मध्ये ভিটামিন 'সি' থাকায় ও অন্যান্য যে-সকল ফলে ভিটামিন 'সি' আছে এই সমুদয় ফল আহাৰ্যে স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের প্রচুর সহায়তা করে। রক্তনের সময় উত্তাপে ভিটামিন 'সি'র গুণ বিনষ্ট হয়, সেজন্য ইহা রক্তন না করিয়াই আহাৰ্য করা শ্রেয়ঃ। ইংরেজী একটি প্রবচন—'an apple a day keeps the doctor away' অর্থাৎ দিনে একটি আপেল আহাৰ্য করিলে চিকিৎসককে দূরে রাখা যায় কথাটি এখন a tomato a day keeps the doctor away হওয়া উচিত।

বিজ্ঞানের মতে মাখন ও বিস্কুট স্বতে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' এবং ডিমে ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'ডি' থাকায় অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত। কাশীতে ও কলিকাতায় দেখা গিয়াছে যে যে-সকল পরিবারে ডিম ও হাত-কুটি খাওয়া হয়, সেই সব পরিবারে বেরিবেরি হয় নাই। এ-বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ছোলা ও গমে যখন অক্সুরোগম হয়, তাহাতে ভিটামিন 'বি' থাকায় আহাৰ্য করিলে বেরিবেরি রোগ হইতে নিস্তারলাভের সম্ভাবনা আছে। চাউলে সামান্য পরিমাণ ভিটামিন 'বি' থাকে, কিন্তু ইহা গমের প্রোটিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া খাদ্য-হিসাবে প্রয়োজনীয়।

দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত ছানা পনীর জাতীয় সামগ্রী, শাক, কিছু মাখন এবং ঘি, রুটি ও ভাত, টোম্যাটো, লেবু এবং সম্ভব হইলে ডিম ও টাটকা ফল আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের তালিকা-ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধিশক্তির পরিচালনার জন্য উৎকৃষ্ট প্রোটিন (জৈব প্রোটিন) দুধ ও ডিমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছোলা, মটর, গম ও ডাল ইত্যাদির প্রোটিন জৈব প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে কোনও জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহার খাদ্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। লেখকের মতে যে জাতির খাদ্যে সহজপাচ্য ও ভাল প্রোটিনের অভাব, সে-জাতির বুদ্ধির প্রবর্ততা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যায়। বৈজ্ঞানিক অহুসন্ধান ও তাহাব ফলাফলে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জৈব প্রোটিন, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হইতে অনেকাংশে শ্রেয়ঃ। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটিন-জগতে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন,

যেহলে জৈব প্রোটিন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কয়েক প্রকার প্রোটিনের পুষ্টিকারিতার কিছু অল্পমান পাওয়া যায় :—

ছূষ, বাছ, মাসে	১০০
চাউল	৮৫
আলু	৭২
মটর-জাতীয়	৫৬
গম	৪
ভুট্টা	৩

তাহা হইলে এই তালিকা হইতেও ইহাই প্রমাণিত হইল যে জৈব প্রোটিন উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা উপকারী। কাজে কাজেই জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে তাহাদের খাদ্যের তালিকায় কোন-না কোন প্রকার জৈব প্রোটিনের স্থান ও ব্যবস্থা থাকার একান্ত আবশ্যক, অথচ দরিদ্রপ্রধান দেশে ইহা তেমন সম্ভবপর নহে, কারণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মূল্য জৈব প্রোটিন অপেক্ষা কম। ভারতও দরিদ্র-প্রধান দেশ, সেজন্য ভারতের অতি অল্পসংখ্যক লোককেই জৈব প্রোটিন তাহাদের দৈনিক খাদ্যতালিকাভুক্ত করিতে পারে। এই জৈব প্রোটিনের অভাব তাহারা চিত্তিরিত্ত পরিমাণ চাল, ডাল, মটর ইত্যাদি খাইয়া পূরণ করে।

উপরিলিখিত তালিকা হইতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে চাউলের প্রোটিন মটর বা ডাল জাতীয় প্রোটিন অপেক্ষা উপকারী। অল্পসংখ্যক লোক বায়, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আহাৰী বাহারা চাউলের উপরেই বেশী নির্ভর করে তাহাদের বৃদ্ধির প্রকরতা, বাহারা কেবলমাত্র গম, ডাল বা মটরের উপর প্রোটিনের জন্ত নির্ভর করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ইহাও দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষে বংশাঙ্কক্রে পুষ্টিবর জৈব প্রোটিন আহাৰের অভাবে অধিকসংখ্যক ভারতবাসী,

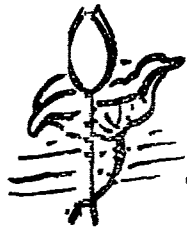
যে-সকল গুণ জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করে—উন্নতির পথে অগ্রসর করে—যথা, বুদ্ধিমত্তা, উদ্যমশীলতা, কর্মবুদ্ধিশীলতা, দৈহিক বল ইত্যাদি বাবতীয় গুণ ক্রমশ হারাইয়া ফেলিতেছে। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য জাতীয় খাদ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করা।

আজকাল মহাত্মা গান্ধীর উপবাসের দৃষ্টান্তে, বছরদিন-ব্যাপী উপবাস পালন সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। লেখকের সহিত কয়েক জন সহকর্মীর গবেষণার ফলে, উপবাসের সময় এবং বহুমুদে রোগে কেবলমাত্র সোডা-বাইকার্বনেট পানীয়ের সহিত ব্যবহার অপেক্ষা, সোডা-টারট্রেট, সোডাসাইট্রেট এবং সোডাবাইকার্বনেট ব্যবহার অধিক ফলপ্রসূ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উপবাসের সময় দেহের অভ্যন্তরের ফ্যাট এবং পরে মাংসপেশী দ্রব হয়—পূর্বে বলিয়াছি যে দেহের ভিতরের দহনকার্য জীবনের শেষ অবধি চলে। সেজন্য সময়ে সময়ে একাধিক দিনের উপবাস উপকারজনক হইলেও একাধিক দিনে বহুদিনের উপবাসে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

স্বর্ঘ্যরশ্মি যেমন অক্সিজেন চহনে (অক্সিডেশনে) খাদ্যের সম্বন্ধে সহায়তা করে, সেইরূপ স্বর্ঘ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়াও অক্সিডেশনে সহায়তা করে। সেই জন্ত উষ্ণ প্রদেশসকল, নাতিউষ্ণ প্রদেশসকল অপেক্ষা বহুবিধ রোগ হইতে রক্ষা পায়।

রিকট, পার্নাসাস্ এনিমিয়া, সর্দি, হাম, ক্যানসার প্রভৃতি রোগের হার, ইউরোপ ও আমেরিকা অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক অল্প।

স্বর্ঘ্যরশ্মির প্রভাবে খাদ্যবস্তু উপযুক্তরূপে অক্সিডেশনে ফলই এই রোগাশ্রতার কারণ। সুতরাং জগতের প্রায় সকল দেশেই যে স্বর্ঘ্যদেব দেবতারূপে আরাধিত হইয়াছেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।



অভাবিত

আধুনিক গদ্যকাব্যের স্পর্শগ্রাসকতায় অভিভূত হয়ে একখানা
গদ্যকাব্য রচনা করেছিলুম। চুসোহসে তার করে কবির সম্মুখে
সেটা যখন নিকেশন করলাম তিনি আমার স্পর্শ গ্রাস করে সেটাকে
পদ্যায়িত করে দিলেন। নিজের নামেই চালাবার লোভ ছিল, যথাকালে
স্ববুদ্ধি মনে উদয় হ'ল, ভাবলাম চুবিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে
ধরা। তাই সমগ্র ইতিহাস সমেত জিনিষটা লোকসমক্ষে প্রকাশ করা
গেল।—ঈশ্বরীচন্দ্র কর।

ঈশ্বরীচন্দ্র কর

এখনই, এই মুহূর্তেই বুঝে পেলাম সব।
আর তো কোনো অপেক্ষা নেই।
সামনে রাত্রির নৈশব্য-পাথার,
আকাশে জলে তারা,
শূন্য পথ,
মাঠের শেষে বনশ্রেণীর কালো রেখা প্রসারিত।
—যেন ওড়ার মুখে ডানামেলা মস্ত একটা বাদুড়।

ক্ষণেক আগেই ভেবেছি,—

অনেক আছে বাধা, বিশৃঙ্খলা-ই বা কত।
নাই যত্ন, নাই আয়োজন, কেবলই ত্রুটি।
আর কিছু কি হবে?
কিন্তু হ'ল তো,—
যা ভাবি নি তাই—
হ'ল এক মুহূর্তেই
মন ভরে, ডুবিয়ে দিয়ে মন,
জাগছে শুধু একটিমাত্র শাস্ত মধুর সবল চেতনা—
“তুমি আছ”।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনি এই মুহূর্তেই বুঝে পেলাম সব,
খামিয়া গেল জীবনের সকল কলরব।
সামনে রাত্রি রয়েছে সীমাহারা,
নৈশব্যের বক্ষ জুড়ে আকাশে জলে তারা,
সকল পথ করিয়া গ্রাস শূন্য অব্যাহত,
মাঠের শেষে ঘন বনের কালিমা প্রসারিত।
ওড়ার মুখে মেলিয়া ডানা বাদুড় যেন জাগে।

ভেবেছি কিছু আগে,

অনেক বাধা, বিশৃঙ্খলা অনেক গেছে জুটি—
অনেক আছে আয়োজনের ত্রুটি,—
তবুও দেখ, ভাবি নি যেই কথা—
মুহূর্তের মস্তবলে এখনি ঘটিল তা,—
ডুবিল মন, ডুবিয়া গেল সকল বেদনা,
রয়েছে শুধু একটি চেতনা
পূর্ণ করি আমার মনোভূমি
একাকী আছ তুমি ॥



ব্রহ্মে বাঙালীর মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা।

শ্রীঃবিমল চৌধুরী

পূর্বে বাংলায় মাতৃভাষার প্রতি বাঙালীদের যেমন অবজ্ঞার ভাব দেখা যাইত, এখনও ব্রহ্মে বাংলা ভাষার প্রতি সেইরূপ অবহেলার ভাব বহুস্থলে পরিলক্ষিত হয়। যে-সকল বাঙালী ছাত্র ব্রহ্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন। মাতৃভাষা শিক্ষা যে শিক্ষার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, উহা চর্চা যে মানুষ মস্তকেরই করা উচিত, তাহা তাঁহাদের কেহবা স্বীকার করেন না, কেহবা জানিয়াও উদাসীন, কেহবা অসুস্থ ব্যবস্থার অভাবে অগ্রসর হইতে পারেন না। অবশ্য শেষোক্ত কারণটি এইরূপ উদাসীনতার কৈফিয়ত মাত্র। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয় এবং ব্রহ্মে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা নাই যাহা বাঙালীর মাতৃভাষা শিক্ষার ও চর্চার ব্যাধাত করে। স্থলে কলেজে বাংলা না পড়িলেও ঘরে পড়িবার কোন বাধা নাই, কিন্তু সাধারণতঃ এ-বিষয়ে বাঙালীদের অহুরাগ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সহিত কৃতকার্য হইলেও বাংলা জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের শিক্ষা অংশতঃ অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, এখনকার ছাত্রগণ বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অনেক সময় ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। বঙ্গসাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, পৃথিবীর উন্নত ভাষাসমূহের মধ্যে যে বঙ্গভাষাও অন্যতম, ভাব ও ভাষার দিক দিয়া বাংলা যে ভারতের একটি সর্ববাসিন্দুস্ত উৎকৃষ্ট ভাষা—চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাষা যে বাংলা—এই সব শুনিলেও তাঁহারা উহার বড়-একটা মার ধারেন না। হিন্দী ও উর্দু ভারতে বহুল প্রচারিত বলিয়া ঐ সকল ভাষাকে অনেকে স্নন্যরে দেখিয়া থাকেন। মাতৃভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকাতোই বাংলা সম্বন্ধে এইরূপ ভুল ধারণা। ছাইপাশ বাংলা পড়িয়া কোন লাভ নাই, তাহা অপেক্ষা বরং ইংরেজী-পড়িলে ইংরেজী-জ্ঞানও হইল

এবং পরীক্ষার ব্যাপারেও সুবিধা হইবে—এইরূপ অনেকের ধারণা। কেবল বিজ্ঞাতীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিলেই হয় না, মাতৃভাষায়ও দখল থাকা আবশ্যক। মাতৃভাষায় সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ কোন দিন বিজ্ঞাতীয় ভাষায় সাহিত্য-জগতে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই—পরীক্ষা পাসই ছাত্রজীবনের একমাত্র কাম্য নয়—মাতৃভাষায় উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা কর সকলেরই কর্তব্য—এই সর্বল বিষয়ের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন। বর্মী কিংবা ইংরেজী—যে সকল ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে, তৎপ্রতি আনক মনোযোগ থাকা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে বাংলাকে অবহেলা করাও উচিত নয়।

ছাত্রদের এইরূপ অবহেলা ও ভুল ধারণা পোষণের জন্য অভিভাবকেরাও কতক অংশ দায়ী। ব্রহ্মের অধিকাংশ বাঙালী অভিভাবকই ছেলেদের বাংলা শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা বাংলা ভাষা শিখাইবার প্রয়োজনীয়তাকে মোটেই প্রাধান্য দেন না। সুবিধাত ছেলেকে কোন সরকারী কিংবা প্রাইভেট-ভার্নাকুলার হাই-স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল; সেই স্কুলে হয়ত বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা নাই, স্বতরাং বাংলা পড়া স্বগিত রাখা হইল, অথবা আর পড়াই হইল না। গৃহে স্বতন্ত্রভাবে পড়িবার ও পড়াইবার উৎসাহ অনেকেরই নাই। মাঝে মাঝে দেখা যায় অনেক ছেলে অল্পবয়সে বাংলায় কথা বলিতে জানে না। যে-স্থানে যে-জাতীয় সঙ্গী পায় সেইরূপ ভাষাতেই কথা বলিতে শিখে। অভিভাবকগণের এই বিষয়ে সতর্ক ও যত্নবান হওয়া উচিত। চুঃখের বিষয়, অনেক সময় বাঙালীর ছেলের বিজ্ঞাতীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস করান হইয়া থাকে। স্থলে পড়িবার পক্ষে সুবিধা হইবে বলিয়া হয়ত উদ্দুতে পাঠারম্ভ করান হইল। স্থলে উদ্দু পড়া আরম্ভ করিল এবং বেশ উন্নতিও করিল। উদ্দু-এক বৎসর পরে পিতা কিংবা অভিভাবক স্থানান্তরিত হইয়া তত্ত্বঃ

জায়গায় আসিলেন। অতঃপর ছেলেকেও কর্মস্থলে কোন একটা স্থলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেই স্থলে উনু পড়ান হয় না—হুতরাং উনু ছাড়িয়া অন্য ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিল। ইহাতে কোনটাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। হয়ত বা উনু ছাড়িয়া বাংলা ধরান হইল, চতুর্থ মানে ছাত্র ‘অ আ ক খ’ আরম্ভ করিল। ইহাতে ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই অসুবিধা। আবার এমন অভিভাবক আছেন যাহারা উনুসাহী ছাত্রের মাতৃভাষা শিক্ষার ও চর্চার আগ্রহকে হনুজের দেখেন না। বাংলা পড়িয়া কোন লাভ নাই, এই মনোভাব। সময় সময় এইরূপও দেখা যায় যে, ইংরেজী যে-কোন বকমের বই পড়িলেও কোন আপত্তি হয় না, কিন্তু বাংলা কোন ভাল বই পড়িতে বলিলেও আপত্তি হয়। মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি অভিভাবকগণের এইরূপ অবহেলার ও যত্নহীনতার ফলে ছাত্রেরাও তৎপ্রতি উদাসীন।

তার পর স্কুল-কলেজের দিক দিয়া বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলির কথা। কলেজে বাংলা পড়াইবার কোন ব্যবস্থা নাই। সমগ্র ব্রহ্মের স্কুলগুলির সংখ্যার অল্পপাতে ভারতীয় কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা অতি অল্প। বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত স্কুল মাত্র একটি—রেজুনের বেঙ্গল একাডেমী। কেবল এই স্কুলেই নিয়মিত বাংলা পড়ান হয়। বাকী ভারতীয় অধিকাংশ স্কুলগুলিতেই বাংলা পড়াইবার ব্যবস্থা নাই। গভর্নেন্ট পরিচালিত স্কুল-সমূহে তা মোটেই নাই। পরন্তু বর্মী লইয়া হাই-স্কুল ফাইন্সাল পাস না করিলে এখানকার কলেজে ভর্তি হওয়া কঠিন। বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্রগণকে বাদ দিলে ব্রহ্মের প্রায় সব বাঙালী ছাত্রই কেবল বর্মী লইয়া পাস করেন। অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র উনু, হিন্দী কিংবা বাংলা লইয়া পাস করেন। অবশ্য অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে বাংলা অনার্সসেই পড়া যায় এবং উহাতে পরীক্ষাও দেওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই তাহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। যে-দেশে থাকিতে হইবে সেই দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু তজ্জন্য মাতৃভাষাকে তুলিলে চলিবে কেন ?

মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ অবহেলার ফলে বর্তমানে

কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্ত বাংলা জানেন, কেহবা একেবারেই জানেন না। ভাল বাংলা-জানা ছাত্রের সংখ্যা অতি অল্প। অন্যান্য বিষয়ে কৃতী হইলেও তাহারা মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্কুলের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বেঙ্গল একাডেমী ছিঃ অন্য কোন স্কুলে ভাল করিয়া বাংলা পড়ান হয় না। দুই-একটি স্কুলে পড়াইবার ব্যবস্থা থাকিলেও বাংলা পড়িবার প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ খুব কমই দেখা যায়। ফলে ব্রহ্মের শতকরা ৭৫ জন বাঙালী ছাত্রই বাংলায় অনভিজ্ঞ। এমন অনেক ছাত্র আছেন যাহারা বাংলায় কথা বলিতে জানেন কিন্তু অক্ষর চিনেন না। কেহ-কেহ নাম লিপ্যন্তর করিতে ও ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া পড়িতে পারেন। কেহ সামান্ত লিখিতে ও পড়িতে জানেন, কেহবা চলনসই বাংলা জানেন। শুদ্ধ করিয়া মোটামুটি লিখিতে পড়িতে পারেন, এমন ছাত্রের সংখ্যা খুব কম। বাংলা ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকাতে বাংলা দেশের ভাবধারার সহিতও ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। মাতৃভাষার সম্বন্ধে অমূলক ধারণা পোষণের ফলেও এই অনভিজ্ঞতা। যদি বাংলা দেশে কোন আত্মীয়ের কাছে চিঠি লিখিতে হয় তবে ইংরেজীতে লিখিতে হইবে। সেই আত্মীয়ের ইংরেজী জানা না থাকিলে হয়ত আবার এক জন অনুবাদকের সন্ধান করিতে হইবে। মাতৃভাষার প্রতি এইরূপ অবজ্ঞা এবং তাহার ফলে অজ্ঞতা দেশে ও জাতির পক্ষে কখনও মঙ্গলকর নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে এমন কোন প্রতিকূল ব্যবস্থা নাই যাহা বাংলা শিক্ষার চর্চার ব্যাঘাত ও অসুবিধা জন্মাইতে পারে, একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু নতুন নিয়ম হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালের পর হইতে যাহারা বাংলা লইয়া পাস করিতে চান তাঁহাদিগকে বাংলা এবং যত্নমানের উপযোগী বর্মীতে পরীক্ষা দিতে হইবে। ব্রহ্মদেশে থাকিতে হইলে বর্মী জানা আবশ্যক এবং উহা আবশ্যিক করা ভালই হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মভাষা শিক্ষা যেমন প্রয়োজনীয় মাতৃভাষা শিক্ষাও সেইরূপ সমভাবে প্রয়োজনীয়। হুতরাং বাংলা শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা কোনক্রমেই হারান উচিত নহে। যাহারা পূর্বে বিদ্যালয়াদিতে বাংলা শিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহাদের গৃহে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা ও চর্চা করা উচিত। অন্তত যাহাতে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে ও

বসিতে পারেন তাহার চেষ্টা কর। কর্তব্য—সময় নাই কিংবা ব্রহ্মদেশে বাঙালী ছাত্রেরা বাহাতে মাতৃভাষা শিক্ষার দিকে
সুবিধা নাই, এইরূপ ভাবিয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। মন দেন এবং অভিভাবকেরাও এই বিষয়ে মনোযোগী
ইচ্ছা থাকিলে সহজেই সময় ও সুবিধা করিয়া লইতে পার হন, তৎক্ষণ্য দেশবাসী ও ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ
যায়। বিশেষত নিজের মাতৃভাষা, সর্বপ্রথমে বাহা শেখা ও করা উচিত।
জানা উচিত, তৎপ্রতি এইরূপ উদাসীন থাকা উচিত নয়।

মান্দালয়

স্বরলিপি

গান

আঁখান অধনে প্রচণ্ড ডঙ্কর
বাজিল গভীর গরজনে।
অশথ পলবে অশান্ত হিলোল
দমীর-স্বল দিগজনে।
নদীর কলোব বনের মর্মর
বাদল-উচ্ছল নির্ঝর ঝরঝর
ধ্বনি স্তরজিল নিবিড় সঙ্কীর্ণে,
শ্রাবণ মম্যাসী রচিল রাগিণী।
কদম্বকুঞ্জর স্পন্দ মদিরা
অজস্র লুটিছে ছুরন্ত বাটিকা।
তড়িৎ শিখা হুটে দিগন্ত সন্ধিয়া,
ভয়ান্ত বায়িনী উঠিছে ক্রন্দিয়া,
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব
মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

II সা সা -৭ রা । রা -পা -মা -পা I মজা জা -৭ রসা । সা রা -জা রা I
আ ধা ০ র অ ম্ ০ ব রে ০ ০ ০ ০০ প্র চ ন্ ড

I সা -রা -৭ ৭। । সা -৭ -৭ -৭ I সা -রা -৭ -৭ । সজা জা -৭ -জা I
ড ম্ ০ ব ক ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ধা ০ র

I জা জা জা -রা । সা রা -জা রা I সা -রা ৭। সা । মমা মা -পা পা I.
অ ম্ ব রে প্র চ ন্ ড ড ম্ ব ক বা জি ০ ল

I	পা	-মা	-গা	ধা	I	পা	-রা	-গা	ধা	I	মা	-পা	০	পা	I
	গ	ম্	০	ভী		র	০	০	০		০	০	০	০	
											বা	জি	০	ল	
I	পাঁ	সাঁ	ধা	পা	I	পা	মা	-রা	পা	I	মা	-জা	-রা	-সা	I
	গ	ম্	ভী	র		গ	র	০	জ		নে	০	০	০	
											জা	ধা	০	র	
I	সা	-রা	-জা	রা	I	সা	-রা	-গা	ধা	I	মা	পা	পা	পা	I
	অ	ম্	০	ব		রে	০	০	০		অ	শ	ত্	থ	
											প	০	ল্	ল	
I	পা	-রা	-মা	-রা	I	রা	-মা	-রা	-রা	I	মা	পা	পা	পা	I
	বে	০	০	০		০	০	০	০		অ	শা	ন্	ত	
											হি	ল্	লো	ল	
I	মা	পা	পা	পা	I	পা	-সাঁ	সাঁ	সাঁ	I	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	I
	অ	শ	ত্	থ		প	ল্	ল	বে		অ	শা	ন্	ত	
											হি	ল্	লো	ল	
I	ধা	-মা	-গা	গা	I	গা	গা	বা	-পা	I	মা	পা	-মা	পা	I
	স	মী	০	র		চ	ন্	চ	ল		দি	গ	ঙ্	গ	
I	সা	সা	-রা	রা	I	সা	-রা	-জা	রা	I	সা	-রা	-গা	ধা	I
	জা	ধা	০	র		অ	ম্	০	ব		রে	০	০	০	
II	মা	পা	-রা	পা	I	পা	-পা	না	না	I	না	না	-সাঁ	সাঁ	I
	ন	দী	০	র		ক	ল্	লো	ল		ব	নে	০	র	
I	পা	-সাঁ	-রা	সাঁ	I	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	I	সাঁ	সাঁ	-মা	সাঁ	I
	বা	দ	০	ল		উ	চ্	ছ	ল		নি	ক্	০	র	
I	রাঁ	রাঁ	-রাঁ	সাঁ	I	সাঁ	-মা	-রা	না	I	সাঁ	-রা	-গা	ধা	I
	ন	দী	০	র		ক	ল্	০	লো		ল	০	০	০	
I	সাঁ	সাঁ	-রাঁ	সাঁ	I	সাঁ	গা	-মা	-মা	I	-পা	-রা	-গা	ধা	I
	ক	নি	০	ত		র	ঙ্	০	গি		ল	০	০	০	
I	সাঁ	সাঁ	-রাঁ	সাঁ	I	-মা	গা	গা	গা	I	ধা	ধা	-রা	-গা	I
	ক	নি	০	ত		র	ঙ্	গি	ল		নি	বি	০	ড	
I	মা	পা	-রা	পা	I	পা	মা	গা	ধা	I	মা	জা	-রা	-রা	I
	জা	ব	০	গ		স	০	০	জা		সাঁ	০	০	০	
I	মা	পা	-রা	পা	I	পা	পা	প্	ধা	I	মা	পা	-রা	মা	I
	জা	ব	০	গ		স	ন্	ন্যা	সাঁ		র	চি	০	ল	
I	সা	সা	-রা	-রা	I	সা	-রা	-জা	রা	I	সা	-রা	-গা	ধা	II
	জা	ধা	০	র		অ	০	ম্	ব		রে	০	০	০	

II	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	।	সাঁ	সাঁ	-পা	-পা	I	গা	পা	-পা	পা	।	ধা	ধা	পা	-।	I
	ক	দ	ম্	ব		কু	নু	জে	র		জু	গ	নু	ধ		ম্	দি	রা	০	
I	মা	পা	-পা	পা	।	ধা	ধা	পা	ধা	I	মা	পা	পা	মা	।	জা	রা	সা	-।	I
	জ	জ	স্	র		লু	ঠি	ছে	০		হু	র	নু	ত		ঝ	টি	কা	০	
I	না	না	না	না	।	না	-।	না	-সাঁ	I	সাঁ	-।	-।	-।	।	-।	-।	-।	-।	I
	ত	ড়ি	৭	শি		ধা	০	ছু	০		টে	০	০	০		০	০	০	০	
I	না	না	না	না	।	না	-।	না	না	I	না	না	-সা	সা	।	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	I
	ত	ড়ি	৭	শি		ধা	০	ছু	টে		দি	গ	নু	ত		স	নু	ধি	য়া	
I	সাঁ	সাঁ	সাঁ	সাঁ	।	সাঁ	-সাঁ	-সাঁ	রা	I	রা	জা	-।	-।	-।	।	-।	-।	-।	I
	ভ	য়া	র	র্ভ		য়া	০	০	মি		গী	০	০	০		০	০	০	০	
I	জা	জা	-মা	মা	।	ম	জা	-।	রা	সাঁ	I	সাঁ	সাঁ	-রা	সাঁ	।	সাঁ	-পা	পা	I
	ভ	য়া	বু	ত		যা	০	মি	নী		উ	ঠি	০	০	ছে		জ	নু	ধি	য়া
I	পা	পা	সাঁ	সাঁ	।	পা	পা	পা	পা	I	পা	ধা	-সাঁ	পা	।	পা	-।	পা	পা	I
	না	চি	০	ছে		যে	ন	কো	নু		প্র	ম	তু	ত		দ	০	ন	ব	
I	সাঁ	সাঁ	-।	সাঁ	।	পা	পা	ধা	পা	I	মা	পা	-।	পা	।	মা	মা	জা	-রসা	I
	মে	যে	০	র		হু	বু	গে	র		দু	য়া	০	র		হা	নি	য়া	০০	
I	সা	সা	-।	রা	।	সা	-রা	-জা	রা	I	সা	-।	-।	-।	II	II				
	আ	ধা	০	র		অ	ম্	০	ব		রে	০	০	০						

তারা

শ্রীমণীষ ঘটক

রাবণে হুঝিবে বানরসৈন্ত লয়ে
এত ছলাকলা, তাই এত আয়োজন ?
বলী সে বালীর সবল বাহুর ভয়ে
দেশত্যাগ করি বাঁচিয়াছে দশানন !

সুগ্রীব নহে চতুর তোমার মত,
প্রাণবিরোধে মাতিল মিতার তরে
কিন্তু সে বীর, শৌর্য-সমুদ্ভূত,
তাহার রমণী রাক্ষসে নাহি হরে !

নরের ইতব আমরা বানর জাতি,
মোরা মানি বীরভোগ্য বহুধরা ।
আমাদের তরে পৃথক শত্রু পাতি,
আমীহঙ্কার হয়েছি স্বপ্নবরা !

• হায় নররূপী নারায়ণ, কহুধার
হরিতে কি এলে আশ্রয় পুরুষকার ।

অলখ-বোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব পরিচয়

চন্দ্রকান্ত মিশ্র মহানন্দোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহামায়া, ভগিনী হেমবতী ও পুত্রকান্তা শিবু ও সখাকে লইয়া থাকেন। সখা শিবু পুজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মাঝার বাড়ী যায়। শালকনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির গল্লর সাড়ী চড়িয়া এখানেও তাহার। রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষণচন্দ্র ও দ্বিদিয়া ভূবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিবাহ দিদি হরধুনীর খুব ভাল। হরধুনী সঙ্গারের কজী কিন্তু অল্পই বিবাহিত তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আশীর্বাদ। পুজার পূর্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সখার দ্বিদিয়া ভূবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও হরধুনী চক্ষে অশ্রুকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অল্পসেবা, কিন্তু শেকের উদাসীত্ব ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনাদের অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে কিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সখার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতার গিয়া জীও চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের মীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সখার মন বিরহ-বাবুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরগরিষ্ঠ গৃহকে ছাড়িয়া ব্যক্তি ও শক্তি মনে হইয়া বা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নতুনদের ভিতর সখা কোন আশ্রয় পাইল না। পঞ্চদশ মাতা ও সঙ্গার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নতুন নতুন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত।]

১৩

বার বৎসর মাত্র বয়সে পল্লীমাতার নিবাড়ম্বর জোড় হইতে সখা যখন মহানগরীর সমারোহের মাঝখানে আসিয়া পড়িল, তখনই তাহার মনের গঠনের ছাঁচ সম্পূর্ণ ঢালাই হইয়া গিয়াছে। পল্লীজননীর শ্রামশ্রদ্ধ শান্তশ্রী তাহার মনে যে চির নবীনতার রং ধরাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে পল্লীর প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু নগরীর সমারোহ ছিল না। ধরপী যেমন করিয়া বুক পাতিয়া বর্ষাধারাকে গ্রহণ করিয়া আপনাদের শ্রামলতায় সজলতায় নীরবে তাহাকে নব রূপ দান ববে, আকাশকে সপ্রোম শ্রদ্ধ হস্তে অভিনন্দিত করে, সখার মনও তেমনই করিয়া মানুষের স্নেহপ্রীতিকে সর্বাঙ্গতঃ গ্রহণ করিয়া নীরব মমতা ও গভীর সরস অস্থিরাকে বিকশিত হইয়া

উঠিতেছিল। গ্রহণ ও দান দুইই তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু লৌকিক দেনা-পাওনার নাগরিক প্রথা সম্বন্ধে চেতনা তাহার ক্রান্ত সজাগ হইয়া উঠিল না। বৃষ্টি-ধারা ধরণীব রন্ধে, রন্ধে, সঞ্চারিত হইয়া তাহার হৃদয়কে নবপ্রাণে বিকশিত করিয়া তোলে, কিন্তু তখন সে বারিধারাকে আর মাগিয়া ওজন করিয়া এই শ্রামলতার ভিতর চিনিয়া লওয়া যায় না। কলের জল পাইপের এক দিকে যেমন রূপে যে মাপে ঢোকে তেমনই মাপে ওজনে অল্প পাত্র গিয়া ধরা দেয়। নাগরিক সভ্যতাও যেন সেই রকম—যেখানে টাকা পাইয়াছে ওজন করিয়া জিনিষ দিবে, ভদ্রতা পাইয়াছে ওজন করিয়া বস্তু দিবে। এই ওজন-করা ব্যবসায়িক ভদ্রতার আদবকায়দা সম্বন্ধে সখার সঙ্কোচ ও অজ্ঞতা চিরকালই রহিয়া গেল। তাহাকে হস্ত মুচুতাও বলা চলে। কারণ ইহারই জন্ত নাগরিক সভ্যতার বিচক্ষণ মানুষকে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া চিরকালই সে একটু পিছনে থাকিত।

শিবু তাহার পাড়াপ্রতিবাদী ইচ্ছুলের সহপাঠী সকলের সঙ্গেই ক্রমশঃ করিতে এবং সর্বক্ষেত্রে আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া প্রমাণ করিতে যখন ব্যস্ত, সখা তখন যেন ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া যাইতেছে। কলিকাতায় আসিয়া পর্যন্ত তাহার সমবয়সী মানুষ যে তাহার চোখে কম পড়িয়াছে তাহা নয়, কিন্তু কাতারও সহিতই সে আপনা হইতে সম্পর্ক গাড়িয়া তুলিতে পারিত না। যাহাকে তাহার ভাল লাগিত তাহাকে সে দূর হইতেই আন্তরিক মমতা ও নিষ্ঠার সহিত ভালবাসিত, পৃথিবীর হৃদয়জাত বনস্পতির মত তাহার শিকড়ও যেমন গভীর ও বিস্তৃত হইত, তাহার বহিঃপ্রকাশও তেমনই শ্রামশ্রদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাতে দূরন্ত গতির চাক্ষুষ আসিত না।

জানুয়ারী মাসের প্রথমে চন্দ্রকান্ত একদিন গাড়ীভাড়া করিয়া সখাকে মেয়ে-ইচ্ছুলে ভর্তি করিতে চলিলেন।

ফুল-বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড সবুজ ঘাসের ময়দান, পাশ দিয়া রাজা স্বরকির পথে সারি সারি কুমকোজবার গাছ, দুই-একটা টগর গন্ধরাজও আছে। দেখিলে নয়ানজোড়ের দিগন্তবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর ও রাজা ধুলার পথ মনে পড়িয়া যায়। কিন্তু চারিধারে হস্তমুখর লীলাচঞ্চল বালিকার সর্কোতুক দৃষ্টিপাতে স্বধার মানবভীতি সজাগ হইয়া উঠিল, সে আর বাহিরের দিকে না তাকাইয়া ঘরের মেঝেতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিল। হাই-হিল জুতার খট্ খট শব্দ করিয়া ব্যস্ত ভাবে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ভয়ে স্বধার বুকেটা ছুঁ ছুঁ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শিষ্টাচার মতে তাহার কি কর্তব্য স্বধা যেটুকু জানিত তাহাও কেমন যেন ছুলিয়া গেল। চক্ষুকাণ্ড উঠিয়া পাড়াইয়া নমস্কার করিলেন, স্বধা নীরবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একবার খালি মুখ তুলিয়া দেখিয়া লইল শিক্ষয়িত্রীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হৃৎকণ্ডল ফরাসভাষার শাড়ী ও তাঁহার বকবক সোনার চশমার অস্তরালে তীক্ষ্ণ স্তেনদৃষ্টি। নিশ্চয় স্বধাকে খুব কঠোর পরীক্ষা দিয়া বিভ্রালয়ে প্রবেশের ছাড় লইতে হইবে। মাহুঘটাকে দেখিয়াই খুব কড়া মনে হইতেছে। শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বাংলা ইংরেজী অঙ্ক কত দূর পড়েছ ?”

সময়ে স্বধা বলিল “সীতার বনবাস, মেঘদূত”... আর বলিতে হইল না। শিক্ষয়িত্রীর কঠোর মুখে হাসি দেখা দিল, “তুমি এতটুকু মেয়ে মেঘদূত পড় ? তবে টোলে ভর্তি হলে ত পারতে।”

চক্ষুকাণ্ড বলিলেন, “মেঘদূত ওর মুখস্থ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ফুল হয়েছে, ইংরেজী বেশী পড়ানো হয় নি।”

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, “তাতে আর কি ? ও ত ছেলে-মাহুঘ, শিখে নেবে এখন। ওকে খার্ড ক্লাসে বসিয়ে দি গিয়ে। কি বলেন আপনি ?”

এই পরীক্ষা! স্বধার ধড়ে প্রাণ আসিল। শিক্ষয়িত্রীর হাতে তাহাকে সঁপিয়া দিয়া চক্ষুকাণ্ড চলিয়া গেলেন। এই জনারণ্যের ভিতর স্বধা নির্বাসিতা সীতার মত একলা পড়িয়া রহিল। শিক্ষয়িত্রী তাহাকে যেখানে লইয়া বসাইয়া দিলেন ক্লাসের ঠিক সেইখানটিতে স্বধা নিশ্চল প্রতিমার মত বসিয়া রহিল। ভাল করিয়া কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলিয়া

তাকাইলও না, পাছে চোখে চোখ পড়িলেই কেহ কোন প্রশ্ন করিয়া বসে। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে পড়াইতেছিলেন, তিনি স্বধার সর্কোচ ভাঙিয়া দিবার জন্ত বলিলেন, “বল দেখি—‘জ্যোৎস্না তুষার মলিনা সীতের চাতপত্তামা’ মানে কি ?”

স্বধা মানে বলিতেই পণ্ডিত মহাশয় মেয়ের বলিলেন, “দেখ, তোমরা যেন সব নতুন মেয়ের কাছে হেরে যেও না।”

মেয়েরা বিস্ময় ও কৌতুহলে দৃষ্টি পূর্ণ করিয়া স্বধার মুখের দিকে তাকাইল, স্বধা কিন্তু মুখ তুলিল না।

স্নেহলতা বলিয়া একটি খ্রীষ্টিয়ান মেয়ে পিছনের বেঞ্চে বসিয়াছিল। সে স্বধার সর্কোচ বুঝিয়া আপনি উঠিয়া আসিয়া স্বধার কাছে বসিয়া ভাব করিতে শুরু করিল। ক্লাসের ভিতর বেশী গল্প করা চল না, কাজেই সে স্বধার খাতার বাংলা ইংরেজী সমস্ত বইয়ের নাম, প্রত্যেক বারের প্রত্যেক কটার কটন একে একে টুকিয়া দিতে লাগিল।

টুকিনের ঘটনা চং চং করিয়া পড়িতেই মেয়েরা যে যাহার প্রিয় বন্ধকে লইয়া বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। স্নেহলতা স্বধাকে সঙ্গে লইয়া মুসলমান বান্ধবীদিগের নিকট হইতে চকোলেট কিনিয়া খাওয়াইল। স্বধার জীবনে চকোলেটের স্বাদ গ্রহণ এই প্রথম। রঙটা ত বেশ স্বন্দর পাটালি শুড়ের মত, কিন্তু স্বাদগন্ধ ঠিক যেন পোড়া জামাক। কিন্তু স্নেহলতা ভালবাসিয়া দিতেছে—কি করিয়া কেলিয়া দেওয়া যায় ? মুখটা বখাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া সে সমস্ত চকোলেটটা এক সঙ্গে গিলিয়া ফেলিল। স্নেহলতা কিন্তু চালাক মেয়ে, সে স্বধার মুহূর্ত্তে গলাথকরণ দেখিয়া আসল ব্যাপারটা ধরিয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল “ওমা, নেসলস্ চকোলেট তোমার ভাল লাগল না! প্রথম দিনে কাকুরই ভাল লাগে না, যদি না আমাদের মত আজন্ম খাওয়া যায়। আচ্ছা, তুমি ‘গোয়াভা চিজ’ খেয়ে দেখ, নিশ্চয় বেশ লাগবে।”

স্বধা আপত্তি করিবার আগেই স্নেহলতা পাভলা কাগজে জড়ানো লাল টুকটুকে ‘চিজ’ তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। “ওমা, এ ত পেরারা”, বলিয়া স্বধা খুশী হইয়া সাগ্রহে সর্বটা খাইয়া ফেলিল। কিন্তু প্রতিমানে কিছু ত দেওয়া তাহারও

উচিত। সুধা বলিল, “কাল আমি পিসীমার তৈরি আমসহ এনে তোমাকে খাওয়াব, দেখো কেমন চমৎকার।”

স্নেহলতা হাসিয়া বলিল, “সে হবে এখন। তোমার ত বই কেনা হয় নি, চল খাতায় লিখে দি, কালকের বইয়ের কতখানি পড়া।”

পড়া লিখিতে লিখিতে স্নেহলতা বলিল, “সেকেণ্ড মাস্টার মহাশয়ের পড়াটা একটু স্বল্প করে ক’রে রেখো, ভাই, উনি বড্ড রাগী মানুষ, শেষে বেকির উপর দাঁড়াতে না বলেন।”

সুধা অজ্ঞের মত বলিল, “বেকির উপর দাঁড়ালে কি হয়?”

স্নেহলতা সুধাকে ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিল, “একবার দাঁড়িয়ে দেখো না কি হয়! তুমি একেবারে অজ্ঞ পাড়ারগেয়ে।”

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, “আর কি পড়া আছে বল।”

স্নেহলতা বলিল, “পণ্ডিতমশায় ভাল মানুষ, বই না গেলে তাঁর পড়াটা দুই-এক দিন বাদ গেলেও তিনি নূতন মেয়েকে কিছু বলবেন না। তাছাড়া তুমি ত ভাই নিজেরই মস্ত পণ্ডিত, না-পড়া জিনিষও বলতে পার। যাই হোক পণ্ডিতমশায়কে কিছু বেশী প্রশ্ন করো না, বা বলবেন চূপ করে শুনো। প্রশ্ন করলেই উনি ভাবেন ওঁকে বুঝি ঠাট্টা করা হচ্ছে।”

স্নেহলতা সুধাব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবার নানা চেষ্টাই করিল। কিন্তু এই চেষ্টা-করা বন্ধুত্বের ভিতর আন্তরিকতার কি একটা অভাব অথবা ভিন্ন তরঙ্গীর স্বর সুধার মনেব গভীরে বাধা দিত। সে স্নেহলতাকে একেবারে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। ইচ্ছুলে প্রত্যেক মেয়েরই এক-একটি বিশেষ বন্ধু ছিল, স্নেহলতার ইচ্ছা ছিল তাহার এই বিশেষ বন্ধুত্বের কোঠায় সে সুধাকে ফেলে। কিন্তু সুধা যে তেমন ভাবে সাড়া দেয় না ইহাতে স্নেহলতা রাগ করিয়া কতবার বলিত, “তুমি ভাই আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পার না। কার দিকে তোমার মন বল না? উপর ক্লাবেব বড় মেয়েদেব এডমায়ারার হতে চাও বুঝি? ওসব ত্রাকামী দেখলে আমার গা জ্বালা করে। ইচ্ছুলে এসে লেখাপড়া শেখবার আগেই ঐ বিজেট সকলের শেখা হয়ে যায়।”

সুধা লজ্জিত হইয়া বলিত, “কি যে তুমি আবলতাবল নক! আমার কাকুর সঙ্গে আলাপই নেই, ত ত্রাকামী করব কোথেকে? তোমাকেই ত কেবল আমি চিনি। হাসের মেয়েদের এখনও ভাল করে চেনা হয় নি।”

বাণ্যবন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন সুধার জীবনে তখনও ঘটে নাই। তাহার প্রায় একমাত্র খেলার সাথীই ছিল ছোট ভাই শিবু। কিন্তু একে ত সে ভাই, তাহাতে শৈশবের স্মরণের মাগে অনেকটাই ছোট, সেই জন্ত সুধা তাহাকে ত্রিক বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে কোন দিন পারে নাই। শিবুর প্রতি তাহার ভালবাসা ছিল গভীর বাৎসল্যমিশ্রিত। সে যে তাহাব ক্ষুদ্র ভাইটির মস্ত বড় দিদি এই কথাটাই ছিল তাহার ভালবাসার ভিতর সকলের চেয়ে বড়। নারীজন্মের প্রথম পর্বেই বাৎসল্যরসের মমতাসিক্ত ধারা তাহার জীবনকে স্রস করিয়া তুলিয়াছিল এই ছোট ভাইটিকে অবলম্বন করিয়া। অথচ সুধার মনে প্রবল একটা বন্ধুপ্রীতি তখনও উখলিয়া ফুলপ্রাবিত করিয়া ছুটিবার জন্ত ধম্ করিতেছে। পূর্ণিমার চাঁদের মত কোন্ বন্ধুর আকর্ষণ তাহার এই প্রীতিব সাগর উজ্জ্বলিত করিয়া জোয়ারের মত টানিয়া লইয়া যাইবে এই-টুকুর প্রত্যাশাতেই যেন সে বসিয়া ছিল।

এমনই দিনে দেখা দিল হৈমন্তী। স্কুলের টিফিনের ছুটির সময় একটা মস্ত মোটর গাড়ী করিয়া গাড়ীবারান্দায় বাহাবা যেন আসিয়া নামিল। সব মেয়েরা তখন স্কুল-বাড়ীর ময়দানে খেলা করিতে ব্যস্ত। স্নেহলতা আজ পড়া তৈয়ারী করিয়া আনে নাই বলিয়া ছুটির সময় প্রাণপণে ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিতেছে। সুধা একলা একলা গাড়ীবারান্দার ধারের চওড়া বারান্দায় পায়চারি করিতেছিল। গাড়ীটা দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। থাকি পোষাক-পরা রুদ্রাক্ষের মালা গলায় হিন্দুস্থানী দরওয়ান গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিবার আগেই একটি গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটি শ্রামাদী বালিকাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া পড়িলেন। সুধা মেয়েটিকে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিল। কলিকাতার আধুনিক স্কুলের মেয়ে সুধা এক মুহূর্তে যেন জ্ঞানতন্ত্র হইয়া কোন স্বপ্ন অতীত যুগে চলিয়া গেল। এই ত তাহার বহুকালের পঞ্চাশাওয়া বন্ধু! ইহারই জন্ত ত সে

জয়জয়ান্তর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়াছিল। কত যুগ ধরিয়া কত ভ্রান্ত পথে পথে ছুবিয়া আজ আবার ভূইজনে দেখা। স্বধা দেখিয়াই চিনিয়াছে। আরত কালো চোখের কি চেহে-
মাখা গভীর অতলস্পর্শ দৃষ্টি। বহুবুগের স্নেহ সঞ্চিত না
হইলে দৃষ্টিতে এমন অমৃত কি উথলিয়া উঠে? মেয়েটিও
যেন স্বধার মুখের দিকে তাকাইয়া স্থির হইয়া গেল। যেন সে
কি একটা আকস্মিক আবিষ্কার করিয়াছে।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি মা?”

স্বধা যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, “স্বধা।”

তিনি আবার সন্তোষে প্রশ্ন করিলেন, “তুমি কার মেয়ে
বল ত। তোমাকে এখানে কেমন যেন নতন নতন
দেখাচ্ছে।”

স্বধা বলিল, “আমার বাবার নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত মিশ্র।”

স্মিতহাস্তে ভদ্রলোকের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি
বলিলেন, “ও তুমি ত দেখছি মস্ত লোকের মেয়ে। ওরকম
পণ্ডিত আজকালকার দিনে দেখা যায় না। আমার সঙ্গে
তার আলাপ নেই বটে, কিন্তু তাঁকে আমি দেখেছি, তাঁর
আশ্রয় গলার গানও শুনেছি। এই দেখ, আমারও একটি
মেয়ে আছে হৈমন্তী, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। এই
ইচ্ছাই ত পড়বে।”

হৈমন্তী হাসিমুখে আসিয়া অতি পুণ্যতন বন্ধুর মত স্বধার
হাত চাপিয়া ধরিল। কিন্তু স্বধা কেমন যেন সঙ্কোচে আড়ষ্ট
হইয়া গেল। অমন পদ্মের পাপড়ির মত ধূলিলেশশূন্য পেলব
সুন্দর বেশভূষা যাহার, অমন সুদীর্ঘ ষণ্মালের মত গ্রীবা, অমন
গভীর অতলস্পর্শী দৃষ্টি যাহার, যাহার মুখের উদাস
ভঙ্গীটুকু, যাহার অতি লঘুশিথ্র গতি, আর পালকের মত
হালকা চুলের রাশ দেখিলে তাহাকে সাধারণ পৃথিবীর মানুষ
মনে করিতে ইচ্ছা কবে না, মনে হয় যেন কোন দামী
বিলাসী উপক্কার বইয়ের পরীর ছবি হঠাৎ মানুষ হইয়া
বইএর পাতা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে এই স্বদেশী
মিলের মোটা শাড়ী ও ধূলিধূসরিত চটিপরা স্বধাকে এমন
অসঙ্কোচে কাছে টানিয়া লইল কি করিয়া? স্বধার চটির
ধূলা চুলের নারিকেল তেল হৈমন্তীর গায়ে লাগিয়া যদি
একটুও তাহার বেশভূষার সৌন্দর্য্যের হানি কবে তাহা হইলে
এমন শিল্পশৃঙ্খলিতে যে খুঁৎ হইয়া যাইবে।

কিন্তু হৈমন্তী যেন স্বধার মধ্যে কি পাইল। সে স্বধার
মোটা কাপড় পাড়ারগৈয়ে সাজসজ্জা কিছুই দেখিতে পাইল
না। সে স্বধার লজ্জাজড়িত চোখে ভিতর আপনার গভীর
দৃষ্টি নামাইয়া যেন কোন পূর্বজন্মের পবিচয়ের স্বত্র খুঁজিতে
লাগিল। যেন বলিতে লাগিল, “আমাকে তুমি ঠিক
চিনেছ ত?”

ভদ্রলোক হৈমন্তীকে হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, “চল
হে, আগে ইচ্ছলে ভর্তি হয়ে তার পর নতন বন্ধুর সঙ্গে গল্প
আলাপ করো এখন।”

হৈমন্তী বাবার কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিল বলিয়া মনে
হইল না। সে বাবার সঙ্গে কোন রকমে চলিল বটে, কিন্তু
স্বধাকে প্রায় জড়াইয়া টানিতে টানিতে। সঙ্কচিত স্বধা
চোখ নামাইয়া একেবাবে নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

হৈমন্তী হঠাৎ আবদারের স্বরে বলিল, “বাবা, স্বধাকে
আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না।”

ভদ্রলোক বলিলেন, “ইচ্ছলে থেকে থেকে চুরি করে নিয়ে
পালাবে, ওর মা বাবা যে পুলিশে খবর দেবেন শেষে।”

হৈমন্তী ঠাট্টায় দমিবার মেয়ে নয়। সে বলিল, “হ্যা
বাবা, নিয়ে যেতেই হবে। তুমি ত এখুনি আমাকে নিয়ে
ফিরে যাবে, তাহলে ভাব করব কখন?”

বাবা বলিলেন, “কেন, কাল থেকে রোজ শুলে আসবে
সে কথা কি ভুলে গেলে? তখন যত খুশী ভাব করো।”

হৈমন্তী তাহার ষণ্মাল গ্রীবা বাঁকাইয়া পিতার দিকে ক্রুদ্ধ
দৃষ্টি হানিয়া বলিল, “হ্যা, ইচ্ছলেব পড়ার মধ্যে যেন কতই
গল্প করবার সময় থাকে। যাও।”

ক্লাসের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মেয়েরা যে যাহা করিতে
ছিল এক মুহুর্তে বন্ধ করিয়া ছুটিয়া ক্লাসে চলিয়া গেল। অস্ত
মেয়েদের মত স্বধাও ব্যস্ত ভাব দোড়িয়া পলাইল।
হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরনে বিদায় লইতেও কেমন
লজ্জা করিল। হৈমন্তী এক মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া
স্বধার পলায়ন দেখিয়া পিতার সঙ্গে আপিস-কামরায় চলিয়া
গেল।

* * *

স্বধাদের শুলে একটা বড় ঘরেই চারিকোণে চারিটি ক্লাস।
পরদিন ক্লাস আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমহাশয় স্বধাদের ক্লাসে

ব্যাকরণকৌমুদী খুলিয়া তদ্বিত প্রত্যয় পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন, হঠাৎ খট্‌খট্‌ করিয়া জোরালো পায়ের আঙ্গুল সুপরিচিত হন্দে বাজিয়া উঠিল। স্বধা ফিরিয়া দেখিল হৈমন্তীকে সঙ্গে করিয়া হেড্‌ মিস্ট্রেস ঘরে আসিতেছেন। আনন্দে স্বধার বুকটা ছলিয়া উঠিল। কাল হইতে সে হৈমন্তীর আশাপথ চাহিয়া আছে। এইবার সশরীরে হৈমন্তী তাহাদের ক্লাসে আসিয়া বসিবে। কিন্তু একটু দুঃখও হইল। যদি বেকিগুলা আর একটু পরিষ্কার চক্‌চকে হইত, যদি মেয়েরা হৈমন্তীকে অভ্যর্থনা করিবার আর একটু উপযুক্ত হইত।

স্বধাকে হতাশ করিয়া হৈমন্তী তাহাদের নীচের ক্লাসে গিয়া বসিল। ক্লাসস্থল মেয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও নিদারুণ বিরক্তিকে অবহেলা করিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে তাকাইল। স্নেহলতার ঠোঁটছুটি কথা বলিবার ভক্ত উদগ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের ভয়ে কথা ফুটল না। যাহার মনে যত কথা ভীড় করিয়া আসিয়াছে, ক্লাস শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তাহার একটিও প্রকাশ করিবার উপায় নাই। পয়তাল্লিশ মিনিট অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসের শেষে ব্যাকরণকৌমুদী হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপুট শিখাটি ক্লাসের দিকে ফিরাইন্তেই স্নেহলতার কণ্ঠ ধনিত হইয়া উঠিল “নুতন মেয়েটি কি রে-গা ভাই? রঙটাও বেশ কালো!”

এক মুহূর্তের ত পরিচয় তবু এতটুকু নিন্দা যেন স্বধার মনে কাটার মত বিধিয়া উঠিল। মনীষা বলিয়া উঠিল, “ফিটফাট বেশ ফিরিঙ্গির মত, কিন্তু কি চোখ বাবা। যেন গিলে খেতে আসছে।”

স্বধা ভাবিল, “হায় অন্ধ। চোখ কাকে বলে তাও কি তোমরা জান না? ঐ অতল কালো চোখের রূপ, ঐ যুগল গ্রীবা, ঐ পদ্মকুঁড়ির মত মুখ, কিছু তোমাদের চোখ পড়ল না, শুধু কালো রঙটুকু দেখতে পেলে।”

কিন্তু স্বধা বাকপটু ছিল না; তা ছাড়া মুখের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত কথায় তাহার এই দৈবলব্ধ শ্রিয় বন্ধুর প্রশংসা করা কিংবা নিন্দা থগুন করিবার চেষ্টা করা ছই যেন তাহার কাছে দেবতার নিষাধ্য লইয়া পুতুলখেলার মত মনে হইতেছিল। সে আলোচনায় যোগ দিল না, কেবল বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, হৈমন্তীর শ্রামস্তীর অন্তরালে পূজার প্রদীপের মত

যে প্রাণটি জলিতেছে, তাহার নিষ্কম্প দীপ্তি যে তাহার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইহা কেন স্বধা ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। স্বধা কবিতা কখনও লেখে নাই, কিন্তু কবিতার হাওয়াতেই তাহার প্রাণবায়ু আজন্ম নিশ্বাস লইয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল একটি ছন্দে লয়ে স্বরে সুসম্পূর্ণ গীতিকবিতা যেন তাহার বাণীরূপ হারাইয়া অকস্মাৎ কাম্যগ্রহণ করিয়াছে হৈমন্তীর মধ্যে। তাহার হাঁটাচলা কথাবলা প্রতি অঙ্গ চালনার ভিতর এই যে আশ্চর্য্য স্বধা ইহা কবিতা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে তুলনীয় নহে।

সঙ্গিনীর স্বধাকে আলোচনায় যোগ দিতে না দেখিয়া বিস্ময় ও কৌতূহল দেখাইতেছিল, কিন্তু স্বধা কি তাহার মনের অহুত্বটিকে এমন করিয়া মুখে প্রকাশ করিতে পারে? করিলেও এই অন্ধেরা তাহাকে পাগল বলিবে।

ছটির পর হৈমন্তী নৌড়িয়া আসিয়া দুই হাতে স্বধার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, “তোমাকে ভাই, আমাদের গাড়ীতে যেতে হবে।”

প্রশ্ন নয় একেবারে স্নিহির্দৃষ্টি আদেশ। স্বধা বলিল, “তুমি কোন্‌ বাসে যাবে তা ত জানি না। আমার বাড়ী যদি তার পথে না পড়ে?”

হৈমন্তী স্বধাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখখানা উঁচু করিয়া তুলিয়া হাসিয়া বলিল, “না গো না, বাসে না। আমাকে নিতে বাবা গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন, তাতে আমরা দুজন যাব, কেমন?”

স্বধা সন্কোচের সঙ্গেই বলিল, “আচ্ছা যাব। কিন্তু তোমার ফিরতে দেবী হয়ে যাবে না?”

প্রথম দিনেই বন্ধুকে অসুবিধায় ফেলিতে স্বধার আপত্তি ছিল। সে নিজের সামান্য স্বখ-সুবিধার জন্য অপরকে এতটুকু অসুবিধায় ফেলিতেও সন্কোচ বোধ করিত। তা ছাড়া যদিও স্বধা এক দিনেই হৈমন্তীর প্রতি এতখানি আকৃষ্ট হইয়াছিল যে পাইলে তাহাকে অষ্টপ্রহরই ধরিয়া রাখিত, তবু তাহার নিজের সকল দিকের অকিঞ্চিংকরতা সযত্নে এমন একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যে তাহাকে লইয়া কেহ বাড়াবাড়ি করিলে সে কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত না।

বয়সে হয়ত হৈমন্তীই চার-পাঁচ মাসের ছোট হইবে, কিন্তু

স্বধাৰ সঙ্গ কথো বলিতে গেলেই সে যেন স্বধাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে কবে।

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, “দু-চার মিনিট দেৱী হ’লেই কি আমি খিদেয় ককিয়ে মরে যাব? আমাকে তোমার মতন অমন কচি মেখে পাও নি।” বলিয়া সে স্বধাৰ দুইটি গাল সজোৱে টিপিয়া দিল।

স্বধা অগত্যা হাৰ মানিয়া হৈমন্তীৰ সঙ্গই বাইতে ৰাজি হইল। বই গুছাইতে ক্লাসে বাইতেই মনীষা বলিল, “এত তাড়াছড়ো কিসেৰ? যাবে ত সেই এটাৰ সেকেণ্ড ক্লাসে। চল না মাঠে একটু ঘূৰে আসি।”

স্বধা বলিল, “আমি যে হৈমন্তীৰ গাড়ীতে যাচ্ছি।”

মনীষা বলিল, “চালাক মেখে বাবা! বড়মানুষেৰ মেখে দেখেই অমনি পিছনে ছুটতে স্বধা কৰে দিয়েছ? ত- যদি এক ক্লাসে পড়ত।”

অপমানে স্বধাৰ কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল। তবু হৈমন্তীকে প্ৰত্যাখ্যান কৰিতে অথবা তাহাৰ বন্ধুত্ব লইয়া হাৰ্টেৰ ভিতৰ অসন্তোষ মত ৰগড়া কবিতো স্বধাৰ মানসিক আভিজাত্য অস্বীকাৰ কৰিল। সে নীৰবেই চলিয়া যায় দেখিয়া স্নেহলতাও বলিল, “আমাদেৰ ভাই একেবাবে ভুলে যেও না, হাজাৰ হোক আমাৰ ত পুৰনো বন্ধু।”

স্বধা তাড়াতাড়ি বই লইয়া পলাইল। গাড়ীৰ ভিতৰ স্বধা ও হৈমন্তী পৰস্পৰেৰ গা ঘেঁসিয়া হাত ধৰাধৰি অৱিয়া বসিল। তাহাদেৰ হাতেৰ স্পৰ্শেৰ ভিতৰ দিয়াই যেন মনেৰ সমস্ত প্ৰীতি উজ্জ্বলিয়া উঠিতেছিল, যেন শব্দহীন কি একটা বাণী-বিনিময় অল্পক্ষণ চলিতেছিল, কথা বলিবাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই। একটা দিনেৰ মাত্ৰ পৰিচয়, তবু স্বধা ও হৈমন্তী দুইজনেই এই স্পৰ্শেৰ ভিতৰ দিয়া বুঝিতেছিল যে কথা বলিয়া পৰস্পৰেৰ পূৰ্ণ পৰিচয় সংগ্ৰহ কৰিবান যে বুধা চেষ্টা মানুহ কৰে, কোন একটা দৈব আশীৰ্বাদে তাহাৰ। তাহাৰ উৰ্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। কথাৰ আবৰণ অতিক্ৰম কৰিয়া তাহাদেৰ হৃদয় পৰস্পৰকে চিনিয়া লইয়াছে।

স্বধা বাড়ীৰ পথ দেখাইয়া দিল। হৈমন্তী ড্ৰাইভাৰকে বলিল, “গাড়ীটা একটু আশ্বে চালিও, নয়ত কখন ভুলে বাড়ী ছাড়িৰে চলে যাব।”

পথে বেখানে ঘৰবাড়ীৰ ভিড় একটু কমিয়াছে সেইখানে

পৰিচিত গলিটুকুৰ কাছে আসিতেই স্বধা বলিল, “এই যে এই গলিতে আমাদেৰ বাড়ী।”

এতবড় একখানা গাড়ী হইতে এই সৰু গলিৰ মধ্যে নামিতে স্বধাৰ মনে কোন সঙ্কোচই আসিল না, কাৰণ অৰ্থেৰ আড়ম্বৰেৰ কাছে মাথা নীচু কৰাৰ শিক্ষা জীৱনে তাহাৰ হয় নাই। কিন্তু তবু তাহাৰ মনে হইবাছিল হৈমন্তী নিশ্চয়ই এই ৰকম ঘৰবাড়ী দেখিতে অভ্যস্ত নয়, হয়ত স্বধাৰ এই ৰকম জায়গায় বাড়ী দেখিয়া হৈমন্তী বিস্মিত হইতে পারে।

কিন্তু হৈমন্তীৰ আনন্দিত মুখে বিশ্বমেৰ কোন চিহ্ন দেখা গেল না। স্বধাকে নামিবাৰ চেষ্টা কৰিতে দেখিয়াই সে বলিল, “ড্ৰাইভাৰ, গাড়ীটা একটু খানি বাথ, আমি একবাৰটি বাড়ীটা দেখে আসি।”

স্বধাৰ বাড়ীৰ এত নিকট হইতে বাড়ী না দেখিয়া সে কি কৰিয়া কৰিয়া যাইবে? ড্ৰাইভাৰ মনিব-কণ্ঠাৰ কথাৰ উপৰ কথা বলিতে সাহস কৰে না তবু একেবাবে নতুন বাড়ীতে গলিৰ মধ্যে হৈমন্তীকে নামিতে দেখিয়া একটু আশ্চৰ্য্যত আশ্চৰ্য্যত কৰিয়া বলিল, “বহুৎ দেৱী হো যায়েগো বাবা, সাহব গুদুসা কৰেছে।”

হৈমন্তী “আমি এখনি আসব” বলিয়া প্ৰায় স্বধাৰ সঙ্গ সজেই লাফাইয়া পড়িল। অগত্যা বেচাৰী ড্ৰাইভাৰ নীৰবে পথেৰ ধাৰেৰ কৃষ্ণচূড়া গাছেৰ তলান গাড়ীটা দাঁড় কৰাইয়া সিটেৰ উপৰ পা দুইটা উৰ্দ্ধমুখী কৰিয়া একটু ঘূমাইয়া লওয়া যায় কিনা তাহাৰই চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

স্বধাদেৰ গলি হইতে খাড়া মইবে মত সিঁড়িটি অতিক্ৰম কৰিয়া তাহাৰা দেখিল যি ননীৰ মা পিছনেৰ কাঠেৰ সিঁড়ি বাহিয়া একবোৰা বাসন লইয়া আসিতেছে। দিদিমণিৰ সঙ্গ এমন মেম সাহেবেৰ মত কিংকট মেয়েটিকে দেখিয়া ভাল কৰিয়া পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিবান উৎসাহে কখন তাহাৰ হাতেৰ বাঁধন আলগা হইয়া একখানা থালা বান্ বান্ ববিয়া পড়িয়া ভাঙিল সে লক্ষ্যই কৰে নাই। বাসন ভাঙাব শব্দে চমকিয়া স্বধাৰ মা উপৰ হইতে ঢাকিয়া বলিলেন, “শেষ কৰলে না কি গা সব ক’খানা বাসন।”

“মোটে একখানা ভেঙেছে” বলিতে বলিতে স্বধা দুইফুট চঙা খাড়া অককাৰ সিঁড়ি দিয়া হৈমন্তীকে লইয়া তিনতলায় উঠিতে লাগিল। শিবু সবেমাত্ৰ ইফুল হইতে ফিৰিয়া ৰামা-

ঘরে কি কি খাওয়া পানীয় বাইতে পারে তাহাই তদারক করিতে উপর হইতে নাচিয়া নাচিয়া নামিতেছিল, হঠাৎ বিদির সঙ্গে অপরিচিত একটি মেয়ে দেখিয়া এক এক লাফে দুই সিঁড়ি ডিঙ্কাইয়া একেবারে চারতলার ছাদে চলিয়া গেল।

শিবু এখন অনেকটা বড় হইয়াছে, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে তাহার এগারো বৎসর পূর্ণ হইবে, লম্বাতেও সে প্রায় দ্বিদির সমান হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসব কলিকাতায় থাকিয়া তাহার অপরিচিত মেয়েদেব সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মিয়া গিয়াছে। তাহারা তাহার দিকে যে রকম অবজ্ঞাভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাতে তাহাদের ত্রিসীমানায় না থাকাই উচিত। তাহার মস্ত অপরাধ যে সে ধোকনের মত গাল-কোলা নয় এবং আধ আধ কথা বলে না। ওঃ ভারি ত! নাইবা তাহারা উহার সঙ্গে কথা বলিল, শিবু বন্ধুর ভাব নাই, সে চায় না মেয়েদের সঙ্গে কথা বলিতে।

মা ছোট ঘরের ভিত্তর একটা তক্তাপোষের উপর খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া তবকারি ফুটিতেছিলেন, ছেলেকে হুড়মুড় করিয়া ছাদে পলাইতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু চট্ করিয়া উঠিয়া খবর লইবার সময় তাহার ছিল না, একটা পা প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

সুধা বড় ঘবে টেবিলের উপর বই কখনো রাখিয়া হৈমন্তীকে লইয়া ছুটিয়া ছোট ঘব খানায় মা'র কাছে গেল। মা একটু ভিতরে বসিয়াছিলেন, না হইলে সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময়ই তাহাদেব দেখিতে পাইতেন। ছোট ঘর, তাহাতে অসংখ্য জিনিষপত্র। বাহিরের পরিচিত লোকজন বিশেষত মেয়ের উপবেই দেখা করিতে আসেন, বড় ঘরখানাতেই তাঁহাদের বসাইতে হয়। কাজেই কাপড়ের আলনা, কীত-কালের জুতা তোলা লেপ-ভোষক, ভাঁড়ারের আলমারী, কাপড়ের দেয়াল, এমন কি তবকারির ঝুড়ি ঝুটি পর্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছে এই ঘরে। মহামায়া ত দেড়ফুট গিয়া তরকারি ফুটিয়া দিয়া আসিতে পারেন না, সুধাও এখন ঘাকে সারাদিন ইন্ধুলে। এত জিনিষেরই মধ্যে একখানা ডক্তা-পোষে দিনে মহামায়ার কাজের আসন, বাজে বিহানা পুত্ৰিয়া চন্দ্রকান্ত ঘুমান। মহামায়া দিনের কাজের শেষে রাজেও এই একই আসনে শুইবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু

বড় ঘরখানায় আলোহাওয়া বেশী এবং দিনান্তে একটু স্থান পবিবর্তনও হয় বলিয়া চন্দ্রকান্ত অসুস্থ স্ত্রীকে সেই ঘরেই থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন। ছেলেমেয়েবা মা'র কাছে থাকিতেই চায়, তাছাড়া বড় ঘরে বেশী লোকের সংকুলানও হয় বলিয়া তাহারা তিন জনেও এই ঘরে আশ্রয় লইয়াছে।

সুধার সহিত স্বেষণা অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখিয়া মহামায়ার দৃষ্টিতে কোতূহল ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মাহুঘের মুখের সামনে তাহাব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পাছে অভজ্ঞতা হয় বলিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। সুধা পরিচয় দিবাব আগেই হৈমন্তী মহামায়াকে প্রণাম করিতে মাথা নামাইল। ব্যস্ত হইয়া সুধা সহাস্তে বলিল, “মা, এই আমার বন্ধু হৈমন্তী।”

তাব পব হৈমন্তীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি ক'রে চিনলে ভাই, আমার মাকে?”

হৈমন্তী বলিল, “আমি মুখ দেখেই চিনতে পেরেছি।” বলিয়া মা ও মেয়েব দুই জনের মুখের উপর সে একবাব স্প্রশংস দৃষ্টি বুলাইয়া লইল।

সুধা বিস্মিত হুয়ে বলিল, “কি যে বল ভাই! মা কি আশ্চর্য্য হৃদয় দেখেছ না?”

হৈমন্তী হাসিয়া সুধার দুইটা হাত ধরিয়া বলিল, “হ্যাঁ গো, দেখছি বই কি।”

তার পব সুধাকে একবাব বাহিরে টানিয়া লইয়া তাহাব দিকে ভ্রমসনাব দৃষ্টি হানিয়া তাহাব গাল দুটো টিপিয়া বলিল, “তুমিও আশ্চর্য্য হৃদয়। কিন্তু তুমি সেকথা জান না।”

সুধা একটু লজ্জা পাইয়া মুখ নামাইল।

হৈমন্তী সুধার কপালে একটি সম্মেহ চুসন দিয়া তাহাকে একবাব আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া “আজ আসি” বলিয়া সেদিনের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল।

১৪

হৈমন্তীকে আবিষ্কার করিবাব পব সুধার জীবনে যেন একটা নূতন আনন্দের স্বর বাজিয়া উঠিল, জীবনের একটা নূতন অর্থ দেখা দিল।

যৌবনের সূচনার পূর্বেই জীবনে একটা অতৃপ্তি এবং বিখমতা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে মনস্ত একটা অভিযোগ লইয়া একদল

মানুষ সংসার-পথে চলে। তাহার পৃথিবীতে কাহার কাহার কাছে অবিচার, কাহার কাছে অত্যাচার ও উৎপীড়ন এবং কাহার কাছে কি কি দুঃখ ও মনোবেদনা পাইয়াছে তাহাবই হিসাব সম্বন্ধে রাখে, অন্য দিকটা অবশ্যপ্রাপ্য মনে করিয়া সম্পূর্ণ তুলিয়া যায়। সুখা কিন্তু সেই দলে জন্মগ্রহণ ববে নাই। তাহার বাল্য ও শৈশব কালের সমস্ত সম্বন্ধই আনন্দের সম্বন্ধ। মাতা পিতা, দুই ভাই, পিসিমা, মাসিমা, বহুদিনের অদেখা দাদামশায়, এমন কি ককণা বি প্রভৃতি যে কয়টি মানুষকে লইয়া তাহার সুনির্দিষ্ট ক্ষুদ্র জগৎ গঠিত, তাহাদের সকলের দানের ভাণ্ডার হইতে নিত্য কি পবিমাণ আনন্দ সে মধুমক্ষিকার মত কণা কণা করিয়া আপনার অন্তরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে ইহাই ছিল তাহার যৌবন জাগরণের পথে সকলের চেয়ে বড় হিসাব। সেই জন্মই খাটি হিসাবীর মত নিজের দেনাটা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া আনন্দে সেবা করিতে সে ভালবাসিত। আপনার প্রিয়জনের শ্রেষ্ঠতা ও অতুলনীয়তা সম্বন্ধে তাহাব মনে যে গৌরবময় ধারণা ছিল সেইটা ছিল তাহাব জীবনের আনন্দের একটা মস্ত খোরাক। এই আনন্দলোকে এবং সুন্দরী পৃথিবীর অপূর্ণ সৌন্দর্যলোকে সংসারের তুচ্ছতা ও অর্থহীন অতৃপ্তির উপরে তাহার মনটা সর্বদা বিচরণ করিত বলিয়া পার্থিব কোন অভাব কি অবিচার সম্বন্ধে যৌবন জাগরণে যুগে তাহার মনে কোন অভিযোগের সৃষ্টি হয় নাই। যত্ন কি বিচ্ছেদের যতটুকু পরিচয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে সে পাইয়াছিল তাহাতে বেদনার অন্তঃসলিলা ধারা অল্পরাগেব মূলকেই আবও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল, যত্ন ও বিচ্ছেদকে অমৌজিক বলিয়া জীবনে বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই।

কিন্তু তাহার এই আত্মীয়গোষ্ঠী-পরিবৃত্ত ক্ষুদ্র জগৎটা ছিল অভ্যস্ত অভ্যস্ত, জন্ম হইতেই ইহার সহিত তাহার নাড়ীর সম্বন্ধ, তাই এই লোকের আনন্দটাও ছিল প্রতিদিনের প্রাণবায়ু ও অঙ্গজলের মত সুপরিচিত।

অকস্মাৎ হৈমন্তীর আবির্ভাব হইল সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক হইতে। সে নিজেই যে শুধু অদেখা ও অপরিচিত ছিল তাহা নয়, সে আসিয়াছিল এমন একটা আবেষ্টনের ভিতর হইতে যাহার সহিত ইতিপূর্বে সুখার কোনই পরিচয় ছিল

না। চোখে চোখ পড়িতেই এই দুইটি ভিন্ন লোকের মানুষের মনে একই তন্ত্রীত্ব স্বব এত সদ্বে বাজিয়া উঠিতে সুখা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। ইহা তাহার জীবনে একটি অপূর্ণ অভিনব আবিষ্কার। সুমিষ্ট ফুলের সৌভ ভেমন অদৃশ্য থাকিয়াও বাতাসের প্রত্যেকটি স্তরে স্তরে অগুতে ছড়াইয়া যায়, তেমনই হৈমন্তীর আবির্ভাবের আনন্দ সুখার জীবনের সকল কাজ ও সকল সেবার মধ্যে অদৃশ্যরূপে নূতনতব প্রেরণা লইয়া ছড়াইয়া পড়িল। বেলুনের গ্যাসে ভার মুক্ত হইয়া তাহা যেমন উর্দ্ধে আকাশলোকে উড়িয়া যায় সুখাও তেমনই এই আনন্দের প্রাচুর্যে ভার মুক্ত হইয়া সংসারের উপরের সৌন্দর্যলোকে পাখীর মত উড়িতে লাগিল।

চক্রকাস্ত একেবারে শেষরাঙে হাল্কা অন্ধকারেব মধ্যেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ছাদেব চিলে-কোঠার ঘরে পূর্বমুখী আসনে বসিয়া একতারা লইয়া গান করিতেন—

“কর তাঁর নাম গান

যত দিন রহে দেহে প্রাণ—

যুমের ভিতরেই বাবার মধুব কণ্ঠে—

“খার হে মহিমা জলন্ত জ্যোতি

জগৎ করে হে আলো”

শুনিয়া প্রায় প্রতি উষা সুখা চোখ মেলিয়া দেখিত স্বর্ঘের নবীন জ্যোতিরেখায় পূর্ব গগন রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সুখাও তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, খোকনের ঘুম ভাঙিবার আগে তাহার ইচ্ছলেব অঙ্ক ও লেখাগুলি অন্তত সারিয়া রাখিত হইবে, না হইলে সে ক্লাব ও ইরেজার লইয়া ডাঙাগুলি খেলিতে এবং কম্পাস লইয়া সারা বাড়ীতে পৃথিবী আঁকিতে লাগিয়া যাইবে। এদিকে বি বাঁধুনী আসিয়া পড়িলেই রান্নাঘরেও একবার না ছুটিলে চলিবে না, মা উপরে বসিয়া ভাঁড়ার বাহিব ও তরকাবি কোটাব কাজটা না-হয় করিয়া দিবেন, কিন্তু খোকর দুখটা ফুটাইয়া আনা, শিব্ব লুচিটা চটপট বেলিয়া দেওয়া, বাবার ভাতটা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া দেওয়া এসব হুড়াহুড়ির কাজ নীচে আসিয়া মা ত করিতে পারিবেন না। শিব্ব ভাল ভাত খাইয়া ফুলে যাইতে চায় না, তাব জন্ত বোজ লুচি চাই, সেটা তবু মাছভাজা দিয়াই বেশ গরম গরম খাইয়া লওয়া চলে।

সুধা যদি ঝি রাধুনীর পিছনে না লাগিয়া থাকিত, তাহা হইলে ন'টার মধ্যে ভাল ভাত, লুচি, দুধ আবার ভাজাভুজি এত আর হইয়া উঠিত না। ষট্টাখানিক ত কাজ নিশ্চয়ই পিছ হইয়া যাইত। কিন্তু সুধারও ন'টায় না হোক সাড়ে ন'টায় বাস আসে। বাড়ীর কাজ চলে না বলিয়া সে দ্বিতীয় বাসে য'ওয়া আসাব ব্যবস্থাই করিয়া লইয়াছে। বিকালে বাড়ী ফিরিতে দেবী হইত বটে, কিন্তু সকালে বেশ খানিকটা সময় প'ওয়া যায়। তাহাতেই আর সকলের কাজটা সাবিত্তা দিয়া সে স্নান পাওয়া সারিয়া লইতে পারে।

চারতলার সিঁড়ির নীচে তিনতলার বড় ঘরের পাশে স্নানের জন্ত ছোট একটা চিলতে ঘব ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কল নাই, কে অত জল টানিয়া তুলিবে? ম'কে না দিলে নয়, তাহারই জলটা শুধু নদীর মা পৌছাইয়া গিত। সুধারা স্নান করিতে যাইত দেড়তলার রান্নাঘরের প'শের কাঠের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একটা অঙ্ককার কোটরে। কান সময় কয়লা খুঁটে রাখিবার জন্ত হয়ত বাড়ীওয়ালা এটা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, কলতলাটা পাড়ামুহু লোক ঘেঁষিতে গায বলিয়া সুধারা ইহাকেই স্নানের ঘর করিয়াছে। বরের মরজা বন্ধ করিলেই চোখে আর কিছু দেখা যাইত না। কিন্তু বালতির ভিতর কলের জলেব শব্দটাই মনকে স্নানশে নাচাইয়া তুলিত। জ্বলে মেয়েদের মুখে শোনা বন্দিবাবু নতুন গান,

“তোমারই ঝণী তলার নিজ্জনে

মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোনখানে।” মনে পড়িয়া যাইত। জলধারার সহিত তাহার অনিশ্চিত কণ্ঠ মিলাইয়া সুধা গান ধরিয়া দিত। মনে থাকিত না যে অঙ্ককার আরসোলাপূর্ণ বায়ুহীন একটা খোপেব ভিতর সে কোনপ্রকারে স্নানটা সারিয়া লইতে আসিয়াছে। যা অনেক দূর তিনতলার ছাদের আলিসা হইতে ঝুঁকিয়া বলিতেন, “ওরে, তাড়াতাড়ি কর, ইজুলের গাড়ী এতকে ফেলে যাবে যে।”

শিবু ভাতের থালা বাড়ী হইয়াছে শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিত, “দাঁড়াও! দ্বিদির কবিত্ব • আগে শেষ হোক, তবে ত ইজুল যাবে।”

ভিজা কাপড় হাতে করিয়া উপরে আসিতে আসিতে

সুধা বলিত, “কবিতা কে লেখে রে, তুই না আমি?” কিন্তু মনেব ভিতর তাহার এ-তর্কের জোর থাকিত না। শিবু বলিত, “আমি বোকা-সোকা মানুষ, যা খুশী তাই লিখি, যে-সে দেখে, তোমার মত সমস্ত কবিত্বের জাহাজ এক-জনের জন্তে বোঝাই ক'রে ত রাখি না।”

সুধা সে-কথার জবাব দিত না। বাসনেব পিড়িব উপব হইতে একটা থালা তুলিয়া রান্নাঘরে নামাইয়া দিয়া বলিত, “বামুনদি, চট্ট ক'রে ভাতটা বাড়, মাছভাজা আর ভাল হলেই হবে, আমি চুলটা ঝাঁচড়ে আসছি।”

ক্রতপদে সুধা উপরে উঠিয়া গেল, চুল ঝাঁচড়াইয়া বঙ্গ-লক্ষ্মী মিলেব কালাপেড়ে মোটা কাপড়খানা বোঝাই ধরনে ঘুবাইয়া পরিতে পরিতে ও গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিতে লাগিল, “রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে

বলাকা কোন্‌ গগনে উড়ে চলে।”

বাল্যলীলাভূমিতে প্রত্যহ দেখা শৈলমালার অন্তরালে অন্তমান স্বর্গের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল, জীবনের নবলব্ধ আনন্দ যেন সেই অন্তরাগের রং আরও রহস্যময় করিয়া তুলিতেছিল। জ্বলের পোষাক করিবার সময় হৈমন্তীর কোকড়া চুলের মোটা বিহুনীর তলায় চওড়া কাল রেশমী ফিতার জোড়া ফাঁস, তাহার সাদা মসলিনের ফাঁপা হাতের জামা, তাহার সাদা খড়কে-ডুরে শান্তিপূর্বে ফুলপেড়ে শাড়ী, তাহার মুক্তাখচিত ‘এইচ’ লেখা ছ-আঙুল লম্বা ব্রোচ, তাহার সাদা লেসের মোজা ও সাদা ক্যানভাসের হিল-দেওয়া জুতা সুধার মনের ভিতর ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। কি সুন্দর হৈমন্তীকে দেখায় এই পোষাকটিতে! কিন্তু সুধা তাহা নকল করিয়া স' সাজিতে এবং হৈমন্তীর পোষাকের অমর্যাদা করিতে চাহে না। সুধাকে অমন হাল্কা পরীর মত পোষাকে মোটেই মানায় না। তাহার এই বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা শাড়ী, মোটা ছিটের জামা ও বিবর্ণ চটিই বেশ ভাল। আঁচলটা কোমরে গুঁজিয়া একটা ষ্টীলের সেক্‌টিপিন কাঁধে লাগাইয়া সে থাইতে চলিয়া গেল। অধিকাংশ দিন আঁচলে চাবি ঝুলাইয়াই সে জ্বলে চলিয়া যায়।

খোবন পাতের কাছে আসিয়া বলিল, “দিদি ভাই, আমাকে এততুষ্‌ মাছ।” তাহার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখাগ্র ঠেকাইয়া সে মাছের পরিমাণ বুঝাইয়া দিল।

সুখা তাহাকে কোলের উপর বসাইয়া তাহার ছোট হাতখানিতে আখখানা মাছভাজা তুলিয়া দিল। মহামায়া এই সময়টা স্নান ইত্যাদি সারিয়া একবার সিঁড়ি ধরিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামেন। সুখা চলিয়া যাইবে, তাহার খাওয়াটাও দেখা হইবে এবং তাহার অসুস্থস্থিতিতে বিকালের কাজও কিছু আগাইয়া দেওয়া যাইবে। নিজের খাওয়ার পর সেই যে তিনি উপরে যান ত আর নীচে নামেন না। মহামায়া সুখার দান দেখিয়া বলিলেন, “এ ত একখানা মাছ তাও আবার আখখানা ওকে দিলি, সারাদিন সেই পাঁচটা পর্যন্ত দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকবি কি করে? বা না মেয়ে, তাঁর লোকের সামনে হাঁ করে খেতেও লজ্জা করে, পাছে তারা দাঁত দেখে ফেলে। ও ননীর মা, এক ভাঁড় দই এনে দে ত বাছা তোর দিদিমণিকে। এই খেয়ে কি ন-টা পাঁচটা চলে কখনও?”

ক্রমশঃ

মায়া

শ্রীশুশ্রূতা দেবী

আসিতে তরণী বাহি নদীর নীরে
চেউগুলি উছলিয়া ভাঙিল তীরে;
হেরিছু শ্রাবণ-নিশি সজল করিছে দিশি,
কথাহীন কানাকানি বাতাস ঘিরে,
আসিতে তরণী বাহি নদীর নীরে।

আজিকে দিবস কোথা এলেম ফেলি,
কোথায় উড়িয়া গেল পাখাটি মেলি!
কোথায় প্রভাতবেলা অরুণ আলোক-মেলা,
অনেক কুমুদবনে মরাল-কেলি;
সারাটি দিবস কোথা এলেম ফেলি।

কখন গ্রামের পথে গোশূর-ধূলি
উড়িয়ে গোধূলি এল, গিয়েছি ছুলি;
তখন শুভেছি মনে নিরালে অলস ক্ষণে,
বিজন মরমবার আথেক ধূলি
কেহ কি হেরিবে স্নম স্বপনগুলি?

দিবস ফুরিয়ে যায়, ফুরায় হাসি,
এবার ঘিরিয়া আসে আঁধার রাশি;
হৃদয়-বাসনারাজি ছড়িয়ে এলেম আজি
ফেলিছু পথের বাঁকে পথের বাঁশী;
এবার ঘিরিয়া রবে আঁধার রাশি।

বারেক চাহিছু দূর আকাশমাঝে,
জ্বলদ-অলক পাশে তারকা রাজে;
যেমন বনানী-কাঁকে চকিত আলোয়া জাগে,
ক্ষণিক বিজলী বলি লুকায় লাজে,
তেমনি একাকী তারা আকাশ মাঝে।

আজিকে মরমে লয় জীবন ভরি
যে বাঁশী বাজিল ম-উদাস করি,
যে-মায়াদ্বয়ের টানে চলেছি সমুখ পানে,
চলেছি দিবস রাত্তি ভাসিয়ে ভরী,
সে-মায়া দিয়েছে ধরা জীবন ভরি।



আধুনিক বাংলা সাহিত্য—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত। ঢাকা এলবাট লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৬। মূল্য ২।০
ও ৩. ঢাকা।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য সপক্ষে এমন নৈবান্ত জন্মিয়া গিয়াছে যে
নিজের লেখা ছাড়া অন্য লেখা পড়া ছাড়িয়াই দিরাছিলাম এমন সময়ে
মোহিতবাবুর আধুনিক বাংলা সাহিত্য নামে সমালোচনা-গ্রন্থ হাতে
পড়িল। ব্রিটিশপ্রভাবোত্তর বাংলা সাহিত্য সপক্ষে একপ চিত্তাপূর্ণ
ধারাবাহিক রচনা ইতিপূর্বে দেখি নাই। বাঙালীর সমালোচনার মধ্য-
পন্থা নাই, তাহাতে হয় 'চমৎকার আছা মরি মরি'র স্বেচ্ছ, নয় ব্যক্তিগত
গালাগালির কুসেব; প্রকৃত সমালোচক মধ্যপন্থার পথিক, মোহিতবাবু
সেই মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :—

“আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ
মজুমদার, নীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল,
শরৎচন্দ্র ও আধুনিক সাহিত্যের ভাষা।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উপরে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাব এক
গভীর ও ব্যাপক যে অপরিণামদর্শীর দৃষ্টিতে ইহা সর্বতোভাবে অ-বাঙালী।
কিন্তু লেখকের কোণী দৃষ্টি ইহার ভিত্তিতে পূর্ণ বাঙালীমানকে আবিষ্কার
করিয়াছে। এই সাহিত্যের মূলে জাতীয় ভিত্তি ছিল বলিয়াই তাহা
বৈদেশিক প্রভাবের গরলকে নীলকণ্ঠের মত অতি সহজে ধারণ করিতে
পারিয়াছিল, এক ধারণা করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিল।
এই সাহিত্যের ‘বেহ ও প্রাণবর্ধন’ দেশেরই, বাহির হইতে আনিরাহিল
কেবল সম্ভাবনী ভাব প্রেরণ। অতএব আজ সাহিত্য ও ভাবার এই
আদর্শনিকটের মনে, জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি—এক কথায়
তাহার স্বার্থ, এই নব্য সাহিত্য-যন্ত্রের পক্ষে কতখানি অনুকূল বা
প্রতিকূল হইবাছে তাহা বুঝিবা নইবা প্রয়োজন আছে।”

এই প্রয়োজন হইতে বর্তমান গ্রন্থের রচনাগুলির উদ্ভব। লেখক
বাংলায় এই পুনরুজ্জীবন-পর্বের দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন।
ইংলেণ্ডের পুনরুজ্জীবন-পর্বের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার অন্তরীণতা
ধরা পড়িবে।

বাঙালী এলিগাবেথের যুগে ইংলেণ্ডের জাতীয় জীবনে যে পুনরুজ্জীবন
ঘটিয়াছিল তাহা উজ্জয়মুখী ছিল—বহিমুখী ও অন্তর্মুখী। বহিলোকে
ড্রেক ও র্যালো, অন্তর্লোকে শেক্সপীয়ার ও স্পেন্সার ইংলেণ্ডের বাণীর বিনিয়োগ
রচনা করিয়াছিল। স্পেন্সার নৌবহর ধ্বংসের মূলে ছিল ক্যাথলিক ধর্মের
অমুশাননকে অস্বীকৃতি। ড্রেক পারস্যযুদ্ধে যে নব দিগন্তের অমুশানন
করিতেছিল তাহার দোসর ছিল শেক্সপীয়ারের অন্তর্মুখী অমুশানন। তার
র্যালো সাত-সমুদ্র-ত্তের-নদীর পারে যে স্বর্ণপুরীর সন্ধান কোনদিন পায় নাই
লগুনে বসিয়া শেরপায়ব তাহা আবিষ্কার কবিবা কেলিয়াছিল—মামুসের
দুস্তর স্মরণসময়ের পরপাবে।

এই জাতীয় জাগরণ উজ্জয়মুখী ছিল বলিয়াই তাহা স্বাভাবিক ভাবে

বাড়িতে পারিয়াছিল এবং উত্তরকালে ইংলেণ্ডকে এমন পৌরবসম কবির
তুলিয়াছিল। ইহাব সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে বাঙালীর
পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত একপাশে ও অদহীন। ইংলেণ্ডের ভারতবাসী
সাম্রাজ্য-পতনে, রাষ্ট্রপুঙ্খলায়, আইন-প্রণয়নে ও সর্বোপরি পাশ্চাত্য
আদর্শের বিস্তারে বাঙালী শাস্তি ও সাম্য অনুভব কবিয়াছিল।
এই শাস্তি ও সাম্য যে-পরিমাণে তাহার ভাবলোকে মুক্তির
আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছিল বহিলোকে সে তুলনার কিছুই মিতে
পাবে নাই। বাঙালী আর্মিডা ধ্বংস করে নাই, রাজ্য বিস্তার
করে নাই, উপনিবেশ স্থাপন করে নাই—কেবল সাহিত্য রচনা
কবিয়াছিল। পশ্চিমের এই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার হৃদয় বাঙালী ধর্ম—
চৈতন্যদেবের সময় হইতে বাহা হৃদয় ছিল—জাঙ্গিয়া উঠিবা আব একবাব,
স্বাধ হর শেষবার, আপন অভিষেক অনুভব করিয়াছিল। মাইকেল-
বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেব বাহ্য আড়ম্বর, ভাষার ঐশ্বর্য্য, ভঙ্গী
বৈশেষিক প্রভাবকে যতই উচ্চ কর্তে প্রচার করুক না কেন, তাহার “বেহ
ও প্রাণবর্ধন” দেশেরই। সর্ব দেশের সর্ব কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেব
লক্ষণ এই যে তাহাতে তৎকাল ও সর্বকালের, অর্থাত্ তব্য ও সত্যের
সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। চিরকালের সত্য তৎকালের রবে আবোহন কবিয়া
দেখা যেন। মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেব মহত্বের বাহন এই
বাঙালীত্ব। এ বাঙালীত্ব এতই শক্তিমান যে বিশ্ববোধের বিশাল গিরি
শৌর্ভর্জন অনায়াসে ধারণ করিতে সক্ষম। ইহাঙ্গের রচিত সাহিত্য বিশিষ্ট
হইবাও বিস্ময়ন। ইহা বাঙালীত্ব বচিত বিস্ময়সাহিত্য। সেই অমৃত
লেখক মধুসূদনকে স্মরণ কবিয়া বলিতেছেন :—“পশ্চিমের প্রকল প্রভাব...
বাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যেই বাঙালীর
বাঙালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই একেবারে গুন্নরিয়া
উঠিল; ... হোমার, ভার্জিল, টাসোস কাব্য-সৌর্য বিকল হইল—
বীর বিক্রমের গাথা অগ্রবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, রাতা ও বধুর কন্দনরবে
শিখরীর জয়গানস ডুবিয়া গেল—বীরাজনার যুদ্ধবাজা বাঙালী বধুর
সহমরণ-বাজীর কবণ দৃষ্টে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিরাশ হইয়া
উঠিল। ... ইহাই হইল বাঙালীর মহাকাব্য। ... মহাকাব্যের
আকারে বাঙালী জীবনের গীতি কাব্য।” লেখক বলিতেছেন, মধুসূদন,
বিদেশের প্রবর্তারাকে লক্ষ্য কবিয়া অচিন্ত্য সমুদ্রের দিকে ভ্রমণী চালনা
করিয়াছিলেন কিন্তু “সমুদ্রতলে কপোতাক্ষেব অন্তঃপ্রোত তাহাব কাব্য-
ভরণীর গতি নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আব হইল না। তরী
যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—‘সেই ঘাটে থেয়া যের ইবরী
পাটনী।”

লেখক এই গ্রন্থে মেজর ও মাইনর দুই শ্রেণীর লেখক সপক্ষে
আলোচনা কবিয়াছেন। লেখকের মতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই জাতীয়
চৈতন্য আছে, কিন্তু মেজর লেখকদের রচনায় সব সময়ে তাহা চোখে পড়ে
না; শিল্পের ইন্দ্ৰজালে তাহা আচ্ছন্ন। মাইনর লেখকদের রচনায়
শিল্পের ইন্দ্ৰজাল তেমন দৃঢ়পিন্দ না হওয়াতে জাতীয় চৈতন্য বেশ সহজে
ধরা পড়ে। মেজর লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে মাইনর লেখকদের বিশেষ
ভাবে আলোচনা করিবার ইহাই প্রধান কারণ।

লেখক বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্গতির ও অধঃপতনের মূলে এই জাতীয় চেতনার জিরোভাব। সেইজন্য সাজসজ্জা, বাহ্য আড়ম্বর সম্বন্ধে যেন ইহা প্রাণহীন। একদিন বাঙালী যে পাতীকে বুদ্ধজয়ের জ্ঞান অন্যায়সে ব্যবহার করিয়াছিল, প্রাণদেবতার অভাবে আজ তাহাকে তুলিবার সাধ্যও তাহার নাই।

বাংলা সাহিত্য আজ জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন; ইহার মূল জাতির নাড়ী বন্ধ আর বন্ধ নহে, তাহা একমাত্র বোম্ব শিল্পীর অত্যাচারে বন্ধ। শিল্পীর আত্মা ও জাতির আত্মার মধ্যে আজ আব সামঞ্জস্য নাই—এই বিবিকীন আত্মপ্রতিষ্ঠা (আত্মবিলাস) বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালী জাতির অধঃপতনের মূলে। জাতিকে বাদ দিয়া আত্মজাতিকতাকে, অপরকে বাদ দিয়া আত্মকে, বিশিষ্টকে বাদ দিয়া নির্বিশেষকেই বাঙালী সাধনার পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। বাংলা সাহিত্য প্রায় পাদক্ষেপে যে নিরন্তর দিকে চলিয়াছে, বিহারীলালের “সারদামঙ্গল” সর্বপ্রথমে সেই দিকেই যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল ভারতীয় ভাবসাধনার সঙ্গে যুক্ত-আত্ম ছিলেন বলিয়া বিনাশ হইতে বক্ষা পাইয়াছেন। বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য লেখক মাইকেল-বক্স-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মধ্যে দেখিয়াছেন, তাহা শেষ বারের অস্ত্র ধরা পড়িয়াছে সেবেঙ্গনাথ সেনের কাব্যে। তার পর হইতে কাব্য ক্রমে জীবন-নিরপেক্ষ (বাস্তব-নিরপেক্ষ) হইয়া পড়িয়াছে, বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য এখন ভিন্ন পথের পথিক।

লেখকের সব মত স্বীকার করিতে পারি না, প্রয়োজনও নাই, এ-সব বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। সাহিত্য-সমালোচনাব্যবস্থার লেখকের রচনায় আছে—পাঠকের চিত্তকে নাড়া দিবার শক্তি। গ্রন্থের প্রতি ছন্দে পাঠকের মন আলোকিত হইতে হইতে অগ্রসর হইতে থাকে; আবার রচনার প্রৌঢ়ের জন্ত মাঝেমাঝে ধামিরা চিত্তা করিতে হয়। আরাম-স্বস্তিরে বসিয়া এ-বই পাঠ করিবার নয়; ইহা লইয়া চিন্তা করিতে হইবে, আলোচনা করিতে হইবে ও অবসর-কালে ধ্যান করিতে হইবে। নব্যসমালোচনী বাঙালী জাতির মধ্যে এখনও যে এই রকম গ্রন্থ লিখিত হয়, ইহাচর্চাই মনে হয় বাঙালীর হৃদয় এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু বাঙালীকে জানি, তাহার দ্বারা এ গ্রন্থ আনৃত হওরা অসম্ভব। কাজেই সে অমরোথ করিব না। মোহিতবাবু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, আবার তিনি সমালোচনা-সাহিত্যেরও প্রধান পথপ্রদর্শক।

শ্রীপ্রমথনাথ বিদ্যী

বাঙালীর সার্কাস—শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রণীত। পাবলিসিটি প্রিণ্টিং; ১৯৭, অপার চিংপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০। পৃঃ ৮৫ ১৭ খানি চিত্র।

বইখানিতে বাঙালীর সার্কাসের, এবং বিশেষ করিয়া বোসের সার্কাসের ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বসু ভিন্ন কুকলাল ব্যাক, ভ্রাম্যাকান্ত, ভীম ভবানী প্রভৃতি অনেকের কথাও ইহা হইতে জানা যায়। বাঙালীর সার্কাস প্রচেষ্টার মধ্যে কর্ণেল হুয়েন বিদ্যাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি বিদেশী সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবু বাঙালী খেলোয়াড়-গণের মধ্যে তাহার নাম স্মরণ করা কর্তব্য ছিল।

বইখানি মোটেই উপর বেশ ভাল হইয়াছে। ইহার ছবিগুলি ভাল, প্রচ্ছদপটখানি সুন্দর। আমবা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ছলনাময়ী—শ্রীভারতবর্ষ বন্দোপাধ্যায়। বয়েজ লাইব্রেরী, ২০৪ কলকাতা স্ট্রিট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩১। মূল্য দুই টাকা।

দশটি ছোট গল্প লইয়া বইখানি। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার সজীবতার

এবং দৃষ্টির মৌলিকতার সমস্ত গল্পগুলিই অতিশয় চিত্তাকর্ষক। একটি ছলনাময়ী এই বইখানিকে বিশিষ্টতা দিয়াছে; তাহা কয়েকটি গল্পের জন্য নয়। বাংলা লেখকদের মধ্যে বাঁহারা এ-রকম লইয়া কারবার করেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়; য-কখনও আছেন তাঁহাদের মধ্যে ভারতবর্ষবাবুর স্থান খুব উচ্চ। তরুণ রসেও তিনি তেমনই কৃতী; তাহা ভিন্ন “রঙীন চশমা” “সুখশ্বেদ-মশল” গল্প দুইটির মধ্য দিয়া যে একটি হাতের সের ধারা বহিয়াছে তাহাও খুব উপভোগ্য।

ছোট গল্পের পাঠক যতাবতই একটি বিচিত্রতা আশা করেন, এই বইখানিতে তিনি পুরাপুরিই তাহা পাইবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছাপাব কিছু কিছু ত্রুটি আছে। ফাল্গুন বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী—শ্রীকালী-কৃষ্ণানন্দ গিরি-কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ২ নং পৌর লাহা স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচলিত ধর্মের স্বরূপ বি, তিনি কোন্ সমুদ্রাশ্রয়ভুক্ত, সমুদ্রাশ্রয়ভুক্ত ভাবে তাহার দার্শনিক স্ফীত ক্রি, তাহার সাধনপ্রণালী কিরূপ, তাহার প্রকৃত গুরু কে—এই সকল বিষয়ের সীমাসার জঘা গিবি মহাশয় এবং রামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র বোম্ব প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষের সহিত সংবাদপত্রের মারবৎ বা ব্যক্তি-গতভাবে যে-সকল পত্র ব্যবহার হইয়াছিল সেইগুলি এই পুস্তিকায সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি এই আলোচনা হইতে এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তথাপি এ জাতীয় আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায় না। ইহা ঐতিহাসিক ও ভক্ত উভয়েই উপকারে আসিবে।

আনন্দগীতা—শ্রীঅমরপদ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, সি-এ, বর্তমান। প্রান্তিকান-গ্রন্থকার, ভ্রাম্যাকান্ত, বর্তমান পোঃ। রক্ষিণ এক টাকা।

মূলতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সংস্করণ বিশেষের ভূমিকারূপে কল্পিত এই পুস্তিকার গীতা তথা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অতি সংক্ষেপে ও যথাসম্ভব সবেল ভাষায় অঙ্গুণ ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনরূপে ‘সাধনা ও মুক্তি’, ‘জীবনমুক্তি’ এবং ‘স্বাধীনতা’ নামক তিন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সমুদায়ের মধ্যে যুগ্ম কি হাতজলন আচারাদি বা পরম্পর-বিরোধ আপাততঃ অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু এই ধারণা যে অনেকাংশে অতিরিক্ত ও আত্ম আলোচনা গ্রন্থ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মূলতঃ সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রেরই অভিমত যে অল্প-বিস্তর একরূপ তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অল্পের মধ্যে গীতার মূল বহুতা বাঁহারা বুঝিতে চান—আচার্য্যদ্বিগের গভীর গ্রন্থরাজি আলোচনা করিবার অনুর বা অধিকার বাঁহাদের নাই তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়। বাহ্য দৃষ্টিশক্তিহীন গ্রন্থকারের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীচিন্তাস্বরূপ চক্রবর্তী

প্রোমানন্দ ১ম ভাগ—শ্রীচক্রবর্তীচন্দ্রনাথ লিখিত এবং ১০১২, বোসপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২২। মূল্য ৮-০ আনা।

পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক সাক্ষাৎ-শিষ্য বাবী প্রোমানন্দের সন্দ্বিপ্ত জীবনী ও উপদেশ। বাবীজী ভক্ত, বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। এই জীবন-কথা ও উপদেশগুলি পড়িতে পড়িতে তাহার শাস্ত্র মধুর ব্যক্তিরে মুগ্ধ না হইত। থাকা যায় না। রামকৃষ্ণদেবের

ভক্তগণী ও ধর্মপিপাসু পাঠক-পাঠিকার নিকট বইখানি আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা ও কাগজ ভাল।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

শ্রীমালী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবর্তারতী গ্রন্থালয়, ২১-নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।

বুড়িট গদ্য কবিতাব সংগ্রহ। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ ভঙ্গিতে রচিত বলিয়া সকল কবিতাগুলির ভিতর গঠনগত একটি একতা ও সাম্য আছে, কিন্তু বাস্তবিক কবিতাগুলির ভাবসম্পদ বিচিত্র। এক একটি কবিতা মানুষের মনকে এক একটি গুণক হুয়ে বাড়াইয়া তুলে।

‘চিরবাঁজী’ বলিতেছে সেই, ‘সংযত বণবাঁজীদের কথা, যাদের চিরবাঁজী অনাগত কালের নিকে, যাদের যুদ্ধ হয় নি শেষ, নিত্য কালের তন্দ্রাভির শব্দে চিত্ত যাদের উদাস, তুচ্ছ যাদের ধনমান, মৃত্যু যাদের প্রিয়।’

‘তৈলুলের কুলে’ গুনি বর্ষাকালে আকাশে জ্বলু মূনির মত মাথা তুলে আকাশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মহারোগের প্রতিবিম্বি শাখার শাখার প্রতিবার তুলে শুৎ সনা করেছে, বসন্তের দিনে সেই প্রোট গাহের পোপন বোমনম্বিরতার কথা, তৈলুল শাখার কোণে লাজুক একটি মঞ্জরীর আকর্ষণের কথা।

‘মিলভাট্টার’ কবি স্বরূপ করেছেন মাখনদীতে সারি গান গাইবার সময় কিশোর বয়সের স্মরণ পারের থেকে যে এই ভরীটিকে প্রথম দিয়েছিল ঠলে, কাঁচা জীবনের গেলব কপটি নিয়ে ছব্বয়েব প্রথম বিষয় যে এনেছিল, সেই প্রথম মাথাকে। ‘অনুভূতি’ দেখি ভারতের নারীর এক নতুন কপ।

‘বলিত’ হৃদয় একটি ছোট গল্প তার সমগ্রগুণ নিয়ে গদ্য কবিতার বাঁধা পড়েছে।

বইখানি উপহার দিবার মত হৃদয়, ছাপা ও বাঁধাইবে সুসজ্জিত।

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবর্তারতী গ্রন্থালয় মূল্য ৮। এটি একটি ক্ষুদ্র কণক নাটিকা। তাসের দেশের মানুষেরা বাঁচিয়াও নাই, মরিয়াও নাই। ‘এ বেন কাব্যের কথা থেকে তার হৃদয়টা’ বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার সবাই চ্যান্ট, পেটে-পিঠে এক চলে, একটুও এগোয় না। এই সব ছক, পাঞ্জা, ছুরি, তিরি, রইতনী, স্টিভেনার দেশে সমুদ্রপথে ভাঙা। তরীতে-রাজপুত্র আসিয়া পড়িয়াছেন। রাজপুত্রের আগমনে হরতনী চিড়েভনীদেব তাসের দেহে নতুন প্রাণ আসিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারের কণ্ঠে গান ফুটিয়াছে, তাসের বন্ধন ছাড়িয়া তাঁহার মুক্ত হইয়াছেন।

নাটিকাটিতে কবি অনেকগুলি পুরাতন হৃদয়র গানকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাসবংশীয়দিগের অপূর্ণ সাজসজ্জা অভিনয়মঞ্চে কলিকাতার বাঁহারী দেখিয়াছেন তাঁহার। কখনও ভুলিবেন না। গুণ বইখানি পড়িলে বহুটুকু বোঝা যায়, অভিনয় দেখিলে মনে তাহার দশ গুণ-ছাপ পড়ে। বিভালয় প্রভৃতিতে বইখানি অভিনীত হইলে খুব লোক-চিন্তারী হইবে।

শারদোৎসব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবর্তারতী গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ। মূল্য ১।

বাংলা ১৩১৫ সালে এই নাটকটি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে হাজিরের দ্বারা অভিনীত হইবার প্রস্তর রচিত হয়। সম্মতি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে তিনবার ‘বংশোদ্ভূত’ ‘কলু-উৎসব’, ইত্যাদি রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।

বালক উপন্যাসের ওপশোধের ক্ষুদ্র কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া রচিত এই শারদোৎসব নাটিকাটি তাহার সঙ্গীতভাণ্ডারের প্রস্তর বহু বৎসর ধরিয়া বাংলাব ঘরে ঘরে পবিচিত। ‘সাঁজা’ ও ‘শারদোৎসবের’ ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত আধুনিক নাট্য অভিনয়ের যুগের প্রথম সূচনা হয়। “আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ” “আমার নয়নভুলানো এলো” ইত্যাদি

গানের সঙ্গেই প্রথম নৃত্য ও অভিনয়ভঙ্গী নতন পথে চলিতে আরম্ভ হয়। আজ তাহা ‘চিত্রাঙ্গদা’ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অপূর্ণ রূপে দেখা দিয়াছে।

“অমল ধবল পালে লেগেছে মল্ল মধুর হাওয়া”,

“আনন্দের সাগর থেকে এসেছে অজ্ঞান বান।”

প্রভৃতি গান বাংলা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শারদোৎসব বিভাগের অভিনীত হইবার পক্ষে আদর্শ নাটিকা। ইহার পুঁথিব মত আকারে ও হৃদয় মলাটে ইহা উপহার দিবার পক্ষেও সম্পূর্ণ উপযুক্ত কপ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিবর্তারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ। মূল্য ১।

ইহার গোড়াতে আছে, চলিত ভাষার কবির আদিতম গদ্য রচনা “মুরোপ প্রবাসীর পত্র”—গ্রন্থাকারে বাহার প্রথম প্রকাশ ১৮৮৮ সালে। আমরা শিশুকালে হিতবাহী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-প্রবাসীতে ইউরোপ-প্রবাসীর পত্র পড়িয়া যে প্রচুর হাস্যরস ও আনন্দ সংগ্রহ করিতাম তাহা এখনও মনে আছে। তখন বোধশক্তি সামান্যই ছিল, রসগ্রাহিতাও প্রচুর ছিল না। কিন্তু কিশোরবয়স্ক কবির লেখনীর ভিতর শিশুর মনকে আকর্ষণ করিবার আশ্চর্য একটি শক্তি ছিল নিশ্চয়ই, বাহা এই সকল বাবাকে অনায়াসে অভিব্যক্ত করিয়াছিল। এককাল পবে ‘মুরোপ প্রবাসীর পত্র’ পড়িয়া শৈশবের সেই আনন্দ তেমন করিবা যে অনুভব করিতে পারিতেছি না, তাহার একটি কাণ ‘মুরোপ’ এখন আমাদের বড় বেশী জান, তাহাড়া পার্থিব সকল জ্ঞানবুদ্ধিতেই মানুষের প্রথম বিষয়ের মাধ্যম কল্পিয়া আসে এবং ৫৫ বৎসর আগেকার ইউরোপ হইতে এখনকার ইউরোপ অনেক দিকে বদল। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা কারণও মনের ভিতর উঁকি বুকি মারে, জানি না তাহা সত্য কি না। শৈতের রায়ে গণ ভুলিয়া বিলম্বে উৎসব-সভায় পৌছিয়া কবিকে যে অনাহারে সন্ধ্যা বেলাগ রাগিণীর আলাপ করিতে হইয়াছিল, এই জাতীর গল্পগুলি ছেলোবেলাব আমাদের খুব আনন্দের খোরাক যোগাইত। সেই সব গল্পের জ্ঞান দেখিয়া মনে হয় কিশোর কবির লেখনীর উপর আকর্ষণের প্রবীণ কবির লেখনীর একটি শাসন যেন অলক্ষ্যে ঘুরিয়া দিবিতেছে। বিজ্ঞান-নাথ ঠাকুর মহাপ্রব্রের মস্তব্য সমেত পূর্বকালে ইহা যেকপ ছিল, পুনর্মুদ্রণের সময় তাহাই থাকিলে পত্রগুলির সা হত্যরস অল্পর থাকিত বলিয়াই মনে হয়। ‘বাংলা চলতি ভাষার সহজ প্রকাশপট্টতার প্রমাণ’ যে এই চিঠিগুলির ছদ্রে ছদ্রে আছে তাহা কবি স্বয় উল্লেখ না করিলেও পাঠকবর্গের বুঝিতে কিলম্ব হইবে না। প্রায় বাট বৎসর পূর্বেকার ইংলেণ্ডের এই সরস ও জীবন্ত ছবিগুলি চলুতি কথার যেমন ফুটিয়াছে, পুঁথির ভাষায় তেমন যে ফুটিত না তাহা বলাই বাহুল্য।

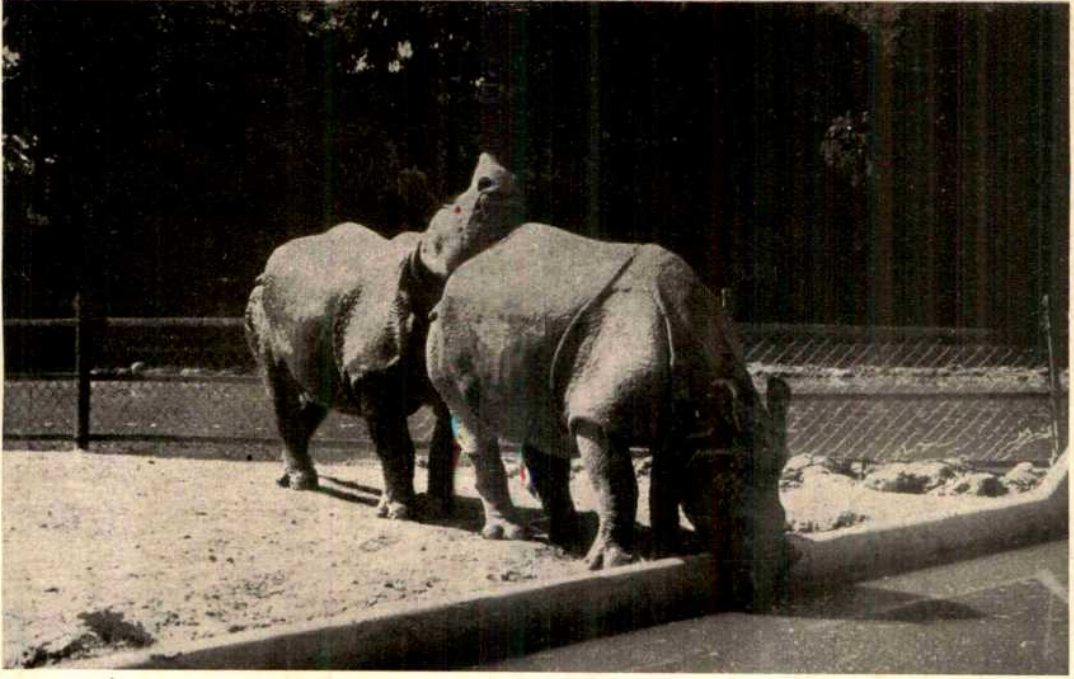
শ্রীশান্তা দেবী

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—এবেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত। মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা। ২১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১। টাকা।

ইহা একটি উন্নত, অনাধাবণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন জীবনের কাহিনী। উপন্যাসের মত মনোরম অশচ পবিজ এই বিবরণ পড়িতে পড়িতে চিত্ত আনন্দে ও তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়। লেখক অতি সহজ ভাষায় ও সরল ভাবে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তবে, স্থানে স্থানে একাক্ষর ইংরেজী শব্দ ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; আর ‘পরমী কাল’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ একটু প্রাদেশিকভাবাপন্ন। ছাপার দোষে ‘হাসি’ প্রারম্ভেই ‘হাসি’ হইয়া দিয়াছে। কিন্তু এদূর নগণ্য ত্রুটি সহজেই উপেক্ষা করা যায়। বইখানা মোটের উপর আমাদের ভালই লাগিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

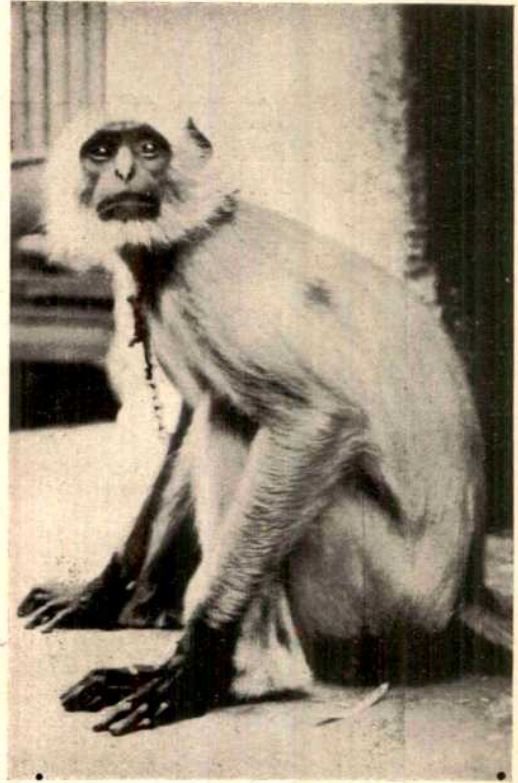
ফোটোগ্রাফিক্স মনোপার্যায়



আশ্রয়

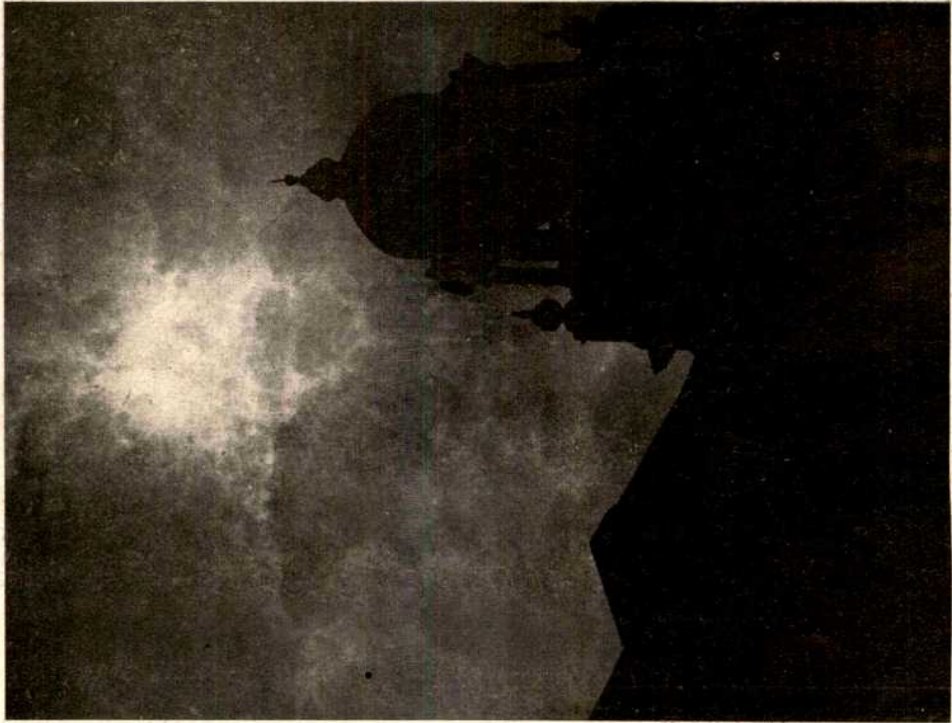


মধ্যাহ্ন-খিলাস

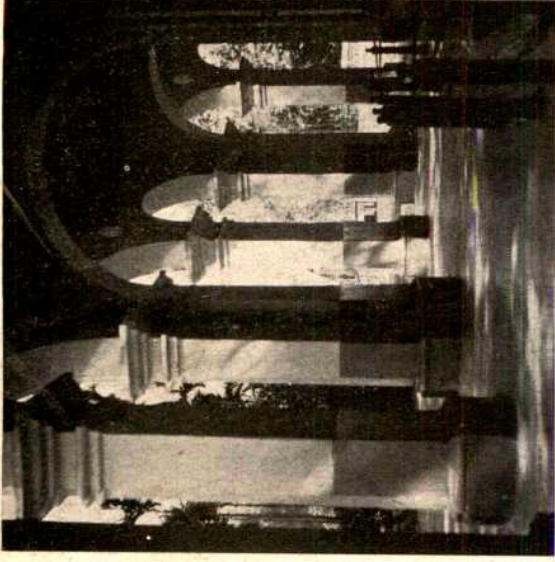


বিজ্ঞ

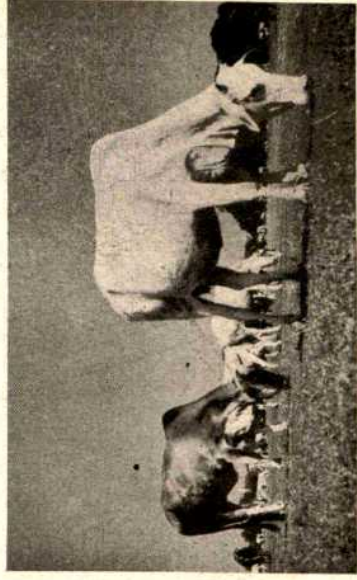
[ফোটো : শ্রীপদ্মিনী গোস্বামী]



দিবাস্পন্দ



পদ্মরাজ-গৃহ : চিড়িয়াখানা



ময়দানের দ্বিপ্রহর

[ফোটে : শ্রী পরিকল্পনা গোষ্ঠী]

ফোটোগ্রাফির নবপর্যায়

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ফোটোগ্রাফির প্রথম আবিষ্কার কাল হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই কিছু কিছু জানি। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসর হইল ঠিক এক শত বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই এক শত বৎসরের হাও-ক্যামেরার সাইজ এবং ঐ সময়ে ছবির সাইজ সম্বন্ধে মধ্যে ইহার যে উন্নতি হইয়াছে তাহা আমরা অল্প বিস্তর ব্যবহারের দিক দিয়া বিশেষজ্ঞগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন



ফোটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী

কলিকাতার দৃশ্য



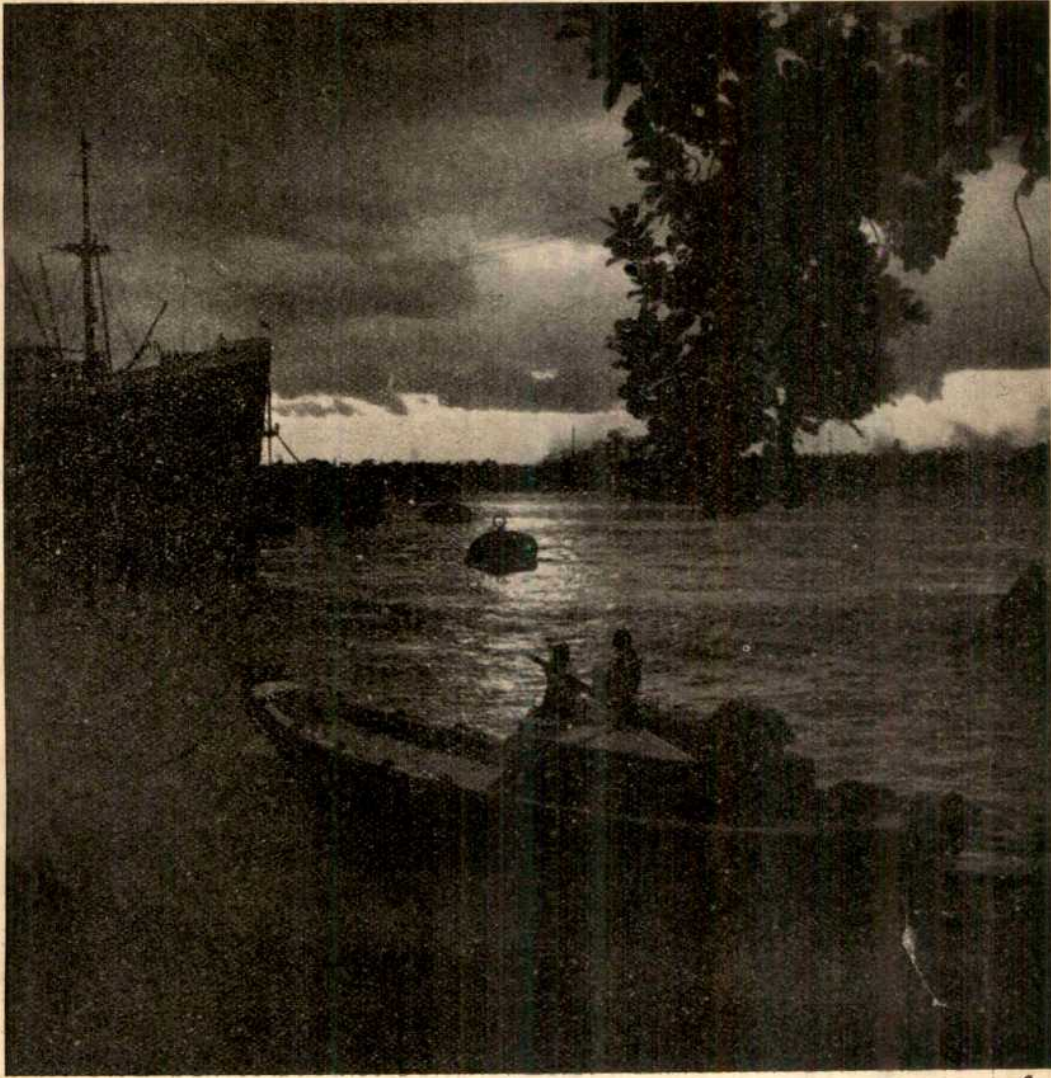
ফোটো : শ্রীপরমল পোখামী

কলিকাতার দৃশ্য

তাহার যুগান্তরকারী পরিবর্তন ঘটয়া গিয়াছে। মাত্র চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বেও হাণ্ড-ক্যামেরা যত বড় হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন, সে ধারণা এখন আর নাই। এত দিন $৩\frac{১}{২} \times ২\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ছবি যে ক্যামেরায় তোলা যায় হাণ্ড-ক্যামেরার মধ্যে তাহাই ছিল সর্বাপেক্ষা ছোট এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাইজ। অবশ্য 'ভেণ্ট-পকেট' ক্যামেরাও প্রস্তুত হইত কিন্তু তাহা জনপ্রিয় ছিল না। $৩\frac{১}{২}$ সাইজ, $২ \times ১\frac{১}{২}$ সেণ্টিমিটার বা পোষ্টকার্ড সাইজ ক্যামেরা যত বিক্রী হইত, 'ভেণ্ট-পকেট' সাইজ তাহার

এক-চতুর্থাংশও বিক্রী হইত কিনা সন্দেহ। 'ভেণ্ট-পকেট' ছবির আকার $২\frac{১}{২} \times ১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। কুড়ি বাইশ বৎসর পূর্বে এনসাইন ক্যাটালগে টিকা-ওয়াচ ক্যামেরার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি—তাহাতে ডাকটিকিট সাইজের ছবি তোলা যাইত। কিন্তু সে ক্যামেরা আদৌ বিক্রী হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

গত তিনচারি বৎসরের মধ্যে লোকে অত্যন্ত ছোট সাইজ ক্যামেরা ও ছোট সাইজ ছবির ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই নূতন রীতির ফোটোগ্রাফির নাম হইয়াছে মিনিয়চার



ফোটো : শ্রীপরমল গোস্বামী

কলিকাতার দৃশ্য

ফোটোগ্রাফি। ইহার জন্য বহুপ্রকার মিনিয়োর বা ক্ষুদ্রাকৃতি ক্যামেরাও প্রস্তুত হইয়াছে। বাংলায় এই ক্যামেরাকে 'মিনি'-ক্যামেরা বলিলে ভুল হইবে না। এই মিনিয়োর ক্যামেরা এবং তাহার আবৃত্তিক সরঞ্জাম যাহাতে একেবারে নিখুঁত হয় এবং অল্প খরচে যাহাতে বেশী ছবি বেশী সহজে তোলা যায় তাহার জন্য ক্যামেরা-প্রস্তুতকারকগণ যেন তাঁহাদের সকল নৈপুণ্য ইহাতে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। তাহার ফল ফলিয়াছে অতি আশ্চর্য্য। মিনিয়োর ক্যামেরার এই উন্নতিতে যেখানে যত বড় সাইজের হ্যাণ্ড-ক্যামেরা ছিল

তাহার অধিকাংশ সস্তা দামে বিক্রী হইবার জন্য বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

মিনিয়োর ক্যামেরার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় সাইজ এখন $৩\frac{১}{২} \times ২\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। এই সাইজটিই কয়েক বৎসর পূর্বে জনপ্রিয় সাইজগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট ছিল। এখন যে সাইজ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তাহার পরিমাণ $২\frac{১}{৪} \times ২\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি হইতে ৩৬×২৪ মিলিমিটার। এই শ্রেণীকৃত সাইজের ক্যামেরা যতগুলি এদেশে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে লাইকা এবং কন্টাক্স সর্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট। কন্টাক্স ক্যামেরার আরও

একটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে তাহার নাম কণ্টাক্সেস। ছবির সাইজ ১৩×১১ ইঞ্চি। ক্যামেরার মূল্য ৮৪৮ টাকা হইতে ১১৪৮ টাকা পর্যন্ত। ক্যামেরায় যে-সব সুবিধা আছে তাহার তুলনায় মূল্য বেশী নহে। ক্যামেরা ছোট বলিয়াই এই মূল্যে বহু প্রকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা ইহাতে করা সম্ভব হইয়াছে। সাইজ বড় হইলে মূল্য দশ-বারো হাজার টাকারও বেশী হইত। কোডাক ৩৫ লেন্স-যুক্ত একটি মিনিয়চার ক্যামেরা বাহির করিয়াছেন। ক্যামেরাটির নাম রেটিনা, দাম ১০৫ টাকা। ইহা ছাড়া, কোডাকের আরও দুইটি নতুন ক্যামেরা আছে। একটির নাম সিল্ম-২০ ডুয়ো, অপরটির নাম ভোলোণ্ডা নং ৪৮। ছবির সাইজ যথাক্রমে $২\frac{১}{২} \times ১\frac{১}{২}$ ও $১\frac{১}{২} \times ১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি, মূল্য যথাক্রমে ১১২ টাকা ও ১৫৫ টাকা। কণ্টাক্স ক্যামেরার মূল্য ৪১৩ টাকা হইতে ১০৪৩ টাকা। সুবিধার তারতম্য অনুসারে মূল্যের তারতম্য। এই মূল্য প্রায়ই কিছু-না-কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকে।

মিনিয়চার ক্যামেরায় সস্তায় যে-সকল সুবিধা পাওয়া যায় বড় ক্যামেরায় তাহা পাইতে গেলে তাহা আর কাহারও কিনিবার সাধ্য থাকিত না। ইহা ছাড়া, বড় ক্যামেরা এত বড় হইয়া উঠিত যে তাহা ব্যবহার করাও দুঃসাধ্য হইত। সেই জন্তই মিনিয়চার ক্যামেরা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে যে-সকল সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে-সকল ব্যবস্থাও অন্যান্যের আবিষ্কার। একটি সুবিধা—দ্রুত ফোকাস ঠিক করিয়া ছবি তোলা যায়। ইতিপূর্বে রিফ্লেক্স ক্যামেরা ছাড়া অন্য কোন ছাণ্ড-ক্যামেরায় এ সুবিধা ছিল না। তখন দূরত্ব আন্দাজ করিয়া লইতে হইত, কিংবা পৃথক দূরত্বপরিমাপক যন্ত্রের সাহায্য লইতে হইত। কিন্তু লাইকা এবং কণ্টাক্স ক্যামেরার সঙ্গে দূরত্বপরিমাপক যন্ত্র এরূপভাবে বসান আছে যে ভিউ-ফাইন্ডারে তাকাইলে একই সঙ্গে, কতটা স্থান ছবিতে উঠিতেছে এবং সে স্থান কত দূরে আছে তাহা মুহূর্তে স্থির করা যায়। বড় অ্যাপারচারযুক্ত লেন্সে দূরত্বের সঠিক মাপ অত্যাশঙ্কক। মাপ ঠিক না হইলে ছবি তোলা বার্থ হইয়া যায়। সস্তাদামের ফিল্ম-ফোকাস ক্যামেরায় অনুরূপ ইহা প্রয়োজন হয় না। কণ্টাক্সেস রিফ্লেক্স-ক্যামেরা, স্তত্রাং

দূরত্বপরিমাপক যন্ত্র ইহাতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহাতে অন্য আর একটি সুবিধা যোগ করা হইয়াছে।

লাইকা, কণ্টাক্স বা কণ্টাক্সেস ক্যামেরায় সিনেমা-ফিল্ম ব্যবহার করিতে হয়। এই সব ক্যামেরায় ব্যবহারের জন্ত পৃথক দৈর্ঘ্যের ফিল্ম পাওয়া যায়, তাহাতে ৩৬ খানা ছবি হয়। ৩৬ খানা ছবি শেষ হইলে তবে তাহা বাহির করা যায়। কিন্তু কণ্টাক্সেস ক্যামেরায় অ্যাডাপ্টার লাগাইয়া একখানি করিয়া ছবি তুলিবার ব্যবস্থাও আছে। ইহা ছাড়া এই ক্যামেরার সঙ্গে ফোটো ইলেকট্রিক এক্সপোজার-মিটার লাগানো আছে। ইহাই শর্কোৎকৃষ্ট এক্সপোজার মিটার। ছবিতে কতটা উঠিতেছে, তাহা কত দূরে আছে, এবং তাহার জন্ত কত এক্সপোজার দিতে হইবে এই তিনটিই একসঙ্গে নিতুলভাবে জানিতে পারা যায়।

মিনিয়চার ক্যামেরা প্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সস্তা দামের বক্স-ক্যামেরাতেও ছোট ছবি লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাজারে অনেক প্রকার সস্তা মিনিয়চার ক্যামেরা বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে নর্টন (মূল্য ২০) ও সিদা (মূল্য ৫) প্রভৃতি কিছু কিছু চলিতেছে। বক্সটেক্স ক্যামেরায় $১\frac{১}{২} \times ১\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ছোট একক-লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরার মধ্যে একজাঙ্কী ক্যামেরা সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার ছবি ভেট-পকেট সাইজের। ইহা ছাড়া, $২\frac{১}{২} \times ২\frac{১}{২}$ ইঞ্চি ছবি তুলিবার জন্ত দুইটি লেন্সযুক্ত রিফ্লেক্স ক্যামেরা বাজারে অনেকগুলি আছে। তন্মধ্যে রোলাইফ্লেক্স, রোলাইকর্ড, ইকোফ্লেক্স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের সঙ্গে যতগুলি ছবি দেওয়া গেল তাহার সবগুলিই ইকোফ্লেক্স ক্যামেরায় (মূল্য ১৩৩) তোলা। মূল ছবি প্রত্যেকটিই সমচতুর্ভুজ— $২\frac{১}{২} \times ২\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। আবশ্যক মত অংশ লইয়া এনলার্জ করা হইয়াছে। ইকোফ্লেক্স নতুন মডেলে যে-সকল সুবিধা আছে কম দামের রিফ্লেক্স ক্যামেরার মধ্যে তাহাতেই চিড়িয়াখানার ছবি তোলা আমার কাছে খুব সহজ মনে হইয়াছে। রিফ্লেক্সের কিছু সুবিধাযুক্ত, অথচ রিফ্লেক্স নয় এমন একটি ক্যামেরা এদেশে খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। ক্যামেরাটির নাম ব্রিলিয়ান্ট। দাম ২৭ টাকা হইতে।

এই ছবিগুলি তুলিতে আমি প্যানাটমিক ও স্যুপার-প্যান নামক দুইটি ফাইনগ্রেন প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম ব্যবহার করিয়াছি। স্যুপারপ্যানের দ্রুতত্ব প্যানাটমিক হইতে একটু বেশী। এই দুই প্রকার ফিল্ম হইতেই বড় আকারের এনলার্জমেন্ট করিতে কোন অসুবিধা হয় না। ইহা ছাড়া, আরও অনেক প্রকার ফিল্ম পাওয়া যায়—কিচি ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাহার চাহিদা।

যে রাসায়নিক পদার্থে ফিল্ম আবৃত থাকে তাহার দানা বা গ্রেন অতি সূক্ষ্ম না হইলে এই সব ক্যামেরায় তাহা ব্যবহার করা চলিত না। কারণ ইহার প্রত্যেকটি ছবিই বড় করিতে হয়। গ্রেন সূক্ষ্ম না হইলে বড়-করা ছবি স্ফুটন হয় না। অথচ এই জিনিষটাই কয়েক বৎসর পূর্বে অসম্ভব ছিল। তখন ফিল্মের স্পীড বা দ্রুতত্ব বেশী করিতে গেলেই সূক্ষ্ম

গ্রেন রাখা সম্ভব হইত না। মিনিয়চার ফোটোগ্রাফির যুগে ইহা সম্ভব হইয়াছে। এখন আর ফোটোগ্রাফি বিশেষ সময়ের মুখাপেক্ষী নহে, একটি উৎকৃষ্ট মিনিয়চার ক্যামেরা হাতে থাকিলে যে-কোন সময়ে, যে-কোন আলোতেই স্যাপ্ লইতে পারা যায়। ফোটোগ্রাফির এই নবপর্যায়ে ফোটোশিল্পী অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। বহুপ্রকার জটিল ব্যবস্থা দ্বারা ফোটোগ্রাফি অত্যন্ত সরল হইয়া আসিয়াছে। এখন আর কিছুই অনুমান করিতে হয় না; শিল্পীর মনের মধ্যে যদি ছবি রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত তাহার আর কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় না; অতি অল্প আয়াসেই কার্যসিদ্ধি হয়।*

* এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত তিনখানি কলিকাতার দৃশ্যের রক ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সৌজন্তে প্রাপ্ত।

ব্রতচারীর গান

. শ্রীগুরুসদয় দাস্ত

চন্দ্র সূর্য্য তারার আলো
যার মাটিতে প্রাণ জাগালো
সেই বহুধার বৃকে সোনার বঙ্গভূমি রাজে,
সেজে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা কুশী গঙ্গাধারার সাজে;—
এই ভূমির অনন্ত দানের বিখেতে দীপালি,
দিব- সন্ততি এই স্বর্ণভূমির স্বধন্ত বাঙালী
মোরা স্বধন্ত বাঙালী
মোরা স্বধন্ত বাঙালী ॥

হিমাচলের শিখর-শ্রোতের
মানস-সরের স্রবর ব্রতের
এই ভূমিতেই হয় অতুলন মিলন পরিণতি;
এই ভূমিতেই বয় অল্পপম পদ্মা মধুমতী।
এই ভূমির... ..

রূপ-নারায়ণ মেঘনা ফেণী
করতোয়া আর ত্রিবেণী
এই ভূমিকেই সিক্ত করে ধায় সাগরের পানে—
এই ভূমি বিদ্যোত প্রবল দামোদরের বানে।
এই ভূমির... ..

যুগে যুগে সংগ্রামে ধায়
রায়-বৈশে আর ঢালী হেথায়;
হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিলন-নিব্ব'রিণী
জাগায় এই ভূমিতেই বাংলা ভাষায় মধুর প্রতিধ্বনি।
এই ভূমির... ..



ঐক্যশাস্ত্র



কাঁটপতঙ্গের আত্মরক্ষার কৌশল

‘মথ’-জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রজাপতির পদে পদে শত্রু। এই জাতীয় পতঙ্গেরা সাধারণত এক ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ডানার রং কালচে সাদা। পৃষ্ঠদেশে ধূসর রঙের কতকগুলি ফোঁটা আছে। চড়াই, টুনটুনি ও বুলবুলি পাখীরা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই ধরিয়। থায়। ইহারা এই প্রজাপতির ক্যাটারপিলার বা শুককীটদিগকেও অতি উপাদেয় বোধে আহাৰ করিয়া থাকে। এই সব শত্রুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত শুককীট ও প্রজাপতি উভয়েই অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের শুককীটগুলি লম্বা গোলাকার কাঠির মত। শরীরের উভয় প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে; কিন্তু মধ্যস্থলে কিছুই নাই। ইহারা জোঁকের মত গাছপালার উপর হাঁটিয়া বেড়ায় এবং গাছের পাতা খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের সম্বন্ধে পাখীরা অনবরত গাছে গাছে ঘুরিয়া বেড়ায়। পাখীদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্ত ইহারা যখন যে-গাছে থাকে সেই গাছের মত গায়ের রং বদলাইয়া ঠিক বোটা বা কণ্ঠিত শাখা-প্রশাখার মত আটকাইয়া থাকে। পাখীরা তো দূরের কথা, বিশেষ ভাবে না দেখিলে মানুষেরই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। সাধারণত ইহারা ধূসর বা ফিকে নীল রংই ধারণ করে। গুটি বাঁধিবার কিছু দিন পূর্বে গায়ের রং লাল হইতে দেখা যায়। গুটি বাঁধিবার অব্যবহিত পূর্বে শরীর সঙ্কুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রং বদলাইয়া সবুজ হইয়া যায়। তার পর চার-পাচ মিনিটের মধ্যে বাহিরের চর্মাবরণ পরিত্যাগ করিয়া ধানের মত আকৃতিবিশিষ্ট উজ্জ্বল বাদামী রঙের গুটিতে পরিণত হয় এবং পাতার গায়ে আটকাইয়া থাকে। প্রায় দশ-পনের দিন গুটিকাবস্থায় কাটাইবার পর প্রজাপতি বাহিরে আসে। এই প্রজাপতির শত্রুর ভয়ে তাহাদের শরীরের অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় ছোট ছোট চিত্রিত পাতার উপর ডানা মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রজাপতির গায়ের ফোঁটা ও পাতার বর্ণ-বৈচিত্র্য সকলের দৃষ্টিবিভ্রম উৎপন্ন করে।

সবুজ রঙের বড় বড় এক প্রকার ক্যাটারপিলার বা শুককীট কপি, বেগুন প্রভৃতি গাছে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি স্থাপিত অঙ্গুরীর মত গায়ে অসংখ্য ভাঁজ। তাহার উপর দিয়া তির্যকভাবে অঙ্কিত কতকগুলি হলুদে ডোরা আছে, আকৃতি অতি ভয়ানক, দেখিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। পশ্চাদেশে অদ্ভুত একটি পুছ আছে। পাখীরা ইহাদের ভীষণ শত্রু। গায়ের রং ইহাদিগকে শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে। ইহারা কপি, বেগুন প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া থাকে। অনবরত খাওয়া ছাড়া ইহাদের আর কোন কাজ নাই। এক দিনে একটি পাছ সম্পূর্ণরূপে উজাড় করিয়া ফেলিতে পারে। গুটি বাঁধিবার



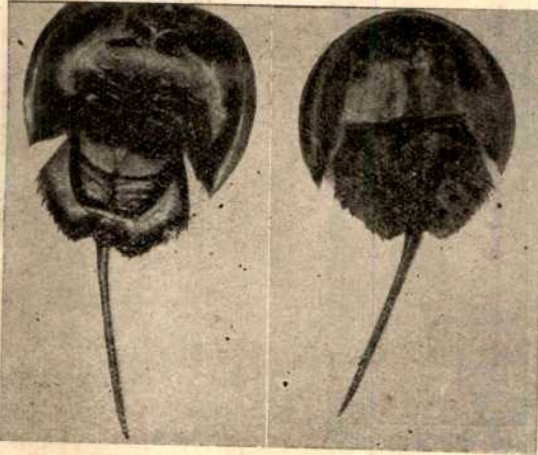
উপরের চিত্র : উপরে, সবুজ রঙের বেগুনপাতার ক্যাটারপিলারের গুটি নীচে, গুটি ফাটিয়া মথ-জাতীয় প্রজাপতিটি বাহির হইয়াছে বান, কাঠির মত ক্যাটারপিলারের প্রজাপতি

নীচের চিত্র : বেগুনপাতার মথ-জাতীয় প্রজাপতির ক্যাটারপিলার। পাতার রঙের সহিত গায়ের রঙ মিলিয়া থাকে।

সময় হইলেই খাওয়া বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া থাকে। প্রায় ৩০ই ইঞ্চি লম্বা এত বড় পোকটি চোখের সামনে পাতার উপর বসিয়া থাকিলেও সহসা নজরে পড়ে না। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে হঠাৎ খোলস বদলাইয়া উভয় দিক ছুঁচলো খুব বড় একটা কুলবিটির মত গুটা ধাঁধিয়া ফেলে। গুটার চক্চকে রং কালো। কিছুদিন নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিবার পর গুটা ফাটিয়া বিচিত্র বর্ণের প্রকাণ্ড 'মথ'-জাতীয় পতঙ্গ বাহির হইয়া আসে।

রাজ-কাঁকড়া

আমাদের দেশে বিবিধ প্রকারের বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট কাঁকড়া দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ব্যতীত অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট 'ক্লিফোজরা' গণভুক্ত রাজ-কাঁকড়া নামে এক প্রকার লম্বা লেজবিশিষ্ট সামুদ্রিক কাঁকড়াও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাঁকড়া মানুষের খাওয়ার উপযোগী হয় না। কিন্তু জমির সার অথবা গৃহপালিত পাখী ও শূকর প্রভৃতির খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর মোহানায় সমুদ্রের ধারে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ কাঁকড়াদের দাঁড়া-সমেত পায়ের সংখ্যা দশটি, কিন্তু ইহাদের ছয় জোড়া পা এবং প্রত্যেক পা-ই দাঁড়ায় পরিণত হইয়াছে। মুখের



বুকের দিক

রাজকাঁকড়া

উপরের দিক

সম্মুখ ভাগের দাঁড়াজোড়াটি সব চেয়ে ছোট, তাহার পরের দুই জোড়া বেঁটে, কিন্তু খুব মোটা এবং সর্কাপেক্ষা শক্তিশালী; অবশিষ্ট তিন জোড়া প্রত্যেকটি ক্রমশ একটার চেয়ে অপেক্ষা বড় হইয়া গিয়াছে। সর্বশেষ দাঁড়ায় খুব ছোট দাঁড়াশী ও কয়েকটি করিয়া পাখনা আছে, এতদ্ব্যতীত সমস্ত পায়ের দাঁড়া রহিয়াছে। খোলার নীচে পিছনের দিকে কাগজের ভাঁজের মত অর্ধগোলাকৃতি ছয় খানি পাতলা পাখনা আছে তার পিছনেই পাঁচ-ছয় ইঞ্চিলম্বা লেজ খোলার সঙ্গে কজার মত আঁটা রহিয়াছে, লেজটা বাদ দিলে ইহাকে

একটা কচ্ছপের মতই দেখায়; অধিকন্তু একটা কলমের হাতলের মত শক্ত লেজ থাকার ফলে কাঁকড়ার সঙ্গে ইহার কিছুই সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না তথাপি ইহার সত্যিকারের কাঁকড়া এবং কাঁকড়ার সেরা বলিয়া রাজ-কাঁকড়া নামে অভিহিত। কাঁকড়া-জগতে ইহারাই বোধ হয় আদি জীব। চিং করিয়া ফেলিলে খোলাটা বাটির মত নিম্নপৃষ্ঠ, ঠিক সারেরের খোলার মত দেখিতে। খোলাটা সম্মুখে ও পিছনে দুই ভাগে বিভক্ত। পিছনের খোলার ধারে বারটি তীক্ষ্ণ নখর আছে। সেগুলি লেজের দিকে ঝাঁকানো, সম্মুখের খোলার পৃষ্ঠদেশে পিছনের দিকে দুই ধারে দুইটি চোখ আছে। ইহার সামুদ্রিক পোকামাকড় ধরিয়া খায় এবং বালি অথবা কর্দমের ভিতর গর্ত করিয়া বাস করে। মে, জুন, জুলাই মাসে ইহার ডিম পাড়িয়া থাকে। এই সময়ে জোয়ারের সঙ্গে কাঁকড়া-গুলি অগভীর জলে আসিয়া পড়ে। স্ত্রী-কাঁকড়াদের পিঠের উপর পুং-কাঁকড়াগিকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। বেজের মত বাহিরে ইহাদের ডিম্বনিষেকক্রিয়া নিম্পন্ন হয়। ডিমগুলি বালিতে পুঁতিয়া রাখে। রৌদ্রের উত্তাপে উপযুক্ত সময়ে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। শিশু-অবস্থায় ইহাদের লেজ থাকে না। পরিণত বয়সে ক্রমশ লেজ গজাইয়া থাকে। লেজের একটা মাত্র উপযোগিতা দেখা যায়। যখন বালির উপরে কোন বস্তু উঠাইয়া পড়ে তখন লেজটাকে 'লিভারের' মত ঠেকা দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া থাকে। এমনই ইহাদের দেহের গঠন যে, একবার চিং হইয়া পড়িলে লেজ না থাকিলে ইহার কিছুতেই উণ্ডু হইতে পারিত না।

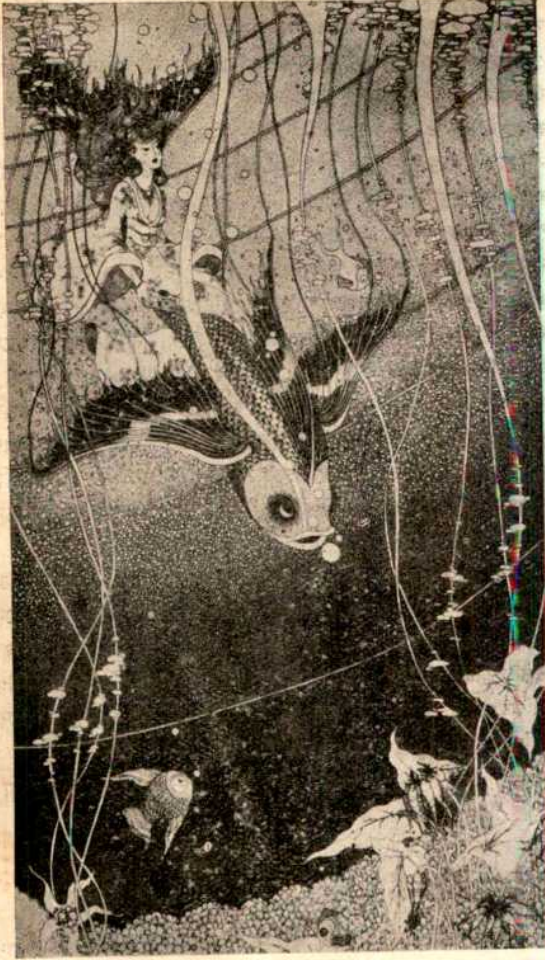
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাচীন চীনের রূপকথা

সকল প্রাচীন দেশের ছায় চীনও রূপকথায় সমৃদ্ধ। তাহার দুইটি সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত হইল। চিত্রগুলি শ্রীমতী জানেট সিউয়াল কর্তৃক অঙ্কিত।

পরিত্যক্তা বধূ : সুদূর অতীতের কথা, এক নিঃস্বল বিদ্যার্থী গ্রাম হইতে পরীক্ষার্থীরূপে শহরে আসিয়াছে। ঘটনাক্রমে সে এক অপকৃপ লাবণ্যবতী অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত ও তাহার রূপে মুগ্ধ হইল। অভিনেত্রী এই কিশোর বিদ্যার্থীকে বিবাহ করিতে সম্মত, কিন্তু তাহার ভাগ্যবিধাতা প্রভুকে অর্থমূল্য প্রদান না করিলে অভিনেত্রীর অব্যাহতির কোনও উপায় নাই। অবশেষে আর এক জন গুণগ্রাহীর নিকট ঋণ করিয়া অভিনেত্রীর মূল্য পরিশোধ হইল। তার পর নবদম্পতী তরুণীতে স্বগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

ইতিমধ্যে যুবকের মনে সংশয় জাগিয়াছে, তাহার পিতামাতা এই অভিনেত্রীকে বধূরূপে গ্রহণ করিয়া লইবে কিনা। বিধা-ব্যাকুলচিত্তে অবশেষে যুবক নবপরিণীতা পত্নীর নিকট চিরবিদায় লইবার সঙ্কল্প করিল এবং আর একটি তরুণীতে এক ধনী নিকট সুন্দরী ভাণ্ডাকে বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইল,—বিদায়বিধুরার



সমুদ্রতলের মৎস্তবাহনে পরিত্যক্তা বধু

অশ্রুকাतर কোনও আবেদন নিষ্ঠুর যুবককে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

স্বামীবিরহে বিবাদময়ী প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া তরঙ্গে ঝাঁপ দিল। কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিল না, এক অতিকায় সমুদ্র-মৎস্ত তাহাকে বহন করিয়া সাগরতলের রাজপুরীতে লইয়া গেল; সেখানে একাকিনী অশ্রুমুখী নির্জনে আপনার দুঃখে আপনি অশ্রু মোচন করে।

একদা স্বপ্নে আবার প্রিয়ের সহিত তাহার মিলন হইয়াছিল।

রূপসীর অভিসার : বহুপূর্বে এক সৌম্যদর্শন বিজ্ঞার্থী একদিন পৃথিমধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসীর সাক্ষাৎলাভ করেন। রূপসী সাদর সম্ভাষণে বিজ্ঞার্থীকে বেণুকুঞ্জে আমন্ত্রণ করিল; সঙ্গীত ও কাব্যালোচনার দীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

ক্রমশ বিজ্ঞার্থী এই রমণীর প্রেমে আকৃষ্ট হইল, এবং বেণুকুঞ্জে

প্রত্যহ তাহাদের সন্ধ্যা কাটিতে লাগিল। কিন্তু অকস্মাৎ একদিন সুন্দরী জানাইল, তাহাদের মিলন-পর্ব শেষ হইয়াছে, আর কোন দিন তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না। এই বলিয়া সে বিজ্ঞার্থীকে একটি মনোরম কোটা প্রেমনিদর্শনরূপে উপহার দিল।

অকস্মাৎ এই বিদায়গ্রহণে হতবুদ্ধি যুবক পর দিন সায়াংকালে পুনরায় কুঞ্জদ্বারে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু কোথায় বা সে কুঞ্জ, কোথায় তাহার সুন্দরী অধিষ্ঠাত্রী!

বহু দিন পরে যুবক এক বিচারপতিকে তাহার প্রেয়সীর স্মৃতিবিজড়িত মনোরম কোটাটি প্রদর্শন করিয়া সবিস্ময়ে জানিল, তাহার মানস-প্রতিমা প্রকৃতপক্ষে এক অপদেবতা!



বেণুকুঞ্জের রূপসী

অতীত কালে সে-ই ছিল রূপবিলাসী এক চীন-সম্রাটের রাজসভা-শোভিকা।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল



খেল
শ্রীপতিমাথ মন্দির

আবদী প্রেস, কলিকাতা

বাঁশী

শ্রীঅলোক রায়

ঝড়ের হাওয়ায় যেমন করিয়া উৎসবরাজির দীপগুলি সহসা একসঙ্গে নিবিয়া যায়, সুপারিটেণ্টেণ্টেব গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্ববে তেমনই করিয়া মেয়েদের শয়নকক্ষের আলোগুলি একসঙ্গে এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল।

সিঁড়িতে সুপারিটেণ্টেণ্টেব পদধ্বনি ক্রমশঃ বিলীন হইয়া গেল, এবং তাহার পরই ভারী দবজাব শব্দ হওয়াতে বোঝা গেল, তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।

দোতলায় মেয়েরা থাকে, পাশাপাশি দশ-বারটা ঘর। সম্মুখে উঁচু রেলিং-দেওয়া কাঠের লম্বা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়াইলেই নদীটা দেখা যায়—কেবল একটি প্রশস্ত রাজ-পথেব ব্যবধান।

নদীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে একেবারে ডান পাশেব শেষে যে ঘরটা, তাহাতে থাকে একটি পাহাড়ী মেয়ে।

আলো সে নিবাইয়া দিয়াছে অনেক ক্ষণ, এখন আর তাই তাহার আলো নিবাইতে হইল না, গাধের কাপড়টা টানিয়া সে কেবল একবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঝরঝর ছায়া চঞ্চল মেয়েটির স্বভাব, এখানে আসিয়া এই সর্কীর্ণ গম্ভীর এবং নিষমকান্থনের ভিতর পড়িয়া প্রাণটা তাহার হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। এখানে সে নবাগতা, এবং নূতন আসিলে যাহা হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছে, অর্থাৎ কারণে-অকারণে পোড়া চোখ-ছুইটাতে কেবল জল আসিয়া পড়িতে চাহিতেছে।

দিনে সকলের চোখের সম্মুখে সে কোন রকমে আত্ম-সংবরণ কবিয়া চলে, কিন্তু রাত্রে নিভুতে শয্যায় শুইয়া শিয়রের উপাধান ভিজিতে থাকে। আজও তাহার ঘুম আসে নাই—নিস্তব্ধ নিশীথে মনটা তাহার মুক্ত বিহঙ্গের ছায় পাখা মেলিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরটির পানে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সফল * বৃক্ষের বে-শাখাটা তাহাদের-জানালার একান্ত

নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই পত্রাস্তবালে আপনাকে লুকাইয়া জানালার ভিতরে দৃষ্টিনিষ্কপ করিয়া সে চুপ কবিয়া বসিয়া আছে।

জানালার ভিতর দিয়া দেখা যায় ছোট একটি ঘর। এক পাশে চিমনি জ্বলিতেছে—তাহাবই আলোতে বুঁকিয়া পড়িয়া মা তাহার পিতার মোজা বিপুল করিতেছেন। বৃদ্ধ পিতা কাগজ-কলম লইয়া কি হিসাব করিতেছেন। অদূরে বইটা হুমুখে খুলিয়া রাখিয়া তাহাব ছোট ভাইটি চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছে এবং মাঝে মাঝে মায়ের ভৎসনা শুনিয়া চোখ-ছুইটাকে যথাসাধ্য টানিয়া টানিয়া খুলিয়া একটা লাইনই পুনঃপুনঃ পড়িয়া যাইতেছে। তাহাদের পশ্চাতে ঘরের অন্তরালে বসিয়া তাহার বোনটি সোসাং-ফল খাইতেছে; মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে কেহ তাহাকে দেখিতেছে কিনা, এবং তাহার পর নিশ্চিন্ত মনে খাইতে খাইতে ভাবিতেছে, কি উপায়ে পিতামাতাকে না জানাইয়া ইহার কিছু অংশ দ্বিদির নিকট পাঠানো যাইতে পারে।

তাহার চিন্তাধারায় বাধা দিয়া নীচেব পড়িবার কক্ষের বড় ঘড়িটায় ঢং-ঢং করিয়া এগারটা বাজিল।

সময় হইল নাকি তাহার আসিবাব? কিন্তু এত রাত কবিয়া বাজায় কেন ও? কত দিন ত ঘুমাইয়া পড়ে, শুনিতেই পায না মোটে। বড় ভাল লাগে তাহার বাঁশী শুনিতে, ভাইটির কথা মনে পড়িয়া যায়। কি ভালই না বাসে ও বাঁশী বাজাইতে। কত দিন জ্বল ফাঁকি দিয়া সে ঐ পাইনগাছটার তলায় দ্বিদিবে ডাকিয়া আনিয়া বাঁশী শুনাইয়াছে। মনে হয় রাত্রেব অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া তাহাব ভাইটি যেন আসে তাহাকে দেখিতে, এখানে ঐ বালুচরে ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া ভাইটি আসিয়া বাঁশী বাজায়—বুঝি বা, প্রবাসী বোনটিব চোখে ঘুম আনিবার জন্তই। চিমনির আলোতে ভাইটির মুখ দেখা যায়—একেবারে স্পষ্ট।

* খাসিরাদের প্রিয় এক প্রকার ফল।

তাহার পরের ঘরটিতে থাকে ক্লোরিন। মা তাহার যুক্তপ্রদেশের মেয়ে, পিতা মাদ্রাজের খ্রীষ্টিয়ান। পিতামাতা থাকেন অনেক দূরে, মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, মেয়ে কিরূপ অধ্যয়ন করিতেছে সে-বিষয়ে অল্পসন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

অতএব ক্লোরিন দুইবার আই-এ পরীক্ষার পর এইবার 'পারিষ না একথাটি বলিও না আর' নীতির সারবত্ত উপলব্ধি করিয়া পুনরায় পরীক্ষার জ্ঞাত প্রস্তুত হইতেছে। বৎসেক দিন পূর্বে একটি ছেলের সঙ্গে তাহার অসম্ভব ভাব হইয়া গিয়াছে, এবং তাহাকে না পাইলে যে সাহারা মরুভূমি এবং তাহার জীবনে কোন প্রভেদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই, অনেক অশ্রুবিসর্জনের পর এই সত্য কথাটি সহপাঠিনীদের নিকট স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু পরম দুঃখের কথা এই যে সহপাঠিনীদের দিক হইতে ইহাতে বিন্দুমাত্র উৎসাহের আভাস পাওয়া যায় নাই। তাহারা কেবল স্বরণ করিতে চাহিয়াছে, ক্লোরিনের জীবন এইবার লইয়া কম বার সাহারাতে পরিণত হইল।

লাইট জালাইয়া সে একখানা পত্র লিখিতেছিল। সহস্র অরসিক সুপারিস্টেণ্ডেটের ততোধিক রসবিহীন কণ্ঠস্বর কানে আসিল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে লাইট নিবাইয়া শুইয়া পড়িল, এবং অর্ধসমাপ্ত পত্রখানাকে কি ভাবে শেন করা যায় সে-বিষয়ে ভাবিতে লাগিল। বড়ই ইচ্ছা করিতেছিল উপসহায়ে একটা কবিতা লিখিবে, কিন্তু সেইখানেই যত গুণ্ডগোল। কবিতা-কবিতা আবার তাহার মোটেই পড় নাই, অথচ টমাস প্রতিটি পদ্রে কতকগুলি করিয়া কবিতা লেখে। অতএব না লিখিলেও নয়, ভাবিবে, দুইবার কেন্দ্র করিয়াছে তাই-নাঃ! লেখা তাহার চাই-ই।

শয্যা ত্যাগ করিয়া ক্লোরিন উঠিল। টর্ক জালাইয়া সে কবিতার বই খুলিয়া বসিল। হ্যাঁ, কবিতা একট তাহার চাই! এমন একটা কবিতা চাই যাহাতে চার-পাঁচ লাইনের ভিতর থাকিবে খানিকটা আকাশ—আকাশে যদি চাঁদ এবং তার পাওয়া যায় তবে ত কথাই নাই—কিছু বসন্ত-বাতাস, কিছু ফুলের নাম এবং পরিশেষে কিছু বিরহের ব্যাকুলতা। কিন্তু এতগুলির সম্মেলন কি বৃদ্ধি করিয়া কোন রসবি এত অল্প লাইনের ভিতর ঘটাইতে পারিয়াছেন? অথচ ইহার

বেশী বড় কবিতা লিখিবার উপায় নাই—টমাস ভাবিবে, বই দেখিয়া লিখিয়াছে।

কিন্তু সেইখানেই যত বিঘ্ন। আকাশ পাইলেও ফুল পাওয়া যায় না, এবং অনেক কষ্টে আকাশ-বাতাস-ফুলকে চার লাইনের ভিতর আটক করিতে পারিলেও বিরহের ব্যাকুলতার আর স্থান হয় না। ভগবান, আজিকার এই এক রাত্রির জন্ত তুমি আমাকে কবিতা রচনা করিবার ক্ষমতা দাও।

টর্কের ব্যাটারি প্রাণ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কবিতাব সন্ধান মিলে নাই! সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, অর্চনা বেশ ভাল কবিতা লিখিতে পারে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিল; কাল অর্চনাকে যে কোন প্রকারে হাত করিতে হইবে।

রাত্রির নিশ্চিন্ততা ভেদ করিয়া ঘড়িটা উচ্চশব্দে জ্বালাইয়া দিল, এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্লান্তদেহে ক্লোরিন শুইয়া পড়িল। আচ্ছা, সেই লোকটা না এই সময়েই বাণী বাজায়? মেয়েরা কাল বলিতেছিল, এগারটা পর আসে; ঘুমাইয়া না পড়িলেই হয়। খুব ভাল লাগে তাহা বাণী, টমাস যদি পারিত অমন করিয়া বাজাইতে!

তাহার পরের ঘরটিতে একটি মেয়ে মোমবাতি জ্বালাইয়া মাফ্লার বুনিতোছে। চোখ দুইটি রহিয়াছে মাফ্লারের উপর একেবারে স্থির, কিন্তু মনের ভিতর চলচ্চিত্রের ছবির স্রাব চিন্তার পর চিন্তা উঁকি দিতেছে।

সুপারিস্টেণ্ডেটের উপর রাগ হয় কি সাধে? কেন বাপু? এত কি ডিসিগ্নি তোমার? কাল ত মোটে শেষ হইল পরীক্ষা, আজ বাজিটা কোথায় একটু শ্রীমত কাজ করিবে,—নাঃ! ঠিক সাড়ে দশটার সময় লাইট নিবানো চাই। বেশ করিয়াছে সে। তুমি ত নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা ঘাইতেছ, আর এদিকে যে সে মোমবাতি জ্বালাইয়া কেমন তোমার আদেশ মানিয়া চলিতেছে—সন্ধান পাও তুমি তাহার?

মাফ্লারটা কিন্তু শেষ করাই চাই। আচ্ছা, বাবা! কি অবাক হইয়া বাইবেন! মা ত ভাবিয়াই পাইবেন

না, এত পড়াশুনার ভিতর কি করিয়া সে এত বড় মাফলারটা শেষ করিয়া ফেলিল।

বাহিরে শান্ত নদীর বক্ষে তরঙ্গের সৃষ্টি ভাঙাইয়া একটা ষ্টীমার চলিয়া গেল। মেয়েটি এতক্ষণ পরে একবার সেই দিকে চাহিল। বেশী লোক নাই ডেকে। কেবল, একেবারে রেলিঙের ধারে বসিয়া কে এক জন একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে জাহাজটা দূরে চলিয়া গেল, জাহাজের লাল নীল আলোগুলি নদীর জলে পড়িয়া বামধরুর ত্রাঘ বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে,—দূরের পাহাড়টার অন্তরালে ষ্টীমারের শেষ আলোটা বিলীন হইয়া গেল।

মেয়েটি পুনর্বার হাতের মাফলারের উপর হুকিয়া পড়িল। মা-বাবাও ত আসিবেন কাল ঐ রকম ষ্টীমার করিয়া। ঠেগনে সে নিশ্চয়ই যাইবে।

ও কি! এগাবটা বাজিয়া গেল ইহার মধ্যে! মাফলারটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অবশিষ্টটুকু কাল অন্যাসে শেষ করিয়া ফেলা যাইবে—ঘুমও আসিতেছে চোখে। কিন্তু এত শীঘ্র ঘুমাইলে ত চলিবে না। বড় প্রথব না তোমাব দৃষ্টি? বাবটা পর্যন্ত আজ মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিবে সে। এত কড়া মেজাজ, অত্যাচার স্থপাৰিটেণ্টেণ্টের, সব সহিয়া চলিয়াছে মেয়েরা; হইত ছেলেদের হোষ্টেল, এত দিনে কিছু শিক্ষা দিয়া ছাড়িত।

দ্বারে করাঘাত হইল, মুহূর্তে অধীর। অপরিণীম বিম্ব এবং ভয়ে মুহূর্তের জন্য মেয়েটির চেতনাশক্তি যেন লোপ পাইল, কিন্তু পতঙ্গেরই বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার সমস্ত শক্তিকে একত্র করিয়া ফুঁ দিয়া যেই মোমবাতি নিবাইতে যাইবে, অমনি দ্বারের বাহিরে মুহূর্তে একটা কণ্ঠস্ব শুনা গেল—“শান্তা, দোবটা খুলে দে ভাই।”

অস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস লইয়া শান্তা দ্বার খুলিল, এবং পরমুহূর্তে অঙ্গের চাদর এবং উপাধান সহ একটি মেয়ে একেবারে হুড়মুড় করিয়া শান্তার গায়ে পড়িয়া গেল। জন্তে পতন সংবরণ করিয়া আগন্তকার পানে চাহিতেই শান্তা দেখিল মেয়েটির ললাটে স্বেদবিন্দু এবং তাহাব স্ফীর্ণরীর থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

শান্তা প্রশ্ন করিল,—“ও কি বে! অমন হি হি ক'বে কাঁপছিস কেন? নেয়ে এলি নাকি এত রাতে?”

অতি কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করিয়া শান্তার কানেক অতি নিকটে মুখ লইয়া মেয়েটি কহিল, “তোকে আমি সত্যি বলছি শান্তা। আমার ঘরের কাছের সেই গাছটা থেকে একেবারে স্পষ্ট কে যেন আমার নাম ধ'রে ডাকলে, একবার নয় ভাই, তিন-তিন বার।”

শান্তার মুখের ভাবে বুঝা গেল না যে ইহাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইয়াছে। বরং একটু যেন বিরক্ত হইয়াই কহিল, “আচ্ছা, পৃথিবীর যত ভূতপ্রেতী কি তোর ঘরের কাছে গিয়ে বাসা বাঁধল রে? আজ তোর নাম ধ'রে ডাকবে, কাল খড়ম পায়ে দিবে তোর দোবের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে, পরন্তু তোব জানালার পবদা ফাঁক ক'বে তোকে দেখবাব জন্তে উঁকি মারবে—না! তুই একেবারে হোপলেস।

কষ্টে করুণ মিনতি ভরিয়া মেয়েটি কহিল, “তোবা বিশ্বাস করিস নে ভাই, কিন্তু এতক্ষণ সত্যি আমার যে কি হচ্ছিল সে শুধু আমিই জানি। লেপের তলায় একেবারে ঘেমে উঠেছি, তবু মুখ বার করতে পারি নি। একটা আঙুল বাইবে ছিল, একেবারে ঠাণ্ডা মনে বরফ, তবু যে লেপের ভেতরে ঢোকাব, সে সাহসও আমার হচ্ছিল না ভাই। তা তুই বাই বলিস শান্তা, আজ আমি কিছুতেই ও-ঘরে গুতে পারব না।”

অতঃপর দুই জনে মিলিয়া শয্যা রচনা করিল; শান্তা পুনর্বার মাফলাবে মনোনিবেশ করিল, এবং অপর মেয়েটি শুইয়া পড়িল।

“শান্তা!”

“কি?”

“সেই বাঁশীটা এই রকম সময়েই ত বাজে, না রে?”

শান্তা মুহূর্তে হাসিল—“ভূতের ভয়েও বাঁশীর কথা ভুলিস নি দেখছি?”

মেয়েটি একটা মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলিল—“না! বাঁশী শুনলে আর আমার ভয় করে না, মনে হয় কোন দেবতা স্বর্গ থেকে আমার অভয়বাণী পাঠাচ্ছেন।

শান্তার পরের কক্ষে যে থাকে, লাইট নিবাইয়া শুইয়া আশ্রয় মনে সে হাসিতেছে। মাঝে মাঝে একটু জোরে

শব্দ হইয়া গেলেই সে আঁচল দিয়া মুখ টিপিয়া ধবে। কিন্তু তবু কি যে হইয়াছে, তাহার হাসি আব থামিতে চাহে না।

না বাপু! ছেলেদের কলেজে পড়া আর তাহার চম্ভিবে না। এত হাসাইতে পারে ওরা, অথচ হাসিতে পারিবে না, প্যাটার মত মুখ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই সেদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল, সকলেই মোটা কোট কিংবা চাদর জড়াইয়া আনিয়াছে। আর এক জন আসিলেন একটি লেপ গাথ দিয়া।

প্রফেসর হাঁকিলেন—“গেট আউট।”

ও বলিল,—“বড্ড যে শীত স্তর, লেপ না গায় গিলে চলে না।” আচ্ছা, এই রকম নাকি দেখিয়াছে কেউ কোনও দিন? আবার প্রফেসর যখন প্রশ্ন করিলেন, “কি নাম?” এক গাল হাসিয়া সজারুর কাঁটার স্থায় অপেক্ষণ কেশসহ মস্তক ঢুলাইয়া কহিলেন—“গদাধব”।

ইহার পবেও নাকি কেহ না হাসিয়া থাকিতে পানে? চোখের স্তম্ভে এই চিড়িয়াখানা দেখিয়াও?

মেয়েরা বলে এই রকম হাসা অত্যাশ! কিন্তু কি করিবে সে? না, ছেলেদের কলেজে পড়া আর কিছুতেই হইবে না তাহার, মাকে সে লিখিয়া দিবে, কলিকাতার কোন মেয়েদের কলেজে ভর্তি না হইলে তাহার চলিবে না।

একদৃষ্টে প্রফেসরের মুখের পানে চাহিয়া থাকাই কি সোজা কথা? ঘাড় একেবারে ব্যথা হইয়া যায় না।

নীচেব কক্ষ হইতে ঘড়িটা বাজিয়া উঠিল এক, দুই, তিন, চাব...এগারটা বাজিয়া ঘড়িটা চূপ কবিল।

ঠিক এগারটার সময়ই না আসিবে তাহারা? মেয়েদের কথায় যদি আর কোনদিন বিশ্বাস করে সে। তাহাকে জ্ঞানিয়া থাকিতে বলিয়া তাহারা বোধ হয় এতক্ষণ আরামে নিদ্রা যাইতেছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া মেয়েটি উঠিল। তাহার পর সন্তপণে দ্বার খুলিয়া অপব মেয়েদের কক্ষের প্রতি চাহিল। সবস্তু হোটেলটা সম্পূর্ণ নীরব, বাইরে একটা বাতাস জেরে বহিয়া যাওয়াতে বৃক্ষের কতকগুলি গুচ্ছ পত্র ঝরিয়া পড়িল—তাহার পর পুনরায় নিবিড় নীরবতা।

মুহূর্ত্ত কয়েক পরেই একটি কক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল— একটি মেয়ে ধীবে ধীবে বাহির হইয়া আসিল, এবং তাহার অন্তর্দৃষ্টি পবেই আরও চার-পাঁচটা কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া চাব-পাঁচটি মেয়ে এই মেয়েটির শয্যাকক্ষেব দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। কাহারও পাছুকার মুহূর্ত্ত শব্দ হইতেই, অপরে অধরে আঙুল চাপিয়া নতর্ক কবিল। একটি মেয়ের অসম্ভব হাসি পাইতেছে, নুখের ভিতর অঞ্চল চাপা দিয়া অতিকষ্টে হাস্ত সংবরণ করিতে করিতে টলিয়া টলিয়া সে অগ্রসর হইল।

তাহার পর একসঙ্গে ঈর্ষফুট কর্তে প্রশ্ন এবং উত্তরের আদান-প্রদান চলিল।

“এগারটা বেজে গেল না? হ্যাঁ, আব আধ-ঘণ্টাখানেক পরেই আসবে দেখিস্।”

“আমার কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে ভাই, যদি কোন একমে স্থপাটিটেণ্ডেট জানতে পাবেন।”

“তোব যেন সব তাতেই ভয়, কেন, কি এমন নারাপ কাছ করছি আমবা?”

“সত্যিই ত একটা শুধু সন্দেহভঞ্জন, বারাণ্ডায় পাড়ালেই ত দেখা যাবে, কতক ক্ষণেরই বা ব্যাপার।”

“আচ্ছা, চিত্রা-দিকে ডাকলে হ’ত না? যা বুদ্ধি ওর, যদিই বা কোন কিছু হয়, ও ঠিক আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে।”

“হ্যাঁ রাখো তোমার চিত্রা-দি। যা কুস্তকর্ণ, ন’টা বাজতে-না-বাজতেই ত দিয়েছেন ঘুম, বাড়ীতে আশুন লাগলেও শুকে ওঠানো যাবে না।”

“আর কি নীরস ভাই, সেদিন বলছিলুম, এত চমৎকার বাঁশী, একদিন একটু জেগে শোন, একেবাবে চারুন্ড হুয় যাবে। তা বললে, হ্যাঁ! রাত জেগে রইব আমি ঐ বাঁশী শোনবার জন্যে—পাগল নাকি তোরা?”

“আমার কিন্তু না দেখলেই চলবে না, এমন চমৎকার বাঁশী আমি জীবনে শুনি নি কোন দিন, শুনবও না হয়ত। সত্যি ভারি রহস্যময় মনে হয় শুকে।”

“কিন্তু যদি সেই খারাপ লোকটাই হয়?”

“কি যে বলিস রেবা। ও হ’লে এত রাত ক’রে আসত এদিকে, আমাদের চোখের আড়াল হয়ে? আমরা জেগে

থাকতে-থাকতেই পঞ্চাশ বার চোখের সমুখে ঘুরে বেড়াড, পাছে আমরা ওকে দেখতে না পাই।”

“কিন্তু জান, কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আমরা সবাই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তোমরা ত সেই উচু চিপটিটার উপর বসে রইলে, আমি পা খোবার ক্ষণে একে-বাবে জলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি সেই রকম বাঁশীর স্বব, অনেক দূবে সেই যে ছোট একটা দ্বীপেই মত জায়গা সেইখানে বসে কে বাজাচ্ছে। কত চেষ্টা করলুম দেখতে—শুধু গায়ের নীল জামাটা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। তার পর যখন হোষ্টেলে ফিরে আসছি দেখি হন হন করে সাইকেলে চেপে সেই খারাপ লোকট চলেছে, গায়ে একটা নীল জামা। এত মন খারাপ হচ্ছে গেল আমার।”

“কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি ও নয়। সেদিন আমরা সেই দাদার বাড়ীতে গিয়েছিলুম না? ছপুয়ে ঘুমিয়ে আছি, এক সময় ঘুম ভেঙে গেল, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই, হঠাৎ শুনি সেই অদ্ভুত স্বরটা বাজছে—ঠিক সেই স্বরটা, তেমনি এক-একবার কানে কানে কথা বলার মত ধীরে, আবার সেই রকম গভীর উত্তেজনার কৈপে-ওঠা কর্তব্যের মত জোরে; মনে হ’ল, একটু দূরের একটা বাড়ীতে কে বাজাচ্ছে। আমার দাদা বাড়ী ছিলেন না, সন্ধ্যাবেলা ফিরতে জিজ্ঞেস করলুম, ও-বাড়ীতে কেউ বাজায় নাকি। তা, দাদা বললেন, ও-বাড়ীতে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক পেন্সন্ নিচ্ছে এসেছেন, কারো সঙ্গে মেশেন না, হয়ত জানেন বাজাতে, ওঁরা কিন্তু কোনদিন শোনেন নি।”

নীচের ঘড়িটাতে চং করিয়া একটা শব্দ হইল।

“সাড়ে এগারটা বেজে গেল না? সত্যি চিত্রা-দিকে ডাকলেই ভাল হ’ত, কি স্তব্ধ রাত্রি দেখছি ত, মনে হয় কানে কানে কথা বললেও যেন দূর থেকে শুনে ফেলবে, তোর নয় থাক, আমিই ওকে ডেকে আনি, কেমন?” বলিয়া কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রস্রকারিণী দ্বীপ বৃদ্ধপদে বাহির হইয়া গেল।

বাহিরে আর একবার বৃষ্টির পড়ে পড়ে কম্পন জাগাইয়া একটা দমকা বাতাস বহিয়া গেল। একটা নিশাচর পক্ষী

অদ্ভুত শব্দে এই শব্দহীন রাত্রির চুম্বারে আঘাত করিয়া দূরে উড়িয়া গেল।

সকলেই যেন কিসের প্রতীক্ষা করিতেছে প্রতি ক্ষণে, বহু দূর হইতে বুঝি কে আসিতেছে।

সহসা দূরে সেই বহু-আকাজ্জিত বাঁশীবাদকের বাঁশীতে পরিচিত স্বরটি বাজিয়া উঠিল, অতি কল্পণ উদাস।

সমগ্র বিশ্বের বিরহী আত্মান যুগযুগান্তরের বিরহবেদনা বুঝি আজিকার নীরব রাত্রির নিবিড় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাহাসিত তটিনীর তরঙ্গায়িত বক্ষের উপর দিয়া বিস্তীর্ণ বালুচনের উদাস প্রশান্তি পায় হইয়া, দিগন্তেব শ্রাম বনানীর গভীরতা অভিক্রম করিয়া, স্বদূর নক্ষত্রালোকে যেন কে অভিধারে চলিয়াছে।

শুনিয়া শুনিয়াও আর তৃপ্তি হয় না। চোখের জলের স্রাব কল্পণ, কিন্তু তেমনই স্বন্দর। প্রত্যেকেরই মনে হয়, এত দিনেব জীবনের নানা কর্ম এবং ব্যস্ততার ভিতরে কি যেন সে চাহিয়া আসিয়াছে, এবং কি যেন পায় নাই। সকল আনন্দ-কোলাহলেব ভিতাব তাহারই অজ্ঞাতে যে অকৃতার্থ কামনার বেদনা অব্যক্ত বহিয়াছিল, আজ এই নিভৃত নিশীথে বাঁশীর স্বব সেই বেদনারই প্রকাশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

পাহাড়ী মেয়েটির অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। জানালায় গরাদে মাথাটি রাখিয়া সে নদীর পানে চাহিয়া রহিয়াছে। বড় ভাল লাগিতেছে তাহার—বড় স্বন্দর স্বর। ভাইটিব কথা পুনঃপুনঃ মনে পড়িয়া যাইতেছে, চিমনির আলোতে বসিয়া সে বাজাইতেছে। প্রবাসী বোনটির কথা কি মনে পড়ে না তাহার? বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে প্রশংসাবাক্য শুনিবার আশায় ভুল করিয়া একবারও কি সে গিছন পানে চাহিয়া ফেলে না?

জোরিনের কবিতা স্মরণে আনিবার ব্যর্থ প্রয়াস থামিয়া গিয়াছে। নাঃ! পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া বাঁশী শিখিলেই ভাল করিত সে। লজিকের নিলজিসম অপেক্ষা অনেক সহজ হইত নিশ্চয়ই।

মুষ্কার বোনা সমাপ্ত করিয়া শান্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বারের পর্দাটা ভাল করিয়া সরাইয়া দিয়াছে, দূরে বাঁশী-

বাদকের অস্পষ্ট বসিবার ভঙ্গীটি চোখে পড়ে—জলের একান্ত নিকটে বসিয়া কে ঐ বাজুর মুক রাজির মুখে বানী ফুটাইল? শয্যা শুইয়া বাঁশী শুনিতে শুনিতে আজ ঘুমাইয়া পড়িলে। প্রতিটি রাজি যে দেবতাব আশীর্বাদের হ্রস্ব নামিয়া আসিতেছে, সে ত তোমারই জন্ত।

আজিকার রাজিতে কাহারও চোখেই বুঝি ঘুম নাই, কেবল আপন কক্ষে চিত্রা অঘোরে ঘুমাইতেছে। যে তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল ললাটে একটি হাত বাম্বিয়া মুদ্রকণ্ঠে সে ডাকিল—“চিত্রা-দি।”

চকিতে চিত্রা উঠিয়া বসিল, কেশপ্রসাধন হয় নাই আজ। এলোথোপা খুলিয়া দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশরাশি পিঠ ঢাকিয়া শুভ্র শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। জানাতার ভিতর দিয়া মেঘমুক্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক একটি বৃক্ষপত্রের ফাঁকে ফাঁকে খণ্ড খণ্ড হইয়া আসিয়া পড়িল তাহার ললাটের কুঞ্চিত অলকগুচ্ছে, দীর্ঘ ঘন আঁখিপল্লবে, নিদ্রাস হাট চোখের তারায়।

চিত্রা প্রশ্ন করিল, “এত রাতে হঠাৎ কি মনে করে?” কিন্তু তাহার মুখের ভাবে মনে হইল না যে সে বিশেষ চমকিত হইয়াছে।

অনেক অন্তঃস্বপ্ন-বিনয় কবিয়া মেঘটি তাহার আসিবার কারণ জানাইল। ঈষৎ হাসিয়া চিত্রা কহিল, “তবু ভাল, আমি ভাবছিলাম বুঝি ডাকাডাকাভাই পড়ল তোমাদের ঘরে।”

মেয়েটিও মুদ্র হাসিল, এবং বুকেরিয়া পড়িয়া চিত্রার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখখানা লইয়া কহিল, “আহা! কি আশ্চর্য্য হিতার্থিনী গো! ডাকাত যদিই বা আসে, তবে তোমারই প্রথম ডাকাতি করে নিয়ে যাবে, তা জান?”

কপট ভয়েব ভঙ্গী করিয়া চিত্রা কহিল, “তাই নাকি? ভাগ্যিস আসে নি”—বলিয়া সে এলোচুলগুলি হাতে জড়াইয়া মোটা চাদরটা বেশ করিয়া টানিয়া লইয়া শুইবার উপক্রম করিতেই মেয়েটি কহিল, “ও কি! চিত্রাদি, শুদ্ধ যে বড়? লক্ষ্মীটি চল না ভাই, কত দিন থেকে ভাঙছি দেখব, একবার দেখে একটু সন্দেহ মেটানো বইত কিছু নয়।”

চিত্রা উঠিয়া বসিল, এবং গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,

“কিন্তু এর পরিণাম কি হবে জান? মেয়েদের হোষ্টেলের কাছে এসে যে বাঁশী বাজায়, সে আর বাই হোক ভাল লোক নয়। একটা খেয়ালের বশে তোমাব বারাগুয় গিষে দাঁড়াবে, যাবার পথে উপর দিকে চাইলেই ও তোমাদের দেখতে পাবে, হয়ত একটা কিছু মধুর সম্ভাষণ করে বসবে। নীচে থেকে মেমসাহেব দৌড়ে আসবেন। তার পর? বাণী দুপুবে বিছানা ছেড়ে এসে ঝাঁড়িয়েছ তোমরা, আর তোমাদের ঠিক নীচে পথের উপর দাঁড়িয়ে..., বুড়ো মেম যে এই বিংশ শতাব্দীর জুলিয়েটদেব কি রকম সম্বন্ধনা করবেন, তা ত বলে দিতে :”

বাধা দিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে মেয়েটি কহিল, “না চিত্রাদি, তোমার যাবার মতলব নেই বলেই তুমি যত মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছ। কিন্তু আমি তোমায় ঠিক বললাম, রাতেব অন্ধকারে স্তম্ভপূর্ণে আপনাকে লুকিয়ে যে এমন করে বাঁশী বাজাবে—খারাপ লোক সে নয়, অসাধারণ শিশুচেই তার ভিতর কিছু আছে। এত আশ্চর্য্য ক্ষমতা ওর, অথচ কাউকে জানতে দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। তাই দেখতে ইচ্ছে করে, ভগবান ওকে কেমন করে গড়েছেন।”

চিত্রা স্নান হাসি হাসিল। কহিল, “মনে ত কতই হতে পাবে। কিন্তু জগৎটা ত স্বপ্ন দিয়ে তৈরি নয় স্নেহা ; এর বাস্তবের স্বর এমন কঠিন, এমন তীব্র, যে এক মুহূর্তে সকল রহস্যের জাল ছিঁড়ে যায়। এই ধর, আমারও ত মনে হতে পারে সাধারণ মানুষ সে নয়, গম্ভীর রাজির নীরবতারই যেন সে প্রাণ! শুধু বিরাট আকাশের মত প্রশান্ত তার রূপ, যে ক্ষীণ চন্দ্রালোক নদীর বুকে পড়ে জ্বলছে—এ যেন তারই অঙ্গ। দিনের কোলাহলে যে-কথা শোনা যায় না, প্রকৃতির সেই কথাটাই তার বাঁশীর স্বর। কিন্তু এসব ত কিছুই সত্যি নয়। রাজির এ অন্ধকারের যবনিকা তুলে ধর, দেখবে কোন মাধুর্য্য নেই; চোখ দুটো তার জ্বলছে নিষ্ঠুর জয়ের উল্লাসে; মুখে তার তীক্ষ্ণ অবহেলার হাসি; সর্ব্বদে তার উদ্ভত অহঙ্কার। হাজার হাজার মানুষ তাকে পাবার জন্যে কাঁদছে, কিন্তু পাষাণেব মত অবিচলিত সে—জয়ের গৌরবে হাসছে।” চিত্রা থামিল, ক্ষীণালোকে স্নেহের মুখে বিশ্বয়ের আভাস পাইয়া সে নিজের উজ্জ্বলনাম অত্যন্ত লজ্জিত হইল।

এ কি করিতেছিল সে। মুহূর্ত্তেব উত্তেজনায় এত কথা কহিয়া ফেলিল সে কি করিয়া? জীবনের যে-অংশটা যত্নেব ত্রায় গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া বহিয়াছে, আজ এত কাল পরে তাহারই উপর আলোকপাত করিতে গেল সে কোন্ বুদ্ধিতে?

পরিহাসের বাতাসে স্নেহের অন্তর হইতে সন্দেহের মেঘকে উড়াইয়া দিবাব উদ্দেশ্যে হাসিয়া চিত্রা কহিল, “বাজে বঁকে অনেক দেরি কবিয়ে দিলুম। ওদিকে যে ‘রাজার ছলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে’।”

স্নেহা কিস্তি হাসিল না। “চিত্রার কম্পিত কণ্ঠস্বর যে কল্পিত চিত্রখানি তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল তাহা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না, তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। একটা কথাও না কহিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নদীব জলেব একান্ত নিকটে বংশীবাদকের হাতে বঁশী বাজিয়া চলিয়াছে। শুক্লাচতুর্দশীব চাঁদের আলো নদীব বুকে পড়িয়া ধরধর কবিতা কাঁপিতেছে। যত দূর দৃষ্টি যায় নীরব প্রকৃতি মুচ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া বহিয়াছে—কাহার অভিসার ব্যর্থ হইল আজ?

সন্ধ্যার অন্ধকারের ন্যায় ধীরে ধীরে ঘুম নামিয়া আসিয়াছে সকলের চোখের পাতায়, বাহিরে জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ ঘুম।

ভাইটির কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন চোখের পাতা নামিয়া আসিয়াছে, পাহাড়ী মেয়েটি নিজেই সে-কথা জানে না।

টমাসের পত্রখানা মনে মনে আর শেষ করিতে পারে নাই ফ্লোরিন।

শাস্ত্রার অধর-কোণে একটা তৃপ্তির হাসি, মাফলার-বোনো শেষ হইয়া গিয়াছে।

অপর কক্ষে পাঁচ-ছয় জন মেয়ে খাটের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি করিয়া চেয়ার জোড়া দিয়া শয্যা বাড়াইয়া পরস্পরের অতি নিকটে সরিয়া আসিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। নীচেব ঘড়িতে যে বাবটা বাজিয়া গিয়াছে অনেক ক্ষণ, আর কিছু পরেই তাহাদের অতি নিকটের রাজপথ দিয়া সেই বংশীবাদক চলিয়া যাইবে, পথেব আলোটা

পড়িবে তাহার অঙ্গে, বারাগায় একবার আসিলেই সকল সন্দেহ এবং কৌতূহলেব অবসান হইতে পারে—সে-কথা ভাবিবার আর সময় নাই। সমস্ত হোটেলটা বৃষ্টি স্থগির পথ বাহিয়া স্বপ্নপুরীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

কেবল অন্ধকারেব বুক চিরিয়া মুহূর্ত্ত জ্যোৎস্নালোকে মুগ্ধিমতী স্বপ্নের ত্রায় একটি তরী দেহ নিদ্রাহীন চোখে বাজপথের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

এত দিন পরে কেন তুমি আসিলে অনাহৃত পথিক? চিত্রা তোমাকে চাহে নাই, কোন দুঃখ নাই তাহার, কোন হারানোর বেদনা তাহার শাস্তিপূর্ণ জীবনেব কোন মুহূর্ত্তকে বিধাক্ত করিয়া দেয় নাই। তবে কেন এ অবাচিত আগমন?

চিত্রা ভোলে নাই। অনাহারক্লিষ্টা, দুঃখজ্বলিতা মুমূর্ষু মাতার মুখখানি চিত্রা এখনও দেখিতে পাইতেছে, অপমানিত, হতসর্কস্ব পিতার কঠিন গর্কিত দৃষ্টি এখনও চিত্রার মুখের পানে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সে-অপমান তুলিবার নয়। পিতার নিকট সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সম্পূর্ণ নির্দোষ পুত্রবধূকে যে ত্যাগ করিতে পারে, বিবাহের পণস্বরূপ তাহার দরিদ্র পিতাব সমস্ত বৃকের রক্ত শুষিয়া লইয়াও যাহার আকাজ্জক পবিত্রত্ব হয় না—তাহার পুত্রকে সে ক্ষমা করিতে পারিবে না। দুঃখ? কিসের দুঃখ তাহার? কাপুরুষের ত্রায় নিজেব জীকে পিতাব হস্তে অপমানিত হইতে দেখিয়াও যে নির্বাক হইয়া থাকিতে পারে, চিত্রা তাহাকে ক্ষমা করিবে না। চিত্রার চোখের জলেও এক দিন তাহার পাষণ্ড-হৃদয় বিচলিত হয় নাই—কাহাকে সে ক্ষমা করিবে? কোন দুঃখ নাই তাহার জীবনে। গর্ক করিয়া সেদিন তুমি চাও নাই চিত্রার পানে—আজ চিত্রার গর্ক করিবার দিন। জীর্ণ বস্ত্রেব ত্রায় সমস্ত অতীতকে সে শাস্ত তৃপ্ত মনে বিদায় দিয়াছে। তবে এই স্বদীর্ঘ দিবস পরে কেন এ ব্যর্থ আহ্বান?

আজ মনে পড়ে, কত দিন পূর্বে, কত বিনীত রজনী কাটিয়া গিয়াছে চিত্রার—এ বঁশী শুনিয়া। এক জন বঁশী শুনাইয়া তৃপ্ত, আর এক জন শুনিয়া ক্লান্ত। সে-

হুয়ে তখন ছিল অপূর্ব উন্নাদনা, প্রথম প্রিয়স্পর্শের ত্রায়
অনন্তভূতপূর্ব পুলক।

কে ভাবিযাছিল তখন যে সকলই স্বপ্ন? বাস্তবের
আঘাতে একদিন চিত্রার চোখে স্বপ্ন মিলাইয়া গেল।

বাঁশী থামিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ চক্ষালোকে যাহার
বসিবার ভকীট কেবল অস্পষ্ট চোখে পড়িতেছিল, এখন
রাজপথের আলোকে তাহাকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। চিত্রা
চমকাইয়া উঠিল। এত ক্লেশ ত সে ছিল না? মাথাব দীর্ঘ
চুলগুলো এলোমেলো ভাবে বাতাসে উড়িতেছে, দীর্ঘ নাকটাই
কেবল চোখে পড়ে সমস্ত মুখে। তবে যে চিত্রা শুনিয়াছিল
এখনও সে...কিন্তু কেন? ইচ্ছা করিলেই ত স্থবী হইতে
পারিতে। কবে কোন্ অবহেলিতা চিত্রা দুইটা চোখে
কক্ষ মিনতি ভরিয়া তোমার পানে চাহিয়াছে—সে প্রশ্ন ত
সমাজ কোনদিনই করিবে না। বাড়ালীর গৃহে অমের
অভাব হইতে পাবে, হইতে পাবে বস্ত্রের, কিন্তু দুর্ভাগা
অরক্ষণীয় কল্পাব অভাব হয় না। তবে আবার সাধ করিয়া
এ-বেশ কেন?

বেশ আছে চিত্রা। মন দিয়া পড়াশুনা করে; হাসিয়া
গান গাহিয়া, অপূর্ব দিনগুলি তাহার কাটিতেছে—বন্ধন-
বিহীন মুক্ত জীবন।

কিন্তু বড় দুর্বল দেখাইতেছে তাহাকে। হয়ত কোন
অস্থখ করিয়াছিল! এমন গৃহহীন, ভাগ্যহীনের ত্রায়
দেখাইল কেন তাহাকে?

কিন্তু এ কি করিতেছে চিত্রা। সমস্ত সম্বন্ধ যাহার সহিত
ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—তাহারই কথা ভাবিয়া মরিতেছে সে,
এত রাজে; স্থখনিজ্রা ত্যাগ করিয়া! কি বুদ্ধিহীন
সে। চিত্রার হাসি পাইতেছে। হ্যা, হাসিবারই কথা
বটে।

কিন্তু তবু কেন চিত্রা হাসিতে পাবে না? সমস্ত
জীবনটার উপর একটা তীব্র বিদ্রূপ হানিয়া কেন সে একবার
প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পাবে না?

বংশীবাদক চলিয়া গিয়াছে। সমস্তের রাজপথের সীমান্তে
কখন তাহাব ছায়া বিলীন হইয়া গিয়াছে—চিত্রা তাহা
জানিতেও পারে নাই।

কিছু ক্ষণ পূর্বে একটি ঈমার চলিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট
টেউগুলি তটভূমিতে আঘাত করিয়া ভাঙিয়া লুটাইয়া
পড়িতেছে। এক খণ্ড শুভ্র মেঘ বীরে বীরে একবাব
চাঁদটাকে লুকাইয়া ফেলিতেছে—পুনরায় আপনাকে বিভক্ত
করিয়া তাহার বাহির হইবার পথ করিয়া দিতেছে।

সেই দিকে চাহিয়া চিত্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—
কি ভাবিতেছে তা সেই জানে।

কৃষ্ণ-গোলাপ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

কালো রং, ক্ষীণদেহ, রূপহীনা বলিতেও পার,
অন্তর্গূঢ় বেদনার স্নানছায়া কোমল অধরে,
নয়নে সীতাংশু দীপ্তি, যৌবনের হিমা মুগ্ধ করে
কুৎসিতা শ্রীহীনা ব'লে হয়ত বা চোখে লাগে কাবো!
প্রেমের মাধুর্য্য কপ মর্মে জেগে তবু আছে তাবো
সে রূপের আত্মহত্যা প্রতিদিন চলে মর্ত্যপরে
রূপস্রষ্টা দিয়েছে কি যত ব্যঙ্গ শুধু তার তরে?
জীবনের ভালবাসা জানে মুগ্ধ হৃদয় তাহারও।

জানে সবি জানে, শুধু সৃষ্টিরাতে অবশ-তুলিকা
শ্রমক্লান্ত মহাশিল্পী পারে নাই বর্ণবিলেপনে
তাই সে হয় নি দৃষ্ট গরবিগী রক্ত শিমূলিকা
কৃষ্ণ-গোলাপের মত ফুটিয়াছে স্রষ্টার কাননে
গন্ধ আছে বর্ণ নাই সেই ক্ষুদ্র কলঙ্কের টাকা
গৌরবের দীপ্তি স্নান করিয়াছে বিষম আননে।



করম-নৃত্য

রাঁচির কথা

শ্রীনিবদকুমার রায়

প্রবাসী বঙ্গদাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে অনেকে রাঁচিতে সমাগত হইবেন। তাঁহাদের জ্ঞাতার্থে রাঁচির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া খেল।

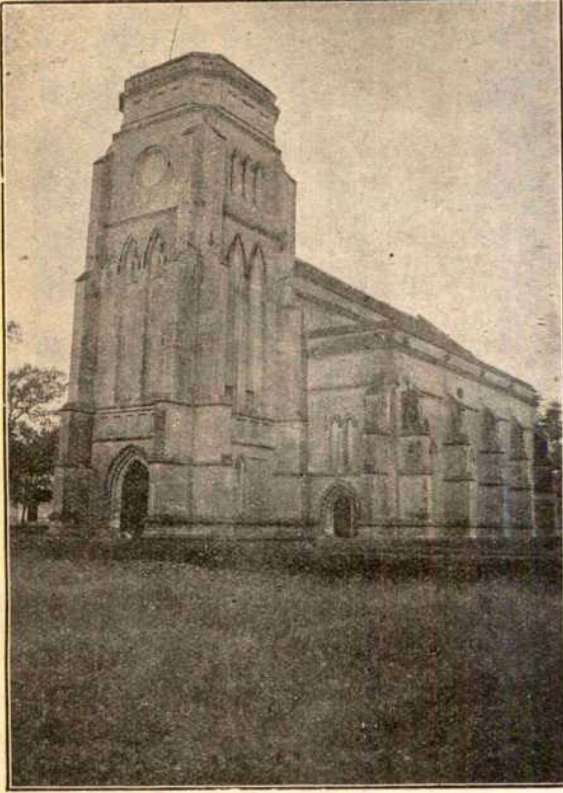
ছোটনাগপুরের পার্বত্য মালভূমির উপর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২২০০ ফুট উচ্চে রাঁচি শহর অবস্থিত।

অধুনা বহু স্বাস্থ্যার্থে ও প্রমোদ-ভ্রমণে নরনারী এবং অনেক বিশিষ্ট কৃতী ব্যক্তি প্রতি বৎসর রাঁচি আসিয়া অল্পবিস্তর কিছুদিন বাস করিয়া যান। পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ বসু ও রাখালদাস হালদার—ইহারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। স্বনামধন্য স্বর্গীয় সবু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার জামাতা ব্যারিষ্টার ঘোষণাচন্দ্র চৌধুরী, স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র, সর আলী ইমাম, পাইকপাড়ার রাজা প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং বাংলার অনেক জমিদার ও অবসর-প্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারিগণ (রায় বাহাদুর ভূপালচন্দ্র বসু এবং শ্রীব্রজ সুরকুমার হালদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য)

এখানে নিজ নিজ শৈলাবাস নির্মাণ করিয়াছেন। বিহার গভর্ণরের গ্রীষ্মাবাসও এইখানে। বিহার সেক্রেটারিয়েটের ক্যাম্প আপিস এখানে বৎসরে প্রায় সাত মাস থাকে, এবং বিহার একাউন্টেন্ট-জেনারেলের বিশাল আপিস ও কয়েকটি ছোট ছোট প্রাদেশিক আপিস এইখানে অবস্থিত। এই সকল কারণে রাঁচি শহরের গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে।

১৮৩৭-৩৫ খ্রিষ্টাব্দে রাঁচি নগরের সূত্রপাত হয়—যখন ইংরেজদের অধীনে এই অঞ্চলটি দক্ষিণ-পশ্চিম এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন কিষণপুর গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ও কার্যালয় (এখন যেখানে সদর থানা) নির্দিষ্ট করেন। ঐ নামের অত্যাচ্ছ স্থানের সহিত ভ্রমের সম্ভাবনা থাকাতে কয়েক বৎসর পরে পাহাড়ীতলার নিকটস্থ একটি গ্রামের নামে এই কর্মস্থানের রাঁচি নাম দেওয়া হয়। এই গ্রামটিকে এখনও পুরাণী রাঁচি বলা হয়।

রাঁচি লেক বা বড়কা তলাও প্রায় ১৬৫ বিঘা জমি জুড়িয়া আছে। লেকটেন্যান্ট আউসলী ইহা খনন করেন।



জর্মান:মিশনের গীর্জা। উপরের দিকে সিপাহী-যুদ্ধের সময়ের একটি গোলার চিহ্ন দেখা যাইতেছে

রাঁচি পাহাড়টি সুন্দর মন্দিরাকৃতি, প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ। লেক্টেন্যান্ট আউসলী ইহার শীর্ষে একটি ক্ষুদ্র হাওয়াখানা নির্মাণ করেন এবং ইহার উপরে ক্রুশ সংলগ্ন করিয়া দেন। এই ক্রুশ থাকা সত্ত্বেও এখন এই ঘরটি এই দেশীয় লোকদের ‘দেও-অস্থান’ রূপে বলি ও পূজার মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। রাঁচি লেকের পূর্ব পার্শ্ব হইতে দেখিলে লেক ও তাহার অপর পার্শ্বে রাঁচি পাহাড়ের দৃশ্য অতি চমৎকার দেখায়।

চুটিয়ার মন্দির এখানকার অত্যন্ত প্রাচীন অট্টালিকা। ছোটনাগপুরের রাজা রঘুনাথের বাঙালী গুরু ব্রহ্মচারী হরিনাথ ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্মাণ করান। জগন্নাথপুরে জগন্নাথদেবের মন্দিরও ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই অর্থে নিৰ্মিত হয়; ইহা শহর হইতে ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি শৈলের উপর অবস্থিত।

রাঁচিতে তিনটি বড় বড় খ্রীষ্টিয়ান মিশনের বাস।

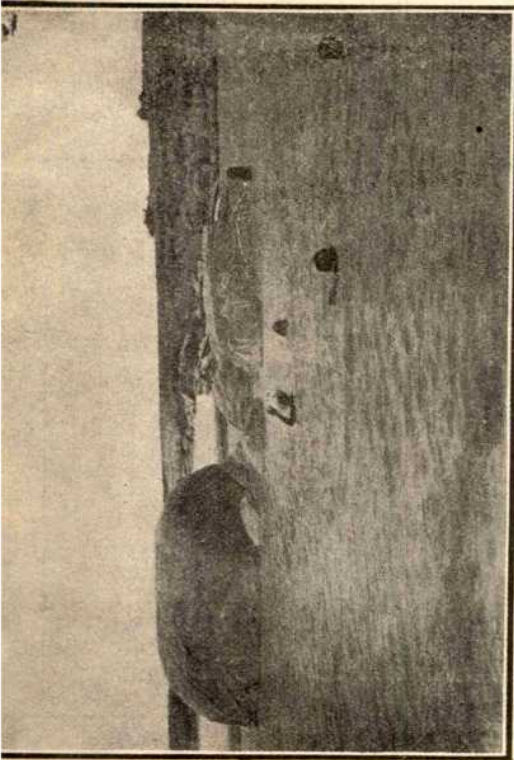
ইহাদের মধ্যে লুথারীয় (জর্মান) মিশন প্রথমে (১৮৪৫ খ্রীঃ) রাঁচি আসিয়া নিজেদের চেষ্টায় গীর্জাটি নির্মাণ করেন। ইহার গায়ে সিপাহী-বিদ্রোহের লড়াইয়ের চিহ্ন এখনও আছে। খ্রীষ্টিকান ও রোমান ক্যাথলিক মিশন দুইটি পরে আসে। এই তিন মিশনের চেষ্টার ফলে ছোটনাগপুরের মধ্যে এ-পর্যন্ত প্রায় চার লক্ষ ওরাত্ত মুণ্ডা ও খাড়িয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে। প্রত্যেক মিশনের স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস ও অগ্ন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে।

রাঁচি শহর হইতে চারি মাইল উত্তরে কাঁকে নামক স্থানে অবস্থিত বিশাল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসালয় এবং সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠান, তিন-চারি মাইল দক্ষিণ-পূর্বে নামকুমের পশুবীজ-সংরক্ষণাগার ও লাফা-বিষয়ক গবেষণা-মন্দির দর্শনযোগ্য। শহর হইতে ১৭ মাইল পশ্চিমে ইট্‌কী গ্রামের নিকট বস্তুারোগীদের একটি স্বাস্থ্যনিবাস আছে।

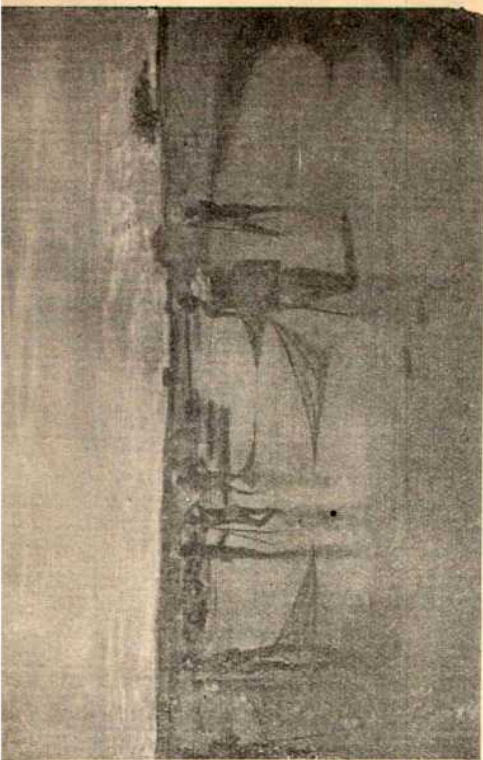
রাঁচি ব্রহ্মচার্য বিদ্যালয় শহরের এক প্রান্তে রেলস্টেশনের নিকট অবস্থিত। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-



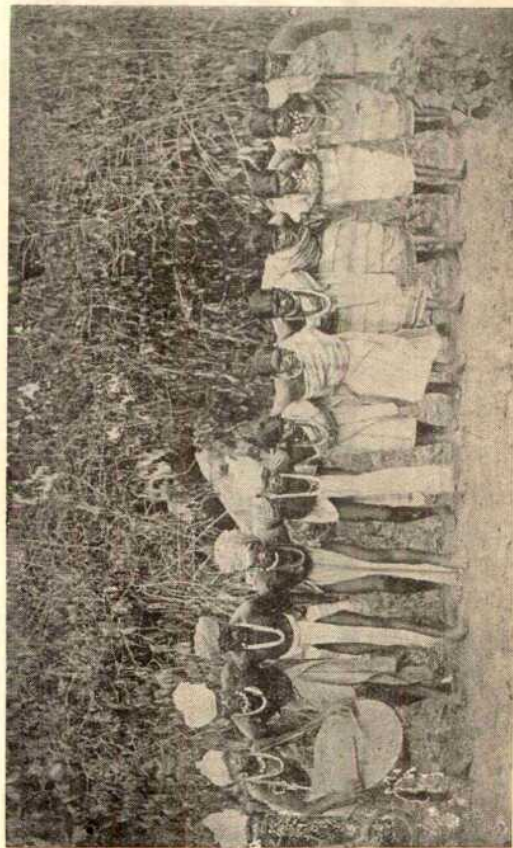
বিবাহের পূর্বে দ্বী-আচারের একটি দৃশ্য



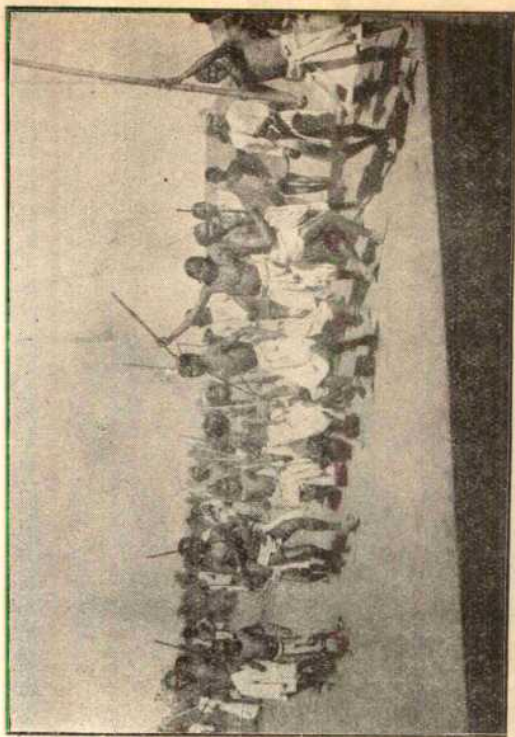
একটি পার্বত্য নদী



মাছ ধরিতেছে



গুয়াওদিগের নৃত্যের একটি দৃশ্য



গুয়াওদিগের সময়-নৃত্য



স্বর্ণা হইতে জল সংগ্রহ করিতেছে

প্রতিষ্ঠান। ইহা বাঙালীর গৌরব, দানবীর, শিক্ষাভি-
ভাবক স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের
পুণ্য কীর্তি, এবং কয়েক জন আশ্রমশিক্ষা-প্রবর্তনপ্রয়াসী
ত্যাগী মনস্বীর দৃঢ়সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ের ফল। ধর্ম্মে কশ্মে,
বিজ্ঞায় বুদ্ধিতে, আচার-ব্যবহারে ছেলেরা যাহাতে দৃঢ়চরিত্র
মাছুষ হইয়া উঠে—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই
বিদ্যালয়ের বাটী ও তৎসংলগ্ন স্ববৃহৎ উদ্যান মহারাজারই
দান। মহারাজার দেহান্তের পর হইতে উপযুক্ত আয়ুক্ষুল্যের
অভাবে ইহার পূর্ব্বের সমৃদ্ধ ও সতেজ অবস্থা এখন আর
নাই। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

মোব্বাবাদী পাহাড়ের গায়ে স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
ঠাকুরের আবাসগৃহ এবং পাহাড়ের শীর্ষদেশে তাঁহার
নির্ম্মিত উপাসনা-মন্দির লোকান্তরিত গৃহস্বামীর সূদাশ্রয়তা,
ঔদার্য্য, সদালাপিত্ব, উচ্চনীচনির্কির্ষেবে সৌজন্ম এবং সঙ্গীত

ও চিত্রশিল্পাদিরাগের স্মৃতিমন্দিরস্বরূপ বাঙালীর তীর্থস্থানে
পরিণত হইয়াছে।

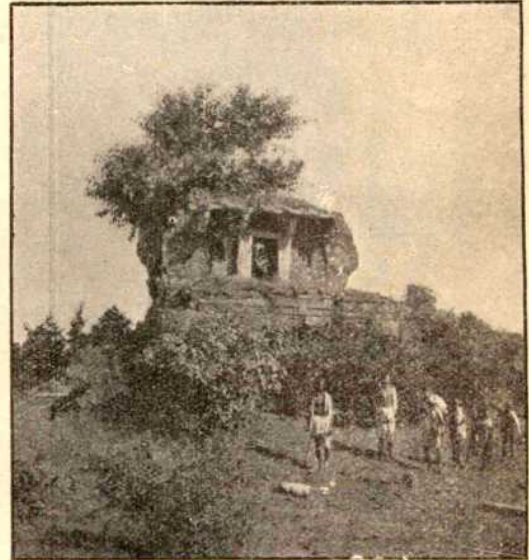
রেল বা মোটর যানে এখন যে-কোন দিক হইতে রাঁচি
গমনাগমন সহজসাধ্য হইয়াছে।

রাঁচি শহরের মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বস্তু বা দৃশ্য অধিক
না থাকিলেও এই জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আগন্তকের
মনোমুগ্ধকর।

চুঁপালু ঘাট রাঁচি হইতে হাজারিবাগের রাস্তায়
২০ মাইল দূরে পর্ব্বতের গায়ে আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিয়াছে।
সর্ব্বোচ্চ স্থানটি হইতে নিম্নে হাজারিবাগের উপত্যকা ছবির
মত দেখায় ও দূরে পরশনাথ পর্ব্বতের গন্তীর দৃশ্য দেখা যায়।
এখান হইতে রাস্তাটি তিন মাইলের মধ্যে ৭০০ ফুট নামিয়া
গিয়াছে।

রাঁচি-চক্রধরপুর রাস্তাটিও সিংহভূম জেলার মধ্যে
বান্দগাঁও হইতে টেবোর অপর পার পর্য্যন্ত চমৎকার দৃশ্যের
মধ্য দিয়া সপিল গতিতে নামিয়া গিয়াছে।

সিম্ভেগা রাঁচি জেলার পশ্চিম প্রান্তে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে
১৬০০ ফুট উচ্চ একটি বিস্তৃত মালভূমির উপরে সুরমা দৃশ্যের
মধ্যে অবস্থিত। রাঁচি হইতে গুম্‌লা, পালকোট ও
কোলেবীরা হইয়া সিম্ভেগা যাওয়া যায়। গুম্‌লা হইতে



একটি প্রাচীন মন্দির

পালকোটের দৃশ্য বেশ চিত্তাকর্ষক এবং পালকোট হইতে কোলেবীরা যাইতে নতুন পার্বত্য পথটি নিরতিশয় মনোমুগ্ধকর বরণাবহুল জঙ্গলের দৃশ্যের মধ্য দিয়া বিসর্পিত হইয়া গিয়াছে।

ছনডু ঘাঘ্, স্ববর্ণরেখা নদীর বিখ্যাত জলপ্রপাত—রাঁচি হইতে প্রায় ২৮ মাইল উত্তর-পূর্বে, রাঁচি ও হাজারিবাগের সীমানায়। পুন্ডলিয়া রাস্তা দিয়া গিয়া আনগড়া হইতে কাঁচা রাস্তায় ১২ মাইলের পর একটি নদী পার হইয়া মাইল-খানেক ইটিয়া যাইতে হয়। ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত ইহার সৌন্দর্য অতুলনীয় ছিল। কর্ণেল ডান্টন ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। অধুনা প্রপাতের উপর কয়েকটি বড় বড় পাথরের চাই পড়িয়া যাওয়াতে প্রপাতটি অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে। ইহা ৩২০ ফুট উচ্চ পাহাড় হইতে ভীষণ গর্জনে নীচে পতিত হইয়া সমতল উপত্যকার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রপাতের উপর হইতে নীচে স্ববর্ণরেখার বন্ধিম গতি বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

গোতমধারা (জোনহা-প্রপাত) রাঁচি হইতে ২৪ মাইল পূর্বে—পুন্ডলিয়া-রাস্তা ছাড়িয়া জোনহা স্টেশন পার হইয়া যাইতে হয়। এই প্রপাতটি ১২০ ফুট উচ্চ। নদীটি নীচে পড়িয়া দুইটি পাহাড়ের মধ্যস্থ খাতের গভীর মনোহর দৃশ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

ডুমারগটী প্রপাত—উপরিউক্ত নদীটি আরও পাঁচ মাইল গিয়া পাহাড়ের উপর হইতে ১৫০ ফুট নীচে পাথরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটু মোড় ফিরিয়া আরও ৫০ ফুট নীচে গভীর জঙ্গলময় প্রদেশে পড়িতেছে। এই প্রপাতের কাছাকাছি ৪০০ ফুট খুব খাড়া উৎরাই অতিক্রম করিতে হয়।

দাস্‌সম্ ঘাঘ্—কাঁচি নদীর প্রপাত—রাঁচি হইতে ২৬ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে বুগুর রাস্তা দিয়া ১৮ মাইলের পর কাঁচা রাস্তায় ৬ মাইল গিয়া কাজুরী গ্রাম বা কুজ্‌রামে যাইতে হয়। সেখান হইতে ইটিয়া কাঁচি নদী পার হইয়া দুই মাইল গেলে প্রপাতের পার্শ্বে উপস্থিত হওয়া যায়। পাহাড়ের নীচে নামিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইলে, পর্বত অরণ্য ও নদীর সমবায়ে এক মহান দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এইরূপ দৃশ্যের মধ্যে নদীটি দুইবার পাহাড় হইতে পড়িতেছে।

প্রথম প্রপাতটি ১০০ ফুট নীচে পড়িতেছে এবং উচ্ছ্বসিত জলরাশি দ্বিতীয় বার পাহাড়ের গা বাহিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে ৫০৬০ ফুট নীচে। দাস্‌সম্ অর্থে ষোড়া। নদীর প্রথম প্রপাত হইতে দ্বিতীয় প্রপাত পর্যন্ত শৈলপৃষ্ঠের সহিত অশ্বপৃষ্ঠের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াই বোধ হয় প্রত্যেকটির এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

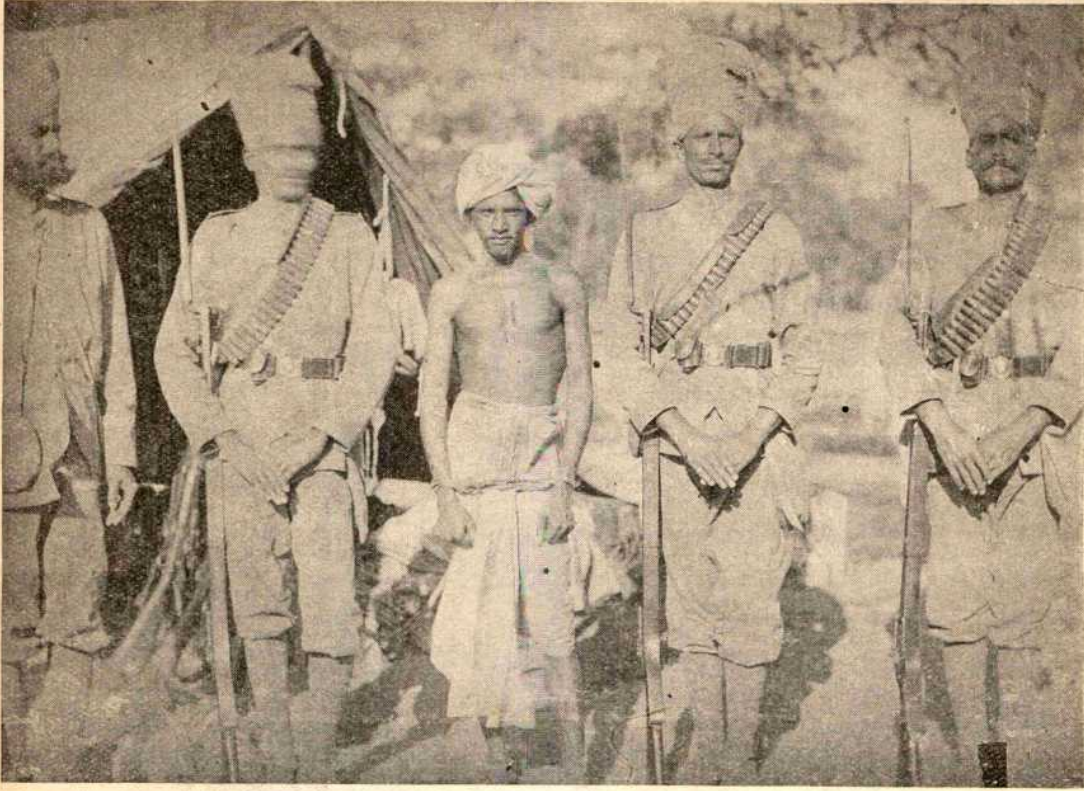


একটি ওরাওঁ রমণী

সদনী ঘাঘ্, রাঁচি জেলার পশ্চিম প্রান্তে শঙ্খ নদী রাজাডেরার পার্বত্য মালভূমি হইতে বরওয়ার সমতল ভূমিতে পতিত হইতেছে। এই প্রপাতের দৃশ্যও অতি সুন্দর।

ইহা ছাড়া কারো নদীর সিংহভূমে প্রবেশমুখে পেরুয়া ঘাঘ্ এবং কোলেবীরা অঞ্চলের পেরুয়া ঘাঘ্ও দর্শনযোগ্য। এই প্রপাতগুলির আশেপাশে বহু পারাবতের বাস থাকাতে ইহারা ঐ নাম পাইয়াছে (পেরুয়া=পায়রা; ঘাঘ্=প্রপাত)।

রাজরোপার প্রপাতসদৃশ ও ছিন্নমস্তার মন্দির রাঁচি জেলার সীমানার নিকটে হাজারিবাগ জেলার মধ্যে। রাঁচি হইতে রামগড়, এবং রামগড় হইতে পূর্বমুখে গোলা হইয়া



বীরশাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে

যাইতে হয়। রাঁচি হইতে ৫২ মাইল রাস্তা। নির্জন অরণ্য-বৃত্ত পৰ্ব্বতময় প্রদেশে ছিন্নমস্তা দেবীর এক পুরাতন মন্দিরের পদধৌত করিয়া ভেড়া নদী ৩০ ফুট নীচে দামোদর নদের গিরিখাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। দামোদর এখানে নিজ স্রোতাবেগে পৰ্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া এক সংকীর্ণ গভীর খাতের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। গিরি ও বনানীর মহান গম্ভীর মূর্তির বক্ষে দামোদর নদ ও ভেড়া নদীর এই যে উদ্ধাম মিলনাবেগে, ইহা এক অপূৰ্ব নৈসর্গিক শোভাবিভাস; দর্শকের মনে ইহা এক অভূতপূৰ্ব আনন্দাবেগের সঞ্চারণ করে।

রাঁচির আদিম অধিবাসীদের অত্যন্ত প্রাচীন নিদর্শন এই জেলার তামাড় অঞ্চলে সোঁপাহাতু থানার এলাকায় অবস্থিত চোকাহাতু গ্রামে মুণ্ডাদের বিশাল সমাধিক্ষেত্র। ইহা ২৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া আছে, এবং ইহাতে ৭০০০ সমাধিপ্রস্তর আছে।

পুরাতন ঐতিহাসিক নিদর্শনের মধ্যে রাঁচি জেলার

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দোইসানগরের (অধুনা 'নগর' নামে পরিচিত) নগরতন-রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষই প্রধান। ইহা গ্রেনাইট প্রস্তরে নিৰ্ম্মিত পঞ্চতল-গৃহ ছিল; ইহার প্রত্যেক তলে নয়টি করিয়া কক্ষ ছিল। মন্দির-পরিবেষ্টিত, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত এই রাজপুরীটিই ছোটনাগপুরের নাগ-বংশীয় রাজাদের অতীত গৌরব ও স্থাপত্য-কৌশলের একমাত্র নিদর্শন। চুটিয়ার মন্দির এবং জগন্নাথপুরের শৈলমন্দিরের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

রাঁচির আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ওরাওঁ এবং মুণ্ডা। ইহা ভিন্ন কতকগুলি অনাৰ্য্য এবং মিশ্রিত জাতিও আছে।

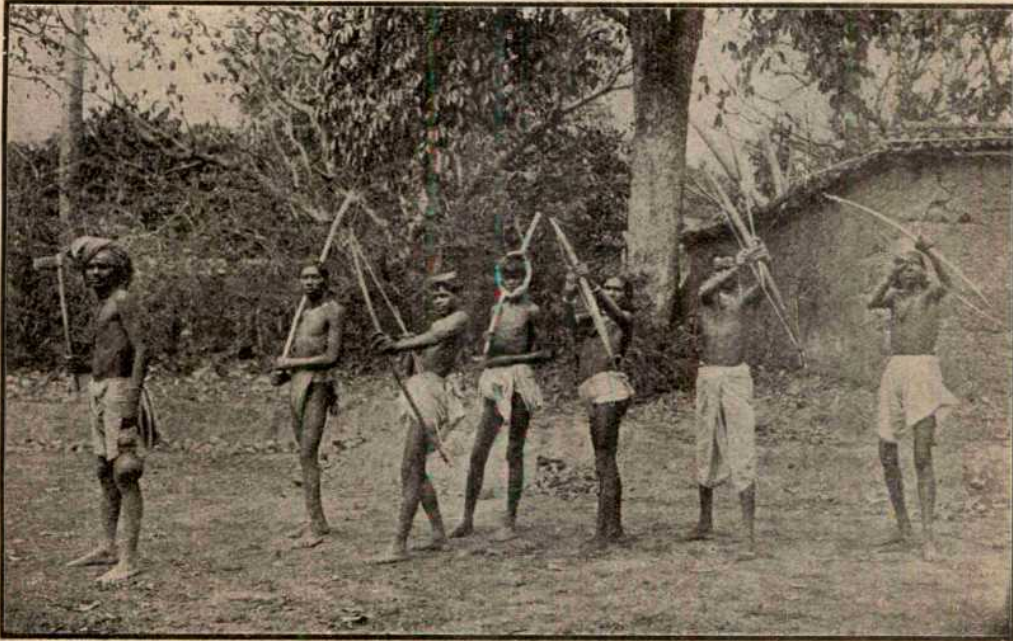
মুণ্ডারাই অতিপ্রাচীন কালে প্রথমে এ-অঞ্চলে আসিয়া বাস করে। ভূমির অধিকার ও গ্রামশাসন সম্বন্ধে তাহাদের ব্যবস্থা সুগঠিত ও সুশৃঙ্খল ছিল। ওরাওঁরা পরে আসিয়া অনেকাংশে তাহাদের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

রাঁচি শহরের দশ মাইল উত্তরে পিঠৌবিয়ার নিকট স্থতিয়াথে গ্রাম ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজাদের আদি-পুরুষ ফণীমুকুট রায়ের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। সেখানে এখনও প্রতি ভাদ্র মাসে 'ইন্দু' পূর্বাধিনে ফণীমুকুটের পালক-পিতা 'মাদ্রা মুণ্ডা'র সম্মানার্থ এক বিশাল ছত্র উত্তোলন করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থতিয়াথে একটি রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে।

কালক্রমে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও রাজপুতানা হইতে আগত এবং রাজবংশী রাজাদের অত্যাচারে সমর্থ ব্যক্তিদের ও রাজকর্মচারীদের নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়নে জর্জরিত হইয়া এই শান্তিপ্রিয় মুণ্ডা, ওরাও প্রভৃতি অধিবাসিগণ মাঝে মাঝে দলবদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি প্রধান ঘটনা, ১৮৩১-৩২ সালের কোল উপপ্লব এবং ১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বীরশা হাঙ্গামা। বীরশার বাস ছিল তামাড় অঞ্চলে। সে খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিল এবং চাইবাসা ইংরেজী মিশন বিদ্যালয়ে সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিল। তাহার জ্ঞাতি-ভাইদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে সে ক্রতসঙ্কল্প হইল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-কৌশলে সে সহস্র সহস্র মুণ্ডা ওরাও চাষীদিগকে দলবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। পরে কৌশলে ধৃত হইয়া

রাঁচির জেল হাজতে কলেরায় সে মারা যায়। বুদ্ধিবলে ওরাও মুণ্ডাদের উপর সে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের মিশ্রণে সে একেশ্বরবাদী সদাচার-উপদেশী এক নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিল। মুণ্ডাদের মধ্যে সে 'বীরশা ভগবান' নামে পরিচিত। মুণ্ডারা তাহাদের ছেলেরদের 'বীরশা' নাম রাখিতে খুব ভালবাসে।

রাঁচি জেলার মালভূমিগুলির উচ্চাচ পর্বত ও উপত্যকা, মধ্যে মধ্যে অসংখ্য স্বচ্ছসলিলা কলনাদিনী শ্রোত-স্বতীর উন্মাদ গতি ও মনোমুগ্ধকর প্রপাতগুলি, শ্রিত্তশ্রাম বনানী এবং অরণ্যমধ্যবিসর্পী ঘাটপথসকল এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে চিরশোভাময় করিয়া সৌন্দর্য্যপিপাসু মানবমনকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছে। আর এখানকার মুক্তনির্মলবায়ুসেবিতা প্রকৃতিমাতার বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় অঙ্কে যাহারা চিরলালিত হইতেছে, মুণ্ডা ওরাও প্রভৃতি সেই কৃষ্ণবর্ণ দেহসৌষ্ঠবযুক্ত আদিম নরনারীগণের সরল অনাড়ম্বর আনন্দময় জীবনযাত্রা ও বিজাবুদ্ধি সভ্যতাভিমুখী মানবের অত্যাধুনিকতা। ইহাদের সরল ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যবোধ, ভাবুকতা ও আত্মসম্মানজ্ঞান, জটিল কৃত্রিমতার আলোকমুগ্ধ জ্ঞানভিমুখী নরনারীর শ্রদ্ধা ও শিক্ষার বস্তু।



কয়েকটি ওরাও শিকারে চলিয়াছে

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

শ্রীধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যৌবনের চিত্রাঙ্গদা—কবির যৌবন, পাঠকের, লেখকের এবং সভ্যতার যৌবন। মোহমদিরতার আবিলতা, বর্ণ-প্রচুরতার দৃশ্যগরিমা, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ব্রতভঙ্গে প্রেমের জয়যোষণা; পৌরুষে নারীত্ব ও নারীত্বে পৌরুষের প্রকাশ; সংযত কামনার ভঙ্গ পরিশেষ, বীর্ঘ্যবানের দোষক্ষয়, ক্ষাত্র-ধর্মের মাধুর্য্য অর্জন; কবিপ্রতিভার সর্বতোমুখী উন্মেষ। চিত্রাঙ্গদা কাব্য আমাদের যৌবনাভিলাষের সর্ব্বাঙ্গীন ইষ্ট-সিদ্ধি।

সেই চিত্রাঙ্গদা বহু বৎসর পরে অভিনীত হ'ল। ইতিমধ্যে কবিপ্রতিভার ও পাঠকের মনে কত না বিবর্তন

ঘটেছে। মোহ আজ বিদূরিত, বর্ণরাজি শুভ্রতায় সঙ্কলিত, ছন্দ বশীভূত ও বিচিত্র, গরিমা মহিমায় পরিণত। কামনার রক্তিম আবরণ উন্মুক্ত ক'রে অন্তরের সত্য পূর্ণ ও শাস্ত জ্যোতিতে বিকাশ পায়, মোহাবেশমুক্ত চিত্ত সহজ সত্যের নিরলঙ্কৃত সৌন্দর্য্যে প্রদীপ্ত হয়। তারই আলো পড়ে দর্শকের মনে। যে-মন নিতান্ত দুর্বল, যে-মন অর্জুনের ক্ষাত্রবীর্ঘ্য গ্রহণ করতে পারে না, কেবল তার স্বমধুর প্রেম-নিবেদনেই সান্ত্বনা পায়। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বীর্ঘ্যবানের জগ্ন। সে যেন রবীন্দ্র-প্রতিভারই প্রতিরূপ। তার নির্দেশ সার্ব্বজনীন। অতএব চিত্রাঙ্গদা-কাব্যের রূপপরিবর্তনে

আমাদের আগ্রহ বিবর্তনশীল মন ও রুচির নিদর্শন। চিত্রাঙ্গদা এখন নৃত্যনাট্য। যৌবনের চিত্রাঙ্গদার সস্তার ছিল শব্দের ও ধ্বনির। তার আদর্শ কাব্য-আবৃত্তির। নূতন চিত্রাঙ্গদার শব্দ, বাক্যধ্বনি গোণ। মুখ্য ভাষা তার নৃত্য। মধ্যে আছে সঙ্গীত। সঙ্গীতও নূতন প্রকারের; নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার সঙ্গীত প্রধানতঃ নৃত্যেরই উপযোগী।

মন মুখরিত হয় ভাষায় ও গানে। সাধারণতঃ, ভাষা ও সঙ্গীত ভিন্ন স্তরের প্রকাশ, অবশ্য একই মনের। কিন্তু মুখরা যখন মুক হয় তখন অল্পসঙ্কলনেই সে-মন নিজকে ব্যক্ত করে। নৃত্যকলা মুকের ভাষা, অক্ষর তার প্রতি আঙ্গুর মুদ্রায়, বাক্য তার দৈহিক সঙ্গতিতে, ছন্দ তার দেহের হিলোলে। নৃত্যকলা নীরব কবির কায়িক কবিতা। তার প্রাণস্পন্দন সর্ব্বপ্রকার কলার পিছনকার মৌলিক চন্দ্রের অনুরূপ। স্থর ও



চিত্রাঙ্গদা—“আমি তোমারে করিব নিবেদন আমার হৃদয় প্রাণ মন।”

অর্জুন—“ক্ষমা করো আমার, বরণযোগ্য নহি বরদান, ব্রজচারী ব্রতধারী।”

[শ্রীমদেন্নাথ চক্রবর্তী প্রস্তুত কাণ্ডোদাই চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজন্তে মুদ্রিত]



চিত্রাঙ্গদার প্রতি মদন : “আমি দিহু বর কষ্টকে র’বে তব পঞ্চম শর মম পঞ্চম শর...”

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রস্তুত রঙীন কার্ণখোদাই চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজস্যে মুদ্রিত]



'Chitrāngada' and the Poet.

R. Chakravarty 1986.

অর্জুন : “কাহারে হেরিলাম ; সে কি সত্য, সে কি মায়া, সে কি কায়া, সে কি স্বর্ণ কিরণে রঞ্জিত ছায়া।”

[শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রস্তুত কাঠখোদাই চিত্র হইতে শিল্পীর সৌজন্তে মুদ্রিত]

কথা তাঁরই সরব সহভাবী, বোধ-পরিবারভুক্ত আশ্রিত আত্মীয়। তাই, নটীর পূজার নটীর মতন, সকল আভরণ যুটিয়ে দেবার পর নৃত্যকলা আপন অস্তিত্ব অর্জন করে। তখনই বাক্য হয় সংযত, স্বরও হয় নৃত্যের অঙ্গুল। এ পক্ষা চিরপরিচিত—বাক্যের তাৎপর্যকে অবদমিত করবার পরই যেমন স্বরের মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছিল।

বোধ হয় প্রকৌস্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে তার প্রত্যেকটি রচনা রাগিণীর সামান্য গুণের অধিকারী হয়েও স্বকীয়। অর্থাৎ কোন রচনাই তাঁর ‘আলাপ’ নয়। ভৈরবীর আলাপে আদি স্বরস্থাপনা থেকে তান কর্তব্য, ধুন চৌধুন সকল প্রকার বিবর্তনের স্থান আছে, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তার বদলে আছে নানা রকমের গান, যার প্রত্যেকটি ভৈরবী কিংবা ভৎসংলগ্ন কোন স্বরের আশ্রিত, তবু যেটি আপন অস্তিত্বে বিশেষ। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কোনটির সন্মুখে বলা চলে না যে সেটি ভৈরবীর গান, তাব সন্মুখে বলা চলে যে এই গানটিতে ভৈরবী রয়েছে। তবু কোন রচনাই স্বরে বসান কবিতা নয়, কোন কবিতাই স্বরে বসাবার জন্ত লেখা হয় নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিশেষত্ব উদ্ভূত হয় স্বর ও কথার অদ্ভুত যোগাযোগে। সেই জন্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে অন্তের পঙ্কিতে বসান যায় না, তাকে নিয়ে যথেষ্টাচারও চলে না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বাভাব্য এতই জীবন্ত যে তাকে নৃত্যের ভাষায় অনুবাদ করলে তার ধর্মচ্যুতি ঘটে। আর্টেবও ধর্ম পরিবর্তন নিতান্তই ভয়াবহ। অনুবাদ যতই সূত্রে হোক না কেন তার মূল্য মৌলিক-সৃষ্টি অপেক্ষা কম। (কবি নিজেই এই তথ্যটি আমাদের সামনে উপস্থিত কবেছেন তাঁর চিত্রে, যেখানে স্বধর্ম্যচরণে নিধনপ্রাপ্তির সংবাদে শাস্তনা পাই পরধর্মের আশ্রয়ত্যাগের সাহসিকতা লক্ষ্য করে। তাঁর কোন চিত্রই অনুবাদ নয়, রঙে গল্প বলা নয়।) আজ গর্ত বয়েক বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ নৃত্যকলার নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনে সযত্ন হয়েছেন। তাঁদের সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। যা দেখেছি তাই থেকে আমার মনে করা নিতান্ত সহজ হয়েছে

যে সে-পদ্ধতি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের (ও রবীন্দ্র-নাট্যের) আশ্রয়ে বিকশিত ও তার বৈশিষ্ট্যই পবিপুষ্ট। তাব মধ্যে অনুমারস্বের ও কৃতিস্বের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান। তবু আমাব বিশ্বাস যে পূর্ব-চিত্রাঙ্গদা যুগের অভিনয়ে বিশুদ্ধ নৃত্যকলাব বীজ থাকলেও সেটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সূর্যলিখিত বৈশিষ্ট্যের জন্ত গুপ্ত ছিল। ‘তপতী’ কিংবা ‘নটব পূজা’র নৃত্যের যা অনুকরণ দেখেছি তাকে ‘ভাও-বাৎসল্য’ ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যেই স্বাধীন নৃত্যকলার সর্বপ্রথম উন্মেষ হ’ল। সর্বদিকে আশ্বাস দিতে পারি—চিত্রাঙ্গদার অনুকরণ হবে না, প্রবাসী বাঙালীরাও ভ্রম পাবেন অভিনয় করতে।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের উৎকর্ষ ও বিশেষ-ভাবাত্মকতা ভিন্ন তাল-বৈচিত্র্যের অভাবও নৃত্যশিল্পের স্বাধীন জীবনযাত্রায় বিপত্তি বাধিয়েছে। ‘রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেতালা’—এই মন্তব্যের কোন অর্থ নেই—কাবণ তাল গায়কের বর্গে। কিন্তু স্বরলিপিতে প্রকাশিত রচনায় তালের বৈচিত্র্য কম কি বেশী ধরা পড়ে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপিতে অল্পসংখ্যক তালের নির্দেশ পাওয়া যায়। ক্রমতাল, ব্রহ্মতাল, বড় দশকুশী পঞ্চম সোয়ারীর প্রত্যাশা কেউ করে না, ধামার আড়াচে-তালের বাঁটোয়ারাও রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বেসঙ্গীত গায়কের ও গানের মেজাজের সাহচর্যে সার্থক হয়, তার গায়ন-পদ্ধতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাঁটোয়ারার সুযোগ নেই। সে-সঙ্গীত যদি আবার নাট্যোপযোগী হয়, তখন অবসর থাকে কেবল লয়ের—অর্থাৎ মাত্রাভাগ ও তালের গিছনকার মূলগত ছন্দের। এই আদিম ছন্দ শাস্ত্রপ্রশাস ও গানের ‘মেজাজের’ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব এক হিসেবে সূক্ষ্ম বাঁটোয়ারার অভাবের জন্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে এবং সেই সঙ্গীতের আশ্রিত নৃত্যকলাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তবু স্বাধীন নৃত্যকলার অভিব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে তালের বৈচিত্র্য নিতান্তই বাঞ্ছনীয় এবং নর্তক-নর্তকীর তাল-ভঙ্গ অত্যন্ত অমার্জনীয়। সামান্য জিতালীতে শান্তি-নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের আমি ভুল পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছি—কিন্তু চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ে নর্তক-নর্তকীর পদক্ষেপ নির্ভুল ছিল। কেবল তাই নয়, বাঁপতালের মত গম্ভীর

তালে (যখন সঙ্গীত ও বাক্য স্তব্ধ হয়েছে তখনও, অর্থাৎ নিরালম্ব নৃত্যেও) আড়ির কাজ লক্ষ্য করেছি। আরও কতটা তালের উন্নতি নৃত্যনাট্যে সম্ভব এই বিচারের স্থান অস্থায়ী—কিন্তু উন্নতি যে হয়েছে এবং সে উন্নতি যে ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে আড়ম্বরে পরিণত হয় নি এইটুকুই আমার বক্তব্য।

অন্ত ভাবে বলা চলে, স্বতন্ত্র নৃত্যকলার উদ্ভাবনের জন্য দুটি সর্বস্বকার প্রয়োজন ছিল; প্রথমত উৎকৃষ্ট এবং কোন বিশেষ ভাবাপ্রাপ্ত সঙ্গীত-রচনার আধিপত্য থেকে নিম্নতি, এবং দ্বিতীয়ত, তালের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি। সঙ্গীত হিসেবে কোন রচনা যে-পরিমাণে উৎকৃষ্ট হবে সেই পরিমাণে সেই রচনা নৃত্যকলার স্বাতন্ত্র্য অর্জনে বাধা দেবে। কাব্যের বেলাও তাই, গুঢ় ভাবব্যঞ্জক কিংবা হৃদয় অর্থবাহী কবিতা নৃত্যের অল্পপযোগী। চিত্রাঙ্গদার অধিকাংশ সঙ্গীত (সবগুলি নয়, কারণ সেগুলি চিত্রাঙ্গদার জন্য লেখা হয় নি) নৃত্যের নিতাস্ত অল্পকূল। তার মধ্যে ছড়া, আবৃত্তি থেকে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বর্তমান, কিন্তু মোটের উপর সঙ্গীতের ধারাটি নৃত্যলীলাকে সমর্থন করে, ছুটতে দেয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। (মোটের উপর অর্থে গড়পড়তা নয়, সমগ্রতার অল্পভূতি উল্লেখ করছি।) সঙ্গীতের এই আত্মসংযম না থাকলে চিত্রাঙ্গদা পুনরাবৃত্তি হ'ত। নৃত্য স্থিতির জন্য অতি সংখ্যের নিতাস্ত প্রয়োজন ছিল।

চিত্রাঙ্গদাকে কেবল নৃত্যের দিক থেকে দেখলেও অন্তর্ভুক্ত কর হবে। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য—অর্থাৎ সাধারণ নার্টিকের কথিত ভাষার পরিবর্তে নৃত্যনাট্যের ভাষা হ'ল নৃত্য এ-নৃত্য দেখের মুক-অভিনয় নয়, সঙ্গীতমুখর নৃত্য। নৃত্যনাট্যে অবশ্য নাট্য, তার মধ্যে গল্প আছে, সে-গল্পের নার্টিকীয় গুণাবলী আছে, যেগুলি নৃত্যোপযোগী সঙ্গীতেরই ইচ্ছিতে পরিস্ফুট হচ্ছে। (সঙ্গীতের আশ্রয়ে নয়, আভাসে।। কারণ, নাটকটি অস্ত্র কারুর নাটক নয়, রবীন্দ্রনাথের। 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরোধ মানসিক, এবং তার অভিব্যক্তিও তাই। 'বিসর্জন' ও সামাজিক দু-তিন খানি নাটক ছাড়া রবীন্দ্রনাট্যের প্রতিভাই হ'ল সঙ্গীতিক। মোহ-মুক্তি যে-নাট্যের সর্বটময় পরিশেষ, সে-নাট্যের গল্পাংশ স্বয়ংক্রিয় হলেও তাকে ঐ ভাবে দৈহিক অল্পবাদ কিংবা অভিনয় করা

যায় না যেমন সম্ভব 'রাজহংসের মৃত্যু' কিংবা 'দুঃশাসনের রক্তপান'কে। চিত্রাঙ্গদা-নাট্যের অবাংগোচর বিশেষত্বটুকু তার আঙ্গিকে রক্ষা করেছে, বিদেশী অপেরার ভাবপ্রবণতা এবং কথাকলির দৈহিক ও জৈবিক অভিনয় থেকে। প্রমাণ, গল্প দেখা ও বোঝা ছাড়া নৃত্যনাট্যের অভিনয়ে অস্ত্র একটি আনন্দের উপকরণ ছিল। সেই জন্য সব সময় গল্পাংশ পরিস্ফুট না হলেও না-বোঝার ব্যাকুলতা আমাকে বাধিত করে নি। সঙ্গীত ও নৃত্যের মীড়ে আমার গল্পানুসরণ প্ররুতি রুদ্ধ হয়। সেটা আক্ষেপের বিষয় হয় নি।

তবু চিত্রাঙ্গদা নাট্য—তার পাত্র-পাত্রী একাধিক, তার গতি একমুখী হলেও একটানা নয়, তাতে জোয়ার-ভাঁটা আছে, খালবিলের জল এসে তাতে পড়ছে। সেই জন্য সমবেদ-নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ করতে রবীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়েছেন। লঙ্কায়ের কালকা-বৃন্দাদীদের প্রবর্তিত এবং সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত নৃত্য-পদ্ধতিতে (যাকে ভুল করে দরবারী, ক্লাসিকাল বলা হয়, কিন্তু যেটি নিতাস্তই রোমান্টিক এবং চুংরীর আশ্রিত) নাটকীয় গুণ বা আছে, তা প্রাকট হয় মাত্র এক জন নর্তকেরই নৃত্যে। তিনিই কখনও কুম্ভ, কখনও রাধা, কখনও বা গোপিনী। তিনিই বিভিন্ন ভূমিমায় গল্প বলেন। দেশী নৃত্যে কিন্তু বহু স্থান আছে। নাটক যখন বহুনিষ্ঠ তখন কবি দেশী নৃত্যের আঙ্গিক গ্রহণ কবতে বাধ্য। গ্রহণ অবশ্য উদ্দেশ্যসাধনের জন্য অল্পকরণ কিংবা চমক লাগাবার জন্য নয়। এই বহুর ব্যবহার নিতাস্তই দায়িত্বপূর্ণ। সংখ্যাধিক্য এককের ও স্বকীয়তার সর্বনাশ ঘটতে সদাই তৎপর। তাই সাবধানতার বিশেষ আবশ্যক। প্রয়োগকুশল শিল্পীর হাতে বহুর অস্তিত্ব এককের, অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার সখ্যের গুরুত্ব নির্ধারণ করে। তখন পাত্র-পাত্রী তরফের এবং নায়ক-নায়িকা জুড়ীর তাবেব কাজ করে। মূল ঐক্যের সঙ্গে ঐ প্রকার সখ্য যদি না থাকে তবে পাত্র-পাত্রী কেবল ভিড়ই জমায়। ভিড়ের এক ভিড়-করা ছাড়া অস্ত্র কোন সার্থকতা নেই, তার মধ্য থেকে স্বতাই কোন সখ্য উদ্গারিত হয় না, বরঞ্চ, একককে নীচু করেই নামায়। কিন্তু নায়ক-নায়িকার ব্যবহারে বিরোধ ও বিবর্তন দেখান যদি উদ্দেশ্য হয়, এবং সেই সঙ্গে অস্ত্র পাত্র-পাত্রী অবতারণা করবার প্রয়োজন যদি

থাকে, তবে তাদের ব্যবহারকে গ্রহিত করতেই হবে। সেই জন্ত গ্রহিত করবার পর স্বস্থতা যদি না রক্ষিত হয়, তবু বিশেষ ক্ষতি হয় না। যেমন, একক নৃত্যে তালের স্বস্থ বিভাগ ও আড়ম্বরের স্বযোগ থাকলেও সমবেত কিংবা পুঞ্জ-নৃত্যে বাঁটোরারা, বিসম, অনাঘাতের স্থান সঙ্গীর্ণ; যেমন খেলালে তানের অবসর যথেষ্ট থাকলেও কোরাসে ছায়ানট কিংবা দেশে বন্দেমাভরম্ গানটি অচল ও অপ্রাচ্য। কোরাসে শ্রুতি কিংবা তান কিংবা তালের বাহাছরী অশোভন। অবশ্য মনে রাখতে হবে বহু এখানে এককেরই আশ্রিত, একক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সে যেন এককের চার পাশে জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করছে, আরও মনে রাখতে হবে নিরালম্বতা শুদ্ধতার আরোহণ-পথ। দেশী নৃত্যের মধ্যে বোধ হয় মণিপুরী নৃত্যেই বহু তার স্বার্থ স্থান পেয়েছে। চিত্রাঙ্গদা নিজে মণিপুরের রাজকন্যা এই কারণটি স্বার্থ নয়।

বলা বাহুল্য, অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা নায়ক-নায়িকা, তাঁরা ভিন্ন দেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যা। চিত্রাঙ্গদার দেশে মণিপুরে অর্জুন এসেছেন একাকী, দেশভ্রমণের পরিণামে। যুবতী চিত্রাঙ্গদা যুবকের মতনই প্রতিপালিত (তিনিই ভারতের প্রথম সাফ-রাজেট) তাঁর এই অল্পত শিক্ষাদীক্ষার ইতিহাস সঙ্গীগণই বিবৃতি করতে পারেন। তস্তি অর্জুনের বস্ত্র পরিচর, গ্রামবাসিগণও আছে, আর আছেন মদন। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার ব্যবহারই নাটকের প্রধান অধিভরণ। তাঁদের ব্যবহারের প্রতিফলন হবে মদন ব্যতীত নাট্যমঞ্চের অস্ত্রান্ত ব্যক্তির উপর। কখনও বা তারাই সেই মূল ব্যবহারের, সেই সঞ্চয়ের অভিব্যক্তির সাতত্যা বজায় রাখবে, সময় সময় তারাই হবে প্রতিবাদ-স্বরূপ। মূল স্বর বাক্ত হবে তাদের আধারে—মূল স্বর ও নৃত্য পরিপুষ্ট হবে তাদেরই সমর্থনে, কিংবা বৈপরীত্যে। চিত্রাঙ্গদায় সমবেত নৃত্যকে নানারূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

তবু যদি বিবর্তনের ধারা শিথিল হয়, ছক্ হয় ছিন্ন-ভিন্ন, তবে মদনের আশীর্বাদে এবং কবির আবৃত্তিতে সে ধারা আবার বইবে। এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখা, এই বন্ধন-রীতির আঙ্গিকটি আমাদের নিত্যসুই পরিচিত। কৈবল্যই যদি হিন্দু সভ্যতার বন্ধনী হয়, তবে নৃত্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার অভিনয়কে প্রাচীন সংস্কৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ভাবে

পারি। সেই ভূমিকায় সমবেত নৃত্যে স্থান নিরূপণ করলে দেখা যাবে যে নৃত্যাজিনয়টি সত্যই স্থিতিবাহক। পুঞ্জ-নৃত্য বোধ হয় ঋষপদী নয়—শাস্ত্রেও তার আঙ্গিক নির্ণীত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। (এখানে আমার ও অস্ত্রান্ত জনসাধারণের অজ্ঞানতাকে তথ্য হিসেবে ধরলে বোঝা যাবে যে সংস্কৃতি যখন বিচ্ছিন্ন, যখন তার পত্নিত্ব সম্বন্ধে আমরা নকলেই অচেতন, তখন তাতে ভিত্তিক করে নৃত্য ইয়ারৎ বড় চলে না। অতএব এই কারণেও মার্গ-নৃত্যের পুনরাবৃত্তি এক্ষেত্রে অসম্ভব—প্রত্যেকে দেশী নৃত্যের স্বারস্ব হতেই হবে। দেশের মাটি থেকে রস আহরণ করা কবির পরিচিত পন্থা। মার্গ-সঙ্গীতে তিনি বাউল ভাটিয়াল মিশিয়ে নৃত্য জাতি সৃষ্টি করেছেন। নৃত্যেও তাই। পার্থক্য অবশ্য আছে এবং যতটুকু পার্থক্য ততটুকু তার কৃতিত্ব। মার্গ কিংবা ঋষপদী সঙ্গীত আমাদের কাছে জীবন্ত, আমাদের সংস্কারগত অন্ততঃ আংশিক ভাবে। মার্গ কিংবা ঋষপদী নৃত্যরূপ কি আমরা জানি না। কলী-নৃত্যকে মৌলিক স্বরূপ? তাও কি আমাদের সংস্কারগত? সর্বপ্রকার হাইজী-নৃত্য যে ঋষ নয়, সে-বিষয়ে সকলেই আমরা নিঃসন্দেহ। তবু দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্যের নানা রূপের মধ্যে এনিকটা ঋষ-পদ্ধতি বর্তমান আছে অনুমান করা অসম্ভব নয়। সে রূপও আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার বাইরে। কিন্তু দক্ষিণী জনসাধারণের, গ্রামবাসীর অপরিচিত নয়। অতএব পণ্ডিতের দল বাই বলুন না কেন, নৃত্যনাট্যের স্বকীয় প্রয়োজনের জন্ত পুঞ্জ-নৃত্যকে গ্রহণ যদি করতেই হয় তবে দেশী ও গ্রাম্য-নৃত্যকে বরণ করাই পার্থক্য। তবেই বিপ্লব সম্পাদিত হবে। দেশী-নৃত্যের মধ্যে ছত্রির প্রতিষ্ঠা আছে—মণিপুরী ও মালাবারী কথাকলির। আর একটি প্রতিপত্তি সহগ্র উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত, কালকা-বৃন্দার পদ্ধতি। শেষেরটি পুরোপুরি ঋষ না হলেও তাকে তার পরিব্যাপ্তির জন্ত বাদ দেওয়া যায় না। এই তিনটিই অল্পত সম্মিশ্রণ চিত্রাঙ্গদা-নৃত্যের বিশ্লেষণের ফলে চোখে পড়ে। অল্পপাত অবশ্য বিভিন্ন এবং সকলনটাই কৃতিত্ব মতে রাখতে হবে।

কালকা-বৃন্দার নৃত্য-রূপ কি রকম ছিল তার সাক্ষ্য দিতে পারব না। তবে তাঁদের পুঞ্জ-সাত্ত্বপুঞ্জ এবং একাধিক শিত্র-শিত্রার নৃত্য দেখে বলতে পারি যে তাঁদের প্রবর্তিত

নৃত্যকলার মূলকথাটি শান্তিনিকেতনী এবং চিত্রাঙ্গদার নৃত্যে পরিত্যক্ত হয় নি। (অবশ্য গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক, কারণ তাঁরাও পুৰাতন মুদ্রা প্রভৃতি নৃত্যকলাবভাষার উত্তরাধিকারী, এবং শান্তিনিকেতনী নৃত্যে মুদ্রা আছে, যদিও সব মুদ্রা শাস্ত্রোক্ত হয়ত নয়)। লক্ষ্মীর পদ্ধতির প্রধান কথা 'পায়ের কাজ' নয়—লোকে যাকে 'পায়ের কাজ' বলে সেটি তাল-বাঁটোয়ারার বোলের পুনরাবৃত্তি। সেটুকু চমকপ্রদ নিশ্চয়, কিন্তু যারা লক্ষ্মীর নৃত্যকে নৃত্য ব'লে শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা পায়ের বাঁটোবলা বাজানকেই মহৎ সৃষ্টি ভাবে পাবেন না। কেবল তাই নয়, 'ভাও-বাংলানা'র অন্তত কৃতিত্ব স্বীকার করেও লক্ষ্মী-নৃত্যকলাপদ্ধতির নৃত্যের অন্য দাবী পেশ করাই সম্ভব। ভাও-বাংলানা ভাবের এক প্রকার না-হয় দশ প্রকার ব্যাখ্যা কিংবা সমর্থন। কিন্তু তবুও ব্যাখ্যা ও সমর্থন নৃত্যের আশ্রয়দাতা সেই সঙ্গীতের পদটিবই। অর্থাৎ তখনও নৃত্য স্বাধীন হয় নি। আমার মতে উত্তর-ভারতের প্রচলিত নৃত্যের মূলকথাটি হ'ল নর্তকের বিশেষতঃ বেথায়িত ডেউগুলির সমঞ্জস সাধনের ইচ্ছিত। তবু কিন্তু তাব প্রেরণা সঙ্গীতের তালের। দেহ তখনও নিজেব ভাবেব তাসিদে রেখায়িত হচ্ছে না, সেই জন্য দেখছে কিংবা আশ্রয় নৃত্য-তরঙ্গের ছন্দের সঙ্গে সান্নিতিক তাল মানের বিরোধ সম্ভব। সত্যসত্যই যে বিরোধ বাধে নিজে দেখেছি।

পূর্বকথিত রেখায়িত তরঙ্গ দক্ষিণী কিংবা বলী-নৃত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিক নয়—অন্ততঃ এই প্রকার উন্নতি দক্ষিণে প্রত্যাশা করি না। দক্ষিণে পায়ের কাজ কিংবা 'ভাও-বাংলানা' সামান্য আছে, কিন্তু সে নৃত্যের ধর্মই ভিন্ন অর্থাৎ অভিনয়। উদয়শঙ্কর যাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেন তাঁর, পোপীনাথের, ভালার্টোলেব শিক্ষাপ্রাপ্ত দলের, বালা-সরস্বতী এবং আবণ দু-তিন জন প্রতিভাশালী নর্তক-নর্তকীর নৃত্য দেখে মনে হয়েছে যে ও-অঞ্চলের নৃত্য এখনও অভিনয়ের সংজ্ঞায় পড়ে এবং সে-অভিনয় দেহের উপরিভাগের প্রতি অঙ্গে যেমন স্পন্দ, ভাব-ব্যঞ্জনাও আর্টের দিক থেকে তেমনই স্থল। উৎকৃষ্ট বলী-নৃত্যভিনয় আমি দেখি নি, তবু যা দেখেছি তাতে মনে হয় যে সেটিও অভিনয়মূলক, যদিও বর্তমান বলী দেশের অভিনয়ের প্রকৃতি অন্ততঃ বর্তমান উত্তর-ভারতীয় অভিনয়ের প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র। বলী ও দক্ষিণী নৃত্যের আঙ্গিক

রেখার লীলা নয়, দৈহিক প্লেনের সমন্বয়সাধন। উত্তর-ভারতীয় নর্তক যতই মঞ্চের উপর ঘুরে বেড়ান না কেন, একটি মুহূর্তে তিনি তাঁর দেহের যে-কোন একটি প্লেনেই থাকেন। তাঁর ব্যক্তিরেক ক্ষণস্থায়ী, তাঁর ভারসাম্য মাধ্যাকর্ষণের রেখাশ্রিত প্লেনেরই মধ্যে। তাই 'পায়ের কাজ' অর্থাৎ বোলের পুনরাবৃত্তি এই নৃত্যের চমক যোগায় না। 'পায়ের কাজ' একই প্লেনে উত্থান ও পতন। তাওব-নৃত্যের কিংবা দীপলক্ষ্মীর মূর্তি যিনি দেখেছেন তিনিই দক্ষিণী নৃত্যের প্লেনভাটার মর্ম বুঝবেন।

মণিপুরী নৃত্যের সঙ্গে আমাদের প্রায় সকলেরই পরিচয় যৎসামান্য। মণিপুর হয়ত বাংলার বাইরে পার্শ্বত্যা অঞ্চলে বলেই। তথাপি মণিপুরী নৃত্য যতটা দেখেছি তাতে তার ভাব্যতা ও কবিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। তার সাজসজ্জা, সঙ্গীত এবং গতির মধ্যে যে সংঘম আছে তার তুলনা আমি কোথাও পাই নি। নেহাৎ মোটামুটি বলা যায় দক্ষিণী ও বলী নৃত্য ভাব্যতা, লক্ষ্মীর অর্থাৎ বাইজীর নৃত্য সঙ্গীত, এবং মণিপুরী নৃত্য কবিত্বধর্মী। মণিপুরী নৃত্যের অন্য বিশেষত্ব তার সমবেত নৃত্যে। সাঁওতালী নৃত্যেও এই গুণটি বর্তমান কিন্তু তার গতিটাও সমবেত অর্থাৎ একই গতিতে অন্ততঃ একটি দল (পুরুষের কিংবা স্ত্রীর) বাঁধা। মণিপুরীতে প্রত্যেকের গতি আছে, এবং সেই প্রত্যেকের গতি মিলে ছক তৈরি হচ্ছে, যে-ছকটি আবার নৃত্য ছকের সঙ্গে কখনও মিশে যাচ্ছে, কখনও বা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মণিপুরী নাচ দেখলে আমার ক্যালিডোস্কোপ কিংবা পার্সিয়ান কার্পেটের কথা মনে পড়ে। তাব সমগ্রতার অল্পভূতি বিশেষের মুখ চেয়ে থাকে না।

শান্তিনিকেতনের নৃত্যের আঙ্গিক প্রথমে ছিল রেখাশ্রিত—অবশ্য, তার মধ্যে বড়ের খেলাও ছিল। তাকে চিত্রধর্মী বলা যায়। মণিপুরের কাব্যনিষ্ঠ ভক্ততার সঙ্গে রবীন্দ্র প্রবর্তিত নৃত্যের যোগ নিতান্ত স্বাভাবিক। অন্যান্য রবীন্দ্র নাটকেব অভিনয়-পদ্ধতির পক্ষে এই প্রকার আঙ্গিকই যথেষ্ট কিন্তু চিত্রাঙ্গদা নাটকটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তার গল্পাংশ অপেক্ষাকৃত জটিল, তার মধ্যে কল্প আছে, পাত্রপাত্রী সংখ্যাও বেশী অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদার অভিনয়ের সুযোগ বেশী

তাব নৃত্য রেখার লীলায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। এখান দক্ষিণী নৃত্যাভিনয় এবং মণিপুৰী নৃত্যের আদ্রিবি আঁও বেশী ক'রে গ্রহণ করতে হবে। দক্ষিণী অভিনয় স্থূল, কিন্তু তার প্লেম-ভাঙাটা নূতন ও জটিল, চিত্রাঙ্গদা নাটকটির প্রকৃতিরই অলুযাযী। সমবেত নৃত্যে মণিপুৰী ব্যক্তি-বিশেষেব মধ্যে পুরুষ-নৃত্যে দক্ষিণী, এবং মহিলা-নৃত্যে উত্তর-ভাবতীয় আঙ্গিক নৃত্য-নাট্যে তাই গৃহীত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

গৃহীত অর্থে সমন্বিত। সমন্বয়টিই আসল কথা। সমগ্র-ভাবে দেখলে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এই সমন্বয়কে। যে-স্থিতিতে এত ভিন্ন ধরণের নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি চারু-কলার সমাবেশ হয়েছে তাকে স্থষ্টি বলতেই হয় দেশের মন যদি জাগ্রত ও স্থষ্টিমুখী হয় তবেই তার মহত্ব উপলব্ধি সম্ভব।

বিশুদ্ধ নৃত্যের দিক থেকে বলা যায় যে চিত্রাঙ্গদায় নৃত্যকলা মুক্তিলাভ করেছে। যোগশাস্ত্রে বলে স্বনই নটকি যোগীর পরম শত্রু। অন্ততঃ বিশুদ্ধ নৃত্যকলা উপভোগের বেলা ত বটেই। সঙ্গীত-ভিন্ন নৃত্যের অস্তিত্বে আনন্দের অভ্যন্ত নই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের অভ্যাস ভাঙার চুসাহসিক কাজেই ব্রতী হয়েছেন। চিত্রাঙ্গদা-অভিনয়ের মধ্যে সঙ্গীত স্তব্ধ হয়, মাত্র তাল চলে—নৃত্য তখন পুরুষে। দুটি বার সঙ্গীতের এই রকম বিরাম অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। কেন সঙ্গীত স্তব্ধ হয় আমাদের বিচার্য। প্রথমত কথা থেকে নিষ্কৃতি পেলে সঙ্গীতের অধীনে অসতেই হয়, সঙ্গীত অর্থে বিশুদ্ধ স্বর (রাগিণী নয়)। আমাদের স্বর-গুলিতে আবোহী-অবরোহী ভিন্ন অস্ত্র 'ভুজ' নেই, অর্থাৎ গায়ন-পদ্ধতি একই প্লেনে চলে। (যন্ত্রবাদনে ছুটি ভ্রুজ আছে।) সেই জন্ত নৃত্যে যখন দুইয়ের অধিক প্লেনে দেহকে ভাঙবার প্রয়োজন হয় তখন তার সম্মুখ হিন্দুস্থানী গায়ন ও বাদন পদ্ধতিতে পাওয়া শক্ত। নৃত্য-নাট্যের জন্ত হয় বিদেশী হার্মনির সাহায্য। গ্রহণ আর ন-হয় চূড়ান্ত মুহূর্তে সঙ্গীতকে থামান, এই দুটি পথ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। আজকালকার থিয়েটার ও সিনেমা সঙ্গীতে প্রথমটি অবলম্বিত ঠিক না হলেও তারই দিকে ঝোঁক পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু যেচ্ছায় 'ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট' হ'ত চান না।

অতএব, দ্বিতীয়ত, সঙ্গীত নীবব হ'তে বাধ্য। নীরব, কিন্তু তার প্রাণস্পন্দন চলছে। স্পন্দনের ছন্দের মতন তখন আঘাত চলেছে, কিন্তু সে-আঘাতে বাঁটোয়াবা নেই। জাগরণ ও নিদ্রার সন্ধিক্ষণের স্রুষ্টিতে স্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ নয়, তবে তার ক্রিয়া নিতান্তই সরল। নাট্যের জটিলতা এই সরল আঘাতে পরিণত হ'ল। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেল নৃত্য-কলার শুদ্ধতা অর্জনের অলুচ্ছানিত ইঙ্গিত।

এতক্ষণ আমি নৃত্যের স্বরাক্রম্যনের বিবরণ দিলাম। স্ববাক্স পাবার পর আন্তর্জাতিক মিলনই প্রকৃত মিলন। তখনই হয় বন্ধুত্ব—কারণ তখন কাউকেই অস্ত্রের অধীনে থাকতে হয় না। শুদ্ধ নৃত্যকলার উদ্ভাবনা অর্থে সঙ্গীতকে পদানত কবানয়। সব জানে, সব কলাবিদ্যার উৎকর্ষের ইতিহাসেই দুটি গতি আছে, ভ্রাতৃগের দ্বারা শুদ্ধি, এবং শুদ্ধির পর সমানে সমানে, পরিত্যক্তের বশে পুনরায় সম্বন্ধ স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধতায় আরোহণ ক'রে সম্বন্ধে অবরোহণ করেছেন—তাই চারুকলার সমন্বয় চিত্রাঙ্গদায় সর্বোচ্চ নই হয়েছে। কোন কলার প্রতি অশ্রদ্ধা স্থচিত হয় নি।

চিত্রকলার ব্যবহার কত সূচ্যক হয়েছে বোঝাতে পারব না। তবে রঙের অর্থাৎ সাজসজ্জার ও দৃশ্যপটের অবস্থান অত্যন্ত সুসমঞ্জস হয়েছিল অ-ভিজ্য ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করেছেন। শুনেছি, সেক্ষত্র কবি প্রতিমা দেবী ও স্বরেন্দ্র বর মহাশয়ের কাছে শুনী। আমি নৃত্যনাট্যে গানের 'ব্যবহার' একটু বিচার করব। বলা বাহুল্য, ব্যবহার অর্থে সম্পত্তির ব্যবহার নয়।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য, ভুললে চলবে না। যেখানে নাট্য সঙ্গীতাদীন সেখানে নাটকীয় গতি রুদ্ধ হয়। আবেগ যায় থেমে যখন শ্রোতৃবৃন্দ নৃত্যরত নায়ক-নায়িকার মুখে গান শোনে। পুরাতন কালে যাত্রায় তাই হ'ত। জুতি রক্ষার জন্ত অস্ত্র এক দল গায়ক-গায়িকাকে রক্ষমণ্ডে অবতারণা করবার রীতি আছে। এই রীতিটাও প্রাচীন। কিন্তু বাংলা যাত্রায় তার ফল হ'ত বিপরীত। কথাকলি, বলী, এমন কি আধুনিক উদঙ্গধরনের নৃত্যের ফল কিন্তু চূড়ান্ত হয়েছে। 'মায়ার খেলা', কিংবা 'বান্দীকি-প্রতিভায়' রীতিটির সাক্ষ্য পাই না। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ আবার সেটি অবলম্বন করেছেন। চিত্রাঙ্গদায় তার নৈম বিকাশ।

পাত্রপাত্রী ভিন্ন অল্প একটি গায়ক-গায়িকার দলকে রঙ্গমঞ্চের পিছনে কিংবা কোণে রাখলে, এবং তাদের সঙ্গীতকে অবদমিত করলে নাটকীয় গতিরক্ষার সুবিধা হয়। তাঁরা হবেন পটভূমি, তাঁদের সঙ্গীত হবে ভূমিকা, এবং বিচ্ছিন্ন ব্যবহারের স্বত্ব। (কবি নিজেই রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকেন—স্বত্বের হিসেবে। তাঁর আয়ত্তিও ঐ রীতির চূড়ান্ত নির্দেশ।) অবশ্য, ভূমিকাটুকু থাকলেই যথেষ্ট হ'ল না। কথাকলিতে সঙ্গীতিক ভূমিকাটি স্থির—গল্পাংশ তাই প্রধান নটের (কিংবা নটীর) অভিনয় ও সাজসজ্জার মধ্য দিয়ে প্রকট হয়। মাত্র একটি অর্ধ-উচ্চারিত একটানা স্বর (drone) থাকে (তার অবশ্যক উত্থান পতন প্রভৃতি বিবর্তন আছে, কিন্তু সংসামান্য)। কথাকলি (ও বঙ্গী নৃত্যও) গল্পাংশ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের পরিচিত ঘটনা ব'লে শ্রোতাদের ব'লে দেবার প্রয়োজনই থাকে না। যেখানে পূর্বপরিচয় সেখানে ঘটকালিটা উপরন্ত। অভিনেতা ও শ্রোতার মন পূর্ব থেকেই সংযুক্ত। তখন ঐ একঘেয়ে স্বরই (দক্ষিণীদের ভাষায়) 'শ্রুতির' কাজ করে। বলা বাহুল্য চিত্রাঙ্গদা-অর্জুনের গল্পটি আমাদের জনসাধারণের সুপরিচিত নয়।

উদয়শঙ্করের নৃত্যাভিনয়ে সঙ্গীতের ব্যবহার আর একটু ভিন্ন ধরনের, যদিও সেই ব্যবহারের জাতি দক্ষিণী। তাঁর নৃত্যে আছে মোহন অভিব্যক্তি এবং তিমিববরণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি তাঁর দলেব সঙ্গীতাচার্যগণ যে সেই বিবর্তনশীল নৃত্যের উপযোগী সঙ্গীতিক অভিব্যক্তি দেখাবেন সে আর বিচিত্র কি? তথাপি, দুটি গতির মিল নেই, দুটির প্রকাশ সমান্তরাল রেখায় চলে। সঙ্গীত-নৃত্যের অপকল্প সৃষ্টি হয় না। হয় দুটির, সঙ্গীতের এবং নৃত্যের। নৃত্যের যখন অপকল্প সৃষ্টি হয় তখন নাটকীয় গতি নৃত্যেব সাহায্যে সবল হয়ে ওঠে; যখন নৃত্য শিথিল হয়, তখন নাটকীয় গতি আর থাকে না। (সাধারণতঃ উদয়শঙ্করের ব্যক্তিগত কৃতিত্বে, তাঁর প্রতিষ্ঠায়, তাঁর প্রযোজনানাশিল্লের জন্ত এই দুর্বলতাটুকু ধরা পড়ে না—কিন্তু দুর্বলতাটি তাঁর পদ্ধতির অন্তর্নিহিত।) যেখানে সঙ্গীত উৎকর্ষ লাভ করে, অত্যন্ত কম ক্ষেত্রে, সেখানে সঙ্গীত

উদয়শঙ্করের নৃত্যের অল্পকরণ করে। অবশ্য তারই নিজের ভাষায় অল্পকরণ, সেই জন্ত সমান্তরালতার উল্লেখ করেছি। ধরা যাক, উদয়শঙ্কর শিবের নৃত্যাভিনয় করছেন—শিবের সঙ্গে ভৈরোর একটা সংস্কারগত যোগ আছে—পিছন থেকে ভৈরো বেঞ্জে উঠল—উদয়শঙ্কর নৃত্য স্বক করলেন—তার নান্য রূপ ব্যক্ত করলেন—পিছনের কনসার্টে ভৈরোর ধ্বন-চৌধুন চলল। দুটিই ভাল লাগছে আমাদের, কিন্তু কান ও চোখকে পৃথক করা শ্রোতার অসাধ্য—ছেদ পড়ে গেল মনঃ-সংযোগে, সেই ফাঁকে দীর্ঘ হয়ে খুলে পড়ল অভিনয়ের স্বত্রটি। 'শিব-পার্কতীর দ্বন্দ্ব' এই দোষটি বর্তমান ছিল।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতের 'ব্যবহার' অর্থাৎ সঙ্গীত ও নৃত্যের সম্বন্ধ পূর্বপ্রকারের নয়, মিশ্রণের। সে মিশ্রণের অল্পপাত যথার্থ; কারণ সেখানে নৃত্য স্বাধীন, সঙ্গীতের ব্যবহারও তাই সশ্রদ্ধ। সেই জন্ত সমগ্র সৃষ্টির দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য আরও বেশী সার্থক মনে হয়। এমন মুহূর্ত কেউ নেই যে উদয়শঙ্কর কিংবা তিমিববরণের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্গে শাস্ত্রনিকেষ্টনের যে-কোন ছাত্রছাত্রীর তুলনা সম্ভব মনে করে। তুলনা চলে উদয়শঙ্করের ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধারণার। রবীন্দ্রনাথের ধারণা সর্বতোমুখী, তাই তাঁর সৃষ্টিকে কোন একটি উৎকৃষ্ট স্থাপত্য বলতে ইচ্ছা হয়—যেখানে মন্দিরের অঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, যার মধ্যকার ভাস্কর্য স্থাপত্যের অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভাস্কর্যের অল্পরূপ, যার পুজারী ও উপাসকের গঠন, আচার, ব্যবহার, গতি নিত্যসুই হৃদয়ঙ্গম, যার নৃত্যগীত মন্দিরের ধর্মাত্মকূল। রবীন্দ্রনাথকে এক জন উচ্চশ্রেণীর স্থপতি বলতে ইচ্ছা হয়।

সমগ্রতার দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের আলোচনা করলাম। স্থলবিশেষে জ্ঞাতি আছে—কিন্তু মূল সম্বন্ধে কোন জ্ঞাতি লক্ষ্য করি নি। বিশেষের আলোচনা আমার সাধ্যাতীত। বিশ্লেষণের ফলে যদি সম্বন্ধ-উপলব্ধির জ্ঞাতি ঘটে থাকে, তবে আমার ভাষাকেই যেন পাঠকবৃন্দ দোষী করেন।

উদ্ভব-আমেরিকা

(ওয়াশ্‌টন হুইটম্যান স্মরণে)

শ্রীকালিদাস নাগ

খুঁজে পেতে হবে
অসীম ধনবস্ত্রের খনি, অনন্ত রহস্যের আড়ৎ ভারত ।

ক্ষেপিয়ে তুলেছে নতুন ইউবোপের নতুন মানুষকে
ছুটছে দিকে দিকে কলম্বাস ভেস্‌পিউসি আরও নতুন
জানপিটে বোম্বের দল ।

রাস্তা কোথায় ? পথ বায় করা চাই ।

ভাসে ডোবে মরে—তবু ভয় নেই

রাস্তা বেরিয়ে যায় রোথের জোরে ।

ভাঙায় লাগে তরী, যেখানে ঠেকে বলে ইণ্ডিয়ান ।

কৈচো খুঁড়তে বেরোয় সাপ
পুরান দেশ খুঁজতে মিলে যায় অকস্মাতের দান—

আনকোরা নতুন মায়-পুবি
নিছক খালি নয়, অনেক মানুষের ভরা,

মায়াবাজের শেষ নৃপতি মণ্ডজেরা

বক্তব্য শেষ করে দেয় সেকেলে ইতিহাস

লাল মানুষ দিয়ে যায়, সাধা মানুষের হাতে,

টাইকা রক্তের দলিল

নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে পুরান রক্তের সাব ।

বিরিট পাহাড়, নদী, বন প্রান্তর

মুষ্টিময় মানুষের কবলে,

কে কার্টে জঙ্গল ? কে করে চাষ ? চাই মজুর, চাই দাস

কাক্সিগ্রাম লুটে কালো মানুষের ঘর ভেঙে অগ্নি হয়

জাহাজ ভাঙি দাসদাসী—জয়ের মত কেনা ।

অর্ধেক মবে, অর্ধেক বাঁচে, কাজ ত চলে যায় ?

খোঁড়া হয় খনি, ওঠে সোনা রূপো কত কী—

ফলে ওঠে সবুজ ক্ষেত, কালো মানুষের রক্তে উর্বর,

গর্জ্জে ওঠে কলকারখানা কোঠা বাড়ী,

আকাশ ভেদ করে ওঠে সৌরচূড়া

তাজ্জব ব্যাপার—অত্যাতিরিক্ত স্বর্গরাজ্য ।

সব চেয়ে বড় সব চেয়ে ছোট

সব চেয়ে দামী সব চেয়ে রুটোর দেশ ।

গুরুচণ্ডালী ভাষা গড়ে তুলছে

নতুন গল্প নতুন গল্প

বলতে পারে চলতে পারে যার যেমন খুশী

সবার রাস্তা খোলা

প্রথম কবি গেয়ে ওঠে 'খোলা পথের গান' ।

খোঁড়া হয়েছে স্মৃষ্টি খাল, পূবে পশ্চিমে মেলাতে,
হুইটম্যানের গলায় নতুন স্রঃ 'রাস্তা বাতলাও—
ভারতের সড়ক' ।

চার শতাব্দী আগে খোঁজ পড়েছিল এই সড়কের

খোঁজ মিলেছে কি ?

আজ ত দেখি শুধু ভারত নয়,

চীনে আপানী তুই ইবাণীতে ভরা আমেরিকা,

শাধা দেশের বুকে পড়ে তুলছে নতুন জাত লক্ষ লক্ষ

কালো মানুষ,

সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে নতুন জাতিভেদ, নতুন ছুৎমার্গ

'ভাষা যাও কাল' আদমি ।'

তারই মধ্যে ডাক পড়ে কালাদেয়, মবতে হবে যখন,

বিব্রট সাপের ছুটো হবে মেলাতে

কাটতে হবে পানামা খাল, মরতে মবতে,

'যো হুইটম্যান হুইটম্যান' কালো মজুরের এক কথা ।

সাগরে সাগবে দেশে দেশে হ'ল ত যোগ

মানুষে মানুষে যোগটা দাঁড়াল কোথায় ?

জ্বেরতা হলেই মানতে হবে ভাব সব দাবী সব অন্তায়

অবিচার ?

চা আর টিকিট আইনেব যুগে উড়িয়েছিল আমেরিকা

শ্রাঘ্য দাবীর ঝাঞ্জা—

তোমার ওয়াশিংটন জেফারসনের দল

জয়ভাঙ্গা বাজিয়েছিল সাম্য স্বাধীনতার,

চমকে উঠেছিল সারা ইউরোপ

তোমার ঘরানা ইংরেজও বুকেছিল, জেগেছে নতুন জাত

গাইছে নতুন স্র গড়ছে নতুন রাষ্ট্র, নতুন মানুষ ।

খোরো এয়ারসনের রচনায় গি তালি করেছ ভাবতের সঙ্গে

ভারতের এক স্পর্শ বসেছিল তোমার প্রাণ,

তাই ত লিনকনের যুগে তুলেছিলে বড় প্রশ্ন

অনেক রক্তপাত অনেক ক্ষতি সবেও সত্য রক্ষা

করেছিলে তুমি—

চামড়ার রঙ যাই হোক, মানুষ যখন, দাস থাকবে

নাক আর ।

তাই হুইটম্যানের গলায় বেজেছিল মহামানবের উদাত্ত

সঙ্গীত ।

তার পর অর্ধশতাব্দী হ'ল পার—কতটা এগিয়েছ
আমেরিকা ?
তোমার হাতে মুক্ত, তোমার দুঃস্থদের সাথী নিগ্রে
একসঙ্গে পায় না খেতে পড়তে খেলতে,
তাকে লিঙ্ক করতে আইনে বাধলেও মানুষে বাধা দেয় না।
বিশ্বধর্মাদিকরণে বসছে তোমার নেতারা
বিশ্বপ্রেম প্রচার করছে অনেক লোক
বিশ্বমৈত্রীব জন্তে ঢালছে অনেক ধন, তারিফ কবি
তোমার,

কিন্তু ঘরের ভিতর মানুষ যদি হয় লাক্ষিত নিষ্টি
সাম্য যদি হয় মিথ্যা, আইন পারবে না সাম্ভাতে
তোমার সমাজ
কুক্কেত্র বাধ্বে আবার
রক্তে ভাস্বে সোনার দেশ
শাদার স্বর্গ থেকে যাবে অলীক স্বপ্ন
সব মানুষ নিয়ে মাটির ধরাকে মন্দির না করলে।

দক্ষিণ-আমেরিকা

(রিকার্দো গিরাগদেস্ অবধে)

ক্রীকালিদাস নাগ

সুন্দরী তরুণী মত দাঁড়িয়ে আছ ললিত ভদ্রীতে
লাতিন আমেরিকা,
একদিকে প্রশান্ত সাগর অঙ্গদিকে অশান্ত অতলান্তিক
বাঁপিয়ে পড়ছে আলিঙ্গন করতে তোমার
পূর্ব পশ্চিমের অভাবিত মিলন হবে নাকি তোমার বুকে ?
বিরোট পাম্পা-প্রান্তর আঁচলের মত বিছিয়ে দিয়েছ ভাইনে
পুরান পৃথিবীর বাছ-পড়া উষ্ম তড়িত মানুষদের আশ্রয়
দেবে বনে ।

অজ্ঞাত যুগে এসেছিল পূর্ব-সাগর বেয়ে লাল মানুষ
তাদের বস্তু তোমার মাটি হয়েছে উর্বর
তোমার বরবপু নব তেজে তরঙ্গিত ।
পুরান মানুষের পাল মরতে মরতে নিয়েছে আশ্রয়
পাহাড়ে জঙ্গলে পারাগোয়াই ব্রাজিলের ভিতবে
ভুলে গেছে তাদেরই প্রাচীন পেরু গড়েছিল আদিম সভ্যতা ।

মবী মানুষের সাজ শিল্প পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—
যাহুয়র ভরে ।
উত্তম আদিস্ হয়ত আজও সাক্ষী দেবে
সেই অতীত বিশ্বত আমেরিকাব ;—
ভল্ভেঙ্ক আজ্ভেঙ্ক ইনকা—কত বিচিত্র সভ্যতা হয়েছিল
গড়,

সুদূর মেক্সিকো থেকে পেরু সাম্রাজ্য পর্যন্ত
গিরামিডে মন্দিরে ছুটেছে বিলুপ্ত মানুষের বিশ্বত কারু শিল্প

যে জন্তু তা'রা করেছিল শিকার
ঘটে পটে এঁকে গেছে তার আশ্রয় প্রতিকৃতি
প্রিয়তমার গলায় পরিয়েছিল বিচিত্র হার
স্বর্ণমণিতে ঝল্‌মল্ করে আজও যাহুয়রের তাকে ।
কোথায় প্রেমিক কোথায় প্রিয়তমা ।
দুর্কল পেলব প্রাণ পরাস্ত হয় প্রচণ্ড শক্তিমানের কাছে
কাব্রাল মাঘেলান পিজারবোর প্রতাপ
নতুন ববে গড়েছে এই দেশ
বিলুপ্তপ্রায় পুরান মানুষের কণ্ঠ প্রায় শোনাই যায় না ।

জেতাদের ইতিহাস জাগিয়ে বেখেছ দু'টি মধুর ভাষায়
তুমি লাতিনা !
মরাল গ্রীবা বাঁকিয়ে কখন বল হিস্পানী কখন পর্দুগী—
দুই মিঠে লাগে ;

ঠোঁটের আগে গানের মতন বাজে তোমার আলাপ
গা-ভাসান্ দিবে উজ্জিয়ে চলেছি—
ব্রাজিল-সড়কেব ভিড বেয়ে
রাস্তায় বাস্তায় বিচিত্র রূপের চিত্রশালা
নরনারী মূর্থে—অবাক হয়ে চাই—
শাদা কালো লাল মানুষ মিলেছে মিশেছে
এগিয়ে চলেছে হাত ধরে

নাই ব্যবধান নাই ঘৃণা উদার ব্রাজিলের বৃক
সাবা জগতের মানুষ—বিশেষ বরে' শাদা জগতের রঙডরান
মানুষ

হয়ত একদিন আসবে দেখতে শিখতে
অঙ্কুশমার্গী ত্রাজিলের অবদান
সমান অধিকার, অসীম সম্ভাব্যতা।

হিম্পানী ভাষায় আলাপ করছ আবার দেখি, লাভিনা।
কালো চুলে পরেছ ফুল
কাজল-হারা চোখে কালো বিদ্যুৎ
বেদুইন প্রেমের প্রচণ্ডতা হয়ত এনেছ বয়ে উষ্ণ রক্তের মশ্যে।
খোলা সবুজ মাঠে কচি ঘাসের জাতিম পাতা,
গেঁয়ো গায়ের ধরে মেঠো গান
জাগিয়ে তোলে তোমার পায়ে নাচের পরে নাচ
ভুলিয়ে দেয় পূর্ব-পশ্চিমের প্রভেদ।
সাদাসিধে গায়ের মাহুস দেখায় ঘোড়া দেখায় বাছুর গরু,
খাওয়ায় প্রচুর দুধ কীর, 'ছল্চে দে লেইচি'
আমার দেশের গরুরোর আর ননীচোরের কথা
শোনাই যদি, অবাক হয়ে বলে
'এ যেন ঠিক আমাদেরই 'গাউচো' ভাষা
গিরালদেসের নিপুণ পটে জাঁক।'

আসে ফেরার পালা
টিকিট-পত্র বাস-প্যাটরা ওলট পালট চলে
পূবের মাহুস ফিরছে শেষে পূবের দিকে
জেটি থেকে সিটি মারে জাহাজ
বিদায় নিতে বন্ধু-জনের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যাই
এই বিদেশে ছুটার দিনের চেনাশানার শেষে
লুকিয়ে রাখে বাঁধনহারা চোখের জল।
সন্দেহ হয়—মাহুস বোধ হয় সব দেশেতেই এক
জাতির দর্পে শক্তি-মোহে বন্দী মাহুস
একটু মুক্তি পেলে
সহজ হয়ে মিলতে ছুটে আসে;
এই কথাটাই আজ—
বারে বারে জাগে কেন? জানি না ত
আজ্ঞাস্তিনা।
বোধ হয় আছে ভাবী-কালের সঙ্কেত
উদাস করা তোমার দিগন্তের উদার বুকে।

অপরিবর্তনীয়

শ্রীবীহেন্দ্রনাথ ঘোষ

হুম্ম কত দিন পরে গ্রামে ফিরছে। যেখানে জীবনের
প্রভাব কেটে গেছে কত কি অপ্রজ্ঞান বুনে, সেখানে আজ
দীর্ঘ বারো বছর পরে।

রাডা সৰু পথ এঁকেবঁকে চলেছে। দু-পাশে কোথাও
মেহেদীর বেড়া, কোথাও আম জাম কাঁঠাল বট বা অশ্বথ
গাছের ঠেলাঠেলি, কোথাও বা ঘেঁটু শেয়ালকাঁটা বা ঝোপ-
ঝাপ। অপরাহ্নের মুহূর্ত অম্পষ্টতা পথে এসে নেমেছে।

পশ্চিম আকাশের বর্ণচ্ছটা তার মনে বুঝি রং ধনিয়ে
ছিল। এ পথে চলতে কত কথাই তার মনে জাগছে আজ;
সে ভাবছে, গ্রামখানা কত ছোট হয়ে গেছে এ ক-বছরে।
গাছগুলো ত তেমন সরল ভাবে দীর্ঘ শাখাপ্রশাখা মেলে
দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে নেই, ওগুলো অমন ঝুঁকে পড়ল কেন?
এ সেই কাকন-দীঘি, সঁতার দিয়ে দীঘিটা পার হ'তে হাত-
পা অবশ হয়ে পড়ত তখন, ওর কালো স্বচ্ছ জলে নীল
আকাশের ছায়া পড়ে পাতালরাজ্যের রাজকন্তাদের

নীলকান্তমণির প্রাসাদের কথা ভাবে মনে করিয়ে দিত,
—এখন ওর পরিসর কত সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

কত বড়, কি বিরাট দেখাত এ বটগাছটা তখন।
ঝুরিগুলো ছায়াধূসর গোখলির আলো যেন কয়েকটা কালো
কালো সবলরেখা। এখন ওগুলো মাটির বুকে নেমে গিয়ে
বস শুয়ে নিচ্ছে—বাতাসের দোলমতেও নিশ্চল। তখন
ওরা শিশু ছিল—ব্যগ্র আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলে হালকা
হাওয়ায় সহজ চাকল্যে নেচে উঠত মানবশিশুদের সঙ্গে
নুকোচুরি-খেলায় ছলে। আজ এ-মাটির মধ্যে শেকড়
গলিয়ে দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে অনন্যীয় ভঙ্গীতে। বড়-
বাদলে এদের এখন নাড়া দিতে পারে না। এদের শিশুবৃত্তি
যুচে গেছে।

এই নিম্ন সৰু পথটা, তখন এটার অপর প্রান্তের
নীমারেখা লুপ্ত ছিল ওর মনে। এর বাঁক বাঁকে কত লুকানো
রাজ্যের সম্মানে মন তার কিরত শৈশবে। বনফুলের

যুহু হুর্ভি মনে হ'ত যেন এই পথেবই অঙ্গসৌরভ। স্তবন-সন্ধ্যার আবছায়ায় এ পথের জনশ্রুতি অদৃশ জগতের হান-উঠত ভরে।

পুবনো বসতবাড়ীটার চূণ-বালি খসে গিয়ে হস্ত বার্ককা এসে গেছে। চার-পাশে আগাছার জঙ্গল নিন্দি হয়ে গেছে এত দিনে, হয়ত চেনাই যাবে না। বাড়ীটির মোতলায় একটা ছোট্ট ঘব ছিল—সেটা ছিল তার পড়র কুঠুরি। সেখানে ব'সে কত দিন ও রাত কত ভাবনায় তলিয়ে গেছে তাব মন। সে ভাবনার ছোঁবাচ এখনও হয়ত লেগে আছে ঘরের দেয়ালগুলোয়, সবুজ শ্র-ও-র মত।

মিস্ত্রির-পুকুরের ঘাটটা শেষে আঘাটার পবিত্র হয়ে। ওর ধাপগুলো ভেঙে গেছে একেবারে। ওইখানে ব'নে ব'সে বন্ধুদের সঙ্গে কত রাজ্যের কত কথা বলেছে সে। এমন তারা কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে কে জানে! ফুটবলে হান-জিত, সেকুবাড়ায় আগুন নেবানো, মুচিপাড়ার সল্জা ও বসন্ত, লাঠিখেলায় গোরাচাঁদের নিপুণতা—ইত্যাদি কত কি গম্ভীর আলোচনায় ঘাটের আশপাশের হান-যখন ভারী ও গমগমে হয়ে উঠত তখন পুকুরের জলো হাওয়া যুহু শীতল নিশ্বাসে সে ভাবটা দিত হালকা ক'র।

স্বপ্ন ভাবছে, সব বদলে গেছে। মাত্র কয়েকটা বৎসরের ব্যবধানে এ কি পরিবর্তন! তার মনের মান-বুলানো পুরনো স্মৃতির সঙ্গে সব কিছু আজ ঠিক মিলছে না যেন। গ্রামখানার স্বেচ্ছবি তার চিত্তচুম্বিকায় ভাগ্যান্বিত। ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাব গৈশবস্বর্গে, তাব মধ্যে ছিল বিশাল উদারতা, সংকীর্ণ স্বল্পতার ধারণা তাতে ত ছিল না।

এখানে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থিরই ছিল না যে এখানে আসবে। তবু এসে যে এত সব পরিবর্তন সে বোধহয় পাবে তা মনে হয় নি। কালের রথাত্মায় তার পুরনো ভাবনা-বেদনার বহুনাশের কুহুম গিয়েছে পিষ্ট হয়ে।

গ্রামখানা যেন শবরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল, বনে ভর প্রিয়বস্ত্র রামচন্দ্র আসবে, যখন শেষে দয়িতের স্নো মিলল, তখন শুকিয়ে ঝরে গেছে তার বিকশিত যৌবন।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করার পব থেকে স্বপ্নকে সরকারী কাজে দেশবিদেশে ঘূবে বেড়াতে হচ্ছে অনেক দিন ধ'বে। আজ সহসা ট্রেন থেকে এই স্টেশনে নেমে পড়তে কেন তার অস্বাভাবিক একটা ভাবপ্রবণ কৌতূহল হ'ল, তা স নিজেরই জানে না। এত কাছে এসে পড়েছে, আব একবার এই পুরাতন লীলানিকেতনের সংসার না নিয়ে ফিরতে তব ইচ্ছে হ'ল না। মাত্র ঘণ্টা দুই কি তিন, তার পথই ত্র স্মারক এই গতিশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে চলা; ক্ষতি কি?

পথে নিপু সবকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্বপ্নকে সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ীতে। তার পর খবর দিতে ছুটল আর সবাইকে।

নিপু ছেলেবেলায় ভারী ঝগড়াবাঁটি করত। এখনও ওর ঠোটের তলায়, ক্রব ওপরে দস্তিপনার দাগ মেলায় নি। কয়েকটা বছর, আর একটি গৃহিণী, তাকে কিন্তু এখন বেশ সভ্যভাব্য ক'রে তুলেছে। ছোট একটুখানি জমিদারী তদারক করে, আর অবসর-সময়ে তাসপাশার আড্ডা বসায় বাড়ীতে।

ছোট্ট তরুণ সঙ্গে তাহ'লে নিপুর বিয়ে হয়েছে?—স্বপ্ন মনে মনে খুশী হয়ে বললে, বেশ। তরু শ্রামল চারাগাছটিব মত ছিল ছোট, চিকণ ঢলঢলে ছিল মুখখানা। ঠোট দুটি পূবস্ত, লক্ষ্মীমস্ত। হাসি আব কান্নায় তার চোখের রংটাও যেন বদলে যেত। মুখে ছিল না ভাষা, চোখেই কথা কইত। কেমন একটা ভালমানুষি ভাব ছিল তার চোখে মুখে, যেন তার অতি বড় মিথ্যে কথাটাও অবিশ্বাস ববতে প্রবৃত্তি হ'ত না। স্বপ্নের এক সময়ে ওকে ভারী ভাল লাগত। বারো বছর আগেকার ঐ তরুকে।

সময়ের অতিপাতে সে-তরু এখন ভিন্ন রূপ। সে এখন কথা কয় যেন গ্রাম্যকোনের মত। যত ক্ষণ কিছু বলবার থাকে, তত ক্ষণ ত বকেই, বলবার কিছু না-থাবেও বিরাম নেই। বুদ্ধির চাষ নেই মগজে, কাজেই বোঝে কম, আবার যা বোঝে না তা নিয়ে করে তর্ক আব বাবায় গোল। তবুদেহের সে স্বপ্ন সীমারেখা নেই, অতিমেদন্যের চাঞ্চল্য তাব মনে গেছে অকালে।

পরিচিতের দল প্রায় সবলেই এসে জুটল নিপুর বাড়ীতে। ডামু, অমু, দীপু, হেমা ইত্যাদি দু-চার জন বাল্য সখা ও সখীদের দেখে মনে হ'ল যেন এরা ভিন্ন জগতের লোক। ওরা কেউ বাবা, কেউ মা,—কঠোর বর্ধব্য ক'রে ওদের মুখ কি গম্ভীর হয়ে গেছে। তারই শুধু ভবঘুরে-বৃত্তি ঘুল না, চোখে তার লাগল না সংসারের মায়াধোর।

গাঁয়ের ছেলেবুড়ো অনেক এল খবর পেয়ে। শুনেছে গাঁয়ের ছেলেটি কোথাকার হাকিম হয়েছে, তাই তাদের ঔৎসুক্য জেগেছে। কিন্তু ঐ-সব মুখের সঙ্গে স্বপ্নের যেন স্পষ্ট পরিচয় নেই। ঘুমন্ত স্মৃতির মধ্যে খুঁজতে লাগল সে ওদের পুবনো চেহারাগুলো।

সবাইকে ডেকে নিপু বললে, “ও নিমাই খুড়ো, ও নাহু দাদা, জান ত আমাদের স্বপ্ন এক জন ডাকসাহেব হাকিম। কত দিন পরে দেখা, আমি কিন্তু মূদীপাড়ার রাস্তায় ওকে দেখেই স্নিতে পারলাম। কেমন? নয় রে স্বপ্ন? তুই কিন্তু বিশেষ বদলে যাস নি, শুধু সাহেবদের মত একটু ঢাঙা আর ফরসা হয়েছিস। বেশ আছিস, না রে স্বপ্ন?”

তার ওপর সকলের প্রসন্ন দৃষ্টি—স্বস্ত্য যুগ হাসলে। বললে, “তাই মনে হচ্ছে নাকি?”

পিঠ খাবড়ে দিয়ে নিপু হেসে বললে, “হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তাই ত। আচ্ছ, স্বমন, এদিকে তাকা ত, এদের সবাইকে চিনতে পারছিস?”

স্বস্ত্য সেদিকে তাকাল, দেখল, ওরা বঁসে বঁসে হাসছে যুগ চাপা হাসি। বাঁ-দিকে ওই যে বেঁটে ক্ষুদ্রা লোকটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে গৌঞ্জে তা দিচ্ছে, ওই ত হেমা? স্থলে ধারাল ছেলে বঁলে হেমাস্থের খ্যাতি ছিল। এখন কি কবছে কে জানে? একথানা অপরিচ্ছন্ন শাড়ী পরে, গিম্বিবারিব মত চেহারা, উনি কে? স্বস্ত্যের মনে ওদের যে চিত্র ছিল তা কি ক্রমে মুছে যাচ্ছে? না, ওরাই পরিবর্তনের শ্রোতে ভেসে ভেসে কোন্ দূরে গেছে যেখানে তার দৃষ্টি আজ ব্যাহত?

“অহুকে চিনতে পারছ, স্বমননা?” বঁলে তরু নূতন কঁবে সকলের পরিচয় দেবার জন্তে এগিয়ে এল।

“নিশ্চয়ই পেরেছি, কি বলছিস তরু! তা আর পাবি নি?” স্বস্ত্য মিথ্যে বঁলে ফেলল ধরা পড়ার লজ্জায়।

“কই, দেখাও দেখি, ভাই!” বঁলে তরু স্বস্ত্যের পাশে এসে দাঁড়াল।

স্বস্ত্য যেন প্রথমটা দিশেহারা হয়ে গেল। একটি স্বল্পকেশা, শীর্ণা বিধবা মেয়ে তার দিকে এগিয়ে এসে হেসে ফেলল, “ছি: স্বমননা, আমায় ভুলে গেলে ভাই? বরাত আমার।”

“সত্যি, ভুলি নি রে অল্প, প্রথমটা বুঝতে পারছিলাম না ঠিক, তার পর...” ওর দিকে চেয়ে চেয়ে স্বস্ত্যের চোখে ভেসে উঠল অল্পপমার কিশোরী মূর্তিটি। সত্যি সে ভোলে নি একেবারে। পাঠশালার ছেলেমেয়েদের ওই যে ছিল সর্দারগী। গেছো মেয়ে বলত শুকে সবাই। একবার স্বস্ত্যকে ও বেত খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। দেখতে খুব সুন্দরী না হোক, ওর মুখে চোখে একটা জলজলে ভাব তখন ছিল—যেটা এখন নিবে গেছে সংসারের দুঃখ তাপে। কত কথাই মনে মনে স্বস্ত্য ভাবছিল। ওদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা স্বক হয়েছিল ইতিমধ্যে।

ওদের সঙ্গে মন খুলে সে আলাপ করতে পারে না। কেমন যেন একটা অলঙ্ঘনীয় দূরত্ব। অল্পদার, সর্দার মন তার। ওরা ত বেশ সহজ, সরল; সে কেন নিজেকে এমন গুটিয়ে নেয়? এত দিন ধরে গাঁয়ে ওরা বাস করে আসছে, গাঁয়ের অস্তঃপ্রকৃতি যেন ওদের অস্থিমজ্জায় আশ্রয় নিয়েছে। বাইরের জগৎ ওদের কাছে হয়েছে বিলুপ্ত—ওদের দৃষ্টিতে তাই রোমন্থনকারী গ্রাম্য গাভীর শ্রান্ত ক্লান্ত

চোখের আভাস ধরা পড়ে। ওদের দোষ কি তাতে? ওদের যৌবন-চাক্ষু্য স্তিমিত হয়ে গেছে, ওরা যেন জীবনের দুর্গম পথে আর এগোতে পারছে না।

পরিবর্তন জগতের নিয়ম,—স্বস্ত্য ভাল করে আজ উপলব্ধি কবছে।

কত কথাই ওরা কয়ে চলেছে। তার জটিলতা থেকে তরুর একটি কথা মুক্তি পেয়ে স্বস্ত্যের কানে বাজল।

“দেবীর কি হ’ল, বল ত! এল না যে বড়? নিধুরামকে দিয়ে খবর পাঠালুম।”

“দেবী?”—অজ্ঞাতসারে স্বস্ত্যের মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

নিপু র জী তরু ওব অহুমন্স ভান দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল। মাংসল মুখে স্থল হাসি ধীরে ধীরে সামলে সে তার পব বললে, “বেশ, স্বমননা, কত কথাই আমরা বলাবলি করলাম, কিছু শোন নি ত? দেবী, দেবী, মনে নেই বুঝি? হাসছ যে, বুঝেছি। হ্যাঁ, দেবী এই গাঁয়েই থাকে—ওই এবটেরে। ওর স্বামী পাশের ঐ মালঞ্চ-গাঁয়ের জমিদারী পেয়েছে, মামার বাড়ীর বিষয়। ওবা শহবেও যায় মাঝে মাঝে বেড়াতে। কেমন ছুটি ছুটি ছেলে হয়েছে, ভাবী চকল আর সুন্দর। শুকে দেখতে তোমার ইচ্ছে হয় না, স্বমননা! বিয়ের পর ও কত কান্নাই কাঁদল।

দেবধানীকে স্বস্ত্য ভোলে নি, কোন দিন পারবেও না। এত কাছে এখানে থাকে ও, তবু দেখ হ’ল না।

ওদের কথা চলেছে। স্বস্ত্য মনে মাঝে মাঝে বোঁগ দিচ্ছে; হাসছে, মাথা নাড়ছে, যত্নের মত সব শুনেছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে, ওদের কাছ থেকে অনেক দূরে সে চলে গেছে, অন্য জগতে, যে-জগতে আছে, একসঙ্গে বসন্তে লঘু বাতাস ও শরতের সোনালী আলো।

একটা নাম যেন যাহুমন্ত্রে তাকে পুরনো দিনের সৌরভ এনে দিলে।

দেবধানীদের বাড়ীটা ছিল তখন স্বচ্ছতোয়া পিঙ্গালী নদীর ধারে। নদীটার পাশে পাশে যে রাজা মাটির পথটা চলে গিয়েছে গাঁয়ের স্থলের দিকে, সেই দিক দিয়ে স্বস্ত্য বই হাতে চলছিল শরৎকালের এক প্রসন্ন প্রভাতে। বাড়ীর বাইরের দিকে একটা স্থলের বাগান। সেখানে ভিজ্জে এলোচুলে কিশোরী দেবধানী পিঙ্গালীর স্বচ্ছ জলের দিকে চেয়ে আনমনাভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিন তাকে দেখে স্বস্ত্যের মান হয়েছিল, মেয়েটি যেন পদ্মগন্ধি। সূর্যের সোনালী আলোর সেদিন তার কুন্তলদল পদ্মদলের মত বলমল করেছিল অপূর্ণ দীপ্তিতে।

তার আগেও হুমত্ন তাকে কতবার দেখেছে, কত কথা বলেছে। কিন্তু ঐ এক পরম শুভক্ষণে ওকে অমন হুমত্ন কেন দেখাল, তার কারণ হুমত্ন খুঁজে পায় নি। ফুলের কুঁড়ির মত কি করে এক রাতে মেরেরা ফুটে ওঠে, এটা তার কাছে একটা চিরন্তন রহস্য।

দেবধানীর বাবা সুরথবাবু শেষ-বয়সে তাঁর মাতৃহারা কষ্টাটিকে নিয়ে এই গাঁয়ের শান্তনিক অঞ্চলে বাস করবার জন্তে এসেছিলেন শহর থেকে। বাড়ীটা তাই করেছিলেন গাঁয়ের এক সীমান্তে, লোকালয় থেকে একটু দূরে। ভদ্রলোক বড়ই অমায়িক-প্রকৃতি, কাজেকর্মে সবাইকে তিনি বাড়ীতে ডাক দিতেন।

সেদিন তাঁর বাড়ীতে কি একটা উৎসব বা ক্রিয়াকাণ্ড। বহু লোকের সমাগম হইবে। গাঁয়ের সকলেই ত এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে, শহর থেকেও বহু ভদ্রলোকের আগমন হইবে। হুমত্নও এসেছিল কলেজের গ্রীষ্মের ছুটি উপলক্ষে। নিমন্ত্রণ রাখতে এসে দেখল কর্মবাড়ীর কাজের ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলা নেই—তখনই নিজে কাজে নামল যেন ঘরেরই লোক। ভদ্রলোকদেব আদর-অভ্যর্থনা, তাঁদের আহ্বানের ব্যবস্থা, সব কাজেই ও গেল এগিয়ে। যে কোন সমস্তা আসে, সুরথবাবু হাঁকেন, হুমত্ন; অগাধ বিশ্বাস তাঁর ওর ওপর।

কাজকর্ম চুকল একটু রাতে। কর্ম-অন্তে স্নান শরীরে দোতলার খোলা ছাদে একটু বাতাস পাবার জন্তে হুমত্ন বারান্দা পেরিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ চোখে পড়ল, বারান্দার রেলিঙে হুঁকে পড়ে কাবা ছ-জন হাসছে আর গল্প করছে, দেবধানী, আর সুরথবাবুর কোন আত্মীয় এক বৃক। হুমত্ন সেখানে আর দাঁড়াল না,—ক্ষতপদে চলে গেল ছাদের দিকে, যেখান থেকে পিয়ালী নদীর জলো বাতাসটা চোখে-মুখে এসে লাগে। উদাস চোখে, ভারাক্রান্ত মনে দাঁড়িয়ে রইল কতকক্ষণ সেখানে সে জানে না। কামিনীফুলের ঝাড় থেকে তীব্র একটা গন্ধ এসে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিল।

“হুমত্না, তোমার খাওয়া হয় নি ত? খাবে এস।”—দেবধানী এসে ডাকল।

হুমত্ন নির্বাক, নিরুত্তর। পিছনে যে দেবধানী এসে কখন দাঁড়িয়েছে তা সে জানতে পারে নি প্রথম, জানতেও যখন পারল তখন চোখ ফেরাল না সেদিকে। অহেতুক হৃদয় অভিমানে তার বুক যেন তোলপাড় করছিল।

“হুমত্না, আমার ওপর রাগ করেছ? ধীরে ধীরে দেবধানী এসে তার হাত ধরল। শিউরে উঠে বোবার মত চাইল হুমত্ন ওর দিকে নিশ্চলক অর্থহীন চোখে।

“কেন? কি করেছি আমি? বল না, বলবে না?” দেবধানীর চোঁট শুকিয়ে গেল, চোখ দুটো অশ্রুর আভাসে কাঁপসা হয়ে এল।

“কি হয়েছে? হয় নি ত কিছুই। একটু কাঁকা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালুম এই ত সব।”

“বুঝেছি, চল, খেতে হবে না বুঝি?...কি বোকা তুমি হুমত্না, একটুতেই রাগ কর”—হুমত্ন পরিহাসে চটুল, বুদ্ধির আভাষ দীপ্ত একটা কটাক্ষ পাত করে দেবধানী হুমত্নের হাত ধরে টানল—হুমত্ন তার দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেলল। হাসির হাওয়ায় তার মুখের কালো মেঘ গেল সরে।...

তার পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

আর এক দিনের কথা। সেদিন বিকেলের দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। অপরাহ্নের যত্ন রক্তাভ আলোয় পৃথিবীর বৃকে যেন ক্ষণিক স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে। মেঘ আকাশের কোণে কোণে জমে আছে তখনও। বর্ষণ-সম্ভাবনায় মস্তুর মেঘের ওপরে সেই আলো এসে পড়তে আকাশের মুখটাকে যেন মৃত পাণ্ডুর বঁলে বোধ হচ্ছে। আলোটা ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে আকাশের গায়ে গেল মিলিয়ে। আবার সুপরাপ বৃষ্টি শুরু হ'ল। বারান্দার ধাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবধানী আকাশের ভাবটা লক্ষ্য করছিল। হুমত্ন এল ভিজে ভিজে।

“ভিজেছ ত বুব, আচ্ছা ছেলে যা হোক, ভিজে আসতে কে বলেছিল? শোন এদিকে।”

এগিয়ে এসে দেবধানী হাত দিয়ে হুমত্নের জামাটা পরীক্ষা করল—“ছেড়ে ফেল এগুলো।”

“না, না, ভিজি নি মোটেই, ব্যস্ত হলো না; আর ভিজলেই বা...কাকাবাবু কোথায়?”

“ঘরে বসে আলো জ্বলে পড়ছেন।”

“চল ওর সঙ্গে দেখা করে আসি, আমি ত কাল যাচ্ছি।”

“হ্যাঁ, যাই, দাঁড়াও না একটু এখানে।”

ছ-জন নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশ জুড়ে ঝঝঝ করে বৃষ্টি নামল। রাস্তাঘাট বুঝি ডুবে যায়। অন্ধকারও চার দিক ছেয়ে ফেলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠাহর করা যায় না। কোথাও একটু আলোর রেখামাত্র নেই। কতক্ষণ কেটে গেল, কেউ কথা কইল না। দেবধানী গুন গুন করে গাইতে শুরু করল—

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে আলো রে তারে আলো...

নদীর বৃকে আকাশটা কি আজ ভেঙে পড়বে? খালি সুপরাপ সুপরাপ—অবিরাম জলধারার পতনধ্বনি, সেই সঙ্গে ভেকের কলরব। অদূর মন্দির থেকে কীসর-কটীর শব্দ কীল হয়ে কানে বাজছিল।

“কাল যাব, দিবা।”—হুমত্ন প্রথম কথা কইল।

“কত দিন থাকবে সেখানে?”

“কি জানি!”

“আমার অন্তে তুমি একটুও ভাববে না, আমি জানি!”

“জান? তবে ত ভালই হ’ল!”

“তোমার কি বল না? শহরের কত নতুন শাস্ত্র, নতুন জিনিষের সঙ্গে পরিচয় হবে তোমার প্রতিদিন। হয়ত কত নতুন মেয়ে...”

“তাদের দিকে...আমি?...কি বলছ তুমি?”

“না, না, আর বলব না, রাগ করলে?”—দেবানী হুমন্ত্রের কাছে এসে দাঁড়াল; নখ দিয়ে তার পাঞ্জাবীর বোতামটা খুঁটতে খুঁটতে বললে, “সত্যি, রাগ করলে?”

হুমন্ত্র কথা কইল না। দেবানীর দিকে শুধু একবার চাইল। অন্ধকার ভেদ করে মেয়েটির চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। চোখে ওর ভরা-গাঙের মত বর্ষার জল ছাপিয়ে আসছে। মুহু মুহু আঁখিপল্লব কাঁপছে।

সে দৃষ্ট ত আজও হুমন্ত্র ভুলতে পারল না।

হুমন্ত্র গেল, কিন্তু আর ফিরল না। জীবনের জেঞ্জার তাকে বয়ে নিয়ে গেল দূবে, আরও দূরে।

কত দিন, কত রাত কেটে গেছে তার পর। সময় যেন হালকা পাখায় উড়ে গেছে অনন্তে। এখনও মনে হয় যেন সেদিনকার কথা।

দিবানন্দ দেখছিল হুমন্ত্র এতক্ষণ।

ওকে দেখতে যারা এসেছিল, তাদের অনেকেই সলে গেছে ইতিমধ্যে। আলাপ-আলোচনাও এসেছিল স্তিমিত

হয়ে। সহসা যেন নিস্তাভ হুয়েছে এমন ভাবে চেয়ে হুমন্ত্র দাঁড়াল। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, “দেখ, ভাই নিগুদা, এখন চল, আমার আবার দেবি হয়ে যাচ্ছে; সাড়ে আটটার ট্রেন না ধনলেই নয়। সাড়ে আটটা ত বাজছে।”

“বা রে! দেবীর সঙ্গে দেখা করবে না?” চক্ক বললে।

“না, ভাই, থাক; কাজ আছে দরকারী। আসি, মনে কিছু ক’রো না যেন।”

তরু, অহু, ভাহু তাকে প্রণাম করতে আসছিল; ওরে অবসব না দিয়েই, পিছন ফিবল হুমন্ত্র, ছুটে চলল সে স্টেশনের পথে।

রাস্তা দিয়ে চলেছে সে, অন্ধকাবে। ভাবছে, দেবানী না এসে, না দেখা নিয়ে ভালই করেছে। যৌবনের যে অতুলনীয় ছবি আঁকা আছে তব মর্শপটে, তাকে সে মেবে না মলিন হ’তে কোনক্রমে। থাক তা অক্ষয় হয়ে সন্ধ্যা দৃষ্টির অন্তরালে, গোপন মর্শকোষে। জগৎ বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে; গ্রামটা বদলে গেছে কত রকমে, সবাই বদলে গেছে এখানকার। কিন্তু দেবানী? অন্ত সবাইকার যত হুমন্ত্র ওকে অতিক্রান্ত যৌবনার বেশে চায় না দেখতে। এখনও যে সেই দেবীমূর্তি পুঞ্জিত কেশভার শিরে, যৌবনের রক্তরাগ-রঞ্জিত দেহে, হরিণের মত তৃষ্ণার্জ চোখ দুটি মেল মনের মন্দিরকে আলোকিত করে বিরাজ করছে অপরিবর্তনীয় রূপে।



নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৮

চা-পান ও আহাৰাদির পালা শেষ হইলে আমাদের যাত্রা-
রস্তার আয়োজন। গৃহস্থামী ছিলেন না, স্বামিনী তিন-চার
সের সত্ত্ব দিতে চাহিলে স্তম্ভিত-প্রজ্ঞ আমাকে তাহা বাধি
লহিতে বলিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল না যে আমার ঐ
হাঙ্গা বোঝা বহিতেই অবস্থা কিরূপ কাহিল, স্ততরাং তাঁহার
বোঝা ভারী হওয়ায় আমারটাও সেইরূপ দাঁড় করাইতে
চাহিলেন। সত্ত্ব আশা শেষ পর্যন্ত ছাড়িতেই হইল, এবং
তাহাতে তিনি চটিলেনও বিলক্ষণ, কিন্তু উপায় কি? বাহ
হউক, রওয়ানা হওয়া গেল এবং বিলক্ষণ পরে চা-কোর
নিকট পৌঁছান গেল। চা-কোর রাজবংশ এক কালে
নিশ্চয়ই প্রবল প্রভাবশালী ছিল, নিবট পক্ষের উপরে
প্রাচীন রাজপ্রাসাদের প্রস্তরপ্রাচীর এবং দুর্গের ভগ্নাবশেষ
তাহার সাক্ষীরূপে এখনও দণ্ডায়মান। বেলায় পৌঁছিব
পূর্বে ভাঙা মাটির দেওয়াল দেখা গেল, শুনিলাম আসে
এইখানে চীন সৈন্তাবাস ছিল। তখন এই দিকে কড়া পাহারা
ছিল, বিনা আজ্ঞাপত্রে কেহই সীমা পার হইতে পারিত না।
চা-কোর গ্রামের কয়েকটি গৃহও তাহাব অবস্থার ক্রমাবনতির
পরিচয় দেয়। এখানে স্তম্ভিত-প্রজ্ঞের পরিচিত ব্যক্তিও
ঘবে ছিলেন না, তবে অনেক বলা-কওয়ার পর আমরা
থাকিবার অস্বস্তি পাইলাম। সন্ধ্যার পর অল্প অল্প
শিলাবৃষ্টির পর সন্ধ্যারে বর্ষণ আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে
বাহিবের অঙ্গন জলে ভরিয়া গেল এবং মাটির ছাদ দিয়া
যেখানে-সেখানে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার সময়
বৃষ্টি গৃহস্থামিনী ফিরিল। স্তম্ভিত-প্রজ্ঞ তাহাকে চিনিতে
এবং আমার উপর চটিয়া থাকায় তাহার নিকট আমার
নিন্দাবাদ স্বরূপ করিলেন। আমি তাহাতে কিছু মনে
করিলাম না, কেন না আমি জানিতাম তাঁহার মনটা
ছিল সাদা।

ঐগারই জুন প্রাতে আমরা আবার চলিতে লাগিলাম

এবং কিছু দূর পূর্বমুখে বাইবার পর কুণ্ডনদী পার হইলাম।
নদীর স্রোত বিস্তৃত এবং তাহাতে জলও ছিল জম্বাপ্রমাণ
গভীর। জল এতই শীতল যে মনে হইতেছিল পা বুঝি
কাটিয়া যায়। অতিকষ্টে নদী পার হইয়া মেঘপালকদের
আড্ডায় গিয়া চা-পান করিলাম। আগেই বলিয়াছি
এদিকে আমাকে বোঝা বহিয়া চলিতে হইতেছিল, উপরন্তু
অল্প খাদ্যের অভাবে সত্ত্ব খাওয়ায়—সত্ত্বতে আমার
অভাবতই রুচি নাই—শরীরও দুর্বল ছিল। পথে আর
একবার চা খাইলাম। এখন আমি কেবল মনের
জোরে পথ চলিতেছিলাম, পথে কয়েকটি ছোট গিরিসঙ্কট
(লা) ছিল, দ্বিতীয়টি পার হইতে আমাব আর শক্তি রহিল
না। কতকগুলি অল্প লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কোর
হইতে শে-কবু জোড়ে বাইতেছিল, তাহাদের একজন আমার
বোঝা লওয়াতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম। আমার
খাল হাতে চলিবার সামর্থ্যের অভাব ছিল না। পাহাড়
হইতে নামিয়া একটি ছোট নদী পার হইয়া শুনিলাম সামনের
ছোট পাহাড়ের ওপারেই শে-কবু জোড়। পথে বিলক্ষণ
এক জায়গায় বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার চলিতে লাগিলাম।
বেলা তিন-চারটার সময় শে-কবু পৌঁছিলাম।

লঙ্কোর লোকজন শে-কবু গ্রামে যেখানে থাকিবার
ব্যবস্থা করিল, আমরাও সেখানেই রহিলাম। শে-কবু
গুহায় স্তম্ভিত-প্রজ্ঞের পরিচিত এক ভিক্ষু ছিলেন, কিন্তু
স্তম্ভিত-প্রজ্ঞ সেখানে বাইলেন না। আমার পা কাটিয়া
গিয়াছিল, স্ততরাং বোঝা ঘাড়ে করিয়া চলিবার সামর্থ্য
ছিল না, সেইজন্য টশী-লুগো পর্যন্ত ঘোড়া ডাড়ার চেষ্টা
করিতেছিলাম। সেই চেষ্টায় ঐগারই হইতে চৌদ্দই জুনের
দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও কিছু ব্যবস্থা করা গেল না।
প্রথম দিনই আমরা শে-কবু মঠের অবতারা লামার নিবাস
দেখিতে গিয়াছিলাম। মন্দিরটি স্বন্দর মূর্তিরাজি ও চিত্রপটে

অসংজ্ঞিত। লামা গৃহে ছিলেন না, তাঁহার গৃহ রাজপ্রাসাদ বলিলেই হয়। প্রাসাদের সম্মুখে সন্ধ্যার বাগান, এবং বাগান ফুলগাছের টবে সাজানো। তেরই ছুন গুহা দেখিতে গেলাম। গুহা পাহাড়ের নিম্ন হইতে শিখর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট মঠ, তাহাতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত ভিক্ষু বাস করেন। ইহার মন্দির বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যময় দীপের আলোকে উদ্ভাসিত। এখানকার প্রধান পণ্ডিতের (কু-শোক খেসো) সঙ্গে—যদিও স্মৃতি-প্রজ্ঞের ইচ্ছা ছিল না—দেখা করিতে গেলাম, তিনি চীন সীমান্তের খাম প্রদেশের লোক এবং লাসার সেরা গুহায় শিক্ষিত। প্রথমে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তার পর তন্ত্র ও বিনয় সম্বন্ধে আলাপ হইল, আমি বলিলাম, “যেখানে বিনয় মতগান, জীবহিংসা, জী-সংসর্গ আদি বর্জন করে, সেখানে তন্ত্রমতে ঐ সকল বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এইরূপ বিবাদী মত কিরূপে একত্রে চলিতে পারে?”

লামা বলিলেন, “ইহার অর্থ, ভিন্ন অবস্থার লোকের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। যেমন রোগীর ভিন্ন বৈদ্য অনেক ঋদ্যাকে কুপণ বলেন, কিন্তু রোগ উপশমের পর ঐ লোকই সেই ঋদ্য ভোজনে উপকার পায়, তেমনি বিনয় সাধারণ লোকের ভ্রম ব্যবস্থা এবং তন্ত্র (বজ্রযান) তাঁহাদের ভ্রম ঋদ্যের অগ্রসর হইয়াছেন।”

পণ্ডিত মহাশয় আমাদের যাত্রার বাখার ব্যাপার শুনিয়া লাসা-মাত্রী এক ব্যাপারীকে ডাকাইয়া আমাদিগকে তাহা হইতে লইতে অত্যাচার করিলেন এবং আমাদের মোটবাট লইয়া গুহায় চলিয়া আসিতে বলিলেন। পরদিন সেই ব্যবস্থানুসারে আমরা গুহায় আসিলে পর শুনিলাম সে সপ্তদাগর চলিয়া গিয়াছে। নিকটস্থ এক খচরওয়ালার কাছে গিয়া ভাড়া চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনও কিছু ঠিক হইল না। শেষে স্মৃতি-প্রজ্ঞ লঙ্কোরের এক ভিক্ষুকে (চাবা) বিনা-পয়সায় লাসা তীর্থ দর্শনের লোভ দেখাইয়া আমাদের সঙ্গে যাইতে রাজী করাইলেন।

১৪ই জুন ত্রিপ্রহরে ভিক্ষুর স্বন্ধে আমার বোঝা চাপাইয়া যাত্রা আরম্ভ করিলাম। পথ একটি নদী পার হইয়া বামদিকে নিম্নাভিমুখী হইয়া অল্প এক নদীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া চলিল। এই উপত্যকা বেশ প্রশস্ত, নদীর কিনারে ছোট ছোট বৃক্ষ, এখানে

সেখানে ক্ষেতে বিঘ্নপ্রমাণ যব ও ধানের চারাম জলের সেচ— এই সব দেখিতে দেখিতে চারটা নগর ঘেরা গ্রামে পৌছান গেল। এখানকার এক ধনী গৃহস্থামীকে স্মৃতি-প্রজ্ঞ চিনিভেন, তাহার ঘর গ্রামের বাহিরে ছিল। সেখানে গেলে দেখা গেল গৃহের চারি কোণে চারটি বিশাল দেহ কালো কুকুর মোটা শিকলে বাঁধা রহিয়াছে। দূর হইতে ভাকাভাকি করিতে একজন লোক বাহিরে আসিয়া ঘরস্থ কুকুরটিকে তাহার কাপড়ে ঢাকিয়া চাণিয়া ধরিলে আমাদের ভিতরে বাওয়া সম্ভব হইল। ভিতরে গিয়া লঙ্কোরের সেই লোকটি কাদিতে লাগিল, “আমার মায়ের আমি এক ছেলে, এই ভয়ানক কুকুর আমার খেয়ে খেললে মা না খেয়ে মরে যাবে।” তাকে স্মৃতি-প্রজ্ঞ ধমকাইতে লাগিলেন, কিন্তু আমি বুঝাইবার চেষ্টা বুঝা দেখিয়া তাহাকে যাইতে দিতে বলিলাম। বেলা অনেক দূর অগ্রসর, স্তত্রং সে তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া প্রস্থান করিল। আমরা গৃহস্থামীর সঙ্গে ঘরের ভিতরের অংশে গিয়া চা-পানের উদ্যোগ করিবার সময় দেখিলাম যে সে স্মৃতি-প্রজ্ঞের ছয়-সাত সের সত্ত্ব খলিটও লইয়া গিয়াছে। স্মৃতি-প্রজ্ঞ তৎক্ষণাৎ সে লোকের পিছনে ছুটিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমি বলিলাম, “ছেড়ে দিন, যা গিয়েছে গিয়েছে।”

স্মৃতি-প্রজ্ঞ বলিলেন “ভূমি সদিন সত্ত্ব নিতে দাও নি, আজ এটার সম্বন্ধেও আবার ঐ ক্রম কথাবার্তা বলছ।”

আমি বলিলাম, “সে গিয়েছে প্রায় ঘণ্টাখানেক, তাকে ধরতে ধরতে সে শে-কবু পৌছে যাবে। আপনি সেখানে পৌছাবার আগেই রাজি হয়ে যান।” গৃহস্থামী আমাদের বাদানুবাদের কারণ শুনিয়া পঁচ-ছয় সের সত্ত্ব আমিরা ধরিলেন, আমি তাহা দেখিয়া বলিলাম “এই নিন, যতটা গিয়েছে ততটা এসে গেল।” সত্ত্ব দিবার পর তিনি একটু ঠাণ্ডা হইলেন। সেই ঘরে এত দরজী কাপড় সেলাই করিতেছিল, জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম যে শে-করের খেসো যে গ্রামের মোড়লের নামে ঘোড়া ঠিক করার ভ্রম চিঠি দিয়াছেন, এ সেই গ্রামের লোক। গৃহস্থামীর কথায় বুঝিলাম ঘোড়া বা মুটিয়া কোনটারই ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নহে, স্তত্রং শেষে আমি স্থির করিলাম সেই দিনই ঐ দরজীর সহিত তাহার গ্রামে যাইব। স্তত্রান্তের মুখে আমরা

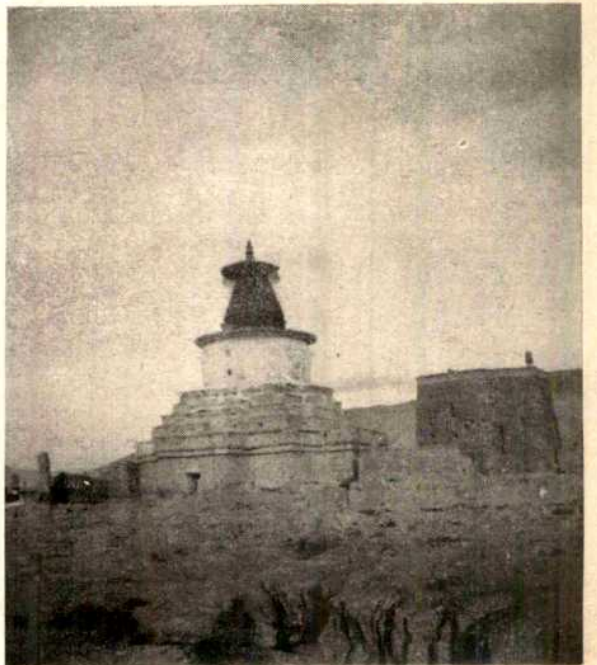
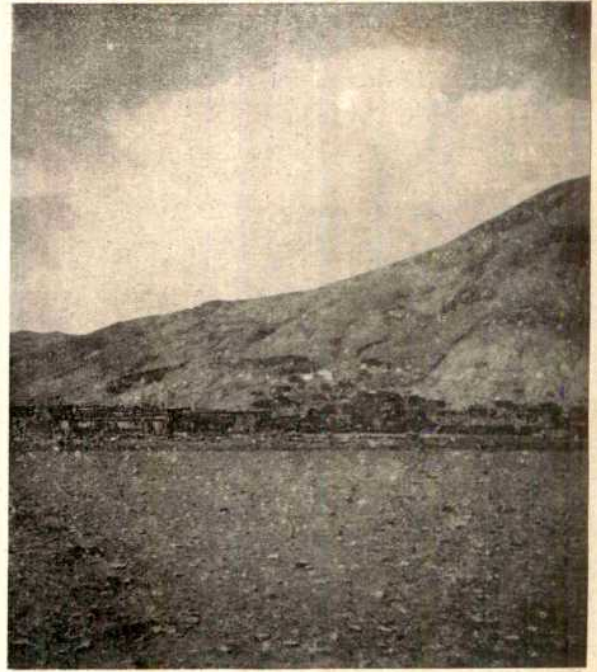
রওয়ানা হইলাম, দরজী আগ্রহের সহিত আমার মোট নিজে তুলিয়া লইল। কিছু রাত্রি হইলে গন্তব্য গ্রামে পৌঁছলাম এবং দরজী মুখিয়্যার (মোড়ল) ঘর দেখাইয়া দিলে তাহাকে চিঠি দিলাম। সে চিঠি পড়িয়া বলিল, “এখন ত ঘোড়া নাই। কাল আপনার সঙ্গে লোক দিয়া লো-লো গ্রামে পাঠাইয়া দিব, সেখানে ঘোড়া পাওয়া যাবে।”

পরদিন অতি-প্রত্যুষে লোকের ঘাড়ে মোট দিয়া রওয়ানা হইয়া আটটার লো-লো পৌঁছলাম। বিশ-পচিশ ঘরের গ্রাম, কিন্তু ঘরগুলি সবই কাঠের অভাবে নিতান্ত ছোট। এই রকম ছোট একটি ঘরে আমাদের লইয়া মুখিয়্যার লোক গৃহস্থামীকে মোড়লের অতুরোধে স্থানাইল। চা-পান ইত্যাদির পর সে বলিল, “ঘোড়া পাওয়া যাইবে এবং ল্যর্সে-জোন্ড পর্যন্ত ভাড়া আঠার টকা।” এখানকার হিসাবে ভাড়া অধিক হইলেও আমি দিতে স্বীকার করায় সে তখনই ঘোড়া চরাইবার প্রাস্তরে চলিল। তিনটার সময় ফিরিয়া আসিয়া সে বলিল যে এখন ল্যর্সেতে বড় গরম, সেইজন্য ঘোড়ার মালিক অতদূর না গিয়া “চালা-লা” পার করিয়া এক দিনের পথের এদিকে পর্যন্ত যাইবে। আমি তাহার ভাড়া এক কথায় স্বীকার করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ কথাবার্তার ধরণ দেখিয়া ঘোড়া লইতে রাজী হইলাম না। লোকটি প্রথমে সৈনিক ছিল। ভিক্সিতে ছোট ভাই পৃথক বিবাহ করিতে পারে না, এ তাহা করায় অস্ত্র ভাইয়েনা তাহাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় সে নূতন একটি ছোট ঘর বাঁধিয়া গৃহস্থালী করিতেছে। আমার কাজে ছুটাছুটি করার দরুন তাহাকে কিছু পরশা দিতে সে খুবই সন্তুষ্ট হইল। এই সময়ে খবর পাইলাম যে শে-করু হইতে ল্যর্সে-জোন্ড যাত্রী একদল বটি গাধা লইয়া এখানে আসিয়াছে। স্মৃতি-প্রসঙ্গ দরদস্তুর করিয়া পাচ টকা (প্রায় আট আনা) আমাদের মাল-পত্র ল্যর্সে-জোন্ড পর্যন্ত পৌঁছাইবার ভাড়া ঠিক করিলেন। গাধাওয়ালার সওয়ারীর জন্ত একটি বড় গাধা ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু খালি হাতে হাঁটিতে আমার কোনও ভয় ছিল না, স্বতরাং তাহা লইলাম না। রাত্রে আমরা দুইজন মালপত্র লইয়া গাধাওয়ালার আড্ডায় চলিয়া গেলাম

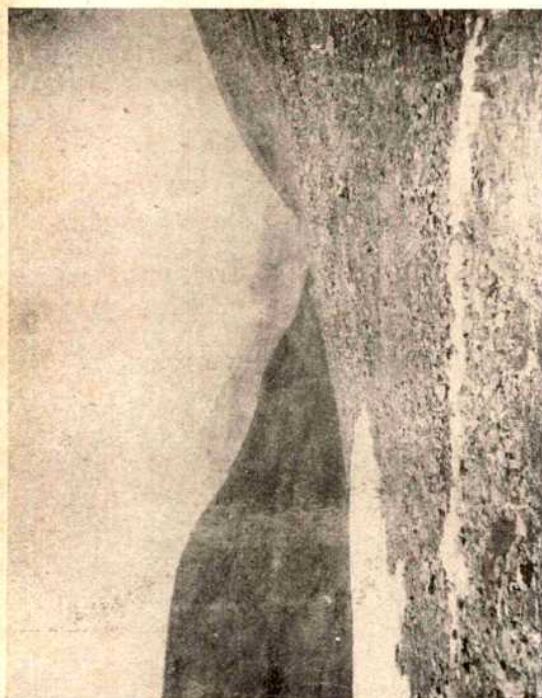
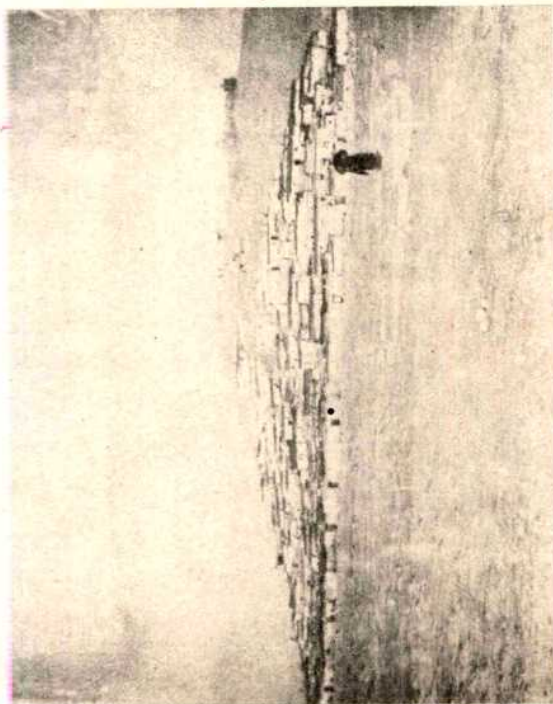
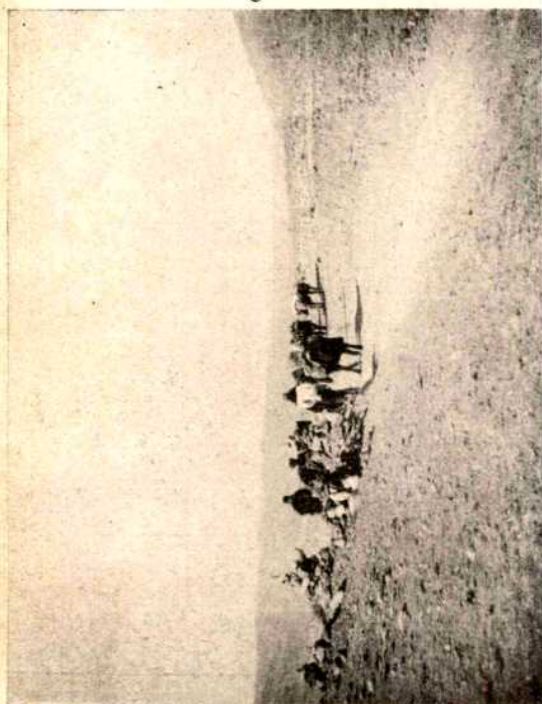
১৬ই জুন রাত্রি থাকিতেই গাধার দল চলিতে লাগিল।

গম্বাতে লাসার জন্ত নেপালী চাউল বোঝাই ছিল, সঙ্গে-সঙ্গে নেপালী সওয়ারীর রক্ষীরা দুই হাত লম্বা তলোয়ার বাঁধিয়া চলিয়াছিল। আমরা চড়াই পথে চলিয়াছিলাম। বেলা দশটায় থাওয়া-দাওয়ার জন্ত থামা হইল এবং সে সময় গাধা-গুলিকে চরিবার জন্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘুঁটের আগুন জালিয়া রন্ধনের ব্যবস্থা চলিল, আমি ততক্ষণ চারিদিকে তুন্দর-দেশের মুখিকের দৌড়াদৌড়ি দেখিতে লাগিলাম। এই জীবগুলি আমাদের দেশের ক্ষেতের মুখিকের সমান বড়, কিন্তু ইহাদের লেজ নাই ও শরীর অতি নরম গোমে আবৃত। প্রাতরাশের পর গাধাগুলিকে ভিজান মটর কচুলাইয়া খাইতে দেওয়া হইল এবং তাহার পর আবার চলা শুরু হইল। আমার হাত খালি, স্বতরাং ষোল হাজার ফুট উচ্চেও চলিতে কষ্ট ছিল না, এবং সেইজন্য আমি সর্বপ্রথমে পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। আমরা সেই প্রথম নদীর পাড়ে পাড়ে চলিয়াছি, এখানে নদী পর্বত ছেদ করিয়া গিয়াছে, অব নদীর পাশে পথ নাই বলিয়া আমাদের পর্বতবাহুর উপরে উঠিতে হইল। ইহার পর উৎরাই আরম্ভ হইল, পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে চমরীর দল চরিতেছে দেখিলাম। আরও নীচে পথ নদীর পাটে নামিল, নদীর ওপারে হরিণের পাল জল খাইতেছিল, আমাদের দেখিয়াই ছুটিয়া পাহাড়ের উপরে পলাইল। কিছু দূর পরে স্নেটের পাহাড় দেখা গেল যাহার নীচের নরম মাটিতে কেরোসিন ভেলের গন্ধ পাইলাম। এইরূপে চারটার সময় বক্চা গ্রামে পৌঁছান গেল। গ্রাম বলিতে সাত-আট ঘর এবং ঘর বসিতে পাথরের স্তূপ মাত্র। গ্রামের লোকের জীবিকার উপায় ভেড়া ছাগল ও চমরী, কেননা এত উচ্চ শস্ত জন্মায় না। স্মৃতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে কিছু চা ছিল, তাহা একটি ঘরে গিয়া প্রস্তুত করাইয়া খানিকটা আমরা পান করিলাম, বাকিটা সঙ্গীদের জন্তও রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে গাধার দলও পৌঁছিল।

১৭ই জুন রাত্রি থাকিতেই আমরা বক্চা ছাড়িয়া চলিলাম। প্রথমে দলের সর্দার বটি বাজাইয়া যাইতেছিল, তাহার পিছনে অস্ত্র সকলে। উপরে পাহাড় ক্রমেই ছোট ও অধিকতা চওড়া হইতেছিল। পথের পাশে কোথাও কেথাও হিমশিলার স্তূপ পড়িয়াছিল, স্থানে স্থানে ভেড়া



শে-কর—ল্যাসে—জোঙের দৃশ্যাবলী



লক্ষ্মীর-তিউড়ির দৃশ্যাবলী

চমরীর গোষ্ঠ ছিল, সেখানে কাল কাল তাধুর ভিতর হইতে ধোঁয়া উঠিতেছিল। দশটার সময় আমরা ছোট ছোট পাহাড়ে-ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌছিলাম সেখানে ঐরূপ কাল তাধু অনেক দেখা গেল। ঐ স্থানের বাম দিকে কিছু দূরে লৌহের প্রস্তরপূর্ণ পাহাড় ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা চা পানের জন্ত বসিলাম, চায়ের পেয়ালায় নিজ নিজ থলির ভিতর হইতে মাখন ও সত্ত্ব দিয়া পান ভোজননের ব্যাপার এক সঙ্গেই শেষ হইল। এইবার উপত্যকা ছাড়িয়া পাহাড় চড়াইয়ের পালা আরম্ভ হইল, স্বমতি-প্রজ্ঞ পিছাইয়া গেলেন, আমি সমানে আগে চলিলাম। যদিও চাসা-লা আঠার হাজার ফুট উচ্চে স্থিত, আমার উপরের ঘাটে পৌছাইতে কষ্ট হয় নাই, ঘাট পার হইয়া নীচে আসিয়া তবে শুইয়া বিশ্রাম করিলাম। অনেক ক্ষণ পরে স্বমতি-প্রজ্ঞ আসিয়া পৌছিলেন, গাধার দল আরও পিছনে পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চলিতে আরম্ভ করিলাম। চাসা-লার উংরাই কঠিন এবং কয়েক মাইল লম্বা, চলিতে চলিতে দেখিলাম কোন কোন পাহাড়ের নীচে বরফ জমিয়া আছে, আশপাশের সবুজ ঘাসে চমরীর দল চরিতেছে। বেলা দুইটার সময় আমরা জিগ-চেব গ্রামে পৌছাইলাম, গাধার পাল আরও প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে আসিল। এই গ্রামের প্রধান পেশা যাত্রীদের থাকিবার স্থান ইত্যাদি দেওয়া, সঙ্গে অন্ন-বিস্তর পশুপালনও আছে। রাতে এখানেই বাস করা গেল।

১৮ই জুন ভোর রাত্রে আবার রওয়ানা হইলাম। এবার উংরাই যে কঠিন শুধু তাহা নহে, উংরাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়িতে লাগিল। প্রভাতের আলোর সঙ্গে পথের পাশে জঙুলী-গোলাপের কোপ দেখা গেল। সাতটা নাগাদ চা পান করিয়া আর এক ঘণ্টা চলিবার পর ব্রহ্মপুত্রের সৈকত দেখা যাইতে লাগিল। দশটার সময় ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে পৌছাইলাম, নদের বেলাভূমি অতি বিস্তৃত, স্থানে স্থানে বৃক্ষপূর্ণ বাগান রহিয়াছে এবং বাকী অন্য প্রায় সকল স্থানেই শস্তের ক্ষেত ও বৃক্ষ লাগান যাইতে পারে কিন্তু বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে। একটার সময় আমাদের দল ষ-চৌ গ্রামে উপস্থিত হইল। ইহা গাধাওয়ালার গ্রাম, স্তরাঙ্গ আজ তাহারা ওখানে থাকাই স্থির করিল।

স্বমতি-প্রজ্ঞ ও আমি এক বৃদ্ধার ঘরে আশ্রয় লইলাম। চা-পানের পর স্বমতি-প্রজ্ঞ গ্রামে বেড়াইবার জন্ত ঘরের অঙ্গনের দরজার বাহিরে যাইবামাত্র, চারটা বৃহৎ কুকুর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। আমি চীৎকার ও কুকুরের ডাক শুনিয়া দেওয়ালের কাছে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম ছাতা-হাতে স্বমতি-প্রজ্ঞ একেবারে কুকুরের মুখে পড়িয়া আছেন। আমি কুকুর তাড়াইবার জন্ত পাথর ছুঁড়িতে কুকুরের দল সরোষে সেই পাথরের টুকরার পিছনে ছুটিতে লাগিল। স্বমতি-প্রজ্ঞ সেই অবসরে ঘরে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইলেন। সেই গ্রামে থাকিতে তিনি আর বাহিরে যাইবার নাম করিলেন না।

১৯শে জুন মালপত্র বাধিয়া গাধাওয়ালার জিম্মা করিয়া আমরা ল্যাসে-জোঙ চলিলাম। এই নদীতে গ্রাম অনেক এবং সেচকার্যের জন্ত বড় বড় নালীও আছে। এইরূপ এক নালী পার হইয়া আমরা একটি ছোট নদীর পারে উপস্থিত হইলাম, স্বমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন উহা স-ক্যাণ্ডা হইতে প্রবাহিত হইতেছে। বেলা নয়-দশটার সময় ল্যাসে পৌছিয়া আমরা প্রথমে গুয়ায় যাইলাম। পথে সকলেই আমায় লদাখী বলায় আমিও এখন নিজেকে লদাখী বলিতাম। গুয়ায় চা-পানের পর আমি নদীর ধারে, গাধার দল যেখানে আসিবে সেখানে, যাইবার প্রস্তাব করায় স্বমতি-প্রজ্ঞ বলিলেন “এখন এখানেই অপেক্ষা করি, পরে যাইয়া মালপত্র আনিব।” তাঁহার ইচ্ছা কিছুক্ষণ এখানে থাকা। আমার মন যাইতে উৎসুক, স্তরাঙ্গ অনেক কথায় বুঝিলাম “কা” (চামড়ার নৌকা) শীগড়ী চলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে দুই-এক দিন লাগিবে। অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বমতি-প্রজ্ঞ ঘাটে চলিলেন; সেখানে দেখিলাম দুইজন সওদাগর মালপত্র লইয়া ক'-র প্রতীক্ষায় আছেন, তাঁহারাও বলিলেন নৌকা আসিতে দুই-তিন দিন লাগিবে। গুয়ায় কয়েক জায়গায় কুকুর ছাড়া আছে দেখিয়া আমি সেখানে থাকিতে চাহিলাম না, কিন্তু স্বমতি-প্রজ্ঞ সেখানেই থাকিবার আগ্রহ দেখাইলেন। শেষে স্থির হইল আমি ঐ সওদাগরদের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় থাকিব এবং স্বমতি-প্রজ্ঞ থাকিবেন গুয়ায়।

ল্যাসে-জোঙ হইতে শীগড়ী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রে চামড়ার *

নৌকা চলে। এই নৌকা যাকের চামড়া জুড়িয়া কাঠের কাঠামোতে আঁটিয়া প্রস্তুত করা হয়, ইহারই নাম “কা” এবং ইহার এক-একটিতে ত্রিশ-চল্লিশ মণ মাল আঁটে। আমার তিনজন সওদাগর সঙ্গীর মধ্যে একজন টর্শী-ল্যুন্টার চাবা (ভিক্ষু বা সাধু), অপরজন লাসার সেরা মঠের চাবা এবং তৃতীয় জন লাসার গৃহস্থ ছিল। ভোট দেশের সাধু দুই প্রকার—প্রথম যাহারা মঠে থাকিয়া পূজা-পাঠ করেন, দ্বিতীয় যাহারা ব্যাপার-ব্যবসায় ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন দৃঢ় সীমা নাই, এক শ্রেণীর লোক যখন ও যত দিনের জন্য ইচ্ছা অপর শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। সওদাগর চাবাদের পরিচ্ছদ সাধারণ গৃহস্থদেরই মত, কেবলমাত্র মস্তক মুণ্ডিত। ইহারা যথেষ্ট মন্তপান ও স্ত্রী-সংসর্গ করে এবং জীবহত্যাও মাঝে মাঝে করে। আমার সঙ্গী চাবা দুইজন থম্-পা (খাম দেশবাসী) এবং গৃহস্থ লাসা-পা (লাসানিবাসী) ছিল; ইহাদের মধ্যে টর্শী-ল্যুন্টার চাবা বয়োজ্যেষ্ঠ ও দলের নেতা ছিল এবং সেরার চাবা সেই লোকই যাহার সঙ্গে শে-কব্ মঠের খেঁষো আমাদের লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রায় আঠারো-বিশ নৌকা-বোঝাই মাল ইহাদের সঙ্গে ছিল, তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ চাউল, বাকী অংশের মধ্যে লৌহ-পিত্তলের বাসন এবং পেয়লা ইত্যাদি তৈয়ারী করার কাঠও ছিল। চারিদিকে মালপত্রের স্তূপ করিয়া দেওয়াল করা হইয়াছিল, মধ্যে চামরীর লোমের ছোলদারী তাধু, আগুন জ্বলাইবার স্থান এবং শয়ন ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের বাহিরে নদীর তীরে একপ মালপত্র লইয়া থাকা বিপজ্জনক, কিন্তু সওদাগরদের নিকট ভোটীয় রূপাণ ও তরবারী ছিল, উপরন্তু ভোটীয় চোরও চাবাকে ভয় করিয়া চলে।

দিনের বেলায় ইহারা মালপত্র মেরামত, নৌকা জোড়ার

কাঠ সংগ্রহ—এখানে নদীতটে ছোট ছোট কাঁটায়ুক্ত গাছ আছে—এই সব ব্যস্ত থাকিত। প্রতিরাতেই নেতা গ্রামে গুইতে যাইত এবং কোন কোন দিন অল্প দুইজনের একজনকে সঙ্গে লইয়া যাইত, কলে আমি ও অপর একজন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকিতাম। ভোটদেশে লজ্জাভয় অত্যন্ত কম, হুতরাং স্ত্রী-পুরুষের অসুচিত বা অবৈধ সম্বন্ধ প্রকাশ্যভাবেই থাকে। পথে চলিতে চলিতেও লোকে আশ-পাশের বসতিতে সেইরূপ সম্বন্ধের হুযোগ পায়, কেননা সাধারণ কুমারী ও মুণ্ডিত মস্তক অনীতে অনেক প্রভেদ—অর্থাৎ কুমারীর ব্রহ্মচর্যের কোনও বালাই নাই। আমি ইহা বলিতেছি না যে ভোটদেশে অন্য দেশ অপেক্ষা ব্যভিচার অত্যন্ত অধিক; বস্তুতপক্ষে যদি গুপ্ত ও প্রকাশ্য ব্যভিচার সকলই একত্রে দেখা যায়, তবে আমার ধারণায় বোধ হয়, সকল দেশের অবস্থাই প্রায় কাছাকাছি আসে। যাহা হউক, নেতা চাবা ত ব্যবসায় সম্পর্কে এই পথে ক্রমাগত যাতায়াত করে এবং এরূপ অবস্থায় এদেশে প্রায় প্রতি বসতিতেই কোন না-কোন স্ত্রীলোক জুটিয়া যায়, হুতরাং উহারও সেই ব্যবস্থাই ছিল। প্রতিদিন চামড়ার মটকায় ভরা ছুঙ (ভোটীয় কাঁচা মজ) গ্রাম হইতে আসিত এবং ইহারা তাহা জলের মত পান করিত। অবসরকালে নদীতে বঁড়শী ফেলিয়া মাছ ধরার চেষ্টাও চলিত, কিন্তু মাছ-ধরায় সফল হইতে কোন দিন দেখি নাই।

১৯ হইতে ২৪শে জুন পর্যন্ত এই ভাবে ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় কাটিয়া গেল। দুই-তিন দিনের স্থলে এত দেরী হওয়ার কারণ শুনিলাম নৌকা যাইবার সময় যায় জলে এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতের মুখে দুই দিনেই নীগর্টা পৌছায়, কিন্তু ফিরিয়া আসে গাধার পৃষ্ঠে—চামড়া ও কাঠ পৃথক বোঝাই হইয়া।

(ক্রমশঃ)





কৃষ্ণকুমার মিত্র

কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বয়স মৃত্যুকালে পঁচাশি বৎসর হইয়াছিল। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ সোজা ছিল, দৃঢ় ছিল; মনও তাঁহার দৃঢ় ছিল। যে-দিন অসুস্থ বোধ করিবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সে-দিনও তিনি প্রাতে গোলদীঘিতে তাঁহার নিয়মিত প্রাত্যহিক পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। যে শনিবারে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার দু-দিন আগেকার “সঞ্জীবনী”র জন্তও তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় মন্তব্য আদি লিখিয়াছিলেন। এরূপ কনিষ্ঠ মাতৃবয়সের মৃত্যু পঁচাশি বৎসর বয়সে হওয়াতেও অকাল-মৃত্যু বলিয়া মনে হইতেছে।

বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। আমি বি-এ পরীক্ষার জন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজেই অধিক সময় পড়িয়াছিলাম, অল্পকাল সিটি কলেজে পড়িয়া সেখান হইতে বি-এ ও পরে এম-এ পাস করি। আমি যখন ছাত্র, কৃষ্ণকুমার বাবু তখন সিটি কলেজ ও স্কুলের ইতিহাসের অধ্যাপক ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট। পরে আমিও সিটি কলেজে কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলাম। এই প্রকারে ছাত্ররূপে এবং কনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে তাঁহাকে অর্দ্ধশতাব্দী কাল দেখিয়া আসিয়াছি ও তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছি। তাঁহার সহিত রাজনৈতিক মতভেদ শেষের দিকে কিছু হইয়াছিল এবং সামাজিক কেবল একটি বিষয়ে (নারীদের অভিনয় ও নৃত্য বিষয়ে) মতভেদও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিচলিত হয় নাই, বিন্দু-মাত্রও হ্রাস পায় নাই। আমার প্রতি তাঁহার প্রীতিও কমে নাই। সামাজিক উক্ত বিষয়টি সন্দেহে মতভেদও আংশিক মাত্র। তিনি নারীদের দ্বারা অভিনয় ও নৃত্য মাত্রেরই বিরোধী ছিলেন; আমার মত এই, যে, নারীদের অভিনয় ও নৃত্য এরূপ হইতে পারে, এবং দেখিয়াছিও, যাহা নির্দোষ,

স্বকচিসদত ও আবশ্যক। কিন্তু মিত্র মহাশয় এ-বিষয়ে যাহা লিখিতেন তাহা নিশ্চয় উচ্চ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, এবং বহু স্থলেই নারীনৃত্য সন্দেহে তাহা ঠিক বলিয়া আমি মনে করি।

বঙ্গভঙ্গ-সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সময় গবর্নমেন্ট হুকুম করেন, যে, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পারিবেন না। সেই জন্ত, রাজনীতির সংশ্লিষ্ট না ছাড়িয়া তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করেন।



কৃষ্ণকুমার মিত্র (প্রৌঢ় বয়সে)

স্বনীতি ও স্বকচির প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক দৃষ্টি আমি যখন ছাত্র ছিলাম, তখন হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তাঁহার স্বরীক্ষণেও ইহা লক্ষিত হইত। সেকালে শিক্ষক

ও অধ্যাপকেরা প্রায়ই ধুতি পরিয়া স্থল কলেজে আসিতেন না, পাজামা এবং চাপকানচোগা বা কোর্ট পরিয়া আসিতেন। কৃষ্ণকুমার বাবু এক প্রকার কোর্ট পরিতেন যাহা সম্পূর্ণ স্বকৃতিসম্পন্ন। তিনি ধার্মিক লোক ছিলেন। ধার্মিকতা সম্বন্ধে এই এক প্রকার ধারণা আছে, যে, ধার্মিক মানুষের দেহ কাপড়চোপড় চুল দাড়ি প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি থাকিবে না, বরং যে যত অপরিচ্ছন্ন সে তত ধার্মিক। কৃষ্ণকুমার বাবু সে-রকমের ধার্মিক ছিলেন না। তাঁহার বেশে পরিচ্ছন্নতা ছিল, কিন্তু বিলাসবিস্রম বিন্দুমাত্রও ছিল না।

তাঁহার ধর্ম কেবল মতের ধর্ম ছিল না। তাহা ছিল গভীর এবং তাহা তাঁহার সমুদয় চিন্তা বাক্য ও কার্যকে নিয়মিত করিত, সমগ্র জীবনকে অন্তর্প্রাণিত করিত। এই সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপারায়ণ, দৃঢ়চিত্ত, নিতীক পুরুষের সাম্পর্শ্যে আসিয়া বহু ছাত্র এবং অনেক সঙ্গী ও সহকর্মী উপকৃত হইয়াছেন।

ধর্মকে তিনি জীবনে সকলের উপরে স্থান দিতেন—মতে দিতেন, আচরণেও দিতেন। তিনি আধোবন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহার অগ্রতম আচার্য ও নেতা এবং মৃত্যুকালে তাহার সভাপতি ছিলেন। ধর্মমতের ভিন্নতার জন্ত কেহ তাঁহার বিরাগভাজন হইত না।

দেশের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর বলিয়া তিনি মনে করিতেন, কেহ এরূপ কোন কথা বলিলে, বহি লিখিলে বা কাজ করিলে তিনি প্রকাণ্ডভাবে তাহার নিন্দা করিতেন। অপ্রসিদ্ধ বা প্রসিদ্ধ, নিজ সম্প্রদায়ের লোক বা অন্য সম্প্রদায়ের লোক, অপরিচিত বা পরিচিত, কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। এরূপ ব্যবহার দ্বারা বিরাগভাজন হইবার ভয় তাঁহার ছিল না।

কোন মানুষের সম্বন্ধে একবার তাঁহার ভাল ধারণা জন্মিলে তাহা টলিত না, তাহা টলান দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। রাজনৈতিক সামাজিক ও অগ্রবিধ মত সম্বন্ধেও তাঁহার এই প্রকার দৃঢ় স্থিতিশীলতা ছিল। মত গঠন অবশ্য তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়াই করিতেন।

চুয়ান বৎসর পূর্বে তিনি পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ও কালীশঙ্কর শুকুল এবং অধ্যাপক হেরখরচন্দ্র মৈত্র মহাশয়দিগের সহযোগিতায় “সঞ্জীবনী” স্থাপন করেন, এক এই

দীর্ঘ কাল তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। “সঞ্জীবনী”র কৃতিত্ব নানা বিষয়ে। তাহা আজকালকার যুবকদের এবং অনেক প্রৌঢ়েরও জানা না থাকিতে পারে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইতে উৎপন্ন বিদেশী বর্জনের ও স্বদেশী গ্রহণের সপক্ষে আন্দোলনে কৃষ্ণকুমার বাবু অগ্রতম প্রধান কর্মী ও নেতা ছিলেন। এই আন্দোলন তিনি অসাধারণ কষ্টাভা উত্তোগিতা বাগিতা ও সাহসের সহিত চালাইয়াছিলেন এবং এই জগুই অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি অগ্র কয়েক জনের সহিত তিনি বিনা বিচারে নির্বাসিত হন! এই আন্দোলনে “সঞ্জীবনী” তাঁহার প্রধান মুখপত্র ছিল। যে গবন্মেণ্ট বিনা বিচারে তাঁহার নির্দোষ স্বামীকে নির্বাসিত করিয়াছিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার সাধ্বী পত্নী কোন সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের দ্বারা বহু বিলম্বে তাঁহাকে নির্বাসিত করার ভ্রম স্বীকৃত হইয়াছিল।

আসামের চা-বাগানসবলে চুক্তিবদ্ধ কুলিদের উপর সেকালে বড় অত্যাচার হইত, বহু কুলি-নারীর সতীত্ব নষ্ট হইত। এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে “সঞ্জীবনী” দীর্ঘকাল আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই কার্যে রামকুমার বিহারত, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতি “সঞ্জীবনীর” প্রধান সহায় ছিলেন।

আফিডের দ্বারা দেশের খুব অনিষ্ট হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। “সঞ্জীবনী” ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। অনেকটা তাহার ফল আফিং কমিশন নিযুক্ত হয় এবং কৃষ্ণকুমার বাবু তাহাতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন ও অগ্র প্রকারেও কমিশনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

রেলে নারীষাঙ্গীদের উপর অত্যাচার এখন যে একেবারেই হয় না, তাহা নহে। আগে কিন্তু আরও বেশী হইত। “সঞ্জীবনী” এই প্রকার অত্যাচার দমনের অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার কিছু স্বফলও হইয়াছিল।

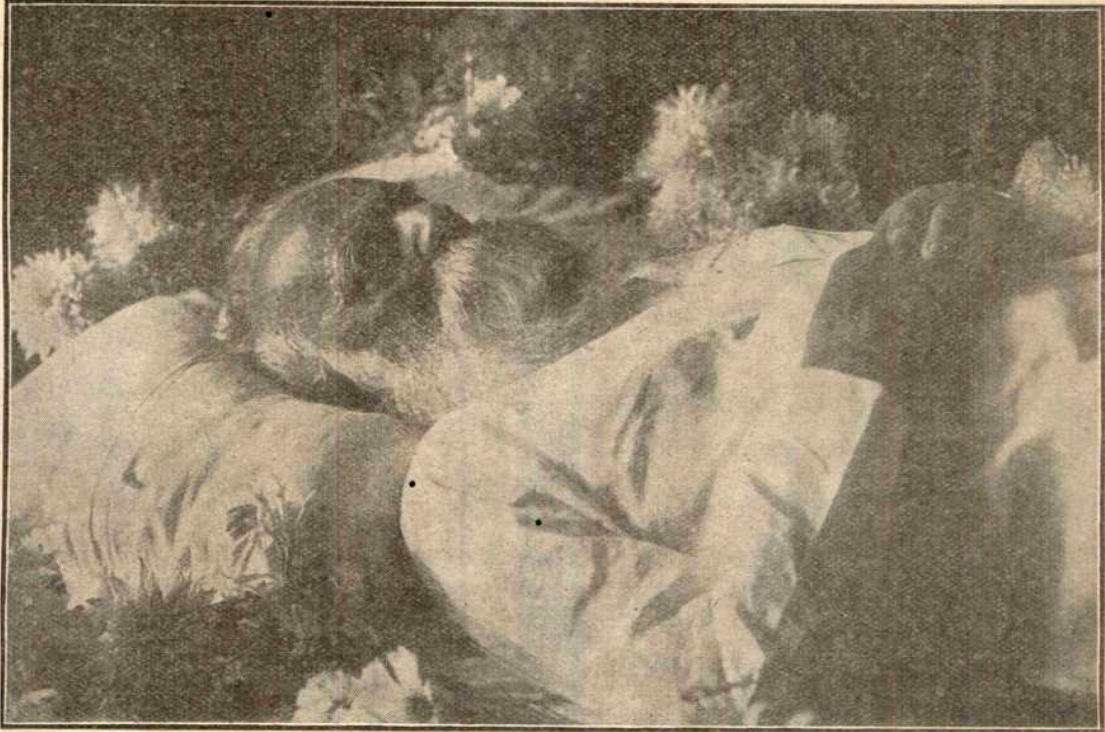
আগে ইংরেজ ও অগ্র ইউরোপীয় এবং ফিরিঙ্গীদের হাতে দেশী লোকদের অপমান, প্রহার ও কখন কখন মৃত্যু এখনকার চেয়ে বেশী হইত। ইহার বিরুদ্ধেও “সঞ্জীবনী” বরাবর লড়িয়াছেন। দেশী লোকদের এই প্রকার দুর্গতি

কিছু কমিবার অল্প একটি কারণ সাক্ষ্যপ্রতিকারপরায়ণ যুবকদের কার্যের প্রভাব।

কৃষ্ণকুমার বাবুই বোধ হয় সর্বপ্রথম বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এখনও স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জন প্রচারে “সঞ্জীবনী” কোন খবরের কাগজের চেয়ে পশ্চাৎপদ নহে।

বঙ্গে বাঙালীর স্থান ও গৌরব রক্ষার জন্ত, ভারতবর্ষে বাঙালীর সোপাঞ্জিত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, কৃষ্ণকুমার বাবু মৃত্যুকাল পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী “নিজ

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয়। তাহার প্রধান উদ্যোক্তা জুবার্ট সাহেবের পুত্রকে এক দিন দর্শকদিগের মাথায় ও পিঠে লাঠি দিয়া টোকা মারিতে দেখিয়া কৃষ্ণকুমার বাবু জুবার্টকে ছেলেকে শাসন করিতে বলেন। জুবার্ট তাহাতে কান না দেওয়ায় মিত্র মহাশয় স্বয়ং নিজের বাহুবল প্রয়োগ করেন। বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি নিষিদ্ধ হয় এবং যাহা বলপূর্বক পুলিশ ভাঙিয়া দেয়, তাহাতে কৃষ্ণকুমার বাবুর দৃঢ়তা ও সাহস বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে সুবিদিত।



কৃষ্ণকুমার মিত্র (অন্তিম শয্যায়)

বাসভূমে”, বঙ্গে, “পরবাসী” হইবে, এ চিন্তা তাঁহার ও তাঁহার “সঞ্জীবনী”র পক্ষে অসম্ভব ছিল।

তিনি পৌরুষের, শক্তিমত্তার ও অপরের প্রাণরক্ষার্থ আত্মোৎসর্গের একান্ত অহুরাগী ছিলেন। “শক্তিমান বাঙালী” ও “পুণ্যকীর্তি” শীর্ষক সংবাদ ও মন্তব্য “সঞ্জীবনী”তে প্রায়ই বাহির হইতে দেখিয়াছি। ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ সালে কলিকাতায় মিউজিয়ামের সম্মুখে গড়ের মাঠে এক বৃহৎ

জাতিধর্মনির্কীর্ণে নারীকুলের পরম সহায় ছিলেন কৃষ্ণকুমার বাবু ও “সঞ্জীবনী”। সহবাস সম্মতি আইন আন্দোলনের সময় এক বরাবর বাল্যবিবাহের বিরোধিতায় ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। অধুনা গত ৭৮ বৎসর হইতে অন্তঃপুরে ও ঘরের বাহিরে নারীদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রধানতঃ কৃষ্ণকুমার বাবুর চেষ্টায় নারীরক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীদের প্রতি অত্যাচার দমনে এই

সমিতির ও “সঞ্জীবনী”র অবিরাম চেষ্টা অনতিক্রান্ত। এই জন্তু আজ তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে তাঁহার সন্তানেরাই পিতৃহীন হইয়াছেন তাহা নহে, জাতিধর্মনির্কীর্ণে বন্ধের অগণিত বালিকা ও অল্প নারী আজ পিতৃহীন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্থান অধিকার করিবার লোক দেখিতে পাইতেছি না।

দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছায়, যেমন করিয়া হউক বাহ্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য উৎপাদন ও রক্ষার মোহে পড়িয়া অনেক নেতা ও তাঁহাদের অনুচরেরা নারীরক্ষা-কর্মে অবহেলা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের ইহা ভ্রম। মুসলমানেরা যে মনে করেন, যে, নারীরক্ষা একটা সাম্প্রদায়িক ছিল, তাহাও ভ্রম। নারীর মর্যাদা রক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি টিকিতে পারে না—পরাদীন জাতি টিকিতে পারে না, স্বাধীন জাতিও টিকিতে পারে না; যে-দেশে নারীর মান ইজ্জৎ সতীত্ব নিরাপদ নহে, তাহা স্বাধীন হইতে পারে এরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র। অতএব, স্বাধীনতাকামীদের কার্য্য অপেক্ষা নারীরক্ষাপ্রয়াসী পুরুষপ্রবরের কার্য্য লঘুতর বা কম আবশ্যক নহে। ইহা সভ্য সমাজের ভিত্তি রক্ষার নিমিত্ত মূলগত কার্য্য।

ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, যে, কৃষ্ণকুমার মিত্র স্বাধীনতাকামী ছিলেন না—নিশ্চয়ই ছিলেন। সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকা অর্দ্ধশতাব্দীর উপর তাঁহার পতাকা ছিল। তিনি মনে করিতেন, উদারনৈতিকদিগের পক্ষা অবলম্বন দ্বারা ডোমিনিয়নশ্বের পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কংগ্রেসের মত ইহার বিপরীত। আমার মত ঠিক কোন দলের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু মতের অমিল কোনও অকপট স্বদেশ-হিতৈষীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি হারাইবার কারণ হওয়া উচিত নয়।

কৃষ্ণকুমার বাবু নিজের মত পূর্বাপর ঠিক রাখিয়াছেন। দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিকমতিবিশিষ্ট লোক কংগ্রেসের মতে সায় দেওয়া ও সাবেক উদারনৈতিক মত লোকের অগ্রিয় হওয়ায় “সঞ্জীবনী”র এককালে যে আর্থিক অবস্থা ছিল তাহা নাই, কিন্তু কাগজের কাটুতি কমিবার ভয়ে বা গ্রাহক বাড়াইবার নিমিত্ত কৃষ্ণকুমার বাবু কপটতা করেন নাই। অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক তাঁহাকে খাতির করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি নিজের সুবিধার জন্তু কাজে লাগান নাই, তাহার দ্বারা অল্প অনেকের উপকার করিয়াছেন।

সম্মান লাভ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন। তাঁহাকে সম্মানিত করিবার কোন চেষ্টায় তিনি কখনও সম্মতি দেন নাই। আতিথেয়তা, বাকসংযম, আশ্রিতবাৎসল্য এবং সৌজন্য তাঁহার চরিত্রের লক্ষণ ছিল।

তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে বুদ্ধদেব ও মোহম্মদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দুটি প্রধান। আগ্রা জেলে নির্বাসনকাল যাপন সময়ে তিনি শিখ ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা ও উপদেশে শ্রোতাগণ সেই অধ্যয়নের কিছু ফলভাগী হইতেন, কিন্তু বোধ হয় তিনি এ-বিষয়ে কোন পুস্তক লিখিয়া যান নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইয়াছি, যে, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী দেবী তাঁহার কথিত “আত্মচরিত” কয়েকটি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ১৯১০ সালে তাঁহার কারাগার হইতে মুক্তিলাভের সময় পর্য্যন্ত। ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে এক জন সত্যনিষ্ঠ পুরুষের কথিত বন্ধের বহু বৎসরের ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যাইবে। কারণ, শুনলাম ইহাতে তিনি নিজের জীবন অল্পই বিবৃত করিয়াছেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্বন্ধে জলধর সেন

গত বিশেষ অগ্রহায়ণ ‘রবিবাসর’ সমিতির অধিবেশনে সভাপতি রায় বাহাদুর জলধর সেন বলেন :—

“কৃষ্ণকুমার বাঙ্গালার, শুধু বাঙ্গালার কেন ভারতের সংবাদপত্রসমি-
পনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাণীশতম ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠভাবে ৫৩
বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া “সঞ্জীবনী” পত্রিকার সেবা করিয়া
সিয়াছেন। তিনি সকল প্রকার দুর্নীতির বিশেষ বিরোধী এবং নারী-
রক্ষা সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মত দেশপ্রেমিক শুধু এদেশে
কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই বিরল। বঙ্গ-ভঙ্গ আলোচনায় তিনি
মুরেলীনাথের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তখন তিনিই সর্বপ্রথম “বিশ্বেশ্বরী
বর্জন ও হর্ষদেবী গ্রহণের” প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। আমার এই
সুখী জীবনে তাঁহার মত আর এক জনও এইরূপ ভেজা, নিতীক,
অকলঙ্ক-চরিত্র, দেশভক্ত, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে জানিবার সৌভাগ্য আমার
ঘটে নাই। বাঙ্গালার এক অতি উজ্জল রত্নকে আমরা হারাইলাম।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহের আগামী নির্বাচন

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্বাচন আসন্ন-
প্রায়। এখন ভোটাদিগকে ভাবিতে হইতেছে তাঁহার
কাহাকে ভোট দিবেন। কাহাকে ভোট দেওয়া উচিত স্থির
করা সহজ নহে। সাধারণতঃ যিনি যে দলের লোক সেই

দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়া থাকেন। অনেক স্থলে অল্পরোধ উপরোধে ভোট দেওয়া হইয়া থাকে। তাহা ভিন্ন, বাধ্যবাধকতা থাকায় কিংবা কোন প্রকার উৎকোচ পাওয়ায় ভোট দেওয়া যে হইয়া না, এমন বলা যায় না।

নানা কারণে আমরা আগেকার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্বাচনে একবারও ভোট দিই নাই, আগামী কোন নির্বাচনেও ভোট দিব না। কোন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার চেষ্টা এ-পর্যন্ত করি নাই, ভবিষ্যতেও করিব না। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়ার বিরোধী আমরা নহি, সদস্য-নির্বাচনে ভোট দেওয়ার বিরোধীও নহি। আমাদের মতে ভোট কিরূপ লোককে দেওয়া উচিত, সে-বিষয়ে কিছু বলিব।

নারীনিগ্রহ দমনে উৎসাহী লোককেই ভোট দিবেন

শুধু বন্ধে নহে, ভারতবর্ষের অল্প অনেক প্রদেশে নারীদের প্রতি অত্যাচারমূলক অপরাধের প্রাদুর্ভাব অনেক বৎসর হইল দেখা যাইতেছে। যেখানে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই, সেখানেও এরূপ অপরাধ নিতান্ত কম হয় না। ইহার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ পুরুষজাতীয় দুর্বৃত্ত লোকদের পাশবিক প্রবৃত্তি। তন্নিহন নারীহরণ ও নারীবিক্রয় লীভজনক ব্যবসা বলিয়াও অনেক দুরাশ্রয় এইরূপ দুষ্কর্ম করিয়া থাকে। এইরূপ অপরাধ দমন নারীকুলের নিরাপত্তার জন্য আবশ্যিক, সমাজ রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যিক, আমরা সকলেই মাতার সন্তান বলিয়া আবশ্যিক। ইহা নিবারণের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তাহার মধ্যে এখন কেবল আইনের দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহার কথাই বিবেচনা করিতেছি। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে যে যে আইন প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহারও যথোচিত ব্যবহার সব বিচারক করেন না। যে প্রকার নারীনিগ্রহ অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড হইতে পারে, তাহাতেও এ-পর্যন্ত কেবল দু-বার বিচারকেরা বেত্রাঘাত দণ্ড দিয়াছেন। অতএব এই দণ্ডের ব্যবস্থা ব্যাপকতর করা উচিত এবং বিচারকেরা যাহাতে তদনুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাহার জন্য আন্দোলন করা উচিত। তন্নিহন, অল্প প্রকার দণ্ড—কারারোধ দণ্ড ও জরিমানা—কঠোরতর করা উচিত।

যাহারা অপহৃত নারীকে লুকাইয়া রাখিবার বা নানা স্থানে লইয়া যাইবার সাহায্য করে, তাহাদেরও সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। দলবদ্ধভাবে নারীদ্বর্ষণ ও তদ্বিধ ঘোরতর দৌরাশ্রয়ের জন্য যাবজ্জীবন কারাবাসের এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বিচারকার্য সঞ্চক্ষে এই প্রকার বন্দোবস্ত আবশ্যিক। শাসন-বিভাগকেও এই প্রকার অপরাধ দমনে অধিক অবহিত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক। যে-জেলায় ও মহকুমায় নারীনিগ্রহ অপরাধে অপরাধীরা ধৃত ও দণ্ডিত কম হয়, তথাকার পুলিশ কর্মচারীদের অকৃতিত্বের জন্য পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি স্বগিত রাখা বা বন্ধ রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। অপহৃত নারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে স্থানীয় পুলিশ কর্মচারীর পদচ্যুতির ব্যবস্থা থাকা উচিত।

যাহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে চান, নারীনিগ্রহ দমন ও নিবারণ করিবার জন্য উল্লিখিত বা তদ্বিধ অল্প প্রকার ব্যবস্থা করাইতে সচেষ্ট হইবেন, তাহাদের এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা চাই। ভোটারদের দেখা চাই, তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা তাহাদের ম্যানিফেস্টোতে করিয়াছেন কি না। না-করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাইতে হইবে, প্রশ্নের দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর লইতে হইবে।

ধর্মসম্প্রদায়নির্কির্শেষে প্রত্যেক সদস্যপদপ্রার্থীর নিকট হইতে এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতি লওয়া দরকার। বঙ্গের দুটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায় মুসলমান ও হিন্দু। ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী উত্তর হইতে জানা যায়, নিগৃহীতাদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা অধিক। যাহা হউক, কোন সম্প্রদায়ের একটি নারীও যদি নিগৃহীতা না হইতেন, তাহা হইলেও নারীনিগ্রহ দমনে তৎপর হওয়া সেই সম্প্রদায়ের লোকদেরও কর্তব্য হইত।

আগামী নির্বাচনে নারী-ভোটারদের সংখ্যা আগেকার চেয়ে বেশী হইয়াছে। তাহারা কাহাকেও ভোট দিবার পূর্বে তাহাকে প্রশ্ন করিতে ছুলিবেন না, যে, তিনি নারী-নিগ্রহ দমনের জন্য কি করিবেন। যিনি কিছু করিবেন না, তাহাকে ভোট দেওয়া উচিত নয়।

সদস্যপদপ্রার্থীদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য

দুঃখের বিষয়, নূতন ভারতশাসন আইনে “ভারতীয়” বলিয়া কোন জীব নাই; ভোটেররা হিন্দু বা অবনত তপশীলভুক্ত জাতি, বা মুসলমান বা শিখ বা খ্রীষ্টিয়ান বা আদিম জাতি বা শ্রমিক বা জমিদার বা ব্যবসাদার ইত্যাদি। আইন-কর্তারা ধরিয়া লইয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে মহাজাতি (নেশন) নাই, থাকার বা গড়িয়া উঠিবার প্রয়োজন নাই, কেহই সমগ্রভারতীয় মহাজাতির এক জন নহে, সমগ্র মহাজাতির কল্যাণসাধন ও স্বার্থসংরক্ষণে কেহ ব্যাপৃত নহে, কাহারও ব্যাপৃত হওয়ার প্রয়োজনও নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষের লোকদিগকে কতকগুলি অসংহত অসংবদ্ধ পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর সমষ্টি বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আইনকর্তারা যাহাই ভাবুন এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, ভারতবর্ষের লোকদিগকে সাধারণ একটি রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত স্বার্থের কথা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। আমরা একাধিক বার পৃথিবীর বহু স্বশাসক দেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণ করিয়াছি যে, স্বশাসন-অধিকার যে-সব দেশের আছে তথাকার দরিদ্রতম ও অল্পমতম শ্রেণীর লোকদের অবস্থাও ভারতবর্ষের রাজাহু-গৃহীততম সম্প্রদায়ের অবস্থা অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট ভাবে ভাল। অতএব আমরা যে ধর্মসম্প্রদায় বা যে-শ্রেণীরই লোক হই না কেন, স্বশাসনের অধিকার লাভ করা আমাদের সাধারণ ও শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখন বিচার্য,

কিরূপ স্বশাসন-অধিকার চাই

ভারতবর্ষে যে-সকল বড় ছোট সাক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রনৈতিক দল আছে, তাহারা সকলেই যে ভারতীয় কোন প্রকার রাষ্ট্রনীতিকেই আপনাদের মতসমষ্টিতে বা কার্য-প্রণালীতে প্রধান স্থান দিয়া থাকে, এমন নয়। কিন্তু কেহই রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়া কাজ করে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত দু-রকম মত আছে।

কংগ্রেসের ও কংগ্রেসপন্থীদের মত এই যে, ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; এশিয়ায় জাপান যেরূপ স্বাধীন, ভারতবর্ষকে সেইরূপ স্বাধীন

হইতে হইবে। এশিয়াতে অন্য স্বাধীন দেশ আরও কয়েকটি আছে। জাপান তন্মধ্যে প্রবলতম বলিয়া জাপানেরই নাম করিলাম। ইউরোপ ও আমেরিকার সব দেশই স্বাধীন—দু-একটা প্রায়-স্বাধীন। কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চান তাহার কারণ ইহা নহে যে স্বাধীনতা লাভ সকলের চেয়ে সহজ। কংগ্রেসপন্থীরা জানেন পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করা সর্বাপেক্ষা কঠিন। কিন্তু যাহাকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া মনে করেন, কঠিন বলিয়াই তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে চান না। এখানে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তিনি “স্বাধীনতার সারাংশ” (substance of independence) পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন ও গ্রহণ করিবেন। ইহাতে তখন কংগ্রেস-দলভুক্ত কেহ আপত্তি করেন নাই। “স্বাধীনতার সারাংশ” পাইলে কংগ্রেসের বামবর্গীয়েরা সকলে সন্তুষ্ট হইবেন কি না বলিতে পারি না।

ভারতবর্ষের জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ (Indian National Liberal Federation) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিয়া কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি স্বশাসক ডোমিনিয়নগুলির মত অধিকার লাভ করিতে চান। এরূপ অধিকারকে স্বাধীনতার সারাংশ বলা যাইতে পারে। এই অধিকার কি প্রকার?

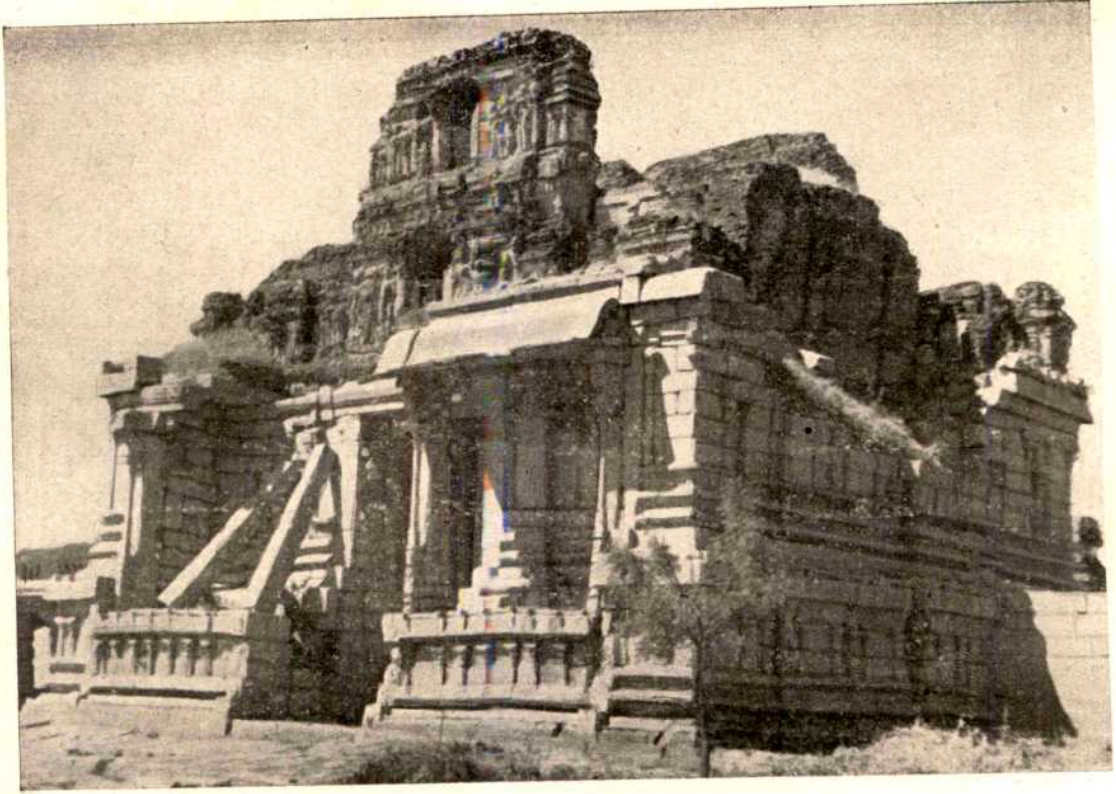
ডোমিনিয়নগুলির আভ্যন্তরিক কোন ব্যাপারে ব্রিটেন হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সামরিক অসামরিক সমুদয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব আছে। তাহাদের গবর্নর-জেনার্যালকে আগে ব্রিটেনের রাজা ব্রিটেনের মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে নিযুক্ত করিতেন, এবং কেবল ব্রিটেনের কোন নাগরিকই গবর্নর-জেনার্যাল নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ইম্পিরিয়াল কন্ফারেন্সের এবং ওয়েষ্টমিনস্টার আইনের ফলে এখন ব্রিটেনের রাজা কোন ডোমিনিয়নের গবর্নর-জেনার্যাল নিযুক্ত করিতে হইলে তাহারই মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে তথাকার কোন নাগরিককে নিযুক্ত করেন। ডোমিনিয়নগুলি স্বেচ্ছায় কোন দেশের সহিত যুক্ত করিতে পারে না, কিন্তু অসামরিক কথাবাত্তা চালাইতে এবং চুক্তি-সন্ধি প্রভৃতি করিতে পারে। ব্রিটেন কোন দেশের সহিত যুক্ত করিলেই ধরিয়া লওয়া হয়, যে, ভারতবর্ষেরও সেই দেশের



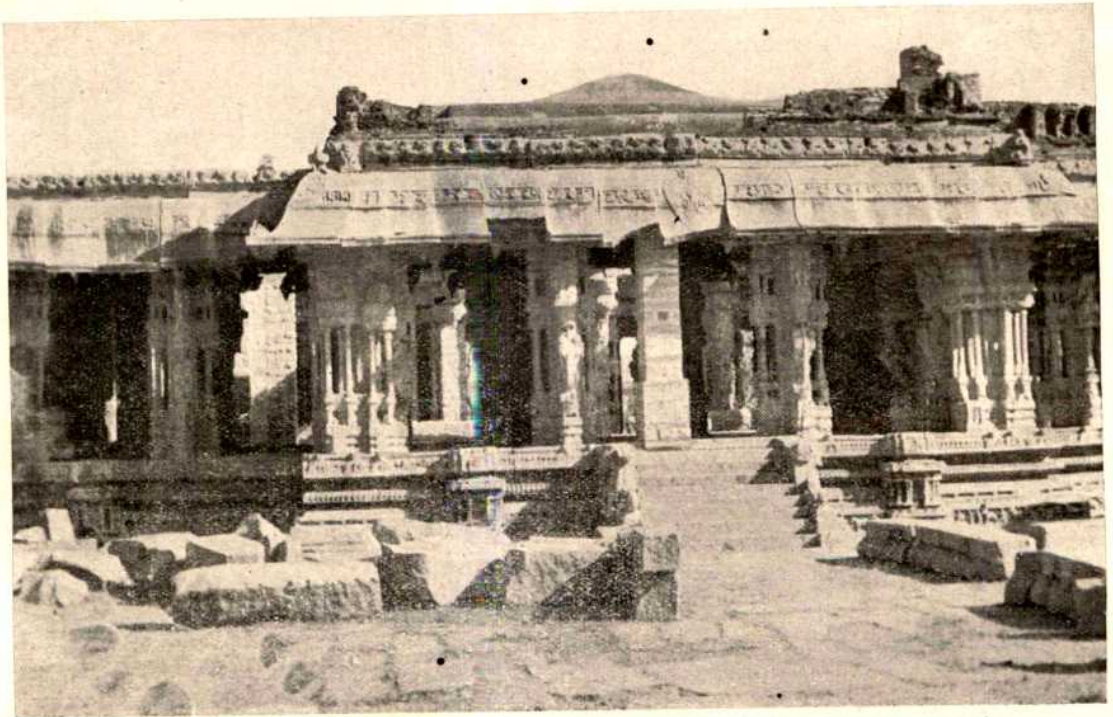
মাদ্রিদ



বিদেশীয় সাংবাদিকগণ মাদ্রিদের উপকণ্ঠ হইতে বিদ্রোহীগণের মাদ্রিদ আক্রমণ লক্ষ্য করিতেছেন



বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ষট্‌শতাব্দিকী ; কুম্ভ মন্দির



বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ষট্‌শতাব্দিকী ; বিঠোবা মন্দির

সহিত যুদ্ধের অবস্থা ঘটমাছে এবং ভারতীয় সৈন্য আদিও তাহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু ব্রিটেন কোন দেশের সহিত যুদ্ধ করিলে কোন ডোমিনিয়নের তাহাতে যোগ দেওয়া না-দেওয়া সেই ডোমিনিয়নের স্বৈচ্ছাধীন। যে কোন বা সম্মুখ ডোমিনিয়ন নিরপেক্ষ থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিতে পারে না।

নিজ নিজ বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের এবং নিজ নিজ জাহাজ চালান প্রভৃতি কার্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্ত ডোমিনিয়নগুলি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বাপন প্রভৃতি করিতে পারে ও করে।

এই প্রকারে দেখা যাইতেছে, যে, ডোমিনিয়নগুলি প্রায় স্বাধীন, যদিও সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে। ভারতবর্ষও ডোমিনিয়নত্ব লাভ করিলে প্রায় স্বাধীন হইবে। এই জন্ত যদিও ব্রিটেনের একাধিক রাজা এবং বহু মন্ত্রী ও গবর্নর-জেনার্যাল ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তথাপি নূতন ভারতশাসন আইন প্রণয়ন ও পাস করিবার সময় তাহাতে ডোমিনিয়ন কথাটা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই এবং ঐ আইন বস্তুতঃ স্বশাসনের ঠিক বিপরীত দিকে গিয়াছে। উহাতে স্বশাসনের কঙ্কাল আছে কিন্তু প্রাণটা নাই—প্রাণটা টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে ডোমিনিয়নত্ব লাভ ও পূর্ণ স্বরাজ লাভ প্রায় সমান কঠিন। বোধ হয় পূর্ণ স্বরাজ লাভ অল্প পরিমাণে অধিক কঠিন।

যাহারা ডোমিনিয়নত্ব চান ও যাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চান, ভারতবর্ষীয় এই উভয় দলের লোককেই আমরা স্বাজাতিক (ন্যাশনালিষ্ট) বলিয়া গণনা করি। কিন্তু যাহারা নূতন ভারতশাসন আইনেই সন্তুষ্ট, তাহাদিগকে স্বাজাতিক মনে করি না।

এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্য নির্বাচিত হইবে; কেন্দ্রীয়, ফেডার্যাল বা সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উভয় কক্ষের সদস্যনির্বাচন পরে হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্যরাই তাহাদিগকে নির্বাচন করিবেন বলিয়া এখন যে সদস্যনির্বাচন হইতে যাইতেছে তাহা সমগ্রভারতীয় সদস্যনির্বাচনেরই প্রথম ধাপ। অতএব এখন হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক। যে-সকল প্রার্থী পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে কিংবা ডোমিনিয়নত্বের পক্ষে, কেবল তাহাদিগকেই ভোট দেওয়া উচিত। নূতন ভারত-শাসন আইনেই যাহারা সন্তুষ্ট এরূপ লোকদিগকে ভোট দেওয়া অসুচিত।

বন্ধু মুসলমানেরা বলিবেন, “যে-সব মুসলমান প্রার্থী মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থরক্ষা করিবেন না তাহাদিগকে আমরা ভোট দিব না।” এ-বিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকুন। মুসলমানদিগকে খুশি করা নূতন ভারতশাসন আইনের একটা অপ্রধান উদ্দেশ্য। মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা এরূপ রাখা

হইয়াছে যে তাহাদিগকে রাজী না-করিয়া কেহ কিছু করিতে পারিবে না—অবশ্য গবর্নর পারিবেন।

কিন্তু মুসলমানেরা ইহাও বুঝিয়া রাখুন, যে, দেশ ডোমিনিয়নত্ব কিংবা পূর্ণস্বাধীনতা না পাইলে মুসলমান বা হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ান কোন সম্প্রদায়েরই জনসাধারণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বা আর্থিক বা অগ্রবিধ উন্নতি স্বশাসক দেশসমূহের দরিদ্রতম শ্রেণীসকলেরও সমান হইবে না—কেবল ‘অভিজাত’, ‘সম্রাট’, অল্পগ্রহজীবী কতকগুলি লোকের সুবিধা হইবে।

বাঙালী হিন্দুরা অনেকে, হিন্দুসম্প্রদায়ের স্বার্থ-রক্ষায় মনোযোগী হইবেন, এরূপ সদস্য চাহিবেন। কিন্তু হিন্দু সদস্যের সংখ্যা এত কম রাখা হইয়াছে, যে, তাহারা সকলে সম্পূর্ণ একমত হইলেও কেবল নিজেদের ভোটের জোরে কিছুই করিতে পারিবেন না। গবর্নরের দয়া হইলে তিনি কিছু করিবেন। কিন্তু দয়ার ভিত্তিয়ারী হওয়া মনুষ্যত্বের বিপরীত। অতএব, নূতন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা বা মন্ত্রীদের দ্বারা, হিন্দুর ইষ্টসাধন তদূরের কথা, হিন্দুর অনিষ্ট নিবারণের আশাও কোন হিন্দু যেন না করেন। তাহা হইলেও, হিন্দু-হিতৈষী সদস্যপদপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া হিন্দু ভোটারদের কর্তব্য। আগেই বলিয়াছি, যিনি ভারতবর্ষের জন্ত অন্ততঃ ডোমিনিয়নত্ব না চান এরূপ কাহাকেও ভোট দেওয়া উচিত নয়—তিনি যে ধর্মসম্প্রদায়েরই লোক হউন না কেন।

ডোমিনিয়নত্ব ও পূর্ণ স্বরাজ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে-সব দেশ ডোমিনিয়ন, দক্ষিণ-আফ্রিকা ছাড়া অল্পতর তাহাদের অধিকাংশ লোক ইউরোপীয়, কোথাও কোথাও অধিকাংশই ইংরেজ, এবং দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও প্রভূত বাহাদের তাহারা ইউরোপীয় বৃদ্ধ ও ইংরেজ। ডোমিনিয়নগুলির ভাষা প্রধানতঃ ইংরেজী এবং ধর্মও প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম। সুতরাং ব্রিটেনের লোকদের সহিত তাহাদের নানা রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ডোমিনিয়নত্ব লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা ইউরোপীয় নহে, ইংরেজ নহে; ভারতবর্ষের ভাষা ইউরোপীয় নহে; ধর্মও প্রধানতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম নহে। সুতরাং ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের স্বাভাবিক কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। অতএব, ভারতবর্ষ শুধু ডোমিনিয়নত্বে সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

অবশ্য ডোমিনিয়নত্ব স্বাধীনতার সারাংশ বটে এবং ডোমিনিয়নত্ব লব্ধ হইলে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। আয়ারল্যান্ড ডোমিনিয়নত্ব পাইয়া পূর্ণস্বাধীন সাধারণতঃ হইতে যাইতেছে। তাহাতে ব্রিটেন বাধা দিতে গেলে অসুবিধায় পড়িবে, বিপন্ন হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা একাধিক বার এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছে, যে,

ব্রিটেন তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাইবার চেষ্টা করিলে সে ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিবে।

আগে বলিয়াছি, ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠতার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষ যদি একটা ডোমিনিয়ন হয়, তাহা হইলে ব্রিটেনের সহিত তাহাকে যে বাধ্যবাধকতা বা সম্পর্ক রাখিতে হইবে, অল্প সব স্বাধীন দেশের সহিত তাহার সেরূপ সম্পর্ক না রাখিবার কোন স্বাভাবিক কারণ নাই। ব্রিটেনের যতগুলি ডোমিনিয়ন আছে, তাহার প্রত্যেকটির লোকসংখ্যা ব্রিটেনের চেয়ে কম। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ব্রিটেনের সাত গুণ। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের ডোমিনিয়ন হওয়া সাজিবে না।

এ সমস্তই অবস্থা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু যখন রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যের কথা উঠিয়াছে, তখন ভবিষ্যতের কথাই বলিতে হইবে। তাহা অদূর ভবিষ্যৎ, দূর ভবিষ্যৎ বা স্বদূর ভবিষ্যৎ হইতে পারে। একমাত্র পূর্ণ স্বরাজকেই আমরা লক্ষ্যস্থল বলিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে পারি।

স্বাভাবিকতা ও অন্তর্জাতিকতা

এ-কথা ঠিক, যে, যেমন কোন দেশের কোন মানুষই সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে পারে না, তাহাকে অল্পদের উপর নির্ভর করিতেই হয়, তেমনি কোন দেশের লোকই সম্পূর্ণরূপে অল্পদেশনিরপেক্ষ হইতে পারে না। এই জন্য পৃথিবীর সব দেশের পক্ষে পরস্পরনির্ভরশীলতা খুব বড় আদর্শ। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত জাতীয়ত্ব জন্মিয়াছে, যাহারা স্বাধীন হইয়াছে, তাহারা ই আত্মসম্মানের সহিত অপর জাতিদের সঙ্গে প্রকৃত পরস্পরনির্ভরশীলতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। পরস্পরনির্ভরশীলতার অর্থ ইহা নহে, যে, একটা জাতি অল্প একটা জাতির আদেশ মানিয়া চলিবে কিন্তু অল্প সেই জাতিটা নিজের ইচ্ছামত চলিবে।

কেহ কেহ পরস্পরনির্ভরশীলতার (ইন্টারডিপেন্ডেন্সের) দোহাই দিয়া বলিয়াছেন, ইহা যখন বড় আদর্শ তখন ব্রিটেনের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু সম্বন্ধটা ত পরস্পরনির্ভরশীলতা নয়। ভারতবর্ষকে যেমন ব্রিটেনের কথা শুনিতে হয়, ব্রিটেনকে ত তেমন ভারতবর্ষের কথা মানিতে হয় না। ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হইলে অবশ্য উভয় দেশের মধ্যে, সম্পূর্ণ না হইলেও, বহু পরিমাণে প্রকৃত পরস্পরনির্ভরশীলতা জন্মিবে।

কিন্তু তাহার পরের কথাও কিছু আছে। ভারতবর্ষ শুধু ব্রিটেনের সহিতই কেন পরস্পরনির্ভরশীল হইবে? অল্প স্বাধীন দেশগুলো কি দোষ করিল? তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ পরস্পরনির্ভরশীল কেন না-হইবে? সব সময়ে সব দেশের

সঙ্গে সব দেশের পরস্পরনির্ভরশীলতা জন্মিতে বা থাকিতে না পারে বটে; কিন্তু স্বাধীনতার একটি অর্থই এই, যে, স্বাধীন দেশ অল্প যে কোন দেশের সহিতই আবশ্যকমত সম্পর্ক স্থাপনে অধিকারী।

অতএব, স্বাভাবিকতার (গ্রাশুয়ালিজ্‌মের) পূর্ণ বিকাশ স্বাধীনতালাভে, এবং স্বাধীনতা লব্ধ হইলে তবে জাতিসমূহ পরস্পরনির্ভরশীল হইতে পারে। তখন অন্তর্জাতিকতার (ইন্টারগ্রাশুয়ালিজ্‌মের) বাস্তব রূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের স্বাভাবিকতা এবং ইউরোপের বহু জাতির ও জাপানের স্বাভাবিকতায় প্রভেদ আছে। আমরা স্বাধীন হইয়া স্বাভাবিকতার বাস্তব রূপ উপলব্ধি করিতে চাহিতেছি, অল্প কোন দেশকে আমাদের অধীন করিয়া তাহাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট করিতে চাহিতেছি না। ইউরোপের অনেক দেশ কিন্তু অল্প অনেক দেশে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়াছে। এখনও তাহাদের অনেকের এই চেষ্টা থামে নাই। জাপানের স্বাভাবিকতাও ইউরোপের স্বাভাবিকতার মত।

যে স্বাভাবিকতার সহিত অন্তর্জাতিকতার বিরোধ নাই, বরং যাহা ব্যতিরেকে প্রকৃত অন্তর্জাতিকতার উদ্ভব হইতে পারে না, আমরা সেই স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী।

খাদ্যের ঘাটতি ও জলসেচনের প্রয়োজন

গবর্নর-জেনার্যাল লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষে সকলের যথেষ্ট খাদ্য পাওয়ার প্রয়োজন জানাইয়াছেন এবং যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত জলসেচনের যথেষ্ট বন্দোবস্ত দরকার বলিয়াছেন। ঠিক কথা।

এ-পর্যন্ত কিন্তু বঙ্গে জলসেচনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক হইয়া আছে। পঞ্জাব সিদ্ধ প্রভৃতি বহু প্রদেশে জলসেচনের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বঙ্গে তাহার তুলনায় কিছুই হয় নাই। যে-সকল প্রদেশে এ-যাবৎ জলসেচনের কৃত্রিম খাল প্রভৃতির জন্য বহু কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, তাহাদের নিজের অত খরচ করিবার টাকা প্রাদেশিক তহবিলে কখনও ছিল না, ভারত-গবর্নমেন্টের টাকাতেই তাহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত-গবর্নমেন্ট টাকা পান প্রদেশগুলিতে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে। বঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হয় এবং বঙ্গের প্রাদেশিক তহবিলকে বঞ্চিত করা হয় সকলের চেয়ে বেশী ও ভারত-গবর্নমেন্ট বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে শতকরা সকলের চেয়ে বেশী টাকা লইয়া থাকেন। ইহা মেস্টন গ্যাওয়ার্ডেরও আগে হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং যে-সকল প্রদেশে

ভারত-গবন্মেণ্টের টাকায় জলসেচনের জন্ত কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিক অনেকটা বঙ্গের রাজস্ব হইতেই স্থবিধা পাইয়াছে। অথচ বাংলা দেশ সেই স্থবিধা পায় নাই।

বঙ্গের পক্ষে আরও অস্থবিধার কথা এই, যে, অতঃপর জলসেচন একটা প্রাদেশিক বিষয় ও বিভাগ হইবে, ভারত-গবন্মেণ্ট ইহার জন্ত কিছু করিবেন না, এবং নূতন বন্দোবস্তে বাংলা দেশ প্রায় পূর্ববৎ নিজের রাজস্ব হইতে বহুপরিমাণে বঞ্চিত হইতে থাকিবে।

অর্থাৎ জলসেচন যখন ভারত-গবন্মেণ্টের এলাকাভুক্ত ছিল তখন, ভারত-গবন্মেণ্ট বঙ্গের টাকা খুব লইতেন বটে, কিন্তু বঙ্গে জলসেচনের জন্ত বিশেষ কিছু করিতেন না, করেন নাই; এবং অতঃপর যখন জলসেচন প্রাদেশিক বিষয় হইল, তখন ত ভারত-গবন্মেণ্ট বঙ্গের জন্ত কিছু করিবেনই না এবং বঙ্গের প্রাদেশিক তহবিলেও বেশী কিছু টাকা থাকিবে না!

এখন বাঙালীরা বাংলা-সরকারকে ক্রমাগত খোঁচা দিয়া যা পারেন করান, এবং নিজেদের বেসরকারী চেষ্টায় যাহা সম্ভব করুন; যেমন বীরভূমে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় করা হইয়াছে। (অগ্রহায়ণ সংখ্যার জন্ত লিখিত)

রাঁচীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন রাঁচীতে হইবে, তাহা আমাদের কাগজে ও অগ্রত্বে পূর্বেই বিজ্ঞাপিত



শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সভাপতি, মূল সম্মেলন ও সাহিত্য-বিভাগ

হইয়াছে। সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, যে, তাহা নিম্ন-লিখিত কার্যসূচী অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে।



শ্রীশিশিরকুমার মিত্র
সভাপতি, বিজ্ঞান-বিভাগ

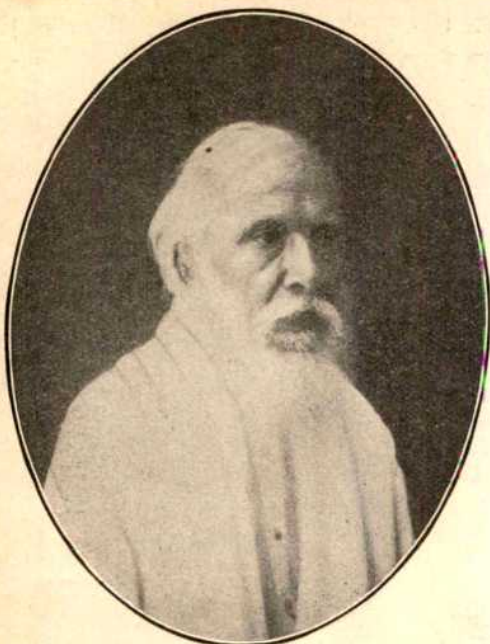
২৬শে ডিসেম্বর রাত্রে সম্মেলনের পরিচালক-সমিতির সভা।

২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১১টা হইতে ৩টা—সভাপতি বরণ, অভ্যর্থনা-সমিতির ও মূল সভাপতির অভিভাষণ, সাহিত্য বিভাগের অধিবেশন। সন্ধ্যা ৫টা হইতে সঙ্গীত-বিভাগের অধিবেশন, পরে সঙ্গীতের বৈঠক।

২৮শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় রামানন্দ-সম্মেলন। বেলা ১১টায় শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিকী বিভাগের অধিবেশন। ২৯টায় অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধিবেশন। বেলা ১টা টায় শিল্প-বিভাগের অধিবেশন।



শ্রী অনুরূপা দেবী
সভানেত্রী, মহিলা-বিভাগ



শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সভাপতি—শিক্ষা, পাঠাগার ও সাংবাদিক বিভাগ



শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

সভাপতি—ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ ও নৃতত্ত্ব বিভাগ



শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত

সভাপতি দর্শন-বিভাগ



শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

সভাপতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিভাগ

৩টা হইতে ৫টায় ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের নৃত্য। সন্ধ্যা ৬টায় বিজ্ঞান-বিভাগের অধিবেশন। রাত্রি ৮টায় ছোট নৃত্য। আহাঙ্গাদির পর বিষয়নির্বাচনী-সমিতির অধিবেশন।

২৯শে ডিসেম্বর সকাল ৮টায় দর্শন-বিভাগের অধিবেশন। বেলা ১১টায় ইতিহাস, বৃহত্তর বঙ্গ ও নৃতত্ত্ব বিভাগের অধিবেশন। ৩টায়

মহিলা-বিভাগের অধিবেশন। সন্ধ্যা ৫টায় মূল সভার অধিবেশন। রাতে আমোদ-প্রমোদ।

অভ্যর্থনাসমিতি জানাইয়াছেন, সম্মেলনে পঠনীয় প্রবন্ধ এবং বিবেচ্য প্রস্তাবাদি ১৭ই ডিসেম্বরের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায়ের নামে, হিন্দু ডাক-



শ্রীশিবেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, সঙ্গীত-বিভাগ



ডাঃ রাধাক্রমণ চৌধুরী
প্রধান কণ্ঠসচিব

ঘর, রাঁচী, ঠিকানায়, পাঠাইতে হইবে। প্রতিনিধি-নিবাস
২৬শে ডিসেম্বর সকাল হইতে ৩০শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন পর্যন্ত



অভ্যর্থনাসমিতির কণ্ঠপরিচালকগণ।

বামদিক হইতে, দণ্ডায়মান—শ্রীলালমোহন ধর চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক; শ্রীললিতাকুমার চৌধুরী, সহঃ সম্পাদক; শ্রীতারকনাথ ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ; শ্রীনারায়ণ গুপ্ত, সম্পাদক—প্রচার-বিভাগ, শ্রীশশিভূষণ ঘোষ সম্পাদক—সাহিত্য-বিভাগ; শ্রীফকীরুদ্দীন আহমদ, সম্পাদক—সভামণ্ডপ-বিভাগ; শ্রীকালীশরণ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক; শ্রীকৃষ্ণকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক—স্বচ্ছাসেবক-বিভাগ
উপবিষ্ট—শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ, সম্পাদক—প্রদর্শনী-বিভাগ; শ্রীমধুসূদন সরকার, সহঃ সম্পাদক প্রদর্শনী-বিভাগ; শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সহঃ সম্পাদক; রায় বাহাদুর শ্রীশরণ চন্দ্র রায় সভাপতি, অভ্যর্থনাসমিতি; শ্রীশান্তশীলা রায়, সম্পাদিকা, মহিলা-বিভাগ; রায় বাহাদুর শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি; শ্রীনন্দকুমার ঘোষ, সহকারী সভাপতি।

খোলা থাকিবে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাঁচীতে শীত খুব বেশী। অতএব প্রতিনিধিগণের ও দর্শকবর্গের যথোপযুক্ত শীতবস্ত্র এবং রাত্রির জন্য বিছানা ও লেপ কবুল যথেষ্ট লইয়া যাওয়া আবশ্যক।

অভ্যর্থনাসমিতি খবরের কাগজে ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে রাঁচী বাইবার পথ বিস্তারিত ভাবে ছাপাইয়া দিয়াছেন।

সাধারণ সভাপতির, মহিলা-বিভাগের সভানেত্রীর, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সভাপতির নাম আগেই অনেক খবরের কাগজে ও প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে। শিল্প-বিভাগের কথা আগে জানাইতে পারা যায় নাই। তাহার পরিচালক হইবেন শ্রীবৃদ্ধ বামিনীরঞ্জন রায়।

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীবৃদ্ধ শরচ্চন্দ্র রায়ের ফোটোগ্রাফ আমরা আগেই প্রকাশিত করিয়াছি। এবার অল্প কক্ষ্মীদের ফোটোগ্রাফও মুদ্রিত হইল।

সাধারণ সভাপতির, মহিলা-বিভাগের সভানেত্রীর, এবং বিভাগীয় সভাপতিগণের ছবিও দিলাম। কেবল শ্রীবৃদ্ধ বামিনীরঞ্জন রায় মহাশয়ের ছবি দিতে পারিলাম না।

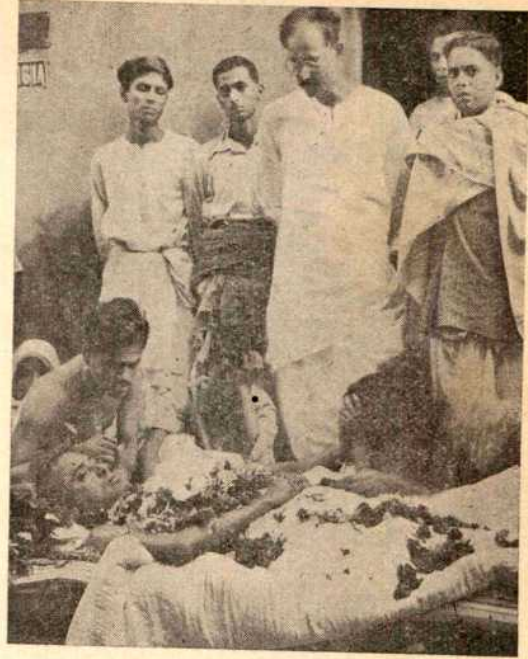
রাঁচী সম্বন্ধে অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে আমরা কিছু লিখিয়াছিলাম। এবার তাহার ও তাহার সম্বন্ধিত স্থান-সমূহের সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল।

বৎসরান্তে বহুদূরের বহু পরিচিত ব্যক্তির দর্শনলাভ ও তাহাদের সংস্পর্শে আসা আনন্দদায়ক। যাহাদের সহিত আগে পরিচয় ছিল না তাহাদের সহিত পরিচয় ও সংস্পর্শও সুখকর। বাঙালী জাতির ধিনি যেখানেই থাকুন, সকলের সহিতই যে আমাদের আত্মীয়তা আছে হৃদয়ের যোগ আছে, যে-প্রতিষ্ঠান তাহা স্বীকৃত করাইয়া দেয় তাহার গৌরব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহার অধিবেশনে যে অনেক স্থলিখিত স্থচিস্তিত অভিভাষণ পঠিত হয়, অল্প ভাল প্রবন্ধও পঠিত হয়, তাহা সুবিদিত।

অধিবেশনের সহিত চিত্তবিনোদনের নানা সুব্যবস্থাও থাকে।

ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউর অত্যন্ত সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের ৪৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় আমরা ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। সাংবাদিকদিগের মধ্য হইতে এক জন প্রতিভাশালী লেখকের তিরোধান হইয়াছে। তিনি ১৩ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন; ১৪ই প্রাতে সম্ভ্রাস রোগে আক্রান্ত হন, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতে নানা প্রকার সারবান প্রবন্ধ লিখিতেন, গল্প লিখি-



অন্তিম শয্যায় ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

বার শক্তিও তাঁহার ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণাতে তাঁহার অগ্রগতি ছিল। গবেষণামূলক ঐতিহাসিক গ্রন্থ তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। লেখাতে তাঁহার উৎসাহ ছিল, লিখিতে ভাল লাগিত বলিয়া, লেখার দ্বারা দেশের লোক-দের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া, দেশের হিত হইবে বলিয়া—অর্থলাভের সন্তান বা আশা তাঁহার উৎসাহের কারণ ছিল না। তিনি মিতবাক, নম্র ও সাতিশয় শিষ্টাচার-সম্পন্ন ছিলেন। কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। এই সকল গুণে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও সহকক্ষ্মীদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেশের এক জন বিশিষ্ট সেবক হইতে পারিতেন।

পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনী

পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন গত ৪৬ বৎসর ধরিয়া হইয়া আসিতেছে। এবার ইহার ষট্চত্বারিংশ অধিবেশন পূজার ছুটিতে টাঙ্গাইলে হইয়া গিয়াছে। অত্যাগত ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে এই সম্মিলনীর কোন গুরুত্ব আছে কিনা তাহা স্থির করিবার ভার তাঁহাদের উপর—আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের লোক। কিন্তু দুটি কারণে টাঙ্গাইলের অধিবেশনটির

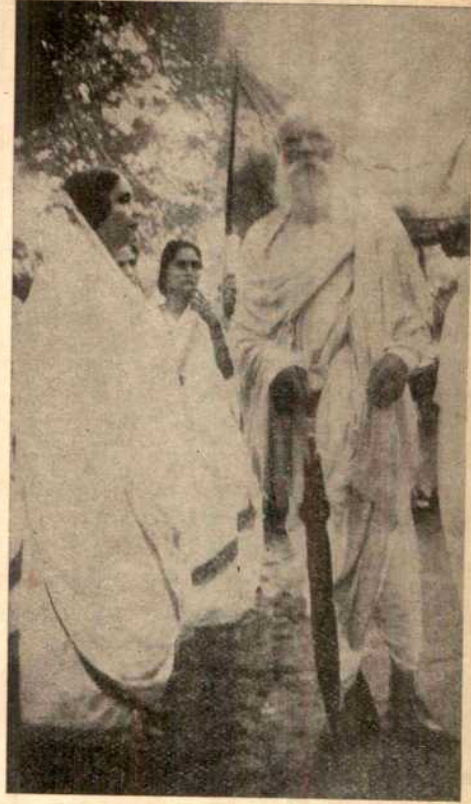


টান্কাইলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র

বিশেষতঃ ব্রাহ্ম ভিন্ন অল্প লোকদের নিকটও আছে, ইহা বলা আবশ্যক মনে করি।

ইহার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। তিনি অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু ব্রাহ্মদের চেয়ে সংখ্যায় বহু শতগুণ অধিক স্বদেশবাসীর সেবা, রাজনীতি, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, মাদকতা নিবারণ, স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, স্থনীতি সংরক্ষণ, অবনত জাতিসমূহের উন্নতিসাধন, ছুঁড়ি ও জলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য দান, নারীরক্ষা প্রভৃতি কার্যক্ষেত্রে করিয়া গিয়াছেন। সার্বজনিক কার্যে বৃহৎ সভাস্থলে এই কর্মবীরের শেষ আবির্ভাব টান্কাইলে হইয়াছিল, ইহা স্মরণীয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানাদ্যাপক বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশী নানা পণ্যশিল্পের কারখানার এক জন প্রধান প্রবর্তক বলিয়া সুবিদিত, ছুঁড়ি জলপ্লাবনাদিতে বিপন্ন লোকদের অত্যন্ত প্রধান সহায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে জানে, এক দিকে চরখা ও খদ্দের এবং অল্প দিকে স্বদেশী কাপড়ের মিলের কার্যতঃ সমর্থক তিনি, দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যদাতা,



টান্কাইলে কৃষ্ণকুমার মিত্র। বাম পার্শ্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

এবং তাহাদেরই মত দীনভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহক তিনি। বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব আছে। টান্কাইলেই তিনি প্রথম, অল্পাচ্ছন্ন কথার মধ্যে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপযোগিতার কথা বলিয়াছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত একটি নহে, অনেক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মদর্শনাদিগের মধ্যে অসম্ভাব ও বিরোধ তন্মধ্যে অন্যতম। নে-বিষয়ে আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন :—

হিন্দুতে মূলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে, এবং জাতিতে জাতিতে, যদ্বংশ-ধর্মের দ্বারা বেঙ্গল আশ্রয়িতা মহা-মুহুর্য্য বিংশ বাজিয়া উঠিয়াছে, এবং দিকে দিকে এই বিশ্বব-বহির ধুমায়মান শিখা লোনজিহবা বিস্তার করতঃ যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিম ঘাটে আরব-সমুদ্রের তীরে যে কালবৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শ,—

“এক জাতি, এক ভগবান

এক দেশ, এক মন প্রাণ”,

এই আদর্শ গ্রহণ না করিলে ভারতের মুক্তি শত সহস্র বৎসরেও সম্ভব হইবে না।

প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষেরই ভারতবর্ষের সমগ্রসমুহের সমাধানে উপায় নির্দেশ করিবার অধিকার আছে। আচার্য্য রায় তাঁহার মত অনুসারে উপায় বলিয়াছেন।

আর একটি সমস্যা হিন্দু অবনত জাতিদের অবস্থা এবং তাহাদের অসন্তোষ। আচার্য্য রায় তাঁহার অভিভাষণের একাধিক স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধারণের সহিত ভারতের অবনত শ্রেণীর হৃদয়শার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিক্ত প্রাণে এক শিথ্যকে লিখিয়াছিলেন—

“যদি কারুর আমাদের চেয়ে নীচকুলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও আশা ভরসা নাই—সে জন্মের মত পেল। কেন হে বাপু?—এ কি অভ্যচার। আমেরিকার সকলেরই আশা আছে, ভরসা আছে, স্বযোগ এবং সুবিধা আছে। আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মাস্ত্র হবে। আজ যে রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবারও আশা রাখে। আর, আমাদের দেশে? Cneo a cobbler, ever and always a cobbler—মুচির ছেলে ছাপ্পার পুরুষ ধরিয়া মুচিই থাকিবে, তাহার আর কোনও উচ্চ আশা নাই— থাকিতে পারে না। কারণ, এদেশে মুচির ছেলের আর গুচি হইবার উপায় নাই।”

পাঞ্জাবের ভান্সী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—

হিন্দু পড় হে পোখিয়া, মুছলমান কোর, চুড়া লীচ গ্ৰীচীয়া না জিমন না আস্মা।

হিন্দুর পুঁথি আছে, মুসলমানদের কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য চুড়াদের খর্গও নাই, মর্জাও নাই—তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন করিতেই আসিয়াছে।

হায় আমরা কি মানুষ!—এ যে হাড়ী, ডোম, বাস্কা, চামার, মালী, মাইঠাল, তোমার বাড়ীর আশেপাশে চারিদিকে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে এবং পশুপং জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্ত তোলরা এই যুগযুগান্তর ধরিয়া কি ক'রেছ বলতে পার? তোমরা তাহাদের ছৌও না, কাছে আসতে দাও না—দূর দূর কর। জাপানী কুতুরটাকেও আদর করিয়া কোলে পিঠে নিয়ে বেড়াও—আর হুশী সবল স্তম্ভপুষ্ট নাহস্-নুহস্ মুচির ছেলেটি যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে, তবে জাত পেল ধর্ম গেল বলিয়া ছকার দিয়া ওঠ।

এম, কে আছ হুয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কর্ম্ম! কে আছ বীর! উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর। প্রেমামৃতধরায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ-বন্ধি নির্দোষ করিয়া দাও।

বাস্তবতার নিগূহীত, এবং নিপীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে আজ মদ্যীত উঠুক,—

“ভেসেছে তুমার, এদেশে জ্যোতির্ধর, তোমারি হউক জয়।

তিমির-বিদ্যার উদার অভ্যাস, তোমারি হউক জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রান্তে,

নবীন আশার খগ্ন তোমারি হাতে,

জীর্ণ আবেশে, কাটো স্নকটোর ঘাতে,

বন্ধন হোক ক্ষয়, তোমারি হউক জয়।”

“নিখিল-ব্রহ্মপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলন”

বর্তমান ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে সেই দেশের বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলন হইবে, ইহা স্বসংবাদ। আমরা দশ বৎসর পূর্বে যখন রেঙ্গুন গিয়াছিলাম, তখন সেখানকার কাহারও কাহারও কাছে এইরূপ সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম; প্রবাসীতেও হয়ত লিখিয়াছিলাম। এখন যে সম্মেলন হইতে বাইতেছে তাহা অবশ্য আমাদের সেই প্রস্তাবের ফল নহে। কথাকাঁটা তুলিলাম আমাদের আনন্দের একটা কারণ জানাইবার জন্ত। আমাদের এত দিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বাইতেছে।



অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধিবেশনটির প্রধান কর্মসচিব শ্রীযুক্ত বিনয়শরণ কাহালী তাঁহার নিমন্ত্রণপত্রে লিখিয়াছেন,

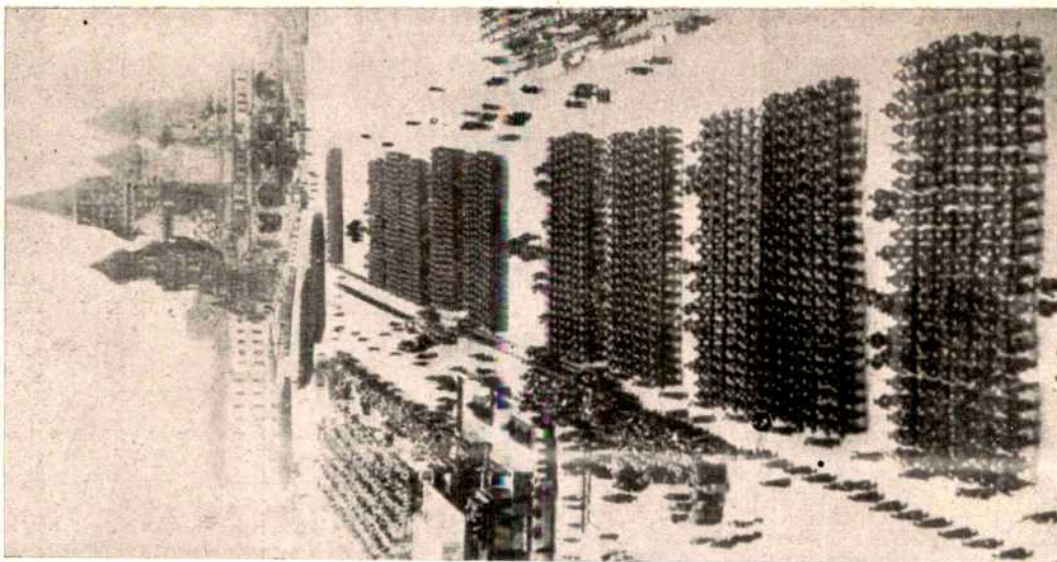
আগামী ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ হইতে ব্রহ্মদেশ ভারত-সরকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। ইতিমধ্যে ব্রহ্মবিচ্ছেদের পূর্বেই রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রহ্মের বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যতালিকা হইতে বাংলা ভাষা ও ভারতীয় অজ্ঞাত ভাষা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়দের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে এইরূপ আশঙ্কা হয়। ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশে বাংলা সাহিত্য চর্চা ও বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই সম্মিলনের অধিবেশনে ব্রহ্মদেশে একটি স্থায়ী বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠা এবং এখানে একটি বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিব।



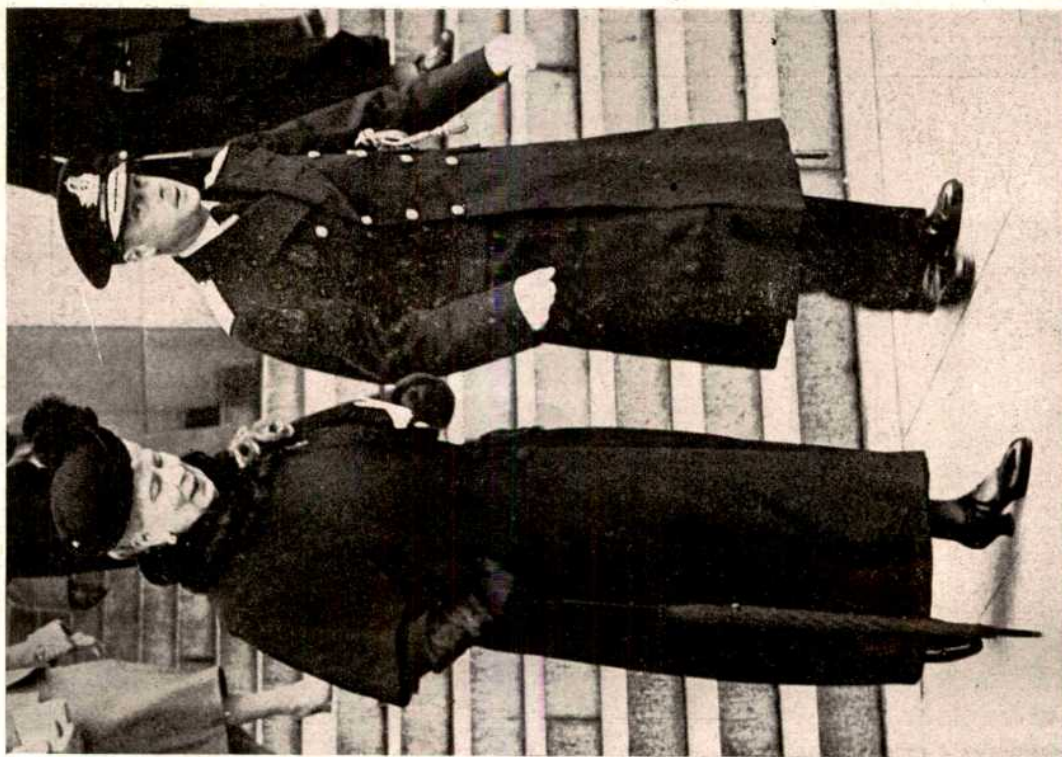
সহাট ষষ্ঠ জর্জ



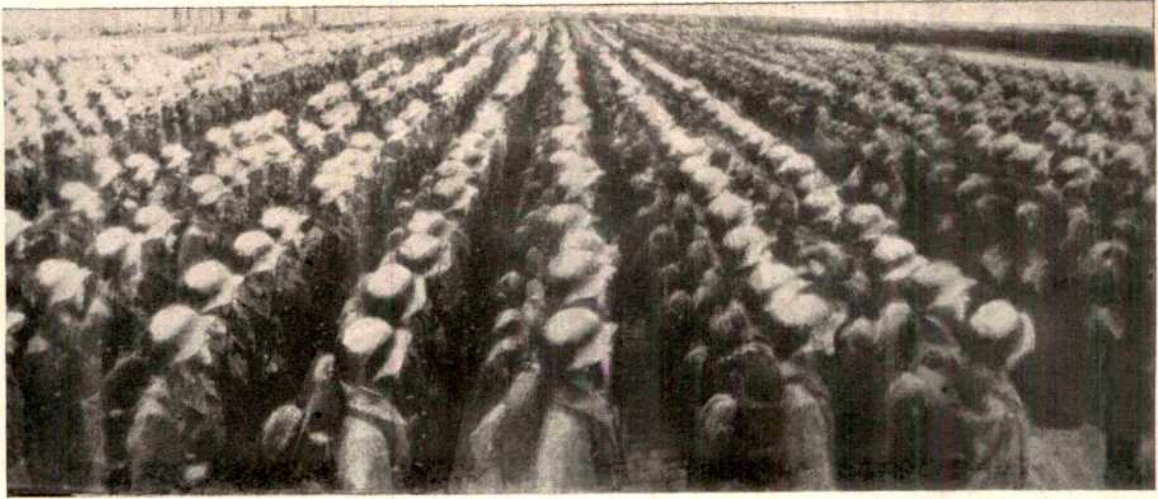
রাজকুমারী এলিজাবেথ ও সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ



রাশিয়ার বিদ্রোহ-বায়িকীতে মস্কোতে 'রেড আর্মি'র কুচকাওয়াজ



রাজমাতা মেরী ও ভূতপূর্ব রাজা এডোয়ার্ড



উপরে : রাশিয়ার সমর-প্রস্তুতি । বলশেভিক বিদ্রোহের বাহিনী উপলক্ষ্যে মস্কোতে ‘রেড আর্মি’র কূচকাণ্ডরাজ
 নীচে : রাশিয়ার বিদ্রোহ-বাহিনীতে স্পেনের প্রতিনিধিগণের শোভাযাত্রা



বালিনে জাপ-জৰ্মন চুক্তিৰ স্বাক্ষৰ। জৰ্মন প্ৰতিনিধি ৱিৰেনট্ৰপ চুক্তিপত্ৰে সহি কৰিতেছেন



জাপানৰ একটো শোভাযাত্ৰা

আমরা প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যায় ইতিপূর্বে “ব্রহ্মে বাঙালীর মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা” বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়াছি। তাহা সম্মোচিত বিবেচিত হইতে পারে।

অভ্যর্থনা-সমিতি যে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে,

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ পর্যন্ত প্রত্যেক নিখিল-ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের রেজুলে অধিবেশন হইবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের “বররা” অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট (অক্সফোর্ড) মহোদয় সম্মিলনের মূল সভাপতিত্ব করিবেন। সাহিত্য ও কলা, দর্শন, ইতিহাস ও অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সঙ্গীত এই কয় শাখায় সম্মিলনের পৃথক পৃথক অধিবেশন হইবে। প্রতিনিমিষণের আদর্শবিধানের জন্য অভিনয় ও নৃত্য-গীতোৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্মিলনের প্রতি শাখা অধিবেশনে পাঁচটি করিয়া প্রবন্ধ পঠিত হইবে। শাখা অধিবেশনে পঠিত হইবার জন্য প্রবন্ধ প্রেরিত হইলে সাগরে গৃহীত হইবে। পঠিতব্য প্রবন্ধ নির্বাচনের ভার শাখা-সভাপতিগণের উপর স্তৃত হইয়াছে। বাহাতে এই সম্মিলন সাময়িক চেষ্টাতেই পর্যাবসিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে এক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গঠনের কল্পনা মূল অধিবেশনে প্রস্তাবিত হইবে এবং আশা করা যায় যে বাঙ্গালী জনসাধারণ এই প্রস্তাবটিকে সর্বোচ্চতর সমর্থন করিবেন।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিভা-বস্তাব বর্ণনা করা অনাবশ্যক। পাণ্ডিত্যের উপর আবার তাঁহার বহুদেশে সম্বন্ধে ভ্রমণলব্ধ সাক্ষ্য-জ্ঞান আছে তথাকার মূল অধিবাসীরা এবং সেই সেই দেশে প্রবাসী বিদেশীরা নিজ নিজ মাতৃভাষার চর্চা এবং নিজ নিজ দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের চর্চা কেমন করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখা তাহা তিনি বলিতে পারিবেন।

আমরা ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের এই চেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য আশা করিতেছি। সম্মেলনের সকল দিনের অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দৈনিকপত্রসমূহে প্রেরণের বন্দোবস্ত অভ্যর্থনা-সমিতি সহজেই করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়

৭ই পৌষ ও তাহার পরবর্তী দিবসের উৎসবের পর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা এক পক্ষ কাল ছুটি পান। তখন তাঁহারা অনেকে দল বাঁধিয়া দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হন। তাহাতে আনন্দ স্বাস্থ্য ও দৈহিক দৃঢ়তা লাভ হয় এবং দেশ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান জন্মে।

এই ছুটি পর বিদ্যালয়-বিভাগে যতগুলি নূতন ছাত্র-ছাত্রীর জায়গা হইতে পারে, বাছিয়া তাহাদিগকে ভর্তি করা হয়। আমরা প্রায় প্রতি বৎসরই এই স্বযোগের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকি, এবারও করিতেছি। ঠাহা নিয়মাবলী জানিতে চান, তাঁহারা

শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিবেন।

ঢাকেশ্বরী মিলের বস্ত্রদান

এ বৎসব বাংলা দেশে অনেক জেলায় অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে। বিপন্ন লোকদের কেবল যে অন্নভাব ঘটিয়াছিল তাহা নহে। দাবিত্র্যবশতঃ তাঁহারা আবশ্যকমত বস্ত্রও কিনিতে পাবেন নাই। এখন শীত পড়িয়াছে। অনেকে এখনও বস্ত্রের অভাব অনুভব করিতেছেন। কোন কোন কাপড়ের মিল বিপন্ন লোকদিগকে অনেক কাপড় দিয়া থাকেন। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল বাঁকুড়া সম্মিলনীকে কাপড় দিয়া তাহার কৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়াছিলেন জানি, যেহেতু বাঁকুড়া সম্মিলনীর সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে। কিন্তু বস্ত্র সব মিলের খবর জানিতাম না। সম্প্রতি ঢাকেশ্বরী মিলের বস্ত্রদানের তালিকা পাইয়া প্রীত হইয়াছি। কিন্তু উহা এত দীর্ঘ যে ছাপিবার জায়গা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই মিল দুর্ভিক্ষ-নিবারণে ব্যাপৃত যে-সকল সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে কাপড় দিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ৩৩। এই মিল মোট ২১৭৪৫ জোড়া ধুতি ও শাড়ী দান করিয়াছেন। সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার ডিবেস্তরদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ

রাজা পঞ্চম জর্জের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টম এডোয়ার্ড নাম লইয়া সিংহাসন অধিগ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত অবস্থাতে রাজা হন। বিবাহ করিবেন কিনা, করিলে কাহাকে করিবেন, এ-বিষয়ে অনেক বন্দনা-জল্পনা চলিতে থাকে। কিন্তু ঠিক কোন খবর বিলাতী কাগজ-গুলাতে প্রকাশিত হয় নাই। কয়েক মাস হইতে কিন্তু আমেরিকান অনেক কাগজে মিসেস্ সিমসন নামী এক আমেরিকান নারীর সহিত রাজা এডোয়ার্ডের অধিক ঘনিষ্ঠতার নানা বিস্তারিত সংবাদ ও আখ্যান মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। শেষে বিলাতী কাগজেও ঐরূপ খবর বাহির হয়।

মিসেস্ সিমসনের সহিত তাঁহার প্রথম স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে—কাহার দোষে জানি না। তাহার পর তিনি আবার বিবাহ করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে তিনি মিসেস্ সিমসন নামে পরিচিত। কিছু দিন পূর্বে এই দ্বিতীয় স্বামীর সহিতও এই আমেরিকান নারীর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। আদালতে বিচারের বৃত্তান্ত হইতে মনে হয়, মিঃ

সিমসন দোষী। এই বিবাহবিচ্ছেদের তারিখ হইতে ছয় মাস কাল মিসেস্ সিমসন নির্দোষ জীবন যাপন করিলে ইহা কান্নেম হইবে এবং তিনি তখন আবার বিবাহ করিতে পারিবেন। ইহাতেও বাধা জন্মিতে পারে।

রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানান (—কখন, জানি না), এবং মিসেস্ সিমসন ত্রাসতে রাজী হন।

বিবাহিতা নারীর সহিত অষ্টম এডওয়ার্ডের দেকপ ঘনিষ্ঠতার কথা কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। তাহাই পরোক্ষ ভাবে মিসেস্ সিমসনের দ্বিতীয় বিবাহবিচ্ছেদের কাণ্ড কিনা, জানি না।

দুইবার বিচ্ছিন্নবিবাহা যে-নারীর দুই পূর্বস্বামী জীবিত, তাহার সহিত কোন পুরুষের—বিশেষতঃ কোন রাজার—বিবাহ যাহাদের ভাল লাগে না, এমন লোক পাশ্চাত্য দেশ-সমূহেও অনেক আছে; হিন্দুভারতে ত বিস্তর আছেই। একপ বিবাহকে আদর্শ বিবাহ হয় ত কোন দেশেব লোকেই মনে করে না। কিন্তু কোন বিবাহটি আদর্শ বিবাহ কে-ন্টি নয়, তাহার বিচার এখন অপ্রাসঙ্গিক।

ইংলণ্ডের রাজার সহিত একপ নারীর বিবাহ অবৈধ হইত, তাহা কেহই বলে নাই। তাহার পক্ষে ইহা দ্বনীতির কাজও হইত না। কিন্তু তথাকার অভিজাত ও “ভদ্র” সমাজ একপ নারীকে রাণী বলিয়া স্বত্ত্বের সহিত গ্রহণ করিতে কুঠা বোধ করিতেছে, একপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহা বৈধ ও স্বাভাবিক। ব্রিটেনের রাজা খ্রীষ্টীয় ধর্মের ইংলণ্ডীয় শাখার রক্ষক ও শিরোমণি (“Defender of the Faith”), অর্থাৎ ইহার একটি মত অনুসারে নিচ্ছিন্নবিবাহা নারী ও তাহার নৃতন স্বামী ইহার কম্যুনিয়ন নামক ধর্মোচ্চাঠানে যোগ দিতে পারে না। রাজা এডওয়ার্ড আত্মগোষ্ঠানিক ধার্মিক ছিলেন না। ইংলণ্ডীয়-খ্রীষ্টান-ধর্মের পুর্বোহিতেরাও এই জন্য তাঁহাকে পছন্দ করিত না। এবং তিনিও ঐ ধর্মের রক্ষক হওয়া বোধ হয় পছন্দ করিতেন না, কারণ তাঁহার সিংহাসনভাগ-ঘোষণায় তিনি নিজের অন্ততম উপাধি “ধর্মরক্ষক” (“Defender of the Faith”) ব্যবহার করেন নাই। অস্ত্র দিকে ইংলণ্ডেব জনসাধারণের সহিত, অমিক কৃষক প্রভৃতির সহিত, ঐ রাজার ঘনিষ্ঠতা ছিল ও বাড়িতেছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে তাহার প্রস্তাবিত বিবাহে কোন আপত্তি হইয়াছিল বলিয়া কোন সন্দেহ নাই। এই সব কারণে একপ কথাও উঠিয়াছে, যে, ইংলণ্ডেব স্থিতিশীল স্বাধীন নেতারা ও পুর্বোহিতগণ রাজার অমিক-কৃষকপ্রেমে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার সিংহাসনভাগ ঘটাইয়াছে।

মর্গ্যান্যাটিক বিবাহ নামক এক প্রকার নিকট “বামাচার” বিবাহের কথা অষ্টম এডওয়ার্ড ভুলিয়াছিলেন।

তাহাতে প্রধান মন্ত্রী মত দেন নাই। না দিবারই কথা। তিনি ঠিকই করিয়াছিলেন। একপ বিবাহ বৈধ, কিন্তু তাহা হইতে উৎপন্ন সন্তানগণ পিতার উপাধি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। সুতরাং একপ বিবাহ দ্বারা বিবাহিতা নারী ও তাহার সন্তানবর্গকে অপমানই করা হয়।

সব দিক্ দিয়া অবস্থা এই প্রকার দাঁড়াই যে, অষ্টম এডওয়ার্ড হয় মিসেস্ সিমসনকে ভাগ করুন, নতুবা সিংহাসন ভাগ করুন। তিনি সিংহাসন ভাগ করিয়াছেন, এবং তাহার পিতা পঞ্চম জর্জের নির্দিষ্ট তাহাদের রাজবংশের “উইগ্‌সর” নাম অনুসারে মিঃ উইগ্‌সর নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মিসেস্ সিমসনও ইতি-পূর্বেই প্রকাশ্যভাবে জানাইয়াছিলেন, যে, তিনি সরিয়া পড়িলে যদি সঙ্কট অবস্থার অবসান হয়, তাহা হইলে তিনি সরিয়া পড়িতে, অর্থাৎ রাজাকে বিবাহ-প্রতিশ্রুতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে, রাজী আছেন।

ইংলণ্ডেব রাজা কাহাকে বিবাহ করিবেন বা না-করিবেন, সে-বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার অধিকার ইংলণ্ডের মন্ত্রীদের, প্যালেমেন্টের ও জনসাধারণের আছে, ডোমিনিয়ন-গুলিরও আছে। ভারতবর্ষ পরাধীন বিদেশ। ভারতবর্ষের মত কেহ জানিতে চাহে নাই, জানিতে চাহিবার কথা নয়, জানিতে না-চাওয়ায় ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্রও অগৌরব হয় নাই। বরং গাণ্ডে পড়িয়া কিছু বলিতে যাওয়া ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মাবমাননা ও অনধিকারচর্চা হইত।

অবে বিদেশী খুব বড় এক জন সম্রাট যেমন মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত, ভাবতবর্ষেব লোক আমরাও তেমনই মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। এক জন মানুষেব আচরণ সম্বন্ধে অস্ত্র এক জন মানুষের ভদ্রভাবে মতপ্রকাশ অস্বীকৃত নহে। সেই জন্য আমরা অষ্টম এডওয়ার্ডেব সিংহাসনভাগ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলিব।

এক কথায় বলি, তিনি মিসেস্ সিমসনকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বা সঙ্কল্পভাগ না করিয়া যে সিংহাসন ভাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছেন, ইহা মানুষের মত কাজ, পুরুষের মত কাজ, হইয়াছে। যে-পুরুষ কোন নারীকে বিবাহ করিবার কথা দিয়া কথা রাখে না সে অমানুষ সে কাপুরুষ—সেই নারী কুমারী, বিধবা বা বিচ্ছিন্ন-বিবাহা, যাহাই হউন। এই কাজটির দ্বারা অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন হারাইলেন কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করিলেন।

মিসেস্ সিমসনও যে সরিয়া পড়িতে রাজী ছিলেন, তাহাও প্রশংসনীয়।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি, মিসেস্ সিমসনের বিবাহিত অবস্থাতেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা এডওয়ার্ড না করিলে ভাল করিতেন।

শুধু ইংলণ্ডে নয়, অন্য অনেক দেশেও, পুরুষদের, বিশেষ করিয়া ‘সম্রাজ্ঞ’ লোকদের, এবং আবও বিশেষ করিয়া রাজ্যরাজ্যভাদের, দুর্নীতি সমাজ সহ করে, ধর্ম্মবজ্রী পাদরী পুরোহিতেরা সহ করে। রাজা এডোয়ার্ডের যদি বহু জীলোকের সহিত অবৈধ সম্পর্ক থাকিত, যদি তিনি মিসেস্ সিমসনকে মর্গ্যান্যাটিক রকমে বিবাহ করিতেন, এবং তদুপরি যদি তিনি কোন রাজবংশীয়া বা অভিজাতবংশীয়া কোন নারীকে “পোষাকী” রাগী করিতেন, তবে তাহা ইংলণ্ডে বোধ হয় সহিয়া যাইত। কেবল মিসেস্ সিমসনকে রাগী করাটা সহিবে না, এই রকম ভাব বিলাতে খুব বেশী প্রকাশ পাইল। ইহাতে ব্রিটিশ উচ্চশ্রেণীসমূহের প্রতি মনটা প্রকৃত ভরপুর হইতেছে না।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় বোর্ড

বঙ্গে বাঙালীর স্থান রক্ষার, বঙ্গে বাঙালীর প্রাধান্য রক্ষার চেষ্টা করিলেই অন্য প্রদেশের অনেক লোক মনে করে ও বলে বাঙালীর প্রাদেশিক সত্বীর্ণতা বড় বেশী। এই সব লোককে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, বঙ্গেও যদি বাঙালীদের স্থান ও প্রাধান্য না থাকিবে, তাহা হইলে কোথায় থাকিবে? কোথাও থাকিবে না? সত্য বটে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকই ভারতীয় এবং সকলেরই সর্বত্র যোগ্যতা অনুসারে স্থান হওয়া উচিত। কিন্তু অন্য প্রদেশের লোকেরা ভ্রমায় পুরুষাত্মকমে বাসিন্দা বাঙালীরও প্রতিষ্ঠা স্থান্যের সহিত পছন্দ করেন কি? যাহা হউক, এ-বিষয়ে তর্ক না করিয়া যাহা বলিতে যাইতেছিলাম বলি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বঙ্গের লোকাল বোর্ডের সদস্য নির্বাচন ও মনোনয়ন দুই-ই হইয়া গিয়াছে। নির্বাচিতদের মধ্যে দু-জন বাঙালী আছেন—শ্রীযুক্ত অমরকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা। উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি। অন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বিড়লা, সন্ন বদরীদাস গোস্বামী ও মিঃ ওয়ার্ডলী। ব্যাঙ্কের কাজ ও ব্যবসা ইহার বৃদ্ধি না, এরূপ কেহ বলে নাই। বিড়লা মহাশয় সকলের চেয়ে বেশী ভোট পাইয়াছিলেন—সম্ভবতঃ তাঁহার প্রাপ্ত ভোটের মধ্যে বাঙালী অংশীদারদের ভোটই বেশী ছিল। তিনি তাঁহার কতক ভোট মিঃ ওয়ার্ডলীকে দেওয়ায় এই ইংরেজকে নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি যদি এই ভোটগুলি ইংরেজকে না-দিয়া বাঙালী ডাঃ এম্ এম্ রায়কে দিতেন, সম্ভবতঃ যদি ইংরেজকে দিতে নিবৃত্ত থাকিতেন এবং ডাঃ রায় বা অন্য কাহাকেও না-ও দিতেন, তাহা হইলেও ডাঃ রায় নির্বাচিত হইতেন; এবং বোর্ডের ৫ জন বাঙালী সদস্যের মধ্যে তিন জন হইতেন বাঙালী। কিন্তু বিড়লাজী বঙ্গে বাঙালীর বিস্তার ভোট পাইয়াও ইংরেজপ্রীতিতে

অভিভূত হইয়া পড়েন। ইহাতে অনেক বাঙালী দুঃখিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যাহা আশ্চর্য্য করিতে জান না পারে না, অপবের নিকট হইতে ভ্রাম্যপরাম্পত্তার আশা তাহাদের করা উচিত নয়—অনুগ্রহ চাওয়া ত উচিত নহেই।

“ইণ্ডিয়ানা”

ইউরোপ ও আমেরিকায় য-সব ভাল সাময়িক পত্র বাহিব হয়, তাহার কোনটির কোন সংখ্যায় কোন পৃষ্ঠায় কি বিষয়ে কি লেখা থাকে, তাহার বিষয়াত্মকমিক ও বর্ণাত্মকমিক নির্ধারিত বা সূচীর একটি জার্মেন সাময়িক পত্র বহু বৎসর পূর্বে (বোধ হয় গত মহাযুদ্ধের পূর্বে) আমবা পাইতাম। তাহাতে মডার্ন রিভিউর বিবৃতিও কিছু কিছু থাকিত। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় এরূপ নির্ধারিত-পত্র এখনও আছে। জেরুসালেম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত একটি হিব্রু সাময়িক পত্রে এইরূপ নির্ধারিত থাকে।

এরূপ নির্ধারিত আবশ্যক—না-না বিষয়ে গবেষকদের ইহা হু-ব কাজে লাগে। সম্ভাব্যের বিষয় বারান্দী হইতে শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র গুহ “ইণ্ডিয়ানা” নাম দিয়া এরূপ একটি নির্ধারিত-পত্রিকা প্রতি মাসে বাহির করিতে সক্ষম করিয়াছেন। প্রকাশ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে বহু বৎসর পূর্বে সত্যীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “ডান” (“The Dawn”) নামক যে বিখ্যাত মাসিক পত্র ছিল, তাহার কার্যপরিচালকরূপে ইনি অভিজ্ঞতা লাভ করেন। “ইণ্ডিয়ানা”তে ভারতবর্ষ প্রকাশিত ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, উর্দু, মরাঠী, কন্নড়, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষার বহু সাময়িক পত্রের নির্ধারিত থাকিবে। ইহার প্রকাশককে সমৃদ্ধ বিদ্যাত্মকসাহী ব্যক্তির উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য।

“চণ্ডীদাস-চরিত”

“চণ্ডীদাস-চরিত” প্রবাসীতে যে ভাবে বাহির করা হইতেছিল, তাহাতে সম্পূর্ণ হইতে ন্যূনকল্পে আড়াই বৎসর লাগিত। তাহা পাঠকদিগের শব্দে সুবিধাজনক নহে এবং গ্রন্থটিও তাহাতে যথোচিত মনোযোগ পাইত না। এই জন্য আমরা ইহার মাসিক ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করিলাম। যাহাতে ইহা আদ্যোপান্ত গুণ্ডকাবারে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা আমরা করিব।

নবদ্বীপ ও বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়

নবদ্বীপ বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক “উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। তাহাতেই আমাদের নবদ্বীপদর্শন ঘটায়, ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালকদিগের

প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ এখন আর নাই। তথাপি দিব্যভাগের কয়েক ঘণ্টায়, নির্দিষ্ট কাঁজ করিয়া ষটটুকু সময় পাইয়াছিলাম, তাহাতে নগরটি দেখিয়া নিঃসংসাহ হই নাই। আমাদের তাহাতে এই ধারণা হইয়াছে, যে, নবদ্বীপ পশ্চিম-বঙ্গেব অল্প কোন কোন পুরাতন নগরের মত ক্ষয়িষ্ণু নহে। এখানকার উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় ও তাহার লাইব্রেরী এবং সাধারণ লাইব্রেরী ছোট একটি নগরের পক্ষে প্রশংসার যোগ্য। অপূর্ব একটি উচ্চ-বিদ্যালয় দেখিলাম, তাহাব পরিচালকবো উত্তম কাঁজ করিতেছেন। বিখ্যাত টোলগুলি দেখিবাব সময় পাই নাই। কেবল সার্বজনিক টোলটির ভিতর গিয়াছিলাম। যে-নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সভক্তি হরিনাম ও ভক্তির ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেখানে অস্তুতঃ একটি টোলে সংস্কৃত বিদ্যার দ্বার সকল জাতির নিকট উন্মুক্ত দেখিয়া প্রীত হইলাম। টোলে ব্রাহ্মণেরা শুধু সংস্কৃত শিখিলে তাঁহাদের পৌরোহিত্য যজ্ঞযাজ্ঞন চলে, বৈদ্যরা শিখিলে আয়ুর্বেদসম্মত চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া কবিরাজ হওয়া চলে; কিন্তু অল্প জাতিব লোকদের টোলে ইহা শিখিয়া উপার্জনের সামান্য কোন উপায়ও হয় বলিয়া অবগত নহি। তাহা সত্ত্বেও যে অল্প জাতীয় বিদ্যার্থীরা সার্বজনিক টোলে ইহা শিখিতেছেন, ইহা জ্ঞানানুসারের একটি দৃষ্টান্ত। এই টোলের অধ্যাপক মহাশয় ও বিদ্যার্থীরা প্রশংসাজনক। নবদ্বীপের সারস্বত মন্দিরে যেরূপ আন্তরিক আগ্রহের সহিত কয়েকটি কুটাবশিল্প ও অন্যান্য কিছু উপার্জনের উপায় শিখান হইতেছে, তাহাতে অনেকে উপকৃত হইতেছেন।

বাল্যকালে আমবা বাংলা বিদ্যালয়ে যে তারিখচিত্র-চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত উৎকৃষ্ট ভূগোলের পুস্তক পড়িয়াছিলাম, নবদ্বীপে তাহার বাসভবন দেখিয়া প্রীত হইলাম, বাল্যকালের অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল।

আর যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার কথা লেখা হইল না।

যে বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়টির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ গিয়াছিলাম, সাত বৎসর পূর্বে তাহ একটি ছোট পাঠশালা ছিল। পরিচালকদিগের আগ্রহে ও শিক্ষকগণের ত্যাগে তাহা এখন একটি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার ছাত্রীদেব বাংলা ইংরেজী ও সংস্কৃত আবৃত্তি ও অভিনয় আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছিল তিনটি ভাষাব উচ্চারণই আমাদের ভাল মনে হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের একটি গান গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গরূপ একটি চিত্র যেরূপ স্রুত অঙ্কিত হইল, তাহা নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ছাত্রীদের সেলাইয়ের কাজগুলিও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। ইহাদের শিখিবার ও আত্মপ্রকাশ করিবার বেশ উৎসাহ আছে।

তাহারা নিজের একটি সমিতি গঠন কবিয়া নিজেরদের মধ্যে চাঁদা তুলিবা সংবন্ধভাবে কাঁজ করিতেছে। তাহারা প্রতি অমাবস্তায় ‘দীপালী’ নাম দিয়া একটি হাতে-লেখা মাসিক পত্র প্রকাশ করে। সেদিন তাহারা একটি সভা আহ্বান করে, এবং অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের সম্মুখে তাহাদের নির্ধারিত রচনা পাঠ করে এবং সারা মাসের শেখা গান ও যন্ত্রসঙ্গীত করে, এবং হাতের কাঁজও সেদিন দেখান হয়। তাহারা নিজেরদের মধ্যে চাঁদা তুলিবা দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। নিজেরদের মধ্যে নিবন্ধাত্মবৃত্তি প্রবর্তনের ভার অনেকটা তাহারা লইয়াছে। বিদ্যালয়কে তাহারা নিজেরাই পরিচালনা করিতেছেন এবং এই মাসে একটি সমবায়প্রণালীমূলক সোপান খুলিবে। এই বিদ্যালয়ের সার্বজনিক তাহাদের মধ্যে দিয়াই এই ভাবে আসিতেছে বলিবা মনে হয়।

এই বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পাঁচ কবানর ছয় বৎসরের পাঠ্যতালিকা বেশ সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে কৃতকাঁর্য হইয়াছে। গত ১৯০৫ সাল হইতে এই পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী ছাত্রীরা ভাল কবিয়া পাঁচ করিতেছে। ইহাতে বালিকাদের অনাবস্তক সমস্ত নষ্ট কবিতে হয় না। যেসবের বোধ এক্ষণে করিবার মত সহজ বুদ্ধি ছেলেদের অপেক্ষা একটু অল্প বয়সে জন্মিত হয়। সেই জন্ত তাহারা সাধারণের বুদ্ধিপ্রাণ জিনিষ অল্প সময়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার কৃতকাঁর্যতার ইহা একটি প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

আয়ুর্বেদের গুণের বঙ্গে সরকারী স্বীকৃতি

অত্যন্ত কোন কোন প্রদেশে গবর্নমেন্ট ইতিপূর্বেই আয়ুর্বেদের গুণ স্বীকার করিয়াছেন। বঙ্গে এখন স্বীকৃত হইতে চলিল। মনোনীত কয়েক জন কবিবাজকে লইয়া গবর্নমেন্টের অমুমোদিত একটি আয়ুর্বেদের ফ্যাকাল্টি বা চিকিৎসক-সমিতি গঠিত হইবে, কবিরাজদিগের নাম রেজিষ্টরী করা হইবে, পরে শিক্ষা ও পরীক্ষাও নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।

গবর্নমেন্টের এইরূপ কার্য সম্ভোষজনক।

আয়ুর্বেদ ত গবর্নমেন্টের “জানিত” চিকিৎসাপ্রণালী হইল। এখন তাহারা কবিরাজী করেন-তাঁহাদের দারিদ্র ও কর্তব্য স্মরণ করিতে হইবে।

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা গোড়া হইতেই গবর্নমেন্টের অমুমোদন ও সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নহে, যে, গবর্নমেন্ট এই চিকিৎসাপ্রণালী সর্বোপায়ে অজ্ঞাত ও অব্যর্থ মনে করেন, বা এরূপ মনে করেন, যে, ইহাব কোন সংশোধন ও উন্নতি, কিংবা ইহাতে কোন সংযোজন হইতে পারে না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও তাহা মনে করেন না। তাঁহাদের অনেকে নানা দিক দিয়া নানা প্রকার গবেষণা ও পরীক্ষা করিতেছেন। তাহার ফলে ভ্রম নিরাকৃত হইতেছে, নূতন চিকিৎসাপ্রণালী ও নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত ও প্রযুক্ত হইতেছে। এই উন্নতিশীলতা এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অনেক স্থলে সাফল্যের ও আদরের একটি কারণ। অবশ্য ইহা সর্বত্র ফলপ্রদ নহে,

সর্বজনীনতায় নহে। কিন্তু ইহার ফলোপধায়কতা বাড়াইবার চেষ্টা অবিরাম চলিতেছে।

আহুর্বেদেরও সব কিছু অস্ত্রস্ত মানিয়া লইলে চলিবে না। ইহাকেও ক্রমোন্নতিশীল করিতে হইবে। কোনও ভ্রম নির্ধারিত হইলে তাহা পরিভাগ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে মেজর রামনদাস বহু প্রণীত ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্রিন্সিপালস (“ঔষধের জন্ত ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিদসমূহ”) নামক বৃহৎ মূল্যবান সচিব গ্রন্থ প্রত্যেক উন্নতিচাহী চিকিৎসকের ও প্রত্যেক চিকিৎসা-শিক্ষালয়ের লাইব্রেরীতে রাখা ও ব্যবহার করা আবশ্যিক।

তিন জন অন্তরীনের আত্মহত্যা

পূর্বে গবেষিত তিন জন অন্তরীনের আত্মহত্যার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে—যদিও ইহাই রাষ্ট্রীয় বেৎসবীনেরা খুব দৃঢ়চিত্ত ও আশাশীল হইবেন এবং ভবিষ্যতে দেশের সেবা কবিবার ইচ্ছায় বাচিয়া থাকিতে দৃঢ়প্রাণ হইবেন। কিন্তু আমরা ত তাহাদের সব দুঃখ জানি না; সুতরাং উপদেশ দিতেছি না, কেবল স্বপ্নের বাসনা প্রকাশ কবিতেছি।

অন্তরীনের আত্মহত্যা ও সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীন অসহস্কার হওয়া একান্ত আবশ্যিক। জাহাজারী মাসে গবন্মেণ্ট এক শত অন্তরীনকে খালাস দিবেন। ইহার কোন-ন-কোন-বৃত্তি শিখিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষিত শিল্প ও কৃষিকারী জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইবে। ইহা ভাল।

বিনাবিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত বন্দী করিবার প্রথার বিরুদ্ধে বহুবাব আমরা আমাদের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি। পুনর্বাবৃত্তি করিবার ইচ্ছা নাই।

গবন্মেণ্ট সকল অন্তরীনকে একসঙ্গে এক সময়ে খালাস দিবেন না। বোধ হয়, তাহারা এক এক বারে কতকগুলি লোককে শিল্প ও কৃষি শিখাইয়া ছাড়িয়া দিতে চান। এই প্রকারে যদি বৎসবে এক শত জনও খালাস পায়, তাহা হইলেও দু-হাজার অন্তরীনের খালাস পাইতে কুড়ি বৎসব লাগিবে। তাহার পক্ষে নূতন নূতন লোককে যে “অন্তরীন” করা হইবে না, গবন্মেণ্ট একপ কৌশল প্রতীক্ষিত দেন নাই। বস্তুতঃ কোন কোন পুলিশের লোকের দ্বারা নির্দোষ লোকের বাড়ীতে রিভলভার বন্দুক গোপনে রাখিয়া দেওয়া এখনও চলিতেছে। সুতরাং বিনা বিচারে কাহারও কাহারও বন্দীকৃত হইবার সম্ভাবনা লোপ পায় নাই।

এ অবস্থায় দেশে অসন্তোষ লাগিয়াই থাকিবে।

কংগ্রেসের কাজ

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাইয়ে সম্প্রতি যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। নেতারা কতক আলোচনা কমিটির অফিসিয়াল কাজ হিসাবে কবিয়াছেন, কতক বা অন্তরীণ ভাবে কবিয়াছেন।

আলোচনার একটি বিষয় ছিল, দেশের জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের যোগস্বাপন। ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের লোকদের অবিকাগণ নিরক্ষর বলিয়া এই যোগস্বাপন কঠিন কাজ। তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিতে সময় লাগিবে। কিন্তু ধৈর্য না হারাওয়া এই গোড়ার কাজটিতে এখনই বিশেষ কবিয়া মন না দিলে নিরক্ষর জনসাধারণের সহিত শিক্ষিত নেতাদের যোগস্বাপন স্বদূর্বপরাতে থাকিবে। ইতিমধ্যে অবশ্য বক্তৃতা মাজিবলগন ও সিনেমার দ্বারা কাজ চলিতে থাকুক।

আর একটি আলোচ্য বিষয় ছিল, স্বাভাসিক (ক্যাসুয়ালিটি) সব দলেব সহিত কংগ্রেসের এতদ্বারা কাজ করা। ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা বহুবাব আমাদের ইংবেজী ও বাংলা কাগজে লিখিয়াছি। বর্তমান ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউতেও, ১১৭-১১৮ পৃষ্ঠায় “মকিং কমন্স কজ্” শীর্ষক নোটটি এই বিষয়ে লিখিয়াছি।

ইউরোপের অবস্থা বেরূপ তাহাতে ব্রিটেনো একটা বড় যুদ্ধে জড়িত ও ব্যাপৃত হইবার খুব সম্ভাবনা খটাইতেছে। এরূপ যুদ্ধ ঘটিলে তাহাকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, কেমন করিয়া ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত কাজে লাগাইতে পাবা যায়, নেতারা তাহা আলোচনাও করিয়াছিলেন এবং উপায় চিন্তা করিতেছেন।

জাপানীদের ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারচেষ্টা

দিল্লীতে একটি বৌদ্ধ মন্দির নিশ্চিত হইয়াছে। তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জাপানী কঙ্গাল তাঁহার বক্তৃতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রবল জাতিবরণসম্বন্ধ ও পবস্পরের প্রতি হিংসাঘোষের নিন্দা করেন এবং বলেন, এই প্রকার আচরণও মনোভাবের প্রতিকার বৌদ্ধ ধর্মের আধ্যাত্মিকতা। আর জাপান-রণসম্বন্ধ এবং চীন প্রভৃতি দেশের প্রতি বক্তৃতাচরণে কাহারও চেয়ে কম যান না। যাহা ইউর, এখন এ-বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কবিব না। ভারতে জাপানীদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তার চেষ্টার কথাই বলি।

সারম্মাথে যে নূতন বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হইয়াছে, তাহার গাত্র চিত্রিত করিবাব ভারতবর্ষে ভারতীয় চিত্রকরবা পান

তাহার চেষ্টা করা হইয়াছিল। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও আমি স্বয়ং পরলোকগত অনাগারিক ধর্মপাল মহোদয়কে অল্পরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, তাঁহার নিজের কোন টাকা নাই। নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে কেবল খাদ্য ও রঙের ব্যয় লইয়া কাজটি করিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এক জন ইংরেজ বৌদ্ধ এই কাজের জন্য অনেক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। তিনি জাপানী বৌদ্ধ চিত্রকরদের দ্বারা এই কাজটি করা হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। জাপানী গবর্নমেন্টও সাহায্য করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠায় জাপানী কম্প্রলেব সহযোগিতা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। আর কোথাও জাপানীরা এইরূপ কাজ করিতেছেন কিনা জানিতাম না।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের কয়েকটি গ্রামে ভ্রমণ করিয়া আমাদেরকে লিখিয়াছেন,

“মেখিলাম অনেক গ্রামে জাপানীরা বিনা পয়সায় বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত গ্রামেই শুদ্ধ যে সেই সব স্থানেও হইবে। এইরূপ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জাপানীদের এই দূর দেশে বৌদ্ধ মঠ নির্মাণে নিশ্চিত কোন গুঢ় রহস্য রহিয়াছে।”

গুঢ় রহস্য থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। পাশ্চাত্য নানা দেশের খ্রীষ্টিয়ানেরা ভারতবর্ষে গীর্জা নির্মাণ করে ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রচার করে। সুতরাং জাপানীরা বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিলে ও তদ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করিলে তাহাতে আপত্তি করা চলে না। কেবল ইহা মনে রাখা আবশ্যিক, যে, ইউরোপীয় অনেক দেশের খ্রীষ্টিয়ানদের কোন কোন প্ররোচনায় সন্মত হইয়াছে, যে, তাহা প্রথমে বাইবেল, পরে (মন্দের) বোতল এবং শেষে বুলেট (গুলি) দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। জাপান কি সেইরূপ কোন নীতির অহসরণ করিবে? (অগ্রহায়ণ সংখ্যার জন্য লিখিত।)

“বুহৎ বজ্জ”

‘পুস্তক-পরিচয়’ বিভাগের জন্য এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এক জন সমালোচক বাহা লিখিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে মুদ্রিত করিতে না পারায় এখানেই দিতেছি। কারণ, তাহাতে পৌষ মাসে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে কি হইবে তাহার উল্লেখ থাকায় মাঘ সংখ্যার জন্য তাহা রাখা সম্ভব হইবে না।

বুহৎ বজ্জ—রায় বাহাদুর শ্রীদেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট. (অন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৯১)। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১২১০ পৃষ্ঠা। চিত্র-সংখ্যা ৩০৪।

বুহৎ বজ্জ ভারতের ইতিহাস যেমন একালের রাজনৈতিক-নীতি হইয়া

বিরাট এশিয়া মহাদেশের নানা সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিয়াছে, তেমনি “বুহৎ-বজ্জ” ভারত-ইতিহাসের পটভূমিকায় বহু বর্ষ ও বিচিত্র শিক্ষা-নীতির সমন্বয়ে উদ্ভূত ও উজ্জ্বল চিত্র। এ হবি জাতীয় অবনতির ও আত্মবিশ্বাসের যুগে চাপা পড়িয়া যায়, যেমন চাপা পড়ে ইজোরা মন্দির-পাত্রেণ অপরূপ সৌন্দর্য্যে যোয়া কালী অথবা চূর্ণকামের জঘন্ত প্রদেশে। বঙ্গবাসীর একনিষ্ঠ সাধক ধীশেনচন্দ্রের একান্ত দৃষ্টি আধুনিক কর্তব্য প্রদেপ্ত করে। বঙ্গবাসীর ইতিহাসিক পৌরবচিত্র উদ্ধার করিয়াছে। ইহা বঙ্গবাসীর কত দিন কত বিনিয়োগের চিন্তা, উৎকর্ষ ও প্রাণপাত পরিশ্রম রহিয়াছে, তাহা ইতিহাসিক যাজ্ঞেই আভাসে বুঝিবেন। অকপট বিনয়ের গ্রন্থকার তাহার “ভুলত্রুটি” কথা তুলিয়াছেন ও স্বীকার করিয়াছেন যে, “ইতিহাস রচনা ইহাই আমার হাতে-খড়ি।” ব্যক্তিগত ভাবে এ কথা না বলিয়া সমগ্র বাঙালী জাতির তরফেও গ্রন্থকার বলিতে পারিতেন, “বুহৎ-বজ্জের” ইতিহাস রচনা ইহাই হাতে-খড়ি। শুদ্ধাংশ লইয়া এই জীবনসংগ্রাম যে তিনি তাহার ব্রত-উৎসাপন করিয়া গেলেন, সেজন্য সমগ্র বাঙালী জাতি ও অনাগত যুগের বাঙালী ইতিহাসিক ধীশেনচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা ও ঐতিহ্য অর্থ্য নিবেদন করিবে। তিন শতের অধিক চিত্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া বাঙালীর জাতীয় কারুশিল্পের আভাস দিয়া এবং বুহৎ বজ্জের ইতিহাসে তিনি একটি নূতন তাৎপর্য্য দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রক্ত-গুলি সব সময় মূল শিল্পবস্তু উপস্থিত হয় নাই, তবু শুদ্ধ শাস্ত্রিক ইতিহাস না লিখিয়া দেখা ও রঙের বাজনার আমাদেব গ্রন্থের নিরক্ষর ও নীরব অঞ্চল শব্দত ইতিহাসিক শোণী কুমার, ছুতার, তাঁতি ও পটুয়ারের প্রতিবে আমাদেব কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন, ইহা সত্যই প্রশংসার। নানা রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে ওধাকথিত উচ্চ জাতি ও সন্ত্রাসমণ্ডলি যখন বিপর্য্যস্ত, তখনও অজ্ঞাত, লালিত, অনাহার-পীড়িত বাংলার গ্রাম্য কারু-শিল্পী—হিন্দু মুসলমান জাতি-ধর্মনির্বিশেষে—দারিদ্র্যকে হুল্লর ও আর্থিক বৈজ্ঞানিক পারমার্থিক দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়াছে। সেই আউল, বাউল, বৈরাগী, কবচ, বাজাওয়াল, পটুয়ারের কাছে আমাদেব কৃতজ্ঞতা অপরিণীত, এই কথাটি গ্রন্থকার স্মরণ করাইয়াছেন। ইহা এ গ্রন্থের একটি মৌলিকত্ব। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারণ বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া রামরায় বঙ্গ ও রামমোহন রায়ের যুগ পর্যন্ত বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ এই “বুহৎ বজ্জ” সূচিত হইয়াছে। এক জন লেখকের পক্ষে এ কাজ প্রায় অসাধ্য; এতদূর অধ্যয় ও পরিচ্ছেদের জন্য একাধিক ইতিহাসিক গবেষণা করিবেন, ইহা আশা করিয়াই গ্রন্থকার এই অষ্টাশ পর্ব (ও প্রাগৈতিক ইতিহাসের বোধন পরিচ্ছেদ সম্বলিত) বুহৎ বজ্জ মহাভারত সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। ত্রিপুরা, মণিপুর, কোচবিহার, শ্রীহট্ট, মেদিনীপুর, বন-বিহুপুর, হুন্দরবন প্রভৃতি পরিচ্ছেদগুলি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, কি বিরাট কাজ আমাদেব সমুখে রহিয়াছে—এক একা ধীশেনচন্দ্র তাহার উদ্যোগ করিয়া বাঙালীজাতিব কি উপকার করিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙালী সম্মেলনের সভাপতিত্বের তিনি আবৃত্ত হইবেন, কিন্তু উক্ত সম্মেলনের তথা বাংলার প্রত্যেক সাহিত্যপরিষৎ ও গ্রন্থাগারের কর্তব্য এতদূর গ্রন্থকারকে সাহায্য করা ও তাহার গ্রন্থ প্রচার করা। এই বুহৎ বজ্জ অবলম্বন করিয়া নানা জেলায় গবেষণা-কেন্দ্র গড়িয়া উঠুক এবং রীতিমত ইতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ হউক, ইহাই বাঙালীর এবং ইহাভেই ধীশেনচন্দ্রকে উপস্থিত মর্যাদা দেওয়া হইবে।

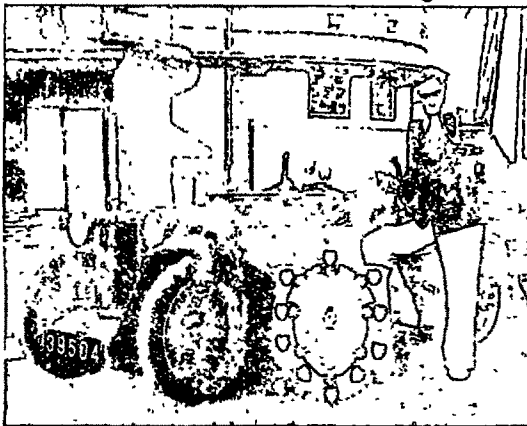
ক. ন.



শ্রীমতী বেবিল মার্কহাম
বিমানযোগে আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ প্রথম বয়সী



ভারত-ভ্রমণে 'ভালভেশন আর্মি'র নেত্রী শ্রীমতী ইভাঙ্কেলিন বৃথ



শ্রীরামনারায়ণ সিং



কুমিল্লা প্রশস্ননীতে কুণ্ডা শিল্পবিদ্যালয়
বাম হইতে : শ্রীমুখা সেন, শ্রীবেণুকা বার শ্রীমতী ঘোষ, শ্রীমতী
রুক্মবর্তী, শ্রীমতী বিশ্বাস। দণ্ডায়মান : শ্রীসত্যভূষণ দত্ত, সম্পাদক,
কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয় ও একজন শিল্প-শিক্ষক

চৌষটি শিল্পকলার একটি



ভালে ছবির আদন, স্বপ্নে গভীর ভাবে
গিয়ে পৌছায়। যারা তার মর্ম বেঁধে তেমন সম্বন্ধকে দে ছবি অসীম আনন্দ দেয়।
ছবি, গান, কবিতা,—এগুলি একই ধরনের আনন্দের উৎস। অবশ্য শিল্প-সৃষ্টি ক'বে পৃথিবীকে
আনন্দ দেওয়ার দুল্লভ প্রতিভা খুব কম হোকেরই আছে। কিন্তু সাধারণ অনেক কাজও ত
হৃদয় ও শোভন ভাবে করা যেতে পারে। নিখুঁত ভাবে উপাদেয় চা তৈরী করাও একটি
শিল্পকলা;—আমাদের দেশে উৎকর্ষ চাষের তেমন উপাদেয় একটি পেয়ালা পান ক'রেও অশেষ
আনন্দ ও আরাম পাওয়া যায়।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

টাইকা জল কোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ
ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল কোটামাত্র চাষের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট
ভিজতে দিন; তারপর পেয়ালায় ঢেলে ফু ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা

বিদেশ

ইঙ্গ-মিশর চুক্তি

সম্প্রতি ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে পূর্বাপেক্ষা মিশর কিছু বেশী সুবিধা পাইলেও ইঙ্গা মিশরবাদীগণকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ যে আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ লইয়া জগন্মূল, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ গঠ পঞ্চাশ বৎসর ধাবৎ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা, বৈদেশিক সৈন্তবলের সম্পূর্ণ অপসারণ, দেশের সর্বপ্রকার শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা; এই চুক্তির ফলে তাহাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। সম্পাদিত চুক্তির ফলে মিশর হইতে সৈন্ত অপস্থত হইবে। অবশ্য কেহ যেন মনে না করেন, যে মিশর হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত সম্পূর্ণরূপে অপস্থত হইবে; কেবল কারবো ও মিশরের অভ্যন্তরে আর ব্রিটিশ সৈন্ত থাকিবে না এই পর্য্যন্ত। অয়েজ-খালেব কর্তৃক পরিচালিত করিতে ব্রিটেন মোটেই প্রস্তুত নহে, কাবণ অদ্বৈতভাবে যদি ইউরোপে যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে এই খালেব ভিত্তি দিয়া ব্রিটেনের জাহাজাদি বাতায়নের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা একান্ত প্রয়োজন। শত্রুপক্ষীয় জাহাজাদি গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ-কার্যেও তাহা স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। এই সকল কাবণে অয়েজ-খালেব কর্তৃক ব্রিটেন স্বস্বস্তে রাখিয়াছে এবং এই চুক্তির বিধান এইরূপ যে, আব ও বিশ বৎসর অয়েজ বন্দার সকল ব্যবস্থা ব্রিটেন

করিবে এক তথ্য সৈন্তবাগিনী রাখিলে। যদি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর পরে মিশরীয় সৈন্তবাগিনী অয়েজ-বন্দারবেশে কিছু সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে এতদন হইতেও সৈন্তবাগিনী অপস্থত হইবে। কিন্তু বিশ বৎসর পরেও মিশর সবকাব সুদীর্ঘ রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ কি না সে বিচার কে করিবে? এই চুক্তিতে বলা হইয়াছে, যদি ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে এই প্রস্তাব লইয়া মতবৈধ উপস্থিত হয় ও সমস্তার সমাধান না হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রসঙ্ঘকে মধ্যস্থ মানা হইবে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘই ইহার বিচার করিয়া দিবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এখন বেকপ অবস্থা তাগতে মিশরের তাহাব উপর আস্থা স্থাপন করিবাব বিশেষ কিছু কাবণ নাই।

এই চুক্তির অপব একটি ধাবাতে বলা হইয়াছে যে ব্রিটেন মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করিবা হইবে ও তাহাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইতে সাগায় করিবে। মিশর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হইবা কি লাভ আশা করে তাহা আমবা জানি না; তবে, এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাউন্সিলে ব্রিটেনের দলবৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়।

এই চুক্তির দ্বাবা সুনান সমস্তার কিছুই সমাধান হয় নাই।

যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া নাহাস পাশার নেতৃবৃন্দে মিশরীয় প্রতিনিধিগণ লগনে গমন করিয়াছিলেন, তাহা ফল হই নাই। মিশরবাদীগণও সকলে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই এবং কোন কোন চরমপন্থী দল নাহাস পাশার প্রতিও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ম্যালেরিয়ার “মহৌষধ” নানা প্রকার আছে

কিন্তু

সাবধান!

যা’ তা’ বাজে ঔষধ সেবনে দেহের অপকার সাধন করিবেন না।

এপাইরিন

ম্যালেরিয়া আদি সর্বপ্রকার জ্বরের

সুপারীকৃত প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ মহৌষধ।

ব্যবহারে কোন প্রকার কুফল নাই।

“এপাইরিন”

যে সকল উপদানে প্রস্তুত, তাহা
বিখ্যাত চিকিৎসকমণ্ডলীর অমুশোদিত।

সকল বড় এবং ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন।

ল্যাডকো

কলিকাতা

দুই বৎসর পূর্বে যখন **বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স ও নিষ্কাশন প্রপার্টি কোম্পানী**র ভ্যালুয়েশান হয় তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাঙ্গালার আর একটি বীমা কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। খরচের হার, মুতাজনিত দাবীর পরিবাণ, ক্ষেত্রের লম্বা প্রভৃতি যে সব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে একটি বীমা কোম্পানী সম্ভাবজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, সেই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম যে বীমা-ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুযোগ্য লোকের হস্তেই ইন্সিওরেন্সের পরিচালনা দ্রুত আছে।

গত ভ্যালুয়েশানের পর মাত্র দুই বৎসর অন্তে এই কোম্পানী পুনরায় ভ্যালুয়েশান করিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কোম্পানীর যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে অল্পকাল অন্ত- ভ্যালুয়েশান কেহ করেন না। বীমা কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে আকচুমারী দ্বারা ভ্যালুয়েশান বরাদ্দিত হয়। অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকিলে বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সের পরিচালকবর্গ এত ক্ষীণ ভ্যালুয়েশান করাইতেন না।

৩১-১২-৩১ তারিখের ভ্যালুয়েশানের বিশেষত্ব এই যে, এবার পূর্ববার অপেক্ষা অনেক কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। তৎসঙ্গেও কোম্পানীর উৎকৃষ্ট হইতে আজীবন বীমাদ প্রতী হাজারে প্রতী বৎসরের জন্য ১৬ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার-করা বৎসরে ১৪ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীর লাভের সম্পূর্ণ অংশই বোনাসরূপে বাটোয়ারা করা হয় নাই, কিয়দংশ রিজার্ভ ফণ্ড লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানীর পরিচালনভার যে বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যক্তির হস্তে দ্রুত আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিশিষ্ট জননায়ক কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত সাত বৎসর কাল এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি পদে থাকিয়া কোম্পানীর উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ব্যবসায়জগতে সুপরিচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঙ্কিকাভা শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরকুমার ঘোষ মহাশয় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় আমাদের আস্থা আছে। স্বত্বের বিষয় যে তিনি এই কোম্পানীতে বীমায়গতে সুনির্দিষ্ট শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে একেবারে ম্যানেজার-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ও সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিবে ইহা অবধারিত। [বিজ্ঞাপন]

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।

সর্বতোভাবে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স লিমিটেড

বাঙ্গালীর মূলধন বাঙ্গালী শ্রমিক
বাঙ্গালী পরিচালনা

বাঙ্গালীর উৎসবে, বিশুদ্ধ বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের জব্যাদি ব্যবহারই বাঙ্গালীর

ঢাকেশ্বরীর সুতা, শাড়ী, ধুতি
সুবিখ্যাত ও সমাদৃত

নর নারীর রূপ ও স্বাস্থ্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখে

মার্গোসোপ

সুগন্ধি নিমের টরলেট
সাবান
গাত্রচর্মে কোমল ও
মসৃণ রাখে।

রেণুকা

হৃৎকম্পনীয় নিমের
টুপ পাউডার
বর্ণ উজ্জ্বল করে।

ভূঙ্গল

হৃৎকম্পনীয় মহাভূঙ্গল
কেশটেল
মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

ক্যালকোমিকোর
প্রসাধন সম্ভার



নিমটুথপেষ্ঠ

দন্তধাবনের পক্ষে
নিমের দাঁতন অপেক্ষাও
উপকারী ও হিতকর

সিলট্রেস

মাথা ঘষা ও কেশমার্জনের
সর্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্র
কেশপাশ রেশমের
মত চিকণ হয়।

লাইজু

বিশ্ব গুণ ও হৃৎকম্পনীয়
“লাইমজুস সিসারিণ”
চুলের পারিপাট্য
সাধন করে।

“রূপ ও স্বাস্থ্য”
পুস্তিকার জন্ম

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
বালিগঞ্জ :: কলিকাতা

আজই আমাদের
পত্র লিখুন।

বিদেশে বাঙালী চিকিৎসক

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডাঃ এ. এন্. মুখার্জি, এম্. ডি. (ইউ. এস্. এ.) আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্ত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-রূপে গত জুলাই মাসে গ্রাসগো যাত্রা করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনের সভ্যরূপেও মনোনীত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্ত রাজকীয় অনুমোদনের প্রয়োজন সন্দেহে তিনি উক্ত সম্মেলনে ও লণ্ডনের ব্রিটিশ হোমিও-প্যাথিক সোসাইটিতে আলোচনা করেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আধুনিকতম উন্নতি সন্দেহে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্ত তিনি ইউরোপে—লণ্ডন, বার্লিন, ড্রেসডেন, ভিয়েনা, হল্যান্ড প্রভৃতি স্থানের ও ইন্ডেনের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন।

বাংলা

পরলোকে অধ্যাপক ডাঃ ননীলাল পান

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীরবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক রায় ননীলাল পান বাহাদুর বিগত ৬ই কার্তিক পরলোক গমন করিয়াছেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন

করিয়াছিলেন—মেডিকেল কলেজের কোন পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন নাই।

চিকিৎসা এবং শিক্ষাদান ব্যতীত, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক মৌলিক গবেষণাও করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গবেষণার জন্ত স্ববর্ণ-পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। তিনি বহুবৎসর যাবৎ কলিকাতা, পাটনা ও লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরবিজ্ঞা ও শরীরবিজ্ঞানের পরীক্ষক ছিলেন।

সম্ভরণপটু কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায়

দ্বাদশবর্ষীয়া কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় সম্ভরণে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। কলিকাতা সেন্ট্রাল স্কুলিং ক্লাবের গত দ্বাদশবার্ষিক প্রতিযোগিতায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন ও ৫০ মিটার সম্ভরণে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন।

মোটরচালন পটু শ্রীরামনারায়ণ সিংহ

বেঙ্গল অটোমবিল এসোসিয়েশনের উত্তোগে গত ২২শে অক্টোবর তারিখে অংশগ্রহিত কলিকাতা হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত মোটর-চালন-প্রতি-যোগিতায় কলিকাতার শ্রীরামনারায়ণ সিংহ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া এ. এ. বি. চ্যালেঞ্জ শিল্ড, ব্রেকওয়েল কাপ, ভীডল চ্যালেঞ্জ কাপ প্রভৃতি বহু পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।



ডাঃ এ. এন. মুখার্জি



শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস



ব্রহ্মারী লীলা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার শিক্ষক শ্রীশান্তিপাল

ব্রহ্ম ব্যবস্থাপরিষদে বাঙালী

ঢাকা জেলার শুভাঢ্যা নিবাসী এডভোকেট শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস অধিক সংখ্যক ভোটে ব্রহ্ম ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি এইবার লইয়া তিনবার এই সভার সদস্য নির্বাচিত হইলেন।



রায় ননীলাল পান বাহাহর

শিল্প-প্রদর্শনী

নিখিল ভারত-নারীসম্মিলনীর কুমিল্লা-শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বিগত ২১শে হইতে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত কুমিল্লা টাউন হলে একটি শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। কুমিল্লার ভদ্রমহিলাদের বিশেষতঃ শ্রীরেণুকা রায়ের চেষ্টায় সম্মিলনী ও প্রদর্শনী সফল হয়।



তোকাইদো-পথে বিশ্রামস্থান
জাপানী চিত্রকর হিরোশিগে

শ্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



“নৃত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“দায়মাঞ্চল বলাহীনেন লভ্যঃ”

৩৬শ ভাগ }
২য় খণ্ড

মাস, ১৩৪৩

{ ৪র্থ সংখ্যা

পুপুদিবির জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে ছিল মেরি ছেলেমানুষ
হারিয়ে গেল কোথা,
পথ ভুলে' যে পেরিয়েছিল
নরা নদীর সোঁতা।
হায়, বুড়োমির পাঁজি তারে
ছাড়াল করল আজ,
জানি নে কেন লুকিয়ে-ধেরা
বয়স-চোরার কাজ।
হঠাৎ তোমার জন্মদিনের
আঘাত লাগল দ্বারে,
ডাক দিল যে দূর সেকালের
ক্যাপা বালকটারে।
ছেলে মানুষ আমি
ডাক শুনে যে এগিয়ে এলে
হঠাৎ গেল থামি'।
বললে, শোনো ওগো কিশোরিকা,
“রবীন্দ্র” নাম কুঠিতে যার লিখা,
নামটা সত্য. সত্য শুধু
তারিখটা মাস্তুর,

তাই ব'লে তো বয়সখানা
 নয় কো ছিয়াস্তব।
 কাঁচা প্রাণের দৃষ্টি যে তার
 জগৎটা তার কাঁচা,
 বাঁধে নি তায় খেতাব-লাভের
 বিষয়-লোভের খাঁচা।
 মনটাতে তার সবুজ রঙে
 সোনার বরণ মেশা ;
 বক্ষে রসের তরঙ্গ তার
 চক্ষে রূপের নেশা।
 কাগুন-দিনের হাওয়ার ক্ষাপামি যে
 পরানে তার স্বপন বোনে
 রঙীন মায়া'র বীজে।
 ভরসা যদি মেলে
 তোমার লীলার আঙিনাতে
 ফিরবে হেসে খেলে।
 এই ভুবনের ভোরবেলাকার গান
 পূর্ণ ক'রে রেখেছে তার প্রাণ।
 সেই গানেরই সুর
 তোমার নবীন জীবনখানি
 করবে সুমধুর ॥

শান্তিনিকেতন

১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩



ব্যাঙ্কের কথা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

আর্থিক জগতে ব্যাঙ্কের একাধিপত্য

বর্তমান যুগে আর্থিক জগতের ভারকেন্দ্র প্রত্যেক দেশের বিশাল ব্যাঙ্কগুলিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে কানোংগি, রপ্তানাইন্ড, রক্ফেলার, কোর্ড বা নিজাম যতই ধনী হউন না কেন, বর্তমান দুনিয়ার প্রকৃত অধিপতি এই ব্যাঙ্কগুলিই। কারণ বিশাল সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজের সম্পদও ইহাদের নিকট আজ তুচ্ছ। পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া ইহারা দুনিয়াটাকে আজ মুঠার মধ্যে রাখিয়া পরিচালনা করিতেছে।

অর্থ পদার্থটিকে আমরা সকলেই ভালরূপে চিনি ও জানি। কিন্তু ইহা কোথা হইতে কি ভাবে আসে এবং কোথা দিয়া কি ভাবে সরিয়া পড়ে, তাহা আমাদের অনেকেই বুঝির অগম্য। আমাদের অভিষেদে সঞ্চিত অর্থপুঁটলি ভাঁটার টানে অকস্মাৎ আমাদের হাতছাড়া হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার কোথা হইতে জোয়ার আসিয়া আমাদের শূন্য তহবিলকে ভরিয়া দেয়। বিনা-কারণে এক দিন আমাদের যে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও জমিজমার মূল্য কমিয়া অর্ধেক হইয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার এক দিন ফাঁপিয়া উঠিয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়া আমরা ইহার ফলমাত্রই শুধু ভোগ করি; কিন্তু কারণ কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। অর্থের এই রহস্যময় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা জানিতে চাই, বর্তমান জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক কাজ-কারবারের জটিল ও কুটিল পথে যদি প্রবেশলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের প্রথমে আধুনিক ব্যাঙ্কের স্বরূপ ভাল করিয়া জানিতে ও বুঝিতে হইবে। রহস্যময় আর্থিক জগতের দ্বারোদঘাটনের ইহাই সহজ পন্থা।

ব্যাঙ্কের বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি এক দিনে হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী

সর্ব বিষয়ে যেমন শঠে শঠে অগ্রসর হইয়াছে, প্রয়োজনব-
তাসিমে ব্যাঙ্কগুলিও তেমনই ধীরে ধীরে প্রসার লাভ
করিয়াছে। ইহাদের শৈশব অবস্থার কথা প্রথমতঃ
আলোচনা করা যাক। আনাদের কাজ-কারবার যখন
প্রধানতঃ ইংলণ্ডের সহিত এবং আর্থিক জগতে ইংলণ্ডের
অধিপত্যই যখন প্রবল, তখন সেই দেশের ইতিহাস
আলোচনা করাই বিধেয়।

ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ও নোটের সৃষ্টি

তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের স্বর্ণকারগণ প্রথমতঃ
নিজেদের মূল্যবান গহনাপত্র ও হীরা-জহরতের সহিত
অপরের ধনসম্পদও গচ্ছিত রাখিতে সুরু করে। দহা-
তস্বরের হাত হইতে নিরাপদ হইবার জন্য ইহাদিগকে
বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইত। সেই জন্যই
জনসাধারণও তাহাদের ধনরক্ষা নিরাপদে রাখিবার জন্য
এই সব স্বর্ণকারের আশ্রয় গ্রহণ করিত। আমাদের দেশে
অনেক স্থানে এইরূপ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। ধনী
জমিদার, মহাজন, সাহকারের নিকটে আজ পর্যন্ত
অনেকে নিজেদের ধনরক্ষা গচ্ছিত রাখিয়া থাকে। ইংরেজ
স্বর্ণকার দেখিতে পাইল যে, প্রয়োজনের সময়ে অনেকেই
তাহার নিকট টাকা ধার করিতে আসে; অথচ বাহারা
অর্থ বা স্বর্ণরৌপ্য গচ্ছিত রাখে, নিতান্ত প্রয়োজন না
হইলে তাহারা উহা ক্ষেত্রত চাহে না। এইরূপ স্বযোগ
দেখিয়া স্বর্ণকারগণ তাহাদের নিকট গচ্ছিত অর্থ অপরকে
সুদ লইয়া ধার দিতে আরম্ভ করে। বাহারা টাকা
আমানত রাখিত, প্রথম অবস্থায় তাহারা কোনরূপ সুদ
পাইত না। ক্রমে এই সব আমানতী টাকার জন্য অল্প হানে
সুদ দেওয়া আরম্ভ হয়। ইহাই ব্যাঙ্কের প্রথম সূত্রপাত।
সময়ে ইহাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বাড়িলে, ইহারা
নগদ অর্থের পরিবর্তে চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে

প্রমিসরি নোট (I promise to pay on demand) প্রচলন করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের প্রচলিত প্রমিসরি নোটে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকলেই উহা গ্রহণ করিতে থাকে এবং এই সব নোট সাধারণের হাতে স্বর্ণ-বা রৌপ্য-মুদ্রার স্থায় চলিতে সুরু করে। প্রয়োজনমত নোটের বিনিময়ে নগদ মুদ্রা পাইতে কোনরূপ বাধা না-হওয়ায় এইরূপ নোটের প্রচলন সহজেই বিস্তার লাভ করে এবং এই ভাবেই ব্যাঙ্ক ও নোটের সৃষ্টি হয়। পরের ধনরত্ন গচ্ছিত রাখা, উহা পুনরায় অপরকে হুদে ধার দেওয়া, নগদ টাকার বিনিময়ে নোট প্রচলন—ইহাই তখনকার স্বর্ণকার-ব্যাঙ্কারদের প্রধান কাজ ছিল। আমরা নিম্নে উহাদের হিসাবের একটি নমুনা দিজেছি—

ব্যাঙ্কের বেনা :	ব্যাঙ্কের সংস্থান :
'ক'-এর নিকট আমানত	নগদ তহবিল (স্বর্ণ ও মুদ্রা)
ব্যাঙ্ক	—১,০০ \ ১০০০
সর্বসাধারণের নিকট নোট	'ক,' 'খ,' 'গ,' 'ক'-এর নিকট
ব্যাঙ্ক	—২,০০০ দামন —২,০০০
	১০,০০০ ১০,০০০

স্বর্ণকার যখন দেখিতে পাইল, তাহার প্রচলিত নোটগুলি অবলীলাক্রমে দেশের মধ্যে চলিয়াছে এবং উহা বিনিময়ে নগদ অর্থ বেশী লোকে চাহিতেছে না, তখন তাহার সাহস ক্রমেই বাড়িয়া যায় এবং পূর্বে যেখানে সে নগদ ১০০০ টাকা হাতে রাখিয়া ২,০০০ টাকার নোট প্রচলন করিতে সাহসী হইয়াছিল, সেখানে সে দুঃসাহস করিয়া আরও অধিক টাকার নোট ধার দিতে আরম্ভ করে। যৎসামান্য ব্যয়ে নোট ছাপাইয়া তাহা হুদে খাটাইয়া লাভবান হইবার লোভ ইহাদিগকে এমনই পাইয়া বসিল যে, সামান্য নগদ অর্থ পুঁজি লইয়া ইহারা অত্যন্ত অধিক পরিমাণ নোট সৃষ্টি করিতে সুরু করিল। সকলে সমস্ত নোট এককালীন উপস্থিত না করিলেও যে পরিমাণ নোট উপস্থিত হইতে লাগিল তাহার টাকাও ইহারা দিতে পারিল না। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইহাদের অনেককে দরজা বন্ধ করিতে হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমানতকারিগণের গচ্ছিত অর্থও বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এই অবস্থা দেখিয়া ১৮৪৪ সালে নতুন আইন করিয়া, কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যতীত আর সকল ব্যাঙ্কের হাত হইতে নোট

প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয়। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশে আইন দ্বারা নোট প্রচলন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে এবং কয়েকটি দেশ ভিন্ন (ইহার মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই প্রধান) আর সব দেশেই ব্যবসাদারী বোধ ব্যাঙ্কের হাত হইতে নোট প্রচলনের অধিকার অপসারিত করা হইয়াছে।

চেকের সৃষ্টি

নোট সৃষ্টির ক্ষমতা এই সব ব্যাঙ্কের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল বটে, কিন্তু শীঘ্রই নোটের পরিবর্তে ইহারা অর্থোপার্জনের আর একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল এবং গচ্ছিত টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক আমানতকারীকে একখানা করিয়া পাস-বই ও চেক-বই দিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক চেক-বইয়ে ২৫৫০১০০ কিংবা ততোধিক চেক থাকে। আমানতকারী তাহার প্রয়োজনমত বই হইতে এক-একখানা চেক লইয়া তাহা যথাযথ পূরণ করিয়া পাওনাদারকে দিয়া থাকে। যাহাকে টাকা দিতে হইবে তাহার নাম ও যত টাকা দিতে হইবে তাহার সংখ্যা পূরণ করিয়া আমানতকারীকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হয়। তাহার স্বাক্ষরের নমুনা পূর্ক্সেই ব্যাঙ্কে রাখা হইয়া থাকে। ঐহার নামে চেক দেওয়া হয়, তিনি এই চেক ব্যাঙ্কে দিয়া নগদ টাকা লইতে পারেন, কিংবা নিজ নামে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা করিয়া দিতে পারেন। মাসে একবার পাস-বইখানা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিলেই কত টাকা জমা ও কত টাকা খরচ হইল এবং কত টাকা উষ্মত (balance) রহিল তাহা হিসাবে তুলিয়া দেওয়া হয়। আজকাল পাস-বইও পাঠাইতে হয় না—ব্যাঙ্ক হইতেই প্রতিমাসে হিসাব ডাকযোগে পাওয়া যায়। চেক-দাতা ও চেক-গ্রহীতা উভয়ের হিসাব যদি একই ব্যাঙ্কে থাকে, তাহা হইলে টাকাটা এক জনের হিসাবে খরচ ও অপরের হিসাবে শুধু জমা করিয়া লইলেই চলে; ব্যাঙ্কে নগদ কোন টাকা দিতে হয় না এবং সেই ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের নগদ তহবিলের কোনরূপ নড়চড়ও হয় না। কিন্তু যদি চেক-গ্রহীতার হিসাব অন্য ব্যাঙ্কে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্ক চেক-দাতার ব্যাঙ্ক হইতে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া

আনিয়া নিজ গ্রাহকের হিসাবে জমা করিয়া লয়। চেকের টাকা নগদ না তুলিয়া কিংবা নিজের হিসাবে জমা না দিয়া চেকের পৃষ্ঠে নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া তৃতীয় কোন ব্যক্তিকেও চেক-গ্রহীতা তাহার দেনা মিটাইবার জন্য দিতে পারেন এবং এই ভাবে একই চেক বিভিন্ন হাত ঘুরিয়া সর্বশেষ ব্যক্তির ব্যাঙ্ক-হিসাবে জমা হইতে পারে। রাম স্ত্রামের নামে ষ্বে-চেক দিবেন, স্ত্রাম তাহা ভাড়াইয়া নগদ টাকা না লইয়া কিংবা নিজ ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা না দিয়া, নিজের দেনার জন্য উহা যত্নে দিতে পারেন, যত্ন আবার উহা হরিকে দিতে পারেন—এ ভাবে বহু হাত ঘুরিয়া গৌরব নিকট পৌঁছিলে, তিনি উহা নিজ ব্যাঙ্ক-হিসাবে জমা করিয়া লইতে পারেন।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে বিভিন্ন চেকের দরুন নগদ টাকার আদান-প্রদান না হইয়া পরস্পরের দেনাপাওনা মিটিয়া গিয়া যে ব্যাঙ্কের দেনা দাঁড়ায় তাহাকে অতিরিক্ত টাকাটা শুধু নগদ দিলেই চলে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার করা যাক। ‘ক’ নামক ব্যাঙ্কের নিকট যদি ‘খ’ নামক ব্যাঙ্কের পাঁচখানা চেকের দরুন মোট পাঁচ হাজার টাকা পাওনা হয়; পক্ষান্তরে ‘খ’ নামক ব্যাঙ্কের নিকট যদি ‘ক’ নামক ব্যাঙ্কের ছ-খানা চেকের দরুন মোট ছয় হাজার টাকা প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে ‘ক’ ব্যাঙ্কে নগদ ১০০০ টাকা মাত্র ‘খ’ ব্যাঙ্কের দিলেই চলিবে—যদিও উভয় ব্যাঙ্কে ১১,০০০ টাকারই জমাখরচ করিতে হইবে। ‘ক’ ব্যাঙ্কে উহার গ্রাহকদের নামে জমা ৬,০০০ টাকা ও খরচ ৫,০০০ টাকা এবং ‘খ’ ব্যাঙ্কে খরচ ৬,০০০ টাকা ও জমা ৫,০০০ টাকা পড়িবে। পরিণামে ‘ক’ ব্যাঙ্কের আমানত মোটের উপর ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি পাইবে এবং ‘খ’ ব্যাঙ্কের আমানত ১,০০০ টাকা হ্রাস পাইবে। এই হাজার টাকাটাই ‘খ’ ব্যাঙ্কের নগদ দিতে হইবে ‘ক’ ব্যাঙ্কে। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, চেক প্রবর্তনের ফলে মোট ১১,০০০ টাকার দেনাপাওনার জন্য ব্যাঙ্কের নগদ মাত্র ১,০০০ টাকার প্রয়োজন হইতেছে।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে খুব অল্প ক্ষেত্রেই চেকের বিনিময়ে নগদ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। দৈনন্দিন হাট-বাজার করা, ট্রাম-রাসের ভাড়া দেওয়া,

বায়োকেপ-থিয়েটারের টিকিট কেনা প্রভৃতি খুচরা ব্যয় ভিন্ন অধিকাংশ কাজকর্ম চেক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যেও নগদ টাকার লেনদেন বেশী করিতে হয় না, পরস্পরের দেনাপাওনা ওঝাবাদ গিয়া যাহার নাহা দেনা দাঁড়ায় শুধু ঐ টাকাটা নগদ দিলেই চলে।* সেই জন্যই নোট-প্রচলনের অধিকার রহিত হইয়া গেলেও নগদ অর্থের পরিবর্তে চেক ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়া ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। নোটের প্রচলন থাকা কালে ব্যাঙ্কেব দেনাপাওনার হিসাবের একটি নমুনা আমরা দিচ্ছি। চেক প্রবর্তিত হইবার পর উহাদের হিসাব কি ভাবে রাখা হইত তাহার একটি নমুনা আমরা দিতেছি—

ব্যাঙ্কের দেনা :	ব্যাঙ্কের সংস্থান :
আমানত বাবদ	নগদ তুলিল (ঘর্ণ ও মুদ্রা)-১,০০০
	‘ক’, ‘খ’ ‘গ’ ‘ঘ’-এর নিকট
	দান
১১,০০০	১১,০০০

পূর্ব হিসাব ও এই হিসাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্বে যেখানে নোটের দরুন ব্যাঙ্কের ২০০০ টাকার দায়িত্ব ছিল, এখন সেখানে আমানতের জন্য তাহাকে ২০০০ টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইতেছে। তাহার দেনা বা দায়িত্ব সমানই রহিয়াছে, শুধু যে-দেনা ছিল নোটের অধিকারীর নিকট, সেই দেনা দাঁড়াইয়াছে এখন আমানতকারীর নিকট।

এখানে কাহারও মনে একটু খটক বাধিতে পারে। কেহ হয়ত ভাবিতে পারেন, পূর্বে ১০০০ টাকার আমানত সম্বল করিয়া ২,০০০ টাকা নোটে দান করিতে পারা যাইত। এক্ষণে নয় হাজার টাকা দান করিতে হইলে প্রথমেই পুরাপুরি নয় হাজার টাকা নগদ আমানত পাওয়া আবশ্যক। এইটি ভুল ধারণা; কারণ প্রত্যেক দান বা ধার (credit) একটি নূতন আমানত সৃষ্টি করে, এই নীতিটি এখানে আমাদের ভুলিলে চলিবে না। ‘ক’ নামক ব্যাঙ্ক যদি ‘খ’ নামক ব্যক্তিকে এক লক্ষ টাকা ধার দেয় তাহা হইলে

* বড় বড় নগরে এই কাজ করিবার জন্য একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে; ইহাকে ক্লিয়ারিং হাউস বলা হয়। সেখানে প্রত্যেক সকল ব্যাঙ্কের চেক জড়ো হয় এবং প্রত্যেকের দেনাপাওনা ওঝাবাদ অন্তে সাব্যস্ত হয়। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এই কাজ করিত। এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া করে।

ইহার অর্থ এই নহে যে ‘খ’ নোটের ও মূল্য এক লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে। আধুনিক কালে ঋণ করিয়া কেহই নগদ অর্থ নিজ গৃহে লইয়া যায় না। সেই অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্কেই আমানতী হিসাব খোলা হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যাঙ্ক যত টাকা ঋণ দান করে প্রায় সেই টাকাই ডিপোজিট হিসাবে কিরিয়া পায় এবং এইরূপে ঋণের টাকা ও আমানতী টাকা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইতিপূর্বে ব্যাঙ্কের হিসাবে দেনার ঘরে যে ১০,০০০ টাকা আমানত দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে এক হাজার টাকাই প্রকৃত ক্যাশ আমানত, বাকী নয় হাজার টাকা শুধু ‘পেপার’ আমানত; যে-টাকার ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ‘ঘ’-কে ধার দেওয়া হইয়াছে (পাস-বই ও চেক-বই মূল), তাহাই আমানতরূপে ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা পড়িয়াছে। ধারও যেমন নগদ দেওয়া হয় নাই, তেমনই আমানতের টাকাও নগদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যেমন নোটের বেলা তেমনই চেকের বেলায়ও ব্যাঙ্ক নগদ মাত্র হাজার টাকা সমল করিয়া স্বচ্ছন্দে নয় দশ হাজার টাকা দান করিতে পারিতেছে। এখানে কথা উঠিতে পারে, আমি যে টাকা ধার করিব, তাহার সমস্তটাই যে ব্যাঙ্কে কেলিয়া রাখিব তাহাব নিশ্চয়তা কি? ঠিক কথা। কিন্তু আমি যেমন আমার প্রয়োজনমত চেক দ্বারা টাকা তুলিয়া লইয়া আমার পাওনাদারকে দিব এবং তিনি উহা তাঁহার ব্যাঙ্ক জমা দিবেন, তেমনই আবার অপরের দেওয়া অর্থ ব্যাঙ্কের চেকও ত আমার ব্যাঙ্কে আসিয়া জমা হইবে। সুতরাং হেরদরে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে চেকেরই আদান-প্রদান হইবে বেশী, নগদ টাকার প্রয়োজন অতি সামান্যই হইবে।

ক্যাশ তহবিল ও দান

অবশ্য এখানে একটা কথা তুলিলে চলিবে না। বর্তমান সময়ে নগদ টাকার ব্যবহার ও প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে উঠিয়া যায় নাই। দশ হাজার টাকা আমানতের জন্য হয়ত এক হাজার টাকার অধিক ক্যাশ তহবিল আবশ্যক হয় না। কিন্তু বিশ হাজার টাকা আমানত স্থলে, অন্ততঃ দুই হাজার টাকার নগদ দাবী মিটাইবার প্রয়োজনও ব্যাঙ্কের হইবে না, এইরূপ মনে

করিবার সম্ভব কারণ নাই। সেই জন্য নগদ তহবিলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ইচ্ছামত ধার দিয়া আমানত বৃদ্ধি করা মোটেই নিরাপদ নহে। তাহা করিতে গেলে, নগদ তহবিলের অনুরূপে অত্যধিক নোট সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্কগুলি যেমন এক কালে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটবার সম্ভাবনা হইবে। তাই, কি পরিমাণ নগদ তহবিল রাখিয়া কত টাকা ধার দেওয়া যাইতে পারে, সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাঙ্কগুলি তাহার একটা সীমা নির্দেশ করিয়া লইয়াছে। বিলাতী ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ গচ্ছিত অর্থের এক-দশমাংশ নগদ তহবিলে রাখিয়া নয়-দশমাংশ ধার দিয়া থাকে। অর্থাৎ আমানত যদি দশ হাজার টাকা হয়, তাহা হইলে নগদ এক হাজার টাকা হাতে রাখিয়া নয় হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ধার দিতে পারে। ভাষান্তরে মাত্র এক হাজার টাকার ক্যাশ আমানত সমল করিয়া ব্যাঙ্ক নয় হাজার টাকা দান দিতে ও নূতন আমানত সৃষ্টি করিতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় আমানতের এক-দশমাংশের অধিক টাকা তুলিয়া লওয়া হয় না, বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাদের এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে। কিন্তু কোন কারণে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারিগণের আস্থা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে, অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হইলে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। সেই জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া, প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ককে তাড়াতাড়ি নগদ তহবিল বাড়াইতে হয় এবং তৎক্ষণাৎ নূতন ধার দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে কিংবা পুরাতন ধারের টাকা অবিলম্বে আদায় করিয়া লইতে হয়। ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ টাকা ধার দিবে তাহা শুধু তাহার নগদ তহবিলের উপরই নির্ভর করে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ অবস্থা, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এবং যাহারা টাকা ধার করিবে তাহাদের অবস্থা ও যোগ্যতা—এই সবের উপরও নির্ভর করে।

কেন্দ্রীয় বা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ইচ্ছার উপর। অধুনা প্রত্যেক দেশে একটি করিয়া সরকারী বা আধা-সরকারী ‘সেন্ট্রাল’ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিরাট

সবকারী তহবিল ইহাতেই রাখা হয় এবং ইহা হইতেই খরচ করা হয়। গবন্মেণ্টের যখন ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহার ব্যবস্থাও ইহারাই করিয়া থাকে। ইহারাই দেশের মুদ্রা ও নোট সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত করে এবং দেশের স্বর্ণ-তহবিলও ইহাদের নিকটই সঞ্চিত ও গচ্ছিত থাকে। এই ব্যাঙ্ক গবন্মেণ্টের সহযোগিতায় পরিচালিত হইলেও যৌথ কার-বাবের ভ্রাম্য সর্বসাধারণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত এবং গবন্মেণ্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন নহে। রাজনৈতিক দলাদলি, বাড়-বাণ্টার বাহিরে থাকিয়া দেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলাই ইহাদের মূখ্য কর্তব্য ও মূল নীতি। বিলাতের এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম “ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড”। আমাদের দেশে এই প্রকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল। দেশবাসীর বহুদিনের আন্দোলনের ফলে সম্প্রতি “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া” নামে এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পণ্যমূল্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও দেশের আর্থিক অবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া অর্ধেব পরিমাণ বাড়ান-কমান নীতি এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে নিষ্কারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, অর্থ বলিতে মুদ্রা বা নোটই শুধু বুঝায় না; ধাব বা ‘ক্রেডিট’ মূলে যে বিরাট কাজকর্ম আজ জুনিয়ায় চলিয়াছে, তাহাও অর্থেরই সামিল। মুদ্রা ও নোট যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করে, তেমনি ‘ক্রেডিট’ সৃষ্টি করিয়া থাকে প্রধানতঃ ব্যবসাদারী যৌথ ব্যাঙ্কগুলি। এই ক্রেডিট বা দাননের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাক্ষাৎ সম্পর্ক তেমন না থাকিলেও, গৌণ প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত ক্রেডিট বা দানন দ্বারা নুতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজেদেরও বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এক ধার হইতে কোম্পানীর কাগজ, ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে এবং তখন এই সব সিকিউরিটি ক্রয় কবিবার জন্য সর্বসাধারণ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আবশ্য করিবে। বিপদ দেখিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির তখন দানন কমান ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিবে না। ফলে ক্রেডিট মূলে বাজারে যে অতিরিক্ত অর্থের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা প্রতিহত হইবে। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট দ্বারা যথোচিত অর্থ সৃষ্টি করিতে না পারায় পণ্যমূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইতেছে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড অমনই কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটি খরিদ কবিতে আরম্ভ করিবে।

ইহার ফলে বাজারে নুতন অর্থের আমদানী হইয়া উহা যৌথ ব্যাঙ্কগুলির আমানত হিসাবে স্থান লাভ করিবে এবং উহাদের নগদ তহবিল বৃদ্ধি করিবে। তখন দানন দিবার পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির আর কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকিবে না। তাই বলিতেছিলাম, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট-সৃষ্টিব প্রধান কেন্দ্র হইলেও, এই বিষয়ে ইহার ক্রমীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বা কর্তৃত্ব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। মুক্ত নহে বলিয়াই দেশের প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে একটি হুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা অহুসরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

যৌথ ব্যাঙ্ক ও তাহার কর্তৃত্বতালিকা

প্রত্যেক ব্যবসায়েরই দুইটি দিক আছে। একটি তাহার দেনার দিক, আর একটি তাহার ভ্রাম্য বা সংস্থানের দিক। ইতিপূর্বে আমরা ব্যাঙ্কের প্রাথমিক যুগের দেনাপাওনার একটি সহজ হিসাব দিয়াছি। এক্ষণে ষোলটি প্রধান বিলাতী ব্যাঙ্কের দেনাপাওনার হিসাব দিতেছি। উহা হইতে ইহাদের সম্মিলিত অর্থবল ও দেনাপাওনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১৬টি বিলাতী যৌথ ব্যাঙ্কের সমষ্টিগত হিসাব

(১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

দেনা	পাউণ্ড	সংস্থান	পাউণ্ড
মূলধন (নগদ প্রাপ্ত)	৮০০ লক্ষ	নগদ তহবিল (ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে গচ্ছিত টাকা)	
রিজার্ভ	৫৫০ লক্ষ	নহ	২,৭০ লক্ষ
অদত্ত লভ্যাংশ	৫০ লক্ষ	শেয়ার মার্কেটে স্বল্প-	
জামিন	২৬০ লক্ষ	সম্রাটী দানন	১,৪২০ লক্ষ
আমানত	২৭,৬৪০ লক্ষ	বিল বা ছত্তী খরিদ	৩,৮২০ লক্ষ
		কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের	
		ক্রয় ধণ দান	৭,৯২০ লক্ষ
		কোম্পানীর কাগজ ও	
		সিকিউরিটি খরিদ	৫,২০০ লক্ষ
		জানিনের সিকিউরিটি	২৬০ লক্ষ
		বাচ-গৃহ ও অন্যান্য	
		দম্পত্তি	৫০০ লক্ষ
মোট	২৭,০০০ লক্ষ	মোট	২৭,০০০ লক্ষ

প্রথমতঃ দেনার দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অদত্ত লভ্যাংশ (unclaimed dividend) বাদ দিলে, এই সব ব্যাঙ্কের দেনা প্রধানতঃ চারি প্রকারের।

১। যে-সব অংশীদারের নিবর্ত হইতে ব্যাঙ্ক তাহার মূলধন জোগাড় করিয়াছে, তাহাদের নিকট ঐ মূলধনের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক দায়ী।

২। ব্যাঙ্ক তাহার কারবারের লাভ হইতে যে টাকার রিজার্ভ তহবিল করিয়াছে তাহার জন্ম সে দায়ী। এই দায় অবশ্য তাহার নিজের নিকটেই।

৩। তৎপর তাহার প্রধান দেনা আমানত-কারিগণের নিকট। তাহার কারবারের পুঁজির বড় অংশই তাহাদের নিকট হইতে আনিয়াছে।

৪। এতদ্ব্যতীত তাহার আরও একটি দেনা আছে। ইহাকে আমরা সম্ভাব্য দেনা (contingent liability) বলিতে পারি। এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তি বা ব্যাক হইতে টাকা ধার করে এবং কোন ব্যাক যদি তাহার জন্ত জামিন হয়, তাহা হইলে টাকা পরিশোধের দায় প্রধানতঃ দেনাদারের হইলেও, তিনি পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে ব্যাককেই ঐ টাকা পূরণ করিতে হইবে। এই ত গেল দেনার দিক। ব্যাকের সংস্থান বা পাওনার দিক সম্বন্ধে এই বার সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

১। তহবিলের একটা অংশ চলতি প্রয়োজনের জন্ত ব্যাককে সর্বদা নিজের নিকটে রাখিতে হয়। আমানতকারিগণের দৈনন্দিন নগদ টাকার দাবী মিটাইবার জন্তই হাতের কাছে এই টাকাটা রাখা প্রয়োজন। ইহার একটা অংশ চাহিবামাত্র দিবার সর্ব্বো ক্রেত্রীয় ব্যাকের চলতি হিসাবে বিনা সন্দেহে গচ্ছিত থাকে। এই টাকা হইতে ব্যাকের কোনরূপ আয় হয় না।

২। শেয়ারের বাজারে (stock-exchange) শেয়ার কেনাবেচা করিয়া শেয়ারের দ্বালালগণ বহু টাকা উপায় করে। এই কাজের জন্ত যে প্রস্তুত অর্থের প্রয়োজন হয় দ্বালালগণ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে কিংবা শেয়ার বন্ধক রাখিয়া উহা ব্যাক হইতে অল্প দিনের মেয়াদে ধার করিয়া থাকে। ব্যাকের পক্ষে এই প্রকার দাননের স্ববিধা এই যে, প্রয়োজনমত টাকাটা স্বেচ্ছা সহ অল্প দিনের মধ্যে ফুরিয়া আসে এবং পুনরায় উহা ঐরূপে ব্যবহার করা চলে।

৩। আধুনিক কালে লক্ষ লক্ষ টাকার কৃষি-ও শিল্প-দ্রব্য বিক্রয়ার্থ দেশবিদেশে চালান হইয়া থাকে। ইহার মূল্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না, অথচ মূল্যের টাকাটা সম্বর পাওয়া না গেলে ব্যবসায়ীর বিশেষ অস্ববিধা ঘটে। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্যবিক্রেতা তাহার মূল্যের বিল ব্যাকের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকাটা অগ্রিম পাইতে পারে। বিলের

সম্ভ্রাতা ক্রেতাকে কিংবা তাহার পক্ষে কোন নামকরা ব্যাককে বিলের উপর স্বাক্ষর করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এই টাকা সাধারণতঃ ৩ মাস মধ্যে ক্রেতাকে শোধ করিতে হয়; ৬ মাসের অনূর্দ্ধকাল মধ্যে ইহা অবশ্য দেয়। প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বর্গীকৃত বর্তমান যুগে এই ভাবে ব্যাকের মারকতে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ব্যাকগুলি এই সব বিল বা ছত্তী ক্রয়বিক্রয়ের কাজ করিয়া বেশ একটা মোটা টাকা লাভ করিয়া থাকে। বিল বা ছত্তী বহু প্রকারের আছে; তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

৪। অনেক ব্যাক, বিশেষতঃ জার্মান ব্যাক, দেশের কৃষি-ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মূলধনও জোগাইয়া থাকে। কিন্তু ব্যাকের নিরাপত্তার দিক হইতে এইরূপ নূতন প্রতিষ্ঠানের মূলধন খরিদ নিরাপদ নহে মনে করিয়া বিলাতী ব্যাকগুলি এই জাতীয় কাজে টাকা খাটান পছন্দ করে না। তৎপরিবর্তে ব্যবসায়জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত কারবারকে, এমন কি ব্যক্তি-বিশেষকে চলতি প্রয়োজনের জন্ত অল্পদিনের মেয়াদে ইহার ঋণদান করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার জন্ত কল-কারখানা ও অন্যান্য সম্পত্তি জামিন লওয়া হয়। বিলাতী ব্যাকের বিরাট আমানতী টাকার অর্ধেকেরও অধিক কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত দানন দেওয়া হইত। ব্যবসা মন্দা শুরু হওয়ার পর এইরূপ দাননের পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মোট দাননের প্রায় অর্ধেক এই বাবদে খাটিতেছে। অতি সামান্য স্বেচ্ছা (বার্ষিক শতকরা ৫-৬ টাকা) এরূপ বিরাট অর্থভাণ্ডারের আহুত্যা লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই শিল্প ও বাণিজ্য ইংলণ্ড ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ আজ এতটা বড় হইতে পারিয়াছে।

৫। কোম্পানীর কাগজ, মিউনিসিপ্যাল বণ্ড,* সুপ্রতিষ্ঠিত বোঁধ কারবারের অংশ ক্রয় ব্যাকের টাকা খাটাইবার অন্ততম উপায়। টাকার বাজারে এই সব সিকিউরিটির বেশ চাহিদা আছে। প্রয়োজন হইলে অতি সহজে এইগুলি শেয়ার মার্কেটে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করা চলে।

* টাকার প্রয়োজন হইলে বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটি তাহাদের আয় জামিন রাখিয়া যে দলিলমূলে ঋণ গ্রহণ করে তাহাকে “মিউনিসিপ্যাল বণ্ড” বলে।

বর্তমান কালে মানুষের বিষয়-সম্পত্তির একটা প্রধান অংশই এই সব Gilt-edged security।

৬। এতদ্ব্যতীত নিজেদের জন্ত বড় বড় আপিস-গৃহ-নির্মাণে ব্যাঙ্ক টাকার একটা অংশ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই সব প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার একাংশ নিজেদের ব্যবহারের জন্ত রাখিয়া অপরাংশ অস্ত্রাশ্রয় ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেওয়া হয়। এই উপায়ে ভাড়া বাবদ নিজেদের জন্ত বহু অর্থ ত বাঁচিয়া যায়ই অধিকন্তু অস্ত্রের নিকট হইতে বেশ একটা স্থায়ী আয়ও হয়। কলিকাতায় লালদীঘির চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক-গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব।

এই বার বিলাতী ব্যাঙ্কগুলির আমানতের শতকরা কত টাকা কি বাবদ খাটিতেছে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নগর তহবিল (ব্যাঙ্ক অব ইল্ডোপেপলিট টাকা সহ)	শেরার মার্কেট অল্লমিনের বেরাদে দান	কি বা হুগী কাগজ ও থ্রি	কোম্পানীর শেরার খরিদ	কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা- বাণিজ্যের জন্ত দান	
১৯২৫	১১.৮	৭.০	১৩.৩	১৭.২	৫১.৪ = ১০০
১৯৩০	১০.৭	৭.৮	১৪.৭	১৪.৩	৫৩.৫ = ১০০
১৯৩৩ (মে পর্যন্ত)	১০.৬	৫.৪	১৭.৮	২৭.৩	৬১.৯ = ১০০



প্রণতি
ঐশ্বর্যহীন নিরোগী



কৃত
ঐশ্বর্যহীন নিরোগী

অলখ-বোরা

শ্রীশাস্তা দেবী

পূর্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত বিশ্ব নন্দানন্দোড় গ্রামে শ্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকান্ত শিবু ও হুথাকে লইয়া থাকেন। হুথা শিবু পুত্রার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা দাবির গরুর গাড়ী চড়িয়া এখানেও তাহার। নতনন্দোড় দাবামহাশয় লক্ষণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি হরধুনীর খুব ভাব। হরধুনী সসারের কত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আদায়বদ্ধ। পুত্রার পূর্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে হুথার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও হরধুনী চক্ষু অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অল্পসেবা, কিন্তু শোকের উদাসীন্তে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনায় অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে কিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি মুখে দিদি হুথার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া শ্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের মীলা-চুমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে হুথার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে হুথা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতায় নতনবের ভিতর হুথা কোন আশ্রয় পাইল না। পীড়িত, মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নতন নতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত হুথাকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবার কিছুদিন পরে একটি নবাপত্তা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ হুথার বন্ধুত্বভিতি উজলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নতন। স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল।]

১৫

স্কুলে পৌছিয়াই সবার আগে মনে হয় হৈমবতী আজ তাহার আগে আসিয়াছে কি? যদি হৈমবতী আগে আসে তাহা হইলে স্কুল-বাড়ীতে পা দিয়াই তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা দেখা যায়। হৈমবতী হাসে ছেলেরাঙ্কুরের মত খিল খিল করিয়া নয়। কি শাস্ত স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ হাস্যটুকু তাহার; সে হাসির শব্দ নাই, আলো আছে।

কিন্তু সব দিন হৈমবতীকে কাছে পাওয়া শক্ত। একে ত সৈ পড়ে অল্প ক্লাসে, তাহার উপর মাসে তিন-চারবার জর হওয়া তাহার যেন একটা বাঁধা নিয়ম। হঠাৎ এক-এক দিন

ক্লাসে গিয়া ছোট্ট একখানি নীল খামে ছোট্ট একটুখানি চিঠি পাওয়া যায়, “হুথা, আমার একটু জর হয়েছে, আজ আর স্কুলে যেতে পারলাম না।”

হুথার মনটা মুষড়িয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটা আনন্দও হয় যে ইচ্ছার মেয়েদের বিদ্রোহের হাসির আড়ালে আজিকার দিনটা অন্ততঃ হৈমবতীর সঙ্গে তাহার দেখা হইবে। দেখা হইত সন্ধ্যার পরে, কারণ হৈমবতীর নিয়ম ছিল, জর হইলেই সন্ধ্যার পর সে হুথাকে আনিতে গাড়ী পাঠাইয়া দিত। হৈমবতীর জরে তাহার আনন্দ করিবার কিছু কারণ যে থাকিতে পারে, ইহাতে হুথার মন নিজেকে অপরাধী ভাবিত।

হৈমবতীদের বাড়ীতে শয়নকক্ষগুলির দক্ষিণ দিকে দোতলায় পূর্ব-পশ্চিমমুখী প্রকাণ্ড একটা বারান্দা ছিল। তাহার মোটা মোটা জোড়া ধামের মাঝখানে উপরের খড়খড়ি হইতে নীচের রেলিং পর্যন্ত লোহার জাল দিয়া আগাগোড়া বিরিয়া কাক পক্ষী ও চোর-ডাকাতের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করা হইয়াছিল। এই বারান্দাতেই লোহার একটা খাটে পুরু গদি পাতিয়া, চণ্ডা হেমটীচ-করা শুভ্র ওয়াড় পরানো আশমনী রেশমের জোড়া বালিশে কক্ষ তৈলহীন মাথাটি একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া হৈমবতী শুইত।

বাড়ী কিরিয়া কোন রকমে একটু লুচি তরকারি থাইয়া হুথা ছুটিয়া আসিয়াছে হৈমবতীর জর বলিয়া। আজ স্কুলের বাসেই কিরিতে হইয়াছে, তাই দেবীও হইয়াছে যথেষ্ট। হুথা খাটের পাশের বেতের চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া হৈমবতীর জরতপ্ত মস্তকপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, শীর্ণ নরম হাতের মুঠা-ছুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু বেশী কথা বলিল না। হৈমবতী তাহার দীর্ঘায়ত চোখের দৃষ্টি দিয়া হুথার আপাদমস্তকে যেন একটি স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিল। তাহার বর্ণহীন পেলব ছুটি ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, একটু থামিয়া হৈমবতী বলিল, “তুমি এসেছ ন?”

এ দৈব কল্পন আর এ দুটি মাত্র কথার স্বধা যেন তাহার সমস্ত অকথিত বাণী আনন্দ-সঙ্গীতের মত স্তব্ধিতে পাইল। ক্ষটিকের মত খচ্ছ হইয়া উঠিল হৈমন্তীর তরুণ চোখের গভীর দৃষ্টি, তাহাব যুগল গ্রীবার স্নেহভঙ্গীটুকুও যেন হইয়া উঠিল ভাবাময়। এমনই নীরবেই দুটিয়া উঠিত তাহাদের নিঃশব্দ কিশোর জীবনের প্রথম বন্ধুপ্রীতির অগ্নান কুসুম। এক মুহূর্ত্তে বলা হইয়া যাইত এক যুগের কথা।

পৃথিবীর হাটে চলতি সাধারণ কথাগুলো সম্বন্ধে স্বধার অবজ্ঞা থাকিলেও সে ধীরে ধীরে বলিল, “তুমি ভাই, রোজ রোজ এমন ক’রে জর ক’রো না, শরীর একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে কি হবে ভাব ত।”

হৈমন্তী স্বধার মুখের দিকে চাহিয়া উদাসীন ভাবে বলিল, “কি আর হবে? তোমরা কত এগিয়ে পাসটাস ক’রে যাবে, আমি প’ড়ে থাকব।”

স্বধা ব্যথিত হইয়া ভাবিল, হৈমন্তী তাহার কথার অর্থ কিছুই বুঝিল না। তুচ্ছ ভাষার ক্ষমতা কি সামান্য। স্বধার মনের গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত যে উৎকর্ষা, যে নিদারুণ দুঃশক্তির কথা সে বুঝাইতে চাহিয়াছিল, তাহার মুখের কথায় ত তাহার সহস্রাংশের একাংশও প্রকাশ হইল না।

স্বধা হৈমন্তীর দুই হাত সজোরে চাপিয়া বলিল, “না, ওসব বাজে কথা নয়। তুমি আর জর করতে পাবে না, পাবে না, কক্ষনো পাবে না।

হৈমন্তী খুশী হইয়া বলিল, “আচ্ছা, তোমার শুকুম পালন করতে চেষ্টা করব।”

তারপর নীরবে কিছুক্ষণ ক্ষান্তবর্ণন আষাঢ়ের আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, “দেখ, দেখ, পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে দেখ। আকাশ ভ’রে রঙের আশ্বিন ছড়িয়ে পড়েছে। কি আশ্চর্য শিল্পী সে, যে এই বিরীচি আকাশের গানে প্রতি সন্ধ্যায় নতুন নতুন রঙের এমন অপূর্ব সমারোহ করে। আমি এ রূপসাগরের ফুল খুঁজে পাই না। মাহুষের তুলিতে এ রূপ কোটে না, মাহুষের ভাষাতেও এর নাম নেই।”

হৈমন্তী কথা বলিতে বলিতে যেন তন্দ্রায় হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া যাইত। স্বধাত্বের বর্ণচ্ছটা তাহাকে যেন মায়াবীর বাঁশির স্বরের মত ভুলাইয়া এক লোক হইতে অত্র লোকে লইয়া যাইত। স্বধা মুগ্ধ হইয়া আকাশের সৌন্দর্যসম্ভারের

দিকে চাহিত, কিন্তু ভ্রাতৃত্বিক মুগ্ধ হইত হৈমন্তীকে দেখিয়া। ভাবিত, না জানি হৈমন্তী তাহা অপ্রত্যাশিত কত শ্রেষ্ঠ লোকের মাহুষ, কত গভীর করিয়া এই পৃথিবীর বিচিত্র রসায়নত্ব তাহার হৃদয়ে জাগে। গন্ধর্বলোকবাসিনীদের মত পৃথিবীর স্থূলতা তাহাকে কোথাও যেন স্পর্শ করে না।

হৈমন্তীর ধ্যান হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “তুমিও কিন্তু এ আকাশের মত সুন্দর, অমনি নিত্য নতুন রূপের ছায়া তোমাব মুখে পড়ে। তোমাব মনে কিসের ধনি আছে বল ত?”

স্বধা লজ্জায় লাল হইয়া বলিল, “কি যে তুমি বল!” আর বেশী কথা তাহার যোগাইল না, মনে মনে ভাবিল, “হৈমন্তী পাগল। আমি ভাবি ত একটা মাহুষ! একটা কথা বলতেও ভাল ক’রে পাবি না। আমাকে ও কি-না মনে করে।”

হৈমন্তী আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, “এই বারান্দায় ব’সে রবিবার ‘বলাকা’ পড়তে আর জর হ’লে এই আকাশের দিকে চেয়ে চুপটি ক’বে শুয়ে থাকতে ভাবি ভাল লাগে। বৃষ্টি না এলে এখান থেকে কেউ অমায় নাড়াতে পারে না। তুমি যদি রোজ এখানে আসতে ত দেখতে যে সকাল-সন্ধ্যা সবই এখানে কেমন সুন্দর হয়।”

পথের ধারে এক সারি দীর্ঘ শুষ্ক দেবদারু গাছ ও দুই-একটা বৃহৎ ছত্রাকার কৃষ্ণচূড়া গাছ বর্ষার জলে ঘন পত্র-সম্ভাবে বলমল করিতেছিল। তাহাদের স্নিগ্ধ শ্রাম রূপে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। স্বধা ভাবিল সুন্দর বটে। কিন্তু নয়ানজোড়ের বর্ষার ঘনঘটা, নীল আকাশের গায়ে জটাজুট-ময়ী রণরঙ্গিণী ভৈরবীর উন্নত বাহিনীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কাল মেঘ, দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে সবুজের কত স্তর, ক্ষেতের কচি ধানের অঙ্কুরে তরঙ্গ-হিল্লোলের মত বাতাসের খেলা, পথের বাঁকে বাঁকে নুপূব বাজাইয়া জনস্রোতের নৃত্য, হৈমন্তী ত দেখে নাই, দেখিলে পাগল হইয়া যাইত।

স্বধা বলিল, “তোমাকে ভাই, একবারটি নয়ানজোড়ে নিয়ে যাব, দেখবে সত্যিকারের পৃথিবী কি।”

হৈমন্তী যেন ছেলের মত স্বধাকে ঠাট্টা কবার স্বরে বলিল, “তার মানে আমার এই পৃথিবীটা কিছু নয় বলতে

চাও ত। আমার এই দক্ষিণের বারান্দায় আগাধিনর প্রদীপ আছে, দু-দিন থাকলে দেখতে পেতে।”

সুখা কিছু বলিল না। স্বর্ধ্যাস্তের শেষ আলোটিবু মিলাইয়া অন্ধকারের পূর্ব সূচনা দেখা দিল। সোনালী মেঘ ক্রমে ক্রোধে কালো হইয়া কেশর ফুলাইয়া উঠিলেই দেখিয়া আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় সুখা বাড়ী ঘাইবার জন্য ন্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, “ঝড় বৃষ্টি এসে পড়লে মাকে বড় ছুটোছুটি করতে হবে, আমি আসি ভাই আজ।”

হৈমন্তীর স্বাস্থ্যহীনতায় ব্যথিত ও তাহার মনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া সুখা যখন বাড়ী ফিরিল তখন বাড়ী নীচব। চন্দ্রকান্ত নূতন একজন জার্মান চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, যদি তাঁহাকে দেখাইলে মহামায়ার কিছু উপকার হয়। শিবু মাঠে মোহনবাগানের খেলা দেখার পর তাহার টিউটরের বাড়ীতে পড়িতে গিয়াছে। বাড়ীতে খোকন ছাড়া মহামায়ার আর কোনও অভিভাবক নাই বলিয়া বামুনদি বাসায় ঘাইতে পার না। সুখার পায়ের গন্ধ পাইয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, “আমি ঘাই ভাল মানুষের মেয়ে, তাই আমারই অদেটে বত দুর্ভোগ। নন্দীর মা দু-ঘটি জল তুলে আর ঘরে দু-খা ঝাঁটা পিটিয়ে কে-মর ছলিয়ে চলে গেল, আর আমি ছিটির রান্না সে-রেও এই গুমোট ঘরে বসে আছি। কি করি বল, মা’কে ত আর একলা কেঁলে যেতে পারি না।”

সুখা যেন লজ্জিত হইয়া তাহাকেও কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, “আজ হ’ল ব’লে কি রোজই তোমার দেবী হবে? আজ আমি বড় আটকা পড়ে গিয়াছিলাম কিনা। অল্পক্ষণ আর একটুও দেবী হবে না। তুমি এখন যাও।”

বামুনদির কণ্ঠস্বরের শুনিয়া মহামায়া সুখা আসিয়াছে বুঝিয়া সিঁড়ির মুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া উপর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, “ও সুখা, উপরে এসে দেখে যা, তোর পিসি তোর জন্তে কি শাড়ী পাঠিয়েছে। তুই বড় বেয়ে, সংসারের গিহ্ম, মা তোর খোঁড়া, তোর জন্তে কিছু করতে পারে না, উল্টে তোরই সেবা নেয়। কিন্তু পিসি সেই পাড়াগাঁ থেকেও ঠিক বছর বছর কাপড় পাঠায়, তার কখনও ভুল হয় না।”

মহামায়া তাহার সেই ছোট ঘরের তক্তাভেই আবার

দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া গিয়া বসিলেন। তক্তার উপর হিসাবের খেরো-মোড়া খাতা, ছোট একটা পানের ডিবা, ও সংসার-ধরনের ক্যাস বাস। সুখা উপরে আসিয়া দেখিল, মা’র কোলের উপর গোলাপী রঙের একখানা জরির পাড়ের শাড়ী। পিসিমা পাড়াগাঁয়ে বসিয়াও ত স্নন্দর জিনিষ সংগ্রহ করিয়াছেন।

মহামায়া বলিলেন, “কাল রথযাত্রার মেলাতে ঠাকুরবি যুগাঙ্কে শহরে পাঠিয়েছিলেন নিশ্চয়। ব্যাপারীরা এই সময় কাপড়চোপড় বাসন কিছু কিছু আনে। ঠাকুরবি আর কিছু না কিনে টাকা ক’টা তোর জন্তেই খরচ করে ব’সে আছেন। কাপড়খানা পরে একবার আসিস এ-ঘরে।”

সুখা কাপড়খানা হাতে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। সামান্য পাঁচ-ছ’ টাকার কাপড়, কিন্তু সুখার কাছে তাহাই অমূল্য। চিরকালই সে সাদাসিধা কাপড় পরে, জরির পাড়ের শাড়ী তাহার বয়সে এই সে প্রথম পাইল। কাপড়-খানা সঘনাই খুলিয়া সন্তর্পণে পরিয়া কি মনে করিয়া কপালে একটি সিন্দূরটিপ পরিবার জন্ত সে আয়নার কাছে গেল। টিপটা পরিয়া ইচ্ছা করিল আয়নার ভিতর নিজের মুখের ছায়াটা একটু ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে। ছায়ার দিকে তাকাইয়া সে নিজেই ভাবিয়া বিস্মিত হইল যে ইতিপূর্বে এরূপ ইচ্ছা তাহার বিশেষ কখনও হয় নাই কেন। তাহার বয়সে মেয়েরা, এমন কি ছেলেরাও নিজেদের অঙ্গবস্তুর বা সৌন্দর্যের পুঞ্জি আছে, তাহা বোল আনা হিসাব করিয়া রাখে। কিন্তু সে কেন এমন অচেতন উদাসীন? হয়ত বিধাতা তাহাকে শৈশব হইতেই এখানে বন্ধিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুকথা সে বেশী ভাবে নাই। হৈমন্তী তাহাকে হঠাৎ সজাগ করিয়া দিয়াছে।

তখন রাত্রি হইয়াছে। এক পশলা বৃষ্টির পর জলভার-মুক্ত মেঘগুলি যেন ক্লাস্ত হইয়া দিগন্তের কোলে চলিয়া পড়িয়াছে। জলকণাধোত সপ্তমীর চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সুখার গোলাপী-শাড়ী জড়ানো স্ত্যাম দেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহার নিটোল স্বাস্থ্যপূর্ণ দীর্ঘ দেহবষ্টির উপরের স্তন্যমার মুখখানির ছায়া তাহার নিজের চোখেই অকস্মাৎ ভারি স্নন্দর লাগিল। বাড়ীতে ছেলেবেলা হইতে প্রায় সকলের কাছেই সে- নাম পাইয়াছে কালো মেয়ে।

কিন্তু এমন সর্বদ্বানিমুক্ত রক্তাভ শ্রামহন্দর মুখলী সে কখনও দেখিযাছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। বিধাতা তাহাকে অটুট স্বাস্থ্য দিয়াছিলেন, তাহারই দীপ্তি যেন তাহার সমগ্র মুখমণ্ডলে হাঙ্কা মেঘের আড়ালের অষ্টমীর জ্যেষ্ঠজ্ঞার মত জলিতেছে। পীতাম্ব রঙীন কাগজের ফাল্গুনের ভিতর মোমবাতির মুহূ আলো জালিয়া দিলে তাহা যেমন জল্ জল্ করে, তাহার রেখালেশহীন উজ্জল ভরণ মুখও যেন তখনই দীপ্যমান। স্বধার বিশ্বাস হইতেছিল না যে এই দর্পণের হৃদয় ছায়াটি তাহারই আজন্ম-পরিচিত স্বধার ছায়া। সে ত এমন ছিল না; একখানা শাড়ীর রঙে কুৎসিত মানুষ কি হঠাৎ এতটা হৃদয় হইয়া উঠিতে পারে? অথবা হয়ত সে হৃদয় ছিল, কিন্তু হৈমন্তীর আবিষ্কারের পূর্বে সে তাহা জ্ঞানিতে পারে নাই। মনটা তাহার অকারণ খুঁজিতে ভরিয়া উঠিল। কোন এক অদৃষ্ট শিল্পী যে তাহার বয়সসঙ্কালে নূতন তুলিকাপাতে তাহাকে সাজাইয়া তুলিতেছে তাহা স্বধা হৃদিতে পারে নাই।

স্বধার মনে পড়িল, কলিকাতায় আসিবার বছরখানিক আগে পিসিমা একদিন যাকে বলিতেছিলেন, “কেমন বউ, আমার কথা ঠিক হবে না বলেছিলে, এখন দেখত ত? স্বধা নাকি তোমার কালো কুচ্ছ হবে? আর ছুঁতী বছর যাক, তখন দেখে নিও জাতসাপের বাচ্ছা জাতসাপ হয় কিনা।”

মা নিশ্চয়ই পিসিমার চেয়ে স্বধাকে কম ভালবাসেন না, কিন্তু পিসিমার কথাতে মা নিজের জেদ ছাড়িলেন না। তিনি মুহূ একটু হাসিয়া বলিলেন, “আমি কি আর বলেছি যে ঐ সাঁওতাল হবে? ভদ্র বাড়ালীর মেয়ে ঘসামাত্রা হবে বই কি! তবে শিবুতে ওতে চিরকালই তফাৎ থাকবে এ আমি নিশ্চয় বলছি।”

হৈমবতী রাগ করিয়া বলিলেন, “মুখে তুমি হান না, কিন্তু বউ, তোমার রঙের জাঁক আছে। তোমার চেয়ে একটু নীরেস ব’লে ওকে তুমি উচু নজরে কোনদিন দেখলেই না।”

হৈমবতী ও মহামায়ার এই সব কথা লইয়া স্বধা কোন দিন মাথা ঘামায় নাই। মনে মনে সে মহামায়ার কথাই সত্য বলিয়া জানিত। পিসিমার পক্ষপাতে মনটা অহা হার যে

মোটাই খুশী হইত না তাহা নয়, কিন্তু সেটা যে নিতান্তই পিসিমার পক্ষপাত এ ধারণাটাও অহা হার পাকা ছিল।

আজ স্বধার ধারণা বদলাইয়া গেল। পিসিমা সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, না হইলে হৈমন্তীই বা তাহাকে আকাশের মত হৃদয় বলিবে কেন, সে নিজেই বা কেন দর্পণে নিজমুখ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইবে? মার উপর একটুখানি অভিমান হইল, মা নিজে অপূর্ণ হৃদয়, তাই শিবুর গৌরবর্ণের উপর তাহার নজর বেশী, স্বধার কিছু হৃদয় তিনি খুঁজিয়া পান না। অবশ্য, মার উপর বেশী অভিমান স্বধা করিতে পারিত না, তাহা হইলে আবার নিজেকেই মত্ত অপরাধী মনে হয়। মানুষ কি দর্পণ, যে বাহাই বলুক না কেন, এ-কথা স্বধা ভোলে নাই যে তাহার মায়ের সৌন্দর্যের সহিত তাহার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। তাহার রূপ-বিচারের মাপকাঠি ত বড় হইবেই। কিন্তু তবু আজ বাহা সে আবিষ্কার করিয়াছে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নয়, আজিকার মত তাহার চোখে তাহাও অপূর্ণই!

১৬

শীতের হাওয়া দিয়াছে। স্বধা ও শিবু পূজার ছুটিতে যুগাক-দাদাব সঙ্গে হৈমবতীর নিকট গিয়াছিল, বিশ-বাইশদিন থাকিয়া ছুটি শেষ হইবার আগেই কিরিয়া আসিয়াছে। নয়ানজোড়ের ধানের ক্ষেত সোনার সোনা হইয়া উঠিয়াছে। স্বধাদের ভিতর-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান গোবর দিয়া নিকাইয়া করণা বি সেখানে ধান মাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গরু ও মহিষের গাড়ীতে বোঝাই রাশি রাশি ধান আনিয়া লখা মাঝি ও দুমকা সাঁওতাল উঠানে চালিতেছে। হৈমবতী ভয়ানক ব্যস্ত। কুলি-কামিনদের ধান দিয়া পয়সা দিয়া যে যেমন চাহে ধানকাটার বেতন শোধ করিতে হইতেছে, আবার তাহার হিসাবও রাখিতে হইবে। স্বধা সাহায্য করিতে গেলে তিনি যেন আজকাল কেমন সঙ্কট হইয়া উঠেন। “না বাছা, তোমরা লেখাপড়া ফেঁলে এর ভিতর কেন? এ সব গোঁয়া চাষা-ভূষার কাজ কি তোমাদের সাজে?” তিনি বছর আগে যে-সব সাঁওতাল মেয়েবুা ঘরের লোকের মত স্বধার সঙ্গে গল্পগুজব করিত তাহারাও এখন একটু দূর হইতে তাকায়।

স্বধা ক্ষুণ্ণ হইত বটে, কিন্তু বিস্মিত হইয়া দেখিত, তাহা-ও মন আজ আর নয়ানজোড়ের ধানের ক্ষেতের ভিতর না-ই। কলিকাতার বাঁধানো রাজপথের ধারে হৈমন্তীদের বারান্নায় হৈমন্তীকে ঘিরিয়াই তাহার মনটি ঘুরিয়া বেড়াইত। শীতের সন্ধ্যা সকাল সকাল কালো হইয়া নামিলে পিসিমা ঘন পশ্চিমদিকের দরজা-জানালাগুলো ভেজাইয়া একলা-ঘরের বহুদিন-সঞ্চিত দুঃখের কথা বলিতে বসিতেন এবং নিজের বুড়ো হাড় ক'খানার জন্ত একটুখানি বিশ্রাম ভিক্ষা করিতেন, শুধু তখনই স্বধার মনে হইত, এমন করিয়া পিসিমা-ক একলা ফেলিয়া সকলে চলিয়া না গেলেই ভাল হইত। যুগাঙ্ক-দাদা বাহিরে বাহিরে ধান চাল আর খাজানা আদায় করিয়া বেড়ায়, পিসিমা তাহাই মাপেন আর মরাইয়ে তোলেন। যদি স্বধা এখানে থাকিত তাহা হইলে পিসিমার জীবন-যাত্রার ধারায় আর-একটুখানি সরসতা ও আর-একটুখানি বৈচিত্র্য হয়ত দেখা যাইত। কিন্তু হায়, তাহাদের অঙ্গ সকলেরই জীবনের মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর পূর্বস্থানে ফিরাইয়া আনা যাইবে না। একলা ধান চল মাপিয়াই পিসিমার শেষ কয়টা দিন কাটানো ছাড়া গতি নাই।

কতকটা যেন মায়া বাড়াইবার ভয়েই স্বধা এবার ছুট শেষ হইবার আগেই কলিকাতায় পলাইয়া আসিয়াছে। নহিলে কোথা হইতে একটা টাটু বোড়া জুটাইয়া শিংকে বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইবার খেলায় যুগাঙ্ক-দাদা বেশ মাতাইরা তুলিয়াছিল।

বহুকাল পরে স্বরধুনী রুগ্ন বোন মহামায়াকে দেখিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভরসাতেই থোকাকে কলিকাতায় রাখিয়া স্বধা পিসিমার কাছে যাইতে পারি-ছিল। না হইলে মা ও থোকাকে ফেলিয়া একদিনের জন্তও তাহার কোথাও যাইবার উপায় নাই। এই একটি চি-রুগ্না মা ও একটি শিশু ভাই যেন তাহার দুই পাখের বেড়ি। তাহারই উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই তাঁহাদের জন্ত তাহার এই বন্দীদশায় ছিল স্বধার আনন্দ ও গৌবব।

স্বরধুনীকে স্বধা খুবই ভালবাসিত, কিন্তু তাঁহার কাছে মামার বাড়ী-ব গল্প শুনিবার আশায় বাঁধা পড়িলে আর পিসিমার কাছে যাওয়া হয় না। স্বতরাং এই বিচ্ছেদে

ভাগটুক তাহাকে স্বীকার করিতেই হইয়াছিল। ফিরিয়া যখন আসিল তাব পরদিনই স্ববধুনীও দেশে ফিরিয়া গেলেন। একটা মাত্র দিনের দেখান্তনা তাহাতেও স্বরধুনী স্বধার সঙ্গে বেশী ছেলেমানুষী গল্প করিলেন না। হাসিয়া দুই-তিন বার বলিলেন, “ষেটের কোলে স্বধা এবার ডাগরটি হয়েছে, মায়া এবার চন্দরকে সজাগ ক'রে দিস, নইলে পণ্ডিতমাহুষের কি আর হুঁস হবে?”

মহামায়া বলিলেন, “উনি বলেন পড়াশুনো সাজ না হ'লে বিয়ে দেবেন না।”

স্বরধুনী বলিলেন, “স্বামীই মেয়েমাহুষের জপতপ ধ্যান ধারণা, এই পড়াশুনোতেই যদি ভালছেলে গছন্দ করে, তবে আর কার জন্তে বেশী পড়াশুনো করবে? ও কি আর আপিস আদালত করতে যাবে?” হৈমবতীও আসিবার সময় স্বধাকে বলিয়াছিলেন বটে, “লেখাপড়া ত খুব করাচ্ছে তোমার বাপ, কিন্তু যেমন এদিকে করাবে, ওদিকেও সেই মত হিসেব ক'রে না আনতে পারলে যে মান থাকবে না, সে সব কি হুঁস আছে? আর ত কচিটি নেই, এবার এসব কথাও ত ভাবতে হবে?”

স্বধা যে বড় হইয়াছে, মাসি পিসি সকলের মুখেই এখন সেই কথা। পিসিমা হুঁসিয়ার মাহুষ, তিনি আবার স্বধাকে কৃত বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। “তোমার মা রোগা মাহুষ, ঘর থেকে ত বেরোয় না, বাইরে যেতে আসতে আর যার তার সঙ্গে হট্ হট্ ক'রে বেড়াবি না। বাপের সঙ্গে যাবি, শিবুকেও সঙ্গে নিস। পুরুষ ছেলের সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করিস না, তাদের সঙ্গে এক আসনেও ক'খনো বসবি না।”

স্বধার ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিশেষ নাই। তাহাদের পবিবারের সকলের বন্ধু স্বধীজ্ঞ-বাবুই এক এ-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেন, তাঁহার সঙ্গে তাহাদের সকলেরই বেশ ভাব। অন্ত কেহ সমবয়স্ক বন্ধু তাহার থাকিলে আপত্তি ছিল না, কারণ স্ত্রীসমাজে পুরুষেরা যে এমন অপাজ্জেন্স স্বধার তাহা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। পিসিমার কাছে এবার সে শিখিয়াছে যে বড় হইলে পুরুষজাতিকে সর্বদা সাত হাত তফাতে রাখিয়া চলিতে হয়। এমন কি সর্বক্ষেত্রে সর্বঘণ্টে সকলকে মুখ দেখিতেও দেওয়া উচিত নয়। কয়েকটা মাত্র

বৎসরের ব্যবধান ঘটিল। তাহার জীবনে এমন সকল পরিবর্তন কেন আসিবে তাহা সে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে না। কেনই বা পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ হইতে তাহাকে দূবে দূরে থাকিতে হইবে এবং কেনই বা বিশেষ একটি মানুষের জন্তই তাহার বিজ্ঞাবুদ্ধি যোগ্যতা সব মাপিষা রাখিতে হইবে তাহাও বুঝা শক্ত। সে এককাল পিতামাতার কাছে ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে শিখিয়াছে, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষা তাহার নিজের এবং দশ জনের আনন্দ ও উন্নতির জন্ত, তবে আজ তাহার বেলা মাসিমা পিসিমারা সব নতুন নিয়ম প্রচার করিতেছেন কেন? জীলোকেরা কি ঠিক মনুষ্যজাতির মধ্যে গণ্য নয়? একটুখানি নীচে বোধ হয় তাহাদের আসন! কিন্তু কেন?

সাইবার সময় সূখা সুরধুনীকে বলিল, “মাসিমা, আবার তুমি কবে আসবে?”

মাসিমা বলিলেন, “তোমার বর দেখতে আসতেই ত হবে যা। সে আমাদের কত আদরের জিনিষ!”

আবার সেই সব কথা! সূখার জন্ত আর মাসিমা আসিবেন না। সূখা এখন আর সে সূখা নাই।

ছুটি প্রায় কাটিয়া আসিতেছে। কিন্তু নতুনজোড়ে চলিয়া যাওয়ার জন্ত বাড়ীর কাজকর্ম অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে। পিসিমা-মাসিমাদেব নতুন প্রসঙ্গের কথা ভুলিয়া এইবার সূখাকে সেই-সব দিকে মন দিতে হইবে। তাহার উপর হৈমন্তীর ডাকও আছে। প্রায় মাস-খানিক দেখা-শুনা নাই, হৈমন্তী অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ছুটি থাকিতে থাকিতেই বড় রকম একটা উৎসব কি চতুর্থাভ্যন্তের আয়োজন করিয়া সে এতদিনের অদর্শনের জুখটা একটু ভুলিতে চায়। সূখার ত এত আয়োজন করিবার ক্ষমতা নাই, সে আর কি করিবে? হৈমন্তীকে ডাকিয়া এক দিন নিজের হাতে মাছের বোল ভাত রাখিয়া খাওয়াইবে। হৈমন্তী নতুন গুড়ের পায়স খাইতে ভালবাসে। সূখা নয়ানজোড় হইতে পিসিমার কাছে চাহিয়া নতুন গুড়ের ‘নবাত’ আনিয়াছে, তাই দিয়া পায়স রাখিবে। আর একটা বিদ্যাও সে পিসিমার কাছে শিখিয়া আসিয়াছে—বিবিশোপা বাঁধা। হৈমন্তীর ঐ রেশমের মত নরম কৃষ্ণিত কাল চুলগুলি দিয়া কেমন খোঁপা হয় সূখা দেখিবে।

হৈমন্তীও ত বড় হইয়াছে, এখন ফ্লোড়া ফাঁস দেওয়া বিহীন না হুলাইয়া তাহার মৃণালের মত গ্রীবাটি বাহিব করিয়া খোঁপা বাঁধিলে গ্রীক দেবীমূর্তির মত স্নন্দর দেখাইবে।

সুরধুনী চলিয়া যাইবার পর নসারের তোলা বিছানা-কাপড় রোদে দিতে দিতে সূখা এই-সব সাত-পাঁচ ভাবিতেছিল। অষ্টান্ত বছর ভাত্র মাসেই সমস্ত কাপড়-চোপড় বোদে দিয়া ছ’মাসের মত ঝাড়িয়া তোলা হয়, এবার আর তাহা হইয়া উঠে নাই। বিধাতাপুরুষ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে পাকিতে ভাত্র আশ্বিন বলিয়া দুইটা মাস আছে। সেই যে জ্যৈষ্ঠ নাসেব শেষ হইতে বৃষ্টি নামিয়াছিল, একেবারে শেষ হইল কার্তিকের গোড়ায় আসিয়া। অবিশ্রাম জলে শাবা ভারতবর্ষটাই যেন তলাইয়া যাইবার যোগাড়। কলিকাতার লোকে সূচ্ছ দু-বেলা ভাবিতেছে, এই বৃষ্টি গঙ্গার জলে ষাঁড়ারিাড়িব বান ডাকিয়া শহর ডুবিয়া যাক। ইহার ভিতর ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে ঘরের ভিতরকর বিছানা-কাপড়ই শুষ্ক রাখা দায় ত বাহিরে দিবে কি? সূর্যদেব ত মেঘেব ঘেরা-টোপ ভুলিয়া পৃথিবীর মুখ দেখিতেই পান না।

দক্ষিণের বারাক্ষর দবজার কাছে তক্তাপোষটা টানিয়া মহামায়া বলিয়াছেন একটু হাওয়া শাইবার আশাতে। সূখা ছোট ছাদে হুলানো লোহার তারে গরম ও রেশমের কাপড়গুলি শুকাইতে দিতেছিল। লেপঙলাও আলিসার উপর মেলিয়া দিয়াছে। মহামায়া বলিলেন, “শিবুর হাতে কাপড় পড়লে ভালমন্দ ত কিছু ফিচার করে না, তার কাছে চটও যা আর কিংবাবও তা। তাপড়গুলোকে একটু দুঠাই করে রাখিস বাছ। তসরের পাঁজাবী, সিন্ধের শার্ট সব বেঁটে গোবর করে রেখেছে, সৈগুলো শুধু রোদে দিলে ত হবে না, শালকরকে ডাকিয়ে একবার কাচিয়ে নিতে হবে। শাবা শীত ওসব গায়ে উঠবে না, অঁকাত তুলে রাখলে যে-কাপড়ের সঙ্গে তুলবে তাও পোকায় কেটে গুঁড়ো গুঁড়ো করে রেখে দেবে।”

সূখা বলিল, “আচ্ছা, আত্মাদের তিনজনের কাপড় রোদে দিয়ে বেড়ে ঝুড়ে রাখি। ওই দুই মূর্তিমানের জিনিষ না-হয় কেচে তোলা যাবে। বাবার ত দুখানা এগুি আর গরদের চাদর, ও ত রোদেও না দিলে চলে। সারা

বহুর গায়ে দিলেও ময়লা হ'ত না বোধ হয়। শালখানা শীতের শেষে কাচিয়ে রাখতে হয়, তাই গত বছর কাচিয়ে ছিলাম। না কাচালেও কেউ বিশ্বাস করত না যে সারা শীতের ব্যবহার। কি ক'রে যে বাবা পারেন ?”

মহামায়া স্থখার সিঙ্কের ব্লাউসে হুক টাঁকিতে টাঁকিতে বলিলেন, “যার ভাল হয় তার সবই ভাল। আমি ত বাপু দিবারাত্রি রাজসিঁহাসনে ব'সে আছি, তবু অমন ক'রে জিনিষ রাখতে পারি কই ? গায়ের থেকে জামা কাপড় নামিয়ে পাট না ক'রে উনি কখনও আলনায় পর্যন্ত রাখেন না।”

পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী তালপাতায় বোনা ব্যাগে করিয়া উলকাটা লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, দুপুরবেলা পাড়াপড়শীর বাড়ী একবার তাঁহার যাওয়া চাই। প্রথম প্রথম মহামায়ার কাছে পাড়ার গিন্নিরা বড় আসিতেন না, কিন্তু হঠাৎ যখন মণ্ডলগৃহিণী একবার আবিষ্কার করিয়া বলিলেন যে মহামায়া মাল্লবটা বেশ গঙ্গে, তখন প্রত্যহ তাঁহার কাছে একবার করিয়া হাজিরা দেওয়া মণ্ডলগৃহিণীর বাঁধা নিয়ম হইয়া উঠিল। কারণ এই মাল্লবটিকে বাড়ীতে আসিয়া অল্পস্থিত কখনও দেখা যাইবে না তাহা সকলেই জানিতেন।

স্থখা তালপাতার ব্যাগের দিকে তাকাইয়াই ভীত স্বরে বলিল, “ও মাসিমা, আপনার ছেলেরা যে সব কলেজে পড়া শুরু ক'রে দিল, আপনি আবার উল বুনছেন কার জন্তে ?”

মণ্ডলগৃহিণী বলিলেন, “ওর কি আর জন্তে টক্সে আছে মা ? হাতটা নাড়লে মনে সাঁঝনা হয় যে একটা কাজ করছি ; তার পর জমা ক'রে রাখলে একে তাকে দিতে কত কাজে লেগে যায়। লোকলোকান্তরে ত আছে। এ দেখ না, তোমার মাও ত টুকটাক ক'রে হাত চালাচ্ছেন।”

হাসিয়া মহামায়া বলিলেন, “টুকটাক নয় ভাই, চট্‌পট্‌ মেয়ের ব্লাউস তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবে, ছুটোছুটির কাজগুলো আমার ও সেরে ফেলছে, আমি ওর হাফা কাজগুলো ক'রে দি।”

• নতুন একটা গল্পের গন্ধ পাইয়া মণ্ডলগৃহিণী ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া বলিলেন, “ভাই নাকি ? কার সঙ্গে যাচ্ছে গো ?”

মহামায়া বলিলেন, “ওই ওর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই যাবে। আমাদের স্থখীন-বাবু আছেন, ছোটর সঙ্গে ছোট আবার বড়র সঙ্গে বড়। তিনিই নিয়ে যাবেন, তবে যোগাড় যাগাড় করছে রপেন পালিতের মেয়ে হৈমন্তী। স্থখাকে যে ভয়ানক ভালবাসে। ওকে ছাড়া এক পা কোথাও যেতে চায় না।”

মণ্ডলগৃহিণী বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিলেন, “ভালবাসে ভালই, তবে মেয়ে না ভালবাসে ছেলে ভালবাসলেই বেশী কাজ হত। বড়মাল্লবের প্রথম ছেলে! আমাদের ক্রীষ্টান ঘর হ'লে লুফে নিত, তোমাদের আবার বামুনের জাত এই যা।”

মহামায়া ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ছেলেমাল্লবের সামনে কি যে ছাইভস্ম বকছ ভাই, তার ঠিক নেই। মা-মাসির সম্পর্কও কি ভুলে গেলে ?”

মণ্ডলগৃহিণী সে কথাই জবাব না দিয়া বলিলেন, “স্থখা বড় হয়েছে, এখন আর ঘরে-তৈরি জামা কাপড় পারিয়ে বাইরে পাঠিও না, ভাই। দরজি ডাকিয়ে মাপসই সব কাপড়চোপড় করাবে। যেখানে বাইরের পাঁচটা লোক আসে সেখানে দশ জনে দেখে ভাল বলে এমন ক'রে ত মেয়েকে পাঠানো উচিত ? মেয়েছেলেকে শুধু লেখাপড়া শেখালেই মাল্লব হয় না, আরও অনেক জিনিষ শেখানো চাই।” এই বলিয়া তিনি মহামায়ার দিকে চোখ টিপিয়া একটা ইসারা করিলেন—অর্থাৎ কাহার কখন স্বনজরে এ-বয়সের মেয়েরা লাগিয়া যায় তাহার ত ঠিক নাই, মনোহরণ-বিদ্যার প্রথম ধাপ যে প্রসাধন, সে কথা এখন আর ভুলিয়া থাকা চলে না।

মহামায়া ইসারা বুঝিয়াও গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে গেলে গায়ে গরীবের মার্কী অত স্পষ্ট ক'রে না মেয়ে যাওয়াই ভাল। সমানে সমানে মিশতে পারলেই মাল্লবের মান থাকে। তবে আমি ত জেলখানার কয়েদী, ঘরের বাইরের পৃথিবীটা কতদিন চোখে দেখি নি, কাজেই কোন্‌খানে যে কি বেমানান হচ্ছে সব সময় বুঝতে পারি নে। মেয়েটাও বেশী সৌখীন নজর নিয়ে জন্মায় নি, ওই বজলন্দী মিলের কাপড় প'রেই ত ক'বছর এখানে কাটিয়ে দিল। একটা হাবড়া হাটের কাপড় তাও ওকে সেধে পরাতে হয়। শুনহিস ত স্থখা, পিসি ত পূজোতেও

তোকে নৃতন জরি পেড়ে নীলাশ্বরী দিয়েছেন, ঐখানাই প'রে যাস। জামাটা ঘরে তৈরি হলেও সিন্ধের ত বটে, ওই পরলেই বেশ চলবে।"

উঠিতে বসিতে বড় হইয়াছে শুনিতে আর সুধাব ভাল লাগে না। মাঝবের শৈশব কি এতই ক্ষণস্থায়ী? আর বড়-হওয়া কি মাঝবের একটা অপরাধ? বড় হইলে সকল বিষয়ে এত ভয়ে ভয়ে আটঘাট বাঁধিয়া চলিতে হইবে কেন? আরও আশ্চর্য যে মুগাঙ্ক-দাধা যে সুধাব চেয়ে আট বছরের বড় তাহাকে কেহ কোনদিন বড় হওয়ার জন্য পঁচিশ রকম নিয়ম পালন কবিতো বলে না। মণ্ডগগিমির ছেলেরা কলেজে পড়ে, তাহারাও বড় হওয়ার কোন দাবিষ বহন করে এমন ত তাহাদের মায়েব কথায় মনে হয় না। তবে সুধা অকস্মাৎ দুই-তিন বছবে সকলকে ভিঙাইয়া এত বড় কি করিয়া হইয়া গেল?

শৈশবেব অঙ্কহস্তি হইতে জীবনে একটা নৃতন জাগরণের মধ্যে যে সে বাড়িয়া উঠিতেছে ইহা সুধা নিজে একেবারেই অহুভব কবে নাই, এমন নহে। উষার উন্মেষ যেমন অন্ধকাবের বৃকের ভিতর হইতেই কোনও আকস্মিক চাকল্যের সৃষ্টি না করিয়া এক এক পরদা করিয়া দেখা দিতে থাকে, তাহার দেহমনও তেমনই পাপড়ির পর পাপড়ি বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। সে বিকাশ ভয়ের নহ, আনন্দের। সেখানে সতর্ক প্রহরীর মত কেহ-চীৎকার কবিয়া বলে নাই, 'সাবধান বড় হইয়াছ।' সেখানে কে যেন শেষ রাত্রেব মধুর স্বপ্নের ভিতর গান গাহিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইতেছে, "দেখ, এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ, কাল যার কোলে অকস্মাৎ এসে পড়েছ মনে হয়েছিল, আজ অহুভব করছ না কি তোমার দেহমনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তুমি তার সঙ্গে জন্ম জন্ম বাঁধা?" কার এ বাণী সুধা বুরিত না, কিন্তু আনন্দ-শিহরণের সহিত সে অহুভব করিত সৃষ্টির সহিত জন্মজন্মান্তরের তাহার অচ্ছেদ্য বন্ধন। সবটা এখনও তাহার চোখেব উপব ভাসিয়া উঠে নাই, কিন্তু প্রতি দিনই যেন ধরিত্রীমাতা একটু একটু করিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া রহস্যমধুর কণ্ঠে কানে কানে বলিয়া দিতেন, "আমার বিশ্ব-সৃষ্টির শতদলে তুমি একটি পাপড়ি, তোমাকে বাদ দিলে তা অসম্পূর্ণ হবে। এ সৃষ্টি-লীলায় তোমার পালা এল বলে, তার জন্য প্রস্তুত হও।"

সুধা বুরিত না, জানিত না, কিন্তু আপনা হইতেই তাহার মনে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল, লগতে একটা কিছু মহৎ উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছে। তাহাকে তাহার জন্ম পূজারিণীর মত নিষ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে হইবে। হয়ত লোকের চক্ষে সৃষ্টিতে তাহার পালা অতি সামান্যই মনে হইবে, কিন্তু তবু নিজের কাছে তাহাকে সেইটুকু নিখুঁত করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জীবনে যে-সকল দুঃখ-বেদনা সে পায় নাই, যে আনন্দও সে জানে নাই, গানের সুরে কস্তিতার ছন্দে তাহা যখন কানেব কাছে বাজিয়া উঠিত, আনন্দ ও বেদনার গভীর অল্পভূতিতে বৃকের তারগুলো কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত, "এ বেদনাব তীব্র আঘাত, এ সুখের নিকট স্পর্শ আমার যে বহু পরিচিত। কবে মনে নাই, কিন্তু ইহাকে আমি একদিন বৃকের ভিতর করিয়া বহন করিয়াছি।" সুধা পৃথিবীর রূপ-বসগন্ধকে যেন দুই হাতে আপনার বলিয়া কাছে টানিয়া লইতে লাগিল। ইহাকে সে দিন দিন যত চিনিতেছে ততই আবও চিনিতে চায়। মনে হয়, বহু-পুরাতন পরিচয়ের উপব শৈশবেব স্মৃষ্টি একটা আবরণ টানিচ দিয়াছিল, আজ তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে।

নিজের সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য তাহা ছিল তাহা যেন ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে। নিজেকেও সে আগের চেয়ে বেশী ভালবাসিতে শিখিয়াছে। তাই প্রাধান্যেও তাহার নজর এখন আগের চেয়ে একটুখানি বেশী হইয়াছে। সখ নামক অজানা জিনিষটা তাহার মনের ভিতর ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র যে রূপের সৌন্দর্যের সুষমা, তাহার মাঝখানে সে একটা শ্রীহীন আবর্জনার মত মাঝবের চক্ষুপীড়া ঘটাইতে চাহে না। তাহার জন্ম সৌন্দর্যের রাগিণীতে যেন হঠাৎ বেহুঁব না বাজিয়া উঠে।

অবশ্য, হৈমন্তীর সমান পর্যায়ে সে উঠিতে রাজি নয়। ময়ূরের পেখমে যে বর্ণচ্ছটা মানায়, বুধ পাখীর স্বর্ণ পালকে কি তাহা খোলে? হৈমন্তীর মত নির্দোষ নিখুঁত উজ্জল নাক্সসজ্জা তাহার অঙ্গে বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইবে। ততটুকু সাজপোষাকই তাহার পক্ষে ভাল যাহাতে লোকে তাহাকে অদ্ভুত কিছু একটা না মনে করে। কিন্তু লোকে আসিয়া তাহার সাজপোষাক তারিফ করিবে।

ভাবিতেও স্থখাব ভয় হয়। হৃশোভন কি অশোভন কোনও ভাবেই মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা বিষয়ে তাহার একটা সংকোচ ছিল।

মণ্ডলগৃহিণীর কৌতূহল তখনও মিটে নাই, সুপদেশ দিবার ইচ্ছাও তেমনই ছিল। তিনি বলিলেন, “গিন্নিবাগ্নি ত সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না দেখছি, শুধু একপাল মেয়ে নিয়েই স্বধীন-বাবু যাবেন, না ছেলেছোকরাও থাকবে?”

মহামায়া বলিলেন, “ছেলেরাও কেউ কেউ আছে শুনিছি। তবে সবই গুদেব চিরকালের চেনাশুনো। আমরা এখানে বেশী দিনের ত মানুষ নয়, আমাদের কাছে একটু নতুন বটে।”

মণ্ডলগৃহিণী কি একটু ভাবিয়া বলিলেন, “আমাব ছেলেরও ও সব বালাই নেই। তারা ক্রিকেট, ফুটবল আর হকি নিয়েই মেতে আছে। মা ছাড়া কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম না আজ পর্যন্ত। বডটা উনিশ বছর হ’ল, এখনও মা না হ’লে থাকে না ঘুমোবে না, যতক্ষণ বাড়ী থাকে আমারই পিছন পিছন বোরে। মেয়ে তোমাব সব লোক-লোকের ত? একলা ত দিবি ছেড়ে দিচ্ছ?”

মহামায়া বলিলেন, “তোমাব এক কথা ভাই! এত জানবাব বোঝাবাব কি আছে? দল বেঁধে পাঁচজনের সঙ্গে

বেড়াতে যাচ্ছে, তারা ত কেউ বাঘ ভালুক নয় যে গুকে খেয়ে ফেলবে!”

মণ্ডলগৃহিণী বলিলেন, “থাক, আমার অত কথায় কাজ কি? তোমার ছাগল তুমি যেদিক দিয়ে খুশী কাট!”

মণ্ডলগৃহিণী ব্যাগ গুছাইয়া বাড়ী চলিয়া গেলে স্বধা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে ভাবিতেছিল, পৃথিবীটা স্বন্দর, কিন্তু তাহার তলায় তলায় কি যেন কি একটা রহস্তের ধারা বহিয়া যাইতেছে। কেউ ইঙ্গিত করে কালো কুৎসিত ভয়ঙ্কর কি একটা রহস্ত পৃথিবীর স্বন্দর মুখোসের আড়াল হইতে উকি মারিতেছে, কখন না জানি উপরের সমস্ত সৌন্দর্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কেউ বা গানের স্বরের ভিতর দিয়া বলে, এই সৌন্দর্যের অন্তরালে আরও কত অনন্ত সৌন্দর্যের খনি রহস্তগভীর গোপন অন্ধকারের তলায় রহিয়াছে, মাঝে মাঝে শুধু নিমেষের মত তাহা দেখা যায়।

স্বধার মনটাও বলে, পৃথিবী রহস্তময়ী। একবার তার অন্তরালের অন্ধকার তমিস্রার শ্রোত বৃকে ভয়েব কাঁপন আনিয়া দেয়, আবার তার চকিতের দেখা সোনালী আলোর শ্রোত বলে, মিথ্যা ও অন্ধকার, মিথ্যা ভয় ভাবনা। তখন ইচ্ছা করে, চোখ বুজিয়া ছুটিয়া চলিতে ঐ না-দেখা রহস্তপুর্বীক আনন্দের সন্ধানে।

ক্রমশঃ

তুমি ভালবাসো নীল

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

তুমি ভালবাসো নীল, ভালবাসো প্রিয়র মতন;
গোলাপী-কোমল তবু যেহি তুমি পর নীল শাড়ী,
অপরাজিতার মত স্বমহৎ স্ব-নীলিমা তারি,—
সে নীলেব স্নিগ্ধ কান্তি কলাপীব কামনার ধন।

কাজল কালির মত নীলা রাত্রি ভালবাসো তুমি,
ভালবাসো আকাশের সীমাহীন প্রশান্ত নীলিম,
ভালবাসো সমুদ্রের স্ববিশাল ঘন কাজলিমা,
ভালবাসো অবশ্যের ছায়াঘন নীলা বনভূমি।

আমিও তোমাবি মত সবচেয়ে নীল ভালবাসি,
• যে নীল তোমার স্তনু জড়ায়েছে স্নেহ-আলিঙ্গনে

যে নীল নখন-কোণে কাঁপিতেছে প্রশয়-অঙ্কনে,
যে নীল কিশোরী-মনে লক্ষ রূপে উঠিছে উদ্ভাসি।

আমি কেন পাই নাই আকাশের নীলিমার কণা?
স্বনীল সাগরে কেন হই নাই সলিল-কুমার?
বনরাজি কেন হয় হ’ল নাকো নিলয় আমার?
রজনীব কাজলিমা কেন মোরে ঘিরে রহিল না?

তুমি যদি ভালবাসো আকাশের সাগরের নীল
কেন তার এক কণা মোর মাঝে দিল না নিখিল?

কৃষিকার্য-পরিচালনার আধুনিক প্রণালী

শ্রীসত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী, ডি-এসসি

জলসেচনের ও জলনিকাশের ব্যবস্থা

উদ্ভিদেব উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধনের জন্ত জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল রক্ষা করা আবশ্যিক। বিভিন্ন মৃত্তিকার ছিদ্রের প্রকৃতি-বিশেষে জলধাবণশক্তিও বিভিন্ন। যে মৃত্তিকার দানা বড়—যেমন বেলেমাটি—তাহার ছিদ্রও তত বেশী বড়। এইরূপ মৃত্তিকার জলশোষণশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু জলধাবণশক্তি অত্যন্ত কম, কারণ স্থূল ছিদ্রের ভিতর দিয়া জল অতি সহজেই উপরের স্তর হইতে নীচেব স্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকাব দানা-গুলি যদি খুব ছোট হয়—যেমন এঁটেল মাটি—তবে তাহার জলশোষণকরিবার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম হয়, কিন্তু জল-ধাবণ কবিবার শক্তি খুব বেশী থাকে। মৃত্তিকায় সঞ্চিত জলের কতক অংশ বাষ্প হইয়া উপরে চলিয়া যায় এবং এই জন্ত অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বেলেমাটির মধ্যস্থিত জলরাশি নিঃশেষিত হয়। কিন্তু এঁটেল মাটির ছিদ্র ছোট। বলিয়া উহা হইতে বাষ্পের আকারে জলশোষণ অপেক্ষাকৃত সমন্ব্যাপেক্ষ।

মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জল কৈশিক আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা (capillarity) উদ্ভিদের মূলের সন্নিহিতে উপস্থিত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা মূলদ্বারা নিজের আবশ্যকমত গ্রহণ কবে। এইরূপে গৃহীত জলরাশির কিয়দংশ উদ্ভিদেব শরীর হইতে বাষ্পাকারে উদগত হয়। মৃত্তিকা ছোট ছোট দানাবুজ হইয়া গঠিত অবস্থায় থাকিলে তাহার মধ্যে কৈশিক আকর্ষণশক্তি বিশেষ প্রবল থাকে এবং এই জন্তই কর্ণের দ্বারা ক্ষেত্রের ঠাণ্ড বড় চেলাগুলিকে ছোট ছোট দানার আকারে পরিণত করিতে পারিলে উদ্ভিদ অতি সহজেই পুষ্টিলাভ করে। লা বাছল্য, প্রত্যেক উদ্ভিদ তাহার মূলের প্রসার অল্পদারী মৃত্তিকার বিভিন্ন স্তর হইতে জল আকর্ষণ করে।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনের জন্ত জমিতে কি পরিমাণে জলসেচন

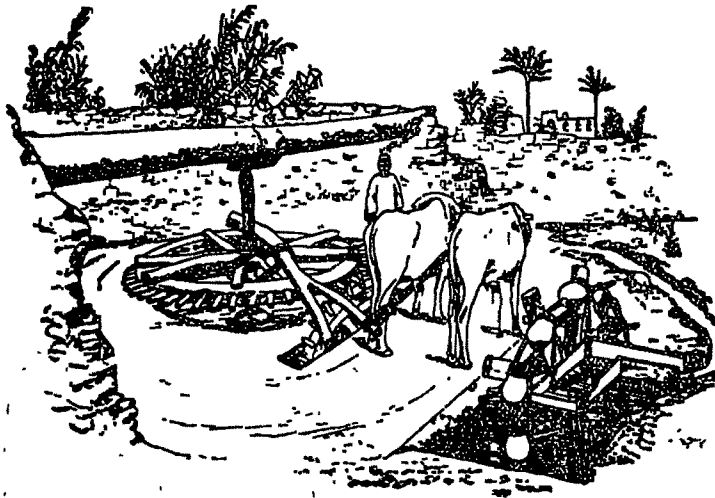
করা দরকার, তাহা উদ্ভিদের এবং ভূমির প্রকৃতির উপরে নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে নানা দেশে প্রচুর গবেষণা হইয়াছে এবং হইতেছে। ক্ষেত্রে যে পরিমাণেব কম জল থাকিলে উদ্ভিদের মূল তাহা মৃত্তিকা হইতে শোষণ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে উদ্ভিদের বিশীর্ণ-সীমা (wilting point) বলে। পক্ষান্তরে যে পরিমাণের অতিরিক্ত জল ক্ষেত্র ধারণ করিতে পারে না, তাহাকে ক্ষেত্র-জল (field capacity) বলে। ক্ষেত্রে সেচিত জলরাশি সর্বল সময়ই এই দুই পরিমাণের মধ্যে নির্ধারিত হওয়া দরকার। কারণ মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জলের পরিমাণ বিশীর্ণ-সীমার কম হইলে উদ্ভিদের মূল তাহা গ্রহণ কবিত্তে পারে না এবং ক্ষেত্র-জলের অধিক হইলে ঐ জলের কতকাংশ পল্ল-প্রণালীযোগে ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং কতকাংশ মৃত্তিকাব মধ্যে প্রবেশ কবে।

জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা কহিতে হইলে শস্যোৎপাদনের জন্ত কি পরিমাণ জল দরকার, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যিক। শস্যোৎপাদনের জন্ত যে কি বিপুল পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয় তাহা নিজের তালিকায় দেখান হইল।*

বিবিধ শস্য	এক মণ শুষ্ক পদার্থ উৎপাদন করিতে কি মণ জলের প্রয়োজন
ঘব	৪৬.১
জই	৫.৪
ভুট্টা	২৭.১
মটরকলাই	৪৭.৭
আলু	৩.৫

জমিতে জলসেচন করার সময়ে দেশ দরকার বাহাতে অনেকটা জল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে না যায়, কারণ তাহাতে জলের প্রোতে ভূমির মূল্যবান সারপদার্থগুলি জমি হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। ফলতঃ, সেচনকালে জল

* F. H. King প্রণীত *Irrigation and Drainage* (Ed. 1913) গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।



পার্সিয়ান হইলের সাহায্যে কৃষা হইতে জল তোলা হইতেছে

একপ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া দরকার যাহাতে নালার দুই পার্শ্বের ও তলার মাটি জলের সহিত প্রবাহিত না হয়, এবং নালার জল খুব পরিষ্কারভাবে প্রবাহিত হইতে পারে। তা ছাড়া জলসেচনের সময়ে জল যাহাতে ক্ষেত্রের সকল স্থানে সমানভাবে প্রবাহিত হইতে পারে এবং জমির কোথাও জমা হইয়া না থাকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা দবকার।

সাধারণতঃ বৃষ্টির জল উদ্ভিদগণের জীবনধারণে পয়োন্মী জল সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য মোটের উপর বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিত এবং এই অজ্ঞাই প্রাচীন কালের কৃষিগ্রন্থসমূহে প্রাকৃতিক অবস্থা হইতে বৃষ্টির সময় ও বৃষ্টিবারির পরিমাণ নির্ণয়ের জ্ঞান বহুবিধ বিধি বর্ণিত হইয়াছে। মহামুনি পরাশর-প্রণীত কৃষিসংগ্রহে উক্ত আছে :—

বৃষ্টিমূল্য কৃষি: সৰ্ব্বা কৃষিমূল্য জীবনম্ ।
তন্মাসাদৌ প্রথমে বৃষ্টিজ্ঞানং সমাচরৎ ॥

অর্থাৎ বৃষ্টিই কৃষিকার্যের মূল, আর জীবনও কৃষিমূল্য, অতএব প্রথমে যন্ত্রের সহিত বৃষ্টিবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে।*

* কৃষিসংগ্রহ, ১৩২২ সাল, পৃষ্ঠা ২-৩, মহামুনি পরাশর-প্রণীত ও শ্রীযুক্ত ভারাকান্ত কব্যাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। এইখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বৃষ্টিপাতের উপরে বিবিধ গ্রহ, নক্ষত্র ও গগনের প্রভাব সম্বন্ধে মহামুনি পরাশর যে-সকল বিধি এবং অন্যান্য ভদ্র 'কৃষি-সংগ্রহ' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের

সাধারণতঃ পৃথিবীর যে-অঞ্চলে যে-পরিমাণ বৃষ্টি হয়, সেই অঞ্চলে ফসলের প্রকৃতিও সেইরূপ হইয়া থাকে। নিম্নবন্ধে গড়ে বার্ষিক ১২৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; সেখানকার প্রধান ফসল ধান। রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১ হইতে ৬ ইঞ্চির মধ্যে; সেখানকার প্রধান ফসল জোয়ার। পৃথিবীর যে-সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম; সে সকল স্থানে বৃষ্টির জল যাহাতে শস্যের উপকারে আসিতে পারে তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মাটিব জলীয় ভাগ সংরক্ষণ করার

উপায় সম্বন্ধে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচুর গবেষণা হইতেছে। যে-অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে জল ধরিয়া রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় জমি সমতল করা। বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য অনেক স্থলে বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বেশী পরিমাণ জমিতে জলসরবরাহ করা হয়। এই উপায়ে অনেক জায়গায় হ্রদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে সাক্ষ্য বা অস্ত্র কোনও পদ্ধতির সাহায্যে এমন শ্রেণীর উদ্ভিদের সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা, যাহাতে উদ্ভিদ নিত্যন্ত অল্প বৃষ্টিপাতের মধ্যেও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এ যাবৎ এ-সম্বন্ধে যে-সকল গবেষণা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে কোনও বিশেষ অবস্থার উপযোগী কবিয়া উদ্ভিদের উৎপত্তি করা অসম্ভব নহে।

তৎকালীন কৃষিপ্রণালী বিশেষ উন্নত ছিল। বস্তুতঃ আধুনিক ভারতীয় কৃষিপ্রণালী সেই পুরাকালের প্রণালী হইতে বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই। পরাশর মুনি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন তাহা সঠিক জ্ঞাত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে পণ্ডিতগণের ক্রাঙ্গিস্ বুকানন্ বহুপ্রকার প্রমাণ আলোচনা করিয়া পরাশর মুনির পুত্র এবং চতুর্বেদেব জন্মদাতা ব্যাস মুনি কোন সময়ে জীবিত ছিলেন তাহার একটা মোটামুটি ধারণা কবিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বুকানন্ লিখিয়াছেন :—“Vyasa the son of Parasara, the supposed author of the Vedas, having lived in the age before Jarasandha King of Magadha, 48 reigns before Chandragupta should have lived about 1250 years before Christ.” --Genealogies of the Hindus, Extracted from their Sacred Writings : By Francis Buchanan and afterwards Hamilton, Edinburgh, 1819, p. 16.

অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় হইতেছে জলাশয়, কূপ অথবা নালা খনন করিয়া জমিতে জল সরবরাহ করা। আকাশের জল অনেক সময়ে অনিশ্চিত হইলেও মাটির নীচের জল ও বড় বড় নদীর জল প্রায় সকল সময়েই স্থানিশ্চিত। এই উপায়কে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে কার্যকরী করা সম্ভব হইয়াছে, এবং পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই পুষ্করিণী, কূপ ইত্যাদি জলাশয় কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন করার পদ্ধতি বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনেক জায়গায় কূপ বা পুষ্করিণী হইতে জল তুলিবার জন্ত বলদ অথবা এঞ্জিন-পরিচালিত পার্শিয়ান হুইল (Persian wheel) ব্যবহৃত হয়। পার্শিয়ান হুইলের চিত্র পূর্বে পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৫১৬ হাত নিম্ন হইতে অনায়াসে জল উত্তোলন করা যাইতে পারে। একটি বড় চাকার উপরে কতকগুলি পাত্র জল পর্যন্ত বুলিতে থাকে এবং চাকা ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রগুলি জলপূর্ণ হইয়া উদ্ধর্মুখে চাকার গা বাহিয়া উপরে আসে এবং উপরে জল ঢালিয়া দিয়া নিম্নমুখে জলের নীচে চলিয়া যায়। জল তুলিবার জন্ত আজকাল বহুবিধ নলকূপ এবং পাম্পও ব্যবহৃত হয়। জমিতে জল সরবরাহের জন্ত নদীর উপরে বিশাল বাঁধ বাঁধা এবং সুদীর্ঘ খাল কাটা আধুনিক যুগে সম্ভব হইয়াছে।

কৃষিকার্যের জন্ত আধুনিক জলরক্ষার প্রণালীগুলি আমেরিকায় সর্বপ্রথমে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগে আমেরিকায় জলসেচন-প্রণালী বিশেষ প্রচলিত ছিল না। মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকার অধিবাসিগণ কোন কোন জায়গায় ছোট ছোট ক্ষেত্রে জলসেচন করিত। সেই সময়ে যে-সকল ইউরোপীয় অধিবাসী আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহারা আমেরিকার যে-সকল স্থানে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইত, সেই সকল স্থানে অবস্থিতি করিতেন। কাজেই তাঁহারা প্রথমে জমিতে ফসল জন্মাইতে জলের অভাব বোধ করেন নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মর্শন্ ধর্মসম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতা ব্রাইহাম ইয়ং এক দল উৎসাহী কর্মীর সহিত আমেরিকার সুদূর পশ্চিম অংশে গ্রেট সল্ট

লেকের উপত্যকায়, যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত অল্প, সেইখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহারা সেই বৎসরই ঐ স্থানে আলুর চাষ করেন এবং লাভের সাহায্যে নালা কাটিয়া নিকটবর্তী শহরের খাল হইতে তাঁহাদের



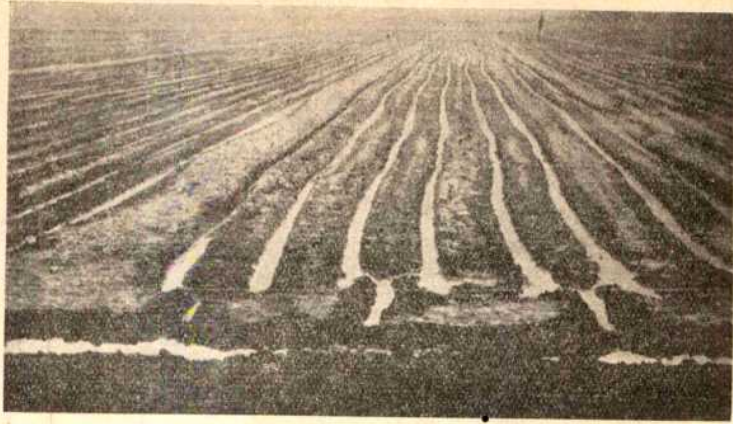
ব্রাইহাম ইয়ং (১৮০১ - ১৮৭৭)

আমেরিকার আধুনিক জলসেচন প্রণালীর সংস্থাপক

ক্ষেত্রে জল আনয়ন করেন। বাস্তবিক এই সময় হইতেই কৃষিকার্যে আমেরিকার আধুনিক জলসেচন-প্রণালীর প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল। আজকাল অল্পকালের স্থানে বহুদূরব্যাপী নালা কাটিয়া এবং স্থানে স্থানে জলরোধের জন্ত বাঁধ বাঁধিয়া সহস্র সহস্র একর জমিতে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন করা হইতেছে।

নদীতে বাঁধ বাঁধিবার পদ্ধতি খুব সহজ। জলসেচনের জন্ত যতখানি জল আবশ্যক সেই অল্পব্যয়ী নদীর জলের গতি রোধ করিবার জন্ত নদীর মধ্যে নিদিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত হ্রদ্বৃত্ত দ্বার (gate) নামাইয়া দেওয়া হয়। স্রোতে বাঁধা পাইয়া নদী-পৃষ্ঠ (level of river) উপরে উঠিয়া আসে এবং বিশাল বাঁধের সাহায্যে নদীর সেই অতিরিক্ত জলরাশি রক্ষা

করিয়া পরে খালের সাহায্যে ইচ্ছামত স্থানে প্রয়োজন অনুযায়ী জলসেচন করা সম্ভব। কৃষক এইরূপ একটি প্রধান খাল হইতে তাহার চাবের জমিতে সারি সারি নালীর মধ্য দিয়া আবশ্যকমত জল চালনা করিয়া লয়। পার্শ্ববর্তী চিত্র হইতে এই প্রণালীর খানিকটা আভাস পাওয়া যাইবে। প্রয়োজন-অনুসারে ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করার নিমিত্ত জলের পরিমাণ মাপিবার বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।



সারি সারি নালী কাটিয়া ক্ষেত্রে জলসেচন-প্রণালী

কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশেই জলসেচনের সাহায্যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জমির বিস্তৃতির জন্য প্রভূত চেষ্টা হইতেছে, কারণ পৃথিবীতে অল্পের জমির অন্ত নাই। অনেক স্থলে উপযুক্ত জল পাইলে শস্তা উৎপন্ন হইবার কোনই বাধা থাকে না। ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি ও পঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের স্থবিস্তৃত জমিতে উপযুক্ত জলসেচনের দ্বারা নানাবিধ শস্তোৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশের স্বক্করের জলরোধের বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে একটি সর্বাঙ্গপক্ষে বড় বাঁধ বলিলে অত্যাতি হয় না। ইহার সাহায্যে প্রায় ৫০০০০০ একর অল্পের জমিতে জলসেচন করা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারত-বর্ষে কতখানি জমিতে জলসেচন দ্বারা শস্তোৎপাদন করা হইতেছে তাহার একটা মোটামুটি আভাস নিম্নের তালিকায় দেখান হইল। এই তালিকাটি ১৯২৭-২৮ সালের ভারত-গবর্ণমেন্টের জলসেচন সম্বন্ধে রিপোর্ট হইতে গৃহীত।

প্রদেশ	কত একর জমিতে ভারত-গবর্ণমেন্ট জল সেচন করিয়াছিলেন	চাষে ব্যবহৃত জমির শতকরা
মাদ্রাজ	৭,১৯১,০০০	১৮.৬৫
বোম্বাই	৪১১,০০০	১.৬
সিন্ধুপ্রদেশ	৩,৩৫৩,০০০	৭৬.৮
বঙ্গদেশ	১০২,০০০	০.৪
যুক্তপ্রদেশ	২,৩৩৩,০০০	৫.৫
পঞ্জাব	১০,৩৮১,০০০	৩৫.২
ব্রহ্মদেশ	১,৯৪৭,০০০	১০.৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৯৪১,০০০	৩.২
মধ্যপ্রদেশ	৪১৫,০০০	২.০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ	৩৯২,০০০	১৫.৩
রাজপুতানা	৩১,০০০	৬.৫
বেলুচিস্তান	২৪,০০০	৬.৩

জমিতে জলসেচন করা যেমন প্রয়োজন, জলনিকাশের আবশ্যকতা তাহা অপেক্ষা কম নহে। আবশ্যক জল জমির উপর দাঁড়াইয়া থাকিলে জমির নিম্নস্থ ক্ষার উপরে উঠে; ইহাতে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়া যায় এবং এই অবস্থা স্থায়ী হইলে জমি কিছুকাল পরে অল্পের হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ভিদের শিকড়ে বায়ু চলাচল করা আবশ্যক। জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকিলে বায়ু-চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, কাজেই উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে বহুবিধ জৈব ও অজৈব দ্রবীভূত পদার্থ মাটির উপরিভাগে ও নিম্ন স্তরে জমা হয় এবং অনেক সময়েই উহা উদ্ভিদের পুষ্টিলাভের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। উল্লিখিত কারণগুলি ব্যতীত আরও একটি ভাবিবার বিষয় এই যে, জলসেচনের দ্বারা জমির নিম্ন স্তরকে সর্বদা আর্দ্র রাখিলে ক্ষেত্রের নিকটস্থ অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য-হানি ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপের ইহা একটি প্রধান কারণ।

ক্ষেত্র হইতে দুই প্রকারে জল নিকাশন করা সম্ভব। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে মাটির নিম্নস্থ ড্রেনের সাহায্যে জমির অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, অবস্থা বিশেষে অনেকে মাটির উপরে নালী কাটিয়া ক্ষেত্রের জল নিকাশিত করিয়া দেওয়া পছন্দ করে। আজকাল শেযোক্ত প্রণালী জলনিকাশের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইংলণ্ড, জার্মেনী ও অস্ট্রিয়া অনেক দেশের বহু লক্ষ একর

জলা জমি হইতে জননিকাশ করিয়া ক্রমে ঐ সকল অঞ্চলকে বাসোপযোগী ও শস্তোৎপাদনের অনুকূল করা হইয়াছে। ঐ সকল উত্তমের সাফল্যের মূল কারণ জনসাধারণ দ্বারা গঠিত বিবিধ সমবায়-সমিতির অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়। আমেরিকায় ও ক্যানাডাতে ১০০,০০০ বর্গমাইলের অধিক বিস্তীর্ণ জলাভূমি ছড়াইয়া আছে। এই সকল স্থান হইতে জল বাহির করিয়া ভাল ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা দ্বীপে

দ্বীপে প্রসার লাভ করিতেছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যেতদধিক তদধিক ভাড়া বাড়াইতেছে তাহাতে জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উর্বর ও বাসোপযোগী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের বাংলা দেশে নীচ জমি ও বিলের অভাব নাই। বলা বাহুল্য, অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিলে এই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট ফসল উৎপন্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ধর্মমত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

জগতের প্রায় সর্বত্র বিজ্ঞানব্রতীদের ভগবন্ত্বক্তি বিষয়ে লোকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতগৌরব বিজ্ঞান-গতপ্রাণ মনীষী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের ভগবন্ত্বক্তি বিষয়েও দেশের লোকে সন্দেহ প্রকাশ করিত। অনেকে তাঁহাকে হিন্দুধর্মের বিদ্বৈষী এবং কেহ কেহ নাস্তিক বলিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে, ডাক্তার সরকার একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, জীবনের প্রত্যেক কার্যে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেন। বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া তিনি কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন নাই, বরং অনন্তশক্তি জগৎস্রষ্টার অপার মহিমায় অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াই পড়িয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল যখন কলেজের ছাত্র, সেই সময় তাঁহার অভিভাবক কনিষ্ঠ মাতুল মহাশয় তাঁহাকে পাদরি মিলনার (Rev. Milner) প্রণীত “টুর রাউন্ড দি ক্রিয়েশান” (Tour Round the Creation) নামক একখানি পুস্তক পাঠ করিতে দেন। ইহাতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচিত ছিল। মহেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাভাবিক অধ্যয়ন-স্পৃহার সহিত পুস্তকখানি পাঠ ও আয়ত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যতই পাঠ

করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কৌতুহল বৃদ্ধি ও জ্ঞানলালসা উদ্দীপিত হইতে লাগিল। সৃষ্ট পদার্থের বৃহৎ ও বিশালত্ব এবং জগৎস্রষ্টার অন্তর্যম শক্তি ও কৌশল চিন্তা করিয়া তাঁহার তরুণ-হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। পুস্তকখানির একস্থলে সূর্য্য সম্বন্ধে সর্ব উইলিয়াম হার্শেলের মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিত ছিল যে, “আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী যেমন সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তেমনই এই গ্রহ-উপগ্রহসম্বলিত সৌরজগৎ অল্প কোন বৃহত্তর সূর্যের এবং তাহাও হয়ত অপর কোন মহাসূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে।” মহেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—“যখন আমি এই অংশটি পাঠ করিলাম, তখন আমার মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। আমার মনে হইলে, জগত্তত্ত্বের একটি গূঢ় রহস্য আমার নিকট সহসা প্রকাশিত হইল। সূর্য্য যদি বৃহত্তর সূর্যের এবং তাহাও যদি তদপেক্ষা আরও বৃহৎ কোন সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে, তবে এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়ত সেই অনন্ত শক্তি, মহামহিমময় জগৎস্রষ্টার সিংহাসনের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে আমি নিকীক হইলাম এবং মনের সেই অবস্থায় নয়পদে ও নয়গাত্রে মাতুল মহাশয়দিগের গৃহ হইতে নেবুতলার গীর্জা পর্যন্ত অনধিব্রত



ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

পাদচারণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সে অবস্থায় দেখিলে লোকে বায়ুরোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। সেই দিন হইতে বিজ্ঞানের প্রতি আমার যে অহুসার এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎস্রষ্টার মহিমা অবগত হইবার জন্ম আমার যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা একদিনের জন্মও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।”

ডাক্তার সরকার বিজ্ঞানকে জীবনের সাথী করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান আলোচনার ফলে তিনি যতই বহির্জগতের গূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিতেন, ততই তাঁহার হৃদয় ভক্তিরসে আপ্ত হইত। তিনি বলিতেন, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ একই স্থানিয়মে পরিচালিত।

ডাক্তার সরকার একেশ্বরবাদী ছিলেন, সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন। এই বিরোধী মত কখনও গোপন রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। সেই জন্মই তিনি দেশের এক শ্রেণীর লোকের নিকট বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “সাকার বা পৌত্তলিক উপাসনার দ্বারা পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।” তিনি

চিরকাল সত্যের পূজক ছিলেন, পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সেই জন্ম তিনি তাহার বিরুদ্ধে যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। একমাত্র চিন্ময় ঈশ্বরেরই তিনি উপাসক ছিলেন, কিন্তু এজন্ম বাহ্যিক আড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন না।

হজরত মহম্মদ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদের জন্ম আশ্রয় চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া, ডাক্তার সরকার তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। খ্রীষ্টিয়ান-গণের সহিত একমত না হইলেও তিনি যিশু খ্রীষ্টকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক বলিয়া মনে করিতেন। বাইবেল তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, তিনি বাইবেলের বহু সংস্করণ ক্রয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্মে তাঁহার বিশেষ অহুসার ছিল।

এদেশে মানুষের পূজা বড়ই প্রবল ভাবে বিद्यমান, ডাক্তার সরকার মনুষ্য-পূজার বড়ই বিরোধী ছিলেন। তিনি সৃষ্টিকে পূজা না করিয়া স্রষ্টাকেই পূজা করিতেন। জগৎ মিথ্যা কি সত্য, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রভৃতি যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কখনও হয় নাই এবং কখনও হইবার সম্ভাবনা নাই, এই সকল বিষয় লইয়া ঈহারা নিফল তর্ক করিতেন, তাহাদিগের উপর ডাক্তার সরকার বড়ই বিরক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, তর্কে জগৎকে মিথ্যা বলিতেছি অথচ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বিধানে সমস্ত কার্য ঈরিতেছি, ইহাতে নিজের জীবনে কেবল অসত্যের প্রশংসা দেওয়া হয় মাত্র; এরূপ অমূলক কল্লনায় মানুষ দিন দিন হীনশক্তি, অসাড় ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। এই কারণে তিনি মধ্যে মধ্যে নিফল দার্শনিক তত্ত্বালোচনার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দর্শনপ্রণেতা ঋষি-গণের প্রতি যে শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাহা নহে। তাহাদিগের জ্ঞান ও বহুদর্শিতার প্রতি ডাক্তার সরকার সর্বদা বিশেষ ভাবে ভক্তি প্রদর্শন করিতেন।

ডাক্তার সরকারের ধর্মমত অনেকটা উদার প্রকৃতির ছিল, কিন্তু কখনও তিনি পারিবারিক ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। হিন্দুভাবেই তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। গীতা তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। রামায়ণ হস্তান্তর বড় ভালবাসিতেন। তিনি পরিণত বয়সে বলিয়াছিলেন, “ছেলেবেলা পথের ধারে রামায়ণ গান শুনিতে

শুনিতে এত উন্নয়ন হইয়া যাইতাম যে, ঘরে আসিয়া এক এক দিন প্রহার খাইতাম। এখনও রামায়ণ মহাভারত শুনিলে যে স্বর্থ পাই, অস্ত্র কোন পুস্তকে তাহা পাই না।” কীর্ত্তনও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। ধর্মসঙ্কীর্ণ শুনিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত।

‘বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি?’ প্রশ্ন করায়, ভগবদ্ভক্ত ডাক্তার সরকার উত্তর দিয়াছিলেন—“বহিজ্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ, দৃশ্য এবং অদৃশ্য জগৎ যে একই স্থানিয়মে পরিচালিত হইতেছে, তাহা বুঝিবার জন্যই জড়বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। জগৎসত্ত্ব এবং তাহা হইতে সেই জগৎ-ঐশ্বর্যকে অবগত হওয়াই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।”

ডাক্তার সরকার ধর্মালোচনা শুনিয়া সাধারণের মত কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন না। শ্রীশ্রীবামদেব পরমহংসদেবের সহিত তিনি অনেক সময় সাক্ষাৎ করিতেন এবং ধর্মালোচনায় রত হইতেন। একদা জনৈক ভক্ত পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, “প্রভু, আপনার উপদেশ শুনিয়া সকলেই রোদন করেন, কিন্তু ডাক্তার সরকার কখনও একবিন্দু অশ্রু ফেলেন না?” উত্তরে পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন, “ছোট ব্রহ্মে হস্তী নামিলে জল তোলপাড় করে, কিন্তু সমুদ্রে নামিলে কিছুই হয় না।” ডাক্তার সরকারের হৃদয় সাগরের তায়াই বিশাল ছিল।

বাহিরে সাধারণতঃ উচ্ছ্বাসবিহীন হইলেও, কখন কখন প্রচলিত ধর্মসঙ্কীর্ণ শ্রবণেই ডাক্তার সরকারের ভক্ত-হৃদয় আলোড়িত হইতে দেখা যাইত। পথে ভিখারীর কণ্ঠে—

‘হবি তোমার মাতৃকণ

সর্বরূপ সার,

বলনতরা না কথাটির

তুলা কথা নাইরে আর।’

এই গানটি শুনিলে, শৈশবে মাতৃহারা ডাক্তার সরকারের চক্ষু বৃন্দবনসেও জলে ভরিয়া উঠিত। জীবনপ্রভাতে অশেষ ক্ষুধ ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া, গায়ক যখন গাহিত—

‘হরি, হুং ধাও বে জনারে

তার কেউ দেখে না মুখ ব্রহ্মাও বৈমুখ

হুংধের উপর হুং ধাও হে বারে বারে।’

শুনিয়া, তিনি আর আত্মসম্মরণ করিতে পারিতেন না, তাঁহার গণ্ড বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। গিরিশ-

চন্দ্রের “জুড়াইতে চাই, কোথায়, জুড়াই” গানটিও বার বার শুনিতেন তিনি আগ্রহাৱিত হইতেন।

ডাক্তার সরকার বলিতেন, “ভগবানকে ভয় করিলে আর কাহাকেও ভয় করিবার দরকার হয় না, ভয় করা উচিতও নয়।” শিশুকাল হইতেই পরমেশ্বরে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, সকল সম্বন্ধে, সকল সংগ্রামের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের সাহায্য অশ্রুভব করিতেন। এমন ভগবদ্ভক্ত লোককেও ধর্মসম্বন্ধে কত কথা স্মৃতি হইয়াছে।

ডাক্তার সরকারের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার ভবনে একটি জন্মতিথি টংসব ও গুরুত্ব-সম্মিলনীর বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। ডাক্তার সরকার সে সময় পীড়িত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এই উৎসবে তাঁহার দীর্ঘজীবন ও রোগযন্ত্রণা উপশমের জন্য সকলে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ধর্মবিষয়ের আলোচনা ও ধর্মসঙ্কীর্ণ গীত হইয়াছিল। সেদিন উত্তরে ভাবস্বত্ব ডাক্তার সরকার সজলনেত্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অল্পবাদের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :

“প্রত্যেক জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাণী মাত্রেই প্রাণ-রক্ষণের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃষ্টকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত; যে জীবনের জন্য সে তাহার নিকট দণ্ডী। যখন আমরা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন দশায় উপস্থিত হই, তখনই তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া আমাদের কর্তব্য এবং শেষ দশায় উপনীত হইলে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তখনই পর্যাণ্ত বলিয়া মনে কর উচিত নহে। তাঁহার অনুজ্ঞায় আমি সপ্ততি বৎসর পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছি এবং তাঁহাব ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য আমার ক্ষমতম যত্নকেও তিনি স্বত্তি প্রদান করিয়াছেন, এ সকলের জন্য বাক্য কিংবা চিন্তা দ্বারা আমার বৃত্তজ্ঞতা সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। তাহা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। আমার বংশধরসমী ও সহ-যোগীরদের জন্য যদি কিছুমাত্র উপকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, উহা কেবল তাঁহারই আশীর্বাদে, যে আশীর্বাদ সম্পদে, বিপদে, সুখতায়, রোগে সমভাবে অনুভব করিয়াছি—বরং বিপদে ও রোগে অধিকতররূপে পাইয়াছি। তাঁহাব অনুশাসনসমূহে আমি তাঁহার অনন্ত কৃপার বিকাশ অনুভব করিয়াছি। যকৌরু পাপসমূহ এক তাহা সত্ত্বেও তিনি আমাকে কি একাবে জীবিত রাখিয়াছেন, ইহা যখন স্মরণ করি তখনই বিমগ্নাভিভূত হইয়া পড়ি। এই সকলের প্রতিজ্ঞানে (যদি একপা সিন্ধু সমুদ্রের হয়) বাহা কিছু আমি করিত পারি তাহা কেবল তাঁহা ইচ্ছা পালনের জন্য শক্তি প্রার্থনা এবং আরও প্রার্থনা যেন সেই ভগবৎ ইচ্ছা তাঁহার হৃষ্ট প্রাণিব মধ্যে সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হয়।

“আমার এক প্রকার অনিচ্ছাসম্বন্ধে আপনারা যে একপা ঘটন অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই ঘটনা সর্বশক্তিমান হৃষ্টকর্ত্তাকে এক মৎপ্রতি ও তাঁহার হৃষ্ট প্রাণি-সমূহের প্রতি যে অনন্ত কৃপা, বাহা প্রাণী আমরা ভুলিয়া থাকি, আমরা হৃদয়ে তাহা জাগরক করিয়া দিতেছি।”

উপরিস্থ ঘটনার চারি মাসেব মধ্যেই শ্রীভগবান তাঁহার ভক্ত সম্মানকে নিজ শাস্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করি- ছিলেন। ভাস্কর্য্যের সরকার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে বোম্বাই-র মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলিতেই তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব পরিষ্কৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার রচিত—

১। “কি বলে তোমারে ডাকিব। (ভাবি তাই)
আদি নাই, অন্ত নাই, কি নাম তোমারে দিব। (কল)”

২। “খা মনে করি আমার, তা সকলি তোমার,
কি দিয়ে তবে পূজিব তোমার।”
৩। “জীবন ফুরিয়ে এলো, তবু ভ্রম ঘুচিল না।”
৪। “ভয় কোনো না রে মন, দেখে শমন আগমন,
শঙ্ক নয় সে পরম বন্ধু, তারে কর আলিঙ্গন।”

প্রভৃতি প্রত্যেক গানে ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত ভক্ত-হৃদয়েরই পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘটনাচক্র

“বনফুল”

১

শ্রীমতী উষা সেন আধুনিক মহিলা।

অর্থাৎ বি-এ পাস করিয়াছেন, ট্রায়ে, বাসে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুবিয়া বেড়াইতে পারেন, নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিজেই নানা দোকান ঘুরিয়া পছন্দ করিয়া খরিদ করিতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক বেহায়াপনা বা লজ্জা কোনটাই নাই। সাহিত্যে অহরহ আগ্রহ। কোন লেখক ভাল, কোন লেখক মন্দ সে-বিষয়ে নিজের একটা স্পষ্ট মতামত আছে। “চেহারা ?” সন্দেহ নাই হইলেও মোটের উপর স্ত্রী বলা চলে। আধুনিক বেশবাসে সজ্জিতা হইয়া তিনি যখন পথেঘাটে বিচরণ করেন তখন অধিকাংশ দর্শকই প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে। সংক্ষেপে, শ্রীমতী উষা—বেশ চটপটে, স্বরূপসম্পন্ন আলোকপ্রাপ্তা ওজ্জ্বল তরুণী।

একটি বিষয়ে শ্রীমতী কিন্তু সাবেক-পন্থী। তিনি বিবাহ করিয়াছেন এবং সে বিবাহও আধুনিক রীতি ও রুচি অল্পাঙ্গী হয় নাই। ইহার জন্ত দায়ী অবশ্য অন্নদা সেন—উষা সেনের বাবা। অন্নদা বাবু ভদ্রলোক, সনাতন মতাবলম্বী। তিনি যখন শুনিলেন যে তাঁহার কন্যা মণীন্দ্রমোহন নামক একটি সহপাঠী কৈবর্ত যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে তখন তিনি কালবিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ

করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস কেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছর-তিনেক হইল ভাস্কর্য্যী পাস করিয়া কলিকাতার রোগী-সমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত যত্ন নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা কবিত্বের সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল—কার্য্যে পরিণত হইল না। একটি প্রতিজ্ঞা কিন্তু উষা সেন মনে মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই—“জর্জেট শাড়ী জীবনে আর কখনও পরিব না।” মণীন্দ্রমোহন জর্জেট শাড়ী অত্যন্ত পছন্দ করিতেন এবং ভবিষ্যতে উষাকে ঐরূপ একটি শাড়ী কিনিয়াও দিবেন কথা ছিল—কিন্তু ব্রজবিহারীর অভ্যাগমে তাহা আর হইল না। সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং উষা সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে জর্জেট শাড়ী জীবনে তিনি আর ছুঁইবেন না।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি—দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। শেষ-কালে এ প্রতিজ্ঞাও টিকে নাই। কি করিয়া ইহা ঘটিল তাহা লইয়াই এই গল্প।

২

পারুল-মিদি বেড়াইতে আসিয়াছিলেন।

পারুল মৈত্র উষা সেনের এক বছরের ‘সিনিয়র’, অথচ

এখনও বিবাহ হয় নাই। বেশ-বিক্রাস প্রসাধন সজ্জা তিনি উদাসিনী নহেন। এই বেশ-বিক্রাসের কল্যাণে তাঁহাকে উবার অপেক্ষা ছোটই দেখায়। নানা কথার পর তিনি বলিলেন, “এইবার উঠি ভাই, একটু মার্কেটে হেঁটে হবে।”

“মার্কেটে কেন?”

পারুল-দিদি মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন, “একখানা শাড়ী কেনার ইচ্ছে আছে। শুনেছি না কি জর্জেট শাড়ী-গুলো আজকাল খুব সস্তার উঠেছে।”

“তাই না কি?”

পারুল-দিদি চলিয়া গেলেন।

জর্জেট শাড়ীর কথায় উবার মণীন্দ্রমোহনকে মনে পড়িল। একটু দুঃখবোধও হইল। বিশেষ করিয়া এই জুজাই দুঃখ হইল যে মণিকে না-পাওয়ার দুঃখের তীব্রতাটা মনে করিয়া গিয়াছে। কই, মণির কথা আর ত সে তেমন কল্পনা ভাবে না। দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে মণির নোন খবরই সে ত রাখে না আর। এখন সে মিসেস গুপ্ত এক একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ব্রজবিহারীর দুঃখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে সে একান্ত ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। মনে অতীতের স্মৃতির ধ্যান করিতেছে না। স্পন্দনবীর বর্তমানকে লইয়া সে ব্যস্ত। ব্রজবিহারী ধারাপ লোক নয়, উষাকে খুশী করিবার জন্য তাহার চেষ্টার জট নাই, তজ্জন্য সে উবার স্বামী। সুতরাং তিলে তিলে সে উবার দ্বন্দ্ব জয় করিয়াছে।

এই কথাটা উপলব্ধি করিয়া উষা একটু আনমনা হইয়া পড়িল। মনে মনে অনর্থক একবার আবৃত্তি করিল—‘তবে আমি ভালবাসি। এখনও বাসি—জর্জেট আমি জীবনে কখনও পরব না—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।’

* * *

এই প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর দ্বিতীয় বোমা নিক্ষেপ করিলেন তাহার সহোদরা ভগিনী সন্ধ্যা সেন। এখন অবশ্য সন্ধ্যা দাস। সন্ধ্যার স্বামী মিষ্টাব দাস ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বলা বাহুল্য, ডেপুটি বাবটি সদ্য-পাস-করা ডাক্তার ব্রজবিহারী অসম্মান অধিক উপার্জনক্ষম। এই জন্তও বটে এবং পিঠা-পিঠি বলিয়াও বটে উবার মনে একটু দৈর্ঘ্য ছিল। এখন অসম্মান

দুঃখ-জেনেই বড় হইয়াছে, চুলোচুলি খাম্‌চাখাম্‌চি করিয়া ঝগড়া চলে না। বরঞ্চ মুখে দুই জনেই দুই জনের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট। ইহাদের পাল্লা চলে এখন নীরবে—গহন-কাপড়ের মারফৎ। উষা যদি সৌখীন ছিল ক্রয় করিয়া কর্ণফুল অলঙ্কৃত করিলেন সন্ধ্যা অমনি সৌখীনতর ছিল দুলাইয়া উষাকে সৌখীনতমের সন্ধান উভলা করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যা যদি কোন ছলে উষাকে জানাইলেন যে তাহার স্যাণ্ডাল জোড়ার পাঁচ টাকা দাম, উষাকে অমনি জানাইতে হইল—“হ্যাঁ, গুরুত্ব স্যাণ্ডালগুলো বেশ,—আমার খুব পছন্দ। কিন্তু তাঁর কিছুতেই গুরুত্ব ট্র্যাপ-দেওয়া পছন্দ হয় না। নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছেন দেখ না—সাড়ে ছ-টাকা দিয়ে। আঙুলগুলো এমন চেপে ধরে—বিচ্ছিরি!”

সুতরাং এই সন্ধ্যাই যখন উপস্থাপি দুই দিন দুই বিভিন্ন প্রকাব জর্জেট পরিয়া দিদির সহিত দেখা করিয়া গেল তখন উষা দেবী বেশ একটু স্ফীলিত হইলেন। জর্জেট কিন্তু তিনি পরিবেন না। মনে মনে কহিলেন, “আহ ভারি ত জর্জেটের দাম। প্রতিজ্ঞা না করলে এত দিন আমি কবে কিনতাম।”

* * *

তৃতীয় বোমা হানিলেন বাম্‌বী ছায়া।

ছায়া সিনেমায় যাইবে—উষাকে ডাকিতে আসিয়াছে পরিয়া আসিয়াছে একখানা জর্জেট শাড়ী। সন্দের সাদ রঙের জর্জেটখানা—সন্দের ফাজ-করা। উষা দেবী তাহার মুশিদাবাদীখানি সম্বন্ধে পরিধান করিয়া বাহিরে আসিতেই ছায়া প্রস্থ করিলেন, “ওটা পরলি কেন এঁই গরমে। জর্জেট নেই তাঁর?”

“না।”

“আজকাল জর্জেটটার খুব চলন হয়েছে—কিনলেই পারি। একখানা। দামও ত বেশী নয়—আমার এইখানার দাম এগার টাকা—”

“মোটো?” অতর্কিতে উবার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মণীন্দ্রমোহনের স্মৃতিপটের নমুখে নানা বর্ণের কয়েক খানা জর্জেট শাড়ী আসিয়া পড়তে পড়তানা বেশ একটু

আবছা হইয়া গেল। উষা কেমন যেন আনমনেই সিনেমটা দেখিতে লাগিলেন। সিনেমার গল্পও একটা কল্পনাব্যর্থ প্রণয়-কাহিনী। এই গল্পের নারিকাতা বাহাকে প্রথম জীবনে ভাল-বাসিয়াছিলেন তাঁহাকে পান নাই এবং বাহাকে পাইয়াছিলেন তাঁহাকে ধীরে ধীরে ভালবাসিতেছিলেন। ইহাই জীবনের অদ্ভুত ট্রাজেডি। 'ইন্টারভাল' হইল—ইন্টারভালে উষা লক্ষ্য করিলেন যে মহিলা-দর্শকদের মধ্যে আরও দুই-এক জন জজের্ট শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার নিজের মনেই তিনি নিজেকে বলিলেন, “আর এক জনকে বিয়েই যখন করতে পেরেছি তখন আর জজের্ট শাড়ী পরতে কি! জীবনে কতবার কত প্রতিজ্ঞাই ত করেছি—সব কি আর পালন করেছি—না, পালন করা সম্ভব! বাক্য, তবু জজের্ট আমি কিনছি না—”

* * *

কয়েকটি দারুণ বোমার গুলতব আঘাত সহ্য করিয়াও উষা দেবীর প্রতিজ্ঞা-দুর্গ ভূমিসাৎ হয় নাই। কোনরূপে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সেদিন ‘চিকিৎসা’ দেখিতে গিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা-দুর্গের উপর যেন বোমাবর্ষণ হইতে লাগিল। চতুর্দিকেই জজের্ট শাড়ী! উষাকে জল্প করিবার ক্ষমতাই নেন সকলে দল বাঁধিয়া জজের্ট পরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মনে হইতে লাগিল তিনি বোধ হয় একাই কান্দারী শাড়ী পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলে তাঁহার এই জজের্ট-বিহীন আবির্ভাব লইয়া মনে মনে হাসাহাসি করিতেছে।

* * *

শেষ বোমাটি নিষ্কিপ্ত হইল একটি মোটর হইতে।

হঠাৎ সেদিন বিকালে উষা দেবী লক্ষ্য করিলেন যে একটি মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। মোটর বসিরা একটি জজের্ট-পরিহিতা তরুণী। সুন্দরী। যিভের গবাক্ষে দাঁড়াইয়া উষা লক্ষ্য করিলেন যে মোটরটি দাঁড়াইতেই একমুখ হাসি লইয়া স্বামী ডিসপেনসারী হইতে বাহির হইয়া মোটরে চড়িয়া যুবতীটির পাশ বসিলেন—মোটর চলিয়া গেল। কে এ মেয়েটি? বোগিণী? চোরা দেখিয়া মনে ত হয় না! উষা দেবীর দোষ দেওয়া যায় না—এ অবস্থায় কোতুল অদম্য হইয়া ওঠাই অসম্ভাবিক।

স্বামী ফিরিতেই উষা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ বিকেলে যে-মেয়েটি তোমাকে এসে নিষে গেল—কে ও?”

“হাসপাতালের এক জন নার্স। ডাক্তার বিশ্বাস আমাদের আজ একটা টি-পার্টি দিলেন কি না—। সুবিধার্থে ওই নার্সটি বেশ মেয়ে।”

“মেয়েটি দেখতে বেশ। জজের্ট পরে বেশ মানিয়েছিল। কিনে দাও না আমাকে একখানা জজের্ট”—উষা বলিয়া ফেলিল।

“বেশ ত! দাম কত?”

“কত আর হবে! আজিকাল সস্তাই হয়েছে শুনেছি। দশ-পনের টাকা হলেই হয়। ছায়া সেদিন প’রে এসেছিল একখানা, বললে এগার টাকা দাম। তাড়াতাড়ি নেই এখন—”

“আচ্ছা দেখি! আমার এক রোগীর কাছে বোলটা টাকা বাকী আছে। কাল ‘বিল’ পাঠাব। টাকাটা যদি পাই কিনে দেব।”

৩

ঠিক তাহার পর দিন সকালে বান্ধবী ছায়া আসিয়া দর্শন দিলেন। গোপনীয় কিছু বলিবার ছিল। মুখচোখ রহস্যময় করিয়া কানে কানে কহিলেন, “মণিবাবু কলকাতায় এসেছেন আজ কদিন হ’ল। আমি জানতাম না। মালতী তাব এক বন্ধুব কাছে নাকি শুনেছে। দেখা করবি না কি? ঠিকানা জোগাড় কবেছি—এই নে। আমার কাজ আছে ভাই—বসতে পারব না। যা না, দেখা ক’রে আয়। দেখা করতে আর দোষ কি?”

ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্ঝাঁক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মণি আসিয়াছে। কলেজের অর্ধবিশ্রুত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীক ভীক মাছুষটি—শাস্ত নিরীহ, নিরহঙ্কার। মণিপ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতর স্থম্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল। —নাঃ, জজের্ট শাড়ী আর সে কিনিবে না! স্বামী আসিলেই বারণ করিয়া দিতে হইবে।—মণিবাবুর সহিত

একবার দেখা করিতে হইবে বইকি। হরিশ মুখাঙ্কির রোড কতটুকুই বা দূর।

* * *

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই উষা দেবী বাহির হইয়া পড়িলেন। বাড়ীটা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। কিন্তু ভিতরে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তিনি মোটেই প্রত্যাশা করেন নাই।

“আপনি আমাকে খবর দিলেন না কেন?”

“আপনার ঠিকানা ত আমার জানা ছিল না। সেই যে আপনি কলেজ থেকে চলে গেলেন, আর ত কোন খবর দেন নি আমাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলাম—আপনার বিষে হয়ে গেছে। কোথায়, কার সঙ্গে—কিছুই ত জানি না—” বলিয়া মণিবাবু একটু হাসিলেন। এমন সময়ে—“কেমন আছেন আজকে আপনি” বলিয়া দুয়ার

ঠেলিয়া ভক্তার ব্রজবিহারী যবে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

“এ কি, তুমি এখানে!”

উষা দেবীও কম বিস্মিত হন নাই।

“আমরা একসঙ্গে পড়তাম। তুমিই এঁর চিকিৎসা করছ না কি?”

* * *

একটু পরেই ব্রজবিহারী বাইরে আসিয়া গাড়ীতে একটা কাগজের বাস্ক দেখাইয়া বলিলেন—“ওই নাও তোমার শাড়ী। এই ভদ্রলোকের কাছেই টাকা বাকী ছিল। ভাগ্যে আজ দিয়ে দিলেন তাই তোমার কাছে মানটা থাকল। দেখ ত রংটা পছন্দ হয় কি না—” বলিয়া ব্রজবিহারী নিজেই প্যাকেটটা খুলিতে লাগিলেন।

উষার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না।

.পিতা-পুত্র

শ্রীরমা প্রসাদ চন্দ

মোকদ্দমা চলিলে বাদীর দাবী প্রমাণিত হইবে না এই ভরসায় প্রতিবাদী নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না। বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জির জবাবে প্রতিবাদী রামমোহন রায় বাঁটোয়াবার পর পিতা রামকান্ত রায়ের এবং অগ্রজ জগমোহন রায়ের সহিত পুনরায় সকল বিষয়ে একত্রিত হওয়ার কথা এবং পিতার মৃত্যুর পব বরাবর জগমোহন রায়ের সহিত এইরূপ একত্র থাকার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন, লাজুপাড়ার বাড়ীতে মাতা তারিণী দেবীর তত্ত্বাবধানে জগমোহন রায়ের এবং তাঁহার জীপরিবার একত্র একান্নবর্গী ছিল, এবং দুই ভাই আপন আপন স্বতন্ত্র তহবীল হইতে সমান অংশে তারিণী দেবীর সংসারের সকল খরচ বহন করিতেন। একান্নবর্গীতা হিন্দু পবিবাহে সাধারণতঃ অজ্ঞাত বিষয়ে অভিন্নতা স্থচিত করে। সুতরাং

১৯২৭ সাল হইতে পিতার এবং অগ্রজের সহিত বৈবয়িক ব্যাপারে যে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন কোর্টে ইহা প্রমাণ করা রামমোহন রায়ের প্রধান কর্তব্য ঠাড়াইয়াছিল।

তিন পক্ষেব এই বৈবয়িক স্বতন্ত্র্য বিষয়ে কোর্টে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পক্ষে যথেষ্ট হইলোও, ইতিহাসের পক্ষে যথেষ্ট নহে। “রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতের উপাদান” নামক প্রবন্ধে আমরা মোকদ্দমাব নথী-বহির্ভূত সরকারী চিঠিপত্র হইতে কিছু কিছু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি।* এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পব আমাদের স্বযোগ্য সহযোগী শ্রীযুক্ত ভট্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার এল আমরা আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভামাদেব অল্পসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই। তথাপি এযাবৎ নগ্নহীত সরকারী কাগজ-

* এবাসী—আধিন, ১৩৪৩, ৮৪২ পৃঃ।

পুত্র রামকান্ত রায়ের এবং জগমোহন রায়ের বৈষয়িক ভৌম সন্মুখে যে সকল উপকরণ আছে তাহার উল্লেখ না করিলে গৃহবিবাদের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া এই প্রস্তাবে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

উপবিভুক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, ১১২৮ সনে (১৭২১ সালে) রামকান্ত রায় যখন গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে ১০২৭০১/০ বার্ষিক জমায় ২ বৎসরের মিত্রাদে তুরন্তপূর্ণগণা ইজারা লইয়াছিলেন, তখন জগমোহন রায় পিতার জামীন হইয়াছিলেন।† রামকান্ত রায় গোয়ালভূম (Gwallaboom) বা গোপভূম নামক আবণ্ড একখানি খাস মহাল ৫১২৩১৮/২১ জমায় ইজারা রাখিতেন।‡ এই দুই মহালের মোট বার্ষিক জমা ছিল ১৫৪২০২/২১। (এল্লফ চুয়ান হাজার নয় শত দুই টাকা পাঁচ আনা সাড়ে নয় গুণ), এবং এই দুইখানি মহালের জমা পরিশোধের জন্যই জগমোহন রায় জামীন ছিলেন। তখন যদি জগমোহন রায়ের কোন স্বতন্ত্র সম্পত্তি না থাকিত তবে সরকার কখনই তাঁহাকে জামীন স্বীকার করিতেন না।

রামকান্ত রায় তাঁহার বণ্টনপত্রে হরিরামপুর তালুক জগমোহন রায়কে দান করিয়াছিলেন। হরিরামপুরের মোট আয় ছিল ২০৮৬২৫১২, এবং সদর জমা ছিল ২৫৮৮৩৬/১১ গুণা, অর্থাৎ সদর জমা বাদে মালিকের টিকিত প্রায় চারি হাজার টাকা। এই চারি হাজার টাকা হইতে মেনন প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের খরচ বাদ যাইত, তেমনি সেকালে নজর সেলামি বাজে জমা বাবৎ কিছু টাকা আদায় হইত। রামমোহন রায়ের পক্ষের শাকী রামভদ্র রায় তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে হরিরামপুর মহাল হইতে জগমোহন রায়ের বার্ষিক প্রায় চারি হাজার টাকা মুনাফা হইত। রামকান্ত রায় তাঁহার আর দুই পুত্র, রামমোহন রায় এবং রামলোচন রায়কে এত আয়ের কোন তালুক দান করিতেন

পারেন নাই। এইরূপ অসমান বাটোয়ারার কারণ কি? হরিরামপুর রামকান্ত রায়ের খরিদ। সম্পত্তি নহে। ১৭২৪ সালের ১০ই জুলাই চিত্রা পরগণার অন্তর্গত তরফ হরিরামপুর, তরফ হরিরামপুর এবং তরফ গদাই ঘাটা বাকী রাজস্বের জন্ত কলিকাতায় রেভিনিউ বোর্ডে আপিসে নীলাম হইয়াছিল। তখন জগমোহন রায় ২২৭০, মূল্যে নিজ নামে হরিরামপুর খরিদ করিয়াছিলেন।* জগমোহন রায় হয়ত ষোণাঙ্গিত অর্থে হরিরামপুর খরিদ করিয়াছিলেন, এবং রামকান্ত রায় তাঁহাকে নামতঃ হরিরামপুর দান করিয়া কার্যতঃ এই তালুকের উপর নিজের এবং নিজের অন্তর্গত গুয়ারিশগণের দাবী ত্যাগ করিয়াছিলেন। জগমোহন রায়কে তাঁহার ষোণাঙ্গিত সম্পত্তিতে সন্তোষিত করা বাটোয়ারার এক কারণ হইতে পারে।

বাটোয়ারাব অব্যবহিত পরে জগমোহন রায় আরও তিন খানি বড় তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১২০৩ সনের (১৭২৬-২৭ সালের) বাকী রাজস্বের জন্ত নিয়োক্ত তিন খানি তালুক নীলামে উঠিয়াছিল, এবং নীলামে বিক্রীত না হইয়া ১২০৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিয়োক্ত খরিদদারগণের নিকট আপোসে বিক্রীত হইয়াছিল—

তালুক	খরিদদার	সদর জমা	মূল্য
হুদা রসিকপুর	রামনিধি ঘোষ	৪৩০৬৫১৭	১৪০০০
হুদা পুরাণ গাজ	বকচাঁদ রায়	১৪২৪১৮২১	১৭০০০
হুদা পবলিয়া (তরফ রামচন্দ্র সেন বর্দার অন্তর্গত)		২২২৫৭	৫০০০
		৮০৫৩২৫৭	৩৬০০০

তার পর জগমোহন রায় রেভিনিউরীকৃত কবালার দ্বারা এই তিন খানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। ১৭২২ সালে তিনি রেভিনিউ বোর্ডের নিকট নামজারী এবং মূল পবগণা হইতে এই তিন খানি তালুক পৃথক করিবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দরখাস্তে জগমোহন রায় বলিয়াছেন, বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব কালেক্টর রবার্ট আয়ারল্যান্ডের (Mr. Robert Ireland) মৃত্যুর পর এবং কালেক্টরীর আমলাদিগের চাতুরী বশতঃ (the trick of the amlahs) দরখাস্তকারীকে তালুক তিন খানিতে দখল দেওয়া হয় নাই (have not obtained

† Board of Revenue, Proceedings, 2 May 1791, No. 29.

‡ Burdwan Records, Vol. 47, No. 329. ডষ্টর বর্তমান সময় সজমদার বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর কাগজপত্র অনুসন্ধান করিতেছেন। বর্দ্ধমান মহালেজ খানার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যেজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ কর্মী এবং রেকর্ড-কিপার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

* Burdwan Records, Vol. 21, No 11, p 46.

† Burdwan Records, Vol. 46, No. 157.

possession)। এই দরখাস্ত সম্বন্ধে বৈফিৎ দিতে গিয়া বর্ধমানের কালেক্টর (Ynyr Buget) তাঁহার ১৭২২ সালের ১৩ই মে তারিখের চিঠিতে লিখিয়াছেন—

The Mehals in question are well known to have been purchased by the Late Ranny, in the names of the parties above-mentioned, and as Jugmohun is the son of Ramcaunt Roy who possessed the uncontrolled management of the Ranny's affairs, there are grounds to suppose that this private sale to his son is entirely an act of his own, and that the parties who signed the Cowlah, had never further interest in the lands, than permitting them to be purchased and stand in their names till the transfer by private sale to Jugmohun.*

এই চিঠিতে উল্লিখিত পরলোকগতা রাণী (Late Ranny) বর্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারী। রামকান্ত রায় এই মহারাণীর এট্টেটের সর্বস্বত্ব ছিলেন। ১২০৫ সনে (১৭২৮-২৯ সালে) মহারাণী বিষ্ণুকুমারী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই তিন খানি মহালের জন্ত বিষ্ণুকুমারীর গুয়ারিশরূপে মহারাজ তেজচাঁদ ১৭২২ সালের ১৩ই জুলাই (১২০৬ সনের ৩১শে আষাঢ়) বর্ধমানের দেওয়ানী আদালতে রামকান্ত রায়ের এবং জগমোহন রায়ের বিরুদ্ধে স্বত্বাব্যবস্থার মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালতে জগমোহন রায়ের হার হইয়াছিল; প্রোভিন্সিয়াল আপিল আদালতে জিত হইয়াছিল; কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতে আবার হার হইয়াছিল। ১৮০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সদর দেওয়ানী আদালতে, দ্বিতীয় আপিল নিষ্পত্তির পূর্বেই, রামকান্ত রায় পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত জগমোহন রায়ের উপর তিন কোর্টেব মোকদ্দমা খরচ এবং বেকর বৎসর মহাল তাঁহার দখলে ছিল সেই বৎসরের মুনাকার টাকা ডিক্রী দিয়াছিল। যদি ১২০৫ সালে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু না হইত তবে হুদা রসিকপুর্বাদি তালুক লইয়া মহারাজ তেজচাঁদ মোকদ্দমা করিবার সুযোগ পাইতেন না; তালুক তিন খানি জগমোহন রায়েরই থাকিয়া যাইত, এবং তাঁহার একারই থাকিয়া যাইত।

উপরে উক্ত হইয়াছে, রামকান্ত রায় দেড় লক্ষ টাকার কিছু অধিক জমায় বর্ধমান জেলার দুইখানি খাস মহাল

ইজারা রাখিতেন। ১২০৬ সনের এই দেড় লক্ষ টাকা জমায় মধ্যে ২৮৫১৮/০ বাকী পড়িয়া ছিল, এবং এই সময় উভয় তালুকের ইজারার মিয়াদও কুরাইয়াছিল। এই জন্ত রামকান্ত রায়কে ১৮০০ সালের বে মাস হইতে বর্ধমানের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল এবং তাঁহার জামীনে জগমোহন রায়কে ১৮০১ সালের জুন মাসে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। আবার হরিরামপুরের ১২০৭ সনের সদর জমায় মধ্যে ৬৭৪২৮/১৯ বাকী পড়িয়াছিল।* ২ই মে তারিখে এই বাকী রাজস্বের জন্ত বর্ধমানের কালেক্টরীতে হরিরামপুর নীলামে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। নীলাম আরম্ভ হইলে ২১০০ একুশ গজ টাকার বেশী মূল্য কেহ দিতে চাহিল না। তখন বর্ধমানের কালেক্টরের প্রস্তাব অনুসারে মহালখানি পবে নীলাম করা স্থির হইল। হরিরামপুর মহালের নীলাম মকুব রাখিবার জন্ত জগমোহন রায় ১৮০১ সালের ১৩ই মে একখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। এই দরখাস্ত সম্বন্ধে বর্ধমানের কালেক্টর তাঁহার ১৮০১ সালের ১৫ই মে তারিখে বোর্ডকে যাহা লিখিয়াছেন তাঁহাব নিম্নোক্ত অংশ হইতে জগমোহন রায়ের এবং রামকান্ত রায়ের তৎকালের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়—

P. 4. With respect to Harreerampore the property of Jugomohun Roy, I deem it my duty to state that on the 13th instant the proprietor presented a petition to me, stating that the Boro crops, from which he expected to have received a sum nearly adequate to discharging the arrears due to Government, had been utterly destroyed by storms of hail which happened in the months of Chyete and Bysack, and praying that Government would for the present be pleased to receive from him Sicca Rupees 3,000 in part of the arrears, and permit him to discharge the residue being 6300.8.12. by instalments during five months.

P. 5. It is to be observed that this Talook was proposed for sale in discharge of arrears due from it account the past year, and of arrears account 1206 due from Ramcaunt Roy, farmer of Bhoorsut &c., and father of the Talookdar, who was his security. It being well known that Ramcaunt Rai, who is a man of property, could, if inclined, immediately discharge the arrears due on account of his Farr, and also the amount due from his son's Estate, and as the present representation of the alleged calamity, which I imagine must be exaggerated, was not received until several days after the Lands have been put up to sale, I do not conceive that prayer of the petitioner is worthy of much consideration. It appearing however that a report was received from the Sesawul under date the 6th instant,

* Burdwan Records, Vol. 47, No. 28.

† Sudder Dewany Select Reports, Vol. I, p. 257.

* Board of Revenue O.C., 15th May, 1801, Separate H.

stating that the Boro crops had been damaged, I have therefore directed him to ascertain as far as practicable the extent of the damage sustained, and the result of his enquiries when received shall be submitted to the Board. Supposing however that the calamity in question has actually befallen the Estate, as 2351.6 of the arrears (exclusive of interest) is due on account of the Farm of Bhoorset &c., for 1206, the Talookdar who was the Farmer's security, has not the smallest claim to have his lands exempted from sale, on account of damage sustained in the end of 1207, and the commencement of 1208, especially as from the small sum offered for the Lands on the 9th instant, it cannot be expected that they will produce a sum more than adequate to the discharge of the arrears due account the Farm.*

১৮০০ সালে রামকান্ত রায় এবং জগমোহন রায় এই পিতা-পুত্রের বৈবাহিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। মূল চিঠি পাঠ না করিলে এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ নয় মনে করিয়া মূল ইংরেজী চিঠির কতক অংশ উদ্ধৃত করিলাম। ১২০৭ সালের চৈত্র মাসের এবং তৎপরবর্তী বৈশাখ মাসের ঋড়ে যে বোরো ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এই কথা কালেক্টর সাহেব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিশেষ কোন অগ্রহ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, এবং পরিণামে তাহা করাও হইয়াছিল না। জগমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের এবং পুত্রের দেনা অকাতরে পরিশোধ করিতে পারেন, এই ধারণা কর্তৃপক্ষের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং ষত দিন না রামকান্ত রায় উভয়ের দেনা পরিশোধ করেন তত দিন উভয়কে কারাগারে আবদ্ধ রাখাই ছিল সরকারের নীতি।

১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে হরিরামপুর তালুক দুই ভাগে বিভাগ করা হইয়াছিল। সোমনগর মৌজা বর্তমান জেলার সামিল, এবং অবশিষ্ট অংশ মেদিনীপুর জেলার সামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।† ১৮০১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সোমনগর মৌজা ২৮৪১/০ মূল্যে নীলাম হইয়াছিল। ইহার এক সপ্তাহ পরে, ১লা অক্টোবর, রামকান্ত রায় তাঁহার দেনার কতক টাকা কালেক্টরীতে দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। এই টাকার সহিত জামীন জগমোহন রায়ের সোমনগর মৌজার মূল্যের টাকার কতকটা ঋণ

করিয়া লইয়া রামকান্ত রায়ের দেনা স্বদ আসল সমেত ৩৩৩৮/৫ ওয়ালীল দেওয়া হইয়াছিল, এবং রামকান্ত রায়কে জেল হইতে মুক্তি দিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এত দিন প্রকৃতপ্রস্তাবে জগমোহন রায় পিতার দেনার জন্ত বর্তমানের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু পিতার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জামীন পুত্রের মুক্তি হইল না; হরিরামপুরের বাকী রাজস্বের জন্ত তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইল।‡ ১৮০১ সালের শেষ ভাগে জগমোহন রায়কে বর্তমানের দেওয়ানী জেল হইতে মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে বদলী করা হইয়াছিল।

জগমোহন রায় সারা ১৮০২ সাল জেলে কাটাইবার পর, যাহারা বাকী রাজস্বের জন্ত মেদিনীপুর জেলে আবদ্ধ ছিল তাহাদের সম্বন্ধে রেভিনিউ বোর্ড রিপোর্ট চাহিলে, মেদিনীপুরের কালেক্টর ১৮০৩ সালের জাম্বারী মাসে তাঁহার সম্বন্ধে এই কৈফিয়ৎ দিলেন—

This defaulter is the son of Ramkaunt Roy who farmed some very profitable Mehals in Burdwan during the period of the decennial settlement and is said to be worth near two lacs of Rupees—I understand that the Raja of Burdwan has a considerable claim upon this man, for which the defaulter, his son, became his security, and that he some time ago obtained a decree against them in the Dewanny Adawlut of Burdwan—It is supposed that, in order to prevent the sale of the lands held by the defaulter in Chitwa in satisfaction of this decree, he purposely fell in arrear last year, that he is determined to remain in jail until he can bring the Rajah of Burdwan to some sort of adjustment of his demand against him and his father, and that, as soon as he can effect this, he will pay this balance and not before. Under these circumstances I conclude that the Board will judge it proper that he should remain in jail until he may make good the whole of his balance.*

এই কৈফিয়তে উল্লিখিত লাভজনক পরগণা অবশ্য ভূরস্ট এবং গোপভূম। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এই দুইখানি পরগণা রামকান্ত রায় ১৫৪২০২/১১ জমায় ইজারা লইয়া ছিলেন। এই দুইখানি মহালের বাবৎ তাঁহার নিজের আওত বোধ হয় প্রায় ২৫০০০ ছিল। তার উপর তহরী-দস্তরী নজর সেলামী ইত্যাদি ছিল। রামকান্ত রায়ের নিকট ভূরস্ট নয় বৎসর কাল (১১৯৮ হইতে ১২০৬ সন) ইজারা ছিল, এবং গোপভূম হয়ত আরও অধিককাল ইজারা ছিল।

* Board of Revenue, Proceedings, 18th May, 1801, No. 56.

† Board of Revenue, O.C., Mis. 21st August, 1801, No. 35.

‡ Burdwan Records, Vol. 51.

* Board of Revenue, Mis. Proceedings, 14th January, 1803, No. 8.

১৭২১ সনের মে মাসে (১১৯৮ সনের গোড়ায়) যখন ভূরহুট পরগণা রামকান্ত রায়কে ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় তখন এই সঙ্গে আরও তিন খানি খাসমহাল আর তিন জন প্রার্থীকে ইজারা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। বর্ধমানের কালেক্টর (L. Mercer) বোর্ডের নিকট তাঁহার ১৭২১ সালের ১লা মে তারিখের চিঠিতে রামকান্ত রায় এবং আর তিন জন প্রার্থী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

Four of the most responsible men of the District. “এই জেলার সর্বাপেক্ষা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকের মধ্যে চারিজন।”†

পূর্বে বড় বড় খাসমহাল ইজারা লইয়া এবং নিয়মমত সদব জমা পরিশোধ করিয়াই অবশ্য বামকান্ত রায় এই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ একজন ইজারাদারকে যে জেলার লোক ধনী মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবাব কোনও কারণ নাই। তাঁহার মত ধনী ব্যক্তি কেন ৫.৬ হাজার টাকা দিয়া পুত্রকে কাবামুক্ত ববেন না তাহা লোক বুঝিতে পারিত না। কাজেই সন্দেহ করিত, বর্ধমানের রাজা পাছে হরিরামপুত্র তালুক ক্রোক করিয়া পাওনা আদায় কবে এই জন্ত জগমোহন বাঘ মহালের রাজস্ব বাকী ফেলিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। এই সন্দেহের কারণ স্বরূপ কালেক্টর সাহেব উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী চিঠিতে বলিতেছেন—

আমি জানিতে পারিয়াছি এই লোকের (রামকান্ত রায়ের) নিকট বর্ধমানের রাজার অনেক টাকা পাওনা আছে, এবং এই বেনার জন্ত সবকারী বাজস্বের দেনাদার তাঁহার পুত্র (জগমোহন বাঘ) জাম ন আছেন। কিছুকাল পূর্বে বর্ধমানের রাজা বর্ধমানের দেওয়ানী আদালতে পিতা পুত্রের উপর টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন। লোকে অনুমান করে (it is supposed), চিতুরা পরগণায় জগমোহন বাঘের যে তালুক (হরিরামপুর) আছে তাহা বাহাতে বর্ধমানের রাজার ডিক্রী টাকার জন্ত নীলাম হইতে না পারে (to prevent the sale of the land) এইজন্ত ইচ্ছা পূর্বক সদব খাজনা বাকী ফেলিয়াছেন। তিনি (জগমোহন বাঘ) স্বেচ্ছা করিয়াছেন, যত দিন না বর্ধমানের রাজার সহিত তাঁহার দাবী সম্বন্ধে একটা বক। করিতে পারেন ততদিন তিনি জেলে থাকিবেন। যে মুহূর্ত্তে এই রখা হইবে তৎক্ষণাৎ তিনি (জগমোহন বাঘ) বাকী রাজস্ব শোধ করিবেন, তাহার পূর্বে করিবেন না।

কালেক্টর সাহেব যে লৌকিক অনুমান এখানে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রটি এই,

হরিরামপুত্র তালুক নীলাম হইতে রক্ষা করাই যদি জগমোহন বাঘের উদ্দেশ্য হইত তবে তিনি তৎক্ষণাৎ যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বাকী রাজস্বের জন্যই এই তালুক নীলাম হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এই তালুকের এক মৌজা, সোমনগর, নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল, এবং বাকী অংশ যে নীলামে বিক্রয় হয় নাই তাহার কারণ সরকারের আশঙ্কা। সরকার নীলামে উপযুক্ত মূল্য পাইবার আশা করেন নাই বলিয়া তালুকের বাকী অংশ নীলামে উঠান নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, ১৮০১ সালের ২ই মে যখন সমস্ত হরিরামপুর তালুক নীলামে উঠান হইয়াছিল, তখন উহার জন্য কেহ ২১০০ টাকা বাকী মূল্য দিতে চাহে নাই। সে বাহাই হউক, এই লৌকিক গুণ্ডবের উপর নির্ভর করিয়া কালেক্টর সাহেব ১৮০৩ সালে বোর্ডকে সুপারিশ করিয়া পাঠাইলেন, যত দিন না বাকী টাকা আদায় হয়, তত দিন জগমোহন বাঘকে জেলে আবদ্ধ কবিয়া রাখা হউক। বোর্ড এই সুপারিশ মঞ্জুর করিলেন।

তারপর ১৮০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অথবা মার্চ মাসের গোড়ায় জগমোহন বাঘ এই মর্মে এক আবেদন করিলেন, তাঁহার আর কোন প্রকাব সম্পত্তি নাই। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় বর্ধমানের রাজার নিকট অনেক টাকা ধারে (very much in debt)। বর্ধমানের রাজা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে রামকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে পাওনা টাকার জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী করিয়া কিছুদিন তাঁহাকে হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ রাখিয়াছিল এবং তার পব বর্ধমানের জেলে বদলী করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার দারিদ্র্য বশতঃ কিছুই আদায় কসিত পাবে নাই। সুতরাং আবেদনকারী (জগমোহন বাঘ) প্রার্থনা করিতেছেন যে তাঁহার নিকট হইতে নগদ ৫০০ টাকা লইয়া, এবং বাকী টাকা আদায় কবিসবার জন্য ছয় বৎসরের কিস্তিবন্দী অল্পমতি দিয়া তাহাকে খালাস দেওয়া হউক। মেদিনীপুরেব কালেক্টর (Mr. T. H. Ernst) জগমোহন বাঘের আবেদনের নকল সহ বর্ধমানের কালেক্টরের নিকট ১৮০৩ সালের ২৫শে মার্চ এই বিববে অনুসন্ধান কবিসবার জন্য অনুবোধ করিয়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। এই চিঠিই উক্ত কালেক্টর (W. Parker.) ৩০শে মার্চ লিখিয়া পাঠাইলেন,

† Board of Revenue, Proceedings, 2nd May, 1791, No. 29

জগমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় এখন বর্দ্ধমানে উপস্থিত নাই। আমি তাঁহার অপর পুত্র রামলোচন রায়কে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, এবং তাঁহার সহিত এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা বার্তা করিয়াছি। সে বলিল, দেড় বৎসর পূর্বে জেল হইতে খালাস পাইয়া তিনি (রামকান্ত রা.) বর্দ্ধমানের রাজাকে মাত্র ৫০০ দিতে পাবিয়াছেন, এবং তাঁহার দৈন্য ৮০০০ আশি হাজার টাকা পবিশোধ করিবার জন্য এগার বৎসরের কিস্তিবন্দী করিয়াছেন। রামবাস্ত রায়ের নিকট বর্দ্ধমানেব রাজার বার্ষিক এক লক্ষ টাকা জন্মের একখানি মহাল ইজারা আছে। এই মহালের মুনাফার উপর সমস্ত পরিবারের জীবিকা নির্ভর করিতেছে। এই মহালের মুনাফার টাকা ভিন্ন অন্য কোন তহবীল হইতে এই দেনা পরিশোধ করিবার উপায় নাই। জগমোহন রায় তাঁহার আবেদনে যে সর্বের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সর্ব বাহতে প্রতিপালিত হয় তদ্বিষয়ে তাঁহারা (রামকান্ত রায় এবং রামলোচন রা.) একযোগে জামীন হইতে রাজি আছেন। তাঁহারা আর কিছু করিতে পাবেন না বা স্বতন্ত্র জামীনও দিতে পারেন না। তার পর বর্দ্ধমানের কালেক্টর লিখিয়াছেন, আমি যাহাদের নিকট অহুসন্ধান করিয়াছি তাহারা সকলে এক বাবো বলিয়াছে, এই পরিবাব এক সময় ধনী ছিল, কিন্তু এখন নিঃস্ব এবং অবস্থা সত্যি শোচনীয়।

এই চিঠি পাইয়া ১৮০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুরের কালেক্টর বোর্ডকে লিখিলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় যদি জগমোহন রায় ১০০০ নগদ দিতে পারে, যদি বাকী টাকা মাসিক ১৫০ হারে দিয়া পরিশোধ করিতে সক্ষম হয়, এবং তাঁহার পিতা ও ভাই (রামলোচন) যদি এই জম্ম জামীন হয়, তবে তাহাকে খালাস দেওয়া যাঁইতে পারে। মেদিনীপুরের অস্থায়ী কালেক্টর আর্গষ্ট সাহেব এই সময় ৫৫৭৮/১৯ গুণ্ডা জগমোহন রায়েব দেনা সন্ধ্যস্ত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতী ১১২০ তদ্রূপ করিয়াছিল ক্রোকদার মীর কুদ্দুস-উল্লা। জগমোহন রায় হবিলামপুরের ১২০৭ সনের সদর খাজনার মধ্যে কতক টাকা বাকী ফেলিলে, ১২০৮ সনের গোড়ায় সরকার তাঁহার মহল কাঁড়িয়া লইয়া মীর কুদ্দুস-উল্লা নামক এক ব্যক্তিকে ক্রোক

সাজোয়াল (সরকার পক্ষের অস্থায়ী তহশীলদার) নিযুক্ত করিয়া মহালের খাজনা আদায় করিতে পাঠাইয়াছিলেন। মীর কুদ্দুস-উল্লা ১১২০ আদায় করিয়া নিজের ডাকিয়াছিল। সবকাব তাহাকে গেরেফতার করিয়া আনিয়া জেলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কালেক্টর সাহেব কুদ্দুস-উল্লার এই ১১২০ দেনা হতভাগ্য জগমোহনের ঘাড়ে চাপাইলেন। তাই তখন তাঁহার মোট দেনা দাঁড়াইল ৫৫৭৮/১৯ গুণ্ডা। ১৭ই মে তারিখের উত্তরে বোর্ড উদ্যোগ পণ্ডী বুখোর ঘাড়ে চাপাইতে রাজি হইলেন না, এবং জগমোহন রায়েব সহিত সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করিবার অহুমতি দিলেন।* ইহার অব্যবহিত পরেই, ১৮০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, রামকান্ত রায় পরলোকগমন করিলেন।

জগমোহন রায়েব কারামুক্তির কাহিনীর বাকী অংশ বর্ণনা করিবার আগে আমরা রামকান্ত রায়ের আর্থিক অবনতির কারণ অহুসন্ধান করিব। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, রামকান্ত রায় মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর এষ্টেটের সর্বস্বত্ব ছিলেন। ১২০৫ সনে (১৮০৮ সালে) বিষ্ণুকুমারী পরলোকগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরবৎসবই (১৭৯৯ সালের ১৩ই জুলাই) মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহারাজ তেজচাঁদ পিতা-পুত্রের নামে তিন খানি মহালের জম্ম স্বত্ত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তেজচাঁদ স্বত্ত্বের মোকদ্দমা রুজু করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন নাই। রামকান্ত রায়ের সহিত তাঁহার অনেক দিন হইতেই বিরোধ ছিল। বর্দ্ধমানেব জজের ১৭৯৬ সালের ১১ই জুলাই তারিখের একখানি চিঠিতে ১৭৮০-৮১ সালে মহাবাজ তেজচাঁদ বাদী এবং রামকান্ত রায় প্রতিবাদী এইরূপ একটি মোকদ্দমার উল্লেখ আছে।† এই চিঠিতে দেখা যায়, এই সময়েও (১৭৯৬ সালে) মহারাজা তেজচাঁদ বাদী হইয়া জজ কোর্টে রামকান্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটি মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। এই সময় মহারাণী বিষ্ণুকুমারী জীবিত ছিলেন। ১৭৯৮ সালে মহারাণীর মৃত্যু রামকান্ত রায়েব এবং জগমোহন রায়েব সর্বনাশের সূচনা

* Board of Revenue, Mis. 30th September, 1803, No 23.

† Burdwan Records, Vol. 25, p. 95.

করিয়াছিল। বর্দ্ধমানের কালেক্টর (Mr Y. Burges)

১৭৯৯ সালের ১৪ই নভেম্বর বোর্ডকে লিখিতেছেন—

Ram Caunt Roy, who holds the Farm of the Pergunnah Boorsoot and Guallaboom under the security of his son, having with him absconded, to avoid the operation of some Decrees passed against him in the Adawlut, I beg leave to suggest the expediency of attaching the Pergunnah, for although the Revenue have been hitherto paid up regularly, there is no saying, as this is the last year of the Farmer's lease whether from the above circumstance, the person left in charge by Ram Caunt Roy may not embezzle and misappropriate the Revenues, to guard against which, I am induced to propose the above measure being adopted immediately, for if it is delayed, till after the month of Poos, little, if any assets can be expected from the Pergunnah.

The Jumma of the Pergunnah farmed to Ramcaunt Roy payable to Government is Sa. Rs. 1549/2592 of which sum there has been paid to the end of Cautic (Kartik) 74,419*

১৭৯৯ সালের ১৪ই নবেম্বর বাংলা ১২০৬ সনের ১লা অগ্রহায়ণ। ইহার পব রামকান্ত রায়েব দুইখানি পরগণার ইজারার মিয়াদের মাত্র বাকী ছিল পাঁচ মাস। বিগত সাত মাসে মোট জমা ১৫৪৯০২/৯৯ মধ্যে ৭৬৪১৯৯ পরিশোধ করা হইয়াছিল। এখনও বাকী ছিল ৭৮৪৮৩/১৯ গড়া। বোর্ড তখনই রামকান্ত রায়েব ইজাবা মহাল ক্রোক কবিত্তে সম্মত হইলেন না। রামকান্ত রায বাকী পাঁচ মাসের মধ্যে সমস্ত বাকী জমা পবিশোধ করিতে পারিলেন না, ২৮৫১৮/ বাকী রহিল। ইহাব অর্থ, ১২০৬ সনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জমাব মহাল হইতে কিছুই তাঁহার মুনাকা হইল না, তাঁর উপব দেনা থাকিল ২৮৫১। রামকান্ত রায বোধ হয় সঞ্চকারী ছিলেন না। সুতরাং এক বৎসরের মুনাকাব টাকা না পাওয়াতে তাহাব আর্থিক অবস্থা ধারাপ হইল। ১২০৬ সনে রামকান্ত রায়েব এইরূপ ক্ষতির মূল বর্দ্ধমানের রাজার সহিত মোকদ্দমা লইয়া ব্যস্ততা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (৫২৪ পৃঃ), বামলোচন রায ১৮০৩ সালের এপ্রিল মাসে বর্দ্ধমানের কালেক্টরকে বলিয়াছিলেন, বর্দ্ধমানের রাজাব বামকান্ত রায়েব নিকট ৮০০০০ আশি হাজার টাকা পাওনা আছে। এই অঙ্কে বোধ হয় ভুলে একটা শূন্য বেশী পড়িয়াছে। ১৮২৩ সালের ১৬ই জুন মহারাজ ভেজটাদ কলিকাতা প্রাদেশিক আপিল আদালতে রামমোহন রায এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়েব নামে ১৫০০২

পনেব হাজার দুই টাকা দাবীতে নালিশ করিয়াছিলেন। আর্জিতে লিখিত হইয়াছিল, রামমোহন রায়েব পিতা এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়েব পিতামহ, রাধানগর নিবাসী রামকান্ত রায বর্দ্ধমানের জমীদারীর অনেক অংশ ইজারা লইয়াছিলেন। পরগণা বুলিয়া এবং বাগড়ির জমার মধ্যে তাহার নিকট ৭০৫১৯ বাকী পড়িয়াছিল। এই টাকা এক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়া তিনি ১২০৪ সনের ১৫ই আশ্বিন (১৮২৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর) কিস্তিবন্দী কবিয়াছিলেন। এই কিস্তিবন্দীর খতে বর্দ্ধমানের জজ এবং রেজিষ্টার এবং হুগলীর ক্রস (Mr. C. Bruce) সাহেব স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই টাকা পরিশোধ না করিয়া রামকান্ত রায ১৮০৩ সালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাব উত্তরাধিকারী রামমোহন রায এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়েব নিকট হুদ সমেত ১৫০০২ দাবী করা যাইতেছে। রামলোচন রায বর্দ্ধমানের কালেক্টরের নিকট অবশ্য এই দেনার কথাই বলিয়াছিলেন, এবং মোটের উপর ৮০০০০ আট হাজার টাকার কথা বলিয়াছিলেন। ভুলে তাহাই ৮০০০০ টাকার আকার ধারণ কবিয়াছে। এই দেনা সম্বন্ধেও রামকান্ত রায বর্দ্ধমানের রাজাব নিকট এক লক্ষ টাকা বার্ষিক জমাব একখানি মহাল ইজারা পাইয়াছিলেন। এক লক্ষ টাকার মহালে তাঁহার আয় অন্ততঃ ১৫০০০ হইত, এবং তহশীল খরচ বাদে তাঁহার অন্ততঃ ৫০০০ টাকা মুনাকা টিকিত। রামকান্ত রায বাঁচিয়া থাকিলে অশ্রু মহালও ইজারা লইতে পারিতেন এবং জগমোহন রায়েব জন্ত সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন। মহালের খাজনা আদায় ওয়াশীল কার্যে জগমোহন পিতার সহযোগী ছিলেন। সুতরাং রামকান্ত রায়েব মৃত্যু কারাবদ্ধ জগমোহন রায়েব সর্কনাশ সাধন করিয়াছিল। তাঁর পর ছন্দা রসিকপুত্রাদি মহাল সম্বন্ধে সদর দেওয়ানী আদালতে ১৮০৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় আপিলে হার হওয়ায় তাঁহার সকল আশাই নির্মূল হইয়াছিল।

এই সেপ্টেম্বর মাসেই জগমোহন রায পুনরায় আবেদন করিলেন, তাঁহাকে খালাস দিলে তিনি নগদ হাজার টাকা দিবেন এবং মাসিক ১০০ হারে বাকী ৩৪৫৮ চৌত্রিশ মাসে পরিশোধ করিবেন। এই কিস্তিবন্দীর জামীন স্বরূপ তিনি

হুই জনের নাম করিলেন—বৈমাত্রেয় ভাই রামলোচন রায় এবং পবগণা গোপভূমের অন্তর্গত দায়সা গ্রাম নিবাসী সভাচন্দ্র রায়। রেভিনিউ বোর্ড এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।* এই হুই ব্যক্তি জামীন হইতে প্রস্তুত আছে কিনা অহুসন্ধান করিবার জন্ত মেদিনীপুরের কালেক্টর (B. Shu-brick) বর্ধমানের কালেক্টরকে চিঠি লিখিলেন। বর্ধমানের কালেক্টর (G. Webb) ১৮০৩ সালের ১৭ই অক্টোবর উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, রামলোচন রায় বর্ধমান জেলার নাই এবং সভাচন্দ্র রায় জামীন হইতে রাজি নহে।†

সভাচন্দ্র রায়কে এবং রামলোচন রায়কে জামীন হইতে সম্মত করিবার জন্ত ১৮০৪ সালের অক্টোবর মাসে জগ-মোহন রায় আবার চিঠি লিখিয়াছিলেন। এই চিঠিখানি মোকদ্দমার নথীর মধ্যে আছে। চিঠিখানির পাঠ বর্তা উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা এই—

পোষ্টাবর
ঐযুত হিরারাম চট্টোপাধ্যায়
দ্বারা

ও পরম কল্যাণীর
ঐযুত জগদীশ মজুমদার
কল্যাণবন্দে

ঐজগমোহন শর্দূপ:

নবম্বর ও পরম শুভানীর্বাদ বিজ্ঞাপনক বিশেষ আমি কেলকটরির কাছারিতে তরক হিরারামপুরের বাকী এক হাজার টাকা নগদ বদে ৩৪৫৮.১২।। চৌত্রিশ শত আঠার সাড়ে উনিশ গুণার কীতিবন্দী চৌত্রিশ মাসেব করিয়া ঐযুত রামলোচন রায় ভায়া ও ঐযুত সভাচন্দ্র রায়ের শাল জামিনের একরার করিয়াছি রায় দিগ পের এতরায়ের নিমিত্ত আপনাত্ত কৃত্যশের (জীভাশের) জমি কুকনগর দিগরের এবং পুন্ডরি ও বিনা আরম্ভ...দিগরের শতবর রাখিয়া করার মত টাকা আদায় না করি রায় মজুমদার এ জমি দিগর আপন একতিয়ারে বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিবেন এই ষত মতন লিখিয়া দিয়া আপনারা হুই জনার সাক্ষী হইবেন আপনি ষত যে লিখিয়া দিবেন তাহা আমার মনজুর ইষ্টাম্প কাগজে আমি দস্তখত করিয়া পাঠাইতেছি কুশলমিতি তা ৭ই কার্তিক

এই চিঠি খানিতে তারিখ দেওয়া আছে, সনটি দেওয়া নাই। সন হইবে ১২১১ এবং ঐষ্টাব্দের তারিখ, ১৮-৪ সালের ২১ অক্টোবর। এবার সভাচন্দ্র এবং রামলোচন জামীন হইতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই হিরারাম চট্টোপাধ্যায় এবং সভাচন্দ্র রায়কে গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের পক্ষ হইতে সাক্ষী যাস্ত করা হইয়াছিল এই কথা পূর্বে প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে।‡ ইহার কেন যে জবানবন্দী দেন নাই, এমন কি সগিন-ও

গ্রহণ করেন নাই, এই চিঠি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। গোবিন্দপ্রসাদের দাবী সমর্থন করিতে হইলে এই চিঠিখানি এবং জগমোহন রায়ের কারামুক্তি সম্বন্ধীয় সকল কথা ইহাদিগকে অস্বীকার করিতে হইত। জগমোহন রায় নগদ টাকাটা হাওলাত লইলেন রামমোহন রায়ের নিকট হইতে। তাঁহার ১২১১ সনের ৩৭ ফাল্গুনের অর্থাৎ ১৮০৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক হাজার টাকার হাওলাত রসিদপত্র পূর্বেই সচিব প্রকাশিত হইয়াছে।† এই হাজার টাকা এবং জামীননামা দখল করিবার পর জগ-মোহন রায় খালাস পাইয়া বাড়ী নিরিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেল হইতে খালাস পাইয়া জগমোহন রায় ৭ বৎসর বাঁজিয়া ছিলেন। বর্ধমানের এবং হুগলীর আদালতে রামকান্ত রায়ের কয়েকটি পাওনা টাকার ডিক্রী ছিল। জগমোহন রায় জেল হইতে খালাস পাইয়া আসিয়া এই সকল টাকা ওদাখিল করিলেন। ভাগিনের গুরুদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছে, জগমোহন রায় এইরূপে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে রাম-কিশোর রায়ের নিকট হইতে প্রায় হাজার টাকা, এবং বিনোদরাম সমদারের নিকট হইতে ৪।৫ শত টাকা। বেচারাম সেন প্রভৃতি অন্যান্য সাক্ষী রামকান্ত রায়ের অন্যান্য খাতকের নাম করিয়াছেন। রামকান্ত রায়ের আর হুই পুত্র, রামমোহন এবং রামলোচন রায়, পিতার ওয়ারিশ রূপে এই সকল ডিক্রীর টাকার অংশ দাবী করেন নাই।‡

মোকদ্দমার নথীর মধ্যে জগমোহন রায়ের দস্তখতী একখানি মূল একরারনামা আছে (চিহ্ন দ্রষ্টব্য)। নিরুদ্ধত এই একরার নামা পাঠ করিলে জগমোহন রায়

+ প্রবাসী, ১৩৪৩, আশ্বিন, ৮৫০ পৃ: ১।

† বাটোয়ারার পর রামলোচন রায় ও নিজের অবহার উন্নতি করিয়াছিলেন। ১৮০৫ সালের ১০ই আগষ্টের একখানি চিঠিতে বর্ধমানের, অস্থায়ী কালেক্টর জর্জ ওবেব (George Webb) লিখিতেছেন, "By the records of my office it appears that 1535 Biggahs and 5 cottas of rent free Lands stands in the name of Ramlochan Roy one of the securities tendered by Jugmohun Roy." Burdwan Records, Vol. 65, No. 33,

* Board of Revenue, Procs. 30th Sept., 1803 No. 23

† Board of Revenue, Proceedings, 27th January, 1804, No. 4 (Enclosure).

‡ প্রবাসী, ১৩৪৩, পৌষ, ৩৪৪ পৃ: ১।

মুক্তিলাভ করিয়া কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার
আভাস পাওয়া যায়—

শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন রায়

বরাবর

লিখিতঃ শ্রীজগমোহন রায় কল্প একবার পত্রমিহ কার্যকর আশে
আমরা কাবিলপুরের আয়না কলকী আমার দস্তখতি খত দ্বারা জ্ঞে সনা
আছে এবং ইন্তক সন ১২১৫ সালে নাং (লাগায়ৎ) সন ১২১৭ সাল
তোমার তালুক তরফ বিরলোকের মধ্যে যে কএক মহাল লক্ষুডপাড়ার
সামিল তহনীল ছিল আর সন ১২১৬ সাল নাগাইত তরফ কৃষ্ণনগর
ইজারায় মাল গুজারির বাকী হিসাবে বই (?) জে হইবেক এবং ঐ
কৃষ্ণনগর তোমার তালুক আই আমের সন ১২১৭ সালের হিসাব বই (?)
যে সেনা হইবেক তাহা আমি নিজে হইতে বিনা গুজরে দিব এতদার্থে
একরায় লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২১৮ সাল তারিখ ১১ আশাষ ১৭*

বেচারাম সেন জেরার উত্তরে বলিয়াছে, ১২০৫ সনে
(১৭৯৮-৯৯ সালে) জগমোহন রায় ১২০০ টাকাতা মূল্য
(কাবিলপুরে) ৪০০ শত বিঘা আয়মা জমী খরিদ করিয়া
ছিলেন। বেচারাম সেন আরও বলিয়াছে, জগমোহন রায়
এই আয়মা জমী ১৬০০ টাকা ধার লইয়া রাজীবলোচন
রায়ের নিকট রেহাণ রাখিয়াছিলেন। এই ১৬০০ টাকার
মধ্যে রাজীবলোচন রায় ১২০০ নগদ দিয়াছিলেন, এবং বাকী
৪০০ টাকা নগদ না দিয়া জগমোহন রায় যে রামমোহন
রায়ের নিকট ৪০০ ধারিতেন তাহা গুয়াশীল দিয়াছিলেন।
বেচারাম সেন আরও বলিয়াছে, এই রেহাণী খত লেখার

সময় সে উপস্থিত ছিল, কিন্তু খতে সাক্ষী হয় নাই। বেচারাম
সেন উপরে উদ্ধৃত একরায় পত্রও স্বীকার করিয়াছে, এবং
বলিয়াছে, ১২১৫ হইতে ১২১৮ সনের মধ্যে নায়েব জগন্নাথ
মজুমদারের অস্থপস্থিতে জগমোহন রায় কৃষ্ণনগর এবং
বীরলোক তালুকের তহনীলদারী করিয়াছিলেন। উপরে
উদ্ধৃত একরায় পত্র সম্পাদনেব দশ মাস পবে, ১২১৮
সনের চৈত্র (১৮১২ সালের মার্চ-এপ্রিল) মাসে জগমোহন
রায় পরলোকগমনক বিয়াছিলেন। হরিরামপুত্রের বাকী
খাজানার মধ্যে নগদ ১০০০ এক হাজার টাকা বাদে
অবশিষ্ট ৩৩৫৮ টাকা পরিশোধ করিবার জন্য কারামুক্তির
সময় তিনি মাসিক ১৫০ টাকা হারে কিস্তিবন্দী করিয়া
আসিয়াছিলেন। কারামুক্তির পর সাত বৎসরের মধ্যে
জগমোহন রায় এই দেনার এক কিস্তি টাকাও পরিশোধ
করিতে পারেন নাই।

সবকারী চিঠিপত্র, জগমোহন রায়ের দস্তখতী চিঠিপত্র,
এবং অন্যান্য দলিল সপ্রমাণ করে, বাঁটোয়ারার পর হইতে
মৃত্যু পর্যন্ত রামকান্ত রায় এবং জগমোহন রায় বিবয়-সম্পত্তি
এবং দেনা-পাওনা সম্বন্ধে রামমোহন রায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক
ছিলেন। তারিখী দেবীর গোঁড়ামি এবং অভিমান,
গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের অনভিজ্ঞতা, এবং কুলোকের কুপরামর্শ
এই সর্বনাশকারী অমূলক মোকদ্দমার মূল।

* ১৮১১ সালের ২৪শে জুন।

মেঘ, চিল, কৃষ্ণচূড়া

শ্রীস্বামীচন্দ্র কর

বড় বড় কালো মেঘ অসংখ্য-সে,
দৈত্যদলের মতো কোমর কঁষে
ঐ ছুটে চলে আজ আকাশ জুড়ি
কে আগে যাবে-যে তাই কী হুড়াহুড়ি !
দেখা-না-দেখাতে মিশি' মেঘেরি তলে
অতি ছোট দুটি চিল উড়িয়া চলে।

ছোট তারা তবু চায় হারাতে মেঘে
কৌতুকে প্লকিত চলার বেগে।

কৃষ্ণচূড়ায় মেলি' পুষ্প-আঁখি
স্বদূরে দিগাঙ্গনা দেখিছে তা' কি।

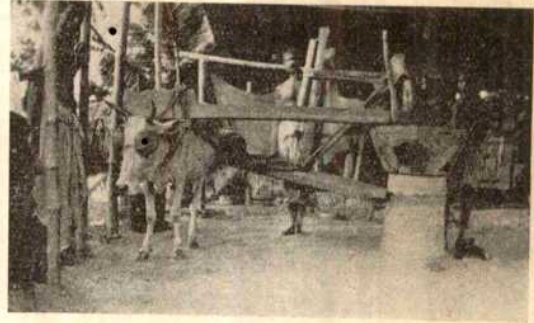
কুটীরশিল্পে কলুর ঘানি

শ্রীসত্যীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

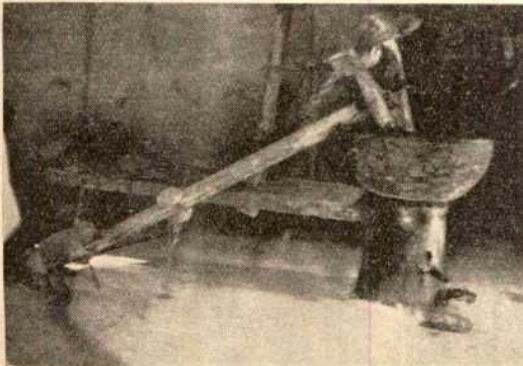
যে-সকল দ্রব্য কুটীরে কুটীরে উৎপন্ন হইতে পারে, কলকারখানার সহযোগে সেগুলি অল্প খরচায় উৎপন্ন করিয়া বেচিতে গেলে সস্তার জগ্গই তাহার কাটতি হয়। কলওয়ালার রোজগার হয় এবং কলের সম্পর্কিত অল্প কতক লোকেরও ভাল রোজগারের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু অপর দিকে ঘরে ঘরে অনেক লোক কর্মহীন হইয়া বেকার বনে ও সমাজের ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। যেখানে জনসাধারণ কাজ করিতে ইচ্ছা করিলেও কাজ পায় না এবং কাজ না-পাওয়ার জগ্গ অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পায় সেখানে কুটীরে কুটীরে মাহুষের হাতের শ্রমে গড়া জিনিষকে কলের সস্তা জিনিষের তুলনায় অধিক মূল্য বলিয়া ত্যাগ করায় সমাজ আত্মঘাতী হয়। একটা কথা ভুল হইলেও শাসক-সম্প্রদায় অনেক দিন হইল শিখাইয়া আসিতেছেন যে ভারতবর্ষ “কৃষি-প্রধান দেশ”। কথাটা যে কত বড় মিথ্যা তাহা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় জালাময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, হিসাব কষিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ “কৃষি ও শিল্প প্রধান” দেশ ছিল এবং ইংরেজের শাসনকালে ভারতবর্ষ নিরন্ন ও শিল্পহীন

হইয়াছে এবং শিল্প নষ্ট হওয়ায় প্রতি বৎসরই কতক লোক জমির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে।

আজ যেমন, তেমনই পূর্বেও ভারতবর্ষের লোকের শিল্পজাত দ্রব্যের শত প্রয়োজন ছিল। ছুতার, কামার, কুমার, সেকরা, তাঁতি, জোলা, কলু, সূতা-কাটুনী, ধান-ভানুনী, চামার, মুচি, রংরেজ—ইহাদের সকলেরই কাজ ছিল। ইহারা এবং ইহাদের মত আরও শত শত শিল্পে নিযুক্ত লোক সমাজের নানা প্রয়োজন জোগাইয়া বাঁচিত ও সমাজকে জীবিত রাখিত। ছুতারের কাজ কমিয়া গিয়াছে। জল- ও স্থল-পথের জগ্গ যান প্রস্তুত করা তাহাদের বড় কাজ ছিল—



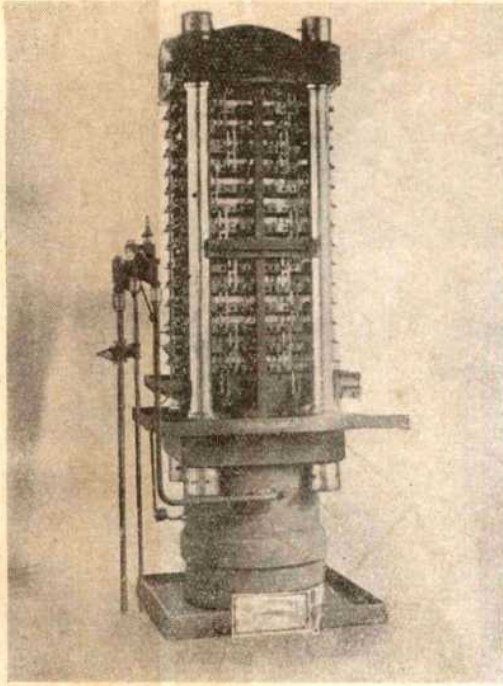
দেউলা গ্রামের চলতি ঘানি—খাদি-প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে



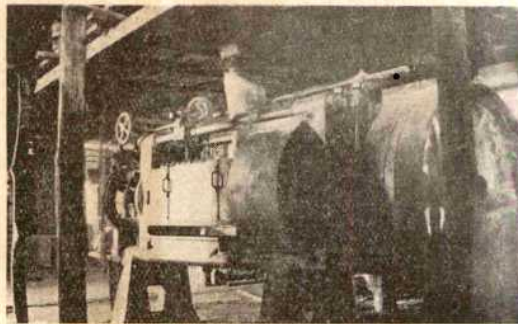
দেউলা গ্রামের পরিত্যক্ত ঘানি—বৎসরাধিক কাল
এই ঘানি বন্ধ রহিয়াছে



দেউলা গ্রামের নারিকেল-বাগান

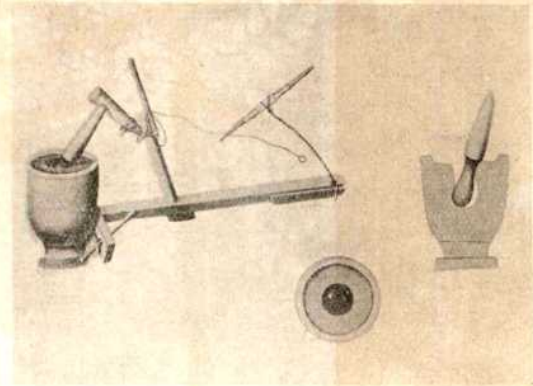


হাইড্রলিক প্রেস



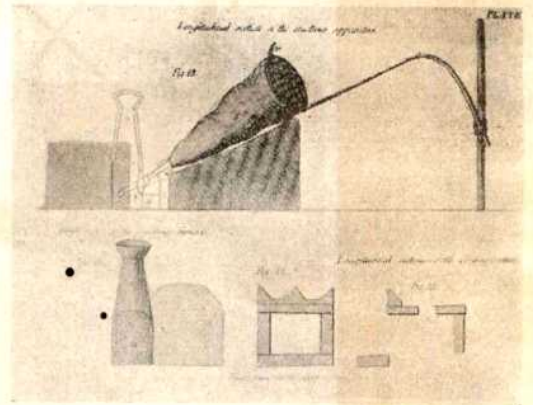
এক্সপেলার অফেন-মিল

সে কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কামারের কাজও আজ অনেক কম। কৃষির যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত আজ বিদেশী বা দেশী কারখানায় এমন সম্ভায় উৎপন্ন হইতেছে যে গ্রাম্য কামারের প্রস্তুত অনেক জিনিষ আর চলে না। কামারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। কামারের জন্ত লোহা প্রস্তুত করার কাজও দেশেই হইত। বিদেশ হইতে লোহা আসিত না, এ-দেশ হইতে কুটারজাত লোহা বিদেশে যাইত,—যদিও আজ ইহা স্বল্পবৎ মনে হয়।



বাঙ্গালোরের ঘানি (১৮০০)

[ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত (১৮০৭) হইতে গৃহীত চিত্র]



মালাবারের লৌহগলান চুল্লী (১৮০০)

[ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে গৃহীত চিত্র]

তাঁতি-জোলা ত মরিয়াই গিয়াছে। কটন মিলগুলি তাহাদের কাজ করিতেছে। যদিবা অল্পসংখ্যক তাঁতি কোনও রকমে বাঁচিয়া আছে, তথাপি যে-কলের সূতা তাহারা বুনে সেই কলই আবার তাহার প্রতিদ্বন্দী। কল যদি নিজ কামা লাভ করিতে পারে—অর্থাৎ দেশের সমস্ত কাপড় কলই বুনিবে এই সাধনায় সার্থক হয়, তবে অবশ্য তাঁতিরা নিশ্চুল হইবে। কলের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটারের একটানা হার হইয়া আসিতেছে। ধানভানার কাজ কল দিয়া করার ফলে অনেক স্থানে ঘরে ঘরে ঢেঁকি বসিয়া আছে। সূতা যাহারা কাটিত, যাহারা হাতে-কাটা সূতায় এক কালে সারা



বধু
শ্রীমতী নিবেদিতা বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



ভারতের জীপুরুষের লক্ষ্য নিবারণের বস্ত্র জোগাইয়া আসিয়াছে, কল আজ তাহাদের কাজ কাড়িয়া লইয়াছে। বর্তমানে খাদির জন্ত চেষ্টা চলিতেছে, কিছু সূতা কাটান হইতেছে। যে-স্বধ্য নিবিয়া গিয়াছিল তাহার চিহ্নরূপ একটা মাটির প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে মাত্র। একবার একটা শিল্প লুপ্ত হইলে প্রতিফুল জন-মনোভাবের ভিতর তাহাকে পুনরায় দাঁড় করান যে কত কঠিন তাহা খাদিতেই দেখা যাইতেছে।

আজ বিশেষ করিয়া একটা শিল্পের কথা বলিব যাহা এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ঘানির কথা বলিতেছি। তেল রান্নার জন্ত চাই, গায়ে মাখার জন্ত চাই। ‘তেলে জলে বাঙালীর শরীর’ কথাটা সত্য। গৃহশিল্প হিসাবে কলুর আবহমান কাল ঘানি হইতে তেল প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কলওয়াল বসুকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে কেন। তাহারা কলুর ঘানিখানা, যেমনটি ঠিক তেমনই লয়—গরুর বদলে এঞ্জিন জুড়িয়া দেয়। কাঠের জাট ফেলিয়া লোহার জাট বসায়। এঞ্জিন দ্বারা গরুর কাজ করাইয়া কতকটা সস্তায় তেল হয়—কিন্তু বিশেষ সুবিধা হয় না। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘানি চলে। শহবে কল বসাইয়া সে তেল দূরে দূরে জোগাইয়া ঘানিকে পরাজয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কলের তেল শহরের সীমানাতেই প্রায় বন্ধ থাকে। কিন্তু কলওয়াল ব্যবসার প্রসার চাহে। সমস্ত ঘানিই কলের ঘানি হউক—সবটা তেল কলওয়ালই দিবে, এই ত কলওয়ালার কাম্য। কিন্তু যেখানে কুটীরশিল্প হিসাবে ঘানি চলে সেখানে কলের তেল সস্তায় পৌছান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন কল গ্রাম্য ঘানির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তেলে ভেজাল দিতে আরম্ভ করে। লোকে সস্তা চায়, খাঁটি ভেজাল বিচার করে না। কলের তেল নিকট হইলেও সস্তা বলিয়া মাত্র শহরের লোকে কিনিত, কিন্তু ভেজাল দেওয়া গ্রামেও প্রবেশ করিয়া ঘানিকে পরাজিত করিতে লাগিল। একটা উদাহরণ দ্বারা বিষয়টা স্পষ্ট করিব।

অতীত কালের শিল্প-প্রধান গ্রাম

কলিকাতার জনসংখ্যা যখন বাড়িতে থাকে তখন নিকটবর্তী অনেক স্থানে নূতন নূতন ঘানি বসিতে থাকে।

আজ কলিকাতা হাওড়া মিলিয় লোকসংখ্যা বারো লক্ষ এই বারো লক্ষ লোকের তেল জোগাইতে বারো হাজার গ্রাম ঘানি ত দরকার। প্রতি শত লোকে একখানা ঘানি ধরিয়া লইতেছি। দশ-বার হাজার ঘানি কলিকাতার উপকণ্ঠে কোনও দিন বসিয়া গিয়াছিল এ-কথা মনে করার হেতু নাই। কলিকাতায় কলের ঘানি বহু বর্ষ হইতে চলিতেছে, তথাপি কলের ঘানির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য ঘানিও যে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল কলুর বা কলু-প্রধান গ্রাম কলিকাতার কাছাকাছি অনেক আছে। এত তেল সে-সকল গ্রামে উৎপন্ন হইতে পারে যে সে-গ্রামের চা পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক কোনও মতেই তাহা ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদের প্রধান কাজ ছিল কলিকাতায় তেল জোগান।

দেউলে নামে এমনই একটি গ্রাম দেখিতে গেলাম। গ্রামে চল্লিশখানা ঘানি ছিল, যদিও লোক চল্লিশ ঘর হইবে না। কলু ভিন্ন অন্য জাতের লোক, নাগিত ঘোপা চামার সামান্য ব্যবসা মাত্র গ্রামে আছে। আত্মিকার দিনে চল্লিশখানার মধ্যে মাত্র ছয়-সাতখানা ঘানি চলিতেছে—তাহাও নিয়মিত চলে না। নিকটেই একটা বড় রকম হাট আছে। তেল ও খইল এই হাটে বরাবর খুব উঠিত। তেল যাইত শহরে আর খইল লাগিত গরুর জন্ত ও চাষের জহু গ্রামের কাজে। কলুয়ের অবস্থা এককালে খুব ভালই ছিল। কাহারও কাহারও প্রাসীর-দেওয়া পাকা বাড়ী আছে। জমিজমা মন্দ ছিল না। এ সমস্তই ঘানি হইতে হইয়াছিল। এখন কিন্তু গ্রামখানি নিরানন্দ ও অবসাদগ্রস্ত, কোনও জীবন নাই। প্রতিপদে অলসতার ও দারিদ্রের ছাপ চোখে পড়ে। গ্রামে প্রবেশ করা মাত্রই এক দল বাসক-বালিকা আমাদের স্বর্গ লইল। আমাদের মধ্যে কিছুই বিশেষ ছিল না, তবে আমরা যে গ্রাম্য লোক নহি, শহর হইতে কিছু দেখিতে আসিয়াছি তাহা ছোট ছেলেও বুঝিতে পারে। আমরা যত গলি গলি ঘুরিতে লাগিলাম ছেলেগুলের সংখ্যা তত বাড়িতে লাগিল। গণিয়া দেখি যে পঁচিশটি মঙ্গ লইয়াছে। যে-বাড়ীতে ঘানির ধোঁজ করিতে যাই ছেলেরা সে-বাড়ীর প্রাঙ্গণ ভরিয়া ফেলে, ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, ঘর ঘানি দেখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঘাব। ঘানি-ঘর অনেকগুলি

দেখি অন্ধকার, ঘানিও বন্ধ আছে। তখন বেলা সাড়ে চারটা, বর্ষা কাল, তথাপি আলো জ্বলাইয়া ঘরের ঘানি দেখিতে হয়। ঘানি আমরা দেখি, ছেলেরা আমাদেরকে দেখে, নিজেরা বলাবলি করে, তাহার পরে কোন্ বাড়ী যাইব সে-জন্মনা করে—আমাদের পূর্বেই ত তাহাদের পৌছিয়া থাকা চাই।

ঘানি দেখিলাম। স্থলর নিপুণ ভাবে তৈরি যন্ত্র। অল্পে পড়িয়া আছে। সর্বত্রই এক কথা। তেল-বিক্রমে আর পোষায় না, সেই জন্ত ঘানি বন্ধ। “ঐ যে কয়লা চলিতেছে?” কি করিয়া চলিতেছে সে-আলোচনা নিশ্চয়োজ্ঞ। আমরাও ততক্ষণ তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু ঘানি অপেক্ষা এই ছেলের দল আমার মন অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। গ্রামে আমাদের যাইতে হয়। এমন গ্রামে ছুড়ি বা বস্তার সাহায্য দিতে গিয়াছি যেখানে বিদেশী ভ্রম-লোক কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা হয়ত তিন জন এক দলে। পথে দেখা পাইয়া ছেলেমেয়েরা উজ্জ্বল বাড়ীর দিকে দৌড়াইয়াছে। বুনো জানোয়ার দেখিলে যে-অবস্থা হয় তাহাদের সেই অবস্থা হইয়াছে। চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়াছে, পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছে। নিকটে গেলে আরও ভয় পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এ তেমন নয়। কলিকাতার উপকণ্ঠেই গ্রাম। আমাদেরকেই ইহার পর্যবেক্ষণের বস্তু করিয়াছে। গ্রাম্য পথপ্রদর্শককে জিজ্ঞাস করিলাম, ছেলেরা এমন ভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে কেন—পাঠশালা নাই বুঝি? চৌদ্দ বছরের ছেলেও ত কয়টি দেখিতেছি। কোনও কাজ নাই নাকি? গরু চরান, ঘাস কাটা, বাড়ীবা কাজ? না, কোনও কাজ নাই। পাঠশালা যাইবে কি, ঘরে খাওয়াই জোটে না। বেতন দেওয়ার শক্তি নাই। ছেলেমেয়েগুলির কথাবার্তা “ও চালচলন দেখি” কষ্ট হইল। সমস্ত গ্রামটার শ্রীহীন ভাব উহাদের ভিতর দিয় দেখিতে পাইলাম।

এমন কেন হইল? তাহারা বলিল যে এমন ছিল না এক কালে গ্রামের শ্রী ছিল—তখন ঘানি চলিত। বাপ-দাদ বাড়ী ঘর রাখিয়া গিয়াছে, জমিজমাও কিছু ছিল, আজ বড় নাই। এখন আর ঘানি চলে না।

“জমিজমা যে সামান্য আছে তাহা নিজেরাই চাষ করত?”

“নিজেরা চাষ করিব কি, চাষ করিতে ত কখনও শিখি নাই।”

“বসিয়া থাক অথচ নিজের জমি অপরকে দিয়া চাষ করাও?”

“হা, কি করিব। চাষ ত জানা নাই। পূর্বে অবস্থা ছিল ভাল, ঘানির কাজ করিতাম, তাহাই জানি। চাষ শিখিতে হয়, হাল-গরু রাখিতে হয়। আব কতটুকুই বা জমি আছে তাহাতে চাষ করাও পোষায় না—বরোগা দেওয়া হয়।”

“তাহা হইলে চলে কি করিয়া?”

“কেহ কেহ এ-কাজ সে-কাজ করে, কেহ বা বসিয়াই কাটাইতেছি।”

“তবুও সন্সার চলে কি করিয়া?”

নারিকেল গাছগুলি দেখাইয়া বলিল, “উহারাই বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সকল বাড়ীতেই কয়টা করিয়া গাছ আছে। তাবগুলি ভাল দামে বিক্রয় হয়। কতক নারিকেল বুনো করা হয় উহা বেচিলে দাম উঠে না—শুকাইয়া তেল বাহির করা হয়। নিজের ঘানিতে ভাড়াইয়া লই, সময়ে অপরের নারিকেলও ভাড়াইয়া দিই—দুই পয়সা তেলের সের হিসাবে মছরি পাওয়া যায়। তাহার পর নারিকেলের পাতা আছে, উন্নত হইতে বাঁটা হয়, সেগুলিও বেশ বিক্রয় হয়। এই ভাবে চলে।”

দেখিলাম, চলে না। একটা ব্যথা লইয়া ফিরিলাম। লোকগুলি মিষ্টভাবী ও ভদ্র। দারিদ্র্য এ-পর্যন্ত তাহাদের বিনয় ও সদাশয়তা নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহাদের পরবর্তীরা, গ্রামের ছেলেরা, ভিন্ন জিনিষ গড়িয়া উঠিতেছে। যাহারা কল বসাইয়া একটা কুটারশিল্প নষ্ট করে, যাহারা কুটার-জাত বস্তু ত্যাগ করিয়া কলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তাহাদের ভিতর এই ভাবে কলের প্রচলন দ্বারা কি সর্বনাশ হইতেছে এ-কথা ইহাদের বুঝিতে পারা উচিত তাঁহারাও বুঝিতে চান না। গ্রাম দেখিয়া দেখিয়া হতাশার শ্বাস ফেলিতে হয়।

কলের ভেজাল

তেলের কথা জানিলাম। কলেব তেলও বাজার-চলতি দরে পোষায় না ভেজাল ম দিলে। কলওয়ালারা তেল

সস্তা করিতে করিতে প্রতিযোগিতায় এমন অবস্থা আনিয়াছে যে বিশ্বব ভেজাল দেওয়া প্রয়োজন, নহিলে প্রতিযোগিতায় টিকা যায় না। কলিকাতাতেই তেলের কল অনেক। এখান কলঘরের সম্মুখে বিজ্ঞাপন আঁটা হয়—“মিশ্রিত তৈলের কারখানা”। আইন বাচাইবার জন্য এই বিজ্ঞাপন আবশ্যিক। মিশ্রিত মানে ভেজাল সরিষার তৈল। কলে প্রথমতঃ খাঁটি সরিষা হইতেই সাধারণতঃ তেল বাহির করা হয় এবং সেই তেলে রুচি ও লাভ করার ইচ্ছা অল্পব্যয়ী নানা সস্তা ফেল মিশান হয়। ভেজাল দেওয়ার সব চাইতে সস্তা একটা ফেল হইতেছে ‘হোয়াইট অয়েল’। ইহা কেরোসিন ও ভেজেলিনের মাঝামাঝি মোটা খনিজ তেল। ইহার মূল্য ছয় টাকা, সাড় ছয় টাকা মণ। এই পদার্থের রং ঠিক সরিষার তৈলের মত এবং তেলে মিশাইলে তেলের বর্ণবিকার হয় না, গন্ধ কমিয়া যায়। কিন্তু সেজন্য কলে ‘রাই’ সরিষা বেশী মিশ্রিত করিয়া ভাজান হয়। উহার ঝাঁজ বেশী। যথেষ্ট হোয়াইট অয়েল মিশাইলেও চলিয়া যায়। এক প্রকার ঝাঁজালো দ্রব্য কিনিত পাওয়া যায়—উহাতে সরিষার তেলের তীব্র গন্ধ থাকে। উহা মিশাইয়া কেবল হোয়াইট অয়েলকেও সরিষার তেল করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ কতকটা সরিষার তেল মিশান হইয়াই থাকে। এক মণ সরিষার তেল যদি ২২ টাকা হয়, আর এক মণ হোয়াইট অয়েল ৬, তবে সমান সমান মিশাইলে দুই মণ তেলের মূল্য হইল ২৬ টাকা। ১৩ টাকা মণ পড়িল। তখন ১৪ টাকা মণ বিক্রয় করিয়াও লাভ থাকে।

কলুর বিপদ

এই মিশ্রিত তেল মফস্বলের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। শহরে যে-পাড়ায় কলের তেলের কারখানা আছে, তাহার নিকটেই খনিজ তেলের দোকানও বসিয়া গিয়াছে। গ্রামে সরিষার তেলের নামে কলিকাতা হইতে এই তেল যায়। উহা দোকানদারেরা রাখে। কলুর বিপদ কে বুঝিবে। তাহার জীবিকা বজায় রাখিবার জন্য এক সের তেল ঘানিতে করে ত তিন সের কলের তেল কিনিয়া মিশাইয়া সামান্য অশ্বক দামে ঘানির তেল বলিয়া বিক্রয় করে। গ্রামের হাটে কলের তেল অপেক্ষা কলুর তেল এখনও সামান্য বেশী দামে বিক্রয় হয়। কিন্তু সে-ভেদ এত সামান্য যে তাহাতে কলুরা

খাঁটি ঘানির তেল দিতে পারে না। তাহাকেও ভেজাল দিতে হয়। আর, একবার চরিত্র নষ্ট হইলে, বা ব্যবসার ধারা ছুঁট হইলে, পারিলেও অনেকে পারিতে চায় না। অধিন্ লাভের লোভ প্রতিবন্ধক হয়। এই জন্য খাঁটি সরিষার তেল বলিয়া কোনও বস্ত্র বাংলার হাট-বাজার হইতে বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। যেখানে বেগের মাল পৌঁছিতে পারে সেইখানেই এই অবস্থা। আজ যে-ঘানিগুলি আছে তাহা মৃতকল্প। সেগুলিব সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে লোকের বিশ্বাস ভাঙাইয়াই নেগুলি চলিতেছে। লোকে জানিয়া না-জানিয়া, কতকটা সন্দেহ সত্ত্বেও, কলুর তেল তবুও কতকটা খাঁটি, এই বিশ্বাসে ক্রয় করে। কিন্তু এই লোভ-দেখান ঘানির সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। যদি কল খাঁটি সরিষার তেল বিক্রয় করিত, তবে ঘানি মরিত না। লোকের রুচি বদলাইয়া সস্তা ভেজাল তেল খাইতে লোককে অভ্যস্ত করিয়াই কল তাহার প্রতিযোগী ঘানিকে নষ্ট করিতেছে। কলওয়ালাদের ভিতবেও যাহা-না ভেজাল দিতে চায় না, তাহাদের পক্ষে কারবার টিকানো রাখা শক্ত।

ঘানি অপরাধেয়

যতগুলি গৃহশিল্পের যন্ত্র কলের নিকট হার মানিয়াছে ঘানি তাহাদের একটি নয়। কল-চালিত যন্ত্র কেবল গতিশীল বাড়াইয়া ও যাহা-বা পণ্ডর পরিবর্তে এঞ্জিন জুড়িয়া দিয়াই ছাড়ে নাই। দ্রব্যপ্রস্তুতের প্রথার আমূল পরিবর্তন করিয়াছে। হাতে-স্বতা-কাটা চরখা, ও কলের চরখায় সমস্ত পদ্ধতিতেই আমূল প্রবেশ। টেকিতে চাউল হাঁটা হয় মুষলের সহিত ধানের ঘর্ষণ। কলে মুষলের ব্যবহার নাই। কিন্তু ঘানিতে তেমন কিছু ঘটে নাই। গ্রামের ঘানি অন্ততঃ বাংলায় যে-ভাবে চলে, কলের ঘানিও ঠিক তাহা-ব নকলে চলে। সে-ই ঘানি, সেই জাঁট, কলুব ঘরে ও কলঘরে ঠিক এক রকম। তৈলবীজ ভাঙাইতে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির চেষ্টা যে হয় নাই বা প্রচলিত নাই এমন নহে। কিন্তু সে-সকল পদ্ধতি সরিষার বেলায় ঘানির সহিত প্রতিযোগিতায় আজও পারিয়া উঠিতেছে না। কল ঘরা চালিত যন্ত্র নূতন ভাবে প্রস্তুত করিয়া ঘানিকে পরাস্ত করায় চেষ্টা আজও খুব চলিতেছে যদিও সে-সংবাদ আমাদের কলুদের জানাও নাই।

হাইড্রলিক অয়েল-প্রেস

ঘানির পরিবর্তে অপর প্রথায় কলে তেল বাহির করায় একটা রীতি হইতেছে হাইড্রলিক প্রেস ব্যবহার করা। আমার হাতেই কয়েক বৎসর একটি হাইড্রলিক অয়েল-প্রেস ছিল। আমি নিজেই উহা চালাইতাম। উহাতে সরিষা ভাঙার পরীক্ষা করিয়াছিলাম। ঘণ্টায় এক মণ সরিষা ভাঙা যাইত। কলের দাম পড়িয়াছিল ছয় হাজার টাকা। ঘানি অপেক্ষা অধিক তেল সরিষার বেলায় উহা হইতে বাহির কর যাইত না। ঘানির চেয়ে উহা চালাইবার ব্যয়ও অনেক বেশী। কলের দামের ত কথাই নাই। একটা গ্রাম্য ঘানিতে দিনে কুড়ি-ত্রিশ সের সরিষা ভাঙান যায়। বোলখান ঘানি চলিলে দিনে আট মণ সরিষা ভাঙান যায় এবং এরুখানা ছোট হাইড্রলিক প্রেসেও ততটাই ভাঙান যায়। এরুখানা গ্রাম্য ঘানির মূল্য গুরু-সমেত পঞ্চাশ টাকার ভিতর হয়। আট শত টাকায় বোলখানা ঘানির স্থলে হাইড্রলিক প্রেসের দাম ছিল তখনকার দিনে (ত্রিশ বৎসর পূর্বে) ছয় হাজার টাকা। ইহার উপর এঞ্জিন আছে। হাইড্রলিক প্রেসে সরিষা বোলায়ে জুড়াইয়া, থাকে থাকে মেনে সেই গুঁড়া লাঙ্গাইয়া প্রেসে চাপিতে হয়। ইহাতে সরিষার সহিত লোহা ঘষা যায় না। সরিষা গরম হয় না। এই তেল গ্রাম্য ঘানির তেলের মতই উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু। কিন্তু গ্রাম্য ঘানির মত সম্ভায় ইহাতে সরিষার তেল হয় নাই।

ঘানি-কল

হাইড্রলিক প্রেসে সরিষা ভাঙা চলতি নাই—চালান যায় নাই। কলুব ঘানির মতই ঘানি-কল চলিতেছে। কিন্তু কলের ঘানি কলুর ঘানির নকল হইলেও উভয়ের মধ্যে মারাত্মক পার্থক্য আছে। কলের ঘানির জাট লোহার এবং গর্ভ কাঠের কিন্তু লোহাঘেরা। জাট লোহার বলিয়া ঘর্ষণে তেল বিশ্বাদ হইয়া উঠে। আর একটা ভেদ এই যে কুটার-ঘানি মিনিটে দুই হইতে তিন বার ঘোবে। ঘীরে ঘোরে বলিয়া সরিষা গরম হইতে পারে না। কিন্তু কলে সেই ঘানিই ঘোরে মিনিটে ত্রিশ বার। তেল গরম হইয়া বাহির হয়। একটা গ্রাম্য ঘানিতে দশ সের সরিষা যদি চার ঘণ্টায় ভাঙা যায় ত কলের ঘানিতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ভাঙা যায়। একটা

কলের ঘানি পাঁচ-ছয়খানা গ্রাম্য ঘানির সমান। কিন্তু মিনিটে তিন বারের স্থানে ত্রিশ বার ঘোরায় সরিষা ও তেল উভয়ই অতিশয় গরম হইয়া উঠে, তাহার উপর লোহার সহিত ঘর্ষণ ত আছেই। এক বার সরিষার তেল রান্নাব জন্ত গরম করিলে যে-অবস্থা হয় কলের সদ্য-গ্রন্থিত তেলের সেই অবস্থা—বরঞ্চ খারাপ, কেননা কেবল তাপ নয়, লোহার ঘর্ষণেও তেলের বিকার হইয়া থাকে। ফলে, কলেব ঘানির সরিষার তেল যখন খাঁটি সরিষা হইতেও হয়, তখনও কুটার-ঘানির তেল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও বিষাদ হয়। কলের ঘানির খাঁটি তেল গ্রাম্য ঘানির খাঁটি তেলের সমপর্যায়ের পাড়িতে পারে না—উহা নিকৃষ্ট জিনিষ।

কিন্তু কল এত দ্রুত ঘানি চালাইয়াও কলুকে মারিতে পারিত না, যদি না ভেজালের আশ্রয় লভত। কলেব সরঞ্জাম ও চালাইবার ব্যয় অনেক। আর এদিকে কুটারে কলুর জ্বাই অনেক সময় গৃহকর্মের সঙ্গে সঙ্গে ঘানি চালায়, কলু কেনা-বেচা করে ও জীকে সাহায্য করে। কুটার-ঘানি নিতান্তই আটপোঁবে ঘরোয়া জিনিষ। শাস্তভাবে বিনা ঝগাটে বিনা হটগোলে গৃহস্থের গৃহচর্য্যার সঙ্গিত খাপ খাইয়া চলে। এই জন্ত একটা ছোট কলে পঞ্চাশ-ষাটটা ঘানি এক সঙ্গে চলিলেও এবং তাহা গ্রাম্য তিন শত ঘানির সমান হইলেও উহার খরচা বেশী। প্রতিযোগিতায় গ্রাম্য ঘানির কষ্ট হইলেও গ্রামে বসিয়া গৃহব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া গরুব খোরাকী ছাড়া এক প্রকার একই খরচায় চালান যায় বলিয়া গ্রামে উহা আজও চলিতে পারে।

এক্সপেলার কল

ঘানির উপর, কলেব ঘানিব উপর, একটা আক্রমণ আসে এক্সপেলার (Expeller) দ্বারা। এক্সপেলার অল্প সময়ে খুব বেশী সরিষা ভাঙাইতে পারে। উহা একটা খোল বদ্ধ জুর মত জিনিষ। এক দিকে সরিষা লইয়া অপর দিকে ঠেলিয়া থইল কবিত্তা বাহির করিয়া দেয়। খোলের মধ্যে চাপে চাপে সরিষা হইতে তেল ঝরিয়া পড়িতে থাকে। ইহাতে সরিষা আরও গরম হইয়া উঠে, লোহার ঘর্ষণেও খুব বেশী হয়। উহার তেল এত নিকৃষ্ট হয় যে কলের তেল বলিয়াও উহা লোকে লইতে

নারাজ হয়। সরিষার তেল বাহির করিতে এঞ্জেলার চলিল না। এখন উহা কলের ঘানির সহিত প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া মিত্রতা করিয়াছে। কলের ঘানিতে যে খইল বাহির হয় উগতে অতি সামান্য তেল থাকে। এঞ্জেলার এই খইলটা চিবাইয়া শেষ-তেলটুকু বাহির করিয়া ছাড়ে। এক মণ খইল হইতে এক সের তেল বাহির হয়। কেহ কেহ কল-ঘানিব কাজে ক্ষত শেষ করার জন্য কতকটা বেশী তেল খইলে রাখিয়া দেয় ও পরে একসপেলারে চাপিয়া বাহির করিয়া ঐ তেল-ঘানির তেলের সহিত মিশাইয়া দেয়। কিন্তু তেজ-ব্যবসায়ে এঞ্জেলারের ব্যবহার আর একটা নতুন অসাধুতা আনিয়াছে। এঞ্জেলারের খইল দেখা মাত্রই চেনা যায়। উহার মূল্য কলের ঘানির খইল হইতেও কম, উহা লোকে গরুকে খাওয়াইবার জন্য লয় না, সারের জন্যই উহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কলওয়ালাকে উহা হইতে ঘানির খইলের দামই তুলিতে হইবে। সে ঐ কাঠের মত খইল ডিসিটিগ্রেটারে গুঁড়াইয়া লয় এবং সেই গুঁড়ার সহিত কতকটা ঘানির খইল ও গাম মিশাইয়া জলের ছিটা দিয়া পুনরায় ঘানিতে চাপিয়া বাহির করে ও কলের ঘানির খইল বলিয়া বিক্রয় করে।

দেখা যাইতেছে কলের প্রতিযোগিতায় যে-ভাবে ঘানি মরিতেছে সে-ভাবে তাহার মরা অবশ্যস্তাবী নয়। তথাপি যে মরিতেছে তাহার কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, কলের ভেজাল দেওয়ার প্রবৃত্তি ও সুবিধা। যদি ভেজাল বন্ধ হইত তবে কুটীর-ঘানিগুলি বাঁচিত।

কুটীর-ঘানি চালিতে পারে

কুটীর-ঘানিগুলিকে বাঁচাইতে হইলে কলুকে নির্ভরযোগ্য

করিয়া তুলিতে হইবে। বিধাসী মধ্যস্থ দ্বারাও একাজ হইতে পারে। আর একটি বিষয় এই যে সকল ঘানি সমান কাজ দেয় না। ঘানির গঠন জেলায় জেলায় ভিন্ন। ভালমন্দ বিচার করিয়া একটা গ্রহণযোগ্য ঘানি আদর্শরূপে লইলে, যে-স্থানে খারাপ ঘানি চলিতেছে সে-স্থানে প্রভূত উপকার হইবে। আমি এমন ঘানি দেখিতেছি যাহাতে দিনে পনের সের মাত্র সরিষা ভাঙান হয়—আবার অল্পদেখিতেছি, সামান্য প্রভেদের জন্য সেই প্রকার ঘানিতে দিনে ত্রিশ সের হইতে চলিণ দেয় সরিষা ভাঙান হয়। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে এই অধিক সরিষা যে-ঘানিতে ভাঙান হয় তাহাতেও উন্নতিব অবকাশ আছে।

খাদি-প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েকটা কুটীরশিল্পেব উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। ঘানি তাহার মধ্যে অন্যতম। বিধাসী মধ্যস্থের কার্য, অর্থাৎ কলুদ্বারা সরিষা ভাঙাইয়া খাটি তেল ক্রেতাকে দেওয়ার কার্যও খাদি-প্রতিষ্ঠান হইতে চলিতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকখানা গ্রামে পুরাতন অচল ঘানিগুলি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লোকের মন যদি জাগ্রত হয়, যদি কুটীরে প্রস্তুত শ্রেষ্ঠ জিনিষের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয় আসে তবে ঘানি পুনরায় বাঁচিতে পারে। গ্রামে বিধাসী মধ্যস্থের কাজ শিক্ষিত বেকার যুবকেরা করিতে পারে, যদি চরিত্রবলেব সম্পদ ও খ্যাতি তাহাদেব থাকে। ঘানি তাহা হইলে সহজেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়া পল্লীকে কতক অংশে শ্রীমণ্ডিত করিতে পারে। কুটীর-ঘানিকে প্রাথমিক করার মত কল আজও আবিস্কৃত হয় নাই, ঘানির বাঁচব পক্ষে ইহা একটা বড় কথা।



ত্রিবেণী

জীবনময় রায়

৪৩

পরদিন সকালবেলা কমল হাসপাতালে ফিরে গেল।
ঝড়ের পর একটা ক্ষতমজ্জা বনস্পতির যেমন একবকম ভয়-
শাখা ছিন্নপত্র বিকলপ্রায় চেহারা হয় তার মনের ভিতরটাও
কতকটা তেমনি শ্রান্ত শিথিল বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

যাবার সময় সে মালতীকে গিয়ে বললে, “রিদি, আমি
এসেছিলাম সংসারে শুধু দুঃখ ছড়াবার জন্তে। নিরুপায়ে
তোমার পায়ে না-জেনে অনেক অপরাধ কবেছি—ক্ষমা
করো। খোকনকে দেখো। তুমি ছাড়া...”

এইটুকু বলে আর সে সামলাতে পারলে না। ঠোঁটে
ঠোঁট চেপে প্রাণপণে উদগত অশ্রু সঞ্চার করবার ব্যর্থ চেষ্টা
করতে লাগল।

মালতী তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে অশ্রুমুখী হয়ে বললে,
“তোমার ভাল করবার ছুতোয় যাবা তোমার সর্বনাশ করার
ফিকির করে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আয় অপরাধ বাড়িও
না, বোন। আমি বৈতে থাকতে খোকনের কোন ক্ষতি
কেউ করতে পারবে না—”

কমলা গড় হয়ে মালতীর পায়ে প্রণাম করতে করতে
বললে, “তা জানি, খোকনের তুমি এই হতভাগী যার চেয়েও
যে বেশী তা জানি বলেই আজ বুকটা বাঁধতে পেরেছি
দিদি—”

কমলা পায়ে হাত দেওয়ার মালতী যেন অপরাধ-ভয়ে
এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, “ও কি ভাই! অপরাধ হবে
যে! যাট, যাট!” বলে কমলাকে ধরে তুললে। কোন
হুস্তিতে বলা কঠিন, কিন্তু মালতীর মনে কেমন একটা অস্ব-
বিশ্বাসই ছিল যে জ্যোৎস্না বামূনের মেয়ে।

বাইরে ভগলু গাড়ী এনে অপেক্ষা করছিল। কমলা
চোখের জল মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে উঠে
পড়ল। বুকটা ফেটে গেলেও, পাছে তার মনে কোন রকম
দুর্বলতা এসে তার অন্তরের কঠিন সঙ্কল্প থেকে তাকে বিচ্যুত

কবে, এই ভয়ে ধোকার কোন তত্ত্ব সে করলে না। প্রাণ
থাকতে এ-বাড়ীতে সে যে আর পদার্পণ করবে না এ-সম্বন্ধে
কাল সমস্ত রাত্রি প্রতিজ্ঞা করে কঠিন পণে নিজের চিন্তকে
সে প্রস্তুত করেছে না?

জ্যোৎস্নার দুঃখপীড়িত অশ্রুলাহিত মুখখানা মালতীর
মনটাকেও অশ্রুভারাক্রান্ত ব্যথিত করে তুললে। স্বামীর
উপব রাগে বিরক্তিতে মনটা তার তেতো হয়ে উঠল। ভবু
কমলা যে খোকনকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে
নাগিয়ে তারই কাছে রেখে গেল তাতে তার মনটা আপাতত
একটা হুত্যাগ্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জ্যোৎস্নার প্রতি যেন
কৃতজ্ঞ হয়ে রইল। সমস্ত রাত্রির দুশ্চিন্তার মধ্যে খোকনের
বিচ্ছেদ-সম্ভাবনাই তাকে বিচলিত করেছিল সব চেয়ে বেশী।
সেই চাপা ভয়েব অবরুদ্ধ বেদনার বাষ্প মুক্তি লাভ করতেই
মালতীর মন হাফা হয়ে নন্দলালের দুষ্কৃত্যের প্রতি উদ্ভত হয়ে
উঠবার অবসর পেল যেন। মনে মনে রেগে বললে, “আজ
না একবার, টের পাওয়াব’খন মজাটা।” কিন্তু ‘মজা টের
পাওয়াবার’ ধন্দের দেখা পেলে ত? নন্দলালের নাগাল
পাওয়া মালতীর অসাধ্য হয়ে উঠেছে। বাড়ীমুখে যদিই
বা সে হয়, তাও গভীর রাতে, নিতান্ত চোরের মত। বাইরে
বৈঠকখানার ঘরে কোন মতে রাতটা কাটায়—কি কাটায়
না, এমনি ভাব। সেদিন রাতে মাংসলোলুপ যে নেকড়ে
বাঘটা গুর অন্তরের গুহার অন্ধকারে ব’সে গুর চোখমুখ দিয়ে
উকি মারছিল তার আহত পুচ্ছের ভগাটুকুও আজ আর
নজরে পড়ে না। তার জায়গায় যেন বাসা বেঁধেছে একটা
হাঁড়িচোরা মেনী বেরাল—গুর মুখ দেখলে তাই মনে হয়।

রেগেমেগে মালতী ক’দিন নন্দর কোন ধোঁজধবর
নিলে না। অবশ্য, নন্দলালের পক্ষে সেটা নিতান্তই যে
অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নয়। তাকমত কেমন করে
মালতীর দৃষ্টি থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বেড়াবে সেইটেই
ছিল তার চেষ্টা। মালতীর তরফ থেকে একটা বিপ্লব

সে যেন মনে মনে আকাঙ্ক্ষাই করছিল। তার ভবিষ্যৎ জীবনটাকে একটা আকস্মিক ভূমিকাম্পের আঘাতে ভেঙে পড়া সংসারের ভয়ঙ্কর মধ্য কল্পনা করে মনে মনে তার আর স্বস্তি ছিল না। জ্যোৎস্নার উপর অকারণেই তার রাগ হতে লাগল। কোনো একটা কৈকিন্স জুটিয়ে নিয়ে মালতীর কাছে যে সে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যাবে তারও দুঃসাহস কিছুতেই সংগ্রহ করে উঠতে পারে না।

কাজের উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে উৎসাহ বিহীন গর্দভের মত তাব ভারাক্রান্ত দিবসগুলিকে টেনে সে মলিন বেশে কক্ষকেশ বাইরে বাইরে ঘুরে কাটিয়ে দিতে লাগল। বেচাবা নিজেকে একটু শিথিলপ্রকৃতির মানুষ; তাতে আবার নিজের নিত্য প্রয়োজনের তাগিদগুলো পর্যন্ত মালতীর সতর্ক দৃষ্টিব শাসনে নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার বহুদিন ধরে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নিজের সেবাস্বত্ব পারিপাট্যের নিপুণতা তার ছিল না। স্তব্রাং কিছুদিনের মধ্যেই নিতান্ত অসহায় অবস্থার মত সে অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সত্যি বড় কাতর হয়ে পড়ল। অনাহার-অর্দ্ধাহার-অনিদ্রা-অস্বাস-জনিত অত্যাচারে নন্দর অবস্থাটা শত্রুরও অকাম্য হয়ে পড়েছে, এবং এত দিন পরে এবার তার নিজের দুঃস্বপ্নায় নিজের উপর প্রায় একটা অকপট বিরক্তি এবং অহুতাপে তার মনটা পূর্ণ হয়ে উঠল। তাব ইচ্ছে করতে লাগল যে না-হোক একটা দুর্ব্যবহার করে মালতী ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলুক। মালতীর কি দয়ামায়া বলে কোন বস্তু নেই? যদি তার একটা শত্রু অস্ত্র হয়? একটা অস্ত্র-বিস্ত্র করলে যে মালতী উদাসীন থাকতে পারবে না তা একবাক্যে নিশ্চয় জানত; এবং একাগ্রচিত্তে সে দেবতার কাছে অন্তত একটা কঠিন পীড়ার জন্ত মনে মনে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল।

ক্রোধের প্রথম উত্তেজনাটা কেটে গেলে, দু-চার দিন পর থেকে বেকার মালতীর দৃষ্টি নন্দলালের দশটার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। গোপনে গোপনে নন্দলালের ভাবখানা দেখে তার কেমন মায়া হ'তে লাগল। বস্তুত নিঃসন্তান মালতীর জীবনটা শিশু অজয় এবং নাবালক নন্দলালের পরিচর্যা মধ্যে ভাগাভাগি করা ছিল এবং ব্যবসাপটু নন্দলালের নিজের স্বখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে অপটুতা বা নাবালক্য তার মাতৃহৃদয়কে

বিচলিত এবং প্রশ্রয়প্রবণ করে তুলেছিল। যদিচ স্থূল মানসিক তুল্যদণ্ডে নন্দলালের চরিত্রগত অবনতি পরিমাপ করে তার দুঃস্বপ্নের প্রতিবিধান কনবার মত নৈতিক যুগ্মা অশিক্ষিতা স্নেহপ্রবণ মালতীর চিত্রে বিশেষ করে জাগে নি, তবু আজ তার মন নন্দলালেবই অপরাধের লক্ষ্য তার কাছে সহসা গিয়ে সোহাগেব শাসন প্রয়োগ করতে স্বভাবতই বিধা বোধ করছিল তাতে সন্দেহ নাই। নন্দলালের বেয়াড়াপনায় সে চটেছিল কম না। হাতে পেলে একচোট নন্দলালের ধুধুড়ি নেড়ে দেবার কল্পনায় মনে মনে যখন তখন সে কোমর বাঁধছিল তাও বটে; তবু নন্দর অপরাধ তার কাছে বেয়াড়াপনার বেশী আর কিছু নয়। অসচ্চরিত্র স্বামীর অধঃপতনজনিত পত্নীবিমুখতার সর্বনাশ কল্পনা ক'বে সমস্ত জগৎ এবং নিজের তাব ভবিষ্যৎ ধোর তমসচ্ছন্ন শূন্যময় দেখে, নিজের প্রতি পরমবক্ষায় অসহায় অশ্রুবর্ষণে অন্তর্যক্ষা হয়ে উপাধান সিক্ত করার কথা তার মনে হয় নি। বরং দু-চার-দিন যাবার পর এই লুণ্ঠাচুরির মধ্যে নন্দলালের এই গল্পচোরের মত গোপন সঙ্কল্পের ছবি মালতীর স্বভাববাস্তবপ্রবণ চিত্রে যেন এবটু কৌতুকের আমেজই লাগিয়েছিল। তার স্থূল দেহটিতে বস্ত্রাবরণে সম্মত করে নিয়ে কারণ-অকারণে সে বৈঠকখানার পথে যাতায়াত করতে লাগল। অকস্মাৎ অসময়ে গিয়ে দরজা ঝেঁষ ফাঁক করে দিনে দশবার দেখে নিলে কোন স্পদ্ধাবান ঘরে প্রবেশ করছে কি না। মালতীর মনের ভাবখানা এই—“আ মর মিনবে! বকম দেখ না। পরের মোর ঘবে এনে বদখেয়ালী করবাব বেলা মনে থাকে না। ব'টা মেয়ে সমান করলে তবে গায়ের ঝাল মেটে। না-নেয়ে ন-থেয়ে আবার ঢং করে সং সাজা হচ্ছে! মরুক গে; কথাটি কইছি নে আমি, ইয়া! বয়ে গেছে আমার সাধাসাধি করছে—” ইত্যাদি।

আরও দু-চার দিন না যেতেই মালতীর সাধাসাধি না করার ধরণটা কিছু উগ্র আকারেই তার ভৃত্যকুলের উপর বর্ষিত হ'তে শুরু হ'ল। মাঠাকরুণের তাড়া খেয়ে বেচারারা দুপুর রাত পর্যন্ত ওং পেতে সাবন গামছা তেল খাদ্য এবং অখাদ্য নিয়ে নন্দলালকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিলে। পায়ের উপরে পা দিয়ে ব'সে ব'সে মাইলে গেলবার জন্তে সতিহি ত তাদের আঁচ রাখা হয় নি; বাবুর

নাওয়া-খাওয়া কি একটুও দেখতে পারে না তারা। কাজ ফাকি দেবার যম সব।

এর পর অল্পতপ্ত নন্দলালের দাম্পত্য মিলনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এল এবং অত্যন্ত নিরীহ বালকের মত মালতীর শাসন এবং পরিচর্যায় সে আত্মসমর্পণ করলে। তাদের সংসারযাত্রা আবার কতকটা স্বাভাবিক হয়ে এল—কেবল অজয়কে মালতী আর পারতপক্ষে তার মেসো-মশায়ের জিনীমানায় যেতে দিলে না। নন্দ যে তাকে স্নানজরে দেখবে না মালতীর মনে এমনই একটা শঙ্কা, কেন জানি না, বন্ধমূল হ'য়ে ছিল।

নন্দ অবশ্য জ্যোৎস্নার নাম আর মুখে আনলে ন, এবং মালতীকে প্রসন্ন করতে খোকার জন্তে নিত্য নৃতন মনোভবণ খেলনা পোষাক প্রভৃতি এনে হাজির কবতে লাগল।

মালতী বলে, “এ আবার কি আদিখ্যেতা স্বরূপ করলে?”

নন্দ মালতীর দুর্বল মনকে স্পর্শ ক'রে বলে, “এ ত একটু হাসি সোহাগ করবার সামগ্রী আছে—আর আমাদের কি আছে বল ত।”

নন্দর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সজল নরনে মালতী বলে, “বাট বাট।”

৪৪

হাসপাতালে ফিরে গিয়ে অসুস্থতা সত্ত্বেও কমল নিজেকে কাজ এবং পড়ার মধ্যে একেবারে ডুবিয়ে দিলে। চিন্তার ভার আর যেন সে বহিতে পারে না। কোন মতে নিজের অস্তিত্বের অল্পভূতিক মন থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হবে এই যেন তার পণ। একলা নিজের দুঃসহ সমস্তার সমাধানচেষ্টা তার দুর্বল মস্তিষ্কের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মনে মনে চাইছে সে সজদয় নিখিলের শাস্ত প্রভাব—যে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে, সাহায্য দিয়ে এবং সহানুভূতি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু নিখিলনাথের সাক্ষাৎকার লাভ করা এক দুর্লভ ব্যাপার হয়ে উঠেছে আজকাল। কখন যে সে বাড়ী থাকে তা বুঝে ওঠা দুসাহ্য। হাসপাতালের কাজটুকু ছাড়া আর অধিকাংশ

সময়ই সে বাড়ী থাকে না। বারংবার দরোয়ান পাঠিয়েও অবসর সময়ে নিখিলের কামরায় তার সন্ধান পাওয়া গেল না। হাসপাতালের কাজে অবশ্য সে কোনদিনই অল্পপস্থিত থাকে নি। কিন্তু তখন এক মুহূর্তও তাকে একান্তে পাওয়া দুষ্কর—যাতে অস্ত্রের অগোচরে কমল তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে। ফিরবার পর প্রথম দিনই তার সঙ্গে কমলেব সাক্ষাৎ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কতক্ষণই বা।

“ও কি। আপনি আজই ফিরলেন যে? ভাল আছেন ত?”

ভাল যে সে নেই এমন স্পষ্ট ক'রে তার মুখের চেহারায় তার ছাপ কোন দিনই পড়ে নি। অল্প সময় হ'লে এই পীড়িত ক্লিষ্ট চেহারা নিখিলনাথের দৃষ্টি এড়াতে না। কিন্তু আজ তার নিজের চিন্তা ছিল অল্প চিন্তায় আচ্ছন্ন, উদ্ভ্রান্ত। এই প্রশ্নটুকু মাত্র ক'রে তার উত্তরের জন্তও সে আজ বিশেষ আগ্রহ কবলে না। কমলের পীড়িত ক্ষত চিন্তে যে তা অভিমানের সৃষ্টি করে নি তা নয়—কিন্তু তার বড় আবশ্যকের প্রয়োজনে সে-অভিমান তার মনের মধ্যে ঘনিয়ে উঠবার অবকাশ পেল না।

লঙ্কার সময় মাথার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় কমলা দরোয়ানের হাতে একটা চিঠি দিয়ে নিখিলনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দরোয়ান ফিরে এসে সংবাদ দিলে যে ‘সাব’ ঘরে নেই। হতাশ হ'য়ে সে শয্যা নিলে।

অনেক রাত্রে ফিরে নিখিল যখন কমলার চিঠিখানা পেল তখন সকালে হাসপাতালে তার অত্যন্ত ক্লিষ্ট যে মুখখানা তার মনোযোগ জাগিয়ে তুলতে পারে নি সেটা মনে পড়ে তার নিজের এই অন্তমনস্কতার জন্তে তার মনে লজ্জা অনুভব করলে এবং তখনি জ্যোৎস্না দেবীর তত্ত্ব করবার জন্তে নাস-কোয়ার্টাসে চলে গেল।

নিখিলনাথ গিয়ে যা দেখলে তাতে একদৃশ জ্যোৎস্নার, কোন সংবাদ নিতে পারে নি বলে তার একটু লজ্জা হ'ল। কমলের মাথার যন্ত্রণা বেড়েছিল খুবই, তার সঙ্গে জরের ধমকে সে প্রলাপ বকে চলেছিল। নিখিল গিয়ে দেখলেন যে তার যাওয়ার পূর্বে দু-জন জুনিয়র ডাক্তার সেখানে

গিয়েছে এবং মোটামুটি তার গুণাব্যব ব্যবস্থা করেছে। নিখিল গিয়ে রক্ত পরীক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য ব্যবস্থা করে তার কামরাষ ফিরে গেল। অল্প কিছু আহাৰ এবং বিশ্রাম করে নিয়ে শোবার আগে সে আর একবার কমলকে দেখতে এবং রাত্রে মত শেষ ব্যবস্থা দিয়ে আসবার জন্যে নার্স-কোয়ার্টার্সে ফিরে গেল। জুনিয়ররা তখন বিদায় নিয়েছে।

কমলার ঘর আবৃত ল্যাম্পের উদ্ভূত আলোকে অন্ধকারপ্রায়। কমলা দ্রুত ও অক্ষুট উচ্চারণে প্রলাপ বকছে মাঝে মাঝে। খানিক ক্ষণ অন্তরমন্ড হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ এক সময় তার মনে হ'ল যে জ্যোৎস্নার প্রলাপের মধ্যে থেকে দু-একটা কথা যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নার মনে যে কোন গুরুতর ক্লেশের কারণ সম্প্রতি ঘটেছিল নিখিলের এ সন্দেহ পূর্বেই হয়েছিল। তবু কোতূহল প্রকাশ করে সে জ্যোৎস্নার আরও দুঃখের কারণ হবে ভেবে চুপ করে ছিল। আজ রোগিণীর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে এই স্তব্ধ কর্ণশ্রুত অন্ধকারে তার নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কোতূহলে সে অল্প একটু কাছে সরে এসে দাঁড়াল। তার পর ঠেথস-কোপটা নিয়ে বুক পরীক্ষার জন্যে সে নীচ হয়ে শুনলে। দু-একটা কথা সে যেন স্পষ্টই শুনতে পেলে—কিন্তু তার একটার সঙ্গে অন্যটার কোন যোগাযোগ করতে পারলে না। বক্ষ-পরীক্ষা কিছু আর বেশীক্ষণ চলে না। বিন্দু বসেছিল বরফের ব্যাগ মাথায় দিয়ে। নিখিল একটু গম্ভীর মুখে তাকে বললে, “যাও, দুটো হট্-ওয়াটার-ব্যাগ তৈরি করে আন।”

বিন্দু নিখিলের মুখ দেখে একটু ভয় পেল, বললে, “সরোজিনীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।”

নিখিল বললে, “না তার দরকার নেই। সরোজিনীকে দুবট। পরে ডেকো। আর দুবট। করে এক-এক জন থেকো। যাও, আমি বসছি একটু।”

বিন্দু ব্যাগ আনতে চলে গেল। নিখিল শুনতে চেষ্টা করতে লাগল। প্রলাপেব কথা প্রায় শোনা যায় না। একবার যেন মনে হ'ল শুনতে পেলে “ভোলাদা খোঁজাচ্ছে ধর।” আর একবার “উঃ কত হাতী।” এই রকম দু-একটা কথা পরস্পর নিতান্ত সঙ্গতিশূন্য। বিন্দু এলে পাত্রে

গরম এবং মাথায় ঠাণ্ডা দিতে উপদেশ দিয়ে একরকম হতাশ হয়েই সে ফিরে এল।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই কমলেন জ্বর ছেড়ে গেল। আরও দু-তিন দিন পরে নিখিলনাথ কোন স্বযোগে কমলকে জিজ্ঞেস করলে, “ভোলাদা ব'লে আপনার কোন আত্মীয় আছেন?”

কমলা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “কেন?”

নিখিল বললে, “প্রলাপে আপনি তাঁর নাম করেছিলেন। মাপ করবেন আমার কোতূহলের জন্যে।”

কমলা সন্তুষ্ট হয়ে বললে, “না না, আপনি মাপ চাইবেন না।” এবং প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেললে, “আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। দয়া করে যদি একটু সময় করতে পারেন।...এখানে ত বচা হবে না।”

যদিও তার অল্পমান করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, তবু কেন জানি না, এই অল্পরোধে নিখিল যেন বিশ্বয় অল্পভব করলে না। সে যেন কোন দিন এনি একটা অল্পরোধের জন্য মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। বললে, “আচ্ছা, ভাল হয়ে উঠুন। সে বন্দোবস্ত করব। কিন্তু আমার প্রেমের উত্তর আপনি দেন নি।”

কমলা বললে, “কি জানি আবার কি মনে পড়ে না। আর কিছু বলি নি?” তার মনে মনে ভয় হ'ল নন্দলালের কথার কিছু উল্লেখ করেছে হয়ত বা, এই মনে করে।

“বলেছিলেন, ভোলাদা খোঁজাচ্ছে ধর। আর এক বার বলেছিলেন, উঃ কত হাতী।”

কমলা অকস্মাৎ ঝব ঝব করে কেঁদে ফেললে। নিখিল অপ্রস্তুত হয়ে বললে, “ছিঃ কাঁদবেন না। না কেনে আপনাকে হয়ত দুঃখ দিয়েছি—”

“না না, তা নয়; আমি যে কিছুতে মনে আনতে পারছি নে। অথচ কিছুই ত ভুলি নি আমি...” বলে কান্না থামবার চেষ্টায় ক্রমাগত সে চোখ মুছেতে লাগল।

এই কথায় নিখিল একটু অবাক হ'ল। কথা যেন খাঁখার মত। জ্যোৎস্নার জীবনে যে কোন দুঃখের ইতিহাস তার সমস্ত অস্তিত্বের মাঝখানে ছায়াপাত করে তার জীবনের স্বাভাবিক আনন্দের বসাবাদনে বঞ্চিত করে বেখেঁচে—এমন সন্দেহ নিখিলের মনে পূর্বে অনেকবারই

হয়েছে ; এবং তারই জন্ম কমলের প্রতি স্বাভাবিক করুণায় তাকে নানা ভাবে সাহায্য করে এসেছে। কিন্তু আজকের কথায় তার মনটা যেন একটা গভীর রহস্যময় হৃদয়বীর বেদনার ইতিহাসের আভাস পেয়ে মনে মনে স্তব্ধ হয়ে বইল।

সেদিন আর কোন কথা হবার অবসর হ'ল না।

* * *

কমল নিজের দুঃখের ইতিহাস একটু একটু করে নিখিলনাথকে বলে গেল। কাল সমস্ত রাত সে নিজের সঙ্কোচটুকু দূর করবার জন্তে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। নইলে তার হতাশার শেষ আশার দীপটুকুও নিবে যায় যে। তবু প্রথম প্রথম তার মনে সঙ্কোচের অস্ত ছিল না। কিন্তু নিখিলনাথের কোতুলকবিহীন সঙ্কমপূর্ণ সহানুভূতির সঙ্কমতায় ধীরে ধীরে তার সঙ্কোচের বাধা অস্বহিত হয়ে তার মনে সে এমন একটা আশাপূর্ণ স্বচ্ছন্দ লঘুতা অনুভব করতে লাগল যে নন্দলালের চরম দুর্ব্যবহারের কাহিনী বলাও তার পক্ষে সহজ হয়ে এলো। তার মনের মানি যেন অপসারিত হয়ে গেল এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সে নিজেকে অনেকখানি স্বস্থ বোধ করতে লাগল। অজয়ের প্রতি মালতীর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের কথা বলতে বলতে চোখ তার শুক রইল না ; এবং এই অশ্রুজলে অভিষিক্ত পরম বিশ্বাসকর করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে নিখিলনাথ কলকালের জন্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে কমলের একখানি হাত ধবে বললে, “মাতৃস্নেহের সাধ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তোমার দুঃখ মোচন করবার ক্ষমতা আমার হবে কিনা জানি না, তবু আমাকে তোমাব নিজের বড় ভাই বলে জেনো। তোমার স্বামীর অহুসঙ্কানে আমার চেষ্টার ফলটি হবে না। নন্দলাল কোন কারণে তোমার মনের শান্তি যাতে নষ্ট না করতে পারে তাব ব্যবস্থা আমি শীঘ্রই করব।” বলে সে উঠে দাঁড়াল।

অনেক কাল পবে আনন্দিত স্বচ্ছন্দ মনোবিস্তারিত হাঁসি কমলের মুখে ফুটে উঠল। এখনি যেন তার দুঃখের অনেকখানি অবসান ঘটেছে এমনি একটা নিবাস শান্তির আভাস তার মনে অবতীর্ণ হ'ল এবং কৃতজ্ঞচিত্তে অবনত হুয়ে সে নিখিলেব পায়েব ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

“ছি ছি, ও কি,” বলে নিখিল এক পা পিছিয়ে গেল। মনটা তার মেহে ও করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

নিখিলনাথ চিন্তাকুল চিত্তে তার খাসকামরায় ফিরে গেল। কমলের অভ্যাচার্য্য কাহিনী তাকে বিস্মিত করেছিল সত্য, কিন্তু তার মনের যে চিন্তা সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তার চিন্তকে সম্প্রতি উন্নয়ন করে রেখেছিল এই ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল না। নন্দলালের দুঃস্বপ্ন থেকে কমলকে কোন মতে নিরাপত্তা করতে পারলে আপাতত যেন কমলের প্রতি তার কর্তব্য সমাধা হয়।

অনেক চিন্তার পর, অধিকাংশই তার মধ্যে কমলের কথা নয়, সে কমলকে অধুনা অনিন্দিতা দেবীর নারীভবনে নিয়ে রেখে আসতে মনস্থ করলে। পরীক্ষার আর অল্পদিনই বাকী ছিল। এই সময়টুকু কোনমতে অতিক্রম করতে পারলে কমলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার পথ স্বাগত হয়ে আসবে।

কমলকে অনিন্দিতা দেবীর নারীভবনে রাখার চিন্তার মধ্যে তার কি কিছু উদ্বেগ ছিল? সীমা তার কথায় যে হিসার পথ থেকে ফিরবে না সে সম্বন্ধে তার মনে আর সন্দেহ-শ্রাব ছিল না। বরং ক্রমে তার মনে এই ধারণাই একটু বদ্ধমূল হচ্ছিল যে তার আগ্রহ সীমাকে যেন ক্রমেই কঠিন করে তুলছে। অবশ্য, এ-ধারণা তার ব্যর্থ হৃদয়ের অভিমানপ্রসূতও হতে পারে। নরনারীর আকর্ষণজনিত দুর্বলতা সীমার দীপ্ত মনের পক্ষে কি হয়? তার অন্ত নাম কি তার কাছে দেশদ্রোহিতা? নিখিলনাথের প্রেমার্ঘ্য চিন্তের উৎকর্ষা যেন তার কাছে উপহাসের সামগ্রী। তবে সে কি করবে? কেমন করে সীমাকে সে আশ্বস্তের মোহ থেকে বাঁচাবে? এই চিন্তায় কিছুকাল যাবৎ তার চিত্ত আকুল হয়ে ছিল। আজ যেন সে নূতন করে একটা পথের সন্ধান পেল। জ্যোৎস্নাব শান্ত স্থির বুদ্ধির আকর্ষণে সীমা যদি ক্রমে ধরা দেয়। যদি জ্যোৎস্নাকে তার সমস্ত বুদ্ধিভরক হৃদয়জিত করে ধীরে ধীরে সীমার উত্তম চিন্তকে শান্ত করে আনতে সমর্থ হয় তা হলে সত্যবানের আদেশ প্রতিপালন করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে। এমন কি—কিন্তু হায় অতটা দুরাশা সে কববে কোন দুঃসাহসে?

পরদিন দুপুরবেলা সে কমলকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টার

জন্তে বাইরে চলে গেল এবং সীমার খাসসত্ত্ব ইতিহাস তাকে বলে, বললে, “জ্যোৎস্না, তোমার দুঃখ অপরিসীম, এমন কি হয়ত ছরণনেয়। কিন্তু তার ভিতর তোমার জীবন্ত প্রেমের পবিপূর্ণ উৎস গভীর বিরহের মধ্যেও তোমার হারানো স্বামীর নিবিড় অস্তিত্বের অল্পভূতিতে তোমাকে সম্বীভিত রেখেছে। কিন্তু যে-নারী তার নারীত্বের সমস্ত মাধুর্য সমস্ত সৃষ্টিশক্তির অপরিমেয় কল্যাণকে অস্বীকার করে তার অনন্তসাধারণ মহিমাকে ধ্বংসের আশুনে ছাই করে পুড়িয়ে ফেলতে চলেছে তাকে উদ্ধার বহ্নিলীলার মত ব্যর্থ হয়ে যাবার সর্বনাশ থেকে তুমি বাঁচও।”

কথা শুনে শুনে কমলের বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে ওঠে। ভাবে, ‘অপার্থ আমি, আমাকে কি এই বিশ্বাস, এই নির্ভর সাজে?’ নিখিলনাথের এমন অস্থিরতা সে কোনদিন দেখে নি। ভাবে ‘এ কি শুধু তাঁর গুরু আদেশ প্রতিপালনের আগ্রহ?’ ভাবে, ‘আমি কতটুকুই বা, আমাকে দিয়ে যদি কোন কাজে লাগিয়ে নিতে পারেন তাতেও আমার জীবন ত কিছু পরিমাণ সার্থক হবে।’ মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, “আমাকে আপনি চালিয়ে নেবেন। জগতে যদি এতটুকু কাজে আসতে পারি, তবু আমার বেঁচে থাকার কতকটা সাধনা পাই।” বলে সে চুপ করে ভাবে, সে কেমন মেয়ে না জানি, ওঁর মত লোককেও যে এমন করে বিচলিত করতে পেরেছে।

পবদিন নিখিল কমলকে নিয়ে নাবীভবনে রেখে এল।

সীমার শ্রামস্ত্রীর সেই স্বভাবদীপ্ত উজ্জলতা যেন স্নান হয়েছে। তার মুখে তার অস্বাভাবিক গাভীরোদের মধ্যে ঘনায়মান করাল মেঘের ছায়া। তার চোখের বিদ্যুৎদীপ্তি, ঘনপঙ্ক্তজালের অন্তরালে, যেন সংশয়চ্ছন্ন ছরাশায় রহস্যময়। নিখিলনাথ তার একরূপ কখনও দেখে নি। ইম্পাতের তরবারির মত সীমার ধেনু-রূপ তার মুক্ত চিত্তের উপর উজ্জত ছিল আজ তার সেই বিদ্যুৎহাস্যমুখরিত শ্লেষভীকৃত হাসির ছায়াপাতে যেন দীপ্তিহীন। অকারণ বেদনায় নিখিলের চিত্ত পীড়িত হ’তে লাগল। তবু সে সীমাকে তার বিপদের তার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেল না। তার প্রগলভতার জন্তে সীমা ক্রুদ্ধ হবে এই ভেবে নয়;

কোন দুঃস্থিত চক্রান্তজাল কোন ভীষণ অচ্যুতান এবং কোন ভীষণতর ক্রুরতব হিংস্রতার পরিকল্পনায় মধ্যে তাকে রক্ষার স্বতীত ভাবে জড়িত দেখতে পাবে এই দুর্ভিক্ষ আতঙ্কে।

অল্পক্ষণ—সময় এক মিনিটও নয়, কিন্তু তারই মধ্যে যেন একটা বিরাট কালের ইতিহাস, মানবচিত্তের স্থখদুঃখের বিচিত্র আন্দোলনে তাদের দুই জনের চিত্ত মথিত হ’তে লাগল। নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ ক’রে নিতে সীমার বিলম্ব হ’ল না। কমলাকে নমস্কার করে, নিখিলকে একটু বসতে বলে সে তাকে মেয়েদেব সঙ্গে পরিচিত করতে ভিতরে নিয়ে গেল। যখন সে ফিরে এল তখন সেই ছায়া তার মুখ থেকে সম্পূর্ণ অন্তহিত হয়েছে। নিখিল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। সীমা সেই চাহনিটুকু অগ্রাহ্য করে বললে, “এখন পরিচয় দিন।”

সীমাকে কমলের ইতিহাস সংক্ষেপ বলে, নিখিলনাথ সল আসবার সময় সীমাকে জিজ্ঞেস করলে, অর্থের তার আবশ্যক আছে কি না।

মূহূর্তকাল চুপ করে থেকে সীমা বললে, “দেখুন, অর্থের প্রয়োজন আমার অনেক। কিন্তু আপনাকে বঞ্চনা করে অর্থ নিতে আমি পারব না। দেশের প্রয়োজনে লোককে নষ্ট করে তাদের আহত অর্থ গ্রহণকে যে উচিত মনে করি তা ত আপনাকে বলেছি, তবু বঞ্চনা করে অর্থ সংগ্রহ করতে আমারও মনে বাধে এখনও। তা ছাড়া অকাবণে এর মধ্যে আপনাকে আমি জড়তে চাই নে। আমার সেদিনকার ষ্টুটাব জন্তে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার দয়াব কথা আমি ভুলব না। কিন্তু আপনার উপদেশে চলবার রাস্তা আমাব খোলা নেই।” সীমার শেষ কথাগুলিতে আশার ক্ষীণ আলোক নিখিলের মনের মধ্যে একটুখানি পথের সন্ধান এনে দিলে স্নেহ। আগ্রহের স্ববে একটু অহুস্র মিশিয়ে সে বললে, “কেন নেই?”

“সে কথা বলবার যদি কোনদিন অবসর পাই ত বলব। আজ আমার সে কথা বলবার সময় আসে নি। এ নিষে আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনার দেখানো পথ আমাব পথ হবার যো নেই। এইটুকু মাত্র আজ আপনাকে জানাতে পারি।” বলে কথার মোড়। ফিরিয়ে নিয়ে যেন একটু অর্ধপূর্ণ হাসি হেসে বললে,

“জ্যোৎস্না দেবীর সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত থাকুন। এখানে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না।”

সীমার এই কথাগুলির মধ্যে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত যে স্বপ্নটি তার কানে পৌঁছল তাতে তার মনটা যেন কতকটা আশা এবং কতকটা ঐশ্বর্য্যে চকিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল। নিজের অজ্ঞাতেই প্রায়, সে তার স্বভাববিরুদ্ধ যুবজনস্বলভ সূক্ষ্ম কপটতায় সীমার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে সহৃদয় গভীর স্বরে বললে, “জ্যোৎস্না দেবীর ইতিহাস অত্যন্ত কল্পণ, সীমা, কিন্তু ওর নিজের চরিত্রের মধ্যে এমন একটি শাস্ত্র নিষ্ঠা আছে যে ওর স্পর্শে এলে মনটা আপনিই সম্মুখে নত হয়ে আসে। ওর জন্তে আমি চিন্তিত হই নি—আমি ভাবছি যে তোমার কাজের কোন অসুবিধা হবে কি না; অর্থাৎ...”

এই অর্থ্যাৎটা অবশ্য নিতান্তই অনাবশ্যক। সীমার দিকে চেয়ে নিখিল কোন বিশেষ ভাবে বৈলক্ষ্য লক্ষ্য করতে পারলে না।

সীমা বললে, “আমার আর এতে সুবিধে, অসুবিধে কি? ববং বোর্ডিঙের একজন মেম্বর বাড়লে লাভই আমাদের। তবে বোর্ডিঙে যাদের থাকা অভ্যাস নেই তাদের প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে ঠেকবে—তা ছাড়া ওর ত আবাব পরীক্ষা কাছে।”

নিখিল হতাশ হয়ে ভাবলে, ওর মন যেন বিজ্ঞানী বাতিব নিষ্কম্প দীপশিখার মত—কিছুতেই ‘বচলিত’ হয় না।

অত্যন্ত চিন্তাকুল হয়ে নিখিল ফিরে গেল। সীমার মুখে যে একটা আসন্ন বিপৎপাতের ছায়া দেখেছিল তাব কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সীমার কথাগুলি অসহায় আবেগে তার মনকে উত্তলা করতে লাগল।

৪৫

হাসপাতালে ফিরে সে এমন একটা ব্যাপারের মধ্যে পড়ে গেল যে কিছুক্ষণ তার অস্ত্র চিন্তার কোন অবসরই রইল না।

একটি মেয়েকে আঙুনে-পোড়া অর্দ্ধদণ্ড অবস্থায় ভাদেব

হাসপাতালে এনেছিল। লোকজন আত্মীয়-অনাত্মীয় পুলিশ-ডাক্তারের ভিড়ে হাসপাতালে আর স্থান নেই।

নিখিল অগ্রসর হ’তেই ইন্সপেক্টর তাকে খুব পরিচিতির মত বললে, “আরে নিখিল যে! আরে তুমিই ডক্টর রয়? তার পর এখানে কত দিন?...আরে, কি চিনতে পারছ না আমায়? ‘বুলডগ’কে ভুলেই গেলে যে!”

নিখিল সত্যিই প্রথমটা চিনতে পারে নি, সে তারই এক সহপাঠী ভুলু দত্ত। তা ছাড়া যতকাল মেয়েটিকে সামনে রেখে রহস্যলাপ করবার মত মন তখন তার ছিল না।

“ও, ভুলু! সত্যি-ভাই তোমার ও পোষাকে এতদিন পরে তোমায় চিনতে পারি নি। একটু ব’স ভাই, মেয়েটিকে একটু দেখে আসি।”

ভুলু দত্ত একটু তাকিয়া ভরে হেসে বললে, “হ্যাঁ, ও আবার দেখবে কি? ও ত হামেশাই হচ্ছে। একটা ক্যাশান বই ত নয়। তুমি ঠিক তেমনটিই আছ দেখছি।...”

নিখিলনাথ আর তার রসিকতার জন্ত অপেক্ষা না ক’রে তাড়াতাড়ি মেয়েটির কাছে গেল। বিশেষ আর কিছু করবার ছিল না।

মেয়েটির বাপ দাঁড়িয়ে অশ্রুবর্ষণ করছিল। মেয়েটির বয়স অল্প, কুমারী। তার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ্য নয় দেখে নিখিল সকলকে বাইরে যেতে আদেশ ক’রে বাপকে নিয়ে পুলিশের কাছে ফিরে গেল।

রিপোর্ট নেওয়া হ’লে ভুলু দত্ত উঠে নিখিলকে বললে, “এস হে একদিন আমার গুথানে, তোমার বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। অবাক হচ্ছ আমাকে দেখে, ভাবছ বুলডগ আবার পুলিশ ইনসপেক্টর হ’ল। তা ঠিকই হয়েছে—বুলডগ নাম দিয়েছিলে—বুলডগেরই কাজ করছি।’ ব’লে নিজের রসিকতায় নিজেই উজ্জ্বলিত হয়ে হাসতে লাগল। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, “যেও একদিন নিশ্চয়—সব স্বথঙ্কণের কথা হবে।” বলে সে সবচেয়ে নিখিলের পিঠে একটা চাপড় মেরে বেরিয়ে গেল।

নিখিলের মনটা ভুলু দত্তের উপর প্রথমটা যতটা বিরূপ হ’য়ে উঠেছিল শেষটা তা আর রইল না—একটু কোরুস এই ব লোকটাকে খারাপ বলে মনে হ’ল না। তা বুলডগ বরাবর অমনই। এক কালে সে ত বিদ্রোহী দলে ভিড়েছিল ওদের।

সঙ্গে। তার পর নিখিল জেলে যাবার পর আর তার খোঁজ খবর রাখে নি।

ইতিমধ্যে পুলিশ-সংস্কারের স্বপক্ষে কবে যে সে পরীক্ষা দিয়ে পুলিশের কাজে বহাল হয়েছে তার সংবাদ তার জানা ছিল না।

হুগাখানেক পরে বিকেল বেলায় দিকে সেদিন নিখিলের কোনও কাজ ছিল না। নারীভবন থেকে ফিরে এসে মনটা তার অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কমলাকে অধ্যাপনার ছলে সে প্রতিদিন একবার করে নারীভবনে যেত। সীমাকে দেখাবার সুযোগলাভ করার চেয়েও কমলাকে ধীরে ধীরে বিপ্লববাদের রূপ, পরিচয় এবং তার বিরুদ্ধে অকাটা হুঁজি তর্ক তাকে দীক্ষিত করতে অভ্যস্ত করা তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ছাত্রীটিও মন্দ নয়। কমলা স্বভাবতঃ শাস্ত স্থিরবুদ্ধি, এবং সংরক্ষণময়ী। তা ছাড়া নারীহুল্লভ স্বাভাবিক কৌতুহল এবং নিখিলনাথের মনোভাবের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাকে এই উদ্যমে আগ্রহান্বিত করেছিল কম নয়। অভিনিবেশ সহকারে সে নিখিলনাথের প্রত্যেকটি কথা শুনত, বুঝতে চেষ্টা করত এবং ইতিমধ্যে দু-এক দিন কথার ছলে সীমার সঙ্গে সামান্য দু-একটা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তাতে নিজের শুঁহিৎ বলবার ক্ষমতায় সে নিজেই অবাক হ'ল; মনটা প্রসন্নও হ'ল তার। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল সীমার মনের একান্ত নিষ্ঠার, অবিচলিত বিশ্বাস এবং দেশের পরাধীনতায় তারও ব্যথা যে সত্যি এমন নিবিড় এমন গভীর এমন অতলম্পর্ষ হ'তে পারে তা প্রত্যক্ষ ক'বে। ও অহুভূতির তীব্রতায় সামনে তার যুক্তির চেষ্টা যেন খেলো হয়ে পড়ে—কথা যেন হাক হয়ে যায়।

আজ সীমাকে দেখে নিখিলনাথের মনে কেমন একটা আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। সীমার কথায় বা বানহারে যে কোনরূপ উৎকর্ষার কারণ ছিল তা নয়, তবু তাব সমস্ত চোয়ার মध्ये তার অন্তর্নিহিত কি এক অস্বাদ্যের পরিচয় নিখিলের চিত্ত যেন শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিল।

এ সম্বন্ধে যে-কোন প্রশ্নই যে বাচালতার পর্যায়ে গিয়ে পড়বে বারংবার আহত হয়ে নিখিলনাথের তা শিক্ষা হয়েছিল। কিন্তু তার তত্ত্বদেহের সম্পূর্ণ ক্রমতা, তাব

দৃষ্টির অস্বাভাবিক শুষ্ক তীব্রতা ক্ষণে ক্ষণে তার উন্নীত চিত্তে সন্নিবিষ্ট করার গোপন প্রয়াস নিখিলের সীমা সম্বন্ধে সচেতন দৃষ্টিব পক্ষে অগোচর ছিল না। অনাগত বিপর্যয়ে ধূমায়িত কল্পনায় তার চিত্তাকাশ সমাচ্ছন্ন হয়েছিল। এ কয়দিন সীমাকে এক রকম এড়িয়েই চলেছে সে—পাছে তার শক্তি চিত্তের ক্ষুদ্র দুর্বলতা সীমার পরিহাসেব আঘাতে পূর্ণাঙ্গ হয়। পাছে তাব ভীরতাব আভাসে সীমার মন কঠিনতব প্রতিজ্ঞায় নিজেকে অধিকতব বিপদের পথে ভিন্ন ক'বে নিয়ে যায়। পাছে জ্যোৎস্নাব বিতর্কের স্বর ও কমা তার নিজের অন্তর্কিতে উচ্চাচিত কোনও ভাবের সঙ্গে মিলে গিয়ে সীমার মনে কোন সন্দেহ জাগায়।

নিজের কামরায় বসে চিন্তা করতে কবতে তার অত্যন্ত শ্রান্ত অসহায় বোধ হতে লাগল। বিপ্লবীদের নানা জটিল এবং বিপদসঙ্কুল কর্মধারার কথা চিন্তা কবতে করতে হঠাৎ মনে হ'ল যে ভুলু দত্ত সেদিন বলেছিল যে সি. আই. ডি. থেকে কিছুদিনেব জন্ত তাকে ধর নেওয়া হয়েছে। শীগগিরই তাকে আবাব নিজের কাজে ফিরে যেতে হবে। সে মনে মনে সংকল্প করল যে ভুলু দত্তের সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্কটা ভাল করে ঝালিয়ে নিতে হবে। যদি বিপদের সঙ্কেত কোন বকমে পূর্বে হ'ত সংগ্রহ করে সীমাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। এতে পরেক্ষ ভাবে সে যে বিপ্লবেরই সহায়তা করছে এ যুক্তি দীর্ঘ বিবেকের মত তার মনকে ক্ষুণ্ণ করলেও, সীমাকে রক্ষা করতে পারাব প্রবল মোহে সে কথা তার মন আমল দিতে চাইলে ন। সে উঠে তৎক্ষণাৎ ভুলু দত্তের বাড়ী গেল।

বাইরের প্রশস্ত বাবান্দায় বিস্তৃত চায়ের সরঞ্জাম সামনে বেখে ভুলু দত্ত খবরের কাগজ পড়ছিল। নিখিলকে দেখে অত্যন্ত হৃগততার সঙ্গে বললে, “আরে, এস এস। আমি ত ভেবেছিলাম যে পুলিশের বাজ নিয়েছি বলে তুমি আর আমার মুখদর্শনই করবে না। তার পব? ব'স, চা খও। আবে এ তেওয়ারী—”

নিখিল বললে, “ব্যস্ত হ'য়ো না ভাই। হবে'খন। হাতে কাজ ছিল না, তাই ডাবলাম একবার তোমার এখানে এসে গল্পশ্রব করা যাক। তার পর আছ কেমন? কতদিন ঢুকেছি সি. আই. ডি-তে?”

“হচ্ছে, হচ্ছে, সব বলছি। এই তেওয়ারী, মা-জীকে বোলো একঠো বাবু আয়া, হাম বোলাতা, সম্বা ?”

নিখিল সসঙ্কোচে বাধা দিয়ে বললে, “না ভাই আজ থাক, আজ তোমার সঙ্গেই একটু গল্প করি। ও আর একদিন এসে আলাপ করে যাব’খন।”

সেদিন বাড়ী যাবার সময় ভুলু দস্ত বারংবার তাকে আসতে অনুরোধ করে বিদায় দিলে। বললে, “এস ভাই মধ্যে মধ্যে। পুলিশের কাজ করে মনে মনে ত দেশের লোকের কাছে একঘরে হয়েছি। তোমরাও ঐ সঙ্গে একেবারে পরিভাগ করো না। তাহলে মন্থস্যসদ্বিবহনে যদি অমাহুয হ’য়ে উঠে তার জন্তে তোমরাও দায়ী কম হবে না।” বলে হাসতে হাসতে বললে, “তা ছাড়া তোমার বোদি ত পুলিশ নয়, কি বল ?”

এমনি করে ভুলু দস্তের উৎসাহে এবং নিখিলের নিজের দরকারে আত্মীয়তা ক্রমে ক্রমে উঠতে লাগল। এমনি অভিনয় করে যেতে প্রথম প্রথম নিখিলের মনে যেটুকু গ্লানি ছিল সেটা ভুলু ও ভুলু-পত্নীর জ্যাতায় একসময় কেটে গেল। নিখিল ভাবল যে, মাহুযকে দূরে রাখি বলেই কল্লনাথ তাকে বীভৎস করে দেখি। তার মনে পড়ল, পাড়ায় একদিন ‘চোর’ ধরা পড়েছে শুনে একটি ছোট্ট মেয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিল। ঐ ছোট্ট মাহুযটির মনে চোরের অপকৃপ মূর্তির যে একটি ছবি ছিল তাই স্মরণ করেই বোধ হয় সে ভয়ে এবং কৌতূহলে তার পা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিস্ময়বিষ্কারিত চোখে তাকে দেখছিল। তখন চোবকে সবাই আপনাপন বীরশ্বেশ নমুনা স্বরূপ চান্দা করে কিছু উত্তমমধ্যমের ব্যবস্থা করেছে; কাল্লরই উৎসাহের অভাব নেই। হঠাৎ তাব বাবাকে দেখে সে কেঁদে ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরলে, “ও বাবা, চোর কই, ও ত মাহুয; ওকে মারছে কেন ?” বুদ্ধ পিতা কন্তাকে তৎক্ষণাৎ জড়িয়ে কোলে নিয়ে বললেন, “হ্যাঁ মা মাহুযই ত। ঐ কথাটাই আমরা ভুলে যাই।” বলে তাকে নিয়ে চলে গেলেন। ঘটনাটা সামান্য কিন্তু নিখিল কথাটা কখনও ভুলতে পারে নি।

ক্রমে ভুলু দস্তের সঙ্গে নিখিলনাথের বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা দাঁড়িয়ে গেল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভুলু দস্ত নিখিলকে বললে, “তোমাকে একটা অদ্ভুত খবর দিতে পারি।”

নিখিল মনে মনে কান খাড়া করে বসল। বাইরে উদাসীন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, “বটে। কি রকম ?”

“সত্যদাকে মনে আছে ?” নিখিল গলার স্বরে স্বাভাবিক আগ্রহ বজায় রেখে বললে, “কে সত্যদান ? নিশ্চয়। খবর জান না কি তার ?”

“লাফিও না। জানি, তাও সুখবর নয়। কিংবা তাই হয়ত সুখবর। শোন, মাস আঠেক আগে একটা বিশেষ সংবাদ পেয়ে শ্রীরামপুরে একটা ভল্লাসে যাই। একজন খবর দিয়েছিল যে ওখানে একটা পোড়ো বাড়ীতে বিপ্লবী কোন একটা ছোট দল আড্ডা নিয়েছে। সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল। অনেক তোড়জোড় করে গিয়ে বা দেখলুম তাতে পুলিশের দিক দিয়ে বিশেষ কিছু ফল হ’ল না। আমার সঙ্গে আমার সুপিরিয়র ছিল। তার রিপোর্ট টাই বলব। রিপোর্টে লিখেছে যে “একটা যুতদেহ বাড়ীটাতে পাওয়া গেছে, বোধ হয় কোন ভিখারীর। বাড়ীটাতে মন্থস্য-বসবাসের অল্প বা চিহ্ন আছে” তা ঐ ভিখারীটার বলেই মনে হয়। একটা লঠন, দুটো ভাঁড়, একটা বাটা আর কলসী প্রভৃতি দু-একটা বাজে জিনিষ ছাড়া আর কিছু নেই। মিঃ দস্তকে পরদিন ভাল করে অনুসন্ধান করবার জন্তে রেখে এলাম।” মিঃ দস্ত অবশ্য তোমাদের বুলভগ। জানই ত আমার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে তার হৃদিস না করে আমার শান্তি হয় না। সাংহেবের বোধ হয় কলকাতায় ফেরবার তাড়া ছিল। বাড়ীর ভাঙা ঘরগুলো এবং বাড়ীর চতুর্দিকে ঘুরে তার কাজ শেষ করে সে চলে গেল। আমিই হচ্ছে করে সাহেবকে বলে আরও অনুসন্ধানের অহমতি নিয়ে রয়ে গেলাম। একটু কারণও ছিল তার। বাড়ীটাতে ঢোকবার আগে বাড়ীটা ঘেরাও করা হয়। তার পর আমিই প্রথম হল ঘরটাতে যাই; যুতদেহটাকে দেখে আমিও প্রথম ভিখারীর মড়াই ভেবেছিলাম; তবু শব্দ না করে আমার সঙ্গে কনস্টেবলটাকে দিয়ে সাহেবকে ডাকতে পাঠিয়ে দিলাম। হঠাৎ আমার চোখ টর্কের আলোয় একটা ইনজেকশানের এমপিউলের উপর পড়লো। চুপি চুপি সেটা পকেটে পুরলাম। এইটাই আমার ভিখারীর খিওরীটা পাস্টে দিলে। তবু সাহেব কি বলে তাব জন্তে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাহেবও অনেকক্ষণ দেখে তাকে ভিখারী বলেই ঠিক করলে। একবার ভাবলাম

এমপ্যলটা দেখাই। তখনি ভাবলাম—মরকগে যদি কিছু বার করতে পারি ত তার ক্রেডিটটা ও ব্যাটা আত্মসাৎ কর কেন। তবু আমি তাকে সাবুর বাটা দেখালাম। সাহেলের মাথায় তখন ভিখারীর খিওরী জমে বসেছে। বললে, “কেউ দয়া করে দিয়ে গেছে; খাবার আগেই কাবার হয়েছে। কিংবা বেটা নিজেই তৈরি করে থাকবে, হঠাৎ বোধ হয় হার্টকেল করে মরেছে। ঐ ত চোঁবা; যম্মা, হে যম্মা, নিশ্চয়, যাকে বলে কনসম্পশন। এখানে বেলী ক্ষণ থেকে না; আজ বরং দু জন সেপাই পাহারায় রেখে যাও। উৎসাহ থাকে ত কাল দিনেব বেলা এসে দেখো খুঁজে কোন গুপ্তধন পাও কি না।” ব’লে একটু ঠাট্টার হাসি হাসলে। আমি আর তর্ক করলাম না। পর দিন গিয়েছিলাম।

“আমার একটুও আর সন্দেহ নেই—যে মুভদেহটা দেখেছিলাম তা সত্যবানবে; এবং শেষ পর্যন্ত তার চিকিৎসা হয়েছিল। তবু সে কথা আমি প্রকাশ করি নি—না-করার আমাব উদ্দেশ্য আছে। সত্যবান যে একলা ছিল না, তা ঘুরে ঘুরে পরদিন অনেকগুলি জিনিষ থেকে টের পেয়েছিলাম।”

“ইন্সপেকশনের একটা কথাও ভুল নয়। আমার বিশ্বাস ভেলোয়ারের কাণ্ডের পর যে মেয়েটাকে পুলিশ গিরিডি অবধি ধাওয়া করেছিল সেই গুর সঙ্গে ছিল। ভীষণ খড়িবান্ড মেয়ে হে। পুলিশকে একেবারে ঘোল খাইয়ে দিয়েছে তাই ভেবেছিলাম যে একেবারে গ্যাং শুদ্ধু গ্রেপ্তার করায় ক্রেডিটটা একলাই নেবো। তা আর হ’ল না—ফস্কে গেল যাক, আমি ছাড়বার ছেলে নই—ও একদিন বুলডগেব মুখে পড়তেই হবে দাদা, হে হে” ব’লে গর্বিত হান্তে তার অকৃতকার্যতা যেন চাপা দিয়ে ফেললে।

নিখিল মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করে ব’লে ফেললে, “ও নিয়ে আর মিছে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? পালের গোদাই যখন মারা পড়েছে তখন বাকী ক’টা এতদিনে দেখ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ঘর-সংসার করছে। চাই কি তোমার পুলিশে নতুন যারা ভর্তি হয়েছে তাদেরও মধ্যে খোঁজ করে দেখ দু-এক জনকে পাওয়া বিচিত্র নয়। তারাই আবার তোমাদের দক্ষিণ হস্ত হবে—”

ভুলু দত্ত হা হা করে হেসে উঠল বললে, “বেশ বলেছ

ভাই, এই আমাকেই দেখ না। আমি যত টেররিষ্টদের ‘বাং ষোঁং’ জানি আর কোন ব্যাটা জানে তত? তাও বলি ভাই, আমার জন্তেই আবার অনেকগুলো নিরপরাধ ছোকরা বেঁচে গেছে। কর্তারা ড হস্ত্র হয়ে আছে। ছায়া দেখলেই জাঁকে ওঠে; আর তখন দোষী-নির্দোষী বাছবার সময় হয় না। তুমি যদি নির্দোষী হও—তবে প্রমাণ ক’রে খালাস হও; নইলে থাক বন্দী হ’য়ে। আরে, ওতে যে ডিসএমেকশন্ প্রেড্ করে দেশ—তা কোন বড়কর্তা বা ছোটকর্তাকে বোঝানো যায় না। যাক গে, কে আবার কোন দিক থেকে শুনে আমার দফাটি সাববে।...”

একটু মুচকি হেসে নিখিল বললে, “কিন্তু মুখ’ লোকেব ধাবণা যে, যেমন চোর ডাকাত গুণ্ডা না থাকলে পুলিশ পোয়া অনাবশ্যক হয়, মিলিটারী আর সি আই ডি-ও অনাবশ্যক হয় তেমনি দেশে এইসব মুভমেন্ট না থাকলে। তা ছাড়া সময় অসময়ে এই সব হতচ্ছাত্রা মুভমেন্টগুলোই নাকি নানা রকম ‘নাগ-পাশ আইন’ প্রবর্তনের ওজুহাত জোগায়।”

ভুলু দত্ত প্রসঙ্গটা আর চলতে ন দিয়ে একটু শুক উগ্রস্বরে বললে, “কি জানি ভাই অত পলিটিক্স আমি বুঝি নে। আমাদের উপর হুকুম টেররিজম্ উচ্ছেদ করবার—তোমরা আবার তারও একটা উটো মানে বের করবে। এই জন্তেই ত বাঙালীদের ওপর ওরা চটে। যত নেই কথাকে কেনিচে খই ভাজা। এ যেন সেই তোমাদের রবি ঠাকুরের কবিতা। তার একটা আধ্যাত্মিক মানে বের করাই চাই, নইলে লোকে নির্বোধ বলবে। ওসব আমি বুঝি নে—আমি বুঝি কজ। টেররিজমকে দেশ থেকে আগাছার মত উগড়ে ফেলতে হবে—ঘ্যাও আই উইল ডু দ্যাট।”

নিখিল বললে, “আরে চট কেন ভাই; টেররিজমের উচ্ছেদ হ’লে আমি যতটা খুশী হব—তুমি অন্তত ততটা হবে না। কারণ ওটাই তোমার ধোঁরাক যোগায় কিনা! বাগ কর না ভাই।” বন্ধু বলেই এসব বলছি।”

“হাঃ হাঃ! রাগ কি হে? বেশ বলেছ। আজ সি. আই. ডি. উঠে গেলে ভুলু দত্তকে কেউ পঁচিশ টাকার একটা মাষ্টারীও দেবে না। তবে কিনা, আগাছা কাটবার জন্তে,

পাখর ভাঙবার জন্তে খোঁজা-কোদালেরও দবকার।
ওগুলোর ত উচ্ছেদ করা চাই—”

“নিশ্চয়—টেররিজমের উচ্ছেদ আমি মনে প্রাণে
কামনা করি। শুধু খুনোখুনিব আতঙ্ক বলছি না; বয়সের
সঙ্গে সঙ্গে সে ভয় মনে ঢুকেও থাকতে পারে, জানি না।
টেররিজম মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে, মানুষকে কাপুরুষ কীর
তোলে বলেই তা কামনা করি। টেরবিজম দুর্বলকে কুশ্চিন্তি
করে—সবলকে বীভৎস করে। সুতরাং অজ্ঞাচারের ভয়
দিয়ে যুত্বের ভয় দিয়ে যেই শাসক সেই নিজেকে এবং অজ্ঞাক
পিপাচ করে তোলে;—সে রামা-শ্রামা বা সভাবান, নেই
হোক। পিশাচের ধর্মই ভয় দেখানো, মানুষের নয়।” বলে সে
ভুলু দত্তের মুখের দিকে দৃষ্টিহীন চোখ রেখে আরও বলব্ধর
কথাগুলো মনে মনে ভাবতে লাগল। ভুলু দত্তও অল্প এফটু
অপ্রস্তুতের হাসি হেসে মাথা নাড়তে লাগল। খানিকটা
দম নিয়ে নিখিল যেন নিজের মনের অবস্থা
আবেগে আবার শুরু কবলে, “শুধু আমার দেশের জন্তে
বলছি নে—চাই যে, সমগ্র মানবজাতির মন থেকে এই
টেররিজম দূর হয়ে যাক। এই পৃথিবী দেশে দেশে মানুষকে
মহানুত্বের পথ থেকে বঞ্চিত করছে, মানুষকে দলে দলে
শিক্ষিত হস্তারক পণ্ডিতে পরিণত করতে চলেছে। নরনারীর
স্বাভাবিক স্থিতিশক্তিকে, অধ্যাত্মশক্তিকে ধ্বংসের পথে,
পাশবিকতার পথে, সর্বনাশের পথে নিয়ে চলেছে। লেভে
ক্রোধে হিংসায় জিহ্বাংসায় তার মুখ থেকে দেবতার ছবি
মুছে গেল—হায় হায় কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারলে
না—শুধু পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্তে অন্ধ উন্নততায়
সর্বনাশের আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছে—দলে দলে—”
বলতে বলতে ভুলু দত্তের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ সে থেমে
গেল। এতটা আবেগের কারণ বুঝতে না পেরে ভুলু হাঁ
ক’রে তার দিকে চেয়ে আছে—যেন কোন একটা বারণ
সে তার দৃষ্টি দিয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। নিখিল জোর করে
একটু কৃত্রিম সলজ্জ হাসি টেনে এনে বললে, “ভাবছ হঠাৎ
নিখিলকে বক্তৃতায় পেয়ে বসল কেন? তুমি জান
তোমাদের সঙ্গে আমিও একদিন ঐ দলে ছিলাম। তার
পরে এ নিয়ে অনেক ভেবেছি। জীবহত্যা-টতার কথা
আমি ভাবি না। প্রতিদিন স্টার-হাউসে ত কত সোটা

কোটা প্রাণী আমাদের খাত্তের জন্তে আমরাই হত্যা করি।
সেটা ভাব কি অজ্ঞায় তার বিচার এখানে করবার নয়।
ভয় দেখিয়ে মানুষকে অমানুষ ক’রে আমাদের বামন
ক’রে রাখার মত অপরাধ নেই। যে-কেউ তা করে,
সেই ঐ পাপে লিপ্ত। প্রবল কেউ যদি শুধু ভয় দেখিয়ে
লোককে শিষ্ট করতে চায়, তবে ‘টেররিজম-এব
উচ্ছেদ করতে চাই’ এ কথা তার বলা সাজে না।
ছেলেকে ঠেড়িয়ে শাস্ত রাখলেই ছেলে মানুষ করা
হয় না—নিজের শক্তিব উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকলে
কেউ টেররিষ্ট হয় না। গভাসন ভীকর অজ্ঞ—তা সে
যেই ব্যবহার করুক।

ভুলু দত্ত বললে, “তাই, তোমার মত ক’রে আমি ভাবি
নে। দেশে শাসক থাকবেই—পেনাল কোডও বুদ্ধদেবের
রচিত হবে না। চুরি, ডাকাতি, খুন, অর্থম অরাজকতা
নিবারণের জন্তে শাস্তির ভয় দেখালে যদি দুর্বলতার অজ্ঞ
বল তবে দেশের শাসন অচল হবে। দেশের শাস্তিরক্ষাও
বড় ভিনিধ—তা না হলে উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না, দেশ সমৃদ্ধ
হয় না। এই ত বাবা সোজা-সুজি বুঝেছি। দি এণ্ড
জাষ্টিফাইজ্ দি মীনস্।”

নিখিল এতখুঁলে যে এই উদ্বেজনা প্রকাশ ক’রে সে ভাল
করে নি। তার উদ্বেজ সিদ্ধি পথ এতে রুদ্ধ হ’তে পারে।
ভুলু দত্তের কনফিডেন্স হারালে তার চলবে না। বললে,
“তা সত্যি, তবু কেমন যেন মনে হয় যে ওতে পাগলের
পালকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে।”

একটু উৎসাহ পেয়ে ভুলু দত্ত বললে, “না হে না; দেখতে
দেখতে কত দু’দে টেররিষ্ট শিখে হয়ে গেল। কত ব্যাটা
আবার কান কেটে সরকারী কাজে জুতে গেছে, দেখ গে।
কথায় বলে ‘যেমন কুকুর তেমনি মুগুর’—বিলেতেব
আমদানী কথা নয় হে—অনেক অভিজ্ঞতার ফল। এই
শর্খাই কত ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করলে—”

ভাল মানুষের মত নিখিল বললে, “তা ঠিক,
টেররিজমকে একেবারে ঠাণ্ডা করেছ তোমরা, তা বলতে
হবে—অস্বতঃ বাংলা দেশে।”

“তা আর কই হ’ল হে! এ ব্যাটারা বক্তবীজের ঝাড়,
ধোঁয়াচ্ছে হে ধোঁয়াচ্ছে—আবার একদিন শুনবে কিছু

একটা কাণ্ড কিংবা তার আগেই যদি বুলডগের মুখে না পড়—”

“বটে, কই কিছু দেখি না ত আর কাগজে। সব চূপচাপ গাণ্ডা।”

“চূপচাপ থাকবে না ত কি জয়ঢাক কাঁধে ক’রে বিজ্ঞান দিয়ে বেঁড়াবে? এরা আঁব আগেকার মত বোকা নেই হে—আর সে খিঁচটারি চঙ মেই এদের। এরা ঢের চালাক, ঢেব কাঁজের লোক হয়ে গেছে। এদের মূলমন্ত একটুও বোঝবার জো নেই। এদের ফন্দী ফাঁস করতে পারায় হুখ আছে হে; কারণ তা সহজ নয়। সত্যি বলছি ভাই, এদের পিছনে লাগি বটে, কিন্তু এদের এক একটর ব্রেন দেখে সত্যিই অবাক হ’তে হয়। এই ধর না কেন নেই যে মেয়েটার কথা বললাম—সত্যদাব সঙ্গে ছিল। শ্রেফ চোখে ধুলো দিলে।”

নিখিল আঁব বেশী কোতুল প্রকাশ না ক’বে বললে,

“আমাদের তখনকার মেথড্‌স্‌ তি বকম ক্রুড ছিল মনে কবলে এখন হাসি পায়।”

“তা সত্যি, এখনকার তুলনায় আমাদের লক্ষ্যব্দ ছিল যেন হাজার দলের আখড়াই। স্তনলে অবাক হয়ে যাবে এদের সব কথা।”

নিখিল দাঁড়িয়ে উঠে বললে, “আজ কাজ আছে ভাই উঠি। শোনা যাবে একদিন তেঁমার মকেলদেব কেবদানি; আঁব তোমার দেবামতি। কোঁকের মাথায় এক চোট বজ্রতা মেরে নিলুম, কিছু মনে ব’বো না।”

“আবে না হে না, আমি আর কি মনে করব। তবে দিন কাল খারাপ, কথাবার্তা একটু সামলে বলাই ভাল—বুলে কি না।”

“ত আর কি বুঝি না। তবে তোমার কাছে বলছি বললাম।” বলে নিখিল বিদায় হ’য়ে গেল।

“বুলডগের মুখে পড়া”ব কথাটা তাব মনেব মধ্যে খচ খচ করতে লাগল।

ক্রমশ:

নবীন দার্শনিক চিন্তার প্রবর্তন*

ত্রীমাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার প্রবর্তন আসিয়া উপলব্ধি করিতে পারি ভারতবর্ষের এখনও অবিলুপ্ত বিরাট সাহিত্যে। যথোপযুক্ত এই রূপে নানা চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছিল এবং এখনও সে প্রচেষ্টার বিরাম নাই। সকল চিন্তার লক্ষ্য সত্যকে উপলব্ধি কর ও জগতের নিকট প্রচারিত করা। পূর্ব মনীষিগণ যে সমস্ত চিন্তাব্যাপ্তি তাঁহাদের যত্নচিত্রিত গ্রন্থে ও ভাব্যটিকাঁব মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া বাখিয়াছেন তাহার আলোচনা আমাদের পক্ষে এই বাস্তবিক তত্ত্ব জিজ্ঞাসার পথে স্মরণ সাহায্য করে, তেমনি চিত্তবিশেষে তাহার প্রতিকূলতাও উপলব্ধি করা যায়। যখন আমরা তাহার সমস্ত দিক অনুসন্ধান না করিয়া বা তাহার বুদ্ধিতে ও অনুভবে যে সমস্ত বিরোধ ও আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহার একটি সহজ সমাধানের চেষ্টায় সত্য জিজ্ঞাসাকে পঙ্গু বা শক্তিহীন করিয়া কোন একটি মতবিশেষকে আঁকড়িয় ধরি—তখন এই পুরাতনের অতিকূল প্রভাব দেখা যায়। এটাও সম্ভাবনা করিতে পারা যায় যে কোন প্রাচীন দার্শনিক বা ভাবুক যে দৃষ্টিতে সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি কবিরাজিহীন, তাঁহার সেই দৃষ্টির সহিত আমাদের দৃষ্টির মিলন না ঘটিলে তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য আমাদের নিকট বাহিরের বস্তুই বহিয়া যায়। কাজেই দার্শনিক জগতে একের পরিশ্রমের দ্বারা অন্তের স্বাক্ষর দিয়া লাভনাই হইবার কোন আশা নাই। মত-বিশ্বাস আমাদের চিন্তা অপরের চিন্তার সহিত

সম্পূর্ণভাবে মিলিত না হয় অর্থাৎ যখন অপরের চিন্তা আমাদের চিন্তার পরিণত না হয় এবং আমি সত্যের স্বরূপকে নিজের অনুভূতিতে অসঙ্গত ভাবে না দেখিতে পারি তত স্বপ্ন আমাদের সত্য জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হইবে না। এই কারণেই দেখি মনীষার ক্ষেত্রে নূতন নূতন দার্শনিক চিন্তার প্রবর্তন বিরাম নাই। অনেকে এইরূপ ভয় দেখান যে পূর্বকর্তন মনীষিগণ তাঁহাদের বাস্তবিক বুদ্ধিসৌরভ ও ঐকান্তিক সাধনা সত্ত্বেও যদি সত্য আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই কর্মবলয় কালে সত্যগ্রহণ করিয়া আমাদের এত অজস্রময়ের সাহায্যে জগৎজন্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করাব চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু দার্শনিক এইরূপ বিভীষিকাঁব ভীত হন না—তিনি অস্ত্রবের প্রেরণায় সাধনক্ষেত্রে অকর্তীর্ণ হন এবং তাঁহার লক্ষ্য হয় সত্যের উপলব্ধি। পূর্বকার্য্যগণের বিফলতা তাঁহাকে দমিত না কবিরাজি আঁবও বিপুলতর উদ্যমে ও উৎসাহে তাঁহার সাধনায় পথ অন্বেষণ করিতে। তিনি পূর্ববর্জিতের চিন্তার মধ্যে বিফলতার বীজ অনুসন্ধান করিয়া এবং যে সমস্ত বিষয় তাঁহাদের চিন্তার পরিধির মধ্যে স্থান পায় নাই এবং এজন্ত তাঁহাদের চিন্তার মধ্যে যে একদেশিতা ও সঙ্কীর্ণতা আসিয়া সত্যের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল

* দার্শনিকী—ডাঃ সুব্রতনাথ দাসগুপ্ত। সিত্র এণ্ড বোদ, ১১ কলের কোবার, কলিকাতা। দাম তিন টা।

ভাষা পরিহার করিয়া চলেন। কোন দার্শনিকের প্রচেষ্টাই একবারে বিফল হয় না—এত্যেকের চিন্তার মধ্যে আমরা সত্যের অংশবিশেষের সন্ধান পাই। ভাষাসের প্রধান ত্রুটি হয় যখন ভাষারা এই অংশকে পূর্ণ বলিয়া মনে করেন এবং জগতের যে সমস্ত অংশের সহিত ভাষাসের সত্যের বিরোধ হয় সেই সমস্ত বিরোধী অংশকে ভাষারা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে সক্ষম করেন না। আর একটি গুরুতর কারণে দার্শনিকদিগের চেষ্টা ফলশ্রুত হয় নাই এবং নানা মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইতেছে একটি চিন্তাসূত্রকে সত্যের একমাত্র মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা এবং সেই চিন্তাসূত্রটি অনেক সময়ে শ্রদ্ধাভিত্তি নিরপেক্ষ ভাবে এবং জগৎতত্ত্বের সহিত ঐশ্বরিক পবিত্রত্বের পূর্ববৈ মানব চিত্তে স্ফুর্নিত হয়—ইহা মনে করা।

এইরূপ জ্ঞানির নিবারণকল্পে প্রতীচ্য দার্শনিক জগতের প্রকৃত ভাস্কর মহামতি কার্ট ভাষাব দার্শনিক চিন্তার প্রতিস্থাপন করেন প্রামাণ্যবাদের উপর। চিন্তের নানা শক্তিবাহার আমরা জগৎতত্ত্বের সহিত পরিচয় স্থাপন করি। এই শক্তির স্বরূপ ও সীমা নির্ধারণ করিতে পারিলে আমাদের বস্তুতত্ত্ব জ্ঞানের পথ সৰ্ব্বত্র হইবে—এই বিবাসে কার্ট Epistemology (জ্ঞান প্রক্রিয়ার) অবতারণা করিয়া তাহার সাহায্যে দার্শনিক চিন্তায় প্রবৃত্ত হন। তারতম্যের সমস্ত দার্শনিক চিন্তারও এইভাবে ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে। “মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও জ্ঞান প্রক্রিয়া (Epistemology) এই দুই দিক দিয়া মনোবিজ্ঞানের ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত চিন্ত (mind) সিনিমিট। যে কি তা একরকম আমরা কিছুই জানি না এবং মনোবিজ্ঞানের ব্যাপারগুলির যতটুকু আমাদের কাছে থাকা পড়েছে তার অনেক বেশীদূর জিনিষ আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে” (৩৭ পৃঃ)। ডক্টর হুরেলের দার্শনিক মহাশয় ভাষার ‘দার্শনিকী’ নামক পুস্তিকায় যে নুতন পন্থায় দার্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন, তাহাও মধ্যে আমরা জ্ঞানপ্রক্রিয়ারও বিশিষ্ট স্থান আছে দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তিনি যেভাবে সম্যাকস্থানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অপূর্ণ এবং ভাষার দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে দর্শনশাস্ত্রের অনেক মামুলী বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। জড় ও চেতনের সম্পর্ক লইয়া যে মতভেদ ও শোলাহস্ত উদ্ভূত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের চতুর্দিক মুখরিত হইয়া আসিতেছে, তিনি নুতন ভাবে সেই সমস্তার সমাধান করিয়াছেন। জড় ও চেতনের মধ্যে, জড় ও প্রাণের মধ্যে এবং প্রাণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধিতা লইয়া যে সমস্ত ভ্রমের উত্থান হইয়া থাকে, তাহা ডক্টর দার্শনিক মহাশয়ের দৃষ্টিতে অনাবশ্যক। অনেকে এক ও বহুর বিরোধের সহজ সমাধানের চেষ্টার বহুকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন কিংবা বহুকে ক্ষোভাতাড় দিয়া একের মধ্যে স্থান দিয়া বিশিষ্টাঙ্কিত বা গুচ্ছভিত্তিক প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অকৃত্রিম বা বিশিষ্টাঙ্কিতবাদের স্থান আমরা ভাষার দার্শনিক চিন্তার মধ্যে পাই না। ভাষার মতবাদের নামকরণ এক কথায় করা কঠিন এবং একপা এক কথায় তাহার পরিচয় দেওয়া আমাদের শক্তির অতীত। আমরা এ বিষয়ের ভার ভাষার উপরেই দ্রুত করিলাম। বাস্তবিক একটি সংজ্ঞার দ্বারা কোন জটিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ নবীন চিন্তার ধারাকে প্রখ্যাপিত করার একটা মুশিল আছে— তাহাতে পুরাতন প্রসিদ্ধ কোন মতবাদের সহিত তাহাকে এক কথায় ফেলিয়া ইহাও নুতনতাকে বিকৃত করিয়া ফেলা অসম্ভবিক নয়। আমরা ভাষার চিন্তার কতকগুলি বিশিষ্ট দ্বারা আলোচনা করিব এবং ভাষাব দার্শনিক দৃষ্টির গতিও লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব। এই রূপ বুঝিবার চেষ্টা দ্বারা আমরা ভাষাকে ভুল বুঝি ইহাও খুব স্বাভাবিক। ভুল বুঝিবার আশঙ্কায় আমাদের নিজের কোন মতামত ব্যক্তি না করিয়া ভাষার কথাকেই ভাষার বক্তব্যগুলি পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিব

এবং তাহাতে আমরা যে সাক্ষিগত টিপসী বোঝনা করিব, তাহা মূল বুঝিবার হবিধার অধিবোধ।

ডক্টর দার্শনিক ‘দার্শনিকী’ নাম দিয়া কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ‘দর্শনের দৃষ্টি’, ‘পবিত্র’, ‘জড়, জীব ও ধাতু পুরুষ’ নামে তিনটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ভাষার নবীন মতের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। ‘কেন ও কেনো’ নামক প্রবন্ধে তিনি যে মতবাদের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত ‘মাদ্যবাদের’ বিপরীত। ‘তত্ত্ব কথা’ নামক প্রবন্ধটি লেখকের বহু পূর্বের লেখা এবং তাহাব মধ্যে Hegel এবং চেতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত মতবাদের সাদৃশ্য অনেক উপলব্ধি করিতে পারেন। ‘তথ্যাপি...পূর্বের চিন্তার সহিত বর্তমান চিন্তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক’ নাই তাহা নহে। উক্ত চিন্তার মধ্যে জগতের কোন অংশকে বাধ দিবার চেষ্টা নাই। জড়, জীব, প্রাণ ও চিত্ত সকলেরই সার্বকতা ও বাস্তবতা উক্ত চিন্তার মধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই আমরা ভাষার চিন্তার অপূর্ণতা লক্ষ্য করিতেছি। জড়জগতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—“জড়ের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির আদর্শের নেই, তাই নানা অবস্থায় তার ব্যবহারের বৈচিত্র্য নেই।” “জড়ের মধ্যে যদি কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় সে উদ্দেশ্য জড়ের নিজের উপকারের জন্য নয়, সে উদ্দেশ্য জীবের উপকারের জন্য।” সাধারণ দর্শনকার জড়ের এই তত্ত্বটুকু ভাল করেই বুঝেছিলেন, তাই তিনি প্রকৃতিকে পরার্থ এবং পুরুষের ভোগ্যপূর্ণসাধনে ব্যাপ্ত বলে বর্ণনা করেছেন।” কিন্তু তাহা হইলেও জড়রাজ্য একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। জীবরাজ্য জড়রাজ্যের সহিত সরিষ্ট কিন্তু তাহাও একেবারে স্বতন্ত্র। “জড়ের উপাদানকে অবলম্বন করেই জীব তার কার্য্য আরম্ভ করে—” কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ কপান্তরিত হইয়াই জীবের কাজে লাগে। “জীবশক্তির দ্বারা আর্জিত ও স্পন্দিত না করে জীব কখনও জড়কে নিজের দেহধাতুরূপে ব্যবহার করতে পারে না।” (৭ পৃঃ) “আমরা সাধারণতঃ জানি যে কোনও কিছু যদি এক হয় তবে সে বহু নয়, যদি বহু হয় তবে সে এক নয়; তাই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মায়ার পড়েছেন তাঁরা এককে জগৎপ্রতি দিয়েছেন, জীব ধীরে ধীরে মায়ার পড়েছেন তাঁরা বহুকে মিথ্যা বলেছেন, কেউ বা বলেছেন, বহু অংশকে নিয়ে এক। কিন্তু প্রাণজগতে এসে আমরা যে লীলা দেখি তাতে দেখি এটা একটা এমন রাজ্য যেখানে কোনও একটি সত্তা বা সম্বন্ধই অপর সত্তা বা সম্বন্ধ ছাড়া তার আপন স্বরূপকে লাভ করতে পারে না। এখানে ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধিকে পাওয়া যায় না, বৃদ্ধির মধ্যেই ক্ষয়, ক্ষয়ের মধ্যেই বৃদ্ধি। বৃদ্ধির পর ক্ষয় আসে এ আবার জানি, বা ক্ষয়ের পর বৃদ্ধি আসে এ আমরা জানি। কিন্তু এখানে দেখি বৃদ্ধি ক্ষয়ের যোগপদ্য।...একের সমষ্টিতেও বহু নয়, বহুর সমষ্টিতেও এক নয়, কিন্তু যাকে এক বলি তাই বহু এবং যাকে বহু বলি তাই এক।” এইরূপকারের ভাষায় আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের চিন্তা-পদ্ধতি হইতে ভাষার চিন্তা-পদ্ধতির ভেদ বর্ণনা করিব। “সাধারণতঃ ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে যেটাকে organic view বা জৈবদৃষ্টি বলে সেটাকে একের জীবনের মধ্যে বহু এসে কেমন গুচ্ছভাবভাবে মিশেছে এই কথাটিই বিশেষ জোর দিয়ে দেখান হয়। একের সঙ্গে যে বহুর বিরোধ নেই, বহুকে নিয়েই যে এক আপনাকে সার্বক করছেন” এই কথাটিই ভাষার প্রতিপাদন করেন। “কিন্তু এ সমস্ত মতবাদের মধ্যে জৈবদৃষ্টির বর্ধার শিক্ষাটি যে প্রকাশ পেয়েছে আমার তা মনে হয় না। জৈবদৃষ্টির বর্ধার ভঙ্গ এইখানেই প্রকাশ পায়...যে এই দৃষ্টিতে এক ও বহুর চিরপ্রসিদ্ধ ভিত্তিটি ভিরোহিত হইয়াছে।...একের স্বতন্ত্রতা যে বহু উৎপত্তি এবং একের স্বতন্ত্রতা যে বহুর স্বতন্ত্রতা ছাড়া হয় না, এই যে কার্য্যকারণ বিরোধী সত্য এতে এক এবং বহুর সীমানাকে এমন অনিবার্য্য রূপে তুলেছে যে এক কলাও পার্শ্বদৃষ্টি বহু কলাও পার্শ্বদৃষ্টি। বৃদ্ধির মধ্যে ক্ষয় ও

ক্ষমের মধ্যে বৃদ্ধি এতে যে ক্রিয়াবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে বৃদ্ধিও পার্শ্বদৃষ্টি, ক্ষয়ও পার্শ্বদৃষ্টি।” লেখক এখানে নাগার্কিন, গব্রাচার্চ, Bradley প্রভৃতির সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন ভাবাব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই বিবোধ দেখিয়া সম্বন্ধগতিকে মিথ্যা বলেন বা অথও দৃষ্টিতে তাঁহাদের বিরোধ তিরোহিত হইয়া যায় এইরূপ আশাস প্রদান করেন। Hogg এই বিরোধের সমাধান করিয়াছেন ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে। কিন্তু এইরূপের সমাধান অসম্ভব। তিনি বলেন “সম্বন্ধগতিকে পৃথক্ করে দেখি ব’লেই ক্রিয়াব্যাপারের মধ্যে তাদের একত্র দেখে তাদের সমাধান করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু জৈবদৃষ্টির মধ্যে এই কথাটি যেন আমাদের চোখে বেশ পরিষ্কার হ’য়ে আসে যে সম্বন্ধগতিকে আমার বুদ্ধির মাত্রার পৃথক্ ব’লে মনে করি সেগুলি পৃথক্ নয়; তাদের প্রত্যেকের সত্তা অপরের মধ্যে নিহিত হ’বে রয়েছে। তাহা একও নয় বহুও নয়।” তাঁহার মতে চিরকাল হইতে যে Laws of Thought (চিন্তাপদ্ধতির নিয়ম) প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার স্বরূপ একেবারেই বদলাইয়া যায়। The Law of Identity (তাদৃশ্য-নিয়ম) অনুসারে বাহ্য এক তাহা একই। The Law of Contradiction (বিবোধ নিয়ম) অনুসারে বাহ্য এক তাহা অনেক নয়। বস্তুর একত্ব ও অনেকত্ব দুইই সত্য নয়। The Law of Excluded Middle (পরস্পরবিরোধী বস্তুদ্বয়ের মধ্যে তৃতীয় প্রকার অসম্ভব) অনুসারে বস্তু এক কিংবা অনেক হইবে—দুইই মিথ্যা নয়। এই নীতিগুলি বাহ্যিক অব্যাহিতার সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে জগৎও এক এক বা বহু বলিতে হইবে এবং তদতিরিক্তকে মিথ্যা বলিতে হইবে। কিন্তু ভক্তর দার্শনিকের মতে ইহা অনাবশ্যক ও অসত্য। সত্যের রূপ প্রতীতির মধ্যেই থকা পড়ে, কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রতীতিকে উড়াইয়া দিয়া সত্য নির্ভাব্যেব চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

ভক্তর দার্শনিকের মতে জড় ও জীবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টাও অনাবশ্যক। কাজেই জড় হইতে জীবের বা জীব হইতে জড়ের সৃষ্টি নিরূপণ করিবার প্রয়োজন নাই, এবং তাহা হইতেও পারে না। এইরূপে জীবলোক হইতে মনোলোকের সৃষ্টিও অসম্ভব। জড়লোকের সহিত জীবলোকের যেমন নিয়ম, প্রকার ও সংগঠন বিষয়ে আত্যন্তিক বৈষম্য দেখা যায়—এইরূপ জীবলোকের সহিতও মনোলোকের বৈষম্য দেখা যায়। কাজেই জড় হইতে জীবের উৎপত্তি যেমন অসম্ভব, এই জীব হইতে চৈতন্তের উৎপত্তিও অসম্ভব। চৈতন্তের স্বপ্রকাশতা ও ও পরপ্রকাশতাকণ ধর্ম জড় বা জীবলোকে দেখা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে Behaviouristগণ এবং Russell প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড় হইতে চৈতন্তের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। “Russell তাঁর Analysis of Mindএ যে সমস্ত উদাহরণ দিইয়াছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই হচ্ছে মানুষের জীবনের সেই বিকটা যে-বিকটা সে জৈবব্যবস্থার প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধ বা যে-বিকটায় মানুষ জড়প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু আমাদের চিন্তা-প্রণালীর মধ্যে এবং সেটা মনোব্যাপারের আত্মগতি, আত্মনিয়ম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন রাজ্যের নতুন নতুন নিয়ম পদ্ধতি দেখতে পাই যেগুলিকে কিছুতেই জৈব ব্যাপারের কোঠায় খেলা যায় না।” তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে জড়রাজ্য, জীবরাজ্য ও মনোরাজ্য পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং কোনও রাজ্যের নিয়মের দ্বারা অপর রাজ্যের ব্যাখ্যা হইতে পারে না। প্রত্যেক রাজ্যের নানা ব্যাপারের মধ্যে যে একটা আছে সে একেবারে অর্থ সামঞ্জস্য বা “তদর্থযোগিতা”—অর্থ্যাৎ একটি যে অপরেরটির কাজে লাগতে পারে, এ প্রতীতির এক।” আর যেমন নানা জীবনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য্য ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া একটি সমষ্টি জীবকোষ উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের অর্থার্থিতাবগত একেবারে

মধ্যে ঋণ ঋণ জীবকোষের স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত না হইয়া পরস্পরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সমগ্রের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং সমগ্রের পুষ্টিতে ঋণ ঋণ জীবকোষের পুষ্টি সাধিত হয়—তেমনি একটি চিন্তের উপর অন্য একটি চিন্তার প্রভাব বিস্তারে ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার একটি স্বতন্ত্র মনোরাজ্য গড়িয়া উঠে এবং ইহার বলে প্রত্যেক মন তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও ও সত্তা লাভ করে। “Trans subjective ও inter-subjective intercourse-এর যদি অবসর মানুষ না পেত তবে মানুষের মন কখনই তার বিশ্ব ও চিন্তাময়রূপে বেড়ে উঠতে পারত না।” ভক্তর দার্শনিক মন বলিয়া স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি মন বলিতে বুঝেন কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম পরস্পর বা ব্যাপার-পরস্পরার সামঞ্জস্য। এই মনের বিশিষ্ট পরিণতিই তাঁহার মতে আত্মা। “আত্মা বা self...হচ্ছে একটা জীবনের সমস্ত অনুভূতির সমস্ত experience-এর একটা সঙ্কিত অভিব্যক্তি।” তিনি আত্মা বলিলে কোন transcendent কুটূহ বস্তু বা ক্ষণ-বিধ্বংসীয়-সমষ্টি বুঝেন না। আত্মা একটি concrete entity এবং সে entity স্থির পদার্থ নয়; অশ্বত্থ ক্রমধারা-রূপে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয় না; আমাদের বা কিছু অনুভূতি বা কিছু experience হয়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে পরস্পরে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে হ’য়ে একটি অশ্বত্থ সত্তার পরিণত হয়েছে; সে সত্তার মধ্যে অনুভূতির ক্রম নেই, আছে পূর্বাপরের ক্রমাতীত অশ্বত্থ সত্তা।...“আমি” বলতে যা বুঝি সেটা হচ্ছে আমার অন্তর্জীবনের সমস্ত অনুভূতির একটি অশ্বত্থ দীর্ঘ ইতিহাস; অশ্বত্থ বলেই সেই ইতিহাসটি সকল সময়েই আমার সামনে প্রকাশক, সেটি একটি অবিস্মৃত ইতিহাস বলেই মনোরাজ্যের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সমস্ত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ও এই “আমি”র মধ্যে এমন একটী একটা আছে যে একটা তার সমস্ত ইতিহাসকে একটি অশ্বত্থ পদার্থে ঘুরান ব্যবহার করতে পারে।...সমস্ত মনের ইতিহাস “আমি”র মধ্যে আছে বলে “আমি” একটা বিচ্ছিন্নতার complex unity বা entity এবং এই জড়ই এর মধ্যে শারীর অনুভূতির অংশ এবং জৈব অনুভূতির অংশগুলিও পূর্ণ মাত্রার বিচ্ছিন্ন। এই “আমি”টি স্থির না হ’য়েও স্থির, স্থির হ’লেও সর্বদাই বর্ধমানী ও পরিবর্তনশীল।” মানুষ বলিতে বাহ্য তথা যার তাহা জড়, জীব ও মন এই তিন রাজ্যের পরস্পর সম্বন্ধে ও আদান প্রদানে উৎপন্ন এবং ইহাদের কোন অংশই মিথ্যা নয়।

“গরিচ” নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই কথাটিই বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে দেখানো হইয়াছে যে সং, বস্তু বা substance বলিয়া যে category দার্শনিকগণ এককাল চিন্তা করিয়া আসিতেছেন ইহা বিকল্প (abstraction) মাত্র। এইরূপে আত্মা প্রভৃতিও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। “সম্বন্ধগতক্রমের সন্নিবেশে যে রচনাটি রহিয়াছে তাহাই আমাদের আত্মা, তাহাই বিশ্বব্রহ্মের আত্মা।” গুণ ও গুণী, মিত্র কাল ও আধেয় বস্তুর মধ্যে, সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিয়া দার্শনিকগণ যে জটিলতার অবতারণা করিয়া থাকেন, সে জটিলতার কোন অবকাশ নাই ভক্তর দার্শনিকের নতুন দর্শনের মধ্যে। এইরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যে অনতিক্রমণীয় ভেদ কল্পনা করিয়া দার্শনিকগণ ঘৃণাবর্জের মধ্যে পতিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহাদের স্বকীয় সৃষ্টি। “শব্দের সহিত যেমন অর্থের সম্পর্ক আমাদের মনোলোকের রূপপ্রকাশের সহিতও তেমনি বহির্লোকের রূপের আত্মকণ্যা। শব্দ যেমন অর্থের সমানার্থী না হইয়াও অর্থের পৃথিব্য দেয় আমাদের অন্তরের রূপপ্রকাশও তেমনি বহির্লোকের রূপলোকের সদৃশ না হইয়াও তাহার আত্মকণ্যের দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করে।...মূর্ত্তরূপে বাহ্য বাহিরে, অন্তর্জ্ঞানরূপে তাহা ভিতরে, তাই উপনিষদ বলিয়াছেন ‘যে বা ব্রহ্মশা রূপে মূর্ত্তকামূর্ত্তক’। ব্রহ্মের দুই রূপ মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত।” বর্তমান কালে যুরোপ ও আমেরিকার যে নতুন

Realistic Philosophy পড়িয়া উঠিতেছে, তাহার সহিত ডব্টন দার্শন্যগুণের দার্শনিক চিন্তার সম্বন্ধ বড়ই ক্ষীণ। তাঁহার দর্শনের বৈশিষ্ট্যও এইখানে যে তিনি পূর্ব দার্শনিকদের কল্পিত concept-গুলি পবিত্যাপ করিয়াছেন। ইহা অবশ্য আশা করা যায় না যে তাঁহার চিন্তাপদ্ধতি দার্শনিক জগতে সকলের নিকট গৃহীত বা সমাদৃত হইবে। concept-লই দার্শনিক জগৎ ব্যস্ত—ইহাই দার্শনিকদিগের মূলধন বা উপজীব্য। তবে ইহা আশা করা যায় যে তাঁহার চিন্তার গতি—তাঁহার বস্তুত্বের প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক জগতে আলোড়ন আনিয়া দিবে। এই নূতন দর্শনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার বৈচিত্র্য ও সমগ্রতা। এখানে world of values-এর স্থান সমান পর্যায়েই স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কিছুকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা নাই। রসবোধ—সৌন্দর্যবোধ mybolic-এর অপরোক্ষানুকূলিত সমস্তেরই স্বেচ্ছাশ্রম ও অবিরোধী সন্নিবেশ আছে। কেবল বহিঃস্থিকে অবলম্বন করিয়া এই দার্শনিক চিন্তা প্রবৃত্ত হইতেছে না—ইহার চরম পরিণতি অন্তর্দৃষ্টিতে—আনন্দে ও প্রেমে। “প্রেম মাত্রই নিষ্কেষর অন্তরুণী বৃত্তি একটি বিশেষ বিভাবন ব্যাপার, একটি বিশেষ আত্মপরিচয়।” “কার্যিক বাচিক সম্পর্কপরম্পরার মধ্য দিয়া যখন একে অপরের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হইতে থাকে, এতদ্বারা যখন অপরের অন্তরুণে আপনাকে প্রবেশিত করিতে থাকে, তখন সেই পরিচয়ের অন্তরালে বাহ্যিক ভোগবৃত্তির ছায়ায় একটি নিত্যস্থায়ী অন্তরতম আত্মবরণের পরিচয় নিজের নিকট উপলব্ধ হইতে থাকে। এই উপলব্ধি দ্রবীভাবের মধ্যে যতই আপনাকে বিলীন করিয়া দেওয়া হয় ততই আমাদের আত্মর গভীর নিবিড় তপস্কার আমাদের চিন্তা তাহার নান্দ্র সম্বন্ধসম্বন্ধের মধ্যে যেন অসম্বন্ধ হইয়া ক্রমশঃ আপনাত্মক একটি নূতন পরিচয় লাভ করে।” উপনিষদে বাহ্য বলা হইয়াছে—“নবাং অণে পত্ন্য কানায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আনয়ন্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” ইহার তাৎপর্য এই যে “প্রেমের সময় যে আত্মার তাহা আমাদের আত্মপরিচয়ের আত্মস্বার্থকতার একটি কলমাত্র।” ডব্টনের দার্শন্যগুণে দার্শনিক চিন্তার সহিত উপনিষদের প্রচারিত সত্যের বিরোধ নাই—তাঁহা তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি—অবশ্য উপনিষদের ব্যাখ্যা তাঁহার নিজের। তাঁহার ব্যাখ্যায় বৈদিক ধর্মের একটি নূতন পরিচয় আমরা পাইতেছি। তাঁহার একটি ব্যাখ্যায় ধার এ কথা প্রমাণ দেওয়া বাইতে পারে। “আমাদের পাশ্বে ব্রহ্মশব্দে অর্থ বৃহৎ বা বৃহত্তম। ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ বৃহত্তমের দিকে যে আত্মচর্য বা আত্মচেষ্টা।” তাই অর্থবোধ বলিতেছেন “ব্রহ্মচর্যেণ যোবা বুবাং পতি মধ্যোতি”—“স্ত্রী যখন পতির সহিত সঙ্গত হয় তখন সেই সঙ্গতির মধ্যে একটি বৃহত্তমের প্রতিষ্ঠা হয়।” এই প্রেমতত্ত্ব ডব্টনের দার্শন্যগুণের দর্শনে বেকপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অস্বত্ব হ্রস্ব। “প্রেমের মধ্যে যে একটি নিবিড় যোগ আছে সে যোগ যত বেশ বহিরঙ্গ সম্বন্ধ লইয়া ব্যাপৃত থাকে, বাচিক কার্যিক ব্যবহারের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে তত বেশ তাহার পূর্ণতা হয় না। তত্ত্ব যত বেশ ভগবানকে আপন অন্তরঙ্গ প্রেমের সময় একটি উপাদানরূপে অনুভব করেন, স্ত্রীপুরুষের যখন রমণ-রমণী ভাব বিগলিত হয় এক একটি উত্তরস্পর্শী প্রেম সম্পর্কের আত্মপরিচয়ের মধ্যে উভয়ে বিদ্যুৎ হইয়া থাকেন তখনই তাঁহাদের যথার্থ সার্থকতা লাভ হয়।” এই কথাই আরও পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন—“তৈল ও বর্ষিকাকে অবলম্বন করিয়া যেমন দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনিই বহিঃপরিচয়ের সহিত আরম্ভ করিয়া, বহিঃপরিচয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের অন্তরে প্রেম

দীপটিও কার্যিক বাচিক ব্যবহারকে অবলম্বন করিয়া অন্তরে একে দীপীপ্যমান হইয়া উঠে, এবং তাহারই শিখার আমরা সমস্ত মনুষ্যলোককে আমাদের অন্তরে একে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যে দেবোহ্মো যোপহ তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।”

ডব্টনের দার্শন্যগুণ তাঁহার দার্শনিক চিন্তা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার দর্শনের সমগ্র রূপটি কল্পনা করা এখনও অসম্ভব। নানা দিকে ও নানা সরণিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহা যে রূপ লাভ করিবে তাহার জন্ত আমরা উৎসুক ভাবে কালপ্রতীক্ষা করিতেছি। নানা দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে সত্য, কিন্তু জগৎতত্ত্ব আমাদের নিকট আলো ও অন্ধকারের দ্বারাই এখনও আবৃত। নানাদিক দ্বির সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের একদেশদর্শিতার দাবি অনেকখানি তিরোহিত হইবে ইহা আশা করা যায়। তাই আমাদের নিবেদন দার্শনিকপ্রবর ডব্টনের দার্শন্যগুণ তাঁহার মতের পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। তাঁহার মতের বিবন্ধ সমালোচনা করা বটিন। কারণ, তাহাতে মৌলিক Concept লইয়াই বিবাক করা হইবে। তাঁহার মূল সূত্র মানিয়া লইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা বাইবে না। অবশ্য, এ মূল সূত্র সম্বন্ধে বিবাদের অবসান কোন দিন হইবে কিনা তাহা উৎপ্রেক্ষার বিষয়। তবে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ডব্টনের দার্শন্যগুণের দার্শনিকী গ্রন্থ হইতে অনেক কিছু ভাবিবার বিষয় পাইবেন এবং অনেক কিছু নূতন করিয়া ভাবিবার আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিবেন।

আমি একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমাদের সাক্ষিত অনুলীখনের উপসংহার করিব। ভারতবর্ষে দার্শনিক জগতে নূতন চিন্তাব প্রচেষ্টা অনেক কাল হইতে বন্ধ রহিয়াছে। বাঁহারা দর্শন লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বড় বৈশিষ্ট্য নাই। মৌলিক চিন্তার পরিমাণ অনুবোধন বহুর সাহায্যে নির্ণয় করিতে হইবে। বাঁহারা কোন দার্শনিক চিন্তা করেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা ঠায়াই পূর্বতন দার্শনিকদিগের চিন্তাব প্রভাব অতিক্রম করে না। অবশ্য যে কোন প্রণালীতেই চিন্তা করা বাটক না কেন, প্রাচীন দার্শনিকদিগের বহুমুখী ও বহুধা বিচিত্র চিন্তাধারার কোন না-কোন ধারার সহিত তাহার কোন না-কোন অংশে মিল থাকিবেই। কিন্তু এই আংশিক ত্রুটি বা সাদৃশ্যের দ্বারা কোন দার্শনিক চিন্তার অর্থও স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না। দার্শনিক চিন্তার বৈশিষ্ট্য তাঁহার অর্থও স্বরূপের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে হইবে। অর্থও স্বরূপে লইয়াই তাঁহার অর্থওতা বজায় রাখে—কাজেই স্বাভাবিক অর্থও হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহার বার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইবে না। ডব্টনের দার্শন্যগুণের চিন্তার অর্থও রূপ আমাদের নিকট সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হইলেও তাহার ছায়া ও ভঙ্গী আমরা উপলব্ধি করিতেছি। এই চিন্তা নবীন। ইহার মূলসূত্র নানা বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্র হইতে আহৃত এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাসমূহের পরম্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। নূতন করিয়া ভাবিবার ও দেখিবার আনন্দকতা অনেক সময়ে বাঁহারা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা ডব্টনের দার্শন্যগুণ মহাশয়ের চিন্তাধারার নবীনতা দেখিয়া আত্মলাভ করিবেন, ইহা আশা করিতে পারি। সুখী সমাজে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যিক এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ইহা অধ্যয়ন করা ও ইহার তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এসিয়া

(ভক্তিভাজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণকঙ্গল)

শ্রীকালিনাস নাগ

বিচিত্র তোমাব রূপ, বিরাট তোমার দেহ
বিষমপদ ছন্দে হয়েছে গুঁথি
জননী এসিয়া !

জন্ম দিয়েছ অগণ্য জাত অসংখ্য জীবকে
কেউ এখনও তোমাব বুক ঝাঁকুড়ে আছে—
কোণ ছেড়ে দূরে চলে গেছে কেউ ।
তবু পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী মানুষ তোমারই বুক
নানা আচার নানা ভাষা নানা ধর্ম—
যেন মনে হয় অনৈক্যের মহাকাব্য ।
অথচ তাব মধ্যেই জেগেছে যুগে যুগে
ঐক্যের অমর বাণী ।

কি ক'বে ? কেন ? তাব জবাব মেলে না ।
মানুষের আদিম চেতনা বিধিবদ্ধ হ'ল বেদে—
তার মধ্যে শুনি :

“সত্য সে অসীম জ্ঞান, আনন্দ সে পাশ রূপ
মূলে সে দৈতহীন, কর্ণে সে কল্যাণ শিব
কর্ণান্তে অপরিসীম শাস্তি” ।
আজ সেই মহাদেশের ইতিহাসে দেখি
পদে পদে দৈত স্বপ্নের বেড়ি
কর্ণে নেই কল্যাণের সাড়া
সমাজে অ-শিব ভূতের উৎপাত
আনন্দ গেছে উড়ে, শাস্তি পেয়েছে লোপ ।

আব কি দেখি এই অবনতি দুর্গতির ধ্বংসরূপে ?
গেছে প্রায় সব, আছে তবু কিছু :
সব চেয়ে প্রাচীন সব চেয়ে বড় পাহাড় জাঙ্গাল
সব চেয়ে পুরান নর-কপাল চীনে বব্বীপে
বিদ্য শিবালিক্ হিমালয়েও খোঁজ মিলবে ।

মিশব স্নেহবিদ্যার সঙ্গে কবছে মিতালি,
সিদ্ধু-ভারতের মানুষ,
ইবাণে তুবাণে মঙ্গলে মালম্ চলে কোলাকুলি ।
এল মাটি পাথর শাঁ-ঝিলুকের খেলনা
এল মণিবস্ত্রের মল্লার্ঘ অলঙ্কার ;
রূপসীদের বঁক চাহনিব তোড়ে
উজান বেয়ে চলে সভ্যতার স্রোত—
ভূমধ্যসাগরের প্রবাল, স্বদূর চীনের জেড-মণি
সিদ্ধু-হৃন্দরীর গায়ে চলে আসে অবাধে ।
সাগরের তল থেকে ওঠে মৃত্তা
মাটির বুক চিবে ওঠে নোনা হীবে
লক্ষীর শ্রী কোটে বাণিজ্যের বিস্তাবে
ভাঙপিটে মানুষ ছোটে পৃথিবীটা লুটতে
সর্বনাশের মুখে তুড়ি দিয়ে সর্বজয়ী হতে ;
বাধা দিতে পারে নি মধ্যএসিয়ার মহামরু,
উত্তর ভ্যাল হিমালয়,
অন্ধকার সাগর পার হয়ে মানুষ গেয়েছে
আদি উষাব বন্দনা
আরিত্যবর্ণের উদার আবির্ভাব
বিশ্বমানবের সমান আকৃতি, অসীম ঐক্য ।

সীমাব কোটাল শুক লুটছে নিষ্ঠুর হাতে
ধন-রত্নের তালি কবেছে হান্ধা
কিন্তু ধান-বস্ত্রের উপর চলে নি ইনকম-ট্যাক্স ।
হুনিষাব দৌলত রাজ্য সাম্রাজ্য পড়ছে গুঁড়িয়ে
বাজায় বাজা কুরুক্ষেত্র—
ইবাণে জাগে নতুন প্রশ্ন : “হুট্টা বাইরে না ভিতরে ?

তলিয়ে দেখে ভাল-মনের দৃশ্য”
 জ্বরথুঙ্গের প্রাঙ্গণে কঁপে ওঠে ধৃতরাষ্ট্রের দল ;
 গাথায় গাথায় গড়ে ওঠে জেন্দু আবেস্তা—
 হিন্দু বেদের নূতন সংস্করণ
 তার সাড়া পৌছয় আখ্যাবর্ষে
 বসে মানুষ জিজ্ঞাসায়, জাগে উপনিষৎ
 নতুন অসত্য বিজ্ঞা অবিজ্ঞা মৃত্যু অমৃতের সম্মান ।
 তত্ত্বদর্শী পুরুষ মুগ্ধ হয়ে শোনে
 প্রজ্ঞারূপিণী মৈত্রেয়ীর বাণী :
 “নিয়মে যাও অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে
 মৃত্যু হতে অমৃত” —
 মৈত্রেয় বুকের আসতে দেরি হয় না
 হিংসায় বিধিয়ে উঠেছে আকাশ
 পৃথিবীর বজ্রবেদী রক্তে রাঙা
 তাই কি জাগে অহিংসার মন্ত্র, মৈত্রীর সাধনা ?
 সারা ভারত ছাপিয়ে ছোটো কল্যাণের ধারা
 করুণার দীপালি জ্বলে স্বীপ-ভারতে চীনে জাপানে
 প্রশান্ত সাগর শোনে মহামানবের গান •
 ভারতকে নিয়ে বিরাট প্রাচ্য জুড়ে যেন মহাভারত অভিনয়—
 কাব্যে দর্শনে কলায়
 ভাস্কর্যে স্থাপত্যে নৃত্যে সঙ্গীতে
 গড়ে ওঠে মহান সম্বন্ধের স্বর-সঙ্গতি
 তার আভাস জাগে লাওংস্য কনফুসাসেব দর্শনে
 কোবোরাইসি হোনেন নিচিরেনের সাধনায় ।
 ঘনিষে আসে মধ্য যুগের অন্ধকার
 তারই মধ্যে ধেয়ে আসে ফিরদৌসি আলবেক্কী মার্কোপোলো
 বৌদ্ধ মঙ্গল-সম্রাটের নিমন্ত্রণে আসে
 নানা ধর্ম নানা ভাষা সংস্কৃতির নেতা,
 পণ্ডিত পাণ্ডিত সাধক প্রচারক
 মধ্যএসিয়ার উত্তর শিখরে বসে
 প্রথম মানব-মৈত্রীধর্ম-সঙ্গতি ।
 সে সাধনার ধারা মেলে পশ্চিম-এসিয়ার ধর্ম-স্বরধুনীতে
 ইশার ধর্ম মুসার ধর্ম উর্কর করে তোলে
 মরুভূমির বেহুইন প্রাণ
 নতুন করে শেখায় সভ্যতাগার্বী মানুষকে
 প্রেমে সবার অবাধ অধিকার—সবার উপরে এক ।

তর্কের ভিতরেই খ্রীষ্টভক্তি ও কৃষ্ণভক্তি যায় মিলে
 যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যেই হিন্দু-মুসলিম মরমী করে কোলাহুলি
 ঘেন গড়ে ওঠে বা অপূর্ব মিলন ।
 হঠাৎ কালের ঘড়ির কাঁটা যায় পিছিয়ে
 মৈত্রী হয় পঙ্কিল কাপুরুষতায়
 শক্তি হয় লোভন জয়ের মাৎসর্যে
 প্রচণ্ড বিক্রমে পশ্চিম পড়ে পূবের বৃকে
 নতুন করে মানুষকে দেয় মস্তুর
 শাস্তি ছায়, প্রতাপ সত্য,
 চাই বল চাই অর্থ চাই সাম্রাজ্য বিশ্বজোড়া ।
 পশ্চিমী বিশ্ববাদের সঙ্গে কেমন হবে মেলে পূবে বিশ্ববাদ ?
 রাষ্ট্র-কলের চাপে পিষে যায় অগণ্য নরনারী
 তাদের ঘামে তাদের রক্তে পঙ্কিল পৃথিবী,
 তবু কলের ঢাকা থামে না,
 মরতে মরতে ভাবে এসিয়ার মানুষ :
 “লক্ষ বছর ধরে দেখছি অনেক রাজ্য ভাঙাগড়া
 নতুন করে বইছে রক্তগঙ্গা দিকে দিকে
 হয়ত পড়বে না টান মহাসাগরের জলে
 ধুয়ে দিতে মানবের রক্তরেখা ।”
 মেলাবার মেলাবার সুযোগ আজ অসীম
 কিন্তু লাগাও ভেদ, জাগাও অমিল,
 হাতে হাতে চাই লাভ, সামনে বাই থাক
 এই ত আধুনিক রাজনীতি, অর্থনীতি ।
 বিশ্বজোড়া বাণিজ্যের আয়োজন—
 গর্জ্জে ওঠে কলকজার হুকার
 কারখানার সঙ্গে যেন পাল্লা দিতে পারে না
 সেকলে পৃথিবী ।
 পর্কতপ্রমাণ জমে ওঠে অব্যাসক্তার
 কারো লাভ বেশী, কারো কম, লাগে দৃশ্য ।
 বাধে যুদ্ধ জাতে জাতে, চীনে-পাঁচিল ওঠে গড়ে,
 মানুষ মরে পাঁচিলের ভিতরে বাইরে নিষ্ঠুর ক্ষুধায়,
 ভিনার খেয়ে এসে হুকুম দেন মালিক ;
 “মরুক কুলি মজুর ছোটলোকের দল,
 পোড়াও শস্ত খাবার সব দাম যতক্ষণ না বাড়ে,
 চিরকাল মরে আসছে যারা মরুক—মুনকা চাই” ।

কোটি কোটি নরনারী জন্মায় মরে অগণ্য গ্রামে
জনকতক সহরে মানুষ তাদের মরণ-বাঁচনের বিধাতা
তুলনা নেই তাদের ক্ষমতার
সীমা নেই তাদের সমৃদ্ধি বিলাসেব
নাইবা থাকল গ্রামের মানুষের ভাত, কাপড়,
শিক্ষা স্বাস্থ্য আলো হাওয়া,
সহর উঠুক বাক্মকিয়ে—সহরের জন্তেই ত গ্রাম।
এক দল খাটে এক দল খাধ এই ত সমাজনীতি।

অগণ্য ঐক্যক নিরন্ন নিস্তেজ সন্তান বুকে নিয়ে
প্রাচীন পূর্ব ভাবে নূতন পশ্চিমের কথা
নূতনে পুবাঁজনে এতই প্রভেদ,
এত বৈষম্য কি সত্য না মায়া ?
ভেবে পায় না কবে কেমন করে উঠল
এত বড় ব্যবধান।
একদিকে শৃঙ্খলিত নিরুপায়
অন্যদিকে জয়দুগ্ধ উপেক্ষা—
মধ্যে পৃথিবীর বুক চিরে চলেছে বয়ে
মুক মানব-বেদনার মহানদী,
নিঃশব্দে পড়ছে ভেঙে পাড় হ্রদিক দিয়ে
হয়ত কারো চোখেই পড়ছে না
কারো বা পড়ছে,
এতটুকু বোঝা-পড়ার জন্তে প্রতীক্ষা করছে
অসংখ্য মানুষের যুগসঞ্চিত নিষ্পেষণ,
মানুষের সমগ্র হৃদয় নেই
বিধাতার ধৈর্য হয়ত আছে।

অপরিসীম করুণা, অক্ষয় ক্ষমা,
সাধারণ মানুষের অনর্জিত ধন—
আছে যেন কোথাও।
তাঁতে কেউ পারে না হাত দিতে, কেউ করে না লুট,

যে ধন খোয়া যায় না জুয়ার খেলালে
জুয়াচোরের চালবাজিতে,
সেই ব্যঙ্গহীন ক্ষমহীন কারুণ্য ভাঙার থেকে
বেরিয়ে আসবে না আবার কল্যাণলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা
অগণ্য নিরন্নদের বাঁচতে ?
মুসুর্ শিশুকে ফেন-ভাতের পথ্য দেয়
গ্রামের জননী,
কোলে তার মরে শিশু,
সংস্কারের সামর্থ্য নেই
চোখের জল চেপে বেরয় ভিক্ষায়—
সে অশ্রব দাম যদি থাকে,
পড়বে সাড়া, আসবে তেউ
দিতে অন্ন দিতে স্বাস্থ্য দিতে নূতন প্রাণ ;
আসবে কেউ ভৈষজ্য-গুরু হয়ে
আনবে যুতসম্মীবনী স্বধা
নূতন তেজ নূতন মস্তিষ্ক।
আসবে কেউ দীপঙ্কর হয়ে
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে জালিয়ে দেবে আবার
সন্তোষ আনন্দেব প্রেমের লীপালি।
যুগসঞ্চিত বুভুক্ষা অস্বাস্থ্য অন্ধকার
যাবে দূর হতে।
উপেক্ষিত নির্ধাতিত নিষ্পেষিত মানুষ,
চিরকালের মানুষ,
সব জাতের সব দেশের মানুষ,
হাত জোড় করে
মাথা নীচু করে
উদয়াচলের দিকে তাকিয়ে
গেয়ে উঠবে নরনারী শাশ্বত বন্দনা
পূর্ব পশ্চিমের ভেদ যুচিয়ে।
সব দুঃখী সব হতভাগ্যের মুখে হাসি ফুটিয়ে
জাগাবে এসিয়া মিলনের ঐক্যতান—
জয় শান্তি জয় মৈত্রী
জয় মানবের অখণ্ড চিরন্তন মিলন।

দেবতা

শ্রীমুখীল জানা

দেবতার জন্ম।...

সেদিন গোখলি আকাশ অন্ধকার করিয়া রূপ-
কথা বড় উঠিয়াছিল। মুখে ঘাস লইয়া গাভীগুলি
কিরিয়া আসিয়াছে—আসে নাই কেবল কাজলী। বাখাল
বালক উদ্বিগ্ন মনে ছুটিয়াছে প্রিয় গাভীটির সন্ধানে।
খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে কাজলীর সাক্ষাৎ মিলিয়াছে
বালুয়াড়ীর পাশে—বাদাম-জল্লের অন্তবালে। সেদিন
বালক বিস্মিত হইয়া দেখিয়াছিল, কাজলী নিশ্চল হইয়া
পাড়াইয়া—তাহার সমস্ত দৃষ্টি বিনা-দোহনেই বালির উপরে
ঝরিয়া পড়িতেছে। দেবতার জন্ম হইয়াছিল সেইখানে।

এ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের কাহিনী। সেই কাহিনী
বাঁচিয়া আছে সবল বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া, কিন্তু
দেবতার বাহু আড়ম্বর সন্দিগ্ধ মনেব উপর ভর করিয়া
বৎসবেব পর বৎসর দেউলের চূড়ায় সোনার কলস, রূপার
কলস সাজাইয়াছে, দেবালয়েব প্রাঙ্গণ দ্বিভূত করিয়াছে,
নাটমন্দির তুলিয়াছে, নতুবা যে দেবতা সঙ্কট হইবে না।
সন্দিগ্ধ মন সঙ্কট করিতে পারে নাই তাই চৈতালী বড়
উগ্রদেবতার মূর্তি খনিয়া ধূলাবালি উড়াইয়া চাবি দিক
অন্ধকার করিয়া ফেলে, বাদাম-ঝাড়ের শ্রেণী গভীর
আর্দ্রনাদে মর্শ্বিত হইয়া উঠে, অদূরবর্তী সহস্র-কল্লোল
যাত্রীর মনে শঙ্কা জাগাইয়া তুলে। কাহিনী বলে সহস্র
সহস্র বৎসর পূর্বের সেই বাখালবাহু ওই সময়ে আসিয়া
পাপীর বিধান দিয়া যায়। মহামারী ছড়াইয়া পড়ে।

সেদিনও বাতাস ক্রমশঃ জোরে বহিতেছিল। যাত্রীদের
গরুর গাড়ী শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়াছে—সঙ্ঘার স্বল্পাঙ্কব
পথ দিয়া। এই সময়টায় গাভন উপলক্ষ্য করিয়া বুড়ান্ধবেব
উৎসব চলে। মেলা বসে—বহু দূর দূরান্তব হইতে যাত্রীব
আসে।

• গরুর গাড়ী মন্থব গতিতে চলিয়াছিল, এমন সময় পাশেব
বাদাম-বনেব ভিতর হইতে এক জন জীলোক বাহির হইয়া

আসিল—আকৃতি দেখিয়া উন্মাদ বলিয়াই বোধ হয়।
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মোহন গৌসাইকে চেন গো ?
সঙ্গে একটি ছোট ছেলে, সুবল নাম।...

গাভোয়ানের নিকট হইতে উত্তর আসিল—না, এখনও
ত খোঁজ পাই নি। পেঙ্গে বলবো।

যেন অভ্যাস-মত উত্তর। যাহারা এই পথ দিয়া
যাত্রায়ত কবে তাহাদেব এই রকম উত্তর দিয়া
যাইতে হয়।

যাত্রীরা কেহ গাড়ীর ভিতর হইতে উকি মাঝিয়া
দেখিতেছিল, কেহ উৎকর্ষ হইয়া শুনিতেছিল। জীলোকটি
হতাশ হইয়া মর্শ্বায়মান বনের মধ্যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।
খলু খলু করিয়া হাসিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ছুটিয়া চলিল—
মোহন গৌসাই...সুবল রে...

বধু মালতীমালা উৎসুক কণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—
কে বল ত গো ?

—কে হারিয়ে-টারিয়ে গেছে বোধ হয়। তাই...

—না বাবু, হারান নয়—ভেতরে আরও কথা আছে,
গাভোয়ান ভণিতা কবিষা বলিল, একে ডাকে লোকে বিস্ত-
পাগলী বলে—আসল নাম বিশাখা। বোষ্টমেব মেয়ে...

সে যেটুকু জানিত বিবৃত করিয়া গেল। খুব অল্পই
সে জানিত। তাই কতকগুলো মিথ্যা কথা জুড়িয়া একটু
দীর্ঘ করিয়া চটপট উপসংহাব করিল : ঝড় উঠবার লক্ষণ
দেখা যাচ্ছে বাবু আজকে। বলা যায় না, বাখালরাজ
হয়ত আসবেন। যাত্রীদের আব হৃদশার অন্ত থাকবে না
তা হ'লে বাবু। তিনি কি আর একা আসবেন, সঙ্গে
নিয়ে আসেন ঝড়, শিলাবৃষ্টি, মহামারী...পাপীর সাজা দেবার
মালিক তিনি। আহা, দয়াময়

গাভোয়ান অদৃশ্য মালিকটিকে প্রণাম কবিল।

বধু সশক্তি চিন্তে রুগ্ন শিশুটিকে বুকের মধ্যে টানিয়া
লইয়া উদ্গাদিনীর বাতাসে-ভাসা কণ্ঠের উৎকর্ষ হইয়া

শনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আর তাহার কণ্ঠস্বর শোনায় না। আবার হয়ত কোন বনান্তরালে মিশিয়া গিয়াছে—পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে একটা বেদনার্ত্ত ইতিহাস।

প্রায় বছর-দশেক পূর্বে এই শিবসাগর গ্রামে ঠিক এই সময়টার প্রাথমিক বৃষ্টিবের গাঙ্গন উপলক্ষ্য করিয় মেলা বসিয়াছিল। সপ্তাহভোর উৎসব চলে; এই সাতটা দিন বিভিন্ন যাত্রার দল পাল্লা দিয়া পর পর গাঙ্গনা করে। সে-বারে কোন একটা যাত্রার দল নিতান্ত হাশ্বকর গাঙ্গনা করায় কানামুখা চলিতেছিল, এ কি আর যাত্রা গো—পরন্তু মোহন গৌসাইয়ের দল হবে যা শুনে স্থখ হয়। শুনে আর খালি চোখ ফেটে জল বেরবে। প্রহ্লাদ গাঙ্গনা ক'রেছিল একবার—কৈদে লোকে আসর ভিজিয়ে দিলে না।

গৌসাই-অপেরার সাজপোষাকের বড় বড় বাস্তবতা আসিয়া পৌছিয়াছে, আসামীরীও আসিয়াছে। অনেকেই স্থপুরুষ দেখিয়া এবং কথাব হাব-ভাবে 'ম্যাক্টোর' বীজ নিহিত দেখিয়া ঝাঁচ কবিত্তেছিল, এই লোকটাই বোধ হয় মোহন গৌসাই হবে।...

কিন্তু মোহন গৌসাই তখন আসিয়া পৌছায় নাই—ঠিক বাহির হইবার মুখে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। স্থবল অর্থাৎ প্রহ্লাদ বে সাজিবে তাহার খোজপাওয়া যাইতেছে না। অনেক খোজাখুঁজির পর অবশেষে তাহার খোজ মিলিল ঈশান দাসের গোড়ো বাড়ীর মধ্যে;—সোনা পোকা ধরিতে স্থবল তখন নিতান্ত ব্যস্ত। 'মোশান মাষ্টার' ঋষি দাসকে দেখিয়াই পলাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু মাষ্টার খাঁ করিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া ঠাস করিয়া গালে একটা চড়ু কসাইয়া দিয়া বলিল, পালান হচ্ছে কোথা—ওদিকে সবাই আমরা বসে.. এক ফোটা ছেলে—টিট ক'রতে হয় কি ক'রে তা ঋষি দাস জানে। সে মুখ্য নয়...

অগত্যা যাইতে হইল স্থবলকে।

স্থবলকে লইয়া পথটাই হইল মুন্সিল। পড়ন্ত রোদটাই যেন বেশী চড়া। মাথার গামছা ঘন ঘন শুকাইয়া যাইতেছে—পুকুরের অভাবে ঘন ঘন গামছা ভিজানও মুন্সিল। ক্রান্ত স্থবল সম্মুখের দূরতর পথের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তে বলিল, পথ আর কত দূর যেতে হবে গৌসাই-কাকা?

মোহন উত্তর দিল, এখনও অনেক দূর—যেতে 'সেই' দু-পহর রাত।

দু-পহর! স্থবল ক্রান্তকণ্ঠে বলিল, গাছটার জলে একটু ব'সব গৌসাই-কাকা। যে রোদ...

—তাই ব'স, রোদই বা আর কতক্ষণ—আর একটু পরে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বেশ বাওয়া যাবে। সেই সকালে ওদের সঙ্গে গেলে এতক্ষণে পৌছে যেতিন্ মেলায়।

স্থবল বসিয়া পড়িয়া বলিল, রক্ষে কর গৌসাই-কাকা—ওদেব সঙ্গে কিছুতেই আমি ইটুতে পাবতাম না। তাই ত সকালবেলা লুকিয়েছিলাম। মাও বললে তোমার সঙ্গে যেতে...

মোহন সোৎসাহে বলিল, তোর মা তাই বলেছিল বুঝি। মোহনের আরও কিছু জানিবার ছিল কিন্তু জিজ্ঞাস্য মনকে শাসন করিয়া বলিল, তোর পোটলায় কিছু বাঁধা আছে নাকি!—খেয়ে নে এই বেলা, আগে গেলে আর ভাল জল পাবি নে—সব লোন।

স্থবল টিড়া ভিজাইয়া আনিয়া দুই ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া মোহন বলিল, ও কি কচ্ছিস্ রে!...

—বেন, তুমি খাবে না?

—আমি! আরে রাম...ওই দুটি ত, তুই খেয়ে নে। ছেলেমাছ—তোর জন্তে দিয়েছে আর আমি...

—না গৌসাই-কাকা, তোমার জন্তেও যে মা দিয়েছে। 'এই দেখ না, রসকরা এতগুলো...কাল মা রাত্রে তৈরি ক'রেছে যে।

মোহনের কোতূহল হইতেছিল জিজ্ঞাসা করে, আমার জন্ত পাঠাইবার তার কি প্রয়োজন ছিল? কোতূহল হইতেছিল স্থবলের নিকট হইতে তাহার মনের সমস্ত কথা জানিয়া লয়। কিন্তু তাহা অশোভন হইবে অধিকন্তু অসম্ভব। মোহন গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, তর্ক না ক'রে খেয়ে নে দিকি চটপট—অনেকটা যেতে হবে যে!

স্থবল কিন্তু বসিয়া রহিল।

মোহন একবার তাহাকে আড়চোখে দেখিয়া লইয়া বলিল, খেলি নে এখনও!

স্থবল মুহূর্ত্তে জবাব দিল, মা বললে যে তোমাকে দিতে! বললে, তোর গৌসাই-কাকা রসকরাই ভালবাসে। তাই...

মোহন হাসিয়া বলিল, কই দে তবে। মুন্সিলে ফেলিল দেখছি। তোর মাকে এবার ফিরে গিয়ে বলিস—বুঝলি, যে গৌসাই-কাকা বলেছে, গুরুকম লোভ দেখিয়ে কি হবে। হ্যাঁ, পেতুম এ-রকম রোজ, দু-দিন একদিন দিয়ে আসল বৈরাগী মানুষকে শুধু লোভী ক'রে দেওয়া। তার পর একটা রসকবা মুখে ফেলিয়া দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, তোর তবু মা আছে স্ববল—রসকরা ক'রে দে, চিড়ে বেঁধে দেয়; মোহন হাসিল—পুনরায় বলিল, আমার কেউ নেই যে এমন দেয়—না আছে মা, আর না আছে কেউ। এমন কপাল...মোহন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। ভাবিল, মিথ্যা কথা—তার কিইবা নাই। আসল কথা—দস্যার পাতিতে তার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। দস্যারের মায়-মমতা, ইহার আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে তাহাকে বৈরাগী সাজাইয়া, নিশ্চ-কাড়াল সাজাইয়া কে যেন বসাইয়া রাখিয়াছে।

স্ববলকে শেষ পর্যন্ত কাঁধে তুলিতে হইল।

কাউগাছে বাতাস লাগিলে শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এমন যে ভীতিপ্রদ শব্দ হয় তাহা স্ববলের নিকট নিতান্ত অজ্ঞাত। তাহার উপরে পথের দু-পাশে নরককাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অদূরে মেলার আলোঙলা জলিতেছে, শরীরও যথেষ্ট ক্লান্ত—এই সমস্তগুলি একযোগে তাহাকে ভীতাক্ত করিয়া তুলিল। সে যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইল, অসংখ্য ভূত-প্রেত মুখে আগুন জ্বালাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে, ধল ধল করিয়া হাসিয়া চারি দিকে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নরমুণ্ড লইয়া গেলুয়া খেলিতেছে। স্ববল ভয়ে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঋষি দাস হাসিয়া বলে, মোহন, স্ববলের জন্তে হুখ ফেনাটা না-হুখ বাদই দিয়ে দাও। সবাই যে রকম হাসাহাসি আরম্ভ করেছে—বলে, আমাদের গৌসাই-ঠাকুরের হঠাৎ এ হ'ল কি! ননী বোষ্টমের ছেলে স্ববলা—যে ফেন-ভাতও...ঋষি দাস মোহনের মুখের অবস্থা দেখিয়া আর বলিল না।

মোহন বিকৃতমুখে হাসিয়া বলিল, আরে ভাই, পরের ছেলে—বিশেষে এনেছি। ভালয় ভালয় তার মায়ের কাছে পৌছে দিতে পারলে হয়। একটি মাত্র ছেলে বে ভাই, না আছে স্বামী আর না আছে কেউ, বুঝলে না...

ঋষি দাস বোধ হয় বুঝিল তাই, আর প্রতিবাদ করিল না। রিহাসাল আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে চলিল।

দুই দিন জোর রিহাসাল চলিতেছিল—মোহন গৌসাইয়ের দল 'প্রহ্লাদ' গাওনা কবিবে। যাহারা পূর্বে কখনও শুনিয়াছে তাহারা মহা গৌরবভবে বলিতেছিল, কি বলে নামটা শুব—কম্বাধু, মোহন গৌসাই কম্বাধু সাজলে গুরুমহাশয় বাঁলে আর চেনা যায় না ভাই রে—সাজ-পোষাকও তেমনি, সাক্ষাৎ একেবারে মহারাণী। আর সেই প্রহ্লাদ...আহা!...

কিন্তু দৈবের উপরে নাকি হাত চলে না, তাই যে-দিন মোহন গৌসাইয়ের দলের গাওনা করিবার কথা সেদিন সকালে স্ববলের সারা অঙ্গে দুসহ বেদনা জাগাইয়া বসন্ত দেখা দিল। ইতিমধ্যে মেলায় চিরাচরিত প্রথমত বসন্ত ও কলেরা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। 'মোশান মাঠার' ঋষি দাস বিপদ বুঝিয়া আর এক জনকে প্রহ্লাদের জন্ত তৈরি করিতে লাগিল। সকাল হইতে বুঝাইয়া-পড়াইয়া আবস্ত হইবার কিছু পূর্বে তাহাকে রীতিমত প্রহ্লাদ বানাইয়া ছাড়িয়া দিল।

অনেককে হতাশ করিয়া যাত্রা কিন্তু তেমন জমিল না।

অভিজ্ঞরা অজুলীনির্দেশ করিয়া বলিল, আরে ধোং—এ কি 'ম্যাক্টো' হচ্ছে, শুনেছিলাম সে বছর...

কম্বাধু নিতান্ত অন্তমনস্ক—বার-বার কথাগুলো ভুল হইয়া যাইতেছে। কোথায় যুলে যেন সমস্ত গাওগোল হইয়া গিয়াছে। আসর হইতে বাহির হইয়াই কম্বাধু অহুসত্বান করে—স্ববল এখন কেমন আছে হে?

স্ববল তখন অঙ্গের দুসহ বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের তুফা যেন তাহাকেই আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। যন্ত্রণা উপশমের আশায় মাথাটা এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে যত্নকণ্ঠে কেবলই ডাকিতেছিল, ও—মা গো।

কম্বাধু স্ববলের শিয়রের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। স্ববল নিশ্চিন্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া যন্ত্রণার একটা অক্ষুট আর্দ্রনাদ করিল।

কম্বাধু স্ববলের পাশে বসিয়া পড়িল। হুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করে, খুব কষ্ট হচ্ছে—না রে? কম্বাধুর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসে। নিমপাতার আঁটিটা গায়ে বুলাইয়া দিতে দিতে যত্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, খুব চুলকচ্ছে—না?

স্ববল পীড়িত মনের মানস চক্ষে দেখিতে পায়—মা।

শিয়রের নিকট আসিয়া বসিমাছে—চোখে যেন দুই ফঁেটা জল। অস্পষ্ট বসে সে বলে, মা, বড্ড ব্যথা।

মা বোন সাজা দেখে না—অশ্রুসিক্ত দুইটা অপরাধী চক্ষু দিয়া নীরবে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে—নিমপাতা-গুলি সর্বাঙ্গে বুলাইতে থাকে। স্ববল স্বস্তির নিশ্বাস কেনিয়া অতিকষ্টে কন্নাধর কোলের উপর মাথাটা তুলিয়া দেয়। আরাম করিয়া মাকে যেন জড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া মানের অদৃশ্য স্নেহটুকু উপভোগ করিবার চেষ্টা করে। চক্ষু মুদিয়া সে যেন শুনিতে পায়—কত দূর-দূরান্তর হইতে ঋষি মাষ্টার ডাকিতেছে, মোহন...ও মোহন—আবে কন্নাধু গেল কোথা। নাঃ, মাটি ক'রলে দেখছি...

কন্নাধু নিশ্চল পাথরের যুষ্টির মত বসিয়া। কোল হইতে স্ববলের মাথাটা নামাইতে তাহার সাহস হয় না—হৃদয় ছেলোটোর তন্ত্রার ঘোরটা কাটিয়া যাইবে। এখন হৃদয় যন্ত্রণার একটু লাঘব হইয়াছে। অপরাধীর মত অনড় ভাবে বসিয়া থাকে।

অপরাধীই ত—মোহন ভাবে, এক জনের নিকট সস্ত্রস্ত্র প্রাণত্যাগ কুড়াইতে গিয়া, আভাবিক ভালবাসা, সহজ সরল ভালবাসা কুড়াইতে যাইয়া, নিজেকে মহাত্ম্যভব সাধুভাষে গিয়া অবশেষে সে এ কি কুড়াইবে! স্ববল যখন তাহাব মার নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিবে, গৌসাই-কাকা আমাকে একটুও যত্ন করে নি মা—আর আমি ওঁর সঙ্গে কিছুতেই যাব না, তুমি কিন্তু কিছু আর বলতে পাবে না। উঃ, বসন্ত হ'লে গা-হাত কি ব্যথা হয় মা—আর চুলকানি, কেউ একটু নিমপাতাটাও বুলিয়ে দেয় নি গায়ে—ইত্যাদি। তাহা হইলে মোহন যাহা পাইয়াছে তাহাও যে হারাইবে! কেবল-মাত্র স্ববল ফিরিয়া গিয়া তার মার কাছে ভাল বলিবে এই জন্ত মোহনের অন্তরে বাহিরে যে কত চেষ্টা—সে কাহাকে তাহা বুঝাইবে। স্ববলের যাহাতে কোন কষ্ট, কোন অসুবিধা না-হয়, সে যাহাতে ভাল থাকে—এক-কথায় কোন অল্পযোগই যেন না উঠিতে পায় মোহন সেজন্ত যথেষ্ট সতর্ক হইয়াছে, যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। দুর্ভাগ্য কপাল তাহার—অবশেষে তাই এমনটা ঘটিল।

যাত্রা কোন রকমে গৌজামিল দিয়া শেষ হইয়া গেল। পরদিন প্রভাতে মোহন দলের সমস্ত লোকজনকে রওয়ানা

করিয়া দিল। ঋষি-মাষ্টার যাইবার সময় সান্দ্র্যে বলিল, তুমি কি এখানে একা থাকতে চাও নাকি মোহন!—এই রোগী নিয়ে!

মোহন মুহু হাসিয়া বলিল, উণায় আর কি! যাও তোমরা—ও একটু ভাল হয়ে উঠলেই যাচ্ছি আমি।

তাই কি হয়! ঋষি মাষ্টার বলিল, আমাদের কি পণ্ড ঠাণ্ডারালে নাকি! এই অবস্থায় আমরা তোমাকে একা ফেলে যাব! ওরা যাক—আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

ঋষি-মাষ্টার বলে, মোহন, ছোঁয়াচে রোগ—অত মেশামেশি ভাল নয়।

মোহন কেবল নির্কোষের মত হাসে। স্ববলের রোগ-শয্যার উপরে বসিয়া বসিয়া ভাবে, স্ববলকে এই যে এত সেবা-যত্ন করা—ইহা স্ববলের জন্ত না তাহাব মায়ের জন্ত! সন্দেহ মন তাহার যাহাই ভাবুক না কেন—যাহাই বলুক না কেন, এই শিশুটাকে ভালবাসিবার ভান করিতে করিতে এখন সে সত্যি ভালবাসিয়া কেলিয়াছে। স্ববলের মারাত্মক বনজন্তুর কথা ভাবিয়া এবং হয়ত সে আর বাঁচিবে না এই ভাবিয়া তাহাব মনে হয়, বহু দূর-স্বরের এক জন বিধবার কি ক্ষতি হইবে ঠিক জানা নাই, তবে তাহার যেন বিশেষ ক্ষতি হইবে। তাহার রোক চাপিয়া যায়—ইহাকে বাঁচাইতেই হইবে, তাহাকে তাহান সাধ্যমত এবং যদি সম্ভব হয় ত সাধ্যাতীত চেষ্টা কবিয়াও ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। তাহাদের সমাজের মধ্যে, তাহাদের গ্রামের মধ্যে বিশাখা বলিয়া এক জন যে বিধবা আছে এবং সেই জীলোকটিকে খেলার সাথীর জীবনকাল হইতে আজিকার এই যৌবন পর্যন্ত যে সে একনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসিয়া আসিয়াছে—এইটুকু দেখাইবার জন্ত স্ববলকে যত্ন করিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে—ইহা সে ভুলিয়া গেছে। এখন স্ববলকে ভালবাসে বলিয়াই তাহার যেন এই সমস্ত করা। ইহার মধ্যে কোথাও কোন বাঁকা-চোরা মানে নাই।

ঋষি দাস মোহনের নিলিষ্ঠ মুখের দিকে চাহিয়া বলে, মোহন, ছেলেবেলায় অনেককে অনেকের ভাল লাগে—তার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভালবাসায় দাঁড়ায়। আমি

তোমার অনেক কথাই জানি, আবার হয়ত অনেক কথাই জানি না। একটা কথা জিজ্ঞেস করব—বলবে ?

মোহন কোন উত্তর দিল না—নীরবে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইল।

ঋষি-মাষ্টার বলিল, বিশাখাকে তুমি ভালবাস জানি আর একথা খুব ছেলেবেলা থেকেই জানি। তোমার বাবা-মা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তার ননী বৈরাগীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আর তুমিও সে সময়ে অল্পবয়সে করবার সুযোগ পাও নি—তাও জানি। কিন্তু পরে ত তুমি তাকে গ্রহণ করতে পারতে। সে যখন বিধবা হয়ে ফিরে এল তখন তোমার বাবা-মাও বেঁচেছিলেন না এবং বাধা দেবাবও কেউ আর ছিল না। তা ছাড়া, এই রকম ভাবে গ্রহণ করা—এ ত আমাদের সমাজে অচল নয় মোহন।

মোহনকে নির্দ্বারক দেখিয়া ঋষি-মাষ্টার আবার বলিল, এ হয়ত তুমি নিছক আত্মাভিমানের জন্ত কর নি। আবার তারই ভয়ে হয়ত তুমি স্ববলকে ভালবাস। শুনি—ভালবাসা ব্যর্থ হ'লেও যার বুকে থাকে সে নাকি সত্যিই ফাঁকি পড়ে না। যা হোক একটু ঠাঁই পেলেই লভিয়ে গুঠে—এ হয়ত তাই। তোমার ভাবভঙ্গী আমি বুঝে পাই নে মোহন।...

মোহন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হারিকেনের দমটা কমাইয়া দিতে দিতে বলিল, শুয়ে পড় ঋষি—রাত হয়েছে।...

মোহন যাই করুক—স্ববলকে শেষ পর্যন্ত বাঁচাইতে পারিল না।

সন্ধ্যার পূর্বে হইতেই বাতাসের জোর বাড়িতেছিল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সন্ধ্যারতিব সময় বলিষ্ঠাছিল, আজ রাত্রের গতক স্ববিধে নয়—মনে হচ্ছে রাখালরাজ আসবেন। ভগবান জানেন কার কি পাপ... রাজীর দল চালাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহাই আলোচনা করিতেছিল। যাহাদের রোগী আছে এবং যাহাদের মধ্যে রোগের কিছুমাত্র চিহ্ন ছিল না তাহারাও দেবতার নামে কিছু কিছু মান্য করিয়া রাখিতেছিল।

মোহনও মান্য করিয়া রাখিয়াছিল, স্ববলকে বাঁচাইয়া দিও ভগবান।...

উদ্ধাম বৈশাখী বাতাস ক্রমশঃ বাড়িতেছিল—উপরের

চালাটা কড়কড় করিয়া উঠিতেছিল, মনে হইতেছিল—বাতাসে বোধ করি উড়াইয়া লইয়া যাইবে। ঋষি-মাষ্টার ওপাশে ঘুমাইতেছে। হারিকেনটা প্রকৃতই জ্বালা আছে কিনা বুঝা যাইতেছে না—কালি পড়িয়া কালো হইয়া গিয়াছে।

মোহন স্ববলের মুখের উপর ঝুঁকিয়া ছিল—এক সময়ে তাহার নাকের কাছে হাত লইয়া গিয়া দেখিল, নিশ্বাস বহিতেছে কিনা। মোহন কিছুই বুঝিতে পারিল না—মুহু একটু ঠালা দিয়া ডাকিল, স্ববল...

তার পর দুই-তিন বাত ডাকিল কিন্তু কোন সাড়াই নাই। মোহন ভাবিল, শেষ হইয়া গেল নাকি! — কখন। সকলে ঘরে ফিরিয়াছে—শঙ্কিত, সমস্ত জননী জাগিয়া। ভগবান! —সেখানে একা ফিরিয়া গিয়া কি বলিব! মোহন বিহ্বল হইয়া উঠিল, স্ববলকে জোরে ঠেলা দিয়া ডাকিল, স্ববল...

মোহন হতাশ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সকাল হইতে তাহারও গায়ে যেন অল্প অল্প বেদনা বোধ হইতেছে। মোহন ভাবিল, এমন যদি হইত যে আজ রাত্রের মধ্যেই সে মরিয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে...মনে সে যথেষ্ট শান্তি পাইত। ঋষি-মাষ্টার আছে—ঠিক সময়ে দেশে সংবাদটা পৌছাইয়া দিত।

মোহন দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকজ্যোৎস্নার অন্ধকার—ধূলাবালি উড়াইয়া, বাদাম-ঝাউয়েব গাছে অখণ্ড মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া বৈশাখী বাতাস বহিতেছে। মোহন তাহারই মধ্য দিয়া অল্পমনস্ক ভাবে মন্দিরের দিকে চলিল। সে ভাবিতেছিল, স্ববল মরিল—তাহার সমস্ত কিছু ব্যর্থ কবিয়া দিয়া গেল—ভগবান! বিশাখা,—বিশাখার নিকটে কতখানি সে অপরাধী হইয়া রহিল। তাহার এত ভালবাসা, এত...সে কান্ডাল হইয়া গেছে।...মোহন অস্থির চকল মনে কখন ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে মোহন দেবতার নিকটে তাহার মনের অসংখ্য কথা জানাইতেছিল, মৃত্যুকামনা করিয়া বলিতেছিল, অপরাধী কি জবাব দিবে।—যেন আর না ফিরিতে হয়।

ভোর হইতে বিলম্ব নাই—ঋষি-মাষ্টারের ঘুম ভাঙিয়া

গেল। স্বপনের মৃত্যুশয্যার নিকটে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে কিছু মাত্র সে বিস্মিত হইল না। ইহা যে ঘটিবে তাহা সে পূর্বেই জানিত কিন্তু মোহন কোথা!

সমস্ত যাত্রী তখন মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে। মাষ্টার তাহাদের অসংলগ্ন কথায় বুঝিল, মন্দিরে নাকি চোর ধরা পড়িয়াছে।

চোর ধরা পড়ে নাই, তবে অজ্ঞান হইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে পড়িয়া আছে। প্রধান পুৰোহিত বুঝাইতেছিল যে, কাল ঝড়ের মধ্য দিয়া বাখালরাজ আসিয়াছিলেন এবং পাণ্ডীর বিধান দিয়া গিয়াছেন। দেবতাব নাকি সমস্ত অলঙ্কার হারি গিয়াছে—কিন্তু তাহার নিকটে নাকি ফাঁকি চলে না—তাই চোরদিগের মধ্যে এক জন মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। তথিত্ত্ব দেবতা প্রধান পুৰোহিতকে স্বপ্নে বলিয়াছেন, নিষ্কৃতি পাইতে

হইলে যাত্রীরা যেন তাহাদের ঘাসাঘাস কিছু কিছু অর্থ নুতন অলঙ্কার নির্মাণের জন্য দিয়া যায়।

ঋষি-মাষ্টার কোতুলী হইয়া উকি মারিয়া দেখিল, চোর নয়—মোহন গোসাই, মুখে সম্প্রতি বসন্তের চিহ্ন। উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে মুহূর্তে লে বাহির হইয়া আসিল। ব্যাপার সুবিধা নয়—চোরদিগের মধ্যে এক জন বলিয়া তাহাকে ধরা—ইহাদের কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

ইহাও বিচিত্র নয় যে রাখালরাজ সত্যই আসিয়াছিল, হয়ত পাণ্ডীর সাজা দিয়া গিয়াছে। কাকজ্যোৎস্নার রাত্রে এই পথে যাইতে যাইতে ঝড় উঠিলে, উম্মাদিনীর বেদনার্ত্ত কণ্ঠস্ব শুনিলে কাড়াল বৈরাগীর অন্তায়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাব একটা। বেদনাঘন ইতিহাস পৃথিক যেন একবারও স্মরণ করে।

“হে সংসার, হে লতা”

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কাল রাতে চুপি চুপি বসলে পাশে
অন্ধকারে—
ছায়া-ঢাকা মুখখানি এলোমেলো চুল
অন্ধকারে।
চিনেছি বা চিন্‌বার, জেনেছি বা জান্‌বার
এই জীবনে—
কাছে এসে বসো শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকো
সাক্ষরকে।
হাতখানি ধ'রে থাকি, ঘামে ভেজা হাতখানি
ব্যাকুল হয়ে—
সুম আর মরণের দূতগুলি চেয়ে থাকে
চাহি' উভয়ে—
ভাবনা নিবিড় রাত্রি, আধারে জাগি
জড়াবে জাগি।
উদাস বিবশ প্রাণ সাড়া নাহি দেখ আর
পরশ লাগি'।
এমনি বসলে পাশে চুপি চুপি কাল রাতে
অন্ধকারে—

সুমের পরীরা সব কেশখা হ'তে নেমে এলো
অন্ধকারে—
সুমের পরীরা থাকে বহুদূর ঝাউবনে
নদীর পারে—
পৌজা তুলো মেঘে থাক আর থাকে মনে মনে
অন্ধকারে।
দু-জনের ঘিরি' তার নেচে নেচে নেমে আসে
গভীর রাতে—
জোনাকির শব্দ আলো—শঙ্কায় শিহরাই
গভীর রাতে।
সুম আর মরণের দূতগুলি নেমে আসে
মিশন ক্ষণে
মিলন-মরণ আর নিদ্রা-মরণ
অধার মনে।
কাল রাতে চুপি চুপি বসলে পাশে
অন্ধকারে—
সংসার-লতা মোর জীবনের লতা মোব
অন্ধকারে।

৭ই পৌষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্বোধন

আজ প্রত্যুষে যখন দেখলাম উদয়পথ মেঘে আচ্ছন্ন,
‘আলোক অবরুদ্ধ, আকাশে দিগন্তে অপ্রসন্নতা প্রসারিত,
তখন ক্ষণকালের জন্ত মনে উদ্বেগের সঞ্চার হ’ল, ভাবলুম এই
আনন্দ-উৎসবের আয়োজনে যেন প্রতিফুলতার কালিমা
বিস্তীর্ণ হ’ল। কিন্তু পরক্ষণে একথা মনে হ’ল যে মানুষের
উৎসবের ভূমিকা তো সহজ নয়, তার নির্মল আনন্দের পথ
অতি দুর্গম, সেই পথ অতিক্রম ক’রে অন্তরলোকে সত্যের
আবিষ্কার হয়, সে সফলতা লাভ করে। মানুষের সত্যের
আয়োজন অন্তরে, তার উৎসবের উপকরণ সাক্ষর্য্য
বাইরে নয়, তাকে অন্তরে প্রস্তুত হ’তে হয়, সেখানে
চিদাকাশের তামসকে নিজের সাধনার দ্বারা নির্মল
করা চাই।

মানুষ বিধাতার কাছে প্রশ্রয় পায় নি, তাকে আত্মশক্তি
প্রয়োগের দ্বারা সার্থকতা লাভ করতে হয়। কারণ
আত্মাকে আপনার মধ্যে আবিষ্কার করা তার
জীবনের সাধনা। আমাদের ঋষিরা সেই উপলব্ধি
কথাই বলেছেন, বেদাহমেতৎ, তাঁকে দেখেছি জেনেছি,
তমসঃ পরন্তাৎ, অন্ধকাবের পরপার থেকে সেই
জ্যোতির্ধর্ম মহান পুরুষকে দেখেছি। অন্ধকার তো বাহিরে
নয়, তা মানুষের অন্তরে, তার সঙ্গে তাকে নিরন্তর সংগ্রাম
করতে হয়।

পশুর সমান ধর্ম নিয়েই মানুষ জগতে জন্মলাভ করে।
পশুর হিংস্রতা স্থলতা নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু
তার আত্মা নিরন্তর অন্ধকারের আবরণ অপসারিত ক’রে
অসীমের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে,
মানুষের তো এই ধর্ম, এই সাধনা।

আজ আকাশের কালিমায় এই কথা ব্যাপ্ত হয়ে রইল, যে
আনন্দ মানুষের অন্তরে। সেই আনন্দ অন্তর থেকে আহরণ

ক’বে অকৃত্রিম নিষ্ঠার মধ্যে মানুষকে উৎসবের আয়োজন
করতে হবে। হৃদয়েব সেই আলোকের দ্বারা সাধনাকে উজ্জল
কর, বিমল আনন্দের জ্যোতিতে জাগ্রত হও।

বিমল আনন্দে জাগো রে
মগ্ন হও স্থানাপরে।
হৃদয় উদয়চলে দেখো রে চাহি
প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে।

—

এই আশ্রমে যিনি নিজের সাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত
করেন আমার সেই পিতৃদেবের তরুণ জীবনে মৃত্যু-
শোকের অন্ধকার নিবিড় হয়ে আক্রমণ কবেছিল। তিনি সেই
অন্ধকারকে অপসারিত ক’রে একান্তভাবে উৎকর্ষিত হয়ে
অমৃতের সন্ধান করেন। তাঁর জীবনীতে এ সময়ের বর্ণনায়
বলেছেন যে, গভীর শোক স্বর্ঘ্যের জ্যোতিকে তাঁর কাছে
কালিমায় আবৃত মনে করেছিল। তিনি তাতে শাস্ত
ধ্বাক্তে পারেন নি। তিনি ধর্মের সন্ধান ছিলেন, তাঁর
অসামান্য অতুল ধন-সম্পদের মধ্যে বিলাসিতার উপকরণ
পুঞ্জীভূত ছিল। তার মধ্যে থেকে তিনি মনে সাধনা
পান নি। এই ধনবিলাসের দুর্গ থেকে মুক্তিলাভের কোনো
উপায় ছিল না। কিন্তু সহসা দ্বারকায় আঘাতে সহসা তাঁর
কাছে দ্বার উদঘাটিত হ’ল। সংসারের আমোদ ও
আরামে তাঁর বিচক্ষণ জন্মাল, মৃত্যু-শোকের আঘাত
পেয়ে তিনি একান্ত মনে সন্ধান করতে লাগলেন কিরূপে
মৃত্যুর অধিকৃত সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবেন।
সে সময়ে যে-বাণী তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিল তা এই—
“তং বেদাৎ পুরুষং বেদ, যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ”,
সেই বেদনীয় পুরুষকে জানো, যাকে জানলে মৃত্যু ব্যথা দিতে
পারে না।

মহাবির মনে মৃত্যু-শোকের ভিতরে অমৃতপিপাসু আত্মার
আকাজকা জাগল। যে অল্প মানুষকে নিজের দিকে টানে

এবং আপন পুত্রীভূত উপকরণে অসীমকে অন্তরালে ফেলে, তাকে অপসারিত ক'বে দিয়ে তিনি মহান পুরুষকে জানতে পাবলেন। তখন তাঁর যে কত ভার লাঘব হয়ে গেল, তা জীবনীতে লিখে গেছেন।

জীবনের এই অতুত্ব যখন তাঁর কাছে স্থম্পষ্ট, তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের জ্বায় তাঁর ধনসম্পদ ধূলিসাৎ হ'ল, পৈতৃক ব্যবসায় ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি সহজে এই দারিদ্র্যকে বরণ ক'রে নিতে পেরেছিলেন। আমা দৈখ্যে পাই যে মানুষের অহং যখন উপকরণ নিয়ে আসক্ত থাকে তখন সে দারিদ্র্যের ভাব সহিতে পারে না। কিন্তু পিতৃদেবকে এই দারিদ্র্য পীড়া দেয় নি। যিনি আবাত্য ধনবিলাসে বেড়ে উঠেছেন, তিনি সেই ধনের অভাবদুঃখের দূরে সরিয়ে দিয়ে অবিচলিত হ'তে পেরেছিলেন, তার কাছ আত্মা যখন আপন আনন্দে পূর্ণ থাকে তখন কোনো বেঝাই তাকে অবনত করতে পারে না। মহর্ষি তাঁর জীবনে স্বে মুক্তির পথ করেছিলেন। তিনি বিপদকালে অকাতরে ঋণভার মোচন ক'রে দিলেন। বিষয়ী বন্ধুরা বলেছিলেন নানা কৌশলে এই ঋণদায় হ'তে অব্যাহতি পেতে, কিন্তু তিনি বললেন, 'যায় যাক সব কিছু ক্ষতি নেই, দুঃখ নেই।' তিনি পিতার ঠাঁট সম্পত্তি বাঁচাতে পারতেন, কিন্তু তাও মহাজনদের হাতে সঁপে দিলেন। তিনি বহু আয়্যাসে পূর্ণপ্রমাণ ঋণ শোধ করলেন।

আমরা মহর্ষির জীবনের আরেকটা দিক দেখতে পাই তিনি বলেন নি যে সংসারের সকল কর্তব্যের বন্ধনকে ছিঁ ক'রে বৈরাগ্য সাধন করতে হবে। তিনি গৃহী ছিলেন। তিনি বলেছেন যে সংসারের মধ্যে বাস ক'রেই আসক্তির বন্ধ-মোচন হবে। "কললাভে আসক্ত না হয়ে কর্ম করতে হবে" গীতার এই বাণী তিনি তাঁর জীবনে প্রতিপালন করেন। তিনি বলেন যে মানুষ সংসারের কর্তব্য পালন করবে কিন্তু মনকে মুক্ত রাখবে। মানুষ যখন পূর্ণ স্বরূপে লাভ করে তখন সংসার তাকে ক্ষতির পীড়া দেয় না, দারিদ্র্য তার চিন্তকে বিক্ষিপ্ত করে না। তাই মহর্ষির জীবনে দেখতে পাই, স্থানবিক্রমে যখন তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রে ভীত না হয়ে উত্তীর্ণ হবার উদ্যোগ করে, তেমনি তিনি সংসারের শোকদুঃখের তরঙ্গে দোলায়মান হয়েও জীবন-ভরণ

পরিচালনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি বলেন সংসারার্থ পালন করতে করতে ভয়সঙ্কেও মুক্তি পেতে হবে সংসারের এই শিক্ষা। প্রমাণ বরতে হবে মানুষ কেবল দেহমন নিয়েই কাল যাপন করবে না, দেহমনের অতীত যে আত্মা তারই আত্মিক ধর্ম তাকে রক্ষা করতে হবে। তাকে সংসারের কর্তব্যের মধ্য দিয়েই প্রমাণ করতে হবে যে সে পশুধর্মের অতীত।

আমাদের দেশবাসীরা বলে থাকেন যে এ সব মূনি-ঋষি বলা কথায়। আমরা সংসারী, আমরা পবিত্র ও মুক্ত হ'তে পারি না। কিন্তু এমন কথা মানুষের আত্মাবমাননার কথা। সংসার ও সন্ন্যাসকে বিভক্ত করা মানুষের শ্রেয়ঃ পথ নয়। গৃহী মানবকেই সন্ন্যাসী হ'তে হবে এবং নিরাসক্ত হয়ে সংসারার্থ পালন করতে হবে। আজকের দিনে পশ্চিমে ঘোর দুর্গতির কাল ঘনিজে এসেছে, দেশে-দেশে মানুষের মনে হিংস্রতার ও স্বন্দেব অন্ত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজকে যদি বলি যে বিজ্ঞানের পাঠশালা বন্ধ ক'রে গিরিগুহায় অরণ্যে চোখ বুজে বসে থাক তবে মিথ্যা বলা হবে? এ যেমন নিরর্থক, তেমনি যদি বলা যায় যে লুপ্ত স্বার্থকে বিস্তার কব, বিজ্ঞানের অস্ত্রে দুর্বলকে মার, সেও তেমনি মিথ্যা কথা। কিন্তু বলতে হবে যে সংসারের সকল কর্তব্য পালনের মধ্যেই মানুষের আত্মিক শক্তিকে জন্মদাতা কর। সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন কর, কিন্তু নিরাসক্ত ভাবে, আত্মাব উদ্ধার লোকে সভ্যতাকে উন্নীত কব। আজকের দিনে একথা বলে লাভ নেই যে ধনসম্পদের আহরণ বন্ধ কর, যা কিছু সব ত্যাগ কর, কিন্তু মানুষকে বলতে হবে যে ঐশ্বর্য-সাধনার ভিতর দিয়েই সন্ন্যাসী হও। সংসারের মধ্যে থেকেই তোমার মাহাত্ম্যের পরিচয় দাও।

একদা ভারতবর্ষের সাধক সংসারের মধ্যে বাস করেই এই আধ্যাত্মিকতার সাধনা করেছিলেন। তাঁরা গৃহী ছিলেন। পূর্ববর্তী যুগে এই সাধনাপথের পরিবর্তন হ'ল, মানুষ অজে বিভূতি মেখে জনসমাজ থেকে দূরে গিয়ে আপনাকে শূন্যের মধ্যে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রাচীন যুগে মানুষ যে নিভৃত নির্জনতায় সাধনার আসন পেতেছিলেন সেখানেও সংসারীদের যাতায়াত ছিল। সব ত্যাগ ক'রে

চলে যেতে হবে- মাছরের পক্ষে একথা সভ্য হ'তে পারে না। সসারের ভিমিরাক্ষকারের মধ্য হতেই আলোকের পথ আবিষ্কার করতে হবে, জ্যোতির্ষ্য পুরুষকে জানতে হবে।

আমার জীবনের একটা সৌভাগ্যের কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে, সে কথা আজ বলতে চাই। এই আশ্রমের প্রারম্ভে আমাকে অসাধ্য ঋণভার ও দারিদ্র্যের বোঝা বহন করতে হয়েছে। আজকের এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন অকস্মাৎ ও সহজে হয় নি, এর পিছনে অনেক কষ্টসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টার ইতিহাস আছে। এখন এ স্থাপিত হয় সে সময়ে আমার নিজের সম্পত্তি ছিল না, দুর্ভিক্ষ ঋণের বোঝা ছিল। সেই অবস্থাতেই নিজেকে সমস্ত কর্মভার এবং সকল ছাত্র ও শিক্ষকের ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে। কিন্তু এই কাজ আমার সহজ হয়েছিল, কারণ আমার কর্তব্যের প্রবাহ সহজেই আমাকে আমার নিজের থেকে সর্বদা সরিয়ে রেখেছিল। আশ্রমের এই স্বদীর্ঘ ৫০ বছরের ইতিহাসে আমাকে অনেক শোক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। দেশের লোকের ঔদাসীন্য ও কুৎসা থেকে আমি নিষ্কৃতি পাই নি, এই প্রতিষ্ঠান চালাতে গিয়ে আত্মীয়-মণ্ডলী থেকে দূরে পড়ে গিয়েছি। প্রতিষ্ঠানভার অস্ত ছিল না,

কারণ বিষয়ীভাবে এই বিভ্রান্তন চালানো যথার্থই মূঢ়তা বলা যেতে পারে। ভূ-এই দুঃখ-দারিদ্র্য, অন্ডায় নিন্দা ও অকারণ উপেক্ষার পীড়ন সহ্য করা আমার কাছে সহজ হয়েছে তার একমাত্র কারণ যে, যে অহঙ্কারের ভার অহংকে পীড়িত করে কর্মের প্রেরণাবেগে সে আপনিই কাঁধ থেকে নেমে গিয়েছিল। যাবা পর তারা আমার আত্মীয় হয়েছিল, যারা বাইরের তারা এসেছিল ভিতরে। কঠিন শোক দুঃখ আমাকে আক্রমণ করেছিল কিন্তু এই আশ্রম আমাকে পরাভব থেকে রক্ষা করেছে।

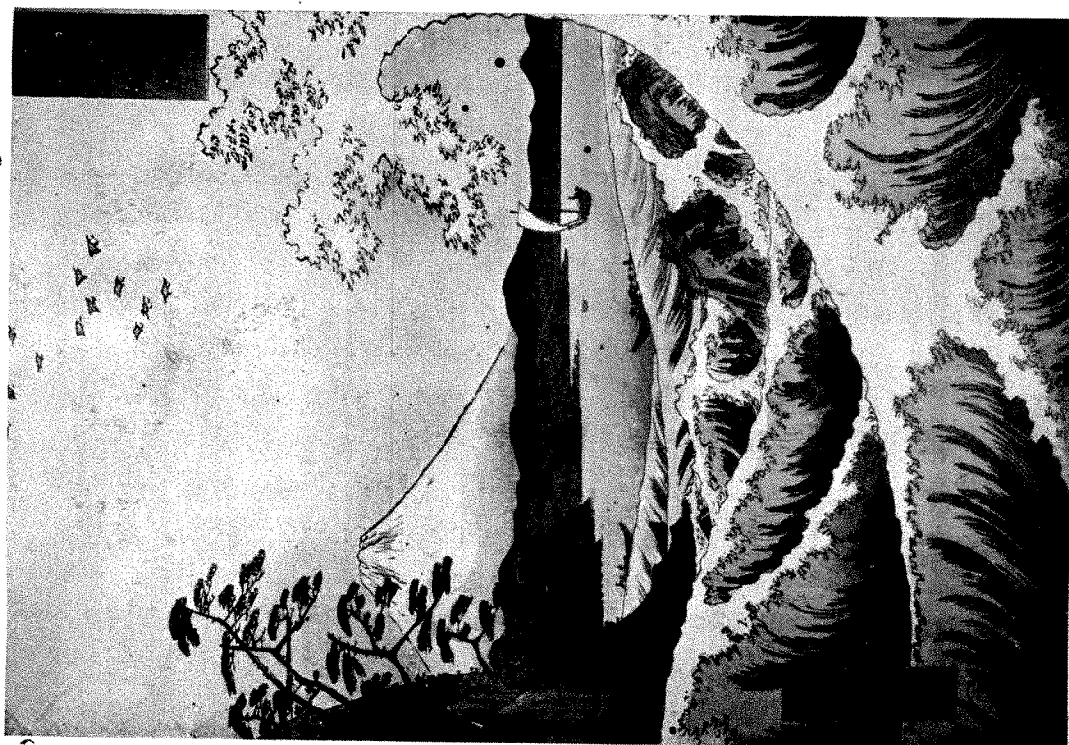
মাছর আপনার কৃতিত্ব প্রমাণ করবার জন্য যখন কর্মের আয়োজন করে তখন স্বদেশের অস্ত থাকে না, কারণ কর্মক্ষেত্রে তখন অহং ঘোষণার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। আজ উৎসবের দিনে আমরা এই কথা বলব যে এখানকার কর্ম-প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র-আপনকে প্রচারের প্রয়াস নয়, আত্ম-উপলব্ধির সাধনা। এই আদর্শ আমাদের কর্মকে উদ্বুদ্ধ বন্ধক, তবেই বিদ্যালয়ে ও আমাদের চারি দিকের পল্লীমণ্ডলে আমাদের কর্মব্রত সভ্য হয়ে উঠবে।*

* শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ (১৩৪০) উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ।
ঐশ্বর্যোত্তমার সেনসত্ত্ব কর্তৃক অঙ্কিত।

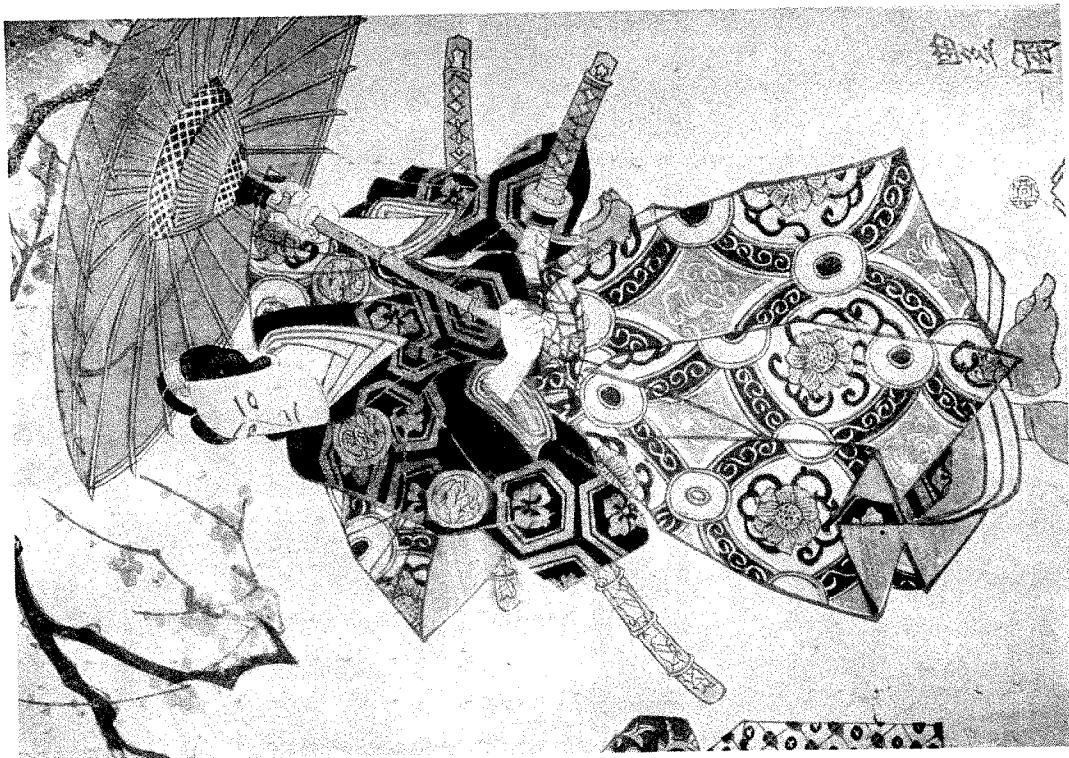




অভিনেতা
তোয়াকুনি এবং হিরোশিগে অঙ্কিত



সত্তার সমুদ্র তরঙ্গ
হিরোশিগে-অঙ্কিত



তোয়াকুনি-অঙ্কিত

ছত্রধারী



কুনিশাদা-অঙ্কিত

পাক্ষীতে আকৃষ্ট নট

কলিকাতায় জাপানী রঙীন কাঠখোদাই চিত্রের প্রদর্শনী

আমাদের দেশে জনসাধারণের শিল্প-চেতনা যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে, এ-সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস-এর প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হয়; বহুদিন পর্যন্ত এই বার্ষিক প্রদর্শনীই কলিকাতার জনসাধারণের পক্ষে শিল্প-পরিচয়ের একমাত্র কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে কেবল কলিকাতাতেই তিনটি বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রদর্শনীগুলিতে সাধারণতঃ কেবল

আধুনিক শিল্পীদেরই শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হয় বলিয়া সাধারণের পক্ষে একটা অসুবিধা থাকিয়া যায়। যে ঐতিহ্যের উপর আধুনিক ভারত-শিল্প প্রতিষ্ঠিত, যে-সকল শিল্পধারার প্রভাব ইহার উপর পড়িয়াছে, তাহার সহিত পরিচয় না থাকায় সাধারণের পক্ষে আধুনিক ভারতশিল্পেরও সম্পূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব হয় না।

শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহারা আলোচনা করেন তাঁহারা সকলেই জানেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পীদের উপর যে-



সকল শিল্পধারার প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছে তাহার মধ্যে চীন ও জাপানের শিল্প অগ্ৰতম। এই শিল্পধারার সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় সাধনেও ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস অগ্রণী হইয়াছেন। এই সমিতির উদ্যোগেই কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় সর্ব-প্রথম চীন-শিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়। সম্প্রতি ইহারই উদ্যোগে কলিকাতায় জাপানী কাঠখোদাই চিত্রের একটি প্রদর্শনী অল্পকাল হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলি জাপান-প্রবাসী অধ্যাপক স্পেইট কর্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহারই সৌজন্তে প্রদর্শিত হয়। পুরাতন ও আধুনিক প্রায় নাড়ে ছয় শত রঙীন কাঠখোদাই ছবি এই প্রদর্শনীতে ছিল।

জাপানের রঙীন কাঠখোদাই ছবি জগতের সর্বত্র ছাপা ছবির অত্যাশ্চর্য নমুনা হিসাবে সমাদৃত হইলেও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাপানের অভিজাত শিল্প-রসিকগণ অতীতে ইহাকে অবজ্ঞাই করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাধারণ লোকেরই উপযুক্ত, শিল্পের অভিজাত্য ইহাতে নাই। আমাদের নিকট এই মত অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে, কিন্তু কথাটার মধ্যে সত্যের আভাস আছে। এই সকল ছবি যাহারা প্রস্তুত করিতেন জীবিতকালে তাঁহারা জাপানের শিল্পীসমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন না, নিম্নস্তরের পটুয়া বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন; এই ছাপের ছবির ক্রেতাও ছিল সাধারণ লোক। সমসাময়িক অভিমত যাহাই হউক, আধুনিক শিল্পরসিকগণ জাপানের রঙীন কাঠখোদাই ছবিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। জনসাধারণের চিত্তেও যে সূক্ষ্ম রসবোধের বিস্তার সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে, জন-মন ও শিল্পচেতনায় যে একান্ত কোন বিরোধ নাই, ইহাতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

জাপানের শিল্পীদের মধ্যে যে-সকল বিভিন্ন শিল্পপন্থার প্রচলন ছিল তাহার অগ্ৰতম উকিওইয়ে বা 'দৃশ্যমান সংসারের দর্পণ'; সংসারের দৈনন্দিন তুচ্ছ চিত্র ও ঘটনাই ইহার বিষয়বস্তু বলিয়াই এই পন্থার এইরূপ নামকরণ। রঙীন কাঠখোদাই ছবিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হিশিকাওয়া মোরোনোবু (জন্ম ১৬৩৮) এই কাঠখোদাই ছবির প্রথম উত্তরাগী। ১৬৫৯ হইতে ১৬৯৫ সালের মধ্যে তিনি প্রায় ত্রিশ খানি পুস্তক এইভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন। ইহার চিত্রগুলি অবশ্য পুরাপুরি ছাপের কাজ নয়; প্রথম একটি কাঠের ব্লক

হইতে ছাপ লইয়া পরে তাহাতে হাতে স্বতন্ত্র বর্ণ-সংযোজন করা হইত। কিমোনোবু নামে এক শিল্পী সর্বপ্রথমে রঙীন ছবি সম্পূর্ণ ছাপিয়া বাহির করেন।

১৭৫০ হইতে ১৮৫০ সাল এই এক শত বৎসরই রঙীন কাঠখোদাই ছবির সর্বাপেক্ষা উন্নতির সময়—কিমোনোগা, হারুনোবু, শিগেমাসা, মাসোনাবু, উতামারো, টোয়োকুনি, হকুসাই, হিরোশিগে প্রভৃতি এই যুগের অস্তিত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে এই চিত্রধারা ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসে—দেশীয় সূক্ষ্ম রঙের পরিবর্তে বিদেশী রঙের ব্যবহার, ও অগ্ৰাণ্ত সামাজিক পরিবর্তনই ইহার মূলে।

কাঠখোদাই ছবি জাপানে কি ভাবে প্রস্তুত হইত তাহার একটু আভাস অন্ততঃ দেওয়া আবশ্যিক। সম্পূর্ণ চিত্র প্রস্তুত হইত তিন জনের সহযোগে—সর্বপ্রথমে চিত্রকর পরিকল্পনা বা নক্সা প্রস্তুত করিয়া দিতেন; ইহারই নামে ছবিটি বাজারে চলিত। এনগ্রেভার এই নক্সা স্কুরা-কাঠের ব্লকে আঁটিয়া লইয়া উহাতে নক্সাটি ছুরি দিয়া আঁকিয়া লইতেন। কাঠের অনাবশ্যক অংশ টাচিয়া বাদ দিলে শুধু নক্সাটিই কাঠের উপর ফুটিয়া উঠিত। অতঃপর প্রত্যেক রঙের জন্য আলাদা ব্লক করা হইলে ছবি ছাপিবার পালা।

ছবি ছাপিতে রঙের সূক্ষ্ম গুঁড়া ভাতের কেনের সহিত মিশাইয়া লওয়া হইত—ইহাতে ছবির রং বিশেষ উজ্জ্বল হইত। তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত এক রূপ কাগজে এই ছবি ছাপা হইত—এই কাগজে কালি চূপসাইয়া যাইত না।

জাপানী রঙীন কাঠখোদাই ছবির বিষয়বস্তু শিল্পী অনুসারে বহুবিচিত্র। উতামারো প্রধানত রমণীর প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন; টোয়োকুনি আঁকিয়াছেন—অভিনেতাদের মূর্তি, হকুসাই ও হিরোশিগে প্রধানত দৃশ্য আঁকিয়াছেন। কিন্তু চিত্রের বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, যে-শিল্পীর বা যে-যুগের চিত্রই হউক না কেন, সর্বত্রই একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। এই সকল ছবি প্রস্তুত করিত সাধারণ লোক এবং ইহার ক্রেতাও ছিল সাধারণ লোক—সুতরাং জনসাধারণের পক্ষে যে-সকল বিষয় ক্রটিকর তাহারই ছবি শিল্পীদিগকে প্রস্তুত করিতে হইত। ইহার মধ্যে রমণীমূর্তি, অভিনয় ও অভিনেতাদের চিত্র, ইতিহাসের কাহিনী, ও দৃশ্যচিত্রই প্রধান।

মহিলা-সংবাদ

যুগোশ্লাভিয়ার দুব্রোভনিকে আন্তর্জাতিক নারী-পরিষদের ১৯৩৬, অক্টোবর মাসে যে অধিবেশন হয় তাহাতে বোম্বাইয়ের শ্রীমতী মানেকলাল প্রেমচাঁদ সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৩০-৩৪ সালে তিনি ভারতবর্ষের

আয়ত্ত করিয়া তিনি 'এ' লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। শ্রীমতী ইমতিয়াজ এক জন লেখিকা। তিনি উর্দুতে ছোট গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখিয়াছেন।



শ্রীমতী মানেকলাল প্রেমচাঁদ

জাতীয় নারী-সংসদের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইহার সহ-সভাপতি। আন্তর্জাতিক নারী-পরিষদের ১৯৩৪ সালের প্যারিস অধিবেশনে শ্রীমতী প্রেমচাঁদ ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

ভারতবর্ষে এরোপ্লেন-চালকের 'এ' লাইসেন্স খাঁহারা পাইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীমতী ইমতিয়াজ আলি একমাত্র মুসলিম নারী। ১৯৩৬, জাহ্নমারীতে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ঐ বৎসরের জুন মাসে এরোপ্লেন-চালনার সকল কৌশল



শ্রীমতী ইমতিয়াজ আলি

নবদ্বীপের বঙ্গবাণী বালিকা-বিদ্যালয়ের উৎসব উপলক্ষে সেখানে গিয়া কুমারী গীতা রায়কে দেখিয়াছিলাম। বালিকাটির অকালমৃত্যুতে নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশ এমন একটি কল্যাণত্বকে হারাইল যে বাঁচিয়া থাকিলে মহীয়সী দেশসেবিকা হইতে পারিত। তাহার সহক্ষে ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক



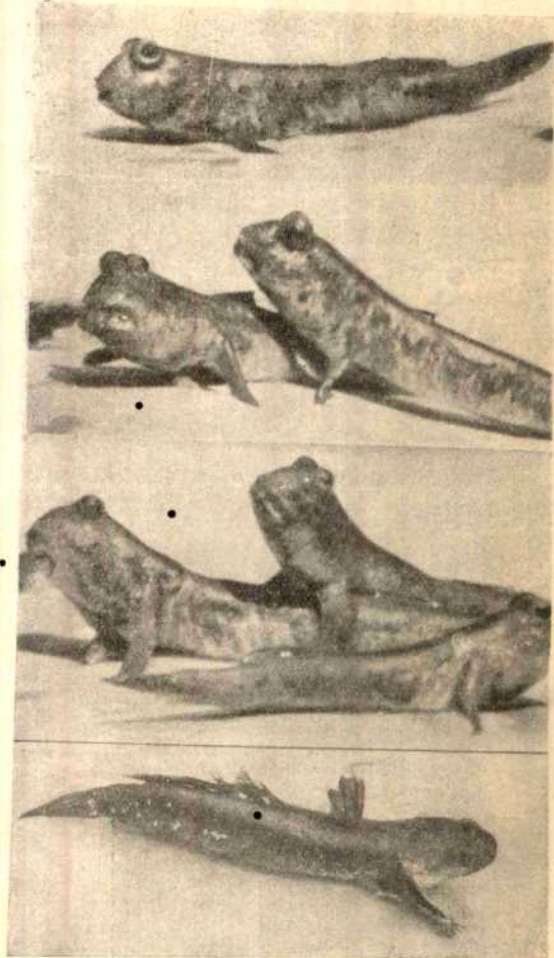
ঐতিহাসিক



ব্যাং-মাছ

ভূপঞ্জরের অন্তর্নিহিত অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীব-জন্তুর প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল বা তাহাদের আকৃতির প্রস্তরীভূত ছাপ এবং বর্তমান একই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর বিষয় আলোচনা করিলে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রম-বিকাশের ফলেই জীবজগতের এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ভূপঞ্জরের অস্থিকঙ্কাল বা ছাপ কখনই মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না; আমাদেরই বয়স বৃদ্ধিবার ভুল হইতে পারে। প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল বা মৃত জীবজন্তুর আকৃতির ছাপ হইতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে মৎস্যই সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বহুযুগ অতিক্রান্ত হইবার পর ক্রমশঃ হস্ত পদ ও অঙ্গুলি সমন্বিত উভচর জীবের আবির্ভাব ঘটে। তাহারও বহুযুগ পরে সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীরা পৃথিবীর জলস্থল অধিকার করিয়া বিচরণ করিতে থাকে। মৎস্যের ছায় টিকটিকি ও গিরগিটি জাতীয় জীব, সামুদ্রিক সর্প, জলচর ও খেচর ড্যাগন ক্রমশঃ বিভিন্ন রূপে পৃথিবীর সর্বত্র অধিকারবিস্তার করিয়াছিল। মনে হয় স্থলচর ডাইনোসোরস্ হইতেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়িয়া এবং জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার অত্যাশ্রয় বাদনার ফলেই পাখী ও স্তন্যপায়ী জন্তুর উদ্ভব হইয়াছিল। পরবর্তী যুগে তাহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সর্বশেষে মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। জীবজগতের বিভিন্ন রূপে ক্রমবিকাশ ঘটিলেও আদি জীবজন্তুর সকলেরই বিলোপ ঘটে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থানবিশেষে কেহ কেহ আজও তাহাদের বংশ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অবশ্য, যাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অকৃতকার্য হইয়াছে অথবা যাহারা কেবল জন্মগত বৈশিষ্ট্যই রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহারা জীবনসংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়াছে। ভূপঞ্জর প্রাগৈতিহাসিক যুগের এমন অনেক জীবজন্তুর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়, যাহারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মধ্যে বিরোধ খাড়া ও স্থানাভাব প্রভৃতি বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়াই জীবজগৎ বিচিত্র-ভাবে বিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। জীবজগতের এই ক্রম-পরিণতি অহরহই ঘটতেছে। অতি দীর্ঘ, অতি মন্থর বলিয়া, আমরা তাহা সহসা ধরিতে পারি না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এক এক জাতীয় জীব আত্মরক্ষা ও বংশবিস্তারের সুবিধার জন্য নিজ নিজ ধারার কোন কোন পুরাতন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন অঙ্গুল প্রকৃতিতে অভ্যস্ত হইয়া একই জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এক মৎস্যজাতীয় প্রাণীর কথা আলোচনা করিলেই দেখিতে

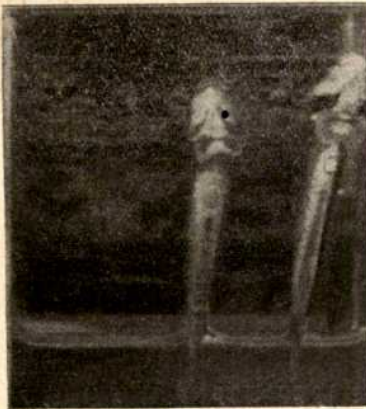
পাওয়া যায়, পৃথিবীতে এক সময়ে কত বিপুলকার্য মৎস্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল; কালক্রমে তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের স্থলে কত বিভিন্ন জাতীয় মৎস্যের আবির্ভাব হইয়াছে।



ব্যাং-মাছ

উপর হইতে: ব্যাং-মাছ পাকের ভিতর ঢুকিতে যাইতেছে। দূরে উদ্ভাস্ত মশা দেখিয়া ব্যাং-মাছ শিকারের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। ব্যাং-মাছেরা একে অপরের পিঠে উঠিয়া খেলা করিতেছে। ব্যাং-মাছের গায়ের নীলাভ ফোটা গিরগিটির মত আঁশ, ও পায়ের ছায় সমুখের পাখনা দেখা যাইতেছে।

ভবিষ্যতে যে আরও কত কি পরিবর্তন ঘটিবে তাহা কে জানে। পূর্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর ইতিহাসে মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে সর্ব-প্রথম মৎস্যই দেখা যায়। মেরুদণ্ডী ও অ-মেরুদণ্ডী জীবের মাঝামাঝি অ্যাম্ফিওক্সাস (Amphioxus) নামে এক জাতীয় জীব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সমুদ্রতীরবর্তী বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করে। ইহাদের মেরুদণ্ড নাই কিন্তু মেরুদণ্ডের স্থলে 'নোটো-কর্ড' নামে স্থূল মাংসের একটি দণ্ড আছে। অ্যাম্ফিওক্সাস-জাতীয় কোন একটি জীব হইতেই মেরুদণ্ডী মাছের উৎপত্তি হইয়াছিল। কত লক্ষ বর্ষ অতিক্রান্ত হইল—মাছই তখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। পৃথিবীতে নৈসর্গিক বিপ্লব অহরহই ঘটয়া আসিতেছে। ইহার ফলে আজ যেখানে জল কালই দেখানে স্থলভাগ আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ বিরাট বিপ্লবে নদীনালা শুষ্ক হইয়া গেল; মাছেরা এমনি ভাবে ডাঙায় উঠিয়া পড়িল, বাহারা ডাঙায় আসিল, বায়ু হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার জন্য তাহাদের ফুস্ফুস ছিল না কাজেই লক্ষ লক্ষ মাছ মরিতে লাগিল। অবশিষ্ট জলে কতক মাছ আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু প্রথর বৌদ্ধে অতিষ্ঠ হইয়া ছায়ার আশায় ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইল। কিন্তু কতক্ষণ আর ডাঙায় থাকিবে, আবার ফিরিতে হইল। এই গুরুতর অশান্তির মধ্যে পড়িয়া তাহাদের কেহ কেহ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অতি কষ্টে কানকোর পাশের পাতলা চামড়া দ্বারা বাতাস হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইহাতে কতক পরিমাণে কৃতকার্য হইল অবশিষ্টেরা মরিল। ইউরোপের কোন কোন স্থানে এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে ফুস্ফুস মাছ বলে। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা হয়ত প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে বা অল্প কোন অবস্থাবিপর্ষ্যে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহাদের ফুলকো ও ফুস্ফুস দুইই আছে। জলের মধ্যে ফুলকো ও বাতাসের মধ্যে ফুস্ফুসের সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারে। ক্রমে এই ভাবে মাছের সাহস বাড়িয়া গেল—তাহারা ডাঙায় ও জলে উভয় স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। আমাদের দেশীয় কইমাছ জলে



ব্যাং-মাছ কাচের গা বাহিয়া জল হইতে কিছু দূর উপরে উঠিয়া
শোষণ-অন্ত্রদ্বারা আটকাইয়া রহিয়াছে

বাস করিলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত ডাঙায় থাকিয়াও জীবনধারণ করিতে পারে। ইহাদিগকে উভচর মাছ বলা যাইতে পারে। কানকোর সাহায্যে ডাঙায় অনেক দূর পর্যন্ত ইহার অবলীলাক্রমে হাঁটিয়া অগ্রসর হইতে পারে। অতিবর্ধনের সময় কইমাছ পুকুরের খাড়া পাড় বাহিয়া ডাঙায় উঠিয়া আসে; ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এইরূপে কত বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়িয়া মাছেরা যে কত বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অল্পশীলনের ফলে কোন কোন মাছের আবার পাখীর মত আকাশে উড়িবার ক্ষমতাও জন্মিয়াছে। ব্যবহারের ফলে তাহাদের কানকোর সমুখস্থ পাখনা দুইটি ডানার মত বড় হইয়া গিয়াছে। উভচর মাছের মধ্যে কইমাছ ব্যতীত আমাদের দেশের সমুদ্রের কাছে নদীর মোহানায় নোনা জলে 'গুলে' মাছের মত এক জাতীয় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে আমরা ব্যাং মাছ নামে অভিহিত করিব। কারণ হঠাৎ দেখিলে ইহাদিগকে লম্বা লেজওয়ালা বড় বড় বেড়াটি বলিয়াই ভুল হয়। ইহাদিগের বৈজ্ঞানিক নাম 'পেরিঅপ্‌থ্যালমাস'। ইহাদের চক্ষু দুইটি কঁকড়ার মত লম্বা বোটার উপর অবস্থিত বলিয়াই এই নামকরণ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের সমুদ্রোপকূলে এবং সামুদ্রিক দ্বীপের নদনদীর মধ্যে ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এই সব পার্কর্ত্য নদনদীই ইহাদের আদি জন্মস্থান। খরশ্রোতা পার্কর্ত্য নদীর প্রবাহে দূর সমুদ্রে চলিয়া গিয়া শত্রুর মুখে পড়িবার ভয়ে বৃকের পাখনার সাহায্যে কঠিন জিনিষ আঁকড়াইয়া ধরিবার ও ডাঙায় বেড়াইবার স্বভাব ইহাদের আয়ত্ত হইয়াছিল। বংশবৃদ্ধির ফলে কালক্রমে ইহার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে সুন্দরবন অঞ্চলের নদনদীতে, ডায়মণ্ড হারবার, ফলতা প্রভৃতি স্থানে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দরবন অঞ্চলের মাছগুলি প্রায়ই আমাদের দেশীয় 'গুলে' মাছের মত প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হয়। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবার ও ফলতা



ব্যাং-মাছ টিকটিকির মত গাছে চড়িয়াছে

প্রভৃতি স্থানের মাছগুলি সাধারণতঃ ২১০ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। মাথাটি দেখিতে ঠিক গুলে' মাছের মত। শরীরের চামড়া গিরগিটির গায়ের মত। উপর ও নীচের চোয়ালে সূচের মত কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধারালো দাঁত আছে। ইহার সাহায্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকামাকড় ধরিয়া খায়। পিঠের উপরের পাখনায় এবং শরীরের উর্দ্ধভাগে উজ্জ্বল ফিকে নীল রঙের কতকগুলি ফোঁটা দেখিতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য্য ইহাদের চোখ দুটি। মস্তকে উর্দ্ধভাগে পাশাপাশি সম্মিলিত দুইটি বোটার উগায় চোখ দুটি স্থাপিত। চক্ষু-তারকা সাধারণ মাছের মত গোলাকার নহে অনেকটা শিম-বীজের মত। চক্ষু-তারকা ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে বা ছোট বড় করিতে পারে। সময়ে সময়ে একটি চোখ উঁচু করিয়া অপর চোখটিকে কোটরের মধ্যে ঢুকাইয়া লয়, হয় যেন চোখ ঠারিতেছে। • সাপ যেমন জলের মধ্যে মাথা একটু উঁচু রাখিয়া সাঁতার কাটে, ইহারা যখন জলে থাকে তখন অনেকটা সাপের সাঁতার কাটার মতই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইহারা জলের ধারে কর্দমাক্ত ডাঙার উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ইহাদের কান্ধকোর সম্মুখস্থ পাখনা দুটি খুব পুরু এবং জোরালো। এই পাখনা দুটির সাহায্যেই ইহারা কর্দমাক্ত স্থানের মধ্যে গুটিগুটি হাটিয়া অগ্রসর হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই পান্নের মধ্যে ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কেহ অল্পসরণ করিলে বা কোনরূপ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে অতি দ্রুতবেগে লাফাইয়া মুহূর্তের মধ্যে বহুদূরে চলিয়া যায়। এই জন্ত ডাঙায় থাকিলেও ইহাদিগকে ধরা অতি কষ্টকর ব্যাপার। জলের ধারে কোন গাছপালা থাকিলে ইহারা টিকটিকির মত গা বাহিয়া উপরে উঠিয়া শয়ন এবং হেলানো ডালপালার উপর উঠিয়া এক জন আর এক জনের ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া অথবা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিয়া খেলা করিয়া থাকে। ইহাদের বকের নীচে ছত্রাকার একটি পাখনা আছে। ইহা এক প্রকার শোষণযন্ত্রবিশেষ। ইহার মধ্যস্থল বাটার মত নিম্ন-পৃষ্ঠ। গাছপালা বাহিয়া উদ্ধে আরোহণ করিবার সময় উক্ত শোষণ-যন্ত্রের দ্বারা গাছের গায়ে আটকাইয়া থাকে এবং পড়িয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এমন কি মস্তক কাচের গা বাহিয়া অবলীলাক্রমে উপরে উঠিয়া যায়। আমার পরীক্ষাগারের বড় কাচের পাত্রের মধ্যে কতগুলি মাছ রাখিয়া দিয়াছিলাম। একদিন ভুলক্রমে পাত্রের মুখ খোলা পড়িয়া ছিল। তাহার পরদিন দেখি সমস্ত মাছ কাচের গা বাহিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অনেক ধোঁজাধুঁজির পর দেখিতে পাইলাম উঁচু ছাতের কাছে শাশির গায়ে দুইটি মাছ ব্যাঙের মত ডাব্‌ডেবে চোখে চাহিয়া রহিয়াছে। ধরিতে বাইবামাত্রই লাফাইয়া পড়িতে গিয়া একটি তৎক্ষণাৎ পঞ্চপ্রাপ্ত হইল অপরটি আঙিনায় পড়িয়া ঘাস পাতার মধ্যে কোথায় লুকাইল স্থির করিতে পারিলাম না, অপরগুলির আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

জলের নীচে ইহারা কান্ধকো সজ্জিত ও প্রসারিত করিয়া সাধারণ মাছের মত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে কিন্তু ডাঙায় উঠিবামাত্র দুই দিকের দুইটি কান্ধকোর ফাঁক বন্ধ করিয়া ঠিক পট্কার মত ফুলাইয়া রাখে। মাছের মত কান্ধকো নাড়ে না। অপেক্ষাকৃত

বড় মাছগুলি যখন সার বাঁধিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া বসিয়া থাকে তখন বড় অদ্ভুত দেখায়, মনে হয় যেন ছোট ছোট কতকগুলি সিঙ্ক-ঘোটক দল বাঁধিয়া ডাঙায় বিশ্রাম করিতেছে।

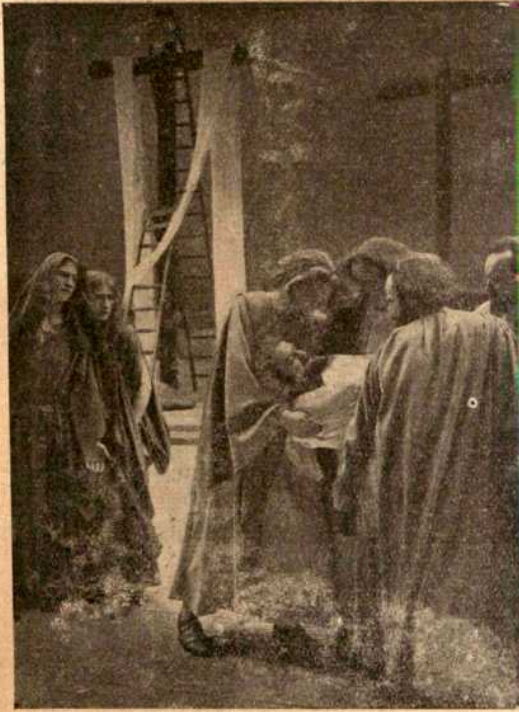
অধিকাংশ সময় ডাঙায় কাটাইলেও কর্দমাক্ত জমি ছাড়া ইহারা শুষ্ক মাটিতে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। শুষ্ক জমিতে গিয়া পড়িলেই শরীরের জল শুকাইয়া শরীর যেন আঠার মত ভূমির সঙ্গে আটকাইয়া যায়। তখন বেশী লাফাইতে বা হাটিতে পারে না। এই অবস্থায় ইহারা সহজেই কাবু হইয়া যায় এবং অনায়াসে ধরা পড়ে সেই জন্ত তাড়া খাইলে নেহাৎ নিরুপায় না হইলে শুষ্ক ডাঙার দিকে অগ্রসর হয় না, কেবলই জলের দিকে যাইবার চেষ্টা করে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জামেনীতে খ্রীষ্টলীলা

অবতার বা মহাপুরুষের জীবনকাহিনী লইয়া আমাদের দেশের জনসাধারণ যেরূপ রামলীলা, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি উৎসবের রচনা করিয়াছে, জামেনীর অন্তর্গত 'ওবরাম-গো' (Oberam-





অনুচরেরা জুশ হইতে খ্রীষ্টের মৃতদেহ নামাইতেছেন



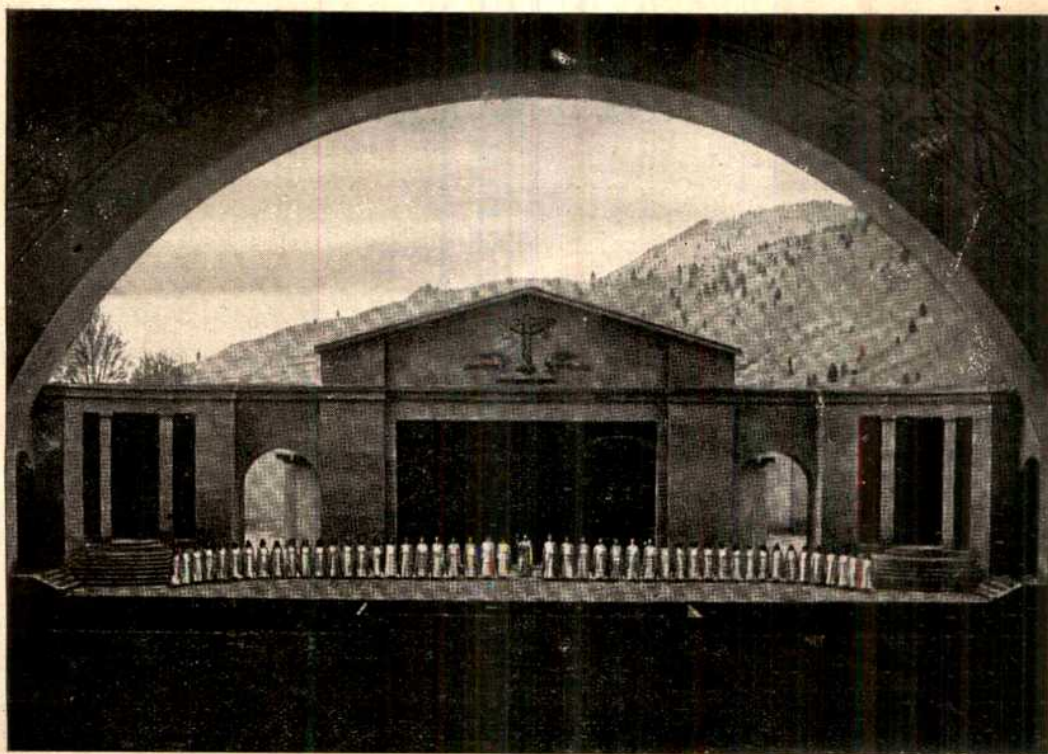
ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ—বীণ্ড

mergau) নামক স্থানে ভক্ত জনসাধারণ সেইরূপ খ্রীষ্টলীলা নাট্যোৎসবের (Passion Play) রচনা করিয়াছে।

কথিত আছে, তিন শত বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলে ভয়ানক মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। এই বিপত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্ত গ্রামবাসিগণ গীর্জায় গিয়া মানত করে যে এই মহামারী হইতে মুক্তি পাইলে তাহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ প্রতি দশ বৎসরে একবার ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী স্মরণ করিয়া নাট্যোৎসবের আয়োজন করিবে। ঐ প্রার্থনার পরই

মহামারী সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। সেই সময় হইতে (১৬৩৪) প্রতি দশ বর্ষে একবার এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। শুধু বিগত মহাযুদ্ধের সময় একবার এই উৎসব বন্ধ ছিল। এই ঐশ্বরের জনসংখ্যা সত্তর কি আঠার শত—তাহার মধ্যে মাত শত নরনারী এই নাট্য-অভিনয়ে যোগদান করে। এই অভিনয় হইতে বীণ্ডের জুশকাষ্ট বহন শেষভোজ জুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট, প্রভৃতি খ্রীষ্টজীবনীর কতকগুলি সুপরিচিত কাহিনীর চিত্র এতৎসহ মুদ্রিত হইল।





জামেনীর গুবরম্বরগো-এ খ্রীষ্টলীলার অভিনয়-মঞ্চ



খ্রীষ্টের অন্তিম ভোজ



খ্রীষ্টের ক্রুশ বহন



ক্রুশ-বিদ্ধ যীশু



পশ্চিমযাত্রিকী—শ্রীমতী দুর্গাবতী বোষ। রত্ন পাবলিশিং
হাউস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, ক্রাউন ৮ পোন্টী, ১৭১ পৃঃ,
মূল্য ২৫।

এই অতি সরস ভ্রমণ-কাহিনী এখন 'প্রবাসী'তে বাহির হইতেছিল তখনই ইহার রচনাভিত্তিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। এক্ষণে পুস্তকাকারে ইহার সুবৃদ্ধ কলেবর ও রম্য প্রাঙ্গণটি দেখিবার এই ক্ষণ ঘুণী হইয়াছি। একাংশকের হাতেও ইহার সর্বাংশ রক্ষা হইয়াছে। বাংলায় এ-পণ্ডিত বহু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে; কবিত্ব পাণ্ডিত্য ও তথ্য প্রভৃতির পর্যাপ্ত সমাবেশে, অথবা লেখকের আত্মপ্রচারের ভঙ্গিমায় সে-সকল রচনা বর্তই উপভোগ্য হউক—প্রায়ই এমন সরস ও সুখপাঠ্য হয় না। এই কাহিনীটি পড়িবার সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ইরোপ-প্রবাসীর পত্র' ও ইন্দুনাথ মুখের 'বিলাত ভ্রমণ' স্মরণ করিয়াছি। সকল সাহিত্যিক রচনা যে কারণে উৎকৃষ্ট হয় লেখকের সেই স্বকীয় দৃষ্টি-ও সহজ প্রকাশ-ক্ষমতা এই ভ্রমণ-কাহিনীতে আছে। এই গ্রন্থখানি এক হিসাবে সম্পূর্ণ নূতন—ইতিপূর্বে ষাট বাতালী মেয়ের চোখে, ইরোপের রাস্তাঘাট, দোকান-পসার ও লোকস্বাক্ষর নানা দৃষ্ট এমনভাবে প্রকাশিত হইতে আমরা দেখি নাই। আমাদেরই ঘরের মেয়ে অমৃতপুত্র ছাড়া, সমুদ্র পার্শ্বতে মরুভূমিতে, আধুনিক সভ্যতার জনাকীর্ণ পীঠস্থানগুলিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন; নারীমূলত কোকুহলের যেমন অস্ত্র নাই তেমনই পথের মাঝেও কলার-প্রত্যাহী মনের নানা বিষয়ে অজ্ঞপ্তি, 'আহর্ধ্য-সংগ্রহ' ও রত্ন-পারিপাট্যের জন্য উৎকণ্ঠা কম নহে, আবার জলের অপ্রচুরাভে বঙ্গরম্যমূলত অস্বস্তি, অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্নতার জন্য অধীর অসন্তোষ প্রভৃতি রচনাকে যেমন সত্য ও সজীব করিয়াছে, তেমনই সর্বত্র একটি সরল অথচ হৃদয় আকর্ষণীয়ভাবে এক সেই সরল চাপল্যহীন রসিকতা তাহাকে শ্রীমতী করিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার স্বকল যে হ্রুৎ ও উদার মনোবৃত্তি, লেখিকার রচনার তাহা যেমন ফুটিয়াছে, তেমনই জল্পচরর বাতালী বধু ও কন্য়ার যে বস্তাবটিকে আমরা এখনও বহুকালোচ্ছিত মূল্যবান সম্পদের মতই গণ্য করি তাহাও ইহাকে একটি ক্রমশঃ প্রসারিত বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। পরিচয় হিসাবে ছ-একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

“কটো তুলতে গিয়ে। সে এক হালির ব্যাপার, আমরাও চড় না, আর গাইও ছাড়বে না; বলে কি, ছবি তোলবার সময় অস্ত্রতঃ একবার উটের পিঠে চড়তেই হবে। তাকে বোঝান গেল, আমরা বাঁটতে পাড়িয়ে ছবি তোলাতেই ভালবাসি। সে নাছোড়বান্দা, বললে উটের পিঠে নিতান্তই বধি না গুঁ। তো, উটের লাগামটি হাতে ধরে। তোমাদের ‘হাস্যব্যঙ্গ’দের টিক পাশেই ঝাঁড়াও, তা হলে কারখা মন্দ হবে না।—কি করি, পড়েছি বন্ধনের হাতে, একবার ধরতে চেষ্টা করলুম, গোড়া উট এমন বিকট হয়ে ডেকে উঠল যে লাগাম ছেড়ে বলে ফেললুম না সাধু, কাজ সেই এবং কারখার। বাতালীর মেয়ে সকাল হলেই ভাঁড়ার ঘের কঁরে ঝাঁট পেতে ফুটনোর বসা অভ্যেস, এ ছেন মনিষ্যি চোখে পিরান্ডি দেখছি তাই স্বপ্নে।”

“একোয়েরিয়র দেখে ফিরে আসিছি হঠাৎ পিছনে এক অজুত রকম

গলার ঘর জ্বল-ফিরে চাইতে দেখি ছোট বুবতী আমার হাত তুলে বহু দেখিয়ে নিজের মধ্যে ছেলে ছোটোপুটি ঝাচ্ছে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলুম এমন বুড়োখাড়া মেয়ে এত অসভ্য কেন? আমাদের সঙ্গে ও-বয়সে যে ছেলেরা নিয়ে ঘর সদস্য করতে হয়।”

“এক ইংরেজ মহিলা তার ছোট ছেলেকে নিয়ে বাচ্ছিলেন। ছেলেট খেলা করতে করতে তার গায়ে কি রকম একটু কাপা লাগিয়ে কেটেছিল। শিক্ষিতা জননী তৎক্ষণাৎ তাঁর রুমাল বার করে নিজের মুখের ধুয়ে দ্বারা এক কোণ ভিজিয়ে ছেলের গালের কাপা তুলে দিলেন। আর এবার—এক জারগায় গোটা-মতক কুলী শাবল নিয়ে রাস্তা হুঁড়ুলিল। হঠাৎ বধু ফেলার আগোজ হতেই আমি সেদিকে চোখ দেখলুম।...ও হরি। দেখি তার হাতে কালি লেগেছে, সেই হাত দুখানি অজলি করে মুখের সামনে ধরে অনববত ওয়াকুফ করে হাতের তেলোর উপরেই ধুয়ে ফেলে হাতে শাবান দেওয়ার মত হাত কচলানত লাগল। তার পর পকেট থেকে কলার বার করে মুছে ফেললো। আমাদের ঘরের খালড ও মেধর—বারা অনববত মল্লা পরিষ্কার করছে—তাদের ভেতরেরও বোব হয় বধু বধু দ্বারা ছেলে মুখ-মোছান, নিজের হাত ধোয়ব ইচ্ছা কোন দিন হবে না।”

বইখানির ভাষা আধুনিক ‘চলুতি ভাষা’ নয়—সত্যকার মাতৃভাষা; যেমন শুদ্ধ ইডিয়ম তেমন শিষ্ট ও চম্প। এই পুস্তকখানির অতি শিল্পিত পাঠ্যকল্পের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

আনন্দবাজার—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। রত্ন-পাবলিশিং
হাউস, ২৫১২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ২৫।

শ্রীমত-অশোক চট্টোপাধ্যায় এত দিনে ঘনামে জাহির হইলেন। ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় এই ‘সকল রঙ্গ-ভিত্তি’ এখন বেনামীতে বাহির হইত তখনও এগুলির লেখক কে সে-সময়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ থাকিত না। কারণ এগুলির ভাল ও কলনার উদ্দেশ্যে আর যাহাই না থাকে একটি যে বলিষ্ঠ মন—রসিকতার মাত্রা-রক্ষাতে যে প্রকৃতকৃতা, এবং মট-উদ্ভাবনার যে জ্যামিতিক রীতি লক্ষিত হয়, তাহা এ ব্যক্তিরই নিজস্ব। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক জন খেচ্ছা-সেবক সাহিত্যিক অর্থাৎ আসন করিয়া চক্রে বসিয়া সাধনা করা তাঁহার প্রকৃতিবিশিষ্ট। নয়-ঈশ্বরদেবের সঙ্গী, লাইট-ইন্সপিরেশনের সিপাহীগিরি, মোটর গুইয়া ঘুরের পাল্লা, বল্লম-চর্চা, কালোবাড়ী সঙ্গীতের প্যাচ প্রভৃতির মতই কবিতা ও গল্পরচনা তাঁহার দেহমলের সহজ মুখা নিবৃত্তির উপান। আজিকার দিনে এরূপ সহ ও স্বাভাবিক মনঃপ্রকৃতি আমাদের সমাজে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং ‘আনন্দবাজার’ের মত পুস্তকে যে ধরণের কৌতুকপ্রিয়তা ও তাহার চমকরাতে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি-মনোভাব রহিয়াছে তাহা একই অসাধারণ বলিয়াই মনে হইবে। তাঁহার চিত্রিত ‘হৃদয়’ ভরবানার, পীতাঘর-সাঙেল, সর্বস্বর ঘটক প্রভৃতির প্রোটোটাইপ আধুনিক সমাজের বাসিন্দাই কটে, কিন্তু সেগুলিকে তিনি ‘যে হাস্য-বর্ণনে প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন সে-ধরণের বিশেষ এই যে তাহাতে ব্যক্তিগুলির চেহারা অতিমাত্রায় প্রলম্বিত বা হৃদয়ীকৃত হইলেও, কুলাপি বলাহানোর

পরিবর্তে খল-হাস্য উল্লেখ করে না। সত্যসার-শ্যালারীর নানা বস্তু-ব-বিড়খিত মন-মননের প্রতি এইরূপ স্পোর্টসম্যান-মুহুর্ত নির্দিষ্ট উচ্চহাস্যই এই গ্রন্থের বিশিষ্ট হাস্যরস। রসকল্পনার সূক্ষ্মতা ইহাতে নাই; বরং অতিশয় সরল ও সৰল কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে যে সংঘম ও শিষ্টতা, এবং নক্সাগুলিতে যে উদ্ভাবনী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় আছে তাহাতে এই রচনাগুলি একটি বৈশিষ্ট্য দাবী করিতে পারে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চক্রান্তই হইতে অবশ্যই রাজী হইবেন না, নতুবা রীতিমত চক্রে বসিয়া সাধনা করিলে আমাদের বিশ্বাস তিনি বাংলা-সাহিত্যের একটি বিক গুপ্ত করিবা আমাদের মনঃপ্রাণের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারিতেন।

হংসদূত—শ্রীহরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও শুক্লদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত। মূল্য ২৫ টাকা।

এখানিও যেমনট ও গমরথেরাম কবীর একখানি চিত্রকাব্য—পাণ্ডিত হয় না, বাহিরের চটকেই ক্ষেত্রের চিত্রচটক চক্কল হইয়া উঠে এক ছবির কল্যাণে কবির মান রক্ষা হয়। সব সময়ে কবিকেও দরকার হয় না, অনুবাদ যেমনই হউক চাই একটা পুরান বড় নাম আর ছবি ও ছাপার কাকিকার্য্য বহন করিবার জন্য মুজিত অক্ষরের জালিকা। এ সমস্ত পুস্তক কেহ না পড়িলেও চলে অর্থাৎ বিক্রয় হয়, কারণ বিবাহে বা ঐব উপলক্ষে উপহার-সমস্যা সমাধানের জন্যই প্রকাশকেরা এইকণ কাল-কাব্য প্রস্তুত করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ও তৎসহ কিঞ্চিৎ কামনমূল্য অর্জন করিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থখানিও সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইয়াছে—ত্রিবার্ণ চিত্র, নানা কালকার্য্যপূর্ণ নক্সা ও মার্জিত-শোভার বৈখানি উপহার দ্বিদিব ব্যক্তিব নেত্রাকর্ষণ করিবে। কিন্তু ইহাও প্রকাশকের কৃতজ্ঞ। তাহাতে কবির মুখ ত উজ্জ্বল হইবে না বরং একপ প্রশংসার স্নান হইবার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু কি করিব? ছবি দেখিব না কবিতা পড়িব? তথাপি পড়িয়াছি, কারণ অনুবাদের ভাষা ও ছন্দ বেশ সহজ সাকলীল হইয়াছে এবং এই ধবনের কাব্যে মূলে বস্তুটুকু কাব্যরস থাকে। সমস্ত সে-রস অনুবাদেও বজায় আছে, এমন কি আধুনিক ভাষা ও ছন্দেব বেশকিছু বসে একটু সজাতর হইয়াছে। হংসদূত কলসোবাসী-কৃত একখানি কৈবল্য কাব্য—বাঙালী রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি মধ্যম শ্রেণীর গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট কাব্য এখনও বাংলা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—ভাল অনুবাদ বিরল। আমরা এই নবীন কবিকে সেই সকল কাব্যের অনুবাদকার্য্যে ত্রুতী হইতে অনুরোধ করি তাহাতে তাঁহার পবিত্র আরও সার্থক হইবে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

হিটে-ফোঁটা—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক সেন ব্রাদার্স, ১৫ কলেজ রোড, কলিকাতা। মূল্য বারো আনা।

হিটে-ফোঁটা নামকরণে গ্রন্থকার অভি বিনয় প্রকাশ করেছেন। 'হীড়িভরা নয় সে ভাড়ি, মণ্ড জনের পিপাসার'—একথা সত্য। কিন্তু 'নয় নবলের রোমাঞ্চ বা দার্শনিকের তত্ত্ব-ফল'—একথা সত্য নয়। কারণ একটি তত্ত্বকথা এর সর্বত্র ছড়ান রয়েছে, বার এচার গ্রন্থকারের জীবনে: 'মিশন'; সেটি এই: 'আদি নচিকেতাও নই, খিওসকিও নই। ওপারের খবর দিতে পারিব না। তবে জানি—ইহলোকের পাঁচ জনকে নির আমাদের কারবার। ব্যোলাজি, গ্যানপুপলজির সাহায্যে ইহাচর বৃষ্টিবার চেষ্টা করা, আর ইহাদের সহিত সুখে-দুখে বাস করার নাম সুখ দুখ-নিবৃত্তির চেষ্টা বাজলতা।'

হিটে-ফোঁটার কয়েকটি ফোঁটা বেশ মোটা-মোটা—কড় লিভাব আরোহের মত। ঠিক কলসেব ডগার হিটাবার মত নয়। 'স্বদেশী

চাকরির কাহিনী', 'গোবুল', 'ধমে'র খেলা', 'শটং', 'অরবান্দ', 'পুজার বাজার', 'ভূতের বোঝা', 'চোখে-মেখা ঘটনা', 'কানাই-বলাই'—'কুককথা'—এরা এই গলের। এগুলির ব্যঙ্গ ও ভাব-গৌরব কেবল 'ফোঁটের বোটার একটু হাসি, চোখের কোণায় একটু ঝল' নয়।

বইয়ের শেষের দিকের কয়েকটি ফোঁটা ছোট হ'লেও, শিশিরবিনুর মত সম্পূর্ণ, সৌন্দর্য্যে চলাচল, হাসি-কান্নার স্বকরকে,—এক-একটি গীতি-কবিতাকল্প।

সত্যিকারের হিটে-ফোঁটা আছে কয়েকটি কবিতার। একটু নির্মল হাসির হুষ্টি করা তাদের উদ্দেশ্য। এ জাতীর কবিতা বাজারে ছলভ, কারণ আমরা কান্তের ঠোকরকেই হাঙ্গরদের উপাদান মনে করি। কতকগুলিতে একটু ভাল আছে—ধমে'র বিরুদ্ধে (কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়),—এগুলি পরিপাক করিলে কাজে লাগিবে। কতকগুলি চিচাইয়া পড়িতে হয় ও রস গ্রহণ মাত্র রঙহাস্যের আবির্ভাব হয়। 'জীবন্তর' 'সুতত্ব'—এগুলি এই জাতের।

গ্রন্থকার লিখিতেছেন অনেক, কিন্তু পড়বে কে? আমার মনে হয়, দেশের মনোবাজ্যে একটা ঘোর দুর্দিন এসেছে। এখন না-আছে 'হবিবান' না আছে হুচিহিত নাস্তিক্য; না আছে ভাব, না আছে অভিজ্ঞতা। আছে শুধু—ধমে' মন্দির-প্রবেশ, কমে' সাম্প্রদায়িকতা, আর সাহিত্যে অজ্ঞাত ক্রয়েড ও অনাগত সাইকলজির বিভীষিকা।

জীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

নেপালের পথে—শ্রীমুখোপাধ্যায় আচার্য্য ও শ্রীরমেশচন্দ্র সাহা প্রণীত। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃ: ১১ ও ৫ খানি চিত্র।

লেখকদ্বয় শিববাজির মেলায় পশুপতিনাথ দর্শনে গিয়াছিলেন। তাঁহার পথে বাঁধ দেখিয়াছিলেন, পুস্তকে মোটামুটি তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব ইহা ভবিষ্যৎ বাস্তবগণের উপকারে লাগিবে।

গ্রন্থের ভাষা দুর্বল, ছাপাতেও অনেক ভুল রহিয়াছে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

আয়না—লেখক আবুল মনসুর আহমদ। প্রকাশিকা মুসল্ল্য আকিবুন্নেসা, ময়মনসিংহ। দাম পাঁচ টাকা।

কয়েকটি সচিত্র ব্যঙ্গরচনা। লেখকের নির্ভাক মতামত ও সহজ রসবোধ সং-সাহিত্য হষ্টির সহায়ক, কিন্তু আরবী-উর্দু সম্মিশ্রিত 'নদা বাংলা' ভাষা সর্বত্র বোধ্য নহে। স্থানে স্থানে রচিপত্তন পীড়াদায়ক। ভৎসনকেও পুস্তকখানি ভাল। লেখকের বেদনা অকৃত্রিম, তাই বিজ্ঞপ্তি। জরনাল-অঙ্কিত ব্যঙ্গচিত্রগুলি স্থলর।

একটি সকাল—লেখক আবুল ফজল। প্রকাশক পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। দাম আট আনা।

তিমিট নাটিকা। লেখকের মনোভাব সাহিত্য রচনা নহে, বিবাহ ও নারীর প্রতি ব্যবহার বিষয়ে বোস্লেম মতামত প্রচার। ভাষা অপাঠ্য ও রচি অস্বাভিজিত।

আলোকলতা—লেখক আবুল ফজল। প্রকাশক খান মহাম্মদ হইয়ুদ্দিন, দাম আট আনা।

পাঁচটি ব্যঙ্গনাট্য। কুকচিপূর্ণ পুস্তক। ছাপা বাঁধাই খারাপ।

মেঘমল্লার—লেখক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দাস; শিল্পক। দাম আট আনা।

একাংশ গীতিনাটিকা। অনেকগুলি গান আছে। রবীন্দ্রগীতী হইলেও শেষের গানটি ও আরও দু-একটি গান হচ্ছে, শব্দ-বিস্তারিত হৃদয়। নাট্যাংশ মায়ুগী। ভাষা ভাল।

শেষ সাংখ্য—বিজনকুমার কল্যাণাধ্যায়। কমলা পারিষিৎ হাউস, ২৭ কলকাতা স্ট্রিট। দাম এক টাকা।

উপভাস। কাঁচা হাতের লেখা, ঘটনাবিস্তার অসংলগ্ন।

শ্রীমণীশ ঘটক

গোবিন্দদাসের করচারণ্য—শ্রীমণীশঘটকি বোম্ব, ভক্তি-ভূষণ প্রণীত। একাংশক—শ্রীমণীশঘটকি বোম্ব, ২ নং আনন্দ চাহুধের সেন, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

গত বর্ষের মাঘ মাসের প্রবাসীতে সমালোচিত 'চৈতন্যসেবের দক্ষিণাপথ জমদ' নামক পুস্তকের দ্বারা বর্তমান পুস্তকেরও উদ্দেশ্য গোবিন্দ কর্ণকারের নামে প্রচলিত 'গোবিন্দদাসের করচা' নামক চৈতন্যসেবের দক্ষিণাপথ-অর্থের বিবরণ বিবরণক বহু বিবরণাংশ প্রবন্ধের অসারতা, অবাচীনতা ও কৃত্রিমতা প্রদর্শন। করচাখানির প্রথম প্রকাশকালেই (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল প্রধানতঃ তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীমণীশঘটকি বোম্ব আলোচ্য পুস্তকে শ্রীমণীশ ঘনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদকতার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হইতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার প্রস্থানটির সারবত্তা ও অকৃত্রিমতা প্রতিপাদনের যে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। নবীন প্রাচীন নানা প্রহ্ম আলোচনা করিয়া তিনি ঘনেশ বাবুর কতকগুলি কথাই অনাসক্ত ও অজ্ঞান্য ভ্রুটিও প্রদর্শন করিয়াছেন। উপসংহারে দেখান হইয়াছে যে প্রস্থানটির প্রথম প্রচারক জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সমাদায়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতে গোস্বামী মহাশয়ই এই প্রবন্ধের রচয়িতা—বক্তব্য, প্রবন্ধের অবাচীন ভাব ও ভাষাও এই মতেই সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। করচা সম্বন্ধে নানা সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক যে-সমস্ত আলোচনা প্রবন্ধ বা প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলির আভাস এই পুস্তক হইতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ইহাদের একটি পূর্ণ তালিকা এই সঙ্গে বোঝিতে হইলে বিশেষ সুবিধা হইত। নানা জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তক পরিপূর্ণ। তবে ঘনেশ বাবু সম্বন্ধে যে-সমস্ত ইঙ্গিত ইহাও মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এ-স্মৃতির প্রবন্ধের পৌরষ ছুর করে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

দেউল—প্রভাসদী দ্বিজ। একাংশক, শ্রীমহেশনাথ দ্বিজ, ৮বি রসনাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

প্রাচীন ভারতের শিল্পসাধনার ধারা লেখিকা এই নাটকখানির ভিতর দিয়া একাংশ করিয়াছেন। কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কিংবদন্তী ও কল্পনার সাহায্যে লেখিকা যে করচা চরিত্রের আশ্রয় দান করিয়াছেন, তাহা অসার্যক হয় নাই সেই পৌরষবশত যুগের চিরবরণীয় শিল্পী ও কবিরা পার্শ্বিক সম্পদকে তুল্য করিয়া নিজেদের স্বপ্ন-স্বপ্নার প্রতি দৃষ্টিপাত মাঝ না করিয়া যে-ভাবে "দেউল" রচনার নিজের উৎসর্গ কবিরা গিয়াছেন সেই ছন্দর সাধনার কপটি বর্তমান যুগে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পল্লী সাথী—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমহেশনাথ দাস, এম-এ পি-এইচ-ডি প্রণীত। একাংশক শ্রীমহেশনাথ বোম্ব, কলকাতা। মূল্য ১৪০। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই বইখানি পল্লীগ্রামের দুইটি তরুণ-তরুণীর আবালা প্রেমের কাহিনী লইয়া রচিত। তরুণীর অভিভাবকের আপত্তিতে প্রথমে তাহাদের মিলনে বাধা জন্মে। কিন্তু পরে ঘটনাক্রমে ঐ বাধা দূরীভূত হওয়ার মিলন সম্ভবপর হয়। পুস্তকখানিতে প্রহকারের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

পুরস্কার প্রতিযোগিতা—শ্রীমহেশনাথ দাস প্রণীত। একাংশক, সেন ব্রাহ্মণ এণ্ড কোং, ১৫ কলকাতা কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

সহপাঠীদের চক্রান্তে নানা দুর্দশায় পড়িয়াও দরিদ্র ছাত্র প্রসাদ ক্রমে শেষ পর্যন্ত পুরস্কার পাইল, তাহাই এই শিশুপাঠ্য উপভাসের গল্প। বইটি স্থলিখিত ও স্থলপাঠ্য; তবে ঘটনা-সংস্থান স্থানে স্থানে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। প্রসাদকে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহাঃ সহপাঠীরা বেক্রম বড়বাক্স করিয়াছিল ও অল্পবয়স্ক ছাত্র বেক্রম বোপসাধন করিয়াছিল তাহা শুলের অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পক্ষে অসম্ভব ত বটেই—বয়স ও দুর্ভাগ্য কুচক্রীদেরও তাহা হইতে শিথিল হইয়াছে।

নূতন কিছু—শ্রীরবীন্দ্রলাল দাস। একাংশক, ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লি., ১ বি, রসারোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

শিশুপাঠ্য হাসির গল্পের সমষ্টি। 'নূতন কিছু'র সন্ধান না পাইলেও অধিকাংশ গল্পই আনন্দদায়ক। তবে কোন কোন গল্পে খোঁচা রসিকতা করিয়া হাসাইবার চেষ্টা আছে, বাহা শিশুপাঠ্য পুস্তকে অন্ততঃ শোভন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রীকৃষ্ণ-উত্তরা সংবাদ বা ললনা-মঞ্জল গীতা—শ্রীমদ্বিনোদ সাহিত্যকল্যণ কর্তৃক প্রণীত।

ইহা একখানি সহপাঠ্যপুস্তক কাব্যরস। লেখক ইহাতে অনেক গভীর বিষয় সহজভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলি সরল, সতেজ ও বহুদল।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

বন্ধনহীন গ্রন্থি—শ্রীমহেশনাথ দাস, এম-এ প্রণীত। শ্রীমদ্বিনোদ সাহিত্যকল্যণ কর্তৃক প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

দীপ্তি চার্চার্জ ইংরেজী সাহিত্যে এম-এ পড়ে। রিচার্জ ফলার নম্বে লাহিড়ীর সঙ্গে ভাবটা একটু বিশেষ স্বাকার ধারণ করিয়াছে। এমন সময় সময়কে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পর বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-গৃহে বাধ্যবদ্ধ তমালের সহিত সাক্ষাৎ। এই তিন উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে লইয়া উপভাসটি রচিত। কাহিনী ঘটনাবল্য বা বিচিত্র নহে, কিন্তু বর্ণনাত্মক হইয়াছে। ঘটনার গতিবিধির মধ্যে ভাবের প্রয়োগে লেখক সংবাদের পরিচয় দিয়াছেন। রচি সুসজ্জিত, ভাষা সহজ ও সরল, চরিত্রগুলি সজীব।

ভূপেন্দ্রলাল দত্ত

ছাইচাপা আশুন

শ্রীকৃষ্ণমাধব ভট্টাচার্য্য

শহরেব এক ধাবে একতলা বাড়ী। উপরটা টালি, নীচের দিকটা পাকা। ইহারই মধ্যে দুইটি পরিবার; মধ্যে দরমাব বেড়া। কলভলাটা একটু বাহির পানে, তাহার পাশে একটা ছোট জামগাছও আছে। দুই পরিবারের একই কলভলা। চৌবাচ্চা আছে; বাঁশের চিরের একটা ছোট জলভরার নলও আছে, একটা টিনের মগও আছে, এক টুকরা কাপড়কাচা সাবান আছে। এ সবই উভয় পরিবারের; সাবান ফুবাইলেই আসে; সেজন্ত কোনদিন কোন কথা নাই।

চন্দনা বিধবা; অল্প বয়সে বিধবা। রূপেন্দু তাব বড় ভাই, বাস চালায়। আর ছোট ভাই গোব, স্থলে পড়ে। চন্দনা নিজে আলতা তৈয়ারী করে, আচার করে, জেলী করে। বোতলে করিয়া স্বদৃশ ইংরেজী লেবেল মারিয়া দাদার হাতে দেয়। রূপেন্দু তাহা নির্দ্ধারিত দোকানে দিয়া নগদ দাম লইয়া আসে। সংসার ছোট, চল ছোট ভাবে,—অভাব-অভিযোগ নাই।

দরমার ওধারে ওরাও ছোট পরিবার, তবে ওবা নিজেদের মধ্যবিত্ত বলে;—বলিতেও পারে। কেদারনাথ পেন্সন পান; পুত্র রাজীব পাটনায় চাকরি করে। কিছু পাঠায় না। জী লইয়া সংসার চালাইয়া পিতার ভাগে অবশিষ্ট কিছু থাকে না। তবু কেদারনাথের পুত্র আছে ও চাকরিও করে। কন্তা নন্দিনীর বিবাহ হইয়াছে গত বৎসর। সে এখন পিতামাতার নিকটেই আছে। স্বামী বেলে চাকরি করে, জব্বলপুরে তাহার প্রধান আড্ডা। স্ত্রীবাং ওরা মধ্যবিত্ত। তবু ছোটভাবে থাকে, তাই বিবাহ-বিসম্বাদ নাই। কেদারবাবু চন্দনাদেব যেন করুণাপ্রবণ আশ্রিত-পালকের চক্ষে দেখেন। চন্দনা সেই মর্ধ্যাটুকু কেদারবাবুকে দিয়া তাঁহাকে জ্যোতামহাশয় ডাকে আপ্যায়িত রাখিত। স্ত্রীর এক কলভলা হইলেও জলের অংশ লইয়া বিতণ্ডাব সৃষ্টি এই পরিবারেব অজ্ঞাতই ছিল।

চন্দনা সকালে উঠিয়াই দাদার জন্ত একটু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দেয়; দাদা ছয়টার আগেই বাহিব হইয়া যান। ততক্ষণে গৌর ওঠে; মুখ হাত পা ধুইয়া তাহাবও কিছু জলযোগ হয়। সে নিজেব পড়াশুনা লইয়া বসে। চন্দনাব ওদিকে উঠনে আশুন ধরিয়া উঠিয়াছে। নিরামিষ খা-হয় ফুটাইয়া লইয়া, সে মাছ রাখিতে বসে। মাছটুকু

আনিয়া দেখ নন্দিনীদের চাকরটা, উহাদেরই বাজারের সঙ্গে। গড়া শঙ্ক হইলে আবশ্যক-মত বাজার গৌরই করিয়া দেয়। তার পর স্নান আহার সারিয়া সে স্থলে চলিয়া যায়। চন্দনা বসিয়া থাকিবে সেই বারোটা পর্যন্ত।

রূপেন্দু তাহার থাকী পোষাক ছাড়িতে ছাড়িতে ডাক পাড়ে—“কই রে চন্দন, ভাত বাড়!”

“বাপ রে বাপ। ছেলে বাড়ী এলেন, অমনি যেন ডাকাত পড়ল। পাশের বাড়ীর সব লোকেরা কি বলবে বল তো?” বলিয়া চন্দনা চূপ করে।

রূপেন্দু আলনায় পাঞ্জামাটা ঝুলাইতে ঝুলাইতে বলে, “বলবে আবার কি! বলবে ছেলেটার কি রাস্তাসে খিদে!”

চন্দনা আলতার শিশির গায়ে লেবেল আঁটিতে আঁটিতে বলে, “আজ রান্না হয় নি দাদা!”

রূপেন্দু এক লাফে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়,—“বলিস কি রে? রান্না হয় নি? খিদেয় যে পেটের নাড়ীতে টান ধরেছে।”

“কি করি বল, একে শরীর খারাপ;—তার ওপর পঞ্চাশ শিশি আলতায় লেবেল লাগালাম। একা হাতে আর পারি নে।”

“মোটর ড্রাইভারের বোনের শরীর খারাপ কি রে? বললে যে লোকে হাসবে?”

এই কথাটায় চন্দনা খুব আঘাত পাইত। সে বলিল, “কেব দাদা?—রান্না তো কোন্ কালে হয়ে গিয়েছে। জিরবে, নাইবে, তার পরে তো গিলবে? —না বাইরে থেকেই হাঁকপাড়াপাড়ি—‘ভাত বাড়’—যেন ডাকাত পড়েছে। কেন এটা কি হোটেল নাকি? আমি আর পাব না, তুমি বৌ আন।”

“বা রে মেয়ে! কোন্ কথায় কোন্ কথা আনে দেখ। ওরে মুখ ড্রাইভারের হাতে কে মেয়ে দেবে?”

আবার শত বন্ধারে চন্দনা বলিয়া উঠিল, “মেয়ে না-দেয় না-দেবে। কারুব দোরে হাত পাততে যাব নাকি? বিয়ে করতে যাবে কেন? বিধবা একটা বোন, ভাত কাপড়ে কি রাধুনী পেয়েছে; তোমার আর বিয়েব দরকার?”

“বলি খেতে দিবি, না ঝগড়া করে মরবি।”—কলভলা

হইতে রূপ রূপ শব্দ আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহা থামিয়া গেল।

চন্দনা উঠিয়া ঠাই করিয়া ভাত বাড়িতে গেল। রূপেন্দু চুল জাঁচড়াইয়া আসিয়া বসিতে বসিতে, চন্দনা ভাতবাড়া সাজ করিয়া পাখা-হাতে মাছি তাড়াইতেছিল।

ধুতি পরিয়া ঠাইতে আসিয়া আসনে দাঁড়াইয়াই কি একটা রূপ করিয়া সে চন্দনার সম্মুখে ফেলিয়া দেয়। “এই নে।”

“কি, ও দাদা?”

“খুলে দেখ, না।”

খুলিয়া দেখে একগাদা লেবেল আর আলতার মশলা।

“এত কি করব?”

“দিন-পনের মধ্যে গুদের পাচশ আলতার শিশি চাই।”

হাসিয়া চন্দনা বলিল, “আর আমি পারি নে বাপু।” রূপেন্দু চলিয়া যায়। আসিবে সেই রাত বারটার পর।

নিজের খাওয়া সারিয়া, সে আবার আলতার শিশি লইয়া বসে।

একটু পরেই আসে নন্দিনী।

নন্দিনী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসে।

“কি রে নন্দ?”

“কিছু নয়।”

“কিছু নয় বখন তখনও বুঝি; আবার কিছু কিছু বখন তা-ও বুঝি। এ তো তোমার কিছু-নয়ের হাসি নয় ভাই। কি যেন কোথায় একটু ঝিকিমিকি করছে।”

একগাল হাসিয়া চন্দনার স্বভৌল পিঠে একটা ছোট চড় মারিয়া নন্দিনী বলিল, “আ-হা-হা রে, উনি যেন সবজাস্তা! কিছু কোথায় আছে তো কি বল না?”

“আচ্ছা বলব? — কি দেবে বল?”

“যা চাও।”

“তার মানেই কিছু নয়। আমি যা চাই, তা আর তুমি কি করে দেবে বল? তুমি যা দেবে তাই নেব। কি দেবে?”

“আচ্ছা দেব একটা জিনিষ। — বল তো কি?”

“আচ্ছা, কি বোকা মেয়ে তুমি। এখনও বুঝবো না কি? যে কথাটা বলতে পারলে আমি যা চাই তাই তুমি আমার দ্বিগুণ ফেলতে পার, সে-কথাটা কি তা-কি এখনও আমি বলতে পারব না?”

“বলই না।”

আলতা-রাঙা ছুটি আঙুলে নন্দিনীর চিবুকে যুহু একটা ঠেলা দিয়া সে বলিল, “বরের চিঠি গো! বরের চিঠি।”

বলিতেই সেমিজের মধ্য হইতে নন্দিনী বাহির করিল তাহার প্রিয়তমের পত্র। ছুঁড়িয়া সেখানা চন্দনার দিকে ফেলিয়া বলিল, “এই নাও।”

চন্দনা হাসিয়া বলিল, “আমি নিয়ে আর কি করব, তুই পড় তনি।”

এমনিই হয়।...নন্দিনীর নুতন বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীর পত্রে নববিবাহের প্রেমচন্দনের ভিলকের দাগ তখনও আনন্দোজ্জলতার স্প্রসন। সে পত্রের আন্তো-পান্ত ভরা থাকে নবজাত সহজ দাম্পত্যলীলার রসমাধুর্য্যে। একাকিনী কিশোরী নন্দিনী তাহার মাদকতায় নিভৃত উচ্ছল হইয়া উঠে। এক-এক বার পত্রিকার্কের তাহার বক্ষ্যাস গভীরতর ও মধুরতর হইয়া আসে; এক-এক বার আকর্ষ অসহনীয় পিপাসায় তাহার চারি খার নিঃশেষিত আনন্দের ক্রান্ত অবশেষের জ্বায় ম্লান হইয়া উঠে।

নারীর এইখানে আছে একটি স্ববর্ণনীয় দুর্বলতা। সে তাহার স্বপ্ন দেখাইয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসে। পাজাপাজ জান থাকে না। তাহার স্বপ্ন অপরের মনে কোন রহস্যের স্রষ্টি করিল, তাহা সে জানিতে চাহে না। সে চাহে শুধুমাত্র অংশ দিতে। একেবারে দিতে নহে। নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখাইতে। নারীর সখীত্ব, নারীর পত্নীত্ব, নারীর মাতৃত্ব—সকল গৌরবস্বয় বৃত্তি সার্থকতা পায় এই অংশ দেওয়ার মাঝে। নন্দিনী ও চন্দনার সখীত্ব বাড়িত এই ভাগ্যায়শ পরিস্রবানের মধ্য দিয়া। দুর্ভাগিনী চন্দনার দুর্ভাগ্য দেখাইয়া লাভ নাই, তাই নন্দিনীর একার সৌভাগ্য দেখিয়া ও দেখাইয়াই ইহারা উভয়ে এক হইয়াছিল।

নন্দিনী তাহার স্বামীর পত্র আনিয়া দেখাইত চন্দনাকে। চন্দনার নিজেরই প্রথম প্রথম দেখিতে লজ্জা করিত; কিন্তু না দেখিলে নন্দিনী যে আবার রাগ করে; তাই দেখিতে হয়।

“দাও দেখি।”

নন্দিনী চন্দনার ঘাড়ের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া কতবার পড়া চিঠিখানা আবার পড়ে।

চন্দনা আলতার কাজ ছাড়িয়া দিয়া চিঠিতে মন দেয়।

এক-এক জায়গায় উভয়ে গা-ঠেলাঠেলি করিয়া হাসে।

নন্দিনী মুখ লাল করিয়া বলে, “দেখেছ ভাই, পুরুষ-মাতৃবস্ত্রলো কি বেহায়া হয়! চিঠিতে এসব কথা লিখতে একটু বাধে না?”

চন্দনা বলে, “তোমার বুঝি বাধে।”

নন্দিনী সলজ্জ চাহনিতে হাসিয়া বলে, “বাধে না-তো কি? আমার চিঠি তো তুমি সব দেখেছ। আমি ভাই চিঠিতে অমন সব যা-তা লিখতে পারি নে।”

কসু করিয়া চন্দনা বলিয়া ফেলিল, “আমায় দিও, আমি লিখে দেব।”

উৎফুল্ল হইয়া নন্দিনী বলে, “দেবে ভাই? সত্যি দেবে? আমার ভাই কেমন ঘেন হইয়া না। তুমি ঠিক পারবে।”

আত্মপ্রশংসায় হাসিয়া লেবেল-মারা আলতার শিশি-গুলি এক পাশে সরাইতে সবাইতে চন্দনা বলে, “হ্যাঁ ঠিক পারবে। ...কেমন করে জানলে তুমি পারবে?”

নন্দিনীও চন্দনার দেখাদেখি শিশির গায়ে লেবেল মারিতে মারিতে বলে, “আহা, তা আর জানি না। তুমি ভাই কত লেখাপড়া শিখেছ। গৌরকে তুমি পড়াও। আমি ভাই কি জানি?”

মান হাসি হাসিয়া উদাস কণ্ঠে চন্দনা বলিল, “এত জেনেই বা কি হ'ল বল? তোমার না-জানাই বজায় থাক ভাই, আমার মত জেনে তোমার দবকার নেই।

নন্দিনী একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়ে। সে বলে, “তোমার ভাই ঘুরে ফিরে ওই এক কথা। ...যাক, আমার এ চিঠির জবাব তোমায় লিখে দিতে হবে।”

এই বাস্তবিকতার ছায়াপাতে শঙ্কায় শিহরিয়া চন্দনা বলিল, “হ্যাঁ, ভাই আবার হয় নাকি?”

“কেন? না হবে কেন?”

“হ্যাঁ, পাগল নাকি? তোর চিঠি আমি লিখে দেব কি?”

“দিলেই বা, আমার হয়ে তুমি লিখে দেবে। আগেকার দিনে তো সব মেঘেরাই তাই করত। তারা কি লেখাপড়া জানতো নাকি? তারা তো পুরুষমানুষকে দিয়েও লেখাত।”

গভীর হইয়া মাথা নীচু করিয়া চন্দনা বলিল, “পুরুষ-মানুষকে দিয়ে লেখান সম্ভব। কিন্তু বিধবা মেয়েমানুষকে দিয়ে স্বামীর প্রেমপত্র লেখাতে নেই নন্দ।”

নন্দ ঘেন হত চম্ব হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কোন কথায় কোন কথা আসিয়া পড়ে। চন্দনা যেন কি! নন্দিনীর এসব কথা ভাল লাগে না। বিধবা তো কি হইয়াছে? চিঠি লেখা বইতো নয়! সেই অল্পরোধটুকুর জন্ত এত কথা। বেচারীর চোখ ভরিয়া জল আসিল। সম্ভ্রমে চিঠিখানি তুলিয়া লইয়া সে এক পা এক পা করিয়া দরমার বেড়ার ওপাশে চলিয়া গেল।

চন্দনা মুখ নীচু করিয়া শিশির গায়ে লেবেল আঁটিতে লাগিল।

লেবেল আঁটিতে আঁটিতে রৌদ্র ঐ হলুদ রঙের বড় বাঁড়ীটার চিলে-কোঠার ওধারে চলিয়া গেল। গৌরও আসিয়া পড়িল। সব কাজ নিত্য বন্ধ হইয়া তেমনই হইল।

কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া চন্দনার মনে পড়িতে লাগিল—নন্দিনীর সেই মান বেদনাকাতর মুখখানি।

আহা, বেচারী শুধু শুধু ব্যথা পাইয়াছে। ও মাত্র নবপরিণীতা বালিকাবধু, বৈধবের অন্তর্ধানতা বুঝিবার মত অল্পভূতি ওর কোথায়? শাস্ত্রে লেখে, বিধবার ইহা করিতে নাই, উহা কবিতা নাই;—করিতে যে কেন নাই তাহা বিধবা ছাড়া কল্পনাই বা বোঝে? যাহারা ভাবিলে বুঝিতে পারে, তাহারা ভাবে না। নববিবাহিতা সখীর প্রণয়লিপি বিধবাকে লিখিতে নাই, একপ কথা শাস্ত্রে লেখে নাই সত্য, কিন্তু চন্দনা নিশ্চয় জানে, মনপ্রাণ দিয়া জানে, ও-কাজ তাহাকে করিতে নাই। বিধবার রসলিপ্সা থাকিতে নাই। ইচ্ছিতে, আভাসে, নেপথ্যে, অভিনয়ে কোনও প্রকাষেই প্রণয়িনী হওয়া তাহার শাস্ত্রে না। শাস্ত্রে না কেন তাহা নন্দিনীর পত্র পড়িবার সময়েই চন্দনা বুঝিয়াছে। তাহার মনের কোণে, তাহার অগোচরে, সেই অপরিচিত কোন একটু যুবকের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে অজ্ঞাতে দেখিয়াছে প্রিয়তমাকে পত্র লিখিবার জন্ত নন্দিনীর স্বামীর বক্ষে কি ব্যাকুলতা, চক্ষে কি উদ্ভাসন, তাহার শরীরকে অবসর করিয়া সে কি পুলক! চন্দনার নিজের মনে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। তাহার মেহে মনে আসিয়াছে চাক্ষুণ্য। না হইবে কেন,—“তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম”! ইহার প্রশ্ন দেওয়া ঠিক নহে, চন্দনা বোঝে।—তাই সে নন্দিনীর ওই বিপুল আগ্রহকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু এখন মন কেমন করে। আহা, নন্দ, বেচারী! জোর করিয়া উঠিয়া গিয়া বেড়ার পাশে গিয়া সে ডাকিল, “নন্দ।”

নন্দিনী প্রথমটায় উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার পর দু-এক ডাকে উত্তর আসিল, “কি চন্দন?”

“চন্দনা কলতলায় গা ধুয়ে আসি। ও কি, চুলও তো বাঁধা হয় নি!”

“না ভাই, আজ আর চুল বাঁধব না।”

“আয় চুল বেঁধে দিই।”

“না ভাই, থাক, একেই তোমার কাজের অন্ত নেই, আবার আমার চুল।”

“রাগ হ'ল বুঝি?” চন্দনা আর নন্দিনীর মুখের পানে সহজভাবে চাহিতে পারিতেছিল না, চক্ষু ছুটি জলে ভরা, মুখখানি বিষণ্ণ-প্রতিমা। “অত রাগ করে না,—বলছি এস।” হাত টানিয়া সে লইয়া আসিল। গৌরকে দিয়া জ্যোষ্ঠা-মশায়দের ঘর হইতে ফিতা চিরুণী আনা হইয়া লইল।

চুলবাঁধা গা-ধোয়ার মধ্য দিয়া নন্দিনীর মুখের ভার অনেকটা কমিল বটে, কিন্তু গেল না। গৌর গেল সম্ভার

পরে, আলতার শিশি ভরিবার বাস্ক আনিতে,—নন্দিনী আসিয়া চন্দনার রান্নার ধারে বসিল। “কই চন্দন, দাও ভাই আলতার শিশি, আমি লেবেল লাগাব।”

“না থাক, তুমি হাত নোংরা করবে কেন?”

“তুমি কর কেন?”

“এ তোমার ভারী মজার প্রশ্ন ভাই!—আমি আর তুমি? ভগবান করুন আমার মত করা যেন তোমায় না-ই করতে হয়।”

“তুমি দেবে না তো?”

“অমনি রাগ হয়ে গেল? ঐ তো ডালায় সব রয়েছে, যা খুশী কর।”

“তবে থাক।”

অভিমানে নন্দিনীর মন ভারী হইয়া আসিতেছে দেখিয়া চন্দনা অন্য কথা পাড়িল। “ও কাজে কি হবে? চিঠি লেখা হ’ল?”

“না ভাই, চিঠি আমি আর লিখব না।”

“চিঠি লিখবে না? সে আবার একটা কথা হ’ল?”

দরজার পাশে গোরুর অঙ্ক কষিবার স্লেট পেঙ্গিল ছিল। নন্দিনী স্লেটের গায়ে আঁচড় টানিতে টানিতে বলিল, “না ভাই, কথা আর না হবে কেন? যা তো কতবার বলেন তোমার কাছে এসে চিঠি লিখতে। কোন বাব আসি না। একবার যদি বা এলাম, তোমার তো আর তা লিখতে নেই।”

“তা এতবার যখন তোমার লেখায় হয়েছে, এবারেই বা হবে না কেন?”

“সে কথা তো আর হচ্ছে না, একবারই বা তুমি লিখে দিলে কি হয়? আমার কি একখানা ভাল চিঠি লিখতে সাধ যায় না?”

চন্দনার মন এই অতি সরল কিশোরীটির কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সে খুশীখানা অস্বাভাবিকতার সহিত নাড়িতে নাড়িতে বলিল, “সাধ যায় নাকি?—তা আমি না লিখে দিলে তুমি আব লিখবে না, সে কি হয় নন্দ? তুমি বেশ পারবে, খুব পারবে, এতদিন তো পেরেছ। নিয়ে এস কাগজকলম,—আমার স্নমুখে বসে লেখ তো!”

স্লেটখানি যথাস্থানে রাখিয়া সে বলিল, “থাক ভাই ও কথায় আর দরকার নেই। এতদিন কি চিঠি লিখেছি সে তো আমি জানি।”—বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

নন্দিনীর গলার স্বরে সন্দিহান হইয়া চাহিতেই চন্দনা দেখিল নন্দিনী উঠিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে কত ভাবিল—“নন্দ ও নন্দ!” কিন্তু অভিমানিনী নন্দ চলিয়াই গেল।

তরকারীটা নামাইয়া ওধারে যাইবে ভাবিতেছে, গৌর আসিয়া একগাছা পেটবোর্ডের লাল লম্বা লম্বা বাস্ক ধরে ফেলিল।

“কত বাস্ক পেলি রে গৌর?”

“দু-শ, দিদি।”

“কত হ’ল?”

“আড়াই টাকা।”

“সব বাকী রইল তো?”

“না দেড় টাকা রইল; একটা দিয়ে এলাম।”

“যা হাত পা ধুয়ে ফেল।”

হাত পা ধুইয়া আসিয়া গৌর বলিল, “এখন পড়াবে দিদি?”

“বোস্ এই রান্নাঘরের দোরে। ইংরাজী বই খোল।”

গৌর পড়িতে লাগিল। সহজভাবেই চন্দনা তাহাকে পড়াইতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইল। দশটার আগেই গৌর খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বারটার রুপেদু আসিবে। চন্দনা ধীবে ধীরে নন্দিনীর ঘরে গেল।

নন্দিনী তখনও শোয় নাই। বাতি জালিয়া বসিয়া আছে।

“কি ভাবছ নন্দ?”

“চন্দন এসেছ?”

“দেখি তোমার চিঠি।”

“কেন ভাই?”

“দাও গে, স্ববাব লিখে দিই।”

অভিমানের বাধ ভাঙিয়া গেল, কিন্তু হস্তে কাগজ কলম আনিয়া দিয়া সে পাশে বসিল।—বিধবা পতিবিরোগবিধুরা চন্দনা কল্পিতা প্রেমিকা সাজিয়া কল্পিত স্বামীকে পত্র লিখিতে রসিল।

সে কত বৎসব পূর্বের কথা! এই কল্পনা সেদিন সত্য ছিল। এই চিঠি লেখা ছিল অক্ষরে অক্ষরে পরিপূর্ণ। সে দিন তাহার প্রশ্ন ছিল যাদুমন্ত্রের জাদু, স্পষ্টোচ্চারিত অথচ বুদ্ধির অনধিগম্য। সেদিন স্বামী ছিলেন জীবন্ত দেবতা, আশাপরিপূর স্ববর্ণ বিগ্রহ। পত্র ছিল প্রাণ পূলকের অধিকার—অভিনন্দন। সে পত্রের আয়োজনে ছিল উৎসাহ, রচনায় ছিল পূলক, রোমাঞ্চ; প্রতিটি অক্ষরে, পংক্তিতে, ব্যঞ্জনায় ছিল অধীর আগ্রহের সংযত বিকাশ। তাহার অপেক্ষায় ছিল পল-গগনার বিরক্তি, তাহার প্রাপ্তিতে ছিল ভুবনমোলান অবগুণীত চঞ্চলতা। আজ সেই সে চন্দনা, সেই প্রণয়লিপি, সেই হামি-জীর অপরূপ গ্রন্থীসম্বন্ধ। তথাপি কি হাস্যকর পাপ অভিনয়। চন্দনার বক্ষ দ্রুত দ্রুত কাঁপে, অতীতের স্বার্থ সত্য আর বর্তমানের অর্থহীন মিথ্যা অভিনয়ের দ্বন্দ্ব। সে ছত্রের পর ছত্র লিখিয়া চলে।—

“প্রিয়তমেষু,—মেয়েমানুষ, চিঠি লিখতে তোমার মত পরব না, কিন্তু প্রাণের কথাটুকু জানাবার ব্যাকুলতা...” এই ভাবে। চিঠি লেখা শেষ হয়। নন্দিনী বলে, “দেখ তো

এমন চিঠি আমি কখনও লিখতে পারি। তোমার এক কথা। সকালে যখন আমার অমন ক'রে বললে, তোমার এত দুঃখ হয়েছিল, ভেবেছিলাম আর তোমার কাছে কোন দিন কিছু চাইব না। কিন্তু আবার তোমার কাছে না গিয়ে পারলাম না।”

চন্দনার বুকে যেন নক্ষত্ররাজ্যের বাতাসের স্পর্শ লাগতেছে। সে কিছুতেই সে কম্পনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তবুও সে মুখে হাসি ফুটাইয়া বলিল, “এখন রাগ গেছে ত? আমি লিখে দিলাম তবে হ'ল। বাপ রে বাপ, কি বাগ মেয়ের! আমার তোমার কাজ ক'রে কি লাভ বল তো? এতক্ষণে আমার পঞ্চাশ শিশি আলতা গোলা হ'ত।”

কৃতজ্ঞতায় নন্দিনীর হৃদে চক্ষু চিক্‌চিক্‌ কবিতা উঠিল। “আচ্ছা ভাই, কাল আমি তোমার পঞ্চাশ শিশি আলতায় লেবেল লাগিয়ে দেব।”

সহসা ডাক আসিল, “কই রে চন্দন, কোথায় গেলি। মেয়ের শুধু আড্ডা আর আড্ডা।”

হুই জনে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। চন্দনা তবু একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, “গাই ভাই, দেবী আর কবর না; নইলে দাদা আবার চোঁচাবে।”

দাদাকে খাইতে দেওয়া; তার পর আর কাজের কিছুই প্রায় বাকী থাকে না। নিজে স্বাস্থ্যসামান্য জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়ে। কিন্তু পোড়া মনে কেবলই বাজে—“ন-জান। কোন অজ্ঞাত পুরুষকে সে লিখিয়াছে প্রিয়তম! কে সে? কোন দিন যদি এ কথা প্রকাশ পায়? সেদিন? সেদিন। কই হইবে? লজ্জা না ভয়? হয়ত প্রণয়লোলুপ সেই যুবকটি বলিবে, ‘এত কথা আপনি জানতেন, ওঃ কম নতুন তো?’—ওঃ সে কি লজ্জার কথা! হয়তো বা বলিবে, তুমিই চন্দনা, আমার সখীর সখী?—তোমার কথাই...”

সেই তো সেদিন কথা হইতেছিল জামাই আসিবে। জামাই হয়তো আসিয়াছে।

কি নাম তার? স্বরথ? বেশ নাম।

স্বরথ ঐ নন্দিনীর ঘরে বসিয়া, চন্দনা ত আর সে কথা জানে না। সে যেমন নিত্য যায়, সেদিনও গেল।—“কই গো নন্দরাণী!”

নন্দিনী খস্‌ খস্‌ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। মাথায় কাপড় একটু টানিয়া দেয়।

“ও কি, বোমটা কেন?” পবক্ষণেই চক্ষু পড়িয়া যায় শয্যায় উপবিষ্ট দিব্যকান্তি ঐ যুবকটির পানে। কণ্ঠকে সজীৱ সংঘত করিয়া বলে, “ওমা, উনি বসে, বসে নি; ধস্তা মেয়ে! চক্ষিণ ঘটা কি পুটুর পুটুব করিস হল তো? এমনি তো মুখে কথা নেই।”

গায়ে স্নেহসূচক খাঙ্কা দিয়া নন্দিনী বলে, “কি আবার বলছিলাম,—ঘরে এসেছিলাম, একটু কাজ ছিল।”

ঘীরে ঘীরে স্বরথ না শুনিতে পায় এই ভাবে চন্দনা বলে, “কাজই ত, আমি কি আর বলছি কাজ নয়।”

কথা হইতেছে আগাগোড়া স্বরথেরই চোখের উপর।

স্বরথ এতক্ষণে কথা কহে, “হু-জনায় ত খুব আলাপ ভমে উঠল। আমি একটু পরিচিত হই।...আপনিই ত... কি বলি,—ব্যাসের গণেশ বলি, না গণেশের ব্যাস বলি। নাঃ, আপনি বোধ হয় ব্যাসদেবকেও হার মানিয়েছেন, নিজেই রচয়িত্রী আব নিজেই লেখিকা।”

চন্দনা হাসিয়া বলে, “আমি কি আর অষ্টাদশ পুরু মহাভারত লিখতে ভরসা পাই; আমি রামায়ণের বাছা বাছা ছুটি কাণ্ড লেখবার চেষ্টা করেছি।”

রহস্য বুদ্ধিতে পারিয়া নবাবি বলে, “কোন ছুটি দ্বিদি? আদিকাণ্ড, আর...কোনটা বলি?...যজ্ঞা দেখেছেন,—রামায়ণে এমন ছুটি কাণ্ড নেই যাতে শুধুই কীষ্টি আর আনন্দ। বিয়োগান্ত না হলে যেন বাস্তবিক লিখতে পারতেন না।”

কথাটায় কেমন একটা সত্যেব ছায়া দেখিয়া চন্দনা শিহরিয়া উঠে। তথাপি সংঘত মিষ্ট স্বরে বলে, “নিজের কোলে মাছ টানতে গিয়ে কেন আর বাস্তবিক বেচারীকে দোষ দিচ্ছেন। উপযুক্ত নায়ক পেয়ে আমি কিঙ্কিধ্যা আব লঙ্কা কাণ্ড দুটিই বর্ণনা করছিলাম। আমার লেখায় তিনি ফুটলেই হ'ল।”

হাসিয়া স্বরথ বলে, “তা আপনি কৃতকার্য হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা মন্ত তুল ক'রে গেছেন। সেই মহা বীরটির পত্নীদায় ব'লে ত কোন দায় ছিল না, আপনার নায়ক কিন্তু...”

কথা শেষ হইবার পূর্বেই চন্দনা বলে, “তা হোক, বিবাহ তাঁর না হ'তে পারে। কিন্তু তাঁর স্বজাতীয় কিঙ্কিধ্যা-বাসিনীর যদি অক্ষর-পবিচয় জানতেন, দু-চার খানা চিঠি-পোতে বা দিতে তাঁর কোন আপত্তি হ'ত না। আর তিনি যে এমন করেন নি একথাও বাস্তবিক লেখেন না।”

একটু গম্ভীর হইয়া স্বরথ বলিল, “তা শুনলাম চিঠি ত আপনিই দিয়েছেন।”

চন্দনা একটু শিহরিয়া ওঠে, “তাই তো কথাটা বড় অত্যাচার ও অসঙ্গত ভাবে বলা হইয়াছে তো।”

“দ্বিলামই বা আমি। সে তো নকল আমি। আসল যে সে আসলই আছে।”

নন্দিনী বাহিব হইয়া গিয়াছে। কক্ষে তাহার শুধু হুই জন।

স্বরথ বলে, “আশ্চর্য্য আপনার চিঠিগুলি। আমি



সীবনরতা.
শ্রীমতী ভদ্রা দেশাই

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কতবার ক'রে পড়েছি। তখনই আমি জানতে পেরেছিলাম, এ কখনও নন্দিনীর লেখা হ'তে পারে না।”

“কেন বলুন ত?”

“আমি ত গুকে জানি। ওর মনের প্রসার বে তত দূর হ'তে পারে না। তা ছাড়া, আমার প্রতিও যেটুকু ভালবাসা জন্মেছে সেই পুঙ্খিতেই অমন গভীর চিন্তাপূর্ণ ভালবাসার কথা ও লিখতে পারে না। সে বলল ওর হয় নি।”

“জেনে শুনেও আপনি অমন সব চিঠির জবাব দিতে কেন?”

“আমার অগোচরে যে রহস্যাবগুঠনা নারী আমার অমন পত্র দিত তাব কাছ থেকে অমন সুন্দর জবাব পাব এই আশায়! হাজার হ'লেও সাহিত্যরসের এমন গভীর একটা নির্দেশ আছে যাকে পাবার লালসা আমি কিছুতেই দমন করতে পারলাম না। তা ছাড়া সে সাহিত্যসৃষ্টি যখন অপরিচিতা রহস্যময়ী এক নারী করছেন!”

“কি ক'রে জানলেন নারীরই লেখা?”

“সে জানা যায ভাষার কমণীরতায়। আপনারা কি ভাবেন, আপনাদের পেলব নারীস্ব শুধু দেহে? তা নয়, নারীব নারীস্ব তার দেহে, তার স্বরে, তার ভঙ্গীতে আচার-ব্যবহারে, ভাষায়,—এমন কি সাহিত্যিক ভাষাতেও। তা ছাড়া, চিঠিগুলিতে সত্যকার নারীর সত্যকার প্রেমের পরিচয় ছিল। তা কি আপনি অস্বীকার করেন?”

সহসা কঠোর দৃষ্টান্তে চন্দনা বলে, “নিশ্চয়। আপনি বলতে চান স্বরথ বাবু যে আমার মধ্যকার সত্যিকার নারী আপনাকে সত্যিকার প্রেম জ্ঞাপন করেছিল। এ অপমান আপনি আমার করতে পাবেন না। হুজু নন্দিনীর অতিক্রান্ত প্রার্থনা অবহেলা করতে-না-পারার দুর্বলতার বশে আমার তার হয়ে আপনাকে পত্র লিখতে হয়েছিল। আমি তার উপকার করেছিলাম। নিজের বাসনার চরিতার্থতা খুঁজি নি।”

স্বরথ রেলের চাকুরী করে, কিন্তু অতি-আধুনিক বলিষ্ঠ গর্ব রাখে, সেই জন্ত যথারীতি ও যথাস্থিতি লেখাপড়া করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে সযম আছে, বিনয় আছে, ভদ্রতা আছে,—বাহা তাহাব সৌম্য সহাস বলিষ্ঠ দেহের মধ্যস্থান একটি বলিষ্ঠ মনের পরিচয় দেয়। সে রুচিসঙ্গত কণ্ঠে বলে, “আমি তোমাকে এতটুকুও অপমান করি নি চন্দনা, করতে চাইও নি। আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির বাহ্যে তুমি আমার অপমানের বহু বাহিরে গেছ। তুমি যা বললে তার উত্তর আমি এখন দেব না। আমার এককথায় যদি তোমান বিশ্বাস হয়, তুমি আবার আমার কাছে আসবে, তখন তোমার ইচ্ছা হ'লে তোমার কথার উত্তর দেব। নইলে

আর নয়। তবে সত্যিই তোমায় অপমান আমি করি নি। তোমার আলোচনায় ও তোমার শব্দের প্রসারতায় তোমার সঙ্গে সত্যিই একটু সহজ ও প্রকাশ্যভাবে কথা বলেছি। যদি কটু লেগে থাকে, অজ্ঞানতাকৃত ও উদ্দেশ্যহীন বলে ক্ষমা ক'রো।”

চন্দনা মনে মনে একটু নবম হয়। তথাপি কঠিন ভাবেই বলে, “অপমান করেন নি একথা মুখে বললেন, কিন্তু হঠাৎ ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’র পর্যায়ে নামিয়ে দিলেন কোন্ সম্মানের অধিকারে বলতে পারেন?”

“নিশ্চয়, এটুকু আর বলতে পরব না! তোমার পত্রে ও আলাপে তোমার প্রতি আমার একটা টান এসেছিল। তা শ্রদ্ধার টান। সেই ক্ষুদ্রে তোমাকে আমি আপনি বলতে চেয়েছিলাম, শ্রদ্ধাব পাত্রী বলে। এখন দেখলাম, আমি ভুল করেছি। মন ভ্রমের সত্যকার বড় মন, আকাজক্ষা তোমার গভীরতাকে চায়;—কিন্তু তুমি ভারি ছোট, বয়সেও, বুদ্ধিতেও। তোমাকে ‘আপনি’ বলার মত শ্রদ্ধা করার আমার কিছু নেই। সাধারণ মেয়েদের চেয়ে তুমি একটু তফাৎ, কিন্তু আমার কাছে শেখবার তোমাব এখনও যথেষ্ট আছে।...আমায় ভুল বুঝো না।”

নন্দিনী ঘরে ঢোকে। বলে, “রাগ ক'রো না ভাই, চৌচানটা বড় বেশী হচ্ছে। কি হ'ল, ঝগড়া বুঝি? ঘটনাক্রমে ঘরে থেকে তোমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারে, তার সঙ্গে সারাজীবন কি ক'রে ঘর করব ভাই?”

কোণে অধীর হইয়া চন্দনা বলে,—ঝগড়া হবে না? রাগুনী! কেন মরতে বলতে গিয়েছিলে আমি চিঠি লিখে দিয়েছিলাম! না ব'লে পার নি!”

“বা বে, তা কি হ'ল? উনিই ত বললেন। কত ক'রে বললেন। তাই তোমার কথা বলেছি। ভাতে কি হয়েছে? উনি ক্ষেপাচ্ছেন বুঝি?”

“ক্ষেপাচ্ছেন বইকি!” চন্দনার স্বর ভারী হইয়া আসে।

হতভম্ব হইয়া নন্দিনী বলে, “কি হ'ল, কিছুই ত বুঝতে পারছি নে।”

গভীর স্বরে স্বরথ থাকে, “চন্দন।”

সে স্ববে চন্দনার সারা দেহমন ছুঁলিয়া ওঠে। শিহরিয়া ওঠে প্রতি শির-উপশিবা। ক্লান্ত স্বরে সে উত্তর করে—“কি বলছেন!”

গভীরতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বরথ বলে, “বাড়ী যাও। আর এখানে থেক না। যাও আমার কথা রাখ।”

মজ্জাবিষ্টের দ্বায় চন্দনা উঠিয়া চলিয়া যায়।

সে-রাত্রে কি দুর্ঘোষগই পেল! বর্ষায় ঝড়ে যেন মাতামাতি। চন্দনার সাবা রাতে ঘুম নাই। পল গণিয়া

গণিমা সমর্থ কার্টে। কে এই স্বরথ? কেন সে আসিল? কেন সে এমন হৃদয় ঐ ছেলেটিকে পত্র দিতে গেল। সে যে তাহার বালুগাণা কব্জর অন্ততল ভেদ করিয়া জলের উৎস বাহির করিল। সে তাহার অন্তঃস্বামী ধরিয়া টানিতেছে।

প্রভাতের বাতাসে জ্বালা। দিবসের প্রাত্যহিক কর্মে ক্লান্তি। আলতা-গোলা গামলা উন্টাইয়া গিয়া তাহার সারা উঠানটুকু রাঙা হইয়া উঠিল।

বিশ্রহের অবিচ্ছেদ্য আলস্ত। সময় নড়িয়া বসিতে চায় না। মনে হয় ওই অদ্ভুত মানুষটির কথা। “যদি আমার এ-কথায় তোমার বিশ্বাস হয়, তুমি কাল আবার আসবে।” না, আজ সে বাইবে না; কোনমতেই না। সে আলতার শিশির গায়ে লেবেল মারে। চক্ষু নিদ্রায় ঢুলিয়া আসে, সে ঘুমাইয়া পড়ে।

কতকক্ষ সে ঘুমাইয়াছিল সে নিজেই জানে না। সহসা পায়ে কাহার উত্তপ্ত হস্তের স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া ডাকে, “কে?”

“ভয় পেও না,—আমি।”

পরিচিত কাক্ষিত বিশ্বরকে সম্মুখে পাইবার বিশ্বয়টাও বড় কম নয়। স্বরথকে দেখিয়া সে বলে, “আপনি, এ সময়ে এখানে?”

স্বরথ বলে, “কেন? কোন অন্তায় করেছি কি?”

নিজেকে সংবৃত করিয়া চন্দনা বলে, “কিছু না, অন্তায় আবার কি? বতন, আসন এনে দিই।”

স্বরথ বলে, “থাক, আসন আমার আগবে না; সেটা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়াতেই আমার প্রাপ্য সম্মানটুকু আমি পেয়েছি।”

তবু বাঙালী মেয়ে চন্দনা, আসন আনিয়া বসিতে দিয়া বলে, “ও, বেলা যে পড়ে এল। আরও কতক্ষণ ঘুমুতাম কে জানে। ভাগ্য আপনি ডাকলেন। আমার তো এ-ভাবে ঘুম কখনও ছিল না।”

স্বরথ বলে, “কখনও হা ছিল না, কখনও তা আসবে না, এমন কথা কি জোর ক’বে বলুলে? আচ্ছা, ভূশষায় শয়ন কি বৈধব্য-ব্রত একটা অবশ্যপালনীয় অঙ্গ নাকি?”

একটু মিষ্ট হাসিয়া চন্দনা বলিল, “বৈধব্য-ব্রত-পালনে যে আমি এক জন উৎকর্ষিত তর্পািনী এমন পরিচয় আপনাকে দিলে কে?”

“তোমাদের ধর্ম সনাতন মতানুযায়ী থাকে আমার অবয়বের একাঙ্গ ক’বে তুলেছেন তিনি তো তোমার নামে এমন একটা অপবাদই দিচ্ছিলেন।”

লজ্জিতভাবে চন্দনা বলিল, “ও, সেটুকুও পোড়ার-মুখী বলতে ছাড়ে নি।”

বিশ্বয়ের ভান করিয়া স্বরথ বলিল, “তুমি কার কথা বলছ জানি না চন্দনা, কিন্তু আমি ধীর কথা বলছিলাম তাঁর মুখে অগ্নিদেবের প্রতাপের কোন চিহ্ন আমি পাই নি। আমি ত বরং...”

“সবাই কি আর সমান দেখে। আমার চোখে আপনিও যদি তাকে দেখেন, তবে ত সে বেচারী প্রাণে মারা যায়।” চন্দনার চক্ষুতে ঘুম জড়াইয়া ছিল, ছোট্ট একটি হাই সে কোন মতেই না তুলিয়া পারিল না। মুখে হাত চাপা দিল।

স্বরথ বলিল, “কাল রাত্রে বোধ হয় ভাল ঘুম হয় নি।”

“কি ক’রে আর হবে বলুন; যা ঝড় আব জল গেছে।”

“সত্যি কাল রাত্রে ঝড় আর জলের কথা মনে ক’রে আমার আঙ্গণ ভায়ী ভয় বোধ হচ্ছিল। তা এখন ত দেখতে পাচ্ছি, আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন নির্মেষ।” কথাটায় দু-জনেই হাসিল।

চন্দনা বলিল, “কেন আর সে-কথা তুলে লজ্জা দিচ্ছেন।”

কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, “একটু বসবেন, আমি দুটো ফল কেটে আর একটু সরবৎ ক’রে আনি।”

“কেন? জামাই-সৎকার নাকি?”

হাসিয়া চন্দনা বলিল, “সামাজিক বিধান যখন আছে তখন আর অমান্য কেন করি বলুন।”

“সত্যি চন্দনা, তুমি বেশ কথা কও।” কথাটা বলিয়াই চন্দনার মুখের পানে চাহিয়া স্বরথ একটু স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর দৃঢ়ভাবে বলিল, “যাও, সামাজিক আপ্যায়ন কি করবে তার ব্যবস্থা আমার স্বমুখেই এনে কর না, দুটো কথা কই।”

গম্ভীর ভাবে উঠিয়া গিয়া, স্বর্ণকের মধ্যে দুটি আম, চাংটি নারকেল-নাড়ু, এক টুকরা আনারস ও এক গ্লাস সরবৎ ও লেবু লইয়া চন্দনা উপস্থিত হইল। সমস্ত সংগ্রাম-গুলি রাখিয়া, স্বরথের সম্মুখে বসিয়াই সে ফলগুলি বানাইতে লাগিল।

স্বরথ ধীরে ধীরে বলিল, “বাল রাত থেকেই আমার কি মনে হচ্ছে জান? ঠিক তোমার মত আমার যদি এটি বোন হ’ত। কি ঝগড়াই করতাম চন্দনা, কি বলব।”

চন্দনার বাইরেরকার আবরণ নড়িয়া উঠিল। সে মনে করিতে লাগিল এ ধবণের মিষ্টকথা শোনা তার উচিত নয়। সে বলিল, “আপনি বোধ হয় জানেন আমার দেবতার মত এক বড় ভাই আছেন। বোন ব’লে আমার পাবার লোভ আপনার ভ্রাতাংশে ভাই ব’লে তার চেয়ে বড় আর যোগ্য আমার আর কারকে মনে হয় না।”

এই আকস্মিক আঘাতে প্রায় বিবর্ণ হইয়া স্বরথ বলে, “না, সে কথা তো আমি বলছি না। আমি খুব সরলভাবেই আমার হৃদয়ের সত্যকার নিষ্পাপ একটা অভাব তোমাকে জানিয়েছিলাম। আশা আমি নিশ্চয়ই করি নি তুমি ত পূরণ করবে। তোমার দাদা যে দেবতুল্য তা আমি জানি।”

একটু চমকিয়া চন্দনা বলিল, “কি রকম? দাদার সঙ্গে আপনাব পরিচয় হ’ল কি ক’রে?”

স্বরথ হাসিয়া বলিল, “সে-কথা শুনে তোমার মনে কষ্টই হবে। আজ সকালে একটা ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে তোমার মুণের আদল পেয়ে আমি সাহস ক’রে এই বাড়ীর ঠিকান বলি। আমার তখন ট্যাক্সি প্রয়োজনও ছিল। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর পরিচয় মিলে, আলাপ জমে উঠল কর্তব্য কাজ ভুলে দু-জনে খুব বেডোলাম আর গল্প করলাম সত্য দেবতুল্য লোক! অদ্ভুত মনের জোর!”

“দাদা তো বাস চালান।”

“তা তি নি বললেন, এখন বাসখানা রিপেয়ার হচ্ছে বলে ট্যাক্সি চালানো হচ্ছে।”

“দাদাকে কত ভাড়া দিলেন?”

“ছি চন্দনা! অথবা এত রুচ হও কেন বল ত? তোমার দাদা ট্যাক্সি চালান, আমি চালান ট্রেন—দু-জনেই তে অটোমোবাইল-পন্থী। এতে গর্বের কি....!”

চন্দনা বেকাষ আগাইয়া দিয়া পাখা লইয়া বসিল।

দেখিতে দেখিতে গৌর আসিয়া পড়িল।

স্বরথ বলিল, “চন্দনা, একটা ভিক্ষা চাইব, দ্বেবে?”

“কি বলুন। কি চাইবেন ন-জেনে দেব বলার মত। দাদা আমি নই, বিবেচন: আপনাদের কাছে। সাধ্যমত হ’লে নিশ্চয় দেব, তা আপন-ও জানেন।”

“গৌরকে ছেড়ে দেবে এবেলা? একটু থিয়েটারে যেতাম।”

“বেন আমি?”

“যা হবে না তার প্রলোভন কেন দেখাও। গৌরকে যেতে দিলেই যথেষ্ট।”

“আমি ওকে এসব বিলাস থেকে তফাৎ রাখি আর রাখতে চাই...গৌর, মুখ হাত পা ধুয়ে এস, এই সঙ্গে সেরে নৌও। কাল দাদা আম এনেছেন।”

স্বরথ বলিল, “তবে গৌর যাবে না?”

“যাবে বইকি। আপনি বলেছেন, আর যাবে না। তবে আমিও একটু ভিক্ষা করব।”

আগ্রহ ভরে স্বরথ বলে, “কি বল?”

“আজ না খেয়েই সবাই থিয়েটারে যান। এসে যা-হয় এখানেই থাকেন।”

“রাত হবে না?”

“সেই জগুই তো বলছিলাম, দাদার ও রাত হয় কি না! যা-হয় এক সঙ্গেই দু-জনে...”

“বেশ, বেশ,...”

চন্দনা বলিল, “যা তো গৌর, তোর নন্দদিদিকে ডেকে নিয়ে আধ তো। অমনি স্নোঠাইদিকে বলে আসবি আজ নন্দ আর স্বরথ বাবু এখানেই থাকেন।”

গৌর নন্দিনীকে লইয়া কিনিয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে আনন্দবিহ্বল গৌরকে লইয়া নন্দিনী আর স্বরথ থিয়েটারে গেল।

রাত্রে আনন্দের মধ্য দিয়া আহা-রাতি-পর্ক সমাধা হইল। চমৎকার-স্বভাব কপেন্দুব রুথায় চন্দনা-স্ববধের রিকুণ্ডার সকল লঘু মেঘগুলি কোথায় লুপ্ত গিয়াছিল। তাহার বাস্তবিক জীবনের একটি রাজিতে এই হৃদয়ের সামাজিক আনন্দের স্বরটুকু ভরিয়া রহিল।

আর সেই স্বর আরও নিম্নি আরও মুখর হইয়া বাজিতে লাগিল চন্দনার বক্ষে কন্দরে কন্দরে। সে কিছুতেই তাহার মনকে স্বরথের স্ত্রী স্বভাব ও রূপ হইতে টানিয়া আনিতে পারে না। সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না এই ব্যক্তিকে সে পরিপূর্ণ প্রেম-সে দীপ্ত করিয়া পজ দিয়াছে। তাহার কল্পলোকের প্রেমিক পত্রবিনিময়কারী এত সত্য, এত জীবন্ত। কল্পনা হ-ন প্রত্যক্ষ হয়, আদর্শ-বাদীর জীবনে সে আসে এক তুমুল বিপ্লবের সময়। এই বিপ্লবকেই কেন্দ্র করিয়া জগতে কত অসাধ্য সাধনই হইয়া গিয়াছে।

সকলেই চারি দিকে নিদ্রাস্থ। একা চন্দনা তর্জহার বক্ষে এই গুরুভার ও আত্মজটিল সিন্ধুভার লইয়া সমসারের সকল কষ্ট শেষ করিয়া শয্যা বিভাইল। শয্যাবিহীন তাহার অধিকারে, কিন্তু চোখের পাতায় ঘুং ডাকিয়া আনা তাহার অধিকারের বাহিরের বস্তু। ঐ ত্রিগুণিই তাহার স্ত্রী। ঐগুণিকে তাহার উদ্ধার কবিতাই হইবে। এই চিন্তা তাহার মস্তিষ্কে শতদণ্ড কীটের হায সংশ্লেষ সংশ্লেষ দংশিতে লাগিল। সে-বিষ তাহার সর্বাঙ্গ ছাইয়া গেল। গভীর রাত্রে এই ভাবের তুলাত চিন্তা প্রথায় খুঁ চাপাইয়া দেয়। চন্দনা ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। দরবার বেড়া তৈলিয়া স্ববধের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। ভয়ে ও উত্তেজনায তাহার সর্বাঙ্গ ঠক ঠক করিয়া বাপে, তবু তাহার মাথার খুঁ নামিল না।

গ্রীষ্মকাল। দুয়ার অর্গলহীন, উন্মুক্ত। ভিতরে মশারি খাটান, নিশ্চরতা বিরাজমান। চন্দনা পা-টিপিয়া টিপিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। আলনা হইতে স্বরথের কোটের পকেট হইতে চাবি উদ্ধারে বিলম্ব হইল না। কার্য

উদ্ধার কবিতা, স্ট্রটকেশ বন্ধ করিয়া, চাবী বখাস্থানে রাখিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দরমার বেড়ার এ ধারটায় ঐ জামগাছটাব নীচে অঙ্ককার। কে চন্দনার হাত চাপিয়া ধরিল।

শব্দ করিবার পূর্বেই সে বলিল, “চপ; আমি স্বরথ। ভয় নেই, তুমি আমার স্ট্রটকেশ থেকে কি নিয়ে যাচ্ছ?”

“আপনি হাত ছাড়ুন। আমি আপনার প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ নিয়ে যাচ্ছি না।”

“কিন্তু জিনিষটা যে তোমার খুব প্রয়োজনীয়, তা নেবার সময় ও পদ্ধতি থেকে বুঝেছি। কি জিনিষ বল।”

“আমি বলব না, আমায় ছাড়ুন।”

“তোমার ভয় নেই; কিন্তু কি নিলে না-বললে আমি ছাড়ব না, তা নিশ্চয়।”

“তাব মানে, আপনি আমার চোর মনে করেন?”

“যা দেখলাম, তার পরে যদি তাই মনেও করি অন্তায় কিছু করব না; তবু তোমায় আমি তা মনে করি না।”

“কেন?”

“সে তুমি বুঝবে না চন্দনা। কিন্তু তোমায় আমি বলে দিতে পারি তুমি কি নিয়েছ।”

“বলুন।”

“চিঠি।”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“আমার লেখা চিঠি আপনার কাছে থাকবে না।”

“তোমার লেখা হোক, বার হোক, চিঠি এখন আমার। ও চিঠি আমায় দিতেই হবে। ও চিঠি আমার জী আমায় দিয়েছে। একথা অস্বীকার করলে তোমার সম্মান বাড়বে না চন্দনা।”

“আপনি প্যাচে ফেলে আমার কাছ থেকে এ-চিঠি আদায় করবেন?”—প্রায় কান-কান হইয়া চন্দনা বলিল, “এই নিম্ন চিঠি, আমায় ছাড়ুন স্বরথবাবু। আপনার ছটি পায়ে পড়ি।”

“না চন্দন, ও চিঠি তুমি নাও। কিন্তু চিঠি ত হ'ল যন্ত্র, সে-যন্ত্র বুকে যে দাগ বসিয়েছে তা তুমি কি কেড়ে নিতে পার? সে যে তোমার নিজের হাতে, নিজের মনের দান! আমার অন্তরে সে-দাগ অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে।”

চন্দনার বুকে কে দাপাদাপি করিয়া রেড়াইতে লাগিল। সে কাতরস্বরে বলিল, “ওগো, তুমি আমায় ছাড়, আমি তোমার পায়ে পড়ি।”

কিন্তু স্বরথ ছাড়িল না। সে ঝুঁকু হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়-কণ্ঠে ঐশ্বর্য করিল, “কেন তুমি চিঠি দিয়েছিলে? তোমার লক্ষ্য হয় নি?”

চন্দনা হাত ছাড়াইয়া বলিল, “তার জন্ত সহস্র যাতনা আমি রোজ পাচ্ছি, তুমি আর দিও না।”

—বলিয়াই ছুটিয়া সে ওধারে চলিয়া গেল। তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল, বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল; তাহার মনে হইতে লাগিল, এখনই বুঝি তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে।

হাঁকে ডাকে ধড়কড় করিয়া চাহিয়া দেখিল, “ও কত বেলা! রূপেন্দু থাকী পোষাক পরিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, “কি রে চন্দন, উঠবি নে? বেলা যে বড় হ'ল! এত ক'রে বলি যে রাত জেগে কাজ করিস্ নে! কাল অত রাতে কাজ সেরে আবার বুঝি আলতা নিয়ে মরছিলি?”

চন্দনা বিহ্বলের গায় চাহিয়া রহিল। রাজের কথা মনে হইল। কি মিথ্যা...ও, কি দুঃস্বপ্ন! তবু সে একবার প্রেরণ করিল, “হ্যাঁ দাদা, তোমাদের বাস খারাপ হ'য়ে গেলে কি তোমরা ট্যান্ডি চালাও?”

রূপেন্দু উজ্জ্বলিত হইয়া হাসিয়া বলিল, “তা চালাতে হয় বইকি; কিন্তু সে-কথা এত সকালে কেন বল তো?”

অপ্রস্তুত হইয়া সে বলে, “না, কিছু নয়...কিন্তু কাল কি খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল?”

রূপেন্দু বলিল, “তুই স্বপন দেখছিস...ঘুমো, ঘুমো, আরও ঘুমো...হ্যাঁ ঝড়বৃষ্টি—ঘুমো—আমি চললাম।”

রূপেন্দু বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু কি দুঃস্বপ্ন...

সকালের কাজে হাত দিতে-না-দিতে নন্দিনী একখান লাল খাম লইয়া উপস্থিত।

“গৌর কই?”

“কেন রে?”

“চিঠিখানা ফেলে দিয়ে আসুক।”

“ঐ ঘরে গৌর, যা!”

একবার মনে হইল এ-চিঠি সে দেবে না। আবার মনে হইল, একখানাই তো, থাক না। তার পর আর না।

দ্বিপ্রহরে আলতার শিশিতে আলতা ভরিতে ভরিতে চন্দনা গত রাজের কথা ভাবে, হাসে আর মাঝে মাঝে শিহরিয়া ওঠে।

নন্দিনী আসিয়া পাশে বসে।

চন্দনা লেবেলের ঝুড়িটা আগাইয়া দেয় মাত্র। আর সব চাপা থাকে।

লক্ষ্য করে নন্দিনীর চোখে মুখে চিক্ চিক্ করে অন্তরের গুলক।

সত্য গোপন

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বড়দিনের ছুটির সন্ধ্যাবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ২১শে ডিসেম্বর তারিখের এই চিঠি-খানি আমার হস্তগত হইয়াছিল—

“আপনি বৎসর তিন পূর্বে রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুশয্যা উপস্থিত ছিলেন কিনা এই প্রশ্নটি লইয়া বিস্তারিত আলোচনা কবিতা ছিলেন। সে ক্ষণ আপনাকে ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত একটি আলোচনা পাঠাইতেছি। ইহা হইতে মনে হইতেছে রামমোহন পিতার মৃত্যুশয্যা উপস্থিত থাকিতে পারেন না। এই বিষয়ে আপনার মত কি জানাইলে বিশেষ অনুগ্রহীত হইব। বলা বাহুল্য, ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত আলোচনাটি আবার দ্বারা লিখিত নহে; মুদ্রিত হইবার পূর্বে আমি উহা দেখিও নাই।”

এই পত্রের সঙ্গে বর্তমান সনের পৌষ মাসের ‘শনিবারের চিঠি’তে প্রকাশিত “রামমোহন রায়, ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ চন্দ” শীর্ষক প্রসঙ্গ কথার কয়েকখানি (৪২৮-৪৩৩ পৃঃ) বিচ্ছিন্ন পত্র ছিল। এই পত্র পাঁচবার দুই দিন পূর্বে (২০শে ডিসেম্বর রবিবার) প্রদেয় প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এইরূপ আর এক প্রস্থ ছিন্নপত্র এবং কলিকাতা রিভিউতে ব্রজেনবাবুর লিখিত একটি প্রবন্ধের ছিন্নপত্রসহ তাঁহার নিকট লিখিত ব্রজেন বাবুর একখানি পত্র আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। ‘শনিবারের চিঠি’র “প্রসঙ্গ কথা” পাঠ করিয়া আমি আনন্দিতেই হইয়াছিলাম। তাহার এক কারণ, ‘শনিবারের চিঠি’তে সাধারণতঃ কবিসম্রাট, সাহিত্যসম্রাট, কথাসাহিত্যসম্রাট প্রভৃতি মহারথ-গণের কথা আলোচিত হয়। এইরূপ সংক্ষেপে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির প্রবেশ স্খাণ্ড বিষয়। দ্বিতীয় কারণ, এ-বাৎসর আর কোথাও আমার উক্ত লেখাটির আলোচনা দেখিয়াছি-বলিয়া স্মরণ হয় না। ‘শনিবারের চিঠি’র লেখক আমার অবজ্ঞাত লেখাটিতে প্রকাশিত মতের আলোচনা উপলক্ষে উহা হইতে দুই পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। অবশ্য গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বলের একটি প্রবন্ধ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া এই লেখক মহাশয় আমাকে কার্যতঃ

সংসাহসবিহীন সত্যগোপনকারী স্যাবাস্ত করিয়াছেন। এই বিচাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেও আমি ইহার জন্য ‘শনিবারের চিঠি’র লেখক মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না; দোষ আমার অদৃষ্টের এবং তাঁহার সমস্ত্রের অভাবের। বর্তমান পৌষ সংখ্যার প্রবাসী বোধ হয় ২৯শে অগ্রহায়ণের (১৫ই ডিসেম্বরের) বা ১লা পৌষের (১৬ই ডিসেম্বরের) পূর্বে তাঁহার হস্তগত হয় নাই। ব্রজেনবাবু পৌষ সংখ্যার ‘শনিবারের চিঠি’র ছিন্নপত্রসহ আমার নিকট চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ২১শে ডিসেম্বর, ৬ই পৌষ, এবং রামানন্দ বাবুর নিকট ঐরূপ ছিন্নপত্রসহ চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন বোধ হয় ১৮ই ডিসেম্বর, ৩রা পৌষ। পৌষের ‘শনিবারের চিঠি’ কোন্ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল জানি না। যাহা হউক, বর্তমান পৌষ সংখ্যার প্রবাসীতে আমার রামমোহন রায় বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, আমার বিস্তৃত পুস্তিকা খুঁজিয়া বাহির কবিতা, ৬পৃষ্ঠাকাপী “প্রসঙ্গ কথা” লিখিয়া সমগ্র-মত পৌষ সংখ্যার ‘শনিবারের চিঠি’র ক্ষণ দিতে গিয়া লেখক মহাশয়কে বিশেষ তাড়াতাড়ি কার্য শেষ করিতে হইয়াছিল। এই তাড়াতাড়িতে তিনি অন্ততঃ দুইটি গুরুতর বিষয় লক্ষ্য করেন নাই।

প্রথম, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল বেচারাম সেনের জবান-বন্দী হইতে রামকান্ত রাবের মৃত্যুর তারিখের যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই যদি শুদ্ধ হয় তবে এই শুদ্ধ পাঠে নিবন্ধ সংবাদের উপেক্ষা যেমন আমার জ্ঞানকৃত সংসাহসের অভাব-বশতঃ হইতে পারে, তেমন অজ্ঞানকৃত অর্থাৎ একটা সাধারণ ভুল নাজ হইতে পারে। সমস্ত্রভাব বশতঃ ‘শনিবারের চিঠি’র লেখক মহাশয় আমার অপরাধ অজ্ঞানকৃতও হইতে পারে এইরূপ সন্দেহ মনে স্থান দিয়া আমাকে benefit of doubt—অর্থাৎ সন্দেহজনিত স্ববিধাটুকু হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, উক্ত লেখক মহাশয় ১৩৪০ সনের আশ্বিন

সংখ্যার 'বঙ্গী' পত্রের উল্লেখ কবিয়াছেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় সময়-অভাবে এইবার প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারেন নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু "রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন (অপ্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে)" শীর্ষক উক্ত সংখ্যায় বঙ্গীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে গোড়ার অংশে লিখিয়াছেন—

"১৮১৭ সনে রামমোহনব্রজেন্দ্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহনের নামে কলিকাতা মুন্সীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিশনে একটি মোকদ্দমা রুজু করেন। এই মোকদ্দমায় রামমোহনের প্রথম জীবন ও বিবরণ সম্পত্তি সম্বন্ধে তার সকল কথাই উঠে, এক রামমোহনব্রজেন্দ্র, তাঁহার বন্ধু ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহার কৰ্ম-চৌধুরী জবানবন্দী লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার পরিজন, বালাজীবন বিবরণ সম্পত্তি ও চাবুরী ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই সকল জবানবন্দীর ব্যবহার অপরিহার্য। এই প্রবন্ধে রামমোহনের প্রথম জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইবে তাহা প্রধানতঃ এই সকল কাগজপত্র ও বোড-অফ-রেভিনিউ-এর পত্রাংলীর সাহায্যে বিচিত্র।" (২৮১ পৃঃ)

এইখানে ব্রজেন্দ্র বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, রামমোহন রায়ের স্বজনের এবং নিজের জীবনের প্রথম ভাগের সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে গোবিন্দপ্রসাদের মোকদ্দমার "জবানবন্দী ব্যবহার অপরিহার্য।" তার পর এই প্রবন্ধের উপসংহারে ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"উপরে রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন সম্বন্ধে সীমাসাময়িক দলিল-পত্রের সাহায্যে কয়েকটি সঠিক সংবাদ দিবার চেষ্টা করা হইল। এই সকল সংবাদ পরিমাণে খুব বেশী নয়, কিন্তু উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সেজন্য উহাদের সাহায্যে রামমোহনের জীবনের যে কাঠামো তৈরী করা হইল তাহা টিকিয় থাকিবে বলিয়াই মনে হয়। হয়ত বা ভবিষ্যতে নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে উহা দু-এক জায়গায় আরও একটু স্পষ্ট হইবে, কোন জায়গায় বা একটু পরিবর্তিতও হইতে পারে, কিন্তু মোর্টের উপর উহা প্রতিষ্ঠান বালাজী এম্মা গত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" (২৯১ পৃঃ)

ব্রজেন্দ্রবাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মোকদ্দমার সাক্ষীর জবানবন্দীগুলি পাঠ করিয়াই অবশ্য এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের প্রথম জীবনের এবং রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি অবশ্যই বেচারাম সেনের জবানবন্দী পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন কাগজ-পত্রের এক জন পবিপক্ষ পাঠক। তিনিও ত বল-মহাশয়ের আবিষ্কৃত নূতন পাঠটি দেখিতে পান নাই। যদি এই পাঠ তাঁহার চক্ষু পড়িত, তবে রামকান্ত রায়ের ভ্রূহাসময় বর্ধমানের রামমোহন রায়ের অস্থপস্থিতি প্রমাণ করিবার জন্য

তাঁহাকে এত কথা বলিতে হইত না। ব্রজেন্দ্রবাবুর অল্পে অল্পে পরিচয় করিয়াও 'শনিবাবের চিঠি'র লেখক মহাশয়ের বল-মহাশয়ের পাঠ সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সময়-অভাবে তিনি এদিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

আমার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ সম্বন্ধে আমার বাহ্যিক বক্তব্য তাহা ব্রজেন্দ্রবাবুর নিকটে প্রেরিত আমার উত্তরে এইরূপে লিখিত হইয়াছে—

'সেটিনারীর সময় যখন আমি এই বিষয় আলোচনা করি তখন আপনার লেখা ভিন্ন আমার আর কোন মতল ছিল না। তার পর ডায়েরী মূলতঃ ব্রজেন্দ্রবাবুর মজুমদার মহাশয়ের মোকদ্দমার অন্তর্গত কাগজপত্রের সহিত আমাকে বেচারাম সেনের জবানবন্দী দেখা দিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে সেই নকল আমি মুলার সহিত মিলিয়া লইয়াছি। গতকল্য (২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৬) আমি এবং ডায়েরী মজুমদার উভয়ে হাইকোর্টে গিয়া বেচারাম সেনের জবানবন্দীর এই অংশটি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া আনিয়াছি। আমরা সেখানে fourth July পাঠ পাই নাই।'

বেচারাম সেন মূল জবানবন্দীতে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ বলিয়াছেন—

"Smith that he know the said Rimonant Roy for about 25 or 28 years before his death and up to the time of his death who died in the month of Joistee in the Bongali year one thousand two hundred and ten at Burdwan as he this deponent hath heard or believes."

বল-মহাশয় ভুলে "in the month of Joistee" র স্থলে "on the fourth of Joist" পাঠ করিয়াছেন। বেচারাম সেনের জবানবন্দীতে যদি month of Joisteeর স্থানে fourth of Joistee থাকিত তাহা হইলেও পিতার মৃত্যুর সময় বর্ধমানের উপস্থিতি সম্বন্ধে রামমোহন রায়কে নিঃশয়স্বরূপে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হইত না। বেচারাম সেন যে তারিখ সম্বন্ধে অপ্রাস্ত ছিলেন না ইহা আমি "গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী" নামক প্রবন্ধে ('প্রবাসী', ১৩৪৩, গৌষ, ৩৫০ পৃঃ) দেখাইয়াছি।

এ-যাবৎ আমরা যাহা পাঠ করিয়াছি তাহাতে-যে ভুলচুক থাকিতে পারে না এমন দাবী আমি করি না। স্তত্রায় আশা করি 'শনিবাবের চিঠি'র লেখক মহাশয় আমাদের সাক্ষাতে হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইডের রেকর্ড-রূমে গিয়া স্বয়ং তদন্ত করিয়া এই তথ্যের পুনর্নির্ধারণ করিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিবেন।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৯

নৌকার প্রতীক্ষায় এক দুই ক'রে পাঁচ দিন কেটে গেল। সঙ্গীদের সঙ্গে ভোট, খাম, অম্বু (দক্ষিণ-চীন ও মঙ্গোলীয়ার প্রান্তের দক্ষিণে তিব্বতীয় প্রদেশ) প্রভৃতি দেশের নানা চমকপ্রদ গল্প শুনিয়াও দিন কাটা ভার হইল। এই সময় মন্ত্রজপের তিব্বতীয় প্রথা অভ্যাস করিলাম। এখানে অধিকাংশ লোকই এক হাতে মালা অথবা হাতে জপচক্র ঘুরায়। জপচক্র তাত্র বা রৌপ্যের চোঙ্গা; চোঙ্গার ভিতর লক্ষাবিক মন্ত্র কাগজে লিখিয়া ভরিয়া দেওয়া হয় এবং একবার ঘুরাইলে তত-সংখ্যক মন্ত্রজপের ফললাভ হয়। অতি বৃহৎ জপচক্রও আছে, তাহা জলের স্রোতের সাহায্যে বা মাছের গায়েব জোরে জাঁতার মত ঘুবানে হয়, কোথাও কোথাও উষ্ণবায়ু-মন্ত্র (hot air motor)-যোগেও চালানো হয়। তিব্বতে বিদ্যুৎশক্তির প্রচলন হইলে তাহাও জপচক্রচালনে ব্যবহৃত হইবে সন্দেহ নাই। যন্ত্র-শক্তিযোগে পুণ্যসঙ্কেতে তিব্বত এখনও ভারত অপেক্ষা শতবর্ষ অগ্রগামী।

যাহা হউক, আমার কাছে মাণী (জপচক্র) ছিল না, তবে নেপাল হইতে এক জপমালা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পথে সময়ে অসময়ে ইহা ব্যবহার করিতাম, কিন্তু এত দিনে আসল স্বরূপ ছুটিল। তিব্বতীদেরা অবলোকিতেশ্বরের মন্ত্র (ওঁ মণি পদে হুঁ) বা বজ্রস্বের মন্ত্র (ওঁ বজ্রসুহু হুঁ, ওঁ বজ্রগুরু পদ্মসিদ্ধি হুঁ, ওঁ অঃ হুঁ) জপ করে, আমি সে-স্থলে “নমো বুদ্ধায়” জপ করিতাম। তিব্বতী মালায় এক শত আট গুটিকা এবং একটি স্মরক থাকে। ইহা ভিন্ন তিন গুচ্ছ দশ-দশটি কবিদ্য রোপ্য বা অস্ত্র ধাতুব পুঁতি মালায় সঙ্গে বাঁধা। পুঁতিগুলি ছাগল বা হবিণের নরম চামড়ায় গাঁথা, এই জন্ত কোন পুঁতি উপরে টানিয়া দিলে আটকাইয়া থাকে। একবার মালা জপ হইলে প্রথম গুচ্ছের প্রথম পুঁতি টানিয়া উপরে চড়ানো হয় এবং এইরূপে দশবার মালা জপ হইলে প্রথম গুচ্ছের

দশটি পুঁতিই উপরে টানা হয়, তাহার অর্থ সহস্রাধিক মন্ত্রজপ হইল। প্রথম গুচ্ছের দশটি পুঁতিই উপবে উঠিলে দ্বিতীয়ের একটি উঠে, অর্থাৎ দ্বিতীয় দশটি উঠিলে দশ হাজার মন্ত্রজপ বুঝায় এবং এইরূপে তৃতীয় দশটি উঠিলে লক্ষাধিক মন্ত্র জপ হয়। এখানে একপে কয়েক লক্ষ বার মন্ত্র জপ হইল। চূপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা পুণ্যাক্কন ভাল।

পূর্বেই বলিয়াছি, এখানে ব্রহ্মপুত্রের চড়া অতি বিধূত। স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত, দুইটির উপরই রঙ্কু-সেতুতে লোক পারাপার হয়। পশু বা বৃহৎ মোট পারের জন্ত কিছু দূরে খেয়াঘাট আছে। ঘাট হইতে কিছু দূরে গ্রামের পাশে একটি পাহাড় একাকী ঝাড়াইয়া আছে, তাহারই শিরে জোড় বা কলেক্টরী অর্থাৎ সেখানে নূতন গৃহনির্মাণ চলিতেছে এবং নির্মাণকার্যে ভোটার নিয়ম অনুসারে বেগার-মজুরীতেই হইতেছে। এদেশে প্রত্যেক গৃহপিছু এক জন লোককে কিয়ৎকাল সরকারী বেগার খাটিতে হয়, অবশ্য, যাহারা ধনী তাহারা অপরকে মজুরীর পয়সা দিয়া উদ্ধার পায়। ঐ সময় দলে দলে জী পুরুষ (জীলোকই বেশী) চমরীর পশমে তৈয়ারী থলীতে নদীতীরের পাখব বোঝাই করিয়া গান গাহিয়া জোড়-এ লইয়া বাইতেছিল। কাজের সঙ্গে সঙ্গে লাফালাফি-খেলা, হাসি-ঠাট্টা সবই চলিতেছিল। জীলোকদের কাপড় টানিয়া উলঙ্গ করাও ইহাদের কাছে রহস্য মাত্র! স্নানের সময় জীলোকদের দৃষ্টির মধ্যেই নগ্নাবস্থার ছুটাছুটি, স্নান, কাদা-ছিটানো এসবই চলিতেছিল। সময় গ্রীষ্মকাল হইলেও নদীর জল অতিশয় ঠাণ্ডা, সেজন্য আমি অল্পক্ষণ জলে থাকিতেও কষ্ট পাইতাম, কিন্তু ভোটার ছেলের বহুকণ সঁতার কাটিত দেখিতাম।

লাসে গ্রামে প্রথম দিনই নমাজের আজ্ঞানের ডাব শুনিয়াছিলাম, তখন সেটা নিজের লম ভাবিয়াছিলাম, পরে জানিলাম ঐ গ্রামে কয়েক ঘর মুসলমান ভোটার-বাস

আছে। লাসা হইতে লদাখ যাইবার পথে লাসে পড়ে এবং এই মুসলমানেরা লদাখী মুসলমানদিগের ভোটায় জীদের সন্তান। অল্প ভোটায় অপেক্ষা ইহার ধর্মকর্মে মজবুত।

২২শে জুন কয়েকখানি কা (চামড়ার নৌকা) আসিল, তাহাতে আমরা যাইতে পারিতাম কিন্তু সঙ্গীরা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বলাব থাকিবা গেলাম। পরদিন তাঁহাদের কা আসিলে দুই দিনের পাথরের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। কিন্তু শুষ্ক ভেড়ার মাংস কিনিয়া সিদ্ধ করিয়া লইলাম। ভোটায়দের মতে শুষ্ক মাংস “স্বল্পপক”, কিন্তু আমি তখনও অতটা অগ্রসর হইতে পারি নাই। সঙ্গী বলিলেন, সিদ্ধ করিলে মাংসের সার বাহির হইয়া যাইবে, তাহা শুনিয়াও মাংস সিদ্ধ করিয়া খণ্ডগুলি পথের জন্ত রাখিয়া লইলাম এবং কাথ চাবাকে দিতে চাহিলাম। চাবা স্বল্প লইতে অস্বীকার করায় প্রথমে বুঝিতে পারি নাই পরে শুনিলাম তাহাকে মাংসখণ্ড না দেওয়ায় সে চটিয়াছে। আমার মতলবই ছিল যে পথে তাহাকে দিব এবং সেই জন্তই বুঝিতে পারি নাই যে এখন না দেওয়ায় কিছু অন্তায় হইয়াছে। যাহা হউক, যাহা ভুল হইবার তাহা ত হইয়াই গিয়াছে, এখন শোধরাইবার উপায় নাই।

পথে গাখার পিঠে আসিতে আসিতে নৌকায় চামড়া শুকাইয়া গিয়াছিল, সেই জন্ত মাল্লার দল সেগুলি পাথর চাপা দিয়া নদীর জলে এক দিন চুকাইয়া রাখিয়া পরের দিন কাঠের কাঠামোতে আঁটিতে লাগিল। চামড়া আঁটা হইলে নৌকা জলে ভাসাইয়া প্রথমে খোলার নীচের দিকে সঙ্গীদের সংগৃহীত কাঠ সাজানো হইল এবং তাহার উপর মালপত্র বোঝাই করা হইল। সকালে চাবা নিজে আসিয়া বলিল, “নৌকায় আপনাদের স্থান হইবে না।” দ্বিপ্রহরে মাল বোঝাই শেষ হইলে সে সেই কথা পুনর্বার বলিল, কিন্তু আমি ইহা ঠাট্টা হিসাবে লইলাম। পরে মটকা-ভরা ছর্ড আসিল এবং তাহার সাহায্যে মাল্লাদের ভোজ হইলে লাল নীল কাপড়ের টুকরার নিশান-পতাকা এক এক জোড়া-বাঁধা নৌকার সম্মুখে লাগানো হইল। ইতিমধ্যে শীগর্ট-বাজী কয়েক জন পৃথিক আসিলে তাহাদের যাইবার ব্যবস্থাও হইল, কিন্তু স্মৃতি-প্রজ্ঞ ও আমার বাওয়ার কোনও ব্যবস্থা হইল না। অল্প সওদাগর বলিল, “আমাব সঙ্গীর আপনাদের

লইতে চাহে না, আমি কি করিতে পারি?” আমি একটি কথাও না বলিয়া আমাদের জিনিষপত্র স্মৃতি-প্রজ্ঞ ও আমার নিজের কাঁধে উঠাইয়া শুধায় চলিয়া আসিলাম।

শুধায় আসিয়া আমি চা-পানের ব্যবস্থা করিয়া স্মৃতি-প্রজ্ঞকে বোড়া বা খচ্চরের ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তিনি সেই কাজে বাহির হইবার কিছুক্ষণ পরে লাসার সেই দুই সওদাগর আসিয়া বলিল, “আমরা সঙ্গীরকে বুঝাইয়া বলিয়া রাজী কবিয়াছি, আপনি চলুন।” আমি সাধীর কথা বলায় তাহার বলিল, তাঁহার স্থান হইবে না। আমি বলিলাম, “তবে তোমাদের সঙ্গে লাসায় দেখা হইবে। আমি তোমাদের উপব বিন্দুমাত্র সন্মিলন নহি, কিন্তু একপ স্থলে আমি সঙ্গীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।” তাহার চলিয়া যাইবার পরেই স্মৃতি-প্রজ্ঞ আসিয়া বলিলেন, “লাসা-গামী এক খচ্চরের দল আসিয়াছে। আমি শীগর্ট পর্যন্ত দুইটি খচ্চর চার সাং (প্রায় ৩ টাকা) ভাড়ায় ঠিক করিয়াছি। তাহার কাল সকালে রওয়ানা হইবে।”

২৬শে জুন সকালেই চা-পান করিয়া মালপত্র লইয়া আমরা খচ্চরওয়ালাদেব কাছে গেলাম। তাহার বলিল যে ঐস্থানের রাজকর্মচারীর কিছু জিনিষপত্র লইয়া যাইতে হইবে, স্তরায় পরদিন জাহাজরাস্তা হইবে। আমরা শুধা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, খচ্চরের আড্ডায় থাকিবার জায়গাও নাই, স্তরায় মালপত্র তাহাদের কাছে ছাড়িয়া দেড় মাইল পথ অগ্রসর হইয়া স্মৃতি-প্রজ্ঞের পরিচিত এক গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিলাম। স্মৃতি-প্রজ্ঞ চা-পানের পর চাউ-বোমো বিহার অভিমুখে— তাহার মহাসুপ দূরে দেখা যাইতেছিল—কাহার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলেন। আমি কিছুক্ষণ গৃহস্থের তাঁত বোনা দেখিতে লাগিলাম। তিব্বতে ঘরে ঘরে পশমের স্ততা কাটা ও বোনা হয়। উলের কাপড় এক বিষয় মাত্র চণ্ডা করিয়া বোনা হয়, সহজেই ইহার প্রস্থ বড় করা যায়, কিন্তু সেমিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। কাপড় সন্দর ও মজবুত হয়। কিছুক্ষণ পরে ছাতে বেড়াইতে গেলাম। কিন্তু সন্ধ্যা পরেই গৃহকর্ত্তী বৃদ্ধা নামিয়া আসিতে বলিল। পরে শুনিলাম, এখানকার লোকেরা ছাতে বেড়ানো অমঙ্গল মনে করে। এই গৃহ ব্রহ্মপুত্রের তীর হইতে দূরে, কিন্তু এখানেও উপত্যকা বিস্তৃত ও সমতল, যদিও নদীর জল এখানে আসে না। ক্ষেতে চারা অল্প অল্প অঙ্কুরিত



তিব্বতের দুর্গ (জোঙ)



পথে খচ্চরের দল-সহ যাত্রীগণ



সম্রাট তিব্বতীয়ের বাসভবন



লাসার বাজার



তিব্বতীয় মঠে তালপত্রের পুথির সংগ্রহ



তিব্বতীয় মহিলা



তিব্বতীয় বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ



তিব্বতীয় মহিলাদের বেশভিহাস

হইয়াছে, সেগুলি সেচনের জন্য বৃষ্টিব উপর নির্ভর করিতে হয়। জুপ হইতে চামড়ার ডোল কবিয়া গ্রামের জর তোলা হয়, জুপ বিশেষ গভীর নয়। রাত্রে গৃহস্থ আমাদে-
থুক-পা খাওয়াইলে পরে স্মৃতি-প্রজ্ঞ পথে কেনা কাপড় টুকরা করিয়া বুদ্ধগয়ার প্রসাদ বলিয়া সকলকে বিতরণ করিলেন।

পরদিন চা পান করিয়া দুই-তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ডাবিলাম আজও বুঝি খচ্চরের দল রওয়ানা হইবে না। সেই জন্ত ফিরিয়া খচ্চরের আড্ডার দিকে যাইতে যাইতে গ্রামের কাছে দলের সঙ্গে দেখা হইল। আমি ও স্মৃতি-প্রজ্ঞ দুই জনে দুইটি খচ্চরের সওয়ার হইলাম। খচ্চরের মুখে লাগাম নাই, স্ততরাং আমরাই তাহাদের ইচ্ছাধীন হই। চলিলাম। আমাদের দল ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়িয়া ডাবিন দিকে চলিল। কিছু দূর যাইবার পর দেখিলাম এখানে-ওখানে দূরবিস্তৃত বালুর চর, তাহার মাঝে মাঝে কুশের মত ঘাস, এবং অল্প চড়াইয়ের পরে এক জোত বা ঘাট, দ্বিপ্রহরে তাহা পার হইলাম। উৎরাইও সহজ, এখানকার পাহাড়গুলিও বৃক্ষশূন্য। কিছু দূর পর্বতশিখরে বামে ও দক্ষিণে দুইট গুহার ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল এবং সেই পাহাড়েরই নীচে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী দেখিলাম, মনে হইল সেগুলি আখবেট কিংবা বিরি বৃক্ষ।

সোদিন বেলা দুইটা পর্যন্ত পথ চলা হইল। কিছুক্ষণে জন্ত এক গ্রামে অপেক্ষা করিয়া খচ্চরগুলির ভূষি ও আমাদের চা জোগাড় করা হইল। গ্রামের পরই চড়াই আরম্ভ, উপর হইতে একটি জলের ধারা নামিতেছিল, সেই জলে এই গ্রামের ক্ষেতের সেচ হয়। তাহার পাশ দিয়া চলিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা চড়াইয়ের পর উপরের ঘাটে পৌঁছিলাম। ঘাটের উপরিস্থিত পর্বতগাত্রের পাথরগুলি আড়ভাষ খাড়া হইয়া আছে, স্ততরাং খচ্চরের স্থবিধার জন্ত উৎরাইয়ের কতকটা পথ হাঁটিয়া চলিলাম। এইখানে এক প্রকার কালো পাথর চারি দিকে দেখা গেল, শুনিলাম এইরূপ পাথরের নিকটেই সোনার খনি থাকে। অনেকটা উৎরাইয়ের পর মোটা পাথরের দেওয়ালযুক্ত একটি ছোট দুর্গের বা ফেঁজী চৌকির কাছে পৌঁছিলাম, ইমারতটি প্রাচীন নহে, কিন্তু এখন জনশূন্য। কেজার দেওয়ালে ঘাটের-দিকে-

মুখ-করা কামানের ছিদ্র! কিছু দূর চলিবার পর আমরা এই জলধারার পাশ ছাড়িয়া, একটি ছোট পাহাড় ও একটি নালা পার হইয়া চবা-অঙ-চারো গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামে মাত্র পাঁচ-ছয়টি ঘর, একটি বেশ বড়, বোধ হয় কোন ধনী, অল্পগুলি খুব ছোট। স্মৃতি-প্রজ্ঞ ও আমি এক বৃদ্ধার গৃহে আশ্রয় লইলাম, খচ্চর-ওয়ালারা মাঠে লোহার খোঁটায় দড়ি দিয়া খচ্চরগুলি বাঁধিয়া বোঝা নামাইয়া ভূষি খাওয়াইল। ভূষি খাওয়ানো হইলে তাহাদিগকে খুলিয়া হল পান করাইয়া মুখে দানার খলি বাঁধিয়া দিল। দান বালিতে এখানে দলিত কাঁচা মটর বা এই জাতীয় পদার্থ দেওয়া হয়। আমাদের জন্ত বৃদ্ধা থুক-পা বাঁধিয়া দিল এবং শয্যার জন্ত গদীও পাতিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে এক টকা “নে-ছঙ” (বাস করিবার জন্ত বকশিশ) দিয়া খচ্চরওয়ালাদের দলের দিবে চলিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার প্রস্তুত হইয় চলিতে লাগিল। পথ বহুদূর পর্যন্ত উৎবাহি, চারি দিবে কালো পাথর চক্ৰমক্ করিতেছে, মধ্যে খচ্চরের পাল লোহার কটার ধ্বনিতে পথ মুখরিত করিয়া জন্ত চলিরাছে। প্রায় এগারটা নাগাদ উৎবাহিয়ার শেষে একটি লাল রঙের গুহা দেখা দিল এবং সামনে একটি নদীও পাইলাম। নদী পার হইয়া তাহার দক্ষিণ তীর ধরিয়া উপবের দিকে কিছু দূর গিয়া এক গ্রামে চা-পানের জন্ত আমরা থামিলাম। গ্রাম হইতে নদী ছাড়িয়া অল্প চড়াইয়ের পর অনেক দূর পর্যন্ত সমতল পথে চলিয়া লা (ঘাট) পার হইলাম। এখানকার মাটি মন্ডল ও হরিজ্ঞাভ, বর্ষায় চাষের বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আরও পরে কতকগুলি ক্ষেত দেখা গেল, সেগুলিও বর্ষাব উপর নির্ভর করে। এইরূপে অনেক দূর চলিয়া শব-কী নদীর পারে একটি বড় গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামে বড় বড় ঘর, সন্ধ্যা ও বিরি বৃক্ষের বাগান এবং সেচ-থালের ব্যবস্থা সবই আছে। এখানে নদীর উপর পাথরের সেতুও রহিয়াছে। সেতু এবড়ো-নেবড়ো পাথরের তৈয়ারী, মাঝে মাঝে কাঠের ব্যবহারও হইয়াছে, জন্তগুলি রক্ষাব জন্ত তাহাদের মূলে চবুতরা কবা আছে। নদী

তট বিস্তৃত কিন্তু সমতল নহে। আমরা নদী ডাহিনে রাখিয়া আগে চলিলাম, কিছুক্ষণ চন্নিবার পর নদী বহু দূরে পড়িয়া গেল। বেলা চারটাব সময় নে-চোঙ গ্রামে পৌছিলাম, এখানে খচ্চর, গাধা ইত্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা আছে। এখানকার লোকে চা ভূষি প্রভৃতি-জিনিষ বিক্রয় করিয়া বেশ দু-পয়সা লাভ করে, সুতরাং এইরূপ গাধা-খচ্চরের দলকে আদর-যত্ন করিয়া থাকে। আজিকার পথ দীর্ঘ, খচ্চরে চড়িয়া চলিতে চলিতে গায়ে ব্যথা হইয়াছিল। আমি গিয়াই, ঘে-ঘর আমাদের দেখিয়া হইল সেখানে বিছানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম, স্মৃতি-প্রজ্ঞা আমাকে দু-চার কথা শুনাইয়া চা তৈয়ারী করিতে বলিলেন। রাজে থু-পা রাখিবার সময়ও তিনি বেশ দু-কথা শুনাইলেন, এই ত তাঁহার প্রধান দোষ—তবে আমি কিছুই বলিলাম না।

২৯শে জুন প্রাতে রওয়ানা হইয়া সোজা সমতল পথ দিয়া আমরা চলিলাম। দশটার সময় লা অর্থাৎ ঘাট পার হইলাম। চড়াই-উৎরাই না থাকায় ইহাকে লা বলা উচিত নহে, তবে দহ্যভয় যথেষ্ট আছে। তাহার পর সামান্য উৎরাই এবং আরও পরে প্রায় সমতল ঢালু উপত্যকার বিস্তৃত জমি। বারটার পর আমরা নার-খণ্ড পৌছিলাম, এখানকার কঙ্কর-তল্লরের ছাপাখানা বৃহৎ, সে বিষয়ে পরে বলিব। এখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া চা পান করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম; দুইটার পর পর্বতমূলে বিশাল মঠ দেখিতে পাইলাম, ইহাই টশী লামার বিখ্যাত টশী ল্যুপ্পো মঠ।

মঠ দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র সকলে খচ্চর হইতে নামিয়া পড়িল। উপর নীচে সাজানো হ্রদ্রবিস্তৃত হস্ত্যরাজির মধ্যস্থিত মন্দিরগুলির চীনা-ধরণের ছাদের সোনালী শোভা অতি স্বন্দর দেখাইতেছিল। মঠের সর্বনিম্ন অংশে টশী লামার উদ্যান, তাহারই দেওয়ালের পাশ দিয়া আমরা মঠের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বারের কাছে বাগানে ছোট ছোট কেরারীতে ও গামলায় মূলা এবং শাকসব্জী লাগানো রহিয়াছে। এখান হইতে শীগটার বস্তী মাত্র কয়েক শত গজ দূরে। সর্বপ্রথমে প্রাচীন চীনা দুর্গের নয় যুৎ-প্রাচীর, তাহার পব প্রান্তরে কোদিত বহু মস্ত ও দেবমূর্তি প্রাচীরে স্থাপিত আছে, তাহার নাম “মাগী”।

অবলোকিতেষরের সর্বপ্রধান মস্ত “ও মণিপদ্মে হু”; মণি শব্দ হইতে এইরূপে জপচক্র ও মন্ত্রপুত স্তুপের নাম “মাগী” হইয়াছে। মাগীর বাম পাশ দিয়া আমরা শীগটারে প্রবেশ করিলাম। গম্ভ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া খচ্চরওয়ালারা আমাদের জিনিষপত্র নামাইয়া দিল এবং স্মৃতি-প্রজ্ঞা আশ্রয়ের সন্ধানে গেলেন। তাঁহার পরিচিত গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাডাকি করিয়াও কেহ বাহিরে আসিল না দেখিয়া আমরা আরও কয়েক জায়গায় চেষ্টা করিলাম কিন্তু ভিক্ষুকের ন্যায় আমাদের বেশ, এমন জীর্ণ মলিন বসনধারীকে স্থান দেয় কে? শেষে অনেক চেষ্টার পর এক সরাইয়ের বারখণ্ডায়, দৈনিক এক টকা ভাড়ায় জায়গা পাওয়া গেল।

সে-রাজ্যেও স্মৃতি-প্রজ্ঞা অশেষ কটুক্তি করায় আমি ভাবিলাম ইহার সঙ্গে আর চলা যায় না। ইহার এ অভ্যাস বাইবে না, আমি উত্তর না-হয়-নাই দিলাম কিন্তু মনের শাস্তি অটুট রাখাও সম্ভব নহে। পবদিন সকাল হইতে আমি মাল-পত্র ছাড়িয়া কোন নেপালীর খোঁজে বাহির হইলাম। নেপালে এক সম্মান শীগটীবাসী নেপালী ছই সওদাগর ভ্রাতার ঠিকানা দিয়াছিলেন। আমি তাহাদের নাম ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম, কিন্তু ছই ভাই একত্রে এখানে ব্যবসায় করেন বলায় এখানকার এক নেপালী সম্মান তাহাদের নাম ঠিকানা বলিয়া দিলেন। এখানে বিশ-পঁচিশটি নেপালী দোকান আছে, তাহার মধ্যে চার-পাঁচটি বেশ বড়, সুতরাং আমি সহজেই তাঁহাদের খুঁজিয়া পাইলাম। সকাল সাতটা—তখনও পর্যন্ত সাহু নিদ্রিত ছিলেন, কিন্তু আমার খবর পাওয়ায় বাহিরে আসিয়া কথাবার্তা কহিলেন এবং অতি আদরের সহিত আমাকে স্বাগত করিয়া তাঁহার লোককে আমার সঙ্গে মালপত্র আনিতে পাঠাইলেন। সরাইয়ে আমাদের দু-জনের ভাড়া চুকাইয়া এবং স্মৃতি-প্রজ্ঞার জন্ত নিজের ঠিকানা রাখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সেখানে গরম জল ও সাবানে মুখ হাত ধুইয়া সন্তু-সহ চা ও মাংস-ভোজন করিলাম।

ভোজনের পর শ্রীআনন্দ ও অশ্ব বন্ধুদের নামে চিঠি লিখিয়া সাহু মহাশয়কে দিলাম এবং শীঘ্র আমার লাসা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি দশ-বার দিন থাকিতে বলায় বলিলাম, “আমি লুকাইয়া

চোবের মত ঘাইতেছি, ধবা পড়িলে এখান হইতেই ফিরিতে হইবে।। লাসা গিয়া দলাই লামাকে নিজের পবিচয় দিয়া কোন সময় নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব।” ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া ঋতু-বর আড্ডায় চলিলেন কিন্তু লাসাযাত্রী কোন দল পাওয়া গেল না, শেষে ল্যাসের সেই দলের খোঁজে গেলাম কিন্তু তাহারা আড্ডায় ছিল না, সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাহাদিগকে দেখা করিতে বলিয়া আসিলাম।

ভোটদেশে লাসার পরই শীগাটী বৃহত্তম বসতি। এখানে দশ হাজার লোকের বাস, তাহার মধ্যে বিশ-পঁচিশ ঘর নেপালী ব্যাপারী এবং অল্পরূপ সংখ্যার মুসলমান দোকানী আছে। অধিকাংশ দোকানই ঘরের ভিতর দিকে স্থিত, রাস্তার দিকে মুখ থাকিলে লুটের আশঙ্কা আছে এই জন্য ঐ রূপ ব্যবস্থা। প্রতি নেপালীর দোকানে দুই-তিনটি পাঁচ-ছয় নলা পিস্তল আছে। আত্মরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা চাড়া প্রভোক্তার ছাদে দুই-চারিটি বৃহৎ কুকুর ছাড়া থাকে যাহাতে দস্যবল ছাতে উঠিয়া ভিতরে ঢুকিতে না পারে।

এখানে সকাল নটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত বৃহৎ মণীর পিছনে হাট বসে। শাকসব্জী কাপড় বাসন মাখন ইত্যাদি সমস্তই ঐ দুই ঘণ্টায় বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে না হইলে পরদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। হাটের পশ্চিম দিকে লাসায় দলাই লামার প্রাসাদ—“পোতলা”র আকারে নিখিত জোড়। এখানকার জীলোকদিগের শিরোভূষণ দেখিতে অনেকটা ধনুর মত। উহার দুই ধারে পবনুলার বেণী থাকে এবং অবস্থা অনুযায়ী প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতিও লাগানো হয়। ভোটদেশে আসিবার পর এখানেই প্রথম শূকরের বাহুল্য দেখিলাম।

১লা জুলাই রামপুর-বৃশহব (শিমলা-পাহাড় অঞ্চল) হইতে আগত তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক তরুণ যুবক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। দেশের স্কুলে আপার প্রাইমারী পর্য্যন্ত উর্দু পড়ায় তাহার উর্দু ও হিন্দী কথা পরিষ্কার, এখন চার-পাঁচ বৎসর যাবৎ এখানে ভোটীয় ভাষায় লেখাপড়া শিখিতেছে। কুতী ছাড়িবার পর ইহার সঙ্গেই প্রথম হিন্দী বলিবার স্বযোগ পাইলাম। তাহাব নিকট সংবাদ পাইলাম যে আমার পরিচিত এক লদাখী যুবক গৃহ ও মুহরীর

চাকরী ছাড়িয়া এখানে ধর্মশিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, সে দুই বৎসরের মধ্যে সিদ্ধপুরুষ হইয়া লাসার এক তরুণী যোগিনীকে সঙ্গে লইয়া এই পথে দিনকয়েক পূর্বে ফিরিয়া গিয়াছে। রামপুরের এই যুবকের নাম রঘুবর। রঘুবর তাহাকে নর-কপালে “কাবণ” পান ও ভূত ভবিষ্যৎ প্রণয় লোকের সুখ-দুঃখের কথা বলিতে দেখিয়াছে। এই সব কথাবার্তার মধ্যে সেই ঋতুরঞ্জনা লাসার আসিয়া পড়িল। তাহাদের সঙ্গে আট সাড় (পাঁচ টাকার কিছু বেশী) ভাড় ঠিক হইল এবং তাহাবা গাফীর পথে বাব দিনে আমাকে লাসায় পৌছাইয়া দিবার কথা দিল। সোজা পথে লাসা সাত দিনে বাওয়া সম্ভব এবং গ্যাফীরে ইংরেজ বাণিজ্যদূত থাকায় সে-পথে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু আমার ঘাইবার অন্য উপায় না থাকায় এবং এত দিনে নিজের ছদ্মবেশের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস হওয়ায় উহাতেই রাজী হইলাম।

২লা জুলাই দ্বিপ্রহরে নদীতীরে নাচের আয়োজন ছিল। সকল শ্রেণীর লোকেই মধ্য ৩ খাওয়া-দাওয়ার অন্তান্ত ব্যবস্থা করিয়া সেখানে ঘাইতেছিল, কেন-না ভোটয়েরা নৃত্য বিশেষ আসক্ত। নাচ হইলে ইহার সবই তুলিয়া যায়। জীলোকেই নাচে, বাঘা বাজায় গুরুত্ব। এখানেও প্রায় প্রত্যেক নেপালীর ভোটীয় রক্ষিতা আছে, তাহারাও নাচে ঘাইতেছিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নাচ চলিল, তাহাব পর যে যাহার ঘরে ফিরিল। এবেশে চাউল জন্মায় না, কিন্তু নেপালী মায়েই অস্তিত্ব: রাজ্যে একবার ভাত খায়, মাংস ত তিন বেলা চলে এবং বাজে মদ্যপান নিত্য সাধারণ ব্যাপার।

৩রা জুলাই বাজার দিন, সেদিন অতি প্রত্যুষেই সাহর সঙ্গে আমি টঙ্গী লুম্পো গুহা দেখিতে গেলাম। এখানে বহু দেবালয় আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান এবং সেগুলির ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত। প্রথমে আমবা আগামী বৃদ্ধ মৈত্রেয় দেখিতে গেলাম। অভি বিশাল মূর্তি, মুখ উত্তম-রূপে দেখিতে হইলে দ্বিতলে উঠিতে হয়, প্রতিমা যুগ্ম কিন্তু সোনার পাতে আচ্ছাদিত। মৈত্রেয় মূর্তি শাস্ত ও স্থির এবং কক্ষ নানা বর্ণের রেশমী ধ্বজায় অতি স্থন্দর ভাবে সজ্জিত। প্রতিমার সম্মুখে স্বর্ণ-রৌপ্যময় ঘৃত-প্রদীপ অবিরাম অষ্ট প্রহর জলিতেছে। মূর্তির আশপাশে অনেক

ক্ষুদ্র মূর্তি রহিয়াছে এবং পাশের কক্ষে শত শত হুন্দর ছোট পিত্তলের মূর্তি সাজানো আছে। ভারতের অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য ও সিদ্ধ পুরুষের মূর্তিও ইহার মধ্যে আছে। অজহীনকে সাধুশ্রেণীভুক্ত করা বিনয়ের মতবিরুদ্ধ, কিন্তু এখানে কাণা ভ্রমণ দেখিলাম। এক দিকে ভোটিয় ভাষায় স্তব্ধগীত হইতেছে শুনিলাম, স্বর নেপালী স্তব্ধগীতের অনুরূপ। অস্ত্রাশ্র মন্দিরও অতি হুন্দর এবং স্বর্ণরৌপ্য মণি-মাণিক্যে পূর্ণ। আজ সময় ছিল না এবং পুনর্ব্বার এখানে আসিতে হইবে, স্বতরাং শীঘ্র দেখা সাক্ষ্য করিয়া ফিরিলাম। ফিরিবার পথে খচরগুলাদের সঙ্গে দেখা হইল।

ভোজনের আয়োজন ঠিক ছিল কিন্তু তাড়াতাড়িতে খাওয়া হইল না। নয়টার মধ্যে মালপত্র লইয়া খচর-গুলাদের নিকট পৌঁছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে শীগর্ষী ত্যাগ করিলাম। চারি দিকে শ্রামল ক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে নহরের (সেচনালী) জলস্রোত চলিয়াছে, যব ও গমের চারা উঠিতেছে এবং সরিষার ফুলের পীত শোভায় চাষি দিক আলোকিত। কোথাও বা লাল ফুলে পূর্ণ মটরের ক্ষেত, কৃষকেরা কোথাও জলসেচনে, কোথাও বা ঘাস নিড়াইতে ব্যস্ত। পথের চারি দিকে ক্রোশব্যাপী ক্ষেত, খচরেরা যাহাতে ক্ষেতে চরিতে না-পারে সেই জন্ত তাহাদের মুখে কাঠের চুপড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামগুলির নিকট সাদা ছাল এবং সবুজ পাতায় আচ্ছাদিত সঙ্কেদা বৃক্ষের ছোট ছোট বাগান ছিল। বিরিগাছের কাটা মাথা হইতে পাতলা সবুজ পাতায় ঢাকা লম্বা বেতের মত সরু শাখা-গুলি পিশাচের মাথার চুলের মত দেখাইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন আমরা মাঘ মাসে ভারতের যুক্তপ্রদেশের প্রান্তস্থিত কোনও অঞ্চলে রহিয়াছি। এক ঘণ্টা পথ চলার পর তুরিং গ্রামে পৌঁছিলাম, আজ আমাদের এখানেই বাস।

আমাদের তিন জন খচরগুলায় মধ্যে এক জন ছিল সর্দার, উহার খচরের সংখ্যাই অধিক। সে কিছু লেখা-পড়া জানিত এবং নিজেকে উচ্চবংশীয় প্রমাণ করিবার জন্ত বিরোজাপাথর-বসানো প্রায় আড়াই তোলা ওজনের সোনার মাঁকড়ী কানে পরিত, হাতের বাম অঙ্গুলেও চণ্ডা সবুজ পাথরের সিল আঁটি ছিল। অস্ত্র দুই জনের

কানে পাঁচ-ছয় তোলা ওজনের রূপার আঁটা ছিল। মাথায় পুবাণো ইবেজী ফেণ্ট হ্যাট ত এখন তিব্বতে সাধারণ ব্যবহারের জিনিষ।

আমরা গ্রামে পৌঁছিলাম খচরগুলি বাহিরে বাঁধা হইল এবং তাহাদের খাওয়ানো চলিল। আমরা ভিতরে কর্তার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাম কর্ণে লম্বিত প্রবাল-মুক্তা-জড়িত সোনালী পেন্সিল তাঁহার সরকারী উচ্চপদের পরিচয় দিতেছিল। তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঙ্গীরা লম্বা জিহ্বা বাহির করিয়া ডান হাতে টুপি খুলিয়া দুই-চার বার উপব নীচে সঞ্চালন করিল; এইরূপে অভিবাদনের পালা শেষ হইলে সকলে মাটিতে বিছানো গদীর উপর বসিলাম। যদিও আগেকার দ্বায় আমার পরিবেশ ভিখারীর মতই ছিল, এখন নেপালী সাহুর নিকট এত সম্মান পাওয়ার ফলে সঙ্গীদের নিকটও সম্মান পাইতেছিলাম। আমিও মাঝে মাঝে নিজের ভিক্ষুক-বেশের উপযোগী আচরণ ভুলিয়া যাইতেছিলাম। এক্ষেত্রেও আমাকে বিশেষ আসন এবং চা-পানের জন্ত চৈনিক চীনা মাটির পেয়লা দেওয়া হইল, অস্ত্রদের দেওয়া হইল শুকানো মাংস ও ছড়। সর্দার মদ্যপান করিত না, সে চা-পান করিল, অস্ত্রেরা খচর-আগলানোর মাঝে ক্রমাগত ছড়, চালাইল, গৃহকর্তার চাকরাণী তাহাদের তামা-পিত্তলের চড়ুদানে সর্কদা মদ ঢালিতে থাকিল। ক্লান্ত হইয়াও সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা পান থামাইল না, পেটে স্থান ছিল না স্বতরাং টুপি খুলিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া অবিরাম অধিকারী মহাশয়কে সেলাম জানাইতে লাগিল, কিন্তু “উহাদের আরও দাঁও” হুকুম পূর্ববৎ চলিল। সূর্যাস্তের সঙ্গে ছড়ের পালা শেষ হইল।

ভোটিয়দিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও কলাকৃতি সাধারণ ভাবে ব্যাপ্ত। এই ঘরের দেওয়ালের হাসিয়া (dado) হুন্দর এবং লাল সবুজ ঝালরে সুসজ্জিত। সমস্ত কাঠপাত্র নানারূপে অলঙ্কৃত, চায়ের চৌকী নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং তাহার পায়গুলির বর্ণবিভাস সূর্য্যচির পরিচায়ক, বসিবার গদী ঘাসে ঠাস। কিন্তু তাহার খোল নানা বর্ণের উলের পট্ট দিয়া হুন্দর ভাবে সাজানো এবং তাহার উপর চীনদেশীয় ছাপা করা সপাতা। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি হওয়ায় অন্ধনে কালপাড়-বৃন্ত

সাদা জিনেব টামোয়া খাটানো হইল। জানালার পাল্লাগুলি কাঠের জালির উপর কাপড় মুড়িয়া তৈয়ারী, বাহিরের দিকে কাল ধাবিযুক্ত সাদা জিনের পর্দা, সেগুলি রঙীন ঘুন্টি ও রঙের সাহায্যে যতটা ইচ্ছা খোলা ও গুটানো যায়। বৈঠকখানার পাশেই অধিকারী মহাশয়ের দুই পুত্র শিক্ষকের কাছে পড়িতেছিল। এদেশে স্কুলের ও ক্রম লেখার জ্ঞান দুই প্রকার লিপি ব্যবহৃত হয়, প্রথমটি “উ-চেন” (দাঁড়িযুক্ত), অষ্টটি “উ-মেদ” (দাঁড়িবিহীন)। সাধারণ ভাবে উ-মেদের ব্যবহার ও প্রয়োজন অধিক, সেই জন্ত ভিক্ষু ভিন্ন অন্য

সাধাবণে ঐ লিপিই শিক্ষা করে। এখানে শিক্ষক কাগজের উপর নিজে স্কুলের ভাবে অক্ষর লিখিয়া দিতেছিলেন, ছাত্রেরা কাঠের পাটায় তাহার অন্বরণ ও অভ্যাস করিতেছিল। আমাদের পুরাতন পাঠশালার পণ্ডিতদের মত এখানেও শিক্ষায় বেতের ব্যবহার অত্যাবশ্যক বলিয়া গৃহীত। শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের ভুল হইলে তাহাকে গাল ফুলাইতে বলিয়া গালের উপর চণ্ডা বেত বা বাঁশের চোঁচাড়ি দিয়া সশব্দে ভুল শোধন করিতেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

চড়ুই

শ্রীঅচ্যুত রায়

অন্ধগুলির মধ্যে এক জীর্ণ বাড়ীর খোপর ডিমপাড়ার পক্ষে উপযুক্ত স্থান মনে করে এক চড়ুই-দম্পতী ত্বাতে খড়-কুটো জড় করতে লাগল। বড় রাস্তার দুই ছেলেরা এ-পথে যাতায়াত করেনা, হিংস্র পাখীরা এর কোন খোঁজ পাবে না। এবং যে-ছোকরাটি ঘরের মধ্যে থাকে তার কাছ থেকে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নেই, সে খুব ভোরে বেরিয়ে যায় এবং গভীর রাত্রে বাসায় ফিরে কালিপড়া মিটমিটে কেরোসিনের বাতি জেলে কি একটু লেখাপড়া করে ঘুমিয়ে পড়ে, ডিমপাড়ার এর থেকে স্কুলের জায়গা আর পাওয়া যাবে না।

দেখতে দেখতে খোপরটি ভরে উঠল, ছেঁড়া কাগজ, দেশলাইয়ের কাঠি, শালপাতার টুকরো, জানালা দিয়ে রাস্তায় ফেলা স্ক্রেকীদের কেশগুচ্ছ এবং অস্বরূপ অশ্রান্ত অনেক প্রকার সরঞ্জাম এনে পাখী দুটি তাদের বাসা সাজিয়ে তুলল। সমস্ত দিন ধরে ওরা বাসা বাঁধে। শুধু দুপুরবেলা একবার মোড়ের ঐ মূদীর দোকানের কাছ থেকে ঘুরে আসে। কত খুদ, ডালের কণা ছড়ানো আছে ওর পথে, তার গোট-কয়েক হাঁলেই ওদের দু-জনের একদিন চলে যায়।

পুরুষ-পাখীটা খড়কুটো জেগাড় করে নিয়ে আসে গোলপাতার চাল থেকে, ডাষ্টবিনের পাশ থেকে। যেখানে যা ভাল জিনিষ পায় সবই এনে নেক্সে-পাখীটাকে দেয়। সে সেগুলিকে স্কুলের করে সাজিয়ে রাখে। এক-এক দিন বেলা-শেষে ঝড়বৃষ্টিতে চারি দিক অন্ধকার হয়ে আসে। আশপাশে বড় বড় বাড়ী থাকতে হাওয়ার কোন ঝাপট ওরা অনুভব করে না। পাশাপাশি দু-জনে চুপ করে বসে থাকে। মেয়ে-পাখীটি চোখ বুজে দেখতে থাকে ওদের সংসারে কত নতুন প্রাণী এসেছে; তানা সকলে মিলে শহরের বাতাসকে তোলপাড় করে এ-ছাদ থেকে সে-ছাদে মনের স্বপ্নে উড়ে যাচ্ছে। পথের পাশে একটা গাছে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সকলে জড় হব; রাত্রি পর্যন্ত গান গেয়ে থেলা করে কেটে যায়।

এক দিন মেয়ে-পাখীটি ডার সাথীকে বলল, “দেখেছ, কদিন ধরে ঐ ছেলোটিকে দেখতে পাচ্ছি নে। ওর বিহান-পত্রও এ-ঘরে নেই, আমার নেন কেমন কেমন লাগছে। এবারে বাসা না বাঁধলেই ভাল হ’ত।”

“তোমার সব তাতেই কেমন কেমন লাগে। কোঁচায়

পথের পাশে বাসা বাঁধতে, ছেলেরা টিল ছুঁড়ত, চিলে ছাঁ। মারত, তার থেকে এ অনেক ভাল হয়েছে। কোনও ভয় নেই তোমার।” পুরুষ-পাখী মোড়ের মূর্খীর দোকানর দিকে উড়ে গেল।

মেয়ে-পাখীর মনে পড়ল ছেলেবেলাব কথা। এখান দ্রেক অনেক দূরে এক খড়ের চালের কোণে মা'র সঙ্গে এরা থাকত। ওর ছোট ভাই, ও, আর ওদের বাপ-মা এই চার জনে কত স্বখে সময় কেটে যেত। ও তখন সবে উড়ন্ত শিখেছে, ওর ভাই পারত না। এক দিন সন্ধ্যাবেলা কোথেকে একটা সাপ এঁকে-বঁেকে এসে ওর ভাইটিকে— “ও কি এনেছ ?”

“তোমাকে আর আজ থেকে বাইরে যেতে হবে না। একটা অঘটন ঘটে বসতে পারে। খাবার নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।”

“তুমি এখন কোথাও যেও না। বড় ভয় করছ আমাব।”

“তুমি একবারেই ছেলেমানুষ। কোনও ভয় নেই। চিলের সাধ্য কি যে এখানে আসে। আর যদিও আসে, তুমি দেখো, খুব ভাল শিক্ষা দিয়ে দেব তাকে।”

“মাকে একটা খবর দিতে পারবে ?”

“কোথায় থাকে আমি জানি না। অনেক দিন আমাব সঙ্গে দেখা হয় নি।”

“উত্তর দিকে সেই সবচেয়ে বড় পার্কের কোণে মালী যে টালির একখানা চালা আছে, তার দক্ষিণ দিকের কড়িকাঠে বসে মা বাজে ঘুমোয়, এখন গেলে দেখা পাবে না। আজ সন্ধ্যাবেলা যেও।”

“আচ্ছা।”

“এ-পথে যেন কয়েক দিন ধরে লোকজন বেশী চলার ফের করছে। গলির মধ্যে লম্বা লম্বা কতকগুলি কি এনে ফেলেছে দেখেছ।”

“ও-সব কিছু নয়।”

“পরন্তু ছুপুরে তুমি বেবিয়া ঘাবার পর কতকগুলি লোক এসে দেয়ালগুলি মেপে কি সব দেখছিল।”

“তোমার কোনও ভয় নেই। একলা থাক ব'লে ঐ

রকম মনে হয়। আজ সন্ধ্যাবেলাই তোমার মাকে ব'লে আসব। সে এলে কোনও ভয় থাকবে না।”

“পাশের বাড়ীর কলতলায় দুটি বউ কাপড় কাচতে কাচতে গল্প করছিল, এই গলিটা ভেঙে মস্তবড় একটা রাস্তা তৈরি হবে, এ-সব বাড়ীঘর কিছুই থাকবে না।”

“তুমিও যেমন! বউরা সব জানে। এই সব বাড়ী ভেঙে রাস্তা তৈরি করা মুখের কথা কি না! তোমার কোন ভয় নেই।”

আরও দুটি দিন কেটে গেল। পুরুষ-পাখী মেয়ে-পাখীর মাকে ব'লে এসেছে। কিন্তু সে আসার কোন সময় পায় নি। হয়ত সেও তার বাসা বাঁধতে ব্যস্ত।

খাবার নিয়ে পুরুষ-পাখী বাসাব দিকে আসছিল, মেয়ে-পাখী তাকে দেখে চোঁচিয়ে উঠল। “সর্বনাশ হয়েছে। আজ বিকেলে এই বাড়ী ভাঙা শুরু হবে। কয়েক জন লোক এই কতকগুলি হল-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঐ দেখ মোটা মোটা কতকগুলি কি রেখে গেছে।”

“কি বলছ ?”

“কি হবে এখন ?”

“ভুগুবে কি বলছ।”

“তাই তু লোকগুলি ব'লে গেল, কি হবে এখন ?”

পুরুষ-পাখী তার সাথীকে সাশ্বনা দিতে লাগল। ভয়ের কোন কারণ নেই। এখানেই ওরা থাকবে বাচ্চাগুলি বড় হওয়া পর্যন্ত। বাচ্চাগুলি উড়তে শিখলে একটা ভাল গাছ দেখে তাতে বাসা বাঁধবে, মেয়ে-পাখীটা যে কেন এত উতলা হয় তা ও বুঝতে পারে না। মেয়ে-পাখী কিছুতেই প্রবোধ মানতে চাইল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে পুরুষ-পাখীর ডানার মধ্যে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল।

বাইরে খুব হৈচৈ শোনা গেল। শাবলের ধাক্কা দেয়াল-গুলি কেঁপে উঠল। কতকগুলি কুলিমজুর ঘবের মধ্যে ঢুকে দরজা জানলাগুলি ভাঙার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়ে-পাখীটা চোঁচিয়ে উঠল, “আর দেরি ক'রো না। এখনই বেরিয়ে চল। দেয়ালের চাপে যে শেষে মরতে হবে।”

যখন তারা বাইরে এসে পাশের বড় বাড়ীর ছাদে গিয়ে বসল তখন ছোট ঘরখানি মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাসাটিও।

মেয়ে-পাখী বলল, “কি হবে?”

“তোমার কোন ভয় নেই। এক দিনের মধ্যেই আমি তোমাকে খাসা বাসা বেঁধে দেব। ওর চেয়ে অনেক ভাল, অনেক সুন্দর। শহরের দক্ষিণে অনেক দূরে যেখানে বাড়ী-গুলি গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেছে, রাস্তাগুলি মাঠের মধ্যে নিলিয়ে গেছে, সেখানে আমার এক চেনা জায়গা আছে। কোন ভয় সেখানে নেই। খাবার খুঁজবার কোন চেষ্টাও সেখানে করতে হবে না। চল আমরা সেখানে যাই।”

তারা উড়তে আরম্ভ করল।

মেয়ে-পাখী বলল, “বৈশীক্ষ ত আমি উড়তে পারব না। আজ শেষরাগ্রেই আমাকে ডিম পাড়তে হবে। চল এখানে কোথাও নাচি।”

“এখানে নামবে কি? সব শহরতলীতে এসেছি; সে জায়গা যে এখনও অনেক দূরে।”

“তা হোক। আমি আর পারি নে। আর কিছুক্ষণ উড়লে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব।”

“তবে নাম।”

একখানা একতলা বাড়ীর জানালার পাশে একটা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছে ওরা বসল। পুরুষ-পাখীটা আবার ঝড়কুটো, হেঁড়া ঝাঁকড়া, হেঁড়া কাগজ জড় ক’রে বাসা বাঁধতে লাগল। এবাব ও একা। মেয়ে-পাখীটা চুপ ক’রে বসে আছে। এইটুকু উড়েই ও ইঁপিয়ে পড়েছে। সন্ধ্যা হয়ে গেল। বাতায় আলো জলে উঠল। তবু পুরুষ-পাখীর একটুও বিরাম নাই। ও যেখান থেকে যা পারল সব জোগাড় ক’রে বাসা বাঁধতে লাগল। আজ ওর মরবার অবসর নেই। শেষরাত্রের আগেই ওর বাসা বাঁধা চাই, আকাশে চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নায় কোন জিনিষ দেখতে কষ্ট হয় না। দূরের ঐ থড়ো বাড়ীর চালে কত কুটোকাটি আছে। হাজারটা বাসা বুনলেও তা শেষ হবে না।

এক জন যুবতী জানালা খুলে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে বলে উঠল, “পোড়া পাখীর মরণ নেই। জ্যোৎস্না দেখে গান আরম্ভ ক’রে দিয়েছে।”

শেষ রাত্রের আগেই বাসা বাঁধা শেষ হয়ে গেল। পুরুষ-পাখী জিজ্ঞেস করল, “মাথাধরা একটু কমেছে? শুনছ?”

“এ্যা।”

“সুস্থছিলে বুঝি?”

“না।”

“মাথাধরা কমল?”

“হ্যা, এখন আর নেই।”

“বাসা হয়ে গেছে। কি সুন্দর বাসা দেখ, ব’সো এব ওপর। এখন আর কোন ভয় নেই, গাছটা বেশ সুন্দর, নয়?”

“হ্যা।”

“কিন্তু মাহুগুলির কোন বৃদ্ধি নেই, জানালার পাশে কখনও গাছ রাখতে হয়।”

“আমার বড় ভয় করছে।”

“কিসের?”

“এখনই, তুমি একবার মাকে ফ্রেক আনবে?”

“এই রাত্তিরে!”

“হ’লেই বা, জ্যোৎস্না আছে, একবার যাও, লক্ষ্মীটি, সেই কড়িকাঠের ওপরে মাকে দেখতে পাবে, রোদ ওঠার আগেই ফিরে এস।”

“আমি এই এলাম ব’লে।” পুরুষ-পাখী পার্কের দিকে চলল।

গাছটার ছোট ছোট পাতা। এ-রকম গাছ পার্কের মধ্যে ও কয়েকটা দেখেছে। একটা বড় গাছের ডালে বাসা বাঁধেই ভাল হ’ত। এত ছোট গাছ বাড়ীর পাশে। ছেলে-পিলেগুলি টের পেলে আর রক্ষে থাকবে না। ওরা খুব চুপ ক’রে বসে থাকবে। বাচ্চাগুলি একবার উড়তে পারলেই হ’ল। পার্ক থেকে আসতে পুরুষ-পাখীর কত দেরি হয়। সকাল থেকেই ওর শরীর ভাল নেই। এইটুকু উড়ে আসতে ইঁপিয়ে পড়েছে। মাথা ঘুরছে কেন? সমস্ত শরীরটাও কেমন কেমন করছে। ভাই ত, নীচে পড়ে যাব না ত! কেন ওকে পাঠালো, কি করবে ও একা একা—বুকের মধ্যেও কেমন করছে—এই স্বপ্নকারে—তাই ত—ছুটি ডিম!

পুরুষ-পাখী যখন ফিরে এল তখন ফর্সা হয়ে গেছে। বলল, “তোমার মাকে দেখতে পেলাম না। শুনলাম, পরশুদিনেব বাড়ির মধ্যে পড়ে উল্লস দিকে উড়ে গেছে।

অল্প সকলকে ব'লে এসেছি, এলেই এখানে পাঠিয়ে দেবে।”

“আন্তে, দেখছ না?”

“কি বলছ?”

“তুমি যেন কিছুই শুনতে পাও না। রাস্তার পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে, টের পেলেই যে ছুটে আসবে। পাশেই আবার এত বড় একটা বাড়ী।”

“ডিম পেড়েছ? তা এতক্ষণ বল নি কেন? ক'টা? দেখি, ছুটো?”

“চৌচিও না, চূপ করে বসো।”

পাখী ছুটি চূপ করে বসে থাকে; কেউ কোনও কথা বলে না। মাঝে মাঝে পুরুষ-পাখীটি অভ্যাস বশতঃ গল্প শুরু করে দেয়, কিন্তু মেয়ে-পাখীর চোখের দিকে চেয়ে আবার চূপ করে। এই ভাবেই ওদের কয়েক দিন কাটল।

এখানেও ওদের খাবার ভাবনা নেই। দূরের রকে ছেলেমেয়েগুলি মুড়ি-মুড়কির চৌড়া নিয়ে বসে। অর্ধেক খায়, অর্ধেক ফেলে দেয়। তার গোটাকয়েক কুড়িয়ে নিয়ে ওদের চলে যায়। মেয়ে-পাখীকে কখনও কখনও ও বেড়িয়ে আসতে বলে, নদীর পাড়ের গাছগুলির মধ্য থেকে অন্ততঃ রাত্তা ধরে সোজা কিছু দূর পর্যন্ত, কিন্তু সে তা সাহস করে না।

পুরুষ-পাখী এক দিন জিজ্ঞেস করল, “আর কত দিন?”

“বেশী দিন নয়। দিন-ছয়কের মধ্যেই ফুটবে। মাঝে মাঝে চোকরাবার শব্দ শুনতে পাই।”

“ছুটো বাচ্চা হবে?”

“ছুটো ডিম থেকে কি তিনটে বাচ্চা হয়?”

“তা বলছি নে। বেশ হবে তা হ'লে, ক'দিনে ওরা উড়তে পারবে?”

“কি করে বলব। মা ঠিক বলতে পারত। মা কিন্তু এক দিনও এল না। কাল সকালে তুমি একবার যাবে?”

“যাব এখন।”

পরদিন সকালে পুরুষ-পাখীটা যখন পার্ক থেকে ফিরে এল, তখন মেয়ে-পাখীটা একতলা বাড়ীর ছাদের উপর ব'সে কাঁদছে। গাছটা সেখানে নেই। শুধু তার কণ্ঠিত অংশটুকু পৃথিবীর বুক চিরে আকাশের দিকে তার নীরব ব্যথা উন্মুক্ত করে ধরেছিল।

“গাছটা কি হ'ল?” পুরুষ-পাখী জিজ্ঞেস করল।

“ওরা কেটে ফেলেছে।”

“বাসা?”

“সেটা গাছের মধ্যে।—”

“ডিম ছুটো?”

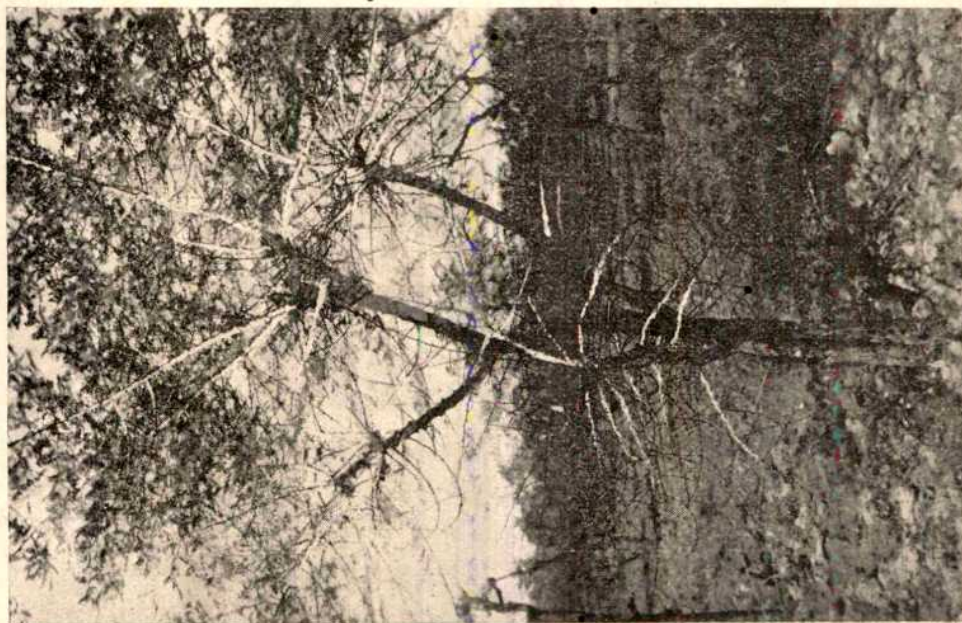
“তা দিয়ে এই বাড়ীর ছোট ছেলোটা গুলি খেলছে ওবা যে দু-দিন পরেই ফুটত, কত কষ্ট পাচ্ছে ওরা। হয়ত এতক্ষণ—ওগো আমি কেমন করে সহ্য করব?”

পাখী দুটোর কি হ'ল সে খবর আর কেউ জানে না। হয়ত ওরা আবার রাস্তার পাশে কোনও গাছে ফিরে গিয়েছিল, কোনও ঘরের কড়িকাঠে ব'সে কিচমিচ করতে শুরু করেছিল কোনও কবিকে কবিতা-লেখার প্রেরণা দিতে। কিন্তু মেয়ে-পাখীটিকে ভাগ্যবতী বলেই মনে হয়। ডিম কোটার পর গাছটা কাটা গেলে ওর যে দুঃখের কোনও অবশিষ্ট থাকত না!

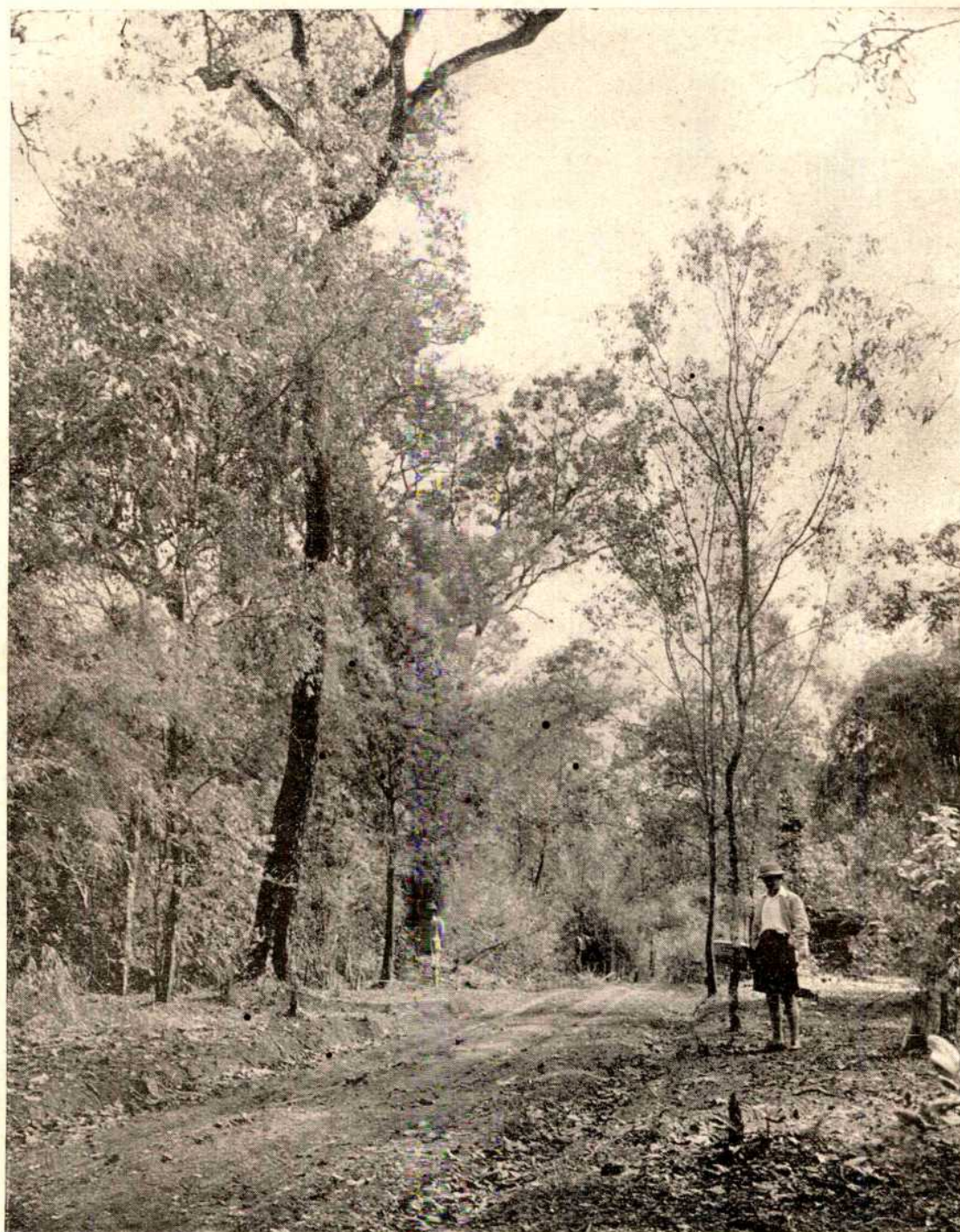




কলবান চালমুগুরা গাছ। ইহাই বাংলার সাধারণ চালমুগুরা



খদিরকে লাক্ষ। গাছের অন্তর্কাষ্ঠ হইতে খয়ের উৎপন্ন হয়



কুর্গের চন্দনবৃক্ষ। অরণ্যপথের দুই ধারে ১৯২০ সালে পোতা গাছের সারি

অরণ্য-সম্পদ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুপ্ত, আই. এফ. এস.

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের মনে অরণ্য-সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছাপ ফেলতে পারে নি। কাঠের গুঁড়ি বা জালানী কাঠ ছাড়া জগতের অরণ্য-লোক থেকে প্রতিদিনের ব্যবহার্য যে-সব জিনিষ আমরা পাই, এ প্রবন্ধ তাঁরই আলোচনা।

প্রথমে কাগজের কথা ধরি। বেশী কাগজ তৈরি হয় জার্মেনী, নরওয়ে, সুইডেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। প্রধানতঃ ডগলাস ফার (Douglas Fir) এবং স্প্রুস—এই দুই জাতের গাছের কাঠই ও-সব দেশের কাগজের মূল উপাদান। প্রথমে কাঠকে মণ্ডে পরিণত করা হয়। তার পর যে শ্রেণীর কাগজ তৈরি করতে হবে, সেই অনুপাতে অংশতঃ অথবা সম্পূর্ণভাবে তা রিচ অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিষ্কার করা হয়। তার পর যন্ত্রের পেয়ণে তা হয় কাগজ। ভারতবর্ষে যে-কয়টি কাগজের কল আছে, তাদের মধ্যে টিটাগড় পেপার মিল্‌স উল্লেখযোগ্য। এই মিলে কিন্তু মূল উপাদান হিসাবে কাঠের বদলে বাঁশ অথবা ঘাস ব্যবহার করা হয়। এর কারণ অবশ্য এ নয় যে, আমাদের দেশের অরণ্যে কাগজের উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছের অভাব আছে। আসল ব্যাপার হ'ল যে সেই সব গাছ ইতস্তত ভাবে অল্প নানা জাতীয় গাছের সঙ্গে মিশে নানা দেশময় ছড়িয়ে আছে, সেই জন্তে সেই সব গাছ থেকে কাঠ সংগ্রহ করার খরচ বেশী পড়ে যায়। সুতরাং নানা জাতীয় বাঁশ এবং ঘাসই উপযুক্ত। কাগজ তৈরি করবার জন্তে যে ঘাস ব্যবহৃত হয়, সেগুলো লম্বা জঙ্গলী ঘাস—তাদের মধ্যে ভাবর অথবা সাবাই ঘাসই হ'ল প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে প্রথম উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তার একটা লম্বা নাম আছে—ইসকোইমাম এন্ডাস্টি ফোলাম্ (Ischoeum angusti folium)। এই ঘাস সমগ্র উত্তর-

ভারতের পাহাড়ে পাহাড়ে জন্মায়। ১৯০৮-৯ সালে বাংলা দেশের অরণ্য থেকে এই ঘাস ৩২২৪ টন পাওয়া যায়, মূল্য চব্বিশ হাজার চুরানব্বই টাকা।

তার পর ছিপির কথা। কোয়েরকাস সুবার ও কোয়েরকাস অক্সিডেন্টালিস নামে দু-জাতের ওক গাছ আছে। সেই দু-জাতের ওক গাছের ছাল থেকে ছিপি তৈরি হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে যে-সব দেশ আছে, সেই সব দেশে, যেমন স্পেন, পর্তুগাল, কসিকা, দক্ষিণ-ফ্রান্স, ইতালী, উত্তর-আফ্রিকায় এই গাছ জন্মায়। যখন গাছগুলোর কুড়ি বছর বয়স হয় তখন তার ছালের উপরের স্তর কেটে ফেলা হয়। এই উপরের ছালকে নাথ-রণতঃ মেল-কর্ক অর্থাৎ পুরুষ কর্ক বলা হয় এবং সেটা কোনও কাজে লাগে না। তার পর যে নতুন ছাল জন্মায় তাকে বলে ফিমেল কর্ক অর্থাৎ মেয়ে কর্ক; সেই নতুন ছাল বা ফিমেল কর্ক থেকেই ছিপি হয়। প্রত্যেক ৮ কিংবা ১০ বৎসর অন্তর সেই গাছ কাটা হয়। আমাদের ভারতবর্ষে বহু বিভিন্ন জাতের গাছ আছে যা থেকে ছিপি হয় এবং সেই সব ছিপি এত নিকট শ্রেণীর যে ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী দেশ থেকে যে-সব ছিপি আমদানী হয়, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না।

এবার রবারের ব্যাপার বলি। রবার হ'ল সাধারণ নাম, কারণ জিনিষটা নানা বিভিন্ন ধরনের হয়। যাকে আমরা ইণ্ডিয়া রবার বলি এবং বাণিজ্য সম্পর্কে যার নাম হ'ল Catechu, সেটা নানা গাছগাছড়া এবং গুল্মের গোড়া অথবা শাখার রস জমিয়ে তৈরি হয়। আমাদের দেশে এই জাতীয় গাছের মধ্যে বটশ্রেণীর এক রকম গাছ আছে—তার নাম হ'ল Ficus charitica, সেইটাই হ'ল সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয়। এই জাতীয় গাছ স্বভাবতই পূর্ব দিকে নেপাল পর্যন্ত হিমালয়ের বাইরের অঞ্চলে জন্মায়।

আগে এই জাতীয় গাছের চাষ ভারতের কোন কোন অংশে করা হয়, কিন্তু ইদানীং এই জাতীয় গাছের প্রতি ভাগ্য বিরূপ হয়ে পড়েছে, এক রকম বিদেশী গাছ তাকে একেবারে বনে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেই বিদেশী গাছের নাম হ'ল হিভিয়া ব্রেজিলিয়েন্সিস—অবশ্য, নাম থেকেই বোঝা যায় যে ইনি এসেছেন ব্রেজিল থেকে। প্যারা-রবার ব'লে যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রবার বাজারে প্রচলিত তা এই গাছ থেকেই পাওয়া যায়। আজকাল সিংহল এবং ডাচ দ্বীপে বিস্তৃতভাবে এই গাছের চাষ হচ্ছে, কিন্তু জার্মানী যে সিনথেটিক রবার তৈরি করতে শুরু করেছে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রবারের চাষের টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারে আর এক রকমের রবার আছে তার নাম হ'ল সিয়ারা রবার, এই রবারও মনিহট গ্যাজিওভাই নামে এক শ্রেণীর বিদেশী গাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে হয়ত একথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আমরা যাকে ভল্কানাইট বলি এবং যা দ্বিজে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই তৈরি হচ্ছে, সেটা হ'ল রবার এবং গন্ধকের একটা সংমিশ্রণ।

কাচের পরিবর্তে আমরা সাধারণতঃ গাটাপাত্রের বহু জিনিষ ব্যবহার করি। সম্মিলিত মালয় ষ্টেট, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে পালা কুইয়াম গাছ ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়। সেই গাছের রস থেকে গাটাপাত্র তৈরি হয়।

অনেকে হয়ত জানেন যে পাথর থেকে ছাপবার কালি, সিলমোহরের মোম, গ্রামোফোন রেকর্ড, পালিস, বার্নিস প্রভৃতি জিনিষের প্রধান উপাদান হ'ল গালা। এই গালা কোন কোন গাছের ছোট ছোট ডালে ট্যাকডিয়া ভাক্স নামে এক রকম পোকের জীজাতিদের দ্বারা তৈরি হয়। এই জাতীয় গাছের মধ্যে পলাশ, কুম্ভম, বাবুল এবং কুল-গাছই প্রধান। নানা ভাবে পরিকার করে এবং গালিয়ে গালা থেকেই সেলল্যাক্ অর্থাৎ পাতা-গালা এবং বোতামের গালা তৈরি হয়। বিহার এবং উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ এবং ব্রহ্মের কোন কোন অংশ, আসাম, বুদ্ধপ্রদেশ এবং পঞ্জাব হ'ল গালা উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে, যেমন মালদহ জেলায়, কিছু কিছু গালা তৈরি

হয়। গালা উৎপাদন হ'ল প্রকৃতপক্ষে ভারতের একচেটে, কারণ জগতে যত গালা উৎপন্ন হয় তার শতকরা ৮৫ ভাগ ভারতবর্ষে জাত। ভারতের সংলগ্ন কোন কোন দেশে গালা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ভারতীয় গালার তুলনায় তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে না।

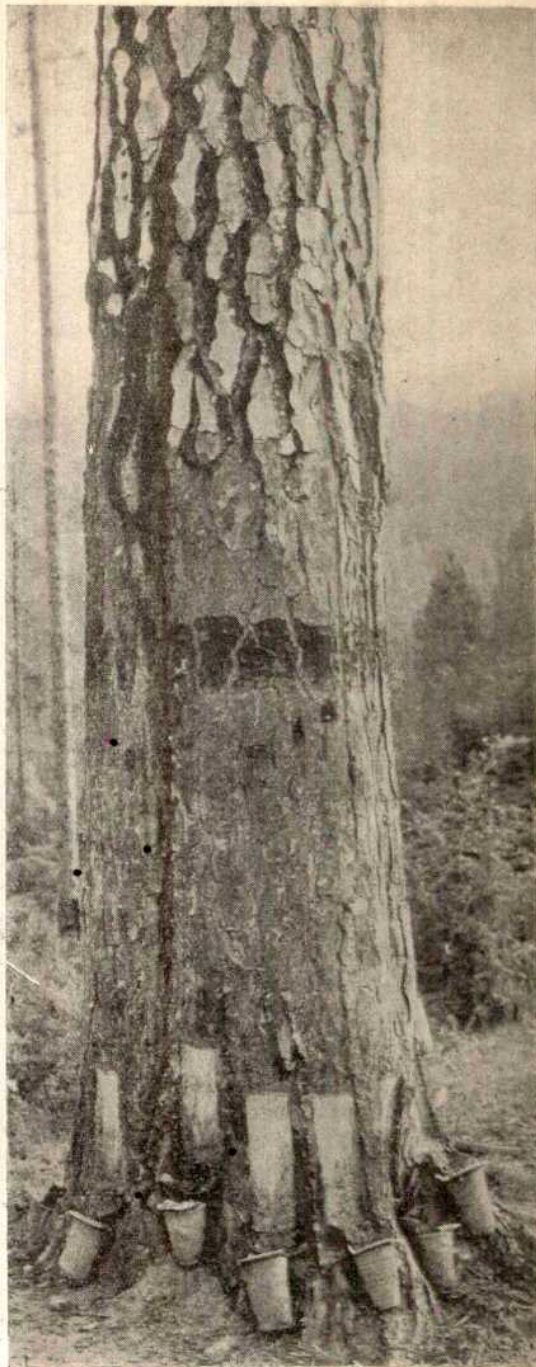
চন্দনকাঠ আমাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত, কিন্তু কেউ কেউ হয়ত নাও জানতে পারেন যে তার প্রয়োজনীয়তা কি এবং ঠিক কোথায় তা জন্মায়। ওজন ধরে যদি তুলনা করা যায়, তাহলে বলতে হয় যে চন্দনকাঠ হ'ল জগতে সকলের চেয়ে বেশী দামী কাঠ। চন্দন গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল স্যান্টালুম অ্যালবাম। এটা হ'ল এক রকমের পরজীবী গাছ। তার কারণ কতকগুলি গাছের শিকড়ের ওপর এই গাছ জন্মায় এবং সেই সব গাছের শিকড় থেকেই চন্দনগাছের জীবিকা নির্বাহ হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কুর্গ এবং প্রধানতঃ মহীশূরে এই গাছ জন্মায়। চন্দন কাঠ চুইয়ে স্যাণ্ডাল অয়েল নামে এক রকম তেল পাওয়া যায়; ইউরোপ এবং আমেরিকায় খুব উচ্চদরের গন্ধদ্রব্য তৈরি করার জন্য এই তেল ব্যবহার করা হয়। আগে চন্দন কাঠ চুইয়ে তেল বার করা শুধু ইউরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সেই হ'ত; কিন্তু আজকাল ভারতবর্ষে, মহীশূরে এবং অযোধ্যায় তা হচ্ছে।

রেড স্যাণ্ডার্স নামে আর এক রকম কাঠ আছে—যাকে আমরা বলি রক্তচন্দন। আসল চন্দনের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। রক্তচন্দনের তিলক ব্রাহ্মণদের কপালে প্রায়ই শোভা পায়। আগে রক্তচন্দন বিশেষ মাত্রায় যুরোপে রপ্তানী করা হ'ত, কিন্তু গ্যানিলাইন্ড আই আবিষ্কারের পর থেকে এই রপ্তানী বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এখন এই কাঠের ব্যবহার যা কিছু ভারতবর্ষেই হয়। দক্ষিণ-ভারতে টেরো-কার্পাস স্যান্টালিম্স ব'লে এক রকমের ছোট গাছ আছে, তাই থেকে এই দরকারী কাঠ আমরা পাই।

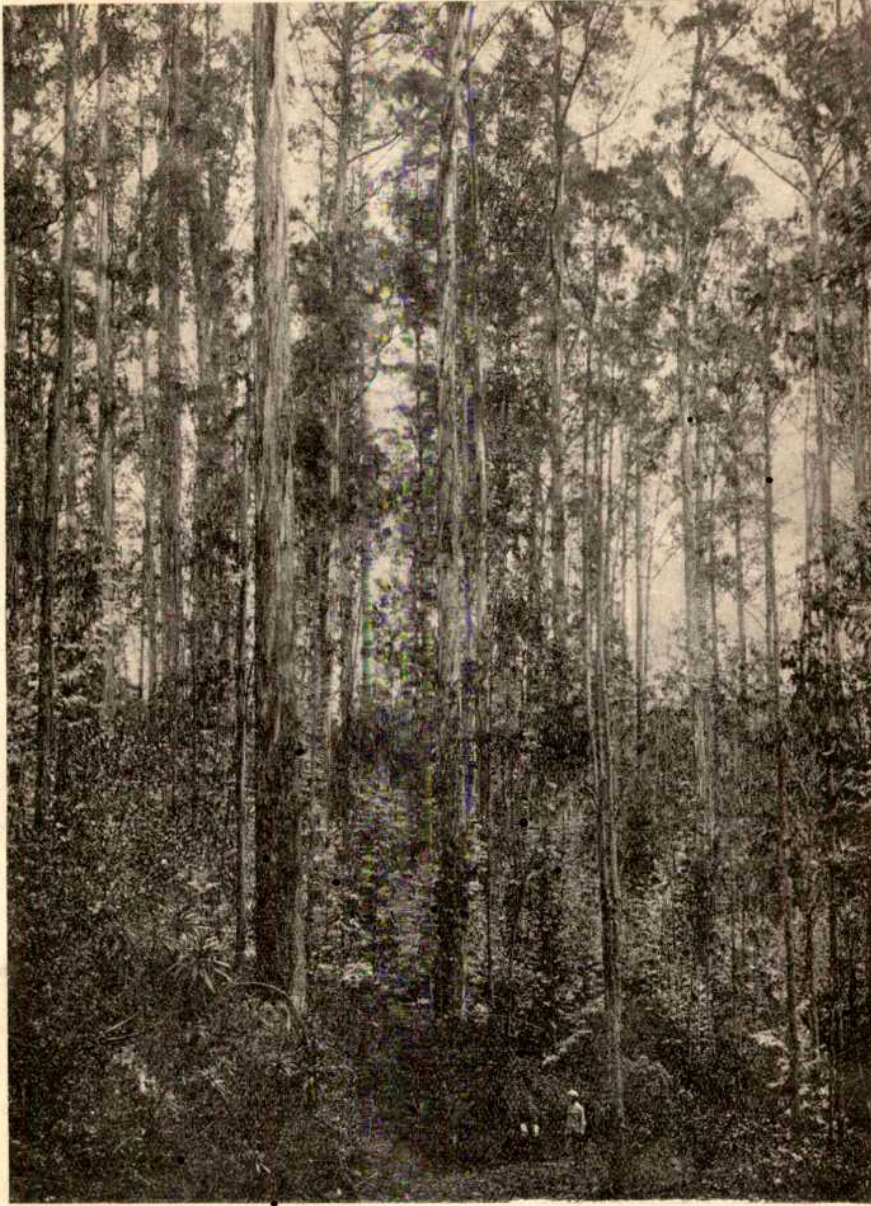
'এসেনশিয়াল অয়েল'-এর ব্যবসাকে রীতিমত দরকারী ব্যবসা ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। এই জাতীয় পাতলা তেল এক রকম ঘাস চুইয়ে পাওয়া যায়। ইহা কতকগুলি বিশেষ স্থানিদ্ধিষ্ট কাজে লাগে, তা ছাড়া, এই জাতীয় তেল

সাধারণত টুথপেপে, গায়ে মাখবার ভাল সাবান এবং মাথা ঘষবার স্ফুগন্ধি তেলে কখনও আলাদা কখনও সংমিশ্রিত ভাবে ব্যবহৃত হয়। সিংহল, জাভা এবং ভারত-মহাসাগরের সেচেলেস দ্বীপপুঞ্জে সিধোপোগন নার্ডাস ব'লে এক রকম ঘাস পাওয়া যায়। সেই ঘাস থেকে সিট্রোনেল্লা তেল পাওয়া যায়। মশা-তাড়ানোর জন্তু এই তেল ভারতবর্ষে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। প্রধানত দক্ষিণ-ভারতে এবং সেচেলেস দ্বীপে সিধোপোগন সাইট্রেটাস ব'লে এক রকম ঘাস জন্মায়, তার থেকে বাজারের ট্রাভাকোর লিমন গ্রাস অয়েল পাওয়া যায়। মধ্যপ্রদেশে, নিমার, বেরার এবং বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশে এবং সেচেলেস দ্বীপে সিধোপোগন মার্টিনি ব'লে যে ঘাস পাওয়া যায় তার আবার দুটো আলাদা জাত আছে। মোতিয়া জাতের ঘাস থেকে গোলাপগন্ধি পান্নারোসা তেল—যাকে নিমার অথবা ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান জেরেনিয়াম অয়েল বলা হয়, সেই তেল পাওয়া যায় এবং সোফিয়া জাতের ঘাস থেকে বাজারের জিঞ্জার গ্রাস তেল পাওয়া যায়। সিধোপোগন ফ্লেঙ্কুয়ুসাস ব'লে দক্ষিণ-ভারতে আর এক রকম ঘাস হয়, তা থেকে আমরা বাজারে মালাবার তেল অর্থাৎ কোচিন তেল পাই। এই ধরনের আরও কতকগুলি ঘাস আছে যা থেকে এসেনশিয়াল অয়েল আমরা পাই বটে, কিন্তু সে-সব তেলের ব্যবসাগত কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই।

তার পর আসে ইউকালিপ্টাস তেলের কথা। যখন বেশ সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগে, তখন আমাদের সকলকেই এই তেলের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হয়। নানা জাতীয় ইউকালিপ্টাস গাছের পাতা এবং কচি কচি ডাল চুইয়ে এই তেল পাওয়া যায়। ইউকালিপ্টাস গ্লোবিউলাস জাতীয় গাছ থেকে (যার সাধারণ নাম হ'ল ব্লু-গাম গাছ) আমরা সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট জাতের ইউকালিপ্টাস পাই। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টাসমানিয়ার জঙ্গলে ল্যাবিলার্দিয়ার নামে এক জন লোক এই গাছ আবিষ্কার করেন এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যামেল এই গাছ ইউরোপে নিয়ে আসেন। ইউকালিপ্টাস তেলের নানা গুণের জন্তু আজকাল সারা জগতে এই গাছের চাষ হয়। আমাদের দেশে নীলগিরি অঞ্চলে এই গাছ ব্যাপক-ভাবে আছে। যদিও জগতের প্রয়োজনীয় ইউকালিপ্টাস তেল



আলমোরা অরণ্যের দীর্ঘপত্র হিমালয়-পাইন। গাছের নীচের দিকে চেরার দাগ। এই অংশ হইতেই রজন বাহির হইয়া মাটির পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে।



মাত্রাজের উটাকামণ্ডের অরণ্যে ব্রু-গাম বৃক্ষরাজি। ইহা হইতেই

বাজার-চলতি উৎকৃষ্ট ইউক্যালিপ্টাস তৈল পাওয়া যায়

অধিকাংশই অষ্ট্রেলিয়া থেকে আসে, তবুও ভারতবর্ষেরও অয়েল ব'লে এক রকম তেল পাওয়া যায়। এই তার মধ্যে কিছু অংশ আছে। গ্যান্‌পিরিন খুব তেলই হ'ল গ্যান্‌পিরিনের মূল উপাদান। এই তেলের একটা প্রচলিত গুণ্ড। জেরুলথেরিয়া ফ্র্যাগ্রান্টিসিমা অধিকাংশই আমেরিকা থেকে সরবরাহ করা হয়। নামে ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এক রকম আমাদের দেশের তৈরি তেল আমেরিকার তেলের মতই গাছ জন্মায়। সেই গাছের পাতা চুইয়ে উই-টার-গ্রীন উৎকৃষ্ট হ'লেও বাণিজ্যের উপযোগী বৃহৎ ভাবে এই তেলের

ব্যবসা আমাদের দেশে করা হয় নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ-কাল বাজার-চলতি অধিকাংশ গ্যাসপিরিনই রাসায়নিক সংমিশ্রণে তৈরি হয়।

চর্মরোগের পক্ষে চালমুগরা তেল বিশেষ উপযোগী। শ্রর নিওলার্ড রোজাস যখন আবিষ্কার করলেন যে এই তেল কুষ্ঠব্যধির পক্ষে বিশেষ উপকারী, তখন থেকে এই তেলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে বেড়ে গিয়েছে। তিনটি বিভিন্ন জাতীয় গাছের বীজ থেকে এই তেল পাওয়া যায়। যথা, Taraktogenos, Kurzii, Gynocardia odorata। প্রথমোক্ত গাছ থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট তেল পাওয়া যায়। এই গাছ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে জন্মায়। দ্বিতীয় গাছ থেকে মধ্যম শ্রেণীর তেল পাওয়া যায় এবং এই গাছ বাংলা, ব্রহ্মদেশ এবং আসাম অঞ্চলে জন্মায়। শেষোক্ত গাছ থেকে যে তেল পাওয়া যায় ব্যবসার বাজারে তার বিশেষ কোন চাহিদা নেই—এই গাছ হিমালয়ের পূর্ব অঞ্চলের জঙ্গলে পাওয়া যায়। ইনকুয়েঞ্জার গুণে সিনামন অয়েল হ'ল প্রধান অঙ্গ। দক্ষিণ-ভারতে এবং ভারতের পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে *cinnamomum zeylanicum* ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়। সেই গাছের পাতা চুইয়ে এই তেল পাওয়া যায়। সেচেল্লিস দ্বীপপুঞ্জও এই জাতীয় গাছ জন্মায়, এবং সেখানে পাতা চুইয়ে তেল বার করবার তিরানকইটি ডিস্টিলারী আছে। এই গাছের ছালই হ'ল আমাদের ডালচিনি।

গারা রোলাণ্ডের ম্যাকাসার অয়েল ব্যবহার করেছেন, এই তেল কি ভাবে তৈরি হয়, তা জানতে হয়ত তাঁদের ঔৎসুক্য থাকতে পারে। প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বুল্লপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে *Sekeleichera trijuga* নামে এক রকম গাছ জন্মে, সাধারণত আমরা এই গাছকে কুহুম গাছ বলি। এই কুহুম গাছের বীজ থেকে যে কুহুম তেল তৈরি হয় তাই হ'ল সেই মাথার তেলের প্রধান উপাদান। ব্রহ্মদেশ, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-ভারতে এই রকম গাছ জন্মায়। তার নাম হ'ল ষ্ট্রিকাস-নাক্স-ভোমিক, এই গাছের বীজ থেকে নাক্স-ভোমিকা তৈরি হয়। নাক্স-ভোমিকা থেকে ষ্ট্রিকনি পাওয়া যায়। তেতো চিরেতার কথা আপনারা সকলেই জানেন। হিমালয়ের উচ্চতর অঞ্চলে

Swertia chirata ব'লে এক রকম লতাগুল্ল জন্মে, সেই শুকনো লতাগুল্লই হ'ল আমাদের চিরেতা।

কতকগুলি গাছের পাতা ও কচি কচি ডাল বাষ্পের সাহায্যে চুইয়ে কর্পূর পাওয়া যায়। বাজারে দু-রকমের কর্পূর চলতি আছে। একটি হ'ল জাপানী কর্পূর, সেইটেই হ'ল সাধারণ যে কর্পূর আমরা ব্যবহার করি। আর একটি হল বোরিও কর্পূর।

চীন জাপান এবং জাপানের অধিকাংশভূত্ব কর্মোসা দ্বীপে *cinnamomum camphora* ব'লে গাছ জন্মায়, তার থেকে প্রথমোক্ত কর্পূর তৈরি হয় এবং এই কর্পূরই বৃহৎ মাত্রায় ইউরোপে চালান যায়। বোরিও, সুমাত্রা এবং সম্মিলিত মালয় ষ্টেটে *Dryabalanops Oromatica* ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়, সেই গাছ থেকে বোরিও কর্পূর পাওয়া যায়। বর্তমানে জগতের প্রয়োজনীয় কর্পূরের বহু অংশ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় এবং প্রধানতঃ জার্মেনীতেই তা হয়, কিন্তু সেই রাসায়নিক পদ্ধতিরও মূলে আছে টারপেনটাইন যা আসে জঙ্গল থেকে। টারপেনটাইনের কথাও এইবার বলছি। •

আজকাল বড়লোকের বৈঠকখানায় বার্গিস ল্যাকারের কাজ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এই ল্যাকারের বার্গিস কি ক'রে পাওয়া যায় তা হয়ত অনেকে জানেন না। বম্বা ও শ্বামের জঙ্গলে *melonorrhoea usitata* ব'লে এক রকম গাছ জন্মায়। এই গাছ থেকে আলকাংরার মত এক রকম রস বার করা হয়। সেই রস থেকেই খিটসি ওয়েল ব'লে এক রকম তেল তৈরি হয়। এই তেল হ'ল ল্যাকারের মূল উপাদান। বাল্ল টেবিল ডিশ এবং অনুরূপ ভারী জিনিষের জন্যে ল্যাকারের কাজের ভিত্তি স্বরূপ বাঁশ এবং হালকা কাঠ ব্যবহৃত হয় এবং চুকটের বাল্ল-জাতীয় ছোটখাটো জিনিষের জন্যে কাপড়ই ব্যবহৃত হয়।

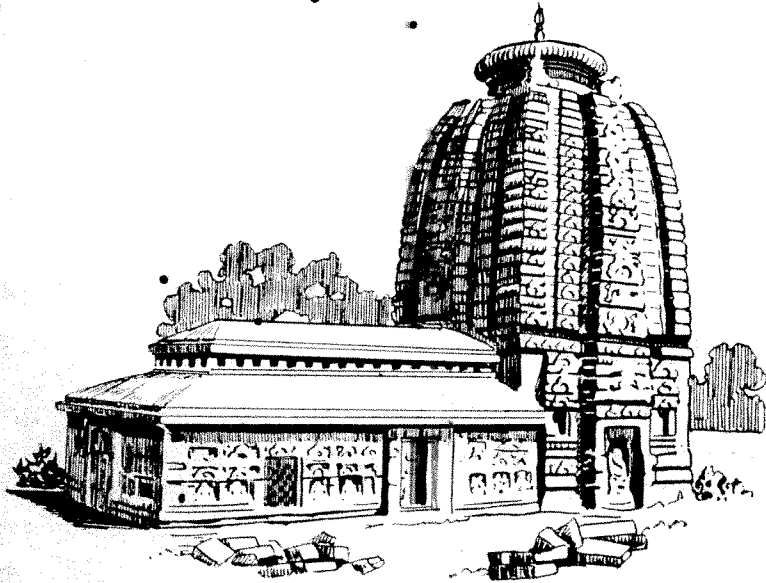
আমরা যাকে রজন বলি ইংরেজীতে তার নাম হ'ল রোসিন, কখনও কখনও কোলোকিনিও বলা হয়। সাবান, অয়েল-ক্লথ, লিনোলিয়াম কাগজ, সিলমোহরের মোম, গ্রামোফোন রেকর্ড, বৈদ্যাতিক ইনসুলেটর প্রভৃতির নির্মাণকার্যে রজন লাগে। পাইন-জাতীয় গাছের গুঁড়ি থেকে রোসিন পাওয়া যায়। চোদ্দাবার সময় টারপেনটাইনের

সঙ্গে রজনও পাওয়া যায়। টারপেন্টাইন হ'ল রং গোলবার একটা মূল উপাদান, জিনিষের উপরে রঙে ছাপাবার কাজে রংকে পাকা করবার প্রধান জিনিষ, জুতোর পালিস, মালিস প্রভৃতির প্রধান অঙ্গ এবং আগেই বলেছি যে রাসায়নিক কপূরের ভিত্তি। রজন এবং টারপেন্টাইনের ব্যবসায় জগতের উৎপন্ন পণ্যের শতকরা ৭০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে, শতকরা ২৫ ভাগ ফ্রান্সের অধিকারে এবং মাত্র বাকী শতকরা ৫ ভাগ সারা জগতের বিভিন্ন জাতির অধিকারে আছে। যে-সব পাইন থেকে বাজার চলতি রজন পাওয়া যায় তাদের মধ্যে হিমালয়ের পাতা-গুলা Pinus longifoliaই হ'ল সর্বপ্রধান। তার পর হ'ল Pinus excelsa, যার অন্ত নাম হ'ল দিব্রু পাইন। বর্মার পাইন গাছের মধ্যে Pinus Khasyaই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২২ সাল হ'তে পাইন গাছ থেকে রজন বার করবার কাজ স্থানীয়ভাবে আরম্ভ হয়। মহাবুদ্ধের সময় শেলে বুলেট বসাবার জন্তে রজনের ব্যবহার খুব ব্যাপকভাবে চলছিল এবং যখন আমেরিকা ও ফ্রান্স থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে গেল

তখন ভারতবর্ষে যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করবার কারখানায় পঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের রজনই ব্যবহার করা হয়েছিল।

Boswellia ব'লে কয়েক শ্রেণীর গাছ আছে যা থেকে alibanum ব'লে আটার মত এক রকম জিনিষ পাওয়া যায়। ধূপকাঠির প্রধান উপাদান হ'ল এই alibanum. আরব এবং উত্তর-আফ্রিকা থেকেই সর্বোৎকৃষ্ট ধূপ আমরা পাই। ভারতবর্ষে আমরা যে ধূপ পাই তা প্রধানত Boswellia serata নামে এক রকম গাছ থেকে হয়। এই গাছ ভারতের মধ্যে প্রধানত মধ্যপ্রদেশে এবং দক্ষিণ-ভারতে জন্মায়।

আমরা সাধারণত যে ধুনা ব্যবহার করি এবং যার বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল Gum Benzoin, মালয় দ্বীপপুঞ্জে Styrax benzoin ব'লে এক রকম ছোট ছোট গাছ হয়, তার থেকে উহা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই জাতীয় গাছের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Styrax serrulatum canarium Sikkimense, শাল এবং অর্জুন।



শীত-সন্ধ্যা

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শীতের কুহেলিখন সন্ধ্যায়
স্বপনের অল্পভবে লভি' তায়
আবেশ নামিল চোখে,—
এই দেহ-নিশ্বাসকে
ফেলে রেখে ভেসে যেতে মন চায়।

অশ্রুর অশ্রুত ভাষাতে
বুক বাঁধা স্তব্ধহীন আশাতে ;
কিছুতেই বুঝি না যে
সহসা শীতের সাঁঝে
সে বাঁধ মিলায় কেন হাওয়াতে।

চকিতে চমকি ভাবি, 'তাই কি !
বারে বারে পথ ভুলে যাই কি ?
বেদনার বুক চিরি
মাহারে খুঁজিয়া ফিরি
ত্রিভুবনে কোথাও সে নাই কি ?'

ঝাপসা নয়নে দূরে ওঠে চাঁদ
নেই নব জ্যোৎস্নার মায়াফাঁদ,
কুন্দকলির হারে
কে আজ সাজাবে তারে
আদরে ঘোচাবে সব অবসাদ।

হিমেল হাওয়ায় তার কান্না
উছসিত, আর না গো আর না ;
ও দুই নয়নতলে
বেদনার শোভা বলে
জলে-থলে ফলে শত পান্না।

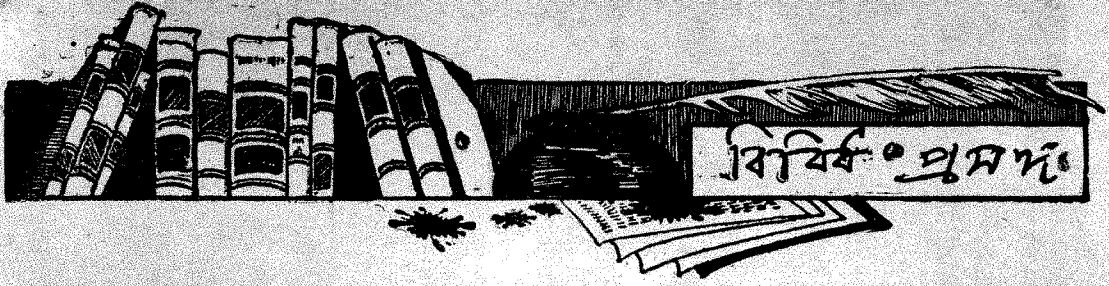
আমার বেদনা পেল রূপ কি !
অশ্রুর বাষ্পের ধূপ কি
মোর প্রতি নিঃশ্বাসে ?
আকাশে বাতাসে ভালো
মুখর ভাষণ, তাই চুপ কি !

ফাগুনের ফুলদলে ভুলেছি
এবার ব্যথার ঢেউয়ে ভুলেছি,
উত্তরী বাতাসের
বানে গুগো দখিনের
দুখ আজ নিঃশেষে ভুলেছি।

পদ্মদীঘির পারে চলে যাই,
জানি জানি, জানি সেথা ফুল নাই,
মৃণাল মলিনমুখী
আমি তার দুখে দুখী,
কামনা-কমলে মোর দল নাই।

চঞ্চল গিল্লোল হারা হায়
নিতল দীঘির জল মুরছায় ;
পাংশু পাতার পুরে
শীতল বায়ু সঞ্চরে,
বুকে কাঁপে হিমকণা লঙ্কায়।

নীরব বিজন এই লগনে
সন্ধ্যার সন্ধ্যায় স্বপনে
নয়নের মণি ছুটি
যে শোভা নিয়েছে লুটি
তারে তুলে রাখি মন-গহনে ॥



পৌষ মাসে বহু সভাসমিতির অধিবেশন

ভারতবর্ষে যে-রাজার অধীন, তিনি খ্রীষ্টিয়ান এবং তাঁহার নিযুক্ত প্রধান শাসনকর্তারা খ্রীষ্টিয়ান। এই কারণে খ্রীষ্টিয়ানদের বড়দিন উপলক্ষ্যে এদেশের আপিস আদালত স্থল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ থাকে। আগে দুই-তিন দিন ছুটি হইত। লর্ড কার্জনের আমল হইতে ছুটি দীর্ঘতর হইয়া আসিতেছে। এই বড়দিন পৌষ মাসে পড়ে।

অষ্ট শতাব্দী পূর্বে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়, তখন হইতে পৌষ মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন ব্যতীত অল্প অনেক সভাসমিতির অধিবেশনও হইয়া আসিতেছে। মধ্যে কয়েক বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন পৌষ মাসে না হইয়া অল্প সময়ের হইয়াছিল; এবার আবার পৌষেই উহার অধিবেশন হইয়াছিল। ডিসেম্বরের অর্ধেক ও জানুয়ারী মাসের অর্ধেক পৌষ মাসের মধ্যে পড়ে। গত পৌষে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিষয়ক, ধর্মবিষয়ক, সংস্কৃতিসম্বন্ধীয় ও অন্তর্বিধ এত সভাসমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, যে, তাহাতে বাহা কিছু বলা ও করা হইয়াছে তৎসমুদয়ের উল্লেখ ও আলোচনা একখানি মাসিকপত্রের কয়েকটি পাতায় করা অসম্ভব। বড় বড় দৈনিকেও তাহাদের অনেকগুলির সংবাদ সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে, এবং অনেকগুলির কার্যকলাপের কোন আলোচনাই সম্ভবপর হয় নাই।

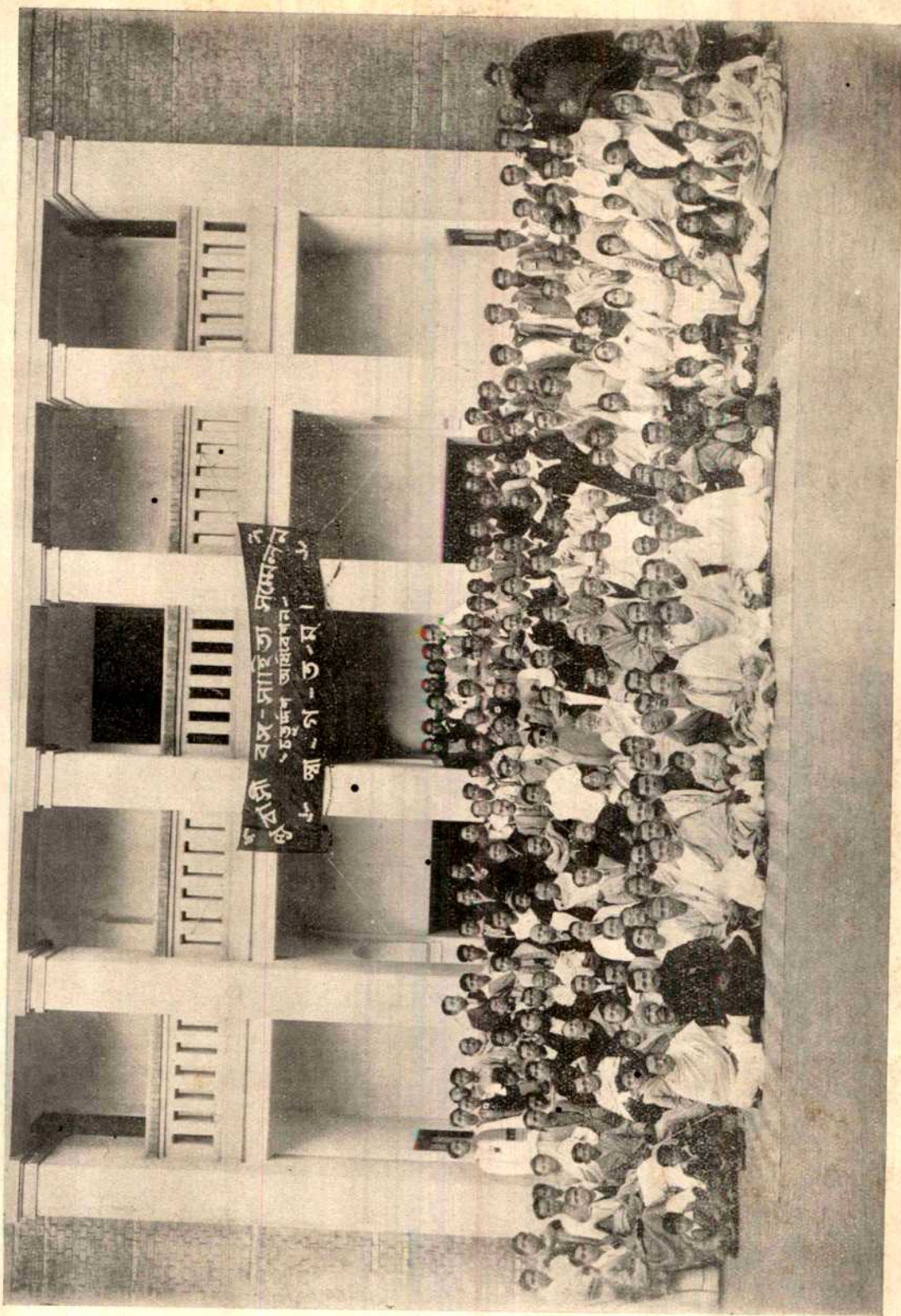
এত রকমের সভাসমিতির অধিবেশন হইতে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে, ভারতবর্ষের লোকেরা কেবল রাজনীতির কথা ভাবিতেছেন না, অল্প অনেক বিষয়েও তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মন দিতেছেন। এমন যদি হইতে পারিত, যে, সকলেই, কেমন করিয়া দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার সুপরিবর্তন হয়, কেমন করিয়া দেশকে স্বাধীন করা যায়, তাহার চিন্তা ও আলোচনা করিতেন, এবং দেশ স্বাধীন

হইবার পর অল্প সব বিষয়ে মন দিতেন, তাহা হইলে মন্দ হইত না। কারণ, বাস্তবিক পরাধীন দেশে অরাজনৈতিক কোন বিষয়ে কোন দিকে সম্যক উন্নতি হইতে পারে না, সে রকম উন্নতির সর্ববিধ চেষ্টাও পূর্ণমাত্রায় করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, স্বাধীনতার চেষ্টাও অল্প অনেক দিকে উন্নতির উপর নির্ভর করে। তাহার দু-একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দি। সামাজিক তামিলা উপেক্ষা অবহেলা লাঞ্ছনা উৎপীড়ন হইতে দেশের নানা শ্রেণীর অগণিত লোক মুক্তি না পাইলে তাহারা স্বাধীনতার জন্ত সমবেত চেষ্টায় যোগ দিবে কেমন করিয়া? অতএব সামাজিক প্রচেষ্টাও চাই। স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বাস্তব ও আহ্বান এই বিশাল দেশের সর্বসাধারণের নিকট পৌছাইতে হইলে অন্ততঃ সকল প্রাপ্তবয়স্ক লোককে লিখনপঠনক্ষম করা আবশ্যক।

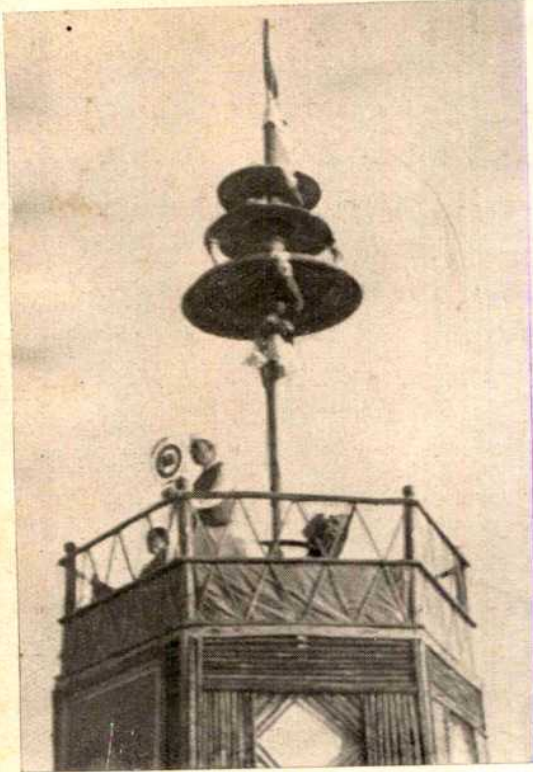
সকল রকমের সংস্কারকার্য এবং উন্নতি প্রগতি পরস্পর-সাপেক্ষ।

সুতরাং রাষ্ট্রনৈতিক ছাড়া অল্প রকমের বিস্তার সভাসমিতির প্রয়োজন আছে। যাহার যেরূপ শক্তি কৃতি হুযোগ অবস্থা তিনি তদনুসারে যেটি বা যে-যে গুলির সহিত সক্রিয় যোগ রাখিতে পারেন, রাখিবেন।

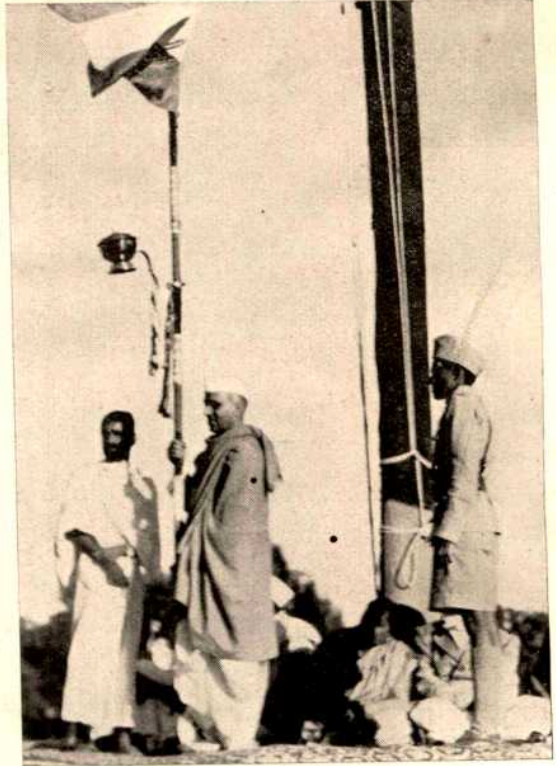
অবস্থাবৈশিষ্ট্যে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় যোগ দিবার যো নাই। তাঁহারা গবর্নমেন্টের চাকরী করেন বলিয়া তাঁহাদের এ বিষয়ে স্বাধীনতা নাই। তাঁহাদের অনেকের আর্থিক অবস্থা ভাল; কর্মশক্তি অল্পাধিক সকলেরই আছে; এবং স্বদেশহিতৈষণাতেও তাঁহাদের অনেকে রাষ্ট্রনৈতিক কর্মীদের সকলের চেয়ে নিয়ন্ত্রণীয় নহেন। সামান্য বা পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টা ছাড়া অল্প যত রকমে দেশের হিত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা করিলে তাঁহাদের দেশহিতৈষণা সফল হয়, তাঁহাদের শক্তির ও অর্থের সদ্যবহার হয়, এবং দেশের কিছু কল্যাণ হয়।



স্বাচিৎ অল্পজিৎ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন উপলক্ষে সমবেত প্রতিনিধি, অত্রার্থী-সমিতির সদস্য ও সভাপতিগণ



ফৈজপুর কংগ্রেস-মঞ্চ হইতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু
তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন



ফৈজপুর টিলকনগরে কংগ্রেসায়িবাহকের হস্ত হইতে গ্রহণ
করিয়া সভাপতি জবাহরলাল কংগ্রেস-বর্তিকা ও
পতাকা উত্তোলন করিতেছেন



নিখিল-ভারত পল্লীশিক্ষাপ্রদর্শনীর উদ্বোধনে মহাত্মা গান্ধী মাইক্রোফোন-সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছেন



রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের আচার্য্য, অধ্যাপকগণ, ছাত্রবৃন্দ ও তিন জন অতিথি

রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়

১৯১৬ সালে যুবক সন্ন্যাসী স্বামী যোগানন্দ সহকর্মীগণের কলিকাতার প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম ও তৎসংলগ্ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্ত স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট নানা যুক্তি দিয়া একটি আবেদন করেন। মহারাজ আবেদনপত্র পাইয়া কলিকাতার ঐ ক্ষুদ্র আশ্রম-বিদ্যালয় দেখিয়া খুশী হন এবং একটি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন ও চালনার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হইতে স্বীকৃত হইলে ১৯১৭ সালে দামোদর ষ্টেশনের নিকট দামোদর-তীরে স্বামী যোগানন্দ কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ সালে এই বিদ্যালয়টি রাঁচিতে স্থানান্তরিত হয়। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিদ্যালয়ের জন্ত কোনও স্থায়ী স্থান বা অর্থ বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যু হওয়ায় এবং স্বামী যোগানন্দের অল্পপস্থিতিহেতু

অত্যন্ত কষ্টগণ হঠাৎ পৃষ্ঠপোষকহীন হইয়া অতিকষ্টে বিদ্যালয় চালাইতে থাকেন। এই অভাবের মধ্যেও বিদ্যালয়ের কোন বিভাগের কর্ম বন্ধ হয় নাই। ১৯৩৫ সালে স্বামী যোগানন্দ ১৫ বৎসর পর আমেরিকা হইতে আগমন করিয়া বিদ্যালয়টিকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিয়া তাহার আমেরিকান শিষ্য ও বন্ধুবর্গের এবং বাংলা দেশের কোন মহাত্ম্যব ব্যক্তির অর্থসাহায্যে রাঁচির ৭০ বিঘা বিস্তীর্ণ বাগানটি আশ্রমের জন্ত খরিদ করেন। তাহার অল্পরোধে বর্তমান মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী কিছু কম মূল্যে এই বাগান বিক্রয় করেন। স্থায়ী স্থান পাইয়া বিদ্যালয় নানা ভাবে কর্মে অগ্রসর হইতেছে। নানা স্থান হইতে সাহায্য পাইবারও সম্ভাবনা হইয়াছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি “যোগদাসংসদ সোসাইটি” নামে ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে রেজিস্ট্রীকৃত সমিতির ট্রাস্টিগণের অধীন। ইহা এখন কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে।

বিদ্যালয়-সংলগ্ন যোগদান সংস্কৃত আশ্রমে যে কোনও ধর্মাবলম্বী ধর্মপিপাসু ব্যক্তি সাধন ভজন করিতে পারিবেন।

এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের ও অবহেলিত শ্রেণীর লোকদিগের জন্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ের কার্যও চলিতেছে। এই সমস্ত জনসেবামূলক কর্মের জন্ত এবং বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগাদির জন্ত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা এই বিদ্যালয় দেখিয়াছি। ইহাতে ছাত্রেরা সুশিক্ষা পাইয়া থাকে। ইহা বাঙালীর প্রতিষ্ঠান এবং সর্বসাধারণের সাহায্য ও সহায়ত্ব পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

রাঁচির ‘বালিকা শিক্ষাভবন’

বাংলা দেশের বাহিরে এবং যাহা বাস্তবিক বাংলা দেশের অন্তর্গত কিন্তু অল্প প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে একপ স্থানেও বাঙালী বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ নহে। বাঙালী বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এরূপ স্থান-সমূহে আরও কঠিন। কঠিনতার একটি কারণ এই, যে, এই সকল স্থানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং বাঙালীর সংস্কৃতির সহিত বালক-বালিকাদিগের যোগ স্থাপন ও রক্ষা করা সুসাধ্য নহে। স্থলের বিষয়, নানা বাধাবিলম্ব সত্ত্বেও এইরূপ অনেক স্থানের বাঙালীরা বালক-বালিকাদিগকে বাঙালী রাখিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। রাঁচির ‘বালিকা-শিক্ষাভবন’ তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। এই বিদ্যালয়টি হইতে বালিকারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারে। আগামী বারে ১৫১৬টি বালিকা এই পরীক্ষা দিবে। ছাত্রীদিগকে এই পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ তিনটি শ্রেণী ইহাতে আছে। মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে আগেকার শিক্ষা পাইয়া ছাত্রীরা এখানে ভর্তি হয়। যাহারা এখান হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়, তাহাদের এই একটি অসুবিধা আছে, যে, তাহারা রাঁচিতে পরীক্ষা দিতে পারে না, তাহাদিগকে কলিকাতা কেন্দ্রে গিয়া পরীক্ষা দিতে হয়। ইহাতে ব্যয়বাহুল্য ও অল্প অসুবিধা আছে। সকল ছাত্রীর অভিভাবকদের এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিবার ক্ষমতা নাই। বর্তমানে বাংলা ও

আসাম এই দুটি প্রদেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত। এই দুটি প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কেন্দ্র নাই। অন্য কোথাও কেন্দ্র হইতে পারে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বা কোন নিয়মে এরূপ নিষেধ আছে কি না জানি না। যদি না-থাকে, তাহা হইলে বর্তমান কক্ষিষ্ঠ ও বিদ্যোৎসাহী ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্রীমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাঁচিতে প্রবেশিকার একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিলে তথাকার পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচি অধিবেশন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন রাঁচিতে স্থানিকাহিত হইয়াছে। এইরূপ সম্মেলনগুলি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি হইবার আশা কেহ করে না। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উনিশবার হইয়া গিয়াছে; কয়েক বৎসর স্থগিত থাকিয়া তাহার বিংশ অধিবেশন চন্দননগরে হইবে। বাংলার নিজস্ব এই সম্মেলনটির দ্বারা সাহিত্যের বিশেষ কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। তথাপি তাহা ব্যর্থ বিবেচিত হয় না। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বারা সেরূপ কিছু ফল উৎপন্ন না হইলে তাহা নৈরাশ্রজনক মনে করিবার কোন কারণ নাই।

বঙ্গের সাহিত্য-সম্মেলনে ভারতবর্ষীয় রাজনীতির আলোচনা নিষিদ্ধ কিনা, জানি না। কিন্তু প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কোন বিষয়ের আলোচনা না-করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে অনেকেই গবর্নমেন্টের কর্মচারী বা পেন্সানভোগী বা তাহাদের পরিবারভুক্ত। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রবাসী সমুদয় বাঙালীকে বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত যোগ ও সংস্পর্শ রক্ষা করিবার সুযোগ দেওয়া। তজ্জন্ত বিশেষ কোন শ্রেণীর বাঙালীদিগকে ইহা হইতে বাদ দেওয়া যায় না; এবং সরকারী চাকুরিয়া বা পেন্সানভোগীদিগকে ইহার সহিত যুক্ত রাখিতে হইলে রাজনীতির চর্চা ইহার অধিবেশনগুলিতে করা চলে না। রাজনীতির প্রকাশ্য আলোচনা না-করিলে সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক বা



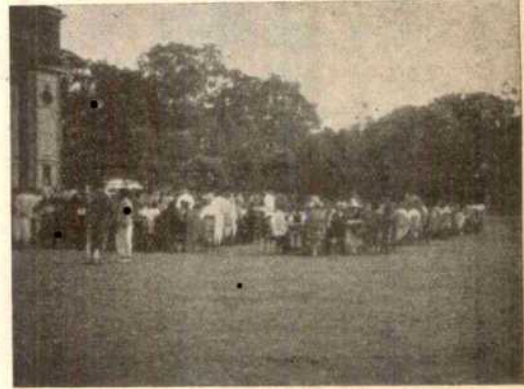
সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনের পর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সভামণ্ডপের বাহিরে আসিতেছেন



রামানন্দ-সধর্দনা-সভার পর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহিরে আসিতেছেন



শ্রীযুক্তা অন্নরূপা দেবী ও পরিচালক-সমিতির সভাপতি
ডাঃ শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ সেন



প্রীতিসম্মিলনীর সাধারণ দৃশ্য

যাঁহারা দুঃখিত, তাঁহাদের বিবেচনার জন্ত উপরের কথাগুলি লিখিলাম।

সাহিত্যসেবী হওয়া যায় না, এমন নয়। বস্তুতঃ বঙ্গের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী কবি বা অন্য প্রকারের প্রস্তুকার নহেন, এবং প্রসিদ্ধ কবি ঔপন্যাসিক ও অন্তবিধ গ্রন্থকারেরাও অধিকাংশ স্থলে রাজনৈতিক কর্মী বলিয়া বিখ্যাত নহেন। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রাজনৈতিক কোন বিষয়ের আলোচনা না হওয়ায় কোন ক্ষতি হয় বলিয়া মনে করি না। রাজনীতির সর্বগ্রাসী হওয়া উচিত নয়। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রাজনৈতিক আলোচনা না হওয়ায়

কেহ সরকারী চাকুরিয়া হইলেই যে তাঁহার বাস্তব জগতের সহিত সহানুভূতি থাকিবে না, জাতীয় বেদনা ও স্বাধীনতার স্পন্দন তিনি অনুভব করিবেন না, জাতীয় আশা-ভরসার কোন খবর রাখিবেন না, বা জাতীয় আদর্শ তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন না, এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন—শুধু তাই নয়, গবর্নেন্ট তাঁহাকে রায় ক্কাহ্নর এবং “সী আই জে”ও করিয়াছিলেন। অথচ তিনি “আনন্দমঠ” ও “দেবী চৌধুরাণী” লিখিয়াছিলেন, এবং



ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,
শ্রীযুক্তা অম্বরূপা দেবী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়,
ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

তাঁহার বন্দে মাতরম্ গান কংগ্রেসের ও অন্ত বহু রাজনৈতিক সভার অধিবেশনের পূর্বে গীত হইয়া থাকে।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সরকারী চাকুরিয়াগণের প্রভাব বেশী থাকাতে ইহার মধ্যে সাহিত্যের পোষাকী ঠাট বড় হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ একটি অভিযোগ পড়িয়াছি। যাহারা এই অভিযোগ করেন, তাঁহাদের বিবেচনার জন্ত কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি। আমরা এই সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনের কথা এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না। কেবল দুইটির কথা বলিতেছি। গোরখপুরের অধিবেশনে এই প্রভাব ছিল না, কলিকাতার অধিবেশনে ছিল না; অথচ এই দুই অধিবেশনে সাহিত্যের ঠাট ঘেরূপ ছিল, অন্ত সব অধিবেশনেও সেইরূপ ছিল। বঙ্গের সম্মেলনের উনিশটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর সরকারী চাকুরিয়াদের প্রভাব ছিল না। তাহাতে সাহিত্যের ঠাট ঘেরূপ ছিল, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেও ঠাট সেই রকম আছে। রাঁচির অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সহকারী সভাপতি প্রধান কর্মসচিব প্রভৃতি প্রধান কর্মকর্তাদের অধিকাংশ সরকারী চাকুরিয়া নহেন বলিয়া শুনিয়াছি।

বাস্তব জগতের বেদনাধ্বনি রাঁচির বাঙালীরা শুনিতে পান না, বা বাংলার যুবকজীবন হইতে তাঁহারা বন্ধুদূরে বাস করেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

সেখানেও শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবল, সেখানেও বাঙালী যুবক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া জেলে গিয়াছিলেন আমরা স্বয়ং জানি। রাঁচির অধিবেশনের কর্মীদের মধ্যেও এরূপ লোক ছিলেন।

দীনেশচন্দ্র সেনের দুটি অভিভাষণ

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচি অধিবেশনে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সাধারণ সভাপতি ও সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার পত্নীকে মুম্বু অবস্থায় বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে রাঁচি যাইতে হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল এই অবস্থায় ছিলেন। হয়ত সেই কারণেই দীনেশবাবু তাঁহার অভিভাষণ দুটি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার রাঁচি পৌছিবার প্রায় সপ্তে সপ্তেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যুসংবাদ সেখানে পৌছে, যদিও সে খবর তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। ইহা সাতিশয় শোকাবহ।

দীনেশ বাবু সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে তরুণ সাহিত্যিকদের “কাহারও কাহারও মত” এবং লেখার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করায়, সভাস্থলে প্রকাশ্য আলোচনা না হইলেও, আলোচনা খুব হইয়াছিল এবং উত্তাপেরও আবির্ভাব খুব হইয়াছিল। সব তরুণ লেখকের লেখার তাঁহার উল্লিখিত দোষ নাই—হয়ত তিনিও তাহা মনে করেন না, এবং সব অ-তরুণের লেখা উপনিষদ বা ভগবদ্-গীতার মত নহে। দীনেশবাবু কোন কোন লেখকের লেখা হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা অতি জঘন্য। শুনিতে লজ্জা বোধ হইতেছিল। তিনি যে অল্পীল পুস্তকসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা পাঠ করার নিষেধবিধি ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে উল্টা কল হইবার আশঙ্কা করি—তাহাতে ঐ সকল বহির পাঠক-লেখ্য ন্যাড়িবার সম্ভাবনা আছে। দীনেশবাবুর এই অভিভাষণটির বিস্তারিত আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার সহিত আমাদের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ আছে। যেমন, তিনি “চোথের বালি”র বিনোদিনীর যাহা ‘সহজ পরিণতি’ বলিয়াছেন, তাহা অবশ্যস্তাবী মনে করি না, এবং কবি সেই ‘সহজ পরিণতি’ না দেখানতে তাঁহার পরিকল্পনা ‘কতকটা inartistic’ হইয়াছে

মনে করি না। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষার ও লিপির সংরক্ষণ ও বিস্তার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মোটের উপর আমরা তাহা সমর্থনযোগ্য মনে করি। তিনি বলিয়াছেন, “যে-সকল পুস্তক পড়ার যোগ্য শ্রুত আশুতোষ তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন।” এইরূপ তালিকা একাধিক যোগ্য ব্যক্তির সহযোগে প্রস্তুত হইলে তাহা পাঠকবর্গের এবং গ্রন্থাগার-পরিচালকদের কাজে লাগিবে।

সাধারণ সভাপতি রূপে তিনি বলিয়াছেন :—

“আজ সমস্ত বাঙালী জাতিই প্রবাসী ; আপনারা উত্তরপশ্চিমে যাইয়া প্রবাসী হইয়াছেন,—আমরা বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিয়াও প্রবাসী স্বভাব এক পধ্যায়।”

ইহা সত্য কথা। বাঙালী “নিজ বাসভূমে পরবাসী।” এক দিকে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বলিয়াছিলেন, বঙ্গে অবাঙালী বিস্তারালী হয়, অন্য দিকে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালীকে বঙ্গের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে নিজের স্বাভাবিক স্থান অধিকার করিতে বলিতেছেন। এখন জমিদারীতে পর্যন্ত অবাঙালী স্থান করিয়া লইয়াছে ও লইতেছে। দীনেশবাবুও অন্য এক দিক দিয়া বাঙালীকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাঁচি অধিবেশনের অন্যান্য অভিভাষণ ও প্রবন্ধ

রাঁচি অধিবেশনে পঠিত অন্য সব মুদ্রিত বা হস্তলিখিত অভিভাষণগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান ও সময় নাই। সংক্ষেপে ইহা বলিতে পারি, যে, সেগুলি উৎকৃষ্ট এবং অন্য এইরূপ যে-কোন সম্মেলনের যোগ্য হইয়াছিল।

প্রবন্ধ বেশী পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহারও সবগুলি পড়িবার সময় হয় নাই। পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। সভাপতির অভিভাষণগুলি যে খুব দীর্ঘ হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু যে-প্রকারেই হউক, প্রবন্ধ পড়িবার জন্য আরও সময় দেওয়া আবশ্যিক। নতুবা প্রবন্ধ পাঠাইবার অন্তরোধের মূল্য কমিয়া যায়।

রাঁচি অধিবেশনের সফলতা

আমাদের বিবেচনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রাঁচি অধিবেশন বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সব ব্যবস্থা যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সঙ্গীত-বিভাগের সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ বসুর বীণাবাদন চমৎকার হইয়াছিল।

রাঁচিতে প্রদর্শনী

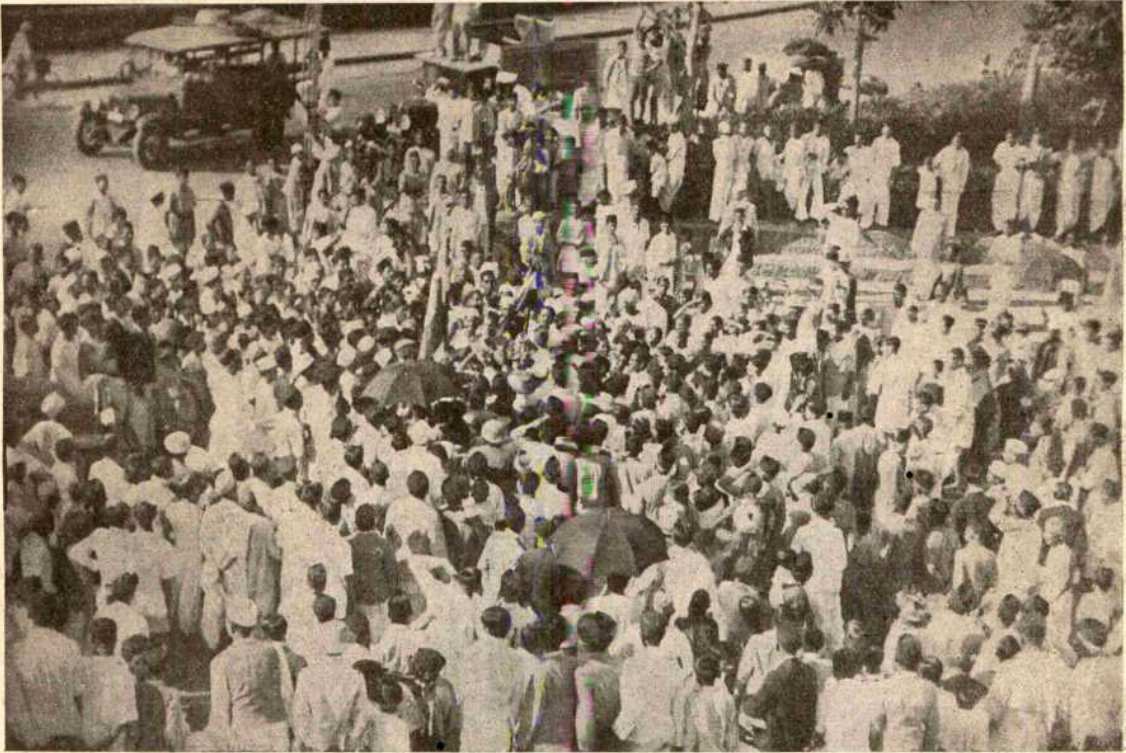
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাঁচিতে যে-সকল ছবি, নৃত্যসম্বন্ধীয় অতি প্রাচীন নানা সামগ্রী ও চিত্র এবং রাঁচিতে প্রস্তুত নানাবিধ বস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিবার শিথিবার ও আনন্দলাভ করিবার অনেক জিনিষ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাল করিয়া দেখিবার সময় আমরা পাই নাই—আর কেহ পাইয়া ছিলেন কি না জানি না। যদি সময় থাকিত এবং নৃত্য-বিষয়ক সামগ্রীগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়, ছবিগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার এবং পণ্যশিল্পজাত দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ সকলকে কিছু বলিতেন, তাহা হইলে সকলে আনন্দিত ও উপকৃত হইতেন। ভবিষ্যতে সম্মেলন তিন দিনের পরিবর্তে চারি দিন করিলে হয়ত যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইতে পারে।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলন

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্যিক সম্মেলনও গত পৌষ মাসে হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা পড়িলাম, তাহাতে উহা সুনির্বাহিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা জন্মিল। অভিভাষণগুলির মধ্যে কেবল সাধারণ সভাপতি অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ও নানা তথ্যপূর্ণ অভিভাষণটি দেখিয়াছি।

ওরাঁওদের নৃত্য ও “ছো” নৃত্য

রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে ওরাঁওদের দলবদ্ধ হৃৎকল সরল নৃত্য বেশ সুন্দর হইয়াছিল। “ছো” নৃত্যও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ও আমোদজনক হইয়াছিল। “ছো” শব্দের অর্থ মুখোস। আদিম জাতি-



কংগ্রেসের বক্তৃকা ও পতাকাধারী গোকুলদাস ভট্টের সন্দর্ভনা

সমূহের অনেকে মুখোস পরিয়া এই নৃত্য করে। এই নৃত্য দ্বারা রামায়ণ আদির প্রাচীন গল্পের অভিনয় করা হয়। মুখোসগুলি দেখিয়া যবদ্বীপের মুখোস-পরা পুতুলের নাচ মনে পড়িয়াছিল। সেগুলি কতকটা তিব্বতী ও তুটিয়াদের নৃত্যের মুখোসেরও মত।

কংগ্রেসের বক্তৃকা ও পতাকা

মহারাষ্ট্র দেশের কৈজপুর গ্রামে কংগ্রেসের গত অধিবেশন উপলক্ষ্যে একটি নূতন প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই শহরে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বোম্বাই ভারতবর্ষের প্রথম দুটি শহরের মধ্যে একটি, এবং সকলের চেয়ে বড় ব্যবসার জায়গা। প্রথম প্রথম বাহারা কংগ্রেসে যোগ দিতেন, তাঁহারা ইংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত এবং হয় ধনী বা অস্তুতঃ মধ্যবিত্ত সচ্ছল অবস্থার লোক। এবার যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে, তাহা মহারাষ্ট্রের কৈজপুর নামক একটি গ্রামে। গ্রামে কংগ্রেস করা হইয়াছে প্রধানতঃ

মহাত্মা গান্ধীর পরামর্শে। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের সহিত গ্রামবাসী লোকদের যোগস্থাপন, বাহারা ভারতবর্ষের অধিবাসীদের বৃহত্তম অংশ, এবং এই যোগস্থাপন দ্বারা তাহাদিগকে জাগাইয়া তোলা ও জাতীয় স্বাধীনতা ও প্রগতির প্রচেষ্টায় তাহাদিগকে প্রধান কর্ম্মী করিয়া তোলা।

বোম্বাইয়ের প্রথম কংগ্রেস হইতে কৈজপুরের আধুনিক কংগ্রেস নানা পরিবর্তন হুচিত করে। কংগ্রেস শহর হইতে গ্রামে পৌছিয়াছে, নাগরিকদিগকে উদ্ধৃদ্ধ করার পর গ্রামবাসীদিগকে উদ্ধৃদ্ধ করিতেছে। কংগ্রেস প্রথমে ইংরেজীশিক্ষা-প্রাপ্ত ও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকদের প্রতিষ্ঠান ছিল। এখন ইহা ইংরেজী-না-জানা, এমন কি নিরক্ষর, লোকদেরও প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়াছে। ইহা আগে প্রধানতঃ চাকুরীজীবী বা ইংরেজীশিক্ষা-সাপেক্ষ আইন চিকিৎসা আদি বৃত্তি অবলম্বী লোকদের ও বড় বণিক ও কলকারখানার মালিকদের প্রতিষ্ঠান ছিল। এখন ইহা কৃষক ও শ্রমিকদেরও প্রতিষ্ঠান হইতে চলিয়াছে। আগে ইহা তাহাদের প্রতিষ্ঠান ছিল



কংগ্রেসের বক্তৃকা ও পতাকাধারী গোকুলদাস ভট্ট

যাঁহারা হাতের ব্যবহার করিতেন লিখিবার জন্ত। এখন ইহা হইতে চলিয়াছে তাঁহাদেরও প্রতিষ্ঠান যাঁহারা চাষ করিবার জন্ত, নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কল চালাইবার জন্ত, পাথর ভাঙিবার, খনি হইতে খনিজ খুঁড়িয়া তুলিবার জন্ত, ...হাতের ব্যবহার করেন।

কিন্তু এক বিষয়ে গোড়া হইতে এখন পর্যন্ত একটি ঐক্যবৃদ্ধ অচ্ছিন্ন রহিয়াছে—কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা দেশের হিত চাহিয়াছিলেন, তাহার বর্তমান পরিচালকেরাও দেশের হিত চান। এই যে হিতৈষণার আশ্রিত ও পতাকা বোম্বাই নগর হইতে ফৈজপুর গ্রামে পৌঁছিয়াছে, তাহা স্মৃতি করিবার নিমিত্ত এক-এক জন মশাল ও পতাকাধারী এক মাইল করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া পরবর্তী অল্প এক জনের হাতে মশাল ও পতাকা দিয়াছে। এই প্রকারে তিন শত জন বক্তৃকা-পতাকাধারীর সাহায্যে কংগ্রেসের আশ্রিত আলোক ও

পতাকা তিন শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নগর হইতে গ্রামে পৌঁছিয়াছে।

ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন

ফৈজপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। বড় শহরেও কংগ্রেসের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন হইলে অনেক হাজার লোকের থাকিবার জায়গা, রাত্রে আলোক, স্নান পান আহালাদি, স্বাস্থ্য, বাতায়নাতের জন্ত বান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সহজ হয় না। গ্রামে তাহা করা আরও কঠিন। ফৈজপুরের কংগ্রেসে আবার বহুসংখ্যের পরিবর্তে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেখানে জল, আলোক, বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহ, প্রভৃতির ব্যবস্থা আগাগোড়া নূতন করিয়া করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির কর্মীদের উদ্যোগিতায় সমুদায় বাধা

অতিক্রান্ত হইয়াছিল। ইহা মহারাষ্ট্রের বিশেষ প্রশংসার বিষয়, মহারাষ্ট্র যে-ভারতবর্ষের অন্তর্গত তাহারও প্রশংসার বিষয়।

গ্রামের কংগ্রেসের সভাপতি যদি মোটরে যাইতেন, তাহা হইলে তাহা বেশ মানানসই হইত না। সেই জন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে একটি প্রাচীন কালের রথের মত যানে রেলওয়ে স্টেশন হইতে ফৈজপুরের কংগ্রেসপুরী টিলকনগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রথটির পরিকল্পনা ও সজ্জা করিয়াছিলেন শিল্পী নন্দলাল বসু। উহা ছয় জোড়া বলদে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাষণ

লক্ষ্যে কংগ্রেসে যেমন, ফৈজপুরের কংগ্রেসেও তেমনি, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সমগ্র জগতে দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের সহিত ভারতবর্ষেও ঐ দুই শক্তির সংঘর্ষের সাদৃশ্য ও যোগ প্রদর্শন করেন। এই দুই বিপরীত শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ এবং গণতান্ত্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতা। ইহাদের নাম যাহাই দেওয়া হউক, কথটা সত্য যে, পৃথিবীর সর্বত্র কতকগুলি জাতি ও লোক অপর কতকগুলি জাতি ও লোকে নিজেদের প্রভুত্বের অধীন রাখিয়া তাহাদেরই পরিশ্রমে আপনারা ধনী হইয়া ধিলাসে কাল কাটাইতে চায়। এই অবস্থার উচ্ছেদ আবশ্যক।

সমাজতান্ত্রিকতা শব্দটা অনেকের বড় অপরিচিত। উহার ব্যবহারে তাঁহারা ভীত। কিন্তু একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র, নিরক্ষর, জ্ঞানালোকে বঞ্চিত, বৃত্তান্তিত, প্রায়শঃ, গৃহহীন, বা অতিশুদ্ধ অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করে, স্নোগে চিকিৎসা ও ঔষধ পায় না। এই অবস্থার প্রতিকারও হওয়া চাই। কেহ যদি বলেন, যে, প্রতিকার হওয়া আবশ্যক নহে বা হইতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহার মত আলোচনা করিতে চাই না। যাহারা মনে করেন, প্রতিকার আবশ্যক ও হইতে পারে, তাঁহাদের মত আলোচনার যোগ্য। সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন, সমাজতন্ত্রদ্বারা সকল মানুষের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। যাহারা তাহা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা অথচ কি উপায় অবলম্বনীয় তাহা বলিতে ও অবলম্বন করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও অন্তর ভারতীয় সমাজ-তান্ত্রিকেরা বলেন, সদ্য সদ্য এখনই ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত হইতে পারে না; আগে দেশকে স্বাধীন করিয়া তবে পরে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করিতে হইবে, কারণ রাষ্ট্রশক্তি করতলগত না হইলে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করা যায় না।

দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ

কংগ্রেস দেশের জন্ত স্বাধীনতা বা পূর্ণস্বরাজ চান, উদারনৈতিক সংঘ ঔপনিবেশিক স্বরাজ (ডোমিনিয়ন স্টেটস) চান। ব্রিটেনে ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যাটুট নামক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর সারতঃ এই দুটির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ সামান্য—বিশেষতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ সমুদয় ব্যাপার সম্বন্ধে। সুতরাং এই দুইটির নাম লইয়া তর্ক করা অনাবশ্যক। যে-কেহ অন্ততঃ ডোমিনিয়ন স্টেটস চান, তাঁহার সহিত কংগ্রেসের সহযোগিতা করিতে এবং কংগ্রেসের সহিত উদারনৈতিক-দিগের সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হওয়া উচিত নয়।

অহিংস স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আপত্তি

কংগ্রেস অহিংস উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করিতে চান। তাহার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি শুনা যায়। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। (১) স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। কিন্তু কেহ যদি মনে করে যাইবে, তাহা হইলে তাহাকে চেষ্টা করিতে দিতে আপত্তি কি? সে ত আপত্তি-কারীদিগকে প্রচেষ্টায় যোগ দিতে বাধ্য করিতেছে না, করিতে পারে না। (২) স্বাধীনতালাভের চেষ্টা বিপৎসঙ্কুল। তাহা হইতে পারে। কিন্তু যদি কেহ বিপদের সম্মুখীন হইতে চায়, তাহাকে সম্মুখীন হইতে দাও না কেন? সে ত তোমাকে টানিতেছে না। (৩) স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা দেশকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিবে। কিন্তু এখন কি দেশ সুখের সাগরে ভাসিতেছে? (৪) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রাখিতে পারিবে না। এখানে আপত্তি-কারী ভুলিয়া যাইতেছেন, যে, স্বাধীনতাকামীরা ব্রিটেনের কাছে স্বাধীনতার বর মাগিতেছে না; তাহারা উহা অর্জন করিতে চায়। স্বাধীনতা অর্জন করিবার ক্ষমতা যাহাদের

হইবে, উহা রক্ষা করিবার ক্ষমতাও তাহাদের থাকিবে। (৫) স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা ও স্বাধীনতালাভ উভয়েরই ফল হইবে এই, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটেনের মিত্রতা ও সাহায্য হারাইবে, অথচ এই দুটি ভারতবর্ষেরই স্বার্থের জন্য আবশ্যক। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, যে, কোন দেশের সহিত অথচ কোন দেশের মিত্রতা বা শত্রুতা স্থায়ী জিনিষ নহে—এক দেশ নিজের সুবিধা ও স্বার্থ অনুসারে কখন কখন অন্য দেশের মিত্র হয়, কখন বা শত্রু হয়। ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না, যে, ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করিবার মত শক্তিশালী হইতে পারে, তাহা হইলে এত বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশের সহিত ব্রিটেন বন্ধুত্বচক সন্ধি স্থাপন নিজের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করিবে। ইহাও মনে রাখা আবশ্যক, যে, ব্রিটেনই পৃথিবীতে একমাত্র শক্তিশালী দেশ নহে। শক্তিশালী ও স্বাধীন ভারতবর্ষের সহিত মৈত্রীচক সন্ধি স্থাপনের স্ববুদ্ধি যদি ব্রিটেনের না হয়, অথচ কোন-না-কোন শক্তিশালী জাতির সেরূপ স্ববুদ্ধি হইবে।

এই সমস্তই ভবিষ্যতের কথা। ধাহারা ভারতবর্ষের জন্য ডোমিনিয়ন বা ওপনিবেশিক স্বরাজ চান, তাহারাও ত তাহা কলা সূর্যোদয়েই পাইতেছেন না। তাহাও ভবিষ্যতের কথা। স্বাধীনতালাভ যত কঠিন, ডোমিনিয়ন লাভ তার চেয়ে অত্যন্ত কম কঠিন নহে। ডোমিনিয়ন মূল্যহীন নহে। মূল্যহীন হইলে বিলাতী প্যার্লমেন্ট তাহা ভারতবর্ষকে সহজেই দিত, ডোমিনিয়ন দিবার অধীকার যে-কেহ আগে কবিয়াছেন তাহা কবিবার অধিকার তাহার ছিল না এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতে প্যার্লমেন্ট বাধ্য নহে, ইহা প্রমাণ করিতে এত চেষ্টা হইত না। কংগ্রেস ডোমিনিয়ন না-চাহিতে পাবেন, কিন্তু আমরা স্বাধীনতার সার অংশ স্বরূপ এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার উপায়স্বরূপ ইহাকে মূল্যবান মনে করি।

রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের বক্তৃতার একটি বিশেষত্ব ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক নেতাবা—যেমন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু—প্রধানতঃ দেশের লোকদের ধনসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় দারিদ্র্যের কথাই বলেন। তাহা বলা এবং এই

প্রকার দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করা নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু এই দারিদ্র্যই আমাদের দেশের এবং মাত্র দারিদ্র্য নহে। আমাদের দেশের লোকদের মানসিক দারিদ্র্যও অত্যন্ত অধিক, বুদ্ধির বিকাশ অত্যন্ত কম। অতএব মানসিক দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করাও অত্যন্ত আবশ্যক। সমস্ত জাতিটার মন না জাগিলে সমস্ত জাতিটার ধনাগমও হইবে না। আবার শুধু ধনাগম হইলে এবং বুদ্ধির বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যন্ত্রনির্মাণকৌশল বাড়িলেই জাতিটা কল্যাণের পথে প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রসর হইতে পাবিবে না। ধর্মনীতি ও আধ্যাত্মিকতাতেও আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে, পাশ্চাত্য জগৎ ধনী, এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যন্ত্রনির্মাণদক্ষতা তাহাব আছে। তথাপি তাহার সভ্যতা বিপন্ন হইয়াছে কেন? এই প্রশ্ন, যে, তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি যথেষ্ট হয় নাই।

ধর্মনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা

আমরা উপরে যাহা লিখিয়াছি মতাপ রিভিউর জন্য সংক্ষেপে তাহা লিখিয়া রাখি গিয়াছিলাম। সেখানে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের অভিভাষণে এই প্রকারের কথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন :—
জড়বিজ্ঞান মানুষকে কষ্ট দিয়াছে, বিদ্যা দিয়াছে, পৃথিবীর বন্যজাত হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান ও সমৃদ্ধি দিতে পারে নাই। নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বাহ্যতে তাহা দিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা আন্তর্জাতিক ভাবে, মানুষের আধুনিক অবস্থা ও আধুনিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর আগে, যখন জড়বিজ্ঞানের এই সব যুগান্তকারী প্ররোচনা হয় নাই, যখন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষাভাষী সভ্যতার বিভিন্ন স্বরেই লোক প্রত্যকে অলম্ব্যতনের মধ্যে বাস করিত, তখনকার সময়ের রীতি, নীতি আইনকানুন আশ্রয় করিয়া থাকিলে চলিবে না। পুরাতন জীর্ণ বসন ত্যাগ না করিয়া নতুন করিয়া পরিধান করিতে চেষ্টা করিলে তাহা আরও ছিঁড়িয়া যায়। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। মানুষ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক শক্তি বাহা আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে বাহা করিবে তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর! এখন মানুষের ব্যক্তিগত শক্তির প্রধান উৎস অম্লপদার্থের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া। কিন্তু এ শক্তি অম্লপদার্থের উপব্যবহার আবরণে শক্তি মাত্র। পরমাণু অত্যন্তবে যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে তাহার সুকান মানুষ সবে মাত্র পাইয়াছে। এই শক্তি আরম্ভ করিতে পারিলে মানুষ ধরাকে সরা জ্ঞান করিবে। কিন্তু তখনও যদি মানুষের চরিত্রের ও মনের উন্নতি না হয়

তাহা হইলে মানুষ এ শক্তি লইব কি কবিবে? অগোষ্ঠ শিশুর হাতে আগুনের মত সে এই শক্তি লইয়া পৃথিবীতে ধ্বংসের লীলা হুস করিয়া দিবে। স্তব্ধ উপসংহারে জ্বালা বসি, জড়বিজ্ঞানের যে স্তব্ধ অগ্রগতি হইয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিবার জন্য এখন চর্চা করিতে হইবে মানুষের নীতিবিজ্ঞান, চরিত্রবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান—এক কথায় মানব-বিজ্ঞান। নিরাশ ও ভয়ানক হইলে চলিবে না। সকলকে জলের বাগী ওনাইতে হইবে। মানুষ অতীতে যেমন বর্বরতার অন্ধকার হইতে বাহির হইয় সভ্যতার আলোক দেখিতে সক্ষম হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতেও তেমনি যন্ত্রের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া প্রবৃত্ত সভ্যতার বা ফল—শুধু পারীক্ষিক হুখ-চ্ছন্দ্য নয়—মানসিক উৎকর্ষ, শিক্ষা ও বৃষ্টি, তাহাও—সকলে সমানে, অবশেষে ভোগ করিতে সক্ষম হইবে।

—

সাধারণ লোকদের সহিত কংগ্রেসের সংস্পর্শ

কংগ্রেস দেশের সাধারণ লোকদের সহিত সংস্পর্শ স্থাপন ও রক্ষা করিতে চান। ইহাকে পূর্ণ মাত্রায় জাতীয় প্রতিষ্ঠান করিয়া তুলিতে হইলে এই সংস্পর্শ একান্ত আবশ্যিক। প্রচারক পাঠাইয়া কিছু সংস্পর্শ স্থাপন করা যায়। কিন্তু যথেষ্টসাংখ্যিক প্রচারক পাওয়া ও তাহাদের ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন। গ্রামে গ্রামে গ্রামোন্নতিসাধক কর্মী নিয়োগ বা প্রেরণ করিতে পারিলে সংস্পর্শস্থাপন আরও ভাল করিয়া হয়। কিন্তু ইহাও সীমিত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু ব্যয়সাধ্য হইলেও এই উভয় উপায় অবলম্বন যথাসাধ্য করিতে হইবে। পুলিশ যে প্রচারক ও কর্মীদের কাজ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু পুলিশের মনোযোগ সশেষে সর্ববিধ দোষহিতকর কাজ করিতে হইবে।

যদি গ্রামে গ্রামে রেডিও থাকিত এবং যদি তাহা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে রেডিও দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজহিতসাধক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক কাজ করিতে পারিত। কিন্তু রেডিও দ্বারা স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত কোন কাজ করা অসম্ভব।

আমাদের দেশে যদি জাপানের মত লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা সর্বসাধারণের থাকিত তাহা হইলে সকল প্রতিষ্ঠানেরই কাজ করা সহজ হইত। এই ক্ষমতা সমৃদ্ধ বালকবালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। যে-সব বালকবালিকা কেবল মাত্র অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ষসমূহের সহিত পরিচিত, তাহারাও

এই একান্ত আবশ্যিক কাজ কবিতে পারে। সকলকেই এই কাজে প্রবৃত্ত কর। উচিত।

—

গ্রামে গ্রামে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন

এইরূপ একটি সরকারী সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, যে, ভারত-গবর্নমেন্টের গ্রামোন্নতি-কার্যপদ্ধতির অঙ্গস্বরূপ গ্রামসমূহেও টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রচলনের একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ভারতবর্ষের গ্রামবাসী লোকদের মধ্যে অগণিত লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তাহাদের পরণে জীর্ণ বস্ত্র, কুটার জীর্ণ, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, শিক্ষার বন্দোবস্ত নাই, রাস্তা নান্দ্যকার মধ্যে, যাহা আছে তাহা পরিষ্কৃত ও সংস্কৃত রাখিবার বন্দোবস্ত নাই, নর্দমা নাই, স্নানের ও পানের বিস্তৃত জলের অভাব যথেষ্ট আছে, মূত্রপূর্বীয়ে পথঘাটমাঠ দূষিত। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের ব্যবস্থা হইতেছে এ হেন গ্রামবাসীদের জন্য, ভাবিলে ও বিশ্বাস করিতে হইলে হাসি পায়। ভারতীয়েরা পরাধীন হইলেও এতটুকু বুদ্ধি তাহাদের আছে, যাহার সাহায্যে তাহারা বুদ্ধিতে পারে, যে, এই সব ব্যবস্থা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য করা হইতেছে। যাহা হউক, যেমন প্রধানমন্ত্রী ও প্রাথমিক ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সামরিক ও ব্রিটিশ জাতির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে রেলওয়ে নির্মিত হইয়া থাকিলেও তাহা দেশের লোকদেরও কাজে লাগিতেছে, তেমনি গ্রামে টেলিগ্রাফ টেলিফোন বসাইলে সেগুলিও কতকটা দেশের লোকদের কাজে লাগিবে। কোন কোন প্রদেশে যে গ্রাম-সমূহেও বেডিঙর ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাও সরকারী প্রয়োজনে। কিন্তু তাহাও দেশের লোকদের কাজে লাগিবে।

—

কংগ্রেসের মনোনীত ব্যবস্থাপক সভার

সদস্যপদপ্রার্থী

গত নবেম্বর মাসে পাঁচ জন কংগ্রেস নেতা (তাহাদের মধ্যে সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুও ছিলেন) কোন কোন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলিকে যে-ভাবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী নির্বাচন করিতেছিলেন, তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কমিটিগুলিকে সাবধান করিয়া দিয়া—

ছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, “the quality of candidates from the point of view of the Congress policy is more important than the winning of seats and the capture of a fictitious majority in the Legislatures.” তাঁহাদের এই উক্তিতে সদস্য-পদপ্রার্থীদের উৎকর্ষের উপর ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা যে কমিটিগুলিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বুঝা যায়, যে, কোন কোন স্থলে অযোগ্য বা অবাস্তব কিংবা অপেক্ষাকৃত অযোগ্য বা অবাস্তব রকমের প্রার্থী মনোনীত করা হইয়াছে। অথচ এখন দেখিতেছি, কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় বা তাঁহার প্রতিযোগী প্রার্থীর সমর্থন করায় কোন কোন প্রদেশে কোন কোন কংগ্রেসওয়ালাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। মোটেব উপর অবস্থা ইহা ঠিক বটে, যে, কংগ্রেসের ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু এই ওজুহাতে গণতান্ত্রিক ও স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের কোনও কংগ্রেসওয়ালার জায্য স্বাধীনতা লোপ করা অস্বাভাবিক। কংগ্রেস-নেতাদের সতর্কতার বাণী হইতেই বুঝা যাইতেছে, যে, সব কংগ্রেস কমিটির সব মনোনয়ন নিখুঁত হয় নাই—কোন কোন স্থলে তাহা ভ্রান্ত বা দূষিত হইয়াছে। অথচ সেই ভ্রম বা দোষত্রুটি-সংশোধনের জন্য যদি অন্য কোন কংগ্রেসওয়ালার স্বয়ং প্রার্থী হন বা কোন যোগ্য কংগ্রেসওয়ালার প্রার্থীর চেষ্টার সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কেন শাস্তি দেওয়া হইবে? নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার চেষ্টারও ত একটা সীমা থাকা চাই।

ব্যোগ্যতমকে অমনোনয়নের একটি দৃষ্টান্ত বাংলা দেশ হইতে দিতেছি।

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নারীদিগের জন্ম যে একটি “সাধারণ” আসন সংরক্ষিত আছে, কংগ্রেস কর্তৃক তাহার জন্ম প্রার্থী মনোনীত হইতে ঐহারা চাহিয়াছিলেন, তাহারা মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ। কিন্তু কংগ্রেস তাঁহাকে মনোনয়ন না-করিয়া এমন একটি মহিলাকে মনোনীত করিয়াছেন রাষ্ট্রনৈতিক ও অন্ত

সার্বজনিক অবৈতনিক কার্যক্ষেত্রে ধাঁহা কৃতিত্ব বা সক্রিয়তা সম্বন্ধে আমরা কখনও কিছু পড়ি নাই শুনি নাই। জ্যোতির্ময়ী দেবী জালন্ধর কল্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ও সিংহলের একটি শিক্ষালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। শিক্ষাসম্পর্কীয় অন্ত নানা কান্ড এবং বহু সার্বজনিক কাজেও তিনি করিয়াছেন। সে সকল বলিবার স্থান ইহা নহে এখানে তাঁহার রাষ্ট্র-নৈতিক কাজের কথাই বলিব। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ ও সত্যগ্রহ আন্দোলনের সময় হইতে আজ পর্যন্ত বোল বৎসব ভারতের—বিশেষতঃ কলিকাতা এবং বাংলার, বিভিন্ন অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় নানা ব্যাপারে জড়িত থাকিয়া কাজ করিয়াছেন এবং ভারতের সর্বপ্রধান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর বাণী বহন করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়াছেন। কাবাবাস ও অন্ত দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনাকে গ্রাহ্য না করিয়া দেশের মঙ্গল হইবে মনে করিয়াই কংগ্রেসের আদেশ শিরোধার্য করিয়া, সরকারী চাকুরী ও অর্থের মোহ পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। নারী-ইহতরুর বহু প্রতিষ্ঠান, জনসেবা-ক্রেতে ত্রুতী বহু প্রতিষ্ঠান ও আর্জুনাগে নিয়োজিত বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ও তাহাদের মধ্য দিয়া জনসাধারণের ও দুঃখপ্রাপী উত্তমদিগের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কংগ্রেস তাঁহাকে মনোনীত না-করায় স্বয়ং নারীদের আসনটির জন্ম স্বাধীন ভাবে তাঁহাকে প্রার্থী হইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তিনি নির্বাক হইলে, কংগ্রেসেই কাজ হইবে। কেন-না তিনি নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে কাজ করিবেন। (১) নূতন শাসনতন্ত্রকে বাধা দিতে হইবে। (২) সাম্প্র-দায়িক সিদ্ধান্তের প্রতিরোধ করিতে হইবে। (৩) মস্তিষ্ক-গ্রহণ প্রচেষ্টার মুলাচ্ছেদ করিতে হইবে। (৪) দমননীতির প্রতিরোধ করিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করিতে হইবে। (৫) দেশবাসীর সর্বদ্বীণ মঙ্গলসাধন করিতে হইবে। (৬) নারীজাতির স্বার্থ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

এই সকল কারণে আমরা মনে বরি, তাহাকে ভোট দিয়া নির্বাক করা উচিত। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি আছে, বাংলা ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিবার শক্তি অভ্যাস ও সাহস আছে এবং রাজনীতির জ্ঞান আছে।

আমরা এপর্যন্ত নির্বাচন বিষয়ে কোনও প্রার্থী সম্বন্ধে আমাদের কাগজে কিছু লিখি নাই। নারীব আসনটি সম্বন্ধে অন্যান্য মনোনয়ন হওয়ায় কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। কেমন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উচিত, সে-বিষয়ে অবশ্য সাধারণ ভাবে আগে কিছু লিখিয়াছি, এবং নিম্নলিখিত কথাগুলি ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিযুতে লিখিয়া মোটের উপর কংগ্রেসের জয়লাভ চাহিয়াছি।

"On the whole we should be glad if the Congress were able to capture the majority of the seats in the provincial legislatures, and, in due course, in the central or federal legislature also. Congress members are likely to fight for India's freedom more strenuously and courageously and in a more organized manner than the followers of any other party or parties. And it is freedom—political and economic—which matters more than anything else." P. 705.

আমরা কংগ্রেসদলভুক্ত না-হইয়াও মোটের উপর কংগ্রেসের জয় কামনা করিয়াছি—যদিও কংগ্রেসেব মনোনীত প্রত্যেক প্রার্থীকে অন্য প্রত্যেক প্রার্থীর চেয়ে যোগ্যতর মনে কবি না। সেই জন্য ডিসেম্বরের মডার্ণ রিভিযুতে এই কথাও লিখিয়াছি :—

"As we have said already, we should be pleased if the nominees of the Congress succeeded in capturing the majority of the seats in the legislatures. This does not mean that, in our opinion, every Congress candidate is preferable to every non-Congress candidate. That is not so." P. 706.

নির্বাচনে সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ

গণতন্ত্রের যুগে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের কার্যকুশলতার উপরই দেশের বা জাতির স্বাধীনতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। সুতরাং এই দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য উপযুক্ত পক্ষে যত্ন সহকারে সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা ব্যতীত ইহা সম্ভব হয় না। এই জন্যই নির্বাচনবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে, নিরপেক্ষতা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে যতগুলি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নির্বাচন ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা তাহাদের অগ্রতম। পূর্বাগত যে প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনে বাংলা দেশে এই প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। বাংলা-সরকারের তরফ হইতে কোনও প্রতিবন্ধনের কথা আমরা আজও শুনি নাই।

নির্বাচনপ্রার্থী যদি রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর সাহায্য লাভে সমর্থ হন, তবে তিনি অতি সহজেই নিজ পথ স্বগম করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে শুধু যে প্রতিযোগিতার স্বফল হইতেই দেশ বঞ্চিত হয় তাহা নহে,—ক্ষমতা অপাঙ্গে গ্রস্ত হয় এবং ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দেশের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি অনিবার্য।

আমরা অবগত হইয়াছি, বাংলা-সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী একাধিক নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রী মহোদয়ের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, হয়ত তাঁহার কৃতকার্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার অভিপ্রায়েই তিনি কয়েকটি কেন্দ্র হইতেই সমভাবে চেষ্টা করিতেছেন—এক স্থানে না এক স্থানে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইবেই। একাধিক কেন্দ্র হইতে চেষ্টা করার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে, এবং আমাদের অহুমান, হয়ত তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ সকল কেন্দ্র হইতেই যদি তিনি নির্বাচিত হইতে পারেন, তবে তাঁহার উপর জনসাধারণের আস্থা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইতে পারিবেন, এবং ইহাতে তাঁহার অভিলষিত প্রধান মন্ত্রীপদের পথ অপেক্ষাকৃত স্বগম হইয়া থাকিবে। অধিকন্তু, একাধিক কেন্দ্র হইতে তিনি নির্বাচিত হইলে একটি ব্যতীত অপরাপর কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হইবে তাহাতে নিজ পক্ষ সমর্থনকারী প্রার্থীর নির্বাচনে সাহায্য করা অতি সহজ হইবে। তাঁহাদের কৃতকার্যতায় আবার ব্যবস্থা-পরিষদে মন্ত্রী বাহাদুরের দলপুষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথ আরও সরল হইয়া আসিবে।

মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের লোকবল ও অর্থবলের তুলনা অতি বিরল। তাঁহার অধিকৃত পদের গুণে তিনি একাধিক সরকারী বিভাগের সর্বসর্গ। কার্যনির্বাহের জন্য ইহাদের প্রত্যেকেরই শক্তি ও প্রতিপত্তি বর্তমান। উদাহরণ-স্বরূপ কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রীর অধীনস্থ সমবায়-বিভাগের কথা উল্লেখ করা যায়। এই বিভাগের কর্মচারীদের সংখ্যা কম নহে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য সমবায়-সমিতি কৃষি-প্রাণ বাংলার পল্লী উন্নয়নের জন্য সমগ্র প্রদেশটিকে জালের মত বেঁধে করিয়া আছে। ইহাদের মিলিত শক্তি অপরিমীম। ইদানীং সমবায়-বিভাগের সংস্কার ও কার্য-প্রসার উদ্দেশ্যে

কতকগুলি পদ মঞ্জুর হইয়াছে। দেশের বর্তমান অভাবনীয় ছরবছায় ঐ সকল পদের আশায় এবং মন্ত্রী বাহাদুরের প্রসাদ লাভোদ্দেশ্যে প্রতিপত্তিশালী অনেক লোক নির্বাচন-ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এই সকল সাহায্য মন্ত্রী বাহাদুরের ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির পরিচায়ক নহে—পদমর্যাদার অস্ত্রায় স্ববিধা গ্রহণের নিদর্শন মাত্র।

সমবায়-বিভাগের প্রধান কর্মচারী রেজিষ্টার। তিনি মন্ত্রী সাহেবের বিশেষ আশ্রয়। প্রধানতঃ সেই জন্তই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিয়াছেন। তিনি যে আজ ১৫ বৎসর ধরিয়া সমবায়-বিভাগের নানা কার্যে নিযুক্ত, একথা অনেকেই অজ্ঞাত। কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রীর অবৈতনিক এক্সেট হিসাবে রেজিষ্টার মহোদয় বৎসরাধিক ধরিয়া মন্ত্রী সাহেবের নির্বাচন-কার্যে তদ্বির ও তদ্বক্ষেপে প্রচারকাৰ্যাদি সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া করিতেছেন। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে সমবায় কনফারেন্স বসাইয়া তিনি এই কার্যের উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন। স্থল-বিশেষে আবার মন্ত্রী বাহাদুরও এই সকল কনফারেন্সে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দেশ-সেবায় নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লোকেব চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সরকারের অল্পমতি ভিন্ন সরকারী কর্মচারিগণ অভিনন্দন গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু রেজিষ্টার সাহেব নিজস্ব চিন্তে নানা স্থানে অভিনন্দন গ্রহণ করেন এবং নানা প্রকার পাটী ও ডিনারের বন্দোবস্ত হয়। এই সকলের জন্ত যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা সমিতি-সমূহের, এবং রেজিষ্টার ও তাঁহার অফিসারগণের মধ্যে াঁহার উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের ব্যয় সরকার-বহন করেন।

রেজিষ্টারের অল্পরোধে কিছু দিন যাবৎ অঞ্চলবিশেষে সমবায় পল্লী-সংস্কার সমিতি গজাইতেছে। অল্পসম্মানে জানা যায় যে দৈবদ্রষ্ট্যপাকে সেই অঞ্চলগুলি অনেক স্থানেই আবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্বাচন-ব্যাপারসংশ্লিষ্ট। যে-সকল কর্মচারী এই কার্যে উৎসাহ দেখাইতেছেন তাঁহাদের উন্নতি এবং াঁহার উপযুক্তসংখ্যক সমিতি গঠন করিতে অসমর্থ হইতেছেন, তাঁহাদিগের জন্ত উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। রেজিষ্টার সাহেব স্বয়ং এবং কোন কোন স্থলে মন্ত্রী সাহেবও এই প্রকার সমিতির উদ্বোধনকার্যে

উপস্থিত থাকেন। বলা বাহুল্য, সরকার এবং সমিতির ব্যয়ে তাঁহাদের নির্বাচনের সুবিধার্থে প্রচার-কাৰ্য্য অব্যাহত চলিতে থাকে। এই সকল ভগ্যানাইজ করিবার ভার সমবায়-বিভাগের জনৈক গেজেটেড অফিসারের উপর বিশেষ ভাবে ন্যস্ত। এই অফিসারের উপর মন্ত্রী সাহেবের নির্বাচন প্রতিযোগিতার কাৰ্য্যাদির ভারও ন্যস্ত আছে।

ইদানীং সমবায়-বিভাগের যে-সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রেজিষ্টার ও মন্ত্রী মহোদয়ের মতে অডিট সার্কেল (audit circle) অন্যতম। এই ব্যবস্থান প্রায় প্রত্যেক ১০০টি সমিতির হিসাব পরীক্ষার ভার এক জন করিয়া অডিটারের উপর ন্যস্ত। অডিটারদিগের মন্তব্যের উপর সমিতির মজলামজল বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। তাঁহারা যদি উপরওয়ালার নিবট হইতে ব্যক্তিগত নির্দেশ পাইয়া অধীনস্থ সমিতিগুলিকে ইঙ্গিত করেন তবেই নির্বাচন-ব্যাপারে ইহাদিগকে নিষ্কিষ্ট কেনও ব্যক্তি বা পক্ষ সমর্থনে বাধ্য করিতে পারেন। এইরূপ চেষ্টা এক দিকে যেমন পল্লী-সরলতার, অপব্যবহার, অপর দিকে তেমনি পল্লীবাসীদের উপর চাপ দেওয়া। কোনও কোনও সমবায়-কনফারেন্সে গ্রাম্য সমবায়-সমিতির সভ্যগণকে বলিতে শুনা গিয়াছে, যে, এই অডিট সার্কেলগুলি মন্ত্রীর নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় সাহায্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত হিসাব-পরীক্ষার আদর্শ নীতি অনুসারেও হিসাব-পরীক্ষকের কর্তব্য কার্যনির্বাহক কর্মচারীদের কর্তব্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

সমবায় কর্মচারীদের বদলি, নিয়োগ, পদোন্নতি এবং সমবায়-বিভাগে অস্থায়ী লোক নিয়োগ প্রভৃতিও নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। কর্মচারীদিগকে উপযুক্ত অঞ্চলে বদলি করিয়া ইহাদেরই সাহায্যে সরকারী কার্যচ্ছল স্থানীয় লোকদের হাত-করিবার চেষ্টা কিছু দিন হইতে বেশ টের পাওয়া যাইতেছে। গত এক বৎসর যাবৎ যে-প্রণালীতে সমবায়-বিভাগের এই সব কার্য চলিতেছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেই উপরিউক্ত অবৈধ কাজগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

সমবায়-বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা অল্প। এই অল্পহাতেই উপযুক্তরূপে কার্য পরিচালনা করিয়া কতকগুলি নূতন পদ মঞ্জুর

করাইয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অল্পতা সত্ত্বেও যে অনেক কর্মচারীকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য নির্বাচন-প্রতিযোগিতার কার্যে ব্যাপৃত রাখা হইতেছে, তাহাতে কি উপযুক্ত কার্য পরিচালনার ব্যাঘাত হয় না? এতদ্ব্যতীত কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও যে এই পথ অবলম্বিত হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

কিছু দিন পর্যন্ত মন্ত্রী মহোদয়ের পশ্চিম-বঙ্গের নির্বাচন-প্রতিযোগিতার কাজকর্ম ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। বেজিষ্ট্রারের তত্ত্বাবধানে কোনও একটি গেজেটেড অফিসার সমিতি এবং সমবায়-বিভাগের কর্মচারীগণের সাহায্যে এই অঞ্চলে মন্ত্রী মহোদয়ের কৃতকার্যতার জন্ত প্রাণগণ চেষ্ঠা করিতেছেন। শুনা যায়, রেজিষ্ট্রার সাহেবও পল্লী-সংস্কার প্রভৃতি নানা কার্যের অজুহাতে ঐ অঞ্চলে ঘন ঘন বাতায়নত করিয়া নির্বাচন-কার্য পরিদর্শনাদি করিয়া থাকেন। আবও শুনা যায়, যে মন্ত্রী-মহাশয়ের সাহায্যকরে সমবায়-বিভাগের প্রেসিডেন্সী ডিভিজন এলাকাস্থ কতক কর্মচারীকে মফস্বল হইতে কলিকাতা আনা হইয়াছে। কলিকাতার কর্মচারীদের মধ্যেও অনেকে এই কর্মে ব্যাপৃত হইয়াছেন। মন্ত্রী-মহাশয়ের অধীনস্থ অল্প এক বিভাগের জর্নেল উচ্চ কর্মচারীও তাঁহার এই অঞ্চলস্থ জমীদারী এবং পৈত্রিক প্রতিপত্তির বলে মন্ত্রী-মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে রত আছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সমবায়-সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার মহোদয় কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের নির্বাচন ব্যাপারে এক প্রকার এই প্রদেশের প্রধান কার্যকর্তা হিসাবে কার্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই কার্যে বিশ্বস্ত কর্মচারীরাও তিনি ডিপার্টমেন্টের এক জন গেজেটেড অফিসারকে পাইয়াছেন। এই অফিসারটি সমবায়-বিভাগের বিশেষ কার্যের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত। অল্পসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে যে-কার্যের জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন সেই কার্যের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যতটা তাহা হইতে অনেক বেশী হইতেছে রাজনৈতিক কাজ; যথা কাউন্সিলের মেম্বরগণকে ঠিক পথে চালান, সমবায় কর্মচারী নিয়োগ এবং বদলি ও সাস্থ্যে করার কার্যে বেজিষ্ট্রারকে উপযুক্ত পরামর্শ ইত্যাদি

দান এবং যে-সকল সমিতি কিংবা কর্মচারীকে রেজিষ্ট্রার এবং মন্ত্রীর আজ্ঞাধীনে আনা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা; তাঁহার উপর কলিকাতার একটি বিশিষ্ট সমিতির কার্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতে নানা প্রকার সাহায্য প্রয়োজন হইলে এই সকল কার্যের উন্নতির জন্য নিয়োগ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু চেষ্টাষ কাউন্সিলে সমবায়-বিভাগ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে মন্ত্রী সাহেবের কৃতকার্যতা এবং উপরোক্ত সভ্যটির পবাক্ষর অনেকটা এই গেজেটেড অফিসারটির উপযুক্ত লবিংয়ের (lobbying-এব) ফল-স্বরূপ। কিছু দিন পূর্বে এই সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত ঘটক মহাশয় নিযুক্ত হন। যখন দেখা গেল, তিনি বিভাগের আজ্ঞাধীনে থাকিবার মত লোক নহেন, তখন হঠাৎ তাঁহাকে সরাইয়া মন্ত্রী সাহেবের এক জন প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়কে (তাঁহার নির্বাচনের জন্য একটি উপযুক্ত কেন্দ্রের অল্পসন্ধান চলিয়াছিল) নিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত ঘটক এই সমিতির অপূর্ণ কাণ্ডাবলী সম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে জ্ঞাত করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত তদ্বিরের ফলে তিনি যাহা জানাইয়াছেন তাহা চাপা পড়িয়া আছে। আমরা আশা করি বাংলা-সরকার এবং গবর্নরের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে।

মন্ত্রী-মহাশয়ের প্রতিপত্তিশালী সমর্থনকারীদের মধ্যে বীরভূম ও নদীয়া অঞ্চল হইতে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে যাহারা দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারাও কি মন্ত্রী সাহেবের নির্বাচন-প্রতিযোগিতায় যে-সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহারই সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিতে আশা করেন?

এদেশে সমবায়-সমিতিসমূহের স্থষ্টির সময়েই রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা একটি আবশ্যিক নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবেও সমবায়-বিভাগের এই জাতীয় কার্যে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ। কিন্তু আসন্ন নির্বাচনে সমবায়-বিভাগের প্রধান কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যের জন্ত রাজনৈতিক কার্যে রত থাকিয়া এই রীতি লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছেন। যদি সরকার-পক্ষ

হইতে এই অবস্থার প্রতিকারের কোনও সুবন্দোবস্ত ন-হয় তবে পরিণাম ভয়াবহ। মন্ত্রী-মহাশয়ের অধীনস্থ আরও যে কয়েকটি বিভাগ আছে তাহাদের সকলের মিলিত শক্তি ব্যবহারের সুযোগ করিয়া লইতে সমর্থ হইলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন এবং তাঁহার অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাবলে সব-শিছুই করিতে পারিবেন। এই সকল সম্ভাবিত বিষয় চিন্তা করিয়া দেশেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় হয়। এই জন্তই আমরা বাংলার গবর্নর ও সরকারের উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অবিলম্বে উপরে লিখিত অবৈধ কাজগুলির যথাযোগ্য প্রতিকারার্থে এত কথা লিখিলাম।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে রফা

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ব অমুদারী একটি রফার বিষয়ে সর্ আবদুল হালিম গজনবী ও বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ মহতাবের দুটি চিঠি এবং অল্প কয়েক জনের মতামত খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। রফার সর্বগুলি এই :—

1. "The Communal Award to remain, subject to revision at the end of ten years, or unless and until the Communal Award is modified, by the mutual agreement of the communities affected by it."

2. "The cabinet to contain an equal number of Hindu and Muslim ministers."

3. "All the services under the Provincial Government to be recruited from now in equal numbers in the proportion of 50 : 50 from the Hindu and Muslim communities in Bengal, subject to the reservation of an agreed percentage thereof for members of the European, Anglo-Indian and Christian communities of the Province and subject to the candidates of all the communities satisfying a test of minimum efficiency to be formulated by a provincial commission."

তথ্যপূর্ণ। ১। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই সর্ব এখন কয়েক থাকিবে যে উহা দশ বৎসর পবে সংশোধনীয় হইবে, যখন তত দিন থাকিবে যতদিন পর্যন্ত না উহা উহা সহিত জড়িতস্বার্থ বঙ্গের সম্প্রদায়গুলির সম্মতি অমুদারে পবিস্বীকৃত না হইবে।

২। বঙ্গের মন্ত্রিসভার সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রী থাকিবে।

৩। এখন হইতে প্রাদেশিক গবর্নর-দেব অধীন সমস্ত চাকুরী-বিভাগেই সব পদে বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সমান-

সমান-সংখ্যক অর্থাৎ শতকরা ৫০ : ৫০টির অমুদারে কর্মচারী লওয়া হইবে এই সর্বাদীন ভাবে যে ইউরোপীয়, এংলো-ইণ্ডিয়ান ও খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায়গুলির জন্ত সমগ্র পদগুলির একটা, সব সম্প্রদায়েব অমুদারিত, অংশ সংরক্ষিত থাকিবে, এবং সব সম্প্রদায়েব কর্মপ্রার্থী-দিগকে প্রাদেশিক চাকুরী-কমিশনের নির্ধারিত একটি ন্যূনতম কর্মক্ষমত্বের প্রমাণ দিতে হইবে।

বঙ্গের সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ও নেতৃস্থানীয় যে কাহারো, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং কয়েক জন লোক উক্ত তিন দফা সর্বের রাজী হইলেই যে বঙ্গের সব অধিবাসীর সম্মতি পাওয়া গিয়াছে এরূপ বলা কঠিন হইবে। কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যে, বঙ্গের সকল অধিবাসীর প্রতিনিধিস্থানীয় সব নেতারা সর্বত্রলাতে রাজী হইয়াছেন। তাহা হইলেও জানিতে হইবে, বাংলা-গবর্নর ও বঙ্গের গবর্নর রাজী হইয়াছেন বা হইবেন কি না। বাংলা-সরকার রাজী হইলেও তাহা যথেষ্ট হইবে না, লণ্ডনস্থ ভারত-সচিব ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার রাজী হওয়া চাই; কিন্তু তাঁহারা রাজী না-হইতেও পারেন। কারণ, বঙ্গ আদারী রাজ্যের যত টাকা বাংলা-সরকার বঙ্গের খরচের জন্য চাহিয়াছিলেন, ভারত-সচিব তাহা দিতে রাজী হন নাই।

সর্ আবদুল হালিম গজনবীর যে চিঠিতে তিনি সর্বগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, যে, তিনি বাঙালী মুসলমানদের প্রায় সব নেতা এবং আগা খাঁ প্রভৃতি অবাঙালী প্রায় সব মুসলমান নেতার পরামর্শ ও সম্মতি লইয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের চিঠিতে কিন্তু বঙ্গের বাহিরের অবাঙালী নেতাদের পরামর্শ ও সম্মতি লইবার কোন উল্লেখ নাই। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্ত, শুধু বঙ্গের জন্ত নহে। এক প্রদেশে উহার পরিবর্তন করিলে, অমুদারে পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। সুতরাং যেমন সব প্রদেশের মুসলমান নেতাদের মতামত জানা দরকার, তেমনি সব প্রদেশের হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও মতামত জানা আবশ্যিক।

গজনবী সাহেব দফা দফা কেবল তিনটা সর্বের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চিঠিটার শেষে একটি লেজ (বা হল ?) জড়িয়া দিয়াছেন। তাহা এই :—

"The acceptance of the proposal on the Muslim side must be understood to be subject to the proviso

that all agitation against the Communal Award, except in the manner agreed upon, must cease as soon as this settlement is put through, otherwise it will be inoperative and of no effect."

তাপর্ধ্য। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে, যে, মুসলমানপক্ষ হইতে রকার প্রস্তাবটি গ্রহণ এই সর্বোত্তম অধীন, যে, রফাটি সম্পন্ন হইবামাত্র সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবাব বিরুদ্ধে, সর্বপক্ষসম্মত প্রকারেব ভিন্ন অস্ত্র সব রকম, আন্দোলন থামিয়া বাওয়া চাই, তাহা না হইলে বকা বাতিল হইবে ও তদনুসারে কাজ হইবে না।

গজনবী সাহেবের তাহা হইলে রফাটার দফা তিনটা না করিয়া চারিটা করা উচিত ছিল। অবশ্য ইংরেজীতে বলে বটে, যে, অনেক চিঠির হলের আঘাতটা থাকে শেষে।

বন্ধে এমন কোন নেতা নাই, যাহার প্রভাবে বা আদেশে একটা কোন রকম আন্দোলন সম্পূর্ণ থামিয়া যাইতে পারে। পীতাল কোডে একটা ধারা বসাইয়া দিলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেকটা থামিতে পারে বটে; কিন্তু তাহাতেও একেবারে না-থামিতে পারে। কেন না, "রাজড্রোহ" সশস্ত্রীয় ধারা পীতাল কোডে থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক "রাজড্রোহ" করিয়া জরিমানা দেয় ও জেলে যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার উচ্ছেদের আগে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্পূর্ণ থামিবে না। সে-বিষয়ে গজনবী সাহেব নিশ্চিত থাকুন।

এখন সর্বশ্রুতা সঙ্ক্ষে কিছু বলি।

গণতন্ত্র (ডিমক্রাসি) ও স্বাধীনতাবাদের (স্ভাশ্রুতালি-জমের) দিক হইতে বাঁটোয়ারাটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল আপত্তি এই, যে, উহা ভারতীয়দিগকে ভারতীয় বলিয়া মানিতেছে না — মানিতেছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের, জাতির ও জাতিত্বের, বৃত্তির ও শ্রেণীর, এবং পুরুষ- ও স্ত্রীজাতীয় মানুষ বলিয়া। সেই জন্ত নির্বাচকমণ্ডলী সব আলাদা আলাদা করা হইয়াছে। সমগ্র মহাজাতিটাকে (নেশনকে) বাঁটোয়ারাটা যে এই প্রকারে নানা টুকরায় বিভক্ত করিয়াছে, রফাটা তাহার কোনই প্রতিকার করে নাই।

বাঁটোয়ারাটা বন্ধের হিন্দু ও অগ্র ভারতীয়ধর্মাবলম্বী-দিগকে তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রাণ্য আসন্নও দেয় নাই — তাহাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, প্রদত্ত টাক্সের পরিমাণ, এবং ঐকনিক কার্যে উৎসাহ ও কৃতিত্ব

অনুসারে ত দেয়ই নাই। রফাটা বাঁটোয়ারাটা এই দোষেবও কোনই প্রতিকার করে নাই।

মন্ত্রী মনোনয়ন করা আইন অনুসারে গবর্নরের কাজ। সাম্প্রদায়িকনির্কির্শেষে ব্যবস্থাপক সভার যোগ্যতম সদস্য-দিগকেই যে মন্ত্রী মনোনয়ন করা হয়, তাহা নহে—যদিও তাহাই করা উচিত। সুতরাং যোগ্যতার বিচার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক মন্ত্রী লইলে, সেরূপ বন্দোবস্তকে মনের ভাল বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রীদিগকে কেবল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় হইতে মনোনীত কেন করা হইবে? তাহারা বন্ধের প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায় বটে। কিন্তু "অগ্রাগ্র" ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ও ত বন্ধে আছে। তাহাদের মধ্যে খুব যোগ্য কোন ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইলে, তাহাকে গবর্নর মন্ত্রী মনোনীত করিতে পারিবেনই না, এমন কোন ব্যবস্থা থাকা ভাল নয়।

এই সব কারণে রফাটার ২ নং সর্ব অল্পমোদনযোগ্য নহে।

ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে এবং ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরীভাগ না করিয়া ধর্মসম্প্রদায়নির্কির্শেষে যোগ্যতম লোকদিগকেই চাকরী দেওয়া উচিত। ধর্মসম্প্রদায় অনুসারে ও ন্যূনতম যোগ্যতা অনুসারে চাকরী ভাগ করিয়া দিলে শুধু যে সব সম্প্রদায়েরই খুব যোগ্য লোকদিগের প্রতি অবিচার হয় তাহা নহে, খুব যোগ্য হইবার প্রবৃত্তির মূলেই কুঠারাঘাত করা হয় এবং সরকারী সব বিভাগেব কাজ উত্তমরূপে নির্বাহিত হইবার পরিবর্তে অপকৃষ্ট রূপে নির্বাহিত হয়।

অতএব রফার ৩ নং সর্বটাও অল্পমোদনযোগ্য নহে।

১ নং সর্বটার ঠিক মানে বুঝা যায় না। ইহার মানে কি এই, যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবাটা দশ বৎসর নিশ্চয়ই থাকিবে ও তাহার পর নিশ্চয়ই সংশোধিত হইবে? না, ইহার মানে এই, যে, সম্প্রদায়গুলি সংশোধন ও পরিবর্তন সঙ্ক্ষে একমত হইলে দশ বৎসরের আগেও সংশোধন হইতে পারিবে? অথবা ইহার মানে কি এই, যে, দশ বৎসরেব পরেও সম্প্রদায়গুলি একমত না হইলে কোন পরিবর্তন হইবে না? শিক্ষিত ইংবেজরা হয়ত সর্বটার ঠিক মানে বুঝিতে ও বলিতে পারিবে, আমবা পারি নাই।

সর্বটাতে কেবল সংশোধন ও পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু সংশোধন ও পরিবর্তন হইবে, তাহা বলা হয় নাই, বাঁটোয়রাটাব সম্পূর্ণ উচ্ছেদের কথা ত বলা হয়ই নাই। কিন্তু উহাব সমূল উচ্ছেদ চাই।

সকল সম্প্রদায়ের সম্মতি অনুসারে উহার পরিবর্তন হইবার কথা রক্ষাটাতে আছে। কিন্তু পত্রব্যবহার হইয়াছে কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরা অবশ্য সংখ্যায় খুব কম। কিন্তু তাহারাও ত মাহুষ এবং ট্যাক্স দেয়। তাহাদেরও মত লওয়া উচিত ছিল, এবং ভবিষ্যতে মত লওয়া উচিত হইবে।

এই সব কারণে রক্ষার ১ নং সর্বটাও অনুমোদনযোগ্য নহে।

আমরা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দিক দিয়া যে আপত্তির উল্লেখ করিয়াছি, যদি তাহাই একমাত্র আপত্তি হইত, তাহা হইলেও বঙ্গের সমগ্র প্রজাবর্গই অনুমোদনের অযোগ্য হইত। কিন্তু অন্য আপত্তিও আছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

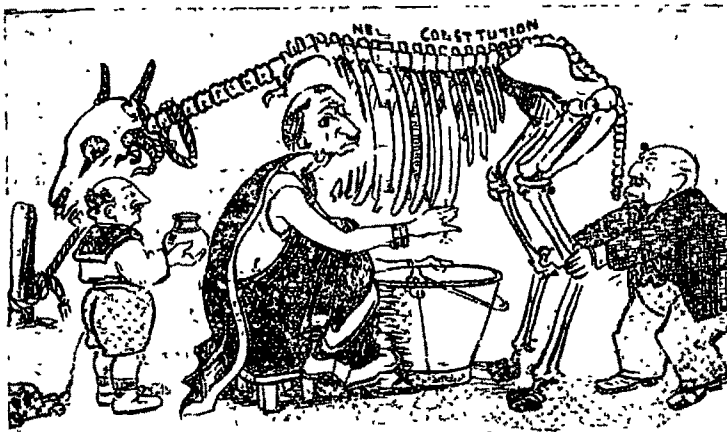
জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের প্রস্তাবাবলী

লঙ্কৌ শহরে গত পৌষ মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় উদারনৈতিক সংঘের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান ছয়টি প্রস্তাব উদ্ভূত ও সম্মোদনযোগ্য। তাহা কার্যে পরিণত হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে।

কিন্তু ইহাও প্রায় নিশ্চিত, যে, নূতন ভারতশাসন আইনের বলে ও সাহায্যে তাহা কার্যে পরিণত হওয়া দুশাধ্য—অসম্ভব বলিলেও খুব অত্যাক্তি হইবে না।

প্রধান প্রস্তাবগুলির প্রথমটিতে সংঘ তাঁহাদের আগে প্রকাশিত মতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ভারতবর্ষকে যে মূল রাষ্ট্রীয় বিধি (কন্সটিটিউশন) দেওয়া হইয়াছে, তাহা সাতিশয় অসন্তোষজনক এবং গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য : ইহা কেবল যে নিতান্ত অযথেষ্ট তাহা নহে, কিন্তু অনেক বিনয়ে, প্রগতিবিধায়ক না হইয়া, বিপরীতপন্থ্যগামী, এবং ইহাতে ভারতীয় জাতীয় মতের বিরোধী বহু ব্যবস্থা আছে। তথাপি সংঘ দেশের লোকদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি নিমিত্ত এবং ভৌমী-নিয়ন্ত্রণের দিকে দেশের আরও প্রগতির বেগ বৃদ্ধির নিমিত্ত ইহা কাজে লাগাইতে চান।

“আরও” কথাটি আমরা আমদানী করি নাই। ইহাতে সংঘের “কার্দার” কথাটির তাৎপর্য দেওয়া হইয়াছে। সংঘ প্রথমে বলিয়াছেন, নূতন আইনটা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রগতির পরিবর্তে উল্টা দিকে লইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ কোন প্রগতিই ইহার দ্বারা হয় নাই। তাহার পরই সংঘ কিন্তু আবার বলিতেছেন, যে, “আরও” প্রগতি চাই। কিন্তু প্রগতি হইয়া থাকিলে তবে “আরও” প্রগতির কথা বলা সাজে। ইহা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হইত, যে, বিপরীত দিকে গতির পরিবর্তে প্রগতি চাই।



নূতন ভারতশাসন আইন দোহন

(হিন্দুস্থান টাইমস্ হইতে)

নূতন আইনটার সাহায্যে দেশের লোকদের বথাসম্ভব সুবিধা করিয়া লইবার কথা বোঝাইয়ের সব চিমন লাল সেতলবাদ প্রভৃতি উদারনৈতিক নেতাবা আগেও অনেক বার বলিয়াছেন। অথচ সেটাকে তাঁহারা সাতিশয় অসন্তোষজনক ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্যও বলিয়াছেন। তথাপি সেটাকে কানধেদুর্ব্ব মনে করিবার কাবণ কি ?

বালি সাধারণ গ্রন্থাগারের স্ববর্ণজয়ন্তী

পৌষে বালি সাধারণ গ্রন্থাগাবে স্ববর্ণজয়ন্তী হইয়া গিয়াছে। বালি মত ছোট একটি নগবে ৫০ বৎসর ধরিয়৷ একটি সাধারণ গ্রন্থাগাবে কাজ ক্রমোন্নতি সহকারে চলিয়া আসা তথাকার নাগরিকদের জ্ঞানানুরাগ ও সার্বজনিক কাজে উৎসাহের পরিচায়ক। ইহা বলিবার বিশেষ কারণ আছে। বালির এই সাধারণ গ্রন্থাগারের বাড়ীটি এবং ইহার অনেক হাজার পুস্তক কোন এক বা দুই-এক ধনী ব্যক্তির দানে নিশ্চিত ও জ্ঞীত হয় নাই। এগুলি বহু ব্যক্তির অল্পাধিক দানের পরিচায়ক। বালির নাগরিকেরা কেবল ৩৫ টাকাই দিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থাগারটির জন্ম সময় এবং শক্তিও ব্যয় করিয়াছেন। ইহার সর্ববিধ কাজ অবৈতনিক কর্মীদের দ্বারা এ-পর্যন্ত নির্বাহিত হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থাগারের জন্ম পুস্তকক্রয় বিচার পূর্বক করা হয়, এবং ভাল বহি যাহাতে পঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করা হয়। ঐহাবা সামান্য চাঁদাও দিতে অসমর্থ অথচ ঐহাদের পাঠানুরাগ আছে, এই গ্রন্থাগার তাঁহাদেরও পড়িবার বথাসাধ্য সুবিধা করিয়া দিয়া থাকে। দেশে গ্রন্থাগার যত বাড়ি এবং তথায় রক্ষিত ভাল ভাল বহি যতই পঠিত হয়, ততই ভাল। কারণ, আমাদের দেশের দাবিদ্র্য শুধু আর্থিক নহে, মানসিক দারিদ্র্যও খুব বেশী। ব্যবহৃত গ্রন্থাগারসমূহ মানসিক দারিদ্র্য দূর করিবার অন্যতম প্রধান উপায়।

নিখিল ভারত নারীরক্ষা সম্মেলন

পৌষে কলিকাতায় নিখিল ভারত নারীরক্ষা সম্মেলনের

অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র নারীদের সম্মেলন। নারীরা যে এই কাজে মন দিয়াছেন, তাহা সম্ভোষেব বিষয়, কিন্তু পুরুষদের অগোবয়ের বিষয়ও বটে। পুরুষদের মধ্যে দ্রব্র্ত নরপিশাচ এত বেশী না-থাকিলে নারীরক্ষা সমিতি ও নারীরক্ষা সম্মেলনের প্রয়োজন হইত না। এক দিকে যেমন এই পিশাচদের কুপ্রবৃত্তি ও গুণ্ডামি আছে, তেমনি যদি অন্য দিকে অন্য পুরুষদের স্ববুদ্ধি, পৌরুষ ও সাহস থাকিত তাহা হইলেও নারীরক্ষা সমিতি ও নারীরক্ষা সম্মেলনের প্রয়োজন হইত না। রাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত উদাসীন এবং আবশ্যকমত আইন প্রণয়নে অবহেলা ও বর্তমান আইন কার্যতঃ প্রয়োগে অবহেলাও ভারতবর্ষে ও বঙ্গে নারীনিগ্রহের প্রাচুর্য্যবের জন্ম দায়ী। হিন্দুসমাজ দ্রব্র্ত পুরুষকে সমাজচ্যুত করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে, কিন্তু নিরপরাধ অপকৃতা ধর্ম্মিতা নিগূহীতা নারীদিগকে এখনও অনেক স্থলে গৃহে ও সমাজে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করে। এ-বিষয়ে সমাজকে জ্ঞায়পরায়ণ, সহৃদয় ও দূরদর্শী হইতে হইবে। নারীদিগকেও স্বশিক্ষার দ্বারা, তাঁহাদের দেহমনের শক্তি বাড়াইয়া, আত্মরক্ষায় সমর্থ করিতে হইবে।

নারীনিগ্রহের প্রতিকার ও তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

শিক্ষার উন্নতির ওজুহাতে শিক্ষার সঙ্কোচ

ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের সর্বত্র শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন ব্যপদেশে, প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র, তাহার সঙ্কোচসাধনের চেষ্টা হইতেছে, এবং এই সঙ্কোচসাধন প্রয়াসের ডেউ দেশী রাজ্যগুলিতেও অবশ্য গিয়া পৌছিতেছে। স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতে কিন্তু দোষজনক সংশোধনের নামে সংহার বা সঙ্কোচসাধন করা হয় না। আমাদের প্রাথমিক পাঠশালাগুলিকে একেজো বলা হয়, তাহাতে লিখন-পঠনকর্ম পর্যন্ত অনেক ছাত্রছাত্রী হয় না বলা হয়। অনেক স্থলে তাহা সভ্যও হইতে পারে। কিন্তু এই দোষ সংশোধনের

অতীত নহে। সংশোধন করাই উচিত। শিক্ষার সংকোচ করা উচিত নহে।

মিঃ এ পিণ্ডার (Mr. A. Pindar) নামক এক জন ইংরেজ শিক্ষক বিলাতের বিখ্যাত নিউ ষ্টেটসম্যান নামক প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে লিখিয়াছেন :—

In one senior school I had to teach a class of boys of about twelve years of age. Many were unable to write their own names correctly. Others could not read words of more than four letters. Some did not recognize the map of Europe and all were incapable of performing correctly the simplest arithmetical operation. They seemed to have gained nothing at all from the .previous seven years' unremitting and costly effort on the part of the state.

খুব সম্ভব বিলাতে এইরূপ বিদ্যালয় আরও আছে। কিন্তু তাহার জন্ত তৎসম বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা হয় নাই, উন্নতির চেষ্টাই হইয়া থাকে ও হইবে।



ডাঃ বিপিনবিহারী সেন

বিপিনবিহারী সেন

ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জননায়ক, ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন মহাশয় গত ৮ই জাহুয়ারী শুক্রবার বেলা ১টার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ময়মনসিংহের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপূরণীয়। তিনি দরিদ্রের মাতাপিতা-স্বরূপ ছিলেন। কত দরিদ্র রোগী যে তাঁহার নিকট হইতে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছে, কত অনাথ ছাত্র যে তাঁহার গৃহে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাই আজ ময়মনসিংহের ঘরে-ঘরে শোকের হাহাকার উঠিয়াছে। তিনি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি বহুকাল ময়মনসিংহ কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন এবং যথেষ্ট সম্মানের সহিত কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। কর্তব্যকে তিনি দেবতার হ্রাদ পূজা করিতেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁহার কর্তব্যকে অবহেলা করেন নাই।

স্থানীয় সকল প্রকার জনহিতকর কার্যের সহিতই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ময়মনসিংহে অল্পদিন পূর্বে যখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তখন ইহার প্রতিরোধের জন্ত অস্বস্তি দেহেও দিবারাত্র তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা অনেকের অতুলনীয়। তিনি নয় বৎসরকাল ময়মনসিংহ মিউনিসিপালিটির স্ববোধ্য চেয়ারম্যান ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে শহরের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল কৌন্সিল অব মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশনের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। পরলোকগমনের এক ঘণ্টা পূর্বেও এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তাঁহার চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে কৰ্ম্মবীর সাধু-পুরুষ পরলোকে চলিয়া গেলেন।

স্বাভাৱিকতার প্রসার

মুসলমান ছাত্রদের একটি নিখিলভারতীয় কনফারেন্স

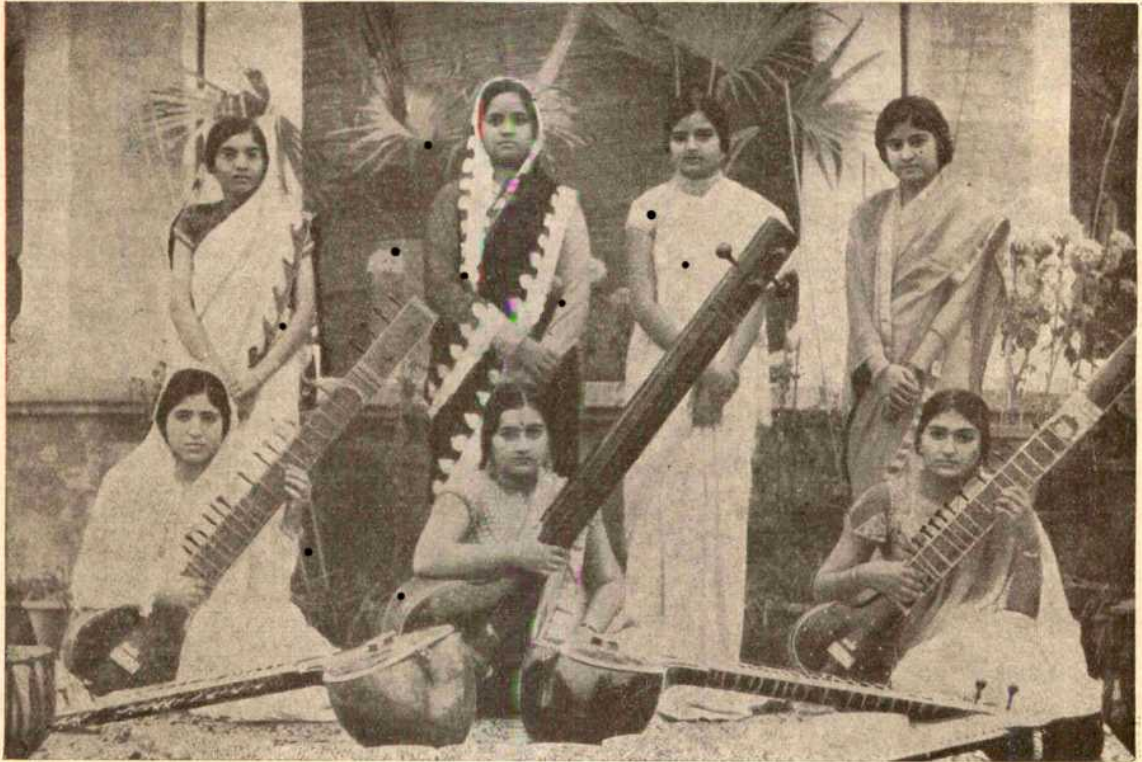
করিবার প্রস্তাব হয়। আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রথমেই ইহার প্রতিবাদ করে। তাহার এই মর্শ্বের কথা বলে যে, আমরা ছাত্র, অতঃপর ধর্মাবলম্বী ছাত্রেরাও ছাত্র, সকল ছাত্রদের একটি সম্মিলিত কন্ফারেন্স বাঙালীয়, সাম্প্রদায়িক কন্ফারেন্স বাঙালীয় নহে। তাহার পর আরও নানা প্রদেশের মুসলমান ছাত্রেরা সাম্প্রদায়িক ছাত্র-কন্ফারেন্সের প্রতিবাদ করিয়াছে। সুতরাং মুসলমান ছাত্র-কন্ফারেন্স করিবার প্রস্তাব আপাততঃ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহা খুব সুসংবাদ।

লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক বিদ্যা

শিক্ষণের প্রস্তাব

লক্ষ্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক কৌন্সিল সাংবাদিক-পত্রপরিচালন বিদ্যা শিখাইতে ও তাহাতে পরীক্ষা লইয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা দিতে সংকল্প করিয়াছেন। শিক্ষণীয় বিষয় প্রভৃতি নির্দ্ধারণের জন্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

কলিকাতার কতকগুলি সাংবাদিকের চেষ্টার ফল এই হইয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত না হইলে ভাল হইত।



লাহোরের এক দল সঙ্গীতকলাকুশলী ছাত্রী।

উপস্থিত : বাম হইতে :—কুমারী লয়লা ভাণ্ডারী, কুমারী প্রিতম ধাওয়ান এবং কুমারী লজ্জাবতী ধাওয়ান।

দণ্ডায়মান : কুমারী বনুনা, কুমারী কমলা মোহন, কুমারী কৌমুদী ও কুমারী এস্. সি. চ্যাটার্জী।



ভারতবর্ষ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন

বিহার-প্রবাসী রায় বাহাদুর শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয় সম্প্রতি কণ্ঠজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ১৯৩৪ সালের বিহার-ধ্বংসী ভূমিকম্পের পর হইতে ভারত-সরকার কর্তৃক অনুকল্প হইয়া ইনি ত্রিভুজ-বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ “ইন্সপেক্টর অফ লোকাল ওয়ার্কস” পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সম্প্রতি ইনি বাংলা দেশের নানাস্থানে বালক-বালিকাগণের শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন।

কৃতী ছাত্র

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ক্রিসত্যশরণ মুখোপাধ্যায় ‘প্রিন্স অব ওয়েলস’ বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত যান। তিনি ট্রাকচারাল এনজিনিয়ারিং-এর শেষ পরীক্ষায় সম্মানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীধর্জিটপ্রসাদ চৌধুরী অধ্যাপনার্থ ইংলণ্ড আসিয়া অর্থাভাবে ব্যবসারে মনোযোগ দেন। লণ্ডন ওয়েস্ট-এণ্ড তৎপরিচালিত ভারতীয় আহাষের

হোটেল বিশেষ জনপ্রিয়। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনে নান ভারতীয় পণ্যের একটি দোকান খুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

নয়া দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবের সাহিত্য-বিভাগ কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ের একটি প্রবন্ধ আহ্বান করা হইতেছে। বাঙ্গালার বাহিরে যে-কোন স্থান হইতে প্রবাসী বাঙ্গালী (স্ত্রী বা পুরুষ) প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিবেন।

বিষয়—“প্রবাসী বাঙ্গালীর অন্ন-সমস্যা ও তাহা নিরাকরণের উপায়।”

প্রবন্ধটি সাধারণ ফুলফ্যাপের ১৫ পৃষ্ঠার অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক একটি রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে।

প্রবন্ধ নিম্নলিখিত ঠিকানায় ৩০শে মাঘের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

অথবা

১২, পার্শ্ব কোয়ার

নিউ দিল্লী।

শ্রীঅপূর্বমণি দত্ত

সম্পাদক—সাহিত্য-বিভাগ

১৪ নং বেয়ার্ড রোড—নিউ দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব

লক্ষাধিক লোকের অনুরোধে

এক-সেরা টীনে শ্রীঘৃতের প্রচলন

আমরা প্রায় লক্ষাধিক লোকের নিকট হইতে শ্রীঘৃতের সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং তাহার উত্তরে অধিকাংশ লোকেই বলিয়াছেন যে অল্প পরিমাণ ঘৃত ক্রয় করিবার সময় তাঁহারা প্রকৃত শ্রীঘৃত পাইতেছেন কিনা নিশ্চিত হইতে পারেন না। ইহার প্রতীকারার্থে এক-সেরা টীনে শ্রীঘৃত প্রচলন হইল। ইহাতে যে সকল ছবিধা তাহার মধ্যে কয়েকটি এই :—

১। প্রকৃত শ্রীঘৃত অল্প পরিমাণেও বন্ধ টীনে পাইবেন।

২। টীনের জন্য কোনরূপ মূল্য দিতে হইবে না।

৩। পাচক, ভৃত্য প্রভৃতি ইচ্ছা করিলেও দস্তুরীর লোভে শ্রীঘৃত বলিয়া অন্য বাজে ঘৃত চালাইতে পারিবে না।

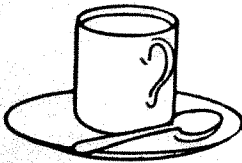
দুঃখের সংসার নিজের হাতেই গড়তে হয়



কোনো কোনো সংসার নিরানন্দ—যেন সেখানে প্রাণ নেই। • কোনো সংসার আবার হাঁ-খুসী, আনন্দে উজ্জল। আনন্দের সংসার মেয়েরাই গড়ে তোলে।

যে দরদী স্ত্রী স্বামীর পারিবারিক অবস্থাকে আনন্দময় করে তুলতে চায়, সে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে এমন লোক যাদের সংসর্গ তার স্বামীর ভালো লাগে। সবচেয়ে ভালো নিমন্ত্রণই হচ্ছে চায়ের নিমন্ত্রণ। তৃপ্তিকর এক পেয়াদা ভালো চা সামনে থাকলে আলাপ জমে ওঠে; বাড়িতে হতাশা ও অন্তরঙ্গতার হাওয়া বয়। এই ‘আনন্দের পাত্র’ই প্রতিদিন নতুন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায়। বাড়িতে যদি চায়ের মজলিশ না থাকে, আজ থেকেই তা শুরু করুন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



টাটকা জল কোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়াদায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা



শ্রী বৃজ্জটি প্রসাদ চৌধুরী



শ্রী হেমেন্দ্রমোহন রায়



শ্রী সত্যশরণ মুখোপাধ্যায়



শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র সেন

মানবের ডাক

প্রকৃতি মহিমাময়ী—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই যে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে মাত্র তাহাই নহে, আমরা চতুর্দিকে যে সকল বৃক্ষ, লতা, তৃণশৃঙ্গাদি নিরীক্ষণ করি, তাহাদের অশেষবিধ গুণ ও অন্তর্নিহিত শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। পরম কারুণিক জগদীশ্বর যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের বিভিন্ন অভাব পূরণ করিতে, তাহাদের রোগাদির উপশম করিতে, দেশময় উপযুক্ত পরিমাণে নান্য উপাদানেরও সমাবেশ করিয়াছেন, উপযুক্ত ভেষজ ঔষধেরও প্রচুর সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্য হিমালয়মুখট পরিবেষ্টিত, বিক্ষ্যামেখলা-পরিহিত, সাগরসলিল-স্নোত-চরণ হিন্দুকুশ শৈল হইতে আরাকান অরণ্যানী বিস্তীর্ণ, ইহার প্রাকৃতিক স্রব-গৌরব অফুরন্ত, অপরিমেয়; স্বভাবজাত ভেষজ-ঔষধের প্রায় সকল প্রাণীর, সর্বদেশবাসীর, সকল অভাব সর্বতোভাবে পূরণক্ষম। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্যানুকরণমোহে পাশ্চাত্যানীত না হইলে ভারতবাসীর তৃপ্তি নাই। ভারত যে সমস্ত ঔষধসম্পদে সর্ব-লীর্ণস্থান অধিকার করিয়া যুগযুগান্তর হইতে নিজ স্বদ জগৎ সমক্ষে প্রতিভাত করিয়াছে, সেই জিনিষগুলিই ভারতবাসীর নিকট গ্রাহ্য হয়, মাত্র যখন সেগুলি পাশ্চাত্য ঔষধ-শোভিত হইয়া বিজ্ঞানীর দ্বারা ভারতবাসীর হস্তে দুর্গম লা প্যারিভ্রমিক সহযোগে প্রত্যর্পিত হয়। ইহাই কি বিত্তবিক নয়? দুই শত বৎসরের অধ্যবসায় ও অনুশীলন ফলে পাশ্চাত্য জগতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি সত্য, কিন্তু মাত্রামুখ্যায়ী অনুপ্রাণিত হইয়াছি কি? কলত: আমরা আমাদের গৃহজাত সহজলব উপাদানগুলি ভুলিয়াছি। যে-ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রথম আলোকসম্পাত হইয়াছিল, যে-ভারতে জাতব, ধাতব ও ভেষজ পদার্থ বৈদ্য ও বৈজ্ঞানিক একত্র গবেষণার দ্বারা মানব রোগারোগ্যে নিয়োগ করেন, ঔষধপরিচয়, ঔষধসমন্বয়, ঔষধশক্তি, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি যে-ভারতে বৈদিকযুগ হইতে ধ্যানরত দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী ঋষিদিগের অনুশীলন বিষয় ছিল, সেই ভারত আজ পাশ্চাত্য মোহে সর্ববিষয়ে সর্বথা পরমুখাপেক্ষী, পরাধীন।

অভাব কোথায়? ঔষধাভাব নাই, জ্ঞানী বা জ্ঞানের অভাব নাই। এখনও এই ভারতে অসম্ভব সম্ভব হইতেছে দেখা যায়, অনেক কটন চুরারোগী রোগ বাহা পাশ্চাত্য, উন্নত, চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে পরাস্ত করিয়াছে, সামান্য কৌশলধারী নাগা সন্ন্যাসী তাহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন শুনা যায়। যে রোগী রোগাতিশয্যে বহুকাল যাবৎ সামান্য জল গলাধঃকরণ করিত না, সেই রোগী আজ একটি মালা-বিশেষ ধারণ করিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে কোন আহার্য পরিপাক করিতে সমর্থ

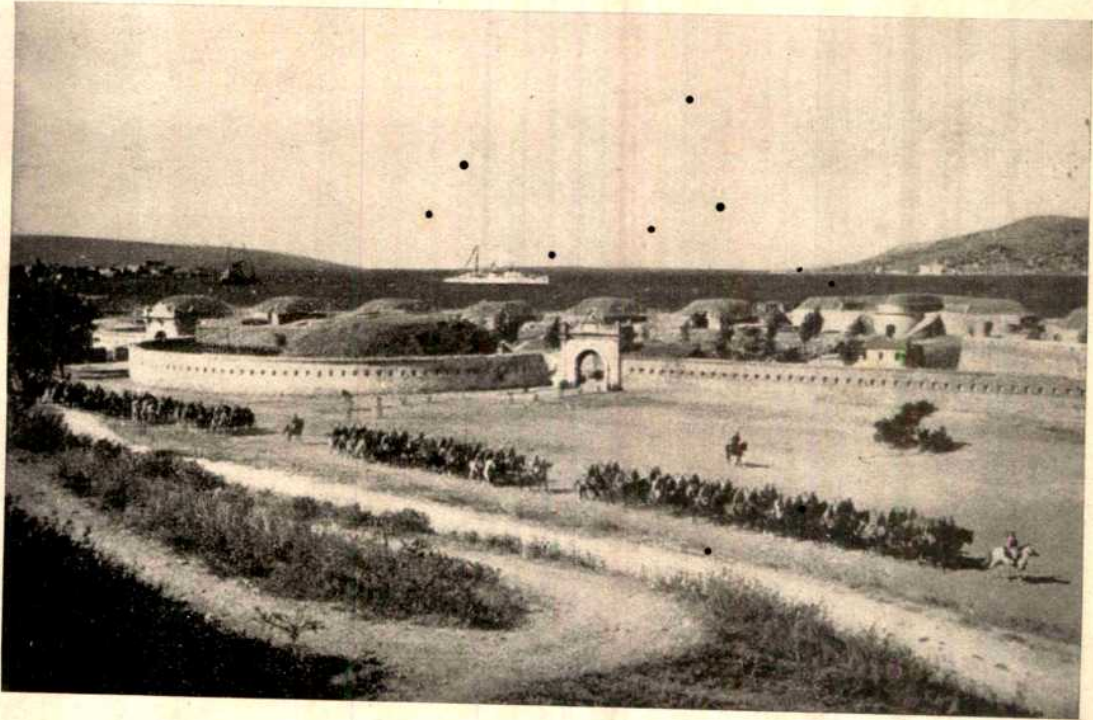
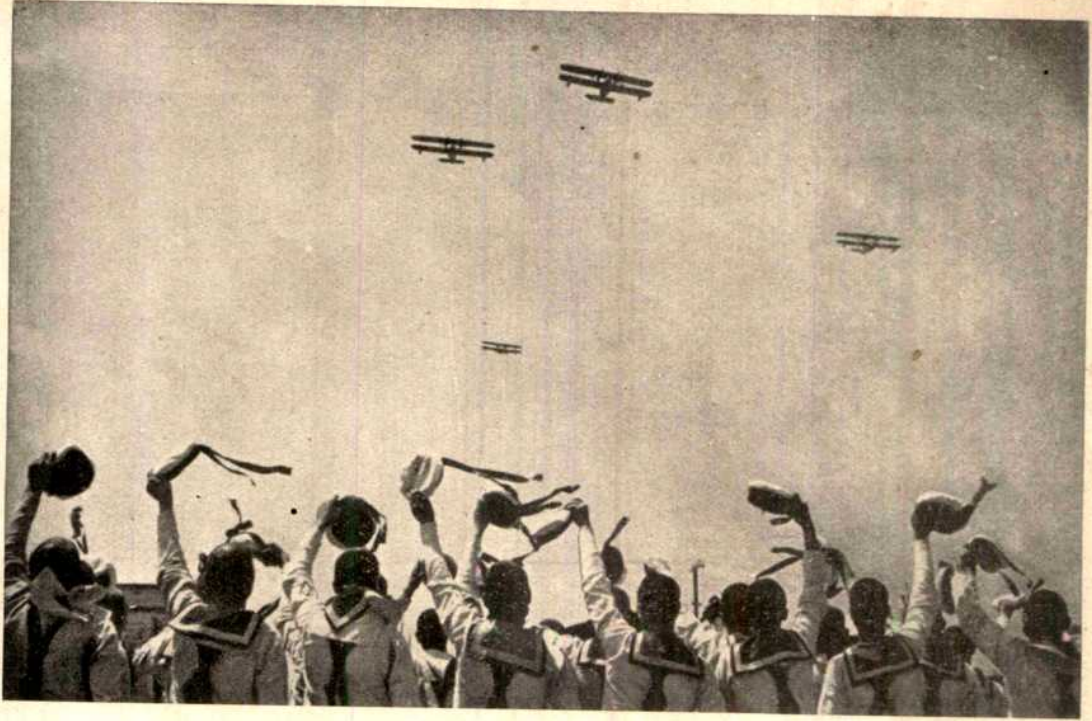
হইয়াছে, নীরোগ হইয়াছে। ভারতীয় ঔষধগুণে ভারতীয় জ্ঞানেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই গুপ্ত, লুপ্তপ্রায় তথাকথিত দৈবশক্তিসম্পন্ন ঔষধজ্ঞান কি অনুশীলনসাপেক্ষ নয়?

ভারতে চাই জ্ঞানানুশীলন মনোবৃত্তি—চাই কর্ণোদায়, বৈজ্ঞানিক-মূলভ ধ্যান ও একাগ্র প্রচেষ্টা, এবং সেই সঙ্গে চাই ধনীর স্বার্থতাগ। সর্বোপরি চাই ভারতবাসীর মনঃপরিবর্তন। সকল দেশেই দেশবাসীর নিকট দেশজ ঔষধের আদর সমধিক আমাদেরও দেশপ্রিয় হওয়া প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন-গবেষণাগার—যেখানে কৃতী বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহযোগে গুপ্ত, লুপ্ত বিদ্যার পুনঃপ্রকাশ কল্পে পূর্ণ প্রচেষ্টার নিযুক্ত থাকিবে। যে সকল ওষধি বহুদিন হইতে বহুলোকের নিকট আদরপ্রিয়, সেই সকল ওষধির অন্তর্নিহিত শক্তির বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায় আয়ুর্বেদানুযায়ী ঔষধসমূহের ব্যবহার-বিধি সময়সাপেক্ষ ও নানা বিড়ম্বনাময়—অন্তথা বিলাতী ঔষধ সর্ব-প্রকারেই উপভোগ্যরূপে প্রস্তুত হইয়া আধারে স্তম্ভ, মাত্রামুখ্যায়ী সেবা। দেশকালানুযায়ী আমাদেরও চালতে হইবে। আমাদেরও দেশীয় ঔষধি সমূহের স্বাধাধি গবেষণার প্রয়োজন। তাহাদের গুণ পরিমাণ আশ্রয়ণ বিশ্লেষণ প্রভৃতি নিরূপিত করা এবং সেগুলি বাহাতে সকলের নিকট সর্বতোভাবে প্রস্তুত আকারে উপস্থিত করা যায় তাহার উপায় স্থির করা।

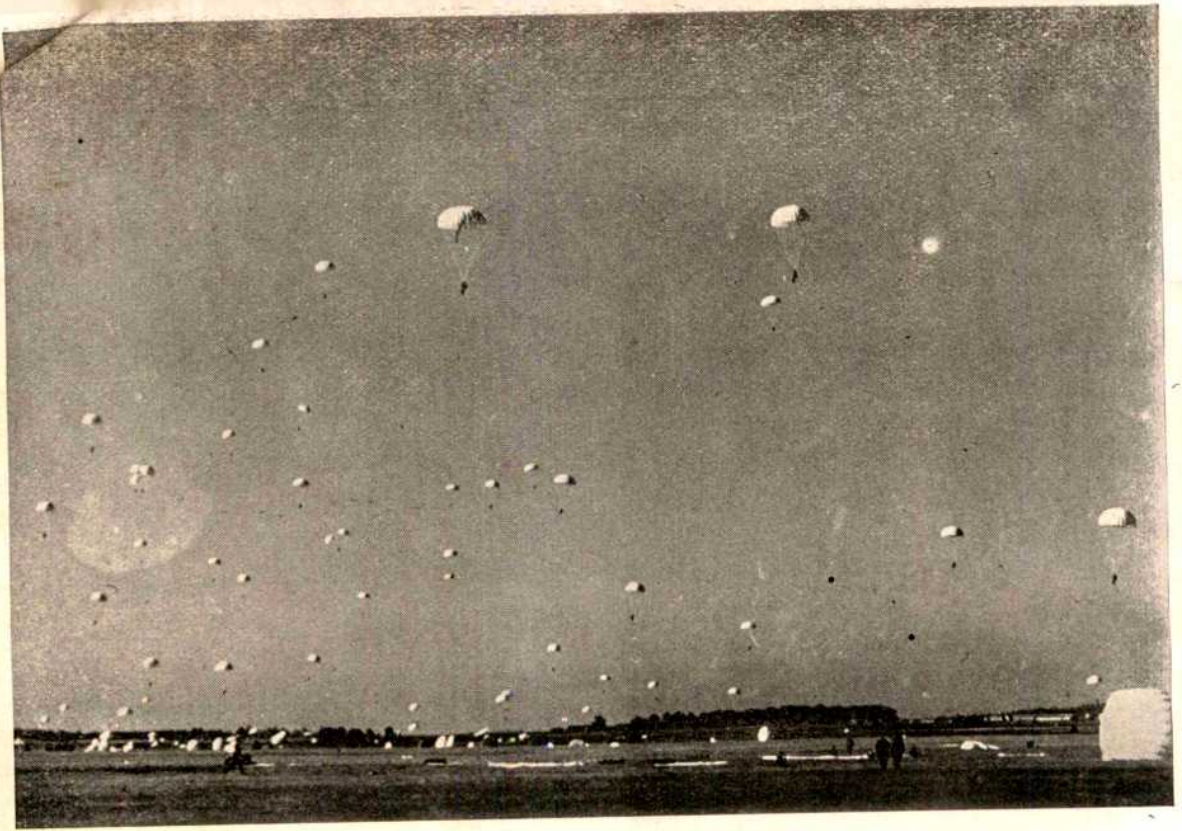
এতদকল্পে আমাদের দেশে চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আরও অধিক ও সমগ্রভাবে চেষ্টা যে করিতে হইবে এবিষয়ে মতান্তর নাই। আমরা আনন্দিত যে সম্প্রতি অশ্বমেধীর একজন মহাশয় বনী বণিক মোলব মহম্মদ আমিন কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও রাসায়নিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সহযোগে একটি গবেষণাগার পরিচালিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। স্তন্য কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ আখ্যাত এই গবেষণা মন্দির হইতে এই অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটি বিশেষ ফলপ্রসূ ঔষধ চিকিৎসকমণ্ডলীর নিকট আদৃত হইতেছে। তন্মধ্যে মাত্র একটির নামই আমরা উল্লেখ করিতেছি, ইহা “ইস্বাগার” নামে পরিচিত,—দেশীয় ঔষধ হইতে প্রস্তুত হইলেও অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতে ইহা প্রচলিত ঔষধ-তালিকার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমরা উপরিউক্ত প্রচেষ্টার সর্বদীন শুভ কামনা করি—এবং আমরা আশা করি, দেশীয় চিকিৎসক মহোদয়দিগকে বিনীত অনুরোধ করি যে এইরূপ প্রচেষ্টার উন্নতি কল্পে তাহাদের সহযোগ বা সহায়ত্ব দিতে যেন সর্বদা আকৃষ্ট হয়। আমাদের চিকিৎসক সম্প্রদায় নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রচার দ্বারা এইরূপ সংপ্রচেষ্টার প্রসার ও তাহাদের স্বায়ত্ব দিতে পারেন।

[বিজ্ঞাপন]



উপরে : দাদানেলিস-প্রণালী সুরক্ষিত করিবার অধিকার তুর্কী পুনঃপ্রাপ্ত হইলে দেশময় আনন্দের মাদ্রা পড়িয়া যায়
 নীচে : ত্রয়োদশ বর্ষ পরে এই প্রথম তুর্ক অধারোহী সৈন্যদল চানাকলে প্রবেশ করিতেছে .



সোভিয়েট রাশিয়ার হৃদকোশল প্রদর্শন : বোমা বর্ষণকারী এরোপ্লেন হইতে প্যারাসুট-সাহাবো নৈচ্ছদের অবতরণ



প্যারাসুট-অবতীর্ণ এক সশস্ত্র রুশ পদাতিক স্থলপথে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত

নূতন ভারতীয় প্রচেষ্টা—‘বোর্ণ-ভিটা’

যুক্তপ্রদেশের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীতে বাণিজ্য-সচিব সদ্র জোয়ালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কাল টন হোটেল কর্তৃক পরিচালিত ‘বোর্ণ-ভিটা’ দৃষ্ট বিপণির দ্বারোন্মোচন করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় এই নূতন ভারতীয় প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আমেরিকায় এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই প্রকার ‘মিউজিয়াম’ বা দৃষ্ট-বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্ট-বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্ট-বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকপ্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্ট-বিপণি প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকপ্রিয় হইয়াছে।

কুমারী অমলা নন্দী

কুমারী অমলা নন্দী বিগত কয়েক মাসের মধ্যে আজমীট অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স মজফেরপুর অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স এবং আগরা কলেজ মিউজিক কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

বিগত অক্টোবর মাসে রাজপুতানার রাজধানী আজমীট নগরে যে অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে দুই শতের উপর স্বনামধন্য নৃত্য-গীত-বাৎসল্য-কুশলীগণ তাঁহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কুমারী অমলা

সাতখানি স্বর্ণপদক, দুইখানি রৌপ্যপদক এবং তিনটি কাপ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ নগরে মহাসমারোহে অল-ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স সম্পন্ন হইয়াছে। বাংলা দেশ হইতে নৃত্যকলাকুশলা কুমারী অমলা নন্দী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রামকিষণ মিশ্র কুমারী বীণা নন্দী কুমারী স্বধমা দে কুমারী বীণাপাণি মুখার্জী, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু বসু এই কনফারেন্সে যোগদান করেন। কুমারী অমলা এই মিউজিক কনফারেন্সে পাঁচখানি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কুমারী অমলার নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার প্রত্যেক ভঙ্গীটি সুরচিসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার অধিকাংশ নৃত্য ভগবৎভক্তিভাবোদ্ভূত। ইনি ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে সমগ্র ইউরোপে নৃত্য প্রদর্শনে সুনাম অর্জন করিয়া আসিয়াছেন। কুমারী অমলা বর্তমানে আন্তর্জাতিক কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও ইনি যশোলাভ করিয়াছেন; ‘সাত সাগরের পারে’ নামক ইউরোপ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের গ্রন্থখানি ইহার রচিত।

কালীনাথ ঘোষাল

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা অঞ্চলে সুপরিচিত কালীনাথ ঘোষাল মহাশয় প্রায় আশী বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু রাজনৈতিক ও জনহিতকর আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সহিত

দুই বৎসর পূর্বে যখন **বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স ও রিসার্ভ প্রপার্টি কোম্পানী** লিমিটেড স্থাপন হয় তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাংলার আর একটি বীমা কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। খরচের হার, মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ, ফণ্ডের লব্ধি প্রভৃতি যে সব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে একটি বীমা কোম্পানী স্বাস্থ্যজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, সেই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম যে বীমা-ব্যবসায়ক্ষেত্রে স্বযোগ্য লোকের হস্তেই বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সের পরিচালনা হস্ত আছে।

গত ভ্যালুয়েশানের পর মাত্র দুই বৎসর অন্তরে এই কোম্পানী পুনরায় ভ্যালুয়েশন করিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কোম্পানীর যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে অল্পকাল অন্তর ভ্যালুয়েশান কেহ করেন না। বীমা কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে অ্যাকচুয়ারী দ্বারা ভ্যালুয়েশান করাইতে হয়। অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকিলে বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সের পরিচালকবর্গ এত শীঘ্র ভ্যালুয়েশান করাইতেন না।

৩১-১২-৩৫ তারিখের ভ্যালুয়েশানের বিশেষত্ব এই যে, এবার পূর্ববার অপেক্ষা অনেক কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। তৎসঙ্গেও কোম্পানীর উন্নত হইতে আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসরের জন্ম ১৬ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার-করা বৎসরে ১৪ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীর লাভের সম্পূর্ণ অংশই বোনাসরূপে বাটোয়া করা হয় নাই, কিয়দংশ রিজার্ভ ফণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানীর পরিচালনভার যে বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যক্তির হস্তে হস্ত আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিশিষ্ট জননায়ক কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত সাত বৎসর কাল এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি পদে থাকিয়া কোম্পানীর উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ব্যবসায়জগতে সুপরিচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরকুমার ঘোষ মহাশয় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইহার জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার স্বল্প পরিচালনার আমাদের আস্থা আছে। স্বথের বিষয় যে তিনি এই কোম্পানীতে বীমাজগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত হৃদীন্দ্রলাল রায় মহাশয়কে এজেন্সী ম্যানেজার-রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ও স্বযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিবে ইহা অবধারিত।

[বিজ্ঞাপন]

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।



কুমারী অমল নন্দী



কালীনাথ ঘোষাল

সংপূর্ণ ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য লর্ড কর্জনের গমনের সময় জনমত গঠনে সাহায্য করেন মহাশয়ের সঙ্গে মিলিয়া প্রবল আন্দোলন করেন এবং ময়মনসিংহে মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির কাজেও তিনি দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

ম্যালেরিয়ার “মহৌষধ” নানা প্রকার আছে
কিন্তু

সামগ্রানে!

যা’ তা’ বাজে ঔষধ সেবনে দেহের অপকার সাধন করিবেন না!

এপাইরিন

ম্যালেরিয়া আদি সর্বপ্রকার জ্বরের
স্থপরিষ্কৃত প্রত্যক্ষ ফলপ্রসূ মহৌষধ।
ব্যবহারে কোন প্রকার কুফল নাই।

“এপাইরিন” যে সকল উপাদানে প্রস্তুত, তাহা
বিখ্যাত চিকিৎসকমণ্ডলীর অমুমোদিত।

সকল বড় এবং ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন।

ল্যাডকো • কলিকাতা

দেহের সৌন্দর্য

দেহের সৌন্দর্যকেই আমরা রূপ বলি। রূপ তখনই অপরূপ হয়ে ওঠে যখন সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে থাকে উজ্জল রং এবং কোমল মৃণ্ময় গাত্রচর্ম! কিন্তু, শীতে এই দু'টি প্রধান সৌন্দর্যেরও হানি ঘটে! রং ময়লা হ'য়ে যায় এবং গা ফাটে! তা'ছাড়া এ সময় আমরা সাবান ব্যবহার করি কম। কারণ, বাজারে প্রচলিত তথাকথিত উৎকৃষ্ট সাবান যথেষ্ট দেখা যায়, গা ফাটে, গায়ে খড়ি ওঠে এবং ময়লা কাটে না! যেহেতু, ঐ সব সাবানে সাবানের ভাগ থাকে অত্যন্ত কম, রজন, শর্করা, নোংরা চর্বি এবং ক্ষার ইত্যাদি বাজে জিনিসই থাকে বেশী! কাজেই, অনেকে এ সময় সাবানের পরিবর্তে তেল মাখেন দেখতে পাই! তেলে গাত্রচর্ম ভাল থাকে বটে, কিন্তু রং ময়লা হয়ে যায়! এই সমস্ত দেখে এবং এর প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রেখেই ক্যালকেমিকো প্রস্তুত করেছেন তাঁদের সুন্দর সুগন্ধি নিমের টয়লেট সাবান

মার্গোসোপ

মার্গোসোপ সাবানের ভাগ সব চেয়ে বেশী থাকে। এর মধ্যে আর কোন বাজে জিনিস নেই। বিস্তৃত নিমের তেল পরিস্রুত করে নিয়ে প্রস্তুত এবং অতিমৌদী গুণসম্পন্ন। এই সাবান মাথলে তাই গা ফাটে না; তেল মাখার সমস্ত সুফল পাওয়া যায়, অথচ রং ময়লা হয় না। গাত্রচর্ম কমণীয় ও মৃণ্ময় ক'রে তোলে, বর্ণ উজ্জল হয়ে ওঠে! শীতের দিনে মার্গোসোপ শুধু দেহের সৌন্দর্য রক্ষাই করে না, রুক্ষও করে। তাছাড়া মার্গোসোপে চর্মরোগও নিবারণ হয়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল

বালিগঞ্জ : কলিকাতা

'রূপ ও স্বাস্থ্য' পুস্তিকা পত্র লিখলে বিনামূল্যে পাঠানো হয়।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পূর্বগণার শেখরনগর গ্রামে ১৮৮১ সনের ২৩শে জুন হেমেন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। তিনি পিতা তৃতীয় পুত্র। তাঁহার পিতা মুক্তাগাছা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, স্বর্গীয় ললিতমোহন রায় সেকালের এক জন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, ইংরেজী-জানা সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

হেমেন্দ্রবাবু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চট্টগ্রামের পথে জাহাজযোগে পাঁচ দিনে বেঙ্গলে পৌঁছেন। সেখানে একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে একটি সামান্য কেরানীর পদে তিনি নিযুক্ত হন। এই কার্যে নিযুক্ত হইবার প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পরে তিনি বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব-প্রস্তুত-বিভাগের সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি আয়ব্যয়-বিভাগের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। এই কার্যে তিনি এইরূপ দক্ষতা লাভ করেন যে, তাঁহাকে তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক জন গেজেটেড অফিসরের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য উর্দ্ধতন কর্মচারী ভারত-সরকারের নিকট সুপারিশপত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে তিনি সে পদ লাভ করিতে পারেন নাই। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাজ করিবার পর অবসর গ্রহণের সময় আসিলে তাঁহাকে পুনরায় আপাততঃ এক বৎসরের জন্য রাজস্ব-বিভাগের এক জন বিশেষ কর্মচারীর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

হেমেন্দ্রবাবু স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি। বেঙ্গলবাসী বাঙালীদের দুর্গাবাদীর ট্রাস্টরূপে তিনি দীর্ঘকাল উহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ ব্যস্ত ও শ্রম করিয়াছেন। বেঙ্গল শহরে একটি 'বেকার-সমস্যা-সমাধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু এই সমিতির বিশিষ্ট সদস্য এবং সম্পাদকরূপে কার্য করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গলবাসীর সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি কোন-না-কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট।

হেমেন্দ্রবাবু বদান্য ব্যক্তি। তিনি ব্রহ্মপ্রবাসী বৌদ্ধ-শ্রমণদের বাসের জন্য একটি "কুন্দি কঙ্গ" নির্মাণ করিয়া দিয়া তাহার সর্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন এবং অনেক দুঃস্থ বয়স্ক বালকের শিক্ষার ব্যয়ভারও বহন করেন। যৌবনে খেলাধুলার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি বেঙ্গলেও বাঙালী কিশোর ও যুবকদের জন্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ সাতার প্রকুর ঘোষ বেঙ্গল শহরে সম্ভরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে গেলে হেমেন্দ্রবাবু সর্বসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে একটি মোটা টাকার তোড়া উপহার দেন। ব্রহ্মপ্রবাসীদের প্রতি তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্মণেরা হেমেন্দ্রবাবুকে তাহাদের আপনাদের জন মনে করিয়া থাকে। যে যুবক এক দিন মাত্র ১৮ আনা মূল্য লইয়া বেঙ্গল শহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তিনিই পরে ভাগ্যদেবীর শুভকস্মিতে এবং নিজ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও কঠিনপুণ্যে প্রায় দুই হাজার টাকা বেতনভূক ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেলের পদলাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন।

মকরধ্বজের ভেষজক্রিয়া

আয়ুর্বেদোক্ত ষাটঘটিত ঔষধের মধ্যে মকরধ্বজ সর্বপ্রধান। ডাক্তার কবিরাজ সকলেই ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ইহার সমাদর আছে। মকরধ্বজ পাকস্থলীর রসে দ্রব হয় না, রাসায়নিক পরীক্ষায় ইহা নিষ্ক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়, তথাপি ইহার রোগনাশন শক্তিতে কাহারও সন্দেহ নাই। ডাক্তারি চিকিৎসাতেও এমন অনেক ঔষধ বিহিত হইয়া থাকে যাহার ক্রিয়া অবোধ্য কিন্তু ফল প্রত্যক্ষ। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে বহু দ্রব্য সাধারণ অবস্থায় নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ সেবনে কোন ফল হয় না, কিন্তু অতি সূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হইলে তাহার ভেষজগুণ প্রকট হয়। মকরধ্বজের উপকার সূক্ষ্ম বিভাজনের উপরেই নির্ভর করে। বেঙ্গল কেমিক্যাল সম্প্রতি যে ‘অণুমকরধ্বজ’ বাহির করিয়াছেন তাহা এই বিভাজনক্রিয়ার চূড়ান্ত নিদর্শন। কিন্তু ষড়্‌গুণ-মকরধ্বজ তিন দিন ধরিয়া কঠোর অরুণপ্রস্রবময় যন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম কণা পাওয়া যায় তাহাই নির্দিষ্ট মাত্রায় ট্যাবলেট আকারে জমাইয়া অণুমকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। এই ট্যাবলেট মধু বা অল্প অল্পপান দিয়া একটু মাড়িলে তখনই গলিয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে খলে মাড়া সাধারণ মকরধ্বজ ও অণুমকরধ্বজের কি আশ্চর্য্য প্রভেদ। এই চরম বিভাজনের ফলে কণাসমূহের গাত্র (surface) শতগুণের অধিক প্রসারিত হয় এবং মকরধ্বজের অণুঘটনক্রিয়া (catalytic action) ও ভেষজগুণ তদুচ্চায়ে বৃদ্ধি পায়। অণুমকরধ্বজ সকল অবস্থায় নির্ভয়ে সেবন করা যাইতে পারে। ইহার মূল্য সাধারণ মকরধ্বজ অপেক্ষা নাম-মাত্র বেশি। সেজন্য ইহার বহুল প্রচার আশা করা যায়।

বিদেশ

ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি

গত ২রা জানুয়ারী রোমে, ভূমধ্যসাগর-সমস্তা সমাধানকল্পে সর্বত্রের ড্রামণ্ড ও কাউন্ট সিন্নানোর দ্বারা একটি ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইটালী কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না; ভূমধ্যসাগরে উভয়েরই যাতায়াতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; ব্রিটেন ও ইটালীর ভূমধ্যসাগরে যে-পরিমাণ নৌবল বিদ্যমান আছে তাহার কোন পরিবর্তন হইবে না এবং উভয়ে মিলিত ভাবে ইউরোপে শান্তিরক্ষার চেষ্টায় ত্রুটি হইবে। ইতালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় মুসোলিনী ভূমধ্যসাগর ও মিশর সম্বন্ধে যে ছমকী দেন তাহা ব্রিটেনের এক বিষম চিন্তস্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই জন্ত ব্রিটেন তাড়াহুড়াই এই দুইটি-সমস্তার সমাধান করিয়া ফেলিল। এখন বেশ বৃদ্ধিতে পারা গেল শক্তিবর্গ আবিসিনিয়ার প্রতি কিরূপ মনোভাব পোষণ করে। হতভাগ্য আবিসিনিয়া কাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল! রাষ্ট্রসংঘের নামে তখন ব্রিটেন যে সোয়গোল তুলিয়াছিল তাহা কি নিঃস্বার্থ মানবিকতার দিক দিয়া, না, ভূমধ্যসাগরের ক্ষমতা হ্রাস ও ভারতের সহিত যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনায়? অথবা, নাইল উপত্যকার জল-সরবরাহ বন্ধ হইবার আশঙ্কায়?

আবিসিনিয়া-বিজয়ের পর ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পরে স্পেনের গৃহবিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ফাসিষ্ট-ও নাৎসী-পন্থিগণ যে ভাবে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় আছে ও ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ ইউরোপীয় যুদ্ধে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের অধীশ্বর ব্রিটেনেরই বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা; সেই জন্ত ইটালীর সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার এত আগ্রহ।

যাহা হউক, এই চুক্তির ফলে আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় হইতে ব্রিটেন ও ইটালীর মধ্যে যে মনোমালিঞ্জের স্বরূপাত হইয়াছিল তাহা কিয়দংশে বিদূরিত হইল। মুসোলিনীও যে এতদিন ধরিয়া ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাও এক প্রকার স্বীকৃত হইল। ব্রিটেনের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে এই চুক্তির ফলে ইটালীর আবিসিনিয়া-বিজয় মানিয়া লওয়া হয় নাই। মানিয়া লওয়ার বাকীই বা রহিল কি? তাহার পর শান্তি স্থাপনের কথা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের মুখে শান্তির কথা স্বভাবতই আমাদের হাতোদ্বেগ করে। ইহা কি সেই শান্তি, “লক্ষ লক্ষ ফাসিষ্ট যুবকের দূত করণ্ডত সঙ্গীনের অগ্রভাগে প্রতিষ্ঠিত জলপাই-শাখা” বলিয়া কিছু দিন পূর্বে মুসোলিনী যাহার আভাস দিয়াছিলেন।

এই চুক্তিতে ইহাও নাকি বলা হইয়াছে যে স্পেনের অখণ্ডতা নষ্ট করিবার অথবা বলিয়ারী স্বীপপুঞ্জ অধিকারে আনিবার কোন চেষ্টা ইতালী করিবে না। অপর দিক হইতে ঠিক যেন ইহার প্রতিবাদ-স্বরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে বিদ্রোহী পক্ষে যোগদান করিবার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য ইতালী হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

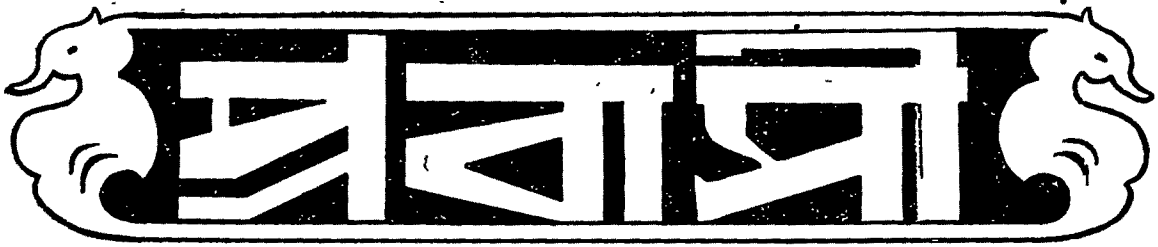
শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে



মা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



“সত্যম্ শিবম্ হৃদয়ম্”

“নাম্যাম্হা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৬শ ভাগ }
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৪৩

{ ৫ম সংখ্যা

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর.

(১)

হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা

• হে বন্ধু আমার,

সে-পুণ্য তীর্থের যিনি জাগ্রত দেবতা

তঁারে নমস্কার ।

বিশ্বলোক নিত্য যার শাস্ত্রত শাসনে

মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,

আবর্জনা দূরে যায় জরা-জীর্ণতার

তঁারে নমস্কার ।

যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তের দিন

নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন,

ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার,

তঁারে নমস্কার ।

পথযাত্রী জীবনের হুঃখ স্রুখে ভরি’

অজানা উদ্দেশ পানে চলে কাল তরী,

ক্রান্তি তার দূর করি কবিছেন পার,

তঁারে নমস্কার ॥

(২)

হৃৎখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক,

তবে তাই হোক ।

মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক,

তবে তাই হোক ।

পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক,

তবে তাই হোক ।

অশ্রু আঁধি পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ চোখ,

তবে তাই হোক ।

(৩)

শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান ;

সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান ।

চির শক্তির নিখর নিত্য ঝরে,

লও সে অভিষেক ললাট 'পরে ।

তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ

• ত্যাগ-ব্রতে নিক্ দীক্ষা,

বিল হ'তে নিক্ শিক্ষা,

• নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান,

হৃৎখই হোক তর বিস্ত মহান ॥

যাত্রি, চলো দিন রাত্রি,

কর অমৃত লোকপথ অমুসন্ধান ।

জড়তা তামস হও উদ্ভীর্ণ,

ক্লাস্তিজাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ,

দিন অস্ত্রে অপরাজিত চিন্তে

• মৃত্যুতরণ-তীর্থে কর স্নান ॥



রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্রের বেটন, পূর্বে দিকে গভীর অরণ্য, কেবল পশ্চিমে দুর্গম গিরিসঙ্কটের পথ ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে তাব অখণ্ডতা, কিন্তু লোকবসতির দিক থেকে সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আচারে বিচারে, ধর্মে ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে খণ্ডিত। এখানে দ্বারা পাশাপাশি আছে, তারা মিলতে চায় না। এই দুর্বলতা দ্বারা ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত, আত্মরক্ষার অক্ষম।

আর একটি দুর্গতি স্থায়ী হয়ে এ দেশকে জীর্ণ করেছে। অশথ গাছ পুরাতন মন্দিরকে সর্বদা বিদীর্ণ করে তাকে শিকড়ে শিকড়ে যেমন আঁকড়ে থাকে তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ় সংস্কার-জাল দেশের চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করে কেলে জড়িয়ে রয়েছে। আগাহার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জোর আছে, তার জন্ত চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। কিন্তু বিজ্ঞ জ্ঞানের ও ধর্মের উৎকর্ষের জন্ত নিরন্তর সাধনা চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্বপ্রকার মুক্তির অন্তরায় উদ্ভূত হয়ে উঠে অশাস্ত্রিক নিবিড় জঙ্গল হয়ে আছে। এমন কি, এদেশে দ্বারা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁদেরও বহু লোকের মন গুচ্ছভাবে আফিমের নেশার মতো তামসিকতার দ্বারা অভিভূত। এর সঙ্গে লড়াই করা দুঃসাধ্য।

আর্য্যজাতি দ্বাদের এক দিন পরাজিত করেছিলেন, অবশেষে তাদেরই প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটিয়ে তুলেছে মারাত্মক আত্মবিচ্ছেদ। পরম্পরকে অবজ্ঞা করা এবং পাশ কাটিয়ে চলার যে দুর্ব্যবহার তা এই দেশের সকল জাতিতেই যুগ যুগ ধরে আঘাত করছে।

আমরা এখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্ত বহুপরিকর, তখন এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের

ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্যবিধির ঐক্যদ্বারা কোনো দেশ কখনই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাত্মাতীয় সার্থকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায় একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র। যেন একটা বৃহৎ রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে স্নানির্দিষ্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ সেখানে সকলে শিক্ষায় দীক্ষায় নিবিড়ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক সান্ন্যমণ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের একপথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তিসাক্ষ্যের এই প্রধান কারণ।

খণ্ডিত মন ও আচরণ নিয়ে আমাদের ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সবেও জিতে যাব, এমন দুঃশাপা পোষণ করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়াব জন্ত ঐক্যের দরকার আছে, এ কথা আমরা তর্কদ্বাবা বুঝি, কিন্তু কোনো মতেই সেই অন্তর দিয়ে বুঝি নে যেখানে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাদ্রাজের লোক, মাদোয়ারের লোককে আমরা পর বংলৈ জানি, তার প্রধান কারণ যে-আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে-আচার কেবল যে স্বীকার করে না বুদ্ধিকে তা নয়, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়।* আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মৃত্যুর গণ্ডির মতো দুঃকৃত্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।

আমাদের দেশের হরিজন-দলিত্রা এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্তার মূলে যে মনোবিকার আছে, তার মতো বর্ধরতা পৃথিবীতে আর কী আছে জানি না। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ, দৈবত্ব স্বীকার না করে নিজেদের বঞ্চনা করতে যাই। মনে করি, ইংলও স্বাধীন

হয়েছে পার্লামেন্টের রীতি মেনে, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করব। ভুলে যাই যে, সে দেশে পার্লামেন্ট বাইরে থেকে আমদানি কর জিনিষ নয়, অল্পকূল অবস্থায় ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে জিনিষ। এককালে ইংলণ্ডে প্রটেক্টরট এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে দূর হয়েছে। ধর্মের তফাৎ সেখানে মানুষকে তফাৎ করে নি।

মহামাঘের বিচ্ছিন্নতাই প্রধান সমস্যা। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে কালে কালে যে-সব সাধক, সিদ্ধাঙ্গীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা অল্পভব করেছেন মিলনের পন্থাই ভারতপন্থা। মধ্যযুগে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বড় সমস্যা হয়ে উঠেছিল, তখন দাদু, কবীর প্রভৃতি সাধকগণ সেই বিচ্ছেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য-সেতু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁরাও ভাবেন নি। প্রদেশে প্রদেশে আজ যে ভেদজ্ঞান, একই প্রদেশের মধ্যে যে পরস্পর ব্যবধান, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে বিভক্ততা, এ দুর্গতি তখন তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছেদ আমাদের পীড়া দিচ্ছে। এই পীড়া উভয় পক্ষেই নিরতিশয় দুঃসহ দুর্দহ হয়ে উঠলে উভয়ের চেষ্টায় তার একটা নিষ্পত্তি হতে পারবে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাধ্য সমস্যা হিন্দুদের, যারা শাস্ত্রত ধর্মের দোহাই দিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের প্রতি সুবুদ্ধিবিরুদ্ধ অসম্মানকর নিরর্থক ভাগবিভাগ নিত্য করে রাখে।

এই জন্যই মনে হয়, নিবিড় প্রদোষাঙ্ককারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্য একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ, বোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড় মন তাঁর ছিল। বর্তমান কালে অস্ত্রত বাংলা দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ, বেদান্তে, উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবী পারসীতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহায়ভূতিও ছিল সেই সঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সর্কারিতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান তাঁর চিন্তে এসে মিলিত

হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এদেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল, আজ তা আমরা হুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিন্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে, সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথর। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পবপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবন-যাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে যে, সেই সময়ে কী করে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে। তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, স্বেচ্ছবিচ্ছাতে অভিজ্ঞ হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয়। এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিজ্ঞা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ, তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্যসাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভাল করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্দলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উত্তত হয়ে

আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালী চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

তাকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ করলে পারে নি, এতেই তাঁর যথার্থ গৌরবের পরিচয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডীব মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তিনি অন্যায়ের জয়ধ্বনি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার করে গেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয়। এই জন্ত তাঁকে আজ নমস্কার করি।

আমাদের অন্তরেও মুক্তি নেই, ঘরেও মুক্তি নেই। পর পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উগ্ৰ

হচ্ছে কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের এ কথা মান রাখতে হবে যে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাভব যেখানে এত বড়, সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড় হৃদয়ও চাই। মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেই রকম বড় হৃদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব বলে এখানে এসেছি।*

* ১০ই আশ্বিন, ১৩৪৩, শান্তিনিকেতনে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবাধিকী মন্দিরে অভিবাদন। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অমূল্যলিখিত ও বঙ্কো কর্তৃক সংশোধিত।

অলখ-বোরা

শ্রীশঙ্করা দেবী

পূর্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নরানন্ডোড গ্রামে শ্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকান্ত শিব ও হৃদ্যকে লইয়া থাকেন। হৃদ্য শিব পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মন্দির বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাথির গরুর গাছী চড়িয়া এবারও তাহার রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্যচন্দ্র ও দিগ্বি ভূসেনবরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাহার বিবাহ বিধি হরধুনীর খুব ভাব। হরধুনী সংসারের কাজে কিন্তু অন্তরে বিরহিত্তি ভরসী। বাপের বাড়ীতে মহামায়া খুব আদর, অনেক আশীষবহু। পূজার পূর্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে হৃদ্য দিগ্বি ভূসেনবরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুতে মহামায়া ও হরধুনী চক্রে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন জন্তুসম্বা, কিন্তু শোলের উদাসিন্তে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাহার শরীর অত্যন্ত ধারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে কিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিত লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র বিধি হৃদ্য হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতার গিয়া শ্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। ঠেগবের লীলা-ছবি ছাড়া অজানা কলিকাতার আসিতে হৃদ্য মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাঝে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে হৃদ্য বা বাবা ও উন্নতি শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নতুনঘরের ভিতর হৃদ্য কোন আশ্রয় পাইল না। পৌত্তি মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নতন নতন

আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত হৃদ্যকে খুলে ভর্তি করিয়া দিব্য কিছদিন গুরে একটি নবাগতা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ হৃদ্য বজ্রলীতি উথলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নতন। স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভবিষ্য উঠিল। হৈমবতীর সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব লইয়া স্কুলের অস্ত্র মেয়েরা ঠাট্টা তামাসা করে, তাহাতে হৃদ্য লজ্জা পায়, কিন্তু ক্ষুদ্রলীতি তাহার নিবিড়তর হইয়া উঠে। হৈমবতীর চোখের ভিতর দ্বন্দ্ব সে নিজেকেও যেন মৃতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। পূজাব সময় মাতীনা হরধুনী কলিকাতায় বোনকে দেখিতে আসাতে, হৃদ্য সেই কীকে শিন্ধুকে লইয়া একবার নন্দানজোড় ঘুরিয়া আসিল। মন কিন্তু যেন কলিকাতার ফেলিয়া গেল। হৃদ্য নিজের আসন্ন বৌবন সম্বন্ধে নিজে ততটা সচেতন নয়, কিন্তু মাতীনা পিসীমা হইতে আরম্ভ কবিয়া পাশের বাড়ী মণ্ডলগৃহিনী পর্যন্ত সকলেই তাহাকে সারাক্ষণ সাবধান করিয়া দিতেছে।]

১৭

চলটা বাঁধিয়া প্রসাধনের শেষ পর পর্যন্ত পৌছিতে না-পৌছিতে গলির ওপার হইতে হৈমবতীদের পরিচিত হর্ণের শব্দ কানে আসিয়া পৌছিল। হৃদ্য হাত পা আরও ক্রমত চলিতে লাগিল, তাহার ভয় হইল পাছে সে শেষ কর্তব্য অবধি সমাপন করিবার পূর্বেই হৈমবতী দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া

উপস্থিত হয়। হৈমন্তীকে স্বধা ভালবাসিত, তাহাকে কাছে পাইলে আনন্দিত হইত। কিন্তু তাহার উপস্থিতিতে মনের সহজ আটপোরে স্বস্তি যেন কোথায় চলিয়া যাইত। সংসারের প্রাত্যহিক ধর্ম তখন চোখে এত ছোট বলিয়া মনে হইত, স্বরোয়া প্রয়োজনের কথাবার্তা কানে এমনই বেসুরো শুনাইত যে তাহার হাত পা মন সবই যেন অবসন্ন আড়ষ্ট হইয়া যাইত। দৈনন্দিন ব্যাপারে তাহাদের আর নিযুক্ত করা যাইত না। সেই জন্য এই সব চুল বাঁধা মুখ ধোওয়ার কাজ সে নেপথ্যে চুকাইয়া রাখিতেই ভালবাসে।

সিঁড়িতে হৈমন্তীর উঁচু হিলেব বিলাতী জুতাব খটখট শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মৃদু একটা অজরাগেব স্বগন্ধ হাওয়ায় ভাসিয়া ঘরে আসিল। স্বধার চেয়ে হৈমন্তী অনেকটা সহজ মাহুষ ছিল। সিঁড়ি হইতেই একবার

ডাকিয়া বলিল, “আসিয়া, আমি স্বধাকে নিতে এসেছি।”

ছোট খোকা একমাথা কঁোকড়া চুল ঢুলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, “হেমুদিদি, তোমার গলাটা বেশ সুরু। তুমি সোনার ঘড়ি পরেছ?”

হৈমন্তী হাসিয়া তাহার হাতের ঘড়িটা ধুলিয়া একবার খোকার হাতে বাঁধিয়া দিল। মহামায়া বলিলেন, “কিরতে কি রাত হবে মা তোমাদের?”

হৈমন্তী বলিল, “না, রাত হবে কেন? আব ইলোও আপনার ভয় নেই। আমি স্বধাকে নিজের হাতে কিরিয়ে এনে আপনার বাড়ীতে দিয়ে যাব। আর আমরা ত একলা যাচ্ছি না। সঙ্গে ত সবাই রয়েছেন।”

হৈমন্তীদের সিঁড়ান গাড়ীতে তাহার বাবা, ছোট ভাই ও একটি জ্যেষ্ঠত বোন ছিলেন। স্বধাকে দেখিয়া তিন জনেই সমস্তরে কথা বলিয়া উঠিলেন। হৈমন্তীর এই দিদি মিলি বয়সে তাহার চেয়ে বছর-তিনের বড়। দ্বিজের অস্তিত্ব অর্ঘ্যাদা ও রূপগুণ সম্বন্ধে এমন আশ্চর্য্য সচেতন মাহুষ খুব কম দেখা যায়। স্বধাকে দেখিয়াই সে একবার মাথার চুলের উপর সঙ্কর্ণে হাত বুলাইয়া, কানের নতুন গহনা দুইটি নাড়িয়া, গায়ের উপরের শাড়ীর ভাঁজ ও পাড়ের ভকীটা ঠিক করিয়া লইয়া আবার চোখের দৃষ্টিটা এমন মোলায়েম করিয়া লইল যেন নিজের ঐশ্ব্যন সম্বন্ধে নিজে সে সম্পূর্ণই উদাসীন।

মিলি বলিল, “এম্মাকিং শূ প’রে এলে না কেন স্বধা? এদিক ওদিক কত ঘোরাঘুরি কবতে হবে, পাগলো বেশ আরামে থাকত।”

হৈমন্তী স্বধাকে জবাব দিবার বিড়ম্বনা হইতে বাঁচাইবার জন্য বলিল, “বাঙালীর মেয়েরা শুধু-পায়ে হরিষার থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বেড়িয়েছে, তাদের চটিতে ত বিধি বিজয় করা হয়ে যায়।”

রণেন বাবু বলিলেন, “তোমার রোমে রোমে ঘোবা অভ্যেস আছে ত মা?”

হৈমন্তীর ছোট ভাই সতু ভাড়া গলায় বলিল, “আমি কি খালি একলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে যাচ্ছি? আমার দলের ত কই কেউ জুটল না। আপনার ভাইকেও যদি আনতেন ত একটু কাজ হ’ত।”

গাড়ী স্বধীজ বাবুর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া এবং রণেন বাবুকে একটা দোকানে নামাইয়া দিয়া গাড়ী সোজা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইবে।

দক্ষিণেশ্বরের জীর্ণ কটকের কাছে গাড়ী যখন পৌছাইল, তখন দেখা গেল ভিতরে ইহাদেরই অপেক্ষায় আর একদল মাহুষ পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীটা দেখিয়াই চার জন যুবক ছুটিয়া আসিয়া প্রায় একই সঙ্গে দরজার হাতল ধরিয়া টান দিল। এ দলে একটিও মেয়ে নাই। নিখিল, স্বরেশ, তপন ও মহেন্দ্র চার জনে প্রায় সমবয়সী। ইহারা প্রায়ই হৈমন্তীদের বাড়ী যাওয়া-আসা করে।

মহেন্দ্র দূরসম্পর্কে স্বধীজ বাবুর কি রকম যেন আত্মীয় হয়। তাঁহাদের বাড়ীতেই ছেলেবেলা হইতে বেশীর ভাগ সময় থাকিত, এখন পাস করিয়া নিজে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছে। হৈমন্তীকে এক সময় সে সংস্কৃত পড়াইত, সেই স্বত্রেই তাহাদের সঙ্গে পরিচয়। আজ ইহারা দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন শুনিয়া মহেন্দ্র আপনা হইতেই তাহার তিন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে। স্বধার সকলের সঙ্গে পরিচয় নাই কিন্তু হৈমন্তীর সকলেই পূর্বপরিচিত।

নিখিল দীর্ঘাকৃতি শ্রামবর্ণ সদাহাস্যমুখ স্পৃহকম যুবা, সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবীর উপর গলায় চামড়ার ব্যাণ্ডে ক্যামেরা ঝুলিতেছে, কথা হাসি ও ছবিতোলা কোন বিষয়েই কাঁপিয়া নাই।

স্বপ্নে কালো মোটা ছোটখাট মানুষ, চোখের চশমা গলায় সরু চেন দিয়া বাঁধা, কখনও বুকের উপর দোলে, কখনও চোখে থাকে। মানুষটা বেশী কথা বলে না। কিন্তু মনে হয় চশমার ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ দেখিয়া নিজেব মনের খাতায় লিখিয়া রাখিতেছে। মোটামোটা মানুষের পক্ষে তাহাকে প্রথরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণদী বলিয়া মনে হয়। কোন বিষয়ে ঐদ্বন্দ্ব নাহি।

তপন নবীন ভাস্করের মতই আশ্চর্য সুন্দর। দেখিলে মনে হয় বিধাতা ইহাকে মর্ম্মর পাথরের উপর তুলি দিয়া আঁকিয়া তাহার পর অভক্ষিত অধ্যবসায়ের সহিত নিখুঁত করিয়া বাটালি দিয়া কাটিয়াছেন। গ্রীক মূর্ত্তির মত তাহার স্বগঠিত নাসা, উদ্ভক্ত পাখীর ডানার মত ঙ্গ-বুগল যেন এখনই নড়িয়া উঠিবে, স্থির সমুদ্রের মত নীল চোখে উজ্জ্বল কালো তারা, হুঙ্কিত ঘন কালো চুল অর্ধচন্দ্রের মত দীপ্যমান প্রশস্ত ললাট ছাড়াইয়া সুগোল মাথার চারি পাশে সমান ওজনে হেলিয়া পড়িয়াছে। পদ্মকোরকের মত হাত দুখানি দেখিলে মনে হয় না পৃথিবীর কোনও কাজে কোন দিন লাগিয়াছে, পূজার মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দিতেই শুধু এমন হাতের প্রয়োজন। তপনের মুখে বেশী কথা নাই, দৃষ্টিতেও চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সে যেন কোন ধ্যানে সমাহিত।

মহেন্দ্র সাহেবদের মত ধপধপে শাব্দ্য, চেহারায় খুব কিছু বিশেষত্ব নাই। চুলগুলি একেবারে সোজা, বিনা সিঁথিতে পাশিশ করিয়া একেবারে পিছন দিকে ঠেলা, কপালটা একবিন্দুও কোথাও ঢাকা নাই। নাকটা একটু বেশী উচু এবং খড়্গের মত বাকা, হাত পা শক্ত শুষ্ক কাঠের মত ও গ্রন্থিবহুল; কথাও বলে জটিল বিষয়ে গুরুগম্ভীরভাবে। যেন সমস্ত পৃথিবীর গুরু-পদ এই কয়সেই তাহাকে কে লিখিয়া দিয়াছে। সকলের শিক্ষা সে না সমাপ্ত করিলে মানব-সমাজের আসন্ন প্রলয় হইতে আর মুক্তির উপায় নাই। মহেন্দ্রেরও গলায় একটা খুব দামী ক্যামেরা ছুলিতেছে, কিন্তু সে-বিষয়ে সে খুব সজাগ নয়।

স্বপ্নার সহিত ছেলেদের সকলের পরিচয় ছিল না। স্বপ্নীক বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই সকলের পরিচয় দিলেন। একে ত আলাপ করা বিষয়েই স্বপ্না অত্যন্ত অপটু, তাহার উপর একসঙ্গে চারি জন জুটিলে ত কথা খুঁজিয়া পাওয়াই

শক্ত। তবু স্বপ্নেশ ও মহেন্দ্রের সহিত কথা বলা তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হইল। নিখিল ও তপনকে দেখিয়া কেন যে তাহার মুখে কথা আটকাইয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না, অথচ নিখিল ত কথা বলিতে খুবই ব্যগ্র।

সকলের আগে নিখিলই গাড়ীর ভিতর উকিঝুঁকি মারিয়া একটা টিকিন-কেরিয়ার ও জলের কুঁজা দেখিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে বাহির করিয়া লইল। এদিক ওদিক চাহিয়া আর তেমন কিছু দেখিতে না পাইয়া মেয়েদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “করেছেন কি? রোদ ত এখনও বেশ আছে, অথচ আপনারা কেউ একটা ছাতা আনেন নি, বাড়ী গিয়ে মাথা ধরে সারারাত ঘুমোতে পারবেন না যে।”

মিলি কাপড়ের আঁচলটা ঠিক সমান করিয়া লইয়া ছোট আয়নার মুখখানা তাড়াতাড়ি একটু দেখিয়া লইল। তাহার পর যেন এইমাত্র কথাটা শুনিয়াছে এমন ভাবে বলিল, “আমি একটা ছাতা এনেছি, আর সবাই ত এঁরা সাক্ষাৎ এক-একটি ‘এঙ্গেল’, পা পিছলে দৈবাৎ স্বর্গের সিঁড়ি থেকে মাটিতে পড়েছেন, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টের কথা ওঁদের মনেই থাকে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে চললেই ওঁদের পেটও ভরে যায়, রোদ ঝড় বৃষ্টিও উড়ে যায়।”

মহেন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলিল, “আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে মেয়েরা পরস্পরের দোষ সম্বন্ধে পুরুষের চেয়ে বেশী সচেতন? এটা তাদের সব চেয়ে প্রিয় টপিক?”

নিখিল হাসিয়া বলিল, “তুমি ত আচ্ছা ক্যাপা দেখছি। আগে মেয়েদের বসবার দাঁড়াবার একটু ব্যবস্থা কর, তার পরে না-হয় নারদ-মূনির কুজটা হুক করা যাবে। আপনারা মহেন্দ্রের কথা শুনবেন না; ও জীহ্বাতি সম্বন্ধে বড় অধরটি-যে নয়, তা ত আপনাদের খুশী কনবার অপূর্ণ চেষ্টা দেখেই বুঝতে পারছেন।”

স্বপ্নেশ ইহাদের কথা ঘুরাইয় দিবার জন্য বলিল, “চলুন, ঐ পঞ্চবটীর দিকে গঙ্গার ধারটায় বসা যাবে, ভারী সুন্দর জায়গা।”

সকলে সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন। শীতের দিনে অধিকাংশ গাছের পাতাই ঝরিয়া পড়িতেছে। কোন কোন

গাছের ডালপালা অনাবৃত শিরা-উপশিরার জালের মত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যেন তাহার আকাশের দিকে সহস্র অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া নূতন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। গঙ্গার ঠিক ধারে একটা বটগাছের বড় শিকড় গুঁড়ির মত মোটা হইয়া প্রায় হেলিয়া শুইয়া আছে। স্বরেশ বলিল, “এখানে পা ঝুলিয়ে বেশ বসা যায়। আপনারা যদি চান ত একটা শতরঞ্জিও পাতা যেতে পারে।”

গাড়ীতে গদির তলায় শতরঞ্জি ছিল, সত্বে একতক্ষেণে তবু একটা কাজের মত কাজ পাইয়া উর্দ্ধ্বাশ্বাসে আনিতে দৌড়িল। ছুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাঙা গলায় গান ধরিয়াছিল,— “এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম কান্তনে।”

শতরঞ্জি আসিয়া পৌঁছিলে মহেন্দ্র পালা করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, “কে কোথায় বসবে বল, তার পর একটা ছবি তোলায় ব্যবস্থা হবে।”

স্বধীশ্রবাবু বলিলেন, “দেখ, আমার যদিও মনে হয়, ‘পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো, সবার আমি একবয়সী যেন,’ তবুও সত্যি কথা বলতে গেলে আমি বুড়ো একথা লুকানো যায় না। সুতরাং আমি তোমাদের ছবির বাইরে থাকলেই ভাল। ঐ উঁচু বেনীটাতে আমার স্থান করে নিচ্ছি আমি। ওখান থেকে গঙ্গার ওপার পর্যন্ত সারাক্ষণ দেখা যায়।”

নিখিল বলিল, “আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে আপনি বুড়ো হ’তে পাবেন না। আপনার যে রকম শরীর তাতে আমাদের চেয়ে আপনার আয়ু কম হবে না।”

সত্বে বলিল, “আমি বিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে না ব’লে ঐ উঁচু ভাগটাকে ধোলনা করে বসি।”

হৈমন্তী তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল; “হুম্মানেরা যত উঁচু ডালে বসে মাছঘের পক্ষে ততই নিরাপদ। তুমি সামনে থাকলে ত আমাদের আর সব ভাবনাই তুলিয়ে দেবে।”

নিখিল হাসিয়া বলিল, “কিন্তু মনে রাখবেন, এখানে আমরা শুধু ভাবনা ভাবতে আসি নি, অল্প কিছু কিছু সাধু উদ্দেশ্যও আছে।”

স্বরেশ সংগ্রহ-দৃষ্টিতে নিখিলের মুখের দিকে তাকাইয়া

বলিল, “কি কি উদ্দেশ্য আছে নির্ভয়ে ব’লে ফেল না। আশ্রমপীড়া না ঘটে এইটুকু মনে রাখলেই হ’ল।”

তখন ঈশ্বর হাসিয়া বলিল, “একটা ত খুব নির্দোষ উদ্দেশ্য ছিল ছবিতোলা। তার অন্ত্রে মস্তিষ্ক কি মাংসপেশী কোনটারই খাটুনি বেশী হ’ত না।”

স্বধা যেন অত্যন্ত ভয়ে ভয়েই বলিল, “মন্দির-টম্দির কিছুই দেখলাম না, আগেই ছবি তুলে কি হবে?”

মিলি আতঙ্কিত হইয়া বলিল, “কি যে তোমাদের সব ব্যবস্থা? ঘুরে ঘুরে ধুলোয় আর হাওয়ায় চুলগুলো জটাই-বুড়ীর মত হ’লে তার পর যা ছবি উঠবে, বাঁধিয়ে রাখবার মত।”

হৈমন্তী বলিল, “আচ্ছা ভাই স্বরেশদা, দিদিকে রাগিয়ে কাজ নেই। ওর চেহারাটা অঙ্গুরার মত থাকতে থাকতে ছবি তুলে ফেলাই ভাল।”

মিলি বলিল, “বাবা, তুমি ত ভাজা মাছটি উন্টে খেতে জানতে না, তোমার মুখে এত কথা ফুটল কবে থেকে?”

প্রথম ছবিখানা তুলিল মহেন্দ্র, দ্বিতীয় নিখিল।

নিখিল বলিল, “আমাদের দেশের সনাতন প্রথামত মেয়েরা একদিকে ছেলেরা একদিকে দাঁড়াতে পাবে না। এক-এক জন মেয়ের পাশে এক-এক জন ছেলে। কে কার পাশে দাঁড়াবে বল।”

সত্বে গাছের উপর হইতে বলিল, “মিলিদিদি, তুমি ভাই তপনদার পাশে দাঁড়িও না, দোহাই, তাহলে Beauty and the Beast-এর উন্টো ছবি হয়ে যাবে।”

মহেন্দ্র বলিল, “এই বোকা ছেলেটাকে আজ না আনলেই ত হ’ত। কথা বলতেও শেখে নি।”

স্বধা স্বভাবত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, বেড়ানো-চেড়ানোর সময়েও প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানবসৃষ্ট শিল্পের সৌন্দর্য অল্পভূতির দিকে তাহার যতটা মন, সঙ্গীদলের হাঙ্গা কথা ও হাসির স্বরের প্রতি তাহার তত মন নয়। কিন্তু আজ সে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে আজিকার এই তুচ্ছ খুঁটিনাটি কথায় তাহার মন ত বেশ আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। যে যত হাঙ্গা হাসির দিকে কথার মোড় ক্রিয়াইতেছে, তাহাকেই তত যেন বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া বোধ হইতেছে।

রাণী রাসমণির প্রকাণ্ড কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবের মন্দির,

পরমহংসদেবের ঘরঘার ঘুরিয়া সকলে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। একদল মানুষকে ঘাটে নামিতে দেখিয়া কয়েকটা পানসী নৌকার মাঝি হাত তুলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিল। তখন ভাঁটা শুরু হইবার উপক্রম করিয়াছে। গজার ছোট ছোট ঢেউগুলি কচি ছেলের মত ক্রমাগত টলিয়া টলিয়া চলিতেছিল। একবাব তীরের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, আবার সরিয়া যায়। ছেলেরা বলিল, “নৌকো চড়তে হ’লে নেমে আসতে হবে, কিছু কানোও ভাঙতে হবে।”

স্বধা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাহার ভয় কম, কোমরে আঁঙ্গুলি একেবারে ঘাটেব শেষ ধাপে নামিয়া গেল। একটা ঈমার দুই ধারের জলে ঢেউ তুলিয়া মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড চণ্ডা রাস্তা কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুই পাশের ভাঙা ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া ছলিয়া ছলিয়া দুই তটে গিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্বধার পায়ের উপরেই ঢেউগুলি আছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া হৈমন্তী বলিল, “গঙ্গাদেবী কাকে প্রণাম জানাচ্ছেন কে জানে, তুমি ভাই ও প্রণাম চুরি করো না।”

স্বধা বলিল, “এ প্রণাম নয়, এ জাহ্নবীর ডাক, উত্তর-রামচবিত্তে পড় নি? দেখ, দেখ, ঢেউয়ের চূড়াগুলি কেমন আঙুলের ডগার মত হুয়ে হুয়ে পড়ছে। দেবী জাহ্নবী সহস্র অঙ্গুলি তুলে তাঁর কণ্ঠকে ডাক দিচ্ছেন। ইচ্ছা কবে কাঁপিয়ে পড়ি।”

এতগুলো কথা বলিয়াই স্বধা কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল তাহার কথা হৈমন্তী ছাড়া বেশী কেউ লক্ষ্য করে নাই। নিখিল ও হরেশ তখন নৌকার নর করিতে ব্যস্ত। অনেক দর-কষাকষির পব আট আনাষ নৌকা ঠিক হইল। নিখিল ও মহেন্দ্রই একটু শক্ত গোছের মানুষ, তাহারা দুই ধারে দাঁড়াইয়া মেয়েদের হাতে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া দিতে লাগিল। নৌকা এত টলে যে তাহার উপর স্থিৎ হইয়া দাঁড়ানোই যায় না। মিলি ও হৈমন্তী নিখিলের হাত ধরিয়া ও মহেন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িল। ইতস্ততঃ করিতে লাগিল স্বধা। ছেলেরদের সঙ্গে-চলা-ফিরায় সে অভ্যস্ত ছিল না। ইহার ভিতর নির্দা-প্রশংসার কোন কথা থাকিতে পারে কি না এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়া তাহার মনে উঠে নাই। একটা

আত্মবিক সঙ্কোচ আপনা হইতেই তাহাকে বাধা দিতেছিল। তদুপরি পিসিমার অতিরিক্ত সাবধানতার বাণী হস্ত তাহার মনে অলক্ষ্যে কিছু কাজ করিয়াছিল।

মহেন্দ্র হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অসিয়া শক্ত করিয়া স্বধার হাত ধরিয়া বলিল, “দেখুন, ভীকতা জীলোকের ধর্ম হ’লেও সব সময় এ ধর্ম নিষ্ঠা রাখা বুদ্ধির পরিচয় নয়। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?”

মহেন্দ্রর হাতের তলায় স্বধার হাত কাঁপিয়া উঠিল; জলে পড়ার ভয়ে নয়, সম্পূর্ণ অজানা অচেনা কি একটা ভয়ে বুকেটা ছলিয়া উঠিল। এ অস্বস্তি তাহার জীবনে একেবারে নূতন। স্বধা উদ্ভব দিতে পারিল না; নিখিলও অগ্রসর হইয়া আসিল। “কিসের আপনাব এত ভয়? আচ্ছা, আমরা দু-জনেই আপনাকে তুলে দিচ্ছি আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ওহে হরেশ, তোমরা কিন্তু এ সময়ে স্ন্যাপ নিতে চেষ্টা করো না।”

নিখিল ও মহেন্দ্র যখন স্বধাকে মাটি হইতে প্রায় শুষ্টে তুলিয়া ফেলিয়াছে, তখন স্বধা ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “না, না, আমি নিজেই পারব। আমাকে তুলে দিতে হবে না।”

নিখিল নৌকার কাছে প্রায় তাদের মধ্যে কাঁধটা নীচু করিয়া অর্ধেক হাঁটু গাড়িয়া বসিতেই স্বধা তাহার পিঠে ভর করিয়া উঠিয়া পড়িল। সর্বশেষে মহেন্দ্র ও নিখিল নৌকার তক্তাব উপর স্বধার দুই পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল। তখন বসিয়াছিল হৈমন্তীর পাশে, আর হরেশ মিলির ও সতুর মাঝখানে। স্বধার ইচ্ছা কবিল, উঠিয়া গিয়া হৈমন্তীর পাশে বসে, নিখিল ও মহেন্দ্রর সঙ্গে গল্প করিতে ত সে আসে নাই, গল্প করিবার ক্ষমতাও তাহার বেশী নাই। কিন্তু উঠিয়া গেলে শহরবৎ ছেলেবা যে ইহাকে অপমান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে এ ভয়টাও তাহার ছিল। তাহাব মনে আছে গত বৎসর আলিপুর্বের বাগানে বেড়াইতে গিয়া সে মহেন্দ্রর কেনা লেমনেড খাইতে আপত্তি করিয়াছিল ভদ্রতা ভাবিয়া, কিন্তু তাহাতে মহেন্দ্র এমনই অসম্মানিত বোধ করিল যে রাগিয়া গেলাসমুদ্র দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। মহেন্দ্র বলিয়াছিল, “আমি কি এমনই অসম্মানিত যে আমার হাতে জলও খাওয়া যায় না।”

সেই হইতে শহরের মানুষকে বিশেষত ছেলেদের স্বাধীনতা ভয় করিয়া চলে।

বেড়ানো আজ যথেষ্টই হইল, কিন্তু অনেক দিন পরে যে আশা লইয়া সে আসিয়াছিল তাহা ত পূর্ণ হইল না। নিরিবিলিতে হৈমন্তীর সহিত দুই দণ্ড গঙ্গার ধারে বসিয়া যে অপার্থিব আনন্দ অনুভব করিবে মনে করিয়াছিল, তাহার আশা এই হাস্যকোলাহলের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য! স্বধা আজ যবে ফিরিয়া নৈরাশ্রের কোন বেদনা মনে অনুভব করিতেছে না।

১৮

পৃথিবীতে কেবল যে স্বধার একলারই পরিবর্তন হইতেছে তাহা নয়, আশেপাশে আরও পাঁচজনকেও হইতেছে, ইহা স্বধা পূজার ছুটির পর স্থলে আসিয়া ভাল করিয়া অনুভব করিল। স্নেহলতা, মনীষা ইহারা যেন এই দেড় মাসেই স্বধার চেহারা অনেক বেশী বড় হইয়া গিয়াছে। তাহাদের কথাবার্তা চলনধরণ সব যেন এক ভিন্ন লোকের। স্থলে তাহারা পড়ে বটে, কিন্তু তাহাদের আলাপ আলোচনা, ভাবনা চিন্তা স্থলের বাহিরের বিষয় লইয়াই।

মনীষা একটু সেকেন্দ্রে হিন্দু ঘরের মেয়ে, স্নেহলতা ক্রীষ্টান। মানুষের বিবাহের আদর্শ কি হওয়া উচিত এই লইয়া সেদিন টিফিনের ঘটায় দুই জনে তর্ক লাগিয়া গিয়াছিল। মনীষা বলিল, “বাপ মা যাকে ভাল বুঝে হাতে ধরে সঁপে দেবেন তাকেই স্বামী ব’লে গ্রহণ করা জীলোকের কর্তব্য। বাপ-মায়ের চেয়ে আমাদের মঙ্গল কে বুঝবে আর তাঁদের চেয়ে বুদ্ধি-বিবেচনাই বা কার বেশী?”

স্নেহলতা মনীষার কথায় তাচ্ছিল্য ভরে হাসিয়া বলিল, “বুদ্ধি-বিবেচনা মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা কে বলছে? তুমি আদত কথাটাই বুঝলে না। মানুষের জীবনে ভালবাসার চেয়ে বড় জিনিষ নেই এটা বোঝ ত? তার একটা নিদ্রা সম্মান আর দাবী আছে। মঙ্গল-অমঙ্গল বাপ-মা কিছুর কাছেই তাকে বলি দেওয়া যায় না। যে মানুষ একজনকে ভালবেসে আর একজনকে বিয়ে করে, সে নিজেরও অপমান করে, ভালবাসাও অপমান করে।”

মনীষা বলিল, “খাও, কি যে ভালবাসা ভালবাসা করছ,

তোমার লজ্জা করে না? বিয়ে হবার আগেই পুরুষ-মানুষকে মেয়েমানুষে ভালবাসলে কখনও তার মান থাকে? ভজ মেয়েরা ওরকম করে না কখনও।”

স্নেহলতা চটিয়া বলিল, “পৃথিবীতে তুমি ছাড়া সবাই তাহলে অভদ্র। যার গায়ে ঠেলে ফেলে দেবে তাকে ভালবাসাই বুঝি খুব ভদ্রতা? আত্মসম্মান বোধ ব’লে যার একটা জিনিষ নেই, সেই ওকথা বলতে পারে।”

মনীষা বলিল, “আচ্ছা, স্বধাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, সে কখন তোমার কথায় সাহায্য দেবে না। আমার চেয়ে তার কথা ত তুমি বেশী বিশ্বাস কর? আমি না-হয় পণ্ডিত নই, সে ত বটে।”

স্থল-বাড়ীর ছাদের উপর হৈমন্তী তখন স্বধাকে টেনিসনের ‘ইন্‌মোমোরিয়ম’ পড়িয়া শুনাইতেছিল। স্বধা ও হৈমন্তী যে যখন-তখন ছাদে চলিয়া যায় মনীষারা তাহা জানিত। হৈমন্তীর গলার স্বরটা ছিল ভারি মিষ্ট, ইংরেজী কবিতা তাহাব গলায় রূপার ঘট-ধ্বনির মত শুনাইত। হৈমন্তী স্বধার মুখের দিকে চাহিয়া এমন করিয়া কবিতা পড়িয়া শুনাইতেছিল, যেন হৈমন্তীই কবি, সে-ই বন্ধু বিবাহে আবুল হইয়া উঠিয়াছে।

মনীষা ও স্নেহলতাকে দেখিয়া হৈমন্তী থামিয়া গেল। স্নেহলতা মনীষাকে ঠেলা দিয়া বলিল, “তুমি ভালবাসার নিম্নে করছিলে, এই দেখ, ভালবাসা কাকে বলে। সবচেয়ে যদি ওই জিনিষ পৃথিবীতে বড় না হবে, তবে ওরা পৃথিবী ছেড়ে পাগিয়ে বেড়ায় কেন?”

স্বধা ও হৈমন্তীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। মনীষা অভ্যস্ত বিরক্ত মুখ করিয়া বলিল, “যা নয় তাই একটা ব’লে বসলেই হ’ল। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তুমি ত আর সখ্যার কথা বলছিলে না, তুমি প্রেমের কথা বলছিলে।”

স্নেহলতা বলিল, “তোমার মত অত সস্তত কথা আমি জানি না বাপু। স্বধা, বল দিখি, ঘটকালির বিয়ে ভাল না লভ-ম্যারেজ ভাল? মনীষা বলছে, ভজ মেয়েরা নাকি কাউকে ভালবাসে না।”

মনীষা তেলে-বেগুনে জলিয়া বলিল, “দেখেছ একবার রকম? আমি তাই বলেছি বইকি!” মনীষার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল।

স্নেহলতা নরম হইয়া বলিল, “আচ্ছা, তা না হোক, তুমি

বলেছ ত যে বিয়ে হবার আগে কোন ভদ্র মেয়ে পুরুষ-মাহুষকে ভালবাসে না ? তাহলে পৃথিবীতে ক'টা যে ভদ্র মেয়ে আছে খুঁজে বার করা শক্ত।”

মনীষা বলিল, “তুমি বলতে চাও যে সব মেয়েই ঐ রকম করে ?”

স্নেহলতা খুব বিজ্ঞের মত বলিল, “হয় করে, নয় মিথ্যে কথা বলে।”

হৈমন্তী বলিল, “এ তোমার অজ্ঞায় কথা ভাই। মাহুষ সব রকমই আছে। সবাই তোমার শাস্ত্রও মেনে চলে না, মনীষার শাস্ত্রও মেনে চলে না।”

স্নেহলতা বলিল, “বাইরের না মানতে পারে, কিন্তু ঘোলা-সতেব বছর বয়স হয়েছে, অথচ মনে মনেও কিছু হয় নি, এমন যাবা বলে তারা মিথ্যে কথা বলে। মাহুষ ওরকম ভাবে তৈরিই নয়।”

স্বধা বলিল, “তোমার ভালবাসা মানে কি ? কাউকে কারুর একটু ভাল লাগলেই ভালবাসা হয়ে গেল ? অমন ত কত মাহুষকেই লোকের ভাল লাগে। পৃথিবীতে জ্ঞান হয়ে পর্যন্তই ধরতে গেলে ত আমরা মাহুষকে ভালবাসি। তার জন্তে বয়স হবার দরকার করে না।”

স্নেহলতা বলিল, “তা কেন ? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা। যার জন্তে বাপ-মাকেও ছেড়ে দেওয়া যায়, সেই রকম ভালবাসা। তুমি যেন আর কিছু বোঝ না ?”

স্বধা বিস্মিত হইয়া বলিল, “যে তোমাব সত্যি কেউ হয় না, তার জন্তে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে যাবে ? এও কি কখনও হয় ? যে অমন কাজ করতে বলে সে কখনও সত্যি ভালবাসে না।”

মনীষা এইবার গাল ফুলাইয়া বলিল, “দেখলে ত ? এই কথা আমি বলেছিলাম ব'লে আমার যা খুশী বললে নির্বিবাদে।”

স্নেহলতা বলিল, “স্বধা, তুমিও ভাই মনীষার মত খুকী সেজো না। সত্যি কথা বলতে তোমার ভয় কি ? তোমায় ত কেউ গলা টিপে যার তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে না ?”

হৈমন্তী বলিল, “স্নেহ, মনীষার পেছনে অমন ক'রে

লেগেছ কেন ভাই ? ওর যা বিশ্বাস তা ও বলবে না ? সব মাহুষই নিজের মতকে সত্য ব'লে মনে করে।”

স্বধা বলিল, “আমি খুকী সাজছি না ভাই। তোমার কথা ভাল ক'রে না বুঝে আমি জবাব দিতে পারব না। আমাকে ভেবে দেখতে হবে।”

স্নেহলতার আজ রোখ চাপিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, “ভেবে আবার দেখবে কি ? এত রোমিও জুলিয়েট, আইড্যান হো, শকুন্তলা, উত্তরচরিত্র পড়লে আবার ভেবে না দেখলে বুঝতে পারবে না ? তোমরা প্রমাণ করতে চাও যে আমি সকলের চেয়ে পাকা, আর তোমরা এখনও কেউ কিছু বোঝ না। সব 'ড্রেড এণ্ড বটম মিস'।”

এ-কথার কি জবাব দিবে স্বধা ভাবিয়া পাইল না। সে কিছুই বোঝে না বলিলে সত্য বলা হয় না এবং স্নেহলতাও বিশ্বাস করিবে না, অথচ তাহার কথা সব ঠিক বুঝিয়াছে বলিলেও মিথ্যা বলা হয় এবং মনীষার প্রতি অজ্ঞায় করা হয়। বাস্তবিকই তাহাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। গল্পেব বইয়ে অনেক প্রেমের কথা সে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবের সহিত মিলাইতে কখনও সে চেষ্টা করে নাই। গল্পেতে সব জিনিষ বাড়াবাড়ি করিয়া লেখাব একটা নিয়ম আছে, ইহাই সে ছেলেবেলা হইতে মানিয়া লইয়াছিল। স্নেহলতা শুনিলে চটয়া যাইবে যে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের অনেক প্রেমিক-প্রেমিকার বক্তৃতাই স্বধার এক এক সময় পাগলের প্রলাপের মত লাগিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিতে অবশ্য সে বিশেষ চেষ্টাও কবে নাই। গল্পাংশটার দিকেই এ-সব সময় তাহার ঝোঁক থাকে বেশী, অল্প জিনিষগুলিকে অব্যাস্তর ভাবেই সে গ্রহণ করিয়া গিয়াছে।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল। টিফিনের ছুটি ফুয়াইয়া গিয়াছে। সকলে উজ্জ্বাসে সিঁড়ি বাহিয়া ছুটিতে লাগিল। ইতিহাসের পড়া আছে। মাঠার মহাশয় ঘণ্টার আগেই ক্লাসে আসিয়া বসিয়া থাকেন, কে কতখানি দেবী করিয়াছে সব লক্ষ্য করিবেন। বিবাহ বিষয়ে নারায়ণ তর্কবুদ্ধ আপাতত ধামা চাপা দিয়া স্বস্বকে বই লইয়া ইংরেজ-রাজ্যের ভারতের মহোদয়তার কথা চিন্তা করিতে হইবে।

মনীষা ও স্নেহলতার তর্কটা বিস্তৃত স্বধার মনে গভীর

চিহ্ন রাখিয়া গেল। সে বছরদিন একথা ভুলিতে পারে নাই। শুধু যে ভোলে নাই তাহা নহে, স্থখার চক্ষে ইহা যেন একটা নূতন অঙ্গন পরাইয়া দিল। সংসারে স্বামী-স্ত্রী রূপে যাহারা পরিচিত তাহারা যে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন গৃহ হইতে আসিয়া একত্রে নীড় বাঁধিয়াছে এ-কথা কয়েক বৎসর পূর্বে হইতেই সে জানে, কিন্তু তবু তাহাব মনে একটা জন্মগত সংস্কার ও শিশুজ্ঞানোচিত ধাবণা ছিল যে মাতা পুত্র, ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ যেমন মানুষ ভাঙিতে গড়িতে পারে না, এই সম্বন্ধও সেই রকমই। বর-কন্যা পবম্পরকে বাছিয়া বিবাহ করিলে বেশী সম্মানাহ হয়, কি তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে বিবাহ হইলে বেশী সম্মানাহ হয় এ-কথা ভাবিয়া দেখিবার কারণ তাহার জীবনে ঘটে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজনের বিবাহ তাহাব জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার আগেই হইয়াছে এবং প্রাচীন মতেই হইয়াছে। আধুনিক আর একটা বিবাহ-পদ্ধতি যে আছে, কলিকাতা আসিবার আগে স্থখ তাহা জানিতই না। এখন যদিও জানে, তবু প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে এই পদ্ধতির যে একটা দারুণ বিরোধ থাকা খুব স্বাভাবিক সে-কথা কখনও সে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। দুই পক্ষীয় লোকেরাই যে আপন আপন মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গর্ব অল্পভব করিতে পারে তাহাও স্থখার মনে আসে নাই। প্রাচীন পন্থাতে সে অভ্যস্ত ছিল, কাজেই মনে মনে খানিকটা প্রাচীনপন্থাই হয়ত সে ছিল। আজ অকস্মাত্বে স্নেহলতার কথায় তাহার মনে হইল, স্বামী বলিয়াই জীলোক যেমন ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাসে, তেমন ভালবাসে বলিয়াই ব্যক্তিবিশেষকে বিবাহ করিতে সে চাহিতে পারে। দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কি রোমিও জুলিয়েট, ইত্যাদিতে যাহা স্থখা পড়িয়াছে জগতে তেমন জিনিষ হয়ত সত্য সত্যই ঘটে। কিন্তু তবু অজানা অচেনা একজন মানুষকে এতখানি ভাল কি করিয়া বাসা যায় যাহাতে চিরজন্মের বন্ধু বাবা মা সকলকে অগ্রাহ করিয়া সব ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া যায়, বুঝিতে স্থখার কষ্ট হইতেছিল। উপস্থানে রোমান্সে যাহাই থাকুক, কিছু তাহার মধ্যে অতিরঞ্জিত নিশ্চয়। হৈমন্তী অবশ্য বন্ধু মাত্র, কিন্তু তাহাকে স্থখা যেমন ভালবাসে তেমন ভালবাসা পৃথিবীতে নিশ্চয় কম দেখা যায়। তবু কই, হৈমন্তীর জন্ম বাবাকে কিংবা

পীড়িতা মাকে ফেলিয়া চিরদিনের জন্ম কোথাও সে চলিয়া বাইতেছে এ-কথা ত সে ভাবিতে পারে না। নিজের শ্রেষ্ঠতম স্থখও সে হৈমন্তীর জন্ম ছাড়িতে পারে কিন্তু আজন্মের যাহারা প্রিয় ও আত্মীয় তাহাদের সে ছাড়িতে পারে না। তাহারা যে তাহার সকলের প্রথম।

আবাব মনে হইল, তাহার বৃদ্ধ দাদামশায়ের কথা, কত আদবে মহামায়াকে তিনি মানুষ করিয়াছিলেন, বৎসরান্তে দেখিবার জন্ম কাছে পাইবার জন্ম কি অগ্রহে পথের ধারে ছুটিয়া আসিতেন। আজ দিদিমা নাই, তবু মাকতকাল দাদামশায়কে একদিনের জন্মও দেখিতে যান না। এ কি শুধু মার অক্ষমতার জন্ম, না মার মন এখন আপন সংসারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া? অবশ্য, দাদামশায়ই মাকে এ সংসারে জুড়িয়া দিয়াছেন, মা আপনি বাছিয়া লন নাই। যদি বিবাহ না দিতেন, হয়ত মা চিরদিনই বতনজোড়ে দাদামশায়ের সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেন। তবুও মার এই পরিবর্তনের কারণের ভিতর আর কিছু আছে কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার।

স্থখা ছুল হইতে বাড়ী আসিয়াই মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, তুমি তিন-চার বৎসব দাদামশায়কে দেখতে যাও নি, তোমার মন কেমন করে না?”

মহামায়া কেমন যেন ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন রে? এমন কথা কেন জিজ্ঞেস করছিস? কোন খারাপ খবর আসে নি ত। বুকটা ধড়াস করে উঠল।”

স্থখা তাড়াতাড়ি হাসিয়া বলিল, “না, না, খারাপ খবর কিছু আসে নি। তোমার বাবাকে দেখতে তোমার ইচ্ছে করে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।”

মহামায়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “করে বইকি মা! বাপ-মায়ের মত জিনিষ সংসারে কি আছে? কিন্তু মানুষের মন যা চায় পৃথিবীতে সব সময় কি তাই পাওয়া যায়?”

মহামায়ার কাছে যা শুনিবে আশা করিয়া স্থখা কথা পাড়িয়াছিল তাহা তিনি বলিলেন না, তাহার চিন্তা-ধারা অস্ত্র পথে চলিয়া গেল। মহামায়া বলিলেন, “বুড়ো বয়সে বাপ-মায়ের সেবা করতে পাওয়া বহু জন্মের

তপস্কার ফল। আমি কি তেমন কিছু পুণ্য করেছি যে ও কাজ করতে পাব? সে পুণ্য করেছেন আমার দিদি। আমি এখন যেখানে যাব সেখানেই লোকের সেবা নেব। এ আমার গত জন্মের পাপের ফল, মা।”

মহামায়ার মনে এই দুঃখ বেদনা জাগাইয়া তুলিতে সুধা চায় নাই, স্বতরাং এ-কথায় আর সে কথা বোকাইল না। একবার ভাবিল মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করে, “মাদামশায় যদি তোমার বিষয়ে না দিতেন, তুমি কি নিজে থেকে বাবাকে বিয়ে করতে পারতে?” কিন্তু সুধার লজ্জা করিল, সে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। সে জানিত, প্রায় শৈশবেই মহামায়ার বিবাহ হইয়াছিল এবং বাপ-মা ছাড়িয়া স্বশুরবাড়ী গিয়া সাত দিন ধরিয়া তিনি এমন কান্নাকাটি করিয়াছিলেন যে পাড়ায় তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। পাড়ার গৃহিণীরা নাকি বলিয়াছিলেন, “যে-মেয়ে বাপ-মায়ের জন্তে এমন করে কাঁদতে পারে, সেই স্বামীপুত্ররূপে সত্যি ভালবাসতে পারবে।”

এ-সকল গল্প সুধার মুখস্থ ছিল, কিন্তু ইহার অর্থ তলাইয়া বুঝিতে আগে সে চেষ্টা করে নাই। বাপ-মাকে যে এমন করিয়া ভালবাসে, সে অন্য কাহারও দিকে ফিরিয়াও চাহিতে পারে না, এই ছিল তাহার শৈশবেই একটা মোটামুটি ধারণা। এখন সে ধারণা আপনা হইতেই তাহার বদলাইয়া গিয়াছে। স্বামীকে ভালবাসা সে চোখে দেখিয়াছে এবং হয়ত খানিকটা বুঝিয়াছেও, কিন্তু স্বামী নির্বাচন করা জিনিষটা কাব্য উপন্যাসের বাহিরে কখনও সে ইতিপূর্বে ভাবিয়া দেখে নাই। মেহনতারা যে তর্ক তুলিয়াছে তাহা আবার সাদাসিধা নির্বাচনের অপেক্ষাও জটিল। ধরা যাক, সুধার বাবা মা একটি বর নির্বাচন করিয়া সুধাকে বিবাহ করিতে বলিলেন এবং সুধা তাঁহাদের অপ্রিয় আর একজনকে

বিবাহ করিতে চাহিল। তাল হইলে জিনিষটা বোখায় গিয়া দাঁড়ায়? সুধা মনে মনে ভাবিয়া দেখিল, বাবামার বাহা পছন্দ নয় এমন কোন জিনিষ সচরাচর তাহার পছন্দ হয় না, সে যেন আপনার পছন্দ ও রুচিকে তাঁহাদেরই ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাদের অপ্রিয় একটা মানুষকে অকস্মাৎ সে পছন্দ করিয়া বসিবে কি করিয়া? কি জানি, দিনে দিনে মানুষের কত পরিবর্তনই হয়, হয়ত একদিন এমনই অভ্যন্তরীণ একটা ব্যাপার তাহার জীবনেও ঘটয়া বসিতে পারে। আশ্চর্য্য পর্যন্ত তাহার ত বিশ্বাস যে সে তাহার পিতামাতাবই মিলিত মনের একটি নৃতন সংস্করণ মাত্র। তাহার নিকট ভাল ও মন্দ বলিতে যে দুইটি বিভাগ, তাহা পিতামাতার ভাল-মন্দ বিভাগের সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিয়া যায়। কিন্তু এমনও ত হইতে পারে এবং তাহা হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পৃথিবীর অনেক জিনিষই সে জানে না, সে বিষয়ে ভাল-মন্দ কি তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও তাহাব হয় নাই। সেই সব ক্ষেত্রে গিয়া পড়িলে সে কি করিবে? পিতামাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে সে পারিবে কি? হইবার কোনও গোপন সম্ভাবনা তাহার চবিত্তের ভিতর লুকাইয়া আছে কি?

কিন্তু এ-সকল ভ্রূখা খুব বেশী সুধা ভাবিতে পারিত না। তাহার জীবনে এই চিন্তার প্রয়োজন এমন জরুরি ছিল না যে ইহা লইয়া সারাক্ষণ সে মাথা ঘামায়। বন্ধুপ্রীতির বিমল আনন্দে তাহার মনট ছিল ভরপুর, তাহাব উপর কর্তব্যনিষ্ঠায় সে ছিল আপনার প্রতি অতি নিষ্ঠুর। এই দুইটি কোমল ও কঠিন বস্তুনে সে আপনাকে এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার ভিতর ভবিষ্যতের ভাবনার বিশেষ স্থান ছিল ন। বন্ধুরা তাহার দৃষ্টিটা এই দিকে খুলিয়া দিয়াছিল মাত্র।

(ক্রমশঃ)

মহামতি বিজ্ঞাননাথ

ত্রিবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

স্বর্গীয় পূজ্যপাদ বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুতিথি আসন্ন। তাঁহার অনেক কথা আজ মনে হইতেছে। এক দিকে বিজ্ঞাননাথ ও অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ, এই হিমালয় ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী আর্ধভূমিতে বাস করিবার সময় উভয়েবই সহিত এই লেখকের একটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহারই ফলে হয়তো এমন কয়েকটি কথা আমার জ্ঞানিবার সুবিধা হইয়াছিল যাহা অন্যে জানেন না। বিজ্ঞাননাথের সম্বন্ধে এইরূপই কয়েকটি কথা আজ লিখিতেছি। যাহারা তাঁহাকে জানেন, অথবা যাহারা জানেন না, উভয়েই ইহাতে আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাননাথ বড় রসিক ও পরিহাসশীল ছিলেন। একবার পূজাবকাশে আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। সে বার পূজা হইয়াছিল কার্তিক মাসে। বিজ্ঞাননাথ আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা ছিল একখানি খাঁমের মুখে। খামখানি ছিঁড়িয়া পত্রের প্রথমেই স্থান দিকে তারিখের সংখ্যার পবে দেখিলাম সারি সারি ছয়টি মুণ্ড আঁকা রহিয়াছে। তাহার পর সালের সংখ্যা। কী বিচিত্র! উহার মানে কী? আমার বুঝিতে দেয়ী হইল না। ঐ ছয়টি মুণ্ডে বিজ্ঞাননাথ কার্তিক মাস বুঝাইয়াছেন। কার্তিকের একটি নাম ষড়ানন। ইহাই হইল তাঁহার ঐ কৌতুকের মূলে।

বিজ্ঞাননাথ বাড়ীর রেখাক্ষর লইয়া দীর্ঘকাল, এমন কি শেষ সময় পর্যন্ত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই রেখাক্ষরের এক-একটি কবিতায় তাঁহার পরিহাস-প্রিয়তা চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ইহার একখানি আমাকে দিয়াছিলেন। ইহাতে আমার নামের পূর্বে একটি চমৎকার বিশেষণ বসাইয়াছিলেন। তাহা এই— “নিখিল শাস্ত্রপারাবারের অগস্ত্য মূনি।” বলা বাহুল্য পাঠকের বুঝিতে দেয়ী হইবে না, উহার অর্থ হইতেছে,

অগস্ত্য মূনি যেমন এক চুমুকে সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন, এই ব্যক্তিও তেমনি সমস্ত শাস্ত্র অধিকার করিয়া শেষ করিয়াছে।

বিজ্ঞাননাথের স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল। তিনি নিজেকে আমাকে বলিয়াছিলেন, খ্রিষ্ট বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাথাও ধরে নাই। পরে একবার তাঁহার গুরুতর পীড়া হয়। তিনি নিজের আমলককুঞ্জে (নীচ বাড়ী) ছিলেন। তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় বিপেকনাথ ও অগ্রাণ্ড আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে ঐ অসুস্থাবস্থায় তাঁহাকে শান্তিনিকেতনের অতিথি-শালার দোতালার উপর আনা হয়। তাঁহার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেই ইহা হইয়াছিল। রোগ যখন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল তখন তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করান স্থির হয়। তদনুসারে রেলগাড়ীর উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত ঠিকঠাক। কিন্তু তাঁহাকে যখন ইহা জানান হইল তিনি একেবারেই বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই তিনি যাইবেন না। তাঁহার ডাক্তারী চিকিৎসায় একটুও শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিলেন, “তোমরা ত আমাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু এমন (অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের মত) atmosphere সেখানে কোথায়?” যখন তিনি কলিকাতায় আসিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, তখন মিথ্যার আশ্রয়ে আনিবার চেষ্টা হইল। তাঁহাকে বলা হইল, ভাল, তিনি না-হয় কলিকাতায় না-ই যাইবেন। কিন্তু তাঁহার নিজের আমলককুঞ্জে গেলে ভাল হয়। তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। এই সুযোগে তাঁহাকে মোটর গাড়ীতে উঠাইয়া একেবারে ষ্টেশনে আনিয়া রেলগাড়ীতে উঠান হয়, এবং এইরূপে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোতে নিজের বাড়ীতে আনা হয়। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে তিনি ভাল হইয়া উঠেন, কিন্তু দুর্বল ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত।

এই সময়ে আমি কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে গুরুদেবের

(পূজাপাদ রবীন্দ্রনাথের) কাছে উপস্থিত হই। ইচ্ছা ছিল, গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরে বড় বাবু মহাশয়ের (আমরা দ্বিজেন্দ্রনাথকে বড় বাবু মহাশয় বলিতাম) নিকট যাইব। তিনি কিন্তু ইহারই মধ্যে আমার সেখানে আসার কথা শুনিয়াই চাকর পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন যে, আমি যেন অবিলম্বে গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি ভিতর বাড়ীতে খুব বড় একখানি খাটে শুইয়া আছেন। আমি ঘরে ঢুকিতেই খাটের উপরে অর্দ্ধোপস্থিত অবস্থায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “আহুন শাস্ত্রী মহাশয়, আহুন। শুভুন, আমি এক শ্লোক রচনা করিয়াছি।” এই বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে যে কি হাসি, তা যে তাঁহার হাসি না শুনিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। নীচ বাড়ীতে তাঁহার হাস্যশব্দ আমার বর্তমানের ‘আদি কুটারে’র কাছে শুনিতে পাইয়াছি। তিনি তখন আমাকে ঐ খাটের একপাশে বসাইয়া শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

ডাক্তার্য বহবঃ সন্তি patientকে দৃষ্টে-মারিণঃ।

দুর্লভাস্তে তু ডাক্তাবাঃ patientকে শাস্তিদায়িনঃ ॥

শ্লোক পড়িয়াই আবার সেইরূপ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। ইহা শ্রুতিতে একটু সময় লাগিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার ডাক্তাবদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না, ঐ শ্লোকে তাহাই কেমন চমৎকাব ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এই রচনাটি হইতেছে নিম্নলিখিত শ্লোকটির পরিহাসাত্মক অলঙ্করণ (parody) :

গুরুবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।

গুরুবো দুর্লভাস্তে তু শিষ্যসম্ভাপহারকাঃ ॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের এইরূপ দুই-একটি কবিতা রচনা করিতেন। তিনি একখানি চিবকুটে লিখিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন—

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি যে শ্লোকটার দুই চরণ আপনাকে শুনাইয়াছিলাম, তাহার চারি চরণ পূরণ করিয়া দিলাম, যথা—

পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ, পয়সা কমলেন বিভ্রাতি সরঃ।

মণিণা বলয়ং বলয়েন মণিমণিণা বলয়েন বিভ্রাতি করঃ ॥

নিশয়া চ শশী শশিনা চ নিশা, নিশয়া শশিনা চ

বিভ্রাতি শরৎ।

রবিণা চ বিধুবিন্দুনা রবী রবিণ বিধুনা চ বিভ্রাতি জগৎ ॥
কেমন হইল এবার ?”

“পয়সা কমলং” হইতে “বিভ্রাতি করঃ” এই পর্য্যন্ত একটি সম্পূর্ণ শ্লোক, ইহা প্রাচীন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহাকেই দুই চরণ ধরিয়া শেষের নিজ কৃত সম্পূর্ণ শ্লোকটিকে অপর দুই চরণ বলিয়া ধরিয়াছেন। “রবিণা” হইতে “জগৎ” পর্য্যন্ত লিখিয়া তিনি যে আর একটি অর্থের ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা কেহ কেহ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

তিনি স্থললিত বাড়ীতে গায়ে এই কবিতা দুইটির অলঙ্করণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা হারাষ্ট্রিয়া ফেলিয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার অনেক সময়ে অনেক আলোচনা হইত। অতীত নানা কাজে আবদ্ধ থাকিতে হইত বলিয়া সব সময়ে তাঁহার কাছে আমার যাওয়া সম্ভব হইত না। তিনিও ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই অনেক সময়ে ছোট ছোট চিবকুটে আমাদের প্রমোদিত চর্চিত। তিনি যে সব চিবকুট পাঠাইতেন তাহাদের অনেকের মধ্যে বড় চমৎকার কথা থাকিত। গুণ্ডলি যন্ত্র করিয়া রাখিলে খুব ভাল হইত। খানকতক মাত্র আছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

(১)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি খুব জানি যে, আপনার মতো সাধুসম্পন্ন ব্যক্তিরও সহিষ্ণুতার সীমা আছে, এই জন্ত এবারে আমার বক্তব্যটা অতীব সংক্ষেপে সারিলাম। সে কথা এই :—

আপনি যদি পক্ষপাতিতা দেখ গায়ে মাখিয়া লইয়া কালিদাসের ত্রৈলোক্যের ব্যালা খান, এবং করণবের ব্যালা আমার প্রতি ঋণগ্রহণ হন—তবে আমি নাচার।

নাছোড়বন্দ দ্বিজ ॥”

একটা শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনায় তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন।

(২)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আপনার চতুষ্পাঠীর দ্বিতীয় অধ্যায় যদি

ফুটনোটটির ভাবার্থ প্রাণধানপূর্বক বুঝিয়া দেখেন তবে আমি স্থখী হইব।”

(৩)

আমাদের মধ্যে একটা তর্ক বাধিয়াছিল। ইহাতে আমার মন্তব্য পাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

“তাড়াতাড়িতে ঠিক শব্দটা সহসা মাথায় যোগাইল না বলিয়া গতকল্য আমি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম ‘আপনার টিপ্পনীর জালায়’ ইত্যাদি; এক্ষণে দেখিতেছি যে, ওরূপ একটা অযোগ্য শব্দ যে লেখনী দিয়া বাহির হইয়াছে সে লেখনীকে আগুনে জ্বালাইয়া ভস্ম করাই উচিত বিধান। উহার পরিবর্তে আমার উচিত ছিল বলা ‘আপনার টিপ্পনীর উত্তেজনায়—’ আপনাকে বলা বাহুল্য যে, গতস্য শোচনা নাস্তি। বিন্দুবিসর্গশরিক চারি ছত্রের মধ্যে বদলাইবার যদি কিছু দেখেন বলিবেন।”

(৪)

“দেশীয় দর্শনের কথা-বার্তার মর্মের ভিতর প্রবেশ করিতে দেশীয় দর্শনের পরিভাষার জঙ্গল পরিষ্কার করা বড় আবশ্যক। জঙ্গল কিরূপ তাহার নমুনা দেখাইতেছি। প্রকরণ ও প্রকৃত শব্দের দার্শনিক অর্থ কী? প্র—করণ = প্র+করণ। করণ শব্দের মুখ্য অর্থ বাহ্য দ্বারা অভীষ্ট সাধন করা হয়। প্রকরণ শব্দের মুখ্য অর্থ তাই ‘অভীষ্ট সাধনের প্রণালী পদ্ধতি। কিন্তু যখন আমরা [বলি] বর্তমান প্রকরণে একথা আলোচনা যোগ্য নহে বা এক কথায় প্রকরণ ভঙ্গ বা অপ্রকৃত প্রসঙ্গ হয় বা এক কথা প্রকরণবিরুদ্ধ, তখন প্রকরণের মুখ্য অর্থ বিপর্যস্ত হইয়া যায়। আমার জিজ্ঞাস্য এখানে প্রকরণের গোড়ার অর্থের সঙ্গে শেষের অর্থের মিল কিরূপ? “মিল নাই” বলিলে আমি ছাড়িব না। আর ঘট-কচু-ডামনী ত্রায়াত্ময়্যায়ী অর্থও প্রবোধ মানিব না। প্রস্থান শব্দের দার্শনিক অর্থ কী? সেটাও জানিতে ইচ্ছা করি। ইংরাজীতে বাহাকে বলে stand-point তাহাই কি প্রস্থান শব্দ বুঝায়?”

(৫)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

৯ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্যন্ত দেখিয়া যদি লেখনীর দুই এক আঁচড়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন—আর বেশী কোনো

কিছু বলিবার থাকিলে লেখনীটাকে তত্পরমুগ্ধ বেশী দৌড় দেওয়ান, তবে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিব।

চাতক দ্বিজ।”

(৬)

আমার একটা উত্তর দিবার অথবা তাঁহার কাছে যাইবার কথা ছিল, তাহা না হওয়ায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

“গরজিল মেঘ, দিল না ধারা।

চাতক হইল ভাবিয়া সারা।”

(৭)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি পাতভাড়া গুটাইবার উদ্যোগ করিতেছি। আপনি ৩৭ পৃষ্ঠা হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া দেখিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিব। বিশেষত, ছর্ব্বোধ্য অংশগুলি কিরূপে সুবোধ্য করা যাইতে পারে তাহার উপায় যদি বাংলাইয়া দেন, তবে আমার কৃতজ্ঞতার ফোয়ারা খুলিয়া যাইবে।”

(৮)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আবার আমি ইাড়ি চড়াইলাম। রান্না কেমন হ’চে—একটু আশ্বাদন করিয়া দেখিয়া লবণাদির পরিমাণ ঠিক হইয়াছে কিনা আমাকে এই বেলা বলুন। লবণাদির আভিষাযে বা ন্যূনতায় রান্না মাটি না হইয়া যায় সেই বিষয়টিতে পূর্বাঙ্কে সাবধান হওয়া পাচকের অতীব কর্তব্য।”

(৯)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

শাস্ত্রের অভিপ্রায় মতে কেবল আত্মাই অসঙ্গ আর সবই সঙ্গ। বস্তু সকলের পরস্পরের সঙ্গ-মিলনকে (সম্মিলন বলিলাম না তাহার কারণ এই যে সম্মিলিত বস্তু অনেক সময় একীভূত হইয়া যায়—যেমন দুই শিশির বিন্দু এক শিশির বিন্দু হইয়া যায়) ইংরাজী ভাষায় বলে “association”. Associationএর দেশী শব্দ আমার দরকার হইয়াছে—আপনি যদি সংস্কৃত শাস্ত্রে association শব্দের অল্পরূপ শব্দ পাইয়া থাকেন তবে তাহার মূল্য আমার কাছে বেশী। আর ফন্স করিয়া Monier Williams-এর

পাতা উল্টাইয়া যদি association-এর একটা প্রতিশব্দ আমাকে গছাইয়া দেন তবে তাহার মূল্য আমার কাছে কম। কিন্তু নেই আমার চেয়ে কানা মামা ভাল—যেন তেন প্রকারেণ একটা সুস্ফুটসঙ্গত এবং বিজ্ঞানসঙ্গত প্রতিশব্দ আমাকে প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।”

(১০)

“শাজী মহাশয়,

আপনি আমাকে “প্রভাভিজ্ঞানের” সংজ্ঞা যাহা দেখাইলেন তাহার সমস্তটা আমাকে যদি লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আপনাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিব।

আপনাকে বিবক্ত করণেশ্বরাল

Old man of the Mountain.”

(১১)

“শাজী মহাশয়,

আপনার আমাকে বলপূর্বক মোহনিত্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়া তীর্থযাত্রার প্ররত্ত করাইতেছেন—গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতেছেন—এখন ঠহার ভাল সামান্য। তীর্থপার্থক ক্ষতিমোহন আয়ুর্বিদ্য ববঃ পাণ্ডা হইয়া স্বাভীর্ণের মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন ইহার অর্থ এই যে আপনাদের মতো লোকের সংস্কার বাতাস গায়ে লাগিলে পল্লুও গিরি লম্বন করিতে পারে।”

উল্লিখিত ক্ষতিমোহন শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষতিমোহন সেন।

(১২)

ও

“শাজী মহাশয়,

সুদূরগন্ত ক্ষতিমোহন আয়ুর্বেদী কানী প্রয়াগ মথুরা বুলাবন নন্দনা কাবেরী গোদাবরী প্রভৃতি সারা তীর্থ পর্যটন করিয়া এখনও তাঁর তীর্থযাত্রার আশা মেটে নাই—এই মাত্র তিনি কালিঘাটাভিমুখে পাত্রাজে রওনা হইলেন। তাঁহাকে পেরে ওঠা ভার, তিনি গৃহস্থ হইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন—শাস্তিনিকেতনের শাস্তিধর্ম পবিত্র্যাগ করিয়া শাস্তিহার্য পরিব্রাজকের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাকে গীতার এই শ্রেয়স্কর বাক্যটি স্মরণ করাইয়া দ্যান যে, স্বধর্ম নিখনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ তবে বড়

ভাল হয়, তাঁর আশা আমি পরিত্যাগ করিলাম। আপদধর্মের বিধি অমুসারে আপনি [যদি] ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হইতে নীচে নাবিয়া উপস্থিত পাণ্ডাগি-বি কার্যটির ভার গ্রহণ করেন তবে আমি আপনাকে 1st prize প্রদান করিতে বামানন্দ বাবুকে অমরোধ করিব।

অনন্তোপায় দীন দ্বিজ।

পুনশ্চ দিহুকে তুলিবেন না।”

পর্যটনপটু বন্ধুবর ক্ষতিমোহন অনেক সময় তাঁহার কাছে ঘাইতে পারিতেন না, ইহাই এই পত্রের বিষয়। উল্লিখিত বামানন্দ বাবু হইতেছেন ‘প্রবাসী’র সম্পাদক শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ শ্রীযুক্ত বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সেই সময়ে তিনি কৌতুক করিয়া শাস্তিনিকেতনে আমাদের মধ্যে কয়েকটা পূবস্কারের ঘোষণা করেন, তাহার বিচারের ভার ছিল বামানন্দ বাবুর উপর। পত্রে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। দিহু হইতেছেন স্বর্গীয় ব্রহ্মবর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁহার পৌত্র।

(১৩)

“অনিল

শাজী মহাশয়,

যদি বহুস্কর ধর্মস্কর মহাশাকে এবং গুণ গুণ কারী ভোমরা ভীমরাওকে টানিয়া আনেন অথবা তুমি টানিয়া আনো তবে ভাল হয়—বহুস্কর মহাশয় বলিয়াছিলেন তিনি সকালে আসিবেন।”

এই পত্রে বহুস্কর শব্দে ক্ষতিমোহন বাবুকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ক্ষতি শ্রীলিঙ্গ, তাই বহুস্কর। কিন্তু আমাদের ক্ষতি অর্থাৎ ক্ষতিমোহন বাবু পুরুষ, তাই তিনি হইলেন বহুস্কর। অনিল হইতেছেন তাঁহার সেক্রেটারী স্বর্গীয় বহু অনিলকুমার মিত্র। এই চিবকূট খানি লিখিয়া অনিল বাবু অথবা আমাকে দিবার লজ্জা তিনি চাকরের হাতে দিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভীমরাও শাজী সাম্ব্যতীর্থ ঐ সময়ে শাস্তিনিকেতনে সঙ্গীতের অধ্যাপক ছিলেন। ভীমরাও নামে তাঁহাকেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ইহাকে অনেক সময়ে ছোট পণ্ডিত বলিতেন, বড় পণ্ডিত ছিলাম আমি।

(১৪)

“ও বিষ্ণু—বড় একটা তুল করিচ্ছি। বৈদ্য জিন

শ্রেণীতে নহে পরন্তু চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে গোবৈদ্য। গোখোর পণ্ডিতব্যক্তির শিষ্য—এই অর্থে গোবৈদ্য। ইহাদের মতে কুইনাইন হইতেছে সর্বরোগ-হারোষি। ইহারা কালেক্টর লেজ ধরিয়া ভীষণ প্রতাপে বাহির হইয়া গোগর্দভমহলে প্রবেশ করেন। ইহাদের রাক্ষসী চিকিৎসায় রোগভোগী বেচারাদিগের জীর্ণ-শীর্ণ দেহে অর ভাগের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীভাগ হইয়া বাইতে একটুও বিলম্ব হয় না।”

এই চিরকূট খানি লিখিবার অব্যবহিত পূর্বেই আর এক খানি লিখিয়াছিলেন। উহা হারাইয়া গিয়াছে। তাহাতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সন্শোধন করিয়া ইহা লিখিয়া-ছিলেন। আমার উত্তর লিখিয়া পাঠাইতে পাঠাইতে কখনো কখনো তাঁহার তিন চার খানি পত্র উপস্থাপি আসিয়া পড়িত। ইহাও সেইরূপ। ডাক্তারী চিকিৎসায় তাঁহার প্রভা ছিল না, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই পত্র খানিতেও তাহা দেখা যাইতেছে।

পূজ্যপাদ গুরুদেবও (রবীন্দ্রনাথ) এক সময়ে একটি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তখন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয় নাই, শান্তিনিকেতন আশ্রমে কেবল ইচ্ছুকই ছিল। সেই সময়ে বোলপুর হইতে একজন ডাক্তার প্রতিদিন আশ্রমে আসিয়া রোগীদের দেখাশুনা করিতেন। আশ্রম হইতে তাঁহাকে একখানা বাইসাইকেল দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তারটির উপর গুরুদেবের তেমন বিশ্বাস ছিল না। ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি এক পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, যমের আসিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু সাইকেলে চড়িয়া যমদূতের আসিতে বিলম্ব হয় না।

(১৫) •

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আপনি সন্ধ্যার পূর্বে এখানে আসিলে আমি বড়ই সুখী হইব।

এই স্বযোগে প্রকৃত কথাটা তবে আপনাকে ভাঙিয়া বলি।

মঙ্গলালয় বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদের সংস্কার বাতালে আমার উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়া আমার জ্ঞান ক্ষুদ্র জীবকে অভাবের একটা প্রেমঃ পথের প্রদর্শন কার্যে

নিযুক্ত করিলেন আর সেই সঙ্গে আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙিয়া দিলেন—

প্রকৃতঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্কশঃ ।

অহঙ্কাববিমুক্ত্যা কর্তাহমিতি মন্ততে ।

এই অহঙ্কারের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। আমি এটা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আপনাদের সংস্কার সাহায্য ব্যতিরেকে আমি অমনদ্বারা উচ্চ অঙ্গের লেখা এক কলমও লিখিতে পারিতাম না। আমি একজন আদ্যাব ব্যাপারী রেখাক্ষরের চুটকি কবিতা লিখিয়া সরস্বতীর পদে বিনিয়োগ করি, কিন্তু ইহাই আমার পক্ষে ঢের।”

ইহাতে যে লেখার কথা বলা হইয়াছে তাহা তাঁহার গীতাপাঠের ভূমিকা। ইহা তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতার আকারে শান্তিনিকেতনে পাঠ করিয়াছিলেন।

(১৬)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

আমি চোকে দেখতে পাই নে ব’লে লেখাটা ছিডিডিকি হইয়া গিয়াছে, কীরূপ আপনার লাগে বলিবেন।

নারিকেলের মতো অমন একটা রসালো ফলের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে অসামঞ্জস্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া জগজ্জননী প্রকৃতির উপরে আমার অভক্তি জন্মিয়াছে। অন্তরঙ্গ কোমল হইতে কোমলতর, বহিরঙ্গ কঠিন হইতে কঠিনতর—এটা কি ভাল ?

উত্তর (প্রথমটা যেমন আছে তেমনি থাকিবে। তাহার পরে সর্বশেষে বসিবে এইরূপ) শাস্ত্রে বলে যে জনক রাজা প্রকৃতির জ্ঞান জীবন্ত মহাপুরুষদিগের অনন্তসাধারণ লক্ষণ একটি এই যে, তাঁহারা বাহিরে কর্তা ভিতরে অকর্তা। ইহার নিগূঢ় অর্থ যিনি বোঝেন—নারিকেলের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মধ্যে গুরু বৈশাদৃশ ঘটবার কাণ্ড বুঝিতে তাঁহার এক মুহূর্তও বিলম্ব হইবে না।”

(১৭)

“শাস্ত্রী মহাশয়,

ধূমকেতুর ল্যাজের জায় স্থল শব্দভ্রমের ন্যায় বাস্পীয় পদার্থকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন “nebulous matter,” neb=নভ=আকাশ। কিন্তু অম্ব (আকাশ), অম্বু, এবং অম্বঃ এই তিন শব্দের মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানঘটিত ধ্ব-

নিকট সম্বন্ধ। আকাশ জলগর্ভ অভ্যন্তরিতের আধার এই অর্থে অক্ষর। nebulous matter এক প্রকার সূক্ষ্ম শরদ্রের স্তায় পদার্থ নভ-ল পদার্থ। nebulous matter বৈজ্ঞানিক মতে নাক্ষত্রিক এবং সৌর জগতের আদিম উপাদান। nebulous matterকে আমি বাঙলায় বলিতে চাহিতেছি—নভিল পদার্থ। ল অক্ষর অনেক সময়ে বিশেষ্যকে বিশেষণে উঠাইয়া দ্যায়—কখনও কখনও বিশেষণকে দোমেটে করিয়া দেয়। যেমন ফেন—ফেনিল, এখানে ফেন বিশেষ্য; বহু—বহুল, এখানে বহু একমেটে বিশেষণ, বহুল দোমেটে বিশেষণ। ফেন হইতে যেমন ফেনিল হইয়াছে, neb হইতে তেমনি nebulous হইয়াছে। নভ হইতে তেমনি বিধান মতে নভিল হইতে পারে। লাস্ত শব্দের এইরূপ অর্থের আর কয়েকটি উদাহরণ। যাহা চলে তাহাকে যেমন চল পদার্থ বলে, তেমনি যাহা সরে তাহাকে সর পদার্থ বলা যাইতে পারে। কক কাশী যখন গলা দিয়া নাক দিয়া বেশ সরে, তখন আমরা বলি যে তাহা সরল হইয়াছে। সর+ল = সরল। পুনশ্চ সরল = সরিল যেমন ফেনল = ফেনিল। সর+ল = সরল = সরিল = সরিল। স্থ = স্থল স্থাবর পদার্থ। স্থ+ল = স্থল = স্থল। জ = ল = জল। জল বাষ্প হইতে বা মেঘ হইতে জন্মায় এই অর্থে জ-ল। স্থল, স্থির থাকে এই অর্থে স্থল; স্থল পদার্থও এইরূপ অর্থে স্থ-ল (= স্থল)।”

ইহা লিখিবাব পরে সঙ্গে সঙ্গেই আবার লিখিয়াছিলেন—

“শাস্ত্রী মহাশয়, আব একট উদাহরণ আমার মনে পড়িল।

Circular = চক্রিল হইতে পারি সহজে।”

এইরূপ তিনি বহু বহু লিখিয়াছিলেন, বহু করিয়া রাখিলে কাছে লাগিত, কিন্তু চুঃখের বিষয় তাহা আমি করি নাই।

তিনি আমাদের সঙ্গে কেমন আলোচনা করিতেন ইহাতে তাহা জানা যাইবে। আজ এই প্রসঙ্গে এক দিনের ঘটনা মনে হইতেছে। আমরা তাঁহার কাছে বসিতে পারিতাম না দেখিয়া কখনো কখনো তিনি নিজেই আমাদের কাছে আসিতেন। এক দিন প্রাতে বেলা প্রায় দশটা এগারটার সময় আমি আমাদের গ্রন্থাগারে ছিলাম। তিনি তখন বেড়াইতে পারিতেন না। একখানি রিকশাতে করিয়া তিনি নীচের বারান্দার কাছে শালগাছের নীচে আসিয়া আমাদের সংবাদ দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আসিলাম। তিনি রিকশাতেই বসিয়া আমার সঙ্গে একটা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেদিন একটা বড় রুমের ভর্তি হইল। ক্রমশ তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন—যদিও আমি খুব সংযত, ধীর ও সাবধানে উত্তর দিতেছিলাম। শেষে এমন হইয়াছিল যে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মুচ্ছা ভঙ্গ হয়। আত্ম ইহা মনে পড়ায় কষ্ট হইতেছে। পাঠকেরা জানিয়া আনন্দিত হইবেন, যদিও ঐরূপ ঘটনাছিল তথাপি তিনি সেজন্য আমার উপর বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হন নাই।

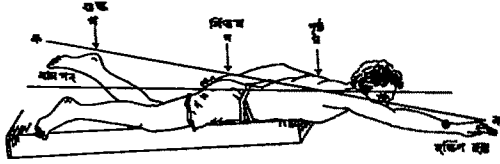


সন্তরণের অ, আ, ক, খ

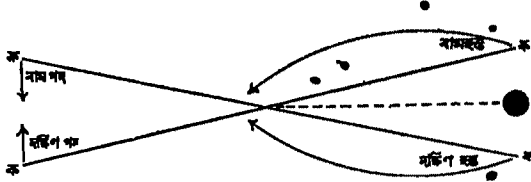
শ্রীশান্তি পাল

সন্তরণ-শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই দো-হাতি পাড়ির সাহায্যে অর্থাৎ দুই হাত মাথার উপর দিয়া নিষ্কেপ করিয়া সঁতার দিতে চেষ্টা করিবেন। শিক্ষার্থীর পাড়ি স্থূল না হইলেও ক্ষতি নাই। নিয়মিত অভ্যাস করিতে করিতে পাড়ি আপনিই স্থূল হইয়া আসিবে। বুক-সঁতার, চিং-সঁতার বা অজ্ঞাত ধরণের সঁতার পরে শিক্ষা করিলেই ভাল হয়। ভেলা, লাইফ-বেন্ট বা অন্য কোন সাহায্য লইবেন না।

শিক্ষার্থী সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন, শিক্ষাকালে দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ (চিত্র ১ ও ২, ক—ক) এবং ঐরূপে বাম



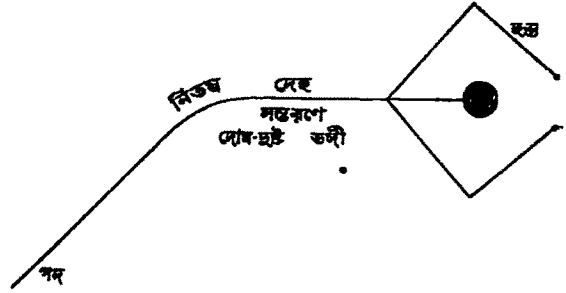
১ নং চিত্র



২ নং চিত্র

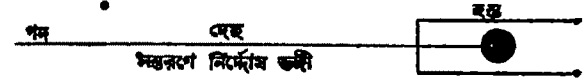
হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের বরাবর মিল রাখিয়া শরীরকে যত দূর সম্ভব (চিত্র ১ খ, গ, ঘ) ভঙ্গীতে জলের উপর ভাসাইয়া, মধ্যে মধ্যে মাথা ডুবাইয়া (বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সঁতার দিতে চেষ্টা করিবেন। এই মিলযুক্ত পাড়ির দ্বারা যে-কোন আধুনিক উন্নত দ্রুত পাড়ি ইচ্ছা করিলে সহজেই বসাইতে পারা যায়। শিক্ষার্থীর যদি ঐ মিলযুক্ত পাড়িতে জলে সঁতার দিতে অসুবিধা হয়, অর্থাৎ ১ নং চিত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক মিল না আসে, তাহা হইলে জলের উপর এককক্ষনিক সন্ধি বেষ্টিতে গদি সংলগ্ন করিয়া ১ নং চিত্র অনুযায়ী অভ্যাস করিবেন। দোষহীন পাড়ি বা ভঙ্গীতে (৩ নং চিত্র)

প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও বড় সঁতারক হওয়া যায় না। অধিক অভ্যাসের ফলে ঐরূপ দোষযুক্ত ভঙ্গীতে ছোট ছোট



৩ নং চিত্র

প্রতিযোগিতায় কোন কোন ক্ষেত্রে জয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সঁতারের দম বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; এবং অধিক দূর পথও স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায় না।



৪ নং চিত্র

শরীরের স্থূল ভঙ্গী ৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। সন্তরণ কালে সর্বদাই ঐরূপ নির্দোষ দেহভঙ্গী অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

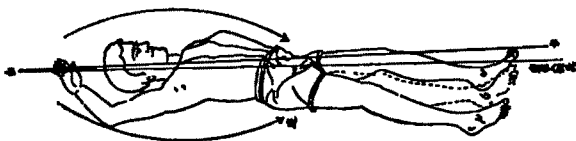
ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অধিকক্ষণ জলে থাকিতে বা অধিক দূর পথ সঁতার কাটিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে শ্বাস-যন্ত্র দুর্বল ও স্বাভাবিক দেহবৃত্তি ক্রমে হ্রাস হইবাব সম্ভাবনা আছে।

সরল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা—সকলেরই জানা আছে, যাহাকে সঁতার-কাটা শিক্ষা করিতে হয়, অথচ গুরু মহিষ কুকুর প্রভৃতি জন্তু জন্মিয়াই অনায়াসে জলে ভাসিতে ও চলিতে পারে। এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ আমাদের জানা আবশ্যক। মোটামুটিভাবে বলা চলে,—জগতের বাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়;

(১) কাঠ, সোলা প্রভৃতি জিনিষ, সমান আয়তনের জল অপেক্ষা লঘু ও সেই কাবণে জলে ভাসে ; (২) লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি পদার্থ সমান আয়তনের জল অপেক্ষা ভারী, সেই কারণে জলে ডুবিয়া যায়। কিন্তু যদি লোহাকে বা ঐরূপ কোন ভারী পদার্থকে পিটিয়া, চেপ্টা করিয়া বাঁকাইয়া নৌকার খোল নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাব আয়তন জোর করিয়া বাড়ানিয়া দেওয়া হইল, এবং তখন তাহা স্বচ্ছন্দে সোলা বা কাঠের মত জলে ভাসিতে থাকে। সেই জন্তই লোহা বা জাহাজ নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে। ভাসমান পদার্থের এই সাধারণ নিয়ম মাহুকের শরীর সম্বন্ধেও খাটে।

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন, মাহুকের শরীর জল অপেক্ষা লঘু ; অত্যন্ত জীবজন্তুর শরীরও তাই, এবং সেই জন্য তাহারা উভয়ে স্বভাবতই জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মাহুকের বেলায় বিপদ হইয়াছে তাহাব মাথাটি লইয়া দেহের মধ্যে তাহার মাথার দিকটা জল অপেক্ষা আয়তনেব অল্পপাতে কিঞ্চিৎ ভারী ; সুতরাং মাহুকের শরীরকে জলে ছাড়িয়া দিলে মাথা এবং পা ঝুলিয়া নীচেব দিকে চলিয়া যাইবে ; বুক ও পেটের কিয়দংশ জাগিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহাতে ত মাহুকের বাঁচিতে পারে না, দম বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে। সেই জন্য কি করিয়া মাথা জাগাইয়া রাখিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে পাওয়া যায়, তাহা মাহুকে শিক্ষা করিতে হয়। জীব-জন্তুর স্থবিধা এই, তাহাদের মাথার দিকটা মাহুকের মত ভারী নহে। তাহাদিগকে জলে ছাড়িয়া দিলে মাথা জলের উপর স্বভাবতই জাগিয়া থাকে। সেই জন্য তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে কোনও অসুবিধা হয় না।

চিৎ-সাঁতার—আধুনিক উন্নত প্রণালীর চিৎ-সাঁতার শিক্ষা করিতে হইলে সাঁতার প্রথমতঃ দেহটিকে ১ নং চিত্র অস্থায়ী জলপৃষ্ঠে ঋজুভাবে ভাসাইয়া রাখিবেন। তার পর



চিৎ-সাঁতার ১নং চিত্র

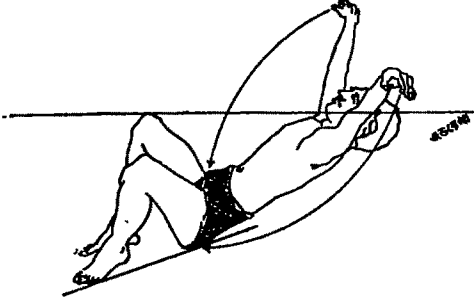
যে ভাবে ছয়পদী, আমেরিকান কিংবা অষ্ট্রেলিয়ান ছুন্ পাড়ির ভঙ্গীতে সাঁতার কাটা হয়, অবিকল সেই ভাবে চিৎ হইয়া একটির পর একটি হাত মাথার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া তালুদ্বারা উল্লম্বের শেষ পর্যন্ত জল টানিবেন। এই সময় যে-হস্তে জল টানা হইতেছে সেই হস্তের কনুইটি শক্ত রাখিবেন, বাহাতে জল টানিবার সময় হাতে জোর পাওয়া যায়। পা-ছুটি ছয়-পদী ছুন্ পাড়ির অল্পকরণে—এখানে ছয়-পদী ছুন্-পাড়ির চিত্র দেওয়া হইয়াছে,—দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদের মিল রাখিয়া, (চিত্র ১, ক—ক) দক্ষিণ পদের একটি জোর ও দুইটি অপেক্ষাকৃত মুহু আঘাত দিয়া (দক্ষিণ, বাম, দক্ষিণ অর্থাৎ ২, ১, ৩) অথবা বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া, সাঁতারের স্থবিধা অস্থায়ী বাম পদের একটি জোর ও দুইটি অপেক্ষাকৃত মুহু আঘাত দিয়া (বাম, দক্ষিণ, বাম অর্থাৎ ১: ২, ৩) মোট দুই পায়ের চমুটি আঘাতের সহিত দুই হাত পরিবর্তিত ভাবে মাথার উপর দিয়া (চিত্র ১ ক—খ) উল্লম্বের শেষ পর্যন্ত জল টানিবেন।

এই চিৎ-সাঁতার ভিন্ন ভঙ্গীতেও কাটা সম্ভব। ১ নং চিত্র অস্থায়ী দেহটিকে পূর্ববৎ জলপৃষ্ঠে ভাসাইয়া অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ান ছুন্-পাড়ির জায় দক্ষিণ হস্তের সহিত বাম পদ এবং বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ পদের মিল রাখিয়া, অথবা আমেরিকান ছুন্-পাড়ির জায় অবিরাম পদদ্বয় উপর নীচে করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে হাত দুটি মাথার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া সাঁতার কাটিতে পারা যায়। সর্বদাই স্থবল রাখিবেন, যেন সম্ভরণ-কালে বুক ও চিবুকের কিয়দংশ জলপৃষ্ঠের উপরে এবং মস্তকের অর্দ্ধভাগ জলপৃষ্ঠের নিম্নে অবস্থান করে। মোটামুটি ভাবে শরীরকে যত দূর স্থাঙ্ক কর সম্ভব তত দূর করিবেন। এই চিৎ-সাঁতারের নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-প্রণালী অবিকল ছুন্-পাড়ির জায়, অর্থাৎ সাঁতার নৈজ স্থবিধা অস্থায়ী এক হস্তের সহিত প্রশ্বাস গ্রহণ ও অপর হস্তের সহিত নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন। এই ধরণের চিৎ-সাঁতার অতি আধুনিক ও প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিশেষ কল্যাণকর।

পুরাতন প্রণালী—এই ধরণের চিৎ-সাঁতার কাটিতে হইলে সাঁতার প্রথমতঃ দেহটিকে ২ নং চিত্র অস্থায়ী ঋজুভাবে জলের উপর ভাসাইয়া, পরে ৩ নং চিত্র অস্থায়ী



চিৎ-সাঁতার ২ নং চিত্র



চিৎ-সাঁতার ৩ নং চিত্র



চিৎ-সাঁতার ৪ নং চিত্র

জাহ্নবয় সঙ্কুচিত করিয়া দুই হস্ত যুগপৎ মাথার উপর দিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া পদদ্বয়ের জোড় নিক্ষেপের সহিত উল্লম্বদেশের শেষ পর্যন্ত জল টানিয়া ৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায় আসিবেন। ৩ নং চিত্রের অবস্থায় আসিলেই প্রাশাস লইবেন ও ৪ নং চিত্রের অবস্থায় নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন।

প্রতিযোগিতার সময় সাঁতারগণ জলের মধ্যে মঞ্চের দিকে মুখ রাখিয়া উভয় হস্ত ও পদ দ্বারা মঞ্চ স্পর্শ করিয়া অবস্থান করিবেন; পরে যাত্রা-জ্ঞাপকের ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ধাক্কা দিয়া পূর্বলিখিত নিয়মে নিজ নিজ স্থবিধা ও শক্তি অনুযায়ী সাঁতার শুরু করিবেন। স্মরণ রাখিবেন, প্রতি ক্ষেপ ঘুরণের সময় অথবা শেষ ক্ষেপে যদি প্রতিযোগী মঞ্চ স্পর্শ করিবার পূর্বেই উণ্ড হইয়া পড়েন, তবে নিয়মানুযায়ী তাঁহার সাঁতার নাকচ হওয়া সম্ভব।

নিমঙ্কমান ব্যক্তির জীবনরক্ষার্থে চিৎ-সাঁতার বিশেষ উপকারী, সুতরাং প্রত্যেক সাঁতার ইহার কলাকৌশলগুলি অভ্যাস করিবেন।

যবনিকার অন্তরালে

শ্রীপাকল দেবী

নীলিমার অনেক দিনের সাধ সে একবার সখের থিয়েটার করে। তাহার স্কুল-কলেজের সাথী ও অগ্রান্ত আলাপী পরিচিতের দল অনেকেই এ কার্যে একাধিক বার ব্রতী হইয়াছে, কিন্তু তাহার ভাগ্যে এখনও একবারও সে সুযোগ আসে নাই; ইহা নীলিমার মনের একটি গোপন ক্ষোভ। কিন্তু এত দিনে সুযোগ মিলিল। বিহাঃ ভূমিকম্পে সাহায্যের জন্য তাঁহার খাতাতে সহি করিতে করিতে সকলে যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময়ে স্থানীয় বঙ্গ-মহিলা-ক্লাবে একদিন কথানি উঠিল।

রমলা মিত্র, এম-এ. তথাকথিত-ক্লাবের সেক্রেটারী ও

ভাণ্ডারী একাধারে ছই-ই। কথাটা তিনিই তুলিলেন। “সত্যি, আর পারা যায় না। ক্লাবের খাতাতেও আমরা দেব, মহিলা-সমিতিতেও আমরা দেব, আবার নূতন রিলিফ-ফাণ্ডও সেই আমাদেরই নিয়ে—ক’দিক আর সামলাই বলুন? মিসেস্ চ্যাটার্জী, একটা কিছু করুন না—চারিটি শো দাঁড় করান একটা। টাকা উঠতেও দৌঁর হবে না, আমরাও ক্রমাগত চাঁদ দেওয়া থেকে একটু রেহাই পাব। আর সত্যি একটা আমোদ-আহ্লাদের জন্তে টাকা দিতে লোকেরও তত গায়ে লাগে না—নেহাৎ শুকনো চাঁদা দিতে দিতে লোকে থেকে গেল যে। আমার ত আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে যে, লোকের বাড়ী দেখা করতে যেতে ভয় করে—আমার চেহারা দেখলেই ভাববে বুঝি চাঁদা

নিতে এসেছি। দোষই বা দিই কি করে বলুন? গত ছ-মাসে চার বার চাঁদা তুলতে বেরিয়েছি। একটা শো-টো কিছু না করাতে পারলে শুধু চাঁদা তোলা আমাদের দিয়ে ত বাপু আর হবে না সত্যি।”

মিসেস চ্যাটার্জী বলিলেন, “ভাল লোককে বলেছেন আপনি! আমি ত গাল-গাইড আর স্কুলের সেই কিজিক্যাল কালচারের নতুন হাঙ্গামটা নিয়ে মরবার ফুরসৎ পাই নে; তাব উপর আবার মহাপ্রভুদের মিটিং নিতি লেগে আছে। গিয়ে কাজ কিছু করি না-করি সময়মত হাজিরা ত ঠিক দিতে হয় আমাদের কিনা। ও সব নিয়ে থিয়েটার দেখতে যাবার সময় পাই কিনা দেখুন, তা আবার থিয়েটার করা। ‘ঐ ত লতিকা, মাদুরী, কল্যাণী সবাই রয়েছে, বলুন না ওদের।’”

কল্যাণী ধর মিহি স্বরে বলিলেন, “মিসেস চ্যাটার্জীর যেমন কথা! আমাদের নিলেই আপনাদের থিয়েটার জমবে ভাল। এমনিতেই ত বড়-একটা কথা-টো আসে না আমার মুখে—গলাও ওঠে না কোনও কালে—তার উপর আবার লোকজনের সামনে হাঁলে ত আর কথাই নেই। আর তাছাড়া আপনারা সব এম-এ, বি-এ,—আপনারা সবই পারেন, আমার মত মুখ্য মানুষকে নিয়ে কি করবেন?”

রমলা মিত্র জোর গলায় বলিলেন, “এম-এ, বি-এর সঙ্গে থিয়েটার করার কি যোগ? তোমাকে ত আর কেমিস্ট্রির ফরমুলা আওড়াতে ডাকা হচ্ছে না। ও রকম বাজে ওজরে পাশ কাটালে ত চলবে না—মাদুরী এদিকে এস, তোমাকেও করতে হবে কিছু।”

মাদুরী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পান-খাওয়া রাজা ঠোঁট, আঁচলে চাবির গোছা বাঁধা, সাদা দেশী-শাড়ী পরনে মেয়েটি হাসিতে খুশীতে যেন উপছাইয়া পড়িতেছে। “রমলা-দি, আমাদের ভাই একটা হাসির পার্ট দেবেন কিন্তু—আমার ষ্টেজে উঠে দাঁড়ালেই সামনে কাল কাল মুণ্ডুর সারি দেখলেই হাসি পাবে, তা আমি ব’লে দিলাম। কথাবার্তা কহিতে হয় না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসলেই চলে, এমন কোনও পার্ট হয় না? আমার যে ভাই কথা-টো একটুও মনে থাকে না, সেই ত মুন্সি কি না আর একটা। দিনের মধ্যে সাতবার ছেলের নাম তুলি, আর কি বলব বলুন

এর উপর? চাবি যে কোথায় ফেলছি কিছুই মনে থাকে না, শান্তড়ী এক কাজ কবতে বললে, আব এক কাজ করে রেখে দিই, এমন জালা। সেদিন কি করেছি জানেন না ত? মাগো, সে যা কাণ্ড!”

বলিতে বলিতে সেদিনকার কাণ্ড স্মরণ কবিয়া মাদুরীর হাসি একেবারে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। হাসিটা সংক্রামক; মাদুরীর হাসি দেখিয়া কল্যাণীরও হাসি পাইল এবং এত হাসির কারণটা জানিবার লোভ সঞ্চার করিতে পাবিল না। জিজ্ঞাসা করিল, “কি কাণ্ড করেছিলে ভাই? আব কান্নার স্বামীকে নিজের স্বামী ব’লে তুল কব নি ত?”

মাদুরী সেদিনের কাণ্ড বলিতে তখনই প্রস্তুত; কিন্তু রমলা মিত্র, এম-এ, কাজের লোক; বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে তিনি ভালবাসেন না—তিনি বাধা দিলেন। “ও-সব রাখ এখন। আগে কাজের কথাটা সেরে নিতে হবে। লতিকা, তোমাকেও নামতে হবে, কোনও ওজর-আপত্তি চলবে না। প্রীতি, শোন এদিকে।”

প্রীতি মজুমদার একটি সমবয়সী সখীর সহিত গল্প করিতেছিল, উঠিয়া আসিল।

“প্রীতি, মাদুরী, কল্যাণী, লতিকা আর আমি এই ত মোটে পাঁচ জন। পাঁচ জনে মিলে ত আর একটা শো দাঁড় করান যায় না। অবিশ্তি আরও মোস্ত পাওয়া যাবে—অসীমা আছে, সুধীরও হয়ত যোগ দিতে পারে; আরও ভেবে দেখতে হবে কে আছে না-আছে। তবে সকলকে দিয়েও ত আবার ঐ কাজ হবে না—উপরন্তু ত হওয়া চাই। একটু বেছে-টেছে নেওয়া দরকার।—মিসেস চ্যাটার্জী, রাখুন আপনার স্কুল আর মীটিং। ওসব কাজের জিনিষ তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু এটা যে আরও বড় একটা কাজ সেটাও মনে রাখবেন। উপস্থিত প্রয়োজনের দাবী আগে মেটাতে হবে ত। আর সবাই হেল্প না বরলে একা আমি কি করে কি করব? বেশী ভারটা ত আমার উপরেই পড়বে তা জানি, কিন্তু আপনারা সব হোগ না দিলে ত হয় না। আপনাকে নামতেই হবে।”

মিসেস চ্যাটার্জী বলিলেন, “নেহাং লোক না পান তখন নামতেই হবে, আর উপায় কি বলুন? কিন্তু আমাব বাড়ীর কাজ, বাইরের কাজ সবই এত বেশী যে, আমাদের বাদ

দিলেই ভাল হয়। তবে কাজের লোকের উপরেই ভাবার কাজের ভারও বেশী বেশী পড়ে কি না, তাই বুঝি সেই শেষ অবধি ঘাড়ে নিতেই হবে।”

কল্যাণী ও লতিকা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিল—হাসিটা অর্থপূর্ণ। রমলা মিত্রের চোখে সে হাসি এতাইল না, কিন্তু তিনি যেন লক্ষ্য করেন নাই এমন ভাবে বলিলেন, “কল্যাণী যাও ত, লাইব্রেরী-ঘর থেকে খানকয়েক ভাল ভাল বই বেছে আন ত—দেখি প্লে করার মত কিছু পাওয়া যায় কি না। বই বাছাই যে এক বিষয় হাজার। ভারই উপর প্লে সাবসেস নির্ভর করে কিনা অনেক।”

মাধুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, “কল্যাণী-দি, বহুদূর আমি যাচ্ছি। আমি লম্বা আছি, সব উঁচু উঁচু তাকগুলো হাতে নাগাল পাব। বাব্বা, এখনও যেন বছরে বছরে লম্বায় বেড়ে চলেছি মনে হয়—আমার স্বামীকে মাথায় ছাড়িয়ে যাব এবার বোধ হয়। আমার দেওর আমাকে কি বলে ডাকে জানেন? লম্বোদি বলে। লম্বা বৌদিব সন্ধি।”

হাসিতে হাসিতে মাধুবী বই আনিতে চলিয়া গেল।

বাহিরে একটা মোটর আসিয়া থামিল, শব্দ শুনিয়া বোঝা গেল। রমলা মিত্র বলিলেন, “দেখি কেউ এল এখন বোধ হয়। সাত আট জনের বেশী ত আজ ক্লাবে লোকই আসে নি, কাকে নিয়ে ঠিক করি।”

একটি মহিলা খুঁটখুঁট করিয়া জুতার শব্দ করিয়া বাগাণ্ডা অভিক্রম করিয়া ময়দানে নামিয়া আসিলেন। “মিসেস মল্লিক বে! আসুন, আসুন, আসুন। আপনি নেই, কাজেই আমাদের এতক্ষণ কিছু ঠিকই হচ্ছে না। আসুন দেখি—কাজটা আরম্ভ ক’রে দেওয়া যাক।”

নবাগতা মহিলাটির নাম নীহারিকা মল্লিক। তিনি স্থানীয় কোনও খ্যাতিমান ব্যারিষ্টারের স্ত্রী—ফ্যাশানে অগ্রগণ্য বলিয়া মহিলা-সমাজে তাঁহার কিছু প্রতিপত্তি আছে। সবুজ জরিপাড় ফিকা-বেগুনী রঙের জর্জেট শাড়ী, সবুজ সাটিনের জামা, পায়ে সবুজ রঙের জুতা, কপালের টিপটি পর্যন্ত সবুজ—বোধ হয় ফরমাস দিয়া করাইয়াছেন। হাতে একগোছা সবুজ ও ফিকা-বেগুনী বড়ের কাচের চুড়ি—সোনার বালাই নাই।

রমলা মিত্রের আহ্বানে নীহারিকা হাসিয়া বলিলেন, “ব্যাপার কি আপনাদের? কাজ-টাজ আবার কিসের? আর কাজ যদি কিছু পড়েই থাকে ত এই ত আপনার সামনেই কাজের লোক বসে। কেমন, ঠিক বলি নি মিসেস চ্যাটার্জী?”

মিসেস চ্যাটার্জী নিজের চেয়ারটা একটু দূরে সরাইয়া লইয়া যেন নবাগতার জন্ত জায়গা ছাড়িয়া দিলেন—যদিও আবশ্যক ছিল না। কেননা, কথাবার্তা হইতেছিল ক্লাবের ময়দানে—স্থান প্রচুর। নীহারিকার কথা কানে না তুলিয়া রমলা মিত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া মিসেস চ্যাটার্জী বলিলেন, “এই ত আপনার থিয়েটার কববার লোক এসে গেছে, আব ভাবনা কি? ও’বার কাজ তারেই সাজে, অস্ত্রের লাঠি বাজে, জানেন ত? ওসব এঁদেরই উপযুক্ত কাজ। সময়েরও অভাব নেই, বৎস সময় কাটাবার কাজেরই অভাব। আর তাছাড়া সাজগোজ, ভাবভঙ্গী জানা চাই, অর্গটিক হওয়া চাই; আমরা হলাম কাঠখোঁটা লোক, কোনও রকমে দরকারী কাজগুলো সারবারই সময় পাই না—তা আবার থিয়েটার! উনি ত মাঝে মাঝে বলেন, তোমার কি সখ ক’বে কখনও ভাল কাপড়ও একটা পরতে ইচ্ছে কবে না? তা আমি এদিকে নিজের জ্বলের টেলাই সামলাই, না কাপড়-চোপড় পরি, বলুন ত?”

রমলা মিত্রের সে সমস্তা সমাধান করিবার কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। মিসেস চ্যাটার্জীর প্রস্তাব উত্তর না দিয়া তিনি নীহারিকার প্রতি কিবিয়া বলিলেন, “দেখুন দেখি মিসেস মল্লিক, ভাবছি একটা চ্যারিটি শো করাই এই বিহারের সাহায্যের জন্তে, তা শো করাই কাকে দিয়ে? কেউ ত করতেই চায় না। মাধুবী বলে ওব হাসি পায়, কল্যাণীর গলা ওঠে না, মিসেস চ্যাটার্জীর ত জ্বল নিয়ে তিলাঙ্ক সময় নেই, মাধুবী ত ছেলের অস্থ জ্ঞানই আছে, সে ত আজ কতদিন হ’ল ক্লাবেই আসে না—ই্যা নীলিমা, তোমার কি? তোমার ত ছেলেপিলেও নেই, জ্বলও নেই, গলাও ওঠে বলে জানি—এদিকে এস দেখি ত।”

নীলিমা এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। তাহাকে রমলা মিত্র ডাকেন নাই বলিয়া সে আভ্যমানে দূরেই সরিয়া বসিয়াছিল, যেন এ সকল কথা কানেই যায় নাই। সন্ধ্যার মান



বৃদ্ধা
শ্রীমতীযী দে

আকাশে দলে দলে পাখীরা ঘরে ফিরিতেছে, তাহাই চাহিয়া চাহিয়া সে দেখিতেছিল, এখন চমক ভাঙিয়া এদিকে চাহিল। রমলা মিত্র আবার বলিলেন, “তুমি যে বড় চুপচাপ ঘরে সবে আছ? সবাই এমন পাশ কাটালে ত চলবে না—এদিকে এস। কিছু পার্ট কবতে পারবে ত? আর পারা-পারিই বা কি—করতেই হবে, যে যেমন পারে।”

নীলিমা স্নান মুখে নিরুপসাহে জবার দিল, “আমি ত কখনও কিছু থিয়েটার-কিয়েটার করি নি; হয়ত আপনাদের সব খারাপ করে দেব। তার চেয়ে আমাকে বাদই দিন না।”

রমলা মিত্র বলিলেন, “তোমাকে বাদ যেন দিলাম, কিন্তু তার বদলে নেব কারকে বল? জানি ত এখানকার কাণ্ড। সেবার সেই ‘লক্ষ্মীর পরীক্ষা’ করাতে গিয়ে সে কি হাজাম—মেয়েই জোটে না।”

নীহারিকা বলিলেন, “হ্যাঁ কে কত ভাল পারে কে মন্দ পারে, বিচার করে কি আর নেওয়া চলে? যা জোটে তাই নিতে হবে। কলকাতা হ’ত ত সে আলাদা কথা।”

মাধুরী পাঁচ-সাতখানা বই হাতে করিয়া বারান্দায় আসিয়া ডাকিল, “আহ্ন রমলাদি’র! সবাই—বাইরে অঙ্ককার হয়ে গেছে, দেখা যাবে না—ঘরে আহ্ন, বই বাছবেন।” সকলে বই বাছিতে ঘরে আসিবার জন্ত উঠিয়া পড়াইতেই নীলিমা মুখখানি স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়া কল্যাণীকে বলিল, “না ভাই আমরা ত আর কলকাতার প্রোফেশনাল স্ট্রাট্টার নই—যা পারি তাই করব। তা যদি সব মনে না ধরে ত আমাদের নেবারই বা দরকার কি? নীহারদি নিজেই বা কি এমন স্ট্রাট্টা করেন দেখেছি ত সেবার। কেবল কণে কণে লাল, নীল, গোলাপী কাপড় বদলে সেজে সেজেই অস্থির। তা লোকের ঠঁট সাজ দেখে দেখে চম্চু ঘুরে গেছে—তা দেখবার জন্তে আর কেউ খরচ করে টিকিট কিনে আসবে না।”

কল্যাণী বলিল, “সত্যি। সবুজের ঘটা দেখে না আজ একবার! বাক্স, এতও পারে।”

সকলে ঘরে আসিতে মাধুরীর আনীত বই কয়খানি লইয়া তুমুল সমালোচনা চলিল। অমৃত বোসের লেখা অভিনীত হইবে কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের অথবা রবীন্দ্রনাথের

—প্রথমে ইহা সাব্যস্ত হইতেই বাধ ঘটা। কাটিয়া গেল। তাহার পর সর্বসম্মতিক্রমে যখন ভাগ্যবান রবীন্দ্রনাথই নির্বাচিত হইলেন তখন গোল বাধিল বই লইয়া। কেহ বলিলেন, ‘রাজা ও রাণী’ হটক, কেহ বলিলেন, ‘গোড়ায় গলদ’ই ভাল, কাহারও মতে ‘বিরজুমার সভা’ই সকলের শ্রেষ্ঠ।

নীহারিকা বলিলেন, “মত মতামত শুনে গেলে আজ আর কোনও কিছু ঠিক করা হইবে না; কেবল গুণগোলই হবে। আমি বলি ‘রাজা ও রাণী’ হোক—আর মতভেদে কাজ নেই। চমৎকার বই। আহা, ভাই-বোনের যা স্থলব সীন, চোখে জল আসে। ‘ইথানা বোধ হয় পঞ্চাশ বার পড়েছি, তবু যেন পুরনো হয় ন’। আর ভাই গোলমাল করে কাজ নেই—এটেই হোক—আপনি কি বলেন মিসেস মিত্র?”

রমলা মিত্রের মনেব কথা কি তাহা ঠিক জানা গেল না। মুখে বলিলেন “বেশ তাই হোক, যদি আপনাদের সকলের মত হয়। মিসেস চ্যাটার্জী কি বলেন? আপনার মত নেওয়াটা দরকার।”

মিসেস চ্যাটার্জী বলিলেন, “আমার ত ওরকম নীরবস্থ ধরণের বই ভাল লাগে না—না না বইটা চমৎকার, তা বলছি নে—তবে প্লে করবার পক্ষে বলছি আর কি। সারাদিনই ত জীবনের নীরবস্থ দিকটাই দেখছি, আবার আমোদ করে থিয়েটার দেখব তাও যদি সেই একই ঘ্যানঘ্যানানী শুনতে হয় তাহলে ত বড় বিপদ। কিন্তু আমার মতামতে কি হবে? আপনারাই করবেন—ওসব আপনারাই বোঝেন ভাল; যা ভাল বোঝেন করুন। আমি ত পার্ট নেব কি না তাই এখনও ঠিক করি নি।”

নীহারিকা ঝাঁহাতের কব্জী উটাইয়া ঘড়ি দেখিলেন। “একি, এ যে আটটা বাজে। আটটা পনেরয় আমার বাড়ীতে ডিনার যে! দেরি করে কেললাম হয়ত। কি মুন্সিল—কথা কইতে কইতে কোথা দিয়ে সময় যায় যে। আমি চললাম; অনেকটা পথ যেতে হবে মিসেস মিত্র, মিসেস চ্যাটার্জী, নমস্কার। যা ঠিক হয় জানাবেন। আর একটা মীটিং ডাকুন না, শুধু এইটে সেটল করবার জন্তে—নঃ হলে কি হয়? কোথায় মীটিং হবে? এই ক্লাবের ঘরে? কেন

তার দরকার কি, আমার বাড়ী ত সেটাল জায়গায়, কান্নরই আসতে অসুবিধা নেই, আমার বাড়ীতেই হোক না। কালই হোক—সন্ধ্যা ৬টায় ধরুন। ... ও কাল ত হবে না, ভুলে যাচ্ছিলাম। কাল যে একটা পার্টি রয়েছে—সে আমাকে যেতেই হবে। আচ্ছা পরশুই হোক না হয়—কি বলেন?”

রমলা মিত্র বলিলেন, “পরশু আমি বুক্‌ডু—আমি ত পরশু সন্ধ্যাবেলা যেতে পারব না। তা হ’লে না হয় বুধবারে করুন।”

মিসেস্ চ্যাটার্জী বলিলেন, “বুধবার দিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে স্কুলের মেয়েদের ল্যাটার্শ লেকচার দিতে হবে—আমি ত যেতে পারব না। তা হোক আমাকে বাদ দিয়েই আপনারা করুন না—আমাকে জড়ালে আপনারাই মুশ্কিলে পড়বেন।”

নীহারিকা বারাণ্ডা হইতে নামিতে নামিতে বলিলেন, “তা হয় না, আপনাকে বাদ দেওয়া যায় না। কি মুশ্কিলেই পড়েছি—রোজই একটা-না-একটা বাধা। আমার ত আজ আর দাঁড়াবারও সময় নেই ছাই যে কিছু একটা ঠিক করি। হয়ত গেটেরা এসে ব’সে থাকবেন—বড় অপ্রস্তুত হ’তে হবে তাহলে। আপনারাই ঠিক করে নিন—আমাকে জানিয়ে দেবেন শুধু—আমি কোনও রকমে ম্যানেজ ক’রে নেব। গুড্‌নাইট্, গুড্‌নাইট্—নমস্কার। জানাবেন আমাকে—সময় ত নেই বেশী। এই ড্রাইভার—জলদি চলো।”

ড্রাইভার মোটরে ঠাট দিল। নীহারিকা চলিয়া যাইতে মাধুরী বলিল, “রমলাদি নীহারিককে ঘোড়ায় চড়িয়ে ষ্টেজে বার ক’বে দিন্ না ভাই। বাব্বা, কি ব্যস্তবাগীশ মানুষ।”

মিসেস্ চ্যাটার্জী বলিলেন, “সারাটা দিন শুয়ে ব’সে কাটিয়ে সন্ধ্যাবেলাই ওঁর বঁত কাজ কিনা। আর কাজের মধ্যে ত দেখতে পাই, হয় বাড়ীতে ডিনার, নয় বাইরে ডিনার—তা সে ত কিছু কিছু বাদ দিলেও চলে। আমাদের যে হয়েছে মুশ্কিল—সুখের কাজ ত নয় যে বাদ দেব। জুহু করলেও রেংই পাবার জো নেই—তা আর কিসে পাব বলুন? উনি তাই বলছিলেন—”

রমলা মিত্র কথাটা শেষ করিতে দিলেন না। বলিলেন, “আচ্ছা আমি একটা দিন ঠিক ক’রে বাড়ী বাড়ী নোটস লিখে পাঠাব—যাঁর যাঁর সুবিধা হবে আসবেন; যাঁর সুবিধা হবে না, তাঁকে বাদ দিয়েই অগত্যা সেদিনের কাজ চালাতে হবে। কি আর করা যায়! আপাততঃ আজ ত বাড়ী যাওয়া যাক—রাত হ’ল।”

নীলিমা বলিল, “মাধুরী আমাকে পৌছে দেবে ভাই! আমাকে উনি নামিয়ে দিয়ে কি কাজে গেছেন, কই এখনও এলেন না ত।”

মাধুরী উত্তর দিল, “এই যে হয়েছে। আবার ভুলেছি, গাড়ী কই আসতে বলি নি ত। পারি না আর বাবা! নূতন একটা ড্রাইভারও জুটেছে তেমনি! নামিয়ে দিয়ে গেল তা কই একবার জিজ্ঞাসাও করলে না ত কখন আবার আসবে। দেখি ভাই কার গাড়ী আবার পাওয়া যায়—একটা কান্নর জুটেই যাবে দেখ না। আমাদের একসঙ্গে যাবার কিছু মুশ্কিল হবে না—একদিকেই ত বাড়ী।”

মোটর জুটিয়া গেল। এ ইহার গাড়ীতে, ও উহার গাড়ীতে করিয়া সকলেই বাড়ী চলিয়া গেল।

২

কয়েক দিন পরে নীহারিকার বাড়ীতেই প্রথম রিহার্সাল সাড়ে পাঁচটা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—সাড়ে সাতটা বাজে, কিন্তু এখনও যে কিছু বিশেষ কার্য অগ্রসর হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। নীলিমাকে ‘রাজা ও রাণী’র ইলার পার্ট দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সকলের মত ছিল না—কিন্তু নীলিমা গান গাহিতে পারে এবং তাহার মুখখানি সর্বদাই অকারণে যেন ম্লান দেখায়, সেই কারণে ইলার পার্ট হয়ত উন্নত হইয়া যাইবে এই ভরসায় শেষ অবধি সকলে মত দিয়াছেন। “এরা পরকে আপন করে আপনারে পর” গানখানি নীলিমা স্বরলিপি দেখিয়া বাড়ী হইতে শিখিয়া আসিয়াছিল এবং এইমাত্র এখানে আসিয়া সকলকে গাহিয়া শুনাইয়াছে। সকলেই গান শুনিয়া তুষ্ট; কিন্তু ইলার অভিনয় সম্বন্ধে সকলেই এত বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছেন যে, নীলিমা তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে একবার জনান্তিকে

মাধুরীকে বলিল, “প্রথম দিনেই যদি একেবারে নিখুঁত ইলা সাজতে পারতুম তাহলে এতদিনে শিশিৰ ভাঙুড়ীর দলে নাম লেখাতুম গিয়ে। এঁরা সব করছেন দেখ না! ফেন যা করছি তাই তুল। নিজেরের যে সব কি এ্যাকটিভের ছিরী তা ত আর নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন না। কষ্ট করে গান-টান শিখে এলুম বটে, কিন্তু সত্যি ভাই আমার আর এখন করতে হচ্ছে করছে না।”

নীহারিকা রমলা মিত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “আচ্ছা ভাই, যেখানে ইলা সখীদের গান করতে থাকছে আর বলছে ‘সখি তোরা আয়, এরে বাঁধ ফুলপাশে কর গান’, সেখানটাতে ওরকম ঐ এক ধরণের সুর করলে চলবে কেন? মোটেই মানাচ্ছে না।” যেখানে বলছে—‘যেতে হবে? কেন যেতে হবে স্ববরাজ?’ সেখানটা ত ঠিক আছে, সে জায়গাটা তো নীলিমা মন্দ করছে না।”

রমলা মিত্র সরিয়া আসিয়া বলিলেন, “সব কথা এক সুরে বলে যায় এই ত নীলিমার দোষ। আমি ত সে-কথা সেই প্রথম থেকেই বলছি।”

নীলিমা মুখ অঙ্ককার করিয়া বলিল, “তা ভাই কি করব? যা পারি তাই ত করব। আপনাদের মত ভাল যদি আমি না-ই পারি।”

রমলা মিত্র বলিলেন, “না, না, আমাদের তোমাদের কথা নয়। সকলেরই অভিনয়ে দোষ আছে, সকলকেই শোধরাতে হবে। আমারই কি অভিনয় নিখুঁত হচ্ছে? মোটেই নয়। তবে চেষ্টা করতে হবে—ক্রমে ক্রমে হবে, এই আর কি! মিসেস্ চ্যাটার্জী, আপনারও কিন্তু দেবদত্তের পাটটি ঠিকমত হচ্ছে না এখনও। ওর সব কথা একটুখানি বিজ্ঞপের সুরে বলতে হবে কিনা। রাজার বয়স, তাতে রসিক লোক—বুঝেছেন ত? আপনার কিনা স্কুলে লেকচার দেওয় অভ্যাস, তাই একটু বক্তৃতার সুর সহজেই এসে পড়ে আর কি—তা সেটা বন্ধ করতে হবে। চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এই দেখুন এমনি করে—

“আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে।
এবাব দেখেছি সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও না ছাড়ে পঞ্চবাণ;
ছোট বড় কবে না বিচার।”

এই রকমটা হবে আর কি। ...কি বলেন মিসেস্ মল্লিক? কতকটা ঠিক হ’ল কি? আমারও ত এই প্রথম দিন, সব কি আর ঠিক হচ্ছে?”

মিসেস্ চ্যাটার্জী বলিলেন, “তা আপনিই নিশ্চয় বাপু দেবদত্তের পাট। আমার ওসব আসে-টাসে না, আমি ত বলেই দিয়েছি আপনাদের। আপনারাই টানাটানি করলেন বলে আমার আসা—আমি ত সাই নি এসব ফাসাদে জড়াতে। উনি বরং বলছিলেন, ‘তুমি ঠিক পারবে, করেওছ ত কত।’ তা সে যখন করেছে, তখন করেছে—এখন নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি, এ-সব কাজে কাজের সময় কোথা?”

রমলা মিত্র বলিলেন, “রাজা বিক্রমদেবের পাট” যে আমি না হ’লে করবার লোক নেই—না হ’লে আমার আর কি—আমাকে যে পাট দেবেন, আমি দু-দিনে তৈরি ক’বে নেব—যেমন ক’রে হোক। দেবদত্তের পাট একটা ভাল পাট, তাই আপনাকেই দিবেছিলাম। তবে আপনার যদি এত কাজে কাজের সময় না থাকে ত সে অন্যদা কথা—তাহলে আর কাউকে এখনই দেখতে হয়।”

নীহারিকা নিকটেই পাড়াইয়া ছিলেন—প্রমাদ গণিলেন। “ওমা, সে কি? সব ঠিকঠাক, এখন কি আর লোক বদল করা যায়? সব মাটি হবে তাহলে। না, না, আমার ত মনে হয় মিসেস্ চ্যাটার্জীকে দেবদত্তের পাটে খুব মানিয়েছে, ও দু-দিন রিহাসার্সাল দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর আমরা মেয়েরা সব করছি—এ্যামোচারের দল সব—একটু যদি খুঁটুই থেকে যায় তা আর কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? টাকা তোলবার জন্তেই করা—পরেব গরজে এতগুলি মেয়ে খেটেখুটে সময় দিয়ে জিনিষটা গুঁড়ে তুলছে, এই ত আমার কাছে খুব প্রশংসার বিষয় বলে মনে হয়। এ ত আর প্রোফেশনাল ম্যাক্টর নয় যে সকলে নিখুঁত ম্যাক্টর করবে কেউ আশা কবে।...এই প্রীতি, স্বাভিজিতের পাট ত সামান্যই, তুমি নাও ত, ঐ পাশের ঘরে গিয়ে নিজের এই পাট টুকু বেশ ক’বে মুখস্ত ক’রে আন, এখনই হয়ে যাবে।...মাধুরী, কুমারের পাটে হাসি-টাসি নেই মনে রেখো, খবরদার হোসো না ফেন। নিজের নিজের পাট ভাল ক’রে মুখস্ত কর সবাই আগে—নাহলে অত বই দেখে দেখে রিহাসার্সাল যেন মোটে জমছেই না। আমারই হয়েছে

মুন্সি, হুমিয়ার পাট বেমন শক্ত তেমনই লখা। কি যে করি।”

মাধুরী কুমার সাজিবে। কুমারের কথাবার্তাগুলি একটা কাগজে সে লিখিয়া লইয়াছে, সেইটা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল—বলিল, “আপনারা সব কতবার করেছেন, আর পারেনও ভাল—আপনাদের আবার মুন্সি কি নীহারদি? আমি যা ক্যাসাদে পড়েছি সে আমিই জানি, একে ত কুমারের মুখে হাসির নাম নেই কোনখানে—আর ভাই ঐ নীলিমাকে যেই বলতে যাচ্ছি ‘আমারে কি করেছিল অগ্নি কুহকিনি’ এমন হাসি পাচ্ছে যে কিছুতে রাখতে পারছি নে। আর নীলিমাটা কি বেঁটে রে বাবা—আমার পেট অবধি ওর মাথাটা আসে। সত্যি, আমাকে বাই-ই দিন নীহারদি—আমি সব আপনাদের খারাপ করে ফেলব।”

মাধুরী হাসিতে লাগিল, কিন্তু রমলা মিত্র ধমক দিলেন। “তোমাদের অবধি সব আর সাথতে গারি নে। সবার মুখে কেবল ঐ এক কথা ‘করব না আর পারব না’। আর আমার নিজের পাট মুখস্থ চুলোয় গেল, আমার এখন কাজ হয়েছে তোমাদের সকলকে সেখে বেড়ান। ও সব চলবে না—বার উপর যা ভার দেওয়া হয়েছে তার আর নড়চড় হবে না মনে রেখ। একবার যখন সব খনমেছ তখন কাজটা শেষ অবধি করে তখন ছাঁড়ান পাবে। নিজের নিজের পাট ভাল করে মুখস্থ করে পরন্ত আবার এইখানেই সবাই আসবে, বুঝেছ?...ওহো দেখেছ। আসল কথাই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। শঙ্করের পাট করবে কে? সেটা ত ঠিক হ’ল না।”

বৃদ্ধ শঙ্কর সাজিতে কেহই রাজী নহে। সকলকেই একবার করিয়া অমরোধ করা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই। শঙ্কর বৃদ্ধ, শঙ্কর ভৃত্য, শঙ্কর সাজিলে দাড়ি পরিতে হইবে ইত্যাদি কারণে শঙ্করের পাট কেহ করিতে চাহে না। নীলিমা একবার ভাবিয়াছিল যে করিবে কিনা—কিন্তু শঙ্করের ত গান নাই—নীলিমার গানটা তাহা হইলে মাঠে মারা যায়। তাই তাহাকে ও পাট দেওয়াতে কাহারও মত হইল না। আপাততঃ শঙ্কর-সমস্ত। সকলকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

নীহারিকা বলিলেন, “আচ্ছা ভাই, ছোটবৌদিকে শঙ্কর সাজালে কি হয়? একটু বয়েসও হয়েছে, আর ওকে যা বল ও তাইতেই রাজী, কোনও গোল নেই। সবাই মিলে একটু চেপে ধরলে ও ঠিক রাজী হয়ে যাবে। একটু মোটা বেশী—পুরুষমানুষ সাজলে হয়ত ঠিক মানাবে না, কিন্তু তা আর কি করা যায়। ও-ই ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও আমি গাড়ী পাঠাচ্ছি।...এই প্রীতি, যাও ত ভাই আমার গাড়ীতে, ছোটবৌদিকে ধরে আন ত। এই ত বাড়ী—যাবে আর আসবে, দেরি ক’রো না।

রমলা মিত্র উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিলেন, “সত্যি ঠিক মনে করেছেন। আপনার কিছু খুব উপস্থিতবুদ্ধি। আমি ত আজ কতবারই ভেবেছি যে ও পাটটা কাকে দেওয়া যায়—কিন্তু ছোটবৌদির নামটা ত কই মনে পড়ে নি। বাঃ বেশ বুদ্ধি দিয়েছেন আপনি। সাতটা মাথা নইলে কি আর এ-সব কাজ হয়। একটা মাথায় আর কত দিকে ভাবব বলুন?”

ছোটবৌদি অর্থাৎ শ্রীমতী সরোজিনী দেবী কোনও অজ্ঞাত কারণে সকলেরই ছোটবৌদি। নীহারিকারও ছোটবৌদি; নীহারিকার একাদশবর্ষীয়া কন্যা রমারও ছোটবৌদি এবং মিসেস চ্যাটার্জী, মিসেস মিত্র, প্রীতি, মাধুরীরও ছোটবৌদি।

প্রীতি কিছুক্ষণ পরে যখন এ হেন ছোটবৌদিকে লইয়া আসিয়া পৌছাইল, তখন রিহার্সাল পুরানমে চলিয়াছে। ছোটবৌদি ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ ভাই তোমরা সব ক্লেপলে নাকি? তোমরা সব কি থিয়েটার করছ শুনিছ, আমাকে নাকি তাতে কি সাজাবে? তা যদি কিছু সাজাও ত বরং না-হয় রূপীন্দর সাজাও—তোমাদের থিয়েটারে নাচব। তাছাড়া ত আর কিছু সাজলে আমাকে মানাবে না ভাই।”

রমলা মিত্র, মিসেস চ্যাটার্জী, নীহারিকা, মাধুরী সকলে রিহার্সাল ফেলিয়া মহাসমারোহে ছোটবৌদিকে অভ্যর্থনা করিলেন, “আহ্নন আহ্নন ছোটবৌদি—বাঁচালেন আপনি এসে। কই, দাঁও, দাঁও শঙ্করের পাট যে আলাদা করে লেখা আছে, এনে দাঁও শীগগির ছোটবৌদিকে। আপনি না হ’লে এ পাট আমাদের হচ্ছিলই না—মাটি হচ্ছিল সব।

ছোটবোদি বলিলেন, “তোমরা সব রূপসী, বিত্তবতী, কলাবতী—তোমরা করছ থিয়েটার—তার মধ্যে আমি বুড়োমাহুষ, আমাকে কেন ভাই?”

সম্বন্ধে সকলে বলিয়া উঠিলেন, “লক্ষ্মীটি ছোটবোদি, আপনি না করবেন না। আপনি বুড়োমাহুষ আর আমরা যুঁজি সব একেবারে ছেলেমাহুষ? না না ও সব বাঞ্ছা ওজর আপনার শোনা হবে না। কিছু শক্তও নয়। আপনি যেমন ভাবে কথা বলেন ঐ ভাবেই এই কাণ্ডে লেখা কথাগুলো ব’লে যাবেন—তাহলেই চমৎকার হবে। আপনাকে নিতেই হবে এ ভারটা—কিছুতেই ছাড়ব না আমরা।”

ছোটবোদি কীপস্থলে পুনর্বার কি একটা আশ্বস্তি করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু টিকিল না। শব্দ-সমস্তা ঘুটিল।

৩

আজ থিয়েটার। নীহারিকা মল্লিকের বাটীর ময়দানে শামিয়ানা খাটাইয়া টেক্স দাঁড় করান হইয়াছে। স্থানীয় সিনেমা হাউস একটি ভাড়া করিয়া সেইখানে অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ভাড়া বেশী চাহে বলিয়া সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হয় নাই। চ্যারিটি শো—যত অল্প খরচে করা যায়।

আলো, ফুল ও পাতার বাহার সব ঠিকই আছে—তাহাতে কিছু খরচ করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু কি আর করা যায়। দর্শকের দল ক্রমে ক্রমে আসিয়া টিকেটের নম্বর মিলাইয়া নিজ নিজ আসন অধিকার করিয়া বসিতেছে। ছোট মেয়েরা জনকয়েক টিকিট বিক্রী করিতেছে; কতকগুলি বালিকা এক-এক গোছা প্রোগ্রাম হাতে লইয়া অভ্যাগতদের বলিয়া বেড়াইতেছে, “প্রোগ্রাম কিনবেন না? কিনুন না। চার আনা করে কপি।” কেহ কেহ দর্শকদিগকে বসাইবার কার্যে নিযুক্ত। অভিনেত্রীগণের পিতা, ভ্রাতা, স্বামীবৃন্দ অনেকেই অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের মুখে স্পষ্ট উৎকর্ষা চিহ্ন। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই বসিবার স্থান প্রায় ভরিয়া আসিল। অধীর আগ্রহে দর্শকের দল উন্মুখ।

ভিতরেও উদ্বেগ উৎকর্ষা ও ব্যস্ততার সীমা নাই।

অভিনেত্রীর দল ছাড়াও, প্রস্পেক্টর, ডিরেক্টর, টেক্স-ম্যানেজার, বাধ্য-স্বামী ইত্যাদির জিড় গ্রীনরুমে পা ফেলিবার স্থান নাই। নীলিমা আখ বক্টার ভিতর তিনবার গোল-মরিচ সহযোগে চা পান করিয়াও গলা ঠিক করিতে পারিতেছে না। শব্দের দাড়ি এতক্ষণ সম্মুখেই রাখা ছিল, এখন ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে যে সে-দাড়ি কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে, কোনখানে তাহার সন্ধান মিলিতেছে না। রমলা মিত্র বকিতেছেন, “এই সখীর দলকে এর মধ্যে চুকিয়ে এই কাণ্ড। কতবার বলেছিলাম সখীরা সব নিজের নিজের বাড়ী থেকে এনেবারে সেজে তৈরি হয়ে আসবে—এখানে এত সাজাবার লোকই বা কোথা, আর জামগাই বা কই? নাজতে ত কেউই কম জান না, কিন্তু আজ দরকার কিনা, আজ আর কেউ নিজে সেজে আসতে পারলে না! এইটুকু ঘরে এই এত-গুলো লোকের রকমারি কাপড়—কোথায় যে চোখের পলকে কোন জিনিষ উড়ে যাচ্ছে জানি না। একটা জিনিষ হাতের কাছে পাবার জো নেই। সেক্টি-গিনের বাস্কাটা তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—তা কোথায় যে কে রেখেছে তার ঠিক নেই। এই প্রীতি, ও কি করছ? বোস না, বোস না ওখানে—আমার পাগড়ী রয়েছে যে, দেখতে পাচ্ছ না? হয়েছিল এখুনি। গিয়েছিল আমার পাগড়ী একেবারে চেপটে শেষ হয়ে।” ছোটবোদির দাড়ি গেছে, আমার পাগড়ীও যাবার দাখিল—ব্যবস্থা চমৎকার।

প্রীতি ভয় পাইয়া সরিয়া আসিল। মাদুবী গ্রীনরুমে এক কোণে দাঁড়াইয়া বই হাতে করিয়া অনর্গল কুমারের পট মুখস্থ বলিতেছিল। এখন সরিয়া আসিয়া প্রীতির হাতে বইখানা দিয়া বলিল, “লক্ষ্মীটি ভাই, দেখ না একটু, আমার ঠিক মুখস্থ হয়েছে কি না। যত সময় এগিয়ে আসছে, সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে আরও—বুক ধরাসু ধরাসু করছে। তখন ভেবেছিলাম হাসি পাবে, এখন মনে হচ্ছে কেঁদে না ফেলি। শোন না ভাই, ঠিকমত বলতে পারছি কিনা। তোর ত ধূম্রাজিতের পার্ট সামান্য, ভাবনা নেই।”

প্রীতি শুনিতে লাগিল ও মাঝে মাঝে জ্বল সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল।

নীহারিকা মল্লিক স্মৃতি সাজিতেছেন। তাঁহার সাত

প্রায় সম্পূর্ণ, কোনও ভাগই হয় নাই; কেবল রাশীজানোচিত মুকুট একখানি সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই, তাই মনে সামান্য ক্ষোভ। কিন্তু মুকুট থাক—এখন পেটা উঁরাইয়া গেলে বাঁচা যায়। শব্বরের দাড়ির অল্প আবার গাড়ী ছুটিয়াছে, ভগবানেব কৃপায় এখন আর একটি দাড়ি ফোকানে তৈয়ারী পাওয়া যায় তবে তে। না হইলে কি যে হইবে তাহা ভাবাও যায় না। ছোটবৌদির মুখখানা আবার এতই নারীমূলভ যে দাড়ি না পরাইলে পুরুষের পোষাকে তাঁহাকে অত্যন্ত অশোভন দেখাইবে। অত করিয়া সন্মাস দিয়া করান দাড়ি শুধু শুধু হারাইয়া গেল। কি মুন্ডলেই পড়া গিয়াছে।

সখীর দলের মধ্যে যে সর্কাপেক্ষা ভাল গারিবা, সে এখন অবধি অল্পপঙ্খিত। কথা আছে সেই মেয়েটি পুরা গানটা গাহিবে; সখীর দলের মধ্যে অল্প তিনটি মেয়ে নামান্ন গাহিতে জানে, তাদেরও যোগ দিতে বলা হইয়াছে; বাকী দুই জন শুধু মুখ নাড়িলেই চলিবে। নীহারিকা চোখের স্বাধীন করিতে করিতে বলিলেন, “এদের কি সত্যি একটুও সময়ের জ্ঞান নেই? বার-বার ক’রে স্মরণমাকে বলেছিলুম যে, তোমার উপরেই সব সখীদের ভার, তুমি একটু আগে আগে এস—তা দেখেছ একবার কাণ্ড? সবাই এল সেই নেই। কতদিক আর একা সামলান যায়? মিসেস্ মিত্র, তখনই আমি আঁখনাকে বলেছিলাম যে আমাকে আর যাকুটিঙের মধ্যে রাখবেন না—এক জন শক্ত ম্যানেজার চাই—আমি সে কাজটার ভার নিলে আর এ রকম গুণ্ডগোলটি হ’ত না। ও মিসেস্ করকে ম্যানেজার করা না-করা সমান। ওদিকে চুপটি ক’রে কোথায় যে দাড়িয়ে আছেন জানি না; আমি ত এ এক ঘণ্টার ভিতর তাঁর চোরাই দেখি নি। এর নাম কি ম্যানেজিং? আমি হ’লে সব ডিউটিভাগ ক’রে ক’রে দ্বিগুণ বন্দোবস্ত ক’রে দিতাম। এখন আমি নিজেই সাজি, না অল্পকে দেখি।”

মিসেস্ মিত্রের নিকট হইতে কিছু সাড়া না পাইয়া নীহারিকা স্বপ্ন-পরা বন্ধ করিয়া একবার দেখিয়া লইলেন। রমলা মিত্র সেখানে নাই।

“কি হ’ল কি হ’ল, ব্যাপার কি? আরে বাপু, হ’ল কি তাই বল না ছাই—” ইত্যাদি শব্দে সকলে

উদ্বেগীত হইয়া সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন নীলিমা ওরফে ইলা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাদিতেছে। রমলা মিত্র সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, “বাপু রে বাপু—এত ‘টাচি’ হ’লে ত আর কোনও পাবলিক কাজে নামা চলে না। দশ জনের সামনে দেখাতে হবে, সকলেই সমালোচনা করবে, তার আগে নিজেদের দোষত্রুটি নিজেরা একটু শুধরে না নিলে কি ক’রে চলেবে? আর তাই বা কি বলেছি? যা কথায় কথায় অভিমান নীলিমার—আমি ত ভয়ে ভয়ে চুপ করেই থাকি। ভাবি যাক্ গে আমার কি? ভাল হলেও ওর, মন্দ হলেও ওর; বলতে গেলেই ত দোষের ভাগী কেবল।”

ব্যাপারটা ভাল বোঝা গেল না—কেহ বুঝিবার বিশেষ চেষ্টাও করিল না; সকলেই আপনাকে লইয়া উদ্বেগ—নীলিমা কাদিতেই লাগিল, মুখের রং খারাপ হইয়া গেল, চোখের কাজল গালে লাগিয়া গালের রং গোলাপীর পরিবর্তে কালো দেখাইতে লাগিল। নীহারিকা স্বপ্না কেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন। নীলিমার কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া আদর করিয়া বলিলেন, “ওমা, ওমা, কান্না কিসের? নীলিমা বয়সে ছেলেমানুষ ত কাজেও ছেলেমানুষ। কাদে না, কাদে না, লক্ষীটি ভাই, চুপ কর। তোমাদেরই উপর ভারসা ক’রে এ কাজে নামা—এখন একটু কটু কথা সয়ে হোক, যা ক’রে হোক কাজটা উদ্ধার ক’রে দাও ভাই। চুপ কর, চুপ কর।...প্রীতি রঙের বাসনটা আন ত ভাই—গেল সব মুখের রং ধুয়ে; আবার ঠিক ক’রে দিই। বেজেছে কটা—? আর কত সময় আছে? বাবা আমার ত মাথা কেমন করছে—ষ্টেজে উঠে না পড়ে যাই।”

প্রীতির হাত হইতে রঙের পাত্র লইয়া ছোখ মুছিয়া নীলিমা নিজেই মুখে রং মাখিতে লাগিল। কান্না-ভরা স্বরে বলিল, “আমি ত পারি না ভাল, সকলেই আপনারা জানেন নীহারদি। তা আমি ত আর সেধে সেধে থিয়েটার করতে আসি নি। আপনাদেরই লোক পাওয়া যাচ্ছিল না ব’লে জোর ক’রে আপনারা আমাকে নামালেন। দেখেছেন ত আমি বরাবরই চেষ্টা করছি ভাল ক’রে করতে—তা ক্ষমতা না থাকলে কি করব বলুন? রমলাদি এমন ক’রে কথা বলেন

যে, যেন আমার দোষেই তাঁদের সব প্লেট মাটি হয়ে যাবে। বার-বার এক কথা শুনলে কষ্ট হয় না? রমলাদির যদি তাই বিশ্বাস যে আমার জন্ত সব মাটি হয়ে যাবে—তাহলে আগেই আমাকে বাদ দিলে পারতেন—এ শেষ মুহূর্তে গোলমাল ক'বে আমাকে অপদস্ত করবার দরকার কি?”

নীহারিকা সাধ্যমত মিষ্ট কথায় নীলিমাকে স্বাসস্তব তুষ্ট করিয়া পায়ে আলতা পরিতে চলিয়া গেলেন। আর আধ ঘণ্টাও সময় নাই। বাহিরে লোক জমিতেছে, তাহার গুঞ্জনধ্বনি কানে আসিয়া বৃকের ভিতরটা স্তমাইয়া উঠিতেছে।

বাহির হইতে একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া শঙ্করের দাড়িটি নীহারিকার হাতে দিল, বলিল, “ড্রাইডার দিলে। আর জানেন নীহারদি, আপনারা আগে যা বিক্রী করেছেন, তা করেছেন,—তাছাড়া এখনই আমি নগদ ৭২ টাকার টিকিট বিক্রী করলাম। বাপ রে লোক যা হয়েছে—আর ত ধরে না।.....ও নাগো, ছোটবৌদিকে কি রকম দেখাচ্ছে। কিছু চেনা যাচ্ছে না। বা-দিকেব দাড়িটা আরও চেষ্টে দিন কিন্তু—গাল দেখা যাচ্ছে।”

মেয়েটি ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

মিসেস চ্যাটার্জী ওরফে দেবদত্তের শুভ্র উত্তরীয়ে গোলাপী রং থানিকটা উল্টাইয়া পড়িয়াছে। যেমন ভাবেই উত্তরীয় গায়ে দেওয়া হউক সে গোলাপী রং কিছুতেই ঢাকা পড়িতেছে না, এই লইয়া দেবদত্ত আকুল। লতিকা সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল।

নীহারিকা সর্বদা গহনাদি পরিয়া আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন, আলতা পরিতে পারিতেছেন না পাছে কোন কিছু সাজ স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে। ডাবলিন, “লতিকা একবারটি এসো না ভাই—পায়ে যেন হাতই পৌঁছেছে না। যেমন-তেমন ক'রে পায়ে থানিকটা আলতা না খেবড়ে দিলে—পা-টা যে বড্ড সাদা দেখাতে লাগল।”

দেবদত্ত উদ্ভাসচ্চিত্তে বলিলেন, “খামুন মিসেস মল্লিক। পায়ের দিকে অত কে দেখছে আপনার? আমার চাদর যে সকলের আগেই চোখে পড়বে। এই সখীর দলকে মিসেস মিত্র আর ঐ আপনাদের ষ্টেজ-ম্যানেজার কি ব'লে বে গ্রীন-

ক্রমে ঢোকালেন আমি তা ভেবে পাই নে। শঙ্করের দাড়ি গেল, আমার চাদরে রং উঠে দিলে, তাছাড়া কি অনর্থক টাচামেটি করছে যে আমার ত প্রাণ যেন খাবি খাচ্ছে। প্রথম নীনেই আমি, প্রথম ক'বাই আমার—আর আমার চাদরের এই অবস্থা। কি কৃষ্ণেই আপনারা থিয়েটারের হজুগ তুলেছিলেন—অপদস্থের একশেষ হ'তে হবে শেষ অবদি, এ আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। আমাব আর কি—আমি গোলাপী চাদর নিয়েই বেরোব।”

ইলা অর্থাৎ নীলিমার চোখে তখনও থাকিয়া থাকিয়া জল আসিতেছে—দূর হইতে দেখিবা রমলা মিত্র মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। পাগড়ীটা মাথায় ঠিক করিয়া বসাইতে বসাইতে নীহারিকাকে বলিলেন, “মিছিমিছি কি রকম সীন করলে নীলিমা দেখলেন ত? কিছুই বলি নি—শুধু বলেছি এখন অবধি বই হাতে ক'রে ব'সে আছি, তাহলেই তোমাকে দিয়ে ইলাব পার্ট হয়েছে। প্লেটো লেখছি তুমিই মাটি করবে। এইটুকু ত কথা—এতেই চোখে একেবারে বান ডাঙছে। ওকি শেষে ষ্টেজ দাড়িয়ে দাড়িয়ে কালবে নাকি? আমি ত বানা আর কিছু বলতে যাব না—আপনি বরং বলুন একটু গিয়ে।”

নীহারিকা আলতা পরিতেছিলেন, বলিলেন, “ওর ষ্টেজে বেরোতে দেবি আছে—ততক্ষণে ঠিক হয়ে যাবে। আপননি এখন আর ওসব কিছু দেখবেন না—সময় হবে গেল বোধ হয়। আপননি যান, আরস্ত করুন। সব ঠিক আছে ত? সীন তোলবার লোক দু-দিকে দু-জন ঠিক আছে ত? দেখুন, কিছু যেন ভুল না হয়ে যান।”

রমলা মিত্র বলিলেন, “কত দিক আব দেখব? মিসেস করের ত দেখা পাবার জো নেই। ওঁর ষ্টেজ ম্যানেজ কববার কথা—তা দেখলাম এখন বাইরে দাড়িয়ে দাড়িয়ে পান খাচ্ছেন! এ রকম লোককে কখনও কাজের ভার দিতে আছে? আমার ত সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শুনছি নীট নাকি একটিও আর খালি বৈই, সব ভ'রে গেছে। অত লোকের সামনে কি ক'রে যে কি করব—আমার আবার পুরুষের পার্ট—এত নার্ভাস মনে হচ্ছে।”

তার পর ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, “উঃ সত্যি আর ত সময় নেই—১টা বাজতে ২ মিনিট। আর না, আর না, আর একটুও সময় নেই। এই প্রম্পটার দু-জন, তোমরা দু-জনে

দু-দিকে থাক। হারমোনিয়াম কে বাজাবে? ঘুহু? আচ্ছা বেশ ব'সো গে নিজের জায়গায়। দেরি ক'রো না আর। প্রথম সীনে দেবদত্ত আর আমি। দেবদত্ত, এদিকে এস। থাকগে ও গোলাপী চাদরে এসে যাবে না কিছ। আমাকে কে প্রস্ট করবে? লীলা? আচ্ছা। প্রথমেই কি ব'লে হুহু একটু ব'লে দাও না ভাই, সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ও, ঠিক। প্রথমে দেবদত্ত বলবে, 'মহারাজ, এ কি উপদ্রব?'

আমি বলব 'হয়েছে কি?' না? আচ্ছা—'হয়েছে কি' হ'ল আমার প্রথম কথা। প্রথমটা একবার আরম্ভ ক'রে নিলে তার পর আপনি এসে যাবে। এস এস দেবদত্ত চ'লে এস আর সময় নেই। দেখুন ত মিসেস মল্লিক, আমাদের দাঁড়ানোটা ঠিক হয়েছে? ...আচ্ছা, আগে দাঁটা বাজাও, তার পর সীন তোলা।' ঘনিকা উঠিল।

ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, র'াচি

নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়গুলি যে মানব-ইতিহাসের গোড়ার কথা, এ সম্বন্ধে দ্বি-মত হইবার আশঙ্কা নাই।

সকলেই অবগত আছেন যে, আদিম মানবের পশুপ্রায় দৈহিক ও মানসিক প্রকৃতির ক্রমিক উন্নয়ন ও তাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য জীবনযাত্রার ক্রমিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌকুমার্য সাধন দ্বারা মানব-সভ্যতার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি কি রীতিতে সাধিত হইয়াছে, ইহাই নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

আধুনিক বিভিন্ন জাতিদের কুলজি ও তাহাদের সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানগুলি এবং বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সম্পর্কে তাহাদের পরিবর্তন-প্রণালী নৃতত্ত্বের অন্ততম গবেষণার বিষয়। মানব-সভ্যতার দিগ্ভিনয় ও গতি নিরূপণ এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বর্তমান কালের সাধারণ অভিজ্ঞতা-মূলক (a posteriori) প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে অতীতের অভিমুখী হইতেছেন।

এইরূপে প্রাগৈকগতের আধুনিক যুগ হইতে উন্নয়ন-যুগ পর্যন্ত ধরিত্রীর স্তরে স্তরে প্রত্নজীবের ও বিশেষতঃ প্রত্ন-মানবের কঙ্কালবশেষ এবং প্রস্তর, তাম্র ও ব্রোঞ্জ নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কারাদি ও গিরি-গহ্বরে বা গিরি-গাড়ে উৎকীর্ণ চিত্রাদি, পুরাকালের সমাধি ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও

অজ্ঞাত জীব্যসত্ত্বারের ভূরি ভূরি নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া, এই সমস্ত বস্তুগত উপাদানগুলির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রত্নজীবের ও প্রত্নমানবের ধ্যাসম্ভব একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদের প্রসঙ্গে এখন আমরা তৃতীয়ক যুগের (tertiary period-এর) অজ্ঞাধুনিক (pliocene) অন্তর্ভুক্ত হইতে চতুর্থক বা আধুনিক যুগ পর্যন্ত কিরূপে ট্রিনিলের (Trinil) প্রাক-মানব (Pre-man) হইতে ক্রমে পিণ্ট ডাউন, হাইডেলবার্গ, পেকিন ও রোডে-সিয়ার গোড়ার মানব (Proto-man) ও নিরান্ডারথাল-জাতীয় পশুভাবাপন্ন প্রাথমিক মানব (Homo-Primigenius) ও সর্বশেষে আধুনিক মানব Homo-Recens বা Homo-Sapiens) উদ্ভূত হইল; এবং কিরূপে রয়টলিয়ান, ম্যাকিলিয়ান, মেসভিনিয়ান প্রভৃতি উষ্ম-শীলা (Eoliths) হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাতন প্রস্তবযুগের লেলিয়ান, আলোলিয়ান, মুষ্টেরিয়ান, ওরিগেনেসিয়ান, সলুইট্রিয়ান, ম্যাগডেলেনিয়ান, আজিলিয়ান, টারডিনেসিয়ান প্রভৃতি প্রত্ন-প্রস্তবায়ু (palaeoliths) ও ক্রমে মধ্যপ্রস্তবায়ু (mesoliths) ও নব্যপ্রস্তবায়ু (neoliths) এবং পরে তাম্রায়ু ও লৌহায়ুগের উদ্ভাবন ও প্রচলন হইল তাহার একটি

স্থল ধারণা করিতে পারি। আর সেই প্রত্ন-ইতিহাসের পরিপূর্বকরূপে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্ববিদেরা বর্তমান অসভ্য জাতিদের জীবনধারা পর্যালোচনা করিয়া মানব-সভ্যতার ও মানব-সমাজের শৈশব-যুগের চিত্র অধিকতর পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছেন। নৃতত্ত্বের এই সমস্ত তথ্যগুলিই মানবের ও মানব-সভ্যতার ইতিহাসের গোড়ার কথা।

সিদ্ধান্ত হিসাবে ইহা সর্ববাসিসম্মত হইলেও কার্যতঃ বিশ্বমানবের ইতিহাসেব এই প্রথম অধ্যায় বাদ দিয়াই সাধারণতঃ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। আমাদের স্থল-কলেজেও এইরূপ মূল-অজ্ঞান ইতিহাসের অধ্যাপনা চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাস-শিক্ষার্থী প্রায় কোনও ছাত্রই নৃতত্ত্বের অল্পশীলন করেন না বা করিবার সুযোগও প্রাপ্ত হন না। ভারতবর্ষে এ-বিষয়ের অল্পশীলন বা প্রচার প্রায় কিছুই হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র ভারতের পঞ্চদশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই, প্রাচীন-স্মরণীয় স্বর্গীয় শ্রুত আশুতোষের নেতৃত্বে পৃথকভাবে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অংশস্বরূপ নৃতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা পনের-ষোল বৎসর ধাবৎ হইয়াছে। এবং সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্রীমাদ্রসায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়েব প্রযত্নে নৃতত্ত্ব মধ্য-পরীক্ষার (Intermediate) পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেবল বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সমাজতত্ত্বের, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের, ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রের অঙ্গস্বরূপ কেবল আংশিকভাবে নৃতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

প্রাচীন ভারতে নৃতত্ত্বের এরূপ অনাদব ছিল না। নৃতত্ত্ব বর্জন করিয়া পুরাতত্ত্ব বা ইতিহাস রচিত বা অধীত হইত না। কিংবা, তাহা হইতে পারে, এরূপ ধারণাও প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে ইতিহাস (History) এবং নৃতত্ত্ব (Anthropology) বলেন এই উভয় শাস্ত্রেরই স্থান প্রাচীন ভারতে অধিকার করিত আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলি ও কতিপয় সংহিতা বা ধর্মশাস্ত্র। আর ভারতের দুইখানি অমূল্য মহাকাব্য—রামায়ণ ও বিশেষতঃ মহাভারত,—আংশিক অভিশ্রোতি ও অভিরঞ্জন সত্ত্বেও, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের নানা তথ্যের

আকর। আমাদের পুরাণকার ঋষিরা তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে মানবের ও মানব-সমাজের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগের অবস্থা-পরম্পরার একটি সমগ্র-চিত্র পুরাণ গ্রন্থগুলিতে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুরাণ-বর্ণিত কোন তথ্য কত দূর প্রামাণ্য তাহা স্বতন্ত্র কথা। এখনও সন্দেহ সম্যক্ গবেষণা হয় নাই। সে যাহা হউক, পুরাণ-প্রত্যেক ঋষিদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অনিত্যের মধ্যে নিত্যের সন্ধান, বাস্তবের মধ্যে আদর্শের সন্ধান ও সেই আদর্শকে ইতিহাসের মধ্যে পরিষ্কৃত ও প্রচার করা। কেবল ঐহিক ঘটনাবলীর ইতিহাস অল্পশীলনে তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন না। ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন আর্ধ্যঋষিদের ধারণার সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণার অবশ্য সম্পূর্ণ মিল হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টি প্রধানতঃ বহিমুখী, কিন্তু ভারতের আর্ধ্যঋষিদের দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী। পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ প্রধানতঃ অহিংসপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-স্থাপন; ভারত-সভ্যতার আদর্শ অহিংসপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা মানবের অন্তর্নিহিত দেবদেব পূর্ণ প্রকাশ। প্রাচীন আর্ধ্য ঋষিদের নিরূপিত পারিবারিক নীতি ও ক্রিয়াকাণ্ড, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি মানবজীবনের চরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিধি-বিধানের মধ্যে কালক্রমে অনেক আবর্জনা প্রক্ষিপ্ত ও সঞ্চিত হইলেও তাহাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানবের পশুপ্রকৃতিকে বশীকৃত করিয়া দেব-প্রকৃতির ক্ষুরণ ও তাহার আধিপত্য স্থাপনের উপায় বিধান। হিন্দুর দুর্গাপ্রতিমা মানবের দেহভাবের স্বল্প পশুভাবের পরাজয়েরই প্রতীক। চণ্ডীর মহিষাসুর-বধ ইহা ব্রহ্মই রূপক।

আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলি সাধারণের বোধগম্য সহজ সরল আখ্যানিকার সাহায্যে ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব ও ধর্মনীতি শিক্ষা দিতেছে। সামাজিক ইতিহাস, নৃতত্ত্বের আধার স্বরূপ সমগ্র ভারতের তৎকালীন প্রচলিত লৌকিক রীতিনীতি, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-সংস্কার ও যজ্ঞাদি ধর্মাহুষ্ঠান, আশ্রম-ধর্ম, দান-বিভাগ, দণ্ডনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সমাহরণ, সংক্ষেপণ ও সমীকরণ করিয়া পুরাণ ও সংহিতাগুলিতে যথারীতি বিধিবদ্ধ

করা হইয়াছিল। ধর্মশিক্ষার দিক দিয়া পুরাণ গ্রন্থগুলিতে তৎকালীন বিভিন্ন স্তরের মানব-সমাজের আদর্শ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সেই সমস্ত আদর্শ আজও হিন্দুসমাজকে অল্প-বিস্তর নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এইরূপে পুরাণগুলিকে একাধারে ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। আর সংহিতাকারেরা ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতিনীতির সামঞ্জস্য করিয়াই ধর্মশাস্ত্রের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সমাজে যে বিভিন্ন প্রকার যৌন-সম্বন্ধ ও বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে সেইগুলি সংহিতাকার সমাহরণ করিয়া আট শ্রেণিতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। যথা, ব্রাহ্ম, দৈব, বার্ষ, প্রাজাপত্য, আহুয়, গান্ধর্ব্য, রাক্ষস, ও পৈশাচ। এখনও বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই বিভিন্ন বিবাহ-প্রথা অল্প-বিস্তর প্রচলিত আছে। সংহিতা-প্রণেতা ঋষির সমাজের শৃঙ্খলা স্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য উক্ত আট প্রকারের বিবাহই বৈধ বিবাহ এবং তন্মধ্যে চারি প্রকারের বিবাহ “উত্তম” বিবাহ এরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তবে বিধান দিয়াছেন যে বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে কোনও কোনও শ্রেণীর বিবাহ “প্রশস্ত”, কোনওটি “ধর্ম্য” অর্থাৎ “প্রশস্ত” বিবাহের অভাবে করণীয়। আরও বিধান দিয়াছেন যে পৈশাচ ও রাক্ষস বিবাহ নিন্দনীয় ও সকল বর্ণেরই অকর্তব্য; কিন্তু বিহিত সম্বন্ধের অভাবে এই দুইটি নিষিদ্ধ বিবাহও কেবলমাত্র শূদ্রের পক্ষে করণীয়।

প্রচলিত আচার-ব্যবহারের উপর মানব-সমাজের চিত্তি অবস্থিত ইহা উপলব্ধি করিয়া সংহিতাকারেরা সেই আচার-ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন ও সেইগুলির স্তর-বিভাগ নির্দেশ করিয়া দিয়া সমাজ-সংস্কারের পথ সূচন করিয়া দিয়াছিলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রে ইতিহাস ও নৃতত্ত্বকে অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। পুরাণগ্রন্থে সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য বা বিভিন্ন মনুর কালের বিবরণ, গ্রন্থকর্তার বিবরণ, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, সমস্ত যুগবার্তা, পুরাবৃত্ত, বিভিন্ন প্রাণিতানামা ঋষিদের ও নৃপতিগণের কীর্তিকলাপ, বংশোদ্ভূতি, যুদ্ধবিগ্রহ, সমাজসংস্থান, প্রচলিত লৌকিক আচার-

ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস ও যজ্ঞাদি অল্পাধুনিক প্রভৃতি যজ্ঞজ্ঞানে জুসবদ্ধ ও শিষ্যপরম্পরায় সুরক্ষিত হইয়াছিল, এবং পরে সেগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য পুরাণ-গ্রন্থগুলিকে “ইতিহাস পুরাণ” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বায়ুপুরাণের প্রথম অধ্যায়ের ৩১-৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

“স্বধর্ম এবমুতত্ত্ব সন্তিদৃষ্টঃ পুৰাতনৈঃ।

দেবতানামৃষীনাঞ্চ বাক্সা চমিততেজসাম্।

বংশানাং ধাবণং কার্য্যং ক্রতানাঞ্চমহাত্মনাম্।

ইতিহাস-পুরাণেষু দৃষ্টা য়ে ব্রহ্মবাদিভিঃ।

পুরাণগুলিকে অনেকে, বিশেষতঃ অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, ইতিহাসের মধ্যে স্থান দিতে অনিচ্ছুক। বস্তুতঃ পুরাণপ্রণেতা ঋষিগণ অধিক পরিমাণে ঐতিহ্য বা কিম্বদন্তীর উপর, হয়ত কতকটা অল্পমান ও সম্ভাব্যতার উপর, কতকটা প্রমাণনিরপেক্ষ (a priori) অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তর্জ্ঞানের (অনেকের মতে কল্পনার) উপর নির্ভর করিয়া পুরাণগুলি উপাখ্যানের আকারে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের ঐতিহাসিক ভাবনার (Historical Sense)র অভাব ছিল এ-কথা বলা সম্ভব মনে হয় না।

যুগে যুগে যে-সমস্ত কর্মবীর ও চিন্তাবীর মহাপুরুষ-পরম্পরা ভারতের মানব-সমাজের উন্নতির পথে-সখপ্রদর্শক হইয়াছেন, পুরাণেতিহাসে তাঁহাদের গুণকীর্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে; বস্তুতঃ তাঁহাদের কীর্তিকলাপই প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি। সে বাহা হউক, আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্বমানবের আদিপুরুষের জ্ঞান ও ধারণার অভাবে কোনও দেশের বা জাতির ইতিহাসের সম্যক উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সাধারণতঃ এখন যাহাকে ইতিহাস বলা হয় তাহা ইতিহাস-বর্ণিত জাতিগুলির বীরপুরুষদের কর্ম বা পুরুষকারের সামান্য প্রতিলিপি মাত্র, জাতীয় জীবনের সমগ্র চিত্র নহে। বুদ্ধি, ভাব ও কর্ম এই তিন শক্তির সমাবেশই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবন গঠিত হয়। ভাব, বুদ্ধি ও কর্ম পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ; একটিকেও ছাড়িয়া দিলে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না। কোনও জাতির সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি তাহার ভাব ও চিন্তার পরিচায়ক। একজন এগুলি বাদ দিলে জাতীয় ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। এই সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-তত্ত্বই নৃতত্ত্বের

প্রধান অঙ্গ। কোনও কর্মের প্ররোচক ও অন্তর্নিহিত ভাব ও চিন্তার উপলব্ধি দ্বারা যেমন ঐ কর্মের ও কর্মীর স্বার্থ স্বরূপ বোধগম্য হয়, তেমনি কোনও জাতির সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতির পরিচয়েই জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-তত্ত্বই নৃতত্ত্বের প্রাণ-স্বরূপ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে ভারতের প্রাচীন ঋষিরা এই সত্য সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মানবের সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-তত্ত্ব পুরাণেতিহাসের অঙ্গীভূত ছিল। মানবের বাহ্যবস্ত্র অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতির উপরেই প্রাচীন হিন্দুঋষিদের অধিকতর দৃষ্টি থাকায় বাহ্যবস্ত্র সম্বন্ধীয় নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) তাঁহাদিগকে আকৃষ্ট করে নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যেও কেহ কেহ এই বাহ্য অবয়ব সম্বন্ধীয় নৃতত্ত্বের প্রামাণিকতা ও কার্যকরিতা সম্বন্ধে সন্নিহান হইতেছেন। বস্তুতঃ মানবের খেত-পীত-কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণগত জাতি-বিভাগ (race-classification) পশুজগতের কিংবা উদ্ভিদ-জগতের জাতি-ভেদ (differentiation of species) হইতে অনেকটা বিভিন্ন। পশু বা উদ্ভিদের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ যেমন অধিক স্থলে অসম্ভব হয়, মানবের বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সেরূপ বন্ধ্যতা দৃষ্ট হইয়া না। ইহা মানবের মূলতঃ একজাতিত্বের পরিচায়ক। আব দেশ-ভেদে ক্রমে জাতিভেদের উৎপত্তি হইলেও দেশান্তর-গমন (migration) প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন দেশের নানা জাতির মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে এত সংমিশ্রণ চলিয়াছে যে আধুনিক সকল জাতিই অল্পবিস্তর বর্ণসঙ্কর,—নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের এইরূপ অভিমত। ভারতের এই মহামানবের তীর্থে বিভিন্ন কালে যে নানা জাতির সমাগম হইয়াছিল বর্তমান ভাবত-বাসীদের শোণিতে তাহার বিচ্ছিন্ন স্রব কোথাও কোথাও আংশিকভাবে ধ্বনিত হইতেছে এই অসম্ভব একেবারে অমূলক বলিয়া মনে হয় না।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন আৰ্য্যঋষিরা বাহ্যপ্রকৃতির ও মানবের বাহ্য অবয়বের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহারা কেবল মানবের বাহ্য অঙ্গ-অবয়বের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া তাহার মধ্য দিয়া মানবের অন্তঃপ্রকৃতিব অন্বেষণ করিতেন ও উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যত্নবান ছিলেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আয়তন পরিমাপের অপেক্ষা তাহাদের আকার-

প্রকার ও ভাবব্যাঞ্জনার (expressionএর) দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির ও জাতির অন্তঃপ্রকৃতির পন্থিচয়ের সন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা ছাদিম অসভ্য জাতিদের “কৃষ্ণবর্ণ” “খর্ব্বদেহ” ও “অল্পমূর্তি নাসিকা” প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের মস্তিষ্কের ও নাসিকার দীর্ঘ বা চ্যাপ্টা বা মধ্যবিধ আকার অনুসারে সমগ্র মানবজাতির জাতিবিভাগ করেন নাই। সংস্কৃতিতে সম্যক উন্নত ব্যক্তি মাত্রই আৰ্য্য পদবাচ্য হইতে পারিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন আৰ্য্যঋষিদের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে অন্তর্মুখী ছিল। তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে পর্য্যাপ্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া ব্যাপ্তি সিদ্ধান্তে (induction) দ্বারা মানবের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ-তত্ত্ব গুণগ্রন্থেব পবনপরের আপেক্ষিক আধিক্য ও ন্যূনতা অনুসারে ‘ব্রাহ্মণ’ ‘কশত্রিয়’ ‘বৈশ্য’ ‘শূদ্র’ এই চারি বর্ণে সমগ্র মানব-জাতিকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি ও দেহাবয়বের ও চিত্তবৃত্তির উপর তাহাদের জাত-বৈশিষ্ট্যের গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্যের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এবং জ্যোতিষমণ্ডলীর সহিত মানবের শরীরের ও মনের সম্বন্ধ বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের দ্বারা নির্ণয় করিয়া এইরূপ বর্ণবিভাগের শৌচক্যতা করিয়াছিলেন। এই প্রাকৃতিক বর্ণবিভাগের নহিত লৌকিক জাতি-বিভাগের কোনও সম্বন্ধ নাই। উপজীবিকা-ভেদে যে ব্যাবহারিক জাতি-ভেদের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার প্রত্যেক জাতিই বিভিন্ন স্বাভাবিক বর্ণের ব্যক্তিসমষ্টি। আৰ্য্যঋষিরা বংশগত স্বভাব ও সংস্কারের এবং উপজীবিকার প্রভাব অগ্রাহ্য করিতেন না বটে, কিন্তু লৌকিক ও লৌকিক জাতি-বিভাগকে অনমনীয় বা অপরিবর্তনীয় মনে করিতেন না। হিন্দুজাতির ও সমাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃত্তিগত জাতিভেদ সম্পূর্ণ বংশগত ও অপরিবর্তনীয় হইয়া পড়ে ও অপূর্ণতা প্রভৃতি কুসংস্কারে ছুষ্ট হইয়া সমাজকে বিকলাঙ্গ ও বিকলগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। বর্তমান বংশগত বিকৃত জাতিভেদ-প্রথা প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রোক্ত গুণগত বর্ণভেদ-প্রথাকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া ক্রমে নির্বাপিত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন আৰ্য্যঋষিগণ এই গুণগত বর্ণভেদের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করিতেন। বস্তুতঃ নৃতত্ত্বের বা বিজ্ঞানের দিক দিয়া ভারতের বৃত্তি ও বংশগত

জাতিভেদ কিংবা পাশ্চাত্য দেশের ধনগত জাতিভেদ ও উত্তর-আমেরিকার ও দক্ষিণ-আফ্রিকার যেত-কৃষ্ণ-চর্মগত জাতিভেদ অপেক্ষা প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক গুণগত বর্ণভেদে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হয়। তবে ব্যবহারিক জাতি-বিভাজন বংশ বা কুলের প্রভাব একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

অতঃপর নৃতত্ত্ব অঙ্কশীলনের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে—
• দুই-এক কথা নিবেদন করিব।

নৃতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণাই সম্ভবতঃ নৃতত্ত্ব অঙ্কশীলনে আমাদের ঔদাসীন্যের হেতু। কেহ কেহ মনে করেন যে অসভ্য জাতিদের কৌতুকপ্রদ আচার-ব্যবহার লইয়া অবসর বিনোদন করাই নৃতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। সত্য অর্থে, বিভিন্ন দেশের মানবের বৈচিত্র্যপূর্ণ আকৃতি-প্রকৃতি, জীবিকা, সাক্ষ্য-সজ্জা, পান-ভোজন, সামাজিক বিধিব্যবস্থা, ব্রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস, পূজাপার্বণ ও লোকসাহিত্য প্রভৃতি নৃতত্ত্বের আলোচনার বিষয়ীভূত। পুরাতাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মানব-সমাজের জীবন-ধারার জীবন্ত চিত্র নৃতত্ত্বের সাহায্যে অঙ্কিত হইতেছে। যাহুঘরের কিংবা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীর ত্রায় ক্ষণিক আনন্দ প্রদান করা এই চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য নহে। এই সমস্ত আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস ও অঙ্কশীলনের উদ্ভব-প্রণালী ও তাৎপর্য নির্ণয় নৃতত্ত্বের গবেষণার বিষয়ীভূত।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য নিখিল সৃষ্টির বিভিন্ন বিভাগের নিগূঢ় সত্যের আবিষ্কার করা,—ঐক্যনিষ্ঠিত অর্থের উদ্ঘাটন করা। সৃষ্টির এই নিহিতার্থের অনুসন্ধানকেই “বিজ্ঞানের জন্ত বিজ্ঞানচর্চা” (Study of Science for its own sake) বলা হয়। এই ভাবে ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া যে-কোন বিজ্ঞানের অঙ্কশীলনে য অনির্কলনীয় আনন্দ লাভ হয় তাহা যিনি একবার আশ্বাস করিয়াছেন তিনি আর বিস্মৃত হইতে পারেন না।

বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও মহিমার ক্রমিক আবিষ্কার চলিতেছে। নৃতত্ত্বে যে নিগূঢ় সত্যের আবিষ্কার চলিতেছে তাহা এই যে মানবজাতি সমাজ হইয়া আবহমান কাল হইতে অদম্য উৎসাহে ও অসীম আনন্দ কেবল বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করিতে প্রবৃত্ত তাহা নহে,

অন্তঃপ্রকৃতিকেও বশে আনিতে যত্ববান; পশুপ্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়া অস্বাভাবিক দেবপ্রকৃতির ক্ষুরণ ও আধিপত্য স্থাপনে প্রবৃত্ত। এই প্রচেষ্টায় সাক্ষ্যের পরিমাণই সভ্যতার মানদণ্ড।

মানবের ও মানবসমাজের এই নিত্য প্রসারের ও সম্পূর্ণতালাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ বিভিন্ন দেশের মানব-সমাজে যে সংস্কৃতি বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে তাহার বিবরণ সংকলন করা নৃতত্ত্বের কার্য। এই বিবরণ সংকলনের উদ্দেশ্য মানবের ও মানব-সভ্যতার চরম লক্ষ্যের সন্ধান। সেই সন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে মানব-সভ্যতার স্তরপরম্পরা মানবের মধ্যেও ভগবন্তের বা ভগবৎ শক্তির ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষ্য সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মার বা পরমাত্মার প্রকাশ ও তজ্জনিত শাস্তত পূর্ণানন্দলাভ। তাই পুরাণকার বলিয়াছেন—

“মহেশ্বর সর্বমিদং পুরাণম্।”

অর্থাৎ, ভগবানই এই নিখিল পুরাণের প্রতিপাদ্য।

বিজ্ঞানের যে মহান লক্ষ্য আর্ধ্যস্ববিরা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ভরসা করি সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা-প্রণালীর সহিত আমাদের ঐশ্বর্যপ্রদর্শিত প্রণালীর সংযোজন ও যথাযথ সমন্বয় করিয়া ভারতের নৃতত্ত্বসেবীরা অদূর ভবিষ্যতে নৃতত্ত্বের গবেষণার ও সাধনার এমন একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন যেখানে পাশ্চাত্য নৃতত্ত্বসেবীরাও প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন। ভারতগৌরব স্তর জগদীশ-চন্দ্রের জড়বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান (Bose Institute of Science) এইরূপ আদর্শেই স্থাপিত। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের পথ স্বগম হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈপরীত্য সম্বন্ধে কিপুলিঙের চপল উক্তি—

“East is East, and West is West

And the twain shall never meet,—”

অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানসেবীরা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের স্বার্থ মিলনসাধন সম্ভবপর।

নৃতত্ত্বের গবেষণার বিষয় সমগ্র মানবজাতির জীবন। তবে

নৃতত্ত্ব অধ্যয়নকালে যে আমরা অসভ্য জাতিদের জীবনধারার সবিশেষ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া থাকি তাহার একমাত্র হেতু এই যে আদিম জাতির সামাজিক জীবনই নৃতত্ত্বের আদিকেন্দ্র; একজন্ত সেখানেই মানব-সভ্যতার বীজভূমির উপলব্ধি সম্ভব।

কিন্তু সম্প্রতি এই জাতিগুলির কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান জাতিগুলি সভ্যতার জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া নতুন আদর্শের প্রভাবে ও শিক্ষার সাহায্যে নব আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় অল্পপ্রাণিত হইয়া সভ্যতার বহু যুগের সঞ্চিত ঋণ (past arrears) পরিশোধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ক্ষিপ্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিছুকাল পরে মানব-সভ্যতার নিম্নতম স্তরগুলির এই সমস্ত নিদর্শন একেবারে অন্তর্হিত হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী। কেবল লোকাচার, বিশেষতঃ স্ত্রীআচার, উপকথা, লোকগীতি, জনশ্রুতি প্রভৃতি লোক-সাহিত্য (folk-lore) সভ্যতার নিম্নতম স্তরগুলির সংস্কৃতির চূর্ণের নিদর্শন-স্বরূপ অবশিষ্ট থাকিবে। এই জন্তই অসভ্য জাতিদের জীবনধারার ও সংস্কৃতির আলোচনায় নৃতত্ত্বসেবীরা আপাততঃ সমধিক মনোনিবেশ করিতেছেন। কিন্তু সভ্যতার জাতিদের সংস্কৃতির অধ্যয়নও নৃতত্ত্ববিৎ উপেক্ষা করেন না।

নৃতত্ত্ব অধ্যয়নে বিভিন্ন জাতির রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস ও অহুষ্ঠানাদির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা উপলব্ধি হয় যে সমগ্র মানব-জাতি ও মানব-সভ্যতা পরস্পর-সম্বন্ধে একই অংশ ও সত্তা। কেবল অধ্যয়নের সৌকর্য্যার্থে, মানবজাতির সমগ্র সভ্যতার ধারা ও গতি সম্যক উপলব্ধির সুবিধার জন্ত ও কিরূপে বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার পরস্পর সংস্পর্শ ও সংমিশ্রণে (contact of cultures and intermixture of races) বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির গতি ও বেগ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ইহা অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্তই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ঋণ ও ভাবে নৃতত্ত্ব আলোচিত হয়। আর জাতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন অভিব্যক্তিগুলি একই জাতীয় জীবনের পরস্পর-সম্বন্ধে বিভিন্ন স্পন্দন বা ক্রিয়া হইলেও কেবল অধ্যয়নসৌকর্য্যের জন্ত ও তুলনামূলক আলোচনার জন্ত বিভিন্ন জাতির বস্তুগত সংস্কৃতি (material culture), সমাজ-

সংস্থান (social organization), মানসিক সংস্কৃতি (intellectual and aesthetic culture), ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ (religious belief and ritual) প্রভৃতি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন দিক দিয়া নৃতত্ত্ববিদেরা পর্যালোচনা করেন। এইরূপ বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে এই সত্য প্রকট হয় যে জাতীয় জীবনের এই বিভিন্ন স্পন্দনগুলি সমগ্র মানব-সভ্যতার উচ্চতম হইতে নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বস্তুতঃ আদিম জাতিগুলির মধ্যেই ইহাদের উৎপত্তি ও প্রথম সাড়া বর্তমান, ও সভ্যতার উচ্চতর স্তর-পরম্পরায় তাহারই ক্রমিক স্ফূরণ হইয়া চলিয়াছে। এইরূপে নৃতত্ত্ব-অধ্যয়নের দ্বারাই সমগ্র মানবজাতির ও মানব সভ্যতার অংশ ও একত্ব (integral unity) সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই বিশ্বজনের হেলায় যে “চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,” নৃতত্ত্ব সেই সুরগুলি ধরিবাব চেষ্টা করে ও তাহাদের মধ্যে মহামানবের জীবনবাণীর মূল সুরের অধ্যয়ন করে।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে প্রকৃত নৃতত্ত্ববিৎ বিশ্ব-মানবের সমগ্র জীবন আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণ, ধ্যান ও ধারণা করিয়া জ্ঞানালোকে হৃদয়-মনকে আলোকিত করিতে যত্নবান হন। নৃতত্ত্বের যথাযথ অধ্যয়নে সমগ্র মানব জাতির একত্ব ও মানবাত্মার ও মানব-সমাজের অনন্ত উন্নতির ও অক্ষয় আনন্দের দিকে—অমৃতের দিকে—গতির অহুভূতি হয়। যদিও প্রত্যেক জাতির সভ্যতা একটি সরলরেখা ধরিয়া অগ্রসর হয় না, তথাপি মোটের উপর সমগ্র মানব-সভ্যতার গতি উর্দ্ধমুখী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

শুদ্ধ জ্ঞানার্জন ও বিমল জ্ঞানানন্দই বিজ্ঞানচর্চার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বর্ধ্যালোকের প্রভাবে যেমন দৃষ্টি ফল উৎপন্ন হয়, তেমনি এই জ্ঞানালোক হইতে নানা প্রকার গৌণ ফলও লাভ হয়। তাই বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাই নৃতত্ত্বের ঐবর্ষক ইংরেজ মনীষী বেকন বলিয়াছেন, “Light first, fruit afterwards”, অর্থাৎ, “বিজ্ঞানীরাই নৃতত্ত্বের মূল লক্ষ্য জ্ঞানলাভ, পরে তাহা হইতে স্বতঃই ফললাভ ঘটয়া থাকে।”

নৃতত্ত্ব-অধ্যয়নের এই গৌণ ফলের সন্ধানে সামান্য আভাসমাত্র দিয়া এই প্রবন্ধের উল্লেখ্য করিব। নৃতত্ত্ব-অ-

শীলনে কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও জ্ঞানপিপাসার চরিতার্থতা হয় তাহা নহে, মনের উদার ভাবের উন্মেষণ ও চিন্তে ভূমার সংস্পর্শ লাভ হয়। বিশ্বমানব একই মূল হইতে উদ্ভূত এবং একই ধারার চিন্তা, ভাব ও বাসনায় অল্পপ্রাণিত, ও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একই লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত, সমগ্র মানব জাতির এক-জাতিত্বের এই উপলব্ধির দ্বারা আত্মার অসীমত্বের প্রকাশ অবশ্যজ্ঞাবী। সেই আত্মপ্রসারের ফলে নৃতত্ত্বসেবী সাধকের হৃদয়ে সার্ক-জনীন সহানুভূতির ও প্রীতির প্রচ্ছন্ন উৎস উন্মুক্ত ও প্রকটিত হয়। এবং মানবের জীবজগতের জৈব-বিশ্বের (biological rivalry-র) পরিবর্তে “বহুধৈব কুটুম্বকম্” এই সার্ক-জনীন আত্মীয়তাবোধ পরিস্ফুট হয়।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় মানব-সভ্যতাব ইতিহাসের গোড়ার কথা—প্রথম অধ্যায়ের বিষয়ীভূত। আর নৃতত্ত্ব-অনুশীলনের ফলে যে একাত্মানুভূতি জন্মে তাহাই সভ্যতার ইতিহাসের শেষ কথা। এজ্ঞাত নৃতত্ত্বকে সমগ্র মানব-সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস বলা বোধ হয় অভ্যুক্তি হইবে না।

নৃতত্ত্বানুশীলনের স্বফল কেবল নৃতত্ত্বসেবীর নিজের জ্ঞান-লাভ ও চিন্তের প্রসারেই পর্যাবসিত হয় না। নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে নানা জাতির সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহাব, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার, স্ব-দুঃখ, ভয় ও আশার-সহিত পরিচিত হইলে ধর্মপ্রচাবক, শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রশাসক এবং বিচারকও স্ব-স্ব কর্তব্য ও জীবনব্রত অধিকতর নিপুণভাবে পালন করিতে সমর্থ হইবেন। আর নৃতত্ত্বজ্ঞান হইতে যে সার্কজনীন সহানুভূতি, সমবেদনা ও প্রীতি উদ্ভূত হয় তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ স্ব-স্ব শক্তি ও সুযোগানুসারে প্রবলের অত্যাচারে প্রসীড়িত, নানাবিধ কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন, দুর্নীতিমূলক ও পীড়াদায়ক সামাজিক আচাবে ক্লিষ্ট আদিম জাতিদের হিতকল্পে সাধ্যানুযায়ী স্ব ও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। বহুকাল যাবৎ আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিজ্ঞা অবস্থার পীড়নে যে-সমস্ত অসভ্য আদিম জাতির গতিশক্তি এত দিন রুদ্ধপ্রায় আছে, তাহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যপালনে নৃতত্ত্বজ্ঞান আমাদের প্রবুদ্ধ করিবে। নৃতত্ত্বানুশীলনের দ্বারা আমরা

সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব যে এই সব পশ্চাত্তম জাতির আমাদেরই ভ্রাতা-ভগ্নী। তাহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কবির ভাষায় বলিতে গেলে—

“এই সব মৌন মান মুক মুখে দিতে হবে ভাষা,

এই সব শাস্ত বৃকে ধনিয়া তুলিতে হবে আশা।”

দৈবচরিত্রপাকে সূদীর্ঘকালব্যাপী প্রতিজ্ঞা আবেষ্টনীর প্রভাবে ও সভ্যতার জাতিদের এবং উচ্চতর সংস্কৃতির সংস্পর্শের অভাবে (মহুর ভাষায়, “ব্রাহ্মণানাং অদর্শনাৎ”) অনেকগুলি আদিম জাতি প্রায় স্থাব্ধ নিশ্চল রহিয়াছে। আর অপর পক্ষে ভগবৎপ্রসাদে অনুকূল প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর প্রভাবে এবং বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে ও আংশিক সংমিশ্রণে বর্তমান সভ্য জাতিদের অভিব্যক্তির বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্তই এই সমস্ত আদিম জাতির প্রতি সভ্যজাতিমানী জাতিদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের এই অনুন্নত পশ্চাত্তম আত্মীয়দের সন্মুখে বিশেষ কোন চিন্তাই করি নাই। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কারের যথাসাধ্য সহায়তা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য, একথা আমরা এত দিন বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। এই কর্তব্য পালনে আশা করা যায়, নৃতত্ত্ব-জ্ঞান আমাদের উদ্বুদ্ধ করিবে। আর সভ্যতার নব নব ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাইতে গিয়া এই সব জাতি যাহাতে স্বাধার সন্ধে হলাহল পান না করে এ সন্মুখেও, আশা করা যায়, সমাজ-সংস্কারকেরা নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে যথার্থ উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন। রাষ্ট্রশাসন ও বিচারকার্যে নৃতত্ত্ব-জ্ঞানের উপযোগিতা ও উপকারিতা সন্মুখে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-পরিচালকেরা এখন সজাগ হইয়াছেন; ভরসা করি ভারত-সরকারও হইবেন। দুঃখের বিষয়, যদিও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জন্ত বিলাতে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে নৃতত্ত্ব অগ্রতম বিষয়রূপে নির্দিষ্ট আছে, ভারতে যে পরীক্ষা হয় তাহাতে নৃতত্ত্ব এখন পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে পরিগৃহীত হয় না।

সে যাহা হউক, নৃতত্ত্ব-অনুশীলন হইতে আর একটি প্রকৃষ্ট ফল প্রত্যাশা করা যায়। তাহা এই যে নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র মানব-জাতির ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ উপলব্ধি হইলে জগতে যথার্থ মহা-মানব-সংঘ,—জেনেভা-মার্কী রাজনৈতিক

সংঘ (League of Nations) নহে, — স্বার্থ
আন্তর্জাতিক প্রত্যাশাবন্ধন (“Parliament of Man,—
the Federation of the World”) স্থাপিত হইতে
পারে। তখনই সকল হইবে রাজ-কবি টেনিসনের
স্বপ্ন :—

“Earth at last a warless world,
A single race, a single tongue.”

মানবজাতির নিত্য-প্রসার্যমান জীবনধারা পর্যালোচনা
করিলে উপলব্ধি হয় যে, সৃষ্টিকালে ভগবান মানবের মধ্যে
যে অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত রাখিয়াছিলেন তাহারই
অভিব্যক্তি আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও
চলিবে। কবির ভাষায়,—

“Only That which made us meant us to be
mightier by and by,—
Set the sphere of all the boundless heavens
within the human eye,

Sent the shadow of Himself, the boundless,
through the human soul,
Boundless inward, in the atom, boundless
outward in the whole.”

পরিণেবে, নৃত্য-অমূল্যলনের চরম ফল এই যে ইহা দ্বারা
মানবজাতির মধ্য দিয়া ভগবানের বিশ্ব-মানব রূপে ধান ও
ধারণা জন্মায়।

ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তের মহান মন্ত্র (১০ মণ্ডল, ৯০ শ্লোক)
নৃত্য-সাধনার সিদ্ধিমন্ত্র রূপেই আনার নিকট প্রতিভাত হয়। •
“সহস্র-শীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্র-পাং পুরুষ” বা ভগবান হইতে
উদ্ভূত বিশ্ব-কপী বিরাট পুরুষের বিশ্বপদ্যরূপে আত্মাহুতি
প্রদান ও সেই যজ্ঞে তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বিভিন্ন বর্ণের
মানবের উৎপত্তি ও বজ্রাবশেষ হইতে অপব সমস্ত জীবের
উৎপত্তি,—ভগবানের বিশ্বরূপে ও বিশেষতঃ মানব-রূপে
অত্মপ্রকাশের এমন সম্পূর্ণ মহান চিত্র বা রূপক
(metaphor) পৃথিবীর অপব কোনও সাহিত্যে আছে
বলিয়া আমার জানা নাই।

মানবমুগ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কাহিনীটি আমার নিজস্ব নয়; অর্থাৎ মস্তিষ্কের
মধ্যে ধূম-বিশেষ সহযোগে ইহার উৎপত্তি হয় নাই। তাই
সর্বপ্রায়ে নিজের সমস্ত দাবী-দাওয়া তুলিয়া লওয়া উচিত
বিবেচনা করিতেছি।

যে হঠাৎ-লব্ধ বস্তুটির মুখে এ কাহিনী শুনিয়াছিলাম,
তিনি নিজের চারিধারে এমন একটি দ্রুতগতির রহস্যের জাল
রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার গল্পকে ছাপাইয়া তাঁহার
নিজের সম্বন্ধেই একটা প্রবল কৌতূহল আমার মনে রহিয়া
গিয়াছে। মাত্র দুইবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তার পর
তিনি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। জানি না, এখন তিনি

কোথায়। হয়ত আমদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুয়ারোহ
গিরিসঙ্কটের মধ্যে সেই অন্তত মানবমুগের অল্পসন্ধান করিয়া
কিরিতেছেন। তবে নিশ্চয় ভাবে বলিতে পারি না;
শুনিয়াছি বড় বড় শিকারীদের কথা একটু লবণ সহযোগে
গ্রহণ করিতে হয়।

এই কাহিনী আমি যেমনটি শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনটিই
লিপিবদ্ধ করিব। কয়েক স্থানে বুঝিতে পারি নাই, স্তব্রাং
কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না। ভরসা শুধু এই, ষাঁহার
ইহা পড়িবেন তাঁহারা সকলেই আমা-অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান,
বুঝবার মত ইঙ্গিত কিছু থাকিলে, তাঁহারা নিশ্চয় ধরিয়া
কেলিগুন, এবং কাহিনীটি যদি নিছক আঘাতে গল্পই হয়,

ভাল হইলেও তাঁহাদের বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। আমি কেবল মাছি-মারা ভাবে অবিকল পুনরাবৃত্তি করিয়া থালাম।

* * *

গত শীতকালে একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ খেয়াল হইল পক্ষীশিকারে বাহির হইব। বড়দিনের ছুটি ঘাইতেছে, শীতও বেশ কনকনে। বৎসরের মধ্যে ঠিক এই সময়টাতে, কেন জানি না, পক্ষীজাতির উপর নিদারুণ জিহাংসা জাগিয়া উঠে।

সঙ্গী পাইলাম না; একাই বাইসিকেল আরোহণে বাহির হইয়া পড়িলাম। শহরের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বন আছে, শস্তপুষ্ট নানা জাতীয় পক্ষী এই সময় তাহাতে ভীড় করিয়া থাকে।

সারা দুপুরটা জঙ্গলের মধ্যে মন্দ কাটিল না। কয়েকটা পাখীও জোগাড় হইল। কিন্তু অপরাহ্নে বাড়ী কিরিবার কথা বখন স্মরণ হইল তখন দেখি, অজ্ঞাতে শিকারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি—প্রায় বারো মাইল। শরীরও বেশ ক্লান্ত হইয়াছে এবং পাকস্থলী অত্যন্ত নিলম্ব ভাবে নিজের রিক্ততা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শীঘ্র বাড়ী পৌঁছিতে হইবে। বনু হইতে পাকা সড়কে উঠিয়া গৃহান্তিমুখে বাইসিকেল চলাইলাম। গৈরিক ধূলায় সমাচ্ছন্ন পথ, দু-ধারে কখনও অড়রের ঘন-পল্লব ক্ষেত, কখনও নারিসন্দের বাড়; কখনও বা ধূম-চন্দ্রাতপে ঢাকা ক্ষুদ্র দু-একটা বস্তি।

যথানন্তর দ্রুতবেগে চলিয়াছি; আলো থাকিতে থাকিতে বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই ভাল; কারণ বাইসিকেলের বাতি আনিতে তুলিয়া গিয়াছি।

দিনের আলো ক্রমে নিবিয়া আসিতে লাগিল। গো-সুর ধূলায় শীত-সন্ধ্যার অবসর দীপ্তি আরও নিশ্চন্দ্র হইয়া গেল। এই আধা-আলো-অন্ধকারের ভিতর দিয়া নিষ্করণ দীর্ঘ পথটা মৃত সর্পের মত পড়িয়া আছে মনে হইল।

চার-পাঁচ মাইল অতিক্রম করিবার পর দেখিলাম হাত দুটা শীতের হাওয়ায় অসাড় হইয়া আসিতেছে; বাইসিকেলের

হ্যাণ্ডেল ধরিয়া আছি কিনা টের পাইতেছি না। 'দু-এক-বার ক্ষুদ্র ইটের টুকরায় ঠোকর খাইয়া পড়ি-পড়ি হইয়া বাঁচিয়া গেলাম। রাস্তার উপর কোথায় কি বিঘ্ন আছে, আর ভাল দেখিতে পাইতেছি না।

আরও কিছু দূর গিয়া বাইসিকেল হইতে নামিতে হইল। দ্বিচক্রবানে আরোহণ আর নিরাপদ নয়; এই স্থানে বাইসিকেল হইতে আছাড় খাইলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া উঠিবে।

এইবার সমস্ত চেতনাকে অবসর করিয়া নিজের অবস্থাটা পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞদয়ঙ্গম হইল। পৌষ মাসের অন্ধকার রাত্রে ক্ষুধার্ত ক্লান্ত দেহ লইয়া গৃহ হইতে ছয়-সাত মাইল দূরে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি। কোথাও জনপ্রাণী নাই; সঙ্গীর মধ্যে কয়েকটা মৃত পক্ষী, একটা ভারী বন্দুক এবং ততোধিক ভারী অকর্মণ্য দ্বিচক্রবান। এইগুলিকে বহন করিয়া বাড়ী পৌঁছিতে হইবে; পথ পরিচিত বটে, কিন্তু অন্ধকারে দিগ্ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নৈরাশ্রে হাত-পা যেন শিথিল হইয়া গেল।

কিন্তু তবু দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। দিল্লী দূরস্ত! যেমন করিয়া হোক বাড়ী পৌঁছনো চাই! বাইসিকেল ঠেলিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। এই দুঃসময়েও কবির কাব্য মনে পড়িয়া গেল—

ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কবির বিহঙ্গের অবস্থা আমার অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হইল না।

বোধ হয় এক ঘণ্টা এইভাবে চলিলাম। শীতে ক্ষুধায় ক্লান্তিতে শরীর অবশ হইয়া গিয়াছিল, মনটাও সেই সঙ্গে কেমন যেন আচ্ছন্ন ও সাড়হীন হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ সচেতন হইয়া মনে হইল, পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি; কারণ, পায়ের নীচে পাকা রাস্তার কঠিন প্রস্তরময় স্পর্শ আর পাইতেছি না,— হয় কাঁচা পথে নামিয়া আসিয়াছি, নহত অজ্ঞাতসারে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইয়াছি। সময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। রক্তহীন অন্ধকারে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া আছে—কোনও দিকে দৃষ্টি চলে না। কেবল উর্দ্ধে নক্ষত্র-গুলি শিকারী জন্তুর নিষ্করণ চক্ষুর মত আমার পানে নির্নিমেষ লুকুতায় তাকাইয়া আছে।

এই নূতন বিপৎপাতের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া ভাবিলাম, যেমিকে হোক চলিতে যখন হইবেই তখন সামনে চলাই ভাল ; পিছু ফিরিলে হয়ত আবার জঙ্গলের দিকেই চলিয়া যাইব। এটা যদি কাঁচা রাস্তাই হয় তবে ইহার প্রান্তে নিশ্চয় লোকালয় আছে। একটা মাস্তবের সাক্ষাৎ পাইলে আর ভাবনা নাই।

লোকালয় ও মাস্তবের সাক্ষাৎকার যে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই।

ছ-পা অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় চোখের উপর একটা তীব্র আলোক জলিয়া উঠিল এবং আলোকের পশ্চাৎ হইতে কড়া হুইর প্রবল আসিল, ‘কে ? কোন্ হায় ?’

আলোকের অসহ্য রূঢ়তা ‘হইতে অনভ্যস্ত চক্ষুকে বাঁচাইবার জন্য একটা হস্ত আপনা হইতে মুখের সম্মুখে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইল ; তখন আরও কড়া হুইর আসিল, ‘হাত নামাও। কে তুমি ?’

হাত নামাইলাম ; কিন্তু কি বলিয়া নিজের পরিচয় দিব ভাবিয়া পাইলাম না, ছ-বার ‘আমি—আমি’ বলিয়া ধামিয়া গেলাম।

আলোকধারী আরও কাছে আসিয়া আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। এতক্ষণে আমার চক্ষুও আলোকে অভ্যস্ত হইয়াছিল ; দেখিলাম আলোটা যত তীব্র মনে করিয়াছিলাম তত তীব্র নয়—একটা সাধারণ বৈদ্যুতিক টর্চলৈ। আলোক-ধারীকেও আবছায়া ভাবে দেখিতে পাইলাম, সে বাঁ-হাতে টর্চলৈ ধরিয়াছে এবং ডান হাতে কি একটা জিনিষ আমার দিকে নির্দেশ করিয়া আছে।

আলোকধারী আবার কথা কহিল, এবার স্বর বেশ নরম। বলিল, ‘আপনি বাঙালী দেখছি। এ সময়ে এখানে কি করে এলেন ?’

এই প্রশ্নটা আমার মনেও এতক্ষণ চাপা ছিল, পরিস্ফুট হইতে পায় নাই। আমি বলিলাম, ‘আপনিও ত বাঙালী ;—এখানে কি করছেন ?’

‘সে কথা পরে হবে। আপনি কেন এখানে এসেছেন, আগে বলুন।’ আবার স্বর একটু কড়া।

কীর্ণস্বরে বলিলাম, ‘কাছেই জঙ্গল আছে, সেখানে শিকার করতে গিয়েছিলাম। ফিরতে রাত হয়ে গেল—পথ হারিয়ে ফেলেছি।’

‘আপনার বাড়ী কোথায় ?’

‘মুন্সের, এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল হবে।’

‘নাম কি ?’

নাম বলিলাম। মনে হইল কেন আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া উকিলের জেরার উত্তর দিতেছি।

কিছুক্ষণ আর কোনও প্রশ্ন হইল না। লক্ষ্য করিলাম, প্রাক্কর্তার উত্তর ডান হাতখানা পকেটের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। টর্চের আলোও আমার ন্থ হইতে নামিয়া মাটির উপর একটা উজ্জল চক্র সৃজন করিল।

‘আপনি নিশ্চয় বাড়ী ফিরতে চান ?’

সাগ্রহে বলিলাম, ‘সে কথা তার বলতে। তবে একটা আলো না পেলে—’ প্রচ্ছন্ন অন্ধরাধটা অসমাপ্ত রাখিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ কোনো জবাব নাই। তার পর হঠাৎ তিনি বলিলেন, ‘আমুন আমার সঙ্গে। আপনি শিকারী ; আমি শিকারীর ব্যথা বুঝি। বোধ হয় খুব ক্লিমে পেয়েছে, ক্লান্ত ও হয়েছেন ; এক পেয়াদা গরম চ বোধ করি মন্দ লাগবে না। আন্নি কাছেই থাকি।—আহন।’

গরম চায়ের নামে সর্বদা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। দ্বিলক্ষি না করিয়া বলিলাম, ‘চলুন।’

২

ছই জন পাশাপাশি চলিলাম। টর্চের রশ্মি অগ্রবর্তী হইয়া আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না, বিশ কদম যাইতে-না-যাইতে একটি ভয় জরাজীর্ণ বড়ীর উপর আলো পড়িল। বাড়ী বলিলাম বটে, কিন্তু বস্তুত সেটা একটা ইট-কাঠের গুপ। চারিদিকে খসিয়া-পড়া-ইট ছড়ানো রহিয়াছে ; বেঁটুকু দাঁড়াইয়া আছে তাহাও জঙ্গলে, কাঁটাগাছে এমন ভাবে আচ্ছন্ন যে সেখানে বাঘ লুকাইয়া থাকিলেও বিশ্বয়ের কিছু নাই। একটা তরুণ অশথগাছ সমুখের ছাদহীন দালানের ভিত্তি কাটাইয়া মাথা তুলিয়াছে এবং ভিতরে প্রবেশের পথ ঘন-পল্লবে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে।

বাড়ীখানা সস্তর-আশী বছর আগে হয়ত কোনও স্থানীয় জমিদারের বাসভবন ছিল, তার পর বহুকাল পরিত্যক্ত

ধাক্কি প্রকৃতির প্রকোপে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ভিতরে বাসোপযোগী ঘর দু-এক থানা এখনও খাড়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাহির হইতে তাহা অসুস্থমান করিবার উপায় নাই।

বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী বলিলেন, 'বাইসিকেল এইখানে রাখুন।'—বলিয়া ভিতরে প্রবেশের উপক্রম করিলেন।

আমি আর কিস্তি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'আপনি এই বাড়ীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। আছেন।'

তাঁহার কঠোর পরিষ্কার বৃথাইয়া দিল যে অথবা কোতুল তিনি পছন্দ করেন না। আর প্রশ্ন করিলাম না, দেয়ালের গায়ে বাইসিকেল হেলাইয়া রাখিয়া তাঁহার অসুস্থগামী হইলাম। তবু মনের মধ্যে নানা উত্তেজিত প্রশ্ন উকিঝুকি মারিতে লাগিল। বিহারের এক প্রান্তে শহর—লোকালয় হইতে বহুদূরে একটি ভাড়া বাড়ীর মধ্যে এই বাড়ালী ভ্রমলোকটি কি করিতেছেন? কে ইনি! এই অজ্ঞাতবাসের অর্থ কি?

নানা প্রকার ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার লগ্নে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। অভ্যস্তের পথ কিন্তু অতিশয় ক্ষুটিল ও বিরসজ্বল। সদর দ্বারের অশুভগাছ উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম একটা মেঘাল ধরসিয়া পড়িয়া সম্মুখে দ্বলভ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকে এড়াইয়া আরও কিছু দূর যাইবার পথ দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড শালের কড়ি বক্রভাবে প্রাচীর হইতে অবতীর্ণ হইয়া মাঝখানে আগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। পদে পদে কাঁটাগাছ বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ধবিতে লাগিল; যেন আমাদের ভিতরে ঘাইতে দিবার ইচ্ছা কাহারও নাই।

যা হোক, অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এক দরজার সম্মুখে আসিয়া আমার সঙ্গী দাঁড়াইলেন। দেখিলাম দরজায় তালা লাগানো।

তালা খুলিয়া তিনি মরিচা-খরা ভারী দরজা উন্মোচিত করিয়া দিলেন, তার পর আমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছিত করিলেন। স্বস্তিকার গম্বীরের মত ঘর দেখিয়া সহসা প্রবেশ করিতে ভয় হয়। কিন্তু যে চক্রব্যূহের এতটা পথ নিরাপত্তিতে আসিয়াছি, তাহার মুখ হইতে ফিরিব কি

বলিয়া? বুকের ভিতর অজানা আশঙ্কায় দ্রুত দ্রুত করিয়া উঠিল—এই অজ্ঞাতভুলস্বীল সঙ্গীটি কেমন লোক? কোথায় আমাকে লইয়া চলিয়াছেন?

কঠোর মধ্যে একটা কঠিন বস্ত্র গলাধঃকরণ করিয়া চৌকাঠ পার হইলাম। তিনিও ভিতরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। টর্চের আলো একবার চারিদিকে ঘুরিয়া নিবিয়া গেল।

কতখাসে অসুস্থ করিলাম, তিনি আমার পাশ হইতে সরিয়া গিয়া কি একটা জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। পরক্ষণেই দেশলাইয়ের কাঠি জলিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উজ্জল ল্যাম্পের আলোয় ঘর ভরিয়া গেল।

এতক্ষণে আমার আবছায়া সঙ্গীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মধ্যমাকৃতি লোকটি, রোগা কিংবা মোটা কোনটাই বলা চলে না, মুখের গড়নও নিতান্ত সাধারণ,—কেবল চোখের দৃষ্টি অতিশয় গভীর, মনে হয় যেন সে-দৃষ্টির নিকট হইতে কিছুই লুকান চলিবে না। চোয়ালের হাড় দৃঢ় ও পরিপুষ্ট, গৌর-মাড়ি কামান—বয়স বোধ হয় চল্লিশের কাছাকাছি। পরিধানে একটা চেক-কাটা রেশমের নুজি ও পাণ্ডটে রঙের মোটা কোট-সোয়েটার। তাঁহার চেহারা ও বেশভূষা দেখিয়া সহসা তাঁহার জাতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে।

তাঁহার গম্ভীর সপ্রশ্ন চোখদুটি আমার মুখের উপর রাখিয়া অথরে একটু হাসির ভঙ্গিমা করিয়া তিনি বলিলেন, 'স্বাগত। বন্দুক রাখুন।'

বন্দুক কাঁধেই ঝোলান ছিল; পাখীর থলোটাও সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সেগুলো নামাইতে নামাইতে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। ঘরের মাঝখানে একটা প্যাকিং বাক্সকে কাত করিয়া টেবিলে পরিণত করা হইয়াছে, তাহার উপর কেরোসিন ল্যাম্প রক্ষিত। ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল, ঘরটি মাঝারি আয়তনের, এক কোণে পুরু ভাবে খড় পাতা রহিয়াছে, ইহাই বোধ হয় বর্তমান গৃহস্থামীর শয্যা। ইহা ছাড়া ঘরে আর কোন আসবাব নাই। ঘরের লম্বা-জর্জরিত দেওয়ালগুলি যেন আপনার নিরাভরণ দীনতার কথা স্মরণ করিয়াই ক্রন্দ-সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দুক দেয়ালে হেলাইয়া রাখিলে গৃহস্থানী বলিলেন,
'আপনার ওটা কি বন্দুক?'

বলিলাম, 'সাধারণ শট-গান্।' খাটি দেশী জিনিষ
কিন্তু; এখানকারই তৈরি।'

তিনি আসিয়া বন্দুকটা হাতে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার
বন্দুক-ধরার ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিলাম আয়েয়া-চালনায় তিনি
অনভ্যস্ত নন। বন্দুকের ষাড় ভাঙিয়া নলের ভিতর দিয়া দৃষ্টি
চালাইয়া তিনি বলিলেন,—মন্দ জিনিষ নয়ত। পাঁচাত্তর
গজ পর্যন্ত পরিষ্কার পাল্লা মারবে। একটু বেশী ভারি—
তা কত কি?—কই কি পাখী মেরেছেন দেখি?'

তিনি নিজেই ধলে আজাড় করিয়া পাখীগুলি বাহির
করিলেন। তার পর আনন্দে বলিয়া উঠিলেন,—'বাঃ এ যে
ভিত্তির আর বন-পায়রা দেখছি। ছুটো হারিয়ারও
পেয়েছেন;—এদিকে অনেক হারিয়ার পাওয়া যায়—আমি
দেখেছি।'

দেখিলাম অকৃত্রিম শিশুহৃদয় আনন্দে তাঁহার মুখ
ভরিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ আমাদের মাঝখানে যে একটা
অস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবধান ছিল তাহা যেন অকস্মাৎ লুপ্ত হইয়া
গেল।

পাখীগুলিকে সঙ্গেহে নাড়িয়া-চাড়িয়া অবশেষে তিনি
সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, একটু লজ্জিত স্বরে বলিলেন,
'চায়ের আশাস দিয়ে আপনাকে এনে কেবল পাখীই দেখছি।
আম্বন চায়ের ব্যবস্থা করি। আপনি বহন; কিন্তু বসতে
দেব কোথায়।—একটু অপেক্ষা করুন।' তিনি দ্রুতপদে
ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া পরক্ষণেই ছুটি ছোট মজবুত-
গোছের প্যাকিং কেস লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, একটিকে
টেবিলের পাশে বসাইয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া শয্যার দিকে
গেলেন, সেখান হইতে একটা সাদা লোমশ আসন আনিয়া
বাক্সের উপর বিছাইয়া দিয়া বলিলেন, 'এবার বহন।'

সাদা আস্তরণটা আমার কোঁড়ুল আকৃষ্ট করিয়াছিল,
সেটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন জন্তুর
চামড়া, ধবধবে সাদা রেশমের মত মোলায়েম দীর্ঘ লোমে
ঢাকা চামড়াটি; দেখিলেই লোভ হয়। জিজ্ঞাসা করিলাম,
'কিসের চামড়া?'

তিনি বলিলেন, 'হরিণের।'

বিস্মিত ভাবে বলিলাম, 'হরিণের। কিন্তু—সাদা হরিণ?'
তিনি একটু হাসিলেন, 'হাঁ—সাদা হরিণ।'

সাদা হরিণের কথা কোথাও শুনি নাই, কিন্তু, কে
জানে, থাকিতেও পারে। প্রশ্ন ত্রিলাম, 'কোথায় পেলেন?
উত্তরমেকর হরিণ নাকি?'

তিনি মাথা নাড়িলেন, 'ন, অত দূরের নয়, শ্রাম-
দেশের। গুর একটা মজার ইতিহাস আছে।—কিন্তু আপনি
বহন' বলিয়া আতিথ্যসংস্কারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দেখা গেল তাঁহার প্যাকিং বাক্সটি কেবল টেবিল নয়,
তাঁহার ভাঁড়ারও বটে। তাহার ভিতর হইতে একটি ঠোঙ
বাহির করিয়া তিনি আলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চায়ের কোটা,
চিনির মোড়ক, জমানো ছমের টিন ও ছুটি কলাই-করা মগ
বাহির করিয়া পাশে রাখিলেন। তার পর একটি অ্যালা-
মিনিয়ামের ঘটতে জল লইয়া ঠোঙে চড়াইয়া দিলেন।

তাঁহার ক্ষিপ্ত নিপুণ কার্যভঙ্গিরতা দেখিতে দেখিতে
আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আপনি যে এক জন পাকা শিকারী
তা ত বুঝতে পারছি, আপনার নাম কি?'

তাঁহার প্রফুল্ল মুখ একটু গভীর হইল, বলিলেন, 'আমার
নাম শুনে আপনার লাভ কি?'

'কিছুই না। তবু কোঁড়ুল হ'ল না কি?'

'তা' বটে। মনে করুন আমার নাম—প্রমথেশ কল্ল।'

বুঝিলাম, আসল নামটা বলিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে
কাটিল।

তার পর সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি একলা
এই ভাঙা বাড়ীতে কেন রয়েছেন এ প্রশ্ন করাও ধৃষ্টতা
হবে কি?'

তিনি উত্তর দিলেন না, যেন আমার প্রশ্ন শুনিতে পান
নাই এমন ভাবে ঠোঙে পাম্প করিতে লাগিলেন, মনে
হইল তাঁহার চোখের উপর একটা অদৃশ্য পর্দা নামিয়া
আসিয়াছে।

ক্রমে চায়ের জল ঠোঙের উপর ঝাঁঝিগোকার মত
শব্দ করিতে আরম্ভ করিল।

তিনি সহজভাবে বলিলেন, 'চায়ের জলও গরম হয়ে
এল। কিন্তু শুধু চা খাবেন? আমার ঘরে এমন কিছু
নেই যা-দিয়ে অতিথিসেবা করতে পারি। কাল রাat্রে তৈরি

খানকয়েক শুকনো কটি আছে, কিন্তু সে বোধ হয় আপনার গলা দিয়ে নামবে না।’

আমি বলিলাম, ‘ক্ষিদের সময় গলা দিয়ে নামে না এমন কঠিন বস্তু পৃথিবীতে কমই আছে। কিন্তু তা ছাড়াও ঐ পাখীগুলো ত রয়েছে। ওগুলার সংকার করলে হয় না?’

‘ওগুলো আপনি বাড়ী নিয়ে যাবেন না?’

‘বাড়ী নিয়ে গিয়েও ত খেতেই হবে। তবে এখানে খেতে ঘোষ কি? পাখীগুলো এক জন বখার্ব শিকারীর পেটে গিয়ে ধস্ত হ’ত।’

তিনি হাসিলেন, ‘মন্দ কথা নয়। পাখীর স্বাদ তুলেই গেছি।’ তাঁহার মুখে একটা বিচিত্র হাসি খেলিয়া গেল; যেন পাখীর স্বাদ তুলিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা মিষ্ট কৌতুক লুকাইয়া আছে। হাসিটি আশ্চর্য, আমাকে দেখাইবার ইচ্ছা বোধ হয় তাঁহার ছিল না; তাই ক্ষণেক পরে সচকিত হইয়া বলিলেন, ‘তাহলে ওগুলোকে ছাড়িয়ে ফেলা যাক—কি বলেন? নরম মাংস, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে।’

তিনি অভ্যস্ত ক্ষিপ্ততার সহিত পাখী ছাড়াইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পানে তাকাইয়া বসিয়া বহিলাম। সেই পুরাতন প্রশ্নই মনে জাগিতে লাগিল—কে ইনি? লোকচক্ষুর আড়ালে লুকাইয়া শুকনো কটি খুঁইয়া জীবনযাপন করিতেছেন কেন?

এক সময় তিনি সহাস্তে মুখ তুলিয়া বলিলেন, ‘আজ একটু শীত আছে। চামড়াটা বেশ গরম মনে হচ্ছে ত?’

‘চমৎকার। আচ্ছা, আপনি অনেক দেশ ঘুরেছেন—না?’

‘হ্যাঁ।’

‘প্রশ্ন করতে সাহস হয় না, তবে সম্ভবত শিকারের জগ্রেই দেশ-বিদেশে ঘুরে বেঁটিয়েছেন?’

‘তা বলতে পারেন।’

যিনি নিজের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন তাঁহার সহিত অন্ত কথ্য বলাই ভাল। তাই ইচ্ছা করিয়া শিকারের আলোচনাই আরম্ভ করিলাম, বিশেষতঃ সাদা চামড়াটা সম্বন্ধে বেশ একটু কৌতুহলও জাগিয়াছিল।

বলিলাম, ‘শ্রামদেশে সাদা হরিণ পাওয়া যায়? কিন্তু কোথাও পড়ি নি ত?’

তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, ‘না পড়বারই কথা। ও হরিণ আর কেউ চোখে দেখে নি। চোখে দেখার জিনিষ ও নয়।’

‘কি রকম?’

‘পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্য জীব আছে—ঐ হরিণ তার মধ্যে একটি। প্রকৃতির সৃষ্টিতে এর তুলনা নেই।’

‘কি ব্যাপার বলুন ত? অবশ্য সাদা হরিণ খুবই অসাধারণ, কিন্তু—’

‘আপনি কেবল সাদা চামড়াটা দেখেছেন। আমি কিন্তু প্রকৃতি দেখেছি সম্পূর্ণ অন্তরূপে—অর্থাৎ দেখি নি বললেই হয়।’

‘আপনি যে ধাঁধা লাগিয়ে দিলেন। কিছুই বুঝতে পারছি না।’

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিলেন, ‘অদৃশ্য প্রাণীর কথা কখনও শুনেছেন?’

‘অদৃশ্য প্রাণী! সে কি?’

‘হ্যাঁ—যাদের চোখে দেখা যায় না, চোখের সামনে যারা মরীচিকার মত মিলিয়ে যায়। শ্রামদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দুর্ভেদ্য পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকায় আমি তাদের দেখেছি,—বিশ্বাস করছেন না? আমারও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, তখন ওই চামড়াটা স্পর্শ ক’রে দেখি।’

‘বড় কৌতুহল হচ্ছে; সব কথা আমায় বলবেন কি?’

তিনি একটু ধামখেয়ালি-হাসি হাসিলেন, বলিলেন, ‘বেশ;—চায়ের জল হয়ে গেছে, মাংসটা চড়িয়ে দিয়ে এই অদ্ভুত গল্প আরম্ভ করা যাবে। সময় কাটাবার পক্ষে মন্দ হবে না।’

৩

চায়ের পাত্র সম্মুখে লইয়া দু-জনে মুখোমুখি বসিলাম। এক চুমুক পান করিতেই মনে হইল শরীরের ভিতর দিয়া অত্যন্ত স্বথকর উত্তাপের একটা প্রবাহ বহিয়া গেল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেমন চা?’

বলিলাম, ‘চা নয়—নির্জ্বলা অমৃত। এবার গল্প আরম্ভ করুন।’

তিনি কিছুক্ষণ শূন্যের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু স্থতিচ্ছায়ায় আবিষ্ট হইল। তিনি ধামিয়া ধামিয়া অসংলগ্ন ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

‘গত বছর এই সময়—কিছুদিন আগেই হবে; হ্যাঁ, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আমি আর আমার এক বন্ধু পাকেচক্রে প’ড়ে বর্মার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলুম।

‘বন্ধুটির নাম জঙ্ঘ-বাহাদুর—নেপালী জঙ্গিয়। আমাদের লটবহরের মধ্যে ছিল দুটি কঙ্কল আর দুটি রাইফেল। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল তাই বেশী কিছু সঙ্গে নিতে পারি নি।

‘অনুরক্ত পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে পথঘাট সব গুলিয়ে গিয়েছিল। যেখানে মাসান্তে মাছবের মুখ দেখা যায় না, এবং শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করা বা শিকারী জঙ্ঘর দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত হওয়াই পা-চালানোর একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে স্থান-কাল ঠিক রাখা শক্ত। আমরা শুধু পূর্বমুকটাকে সামনে রেখে আর-সব ক্রীতগবানের হাতে সমর্পণ ক’রে দিয়ে চলেছিলুম। কোথায় গিয়ে এ যাত্রা শেষ হবে তার কোন টিকানা ছিল না।

‘একদিন একটা প্রকাণ্ড নদী বেতের ডোডায় ক’রে পার হয়ে গেলুম। জানতেও পারলুম না যে বর্মাকে পিছনে ফেলে আর এক রাজ্যে ঢুকে পড়েছি। জানতে অবশ্য পেরেছিলুম—কয়েক দিন পরে।

‘মেকং নদীর নাম নিশ্চয় জানেন। সেই মেকং নদী আমরা পার হলুম এমন জায়গায় যেখানে তিনটি রাজ্যের সীমানা এসে মিশেছে—পশ্চিমে বর্মার, দক্ষিণে শ্রামদেশ, আর পূর্বে ফরাসী-শাসিত আনাম। এ সব থবর কিন্তু পার হবার সময় কিছুই জানতুম না।

‘মেকং পার হয়ে আমরা নদীর ধার ঘেঁষে দক্ষিণ মুখে চললুম। এদিকে পাহাড় জঙ্ঘল গুরই মধ্যে কম, মাঝে মাঝে ছোট-একটা গ্রাম আছে। শিকারও প্রচুর। খাত্তর অভাব নেই। জঙ্ঘ-বাহাদুর এ দেশের ভাষা কিছু কিছু বোঝে, তাই রাজিকালে গ্রামে কোন গৃহস্থের ছুটরে আশ্রয় নেবার সুবিধা হয়—দুর্ভিক্ষ সীতে মাথা রাখবার জায়গা পাই।

‘বড় শহর বা গ্রাম আমরা যথাসাধ্য এড়িয়ে যেতুম। তবু একদিন ধরা প’ড়ে গেলুম। দুপুরবেলা দু-জনে একটন পাথুরে গিরিশঙ্কটের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বাঁ-দিক থেকে কর্কশ আগুয়াজে চমকে উঠে দেখি, একটা লোক পাথরের চাঙড়ের আড়ালে থেকে রাইফেল উচিয়ে আমাদের লক্ষ্য

ক’রে আছে। দিশী লোক—নাক চাপুটা খ্যারড়া মুখ কিন্তু তার পরিধানে সিপাহীর ইউনিফর্ম; গায়ে থাকি পোষাক, মাথায় জরির কাজ করা গোল টুপি, পায়ে পট্টি আর অ্যামুনিশন বুট।

‘বুঝতে বাকী রইল না যে বিপদে পড়েছি। সিপাহী সেই অবস্থাতেই বাঁশী বাজালে; দেখতে দেখতে আরও দু-জন এসে উপস্থিত হ’ল। তখন তারা আমাদের সামনে রেখে মার্চ করিয়ে নিয়ে চলল।

‘কাছেই তাদের ঘাঁটি। সেখানকার অফিসার আমাদের খানাতল্লাস করলেন, অনেক প্রশ্ন করলেন যার একটাও বুঝতে পারলুম না, তার পর বন্দুক আর টোটা বাজেরাস্ত ক’রে নিয়ে চার জন সিপাহীর জিম্মায় দিয়ে আমাদের রওনা ক’রে দিলেন।

‘মাইল-তিনেক যাবার পর দেখলুম এক শহরে এসে পৌঁছেছি। নদীর ধারেই শহরটি—খুব বড় নয়, কিন্তু ছবির মত দেখতে।

‘সিপাহীরা নদীর কিনারায় একটা বড় বাংলায় আমাদের নিয়ে হাজির করলে। এখানে শহরের সবচেয়ে বড় কর্মচারী থাকেন।

‘যথাসময়ে আমরা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম তিনি এক জন কোজী অফিসার—জাতিতে ফরাসী—বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, গায়ের রং বহুকাল গরম দেশে থেকে তামাটে হয়ে গেছে

‘তিনি ইংরেজী কিছু কিছু বলতে পারেন। আমার সঙ্গে প্রথমেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল। ফরাসীদেব মত এমন মিস্তক জাত আর আমি দেখি নি, সাদা-কালোর প্রভেদ তাদের মনে নেই। এর নাম ক্যাপ্টেন হ’বোয়া। অল্পকালের মধ্যেই তিনি আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ শুরু ক’রে দিলেন। তাঁরই মুখে প্রথম জানতে পারলুম, আমরা আনাম দেশে এসে পড়েছি, নদীর ওপারে ঐ পর্বত-বন্ধুর দেশটা শ্রামরাজ্য। মেকং নদী এই দুই রাজ্যের সীমান্ত রচনা ক’রে বয়ে গেছে।

‘আমরা কোথা থেকে আসছি, কি উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি এ সব প্রশ্নও তিনি করলেন। যথাসাধ্য সত্য উত্তর দিলুম। বললুম প্রাচ্যদেশ পদব্রজে ভ্রমণ করবার অভিপ্রায়েই বৃটিশ

রাজ্য থেকে বেরিয়েছি, পাসপোর্ট নেওয়া যে দরকার তা জানতুম না। তবে শিকার এবং দেশ-বিদেশ দেখা ছাড়া আমাদের আর কোনও অসাধু উদ্দেশ্য নেই।

‘নানাবিধ গল্প করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এইবার কাপ্তেন ছ’বোয়া করাসী শিষ্টতার চরম করলেন; আমাদের নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ জানানলেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যে তাঁর বড়ীতে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হ’ল। রাজ-পুরুষের এই অবাচিত স্বয়ংস্বত্ব আমাদের পক্ষে যেমন অভাবনীয় তেমনই অস্বস্তিকর।

‘রাত্রে অত্যাচারে ব’সে কাপ্তেন হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনারা ব্রিটিশ কোজি-রাইকেল কোথায় গেলেন ?

বললুম,—আমি ঠৌর থেকে মাঝে মাঝে পুরনো বন্দুক বিক্রী হয়, তাই কিনেছি।

কাপ্তেন আর কিছু বললেন না।

‘অনেক রাজি পর্যন্ত গল্পগুজব হ’ল। তার পর কাপ্তেন নিজেকে এসে আমাদের শোবার ঘরের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। অনেক দিন পরে নরম বিছানায় শয়ন করলুম। কিন্তু তবু ভাল ঘুম হ’ল না।

‘শেষরাত্রির দিকে জড়-বাহাদুর আমার গা তেলে চুপি চুপি বললে,—চলুন—পালাই।

আগি বললুম—আপত্তি নেই। ‘কিন্তু দরজায় শাস্ত্রী পাহারা দিচ্ছে যে।

‘জড়-বাহাদুর দরজা ফাঁক ক’রে একবার উকি মেরে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

‘ভোর হ’তে না হ’তে কাপ্তেন সাহেব নিজেকে এসে আমাদের ডেকে তুললেন। তার পর হুমিষ্ট স্বরে হুপ্রভাত জ্ঞাপন ক’রে আমাদের নদীর ধারে বাঁধাঘাটে নিয়ে গেলেন।

‘দেখলুম, কিনারায় একটি ছোট বেতের ডোঙা বাঁধা রয়েছে, আর ঘাটের শানের উপর বারো জন রাইকেলধারী সেপাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

‘কাপ্তেন আমাদের করমর্দন ক’রে বললেন,—আপনাদের সজ-স্বপ্ন পেয়ে আমার একটা দিন বড় আনন্দে কেটেছে। কিন্তু এবার আপনাদের কেতে হবে।

পরপারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—আমরা তাঁর

ঐ অংশটা বড় অন্তর্কর, এক-শ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। আপনাদের সঙ্গে খাবার দিয়েছি। রাইকেলও দিলাম, আর পাঁচটা কার্তুজ। এরই সাহায্যে আশা করি আপনারা নির্বিক্সে লোকালয়ে পৌঁছতে পারবেন। — ব’ ভোয়াজ।

‘আমি আপত্তি করতে গেলুম, তিনি হেসে বললেন,—ডোঙায় উঠুন। নদীর এপারে নামবার চেষ্টা করবেন না, তা হলে—সৈন্যদের দিকে হাত নেড়ে দেখালেন।

‘ডোঙায় গিয়ে উঠলুম, বারো জন সৈনিক বন্দুক তুলে আমাদের দিকে লক্ষ্য ক’রে রইল।

‘তীর থেকে বিশ গজ দূরে ডোঙা ঘাবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—আমাদের অপরাধ কি তাও কি জানতে পারব না ?

‘তিনি ঘাট থেকে ডাঙা-ডাঙা ইংরেজীতে বললেন,—আনামে ব্রিটিশ গুপ্তচরের স্থান নেই।

এই পর্যন্ত বলিয়া প্রমথেশ রুদ্র থামিলেন। তাঁহার মুখে ধীরে ধীরে একটি অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ‘একেই বলে দৈব বিভ্রম। কাপ্তেন ছ’বোয়া আমাদের হাতে মিলিটারি বন্দুক দেখে আমাদের ইংরেজের গোয়েন্দা মনে করেছিলেন।’

আমি বলিলাম, ‘কিন্তু ইংলণ্ড আর ফ্রান্সে ত এখন বন্দুক চলছে।’

‘হঁ—একেবারে গলাগলি ভাব। কিন্তু ওরা আজ পর্যন্ত কখনও পরস্পরকে বিশ্বাস করে নি, যত দিন চন্দ্রস্বর্গ থাকবে তত দিন করবে না। ওরা শুধু দুটো আলাদা জাত নয়, মানব-সভ্যতার দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রতীক। কিন্তু সে যাক—’ বলিয়া আবার গল্প আরম্ভ করিলেন।

‘বতকশ নদী পার হলুম, সিপাহীরা বন্দুক উচিয়ে রইল। বুঝলাম, দুটি মাত্র পথ আছে—হয় পরপার, নয় পরলোক। তৃতীয় পথ নেই।

‘পরপারেই গিয়ে নামলুম। তার পর বন্দুক আর খাবারের হাতারসাক্ কাঁধে কেলে শ্রামদেশের লোকালয়ের সন্ধানে রওনা হয়ে পড়া গেল।

‘প্রায় নদীর কিনারা থেকেই পাহাড় আরম্ভ হয়েছে। আনাম-রাজ্য এবং মেকং নদী পিছনে রেখে চড়াই উঠতে

আরম্ভ করলুম। পাহাড়ের পথ বন্ধুর ছলজ্য হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমরা পথশ্রমে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম; এই পার্বত্য ভূমি যত শীঘ্র সম্ভব পার হবার জন্তে সজোরে পা চালিয়ে দিলুম।

‘তুপুববেলা নাগাদ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলুম যেখান থেকে চারি দিকে অগণ্য নীরস পাহাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না—গাছপালা পর্যন্ত নেই, কেবল পাথর আর পাথর।

‘বিলক্ষণ ক্ষিদে পেয়েছিল। খাবারের ঝুলি নামিয়ে হু-জনে খেতে বসলুম। ঝুলি খুলে দেখি, তাক্সা খাবার কিছু নেই, কেবল কতকগুলো টিনের কোঁটা। যাহোক, যে-অবস্থায় পড়েছি তাতে টিনে-বন্ধ চালানি খাবারই বা ক’জন পায়?

‘কিন্তু টিনের লেবেল দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল—
Corned beef—গো-মাংস! পরস্পর মুখের দিকে তাকালুম। জঙ-বাহাদুর খাটি হিন্দু, কিছুক্ষণ মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল, তার পর একটা নিশ্বাস কেলে উঠে দাঁড়াল।

‘কোনও কথা হ’ল না, হু-জনে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। অখাতি টিনগুলো পিছনে পড়ে রইল।

‘তার পর আমাদের যে দুর্গতির অভিযান আরম্ভ হ’ল তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে আপনাকে দুঃখ দেব না। আকাশে একটা পাখী নেই, মাটিতে অস্ত্র জন্ত ত দূরের কথা, একটা গিরগিটি পর্যন্ত দেখতে পেলুম না। তুষার ঢাকরা শুকিয়ে গেল কিন্তু জল নেই।

‘প্রথম দিনটা এক দানা খাদ্য বা এক ফোঁটা জল পেতে গেল না। রাত্রি কাটালুম খোলা আকাশের নীচে কখন মুড়ি দিয়ে। দ্বিতীয় দিন বেলা তিন প্রহরে একটা জন্ত দেখতে পেলুম, কিন্তু এত দূরে যে, সেটা কি জন্ত তা চেনা গেল না। কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন এমন যে, মা ভগবতী ছাড়া কিছুতেই আপত্তি নেই। প্রায় তিন-শ গজ দূর থেকে তার ওপর গুলি চালানুম—কিন্তু লাগল না। মোট পাঁচটি কার্তুজ ছিল, একটি গেল।

‘সেদিন সন্ধ্যার সময় জল পেলুম। একটা পাথরের কাটল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল চুইয়ে পড়ছে, আশ বটায়

এক গুণ্ড জল ধরা যায়। জঙ-বাহাদুরের মুখ ঝামার মত কালো হয়ে গিয়েছিল; আমার মৃত্যুও যে অল্পরূপ বর্ণ ধারণ করেছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। শরীরের রক্ত তরল বস্তুর অভাবে গাঢ় হয়ে আসছিল; সেদিন জল না পেলে বোধ হয় বাঁচতুম না।

‘কিন্তু তবু শুধু জল খেয়ে খেঁচো থাকে যায় না। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছিল, মাথাও বোধ হয় আর খাতস্থ ছিল না। তৃতীয় দিনের ঘটনাগুলো একটানা দুঃস্বপ্নের মত মনে আছে। একটা লালচে রঙের ধরণাশ দেখতে পেয়ে তারই পিছনে তাড়া করেছিলুম—নিশ্চয়ই জ্ঞান ছিল না। ধরণাশটা আমাদের সঙ্গে যেন বেলা করছিল; একেবারে গালিয়েও যাচ্ছিল না, আবার বন্দুকের পাল্লার মধ্যেও ধরা দিচ্ছিল না। তার পিছনে দুটো কার্তুজ খরচ করলুম; কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে, হাতও কাঁপছে, ধরণাশটা মারতে পারলুম না।

‘সন্ধ্যাবেলা একটা লম্বা বাঁধের মত পাহাড়ের গিঠের ওপর উঠে ধরণাশ মিলিয়ে গেল। দেহে তখন আর শক্তি নেই, বন্দুকটা অসহ্য ভারি বোধ হচ্ছে; তবু আমরাও সেখানে উঠলুম। বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তখন চলছি না, একটা অন্ধ আবেগের ঝোঁকেই ধরণাশের পশ্চাদ্ভাবন করেছি। পাহাড়ের ওপর উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল, একটা সবুজ রঙের আলো চোখের সামনে বিলিক ঘেরে উঠল; তার পর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

‘বধুন মুচ্ছা ভাঙল তখন হোঁ উঠেছে। জঙ-বাহাদুর তখনও আমার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড় আছে। আর—আর সামনেই ঠিক পাহাড়ের কোলে হত দূর দৃষ্টি যায় একটি সবুজ ঘাসে-ভরা উপত্যকা। তার বৃত্ত চরে জরির ফিতের মত এষাট সূর্য পার্শ্বাত্য নদী বয়ে গেছে।

‘কিছুক্ষণ পরে জঙ-বাহাদুরের জ্ঞান হ’ল। তখন হু-জনে হু-জনে অবলম্বন করে টলতে টলতে পাহাড় থেকে নেমে সেই নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হনুম।

‘তুষা নিবারণ হ’ল। আকাশ জল খেয়ে ঘাসের ওপর অনেকক্ষণ পড়ে রইলুম। আশ্বিন এখনি চায়ের সঙ্গে অমৃতের তুলনা করছিলেন; আমরা সেদিন যে-জল খেয়েছিলুম, অমৃতও বোধ করি তাই কাছে বিশ্বাস।

‘কিন্তু সে যাক—তৃষ্ণানিবারণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার ভাবনা এসে জুটেছিল। তাকে মেটাই কি দিয়ে?’

‘আমাদের উপত্যকার চারিদিকে তাকালুম, কিন্তু কোথাও একটি পল্লী নেই। এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ যেন দলবদ্ধ হয়ে জন্মেছে, হয়ত কোন গাছে ফল ফলেছে এই আশায় উঠে বললুম—জঙ-বাহাদুর, চল দেখি, যদি গাছে কিছু পাই।

• ‘গাছে কিন্তু ফল-ফলবার সময় নয়। একটা কুলের মত কাঁটাওয়ালা গাছে ছয়টি ছোট ছোট কাঁচা ফল পেলুম। তৎক্ষণাৎ হু-জনে ভাগাভাগি করে উদরসাৎ করলুম। দারুণ টক—কিন্তু তবু খাত ত।

‘আরও ফলের সন্ধানে অল্প একটা ঝোপের দিকে চলেছি, জঙ-বাহাদুর পাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চীৎকার করে উঠল,—ঐ—ঐ দেখুন!

‘ঘাড় ফিরিয়ে দেখি—আশ্চর্য দৃশ্য! সাদা ধবধবে এক পাল হরিণ নির্ভয়ে মন্থর-পদে নদীর দিকে চলেছে। সকলের আগে একটা শৃঙ্গধর মদা হরিণ, তার পিছনে গুটি আট-দশ হরিণী। আমাদের কাছ থেকে প্রায় এক-শ গজ দূর দিয়ে তারা যাচ্ছে।

‘কিন্তু এ দৃশ্য দেখলুম মুহূর্ত্ত কালের জন্যে। জঙ-বাহাদুরের চীৎকার বোধ হয় তাদের কানে গিয়েছিল—তারা এক-সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দিকে চাইলে। তার পর এক অদ্ভুত ব্যাপার হ’ল। হরিণগুলো দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

‘হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম; তার পর চোখ রগড়ে আবার দেখলুম। কিছু নেই—রৌদ্রোজ্জ্বল উপত্যকা একেবারে শূন্য।

‘ভয় হ’ল। এ কি ভৌতিক উপত্যকা? না আমরাই ক্ষুধার মত্ততায় কাল্পনিক জীবজন্তু দেখতে স্ফারিত করেছি? মরুভূমিতে শুনেছি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উন্মাদ পাছ মুতুর আগে এমনি মায়ামূর্ত্তি দেখে থাকে। -তবে কি আমাদেরও মৃত্যু আসন্ন!

‘জঙ-বাহাদুরের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চোখ দুটো পাগলের মত বিস্ফারিত। সে ত্রাস-কম্পিত স্বরে বলে উঠল,—এ আমরা কোথায় এসেছি!—তার ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে উঠল।

‘হু-জনে একসঙ্গে ভয়ে মিশাহারা হ’লে চলবে না। আমি জঙ-বাহাদুরকে সাহস দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু বোঝাব কি? নিজেই তখন খাত ছেড়ে আসছে!

‘একটা ঘন ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসলুম। খাবার খোঁজবার উত্তমও আর ছিল না; অবসন্ন ভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

‘আধ ঘণ্টা এই ভাবে কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম; ঠিক মনে হ’ল একপাল হরিণ ক্ষুরের শব্দ ক’বে আমাদের পাশ দিয়ে দ্রুত ছুটে চলে গেল। পরক্ষণেই পিছন দিকে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের চীৎকার যেন বাতাসকে চিরে ছিন্নভিন্ন করে দিলে। ফিরে দেখি, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে প্রকাণ্ড দুর্গে খুসর রঙের নেকড়ে পাশ-পাশি দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তারা আর একবার চীৎকার করে উঠল—শিকাব ফস্কে বাঘার বার্থ গর্জন। তার পর অনিচ্ছাভরে বিপরীত মুখে চলে গেল।

অনেক দূর পর্যন্ত তাদের দেখতে পেলুম। এবার নতুন রকমের ঘোঁকা লাগল। তাই ত! নেকড়ে দুটো ত মিলিয়ে গেল না! তবে ত আমাদের চোখের ভ্রান্তি নয়। অঁখচ হরিণগুলো অমন কর্ণরের মত উবে গেল কেন? আর, এখনই যে ক্ষুরের আওয়াজ শুনেতে পেলুম, সেটাই বা কি?

‘ক্রমে বেলা দুপুর হ’ল। শরীর নেতিয়ে পড়ছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। উপত্যকা পৌছনোর প্রথম উত্তেজনা কেটে গিয়ে তিন দিনের অনশন আর ক্লান্তি দেহকে আক্রমণ করেছে। হয়ত এই ভাবে নিশ্বেজ হ’তে হ’তে ক্রমে তৈলহীন প্রাণীপের মত নিবে যাব।

‘নিবে যেতুমও, যদি না এই সময় একটি পরম বিস্ময়কর ইঙ্গাজাল আমাদের চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে আগিয়ে তুলত। অসাড় ভাবে নদীর দিকেই তাকিয়ে ছিলুম, স্বর্ঘ্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছিল। এই সময় দেখলুম নদীর কিনারায় যেন অস্পষ্ট ভাবে কি নড়ছে। গ্রীষ্মের দুপুরে তপ্ত বালির চড়ার ওপর যেমন বাষ্পের ছায়াফুল্লী উঠতে থাকে, অনেকটা সেই রকম। ক্রমে পেঙলা যেন আরও স্থূল আকার ধারণ করলে। তার পর ধীরে ধীরে একদল সাদা

হরিণ আমাদের চোখের সামনে মৃষ্টি পরিগ্রহ করে পাড়াল।

‘মুহূর্ত অবিশ্বাস ভরে চেয়ে রইলুম। এও কি সম্ভব? এরা কি সত্যিই শরীর-ধারী? তাদের দেখে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই; সাদা রোমশ গায়ে সূর্যের আলো পিছলে পড়ছে। নিশ্চিন্ত অস্কেচে তারা নদীতে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে খেলা করছে,—কেউ বা নদীর ধারের কচি বাস ছিড়ে ভূপ্তি ভরে চিবচ্ছে।

‘জঙ্ঘ-বাহাদুর কখন রাইফেল তুলে নিয়েছিল তা জানতে পারি নি, এত ভয় হয়ে দেখছিলুম। হঠাৎ কানের পাশে গুলির আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠলুম; দেখি জঙ্ঘ-বাহাদুরের হাতে রাইফেলের নল কম্পাসের কাঁটার মত ছুঁলছে। সে রাইফেল ফেলে দিয়ে বললে,—পারলাম না, ওরা মায়াবী।

‘হরিণের দল তখন আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

‘এতক্ষণে এই অদ্ভুত হরিণের রহস্য যেন কতক বুঝতে পারলুম। ওরা অশরীরী নয়, সাধারণ জীবের মত ওদেরও দেহ আছে, কিন্তু কোনও কারণে ভয় পেলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়। খানিকক্ষণ আগে ওদের নেকড়ে ভাড়া করেছিল, তখন ওদেরই অদৃশ্য পদধ্বনি আমরা শুনেছিলুম। প্রকৃতির বিধান বিচিত্র। এই পাহাড়ে-ঘেরা ছোট উপত্যকাটিতে ওরা অনাদি কাল থেকে আছে; সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জন্তুরাও আছে। তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র ওদের নেই, তাই শত্রু দেখলেই ওরা অদৃশ্য হয়ে যায়।’

বক্তা আবার থামলেন। সেই গূঢ়ার্থ হাসি আবার তাঁহার মুখে খেলিয়া গেল।

আমি মোহাম্মদের মত শুনিতেছিলাম। অলৌকিক রূপকথাকে বাস্তব আবহাওয়ার মাঝখানে স্থাপন করিলে যেমন শুনিতে হয়, গল্পটা সেইরূপ মনে হইতেছিল; বলিলাম, ‘কিন্তু এ কি সম্ভব? অর্থাৎ বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপ্রাকৃত নয় কি?’

তিনি বলিলেন, ‘দেখুন, বিজ্ঞান এখনও সৃষ্টি-সমুদ্রের কিনারায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তীরের উপলব্ধিও কুড়িয়ে ঝুলি ভরছে—সমুদ্রে ডুব দিতে পারে নি। তাছাড়া, অপ্রাকৃতই বা কি করে বলি? ক্যামিলিয়ন নামে একটা জন্তু আছে,

সে ইচ্ছামত নিজের দেহের রং বদলাতে পারে। প্রকৃতি আত্মরক্ষার জন্য তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। বেশী দূর যাবার দরকার নেই, আশ্রয় যে আপনি হারিয়াল মেরেছেন তাদের কথাই ধরুন না। হারিয়াল একবার গাছে বসলে আর তাদের দেখতে পান কি?’

বলিলাম, ‘তা পাই না বটে। গাছের পাতার সঙ্গে তাদের গায়ে রং মিশে যায়।’

তিনি বলিলেন, ‘তবেই দেখুন, সেও ত এক রকম অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এই হরিণের অদৃশ্য হওয়া বড়জোর তার চেয়ে এক ধাপ উচুতে।’

‘তার পর বলুন।’

‘ব্যাপারটা মোটামুটি বকম বকম নিয়ে জঙ্ঘ-বাহাদুরকে বললুম,—ভয় নেই জঙ্ঘ-বাহাদুর, ওরা মায়াবী নয়। বরং আমাদের বৈচে থাকবার একমাত্র উপায়।

‘একটি মাত্র কার্তুজ তখন অবশিষ্ট আছে—এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথের শেষ পাথেয়। এট যদি ক্ষতায় তাহলে অনশনে মৃত্যু কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

‘টোটা রাইফেলে গুলে বোম্বের মধ্যে লুকিয়ে বসে রইলুম—হয়ত তারা আবার এখানে আসবে জল খেতে। কিন্তু যদি না আসে? দু-বার এইখানেই ভয় পেয়েছে—না আসতেও পারে।

‘দিন ক্রমে ফুরিয়ে এল; সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। জঙ্ঘ-বাহাদুর কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে বসে আছে; আমি প্রাণপণ শক্তিতে নিরাশা আর অবসাদকে দূরে ঠেলে রেখে প্রতীক্ষা করছি।

‘নদীর জলের ঝকঝকে রূপালী ৭৭ মলিন হয়ে এল, কিন্তু হরিণের দেখা নেই। নিরাশাকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছি না। তারা সত্যিই পালিয়েছে, আর আসবে না।

‘কিন্তু প্রকৃতির বিধানে একটা সমঞ্জস্য আছে,—এমার্সন যাকে law of compensation বলেছেন। এক দিক দিয়ে প্রকৃতি যদি কিছু কম দিয়ে ফেলেন, অন্য দিক দিয়ে অমনি তা পূরণ করে দেন। এই হরিণজাতিকে তিনি বৃষ্টি কম দিয়েছেন বলেই বোধ হয় এমন অসংখ্য আত্মরক্ষার উপায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দান করেছেন। অন্ধকার হ’তে আর দেরি

নেই এমন সময় তারা আবার ঠিক সেই জায়গায় এসে আবিভূত হ'ল।

‘তাদের দেখে আমার বুক ভীষণ ভাবে ধরাস ধরাস করতে লাগল। তারা আগের মতই দলবদ্ধ হয়ে এসেছে—তেমনই স্বচ্ছন্দ মনে ঘাস খাচ্ছে—খেলা করছে। আমি রাইফেলটা তুলে নিলাম। পাল্লা বড়জোর পঁচাত্তর গজ, রাইফেলের পক্ষে কিছুই নয়; তবু হাত কাঁপছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না এই শেষ কার্ডুজ—

‘নিজের রাইফেলের আঁগুয়াজে নিজেই চমকে উঠলুম। একটা হরিণ খাড়া উঁচু দিকে লাফিয়ে উঠল—তার পর আবার সমস্ত দল ছায়াবাজির মত মিলিয়ে গেল।

‘শেষ কার্ডুজও ব্যর্থ হ'ল! পক্ষাবতগ্রস্ত অসাড় মন নিয়ে কিছুক্ষণ ব'সে রইলুম। তার পর আশ্বে আশ্বে চেতনা ফিরে এল। মনে হ'ল, যেখানে হরিণগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে একগুচ্ছ লম্বা ঘাস আপনা-আপনি নড়ছে।

‘কি হ'ল! তবে কি—? ধুকতে ধুকতে দু-জনে সেখানে গেলুম।

‘বাতাস বইছে না, কিন্তু তবু ঘাসগুলো নড়ছে—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের নড়াচ্ছে। ক্রমে ঘাসেব আন্দোলন কমে এল। তার পর ছায়ার মত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল—চারটি হরিণের স্ক্র।

‘মরেছে! মরেছে!—জড়-বাহাদুর ভাড়া গলায় চীৎকার করে উঠল। আমি তখন পাগলের মত ঘাসের উপর নৃত্য শুরু করে দিয়েছি। একটা নিরীহ ভীকু প্রাণীকে হত্যা করে এমন উৎকট আনন্দ কখনও অনুভব করি নি।

‘পনব মিনিটের মধ্যে মৃত হরিণের দেহটি পরিপূর্ণ দেখা গেল। মৃত্যু এসে তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের চোখের সামনে প্রকট করে দিলে।...

‘তারই চামড়ার ওপর আপনি আজ ব'সে আছেন।’

তাহার গল্প হঠাৎ শেষ হইয়া গেল।

আমি বলিলাম, ‘তার পর?’

তিনি বলিলেন, ‘তার পর আর কি—শূন্য মাংস পেয়ে প্রাণ বাঁচালুম। সাত দিন পরে সেই উপত্যকার গাভী পার হয়ে লোকালয়ে পৌঁছলাম। তার পর দু-মাস একদিনক্রমে

হেঁটে এক দিন ব্যাঙ্ক শহরে পদার্পণ করা গেল। সেখান থেকে জড়-বাহাদুর চীনের জাহাজে চড়ল; আর আমি—; মাংসটা বোধ হয় তৈরি হ'য়ে গেছে।’

৪

আহার শেষ করিয়া যখন এই ভাড়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

বন্ধু আমার সঙ্গে চলিলেন। টর্চ জালিলেন না, অন্ধকারে আমার বাইকের একটা হাতল ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন।

প্রায় দশ মিনিট নীরবে চলিয়াছি। কোন্ দিকে চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই; মনে হইতেছে যে-পথে আসিয়াছিলাম সে পথে ফিরিতেছি না।

হঠাৎ বন্ধু বলিলেন, ‘আজ সন্ধ্যাটা আমার বড় ভাল কাটল।’

আমি বলিলাম, ‘আপনার—না আমার?’

‘আমার। মাংসখানেকের মধ্যে মন খুলে কথা কইবার সুযোগ পাই নি।’

আরও পনের মিনিট নিঃশব্দে চলিলাম। তার পর তিনি আমার হাতে টর্চ দিয়া বলিলেন, ‘পাকা রাস্তায় পৌঁছে গেছেন, এখান থেকে সহজেই বাড়ী ফিরতে পারবেন। এবার বিদায়। আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না।’

আমি বলিলাম, ‘সে কি! আমি আবার আসব। অন্তত আপনার টর্চটা ফেরত দিতে হবে ত।’

‘আসার দরকার নেই। এলেও আমার আস্তানা খুঁজে পাবেন না। টর্চ আপনার কাছেই থাক—একটা সন্ধ্যায় স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই চ'লে যাব।’

‘কোথায় যাবেন?’

তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ‘তা জানি না। হয়ত আবার ভ্রামদেশে যাব। এবার একটা জীবন্ত হরিণ ধ'রে আনবার চেষ্টা করব—কি বলেন?’

‘বেশ ত। কিন্তু—আর আমাদের দেখা হবে না?’

‘সম্ভব নয়। আচ্ছা—বিদায়।’

‘বিদায়। দুর্দিনের বন্ধু—নমস্কার।’

কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া টর্চ জ্বালিলাম—
দেখিলাম, তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছেন।

* * *

কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল না, আর একবার
দেখা হইল। দিন-সাতেক পরে একদিন রাত্রি সাতটার
ট্রেনে আমার এক আত্মীয়কে তুলিয়া দিতে স্টেশনে গিয়াছি—
অকস্মাৎ তাঁহার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া গেল।

‘একি! আপনি!’

তাঁহার মাথায় একটা কান-ঢাকা টুপি; গায়ে সেই সোয়েটার
ও লুঙ্গি। একটু হাসিয়া বলিলেন, ‘খাচ্ছি।’

এই সময় ঘণ্টা বাজিল। স্টেশনে ভীড় ছিল; এক জন
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী প্রফাও পোর্টলাইন্ড পিছন হইতে
আমাকে থাক্কা মারিল। তাল সামলাইয়া কিরিয়া দেখি—
বন্ধু নাই।

বিস্মিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাইতেছি—দেখি আমাদের
শশাঙ্ক বাবু আসিতেছেন। পুলিশের ডি-এস-পি হইলেও
লোকটি মিশুক। পরিচয় ছিল, এড়াইতে পারিলাম
না; জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কি খবর? আপনি কোথায়
চলেছেন?’

‘বাব না কোথাও। স্টেশনে বেড়াতে এসেছি’—বলিয়া
যুহু হাস্তে তিনি অত্র দিকে চলিয়া গেলেন।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়া গিয়াছিল। তবু বন্ধুকে
চারিদিকে খুঁজিলাম; কিন্তু এই দুই মিনিটের মধ্যে তিনি

তাঁহার মান্নামুগের মতই এমন অবস্থায় হইয়াছিলেন যে, আর
তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

তার পর হইতে এই এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে দেখি
নাই; আর কখনও দেখিব কিনা—জানি না।

* * *

গল্প-সাহিত্যের আইন-কানুন অনুসারে এ কাহিনী বোধ
হয় বহুপূর্বেই শেষ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। বস্তুত, মান্নামুগ-
হরিণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, ‘খান
ভানিতে শিবের গীতই’ বেশী গাহিয়ছি; গল্পের চেয়ে গল্পের
বক্তাব কথাই বেশী বলিয়াছি। আমি প্রথিতযশা কথা-শিল্পী
নই, এইটুকুই বা রক্ষা, নহিলে লক্ষ্য রাখিবার আর স্থান
থাকিত না।

যা হোক, আইন-ভঙ্গ যখন হইয়াই গিয়াছে তখন আর
একটু বলিব। এই কাহিনী লেখা সমাপ্ত করিবার পর একটি
চিঠি পাইয়াছি, সেই চিঠিখানি উপসংহার-স্বরূপ এই সঙ্গে বোগ
করিয়া দিলাম—

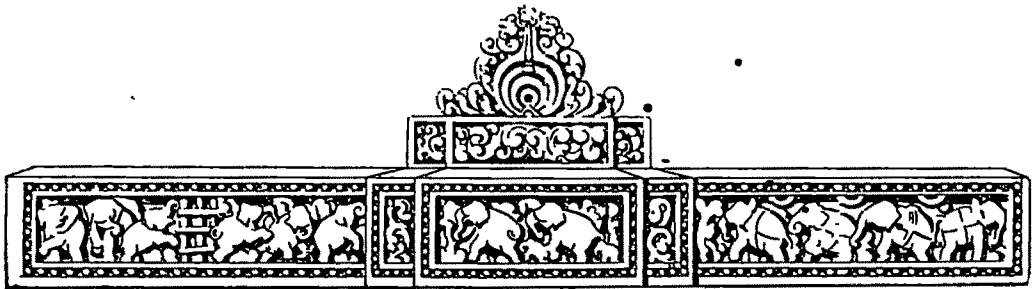
প্রীতিনিগ্নেয়,

আমাকে বোধ হয় ভোলেন নাই। শ্রামদেশে গিয়াছিলাম,
কিন্তু সে-হরিণ ধরিয়া আনিতে পারি নাই। বন্দী-দশায়
উদ্ধার বাঁচেন না—না খাইয়া মরিয়া যায়।

ইতি—

শ্রীপ্রমথেশ কল্ল

চিঠিতে তারিখ বা ঠিকানা নাই। পোষ্ট-অফিসের
মোহরও এমন অস্পষ্ট যে কিছু পড়া যায় না।



নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার

শ্রীমদ্রামপ্রসাদ চন্দ

বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের দাবী অমূলক প্রমাণ কবিত্বের
• জন্ম, এবং এই উদ্দেশ্যে কোর্টে যে সকল দলীলপত্র দাখিল
করা হইয়াছিল তাহা তজ্জদিক (মৌলিক প্রমাণ) করাইবার
জন্ম প্রতিবাদী রামমোহন রায়কে অনেক সাক্ষী মাত্র
করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পক্ষে এই দশ জন সাক্ষীর
জবানবন্দী হইয়াছিল—

(১) গুরুপ্রসাদ রায়। রামকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠ ভাই
নিমানন্দ রায়ের পুত্র। জবানবন্দীর সময় (১৮১৮ সালের ১লা
অক্টোবর) ইহার বয়স প্রায় ৪৭ বৎসর ছিল। ১৭৭২ সালে
জন্ম ধরিলে এই সময়ে রামমোহন রায়ের বয়স ঠাড়া
৪৬ বৎসর, অর্থাৎ গুরুপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের
প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। প্রশ্নমালার (interrogatories)
শেষভাগে লিখিত হলপের বিবরণে দেখা যায়, গুরুপ্রসাদ
রায় প্রচলিত রীতিতে হলপ করিয়াছিলেন; রামতনু রায়,
গুরুদাস মুখোপাধ্যায়, গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং
নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের মত স্বতন্ত্র রীতিতে হলপ করেন
নাই; অর্থাৎ গুরুপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের আত্মীয়
সভায় প্রচলিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

(২) রামতনু রায়। রামকান্ত রায়ের আর এক
ভাই, গোপীমোহন রায়ের পুত্র। বয়সে রামমোহন রায়ের
অপেক্ষা সাত-আট বৎসরের ছোট। ইনি এক সময় তমনুকের
নিয়ক মহালের দেওয়ান ছিলেন। ইনি স্বতন্ত্র রীতিতে
হলপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রামমোহন রায়ের ধর্মমত
গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। রামমোহন রায়ের
ভাগিনেয়। জবানবন্দীর সময় (১৮১৯ সালের ৩০শে এপ্রিল)
বয়স প্রায় ৩২ বৎসর ছিল। ইহার সম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব
পূর্ব প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে। হলপের রীতি হইতে দেখা
যায় ইনি মাতুলের শিষ্য হইয়াছিলেন।

এই তিন জন সাক্ষী রাধানগরের এবং লাঙ্গুড়পাড়ার
রায়-পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন।

(৪) রাজীবলোচন রায়। জবানবন্দী দেওয়ার সময়
(১৮১৯ সালের ২০শে এপ্রিল) বয়স পঞ্চাশ বৎসর কিম্বা
ততোধিক ছিল। রাজীবলোচন রায় বলিয়াছেন, ত্রিশ বৎসর
যাবৎ, অর্থাৎ রামমোহন রায়ের বয়স যখন ১৬।১৭ বৎসর
তদবধি তিনি তাঁহাকে চেনেন। ত্রিশ বৎসর এখানে
মোটামুটি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ষোল বৎসর বয়সের
সময় রামমোহন বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; স্মরণ্য
মনে করিতে হইবে তাহার পূর্বাধি, অর্থাৎ আশৈশব,
রাজীবলোচন রামমোহন রায়কে চিনিতে। রামমোহন
রায়ের বৈষয়িক জীবনের সহিত রাজীবলোচন রায় বিশেষ
ভাবে জড়িত ছিলেন এই কথা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে উক্ত
হইয়াছে। রাজীবলোচন রায় প্রচলিত রীতি অল্পসারে
হলপ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি গুরুপ্রসাদ রায়ের মত
রামমোহন রায়ের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

(৫) গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। জবানবন্দী দেওয়ার
সময় (১৮১৮ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর) ইহার বয়স ছিল
প্রায় ৩২ বৎসর। ১২০৮ সনে (১৮০১-২ সালে)
গোপীমোহন রামমোহন রায়ের তহবীলদার (খাজাঞ্চী)
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হলপের রীতি হইতে দেখা যায়
ইনি রামমোহন রায়ের শিষ্য হইয়াছিলেন।

এই পাঁচ জন প্রধান সাক্ষী। অপর পাঁচ জন সাক্ষী
কোর্টে দাখিল করা দলীলে নিজের বা অপরের স্বাক্ষর এবং
হস্তাক্ষর তজ্জদিক করিয়াছেন বা প্রতিবাদীর দুই-একটি
কথা সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। ইহাদের মধ্যে বিশেষ
উল্লেখযোগ্য নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। ১২০৬ সনের ৭ই পৌষ
রাজীবলোচন রায় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের নামে গোবিন্দপুর
এবং রামেশ্বরপুর তালুক সম্বন্ধে যে একরারনামা সম্পাদন

করিয়াছিলেন, এবং ১৮১২ সালের ১৪ই জাহ্নয়ারী গুরুদাস মুখোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের বরাবরে এই দুই খানি তালুকের যে কবালা সম্পাদন করিয়াছিলেন, এই দুই খানি দলীলেই নন্দকুমার শর্মা বা বিদ্যালঙ্কার সাক্ষী আছেন। এই দুই খানি দলীলের সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর স্বীকার করিবার জন্য নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার জবানবন্দী দিয়াছেন। এই মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রামমোহন রায়ের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। রামমোহন রায়ের বৈয়াক্ষিক জীবন-চরিতে বোন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নাই, এবং তিনি নিজেও বৈয়াক্ষিক ব্যাপারে বিশেষ লিপ্ত ছিলেন না, রাজীবলোচন রায় তাঁহার বিষয়বস্তু পরিচালন করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের ধর্মজীবন বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যময়। নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জবানবন্দীতে একটি উক্তি আছে যাহা রামমোহন রায়ের ধর্মজীবনের দ্বারা ব্যুৎপত্তি বিশেষ সহায়তা করে। আবার সংক্ষেপে মোকদ্দমাব নিষ্পত্তি বিবরণ প্রদান করিয়া এই উক্তিটির আলোচনা করিব।

১৮১২ সালের ১৪ই মে প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের পক্ষের শেষ সাক্ষী যশোদানন্দন ঘোষের জবানবন্দী হইয়া গেলে, ২৭শে মে প্রতিবাদীর ব্যারিষ্টার আবেদন করিয়াছিলেন, মোকদ্দমায় গৃহীত জবানবন্দী এবং প্রমাণ প্রকাশিত করা হউক। ইহার অর্থ, উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী বন্ধ করিয়া সওয়াল জবাবের দিন ধার্য করা হউক তখন যেন বাদী গোবিন্দপ্রসাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ১১ই জুন একিডেবিট করিলেন, তাঁহার পক্ষের দরকারী সাক্ষীগণকে হাজির করিবার জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হউক। তদবধি ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোকদ্দমার ইতিহাস “গোবিন্দপ্রসাদের দাবী” নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।* ২৪শে আগষ্ট গোবিন্দপ্রসাদ বায় পপার রূপে সরকারী খরচে মোকদ্দমা চালাইবার অহুমতি চাহিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই প্রার্থনাও নাবজ্বর হইয়াছিল। তার পর কি ঘটনাছিল তাহা সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ট্রেট, এবং বিচারপতি

স্যার ফ্রানসিস ম্যাকজানটেন এবং স্যার আর্চবিশপ ব্লায়ের রায়ে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

“This cause coming on this day to be heard and debated before the Court in the presence of Counsel learned for the Defendant and no person appearing for the Complainant, etc.”

এই স্তন্যনীর তারিখ ১৮১৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবার। বাদীপক্ষের কেহ তখন কোর্টে হাজির ছিল না। প্রতিবাদী পক্ষের ব্যারিষ্টার আসিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তার পর রায়ে বাদীর আর্জির এবং প্রতিবাদীর জবাবের সার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং উপসহারে বলা হইয়াছে—

Whereas after the filing of the said answer and issue joined thereon and examination of witnesses had and publication passed and upon reading Subpoena to hear Judgment which issued on the 6th day of October in the year of our Lord one thousand eight hundred and nineteen and an affidavit of Gorauchund Doss sworn this 25th day of October last of the due service thereof and upon reading the office copy of an order of this Court made in this cause on the 20th day July last past and upon hearing what was alleged by the advocates for the Defendants. This Court doth think fit to adjudge Order and Decree and doth adjudge Order and Decree that the said Bill of Complaint of the said Complainant in this cause do stand absolutely dismissed out of and from this Court with costs.

এখানে বাদী গোবিন্দপ্রসাদের দাবী সম্পূর্ণরূপে ডিসমিস করা হইয়াছে, এবং প্রতিবাদীর খরচের ভার বাদীর স্বন্ধে চাপান হইয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের যবোত্তর জীবনের অনেক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত পাওয়া যায় বলিয়া আমরা গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের অনীত মোকদ্দমার কাগজপত্র বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলাম। এই আড়াই বৎসর ন্যাপী মোকদ্দমার বা সর্বস্ব লইয়া টানাটানির ফলে রামমোহন রায় কলিকাতা আসিয়া যে বিখ্যাত যন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—যে প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহান কোন ব্যাঘাত ঘটনাছিল কিনা তাহা এখন আলোচ্য। ১৭৬৯ শকের (১৮৪৭ সালের) আশ্বিন মাসের ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত “ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ” নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

ইতিমধ্যে ১৭৩৯ শকে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রমপ্রীমকোট বিচাৰালয়ে অভিযোগ করেন ইহাতে তিনি প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিরত থাকিতে জ্ঞানচর্চা জন্ত তাঁহার ডিল মাত্র অবকাশ ছিল না। আত্মীয় সভা পর্য্যন্ত আর হইত ন। পবিত্র তিনি সেই অজ্ঞার অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্বার স্তা আবৃত্ত করিলেন।*

মোকদ্দমা লইয়া রামমোহন রায় যে বিরক্ত ছিলেন মোকদ্দমার নথীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হয়ত আত্মীয় সভার অধিবেশনের ব্যবস্থা করা তখন অস্ববিধাজনক হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানচর্চার জন্ত তাঁহার ডিল মাত্র অবকাশ ছিল না একথা সত্য নহে। ১৮১৭ হইতে ১৮১৯ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায় যে সকল ইংরেজী এবং বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহাদের ক্কা হিসাব করিলে মনে হয়, এই সময় তাঁহার জ্ঞান-চর্চার অবকাশ যেন পূর্ণাঙ্গাৎ বাড়াইয়াছিল। ১৮১৭ সালের ২৩শে জুন গোবিন্দ-প্রসাদ রায়ের আর্জি দাখিল করা হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ব্যারিষ্টার কম্পটন সাহেব জবাব দাখিল করিবার জন্ত প্রথমতঃ এক মাস সময় চাহিয়াছিলেন। জবাব প্রস্তুত করিবার জন্ত নানাবিধ কাগজপত্র এবং দলীল অমুদ্রিত করিতে সময় লাগিতেছে বলিয়া ২৯শে আগষ্ট রামমোহন রায়ের পক্ষ হইতে পুনরায় তিন সপ্তাহের সময় চাওয়া হইয়াছিল। এই তিন সপ্তাহ পরে, ২৪শে সেপ্টেম্বর, জবাব দাখিল করিবার জন্ত আরও আট দিনের সময় লওয়া হইয়াছিল, এবং অবশেষে ৪ঠা অক্টোবর জবাব দাখিল করা হইয়াছিল। অতঃপর জবাব প্রস্তুত করিবার জন্ত রামমোহন রায় যে বিরত হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু যখন জবাবের মোসাবিদা চলিতেছিল সেই সময়ে, ১২২৪ সনের ১৩ই ভাদ্র (১৮১৭ সালের ৩০শে আগষ্ট) বাংলা অহুবাদসহ কঠোপনিষৎ, এবং জবাব দাখিলের পর দিন, ২১শে আশ্বিন (এই অক্টোবর), মাণ্ডুক্যোপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুই খানি গ্রন্থ আকারে ছোট হইলেও, মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকার গুরুত্ব অত্যধিক। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত ঈশোপনিষদের ভূমিকায় পৌত্তলিকত্বের তীব্র আক্রমণ করিয়া রামমোহন রায় দেশে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রচলিত উপাসনা-রীতিনীতির

বিধান করিয়া মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় তিনি ব্রহ্মোপাসনার রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই উপাসনা রীতিতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। এই ব্রহ্মোপাসনা রীতির আকর শব্বরের ব্যাখ্যাত দশোপনিষৎ। এই সকল উপনিষদে পরস্পরবিরোধী মতও রহিয়াছে। এই বিরোধের মীমাংসার জন্ত বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা দর্শন সৃষ্ট হইয়াছিল। বর্তমানে বাদরায়ণের বেদান্তসূত্র বা উত্তরমীমাংসা প্রচলিত আছে। বাদরায়ণের সূত্রে দেখা যায়, এক সময়ে জৈমিনি প্রভৃতি অজ্ঞাত মূনির রচিত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রও প্রচলিত ছিল। বাদরায়ণ জানে স্থানে স্থানে তাঁহাদের মত উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আবশ্যকমত খণ্ডনও করিয়াছেন। বাদরায়ণের বেদান্ত-সূত্রের শব্বর রূত ভাষা এবং অজ্ঞাত অনেক ভাষা আছে। রামমোহন রায় উপনিষদের মর্ম্ম সম্বন্ধে বাদরায়ণের এবং শব্বরের অমুগত ছিলেন। কিন্তু তদতিরিক্ত তিনি বুদ্ধির বিবেচনার অমুসরণ করাও কর্তব্য বোধ করিতেন। বেদান্ত-সারের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

“বেদেব প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হইলেন।”

বুদ্ধির বিবেচনা অমুসারে উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে রামমোহন রায় বাদরায়ণের এবং শব্বরের দুইটি উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। একটা সম্ম্যাস। বাদরায়ণ এবং শব্বর উভয়ের মতেই সম্ম্যাস গ্রহণ না করিলে অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান এবং মুক্তি লাভ করা যায় না। দ্বিতীয়, আসন করিয়া যোগাভ্যাস। ছান্দোগ উপনিষদের উপসংহার ভাগের উপর নির্ভর করিয়া, গৃহস্থের পক্ষে যে মোক্ষলাভ করা সম্ভব, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশের যে অধিকার আছে, এই মত তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা কেবল গ্রন্থচর্চার ফল নহে, বুদ্ধির দীর্ঘ বিবেচনার ফল। গোবিন্দপ্রসাদের আর্জির জবাবের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায় এই নব উপাসনারীতি পরিচিন্তনে রত ছিলেন।

মোকদ্দমা যখন রীতিমত চলিতেছিল তখন, ১৮১৮ সালে, রামমোহন রায় বাংলায় এবং ইংরেজীতে “সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের প্রথম সংবাদ” প্রকাশিত করিয়া

আর একটি গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সহমরণ-বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮১২ সালে। গোবিন্দপ্রসাদের যৌকন্দমার সময় রামমোহন রায়ের এই সকল কার্যকলাপের প্রতি দৃকপাত করিলে মনে হয়, তিনি যেন তখনও ধর্মসংস্কার এবং সমাজসংস্কার কার্যেই বিব্রত। তাঁহার যেন আর কোন গুরুতব কার্য নাই। এইরূপ অবিচলিত এবং অপ্রান্ত ভাবে বিষয়াতিরিক্ত মহত্তর কর্তব্য পালনের নাম সাধনা। রামমোহন রায় কিশোর বয়স হইতে সাধবোচিত শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন, এবং চিরজীবন সাধনেন্দ্ৰ রত ছিলেন। এই সংবাদের আভাস পাওয়া যায় নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জবানবন্দীতে। তিনি বলিয়াছেন—

To the Second Interrogatory this Deponent saith that he doth know the parties the Complainant and defendant in the title of these interrogatories named saith that he hath known the said Complainant Govindpersaud Roy from his the said Govindpersaud Roy's childhood but he hath never been upon terms of intimacy with the said Complainant. Saith that he hath known the Defendant Rammohun Roy from the time that the said Defendant attained the age of fourteen years and hath ever since been on the most intimate terms with him.

অর্থাৎ সাক্ষী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার বাদী গোবিন্দপ্রসাদ রায়কে আশৈশব জানেন, কিন্তু বাদীর সহিত তাঁহার কখনও মিশামিশি হয় নাই। সাক্ষী প্রতিবাদী রামমোহন রায়কে তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে জানেন। সেই অবধি রামমোহন রায়ের সহিত বরাবর তাঁহার খুব মিশামিশি চলিয়াছে।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের লাজুলপাড়ার রায় পরিবারের আভ্যন্তরীণ অনেক খবরই জানিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু জবানবন্দীর সময় সে সকল বিষয়ে তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই, এবং তিনিও কোন কথা বলেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয়, তিনি সাধন ভঞ্জে এত ব্যস্ত এবং রামমোহন রায়ের এবং তাঁহার পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে বরাবর এত উদাসীন ছিলেন, যে তাঁহার নিকট কোন সঠিক খবর পাওয়ার আশা ছিল না। জবানবন্দী দেওয়ার সময় (১৮১২ সালের ২৪শে এপ্রিল) তাঁহার বয়স ছিল ৫৬ বৎসর বা তাঁহার কাছাকাছি (or there-

abouts)। সুতরাং ১৭৬৩ সালে নন্দকুমারের জন্ম ধরা যাইতে পারে। ১৭৭২ সালের মে মাসে রামমোহন রায়ের জন্ম ধরিলে নন্দকুমার বয়সে রামমোহনের ২ বৎসরের বড় হইবেন। এই হিসাবে রামমোহন চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন ১৭৮৬ সালে। তখন নন্দকুমারের বয়স ২৩ বৎসর। সুবক নন্দকুমারের সহিত কিশোর রামমোহনের তখন কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল? উপরে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রবন্ধে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি রাজ্যার সন্নিধানে ছায়াবৎ অদ্রুগত ছিলেন। রামমোহন রায় যখন কলিকাতায় (১৮১৪-১৮২২) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন এখানে তখনকার কথা বলা হইয়াছে। ১৭৬৭ সালের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত “মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগিনের জীবনবৃত্তান্ত” প্রবন্ধে (১৬৫ পৃঃ) নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সম্বন্ধে এই সংবাদ পাওয়া যায়—

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগিন ১৭০৭ শকের ২৯শে মাদ বুধবাৰে পাঙ্গাপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, তিনি পার্শ্বস্থ আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসাঙ্গম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন; *

পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী সশ পর্ধ্যটন করতঃ রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরীর দেওয়ান বাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্রচর্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদপ্রযুক্ত তীর্থস্বামীকে মহাসমাদরপূর্বক আহ্বান করিলেন। স্বভাবতঃ গাঢ় জ্ঞানৈষণা ও স্বদেশের মঙ্গলাভিলাষে শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় বিষয়কর্ত্তে জড়িত থাকিতে অসম্মত হইয়া রঙ্গপুরের কর্ত্ত পবিত্যাগপূর্বক তীর্থস্বামীতে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন।*

এই লেখা পাঠ করিলে মনে হয়, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্যে এই মূল্যবান প্রবন্ধে একটি নকল পাইয়াছি এবং তাহা মূলের সহিত মিলাইয়া লইয়াছি।

সহিত রামমোহন রায়ের প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল রংপুরে ১৮০২ সালের শেষ ভাগে বা তাহার পরে। ১২০৬ সনের ৭ই পৌষ (১৮০৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী) রাজীবলোচন রায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর তালুক সম্বন্ধে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের বরাবরে যে একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে একজন সাক্ষী শ্রীমদকুমার শর্মা সাং বঘুনাথপুর। এই মলীল হয় কলিকাতায় না-হয় বর্দ্ধমানে সম্পাদিত হইয়াছিল। এই নন্দকুমার শর্মা যে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী) তাহা তিনি জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছেন। হুতবাং মনে করিতে হইবে, এই সময়ও নন্দকুমারের বিদ্যালঙ্কার রামমোহন রায়ের সঙ্গে ছিলেন। উভয়ের মধ্যে এই সঙ্কলিপ্যার বীজ রামমোহন রায়ের চৌদ্ধ বৎসর বয়সের প্রথম মিলনের সময়ই বপন করা হইয়াছিল। আমি কোন কোন সন্ন্যাসীর এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, প্রবাদ আছে, হরিহরানন্দনাথ রামমোহন রায়ের গুরু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ থাক আর না থাক, এক সময়ে যে রামমোহন রায়ের উপর বয়োজ্যেষ্ঠ হরিহরানন্দনাথের বিশেষ প্রভাব ছিল এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগের সাধন রীতির পরিচয় লাভ করিতে হইলে, নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সাধনরীতি আলোচনা করা কর্তব্য। তাহার হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী উপাধি হইতে বুঝা যায়, তিনি শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী বা দণ্ডী ছিলেন। এই সম্প্রদায় বেদান্তপন্থী; হুতরাং নন্দকুমারও বৈদান্তিক ছিলেন। তাহার উপরে তিনি কুলাবধূত ছিলেন। সংস্কৃত অভিধানে অবধূত শব্দের অর্থ বিষয়ে এই দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

যে বিলম্বপ্রাপ্তানু বর্ণনাসম্প্রভে স্থিতঃ পূমান্।

অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।

অক্ষরখ্যাং ববেণ্যখ্যাং ধূতঃ সসারঃ বংধনাং।

তত্ত্বমন্ত্রার্থ সিদ্ধবাদবধূতোহভিবীৰ্য্যতে।

“যে ব্যক্তি চতুর্বাশ্রমধর্ম এবং বর্ণধর্ম অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার স্থিতি লাভ করিয়াছেন, সেই অতিবর্ণাশ্রমী যোগীকে অবধূত বলে।

“তিনি অক্ষর পুরুষ স্বরূপ, বরণীয় সংসারবন্ধন মুক্ত এবং তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ অল্পভব কবিয়াছেন বলিয়া (তাহাকে) অবধূত বলে।”

নন্দকুমার কেবল অবধূত বা অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য হইতেন না, তিনি “কুলাবধূত” অর্থাৎ কুলাচারী অবধূত ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য, তিনি তান্ত্রিক কুলাচার অনুসারে অর্ধেত ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকৃত “তন্ত্রসার” নামক প্রমাণ্য তান্ত্রিক নিবন্ধে কুলাচার বা বামাচার বা বীরাচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এদেশের মানুষ পরলোকে সুখলাভের বা জন্মজন্মবৃত্তার হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য ঋজু-কুটিল নানা প্রকার পথের, নানা প্রকার শর্ট কাটের (short cut), অনুসন্ধান করিয়াছে। ইন্দ্রিয় জয় এবং চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি লাভ করা যায় না। কুলাচার ইন্দ্রিয় জয় এবং চিত্তস্থির করিবার একটি শর্ট কাট বলিয়া গণ্য। তবে যে নন্দকুমার সন্ন্যাস গ্রহণ এবং কুলাচাৰ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তবে যে দিন চৌদ্ধ বৎসর বয়স্ক রামমোহনের সহিত তাহার প্রথম মিলন ঘটিয়াছিল, সেই দিন তাঁহার আশ্রম যাহাই হউক, সাধন রীতি কুলাচার-মুখী ছিল এমন অস্বাভাবিক করা যাইতে পারে। বালক রামমোহনও একান্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। ১৬৬৮ শকের বৈশাখ (১৮৪৬ সালের এপ্রিল) মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় “রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্তে” লিখিত হইয়াছে—

“প্রথমে তিনি (রামমোহন) বৈষ্ণবধর্ম অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন, তাহাতে তাহার এমত ভক্তি ছিল যে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না কবিয়া জল গ্রহণ কবিতেন না। কিন্তু রামমোহন রায়ের বুদ্ধি ইহাতে কতকাল অভিজ্ঞত খাটিতে পারে? তিনি আবহি ভাষায় ইউক্লিড ও এরিস্টটল নামক দুই পণ্ডিতের গ্রন্থ অধ্যয়ন কবাতো বুদ্ধি বিশেষ প্রার্থ্য হইল এবং তদবধি তিনি ধর্মের সত্যাসত্য বিবেচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনা কবিয়া দেখিলেন যে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম তৎকালের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়াছে” (১ পৃঃ)।

সংক্ষেপ জীবনবৃত্তান্তলেখক কোথা হইতে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। ডাক্তার কার্পেন্টার ও এরিস্টটলের এবং ইউক্লিডের আরবী

অল্পবয়স পড়ার কথা লিখিয়াছেন।* এই সকল সংবাদের মধ্যে কোনটুকু সত্য তাহা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া এই পর্য্যন্ত নিরাপদে বলা যাইতে পারে—রামমোহন আশৈশব ধর্মনিষ্ঠ এবং বিচারনিষ্ঠ ছিলেন। এমন সময় নন্দকুমার বিজ্ঞানস্বাক্ষরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সংক্ষেপে জীবনবৃত্তান্তকার তার পরের ঘটনার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন—

তিনি কহিয়াছেন যে “আমি যখন বোডল বৎসব বয়স্ক, তখন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মের বিবোধে এক প্রহু প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রহু এবং ধর্মবিষয়ে আমার মনোগত অভিনায় ব্যক্তি হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীর ব্যক্তিদ্বিগের সহিত আমার ভাবসম্বন্ধ হইল; এ কাৰণে আমি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলাম।” বামনে হন রায় তিব্বত দেশে তিন বৎসব অবস্থিতিপূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্মের অধ্যয়ন করিলেন। তখনস্থব ভাবতবব ও তাহার উত্তরলীমা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরে নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন। পরে তখন তাঁহার বয়স্ক্রম বিশিষ্ট বৎসব হইল, তখন বামকান্ত রায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার গৃহে আস্থান করিলেন ও তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বামমোহন রায় স্বীয় গৃহে প্রত্যাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বিজ্ঞানভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন।

ডাক্তার কার্পেন্টার রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত “সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে” (Biographical Sketch) গৃহভাগ এবং তিব্বত ভ্রমণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

রামমোহন রায়ের বয়স যখন মাত্র পনের বৎসর তখন “ব্রহ্ম-গৃহ” পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্তপ্রকার ধর্ম দেখিবার জন্য তিনি তিব্বত ভ্রমণেব সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি ঐ দেশে হই তিন বৎসব বাস করিয়াছিলেন, এবং সেবাব্যব দাবীদাব একজন জীবিত মনুষ্য জগতেব স্রষ্টা এবং পালনকর্তা, এই মত উপেক্ষা করিয়া অনেক সময় লামা-উপাসকগণের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার সময় তিব্বতীয় পরিবাবের মহিলাগণ তাঁহাকে সাঙ্ঘনা দিত এবং তাঁহার উপর দয়া প্রকাশ করিত।

যখন তিনি হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতাকর্তৃক প্রেবিত কয়েকজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল এবং তিনি (পিতা) তাঁহাকে বিশেষ আদবেব সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে রামমোহন রায় সম্ভবতঃ সন্তুষ্ট এবং যজ্ঞান্ত ভাবাব অনুভবিলেন এবং প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।†

ডাক্তার কার্পেন্টারের লেখার ভঙ্গী হইতে মনে হয়, তিনি

* Mary Carpenter, *The Last Days in England of Ram Mohun Roy*, Calcutta. 1815, p. 3.

† Mary Carpenter, *op. cit.* pp. 3-4.

রাজার নিজের মুখ হইতে তিব্বত ভ্রমণের কাহিনী শুনিয়াছিলেন।* শুণ্ডচরদিগের বিপক্ষনক ভ্রমণকাহিনীর সহিত পরিচিত এ কালের শিক্ষিত লোকেরা রামমোহন রায়ের তিব্বত ভ্রমণকাহিনী সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। হিন্দুর দুইটি প্রধান তীর্থ, মানস সর্বোবর এবং কৈলাস পর্ব্বত, তিব্বতদেশে অবস্থিত। এই সর্ব্ব তীর্থ দর্শন করিবার জন্য এখনও হিন্দু সাধুরা তিব্বত গিয়া থাকেন। আমার স্বপ্নবিচিত্র একটি বাঙালী সন্ন্যাসী আর কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত ভিক্ষার উপর নির্ভব করিয়া তিব্বত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিশোর রামমোহন সম্ভবতঃ এইরূপ একজন তীর্থযাত্রী সাধুসঙ্গে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কিশোর রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণে তাত্ত্বিক নন্দকুমার বিজ্ঞানস্বাক্ষরের প্রভাব লক্ষিত হব। তত্ত্বশাস্ত্রে তিব্বতের নাম মহাচীন। মহাচীন তারা উপাসকের এবং বামাচারীর মহাতীর্থ। “তারা-রহস্য-বৃত্তিকা” নামক একখানি প্রাচীন নিবন্ধে চীনাচার তত্ত্বের অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল বচনে কথিত হইয়াছে, বশিষ্ঠ ঋষি মহাচীনে গিয়া বৃদ্ধরূপী ন্যুরায়ণের নিকট চীনাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়া ছিলেন। চীনাচার বামাচারের রূপান্তর। রামমোহন বোধ হয় নন্দকুমারের নিকট মহাচীনের মহিমা শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞাতসারে তথায় গিয়াছিলেন। রামমোহনের গতিবিধির কথা খুব সম্ভব নন্দকুমার জানিতেন এবং বামকান্ত রায়কে জানাইতেন। তাই যখন রামমোহন তিব্বত হইতে হিন্দুস্থানে ফিরিলেন, তখন বামকান্ত রায় পুত্রকে গৃহে ফিরিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়া রামমোহন হয়ত নন্দকুমারের তত্ত্বাবধানেই হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন অবস্তু করিয়াছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন সাড়ে চব্বিশ বৎসর তখন বামকান্ত রায় তাঁহার স্বাবর সম্পত্তির অধিকাংশ ভাগ তিন হিষায় বিভাগ করিয়া এক হিষা রামমোহন রায়কে দান করিয়াছিলেন। তার পর হইতে নন্দকুমার বিজ্ঞানস্বাক্ষরকে রামমোহন রাজের সঙ্গে সঘেই দেখা

* “And his gentle feeling heart dwelt, with deep interest, at the distance of more than forty years, on the recollection of that period; these, he said, had made him always feel respect and gratitude towards the female sex.”

যায়। উভয়ে একত্র হইয়া কি করিতেন? শাস্ত্রালোচনা এক কাজ ছিল। তাহা ছাড়া, রামমোহন রায় বোধ হয় নন্দকুমার বিজ্ঞানঙ্করের সহিত সাধন ভজন করিতেন— কুলাচারীর সহিত কুলাচার অমুষ্ঠান করিতেন। পূর্বো-
ল্লিখিত “ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার বিবরণ” প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে—

- শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিজ্ঞানবিশেষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দকুমার
- বিজ্ঞানঙ্কর যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাচরণের নামে খ্যাত হয়েন, তিনি যশি ও বাক্যের সঙ্গিধানে ছায়াবৎ অমুগত ছিলেন, কিন্তু তিনি তদ্ব্যক্ত সাধন বামাচারে বৃত্ত ছিলেন, বেদান্ত প্রতিপাদ ব্রহ্মজ্ঞান অমুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠা মাত্র ছিল না।

এই বচন পাঠ করিলে মনে হয়, নন্দকুমার বামাচারী ছিলেন। লেখক বামাচারের প্রতি একটু অবজ্ঞাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলে রামমোহন রায় যে একজন বামাচারীকে ছায়াবৎ মত সঙ্কে সঙ্কে রাখিতেন এমন মনে হয় না। তিনি স্বয়ং এক সময় বামাচারী সাধক ছিলেন এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। ১৮২২ সালের চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে রামমোহন রায় ঐক্য তাঁহার অমুগতগণকে লক্ষ্য করিয়া সংবাদ পত্রে চারিটি প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রশ্নটি এই—

ব্রাহ্ম সমাজের অর্থে হিংসা কবণ কোন ধর্ম, বিশেষতঃ সর্বভূতে-হিতেবৎ অহিংসক পরম কাকটিক আত্মতত্ত্ব জ্ঞানিদেব আত্মার ভরণার্থে পবন হর্ষে প্রত্যন্ত শ্বাগলাদি ছেদন কারণ কি আশ্রয়, এতাদৃশ সদাচার মহাশয় সকলের স্বল্পপূর্ব অমুগাবে ঐহিক পারত্রিক কি প্রকাব হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

কৌলের ধর্ম যে নিবেদিত মন্ত্র মাংসাদি ভোজন ও মন্ত্র মাংস যে আহার না করে তাহার প্রতি পশু শব্দ প্রয়োগ ইহাও করিয়া থাকেন কি না।

“কৌল” অর্থ কুলাচারী বা বামাচারী। কুলাচারীকে বীর বলে। যে কুলাচার অমুষ্ঠান করতঃ মন্স্য, মাংস আহার না করে তাহাকে পশু বলাই। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—

কিন্তু ধর্ম সংস্থাপনাকাজী (চারি প্রশ্নের কর্তা) কিরূপে জানিয়াছেন যে অনিবেদিত ভোজন ও পবন হর্ষে ছেদন লেহ করিয়া থাকেন তাহা বিশেষ লিখেন নাই তিনি কি ছাগ হনন কালে বিভ্রম্ন থাকিয়া নৃত্য কিবা উৎসাহ কবিত্তে দেখিয়াছেন কি ভোজন কালে যদিও স্ব স্ব উপাসনার অমুগাবে অনিবেদিত ভোজন করিত্তে

দৃষ্টি করিয়াছেন। দোষোন্মেষ কবিবাব জগৎ ধর্ম সংস্থাপনাকাজী সত্যকে একে কালেই জলাঞ্জলি দিয়াছেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি যাহা বা পরমেশ্বরের জগৎ মরণ চৌর্য পরদাবাভিমর্ষণ ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পাবেন তাহারা যে কেবল অনিবেদিত ভোজনেব অপবাদ মমুগাকে দিয়া কাস্ত থাকেন ইহাও আমোদেব বিষয়।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে স্বরাপানের সমর্থনে কুলার্ণব ও মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

কলৌ যুগে মহেশানি ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
পশুনশ্চ পশুনশ্চ পশুনশ্চ মমাক্ষয়।
অতএব দ্বিজাভীনাং মন্ত্রপানং বিধীয়তে।

কলিকালে ব্রাহ্মগণ পশু হইবে না অর্থাৎ মন্ত্র-মাংস বর্জন করিয়া পশুভাবে সাধন করিবে না। দ্বিজাতিব পক্ষে (সাধনক-
সময়) মন্ত্রপান বিহিত হইয়াছে।

তারপর কুলার্ণব ও মহানির্বাণ তন্ত্র হইতে এই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অলিপানং কুলজীবাং গন্ধবীকার লক্ষণং।
সাধুকানাং গৃহস্থানাং পক্ষপাত প্রকীর্তিতং।
পানপাত্র প্রকুর্ভূত ন পক্ষতোলকাধিতং।
মন্ত্রার্থ ক্ষুণ্ণার্থ্য ব্রহ্মজ্ঞান স্থিরায চ।
অলিপানং প্রকুর্ভূতং লোমুপো নরকঞ্চ জেং।
পানে ভ্রান্তিভবেৎ যন্ত সিদ্ধিস্তত্ত্ব ন জায়তে।

কুলবধূঃ মন্ত্র পান কবিবে না, মদের আচ্ছাদন মাত্র লইবে। গৃহস্থ সাধকেবা পাঁচ পাত্রের অধিক মন্ত্র পান কবিবে না। এক এক পাত্র পাঁচ তোলার বেশী মদ ধবিবে না। মন্ত্রার্থের ক্ষুণ্ণ জগৎ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের স্থিরতার জগৎ মন্ত্র পান কবা কর্তব্য। লোভেব বশীভূত হইয়া মন্ত্র পান কবিলে নবকে যাইতে হয়। মন্ত্র পান কবিলে যাহার নেশা হয় সে সিদ্ধিলাভ করিতে পাবে না।

চারি প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন রায় যেভাবে বামাচারের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে অমুমান হয় তিনি নিজে বামাচারী ছিলেন। এই উত্তরের উত্তরে ১২২৯ সনের ২০শে মাঘ (১৮২৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী) “পাষণ্ড পীড়ন” প্রকাশিত এবং বৈশাখ মাসে বিতরিত হইয়াছিল। “পাষণ্ড পীড়ন”র উত্তরে রামমোহন রায় ১২৩০ সনের ১৫ই পৌষ “পাষ প্রদান” প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুই খানি পুস্তকেই গ্রন্থকার নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন—

সমাহুষ্ঠানাক্ষমভজ্ঞমনস্তাপবিশিষ্টকর্তৃক।

By one who laments his inability to perform all righteousness.

“পথ্য প্রদানে” গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

১৪৫ পৃষ্ঠেব শেষে [“পাষণ্ড পীড়ন”কাব] লিখেন “কথং তত্ত্বজ্ঞানী কথন বা ভাস্কর্য বামাচারী” এবং ১৩০ পৃষ্ঠেও এইরূপ পুনঃপুনঃ কথন আছে, কিন্তু ধর্ম সাহাবকেব এইকপ লিখিবাত্তে আশ্চর্য্য কি যে হেতু তাঁহাব এ বোধও নাই যে কুলাচার সর্ব্বথ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হয়েন। সর্ব্বত্র সংস্কার বিষয়ে বামাচাবেব সজ্ঞ এই হয় (একমেব পূর্ব ব্রহ্ম স্থূল স্বক্ষময়ঃ ধ্রুবঃ) এবং দ্রব্য শোষণেন বিধি এই (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ঃ ভাবয়েৎ) এবং কুলধাতুব অর্থ সন্ত্যান, অর্থায় সমূহ অর্থো বর্ভে, অতএব সমূহ যে বিশ্ব বাহ্য মহাবাক্যো ভাংপর্য্য হইয়াছে। কুলার্চন দীপিকাযুক্ত তন্ত্র বচন—

* * * * *

কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদ্ব্যচ্যতে।”

এই অংশ এবং “পথ্য প্রদানের” অন্ত্যন্ত অংশ পাঠ করিলে অল্পমান হয়, রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বামাচার অস্থগ্ঠান কবিয়াছিলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এদেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের জনশ্রুতি যে রামমোহন রায় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর শিষ্য ছিলেন হরিহরানন্দনাথ বামাচারী ছিলেন এবং রামমোহন রায়ের নিত্য সঙ্গী ছিলেন। এই সম্পর্কে “ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিবরণ” লেখকের উক্তি আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি সুপ্রিয় কোর্টে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জবানবন্দী সহিত এই সকল প্রমাণ একত্র বিবেচনা করিলে সিদ্ধান্ত হয়, রামমোহন রায় কিশোর বয়সে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের নিকট তাত্ত্বিক ব্রহ্মোপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন; তিব্বত হইতে ফিরিয়া আসিয়া গুরুর নিকট তন্ত্রশাস্ত্র এবং অন্ত্যন্ত আত্মযজ্ঞিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং বাঁটেয়ারার পর বৈষয়িক স্বাধীনতা লাভ করিয়া গুরুকে সাধনের সঙ্গীরূপে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বামাচারের নামাস্তর বীরাচার, এবং বাহার্য্য অন্ত প্রকার আচরণ করে তাহাদিগকে বলে পশু। পশুর আচার সম্বন্ধে রামমোহন রায় “পথ্য প্রদানে” কুলার্চন চন্দ্রিকাযুক্ত বুদ্ধিকাতন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

পত্রং পুষ্পং ফলংতোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।

ন পিবেদ্যাদকং দ্রব্যং নামিবঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ।

পশু স্বয়ং পত্র, পুষ্প, ফল, জল আহরণ করিবে, কিন্তু মাদক দ্রব্য পান করিবে না, এবং আমিষ (মৎস্য, মাংস) আহরণ করিবে না।

বৈষম্যবশতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া কিশোর রামমোহন

ঘটনাচক্রে বামাচার আশ্রয় করিয়া সাধন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাহার্য্য রামমোহন রায়ের মতপানের কথা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ করা কর্তব্য যে তিনি সাধকরূপে সাধনের সামগ্রীকপে মতপান করিতেন। বামাচার স্বেচ্ছাচার (self-indulgence) নহে, এক প্রকার সাধন (discipline)। বামাচার রামমোহন রায়ের পক্ষে স্বফল উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এই সঙ্গীর্ণ পথে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিয়া উপনিষদের দক্ষিণাচারে পৌছিয়াছিলেন, এবং তাহাকে নূতন আকাব দান কবিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের বামাচারের গুরু এবং সঙ্গী যেমন ছিলেন হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, তাঁহার প্রবর্তিত নব দক্ষিণাচারের প্রধান শিষ্য এবং সঙ্গী ছিলেন হরিহরানন্দনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। বামাচার হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণামে রামমোহন কিরূপ বিস্তৃত আচারে পৌছিয়াছিলেন তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনে এবং আচরণে। সৌভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর মাসাধিক কাল পরে, ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, “মহাত্মা শ্রীমুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশেব জীবন বৃত্তান্ত” নামক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাবাগীশের কোনও সহকর্মীর লিখিত এই প্রবন্ধের সারাংশ নিম্নে প্রদান করিব।

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২০শে মাস (১৭৮৬ সালের ২ই ফেব্রুয়ারী) পালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পালপাড়ায় ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া রামচন্দ্র কানী প্রভৃতি গণ্ডিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং যখন তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর তখন শান্তিপুরের রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির নিকট স্থিতি প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাঠ শেষ করিয়া যখন বাড়ী ফিবিলেন, তখন তাঁহার আর দুই ভাই তাঁহাকে পৃথক করিয়া দিয়া অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত করিলেন বিদ্যাবাগীশের এই বিপদের সময় তাঁহার অগ্রজ হরিহরানন্দনাথ তাঁহাকে আনিয়া রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। কলিকাতা আসিয়া রামমোহন রায়ের

প্রচারকার্য আরম্ভের সময়সময়ে, অর্থাৎ ১৮১৪ বা ১৮১৫ সালে, তাঁহার সহিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের এই মিলন ঘটয়াছিল। এই দুই জনে মিলিত হইয়া কি করিয়াছিলেন জীবনব্যস্ততার ভাষায় তাহ বর্ণনা করিব।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত ভাষান্ত শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি-শাস্ত্রে ও ধর্ম-শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্নপ্রায়ুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্মতপূর্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছামুতাবে তাঁহার সমভিযাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক একজন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকট উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি মৌল্যপ্রযোজক শাস্ত্র অধ্যয়ন কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জল মেধা বশতঃ অত্যন্তকাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতাবান হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বলভাষাতে এক অভিধান ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রে একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয়দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘন সংগ্রহপূর্বক পবিত্রবাব বাসেব জন্ত শিমুলিয়ায় হেতুয়া পুস্তকালয়ের উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পবস্ত তিনি বাজার নিকট ক্রমাৎ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্যদ্বারা হেতুয়া পুস্তকালয়ের দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপনপূর্বক কয়েকজন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা কবিত্তে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এই প্রকার উজ্জল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত বাস্তব যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—বাক্য তাঁহার পবামর্শ ব্যতীত কেন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবিতেন না। এবংপ্রকার ধর্মচর্চায় জন্ত তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মাত্র ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়েব বিশেষ যত্নদ্বারা মাদিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্ত ক্ষুদ্র আকারে আশ্রয় সভা নামী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান কবিতেন। পবে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাস দিবস ব্রাহ্ম সমাজ ঘোড়াসাঁকোয় বর্তমান গৃহস্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহাব একজন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তদ্বিষয়ক ব্যাখ্যানদ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনাব উপদেশ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বামাচারী ছিলেন না। সর্বশাস্ত্রে আলোচনা করিয়া এবং সর্বধর্মের আচারের বিচার করিয়া রাজা রামমোহন রায়ে যে আচার উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তিনি জীবিত থাকিলে স্বয়ং যে আচার প্রচার করিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের আচার। বিদ্যাবাগীশের জীবনব্যস্ততার লিখিয়াছেন—

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎজীবন পর্যন্ত সাধারণ ক্ষুদ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রচাবেব জন্ত যত্নশীল ছিলেন কিন্তু তাঁহার চিন্তা ইহা সর্বদা জাগ্রত ছিল যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ না কবিলে সে ধর্মের বৈধি হইতে পারে না এবং তদনুসারে শুরুর একবার রাজা রামমোহন রায়েব সহযোগী হইয়া এইরূপ বিধিবৎ লোকদিগকে উপদেশ কবিবাব জন্ত উত্তোগ কবিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও ঘেবেব আধিক্যপ্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে নাসী হইলেন না। সম্প্রতি যখন জ্ঞানবলে লোকেব মন সত্যধর্ম গ্রহণেব উপযুক্ত হইতেছে তখন তিনি তাঁহার মানস সকল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্যরূপে বেদান্ত শাস্ত্রেব সাবার্থানুসারে বিধি-মুর্সক এই ব্রাহ্মধর্ম এদেশে প্রচাব কবিবাব জন্ত ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ (১৮৪৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবাব দিবা দুই ব্রহ্ম তিন ঘটাব সমবে প্রথমতঃ একবিশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্মে প্রতিষ্ঠ কবিলেন এবং তজ্জন্ত ব্রাহ্মদিগেব সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যস্ত কবিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেবই হৃদয়ঙ্গম আছে।

এখানে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে রাজা রামমোহন রায়েব জীবদ্দশায় এই দীক্ষাবিধি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। হরিহরানন্দনাথ এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই দুই ভাই রামমোহন রায়েব বাম-দক্ষিণ দুই বাহু ছিলেন। কিন্তু এই দুই ভাইই ছিলেন যত্ন-মাত্র, রাজা রামমোহন রায়ে ছিলেন যন্ত্রী। “ব্রাহ্ম-নমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণে”র পূর্বোক্ত বচনে হরিহরানন্দনাথ-নামকে লিখিত হইয়াছে,

“বেদান্ত প্রতিপাদ ব্রহ্মজ্ঞান অমূল্যলেনে তাঁহার নিষ্ঠা মাত্র ছিল না।”

এই বিবরণকার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“এ দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাহাব সম্যক অনুবর্তী ছিলেন কিন্তু লোকভয়প্রযুক্ত তিনিও সর্বদা সমতামুগত ব্যবহার কবিত্তে সমর্থ হইতেন না। সহমরণ নিবারণের শ্রবস্থা প্রচাব হইলে তাহা রহিত কবিবাব জন্ত প্রবর্তক পক্ষরা নাজ বিচালালে যে আবেদনপত্র প্রদান কবিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে স্বনাম স্বাক্ষর কবিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায়ে তাঁহার প্রতি বিবাগ প্রকাশ করেন।”*

* প্রবাসী, ১৩৪৩, জৈষ্ঠ, ২১২ পৃ:



খাতবিস্তার। শ্রীশ্রীচন্দ্র রায় ও শ্রীহরগোপাল বিহাস এম,এস-সি প্রণীত। চক্রবর্তী চ্যারিট্রি এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও এন্ড ডি রায় বুক ব্যুরো, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

উপযুক্ত পরিমাণে পুস্তিকর খাত আহার না কবিলে স্বহ ও সবল থাকে। বায় না, ইহা বিজ্ঞানদের ছোট ছাত্রছাত্রীরাও পুস্তকে পড়িয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন খাতদ্রব্য পুস্তিকর, এযু তাহা কোন বয়সের লোকদের কি পরিমাণ খাওর। আবস্তক, তাহা সকলের জ্ঞান নাই। এই বিষয়ের আলোচনা পুণিবীর সর্বত্র হইতেছে। লীগ অব নেছান বা মহাজাতি-সংঘ জেনিট হইতে পুস্তি সম্বন্ধে চারি ভদ্রাম বহি বাহির কবিয়াছেন। তাহাতে এতদ্বিষয়ক পদবর্ণার ফল লিপিবদ্ধ আছে। বাংলা দেশে স্বাস্থ্যের ও পুষ্টির অবস্থা ভাল নহে। সুতরাং যে-বিষয়ের আলোচনা পুণিবীর অপেক্ষাকৃত স্বহ ও শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে হইতেছে, তাহার আলোচনা ও তদ্বিষয়ক গ্রন্থ যে বাংলা দেশের পক্ষে আবস্তক, তাহা বলাই বাহুল্য। ই রেজীতে খাত সম্বন্ধে বিদেশে প্রকাশিত যে-সকল পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাঙালীর প্রচলিত খাতদ্রব্যগুলি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ কবা যায় না। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যোগ্য বাঙালীর দ্বারাই বহি লিখিত হওয়া চাই।

অ'চার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিহাস এই ব'হি লিখিয়া বাঙালী জাতির উপকার কবিয়াছেন। ইহা বস্তুর লীল-বৈচিত্র্য, শরীর-বস্ত্র, এনজাইম ও পরিপাকপ্রণালী, পরিপাকবস্ত্র ও পরিপাকপ্রণালী, কার্বোহাইড্রেট, স্টার্চ বা স্নেহপদার্থ, প্রোটিন, ভাইটামিন, ভাইটামিন ও বাঙালীর খাত, হরমোন, লবণপদার্থ, বয়স ও অবস্থাস্থে খাতের বিভিন্নতা, রোগীর খাত, বিবিধ, ও উপসংহা, এই কবটি অগায়ে বিস্তৃত। তদ্বিত্ত ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি পরিশিষ্ট আছে। ইহা ছাত্রছাত্রীদের এবং গৃহস্থালীর কর্তৃ ও কত্রদের—বিশেষ করিয়া কত্রীদের—অবস্ত-পাঠ্য। ইহা গল্পের মত আমোদ-দায়ক বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। কিন্তু ইহা বখাস্তব সহজ ভাষার লেখা হইয়াছে।

মুচাসমেত ইহার পৃষ্ঠ-সংখ্যা ৩২০। পৃষ্ঠাগুলি প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্ধেক। কাগজ ও ছাপা ভাল, বাঁধাই মজবুত। দাম রাখ হইয়াছে দেড় টাকা মাত্র। অতএব গ্রন্থকাষয় ও প্রকাশক বইখানি বেশ সন্তো-করিয়াছেন বলিতে হইবে।

ব্রাহ্ম-ধর্মঃ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। নবম সংস্করণ। কলিকাতা স্যাবারন ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। কাগজের মলাট ৮০, কাপড়ের মলাট ১০০।

‘ব্রাহ্ম-ধর্ম’ গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ বহুকাল নিশেবিত হইয়া গিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবদ্দশায় মুদ্রিত শেষ সংস্করণকে আদর্শ করিয়া এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম খণ্ডে উপনিষৎ ও দ্বিতীয় খণ্ডে অনুশাসন আছে। সংস্কৃত বচন, এবং বচনগুলির সংস্কৃত টীকা, বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ইহাতে

আছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যশচন্দ্র চক্রবর্তী এম-এ পরিশ্রম করিয়া ইহাতে কয়েকটি বিষয় পরিশিষ্টে যোজিত করিয়াছেন। যথা—এই গ্রন্থরচনা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে ভাব, ইহার বিভিন্ন অংশের রচনার ইতিহাস, ইহার পূর্ব পূর্ব সংস্করণের বিবরণ, ব্রাহ্মসমাজের উপর এই গ্রন্থের প্রভাব, গ্রন্থোক্ত বচনাবলীর মূল, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অপর্যাপর ব্যয়েক জন আচার্য কর্তৃক ইহা বচন অবলম্বনে প্রস্তুত বাংলা ও ইংরেজী ব্যাখ্যানের সূচী, প্রভৃতি।

এই গ্রন্থ ঈশ্বরবিদ্যাসী সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকগণের পাঠ্যগ্রন্থ।

কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত। ২২৪ নং দর্পা রোড, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা, হইতে শ্রীবান্ধী চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্ধেক আকারের ৩৪২ পৃষ্ঠা। এটীক কাগজে ছাপা। ভিন্ন ভিন্ন বয়সের তিনটি ছবি আর্ট কাগজে ছাপা। সেটি কাগজের পাতার মজবুত বাঁধাই। মূল্য দুই টাকা।

এই বইখানি তৎপরতার সহিত এক সপ্তাহে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মিত্র মহাশয়ের দীর্ঘ জীবনের বৃত্তান্ত তাঁহার বালাকাল হইতে নির্বাসনের পর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীকে নিজের জীবনচরিত সম্বন্ধে বাহা লিখাইয়াছিলেন তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার যৌবনকাল হইতে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত দেশের সমুদ্র প্রধান প্রধান সার্বজনিক প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত ও অনেক ভিতরের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁহা নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি বলেন নাই, যেমন, ‘‘সজীবন’’ স্থাপন ও তাহার দ্বারা দেশের হিতার্থ বহু প্রচেষ্টার সংগ্রহে স্বহ আন্দোলন পরিচালন। তাঁহার সন্তান-দ্বিগকে ‘‘সজীবনী’’র পুরাতন সংখ্যাগুলি হইতে এই সমুদয়ের বৃত্তান্ত আলোচনা এটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ কবিতে হইবে। অজান্ত কদাও তাঁহার এখনও জীবিত বন্ধুদের সাহায্যে লিখিতে হইবে। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের পর যে ২৬ বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের এই অংশের বৃত্তান্তও এই পুস্তিকায় লিখিত হওয়া আবস্তক। এই অংশে তিনি নিগৃহীতা, অসুস্থতা, বর্জিত নারীদের জন্য বাহা করিয়াছিলেন, তাহা অন্য কোনও কত্রার দ্বাৰা অনতিক্রান্ত। অত্র প্রকারে সাহায্য করা ছাড়া তিনি বহু অজ্ঞাচারিত নারীকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিত হইয়াছে, ‘‘গল্পের বহি মেরুণ আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়া থাকে, আমি সেই বপ আগ্রহের সহিত ইহা আভ্যোপাস্ত পড়িছি।’’ পুস্তকটির পরিচয় দিবার নিমিত্ত আরও অনেক কথা ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে।

দিনেন্দ্র-রচনাবলী। প্রকাশিকা শ্রীকমলা দেবী ঠাকুরাণী ৪৮ বহুল বাগান রো, ভবানীপুর, কলিকাতা। প্রবাসীর মত পৃষ্ঠা ১২৪ পৃষ্ঠা। আর্ট কাগজ ছাপা তিনটি ছবি। বইখানি এটীক কাগজে ছাপা। মূল্য ১৪০ টাকা।

এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘ হইয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া:

এমন অনেক স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিতেছে, বাহা নিরানন্দের নহে, কিন্তু বাহা বেদনা দিতেছে।

ইহাতে স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কতকগুলি গান ও তাঁহার স্বরলিপি এবং তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা আছে। “রবীন্দ্র সঙ্গীত” ও “সঙ্গীত সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ” শীর্ষক দুটি গল্প রচনাও আছে। পোড়ায় আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ভূমিকা। পুস্তকখানির শেষে “দিনেন্দ্র স্মরণে” নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং দিনেন্দ্রনাথের কয়েক জন ছাত্রছাত্রীর ও বয়সের লেখা আছে।

সমগ্র বিহিন্মানি আনন্দদায়ক। ইহা দিনেন্দ্রনাথের পুজনীয় পিতামহ মহাপ্রভুর স্নেহভাজন বহু ব্যক্তির, তাঁহার বহু পিতৃবন্ধুর, তাঁহার বন্ধু ও বন্ধুত্বের এবং তাঁহার নানা প্রমোদে ও জেলায় বিক্ষিপ্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় হইবে।

দিনেন্দ্রনাথের আত্মপোষন ও আত্মবিলোপ কিরূপ অসামান্য ছিল তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকায় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

“দিনেন্দ্রনাথের কঠোর আমার গান শুনেছি, কিন্তু কোন দিন তার নিজের গান শুনি নি।...গান নিয়ে বারো তার সঙ্গে ব্যবহার করেছে, তারা জানে সুদের জ্ঞান তার ছিল অসামান্য। আমার বিশ্বাস গান হুটি করা এবং সেটা প্রচার করার সম্বন্ধে তার কুষ্ঠার কারণই ছিল তাই। পাছে তার যোগ্যতা তার আশ্রয় পর্ষদ না পৌছয়, বোধ করি এই ছিল তার আশঙ্কা। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা; কাব্যরসে তার মতো দরজী অল্পই দেখা গেছে।.....অথচ কবিতা সে যে নিয়ে লেখে, এ কথা প্রায় গোপন ছিল বললেই হয়।.....চিত্রজীবন অন্যকেই সে প্রকাশ করেছে, নিজেকে বরেনি। তার চেষ্টা না থাকলে আমার গানের অধিকাংশই বিলুপ্ত হোত। কেননা, নিজের রচনা সম্বন্ধে আমার বিশ্ময়জনক অসামান্য। আমার স্বরগুলিকে রক্ষা করা এবং যোগ্য এমন কি অব্যোধ্য পাত্রকেও সমর্পণ করা তার যেন একাধি সাধনার বিষয় ছিল। তাতে তার কোন দিন ক্লান্তি বা বৈধিচ্যুতি হোতে দেখি নি। আমার হৃষ্টিকে নিরুই সে আপনাতর হৃষ্টের আনন্দকে সম্পূর্ণ করেছিল। আজ স্পষ্টই অনুভব করছি, তার স্বকীয় রচনাচর্চার বাধাই ছিলো আমার। কিন্তু তাতে তার আনন্দ যে ক্ষুণ্ণ হয় নি, সে কথা তার অস্বস্তি অধ্যবসায় থেকেই বোঝা যায়। আজ এতই আমি স্বধ্ব বোধ করি যে, তার জীবনের একটি প্রধান পরিতৃষ্টির উপকরণ আমিই তাকে দ্রোণাতে পেরেছিলাম।

“.....তার বন্ধু ছিল অনেক, তার ছাত্রেরও অভাব ছিল না, এদের সম্মুখে এবং আমাদের মতো নিম্নজনের কাছে এই লেখাগুলি নিয়ে তার একটি মাননমুগ্ধির আবরণ উদ্ঘাটিত হোলো—এই আমাদের লাভ।”

মার্কিন সমাজ ও সমস্তা। ঈনেন্দ্রনাথ চৌধুরী এন্ড এ [নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা] প্রণীত। প্রাণ্ডিস্টান চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, -এ কলেজ কোয়ার্টার, কলিকাতা। মূল্য লেখা নাই। প্রবাসীর পুষ্ঠার অর্ধেক আকারের প্রায় ২১০ পৃষ্ঠা। সম্ভবত কাগজের পাটায় বানান। এটীক কাগজে ছাপা।

এই গ্রন্থে লেখক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ধনদৌলৎ, ঘোঁষন সমস্তা, পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্তা, গণতন্ত্র, আইনের অবমাননা, অপরাধের বিভীষিকা, অপরাধীর প্রাণদণ্ড, প্রাণত্যাগ ও ভ্রমবান—এই কষ্ট বিধির সম্বন্ধে নিজের সঙ্কলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শেষে একটি উপসংহারের অধ্যায়ও আছে। ইহা পাঠ করিলে আমেরিকা

সম্বন্ধে বহু বিষয় জানা যায়—বিশেষতঃ মন্দ দিকটা। আমেরিকাপ্রবাসী অধ্যাপক ডক্টর হৃদীন্দ্র বসুর লিখিত Mother America পাঠ আরও জ্ঞানলাভের জন্য আবশ্যক।

চ.

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রাসরাম বসু রচিত ও ১৮০১ সনে প্রথম প্রকাশিত। ঈনেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২৫১২ মোহনবাগান রো, বঙ্গন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৮।

এই পুস্তকখানি দুস্তাপ্য গ্রন্থমালায় তৃতীয় গ্রন্থ। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস উচ্চ উপাধি পরীক্ষার পক্ষে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু পাঠ্যসাহিত্যের একান্ত অভাব। এ কথা বাঁহারা অধ্যাপনা করেন তাঁহারাও জানেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গল্পসাহিত্য-হৃষ্টের যে প্রয়াস তাহার কাহিনী যেমন কোতুলোদীপক তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এই সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে এইকণ দুস্তাপ্য গ্রন্থমালা বিনাশ হইতে রক্ষা করা আবশ্যক। ঈনেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সকল গ্রন্থ পুস্তকপ্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই—তাঁহার আবশ্যকতাও নাই। তিনি এইগুলিকে আর একবার ছাপিয়া কয়েকখানি প্রতিলিপি রাজ ধরেন হইতে বন্ধা কবিবার সংকল করিয়াছেন। আর দেবি কবিলে শুধুই দুস্তাপ্য নব, এগুলি একেবারে লোপ পাইবে। তখন এই সাহিত্যের উদ্ভব-রহস্য আর জানা যাইবে না—ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের প্রথম অধ্যায়, ইতিহাসের পক্ষে বাহা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান তাহার কোনও উপাদান আর মিলিবে না।

সকল গ্রন্থই এই গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই; বাহিয়া বাহিয়া কয়েকখানি মাত্র ছাপা হইতেছে; এই নির্বাচনকাণ্ডেও যথেষ্ট বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন আছে। এ যাবৎ তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—‘কলিকাতা কমসালার’, ‘মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়চন্দ্র চরিত্র’ ও ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’। ইহার প্রত্যেকটিই যে সুনির্বাচিত গণিত মাঝেই তুহা স্বীকার করিবেন।

০. প্রথমখানি আদি গল্পরীতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ত কটেই; কিন্তু ভ্রমপেক্ষা আর এক হিসাবে অতিশয় মূল্যবান। বাঙালীর অনভ্যস্ত নাগরিক জীবনের নতুন রীতিনীতি ও তদ্বিবন্ধে পুণ্ডিত পণ্ডিতবাসীর সংস্কার এই গ্রন্থে যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আধুনিকতম সমাজবিদ্যাবাদের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থে শুধুই গল্প নহে গদ্যসাহিত্যের অল্পের দেখা যাইতেছে। শিশু যেন প্রথম চলিতে শিখিতেছে। একটিকে এখনও পদক্ষেপ সঙ্কটময়, অপরিচিত হইলেও সবল ও নির্ভীক।

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র রীতিমত গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে যেমন মূল্যবান, ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ তাহার পূর্ববর্তী হইলেও অধিকতর সাহিত্যের পরিচয় দিতেছে। রাসরাম বসু শব্দশক্তি ও বাক্যযোজনা বিষয়ে যেমন নিরুপুণ—চলতি ভাষার শব্দগুলিকে অল্পত উচ্চারণ ও বানান সাহায্যে শুকগভীর সাধুভাষার গাভীর দান করিতে যেমন পটু, তেমনই কিম্বদন্তী ও যৎসামান্য ঐতিহাসিক মদলা সহযোগে প্রতাপাদিত্য-কথাকে তিনি যেভাবে ‘সত্যমূলক’ করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাঁহার মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রকট হইয়াছে বলিতে হইবে। ইতিহাস-রচনার ভানে সেকালের এই বুদ্ধিজীবী বাঙালী মূলী যে চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা শক্তি হিসাবে নিফল হয় নাই। ব্রজেনবাবু তাঁহার যেটুকু জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেই যে মাহাত্ম্যের পরিচয় পাই সেই মানুষের পক্ষেই এইরূপ অকৃতোত্তরে

লেখনী চালনা সম্ভব, এবং তাহারই ফলে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' সভ্যতার ইতিহাস না হইলেও, কল্পনার প্রসারে ও ভাব্যর স্বচ্ছন্দ মুক্ত ভঙ্গিতে সাহিত্যিক গদ্যরচনার একটি আদি ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে যে নাটক বা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে এই গ্রন্থই তাহার ঘটনাক্ষর প্রায় সব, এমন কি কল্পনারও প্রেরণা প্রোতাইয়াছে। অতএব এই গ্রন্থখানি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে একাধিক কারণে মূল্যবান বলিতে হইবে।

পরিষেবে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, দুস্তাশ্য গ্রন্থখালার সম্পাদনকার্য যেভাবে হইতেছে, গ্রন্থকারের জীবনী ও তৎসহ নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য যেরূপ পরিষ্কার স্বেচ্ছায় সঙ্কলিত হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক গ্রন্থ অল্প কারণেও অভিশ্রম মূল্যবান হইয়াছে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

কুম্ভাস্বত্ব (উপন্যাস), শ্রীমতী দেবী প্রণীত। কাত্যায়নী বুকস্টল, ২০৩, তর্কভ্যালিস স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা। ২৪৪ পৃষ্ঠা।

লেখিকা বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা, বাংলা সাহিত্যের আসরে তিনি স্বকীয় শক্তিবলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। সরল অথচ মধুর, স্বচ্ছন্দগতি ভাষা, অনাড়ম্বর, অকুণ্ঠিত প্রকাশ-ভঙ্গী সীতা দেবীর রচনার বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার সে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে। প্রচুর মধ্যে কটকল্পনা-প্রসূত কোন জটিলতা নাই, কোথাও একবিম্ব অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নাই। আধুনিক যুগের কলিকাতার প্রগতিশীল সমাজের কাহিনী হইলেও কোন হ্রস্ব এক কোঁটা উগ্রতা অথবা পাশ্চাত্য-সাহিত্য উদ্দেশ্যিত জ্ঞানবী নাই। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, লেখিকা এত বড় পুস্তকখানিতে বাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা পঠীর নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, জীবনে যে জন নারীর প্রিয়তম হইবে, যাহার সহিত নারী নীড় বাঁধিবে, তাহাকে পুঞ্জি বাহির করিবার অধিকার নারীর একান্ত ভাবে নিজস্ব, এ তাহার জন্মবন্ধ।

এই বিশ শতাব্দীতেও এই মত লইয়া বিরোধ করিবার লোকের হয়ত অভাব হইবে না, নারীর জন্মবন্ধের দাবী নাকচ করিবার ক্ষমতা মামলা অনেক কবিবেন, কিন্তু জন্মবন্ধ বইখানি যে রসবিচারে উত্তীর্ণ এ স্বত্ব লইয়া কেহ কোন বিরোধ করিবেন না।

চরিত্রাঙ্কনেও লেখিকা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মামুলি রক্তমাংসের মানুষের মত রূপ লইয়া মানস-লোকে চলাফেরা করে, কথা কর। স্বরের বারমিনীকে বড় ভাল লাগিল। সমতা নিখুঁত, হৃদয়িত হরেকহর উপযুক্ত পুত্র। ভাবী আই, সি. এস. যেরূপ চমৎকার, অলকা আবও চমৎকার। কোন একটা ক্ষেত্রে অলকা যেরূপে লেখিকা যদি মুখোমুখি পাঁচ করাইয়া দিতেন তবে বড়ই উপভোগ্য হইত। অল্পের মধ্যে ভয়ঙ্কর মনস্তাত্ত্বিক উপযুক্ত দ্রুতি রূপেই ফুটিয়াছে।

বইখানি শুধু হৃদয়ই নয়। উগ্র আধুনিকতার যুগে যে গুণ পবিত্র শাস্ত্র সভ্যতার সংঘত রূপ বইখানি প্রকাশ করিয়াছে, তাহা সদলম্বর বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—দ্ব্যতং পিবেৎ—শ্রীপ্রমথনাথ বিশি। রঙ্গন পাবলিশিং হাউস। ২৫২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ১।

চর্যাকবাদের চূড়ক হিসাবে যে গুরু শ্রীকট প্রচলিত দ্ব্যতং পিবেৎ তাহার মূল্য এবং শ্রেষ্ঠতম অংশ। আধুনিক সভ্যতার এটি মূলমন্ত্র। এই

সভ্যতার ভগ্নভূমি ইউরোপের অমুকরণে এই মন্ত্রের সাধনায় আবাদের অবস্থা কি পাড়াইয়াছে লেখক এই বইখানিতে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশেষ করিয়া বিবাহের দিকটাই বইয়ের লক্ষ্য। ভূমিকার লেখা হইয়াছে—“‘দ্ব্যতং পিবেৎ’ বিবাহতত্ত্ববিদ্যাক একখানি অপ-রোম্যান্টিক নাটক।” ভারতীয় বিবাহে পূর্ববাসের স্থান নাই, অথচ তাহার একটা নিজস্ব রোম্যান্স আছে। ইহার মধ্যে আধুনিক প্রথা পূর্বরূপ আসিয়া পড়িয়া এখন একটা ‘জগাখিচুড়ি’ পাকাইয়া তুলিতেছে। ইহাতে যে-অবস্থাটা সৃষ্টি হয় তাহার বহুবিধ সন্ধানবাব মধ্যে অস্তুতম দুইটি—চারিরা লোক বা পোটাশিবাম সাইনাইড।

এই পূর্বরূপ আর হিন্দু-বিবাহের অচ্ছেদ্যতাকে কেন্দ্র করিয়া লেখক আধুনিক সভ্যতার অনেকগুলি জিনিসই চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন—নিও-অ্যারিস্টোক্রাসি, কম্যুনিজম, ব্যবসায়ভিত্তিক সাহিত্য, আরও অনেক কিছু। নাটকের অতিরিক্ত বাহা তাহা ভূমিকার আছে।

প্রবল সিনিক্স-এর মত জাতীয় জীবনের (অর্থাৎ বর্তমানে জাতীয় জীবন বাহা হইয়া পাড়াইয়াছে তাহার) সমস্ত উপাদানগুলিই নিবপেক্ষ-ভাবে তুলিতে সব সময় লেখকের সহিত একমত হওয়া যায় না। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয় G. B. S.-এর অমুকরণে তিনি বাঙ্গলা নাটকে যে পদ্ধতি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই বহুলাংশে সফল হইয়াছেন সাহিত্যে সিনিসিম্ব একটা আর্ট; এই আর্টে সিদ্ধান্ত হইবার জন্য বাহা কিছু দরকার—ভাব্যর গুরুত্ব, ব্যঙ্গের তীব্রতা, হিউমার;—বা হাসির সঙ্গে সঙ্গে গায়ে জল-বিহুটি ধর, সবই তাঁহার অ-হস্ত, অবশেষে পুরাতাত্ত্বিক। নাটকীয় সিঁদুরেশ্যন সৃষ্টি করিতেও তিনি সিদ্ধান্ত। প্রবন্ধাংশে (বা ভূমিকার); তাঁহার কলকসবচেরে জোড়ালো। ‘বীরবল’ পর তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে এ জিনিসটা বাঁচাইয়া রাখিবেন।

বোধ হব নূতন প্রচেষ্টা বলিয়া মাঝে মাঝে শক্তির অপব্যয় হইয়াছে—তাহাতে তথ্যবুদ্ধি এবং ঘটনা-সৃষ্টিতে কোথাও কোথাও জটিলতা আসিয়াগিয়াছে। শক্তিশালী লেখক এ-দাখ নিজেই ভবিষ্যতে কাটাওয়া উদ্ভিবন।

কাগজের বাঁধাই। ছাপাভাস।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সোসিয়ালিজম বা সমাজতত্ত্ববাদ—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক উদ্ভাসেন্দ্র সঙ্গ লিমিটেড, ১৮ নং ভ্রামাচরণ বৈ স্ট্রিট, কলিকাতা। ১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র।

সোসিয়ালিজম ও কম্যুনিজমের মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে অথচ নিপুণভাবে গ্রন্থকার এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় একপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাহিনীর এবং সমরোপযোগী। শেষ পরিচ্ছেদে হিন্দু ‘সোসিয়ালিজম’ সম্বন্ধে গ্রন্থকার তাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণয়ন-যোগ্য। আমরা লেখকের-স্বাধীনতা ও লিখন-ভঙ্গির প্রশংসা করি এবং বইখানার বিস্তার প্রচার কামনা করি।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীগীতাসার বা গুপ্ত শ্রীমত্তাগবদগীতা,—শ্রীব্রজচরণ সেন কর্তৃক বিবৃত। শান্তিপ্রেস, ঢাকা, মূল্য—১।

গ্রন্থকার তাঁহার গীতাসারে গীতবৎ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অতি সরল ও প্রশংসনীয় ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকের বিশেষ এই যে

তিনি গীতার সমস্ত শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া, গীতার সার মর্মের সরল অনুবাদ দিয়াছেন। লেখক বহু পুস্তক হইতে ভাব ও ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, গীতার মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। এই যুগ-সমস্তার দিনে এইকণ পুস্তকের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকেনারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২০২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৫৫, মূল্য ১।০ মাত্র।

লেখিকা 'সরোজনলিনী দত্ত নারায়ণ সন্নিতি' ও অন্ত্যস্ত বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া যে অতিজ্ঞতা ধর্ষণ করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাহার পরিচায়ক। ইহাতে ৯৪টি ছোট ছোট প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধের বিষয়গুলিকে সোটা মুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) সমাজ, (২) ধর্ম, (৩) নীতি, (৪) শিক্ষা ও (৫) বিবিধ। আমাদের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া যে সকল সমস্যা (অশান্ততা, বর্ণগত জাতিভেদ, অমুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাসিগণের অসংহত প্রভৃতি) অসামান্যতঃ বহিয়াছে বা সম্যকরূপে সীমাসীত হয় নাই এবং অধুন প্রচা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে যে-সমস্ত নতুন সমস্যা (পাশ্চাত্য ধর্মের জীবনধারণ ও পরিবার-গঠন, ধনগত জাতিভেদ ইত্যাদি) উদ্ভব হইয়াছে, এই বইখানিতে তাহাদেরই আলোচনা আছে। এই সমস্যাগুলির আলোচনা ও সমাধান করিতে গিয়া লেখিকা বেশ সুস্পষ্ট ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার মত অতি উদার; সিদ্ধান্তগুলিও সুস্পষ্ট। তিনি বাস্তব কথার প্রবন্ধগুলির কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই, অল্প কথার নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষা অনাড়ম্বর, সরল ও সচ্ছন্দ, কোথাও 'জটিলত' নাই। স্ত্রী পুরুষ-নির্কিশেষে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট পুস্তকখানি যে আদৃত হইবে, তাহা নিয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

কাঁটা—শ্রীনিতানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক 'সুন্দর চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা'। ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ টাকা।

আটটি ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলি একটানা পড়িয়া বাইতে কোন কষ্ট হয় না, ভাষা বেশ পরিষ্কার। ছোট গল্পে প্রকাশ-পরিমিত যেটুকু বাস্তবীয় নিতানারায়ণ বাবুর গল্পে তাহার অভাব নাই। কিন্তু যে ঘনঘ ছোট গল্পের গ্রন্থ, অধিকাংশ গল্পে তাহার অভাব আছে। স্বেচ্ছা সেগুলি মনের উপর গভীর রেখাপাত করে ন। অর্থাৎ সেগুলি গল্পের সম্পূর্ণতা পায় নাই। 'নিয়তি' গল্পটির চং বিলাতি, এবং এইটিই তাহার সমস্ত গল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট। 'খলাই চাটুজো', 'বারে ঘন্টা' এবং 'সমস্ত' ইহার তুলনার দ্বিতীয় স্থান পাইবে। 'সমস্ত'র খেব অংশে সমস্ত-আলোচনার অতটা বিস্তার না থাকিলে উহা একটি উৎকৃষ্ট গল্প হইতে পারিত। গল্পগুলি পড়িয়া আশা হয় লেখকের দ্বার উচ্চশ্রেণীর গল্প রচনা সম্ভব।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

মধুচ্ছন্দা. (কবিতার বই)—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। 'সুন্দর চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স'র পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে গোবিন্দপদ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

'মধুচ্ছন্দা' নামটির আকর্ষণে একান্ত আগ্রহ লইয়া কইখানি খুলিয়া আভ্যন্তর পড়িলাম। আগ্রহ অসামর্থ্যক হইল না। প্রথমেই ছন্দের দোহল-পদ্যমূলে 'মধুচ্ছন্দা' সমুদ্রিতে আবিস্কৃত।

বর্ষাসেতুর রাতি কাঁপে মধুচ্ছন্দা
দ্বার হিসোলো নামে কপলো কানন্দ।

এই কপলোকানন্দা 'মধুচ্ছন্দা' কবির মানসপক্ষে নামিবাই কবিকে দিয়া "বিদ্যালার স্ত্রী" গাঁথাইলেন। এই "বিদ্যালার স্ত্রী"টির সঙ্গে মধুচ্ছন্দার সমস্ত কণিতাগুলি গ্রথিত। মধুচ্ছন্দার ভাবে আবিষ্টি কবি এই মাত্রের ধরণেই নামির পার্থিব জীবনের সমস্ত ভোগকে মানবজীবনের উচ্চমুখী শতমলে: সঙ্গে একত্রে গাঁথিয়াছেন। প্রেমের মধুচ্ছন্দা নামের ইহাই সার্থকতা।

কবির কল্পনা কখনও উর্দ্ধে টুটিয়াছে, কখনও বা বৃক্ষের জগতের টানে নীচে নামিয়া পৃথিবীর রূপে রসে নিম্নে হস্তে হস্তোত্তীর্ণ করিয়াছে। কোন কোন স্থলে নিত্যন্ত ভোগের বস্তুর মধ্যে তাহার কাব্য রক্তমাংসে: সহকে আশ্রয় করিয়াও দেহাতীত হইতে পারিয়াছে। কবির মূলদান যে উচ্চমুখী ইহা তাহাবই পরিচয়।

ছন্দের কলঙ্কের ন্যায় এই গ্রন্থে এমন কয়েকটি অলিঙ্গিত কবিতা দেখিলাম, যাহা মধুচ্ছন্দার সৌন্দর্য-শতদলে কীটবর্ষণ হইয়া আছে। আমার মনে হয় ঐ শ্রেণীর দুই একটী কবিতা কবির নিত্যন্ত কিশোর বয়সের লেখা। এগুলি মধুচ্ছন্দার না সাম্রাজ্যেই ভাল হইত। তবে কলঙ্ক থাকে সত্ত্বেও চন্দ্র যেমন মানবমনকে নন্দিত করে এবং কীট থাকে সত্ত্বেও পদ্ম যেমন পবিত্রতা-গৌরবে অনাবাসে সেচরণ চুষনের অধিকার পায়, তেমনি উক্ত কবিতা সত্ত্বেও এই কাব্যগ্রন্থখানি বঙ্গবাসীর শ্রীচরণে যে পদ্মের ন্যায়ই ফুটর রহিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি মধুচ্ছন্দার কবির এই কাব্য-সাধনা স্রবশ্রুত ও অক্ষর হইবে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

যক্ষা-চিকিৎসা—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—হাহামিও কমিটি, রাঁচি। ১৩০ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

এই পুস্তকের লেখক যক্ষা রোগের আক্রান্ত হইয়া কিরূপে উক্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত প্রবন্ধ করিয়া যক্ষারোগের হাত হইতে কিরূপে অব্যাহত থাকে যায় এবং যক্ষা রোগীর কিরূপ নিয়ম পালন করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। যক্ষারোগের পরীক্ষিত আনুষ্ঠানিক কতিপয় ঔষধ লেখক বাহ্য ব্যবহার করিয়া ও অন্তরকে ব্যবহার করিতে দিয়া ফল পাইয়াছেন সেই সব ঔষধের প্রস্তুতবিধি এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন। স্বামীজীর চিকিৎসাবিদ্যে থাকাকালীন লেখক যে-সব ঔষধ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাদের উপাদান এসঙ্গে "সূত্র-রাজপত্র" প্রভৃতি কয়েকটি বনোবধির উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল বনোবধির পরিচয়, উদ্ভাবের বাংলা নাম এবং কোথায় পাওয়া যায় বহি স্বামীজীর নিকট হইতে জানিয়া প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে সঙ্গ্রহ করা সহজ হইত। লেখক পুস্তকের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে বিস্তৃত বায়ু, প্রফুল্ল মন, উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম রোগ-আরোগ্যের সহায়। ইহার সহিত আর একটি কথা যোগ করিলে ভাল হইত—মাধক দ্রব্য পরিহার। বর্তমান সময়ে যেকোন দিনের পর দিন যক্ষারোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এরূপ পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধারণ—বিশেষতঃ যক্ষারোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির এই পুস্তক পাঠে বহু বিবরণ জানিতে পারিবেন। পুস্তকের কলেবরের তুলনায় মূল্য অধিক হইয়াছে।

শ্রীইন্দ্রভূষণ সেন

নারী

শ্রীউমা দেবী কাব্যানিধি

এসেছিলে নারী,
সৃষ্টির আদিম প্রাতে স্রষ্টার সৃজন-ধৃত্য হয়ে
হাতে লয়ে কী বেদনা বারি !
মথিয়া ত্রিলোকসিন্ধু—ভাগ্যে তব উঠিল গরল,
সৌন্দর্য্য-পসরাখানি শিরে ধরি—চল অচঞ্চল ।
করুণায় কঁদেছিল ভূমি
সেদিন চরণ-দুটি চুমি,
তোমার সঙ্গীতে অগ্নি, বিষাদের গভীর রাগিণী
দিকে দিকে উঠিলস্বাক্ষারি,
অভাগিনী নারী ।
শোক, দুঃখ, দৈন্ত ও ভরম,
আশা, প্রীতি, হৃদয়-ধরম
যেদিন মানব প্রাণে আবর্তিল স্রোত-জলরাশি
জাগিল সরম ।
জীব-জন্মের রূপে মহিমায় দীপ্ত মহীয়সী
মানবের গৃহে যবে শক্তি তব উঠিল উচ্ছ্বসি,
বিধাতার বিধান কি নব—
এলো বৃকে দুর্বলতা তব ?
স্নেহ, প্রেম, সরলতা, করুণায় ভরিল মরম ।
চিনিল মানব জাতি, তোমার দুর্বল চিত্তখানি,
কাঞ্ছনে পড়িলে রেখা সে কলঙ্ক মুছে নাকো জানি ।
ধীরে ধীরে অলঙ্কিতে আসি
তোমারে করিল তারা দাসী,
হরিল স্বাধীন বৃত্তি হৃদয়ের আনন্দ-গরিমা,
চারি দিকে বেড়ি দিল সীমা ;
স্থখ সাধ শূন্যেতে বিলীন—
তুমি হ'লে হীন ।

অগ্নি গৃহদেবী,
হ'ল শত অত্যাচার সেবি
পবিত্র দেউল তব প্রেতের বীভৎস ক্রীড়াভূমি ;
চিত্ত শতদল হ'তে বরে দল মান ধূলি চুমি ।
কোথা তব প্রেম-অর্ঘ্য শুচিশুদ্ধ কলকবিহীন ?
তোমার নৈবেদ্য হের ফুল্লরের প্রসাদ অধীন ।

তবু সেখা ছদ্মবেশ পরি,
পূজা নিতে হবে, পুট ভরি ?
আত্মারে ছলিতে হবে দেবী,
প্রাতঃসেবি ?

যে করে লাঞ্ছনা,
তাহারি চরণ তলে বিমুখ আত্মারে আনি
আপনারে করিবে বঞ্চনা ?
দাক্ষণ মিথ্যার জাল দৃঢ় হস্তে ছিন্ন কর টানি,
ধনিত হউক বিধে স্বকঠিন ধ্রুব সত্যবাণী !
অসত্যের ক'রো না কামনা,
স্বন্দরের নির্মলের কর উপাসনা ।

জড়ের আকার
কুসুম-পেলব প্রাণে সহ কর প্রবলের মিথ্যা অত্যাচার !
সর্বসত্ত্বাহীন
কোন্ মোহে ত্যাগ কর মাতৃষের আত্ম-অধিকার ?
বিবেকবিহীন,

মহুয্যে তুচ্ছ করে নির্মম মানব ;
দুই পদে দলি সত্য নৃত্য করে অজ্ঞান-দানব ।
বক্ষ্মাঝে মুচ্ছাহত প্রাণ,
গাহিতেছে মরণের গান ;
নিপ্রভ জীবনীশক্তি, মহিমা সে লুপ্তি ধূল্য,
হ'লে কি আহুতি তুমি সমাজের পাবক-শিখায় ?
তার পরে অন্তহীন তমিস্রায় লীন
জগৎ মলিন ।

বরি নিলে বালা,
এই নানান-বাধা, রুদ্ধ মৌন অন্ধ কারাগারে
শত তীব্র বশিকের জালা,
নির্ধিকার শাস্তমুখে, সহিষ্ণুতা-ছদ্মবেশ ধরি
মানি আর লাঞ্ছনারে কেন নিলে বরি ?
মুক্ত কারাগার,
আত্মার আদেশ বাণী লজ্জন ক'রো না বার বার ।
বিজয়ের স্মরভিত্ত মাল্য
বহি আনো বালা !

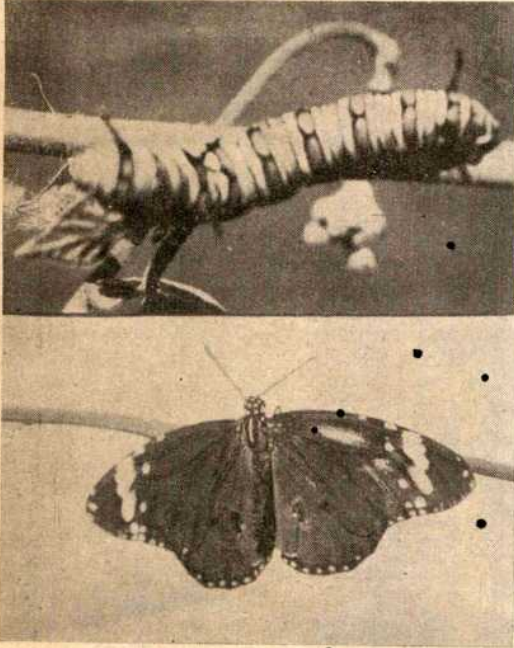


ঐক্য



দুধ-লতা প্রজাপতির জন্মকথা

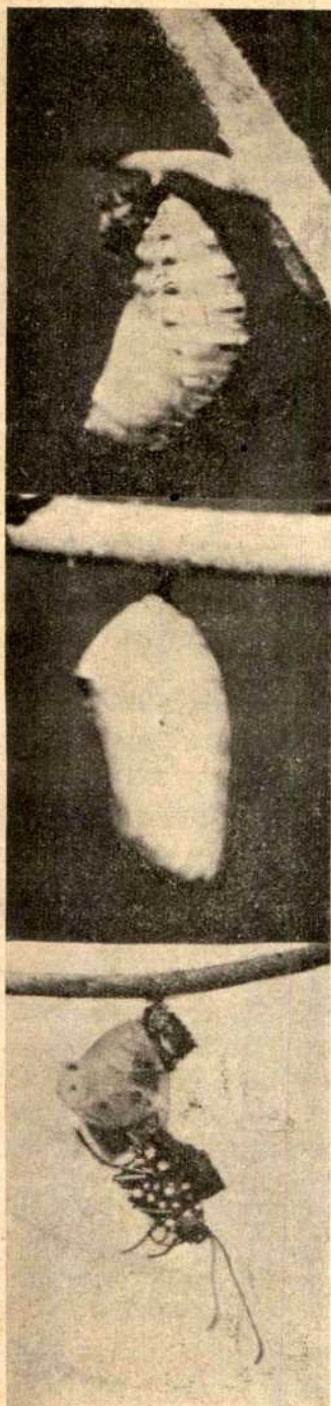
রূপকথার ব্যাং যেমন রাজকন্যা-সকালে তাঁহার কুৎসিত আবরণটা পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ রাজপুত্রের রূপ ধারণ করিত প্রাণী-জগতে কিন্তু এরূপ সত্যিকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের আশেপাশে অহরহ কত বিচিত্র বর্ণের স্রষ্টা প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে পাই। তাহাদের জন্ম-ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই একখার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এস্থলে আমাদের দেশীয় লালচে হলুদে রঙের দুধ-লতা প্রজাপতির জন্মবৃত্তান্ত প্রদান করিতেছি।



দুধ-লতা প্রজাপতির কীড়া বা প্রাক্তন কীটাবস্থা
নীচে : পূর্ণাঙ্গ দুধ-লতা প্রজাপতি

কলিকাতার আশেপাশে বনেজঙ্গ বড় গাছ বা বেড়ার গায়ে অব্যবহিত প্রকার বৃক্ষ-পাতার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পাতাগুলি একটু গোলাকার ধরণের, প্রায় প্রত্যেক গাট হইতে এক-একটা লম্বা বোটার উগায় এক জোড়া কাঁটাওয়ালা সরু-মুখ ফল ধরে। ফলগুলি শুকাইলে ফাটিয়া যায় এবং ঝাঁটার মত এক গোছা সূক্ষ্ম তন্তু সমন্বিত বীজ বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে; পাতা বা ডাঁটা ছিঁড়িলে ত্বকের মত অজস্র রস বরিতে থাকে, এই জন্মই বোধ হয় ইহাদিগকে দুধ-লতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

একটু মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিলেই এই লতার গায়ে অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার অজস্র গুয়াপোকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই গুয়াপোকাগুলি প্রায় এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়, গায়ে উপরি ভাগে হলুদে ও কাল রঙের ডোরা-কাটা। দেহের সম্মুখ ভাগে পিঠের উপর দুই জোড়া এবং শেষের দিকে এক জোড়া কাল রঙের লম্বা শুঁড় আছে। মুখটা সাদা কাল ডোরাযুক্ত। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে ইহারা রাত দিন এই দুধ-লতার পাতা ও ডাঁটা খাইতেছে। এক দণ্ডও বিশ্রাম নাই, পাতার ধার হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে প্রায় ১ ইঞ্চি স্থান লম্বালম্বিভাবে অতি সূক্ষ্ম অংশে কাটিয়া খায়। খাইবার সময় দেখা যায় যেন মুখটাকে কেবল বার-বার উপর হইতে নীচের দিকে নামাইতেছে। ইহাদের চেহারা দেখিতে ভীষণ হইলেও অত্যাশ্চর্য্য সাধারণ গুয়াপোকাকার মত বিষাক্ত নহে। অত্যাশ্চর্য্য সাধারণ গুয়াপোকা মানুষের গায়ে লাগিলেই চামড়ার মধ্যে গুয়াগুলি বিদ্ধ হইয়া যায় এবং সেখানে প্রদাহ, এমন কি সময়ে সময়ে ক্ষতেরও সৃষ্টি করে। কিন্তু এই গুয়াপোকাকার গায়ে মোটেই গুয়া নাই। ইহারা দুধ-লতা প্রজাপতির বাচ্চা বা কীড়া। এই কীড়া বা গুয়াপোকাই কালক্রমে অমন সুন্দর প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই দুধ-লতা প্রজাপতিই যেখানে-সেখানে বেশীর ভাগ নজরে পড়ে। দিনের বেলায় উড়িতে উড়িতে ইহাদের যৌন সন্মিলন ঘটে; এই সন্মিলনের কিছুকাল পরেই স্ত্রী-প্রজাপতি দুধ-লতার পাতার গায়ে একসঙ্গে কতকগুলি করিয়া ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। দিন-দশ-পনের পরে ডিম ফুটিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুয়াপোকা বাহির হয়। তখন তাহাদের গায়ে রং থাকে কতকটা ছাইয়ের রঙের মত। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার কিছুক্ষণ বাদেই খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু তখন পাতার সমস্ত অংশটাই খাইতে পারে না; কেবল পাতার সবুজ অংশটুকুই কুরিয়া কুরিয়া খায়। আর একটু বড় হইলেই পাতা বা ডাঁটার সমস্ত অংশ কাটিয়া কাটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। প্রায় দশ-পনের দিন এরূপ খাইতে খাইতে বড় হইয়া হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, এবং কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া শক্ত একটা ডাঁটা নির্বাচন করিয়া শরীরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে এক প্রকার আঠালো পদার্থ নির্গত করে এবং ঐ ডাঁটার গায়ে মাখাইতে থাকে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাখান মাত্রই ঐ রস জমিয়া স্রতার আকার ধারণ করে এবং বোটার স্থায় ঐ স্রতার সঙ্গে গুয়াপোকাটি মাখা নীচের দিকে রাখিয়া ঝুলিয়া পড়ে। ঝুলিবার সময় কেন্নোর ঝায় মাথার দিক ঈষৎ বক্র ভাবে থাকে। প্রায় আট-দশ ঘণ্টা এরূপ নিশ্চিন্দভাবে ঝুলিয়া থাকিবার পর হঠাৎ দেখা যায়—গুয়াপোকাটার শরীর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃই কাঁপনি বাড়িতে বাড়িতে কাঁকুনিতে পরিণত হয়। এই সময়ে দেখা যায়



১। গুটির আকার প্রায় স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে

২। পিউপা বা স্বাভাবিক গুটি

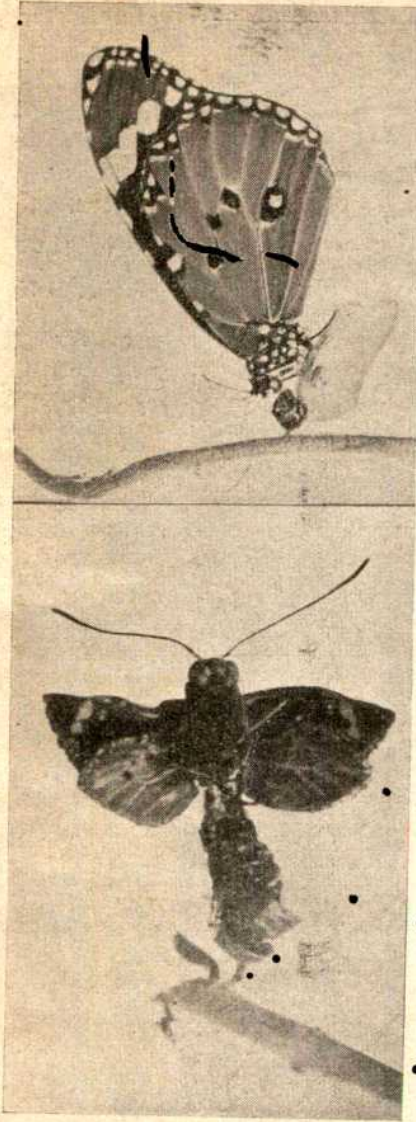
৩। গুটি বাধিবার আঠার দিন পরে প্রজাপতি বাহির হইতেছে



দুধ-লতা প্রজাপতির কীড়া
গুটি বাধিবার জন্ম বুলিয়া
পড়িয়াছে

উপরের খোলস ত্যাগ
করিয়া এ কীড়া গুটি
বাধিতেছে, গানের
খোলসের কিয়দংশ দেখা
যাইতেছে

গুটির আকার ক্রমশ
পরিবর্তিত হইতেছে



- ১। গুটি হইতে সবে প্রজাপতি বাহির হইয়াছে
- ২। পরিত্যক্ত গুটির খোলসের উপর প্রজাপতিটি বসিয়া আছে, ডানা বড় হইয়াছে

গুয়াপোকাটার মাথার দিকে পিঠের উপর থানিকটা স্থান হইয়া একটু ক্ষীত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই চামড়াটা ফাটিয়া গেল, এবং ভিতর হইতে উপরের দিক সুরু ও নীচের দিক মোটা এক অপূর্ণ সবুজাভ পিণ্ডাকার পদার্থ বাহির হইতে লাগিল। তখনও শরীরের কাঁকুনি পূর্বমতই চলিতেছে। প্রায় দশ-পনের সেকেন্ডের মধ্যেই দেখিতে দেখিতে উপরের চামড়াটা সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া গিয়া একটু কাল ফুলের মত বোটার কাছে আটকাইয়া রহিল। সবুজ পিণ্ডাকার পদার্থটা সেই বোটার কুলিয়াই শরীর একবার প্রসারিত এবং একবার সঙ্কুচিত করিয়া নানাভাবে মোড় খাইতে লাগিল।

প্রায় পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সবুজ রঙের পিণ্ডটার আকার পরিবর্তিত হইয়া উপরের দিক মোটা ও নীচের দিক সরু হইয়া গেল। উপরের দিকে পাশাপাশি ভাবে একটু ক্ষীত স্থানের উপর উজ্জ্বল সোনালী রঙের ফোঁটা সারি সারি ফুটিয়া উঠিল। শরীরের নিম্নভাগেও ঐরূপ কয়েকটি সোনালী রঙের ফোঁটা আশ্চর্য্যকর। পাঁচ-সাত মিনিটের ভিতরই এমন একটা অদ্ভুত রূপান্তর ঘটিয়া যায় যে দেখিয়া বিশ্বাসে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। তার পর সেই অবস্থায় সবুজ রঙের ঠিক ছোট একটি আঙুর ফলের মত লতার গায়ে ঝুলিতে থাকে। রং প্রথমে হালকা সবুজ, পরে গাঢ় সবুজ হইয়া যায়। সোনালী ফোঁটাগুলিতে আলো প্রতিফলিত হইয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে। কিন্তু পাতার সবুজ রঙের সহিত ইহাদের গায়ের রঙের এমন অপূর্ণ সাদৃশ্য যে অনেক ক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে অন্বেষণ না করিলে সহসা কোন মতেই নজরে পড়ে না। পনের হইতে বিশ দিন পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে ঠিক কানের তুলের মত ঝুলিয়া থাকে। ইহাই প্রজাপতির গুটি বা পিউপা অবস্থা। বিভিন্ন প্রজাপতির গুটি বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রঙের হইয়া থাকে। কত না তাহাদের রঙের বাহার, কত না তাহাদের কারুকার্য্য! বর্ণের উজ্জ্বল্য ও গঠন-পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কবির ভাষায় ইহাদিগকে সত্যিকার 'পরীর কানের তুল' বলিতেই ইচ্ছা হয়।

দুধ-লতা প্রজাপতির গুটি বা পিউপার রং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাঢ় সবুজ; কিন্তু মাঝে মাঝে কতকগুলির রং একেবারে সাদা হইয়া থাকে। সোনালী ফোঁটাগুলি কিন্তু উভয়েরই একই রকমের।

পনের-বিশ দিন পরে গুটির রং ক্রমশ পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফিকে হইয়া যায়। তখন উপরের আবরণটা অনেক স্বচ্ছ হইয়া পড়ে। তখন তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের প্রজাপতিটিকে আবুছা ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়—যেন ডানা মুড়িয়া রহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গুটির মধ্যস্থল হইতে নীচের দিকে একাংশ ফাটিয়া যায় এবং তাহার ভিতর দিয়া প্রজাপতি আস্তে আস্তে মুখ বাহির করিতে থাকে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই ডানা বাহিরে আসে, তার পর একবারে প্রজাপতির সমস্ত শরীর বহির্গত হয়। খোলস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবার সময় তাহার ডানা অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় থাকে। লেজের দিকও সেইরূপ অস্বাভাবিক ক্ষুদ্র কিন্তু মোটা। বাহিরে আসিয়াই ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতিটি তাহার পরিত্যক্ত খোলস আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের পশ্চাঙ্গাগ ও ডানাগুলি তর তর করিয়া বাড়িতে থাকে। প্রায় চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্বাভাবিক প্রজাপতির অবস্থায় পরিণত হয়। এই সময়ে ডানাগুলি কোমল ও তকতকে থাকে। বেকায়দায় পড়িয়া ডানাগুলি একটু এদিক-ওদিক বাঁকিয়া গেলে আর সোজা হইবার উপায় থাকে না। স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পরও প্রায় ঘণ্টাখানেকের উপর প্রজাপতিটি ডানা মুড়িয়া সেই পরিত্যক্ত খোলসের উপরই বসিয়া থাকে। তার পর ডানা একবার প্রসারিত করিয়া আবার গুটাইয়া পরখ করিয়া দেখে ঠিক উড়িবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা। তাহার কিছুক্ষণ পরেই উড়িয়া গিয়া ফুলের মধু আহরণে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



মিউনিক্ শহর

মিউনিক্

শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ ও শ্রীধন্যকুমার জৈন

ব্যাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিক্ শহরকে জার্মেনীর প্রাণ বললেও অতুক্তি হয় না। মিউনিক্ ওদেশের সব চেয়ে সুন্দর জায়গা। জার্মানরা একে সাজিয়ে-গুজিয়ে এমন মনোরম করে তুলেছে যে একে একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। তা-ছাড়া, প্রকৃতির দানও কম নয়;— চারদিকে গাছ-পালা, জলাশয়, পাহাড়-পর্বত,—দেখে প্রাণে কবিত্বের উদয় হয়।

কিছুদিন পূর্বে এখানে একটি বিরাট মিউজিয়ম বা বৈজ্ঞানিক সংগ্রহালয় স্থাপন করা হয়। সেই থেকে শহরটা যন্ত্র-যুগের তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা দেশ থেকে বিজ্ঞানের উপাসকেরা এই যন্ত্র-তীর্থে এসে থাকে।

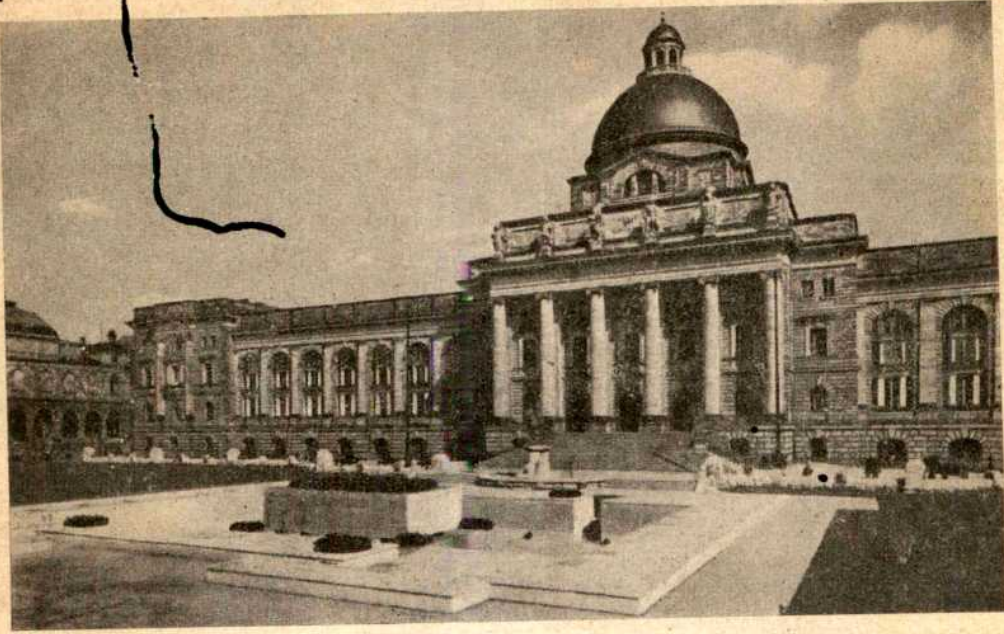
কিন্তু আজকাল সেই আকর্ষণের মধ্যে একটা ভীষণতা প্রবেশ করেছে। এটা হ'ল হিটলারের প্রিয় নগরী। নাসি-শক্তির প্রাদুর্ভাব এইখানেই হয়েছিল এবং এখনও সে শক্তি পরিচালিত হয় এখান থেকেই। কাজেই মিউনিক্ এখন হিটলারের লীলাভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংবাদপত্রে নাসি-অত্যাচারের কাহিনী পড়ে মনে হ'ত, কাগজগুয়ালারা বড় বাড়িয়ে লেখে। কিন্তু এখানে এসে দেখলাম তার মধ্যে অতুক্তি নাই। বার্লিনের পুলিশ তবু

সভ্য, কিন্তু মিউনিকের পুলিশের ব্যবহার দেখে বর্বর যুগের কথা মনে পড়ে। রাস্তায় হিটলারের উদ্‌গু নাসি যুবকরা আমাদের দেখে এমনি মুখভঙ্গী করত, যেন আমরা তাদের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণা। এই বিংশ শতাব্দীতে, এমন সভ্য যুগে এ-সব দেখে-শুনে বড় দুঃখ হয়।

শহরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানকার লোকসংখ্যা সাত লক্ষ। নদীর দুই ধারে শহর, মাঝখানে ইসার বইছে। প্রশস্ত রাজপথগুলি সোজা টানা চলে গেছে। স্থানে স্থানে মাঠ, গাছপালা, বাগান-বাড়ি আর বড় বড় ফোয়ারা। দেখে মনটা চান্দা হয়ে ওঠে। এখানকার একটি ফোয়ারা (Wittelsbacher Brunnen) জগৎ-প্রসিদ্ধ এবং সেটার জন্ত জার্মানরা গর্ব বোধ করে।

সাধারণতঃ যখন গেলো জার্মেনীর সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই জার্মান-সংস্কৃতির কেন্দ্র, কিন্তু বার্লিন ও মিউনিক্ তাদের মধ্যে প্রধান। মিউনিক্-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সব দেশেরই বিদ্যার্থীরা জ্ঞানলাভ করে থাকে। ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যাও কম নয়। এখানে বিজ্ঞানের এবং আরও অনেক রকম পরীক্ষাগার আছে। এখানকার হাইড্রলিক বিদ্যালয় দেখে আনন্দ হ'ল। সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও মন্দ নয়।



আশ্বিন-মিউজিয়ম

শিল্প ও কলা বিদ্যালয় এবং টেকনিক্যাল স্কুল আরও সুন্দর ;—প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। মিউনিকের বিরাট টাউন-হল দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা অতি সুন্দর।

মিউজিয়মগুলির মধ্যে ডেরেটশে মিউজিয়মই শ্রেষ্ঠ, জগতে ইহার তুলনা বিরল। এখানকার লোক এর জন্য গর্ব ক'রে থাকে। ইসার নদীর মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপ, তার উপর মিউজিয়মের বিশাল অট্টালিকা। চারদিকে নদীর নীল জলের ঢেউ আর স্নিগ্ধ সমীর। সাজাহানের সময়কার রাজকবির সেই কথা মনে পড়ে,

“অগর ছনিয়ামে হৈ জমত কহী” পর
যহী পর হৈ, যহী পর হৈ, যহী পর।”

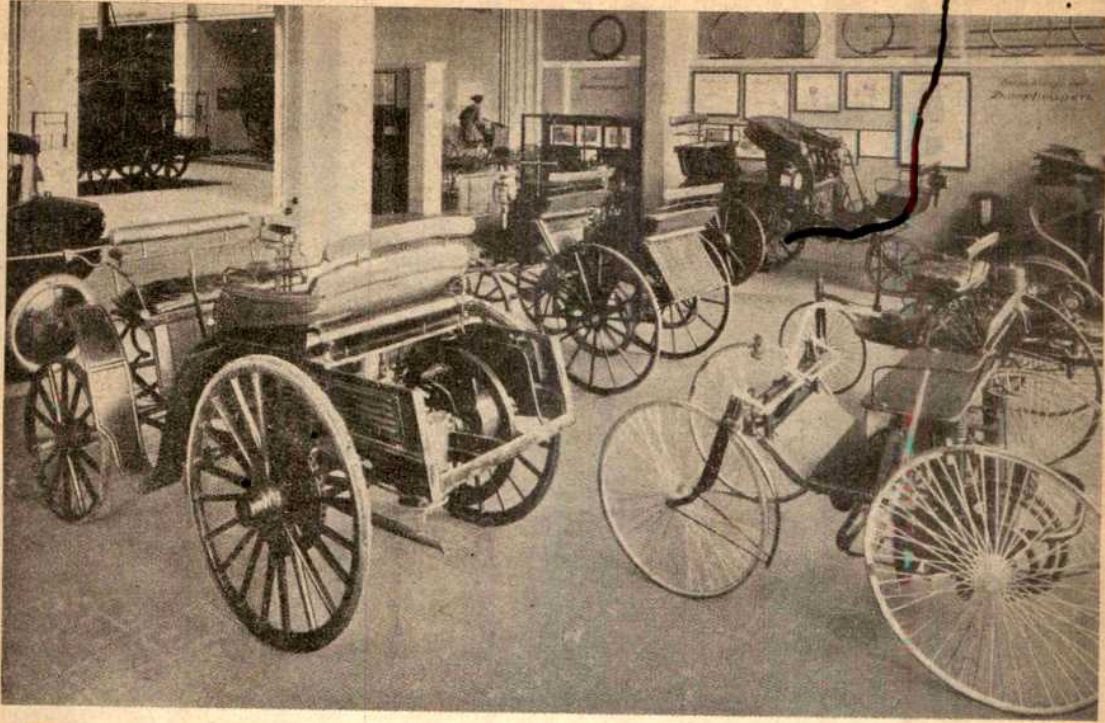
যদি কোথাও স্মরণ থাকে, তবে এটা এখানেই। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় ও সুন্দর বৈজ্ঞানিক মিউজিয়ম কোথাও আছে কি না সন্দেহ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ অস্কার ফন্ মিলার ইহা স্থাপন করেন।

১৯২৫ সালে অর্থাৎ বাইশ বৎসরে ইহার নির্মাণ-কাজ শেষ হয়। সমস্ত মিউজিয়মটা ঘুরে-ফিরে ভাল ক'রে দেখতে

গেলে ন-মাইল হাঁটতে হয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে কি বিরাট ব্যাপার! মিউজিয়মের দর্শনীয় জিনিসগুলি ষাট হাজার বর্গ-গজ জায়গায় সাজান। ভারতবর্ষে লণ্ডনের মিউজিয়মের বেশ প্রশংসা আছে এবং সাধারণতঃ ভারতীয় যাত্রীরা তাই দেখে ফিরে আসেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংগ্রহালয় হিসাবে মিউনিকের এই মিউজিয়মের কোন তুলনাই নাই। এখানে শত শত উচ্চশ্রেণীর ছাত্র নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে। তারা প্রত্যেকটি ব্যাপার এবং তার প্রয়োগ ও পরীক্ষা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ ক'রে জ্ঞান সঞ্চয় করে। এত সুবিধা অত্র পাওয়া দুরূহ। বিজ্ঞান-বিভাগে হাজার রকমের পরীক্ষা-যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম এমন ভাবে সাজান যে, যার যখন ইচ্ছা, সেগুলি চালিয়ে প্রয়োগ-কৌশলের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

অপরূপ বিভাগেও ঠিক এই রকম সুবিধা আছে। সব বিভাগের কথা লিখতে গেলে এখানে কুলিয়ে উঠবে না তাই প্রধান ক'টি বিভাগের কথা বলব, যেমন—ভূ-তত্ত্ব, খনি-বিজ্ঞান ধাতুবিদ্যা ও পাওয়ার-এঞ্জিন বিভাগ।

মাটির ভিতরকার শত শত ফুট নিয়ে অবস্থিত কয়লা,



মিউজিয়মের মোটর গাড়ী বিভাগ। এখানে আজ পর্যন্ত বত রকম মোটর গাড়ী আবিষ্কার হয়েছে, সবগুলিরই নমুনা পাইবেন

লবণ, তৈল প্রভৃতি খনির মডেল খুব বড় করে দেখান হয়েছে। পূর্বে খনির ভিতর রেল ও ঘোড়ার গাড়ির দ্বারা কেমন করে কাজ হত, তার পর এঞ্জিন-শক্তির কেমন করে প্রসার হ'ল, খননকারীরা কেমন করে কাজ করে, এমনই সব ব্যাপার স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা যায়। কেমন করে ভূমিকম্প হয়, কেমন করে পৃথিবী ফাটে, এ সব কঠিন বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বড় বড় মডেল দেখলে মুক্টিল আপনা হতেই আসান হয়ে যায়।

রেল, জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যান-বাহন বিভাগও বেশ উপভোগ্য। এই বিভাগে রাস্তা-ঘাট, রেল-লাইন, ছোট-বড় পুল, সড়ক প্রভৃতি দেখান হয়েছে। এমন সুন্দরভাবে সব সাজান যে দেখে তাক লেগে যায়। জাহাজের মডেলগুলি আরও চমৎকার। ট্রাফালগারে ব্যবহৃত বৃটিশ নৌ-সেনাপতি নেলসনের 'ভিক্টরী' নামক জাহাজ থেকে আরম্ভ করে অতিআধুনিক যুদ্ধ-জাহাজের মডেল পর্যন্ত এখানে বিদ্যমান। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস যে-জাহাজে চড়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন

সেই জাহাজের সঙ্গে আধুনিক জাহাজের তুলনা করতে বেশ লাগে। জার্মানীর প্রথম সাবমেরিন 'U' ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চিত হয়। এই সাবমেরিন ১৪০ ফুট লম্বা। 'U'-এর মডেলটি অতি চমৎকার।

উড়ো-জাহাজ বিভাগটা দেখে চমক লাগে। চোখের সামনে উড়ো-জাহাজের এমন প্রত্যক্ষ ইতিহাস দেখা সহজে ঘটে না। সেই বেলুন-যুগ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক এরোপ্লেন ও জেপ্লিনের মডেলগুলি পর পর সুন্দরভাবে সাজান। এই সব উড়ো-জাহাজ কেমন করে তৈরি করা হয়, তাও দেখান হয়েছে।

গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন-বিজ্ঞান বিভাগও প্রশংসার যোগ্য। এই বিভাগে সময়ের মাপ (measurement of time), গণিত, আলোক-বিজ্ঞান তাপ-তত্ত্ব, বিদ্যুৎ-তত্ত্ব, ধ্বনি-তত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, তারবাহী, টেলিফোন, টেলিভিশন, রসায়ন, শারীর-রসায়ন ঔষধ-বিজ্ঞান প্রভৃতি এমন সুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে যে, অনভিজ্ঞ লোকও একবার ভাল করে দেখলে সব বুঝতে পারবে।

বাস্তব-বিভাগে বাড়ি তৈরি করবার সরঞ্জাম, ঘরে আলোর ব্যবস্থা, শীতপ্রধান দেশে ঘর গরম রাখার প্রণালী, জল গ্যাস ও ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপার হুন্দর ভাবে দেখান হয়েছে। ইহা চতুর্থ বিভাগ।

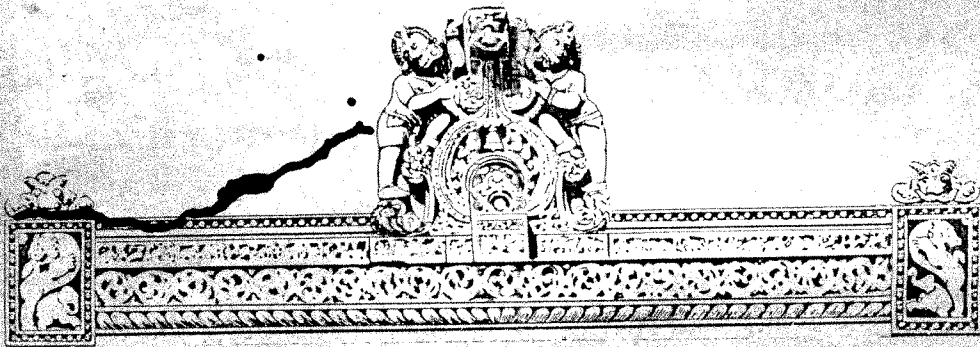
পঞ্চম বিভাগে জ্যোতিষ, জরীপ, বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী প্রভৃতি দেখান হয়েছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে এমন হুন্দর সংগ্রহ অল্প আছে কি-না সন্দেহ। এখানে দুইটি মানমন্দির আছে,—একটি টলেমিপন্থী, আর একটি কোপারনিকান। মানমন্দিরে যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের আলোকিক দৃশ্য দেখানোর সময় ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হয়। সেই নিবিড় অন্ধকারে নবগ্রহ, সপ্তমিগুণ্ডল, গ্রহবারা ও অগ্ন্যন্তর তারকা-প্রকাশ, চন্দ্রোদয়, সূর্যোদয়, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দেখে মনে হ'ল যেন আকাশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। এ সব দৃশ্য দেখে মনে হয় মানুষ বুদ্ধি-বলে অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে।

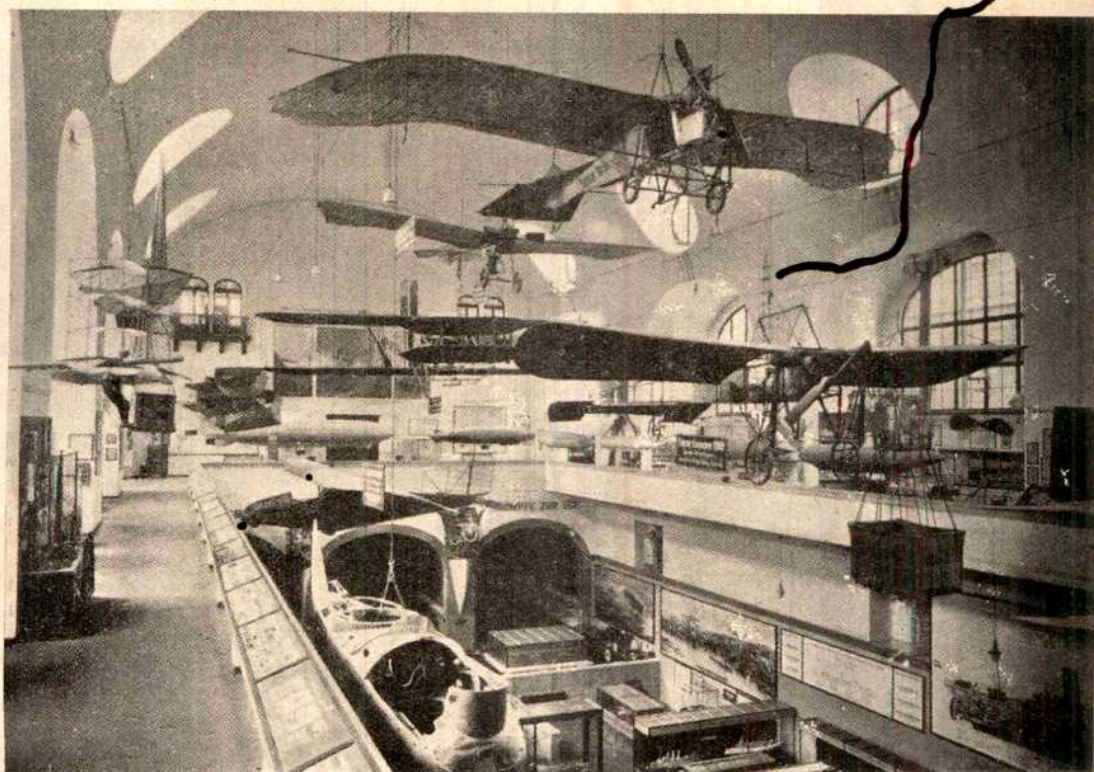
সংগ্রহালয়ের এক ধারে সাধারণের জ্ঞান গ্রন্থাগার ও পাঠাগার আছে। এই গ্রন্থাগারে নানা বিষয়ের পুরাতন ও নতুন এক লক্ষ ষাট হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। জগতে এরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-সংগ্রহ খুব কমই দেখা যায়। এখানে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের ব্যবস্থাও আছে।

একটি কথা বলতে ভুলে গেছি; সংগ্রহালয়ে আগ্রার তাজমহল ও জয়পুরের মানমন্দিরের মডেলও রাখা হয়েছে। দেশের দুটো জিনিষ দেখে একটু গৌরব অনুভব করলাম।

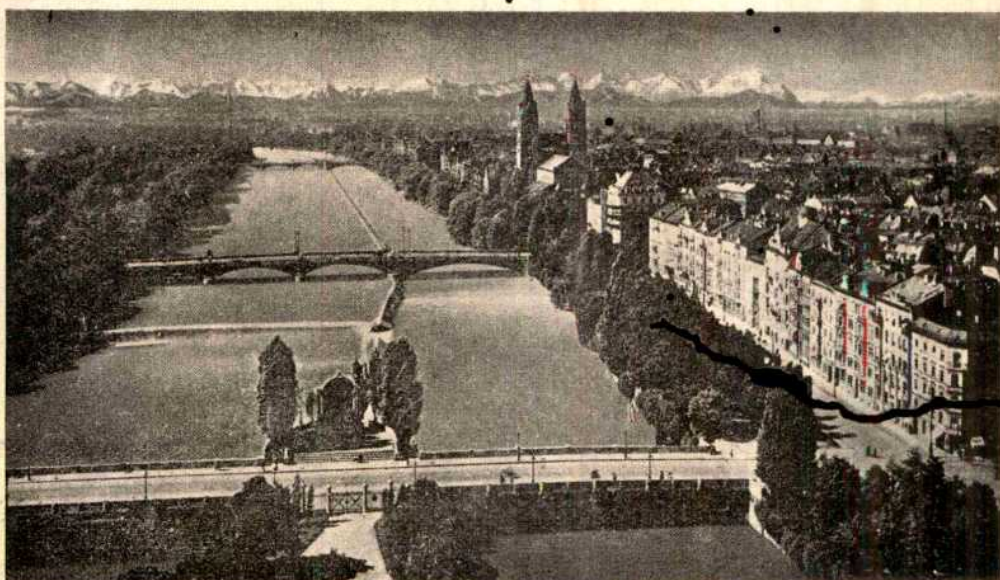
দর্শকদের মধ্যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের সংখ্যাই বেশী। স্থলের শিক্ষকেরা তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ান ও বক্তৃতা দিয়ে সহজে সব ব্যাপার বুঝিয়ে দেন।

এখানকার কংগ্রেস-হল এবং আম্বি ও রেজিমেন্ট মিউজিয়মও দেখবার জিনিষ। আম্বি-মিউজিয়মে প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ অবধি সব রকমের যুদ্ধাস্ত্র রাখা হয়েছে। সবটা দেখে গা হুম্‌হুম করে উঠে। দেখলাম এখানেও ছেলে-মেয়েদের বেশ ভিড়। রেজিমেন্ট-মিউজিয়মের বিরাট সৌধ, তার পিছনে বাগান, আশেপাশে খেলবার মাঠ, থিয়েটার-ইত্যাদি। আগে এই বাড়িটাকে ব্যাভেরিয়ার রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন সাধারণের মিউজিয়ম। ভিতরটা অতি হুন্দর, প্রায় দু-শ হল ও কামরা আছে। প্রত্যেক গৃহ স্মৃষ্টি কারুকার্যে মণ্ডিত। দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণের রকমারি পাথর, মতি, বিলুক, প্রভৃতি বসিয়ে অনেক রকম লতা-পুষ্প ও পশু-পক্ষী আঁকা হয়েছে। নীল রঙের পাথরে বাসনের সেট দেখে নীলমণি বলে ভ্রম হয়। চিনেমাটির বাসনও অতি চমৎকার। চিনেমাটির ছবিগুলি বিচিত্র, দূর থেকে মনে হয় যেন তৈলচিত্র। মিউজিয়মের উপরতলার অংশের নাম 'স্বর্গ-ভবন'। এর সমস্ত কারুকার্য সোনালি রঙের, ছাদের গড়ন ও চিত্রাঙ্কন দেখে শিল্পীর প্রশংসা না করে থাকতে পারা যায় না।

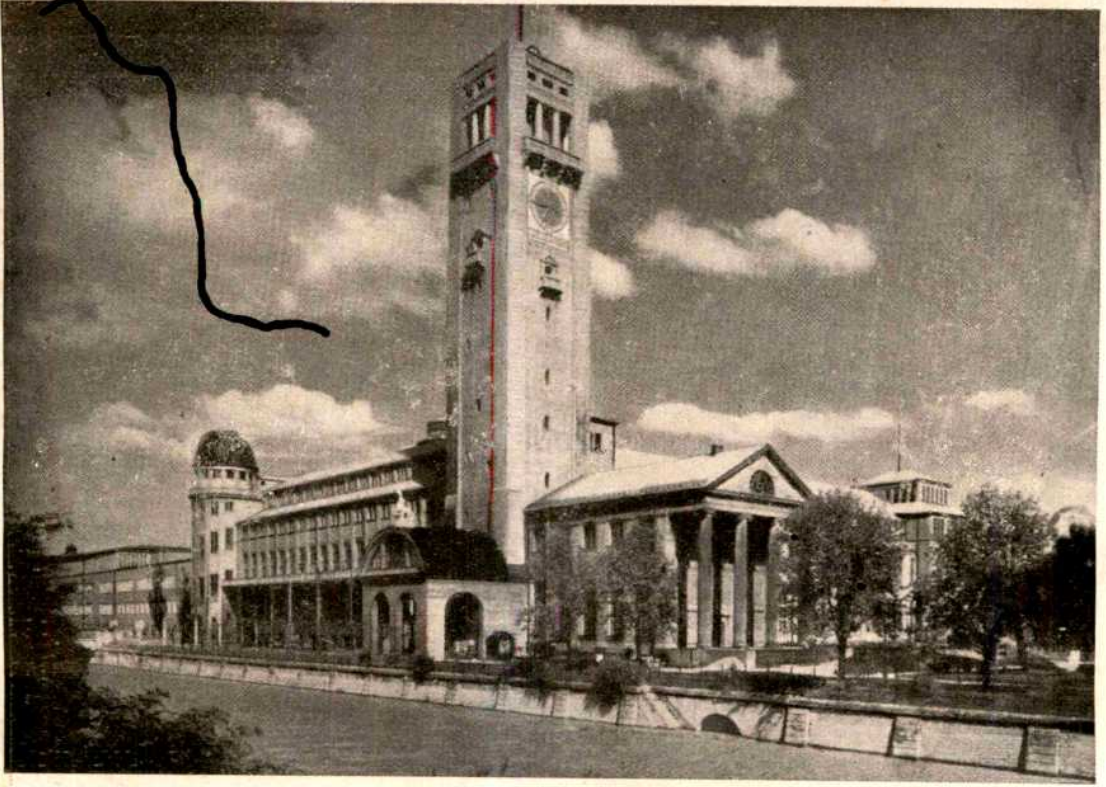




মিউজিয়মের উড়ো-জাহাজ বিভাগ



মিউনিক শহরের মধ্যস্থলে ইসার নদী



মিনিউনিকের ডয়েটেশো নামক মিউজিয়ম। টাওয়ারটি ২১০ ফুট উচ্চ



মিউজিয়মের ময়দান। এখানে উড়ো-জাহাজ ও উইণ্ডমিল (বায়ুচক্র) প্রভৃতি দেখান হইয়াছে

পরম

শ্রীমণীশ ঘটক

আর কেহ বুঝিবে না। তোমাতে আমাতে
এ বোঝা-পড়ার পালা সাধ করে যাব আজ রাতে
অস্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে
শান্ততর, স্নিগ্ধতর হয়ে এল রাঘু।
তৃতীয়ার চন্ডের প্রায়
হ'ল শেষ। মেঘলোক হয়ে পার
বনিষ্ঠ আগ্রহ রচে পরম আত্মীয় অঙ্ককার।

হলা পিয় সহি,
জাস্তবজিগীবা বন্ধে অতীতের সে নিবাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসক্তের জ্বর আক্রমণ
সবিক্রপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা-পণ
বধির বাসব হস্ত-চ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিল চূর্ণ; আমারি নিঃশ্বাস
স্বার্থ পরমার্থ ঘন্থে আজি নির্ঝাঁপত
সে অনল,—স্বতিভস্মস্তূপে সমাহিত।
অনলস কাল আবর্তনে
মহীকহ হয়েছে অন্ধার। হয়ত পরম কোনো ক্ষণে
অন্ধারে ফুটিবে হীরা,—আজি সে প্রসঙ্গ অবাস্তর।

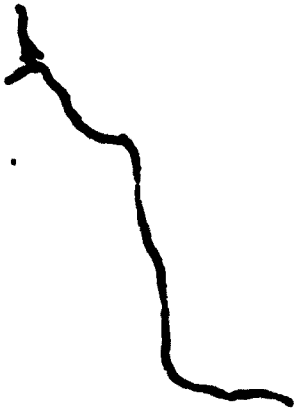
পূর্ণলোহ যৌবনের মধ্যাহ্ন-ভাস্কর
সেদিন জলিতেছিল এ দেহ অধরে।
দিকে দিগন্তরে
সন্নীর খসিতেছিল অগ্নিবর্ষা হাস।

চক্ষে ভরি জ্বাস
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধ্বংস-উৎসবে?
বৌবন গৌরবে
বকল-শাসন-মুক্ত তুমি তনয়,
সহসা উবেল হ'ল-শত্রু বক্ষময়।
অজ্ঞাত শব্দায়
অপাদে অনল-তীর মুহমূহ্ণ এমকিল হায়।
শিহরিল প্রবাল-অধর
কেদ্রীভূত কামনার চুষক-বিগারে থর থর।

আশ্রম-আশ্রয় ত্যজি আশ্রয়-তাপসী বধনতা
নিষ্কলুষা কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে হুল আবির্ভূতা।
নিষ্কল ক্রান্তের প্রথম সংস্পর্শে আচম্বিত
মদাগ্নুতা,—হারালে সঞ্চিৎ।

হায় সখি-হায়,
তুমি তো জানিলে না-কো নেই যুগস্মার
এক অস্ত্রে হত হ'ল যুগী ও নিষাদ।
আদি বিপু উন্মোচিত প্রাণের বাঁধ
সেই পথ দিয়া।

প্রেম এল বজ্রাসম দুফুল ছাপিয়া
সুগন্ধীর সমারোহে।
অনাদ্যে আজও তাহা বহে
দুর্বার প্রবাহে ফলি উন্মত্ত কল্লোল।
আমার নিখিল তারি কিসে আজি উন্মত্ত কল্লোল।



ভ্রষ্ট-লগ্ন

বনফুল

• স্তম্ভ হইয়া বসিয়া আছি।

আমার পায়ের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে আমার জী। তাহার আলুলায়িত কেশরাশি পায়ের কাছে থানিকটা জমাট অন্ধকারের মত পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে—অবশ্য জননাবেষে তাহার সর্বদা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

কি বলিব—কথা সরিতেছে না।

* * *

অতীতের চিত্রগুলি মনে জাগিতেছে।

মনে পড়িতেছে সেই দিনের কথা যখন আমি স্কুলে পড়িতাম—যখন আমার কৈশোর পার হয় নাই—যখন স্বপ্নের সঙ্গে সত্যের খাদ এত বেশী করিয়া মেশে নাই।

স্কুলে পরম বন্ধু ছিল তবু—অর্থাৎ জৈলোক্য। বন্ধুত্বের ইতিহাসও আছে একটু। আমি থাকিতাম বোর্ডিঙে, আর তবু থাকিত বাড়ীতে। এক পল্লীগ্রামের মাইনর স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া আমি শহরের হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। ঠিক সেই বৎসরই সেই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল তবু। মুখচোরা ফরসা ছেলেটি। স্কুলের শিক্ষকগণ মেড়ার-লড়াই-দেখা মনোভাব লইয়া আমাদের উভয়ের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়—তাহার আগ্রহে আমি এই স্কুলে আসিয়া ভর্তি হইয়াছিলাম—একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “সেই উকুন কেন করে হোক হটাতে হবে। পারবে ত?”

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়াছিলাম মনে পড়িতেছে।

তখনও জানা ছিল না তবু কি বস্ত।

তবুকেও নাকি তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় গোপনে বলিয়া ছিলেন, “ওই ছেলেটিকে কিন্তু হারানো চাই। শুনছি বটে

ভাল ছেলে—কিন্তু হাজার ভাল হলেও পাড়াগাঁ থেকে আসছে, ইংরেজীতে কাঁচা হবেই। তুমি চেষ্টা করলে ও কিছুতে তোমার সঙ্গে পারবে না—”

চেষ্টা করিলে তবু যে আমাকে অনায়াসে হারাইয়া দিতে পারিত এ-বিষয়ে এখনও আমি নিঃসন্দেহ। তবু কিন্তু চেষ্টা করে নাই সেই জন্ত দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আমার মানরক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তবু ছিল কবি—সে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়া দিল—অ্যালজেব্রা ও উপক্রমণিকা—মুখস্থ-করা ভাল ছেলে সে হইল না। তাহার কবিতাও এমন কবিতা যে তাহা আমার কাষ্ট হওয়ার গৌরবকে নিশ্চয় করিয়া দিল। নবোদিত দিবাকরের জ্যোতিতে ইলেকট্রিকের বাতি ম্লান হইয়া পড়িল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমি রহিলাম মানপুর স্কুলের কাষ্ট বয় আর তবু হইতে চলিল বঙ্গসাহিত্যের এক জন উদীয়মান কবি। তবুকাঁটা যে কি এবং কত বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

• ফলে,—তবুও ভক্ত ও বন্ধু হইয়া পড়িলাম।

২

ক্রমশঃ বন্ধুত্বটা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হইল যে স্কুলের সীমানার মধ্যে আর তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল না। তবু একদিন আমাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। তবু মায়ের মেহ-কোমল ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিল—কিন্তু আমাকে চমৎকৃত করিল আব এক জন। তবুর বোন। অসাধারণ তাহার রূপ। “অসাধারণ রূপ” বলিতেছি কারণ, চক্চকে ধারালো স্বন্দর একটা কথা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া। এমন স্বন্দরী সত্যই আমি দেখি নাই। ছিপছিপে পাতলা গড়ন। চোখ মুগ্ধ নাক অসুত। একমাথা কালো কোঁকড়ান চুল। গায়ের রং—সেও অতিশয় অপূর্ণ। টাপাস্কুলে গোলাপী আভা থাকিলে যাহা হইতে পারিত তাহাই। মনে হইছে লাগিল যেন স্বপ্নাবিষ্ট শিল্পীরা কল্পনা সহসা মুষ্টি ধরিয়াছে।

আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম তাহার ব্যবহারে।

বছর-দশেকের মেয়ে—অবাক হইয়া গেলাম তাহার গাভী-র্য দেখিয়া। আমার সহিত কথাই বলিল না। আচারে, ব্যবহারে, ভাবে ভদ্রীতে বেশ হুস্পষ্ট করিয়াই সে বুঝাইয়া দিল যে আমাকে সে গ্রামের মধ্যেই আনিতেছে না। আমার সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। মনে মনে আশ্চর্য্য-সন্মানে একটু আঘাত লাগিল। চুপ করিয়া রহিলাম। বলিবার কিই বা ছিল।...সে দিনটা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে।

* * *

তরুণ বাড়ী প্রায়ই নিমন্ত্রণ হইত। প্রায় প্রতি রবি-বারেই। হুতরাং ক্রমশঃ কথা দু-একটা হইলই।

বেশ মনে পড়িতেছে প্রথম দিনই সে আমাকে বলিয়া-ছিল, “দাদাদের ক্লাসে আপনিই বুঝি ফাষ্ট বয়?”

সত্য কথাই বলিয়াছিলাম, “হ্যাঁ—”

উত্তরে সে কি বলিল শুনিবেন?

“বই মুখস্থ ক’রে ফাষ্ট সবাই হ’তে পারে। দাদার মত, অমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন আপনি?”

মনে পড়িতেছে একটু সলজ্জ গলা-ধাকারি দিয়া বলিয়া-ছিলাম, “আমি তোমার দাদার মত নই ত। হ’তেও চাই না—”

“পারবেনই না—”

দশ বছরের মেয়ে।

৩

দেখিতে দেখিতে চারিটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এই চারি বৎসরে ত্রৈলোক্যের বাড়ী বছবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু মালতীর অর্থাৎ তরুর বোনের সহিত খুব অল্প কথাই হইয়াছে। যখনই যাইতাম দেখিতাম হয় সে আয়নায় মুখ দেখিতেছে—না হয় শাড়ীটি গুছাইয়া পরিতেছে—না হয় পরিপাটি করিয়া চুল বাধিতেছে—না হয় অমন একটা কিছু। নানাভাবে সে আপনাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসিত। আয়নায় যখন সে চাহিয়া থাকিত মনে হইত যেন সে প্রণয়ী-ব মুখপানে চাহিয়া আছে। নিজের মুখখানির প্রেমে সে নিজেই পড়িয়াছিল। সে যে অজুত রূপসী এই সত্য কথা সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং একদণ্ডও ভুলিয়া থাকিত না।

তাহার বয়স বত বাড়িতে লাগিল। বাদকতাও বাড়িতে লাগিল। আমার সেই সম্ভ্রান্ত যৌবনে—বেশী বঞ্চিত করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না—আপনারা বাহা আশঙ্ক করিতেছেন তাহাই ঘটিবে। জীবনে সেই প্রথম প্রেমে পড়িলাম এবং সেই মেয়ের সহিত যে আমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহে নাই—বাহার ভাবে-ভদ্রীতে কথা-বার্তা আমার প্রতি অবজ্ঞাই—অল্পকাল কুটিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্য্য-হ্রেমের নিয়ম। আমি ঠিক তানাদের পালাটি ঘর ছিলাম, আমার ভাল ছেলে বলিয়া একটু সন্মানও ছিল, মালতী যদি সমান্ত্র একটু আশাস দিত—বিনাহ আটকাইত না। কিন্তু আশাস সে মোটেই দিল না। একদিন মনে পড়িতেছে ত্রাহাকে আড়ালে পাইয়াছিলাম—মনের কথাটা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়া অনিশ্চিত ভাবে একটু আমতা-আমতা করিতেছিলাম। আমার ভাব-গতিক দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিয়াছিল, “আপনি যা বলবেন তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু বলবেন না। নিজের চোখাটা কখনও মেখেছেন আয়না?”

এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গিয়াছিল।.....সেদিন সন্ধ্যায় শুলের খেলাব মাঠটাতে অনেকক্ষণ একা একা ঘুরিয়া ঘোড়াইয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। ইহাও মনে পড়িতেছে যে অত বড় রুঢ় আঘাতের পরও মালতীর উপর বিতৃষ্ণা আসে নাই। বরং তাহার পক্ষ লইয়া নিজেরই সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। যাহার গর্ভ পরিবার মত রূপ আছে সে ত্রাহা লইয়া গর্ভ করিবে বৈকি! রূপসী মাজেই গরবিনী। গর্ভিণী সৌন্দর্যের একটা অলঙ্কার। অনেক তপস্যা করিয়া তনে সুন্দরীর মনের নাগাল পাওয়া যায়। এমনি কত কি যুক্তি। আমি কিন্তু আর সময় পাই নাই। সেটা ম্যাট্রিক দ্বিবার বছর। পড়াশোনা কিছুদিন ব্যস্ত রহিলাম—ত্রাহার পর পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতে হইল। যখনগ্নে কিংকিয়া বাওয়ার অক্লান্ত শ্রম আর পাওয়া গেল না।

৪

ইহার পর আরও চারি বৎসর কাটিল।

আমার উপব দিয়া অনেক বাড়িবাঁটা গেল—বাবা, মা মরা গেলেন। সংসারে আমার আর আপন বলিতে

বিশেষ কেহ ছিল না। কলিকাতার মেসে নিঃসঙ্গ জীবন-
যাপন করিতেছিলাম। মালতীকে ভুলি নাই। ভোল
ষায় না বলিয়াই ভুলি নাই। তাহাকে পাইবার আশ
অবশ্য অনেক দিন ভাগ করিয়াছিলাম।

তকুর পত্র মাঝে মাঝে পাইতাম।

সে সাহিত্য-সাধনায় এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল এ
মাত্রিকটা পর্যন্ত পাস করিতে পারিল না। অথচ ভাল
তাহার পক্ষে কতই না সহজ ছিল। তকুর বাবাও মার
গেলেন। তকুরদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না—আরও
খারাপ হইয়া গেল। একদিন তকুর পত্র পাইলাম—
লিখিয়াছে মালতীর জন্য একটি ভাল পাত্রের সন্ধান আ
নেন করি। পাত্রটি আর যা-ই হউক স্বরূপ হওয়া প্রয়োজন,
কারণ কালো বলিয়া দুইটি ভাল পাত্রকে মালতী কিছুতেই
বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। উত্তরে লিখিলাম, “ভাল
পাত্রের সন্ধানে রহিলাম। জানাশোনা একটি ভাল পাত্র
আছে—কিন্তু চেহারা তেমন সুবিধার নয়। মালতীর
পছন্দ হইবে না। বল ত সম্বন্ধ করি।”

সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম।

কোন উত্তর আসে নাই।

আরও কিছুদিন কাটিয়াছে।

এম-এ পড়িতেছি। আশ্চর্য্য মাহুদের মন। হঠাৎ একদিন
আবিষ্কার করিলাম যে মালতী কখন মন হইতে অতর্কিতে
সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে
আর এক জন—মুহূর্ত্তাসিনী মুহূর্ত্তাধিগী মিস্ মিত্র।
আমার সহপাঠিনী।...আলাপটা হইয়াছিল লাইব্রেরীতে।
এখিল্লবে একটা অংশ-বিশেষ বুঝিয়া লইবার জন্য মিস্ মিত্র
আমার সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। সেই হইতেই আলাপ।
আলাপ সাধারণতঃ যেভাবে ঘনিষ্ঠতর হয়—সেই ভাবে
হইয়াছিল। মিস্ মিত্র যে মনুষ্য তাহা নয়। কিন্তু
তাহার চোখে যখন একটা মার্জিত কমনীয়ত,
এমন একটা সম্যক মধুর বুদ্ধিদীপ্ত রূপ দেখিয়াছিলাম
যে মনে রং ধরিয়া গেল।...ক্রমশঃ দেখিলাম তাহার
অল্পস্থিতিতেও আমি তাহার কথা চিন্তা করিতেছি,
অজ্ঞাতসারেই তাহার চলা-কোলা লক্ষ্য করিতেছি, কোন

কোন রঙের শাড়ী পরিলে তাহাকে মানায় তাহা বিশ্লেষণ
করিতেছি এবং কখন সে ক্লাসে আসিবে সেই আশায় ঘরের
দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

৬

যখন মিস্ মিত্রের সঙ্গে আমার বিবাহের কথা পাকা
হইয়া গিয়াছে—আর কয়েক দিন পরেই বিবাহ হইবে—এমন
সময় তকু আসিয়া হাজির।

তকুর মুখে সমস্ত শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

বলিলাম, “সে কি সম্ভব?”

তকু বলিল, “সম্ভব অসম্ভব বুঝি না ভাই—সমস্ত খুলে
বললাম। শুকে এখন আর কে বিয়ে করবে বল? অসাবধানে
ঠোত জ্বালতে গিয়ে—ছি ছি, কি ক্রাণ্টাই হয়ে গেল। মা
বললেন তোর কাছে আসতে। তুই ছাড়া কাউকে এ অল্পরোধ
করতেও সাহস পাই না যে।—” বলিয়া তকু হঠাৎ কাঁদিয়া
ফেলিল।

তাহার চোখে জল দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলাম।
তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, “না ভাই এখন আর সে হয় না।
অনেক দূর এগিয়ে পড়েছি। চল মাকে গিয়ে আমি বুঝিয়ে
বলছি—”

মানপুর গেলাম।

* * * * *

পায়ের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া দ্বী বলিতেছে
শুনিতেছি, “কক্ষণো তুমি আমার ভালবাস না—
কক্ষণো না। একদিনও বাস নি—বাসতে পার না।
আমায় তুমি শুধু দয়া করেছ—কে তোমার দয়া চেয়েছিল—
কেন তুমি দয়া করেছ—কেন—কেন—কেন—কেন—”

পাগলের মত বলিয়া চলিয়াছে।

“শোন—একটা কথা শোন—পায়ের উপর থেকে মুখ
তোল—”

অশ্রুসিক্ত মুখ সে তুলিল।

মালতীর অনিন্দ্যস্বপ্নর মুখ আগে যে দেখিয়াছে তাহার
এ মূর্ত্তি দেখিয়া সে শিররিয়া উঠবে। বীভৎস পোড়া
কদাকার! অসাবধানে ঠোত জ্বালিতে গিয়া সমস্ত মুখটাই
তাহার পুড়িয়া গিয়াছিল।

মিস্ মিত্রের খোলা চিঠিখানা কাছেই পড়িয়া রহিয়াছে।

আলোচনা

বাংলা বানান

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ, ডি-লিট

বাংলা বানানের সমস্যার চেষ্টা অনেক দিন হইতে হইতেছিল। অনেকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, আমিও কবিরাজ (আমার “ভাষা ও সাহিত্য” দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ব্যক্তিগত চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় “বাংলা বানানের নিয়ম” সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া অতি সমীচীন কার্যই করিয়াছেন। গত কার্তিকের ‘প্রবাসী’ পত্রে আচার্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত “খেও”, “দিও” বানান সম্বন্ধে তাঁহার প্রাপ্তি জানাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু অগ্রহায়ণের ‘প্রবাসী’তে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। প্রক্টর আচার্য মহাশয় গত পৌষের ‘প্রবাসী’ পত্রে পুনরায় তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমি নিম্নে সংক্ষেপে আমার মন্তব্য নিবেদন করিতেছি।

প্রচলিত বাংলা বানানে য় অক্ষরের চারিটি উচ্চারণ আছে ;—

(১) অকাব্যি স্ববেব সহিত অভিন্ন ; যেমন—পেয়ারা, বায়ার, মারে (—মাতার), পায়ের (—পদের) ইত্যাদি। (২) উকার বা ওকার পরস্থিত য়া ইংবেজী ya-র মত ; যেমন—কুয়া, সুরা, মোয়া, শোয়া ইত্যাদি। শব্দের আদিতে এবং উকার ও ওকার ভিন্ন স্বরেব পরবর্তী স্থলে “ওয়া” বানান এই ya উচ্চারণ প্রকাশ করে ; যথা,—ওয়াড়, হওয়া, খাওয়া, দেওয়া। একপ স্থলে আসানীতে অস্ত্রঃস্থ য-কাব লেখা হয়। (৩) ইংবেজী y-এর মত ; যথা,—বায়ু, ময়ূব, ইত্যাদি। হইয়া, দেখিয়া প্রভৃতি স্থলে য়া-র উচ্চারণ আ এবং ya-ব মধ্যবর্তী। বস্তুতঃ ই কাব ও স্ববর্ণের মধ্যস্থিত য-কে দুই স্বরেব অস্ত্রবর্তী সন্ধিবর্ণ (glide) বলা হয়। শব্দের আদিতে “ইয়া” ইংবেজী ya-র উচ্চারণ প্রকাশ করে ; যথা,—ইয়ার, ইয়ারিং ইত্যাদি। (৪) অ, আ, এ, ও স্বরেব পরবর্তী হসন্ত য় পূর্ব স্বরেব সহিত সন্ধিস্বব (diphthong) সৃষ্টি করে ; যথা,—হয়, পয়সা হায়, বায়না, দেয়, পের (পান করে), দোয় (—দোহন করে) ইত্যাদি। একপ স্থলে হসন্ত য় হসন্ত এ-কাবেব সহিত অভিন্ন

এক্ষণে আমরা দেখিব “খেরো” কিংবা “খেও” কোন্ বানান শুদ্ধ বা ধ্বনিসঙ্গত। “খেরো” শব্দ য়-র উচ্চারণ তৃতীয় প্রকারের, যেমন—কুরো, হুরো প্রভৃতি শব্দে। স্তবরাং “খেও” বানানে প্রকৃত উচ্চারণ রক্ষিত হয় না। “খেও কুরুর”, “সেও বলিল”, “দেশেও নাই”, প্রভৃতি স্থলে “খেও”, “সেও”, “দেশেও” প্রভৃতি বানানে যেমন য়-র তৃতীয় প্রকারের ধ্বনি আসিতে পারে না, “খেও” বানানেও সেইরূপ। এই জন্য আমি খেরো, খেরো, পেরো (খাইও, যাইও, পাইও শব্দের চলিত রূপে) বানান শুদ্ধ ও সঙ্গত মনে করি।

“দিয়ো” কিংবা “দিও” কোন্ বানান ধ্বনিসঙ্গত ? ইহার উত্তরে আমরা বলিব এখানে বাস্তবিক ই- এবং ও-ব মধ্যে সন্ধিবর্ণ য় আসে। এই জন্য “দিয়ো” বানান অধিকতর ধ্বনিসঙ্গত। “দিও” লিখিলেও উচ্চারণে কোন গোলযোগ হয় না, সত্য ; কিন্তু তাহা স্রষ্টাক্রমে ধ্বনিসঙ্গত হয় না। এইজন্য কবিও, দেখিও, যাইও ইত্যাদি স্থলেও আমি ধ্বনিসঙ্গত কবিরো, দেখিরো, যাইরো ইত্যাদি বানান প্রচলনের পক্ষপাতী। আমাব বিবেচনার একমাত্র তৃতীয় প্রকারের য়-ব উচ্চারণের জন্য বানানে য় ব্যবহার কর্তব্য। আচার্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এই বিষয়ে পতিত হওয়ার তিনি বাস্তবিক শাস্তিকগণের ধন্যবাদার্থ।

“শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক”

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(১)

গত শ্রাবণ মাসের ‘প্রবাসী’তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর “শব্দ-তত্ত্বের একটি তর্ক” যে ভাবে নীমাণে করিয়াছেন তাহাতে ভাষা-তত্ত্বাবোধীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে “গান গাব” বাক্যেব “গাব” শব্দের শুদ্ধাংশ লইয়াই এই তর্ক উদ্ভূত। রবীন্দ্রনাথ উক্ত “গাব” শব্দের ও অক্ষরপ কতগুলি শব্দের দায়ুজনগ্রাহ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়া ইহার বিস্তৃতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ বলেন, “বাংলা গাওয়া” শব্দটার মূল ধাতু গাহ্—আধুনিক বাংলার ‘হ’ শব্দটি উচ্চারণে লুপ্ত হইলেও তৎসংযুক্ত স্বরধ্বনি লুপ্ত হয় নাই। অতএব “গান গাইব” হওয়া বিস্তর। বিষয়টি—একটু ভাষাগত ঐতিহাসিক আলোচনার প্রবৃত্ত হওয়া বাউক।

বাংলা “গাওয়া” শব্দটির মূল ধাতু ‘গাহ্’ না ‘গা’ ? গান গাওয়া অর্থে সংযুক্ত ধাতু ‘গৈ’ ও ‘গা’ প্রাকৃতিক ‘গা’, তবে বাংলাতে কোথা হইতে ‘হ’র উদয় হইল ? প্রাচীনতম বাংলা ভাষার যে সমস্ত নির্দল পাওয়া যায় তাহা হইতে স্পষ্টতই দেখা যাইবে যে শব্দটির মূল ধাতু ‘গাহ্’ নয়, প্রকৃতপক্ষে ‘গা’। যেমন,

“আইসন চর্যা বুকুরী পুঞ গাইড (গাইল)।”—বৌদ্ধগান, চর্যা ২.

“কাদে গাই (গায়) তু কাম-চণালী।”—বৌদ্ধগান, চর্যা ১৮

“হুম্বর সে গাঁত পাখী বাখী করতালী।”—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, পৃ: ২১৫

“গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীগ।”—ঐ পৃ: ২

“হুসর গন্ধ শর গাই বিজ্ঞানে।”—ঐ পৃ: ১৩

“এ বাটে জারিতে গারিতে নৈবেদ্য হোত।”—ঐ পৃ: ৩৪৬

“বাসলী শিরে কলী গারিল চণ্ডীদাস।”—ঐ পৃ: ১১১

“চারী বেদ পাও নো বাশীর সরে।”—ঐ পৃ: ৩২৩

এই ভাবে ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’র চর্যাগদে দুইবার ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পঞ্চাশ বারেরও অধিক গান গাওয়া অর্থবাচক শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে কিন্তু কোথাও “হ” বর্ণটির পতিত দেখিতে পাওয়া যায় না।

অন্তএব পাওবা। শব্দের মূল ধাতু 'গাহ' কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত মূল ধাতু 'গা', তাহা হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক বাংলার 'বার', 'গাও' ও 'গাই'; যেমন 'বা' ধাতু হইতে 'বার', 'বাও' ও 'বাই'। এই 'বা' ধাতুর নিরমায়নামিত শব্দ যেমন 'বা'ব', 'বা'বেন', 'বা'বার' তেমন 'গা' ধাতু গঠিত শব্দও 'গা'ব', 'গা'বেন', 'গা'বার'। অন্তএব এই শব্দগুলির বিসৃঙ্খলতা ইঙ্গিত করিবার কোন কারণ নাই। সাধু-ভাষার এই প্রকাব শব্দের শিল্প প্রয়োগের অঙ্গ নাই; যেমন,

‘‘গা’ব গান খুলি হরিদ্বার।’ ‘মহিলা-কাব্য’—৬শ্রুতেন্দ্রনাথ বসুসদার

প্রতিপক্ষ একটি কথা বলিতে পাতেন যে স্বর-সমুহ 'হ'-ক্ষণির উচ্চারণ প্রাচীন বাংলাতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং এরফলি সেই স্মৃতিরক্ষা কবিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার উত্তরেও এই বক্তব্য যে প্রাচীন এমন কি স্বাধ্যুগের বাংলা ভাষাতেও স্বর-সমুহ 'হ'-ক্ষণি লুপ্ত হইতে দেখা যায় না; যেমন,

‘টাল ত মোর ঘর ‘নাহি’ পড় বেণী’—বৌদ্ধগান, চর্যা ৩৩

“‘काह मोर कृष्ण महोदय ‘नाहि’ मती ।”—श्रीकृष्णकौतुहल, पृ: ७८

—“কান্ন দেখি বাট ত যমুনা ধাড়া দিল।”—ঐ পৃঃ ৫

এই প্রকার আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া বাইতে পাবে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখিতে পাই যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাতেও 'নাহি', 'নাহা' (আধুনিক বাংলায় 'নাই', 'না') 'হ'-সংযুক্তই রহিয়াছে, 'নাই', 'না' হয় নাই। তেমনি গান গাওনা শব্দটির ধাতু যদি 'হ'-মূল অর্থাৎ 'গাহ' হইত তাহা হইলে তজ্জাত শব্দগুলি হইতও 'হ'-ধ্বনি বিলুপ্ত হইত না, কিন্তু পূর্বে যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই দেখা বাইবে যে এ ধাতুনিপন্ন শব্দ কদাচ 'হ'-মূল হয় নাই, যেমন, 'গাইল', 'গাএ' ইত্যাদি। অতএব "বাংলা গাওনা শব্দটাব মূলধাতু 'গাহ'" নহে ইহার মূল ধাতু 'গা'। সংস্কৃতের (অবাদিগণীয়) 'গা' ধাতুর অস্তিত্ব রহিয়াছে, ইহা একবারে আভিজাত্য বর্জিত নহে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সাধুভাষ্য (বিশেষতঃ কবিতাৰ) -
 -গান গাওঁৱা অৰ্থবাচক শব্দে কোন কোন স্থানে 'হ' বৰ্ণটিৰ উদয় হইয়াছে।
 -যেমন,

“গাহিছে কানীনাধ নবীন সুবা”—গান শুধু (ব্রজবিনোদ)।

“गङ्गा छाड़िवा गान गाह ।”—ॐ

“গাহিবে একজন ধলিয়া গলা”

কিছু "আবেক মনে গাবে মনে।"—ঐ

উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে অর্ধাচীন 'গাহ্' ও প্রাচীন 'গা' উভয় ধাতুরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়িতেছে। এমন কি একই বাক্যে দ্বিবিধ ধাতুনিপ্পন্ন দুইটি শব্দই বর্তমান রহিয়াছে। এই 'গাহ্' ধাতুটি কৃত্রিম। ছন্দানুরোধে কবিতার যে সমস্ত চরণে স্বরবর্ণের লঘু উচ্চারণ পরিহার করিবাব প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সব স্থানেই 'রে'র উচ্চারণকে সম্বাপ্রাণে উন্নত করিয়া 'হ' সংযুক্ত করা হইয়াছে। এমনু অন্ত্যস্ত শব্দেও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়িতে পারে; যেমন,

“সম্মানে বলে বাহা বাহা”—গানমঞ্চ (রবীন্দ্রনাথ)

“সেখানে গান নাহি জাগে ।—এ

• বসিও 'বাহা' ও 'নাই' ইত্যাদি শব্দ হইতে আধুনিক বাংলার 'হ'-
 ধ্বনির উচ্চারণ বহুকাল হইল লুপ্ত হইয়াছে তথাপি ব্যঞ্জন-ধ্বনিবহল
 জ্বলন্ত উচ্চারণ-সৌন্দর্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বর-ধ্বনিতো 'হ' (ব্যঞ্জন)-
 যুক্ত করা হইয়াছে। কবিতার এই প্রকার দৃষ্টান্ত হইতেই আধুনিক
 বাংলাব সাধুভাষার গুজবিনী অশ্বা-রচনারও এই প্রকার স্বরকে 'হ'-যুক্ত

aspirated করা হয়ই বা থাকে। সেই অস্ত বলিরাহি “গাং” ধাতুটি কৃত্রিম, ও অর্ধাচীন এবং ইহা কথা ও শব্দবল “গা” ধাতুর কপট প্রয়-বৎ নাত্র। অতএব ইহাকে প্রকৃত আভিজাত্যের মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে না।

(2)

শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার “শব্দভাষ্যের একটি তর্ক” এখানে লিখিয়াছেন “গান
গা’ব” বাক্যের “গা’ব” শব্দটিকে আমি অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে
উল্লেখ করিয়াছি।

আমি ঐ প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহাব কিয়দংশ পুনৰাব উদ্ধৃত
করিয়া আমাব বক্তব্যটি পৰিষ্কার কবিতে চাই। আমি নিখিয়াছি :—

“পূর্বই বলিয়াছি জীবন্ত ভাবা সর্বথা এবং সর্বথা ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চল না। যে-ভাবা অঙ্কের মত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ কবিন্না চলে সে-ভাবাব মুক্তা-অবজ্ঞাতাবী। সম্ভূতই তাহাব প্রমাণ। অথচ প্রাকৃত ভাবা যুগে যুগে পবিবর্তিত হইয়া আজ পর্যন্ত সম্ভাবিতা বন্ধা কবিন্না চলিতেছে। প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকগণ ব্যাকরণেব অনুমোদিত পদ ও ভাবাব ব্যবহাব কবেন। তথাকথিত অশুদ্ধ পদও বিশেষ বিশেষ অর্থে চলিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গাহির্ অর্থে কোথাও কোথাও ‘পাব’ লিখিয়াছেন। ঙ্গলিখিত পদগুলি অধুনা প্রচলিত ব্যাকরণেব নিয়ম অনুসারে অচল হইলেও, পরবর্তী কালে যে ব্যাকরণ বিচিত হইবে তাহাতে শুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।”

গুপ্তি অন্তর্গত বিচারকালে ব্যাকরণের সাক্ষ্যই একমাত্র নির্ভরহল নয়। তাহা হইলে 'মণীষা' 'শকলু' 'সীমন্ত' 'হিবমার' প্রভৃতি শব্দ সংকুত ভাবার অপাণ্ডের হইয়া বাইত। মর্হর্ষি চার্বাক তাহার ভ্রমীভূত দেখেব অন্তরালে চিবকালেব জন্ত অন্তর্হিত হইতেন। বৈদ্যাকরণের রোবাণি স্ত্রাদেবের স্রোধানল অপেক্ষা ভীতর হইলে 'মমথ' মেবের পুনরাবিত্তাব সম্ভব হইত না। সমাসের প্রধান বিশেষ্য অধীকার করিয়াও অর্ধেক সমাস সমাস বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। ব্যাকরণের সাধারণ বিধি ইহাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই। স্ব স্ব শক্তিবলে ইহাবা ভাবার নিজ নিজ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বৈদ্যাকরণ তাহাদের দ্বন্দ্ব বিশেষ বিধি রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গাবও সাধারণ বিধিতে পড়ে নাই, তাহার জন্ত বিশেষ বিধি আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে যে সাধারণ বিবিধ উল্লেখ করিয়াছিলাম ববীন্দ্রনাথই তাহা সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। বাবু সাহেব যখন 'খেতে' 'পেতে' 'খেতের সহিত 'গাইতে' 'চাইতে' 'নাইতে'র সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া গাঁহ চাহ্ নাহ্ প্রভৃতি ধাতুমূলকে নাতিপ্রচলিত বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ববীন্দ্রনাথই তখন তাঁহার পবিত্র হাল ধরিয়া অনায়াসে তবণী ভাবস্থ করেন। বাংলা ভাষাতত্ত্বে তাঁহার সেই নিয়মটি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই নিয়মের কল বহু শব্দের মূল নির্ণয় সম্ভব ও সহজনাথ হইয়াছে। তিনি গিথিয়াছিলেন :—

“বাইতে গাঁইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে।
এই নয়টি * মধ্যে কেবল ঝাইতে পাইতে ও যাইতে এই তিনটি
শব্দ মাত্র বীষম সাহেবেব নিয়ম পালন করে।” বাকি ছয়টি অন্ত

* তালিকায় নম্রটি নাই, আটটি ধাতুর উল্লেখ আছে।

† অর্থাৎ খেতে পেতে ও বেতে হয় ।

নিয়মে চলে। এই ছন্দটির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা ‘হ’ লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়,—গাহিতে, চাহিতে, নাইতে ও বাহিতে (বহন করিতে)। হ আশ্রয় কবিরা যে ইকাবন্তলি আছে তাহাব বল অধিক দেখা বাইতেছে। ইহাব অনুবুল অপব দৃষ্টান্ত আছে। করিতে, চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকাব লোপ হইয়া করুতে চলুতে হয়;...কিন্তু বাহিতে, সহিতে, কহিতে শব্দের ইকার বহিতে, সহিতে, কহিতে শব্দের মধ্যে টি ক্রিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ ব্যতীত আর কোন অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।—‘শব্দতত্ত্ব’ (নূতন সংস্করণ), পৃ. ৭৯।

হ-অন্ত সকল ধাতুই প্রায় সব স্থানে তাঁহাব এই নিয়মের বন্ধনে ধরা দিয়াছে। নিম্নের তালিকায় তাহা দেখা যাবে।

	✓গাহ্	✓চাহ্	✓নাই	✓খা	✓পা	✓যা
নিত্য অতীত	গাহিত	চাহিত	নাইত	খেত	পেত	যেত
অচিৎ অতীত	গাইল	চাইল	নাইল	খেল	পেল	×
কৃদ্ব্যোমে	{-ইতে গাহিতে চাইতে-নাইতে খেতে পেতে যেতে					
	{-ইলে গাইলে চাইলে নাইলে খেলে পেলে					

নিত্য ভবিষ্যতের প্রত্যয়ও উল্লিখিত প্রত্যয়গুলির অনুকরণ বলিয়া আমি ধারণা করিয়াছিলাম গাহ্ বা চাহ্ ধাতুর ভবিষ্যতে একমাত্র ‘গাইব’ ‘চাইব’ হওয়াই সম্ভব। আমি নিজে ‘গাইব’ বলি এক বহু লোকের মুখে শুনিয়াছিও ঐক্য। ববীন্দ্রনাথের সহিত আলোচনায় পব অনেকের সঙ্গে কথা বলিয়াছি। তাহাব ফলে এখন বুঝিতে পারিতেছি কথা ভাবায় কোন কোন স্থলে বিকল্পে ই লোপ হইয়া থাকে। এই লোপের ক্ষেত্র কত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র সে আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে একটি সহৃদয়-প্রসাবী সাধারণ বিধি ব্যতিক্রম ঘটনা আছে এই কথাই আমি সন্নিবে বলিতে চাই। ‘ধাব’ ‘যাব’ব সাদৃশ্যবশতই হটক অথবা অন্ত যে কোন কাবশে হটক ‘গাব’ শব্দ তাহাব প্রদর্শিত নিয়মের বন্ধনে ধবা দেব নাই।

ইহাকে যদি অন্তর্ভুক্ত বসি সে এই হিনাবেই। কিন্তু ঠিক অন্তর্ভুক্ত আমি বলি নাই—“তথাবিধিত অন্তর্ভুক্ত” বলিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আব একটি কথা বলি। আসা ধাতুর নিত্য বর্তমানে ‘আস’ (আসিবা থাক) হওয়া উচিত। আসাব :ত দুব মনে হয় ববীন্দ্রনাথও তাহাই বলেন। কিন্তু ঐ স্থলে অনুজ্ঞাব সাদৃশ্যে ‘এস’ শব্দের ব্যবহার সাহিত্যেও বেশ চলিয়া গিয়াছে দেখিতে পাই, কথোপকথনের মধ্যে ত কথাই নাই। তথাপি ব্যাকরণে নিয়মে কি উহাকে অন্তর্ভুক্ত বলিবেন না?

ববীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “দোহা ত্রিগোপদেব আবন্তে ওকাব আছে তাহাই জ্ঞোবে ই থেকে যায়—বলি ‘গোহু হুইবে’।” এ বিষয়ে আসাব কিছু বলিবার আছে। আমি বলি, দোহা ত্রিগোপদেব ধাতুকপ ✓চুহ্ এক এই দুহেব ‘হ’ ই দুইবে-ব ‘হ’কে লুপ্ত হইতে দেখ না। এখানেও ববীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত বিধানই বলবান বলিয়া আসাব বিশ্বাস।

✓গোহা ধাতুর “পুইবে” রূপ হইতে পাবে বলিবা তাহাব সন্দেহ হয়। কিন্তু শব্দটা যেন অত্যন্ত অচেনা অচেনা ঠেকিতেছে। “পুইবে”ব অনুকরণ একটি শব্দও খুঁজিয়া পাইতেছি না। গোহাব মত আব করেকটি পিতৃস্ত ধাতুর নাম কবা যাক। যখা,—গোহা, চাহা, নাইহা, সহা ইত্যাদি। ইহাদের ভবিষ্যৎ কপ হইবে গাওযাবে, চাওযাবে, নাওযাবে, সওযাবে; বিকল্পে গাইবে চাইবে হইতে পাবে না। গয়লাকে দিয়ে চুখ “দোয়াবে” বলি, “দুইবে” বলি না। “দুইবে” অশিক্ষিত ✓চুহ্ ধাতুর ভবিষ্যৎ কপ, ‘দোয়াবে’ পিতৃস্ত ✓গোহা ব। ✓দাঁড়া, ✓বোড়া প্রভৃতি ধাতুর মত গোহা ব অশিক্ষিত কপ নাই। গোহাব অশিক্ষিত কপ ✓পুহ্ থাকিলে তাহাব ভবিষ্যতে ‘পুইবে’ হওয়া সম্ভব ছিল। ‘গোহা’ হইতে ‘পুইবে’ পদ যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে একমাত্র ব্যতিক্রম বলিয়াই ধরিতে হইবে।

স্বরলিপি.

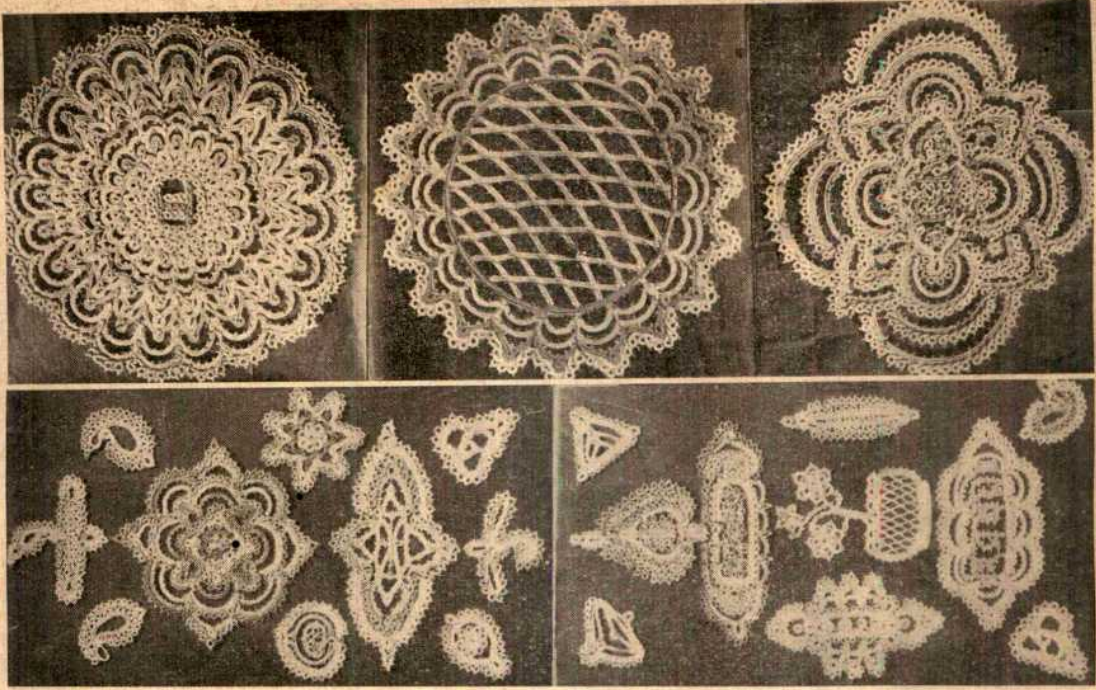
গান—হুংখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক.

কথা ও সুর—ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—ঐশ্বিন্দেব ঘোষ

II	সা	-গা	গা	।	গা	গা	-।	I	গা	গা	-।	।	গা	গা	-।	I
	হু	০	খে		ব	তি	০		মি	রে	০		ষ	দি	০	
I	গা	-।	-রা	।	রা	-মা	-।	I	গা	-।	শ	।	জা	পা	-জা	I
	জ	০	০		লে	০	০		০	০	০		ত	ব	০	
I	পা	-না	না	।	ধা	পা	-জা	I	ধপা	-মা	-পা	।	মা	গা	-মা	II
	ম	ঙ	গ		ল	আ	০		লো	০	০		ষ	দি	০	
I	রা	-।	গমা	।	গা	-।	-।	I	-।	-।	-।	।	সাঁ	সাঁ	-না	I
	জ	০	০০		লে	০	০		০	০	০		ত	বে	০	
I	সাঁ	-।	-গাঁ	।	রা	-সাঁ	-।	I	না	-সাঁ	-।	।	সাঁ	সাঁ	-না	I
	তা	০	ই		হো	০	০		০	ক	০		ত	বে	০	

I	ধা	-	নসাঁ	I	না	-	-	I	না	ধা	-	পা	-	পা	-	-	II		
	তা	০	০ই		হো	০	০		০	০	০	ক	০	০					
	-	-	-	II	পা	পা	পা	I	না	ধা	-	I	সাঁ	সাঁ	-	I			
	০	০	০		য	০	তু		য	দি	০		কা	ছে	০				
I	সাঁ	সাঁ	-	I	ধা	-	ধা	I	ধা	সাঁ	-	I	সাঁ	-	-	I			
	আ	নে	০		তো	০	০		মা	০	০		বু	০	০				
I	-	-	-	I	সাঁ	সাঁ	গাঁ	I	রাঁ	-	-	I	সাঁ	-	সাঁ	-	I		
	০	০	০		অ	য	ত		য	০	য		লো	০	ক		ত	বে	০
I	ধা	-	সাঁ	I	না	-	-	I	না	-	-	I	ধা	ধা	-	পা	I		
	তা	০	ই		হো	০	০		ক	০	০		ত	বে	০				
I	পা	ধা	-	I	পা	-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	II			
	তা	ই	০		হো	০	০		ক	০	০		০	০	০				
II	পা	পা	পা	I	পা	পা	পা	I	পা	-	-	I	পা	ধা	-	গা	I		
	পু	জা	র		এ	দী	পে		ত	০	০		ব	০	০				
I	গা	-	ধা	I	গা	ধা	ধা	I	গা	-	-	I	গা	গা	-	সা	I		
	জ	০	০		লে	০০	য		দি	০	০		য	য	০				
I	গা	-	-	I	গা	-	-	I	রসা	-	-	I	সা	সা	-	রা	I		
	দী	০	০		০	০	পু		শো	০	ক		ত	বে	০				
I	গা	-	-	I	গা	-	-	I	রসা	-	-	I	-	-	-	II			
	তা	০	০		০	০	ই		হো	০	ক		০	০	০				
II	পা	-	গা	I	পা	পা	-	I	ধসাঁ	সাঁ	-	I	সাঁ	সাঁ	-	I			
	অ	০	এ		আ	ধি	০		প	রে	০		য	দি	০				
I	সাঁ	রাঁ	-	I	সাঁ	-	-	I	গাঁ	-	-	I	সাঁ	সাঁ	-	না	I		
	হু	টে	০		ও	০	০		ঠে	০	০		ত	ব	০				
I	ধা	-	-	I	ধা	সাঁ	না	I	ধা	-	পা	I	পা	-	-	ধা	I		
	জে	০	০		০	০	হ		চো	০	ধ		ত	বে	০				
I	পা	-	ধা	I	পা	-	-	I	ধা	-	পা	I	ধা	গা	-	I			
	তা	০	০		০	০	ই		হো	০	ক		ত	বে	০				
I	গা	-	-	I	গা	-	-	I	রসা	-	-	I	-	-	-	II	II		
	তা	০	০		০	০	ই		হো	০	ক		০	০	০				

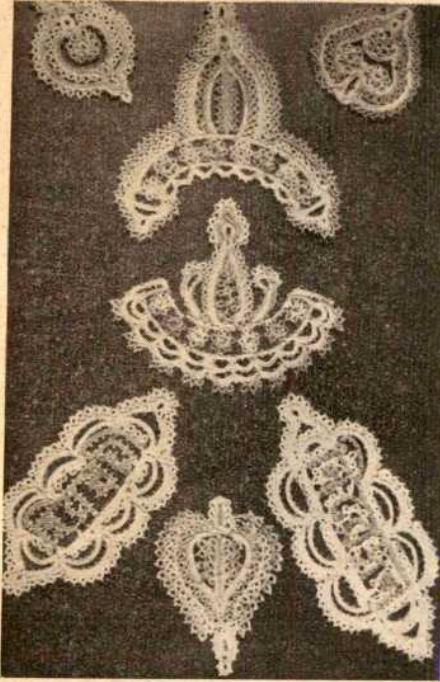


মহিলা-সংবাদ

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত দক্ষা গ্রাম নিবাসিনী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ইতিপূর্বে একবার আমাদের তাঁহার তৈরি অনেকগুলি সুন্দর বড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এবৎসরও আবার শ্রীযুক্ত স্বদেশনারায়ণ মাইতি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর অনেক বড়ি আমাদের দিয়াছেন। এগুলির আকৃতি ও বর্ণবিভাস চমৎকার। আকৃতি কতকটা কোটোগ্রাফগুলি হইতে বুঝা যাইবে, কিন্তু নানা রঙের বিভাস তাহা হইতে বুঝা যাইবে না; অনেকগুলি বড়ি যে কত বড় তাহাও বুঝা যাইবে না। বৃত্তাকার কোন-কোনটির ব্যাস এবং চারি-কোণা কোন-কোনটির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ এক হাত বা ততোধিক। সবগুলি ভাজিয়া খাইবার উপযুক্ত! কিন্তু রসনাতৃপ্তির উপায় বলিয়া সেগুলির প্রশংসা করিতেছি না। ছাঁচের সন্দেশ ধাঁহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ কিছু দক্ষতা প্রকাশ পায় না—ছাঁচ যে স্বত্বধর নির্মাণ করেন দক্ষতা প্রধানতঃ তাঁহার। কিন্তু এই বড়িগুলির পরিকল্পনা রচনায় ও পারিকল্পনার অল্পযায়ী বড়ি দেওয়াতে, যিনি এই কাজ করেন তাঁহারই শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। নানা-



শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী বড়ি দিতেছেন



বিধ বিচিত্র আলিপনা দেওয়া অপেক্ষা ইহা অধিকতর কলা-
দক্ষতার পরিচায়ক। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর কলাকুশলতা
অধিকতর স্থায়ী কোন শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুতিতে প্রকাশ পাইলে
আমরা আরও প্রীত হইব। তিনি যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি
করিয়াছেন তাহারই সম্যক আদর হইলে আমরা আপাততঃ
তৃপ্ত হইব।



কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা

ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিক মণ্টেসরি কনফারেন্সের যে অধিবেশন
হয়, তাহাতেও তিনি যোগদান করেন।

কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাশগুপ্তা ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত
করিয়া সম্প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি ডেভিড
হেয়ার ট্রেনিং কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল অধ্যাপক জি সি
দাশগুপ্ত মহাশয়ের কন্যা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে
এম-এ, বি-টি, পাস করিয়া উচ্চশিক্ষা-লাভার্থে তিনি ইংলণ্ড
গমন করেন। তথায় তিনি মারিয়া গ্রে ট্রেনিং কলেজে
যোগদান করেন ও গত জুলাই মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়
হইতে “ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন” প্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয়
অধ্যবসায় ও কর্মকুশলতার দ্বারা উচ্চতর রাজকর্মচারীদের
সাহায্য লাভে সমর্থ হন ও তাঁহাদের সহায়তায় ইংলণ্ডের
প্রায় তেইশটি বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখিয়া
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার সুযোগ লাভ করেন। সম্প্রতি

বেগম মির আমিরুদ্দীন, মাদ্রালোরের ডিস্ট্রিক্ট ও সেন্স
জজ মিঃ মির আমিরুদ্দীনের পত্নী। ইনি ‘সকল ধর্মসম্প্রদায়ের
কংগ্রেস’ (World Congress of Faiths)-এর আগামী
অধিবেশনে বক্তৃতা দিবার জন্ম নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।
আগামী জুলাই মাসের শেষভাগে অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল
কলেজে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। বেগম মির
আমিরুদ্দীন প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ইউরোপের বহুদেশ,
মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ
করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ইনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও
নারী-আন্দোলনের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। উক্ত
কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ তাঁহার যাতায়াতের সমস্ত ব্যয় বহন
করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।



বেগম মির আমিরুদ্দীন

শ্রীমতী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবিনী ছাত্রী। তিনি বি-এ অনার্স ও এম-এ এই উভয় পরীক্ষাতেই দর্শনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রায় বাহাদুর বিহারীলাল মিত্র প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করিবার জন্ত তিনি প্রায় দুই বৎসর পূর্বে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার থীসিস্ যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তিনি সম্ভ্রান্ত অক্সফোর্ডের ডি-ফিল (ডক্টর অফ ফিলজফি) উপাধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী রমা বসু শ্রীযুক্ত এস এম বসুর কন্যা এবং স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্রী।

গত নিখিলবন্ধ সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় কুমারী দীপ্তি সান্যাল প্রাচ্য নৃত্যে দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি রৌপ্যপদক লাভ করেন। শ্রীযুক্ত এস কে পোদ্দার ইহার নৃত্যকুশলতার জন্ত ইহাকে একটি স্ববর্ণপদক দিয়াছেন। নিখিলবন্ধ সঙ্গীত-সম্মিলনীতেও নৃত্য দেখাইয়া ইনি একটি স্ববর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। কুমারী দীপ্তি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের অষ্টম মানের ছাত্রী।

কুমারী
দীপ্তি সান্যাল

শ্রীমতী রমা বসু •

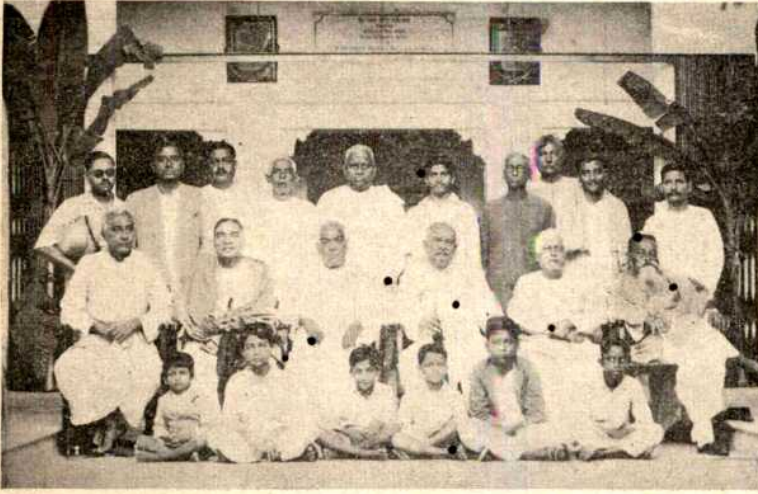
বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা

শ্রীসরোজকুমার দে ও শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

যে পরিবারে পারস্পরিক সৌহার্দ গভীর, যেখানে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেকের কল্যাণ সাধনে তৎপর, পারিবারিক সুখ্যাতির জন্ত, গোষ্ঠীর শির উন্নত রাখিবার জন্ত যে-পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগে পরানুগ্ন নহে, সে-পরিবারের ঐক্য ও সংহতি দর্শনে পক্ষপাতশূন্য প্রতিবেশী ও জনসাধারণ মুগ্ধ হয়, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ পুলকিত হয় ও পরিবারের পরশ্রীকাতর শত্রুরা দীর্ঘায় জর্জরিত ও ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়।

অন্ধকার জাতীয় জীবনে যেন আজ সেই ব্রাহ্মমূর্ত্তের লক্ষণসমূহ স্ফুটিত হইতেছে, পূর্বদিগন্ত যেন সেই পরমতম শুভ প্রত্যাশের সম্ভাবনায় রোমাঙ্কিত হইতেছে। বাঙালী আজ স্বদেশবাসীর দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী হইতে শিখিয়াছে। তাই মনে হয় বাঙালীর অনাগত ভবিষ্যৎ জীবন সাফল্যের আলোকপাতে অচিরেই আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এ আশা হয়ত নিতান্ত দুরাশা নহে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সকল শুভ লক্ষণ দর্শনে আজ এই



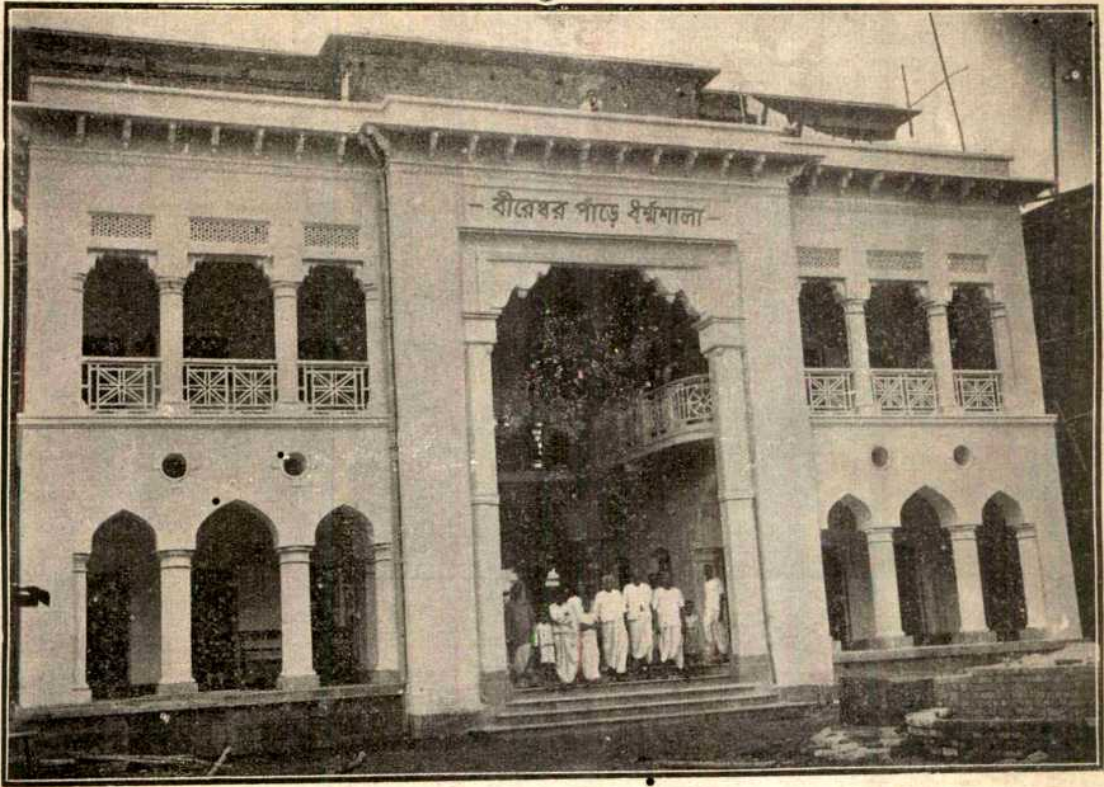
বীরেশ্বর পাণ্ডে ধর্মশালার দ্বারোপস্থিত-উৎসব

আশার কথা মনে উদয় হইতেছে, সে-সমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। বন্দে ও বাহিরে তীর্থকামী ও পর্যটকদের আশ্রয়দানকল্পে বাঙালীকর্তৃক অদ্যাবধি যে-কয়টি ধর্মশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহারই বিশদ বিবৃতি মাত্র এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

ভিন্ন প্রাদেশীয় দানশীল ধন-কুবেরদের দ্বারা অজস্র অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র ভারতের অসংখ্য প্রাসাদোপম ধর্মশালার পার্শ্বে

এই সত্যটি পরিবার সম্বন্ধে যেমন, জাতির সম্বন্ধেও তেমনি সমভাবে প্রযোজ্য। আমার স্বজাতির দুঃখে যে-দিন আমি অশ্রুত্যাগ করিব, কোন এক জন নগণ্য অথচ নিরপরাধী বাঙালী কোন স্বদূরতম প্রদেশেও অকারণে লাক্ষিত হইতেছে শুনিয়া যে-দিন সমগ্র বাঙালী জাতি না হউক অধিকাংশ বাঙালী নিজেদের লাক্ষিতজ্ঞানে যথাকর্তব্য সাধনে অগ্রসর হইবে, ব্যষ্টির দুঃখে যে-দিন সমষ্টির হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিবে, জাতির পক্ষে সে-দিন পরম শুভদিন। আমাদের

বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় নাতিবৃহৎ ধর্মশালা হয়ত কাহারও কাহারও নিকট চন্দ্রের পার্শ্বে খন্দোতের ছায়াই অকিঞ্চিংকর মনে হইতে পারে, কিন্তু সর্বপ পরিমাণ ক্ষুদ্রাকৃতি বীজের মধ্যেই যে বিশাল বটবৃক্ষের বিরাট সম্ভাবনা নিহিত থাকে সে-কথাও মিথ্যা নহে, অথবা উত্তর-কালে সেই বহুশাখ মহামহীকূহের তলদেশে যে আতপতাপ-তপ্ত পরিশ্রান্ত বহু পথিক আশ্রয় ও বিশ্রামলাভে উপকৃত হয়, এ-কথাও অসত্য নহে। উপরন্তু, স্বজাতির কুটীরও



বীরেশ্বর পাড়ে ধর্মশালা, বারাগসী

যে বিদেশীয়ে প্রাসাদ অপেক্ষা সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয়, এ-কথা সহজেই অনুমেয়। বাঙালীর ধর্মশালায় বাঙালী পর্যটক যে সশ্রদ্ধ ব্যবহার লাভ করে, অবাঙালীর ধর্মশালায় সাধারণতঃ সে ব্যবহার আমরা আশাতীত মনে করি;— এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে শেষোক্ত ধর্মশালায় আমাদের অপরিণীত লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়, সে-কথা ভুক্তভোগী মাত্রেরই অবগত আছেন।

বাঙালীর এবিধি বহু দুর্দশার দৃষ্টান্ত স্বক্ষে দেখিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেরা দুঃখ ভোগ করিয়া কতিপয় দানশীল মহাত্ম্যব বাঙালী ভদ্রলোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি ধর্মশালা স্থাপন করিয়া স্বজাতিবাসল্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সং দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বাহাতে অগ্রাগ্র ধনশালী বাঙালী আরও অনেক ধর্মশালা স্থাপনে সচেষ্ট হন, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই সূত্রে তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে মথুরা, বৃন্দাবন,

বিষ্ণুচল প্রভৃতি তীর্থস্থানে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত সুপরিচালিত ধর্মশালায় অভাবে বাঙালী যাত্রীরা প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

বৃহৎ বাহিরে একটি ধর্মশালা স্থাপনের ইচ্ছা প্রথম উদয় হয় কলিকাতা চোরবাগানের স্থবিখ্যাত রাজবাটীর কুমার যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের মনে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি কুরুক্ষেত্রে একটি ধর্মশালা স্থাপন করেন। ধর্মশালাটি আকারে খুব বৃহৎ না হইলেও অথবা তাহার পরিচালন-ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছু না থাকিলেও, প্রথম বাঙালী ধর্মশালা স্থাপনের সমস্ত গৌরব মল্লিক-মহাশয়েরই প্রাপ্য। কিন্তু যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, উক্ত ধর্মশালায় তত্ত্বাবধানের সমুদয় ভার স্থানীয় পাণ্ডাদের হস্তেই হস্ত হওয়ায় যাত্রীদের দুর্দশার বিশেষ কোন লাঘব হয় নাই। সংবাদটি সত্য হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

“আজমীর বাঙালী-ধর্মশালা” প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়



হরির বাঙালী ধর্মশালা, কালীধাম



হরির বাঙালী ধর্মশালা, বৈষ্ণবনাথদাম

১৯২৪ সালে। প্রধানতঃ যে স্বদেশপ্রেমিক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উদ্যোগে ও কর্মনিষ্ঠায় এই ধর্মশালাটি স্থাপিত হয় তাঁহার নাম শ্রীযুত হরিদাস গোস্বামী। ইহার নিবাস নবদ্বীপে। ইনি যখন আজমীরে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন, সেই সময় পুষ্করধাত্রী নিরবশ্রয় বাঙালী নরনারীর নির্ধাতন দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি তাহাদের দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর

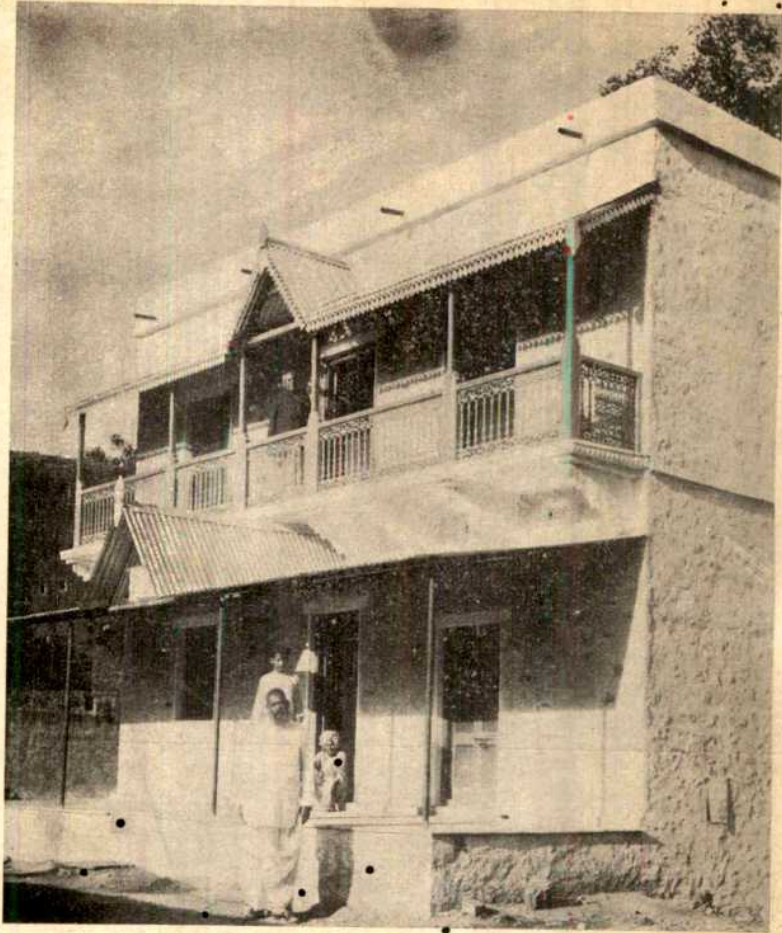
হন। তিনি নিজে ধনী ছিলেন না। তজ্জন্ম তিনি স্বয়ং স্থানীয় প্রত্যেক বাঙালীর নিকট গিয়া তাঁহার মহৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ও প্রত্যেকের নিকট অর্থ প্রার্থনা করেন। এইরূপে বহু পরিশ্রমে স্থানীয় বাঙালী জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে বাঙালীদের জন্ম এই ধর্মশালা নির্মিত হয়। বলা বাহুল্য, গোস্বামী মহাশয়, তাঁহার এই মহৎ কার্যে অনেকগুলি উৎসাহী বাঙালী সহকর্মীর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

‘আজমীর বাঙালী ধর্মশালা’র দ্বিতল বাটা আজমীর রেল-স্টেশনের সন্নিহিতে (দুই মিনিটের পথ) কাছারী রোডের উপর অবস্থিত। ইহাতে সর্বসমেত চৌদ্দ-পনের খানি ঘর আছে। ইহা ভিন্ন স্নানাগার, জলের কল ও পৃথক রন্ধনেরও ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে ইহা ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

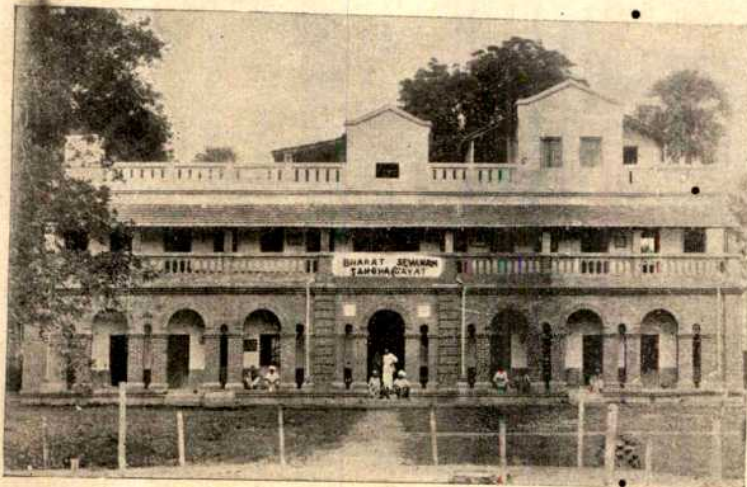
গত ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে দোলপূর্ণিমার দিন কলিকাতা ১৩ কাঁটাপুকুর লেন, বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে পুষ্করমনতীর্থে ‘বাঙালী হিন্দু ধর্মশালা’ নামে বাঙালীদের জন্ম আর একটি দ্বিতল প্রস্তরনির্মিত বৃহত্তর ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। পুষ্কর-হ্রদের তীরে ব্রহ্মাঘাটের পার্শ্বে ছদ্ম-সাত

কাঠা জমির উপর এই অট্টালিকা অবস্থিত। যে-সকল যাত্রী সাবিত্রী পাহাড় ও পুষ্করতীর্থ উভয় স্থানই দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই ধর্মশালায় অবস্থান করা বিশেষ সুবিধাজনক; কারণ উক্ত উভয় স্থানই এই ধর্মশালা হইতে অধিক দূরে নহে। ইহাতে প্রচুর সূর্যালোক ও বাতাসযুক্ত চৌদ্দ-পনরখানি প্রশস্ত ঘর ও পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্নানাদির পৃথক ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা পাতকুয়ার ও পুষ্কর-তটের জল ব্যবহার করেন; সেই জন্য জলের কলের অভাব আদৌ অনুভূত হয় না।

দেওঘর বৈদ্যনাথধামে রেলস্টেশনের অদূরে অবস্থিত 'হরির বাঙালী ধর্মশালা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে রথযাত্রার দিন। কলিকাতার বি দত্ত এণ্ড

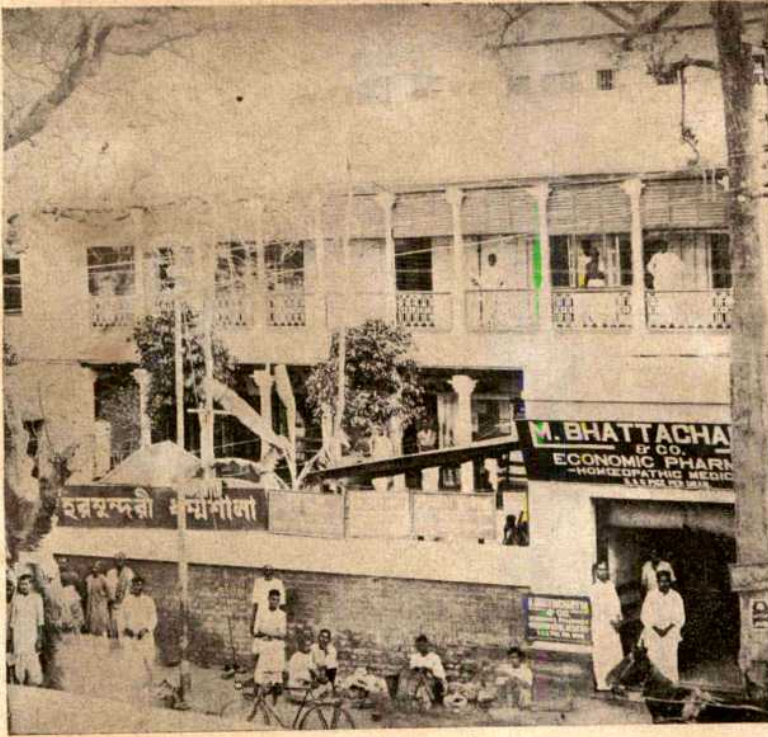


বাঙালী হিন্দু ধর্মশালা, পুষ্কর



ভারত-সেবাসাম-সম্ম-পরিচালিত ধর্মশালা, গয়া

কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, ৩১ ইমামবক্স লেন, বীডন স্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিধন দত্ত মহাশয় ইহার সংস্থাপক। ভারতের প্রায় সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া হরিধনবাবু এই তিলক অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়াছেন যে, ভিন্ন প্রদেশীয় ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালায় ও ছত্রে মংস্কাহারী বলিয়া বাঙালীদের অনেক সময়ে স্থান দান করা হয় না। অথবা যিনি বহু



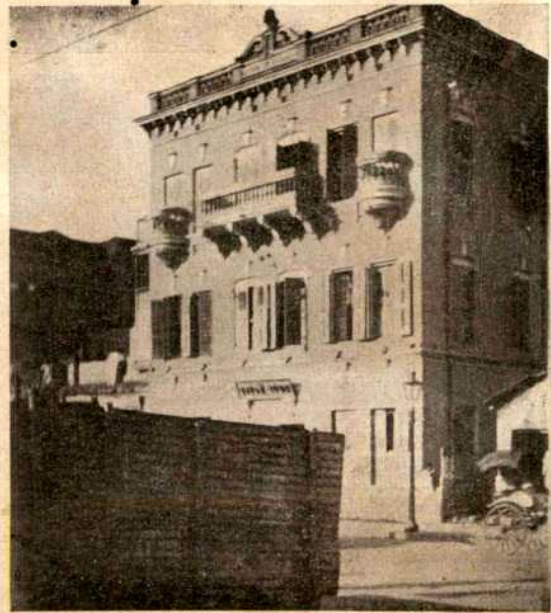
হরসুন্দরী ধর্মশালা, বারানগরী

পুণ্যফলে স্থানলাভে সমর্থ হন, তাঁহাকে প্রায়ই পরে অনেক দুর্ভাবহার সহ করিতে হয়। স্বদেশবাসীর এই দুঃখে ও নির্ধাতনে মর্মাহত হইয়া তন্নিবারণকল্পে হরিধনবাবু বৈদ্যনাথধামে বাঙালীদের জন্ত এই ধর্মশালা স্থাপন করেন। ইহার একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, ইহার নিয়মাবলীর মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ধর্মশালার মধ্যে মৎসাহার নিষিদ্ধ নহে। ধর্মশালার বৃহৎ বাটাটি দ্বিতল ও দেড় বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহাতে দুই শত ব্যক্তির বাসোপযোগী কুড়িখানি প্রশস্ত গৃহ আছে। শুধু ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াই হরিধনবাবু তাঁহার কুন্তব্য সমাধা করেন নাই, অসুস্থ যাত্রীদের চিকিৎসার জন্ত ধর্মশালার অদূরে হরিধন দত্ত ফ্রি ওয়ার্ড নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও করিয়া দিয়াছেন।

স্বদেশবাসীর মঙ্গলার্থ হরিধনবাবুর দানশীলতার দৃষ্টান্ত আরও আছে। বাঙালী তীর্থযাত্রীদের বাসের সুবিধার জন্ত তিনি কান্দীধামের লাক্সা, রামাপুরায় সতর কাঠা জমির

উপর 'হরির বাঙালী ধর্মশালা' নামে আর একটি ধর্মশালা বহু অর্থব্যয়ে নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে এককালীন প্রায় দুই শত লোকের বাসোপযোগী চিকিৎসখানি প্রশস্ত বক্ষ আছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে শারদীয় দেবীপূজার প্রতিপদে ইহার দারোদবাটন হয়।

বিশেষ স্মৃতির বিষয়, বারানগরী-ধামের ত্রায় স্প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে ইহাই বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত একমাত্র ধর্মশালা নহে। পূর্বোক্ত ধর্মশালার অনতিদূরে গোপালিয়ায় কলিকাতার ১১, সিমলা ষ্ট্রিট নিবাসী বিখ্যাত ঔষধ-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত 'হরসুন্দরী ধর্মশালা' অবস্থিত। মহেশবাবু



হরসুন্দরী ধর্মশালা, কলিকাতা



বেদনা
শ্রীমদীরঙ্গন খাস্তগীর

অবাসী প্রেস, কলিকাতা

হুমিলাব অধিবাসী; এখন তাঁহার বয়স প্রায় পঁচাত্তর বৎসর। বঙ্গের বাহিরে ধর্মশালা-স্থাপনের বাসনা তাঁহার কি করিয়া হইল, বলিতেছি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে, মহেশবাবু গয়াধামে গিয়া আশ্রয় অভাবে কিছুকাল এক জন বাঙালী ভক্তলোকের বাটীতে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। অথচ, তৎকাল সেই ভক্তলোক স্বভাবতই কোন মূল্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পর মহেশবাবু হিন্দুসাধারণের বাসের সুবিধার জন্য গয়ায় একখানি ছোট ঘর মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে চয় মাসের জন্য ভাড়া করেন। অল্প দিনেব জন্য হইলেও সেই ঘরখানি তখন গয়ায় ধর্মশালার অভাব কথঞ্চিৎ দূর করিয়াছিল।

পরে যে-কারণেই হউক, মহেশবাবু গয়ার পরিবর্তে কাশীতে একটি ধর্মশালা স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। গয়ার জায় কাশীতেও তিনি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ধর্মশালার উদ্দেশ্যে একটি বৃহত্তর বাটী ভাড়া করেন ও তাহার সম্মুখে সাধারণের অবগতির জন্য একটি ক্ষুদ্র সাইনবোর্ডও প্রদান করিয়া দিয়া হয়। অত্যল্পকাল মধ্যেই সেই গৃহে এরূপ যাত্রীসমাগম হইতে থাকে যে ভক্তদর্শনে মহেশবাবু বাটীখানি ক্রয় করিতে মনস্থ করেন ও সেই বিষয়ে গৃহস্বামীর সহিত কুথাবার্তাও হইতে থাকে। পবে একচল্লিশ হাজার টাকা মূল্যে বাটীটি ক্রীত হইলে, মহেশবাবু বহু অর্থব্যয়ে উহা সুসজ্জিত করেন। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় তারিখে ধর্মশালার দারোদারটন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ত্রিশখানি প্রশস্ত গৃহযুক্ত এই দ্বিতল ধর্মশালাটির সুপরিচালনের জন্য তিন জন বেতন-ভোগী ম্যানেজার ও তাঁহাদের অধীনে একাধিক দ্বারবান, ভৃত্য, মেথর প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। কর্তৃপক্ষ যে শুধু যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকেই দৃষ্টি রাখেন তাহা নহে, পরন্তু যাহাতে বিদেশে নবাগত তীর্থকামী যাত্রীদের উপর স্থানীয় পাণ্ডারা কোনরূপ অত্যাচার না করিতে পারে, সে-বিষয়েও ইহারা বিশেষ সচেতন। ধর্মশালায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্নানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। যাত্রীদের কেহ কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, কর্তৃপক্ষেরা স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

কাশীর তৃতীয় ধর্মশালাটির নাম 'বীরেশ্বর পাণ্ডে

ধর্মশালা।' ইহা কলিকাতার স্যাতনামা ধনী, 'অধুনালুপ্ত মনোমোহন থিয়েটারের ভূতপূর্ব স্বত্বাধিকারী' মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয়ের দ্বারা তাঁহার মর্গগত পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপিত হয়। বীরেশ্বরবাবু পণ্ডিত ব্যক্তি ও বঙ্গসাহিত্যের স্বেচ্ছা ছিলেন। মনোমোহন-বাবুরা মূলতঃ ভিন্ন প্রদেশবাসী, হইলেও বহু পুরুষাবলীকমে বঙ্গদেশে বাস করিয়া ও বঙ্গদেশী-ধর্ম ও সমাজ অহুমোদিত আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া বঙালী রূপেই পরিচিত ছিলেন। মনোমোহনবাবু বংশধরের মুঠিয়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশের বিবাহাদি ক্রিয়াও এ দেশীয়দের সহিতই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনোমোহনবাবু হিন্দু নরনারী-বাসের সুবিধার জন্য যে বিশাল প্রাসাদতুল্য ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তৎকাল তাঁহার কীর্ষি অক্ষয় হইয়া থাকিবে। বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালাসমূহের মধ্যে এই ধর্মশালাটিই যে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯২, ২০০ নং রামাপুরা, বেনারস সিটিতে ব্যাড়াই বিধা জমির উপর ইহা অবস্থিত। ইহাতে পাঁচ শতাধিক লোকের বাসোপযোগী সমস্তখানি সুপ্রশস্ত শয়ন-গৃহ, হুড়িটি পাকশালা ও প্রায় চল্লিশটি স্কেনু-পাইখানা আছে। যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য টিউবওয়েল, ইদারা, জল-কল ও বিজলী-বাতির ব্যবস্থা আছে। ১৯৩৪ সালে, ৪ঠা নবেম্বর কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য বিচারপতি (অধুনা অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধর্মশালাব দারোদারটন-উৎসব বহুসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উৎসবে মহামহোপাধ্যায় শ্রমথনাথ তর্কভূষণ, পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি বিদ্বান্ধলী ও বহু উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী-যোগদান করিয়া মনোমোহনবাবুকে তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মনোমোহনবাবুর বাসনা ছিল, ধর্মশালার সংলগ্ন ক্ষমিত অনেকগুলি কক্ষ নির্মাণ করিয়া ভাড়া দিবেন ও প্রাপ্ত অর্থে ধর্মশালা পরিচালনার জন্য স্থাপিত স্থায়ী খনজীভারের গুটি হইবে। কিন্তু জাতির নিতান্ত দুর্ভাগ্য তাঁহার সে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে ইহা 'পরিভাগ করিতে হইল (২২শে আশ্বিন, ১৩৪২)।

পূর্বে গয়া বাঙালী হিন্দুযাত্রীরা একটি সুপরিচালিত ধর্মশালার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেন। তখন বঙ্গদেশাগত সরলপ্রকৃতি তীর্থযাত্রীরা দুর্কৃত্তদের ও স্থানীয় পাণ্ডাদের নিকট প্রায়ই উৎপীড়িত হইতেন। উপস্থাপিত কয়েক জন বাঙালী যাত্রীকে এইরূপে অভ্যাসিত হইতে দেখিয়া গয়া বঙ্গীয় ঔপনিবেশিক সমিতি (Bengalee Settlers' Association) ভারত-সেবাশ্রম-সভ্যের খ্যাতি-
 • নামা প্রতিষ্ঠাতা বাজিৎপুর-নিবাসী আচার্য শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দজীকে গয়া সেবাশ্রমের একটি শাখা স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। ইহারই ফলে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে সামান্য একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে গয়া সেবাশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। আশ্রমের ব্যবস্থাপনা গুণ আশ্রয়গ্রার্থী যাত্রীর সংখ্যা শীঘ্রই অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় আর একখানি বাড়ী ভাড়া করার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হইল। কিন্তু দুইখানি বাড়ী ভাড়া হইবার পরেও আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানান্তরে বঙ্গ আশ্রয়গ্রার্থী যাত্রীদের বিমুখ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সঙ্ঘ-কর্মীগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ৪,২৭৩ টাকা সংগৃহীত হইল। এক জন দানশীল বাঙালী ভদ্রলোক আট হাজার টাকা দান করিলেন। মোট এই ১২,২৭৩ টাকা ব্যয়ে ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকলাউড্‌গঞ্জ রোডের উপর বারো বিঘা পরিমাণ এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ডও ক্রয় করা হইল। এইরূপে বাঙালীদেরই একান্ত চেষ্টায় ও উত্তোগে বঙ্গীয় ঔপনিবেশিক সমিতির বহুদিনের কামনা পূরণের পথ প্রশস্ত হইল। ইহার পর ১৯২৯ সালে কলিকাতার এক জন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী এই জমির উপর একটি প্রশস্ত যাত্রীনিবাস ও একটি পাকশালা নির্মাণ করিয়া দেন। সে প্রায় সাত বৎসর পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে সেবাব্রতী কর্মীগণের সদ্যবহায়ে মুক্ত বহু দানশীল হিন্দু প্রদত্ত অর্থসাহায্যে ধর্মশালার আরও প্রসার হইয়াছে। এখন আশ্রমে দুই শত পঞ্চাশ জন লোকের এককালীন বাসোপযোগী দুইটি সুবৃহৎ বিত্তল দালান-সংলগ্ন বহু কক্ষ, দুইটি পাকশালা, একটি সাধারণ আহারের স্থান, একট দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাধারণ প্রার্থনার জন্য একটি মন্দির আছে। হিন্দুযাত্রীরা এখানে সাদরে গৃহীত ও সাহায্যপ্রাপ্ত

হন। ভারত-সেবাশ্রম-সভ্যের তদ্বাবধানে এই ধর্মশালাটি পরিচালিত হয় এবং ইহার আশ্রিত যাত্রীদের স্বখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। পূণ্যার্থী হিন্দুযাত্রীরা যাহাতে সুপরিবারে এখানে থাকিয়া সামান্য ব্যয়ে গম্ভীর প্রভুতি করিতে পারেন, সে ব্যবস্থাও ইহার করিয়া দেন। আরও দুই-একটি তীর্থস্থানে ধর্মশালা স্থাপনোদ্দেশ্যে ইহার জমি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাভাবে জন্ম কার্য অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

ভুবনেশ্বরে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পাল মহাশয়ের একটি ধর্মশালা আছে। ঠেগন হইতে দুই মাইল দূরে বিন্দু-সরোবরের তীরে ইহা অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মন্দির অতি নিকটবর্তী বলিয়া যাত্রীদের মন্দির ও দেবদর্শনের বিশেষ সুবিধা আছে।

৮ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী জনসাধারণের নিকট ভিক্ষালব্ধ অর্থ অবাধা, মধ্যভারত, পঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, কাবুল, বেলুচিস্তান ও হিমালয়ের পার্বত্য-প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক যুগ পূর্বে বজ্রিণি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবাসে বাঙালীর যে সুচারু আশ্রয় ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আজ ধর্মশালার ইতিহাস সম্পর্কে সেই কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার সেই অক্ষয় কীর্তির নিদর্শনগুলি যাহাতে উত্তরকালে বঙ্গযুবকদের অনুরূপ স্মৃতিস্মারী সংকার্যে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, প্রত্যেক বাঙালীর সে-বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। ৮ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

বাংলার মধ্যেও বাঙালীর আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন আছে, সে-কথাও স্বজাতিপ্রেমিক বাঙালীরা বিস্মৃত হন নাই। প্রদীপের নীচেই যেমন আলোকের অভাব অনুভূত হয়, বাংলার মধ্যেই অনেক সময়ে সেইরূপ বাঙালীকে আশ্রয়ের অভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়।

কলিকাতা বড়বাজারের সুপরিচিত জমিদার দক্ষিণারঞ্জন বসাক মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার দানশীল সাধবী পত্নী শ্রীমতী পূর্ণশ্রী দাসী স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কলিকাতায় নবাগত বাঙালী হিন্দুদিগের বাসের জন্য

একটি ধর্মশালা স্থাপনের ইচ্ছা করেন ও তদ্বন্দ্বেষ্টে ছাপ্পার হাজার টাকা ব্যয়ে ৫০, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে প্রায় সাত কাঠা জমির উপর অবস্থিত সুবৃহৎ দ্বিতল বাটখানি ক্রীত হয়। ধর্মশালাটির প্রতিষ্ঠা হয় ১০ই পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৩২ সালে। 'দক্ষিণারঞ্জন বসাক ধর্মশালা'ই কলিকাতায় বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ধর্মশালা। এই ধর্মশালায় সর্বসমেত আঠারখানি প্রশস্ত কক্ষ ও তন্নিম্ন পৃথক পাকশালা আছে। ঘরগুলিতে বিজলী-বাতিরও বন্দোবস্ত আছে। ধর্মশালায় যাত্রীসমাগম বৃদ্ধি হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে দ্বিতলে আরও অনেকগুলি গৃহ নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আশ্রিত ব্যক্তিদের স্বথ-স্ববিধার জন্ত একজন ম্যানেজারের অধীনে অনেকগুলি ভৃত্য, দরওয়ান, মেথর প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। ধর্মশালাটি প্রকৃতই সুপরিচালিত।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাজধানী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতায় নানা কার্যব্যপদেশে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু হিন্দু নর-নারীর সমাগম হয়। তাঁহাদের আশ্রয়দানের অন্ততঃ কিঞ্চিদ্ভিন্ন ব্যবস্থাও বাহাতে সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে কলিকাতা, ২ নং তারাতাঁদ দস্ত ষ্ট্রীট, নিবাসী স্বর্গীর কৃষীকেশ মল্লিক মহাশয়ের সহধর্মিণী ও পুণ্যলোক মতিলাল শীল মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী পুরস্কন্দরী দাসী সাত বৎসর পূর্বে উনআশি হাজার টাকা ব্যয়ে ৬২৪, বীজন ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদোপম দ্বিতল বাটখানি ক্রয় করেন ও দানপত্রের যথারীতি স্বাক্ষর করিয়া হিন্দু জনসাধারণের ও বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুদিগের বাসের জন্ত উৎসর্গ করেন। এই পুণ্যবতী হিন্দুমহিলা ধর্মশালার জন্ত শুধু বাটখানি দান করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি ইহার রক্ষাবেক্ষণের জন্ত একটি স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনোদ্দেশ্যে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন

ও পাঁচ জন অছি (Trustee) নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের হস্তে এই অর্থ ও বাটখানি অর্পণ করিয়াছেন। কিঞ্চিদধিক আট কাঠা পাঁচ ছটাক জমির উপর অবস্থিত এই দ্বিতল ধর্মশালায় সর্বসমেত চব্বিশখানি প্রশস্ত গৃহ আছে। ধর্মশালা সুপরিচালনার জন্ত এক জন বেতনভোগী কর্মচারী, দুই জন দরওয়ান, একজন ভৃত্য ও এক জন ঝাড়ুদার নিযুক্ত আছে ইংরেজী ১৯২৯ সালে, ১লা নভেম্বর, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব শ্রীযুক্ত জে সি মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক 'পুরস্কন্দরী ধর্মশালা'র স্বারোক্ষাটন হয়।

কলিকাতার 'দক্ষিণারঞ্জন বসাক ধর্মশালা' ও 'পুরস্কন্দরী ধর্মশালা' ও চাঁদপুরের শ্রীমতী বসন্তী দেবী প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মশালা ব্যতীত বাঙালী হিন্দু-মহিলা প্রতিষ্ঠিত আর কোন ধর্মশালা আছে বলিয়া অবগত নহি।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমায় 'রামেশ্বর স্মৃতি-ভবন' নামে একটি স্মৃতিশিলা আছে। স্থানীয় বাঙালী উজ্জলোকদের উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে আচার্য্য রামেশ্বরমন্ডর জিবেরী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের অদূরে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাটোয়ার ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে গৌরালঘাটের সম্মিলিত শ্রীযুক্ত দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি কালীবাড়ী আছে। সেখানে হিন্দু আগন্তুকদের আশ্রয়দানের ব্যবস্থা থাকায় ধর্মশালার উদ্দেশ্যে কিঞ্চৎপরিমাণে সাধিত হইতেছে।

বর্তমানে শ্রীযুক্ত শশীকুমার বসু মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি ও চন্দননগর ও নবদ্বীপে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি ধর্মশালা আছে শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাদের বিশেষ কোন বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।



ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৪৬

নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টায় পার্কতী নিজেকে কিছুতেই অণুমান্য বিশ্রাম দিল না। নব নব উন্নতির পন্থা উদ্ভাবন করে আশ্রমকে সে যেন আবার নূতন রূপ দিয়ে গড়ে ভোলবার উদ্যমে প্রাণপাত করতে লাগল। এই উৎসাহের স্রোতে পার্কতীর কর্মপ্রবণ হৃদয়কে, তার ক্ষুদ্র অন্তরের যুত্যাগ্ধার অল্প সমাধি থেকে আবার কখন যে ধীরে ধীরে আশা-আনন্দ-আলোকময় সঞ্জীবনরসধারা প্রবাহে আপন হৃদয়ের স্থখ-শান্তি-সাম্ব্যাপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রতি স্নেহাতুর করে তুললে তা সে জানতেও পারে নি। সমস্ত মাসের অন্তে শচীন্দ্র যখন এসে উপস্থিত হবে তখন এই নূতন সৃষ্টির বিশ্বাসের অর্থ দিয়ে সে শচীন্দ্রের ক্ষুদ্রচিত্তে যে অপরিমিত আনন্দের সঞ্চয় করবে সেইটুকু কল্পনা করে তার মহাপ্রসন্ন মনে মনে যেন প্রসাদ লাভ করতে লাগল। তার চিন্তের সকল সংশয় অপসারিত হয়ে গেল।

দিনের পর দিন যায় তার বৃত্তকে চিত্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনার উত্তেজনায় তোলপাড় করতে থাকে। যে প্রসাধন সঙ্কে কোনদিন তার রুচিতে আগ্রহের ছোঁয়াচ লাগবার অবসর পায় নি, সেই প্রসাধন সঙ্কেও নিজের অজ্ঞাস্টার সে যেন একটু সজাগ হচ্ছে। বাঙালী রান্নার নানা বিচিত্র জটিল বস্ত্র আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে ওধানকার ছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন করে করে বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছে। বাঙালী পরিবারের গৃহস্থালী সম্পর্কে গল্পের ছলে মেয়েদের কাছে নানা তথ্য সংগ্রহ করে—এমনি করে দিন যায় তার ভবিষ্য-

জীবন রচনার ভূমিকা-বিস্তার।

মাস অতীত হ'তে চলল; শচীন্দ্রের কাছ থেকে কোনও আগমনীবার্তা এখনও এসে পৌঁছল না। পার্কতী ভাবে—নিশ্চয় জমিদারীর কাজে ফুরিয়ে পান নি।

অল্প মাসের শেষদিন। শচীন্দ্রের আগমন-প্রতীক্ষায়

পার্কতী গিয়ে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছে। তার বেশভূষায় কোথাও আভিযা না থাকলেও পারিপার্শ্বের অভাব নেই। মুখ তার আশা ও আনন্দের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দূরে বাকের মুখে লঙ্কের আভাস দেখা দিয়েছে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই লঙ্ক এসে ঘাটের কাছে পৌঁছবে। কিন্তু এই সময়টুকু যেন কাটিতে আর চায় না, এটুকু সময় যেন এই ২২ দিনের চেয়েও অনেক বিস্তৃত। সারেরট্টা যেন কি! লঙ্কের গতি যে নৌকারও অধম হ'ল! তবু সময় যায়। লঙ্ক ঘাটের কাছে এসে পৌঁছল। কিন্তু কই শচীন্দ্র ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেই! কেবিনে গেছে নিশ্চয়—কোনও কাজে।

লঙ্ক ঘাটে লাগতেই পার্কতী এগিয়ে গেল। কিন্তু শচীন্দ্র কই! ভোলানাথ এগিয়ে এসে 'গড় ক'রে' একটা কাগজের মোড়ক পার্কতীর হাতে দিলে। শচীন্দ্র আসে নি। কোনও কঠিন অস্ত্রধ করে নি ত! জিজ্ঞেস করতে যেন সাহস হয় না। স্নেহ যে বিলেতে একবার—উঃ কত কষ্ট ক'রেই না তাকে বাঁচিয়েছিল!

এক মুহূর্তের মধ্যে পার্কতীর মনে সম্ভব-অসম্ভব লঙ্ক কথার চুম্বকি তুবড়ীর ফুলফুরির মত মনের মধ্যে ঝরে ঝরে পড়ল। শব্দ মেয়ে সে; মনের এই উত্তাল উচ্ছ্বাস সে কঠিন বলে চেপে জিজ্ঞেস করলে, "ভোলাদা—ভাল আছ ত? তোমার বাবু এলেন না যে?"—বলে সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না দিয়ে ক্রমাগত কথা বলে যেতে লাগল—যেন, পাছে কোন দুঃসংবাদ ভোলাদার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, এই ভয়।

"উঃ কত দিন পরে তুমি এলে বল ত ভোলাদা? দেখ সব বললে গেছে। বলতে হবে—দ্বিধিমপির ক্ষমতা আছে। তোমার বাবু এলে অবাক হতেন। কিন্তু এলেন না ত! কিছু খেয়েছ সকালে? চল আমার বাড়ী চল। বিশ্রাম করে নাও। তার পর সব শুনব'খন।" ইত্যাদি অনেক—

শুধু নিরাশার উষ্ম বেদনার উপর কথার পর কথা চাপা দিয়ে চলা।

চলতে চলতে ভোলানাথ এক সময়ে অবসর পেয়ে বললে, “বাবু পশ্চিমে গেল দ্বিদিগ্গিশি। তা বাবুকে কত বললুম, ‘বাবু আমাকে সঙ্গে নাও’—তা শুনে না। বললে, ‘না ভোলাদা, তুই বরং তোর দ্বিদিগ্গিশির কাছে থাক তদ্দিন আমি ক’টা দিন পশ্চিমটা একটু ঘুরে আসি। তুই থাকলে তবু আমি একটু নিশ্চিন্দ হ’তে পারি।’ তা দ্বিদিগ্গিশি আমি জানি কি না। ও আর কোথাও না; বাবু গেছে ঐ প্রাণে। তুমি দেখে নিও। বোঁমারে কি ভালই না বাস্‌ত বাবু। আমারে এই টাকা আর পস্তর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।”

স্নেহীল ভোলানাথের সুরল উক্তি পার্শ্বতীর মনে শচীন্দ্র সম্বন্ধে আবার একটু দ্বিধা উপস্থিত করলে। তবে কি সত্যই সে শচীন্দ্রকে তার কর্তব্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়!

বিপুল বলে সে মন থেকে আপাততঃ এই চিন্তা সরিয়ে দিলে। ভোলানাথের আতিথ্যের ব্যবস্থা ক’রে দিয়ে সে চিঠিপত্র নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করলে।

প্রথম প্যাকেটটায় কিছু টাকা, তার পবেরটায় হিসাব-পত্রের একটা খসড়া। এই রকম আরও দু-তিনটু। তার পর কয়েকখানা চিঠি—তাব মধ্যে মেয়ে পাঠাবার দরখাস্ত থেকে আশ্রম-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের চিঠি। একখানা চিঠিতে অনিন্দিতা দেবী, কলিকাতা নাবীভবন থেকে লিখছেন, “আপনার ও আপনার আশ্রম সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আশ্রম দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আমিও সামান্যভাবে একটি ‘নারীভবন’ খুলিয়াছি। আপনার নিকট হইতে সাহায্য পাইলে উপকৃত হইব। দয়া করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করিলে বাঞ্ছিত হইব।”—

নারী-প্রতিষ্ঠানে আসতে হ’লে, হয় পার্শ্বতীর লঙ্কের ব্যবস্থা করতে হয়—তাই চিঠিখানা সে আলাদা ক’রে রেখে দিলে; নতুবা কলকাতার ঘাট, যেখান থেকে লঞ্চ ছাড়ে, সেখানে অত্যন্ত অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে টিকিট কিনে লঞ্চে যাওয়া চলে। সপ্তাহে মাত্র দু-দিন এই লঞ্চ যাতায়াত করে।

শেষ পত্রখানি একটা খামে মোহর করা। শচীন্দ্রের হস্তাক্ষর। পার্শ্বতীর মনটা ব’লে উঠল, “না গো না এমন

ক’রে বিচ্ছেদ হ’তে পারে না। “না—না—না” ব’লে সে পত্রোন্মোচনের পূর্বে নিজেকে যেন সান্না দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

চিঠি ইংরেজীতে—এবং ছোট। চিঠিতে লেখা—যাহা বলিয়া তোমাকে সোধোন করিলে উপযুক্ত হয়, তাহা য এমন শব্দ পাই না। তুমি আমার চিন্তায় সর্কশ্রেষ্ঠ অর্থ গ্রহণ কব। তাহাকে প্রেম বলিতে চাও বল, ন বলিতে চাও, যাহা ইচ্ছা বলিও—কিন্তু তাহাকে অস্বীকার বরিও না। আমার পত্নীর প্রতি আমার যে প্রেম তাহার মহ-মুত্যা ঘটিতে পারে না,— সেই কথাটাই জানিবার জন্য বাহির হইলাম। পুনশ্চঃ—ব্যাকের সহায়তায় নিয়মিত টাবা পছন্দ হবে—আশা করি তাহাতে কাজের অস্থবিধা হইবে ন।

চিঠিতে প্রত্যুত্তরের জন্য কোনও ঠিকানা দেওয়া নাই।

চিঠিখানা হাতে ক’রে সে দীর্ঘকাল বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক’রে ব’সে রইল। তারই ভ্রমসনার আঘাতে কতখানি অভিমানের আবেগে যে পত্রখানি রচনা করা সেই কথা মনে ক’রে শচীন্দ্রের দুর্ভাগা জীবনের প্রতি কল্পনায় প্রেমে তাব চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। মনে মনে নিজের কর্তব্য স্থির ক’রে চিঠিখানি বাস্তবে রেখে সে বারান্দায় গিয়ে বসল।

৪৭

অনিন্দিতা দেবীর নারীভবনে আজ দু-মাস কমলা কতকটা নিরুদ্বেগে এবং অপেক্ষাকৃত মনের স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করবার সুযোগ পেলে এক দিকে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিল অন্য দিকে অজ্ঞেয় অদর্শন তার মনের অশান্তিও কিছু কম ছিল না।

সীমার বন্ধুত্বে এবং সীমা সম্বন্ধে নিখিলনাথের অসুরোধ পালনের চেষ্টায় সময় তাঁর অবশ্য নিতান্ত ভারবহ হয়ে ওঠে নি এই যা। তবু সময়-সময় দনোদান পাঠিয়ে গোপনে নিখিলনাথকে অজ্ঞেয় সংবাদ সংগ্রহ ক’রে এনে দিতে হয়েছে। এতে যে দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় ফলের জীবনে অহেতুক অশুশোচনার কারণ তার চেয়ে বড় আর কখনও ঘটে নি।

কয়েক দিন হ’ল কমলের হাসপাতালের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। হাতে কিছু বিশেষ কাজ না থাকায় উপবের জানলায় ব’সে রাস্তার জনশ্রোতের দিকে চেয়ে তাব দীর্ঘ অলস গ্রহণ

যাপন করছে সে। মনটা যেন তার অসাড় হয়ে গেছে। তার স্বামীর আশু অলসজ্ঞানের সম্ভাবনা নিখিলনাথের উৎস-পীড়িত চিন্তে চেতিয়ে তোলবার মত স্বার্থপরতা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। নিখিলনাথ এ বিষয়ে যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বা উদাসীন নয় তা সে কৃতজ্ঞচিন্তে ভুলভব করত। ব্যথিত হৃদয়ে অস্বাভাবিক বেদনায় সে পথের দিকে চেয়ে বসে আছে। সম্রাট সমাগতপ্রায়। গ্যাসের বাতি জ্বলান হয়ে গেছে। মল্ল দূরে একটা গ্যাস-পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাদেরই বাড়ীটাকে লক্ষ্য করছে বলেই মনে হ'ল। অনৌ-আবছায়ায় মুখ ভাল দেখা যায় না। কমলা ভাবলে সীমার দলের লোকই হবে বোধ হয়। তবু কি জানি—সীমাকে জানান উচিত বলেই মনে হ'ল। উঠে যাবে—এমন সময় তার ভদ্রী দেখে বুকাটা খড়স করে তার মনে হ'ল সে নন্দলাল। লোকটা তখন স'রে গেছে। কমলের মাটা কেমন বিকল হয়ে রইল।

নিজের চিন্তাকে তোলবার জন্তে সে নিখিলের কাজে তার ক্ষুদ্র শক্তি নিযুক্ত করতে চেষ্টা করে। স্বযোগ খুঁজে নিয়ে প্রায়ই সে সাবধানে ধীরে ধীরে তর্ক তোলে এবং নিখিল-নাথের শিক্ষার যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করে নিখিলের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করে। কমলের দৃষ্টি এই তর্কের আর একটি আকর্ষণ ছিল; তা সীমাকে নিতীহ পছন্দ প্রত্যাবৃত্ত করা নয়; সীমার প্রতি নিখিলের দুর্নিবার আকর্ষণের কথা কমলের ক্রমে আর অগোচর ছিল না। জীলোকের চিন্তে অহুপ্রেরণার পক্ষে তাই কি যথেষ্ট নয়?

তর্কের মুখে শিক্ষামত কমলা সেদিন সীমাকে বলেছিল, “হবে না কেন? পৃথিবীর সমস্ত মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে নিজেদের অন্তর্গত উপস্ব স্বভাব ভোগ করবে, মনুষ্য-সমাজে এ নিয়মই নয়। এক জন অপরের উপর প্রভুত্ব করবেই। এমন একটা স্বাধীন দেশের মানুষ যে সেখানকার অস্ত্র কতগুলি মানুষের প্রভুত্বের বা আইনের বা সামাজিক স্তরগত সিন্ধ-তত্ত্বের স্বাধীন এ ত দেখতেই পাচ্ছি। তবে তোমরাই দেশের কতগুলি মানুষ তোমার উপর প্রভুত্ব করছে না, অস্ত্র দেশের মানুষকে করছে, এতে পরাধীনতার তফাৎ হচ্ছে কোথায়?”

“হচ্ছে; এক-শ বার হচ্ছে। স্বাধীনতা বলতে পুত্র

জীবন আমি কখনও বলতে চাই নি—যাদের রাষ্ট্র নাই, সমাজ নাই, সংস্কৃতি নাই—কিছুই নাই। স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা বোঝায়। যেখানে নিজের অর্থ আমি নিজের কল্যাণের জন্ত স্বৈচ্ছায় ব্যয় করতে পারি, যেখানে মানুষের অধিকার নিয়ে সমস্ত জাতির সঙ্গে সমান গৌরবে দাঁড়াতে পারি, যেখানে—”

“সোজা কথায় বল না ভাই যে মানুষের মঙ্গলের চেয়ে মানুষের দৈম্যকটাকে বড় করে বলতে চাও—তাতে মঙ্গল হয় ভাল, না-হয় নেই, নেই। স্বাধীন হ'লেই যে মানুষ মনুষ্যত্বলাভ কবে না সে ত হাজার বার তুমিই ভাই দেখাচ্ছ—অস্ত্র সব স্বাধীনতা-মত জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে। তবে স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে কেপে বেড়াবার আমাদের কি আছে বল ত? দেশের লোককে মানুষ করে তোল দেখ স্বাধীন হওয়ার চেয়ে অনেক বড় হবে। সে এমন কি শেষে, চাই কি স্বাধীনও হয়ে যেতে পারে। মনুষ্যত্বলাভ করলে স্বাধীন বাবা তাদের চেয়েও কি বড় হবে না? এই যে তুমি নারীভবন করছ এইটাকেই গড়ে তোল না। আমাদের দেশের স্ত্রী-পুরুষ কেউ আত্মনির্ভরশীল নয়। সকলকে পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখাও না। আরও ত কেউ কেউ এই কাজে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা তোমার মনুষ্যত্ব-বিরোধী স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার চেয়ে ধারাপ কিছু করেছে বলে ত আমার মনে হয় না। এই কমলাপুত্রীর কথাই ধর না কেন। দেখ না, পার্শ্বভী দেবী কি করে তুলেছেন? এই ত কাজ!”

“পার্শ্বভী দেবীটি কে?”

“বা: কমলাপুত্রীর নারী-প্রতিষ্ঠানের কথা শোন নি? এ রকম একটা প্রকাশ জিনিষ এক জন মাত্র মেয়ের পক্ষে গড়ে তোলা যে কী—পড়লে অবাক হ'তে হয়। দাঁড়াও—এই বলে কমলা নিখিলনাথের সংগৃহীত কমলাপুত্রীর প্রসূপেকটস্ ইত্যাদি এনে দেখাল।

কাজ পড়তে পড়তে সীমার মনের চিন্তা অস্ত্র ধারায় বইতে লাগল। “এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে যদি হাতে পাওয়া যায়! এই ত চাই; নিজের পায়ের উপর যারা নির্ভর করে আত্মীয়ের পরাধীনতাকে যারা স্থগণ করতে শিখেছে, তাদের মনে বিজ্ঞাতির পরাধীনতার উপর বিবেক

আনতে পারলে—” তার মনের ভিতরটা এই প্রতিষ্ঠানের উপর যেন কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগল। যেন তারই কাজ এরা অনেকটা করে রেখেছে। এই ত একটা বৃহৎ জমি প্রস্তুত—অদৃষ্ট স্বপ্রসন্ন হ’লে এই রকম একটা জায়গা থেকে কি না হ’তে পারে।

সে মনে মনে কমলাপুরী দেখে আসবার সংকল্প স্থির করলে। মুখে অবশ্য কোনও কথা সে প্রকাশ করলে না।

সীমাকে স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করতে দেখে কমলার মনে একটু আশার সঞ্চার হ’ল। সে উৎসাহিত হয়ে বললে, “মামুষকে কল্যাণের পথে চালাতে হ’লে যে-শক্তির দরকার এই মেয়েটির তা নিশ্চয়ই প্রচুর আছে। কিন্তু আমি জানি না তোমার মত এমন একটা প্রকাশ কাজের ক্ষেত্র করে এমন সহজে চালাবার ক্ষমতা তাঁর আছে কি না। তুমি যদি মনে কর, কি না করতে পার বল ত? সমস্ত দেশের শিক্ষা, শিল্প, শক্তিকে জাগাতে তোমার এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে অনায়াসেই তুমি পার। বাদের স্বাধীনতা চাও তাদের ভিতর থেকে স্বাধীন করে তোলা—বাইরের পরাধীনতার খোলস একদিন খসে যাবেই।”

হঠাৎ সীমার মুখের দিকে চেয়ে তার শূন্য দৃষ্টির উপর চোখ পড়ায় কমলা চুপ করলে—সীমা তার কথা শুনছে না নাকি! না তারই কথায় তার মনটা বিচলিত হয়েছে। বললে, “সত্যি ভাই, তুমি এমন একটা কাজে লেগে যাও ত আমার এই আঁতাকুড়ে ফেলে-দেওয়া জীবনটা একটা কাজের রাস্তা পেয়ে বেঁচে যায়। আমি সামান্য, কিন্তু তোমার উপর আমার ভালবাসা ত কম নয়। কাঠবেয়ালি দিয়েও সেতু বাঁধার কাজ হয়েছিল—কি বল?”—বলে হাসতে লাগল।

সীমা অল্প হাসবার ভান করে বললে, “তবে কাঠবেয়ালি ত জুতুগুঁহ-নির্মাণে লাগে নি। না না সত্যি, আসল কথা তোমরা উঠোটা করে ভাব তাই আমার কথা তোমরা বোঝ না। এটা প্রতিমা গড়া নয় যে তার কাঠ-খড় ঠিকমত সাজাও, রং দাও তার পর একদিন মন্ত্র পড়লেই তা’তে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। এটা একটা জীবন্ত মহাভক্ত; মরতে বসেছে যে স্বর্ধ্যালোকের অভাবে, সেই স্বর্ধ্যালোক তাকে

যোগাও—দেখো ফলে ফুলে পাতায় সৌন্দর্যে হিম্মোলে আপনিই বলমল করে উঠবে। স্বাধীনতা আমাদের সেই স্বর্ধ্যালোক—সেই আমাদের অমৃতরস যোগাবে। গাছকে স্বর্ধ্যালোক থেকে বঞ্চিত করে তার তদ্বির-তদারক করতে বললে তাকে উপহাস করা ছাড়া আর কিছু হয় না।” বলে অসহিষ্ণু চোখে জানালার বাইরে চেয়ে চুপ করে রইল।

কমলা তার বিরক্তি দেখে আর কিছু বলবে না ভাবছে এমন সময় সীমা তার দিকে ফিরে বললে, “কিছু মনে করে না ভাই, তোমাদের ঐ রকম বিনিময়ে বিনিময়ে চুনিয়ে চুনিয়ে ভাবতে দেখলে আমার ধৈর্য থাকে না। নিখিলবাবুর মত লোক, যার মৃত্যুভয় কেন, কোন ভয় কোন লোভ নেই বলে আমার বিশ্বাস; যার মত লোক দেশের কাজে নামলে আমাদের বুকেটা নশ হাত বেড়ে যায়, এই বয়সে তিনিও যখন বালাপোষ-মুড়ি-দেওয়া তামাক-থেকে বুড়োদের মত ওজন করে করে কথা বলতে থাকেন তখন তোমায় আর কি বলব বল? কিন্তু সত্যি বল ত সত্যিই কি তোমরা দেশের স্বাধীনতাকে প্রাণে মনে কামনা কর না? স্বাধীনতার চেয়ে বড় কাম্য কেমন করে লোকের মনে থাকতে পারে তা আমি ভেবেই পাই না। সমস্ত স্বাধীন দেশের লোকদের গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, কি হারালে তারা সবচেয়ে শনিজন্মের দিনে ব’লে অশ্রুভব করবে—একবাক্যে তারা বলবে স্বাধীনতা। আমরাই কেবল নানা মনোভাবের তাড়নায় প’ড়ে দার্শনিক সেজে রইলাম।”

কমলা খুব নরম স্বরে বললে, “ভাই তোমাদের মত ত আমি পড়াশুনো করি নাই। খবরের কাগজ প’ড়ে প’ড়ে যেটুকু শিখি। সব ভাই আবার নুঞ্চিও না। স্বাধীনতা যে ভাল সে-কথা ত “না” বলছি না। তবু আজকাল আবার অনেক চিন্তাশীল লোক ত এই সব জিনিষকে অল্প চোখে দেখতে শুরু করেছেন। সেদিন কোথায় যেন দেখলাম যে এই রাজনৈতিক জাতিভেদ অর্থাত্ জাতীয় স্বাধীনতা—এসব জিনিষ সভ্যতা এবং মহত্ত্বের বিরোধী—আর এটা নাকি সভ্যজগতে আর বেশী দিন টিকবে না। ‘এতখানি জমি আমি দখল করে আছি এর মধ্যে একেউ পা বাড়িও না তা হলোই খুনোখুনি বাধবে—কিন্তু আমার গায়ের পোষার

বাড়লেই তোমারটা কেড়ে নেব' এসব অসভ্যতা বেশী দিন টিকবে না। 'দেশ জাতি' এসব মানুষের মধ্যের তর্কাৎ উঠে গিয়ে পৃথিবীর জাতিধর্মনিবিশেষে সমস্ত মানুষের যোগাযোগে শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র সব গড়ে উঠবে। এই রকম সব কথা; ঠিক বৃথি নে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে কোন একটা দেশে আজ সেই দেশেব লোক প্রভুত্ব করতে পেল না ব'লে—"

- কমলা বেচারী নিতান্ত মরিয়া হয়েই নিখিলের শেখানো মুখস্থ কথা আওরাতে গিয়ে মুকিলে পড়ে গেল। সীমা আব বৈধ্য রাখতে পারলে না, বললে, "হয়েছে, হয়েছে। নিখিলবাবুর চেলাগিবি আর করতে হবে না। ওসব ঢের শুনেছি—তাকে শোনাও গে যাও, তোমার উপর ভক্তি বেড়ে যাবে।" ব'লে একটু নরম হয়ে হেসে বললে, "অমনিই কিছু কম নেই অবিশিষ্ট।"

কমলা জিব কেটে বললে, "ছিঃ ও কি ভাই। শ্রদ্ধা যদি সত্যি কাউকে করেন ত সে তোমাকে। তা ভাই তোমার মুখের উপর বলছি ব'লে নয়, তোমার মত মেয়েকেও যদি তাঁর শ্রদ্ধা কববার চোখ না থাকত ত তাঁকে নিশ্চয় করতাম নিশ্চয়।"

সীমা ঠাট্টার মুখে একটু ঝাঁজ দিয়ে বললে, "আচ্ছা, থাক আব শ্রদ্ধা করাতে হবে না। তোমার নিখিলবাবুকে তাঁর 'বালাপোষ-বৃত্তিটা' একটু পরিত্যাগ করতে ব'লো তাহ'লে আমার শ্রদ্ধাও কিছু পেতে পারেন। তারও মূল্য কিছু অল্প নয়, কি বল?" ব'লে হাসতে হাসতে উঠে গেল। •

সীমার কথার ঝাঁজে তাব মনের রহস্যটুকু কল্পনা করে কমলা মনে মনে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করলে।

৪৮

সমস্ত কথা শুনে নিখিলের একথা বুঝতে বাকী ছিল না যে সীমা কমলাপুরী গিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি নিখিলের মনে সত্যিই একটা শ্রদ্ধা এবং দরদ ছিল। পাছে সীমার দল এদের উপর কোন উৎপাত করে হঠাৎ তার এই ভয় মনে পেয়ে বসল এবং সেও কমলাপুরী যাওয়া মনে মনে স্থির হুঁরে হাসপাতালে ফিরে গেল, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

কমলার মুখে সীমার অকস্মাৎ অন্তর্দ্বানের কথা নিখিলকে চিন্তাকুল করে তুলেছিল। তা ছাড়া আজ কিছুদিন যাবৎ সীমার এবং রত্নলালের গতিবিধি নিখিলকে অমনিই ভাবিয়ে তুলেছিল। একটা গুরুতর কোন ধ্যান যে তাদের মাথায় খেলছে—নিখিলনাথের তা বুঝতে বাকী ছিল না। সম্প্রতি কয়েকটা অদ্ভুত ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলির কোন কিনারা হয় নি। ডাকাতিতে লুটপাটের কোন চেষ্টা ছিল না। অর্থবান লোককে হঠাৎ 'শুম' করে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করাই এগুলির উদ্দেশ্য ছিল। অহুস্কারানের দাপটে পুলিশেব ও গৃহস্থের আর আহাং নিঃশব্দ ছিল না।

নিখিল সীমাব সীমানার মধ্যে গতায়ত করলেও সীমা বা রত্নলাল অবশ্য তাদের নিজেদের গতিবিধি কার্যকলাপ সম্বন্ধে কখনও নিখিলের সঙ্গে প্রকাশ্য আলোচনা করত না। নিখিল সম্বন্ধে রত্নলালের মনেব বিশ্বাস যদিও কোনদিন সম্পূর্ণ নিরাকৃত হয় নি, তবু সীমার খাতিরেই সে নিখিলকে সহ্য করত।

নিখিলকে এই শ্রোতের মধ্যে আকৃষ্ট করবার জন্তেই হোক বা মনস্তত্ত্বটিত অন্ত কোন কারণেই হোক সীমা যে তাকে মোটামুটি বিশ্বাস করে এটুকু তার ব্যবহাবে প্রকাশ করতে জটিল করত না। দমদমার বাড়ীতে যেতেও যে নিখিলের বাধা ছিল না এইটুকু গলাধঃকরণ করতাই রত্নলালের সবচেয়ে বাধত। সীমার খাতিরে কোনমতে সে সহ্য করে যেত এই যা।

কারণও ছিল তার। রত্নলাল মোটের উপর বলতে গেলে এই নূতন উদ্যমের কর্তৃকর্তা। সেই হিসাবে সীমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা সে মনে মনে দাবী করত। সীমা অবশ্য তাকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে জটিল করত না; কিন্তু দেশের কাজের জন্য রত্নলালের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার চিন্তা তার কাছে হাস্তকর ছিল। দেশের কার্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারায় রত্নলাল যদি নিজেকে ভাগ্যবান মনে না করে তবে দেশের কাজে না নেমে হাততালির লোভে তার বাজার দলে আখড়াধারীর কাজে যাওয়া সমীচীন ছিল, এই তার মত; এবং স্পষ্ট ভাষায় এ মত ব্যক্ত করতে সে কল্প করত না।

রঙ্গলালের এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার কাণ্ড নিষ্ফল। দেশ-প্রীতি মনে কবলে একটু ভুল হবে। আরও ভুল হবে সে সীমার প্রতি বা কারও প্রতি কোন আকর্ষণে এ কাজে নেমেছে মনে করলে। দেশেব কাজে তার মন যে একেবারেই টানত না তা নয়; কিন্তু সে প্রাণপাত করবার মত এমন কিছু নয়। আসল কথা আদিম বোমারু দলের কোন কোন নায়কের মত রঙ্গলালের মনেও দুর্বল কিছু একটা করে এবং দেশময় একটা বিরাট হলস্থল বাধিয়ে দুশুভি নিনাদ করার উচ্চাভিলাষ তার মনে মনে বরাবরই ছিল। তা ছাড়া দুরন্ত বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরার নেশাও তার প্রবল ছিল। স্বাধীন দেশে এরাই হয়ত দুঃসাহসী সেনানায়ক হ'তে পারত। কিন্তু দৃষ্ট মৌবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে তাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। ভীক সে কোন কালেই ছিল না; হুতরাং সীমার আস্থানে সীমাকে কেন্দ্র করে একটা কিছু ঘটলে তোলবার নেশাতেই সে এই দলগঠনের, এই প্রতিষ্ঠান-পরিচালনের ভার নিয়েছিল।

সম্প্রতি নিখিলকে নিয়ে সীমার সঙ্গে তার মনোমালিহ ঘটেছিল। সীমা যে মানুষ হিসাবে, এমন কি জননায়ক হিসাবেও নিখিলকে মনে মনে একটা বড় আসন দেয় এবং সেই হিসাবে দলের মধ্যে তাকে পেতেও চায়, এটা রঙ্গলালের পক্ষে কঠিনোচন ছিল না। সীমাকে অবশ্য সে লঙ্ঘন করতে ভরসা পেত না, কারণ দলের সকলেরই সীমার নিষ্ঠার একাগ্রতায় সাহসে সে দলেব প্রায় দেবী আসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দেবতার আসন আমাদের দেশে সঙ্কল হলেও এক্ষেত্রে দেবতা নিতান্ত নিগুণ ছিলেন না। সে ঘাই হোক, কিছুদিন হ'ল একটা ঘটনায় রঙ্গলাল সীমার উপর আন্তরিক বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে উঠেছিল। ঘটনাটি এই—

“কৃতকার্যতার উৎসাহে রঙ্গলাল এবং তার পণ্টনদেব কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লোপ পাবার ঘো হয়েছিল। এবারে যাকে চুরি করেছিল সে একটা পাড়ার্গেয়ে কুশীদজীবী একমাত্র পুত্র—নিতান্ত কচি ছেলে। এই লোকটির ধনের এবং কুশীদ-ব্যবসায়ের দুর্নাম ছিল অল্প নয়। এমন লোককেও একমাত্র শিশুর প্রতি অপরিসীম মোহের তাড়নে, প্রাণের আন্তরিক কলকাতায় তার চিকিৎসার জন্য আনতে হয়।

অর্থব্যয় করতে হয়—অর্থ তখন তান কাছে তুচ্ছ বোধ হয়। দাঁড়িয়ে সাহায্যে এই শিশুটিকে তারা হরণ করে দমদমার বাগানে এনেছিল। তাগা-তারিঙ্গ-মাচুলী-ভারাকান্ত জীর্ণ এতটুকু মেহের মধ্যে প্রাণ তাব যেন শুধু শক্তিব অভাবেই বেরিয়ে যেতে পাবে নি। সীমার মনের মধ্যে কেন যে মাতৃস্নেহ অকস্মাৎ উদ্বেল হয়ে উঠল বলা যায় না। অকস্মাৎ তার গুহ চোখ জলে ভরে এ'ল, সে শিশুটিকে বুকে চেপে নিয়ে বললে, “রঙ্গদা একে দিয়ে এ'স, এর মা এতক্ষণে হয়ত আত্মহত্যা করেছে, এ এমনি মাত্রা যাবে তা'তে কাবোর কিছু লাভ হবে না।”

ফিরিয়ে দিয়ে আসাব প্রস্তাব অবশ্য কঠিন—ধরা পড়বার ভয় ছিল। রঙ্গলাল কিছুতেই রাজী হ'ল না, ব্যঙ্গ ক'বে বললে, “এত করুণাময়ী দিয়ে দেশের কাজ হবে না—তুমি গিয়ে ঘরকরনা কর গে। শিশুশালনের অবসরও মিলবে তা'তে।

৫-বালকটি রঙ্গলালের সহায় ছিল, সীমার কথায় তারও চোখ ছলছল করে এসেছিল তার ছোট ভাইটিকে মরণাপন্ন দেখে এসেছে কাল। এমন সময় বিলাট হ'ল নিখিল উপস্থিত হ'য়ে। তীর উত্তেজিত স্বরে এই অমায়ুষিকতার সে প্রতিবাদ স্রবতে লাগল, বললে, “এই রকম স্বাপনবৃত্তির মূল্যে ক্রয় করা স্বাধীনতার চেষ্টা দেশ যদি তাঁদের হাতে স্বাধীন হয় তবে তা মানুষের দেশ থাকবে না, পশুরই দেশ হবে। এমন ঘটতে দিও না সীমা—তোমার মধ্যে যে মাতৃস্নেহ এখনও বেঁচে আছে তার দোহাই; এমনি করে দেশকে মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রো না।”

সীমা চুপ করে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে তার গল্ল প্রাণস্পর্শ নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করতে লাগল। এক মুহূর্তে এই সব স্বাধীনতার প্রয়াস, বিজাতীয় স্বপ্ন, দেশের অধিকার ইত্যাদি মনঃ ব্যাপার তার কাছে বীভৎস হয়ে দেখা দিল। কিন্তু হায় কেন্দ্রের তখন তার মন নাই। চারিদিকে পরের এবং নিজের, শত্রুর এবং মিত্রের গণ্ডে তোলা বেড়াঙ্কালে তাকে ঘিরেছে। মুক্তিপথপ্রয়াসী মুক্তিঅবকাশবিহীন সেই জড়পূর্ণের মধ্যে যে আশ্রয় নে জ্বলেছে তাব থেকে পালাবার পথ কোথায়! এবং অন্য

সকলকে এই আগুনের মধ্যে ফেলে একাকী পলায়নের মত ভীক নীচতার চিন্তাও তাব পক্ষে অসম্ভব।

রত্নলাল দাঁড়িয়ে সীমার ভাবটুকু লক্ষ্য করে নিখিলের কথায় একেবারে জলে উঠল, বললে, “বাঃ বেশ, থিয়েটারী চলছে মন্দ নয়। নিখিলবাবু এ অনধিকার চর্চায় ত আপনার কোন প্রয়োজন নেই। বেশ খাচ্ছেন-দাচ্ছেন আরামে আছেন—বুদ্ধি করে প্রাণ নিয়ে সবে পড়েছেন সেই ত বেশ।

- আবার মিশনরীগিরি ফলাবার চেষ্টা নাই করলেন। নারী নিয়ে আপনার কারবার—নারীভবনে যান মিশনরীর কাজটা লাগবে ভাল,”—বলে পাশের বালকটির দিকে চেয়ে একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে। বালকটি লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল।

সীমা আর সঙ্ক করতে পারল না। এগিয়ে এসে বললে, “রত্নলাল তোমাব ইতরামি করবার জায়গা এ নয়। যাও, এখনই এখান থেকে, চলে যাও—নইলে সীমাকে তুমি জান; আমি এখনই গিয়ে পুলিশে ধরা দেব—তোমাকেও বাদ দেব না।”

রত্নলাল এতটা আশা কবে নি। ধবা দিয়ে কুকুরের মত মাঝা পড়বার মত মনোবৃত্তি তাব নয়। প্রচণ্ড বিপদেব মধ্যে বিপুল অভিযান করে দেশের ও দুনিয়ার লোককে চমকে দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সামান্যামনি লড়াই করে মারা যাবাব বেপরোয়া কলনায় সে তুড়ুকুসওয়ার।

ক্রোধে, বিরক্তিতে, হিংসায় মুখ তার বিকৃত হয়ে এল। তবু আপাততঃ নিজেকে সামলে নিয়ে মনে মনে একটা শপথ-বাক্য উচ্চারণ করে সে সরে গেল।

সীমা এগিয়ে এসে বালকটির কোলে শিশুকে দিয়ে বললে, “নিখিলবাবু একে ফিরিয়ে দিতে হাওযায় অনর্থক বিপদ আছে তা’ত আপনি বোঝেন। আপনি কি দয়া করে এ বিষয়ে একটু সাহায্য করবেন?”

নিখিল অত্যন্ত খুশীভব। আগ্রহের সঙ্গে বললে, “নিশ্চয়, আমার ক্ষে-বকম বল তাই করতে প্রস্তুত আছি। আমি একে নিয়ে কি ওব বাবার কাছে—”

সীমা একটু হেসে বাধা দিয়ে বললে, “না না তেমন কিছু করবেন না। তাতে আপনার ত মজল নাই-ই—আমরাও এড়িয়ে না যেতে পারি। আমরা টাকা দিচ্ছি। আপনি

দয়া করে একে ওর বাবার নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে আপনার হাসপাতালে শিশু-বিভাগে একটা কেবিনে ভর্তি করে নিয়ে তাদের খবর দিন এই বলে যে তারা শিশুকে ভর্তি করে দিয়ে আর কোন খোঁজ করছে না কেন। তাতে আপনার চিকিৎসাও ওরও বাঁচবার উপায় হবে, কি বলেন?”

সীমাব ব্যবস্থায় তার প্রতি নিখিলের প্রশংসমান চিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; বললে, “সত্যি তোমাব তুলনা নেই।” এই প্রশংসাব লজ্জায় এবং একটা অপরিচিত তৃপ্তিতে সীমার মনটা ভেবে গেল।

ঘটনাটি মাস্থানেক পূর্বেব। ইতিমধ্যে রত্নলালের ব্যবহাবে অবশ্য কোন বিচ্যুতি ঘটে নি। সাময়িক নিয়মে রত্নলাল নিজের কাজ করে যায়। সীমার সঙ্গেও ব্যবহারে তাব আব কোন কঠিন ঋজুতা নাই। সীমা ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল। শুধু কলকাতা ভাগ করবাব পূর্বের সন্ধ্যাবেলা সেই বালকটি হঠাৎ এসে একটা প্রণাম কবে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি একটা ছোট চিঠি তার হাতে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ছেলোট সীমাকে সত্যিই ভক্তি কবত। সেই কাগজখণ্ডে ‘প্রবাসী’র সম্বন্ধে সাবধান হতে সুনীর্ভক অনুনয় ছিল। সেইটুকু পড়ে সীমাব মুখে একটা তাজিলোর হাসি ফুটে উঠল। সে উঠে গিয়ে কাগজটাব অগ্নিসংকার করলে।

নিখিলের দৃষ্টিভঙ্গার আরও একটা গুরুতর কারণ ছিল। শিকারের গন্ধ পেলে হাউণ্ডের মুখের ভাবখানা যেমন হয় ভুলু দস্তের মুখের ভাবখানা প্রায় তারই অনুরূপ হয়ে উঠেছে আজ ক’দিন। আগেকাব মত বেশী কথা আর সে কয় না—মাঝে মাঝে অগ্রমনস্কভাবে মাথা নাড়ে, যেন কোন বিশেষ সমস্ভাব এক-একটা সমাধান তাব মনে মনে হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবদের আব তেমন হৃদতার সঙ্গে ব্যাপকভাবে আদর-আপায়ন কবে না। লোক এলেই তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেবাব জন্তে ব্যস্ত হয়। আবার অধিকাংশ সময় তাকে বাড়ীতেও পাওয়া যায় না।

এক নিখিলের সঙ্গে ব্যবহারে ভুলু দস্তের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। টেবিলজমের প্রতি নিখিলের নিদারুণ বিরুদ্ধতা এবং অসহিষ্ণুতা ক্রমে ভুলু দস্তের মনেও একটা

বিশ্বাস এমন কি তার 'উত্তেজনার' প্রতি একটু কোতুরের ভাবই এনে দিয়েছিল। বস্তুতঃ টেররিজম সম্বন্ধে ভুলু দত্তের মনে নিখিলের মত বিশেষ কোন উত্তেজনাই ছিল না, থাকাব কথাও নয়। টেররিষ্টদের কার্যকলাপ গতিবিধি নিয়েই ভুলু দত্তের সমস্ত মনের এবং ক্ষমতার প্রেরণা নিযুক্ত ছিল। টেররিজমের নৈতিক দিক সম্বন্ধে তার কোন মাথাব্যথা ছিল না; স্তত্রাং দিনের পব দিন নিখিলের অসহিষ্ণু উত্তেজনার স্ত্রুে সে নিজের চেয়েও নিখিলকে টেররিজমের ঘোরতর শত্রু বলে বিশ্বাস করতে

আরম্ভ করেছিল। নিখিল যে খাঁটি লোক তার দলের সকলেবই এ বিশ্বাস ছিল; এবং বিশ্বাসঘাতকতা তার দ্বারা যে অসম্ভব পুলিশ হ'য়েও তার পূর্ব জীবনের এ ধারণা মন থেকে কখনও ঘোচে নি। স্তত্রাং নিজের গতিবিধি সম্বন্ধে অল্পশল্প গর্ব করা নিখিলের কাছে বিপজ্জনক বলে তার মনে হ'ত না। শুধু মাঝে মাঝে অভ্যাসমত বলত, 'দেখো ভাই কোথাও গল্প ক'রে আমার হাতে হাতকড়ি দিয়ে অল্পটি মেব না।' নিখিল যে অলস গল্প ক'রে বেড়াবে না এ বিশ্বাস অবশ্য তার মনে দৃঢ় ছিল। ক্রমশঃ

ভোরাই

শ্রীহেমচন্দ্র বাগ্চী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাবছিলাম ব'সে ব'সে একটি গল্প লিখি। বর্ণনার অতি-রঞ্জন থাকবে না তাতে, একটি কোন উপেক্ষিত দরিদ্র জীবনের ইতিহাস, সব সময়ে যা চোখে পড়ে অথচ মন যা সব সময়ে গ্রহণ করে না এমনি কোন একটি ছোট, কল্প কাহিনী। বর্ষার দিনে গুনগুন ক'রে গান ক'রে আর সংসারের অসংখ্য কাজ ক'রে যায় এমন একটি মেয়ে—চোখের কোণে একটি অবরুদ্ধ বিষাদের রেখা—মন তার কোথায় পাড়ি দেয় অজানা লোকে। বেশ নিপুণভাবে ব'সে ব'সে একটির পর একটি অধ্যায়ে সেই মেয়েটির ইতিবৃত্ত রচনা ক'রে যাই এমনি ইচ্ছা ছিল।

সব সময়ে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করা কঠিন। বিশেষ ক'রে গল্প রচনা করবার অবসর পাওয়াই শক্ত। মনকে প্রস্তুত করতে হয়, যা দেখেছি এবং যা দেখি নি এই উভয়কে মিলিয়ে একটি বিচিত্র রহস্য-লোক মনের মধ্যে গ'ড়ে তুলতে হয়। অ'মাদের প্রতিদিনের জীবনে সে-অবসর কোথায়? কোথায় কোন উপেক্ষিত জীবনের উপর স্রষ্টার দৃষ্টিব আলো পড়বে, তার জন্তে সে জীবন অপেক্ষা ক'বে ব'সে নেই। তাছাড়া জীবনের সমগ্রতাকে কে কবে হাতের মুঠোর মধ্যে অনায়সলভ্য ক'রে পেয়েছে? অথচ সেই সমগ্রতাকে নইলে চলাবে না, সমস্ত খণ্ড খণ্ড রূপ একটি অপবিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে—কুশলী শিল্পী ত সেইখানেই সার্থকতা।

ব'সে ব'সে এমনি ভাবছিলাম বর্ষার দিনে। ভিজে

নারকেল গাছের গা বেয়ে বৃষ্টির ধার মাটিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। পথে লোকচলাচল নেই—ডিম্বীক্ট বোর্ডের ইদারায় জল তুলতে আসে নি কেউ। অন্ধকার ছোট্ট ঘবটিতে একরাশ বই হড়ান—তারই মধ্যে ব'সে ব'সে ভাবছি। হঠাৎ বাইরে ভাবি একটা গেলমালা।

'এখানে হবে না বাপু, যাও যাও অন্য কোথাও দেখ গিয়ে। ও দিদি, দেখসে একটা বৃহড়া লোব কি রকম নাচছে আর গান করছে।'

আমার অন্ধকার ঘরের নেপথ্য কি হচ্ছে জানবাব ভারি একটি কোতুহল হ'ল। কান পেতে আছি কি হয় জানবার জন্তে অথচ উঠে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

'গুগো নাচ দেখে যাও গো, নাচ দেখে যাও—যেন একটি সা—আ মরণ।'

'ছিঃ, বলতে নেই—ও বাউল।'

বই-খাতা ছেড়ে উঠেছি। মেয়েদের সব কলকণ্ঠ হাণিয়ে একতারায় একটা তীব্র দীর্ঘ বন্ধার উঠল—

শুক গোবাক বল মনপায়ী

ও তুই বইসে বইসে ভাবছ কি?

শুক গোবাক বল মনপায়ী।

মাথায় একটি গেলমালা চাদর জড়ান—আলখান্না-গরা রক্ষ বৈরাগীর মূর্তি। তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে বললাম—গান কর, শুনি।

কথাবার্তার ধরণ দেখে বুঝলাম তার বাড়ী পূর্ব-বঙ্গে। অতি সঙ্কোচের সঙ্গে সে তার একতারাটি নিয়ে বসল আর শিরা-বার-করা হাতে পিড়ী পিড়ী করে একতারা বাজিয়ে গান গাইতে লাগল। বর্ষার দিনে তার সেই উদাস-করা স্বর বড় ভাল লাগল।

- ৩ তুই বইসে বইসে ভাবছ কি
গুরু গোবিন্দ বল মনপাখী
গুরুপে গোবিন্দ এসে
মজ্জা দিল কর্ণমূলে পেলাম না দিশে
রে স্যাপা পেলাম না দিশে
- ৩ তুই যাবে বলিস আপন আপন
চেয়েই দেখ সব ফাঁকি—
গুরু গোবিন্দ বল মনপাখী।

অনেক ক্ষণ ধরে একই গান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইলে। তাকে যত্ন করে খেতে দেওয়া হ'ল—ভারি সঙ্কোচ তার। বলে, 'কোথাও খাই নে বাবু, আপনারা যত্ন করলেন, তাই খেলায়।' তার পর তার কাছ থেকে অনেকগুলি গান খাতায় লিখে নিলাম। ভাল গান সংগ্রহের বাতিক ছিল। খাতায় লিখে নিয়েই তৃপ্তি হ'ল না। সে চলে যাওয়ার পর ঠিক তারই স্বর নকল করে করে আপন মনে গাইতে শুরু করলাম। আমার অঙ্ককার নির্জন ঘর পূর্ব-বঙ্গের সেই বাড়লের স্তবে মুখর হয়ে উঠল। প্রায়ই মনের মধ্যে তারই কথা ওঠে। সেই বাড়ল, তার একতারা, তার সেই উদাস-করা স্বর, যে-স্বর স্বর্ণকালের জ্ঞান ও সন্সারের কাদন ভুলিয়ে দেয়। ভাবতে থাকি তার জীবনের মাধুরী কোথায়?

বন্ধু মাধব—সে বেশী পড়াশুনা করে নি; চাফ-আবাদ নিয়ে থাকে। গায়ের লোকের প্রয়োজন হ'লে সে করতে পারে না এমন কিছু নেই। সে একদিন হঠাৎ এসে বললে, 'কি হচ্ছে এসব নিয়ে? চল বেড়িয়ে আসি।'

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি, বাড়লের স্বরের নিহিতার্থ। পুঁথি পড়ে পড়ে বাড়ল-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান অর্জন কবেছি, সে সব তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। সে শুধু হাসে আব বলে 'আমিও বাড়ল।'

এমনি করে কিছুদিন আমাদের বাড়লের নেশায় চেপে ধরল। গায়ের ছেলে-বুড়ো সন্ধ্যায় যখন ভিড় করে বসত, বাড়লের গান চলত তাদের সেই আসরে। গান শেষ হ'লে জল্পা-কথন—'দাদাঠাকুর এ গান বেশ নিকে নিয়েছেন।'

মনে মনে গোপন ইচ্ছা ছিল, এমনি করে সব লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করি—ছড়া, পাঁচালি, বাড়ল এবং কর্তা-ভজাব গান। সংগ্রহ করে করে পাদটীকা দিয়ে দিখে এক পুঁথি রচনা করি—এমন ছরাশাও ছিল। বন্ধু মাধব তা হাতে দিল না। সে তার স্বাস্থ্যেব প্রাচুর্য আর নির্মল হাসি

নিয়ে আমার পড়ুয়া মনকে গায়ের নানা কাজের মধ্যে ছুটি দিত। কোথায় পাড়ায় কাদের মধ্যে বেধেছে ঝগড়া, মেটাতে হবে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে, লোক্যাল বোর্ডে দরখাস্ত করে রাস্তাঘাট মেঘামত করাতে হবে, গায়ের কোন দিকের কোন জঙ্গলটি পরিষ্কার করলে লোকজনের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে—ডিসপেন্সারি নেই—হোমিওপ্যাথি গুণ্ডা আনিয়ে হোমিওপ্যাথি বই আনিয়ে সেবাকার্যে আত্ম-নিবেগ কবতে হবে, কোথায় বাঁশের বন, কাদের বাড়ীর চারি পাশে মশা এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি করেছে, তার বিহিত করতে হবে জমিদারকে জানিয়ে—ক্রমশঃ এই সব আমাদের নিত্য আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল।

আব, সন্ধ্যায় নির্জন অবসরে ঠাকুর-ঘরের নীচে ছুর্দাদলের উপরে বসে কীর্তন আব বাড়লের গান—যেন নেশাব মত আমাদের পেয়ে বসল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন যখন এমনি জড়িয়ে পড়ছে কীর্তনের নেশায়, তখন একদিন আমাদের দীনবন্ধু দাদাঠাকুর আবির্ভূত হলেন আমাদের সামনে তাঁর অভিজ্ঞতা নিয়ে। মৃষ্টি তাঁর কঠোর নয়, স্নিগ্ধ স্মিত-হাস্তও মুখে ছিল না। গ্রামের সিধু মটীকে দিয়ে তৈরি করান এক জোড়া চটি পায়ে, অনাবৃত দেহে আমাদের সামনে এলেন, বললেন, 'কি হচ্ছে ছোকরারা? জঙ্গল সাক্ষর করছ বুঝি?' বললাম, 'হ্যাঁ, কি আর করি? ছুটির সময়টা এইভাবে কাটাচ্ছি।'

'তা' আমার ওখানে গেলেও ত পার। বই আনিয়েছি বিস্তর। শ্রীমদ্ভাগবৎ, চণ্ডী, গীতা—এসব পড়তে পাব ত বসে বসে।'

বললাম, 'পড়বার কিছু পেলেই পড়ি—তা যাব এক দিন আপনাদের ওখানে।'

হাত নেড়ে বললেন, 'দেও। আর এসব জঙ্গল-টঙ্গল কাটা বাদ দাও। এসব ধূয়ো আজকাল উঠেছে—আমরা কিন্তু চিরকাল জঙ্গলেই কাটলাম।'

হেসে বললাম, 'জঙ্গল ত বরাবরই ছিল—না হয় এখনও থাকবে। তবে বসে ত থাকেন দাদামশায়, আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন না, তা'হলে আমরা বড় খুশী হ'ব।'

দীনবন্ধু ঠাকুর একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'তা, তা তোমরা যেও আমার ওখানে, ভেবে দেখব।' এই বলে তিনি চটি পায়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় মাধব আর আমি—আমরা বেরিয়েছি কুড়ুল হাতে নিয়ে—কেউ না আসে নিজেরাই জঙ্গল পরিষ্কার কবব এই উদ্দেশ্য। দেখি দাদামশায় তাঁর চটি বাদ দিয়ে হাতে একখানি কাস্তে নিয়ে আমাদের পিছন পিছন

আসছেন। 'বলি ওহে ছোকরারা, চল আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে জঙ্গল কাটতে।'

আমবা বিস্মিত হলাম। বৃদ্ধ যে হঠাৎ আমাদের সঙ্গী হবেন—এমন আশা করি নি।

তিনি বললেন, 'এই দেখ কোমরে গামছা বেঁধে এনেছি, মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পবেছি—ঠিক তোমাদের মত জঙ্গল সাফ করতে যদি না পারি—ত নাম দীনবন্ধু নয়।'

এই বলে তিনি আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে কান্ধে দিয়ে পথের দুই পাশের আসসেওড়ার জঙ্গল সাফ করতে লাগলেন।

তাঁর উৎসাহে আমাদের তরুণ উৎসাহ দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠল। আমবা কুড়ুল নিয়ে সিধু মুচীর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের জঙ্গল কাটতে লাগলাম। ছোট ছোট গাছ কাটা হ'য়ে গেলে একটা বড় নিমগাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ল। মাধব বললে, 'ধাক্ ওগাছটা আর কেটে দরকার নেই।'

বললাম, 'জঙ্গল কাটতে যখন নেমেছি, তখন গ'য়ের যেখানে যেখানে জঙ্গল দেখবে, সব কেটে পরিষ্কার ক'বে ফেলবে।'

মাধব বললে, 'তবে এস দেখা ধাক্—' এই বলে সে গাছের গোড়ায় ব'সে কুড়ুল চালাতে লাগল। আমিও তার সঙ্গে যোগ দিলাম। দেখলাম, মাধবের অভ্যস্ত হাত, তার কুড়ুলের আঘাত নিভুল, আমাব হাত থেকে কুড়ুল কেবলই খুলে খুলে স'রে স'রে যায়।

মাধব একটু হেসে বললে, 'তুমি পারবে না—এদিকে স'রে ব'স।'

আমি কুড়ুলটি এক পাশে ফেলে রেখে আসসেওড়ার জঙ্গলের দিকে স'রে এসে বসলাম। চোখের সামনে বেধেছি গাছেব বাকল ফেটে চৌচির হয়ে গেল, কাঠের টুকবোগুলো ছিটকে ছিটকে দূরে চ'লে যাচ্ছে—গাছটার অনিবার্য মৃত্যু মাধবের হাতে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

সিধু মুচীর বাড়ীর দক্ষিণ দিকের নিবিড় জঙ্গল প্রায় পরিষ্কার হয়ে এল। এক-একটা বড় গাছ কাটাব সঙ্গে সঙ্গে এতখানি ফাঁকা হয়ে যায় যে, তাই দেখে মন আমার বড় খুলী হয়ে ওঠে। মাধবকে ডেকে বললাম, 'মাধব, আর কত দূর?'

মাধব বললে, 'এই আর একটুখানি বাকী আছে'—বলার সঙ্গে সঙ্গে তার কুড়ুলের শেষ ঘা পড়ল এবং মড়মড় করতে করতে গাছটি তার বিপুল দেহ নিয়ে সিধু মুচীর বাড়ীর চালের উপর পড়ল। খড়ের ছাউনি সমেত খানিকটা চাল এবং দেওয়ালের খানিকটা ধসে গেল।

দাদামশায় কান্ধে হাতে এসে হাজির, বললেন, 'এ হে, ছোকরারা কবলে কি? করলে কি?'

মাধব মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। গরিব সিধু মুচীর

আকাশের হাওয়া খাওয়ার তত দরকার ছিল না, যত দরকার ছিল তাব ঘরের চালের এবং দেওয়ালের। সে বেঁচার সমস্ত দিন খেটে-খুটে এসে দাওয়া শুয়েছিল, হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে এল—আমাদের দেখে একেবারে হতভম্ব হয়ে রইল। বাবুব জঙ্গল কাটতে নেমেছেন, এ সে জানত, শেষকালে যে তারই খড়ের চালের উপর বাবুদের ফাঁটা নিমগাছ সশব্দে এসে পড়বে এ ধারণা তার নিশ্চয়ই ছিল না। তাই সে নিশ্চয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দাদামশায় তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'এই গাছটি তুই নিস' বলে আশ্বস্ত ক'রে আমাদের সঙ্গে নিয়ে তাঁব আসসেওড়ার কীর্তি দেখাতে দেখাতে পথ চলতে লাগলেন।

'একটু সাবধান হয়ে জঙ্গল-টঙ্গল কাটতে হয় হে ছোকবার—অস্তুত গাছটি কাটবাব আগে আমাকে একটু ডাকবে, পারতে।'

আমরা নিশ্চয় পথ চলতে লাগলাম। সিধু মুচীর ঘরের দুর্দশায় আমাদের মনে আর উৎসাহ ছিল না। তিনি বলে চললেন—গ্রামের পুরনো দিনের কাহিনী। গ্রাম ছিল না আগে, ছিল নিবিড় জঙ্গল, বেতবন, মজাদীঘি। এক দল ব্রাহ্মণ এসে বাস করতে লাগলেন এই গ্রামে—জঙ্গল কাটালেন তাঁরা। অনেক পুঁজাতন কীর্তি, অনেক আনন্দ, প্রাচুর্য এবং সমারোহের ব্যাপার—বললেন, 'আমরা সে-সব দেখি নি। আমরা এই গ্রামই দেখছি। এই দুর্দশ, ম্যালেরিয়া—এ সব এত ছিল না যেমন তোমরা দেখছ।'

মাধব বললে, 'দাদা, একটু চেষ্টা করা যায় না—গ্রামটিকে আবার ভাল করবার?' দাদামশায় বললেন, 'তুমি এত কি করতে পার? অনেক হাঠামার প্রয়োজন। অনেক দরখাস্ত করা, অনেক টাকাকড়ি খরচের দরকার।' আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আব তুমি বিশোর, তুমি শু বৈশী দিন এখানে থাকবে না তবে দেখ, যত দিন পার নিজেরা খেটে-খুটে। পয়সাকড়ি কেউ বড়-একটা খরচ করতে চাইবে না।'

আমাদের উৎসাহ একটু কমে এল। দাদামশায়ের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। পল্লীর দুঃখদৈন্ত-ভরা শ্রামলশ্রীকে আমরা কেটে ক্ষতবিক্ষত করছি—এই ভেবে মনটি এবটু ব্যথিত হ'ল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাধবকে একদিন ডেকে বললাম, 'ওহে আমার ত চ'লে যাওয়ার সময় এল। তুমি দেখ যদি গ্রামের কোনও উপকার করতে পার।'

মাধব বললে, 'তুমি চ'লে গেলে আমি আর কি চেষ্টাই

বা করব? একা একা তোমার সেই বাড়িলেব গান গেয়ে বেড়াতে হবে আর কি!’

মনটা একটু খাবাপ হ’ল। ইচ্ছা ছিল সমস্ত উৎসাহ আনন্দ এবং কাজের শেষে একটি গল্প লিখবার। সে সুযোগ আর পেলুম না। বল্কাতা গিয়ে কি সম্বল নিয়েই বা গল্প লিখব? নির্জন গ্রাম এসে মনেব মধ্যে বারে বারে দেখা দেবে। শুধু গ্রাম আর গাছপালা নিয়ে কি গল্পই বা লিখব? এমন একটি মেয়ে যে সমস্ত দিন সংসারের কাজ করে আর গান গায়, সে মেয়েটিকে পাই কোথায়? বাড়িলেব গানের করুণ স্বর এসে বারে বারে মনের চিন্তাধাবাকে বিক্ষিপ্ত করতে লাগল। আমার সেই বই-ছড়ানো অঙ্ককার ঘর আমাকে বারে বারে ডাকতে লাগল। ছুটিতে বাড়ী এসে গ্রামের কাজ-টাজ করা, আবার ছুটি শেষ হয়ে গেলে নিজের কর্শ্বস্থানে ফিরে যাওয়া—এ রকম ত কতবার হয়েছে। কিন্তু এবারে মনটা যেন কিছু বেশী মাত্রায় উদাসীন হয়ে আছে।

মাধবকে তেকে বললাম, ‘মাধব, সবই ত হ’ল, কিন্তু একটা গল্প লিখবার ইচ্ছা ছিল, সেটা বোধ হয় এ যাত্রা আর হ’ল না।’

মাধব তার স্বকৃৎকে সাদা দু-পাটি দাঁত বের ক’রে হেসে বললে, ‘গল্প—গল্প আবার কি রে? গল্প লিখিস্ না কি তুই?’

‘মাঝে মাঝে লিখতে ইচ্ছে যায় রে! করুণ কোনও কাহিনী লিখতে আমার বড় ইচ্ছে করে।’ মাধব একটুখানি মাথা চুলকে বললে, ‘বই-টাই পড়ি বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু আমার ভাল লাগে না কেন বলতে পারিস?’

মাধবের কথায় তত কান দিই নি। নিজের মনে গল্পের ভাবনা আর আমার মুখের অঙ্ককার ঘরের ভাবনা নিয়েই ছিলাম। মাধব আমাকে অন্তমনস্ক দেখে বললে, ‘কি ভাবছিস অত? আমার কথা কি শুনতে পাস্ নি?’

বললাম, ‘গল্পের কথাই ভাবছি। বই-টাই পড়াব কথা বলছিলি? বইয়ের লেখার সঙ্গে সব সময়ে সাধারণ জীবন খাপ খায় না, তাই বোধ হয় তোর বই পড়তে ভাল লাগে না।’

মাধব বললে, ‘কি জানি? অনেক মোটা-মোটা নভেল পড়েছি, কিন্তু কেন জানি নে, সে-সব পড়ে আমি তেমন আনন্দ পাই নে।’

মাধবের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম। একখানা বারোয়ারী পুজার ঘর তুলতে হবে—মাধবের সঙ্গে সেই বিষয়ে কথাবার্তা কইতে লাগলাম। চাঁদা কারা কারা দেবে বা নী-দেবে তাই নিয়ে আলোচনা।

রাস্তার পাশে মাধুর বিছিয়ে গ্রামের লোকেরা ব’সে ব’সে গল্প করছে। অগাধ আলস্ত—তামাক—চাষ-আবাদের কথাবার্তা। তারা বললে, ‘দাদাঠাকুররা—যাওয়া হয়েছিল কোথায়?’

মাধব বললে, ‘এই তোর চাঁদা দিবি? বারোয়ারী ঘর তুলছি আমরা।’ চাঁদা!—তার। যেন আকাশ থেকে পড়ল। নিতান্ত জোর-জবরদস্তি ক’রে চাঁদা আদায় করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মাধব বললে, ‘আমি ফর্দ ক’রে ফেলছি—চাঁদা দিতে হবেই।’

‘আচ্ছা, আগে ফর্দ ত তৈরি হোক, তার পর দেখা যাবে।’

তারা যেন এই রকম চিরকাল। স্থির হয়ে ব’সে আছে—রৌদ্র বৃষ্টি—সর্ব অবস্থাতেই একটি অসীম উদাসীনতা। জোর কর, চোঁচাও—কথা কইবে। নইলে, তামাক টানবে ব’সে ব’সে অনন্ত কাল ধ’রে।

মাধবের সঙ্গে ব’সে ব’সে একটি ফর্দ ক’রে ফেলা গেল। দাদামশায়ের নামটি আমরা সর্কাগ্রে দিলাম। দাদামশায় তাঁর দাওয়ায় ব’সে জমাখরচের খাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, ‘আমি কিন্তু বেশী দিতে পারছি নে।’ তার পর দাদামশায়ের কাছ থেকে আমরা পরামর্শ নিতে লাগলাম। তিনি তাঁর পুর্বনো চশমাজোড়া মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, ‘খুব সাবধান ভায়াবা—বেশী চেঁচামেচি ক’রো না। • যে যা দেবে তাই হাসিমুখে নিতে হয়।’

• * * *

মাধব চলে গেলে একা একা ফিরছি গ্রামের পথ দিয়ে। ঘন ঝাশের বন মাথার উপর নত হয়ে পড়েছে। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু বন—ঘন হয়ে ক্রমশঃ অনেক দূরে জমার অঙ্ককাবে মিশে গেছে। সেই ছায়াচ্ছন্ন পথ দিয়ে একা একা ফিরছি।

পিছন থেকে কে ডাকল, ‘বাবুজী?’

পিছনে চাইলাম। চিনতে পাবলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কে?’

‘চিনতে পারবেন না বাবু আমাকে। আপনাকে অনেক ছোট দেখেছি।’

‘কি নাম?’

‘আমার নাম সহায়রাম—কথকতা করি, গান গেয়ে বেড়াই। এই হল আমার পেশা।’

‘গান গেয়ে বেড়াও? কি গান?’—গানের কথা শুনলেই বিহ্বল হয়ে পড়ি।

‘এই ধরুন গিয়ে রামায়ণের গান, বেহুলার গান—এই সব।’

‘তা বেশ, বেশ!’
লোকটির মাথার চুল বড় বড়। গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। গলায় বৈষ্ণবদের মত মালা।
‘বাবুজী, এদিকে যাওয়া হয়েছিল কোথায়?’
‘এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’
‘তা আমাদের এ দেশ ঘোরবারই বটে!’
হেসে বললাম, ‘থাকি নে তাই। নইলে এ দেশ শুধু তোমাদের নয়, আমারও।’ একটু থেমে তার দিকে চেয়ে বললাম, ‘আচ্ছা গান গাইতে পার?’
লোকটি অবাক হয়ে গেল। গান ত সে গাইতে পারেই। আমার প্রশ্নটা অনেকটা অশ্রমনস্বেব মত হয়ে গেল। বললে, ‘গান শুনবেন বাবু?’

‘বড় ইচ্ছে আমার গান শোনবার। তবে, বোধ হয় এ যাত্রা আর হয় না। ক্ষিরে এসে দেখা যাবে।’

তারা ত এমনি গান করবে না। আসরে যেমন সাধারণতঃ গান করে, সেই ভাবে তারা গাইবে—তাই ও কথা বললাম।

লোকটিকে বড় ভাল লাগল। সে যখন হাসে, এত সরল তাকে মনে হয়!

বাড়ী ক্ষিরে এলাম। বাড়ীতে কেউ নেই। অন্ধকার নির্জন ঘরে বসে বাইরে চেয়ে রইলাম। অনেক কাজ করবার থাকে। শিক্ষিত মন নিয়ে মনে হয়, এ যেন ঠিক হচ্ছে না। ঐ ডোবাটাকে বুজিয়ে দেওয়া উচিত। দক্ষিণ দিকের বীশঝাড় আরও পাতলা হওয়া দরকার। রাস্তাঘাট এত কাদা আর জল জমে—এত সাপ—এত ম্যালেরিয়া—ডোবার উপর হুলদে পানাপুলো দেখলে কেমন যেন একটা হুবকম্প আসে। কাকে বলা যাবে এ কথা? মাছুষ ম’রে যায়—শুধু এসব দিকে কারও দৃষ্টি পড়ে না।

বসে বসে বইয়ের পাতা উলটাতে লাগলাম। আজই যাত্রা করব শহরের দিকে। অসমাপ্ত কাজ অনেক র’য়ে গেল।

প্রত্যেক বার গ্রাম ছেড়ে যখন কলকাতা গিয়েছি, মন আমার ঘুরে ঘুরে গ্রামের পথ বেয়ে আবার গ্রামে ফিরে গেছে। কত দুঃখ, কত দারিদ্র্য, তবু গ্রামকে ভুলে থাকা যায় না। সমস্ত কাজ-কর্মের শেষে মাঠের মধ্যে আমি আর মাধব একটা মোটা আমকাঠের গুঁড়িতে এসে বসতাম। সেই দৃশ্যটি মনে পড়ল এবার গ্রাম থেকে চলে আসবার আগে। মাধবকে বলতাম, ‘মাধব, এত দুঃখ গ্রামের, অমুক লোকটি খেতে পাচ্ছে না, অমুক লোকটার বাড়ী-ঘর নেই—এ সব ত নিতা দেখছি—তবু এই গ্রাম এত ভাল লাগে কেন বলতে পারিস?’

মাধব শুধু হাসত, আমার মনের গোলকধাঁধায় প্রশ্ন উঠত, শুনে সে ভাল উত্তর দিতে পারত না।

সন্ধ্যা নেমে আসত। সমস্ত গ্রামের গোয়ালঘরের ধোঁয়া জমাট বেঁধে স্বপ্ন কুয়াশার আবরণের মত ঘন বনেব উপরে ভাসত। কোন অভিনবত্ব নেই—তবু এ মনের মধ্যে একখানি ছবির মত মুদ্রিত হয়ে থাকত।

জানতাম কিছু হবে না। পোড়ো ডিটে আর নিবিড় জঙ্গলে গ্রাম ছেয়ে যাবে—দিনের বেলায় শেয়াল ডাকতে থাকবে ‘হুকা হুকা’। যে কয়েকটা লোক আছে, তারা দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পালিয়ে যাবে গ্রাম ছেড়ে—তবু আমার মন কেমন করত—অসহায়ের অরণ্যে বোদনের মত।

ভাল দেখে একটি মেস ঠিক ক’বে সেইখানে থাকব এই ইচ্ছা ছিল। বন্ধু চরণদাস বললেন, ‘আমাদের মেসে এস।’

বেশী হাঙ্গামা-ঝগড়াট কোন কালে পোয়াই নি; বিশেষ ক’রে মেস খুঁজে নেওয়ার মত বাক্যমারি আর নেই। চরণদাসের মেসে এসে ওঠা গেল। নীচের ঘবগুলো অন্ধকার। চাকর-বাকররা থাকে। খাবার ঘরে দিনের বেলায় হারিকেন জেলে খেতে হয়। উপরে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি নড়-বড় ক’রে নড়ে। তেতলার উপরে একখানি ঘন—পূর্ব-দক্ষিণ খোলা—সেই ঘরে এসে ওঠা গেল। চার জন ভদ্রলোকের সীট রয়েছে। আমি তারই পাশে সনকোচে নিজের জিনিষপত্র রাখলাম।

এত একা-একা কোনও কালে মনে হয় নি। কয়েকটা ভাঙা ফুলের টবে ছুটি ক্ষীর্ণকায় বেলফুলের গাছ বাইরের ছাদের উপরে। বিকেলবেলায় দেখি ক্ষীণ-কটি এক ভদ্রলোক হাত-পা-মাথা নেড়ে প্রথর ব্যাঘাম আরম্ভ ক’রে দিয়েছেন।

চরণদাস এসে বললেন, ‘এই আমাদের মেস কিণোর বাবু।’

কিশোরবাবু অর্থাৎ আমি তখন হতভম্ব হয়ে বসে আছি। এক বিপুলকায় ভদ্রলোক প্রলয়কালীন মেঘের মত আমাবশস্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বিছানার পাশে ছুটি প্রকাণ্ড মুগুর, চৌকির নীচে ছোলা ভিজিয়ে খাবার সরঞ্জাম। তিনি গুরুগব্বনে আমাকে বললেন, ‘আপনি নতুন এসেছেন বুঝি।’

আমি বললাম, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ।’

‘চূপ ক’রে বসে রয়েছেন যে! এখানে চাকরদের ডাকলে পাওয়া যায় না। নিজেই সব ব্যবস্থা ক’রে নিন।’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে করছি।’

চরণদাস ব্যস্ত হ’য়ে বললেন, ‘সে কি কথা? চাকর

ডাকলে পাওয়া যায় না—একি একটা কথা হ'ল? চাকর এল এবং এক পাশে থাকবার একটা ব্যবস্থাও হ'ল।

থেতে ব'সে চরণদাস হেসে বললেন, 'গরিবদের মেস এটি কিশোরবাবু, চাক্রিও খুব কম—অস্থবিধে হ'লে বলবেন।'

একপাশে সেই কীট-কটি ভদ্রলোক ঠাকুরের সজ বগড়া বাধিয়েছেন দেখলাম। তারই মধ্যে কোনও রকমে আহাঙ্গ সমাপ্ত ক'রে উপরে উঠে আসা গেল। আহাঙ্গদি শেষ হওয়ার পর একটা প্রচণ্ড তর্ক-সভা বসে। সেদিন ঘর তর্কে • যোগ দেওয়া হ'ল না। কয়েক মাস ধ'রে গ্রামে যে কাজ ক'বে এসেছি, তাবই খণ্ড-চিত্রগুলি ছাড়া-ছবির মত নিম্ন-জড়িত চোখের উপরে ভাসতে লাগল।

* * *

কয়েক দিন পরে চরণদাস একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রকম কিশোরবাবু, কেমন আছেন এ মেসে?' বললাম, 'তবু ভাল এত দিন পরে খোঁজ নিচ্ছেন।'

'বড় ব্যস্ত থাকি মশায়, যা দিনকাল পড়েছে—ভাইনে আনতে বাঁয়ে' কুলোয় না। তা দেখুন, আমাদের এ মেসে খরচপত্র খুবই কম। টিউশনী রএক-আধটা করতে পারেন ইচ্ছে কবলে। পড়া-শুনাও করতে পারেন—ইচ্ছা করলে চাকুরীর চেষ্টাও করতে পারবেন—যেমন খুশী কি বলেন?'

চেয়ে দেখি তিনি কথা কইছেন এদিকে আর এক দিকে জমা-খরচ লিখে যাচ্ছেন—কখনও বা গীতার ভাষা মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন। বাইরে দেখলে মনে হয় নিরাবরণ নিম্পৃহ ভদ্রলোকটি।

একটু হাসলাম। দেখি তাঁর বিরাম নেই—মেসটি তিনিই বেখেছেন চেষ্টাচরিত্র ক'রে।

মাঝে মাঝে মেসের দোতলায় নামতাম। দেখি একটি ঘরে এক দল ভদ্রলোক ব'সে নানা রকমের আলোচনা করছেন। সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজ কত কি যে আলোচনা তাব আব অন্ত নেই। কাগজপত্র ছড়িয়ে অব ভদ্রলোক ক্রমাগত খবরের কাগজের কাটিং সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ্য একখানি খাতায় আটা দিয়ে আঁটছেন। আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুহূর্ত হেসে বললেন, 'আমুন, আমুন।'

পাশের চৌকিতে এক দীর্ঘাকৃতি গৌরবাস্তি ভদ্রলোক ক্রমাগত বাগভট্টের কাদম্বরী আউডে যাচ্ছেন বইয়ের স্তুপের মধ্যে তিনি সমাহিত।

ভদ্রলোকদের আলোচনা শুনে লাগলাম।

'সাহিত্যের 'স' জানে না এমন সব লেখক আজকাল বুঝলে হে! যা খুশী তাই লিখলেই হ'ল?'

'মাসিকপত্রখানা উলটে যান একধার থেকে দেখবেন সবই এক—একই লেখক নানা কাগজে লিখছেন—না আছে বিশ্বাস না আছে বৈচিত্র্য।'

'আচ্ছা এরা লেখে কেন বলতে পার? কি আনন্দ পায় ভাই লিখে বুঝতে পারি নে।'

'তার পব ধর দেশ—কি উপকাবটা হচ্ছে বল দেশের? গ্রামগুলো ত বার—গ্রামেরই যদি উন্নতি না হ'ল, সংস্কার না হ'ল—তা হলে কি হবে দেশের?'

'সবেতেই সেই একই সমস্তা দাদা—সেই অর্থসমস্তা।'

'তা হলেও ত চেষ্টার দরকার।'

'তারপর ধরুন গল্প—সব যেন মনে হয় বায়োস্কোপের ভাষা পড়ছি।'

'ঠিক ঠিক—বায়োস্কোপের ভাষাই বটে। ভাবার এত শ্রীহীনতা কখনও দেখি নি।'

'কালে কালে কতই বা দেখব! আর সমাজ। সমাজের কথা আর বল কেন?'

এমন সময়ে চা এল। তাঁরা সব চা খেতে লাগলেন। আমি খার কাছে বসেছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করেন আগনি এখানে?'

'আজকাল অগতির গতি কি বলুন ত দেখি।'

হেসে বললাম, 'টিউশনী?'

'তাই করি।'

তাঁকে বড় ভাল লাগল।

* * *

মেসের গতানুগতিক বিশ্বাস জীবন চলতে লাগল। কত লোক, কত মেলামেণা, কত কোলাহল। টিউশনী ত সংগ্রহ করলাম—খরচপত্র মেটাতে হবে ত। চরণদাস বললেন, 'দেখুন, এই ভাবেই চলছে আজকাল সবারই। স্বথ বা শাস্তি যা-কিছু বলেন সে-সব মানুষের নিজের সৃষ্টি।'

'তা ত বটেই। মানুষের নিজের সৃষ্টি সমস্তই।'

মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম পার্কে, ভিক্টোরিয়ান—মাঠে। দেখি অসম্ভব ভিড়—মানুষের সদাব্যস্ততা, কর্মকোলাহল, অগণিত অসংখ্য মানুষ—জীবনের সংগ্রাম। চূপ ক'বে ব'সে থাকি—বাউলের গানের স্বর মনে পড়ে—আর মনে পড়ে আমার গ্রাম—শিশিরসিক্ত মাঠ, বিদ্রোহহীন, কোলাহলহীন শান্ত জীবন-যাত্রা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছুটিতে আবার গ্রামে ফিরে এলাম—দেখি, সমস্ত গ্রাম জুড়ে নানা রকম অস্থখের পালা চলছে। মাধব কেবলই ছুটিছুটি করছে—ওষু সংগ্রহ করছে, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছে, আর এ-বাড়ী সে-বাড়ী ক'রে সেবা ক'রে বেড়াচ্ছে। লোক দেখাবার জন্তে সে যে সেবা করছে তা' নয়—কেমন একটা আন্তরিকতা—যেটা শুধু তার ঘারাই সম্ভব। আর দেখলাম, যেখানে-যেখানে আমরা জঙ্গল

কেটেছি, সে-সব জায়গায় আবার জঙ্গলে ভরে গেছে।
ব্যর্থ চেষ্টার দিকে তাকিয়ে হাসি পেল।

মাধবের সঙ্গে কিছু দিন সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করা
গেল। কেউ কেউ বললেন, ‘অকারণে ছুটাছুটি করছেন
বাবু—ওরা মরবেই।’

মাধব আমাদের পাশে পেয়ে আরও উৎসাহিত হয়ে
উঠল। দাদামশায়ও দেখাদেখি এসে যোগ দিলেন। তিনি
ঘরা করে কিছু কিছু খরচও করলেন। আমাদের চেষ্টায়
গ্রামেরও কেউ কেউ উৎসাহান্বিত হ’ল। প্রবল চেষ্টার জয়
সর্বত্র। অস্থখের সময়টা কেটে গেলে অনেকেরই সেরে
উঠল।

মাধবের বৈঠকখানায় একদিন সেলাম। দেখি সে
অনেক কিছু জোগাড় করেছে। শুধুপত্র আনিয়ে রেখেছে।
‘নিভান্ত প্রয়োজনের সময় বা তার কাজে লাগতে পারে এমন
সব জিনিষ সে আনিয়ে রেখেছে। বাইরের নানা
সমিতি থেকে তার কাছে চিঠিপত্র আসছে। বারে বাবে
ব্যর্থ হয়েও তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। টিউবওয়েল বদ্যাবার
চেষ্টায় সে এবার উঠে-পড়ে লাগবে বললে।

* * *

দাদামশায়ের কাছে গিয়ে একদিন বললাম, ‘দাদামশায়,
একদিন গাঁয়ে গানের ব্যবস্থা হোক।’

দাদামশায় বললেন, ‘তা বেশ ত—ব্যবস্থা কর।’

মাধবের কাছে গেলুম। সে তখন জঙ্গল কাটাবার
দরখাস্ত করছে। দেখলাম সে একেবারে আশ্চর্য একটা
পটীসংস্কারক হয়ে গেছে। সাধারণতঃ তা-ই হয়।

মাধবও আমার কথা শুনে বলল, ‘বেশ, চেষ্টা কর যাক।’

কল্প ধরে চাঁদা আদায় হ’ল। গান হবে এই কথাটি
দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ উৎসাহটি
অন্ত রকমের। অস্থখ যার সেরেছে এবং অস্থখ যার সারে
নি—সকলেই উৎসাহিত হয়ে উঠল, গান হবে শুনে।

* * *

তাকেই খবর পাঠান হ’ল—যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল
বাঁশবনের অঙ্কবারে। সে খবর পাওয়া মাত্র এল তার
দলবল নিয়ে। তার পর পাড়াগাঁয়ে যেমন গানের ব্যবস্থা
হয়ে থাকে। তেমনি ব্যবস্থা হ’ল। এক পাশে মেয়েরা

এসে বসলেন—আর এক পাশে পুরুষরা। পোড়া তামাকের
গন্ধে, রাত্রির শিশিরে, কালি-পড়া পুবাণো লঠনের ধোঁয়ায়
স্থানটি অপকণ হয়ে উঠল। কেউবা এক-একগাছি ছোট
বাঁশের লাঠি নিয়ে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি
পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। সাধারণ ন্যায্যবিশ্ব শ্রেণীব ভক্তলোকেরা
সতবন্ধি আর কঞ্চল বিছিয়ে মাঝে মাঝে তামাক টানছেন।
এক পাশ থেকে কখনও ব’সে কখনও বা দাঁড়িয়ে দেখছি।

এক জন জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হঠাৎ গানের ব্যবস্থা হ’ল
কেন?’

তামাক টানতে টানতে এক ভক্তলোক উত্তর দিলেন,
‘এ সব ঐ কিশোর মাধবদের কাজ।’

‘তা মন্দ হয় নি—কি বল হে?’

কেউ উত্তর দিল, কেউ বা দিল না। এরই মধ্যে গানের
আসরে লব-কুশের আবির্ভাব হ’ল। হাতে চামচ, মাথার
চুল চূড়া ক’বে বাঁধা—ঠিক যেন রামায়ণের ছবির লব-কুশ।
আসরের স্বল্প আলোয় তাদের বড় স্থল্লর দেখাতে লাগল।

তারা চামচ ঢুলায় আর গান গায়। মাঝে মাঝে গানের
শেষে নাচে। প্রথমটা ‘সীতার বনবাসের’ একটা ছোটখাট
বর্ণনা ছিল, তার পর নাচের সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের
ভাঙা গ্যারে রচিত কোন অব্যাতনামা কবির ভাষা হ্রস্ব
ক’বে ক’বে গান করলে। নাচের সঙ্গে সঙ্গে সেই গানের
স্বরে সীতার বনবাসের কল্পণ কথা বেশ জমে উঠল।

দুখিনী সীতা নির্বাসিত হয়েছেন তমসাতীবে বায়ীন্দ্রির
তপোবনে। সেখানে কুশ-লবের জন্ম হয়েছে। সেই কুশ-লব
বায়ীন্দ্রির শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। রামচন্দ্রের কল্পশেষ
সেই কুশ-লব এসেছেন বায়ীন্দ্রির আদেশে রামায়ণ গান
করতে। রামচন্দ্র জ্ঞানেন না যে, এই কুশ-লব তাঁরই সন্তান।
বায়ীন্দ্রির রচিত রামায়ণ-কথা কুশ-লব সমবেত অয়োধ্যাবানী-
দের সম্মুখে গান করছেন স্থল্লিত কণ্ঠে। রামচন্দ্রের মনে
আসছে কোতুল, ‘এই তরুণ স্বকণ্ঠ কিশোর দুটি কাজ?’
কখনও শ্রদ্ধা, কখনও বাৎসল্য, কখনও বা কল্পণা—রামচন্দ্রের
বিদীর্ঘমান হৃদয়ের মধ্যে নানা চিন্তাবৃত্তির কলহ উল্লাস।
প্রিয়দর্শন দুটি কিশোর কিন্তু ধীরকণ্ঠে রামায়ণ গান ক’রে
চলেছেন।

মহাকাব্যের সেই চিরস্থান দুঃখ-কাহিনী, সেদিনকার

পাড়াগাঁয়ের ধূলিধূসর আসরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই বিচলিত করল।

শেষ দিকটায় কেউ কেউ উঠে গেলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে ঝাঁরা এসেছিলেন—কি স্ত্রী কি পুরুষ— তাঁরা আগেই চলে গেছেন। গান যখন ভাঙল, তখন রাত অনেক। বেণুবনের পাশে চাঁদ উঠেছে। একটা শীতল বাতাসের স্রোত কোথা থেকে ভেসে আসছে। বাড়ী কিরে ঘাব ভাবছি—এমন সময় মাধব দৌড়ে এসে বলল, ‘ওরে কিশোর, এদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে—আমার এখন অনেক কাজ বাকী।’

অঙ্ককার রাজি। মাধব আমার হাতে একটি কালি-পড়া লঠন দিল।

* * *

এঁরা যে কারা, সে-কথা মাধব আমাকে বলে দিলে না। কয়দিনের পরিশ্রমে রাত ভেপে ঘুমও পেয়েছে খুব। কালি-বুল-মাখা লঠনটি হাতে নিয়ে ঝাঁদের আগিয়ে দিয়ে আসতে হবে তাঁদের দিকে চেয়ে বললাম, ‘আমুন।’ গাঁয়ের সকলকে ঠিক চিনি না—কাজেই তাঁরা আগে আগে চলতে লাগলেন আর আমি লঠনটি হাতে নিয়ে পিছনে পিছনে আসতে লাগলাম। গ্রামের পথ এঁকে-বঁেকে চলে গিয়েছে, মাঝে মাঝে এক-এক ঘর বাড়ী—ক্রমশঃ ভীড় ক্রমে আসতে লাগল। লঠন নিয়ে আমি চলছি—হুই—একটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আর একটি মেয়ে তখনও বাকী। মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে বললেন, ‘আরও একটু আসতে হবে তোমাকে।’

আমার তখন ক্লান্তিতে আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, তবু হেসে বললাম, ‘চলুন।’ জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কত দূর যেতে হবে?’

‘বেশী দূর নয়—এই বাঙ্গোপাড়া পার হয়ে গিয়ে মাঠের কাছাকাছি আমাদের বাড়ী।’

‘কোন বাড়ী বলুন ত? মাধবদের বাড়ীও এখানে।’

‘না, মাধবদের বাড়ী নয়—মাধবদের বাড়ীর পাশেই।’

‘ও বুঝেছি—চলুন।’ কি যে বুঝলাম জানি না, তবু বলতে হ’ল বুঝেছি। মনে হ’ল তিনি আমাকে সেনেন। আমার দিকে কিরে বললেন, ‘তুমি আর কতদিন এখানে

থাকবে?’ আমি বললাম, ‘ছুটিতে এসেছি, ছুটি ফুরলেই আমাকে আবার চলে যেতে হবে।’

পথ ঘেন আর শেষ হ’তে চায় না। তাঁদের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে এল। নির্জন পথে সঙ্গীহীন অবস্থায় আবার কিরে আসতে হবে। মাধব সঙ্গে এলে বড় ভাল হ’ত। কিছু জিজ্ঞাসা করাও শক্ত। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি আমাকে জানেন দেখছি।’ অস্পষ্ট মুহূর্তে তিনি বললেন, ‘তোমাকে আবার কে না জানে?’

সেই নির্জন পথে তাঁর পরিচয় জানবার ঔৎসুক্য থাকলেও বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তিনি বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝলেন এবং বললেন, ‘তুমি এইবার বাড়ী যাও। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছ, তা-ছাড়া এ ক-দিনের গানের হাঝামাতেও কষ্ট পেয়েছ খুবই। কেমন না?’

লজ্জিত হলাম। বুঝলাম, তিনি অনেক খবর রাখেন। মনে একটি অদ্ভুত আনন্দ এল। সে আনন্দকে বিশ্লেষণ করে বোঝান শক্ত। কিরে এলাম। লঠন নিবিয়ে দিলাম। রাজি ভোর হয়ে আসছে, রাজি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে চলতে মনে হ’ল—গ্রামের এখনও অনেক কাজ বাকী আছে।

* * *

বকুলবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি। ভোরের মুহূর্ত হাওয়ায় টুপটাগন্ধের বকুল ফুল রাঁধে পড়ছে। ফুল-রাঁধার মত গানের সুর কোথা থেকে কানে ভেসে এল। সম্মুখে তাকিয়ে দেখি—সহায়রাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি গো গানের আসর ভাঙল বুঝি?’ সহায়রাম সচকিত হয়ে উঠল। বলল, ‘কে, দাদাঠাকুর?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

আসর ত অনেকক্ষণ ভেঙেছে। গান গাইতে গাইতে এই পথ দিয়ে যাচ্ছি। সহায়রামকে বড় ভাল লাগে। বললাম, ‘বড় স্বন্দর তোমার গান সহায়রাম।’ সে ম্লানস্বরে বলল, ‘কি করব দাদাঠাকুর?—এই গানই আমার পেশা।’ বললাম, ‘আর একদিন তোমার গান হবে।’

সে খুশী হয়ে বকুল-বনের পথ দিয়ে চলে গেল।

ভোরের সুর কানে বাজতে লাগল।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১০

এই ভিক্তরী ভক্ত-মহোদয়ের গৃহে বহু চাকর-চাকরাণী কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু তৎসঙ্গেও “চাম-কুশোক” (ভক্ত-মহিলা অর্থাৎ কর্ত্তীঠাকুরাণী) মাথায় ধনুকাকার মুক্তাপ্রবাল-মণ্ডিত শিরোভূষণ পরিয়া ক্রমাগত রন্ধনশালা, মজাগার, দেব-গৃহ প্রভৃতি বাড়ীর সকল অংশে ঘুরিতেছিলেন। বলা বাহুল্য ইহাবও হাতে-মুখে বেশ ঐক পৌছ ময়লা জমিয়াছিল এবং পবিচ্ছদের সামনে-ঝুলানো পশমী ঝাড়ন একেবারে কালো রঙে দাঁড়াইয়াছিল। রাত্রে মাংসযুক্ত খুঁপা ভোজনের পর আচা মহাশয় অনেকক্ষণ ‘আমার জন্মস্থান’ ললাধ সন্ধ্যা নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, তাহার পরে অনেক রাত্রে নিজার জন্ত সভা ভঙ্গ হইল। ততক্ষণে কর্ত্তী-মহাশয়ের দুই-পুত্র লোমযুক্ত মোটা মোলায়েম কবল ‘চুকটু’-নির্মিত খলির মধ্যে ‘নাকে তেল দিয়া’ ঘুমাইতেছিল। ভোটদেশে জী-পুরুষ সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করে, ইহাতে তাহাদের সন্মোচ বোধ নাই, এমন কি একই ঘরে পিতামাতা, পুত্র-পুত্রবধু ভিন্ন ভিন্ন শয়নস্থালিতে ঐ ভাবে নিজা ঘুম, বহু-ভর্তৃকা পত্নীও ঐ ভাবে পতিমণ্ডলীর সঙ্গে লেগ-কবলের মধ্যে নিজা যায়।

১৮ জুলাই সকাল দশটায় ডুরিং হইতে যাত্রা করিয়া ক্ষেতের মাঝের পথ ধরিয়া আমরা দুইটা নাগাদ জু-গ্যা গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে পৌছিবার একটু আগেই পথ এক পতীর ও স্বল্পপরিসরের সেচ-নালীর পাড় দিয়া চলিয়াছিল। খচ্চর জীবটাই ছুই, কখনও সোজা পথে চলে না, একটা বুড়া খচ্চর বোঝা-হুঙ্ক ক্ষেতের উঁচু জালে উঠিয়া প্রহারের ভয়ে সেচ-নালীর গভীর অংশে লাকাইয়া পড়িল। চাউলের বোঝার ভারে প্রথমে ত সেটা মুখ খুঁড়াইয়া জলের ভিতর বসিয়া পড়িল। আমি তাবিলাম আপদটা বুঝি মরিল, কিন্তু খচ্চরওয়ালারা তাহার মুখ জলের উপর তুলিয়া খরিয় চাউলের বস্তাগুলি ক্ষিপ্ৰতার সহিত খুলিয়া লওয়ায় ছুই

বাহনটি উঠিয়া আসিতে পারিল। চাউল ভিজিয়া গিয়াছে, এদিকে চাউলের বস্তার মুখ বন্ধ এবং গালা দিয়া নীলমোহব করা, কিন্তু চাউল না শুকাইলে লামা পৌছাইবার পূর্বেই তাহা অখাদ্য অবস্থায় পরিণত হইবে; সুতরাং খচ্চরওয়ালারা জু-গ্যা গ্রামে পৌছিয়া ঐ মোহর ভাড়িয়া চাউল খুলিয়া বাহির করিয়া কবলের উপর ছড়াইয়া শুকাইতে দিল। পারিশ্রমিক হিসাবে দিন দুই-তিনের মত খুঁপার জন্ত চাউলের ব্যবস্থাও করিয়া লইল।

শীগর্টা হইতেই আমরা ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা ছাড়িয়া গ্যাঙ্গী নদীর উপত্যকা দিয়া চলিতেছিলাম। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে শীগর্টা ১২,৮৫০ ফুট এবং গ্যাঙ্গী বা ‘গিয়াংসি’ ১৩,১২০ ফুট উচ্চে অবস্থিত হুতরাং গ্যাঙ্গীতে অপেক্ষাকৃত অধিক নৈত্য অল্পভূত হয়। এখনও আমরা শীগর্টা হইতে বিশেষ দূরে আসি নাই, সুতরাং এই অঞ্চল গরম বলিয়াই অনুভব করিতেছিলাম। এখানের ক্ষেতে প্রচুর বথুয়া শাক দেখিলাম। জু-গ্যাতে আমদের সর্দারের পূর্বজদিগের ভ্রাসন, মাত্র দুই-এক পুরুষ আগে ইহারা এখান হইতে লাসার কাছে গমনে ভিটা বাঁিয়াছে। খবর পৌছিবামাত্র সর্দারের জ্ঞাতিভাইদের পত্নীরা পান-ভোজনের সজ্জা লইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল। মুড়ি, খই, ভেলে-ভাজা, সেও, কমলা-বুর মিঠাই এমনি অনেক খাবার আসিল। এ দেশের নিয়ম এই যে ঐরূপ খাদ্য-সামগ্রী সামনে রাখিলে দুই-চার দানা মাত্র মুখে দিতে হয় নহিলে ভক্ততার সীমা লঙ্ঘন করা হয়। আমিও ভক্ততা রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু সর্দার বলিল, “খুব খাও।” পরে প্রচুর মাংসযুক্ত গরম চা-ও অনেক আসিল। রাত্রে সর্দার তাহার জ্ঞাতি-বন্ধুদের ঘরে দেখা করিতে গেল।

৫ই জুলাই যবের আটা সিন্ধ ও গরম সরিষার তৈল প্রভৃতির জন্ত আসিল, তবে আমি তাহা খাইলাম না। দশটার সময় খচ্চরগুলিকে খাওয়াইয়া আবার চলিতে আরম্ভ

করলাম; আজ পথ অন্ধই ছিল, গ্রাম হইতে দক্ষিণ মুখে চলিয়া প্রথমে পাহাড়ের পাদদেশে পৌছিয়া পাহাড়ের নীচে নীচে ক্ষেতের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলাম। এদিকে সেচ-নালীর ব্যবস্থা ভাল, সে-সব পার হইয়া আড়াই মাইল আনাজ পথ চলিয়া আমরা পা-চা গ্রামে পৌছাইলাম। খচরগুলি ইতি-পূর্বে ভাল বিশ্রাম কবিলার সুযোগ পায় নাই, তাই সর্দারের ইচ্ছা ছিল এখানে দু-চার দিন থাকিয়া তাহাদের সস্তা দানা-ভূষি খাওয়ায় এবং নিজে নাটক অভিনয় দেখে। পা-চা গ্রামে বাহার গোশালায় আমরা ছিলাম সে এ-অঞ্চলের বড় জায়গীরদার, তাহার গৃহের ভিতরে যাই নাই কিন্তু বাহির হইতে উহা অতি স্বন্দর মনে হইতেছিল।

চা-পানের পর সকলে নাটক অভিনয় দেখিতে গেলাম। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে, প্রায় এক মাইল দূরে, নদীর পাড়ে অভিনয় চলিতেছিল। এখানে এই যাত্রাকে “অচী লাহমো”র “তেমু” অর্থাৎ ‘স্ত্রী দেবীর লীলা’, অভিনয় বলে। ইহাকে ভৌটীয় ধর্ম্মাভিনয় বলা উচিত। আমাদের সঙ্গে দুটি বড় কুকুর ছিল, সেগুলিকে দরজায় বাঁধিয়া, ঘারে তালা দিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। সবুজ ঘাসে-ভরা প্রান্তরে রক্তভূমি, তাহার পাশে তিব্বতী বাবলাগাছের গুচ্ছ। এই যাত্রা প্রতি বৎসর এখানকার জমিদার নিজেদের খরচে করাইয়া থাকেন। ভিক্ষুগণ নাটকের অভিনেতা। ভিক্ষু-পাত্রদের পান-ভোজন পারিতোষিকের ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হয়; অধিকন্তু অভ্যাগত সন্ন্যাস্ত ব্যক্তিদের আহাারাদির ব্যয়ও তাহাকে দিতে হয়। নাটকের অভিনয়ের জন্য বৃহৎ চতুর্কোণ শামিয়ানা টাঙানো ছিল; আশেপাশে আরও অনেকগুলি ছোট বড় শামিয়ানায় দূর হইতে আগত অতিথিদের থাকিবার ব্যস্থা ছিল, সেগুলির পাশে তাহাদের ঘোড়া বাঁধা থাকিত। রক্তভূমির দক্ষিণে ছোট ছোট স্বন্দর তাস্তে বহু সম্রাস্ত্রী-পুরুষ বসিয়া ছিলেন এবং পূর্বদিকে বোতের মধ্যেই অল্প অতিথিদের জন্য করশা বিছানো ছিল। অল্প সব দিকে অস্ত্রাস্ত্র দর্শকেরা নিজ নিজ আসন বিছাইয়া বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে জীলোকের সংখ্যা অনেক। জমিদার মহাশয় আমার সঙ্গীকে দেখিয়াই লোক পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া পূর্বদিকের ফরাশের উপর বসাইলেন। নাটক দেখার সঙ্গে চা ও ছু-পান সন্মানে

চলিতেছিল, আমাদের জন্যও চা আসিল। দ্বিপ্রহরে রোজ প্রথর হওয়া সঙ্গেও লোকে উঠিবার নাম করিল না। ভৌটীয় নাটকে যবনিকার ব্যবহার নাই, রক্তমঞ্চও সমতলভূমি। অভিনেতাদের জন্য বাদকদিগের স্থানের পাশে মত্তপূর্ণ চামড়ার মটকা সাজানো। বাস্তব মধ্যে রোশনচোকী, দীর্ঘাকৃতি বীণ, এবং দীর্ঘ দণ্ডের উপর স্থাপিত এক প্রকার ডমরু। বাদক ও নট সকলেই নিকটস্থ এক গুহার “চাবা”। নাটকের প্রসঙ্গ বৃদ্ধদেবের পূর্বজন্মের জাতক সঙ্ক্ষিপ্ত এবং অভিনয়ের মধ্যে নৃত্যগীত, রক্তভূমি, কেঁতুক সবই ছিল। অভিনেতাদিগের মুখোশ কাগজ বা কাপড়ের, বেশভূষা স্বন্দর। গানের প্রশংসা চারি দিকেই, যদিও গানের কথা তাৎপর্য দু-চার জনও বুঝিতেছিল কিনা সন্দেহ। গদ্য-পদ্য দুয়েরই উচ্চারণের কৃত্রিমতায় আমাদের রামলীলাব অভিনয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা মনে হইতেছিল। যাত্রার এক অঙ্কে চারিটি স্ত্রী-ভূমিকা ছিল, তাহাদের পরিচ্ছদ স্বাভাবিক। অমনিতেই সাধারণ ভৌটীয় মহিলাদের বেশ যথেষ্ট কৃত্রিম (যথা, পরচুলার ব্যবহার, বৃহৎ শিরোভূষণ ইত্যাদি), নাটকে অধিক কিছু করার প্রয়োজন ছিল না। এই চারিটি নারীর মধ্যে দুই জন চাং (সুতী হইতে ঋষা-লা পর্যন্ত) অঞ্চলের ধনুকাকার শিরোভূষণ এবং অল্প দুই জন লাস্য অঞ্চলের ত্রিকোণ শিরোভূষণ পরিয়াছিল। লাসার বেশ বাহারা পরিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এক জন এতই ভাল সাজিয়াছিল যে, স্ত্রী-দর্শকেরাও তাহাকে প্রকৃত স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল, যদিও সকলেই জানিত। এই শ্রেণীর নাটকে স্ত্রী-অভিনেত্রী লওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। নৃত্যে তাল-লয়-সহযোগে মন্দগতিতে অগ্রপশ্চাৎ গমন, হস্তসঞ্চালন, চক্রব্য পরিভ্রমণ সবই অতি স্বন্দর দেখাইতেছিল। প্রহসনের মধ্যে বৈদ্য ও মন্ত্রবিদগণের এক আঙ্গ কিছু অঙ্গীল অংশ ছিল কিন্তু লোকে হাসিয়া গড়াইতেছিল। নাটকের পাত্রগণের অধিকাংশই দেবতা, নাটকের মধ্যেই পান-লীলা ছিল, স্বতরাং স্ত্রী-পুরুষ-বেশ সুসজ্জিত বহু রাজপরিচারক রৌপ্যময় পানপাত্রে মগ্ন লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বেলা দুইটার সময় সম্রাস্ত্র অভ্যাগতদিগের মধ্যে মাংস, ডিম্বাদি পরিবেশন আরম্ভ

তিব্বতের দৃশ্যাবলী





—রাহুল সাংকৃত্যায়ন বর্জক গৃহীত ফোটো :

হইল ; মাংস কিসের স্থির করিতে না পারায় আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। খাইবার সরঞ্জামের মধ্যে কাঠের বারকোস, চীনা-মাটির বাসন এবং কাঠ-নির্মিত চীনা “চপ-ষ্টিক” (চীনারা এই শলাকা কাঁটা-চামচের মত ব্যবহার করে) দেওয়া হইতেছিল। চীন দেশের সঙ্গে বহুদিন ঘনিষ্ঠ সংস্কৃতি থাকায় এদেশে বহু চীনা রীতি-নীতির চলন হইয়াছে। বেলা চারিটার সময় আমরা ফিরিলাম, পথে এক জন ভোটিয়কে বলিতে শুনিলাম, “এ নিশ্চয় ভারতীয়।” ইহাতে আমি একটু শঙ্কিত হইলাম, তবে লদাখ ও বৃশহরের লোকের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য থাকায় এরূপ সন্দেহ ঘুচানো সহজ স্বতরাং ভয়ের কারণ বিশেষ ছিল না। গ্যাফী কাছে হওয়ায়, এখানের অনেকে ভারতীয় সিপাহী দেখিয়াছে, তাহাদের এরূপ সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

আমাদের কুকুর দুইটি এতদিনে আমাকে চিনিয়া গিয়াছিল। কুকুরগুলির বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমি প্রথমে ভাবিতাম, ভোটিয়েরা নিশ্চয়ই উহাদের খুব খাওয়ায় ; কিন্তু দেখিলাম প্রাতে সের-দুই গরম জলে দেড় ছটাক আন্না জল সত্ত্ব এবং সন্ধ্যায়ও তাহাই মাত্র ইহাদের আহার। তিব্বতী কুকুর মাত্রেই দৈনিক খাদ্যের এই পরিমাণ। বস্তুতঃ এই দেশে সকল কুকুরই সর্বদা ক্ষুধার্ত থাকে, কেন না একদিন যাত্রা শুনিতে না যাওয়ায় আমি এই কুকুর দুইটিকে খাওয়াইয়া দেখিলাম এক-একটি প্রায় এক সেরের উপর সত্ত্ব পার করিল। যেখানে আমরা ছিলাম সেই গৃহের ছাদে একটি বিরাট কুকুরের ছালে ভূষি ভরিয়া লটকাইয়া দেওয়া ছিল। কোথাও কোথাও এরূপে যাক ও ভল্লকের ছালও টাঙান দেখিয়াছি, বোধ হয় ইহা তিব্বতী তুর্ক-তাকের অঙ্গীভূত। ভোটিয়েরা রাত্রে ছাদে কুকুর ছাড়িয়া দেয়। এক রাত্রে আমি ও আমার এক সঙ্গী ভুলক্রমে ছাদেই শুইয়াছিলাম। অতি ভোরে সঙ্গী উঠিয়া চলিয়া যায়, আমি শুইয়া থাকায় (না বুঝিতে পারায়) কুকুরগুলি আমাকে আক্রমণ করে নাই, কিন্তু জাগিলামাত্র আমি বুঝিলাম উঠিলেই আমাকে কুকুরের সঙ্গে লড়িতে হইবে। স্বতরাং অনেক দেরি হওয়া সত্ত্বেও, যতক্ষণ একজন বাড়ির লোক উপরে না আসিল, ততক্ষণ আমি চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম।

স্বমতি-প্রজ্ঞ একদিন বলিয়াছিলেন এদেশের লোকে উকুন খায়। সেই সময় এই খচরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করায় সে এ-কথা অস্বীকার করে। একদিন ঐ সন্ধারেরই এক ধনী-জাতির তরুণী স্ত্রী আমাদের বাসায় আসিল। ভোটিয়েরা স্নান না করায় উকুনের উৎপাত স্বাভাবিক। স্ত্রীলোকদের সাধারণ পরিচ্ছদের মধ্যে বাহিরে লম্বা পশমী ছুপা (চোগা), ভিতরে কোমরের উপরে রঙীন স্ত্রী বা রেশমী জ্যাকেট, এবং কোমরের নীচে স্ত্রী বা রেশমী লম্বা ঘাগরা। এই জ্যাকেট ও ঘাগরা শরীরে লগ্ন হওয়ায় ঐগুলিতেই উকুনের বাসা। ঐ তরুণী সেদিন তাহার জ্যাকেট খুলিয়া তাহা হইতে উকুন বাছিয়া খাইতে লাগিল। আগে এক জন ভোটিয় আমায় বলিয়াছিল এরূপ ব্যাপার এদেশে অতি সাধারণ এবং উকুন খাইতে টক লাগে।

৮ই জুলাই প্রাতরাশের পর আবার যাত্রারন্ত হইল। স্বক্কেই একটা খচর তাহার বোঝার বন্ধনী খুলিয়া ফেলায় কিছু দেরি হইল। গ্রাম হইতে প্রথমে দক্ষিণে পরে পূর্বদিকে যাওয়া হইল, এখানে একটি দেবালয় আছে, তাহার পাশের সেচ-নালীর ধার দিয়া রাস্তা গিয়াছে। এই পথে, ক্ষেত-গুলির পাশে পাহাড়ের ধারে ধারে অতি ধীরে চড়াই পথে চলিয়া বেলা বারটার সময় স-চা গ্রামে উপনীত হইলাম। গ্রামের নিকট এক পাহাড়ের মূলে নেশা নামক একটি ছোট মঠ আছে। এত দিন পরে খচরওয়ালারা নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করিল। উত্তর দিবার প্রবৃত্তি দমন করিলেও এরূপ রূঢ় ব্যবহারের ফলে মনের মধ্যে বিরক্তি থাকিয়া গেল। কি ভাবে চলিলে তাহারা আমার উপর প্রসন্ন থাকে বা আমা হইতে অসম্ভব কিছু আশা না করে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ ব্যবহার ইহাদের শুধু নুহে, ভোটিয় জাতিরই স্বভাবগত।

সন্ধ্যার সময় উহার বালি, কাল প্রাতে রওয়ানা হইয়া গ্যাফীতে চা পান করিয়াই সেখান হইতে যাত্রা করিব ; সেখানে ভূষি-চারার দাম বেশী স্বতরাং আরও সন্ধ্যায় চলিয়া কোথাও থাকিব। সেই কথা মত ৯ই জুলাই শ্রদ্ধোদয়ের পরেই চলিতে স্বরূপ করিলাম। এদিকের সেচ-নালীতে জল বেশী, ক্ষেতগুলির হরিৎশোভা নয়নমনোহর, নদীর ধারের বাবলা-বনের শোভাও হৃদয়

গ্রামের অবস্থা ভাল, বাড়ীগুলি দুইতলা ও দৃঢ়ভায়ে নির্মিত। দেওয়ালের সাদা মাটির প্রলেপ, কাল কাঠের টুকরায় তৈরি ছাউনির কুণ্ডরেখা, ছাদের উন্নত ধ্বজা এক দ্বার-জানালার সরল রেখা দূর হইতে অতি স্থলর দেখায়। সেচ-নালীর অন্তঃস্থিত প্রপাতস্থলে সন্তু পিষিবার “পঞ্চকি” (জলধারায় চালিত পেয়ণ-যন্ত্র) প্রায় চারিদিকেই দেখা যাইতেছিল। সেচ-নালী মধ্য-ভোট দেশে প্রায় সর্বত্রই আছে কিন্তু এদিকের গুলি অধিক সুরক্ষিত ও নিপুণভাবে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। গ্রামের মধ্যেও ঐরূপ পঞ্চকি এবং বহু অর্কুদকোটি মস্ত্র পূর্ণ একটি বৃহৎ “মাণী” জলশক্তিতে চালিত আছে দেখিলাম। মাণীর উপরিভাগে বাহিরের দিকে একটি দণ্ড যুক্ত ছিল, মাণী ঘুরিতে ঘুরিতে প্রতি সম্পূর্ণ পরিক্রমায় একবার ঐ দণ্ড দিয়া উপরে লম্বমান ঘণ্টার জিহ্বায় আঘাত করিতেছিল এবং এইরূপে প্রতি চক্রের শেষে একবার ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল। এইরূপে প্রতি মুহূর্তে বহু অর্কুদ মস্ত্র জপের পুণ্য অর্জিত হইতেছিল। এই মস্ত্রও সাধারণ নহে, ভারতের শ্রেষ্ঠতম মস্ত্রের এক কোটি ইহার একটির সমান, সুতরাং এক সেকেণ্ডে এই গ্রামে যে-পরিমাণ পুণ্য উৎপন্ন হইতেছিল তাহা সামান্য গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি ভাবিতেছিলাম যে যদি এই সমস্ত পুণ্যরাশি ঐ মাণী-স্থাপনকারী নিজের জন্ম রাখে তবে এক মুহূর্তের পুণ্য ভোগ করিতেই তাহাকে বহু কল্পকাল ইন্দ্র বা ব্রহ্মার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইবে, এক মাসের পুণ্যের ত কথাই নাই। গণিতের এই দুর্লভ সমস্যায় প্রান্ত আমার মন এই ভাবিয়া শাস্তি পাইল যে, এদেশে মহাবান প্রচলিত সুতরাং ঐ পুণ্যের পুঁজি প্রাণীমাত্রেরই পাইবে। কে বলিতে পারে, হয়ত এই ঘোর পাপসঙ্কটে লিপ্ত ভূমণ্ডলে মনুষ্য সমাজ যে এতদিনে ভূগর্ভে বা সমুদ্রতলে বিলীন হয় নাই তাহা-কারণ তিব্বতের এই হাজার হাজার “মাণী”! অহা! যদি যন্ত্রবানী দুনিয়ার সকলে ইহার মহাত্ম্য বুঝিত এবং আল্লা, খ্রীষ্ট, রাম, কৃষ্ণ এই সকল নাম প্রতি যন্ত্রক্ষে লক্ষ লক্ষ বার লিখিয়া রাখিত, যদি প্রতি ঘড়ির চাকায় শ্রীমদ্ভাগবদগীতার শ্লোক অঙ্কিত থাকিত, তাহা হইলে...!

দশটার সময় আমরা গ্যাকী পৌছিলাম। কাঠমাণ্ডবের ধর্ম্মমান সাহর অপার ধর্ম্মপ্রদ্বার কথা ত সিংহলেই এক লদাখী মিত্রের নিকট শুনিয়াছিলাম। শীগর্জীতে শুনিয়াছিলাম যে এখন কিছু দিনের মত তাঁহার এখানকার দোকান বন্ধ আছে। গ্যাকীতে তাঁহার দোকানের নাম গ্যো-লিং-ছোক-পা, তিব্বতে মহল্লা বা নগরের স্থলে প্রতি গৃহের এইরূপ পৃথক নাম থাকে। এখনও লাসায় পৌছিতে আট-দশ দিন বাকী, এই জন্ত আমি খচরওয়ালাকে বলিলাম, আমি দ্বিপ্রহরে গ্যো-লিং-ছোক-পা-তে থাকিয়া কিছু আহাৰ্য ও পাথের ব্যবস্থা করিব, তাহার পর তাহাদের সঙ্গে চলিব। আমি সেখানে গেলে পর কিছুক্ষণ বাদে খচরওয়ালারা জানাইল তাহীরাও সেদিন গ্যাকীতেই থাকিবে, পরদিন যাত্রা করা হইবে।

গ্যাকী—লাসা ও ভারতের প্রধান পথের উপরে পড়ে, এই পথ কালিম্পং হইয়া শিলিগুড়ি চলিয়া গিয়াছে। এখানে ভারত-সরকারের বাণিজ্যদূত, নেপাল সরকারের “উকিল” (রাজদূত) ও তাঁহার সঙ্গে সহায়ক-বাণিজ্যদূত, ডাক্তার এবং দু-এক জন ইংরেজ অফিসার থাকেন। প্রায় এক শত হিন্দুস্থানী সিপাহী-পল্টনও এখানে থাকে। গ্যাকীর বিষয় পরে লিখিব সুতরাং এখন এইটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট।

রাত্রি বর্ষা নামিল, এবং পরদিন (১০ই জুলাই) বেলা দশটা পর্য্যন্ত বৃষ্টি চলিল। গ্যাকীতেও সকালে আটটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত হাট বসে, আমি পথের জন্ত কাঁচা মূলা, চিঁড়া, চিনি, চাউল, চা, মিঠাই, সিদ্ধ মাংস ও মিষ্ট পরটা কিনিয়া লইলাম। পশ্চিম দিকের পর্বতমালার একটি বাহু গ্যাকীর প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার অন্তিম শিখরে গ্যাকীর জোঙ এবং তিন দিকে গ্যাকীর বসতি। প্রধান বাজার ঐ পর্বতবাহুর দক্ষিণ দিকে নীচে হইতে ঘুরিয়া পর্বতের উপরিস্থিত গুহার ফাটক পর্য্যন্ত লম্বা চলিয়া গিয়াছে। গ্যো-লিং-ছোক-পা যে-পথে স্থিত তাহার উপর দীর্ঘ মাণীর দেওয়াল আছে। দ্বিপ্রহরে আমরা পর্বতের ছোট টিলা পার হইয়া অল্প পারের বসতিতে আসিলাম। বস্তী হইতে-বাহির হইবার পথে কোথাও কোথাও জল বহিয়া যাইতে ছিল। পাশের ক্ষেতের বৃষ্টি-স্নাত গম ও জবের চারার হরিৎ আভা আরও উজ্জল দেখাইতেছিল।

পথে চীনা-সিপাহীদের থাকিবার স্থানের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। রাস্তার পূর্ব দিকে বৃটিশ দূতাবাসের পার্টলবর্ণের বৃহৎ অট্টালিকা। এখানে প্রান্তর অতি বিস্তৃত, সুদূরপ্রসারী হরিৎবর্ণ ক্ষেত দেখা যাইতেছিল। আরও অগ্রসর হইলে পর টেলিগ্রাফের তারের কাঠের থামের সারি নজরে পড়িল। গ্যাঙ্কী পর্যন্ত বৃটিশ তার ও ডাকঘর, ইহার পরে লাসা পর্যন্ত তিব্বত-সরকারের টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা আছে। ভোট-সরকারের ডাকঘর ফরী-জোঙ পর্যন্ত আছে। গ্যাঙ্কী হইতে এক মাইল পথ যাইতে যাইতে ভোটীয় ডাকবাহী দু-জন পিয়নের সঙ্গে দেখা হইল, তাহাদের হাতে ঘুঁড়ুর-বাঁধা ছোট-মালা এবং পিঠে পীতবর্ণ পশমী ডাকের থলি। ঐ দু-জনের মধ্যে এক জন দশ-বার বৎসরের বালক মাত্র। যেখানে গ্যাঙ্কী পর্যন্ত ইংরেজী ডাক লইতে দুইটি ঘোড়া লাগে সেখানে তিব্বতী ডাক ঐ রকম দুইটি লোকে দুই ছোট পুঁটলিতে লইয়া চলিয়াছে, ইহাতেই বুঝা যায় এদেশের লোকের ভোটীয় ডাকের উপর কতটা আস্থা। এদিকের ইংরেজী ডাকে ইন্দিওর (বীমা) করা যায় না, কিন্তু তৎসঙ্গেও নেপালী সওদাগরেরা ঐ ডাক মারফৎ বহু মূল্যবান পদার্থ আদান-প্রদান করে এবং ভোটীয় ডাকে বীমা করা সম্ভব হইলেও তাহারা তাহার মারফৎ পারতপক্ষে কিছুই পাঠায় না।

কটাকাঠানে চলিবার পর আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল, এবং সেই সময় দেখা গেল যে, আমাদের একটা কুকুর গ্যাঙ্কীতে ফেলিয়া আসা হইয়াছে। কুকুরের মালিক গ্যাঙ্কী ফিরিয়া গেল, আমরা অগ্রসর হইতে থাকিলাম। পথের দুই পার্শ্বে বিরি ও সফেদা বৃক্ষে ঘেরা গ্রাম ও শস্যে ভরা ক্ষেত। পথে পর্বতমালার একটি বাহু অতিক্রম করিতে হইল, তাহাতে চড়াই বেশী নহে কিন্তু তাহার উপরের ফোঁজী পরিখা সামরিক হিসাবে তাহার গুরুত্বের প্রমাণ দিতেছিল। পার হইলে পরে কাঁচা মাটির ছোট কেল্লার ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেল। কিছু দূর উত্তর-পূর্ব মুখে চলিবার পর দি-কী-চো-মো পৌঁছান গেল, সেখানে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ী। মালবহনের সঙ্গে চিঠিপত্র লইয়া যাওয়াও আমাদের সঙ্গীদের এক কাজ ছিল, ডাকের ব্যবস্থা হইবার পূর্বে আমাদের দেশে বন্জারা

ব্যাপারীরা যেরূপ করিত। সেই গৃহস্থের বাড়ীর কাছে যাইতেই একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর আমাদের স্বাগত-সন্ধ্যায়ণ করিতে আসিল, কিন্তু ভোটীয়েরা এরূপ কুকুরের প্রতি ক্রক্ষেপও করে কিনা সন্দেহ। বৃষ্টি পড়িতেছিল, খচ্চরের পিঠ হইতে মাল নামাইতে আমিও সাহায্য করিতে লাগিলাম। শীঘ্র সে-কাজ শেষ করিয়া ছোলদারী তাঁবুর সারি খাটানো গেল। তাহার খোঁচায় খচ্চর বাঁধিয়া তাহাদের সম্মুখে ভূষিচালিয়া সর্দার ও আমি সেই ধনীর গৃহে চলিলাম। গৃহস্থের দরজার বাহিরে মোটা খোঁচায় মজবুত শিকলে বাঁধা অতি ভয়ানক এক কুকুর আমাদের দেখিয়াই গর্জন ও লক্ষ্যবস্ত করিতে লাগিল। দ্বারের ভিতর উপরে যাইবার সিঁড়ির পাশেও এরূপ আর একটি কুকুর বাঁধা ছিল। এই দুইটিই বিরাট কলেবর, নেকড়ে বাঘ ইহাদের কাছে কিছুই নয়। আমার ধারণা ছিল এইরূপ কুকুর অতি মূল্যবান, কিন্তু শুনিলাম দশ-পনের টাকায় এই জাতীয় কুকুরের বাচ্চার জোড়া কিনিতে পাওয়া যায়। ঘরের একটি ছেলে কুকুরের মুখ চাপিয়া ধরিলে আমরা উপরে গিয়া রক্ষনশালায় গদীতে বসিলাম। সন্তু ও চা আসিল। আমি কিছু ঘোলও পান করিলাম। গৃহস্থামী লদাখের খবরাখবর করিলেন। ঐ সময়ে গৃহস্থামীর মঙ্গলার্থে পূজাপাঠ করিতে কতকগুলি ভিক্ষুও আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও “লদাখী ভিক্ষু”র কুশল প্রশ্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা আমাদের আড্ডায় ফিরিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে আমার সঙ্গী কুকুর লইয়া ফিরিল। এই গৃহের কিছু উত্তরে একটি নদী, ওপারে চাষের উপযুক্ত অনেক জমী পড়িয়া আছে। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছু তফাতে একটি স্তূপ, সম্ভাব্যকালে বুদ্ধ গৃহস্থামী মালা ও মাণী হাতে তাহার পরিক্রমায় চলিলেন, সঙ্গীরাও গৃহান্তরে গেল, আমি একেলা ঘরে রহিলাম। সে সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টপটপ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। একেলা বসিয়া আমি ভাবিতে-ছিলাম, গ্যাঙ্কীও তো পার হইয়াছি, লাসা আর কয় দিনের পথ মাত্র; এই তো সেই পথ যাহার সম্বন্ধে নেপাল পর্যন্ত সব লোক ভয় দেখাইয়াছিল, এখনও

পর্যন্ত তো সেরূপ কিছু দেখি নাই, অল্প কয়দিন পরে দিল। বলা বাহুল্য তাহাকে দেখিয়াই আমার চিন্তা-
রহস্যময় লাস্যময় এইরূপে পৌছিয়া যাইব এবং তখন ধারার সূত্র ছিন্ন হইল, আমি তাড়াতাড়ি লাঠি-হাতে
বলিব যে মিথ্যাই লোকে এ-পথের সম্বন্ধে এত ভয় দেখায়। বসিয়া পড়িলাম। দূর হইতে কিছুক্ষণ চীৎকার করিয়া
ভয়ের সময় উত্তীর্ণ হইলে লোকে এইরূপই ভাবে, আমি সে চলিয়া গেল। খানিক রাত্রি হইলে, সন্ধ্যার দল বিলক্ষণ
যখন এইরূপে কল্লনারাজ্যে বিহার করিতেছি সেই সময় ছড় পান করিয়া ফিরিলে পরে, সকলে মিলিয়া তাঁবুর
সেই ছাড়া-কুকুরটি আমার সমীপবর্তী হইয়া গর্জন শুরু করিয়া ভিতর নিদ্রার ব্যবস্থা করিলাম। (ক্রমশঃ)

কুয়াশা

শ্রীশ্রীমলচন্দ্র ঘোষ

কুয়াশায় ঢাকা অঞ্চলখানি নীলনভোময় চন্দ্রাতপে—
হে উদাসিনী!

রহিয়া রহিয়া শিহরি ওঠে
তন্দ্রাবিহীন গ্রহতারাদল অসীম শূন্য মরুতে লোটে;
তোমার মর্শ্ব অনাহত সুরে বিরহের মহামন্ত্র জপে
তুমি কি গৌরী সন্ধ্যাসিনী?

ছায়া পড়ে তব সিঁধু বুকে—
ফুলিয়া ফুলিয়া উদ্মনা ঢেউ নাচে সেই ছায়া ধ্বনিত্য সুরে।

শুভ্রাংশুর পাংশু আঁখিতে হুঃসহ ব্যথা ঘনায়ে অঙ্গে
হে বিরহিণী!

বেহুলার মত বাসরঘরে—
হে ভীক বালিকা, আলুথালু কেশে কি খুঁজিছ দিক্দিগন্তরে?
দীর্ঘ নিশাস বহে ছহ করি আকাশ অশ্রুসাগরে ভালো;
তব ক্রন্দন হে মায়াবিনী,
ঘনায় বিপুল কুজাটিকা
বাহিরের জ্যোতি হরিয়া জালায় ভিতরে বিরহ বহ্নিশিখা।

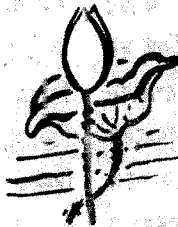
ঘন-তালীবন বেষ্টিত দূর নিবিড় স্বপ্ন কুয়াশা-দীপে
নির্ভাসিতা,

কারে আজ তুমি বেসেছ ভাল?
তোমার প্রণয় তুবার রাজ্য ভেদিয়া আসিছে মেকুর আলো;
কার স্রবণের তুলসীমঞ্চ আলোকিত আজ সন্ধ্যাদীপে
কোন শ্রীরামের স্বর্ণসীতা?

বলে যাও তব মর্শ্ববাণী
কার বিরহের অতল সাগরে শুস্তির মাঝে মুক্তারাগী!

কুয়াশায় ঢাকা ছল-ছল আঁখি প্রেমিকের বুকে ফুটিয়া উঠে,
হে উদাসিনী!

মৃত পুষ্পের মালা গাঁথি
এলোচুলে কেন জড়ায়েছ সখি, আসে নিত আজো প্রলয়-রাত্তি;
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে তোমার অসহ বাতনা গুঁঠ-পুটে
বঙ্কিতা ওগো সন্ধ্যাসিনী,
ধূমহীন তুমি বহ্নি-শিখা,
প্রেমের সাধনা জটিল করেছ ঢাকিয়া নিবিড় কুজাটিকা!





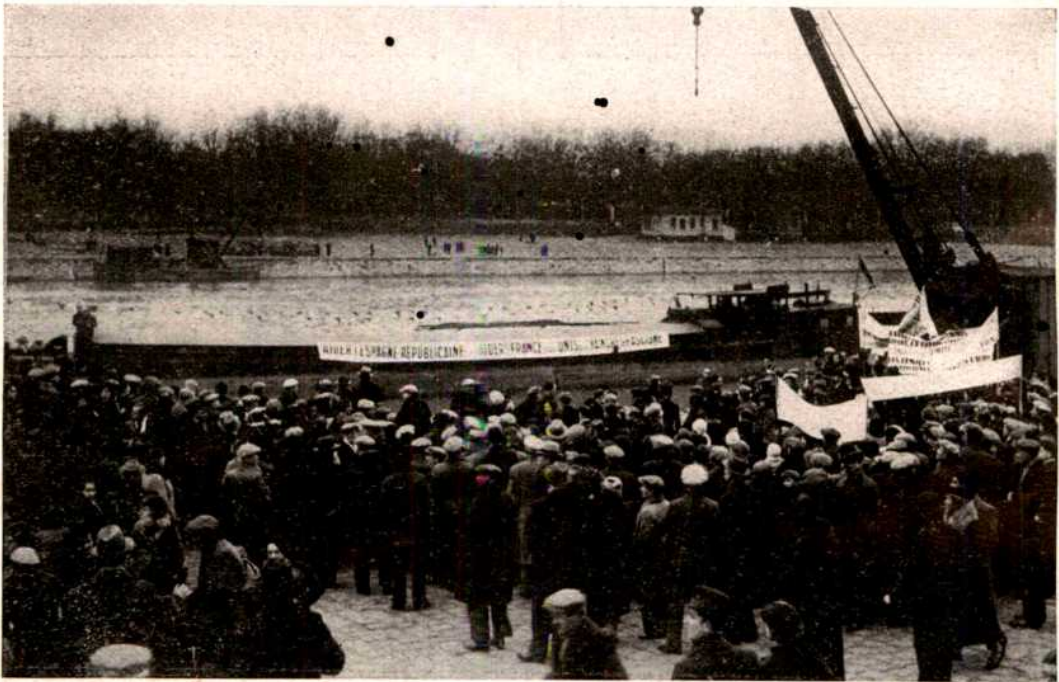
মিশরের রাজা ফারুক ভগ্নদ্বয়সহ দক্ষিণ-মিশরে ভ্রমণ করিতেছেন
মিনিয় শহরে জনতার জয়ধ্বনিতে স্বাগত রাজা ফারুক



ইংলণ্ডের ব্র্যাকবর্গে জিওফ্রে লয়েড কর্তৃক সরকারী গ্যাস-মুখোস কারখানার উদ্বোধন
মুখোস-নিৰ্মাণকাণ্ডে রত তরুণীগণ



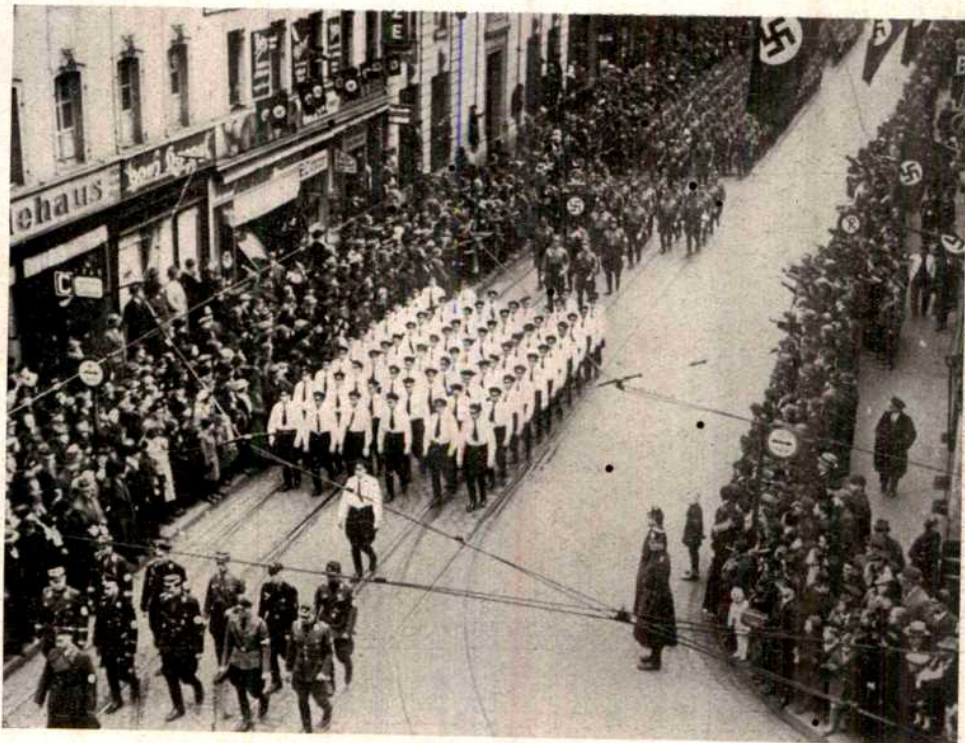
ইগ্যোপিয়ান বেদনা
আবিসিনিয়ার মুতাদেও-দগিত-পুত্র-শোকাতুর পিতা ইতালীহস্তে বন্দী রাস ইমর



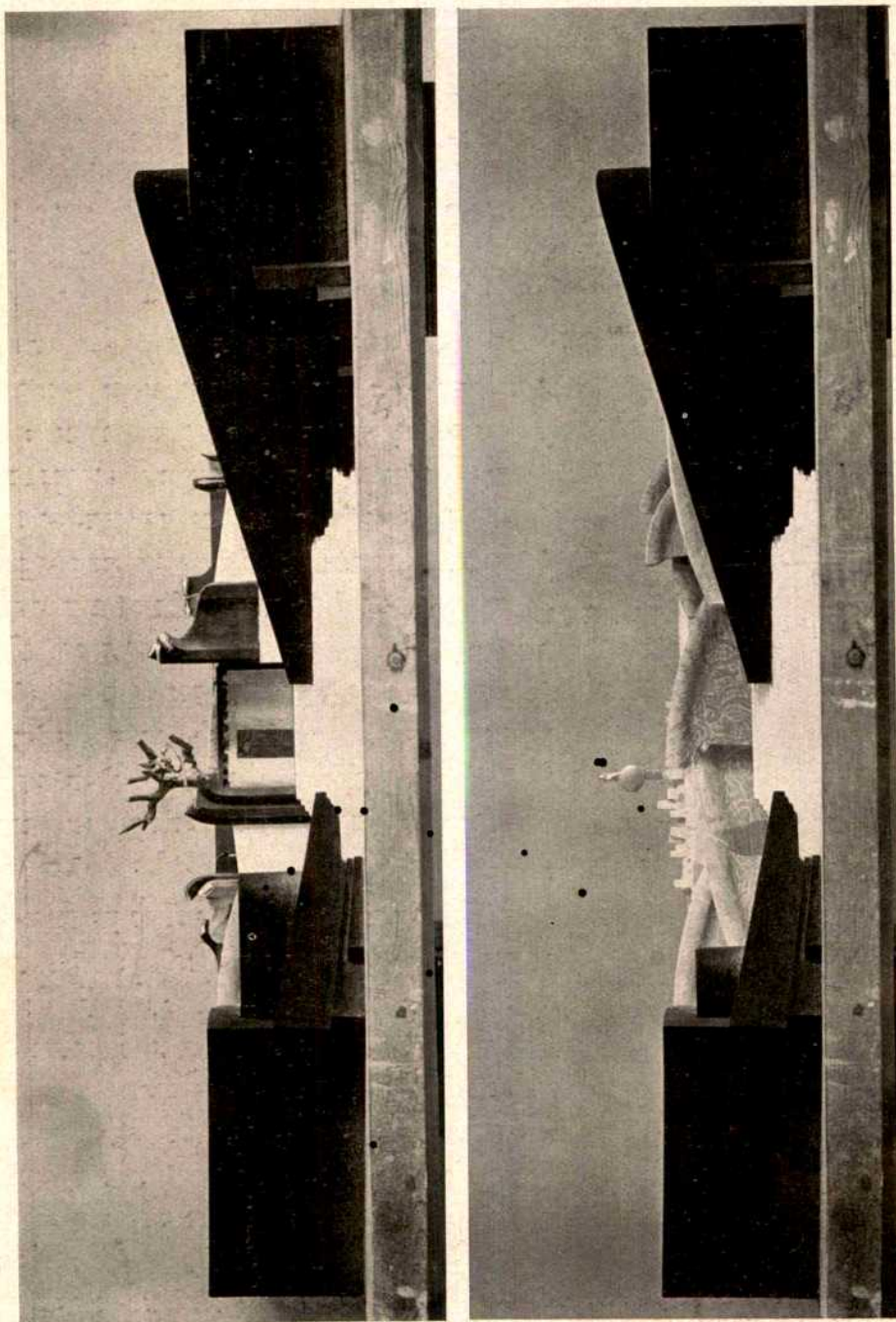
স্পেনীয় রিপাব্লিকান-সরকারের সাহায্যার্থে খাদ্য বস্ত্র ও অর্থ লইয়া প্যারিসের ঘাট হইতে
যাত্রার প্রাকালে জনগণ কর্তৃক অভিনন্দিত একখানি ফরাসী জাহাজ



জার্মানীর অলিম্পিক জীড়াক্ষেত্রে 'শী' বা 'স্কী' প্রতিযোগিতায় পাটেনবার্গের
জোসেফ কিম্পবের অপরূপ স্কী-দৌড় প্রদর্শন



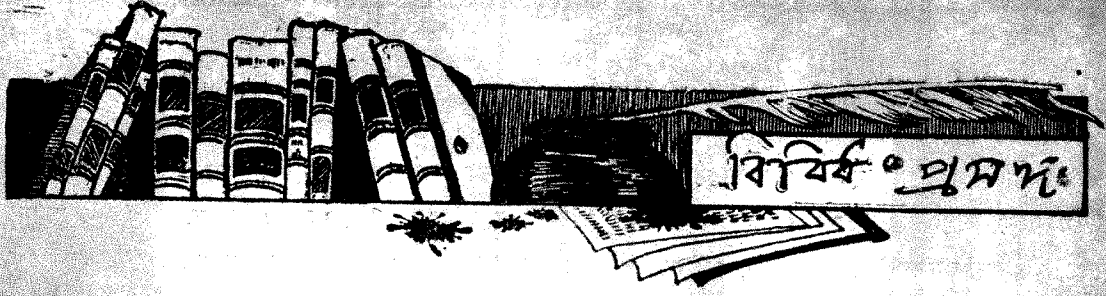
সারল্যান্ডের জার্মান রাষ্ট্রভুক্ত হাইবার প্রস্তাব সম্পর্কে জনমতগ্রহণের দ্বিতীয় বার্ষিক
উৎসবে সার-বাসী ও জার্মান সৈন্যদের শোভাযাত্রা



দুইভো কাথেলোত্তি বঙ্কক সিসিলির সাইরাকিউসের প্রাচীন গ্রীক নাট্যশালার জীর্ণ সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

উপরে : ইউরিপাইডিসের 'ইফোনিটো' নাটকের একটি দৃশ্য

নিম্নে : সফোক্লিসের 'ইডিপাস' নাটকের একটি দৃশ্য



রাষ্ট্রবন্দীদের সংখ্যা

১৯৩৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্ন করিয়া জানিতে চান, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এ-পর্যন্ত কোন্ প্রদেশে কত জন কত সময়ের জন্য কোন-না-কোন রেগুলেঞ্ছন অনুসারে (বিনা বিচারে) বন্দী ছিলেন বা এখনও আছেন। গবন্মেণ্টপক্ষ হইতে সম্মতি সর্ব হেনরী ক্রেক এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। উত্তরে যে-সকল সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যোগ দিয়া দেখিতেছি, যাহাদিগকে রাষ্ট্রবন্দী করা হইয়াছিল এবং যাহারা এখন আর বন্দী নাই, প্রদেশ অনুসারে তাহাদের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ।

পঞ্জাব	১৬,
মাদ্রাজ	১৬,
বঙ্গ	২১০,
বোম্বাই	২,
আজমের-মেরওয়ারা	২,
মধ্য-প্রদেশ	২,
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২০,
দিল্লী	২।

যাহারা এখনও বন্দী আছেন, তাহাদের সংখ্যা প্রদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত রূপ।

বঙ্গ	১৭,
পঞ্জাব	৭,
দিল্লী	৩,
ব্রহ্মদেশ	১,
মাদ্রাজ	১,
আজমের-মেরওয়ারা	১।

কাহাকে ঠিক কি কারণে রাষ্ট্রবন্দী (State prisoner) করা হইয়াছিল, তাহা জানা নাই। মোটামুটি যেরূপ

অহুমান লোকে করিয়া থাকে, তাহাতে মনে নানা প্রশ্নের আবির্ভাব হয়। যথা—বাঙালীরাই কি ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্দ্বন্দ্ব ও দুর্দান্ত জাতি? অথবা, বাঙালীরাই কি সর্বাপেক্ষা স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনতাকামী জাতি? কিংবা, বাঙালীরাই কি ইংরেজ-রাজত্ব বা ইংরেজ-প্রভুত্ব বিনাশের জন্য সকলের চেয়ে অধিক চেষ্টা করিয়াছে? ইত্যাদি। এরূপ প্রশ্ন যদি যুক্তিসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে আর কি প্রশ্ন করা যাইতে পারে যাহার উত্তরে বাঙালীদিগকে এত বেশী সংখ্যায় রাষ্ট্রবন্দী করিবার কারণ জানা যাইতে পারে?

“অন্তরীণ”দের সংখ্যা ও মুক্তির প্রশ্ন

বঙ্গে যে-সকল লোককে এ-পর্যন্ত বিনা বিচারে রাষ্ট্রবন্দী করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া, যত দূর জানা যায়, আনুমানিক আড়াই হাজার বাঙালী পুরুষ ও মহিলাকে বিনা-বিচারে “অন্তরীণ” করা হইয়াছে। তাহাদিগকে ঠিক কি কারণে “অন্তরীণ” করা হইয়াছে, গবন্মেণ্ট তাহা বলেন নাই। সাধারণতঃ সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, তাহারা সন্ত্রাসনপন্থী (অর্থাৎ “টেরারিষ্ট”)। যাহা হউক, ইহা ঠিক যে, তাহারা (অবৈধ উপায়ে) দেশের স্বাধীনতা চায়, এই সন্দেহে সরকার তাহাদিগকে বন্দী রাখিয়াছেন। তাহারা দেশের স্বাধীনতা চায়, এই অহুমান হয়ত ঠিক। অবৈধ উপায়ে, বিশেষতঃ সন্ত্রাসন দ্বারা, তাহারা দেশকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ সর্বসাধারণে অবগত নহে।

এতগুলি মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিবার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, রাষ্ট্রবন্দীদের সংখ্যা হইতে এবং “অন্তরীণ”দের সংখ্যা হইতে অহুমান হয়, যে, সরকার সন্দেহ করেন, সব প্রদেশের মধ্যে বঙ্গে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা

প্রবলতম এবং ব্রিটিশ মতে অবৈধ উপায়ে সেই মনোরথ পূর্ণ করিবার চেষ্টা বন্ধে অধিক হইয়াছে ও হইতেছে।

স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রিটিশ জাতি স্বাধীনতা পাইবার ইচ্ছার নিন্দা করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতীয়দিগকে, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতিকে, এই জাতির বলিয়া দেওয়া উচিত, স্বাধীনতা লাভের বৈধ উপায় কি, এবং সে উপায় যে অব্যর্থ তাহার প্রমাণও ইতিহাস হইতে দেখাইয়া দেওয়া উচিত।

ভারতীয়েরা ও বাঙালীরা “অস্তরীন”দের কোন অপরাধের প্রমাণ না পাওয়ায়, বার-বার হয় তাহাদের মুক্তি নয় তাহাদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার প্রার্থনা করিবার থাকে। সরকার-পক্ষ প্রকাশ্য আদালতে তাহাদের বিচার করিতে চান না। তাহাদের মুক্তি সম্বন্ধে বরাবর একই কথা বলিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতিও সর্ব হেনরী ক্রেক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহাই বলিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের উত্তরে সর্ব হেনরী বলেন, “সম্মানবাদ সম্বন্ধে পরিস্থিতির (“situation”) উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা সম্মানবাদ সম্পর্কে বন্দী আছে, এই উন্নতির জন্ত তাহাদের সকলকে মুক্তিদান সমর্থন করা যায় না, কারণ অতীত কালে এইরূপ মুক্তির পর আবার সম্মানপ্রচেষ্টার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল।”

এখানে সর্ব হেনরী ধরিয়া লইয়াছেন, যে, এই বন্দীরা সম্মানক; ইহাও ধরিয়া লইয়াছেন, যে, অতীতে এইরূপ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়াতেই সম্মান-প্রচেষ্টার পুনরাবির্ভাব হইয়াছিল, অত্বে কোন কারণ হয় নাই, হইতে পারেনা। অধিকন্তু তাহার কথার মধ্যে ইহাও উহা রহিয়াছে, যে, সম্মানপন্থার পুনরুজ্জীবন মুক্ত বন্দীরাই সাফল্য বা পরোক্ষ ভাবে করিয়াছিল। কিন্তু এতগুলি অনুমান কেবল সত্য বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে কোন প্রমাণ আমরা অবগত নহি। বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তি চাহিলে বা তাহাদের পীড়া ভাতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, এই প্রকার অনুমানের কলে সরকার-পক্ষ ভাবেন ও বলেন, যে, তদ্বারা সম্মানবাদের ও সম্মানপন্থীদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। বস্তুতঃ কিন্তু আমরা রক্তপাত ও নরহত্যার সমর্থক নহি। এবং

দু-দশ জন সরকারী কর্মচারীকে বধ করিয়া দেশকে স্বাধীন ও উন্নত করা যায়, ইহাও বিশ্বাস করি না।

যদি সম্মানপন্থীদের সক্রিয়তা বজায় থাকিত এবং সে অবস্থায় কেহ ব্যবস্থাপক সভায় “অস্তরীন”দের মুক্তি চাহিতেন, তাহা হইলে সরকারী জবাব এই হইত, যে, এখনও সম্মানকরা তাহাদের প্রচেষ্টা চালাইতেছে, অতএব এখন “অস্তরীন”দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। এখন সম্মানকদের অস্তিত্বের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, তাহারা সম্মান ছাড়িয়া দিয়া অস্ত্র কাজ করিতেছে। তাহাদের মত পরিবর্তন প্রযুক্তই হউক, শান্তির ভয়েই হউক, সম্মানক কার্য নিবারণে পুলিশের কৃতকার্যতার জন্তই হউক, লোকমত সম্মানকদের বিরুদ্ধ হওয়ার জন্তই হউক—যে কোন কারণ বা কারণ-সমবাহেই হউক, সম্মানপন্থা সম্বন্ধে দেশের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। এ অবস্থাতেও কিন্তু সরকার বলিতেছেন, “অস্তরীন”দিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, সম্মান যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে ত তাহাদিগকে খালাস দেওয়া যায়ই না; কিন্তু যদি তাহা চলিতে না-থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, কি অবস্থায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়? কোন অবস্থাতেই নহে?

এই “অস্তরীন”রা যে প্রত্যেকে, পৃথক পৃথক, বা সকলে, দলবদ্ধ সমষ্টিগত ভাবে সম্মানক কাজ করিয়াছিল বা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তাহা কোন আদালতে প্রমাণিত হয় নাই। অথচ তাহারা দণ্ড ভোগ করিতেছে এবং অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্ত দণ্ডভোগ করিতেছে। অত্বে দিকে, তাহাদিগকে যে প্রকার বেআইনী কাজ বা চেষ্টার সন্দেহে বন্দী রাখা হইয়াছে, সেই প্রকার চেষ্টা ও কাজের জন্ত আদালতের প্রকাশ্য বিচারে অনেকের নির্দিষ্ট কালের জন্ত কারাদণ্ড হইয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হয় নাই, তাহাদের শাস্তি অনির্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্ত, কিন্তু যাহাদের অপরাধ আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদের শাস্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত কারাদণ্ড। এই প্রকার ব্যবস্থাকে কি বিশেষণে বিশেষিত করা উচিত? সরকার-পক্ষ এই প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই বিশেষণটির উপযোগিতা বিবেচিত হইতে পারে।

“অন্তরীণ”দের ক্রমিক পৃথক্ মুক্তি

সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে, কৃষি বা শিল্প শিখাইয়া দিয়া জনা চল্লিশ “অন্তরীণ”কে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর জনা ষাটকে ঐ প্রকারে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী কোন কোন উক্তি এবং এই প্রকার কাজ হইতে অনুমান হয়, গবন্মেণ্ট ক্রমে ক্রমে কয়েক জন বন্দীকে প্রতি বৎসর ছাড়িয়া দিবেন। কৃষি ও শিল্প ভাল। কিন্তু অনেক যুবক অল্প কাজের উপযুক্ত, কৃষিকার্য্য ও শিল্পের কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। তাহারা কি খালাস পাইবে না?

এখন ঠিক কত জন এই রকম বন্দী আছে, জানি না। যেমন কতকগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, তেমনই আবার নূতন নূতন লোককেও বন্দী করা হইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা—ঠিক বলিতে পারি না। যাহা হউক, ব্যবস্থাপক সভায় আগেকার কোন কোন প্রস্তোত্তর হইতে মনে হয়, এখন বিনা-বিচারে বন্দীর সংখ্যা আড়াই হাজার হইতে পারে—দু-হাজারের কম নয়। যদি প্রতি বৎসর গড়ে পঞ্চাশ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহা হইলে সকলের মুক্তি পাইতে পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসর লাগিবে—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে তাহাদের স্থান পূরণের নিমিত্ত নূতন নূতন বন্দীর আমদানী না হয়। পঞ্চাশ বা চল্লিশ বৎসরের আগেই অনেকের ভবধাম হইতে মুক্তিলাভ ঘটিবে—রোগে বা স্বেচ্ছাবলম্বিত উপায়ে। প্রতি বৎসর গড়ে এক শত জনকে খালাস দিলেও সকলের মুক্তি পাইতে পঁচিশ বা কুড়ি বৎসর লাগিবে। এক জন লোককেও বিনা বিচারে পঞ্চাশ চল্লিশ পঁচিশ বা বিশ বৎসর, কিংবা এক বৎসরও, বন্দী করিয়া রাখা কি উচিত?

বিনা বিচারে বন্দীকরণের ফল

যে-সব ধবরের কাগজের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাষ্ট্রবন্দীদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন, বন্দীরা তাহাদের আত্মীয়স্বজন বলিয়া তাহা করেন না—অনেকেরই সহিত কোন বন্দীর দূর সম্পর্কও নাই। তাহারা আলোচনা করেন এই নীতির অনুসরণ করিয়া, যে, বিনা বিচারে কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা উচিত নয়। এবং ব্রিটিশ আইনের একটি ভিত্তিগত

নীতিও এই, যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ অপরাধী প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে নিরপরাধ বিবেচনা করিতে হইবে।

রাষ্ট্রবন্দীদের দুর্দশামোচনের চেষ্টার অল্প প্রধান কারণও আছে। তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিল। কিন্তু লোকমত এই, যে, তাহাদের অধিকাংশ কোন বেআইনী কাজ করে নাই এবং দেশভক্তি ও দেশের দুর্দশামোচনের ইচ্ছাই তাহাদের দুঃখভোগের কারণ। তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী পরার্থপর ব্যক্তি অনেকে আছেন। এতগুলি মানুষের সেবা হইতে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হওয়ায় দেশের ক্ষতি হইতেছে। অধিকন্তু, বিনা বিচারে বহু যুবক ও কতিপয় যুবতী বন্দী হওয়ায় বঙ্গের সমগ্র যুবসমাজের উপর অবসাদের নিরুৎসাহতার আশাহীনতার একটা গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের কারণ।

যুবক রাষ্ট্রবন্দীদের নমুনা

যুবক রাষ্ট্রবন্দীরা সবাই খুব বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী, এরূপ বলিবার মত কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে যে বেশ বুদ্ধিমান, তাহার প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়া যায়। যাইতেছে। প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বন্দী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অজুমতি দেন এবং অনেকে পাস করে—কেহ কেহ বেশ ভাল পাস করে। তাহারা শিক্ষকদের ও ভাল লাইব্রেরীর সাহায্য ব্যতিরেকেও এইরূপ কৃতিত্ব দেখায়।

গত ২৫শে মাঘ শান্তিনিকেতনে “বন্দী শঙ্ককোষ” নামক বৃহত্তম বাংলা অভিধানের প্রণেতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার গ্রন্থখানির গ্রাহক কিরূপ হইতেছে তাহার সংবাদ লইতেছিলাম। তিনি অল্প দুই একটি খবরের সঙ্গে আমাকে বলিলেন, একটি রাষ্ট্র-বন্দীও তাঁহার অভিধানের গ্রাহক হইয়াছেন। তাহাতে আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রীতও অবশ্যই হইয়াছিলাম। আমরা ত অনেকেই দিব্য আরামে নিজের নিজের বাড়ীতে থাকি, আয়ও নিজের নিজের আছে। অথচ এক জন নিঃস্বল পণ্ডিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে উপকৃত্তার করিতেছেন, দেশের সচ্ছল বা ধনী কয় জন লোক তাঁহার

সংযোগিতা করিতেছেন? অল্প দিকে এই একটি বুবক কারাগারে বন্দী থাকিয়া ও সরকারী সামান্য ভাতার উপর নির্ভর করিয়া “বন্দী শব্দকোষ” কিনিতেছেন! ইহার চিঠি দেখিলাম। ইহার নাম ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, বন্দী আছেন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বরেলী জেলে। মহাদেব সরকার নামক আর এক জন এইরূপ বন্দী হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের অভিধানখানির জন্য চিঠি লিখিয়াছেন। ইহাদের মাতৃভাষাভূরাগ প্রশংসনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের সাত্বৎসরিক অনুষ্ঠান বর্তমান বৎসরেও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কোন-কোনটি সম্বন্ধে সকলে একমত না-হইতে পারেন, কেহ কেহ আরও কিছু যোগ করিতে চাহিতে পারেন—আমরাও (বোধ হয় গত বৎসর) লিখিয়াছিলাম ইহার সহিত একটি প্রাক্তনছাত্রসম্মেলন সংযোজিত হওয়া আবশ্যিক—কিন্তু আংশিক মতভেদের জন্য অনুষ্ঠানটি বর্জনীয় হইতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্রেরই ইহা যোগদানের যোগ্য মনে করি।

বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রছাত্রীদের দলবদ্ধ পথ-চারিতার আনুষ্ঠানিক এই গানটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন।

“ও

“চলো যাই চলো যাই চলো যাই চলো যাই।”

চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,

চলো দুঃস্বপ্ন প্রাণের আনন্দে।

চলো মুক্তি-পথে, চলো বিদ্যাবিপদজয়ী মনোরথে,

করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন,

স্বপ্ন-কুহক করো ছিন্ন,

থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ, জড়তার জর্জরবন্ধে।

বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,

মুক্তির জয় বলো ভাই—

চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।

• চলো দুর্গম দূর পথ যাত্রী

চলো দিবা রাত্রি,

করো জয় যাত্রা, চলো বহি নির্ভয় বীর্ঘের বার্তা,

বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,

সত্যের জয় বলো ভাই,

যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।

দূর করো সংশয় শঙ্কার ভার

যাও চলি তিমির দিগন্তের পার,

চলো চলো জ্যোতির্ময় লোকে জাগ্রত চোখে,

বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়—

বলো নিখিল জ্যোতির জয় বল ভাই—

চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।

হও মৃত্যু তোরণ উত্তীর্ণ,

যাক্, যাক্ ভেঙে যাক্ বাহা জীর্ণ,

চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,

বলো জয়, বলো জয়, বলো জয়,

অমৃতের জয় বল ভাই—

চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।”

প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে শুধু এই গানটি থাকিলেও তাহা অনুপ্রেরণালাভের উপায় বিবেচিত হইতে পারিত। ইহাতে যে মুক্তিপথের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মানবজীবনের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তির পথ।

• প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে খবরের কাগজে কিছু সমালোচনা দেখিয়াছিলাম। দুই পক্ষের প্রতিবাদ বা সমালোচনার কথা মনে পড়িতেছে। বিভাসাগর কলেজের ছাত্রেরা কোন কোন বিষয়ে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রেরাও প্রতিবাদ জানাইয়াছিল। শেখোক্তাদের একটি প্রধান আপত্তি “বন্দেমাতরম্” গানটি অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে গীত হওয়া সম্বন্ধে। ইহার কোন কোন পংক্তির ‘আক্ষরিক’ (literal) অর্থ করিলে তাহা মূর্তিপূজাসূচক বলিয়া যাহারা মূর্তিপূজা করেন না তাঁহাদের অননুমোদিত হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ‘আক্ষরিক’ অর্থ সকলে করেন না। ব্রাহ্মেরা একেশ্বরবাদী এবং মূর্তিপূজা করেন না। রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছেন ঐরূপ ব্রাহ্ম নেতা ও আচার্য্যদিগকে বন্দেমাতরম্ গানে আপত্তি করিতে শুনি নাই। স্বর্গীয় ললিতমোহন দাস ও স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র আপত্তি করিতেন বলিয়া অবগত নহি।

ললিতমোহন দাস মহাশয় আমাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, তিনি “ঝহি দুর্গা” ইত্যাদি কথাগুলি রূপকভাবে, “মাতৃভূমিই দুর্গা”, এই অর্থে বুঝিতেন। তাঁহার ইহা বলিবার উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে, দুর্গাকে রূপকের যে প্রতীক মনে করা হয়, মাতৃভূমিই সেই প্রতীক। যাহা হউক, তিনি যাহাই বুঝিয়া থাকুন, ব্রাহ্ম রাষ্ট্রনৈতিক নেতারা “বন্দেমাতরম্” গানে আপত্তি করেন নাই আমাদের ইহা বলাই উদ্দেশ্য। “বন্দেমাতরম্” জয়ধ্বনিতেও তাঁহারা আপত্তি করেন নাই। তাঁহারা অবশ্য সংখ্যায় অতি কম একটি সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু আমাদের ইহাও মনে পড়িতেছে, যে, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় একাধিক প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতাও (এবং খ্রীষ্টিয়ান কোন কোন নেতাও) আপত্তি করেন নাই।

“বন্দেমাতরম্” গানটির “ঝহি দুর্গা” প্রভৃতি কথা সম্বন্ধে যাহাই হউক, প্রথম কয়েক পংক্তি সম্বন্ধে ধর্মমতমূলক কোন আপত্তি না-হওয়া উচিত। কবিতা ও গানের প্রত্যেকটি কথার ‘আক্ষরিক’ অর্থ করা সম্ভব নহে। কিন্তু ঐ সংগীতের কেবল প্রথম চারিটি পংক্তি গান করার বিরুদ্ধেও নাকি আপত্তি হইয়াছিল। “বন্দেমাতরম্” কথাছটিও নাকি পৌত্তলিকতাব্যাঞ্জক। আমরা এইরূপ পড়িয়াছিলাম—ইংরেজী অনুবাদে পড়িয়াছিলাম, হজরত মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন, “Paradise lies at the feet of the mother,” “স্বর্গ মাতার পদতলে”। তিনি ঠিক ইহা বলিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কারণ কোন মুসলমান শাস্ত্র আরবীতে পড়ি নাই। কিন্তু তিনি যদি ইহা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আলঙ্কারিক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

আপত্তিকারী মুসলমান ছাত্রদের আরও আপত্তি আছে শুনা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় ও সীল-মোহরের মাঝখানে যে পদ্মের ছবি ও “শ্রী” লেখা আছে, তাহাও আপত্তির কারণ বিবেচিত হইয়াছে। পদ্ম কোন কোন হিন্দু দেবদেবীর আসন ও আলয় বটে। কিন্তু যিনি আরাধ্যতম তাঁহার আসন হৃদয়কমলে, ভারতীয় সাহিত্যে এরূপ বাক্য আছে, এবং মানুষের মধ্যে যিনি বা যাহারা ভক্তিভাজন তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতেও এরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মুসলমানধর্ম-বিরুদ্ধ কি না, বলিতে পারি না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলেও

প্রাচীনকালাগত ভারতীয় সাহিত্যিক প্রয়োগ-তাহার প্রভাবে লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

“শ্রী” শব্দটির অর্থগুলি আপ্টে-প্রণীত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Wealth, riches, affluence, prosperity, plenty.
2. Royalty, majesty, royal wealth.
3. Dignity, high position, state.
4. Beauty, grace, splendour, lustre.
5. Colour, aspect.
6. The goddess of wealth; Lakshmi, the wife of Vishnu.
7. Any virtue or excellence.
8. Decoration.
9. Intellect, understanding.
10. Superhuman power.
11. The three objects of human existence taken collectively [namely, dharma, artha and kama].
12. The Sarala tree.
13. The Vilva tree.
14. Cloves.
15. A lotus.
16. The twelfth digit of the moon.
17. Name of Sarasvati.
18. Speech.
19. Fame, glory.
20. m. Name of one of the six Ragas or musical modes.

“শ্রী” শব্দের এই কুড়িটি অর্থের মধ্যে কেবল দুটি দুই হিন্দু দেবীর, লক্ষ্মীর ও সরস্বতীর, নাম। বাকী অর্থগুলির মধ্যে আছে ধনসম্পদ, অভ্যুদয়, প্রাচুর্য্য, রাজকীয় মহিমা, মান সম্বন্ধ, প্রতিষ্ঠা, উচ্চ পদ, সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, যে-কোন সঙ্গুণ, সজ্জা, বুদ্ধি, বোধ, অতিমানব শক্তি, দ্বিবর্ণ অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম, পদ্ম, বাণী, যশ। আপত্তিকারী মুসলমানেরা কি ইহার কিছুই চান না? যদি দুইটি অর্থে শ্রী শব্দ হিন্দু কোন দেবী বাচক বলিয়া শ্রীর ব্যবহার বর্জনীয় হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রাচীন বর্ণমালাই ত ত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার গোড়ার অক্ষর অ। ইহা বিষ্ণুর নাম; শিব, ব্রহ্মা, বায়ু ও বৈশ্বানরেরও নাম। আমাদের বর্ণ-মালার অনেক অক্ষর এইরূপ দেবতাবাচক। কিন্তু ভারতীয় ভাষা যাহারা ব্যবহার করে, তাহাদের ধর্ম-বিশ্বাস যাহাই হউক, তাহাদিগকে এই বর্ণমালা ব্যবহার করিতে হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় মুসলমানেরাও তাহা ব্যবহার করিতেছে। তাহা করায় তাহারা অমুসলমান হইয়া যায় নাই।

রাচিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

রাচিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্দশ অধি-বেশনের সাফল্যের জন্য যেমন পুরুষ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রশংসার, মহিলা কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবিকাগণও তদ্রূপ প্রশংসার পাত্রী। বস্তুতঃ তাঁহাদের অধিকতর প্রশংসাই



রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ-পরিবৃত কণ্ঠগণ

- ১। শ্রীযুক্ত ব্রজানন্দ সেন, ২। শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার চৌধুরী (সহকারী সম্পাদক), ৩। শ্রীযুক্ত লালমোহন ধর চৌধুরী (যুগ্ম-সম্পাদক), ৪। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র ঘোষ, ৫। শ্রীযুক্ত কালীশরণ মুখোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক), ৬। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত (সম্পাদক, আতিথ্য-বিভাগ), ৭। শ্রীযুক্ত কালীপদ চৌধুরী, ৮। শ্রীযুক্ত হেরথকুমার গুহ, ৯। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ সেন।

করা উচিত। সামাজিক প্রথার জগ্ন তঁাহাদের ঘরের বাহিরের কাজ করিবার সুযোগ, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা কম হওয়া সত্ত্বেও তঁাহারা সম্মেলনের তঁাহাদের অংশের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ইহা তঁাহাদিগকে অধিকতর প্রশংসাজনক করিয়াছিল। অধিকন্তু তঁাহারা মহিলা-বিভাগের অধিবেশন ব্যতীত অন্ত্র অধিবেশনগুলিকেও সঙ্গীতের দ্বারা আনন্দদায়ক ও অনুপ্রেরণাপূর্ণ করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর শোভাযাত্রা

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী নানা অঙ্গ সমৃদ্ধ হইয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কলিকাতার অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ কয়েক দিন আগেকার নানা ধর্মাবলম্বী লোকদের দীর্ঘ মিছিল।

এই শোভাযাত্রায় কোন্ কোন্ ধর্মের লোক যোগ দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানি না। হিন্দু ছাড়া শিখরাও যোগ দিয়াছিলেন, খবরের কাগজে দেখিয়াছি। তঁাহারাও



রাচিত অমুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ-পরিবৃত্তা মহিলা কঙ্গিগণ

১। শ্রীযুক্ত শান্তশীলা রায় (সম্পাদিকা মহিলা-বিভাগ) ২। শ্রীযুক্ত সুধাকণা দাসগুপ্ত (পরিচালিকা, স্বেচ্ছাসেবিকা-বিভাগ)

হিন্দুমহাসভার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা কেহ কেহ যোগ দিয়াছিলেন কিনা, অবগত নহি। যোগ দিয়া থাকিলে তাহা সন্তোষের বিষয়।

যিনি সকল ধর্মকে সত্য মনে করিতেন, তিনি সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিলেন, সেই শ্রদ্ধার প্রতি ও শ্রদ্ধাবানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ ও প্রদর্শন স্বাভাবিক।

এমন এক সময় ছিল যখন ধর্মবিশেষের লোকেরা অল্প সকল ধর্মকে মিথ্যা ও শয়তানের ছলনা বোধে অবজ্ঞা করিতেন। এখন তাঁহারাও অন্তর্গত ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য স্বীকার করেন—যদিও তাঁহারা নিজেদের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করেন। সকল প্রধান

প্রধান ধর্মের লোকেরা রামকৃষ্ণের মত অল্প সব প্রধান ধর্মকে সত্য মনে না করিলেও, যদি তাহাদের সবগুলিতে সত্য আছে মনে করেন এবং তাহা মনে করিয়া তৎপ্রতি আংশিক ভাবেও শ্রদ্ধাবান হন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক অবজ্ঞা হ্রাস কলহ কমিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেকেই এখনও অল্প ধর্মের লোকদিগের সমান পর্যায়ে পাশাপাশি দাঁড়াইতে চান না। রামকৃষ্ণের ঔদার্য এই সাম্প্রদায়িক আত্মাভিমান কিয়ৎপরিমাণেও কমাইয়া থাকিলে তাহা সন্তোষের বিষয়।

সরিষায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি বিদ্যালয়

কিছু দিন হইল কলিকাতা হইতে ২৬ মহিল দূরবর্তী



সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ছাত্রীদের ড়িল

সরিষা গ্রামে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বালকদের ও বালিকাদের দুটি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত হইবার সুযোগ হইয়াছিল। বিদ্যালয় দুটি ডায়মণ্ড হারবার রোডের অদূরে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত। স্থানটি গ্রামের নিকটে হওয়ায় অথচ গ্রামটির সহিত সংলগ্ন না-হওয়ায় বিদ্যালয়ের উপযোগী। এই বিদ্যালয় দুটিতে ছাত্র ও ছাত্রীদ্বিগকে সুস্থ সবল রাখিয়া সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নানা প্রকার খেলা ও ড়িল, বাইসিকল ব্যবহার, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রী ও ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল। কয়েকটি ছাত্রী এই অঞ্চলের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অনেক পুরস্কার পাইয়াছে। ছাত্রেরা গ্রামের উন্নতিসাধনের জন্ত অনেক কাজ করিয়া থাকে। যেমন, তাহারা গ্রামের প্রধান পথপ্রণালী খনন করিয়াছে।

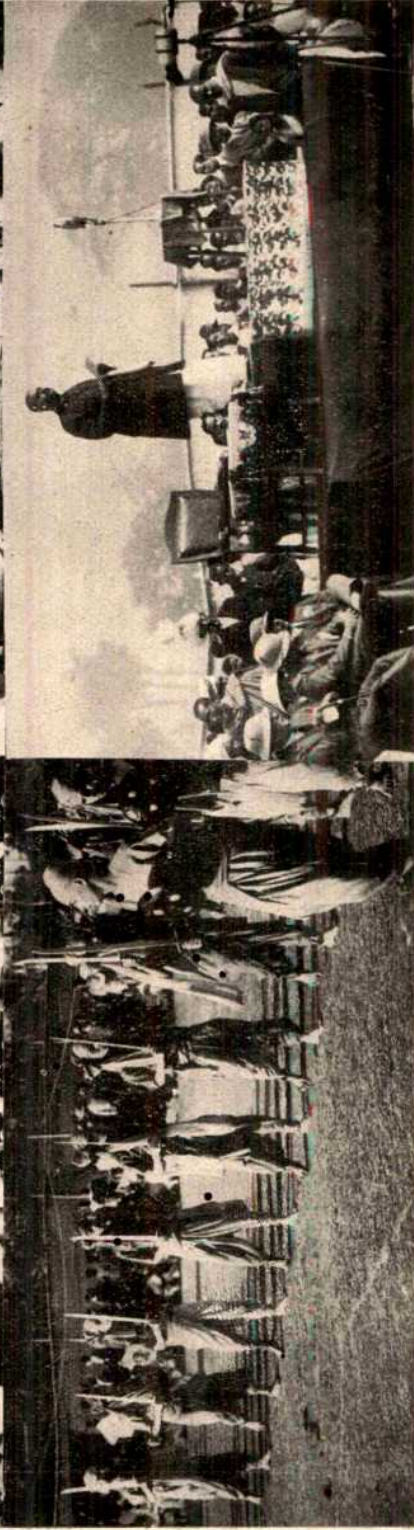
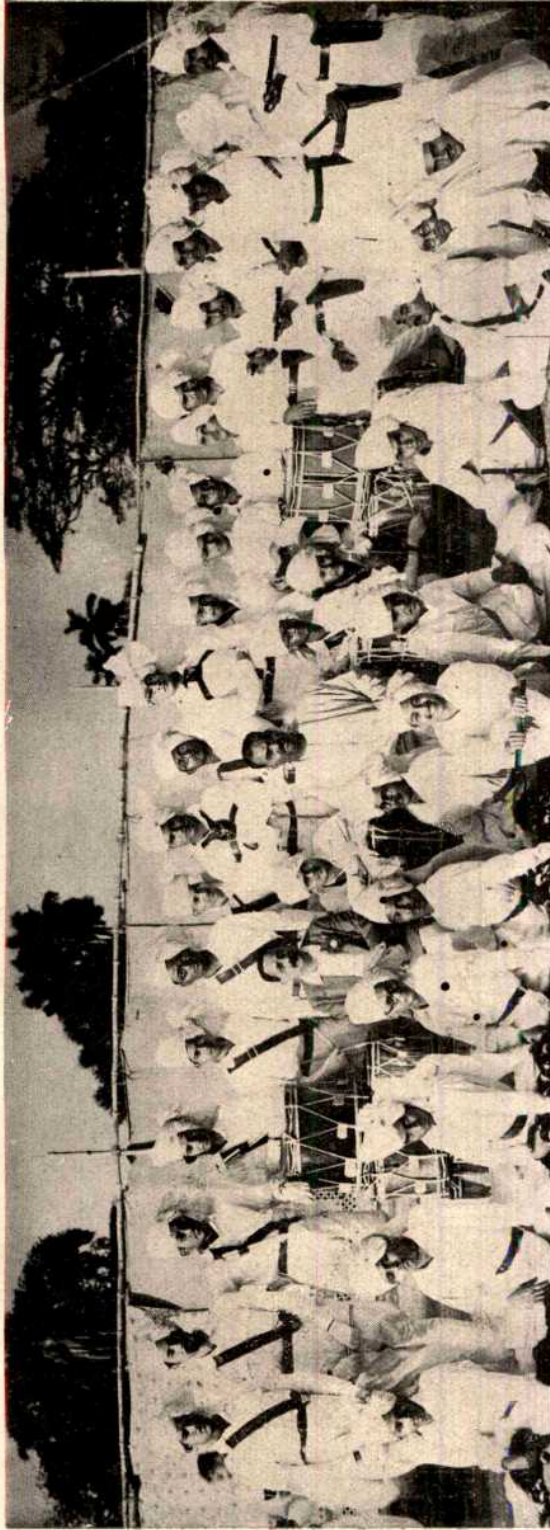
এই বিদ্যালয় দুটিতে অনেক দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষালাভের জন্ত আসে। অনেকে না-খাইয়াই আসে। তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। এই জন্ত ইহাতে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন কোন সন্ন্যাসী ও অন্ন আশ্রোয়স্থ শিক্ষকেরা কাজ করিলেও বায় মাসিক প্রায় দেড় হাজার টাকার কম হয় না। তাহা এককালীন দান ও মাসিক চান্দা হইতে সংগৃহীত হয়। বাঙালীরা কেহই কিছু দেন না,

এমন নয়। কিন্তু অবগত হইলাম বেশী দান মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া বণিকগণই করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের আত্ম-প্রসাদের কারণ, কিন্তু বাঙালীদের পক্ষে গৌরবজনক নহে।

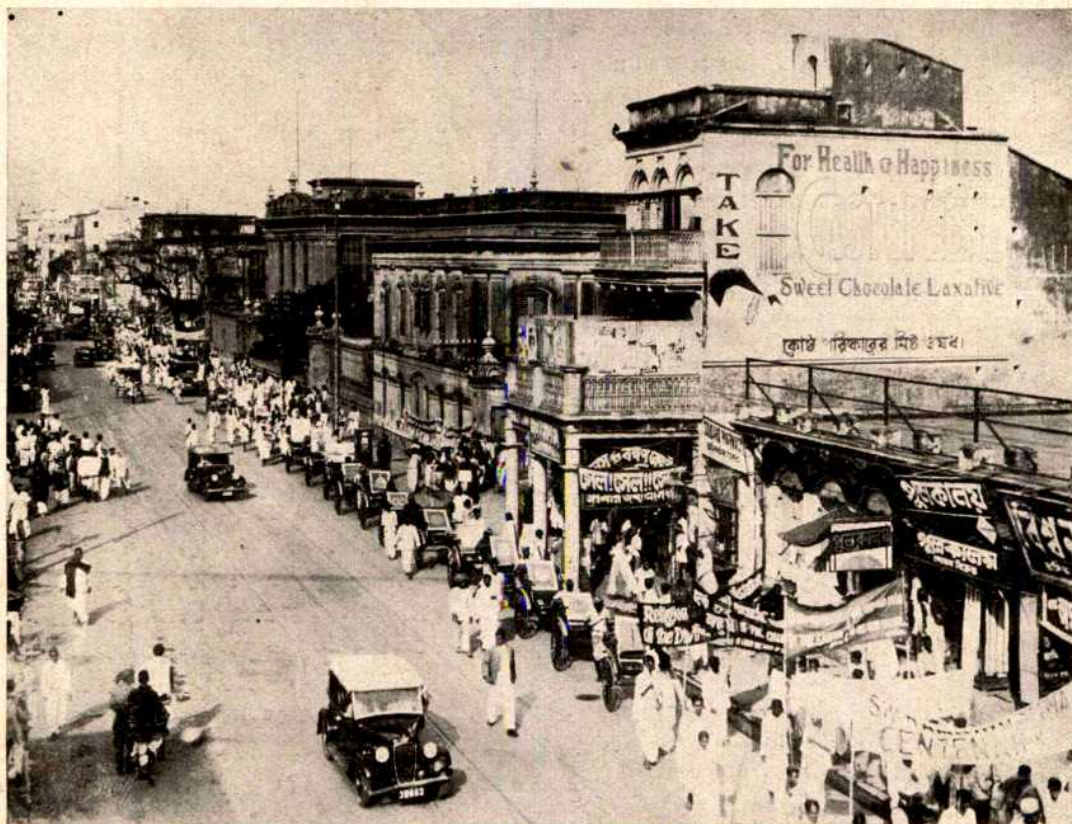
ইহার ভাণ্ডারটি যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাহাতে নানা খাদ্যোপকরণ যেরূপ সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হইয়াছে, তাহা অনেক গৃহস্থের অমুল্যবোধযোগ্য।

শ্রীনিকেতনের বার্ষিক মেলা

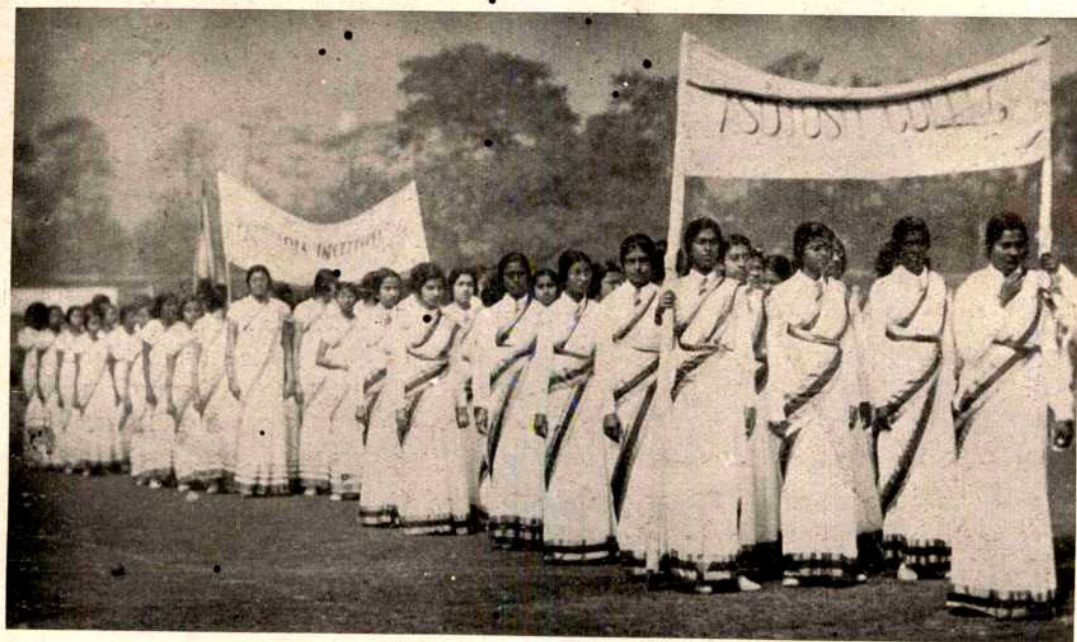
চৌদ্দ বৎসর পূর্বে স্বকলের শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত পল্লীসংগঠন-বিভাগ খুলেন। সেখানে কয়েক বৎসর হইতে মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে একটি মেলা হইতেছে। কৃষি ও শিল্পের প্রদর্শনী এই মেলার একটি অঙ্গ। ইহাতে শ্রীনিকেতনে উৎপন্ন এবং নিকটস্থ গ্রামসমূহে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রীত হয়। মেলার বাহিরের জায়গায় দেখিলাম সাঁওতালদের তৈরি বিস্তার চৌকাঠ ও কপাট বিক্রীর জন্ত রাখা হইয়াছে। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগ নানা চিকিৎসার সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নানা তথ্য ও নিয়ম বুঝাইয়া দেন। সরকারী কৃষি-বিভাগ ধান ও বহু শস্যের উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতেছেন। উৎকৃষ্ট পাট, শণ প্রভৃতি রাখিয়াছেন, ভাল আকের গুড় ও তাহার প্রস্তুতি প্রণালী দেখাইতেছেন। নানা



উপরে : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাণ্ড মাধো উপবিষ্ট ভাইস-চ্যান্সেলর ।
 নিম্নে : দক্ষিণে—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে ভাইস-চ্যান্সেলর—শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভিভাবণ পাঠ করিতেছেন ।
 বামে—প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে ছাত্রগণের পাইক-নৃত্য ।



রামকৃষ্ণ শতবর্ষিকী উৎসব—শোভাযাত্রার একাংশ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্রীদের মিছিল

রকমের লাঙ্গলও রাখা হইয়াছে। পল্লীবাসীদের আমোদ ও শিক্ষার নিমিত্ত যাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। নাগরদোলাও একটি খুব ঘুরিতেছে দেখিলাম। এখন অনেক দোকানী-পসারী স্বতঃপ্রসূত হইয়া এখানে দোকান খুলে। তাহা হইতে বুঝা যায় তাহারা ও তাহাদের ক্রোতা পল্লীবাসীরা মেলাটির সুবিধা ও হিতকারিতা বুঝিয়াছে।

পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য-ও অন্ন-সমস্যা

শ্রীলঙ্কাতনের বার্ষিক মেলায় সময় সেখানে বীরভূমের স্বাস্থ্যসমস্যা ও অন্নসমস্যার আলোচনা করিবার জন্য একটি কনফারেন্স হয়। তাহাতে স্থানীয় পল্লীবাসীরা ছাড়া বঙ্গের উচ্চপদস্থ কোন কোন সরকারী কর্মচারী এবং বেসরকারী কোন কোন কংগ্রেসকর্মী যোগ দিয়াছিলেন। এই কনফারেন্সে শ্রীলঙ্কাতন পল্লীসেবা-বিভাগের কর্মী শ্রীযুক্ত কালীমোহন বোষ তাঁহার একটি মুদ্রিত বক্তৃতা পাঠ করেন। তাহার অধিকাংশ আমরা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

চৌদ্দ বৎসর পূর্বে শ্রীলঙ্কাতনে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে এক দল কর্মী যখন সুরুল গ্রামস্থিত শ্রীলঙ্কাতনে পল্লী সংগঠনের কার্যে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। জঙ্গলকাণ্ড শ্রীলঙ্কাতন তখন ম্যালেরিয়ার প্রধান আড্ডা ছিল। শ্রীলঙ্কাতনের প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাহাবা এখানে বাস করিতেন তাঁহারা সকলেই ম্যালেরিয়ার জর্জরিত হইয়া এই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। গ্রামবাসীদের প্রীহাগ্রস্ত দেহ কৃষির জন্য উপযুক্ত শ্রম করিতে অক্ষম। তখন আমাদের হিষ্টেবী বন্ধু মিঃ এলমহাষ্টের উপদেশানুযায়ী একটি ক্ষুদ্র ডাক্তারখানা স্থাপিত হয় এবং কৃষিগণ পার্শ্ব গ্রামসমূহে নয়টি সমবায় পল্লীসংগঠন ও স্বাস্থ্যসমিতি গঠন করিয়া ম্যালেরিয়ার গতিরোধ কবিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই সময় এক জন অভিজ্ঞ ডাক্তার আনাইয়া এই সকল গ্রামের বর্ধিত প্রীহার তালিকা (spleen index) লওয়া হয়। তাহাতে দেখা যায় শতকরা ৮০ হইতে ৯৫ জন বালকের বর্ধিত প্রীহা আছে।

উক্ত সমিতির কার্য পরিচালনের জন্য পল্লীসমিতির প্রত্যেক সভাকে মাসিক ১০ চারি আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইত। বাহাদের কোন জায়গা জমি নাই, এবং বাহাদিগকে মজুবি খাটরা দিনান্তি-পাত করিতে হয় তাহাদিগকে মাসে একদিন করিয়া বিনা বেতনে সমিতির জন্য খাটিয়া দিতে হইত। সমিতির সভাগণ শ্রীলঙ্কাতন ডাক্তারখানা হইতে ১০ এক আনা মূল্যে এক শিশি ঔষধ এবং এক টাকা ফিতে ডাক্তার ডাকিতে পারিত; সমিতির ডাক্তারের উপদেশানুযায়ী গ্রামবাসিগণ নিম্নলিখিত উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা করিতে থাকেন :-

- (১) গ্রামে জ্বল কাটিয়া জল নিকাশনের ব্যবস্থা করা।
- (২) অনাবশ্যক ডোবা ভরাট করিয়া দেওয়া।
- (৩) পুকুরিণী পরিষ্কার রাখা।
- (৪) কোপ জঙ্গল কাটিয়া ফেলা।

(৫) ডিপ্টিস্ট বোর্ড এবং শ্রীলঙ্কাতনের সাহায্যে ম্যালেরিয়া স্বভূতে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া কুইনাইন খাওয়ান।

(৬) বর্ষাকালে ডোবা ও পুকুরিণীতে কেরোসিন দেওয়া।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামে রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য এই সবল সমিতি যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

এই সময় শ্রীলঙ্কাতনে যে-সকল মেডিকেল অফিসার (Medical officer) ছিলেন, তাঁহারা প্রাইভেট প্রাক্টিস (private practice) করিতে পারিতেন। সেজন্য সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহারা যথেষ্ট সময় দিতে পারিতেন না। সুতরাং প্রাইভেট প্রাক্টিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। গত ১৯২৭ সালে ত্রাত্তার জিৎসেন্দ্র চক্রবর্তী এম-বি, পল্লীসংগঠনের কার্যে যোগদান করেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল গ্রামের সমিতিগুলি নবজীবন লাভ করে। এই সময় সভাসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় এবং ডাক্তারের কাজও বাড়িয়া যায়। সমিতির সভ্যদিগের স্বেচ্ছাসেবিত্ব জন্য ডাক্তার চক্রবর্তীর উদ্যোগে একটি ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি (Clinical Laboratory) স্থাপিত হয়। অতঃপর ডাক্তার-ছারি টিমবাস (Dr. H. Timbres) নামক এক জন আমেরিকান ডাক্তার ম্যালেরিয়া সার্ভের জন্য শ্রীলঙ্কাতনে আগমন করেন ও স্ট্রেডী, বাহাদুরপুর, ইসলামপুর, লোহাগড় এই চারিটি গ্রামে পুষ্কায়পুষ্কায় ম্যাসেবিয়া-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেন। এই কয় বৎসরের চেষ্টাবলে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া নানাদিক হইতে ভারত সমিতি গঠন করিবার জন্য আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু এক জন ডাক্তারের পক্ষে অধিকসংখ্যক গ্রামের ভার লওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া কৃষিগণ কংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এই সময় তাঁহারা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার উপদেশের জন্য উপস্থিত হন। গ্রামের অধিবাসিগণ বাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে ভবিষ্যতে সম্ভব শক্তির দ্বারা আমাদের মুখোপেক্ষী না হইয়াও নিজেদের চেষ্টায় স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারে, তিনি এই উদ্দেশ্য সমুখে রাখিয়া সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করিতে আদেশ দেন। তাঁহার উপদেশ ও প্রেরণার বলে ১৯৩২ সালে বেহুড়ী, বলাভপু, গেরালপাড়া ও বাঁধগোড়ায় চারিটি ডাক্তারখানা স্থাপিত হয়। এই সকল গ্রামের অধিবাসিগণ বাহির হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে এই সকল ডাক্তারখানার মূলধন সংগ্রহ করে। এইগুলির পরিচালনার জন্য দুই জন অতিরিক্ত ডাক্তার (Sub-Assistant Surgeon) নিযুক্ত করা হয়। ডাক্তার চক্রবর্তী চীফ মেডিকেল অফিসার রূপে ইহাদের কার্য তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। এবং এই সকল স্বাস্থ্য-সমিতি পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত বিধান প্রবর্তন করা হয় :-

(১) চার পাঁচটি গ্রামের ২৫০ আড়াই শত পবিতার লইয়া এক একটি স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক পরিবারকে ১০ এক আনা করিয়া মাসিক ৩০০ তিন টাকা চারি আনা করিয়া বার্ষিক চাঁদ দিতে হইবে।

(৩) সভাগণ :- এক আনা মূল্য সাধারণ ঔষধ এক শিশি পাইবেন। বাহারা সভা নহেন তাহাদিগকে বাজাব দরে ঔষধের মূল্য দিতে হইবে।

(৪). সভাগণ ১০ চারি আনা মাত্র ভিকিট ডাক্তার ডাকিতে পারিবেন।

(৫) চিকিৎসালয়ে আপিয়া রোগ দেখাইলে ভিকিট লাগিবে না।

(৬) ভিকিটের আয় সমিতির ভহিলে জমা হইবে।

(৭) ডাক্তারের নিজের প্রাইভেট প্র্যাক্টিস থাকিবে না।

(৮) সমিতি নিজেদের পঞ্চায়ত নিজেরা নির্বাচন করিবে।

(৯) সমিতির অধীনস্থ গ্রামগুলির স্বাস্থ্যোন্নতিব জন্ত বার্ষিক কার্যসূচী প্রস্তুত করা হইবে, তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্ত ডাক্তার পঞ্চায়ত সভাকে উপদেশ দিবেন এবং তাহাদের কার্য-প্রণালী তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই অবস্থায় এক দিকে যেমন দরিদ্র পল্লীবাসী অতি সম্ভার সুরক্ষিতস্বরূপ সুরোগ লাভ করিল, অপর দিকে রোগের উৎপত্তির কারণগুলিকে দূর করিবার জন্ত প্রবল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

এই সময় বাঁধগোড়া সমিতির সভাগণ তাহাদিগের গ্রামকে ম্যালেরিয়ার প্রাঙ্গণ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের সং-দৃষ্টান্তে আকৃষ্ট হইয়া বোলপুন্ডের অধিবাসিগণ ১৯৩৪ সালে তাহাদিগের সঙ্গে যোগদান করেন। বোলপুন্ড-বাঁধগোড়া স্বাস্থ্য-সমিতি সর্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে সমর্থ হইয়াছে। ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ সরকার এল. এম্. এফ. এক জন কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে সমিতির কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

বাঁধগোড়া-সমিতির এক জন সভ্যের পরিবারের এক-বৎসরের চিকিৎসার ব্যয় হইয়াছে ২২৫০ বাইশ টাকা বারো আনা। গ্রামের সমিতি না থাকিলে বাজার দবে উক্ত চিকিৎসার ব্যয় হইত ১২৮১০ এক শত আটশ টাকা আট আনা। অতএব দেখা যায়, এই একটি পরিবারের এক বৎসরের চিকিৎসায় ১০৫৫০ এক শত পাঁচ টাকা বাবো আনা বাঁচিয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে সমিতির সাহায্যে সমগ্র গ্রামের চিকিৎসার ব্যয় এক বৎসরে ১৬৮৩৫০ বোল শত তিবানী টাকা বারো আনা বাঁচিয়াছে।

এই পর্যন্ত বাঁধগোড়া-সমিতি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্ত নতুন বাস্তব তৈয়ারী, বাস্তব মেরামত, নতুন স্কেন তৈয়ারী, ও মেবামত, ডোবা ভরাট, জল পরিষ্কার ও কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনমত প্রত্যেক বৎসরে দুই-তিন বার করিয়া ডোবা এবং পুকুরিগুলি পরিষ্কার করা হয় এবং ম্যালেরিয়া ক্ষতুতে নিয়মিত ভাবে কেরোসিন তৈল দেওয়া হয়।

গত অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ (Malaria specialist) ডাক্তার এস. এন. সুর মহোদয় যখন স্বাস্থ্য-সমিতি পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন বাঁধগোড়া গ্রামে কোনও বালকের বহুত প্রাণ পান নাই। ইহা যে তাহাদের সচেতনতার ফল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

১৯৩৩ সালে বিহুড়ী পল্লীসংগঠন কেন্দ্রে উক্ত পবিত্রনা অম্বারী আর একটি স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করা হয় এবং ডাক্তার সেবেন্দ্রনাথ মজুমদার এল. এম্. এফ. এক জন কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে সমিতির কার্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

ঐনিকতন হইতে প্রথম দুই বৎসর এই সমিতির ব্যয়ের অর্ধেক বহন করা হয়। গত বৎসর হইতে ঐনিকতনের কোন আর্থিক সাহায্য না লইয়া সমিতির সভাগণ ইহার ব্যবসায় ব্যয় বহন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বিষয়ে সমিতির সভাপতি এবং কপপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাণ্ডা এবং কপপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত অম্বুলচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়। অপরগর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ উক্ত প্রেসিডেন্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ইউনিয়নেই এইরূপ স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইতে পারে।

মন্ত্রী শ্রী বজ্রপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর এই দুইটি সমিতির সফলতা দর্শনে আনন্দিত হইয়া আবার পাঁচটি নতুন স্বাস্থ্য-সমিতি গঠনের জন্ত বিশ্বভারতী বহু ১১,০০০/- এগাব হাজার টাকা সাহায্য যন্ত্রণ করেন এবং এই অর্থের সাহায্যে ইলামবাজার বাহরী, আদিত্যপুর, লাহুলিয়া ও আদিত্যপুর পাঁচটি স্বাস্থ্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতিগুলির শৈশব অবস্থা এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। তন্মধ্যে অধিকাংশ সমিতির কার্যই আশীশ্রম বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এক বৎসর অতিবাহিত না হইলে উহার ফলাফল নির্দেশ করিতে পারিব না।

এই বৎসর এই জিলায় মশার উপদ্রব খুব কম, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে গত বৎসর অনাবৃষ্টি ফলে গ্রীষ্মকালে গ্রামে খুব অল্প জায়গাতেই জল ছিল, সেজন্য মশার উৎপত্তিস্থানের অভাব হওয়ায় উহাদের পর্যাপ্তরূপে বংশবৃদ্ধি সম্ভবপর হয় নাই। ম্যালেরিয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুর মনে করেন যে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন অধিকাংশ নাল ডোবা শুকাইয়া যায় তখন যদি গ্রামের ব্যবসায়ী পুকুরি ও ডোবা পবিত্র করিয়া নিয়মিতরূপে কেরোসিন প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সেই গ্রামে মশাকুল নিম্ন হইয়া যাইবে এবং বর্ষাকালে গ্রামের বহু স্থানে জল জমিলেও ডিম পাড়িবার জন্ত মশা আব থাকিবে না এবং তখন কেরোসিন দেওয়ারও কোন প্রয়োজন হইবে না। শীত ও গ্রীষ্মকালে গ্রামে অল্প জায়গায় জল থাকিবে বলিয়া কেরোসিন দেওয়ার ব্যয়ও কম হইবে। এই মতের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ত আমরা গোয়ালপাড়া গ্রামে পরীক্ষা করিতেছি। তথায় ৫৬টি পুকুর ও ডোবা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া সেগুলিতে সপ্তাহে এক দিন করিয়া কেরোসিন প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্ষাব পূর্ব পর্যন্ত এই কাজ চলিবে।

গত তিন বৎসর হইতে এই গোয়ালপাড়া গ্রামে স্বাস্থ্য-সমিতির কার্য শুরু করা হয় এবং ইতিমধ্যে তাহারা স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে বাস্তব মেরামত, স্কেন মেরামত, জল কাটা, ডোবা ভরাট, পুকুর পরিষ্কার, কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে। এই কার্যের ফলে উক্ত গ্রামে বহুত প্রাণ হার শতকরা ৬৭ হইতে কমিয়া শতকরা ৩৪ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বৎসর ম্যালেরিয়া ক্ষতুতে নিয়মিত ভাবে পুকুর পরিষ্কার করা ও কেরোসিন দেওয়া হয়।

যে-সকল গ্রামে এই বৎসর স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করিয়াছে সেই সকল গ্রামের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহার সহিত তুলনা করিয়া বৎসরান্তে আমরা

ফলাফল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রতিদিনই অল্পভব কবিত্তেছি যে পল্লীগ্রামে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি পালন সম্বন্ধে জ্ঞান অতি সামান্য। এই বিষয়ে তাহাদের চিত্তকে সচেতন কবিবাব জন্ত ম্যাজিক লঠন ইত্যাদির সাহায্যে বক্তৃতা ও আলোচনাব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গের বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার অবস্থা বীরভূমের সদৃশ। তথাকার বহু পল্লীগ্রামে শ্রীলঙ্কাতন-প্রবর্তিত স্বাস্থ্য-সমিতিসমূহের মত সমিতি স্থাপিত ও পরিচালিত হইলে তাহার দ্বারা দেশের হিত হইবে বলিয়া সমিতিগুলির কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিলাম।

কনফারেন্সটিতে বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে কতকগুলি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয়। জলসেচনের অনেক হাজার পুষ্করিণী বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় আছে (বা ছিল)। কিন্তু অধিকাংশ ড্রাট বা আধ-ড্রাট হইয়া ষাওয়ায় তদ্বারা জলসেচনের কাজ হয় না, অধিকন্তু সেগুলি মশার উৎপত্তির কারণ হইয়া পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যনাশ করে। এইগুলির পক্ষোদ্ধার একান্ত আবশ্যক। তাহার জন্ত অন্ততঃ আর্দ্রে টাকা গবর্নমেন্টের দেওয়া উচিত। তাহা গবর্নমেন্টের কর্তব্য। এবং তাহাতে গবর্নমেন্টের লাভ বই লোকসান হইবে না। এইরূপ ব্যয় করিলে যে-সব গ্রামের পুষ্করিণীর পক্ষোদ্ধার হইবে, তথাকার লোকদের চাষের আয় বাড়িবে ও স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তাহাতে সাফল্য ও পরোক্ষ ভাবে গবর্নমেন্টের আয় বাড়িবে।

ব্যবসায়ী সমিতি

ফরিদপুর জেলার ব্যবসায়ী সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে কয়েক দিন পূর্বে ফরিদপুর গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে এক বার ও অপরাহ্নে এক বার তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রাতঃকালের অধিবেশনে সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় একটি বহুতথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি, ফরিদপুর হইতে যত রকম জিনিষ রপ্তানী হয় বা হইতে পারে, এবং ফরিদপুরে যত রকম জিনিষ আমদানী হয়, তাহার প্রধান প্রধান দ্রব্য-গুলির উল্লেখ করেন; ফরিদপুরের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহের উল্লেখ করেন এবং লাভজনক আরও কি কি শস্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহা বলেন; এবং স্থলপথে ও জলপথে বাতায়াত ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রপ্তানীর সুবিধা-অসুবিধার কথা বলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্ত নানাবিধ সুবিধা-অসুবিধার কথাও তাহার অভিভাষণে ছিল।

অপরাহ্নের অধিবেশনে সমিতির নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহার মধ্যে কয়েকটিতে রেল ও ষ্টীমারের কর্তৃপক্ষ এবং গবর্নমেন্টকে ব্যবসায়ীদের অনেক অসুবিধার কথা

জানান হইয়াছে। এইগুলি শীঘ্র দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধীয় অসুবিধা ও অভিযোগটির প্রতিকার না হইলে শুধু ধোঁয়াবাসীদের অসুবিধা তাহা নহে, যে-সকল ক্রেতা না-জানিয়া ভেজাল দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ভেজাল দ্রব্যের রাসায়নিক পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি ও তাহার আলোচনা হইতে জানিলাম, যে, ভেজাল জিনিষের পরীক্ষার ফল জানিতে পাঁচ ছয় মাস বিলম্ব হয়, তত দিনে দোকান হইতে তাহা সমস্তই বিক্রী হইয়া যাইবে এবং তাহার ব্যবহারে সাধারণের যে স্বাস্থ্যহানি হইবার তাহা হইয়া যায়। তখন ভেজাল-দ্রব্যবিক্রেতা দোকানদারের শাস্তি হইলেও ক্রেতাদের স্বাস্থ্যহানি বাহা হইয়া যায় তাহার কোন প্রতিকার হয় না।

অভিযোগটিব আলোচনায় ইহাও শুনিলাম, যে, ভেজাল দ্রব্য বাহারা উৎপাদন করে—যেমন ভেজাল সরিষার তেল উৎপাদক কলওয়াল, শাস্তি তাহাদের হয় না; কিন্তু মকদ্দমের যে আমদানীকারী খুচরা বিক্রেতা তাহা আমদানী কবির বিক্রী করে, শাস্তি তাহার হয়, কারণ ভেজাল দ্রব্যের নমুন তাহার দোকান হইতে গৃহীত।

ফরিদপুরে যেক্ষণ ব্যবসায়ী সমিতি আছে, তেমন সমিতি আর কোন্ কোন্ জেলায় আছে জানি না। কিন্তু সকল জেলাতেই এই প্রকার সমিতি থাকা উচিত, এবং সকলগুলির সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ত ও প্রয়োজন-মত পরামর্শের জন্ত কলিকাতায় কেন্দ্রীয় সমিতিও একটি থাকা আবশ্যক। বেঙ্গল ক্রাশট্রাল চেম্বারের উদ্দেশ্য যদি এইরূপ হয় এবং তাহার দ্বারা যদি এইরূপ কাজ হয়, ও ভালই। নতুবা অন্ত একটী কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার চেম্বার অব কমার্সে বাঙালীও সভ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে অবাঙালীরা সখ্যাও প্রাপ্ত হইবে না। মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্সে মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদেরই স্বার্থ দেখা হয়। সুতরাং বাঙালী ব্যবসাদারদের স্বার্থরক্ষার জন্ত বিশেষ করিয়া বাঙালীদিগের ব্যবসায়ী সমিতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ফরিদপুর ব্যবসায়ী সমিতি কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যবসাদারের সমিতি নহে। এই জন্ত এই প্রকার সমিতির দ্বারা সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ফরিদপুর ব্যবসায়ী সমিতির কার্যবিবরণ, প্রস্তাবাবলী এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের অভিভাষণটি মুদ্রিত হইয়া সকল জেলার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচারিত হইলে ফল ভাল হইবে মনে করি।

অধ্যাপকের মহৎ দান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। আবার এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। তাহার আইনানুযায়ী কাগজপত্র প্রস্তুত হইতেছে। অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ধনী লোক নহেন, তিনিও ধনী নহেন। তিনি সজ্জীক অতিশয় সাদাসিধা ভাবে থাকিয়া অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও কলেজ-পরিদর্শক রূপে বাহা পাইয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই এই প্রকারে দান করিয়াছেন।

ধন্ত তিনি ও তাঁহার সহধর্মিণী।

ফজলুল হকের জয়

খাজা নাজিমুদ্দিনকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যনির্বাচন ঘন্থে পরাজিত করিয়া মিঃ ফজলুল হক যে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহার রাজনৈতিক অর্থ ব্যাখ্যা অনেক কাগজে করা হইয়াছে। আমরা ইহার অল্প একটা দিকের উল্লেখ করিতেছি। খাজা নাজিমুদ্দিন পুরুষাত্মকমে বাঙালী ও বাংলার নিমক খান, কিন্তু বাংলা বলেন না—বলেন উর্দু। মিঃ ফজলুল হক বাংলাভাবী বাঙালী। বঙ্গে বাংলাভাবী বাঙালীর কাছে উর্দুভাবী বাঙালীর পরাজয় ঠিকই হইয়াছে।

সম্পত্তিতে হিন্দু-বিধবাদের অধিকার

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সম্পত্তিতে বিধবাদের ও অল্প নারীদের যে অধিকার আছে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট কর্তৃক পণ্ডিতী ব্যাখ্যা গ্রহণের ফলে সেই অধিকার হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইহা দেখাইয়াছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্ততম সভ্য ডাঃ দেশমুখের চেষ্টায় যে নতুন আইন প্রণীত হইল, তাহাতে হিন্দু বিধবাদের অধিকার কতকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। আইনসচিব সর্ব নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, আইনটি স্বাভাবিক অধিকার প্রদত্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই, কিন্তু কতকটা হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, আমরা স্বল্প অস্ত্রের দাস হওয়ার ফলে নারীদিগকে আমাদের দাসের মত করিয়াছি। বস্তুতঃ সর্ব নৃপেন্দ্রনাথ অহঙ্কল থাকতেই ডাঃ দেশমুখের বিলটি পাস হইতে পারিয়াছে। এই জন্ত, ডাঃ দেশমুখের মত তিনিও কৃতজ্ঞতার পাত্র ও ধন্তবাদভাজন।

ইংলণ্ডেশ্বরের অভিব্যেক-উৎসব

ইংলণ্ডে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিব্যেক-উৎসব হইবে, কিন্তু আগামী শীতকালে তাঁহার ভারতে অভিব্যেক-উৎসব উপলক্ষ্যে যে তাঁহার এদেশে আসিবার কথা ছিল, তাহা তিনি আসিতে পারিবেন না—তখন তিনি বেন্দীদিন ইংলণ্ড হইতে অল্পপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। ইউরোপের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইহা বিচিত্র নহে।

যে আর্টই কেক্সারী ঐ সংবাদ ভারতবর্ষে আসে সেই আর্টই কেক্সারী পালেমেন্টে প্রস্তাব হয়, যে, ভারতে অভিব্যেক-উৎসব 'বয়কট' করিতে অল্পরোধ করিয়া কংগ্রেস একটি প্রস্তাব ধাৰ্য্য করিয়াছে; অতএব ভারতসচিব কি তাহা বিবেচনা করিয়া রাজাকে তত্ত্বরূপ পরামর্শ দিবেন। উত্তরে সহকারী ভারতসচিব বলেন, রাজা ভারতে গেলে ভারতীয়েরা খুব রাজভক্তির সহিত অভ্যর্থনা করিবে ইহা নিশ্চিত; সুতরাং ভারতসচিব কংগ্রেস-প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া কোন পরামর্শ দিবেন না (অর্থাৎ রাজাকে ভারতবর্ষে না যাইতে পরামর্শ দিবেন না)। এদিকে কিন্তু, যাহার পরামর্শই হউক, রাজা ঐ প্রস্তোত্তরের পূর্বেই বা তৎসমকালেই আপাততঃ ভারতবর্ষে না-আগাই ঠিক করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন।

ইহাকে কাকতালীয় স্থায় বলিব, না আর কিছু?

রামমোহন রায় সম্বন্ধে সত্যনির্ণয়

রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক গুজব ও নিন্দা প্রচারিত হইয়াছে। সেগুলি সত্য কি মিথ্যা নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক ছিল। রামমোহন রায়ের প্রতি ঐহারা প্রত্যাশা, তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারিত নিন্দা বিশ্বাস করেন না। তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই অবিশ্বাস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যথেষ্ট নহে। অবিশ্বাস প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। আগে যে-সকল তথ্য জানা ছিল এ-পর্যন্ত তাহার সাহায্যেই নিন্দাগুলির অমূলকত্ব প্রমাণিত হইতেছিল। তাহার পর গত কয়েক মাস হইতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের অল্পসঙ্কানে কলিকাতায় ও বর্ধমানে সরকারী রেকর্ড আকিসসমূহে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তজ্জন্ত ইহারা ধন্তবাদার্থী। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এই সব নীবস দলিল অনেক পরিশ্রম করিয়া দৈর্ঘ্যসহকারে অধ্যয়নপূর্বক কতকগুলি প্রবন্ধ লেখায় সত্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত সাহায্য হইয়াছে। তাহার জন্ত তিনি সত্যজিজ্ঞাসু সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে যোকদ্দমা

করিয়া তাঁহাকে যে-প্রকারে উপাধিত করা হইয়াছিল, তাহা বহুপরিমাণে জানা গিয়াছে। তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে মোকদ্দমাঙ্গলে জড়িত করিয়া পিতা ও পুত্রকে বহু বৎসর ধরিয়া বৈরুপ নির্ধাতন করা হইয়াছিল, তাহা যতীন্দ্রবাবু ও রমাপ্রসাদবাবু অহুসঙ্কান করিয়া বাহির করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধেও রমাপ্রসাদবাবু কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিবেন। এইগুলি হইতেও রামমোহন রায়ের জীবনকৃতান্তে আলোকপাত হইবে। সমুদয় মূল দলিল পুস্তকাকারে বাহির করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা

বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও পাঠ্যতালিকা নির্ধারণের নিমিত্ত গত বৎসর একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের ধর্ম কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার ভারও এই কমিটির উপর ছিল। এই কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র রিপোর্টটির আলোচনা এখানে করা সম্ভবপর নহে। কেবল ধর্মশিক্ষাবিধি সম্বন্ধে কিছু বলিব। বলিয়া রাখা ভাল, ধর্মশিক্ষার বিবোধী আমরা নহি।

যে-সকল বিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে, তাহাতে তাহাদের পৃথক পৃথক ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থার আমরা প্রথম হইতেই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। জাপানে ধর্মসম্প্রদায়সমূহের সংখ্যা ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক কম। তাহা সত্ত্বেও জাপানী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ধর্মশিক্ষা নিষিদ্ধ। কমিটির অন্ত্যতম সভ্য অধ্যাপক অনাখনাথ বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষাদান বিষয়ে অন্য সভ্য সকলের মতের ও রিপোর্টের সহিত অনেক জানাইবার নিমিত্ত একটি পৃথক মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন ও তাহা রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। তাহা শিক্ষাবুরাগী সকলের পড়া উচিত।

আমরা পুনর্বার বলিতেছি, একই বিদ্যালয়ে নানা ধর্ম নানা ধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষাইবার চেষ্টায় শৈশব হইতেই তাহাদের ভেদবোধ জাগ্রত করা হইবে, মানবিক ঐক্যবোধ জন্মান হইবে না। ইহা হিতকর নহে, অমঙ্গলজনক।

মুসলমান বালক-বালিকাদিগের ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কেননা, তাহাদের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য; তন্নিমিত্ত আবার শিক্ষণীয় বিষয়গুলির তালিকায় যে-সকল আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার কেবল দু-একটির অর্থ জানি, অন্যগুলির জানি না।

হিন্দু ধর্মশিক্ষাবিধির আলোচনায় আমবা, হিন্দুধর্মে কি শ্রেষ্ঠ কি অশ্রেষ্ঠ, এরূপ কোন বিচার করিব না। প্রচলিত হিন্দু মত যাহা তাহাই শিক্ষাইতে হইবে, ইহা ধরিয়া লইয়া আলোচনা করিতে হইবে। তাহাও বিস্তারিত ভাবে এখন করিতে পারিব না।

হিন্দুধর্মশিক্ষাবিধিতে যাহা যাহা শিক্ষাইতে বলা হইয়াছে, তাহার অনেক অংশ এবং অনেক বাক্য ও শ্লোক বালক-বালিকাদিগকে পরিচ্ছাব করিয়া বুঝাইতে পারা যাইবে কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।

ধর্মের স্বরূপ বুঝাইতে বলা হইয়াছে। তাহা খুব সহজ নহে।

ধর্মকে ইংরেজীতে religion and morality বলিয়া কমিটি ঠিক করিয়াছেন। শিশুদের শিক্ষায় ধর্মের বিশেষ বিশেষ মত অপেক্ষা সুনীতি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া শ্রেয়ঃ। নিরাকার উপাসনা হিন্দুধর্মসম্মত বলিয়া কমিটি যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সম্ভাব্যের বিপরীত; কেননা, সাধারণতঃ শিক্ষিত হিন্দুরাও সাকার উপাসনাকেই হিন্দুধর্মসম্মত মনে করেন। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আবার নিরাকার উপাসনা অসম্ভব বলিয়াছেন।

“God has appeared to devotees in many forms,” “ঈশ্বর ভক্তদের নিকট নানা মূর্তিতে আবিভূত হইয়াছেন,” এই উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু ইহার পর যে বলা হইয়াছে, যে, “The hymns selected should have no exclusive reference to any particular form or aspect of the Deity,” “[মুখ্য কবিতা প্রার্থনার সময়ে আবৃত্তি নিমিত্ত] যে-সকল স্তোত্র নির্বাচিত হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের কেবল বিশেষ কোন মূর্তিরই উল্লেখ যেন না থাকে,” তাহা বলায় প্রথমোক্ত উক্তিটির গুরুত্ব কমান হইয়াছে। কারণ, যদি ঈশ্বর নানা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন মূর্তিরই উল্লেখ অবৈধ নহে। অবশ্য আমরা নিজে এরূপ স্তোত্রেরই পক্ষপাতী যাহাতে কোন মূর্তির উল্লেখ নাই।

আদর্শ পুরুষ ও নারী চরিত্র বুঝাইবার নিমিত্ত পৌরাণিক বহু আখ্যানিকার ব্যবহার করিতে বলিয়া কমিটি ঠিক করিয়াছেন।

জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তির্জান-ম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

যস্য স্ববীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিম্নোক্তোহস্মি তথা কয়ামি।

এই বচনটির প্রকৃত অর্থ বালক-বালিকাদের বোধগম্য হইবে কি? বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়ের ইহার প্রকৃত অর্থ জানান কি? সাংসারিক লোকেনা ইহার দ্বিতীয় পংক্তিটির এইরূপ (উল্টা) মানে করিয়া থাকে, যে, “আমরা মন্দ যাহা করি, তাহাও ভগবান করান, সুতরাং তাহাতে

আমাদের কোন দোষ বা পাপ হয় না ;” অথচ ইহার প্রকৃত অর্থ, হৃদিস্থিত ভগবান বাহ্য করিতে চলিবেন, তাহাই করিব। এই সব সামসারিক লোকদের মত বালক-বালিকাদের কুবুদ্ধিবিচলিত হইবার আশঙ্কা নাই কি ?

একটি বচনে বলা হইয়াছে, বেদ, স্মৃতি, সনাতন, নিম্ন আশ্রয় অল্পমোদন—এই চারিটি ধর্মের লক্ষণ। কিন্তু প্রাচ্য কাহার ? কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে, যে, বেদ-সকল বিভিন্ন, স্মৃতিসকল বিভিন্ন, এবং ঋগ্বেদ মত ভিন্ন নহে তিনি যিনি নহেন। ইহাও উক্ত হইয়াছে, যে, কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিচার করা কর্তব্য নহে। গীতাতে “বেদ-বাদরত” লোকদের নিন্দা করা হইয়াছে।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ব্যাখ্যা করিয়া শিখাইতে বলা হইয়াছে। এই প্রকার দার্শনিক মত শিক্ষা বালক-বালিকাদের উপযোগী কি না তদ্বিশেষে আমাদের সন্দেহ আছে।

হিন্দুশাস্ত্র বহু ও বিস্তীর্ণ, হিন্দুধর্ম খুব ব্যাপক। উভয়ে অনেক পরস্পরবিরোধী জিনিষ আছে। সমুদয়ের সামঞ্জস্য করিয়া কিছু নির্দেশ দিতে গেলে তাহা অল্প বয়সের মানুষদের উপযোগী হয় না। অথচ বালক-বালিকাদিগকে ধর্ম যদি শিখাইতে হয়, তাহা হইলে তাহা জটিলতাবর্জিত ও সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যিক।

খ্রীষ্টিয়ান বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রটেস্ট্যান্টদের জন্য এক প্রকার ও রোমান ক্যাথলিক বালক-বালিকাদের নিমিত্ত অন্য এক প্রকার ব্যবস্থা কথা হইয়াছে। কোনটিরই বিস্তারিত আলোচনা করিব না—রোমান ক্যাথলিক পদ্ধতিটিতে বিস্তারিত কিছু লিখিত না থাকায় তাহার আলোচনা করা সম্ভবপরও নহে। প্রটেস্ট্যান্ট পদ্ধতিটিতে এদেন, উদ্যানের (Garden of Eden-এর) কাহিনীটি শিখাইতে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যে, আদম ও হাবা যে দৈত্যের অবাধ্য হইয়াছিলেন, সেই অবাধ্যতার কাহিনী এবং পৃথিবীতে পাপের প্রবেশের কাহিনী বাদ দিতে হইবে। এগুলি কি বিশ্বাসেব অযোগ্য বলিয়া বাদ দেওয়া হইবে, না অনিষ্টকর বলিয়া বাদ দেওয়া হইবে ?

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ছাড়া অন্য ধর্মের বালক-বালিকারা ধর্মশিক্ষার কটায় কি করিবে ?

শ্রীনিকেতনে গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়

সরকারী গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়সকলে পাঠশালায় গুরু হইবার উপযোগী শিক্ষা দিবার কথা। অর্থাৎ পাঠশালা-সকলে যে-সব বিষয় শিক্ষা দিতে হয়, সেগুলি সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান জন্মাইবার ও শিক্ষাপ্রণালী শিখাইবার কথা। এই কাজ বিদ্যালয়গুলি কিয়ৎপরিমাণে করিয়া

থাকে। কিন্তু যে-শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদিগকে শিখান হয়, তাহা সেকলে গোছের—আধুনিকতম শিক্ষাবিজ্ঞানের সহিত তাহার সম্পর্ক কম। অধিকন্তু, যে-গ্রামসমূহে গুরুমহাশয়দিগকে শিক্ষা দিতে ও জীবনযাপন করিতে হইবে, তাহার নানাবিধ সমস্যা সহিত তাঁহাদিগকে পরিচিত করিবার ও তৎসমুদয়ের সমাধানকল্পে কিছু করিতে শিখাইবার কোন চেষ্টা এই সব বিদ্যালয়ে হয় না। মোটামুটি এইরূপ কারণে, গবর্নমেন্ট বিশ্বভারতীর পরিচালনাব্যবস্থায় একটি গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় শ্রীনিকেতনে স্থাপন করা মঞ্জুর করিয়াছেন। গবর্নমেন্টের এই সিদ্ধান্তের কলে সেখানে শিক্ষার্থী গুরুরা শিশুমনস্তত্ত্বের ও শিশুশিক্ষার আধুনিকতম তত্ত্বের ও প্রণালীর সহিত পরিচিত বিশ্ব-ভারতীর কতিপয় অধ্যাপকের সাহায্য পাইবেন ও গ্রাম্য সমস্যাসমূহের সমাধানরীতিও শিখিবেন।

বিদ্যালয়টির কাজ গত ২রা জ্যৈষ্ঠারী আরম্ভ হইয়াছে। শান্তিনিকেতন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেনের উপর ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছে।

স্বইডেনে হাতের কাজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ইউরোপের বহু দেশের হাতের কাজ শিক্ষার প্রণালীর সহিত পরিচিত খ্রীষ্টান লক্ষ্মীধর সিংহ নানা প্রকার হাতের কাজ ও কোন কোন কুটিরশিল্প শিখাইবেন।

মেদিনীপুরে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর জয়

গবর্নমেন্টের দমননীতি ও কংগ্রেসবিরোধী নীতি মেদিনীপুর অপেক্ষা অন্য কোন জেলায় কঠোরতর রূপে প্রযুক্ত হয় নাই। এ হেন জেলায় গবর্নমেন্টের প্রিয়পাত্র প্রার্থীকে ৬৫০০০ ভোটে পরাজিত করিয়া কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ নির্বাচিত হওয়াতে বুঝা গেল এত করিয়াও সরকার মেদিনীপুরকে কংগ্রেসবিরোধী করিতে পারিলেন না। অথবা হয়ত ইহা বলাই ঠিক যে, গবর্নমেন্ট এত করিয়াছেন, বলিয়াই মেদিনীপুর বেশী করিয়া বেহাত হইয়া গেল।

ইংলণ্ডেশ্বরের ভ্রাতারা কি রাজবন্দী ?

সিহাসনভাগী ভূতপূর্ব রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড এখন উইগসবের ডিউক বলিয়া পরিচিত। তাহার এক ভাইয়ের তাহার সহিত ইউরোপে তাহার বর্তমান বাসস্থানে দেখা করিবার কথা উঠে। ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন। রাজভ্রাতারা কি রাজবন্দী ? না, তাহারা সরকারী ভাতা পান বলিয়া মন্ত্রীদের আদেশ শুনিতে বাধ্য ? এরূপ কোন সন্দেহ আছে কি যে, উইগসবের ডিউক তাহাদের সহিত কোন যত্ন করিতে পারেন ?

আচার্য্য উইন্টারনিটজ্

কোকোভাক্সিয়ার রাজধানী প্রাগের জার্মান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক ডক্টর মরিস্ উইন্টারনিটজ্‌র মৃত্যুতে পাশ্চাত্য মহাদেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের তিরোধান হইল। তিনি কেবল বিদ্যাবস্তার দ্রুত বিখ্যাত ছিলেন না, মানুষ হিসাবেও খুব বড় ছিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রাগে তাঁহার বাড়ীতে ও প্রাগের অন্ততম পৌরজন-রূপে ঘেঁরুপ দেখিয়াছিলাম, কলিকাতায় ঘেঁরুপ দেখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িতেছে। প্রাগে রবীন্দ্রনাথের ও আমাদের কয়েক জনের চিঠিপত্র তাঁহার ঠিকানায় আসিত। তিনি ডাকপিঙ্গনদের মত একটি ব্যাগে করিয়া সেন্সলি হোটেলের আমাঙ্গিকে দিয়া যাইতেন। প্রাগে আমি অল্পই হইয়া পড়ি। তথাকার প্রসিদ্ধতম ডাক্তার আমাকে ব্রাঙ্কো ক্রানেলের পাঞ্জামা ও জামা ব্যবহার না করিয়া সাধারণ হুতী পবিচ্ছন্ন ব্যবহার করিতে বলেন। ইউরোপে সেরূপ কিছু স্বরকার হইবে না মনে করিয়া হুতী সব জামা পাঞ্জামা আমি পূর্বেই আমার একটি আমেরিকা-প্রত্যাগত ভারতবর্ষাজ্ঞী প্রাক্তন বাঙালী ছাত্রের মারফৎ জেনিভা হইতে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমার হুতী জামা পাঞ্জামা কিছু নাই, অধ্যাপক উইন্টারনিটজ্‌ তাঁহাব কনিষ্ঠ পুত্রের প্রমুখ্যৎ স্তনিধা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সজীক আমাদের হোটেলের আসিয়া আমার অন্ত জামা পাঞ্জামা দোকানে লইয়া গিয়া সেই মাপের হুতী জিনিষ আমার দ্রুত কিনিয়া আনিয়া দিলেন। এই সামান্য ঘটনাটি বর্ণনা করিলাম, এই জগৎবিখ্যাত ও আমা অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয়ের সহৃদয়তার ক্ষুদ্র একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। প্রাগের জার্মান থিয়েটারে যখন রবীন্দ্রনাথের “ডাকঘর” জার্মান ভাষায় অভিনীত হয়, তাহার পূর্বে অধ্যাপক মহাশয় আমাকে বলেন, “আমি আপনারদের দেশের ও জাতির সহিত পরিচিত বলিয়া, অভিনয় বাহার্য্য করিবে তাহাদিগকে আমি শিখাইয়াছি; অভিনয় কেমন হয় আমাকে বলিবেন।” অভিনয়ের পর তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম, যে, ভালই হইয়াছে।

তিনি নিজে অসাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোছের মানুষ ছিলেন। তাঁহার সাধী গৃহিণী শুছাইয়া সংসার চলাইতেন ও তাঁহাকেও চলাইতেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাহাতে তিনি বড় আশ্রিত পান বলিলে যথেষ্ট বলা হইবে না, তাঁহার জীবনপথের সজিনী হারাইয়া অনেকটা অসহায় হন।

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক মহাশয়কে তাঁহার অন্ততম বন্ধুরূপে এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপক রূপে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তাঁহার ভগিনীকে কবি সমবেদনা জানাইয়া যে চিঠি

লিখিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক মহাশয় সম্বন্ধে লিখিত প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য :—

The news was indeed painful for us, who were used to looking upon him as one of our truest and most respected friends outside India. During my long life and extensive travels, I never met a savant more worthy of respect than the learned doctor. His deep and broad humanity, co-extensive with his amazingly wide scholarship, his devotion to truth and the courage with which he held fast to his idealism in the midst of a growingly hostile atmosphere in Central Europe, are his claims to our homage. In him I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friends, and humanity one of its most sincere champions.

অধ্যাপক মহাশয় মর্ডান রিভিউ মাসিক পত্রে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এখন কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা মনে পড়িতেছে। অধ্যাপক মহাশয়ের সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ক্ষিত্তিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধটি চৈত্রের প্রবাসীতে ছাপিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমান সংখ্যাতেই উহা অধিকতর সময়োচিত হইবে মনে করিয়া এখানেই দিতেছি।

উইন্টারনিটজ্

এমন অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাহাদের জীবন বাহিরের ঘটনা দিয়া সম্পূর্ণ জানা যায় না। অধ্যাপক উইন্টারনিটজ্‌ (Winternitz) ছিলেন এইরূপ মানুষ। ভারতের প্রতি এমন ষাট ও গভীর অনুরাগ ও সঙ্গ সঙ্গে ভারতীয় পাশ্বে ও বিদ্যায় এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থোঁা যায় না।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অষ্ট্রিয়ার নিম্ন প্রদেশে তাঁহার জন্ম। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বোল কি সত্তর বৎসর বয়সে তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দর্শনশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞানই ছিল তাঁহার মুখ্য সাধনার বিষয়। তাহার পর বৎসরে, অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, অধ্যাপক বুনরের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটিল। তখন হইতে তিনি বৃত্তব্দের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ২২ বৎসর বয়সে, তিনি ডক্টর উপাধি লাভ করিলেন। জ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম উপহার হইল আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র। এই গ্রন্থখানি সম্পাদনে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

এই সময় অধ্যাপক ম্যাকমুল্লেনের বিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবার প্রয়োজন হয়। তাই তিনি এক জন যোগ্য সহকারী খুঁজিতেছিলেন। আপস্তম্বীয় গৃহসূত্রে গ্রন্থখানির সম্পাদনপ্রণালী দেখিয়া তিনি খুবক উইন্টারনিটজ্‌কেই তাঁহার সহকারীরূপে মনোনীত করিলেন।

তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। এই বয়সেই তিনি বৈষ্ণব নিপুণ পাণ্ডিত্যের সহিত ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণটি বাহির করিলেন, তাহাতে এই গ্রন্থখানিই তাঁহার তপস্বী ও সাধনার অমর কীর্তিস্তম্ভ হইয়া রহিল।

এই উপলক্ষ্যে তিনি অক্রেকট প্রতিভা বহু প্রবীণ আচার্য্যগণের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। কতকটা তাঁহার নৃত্যের প্রতি অমুরাগবশত তাঁহার দৃষ্টি পড়িল বৈদিক-যুগের উদ্বাহকাদের দিকে। তাঁহার রচনা এই বিষয়ে বহু পরিমাণে আলোকপাত করিল। তাঁহার সম্পাদিত আপস্তম্ব মন্ত্রপাঠও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাধনার সাক্ষী।

ইহার পর তিনি যে-কাজে হাত দিলেন তাহা একান্ত নীরস ও একঘেয়ে হইলেও তাহার দ্বারা তাঁহার অমুরাগ ও সাধনা একটি কঠিন প্রতিষ্ঠাত্বমি ও বাখ্যাত্ব লাভ করিল। তিনি বিখ্যাত বঙ্গলিয়ান গ্রন্থালয়ের বৈদিক পুঁথির সূচী রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গ্রেটব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের পুস্তকালয়স্থিত দক্ষিণ-ভারতীয় পুঁথির তালিকা প্রণয়ন করেন। এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি মহাভারতের মহিমা উপলব্ধি করেন এবং এই মহাগ্রন্থের একখানি সুসম্পাদিত সংস্করণের প্রয়োজন বোধিতে পারেন। নৃত্যের প্রতি তাঁহার অমুরাগও কতক পরিমাণে ইহার হেতু হইতে পারে। এই নৃত্যামুরাগই তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Position of Women in Brahmanic Literature-এর (“ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে নারীর সামাজিক অবস্থা”) মূল কারণ। মহাবান বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তাঁহার যে গভীর জ্ঞান ছিল তাহারও পারিচয় দিয়াছেন তিনি বহু গ্রন্থে এবং রচনায়।

তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ তিনি আপন হস্তেই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা তাঁহার তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ History of Indian Literature (“ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের ইতিহাস”)। এই গ্রন্থখানা প্রথমে বাহির হয় জার্মান ভাষায়, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে।

ইহার পরে তিনি আসেন ভারতে। এদেশে তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিধ বক্তৃতা দেন। তাহার মধ্যে মুখ্য হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত Six Reader-ship Lectures।

জ্ঞানক্ষেত্রের বিখ্যাত দুইখানি জর্ণালও তাঁহার প্রেরণায় চালিত হইত। জীবনে ছোট বড় গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রায় চারি শতখানি তাঁহার রচনা। মোট কথা, আপন স্বতিস্তম্ভ রচনার ভার তিনি পরহস্তে রাখিয়া যান নাই।

এই পর্যন্ত তাঁহার যে জীবন তাহা তাঁহার গ্রন্থাদি দেখিয়াই জানা যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে তাঁহার আসল মাহাত্ম্যটি আমরা ধরিতে পারিলাম না। তাহার স্বকীয়

পাইলাম বিশ্বভারতীয় সাধনা-ক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ে।

বিশ্বভারতীয় প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার ছিল অপরিমেয় শ্রদ্ধা।* কবিবরের নিমন্ত্রণে তিনি আসিলেন ভারতে। বিশ্বভারতীতে পৌছিবার পূর্বে পথে তিনি কলকাতা কাটাইয়া আসিলেন পুনায়। সেখানে বিখ্যাত ডাক্তারকর ইনস্টিটিউটে তিনি দেখাইয়া দেন কেমন করিয়া ভারতের সর্বপ্রদেশের পুঁথি মিলাইয়া স্থবিচারসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থ সম্পাদন করিতে হয়। তাঁহার প্রদর্শিত এই প্রণালীতেই ব্রহ্মা যায় তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচারশক্তি ও গভীর শাস্ত্রজ্ঞান।

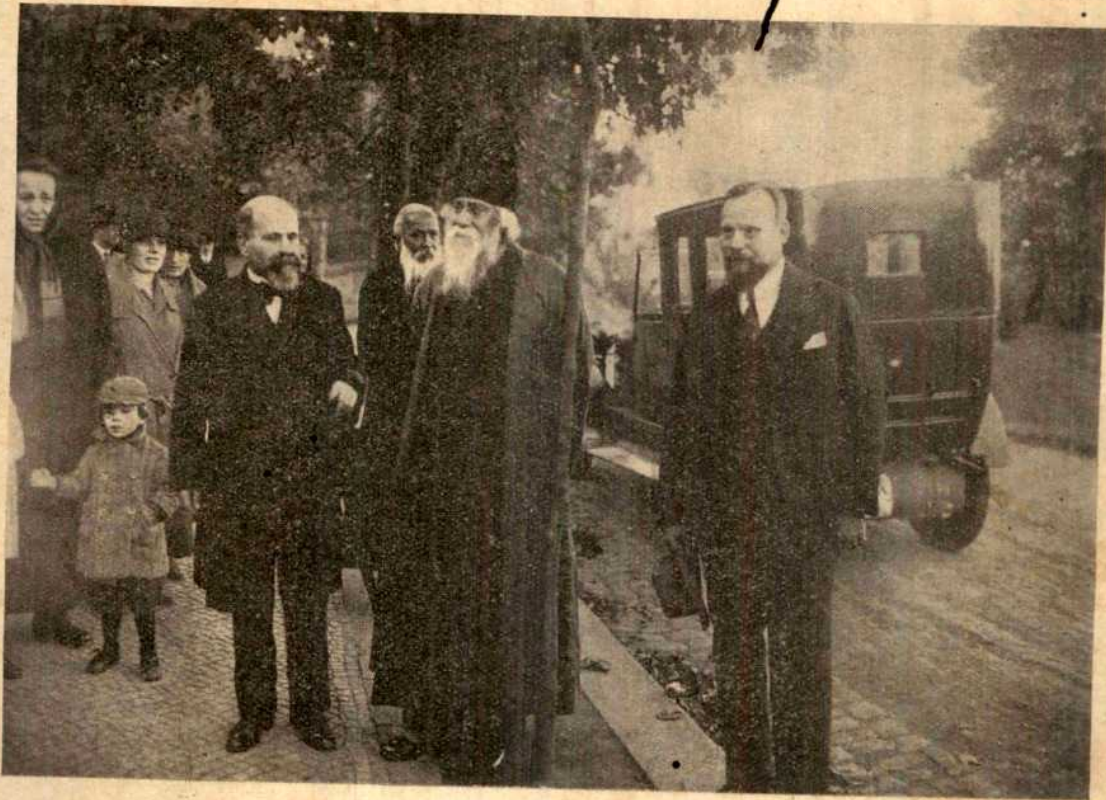
যদিও তাঁহার জ্ঞান ছিল অতি বিস্তৃত ও অতুলনীয় তবু তাহা কোন প্রকারেই নির্জীব ও অচল প্রকৃতির ছিল না। এই দেশের জীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া তাঁহার মনোবা বহু দিকে নব আলোক লাভ করিল। সেই সব সম্পদে পূর্ণ হইয়া তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ভাগটি তাঁহার স্বরচিত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থখানি মূল জার্মান ভাষা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত করিতে-ছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইল তাহার প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডখানা সম্পূর্ণ হইল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় খণ্ডখানার কাজ চলিতেছে এমন সময় তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। আমরা সবাই তাঁহার তৃতীয় খণ্ডখানির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলাম। তাই তিনি একটু সুস্থ হইয়াই জানাইলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল হইতেছে, শীঘ্রই তিনি কাজে হাত দিতে পারিবেন।

আমরা তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম। তাঁহার তৃতীয় খণ্ডখানিতে ভারতের অনেক রহস্যপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে আলোকপাত করিবার কথা। এই ইংরেজী অমুরাগ ত অমুরাগ মাত্র নহে, ইহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি তাঁহার পরিণত জীবনসঞ্চিত তাবৎ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্য চালিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য, এই অমূল্য গ্রন্থ অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাকে অমরধামে প্রয়াণ করিতে হইল।

তিনি যখন প্রথম বিশ্বভারতীতে আসিলেন, তখন সর্বপ্রায়ে চোখে পড়িল তাঁহার অতুলনীয় ভক্ততা, বিনয় ও চরিত্রমাদুর্য্য। আমাদের কাছেও তিনি প্রকটনত ছাত্রের মত বিনয়ের সহিত প্রশ্ন করিতেন। অথচ সেই সব বিষয়ে দেখিতাম তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অবশিষ্ট নাই।

* প্রাগে কবিকে তথাকার পৌরজনদিগের পক্ষ হইতে যে সন্মাননা করা হয়, তদুপলক্ষ্যে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে “গুরুদেব” বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিজ অভিভাবণ পাঠ করেন।

প্রবাসীর সম্পাদক।



বাম দিক হইতে—অধ্যাপক উইন্টারনিট্জ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক লেজনা

—১৯২৬ সালে প্রাগ শহরে গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে

নায়মাত্রা বলহীন লভ্যা

ন মেধয়া ন বহন্য প্রভেন কঠ, ২২, ২৩

তাহার সম্পাদন ও বিচারপ্রণালীর মধ্যে যেমন দেখা যাইত তাহার জ্ঞানের গভীরতা তেমনি থাকিত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অহুরাগ। তাহার অহুরাগ প্রগাঢ় হইলেও তাহার বিচারবুদ্ধি ছিল সদা জাগ্রত। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পদের আলোচনায় তিনি মহৎ সব ভাবের প্রতি যেমন গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন তেমনি অন্যর ও হীন বস্তুর প্রতি কখনও মিথ্যা সম্মান দেখান নাই। এক কথায় তাহার বিচারপ্রণালীর মধ্যে একটি অপূর্ব সামঞ্জস্য বোধ (balance) ছিল। তাহাই তাহার প্রণালীর বিশেষত্ব।

আমাদের মনে তখন একটা ভাব ছিল যে, যুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্মের মধ্যে তেমন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু উইন্টারনিট্জের ক্ষেত্রে এই কথাটা খাটিল না। তিনি নিজে মহৎ ছিলেন বলিয়া ভারতীয় সাধনার যথার্থ মাহাত্ম্য তাহার কাছে সহজে ধরা দিল। শুধু পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেই এই মর্মগত পরিচয়টি লাভ করা সম্ভব হয় না।

ভারতীয় সাধনায় আত্মা ত এক বিরাট সাধনার উপলব্ধি বস্তু। কিন্তু এই কথাই বিচার্য যে, যে-কোন মাহাত্ম্যের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করাই কি সহজ? চিরকাল এক সংসারে বসবাস করিয়াও ভাইয়ের অন্তরের মধ্যে ভাই, স্বামীর অন্তরে স্ত্রী, স্ত্রীর অন্তরে স্বামী, কি সব সময়ে প্রবেশ করিতে পারেন? অনেক সময়েই দেখা যায় চিরটা কাল একত্র থাকিয়াও কেহ কাহাকেও বুঝেন নাই। হাজার-হাজার মাইল দূরের মাহাত্ম্য হইয়াও কেমন করিয়া তিনি যে ভারতের মর্মের মধ্যে এমন সহজে প্রবেশ করিতে পারিলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। তাহার মূলে দেখিতে পাই তাহার শাস্ত্রজ্ঞানের উদারতা ও বিশালতা, অন্তরের মহত্ত্ব ও গভীর দরদ (sympathy)।

অথর্ববেদের মর্মগত তাৎপর্য, উপনিষদের গভীর রহস্য, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব তাহার শ্রদ্ধা ছিল গভীর, অথচ দৃষ্টি ছিল বিচারে সদা জাগ্রত। বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ

হিন্দু ভাবের মধ্যে যে কোথাও মন্দির বিরোধ নাই, ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত সহজ হইয়া দেখা দিয়াছিল।

এখানে আসিয়া তিনি তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও যোগ-বাসিষ্ঠাদি গ্রন্থের নিগূঢ় পরিচয় পাইলেন এবং গভীর ভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাধারণতঃ বিদেশীর পক্ষে এই সাধনা সহজ নয়, কিন্তু তাঁহার মহত্বের কাছে সব বাধাই পরাভূত হইল।

ভারতের সবটা পরিচয় যে গ্রন্থের ও শাস্ত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, গ্রন্থের বাহিরেও ভারতের জীবনে ও সাধনায় তাহার যে আরও কিছু পরিচয় থাকিতে পারে, এই কথা বড় বড় পণ্ডিতদের ধারণাতেও সহজে আসে না। উইন্টারনিটজ্ সারাটা জীবন কাটাইলেন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া ও পুঁথিপত্র ঘাটিয়া। তাঁহার কাছে এই সত্যটি ধরা পড়িল কেমন করিয়া তাহা বুঝা কঠিন।

দেখিয়াছি, তিনি ভারতীয় কলাশাস্ত্রের সম্পাদিত কোন গ্রন্থ দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থকর্তাকে প্রশ্ন করিতেন, “দেশবাসীর জীবনের মধ্যে এই সব কলার যে রূপটি আছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া গ্রন্থগত সব বস্তু কেন সত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই। বিদেশী কোন পণ্ডিত এরূপ করিলে তাহা মার্জ্জনীয় হইলেও ভারতীয় কোন পণ্ডিতের পক্ষে এইরূপ অসম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত কোন গ্রন্থ স্বধীজনসমাজে উপস্থিত করা বড়ই লজ্জার কথা।”

যোগ, তন্ত্র, ভারতীয় সাধনা, সন্তমত, বাউলমত, প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার গভীর আলোচনা চলিত। সব সময়েই তাঁহার অমুরাগ ও অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। এইখানে তাঁহার কাছে আমার একটি স্বপ্ন স্বীকার করা সম্ভব। তিনি গুরুর মত আমাকে একটি মহা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঋণ আমার কখনও পরিশোধ করা অসম্ভব।

কাশীতে আমার জন্ম। ভারতীয় শাস্ত্রে আমার শিক্ষা-দীক্ষাও হইয়াছিল সেখানেই। কিন্তু পরে আমি তন্ত্রমত, সন্তমত ও বাউলমত প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু সেই সব জিনিষ কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই এবং প্রকাশ করা সম্ভবও মনে করি নাই। বরং এরূপ প্রস্তাব হইলে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতাম। বিশ্বভারতীতে আচার্য্যপ্রবর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে এই সব জিনিষ আলোচনারই ভার আমাকে দিলেন। তখন চারি দিকে অবস্থা কিছু এই সব বস্তুর অন্তর্কূল ছিল না। এমন কি কাশীতে নাগরীর মহাপণ্ডিতগণ তখনও কবীরকে হিন্দী সাহিত্যের নবরত্নের মধ্যে স্থান দেন নাই। কাশীতে আজও এমন সব মহাপণ্ডিত আছেন যাহারা কবীরকে কোন মতেই স্বীকার করেন না। বাংলা দেশের কথা এখানে না-ই উল্লেখ

করিলাম। কাজেই বিশ্বভারতীতে আমার এই কাজ ছিল তখন পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টির বাহিরে।

পরলোকগত মহাপণ্ডিত আচার্য্য দিলভাঁ লেভী যখন বিশ্বভারতীতে চীনাড় ও তিব্বতীয় শিক্ষা প্রবর্তিত করিলেন, তখন আমিও তাহাতে যোগ দিলাম এবং তাঁহার সঙ্গে কিছু কাজও করিলাম। তিনি আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া এমন ভাবে উৎসাহ দিলেন যে, আমার চিতে একটা প্রলোভন উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, “কেন আর পণ্ডিতবর্গের উপেক্ষিত ক্ষেত্রে নিজের জীবনটা ক্ষয় করি? পণ্ডিতবর্গের সমাদৃত পথেই তো আমি সবার দৃষ্টি ও সম্মান লাভ করিতে পারি।”

মন যখন আমার এইরূপ দুর্বলতায় টলটলায়মান, তখন আচার্য্য উইন্টারনিটজ্ বলিলেন, “বলেন কি! এমন কাজও করিবেন না। ভারতের অতি গভীর পরিচয় আজও এই ক্ষেত্রে চাপা পড়িয়া আছে। যুরোপ এখনও তাহার নানা জালজঞ্জাল লইয়া ইহার উপর আসিয়া পড়িল হুড়মুড় করিয়া। এখন হয়তো আপন পরিচয়টুকু নিশ্চয় করিয়া এই সব ভুল ভবস্ত চিরকালের জন্ত অন্তর্হিত হইবে। এমন দুঃসময়ে শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্ত আপনি নিজ সাধনায় অটল আসন হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। কিছুতেই যেন আপনাকে ব্রতভ্রষ্ট না করে।”

তাঁহার মত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে এরূপ শাস্ত্রবহির্ভূত ক্ষেত্রে সাধনাতে এমন উৎসাহ পাইব তাহা আশাই করি নাই। এইখানেই তাঁহার মহত্ব।

এখান হইতে দেশে গিয়াও তিনি আমাদিগকে বা বিশ্বভারতীকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। সর্বদাই নানা ভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত তিনি উৎসুক থাকিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য যখন ভাঙিয়া আসিয়াছে, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি জীবনী লিখিয়া তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধাটুকুর পরিচয় দিয়াছেন।

শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল তাঁহার অসাধারণ, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গভীরতর ছিল তাঁহার মানবপ্রেম। জীবন বিয়োগেই তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর চলিল তাঁহার দুর্জয় সাধনা। বৃদ্ধ বয়সে এমন সাধনাক্রিষ্ট শরীরে তিনি জীবন সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আরও পড়িলেন ভাঙিয়া। তাহার মধ্যে একবার একটু আশার রেখা দেখা দিল, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মৃত্যু জগৎ হইতে বিদায় লইয়া তিনি ভারতীয় জ্ঞানসেবকদের চিহ্ন সিংহাসনে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এখান হইতে কেহ কোন দিন তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কাল ও মৃত্যুর আক্রমণের অতীত এই অমরধাম।

শ্রীকৃষ্ণমোহন সেন।

প্রয়াগের শরৎচন্দ্র চৌধুরী

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের অধ্যাপক শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগের সমগ্র সমাজ, এবং বিশেষ করিয়া তথাকার বাঙালী সমাজ কতিগ্রস্ত হইল। শরৎবাবুর চুল পাকিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা বাদ্ধিক্যবশতঃ নহে। তিনি আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু। তাঁহার পিতা এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সেকালের অত্যন্ত সব প্রসিদ্ধ উকীল পণ্ডিত সন্ন্যাসী হুন্দরলাল, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, মুন্সী রামপ্রসাদ প্রভৃতির মত আইনের জ্ঞানে ও তাহার প্রয়োগে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। শরৎবাবুরও



স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চৌধুরী

আইনের জ্ঞান বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তাঁহাকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করিলে যথাযোগ্য নিয়োগ হইত। তিনি কেবল আইনজ্ঞ ছিলেন না। ইংরেজী সাহিত্য প্রভৃতিতেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল, এবং তিনি সাধারণ সংস্কৃতি, সৌজন্য ও চরিত্রমাধুর্যের জন্য জনপ্রিয় ছিলেন।

কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

উড়িষ্যা প্রদেশের ও বিহার প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচনে কংগ্রেসের লোকেরা অধিকাংশ আসন অধিকার করিয়াছেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেও তাহা হইবার সম্ভাবনা। বন্ধে তাহা হয় নাই, পঞ্জাবেও হইবে না। বোম্বাই ও মাদ্রাজে কি হইবে, বলা যায় না—উভয় প্রদেশে কংগ্রেসের প্রাধান্য হইতেও পারে।

এখন কংগ্রেসকে স্থির করিতে হইবে, কংগ্রেসওয়ালারা সদস্যেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কি না। যে-যে প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যাভূষ্টি, সেখানে তাঁহারা সম্মত হইলে মন্ত্রিত্ব পাইতে পারিবেন; অন্যত্র না-পাইতে পারেন, পাইতেও পারেন। কংগ্রেসকে স্থির করিতে হইবে, সব প্রদেশে একই রীতি অবলম্বিত হইবে, না কংগ্রেসওয়ালারা সদস্যদের সংখ্যাভূষ্টিতা বা সংখ্যালব্ধিতা অনুসারে প্রদেশভেদে দু-রকমের কোন এক রকম নীতি অবলম্বিত হইবে। কংগ্রেস নূতন কন্সটিটিউশনটাকে বর্জনীয় বলিয়াছেন। মন্ত্রিত্বগ্রহণ এই নিন্দাবাদের সহিত খাপ খাইবে না।

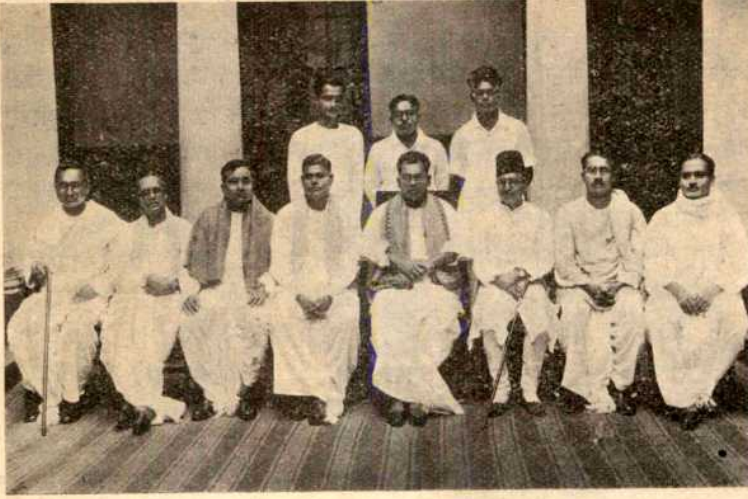
পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এ-বিষয়ে প্রাদেশিক কমিটিসমূহের মত জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুধু ইহা না বলিলে চলিবে না, সিদ্ধান্তের সমর্থক যুক্তি ও তথ্যও তাঁহাকে পাঠাইতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী ও স্বরাজ

মিঃ এইচ এন্স এল পোলাক মহাত্মা গান্ধীকে প্রশংসা করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা বলিতে তিনি কি বুঝেন। মহাত্মা গান্ধী উত্তর দিয়াছেন—

“আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, ১৯৩১ অব্দে গোলটেবল বৈঠকের সময় আমি যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, এখনও ঐ মতই আমি পোষণ করি কি না। আমি তখনও বাহা বলিয়াছি, এখনও আবার তাহাই বলিব। আমার ব্যক্তিগত কথা এই যে ‘ষ্ট্যাটিউট অব ওয়েষ্টমিনস্টার’ের বিধানমতে ইচ্ছানুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকারসম্বলিত ‘ডোমিনিয়ন স্টেটস’ পাইলে উহা আমি গ্রহণ করিব, কোন দ্বিধাবোধ করিব না।”

গোলটেবল বৈঠকের সময় মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, তিনি স্বাধীনতার সার অংশ (“substance of independence”) পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। এখনও সেইরূপ কথাই বলিতেছেন। বস্তুতঃ ওয়েষ্টমিনস্টার স্ট্যাটিউট আইন অনুসারে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিকে প্রায় স্বাধীন করা হইয়াছে। তাহাদের মর্যাদা ব্রিটেনের সমান। যে-কোন ডোমিনিয়ন আবশ্যকবোধে ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গভীর বাহিরে যাইতে পারে। আমরা বহুবায়ী বলিয়াছি, এইরূপ সর্বোত্তম ভারতবর্ষের



উপবিষ্ট : বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিগণ : বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রীযুক্ত ফেহ্রনাথ ডাঙ্গালী (অভ্যর্থনা-সমিতি), শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মজুমদার (ইতিহাস), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন হালদার (বিজ্ঞান), শ্রীযুক্ত নৃপেশচন্দ্র দাস (দর্শন), ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (মূল সভাপতি), মৌলবী শ্রীযুক্ত সখায়ৎ হোসেন খাঁ (সঙ্গীত) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী (সাহিত্য), শ্রীযুক্ত বিনয়শরণ কাহালী (কর্মসচিব)।
দণ্ডায়মান : বাম হইতে—শ্রীযুক্ত শান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পরমেশ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিনয় রায় (সহ কর্মসচিবত্রয়)।

—জম্মু ষ্টুডিও কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে।

ভোমীনিয়নত্ব প্রাপ্তিতে লাভ বই ক্ষতি নাই—দরকার হইলেই ভারতবর্ষ ব্রিটেনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, যে, ব্রিটেন সহজে ভারতবর্ষের ভোমীনিয়নত্বলাভে রাজী হইবে না—স্বতরাং তাহা দূরপরাহত। তবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ব্রিটেনের সহিত সম্পর্কমাত্রাংশ পূর্ণ-স্বাধীনতালাভও সুদূরপরাহত।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ধর্মঘটের অবসান

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের যে-সকল কর্মচারী ধর্মঘট করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জিত হইয়াছে। তাঁহাদেরই সর্বোত্তম এ রেলওয়ের এজেন্টকে রাজী হইতে হইয়াছে। অবশ্য যাহারা ধর্মঘট করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্মঘটকালের বেতন পাইবেন না। তেমনই অল্প দিকে ঐ রেলওয় ও বিস্তারিত ক্ষতি হইয়াছে। আশা করি, শুধু ঐ রেলওয়ের নহে, অল্প রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ-দিগেরও এখন চেতনা ও স্ববুদ্ধি হইবে। গরিব লোকদের প্রতি অত্যাচার ব্যবহার সব সময়েই সব অবস্থায় করা লাভজনক বা সম্ভবপর নহে। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের কর্মচারীরা যে

তাহার কর্তৃপক্ষকে এই শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার জন্ত তাহারা সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্থ। —

স্পেনের খবর

স্পেনে বিদ্রোহীরা মালাগা দখল করিয়াছে। ইটালী ও জার্মানীর সাহায্যে তাহারা জয়লাভ করিয়াছে। ঐ দুই দেশ বরাবরই বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিতেছে। বস্তুতঃ, যেমন আভিসীনীয়র যুদ্ধে, তেমনই স্পেনেরও এই যুদ্ধে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিলিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকিবার তথাকথিত চেষ্টা কথার কথা ও ফাঁকি মাত্র।

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মেলন

ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সম্মেলনের বিষয় আমরা আগে-আগে লিখিয়াছি। তাহার একটি বিস্তারিত বিবরণ পাইয়াছি। যথেষ্ট স্থান না থাকায় তাহা এই সংখ্যায় ছাপিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে তাহার অন্ততঃ কিছু অংশ ছাপিতে পারি কি না বিবেচনা করিব। বৃত্তান্তটি পড়িলে বুঝা যায়, ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালীর এই প্রথম চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। —



বাংলা

বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

দীর্ঘ ছয় বৎসরের পর, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশতম অধিবেশন ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর হইবে। আগামী ৯ই, ১০ই ও ১১ই ফাল্গুন, ইংরেজী ১১শে, ১২শে ও ১৩শে ফেব্রুয়ারী, এই তিন দিন সম্মিলনের অধিবেশন স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্মিলনের মূল সভাপতি পদে বৃত্ত হইয়াছেন। বিভিন্ন শাখা সম্মিলনের যাহারা সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহাদের নাম নিয়ে প্রকাশিত হইল :—

সাহিত্য—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, বিজ্ঞান—শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র,

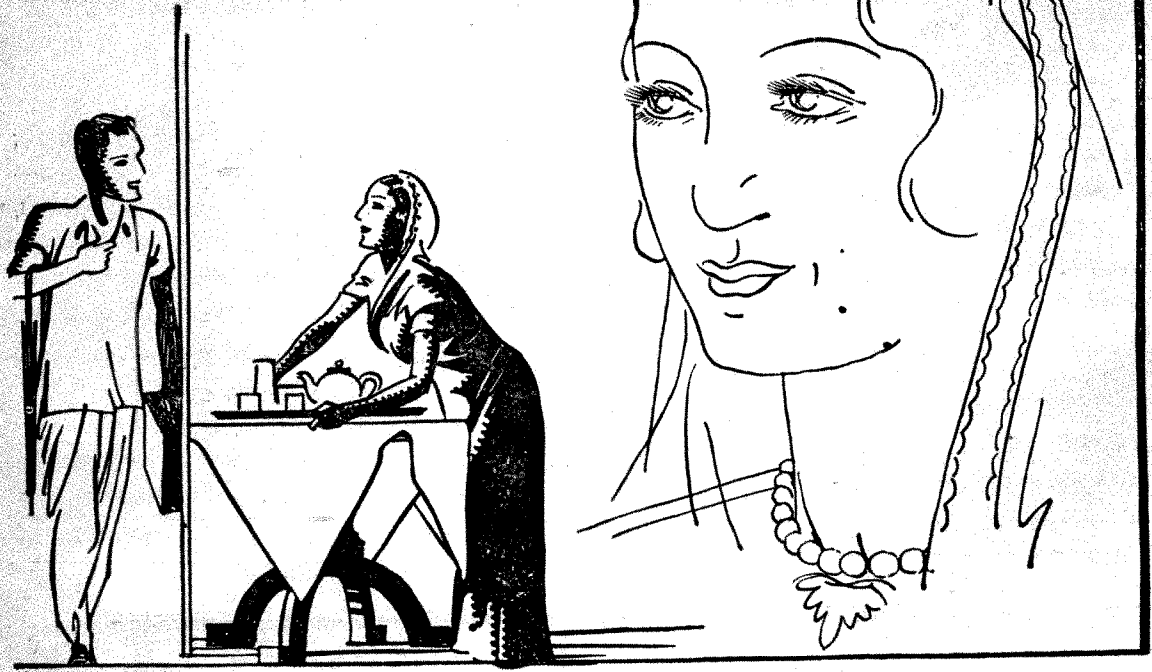
অর্থনীতি—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস—শ্রী যদুনাথ সরকার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা—ডাঃ জুন্দরীমোহন দাস দর্শন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, কথাসাহিত্য—শ্রীমতী অমৃকপা দেবী, কাব্যসাহিত্য—শ্রীমতী মানকুমারী বসু, শিশুসাহিত্য—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্রুত—শ্রী অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সাংবাদিক—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

এই সম্মিলনে চন্দননগরবাসীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন—লোকপ্রিয় শ্রীহরিহর সেট। সহকারী সভাপতি—শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশ্রীলকুমার মুখোপাধ্যায়। যুক্ত-সম্পাদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে ও শ্রীকৃষ্ণলাল দাস। কোষাধ্যক্ষ—ডাঃ যোগেশ্বর শ্রীমানী।

সুদূর প্রাচ্যেও স্বাধীনতার বিজয় অভিযান

বাম্মা
স্ট্রুট সেটলমেন্ট
মালয়
শ্যাম • চীন
ফিলিপাইন
ইন্দো-চীন
জাভা • সুমাত্রা
ফরমোসা
আন্দামান
ফিজি
জাপান

জানে— সে কী 'চায়'!



স্বামীকে রাত্তার ঘোড়ে দেখতে পেয়েই স্ত্রী উঠানে কেটলি চাপালেন। স্বামী যখন বাইরের দরজায় ঢুকলেন, তখন কেটলির জল ফুটে উঠেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার এক পেয়লা চা প্রস্তুত।

স্বামীর স্বথ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সামান্য এইটুকু মনোযোগের ফলে দাম্পত্য-জীবন কতই না মধুর হয়ে ওঠে। সারাদিনের ক্লান্তির পর চায়ের পেয়লাটি যথাসময়ে পাবার দরুন স্বামীর মেজাজ আর বিগড়ে থাকে না—কথায় কথায় আর চটাচটি নেই। সে এখন পরিতৃপ্ত, নিজের সংসারে স্থখী।

আজকেই স্বামী কাজ থেকে ঘরে ফিরলে এই মধুর চায়ের পেয়লা তাঁর হাতে তুলে দিন,—আপনার ওপর কি খুসী যে হবেন বলা যায় না।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন; তারপর পেয়লায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র পানীয়—ভারতীয় চা

মূলসভার অধিবেশন ২১শে ফেব্রুয়ারী ১২টার সময় আরম্ভ হইবে। ঐ দিনে সাহিত্য-শাখার ও ইতিহাস-শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ পঠিত হইবে। অগ্ন্যঙ্ক শাখার সভাপতিদের অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি পাঠ দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভা ও বাহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের ২২ করিয়া দেয় স্থির হইয়াছে। সাধারণের জগৎ প্রথম দিনের প্রবেশমূল্য ১০ ও ছাত্রদের ১০ করা হইয়াছে। ছাত্রী ও ভদ্রমহিলাগণ বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার পাইবেন।

সম্মিলনের সহিত একটি প্রদর্শনীও সংযোজিত করা হইবে। এই প্রদর্শনীতে চন্দ্রনগরের শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিষয়ক বস্তু তথ্য চিত্রাদি পরিদর্শিত হইবে। প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবেন কলিকাতার মেয়র শ্রী হরিশঙ্কর পাল মহাশয়।

রবি-বাসর—

সাত বৎসর পূর্বে অধুনা-লুপ্ত ‘মানসী ও মর্ষবাণী’র কার্যালয়ে একটি সাক্ষ্য চায়ের মজলিস বসিত। সেই প্রাত্যহিক মজলিসে

কয়েক জন নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যোন্মাদী কলমবিৎ ও পত্র-সম্পাদক যোগদান করিতেন। কিছুদিন পরে তাহা রীতিমত সভায় রূপান্তরিত হইয়া ‘রবি-বাসর’ নাম ধারণ করে। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে বায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর ইহার অধ্যক্ষ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা প্রভৃতি ইহার পূর্বতন সম্পাদক ছিলেন, বর্তমান সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু। রবি-বাসরের সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশতে সীমাবদ্ধ। পাদ্যিক প্রতি রবিবারে ইহার অধিবেশন হয়। বাংলা সাহিত্যের সর্ব বিভাগের বহু শ্রেষ্ঠ লেখক এবং শিল্প-বিভাগের বহু সুপ্রতিষ্ঠাশীল ইহার সভা। রবি-বাসর শুধু কলামিৎ এবং সাহিত্যিকগণের আলোচনা-সভা নহে, ইহা তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ মিলন-ক্ষেত্র। প্রত্যেক সদস্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বৎসরে একবার করিয়া স্বভবনে সভা আস্থান করেন। বর্তমান বর্ষে শ্রীশবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে আহৃত সভার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধিনায়ক-পদ এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার আলয়ে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। শেষোক্ত অধিবেশনে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ‘বাংলা সাহিত্যের অভাব-অভিযোগ’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবাসী’র পরবর্তী সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে।) রবীন্দ্রনাথের অধিনায়ক-পদ গ্রহণে ‘রবি-বাসর’ নামের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে।



ভাইব্রোভিন

এলটেরিস অশোক
কর্ডিয়েল উইথ ভাইটোফিন
সকলপ্রকার স্ত্রীরোগে যথেষ্ট



সানকেমিকেল ওয়ার্কস

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

কলিকাতা হাইকোর্টের স্যাড্‌ভোকেট এবং হাইকোর্ট বার-এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় গত ১৪ই নভেম্বর ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। শরৎ-বাবু সেকালের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু মহাশয়ের পুত্র। তিনিও কংগ্রেসের সেবকরূপে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের সদস্যরূপে, তিনি স্থায়ী পৈতৃক বাসস্থান বর্তমান জেলা হইতে দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯২৫ সনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন ও অল্প সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট মাল্য লাভ করেন। তিনি বাগিতা-শক্তির অধিকারী এবং ব্যক্তিগত জীবনে উদার, দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। খনি-বিষয়ক আইন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। অচ্যুত বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।



শরৎচন্দ্র বসু

ম্যালেরিয়ার “মহৌষধ” নানাপ্রকার আছে

কিন্তু

সামগ্রান!

যা’ তা’ বাজে ঔষধ সেবনে দেহের অপকার সাধন করিবেন না!

এপাইরিনা

ম্যালেরিয়া আদি সর্বপ্রকার জ্বরের
সুপরিষ্কৃত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।
ব্যবহারে কোন প্রকার কুফল নাই।

‘এপাইরিন’

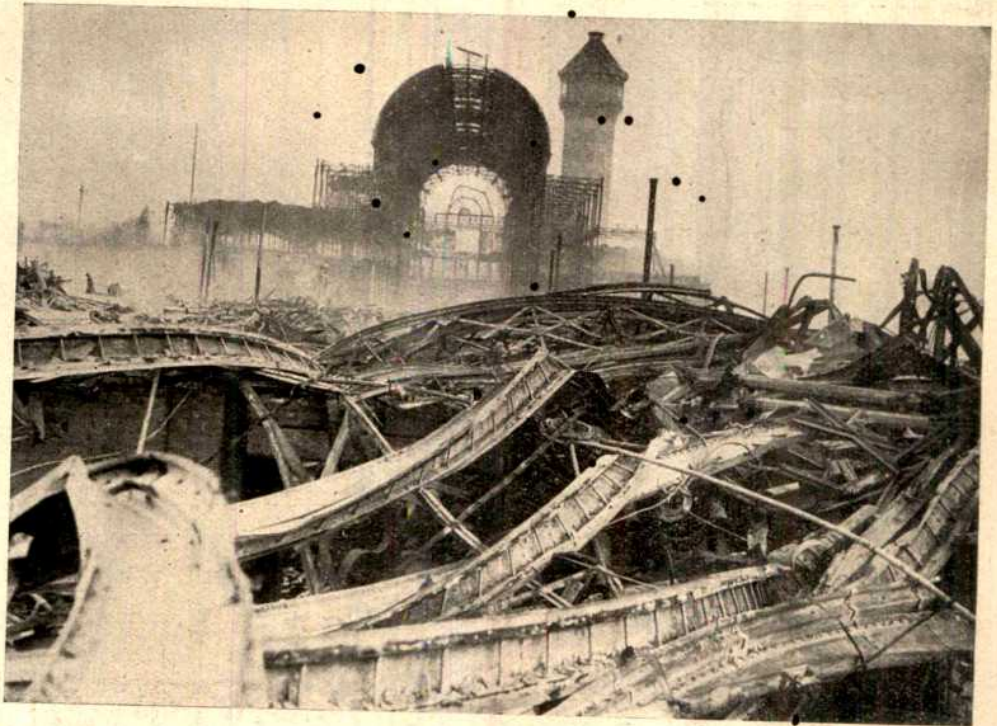
যে সকল উপাদানে প্রস্তুত, তাহা
বিখ্যাত চিকিৎসকমণ্ডলীর অনুমোদিত।

সকল বড় এবং ভাল ডাক্তারখানায় পাইবেন।

ল্যাড্‌কো • কলিকাতা



কর্নেল লিওবার্গ ও প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা
লিওবার্গ এরোপ্লেন-পরিচালক না হইলে বিমান-বিহার করিবেন না তাঁহার এই অঙ্গীকার ডি ভ্যালেরা
রক্ষা করিয়াছেন। আইরিশ ফ্রী-ষ্টেটে লিওবার্গসহ ডি ভ্যালেরার ইহাই প্রথম বিমান-যাত্রা।



লণ্ডনের স্ফটিক-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ
কোন কোন সংবাদ পত্র বলে, শত্রু-বিমানের পথপ্রদর্শকরূপে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব বলিয়া
এই পাসিফ সীমার-চিকিৎসা 'আগাস্টিন' হইবে



মহীশূরের যুবরাজ মহীশূর বাণিজ্য-ভাণ্ডারের নূতন দৌধের উদ্বোধন করিতেছেন



মার্শাল চ্যাং গুয়ে-লিফাং, শ্রীমতী চ্যাং, মিসেস্ চিরাং এবং সেনাপতি চিরাং কাইসেক

ভারতবর্ষ

পাটনায় প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলন—

গত ১০ই ও ১১ই মাঘ শনিবার ও রবিবার, পাটনা-প্রবাসী বাঙালী ছাত্রসমিতি 'প্রভাতী-সংঘ'র বাৎসরিক উৎসব স্থানীয় বি. এন. কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। গত বৎসরও এইরূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

এই সম্মেলনীতে ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস, ঔপন্যাসিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল গোস্বামী, "বনফুল" ওরফে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা ও বিহারের কয়েক জন সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিরদচন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সম্মেলন উপলক্ষে পাটনার সর্বত্র খুবই উৎসাহের সঞ্চার হয়। সভায় দুই দিনই প্রচুর জনসমাগম হয়। পাটনার বাহির হইতেও দর্শকবৃন্দ আসিয়াছিলেন। সম্মেলনীকে সর্বদাসুন্দর করিবার জন্ত সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি শ্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। তাহার মধ্যে অধ্যাপক শ্রীরত্ন হালদার ও বেঙ্গলী স্টেটস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমহিরনাথ রায় মহাশয়দ্বয়ের গৃহে চা-পানের আয়োজন উল্লেখযোগ্য। অতিথিবৃন্দের



পাটনা 'প্রভাতী-সংঘ' সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দ উজান-সম্মিলনে

অধ্যাপক শ্রীরত্ন হালদার কর্তৃক অভ্যর্থিত

[শ্রীবিবেকানন্দ মুক্তকী কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে অধিকাংশই পরলোকগত অধ্যাপক সমাদার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন।

অধ্যাপক হালদার মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলে সম্মেলনের সভাপতি নিরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "বর্তমান ভারতের সংস্কৃতি" শীর্ষক অভিভাষণ পাঠ করেন।

টাকুন্দা

ক্যালকেমিকোর

নিম টুথপেষ্ট

সীসক বর্জিত টিনের

টিউবে থাকে।



অবাক !!

ক্যালকেমিকোর

মার্গোফ্রিস্

কাঁচের শিশিতে এবং

টিনে থাকে।



আজকালকার ছেলেমেয়েরা বলে কি !
নিম টুথপেষ্ট আর মার্গোফ্রিস্
(নিমের গুঁড়া মাজন)

নিমদাঁতনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। বলে, ওর মধ্যে নিম দাঁতনের সমস্ত গুণ ত' আছেই, তাছাড়া আছে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত ও দাঁতের পক্ষে হিতকর কয়েকটি মূল্যবান উপাদান যা দাঁতের এনামেল অক্ষুণ্ণ রাখে, দাঁতের গোড়া শক্ত করে, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতগুলি মুক্তোর মত উজ্জ্বল করে তোলে।

ক্যালকাতা কেমিক্যাল
কলিকাতা



সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীপরমল গোস্বামী “সম্মেলনীর মার্থিকতা” নামক একটি প্রবন্ধ ও ‘বনফুল’ ‘ভ্রয়োদর্শন’ নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। দুইটি প্রবন্ধই হাশুরসাহসক অঙ্কত সুলিখিত ছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শতাধিক বর্ষ পূর্বে বাঙালী সমাজ সম্বন্ধে একটি স্ফুটিত, বিবিধ তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সরল নাতিলীর্ণ বক্তৃতায় তাঁহার সাহিত্য সাধনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ মহাশয়দ্বয় নাতিলীর্ণ বক্তৃতা করেন ও সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দকে সমিতির পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেন।

রাঁচি জেলার একটি প্রাচীন অনাবিকৃত মন্দির

গত পৌষের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নীরদকুমার রায় “রাঁচির কথা” প্রবন্ধের ৪২২ পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন মন্দিরের ছবি দিয়াছেন, কিন্তু প্রবন্ধের মধ্যে তাহার অবস্থান প্রভৃতি কোনরূপ বর্ণনা দেখিলাম না। সম্ভবতঃ নীরদবাবু ৪২৪ পৃষ্ঠায় যে ছিন্নমস্তার মন্দিরের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন উহা তাহারই ছবি হইবে। এই স্থলে রাঁচি জেলার অপর একটি মন্দিরের কথা উল্লেখ করা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না।

এই মন্দিরটি লোহারডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের চারি মাইল উত্তর-পূর্বে খেঁখু পারতা নামক একটি গ্রামে অবস্থিত। মন্দিরটির অবস্থা খুব শোচনীয় না হইলেও ১ নং চিত্র হইতে বুঝা যাইবে যে ইহার সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই মন্দিরটি সংরক্ষণের জন্য প্রকৃত-বিভাগের শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি।

খেঁখু পারতার মন্দিরটি একটি ছোট পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত, মন্দিরটির উচ্চতা ১০।১২ ফুট হইবে। মন্দিরের পূর্বমুখে একটি মাত্র প্রবেশ-দ্বার (চিত্র নং ৩) আছে। প্রবেশ-দ্বারের সর্দালের (lintel) মধ্যস্থলে একটি গণেশের মূর্তি অমৃশভাবে খোদিত এবং মন্দিরের দক্ষিণেও কয়েকটি মূর্তির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। খেঁখু পারতা গ্রামটি ওরাওঁ-প্রধান, হিন্দুর মত্রে কয়েক ঘর শুড়ী আছে। ইহাদের মধ্যে এই মন্দির সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী প্রচলিত নাই, তবে প্রবাদ, ওরাওঁরা এই মন্দিরের পার্শ্বে গো-বলি দিয়া থাকে।

শ্রীশশাঙ্কেশ্বর সরকার

দুই বৎসর পূর্বে যখন **বেঙ্গল ইনসিওরেন্স ও নিম্মাল প্রপার্টি কোম্পানীর** ভ্যালুয়েশান হয় তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাংলার আর একটি বীমা কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ধরচের হার, যুতাজনিত দাবীর পরিমাণ, ফণ্ডের লব্ধী প্রভৃতি যে সব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে একটি বীমা কোম্পানী সম্ভাব্যজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, সেই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছিলাম যে বীমা-ব্যবসায়ক্ষেত্রে স্বযোগ্য **বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের** পরিচালনা গুণ্ড আছে।

গত ভ্যালুয়েশানের পর মাত্র দুই বৎসর অন্তরে এই কোম্পানী পুনরায় ভ্যালুয়েশান করিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। কোম্পানীর যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে অল্পকাল অন্তর ভ্যালুয়েশান কেহ করেন না। বীমা কোম্পানীর প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে আকচুয়ারী দ্বারা ভ্যালুয়েশান করাইতে হয়। অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা না থাকিলে বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের পরিচালকবর্গ এত শীঘ্র ভ্যালুয়েশান করাইতেন না।

৩১-১২-৩৫ তারিখের ভ্যালুয়েশানের বিশেষত্ব এই যে, এবার পূর্ববার অপেক্ষা অনেক কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও কোম্পানীর উন্নত হইতে আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসরের জন্য ১৩ টাকা ও মেয়াদী বীমায় হাজার-করা বৎসরে ১৪ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীর লাভের সম্পূর্ণ অংশই বোনাসরূপে বাটোয়ারা করা হয় নাই, কিয়দংশ রিজার্ভ ফণ্ড লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানীর পরিচালনভার যে বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যক্তির হস্তে গুণ্ড আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিশিষ্ট জনসম্মত কলিকাতা হাইকোর্টের স্প্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত সাত বৎসর কাল এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি পদে থাকিয়া কোম্পানীর উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ব্যবসায়জগতে সুপরিচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার স্বদক্ষ পরিচালনা আমাদের আস্থা আছে। স্বথের বিষয় যে তিনি এই কোম্পানীতে বীমাজগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত হৃদীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে এজেন্সী ম্যানেজার-রূপে গ্রাহ্য হইয়াছেন। তাঁহার ও স্বযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই বাঙালী প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিবে ইহা অবধারিত।

[বিজ্ঞাপন]

হেড অফিস—২নং চার্জ লেন, কলিকাতা।



১ নং চিত্র

২ নং চিত্র

৩ নং চিত্র

রাঁচী জেলার একটি প্রাচীন অনাবিকৃত মন্দির

কৃতী বাঙালী—

শ্রীযুক্ত মাখনলাল দে, এম-এ, আই-ই-এস, সম্প্রতি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স বিভাগের 'ডীন' মনোনীত হইয়াছেন। ১৯০৭ সনে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপকরূপে নাগপুর ভিক্টোরিয়া কলেজে যোগদান করিয়া অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষকতাকার্যে সুনাম অর্জন করেন। ১৯২১ সালে তিনি আই-ই-এস্ অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে উন্নীত হন। দে-মহাশয় বহু কাল জব্বলপুর রবার্টসন কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সন হইতে তিনি নাগপুর বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, আই-ই-এস, সম্প্রতি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব আর্টস-বিভাগের 'ডীন' মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতি বিষয়ে এম-এ পদবীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কিছুকাল কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ও তৎপরে নাগপুর মরিস কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি নাগপুরের মরিস কলেজের অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরিয়ানের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি নাগপুর-প্রবাসী পরলোকগত ডাক্তার রায় বাহাদুর রাধিকাপ্রসাদ



শ্রীমাখনলাল দে



শ্রীঅতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত



শ্রীশক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়



মিঃ এ. এন. দাস

মনোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। শক্তিপ্রসাদবাবু ইতিপূর্বে নূরগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিষ্ট্রার রূপেও কিছুকাল কাজ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ. এন. ধর কিছুদিন পূর্বে উচ্চশিক্ষালাভার্থে জাপান যাত্রা করেন। তাঁহার পিতা জাহানাবাদ গম্বার এক জন বিশিষ্ট আইনব্যবসায়ী। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধরকে জাপানের ওসাকা ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিল্পসম্পর্কীয় রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ভারতবাসীর পক্ষে এইরূপ অনুমতি-লাভ এই প্রথম।

নৃত্যকলাকুশলী কুমারী জগসিয়া—

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের লক্ষ্যে অধিবেশনে, করাচীর কুমারী ভিশিনী জগসিয়া উচ্চাঙ্গের ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শনে সকলকে মুগ্ধ করিয়া সাতটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তাঁহার



কুমারী ভিশিনী জগসিয়া

নৃত্যকলা শাস্ত্রনিকেতনের আশীর্ষে অল্পপ্রাণিত। কুমারী জগসিয়ার 'আরতি' এবং 'পূজা' নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কুমারী ভিশিনী কিছুদিন পূর্বে একবার ছায়াচিত্রেও বিশেষ সফলতার সহিত অভিনয় করেন। কুমারী এখনও বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

বিদেশ

নাৎসী শাসনাধীনে জার্মেনী—

সম্প্রতি বার্লিনে নাৎসী শাসনের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং হের হিটলার আরও চার বৎসরের জন্ত রাইখ্‌স্ট্যাগের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রহিলেন। গত মহাযুদ্ধের পর জার্মেনী যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিল সেই অবস্থা হইতে আজ সে যে অনেকটা উদ্ধার পাইয়াছে তাহার মূলে হের হিটলার।

বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনিও নিজেকে শাস্তিকামী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি নিরস্তর যে বিদ্বেষ-বিষ উল্লীর্ণ করিতেছেন ও দল পাকাইতেছেন তাহাতে ইউরোপে শাস্তির আশা আরও সূদূরপর্যন্ত হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। স্বতঃ-গৌরব পুনরুদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প জার্মেনী অধুনা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। রাজস্বের ত্রিচতুর্থাংশ অল্পসঙ্কল্পে ব্যয়িত হইতেছে। রাইনল্যান্ড-সমস্তার এক প্রকার সমাধান হইয়াছে, ভাস্‌হি-চুক্তির জলপথ সম্বন্ধীয় ধারা নাকচ করিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইবার চাই উপনিবেশ। ব্রিটেনের, ফ্রান্সের, রাশিয়ার উপনিবেশ আছে, ইটালীও সম্প্রতি রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে স্বতরাং জার্মেনীই বা বাকী থাকে কেন? জার্মেনী আপাততঃ তাহার এই উপনিবেশ সম্পর্কিত দাবী সমগ্র জগৎকে শুনাইতে ব্যস্ত। গত মহাযুদ্ধের পর অনেকগুলি প্রয়োজনীয় উপনিবেশ জার্মেনীর নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং আপাততঃ তাহা রাষ্ট্রসম্মত প্রদত্ত ম্যাণ্ডেট ক্ষমতাবলে বিভিন্ন শক্তিবর্গ ভোগ করিতেছে। কিন্তু ইহুদীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার অধুনা জার্মেনীতে চলিতেছে তাহাতে তাহাদের এই দাবী সমর্থনযোগ্য কি না তাহা বিবেচ্য।

এই উৎসবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হের হিটলার আর একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জার্মানদিগের নোবেল পুরস্কার গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। গত বৎসর নাৎসীদিগের বিরাগভাজন ওসিটেকি নামক জর্মনৈক শাস্তিকামী 'নোবেল পীস' পুরস্কার পাওয়াতে এই বিধান করা হইল।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে



বসন্ত
শ্রী ভবানীচরণ গুহ

আমার পিতা মহাশয়

১৯২২



“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ”

৩৬শ ভাগ }
২য় খণ্ড }

চৈত্র, ১৩৪৩

{ ৬ষ্ঠ সংখ্যা .

আফ্রিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্ভাস্ত সেই আদিম যুগ,

প্রাচী যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে

নতুন সৃষ্টিকে বার-বার করছিলেন বিশ্বস্ত,

তার সেই অর্ধার্থে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে

করু সমুদ্রের বাহু

প্রাচী ধরিত্রীর বৃকের থেকে

হিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকৈ, আফ্রিকা,

বাঁধলে তোমাকৈ বনস্পতির নিবিড় পাহারায়

কুপণ আলোর অস্তঃপুরে ।

সেখানে নিভৃত অরুকাশে তুমি

সংগ্ৰহ করছিলে দুর্গমের রহস্য,

চিনছিল জলস্থল আকাশের দুর্বোধ্য সঙ্কেত,

প্রকৃতির দৃষ্টি-অতীত জাহ্ন

মস্ত্র জাগাছিল তোমার চেতনাতীত মনে ।

বিক্রপ করছিলে ভীষণকে

বিরূপের ছদ্মবেশে,

শঙ্কাকে চাচ্ছিলে হার মানাতে

আপনাকে উগ্র করে বিভীষিকার প্রচণ্ড মহিমায়

তাণ্ডবের হুন্দুভি নিনাদে ।

হায় ছান্নাবৃত্তা,

কালো ঘোমটার নিচে

অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ

উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে

নখ বাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,

এল মানুষ-ধরার দল,

গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্য্যহারা; অরণ্যের চেয়ে।

সভ্যের বর্বর লোভ

নয় করল আপন নিলজ্জ অমানুষতা।

তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে

পঙ্কিল হোলো ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে;

দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়

বীভৎস কাদার পিণ্ড

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়

মন্দিরে বসজ ছিল পূজার ঘণ্টা

সকালে সন্ধ্যায়, দয়াময় দেবতার নামে;

শিশুরা খেজছিল মায়ের কোলে;

কবির সঙ্গীতে বেজে উঠছিল

সুন্দরের আরাধনা।

আজ যখন পশ্চিম দিগন্তে

প্রদোষকাল বজ্রাবাতাসে রুদ্ধমান,

যখন গুপ্তগহ্বর থেকে শঙ্করা বেরিয়ে এল,

অশুভ ধ্বনিতে বোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,

এসে যুগান্তের কবি

আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে

দাঁড়াও ঐ মান-হারা মানবীর ঘারে,

বলো, ক্ষমা করো,—

হিংস্র প্রলাপের মধ্যে

সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।

আমাদের এই ভুলোককে বেঁধে ক'রে আছে ভুবলোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিঃশ্বাসবায়ু সমীকৃত হয়। ভুলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভুবলোক আছে ব'লেই আমাদের পৃথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সঙ্গীত-সম্পদে সমৃদ্ধ—পৃথিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবলোকের দান। এক সময় পৃথিবী যখন প্রথম অবস্থায় ছিল তখন তার চারদিকে বিষবাস্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্য্যকিরণ এই আচ্ছাদন ভাল ক'রে ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অনবধৃত হয়ে জলস্থলকে ক্ষুদ্র ক'বে তুলেছিল। ক্রমশঃ এই তাপ শান্ত হয়ে গেলে আকাশ নির্মল হয়ে এল, মেঘপুঞ্জ হ'ল ক্ষীণ, সূর্য্যকিরণ পৃথিবীর ললাটে আশীর্বাদটাকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভুবলোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হ'লে পৃথিবী হ'ল সুন্দর, জীবজন্তু হ'ল আনন্দিত। মানবলোকসৃষ্টিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিন্তার আকাশমণ্ডলকে মোহকালিমা থেকে নিমুক্ত করবার জন্ত, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্ত, মানুষকে চলতে হয়েছে দুঃখস্বীকারের কাঁটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টায় মানুষ ভুল করেছে, কালিমা শোঁধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পৃথিবী যখন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভূকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, বায়ুমণ্ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, লুপ্ততা, দুর্বলকে পীড়ন আজও চলছে; আদিম কালে রিপূর অন্ধবেগের পথে শুভবুদ্ধির বাধা আরও অল্প ছিল। এই যে বিবিনিঃশ্বাসে মানুষের ভুবলোক আবিল মেঘাচ্ছন্ন, এই যে কালিমা আলোককে অবরুদ্ধ কবে, তাকে নির্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেষ্টা শুধু নিয়মশাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হ'তে পারে না। নিয়মের বন্ধায় প্রমত্ত রিপূর উচ্ছ্বলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে, কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিয়ম মানে ভয়ে এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্বলতা। তরদ্বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মানুষকে পশুর ভুল্যে অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। মানবলোককে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মানুষের অন্তরের বায়ুমণ্ডল মলিনতামুক্ত হয় নি ব'লেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের অন্তর-লোকের মোহাবরণ মুক্ত ক'বার জন্তে যুগে যুগে মনঃপ্রাণেব অভ্যাস হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেখানে তার সোনারপার গনি, যেখানে মানুষের অশন-বসনেব আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্থল ভূমিকে আমাদের স্বীকার কবতেই হবে। কিন্তু সেই স্থল যুক্তিকাতাঙানই তো পৃথিবীর মাহাত্ম্য-ভাঙ্গার নয়। যেখানে তার আলোক বিচ্ছুরিত, যেখানে নিঃশ্বাসিত তার প্রাণ, যেখানে প্রসারিত তার মুক্তি, সেই উর্দ্ধলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ, সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য্য। মানবস্রষ্টৃত্বিতও আছে স্থলতা, যেখানে তার বিষমবুদ্ধি, যেখানে তার অন্ধন এবং সঙ্গম, তারই প্রতি আসক্তিই যদি কোনো মুক্ততায় সর্বপ্রাণন হয়ে ওঠে, তাহ'লে শান্তি থাকে না, সমাজ বিষ-বাস্পে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সামন্ত পৃথিবী জুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লুপ্ততা প্রবল হয়ে উঠে মানুষে মানুষে হিংস্রবুদ্ধির অগুন জালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে অরুণ করি সেই মহাপুরুষদের ধারা মানুষকে সেনা-রূপাব ভাঙারের সন্ধান দিত আসেন নি, দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইম্পাত-বীধানো বড় রাষ্ট্রা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা ধারা নন,—মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ যে মুক্তি, সেই মুক্তি দান কর ধাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নাঙ জানি না—কিন্তু নিশ্চয়ই

এমন অনেক আছেন এখনও যারা এই পৃথিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে স্বন্দর উজ্জ্বল করছেন। নিজস্ব জেনেছি, জন্মরা যে বিবিনিঃশাস পরিভাগ করে গাছপালা সে নিঃশাস গ্রহণ করে প্রাণদায়ী অস্ত্রিজেন প্রসূত করে দেয়। তেমনই মানুষের চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উদগার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্র জীবনের সম্পর্কে। এই শুভচেষ্টা মানবলোকে যারা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রাতীক, যন্ত্রণ তন্ন আশ্রয়, এই বাণী যার মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই—যারা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যার জন্মদিন বলে খ্যাত সেই যীশুর নিকটই উপস্থিত করি জগতে যারা প্রণয় তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখতে পেয়েছি কয়েক জনের মধ্যে। এই কল্যাণের দূত আমাদের ইতিহাসে অল্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হ'তে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। ষাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেমন না শাস্ত্র-বাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যার কথা শ্রবণ করছি তিনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, বিরুদ্ধতা, শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠুর যত্নে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্য চিরকালের মতো দেবীপ্যমান হয়ে আছে এ তো বই-পড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের

আগুনে উজ্জ্বল। এঁকে উপলব্ধি করা সহজ; শাস্ত্র-বাক্যকে তো আমরা ভালবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালবাসতে পারি তাঁদের, যারা মানুষকে ভালবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি; সেই ভক্তির মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। ঈষ্টকে যারা প্রত্যক্ষভাবে ভালবাসতে পেরেছেন তাঁরা শুধু একা ব'লে বিপুল দমন করেন নি, তাঁরা দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা শিয়েছেন দূর-দূরান্তরে, পর্বত সমুদ্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এই রকম আপন জীবনের প্রদীপ জালান, তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে।

ঈষ্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোট বড় কত প্রদীপ জালিয়েছে, অনাথ পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্য তাঁরা অপরিমিত ভালবাসা ঢেলে দিয়েছেন। ক' দানবতা আজ চারদিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন—তবু বলতে হবে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য জায়তে মহতো ভয়াৎ। এই ত্রিটি কলুষ-নিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যারা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন, নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হ'ত, সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হ'ত। *

২৫শ ডিসেম্বর, ১৯৩৬

শান্তিনিকেতন

* শান্তিনিকেতন মন্দিরে বড়দিন উপলক্ষে কথিত। ঈপুলিন, বিহারী সেন কর্তৃক অঙ্কলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত।



চিত্রাঙ্গনা নৃত্যনাট্য

প্রতিমা দেবী

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গনা গত ১৯৩৬ সনের জামুয়াবিরিতে কলকাতায় প্রথম অভিনীত হয়। তার পর থেকে এই নাটকের বিবিধ আলোচনা অনেক কাগজে অনেক মাসিক পত্রিকায় নানা ভাবে লিখিত হয়েছে এবং সম্ভ্রুতি ধূর্জটিবাবুর লেখা প্রবাসীতে পড়ে আমাদের দিক থেকে যা বলবার মতো মনে হ'ল তাই লিখবার চেষ্টা করব।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর ধ'রে লোকচক্ষুর অগোচরে যে কলাবিদ্যার সাধনা শান্তিনিকেতনে স্বকৃৎ হয়েছিল আজ চিত্রাঙ্গনায় তারই বিস্তৃত রূপের বিকাশ হয়েছে। চিত্রাঙ্গনার দ্বারা প্রধান রূপায়নী (যেমন যমুনা, নন্দিতা, নিবেদিতা) তাঁরা শিশুকাল থেকে এই কলাবিদ্যার চর্চা স্বকৃৎ করেছিলেন। তখন তাঁবাও জানতেন না যে, তাঁদের দ্বারা ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা নৃত্তন রূপ পাবে। দ্বারা শান্তিনিকেতনে নৃত্তপদ্ধতির ক্রমপদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে অন্বেষণ করে এসেছেন তাঁরা সকলেই জানেন কি ভাবে এই কয়ক বৎসরের মধ্যে নৃত্তকলা বিকাশ লাভ করল।

শান্তিনিকেতনের বর্ষাঋতু উৎসবগুলির মধ্যে নৃত্তের প্রথম কাহুতি দেখি। তার অপরিণত ভাষা শ্রীকৃষ্ণ কবিতা নিজেকে পরিচুত কববার ক্ষমতা। শিশুর প্রথম চলার মতো সে আপন ধাত্রী গীতকলাকে আঁকড়ে ধাক্ত, তার নিজের ক্ষমতা তখনও তার অগোচর। তার পর এল “নট্য পূজা”র সরল ছন্দে নৃত্তের নৃত্তন রূপ। সহজ ও স্নিগ্ধ তার গতি। তাই মুগ্ধ করেছিল সে দর্শকের চিত্তকে তার স্বতউচ্ছসিত অশিক্ষিতপটুত্ব। “নট্য পূজা”র সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সাজসজ্জা ও রঙ্গমঞ্চ বিশেষ লাভ করেছিল।

এর পর সঙ্গীতের রূপসৃষ্টি নিয়ে “ঋতুরঙ্গ” দেখা গিল। নৃত্তকলায় জাগাল সে নৃত্তন আকাজ্জক। “ঋতুরঙ্গ”র মধ্যে সঙ্গীর বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল। তখন থেকেই

আমাদের ছাত্রছাত্রীবা বুঝতে পেরেছিলেন, তন্নী খুব নিখুঁত হওয়া চাই।

“ঋতুরঙ্গ”র কিছু পূর্বে শুকদেব জাভা বাজা করেছিলেন। জাভানী নৃত্তের নানাবিধ ছবি এবং নৃত্ত-সাহিত্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, আর এসেছিল সেখানকাব কলানৈপুণ্যের প্ররোচনা। এই ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের জাভানী নৃত্তপদ্ধতি আয়ত্ত্ব বরবার স্বযোগ হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে ঋতুরঙ্গের নাট্যসংযোজনা এবং সাজসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্তমান ছিল এবং স্বরেনবাবুর রচিত টেঙ্গের মধ্যেও জাভানী স্থপত্যের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ঋতুরঙ্গের কয়েকটি নৃত্ত কলাঙ্গগতে সম্মানলাভের যোগ্য। যেমন “নৃত্তের তালে তালে” “যেতে যেতে একলা পথে” এবং আলপনাব নাচ ইত্যাদি—(নির্মলকান্ত নমো হে নমঃ)। খুঁটিনাটি বাদ দিয়েও সবটাই মিলিয়ে দেখতে গেলে ঋতুরঙ্গ একটি কলাকুশল রচনা। পববর্তী কালেও বহুদিন পর্যন্ত ঋতুরঙ্গের কলারীতি নিয়েই নাড়াচাড়া চলেছিল। মাঝে মাঝে অনেকগুলি নৃত্ত উল্লেখযোগ্য হয়েছিল ব'লে মনে করি, যেমন শ্রীমতী দেবীর “এসো নীপবনে” “দে দোল” “শিশুতীর্থ” ইত্যাদি। কিন্তু তখনও আমরা চলেছি পবীক্ষণের মধ্য দিয়ে। বর্তমান যুগে নাচের প্রকৃত রূপ কি হওয়া উচিত, সে সময়ে মনের মধ্যে তা পরিচুত হয়ে ওঠে নি; অন্ধকারে হাডড়ে বেড়ানোব মতো কতকটা মুক-অভিনয়, কতকটা গীতাভিনয়, কতকটা দেহভঙ্গীর মধ্য দিয়ে ভাবের প্রকাশ হ'ত বটে কিন্তু তার পরিপূর্ণ রূপ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল।

তখন নাচগুলি ছিল ছোট, খণ্ড খণ্ড গানের সঙ্গে হ'ত তার আরম্ভ ও শেষ। সেই টুকরা নৃত্তগুলি স্বন্দর হ'লেও দর্শকের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেত, মনে

কোন স্বাধীন রস রেখে যেতে পারত না। শাপমোচনের আগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জন্মস্মৃতি উৎসবের সময় যুনিটের ছাত্রদের অল্পরোধে তিনি “শাপমোচনে”র কথাবস্তু লিখেছিলেন এবং কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর দালানে “টুডেসডে ডে”-তে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের গল্পাংশকে অল্পসরণ করে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে মুক-অভিনয়ের দ্বারা ভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। সব জায়গায় প্রকৃত নৃত্যনাট্যের প্রকৃতি রক্ষা করতে না পারলেও গুরুদেবের সঙ্গীত ও মুক-অভিনয় মিলিয়ে জিনিষটি মনোরম হয়েছিল। কিন্তু এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যকলা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। এই নাটক প্রথমে লক্ষ্মোয়ে ও পরে বছবার মাস্ত্রাজ, বধে, সিংহলে অভিনীত হ’তে হ’তে পরিণতি লাভ করেছে। এই “শাপমোচনে”র অভিনয় বাইরে যখন প্রাশংসিত হ’ল, তখন এল বাংলা দেশে উদযাপনের যুগ। এই সময় থেকে শান্তিনিকেতনের নাচের পালা কলকাতায় কিছুদিনের মতো স্থগিত রাখা হ’ল। এই অবসরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে তাদের নৃত্যসাধন এগিয়ে চলেছিল ক্রতগতিতে। কয়েক বৎসরের মধ্যে ষাঁরা তৈরি হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যে কল্যাণীয়া বমুনা, নিবেদিতা, নন্দিতার নাম বিশেষভাবে প্রাশংসাযোগ্য, আর পুরুষদের মধ্যে শান্তি ঘোষ। শ্রীমতীকেও আমাদেরই ছাত্রী বলতে পারি কারণ তাঁর প্রথম নৃত্যশিক্ষা শান্তিনিকেতনের মণিপুরী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই। অবশ্য পরে যুরোপে নানা দেশ ভ্রমণের দ্বারা নৃত্যকলা সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন কিন্তু তাঁর নৃত্যের মূলে যে গুরুদেবের সঙ্গীতের প্রেরণা রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রশংসা এবং উৎসাহের আভিষ্য হয়তো আর্টের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই হয়েছিল আমাদের শাপমোচনের পক্ষে। অনেকেরই মনে হ’তে লাগল শাপমোচনেই হয়তো আমাদের শক্তির সীমা।

এই সময় ঘটনাচক্রে আমরা বিলাত-যাত্রা করলুম।

সেখানে ডেভনশায়ার ডার্টমুথ স্কুলে জার্মানীর অগ্রসিদ্ধ নর্তক লাবাসের শিষ্য মিটার ইয়স (Joss) একটি নৃত্যশালা খুলেছিলেন; তখন একটি নৃত্তন নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনার কাজ তাঁর হুঁড়িয়েতে আরম্ভ হয়েছিল। মিটার ইয়সের উদারতাগুণে আমি তাঁর কার্যপ্রণালী দেখবার সুযোগ পেলাম। ইয়স যে-প্রণালীতে নৃত্যনাট্যের প্রত্যেক অধ্যায় বানিয়ে তোলেন সেটা আমার কাছে খুবই উপাদেয় লেগেছিল। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড-নাচে মিলে ক্রমে ক্রমে যে-ক’রে একটি সম্পূর্ণ ভূমিকা পরিণত হ’তে পারে তারই নৃত্তন পদ্ধতি চোখে পড়তে লাগল। ছাত্রছাত্রীরা কি গভীর অহরাগ নিয়ে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করত নৃত্যকলা-সৃষ্টির কাজে, দেখে আনন্দিত হয়েছি। দেখলুম যুরোপীয় গানে যেমন বহু স্বরের সঙ্গীত আছে তেমনি যুরোপীয় নাচে নানা ভঙ্গীর সমবায়তা সংঘটিত হয়েছে। একই দৃশ্যে হয়তো দশ জন লোক বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচছে, একই তালকে অল্পসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ ইয়সের নাটকের একটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে; তার নাম—“পথের দৃশ্য”। কোথাও বা একদল লোক স্মৃতি করছে, কোথাও বা দু-জন প্রেমিক নিজের মনোভাবপ্রকাশ করছে, দু’থেকে কয়েক জন অপরিচিতা উপহাস করছে। বিচিত্র ভাবের লীলা একই দৃশ্যে একই তালকে অল্পসরণ করে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ক্লাস্তি আনে নি মনে, কেন না তালের লয় প্রত্যেক ভাবের সঙ্গে বদলে বদলে গিয়ে ঐশ্বর্য্য সজাগ করে রাখে। ইয়সের এই সংগঠনপ্রণালী একটি নাটক তৈরির পক্ষে খুব উপযোগী। বিচিত্র ভাবকে প্রকাশ করতে হ’লে তালকে অনেকটা মুক্তি দেওয়া চাই। ইয়সের নৃত্যপ্রণালীর মধ্যে সে স্বাধীনতা ছিল তাই তাঁদের নৃত্যকৌশল দেখে নাচ সম্বন্ধে অনেকগুলি নৃত্তন ধারণা আমার মনে এসেছিল একথা স্বীকার করি। তার পরে যখন দেশে ফিরে গুনলুম দিল্লীতে “শাপমোচন” অভিনয় হবার কথা হচ্ছে, তখন ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় একটি নৃত্তন নৃত্যনাট্যের সংগঠনের কথা মনে এল। এই সময় আমাদের দুই জন নৃত্য্যার্থী ছিলেন, এক জন মণিপুরী, অপবটি মাস্ত্রাজী। শেষোক্তটি লোক-নৃত্যশিল্পী। ছাত্রীরাও দেখলুম আঙ্গিকে বিশেষ দখল লাভ করেছেন। এরই মধ্যে অনেক নৃত্তন ধরণের নাচ তাঁরা আয়ত্ত করেছেন,

তাছাড়া মণিপুরী নাচ যেন তখন তাঁদের নিজের জিনিষ হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য নাচের শিক্ষা কোন দিনই আমার ছিল না, রূপকারের চোখেই সমস্ত জিনিষটা মনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হ'ল। স্থির হ'ল, আখ্যানের ক্ষেত্রে নেওয়া হবে চিত্রাঙ্গদার কবিতা। কেননা, এই কবিতার সাদৃশ্যবোধ আবেগ নাচের সম্পূর্ণ উপযোগী। নাচের ক্লাসগুলি দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলুম মণিপুরী ও দক্ষিণী নাচের অনেক ভঙ্গী ও তাল একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিলে একটি ভূমিকা অনায়াসেই তৈরি করা যায়। এখানে চিত্রাঙ্গদাকে নাচের ভাষায় অভিযুক্ত করতে হবে কাজেই সেই ভাব প্রকাশের অল্পরূপ নৃত্যের ভঙ্গী ও তালের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলি বাছাই করে নিতে হ'ল। ধূন্ধটিবাবু চিত্রাঙ্গদাকে বিশুদ্ধ নৃত্যনাট্য বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু চিত্রাঙ্গদার বৈশিষ্ট্য কি ভাবে গড়ে উঠল সেটা আমাদের দৃষ্টি থেকে বলতে চেষ্টা করব। প্রথমেই হ'ল গুরুদেবের সঙ্গীত যার উপর সমস্ত নৃত্যনাট্যটি প্রতিষ্ঠিত। চিত্রাঙ্গদার এই নৃত্য রূপ তাঁরই সঙ্গীতকে অবলম্বন করে বিকশিত। কবিতার চিত্রাঙ্গদা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বেশ পরিবর্তন করেছে মাত্র, তারই শৌর্যের নিছক রূপ জেগে উঠেছে তাল ও স্বরের বিচিত্র ছন্দে। এই নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিবিধ তালের সমন্বয় ঘটেছে যেমন মণিপুরী কাওয়ালী, হিন্দীতে থাকে বলে কাহারবা, মণিপুরী চারতাল যার হিন্দী নাম আড়া চৌতাল। মাদ্রাজী নাচের থেকে এল তেওরা এবং দাদরা। আর ঝাঁপতাল এসে পড়ল গুরুদেবের গানের মধ্য দিয়ে। অর্জুনের ধ্যানভঙ্গের নাচে তেহাই ভোরাপরণ তালের কৌশল যুক্ত হয়েছে। এই তালটি শুনে হয়তো ধূন্ধটিবাবুর মনে হয়ে থাকতে পারে যে, আমাদের ছাত্রীবা উত্তর-ভারতের নৃত্যকলা চর্চা করেছেন কিন্তু আমরা এই তালটি পেয়েছি মণিপুরী নাচের মধ্য দিয়ে। মাদ্রাজী তেওরা ও দাদরা মণিপুরী খোলের বালের সঙ্গে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কানে ঝাঁপি তেওরা ও দাদরাব আমেজ লাগায়। পঞ্চম নামে আছে মণিপুরের আর একটি তাল যা রাসলীল-নৃত্যে ব্যবহার হয়ে থাকে, যার ছন্দ আমাদের কানে কাওয়ালীর আভাস নিয়ে আসে। এই দক্ষিণী ও মণিপুরী নৃত্য যখন চিরকালীন

প্রথা অহসরণ করে তখন দর্শকের চিত্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাব তালের ক্লাস্তিকর পুনরাবৃত্তি ধরা পড়ে। লোকনৃত্য মাজেই আছে এই পৌনঃপুনিকতা যুরোপে নৃত্যের বেশ খুব উচুতে চড়ে গিয়ে আবার ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে একটি স্থিতিতে পরিণত হয়। এই বৈচিত্রীকরণ আমাদের সনাতন নাচের মধ্যে দেখেছি ব'ল মনে হয় না। নৃত্য কেবল প্রাচীনকে যেনে চললে নাটকের যোগ্য বৈচিত্র্য প্রকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু দেখেছি ক্রবঙ্গী বিভিন্ন নাচকে যথোচিত কৌশলে জুড়ে দিয়ে সাজাতে পারলে নৃত্যে ভাবপ্রকাশে কোনও জড়তা থাকে না। চিত্রাঙ্গদার মধ্যে অনেক দৃষ্টেই এই দুই নাচকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি জায়গার উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন "শুনি ক্ষণে ক্ষণে" এই স্থানের নাচের মধ্যে মণিপুরী কাওয়ালী, চারতাল ও মাদ্রাজী তেওরা ও দাদরা তালের মিশ্রণ ঘটেছে। এই দুই নাচের সংযোগে দেখা গেল ভাব সম্পৃষ্ট হয়ে উঠেছে আর অবিচ্ছিন্ন তালের অবসাদ কেটে গিয়ে নৃত্য উদ্দীপনা এনেছে। মণিপুরী নর্তকরা মুখে বা চোখে কোন ভাবের প্রকাশ করতে অভ্যস্ত নয়। তাদের মনের গতি প্রকাশ পায় তালের মধ্য দিয়ে। সব জায়গায় মণিপুরী নাচের এই বিশেষত্ব আমরা রাখি নি। তবে কোথাও কোথাও দরকার-মতো তার অহসরণ করা হয়েছে— যেমন চিত্রাঙ্গদা যখন মদন-দেবতার পূজার আয়োজনের জন্য ফুল তোলবার আবেশ করছেন কিংবা সিকারের নাচে অর্জুনকে দেখে তাঁর মানসিক পরিবর্তন হওয়াতে সখীদের বনভ্রমি হ'তে বিদায় দিচ্ছেন, এই সব জায়গাগুলিতে তালের মধ্য দিয়েই ভাবের প্রকাশ হয়েছে। অথবা অর্জুনের "যদি মিলে দেখা" গানে তাঁর মুখের ভাবকে ছাড়িয়ে তাল ও স্বর বহুদূর চলে গেছে। সেখানে দর্শকের চোখে নর্তকের মুখ দৃষ্টিপথে পড়ে না, স্বর ও তালের ছন্দ জানিয়ে দেয় যে অর্জুনের মনের মধ্যে কর্মজগতের আহ্বান পৌছেছে, তিনি বেরিয়ে পড়তে চান ভোগাবেশে অভিভূত পৌরুষ হয়েছে ক্লাস্ত ও অহতপ্ত। এই জায়গার তাল ও স্বর দেহের রেখাবিন্যাসের সঙ্গে মিলে এমন ভাবে ঐক্য পেয়েছিল যে মুখের ভাবের কোনও প্রয়োজন হয় নি, এই যে মণিকাকনযোগ এই হ'ল "বথার্থ" নৃত্যের আদর্শ।

“অর্জুন তুমি অর্জুন” চিত্রাঙ্গদার এই প্রথম আবেগপূর্ণ স্বাণী যখন চরম উচ্চাঙ্গে পরিণত হয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল “হা হতভাগিনী, এ কি অত্যর্থনা মহতেব”—বিষাদের এই পঙ্খীর্ণের মধ্যে, এখানকার সুর ও তালের বৈচিত্র্যকরণ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং নাটকীয় সংঘাত পূর্ণ হয়েছে তালের বিরামে এসে। এই থামার দ্বারা পরবর্তী বিষয়ের সঙ্গে ঘটনাসূত্র ঘাতে বিচ্ছিন্ন না হয় সেই জন্ত রূপসংযোজনায় ছবি দিয়ে নৃত্যের সঙ্গতি রক্ষা করতে হয়েছে। এখানে সুর তাল মিলে একটি চিত্রপরিপ্রেক্ষণী দর্শকের চোখে জেগে ওঠে যার মধ্যে আছে চিত্রাঙ্গদার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিতকে দেখবার উচ্চাঙ্গ, অর্জুনের অবজ্ঞা এবং হঠাৎ ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে সখীদের আশ্চর্য্যাব্বিত ভাব। এই সমস্তটাই সংযোজনায় স্বাধীন ছুটিয়ে তুলতে হয়েছিল। এখানে প্রথাগত নচ চলত কিনা সন্দেহ। নৃত্যের মধ্যে এই রেখাচিত্রের প্রকাশ পূর্বে ও পরবর্তী বিষয়ের মাঝখানে থাকতে নাটকের আবেগকে আবণ্ড একাগ্র করে তুলেছিল এবং অসংলগ্নতা দোষ ঘটতে দেয় নি। দর্শকের মনের মধ্যে নৃত্যনাটকের উত্থানপতন যে তালে তালে চলেছিল কোথাও বাধা না ক্রান্তি আনতে পারে নি তার একটি কারণ নাটকীয় গতি মাঝে মাঝে সংঘত হয়েছিল ছবির রাজ্যে এসে। চিত্রাঙ্গদার আর একটি বিশেষ জিনিষ হ’ল ছোট ছোট কবিতাগুলি, তারা মাঝে মাঝে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে, মূল ঘটনার, গান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দেওয়ার সঙ্গে নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখাই হ’ল তাদের কাজ, এই কবিতাগুলির ছন্দ দেহেব নৃত্যলীলাতে ঝাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তী নৃত্য যে আবার সেই ভঙ্গীর মধ্যে সাড়া দিয়ে উঠবে এ যেন তারই ভূমিকা। যে বিশেষ প্রণালীকে অবলম্বন করে বিভিন্ন তাল ও সুর এক হয়ে একটি বিশেষ ভাবকে চিত্রাঙ্গদায় রূপ দান করল এই বিচিত্র উপাদানকে সম্বদ্ধ করার নিয়মকেই সংযোজনা বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই জিনিষ যুরোপীয় নৃত্যনাট্যে খুবই উৎকর্ষ লাভ করেছে। আমাদের প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি এই প্রণালী অনুসরণ কবে কি না তা আমার জানা নেই। সেই জন্ত সংঘটন-প্রণালীর দিক থেকে পুরাণী পদ্ধতি চিত্রাঙ্গদায় মনে চলা হয় নি। সেখানে সনাতন প্রথাতে

ছাড়িয়ে সে নৃত্তন রূপ নিয়েছে। চিত্রাঙ্গদার সমস্ত নৃত্যই পুরাণী ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কতকগুলি বিগুহ তাল-নৃত্য ও গীতনৃত্যের বৈচিত্র্য দেবার জন্ত রাখা হয়েছিল দেহেরেখার ব্যঞ্জনা, এগুলি বাদ দিলে সঙ্গীতযোগে নৃত্যগুলিকে জমিয়ে তোলা যায় না। চিত্রাঙ্গদার সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে নৃত্যনাট্যে কলাকৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হ’ল স্বব ও তাল; ভাব খেলে তার দেহেরেখায়। এই রেখার খেলা মাজেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্তে পটভূমির দরকার হয় রং ও আলো। এই রং আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ছুটিয়ে তোলা শব্দ, বিশেষতঃ যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌঁছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনও অবাস্তব ভঙ্গী হ’ল তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সঙ্গতি রক্ষা করা দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাৎ, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিগুহ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য। নৃত্য হ’ল ইঙ্গিতকলা। তার প্রেরণা অনির্ব্বচনীয়। বিগুহ নাটকের মতো তার আবেদন স্পষ্টতাক্ষ নয়। দেহের মধ্য দিয়ে যে ছন্দলীলার ইঙ্গিত মানুষের মনে গভীর ছাপ দিয়ে যায় তাকে ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না, তার ভাব অমুভূতির রাজ্যে আপনি আত্মপ্রকাশ করে সেই জন্তই এই নৃত্যকলার তাৎপর্য্য বোঝা সাধারণ মনের পক্ষে কঠিন কিছু তার স্থায়ী আকর্ষণ স্থায়ীসমাজের মনে চিরকালই থাকবে।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে আমরা একটি জিনিষ পুরাতন প্রথা অনুযায়ী গ্রহণ করি নি সেটি হচ্ছে—দক্ষিণী ও উত্তর-ভারতীয় ঘাড় ও চোখের খেলা। আমার মনে হয় যদিও এটি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে তবুও এর মধ্যে একটু বিদেশী গন্ধ আছে। পুরাকালে যখন আরবি ও পারসি প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ছায়াপাত করেছিল সেই সময় নাচের এই চোখ ও ঘাড় নাড়ার ভঙ্গীও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের নৃত্যে এসে পড়েছিল, সেই জন্ত অন্ত কোন এদেশী লোকনৃত্যে এই ভঙ্গীগুলি চোখে পড়ে বলে জানি না। মণিপুরী নৃত্যে বাইরের কোনও

মিশ্রণ ঘটে নি' বলে ভারতীয় আদর্শ অল্পস্বারে সে ববাবর নিজের বিস্ময়তা বাঁচিয়ে এসেছে। সেই জন্ত মণিপুরী নাচে মুখের হাবভাব বা কটিদেশের কোনও প্রকার আন্দোলন নেই, অধিকন্তু তালের নাচের মধ্যে এই প্রথা অত্যন্ত দৃশ্যীয় বলে গণ্য হয়। নৃত্য শিক্ষা দেবার সময় মণিপুরী শিক্ষক দেখেছি বিশেষভাবে এ বিষয়ে সাবধানতা গ্রহণ করেন। মণিপুরী নৃত্য যথার্থ সৌন্দর্য্যকেই সাধনা করে, তার মধ্যে কোনও দৈহিক স্থল আকর্ষণের আয়োজন নেই। ভারতীয় নাচে বিদেশী প্রভাবের ধারণা আমার কাছে আরও সমর্থন পেয়েছিল যখন ইরাকের কোনও প্রসিদ্ধ নর্তকীর নৃত্যের মধ্যে ঐ ঘাড় ও চোখের খেলা দেখলুম। কিন্তু তাঁর নৃত্য দেহের সকল ভঙ্গীই ঐ চোখ ও ঘাড় নাড়ার কায়দার অল্পযত্নী ছিল তাই সমস্ত দেহের সঙ্গে মিলে নৃত্যের ঐ কলাকৌশলটি অসঙ্গত বলে মনে হয় নি, যদিও স্পষ্টই দেখা গেল সেখানকার নৃত্য স্থল ইন্দ্রিয়সক্তির আদিমতাকেই প্রকাশ করে। মাংসের কল্লনারাজ্যের রহস্য তার মধ্যে নেই। তার স্থান নৃত্যকলা-জগতে খুব উচ্চ নয়। তবে আঙ্গিকের নৈপুণ্য তার মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান আছে। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়াতীত রসের সঙ্কেত পাওয়া যায়, সে স্থান, কাল, পাত্র সমস্তকে ছাড়িয়ে তার আসন নিছিরেছে সর্বজনীন রসাতলভূতির মধ্যে। তাই শিবের ভাণ্ডাব নৃত্য দেখিয়ে একদিন সে সমস্ত দেশকে মুগ্ধ করেছিল আঙ্গিক যার শক্তি কত ছবি কত মূর্তির মধ্যে তার বিশেষত্বের নিদর্শন রেখে গেছে। সেই শক্তিশালী নৃত্যের মধ্যে এই বাঁড় ও চোখের খেলা অসঙ্গত মনে হয়। তবে উত্তর-ভারতে যেখানে পারসি সঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটেছে সেখানে কুম্ভলীলা বা গজলের সঙ্গে এই ভাবভঙ্গিগুলি অসঙ্গত হ'তে নাও পারে কারণ আদিরসাত্মক বিষয়ের সঙ্গে ওটা মানিয়ে বেতে পারে। বিস্ময় সৌন্দর্য্যরসের তাৎপর্য্য এমন স্বন্দ্র

পরিমাপনীর উপর দাঁড়িয়ে আছে যে তার কোনদিকে একটু স্থলতার ভার চাপলে গতি নিম্নগামী হবে এই আশঙ্কায় অনেকগুলি প্রচলিত নৃত্যরীতিকে আমরা প্রকার করি নি।

শাস্তিনিকেতনের নাচে বাজনার বৈচিত্র্য তেমন হয় নি তার কারণ গুরুদেবের সঙ্গীত ও স্বর বাজনার অভাব পুরিয়ে দেয়। এখানে তাঁর স্বরের ও গানের সঙ্গে প্রাচীন নৃত্যের এক অভাবনীয় মিলন হয়েছে। এই জীবনীসঙ্গমের ধারা এক নতুন রসহাটির পদ্ধতিকে অহুস্রণ করে। এই যে সঙ্গীত ও নৃত্যের অপূর্ণ ঐক্য যেখানে কেউ কাউকে পূর্ণ প্রকাশের পথে বাধা না দিয়ে নিজের শক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে, এইখানেই চিত্রাঙ্গদার আর একটি বিশেষত্ব। বাংলার নৃত্য চিত্রকল যেমন ভারতের চিত্রাঙ্গন-পদ্ধতির স্বর ফিরিয়ে দিয়ে চারুশিষ্টজগতে নৃত্য প্রাণ সঞ্চার করল, বাংলার বা শাস্তিনিকেতনের নাচ সেই একই কাজ করেছে নৃত্যকলা-জগতে। নৃত্যকলার প্রতি আজ ভারতের জনসাধারণের যে আগ্রহ জেগেছে সে তাকিয়ে রয়েছে বাংলার দিকেই। আমাদেরই মণিপুরী শিক্ষক নানা জায়গায় নৃত্যশিক্ষা দিচ্ছেন। তার মধ্যে নবকুমার ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য মনে করি। কিন্তু এঁরা শুধু যে শাস্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন তা নয়, গুরুদেবের সঙ্গীতের ধারণাব মধ্য দিয়ে কি করে প্রাচীন নৃত্যকলা নতুন হয়ে বর্তমান যুগে স্থান পাবে সে শিক্ষা তাঁরা এখান থেকে পেয়ে গেছেন। এই স্বত্রে তাঁদের প্রাচীন প্রথাগত নাচ অনেক পরিবর্তন দিয়ে শাস্তিনিকেতনের ছাপ নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গীতসহযোগে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আমাদের নৃত্যের রূপায়নীর ধারা এই কলাকে নিজের সাধনার জিনিষ মনে করেন তাঁদের হাতে এই নৃত্যকলার সব নব অধ্যায়ের ক্রমবিকাশের দাবিও রয়েছে ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে।



অগ্নিদানী

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা কাঠিকে মাঝামাঝি মচকাইয়া নোয়াইয়া দিলে যেমন হয়, দীর্ঘ শীর্ণ পূর্ণ চক্রবর্তীর অবস্থাও এখন তেমনি। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে সে এমন ছিল না, তখন সে বত্রিশ বৎসরের জোয়ান, খাড়া সোজা; লোকে বলিত, 'মই আসছে, মই আসছে'। কিন্তু ছোট ছেলেদের সে ছিল মহা প্রিয়পাত্র।

বয়স্ক ব্যক্তিদের হাসি দেখিয়া সে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিত, হুঁ—কি রকম, হাসছ যে?

—এই দাদা, একটা রসের কথা হচ্ছিল।

—হুঁ। তা বটে, তা তোমার রসের কথা ও তোমার রস খাওয়ারই সমান। এক জন হয়ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বলিয়া দিত, না দাদা, তোমাকে দেখেই সব হাসছিল, বলছিল—'মই আসছে'।

চক্রবর্তী আকর্ষণীত মেলিয়া হাসিয়া উত্তর দিত—হুঁ তা বটে! তা, কাঁধে চড়লে স্বগুণে যাওয়া যায়। বেশ, পেট ভরে খাইয়ে দিলেই ব্যস! স্বগুণে পাঠিয়ে দৌব।

—আর পতনে রসাতল, কি বল দাদা?

চক্রবর্তী মনে মনে উত্তর খুঁজিত। কিন্তু তাহার পূর্বেই চক্রবর্তীর নজরে পড়িত, অল্প দূরে একটা গলির মুখে ছেলের দল তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিতেছে। আর চক্রবর্তীর উত্তর দেওয়া হইত না। সে কাজের ছুতা করিয়া সরিয়া পড়িত।

কোন দিন রায়েদের বাগানে—কোন দিন মিঞাদের বাগানে—ছেলেদের দলের সঙ্গে গিয়া হাজির হইয়া আম জাম বা পেয়ারা আহরণে মত্ত থাকিত। সরস পরিপক্ক ফলগুলির মিষ্ট গন্ধে সমবেত মৌমাছি বোলতারা দল ঝাঁক বাঁধিয়া চারি দিক হইতে আক্রমণের ভয় দেখাইলেও সে নিরস্ত হইত না; চুপচাপ করিয়া মুখে ফেলিয়া চোখ বুজিয়া রসাস্বাদনে নিমুক্ত থাকিত।

ছেলেরা কলরব করিত, ওই, এঁা—তুমি যে সব খেয়ে দিলে, এঁা।

সে তাড়াতাড়ি ভালটা নাড়া দিয়া কতকগুলো ঝরাইয়া দিয়া আবার গোটা-দুই মুখে পুরিয়া বলিত—আঃ।

কেহ হয়ত বলিত—বীঃ পূর কাকা তুমি যে খেতে লেগেছ! ঠাকুরপুজো করবে না?

পূর্ণ উত্তর দিত—ফল—ফল; ভাত মুড়ি ত নয়, ফল—ফল।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেদিন এ কাহিনীর আরম্ভ, সেদিন স্থানীয় ধনী শ্রামাদাসবাবুর বাড়ীতে এক বিরাট শান্তি-স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষ্যে ছিল ব্রাহ্মণভোজন। শ্রামাদাসবাবু সম্ভানহীন, একে একে পাঁচ পাঁচটি সম্ভান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা গিয়াছে। ইহার পূর্বেও বহু অল্পটান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার শ্রামাদাসবাবু বিবাহ করিতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু জী শিবরাণী সজল চক্ষে অহরোধ করিল, আর কিছু দিন অপেক্ষা করে দেখ; তাঁরপর আমি বাবণ করব না, নিজে আমি তোমার বিয়ে দৌব।

শিবরাণী তখন আবার সম্ভানসম্ভবা। শ্রামাদাসবাবু সে-অহরোধ রক্ষা করিলেন। শুধু তাই নয়, এবাব তিনি এমন ধারা ব্যবস্থা কবিলেন যে, সে-ব্যবস্থা যদি নিষ্ফল হয় তবে যেন শিবরাণীর পুনরায় অহরোধের উপায় আর না থাকে। কানী, বৈজনাথ, তারকেশ্বর এবং স্বর্গুহে একসঙ্গে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। স্বস্ত্যয়ন বলিলে ঠিক বলা হয় না, পুত্রোষ্টি-যজ্ঞই বোধ হয় বলা উচিত।

ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনও বিপুল। শ্রামাদাসবাবু গলবস্ত্র হইয়া প্রতি পংক্তির প্রত্যেক ব্রাহ্মণটির নিকট গিয়া দেখিতেছেন কি নাই, কি চাই। একপাশে পূর্ণ চক্রবর্তীও বসিয়া গিয়াছে, সঙ্গে তাহার তিনটি ছেলে। কিন্তু পাতা

অধিকার করিয়া আছে পাঁচটি। বাড়তি পাতাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন মাছ শুণীকৃত হইয়া আছে বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। পাতাট তাহার ছাঁদা; তাহার নাকি এটিতে দাবি আছে। সেই শ্রামাদাসবাবুর প্রতিনিধি হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ জানাইয়া আসিয়াছে আবার আহারের সময় আহ্বান জানাইয়াও আসিয়াছে। তাহারই পারিশ্রমিক এটি। শুধু শ্রামাদাসবাবুর বাড়ীতে এবং এই ক্ষেত্র-বিশেষটিতেই নয়, এই কাজটি তাহার যেন নিদিষ্ট কাজ, এখানে পঞ্চগ্রামের মধ্যে যেখানে যে বাড়ীতেই হউক এবং যত সামান্য আহোজনের ব্রাহ্মণ-ভোজন হউক না কেন, পূর্ণ চক্রবর্তী আপনাই সেখানে গিয়া হাজির হয়; হাঁটু পর্যন্ত কোনরূপে ঢাকে এমনি বহরের তাহাব পোষাকী কাপড়খানি পবিয়া এবং বাপ-পিতামহের আমলের রেশমের একখানি কালী-নামাবলী গায়ে দিয়া হাজির হইয়া বলে—হঁ; তা কস্তা বই গো, নেমস্তম্ভ কি রকম হবে একবার বলে দেন। ওঃ মাচগুলো যে বেশ তেলুক-তেলুক ঠেকছে।—হই—হই। নিয়েছিল একুনি চিলে।

চিলটা উড়িতেছে দুব আকাশের গায়, পূর্ণ চক্রবর্তী সেটাকেই তাড়াইয়া গৃহস্থের হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দেয়। দুর্দান্ত শীতের গভীর রাত্রি পর্যন্ত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া সে সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া কেবে, প্রচণ্ড ঐশ্বর্যের দ্বিপ্রহরেও আহারের আহ্বান জানাইতে চক্রবর্তী ছেঁড়া চটি পায়ের মাথায় ভিজা গামছাখানি চাপাইয়া কর্তব্য সারিয়া আসে; সেই কণ্ঠের বিনিময়ে এটি তাহার পারিশ্রমিক। যাক্।

শ্রামাদাসবাবু আসিয়া পূর্ণকে বলিলেন—আর কয়েক খানা মাছ দিক চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর তখন খান-বিশেষ মাছ শেষ হইয়া গিয়াছে; সে একটা মাছের কাঁটা চুষিতেছিল, বলিল—আজ্ঞে না, মিষ্টি-টিষ্টি আবার আছে ত! হঁরে ময়রার রসের কড়ইয়ে ইয়া ইয়া ছানাবড়া ভাসছে, আমি দেখে এসেছি।

শ্রামাদাসবাবু বলিলেন—সে ত হবেই; একটা মাছের মাথা—?

পূর্ণ পাতাখানা পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—ছোট দেখে।

মাছের মাথাটা শেষ করিতে করিতে ওপাশে তখন মিষ্টি আসিয়া পড়িল।

চক্রবর্তী ছেলেদের বলিল—হঁ! বেশ কঁরে পাতা পরিষ্কার কর সব; হঁ! নইলে নাস্তা বোঝ লেগে, বাঁরাপ লাগবে খেতে। এঃ, তুই যে কিছুই খেতে পারলি নে, মাছহুড় পড়ে আছে।

বলিয়া ছোট ছেলেটাব পাতের আধখানা মাছও সে নিজের পাত্রে উঠাইয়া লইল। মাছখানা শেষ করিয়া সে গলাটা ঝুৎ ঝুৎ করিয়া মিষ্টি পরিবেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে হাঁকিতেছিল—এই দিকে।

ওপাশে সকলে তাহাকে দেখিয়া টোপাটিপি করিয়া হাসিতেছিল, এক জন বলিল—চোখ দুটো দেখে—চোখ দুটো দেখ।

—উঃ যেন চোখ দিয়ে গিলছে।

—আমি ত ভাই কখনও গুর পাশে খেতে বসি না।

উঃ কি দৃষ্টি! ততক্ষণে মিষ্টান্ন চক্রবর্তীর পাতার সম্মুখে গিয়া হাজির হইয়াছে।

চক্রবর্তী মিষ্টান্ন-পরিবেশকের সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া ছিল।

—ছাঁদার পাত্রে আমি আঁটা মিষ্টি পাব।

—বাঃ—সে তো চারটে কঁরে মিষ্টি পাব মশাই।

—সে দুটো কঁরে যদি পাত্রে পড়ে—তবে চারটে।

আর চারটে যখন পাত্রে পড়ছে—তখন আঁটা পাবনা—বাঃ!

শ্রামাদাসবাবু আসিয়া বলিলেন,—যোলটা দাও ওঁর ছাঁদার পাত্রে। ভজলোক বিনি-মাইনেতে নেমস্তম্ভ কঁরে আসেন—দাও—যোলটা দাও!

পূর্ণ চক্রবর্তী আঁচল খুলিতে খুলিতে বলিল—আঁচলে দাও—আমার আঁচলে দাও।

শ্রামাদাসবাবু বলিলেন—চক্রবর্তী কাল সকালে একবার আসবে ত! কেমন! এখানে এসেই জল খাবে।

—যে আজ্ঞে; তা আসব।

ওপাশ হইতে কে বলিল—চক্রবর্তী, বাবুকে ধঁরে পড়ে ভূমি বিদূষক হয়ে যাও। আগেকার রাজাদের যেমন বিদূষক থাকত।

চক্রবর্তী গামছায় ছাঁদার পাত-এঁ বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,

হু। তা'তোমার, হ'লে ত ভালই হয়; আর তোমার, ব্রাহ্মণের ছেলের লক্ষ্যই বা কি? রাজা জমিদারের বিদুষক হয়ে যদি ভাল মন্দটা—।

বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া উঠিল।

* * *

বাড়ীতে আসিয়া ছাঁদা বাঁধা গামছাটা বড়ছেলের হাতে দিয়া চক্রবর্তী বলিল, যা বাড়ীতে দিগে যা।

ছেলেটা গামছা হাতে লইতেই মেজমেয়েটা বলিল, মিষ্টিগুলো?

—সে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যা।

—এ্যা—তুমি লুকিয়ে রাখবে! বোলটা মিষ্টি কিন্তু গুণে নোব—হ্যাঁ।

—আরে—আরে—এ বলছে কি? বোলটা কোথা রে বাপু!—দিলেতো—আর্টটা; তাও কত ঝগড়া করে—।

—মা—মা! দেখ, বাবা মিষ্টিগুলো লুকিয়ে রাখছে—এ্যা।

চক্রবর্তী-গৃহিণী যাহাকে বলে রূপসী মেয়ে। দারিদ্র্যের শতমুখী আক্রমণেও সে রূপকে জীর্ণ করিতে পারে নাই। দেহ শীর্ণ, চুল রুক্ষ, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, তবুও হৈমবতী যেন সভাই হৈমবতী। কাঞ্চননিভ দেহবর্ণ দেখিয়া সোনার প্রতিমা বলিতেই ইচ্ছা করে। চোখ দুইটি আয়ত, সুন্দর কিন্তু দৃষ্টি তাহার নিষ্ঠুর মায়াহীন। মাল্লহীন অন্তর ও রূপময়ী কান্না লইয়া হৈম যেন উজ্জ্বল বালুশূরময়ী নকশ্চুমি; প্রভাতেব পর হইতেই দিবসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মরুর মতই প্রথর হইতে প্রথরতর হইয়া উঠে।

হৈমবতী আসিয়া দাঁড়াইতেই চক্রবর্তী সভয়ে মৈয়েকে বলিল, বলছি, তুই নিয়ে যেতে পারবি না; না, মেয়ে চোঁচাতে—।

হৈমবতী কঠোর স্বরে বলিল, দাঁও।

চক্রবর্তী আঁচলের খুঁটটি খুলিয়া হৈমর সন্মুখে ধরিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছেলেটা বলিল, বাবাকে আর দিয়ো না, মা। আজ যা খেয়েছে বাবা, উঃ! আবার কাল সকালে বাবু নেমস্তন্ন করেছে বাবাকে; মিষ্টি খাওয়াবে।

হৈম কঠিন স্বরে বলিল, বেরো—বেরো—বেরো বলছি

আমার স্বমুখ থেকে হতভাগা ছেলে। বাপের প্রতি ভক্তি দেখ! তোরা সব মরিস না কেন—আমি যে বাঁচি।

পূর্ণ এবার সাহস করিয়া বলিল—দেখ না, ছেলের তরিবৎ—যেন চাষার তরিবৎ।

হৈম বলিল—বাপ যে চামার, লোভী চামারের ছেলে চাষাও যে হয়েছে সেটুকুও ভাগ্যি মেনো। লেখাপড়া শেখাবার পক্ষা নেই—রোগে গুপ্ত নেই—গায়ে জামা নেই—ভবু মরে না গুরা। রাক্ষসের ঝাড়, অশুও পেরমাই।

চক্রবর্তী চূপ করিয়া রহিল। হৈম যেন আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া গেল। চক্রবর্তী ছেলেটাকে বলিল, দেখ, দেখি, এক টুকরো হরিতকী কি স্বপুর্বা একটুকু যদি পাস। তোর মার কাছে যেন চাস নে বাবা।

সন্ধ্যার পর চক্রবর্তী হৈমকে কাছে বসিয়া ক্রমাগত তাহার ভোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল। হৈম কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। চক্রবর্তী এবং ছেলেরা আজ নিমজ্ঞ খাইয়াছে, রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা নাই, যে ছাঁদাটা আসিয়াছে তাহাতে হৈম এবং কোলের ছেলে-টারও চলিয়া গিয়াছে।

বহু ভোষামোদেও হৈম যেন তেমন প্রসন্ন হইল না, অন্ততঃ চক্রবর্তীর তাই মনে হইল, সে মনের কথা বলিতে সাহস পাইল না। তাহার একান্ত ইচ্ছা যে, রাত্রে কয়েকটা ছানাবড়া সে খায়। তাহার তৃপ্তি হয় নাই, বুকের মধ্যে লালসা ক্রমবর্দ্ধমান বহি-শিখার মত জ্বলিতেছে।

ধীরে ধীরে হৈমবতী ঘুমাইয়া পড়িল। শীর্ণ দুর্বল দেহ, তাহার উপর আবার সে সম্মানসম্ভবা, সন্ধ্যার পরই শরীর যেন তাহার ভাঙিয়া পড়ে। ছেলেগুলোও ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী হৈমর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হ্যাঁ হৈম ঘুমাইয়াছে। চক্রবর্তী আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, হৈমর আঁচল হইতে দড়িতে বাঁধা কয়টা চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই ছেলেরা নাচিতে নাচিতে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল—ছানাবড়া খাব। বড়ছেলেটা খুব-খুব করিয়া বার-বার মায়ের কাছে আসিয়া বলিতেছিল—আমাকে কিন্তু একটা গোটা দিতে হবে মা।

হৈম বিরক্ত হইয়া বলিল—সব—সব—সবগুলো বের করে

দিচ্ছি, একটা কেন? সে চাবি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই একটা
কুট বিনয়ের আঘাতে শুদ্ধ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল।
যে শিকাটাতে মিষ্টগুলি ঝুলান ছিল, সেটা কিসে কাটিয়া
ফেলিয়াছে—মিষ্টগুলির অধিকাংশই কিসে খাইয়া গিয়াছে;
মাত্র গোটা তিন-চার মেয়ের উপর পড়িয়া আছে—তাও
সেগুলি রসহীন শুষ্ক—নিঃশেষে রস শোষণ করিয়া লইয়া
ছাড়িয়াছে। ছেঁড়া শিকাটাকে সে একবার তুলিয়া বরিয়
দেখিল, কাটা নয়, টানিয়া কিসে ছিড়িয়াছে। অতি নিষ্ঠুর
কঠিন হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

* * *

বাবু বলিলেন, চক্রবর্তী, স্ত্রিমীর একান্ত ইচ্ছে যে তুমি,
এবার তাঁর আত্মদুঃসারে থাকবে।

এখানকার প্রচলিত প্রাচীন স্মৃতি-গৃহের ছায়াবের
সম্মুখে রাখে ব্রাহ্মণ রাখিতে হয়। চক্রবর্তীর সন্তানদের
মধ্যে সবকটিই জীবিত, চক্রবর্তী-গৃহিণী নিখুঁত প্রসূতি;
তাঁহার স্মৃতি-গৃহের ছায়ায় চক্রবর্তীই শুইয়া থাকে।
তাই শিবরাণী এবার এ ইচ্ছা প্রকাশ কবিয়াছে—কল্যাণের
এমনি সহস্র খুঁটিনাটি লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত। শ্রামাদাস-
বাবুও তাহাব কোন ইচ্ছা অর্পণ রাখিবেন না।

চক্রবর্তী বলিল, হঁ। তা আজে।

এক জন মোসাম্বের বলিয়া উঠিল, তা—না—না—কিছু
নাই চক্রবর্তী। দিব্যি এখানে এসে রাজভোগ খাবে রাজে—
ইয় পুরু বিছানা, তোকা ভরা পেটে—বুঝেছ—।

বলিয়া সে ‘বড়-বড়’ করিয়া নাক ডাকাইয়া ফেলিল।

আহার ও আরামের বর্ণনায় পুলকিত চক্রবর্তী হাসিয়া
ফেলিয়া বলিল, হঁ—তা হজুব যখন বলছেন, তখন না
পারলে হবে কেন?

শ্রামাদাসবাবু বলিলেন—বঁসো তুমি, আমি জল খেয়ে
আসছি। তোমারও জলখাবার আছে। বলিয়া তিনি
পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

এক জন চাকর একখানা আসন পাতিয়া দিয়া মিষ্ট-
পরিপূর্ণ একখানা থালা নামাইয়া দিল।

এক জন বলিল—খাও, চক্রবর্তী।

—হঁ। তা, একটু জল—হাতটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

আর এক জন পারিষদ বলিল—গঙ্গা গঙ্গা বঁসে বঁসে পড়

চক্রবর্তী! অপবিত্র পবিত্রো বা—ও বিষ্ণু স্মরণ করলেই
সব শুদ্ধ, বঁসে পড়।

শ্রামাদাসবাবু জলেই একটা কুলচুচা করিয়া খানিকটা হাতে
বুলাইয়া লইয়া চক্রবর্তী লোলুপ ভাবে থালার সম্মুখে বসিয়া
পড়িল।

পাশের ঘরে জলযোগ শেষ করিয়া আসিয়া শ্রামাদাসবাবু
বলিলেন, পেট ভরল চক্রবর্তী?

চক্রবর্তীর মুখে তখন গোটা একটা ছানাবড়া। এক জন
বলিয়া উঠিল, আজে কথা বলবার অবসর নেই, চক্রবর্তী
এখন।

সেটা শেষ করিয়া চক্রবর্তী বলিল—আজে পরিপূর্ণ।
ভিল ধরবার জায়গা নেই আর পেটে। সে উঠিয়া পড়িল।

শ্রামাদাসবাবু বলিলেন—তোমাব কল্যাণে যদি মনস্কামনা
আমার সিদ্ধ হয় চক্রবর্তী, তবে দশ বিঘে জমি আমি
তোমাকে দোব। আর আজীবন তুমি সিংহবাহিনীর
একটা প্রসাদ পাবে। ত হলে তোমার কথা ত পাকা—
কেমন?

সিংহবাহিনীর প্রসাদ কল্পনা করিয়া চক্রবর্তী পুলকিত
হইয়া উঠিল। সিংহবাহিনীর ভোগের প্রসাদ সে যে
রাজভোগ!

—হঁ। তা পাকা বইকি! হজুব—।

কথা স্নানসমাপ্ত রাখিয়া সে বলিয়া উঠিল, দেখি—
দেখি—ওহে দেখি!

চোখ তাহার ঘেন জল জল কবিয়া উঠিল।

খানসামাটা শ্রামাদাসবাবুর উচ্ছিষ্ট জলখাবারের
থালীটা লইয়া সম্মুখে দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। একটা
অভূক্ত ক্ষীরের স্নেহ ও মালপোয়া থালাটার উপর পড়িয়া
ছিল। চক্রবর্তীব লোলুপতা অকস্মাৎ ঘেন সাপের মত
বিবর হইতে ফণা বিস্তার করিয়া বাহির হইয়া বিষ উদগর
কবিল। চক্রবর্তী স্থান কাল সমস্ত তুলিয়া বলিয়া উঠিল—
দেখি—দেখি—ওহে দেখি—দেখি!

শ্রামাদাসবাবু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, কর কি—কর কি
—এঁটো এঁটো। নতুন এনে দিক!

চক্রবর্তী তখন থালাটা টানিয়া লইয়াছে। ক্ষীরের
স্নেহটা মুখে পুরিয়া বলিল—আজে, রাজার প্রসাদ!

আর সে বলিতে পারিল না, আপনার অজ্ঞানতা মুহূর্তে তাহার বোধগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আর উপায় ছিল না, বাকীটাও আর ফেলিয়া রাখা চল না। লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া সেটাও কোনকপে গলাধঃকরণ করিয়া তাতাতাতি কাজের ছুতা করিয়া সে পলাইয়া আসিল।

বাড়ীতে তখন মরুতে যেন ঝড় বহিতেছে। হৈম মূচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছে, ছোট ছেলেগুলো কান্নিতেছে। বড়টা কোথায় পলাইয়াছে।

মেজমেয়েটা কান্নিতে কান্নিতে বলিল, মিষ্টিগুলো কিসে খেয়ে দিয়েছে—তাই দাদা ঝগড়া করে মাকে মেরে পালান। মা পড়ে গিয়ে—।

কথার শেষাংশ তাহার কান্নায় ঢাকিয়া গেল। চক্রবর্তীর চোখে জল আসিল; জলের ঝটি ও পাখা লইয় সে হৈমর পাশে বসিয়া গুপ্তাধা করিতে করিতে সতৃক দৃষ্টিতে হৈমর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চেতনা হইতেই হৈম স্বামীকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ছি—ছি—ছি; তোমাকে কি বলব আমি—ছি।

চক্রবর্তী হৈমর পাশে জড়াইয়া ধরিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল—মাথা ঠুকে মরব আমি—ছাড় পা ছাড়। সমস্ত দিন হৈম নিঃশব্দে মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার দিকে সে স্বস্থ হইয়া উঠিলে চক্রবর্তী সমস্ত কথা বলিয়া বলিল—তোমার বলছ আবার ওই সময়েই—। তা হ'লে না হয় কাল ব'লে দেব যে পরব না আমি।

হৈম চীৎকার করিয়া উঠিল, না, না, না। মরুক—মরুক, হয়ে মরুক আমার। আমি খালাস পাব। জমি পেলে অন্তঃকলো ত বাঁচবে।

প্রাণ মাসের প্রথম সপ্তাহেই। সেদিন সন্ধ্যায় শ্রাদ্ধাঙ্গ-বাণর লোক আসিয়া চক্রবর্তীকে ডাকিল, চলুন আপনি, গিন্নীমায়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে।

চক্রবর্তী বিব্রত হইয়া উঠিল; হৈমরও শরীর আজ কেমন করিতেছে।

হৈম বলিল—যাও তুমি।

—কিন্তু !—

—আমাকে আর জালিয়ে না বাপু, যাও। বাড়ীতে বড় খোকা রয়েছে—যাও তুমি !

চক্রবর্তী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল। জমিদার-বাড়ী তখন লোকজন ভরিয়া গিয়াছে। শ্রাদ্ধাঙ্গবাবু বলিলেন—এস চক্রবর্তী, এস। আমি বড় ব্যস্ত এখন। তুমি যেন বাম্বাবাড়ীতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেবে নিও।

চক্রবর্তী সটান গিয়া তখনই বাম্বাশালে উঠিল।

—হঁ। ঠাকুর—কি রান্না হচ্ছে আজ ? বাঃ খোসবুই ত খুব উঠছে। কি হে ওটা, মাছের কালিয়া না মাংস ?

—মাংস। আজ মাংস পুজো দিয়ে বলি দেওয়া হয়েছে কি না।

—হঁ। তা তোমার রান্নাও খুব ভাল। তার ওপর তোমার, বাদলাব দিন ! কত দূর, বলি দেবি কত ? দাও না, দেখি একটু চেখে।

সে একখানা শালপাতা ছিঁড়িয়া ঠোঙা করিয়া একেবাবে কড়াই ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা লোভ তোমার কিন্তু চক্রবর্তী।

—হঁ। তা বলেছ ঠিক। তা একটু বেশী। তা বটে।

একটুখানি নীরব থাকিয়া বলিল—সিদ্ধ হ'তে দেবি আছে না কি ?

হাতাতে কবিতা খানিকটা অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস তাহাব ঠোঙাতে দিয়া ঠাকুর বলিল, এই দেখ, বললে ত বিশ্বাস করবে না। নাও—হঁঃ।

সেই গরম ঝোলই খানিকটা সড়াম করিয়া টানিয়া লইয়া চক্রবর্তী বলিল, হঁ। বাঃ ঝোলটা বেড়ে হয়েছে। হঁ। তা তোমার রান্না, যাকে বলে উৎকৃষ্ট !

ঠাকুর আপন মনেই কাজ করিতেছিল, সে কোন উত্তর দিল না।

চক্রবর্তী আবার বলিল, হঁ। তা তোমার এ চাকলায়, ত কাউকে তোমার জুড়ি দেখলাম না। মাংসটা সিদ্ধ এখনও হয় নি তবে তোমার গিয়ে খাওয়া চলছে।

ঠাকুর বলিল, চক্রবর্তী, তুমি এখন যাও এখান থেকে। খাবার হ'লে খবর দেবে চাকররা। আমাকে কাজ করতে দাও। যাও, ওঠ।

চক্রবর্তী উঠিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই সময়েই অহর না আমি। তা তুমি একেবাবে আগুন হয়ে উঠলে। কিসে যে কি হয়—হঁ!

চক্রবর্তী উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি রে?

—একবার বাড়ী এস। ছেলে হয়েছে।

—তোর মা, তোর মা কেমন আছে?

—ভালই আছে গো। তবে দাই-টাই কেউ নেই, দাই এসেছে বাবুদের বাড়ী; নাড়ী কাটতে লোক চাই।

চক্রবর্তী তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

—হৈম।

—ভয় নেই, ভালই আছি। তুমি শুদ্ধুরদের দাইকে ডাক দেখি, নাড়ী কেটে দিয়ে থাক। আমাদের দাইকে ত পাওনা যাবে না।

তাহাই হইল। দাইটা নাড়ী কাটিয়া বলিল, সোন্দর শোকা হইচে বাপু, মা-বাপ সোন্দর না হ'লে কি ছেলে সোন্দর হয়। মা কেমন, দেখতে হবে।

হৈম বলিল, যা যা বকিস নে বাপু; কাজ হ'ল তোর, তুই যা।

চক্রবর্তী বলিল, হঁ। তা হ'লে, তাই ত। বোক বাক, ব'লে আহুক বাবুকে, অস্ত্র লোক দেখুন গুঁরা।

হৈম বলিল, দেখ জালিয়ে না আমাকে! যাও বলছি যাও।

চক্রবর্তী আবার অন্ধকাবের মধ্যে বাবুদের বাড়ীর দিকে চলিল।

মধ্যরাত্রে জমিদার-বাড়ী শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শিবরাণী একটি পুজুসন্ধান প্রসব করিয়াছেন।

পূর্ব হইতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ছিল, সেই বস্তুর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নাড়ী কাটিল গরম জলে শিশুর শরীরের ক্লেদাদি ধুইয়া মুছিয়া দাইয়ের কোলে শিশুটিকে সমর্পণ করিয়া সে যখন বিদায় লইল তখন কান্দি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

প্রভাতে চক্রবর্তী বাড়ী আসিতেই হৈম বলিল, ওগো, ছেলোটর ভোররাত্রে যেন জর হয়েছে মনে হচ্ছে।

চক্রবর্তী চমকিয়া উঠিল, বলিল—হঁ। তা—

অবশেষে অমুযোগ করিয়া বলিল, বললাম তখন যাব

না আমি। তা তুমি একেবাবে আগুন হয়ে উঠলে। কিসে যে কি হয়—হঁ!

হৈম বলিল—ও কিছু না। আপনি সেরে যাবে। এখন পয়সাটাকের সাবু কি দুধ যদি একটু পাও ত দেখ দৈখি আমাতে কাটলেও ত এক ফোঁটা দুধ বেরবে না।

যশা ছিল না, চক্রবর্তী প্রাতঃকৃত্য সারিয়া বাবুদের বাড়ীর দিকেই চলিল, ছবের জন্ত। কাছারী-বাড়ীতে ঘটিট হাতে দাঁড়াইয়া সে বাবুকে খুঁজিতেছিল। বাবু ছিলেন না। লোকজনও সব ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চলিতেছে। কেহ চক্রবর্তীকে লক্ষ্যই করিল না।

খানসামাটা বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোথা যাইতেছিল, সে চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আজ আর পেসাদ-টোসাদ মিলবে না ঠাকুর; যাও বাড়ী যাও।

চক্রবর্তী ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে নামিয়া আসিল। এক জন নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য একটা আড়াল দেখিয় বসিয়া তামাক টানিতেছিল, চক্রবর্তী তাহাকেই জিজ্ঞাস করিল, ইয়া বাবা, ছেলের জন্তে গাই দোয়া হয় নি?

সে উত্তর দিল, কেন ঠাকুর, ধারস্ত থাকে না কি। আচ্ছা ষ্টেটিক ঠাকুর যা হোক। না, গাই দোয়া হয় নি—বাড়ীতে ছেলের অস্থখ, ওসব হ'লে না এখন যাও।

শিশুর অস্থখ বোধ হয় শেষরাত্রেই আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু বোঝা যায় নাই। সাধারণতঃ শিশুরা ভোগ করিয়া শিবরাণীও এলাইয়া পড়িয়াছিল, রাজি-জাগরণক্লিষ্টা দাইটুও ঘুমাইয়া ছিল।

প্রভাতে, বেশ একটু বেলা হইলে, শিবরাণী উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়াই আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিলেন। এ বি ছেলে যে কেমন করিতেছে। তাহার পূর্বের সন্তানগুলিও ত এমনি ভাবেই—। চোখের জ্বল শিবরাণীর বুক ভাসিয়া গেল। শিশুর শুভ্র-পুষ্প-তুল্য দেহবর্ণ যেন ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

শিবরাণী আশ্চর্যের ডাকিল, যমুনা, একবার বাবুকে ডেকে দে ত।

শ্রামাদাসবাবু আসিতেই সে বলিল, ডাক্তার ডাকাও ছেলে কেমন হয়ে গেছে। সেই অস্থখ!

শ্রামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দুর্গা !

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। স্থানীয় ডাক্তার তৎক্ষণাৎ আসিল এবং তাহার পরামর্শ-মত শহরেও লোক পাঠান হইল বিচক্ষণ চিকিৎসকের জন্ত। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, শিবরাণীর আশঙ্কা সত্য ; সত্যই শিশু অসুস্থ। ধীরে ধীরে শিশুর দেহবর্ণ হইতে আকৃতি পর্য্যন্ত যেন কেমন অস্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে। এই সর্বনাশা রোগেই শিবরাণীর শিশুগুলি এমনি করিয়াই স্মৃতিকা-গৃহে একে একে বিনষ্ট হইয়াছে।

অপরাজে সদর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়া শিশুকে কিছুক্ষণ দেখিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চলুন, আমার দেখা হয়েছে।

দাইটা বলিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, ছেলে—?

তাহার প্রশ্ন শেষ হইবার পূর্বেই ডাক্তার বলিল, ওষুধ দিচ্ছি।

শ্রামাদাসবাবুর সঙ্গে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল।

শ্রামাদাসবাবুর মাসীমা স্মৃতিকা-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাইকে বলিলেন, কই ছেলে নিয়ে আয় ত দেখি।

ছেলের অবস্থা দেখিয়া তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ আমার কপাল রে! বলিয়া ললাটে তিনি করাঘাত করিলেন। ঘরের মধ্যে শিবরাণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল।

মাসীমা আপন মনেই বলিলেন—আর ও বার ক'রে দিতে হয়েছে।...কি ক'রেই বা বলি! আর পোয়াতীর কোনেই বা—।

ডাক্তার, শ্রামাদাসবাবুকে বলিল, কিছু মনে করবেন না শ্রামাদাসবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

—বলুন।

ডাক্তার, শ্রামাদাসবাবুর যৌবনের ইতিহাস প্রশ্ন করিয়া সংগ্রহ করিয়া বলিল—আমিও তাই ভেবেছিলাম। ঐ হ'ল আপনার সন্তানদের অকালমৃত্যুর কারণ।

—তা হ'লে, ছেলেটা কি—?

—নাঃ—আশা আমি দেখি নে—বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইল।

শ্রামাদাসবাবু বাড়ীর মধ্যে আসিতেই মাসীমা আপনার মনের কথাটা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—নইলে কি পোয়াতীর কোলে ছেলে মরবে? সে যে দারুণ দোষ হবে বাবা! আচার-আচরণগুলোও মানতে হবে ত।

আচার রক্ষা করিতে হইলে বিচার করার কোন প্রয়োজন হয় না; এবং হিন্দুব সংসারে আচারের উপরেই না কি ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিবরাণীর কোল শূন্য করিয়া দিয়া শিশুকে স্মৃতিকা-গৃহের বাহিরে বারান্দায় মৃত্যু প্রতীক্ষায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তাহার কাছে রহিল দাই, এবং প্রহরায় রহিল ব্রাহ্মণ আর মাথার শিয়রে রহিল দেবতার নিখাল্যের রাশি। ঘরের মধ্যে পুত্রশোকাতুরা শিবরাণীর সেবা ও সাহসনার জন্ত রহিল যুনা বি।

শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি। চক্রবর্তী বসিয়া ঘন ঘন তামাক খাইতেছিল। তাহার ঘরেও শিশুটি অসুস্থ। কিন্তু সে সারিয়া উঠবে। চক্রবর্তী মধ্যে মধ্যে আপন মনেই বিজ্ঞপের হাসি হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল বিধিলিপি! তাহাব শিশুটা মরিয়া যদি এটি বাঁচিত তবে চক্রবর্তী অন্তত বাঁচিত। দশ বিধা জমি আর সিংহবাহিনীর প্রসাদ নিত্য এক থালা। ভাগ্যের চিকিৎসা কি আর ডাক্তারে করিতে পারে! •

শিশুটি মধ্যে মধ্যে ক্রীণ কণ্ঠে অস্বস্তি যন্ত্রণায় আর্জনাৎ করিতেছে।

চক্রবর্তী দাইটাকে বলিল—একটু জল-টল মুখে দে রে বাপু।

নিদ্রাকাতর দাইটা বলিল—জল কি বাবে গো ঠাকুর? তা বলছ, দিই।

সে উঠিয়া ফোটা দুই জল দিয়া শিশুর অধর ভিজাইয়া দিল। তার পর শুইতে শুইতে বলিল, ঘুমোও ঠাকুর! তোমার কি আর ঘুম-চুম নাই!

চক্রবর্তীর চক্ষে সত্যই ঘুম নাই। সে বসিয়া আকাশ-জোড়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আপন ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। তাহার ভাগ্যাকাশও এমনি অন্ধকার।—আঃ—ছেলেটা যদি যাত্রমন্ড্রে বাঁচিয়া উঠে! চক্রবর্তী পৈতা ধরিয়া শিশুর ললাটখানি একবার স্পর্শ করিল।

অকস্মাৎ সে শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে সর্বাঙ্গ তাহার থর থর করিয়া কাঁপে।

না—না—সে হয় না! জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। দেখিতে দেখিতে তাহার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া উঠিল। সে আবার তামাক ধাইতে বসিল।

দাইটা নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঘরের মধ্যেও শিবরাণীর মুহু ক্রন্দনধ্বনি আর শোনা যায় না! বন্ধের আগুনে হুঁ দিতে দিতে চক্রবর্তী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল; জলন্ত অল্বারের প্রভায় চোখের মধ্যেও যেন তাহার আগুন জ্বলিতেছে।

উঃ, চিরদিনের জন্য তাহার দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে। এ শিশুর প্রভাত হইতেই বিকৃত মুষ্টি—তাহার শিশুও কুৎসিত নয়, দরিদ্রের সম্ভান হইলেও জননীক কল্যাণে সে রূপ লইয়া জন্মিয়াছে। সমস্ত সম্পত্তি তাহার সম্ভানের হইবে। উঃ।

পাপ যেন সম্মুখে অদৃশ্য কান্না লইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল। গভীর অন্ধকারের মধ্যেও আলোকিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখে ঝলমল করিতেছে। চক্রবর্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। শিশুর নিকট আসিয়া কিন্তু আবার তাহার ভয় হইল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত। পরমুহূর্ত্তে সে যুতপ্রায় শিশুকে বজ্রাবৃত করিয়া লইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া সম্ভরণে বাহির হইয়া পড়িল।

অমৃত—সে যেন চলিয়াছে অদৃশ্য বায়ুপ্রবাহের মত। নিঃশব্দে, লঘু ক্রম গতিতে। অন্ধকার পথে আজ সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ কেহ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করে না, তাহারও সেদিকে অঙ্গক্ষেপ নাই! ভাঙ্গা ঘর। চারিদিকে প্রাচীরও সর্বত্র নাই। হৈমর স্মৃতিকা-গৃহের দরজাও নাই, একটা আগড় দিয়া কোনরূপে ছয়ারটা কোনরূপে আগলান আছে। হৈমও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

চক্রবর্তী আবার বাতাসের মত লঘু ক্ষিপ্ত-গতিতে ফিবিলা।

দাইটা শুখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

রোগগ্রস্ত শিশু, মৃত্যু-রোগগ্রস্ত নয়। সে থাকিতে থাকিতে অপেক্ষাকৃত সবল ক্রমশে আপনার অভিযোগ জানাইল। দাইটার কিন্তু ঘুম ভাঙিল না। চক্রবর্তী ঘুমের ভান করিয়া কাঁঠ মারিয়া পড়িয়া রহিল।

শিশু আবার কাঁদিল।

ঘরের মধ্যে শিবরাণীর অক্ষ ট ক্রন্দন এবার যেন শোনা গেল।

শিশু আবার কাঁদিল।

এবার যমুনা ঈষৎ দরজা খুলিয়া বলিল—দাই ও দাই! ওমা নাক ডাকছে যে! ঠাকুরও দেখছি মড়ার মত ঘুমিয়েছে ও দাই!

দাইটা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। যমুনা বলিল, এই বুঝি তোর ছেলে আগলান! ছেলে যে কাতরাচ্ছে! মুখে একটু করে জল দে।

দাইটা তাড়াতাড়ি শিশুর মুখে জল দিল; শুষ্ককণ্ঠ শিশু চৌট চাটিয়া জলটুকু পান করিয়া আবার যেন চাহিল দাই আবার দিল।

এবার সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, ওগো জল খাচ্ছে গো! চৌট চেটে চেটে।

শিবরাণী ছুঁকল দেহে উঠিয়া পড়িয়া বলিল—নিষে আর ঘরে নিয়ে আর আমার ছেলে, করও কথা আমি শুনব না।

প্রভাতে আবার লোক ছুটল সদরে। এবার অহু ভাস্কর আসিবে। মৃত্যুবার হইতে শিশু ফিরিয়াছে দেবতার দান, ব্রাহ্মণের প্রসাদ! চক্রবর্তী না কি আপন শিশুর পরমায়ু রাজার শিশুক দিয়াছে। হস্তভাগ্যে সম্ভানটি মারা গিয়াছে! প্রায়াক্কার স্মৃতিকা-গৃহে শিবরাণী অর-কাতর শিশুটিকে ক্রোলে কনিয়া বসিয়া আছে। তাহার ভাগ্য-দেবতা, তাহার হারান মানিক।

দশ বিঘা জমি চক্রবর্তী পাইল। সিংহবাহিনীর প্রসাদও এক থালা করিয়া নিত্য সে পায়। হৈম অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্তী সেই ত্রেননি করিয়াই বেড়ায়।

লোকে বলে, স্বভাব যায় না ম'লে।

চক্রবর্তী বলে, হুঁ—তা বটে! কিন্তু ছেলের দশ দেখেছ, এক একটা ছেলে যে এতটা হাতীর সমান।

হৈম ছেলেগুলিকে ইচ্ছায়ে নিয়াছে। বড়ছেলেটি এখন ইত্তরের মত কথা বলে না, কিন্তু বড় বড় কথা বলে, বাবান ব্যবহাবে, ইচ্ছায়ে আমার মুখ দেখানো ভার মা! ছেলেরা মা-তা বলে। কেউ বলে ভাঁড়ের বেটা খুরি। কেউ কেউ

আবার দেখলেই সড়াম ক'রে মুখে ঝোল টানে। তুমি বাপু বারণ ক'রে দিও বাবাকে। হৈম সে কথা বলিতেই চক্রবর্তী সহসা যেন আশ্রুনেব মত জলিয়া উঠিল। তাহার এ অস্বাভাবিক রূপ দেখিয়া হৈমও চমকিয়া উঠিল।

চক্রবর্তী বলিল—চ'লে যাব, চলে যাব, আগি সয়েসী হয়ে।

ব্যাপারটা আরও অগ্রসর হইত। কিন্তু বাহির হইতে কে ডাকিল—চক্রবর্তী!

—কে?

—বাঁদুজ্জেরা পাঠালে হে। ওদের মেঘের বাড়ী তত্ত্ব যাবে, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে; ওবা 'কেউ যেতে পারবে না। লাভ আছে হে, ভাল-মন্দ থাকবে, বিদেয়টাও পাবে।

—আচ্ছা,—চল যাই। চক্রবর্তী বাহির হইয়া পড়িল।

বাঁদুজ্জেরদের বাড়ী গিয়া যেখানে মিষ্টি তৈয়ারী হইতেছিল সেখানে চাপিয়া বসিয়া বলিল—ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণ্য গতি। হুঁ! তা যেতে হবে বইকি! উনোনের আঁচটা একটু ঠেলে দিই, কি বল হে মোদক মণায়।

সে সতৃষ্ণ নয়নে কড়াইয়ের পাকের দিকে চাহিয়া রহিল।

* * *

বৎসর-দশেক পর। শিবরাগী হঠাৎ মারা গেলেন। লোকে বলিল—ভাগ্যবতী! স্বামী-পুত্রের বেখে, ডকা মেরে চলে গেল।

শ্রামাদাসবাবু শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। চক্রবর্তীর এখন ঐখানেই বাসা হইয়াছে। সকালবেলাতেই ঠুক ঠুক কবিতা গিয়া হাজির হয়। বসিয়া বসিয়া আয়োজনেব বলি-বন্দোবস্ত দেখে। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে।

সেদিন বলিল—হুঁ। ছাঁদা একটা ক'রে ত দেওয়া হবে। তা তোমার লুচিই বা ক'খানা আর তোমার মিষ্টিই বা কি রকম হবে?

এক জন উত্তর দিল, হবে, হবে! একখানা ক'বে লুচি, এই চালুনের মত। আর মিষ্টি একটা ক'বে, তোমার লেডীকেনী, এই পাশ-বাগিশের মত, বুঝলে!

সকলে যুহু যুহু হাসিতে আরম্ভ করিল। শ্রামাদাসবাবু ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, একটু থাম ত সব। হ্যাঁ কি হ'ল—পাওয়া গেল না?

এক জন কর্ণসারীর সঙ্গে তিনি কথা কহিতেছিলেন। কর্ণসারীটি বলিল—আজ্ঞে, তাদের বংশই নির্বংশ হয়ে গিয়েছে।

—তা হ'লে অগ্র জায়াগায় লোক পাঠাও। অগ্রদানী না হ'লে ত শ্রাদ্ধ হয় না।

—আচ্ছা তাই দেখি। অগ্রদানী ত বড় বেশী নেই—দশ-বিশ ক্রোশ অন্তর একঘর-আঘর।

কে এক জন বলিয়া উঠিল—তা আমাদের চক্রবর্তী রয়েছে—চক্রবর্তী নাও-না কেন দান, ক্ষতি কি? পতিত ক'রে আর কে কি কববে তোমাব?

শ্রামাদাসবাবু ঈষৎ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিলেন—মন্দ কি, চক্রবর্তী! শুধু দান-সামগ্রী নয়, ভূ-সম্পত্তিও কিছু পাবে; পচিশ বিঘে জমি দোব আমি, আর তুমি যদি রাজী হও তবে বছরে পঞ্চাশ টাকা জমিদারী সম্পত্তির মুনাফা দোব আমি, দেখ।

বলিয়াই তিনি এদিক-ওদিক চাহিয়া চাকরকে ডাকিলেন, ওরে, চক্রবর্তীকে জলখাবার এনে দে। কলকাতার মিষ্টি কি আছে, নিয়ে আয়।

শ্রাদ্ধের দিন সকলে দেখিল শ্রামাদাসবাবুর বংশধর শিবরাগীর শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে অগ্র দান গ্রহণ করিবার জন্ত দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছে পূর্ব চক্রবর্তী।

তার পর গোশালায় বসিয়া তাহারই হাত হইতে গ্রহণ করিয়া চক্রবর্তী গোত্রাসে পিণ্ড ভোজন করিল।

* * *

গল্পেব এইখানেই শেষ, কিন্তু চক্রবর্তীর কাহিনীর এখানে শেষ নয়। সেটুকু না বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

লোভী, আহার-লোলুপ চক্রবর্তীর আপন সম্বানের হাতে পিণ্ড ভোজন করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই। লুহু-দৃষ্টি লোলুপ-রসনা লইয়া সে তেমনি করিয়াই ফিরিতেছিল। এই শ্রাদ্ধের চৌদ্দ বৎসর পর সে একদিন শ্রামাদাস বাবুর পায়ে আসিয়া গড়াইয়া পড়িল। শ্রামাদাসবাবু তাহার দুই বৎসরের পৌত্রকে কোলে করিয়া শুষ্ক অশ্বখ তরুর মত পাড়াইয়া ছিলেন।

চক্রবর্তী তাঁহার দুটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, পারব না বাবু, আমি পারব না।

শ্রামাদাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—না পারলে উপায় কি, চক্রবর্তী! আমি বাগ হ'য়ে তার আদ্বের আয়োজন করছি, কচি মেয়ে তার বিধবা স্ত্রী আদ্ব করতে পারবে, আর তুমি পারব না বললে চলবে কেন, বল? দশ বিঘে জমি তুমি এতেও পাবে।

শ্রামাদাসবাবু বংশধর শিশু-পুত্র ও পত্নী রাখি মারা গিয়াছে—তাঁহারই আদ্ব হইবে।

চক্রবর্তী নিরুপায় হইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল।

আদ্বের দিন, গোশালায় বঁসিয়া বিধবা বধু পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল।

পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।

একটা গ্রাস মুখে তুলিয়াই চক্রবর্তী থক থক করিয়া কাশিতে কাশিতে আঁহা শব্দ করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

জল, জল, জল। পিণ্ডি বৃকে লোগেছে—জল, জল।

পুরোহিত চীৎকার করিয়া উঠিল।

পূর্ণ চক্রবর্তী বিষ্ণু তাহাতেও মরিল না; তবে কিছু দিনের মধ্যেই তাহার সোজা দীর্ঘ দেহখানা কে বেন মচকাইয়া ভাঙিয়া দিল।

আর তাহার আহারে রুচি নাই—বলে সব তেতো।

লোক হাসিয়া গোপনে বলে, লোভী মরবে এইবার।

ভারতে কৃষির উন্নতি

ডঃ নীলরতন ধর

ভারতবর্ষ কৃষিপ্ৰধান দেশ। অধিকাংশ লোকেরই জীবিকানির্ব্বাহ কৃষিধারা হয়। তথাপি ভারতের কৃষির অবস্থা শোচনীয়। অত্রান্ত দেশের সহিত বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের তুলনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হব। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশে গড়ে প্রত্যেক একরে গম ৭৮ মণের অধিক জন্মায় না। যে-সব অঞ্চলে খাল বেটে বিশেষ ভাবে সিঞ্চন করা হয় সেখানেও ১১ হইতে ১৩ মণের অধিক গম কিছুতেই উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বেলজিয়ামে প্রতি একরে ২৬ মণ ও ইংলণ্ডে ২৪ মণ গম জন্মায়। এমন কি খান, যার চাষ ভারতে অত্রান্ত সব শস্তের চেয়েও অধিক, তাও অত্রান্ত দেশে ভারতের তুলনায় অনেক অধিক উৎপন্ন হয়। ভারতে ধান প্রতি একরে জন্মায় ১০০০ পাউণ্ড, জাপানে ৩০৪০ পাউণ্ড ও মিশরের যে-সব স্থলে নীলনদ থেকে খাল কেটে সেচন করে ধানের চাষ করা হয় সেখানে ২৮০০ পাউণ্ড।

আহমদাবাদ, বম্বে, সুরাট প্রভৃতি স্থানে তুলা উৎপন্ন হয়। দাক্ষিণাত্যের “ব্ল্যাক কটন সয়েল” তুলা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সেই কারণে সেখানে তুলার কল অনেক আছে। আহমদাবাদে ৮২টি কাপড়ের কল আছে। সেখানে গিঘে সেগুলি তুলনা করে দেখবার আমার সুবিধা হয়েছিল। ‘ক্যালিকো’ মিলের স্বত্বাধিকারী অম্বালাল সাবাভাইয়ের সহিত দেখা হয়েছিল। তাঁহার কলে আগেকার জোলারাই বেশী কাজ করে। তিনি আক্ষেপের স্বরে বলেন যে, তাঁহার কলের জন্য শতকরা ৯০ ভাগ তুলা বিদেশ—আফ্রিকা, মিশর ও আমেরিকা—থেকে আনাতে হয়। ইহার একমাত্র কারণ যে ভারতের ভূমির তুলা-উৎপাদিকা শক্তি অত্রান্ত দেশের তুলনায় অনেক কম। ভারতে একর-প্রতি ৮৭ পাউণ্ড তুলা জন্মায়, কিন্তু মিশরে ২৭৮৩ ও জাপানে ৩০৪০ পাউণ্ড।

তার পরে নেওয়া যাক আগের চাষ। সরকার কর্তৃক

সংরক্ষণ (প্রোটেকশন) প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষে এখন অনেকগুলি চিনির কল স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩১ সালে মাত্র ১০১২টি চিনির কল ছিল, কিন্তু এখন ১০৮টি। ভারতীয় মিলগুলি এখন সমগ্র ভারতবাসীর চিনি জোগাচ্ছে। কিন্তু ১৯৪৬ সালে যখন এ সংরক্ষণ আর থাকবে না তখন ভারতীয় চিনির অবস্থা এইরূপই থাকবে কিনা তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ ভারতবর্ষের চেয়ে জাভা ইত্যাদি স্থানে আকের চাষ অনেক ভাল হয়। ভারতবর্ষে প্রতি একর থেকে ২৪০০ পাউণ্ড চিনি পাওয়া যায়, কিন্তু জাভায় ১২০০০ পাউণ্ড ও হাওয়াই-হীপে ১২০০০ পাউণ্ড। কোথায় যে গলদ, তা বোঝা যায়। স্বপ্নেও আমরা এর সমকক্ষ হ'তে পারি ব'লে ত মনে হয় না।

সাধারণতঃ স্থল সবল ভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে প্রত্যেক মানুষের ২ একর ভূমির উপর ফসলের প্রয়োজন। ফ্রান্সে এক-এক জনের ভাগে ২'৩ একর ও আমেরিকাতে ২'৬ একর পড়ে। তাই তারা স্বাস্থ্যে এত উন্নত। কিন্তু ভারতে প্রত্যেকের ভাগে পড়ে মাত্র ০'৭৫ একর। এর একটা কারণ ভারতের লোকসংখ্যা এত বেশী এবং এত দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে—মাত্র দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ৪ কোটি (সমগ্র ইংলণ্ডের জনসংখ্যা মোট ৩ কোটি ৭০ লক্ষ)। কিন্তু কবিত ভূমি বৃদ্ধি পায় নি। তাই পূর্বে লোকপিছু ১ একর ভূমি ছিল; আর এখন আরও শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। ভারতবর্ষে স্বাস্থ্য, ধারাপ। স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হ'লে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত পরিমাণে শস্ত উৎপাদনের দুটি উপায় :—

প্রথমতঃ জমিতে সার দিয়ে তার ফসল বাড়ান ও দ্বিতীয়তঃ যে-সব জমিতে চাষ হয় না বা হ'তে পারে না বৈজ্ঞানিক উপায়ে তার উর্বরতা-শক্তি বাড়িয়ে তাতে চাষ করা।

এক কালে আমাদের দেশ সত্যসত্যই স্বজলা স্বকলা ছিল। কিন্তু ক্রমাগত চাষ ক'রে এখন অবস্থা অনেক ধারাপ হয়ে গেছে। আমাদের মত এখন সে-সব জমিরও খাদ্যের প্রয়োজন। আমরা যা খাই তার মধ্যে অধিকাংশ বস্তুতেই কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে চিনি। চিনিতে একটু জল মিলিয়ে

তাতে সালফিউরিক এসিড ঢাললেই পরিষ্কার বোঝা যাবে চিনিতে কয়লা বা কার্বন আছে, কারণ এই প্রক্রিয়ার পর কয়লা প'ড়ে থাকে এবং প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প নির্গত হয়। ভাত বা আলু বা গুড়ের সহিত ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। আমরা যে-সব বস্তু খাই বায়ুর সঙ্গে তার কার্বন মিলিত হয়ে তাপ বা শক্তি দেয়। এই শক্তি থেকেই আমরা কাজ করতে পারি; এবং পরিশ্রমের পর শ্রান্তি অল্পভব করলে পুনরায় শক্তি আহরণের জন্য আমাদের খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। এর সমতুল্য বলা যেতে পারে কয়লা পুড়িয়ে জাহাজ চালান। বেগবৃদ্ধি কয়লা বেশী পুড়িয়ে করা যায়, কারণ তাতে শক্তি বেশী পাওয়া যায়। আমরা যখন নৌড়াই বা পরিশ্রম করি তখন আমাদের শক্তির বেশী অপচয় হয় এবং সেই জন্যই বেশী ক্ষুধা পায়।

নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি অঞ্চলে বৈজ্ঞাতিক শক্তি শিল্পে ও বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়—কয়লা পুড়িয়ে নয়।

বাতাসে মুখ্যতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন আছে। শক্তি প্রয়োগ ক'রে এই দুটিকে মিলিত ক'রে নানা প্রকারের উপযোগী ও উপকারী দ্রব্য প্রস্তুত করা যায়। ক্ষেত্রের সার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, সোরা ইত্যাদি এইরূপে প্রস্তুত করা যেতে পারে। ইংলণ্ডেও বৈজ্ঞাতিক শক্তি দ্বারা বায়বীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এবং জলের হাইড্রোজেন মিলিত ক'রে এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। সেখানে এ-সব কাঁচের জন্য প্রতি ইউনিট বৈজ্ঞাতিক শক্তি এক পয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু এলাহাবাদে প্রতি ইউনিট তিন আনা। হুতরাং এ-সব অঞ্চলে ইহা ব্যয়সাধ্য নহে। অথচ ভারতের ভূমি অল্পবর্ষ এবং সারের প্রয়োজন বেশী।

মানবদেহের জন্য নাইট্রোজেনের আবশ্যক কিন্তু বাতাসের নাইট্রোজেনে মানুষের কোনও লাভ হয় না। সেই জন্যই নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ খাদ্য বা প্রোটিন অপরিহার্য। ডাল, ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে কিন্তু এই সব উদ্ভিদ-প্রোটিনে মস্তিষ্ক-বৃদ্ধি বিশেষ হয় না। মানসিক উন্নতির জন্য জৈব প্রোটিন খাওয়া উচিত। জৈব প্রোটিন-ঘটিত পদার্থ—দুধ, দধি, মাংস, মৎস্য, ডিম ইত্যাদিতে বৃদ্ধি-বৃদ্ধি হয়। জগতের বুদ্ধিমান জাতিমাত্রই এ সব জিনিষ খেয়ে থাকে। মানুষের মত গাছের জন্যও

নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস, লৌহঘটিত পদার্থ ও চূণ চাই।

ভারতবর্ষের জমিতে ফস্ফরাস, চূণ ও লৌহঘটিত পদার্থের অভাব নেই কিন্তু নাইট্রোজেনের বিশেষ অভাব আছে। ভারতের জমিতে মাত্র শতকরা ০.০৫ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে আছে শতকরা ০.১৫ ভাগ। এই নাইট্রোজেন সোরা বা অ্যামোনিয়াম সল্টসে আছে।

ইউরোপে নানা স্থানে যুক্ত-নাইট্রোজেনের কারখানা আছে। কারণ যুদ্ধের সময় বিস্ফোরক ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য এইগুলির একান্ত আবশ্যিক। যুক্ত-নাইট্রোজেন যুদ্ধের রক্তমাংসের মত। এই প্রকারের কারখানা যে-দেশে বর্তমান আছে আধুনিক কালে সেই দেশকেই তত সমৃদ্ধিশালী ও সভ্য জ্ঞান করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সমগ্র ভারতে এইরূপ একটিও কারখানা নেই যেখানে যুক্ত-নাইট্রোজেন প্রস্তুত করা হয়।

নানা গবেষণার দ্বারা আমরা শুধু থেকে এই নাইট্রোজেন জমির জন্য পাবার সন্ধান পেয়েছি। ভারতে কাপড়ের ব্যবসা সবচেয়ে বেশী, তার পরেই চিনি (অজান্ত্র দেশে প্রথম লৌহ, তার পর কয়লা ও যুক্ত-নাইট্রোজেন)। এই চিনির কলগুলি থেকে অনেক মাংগুড় পাওয়া যায়—যা থেকে আর চিনি প্রস্তুত করার কোনও কল ভারতে নেই। সুতরাং সেগুলি নষ্টই হয়। এরূপে মাংগুড়ে প্রায় দশ কোটি টাকা চিনি প্রতি বৎসর নষ্ট হয়। অথচ এই মাংগুড় দিয়েই আমরা ভূমির উৎকর্ষ সাধন করেছি। এই শুধুই ভূমিকে শক্তি দেয়। ও দেশে বিদ্যুৎ থেকে শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের সেই শক্তিকে পেতে হবে শুধু জালিয়ে।

কতকগুলি পরীক্ষার দ্বারা এই-সব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপলব্ধি সহজে করা যায়। কোনও একটি ম্যানুয়াল সল্টে কষ্টিক সোডা দিলে প্রথমে সাদা রং দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ক্রমশঃ লাল রং হতে থাকে। লৌহঘটিত কোনও বস্তুতে কষ্টিক সোডা দিলেও ধীরে ধীরে রঙের পরিবর্তন হয়—সবুজে থেকে বাদামী। এইরূপ পাইরোগ্যালিক অ্যাসিড ও কষ্টিক সোডা মিশ্রিত হলে ক্রমশঃ রং কালো হয়ে যায়। এই সকল বস্তু

সহজেই বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় ও তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, সেই জন্যই ক্রমশঃ রঙের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু চিনি এরূপ পদার্থ নহে। ইহা সহজে কোনও মতেই বায়ু থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। যেমন টার্টারিক অ্যাসিড সহজে অক্সিজেন নেয় না ও হাইড্রোজেন পারক্সাইডের সহিত সংমিশ্রণে বোনও প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। অথচ সামান্য মাত্রাতে যদি কোনও লৌহঘটিত পদার্থ দেওয়া যায় তৎক্ষণাৎ প্রক্রিয়া দ্রুতবেগে আরম্ভ হয়। রক্তেও লৌহঘটিত দ্রব্য আছে এবং এইরূপেই এই দ্রব্যের সাহায্যে চিনি অক্সিজেনের সহিত দেহপ্রাক্তরে মিশ্রিত হয়। মাটিতে লৌহ থাকায় শুষ্ক দিলে ঠিক এইরূপেই বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হতে পারে।

আলোক দ্বারাও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশে সূর্যরশ্মি প্রচুর এবং সেই কারণেই আমাদের রং কালো। কিন্তু এই সূর্যরশ্মির জন্যই অনেক ক্ষতিকারী জীবাণু ধ্বংস হয় এবং আমাদের দেশে শীতপ্রধান দেশের চেয়ে রিকটস, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া ও অজান্ত্র কয়েকটি রোগ কম হয়। সূর্যরশ্মির সাহায্যে মাংগুড়ের সহিত বায়ুর প্রক্রিয়া হয়, এবং তাহা হইতে শক্তি উৎপাদিত হয়। ভারতে প্রতি বৎসর ২,০০,০০০ টন চিনি প্রস্তুত করা হয় এবং চিনির কারখানা থেকে পাঁচ ছয় লক্ষ টন মাংগুড় পাওয়া যায়। জমিতে মাংগুড় দিলে দু-এক মাসেই যুক্ত-নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় সুতরাং জমির ফসল-উৎপাদিকা শক্তিও বাড়ে। এমন কি ইংলণ্ড ইত্যাদি দেশের মত ফসলা ভূমি করা যান। যেখানে পূর্বে মাত্র ৭৮ মণ ধান প্রতি একরে পাওয়া যেত, এখন সেখানেই ১৩১৫ মণ পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে অনেক লবণাক্ত ভূমি আছে (এ অঞ্চলে যাকে “উসর” বলে)। কেবল মাত্র সমুদ্র প্রান্তেই ৪০,০০,০০০ একর এরূপ ভূমি আছে। এই ক্ষার বা সোডা অম্লকরতার একটি প্রধান কারণ। কেনফ্যালিন-এর সহিত সংমিশ্রণ হলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, উর্বর ভূমিতে ক্ষার নেই এবং যে-ভূমি যত অম্লকর ক্ষারও তাতে তত বেশী; কারণ কেনফ্যালিন যোগে তত ঘন-লাল রং দেখা যায়। কিন্তু এই ক্ষারবৃত্ত জমিতে শুধু দিয়ে তার পর কেনফ্যালিন দিলে দেখা যায় যে,

ঠিক উর্বর ভূমির মতই কোনও রং হয় না, অর্থাৎ ক্রাব বিনষ্ট হয়ে যায়। গুড় ব্যতীত খোল দিলেও ক্রাব নষ্ট করা যায়। তাই ভারতবর্ষের যে-সব অঞ্চলে চিনির কল নেই এবং গুড় নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য সে-সকল স্থানে খোল ব্যবহার ক'বে জমি উর্বর করা যায়।

আমরা সোঁরাও-এ ধারাপ জমিতে গুড় দিয়ে ধানের চাষ করতে সফল হয়েছি। পূর্বে জমি এত ধারাপ ছিল যে ঘাস পর্যন্ত জন্মাত না। মহীশূরে অল্পবর্ষ ভূমিতে এক একরে ১ টন গুড় ঢেলে ১২০০—১৮০০ পাউণ্ড ধান

পাওয়া গেছে। মহীশূর-সরকারের চিনির কল আছে। এই কলের লোকেরা সমস্ত ক্রাবযুক্ত জমি উর্বর ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছেন। তাঁরা এ বৎসর ১০০ একর ক্রাবযুক্ত জমি গুড় দিয়ে উর্বর করছেন।

হুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষে কবিত ভূমির উন্নতি জমিতে গুড় ঢেলে করা যায় এবং ভারতবর্ষীয় অল্পকষ্ট-সমস্তার এইরূপে কিয়ৎ পরিমাণে উপশম ঘটতে পারে।*

* প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গসাহিত্য-পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা। সম্পাদক শ্রীদিবেন্দ্রমোহন কর কর্তৃক অনুলিখিত।

কাঠধংসী ছত্রাক—‘পলিপোর’

ডক্টর সহায়রাম বসু

‘পলিপোর,’ বেসিডিওমাইসেটিস্ জাতীয় এক প্রকাব ছত্রাক। ইহারা মোটর গাড়ীর কাঠনির্মিত অংশ ও গৃহের কড়ি, বরগার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ‘পলিপোর’ ছত্রাকের নিম্ন পৃষ্ঠে অসংখ্য ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল ছিদ্র হইতে যথেষ্ট পরিমাণ স্পোর (spores) নির্গত হইয়া থাকে। বহুছিদ্রবিশিষ্ট বলিয়াই ইহাদের ‘পলিপোর’ নাম দেওয়া হইয়াছে।

বৃক্ষপত্রাঙ্কিত ‘ক্লোবোফিল’ বা সবুজ-কণিকা যেমন তাহাদের পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে, ছত্রাকের দেহে সেরূপ কোন সবুজ-কণিকার অস্তিত্ব নাই; কাজেই উপযুক্ত খাদ্য আহবণের জন্য তাহাদিগকে বৃক্ষদেহ আশ্রয় করিতে হয়। দেহগঠনোপযোগী গাণ্ড নির্মাণ করিতে পারে না বলিয়াই ইহারা পরনির্ভরশীল। খাদ্য আহরণের প্রকার-ভেদে ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সরল ছত্রাক সজীব উদ্ভিদের দেহ হইতে খাদ্য আহরণ করে তাহাদিগকে পরজীবী বল হয়; আব বাহ্যরা মৃত উদ্ভিদ-জাত দ্রব্য হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদিগকে গলিত-ভোজী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ‘পলিপোর’

জাতীয় ছত্রাকের বেশীর ভাগই গলিত-ভোজী। অবশ্য, পরজীবী ছত্রাকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। ইহারা সাধারণতঃ ক্ষত ভোজী এবং বৃক্ষকাণ্ডের কর্ণিত অংশে প্রবেশ করিয়া আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। ‘পলিপোর’ জাতীয় ছত্রাক সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ ও কঠিন হইয়া থাকে। সময় সময় ইহাদের কোন কোনটির ওজন ৩০-৪০ পাউণ্ডেরও অধিক হইয়া থাকে। সময় সময় ইহাদিগকে পুরাতন বৃক্ষের কাণ্ডে বা শাখার গায়ে বড় বড় ‘ব্রাকেট’র মত সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায় (১নং চিত্র)। গাছ সকল অবস্থাতেই ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। তবে পরিণত বয়স্ক গাছের পক্ষেই ছত্রাকের আক্রমণ বিশেষ ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ শিকড়ের উপর আক্রমণেই বেশী অনিষ্ট হইয়া থাকে।

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে ‘পলিপোর’ের জীবনেতিহাস-সম্পূর্ণক উদ্ভিদের জীবনেতিহাসেরই প্রাক্কর। সম্পূর্ণক উদ্ভিদের উৎপত্তির সময় বীজের ভিতর হইতে যেমন অল্পর উদগম হয়, পলিপোরেরও তেমন এক একটি অতি ক্ষুদ্র কোষ বা-রেণু প্রথমে ‘টিউব’ বা নলাকার ধারণ করে। এই নল

ক্রমশঃ পাখা-প্রশাখা বিস্তার কবিতা অতি সূক্ষ্ম সূত্র-গুচ্ছের সৃষ্টি করে। এই সূত্রগুলিই ছত্রাকের পোষকাংশ। ইহা-দিগকে ছত্রাক-সূত্র বলা হয়। ইহারা সবুজ উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পত্রের জ্বায় কার্য করিয়া থাকে। কিছুকাল পরে যখন এই ছত্রাক-সূত্র গাছের বা কাঠের তন্তুতে সম্পূর্ণভাবে নিজেব আধিপত্য বিস্তার কবিতা লম্ব এবং তথা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী আহরণ করিতে থাকে তখন ‘পলিপোব’ সবুজ উদ্ভিদের পুষ্পেব মত গাছের বা কাঠেব বহির্দেশে ফলাবয়বের সৃষ্টি করে। পুষ্পেব ভিতর হইতে যেমন বীজের উৎপত্তি হয় সেরূপ এক একটি পরিপক ফলাবয়ব হইতে অসংখ্য রেণু বা বীজকোষ নির্গত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কখনও কখনও আশ্রয়দাতার বহির্দেশে অথবা তন্তুর অভ্যন্তরে আর এক প্রকার রেণু উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সময়ে সময়ে কতকগুলি সূত্রগুচ্ছ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পৃথক হইয়া গড়ে এবং নূতন ছত্রাক-বংশ গড়িয়া তোলে।

বৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, শাল, সেগুন, পাইন প্রভৃতি গাছক ছত্রাকের অনিষ্টকর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ইহাদের আক্রমণের ধাৰা, আক্রমণের শেষ পরিণতি কিরূপ, কিরূপে ইহাদের প্রসার প্রতিরোধ করা যায়, গাছেব সাধারণ গঠন এবং কোন অঙ্গ বিশেষ করিয়া আক্রান্ত হই-ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে।

গাছের কাণ্ডের, পাখাপ্রশাখার ও শিকড়ের প্রান্তভাগে ও অভ্যন্তরস্থ কাঠের মধ্যস্থলে নির্মকন্তব নামে নিয়ত বর্দ্ধনশীল অতিসূক্ষ্ম কতকগুলি কোষ সমষ্টি আছে। ইহাদের সাহায্যে গাছ দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে-বাড়িয়া থাকে। পাখাপাশিভাবে গুঁড়ি ছেদ বরিলে তাহার অভ্যন্তরে কতগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। নির্মকন্তবের সাহায্যে প্রস্থে বর্দ্ধিত হইবার ফলে প্রত্যেক বৎসরে এক একটি নূতন স্তরের সৃষ্টি হয়। রেখাগুলি এই বৃদ্ধির পরিচায়ক। এই রেখার সাহায্যে বৃক্ষের বয়স নিরূপিত হয়। কয়েক বৎসর পরে অতি পুৰাতন রেখাগুলির কোষসমূহ মরিয়া যায় এবং কোষগুলির রং পরিবর্তিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহাই অন্তঃকাঠ বা (সার কাঠ) নামে পরিচিত। ইহার বাহিরের সজীব স্তব-সমূহেব রসবাহী কাঠ নামে অভিহিত করা হয়।

‘পলিপোর’ ছত্রাক, বৃক্ষের মূল বা কাণ্ডের ক্ষতস্থান দিয়া

ভিতরে প্রবেশ করে। ট্রপ (F. S. Troup: *Indian Forest Utilization*, 1907) বলিয়াছেন, ভারতবর্ষেব যে-সব পরজীবী ছত্রাক শিকড় ভেদ করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে প্রবেশ করে তাহাদের মধ্যে ‘ফমিস্ এনোসুস্’ (*Fomes anposus*) সর্বাধিক ক্ষতিকর। ইহারা বৃক্ষকাণ্ডের নীচের দিকে কাঠস্তরকে প্রথমে আক্রমণ করে। এইরূপ আক্রমণের ফলে হিমালয় অঞ্চলেব বহু দেবদারু ও শিশু বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। কাণ্ড আক্রমণকাবী বিভিন্ন ছত্রাক বিভিন্ন বৃক্ষের অন্তঃকাঠ আক্রমণ কবিতা কাণ্ডগুলিকে ফাঁপা নলে পরিণত করিয়া ফেলে। গাছ কাটিয়া কাঠে পরিণত করিলে অধিকাংশ ‘পলিপোরের’ই ধ্বংসক্রিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না। ছত্রাকের আক্রমণে অন্তঃকাঠ অপেক্ষা রসবাহী কাঠই সহজে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। রসবাহী কাঠের কোষগুলিতে এমন কোন পদার্থ থাকে যাহা খাদ্যরূপে আক্রমণের পক্ষে সুবিধাই করে কিন্তু অন্তঃকাঠে হৃত এমন কোন বিযাক্ত পদার্থ থাকে যাহা আক্রমণ-প্রতিরোধক।

ছত্রাকাক্রান্ত কাঠের মোটামুটি বিশিষ্টতা হিসাবে দুই প্রকারের গলন দেখা যায়। এই প্রকার গলনকে রংগের প্রকারভেদে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যেমন, শ্বেত গলন ও বাদামী গলন। প্রথম শ্রেণীর গলনে কাঠের রং অনেকটা ফিকে হইয়া যায় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গলনে কাঠের রং স্বাভাবিক বং অপেক্ষা কালো বা লাল বাদামী বং ধারণ করে। প্রথম শ্রেণীর গলনে কাঠের উপরিভাগ স্থানে স্থানে সাদা হইয়া যায়, অথবা সমস্ত কাঠের রং-টাই ফিকে বর্ণে পরিণত হয়। যে সব ছত্রাক হইতে শ্বেত গলনের উৎপত্তি হয় তাহাবা সাধারণতঃ কাঠের দারুকে (lignin) আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু যে-সব ছত্রাক বাদামী গলনের সৃষ্টি করে তাহারা কাঠের তোলিকের (cellulose) উপরেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে, ফলে কাঠেব উপর কতকগুলি বাদামী খণ্ডের সৃষ্টি হয়, অথবা কাঠেব গায়ে লম্বা লম্বা ফাটলের উৎপত্তি হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পলিস্টিক্টাস্ ভার্সিকলার (*Polystictus versicolor*) সাধারণতঃ বেশী এবং এরা শ্বেত গলন সৃষ্টি করিতে খুব মজবুত।

• বত দিন না এই ছত্রাক সমস্ত কাঠের ভিতর বেশু ভাল

ভাবে প্রসার লাভ করিতে পারে তত দিন ‘পলিপোরের’ ফলোদগম হয় না। অবশ্য আলোর উপরেও ইহা অনেকটা নির্ভর করে। ‘পলিপোরের’ আক্রমণের সাধারণ বীতি এই যে, যখন সজীব রেণুগুলি স্যাংসেঁতে কাঠের গায়ে পড়ে তখন বাতাসের সংস্পর্শে ভিজ্রা ও দ্রবদ্রব্য জমিতে বীজের অঙ্কুরোদগমের মত তাহাদেরও গাত্র হইতে বহুসংখ্যক সূত্রাণুচ্ছের উদগম হয়; এইগুলিকে সূত্রাণু (hyphae) বলা হয়। এই সূত্রাণুগুলি হইতে অনেক শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া কাঠের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা প্রথমতঃ কাঠের ভিতরকার অগণিত কোষ হইতে খাণ্ডদ্রব্য আহরণ করে। তার পর এই সূত্রাণুগুলির বর্দ্ধনশীল অগ্রভাগ হইতে এক প্রকার পাচকরস নিঃসৃত হইয়া কোষের আবরণগুলিকে দ্রবীভূত করে ও শেষে ঐগুলিকেই ইহারা খাণ্ডসমগ্ররূপে ব্যবহার করে। এইরূপে ইহারা সরাসরিভাবে কোষাবরণ ভেদ করিয়া কিংবা কোষাবরণের কোন স্বাভাবিক গর্ভ বা ছিদ্র দিয়া অগ্রসর হয়। কিক্সিম্যাক্স আল্ বা স্যাংসেঁতে স্থান ব্যতিরেকে ছত্রাক জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই কাঠখানি যখন কিক্সিদধিক মাত্রায় আল্ হইয়া পড়ে তখনই সকল রকমের শুষ্ক গলনের আক্রমণ শুরু হয়। যে-সব ছত্রাক বেশী রকমের শুষ্ক অনিয়ন করে তাহাদের মধ্যে মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্, পোরিয়া ইনক্রাসেটা, পোরিয়া ভেপোরেরিয়া নাম উল্লেখযোগ্য।

কার্টরাইট (K. St. G. Cartwright) এর মতে ইংলণ্ডের গৃহকাঠাদির শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ ক্ষতি একা মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্-এর দ্বারাই সাধিত হয়। অবশ্য, এটা স্থলের বিষয় যে আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অত্যধিক তাপ হেতু এই ছত্রাক জন্মায় না। কার্টরাইট ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে প্রাকৃতিক ভগ্নিতে সাধারণ অবস্থায় প্রধানতঃ মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্ জন্মায় না। মাল্লব ও তাহার কার্যকলাপের সঙ্গে এই ছত্রাক বিশেষভাবে জড়িত। কার্টরাইটের মতে তাহার কারণ এই যে গৃহনির্মাণের জায়গাতেই ছত্রাক জন্মাবার পক্ষে সবচেয়ে অল্পকাল অবস্থা বর্তমান। কেননা, সেখানে অনেক কাদামাটি সুপাকার করা থাকে কিংবা অনেক গর্ভ থাকে যেগুলি জলে ভাস্তি হইলে জল-সীমানা জন্মের উপরি-

ভাগের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। ‘এই সব স্থানে কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে শুষ্ক গলনের আক্রমণ (২ নং চিত্র) এক রকম অনিচ্ছিত। বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক সময় খুবই ফলপ্রসূ হয়, কিন্তু সেই বায়ুর ভিতরে যদি অত্যধিক জলীয় অংশ থাকে তাহাতে আরও অধিকতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে হামফ্রি (C. J. Humphrey) উল্লেখ করিয়াছেন যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে মেরুলিয়াস্ (Merulius) প্রেণীর ছত্রাকের চেয়ে পোরিয়া ইনক্রাসেটা (Poria incrassata)-ই সবচেয়ে বেশী অনিষ্টকারক।

পোরিয়া ইনক্রাসেটা ও মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্-এর কৃত ধ্বংস অনেকটা একই রকমের এবং সেই ক্ষেত্রেই এই দুই ছত্রাকের মধ্যে অনেকে গোলমাল করিয়া ফেলেন। তার আরও কারণ এই যে মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্ প্রায়ই অফলা অবস্থায় পাওয়া যায়। ঠিক মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্-এর মত ভিজ্রা ও ঠাণ্ডা জায়গায় কাঠের উপর ইহার আক্রমণ শুরু হয়—বিশেষতঃ যে সব কাঠ মেঝের নীচে মাটির সহিত মিশিয়া আছে, অথবা মাটির কিক্স উপরে আছে। আলাবামা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৮ নং সাকুলারে ডাঃ হামফ্রি পোরিয়া ইনক্রাসেটার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্বচ্ছ চূড়ান্তভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং উদাহরণ-স্বরূপ একটি সুন্দর রঙীন চিত্র ও কতকগুলি আদর্শ চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। পোরিয়া ইনক্রাসেটার রেণুগুলির রং কালো-সবুজবর্ণ (কতকটা ধূসর ধরণের), কিন্তু মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্-এর রেণুগুলির রং লোহার মরিচার রঙের মত লাল। এ ছাড়া দুইয়ের পরিণত ফলাবয়বের রঙের মধ্যেও বিশেষ তারতম্য আছে। পোরিয়া ইনক্রাসেটার পরিণত ফলাবয়ব বাদামী অথবা তাহা হইতে কিছু গাঢ় হয়; কিন্তু মেরুলিয়াস্ ল্যাক্সিম্যানস্-এর ফলাবয়বের রং গন্ধকের মত হলদে, অথবা তাহাতে বেগুনী রঙের আভাও কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পোরিয়া ভ্যাপোরিয়া যে প্রকার ধ্বংসের সৃষ্টি করে তাহা মেরুলিয়াস্-জনিত ধ্বংস হইতে অভিন্ন, কিন্তু ইহার ফলাবয়ব সম্পূর্ণ অল্প রকমের ও তাহাতে গন্ধকের মত হলদে অথবা ছাইয়ের

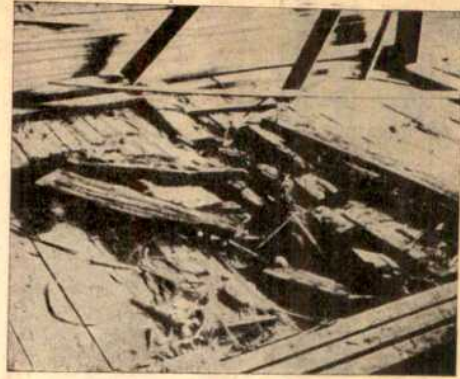


১ নং চিত্র—বৃক্ষের কাণ্ডে সংলগ্ন 'ব্রাকেটের' মত বড় বড় ছত্রাক

মত ধূসর রং নাই, এবং ইহার রেণুগুলিও বর্ণহীন। এই ছত্রাক ইংলণ্ডে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার জন্মাইলে ইহারা বোধ হয় মেরু-লিয়াসের মতই ধ্বংসকারী হয়।

অগভীর স্যাংসেতে খনিই ছত্রাকের জন্মের ও বংশ-বিস্তারের সুবিধাজনক স্থান। সেইখানকার তাপের সমতা ও বাতাসের আর্দ্রতা ছত্রাকের বংশ-বিস্তারের পক্ষে একান্ত অনুকূল। সেইখানে কাষ্ঠধ্বংসকারী ছত্রাক প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া এক অতি চমৎকার দৃশ্যের সৃষ্টি করে। ছত্রাকের এইরূপ বৃদ্ধিতে যদি বাধা প্রদান করা না হয় তাহা হইলে ছত্রাকসূত্রগুলি একটি গভীর জাল রচনা করে এবং আলোর অভাব হেতু সেখানে সকল প্রকারের অস্বাভাবিক আকার জন্মাইতে দেখা যায়। আশ্চর্য্যরূপ ক্ষিপ্ৰগতিতে পোষকাংশ বৃদ্ধির ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং ইহার জন্ত খনির কাঠের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহা নিতান্ত কম নহে। এনেলিস্ মাইকোলজিসি ৩০ ভাগে (১৯৩৩ সাল) এলবার্ট পিলা প্রাগ্ দেশে ১১৪ কিলোমিটার লম্বা ভাইন-বারগার রেল-স্ট্রডের অন্ধকারে পোরিয়া আণ্ডেটা নামক একটি ছত্রাকের পোষকাংশের এরূপ প্রচুর বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রেলরাস্তার কাঠ ও অগ্ন্যস্ত্র কাঠের উপর প্রথমে আক্রমণ শুরু হইয়া এখন সমস্ত স্ট্রডের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কি উপায়ে এই আক্রমণের গতিরোধ করা যায় তাহা একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোটরগাড়ী ও অগ্ন্যস্ত্র যানবাহনাদিতে সাধারণতঃ

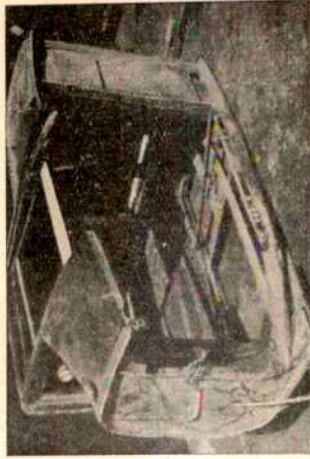
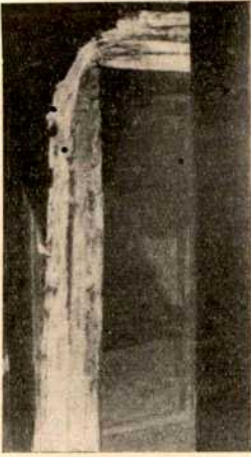


২ নং চিত্র—গৃহকাঠে শুষ্ক গলনের আক্রমণ



৪ নং চিত্র—ছত্রাকের আক্রমণ হইতে নিরুতি পাইবার জন্ত গাছে আর্সেনিক প্রয়োগ

যে সকল কাঠ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তাপযুক্ত জলীয় আবহাওয়ার পক্ষে নিতান্ত অসুপযোগী। গাড়ী বারং বারে ধুইবার সময় কিংবা বৃষ্টির সময় বন্ধ দরজা ও জানলায় জলের ছিটা লাগিয়া কাঠের ভিতর অনায়াসেই জল প্রবেশ করে; তাহার ফলে খুব সহজেই কাষ্ঠধ্বংসকারী ছত্রাকের আবির্ভাব হয়। সেই জন্ত গাড়ীগুলিতে এ দেশে আসিবার পরেই এইরূপ আক্রমণ শুরু হয়। (৩ নং চিত্র) আমার বন্ধু-ছত্রাকবিৎ ডাঃ হরপ্রসাদ চৌধুরীর সৌজন্যে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় একটি ছাদ-আঁটা মোটরগাড়ীর ভিতরের



৩ নং চিত্র—মোটরগাড়ীর কাঠ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত

বসিবার জায়গার পিছন হইতে এবং ১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে লাহোর হইতে প্রেরিত আমি পোলিষ্টিক্টাস্ স্মাদুইনিয়াস্ এবং ইরুপেক্স (Irpex) নামক ছত্রাকের দুইটি ফলাবয়ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ১৯৩১ সালে ফিলিপাইন্স হইতে ডাঃ হাম্ফ্রি গাড়ীর কাঠের উপর ফলোৎপাদনকারী তিনটি বিভিন্ন প্রকারের ‘পলিপোরের’ কথা আমাদের জানাইয়াছেন, যথা লেঙ্গ্যাইটিস্ স্ট্রিয়েটাস্, পোলিষ্টিক্টাস্ স্মাদুইনিয়াস্ ও ট্র্যামিটিস্ ভাসেটিলিস্। এরা সকলেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে। তিনি ছত্রাকের দ্বারা এইরূপ ক্ষতি নিবারণের দুই প্রকার পদ্ধতি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পদ্ধতি হইতেছে, মোটরগাড়ী-নিৰ্মাতা ব্যবসায়ীদের পক্ষে একান্ত টেকসই কাঠ বাছাই করিয়া তাহার অন্তঃকাঠ হইতে গাড়ীর দেহ নিৰ্মাণ করা। দ্বিতীয়টি হইতেছে, যদি সাধারণ কাঠই ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে সেই কাঠ ভেদ করিয়া ক্রিয়োজোট, জিঙ্ক ক্লোরাইড অথবা সোডিয়াম ফ্লুরাইড জাতীয় ছত্রাক-নিবারক কোন প্রকার পদার্থ তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া। আজ-কাল কতগুলি বিলাতী গাড়ীতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আব-হাওয়ার উপযোগী কাঠ ব্যবহার করা হইতেছে এবং সেই-গুলি আমাদের দেশের পক্ষে ভাল ফলই দিতেছে।

এই ব্যাধির আক্রমণের পূর্বেই প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কোন গাছ যদি একবার এই ভয়ঙ্কর শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে বাঁচান অতি দুর্লব ব্যাপার। অন্তঃগলন-উৎপাদনকারী ছত্রাক

একবার কোন গাছকে আক্রমণ করিলে সে গাছকে কিছুতেই বাঁচান যায় না। তাহা চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়।

সেই জন্তই চারাগাছ প্রস্তুতের ক্ষেত্র ও বাগিচার চারি-ধার যতদূর সম্ভব পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। ব্যাধিগ্রস্ত বৃক্ষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত বনের গাছগুলি খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন গাছে ছত্রাক প্রবেশ করে তাহা হইলে ইহা নিবারণের একমাত্র পদ্ধতি হইল—যতটা জায়গা ছত্রাকাক্রান্ত হইয়াছে তাহা হইতে দুই তিন ফুট নীচের কাঠ কাটিয়া সেই ছত্রাক সমূলে

বিনাশ করা এবং নীরোগ অংশের উপর ক্রিয়োজোট, জিঙ্ক ক্লোরাইড প্রভৃতি কোন জীবাণুনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করা ও তাহাকে শুষ্ক করা। ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পিয়ারসন্স ম্যাগাজিনে (Pearson's Magazine-এ, (নং ৪৭৭, পৃঃ ২৩৮-২৪৫) সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে প্রিন্সেস্ রিসবরোর (Prince's Risborough-র) বনবিভাগীয় পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করিয়া ছত্রাক নিবারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহারা ঘরের কাঠের মেঝেতে কৃত্রিম উপায়ে মেকলিয়াস্ লাক্রিম্যান্স নামক ছত্রাক রোপণ করিয়া আক্রান্ত কাঠে এই শুষ্ক গলন-জীবাণুনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা গবেষণাগারে একটি পরীক্ষামূলক শুষ্কগলনপ্রকোষ্ঠ নিৰ্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বিনাশকার্যের প্রধান অস্ত্রবিধা হইতেছে জীবাণুনাশক দ্রব্যকে কাঠের ভিতরকার ছত্রাকের দেহে প্রবেশ করান, কেননা, শুষ্ক কাঠের উপরে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করিলে কেবল উপরের ছত্রাকগুলিই ধ্বংস হয়। ঐ সমস্তার এখনও সমাধান হয় নাই, তবে তাঁহারা এতদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। উক্ত পরীক্ষাগারের ডিরেক্টর মিঃ পিয়ারসন্স যথার্থ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন যে “ইহা বহু সময়সাপেক্ষ।...আমরা কাঠের জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে যতই জ্ঞান লাভ করিতেছি ততই অশুভব করিতেছি যে আরও কতই না জানিবার আছে।” তাঁহারা শত্রুদিগকে দমন করিবার জন্ত গাছে অসৈনিক প্রয়োগ করিতেছেন। (৪ নং চিত্র)

হাজারিবাগে বাঙালী

শ্রীঅশোক চৌধুরী ও শ্রীকল্যাণী দেবী

বাঙালী যে সর্বদাই ঘরের কোণে বসে থাকত না, তা বাংলা দেশের বাহিরে প্রবাসী বাঙালীর সংখ্যা, প্রভাব এবং পূর্বকার প্রতিপত্তির ইতিহাস থেকে জানা যায়। বর্তমানে অবশ্য প্রাদেশিকতার চাপে অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীর

ভারত, এই রকমে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষকেই গ্রাস করে। ছোট-নাগপুর প্রদেশও বাদ পড়ে নি। তখন হাজারিবাগ সামান্য শহর। দেশীয় রাজা, নবাব এবং ভূস্বামীদের সঙ্গে কোম্পানীকে কম যুদ্ধ করতে হয় নি, এবং এমনি ধারা



সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

প্রসার কমে এসেছে এবং সেই কারণে নিজের দেশে গুঁতোগুতি করা ছাড়া উপায় নেই। এখন বাংলা দেশ থেকে লোক অন্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করা দূর থাকুক, হুদূর পঞ্জাব, রাজপুতানা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান থেকে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে অ-বাঙালীরা এসে দিন দিন বাংলা দেশ ছেয়ে ফেলছে।

ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনা আমাদেরই দেশে, এবং এই বাংলা দেশ থেকেই যেমন এই রাজত্ব ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীর প্রসারও তেমনই সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকার্যে এবং রাজনীতিতে বাঙালীর দানই সর্বপ্রথম, সেই রকম ব্রিটিশ রীতিতে আপিস, আদালত, স্কুল সমস্ত স্থানে ছড়িয়ে পড়াতে, বাঙালীই সর্বপ্রথম তাতে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং উচ্চপদ লাভ করে দেশ বিদেশে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা অধিকার করে ক্রমশঃ আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, তার পর উত্তর-



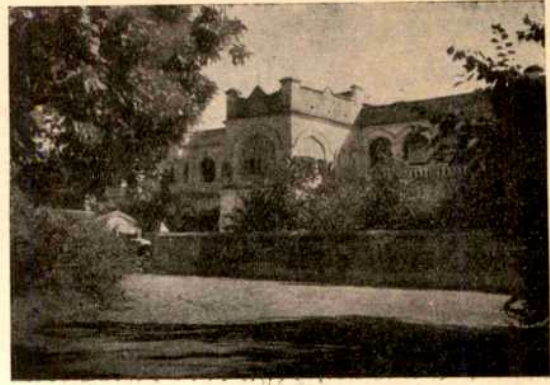
নববিধান-মন্দির

রামগড়ের রাজার সঙ্গে গোলমাল বেধেছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছোটনাগপুরের উত্তর ভাগটা—যেটাকে আজকাল হাজারিবাগ জেলা বলা হয়—সেটাকে রামগড় জেলা নাম দিয়ে বহুদিন পর্যন্ত বাংলা-সরকারের এলাকায় রেখেছিল—তখনও এ শহরের দিকে দৃষ্টি পড়ে নি।

১৮৩১ সালে বাঁধল কোল-বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন করবার জন্ত ক্যাপ্টেন টাইলারের অধীনে কলকাতা থেকে এক দল সৈন্য পাঠান হয়—এই সেনাদল রামগড়ের কাছে হাজারিবাগ শহরের সর্কাপেক্ষা পুরাতন পল্লী গুন্ডনীতে আস্তানা গাড়ে। এর পূর্বে ১৭৮০ সালে জায়গাটি উপযুক্ত দেখে এক ক্যাপ্টেনমেন্ট নির্মাণ করা হয় সমস্ত উত্তর-ছোটনাগপুরের শান্তি রক্ষা করবার জন্ত। ক্যাপ্টেনমেন্ট অবশ্য বহুদিন হ'ল তুলে দেওয়া হয়েছে, তার



বেলজিয়াম সেমিনারী



মেয়েদের সেট কলম্বাস হাসপাতাল

বাড়ী-ঘর প্রায় সব ভেঙে চূরে গেছে ; যা ছিল, তা মেরামত করে পুলিশ-ফৌজদারী কাজে ব্যবহার হচ্ছে।

সেই সময় ক্যান্টনমেন্ট সৃষ্টি হওয়াতে এই স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং মনোরম আবহাওয়া, ও স্বাস্থ্য-করতার প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টি পড়ে। কোল-বিদ্রোহের পর ১৮৩৩ সালে কোম্পানী হাজারিবাগ জেলার পত্তন করে এই ওকুনী গ্রামকে এবং সংলগ্ন হাজারিবাগ পল্লীকে শহরের আকারে বাড়িয়ে জেলার সদরে পরিণত করে। নতুন আপিস-আদালত খোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কর্মচারীদের সহিত শিক্ষিত বাঙালীও ক্রমশঃ শহরে উপনিবেশ স্থাপন করতে আসেন। সেই সময় রাঁচিতে কেন্দ্র করে জার্মান ইভাজেলিক লুথারান মিশন এখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে আদিম কোল, সাঁওতাল, ভূঁইয়া এদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত করছিলেন। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহে এই অগ্রগতিতে বাধা পড়ে।

১৮৬৪ সালে হুগলী থেকে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর যত্ননাথ মুখোপাধ্যায় এখানে সরকারী উকিল হয়ে আসেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পল্লী খতম্বাজারে তিনি অনেকটা ভূমি ক্রয় করেন। তার পর ক্রমশঃ হাজারিবাগ সদর-কোর্টে বাঙালী উকিলের সংখ্যা বেড়ে যেতে অনেকেই জমি-জমা ক্রয় করে এখানে বাস করতে থাকেন। বাহিরে তদানীন্তন বাঙালীর প্রতীষ্ঠালাভের স্বযোগ ছিল যথেষ্ট, কারণ স্থানীয় অধিবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভালরূপে গ্রহণই করে নি।

ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ উনিবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ

মনীষিগণের উৎসাহে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন কলকাতা থেকে হাজারিবাগেও পৌঁছতে দেরি হয় নি। তৎকালীন বাঙালী অধিবাসীরা সকলে মিলে খতম্বাজারে যত্ননাথ বাবুর জমিতে বড় রাস্তার ধারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও বড়বাজারের মধ্যে নববিধান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে টাউন-হল খোলা হয় একটা বৃহৎ বাংলাতে, সেখানে বাঙালী ক্লাব ও একটা লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্রের নামে পরে সেটার 'কেশব-হল' নামকরণ হয়। প্রতিবৎসর মাঘোৎসবে এই কেশব-হলে আনন্দ-মেলা হয়, তাতে স্থানীয় মহিলারা যোগদান করে আলাপ-আলোচনা এবং আমোদ-প্রমোদে তৃপ্তি লাভ করেন। স্থানীয় শিক্ষিত বাঙালীর মজলিস এই ক্লাবের অঙ্গনেই বসে—তাতে পাঠাগার ও খেলা-ধুলার বিভাগ আছে। পাঠাগারটিতে ভাল ভাল বাংলা ও ইংরেজী বই আছে দেখলাম। হলে মাঝে মাঝে সভা এবং জলসার আয়োজন হ'ত। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, সম্প্রতি সেখানে এক সিনেমার আবির্ভাব হয়েছে। বর্তমানে প্রত্যহ শো দেখান হয়। নিকটেই কিছুদিন হ'ল কোন মাড়োয়ারী কি বিহারী বণিকের উত্তোগে আর একটি প্রেক্ষাগারও নির্মিত হয়েছে—'রঘুনন্দন হল'—সেখানেও মাঝে মাঝে থিয়েটার-বায়স্কোপ হয়ে থাকে।

নববিধান-মন্দিরটি আকারে বড় নয়, অনেকটা আমাদের ভবানীপুরের পুরাতন সাধারণ সমাজের মত। অঙ্গনের মাঝে সম্মুখেই সাধু প্রমথলালের স্মৃতিচিহ্ন। এখানে প্রতি রবিবার নিয়মিত প্রার্থনা হয়।



ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক

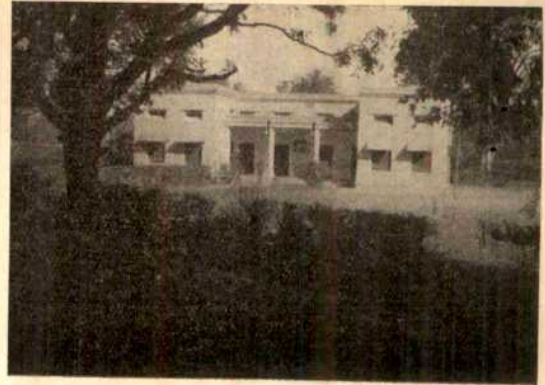
সাধারণ সমাজের আচার্য্য মন্ত্রণাবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মন্দিরটি তুলনায় বড়; চমৎকার পুষ্পোদ্যানের মধ্যে একটা নাতিবৃহৎ টাইল-গৃহে অবস্থিত। প্রত্যহ সকালে দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়। মন্দিরের পিছনেই আচার্য্য মহাশয়ের কুটার।

বড় রাস্তার ধারেই বাজারের সামনে মেয়েদের স্কুল—শুনলাম স্থানীয় শিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায়ের আহুকুল্যে প্রায় ৪০।৫০ বৎসর হ'ল স্থাপিত হয়েছে। ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত এগোতে পারে নি এখনও।

মেয়েদের আরও কয়েকটা স্কুল আছে, তার মধ্যে মিশনারী স্কুলটাই উল্লেখযোগ্য—এখানে কয়েকজন বাঙালী শিক্ষয়িত্রী আছেন; এ ছাড়া জেলা স্কুল ও মিশনারী সেন্ট কলম্বাস কলেজ-স্কুল প্রভৃতি ছেলেদের স্কুলও আছে। হিন্দী মাইনর স্কুলও গোটা কতক আছে। হজরৎগঞ্জে মিশনারী-পরিচালিত মেয়েদেরও একটি হিন্দী স্কুল আছে—রাঁচি রোডে খড়্গাবাবুর বাড়ীর নিকটেই।

হাজারিবাগ শহরের শিক্ষার প্রসার কিরূপ তা মিশনারী সেন্ট কলম্বাস কলেজটি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সুন্দর প্রাসাদোপম কলেজ-গৃহটি—নির্জন নিরিবিলি জায়গায় বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ অবস্থান। বিস্তৃত হাতার মধ্যে পরিচ্ছন্ন বৃক্ষলতায়-ঘেরা কলেজ-গৃহ, ছাত্রাবাস, টেনিসকোর্ট।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় মিশন এই প্রদেশে কাজ শুরু করে আসেন। তাঁরা প্রথম সরকারের কাছ থেকে পুরাতন সেনাদলের পরিভাষা, হাসপাতাল-

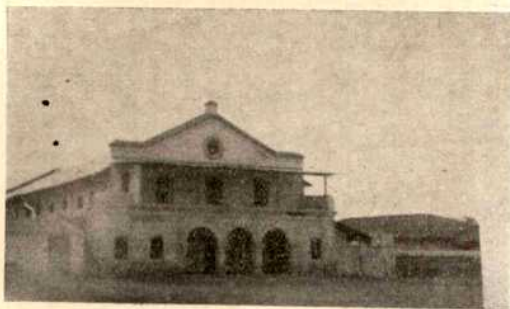


জেলা স্কুল—ছাত্রনিবাস

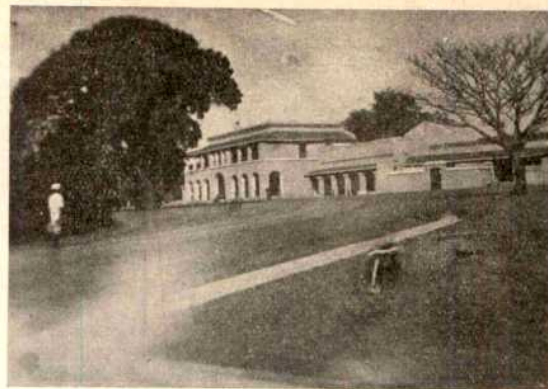
গৃহটি নিয়ে ধর্মপ্রচার এবং শিক্ষা-প্রসার শুরু করেন। বিশপ্ হুইটলী ছিলেন এই দলের নেতা। তাঁদেরই উৎসাহে ১৮২২ সালে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। প্রথমে, বর্তমানে যে-গৃহে ডাকঘর রয়েছে সেইখানে ক্লাস হ'ল। মারে সাহেব হলেন সর্বপ্রথম প্রিন্সিপ্যাল। পরে কয়েক জন খ্রীষ্টান বাঙালী অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পর চাঁদা তুলে ১৯০৮ সালে এই বৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয়। এর মাঝখানে প্রার্থনা-ভবন, হুইটলী সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত। সেন্ট কলম্বাস কলেজ-স্কুলও এঁদেরই উদ্যোগে সৃষ্ট। মহিলা-বিভাগ প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত এখনও অগ্রসর হয় নি শুনলাম।

সেন্ট স্টিফেন্স গীর্জাও এঁদের উদ্যোগে নির্মিত হয়। ডাবলিন মিশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি, জেনানা হাসপাতাল। চমৎকার একটি দ্বিতল অট্টালিকায় এটি অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে ছিল ডাক্তার হার্ণের অক্লান্ত উদ্যম। প্রথমে সামান্য ডিসপেন্সরী-গোছের ছিল, তার পর ১৯১৩ সালে এই বাড়ী নির্মিত হয়। প্রায় ৪০।৫০টি রোগীর আসন আছে, সরকারের কাছ থেকে কিছু বায়িক সাহায্যও পেয়ে থাকেন শুনলাম। প্রাইভেট ওয়ার্ডে সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও ইচ্ছা করলে বেশ আরামে থাকতে পারেন।

পার্টনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পূর্বে হাজারিবাগ কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে এখানে অনেকগুলি বাঙালী শিক্ষক আছেন। কলেজে কলা ও বিজ্ঞান দুই-ই পড়ান হয়। বাঙালী ছাত্রের সংখ্যাও মন্দ



রবীন্দ্রনাথ হল



কলেজখানা

নয়। বাঙালী অধ্যাপকেরা প্রায় সকলেই কলেজের নিকটেই বাড়ী করে বাস করছেন।

হাজারিবাগ শহরের এক প্রান্তে শীতাগড় পাহাড়ের তলায় আর একটি ধর্মযাজক সম্প্রদায়—বেলজিয়ান মিশন একটি সেমিনারী নির্মাণ করে বাস করছেন। এঁরা রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মচারী। মিশনের অবস্থানটি অনেকটা শিল্পের ইটালীয়ান কনভেন্টের মত। চমৎকার নির্জন স্থান—সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগী। মেয়েদের কোন বিভাগ নেই—পাদরীরা সকলে নিজেরাই পালা করে রান্নাবান্না করেন এবং আপন-আপন পড়াশুনায় নিমগ্ন থাকেন।

শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে হাজারিবাগের গুরুত্ব কিছু কম নয়—সাধারণ কলেজ ভিন্ন গবর্ণমেন্টের পুলিশ ট্রেনিং কলেজ উল্লেখযোগ্য। ওখানকার সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবার পর আমরা আবিষ্কার করলাম যে তিনি বাঙালী। আমাদের প্রতিষ্ঠানটি দেখবার ঔৎসুক্য এবং উৎসাহে তিনি আহ্লাদিত হয়ে যত্নের সহিত সব

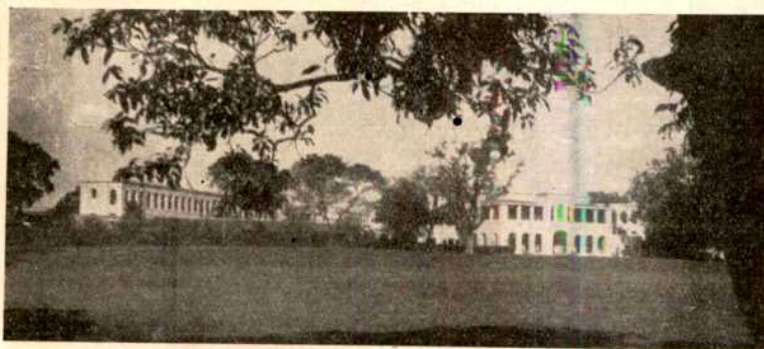
দেখালেন। ভদ্রলোকের নাম শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঢাকা তাঁর জন্মভূমি। বললেন, এককালীন জন-পঞ্চাশ ছাত্র থাকে—এক বৎসরের কোর্স। ওখানে প্রবেশলাভ স্থানীয় এস-পির উপরেই নির্ভর করে। কলেজটির অবস্থানও মনোরম; পুরাতন ট্রান্স রোডের উপরেই বেশ বড়গোছের দ্বিতল অট্টালিকায় ছেলেরা শিক্ষালাভ করে।

সেন্ট্রাল জেলের প্রায় সংলগ্ন এবং শহরের উত্তর সীমানায় কৃত্রিম হ্রদের উপরেই সংশোধনী বিজ্ঞালয় (রিফর্মটরী)। এটি দেখবার স্বযোগ সহজেই হয়। অনেক রকম অর্থকরী শিক্ষা দেওয়া ছাড়া সাধারণভাবে লেখাপড়াও শেখান হয়—তার জন্ত হাতার মধ্যেই একটি স্কুল রয়েছে দেখলাম। সাধারণ জেলের মত ছোটখাট হাসপাতালও রয়েছে। প্রায় দু-শ জন ছেলের স্থান আছে—সম্প্রতি বোধ হয় ১৭০৭৫ জন অধিবাসী। এদের মধ্যে কিছু বাঙালী আছে। বাঙালী

শিক্ষকও কয়েক জন আছেন।

রিফর্মটরীর কারখানা একটি দেখবার জিনিষ—কোথাও ছেলেরা ইলেক্ট্রোপ্লটিং শিখছে, কোথাও বেতের বা কাঠের আসবাবপত্র প্রস্তুত করা শিখছে, কোথাও জঁকা বা স্কেচিং শিখছে।

হাজারিবাগের সদর চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী ও পলি-চিকিৎসালয়টিও দেখবার স্বযোগ হয়েছিল। সদর হাসপাতালের বর্তমান সিভিল সার্জন

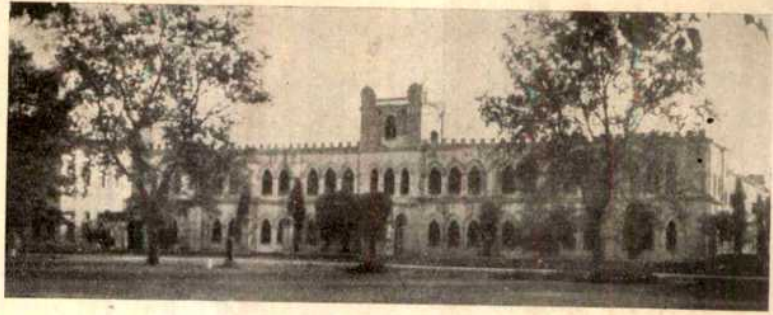


রিফর্মটরী স্কুল

ক্যাপ্টেন হিষ্ সাহেব—তঁার সহকারী হলেন ডাক্তার ব্যানার্জি। আরও দু-এক জন ওখানে কাজ করেন, কয়েক জন বাঙালী নাসও আছেন। ওখানকার বড় চিকিৎসক হলেন ভূতপূর্ব সিবিল সার্জন শ্রীশ্রেরদ্রচন্দ্র মিত্র। আমরা ওঁকে প্রায়ই সান্ধ্যভ্রমণে রত দেখতাম। স্বর্গীয় আশুতোষ রায় মহাশয় ওখানে এক জন স্নানমখ্যাত ডাক্তার ছিলেন—ওঁর সঙ্গে এক সময় আলাপ হয়েছিল।

হাজারিবাগ কোর্টে বাঙালী উকিলের সংখ্যা যথেষ্ট। সরকারী উকিল শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। দেখলাম তিনি একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করছেন। নন-রেগুলেটেড জেলা, দেওয়ানী মোকদ্দমা বিশেষ হয় না, তার জন্য একটি মুন্সেফ কোর্ট। কোজদারী বিভাগে বোধ হয় পাঁচ-ছয় জন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণতঃ দু-তিন জন থাকেন। পূর্বে শ্রীনন্দলাল ঘোষ মহাশয় ছিলেন এস. ডি. ও। ডেপুটি কমিশনার মারউড সাহেব ছুটি লওয়াতে সম্প্রতি রায়বাহাদুর নগেন্দ্র রায় তঁার স্থানে কাজ করছেন। কাছারীতে কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খুবই কম ব'লে মনে হ'ল।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান কিছু কম নয়। তার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পরিচয় ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক এবং গাঙ্গুলি কোম্পানীর লাল মোটর। গাঙ্গুলি কোম্পানী বহুদিন থেকে

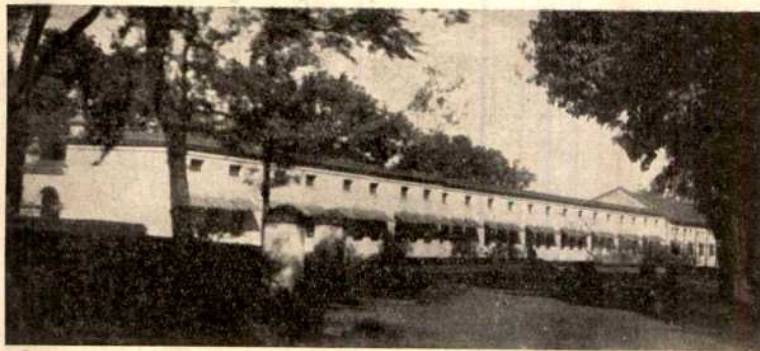


হাজারিবাগ কলেজ

এখানে মোটর এবং বাস সার্ভিসের ব্যবসা করছেন। এঁরা পূর্বে এটি একচেটিয়া ক'রে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি কয় বৎসর কয়েকটা অ-বাঙালী কোম্পানী জয়লাভ করেছে। প্রশংসার বিষয় যে, গাঙ্গুলি কোম্পানী কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা না ক'রে বহু বিহারীকে চাকরি দিয়েছেন। বাঙালী যুবক কয়েক জন প্রাইভেট ট্যাক্সির ব্যবসা ক'রে বেশ অর্থ উপার্জন করছেন। তবে কলকাতার মত অনেক পঞ্জাবী হালে এখানে বাস, ট্যাক্সি ক'রে ফেলেছে।

ছোটনাগপুরের ব্যাঙ্কের নূতন দ্বিতল গৃহটি যেমন সুন্দর তেমনই উপযোগী। এই প্রতিষ্ঠান ছোটনাগপুরে বাঙালীর সম্মান বৃদ্ধি করেছে। হাজারিবাগের বাঙালী সম্প্রদায়ে কয়েক জন কোদন্দী এবং তার নিকটবর্তী অভ্যর্থনিত্তে অনেক দিন ব্যবসা ক'রে আসছেন; নিজস্ব থনি কয়েক জনের আছে। তাঁরা থনিতেই বেশীর ভাগ সময় থাকেন, তবে সকলেই প্রায় শহরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন—পূর্বে গ্র্যাণ্ড-কর্ড খোলবার আগে আরও ছিল তবে কোদন্দী রেলস্টেশন হওয়াতে একটু কমে গেছে। এ ছাড়া মহায়া, গালা, সবাই-ঘাস, খয়ের এবং শালপাতা ও কাঠ প্রভৃতি ছোটখাট ব্যবসা অনেক আছে।

হোটেল, বোর্ডিং বা স্বাস্থ্যনিবাস প্রায় পাঁচ-ছয়টি—প্রায় সবগুলিই বাঙালীর। সাহেবপাড়ায় হাম্পটন কোর্টটিই সর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং মিস্ পলি মিত্র এটি প্রথম স্থাপন



জেলা স্কুল



সদর জেলা হাসপাতাল

করেন। উপস্থিত তাঁর মেয়ে মিস্ মেরী মিত্র এটাকে চালাচ্ছেন।

বাঙালীর পক্ষে চাকরির বাজার অত্যন্ত স্থানের মতই সঙ্কীর্ণ, তবে বোধ করি রামগড় এষ্টেটে কয়েক জন বাঙালী কর্মচারী এবং কেরাণী আছেন। কোর্ট-অব-ওয়ার্ডদের কাছাকাছি অনেক সেরেক্ষা আছে এবং সৌভাগ্যবশতঃ এখনও কিছু বাঙালী এগুলিতে নিযুক্ত আছেন। এ ছাড়া শহরের মধ্যে কয়েকটি বাঙালী-পরিচালিত দোকান আছে। তবে বড় বড় কাপড়ের দোকান বা মুদিখানা সম্পূর্ণ মাড়োয়ারী বণিকের হাতে।

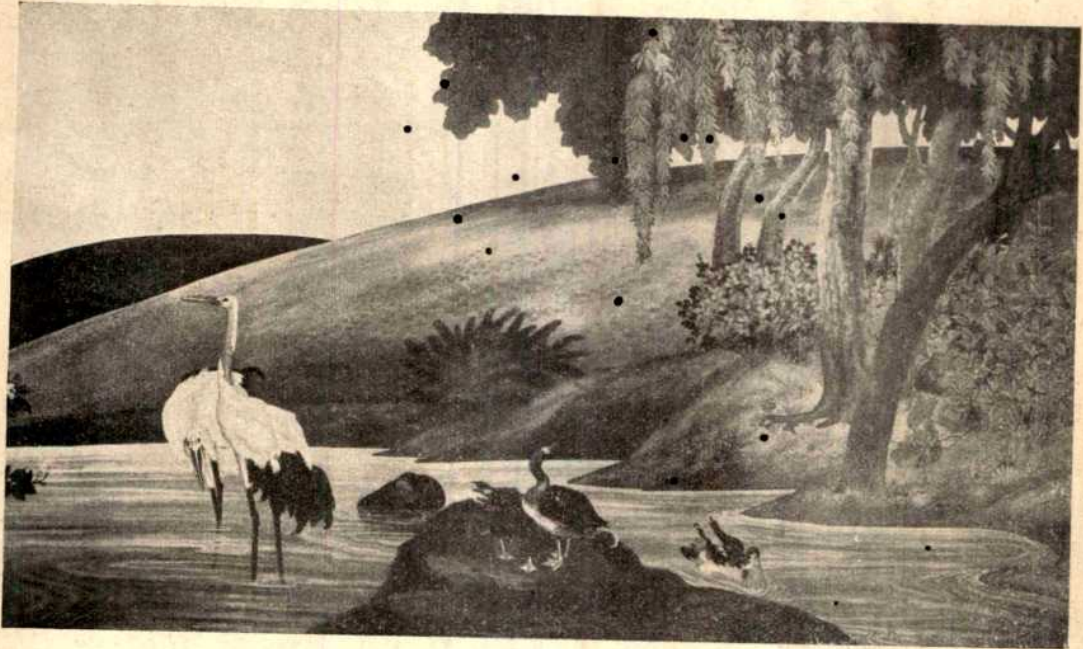
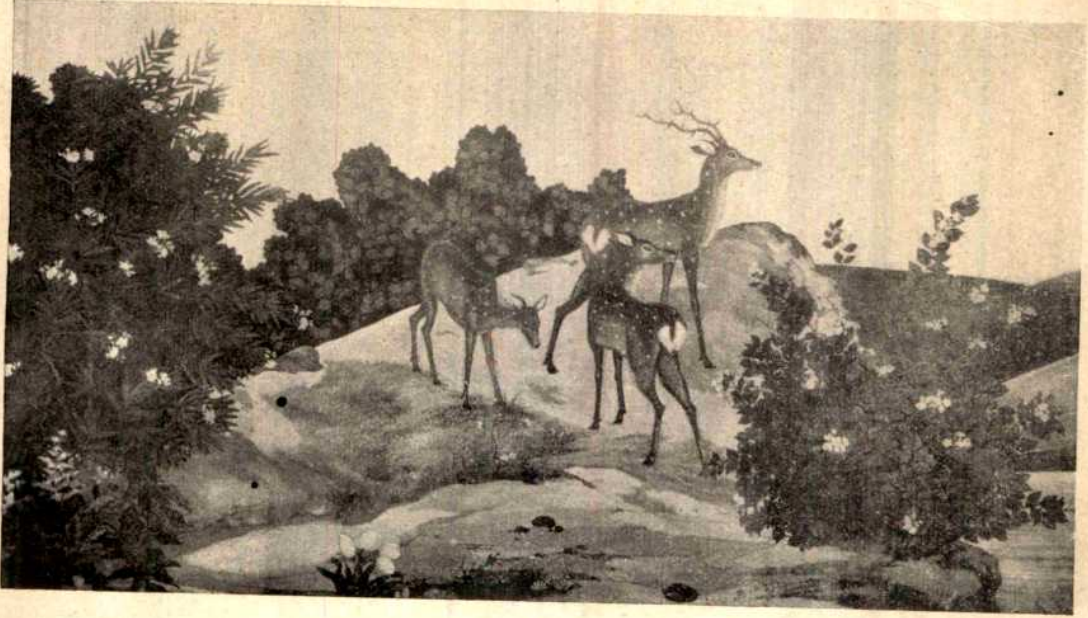
গত ১৯৩১ সালের আদমশুমারী-অনুসারে হাজারিবাগ শহরের লোকসংখ্যা এইরূপ—

	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৭,৬৮২	৬,৯৬৬	১৪,৬৪৮
মুসলমান	২,৫১০	২,৪৬৫	৪,৯৭৫
খ্রীষ্টান	৪৫৫	৪০৫	৮৬০
আদিম জাতি	১২৯	১৩২	২৬১
জৈন	১১১	১০২	২১৩
শিখ	১৪	৪	১৮
অপর	২	২	৪
সর্বসমেত	১০,৯০৩	১০,০৭৮	২০,৯৮১

চৌদ্দ হাজার হিন্দু নাগরিকের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সম্ভবতঃ দুই-তিন হাজারের বেশী হবে না। খ্রীষ্টানের মধ্যে কুড়ি-পঁচিশ ঘর বাঙালী আছেন, তাঁরা বেশীর ভাগ হার্বগঞ্জের দিকেই বাস করেন। মুসলমানদের সংখ্যা গিরিডির তুলনায় অনেক কম—ক্ষীরগাঁওয়ের দিকেই এদের আড্ডা।

প্রতি বৎসর বহু বাঙালী স্বাস্থ্যলাভের জন্ত বিহারের এই সমস্ত শহরে বেড়াতে আসেন, কিন্তু হুঃখের বিষয় পূর্বের মত স্বযোগ-সুবিধা তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। প্রাদেশিকতার হুজুগে এই সমস্ত শহরে জমি কিনে বাস করাও হয়ত পরে আর বাঙালীর পক্ষে ঘটে উঠবে না। আসলে ছোটনাগপুর প্রদেশ—বিহারেরও নয়, উড়িষ্যারও ছিল না। এটা মূলতঃ আদিম জাতির আবাসভূমি। আজ বাংলা দেশের জনসংখ্যা বিহার অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে অধিক; শুধু তাই নয়, বাংলায়, বিশেষতঃ কলিকাতায় বিহারী জন-সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে বাংলা দেশের আয়তন বৃদ্ধি করা সরকারের একান্ত উচিত। মাঝে বাংলাকে কোন এক স্বাভাবিক জেলা দেবার কথা শুনে-ছিলাম; সমস্ত ছোটনাগপুর প্রদেশ—না হয় অন্ততঃ মানভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং হাজারিবাগ জেলা, এই তিনটিকে দিলেও বাঙালীর যথেষ্ট উপকার হ'তে পারে।

বঙ্গ আধুনিক প্রাচীর-চিত্র



উপরে ও নীচে : শ্রীমধাংশু চৌধুরী অঙ্কিত একখানি প্রাচীর-চিত্রের দুই অংশ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারে শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববংশী অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র
[কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের অস্ত্রভাগ ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ]



শ্রীস্বধাংশু সেধুরী অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র

অলখ-বোরা

ত্রিশস্তা দেনী

পূর্ব পরিচয়

। চন্দ্রকান্ত মিশ্র নরানন্দোড গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকম্ব শিবু ও স্ত্রীকে লইয়া থাকেন। স্ত্রী শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লখা মাটির গল্পর গাভী চড়িয়া এবারেও তাহার রতনজোড়ে লালমহাশয় লক্ষণচন্দ্র ও দিদিমা জুবনেবরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাহার বিধবা দিদি হুহুধুনীর খুব ভাব। হুহুধুনী সংসারের কতী কিন্তু অন্তরে বিরহিনী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আদায়বন্ধু। পুজার পূর্বেই সেখানকার আকন্দ-উৎসবের মাঝখানে হুহুধুনী জুবনেবরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুতে মহামায়া ও হুহুধুনী চক্ষে অশ্রুকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃস্বা, কিন্তু পোকেসর গুণসৌভে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনাদের অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে কিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাহার শরীরের একটা দিক্ অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি হুহুধুনীর হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে হুহুধুনীর মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে হুহুধু বা বা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নূতনদের ভিতর হুহুধু কোনও আশ্রয় পাইল না। গীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নূতন নূতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত হুহুধুকে সুলে ভর্তি করিয়া দিব্য কিছুদিন পরে একটি নবাস্থা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ হুহুধু ত্রুষ্ণীতি উল্লসিতা উঠিল। এ অমৃতভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন। সুলের স্ত্রী ধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা, এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হৈমবতীর সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব লইয়া সুলের অন্তরে মেয়েরা ঠাট্টা তামাসা করে, তাহাতে হুহুধু লজ্জা পায়, কিন্তু বন্ধুত্ব তাহার নিবিড়তর হইয়া উঠে। হৈমবতীর চোখের ভিতর দিয়া সে নিজেকেও যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। পুজার সময় মাসিমা হুহুধুনী কলিকাতায় বোনকে দেখিতে আসতে, হুহুধু সেই ক্রীকে শিবুকে লইয়া একবার নরানন্দোড ঘুরিয়া আসিল। মন কিন্তু যেন কলিকাতায় ফেলিয়া গেল। হুহুধু নিজের আপন যৌবন সব্বন্ধে নিজে ততটা সচেতন নয়, কিন্তু মাসিমা পিসিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পাশের বাড়ীর সব্বলগ্নহী পথ্য সব্বলগ্নেই তাহাকে সারাক্ষণ সাবধান করিয়া দিতেছে।

হৈমবতীর কল্যাণে হুহুধু প্রথম নিসম্পর্কীয় যুবকদের সঙ্গেও মিশিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণেব একদিন হল বাঁধিয়া অনেকে বেড়াইয়া আসিল। হল চারজন যুবক ছিল, মহেন্দ্র, হুহুধু, তপন আর নিখিল। তপন অতিশয় সুপুরুষ, হুহুধু মোটা, কালো, ছোট-খাট মানুষ, বেশী কথা বলে না, তবে প্রখরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণবী। মহেন্দ্র কাঁধখোঁটা গোছের

মানুষ, সারাক্ষণ মানবজাতির ক্ষুদ্রগিবি কবিত্তে ব্যস্ত। নিখিল বীণাকৃতি, জামনা সরাহাস্যময়।

সুলে একদিন মেয়েমহলে মহাতর্ক হইয়া গেল। মেয়েদের বামী নির্বাচন ভালবাসিয়া নিজে কথা উচিত, না উচিত চোখ কান বুজিয়া মা বপের হাতের পুতুলের মত পার হইয়া যাওয়া। মনীষা একদিকে, মেহনতা আর-একদিকে। হুহুধু এ বিবাদের আগে কিছু ভাবে নাই, এখন ভাবিত চেষ্টা করিয়াও কুল পাইল না। সবাতনপন্থী জীবনব্যাজ দেখিতেই সে হতাশ, কিন্তু এখন আবার মনে সংশয় জাগে হস্ত আব এক ধর্মের জীবনও আছে, তাহাতে মানুষের নিজের মন তাহার একমাত্র কাণ্ডারী। এবং হস্ত সে পথে বাহাঙ্গা চলে তাহার মনেই ভুল করে না।]

১২

হৈমবতীর বাড়ীতে বড় একটা গোলমাল লাগিয়া গিয়াছে। হৈমবতীর জ্যাঠামহাশয় নরেশ্বর পালিত পাড়া-গাঁয়েরই মানুষ, কিন্তু তাহার স্বখ ছিল বিলাত-ফেরত ভাইয়ের কাছে রাখিয়া মেয়েটিকে একটু আধুনিক ধরণে মানুষ করেন। তাই অল্প বয়স হইতেই মিলি আসিয়াছে কলিকাতায়; চলন ধরণ সাজসজ্জা কথাবার্তা কোনও কিছুতেই আজ আর তাহার খুং পাওয়া যায় না। ছেলেবেলা ইংরেজী স্কুলে পড়িয়াছে, বড় হইয়া বাংলা স্কুলেও হৈমবতীর মত দুই-তিন বছর ছিল; হুহুধু দুই জাতীয় শিক্ষাই তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মেয়ের বয়স উনিশের কাছাকাছি হইল দেখিয়া বাপ জ্যাঠা সকলেই বিবাহের জন্ত ব্যস্ত। বেশ ভাল একটি বিলাত-ফেরত ছেলের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। অর্থ সামর্থ্য বংশমর্যাদা ও রূপ, কোনও দিক্ দিয়াই সে ছেলে উপেক্ষার যোগ্য নয় মিলিকে ঠিক হুহুধুনী কিংবা ধনী-বন্ধা বলা যায় না, হুহুধু তাহার পক্ষে এই রকম সামী পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই দণ্ডজন্য বলিবে। কিন্তু মিলি হঠাৎ বলিয়া বসিল যে সে বিবাহ করিবে না। বরপক্ষ কতাপক্ষ উভয় পক্ষেরই চক্ষুস্থির।

মিলির মা শহুরে সভ্য-ভাব্য কথার খার ধারেন না। তিনি চট্টা আশুন হইয়া উঠিয়াছেন। “ডেকি মেয়ে, বিয়ে

করবি না ত কি, চিরকাল আইবুড়ো হয়ে বসে থাকবি ?
তোমার জন্তে জ্ঞাতকুল সব খোয়াব নাকি আমরা ? এমন
ছেলে তপিস্তে করলে পাওয়া যায় না, রূপসী মেয়ে আমন্ত্রণ
খাওয়া নাকি উচিত অমন 'না' বলে বসলেন। ঘাড়ে ধ'ব
তোকে আমি বিয়ে দেব।"

হৈমন্তীর মা নাই, কাজেই রশ্মি পালিত আসিলেন
বুড় মিটাইতে। তিনি বলিলেন, "বৌঠাকরুণ, এমন
রশ্মিজনীর মত খাড়া না তুলে একটু অল্প পছা ধর ন ?
হিমকে দিয়ে খোঁজ নাও, কেন মেয়ের আপত্তি। আজ-
কালকার মেয়ে, কেন কি বলছে সব জেনে শুনে কাজ
করা দরকার। হয়ত আর কাউকে মনে ধরেছে। স্বয়ম্বরের
হুগ।"

বৌঠাকরুণ একেবারে করুণ স্বর ধরিলেন, "ওমা, আমার
কপালে শেষে এই ছিল। এমন মেয়ে আমি গর্ভে ধরলাম
যে যা নয় তাই আমার গুণতে হল এই বয়সে।"

পালিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "যা নয়, নয় বৌঠাকরুণ,
আজকাল এইগুলোই হয়। ওর জন্তে ভেব না, তোমার
কিছু মানহানি হবে না। তুমি একবার হিমকে মিষ্টি
পেছনে লাগিয়ে দাও।"

বৌঠাকরুণী কি আর করেন, হৈমন্তীরই শরণ লইলেন।
ভাবিলেন, বস্মিন্ দেশে যদাচার তা মানিয়াই চলিত
হইবে।

হৈমন্তী স্থলে আসিয়াই টিকিনের কটায় সর্বাঙ্গে স্থা-ক
ভাকিয়া বলিল, "জান ভাই, মিলিদিদি এক কাণ্ড করে ব'সে
আছে। বিষের সঙ্কল্প হচ্ছিল, সব ভেঙে দিয়েছে কি জানি
কি জন্তে। জ্যাঠাইমা এখন বলছেন, 'তুই খোঁজ নে ওর
কাকে মনে ধরেছে।' কি করে খোঁজ নি বল ত আমি।"

কথাটা শুনিয়াই স্থা চোখ বড় করিয়া বলিল, "আমি
হয়ত জানি সে কে।"

হৈমন্তী স্থার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "তুমি ?
পৃথিবীতে এত লোক থাকতে শেষে তোমার মত 'ইনোসেন্ট
বেবী'র কাছে খবর নিতে হবে ?"

হৈমন্তীর ঠাঠার জবাব না দিয়া স্থা গভীর মুখ করিয়া
বলিল, "তোমাদের পূর্বের বাবান্দার আমি একদিন
দেখেছিলাম, মিলিদি স্বরেশদার গলা জড়িয়ে— বুঝেছ ?

আমাকে হঠাৎ দেখে স্বরেশদা চমকে উঠেছিল, তার পরেই
বলল, 'বুদ্ধব্রতের মর্যাদা তুমি নিশ্চয় রক্ষা করবে। তোমাকে
আমবা বিশ্বাস কবতে পারি।' আমি কিছু বলি নি, কিন্তু
আমার ভারী রাগ হয়েছিল। লুকিয়ে কোন কাজ কি
মাছবের করা উচিত ?"

হৈমন্তী মুখ রান করিয়া বলিল, "বেচাৰী মিলিদিদি,
বেচাৰী স্বরেশদা।"

স্থা বিচারকের মত কঠিন স্বরে বলিল, "বেচাৰী কেন
বলছ ভাই, ওরা ত জেনে শুনেই যা করবার করেছে ?"

হৈমন্তী স্থার দিকে করুণ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল, "বোকা
মেয়ে। তুমি বুঝবে না। স্বরেশদার যে এক পয়সার
সম্বল নেই। মিলিদি এত আদরে মাছব, শেষে এই
দুখে বরণ করা তার কপালে ছিল। জ্যাঠামশায় নিশ্চয়
কিছুই দেবেন না।"

স্থা বলিল, "মিলিদি ত নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। সে
কেন এ পথে গেল ?"

হৈমন্তী উদাস চোখে অল্প দিকে চাহিয়া ঘেন কতকটা
আপন মনেই বলিল, "স্থা। আমি যদি এমন কাজ করি,
তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে ?" স্থা চুপ করিয়া
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হৈমন্তী আবার বলিল,
"মাছবের ভবিষ্যৎ মাছবকে এই পথে টেনে নিয়ে যায়,
তার দৃষ্টি যে তখন প্রবল ঝড়ে একেবারে অন্ধ হয়ে যায়,
একথা তুমি কবে বুঝতে শিখবে ? তুমি কি তপস্বিনী
হলে ব'লে পৃথিবীতে এসেছ ?"

স্থা ভবু বলিল, "আচ্ছা, মিলিদি না-হয় যা করেছে
করেছে, স্বরেশদা ত পুরুষ মাছব, তাকে সংসারের ভার নিতে
হবে। সে যদি সে কাজের যোগ্য না হয়ে থাকে তবে
মিলিদিকে এই পথে টানার জন্তে নিজের কাছে নিজে
সে কি অপরাধী নয় ?"

হৈমন্তী বলিল, "পাগলী, মাছব কি মাছব বেছে নিয়ে
প্রাণ করে তবে ভালবাসে ? অদৃষ্ট থাকে যে দিকে নিয়ে
যায় তাকে সেই দিকেই ছুটতে হয়।"

স্থা এবার হাসিয়া বলিল, "তুমি ত আমার চেয়েও
বয়সে ছোট, তুমি এমন সবজ্ঞাতার মত কথা বলছ কেন ?
অদৃষ্টই হোক আর বাই হোক, নিজেকে নিজের হাতের

মুঠোর মধ্যে রাখবার ক্ষমতা মানুষের নিশ্চয় আছে। সে ইচ্ছা করলেই তার বাইরের ব্যবহারকে সংযত করতে পারে। মানুষের মনুষ্যত্বই ওইখানে।”

হৈমন্তী বলিল, “তুমি ভুল বুঝেছ এমন কথা বলতে পারি না। কিন্তু হয়ত আর একদিন অল্প দিক্‌টাও কিছু বুঝবে তুমি। আমি যদি তার আগেই কিছু ক’রে বসি, তুমি যেন আমার ওপর রাগ ক’রে মুখ ফিরিয়ে বস না।”

কথাটা শুনিয়াই স্বধার অভিমান হইল। মিসিদির কথা হইতেছে, তাহার কথা হইলেই চলিত, হৈমন্তী আবার ইহার ভিতর আপনার কথা ঢুকাইতে ব্যস্ত কেন? এখনই কি তাহার বন্ধুত্বের কাব্য শেষ করিয়া সংসারের হাঁড়িকুঁড়ির ভিতর ঢুকিবার বয়স হইয়াছে? এত শীঘ্র এই অপূর্ব সঙ্গীতের কথা ভুলিয়া হৈমন্তী অল্প কথা ভাবে কি করিয়া?

হৈমন্তী স্বধার অভিমান বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “যাক্, এখন থেকেই আর গাল ফুলিয়ে থাকতে হবে না। মিসিদিরকে কি ক’রে জিজ্ঞেস করব এল পরামর্শ করা যাক্। তুমি আমাদের বাড়ী চা খেয়ে তার পর বাড়ী ফিরো। ততক্ষণে একটা কিছু উপায় ঠিক করার করা যাবে।”

এত শীঘ্রই মিলির মনের খবর জানিতে পারিবে হৈমন্তী ভাবে নাই। সে আজ মিলিকে কোন প্রশ্ন করিবেও মনে করে নাই। স্বধাকে সঙ্গে করিয়া ফুল হইতে ফিরিয়া চায়ের সন্ধানে ভাঁড়ার-ঘরে অকস্মাৎ মিলিকে আবিষ্কার করিয়া হৈমন্তী বিস্মিত ভাবে বলিল, “দিদি, আজ অসময়ে এমন জায়গায় কেন? ড্রেসিং টেবিলের ধারেই ত তোমার এখন আসন পাতবার সময়।”

মিলি মুখ অঙ্ককার করিয়া বলিল, “চুলোর ভিতর আসন নিলেই আমার সব চেয়ে ভাল হয়। ড্রেস করব আর আমি কি স্থখে? মা ত আমায় গলায় দড়ি বেঁধে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।”

হৈমন্তী রাগ করিয়া বলিল, “ও সব কি ছাইভস্ম কথা বলছ ভাই! তোমার বিয়ে করতে ইচ্ছে না হয়, তুমি ক’রো না। সত্যি কি কাউকে কেউ জোর ক’রে বিয়ে দিতে পারে?”

মিলি বলিল, “যতখানি যুক্ত করলে জোরজবরান্টি ঠেকিয়ে রাখা যায়, ততটা ক্ষমতা যদি আমার না থাকে?”

হৈমন্তী বলিল, “তাহলে তোমার তাই নিয়ে কাদবার অধিকার নেই। যে অতটাই দুর্বল তার নিজের পথ নিজে বাছবার যোগ্যতা কেউ স্বীকার করবে না।”

মিলির চোখে জল ছিল চল বরিতে লাগিল। সে মুখটা নীচু করিয়া বলিল, “বাইরে যতই মেমসাহেবী দেখাই, আমি ভিতরে এখনও সেই পাড়ারগেয়ে মেয়ে। আমার মত মেয়েমানুষের শক্তির উপর আমাব নিজেরই বিশ্বাস নেই। যে আমাকে শক্তি যোগাতে পবত সে যদি আমার পাশে থাকত তাহলে আমার যত বল বৃদ্ধ করতে পারতাম। এখন যা হবে তা আমি জানি, মার জেদে হার মানব, তার পর চিরজন্ম কাদব।”

স্বধার নাম প্রকাশ হইয়া পড়িবার ভয়ে হৈমন্তী সব জানিয়াও প্রশ্ন করিল, “সে কে ভাই?”

মিলি হৈমন্তীকে কাঁধের উপর মুখ ঝুঁজিয়া কাদিয়া কাদিয়া বলিল, “ভোকেও কি ব’লে দিতে হবে? তুই ত তাকে চিনিস, তাকে দাদা ব’লে ডাকিস।”

হৈমন্তী মিলির চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “স্বরেশদা? আচ্ছা, জ্যাঠাইমাকে একবার ব’লে দেখব? তিনি ত আমায় খোঁজখবর নিতেই বলেছিলেন। মেয়ের কান্না দেখে হয়ত রাজি হয়ে যেতেও পারেন।”

মিলি বলিল, “তুই এখনও ছেলোমানুষ, তাই ওকথা ভাবতে পারিস। চোখের জলে নরম হবার বয়স মার এখন নেই।” মা আমাকে সারাক্ষণ ভারতনারীর আদর্শ আর নিজাম প্রেম বিষয়ে লেকচার দিচ্ছেন। মা বলেন, এ বয়সের ভালবাসা ভালবাসাই নয় ও শুধু চোখের নেশা, মনের মোহ। তোর মত একটা কচি মেয়ের কথায় মা ভুলবেন সে আশা আমার নেই, বরং উল্টো উৎপত্তিই হবে। জানতে পারলে তাকে আব কেউ এ বাড়ী ঢুকতে দেবে না। এ জন্মের মত দেখাশুনা বন্ধ হয়ে যাবে।”

হৈমন্তী বলিল, “কিন্তু তুমি কথাটা চিরকাল লুকিয়েই বা রাখবে কি ক’রে? তুমি যদি তাব সঙ্গে চিরদিনেব সম্পর্ক পাতাতে চাও, যদি সে বিষয়ে তোমাদের বোঝাপড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যত শীঘ্রই সেটা প্রকাশ ক’রে

বলবে ততই ত ভাল। যদি সে আশা ছেড়ে দিতে, তাহলে না-হয় সব কথা চাপা দিয়েও দিতে পারতে।”

মিলি ভীতকণ্ঠে বলিল, “সে কথা সত্যি বটে, কিন্তু এখনই অদর্শন শুরু হয়ে যাবে মনে করলে ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে পারি না। শুধু বর্তমানের কয়েকটা মুহূর্তে যা কুড়িয়ে পাই, তার লোভ যে সামলাতে পারি না।”

হৈমন্তী বলিল, “এ বর্তমান তোমার বেশী দিন থাকবে না ভাই। এমন একটা গোলমালের পর চারদিকে কড়া নজর আপনা থেকেই সকলের পড়বে। তুমি তাঁদের কাছে ধরা পড়ার অপমান কেন স্বীকার করবে? নিজে থেকে তোমার যা বলবার আছে বলে দাও।”

বাহিরে জ্বাধার মুছ কণ্ঠ শোনা গেল, “হৈমন্তী, আমি কি আজ বাড়ী যাব না? তুমি আমায় বসিয়ে রেখে ভাঁড়ার-ঘরে কি করছ? একলাই সব খাওয়া সেরে নিলে?”

মিলি চোখের জল মুছিয়া সংযত হইয়া বলিল। হৈমন্তী ডাকিল, “ঘরে এস ভাই। দিদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চায়ের কথা তুলে গিয়েছিলাম।”

জ্বাধার ঘরে ঢুকিয়া মিলির অশ্রুস্রাবিত আশ্রয়বিশ্রুত মুখচ্ছবি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আজ কতদিন ধরিয়া হৈমন্তীর বাড়ী জ্বাধার আসা-যাওয়া, কিন্তু ইহার ভিতর একদিনও মিলিকে সে এমন যোগিনীমূর্তিতে দেখে নাই। মিলির সিঁথির রেখা, আঁচলের ডাঁড়, মুখের পাউন্ডাব, খোঁপার বাঁধন, নখের পালিশ, কোনটাকে কোনও দিন সে স্বস্থানভ্রষ্ট হইতে দেখে নাই। আজ সেই মিলি ভাঁড়ার-ঘরে সন্ধ্যার অন্ধকারে বিপর্যস্ত বেশভূষায় যেন বৈষ্ণব কবিতার রাধিকার মত উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বিসের ধ্যান করিতেছে? জ্বাধার মনে পড়িল, কি একটা প্রাচীন পুঁথিতে সে পড়িয়াছিল,

“বিরতি আধারে রাভা বাস পরে যেমন যোগিনী পারা

সদাই যেখানে চাঁহি মুখপানে না চলে নয়নতারা।”

পড়িবার সময় কবিতাটা জ্বাধারিক বুঝে নাই; কিন্তু আজ মিলিকে দেখিয়া কাব্যের অর্থ যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। হৈমন্তী যে বড়ের কথা বলিয়াছিল, সেই বড় কি মিলির এমন দৃশ্য করিয়া দিয়া গিয়াছে? সন্ধ্যার প্রীতির মুত

এ শুধু মধুর আনন্দের বজ্রা নয়, এ যে কি জ্বাধা আজও তাহার ঠিক জানে না। পৃথিবীর বুকের রহস্যের অন্তরালে যে ভয়ঙ্করী লুকাইয়া আছে, এ কি তাহারই প্রলয়লীলার চিহ্ন মিলির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে? জ্বাধার আনাচে-কানাচে কি যে একটা ভয়ঙ্কর রহস্যের ইসারা সদাসর্বদা বরে, জ্বাধার নাম কেহ করে না, অথচ বিশোর-বদ্বন্ধদের জ্বাধার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য পদে পদে সাবধান করিয়া দেয়, এই কি তাহার উন্নত অন্তরের আভাস?

হৈমন্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল, “আমি চায়ের জল আনতে বলছি, চা খেয়েই তুমি যাবে।”

জ্বাধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, “না, না, আমি চা খাব না, আমি এখনি চলে যাই।” এমন জায়গায় বসিয়া সে থাইতে পারিবে না।

মিলি অকস্মাৎ জ্বাধার হাত ধরিয়া বলিল, “জ্বাধা, তোমাকে ভাই আমার একটা কাজ ক’রে দিতে হবে। তোমার মত কচি মেরেকে কেউ সন্দেহ করবে না, তুমিই একমাত্র নিরাপদ, তা ছাড়া তুমি ত ভাই সব জান।”

কি একটা গোপন বড়বজ্রের ভিতর জ্বাধাকে টানা হইতেছে মনে করিয়া আশঙ্কায় সে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিতেছিল। মিলি এমন কাতর হইয়া তাহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে যে তাহাকে ‘না’ বলা বড়ই বঠিন হইবে, কিন্তু জ্বাধার বিবেক দেখানে সাহ না দিবে এমন কোনও কাজ যদি মিলি তাহাকে করিতে বলে তবে কেমন করিয়া জ্বাধা তাহা করিবে? সেই ভয়টাই তাহার আগে হইল।

মিলি বলিল, “আমি তোমাকে একটা চিঠি দেব সেটা তোমায় পোষ্ট ক’রে দিতে হবে। তার জবাবও তোমার নামে আসবে; লক্ষ্মীটি, আমায় সেটা পৌছে দিও।” জ্বাধার হাতের ভিতর মিলি যেন চিঠি গুঁজিয়া দিতেছে এমনই আশঙ্কায় জ্বাধা হাত দুইটা মুঠা করিয়া ফেলিল। এই গোপন দৌত্যের কাজ সে কি করিয়া করিবে? ইহা কি ভাল কাজ, উচিত কাজ? জ্বাধার সন্দেহবিক্ষুব্ধ মনের ভাব মুখের রেখায় ফুটিয়া উঠিল, দেখিয়াই হৈমন্তী তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। হৈমন্তী বলিল, “তোমার ভয় নেই জ্বাধা, কোন অন্যায় কাজ তোমায় করতে বলা হচ্ছে না।”

স্বধা বলিল, “কি জানি ভাই, যা ভাল কাজ তা লুকিয়ে করতে হবে কেন? কিসের জন্ত কাউকে ভয় করে চলতে হবে সেখানে?”

মিলি বলিল, “সব ভাল কাজকে সবাই ভাল বলে বুঝতে পারে না। যাবা বোঝে না তাদের কাছে লুকানো ছাড়া কি পথ আছে?”

স্বধা বলিল, “কিন্তু তুমিই যে ঠিক বুঝেছ তা তুমি কি করে জানলে? তুমি ষাঁদের লুকোচ্ছ তাঁরাও সব জিনিষই তোমার চেয়ে বেশী বোঝেন।”

মিলি বিস্মিত হইয়া স্বধার মুখের দিকে তাকাইল। স্বধা এত বোকা? এইটুকু বোঝে না? মিলি বলিল, “আমার সমস্ত মন থাকে ঠিক বলছে, যা নইলে আমার বেঁচে থাকা দুস্বার্থ—তা তুল কি করে বসব? ষাঁদের সামনে এ সমস্তা নেই তাঁরা এর মূল্য কি করে বুঝবেন? অতীতেও এ সব তাঁদের কোনওদিন ভাবতে হয় নি।”

স্বধা চুপ করিয়া রহিল। সে কি ভাবিয়া বলিল, “অচ্ছা, আমি স্বরেশদাকে আমাদের বাড়ীতে কাল ডাকব, তুমি সেখানে গিয়ে তোমার যা বলবার ব'লো। আমাকে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি বলব যে স্বরেশদাকে আমি ডেকেছিলাম। কিন্তু আমার নামে চিঠি ডাকে দিতে ব'লো না, আমি লুকোচুরি করতে পারব না।”

মিলির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহা নিষ্ঠুরতা হইল কিনা ভাবিয়া স্বধা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। আবার তাহার নিজের প্রস্তাবটাও ঠিক হইয়াছে কিনা এও হইল মস্ত একটা ভাবনা। দুইমুখী দুই চিন্তায় তাহার মনটা ভোলপাড় করিতে লাগিল।

২০

স্বধার নিমন্ত্রণে তাহাদেরই বাড়ীতে স্বরেশ ও মিলির দেখা হইয়াছিল। স্বরেশের অর্থ না থাকিলেও সাহস ছিল। সে বলিল, “কপালে যাই থাক, আমার যা বক্তব্য আমাকে তা বলতেই হবে।”

তাহার বক্তব্যের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল।

আপাতত এ-বাড়ীতে আসা তাহার বন্ধ রাখিতে হইল। নরেশ্বর পালিত বলিলেন, “তুমি আমার জামাই হবার যোগ্য হয়ে তবে এ-বাড়ীতে আসবে। তার আগে আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোমান দেখা-সাক্ষাৎ চলবে না। লুকিয়ে কচি মেয়ের মন পাওয়া যত সহজ, তাকে ভরণ-পোষণ করবার যোগ্যতা অর্জন যে তার চেয়ে শক্ত, এটি তোমাব আগে জানা উচিত ছিল।”

স্বরেশ পরের ছেলে, তাহাকে বিদায় করা সহজ হইলেও ঘরের মেয়েকে বশ করা শক্ত। দেখা গেল, সে তর্জন-গর্জন, অহ্ননয়-বিনয়, অর্দ্ধাশন-অনশন, কিছুতেই তুলিবার মেয়ে নয়। মেয়েকে শাসন করিতে গিয়া মায়েরও আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে, কিন্তু ফল হয় নাই। মিলিতে খাইতে বলিলে খায় না, বেড়াইতে বলিলে বেড়ায় না, লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎও তুলিয়া দিয়াছে। পাছে কোনও শত্রুপক্ষ লুকাইয়া তাহাকে কনে দেখিয়া যায়, এই ভয়ে শত্রু মিত্র সকলকেই সে এড়াইয়া চলে।

রণেন পালিত বলিলেন, “দেখ, তোমরা উভয় পক্ষই যদি এমন যুক্ত দেহি ব'লে চলতে থাক তাহলে ও ছেলে-মাতৃবোঝে হাড় বেশী দিন টিকবে না। হয় ও একটা শত্রু অস্ত্র বিলুপ্ত করে হারা যাবে, নয় একটা এমন কিছু কাণ্ড করে বসবে যাব থেকে আর উদ্ধারের উপায় থাকবে না।”

নরেশ্বর বলিলেন, “তুমি তবে কি করতে বল? ই ভবঘুরের ভিক্ষের ঝুলিটি দেখেই মেয়েটাকে সঁপে দেব?”

রণেশ মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, “তাই কি আর ঠিক বলছি? ওদের সঁপে একটা রক্ষা করে দেখ ন। আজ ভিক্ষের ঝুলি ছাড়া কিছু নেই, কাল লক্ষ্মীর আনন পাতা হতে ত স্ফাপতি নেই। একটু সময় নিয়ে দেখ। বল যে এই সময়ের মধ্যে যদি তুমি এত টাকা রোজগার করতে পার তাহলে তোমাদেরই কথা থাকবে।”

মিলির মায়ের মহা আপত্তি। “এমন করে কতকাল আইবুড়ো মেয়ে টাঙিয়ে রেখে দেবে? ওরকম সময়ের কোন ত ধরাবীধা নেই। আমি বুঝি, বাঙালীর ক্ষেত্র, বিয়ে হ'লেই স্বামীকে ভালবাসবে, তাই এখনও বসি, জোর করে বিয়েটা সেরে ফেলা যাক।”

নরেশ্বর চট্টায়া বলিলেন, “মুখে বলতে ত পক্ষাধীন হয় না। কাজে কবে দেখাতে পেরেছ? এই দুই-তিন মাস ধরে মেয়ের একটা কড়ে আঙুলও ত নাড়াতে পারছ না।”

রঞ্জন বলিলেন, “আচ্ছা, এক কাজ কর। ওকে কিছুদিনের জন্তে বিদেশে পাঠিয়ে দাও। শরীরটা খারাপ আছে, বছর-খানিক রেডুনে পিসির কাছে থেকে আশ্রয়। ফিরে এসে গুর কি মতামত থাকে দেখে ব্যবস্থা করা যাবে।”

অনিচ্ছাসঙ্গেও মিজ-গৃহিণীকে এই ব্যবস্থাতে রাজি হইতে হইল। মিলি ও হৈমন্তীর এক পিসি কয়েক বছর হইল রেডুনে দরবাড়ী করিয়া আছেন। তিনি খুব ক্যাশানেবল সমাজে ঘোরেন করেন, শরীর সারাইবার নাম করিয়া সেখানে পিসির দরবারে যদি কাহারও হাতে কোনও উপায়ে মেয়েটিকে সঁপিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক টিলে দুই পাখী মাঝে হইবে। অতঃপর দেশে স্ববেশ বাগড়া দিতে যাইতে পারিবে না, মিলিও নূতন আবহাওয়ার ভিতর পড়িয়া তাহার পুরাতন সাজ-সজ্জা জাঁকজমকের নেশায় আবার মাতিয়া উঠিতে পারে। এখানে এক কবিতা-পড়া হৈমন্তী ছাড়া দ্বিতীয় সঙ্গী নাই, কে মিলিকে সংসারের শ্রেষ্ঠ বস চিনাইয়া দেয়? মা হইয়া মেয়েকে কি কবিতা শিক্ষা দেওয়া যায় যে সংসারে টাকার চেয়ে বড় কিছু নাই? টাকা না হইলে স্বথ সৌভাগ্য, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, মান মর্যাদা, কিছুই রক্ষা করা যায় না, অথচ টাকা যে সবার বড় একুশা মুখ ফুটিয়া বলিতে বাগবাঁও লজ্জার কথা। তাহার চেয়ে যেখানে টাকার স্বথ, টাকার আনন্দ মাছর দুই বেলা হাজার কাজে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে, সেইখানে মেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পরখ কবিতা দেখা যাউক না, আপনা হইতে উহার মস্তিষ্কে কিছু ঢোকে কি না! এ বিষয়ে-হৈমন্তীর মত বোকা ত সে ছিল না বরাবর। হৈমন্তীকে পুতুলের মত সাজাইয়া রাখা হয়, তাই সে সাজে গোজে, কিন্তু মিলির এ সকল বিষয়ে আপনার অন্তরের প্রেরণা ছিল। ইহাও একটা ক্যাপা, ভিখারী ছেলের পান্নায় পড়িয়া তাহার যে এমন মাথা

বিগড়াইয়া যাইবে তাহা কে জানিত? যৌবন-ধর্ম বাস্তবিকই বিচিত্র! মিলিব মত মেয়ে এই অর্থ-সর্বস্ব দিনে গেল ফেপিয়া, আর মিজ-গৃহিণীর মত রামকৃষ্ণের ভক্তিমতী শিষ্যাকে কিনা শেষে কজাকে বুকাইতে হইবে টাকার মর্যাদা!

মিলি যাত্রার আরোজন করিল প্রায় সন্ধ্যাসিনীর মত। বত ভাল কাপড়চোপড় ছিল সব আলমারী বোকাই করিয়া রাখিয়া বঙ্গলক্ষীর মোটা মোটা কাপড়ে বাস্তব সাজানো হইল। স্বথ দেখিয়া বলিল, “তুমি ভাই, এই ক’মাসে এমন বদলে গেলে কি করে? তোমার রেডুনের পিসিমার বাড়ী পান থেকে চুপ খসলে ত বল টি টি পড়ে যায়, সেখানে নাকি আয়ারা ছাড়া কেউ স্বতোর কাপড় পরে না, তবে তুমি কোন্ সাহসে এমন করে সেখানে যাচ্ছ?”

মিলি বলিল, “আমি ত ভগ্নপ্রা করতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি? ত্যাগেই ভগ্নপ্রা সিদ্ধি হয়, ভোগে কি সিদ্ধি মেলে কখনও?”

স্বথ অবাক হইয়া মিলির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “মিলিদি, তুমি এসব কথা কোথা থেকে শিখলে? এসব তুমি জানতে? বিশ্বাস হয় না ভাল করে।”

মিলি বলিল, “সব মাহুকেরই আশ্রিতোক্ত জাগবার দিন আসে। এতদিন ঘুমিয়ে অন্ধ হয়ে ছিলাম বলে আমি কি চিরদিনই তাই থাকব? হুখ আমার ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে।”

মিলিকে কিছু বলিল না, কিন্তু স্বথার মনে পড়িল, প্রথম যখন সে বিবাহের ‘মেঘ ও রোদ্দ’ পড়ে তখন হৈমন্তী তাহাকে ‘এস হে ফিরে এস, নাথ হে ফিরে এস’ গানটি গাহিয়া শুনাইয়াছিল। সে বেশীদিনের কথা নয় স্বথ বলিয়াছিল, “আমার নিতি স্বথ ফিরে এস হে, আমার চিরদুখ ফিরে এস” মানে কি? যে নিতি স্বথ, সেই কি চিরদুখ হইতে পারে? হৈমন্তী বলিয়াছিল, “ঐখানেই ত গানের আসল সৌন্দর্য!” আজও স্বথ ভাবিতেছিল, মিলির জীবনের এই সমস্ত দিনে কোনটা বড়, তাহার দুখ না তাহার স্বথ? স্বথের সন্ধানে কি সে দুখের কষ্টকমুর্ট মাথায় করিয়া চলিয়াছে, না দুখ-বেদনাই তাহাকে স্বথের তুচ্ছতা বুকাইয়া

দিয়াছে? মানুষ পৃথিবীতে আনন্দের পিছনে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুঃখই বলুক আর ভাগই বলুক, এই বেদনা, এই নিপীড়নের ভিতর মিলিদিদি নিশ্চয়ই কিছু একটা অপূর্ণ আনন্দ আবিষ্কার করিয়াছে যাহা তাহাকে অনায়াসে সকল কষ্টের উপবে উঠিতে সমর্থ করিতেছে। সুখা বুঝিয়াছে, ইহা মিলির প্রেমের গৌরব।

হৈমন্তী কালো বলিয়া স্কুলের মেয়েরা যখন তাহার সমালোচনা করিয়াছিল, তখন সুখা বিস্মিত হইয়াছিল তাহাদের অন্ধতা দেখিয়া যাহারা হৈমন্তীর আয়ত গভীর চোখের দৃষ্টি ও যুগলগ্রীবের অপূর্ণ ভঙ্গী দেখিতে পায় নাই। আজ সুখাই ভাবিতেছিল, মানুষের পরিচয়ের প্রথম সূত্র ত চোখের দৃষ্টি, সেই ত প্রথম ভাল-লাগার সিংহদ্বার খুলিয়া দেয়। কিন্তু সুরেশদাকে দেখিয়া ভাল লাগিবার কিছু ত সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সে শুধু কালো নয়, মোটা বৈটে। চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রখরতা তাহার একমাত্র সৌন্দর্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে চোখও ত সাবাস্থ্য থাকে চশমায় ঢাকা। কথা বলিয়া মানুষের মনকে মুগ্ধ করার দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠতর একটি পথ আছে বটে, কিন্তু সুবেদার কাজে আলস্য যতই কম হউক, কথা বলার আলস্য অসাধারণ। মিলির মত যে মেয়ে পৃথিবীর বাইরের খোলস দেখিয়াই বিশ্বসংসারের মূল্য নির্ধারণ করিত, সে কি করিয়া বাহিরের এত বড় সব বাধাকে অতিক্রম করিয়া একেবারে সুরেশের অন্তরের খবর লইতে অগ্রসর হইল?

নিজেকে প্রশ্ন করিয়া সুখা নিজেকেই তিরস্কার করিল। যাহাদের অন্তরের পবিচয়কে বিধাতা বহু রূপহীন আবরণ দিয়া

ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের চিনিয়া লইবার জন্য তিনিই যে মানুষের মনে পরশপাথরের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কি সুখার ভোলা উচিত? বিধাতা ত সুখাকে রূপের পসরা দিয়া পৃথিবীতে পাঠান নাই, বাস্বেদবীই বা তাহাব উপর সদয় কোথায়? তবে সে কি মনে করে যে পৃথিবীতে তাহাকে কেহ কোনও দিন চিনিবে না? সুখা জানে, সুখা বিশ্বাস করে, এই রকম অসম্ভব জগতে প্রতিনিয়ত সম্ভব হইতেছে। এমনই করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করাতাই মানুষের ভালবাসার গৌরব, ইহা যত দিন যাইতেছে ততই সুখা সন্তুষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছে। পৃথিবীতে অমর হইয়া তাহারা থাকে না যাহারা ধন জন নৃপ মান মর্যাদা দেখিা ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহারাই হয় অমর যাহারা ভালবাসাব জন্য দারিদ্র্য অপমান, দুঃখ বেদনা, সকলই মাথা পাতিয়া লইয়াছে। একথা কাব্যে সহিতে প্রতিদিনই ত সে পড়িতেছে। তাহার অন্তরও ইহাতেই প্রকার সহিত সম দিতেছে।

মিলি কঠিন সঙ্কল্প লইয়া চটিয়া গেল, হৈমন্তী ও সুখার কৈশোর-নাটো ঘেন যবনিকা পড়িয়া নূতন একটা অঙ্কে আরম্ভ হইল। যাহা তাগজে-কালিতে এতদিন পড়িয়াছে তাহা এমন কবিতা বাস্তব হইয়া উঠিতে তাহারাই ইতিপূর্বে দেখে নাই। তাহাদের স্কুলের তরুণের পিছনে এখন জীবন্ত উপমা সর্বদা মনের পর্দায় আঁকা থাকে, শুধু মস্তিষ্কে বিচাশক্তির উপব নির্ভর করিয়া তরু করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। মিলি ঘেন নীরবে চোখ তুলিয়া বলে, আমার দিকে চেয়ে কথা বল। তরুণের যুক্তির খেই হারাইয়া যায়, তাহার নীরব অনুরোধ বড় হইয়া উঠে। [ক্রমশঃ]



বঞ্চে নারী-নির্ধাতন ও তাহার প্রতিকার

কাজী আনিসর রহমান, যশোহর

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের বর্করতাব কাহিনী কৰ্ণগোচর হওয়ার পর যার সৰ্কসেহের রক্তকণিকা উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে লোকসমাজে হিন্দু বা মুসলমান যে-নামেই পরিচিত হোক না কেন—আমরা মনে করি, তার ধর্মই নেই, কারণ-আজ পর্যন্ত জগতের কোন ধর্মগ্রন্থকই পাপের প্রশ্রয় দেবার নির্দেশ দিয়ে যান নি। মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন সমাজহিতৈষী হয়ত বলতে পারেন যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা না হলেও অনেকটা অতিরঞ্জিত; হিন্দুরা একে সাজিয়ে-গুজিয়ে খুব বড় করে দেখিয়েছেন। এ মন্তব্যটি মেনে নিলেও ঘটনাটি যে-আকাবে প্রকাশিত হয়েছে তার যদি এক-চতুর্থাংশও সত্য হয় তবে তা শুধু মুসলমানের নয়, সমগ্র বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির ছুরপনের কলঙ্ক।

প্রতিহিংসার নাম করে যে-দেশে এখনও দলবদ্ধ ভাবে এক জন বর্ষীয়সী মহিলার স্ত্রীলতা ও সত্যীত্বের উপর নিকৃষ্ট বর্করতা চলতে পারে সে-দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার শুদ্ধতা নিয়ে আজ যদি জগৎ-সভায় কোন অপপ্রিয় প্রশ্ন উঠেই পড়ে ত তার জন্য যে-কোন আন্তর্জাতিক আন্দোলনই সমগ্র বাঙালী জাতির পক্ষেই একান্ত লজ্জাকর; কারণ খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের আসামীরা আগে বাঙালী, পরে মুসলমান।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ঠিক উক্ত ঘটনার পর থেকেই, কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যেক বাঙালীর মনে প্রশ্নে এবং সামাজিক ব্যবস্থায় এমন একটি পবিবর্তন হওয়া উচিত যার ফলে ভবিষ্যতে অল্পরূপ ঘটনা বন্ধদেগকে অভিশপ্ত করতে না পারে।

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের ঘটনা না-হয় উৎকট প্রতিহিংসার একটি স্বঘন্যতম নারকীয় রূপ, কিন্তু সে ঘটনা বাদ দিলেও প্রতিদিন নারীঘটিত যে-সব পাশবিক ব্যাপারের সঙ্গে

আমাদের পরিচয় ঘটছে তাই-ই বা কম কি? বহুদিন থেকে দেখে আসছি, দৈনিক খবরের কাগজ উল্টোতেই “আইন আদালত” প্রসঙ্গে সব-চেয়ে বেশী কবে চোখে পড়ে নারী-নিগ্রহের সংবাদ; পথে ঘাটে ট্রেনে সীমারে প্রায়ই চোখে পড়ে, হয়ত একটি লোক একখানা দৈনিক কাগজ ধরে বসে আছে। আর একদল লোক, সকলেই বাঙালী—হিন্দু-মুসলমান—আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নারীর উপর অত্যাচারের যে পরম উপাদেয় খবর নিঃশেষে সংগ্রহ করে নিচ্ছে—যেন এক দল ক্ষুধাতুরের মধ্যে এক বুড়ি মিঠায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

আদালতে দেখা যায়, খুনী মোকদ্দমায় যত লোক জমা হয় তার চেয়ে বেশী লোক হাজির হয় সামান্য কোন নারী-নির্ধাতনের লজ্জাকর মোকদ্দমায় রস উপভোগ করার জন্য। এ থেকে এটুকু বেশ সহজেই বোঝা যায় যে, নারী-নির্ধাতন ব্যাপারে বাঙালী সম্পূর্ণ উদাসীন নয়। নারী-নির্ধাতনের কৌতুকবোধে তারা বিশেষ মনোযোগী, কেবল তার প্রতিকার ও নিরোধের বেলাতেই তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

আজকাল কয়েক জন সজ্জন ডব্ললোকের চেষ্টায় কয়েকটি আশ্রমের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে নির্ধাতিতা মেয়েরা আশ্রয় পান এবং যেখান থেকে ঐ সমস্ত মোকদ্দমায় তদ্বিরাদি করা হয়। উষর মরুভূমির উত্তপ্ত কঠোরতা ও অভ্যাগ্র জ্বালার মাঝে ঐ ছুটি-একটি জলাশয়ের সৃষ্টিতে বাস্তবিকই গৌরব বোধ করা যায়। কিন্তু নিরাশ্রিতাদের সংখ্যার হুলনায় সেগুলি অকিঞ্চিৎকর এবং ঐ সব আশ্রমের সৃষ্টপোষকদের যে পরিমাণ আগ্রহ ও উত্তম বর্ধমান, বোধ হয় ঠিক সেই পরিমাণে অর্থের অনটন। বাংলা দেশে আজও এমন দু-এক জন ধনবান ব্যক্তি আছেন তাদের মনের প্রসার তাঁদের ধনের পরিমাণে যদি বেড়ে

যায় তাহ'লে ঐ-সব শুভপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ উন্নতি হ'তে পারে এবং নির্ধাতিতা সকল মহিলাদেরই হয়ত পবে সছুপায়ে নির্দোষ কার্যিক পরিশ্রমে জীবন ধারণের ব্যবস্থা হ'তে পারে।

তবু নারী-নির্ধাতন ঠিক একই ভাবেই চলতে থাকবে যদি সঙ্গে সঙ্গে তা নিরোধের অন্য প্রকার ব্যবস্থাও না করা যায়। হয়ত ঐ সব আশ্রমেব তরফ থেকে তদ্বির আবও ভাল হবে, অপরাধীর দণ্ড আরও বেশী হবে, কিন্তু তাতে অপরাধের সংখ্যা কম হবে কি? যদি তাই হ'ত তাহ'লে 'খুনের বদলে ফাঁসির দৃষ্টান্ত এ-দেশ থেকে হত্যাবৃত্তির বিলোপ সাধন করত। মানুষ যত দিন স্বীয় বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে কোন কাজকে অস্ত্রায় ও নিন্দনীয় মনে না করবে তত দিন অল্পকুল অবস্থা পেলেই সে অপরাধ করেই যেতে থাকবে। সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা শাস্তির দৃষ্টান্ত থেকেই কোন দিনই সং লোকে পরিণত হবে না। একই ব্যক্তি বার-বার একই অপরাধে দণ্ডিত হচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

নির্ধাতিতা ও নির্ধাতকের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত যাতে নারী-নির্ধাতনের বাস্তবিকই প্রতিকার হ'তে পারে।

সম্প্রতি মেয়েদের ভিতরেও প্রতিজ্ঞার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খোঁদ-গোবিন্দপুরের ব্যাপারের পূর্ব তাঁরাও দলবদ্ধ ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং এর প্রতিকারের জন্য সমিতি প্রভৃতির সৃষ্টি করেছেন। এ সমস্তই শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। আশ্রয়কার জন্য তাঁরা যে যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন এবং অস্ত্রায় মেয়েদের শক্তিসঙ্কে সাহায্য করতে পারেন ততই এ-দেশের পক্ষে মঙ্গল, কিন্তু তাঁদের প্রচারণা যেন তাঁদের নিজেদের ভিতরই সীমাবদ্ধ না হয়। শহরের গুলিকয়েক শিক্ষিতা মহিলার ব্যায়াম, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি শিক্ষায় বাংলায় লক্ষ লক্ষ অবগুষ্ঠনবতী পল্লীবধুর উপকার হবে না।

অবস্থা বেরূপ দাঁড়িয়েছে তাতে উক্ত নারী-নির্ধাতনের প্রকৃত প্রতিকারের জন্য আমাদেরকে হিন্দু-মুসলমান ও জ্ঞান-পুরুষনির্কির্শেবে সমবেতভাবে এমন কতকগুলি

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যা শুধু কথায় পর্যাবসিত না হয়ে সর্বতোভাবে কার্যকরী হয়। সর্বসাধারণের বিবেচনার জন্য কতকগুলি বিষয়ব্যবস্থার উল্লেখ করছি যেগুলি নারী-নির্ধাতনে সবিশেষ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে হয় :—

(১) যে-সকল শিক্ষিতা মহিলা লাঠি, ছোরা ও জুজু-হু খেলার নিপুণা তাঁদের সমবেত চেষ্টায় পল্লী-অঞ্চলে বিস্তৃত ও ব্যাপক ভাবে সমিতি স্থাপন, এবং সেই সকল সমিতির উদ্দেশ্যে গ্রামস্থ মহিলাগণকে সাহসী ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা,—বিপদ উপস্থিত হ'লে যাতে বিপদগ্রস্ত পল্লী-বধু ও পল্লীবালারা ভয়ে অস্থির না হয়ে সাহস বিক্রম ও উপস্থিত-বুদ্ধি প্রয়োগে আপন আপন নিষ্কৃতির পথ আবিষ্কার করতে পারেন। সমিতির মেয়েরা হিন্দু-মুসলমান জাতি-নির্কির্শেবে প্রতি গৃহে উপযাচিকা হয়ে উপস্থিত হবেন এবং তথাকার মহিলাগণকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলবেন। এই কাণ্ডে হয়ত তাঁরা প্রতি গ্রাম থেকেই অল্পবিস্তর বধা পাবেন, কিন্তু সেই বধা জয় করাই হবে তাঁদের কৃতিত্ব।

সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়ে নারী-নির্ধাতনের প্রতিকার সমস্তা সম্বন্ধে দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা প্রয়োজন, যাতে বিষয়টির খুব গুরুত্ব সকাল বুঝতে পাবেন এবং তাঁর প্রতিকারের জন্য শিক্ষিত সম্ভ্রদায়ের পক্ষ থেকে অবিরত চেষ্টা চলতে থাকে। ফলে আজ যারা সংবাদপত্রে নারী-নির্ধাতন প্রসঙ্গের উল্লেখ দলবদ্ধভাবে কৌতুকোৎসাহে বুকে পড়ছেন হয়ত কাল তাঁরাই ঐ একই সংবাদে ঘৃণার ক্রোধে ও লজ্জায় অস্থির বোধ করবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের নিষ্ঠুর পল্লীপ্রান্তেও নারী-নির্ধাতনের প্রতিকারের জন্য প্রত্যেকেই সচেষ্ট হবেন। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়েই এই ব্যাপারে দেশের জনগণের আন্তরিক সহায়ত্ব ও সহযোগ লাভ করা সম্ভব হবে। বঙ্গের সমস্ত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখক লেখিকাদের একান্ত মনোযোগ এই সমস্যার দিকে ফেন আবর্ত্ত হয়।

(২) কোন নারী-নির্ধাতনের ঘটনাকে যেন সাম্প্রদায়িক করে না-তোলা হয়। অপরাধী হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, সর্বক্ষেত্রেই নিষ্ঠা ও শান্তির পাত্র। • যেহেতু

আসামী এক জন মুসলমান এবং নির্ধাতিতা নাবী হিন্দু কাজেই মুসলমানমাজেই সর্বতোভাবে আসামীকে সাহায্য কবতে হবে, সে গুরুতর অপবাধে অভিযুক্ত হলেও তাকে রক্ষা করতেই হবে, কোন মুসলমানই যেন এরূপ চিন্তা মনে পোষণ না করেন। ধর্ম নিয়ে, চাকুবী নিয়ে, সবকাবের দান নিয়ে, সদস্য-সংখ্যা নিয়ে, যে-সব সাম্প্রদায়িকতা এতদিন চলে আসছে তাতেই এ-দেশের উত্তাপ তাপমান-যন্ত্রের সর্বোচ্চ ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই উঠে গেছে, এর পর চোর ডাকাত বদমায়েসদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক লীলা আরম্ভ করলে দেশে অবস্থা এমন হয়ে পড়াবে যে বোধ হয় সারারাত লাঠি হাতে করে ঘরের সম্মুখে পাহারা দিয়েই জীবন কাটাতে হবে। নির্ধাতিতা জীলোক হিন্দু হ'লে এবং অত্যাচারীবা মুসলমান হ'লে এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজ থেকে অপরাধীকে কোন প্রকারে অহুকম্পা সহানুভূতি বা সাহায্য কবতে কেহই যেন আগ্রহ না হন। গ্রামের নেতা ও মাতব্বরগণ থেকে আরম্ভ করে পুলিশ ও উকিল-মোস্তার পর্যন্ত কেহই যেন নারী-নির্ধাতিতাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপাব মনে না করে যথার্থ অপরাধী শাস্তিপ্রদানে তৎপর হন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মৌলবী-মওলানা থেকে আরম্ভ করে বঙ্গদেশের প্রত্যেক মসজিদে-এমামগণ পর্যন্ত ধর্মোপদেশের ভিতর দিয়ে অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে উক্ত অপবাধের গুরুত্ব কি ও পবিত্রিকত দূর তা যেন সুন্দররূপে বুঝিয়ে দেন। অপরাধীদের মধ্যে সংখ্যা হিসাবে মুসলমানই বেশী, সুতরাং তাহাদেরই শাস্তি বেশী হইবে বলিয়া কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানই ক্ষেত্রে স্থগিত না হন। দুই ফোটার অস্ত্রোপচাবের সময় সামাজিক অঙ্গ থেকে যে রুধিরপাত হবে এত স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলে ত আর বিবাস্ত ফোটারকে পোষণ করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হয়ে না-হয় ইংরেজের আদালত থেকেই আসামীকে ছাড়িয়ে আনলাম, কিন্তু এইরূপ অপরাধীর জন্ত কোরান-শরীফে যে-সব ব্যবস্থার কথা লেখা আছে তার থেকে পরিজ্ঞানের উপায় কি? কুলবধূদো ইজ্জৎ যখন বিপদাপন্ন তখন আইন একটু কঠিন হ'লে ক্ষতি কি?

(৩) ম্যালেরিয়া-বিনাশক সমিতি এবং রক্ষীর দলেন

মত প্রতি গ্রামে উৎসাহী ভদ্র বুঝবুঝ কহুক এক-একটি সমিতি গঠিত হোক—যাদের কাজ হবে প্রতি গ্রামে পালাক্রমে দলবদ্ধভাবে গ্রামস্থ চৌকিদার ও দফাদার সমভিব্যাহারে গ্রামের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাহারা দেওয়া, সন্দিক্ত ব্যক্তির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং অবস্থা-বিশেষে উপরিস্থ পুলিশ কর্মচারী বা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সাময়িক রিপোর্ট দিয়ে তাঁদের সমস্ত বিষয়ে ওচাতিবহাল রাখা। উক্ত সমিতি যেখানে যেখানে রক্ষীব দল আছে তাদের এবং প্রয়োজন-মত নবগঠিত মহিলা-সমিতির সাহায্য লাভ করতে পারবে। গবর্নেন্টের কাছ থেকে উক্ত কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্য লাভের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের ইউনিয়ন বোর্ডগুলিও যাতে সঙ্গে সঙ্গে ত্বরূপে-দমনে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকে তারও ব্যবস্থা করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা দরকার।

(৪) পর্দা বিষয়ে যথাসম্ভব সাবধান হওয়া। উপযুক্ত পর্দা প্রচলিত রাখলে নারী-শিক্ষা ও নারী-জাগরণ অসম্ভব হবে একথা ঠাৱা মনে করেন তাঁরা ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখতে পাব যে উপযুক্ত পর্দার ভিতর আত্ম রক্ষা করেও ক্রমশঃ জীলোকেরা সাহিত্য ধর্ম ও রাজনীতি আলোচনায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন এবং অনেকে রাজ্যশাসনেও অভ্যস্ত ছিলেন। সেরূপ ব্যাপক ভাবে পর্দার ব্যবস্থা না হয় নাই হ'ল তবু স্থান-বিশেষে এবং প্রয়োজন-মত পর্দারক্ষার ব্যবস্থা না করলে এ-দেশে নিরাপদ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা বোধ করি কঠিন হয়ে পড়বে। শহরের শিক্ষিতা মহিলাগণের কথা পৃথক। কারণ সেখানে ঐ সমস্ত অপরাধের সুযোগ ও সুবিধা অল্প এবং সে-সমস্ত মহিলা এত দূর অগ্রসর যে, দরকার হ'লে আত্মরক্ষার যে-কোন ব্যবস্থা তাঁরা যেক্রমেই হোক কবতে পাবেন। সেইরূপ কোন কোন বন্ধিফু গ্রামের কথাও পৃথক। ঠাৱা গ্রামে বাস করেন তাঁদের ভিতর পর্দা সম্বন্ধে আর একটু হুঁশিয়ার হ'লে বোধ হয় অনেকটা ভাল হয়। লজ্জাশীলা গ্রাম্য নারী আত্মরক্ষার কোন উপায়েই অভ্যস্তা নন, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতেও এত দূর অগ্রসর নন যে সহসা আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন।

আর সবচেয়ে বিপদে পড়েন এই সব নিরীহ গ্রাম্য মহিলারা। নির্ধাতা জীলোকের সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, হয় তাঁরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান (যাদের পর্দা নেই) নয়ত গ্রাম্য হিন্দু পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই সব পল্লীবালা ও পল্লীবধূগণ গ্রাম্য পুরুষ-দীঘি এবং নদীঘাটে স্নান করেন এবং স্নানান্তে সিন্ধুসনাবৃত্তা, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে যখন পল্লীপথে গৃহাভিমুখিনী হন তখনই এই-সব নরপশুর ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ও লালসায় উন্নত হয়ে নির্দ্বিষ্ট কুলললনা বা কুল-বধূর অগ্রগামী হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই স্বযোগ বুঝে কোন এক অন্তর্ভুক্ত তাদের কারুর-না-কারুর সর্বনাশ সাধন করে। সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চশ্রেণীর মুসলমান পরিবারে সচরাচর এ ঘটনা দেখা যায় না, কারণ পর্দার সেখানে খুবই কড়াবড়ি এবং যে-সমস্ত হিন্দু এঁদেরই মত পর্দা মেনে চলেন তাঁরাও কতকটা নিশ্চিন্ত, আর যে-সমস্ত মহিলা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন বা শহরে বাস করে চালচলনে অভ্যস্ত হয়েছেন, যার এক বা খাবার আগেই ছু-ধা দেওয়ার মত সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছেন তাঁদের কথা সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র, কিন্তু যারা ততটা পারেন নি সেই সমস্ত গ্রাম্য কুলললনা ও কুলবধূদের ভিতর পর্দার খুব কড়াবড়ি না করলেও অন্ততঃ স্থান-বিশেষে এবং লোক ও শ্রেণী বিশেষের সম্মুখে অন্তরালবর্তিনী হয়ে চলাটাই বোধ হয় বিশেষ সূক্ষ্মপ্রদ হবে। পর্দা-উচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কোন কথা বলছি না। যে-সমস্ত মহিলা আত্মনির্ভরশীলা হয়ে পথে-ঘাটে চলার মত সাহস, ক্ষমতা, শিক্ষা ও শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন তাঁরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন এবং যে ভাবে ইচ্ছা চলতে পারেন। কিন্তু যারা তা পারেন নি, তাঁরা কেন এই-সব বিপদের ভিতর অঁথা বাঁপ দেবেন?

দেশের সমস্ত স্বথ-সৌভাগ্য আশ-ভরসার উৎস যে মায়েবা তাঁদেরই সম্বন্ধ ও নারীত্ব স্বরূপ অমূল্যমূল্য বর্ধনকারী উৎপীড়িত হয়ে চলছে, তাতে হিন্দু-মুসলমাননির্কিশেষ বজ্রের সমস্ত হুসন্তানকে সমস্তভাবে এমন ব্যবস্থার জন্ত চেষ্টা করতে হবে যাতে এই পাপ ও পঙ্কিলতার ধারাবর্ষণ থেকে রক্ষা পেতে পারা যায়।

চিলে-কোঠার ছাদ

জীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হেমন্তের অপরাহ্নে সজ্জিত রাসের মিনার্ভা-গাড়ীখানি অরুণ শুভে নবনির্মিত বাড়ীর দুয়ারে অল্প একটু শব্দ করিয়া থামিল। অরুণ শুভ হালের বড়লোক। সরকারী চাকুরী হইতে সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন এবং অবসরপ্রাপ্তির স্বযোগে কিছু মোটা টাকা হাতে আসাতে কাঞ্চন-কৌলীয়া বজায় রাখিতে লেক-বরাবর একখানি জিতল বাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছেন।

কোলাপুসিবল্-গেটের দু-ধারে পিতলের হরফে নিজ নামের পরিচয় খুঁদিয়া রাখিয়া আপনাকে অমর করিবার বাসনা অত্যন্ত বড় লোকদেরই মত তাঁরও প্রবল। গেটের মধ্য দিয়া নাতিবৃহৎ বৈঠকখানায় ঢুকিলেই বুঝা যায় অতিআধুনিকতার

সঙ্গে তাঁর কচির কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বৈঠক-খানায় ঢুকিবার আগে সজ্জিত রাসের মিনার্ভা-কার হঠাৎ কেন এখানে আসিল সেই কথা বলা যাক।

নূতন বাড়ীতে আসিবার মুখে যে-উৎসব নবাগত অধিবাসীদের বার্তা পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করিয়া দেয়, হিসাবী শুভ-পরিবার সেই উৎসবকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া এখানে ঢুকিয়াছিলেন। মাত্র মাস-দেড়েকের কথা, পূজার সময় তাঁরা আসিয়াছেন এবং অগ্রহায়ণে এই ছেলের বিবাহ উপলক্ষে গৃহপ্রবেশের জটটুকু হুদে আসতে পোষাইয়া লইতেছেন।

আজ বৌ-ভাত। আলোকমালায় উজ্জলিত নাট্য-মঞ্চের মত সাদা বাড়ীখানি ঝকঝক করিতেছে। • প্রত্যেক

বাতায়নে সূদৃশ রেশমী পর্দার আড়ালে বিহ্বল-লেখার মত রূপের রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। কত রকমের শাড়ী ও গহনা এবং সৌন্দর্য্যপ্রকাশের কত না অভিনব ভঙ্গী। বাড়ীখানির নিকটবর্তী হইলে ঘন পুষ্পসার-সৌরভে সুরভিত উদ্যান্তে আসিয়াছি বলিয়া ভ্রম হয় (অবশ্য চক্ষু মুদিলে) এবং পরক্ষণেই কোলাহলে সে মোহ ভাঙিয়া হাটের মাঝে দাঁড়াইয়া আছি এ ধারণাও দূরতর হয়। যে ধারণাই হউক, নূতন বাড়ী এবং প্রথম উৎসব, প্রচারের গৌরব ঘাঘাতে কোনক্রমে মলিন না হয় সে-দিকে গৃহস্থামীর দৃষ্টি প্রথর।

মোটর থামিতেই গৃহকর্ত্তী অগ্রসর হইয়া ইহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। স্বজিত রায়ের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। রায় বাহাদুর স্বজিত রায়—দোদীশু প্রতাপশালী জমিদার; বংশমর্যাদায় ও ধনশালিতায় সে প্রতাপের কিয়দংশ বালিগঞ্জ-সমাজে প্রচারিত। ঐ বাড়ীর এক ছেলে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইতে গিয়াছে, এক ছেলে কোথাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, চিত্র-প্রতিভায় এক ছেলের খ্যাতি বর্ষাসম্ভার হাসহানার গন্ধের মত বাংলায় বহুদূরব্যাপী, কনিষ্ঠ পুত্রটি লার্ন-রপ্তরের বড় চাকুরিয়া। অর্থ এবং সম্মানের সৌভাগ্য দুই-ই প্রচুর। ইহাদের পরিবার যে অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

অরুণ গুহের বাড়ীখানি বড় হইলেও গঠন-নৈপুণ্যে অতি-আধুনিকতার কিছু জটিল ইহাতে আছে। বাড়ীর সামনে এতটুকু লন নাই যেখানে বৈকালিক-ব্যাডমিন্টনের আসর অনায়াসে জমিয়া উঠিবে। ফটকের সামনে নাতিপ্রশস্ত সিঁড়িতে তাই পাম-অর্কিড বসাইয়া উজানবিলাসকে পরিভূষিত করিতে হইয়াছে। সেই কৃত্রিম উজানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া গুহ-গৃহিণী রায়-পরিবারকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সামনের ঘরটি বৈঠকখানা। ঠিক চতুষ্কোণি নহে, খুব প্রশস্তও নহে এবং ন্যূনতরুপে বলিয়াই বৈঠকরুম আসবাব-পত্র দিয়া ঢাকিয়া দোকানের শো-কেসের আকৃতি ধারণ করে নাই। ছদ্ম-জানালায় আটটি...মধ্যস্থলের ছদ্মের মাথায় গোলাকৃতি পিতলের ঘড়ি—ঘণ্টা ও আধ ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মিনিটব্যাপী স্রমধুর জলতরঙ্গের শব্দ শ্রবণ পরিভূষিত করে। নাকী সাতটি ছদ্ম-জানালায় মাথায় দেশী সিঁদুরের

আঁকা ছবি—যে-ছবিগুলির অধিকাংশই চিত্র-প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে।

ঘড়ির নীচের কারুকার্য্যখচিত এক ব্রাকেটে পিতলের ছোট ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি। সাদা রজনীগন্ধার মালা তথাগতের কণ্ঠ-দেশে বিলম্বিত হইয়া বদ্ধাঙ্গলিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। প্রত্যেক ছবির ক্রেম বেড়িয়া আধফুটস্থ কুলমালা। ঘরের মেঝের ছোট টেবিলটার উপরে ও মীনখচিত ফুলদানে গোলাপ-গুচ্ছ ও রজনীগন্ধার ঝাড়। দামী টেবল-ক্লথের নক্সা এই বাড়ীরই কোন কুমারী কস্তার শিল্পসাধনার পরিচয় বহন করিতেছে; বিকশিত পুষ্পের প্রত্যেকটি পাপড়িতে সূক্ষ্ম সূচীশিল্পে তার নামের আত্মকর বিভ্রমান।

মেঝের পাতা পুরু গালিচার পা দিলে অতি কোমল আরামম্পর্শে মন যেন তল্লাস হইয়া উঠে। নিতান্ত পায়ের তলায় পড়িয়া আছে বলিয়াই তার বুননশিল্পেব এতটুকু প্রতিভা কাহারও মনের মাঝে কোন পরিচয়ই বহন করে না উপবে মধ্যমলের নীল চন্দ্রাতপ,—অত্যন্ত ছোট ও ক্ষীণ-জ্যোতি বিজলী বাতির ঘন সন্নিবেশে নক্ষত্রখচিত আকাশের মতই মনে হয়। লতায়, ফুলে, গন্ধে ও সজ্জাপারিপাটো মনোহরণের চেষ্টা সর্বত্র সুপরিষ্কৃত। ঘরের কোণে টিপদের উত্তর রক্ষিত পিতলের 'ভাস' ও সারসপাখীর কথা বলিতে ভুল হইয়াছে এবং চকচকে মেহগনি পালিশের দেওয়াল-আলমারিতে সোনার জলে নাম লেখা যে-সব বই বক্তৃক করিতেছে—কাব্য, ইতিহাস, জীবনী ও উপজ্ঞাস—সেগুলির কথাও বলা হয় নাই। ছোট আলমারি, সংগ্রহ কম, কিন্তু সারবান। বিশ্বসাহিত্যের খ্যাতিমান লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনার নমুনা এটুকু আলমারিতেই পাওয়া যায়। বুঝা গেল, ঘনের সঙ্গে রুচির সামঞ্জস্য সাধনে গৃহস্থামী অক্লপ।

মেঝেরা কিন্তু বৈঠকখানায় বসিলেন না।

ছদ্মের টাডানো সূদৃশ ও সুবাসিত মধ্যমলের পর্দা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন।

কাজের বাড়ী, তথাপি বিশৃঙ্খলতার চিরুজাজ কোথাও নাই। লাল সিমেণ্টের উঠান—বেলে পাথরের মত মন্থ ও চক্চকে; ঘরের মেঝেগুলি সূদৃশ কার্পেটে ঢাকা না থাকিলে 'মোজেক' শিল্পের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইত।

প্রত্যেক ঘরে ঢুকিবার সময় নীচের চৌকাঠে বসিয়া আঙুল-পরিহিত পদযুগল বাহাতে স্বল্পমাত্র বাধা প্রাপ্ত না হয়, সেই জন্য চৌকাঠের বালাই নাই। পালিশ-করা সেগুন কাঠের নক্সা-কাটা ছয়, মাঝখানটার চড়া পালিশ আঙ্গনার কাজ করিতেছে, চীনা-মিজীর হাতে কাঠের ফুল কোটে ভাল—তাই চার গুণ মজুরি দিয়া দুয়ারের উপর ফুল ফুটানো হইয়াছে। বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান থাকিলে প্যাসোডা নির্মাণের জন্য জাপান হইতে কারিগর আসিত এবং তক্ষণ-শিল্পের উৎকর্ষ দেখাইতে গ্রীক ভাস্কর যে না-আসিত এমন নহে, সেজন্য অল্প একটু আক্ষেপ করিয়া গৃহ-গৃহিণী বিকে সন্ধান করিয়া কহিলেন, “পরানের মা, মাছ তুমি একাই ফুটলে?”

পরানের মা মোস্তা-রঞ্জিত কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল, “শোন গো কথা! ওই রান্নাসে মাছ একা ফুটল কি গো? রাজভজন ফুডল দিয়ে কাঠ চেলানোর মত চেলিয়ে দিলে—তবে ত পুটিতে আমাতে ধরাধরি ক’রে ফুটল!”

গৃহিণী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “ক-টা এসেছিল?”

হাতের বুড়া আঙুলটি মাত্র মুড়িয়া বি ইঙ্গিতে জানাইল। পানের রসে মজা মোস্তার পিকটুকু তখন সে পরমু আরামে গিলিতেছিল। গৃহিণী বিষয় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “মোট চারটে। এদিকে যে হাজার লোকের আয়োজন করা হয়েছে।”

বি এবার মুখে জবাব দিল, “চারটে ত চার ক্ষণও বেশী। ও ভোমাদের বাঁশ-দীঘিখে এসেছে। আর বাজারে-কেনা আছে চার মণ, গল্‌দা চিংড়ি আছে—”

“হ’লে ভাল।” বলিয়া অতিথিদের লইয়া গৃহ-গৃহিণী সামনের ঘরখানিতে ঢুকিলেন।

প্রকাণ্ড পালঙ্ক—প্রায় ঘরখানি জুড়িয়া আছে। এত বড় ও ভারি পালঙ্ক একালে কেহ কদাচিৎ ব্যবহার করে। ভারি পায়ার সেকালের দেশী ছুতার-মিজির কাজ, নামী মিজী তিনটি পায়ার নক্সা কাটিয়া চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই এবং তাহার অসম্পূর্ণ কাজ বহু চেষ্টায় যদি বা চীনা মিজী দ্বারা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে—তথাপি নাকি তেমনটি হয় নাই।

নীল ফাল্গুনের স্নিগ্ধ আলো পড়িয়া ঘরের মধ্যে পোষাকের আলমারিটা বেশ মানাইয়াছে।

মুক্তা-বসানো বেনাবসী ব্লাউস ও জ্যাকেট, পাড়ের উপর মীনার কাজ করা শান্তিপূরী শাড়ীগুলি অত্যন্ত লোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

কক্ষান্তরে আর একটি দ্রষ্টব্য জিনিষ হইতেছে ফটো-এলবাম। এই পরিবারস্থ জীবিত এক মৃত, বৃদ্ধ এবং তরুণের, একক অথবা গোষ্ঠীসনেত বিচিত্র বকমের ক্রেয়ে বাঁধানো বিভিন্ন বকমের ফটোগুলি বংশের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেকটি ফটোর পাশে জন্ম, মৃত্যু ও জীবনের স্বর্ণীয় ঘটনা বা কীর্তিগুলির স্মরণ-তারিখ লেখা—ভবিষ্যতে কোন তথ্যাহুসন্ধানী এই বংশের ইতিহাস সঙ্কলনে বাহাতে ভ্রম-প্রমাদের অধীন হইয়া না পড়েন সেই জন্যই বা হয়ত এই সতর্কতা! উৎসব উপলক্ষে আজ প্রত্যেকটি ফটো মাণ্যবিকৃষিত, ফটোর ক্রেয়ে বেড-চন্দনের ফোঁটা!

এ-ঘরের মধ্য দিয়া যে লম্বা ফালি-ঘরখানিতে যাওয়া যায়—সেটা এ-বাড়ীর ভাঁড়ার। স্থলর পালঙ্ক নাই; ফুলের মালা, ফটো বা নয়নরঞ্জক কোন কিছু না থাকিলেও ছন্দও চাহিয়া দেখিবার বস্তু আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিতলের গামলা, ডেকুটি, পিতলের বাদতি, জাগু, নানান বকমের কাসার খালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বড়া, হাত, বেড়ি প্রভৃতিতে ঘরখানি আকর্ষণ বোঝাই। জিনিষগুলি যে কক্ষোপলক্ষে অল্প বাড়ী হইতে চাহিয়া আনা হয় নাই তাহাও প্রমাণ-স্বরূপ গৃহ-গৃহিণী পিতলের সবচেয়ে বড় গামলাখানা হাত দিয়া উল্টাইয়া অতিথির পানে চাহিয়া সহাস্তে কহিলেন, “কর্তার খেয়াল—পুরো নাম না লেখালে জিনিষ চুরি যেতে পারে। প্রত্যেকটিতে এমন ধারা পুরো নাম লেখা।” একটু থামিয়া বলিলেন, “চুরিই যদি যায় নামে কি কোন কিনারা হয়!”—বলিয়া পরম কৌতুকভরে হাসিলেন।

একতলার রান্নাঘরটা তেতলার প্রমোশন পাইবে—কোক কয়লার পাট তুলিয়া দিয়া বিদ্যুতপে রান্না করিলে অনর্থক ধোঁয়া হয় না, দামী আসবাবপত্র বা ঘরের পেষ্টিংও নষ্ট হয় না—কর্তা নিমরাজী হইয়াছেন, স্বতরাং এখন ও-ঘরটার চুকিয়া কাজ নাই।

উহার পাশে ঝি চাকরদের ঘর—হাজার বল—কহা করিলেও নোংরামি উহাদের মজ্জাগত স্বভাব—মিছামিছি ও-ঘরে গিয়া মাথা ধরাইয়া কি হইবে ?

দোতলায় পিতলমণ্ডিত সিঁড়ি আর সিঁড়ির পাশে ছোট ছোট আয়না ও লতাফুলে আঁকা নকশা—কর্তার সখ ।

বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময় সখের দিকে চাহিয়া খরচের কথাটা একদম ভুলিয়া গিয়াছিলেন । কর্তা যদি সখ করিলেন লতায়, গৃহিণীর সখ গেল স্নানঘরের পারিপাটসাদ্য ন । ঠাণ্ডা ও গরম জলের বাথ-টব, হাঁসের ভিমের মত চন্দন কঠোর ক্রেমে বাঁধানো বড় আয়না, টয়লেটের জল স্ফুটন্ত দেয়াল-আলমারি, উচ্চশক্তিবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক আলো, মেঝে ও দেওয়ালে ছন্দবল মর্ম্মর প্রস্তর—এ-সব তাঁরই স্ববাস-মত হইয়াছে । স্নানঘর ঠাকুরঘরের চেয়েও এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ । দেহমন্দির সুসজ্জিত কবিতা যেখানে সকাল-বিকালের অনেকগুলি মুহূর্ত্ত প্রত্যহ ব্যয়িত হইয়া যায়, প্রসাধনে মেহের সজীবতা ও মনের প্রফুল্লতা যেখানে প্রজ্জ্বলিত দীপ-শলাকার স্পর্শে পূর্ণ-তৈল প্রদীপের মতই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে । শুচিতায়, সৌগন্ধে, তারুণ্যে ও নবীভূত আশায় যেখানে প্রাণেব দলগুলি নিত্য বিকশিত হয়—তেমন জান এই স্নানাগার । জীবনে স্মরণীয় রাত্রির রেখা এই ঘরের প্রত্যেক পাথরের স্ফুটনায় দীপ্যমান এবং দিনের পুষ্টীভূত আলস্তে সেগুলি মম্বর ।

কিন্তু স্নানঘরের এই বিস্তৃত বর্ণনার কোন প্রয়োজনই ছিল না, কেবল মাত্র গৃহিণীর সখের জিনিষ এবং গৃহিণীই বক্তা বলিয়া নিরুপায় লেখক এবং ততোধিক নিরুপায় পাঠকের ধৈর্য্যকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার সব পথই বন্ধ ।

সেই নিরুপায়তার পথ ধরিয়া আমরা দোতলায় পৌছিলাম । এখানেও ‘মোজেকে’র মেঝে পুরু গালিচায় ঢাকা, ছবির ক্রেমে ফুলের মালা ও বোঝাই খাটে নেটের মশারি । এখানে আলনা, আলমারি, প্রসাধন-টেবিল, খেঁত পাথরের টিপস, বুককেস, প্রত্যেক ঘরে বিভিন্ন রকমের ঘড়ি, বিভিন্ন রকমের পুস্পারসৌরভ ; বিদ্যুৎ-বাতিতেও বৈচিত্র্য যথেষ্ট । রূপার মীন-করা ট্রেতে গোলাপী পান আন্নিয়া দাসী হাজির করিল ; ট্রের এক পাশে সোনার কোটায় লক্কো-

জবনা ও কান্নীর সৃষ্টি । এই বাড়ীরই এক মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া রূপার পিচ্কারীতে গোলাপজল ছিটাইয়া অতিথিদের স্নান করাইয়া দিল ।

সকলে জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন । পর্দা সরাইয়া মুখ বাড়াইতেই রাস্তার এক ভিখারী মেয়ে হাত উচু করিয়া ভিক্ষা চাহিল । মেয়েটার বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য । কালো রং, ময়লা কাপড় ও কাঁকড়া চুলে তাকে বেশ ক্ষুৎসিত দেখাইতেছে ।

গৃহিণীর ছোট মেয়ে হাত ভুলিয়া বলিল, “ভাগু” । গৃহিণী তাহাকে মিষ্ট স্বরে ধমক দিলেন এবং আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া একটি টাকা ভিখারী মেয়ের প্রসারিত হাতের উপর ফেলিয়া দিয়া মেয়েকে বলিলেন, “ছি মা ! কাউকে কটু কথা বলতে নেই । ওরা হচ্ছে দরিদ্রনারায়ণ” ।

ভিখারী মেয়েটির উচ্ছ্বসিত কল্যাণকামনায় কান না দিয়া গৃহিণী সকলকে লইয়া চলিলেন জিতলে ।

জিতলে—ঘে-ঘরে ফুলশয্যা হইবে সেই ঘরে আসিয়া—একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়া অন্ত সকলকে বসিতে অনুরোধ করিলেন । ঘরে আসবাব বেশী নাই—দেওয়াল হইতে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত ফুলে ঢাকা । ঘরের কোণে অগ্যান্য অ্যুর জানালার ধারে পালক, কোথাও ফুলের অপ্রাচুর্য্য নাই । ঘর ফুলমসৌরভে বাতাসটুকু পর্য্যন্ত সেখানে নিশ্বাসের অনুভূত নহে এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে যে-টুকু পরিচয় জমিয়া উঠিল তাহাও ঘনতায় কুসুমগন্ধের মতই শ্বাসরোধক । আয়নায় হাই দিলে যেমন অস্বচ্ছতা জমিয়া উঠে কিংবা শীতের দিনে মেঘলা আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য্যকে যেমন দেখায়, তেমনই এই পরিচয়ের প্রণয় এ-পিঠের পাশে ও-পিঠের প্রতিবিম্বকে ভাসাইয়া তুলে না । গৃহিণী শ্রোতীদের গল্প বলিতেছিলেন, “ওঁর ইচ্ছে বিলেত যান—বাড়ীর কর্তাদের অমত । তাঁদের প্রেজুডিস না থাকলেও কেমন একটা ভয় ছিল—লণ্ডনের হাওয়ায় এ দেশের ছেলেগুলির স্বভাব যায় বদলে । আমরা বললেন, ‘কি করি ?’ ছোট মেয়ে আমি—কি-ই বা বুঝি ! তবু বুক বেঁধে বললুম, ‘যাও ।’ মনে ভয় আর ভাবনা অবিশ্তি খুবই হয়েছিল, কিন্তু ওঁর বাবার আগ্রহ দেখে ‘না’ বলতে পারলুম না ।.....বিলেত থেকে ফিরে এলেন—এতটুকুও বদলে যান নি । ধুতি পরে বাবা-মাকে

প্রণাম করতই তাঁরা খুশী হয়ে বললেন, ‘বোমারই ভয়।’
যাহোক ভাই আমি ত খোঁটা খাবার দায় থেকে বেঁচে গেলাম।”

মুখে চোখে তাঁর আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। কয়েকটি পান
গালে পুরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “চাকরি নিয়েও
বিভ্রাট। মোটা মাইনের একটা অফারে থাকিলেন—সিমলয়ে।
বললুম, ‘না, বাপ-মা’র মনে আর কষ্ট দিও না।’”

স্বজিত রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা মুচকি হাসিয়া বলিলেন,
“শুধু বাপ-মায়ের মনে।”

গৃহিণীও হাসিলেন, “সে ত ভাই নিজের মনেই জন।
কষ্টটা যারই হোক বা যে-দিক দিয়েই হোক বলবার কান্ড
ওই একটি।”

ঘরস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

হাসিবে মধ্যেই গৃহিণী আবশ্য করিলেন, “কলকাতাতেই
রইলেন—চাকরি করপোরেশনে। মাইনে অবিভ্রাট খুব
মোটা নয়—পাঁচ-শ থেকে শুরু। এখন আমায় দেন খোঁট,—
‘সিমলয়ে গেলে এ-রকম বাড়ী দশখানা তুলে ছাড়তুম।’
আমিও হাসি আর বলি, ‘তোমার মাত্র দুই ছেলে—মেরুও
দুই। বা আছে ওদের দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা
ঐ থেকেই হবে। আমাদের দিন ত শেষ হয়ে এল।’”

স্বজিত রায়ের বিধবা ভগ্নী বলিলেন, “তা তু বটেই।
বড়ছেলেটি বুঝি বিলেত গেছে?”

“হা, ইচ্ছেটা ওর আই-সি-এস হয়। আমরা বলি
আই-সি-এসই হও আর বাই হও এমনটি নাম আর করতে
হবে না। ছোট এবার ডাক্তারী দিলে—ওর ইচ্ছে জার্মেনীতে
যায়।”

স্বজিত রায়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কহিলেন, “তা ঘুরে এলেই
না হয় বিয়ে দিতেন।”

“ষে-বাড়ীর যে প্রথা।”

“প্রথার কথা বলছি না, দূর-প্রবাসে স্বামী গেলে
বউয়ের মনে কি হয় সেটা ত জানেন।”

“সে ভাই তুমিও ত জান। ক-বছর হ’ল?”

বউট মুখ নামাইয়া কহিলেন, “পাঁচ।”

স্বজিত রায়ের ভগ্নী কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন,
“ছেলের বিয়ে ত সুনলুম দিয়েছেন বিলেত-ফেরতের ঘরে,
ছেলে যে বিলেত যাবে তার আর আশঙ্কা কি।”

গৃহিণী প্রসঙ্গ পাইয়া শতমুখ হইলেন, “ওই দেখুন, বলতে
ভুলেছি—বিলেত-ফেরতের চোখই আলাদা। আহ্ন না,
দেখবেন বিয়ের দান-সামগ্রী, দুটি ঘর বোঝাই শুধু ফার্ণিচার।
কর্তা বলছিলেন, ‘এই-সব সাজাতে নতুন একখানা বাড়ী
করতে হবে সায়েবী ক্যাশানের’।” বললুম, আহ্নক ত বিলেত
ঘুরে, যদি ডাক্তার হয় কাজে লাগবে। বেম্বাই বুদ্ধিমান,
সুনেছেন জমাই জার্মেনী যাবে ডাক্তারী শিখতে, তাই
আগে থেকেই ডাক্তারের ঘর দিচ্ছেন শুঁড়িয়ে।”

গৃহিণীর কথা শেষ হইল না, নাহিরে ঘন ঘন মোটরের
শব্দ উঠিল। সিঁড়িতে জুতার ও শাড়ীর শব্দ, বহু কণ্ঠের
কোলাহল, উগ্র পুষ্পসার সৌরভ ভাসিয়া আসিল। “নারী-
জাদা ঘর হইতে নিমন্ত্রিতের আসিয়াছেন—তাঁহাদের
অভ্যর্থনার দ্রুতি না হয়—ব্যস্ত হইয়া গৃহিণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা হইতে রাত্রির মধ্যময় পর্যন্ত উৎসবের যে-
কলরোল চলিল তাহার বর্ণনা দেওয়া বাহুল্য মাত্র। উৎসবের
ক্ষেত্র পাইলে প্রকাশেব মহিমা যে কতটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে
সে-কথা বিচিত্রবেশিনী স্বস্তি-পুরিকারা ভালই জানেন।
তাদের নবতর ফ্যাশান বা বনিয়াদী চাল, তাঁদের হাসির
মাত্রা ও বাক্যের শালীনতা, তাঁদের শিষ্টাচার ও বিলাস-
পরিমিতির ইতিহাস দেওয়া বাহুল্য মাত্র, কেন না, ইতিহাস
পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি করে।

ঐ-বাড়ীর সর্বত্র ঘুরিয়াছেন সকল স্থানেরই কাহিনী
সুনিয়াছেন—কার থৈথালে কোন স্থানের স্বয়মাতৃক ভাল
ফুটিয়াছে সে তথ্য কাহারও অবদিত নহে, শুধু পরিত্যক্ত
চিলে-কোঠার কাহিনী অস্বস্ত বহিয়াছে।

একান্ত নির্জন—সমস্ত ঐশ্বর্যেরই মণিস্বরূপ হইয়াও
ঐহীন ছাদে উঠিবার সিঁড়ি না থাকিলে যাহার আশ্রয় পর্যন্ত
কেহ কল্পনা করিতে পাবিত না সেই সর্বহা বা বাংলার
বিধবার মত উৎসব-ক্ষেত্র হইতে সসঙ্কোচে হৃদয়ে অবস্থিত
চিলে-কোঠার আসিবার সময় এতদংশে হইল।

রাত্রি গভীর। চারিদিকের কোলাহল স্তিমিতপ্রায়,
নীচের দীপাবলী নিবিয়া গিয়াছে, আকাশজোড়া অন্ধকারের
কালে শান্তিময় বাড়ীখানি অভ্যস্ত আরামে ঘুমাইতেছে।
উপরেব কীর্ণজ্যোতি নক্ষত্রের আলোয় দেখা গেল, তেতলার
ছাদে দুইটি তরুণ-তরুণী আসিয়া দাঁড়াইল।

ছাদের অধিকাংশ হোগলায় ছাওয়া, এক পাশে তার ভিমানঘর। বাকী জায়গাটা উচ্ছিষ্ট পাতায়, ঘাসে লুচি-তরকারির সঙ্গে খই খই করিতেছে, ও-দিক পানে পা দেওয়া দূরের কথা চাহিলেই গা বমি বমি করে।

তরুণ-তরুণীও সেখানে দাঁড়াইল না, চিলেকোঠার ছাদে উঠিবার জন্য যে কাঠের সিঁড়ি ছিল তাহার প্রথম ধাপে পা দিয়া তরুণ তরুণীর হাত ধরিয়া কহিল, “এস।”

তারপর দু-জনে নিঃশব্দে চিলেকোঠার ছাদের উপর উঠিয়া আসিল। ক্ষীণ-জ্যোতি তারার আলোয় দেখা গেল উহাদের স্বকুমার ললার চন্দনচর্চিত, গলায় ফুলের মালা, পন্ননে দামী ঘুতি ও বেনারসী শাড়ী। ফুলের টায়রাটা মাথা হইতে খুলিয়া হাতে লইয়া তরুণী নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুহূষের কহিল, “আঃ! বা মাথা ধরেছে।”

তরুণও হাসিয়া বলিল, “ওপরে এসে বাঁচলুম। এস, বস। যাক।”

অপরিস্কার ছাদের উপর বর-বধূ পরম আরামে পাশাপাশি বসিল।

ছেলেটি বধুর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, “তোমার খুব ভয় কচ্ছিল, নয়?”

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল।

ছেলেটি বলিল, “সারাদিন যা গেছে। হৈ হৈ হইগোল—বিয়ে না! বাজার বসানো! ঐ ফুল, আলো, খাওয়াদাওয়া আর লোকের লোকিকতাগুলো যদি কেউ উঠিয়ে দেয় ত বিয়েটা খুব সোজা হয়ে আসে।”

মেয়েটি মুখে কাপড় দিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

ছেলেটি বলিল, “তোমার ভাল লাগছিল?”

মেয়েটি হাসিতে হাসিতেই জবাব দিল, “না লাগলে উপায় কি? তুমি ত ঘুরলে বাইরে বাইরে; সেজেগুজে এক গা গহনা পরে যদি চোরের মত বসতে ত টের পেতে মজা।”

ছেলেটি বলিল, “তুমি যেন নতুন-কেনা গুতুল, তাই ঠকা-জেতার বিচার করবেন বাইরের পাঁচ জনে।”

মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিল, “দশে মিলে করি কাজ হার জিত নাহি লাজ—জান ত?”

ছেলেটি একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, “যাক ও-সব কথা। কেমন লাগছে ছাদ? আকাশে চাঁদ নেই, বাঁচা গেছে। অন্ধকারে তুমি আর আমি, নতুন আলাপের পক্ষে এর চেয়ে ভাল ব্যাকগ্রাউণ্ড আর কি হতে পারে?”

মেয়েটি বলিল, “সারারাত এখানে কাটাবে নাকি?”

“কতি কি। আর একটু স’রে এস, তোমার হাত—বাঃ রে শুয়ে পড়বার উত্তোগ করছ যে। কোথায় আমি মনে করছি তোমার কোলে মাথা রেখে—”

মেয়েটি হাসিল, “দু-জনের মন আজ থেকে এক হ’ল কিনা—তাই তোমার মনের কথা আমার মনকেও ছুঁয়েছে।”—বলিয়া মেয়েটি সত্যসত্যই জজাল-ভরা ছাদে সটান শুইয়া পড়িয়া ছেলেটির কোলে মাথা রাখিল।

তার এলো খোঁপাটা সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া পড়িয়া চুলের গন্ধের সঙ্গে ফুলের গন্ধ মিশিয়া গেল ও অন্ধকার ছাদ সেই পরম লোভনীয় স্বাদে স্বাদ হইয়া উঠিল।

ছেলেটির হাত দুখানি প্রথম প্রিয়স্পর্শের স্বপ্নাতিশয্যে অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটির মুখের উপর কুঁকিয়া পড়িয়া সেই মুহূ-কম্পিত হাত দুখানি দিয়া তার মস্ত ললাটের চূর্ণ কুন্তলদাম সরাইতে সরাইতে বিহ্বল কণ্ঠে ডাকিল, “নন্দ, নন্দরাণী?”

চক্ষু মুদ্রিয়া নন্দরাণী ছোট্ট জবাব দিল, “উ।”

ধানিকক্ষণ স্পর্শবিহ্বলতার মধ্যে কাটিবার পর নন্দরাণী বলিল, “একটা কথা ভাবাচ্ছি।”

“কি কথা, রাণী?”

“এই চিলেকোঠার ছাদ কি চিরকাল আমাদের মনে থাকবে?”

“কেন থাকবে না, রাণী?”

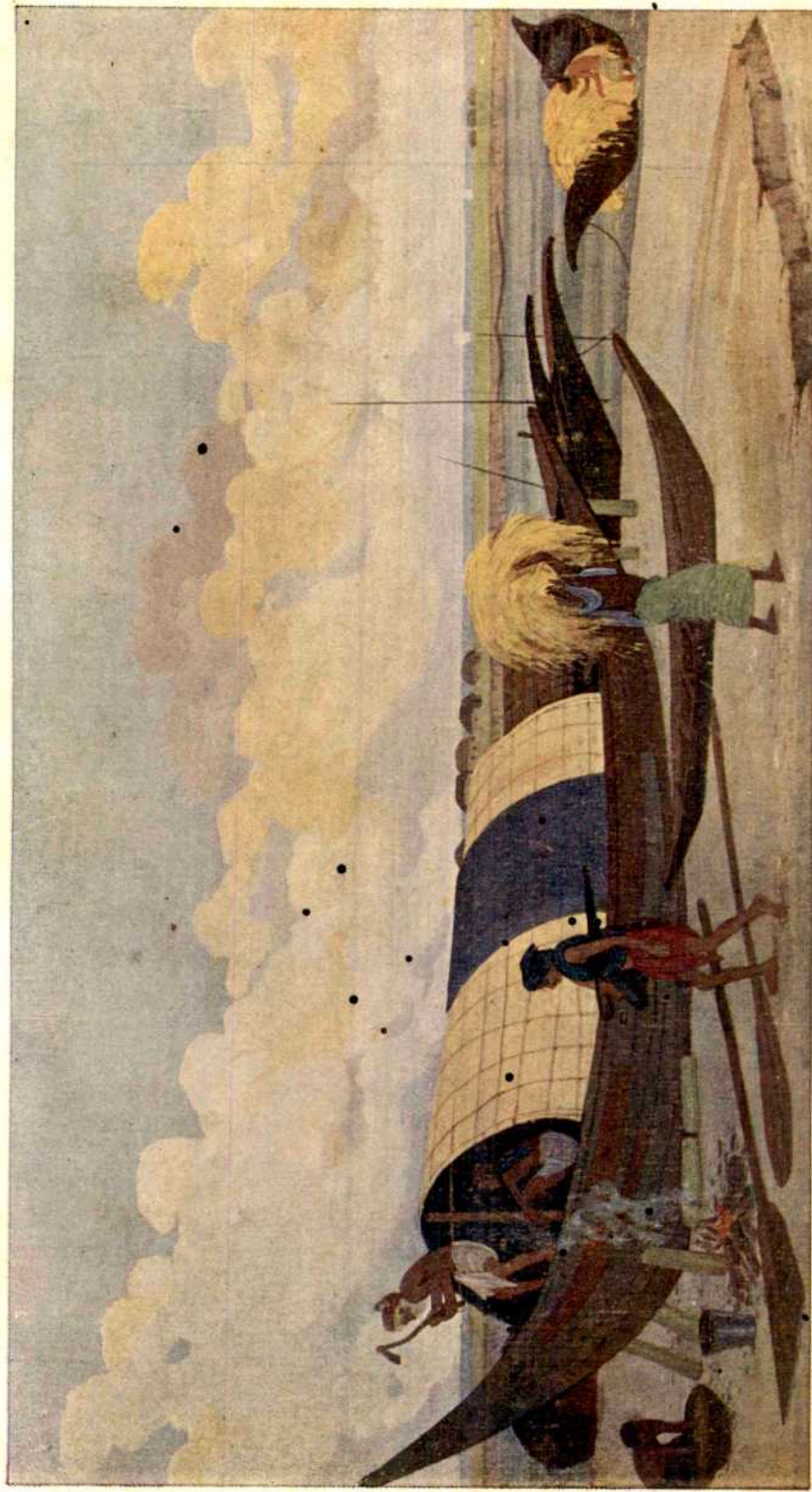
“কি জানি! আমার ত মনে হয় পুরো একটা রাত্রি নীচের ঘরে কাটালে ওপরকে রীতিমত ভয় করতে শিব।”

“দূর পাগলি!”—বলিয়া ছেলেটি আঙুল দিয়া মেয়েটির মাথায় যুহু যুহু টোকা দিতে লাগিল।

“এ যে আমাদের প্রথম আলাপের ক্ষেত্র—একে কি ভোলা যায়? ওকি পা গুটিয়ে নিচ্ছ যে? শীত করছে বুঝি? অজ্ঞান মাস, হিম ত মন্দ পড়ছে না! দাঁড়াও, আমার গায়ের শালখানা দিয়ে তোমার পা দুটি ঢেকে দিই—”

“তার চেয়ে ঘরে চল না কেন?”

“না, এই ত বেশ আছি।” বলিয়া ছেলেটি গা হইতে পাতলা শালখানা খুলিয়া মেয়েটির পা দুটি সঙ্গপণে ঢাকিয়া দিল এবং দুটি বাহু দিয়া তার গঙ্গসিক্ত মুখখানি নিবিড় ভাবে স্পর্শ করিয়া তুলিয়া ধরিল ও সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া আপনার মুখখানি বেপথুমতী বধুর মুখখানির অতি সন্নিকটে নামাইয়া আনিল।



নদীপথে
শ্রী বাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।



ঐক্যশাস্ত্র



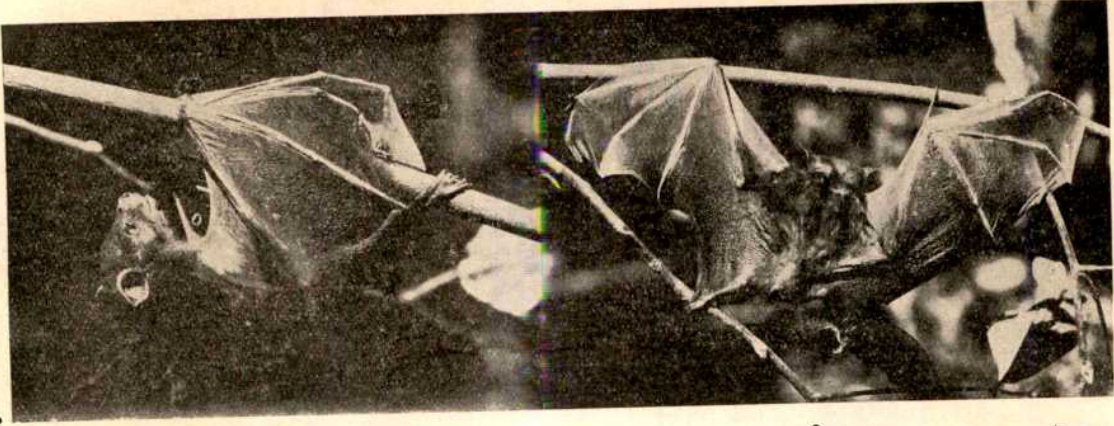
ছিঁচকে-বাহুড়ের আত্মরক্ষার কৌশল

বাহুড় এক অদ্ভুত প্রাণী। পাখীর মত আকাশে উড়িয়া বেড়াইলেও ইহার পক্ষিশ্রেণীভুক্ত নহে। পাখীর ডানা যেমন বিভিন্ন রকমের পালকের সমবায়ে গঠিত, ইহাদের ডানার গড়ন সেক্ষপ নহে। ডানার হাড় পরীক্ষা করিলে মানুষের হাতের সঙ্গে উহার অনেকটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বুঝাঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অগ্ন্যাশ্রু আঙুলগুলি অসম্ভব লম্বা হইয়া গিয়াছে। ডানা হইতে পা পর্যন্ত একখানি পাতলা চামড়া বিস্তৃত। ডানা বিস্তার করিলে এই পাতলা চামড়াই প্যারাসুটের মত বাতাস কাটাইয়া বাহুড়কে আকাশে উড়িতে সাহায্য করে। কোন যুগে বাহুড় সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার সঠিক হিসাব এখনও নির্ণীত হয় নাই। কেবল 'ইয়োসিন' যুগের উর্জ্বতন স্তর হইতে এ পর্যন্ত প্রায় ছয়টি বিভিন্ন গণভুক্ত কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর বাহুড়ের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের বংশধরেরা আজও পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন, যোগ্যতমের উত্তম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার প্রচেষ্টা প্রাণী-জগতের বৈচিত্র্য সৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। শত্রুর আক্রমণ-ভীতি অথবা ভক্ষকের হস্ত হইতে ভক্ষ্যের আত্মরক্ষার্থ পলায়নের প্রচেষ্টার ফলে যে বিভিন্ন ধারায় জীব-জগতের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে—এই মতবাদ সুনির্দিষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলেও অব্যক্তিক নহে। প্রাগৈতিহাসিক সন্নিবেশ বা ঐরূপ কোন প্রাণী হইতে পক্ষযুক্ত প্রাণীর উৎপত্তির বিবরণ সন্দেহাতীত না হইলেও, পাখী ব্যতীত উড়িতে সমর্থ অগ্ন্যাশ্রু প্রাণীদের বিষয় আলোচনা করিলে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, আত্মরক্ষার্থ শত্রুর হস্ত হইতে দ্রুত পলায়ন-প্রচেষ্টার ফলেই তাহাদের উড়বার উপযোগী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ হইয়াছে। উড়ু মাহু, উড়ু কাঠবিড়াল, উড়ু গিরগিটি, বাহুড় এমন কি উড়ু সাপেরা বোধ হয় এমনই কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া উড়বার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছিল। কিন্তু পাখীকে বাদ দিলে, এক বাহুড় ছাড়া আর কেহই আকাশে যথেষ্ট বিচরণ করিতে পারে না। উড়ু মাছেরা তাহাদের পাখীর সাহায্যে এবং কাঠবিড়ালী ও গিরগিটি জাতীয় প্রাণীরা প্যারাসুটের মত বদ্ধিত চামড়ার সাহায্যে বাতাসে ভর করিয়া খানিক দূর উড়িয়া বাইতে পারে মাত্র। এই সমস্ত অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রমবিকাশের উপর অভ্যাস বা অনভ্যাসের ফলাফলও সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। ডানা থাকা সত্ত্বেও অনভ্যাসের ফলে অনেক গৃহপালিত ও বন্ড পাখীর উড়বার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। পেঙ্গুইনদের ডানা যেন ক্রমশই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে, আধিপত্য বিস্তার বা আত্মরক্ষার্থ বংশানুপবংশীয়

পোষিত কোন অভ্যাস বাসনা প্রাণীজগতের দৈনিক ক্রমবিকাশের সহায়ক কি না? আদিম যুগ হইতে মানুষ আকাশে বিচরণ করিবার বাসনা স্থলরে পোষণ করিয়া আসিতেছে। স্বাভাবিক উপায়ে সেই বাসনা পরিতৃপ্তির কোন লক্ষণ প্রকট হইয়াছে কি? অথচ নিম্ন শ্রেণীর অমেবদণ্ডীদের মধ্যে অধিকাংশ কীটপতঙ্গই এই ক্ষমতার অধিকারী, মেবদণ্ডীদের মধ্যে, উড়বার ক্ষমতায় পাখীর পক্ষে বাহুড়ের নাম করা যাইতে পারে। পৃথিবীতে বিচিত্র বর্ণ ও বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির বাহুড়ের সংখ্যা যে কত তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুঃস্থ, সাধারণতঃ কীটপতঙ্গ ও ফলমূলভোজী বাহুড়ের সংখ্যাই বেশী। কীটপতঙ্গত্ব বাহুড়েরা প্রায়ই আকারে ছোট হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ৬০০ শত বিভিন্ন জাতীয় কীট



ছিঁচকে-বাহুড়ের ডালে ঝুলিয়া মাথা নীচু করিয়া
বিশ্রামের উপক্রম



বৃক্ষশাখা অবলম্বনে ঝুলিতে ঝুলিতে ছিঁচকে-
বাহুড় অগ্রসর হইতেছে

ছিঁচকে-বাহুড় উড়িয়া আসিয়া এইমাত্র একটা ঝোপের উপর
পড়িয়াছে। এখন পা দিয়া ডাল ধরিয়া মাথা নীচু
করিয়া বিশ্রাম করিতেছে

পতঙ্গভূক্ত বাহুড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত
“নকটিলিওনিডি” গোষ্ঠীভুক্ত মংগ্রভোজী এবং “ভ্যাম্পায়ার” নামক
রক্তশোষক বাহুড়ও পৃথিবীর কোন কোন অংশে আধিপত্য বিস্তার
করিয়াছে। জাভার “কেলং” বাহুড়ই বোধ হয় আকারে সর্বাপেক্ষা
বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহাদের শরীর প্রায় এক ফুট লম্বা। ডানার
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাঁচ ফুটেরও বেশী লম্বা হইয়া
থাকে। বাহুড়েরা একধারে একটি বা দুইটি বাক্স প্রসব করে।
বাক্সেরা মায়ের বৃক ঝাঁকড়াইয়া থাকে। জ্বী-বাহুড় বাক্স বৃকে
করিয়াই উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা বাসা বাঁধে না মাথা নীচু করিয়া।
পায়ের নখের সাহায্যে গাছের ডালে ঝুলিয়া সারাদিন কাটাইয়া দেয়
এবং স্বাস্থ্যের পর আহাৰ্য্যে বর্গিত হয়। দিনের বেলায়
বিশ্রামকালে প্রায়ই চোচামেচি করিয়া বাসস্থান মুখরিত করিয়া
তোলে। বাহুড়ের মাংস নাকি ধরগোত্রের মাংসের মত খাইতে
সুস্বাদু। অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের “টেরোডেক্টিল”
নামক অদ্ভুত প্রাণীর সঙ্গে বাহুড়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া
যায়। কিন্তু তথাপি বাহুড় ও “টেরোডেক্টিল” এক শ্রেণীর প্রাণী
নহে। বাহুড়ের দৈহিক গঠন হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে,
ইহারা “মারসুপিয়েল” বা প্রাগৈতিহাসিক কাঠবিড়ালীর অঙ্কুর
কোন জন্তু হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমান অবস্থায়
পৌছিয়াছে। টেরোডেক্টিল প্রকৃতিদত্ত আয়ুধে বাহুড় অপেক্ষা
অধিকতর বলীয়ান ছিল এবং আকৃতিতেও ছিল তাহার। বাহুড়
অপেক্ষা অনেক বড়। তথাপি জীবনসংগ্রামে তাহার হারিয়া গেলে,
অথচ শত শত বিভিন্ন জাতীয় বাহুড় আজও পৃথিবীর বৃকে অবাধে
বিচরণ করিতেছে। তবে আশ্চর্য্যকর ইহাদের অনেকেরই নানাবিধ
কৌশল ও লুকোচুরির আশ্রয় লইতে হইয়াছে এই প্রসঙ্গে আমাদের
দেশীয় ছিঁচকে-বাহুড় বা কলা-বাহুড় নামে এক প্রকার মধ্যমাকৃতি
বাহুড়ের জীবনযাত্রা ও আশ্রয়স্থল কৌশলের কথা বিবৃত করিতেছি।

আমাদের দেশে ছোট ও বড় কয়েক প্রকারের বাহুড় দেখিতে
পাওয়া যায়। বড় বাহুড়েরা বংশপরম্পরায় একই স্থানে প্রকৃতিদত্ত

দলবদ্ধাবস্থায় উঁচু গাছের ডালে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ছিঁচকে-
বাহুড়েরা এক স্থানে দলবদ্ধ ভাবে বাস করে না। এক স্থানে
একটি বা সময়ে সময়ে দুইটির অধিক ছিঁচকে-বাহুড় দেখিতে
পাওয়া যায় না। ইহারা প্রায়ই কলা গাছে অথবা ছোট ছোট
নারিকেল সুপারি গাছের পাতার গায়ে ঝুলিয়া দিনের বেলায়
বিশ্রাম উপভোগ করে। সমস্ত সময় পরিত্যক্ত নিষ্কিন প্রকোষ্ঠে ও
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অত্যন্ত
প্রখর, সর্বদাই যেন সজাগ, একটু শব্দ পাইলেই কান খাড়া
করিয়া, চোখ ঘুরাইয়া চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইহারা
রাত্রির কলিয়া অনেকের ধারণা আছে যে, দিনের বেলায় ইহারা
চোখে দেখিতে পায় না। কিন্তু সে ধারণা ভুল। বাহুড় পুষিয়া পরীক্ষা
করিয়া দেখিয়াছি—দিনের বেলায় ইহাদের দৃষ্টিশক্তির বিশেষ কোন
তরতম্য লক্ষিত হয় না। কানের মধ্যে পাশাপাশি ভাবে সমান্তরাল
কতকগুলি ভাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় ইহা শব্দানুভূতির
তীক্ষ্ণতা বর্ধনের সহায়তা করিয়া থাকে। এক প্রান্ত হইতে অপর
প্রান্ত পর্যন্ত ছিঁচকে-বাহুড়ের ডানা প্রায়ই এক ফুট হইতে দেড়
ফুটের বেশী লম্বা হয় না। গায়ের লোম গাঢ় ধূসর বর্ণের; কিন্তু
ডানার পাতলা পর্দার রং কালো। বিশ্রাম করিবার সময় গাছের
শুষ্ক অথবা পচা পাতার মধ্যে ডানায় সর্বশরীর আবৃত করিয়া মুখ
গুঁজিয়া ঝুলিয়া থাকে; কিন্তু চোখ কান অনাবৃত রাখে। হঠাৎ
দেখিলে এই অবস্থায় ইহাদিগকে শুষ্ক পত্র বা ঠিক কোন আবর্জনা
বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এই ভাবে আশ্রয়গোপন করিয়া
সহজেই ইহারা শত্রুর দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হয়। কিন্তু অতিরিক্ত
সাধনাতার ফলে সময় সময় ইহারা শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যায়।
দলবদ্ধ ভাবে উঁচু গাছে অবস্থান করে বলিয়াই হউক অথবা সর্বদা
চোচামেচি করিয়া বিশ্রান্তালাপে মগ্ন থাকে বলিয়াই হউক, বড়
বাহুড়েরা আশ্রয়গোপনের জ্ঞান কোন চলচাতুরী অবলম্বন করে না।
কিন্তু ছিঁচকে-বাহুড়েরা সাধারণতঃ নীচু গাছে, শত্রুর নাগালের
সীমানার মধ্যে বাস করে বলিয়াই বোধ হয় প্রকৃতিদত্ত আশ্রয়গোপন-

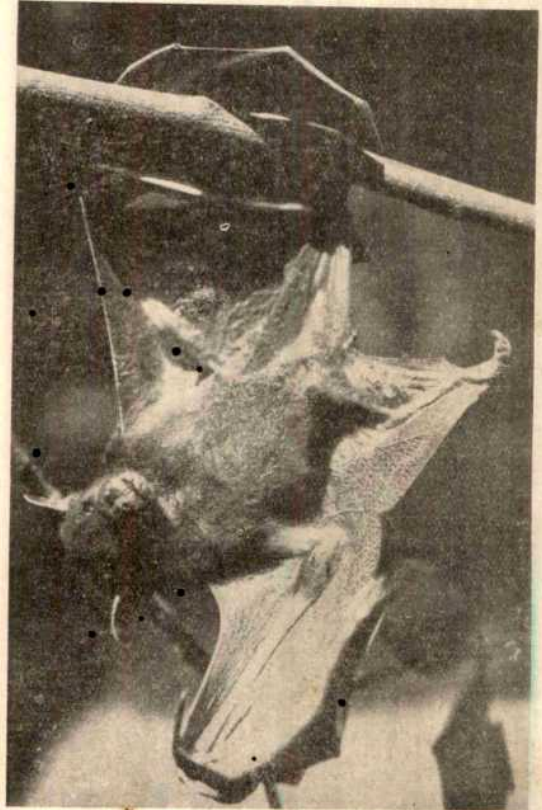
ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও সর্বদাই অতিমাত্রায় সতর্ক। যে স্থানে এই বাহুড় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার আশেপাশে কেহ উপস্থিত হইলেই ইহার ডানার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া শত্রুর গতিরিরি উপর সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে। নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিলে ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কোনই কারণ ঘটে না; কিন্তু এই প্রকার মস্তক-সঞ্চালনের ফলে সহজেই ইহার ধরা পড়িয়া যায়। ধরা পড়িয়া গেলেও সহজে উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে না। সম্মুখের ডানার বুদ্ধাদুষ্ঠের নখ ও পিছনের পায়ের সাহায্যে ডাল বা আশ্রয়স্থানের গা বাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকে। দিনের বেলায় আশ্রয়স্থল পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে গেলে ইহাদের বিপদ অবশ্যস্বাবী। অগাধ হিংস্র প্রাণীর কথা বাদ দিলেও পাখীদের মধ্যে অনেকেই ইহাদের শত্রু। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসীড়ন করে কাকেরা; কোনক্রমে একবার একটু দেখিলেই হয়। যেখানে যার, কাকেরা দল বাধিয়া ইহা-দিগকে অহুসরণ করে এবং ঠোকাইয়া বাহির করে।

গল্পে আছে—একসময়ে পশু ও পাখীদের মধ্যে গুরুতর লড়াই বাধিয়া উঠিয়াছিল। বাহুড়ের সঙ্গে পশু ও পাখী উভয়েরই কোন না-কোন বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের সুযোগে, লড়াইয়ের গতিকে বুঝিয়া, বাহুড় একবার পশুর দলে একবার পাখীর দলে ভিড়িতে লাগিল। পরে উভয় দলে সন্ধি স্থাপিত হইলে বাহুড় মহা ফাঁপরে পড়িল। সেই অবধি সে উভয় দল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া বেড়ায়। কাকেরা নাকি তাহার পক্ষে দৌত্যকার্য্য করিয়া প্রতারণিত হইয়াছিল, তাই আজও তাহার বাহুড়ের অনিষ্ট করিতে ছাড়ে না।

গল্পে বাহাই থাকুক—কাকেরা যে তাহার মাংসের লোভে পিছু তাড়া করে না তাহা তাহাদের ব্যবহার দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাহার উঠাকে উত্থাপ্ত করিয়াই যেন যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করে। কারণ কাকদের ক্রিপণ হৃষ্টমি করা স্বভাব, চিল-শকুনির বেলায় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কাকেরা তাড়া করিতে করিতে ছিঁচকে-বাহুড়কে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেই ইহার প্রাণভয়ে এমন বিকট চীৎকার জুড়িয়া দেয় যে কাকগুলি ভয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না। চারিদিক ঘেরিয়া সকলে মিলিয়া কেবল উচ্চকণ্ঠে কলরব করিতে থাকে।

কিছু দিন আগের কথা। কলিকাতার উপকণ্ঠে একটা বাড়ীতে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি। হঠাৎ বাহিরে একসঙ্গে অনেকগুলি কাকের কলরব শুনিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে বিকৃত মনুষ্য-কণ্ঠের মত এক একটা বিকট চীৎকার। বাহিরে আসিয়া দেখি—কাকগুলি কোথা হইতে যেন একটা বড় ছিঁচকে-বাহুড়কে তাড়া করিয়া আনিয়াছে। বাহুড়টা উড়িয়া যেদিকেই পলাইবার চেষ্টা করে, সকলে মিলিয়া কাকেরা সেদিকেই অহুসরণ করে। দুই-তিন বার বাহুড়টা দালানের কার্ণিসের নীচে লুকাইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না; কাকেরা সেখান হইতে তাহাকে খোঁচাইয়া বাহির করিল। উড়িবার সময় দেখিলাম বাহুড়টার পায়ের প্রায় ৫৬ ইঞ্চি লম্বা একগাছি মোটা স্নাতা বাঁধা রহিয়াছে। বোধ হয় ছেলেরা ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; বাঁধন কাটিয়া পলাইয়াছে। হয়রান হইয়া অবশেষে সে আঙ্গিনার এক প্রান্তে পৌতা একটা

কালো রঙের লম্বা খুঁটির গায়ে লেপটাইয়া বসিয়া পড়িল। আধাআধিভাবে ডানা মেলিয়া বসিবার অদ্ভুত কায়দায় গায়ে বসে খুঁটির রঙের সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়া গেল যে, কাকগুলি ত দূরের কথা, আমিও অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কাকগুলি বাহুড়টাকে খুঁজিয়া না পাইয়া আশে-পাশে তখনও চূপচাপ বসিয়াছিল। খানিকক্ষণ লক্ষ্য করিতেই দেখিতে পাইলাম পায়ের সেই মোটা স্নাতাটা খুঁটির এক পাশ হইতে ঝুলিতেছে। ধরিবার চেষ্টা করিতেই আবার উড়িয়া গেল। কাকগুলি আবার পিছু লইল। এবার ছোট্ট একটা নারিকেলের পাতার ভিতর লুকাইল। এমনই আত্মগোপন করিবার ক্ষমতা যে পরিষ্কার জায়গায় একটা পাতার গায়ে ঝুলিয়া থাকা সত্ত্বেও এতগুলি কাকের নজরে পড়িল না। আমি একটু দূরে থাকিয়া উহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলাম—এবার আমারও স্নাতা ভগ্ন হইল। আন্দাজী দুই-চারটা জিল ছুঁড়িতেই, বাহুড়টা চীৎকার করিতে করিতে উড়িয়া গিয়া একটা উঁচু কলাগাছে আশ্রয় লইল। এবার কিন্তু কাকগুলি ঠিকই লক্ষ্য রাখিয়াছিল। তাহার একযোগে অনেকেই গিয়া গাছটার উপর পড়িল।



ডানার নখের সাহায্যে ছিঁচকে-বাহুড়ের এক ডাল
হইতে অঙ্গ ডালে ঘাইবার চেষ্টা



লক্ষমান ছিঁচকে বাহুড় ডানা নাড়িয়া যেন নিজের
গায়ে হাওয়া করিতেছে

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর কাহারও সাড়াশব্দ নাই। বুঝিলাম—
বাহুড়টা কাকগুলির চোখে ধুলা দিয়াছে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট
পরে গোটাছইঁ কাক কলাগাছটার মাথার ডাঁটাগুলির মধ্যে
ঠোকরাইতেই একটা বিকট চীৎকার শুনিতে পাইলাম। সে কি
ভীষণ চীৎকার! কানে না শুনিতে বুঝিতে পারা যায় না।
ছাতের উপর উঠিয়া দেখিলাম—বাহুড়টা বেঁধে হয় সেই পায়ে-বাঁধা

সুতান্নয় কোনক্রমে গাছের সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। তাই
কাকগুলিকে সম্মুখে দেখিয়া প্রাণভয়ে মুখ হাঁ করিয়া বিকট চীৎকার
করিতেছে। তাহার সেই সময়ের মুখের ভঙ্গী এবং সেই বিকট
চীৎকার শুনিতে সাহসী লোকেরও বোধ হয় হৃৎকম্প উপস্থিত
হইত। আশ্চর্য্য এই দেখিলাম—বাহুড়টার মুখের সেই আক্রমণাত্মক
ভাব ও চীৎকারে কাকগুলি ভড়কাইয়া দূরে সরিয়া গেল। খানিক
বাদে আবার কাছে বাইতেই সেই বিকট চীৎকার—আর হাঁ করিয়া
যেন গিলিতে আসে। কাকগুলি আর অগ্রসর হইল না। প্রায়
আধ ঘণ্টার উপর তাহারা এদিক ওদিক চূপচাপ বসিয়া রহিল।
অবশেষে একান্ত মনমরা হইয়াই যেন উড়িয়া চলিয়া গেল।

ছিঁচকে-বাহুড়ের মুখের উপরের ও নীচের চোয়ালের ধারালো
দাঁতের দারি দেখিলে কীটপতঙ্গ চিবাইয়া খাইবার উপযোগী বলিয়াই
মনে হয়। কিন্তু আমি ইহাঙ্গিকে কীটপতঙ্গ খাইতে লক্ষ্য করি
নাই। পেয়ারা, কলা প্রভৃতি ফল ডানার সম্মুখের নখ দিয়া
বুকের উপর লইয়া কুড়িয়া কুড়িয়া খায়। কিছুক্ষণ খাইয়া আবার
জিভ দিয়া চাটিতে থাকে। ছিঁচকি বাহুড় একত্র হইলে উভয়ে অনেক
প্রকার ক্রীড়াকৌতুক করে, আবার সময়ে সময়ে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া
চৈতামেচি করে। সময়ে সময়ে দেখা যায় ঝুলিতে ঝুলিতে ডানা
মেলিয়া যেন নিজের শরীরে হাওয়া করিতেছে। কখনও বা সম্মুখের
নখ দিয়া ঝুলিয়া যেন হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়—দূর হইতে মনে হয়
যেন একটা কালো রঙের অদ্ভুত আকৃতির ব্যাং আস্তে আস্তে পা
ফেলিয়া চলিয়াছে। নির্জন সমাধিমন্দিরে বা পরিত্যক্ত নির্জন
বাড়ীতে সময় সময় ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অগাত্য
বাহুড়ের কণ্ঠস্বরের তুলনায় এই ছিঁচকে-বাহুড়ের কণ্ঠস্বর অতি ভীষণ—
বিকৃত মনুষ্যকণ্ঠস্বরের স্তায়। ইহাদের এই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের
জগাই অনেক সময়ে নির্জন স্থানসমূহ 'ভূতের আড্ডা' বলিয়া
লোকের মনে একটা ভাস্কর্য্য ধারণা জন্মিয়া থাকে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



মহারাজ দিব্য

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিজ্ঞাবিনোদ

অষ্টম শতাব্দীর এক পুণ্যতিথিতে গোড়ীয় প্রজাবৃন্দ প্রশংসনীয় উজ্জমে সমবেত হইয়া অরাজকতা নিবারণকল্পে গোপাল নামক অনুপম সৌভাগ্যশালী এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ পাল-বংশের আদিপুরুষ। ইহার পরবর্তী রাজগণ স্বদীর্ঘকাল প্রজাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন এবং প্রজাগণও সম্পদে বিপদে রাজশক্তির সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া পালরাজগণ আসমুদ্র হিমাচল সাম্রাজ্যবিস্তার, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ ও তাহার হস্ত হইতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রজাশক্তি পাল-সাম্রাজ্যের সম্ভাবনীয়শক্তির আধার ছিল।

একাদশ শতাব্দীতে এই বংশের একাদশ রাজা তৃতীয়-বিগ্রহপাল, মহীপাল, শূরপাল, রামপাল নামক তিন পুত্র রাথিয়া পরলোকগমন করিলে মহীপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া এই বংশে এক নূতন নাটকের অভিনয় আরম্ভ করেন। পরবর্তী পালরাজগণের তাম্রশাসনে ইহার কৃতকর্মের উল্লেখ নাই সত্য কিন্তু ইহার কর্মক্ষেত্রে হস্তান্তরিত রাজ্য পরবর্তী রাজ্যকর্তৃক পুনরায় অজ্ঞিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ লিখিত আছে। মহীপালের ভ্রাতৃপুত্র রাজা কুমারপালের মন্ত্রী বৈষ্ণবদেবের কর্মোলী-লিপির দুইটি শ্লোক এইরূপ—

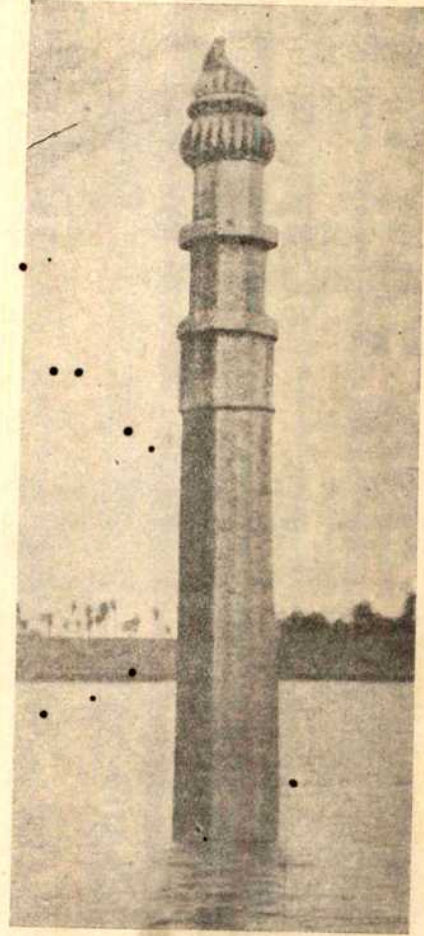
তস্যোজ্জ্বল পৌরুষস্য নৃপতে: শ্রীরামপালোহভবৎ
পুত্র পালকুলদি শীতকিরণ: সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্ যথাবদ্যশ:
ক্ষৌণীনায়ক ভীমরাবণ বধাত্ম্যদ্বৈবোন্মৎসনাং ॥

নৃপতি বিগ্রহপালের রামপাল নামক পুত্র ছিলেন। তিনি যুদ্ধরূপ সাগর লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীনায়ক ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া জনকভূরূপ সীতার উদ্ধার করিয়া ত্রিজগতে যশ: বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

কুমারপালের ভ্রাতা রাজা মদনপালের মনহলি-লিপির একটি শ্লোক এইরূপ—

এতদ্যাপি সহোদর নরপতিদ্বিবা প্রজানির্ভর।
ফোভাহুত বিধূত বাসবদ্যুতি রামপালোহভবৎ ॥

দেবলোকবাসিগণের অতিশয় চিন্তাচঞ্চল্যে আহুত হইয়া আন্দোলিতচিত্ত দেবরাজ যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন এই নরপতির (শূরপালের) সহোদর শ্রীরামপাল নামক নরপতি সেইরূপ দিব্যের পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আহুত ও আন্দোলিতচিত্ত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন।



মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ

বিজ্ঞানবস্থান ব্যুহে ভূতনয়াদ্রাণমুক্তদায়াদে
বিদ্যাবিলাস চঞ্চল মায়ামুগ তৃষ্ণাস্তুরিতে ।

রামপাল পক্ষের ঢাকা—অজ্ঞাত বিজনে স্থানমবস্থানং তেন
ব্যুহবিগত উ যন্ত তস্মিন রামপালে ভূতং সত্যং নয়োনীতং তয়ো-
ররক্ষণে যুক্তঃ প্রসজ্ঞোদায়াদো ভ্রাতা মহীপালে। যন্তা ময়া লক্ষা
মৃগতৃষ্ণা মমায়ং লক্ষ্মীং গ্রহীয্যতীতি মুগ্ধতয়াহস্তুরিতে তিরোহিতে
ভূমিগৃহাদিগুপ্তক্ষিপ্তে রামপালে সতি ॥

নিজ্জনে নির্বাকভাবে রামপাল অবস্থান করিতেছিলেন ।
সত্য ও গ্রায় এই দুইটির অরক্ষণে (তয়োৱরক্ষণে = তয়োঃ +
অরক্ষণে) নিযুক্ত অর্থাৎ সত্য ও গ্রায়ের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী
ভ্রাতা মহীপাল “আমার লক্ষ্মী হরণ করিবে” এই অলীক
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রামপালকে তৃণভৃৎ কারাগারে নিক্ষেপ
করিয়াছিলেন । (১)

মায়িকানিনা শঙ্কিতবিপদো ভর্তৃ ভূবঃ প্রভৃত্যয়াঃ ।

নিকৃতি প্রযুক্তিতো রক্ষিতরি কনিষ্ঠে তথাপন্নৈঃ ॥ ১১৩৭ ॥

ঢাকা—অজ্ঞাত মায়িনাং থলানাং ধনিনা অয়ং রামপাল ক্ষমো-
হধিকারী সর্বসম্মতঃ ততশ্চ দেবদ্য রাজ্য গ্রহীয্যতীতি সূচনয়া
শঙ্কিত বিপদঃ মামসৌ হনিষ্যতীতি শঙ্কিতা বিপদোন তন্ত ভূবোভর্তৃ
মহীপালস্য প্রভৃত্যয়া বহুতরায় নিরাকৃতি প্রযুক্তিতঃ শাঠ্যপ্রয়োগাৎ
উপার বধচেষ্টয়া তথাহনাকারেনাপন্নৈঃ দুর্গতে কনিষ্ঠে ভ্রাতরি
রামপালে রক্ষিতরি ভাবার্থে ।

তাৎপর্য—থল লোকেরা মহীপালকে পরামর্শ দিয়াছিল
“এই রামপাল ক্ষমতাশালী সুযোগ্য এবং সকলের প্রিয় ।
সুতরাং ইনি আপনার রাজ্য কাড়িয়া লইবে ॥” এই কথা
শুনিয়া নৃপতি মহীপাল মনে করিলেন “রামপাল আমাকে
বধ করিবে” এবং অনেক শঠতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা
করিবার জন্ত কারাগারে আবদ্ধ করিলেন । রামপালের
প্রশংসার্থে রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে কবি মহীপাল চরিত্রের
আভাস প্রদান করিয়াছেন ।

লোকান্তর প্রণয়িনো দুর্গয়ভাজোহগ্রজন্মনো বাসনাং ।

পতিতাকার বত্তুভাবাদুদহারি গোতমী তেন ॥ ১১২২ ॥

পরলোকগত দুর্নীতিপরায়ণ অগ্রজ মহীপালের নিফল

(১) হরপ্রদাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত রামচরিতের ১১৩৬
শ্লোকের ঢাকায় ‘তয়োৱরক্ষণে’ পদটি তয়োৱ (২র) ক্ষণে রূপে
লিখিত ও ‘ভ্রাতা’ শব্দ বিলুপ্ত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে প্রকৃত অর্থ
গ্রহণে অসুবিধা হইয়াছে । নেপাল হইতে আনীত ও এশিয়াটিক
সোসাইটিতে রক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি হইতে ঢাকা ও উহার আলোক-
চিত্র প্রদত্ত হইল ।

যুদ্ধে রত হওয়ার ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর অন্ধকার
রামপাল কর্তৃক অপসারিত হইয়াছিল ।

বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে কাব্যে
মহীপালের কৃতকর্ম বর্ণিত হইয়াছে ।

প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমভারম্ ।

বিভ্রতানীতিকারস্তুরতে রামাধিকারিতাং দধতি ॥ ১১৩১ ॥

পিতৃবিয়োগের পর প্রথমতঃ ভ্রাতা মহীপাল রাজ্যভার গ্রহণ
করিয়া নীতিবিরুদ্ধ কার্যে রত হন । রামপালের তৎকালীন
অবস্থা পরে বর্ণিত হইতেছে ।

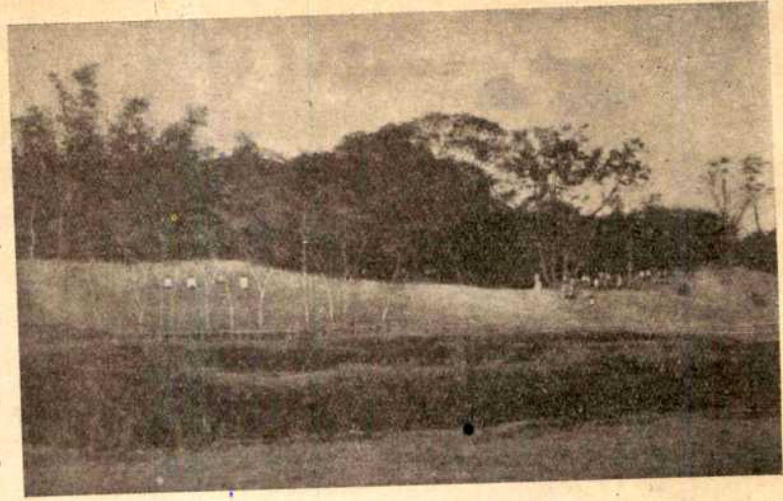
এক্ষণে ঢাকাসহ ২২, ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৭ শ্লোক একত্রে
পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে মহীপাল দুর্নীতি-
পরায়ণ, অনীতিক আচরণকারী, বিচিত্র কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, ককশ-
প্রকৃতি, সত্য ও গ্রায়ের মর্যাদালঙ্ঘনকারী রাজা ছিলেন,
ও খলস্বভাব ব্যক্তিদিগের পরামর্শানুসারে কার্য করিতেন ।

তিনি যে বিচক্ষণ মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতেন
তাহা ১১৩১ শ্লোকের ঢাকার “বাড়গুণগণ্যস্য মন্ত্রীনো গুণীতমো-
বগুণয়ন” পদ হইতে আমরা জানিতে পারি । অনন্ত-
সামন্তচক্রের বিপুল বাহিনী যখন তাঁহার বিরুদ্ধে সসজ্জিত
তখন ষড়বিধ উপায়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গের উপদেশ তিনি
অগ্রাহ্য করিয়া রণভূমে অবতীর্ণ হন । যিনি বিপদকালে
যুদ্ধের প্রাক্কালে মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ উপেক্ষা করেন, তিনি
সম্প্রসঙ্গকালে শুধীন রাজপুরুষগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার
করিতেন তাহা সহজে অনুমেয়, অথচ ইহারই পূর্বপুরুষ
মন্ত্রিগণের নীতিকৌশলে বিদ্যাগিরি হইতে হিমাচল পর্যন্ত
সমগ্র আর্ধ্যাবর্ত্তে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ।

মহীপালের এইরূপ চরিত্র ও আচরণ হইতে সামন্তচক্র ও
প্রজাবর্গের উপর তাঁহার ব্যবহার অনুমান করা যায় ।
মন্ত্রিবর্গ ও কারারুদ্ধ রামপাল অত্যাচারক্লিষ্ট হইলেও
কতক পরিমাণে নিরুপায়, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জ ও সামন্তচক্র
রাজ-অত্যাচার নির্মিলে সঙ্কট করিতে পারেন না । মাৎস্যাত্ম্য
নিবারণের জন্ত যাহাদের রাজ-নির্বাচনের অধিকার ছিল,
অনীতিক আচরণের প্রতিকারেরও অধিকার তাহারা তখন
বিস্তৃত হয় নাই । গোড়জন যখন আর মহীপালকে সহ্য
করিতে পারিল না তখন আবার সম্মিলিত হইল । (২)

(২) ‘বাক্সালীর বল’, ১০১ পৃষ্ঠা ।

প্রজাসাধারণের এই অভ্যুত্থান কেবল মন্ত্রিবর্গ, কেবল রামপাল বা কেবল প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার-নিবন্ধন সংগঠিত হয় নাই। রাজকৃত-লাঞ্ছনায় প্রপীড়িত মন্ত্রিগণ দেশের সর্বত্র রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রজাকে সম্মিলিত করিতে পারেন না যদি প্রজাপুঞ্জ সেই লাঞ্ছনার অংশভাগী না হয়। রামপালের উপর অত্যাচারও ইহার মুখ্য কারণ নহে, অনন্তসামন্তচক্র মহীপালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা রামপালের জ্ঞাত নহে।



এই সময়ে দিব্য বা দিব্যোক নামে এক অসাধারণ যোদ্ধারাজপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভোজবর্ষার তাম্রশাসনের ৮ম শ্লোক অনুসারে স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—

দিব্যের বীর বলিয়া এত বেশী সুনাম ছিল যে লোকে তাহা একটা উপমার কথা মনে করিত, যেন তিনি বীরত্বের সীমা, ইহার বেশী বীর কেহই হইতে পারে না। তিনি মহীপালের পিতা বিগ্রহপালের সময় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (৩)

মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূদস্যনোপধিব্রতিনা।

দিব্যাহবয়েন সীতাবাসালং কৃতিরহারি কাস্ত্যাস্য। ১৩৮.

অন্তর্ভা। অস্য রামপালস্য জনকভূঃ উপত্রভূমিবরেন্দ্রী সীতা বাসলংকৃতি লাদলপদ্ধতি বসত্যলং কাদাচাবাসংপন্নৈতর্থাঃ। অতএব কাস্ত্যাকমনীয়া দিব্যাহবয়েন দিব্যনাম্না দিব্যোকেন মাংসভুজা লক্ষ্ম্যা অংশং ভুজ্ঞানেন ভূত্যোনোচ্চৈর্দশকেন উচ্চৈর্মহতী দশা অবস্থা যস্য অভ্যুচ্ছিতেনৈতর্থাঃ, দস্ত্যনা শক্রনা তস্তাবাপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্তব্য তয়া আরকং কণ্ঠপ্রত্যং ছদ্মানিব্রতী। যথা আচারক্ৰিপ হেতুমল্লিজস্তা-ম্নিনি অহারি গৃহীতা।

ইহার তাৎপর্য এই যে দিব্য গৌড়রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী অর্থাৎ অতিশয় উন্নত পদে আরুঢ় রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি দস্ত্য অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। উপাধি শব্দের অর্থ কপট। অবশ্য কর্তব্যবোধে কাণ্ড্য করাকে ব্রত কহে। তাঁহার শত্রুতা করিবার আদৌ ইচ্ছা না থাকিলেও অবশ্য কর্তব্যবোধে শত্রুতারূপ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

বগুড়া হইতে দুই মাইল দূরে বৃন্দাবনপাড়া গ্রামে ভীমের জাদাল

রামপালের জনকভূ বরেন্দ্রীরাপা সীতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন—

দিব্য এমন সাধুপুরুষ যে অত অবহেলা অত্যাচার পাইয়াও নিজের মনিব মহীপালকে রাজ্যলোভে বা প্রতিহিংসার রাগে আক্রমণ করেন নাই। যখন মহীপালের শাসন প্রজাদের অসহ্য হইয়া উঠিল, যখন দিব্য দেখিলেন যে দেশ উদ্ধার, লোকের মান-সম্মান রক্ষা করা তাঁহারই কর্তব্য, তখন তিনি বিদ্রোহী-দলে যোগ দিলেন। (৪)

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও বলিয়াছেন—

দিব্যের বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। ঘটনাচক্রে অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া তিনি রাজদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (৫)

১৩১ শ্লোকের টীকায় মহীপালের সহিত সামন্তচক্রের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। মহীপাল অল্পসংখ্যক ভয়-ভীত সৈন্য লইয়া সমর আরম্ভ করেন ও পরাজিত হন। ১৩২, ২৩ শ্লোক হইতে জানা যায় যে মহীপাল যুদ্ধে নিহত হন। এই সময়ে রামপাল পুত্রকলত্রাদিসহ রাষ্ট্রকূট-রাজ্যে চলিয়া যান। কাজেই স্বদক্ষ সেনানায়ক না হইলে এই দুঃসময়ে রাজ্য রক্ষা অসম্ভব হইবে মনে করিয়া অনন্তসামন্তচক্র দিব্যের শিরে রাজমুকুট পরাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ

(৩) দ্বিতীয় বার্ষিক দিব্যস্মৃতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ ও ভোজবর্ষার বেলাব শাসন।

(৪) দ্বিতীয় বার্ষিক দিব্যস্মৃতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

(৫) প্রথম বার্ষিক দিব্যস্মৃতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

চন্দ বলিয়াছেন, দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই। (৬) উপায়াস্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ও বলিয়াছেন (৭) দিব্য তখন বুড়া হইয়াছেন, সংসারের স্বভোগের ইচ্ছা নাই কিন্তু মাতৃভূমি অরাজক থাকিলে সকলই নষ্ট হইবে। সেই জগু শাস্তিরক্ষার, দুঃ-দমনের, দেশশাসনের ভারী বোঝা তিনি কাঁধে তুলিয়া লইলেন—আমি পারিব না এ কথা বলিলেন না।

পরবর্তী কালে রামপাল দিব্যের ভ্রাতৃপুত্র ভীম ও তাঁহার অগ্রগামী দলকে পরাজিত করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন—ইহা অনেকে অবগত আছেন। কিন্তু “রামপালের বিপুল বাহিনী কর্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিষয়ের জয়-পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাত্মত্বের অবসান কাহিনী। দিব্যের কর্তৃক যে মহাত্মত্ব আরম্ভ হইয়াছিল সেই ত্রুট উদ্ঘাপিত হইবার পূর্বেই রামপালের ক্রীতদাস সামন্তরাজ্যগণ তাহার ধ্বংসসাধন করিলেন।... কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অল্পমিত হয় যে, প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য সহজে রামপালের করায়ত্ত হয় নাই। প্রাচ্য দেশে সাধারণতঃ রাজা বা সেনাপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের অবসান হইত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, ভীমের পরাজয়ের পরও রামপাল বরেন্দ্রী অধিকার করিতে পারেন নাই। ভীমের সহস্র হরির নেতৃত্বে বরেন্দ্রের প্রজাগণ প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জগু পুনরায় যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছিল। হরির পরাজয়েও এই যুদ্ধের মীমাংসা হয় নাই। ভীম পুনরায় ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া রামপালের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের প্রজাগণ যতদূর সাধ্য প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু এত ত্যাগস্বীকার করিয়াও অঙ্গ মগধাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে বরেন্দ্রের ক্ষুদ্রশক্তি জয়লাভ করিতে পারে নাই।... ভাড়া-করা সৈন্তের সাহায্যে রামপাল প্রজাশক্তি উন্মূলিত করিয়া পুনরায় পিতৃসিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বাহা হারাইয়াছিলেন তাহা আর ফিরাইয়া পাইলেন না। যে

প্রজাশক্তি পাল-সাম্রাজ্যের সঞ্জীবনীশক্তির আধার ছিল অর্থবলে ক্রীত বিপুল সৈন্তের শাণিত তরবারির আঘাতে চিরদিনের নিমিত্ত তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। যে প্রজাশক্তির সাহায্যে আসমুদ্রহিমালয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহের উপর দিয়া শকট চলাইয়া রামপাল পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসেন।” (৮)

দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার ‘৩নং দিবর ইউ-নিয়ন বোর্ডের’ মধ্যে ‘দিবর’ নামে একটি গ্রাম আছে। উহা দিনাজপুর কালেক্টরীর ‘১১৫ নং লাট সাহাবাজপুরের’ অন্তর্ভুক্ত। মুর্শিদাবাদ জেলার সদ্যাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত গ্রামের জমিদার। তাঁহাদের কাগজপত্রে ঐ অঞ্চল ‘তরফ-দিবর’ ও উক্ত গ্রাম ‘মোজাদিবর’ নামে অভিহিত। (৯) ঐ গ্রামে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ‘দিবর দীঘি’ নামে একটি জলাশয় আছে। উহার মধ্যে প্রায় ৪১ ফুট দীর্ঘ একটি প্রস্তর-স্তম্ভ বিদ্যমান। এরূপ স্তম্ভ ভারতে আর দু-একটি মাত্র আছে। সার্ভে অব ইণ্ডিয়া-প্রচারিত পত্নীতলা থানার মানচিত্রে, রেনেলের মানচিত্রে উহা চিহ্নিত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার ‘মহীপাল দীঘি’, মুন্সিগঞ্জের ‘রামপাল দীঘি’, ভূবণার ‘নীতা-রামের দীঘি’ যেমন ঐতিহাসিক নামের সহিত সংজ্ঞিত তেমনি ‘দিবর দীঘি’ ও তদ্ব্যবস্থ শিলাস্তম্ভ ঐতিহাসিক দিব্যের পুণ্য নামের সহিত সংযুক্ত বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বিশ্বাস করেন। (১০) কিন্তু বুকানন হ্যামিণ্টনের ‘দ্বীপ ইণ্ডিয়া’ গ্রন্থে উহাকে ‘দীঘর দীঘি’ বলা হইয়াছে। এরূপ লিখিবার কারণ কি? বুকানন কর্তৃক উত্তর-বঙ্গের বিবরণ সংগ্রহ কালে (১৮০৮-১৪ খৃঃ অঃ) বর্তমান ঐতিহাসিক

(৮) সিনেট-হলে বক্তৃতা

(৯) ‘তরফ দিবর মোজা দিবর’ের প্রজা দুখু মণ্ডলের নামিত জমিদার বাবু বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেরস্তা হইতে সন ১৩০২ সালের ৩০ ভাদ্র তারিখে প্রদত্ত একখানি দাখিলা ও ‘৩ নং দিবর ইউনিয়ন বোর্ডের’ টেকের রসিদ একখানি আমার নিকট আছে।

(১০) স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখিত ‘গৌড়রাজমালা’র ভূমিকা; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য প্রণীত ‘বঙ্গালীর বঙ্গ’ গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় ১ম বার্ষিক দিব্যশ্রুতি-উৎসবের পুরোহিতরূপে এই স্তম্ভমূলে মহারাজ দিব্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন।

(৬) প্রথম বার্ষিক দিব্যশ্রুতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

(৭) দ্বিতীয় বার্ষিক দিব্যশ্রুতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। দিব্য নামে যে কোন রাজা ছিলেন 'রামচরিত'-আবিষ্কারের পূর্বে কেহ তাহা জানিতেন না। এমন কি তৎপূর্বে কেহ কর্মোলি-লিপির চতুর্থ শ্লোকের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বুকাননকে যিনি 'দীবর' শুনাইয়াছেন তিনি মনে করিয়া থাকিবেন, 'দীবর' অর্থহীন শব্দ—'দীবর' শুদ্ধ। স্ত্রর য়নাত্ সরকার মহাশয় বুকাননের এই উক্তি সম্পর্কে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "দীবর দীঘিটিকে বুকানন হামিলটনের সঙ্গী পণ্ডিত ও মূলিগণ দীবর দীঘির আকারে প্রাপ্ত হন। ১৮০৮-১৪ খৃঃ অব্দে বুকানন হামিলটন যখন বিহার ও উত্তর-বঙ্গে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহার সঙ্গী পণ্ডিত ও মৌলবী ক'টি অতি অজ্ঞ ছিল। ভারততত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব (Indology and Archaeology) সম্বন্ধে তাহারা ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এবং বুকানন নিজেও বেশী জানিতেন না। জোস, কোলক্কর প্রভৃতির তুলনায় বুকানন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ (Orientalist) বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ বিশ্বাস যোগ্য বটে, কিন্তু পুরাতত্ত্ব-সংক্রীয় মতামত (Archaeological opinions) অসার; তাঁহার বিহীন অধ্যয়নগুলিতে ঝুড়ি ঝুড়ি ভুল বাহির হইয়াছে। সুতরাং বুকাননের রিপোর্ট বেদবাক্য নহে।"

'ভীম জাঙ্গাল' নামে কয়েকটি স্ববৃহৎ রথ্যা উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরিদৃষ্ট হয়।

পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এদেশের বৌদ্ধেরা হিন্দুই ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা বর্ধম্বে বিশ্বাস করিতেন।(১২) দেবপালদেবের মুন্সের তাম্রশাসন (৫ম শ্লোক), তৃতীয় বিগ্রহ-পালের আমগাছিলিপি (১৩ শ্লোক) হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। রামচরিতের বৌদ্ধ কবিও বরেন্দ্রভূমির পবিত্রতা বর্ণন করিতে গিয়া উহাকে 'ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং'। (৩৯) বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণের উদ্ভব স্থান, রামাবতীকে 'ভগবন্তক বিপ্র' ও 'প্রশান্ততম অনুচান' (৩৬) সাদ্র বেদে বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের বাসস্থান এবং নিজ জন্মভূমি পৌণ্ড বর্দ্ধনপুরীকে 'বহুদ্রু'—শাস্ত্রজ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত বলিয়াছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিপত্তি না থাকিলে বৌদ্ধ রাজসভা হইতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপক এইরূপ উক্তি কখন উচ্চারিত হইত না।

(১১) চন্দ্র-মহাশয়ের অভিভাষণ

পক্ষান্তরে স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচীন পুঁথি হইতে দেখাইয়াছেন—মৎস্যঘাতী কৈবর্তগণ তৎকালে সমাজনির্মিত ছিল ও বৌদ্ধধর্মের শীতল ছায়া হইতেও দূরে ছিল, এমন কি বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণও তাহাদিগকে ঘৃণা করিতেন।(১২) ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পালরাজগণ দশম ও একাদশ শতাব্দীতে বর্ণাশ্রমী হিন্দুর গ্রায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের প্রতি শ্রদ্ধা ও অহম্মত হিন্দুর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন।

পালরাজগণ স্ব-স্ব তাম্রশাসনে নিজ জাতির কোন উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ইহাদের সামন্ত নরপতি বৈদ্যদেব ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন।(১৩) রামচরিতে ইহাদিগকে ত্রীপতিনাভি: সম্ভূত (১১৭)—ত্রীপতি পাথিবো যো নাভি: ক্ষত্রিয়: তস্মাৎ সম্ভূত: অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-সম্ভূত বলা হইয়াছে; সোজাহজি ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই। 'ক্ষত্রিয়' শব্দ দুর্বলভাবে উপগৃহ্য হওয়ায় মনে হয় ইহাদের পিতৃকুল ক্ষত্রিয় হইলেও মাতৃকুল নহে। অবশ্য এই অভিজাত ক্ষত্রিয়দের দাবী অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন শেষ রাজঘরের সময়ে উত্থাপিত। এই সকল লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় 'রামচরিতের' ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—As time went on, their pretensions seem to have been on the increase...In none of the earlier inscriptions do the Palas advance any such pretensions.

রামচরিতের টীকায় দিব্যকে কৈবর্ত-জাতীয় বলা হইয়াছে। পালরাজত্বকালে কৈবর্ত নামে অভিহিত মৎস্যঘাতী সমাজ লাক্ষিত সম্প্রদায়-বিশেষের বিদ্যমানতা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। আফগানরাজ আমাছুয়ার সিংহাসনচ্যুতির স্বযোগে বাচ্চাইশাকো, বা যোগল-সম্রাট হুমায়ূনের প্রাণরক্ষার বিনিময়ে ভিত্তিওয়ালার গ্রায় দিব্য হঠাৎ এক দিনের জন্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। বরেন্দ্রী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তিনি প্রধান সেনাপতি বা প্রধান মন্ত্রীর পদবীতে আরুঢ় থাকিয়া বিপুল সম্মান-প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। ভীম সম্বন্ধেও

(১২) প্রবর্তক, কার্তিক ১৩৩০; প্রবাসী, মাঘ ১৩৩০।

(১৩) কর্মোলি-লিপি, ২য় শ্লোক

কবি বলিয়াছেন—তিনি লক্ষী সরস্বতীর আবাসস্থল ও সজ্জন-প্রতিপালক ছিলেন। বরেন্দ্রেও তৎকালে সাক্ষ বেদে বিচক্ষণ বহু ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াছি। আধুনিক রুশিয়ার স্ত্রায় পাল-সাম্রাজ্যে আভিজাত্যবিহীন ব্যক্তি সমাদৃত হইতেন এরূপ নিদর্শন নাই; বরং আলোচ্য সময়ে আভিজাত্যের মর্যাদা বাড়িয়াই গিয়াছিল, সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই সময়ে যিনি সুবিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্যের রাজপুরুষের সর্বোত্তম পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহার বিদ্যাবত্তা, আভিজাত্য ও কুলগৌরব অল্প ছিল না। মহীপালের অত্যাচারপ্রাপ্তিভিত্তি বরেন্দ্রের অনন্তসামন্তচক্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৌদ্ধ নীরপতিগণ যাহাকে নায়ক রূপে এবং মহীপালের মৃত্যুর পর যাহাকে রাজচক্রবর্তীরূপে নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং যাহার বংশধরের জন্ত বরেন্দ্রের অনন্তসামন্তচক্র ও বীর প্রজাবৃন্দ পুনঃ পুনঃ অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বীরের বাহিত্রি শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তৎকালীন জনসাধারণ ও শাস্ত্রবেত্তাগণের নিন্দিত মৎস্য-

ঘাতী কৈবর্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কল্পনা করাও যায় না। পরলোকগত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন—Divya or Dibyaka, chief of the Chasi Kaivarta tribe or Mahisya caste which at that time was powerful in northern Bengal (*Early History of India*, 4th edition, page 416.)

স্মরণ যখনাথ সরকার মহোদয়ও তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—বর্তমানে বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহাদের (দিব্য ও ভীমের) স্বজাতিগণ মাহিস্য বলিয়া অভিহিত হন।

দিব্য ও ভীম জাতিতে যাহাই হউন না কেন তাঁহারা কে তাঁহাদের জননী জন্মভূমির অতিশয় দুর্দশার দিনে অশূলনীয় স্বদেশপ্রীতি-প্রণোদিত অপূর্ণ বীরত্ব ও মঙ্গলময় একো ‘অরবিন্দেন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল’ ‘পুণ্যভূ’ বরেন্দ্রীর স্মৃতি উদ্বোধিত করিয়াছিলেন সেই ইতিবৃত্ত সমুজ্জল আলোকসুস্তের স্ত্রায় ‘জনগণপথপরিচায়ক’ রূপে আজিকার দিগ্ভ্রান্ত-বিচ্ছিন্ন-শক্তি বাঙালীকে সুপথ প্রদান করিবে।

বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে মুসলিম স্বার্থ

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

ব্রিটিশ-সরকারের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সত্ত্বে এদেশের হিন্দুদের অভিমত যেমন স্পষ্ট, অধিকাংশ মুসলমানের অভিমতও সেইরূপ স্পষ্ট ও দ্বিধা-সন্দেহের বহির্ভূত। হিন্দুরা যেমন কোন দিক দিয়াই বাঁটোয়ারাকে সমর্থন করিতে সম্মত নহে, মুসলমানগণও সেইরূপ বর্তমান অবস্থায় কোনক্রমেই উহার একটি ‘কমা-সেমিকোলন’ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহে। অথচ যে-সিদ্ধান্তকে দেশের কোন সম্প্রদায়ই আদর্শরূপে গ্রহণ করেন না, তাহার পরিবর্তনের কথা উঠিলে মুসলমানগণ কেন এত বিচলিত ও ভীত হইয়া পড়েন তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের নেতারা প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বাগ্রে মুসলমানের

স্বার্থের কথাই ভাবিয়া থাকেন। স্বাধীনতার কথাই হউক আর দেশের সাধারণ কল্যাণের কথাই হউক, সকলের উদ্দেশ্যে তাঁহারা স্থান দিয়া থাকেন মুসলমানের কয়েকটি বিশেষ স্বার্থকে। এইগুলি রক্ষিত হইলেই মুসলমানের আর কোনও বিপদ নাই, ইহাদেরই জোরে মুসলমান সকল বাধা তৈলিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে এই কথা তাঁহারা মনে করেন। এই বিশেষ স্বার্থের তাগিদে লীগ, কনফারেন্স, সভা সমিতি প্রভৃতি অনেক কিছুই আয়োজন হইয়াছে, মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফার স্মৃতি হইয়াছে। যে বাঁটোয়ারা এই চৌদ্দ দফার অধিকাংশ দফাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, চৌদ্দ দফার অভাবে তাহাকেই আমাদের নেতারা মুসলিম

স্বার্থের “ম্যাগনা কার্টা” বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে, সরকার চৌদ্দ দফাকে বর্ষে বর্ষে স্বীকার করিবেন না। সুতরাং তাহার বদলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভাল, এই নীতিতে বাঁটোয়ারাকে অস্ত্রের যষ্টির মত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, এবং কিছুতেই ইহার রদ-বদল হইতে দিবেন না, এরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

বিভিন্ন প্রবন্ধে বাঁটোয়ারার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে মুসলিম স্বার্থের দিক হইতে দুই-একটি বিষয় আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, উহার আশ্রয়ে মুসলমানদের প্রকৃত স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে না, বরং তাহা নানাভাবে পদদলিত হইবে।

অনেক স্থলদর্শী ব্যক্তি বাঁটোয়ারার অন্তর্নিহিত দোষ-গুণের বিচার না করিয়া এই যুক্তি দেখান যে, যেহেতু হিন্দুরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবিয়া উহার বিরোধিতা করিতেছে, অতএব নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে মুসলমানদেরও উহাকে সমর্থন করাই উচিত। সেই জন্ত বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে হিন্দুরা যে আন্দোলন করিতেছে তাহাতে তাঁহারা যোগদান ত করেনই না, বরং উহাকে মুসলিম স্বার্থের বিরোধী আন্দোলন বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু এই যুক্তি ও অজুহাত নিতান্ত ভুল। অপূরের আচরণ দেখিয়া কোন বিষয়ের দোষগুণ নির্দ্ধারিত হয় না; বিষয়টির অন্তর্নিহিত দোষগুণ বিচার করিয়াই তাহা সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এই বাঁটোয়ারাকেও আমরা সেই ভাবে বিচার করিব।

আমাদের মনে হয় হিন্দুদের স্থায় যদি আমরাও সমভাবে বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করি, এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে কোন একটা মীমাংসায় আসিতে চেষ্টা করি, তবে তাহা দেশের সকলেরই পক্ষে শুভকর হইবে। যেখানে দেশের আপামর সাধারণ হিন্দুর স্বার্থ, সাধারণ মুসলমানের স্বার্থ হইতে একটুও বিভিন্ন নহে, বরং সর্বাংশে এক ও অভিন্ন, সেখানে দুই সম্প্রদায়ের জন্ত দুই রূপ বিভিন্ন ব্যবস্থা দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। বাঁটোয়ারাকে সমর্থন করিবার সময় আমাদেরই সবার সময়ে দেখিতে হইবে উহা দেশের সাধারণ স্বার্থের বিরোধী কি না। যদি বিরোধী হয়, তবে

সকল অবস্থাতেই তাহা বর্জন করিতে হইবে। এক জনকে একটু প্রলোভন দেখাইলে ভৃত-ভবিষ্যৎ তুলিয়া অবিবেচকের মত আহ্লাদে আটখানা হইলে চলিবে না।

বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে বলিয়া তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা কি মনে করেন যে, বাস্তবিকই মুসলিম স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অথবা মুসলমানদের উদ্ধারের জন্ত উহা রচিত হইয়াছে? তাঁহারা কি মনে করেন সরকার-বাহাদুর মুসলমানদের এত দরদী বন্ধু যে তাঁহাদের প্রেমে গদগদ হইয়া তাঁহারা এই অপরূপ অমৃত-ভাণ্ডার মুসলমানদিগকে উপহারস্বরূপ দিয়াছেন? যদি তাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তবে তাঁহাদিগকে বাঁটোয়ারার ধারাগুলি পুনরায় দেখিতে অনুরোধ করি। যদি সেগুলি কেহ নিরপেক্ষভাবে দেখেন তবে বুঝিবেন যে, মুসলিম স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্ত উহা রচিত হয় নাই—উহা হইয়াছে সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্ত—সাম্রাজ্যবাদের রথচক্র ঘূর্ণন রবে ভারতের বুকে চালাইবার জন্ত। মুসলিম স্বার্থের সহিত উহার নামগন্ধ সম্বন্ধ নাই। উহা সাম্রাজ্যবাদীদের লৌহ হস্তে ভারতকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিবার উপায়-বিশেষ।

আগামী শাসন-সংস্কারে যাহাতে ব্রিটিশ-স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহার জন্ত নানাদিকে আটখাটী বাঁধিয়া এমন কতকগুলি রক্ষাকবচ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে যে তাহার চাপে এদেশের কোনও সম্প্রদায়ই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না।

এই রক্ষাকবচ-কটকিত শাসনতন্ত্রে ভারতীয়গণ স্বেচ্ছামত নিজেদের অভীষিত কোন প্রস্তাবেই বিশেষ সুরক্ষা করিতে পারিবে না। লার্ড সাহেবদের বিশেষ ক্ষমতা, মন্ত্রীদের সঙ্কুচিত ক্ষমতা, নির্ধারিত সদস্যদের মধ্যে ঐক্যের অভাব—এইগুলি হইবে নবাগত ব্যবস্থাপক সভার সবচেয়ে মারাত্মক বিষয়। তা ছাড়া দেশবাসীর নির্ধারিত সদস্যদের সব বিষয়ে কোন ক্ষমতা থাকিবে না,—এমন কতকগুলি বিষয় থাকিবে যাহা তাঁহাদের আলোচনা করিবার কোনই অধিকার থাকিবে না। এই সব বিষয় প্রবাসীতে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। এই সব অনুরোধ ও ক্ষমতা-সম্বন্ধে যাহা পরিপূর্ণ তাহা যে পদে পদে দেশবাসীকে পর্যুদস্ত করিবে

তাহা কি এখনও কেহ বুঝেন নাই? এইসব ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয়গণ দেশের কল্যাণের জন্ত বিশেষ কিছুই করিতে পারিবেন না। কিন্তু ক্ষমতা এত সঙ্কুচিত করিয়াও আমাদের কর্তাগণ স্বস্তি পান নাই। তাঁহারা অল্প উপায়েও ব্যবস্থাপক সভার মর্যাদা ও সংহতি-শক্তিকে বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই উপায় হইতেছে এই বহুনির্মিত বাঁটোয়ারা। ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত সদস্যগণ যদি একজোটে কাজ করিবার অবসর পাইতেন, তবে অল্প কিছু না পারিতেন, দেশের অনিষ্টে বাধা দিতে পারিতেন, এবং পুনঃপুনঃ প্রতি বিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দিয়া উহার অকিঞ্চিৎকর প্রমাণিত করিতে পারিতেন, প্রত্যেক ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করিয়া দিতে পারিতেন। ইহার পরিণাম সুদূরপ্রসারী হইত। কিন্তু বাঁটোয়ারার জন্ত ইহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। কারণ ভারতীয়গণ যাহাতে একজোটে হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া বাঁটোয়ারা রচিত হইয়াছে, অন্ততঃ সেইটা তাহার অগ্রতম উদ্দেশ্য। আর যত দিন বাঁটোয়ারা বর্তমান অবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তত দিন যে দেশের সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে জাতীয়তাবোধ জাগিবে না ইহা স্থনিশ্চিত। পরস্পরের মধ্যে হৃদ-কোলাহল লাগিয়াই থাকিবে, মাঝে মাঝে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইবে না, তাহাও মনে হয় না। এই ঈর্ষা-বিদ্বেষ, হৃদ-কোলাহল ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিতে পারে না, নানা ভাবে তাহাদের অসুবিধা হইবে, প্রতিশোধমূলক কার্যে তাহাদের সময় ও শক্তি অধিক ব্যয়িত হইবে। তাহাদের স্বার্থসাধনের জন্য অধিক ভোট পাইতে হইলে তাহাদিগকে অন্য সম্প্রদায়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু নির্বাচন-ক্ষেত্রে তাহাদের সহিত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা থাকিবে না বলিয়া তাহাদের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন না। হয়ত কতকগুলি অসার বিষয়ে অন্যবিধ কারণে ইউরোপীয়ানদের সাহায্য পাইতে পারেন, কিন্তু তাহার প্রতিদানে তাঁহাদিগকে দেশের স্বার্থ বলি দিতে হইবে।

ইহা সত্য যে বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা সমূহে মুসলমানদের আত্মপাতিক সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে। আর কেন্দ্রীয় সভায়ও মুসলমানেরা এক-তৃতীয়াংশ

আসন পাইবেন। বাংলা ও পঞ্জাবে অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা তাঁহাদের জন্য অধিক আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং অত্যান্য প্রদেশে আশাহুরূপ ‘ওয়েটেজ’ সহ আসন পাইয়াছেন। এই দিক দিয়া বাঁটোয়ারার কল্যাণে মুসলমানদের ঘোল আনা লাভই হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত লাভ নহে। সাম্রাজ্যবাদীদের দয়ার দানকে আশার রঙীন চশমা দিয়া দেখিলে কার্যক্ষেত্রে হতাশ হইতে হইবে। এই আপাতমধুর সুবিধার মোহে না ভুলিয়া বাঁটোয়ারার অন্য দিকটা একবার দেখিলে সমস্ত আশা ও আনন্দ নিরাশা, হতাশা ও নিরানন্দে পরিণত হইবে। সদস্যদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার যদি কোন ক্ষমতা না থাকে, যদি তাহাদের প্রস্তাবিত প্রত্যেক কার্য পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং ক্ষমতা সম্প্রসারণের যদি কোন অধিকার না থাকে, তবে আশাহুরূপ অতিরিক্ত আসন লাভ করিয়া তাঁহারা কি কোন কাজ করিতে পারিবেন? আর নূতন ব্যবস্থাপক সভার যে কোনই ক্ষমতা থাকিবে না তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ফাঁকা আওয়াজে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত তথায় বিশেষ কোন কাজ হইবে না। সুতরাং বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে নিজেদের ভারতবল্লী হিসাবে নিরাপদ মনে করা নিতান্ত ভুল হইবে। এই প্রলোভনে না ভুলিয়া মুসলমানদের উচিত, প্রকৃত ক্ষমতা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা।

• এরূপ ক্ষেত্রে বাঁটোয়ারাকে প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত আমাদের জন্ত দ্বিতীয় পন্থা নাই। কেন প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা আবশ্যিক।

• পরাধীন দেশের ব্যবস্থাপক সভায়, যেখানে কোনরূপ প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় না, আর যে সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা নানাবিধ আইন দ্বারা কটকিত, সেখানে দুইটি উপায়ে ক্ষমতা প্রসারের অথবা আদায়ের চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, উহাকে সরাসরিভাবে পরিত্যাগ বা বয়কট করা। দেশবাসীকে এমন ভাবে একত্র করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেকে উহাকে স্পর্শ মাত্র করিতে ঘৃণা বোধ করে। শাসনকর্তাদের প্রদত্ত বস্তু তাঁহাদেরকেই প্রত্যাৰ্পণ করিতে হইবে। যদি কেহই উহা স্পর্শ না করে তবে সরকার তাহা পরিবর্তন করিয়া দেশবাসীর দাবী অনুযায়ী শাসন-সংস্কার দিতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, ব্যবস্থাপক

সভায় প্রবেশ করিয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে অচল করিয়া তুলিতে হইবে, যেমন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় প্রথম পন্থাটি অবলম্বন করা হয়ত সম্ভবপর হইবে না। যদিও আমাদের মতে তাহাই উচিত ছিল, কিন্তু তদভাবে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন আত্মমর্যাদাশীল ভারতবাসীর কর্তব্য। এই সব উপায় ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে আসন্ন শাসন সংস্কারের অকর্ষণ্যতার বিষয় দেশবাসীর নিকট প্রকট করিতে পারিব না। সমগ্র ভারতবাসী একত্র হইয়া একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে যে এই পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা কর্তৃপক্ষগণ ভাল করিয়াই জানেন। তাহা যাহাতে সম্ভব না হয় এই জ্ঞাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রচনা করিয়াছেন। মুসলমানদের প্রতি দরদের জ্ঞাত নহে, তাহাদের দ্বারা কাজ হাসিল করিবার জ্ঞাতই তাঁহারা তাহাদের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেছেন। তাঁহারা জানেন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের সম্যক ক্ষুরণ হয় নাই। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে ইহাদের সদৃশ নির্বাচিত হইলে তাহাতে সরকার পক্ষেরই লাভ হইবে, এ-কথা বিগত দ্বৈত-শাসনের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন। তাই এই নূতন শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ করিবার সময় তাঁহারা মুসলমানগণকে অধিক আসনের লোভ দেখাইয়া এমন ভাবে এই বহুনির্দিষ্ট বাঁটোয়ারাটি রচনা করিলেন যাহাতে উপরিউক্ত দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা কোনও মতে সম্ভব না হয়। মুসলমানদের জ্ঞাত স্বতন্ত্র ভাবে নির্বাচন হইবে বলিয়া নির্বাচকগণ কোন মহান আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারিবে না। রাজনীতিতে অনগ্রসর সরকারপন্থী বহু ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া যাইবেন। আর তাঁহারা তখন সমাজ ও স্বদেশ ভুলিয়া অন্য সম্প্রদায়ের অনগ্রসর মতের লোকের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় এমন একটা দল গঠন করিবেন, যাহা সরকারী 'ব্লক'রই অনুরূপ হইবে। যে রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদিগকে আর্থিক স্বাভাব্য দিতে পারিবে, বাঁটোয়ারা ব্যাপারে তাহার জ্ঞাত আন্দোলন করাও সম্ভব

হইবে না। এই ভাবে মুসলমানদের সর্বপ্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্বার্থ পদে পদে ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ হইতে থাকিবে।

তার পর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে অধিকার করিয়া সচল করিলে কিছু উপকার পাওয়া যাইবে, তাহা হইলেও বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার বিশেষ কোন আশা নাই। কারণ অপরের সদিচ্ছা ব্যতীত কেবল মুসলমানদের সাহায্যে তাহা সম্ভব নহে; আর বাঁটোয়ারা থাকিতে সে লাভের সদিচ্ছা আশা বাতুলতা মাত্র। যাহা মুসলমানদের প্রকৃত ও মূল স্বার্থ তাহা ভারতীয় অমুসলমানের বিশেষতঃ হিন্দুদের স্বার্থ হইতে একটুও বিভিন্ন নহে। মুসলমানদের আধিক্য না হইলেও সে-স্বার্থগুলি হিন্দুদের সাহায্যে সংরক্ষিত হইবে, কারণ সে-সকল বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ সমভাবে জড়িত। তাহার জ্ঞাত বাঁটোয়ারার মত সর্বনাশকর ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিবার প্রয়োজন নাই।

সাধারণ মুসলমানদের নিকট একটা কথা বিনয়ের সহিত নিবেদন করি। বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে তাঁহারা অধিক সংখ্যক আসন পাইবেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন এগুলি কোন শ্রেণীর মুসলমানদের কবলিত হইবে? ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে আমাদের নেতাদের উৎকট সাম্প্রদায়িকতার জ্ঞাত সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার আদর্শ ব্যাপক ভাবে প্রচার হয় নাই, এবং সমাজ কোনরূপ উচ্চ শ্রেণীর রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। আসন্ন নির্বাচনের সময় নবাব, স্ববা, জমিদার ও হোমরা-চোমরাদের প্রভাব কি এ-সমাজ সহজে পরিহার করিতে পারিবে? বহু যুগ পরে হয়ত পারিবে, কিন্তু বর্তমানে তাহা সম্ভব হইবে না। আর অত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে কি সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইবে না? শুধু মুসলমানদের বেলায় নহে, বাঁটোয়ারার জ্ঞাত সাধারণ হিন্দুরাও অবাস্তিতদের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইবে না। কিন্তু মিশ্র নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তিত হইলে দেশের সাধারণ অধিবাসিগণ সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমবেত চেষ্টায় নিজেদের মনোনীত প্রার্থী নির্বাচিত করিতে পারিত, কিন্তু পৃথক নির্বাচন থাকাতে সাধারণের একত্র যোগ হওয়া সম্ভবপর হইবে না। সকল সম্প্রদায়ের জমিদার শ্রেণীর লোক অন্য

বাধায় বা বিনা বাধায় নির্বাচিত হইয়া যাইবে। ইহারা হিন্দু হউক আর মুসলমান হউক, ব্যবস্থাপক সভায় ইহাদের সংখ্যাধিক্যের অর্থই হইতেছে সাধারণ প্রজাদের সমৃদ্ধি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বনাশকর। মুসলমানদের ক্ষতি হিন্দুদের অপেক্ষা মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা আছে। কারণ কংগ্রেসের প্রভাবে অনেক প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার পরাভূত হইবেন, আর কংগ্রেস যাহাই করুক, দরিদ্র প্রজাদের সর্বনাশ করিতে পারিবে না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যাহারা জমিদার শ্রেণীভুক্ত তাহারা সমাজের ধর্ম্মাঙ্কতার স্বয়োগ লইয়া নিজেদের দল ভারী করিবে, চাকরির প্রলোভন দেখাইয়া সমাজকে বৃহত্তম কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবে, কিন্তু দরিদ্র প্রজাদের কোনই উপকারে আসিবে না। হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর প্রজাদের এক হওয়া চাই। কিন্তু বাঁটোয়ারার অভিধানে তাহা হইবে না। প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে, দেশে মুসলিম স্বার্থ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই—দেশবাসীর সাধারণ স্বার্থই এক মাত্র সার বস্তু যাহার জন্ত সকলকে এক সন্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। স্বরাজ আসিবে একটা আদর্শকে কেন্দ্র করিয়া; বহু লোকের মিলন ও সহতি হইতে। কিন্তু বাঁটোয়ারার উপর নির্ভর করিলে অথবা তাহাকে অপরিবর্তিত থাকিতে দিলে বহু লোকের একত্র মিলন সম্ভব হইবে না—ইহাতে সাধারণ মুসলমানের ক্ষতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর হইবে। আজ মুসলিম স্বার্থের টাই সাজিয়া যাহারা সমাজে নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহারা কে ও কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা কি সাধারণ মুসলমান এখনও বুঝে নাই? ভারতে ব্রিটিশ বণিকদের যাহারা পৃষ্ঠ-পোষক, সরকারের চণ্ডনীতির যাহারা সমর্থক মুসলিম স্বার্থের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ? কোন প্রকার মুসলিম স্বার্থ তাহাদের হস্তে নিরাপদ নহে; অথচ বাঁটোয়ারার জন্ত তাহাদের পরিহার করিবার উপায় নাই।

বাঁটোয়ারার সবচেয়ে অনিষ্টকর অংশ হইতেছে ইউরোপীয়ানদিগকে অত্যধিক আসন দেওয়া। বলিতে গেলে ইউরোপীয়ানরা এদেশের কেহই নহে, এদেশের স্ব-স্ব-অভাব-অভিযোগের সহিত তাহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা এদেশের অর্থ শোষণই তাহাদের প্রধান কাজ, আর সেই জন্ত তাহারা এদেশের

বুকে বৈদেশিক প্রভু চিরস্থায়ী রাখিবার জন্ত সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে, এবং জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়া থাকে। ব্যবস্থাপক সভায় ইহাদের প্রাধান্তের অর্থই হইতেছে ইহাদের উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করিতে সাহায্য করা। অল্প কোন কারণে না হউক, এই একমাত্র কারণে বাঁটোয়ারাকে সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল, অথচ এদিকে আমাদের নেতাদের কোনই দৃষ্টি নাই। নিজেদের জন্ত কতকগুলি অধিক আসন পাইয়াই তাঁহারা ইহার অন্তর্নিহিত মূল ক্রটির প্রতি লক্ষ্য করিতে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। হিন্দুরা বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করিলেই তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, মনে করেন মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাহারা এইরূপ করিতেছে। কিন্তু যাহাতে ইউরোপীয়ানদিগকে অতিরিক্ত আসন দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ কি মুসলমানদের নাই? নিজেদের জন্ত কয়েকটি আসনের লোভে তাঁহারা যদি কোন উচ্চবাচ্য না করেন তবে বুঝিব, দেশের প্রতি মমত্ববোধ তাঁহাদের কাহারও নাই, রাজনৈতিক দূরদর্শিতাও তাঁহাদের নাই। বস্তুতঃ, ইউরোপীয়ানদিগকে যে-অল্পপাতে আসন দেওয়া হইয়াছে ভারতের কাহাকেও তাহা দেওয়া হয়, নাই। বাঁটোয়ারার দ্বারা যদি কেহ যোল আনা লাভবান হইয়া থাকে তবে তাহা ইউরোপীয়গণ। এই অত্যধিক আসনের ফলে বাংলায় ইহারাই হইবে সমস্ত ক্ষমতার পরিচালক ও নিয়ামক। সরকারের স্থলে দেশের উপর বিশেষতঃ নির্বাচিত সদস্যদের উপর তাহারাই করিবে পূর্ণ কর্তৃত্ব। কখনও মুসলমানকে দলে টানিয়া হিন্দুদের বিরোধিতা করিবে, আবার কখনও হিন্দুদিগকে পক্ষপুষ্টে লইয়া মুসলমানদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবে। এই জন্ত মুসলমানদের কি মূল স্বার্থ, কি বিশেষ স্বার্থ, সবই প্রত্যাশিত ব্যাহত হইতে থাকিবে। মন্ত্রীস্বের স্থায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করিবে এই ইউরোপীয়ানদের দ্বার উপর। ব্যবস্থাপক সভায় যত দিন ইউরোপীয়ানদের প্রাধান্ত থাকিবে, তত দিন কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই দেশের জন্ত কল্যাণকর কার্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। ইউরোপীয়গণ ব্যতীত, আরও যে-সকল বিশেষ নির্বাচক-মণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছে সেগুলির প্রভাবেও মুসলমানদের স্বার্থ প্রতি ক্ষেত্রেই বিপন্ন হইবার খুবই সম্ভাবনা আছে।

আর এই সব বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্ত আমাদের অবিবেচক নেতরাই অধিকাংশ স্থলে দায়ী। তাঁহাদের যদি একটুও দূরদর্শিতা থাকিত তবে তাঁহারা কিছুতেই ভারতবাসীকে এই ভাবে ছিন্নভিন্ন হইতে দিতেন না। কিন্তু আপাতরম্য স্বথের লোভে তাঁহারা এসব বিষয়ের প্রতি একটুও লক্ষ্য রাখেন নাই। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে চৌদ্দ দফার দাবী মিটাইতে গেলে ব্রিটিশ সরকার আরও নানাবিধ বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী সৃষ্টি না করিয়া ছাড়িবেন না, তত্বেই তাঁহাদের সকল দাবী পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুদের সম্মিলিত হইয়া অবাধ যুক্ত নির্বাচনের দাবী করিতে হইত—যেন কোথাও কাহারও জন্ত কোনরূপ বিশেষ স্বার্থ আইনতঃ স্বীকৃত না হইতে পায়। ইহাতে মুসলমানদের লাভ কোনও অংশেই কম হইত না। কিন্তু তাঁহাদের অদূরদর্শিতার ফলে আজ এমন অবস্থা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত আসন পাইয়াও তাঁহারা সমাজের জন্ত বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন না।

বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে সকল দিক দিয়া আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে যে, উহার দ্বারা ভারতের কোন সম্প্রদায়ই উপকৃত হইবে না। যে সম্প্রদায় উপকৃত হইবে, তাহার হইতেছে অ-ভারতীয় ও ভারতের স্বার্থবিরোধী ইউরোপীয়গণ। সমগ্র ভারতবাসী এক দলভুক্ত, তাহাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন, এই মূল বিষয়টি বাঁটোয়ারা স্বীকার করে নাই।

বাংলার মুসলমানদের সম্মুখে এই সকল কথা পেশ করিলাম, যেন তাঁহারা আবার এ-বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া উহার দোষ-গুণ বিচার করিয়া দেখেন। স্বাধীনভাবে এবং অপরের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাঁহারা বাঁটোয়ারার অসারতা ও অস্বীকারিতা বুঝিতে পারিবেন এবং উহাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত হইবেন।

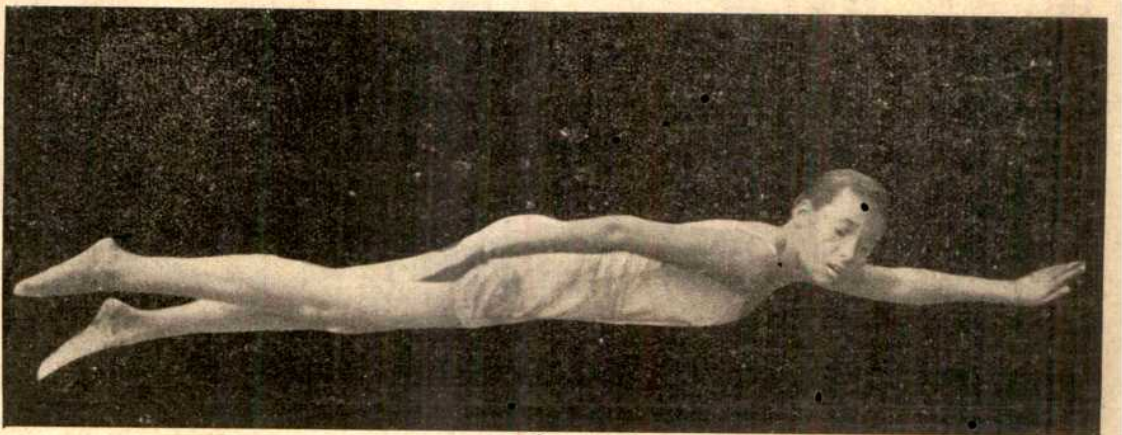
বাঁটোয়ারার আশ্রয়ে হিন্দু স্বার্থ সম্পর্কে বারান্তরে বলিবার বাসনা রহিল।

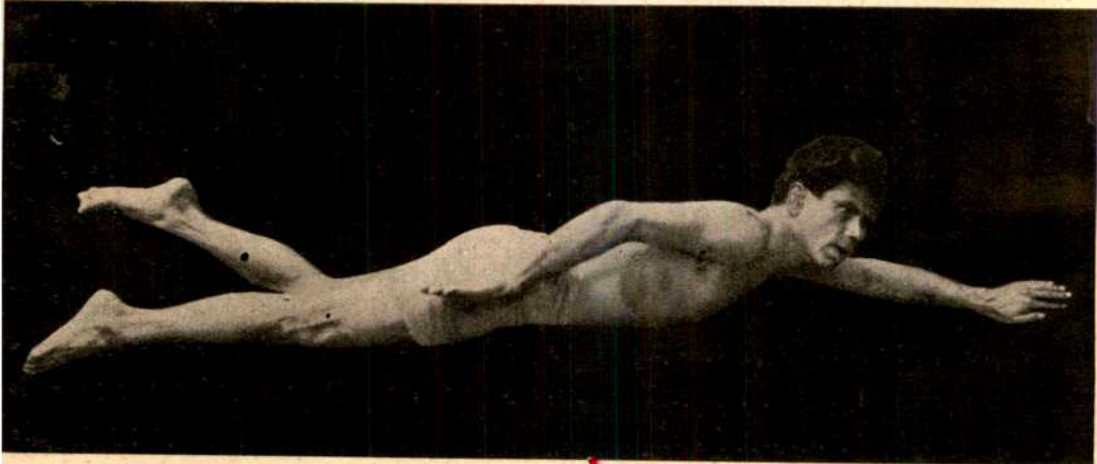
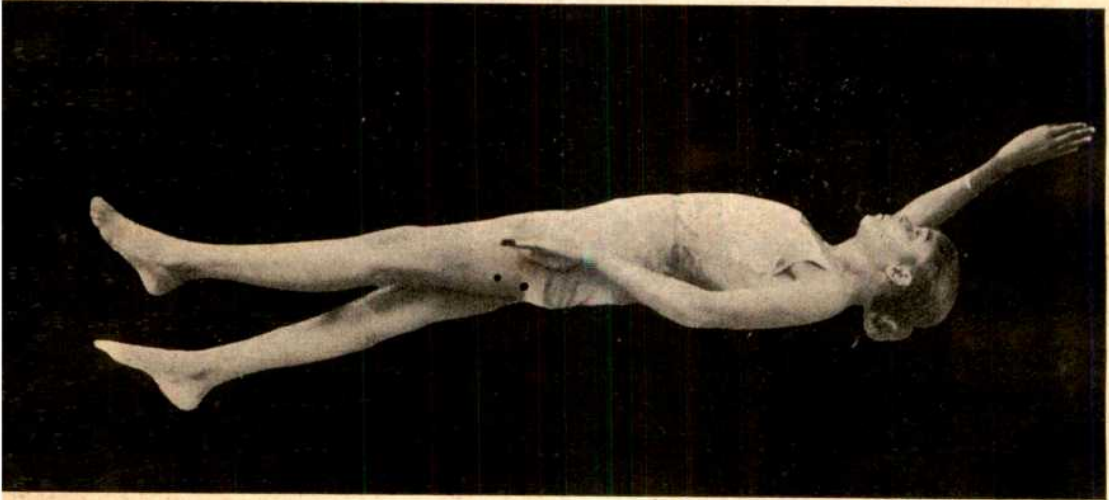
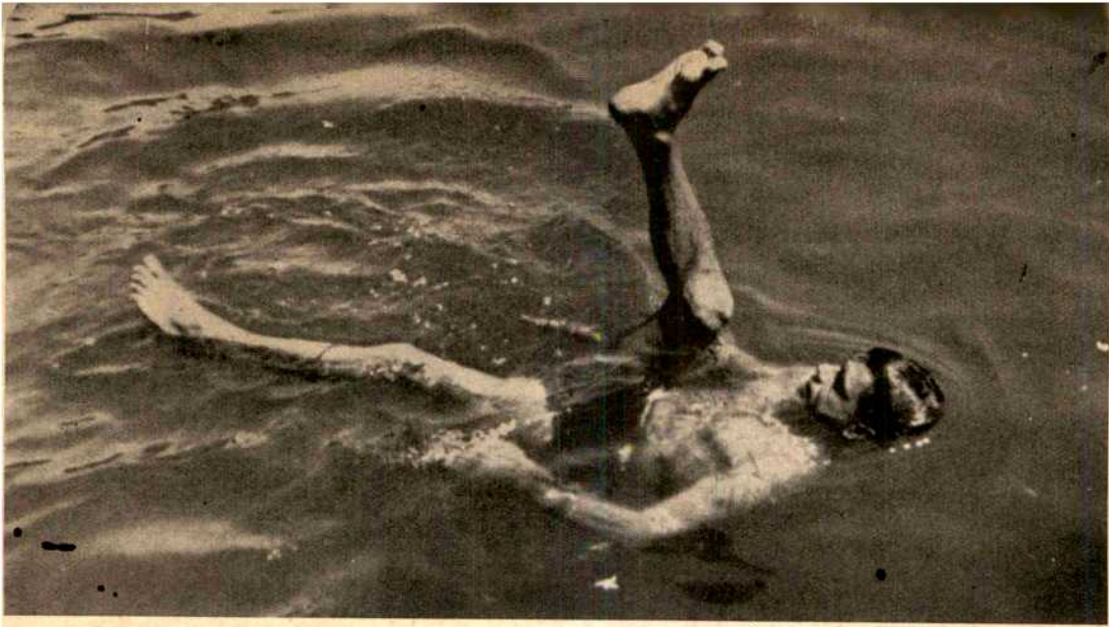
তুসি

“বনফুল”

প্রথম সে যৌবনের স্বপ্নময় লোকে
একদা দেখিয়াছিল কল্পনা-আলোকে
গুপ্তিতা তরুণী এক মানস-হারিণী
মুখ ছিল ঢাকা তার চিনিতে প্লুরি নি।

সহসা আজি সে নারী মুখ খুলিয়াছে
রহস্ত-গুপ্তনখানি ধীরে তুলিয়াছে
আলোক পড়েছে তার সর্ব অঙ্গ চুমি
দেখিতেছি সবিস্ময়ে—এ কি এ যে তুমি।





বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

বন-চাতকী আর আখিজল পাশাপাশি গ্রাম। আমাদের গ্রামের নাম বাবুইডাঙ্গা—তরঙ্গী নদীর অপর পারে। আমরা বাবুইডাঙ্গা হইতে আখিজলের জমিদার শঙ্কু মুখুজ্যের বাড়ী বরষাত্রী আসিয়াছিলাম তরঙ্গী পার হইয়া এবং উভয় গ্রামের মধ্যে দূরত্ব প্রায় দশ মাইলেরও সামান্য উর্দ্ধে হইবে বলিয়া ধাবণা হয়। বয়স আমার তখন অল্পই—স্কুলে পড়ি, অবশ্য স্কুলে পড়াব কক্ষও সেটা ঠিক নয়, আর একটু উচ্চ স্থানে কোথাও পড়িলেই ভাল হইত। কিন্তু গান-বাজনা আমাকে কেমন পাইয়া বসিয়াছিল, কাজেই পড়াশুনার দিকটায় তেমন নজর দিতে পারি নাই। গ্রামে আমার গান-বাজনায় বেশ একটু খ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে, গ্রামের কোন ছেলের যদি অন্তর কোথাও বিবাহ হইত ত বরষাত্রী আর কেহ না গেলেও আমাকে যাইতেই হইত। আখিজলের জমিদার শঙ্কু মুখুজ্যের বাড়ী না যাইবই বা কেন, আর এ বৃহৎ ব্যাপারে গ্রামের লোকেরাই বা আমাকে ছাড়িবে কেন। কাজেই গিয়াছিলাম।

তখনও শীত ঠিক পড়ে নাই, পড়ার আয়োজন চলিতেছিল। সন্ধ্যার সামান্য পূর্বেই আমরা আখিজলের জমিদার-ভবনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আদর-অভ্যর্থনার ঘটা পড়িয়া গেল। কোন ক্রটি কিছুতেই দেখিলাম না। মনে হইল, এক রাজ্যের জন্ত যেন আমরা আখিজলে দৌড়িও প্রতাপে রাজত্ব চালাইতে আসিয়াছি।

জমিদার শঙ্কু মুখুজ্যের বহির্কাটার বৃহৎ আটচালায় আমাদের জন্ত বিরাট ফরাশ বিছাইয়া আসর করা হইয়াছিল, তাকিয়ায় তাকিয়ায় ফরাশ ছাইয়া ছিল, আশে-পাশে ছয় সাতটি গড়গড়া প্রস্তুত ছিল এবং চার পাঁচটি ফরাশের রেকাবীতে পান, জরদা, চূণ ও মশলা সাজান ছিল। ফরাশের একপাশে দেখিলাম, একটা হারমোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা বসান রাখিয়াছে। আয়োজন দেখিয়া খুশী হইলাম।

যথাকালে হারমোনিয়ম ও বাঁয়া-তবলা আসরের মধ্যে আসিয়া গেল এবং আমাকেও তাহাদের নিকটবর্তী হইতে হইল, তাকিয়ায় ঠেস দিয়া আরাম উপভোগের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া। যথারীতি প্রথম একটু না না করিয়া হারমোনিয়ম ধরলাম। অমনি কথা উঠিল তবলটির; কে যে আমার সঙ্গে তবলা বাজাইবে তাহারই ভাবনা দেখা দিল। কেহ আর সাহস করে না। আমাদের মধ্যে এমন উপযুক্ত কেহই ছিল না।

জমিদার শঙ্কু মুখুজ্যে অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কেমন একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, তাই ত। শ্রীমন্ত পৈলান এসে পৌছে গেলে বড় যে ভাল হ'ত। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আপাততঃ কাজ চালিয়ে নেয় ?

কাজ চালাইয়া লইবার বত লোকও আমাদের মধ্যে ছিল না। আর যাহাকে গিয়া চলিলেও চলিতে পানিত, সে শ্রীমন্ত পৈলানের নাম শুনিয়াই কেমন যেন হইয়া গেল, তাহাকে কিছুতেই আর রাজী কবানো গেল না। শুনিয়াছি এদিককার মধ্যে বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান এক জন বিখ্যাত তবলচী, কিন্তু কখনও তাহাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। আজ দেখিতে পাইব ভাবিয়া খুশী হইলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে আমাকেই গান গাহিতে হইবে তাহা ভাবিয়া রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। না জানি, সভামধ্যে আমাকে আজ জ্যোতিব মত লজ্জায় পড়িতে হয়, ভয়ে তাই লজ্জাহারী মুখুদনের নামই মনে মনে জপিলাম।

শেষ পর্যন্ত জমিদার শঙ্কু মুখুজ্যে স্বয়ং বাড়ীর ভিতর হইতে প্রায় আমারই সমন্বয়ী একটি ছেলেকে ঘোর করিয়া ধরিয়া লইয়া আসিলেন। ছেলেটিকে দেখিয়াই বুঝিলাম, সে বাড়ীর ভিতরে কি যেন কাজে ব্যস্ত ছিল, আর সেই অবস্থাতেই তাহাকে ধরিয়া আনা হইয়াছে। ছেলেটি

আসরে আসিয়া যেন মহা লঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে! কোন রকমে মালকোছা খুলিয়া দাঁড়াইল। আর জমিদার শঙ্খ মুখ্যোও তাহাকে আসবে বসাইয়া দিয়া বলিলেন, নইলে গান স্বরু হ'তে পারছে না দীপু, কিছুক্ষণ চালা, শ্রীমন্ত হয়ত এরই মধ্যে এসে যাবে।

দীপু ওবফে দীপক তখন বলিল, ভাল জ্ঞাতনে ফেললেন আপনি মেসোমশাই, তবলা কি আমি বাজাতে জানি, না ছাই। এজন্তে আসতে হবে জানলে একটা কিছু গায়ে দিয়েই না-হয় আসতাম। যাই, বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কিছু গায়ে দিয়েই আসি।

জমিদার শঙ্খ মুখ্যো সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, লোক পাঠিয়ে আমি তা আনিয়ে দিচ্ছি, তুই বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে বস ত।

দীপক তাহাতে যেন একটু ক্ষুব্ধ হইয়াই বলিল, হ্যা, বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে বসি, আর শ্রীমন্ত পৈলান এসে তাই দেখুক।

সকলের একান্ত অস্থরোধে শেষ পর্যন্ত দীপক নিজের কাছেই বাঁয়া-তবলা টানিয়া নিয়া বসিল।

তুই জনের বয়স প্রায় সমান হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বনিবনা হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য হইল না। একটা সহজ বনিবনা করিয়া লইয়া গান ধরিলাম,—

জাগো ফুলদল রজনী উত্তল

পদধ্বনি মোর শুনি।—

দেখিতে দেখিতে গান বেশ জমিয়া উঠিল। দীপক সঙ্গে চমৎকার তবলা বাজাইয়া চলিয়াছিল। আমি নিজে কোন অস্থবিধা বোধ করিতেছিলাম না। দীপকের লঙ্কাও ক্রমে কাটিয়া আসিল, সে সহজ ভাবেই বাজাইতে লাগিল। দ্বিতীয় গান স্বরু করার আগেই আসরের এক পাশ হইতে আখিজলের লোকেব মন্তব্য শুনিলাম, ছেলেটি খাসা গায় ত। অত্যন্ত আশ্চর্যসাদ অস্থভব করিয়া সগর্বে দ্বিতীয় গান ধরিলাম। কিন্তু এক চরণ গাহিয়া শেষ করিতেই সহসা আসরের চতুর্দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বুঝিলাম, শ্রীমন্ত পৈলান আসিয়া গিয়াছে। সাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপক হঠাৎ বাঁয়া-তবলা ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া এক লাফে আসরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। আমিও বাধ্য হইয়া গান বন্ধ করিলাম।

জমিদার শঙ্খ মুখ্যো স্বয়ং বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানকে এক প্রকার জড়াইয়া ধরিয়া আসরে লইয়া আসিলেন এবং তাহাদের পিছনে একটি চাকরের হাতে দেখিলাম, এক-জোড়া বাঁয়া-তবলা। দেখিয়াই বুঝিলাম, নিশ্চয়, ইহা শ্রীমন্ত পৈলানের নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে যায়—সঙ্গে লইয়া যায়।

মুহুর্তে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম একবার বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানকে। তবলটীব উপযুক্ত চেহারা হই বটে। সাবাহেহে মাংসের কোন বালাই নাই, হাড়-সর্ব্ব্বাংগ চোখ-মুখের ভাব কেমন যেন তিরিষ্কি ও রক্ষ, মাথার দুই পাশে বেশ ঢাক পড়িয়াছে, তাহাতে আবার পাতলা চুল ও পিছনের দিক খানিকটা তুলিয়া ঘাড়-কামানোগোছ করিয়া রাখিয়াছে। আসরের সকলের প্রতি একটা চোখ যেন একটু কঁচকাইয়া চাহিয়া আছে। দেখিলেই মনে হয়, লোকটা যেন কাহারও প্রতি খুশী নয়।

জমিদার শঙ্খ মুখ্যো সম্বন্ধে শ্রীমন্ত পৈলানকে আসরে স্থান করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিলেন, এসে আমার মুখ রক্ষ করেছ শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত পৈলান আসরের চতুর্দিকে একবার ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আমাদের বাঁড়ুজ্যো-মশাই কই? তাঁকে যে দেখছি না?

জমিদার শঙ্খ মুখ্যো বলিলেন, বাঁড়ুজ্যো-মশাইয়ের হঠাৎ দু-দিন ধরে জ্বর, আজ আবার জ্বরটা বেড়েছে একটু, তাই আসতে পারেন নি। তবে ব'লে পাঠিয়েছেন, 'শ্রীমন্ত পৈলান, এসে গেলে আমাকে যেন একটা খবর দেওয়া হয়'। তা খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই।

শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, তা হ'লে খবর পাঠান ত ঠিক হয় নি। ঐ জব নিয়েই না আবার এসে হাজিব হন। শুণী লোক, শুঁদের কি বিশ্বাস করতে আছে মুখ্যো মশাই।

তার পরে সহসা আমার দিকে ফিরিয়া শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, বাইরে থেকেই একটা টান শুনলাম বটে, বেশ মিষ্টি গলাই ত! সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছিলেন বুঝি দীপকবাবু, তিনি গেলেন কোথায়?

জমিদার শঙ্খ মুখ্যো বলিলেন, সে কি আর থাকে, পালিয়েছে কোথাও নিশ্চয়।

শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, আমাকে ওনার বড় ভয়, কিন্তু

কালে উনি এক জন গুলীলোক হবেন, এখনই বেশ হাত-চাত
চলে দেখতে পাই। তবে সাধনা চাই, এক-আধ দিনে কি
আর হবার জিনিষ এসব। তাঁর দয়া আর সাধনা এক ঠাই
হ'লেই তবে হবে। নইলে এ জিনিষ হবার নহ। কি
বলেন মুখুজ্যে-মশাই?

তা বইকি!—বলিয়াই জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে আসরের
সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই হ'ল আমাদের বন-
চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান, আমাদের এদিককার গৌরব
একটা। আপনাদের যে আন্তরিক ঠর তবলা শোনাতে
পারব সে আমার মস্ত সৌভাগ্যেব কথা।

শ্রীমন্ত পৈলান সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, কথাটা নেহাৎ
অজ্ঞায় কিছু বলেন নি মুখুজ্যে-মশাই। তা বলুক দেখি
লোকে যে, শ্রীমন্ত পৈলান কখনও কারও বাড়ী গেছে তবলা
শোনাতে। সে পান্তরই আমি নই। যার শোনবার
গবজ থাকবে সে বন-চাতকী গিয়ে শ্রীমন্ত পৈলানের কুঁড়েতে
বাসই শুনে আসতে পাববে। কিন্তু আখিজলের মুখুজ্যে-
বাড়ী আমার না এসে উপায় নেই, আপনি আমাকে কিনে
নিয়েছেন একেবারে মুখুজ্যে-মশাই।

এমন সময় সর্বাঙ্গে একখানি বালাপোষ জড়াইয়া নন্দ
বাঁদুজ্যে সেখানে উপস্থিত। জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে তাহা
দেখিয়া বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে
ধরিয়া বলিলেন, এই ভীষণ জ্বর নিয়ে এসে হাজির হ'লেন
যে বড়। এমন জ্বালে ত আপনাকে থবরই পাষ্টতাম না।

নন্দ বাঁদুজ্যে আসরে শ্রীমন্ত পৈলানের কাছে আসিয়া
বসিয়া বলিলেন, না, সামান্যই জ্বর, মাত্র এক-শ তিন।
ভায়া এসে গেছে শুনে না এসে আব থাকতে পারলাম না।

তার পবে শ্রীমন্ত পৈলানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এসে
ভালই করেছ ভায়া। আমারও জ্বর, তুমিও আসবে না,
তাইলে মুখুজ্যে আমাদের বাড়ীতে দশ জন ভদ্রলোক এনে
তাঁদের আপ্যায়িত করে কি দিয়ে। তুমি এসে যাওয়ায়
গাঁয়ের আমাদের তবু মান থাকল ভদ্রলোকদের কাছে।
এইবার বাঁয়া-তবলা টেনে নিয়ে বসো। দেখি, কতক্ষণ
থাকতে পারি। ম্যালেরিয়ায় এবার বড় কাবু ক'রে
ছেড়েছে হে। তোমার ওখানে যাব যাব ক'বে তাই
আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। রোজ জ্বরের ঘোরে তবু যেন

কানে ভেসে এসেছে বন-চাতকীর দিক থেকে তোমার
তবলার আওয়াজ। তাই মুখুজ্যেকে থবর দিতে চলে
রেখেছিলাম। না এসেও তাই পারলাম না।

নন্দ বাঁদুজ্যের কণ্ঠস্বরে তাহার শারীরিক দুর্বলতা
সহজেই ধরা পড়িতেছিল, লোকটা যেন জ্বরের ষাটনায়
কথা কহিতেছিল।

শ্রীমন্ত পৈলান গলায় জড়াইয়া রাখা তাঁজ-করা পুৰাতন
এণ্ডির চাদরটি গলা হইতে খুলিয়া লইয়া তাহা বুজাবারে
পাকাইয়া ফরাশেব উপর বসাইয়া তাহারই উপর তবলা
বসানোর আয়োজন করিয়া কেপ-কলারের শাটের একটি
হইতে একটা ছোট তবলা-পেটা হাতুড়ি বাহির ক'রিয়া
কোনদিকে না চাহিয়াই বলিল, বাঁদুজ্যে মশাই, তানপুহোটা
সঙ্গে নিয়ে যদি আসতেন ত ভদ্রলোকদের আপ্যায়িত
ক'রে সুখ হ'ত।

নন্দ বাঁদুজ্যে বিষয় কণ্ঠে বলিলেন, ইচ্ছে কি আর না
ছিল পৈলান, কিন্তু সামর্থ্যে যে কুলোবে না। আচ্ছা,
চলুক ত ততক্ষণ। নেহাৎ যদি না চলে ত তানপুহোটা
আনিয়া নিলেই চলবে।

তা বেশ কথা।—বলিয়া শ্রীমন্ত পৈলান বাঁ-হাতের আঙুল
দিয়া আমাকে হারমোনিয়মের একটা রীড টিপিয়া ধরিয়া
থাকিতে। বলিয়া হাতুড়ি দিয়া তবলার স্বর বাঁধিতে
সুঁক করিল। শ্রীমন্ত পৈলানের তবলায় স্বর বাঁধা একটা
দেখিবার জিনিষ। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সে যেন সঙ্গাগ
রাখিয়া স্বর বাঁধিতে লাগিল। আমাব যে-হাতেব আঙুল
দিয়া আমি রীড চাপিয়া বসিয়া ছিলাম সে-হাত আমার
রীতিমত কাঁপিতেছিল এবং ক্রমেই যেন অসাড় হইয়া
আসিতেছিল। ভয়ে মনে হইতেছিল, কণ্ঠ দিয়া আর হয়ত
আজ স্বর বাহির হইবে না। একটা বেলেকাবী করিয়া
যে আখিজল হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইবে সেই
কথাই আমি ভাবিতেছিলাম। মান-সম্মত বৃষ্টি আর
বাঁচিল না।

আসবের লোকজন যখন একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল
তখন শ্রীমন্ত পৈলানের তবলা ঠিক স্বরে বাঁধা হইল। তার
পরে নিজের দুই উচ্ছ্রিত জাহ্নব পবে নিশ্চিন্ত নির্ভরে হাত
দুইটি স্তম্ভ করিয়া নিতান্ত নিশ্চুহভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল,

এইবার তবে শুরু হোক। কিন্তু ইনি যে নিতান্ত ছেলে-মানুষ, আপনাদের বয়স আর কেউ নেই বুঝি? ... আর সত্যিই ত, শুণীলোক দুনিয়ায় ঢুল'ড। তা চলুক তবে। বলিয়া শ্রীমন্ত পৈলান এমনভাবে আমার মুখের দিকে চাইল যে, যেটুকু দুসাহস অন্তরে তখনও বাঁচিয়া ছিল তাহাও নিঃশেষে মরিয়া গেল। হাড-পা যেন আমার কাঠ হইয়া আসিল।

আমিও গান শুরু করিলাম, শ্রীমন্ত পৈলানও ফুটি করিল। অপাঙ্গে তাহা লক্ষ্য করিলাম। লক্ষ্য করিয়াই আরও বেশ কেনন হইয়া গেলাম। শেষে, কি যে গাহিয়া চলিয়াছিলাম তাহা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রীমন্ত পৈলান হাত তুলিয়াই বসিয়া রহিল, বাঁয়া-তবলায় হাত ছোঁয়াইল না।

হঠাৎ বাডুজ্যো মশাই বলিলেন, ছেলেটির গলা ভাল। পৈলান, ঐতেই কোন রকমে চালিয়ে নিয়ে চল। সাধনা আর ক'জনর থাকে। কালে ছেলেটি ঠাড়াতে পারবে।

শ্রীমন্ত পৈলান একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া গিয়া হঠাৎ যেন বাঁয়া-তবলার উপর একসঙ্গে হাত রাখিল। আমি নিজেও তাহাতে যেন আরও দুর্বল, আরও নিঃশব্দ মনে করিলাম। তার পরে ঠিক কি যে ঘটিল তাহা আর মনে নাই। তবে বুঝিলাম, গানটি আমাকে শেষ পর্যন্ত আর গাহিতে হয় নাই। দেখিলাম, শ্রীমন্ত পৈলান অল্প দিকে 'মুখ করিয়া ঘুরিয়া বসিয়াছে, আব নন্দ বাডুজ্যো অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে একটি ছেলেকে বলিতেছেন, যা যা, ছুটে যা বাবা অনাদি, আমার তানপুরাটা নিয়ে আসগে যা, নইলে মুখজ্যোর আমাদের আর মানটান থাকে না আর পৈলানেরই বা মর্যাদা রক্ষা হয় কেমন করে।

অনাদি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

আমি অগত্যা হারমোনিয়ম ছাড়িয়া আসরের এক পাশে গিয়া বসিলাম। অপমানের চরম যে আমার হইয়াছে সে বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম। শ্রীমন্ত পৈলানের উপর আক্রোশে তাই সমস্ত শরীর আমার জ্বলিতেছিল। মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিয়া সহ্যহুঁত্বি যে প্রত্যাশা করিব সে সাহসও আর হইতেছিল না।

অনাদি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে তানপুরা আসিল। অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, শ্রীমন্ত পৈলান আবার ঘুরিয়া বসিয়াছে। নন্দ বাডুজ্যো তানপুরায় স্বর বাঁধিতে লাগিয়া গেলেন।

শ্রীমন্ত পৈলান সহসা বলিল, আহা, ছেলেটি বুঝি পালানো? সামান্যই ওর বয়েস, ভাল-মান রেখে গাওয়া কি-চারটিখানি কথা, কিন্তু গলাটি ওর বেশ। আহা! ছেলেটি-ক-ভাকুন, হারমোনিয়মে স্বর দিয়ে যাক শুধু। এমনি কবেই একদিন হবে।

সকলের অহরোধে আবার আসিয়া হারমোনিয়ম লইয়া বসিলাম। শ্রীমন্ত পৈলান একটা রীড়ে আঙুল দেখাইয়া স্বর দিয়া যাইতে বলিল। যন্ত্রচালিতের মত স্বর দিয়াই চলিলাম। তার পরে আধ ফুটারও উপরে চলিল স্বর-বাঁধাবাধি। বাঁয়া-তবলায় স্বর লাগে ত তানপুরায় স্বর লাগে না, আবার তানপুরায় স্বর লাগে ত বাঁয়া-তবলার লাগে না। সে যেন দেবাসুরে মিলিয়া স্বর-সমুদ্র মন্থন শুরু হইল, অমৃত গরল দুই-ই তাহাতে উঠিয়া আসিল।

তার পরে যখন নন্দ বাডুজ্যো স্বরগ্রাম সাধিতে শুরু করিলেন তখন তাহার অঙ্গের বালাপোষ ফরাশে নামিয়া আসিল, আর শ্রীমন্ত পৈলানের সর্বাঙ্গে, চোখে-মুখে, এমন কি ফিরা-উপশিরাতেও যেন একটা অমানবীয় আত্মরিক উত্তেজনা জাগিয়া উঠিল। আজ একটা যেন প্রলয় ঘটিবে এমনই উভয়ের ভাব-ব্যঞ্জনা। অতি ভয়ে ভয়ে আমি বীড় চাপিয়া বসিয়া ছিলাম।

তার পরে বাক্স আর বাক্স। থাকিয়া থাকিয়া সরা-দেহময় স্বর-শিহরণ অল্পভব করিতেছিলাম।

ধন্য শ্রীমন্ত পৈলান। বাঁয়া-তবলা যেন কথা কহিয়া চলিয়াছে, স্বরে স্বরে যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। লজ্জা অপমান মুহুর্তে কোথায় যে আমার ভাসিয়া গেল তাহা আর ভাবিয়া পাইলাম না। মনে হইল আজীবন যেন বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানের দাসোচ্চাস হইয়া থাকিতে পারি।

নন্দ বাডুজ্যো এক জন শুণী লোক বটে। তখন গাহিয়া চলিয়াছিলেন,—

নুমুণ্ডে তোরে মানাত না মা,
মহেশ যদি না থাকিত বাক্য হুটি পায়ের তলে;
সে কথা কি ভাবিস্ কালী—শশান-পাষাণী।

সে গান যেন আর খামিতে চাহে না, সুরে সুরে সে যেন
ইন্দ্রজাল রচিত হইয়া গেল। সমস্ত অন্তর আমার পরিতৃপ্তির
শেষ সীমায় পৌঁছিয়া যেন কাঁপিতে লাগিল।

গান যখন খামিল তখন আসরের সকলেই বিস্ময়-স্তম্ভিত,
কথা বলিয়া কেহ আর আনন্দ প্রকাশের ঔদ্ধত্য জানাইতে
সাহসী হইল না।

নন্দ বাঁড়ুজ্যে সহসা বাংলাপোষ আবার অঙ্গে টানিয়া
জড়াইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, শক্তিতে
আর দিচ্ছে না পৈলান, আজকের মত উঠি। জ্বর বোধ হয়
বেড়েই গেল। তোমাব মত গুণী লোককে যদি বা পেলাম
ত আপশোষ মিটিয়ে গাইতে পারলাম না।

তার পরে অনাদির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ধর ত বাবা
অনাদি, একটা হাত ধরে তুলে ধর দিকি, গায়ে আর জোর
পাচ্ছি নে।

অনাদি এবং দীপক একসঙ্গেই আসিয়া নন্দ বাঁড়ুজ্যেকে
ধরিতে গেল। বাঁড়ুজ্যে-মশাই দীপকের হাতে তানপুরাটা
দিয়া অনাদির হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বাঁড়ুজ্যে-মশাইকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া শ্রীমন্ত
পৈলান বলিল, আসুন তবে বাঁড়ুজ্যে-মশাই, আমিও গুণার
জোগাড় দেখি। কাজের বাড়ী, মুখুজ্যে-মশাই আবার
গেলেন কোথায় কে জানে।

বাঁড়ুজ্যে-মশাই চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই ঠিক বাড়ীর
ভিতর হইতে খবর আসিল, বিবাহের আয়োজন সব ঠিক,
লগ্নও সমাগত। বিবাহের আসরে আমাদের সবার
উপস্থিতির জন্য আহ্বান লইয়া লোক আসিল।

একে একে সকলেই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। আসরে
শুধু রহিলাম আমি আর বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান।
শ্রীমন্ত পৈলানের মত এতবড় গুণী আর কোথাও কখনও
দেখিতে পাইব কিনা জানি না। তাহাকে ছাড়িয়া বাইতে
কেন জানি ভাল লাগিল না।

আশ্চর্য্য। শ্রীমন্ত পৈলান গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

একটা কথাও কহিল না। আমিও কোন কথা কহিয়া তাহাব
নীরবতা ভাঙিয়া দিতে সাহসী হইলাম না।

অনেক রাত হইয়া গেল। ভবু সেখান হইতে আমি না
পারিলাম উঠিয়া যাইতে, না পারিলাম শ্রীমন্ত পৈলানের দৃষ্টি-
আকর্ষণ করিতে।

তার পরে জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে এক জন চাকর সঙ্গে লইয়া
বহির্কোঠাতে আসিলেন এবং শ্রীমন্ত পৈলানকে লক্ষ্য করিয়া
বলিলেন, শ্রীমন্ত, লোকজন সব কাজে ব্যস্ত, একটা লোক
পাচ্ছিলাম না যে তোমার সঙ্গে পাঠাই। আহারাতি ত
কোথাও করবে না যখন, তখন আর তোমার দেরি কবিয়ে
দিয়ে লাভ নেই।

পরে চাকরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, একটা লঠন সঙ্গে
নিয়ে পৈলানকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আয়।

শ্রীমন্ত পৈলান চলিয়া গেল। জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে
খানিকটা পথ তাহাকে আগাইয়া দিয়া আসিলেন। আমি
এতক্ষণ যে অকারণ বহির্কোঠাতে বসিয়াছিলাম সেজন্য মনে
মনে দুঃখই হইল। জমিদার শম্ভু মুখুজ্যে বন-চাতকীর শ্রীমন্ত
পৈলানকে পথে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন
আপনি যে এখানে একা একা বাসে আছেন, ভেতরে চলুন।

জমিদার শম্ভু মুখুজ্যের সঙ্গে বিবাহের আসরে সমাগত
বরযাত্রীদের মধ্যে গিয়া বসিলাম। কিন্তু মন আমার
শ্রীমন্ত পৈলানের কথাই ভাবিতে লাগিল। লোকটাকে
অদ্ভুত সন্দেহ নাই, কিন্তু অসাধারণ একজন গুণীও যে
সে-কথাও ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আখিড়ল হইতে বাবুইডাঙ্গা ফিরিয়া আসিয়া কিছুতেই
আর কোন জিনিষে মন দিতে পারিতেছিলাম না।
বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলান যেন আমাকে গ্রাস করিয়া
বসিয়াছিল। শ্রীমন্ত পৈলানের কাছে বাঁয়া-তবলা
আমাকে শিখিতেই হইবে। আব তাহা যদি না শিখিতে
পারি ত গান-বাজনা শেখার কোন মানেই হয় না।
অত বড় এক জন গুণীর সামান্য অমুগ্রহ পাইলেও জীবন
আমার ধন হইয়া যাইবে। অষ্টগ্রহব সেই ভাবনাই আমাকে
কেমন পাইয়া বসিল।

শেষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন বন-চাতকীর

উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পড়িলাম। স্থির করিলাম, সমস্ত কিছুই বিনিময়ে শ্রীমন্ত শৈলানের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব।

মধ্যাহ্নে বন-চাতকী আসিয়া পৌঁছিলাম। কি জানি, বুক আমার কেন জানি শকায় কাঁপিতেছিল। হৃদয় শ্রীমন্ত পৈলান রূঢ় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আমার ইচ্ছার বাদ সাধিবে। কিন্তু অবজ্ঞা অপমান কিছুই গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। প্রয়োজন হইলে শ্রীমন্ত পৈলানের পা জড়াইয়া ধরিয়াও তাহার মন গলাইতে চেষ্টা পাইব।

শ্রীমন্ত পৈলানেব বাড়ী চিনিতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হইল না। গ্রামের যেকোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম সে-ই বলিয়া দিল।

শ্রীমন্ত পৈলানেব ছোট দুইটি চালাঘরওয়ালা বাড়ীর উঠানে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি হাত তুলিয়া তাহাকে একটা নমস্কার জানাইয়া বলিলাম, পৈলান মশাই, আপনার কাছেই এলাম। আমাকে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই? সেই যে আঁখিজলের জমিদার শঙ্কু মুখোয়ার বাড়ী বাবুভাঙ্গা থেকে বরষাত্রী এসেছিল আমিও তাদের সঙ্গে এসেছিলাম।

শ্রীমন্ত পৈলান আমাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, ও, এসেছিলে নাকি? হ্যাঁ, অনেকেই এসেছিল বটে, কাউকেই আমার মনে নেই।

সাহস কবিতা আর বলিতে পারিলাম না যে, আমি গান গাহিয়াছিলাম। সে দুঃসাহসের কথা আর স্মরণ করাইয়া দিতে মন চাহিল না।

বলিলাম, বহুদূর থেকে আমি আসছি আপনার কাছে। সেই বাবুভাঙ্গা থেকেই আমি আসছি। আমার বচ ইচ্ছা যে আপনার কাছে বাজনা শিখি।

শ্রীমন্ত পৈলান আমাকে একটা আসনে বাবান্দার বসিতে দিয়া নিজেও আর একটা আসনে বসিয়া বলিল, তা তোমার চেষ্টা আছে বুঝি, কিন্তু শ্রীমন্ত পৈলান কাউকে কখনও শেখায় না। তুমি এত কষ্ট স্বীকার করে এসে যে বড় ভুল করছ।

এত সহজে দমিবে না, তাহা পথেই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম। কাজেই বলিলাম, তা না শেখান বেশ

কিন্তু আমি আপনার কাছে আপনার চাকরের মত দিনরাত্রি পড়ে থাকবো, আর তাতেই যা সম্ভব তাই শিখে নেব।

শ্রীমন্ত পৈলান যত্ন একটু হাসিয়া বলিল, না, তাও যে সম্ভব নয়। এ জিনিষ আমি কাউকে আর কখনও একটা অক্ষরও শেখাতে পারব না। অনেক পাপ ছিল জীবনে তারই শাস্তি আজ ভোগ করছি। নইলে এমন দৈবদত্ত জিনিষের ভাগ কাউকে দিতে পারছি না। ভগবান আমাকে মেরে রেখেছেন। আমাব এই ভাড়া ঘরে এসে বহু জায়গার বহু লোক বাজনা শুনে গেছে, কিন্তু শিখতে চেয়েছে কি আমাব সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। না, কাউকে আমার আর শেখাবার উপায় নেই। বাজনা যদি শুনতে চাও ত সম্ভ্যে পর্যন্ত বসলেই তা শুনতে পারবে।

শ্রীমন্ত পৈলানের কথা শুনিয়া ভয় পাইলাম। বলিলাম, আমার এত কষ্ট স্বীকার করে আসা কি তাহলে বুধা হয়ে যাবে? আমি যে বাড়ী থেকে পালিয়ে বেবিয়া এলাম আপনার কাছে তবলা শিখব বলে। কিন্তু কিছু না শিখেই বা বাড়ী ফিরি কেমন করে?

শ্রীমন্ত পৈলান বলিল, আহা! তোমাদের জন্মে সত্যি আমার দুঃখ হয়। এমন কত লোক আগ্রহ নিয়েই না শিখতে এসেছে আমার কাছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি, তাই কাউকে কিছু দিতে পারি নি। আমার পরে ভগবানের রূপাও যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর মহা অভিশাপও আমাকে বহন করতে হচ্ছে। আর সে যে ভগবানের কি নিষ্ঠুর অভিশাপ সে শুধু আমিই জানি। আমাব কাউকে আজ আর শেখাবার অধিকার নেই। একদিন বহু ছাত্রই আমার কাছে শিখতে আসত, কিন্তু সে সৌভাগ্য থেকে আমি আজ বঞ্চিত। আমার একটি ছেলে—সেই ছিল আমার ছাত্রদের মধ্যে প্রধান। আজ বেঁচে থাকলে হয়ত তোমাদেবই বয়স তার হ'ত। কিন্তু ওস্তাদ হ'ত হয়ত সে আমার চেয়েও ঢেব বড়। কাবণ, সেই বয়সেই তার বা হাতে বোল উঠত তা দেখে আমিও যেতাম হুক চকিয়ে। জী মারা যেতে সে-ই হয়েছিল আমার সংসারের একমাত্র সম্বল। ভগবানের চক্র, একদিন আমার সঙ্গে সঙ্গতে বসেছে, হঠাৎ কোথায় যেন দিলে ভাল কেটে।

মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না, তবলা-পেটা হাড়-ডাটা তুলেই দিলাম তার মাথায় এক ঘা বসিয়ে.....

আর কিছু না বলিয়াই মস্ত গুণী শ্রীমন্ত পৈলান নিতান্ত ছেলে মানুষের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শ্রীমন্ত পৈলানের মত এত বড় গুণীকে এমন অসহায়ের মত কাঁদিয়া উঠিতে দেখিয়া আমারও চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ উভয়ে আর কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। তার পরে শ্রীমন্ত পৈলান কাপড়ের খুঁট দিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া বলিল, সেই নিয়ে পড়লাম হনের মামলায়। একে ত নিজের দুঃখেই নিজের ম'রে ভাছি, তাতে আবার ঐ বিস্ত্রী মামলা, হাতে নেই একটা পরা। ভগবানের মার, তাই চূপ ক'বেই রইলাম। ভাবলাম, যা বরাতে লেখা আছে তাই হোক, মামলা থেকে বাঁচার আর কোন চেষ্টাই করব না। অবশ্য, সামর্থ্যও আমার ছিল না। কিন্তু গুণীর আদর জানেন আমাদের আখিজলের শত্ৰু মুখোয় মশায়। তিনি কত দিনই আমার এই ভাড়া হুঁড়ের ব'লে আমার বাঁয়া-তবলা স্তনে গেছেন। তিনি খবর পেয়েই তাঁর নায়েবকে দিলেন আদালতে পাঠিয়ে। আর ব'লে দিলেন, যত টাকা লাগে এ মামলা থেকে শ্রীমন্ত পৈলানকে বাঁচাতেই হবে। তাঁরই দয়ায় কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচলাম

কোন রকমে। সেই থেকে জমিদার শত্ৰু মুখোয়র আদি কেনা গুণী। নইলে, কারও কি সাধ্য আছে যে শ্রীমন্ত পৈলানকে নিয়ে যাবে তার বাড়ী, এক তা পারেন আখিজলের শত্ৰু মুখোয় মশায়, গুণীর যিনি সত্যিকারের আদর জানেন। ব্যস, সেই অঘটন ঘটায় পর থেকেই শেখান আমাব শেষ হয়ে গেছে। ভগবানের অভিধাপে তাই বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানকে মরতে হবে নিশ্চিত অবস্থায়। তাঁব কাছ থেকে যা পেলাম, কাউকে তা দিয়ে যেতে পারলাম না। এর চেয়ে আর অভিধাপ মানুষের জীবনে কি থাকতে পারে?

সমস্ত গুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। শ্রীমন্ত পৈলানের মত এক জন গুণী এমন নৃশংস হত্যার অপরাধে একদিন আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল, সে তাহান নিজ পুত্রকে সামান্য একটু তুলের জন্ত হত্যা করিয়াছে। আশ্চর্য্য ত।

বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম।

বন-চাতকীর শ্রীমন্ত পৈলানের শিষ্য গ্রহণ করা আমান ঘারা আর সম্ভব হইল না। লোকটা অসাধারণ গুণী হইতে পারে, কিন্তু নিদারুণ অভিধাপ।

মদির মুহূর্ত

শ্রীশ্রীরঙ্গকুমার গুপ্ত

বহুযুগ আকাজিকত আজিকার মুহূর্ত মদির
তোমারে নিরখি সখি জীবনের প্রাণকুঞ্জছায়,
ভরস্বয় ফেনপাত্র উচ্ছ্বসিছে ওষ্ঠের কানায়;
মনে-হর রাত্রি-বৃন্তে ইন্দুরশি বর্ষণ-অধীর,
বলম্বল স্বপ্নপুষ্ট জাল বৃনি পায় ও মোতির
মোদের চম্পক-হাতে, মদালসা চীনাংস্তক হায়,
শ্রেণীবদ্ধ ঘূর্ণমান বাহুড়ের উল্লাস পাখায়;
আমি লুপ্ত পুরুষবা, তুমি যেন উর্কশী মাটির।

ভূজবদ্ধ তুমি মোব, উর্কে শোভে পুর্ণিমা-শরীরী,
স্পন্দমান তরুতন্ত্রী, লীলায়িত লাহড়ঙ্গী কিবা—
হেরিহু নির্ভয়ে আমি, ভাঙে তব চন্দ্রমঞ্জী-সিঁথি;
সঙ্কোচজড়িত লজ্জা রেখে আনো ফুলপদ্ম গ্রীবা—
প্রথম-প্রণয়-ভীক শ্রিতদৃষ্টি সঙ্গ-সহচরী;
আমরা ব্যগ্রতা লয়ে অতহুত নেপথ্য-অতিথি।

বাংলা সাহিত্যের অভাব-অভিযোগ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

১

সাহিত্যের যে-সব অভাব নিয়ে অভিযোগ করা চলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তারই একটু আলোচনা উপস্থিত করব। আমাদের নবীন কবিদের মধ্যে দু-চার জন। রবীন্দ্রনাথ নেই কেন, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ট্রাষ্টের 'ওয়ার এণ্ড পীসেব' মত উপজ্ঞাস কেন লেখেন নি, 'উরিপিডিস কি শেক্সপিয়ারের তুল্য নাট্যকার বাংলা দেশে কেন জন্মায় নি—এ নিয়ে ইচ্ছা হ'লে দুঃখ করা যেতে পারে, অভিযোগ করা অর্থহীন। পাঠকের প্রচণ্ড তাগিদে লেখকের ইচ্ছা দুঃখ হ'লেও তার কলে রবীন্দ্রনাথ কি টলষ্টয়, উরিপিডিস কি শেক্সপিয়ার, এমন কি বার্গাড শ-রও সৃষ্টি হয়-না। প্রতিভার সৃষ্টিরহস্ত অজ্ঞাত, কিন্তু ইচ্ছার বেগ তার একটা কারণ নয়। সুতরাং আমাদের আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের রসপ্রাপ্তদের সৃষ্টিপ্রতিভা যদি আশঙ্ক-রূপ বড় না হয় তা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা চলে না, কারণ চেষ্টা করলেই তাঁরা তাঁদের ক্ষমতার রকম ও পরিমাণের রদবদল ঘটাতে পারেন না। তাঁদের সৃষ্টি যদি আমাদের দুর্ভাগ্যে কানা ছেলেই হয়, তবে গালাগল্পের জোরে তাকে পর্যালোচন করার চেষ্টা বৃথা। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আবির্ভাব আশা করে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

রসের সৃষ্টি নিঃসন্দেহ সাহিত্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই সাহিত্যে অমর। হাজার হাজার বছর পূর্বে শ্রেষ্ঠ রসশিল্পীদের প্রতিভা যা জন্ম দিয়েছে আজও মানুষকে তা কাব্যের আনন্দ দিচ্ছে, ঐতিহাসিক হয়ে যায় নি, এবং-মানুষের মন যদি আমূল বদলে না যায় চিরকাল দেবে। আজকের দিনে যখন সব দেশে প্রকাণ্ড পাঠক-গোষ্ঠীর মোটা চাহিদা মেটাবার জন্য ইঁদুরকো গল্প উপজ্ঞাসের অক্ষরস্ত্র জোগানে সাহিত্যের বাজার ভরে যাচ্ছে, কবিতার ক্ষেত্র অকিঞ্চিৎকর মানসিক চর্চের দুর্বল প্রকাশ চেষ্টার শুকনো আগাছায় আচ্ছন্ন,—তখন এ-কথা মনে করার প্রয়োজন আছে যে সাহিত্যের হীরা-জহরৎ এই বাজারেই

মেলে, সাহিত্যের গোলাপ এই আগাছার জঙ্গলেই ফোটে। কিন্তু বাজার করলেই তাদের পাওয়া যায় না, এবং কোন্ শুভ সুযোগে তাদের উদয় হয় তার জ্যোতিষিক গণনা সম্ভব নয়। জাতির জীবনে যখন অল্প পাঁচ দিকে প্রাণের জোয়ার এসেছে তখন সাহিত্যের বড় সৃষ্টি দেখা দিয়েছে, আবার দেয়ও নি, জাতির অবসাদের সময় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আবির্ভাবের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। আজকের পৃথিবীতে যখন জাতির সঙ্গে জাতির মানসিক জগতের সীমারেখা পরিক্ষীণ হয়ে এসেছে তখন বড় সাহিত্যিক প্রতিভার উপর তার নিজের দেশের পারিপার্শ্বিকের চাপ হ্রত আগেকার দিনের মত প্রবল নাও হতে পারে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বড় প্রতিভাবান শিল্পীর উদয় হ'লে আমাদের অল্প হীনতা ও দুর্দশা তার প্রতিভার পরিপূর্ণ ফুরণে বাধা না হতে পারে; অন্তত তাই মনে করে একটু আনন্দ পাওয়া যাক।

২

কিন্তু মাথা মানুষের উত্তমাজ হ'লেও তার সমস্ত শরীর নয়, রস-সাহিত্য সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হ'লেও সমগ্র সাহিত্য নয়। মানুষের অন্তরে শুধু সৌন্দর্য ও রসের সৃষ্টির প্রেরণা ও সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাই নেই, তার মনে আছে কোতুহল—নিজেকে ও জগৎকে জানতে, যা জটিল তাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে, বিক্ষিপ্ত জ্ঞানের টুকরোকে তত্ত্বের কাঠামে সাজিয়ে দেখতে। এই কোতুহলের ফলে যে চেষ্টা তার অনেক ব্যয় হয় জৈবিক ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে, কিন্তু যা উত্তর থাকে তার কিছু মানুষ লাগিয়েছে সাহিত্যের সৃষ্টিতে। বহুমুখী এই কোতুহলের মত সে-সাহিত্যও বহুমুখী। এ-সাহিত্য বিচার করে, বিভ্রক করে, তথ্যের সন্ধান করে, তাকে তত্ত্বের রূপ দিতে প্রয়াস পায়। রসসৃষ্টি এ-সাহিত্যের লক্ষ্য নয়, আবিস্কারিক ভাবে ছাড়া। মানুষের মননবৃত্তির উপর এর প্রতিভা। এ-সাহিত্য রসসাহিত্য নয়, মনন-সাহিত্য।

দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, তথ্য, বৃত্তান্ত, বিচার, আলোচনা—যখন সাহিত্যিক রূপ পায় তখনই মনন-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

সভ্যতার ইতিহাসে এ সাহিত্যের আবির্ভাব রস-সাহিত্যের অনেক পরে। কারণ জৈবিক দাসত্ব থেকে মানুষের মন মুক্তি পেয়েছে হৃদয়ের অনেক পরে। আর রসসাহিত্যের তুলনায় এই সকল মনন-সাহিত্যের সৃষ্টি অচিরস্থায়ী। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে মানুষের হৃদয়-বৃত্তি কি মনন-বৃত্তি কারও মূল গড়নের কোনও পরিবর্তন হয় নি। সেই জন্য হাজার বছর পূর্বেরকার রসশিল্পীর সৃষ্টি আমাদের রসানুভূতিকে আজও নিবিড় আনন্দ দেয়, অনেকটা যেমন শিল্পীর সমসাময়িক লোকদের দিত। কিন্তু মনন-বৃত্তি তাব অশান্ত কর্ষের ফলে নিজের পূর্ব কর্ষকল বিনাশ ও পরিবর্তন করে চলে। যে তথ্য ও জ্ঞান ও জগতের কল্লিত রূপ লোকের মনে কাল ছিল, আজ তা বজায় থাকে না, এবং যে-সাহিত্যের এরই উপর প্রতিষ্ঠা পরবর্তী যুগে তার বেশীর ভাগের মূল্য হয় কেবল ঐতিহাসিক, অর্থাৎ সাহিত্য নয় সাহিত্যের উপাদান। প্রাচীন যুগের অতি শ্রেষ্ঠ মনন-সাহিত্যিকদের রচনারও পরবর্তী কালে প্রধান আকর্ষণ হয় তাদের মূল বক্তব্য নয়, তাদের লেখার সাহিত্যিক গড়ন, এবং বিষয়বস্তু যাই হোক সৃষ্টির অতি নিপুণ প্রয়োগ কৌশলের আনন্দ। প্লেটো কি শব্বরের লেখার সঙ্গে সফোক্লিস কি কালিদাসের কাব্যের আধুনিক মনের যোগাযোগ তুলনা করলেই এ-কথা বোঝা যায়।

কিন্তু হোক অচিরস্থায়ী, এই সাহিত্য মানুষের মুক্ত সচল মনের প্রকাশ, যে মন অম্ললোকের উল্কে উঠে সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। প্রতি কালের মানুষ তার নিজের বিশ্বকে প্রকাশ করবে, পরীক্ষা করবে—তার চিন্তা ও অনুভূতি সাহিত্যে প্রকাশ করবে। সে বিশ্বের রূপ যখন মনের চোখে বসল হবে তখন নতুন প্রশ্ন, নতুন পরীক্ষা আরম্ভ হবে, নতুন সাহিত্য জন্ম নেবে। তাতে পুরাতন সাহিত্যের সাহিত্য হিসাবে যদি মৃত্যুও হয় তবু সে নিষ্ফল নয়। মনন-প্রবাহকে সচল রাখার যে কাজ তা সে করেই মরেছে। জীবের মৃত্যু হয়, জীবনের ধারা চলেতে থাকে মরণশীল জীব-পরম্পরাকেই আশ্রয় করে।

এই মনন-সাহিত্যের দুর্বলতা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান অভিযোগের কারণ। ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রেরণায় আধুনিক বাংলায় যে রস-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে তার তুলনায় আমাদের মনন-সাহিত্য গুণে ও পরিমাণে হীন ও তুচ্ছ। সাহিত্যের এ-ক্ষেত্রেও অবশ্য অভিযোগের ফলে প্রতিভার উদয় হয় ন, কিন্তু প্রতিভার চেয়ে নীচ শক্তিও অনেক মূল্যবান দান এ-সাহিত্যে দিতে পারে যেমন পশ্চিমের সভ্য দেশগুলিতে দিচ্ছে; এবং চেষ্টা ও একাগ্রতায় এ-শক্তিকে অধিকৃত্ত্ব ফলপ্রসূ করা সম্ভব। এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে ইংরেজ যুগের বাঙালী জাতির মধ্যে রসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার চেয়ে মনন-সাহিত্য বচনার মধ্যবিত্ত শক্তির পরিমাণ কম। আমাদের রসসাহিত্যের তুলনায় মনন-সাহিত্যের অভাব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার, এবং এর মূলে রয়েছে চিন্তা ও মননের জগতে আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন ইংরেজী ভাষার মারফৎ ইংরেজী ও ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হ'ল তখন বাংলা ভাষায় রসসাহিত্যের অভাব ছিল ন, কিন্তু চিন্তা ও বিচারের সাহিত্য আলোচনা হ'ত সংস্কৃত ভাষায় ভট্টাচার্য্যের টোলে, নয় আরবী ও পার্সিতে মৌলবীর মাস্রাসাদ। মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করে বিদেশী ভাষাকেই রস-সম্ভোগের ও রসসৃষ্টির বাহন করার চেষ্টা ব্যর্থতা অল্প দিনেই ধরা পড়ল। কারণ ও ব্যাপারটা ছিল অসম্ভব রকম অস্বাভাবিক। ফলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পূর্বান থাকেই নতুন জোয়ার এসেছে। বাঙালী কথাসিদ্ধীদের প্রতিভা ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে বাংলার উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য গড়ে তুলেছে। ইউরোপে মনন-সাহিত্য প্রথম ইংরেজ যুগের বাঙালী মনীষীদের কম আকৃষ্ট করে নি, এবং সংস্কৃত-আরবীর বন্ধন কাটিয়ে বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য গড়ে তোলার প্রেরণা যে তাঁরা পেয়েছিলেন রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী তান সাক্ষী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় পর্যন্তও এ-আশা অনেকটা ছিল যে, ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন-ইতিহাস

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই বাঙালী আয়ত্ত করবে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বহুল প্রচারে, যার ফলে শিক্ষিতের অর্থ দাঁড়িয়েছে ইংরেজী-ভাষায় পঠন-লিখনে সুশিক্ষিত। বাঙালী পণ্ডিত ইংরেজ-পূর্ব যুগে মনন-সাহিত্যের চর্চা করত সংস্কৃতে কি ফার্সী-আরবীতে, এখন করছে ইংরেজী ভাষায়। এর অস্বাভাবিকতা বাঙালীর ইংবেজীতে কাব্যরচনার চেষ্টার মত প্রকট নয়, এবং বাঙালীর চিন্তা ও তার প্রকাশের শক্তি যে এতে কত পঙ্ক হয়ে আছে তা ভেবে না দেখলে ক্ষমতাহীন হয় না, হুতরাং সহজেই চোখ ও মন এড়িয়ে যায়। এই অস্বাভাবিক অবস্থা বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ মনন-সাহিত্য গড়ে ওঠার প্রধান বাধা, আবার মাতৃভাষায় সে সাহিত্যের অভাব বাঙালীর মন-চেষ্টার ও তার সাহিত্যিক প্রকাশ-ক্ষমতার ক্ষুণ্ণতার প্রধান অন্তরায়।

৪

বাংলা ভাষায় যে আমরা মনন-সাহিত্য রচনা করছি নে তা নয়, কিন্তু তা করছি অল্পবিস্তর সৌধীন ভাবে। যখনই মনে করি বলার মত কিছু বলার আছে—ইতিহাসে হোক, ভাষাতত্ত্বে হোক, ধনবিজ্ঞান হোক, দর্শনে হোক—তখনই তার প্রকাশের বাহন করি ইংরেজী ভাষা; অবশ্য, প্রধান লক্ষ্য যে তা সাগর পেরিয়ে বা সাগরের এ-পারেই আমাদের বিদ্যাগুরুদের নজরে পড়ে, অথবা বলা যাক প্রকৃত সমাজ্যার বৃহত্তর বিশ্বজনসমাজে প্রচারিত হয়। এ-ভরসা রাখি নে যে, বিদ্যা ও চিন্তার জগতে দেবার মত যদি কিছু দিয়ে থাকি, আজ হোক কাল হোক এই বৃহত্তর পণ্ডিত সমাজ তার পরিচয় নিতে বাধ্য হবে।

কিন্তু প্রকৃত বিপদ এই যে, মাহুষের চিন্তা ভাষা-নিরপেক্ষ নয়, এবং সে-চিন্তা ভাষায় সাহিত্যিক রূপ নিয়ে প্রকাশ পেলেই স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য হয়। বিদ্যা ও চিন্তাকে সাহিত্যিক গড়ন দেওয়া নিজের মাতৃভাষায় ছাড়া বিদেশীর ভাষায় প্রায় অসম্ভব। ফলে ইংরেজী ভাষায় আমরা যে ইতিহাস, দর্শন, অর্থবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব রচনা করি তা সাহিত্য হয়ে ওঠে না—হয় সাহিত্যের কঙ্কাল, বিদেশী লেখকের রচিত সাহিত্যের ফুটনোটের উপাদান। এবং ভাব ও

চিন্তা প্রকাশের পরম উপযোগী অভিসমুদ্র এই বিদেশী ভাষায় মনন-চেষ্টা প্রকাশে সে দেশের চিন্তার কাঠামো থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা কঠিন। কতটা যে নিজের চিন্তা আর কতটা এই বিদেশী ভাষার মধ্যেই নিহিত তত্ত্ব ও ভঙ্গী—লেখকের কাছে তা সব সময় স্পষ্ট থাকে না।

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মনন-সাহিত্যের ঐকান্তিক চর্চা আমাদের চিন্তাকে কতদূর ভীক ও দুর্বল করেছে তার একটা উদারণ দিই। ইংরেজী কাব্য ও রসসাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ইউরোপের যে-কোনও অ-ইংরেজ জাতির চেয়ে অনেক বেশী। এই সাহিত্য আমাদের রসপিপাসা নিবৃত্তির এখনও বোধ হয় প্রধান উৎস। এ-সাহিত্যের বিচার, সমালোচনা, রসোদ্ধাটন করাসী করেছে, জার্মান করেছে, ইতালীয় করেছে, ইউরোপের অগ্র সব জাতি করেছে—আমরা করি নি। আমরা ইংরেজের ও অ-ইংরেজের সেই সব আলোচনা মাত্র পড়ে গেছি, অথচ আমরা একটা ভিন্ন জাতি; আমাদের মনের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ও রসোপলব্ধির ধারা ইউরোপীয়ের সঙ্গে নিশ্চয় সম্পূর্ণ এক নয়। আমাদের চোখে এই সাহিত্যের যথার্থ রূপটি কি ফুটে উঠেছে সে-কথা সাহস কঁরে কখনও বলতে চেষ্টা করি নি, অথচ আমাদের উপর এই সাহিত্যের প্রভাব যে কত, আমাদের নিজেকে আধুনিক রসসাহিত্যই তার প্রমাণ।

বাংলা ভাষার মনন-সাহিত্যকে বড় করতে হ'লে এ মানসিক ও সাহিত্যিক ভীকতাকে আমাদের মন থেকে দূর করতে হবে, আর এ-সাহিত্য গড়ে না উঠলে আমাদের চিন্তা ও প্রকাশের শক্তি কখনও যথার্থ মুক্তি ও বল পাবে না। বিষয়বস্তু যাই হোক নিজের মতে চিন্তা করবার সাহস এবং নিজের ভাষায় তা প্রকাশ করার সাহস আমাদের মনে আনতে হবে। আর এ সাহস কিছু দুঃসাহস নয়। ইউরোপীয় মনন-সাহিত্যের যারা মহাপ্রতিভাশালী লেখক নন, মাত্র শক্তিশালী লেখক, তাঁদের রচিত সাহিত্য পড়ে এ মনে হয় না যে বাঙালী শক্তিশালী লেখকের নিষ্ঠা ও চেষ্টার তা উপরে।

কিন্তু ‘অভিযোগ’ সাহিত্যের এক্ষেত্রেও হয়ত বৃথা। পারে এবং আর কোনও ভাষায় পারেনা পরিমিত শক্তিশালী হয়ত মনন-সাহিত্যের প্রতি বিভাগে প্রতিভার আবির্ভাবের লেখকদের চিত্ত তখনই বাংলা ভাষার দিকে মুখ ঘোরাবে যখন প্রতিভার সৃষ্টিতে বাংলা মনন-সাহিত্য বিদেশী পাঠকসমাজেও এখানেও বাঙালী বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করতে নিশ্চিত আসন পাবে, অর্থাৎ রেসপেক্টেবল হয়ে উঠবে।

ইউরোপ

ক্রীকালিদাস নাগ

[শ্রীরমা রলী করকমলেশু]

হোক মানুষ কালো, হলুদে, কটা, লাল, সাদা,
তার চামড়ার তলায় আছে একই রঙ, রক্ত-রাঙ।
বিখাতা গড়েন মানুষকে মূলত এক রেখে,
মানুষ কিন্তু করেছে ‘খোদার উপর খোদকারি,’
থেকে থেকে বলেছে : ‘তক্ষাৎ যাও ! তুমি আমি এক নয়’।
যুগে যুগে এটা দেখেছি—নজিরের অভাব নেই।
কিন্তু মৌলিক সত্যটার হ’ল কি ? গেল কোথায় ?
সেটা কি ছাল-চাপা পড়ে’ মারা যেতে পারে ?
কালো কটা হলুদে ছাল উপেক্ষা করে’
তরঙ্গে উঠল শাদা ছাল : ‘তক্ষাৎ যাও !
নোয়াও মাথা আমার পায়ের ; আমি বড়, আমি হুঁতু’।
বড়াইটা চলে আসছে কিছু কাল
সহে আসছে কালপুরুষও যেন ভয়ে ভয়ে।
তবু চোখ চেয়ে দেখা যাক শাদার দাবী
যেটুকু সাজা যাবে টিকে, মেকী পড়বে ঝরে।

অগ্নিপ্লাবনের হাপরে ফেলে
বিশ্বকর্মা পুড়িয়ে গলিয়ে গড়লেন পৃথিবীকে ;
তার স্মৃতি মানুষের নেই।
কৈচো গুলি মাছ পাখী পত্তর পর্যায় শেষ করে’
সৃষ্টিকর্তা মানুষকে দিলেন ডাক।

এল সে ভীক অসহায় জীব
বহু কষ্টে উঠল বেঁচে, বাড়ল ভেজ।
অগ্নিবর্ষণের পর তুহারপ্লাবনে পৃথিবী ফেটে চৌচির,
নতুন করে আবার ভাঙ গড়া
মহাসমুদ্র, সাগর, দেশ, মহাদেশ, ছাপিয়ে ভাসিয়ে—
‘দেখা দিল যেত দ্বীপ উত্তরে,
দক্ষিণে রইল কালো দ্বীপ, মাঝে ভূমধ্য সাগর।
যেত দ্বীপেব আদি মনু গড়ে তুললেন মৈনয়ে সভ্যতা
ক্রীট থেকে সীরিয়া মিশর পর্যন্ত উঠল জলে
রূপের দীপ্তি ভোগের আসবাব,
মাটির পায়ে ফুটল বেথা রঙের গলাগলি,
ভিত্তিগাত্রে সজীব ছবি,
গজদন্তে সোনা বলিয়ে উঠল নেচে প্রথম প্রকৃতি—
মাথায় মুকুট, হাতে নাগপাশ, মৈনয়ে মনসা।
দেবী দেখা দেন আবার কুমার নিয়ে কোলে
‘অর্ঘ্য নিয়ে সবাই আসে করতে পূজা
সন্তানের ভিতর দিয়ে চলে সমাজের বিস্তার
শাদায় কালোয় থাকে না ভেদ, কোন দ্বন্দ্ব।
হঠাৎ ছোট্টে মাইসিনী নারীর বাকা কটাক্ষ,
পূর্বে পশ্চিমে লাগে সর্ব্বনেশে রণ।
সংঘর্ষের সেই আদিপর্ব্ব
আজো খুঁজছে, শান্তিপর্ব্ব কোথায় ?

জোজান্ নারীর কান্না জাগে ইউরিপিডিসের নাটে,

কত ইরানী কত যবনী বহায় অশ্রু-বজ্রা,

দারৈয়ুস্ সেকেন্দরের কত স্বপ্ন

গড়ে ওঠে, পড়ে ভেঙ্গে

মেটোনা তবু পূব-পশ্চিম কালা-ধলার দ্বন্দ্ব !

ভাঙ্গা স্বপ্নের জের টেনে চলে রোমক রাজ্য,

চাকার তলায় পিষে যায় পিউনিক জাত ।

যথা কালে ধ্বংসে পড়ে রোমের জয়ন্তস্ত

কিন্তু রোমক বিধিব ভিতর পড়ে বাঁধা

তিনটে মহাদেশের মাল্লুষ,

গড়ে তোলে মাল্লুষে মাল্লুষে নতুন ঐক্যবোধ ।

যে জুডিয়া এসেছে রোম জালিয়ে পুড়িয়ে

তারই বুকের থেকে উৎলে ওঠে প্রেমের বাণী, রোমের

শ্রাশানে

ক্রুশে বিদ্ধ হতে হতে পূবের মাল্লুষ দেয় অমরত্বের সন্ধান

শান্তির মন্ত্র ; কিন্তু নেবে কে ?

ছন্দাড় করে নামে বর্ষের প্লাবন—

শাদা বর্ষেরতা পালিস্ করতে লাগে অনেক যুগ

মধ্যযুগে ক্রুজেন্-জেরাহদেব ভাঙ্গা গড়া . .

পূবে-বজ্রা ঠেলে এসে স্তম্ভিত হয় ইস্তাবুলে

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের ক্ষেত্র যায় বেড়ে .

পূবের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বেড়ে ওঠে পশ্চিমী সভ্যতা । .

শাদা নাবিক খুঁজছে পূবের পথ, ধনের পথ, রাজ্যের

পথ

তখন পূব সাগরে পড়ছে ভাঁটা ।

এল দীয়াস্, এল গামা, এল কলন্ ডেস্‌পিউসি—

সোনার ভাবত হীরের ভারত চাই ! কোথায় পথ ?

মহাসাগর মহাদেশ পরিক্রমার শেষে . .

চোখে পড়ে নতুন পৃথিবী,

লাল চামড়ার মাল্লুষ প্রথম দেখে শাদা মাল্লুষ ;

শাদার হাত রক্তে হ'ল রাঙা ।

ক্রুশের নরদেবতা কি আর্জনাৎ করেন নি ?

কিন্তু তনুবে কে ? শাদার চোখে কিসের নেশ ?

ধর্মের না রক্তের ?

সারা সাগরের জলে খোয়া যায় কি অত রক্ত ?

অসীম সাহস অগাধ অহমিকা রূপ ধরে' ওঠে

নব নব ষেত সাম্রাজ্যে ।

রোমক সাম্রাজ্যও বুঝি হার মানে ।

উত্তর দক্ষিণ আমেরিকায় ওড়ে বিজয় কেতন ।

লাল-চামড়াদের প্রায় শেষ করে' পড়ে কালো চামড়ার দেশে

শাদা মাল্লুষ, করে কালনেমির লঙ্কাভাগ আফ্রিকার বুকে,

সিংহল ভারতও বাদ পড়ে না ।

তবু ঢাকা যায় না কালের বিকট চাপা হাসি,

সভ্যতার শাদা মুখোস যায় খসে,

বেরিয়ে আসে আসল মূখ—

কে কতটা কামড়ে ছিড়বে গিল্বে,

এই নিয়ে লাগে 'মহাযুদ্ধ' !

সভ্যতার দুর্বলতা এড়িয়ে সহজ বর্ষের ছাড়ে হুকার,

রক্তবস্ত্রায় বিষবাম্পে দিগ্বিদিক যায় ডুবে ।

জ্ঞায় সত্য শাস্তি মিথ্যা, মৈত্রী মিথ্যা—

নতুন ধর্মতত্ত্ব শোনায শাদা মাল্লুষ,

মরতে মরতে, মারতে মারতে, হিংসা ধর্মের অবদান ।

হায় শাদা মাল্লুষ !

মনের তেজ তোমার অসীম, হাতের শক্তি অপূর্ণ,

তারিফ করি তোমায় ।

কিন্তু প্রাণ কোথায় তোমার ?

খুঁজছে কি ? পেয়েছ কি ?

হয়ত দিয়েছ 'সোনা কেলে আঁচলে গেরো',

হয়ত সয়েছে অনেক অত্যাচার

তোমার অনেক বছরের উদ্দাম যৌবন ।

কিন্তু রক্তের স্রোতেও ভাঁটা পড়ে,

মধ্যাহ্নের পর নামে সন্ধ্যার অন্ধকার ।

কি নিয়ে জাগবে তার মধ্যে ?

কোন অলখ দৃষ্টি ? কোন অতকিত শাস্তি ?

তোমার পিথাগোরাস্ সজ্জেটিন্‌ প্লেটো দাস্তে রুসো

শিখিয়েছে তোমায় অনেক কথা, দিয়েছে সাধন-সঙ্কেত,

বলেছে তোমায় : "আত্মা অমর, নিজেকে জান, স্বর্গ

আন ধরায়

পৃথিবীকে তোলা স্বর্গে, মানুষকে জ্ঞান জীবন্ত
দেবতা—
সব মানুষ এক—” এমন কত বাণী
অমর হয়ে আছে তোমার গ্রন্থে, শাদা মানুষ !
কবে তারা সত্য হবে তোমার রক্তে, তোমার প্রাণে ?
লাল মানুষকে প্রায় তুমি করেছ শেষ,
কালো মানুষকে করেছ ক্রীতদাস,
হলুদে মানুষদের করতে চাও প্রাস—
মুখে বল ‘শাদাব দারিছ বিয়ম’—
কাজে দেখাও শাদার ক্ষুধা অপরিণীম ।
ইতিহাসে ও জীবনে, বাক্যে ও সাধনায়

এই ব্যবধান, এ উৎকর্ষ ভেদ,—
কোথায় গেলে নিয়ে চলেছে তোমায় ?
দৃষ্ট তেজ্ঞ এখনও আছে মাথা উচু
কিন্তু বুকেব ভিতব জাগছে না কি ভয় ?
সত্য ও মানবত্ব হয়েছে সাক্ষিত, ধর্ম বিকৃত,
এতটা সহিবে কি ইতিহাস ?
বিধাতার ধৈর্য ও ক্ষমা কি অসীম ?
এ প্রশ্নেব জবাব তুমি অ-মি হয়ত পেয়ে যাব না ।
কিন্তু পাবে ভবিষ্যতের উৎকর্ষিত মহামানব,
যদি থাকে শাদা কালো হলুদে ছাপমারা চামড়ার উপরে
চিরন্তন একো গাঁথা চিরকালের মানুষ ।

বেকার-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, ব্যারিষ্টার-এফ-ল

শিক্ষিত যুব-বেকারের সমস্যা এক্ষণে কেবল আমাদের দেশে
নহে ইউরোপেব প্রধান দেশগুলিতেও জাগ্রত হইয়াছে ও
কর্ষণক্ষের দৃষ্টিও বিশেষ আকর্ষণ করিয়াছে । দেখা যায়,
লীগ অব নেশন্স বা জাতিসঙ্ঘ এই সমস্যা সমাধানের
জন্ত যথেষ্ট চেষ্টিত হইয়াছেন ও উহার নেতৃত্বে ইউরোপের
বিভিন্ন দেশের কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে অবহিত হইয়াছেন ।
যাহা হউক, ইউরোপের বিষয় আলোচনা করা আমার এখানে
উদ্দেশ্য নহে, এ বিষয়ে ভারতে, এবং বিশেষ করিয়া বাংলা
দেশে কি হইতেছে তাহার বিষয় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা
করা যাউক ।

আমাদের দেশে শিক্ষিত যুব-বেকারসমস্যা যে কেবল
অর্থনীতির দিক দিয়া এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে,
ইহা এক রাজনীতিক সমস্যারূপেও দাঁড়াইয়াছে । গত কয়েক
বৎসরে শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে
তাহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ
হইয়া জীবিকাার্জনের সম্ভাবনা হইয়া থাকে । যে অর্থ ও

সামর্থ্য ব্যয়ের দ্বারা জীবনের প্রেক্ষাগণ বিজ্ঞানকে কাটিয়া যায়,
তাহার পর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যদি সামান্য
জরাজীর্ণের উপযুক্ত অর্থ উপার্জনেন সম্ভাবনা না থাকে
তাহা হইলে তাহাদের মনে বিরূপ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার তাব
জাগ্রত হয়, তাহা সহজেই অহমেয় । অবশ্য, বেকার-সমস্যা
চিরদিনই ছিল ও থাকিবেও, কিন্তু ইহা এক্ষণে যেরূপ আকার
ধারণ করিয়াছে তাহা অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় । শিক্ষিত
বেকার যুবকদের এই নিবাস ও ব্যর্থ মনোভাবের সুযোগ
নইয়া যে সকল লোক তাহাদিগকে রাজনীতিক
উদ্দেশ্যে বিপথগামী করিয়াছে তাহার দ্বারা কেবল যে
শব্দগোষ্ঠের তাহা নহে, সমাজেরও বিশেষ ক্ষতিসাধন
হইয়াছে ও হইবাবও যে সম্ভাবনা, তৎপ্রতি দেশের অনেক
নেতাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিবার
চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহার ফলও এখন ফলিতে
আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া আশান্বিত হওয়া যায় যে
অল্পকালের মধ্যে উক্ত সমস্যার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস

হইবে। এই ব্যাপারে এক্ষণে যে সকল চেষ্টা আমাদের দেশে আরম্ভ হইয়াছে তাহার বিষয় অল্পবিস্তর অনেকেই অবগত আছেন।

দেখা যায়, এবিষয়ে গবন্মেণ্ট কর্তৃপক্ষ প্রথমে অবহিত হইয়া যে চেষ্টা গত তিন-চারি বৎসর যাবৎ আরম্ভ করিয়াছেন তাহা কার্যকরী হইয়াছে এবং স্বল্পলব্ধ উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩২ সালের জাহুয়ারী মাসে কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় প্রথম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে সভ্যদিগকে যুবক বেকাররা যাহাতে বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য বহু ব্যয়সাধনিক না-হয় এরূপ কোন উপায় দ্বারা গবন্মেণ্ট তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহার স্বীকৃতি উদ্ভাবন করিতে আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া যে স্বীকৃতি উপস্থিত করেন তাহাই কিছু কিছু সংশোধন করিয়া গবন্মেণ্ট গ্রহণ করেন ও কার্যে পরিণত করেন।

গবন্মেণ্টের শিল্পবিভাগ অনেক দিন হইতেই পরীক্ষা ও বিবেচনা করিতেছিলেন কি ভাবে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতি সাধন করা যায়। ইহার জন্য কর্তৃপক্ষ দেখেন যে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও উৎপন্ন দ্রব্যগুলি যাহাতে অল্প ব্যয়ে হয়—ইহার দ্বারাই উহা সম্ভব। ইহাতে দেখা যায় যে, এই সকল শিল্পের উক্ত উন্নত প্রণালীতে সাহায্যে উন্নতি করিতে হইলে আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকদের কর্মলাভের সুযোগ হইতে পাবে। কারণ, দেশে যে-সকল বড় বড় কলকারখানা আছে তাহাতে যত যুবক নিযুক্ত হইতে পারে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক যুবকের কর্মলাভের সম্ভাবনা, যেহেতু এই ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসার ও বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই সকল শিল্প স্থানীয় ও ইহার উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বোল আনা স্থানীয়, এবং এগুলি জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের সহিত পৃক্ষ-পরম্পরা যোগযুক্ত হওয়ায় লোকেব নিকট ইহার যে আদর আছে তাহাই ইহার রক্ষাকবচ। কিন্তু এককাল এই শিল্প-গুলি যে উপায়ের দ্বারা চালিত হইয়া আসিয়াছে তাহার আধুনিক উপায়ে উন্নতি হইলে ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্র যুবকদের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অধিক হয়। এই জন্য গবন্মেণ্টের শিল্পবিভাগ এক্ষণে ভদ্র যুবকদের নানা কুটীর-

শিল্পে আধুনিক শিক্ষা দিয়া থাকেন। গবন্মেণ্ট টেকনিক্যাল স্কুলগুলিতে ও বিভিন্ন কেন্দ্রে উপযুক্ত শিক্ষক পাঠাইয়া নানা রূপে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্য ব্যাপদেশে গবন্মেণ্ট প্রথম বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন।

যাহাতে গবন্মেণ্টের উক্ত কার্য ঠিক ভাবে চলিতে পারে ও লোকের বিশ্বাস উৎপাদন হয় তাহাব জন্য প্রত্যেক জেলায় তত্ত্বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া শিল্প-সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-গুলিও আহূত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষার দ্বারা ইতিমধ্যেই স্বল্পলব্ধ দেখা দিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষান্তিরীতে কার্য লাভ করিতেছে, আবার নিজেরাও ছোট ছোট কাবখানা খুলিয়াছে। এই কারখানাগুলিতে আবার অল্পরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা কার্য লাভ করিতেছে।

যাহাতে উক্তরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা অধিকতর সংখ্যায় কলকারখানা খুলিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্য মূলধন সরবরাহেরও এক পরিকল্পনা গবন্মেণ্ট করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ অধিবেশনে কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় লোকের জ্ঞাতার্থে উক্ত পরিকল্পনার এক বিস্তৃত বিবরণ দান করেন। গবন্মেণ্ট স্থির করিয়াছেন উক্তরূপ ঋণদানের জন্য একটি লিমিটেড সোসাইটি স্থাপন করিবেন যাহার গ্যারান্টি-স্বরূপ গবন্মেণ্ট অনেক টাকা দান করিবেন। ইহার দ্বারা যুববেকারসমস্তাব কিছু সমাধান হইতে পারে।

দেশের উক্ত সমস্তায় কেবল যে গবন্মেণ্টেরই সকল দায়িত্ব আছে একথা ভাবা ভুল হইবে। যে বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এত যুবকের শিক্ষাদাতা ও অভিভাবকস্বরূপ কার্য করেন তাহারও যে কেবল শিক্ষা দিয়া নহে, যাহাতে উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে তাহার ব্যবস্থা বা উপায় উদ্ভাবন করারও এক দায়িত্ব আছে। সুখের বিষয় তাহার ব্যবস্থা এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে প্রথম যুক্তপ্রদেশের গবন্মেণ্ট যে সপ্ত-অল্পসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত করেন তাহার সুপারিশ মত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় নানা উপায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখানে ইহার বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যকতা নাই। তবে ইহা লক্ষ্যের বিষয়।

যে, উক্ত কমিটি বাংলা গবর্নমেন্টের উপরিউক্ত স্কীমের প্রণয় ও সুপারিশ করিয়াছেন।

ইহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এ-বিষয়ে যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সংক্ষেপে এইরূপ—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দুই বৎসরের জন্য পরীক্ষাধীনভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে নির্দিষ্টসংখ্যক যুবক ব্যবসাদি সংক্রান্ত শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। ব্যবসাদি বিষয়ের তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য যেমন এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারের ব্যবস্থা থাকিবে, তেমনই অন্য দিকে যাহাতে উক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা হাতেকলমে ব্যবসাদি পরিচালনার বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে তাহাব ব্যবস্থা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্টের সহিত আলাপ করিয়া ঠিক করা হইয়াছে। বড় বড় ইংবেজ ব্যবসায়ীরা যাহাতে উক্ত যুবকদের ব্যবসাদি শিক্ষার সুযোগ দেন তাহাব ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এ-বিষয়ে যাহাতে দেশীয় ব্যবসায়ীরাও উক্ত যুবকদিগকে ব্যবসাদি হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ দেন তাহার চেষ্টাও হইতেছে। যে সকল মনোনীত যুবক উক্তরূপ শিক্ষার জন্য গৃহীত হইবে তাহাদিগকে শিক্ষাকালীন মাসে ৩০ টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ব্যাপার পরিচালনের জন্য যে আপিস ও লোকজন রাখিতে হইবে তাহার জন্য ও উক্ত বৃত্তি বাবদে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাব করিয়াছেন যে দুই বৎসবে ৩৬,০০০ টাকা ব্যয় হইবে, এবং এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজার্ভ ফণ্ড হইতে ব্যয়িত হইবে ঠিক হইয়াছে।

অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত স্কীম সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে, সে-বিষয়ে বিবেচনা করার এখানে আবশ্যকতা নাই, যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গল; কিন্তু একথা বলিতে হইবে যে এতকাল পবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যে উক্ত গুরুতর বিষয়ে একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সুখের বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই ভাবে যদি বাস্তবিকই যুবকদের কিছু উপকারও সাধন কবিতে পারেন ত তাহাদের কর্তব্য কথঞ্চিৎ পালিত হয়।

সুখের বিষয়, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষও এ-বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তাহারা এ-বিষয়ে যে অনুসন্ধান করিতেছেন

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার বিগদ বিবরণ প্রকাশিত না হওয়ায় এ-বিষয়ে অধিক জানিবার উপায় নাই। অবশ্য, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসেবও যে এ-বিষয়ে বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে তাহা অধিক বলা বাহুল্য মাত্র, এবং এ-বিষয়ে যদি তাহারা কিছু কার্যকর উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন ত মঙ্গলের বিষয়ই হইবে।

উক্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে জনসাধারণেরও যে এক বিশেষ কর্তব্য আছে একথা ভুলিলে চলিবে না। কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশেব জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি এক স্থানীয় বক্তৃতায় জনসাধারণের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন দেশের যে-সকল ব্যক্তি চাকুরী প্রভৃতি করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন তাহারা তাহর কিছু অংশ দান করুন ও তাহা দ্বারা একটি ফণ্ড করিয়া বেকার যুবকরা যাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে স্থল প্রভৃতি প্রতিলিপিত করুন। অবশ্য ইহা জনসাধারণের উৎসাহের বিষয় না হইয়া থাকিলেও, এ সবল বা অল্পরূপ বিষয়ে লোকের বিশেষ চিন্তা করিবার আছে। এই সকল বিষয় যতই আলোচিত হয় এবং লোকেও যতই চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

উপরে গবর্নমেন্ট প্রভৃতির বেকার-সমস্যা সমাধানের যে-সকল পরিকল্পনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা যে দোষশূন্য বা সর্বোৎকৃষ্ট একথা কেহ বলেন না। গবর্নমেন্ট কর্তৃপক্ষ যাহাতে তাহাদের চেষ্টার দ্বারা ঠিক ও অধিকতর ভাবে যুবকদের সাহায্য হইতে পারে তদ্বিষয়ে আরও পরামর্শ দিবার জন্য ক্রিয়া হইতে বিশেষরূপে আনাইয়াছেন। ইহারা বিশেষী বলিয়া ইহাদের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন দেশের প্রকৃত বা ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে না জানায় জনহিতবী দেশীয় ব্যক্তিমাজেরই উচিত এ-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কর্তৃপক্ষের যে সকল ব্যবস্থা দোষযুক্ত তাহা প্রাশ্ন করা ও যাহাতে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে তাহার উপদেশ বা পরামর্শও দেওয়া। বাস্তবিক যদি এইরূপ দেশপ্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত বিষয়ে আলোচনা চলে ত দেশের ও দেশের প্রকৃতই মঙ্গল হয়।

আমি

শ্রীসঙ্কনীকান্ত দাস

প্রতিদিন আকাশের চেয়েছি বারতা,
মাটির আঁধার হ'তে বিষ-বাষ্প দিয়েছে উত্তর।
মোর শান্ত মুহূর্তের অন্তরের সহজ কামনা—
উদার পরিধি আর অনন্ত বিস্তার,

• • আলোকের প্রসার বিপুল—

উত্তেজিত মুহূর্তের মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চক্রবাহে
কুণ্ডলিত সর্পসম পাকে পাকে জড়িয়ে জড়িয়ে
ফুঁসিয়াছে জীর্ণ ক্ষুদ্র আপন বিবরে ;
বৃহতে করেছে ক্ষুদ্র, সীমাহীনে দিয়াছে সীমানা,
অপ্রচুরী চূড়া মোর নিমেষে করেছে ধূলিসাৎ।

কে আমি, কি মোর পরিচয়—

এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব বারবার পাসরি পাসরি
ভালমনে গড়া আমি মোর বিধে পেয়েছি প্রকাশ।
কেহ করিয়াছে ঘৃণা, কেহ মোরে বাসিয়াছে ভাল,
কেহ আসিয়াছে কাছে, দূরে কেহ করে পরিহার—
তাহাদের ঘৃণা আর ভালবাসা, রূপ, বস, রঙ
আমাবে করেছে স্রষ্টা, সেই আমি সংসারের জীব ;
সত্য পরিচয় মোর গোপন রহিয়া গেল, হবে না প্রকাশ
কোন দিন।

জীবনের দুঃখ শোক লান্ধনা ও অপমান মাঝে

এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—

মহতের বৃহত্তের প্রতিদিন কবির স্বীকার।
দ্বিধা আছে, দ্বন্দ্ব আছে, ভুল ভ্রান্তি স্বপ্ন, পতন—
আছে লোভ বীভৎস, কুৎসিত ;
আছে ক্ষুধা, আছে ক্ষোভ, বেদনার বারে-অশ্রুজল।
সমস্ত ক্ষুদ্রতা ক্ষোভ অসহ-যন্ত্রণা দুঃখ মাঝে—
প্রতিদিবসের অতি বার্থ শূন্য নিরর্থক কাজে
মাথার উপরে স্থির স্তব্ধ শূন্য অনন্ত আকাশ,

দীর্ঘ বনস্পতি শিরে নবশ্রাম কচি কিশলয়,
নামহীন পাখীদের গান,
নিভৃত অন্তর মাঝে ক্ষণে ক্ষণে গেয়ে-ওঠা ব্যক্তিদের
অসম্পূর্ণ গান,

হঠাৎ কাঁপিয়া-জাগা স্বপ্ন।

হঠাৎ ভাঙিয়া-পড়া বন্ধুত্বের প্রণয়ের উজ্জ্বল প্রচুর,
নিজে বেশ ভাল আছি, অকস্মাৎ বুঝিয়া বিশ্বাসে
নিপীড়িত দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে দুই চক্ষে ছল ছল জল—
যতই ক্ষুদ্রতা থাক, যত আমি বার্থ হই, বৃহত্তে বিরীটে
নমস্কার,

নমঃ শূন্য নীলাকাশ,

নমো নমো নমঃ হিমালয়,

মাছঘের ভগবানে প্রণমিয়া মাছঘেরে করি নমস্কার।

উজ্জ্বল শূন্য নীলাকাশ

বারবার তবু ভুল হই—

ঘরের কপাট কখি, বাহিরের কখিয়া বাঁতাস
আপনার বিষ-বাষ্পে আচন্নিতে হাঁপাইয়া উঠি ;
মর্মভেদী নিঃস্বতায় আত্মীয়েরে করি উৎপীড়ন,
রুঢ় কহি প্রিয় বন্ধুজনে—
বিকৃত বীভৎস রূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ—
আপনি শিহরি উঠি নিজেই প্রত্যক্ষ করি মনের মুকুরে।

কারে কহি, কারে বা বুঝাই,

মোর মুষ্টি সত্য এ তো নহে—

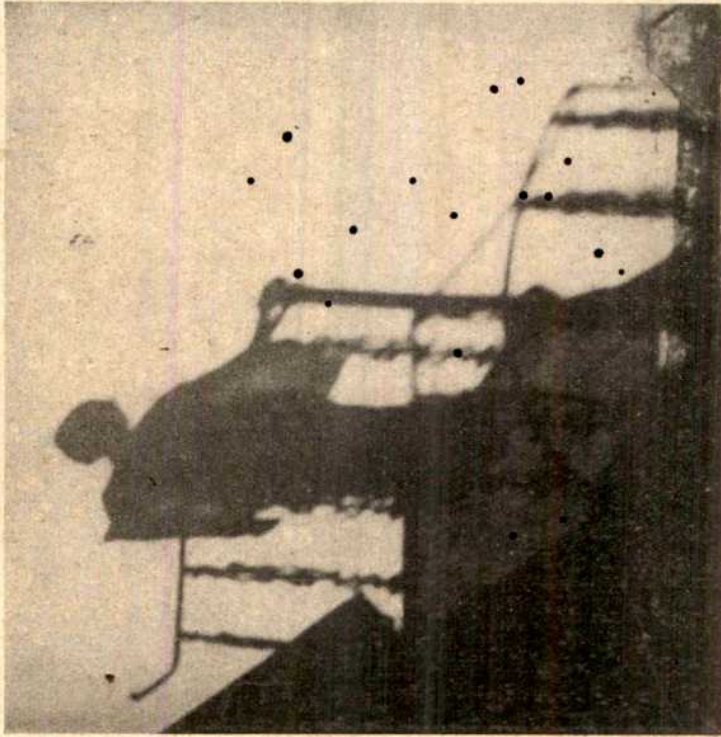
সে তো নহি আমি।

পীড়িতের ব্যথিতের যন্ত্রণায় মধ্যরাত্রে একা জাগি আমি,
একা গাহি গান—

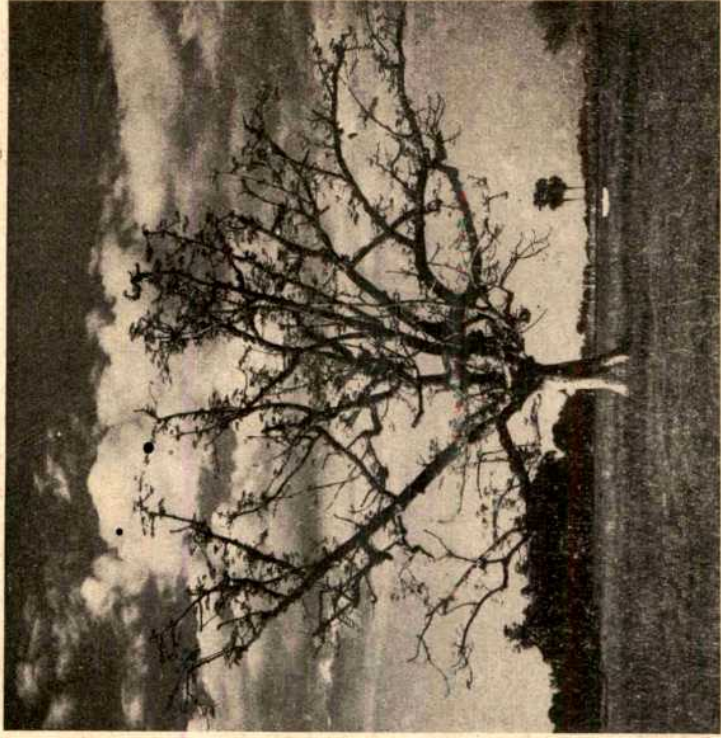
কেহ মোরে দেখিল না, বুঝিল না গান কি যে বলে—

অর্থ তার গুপ্ত রহে স্বর আর ছন্দের আধারে,

আমি—মোর নামের আড়ালে ;

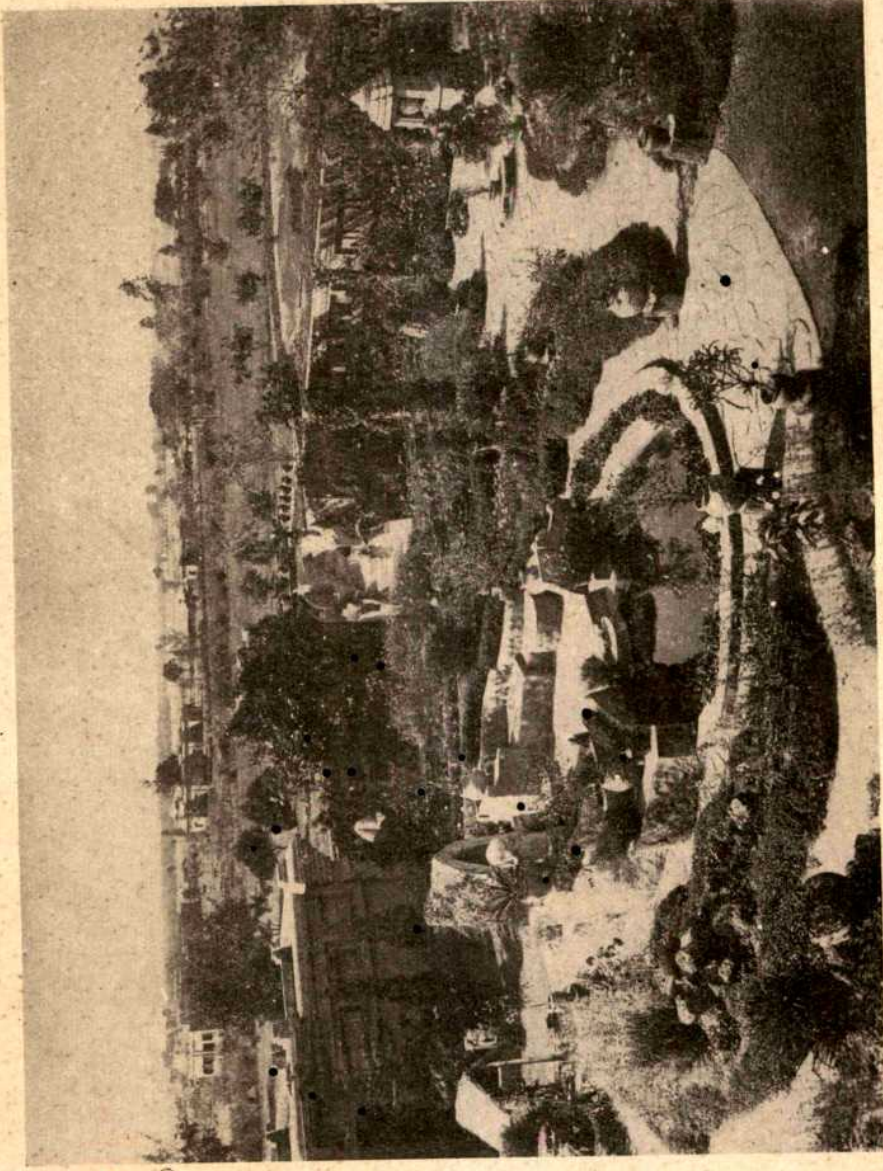


ছায়ার মাত্র



একা

ত্বীপরিমল গোপ্যমী কর্তৃক গৃহীত চিত্র



শান্তিনিকেতনে উত্তরাধ্বের উজান

নাম সে'মরিয়া যাবে, উদার নিঃসীম শৃঙ্গে আমি তব
রহিব জাগিয়া ।

বন্ধু, শোন তোমাদের বলি,
অনন্ত আমার এই চোখে-দেখা খণ্ড ইতিহাস
যতটুকু আমি তার জানি—
আকাশে খসিছে তারা, নদীতটে ভেঙে পড়ে ঢেউ
ছায়া কভু পড়ে না-ক শুভ্র স্বচ্ছ আকাশের নীলে,
দাগ কভু পড়ে নাই টলমল বারিধির বুকে ;
সে বিরাট শৃঙ্খলায় আমি পরিচয়হীন তোমাদের কাছে ;
তোমরাও নহ প্রয়োজন ।
সেখানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমুক ইতিহাস মোর ।

শৃঙ্খলায় রোজ করে মায়া'র স্বজন
রূপে রঙে তাহার বিকাশ—
মাল্লবের রঙ দেয় রূপ দেয় শুধু ভালবাসা,
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে একমাত্র মায়া-বাহু কর ।

আমি ভালবাসার কাড়াল—
আমারে ডাকিয়া কাছে আমারে নির্মাণ করি লও
ক্ষণিকের আলোকসম্পাতে—
তোমাদের প্রেমের আলোকে ।
দেহহীন মাল্লবেরা নিরালস্য ভাসিছে অসীমে
পরম্পর পরিচয়হীন—
যার যত ভালবাসা তার কাছে ততই প্রকাশ ।
বিশ্ব তার ভরে ওঠে রূপের গৌরবে,
প্রেমের রহস্তে ঘেরা এ-বিশ্বের পরিধি বিপুল—
আমারে তোমরা দাও প্রেম,
রূপ দাও, দেহ দাও মোরে ।

সমস্ত বেদনা-বিশ্ব এ-জীবনে করিয়া মস্তন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে গড়িয়া তুলিতে ;
মুছে-বাওয়া শৃঙ্খলায় রূপহীন মাল্লবের আর কোনো নাহি
পরিচয় ।

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ

শ্রীকিরণবালা সেন

পৌষের উৎসব এবারকার মত সাদৃশ্য হয়েছে । মনে পড়ে প্রথম
যেবার এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম সেদিনকার কথা ।
সেদিন ভোরে যে-গানটি শুনেছিলাম আর সেদিনকার সব
মিলিয়ে যে একটি আনন্দ পেয়েছিলাম তাই মনে পড়ে ।

মোরে ডাকি লয়ে বাও মুক্ত ছায়ে
তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ।

এই গানটি সেদিন ভোরে যে শুনেছিলাম তার স্মৃতি
যেন আজও কানে লেগে আছে ।

এ-উৎসবটি আশ্রমের প্রধান উৎসব । মহর্ষিদেবের
দীক্ষার দিন থেকে এই উৎসবের আরম্ভ । ৭ই পৌষে এই
উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর এখানে মেলা হয় । এই মেলা
আজকাল পুরো তিনটি দিন থাকে । চারদিকের গ্রাম
থেকে কত লোক এসে তখন এখানে জড়ো হয় । এই দিনটির
কথা 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে গুরুদেব [রবীন্দ্রনাথ] এক জায়গায়
বলেছেন,

“সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে, তাঁর
দীক্ষার দিনটিকে, এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশে ও নির্মল



বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের অভিভাষণ



বিশ্বভারতী পরিষদের অধিবেশন, ৯ই পৌষ, ১৩৪৩

[শ্রীস্বধীররঞ্জন খাস্তগীর কর্তৃক গৃহীত চিত্র]

আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটার চারদিকে এই মন্দির এই আশ্রম এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠেছে। আমাদের জীবন, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের চেতনা একে বেঁধে ধরে দাঁড়িয়েছে। এই দিনটির আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে এবং তাঁর সেই সত্য দীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মুর্থকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে।

এবারও এই উৎসবে কত আনন্দ। বন্ধুবান্ধব, কত অতিথি-অভাগত, আত্মীয়স্বজন নিয়ে আনন্দে এই দিন কয়টি আমাদের কেটেছে। উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ যে ভগবদর্চনা তাও সুসম্পন্ন হয়েছে। তাই সকলের মনেই একটি তৃপ্তির ভাব। গুরুদেব এবারও মন্দিরে যা বলেছেন তা সকলের মনকে পূর্ণ করেছে।

উৎসব আসবার পূর্বেরও একটি আনন্দ আছে। বৎসারান্তে ৭ই পৌষের উৎসব যখন আবার আসতে থাকে তখন আশ্রমে যে তার একটি সাড়া পড়ে যায় তার মধ্যেও আনন্দ আছে। কন্ঠীদের মধ্যে আলোচনা-বৈঠক বসে, কোথাও বা গানের অভ্যাস চলে,—উৎসবটিকে সুসম্পন্ন করবার জন্তে নানা আয়োজন চলতে থাকে।

এই উপলক্ষে আশ্রমের ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে একটি আনন্দ-উৎসাহ দেখা যায় সেটিও দেখবার জিনিষ। উৎসবের এও যেন একটি অঙ্গ। মেলার জায়গার সব ব্যবস্থা হচ্ছে, নানা সরঞ্জাম আসছে, এসব

দেখে তাদের কত আনন্দ। উৎসব আসছে বলে এক দিকে শিশুরা উল্লসিত, অল্প দিকে বড়দের মধ্যেও একটি প্রতীক্ষার ভাব। উৎসবের সব আয়োজনের মধ্যে সেদিন মন্দিরের উপদেশ শুনতে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সকলের উপরে। গুরুদেব দেশে থাকলে প্রতিবৎসর এই দিনে তিনি মন্দিরে বলেন। দূরে যারা আছেন তাঁরাও এই দিনটিতে গুরুদেব মন্দিরে কি বলেন সেটা শুনতে পাওয়া যাবে বলে উৎসুক হয়ে থাকেন। শুধু এই জগতই কত অতিথি এই দিনে এখানে আসেন।

কিন্তু এবারে উৎসবের আগে একদিন গুরুদেব যখন বড় ক্লাস্ত হয়েছিলেন তখন বলছিলেন যে কিছুক্ষণ অন্ততঃ চুপ করে থাকার যে একটা শাস্তি আছে, সেটা তিনি পাচ্ছেন না। বললেন, “ক্রমাগত লোকের ভীড়, কাজেরও অন্ত নেই। আজ দশ মিনিটও যেন একজন্মে চুপ করে থাকতে পারি নি।” উৎসব কাছে এসে পড়েছে; বললেন, “মন্দিরে আর বলতে ইচ্ছে করে না। ক্লাস্তির জগতই যে শুধু, তা নয়। একটা বয়স আছে যখন থামা দরকার। এই বয়সের একটি পাওয়া আছে, সেই পাওয়ার মধ্যে এই সময়ে সব বলা সব কথার শেষ হওয়া উচিত।”

বললেন, “আমার পিতৃদেবও একটা বয়সে মন্দিরে বলা থামিয়েছিলেন। বোধ হয় আমারও এখন সেই বয়স।



“আমাদের শান্তিনিকেতন” সঙ্গীত করিয়া পূর্বতন
ছাত্রছাত্রীদের অংশম-প্রদর্শন



৭ই পৌষের উৎসবে শান্তিনিকেতনের পূর্বতন
ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক সম্মিলন, ১৩৪৩

[শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত চিত্র]

তার পূর্বে তিনি নিয়মমত মন্দিরে উপদেশ দিতেন। অনেক দিন তা বন্ধ ছিল। বহুকাল পরে প্রবাস থেকে ফিরে এসে একদিন উপনিষদের ব্যাখ্যা করেন, সেই বারই আমি তাঁর উপদেশ প্রথম শুনি, তার পূর্বে কোন দিন শুনি নি।”

রাত্রিশেষে গুরুদেব অন্ধকার থাকতে উঠে বাইরে এসে বসে থাকেন। অনেক দিন থেকে তাঁর এই অভ্যাস। তিনি বলেন, এই সময়ে গভীর একটি শান্তি সমস্ত চিত্তে তিনি অনুভব করেন। এই সময়টির কথা ‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থের কত জায়গায় গুরুদেব লিখেছেন, যেমন,

“এই ব্রাহ্মমুহুর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা! বাগানের সমস্ত পাখী জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না, শালবনের মর্ম্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তরে হাওয়া ছরস্তু হয়ে উঠলেও এই শান্তিকে স্পর্শ করতে পারে না।”

‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থের উপদেশগুলি যখন লেখা হয় তখন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে প্রতিদিন মন্দিরে গুরুদেব বলতেন। অনেকেই সে-সময়ে সেখানে একত্র হ’তেন। কি আগ্রহ নিয়ে সকলে শুনতে যেতেন তা দেখেছি। এই অমূল্য সুযোগের কয়েকটি দিন পাবার সৌভাগ্য আমারও হয়েছিল। তখন শীতকাল। তিনি যখন বলতে আরম্ভ করতেন তখন এমন অন্ধকার থাকত যে পরস্পরকে চেনা যেত না। যখন শেষ হ’ত তখন সবে সূর্যোদয় হয়েছিল। আর সেই আলো সমস্ত গাছপালা ফুলের উপর পড়ে

আশ্রমের সুন্দর একটি রূপ ফুটে উঠেছে। তখন আশ্রমে প্রচুর গোলাপ ফুটত মনে আছে।

কিছুদিন পূর্বে পর্যন্তও প্রতি বুধবার গুরুদেব মন্দিরে বলতেন। মন্দিরে বলবার মধ্যে তাঁর অহুভূতির গভীরতা ও আনন্দ বোঝা যায়। ভোরের আলোতে সমস্ত প্রকৃতি তাঁর কাছে আনন্দরূপে প্রকাশিত হয়। গুরুদেবের বলায় আর তাঁর গানে সেই আনন্দের উপলব্ধি অপূর্বভাবে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়। এক এক সময়ে অহরূপ গান নিজেই



রবীন্দ্রনাথ, উৎসবাস্ত্রে নবনির্মিত গৃহের সম্মুখে

[শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত চিত্র]

করেন বা মন্দিরের গানে যোগ দেন। মনের আনন্দে দরদে সেই গানের সুরে যা প্রকাশ হয়, কথায় তা হয় না। কত গান এমন বলার মাঝে মাঝে তিনি গেয়েছেন; এই রকম একটি গানের কথা এখন মনে হচ্ছে :

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুরা পরশে।

গুরুদেব এবার বলেছিলেন, তাঁর বলবার ক্ষমতা কমে গিয়েছে কিন্তু এই ত উৎসব শেষ হ'ল। সকলের যে জন্ত প্রতীক্ষা ছিল তা সফল হয়েছে। মন্দিরে এবারেও তিনি যা বলেছেন তার গভীরতা ও আনন্দ অপরিমেয়।

সেদিন তাঁর বলায় আর সব গানে এমন একটি সামঞ্জস্য ছিল যে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজেও সেদিন যে-গানটি পেয়েছিলেন সেটির সুরের আর ভাবের তুলনা নেই :

বিমল আনন্দে জাগো রে মগন হও স্বধাসাগরে।

এই গানটি সকলের চিত্ত পূর্ণ করে রয়েছে।

এই সঙ্গেই মনে পড়ছে যখন পাশাপাশি বাড়ীতে থাকতাম, তখন কত দিন শুনেছি জ্ঞানের সময়ে গুরুদেব “শান্তম্ শিবম্ অৰ্ঘ্যতম্” মন্ত্রটি সুরে গাইছেন। আর সেই সুরে সমস্ত আশ্রম তখন মুখরিত হয়ে উঠত।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী শ্রীমা নেহরু



শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্তী

শ্রীমতী উমা নেহরু যুক্তপ্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ দেশ সেবিকা। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নব-নির্বাচনে বাবু ব্রজনারায়ণ রাওকে ১২,০০০ ভোটে পরাজিত করিয়া তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন।



মং রাজা শ্রীমতী নাহুমা

শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্তী গত বৎসর স্কটিশ চার্ট কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন ও ট্রশান-বৃত্তি লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু স্বর্ণ-পদক (কেশবচন্দ্র সেন, গঙ্গামণি



শ্রীমতী এস্ এল্ খাস্তগীর



বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিলা-পত্নিদের কাকশিল্পপ্রদর্শনী

দেবী, রমা; হেমন্তকুমার, পদ্মাবতী স্মৃতি পদক), রোপ্য-পদক (প্রভাবতী দেবী, শান্তমণি স্মৃতিপদক) ও বহু পুরস্কার (উইলিয়ম স্মিথ, কেশবচন্দ্র পুরস্কার) ও জুবিলি পোষ্ট গ্র্যাঞ্জুয়েট বৃত্তি লাভ করেন।

পার্কীতে চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমার মাণিকচাঁদীতে মং সম্প্রদায়ের পরলোকগত অধিনায়ক মং রাজা নেক্‌সাইনের কন্যা শ্রীযুক্তা নাহুমা সম্প্রতি মং রাজার পদে অধিষ্ঠিতা

হইয়াছেন। মং সম্প্রদায়ের অধিনেতৃপদে ইনিই সর্বপ্রথম নারী।

শ্রীমতী এন্‌ এল্‌ খাস্তগীর চট্টগ্রামের সর্ববিধ সামাজিক ও নারীমঙ্গল অঙ্গুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্টা। সম্প্রতি তাঁহার উত্তোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে চট্টগ্রামে রবীন্দ্রনাথের “বাল্মীকি-প্রতিভা” সর্বাঙ্গহৃদয়ভাবে অভিনীত হইয়াছে।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৪২

পার্কীতীর সঙ্গে কথাবার্তায় সীমা একটু নিরাশ হ'ল। ব্যক্তিত্বের সতেজ উদগ্র প্রকাশ পার্কীতীর মধ্যে সে আশা করেছিল; কিন্তু পার্কীতীর মধ্যে সেই তীব্র উত্তেজনাযম অহমিকার প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখে সে প্রথমটা মনে মনে একটু তুচ্ছই করেছিল তাকে। পার্কীতী বিনীতভাবে বললে, “দেখুন এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের কোন কৃতিত্বই আমার প্রাপ্য নয়। আমি একজন কর্মচারী মাত্র। যার প্রেরণায়, অর্থে এবং শক্তিতে এর প্রতিষ্ঠা তাঁর নাম শচীন্দ্রনাথ সিংহ। তিনি এখানে থাকেন না—মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসেন। সুতরাং আপনার যে নারী-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একে যুক্ত করে একযোগে কাজ করবার প্রস্তাব করছেন তা কার্যে পরিণত করতে হ'লে আপনাকে তাঁরই সঙ্গে দেখা করে সব বন্দোবস্ত ঠিক করতে হবে।” ব'লে অল্পক্ষণ থেতম আবার বললে, “তা ছাড়া আমি অন্ততঃ যত দূর জানি, দেশের স্বাধীনতা লাভের দিক থেকে চিন্তা করে এই প্রতিষ্ঠানের কোন উদ্যোগ হয় নি। বাংলা দেশের নারীকে পরান্নপ্রত্যাশী পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন কাটাতে হয়। বাঙালী মেয়ের সেই দুঃস্বখ আর যদি কোন প্রতিকার করা যায় সেই ভাবেই এই উদ্যোগটুকু করা। অতঃপর কোন মহন্তর বা বৃহন্তর উদ্দেশ্য এর মধ্যে আছে ব'লে আমার মনে হয় না।”

পার্কীতীর কথার মধ্যে একটু শ্লেষ কল্পনা করে এবং দেশের প্রতি এমন উদাসীন উজ্জিতে সীমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললে, “আপনার কাছেই শুনেছি যে আপনি বিলেতে মানুষ হয়েছেন, সুতরাং আপনি যে পরাধীন দেশে ভারতবাসী হয়ে জন্মেছেন তা ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়। আপনার কথা না-হয় বান্ধাই দিলাম—কিন্তু দু-এক বছর বিলেতী জমি মাড়িয়ে এসে শচীনবাবুও কি ভারতীয় চর্ম বদলে এসেছেন নাকি, যে দেশের পরাধীনতার চিন্তা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে উঠবে? আমাদের দেশের যে-কোন মঙ্গল কাজ, যে-কোন প্রতিষ্ঠান, দেশের মুক্তি কামনা করে না করলে আমার ত মনে হয় সবই বৃথা। কাজ যত বড়, শক্তির অপব্যয়ও তত বেশী, নয় কি?”

পার্কীতী স্থির হয়ে সীমার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বললে, “তা কেন হবে বলুন ত? মঙ্গল কাজ ত তাই যাতে লোকের ভাল হয়, সুতরাং সে আপনি দেশের মুক্তি কামনা করেই করুন আর যা কামনা করেই করুন, তাতে যদি মানুষের মঙ্গল হয় তবে শক্তির অপব্যয় কেন হবে বলছেন ঠিক বুঝলাম না।”

সীমা বললে, “সে হয়ত বোঝান আপনাকে সম্ভব হবে না। তবু ভেবে দেখুন, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মূলধন অল্প। সুতরাং আমাদের সমগ্র শক্তিকে যদি

স্বাধীনতাস্বপ্নে না গাঁথতে পারি, আমাদের সমগ্র চিত্তকে একমাত্র সেই চিন্তায় পূর্ণ করে না তুলতে পারি ভবে আমাদের স্বল্পাবশিষ্ট প্রাণশক্তি ক্ষুদ্রতর মঙ্গল কাজের মধ্যে নিশ্চিন্তে হারিয়ে যাবে—স্বাধীনতা এবং দেশের বিনাটি বৃহত্তর ভবিষ্যৎ হৃদরপরাহত হয়ে উঠবে। অমনিতেই আমাদের অলস দুঃখভীত চিত্ত স্বাধীনতালাভ চেষ্টার দুঃশ্রমে বরণ করবার আশঙ্কায় আড়ষ্ট। তাই সে দেশের আপাত দুঃখ ঘোচনের ক্ষুদ্রতর তথাকথিত স্বদেশহিতৈষণার আশ্রয়ে নিজেকে এবং অপরকে ভুলিয়ে রেখে নিরাপদ হ'তে চয়। সেই নিরাপদ নীড় সে বেঁধেছে আজ বিদেশীর খাঁচা— সেখানে আকাশের মুক্তি নেই। সেখানে তার ভোজ্য পরের উষ্ম হৃদয়ের উচ্ছিষ্ট। কিন্তু এসব কথা'র মূল্য আপনার কাছে কিইবা? আপনাকে মিছে বিরক্ত করছি।”

কথার খোঁচায় পার্কতী কিছুমাত্র উদ্ভ্রা প্রকাশ না করে শান্ত কণ্ঠে বললে, “দেশকে আপনি ভালবাসেন; স্রোকে স্বাধীন করতে চান। আপনার এই কথাগুলি সত্যিই আমার ভাল লেগেছে; স্বাধীন দেশে মানুষ হবার স্বপ্নেই বোধ হয়। আমি জানি কোন ইংরেজই আপনার এই সেন্টিমেন্টকে তুচ্ছ করবে না। তবে দেশের কথা বলছেন যে, সেটা কোন্ দেশ, বাংলা না ভারতবর্ষ? তা আমি ঠিক জানি না—ও কথা ভাবিও নি কখনও। দেশকে আমিও একরকম করে ভালবাসি, সে আমার মাকে ভালবাসি বলে। আমার কাছে দেশের মূল্য মায়ের বাংলা দেশ বলে—যেখানকার শ্রামলতা ও সরসতা নিয়ে আমার মা সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমাকে ভালবেসেও আমার জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে পারেন নি। যেখানকার পুরুষ তার নারীকে মানুষের অধিকার থেকে তিলে তিলে বঞ্চিত করে, সবলে দেবী বানিয়ে তোলবার মৃত গর্বে নিষ্ঠুর; যেখানে লক্ষ মায়ের চোখের জল দিনেব পর দিন ময়ূটে মিশেছে সেই বাংলা দেশকে আমি ভালবাসি। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার বলে সেই বাংলা দেশকে যদি নারীনিষ্ঠাতনের পাপ থেকে একটুও মুক্ত করতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব। সেই সামান্য উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় আমি যোগ দিয়েছি। আপাততঃ এর চেয়ে বড় মুক্তির কথা আমি ভাবি না। আপনি বলছেন বটে, কিন্তু সমস্ত

ভারতটাকে দেশ ভেবে সেই দেশের স্বাধীনতার কর্প এখনকার অবস্থায় কিছুতেই স্পষ্ট করে ভেবে উঠতে পারছি নে। তা ছাড়া পোলিটিক্যাল ইমানুসিপেশন ইত্যাদির কথা আমার কখনও মনে হয় নি। আপনি বরং শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা ক'বে এসব কথা বলুন, দেখুন তিনি কি বলেন।”

সীমা পার্কতীর সম্বন্ধে মনে মনে হতাশ হয়ে বললে, “আপনার পূর্ক জীবন যেমন ভাবে কেটেছে বলছেন, তাতে আপনার নিজের দেশের স্বাধীনতার সম্বন্ধে দরদ হওয়ার কথা নয়। সে বাই হোক গো। শচীনবাবু করেন কি? তাঁর ঠিকানাটা যদি—”

“শচীনবাবু জমিদার। তাঁর বর্তমান ঠিকানা অবশ্য ঠিক জানি না। আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।” বলে সে বেরিয়ে ভোলানাথের কাছে গেল।

পার্কতীর মনেও শচীনের সঙ্গে দেখা করবার বাসনা অনেক দিন থেকেই ছিল। ভাবেন, এই মেয়েটির সঙ্গে গেলে মঙ্গ হয় না। মেয়েটির প্রস্তাবের আলোচনায় আমাকেও ত দরকার হবে। মেয়েটির কথাবার্তায় তাকে অত্যন্ত আনন্দপ্রাপ্তিকাল অব্যাপারী বলে পার্কতীর মনে হয়েছিল—এবং তার স্নেহের প্রতিষ্ঠানটিকে ওর সঙ্গে যুক্ত করে দেবার প্রস্তাব পার্কতীর ভাল লাগ নি। মনে মনে ভাবলে, “হু-মাস এলেন না। কোথায় একলা একলা ঘুরে অহুহ হয়ে পড়বেন হয়ত।” তারই কথায় যে এমনটি ঘটেছে এই কথা মনে করে অত্যন্ত হয়ে সে মনে মনে বললে, “না এর একটা বিহিত করে ফেলতেই হবে।”

লটীজের নায়েবের কাছ থেকে যদি কোন ঠিকানা পাওয়া যায় এই আশায় ভোলানাথকে গিয়ে বললে, “ভোলাদা, একটা নৌকা ঠিক করে দিতে পার ?”

“কেন দিদিমণি, বেড়াতে যাব ?”

“না, ভোমাদৈর দেশে যাব। নৌকায় কতক্ষণ লাগবে বল ত ?”

“তা বাতাস পেলে এক দিনেই যেতে পারে ওতরবাড়ী। সেখান থেকে সিংঘোড় রেলের এক ঘণ্টার পথ। আর সিংঘোড় ইষ্ট্রিশন থেকে বনভপুর এক পো পথ।”

“ভোমায় কিন্তু এখানে কদিন থাকতে হবে। সব দেখবে শুনবে। পারবে ত ?”

“তা খুব পারব। সে তোমায় ভাবতে হবে না।”

“আচ্ছা। ভোলাহা—এলাহাবাদে যেখানে ছিল সে জারগাটার নাম জানো?”

“তা ত মনে নেই, দিদিমণি। যোমনোব ধারে “রাণী কুঠি” বললেই নে যাবে” খন। সামনেই যোমনোর ওপর একটা ভাঙা ইটের বাধানো মত আছে। জিবেণী থেকে বেশী দূর নয়।”

“আচ্ছা যাও, নৌকা ঠিক করগে। দুপুবে খেয়ে দেয়ে বেরব।”

কয়েক দিনের জন্তে সমস্ত বন্দোবস্ত করে সীমাকে নিয়ে সে বেবিয়ে পড়ল।

পরদিন সীমা ও পার্কতী যখন শচীশ্রের গ্রামে গিয়ে পৌঁছল তখন রাত নট। ম্যানেজার অভ্যস্ত সমাদরে পার্কতী ও তার সঙ্গিনীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তাব পর সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শচীশ্রের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তার বিপুল ঐশ্ব্যের বিচিত্র রূপ দেখাতে এবং গল্প করতে লাগলেন। পার্কতীর থেকে থেকে একটা অস্পষ্ট বেদনা জেগে উঠছে। শচীশ্র তাব এই সুখসমৃদ্ধির সুস্থ আরাম পরিভাগ কবে তারই জন্ত আজ গৃহভাগী। তাকে তার আচ্ছন্ন্যের মধ্যে এনে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ ত তাবই কাজ। এই সব চিন্তায় অন্তমনস্ক রয়েছে সে; সীমা ও নির্বাক বিস্ময়ে শচীশ্রের এই ঐশ্ব্যের পরিমাণ অহুমান করবার চেষ্টা করছে। ধীরে-ধীরে তার মনে এই বিস্ত্রালী পুরুষটিকে আয়ত্ত করবার বাসনা জেগে উঠছে। শচীশ্রকে যদি কোন মতে তাব পথের পথিক করা যায়। ভাবে, মন যার পবের জন্ত কাঁদে দেশের ক্রন্দন তার কানে নিশ্চয় পৌঁছবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আবার মনে হয়, যদি সে অল্প দশ জনের মত বিলাসী জমিদার হয়, যদি ভীক হয়। যদি ইংরেজের প্রসাদজীবী হয়, মন তাব জলে ওঠে, রক্তালেকের কথা মনে হয়। ভাবে, তবে রক্তদার বড় শিকার জুটবে—উঃ কি খুসিই হবে সে। ভাবতে ভাবতে ঠিক করে সে কলকাতায় গিয়ে ‘সব বন্দোবস্ত করে তবে যাবে।

শচীশ্র সত্যই প্রমাণে একাকী বাগন করবাব জন্ত গিয়েছিল, এবং যদিও ম্যানেজারের প্রতি ইচ্ছা ছিল কে

কোন বিষয়কর্ষ নিয়ে তাকে বিবস্ত করা না হয়, তবু পার্কতীকে তার ঠিকানা না জানাতে ম্যানেজার সাহস করে নি। কমলাপুরী ও পার্কতী সম্বন্ধে শচীশ্রনাথের মনোভাব ম্যানেজারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচর ছিল না। ঠিকানা সংগ্রহ করে পরদিন সীমা ও পার্কতী কলকাতায় রওনা হয়ে গেল। কলকাতায় শচীশ্রের বাসার ঠিকানা পার্কতীই জানা ছিল। দু-জনে প্রথমে সেখানেই গিয়ে উঠল। সীমা বললে, “দেখুন, আজ রাঙের ট্রেনেই আয়বা রওনা হব। আমি এখন একটু কাজে বেরব। সময়মত আপনি ষ্টেশনে যাবেন, সেখানেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।” পার্কতী একটা নমস্কার করে সীমাকে বিদায় দিলে। তার চিত্ত তখন নানা চিন্তায় আবুল। শচীশ্রের এই বাড়ীতে সে অল্পপস্থিত শচীশ্রের সন্তাকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে একবার অল্পভব করে নিতে চায়। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব তার কাছে আনন্দদায়ক নয়।

সমস্ত দিন সে নিজেকে বিশ্রাম দিল না। শচীশ্রের বিশ্রুত সঙ্গার সে নিজের নৈপুণ্য দিয়ে স্বন্দর মনোরম করে তুলতে চায়, যেখানে এলে শচীশ্রের এতদিনকার লক্ষীছাড়া শ্রীহীন জীবনযাত্রাকে সে তৃপ্তিদান করতে পারবে। বৈকালের দিকে কাজকর্ষ সমাধা করে সে শচীশ্রের শোবার ঘরের নুতন সরঞ্জামগুলি তদারক করতে গেল। শচীশ্রের শয়্যার পাশে তার দোলা-চোরারটিতে শুয়ে সে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। একটা দুঃস্বপ্নের আঘাতে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসল। স্বপ্নে দেখল, কমলা কিরে এসেছে। কমলাপুরীর ঘাটের কাছে লঞ্চ প্রস্তুত, এখনই তাকে চলে যেতে হবে—তার মালপত্র সব তোলা হয়ে গেছে—অথচ কিছুতে শচীশ্রের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। যে লক্ষ্মীহীনা, কমলার অল্পপস্থিতিতে তার স্বামীকে গ্রাস করতে চেষ্টা করছে, তার কাছে শচীশ্রকে কমলা বিদায় নেবার ছলেও যেতে দেবে না। ঘুম ভেঙে পার্কতীর মনটা বিকল হয়ে গেল। যদিও স্বপ্ন, তবু এ-কথা সে না ভেবে থাকতে পাবল না যে শচীশ্র কমলারই প্রতি এখনও অহুয়রক্ত। তবে কেন সে তার প্রতি শচীশ্রের দুর্বলতার সুযোগে তাকে গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করবে। এলাহাবাদে সে যাবে না এটা স্থির করে চাকবকে দিয়ে সে সীমার কাছে ষ্টেশনে চিঠি পাঠিয়ে লিখল,

“বিশেষ কারণে আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। আমাকে ক্ষমা করবেন।”

সকালে সীমাকে ভূতটি দেখেছিল, স্বতরাং পূর্বতীর নির্দেশমত ষ্টেশনে সীমাকে খুঁজে বার করতে তার কষ্ট হয় নি।

৫০

সীমা যে কলকাতায় ফিরেছে একথা নারীভবনে প্রকাশ করতে তার বাধা ছিল। তাই সে সোজা রক্তলালের সঙ্গে সিয়ে দেখা করলে।

রক্তলাল সীমার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বললে, “দরকার কি আর ঘোর-পাঁচ খেলে। ওসব ভুঁড়ো-পেট জমিদার তোমার ওসব কথায় বাজী হবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের তাঁবেদারীতে জমিদারী বাঁচিয়ে তাদের খেতে হবে ত। রেভেনুশুনারী হলে তাদের চলবে কেন, তার চেয়ে একেবারে এলাহাবাদ থেকে তাকে কিড্‌নাপ করে আনা যাক—কি বল?”

সীমা বললে, “রক্তদা, তোমার ছুসাহস বতখানি, বুদ্ধি যদি ততটা খেলত তবে এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তোমার জোড়া মিলত না। লোকটাকে আমি কলকাতায় এনে ফেলি। তখন তোমার টাক্সির সাহায্যে তোমার খাঁচায় পোরা শক্ত হবে না। একেবারে হাওড়া স্টেশন থেকে দমদমার বাগানে—বুলে কি না। আজ বুধবার, শনিবার সন্ধ্যার সময় প্রস্তুত থেকে।”

আহতপুচ্ছ রক্তলাল মনে মনে ক্রোধ পরিপাক করে চলে গেল। সীমাব নিয়ত শ্লেষ তার আর সহ হচ্ছিল না। সীমার কর্তৃত্বে অকারণ নরহত্যার উত্তেজনা নেই, বিপদের সন্ধান নেই, মাত্র নির্জীব নিয়মের অধীনে স্বদ্র ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সুযোগের অপেক্ষায় নীরবে কাজ করে চলায় তার ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে এসেছিল। দুর্দান্ত দুর্দর্ষ একটা কিছু করে ফেলবার তাড়নায় তার চিত্ত নিজের বাহিরের পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ধর্মজ্ঞান বলে কোন বস্তু তার বড় একটা ছিল না। সীমার অহুপস্থিতিতে সে কি করবে তার একটা মতলব মনে মনে ঠিক করে সীমাকে বললে, “বেশ কথা, আমি এদিকে সব ঠিকঠাক করে রাখব; কেবল আসবার আগে

একটা খবর দিও।” এত সহজে বিনা তর্কে রক্তলালকে রাজী হতে দেখে সীমা একটু খুশী হল।

৫১

নন্দলাল যদিও বাহৃত: তার সজারযাত্রায় পরিস্পূর্ণ আগ্রহ ও একাগ্রতার অভিনয় করে চলেছিল, তবু মন তার স্থস্থ ছিল না। জ্যোৎস্নার সময়ে তার মতিচ্ছন্ন চিত্ত কিছুদিনের মধ্যেই আবার তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। হতভাগা ডাক্তার যে জ্যোৎস্নাকে তার কাছ থেকে এমন করে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের আয়ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধেশ করে ফেলবে এ সে সহ করতে পারে না। কিছুদিন সে অকারণে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে নিজের মনকে বেশে আঁনবার চেষ্টা করতে লাগল। একবার মনে করলে, মরুক গে ডাক্তার, আর এমন করে অশান্তি ভোগ করা যায় না। কিন্তু ‘মরুক গে’ বললেই উদ্দাম বাসনাকে কিছু আর সফল করা যায় না। তবু সে অন্ত্রোপায় হয়ে অর্থোপার্জনের দিকে প্রাণপণে নিজেকে নিযুক্ত করতে চেষ্টা করতে লাগল। নাওয়া-খাওয়ার সময়ের আর কোন স্থিরতা রইল না। প্রতিদিন রাতে ফিরে নিতান্ত শ্রান্ত নির্জীব হয়ে সে রাত্রি শয়ান আশ্রয় নিত। শ্রান্ত চোখে নিজা আসতে ফিল্ম হত না এবং প্রাতঃকালে উঠেই আবার ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা জটিল ব্যাপারে নিজেকে ব্যাপৃত করে তোলবার অসাধ্য শাসনে সময় ও শরীরকে সে ক্ষয় করতে লাগল।

এমন সময় একদিন সন্ধ্যাবেলা হাসপাতালের পরিচিত দরওয়ানের সঙ্গে বাড়ীর দরজায় তার সাক্ষাৎ হল। জ্যোৎস্নার নামে মালতীর একখানা চিঠি নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই নন্দলালের মনে একটা কুটিল সন্দেহপূর্ণ আশার সঞ্চার হল। নিতান্ত অকারণে যে হাসপাতালের দরওয়ানের তার গরীবখানায় আগমন সম্ভব নয় এটুকু বুঝতে তার দেরী হয় নি। জ্যোৎস্নার কাছ থেকেই যে দরওয়ান এসেছে এই কথা মনে করে সে পরিচিত দরওয়ানকে নিতান্ত পুরাতন বস্তুর মত প্রায় সমাদর করে বললে, “এই যে এস এস দরওয়ানজী। সব ভাল ত? তোমাদের ওদিকে অনেক দিন যেতে পারি নি। তার পর কেমন আছ?”

দরওয়ান অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়ে কুশল প্রত্যুত্তর দিল।

করলে। নন্দ নিতান্ত ভালমাহুকের মত বললে, “আরে একটু বোস দরোয়ানজী। তোমার একটা বড় বকশিশ পাওনা আছে; যাই না ব’লে দেওয়াই হয় নি। আজ নিয়ে যাও।”

এক গাল হেসে দরোয়ান বললে, “হুজুর মা বাপ, আপনাদের পরবর্ত্তিতেই গরীব বেঁচে আছে।” ইত্যাদি বলতে বলতে বৈঠকখানার ঘরের মেঝেয় বসল।

প্রথম চেষ্টাতেই এতটা ফল পেয়ে খুশী হয়ে নন্দ তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললে, “পরবর্ত্তি আর কি দরোয়ানজী, তোমারই ভরসাতে ত জ্যোৎস্না মাইকে ওখানে রাখা। মাই ভাল আছে ত?”

“মাইজী ত বাবু ওখানে থাকে না। সে একটা বোড়ীমে উঠে গেছে।”

নন্দ তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে, “আরে হ্যাঁ, সে ত গেছেই। ওখানে পড়াশুনার অহবিধা হয় কি না তাই তাকে অস্ত্র বোড়ীতে দিতে বলেছি। আমার আবার কাজকর্মের চাপে যাওয়া হয় না। বাড়ীটার নঘর ভুলে গেছি, একখানা চিঠি দেব তাও হয় না।”

“দেন না, আমাকে দিয়ে দেন, আমি পৌঁছে দেব।”

“না না আজ মাইজী চিঠি দিয়েছে, আজ আর কাজ নেই। ঠিকানাটা এনে দিও, আর ভাল ক’রে দেখাশুনা ক’রো, তোমায় আরও বকশিশ করব। প্লস করলে দোপাট্টা আর পাগড়ী পাবে।”

“হুজুর মা বাপ। কালই আপনাকে ঠিকানা এনে দেব।”

“বেশ বেশ। আর দেখ আমি যে ঠিকানা ভুলে গেছি একথা আর কাউকে ব’লো না, এ বড় সবমেব বাৎ। বুড়ো হয়ে কিছু মনে থাকে না, বুঝলে। কাল ঠিকানা এনো, বুঝলে?”

“জি হুজুর” ব’লে দরোয়ান বাবুবার অভিবাধন ক’রে বিদায় নিলে।

ঠিকানা সংগ্রহ হওয়ার পব থেকে নন্দর আর স্বস্তি রইল না। দুসাহসে ভর ক’রে সে যে নারীভবনে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে, তেমন সাহস সে সংগ্রহ করে উঠতে পারে না, অথচ নিত্য সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা

দিয়ে নারীভবনের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানোর নেশায় তাকে পেয়ে বসল। নারীভবনের একটা জানালায় একদিন কমলাকে দেখে তার নেশা আরও বেড়ে গেল। মোহগ্রস্ত মেহের আলি বত সে যেন নারীভবনের ক্ষুধিত পাষাণের আকর্ষণ থেকে নিজেকে কিছুতেই দূরে রাখতে পাবে না। কমলাকে অপহরণ করবার নানা অসম্ভব কল্পনায় সে প্রায় সম্পূর্ণ বাস্তবজ্ঞান হারিয়েছিল; এবং এমনি ক’রে সে রক্তলালের অহুচর নারীভবনের রক্ষীদের শুভদৃষ্টির কোপে পড়ে গেল।

প্রত্যহই একটা লোককে সন্দেহজনকভাবে নারীভবনের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখে অহুচরদের একজন আর একজনকে একথা জানালে। ক্রমে রক্তলালের কানেও কথাটা উঠল। দু-চার দিন পৃথ্যবেক্ষণ ক’রে রক্তলালেরও লোকটাকে স্ববিধের মনে হ’ল না। পুলিশের চর যে, সে বিষয়ে তার আর সন্দেহ রইল না। নন্দর উপর তারা কড়া নজর রাখতে লাগল।

লোকে নিজের সর্বনাশের পথ নিজেই পরিষ্কার ক’রে থাকে। কমলাকে উদ্ধার করবার কোন উপায় চিন্তা ক’রে উঠতে না পেরে সে মনে মনে অস্থির হ’য়ে উঠল। এমনই ক’রে রাত্তায় রাত্তায় একটা জীলোকের মোহে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ানোর মানিও তার মনে সঞ্চিত হচ্ছিল; এবং তার নিজের মনকে ও নিজের অজ্ঞাতে মালতীকে কৈফিয়ৎ দেবার উদ্দেশে সে নিজেকে বুঝিয়েছিল, “জ্যোৎস্নার অভিভাবকসে, জ্যোৎস্নাকে এমন ক’রে ভেসে যেতে দেবার তার কোন অধিকার নেই।” জ্যোৎস্নার প্রতি তার চিন্তা লোভাতুর একথা সে মানতে চাইলে না। কোন এক সময়ের মোহের দুর্ভাগ্যভার জন্তে চিরকাল কি সে অমাহুষ হয়ে আছে? কখনই না। এমনি ক’রে নিজেকে বুঝ দিয়ে সে নিজের এবং অপরের কাছে যেন আত্মমর্যাদা বজায় রাখলে। মনে মনে বললে, “জ্যোৎস্না সম্বন্ধে তার একটা দায়িত্বও আছে? ভাব্যতার কে? কে বলতে পারে তার অতিভ্রাতার আড়ালে অসহৃদে নেই। এই ত হাসপাতালের ডাক্তাররাই ত কত কি বলে ওর নামে। এমনি কিছু আর বলে না? হ্যাঁ, এমন সাধুগিরি ঢের দেখেছি। আরে তুই কে রে বাবা, যে জ্যোৎস্নার জন্তে

তোর এত মাথা ব্যথা? তা ছাড়া জ্যোৎস্নাই না-হয় নির্দোষ। ওর মৎলব কিছু বোঝে না; তাই ব'লে তাকে বাঁচান ত তারই কাজ।”

তার অন্তরের বাসনা তার কর্তব্য বোধের মহৎ প্রেরণা পেয়ে একেবারে উদ্ধাম ক'রে তুললে তার চিন্তা ও চেষ্টাকে। সে যখন অভিভাবক তখন সে পুলিশের সাহায্যে জ্যোৎস্নাকে উদ্ধার করবে না কেন! এই ভেবে সে একদিন উদ্ভাস্তচিত্তে পুলিশ-ষ্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়েই তার উৎসাহ এল জুড়িয়ে। যদি জ্যোৎস্না তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যদি তার বিরুদ্ধে অত্যাচার করার পাশ্চাৎ নালিশ করে? পুলিশকে সে চিরদিনই ভয় ক'রে এসেছে। পুলিশের কাছে নালিশ জানালে ভোগাস্তি তারও যে কিছু কম হবে না একথা সে যতই চিন্তা করতে লাগল উৎসাহ তার ততই কমে এলো। তা ছাড়া, ব্যাপারটাকে এত প্রকাশ্য ক'রে ফেলা তার 'সৎসাহসে' কুসঙ্গ ছিল না। মালতী তার এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে তার গোপন অভিসারের কাহিনী জানতে পারলে আর এক পারিবারিক হান্ধামে তাকে পড়তে হবে, এবং তার অধুনা নিবাসস্থিত গৃহব্যবস্থার মধ্যে আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হবে। কোন দিকেই সে আর যেন কোন উপায় খুঁজে পেল না। চিন্তা করতে করতে তার মনে আর স্থিতি রইল না। পুলিশের কোন হান্ধামে নেমে পড়তে তার ভীক মন পেছিয়ে এল। কোনও দিকে কোন উপায় না করতে পেরে তার চিরাত্তস্ত গৃহাহুগত ভয় অন্তঃকরণ আবার তাকে গৃহভিমুখে ফিরিয়ে আনবার স্বযোগ পেল। সে ভাবতে লাগল, “কেন আমি আমার শাস্ত গৃহনীড়টুকু মধ্যে মালতীর অকৃত্রিম স্নেহ সেবা যত্নে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারব না! আমি ভক্তসন্তান, কেন আমি বারংবার অভদ্র লোভে বিশ্বাসঘাতকেব নীচতার মধ্যে নামতে চাচ্ছি! হি হি! এতটুকু সংযমে আমি নিজেকে যদি না বাঁধতে পারি তবে মনুষ্যসমাজে আমার স্থান হওয়া উচিত নয়।”

নিজেকে ভক্তসন্তান ব'লে চিন্তা করতে করতে সে ভক্ত-জনোচিত মনোবৃত্তিকে নিজের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। ভাবলে, “ফিরে গিয়ে নিজেকে মালতীর নিশ্চিত স্নেহাশ্রয়ে সমর্পণ করি। জ্যোৎস্নার জন্ত আমার

চিন্তে যে-প্রেম, তা যেন আজ থেকে অহেতুকী হয়। তারই মঙ্গলের জন্ত যেন সে-প্রেমকে নিয়োজিত করতে পারি।” ভাবতে ভাবতে সে বাঙালীর ভাবপ্রবণ চিন্তের আনন্দে নিজেকে যেন মার্টিবের পঙ্ক্তি ত নিয়ে বসালে এবং নিজের প্রতি করুণাপূর্ণ শ্রদ্ধা তার মনে জেগে উঠল।

সে শান্তচিত্তে বাড়ী ফেল এবং তার অল্পতপ্ত মনের অবসাদ নিয়ে মালতীর কাছে অধিকতর স্নেহ করুণা এবং আদরের প্রার্থী হয়ে তার কাছে ফিরে গেল। রাজে মালতী উদ্বিগ্ন হ'য়ে স্ব্থোলে “ভি গো, অমন করছ কেন?” নন্দলাল তার জবাব না দিয়ে মালতীকে ঘনিষ্ঠতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে তার বুকে মাথা ঝুঁজে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল।

রক্তলালের চেলাদের মনে যেটুকু সন্দেহ বা ছিল তার আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইল না। সীমার অল্পপরিচিতি রক্তলালের দুর্দম জিঘাংসাকে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুললে। সীমাকে নিরঙ্কুশে লক্ষ্যন করার এত বড় স্বযোগ সে ছাড়লে না। নিতান্ত অসহ্য নিঃসহায় স্বভাব-সীক নিরীক্ষারোধী নন্দলালকে পরদিন তার নিজের বাড়ীর সামনে নৃশংসভাবে তারা হত্যা করলে। মালতীব ক্রন্দনে পুলিশের চোখও সেদিন শুষ্ক রইল না। ব্যাপারটা সহজে সীমার গোচর না হয় রক্তলাল বখাস্য তার ব্যবস্থা করেছিল।

• নিখিলনাথ সংবাদ পেয়ে নন্দলালের বাড়ী উপস্থিত হ'ল; এবং যথাকর্তব্য ব্যবস্থাদি করতে লাগল। প্রথমেই সে জ্যোৎস্নাকে মালতীর কাছে এনে রাখলে। যে-বাড়ীতে প্রাণান্তেও কমল প্রবেশ করবে না ব'লে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল, আজ তারই আশ্রয়দাতার এক অভাবনীয় সর্বনাশের স্ত্রে সেখানে প্রবেশ ক'রে নিজেকে সে “দুর্দৃষ্ট সর্বনাশী” ব'লে মনে মনে নির্ধাতন করতে লাগল। নন্দলালের গতি-বিধির কথা নিখিল পূর্বে তাইই কাছে শুনেছিল; স্তত্রায় এটা যে সীমার দলেরই কাজ একথা নিখিলের বুঝতে যেরী হয় নি। নিখিল ক্ষুব্ধ ক'রে কমলাকে বলেছিল, “হায় রে এত ভাল মানুষ এই নন্দবাবু তাঁর একটা দুর্ভাগ্যের এ কি অকারণ কঠিন পরিণাম হ'ল!” প্রশ্ন ক'রে নিখিলের বাছ থেকে কমলা ব্যাপারটা বুঝে অল্পতাপের তার আর সীমা রইল না। সেই না সীমাকে নন্দলালের গতিবিধির কথা

জানিয়েছিল। তার জানানতে যে কিছু হয় নি একথা তার মন মানতে চাইল না।

পরদিন নিখিল ভুলু দত্তের কাছে গেল; এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ কমিশনের কাছে বোরাঘুরি করে সে পুলিশ হাজামের ব্যাপারটা অনেকখানি সংক্ষেপ করে আনলে। নন্দলালের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক ব্যাপারের কিছুমাত্র যোগ না থাকায় পুলিশ এই খুনটাকে নিছক তার কোন পাওনাদার বা শত্রুর কাজ বলেই সাব্যস্ত করলে। অল্পসন্ধান অবশ্য চলেতেই লাগল, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপার অল্পসন্ধানের উৎসব-আয়োজনের উৎসাহ আর ততটা রইল না।

৫২

অত্যন্ত হুশিয়ার মধ্যে নিখিলনাথের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। নন্দলালের বাড়ীর চারিদিকে পুলিশ প্রহরী বসেছিল, সুতরাং বাইরে থেকে সে-বাড়ীতে বিপদের সম্ভাবনা বড় একটা ছিল না। তার ভয় ছিল শুধু অল্পপন্ডিত সীমা সঙ্কে। এদের দলের অস্তিত্বের কতখানি সন্ধান ভুলু দত্তের কাছে আছে তা সে জানত না। শুধু একটা অজানা ভয়ে সীমা সঙ্কে তার মনকে অত্যন্ত চিন্তাতুর করে তুললে। কমলাকে অবশ্য সে কোন রকম কথাবার্তা পুলিশের কাছে না-বলতে সাবধান করে দিয়েছিল। তবু তার মনে স্বস্তি রইল না। সীমার সাক্ষাৎ পাওয়া তার নিতান্ত আবশ্যক। এই ঘটনার মধ্যে সীমার কোন হাত ছিল কি না তা সে না জানলেও, সময়মত সীমাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্তে মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠল এবং অনন্ত-বিলম্বে কমলাপুরীতে যাওয়া ঠিক করে সে প্রাস্তরিত্তে নিজের কামরায় ফিরে গেল।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মন তার অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল সভ্য, কিন্তু সবচেয়ে বা নিয়ে তার মনের দৃষ্টি সে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না, যে-চিন্তা সবচেয়ে তীব্র হয়ে তার অন্তরাত্মকে গীড়িত করছিল, যে-সমস্ত তার জীবনপথে সবচেয়ে জটিল হয়ে উঠেছিল, তার কোন সমাধান সে খুঁজে পেল না। তার প্রেমের দিক দিয়ে সীমাকে রক্ষা করবার প্রবল ইচ্ছা তাকে যে তার সভ্য থেকে বিচলিত করেছে, তার গানি অন্তরে অন্তরে তাকে গীড়িত করে তুলেছিল।

আজ এই হত্যার এবং হত্যাকারী দলের প্রায় সকল সন্ধান জেনেও সীমার প্রতি তার একান্ত আকর্ষণে যে সে বাইরের দিক থেকে বাধাস্বরূপ হয় নি একথা সে ভুলতে পারছে না।

মাছুষের চিন্তের স্বাভাবিক নিয়মামুসারে নিজের কাজের সমর্থনে চিন্তা এক সময় অল্প বৃত্তি তার মনের মধ্যে অবতারণা করলে।

সীমা এই হত্যাকাণ্ডে হয়ত লিপ্ত নেই; অথচ তার নিজের সাধুতার মূল্যে এদের সন্ধান দিয়ে সীমাকে সে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবে কেমন করে। তা ছাড়া এরাই যে তাকে হত্যা করেছে তারই বা নিশ্চয়তা কি! সুতরাং—কিন্তু এমন করে নিজেকে বুঝিয়েও মনের কাঁটা তার দূর হতে চাইল না। নিখিলনাথের মনে সীমার সর্বনাশময় ভবিষ্যতের আতঙ্কে তার নিজের বিবেকের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল। কিছুমাত্র বিলম্ব করলেই যে সীমাকে তার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে কোনমতেই রক্ষা করতে পারবে না একথা মনে করে সে পরদিন প্রত্যুষেই কমলাপুরী যাবার বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললে। লঙ্কের সারেঙকে প্রেরণ করে সে বুঝতে পারলে যে সীমা সত্যিই কমলাপুরী গিয়েছে এবং সেখান থেকে এখনও ফেরে নি। এইটুকু সংবাদে তার মন অনেকটা শান্ত হ'ল। আর কিছু না হোক, সীমাকে সে কলকাতায় ফিরবার পূর্ব্বেই ধরতে পারবে। সীমাকে যে সে এই ব্যাপার থেকে নিরস্ত করতে পারবে সে আশা তার মনে ছিল না। তবু আপাত্তবিপদসম্ভাবনার হাত থেকে বাঁচাতে পারলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পথ মুক্ত থাকে এই চিন্তা করে সে নিজের চিন্তকে স্থির করতে চেষ্টা করতে লাগল।

কতকটা এই চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পাবার আশায় এবং কতকটা কমলাপুরী সঙ্কে তথ্য সংগ্রহ করবার আশ্রয়ে নিখিল সারেঙের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। অপ্রশস্ত রঞ্জিনী নদীর তীরে তীরে নিরাময় নিশ্চিন্ত আনন্দকলোচ্ছাসপূর্ণ সহজ জীবনযাত্রার বিচিত্র লীলা তার চিন্তে কোলাহল-মুখরিত নগরীর উদ্বেগ উত্তেজনাপূর্ণ জটিল ব্যর্থ অজ্ঞতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল। তার মনে হ'ল মানবের মঙ্গলসাধনের উন্মাদ মোহের উন্মত্ত গতিবেগ থেকে যদি কোনমতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে এই শান্ত কোমল

শিষ্ট নিশ্চিত গ্রাম্য কুটীরের উদ্ভেজনাবিহীন মাতৃকোড়ে স্থান লাভ করতে পারে; যেখানে একটিমাত্র বিকৃত হিংসাতপ্ত জর্জরিত জীবনকে সে আপনার স্নেহের আশ্রয়ে শিষ্ট শান্ত পরিতৃপ্ত করে সে নিজের অবখ্যাত অস্তিত্বের শান্তিপূর্ণ অবসানের মধ্যে অনন্ত বিশ্বতিসাগরের একটি বুদুদের মত মিশিয়ে যেতে পারবে।

সারেঙ গল্প করে চলেছিল মনের আনন্দে, তার মধ্যে অধিকাংশই তার আত্মকথা; তার জলচর-জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিশ্বয়কর ইতিহাস। সত্যের চেয়ে রূপকথার সঙ্গেই তার সম্পর্ক অধিক। কিন্তু বহু আবৃত্তির ফলে তারও মনে সেগুলি বিশ্বাসের কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। সত্য মিথ্যায় পূর্ণ তার এই সরল কাহিনী নিখিলের মনে আনন্দের সঞ্চার কম করে নিশ মারে মারে প্রশংসাপূর্ণ প্রশংসা করে গল্পের ধারাকে সে অক্ষুণ্ণ রাখলে।

আত্মকাহিনীর গতিবেগ ভিত্তিমিত হয়ে এলে এক সময় নিখিল তাকে প্রশংসা করলে, “হ্যাঁ, সাহেব, এই কমলাপুরীতে নাকি কোন পুরুষমানুষ নেই—সব নাকি মেয়েরা করে? সত্যি? কোন পুরুষ সেখানে বেতে পায় না?”

সারেঙ প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললে, “উহু একেবারে বাদশাহদের হারেমের মত।” তুলনাটা ঠিক নয়, তবু সারেঙের মনে কমলাপুরী সম্বন্ধে গর্ভ করবার ওর চেয়ে আর সম্মানজনক উপমা তার মনে ছিল না। তার পর একটু থেমে বললে, “কেবল রাজ্যসাহেব মাসে একবার আসেন। তা সাহেব সেই ত বাদশাহ।” কথাটা বিসদৃশ, কিন্তু সে বেচারার মনে মনিবের পদমর্যাদার পরিমাণটা বোঝাবার আগ্রহও কম নয়।

তার কথায় হাসি পেলেও নিখিল গম্ভীর হয়েই শুনছিল। কোতুলও হ’ল তার, বললে, “পার্বতী দেবী মালিক না?”

সারেঙ আবার উৎসাহের সহিত বললে, “আলবৎ, ওই ত সব। রাজ্যসাহেব ত শুধু টাকা দিয়ে খালাস। তিনি জমিদার কিনা! পেজার জমিদার সাহেব। গ্রামে তার হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, সাত মহলা বাড়ী—বাড়ী ত নয় একটা শহর।”

“বটে! তা নিজের গ্রামে এ সব না করে এমন একটা জায়গায় এ-সব কেন করলেন?”

“তা কি জানি সাহেব। রাজ্য-রাজ্যের মজ্জি। গ্রামে ত তিনি থাকেনই না। বেলাত থেকে আসার পর কলকাতাতেই বেশী থাকেন। সাহেব-লোকের কি গ্রামে ভাল লাগে আর। আর তা লাগবেই বা কি সাহেব, রাণীমা ছিল যেন ‘বেহস্তর পরী’। এমন জরু গেল লোকে গলায় দড়ি দেয়।”

এবার নিখিল একটু হেসেই ফেললে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, “রাজার ছেলেরা নেই বুঝি?”

“হায় আল্লা, ছেলেও ত ঐ এক সাথে গেছে। কত তলাস হ’ল সাহেব; তা কারোরই খোঁজ মিলল না।” ব’লে সারেঙ অত্যন্ত ব্যথিত হয়েই বোধ করি বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করলে।

নিখিলনাথ এতক্ষণ অলস অবসর যাপন করবার আশায় শিথিল চিত্তে গল্প শুনছিল। হঠাৎ সে খাড়া হ’য়ে বসে, সারেঙের হাত প্রায় চেপে ধরলে। এত বড় আশ্চর্য সংবাদ যে এই দুঃসময়ে তার কাছে এসে ধরা দেবে, তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিছুক্ষণের জন্তে সে কালকের দুর্ঘটনা, সীমার সর্বনাশ, ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা—সব ভুলে গেল। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে, “বল, বল সাহেব, বল ত ব্যাপারটা কি? তোমাদের রাণীমা আর তাঁর ছেলে কি হারিয়ে গেছে?”

তার ঐই আগ্রহ এবং কোতুলে সারেঙ অত্যন্ত আশ্চর্য হ’ল। বিরক্তও হ’ল মনে মনে। এতখানি গল্প করার তার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু নিখিলনাথের স্বাভাবিক সৌজ্ঞাত্য এবং সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে সেদিন গল্প করতে করতে তারও মনটা একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিল। এখন সচেতন হয়ে সে মনে মনে চটে গেল। তার মনে হ’ল ঘরের বোয়ের নিকৃৎশেষের সংবাদে কেমন যেন ইজ্জতের হানি হ’য়ে যাচ্ছে—প্রায় একটা বে-আবর হওয়ার সামিল যেন। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে, “অতশত জানি নে। হারিয়ে গেছে না চোরে নেছে, তাতে আপনার আমার কি? আমার অনেক কাজ সাহেব, তুমি আপনার কামরায় যাও।” ব’লে হঠাৎ পিছন ফিরে সে চলে গেল।

নিখিল ব্যাপারটা বুঝলে। ঘরের গৃহিণী নিকৃৎশেষ হওয়া যে আমাদের দেশে কত বড় ছর্নােমের ব্যাপার তা

চিন্তা করে তার মনটা অত্যন্ত ত্রিস্থিতি হয়ে গেল। সত্যিই যদি জ্যোৎস্না তার স্বামীর কোন সন্ধান পায়ও, তা হ'লেও তার উপায় কি হবে।

একবার ভাবলে নিতান্ত সেকেলে কনসারভেটিব বুড়ো নম্র বোধ হয়, বিলাত যেত না তাহ'লে। আবার মনে হ'ল, কোথাকার কে তার ঠিক নেই—আগে থাকতেই একটা যোগাযোগ করে সমস্তার সমাধান করতে বসেছি। যাই হোক, এই স্মৃতিটুকুকে ছাড়া হবে না; ভাল করে অহুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে।

নানা চিন্তায় বিনিময় রজনী কাটিয়ে পরদিন সকালে তারা কমলাপুরীর ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। কমলাপুরী পৌঁছে সে স্তন্যে পেল যে পার্কতী দেবী আশ্রমে নেই। সম্ভ্রুতি অবশ্য পার্কতী দেবীর অল্পপস্থিতি সন্দেহে তার হৃদয়ঙ্গর কোন কারণ ছিল না। তাকে দেখবার আগ্রহ থাকলেও আসল লোকটির সন্ধান এখনই তার পাওয়া দরকার। সুতরাং যে-ভদ্রমহিলা পার্কতীর বদলে আশ্রমের কর্ণধাররূপে ছিলেন, অগত্যা তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে সে সীমার সংবাদে আরও হৃদয়ঙ্গরিত হয়ে পড়ল। পার্কতীকে নিয়ে সীমা চল গেছে, হৃদয়ঙ্গরিত কারণ বইকি? একে ত সীমাকে কলকাতার চূর্ণটনার কথা ব'লে তার গতিবিধি সন্দেহে বিশেষ সংযত হবার জন্তে সাবধান করবার অবসরই তার হ'ল না; তার উপর নারী-প্রতিষ্ঠানের অধিনেত্রীকে এই ক'দিনের আলমুপে সে এমনভাবে আকর্ষণ কেমন করে করুণে সমর্থ হ'ল যাতে তার সমস্ত পরিবেষ্টন থেকে মুক্ত করে এমন অনায়াসে নিজের অহুসরণ করতে তাকে প্রলুব্ধ করলে। পার্কতী যে ক্লিসের আকর্ষণে সীমার অহুসরণ করেছিল নিখিলনাথের তা জানবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং রূপপঙ্খার অগ্নিমোহেই যে পার্কতীকে সীমা আকর্ষণ ক'বে নিয়ে গেছে সেই কথা ভেবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের সর্বনাশ কল্পনা করে সে সত্যিই বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে পড়ল। এতগুলি অল্পবয়সী নারীর সমগ্র ভবিষ্যৎ অচিরে তাড়াতাড়ি সর্বনাশে ধ্বংস হয়ে যাবে, অথচ একমাত্র সীমার মোহে এই দুর্গতি থেকে এদের সে বাঁচাতে পারছে না এই মনে করে অহুশোচনায় আবার তার চিন্তা গীড়িত হ'তে লাগল। মনে মনে কোন উপায় সে স্থির করতে পারলে না। কোন প্রকারে সীমাকে লুটে নিয়ে সে

যদি উদ্ধাও হতে পারে, ভারতবর্ষের বাহিরে, জাভায় হোক, আফ্রিকায় হোক, বনে জঙ্গলে মরুভূমিতে, মৃত্যুযাবিহীন নির্জন দ্বীপে, যেখানে হোক, যদি পালাতে পারে। উঃ সে আর ভাবতে পারে না। তার মনে হ'ল এতগুলি জীবনের নিশ্চিত সর্বনাশের অভিশাপ তার উপর উদ্ভূত হ'য়ে উঠেছে। তার জীবনের সত্যব্রতের অগ্নিপরীক্ষায় সে একেবারেই অপদার্থ হয়ে রইল। যেমন ক'রেই হোক সীমাকে তার ধরাই চাই।

অস্তরের এই বজ্রাকে অস্তরে অবরুদ্ধ রেখে সে উপনেত্রীকে জিজ্ঞেস করলে, “দেখুন, অনিন্দিতা দেবীর আশ্রম থেকেই আমি আসছি। তাঁকে আমার বিশেষ দরকার। তাঁর বোর্ডিঙের একজন মেয়ের বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে তাঁর ভগ্নীপতিকে খুন করেছে। সেই সম্পর্কে অনিন্দিতা দেবীকে এখনই আবশ্যক। দয়া করে তিনি কোথায় গেছেন—” নিখিলকে তার কথা শেষ করতে হ'ল না।

একটি বাড়ালী মেয়ের কাছে অকস্মাৎ একটা খুনের কথা উল্লেখ করলে যে সে অভিভূত হয়ে পড়বে এবং অনেক প্রশ্ন ইত্যাদির বিড়ম্বনা থেকে সে বেঁচে যাবে এই উদ্দেশ্যে কথাটা সে বলেছিল। উদ্দেশ্য সফল হ'তে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। “ও মা গো, কি সর্বনাশ! খুন করেছে? কি ভয়ানক। চলুন, নিয়ে যাই আপনাকে। ভোলাদা, ও ভোলাদা।” বিশেষ বিচলিত হয়ে সে ডাকাডাকি শুরু করে দিলে। অল্প অহুসন্ধানের পব ভোলানাথকে তারা নদীর ধারে দেখতে পেল। নিখিল ভাবলে, “ভোলাদা” “ভোলাদা” এ নাম কেন কার কাছে শুনেছে। চিত্ত বিব্রত না থাকলে একথা স্বরণ করতে এতটুকু বিলম্বও তাব হোত না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কমলার প্রলাপ, “ভোলাদা, খোকনকে একটু ধর না।”

আবার লঙ্ঘের সাবেডের কথাও মনে পড়ল। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে সে শুভ্রকেশ সেই বৃদ্ধকে দেখতে লাগল। এই কয় বৎসরের মধ্যেই খোকনের শোকে এবং নানা চিন্তায় তার অনাগতপূর্ব বার্কক্য তাকে এসে আক্রমণ করেছিল। তার বলিষ্ঠ দেহ অনেক ক্লম অল্প হ্রাস, তার কেশ পলিত এবং মুখশ্রী বলিরেখায় আকীর্ণ হয়েছিল। জ্যোৎস্নার বর্ণিত বোবনলাবণ্য এবং বলিষ্ঠতার বিশেষ চিহ্ন এই লোকটির

দেহে না দেখে সে একটু হতাশ হ'ল। তবু অনেক নিরীক্ষণ করে দেখলে জ্যোৎস্নার কাছে শোনা তাদের ক্ষুভের বর্ণনার অল্প কিছু মেলে বইকি? এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও কতকটা আশাব সঞ্চার তার মনের মধ্যে হ'তে লাগল। আশাতেই আশার বৃদ্ধি। তার মনে হ'তে লাগল যে দুঃসময়ের দুঃগ্রহ যেন কেটে গেছে, যেন সৌভাগ্যের সূচনায় মন তার প্রসন্ন হয়ে উঠতে চাইছে। সীমা সঘন্থেও অকারণেই তার মনটা হাঙ্কা হ'য়ে উঠল।

ভোলানাথ কাছে আসতে না-আসতেই সেই মেয়েটি চীৎকার করে বলতে লাগল, “ভোলাদা, শীগ্গির শীগ্গির এঁর যাওয়ার ব্যবস্থা কর।”

ভোলানাথ আশ্চর্য হয়ে বললে, “বাবু ত এখুনি এলেন, তা যাওয়া ত সেই কাল ভোরের ইষ্টিমারে। তার আগে ত হবার জো নেই। তা মা, বাবুরে খাওয়াও দাওয়াও, এখন যাবেন কেন?”

“আঃ ভোলাদা, বড়ো হয়ে তুমি বড় বেশী কথা বল। ঈমাবে যাবেন কেন? ওঁর বাড়ীতে খুন হয়েছে যে, নৌকো, নৌকো ঠিক কর। উনি দিদিমণিদের কাছে যাবেন।”

ভোলানাথ এসব কথার মাথামুণ্ডে কিছু ঠিক কবতে না পেরে একবার নিখিলনাথের দিকে, একবার সেই ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে কোথাকার খুন এবং সেই খুনের সঙ্গে দিদিমণিদের পিছনে নৌকা নিয়ে ধাওয়া করার কি যোগ থাকতে পারে তা ভেবে উঠতে পারলে না। নিখিল এই মহিলাটির এই স্নায়বিক উত্তেজনায় অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। সে লজ্জিত ভাবে বললে, “আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভোলানাথের সঙ্গে আমি সব ঠিক ক'রে নেব। নমস্কাব।” ব'লে আর পিছন না ফিরে ভোলানাথকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল, “ভোলাদা চল কথা বলি” বলে নদীর দিকে চলে গেল। কিছুমাত্র পবিচয় না থাকলেও এক্ষেত্রে ভোলানাথকে সঙ্কোচ করবার অবসরমাত্র দিল না। ভোলানাথ বললে, “বাবু আপনারে ত আমি চিনি নে। আপনি নিশ্চয় ছোড়-দিদিমণির (অর্থাৎ এই মহিলাটির) কেউ হবেন। তা বাবু আপনার বাড়ী কোথায়? খুন হলেন কেমন করে?”

নিখিল হেসে বললে, “আমার বাড়ীতে খুন হয় নি। যে

দিদিমণি পার্বতী দেবীর সঙ্গে গেছেন তাঁর একজন আত্মীয় খুন হয়েছে। তাই এখুনি তার বাগাল পাওয়া চাই।”

“ও তাই কও বাবু। তা দিদিমণির নৌকোর গেছে বাবু বাড়ী; তা নৌকো ঠিক কর দিচ্ছি।”

“নৌকায়?—সে ত জ্ঞানক দেবী হবে। অন্য কোন উপায় নেই?”

“তা বাবু পায়ে হেঁটে যেতে পার ত ভাড়াভাড়ি হ'তে পাবে। পথ বেশী নয়। কোশ-দশ হবে। সন্ধ্যে নাগাদ ইষ্টিশান পৌছবে। আটটার গাড়ী ধরতে পারবে।”

“পায়ে হেঁটে খুব পারব। তুমি পথটা আমাকে একটু দেখিয়ে দিও, তা'হলে আর ভাবনা থাকবে না।”

নিখিলনাথের কথাবার্তায় ব্যবহারে ভোলানাথের তাকে বেশ ভালই লেগেছিল। লঙ্কে দ্বিরে সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে নিয়ে নিখিল প্রস্তুত হয়ে ভোলানাথের সঙ্গে বেড়িয়ে পড়ল। পথ বলতে সেখানে কিছু নেই। মাইল চারেক পথ চা মাঠের মধ্যে দিয়ে দিয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাস্তা পাওয়া যায়; সেই পর্যন্ত ভোলানাথ তাকে পৌছে দিয়ে এল।

পথে ভোলানাথের সঙ্গে গল্প করতে করতে নিখিল সব জেনে নিতে লাগল। গল্পে গল্পে ভোলানাথ বললে, “তা বাবু এত বড় জমিদারী, তা এত পর ভোণ করবে কে? বাবু ত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতায় থাকে, মাসে এক দিন ঐ কমলাপুরীতে যায়।”

“কেন বাবু বাড়ী যান না?”

“না বাবু, আগে যাও বা যেত এখন আর দু'বছর ওমুখো হয় না। আর পুরী খাঁ খাঁ করছে, কার তরেই বা যাবে বল।”

নিখিল জিজ্ঞেস করলে, “কেন বাবুর ছেলের পিলে নেই?”

“আর বাবু, ছেলে? সেনার চাঁদ ছেলে ছিল, বুকে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়। তা অদেই বাবু, কিছুই ত রইল না।” বলতে বলতে ভোলানাথের চেখ ছলছল ক'রে উঠল।

লজ্জিত হয়ে নিখিল বললে, “আহা! তা ভোলাদা দুঃখ ক'রো না, মরা-বাঁচা ত কাকুর হাত নয়।”

ভোলানাথ বললে, “ষাট, ষাট, মরার কথা নয় বাবু

মরলে বরষ সওয়া বায়। কোথায় যেন মিলিয়ে গেল বাবু। কত খুঁজলাম, তা আর পাওয়া গেল না। সেই থেকে বোমার শোকে বাবু কতদিন একেবারে পাগল-পারা হয়ে রইল। তার পর বেলাত চল গেল। ফিরে এসে বোমার নামে ঐ কমলাপুরী করলে। সে আজ পাঁচ-ছয় বছর হ'তে চলল। এদ্বিন কি আর আছে বাবু? তা বাবুর মতিগতি খারাপ নয়। আর বে-থা করলে না। সেই মাঝে মাঝে প্রাণে গিয়ে থাকে। ঐ খেনেই কুম্ভমেলায় বোমা হেরিয়ে যান কি না। এবারে কোথায় যে গেল আমাদের সঙ্গে নিলে না। কত বললুম তা স্তনলে না। গেছে ঐ প্রাণেই ঠিক।" ব'লে সে অজ্ঞমনস্ক ভাবে চিন্তামগ্ন হ'য়ে চলতে লাগল।

নিখিল আর কোন প্রশ্ন করলে না। আর কোন প্রশ্নের আবশ্যকও ছিল না তার। তার মনে আর সংশয় বড় ছিল না।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় তুলে দিয়ে ভোলানাথ কিরে গেল। চিন্তায় নিমগ্ন নিখিল পথপ্রমের কষ্ট সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে চলতে লাগল। তার মনে নূতন আশঙ্কা ঘনিষে উঠেছে। সীমা যে সম্প্রতি শতীন্দ্রনাথের অহুসন্ধানেই তার গ্রামে গিয়েছে এ-বিষয়ে তার আব কোন সন্দেহমাত্র রইল না। এতে শতীন্দ্রের বিপদ কল্পনা ক'রে নিখিলের মন অত্যন্ত বিচলিত হ'ল। রক্তলালের কবলে পড়লে শতীন্দ্রনাথের যে কি পরিণাম হবে সম্প্রতি নন্দলালের হত্যার পর তা কল্পনা করতেও তার মন কণ্টকিত হয়ে উঠছিল।

শতীন্দ্রনাথ যদি সত্যিই জ্যোৎস্নার স্বামী হয় এবং তার সমূহ বিপদ জেনেও যদি নিজের মোহের দুর্বলতায় তাকে সেই বিপদে রক্ষা করবার চেষ্টা সে না করে, তবে সে অসহায় জ্যোৎস্নার শুভাঙ্কন্যায়ী সেজে তারই সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করা সম্বন্ধে নন্দলালের চেয়ে কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? চিন্তার বেগে তার চলার গতিও বেড়ে চলল। উদ্বেগনার আবেগে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, যেমন ক'রেই হোক সীমাকে সে নিবৃত্ত করবে—শতীন্দ্রের সর্বনাশ সে ঘটতে দেবে না।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। বিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তসীমায় সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটায় দিকচক্র অতুরঞ্জিত। স্ত্রীমায়ায়

ব্যাপ্ত আকাশের তলে জনমানব-পরিশৃঙ্খল রিরাট প্রান্তরের মধ্যে দিশাহারা দীর্ঘপথ আশা আনন্দ আশ্রয় বিহীন। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ আপনার অগ্নিদাহে যেন মুচ্ছাতুর। ক্লাস্ত চরণ চলতে আর চায় না। তবু তার বিশ্রাম করবাব অবসর নেই। পথ এখনও মাইল চারেক বাকী।

ষ্টেশনে যখন সে পৌঁছল ট্রেন আসতে তখন আর বড় বিলম্ব নেই, বড় জোর আধ কটা। ছোট্ট ষ্টেশনটিতে তখনও তৈলাগচয়ের ভয়ে আলোঙলিকে সজীব ক'রে তোলা হয় নি। নিখিল সেই অন্ধকারপ্রায় প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা ক'রে নিচ্ছে। তার মনে ভয় ছিল যে সীমা সিংহঘোড়ে না নেমে হয়ত সোজা কলকাতায় চল গিয়েছে। খবরটা পাওয়া দরকার মনে ক'রে সে সোজা ষ্টেশন ঘরে ঢুকে সিংহঘোড়ের একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট চাইল। ফল কলূতে দেবী হ'ল না। একে প্রথম শ্রেণী, তায় সাহেবী পোষাক, গ্রাম-অঞ্চলে এ মণিকাকুন বড় মেলে না। ষ্টেশন-মাষ্টার ভারি খাতির ক'রে নিখিলকে বসালে। সন্ধ্যাবেলায় যে দু-এক জন বৃদ্ধের পাশা খেলতে সেখানে সমাগম হয় তারাও নিখিলের উপর সসম্মম দৃষ্টি রেখে নড়ে-চড়ে ভাব্য হয়ে বসল। নিখিল সবিনয়ে তাদের নভ হয়ে নমস্কার জানিয়ে একটু-আধটু খোঁজখবর নিতে লাগল। সাহেবের সমতুল্য একজন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে এমন বিনীত ঘরোয়া রকমের আলাপপরায়ণ মেখে মহা খুশী হ'য়ে বৃদ্ধদ্বয় গল্প জুড়ে দিলে।

নিখিলনাথ শতীন্দ্রের পরিচিত নয় জেনে তাদের রসনা চটুল হ'য়ে উঠল। বললে, "হ্যাঁ, জমিদার ছিল বটে শতীন সিংহীর বাপ। তার দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। আর এ একটা মহম্মদ নয়। একটা বৌ হারিয়ে যে পাগল হয়, সে আবার কি একটা মাহম্মদ? বৌ গেছে গেছে, তার কি হয়েছে? এতবড় জমিদারী, আবার বে-থা কর, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থা। তা নয়, বিলেত গিয়ে ঐষ্টান হয়েছে। আবার শুনতে পাই, বিলেত থেকে একটা ঐষ্টান মাগী এনেছে, তাকে দিয়ে বিবাহদের সব ঐষ্টান করাবার মতলব। শুন্ছি তাকে নাকি বে করবে। ধর্ম্ম আন্ধ রাখলে না।"

নিখিল-জিজ্ঞেস করলে, “দেখেছেন তাকে ?”

“দেখব না কেন ? এই ত সেদিন আর একটা মেয়ে নিয়ে সিঁধোড়ে গেল। কি মতলব, সেই জানে।”

ট্রেন এসে পড়েছিল, স্বতন্ত্র কথাবার্তা আব চলল না।
বুদ্ধদেবকে নমস্কার করে নিখিল বেরিয়ে গেল।

জমিদার বাড়ী যখন গিয়ে সে পৌছল তখন রাত অনেক।
গ্রামের পক্ষে তখন নিশুতি রাত। তার সেবা-যত্ন-খাতিরের

কটি হ'ল না বটে, কিন্তু ম্যানেজারের শরীর অসুস্থ থাকার তাঁর সাক্ষাৎ সে রাজে আর সে পেল না। পার্শ্বতীরা যে কলকাতায় চলে গেছে সে সংবাদ দরওয়ানের কাছেই সে জেনেছিল। ক্লান্ত দেহ এবং চিন্তাকুল চিত্তে সে সমস্ত রাত নিশ্চীর্ণ হ'য়ে বিছানায় প'ড়ে রইল। দুর্দৈব পদে পদে তাকে ব্যাহত করছে মনে ক'রে। একটা দুর্দমনীয় সর্বনাশের আশঙ্কায় মনটা তার পূর্ণ হ'য়ে উঠল। (ক্রমশঃ)

অন্তঃসলিল

ত্রিবিভূতিভূষণ গুপ্ত

লোকে বলে বুদ্ধা; কিন্তু হিমি-ঠানদি তাহা স্বীকার করেন না, বরং উষ্ণ কর্তে বলিয়া থাকেন, গোড়ার-মুখোদের কথা শুনেছি। কিন্তু—এই ত সেদিনের কথা, কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছুটোছুটি ক'রে পাড়া মাতিয়ে তুলতুম। নালুদের গাছ থেকে কৌচড়-ভাঙি জামরুল নিয়ে এসে বিলিয়ে দিয়েছি। দেশগাঁয়ে ত থাকিস নে, জানবি কি ক'বে। ঠানদি খামিলেন—চোখ বুজিয়া অতীতকে বোধ করি চোখের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া আর একবার অনুভব করিয়া পুনশ্চ তিনি কহিলেন, ওদের নজর শুধু বাবার টাকার দিকে জানিল বিশ্বনাথ। ওদের মুখে যদি না আমি ছাই তুলে দি তবে আমার নাম—

হেমাঙ্গিনী বুদ্ধা হইয়াছেন একথা সত্য, কিন্তু যে লোক তার বয়সের অঙ্কটা কিছু হ্রাস করিয়া খুশী থাকিতে চান তাঁহাকে এই সামান্য আনন্দটুকু হইতে বঞ্চিত করিতে আর যাহারা চান করুন, কিন্তু ইহাকে আমি ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। ঠানদির পক্ষাবলম্বন করিয়া কথা বলিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণের টাকাটিকানী শুনিয়া থাকি—কথাগুলি মর্শাস্তিক হইলেও এখন কতকটা গা-সহ্য হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া কেন জানি না এই সামান্য কয়েকটা দিনের মধ্যেই আমি রূঢ়ভাবী কদাকার চেহারা ঠানদিটিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।

আমার নীরবতাকে লক্ষ্য করিয়া ঠানদি পুনরায় কথা কহিয়া উঠেন, আচ্ছা তুই-ই বল বিষ্ণু ওদের কি চোখ নেই রে, এই ত কয়েকটা বছর আগে রাজা চেলী প'রে পাঙ্কী ক'বে স্বস্তরঘর করতে গিয়েছিলাম। কে যিরে আসত নাপু। নিজের চেহারা করলে বেইমানী, তা ছবব ক'কে। এই চেহারা নিয়ে কখন পুরুষমানুষ বর করে!

ঠানদি তাব দস্তহীন মুখে খানিক করুণ হাসিলেন—
তাঁর বিগত দিল্লির অতৃপ্তির হাহাকাব সে-মুখে আর্জনাৎ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠানদির জীবনের এই ইতিবৃত্ত আমি এরই মধ্যে অবগত হইয়াছি। তাঁর কুৎসিত চেহারা বাপের অগাধ পয়সাও চাপা দিতে পাবে নাই—বিবাহের অনতিকাল মধ্যেই ঠানদিকে তাঁর বাপের কাছে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাঁর বাল্য-ইতিহাসও বৃদ্ধমহলে আলোচিত হইতে শোনা যায়। সুপারির খোলায় চোঙা তৈয়ারী করিয়া তবে লালমোহনদের কাঁচামিঠা আমগাছতলায় মধ্যরাত্রে শিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কবে গ্রাম গুপ্তের ছোট ছেলেটা সন্ধ্যার প্রাকালে তাঁহাকে দেখিয়া বেহীন হইয়া পড়িয়াছিল—একথা শুনিয়া শুনিয়া এত পুরান হইয়া গিয়াছে যে উঁহার পুনরাবৃত্তি নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ

বাহা প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা সম্ভবত চিরদিন আমার মনে থাকিবে। মনে থাকিবে কেমন করিয়া মাছুষের অতৃপ্তি তার চেতনার সহিত সংগোপনে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া থাকে।

দশজনাতে ঠানদি এড়াইয়া চলেন, বলেন, কাজ কি বাপু আগাছা জড়ো করে। কিন্তু আগাছা আপনি হয়—রোপণ করিবার প্রয়োজন হয় না।

পাশের বাড়ীর হরিহর খুড়োর ছোট মেয়ে শ্রামলীকে প্রায়ই ঠানদির গা বেঁধিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি। মা-মরা ছোট মেয়ে সকলেই একটু বিশেষ চোখে দেখেন। ঐ অতটুকু মেয়েটিকে তার মাতৃবিরোধের কথাটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দিয়া আপশোষ করেন। বউরা বলে, আহা এই বয়সেই মা-মাগীকে খেয়ে বসে আছি! মাতার মৃত্যুকে আজকাল সে ভাবিয়া দেখে। ঠানদিকে সেদিন তার মার বিষয় বহু প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছি। ঠানদি উত্তরের পরিবর্তে তাড়না করায় মেয়েটা পলাইয়া তাঁর হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।

দাওয়ায় বসিয়া জাল বুনিতেছিলাম, কিন্তু হাতের কাজ আমার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। পুনরায় গোটা-দুই ফাঁস বুনিত্তেই শ্রামলীর কণ্ঠস্বর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। “দাও না তোমার পাতের ছুটি পেসাদ খেতে দিদিমা।” ঠানদি মারমুখী হইয়া উঠিলেন, ছুটি খেতে পর্যন্ত দেবে না হতভাগী—দূর হ বলছি। মুখপুড়ী বাপের কাছে খেতে পারিস নে। শ্রামলী হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

এই দৃশ্যটি রোজই অভিনীত হয়। আশ্চর্য্য হইলাম না। কিন্তু রোজই ভাবি, ঐ একরকমি মেয়ে কেমন করিয়া ঠানদির অন্তরের খোঁজ পাইল।

শ্রামলী বলিতে লাগিল, আচ্ছা যাচ্ছি দূর হয়ে, তখন আবার পাকা চুল তুলতে বললে আর আসছি নে কিন্তু। শ্রামলী ঠানদির আরও সন্নিহিত অগ্রসর হইয়া আসিল, আদ্যার করিয়া কহিল, আজকে তোমার বরের গল্প বলতে হবে দিদিমা, নইলে আমি শুনব না। ঠানদির পিঠের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া, এক হাতে তাঁর কণ্ঠ বেটন করিয়া পুনশ্চ বলে, সেই যে রাডা ঢেলী পংরে খন্তরবাড়ী যাওয়া...

তোমার বাবার কান্না...হ্যাঁ ঠানদি, তোমার বর খুব স্বন্দর ছিল, না? ঐ যাত্রার দলের কেউর চেয়েও?

ঠানদি তাকে এক হাতে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে থাকেন, অত কি আর মনে আছে মুখপুড়ী—তুই একরকমি মেয়ে, অত খবরে কাজ কি! ঠানদি এক গ্রাস ভাত শ্রামলীর মুখে পুরিয়া দিলেন।

হাতের কাজে আমার মন বসে না। একাধিচ্ছিত্তে এই দুই কাঁচ-পাকার কথোপকথন শুনিতে থাকি। এ এক অন্তত কৌতুহল আমাব।

শ্রামলী পুনরায় প্রশ্ন করিল।

ঠানদি বেশ উৎসাহের সহিত গল্প বলিতে লাগিলেন। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। তাঁর মাতাপিতার অশ্র-সজ্জল বিদায়কণ হইতে আরম্ভ করিয়া বেহারাদের পরিশ্রান্ত কণ্ঠের হুম হুম শব্দটি পর্যন্ত তাঁর গল্প হইতে বাদ পড়িল না। কিন্তু শ্রামলীর ইহাতে মন ওঠে না, বলিতে থাকে, তুমি ফাঁকি দিচ্ছ দিদিমা। তোমার বাবা যে সোনার গয়নাগুলো দিয়েরছিল তার কথা একেবারে বল নি। সেই যে গো তোমার গা থেকে টেনে খুলতে গিয়ে হাত কেটে রক্ত বেরিয়েছিল। মাগো, তোমার বরটা কি যাচ্ছেতাই।

ছেলেমানুষের আবোলভাবোল বকিয়া দাওয়া ইহা লইয়া ধামকা মাথা ঘামাইবার মত কোন বৃত্তিই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। কিন্তু ঠানদির কোটরগত চোখ দুইটা সহসা ধক ধক করিয়া জলিয়া উঠিল। শ্রামলী সভয়ে চুপ করিল। ঠানদি বাজিয়া উঠিলেন, মরবার আর জায়গা পাও না, আমায় এয়েছো জ্বালাতে।

চোখ তুলিয়া দেখি শ্রামলী তত ক্ষণে সরিয়া পড়িয়াছে। আর ঠানদি আপন মনে বকিয়া চলিয়াছেন, যত সব আগাছা—দেব রেটিয়ে বিদায় করে...এ-শুণ নেই সে-শুণ আছে... বাপ ত দিনান্তে ডেকেও জিজ্ঞেস করে না...সংমা বেটাও হয়েছেন সাপের সলুই...দেবে এখন খেতে পিঠের উপর দিয়ে।

ঠানদি জোরগলায় হাঁকিলেন, এক বার এদিকে শুনে বা বিণ্ড। হাতের কাজ শুটাইয়া রাখিয়া ঠানদির কাছে উপস্থিত হইতে আমার একটু বিলম্ব হইয়া গেল। ঠানদির

কণ্ঠস্বব পুনরায় শোনা গেল, হাতের এ-পিঠ আর ও-পিঠ...সব সমান...এই বিশেষ্টাই কি কিছু কম যায়। আমি সাড়া দিলাম,—অত বকছ কি ঠানদি? ঠানদি শূন্যে আশ্ফালন করিতে লাগিলেন, ভালমানুষ সেজে ব'সে আছেন যেন কিছু বুঝি নে আমি। ঠানদির ব্রকম দেখিয়া আমার হাসি পাইতেছিল। তাঁর এই ধরনের মধুর আপ্যায়ন রোজই আমার অদৃষ্টে জুটিয়া থাকে। ঠানদির চোখের সম্মুখে গিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিলাম, তোমার হ'ল কি ঠানদি?

ঠানদি বাক্য দিয়া উঠিলেন, সে-খববে তোর দরকার কি। এসেছেন যায়া দেখাতে, যেন ঐ যানাকান্নায় আমার মন ভিজবে। এই যে মেয়েটা না খেয়ে রাগ ক'রে চ'লেই গেল, জানি ত আজ আর বরাতে ভাত জুটবে না—তা ব'লে ডেকেছি একবার। খেল খেল, না-খেল না-খেল—বয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শ্রামলী আসিয়া ঠানদির অঞ্চলাগ্র ধরিয়া তার গা বেঁধিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম—কিন্তু না-দেখার ভান করিয়া বলিলাম, মেয়েটা না খেয়ে থাকবে—আমি বরং ডেকে আনছি।

আমার এই অভিনয় করিবার প্রয়াসটুকু ঠানদি বিফল হইতে দিলেন না। আমি নীরবে সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমাব কোতুলী চক্ষুজোড়া ওদের প্রহরায় নিযুক্ত রহিল।

ঠানদি শ্রামলীর হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ভাতের থালায় কাছে বসাইয়া দিলেন, কহিলেন, এগুলো গিলবে কে শুনি?

শ্রামলী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, আমি—আমি দিদিমা—মধ্যপথে হঠাৎ থামিয়া গিয়া শ্রামলী পুনরায় কহিল, তোমার ঘরে আমি আর থাক না। ভূমি মাকে বলেছ তোমার জিনিষপত্র আমি চুরি ক'রে খাই।

পুনরায় ঠানদির ডাক আসিল, শোন বিশে শোন, মেয়েটার কথা শুনে যা।

এবারে আর বিলম্ব হইল না।

ঠানদি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, তুই ত বাপু দিনরাত ঘরেই ব'সে আছিল, শুনেছিল আমার মুখে এমন কথা কোন দিনও? ঠানদি এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন

যেন আমার একটি মাত্র উত্তরে সকল গোলযোগের অবসান হয়। আমি কথা কহিলাম না। ঠানদি পুনরায় কি বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠানদির এমন ধৈর্যচ্যুতি আমার চোখে এই প্রথম। বিস্ত্রিত বিহ্বল দৃষ্টিতে আমি তাঁর শীর্ণ, লোল, কদাকার মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে-মুখে কেমন একটা ভীতিব্যাকুল ভাব, যেন কেহ জোর করিয়া তাঁর পাজরের হাড় ক-খানা খুলিয়া লইতে বল প্রয়োগ করিতেছে।

শ্রামলী একবার আমার, একবার ঠানদির মুখেও প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বলিতে লাগিল, বা রে ভূমি কাঁদছ কেন... আমি ত আর তোমায় কিছু বলি নি। ভূমি বল না বিগুদা—

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও আমি বলিতে পারিলাম না। বলিবার মত আছেই বা কি। তা ছাড়া এমন করিয়া কাঁদিতে ঠানদিকে আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই। আজিকার ঘটনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। ঠানদির বাহিরের কাঠামোটাই যে তাঁর অন্তরের প্রতীক নয়—এখবর আমি বহুবার পাইয়াছি কিন্তু তবুও তাঁকে এফুটু আলাদা চোখে দেখিতাম। ভাবিতাম, নারীর স্বভাব-কোমলতার সত্যকারের অভাব তার মধ্যে বড় বেশী, তাইতেই তাঁর বহিরাবরণ এত রুক্ষ। কিন্তু আমার সে ধারণা আজ উল্টাইয়া গেল। ঠানদির দিকে চাহিয়া আমার থাকিয়া থাকিয়া মনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এমনি কান্না আমি তাঁর চোখেও একদিন দেখিয়াছিলাম যেদিনে ইচ্ছারঞ্জের হইয়া বুদ্ধ করিতে আমি দেশত্যাগ করিয়াছিলাম। আজ মা বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তাঁর সেই অশ্রুসজল মুখখানা যে আমি ভুলি নাই তাহা আজ নূতন করিয়া পুনরায় উপলব্ধি করিলাম।

ঠানদিকে আমি যতটা জানি যতটা চিনিয়াছি এতটা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়, এমনি এবটা মিথ্যা অহংকার আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু আজ আমি আমার বুঝা দস্তক শাসন করিলাম।

ঠানদি সজল চোখে আমার প্রতি চোখ তুলিয়া যত্নবশে কহিলেন, মেয়েটাকে ওরা সময়মত খেতে দেয় না, কণায় কণায় কিং চড়টা লেগেই আছে। পায়ে পড়ে ঘুরে বেড়ায়—

একটা মায়া পড়ে গেছে। নইলে কি এমন আমার দায় ঠেকেছে। সেদিনে মেয়েটাকে বলেছে, ও-বুড়ী কাছে যাস নে, ও ডান...সেইদিনই দিয়েছিলাম দূর করে...তবুও আমার পিছু নেবে। ঐ একরত্তি দশ-এগার বছরের মেয়ে, মেয়ে ত আর তাড়িয়ে দিতে পাবি না। আচ্ছা তুই-ই বল সে-দোষ কি আমার—

দোষ কাহার? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিলাম। ইচ্ছা হইতেছিল বলি, দোষ তোমার নয় ঠানদি, দোষ তোমার কালো কদাকার দেহের অস্থায়ী ঐ মাংসপিণ্ডটার, আর তোমার বাপের জমার অর্ধটার। কিন্তু মুখে আমি কোন কথাই কহিলাম না। নিজের শ্রীহীনতার দৈন্ত্য বার প্রতি কথায় ও কাজে অহরহ প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে সে-কথা স্মরণ করাইয়া দিবার মত নিষ্ঠুরতা আমার মধ্যে নাই।

সহসা ঠানদি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রামলীর পিঠের উপর ঘা-কয়েক বসাইয়া দিয়া কহিলেন, দূর হয়ে যা আমার চোখের স্মৃৎ থেকে। তোর মাকে বল গে দিদিমা আমার মেয়ে তাড়িয়ে দেছে। ঠানদি আশ্ফালন করিতে লাগিলেন। যত সব আগাছা-পবগাছা কেটে সাফ করে ফেলব। মেয়েটা কিছু সময় ঠানদির মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বিমর্ষ মুখে প্রস্থান করিল।

আমার অলক্ষ্যে ঠানদি তাঁর চোখের জল মুছিয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু আমার সঁজুত দৃষ্টিতে তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। হায় রে দুর্ভাগা মেয়েটা, কেমন করিয়া তুই বুঝিবি তোকে তাড়না করিবার অন্তরালে কতখানি স্নেহ লুকাইয়া রহিয়াছে ঐ ক্লান্ত-মেজাজ ঠানদির অন্তরে। বুঝিলাম সবই মিথ্যা, তথাপি প্রতিবাদ করিলাম, লোকের কথায় কি এসে যায় ঠানদি—মেয়েটাকে মারধর করে যখন নিজেই তুমি সকলের চেয়ে বেশী ব্যথা পাও তখন এ মিথ্যা আশ্ফালনে লাভ কি! লোকের কথায় ত আর গায়ে ফোঁস পড়ে না।

ঠানদি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, আমি বলিই এত দিন পড়িনি, তোদের হ'লে যা হয়ে যেত রে বিত্ত।

ঠানদি আর দাঁড়াইলেন না।

মনটা আমার ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। সারাদিন আর ঠানদির সাক্ষাৎ মিলিল না। শ্রামলীর দেখা বার-কয়েক

মিলিল। এত তাড়না খাইয়াও মেয়েটা ঘুর-ঘুর করিয়া ঠানদির ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া কিরিতে লাগিল। আমার কাছে আসিয়াও সে বহু প্রশ্ন করিয়াছে—ছেলেমাছুষী প্রশ্ন, কিন্তু সাদা মনের অকপটতা তার প্রতিটি কথায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রামলী বলে, দিদিমার ভাতগুলি তেমন পড়ে আছে বিত্তদাদা, আমি জানালার ফাঁকে দেখে এলাম।

বুঝিলাম, অতুস্ত মেয়েটাকে তাড়াইয়া দিয়া ঠানদিও উপবাসী আছেন, কিন্তু সে-কথা এই বালিকাকে বুঝাই কি করিয়া। বলিলাম, ঠানদির শরীর ভাল নেই, তাকে বিরক্ত করতে যাস নে শ্রামলী। মেজাজটা আমারও তেমন ভাল ছিল না, হয়ত শ্রামলীর প্রশ্নের স্বাভাবিক উত্তর আমি দিতে পারি নাই, অথবা যাহা দিয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ ক্লান্তভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রামলী কি বুঝিয়াছে জানি না, কিন্তু তার পরেও তাকে বার-কয়েক ঠানদির ঘরেব আশেপাশে দেখিয়াছি, অথচ আমি ডাকাডাকি করিয়াও আর তার সাড়া পাই নাই।

ঠানদি দিনরাত 'দূর দূর' করিয়াও যাহা পারেন নাই: আমার একটি মাত্র ক্লান্ত কথা তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করিয়াছে। তাই ত ভাবি, একরত্তি ঐ মেয়েটা কি একখানা আয়না যে এমনি করিয়া অন্তরের প্রতিবিম্ব তার বুকে প্রকাশ পাইতেছে। ছোট্ট মেয়ে মনস্তত্ত্বের ধার ধারে না, অথচ মানুষকে যাচাই করিবার কি নির্ভুল অদ্ভুত ক্ষমতা, আমার আস্থানকে শ্রামলী উপেক্ষা করিয়াছে—ভালই করিয়াছে, আমার দৃষ্টিকে পদাঘাত করিয়া।

কেন জানি না হঠাৎ মনটা আমার বড় প্রশস্ত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল, মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করি, মানুষকে চিনিবার এ তীক্ষ্ণ অলঙ্কার তুই কোথায় পেলি? কিন্তু মনের এ-পাগলামি মনেই চাপিয়া রাখি।

সন্ধ্যার প্রাকালে ও-পাড়ার নরেশ আসিয়া জানাইয়া গেল, তাদের পাড়ায় আজ মুহম্মদ দাসের গান আছে। যাত্রাগানে আমার আকর্ষণ নাই, কিন্তু মুহম্মদ গানের প্রশংসা আমি স্মৃদ্র প্রবাসেও শুনিয়াছি।

ঠানদির দরজায় আঘাত করিলাম, বলিলাম, সন্ধ্যা হচ্ছে এসেছে ঠানদি। ঠানদি তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠে বাক্য দিলেন,

সে হুঁস আমার আছে, মিছে বিরক্ত করিস নে বিশ্বনাথ।

কথা বাড়াইবার ইচ্ছা আমারও ছিল না, তথাপি কহিলাম, ওগারে মুকুন্দর ষাড়াগান আছে, যাবে নাকি ঠানদি?

ঠানদির আর সাড়া পাওয়া গেল না। আমাকে বাধ্য হইয়া নিজের পথ দেখিতে হইল।

পৌছাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। গান তখন প্রায় আরম্ভ হয়-হয়। কোন রকমে কষ্টেহুটে এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিবার মত একটু স্থান হইল। গান শুরু হইয়াছে। ঘন ঘন হাততালিও কানে আসিতেছিল, কিন্তু সব ছাপিয়া থাকিয়া থাকিয়া আমার ঠানদির কথাই মনে পড়িতে লাগিল। হয়ত তিনি এখন তেমনি অতুল্য অবস্থায় গৃহকোণে পড়িয়া আছেন—হয়ত শ্রামলী তার অপরিণত মনের দুর্বীর টানে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঠানদির গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত ফিরিয়া যাইতেছে।

বিবাহ আমি করি নাই। থামকা দরজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ কি। লোকে বলে আমি রুঢ়, দয়ামায়াহীন, যেহেতু আমার পিছুটান নাই। তাই ত ভাবি, মাহুষ তার কল্পনায় রং চড়াইয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া কত বাহাদুরীই নেয়।

গান শোনার মত মন আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। পকেট হইতে ঘড়িটা বাহির কবিলাম। রাত নিতান্ত কম হয় নাই। বারটা। উঠিয়া পড়িলাম। হেমন্তের শেষ। অঙ্ককার রাজি, তায় গ্রামের পথ। রাস্তায় জনমানবের সাড়া নাই। দুই হাতে কুয়াশা-সিক্ত অঙ্ককারকে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সঙ্গে একটা চর্চ পর্য্যন্ত নাই। পায়ের পাশ দিয়া সড়াং করিয়া কি একটা সরিয়া গেল। সাপ নয়ত... যদিও শীতের স্পর্শ পাওয়া যাইতেছিল। এইটুকুই যা ভরসা। সূচীভেদ্য অঙ্ককাব... আশেপাশের ঘন সন্নিবেশিত গাছের ফাঁকে ফাঁকে আজ এই প্রথম উহার রূপকে উপলব্ধি কবিলাম। কর্মজীবনে এমনি কত অঙ্ককার রাজে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, কিন্তু প্রকৃতি কোন দিনই আমার আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আজ সেদিন আর আমার নাই, চোখের দৃষ্টি আমার বদলাইয়া গিয়াছে। ভূত-প্রেতে আমার বিশ্বাস আছে, যদিও চোখে কখন দেখি

নাই। বুকে সাহস আছে, দুসাহস নাই। সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতেছিলাম। বাড়ীর সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছি। আর খানিক অগ্রসর হইতে পারিলেই আমার গান শুনিতে যাইবার দুর্ভোগের সম্ভব হয়। কিন্তু সহসা সম্মুখে একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হাঁক দিলাম, কে?

ঠানদির গলার সাড়া পাইলাম, কে, বিঘ্ন? গান শেষ হয়ে গেল বুঝি?

বিস্মিত হইলাম, এত রাজে এ পোড়ো ভিটায় ঠানদির কি প্রয়োজন থাকিতে পারে। আরও খানিক অগ্রসর হইলাম। ততোধিক বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম, তোমার মাখায় ওগুলো কি ঠানদি?

ঠানদি শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বহিস কেন আর... তা এ এক রকম মন্দ নয়... অবলা জীব, কথ কইতে ত আর পারবে না। বুঝিলাম না ঠানদি কি বলিতে চান। পুনরায় একই প্রশ্ন করিলাম। ঠানদি কহিলেন, ছাগলছানাটার জন্য দুটি কাঁঠালপাতা নিয়ে এলুম ভট্টাচার্য্যদের বাগান থেকে। দিনের বেলায় কি আর আনবার ঘো আছে। আহা! অবলা জীব, দুটি পাতা খেতে গিয়েই না পা খোঁড়া করে এল। ভট্টাচার্য্য ঠাকুরের কি মায়াদয়া আছে।—

বুঝিলাম ঠানদির এ-আয়োজন তাঁর বছর-দুয়েকের লম্বিত পুঁকুঁ ছাগলটির জন্য। মাহুষের বাছে যে-ভালবাসা তাঁর আশ্রিত থাইয়া প্রতিহত হইয়াছে, তাহারই খানিক, আজ নিতান্ত সামান্য কারণে ছাগলটির উপর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ঠানদি পুনশ্চ কহিলেন, মা-মরা ছাগলছানাটা কতকাষ্টে এত বড় করেছি, তার ওরা কি বুঝবে। তেমনি আমিও হিমি বামুনি... নিম্নে এসেছি বামুনের পার সব ক-টা চারা গাছ উগুড়ে।

অঙ্ককারে পথ চলিতে চলিতে ঠানদি পুনরায় কহিলেন, মেয়েটার জন্তে সভ্যই মায়া হয় কিন্তু ওরও যে মা নেই।

আমি নীবব রহিলাম।

ঠানদি বলিতে লাগিলেন, দিনরাত মুখ করি তও আমার কাছে ঘুরে ফিরে আসে। সন্ধ্যাবেলা ছুটে এসে

বললে, দিদিমা তোমার ছাগলকে ওরা মেবে ফেললে গো।
কতক্ষণ আর চূপচাপ থাকা যায়। দরজা খুলতেই হ'ল।
একটু থামিয়া ঠানদি পুনশ্চ করণ কর্তে কহিলেন, মেয়েটাকে
যে একটু প্রাণ ভরে আদর করব তাও ভয় হয়।

অবাক হইলাম। কথাটির সত্যতা সম্বন্ধে আমারও
শিষ্যত নাহি। ঠানদির আদরে যে মেয়েটার গীড়ন আরও
বৃদ্ধি পায় এ কথা সত্য, কিন্তু এই সত্য যে ঠানদি এমন
করিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁর বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের
সংস্কার করিয়া লইয়াছেন এ-তথ্য আমার জানা ছিল না।
ঠানদির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিকে আমি সাধুবাদ দিলাম।

কথা বলিতে বলিতে আমরা ঠানদির ঘরের পশ্চাৎদিকে
আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঠানদি আর দ্বিতীয় কথা না
কহিয়া গৃহে প্রবেশ কবিলেন। আমি মন্দির পতিতে অগ্রসর
হইলাম।

এমনি ভাবেই দিন যায়।

জীবনের আরও গোটা-কয়েক বছর আগাইয়া গিয়াছে।
ঠানদিকে এখন অধর বসিলেও ভুল বলা হয় না। তত্পরি
দু-পায়ের আঙুল-কটা কি বিযাক্ত পদার্থ লাগিয়া খনিয়া
গিয়াছে। ভাল চলিতে পারেন না। চোখের দৃষ্টিও বাপসা
হইয়া আসিয়াছে। দিনরাত ঘরেই বসিয়া থাকেন। নিজ-
হাতে রান্না করিয়া খাইতে হয়। সেদিন ভাতের মাড়
গড়াইতে গিয়া হাত পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন। একটু
রাধুনী বামুনীর কথা বলিতে গিয়া ভাড়া কাইয়া আসিয়াছি।
ঠানদি বলেন, টাকার তাঁর গাছ নাই।

শ্রামলী বড় হইয়াছে। যৌবনের আভাস তার ফ্লেহে
দেখা দিয়াছে। লাজনত্র মেয়েটি,—বড় ভাল লাগে। কিন্তু
এ-দিকে আজকাল আর তাকে দেখা যায় না। মেয়ের উপর
স্বড়োব কড়া নজর। ঠানদিকে রান্না করিয়া দিবার
অপরামে তিনি তার বয়স্ক কন্ডাকে শাসন করিতে দ্বিধা
করেন নাই। পথে দেখা হইতে শ্রামলী সেদিন পিঠের
কাপড়টা সরাইয়া দেখাইয়াছিল। স্নান হাসিয়া বলিয়াছিল,
ঠানদিকে দেখবার কেউ নেই বিগুদা, তুমি তাকে দেখো।

বোকা মেয়ে জানে না ত তার বিগুদা কত বড়
অপদার্থ। নিজের একক জীবনই তার কাছে কতবড় বোঝ।
কিন্তু তথাপি নীরব থাকিতে পারি না। মাছুষ ত বটে।

চোখের সম্মুখে কত আর দেখা যায়। নিজের খাওয়া-দাওয়ার
ব্যবস্থা ঠানদির সহিতই করিলাম। ঠানদি খুশী হইয়াছেন
বুঝি, কিন্তু মুখে তিনি বিষ ছড়াইতে ছাড়েন না। আমার
আমোদ লাগে, হাসিয়া বলি, পয়সাকড়ি নিঃশেষ হয়েছে
ঠানদি কিন্তু পেট ত আর তা স্তনবে না। তা ব'লে
বেইমান নই আমি—থোটে দেনা শোধ দিচ্ছি।

ঠানদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, শোন কথা—আজকেই না-
হয় অচল হয়ে পড়েছি, নইলে এই হিমিও একদিন এক-শ
জন্য রান্না রেখেছে। ঠানদি থামিলেন। কিছু সময়
নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, ইয়ারে বিগু, সত্যিই কি
অভাবে পড়েছিল? না আমার জন্তে তোকেও হবিষ্য
করতে হচ্ছে?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব। একটু হাসিয়া পাঁচটা প্রশ্ন
করিয়া বসিলাম, তোমার কি মনে হয় ঠানদি?

ঠানদি হয়ত তাঁর প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছেই
পাইয়াছেন। তিনি নীরব রহিলেন।

ইহারই দিনকয়েক পরে ভোর হইতে-না-হইতে ঠানদির
ডাকাডাকিতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িতে হইল।
ব্যাপার কি। ঠানদির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি
কথা কহিয়া উঠিলেন, এ-কথা আমায় এত দিন বলি নি
কেন বিগু?

প্রশ্ন যে আমাকেই করা হইয়াছে তাহা বুঝিলাম,
কিন্তু ঠানদি কি যে বলিতে চান তাহা ঠাহর করিতে
পারিলাম না।

আমার নীরবতাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন,
তাই ত ভাবি মেয়েটা আর এদিকে আসে না কেন।
ঠানদির কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল, দেহে কি মাছুষের
চামড়া আছে। নইলে নিজের মেয়ের উপর এমন অত্যাচার
করতে পারে! পিঠের কোথাও জায়গা নেই বিগু।
মেয়েটার কি কান্না।

আমি কথা কহিলাম না।

ঠানদির কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া পড়িল, মেয়েটাকে ওর। মেয়ে
ফেলবে। কহিলাম, তাদের মেয়ে তারা মেয়ে ফেললেই বা
আমরা কি করতে পারি।

ঠানদি জলিয়া উঠিলেন, কেন পারি নে—এক-শ বার

পারি—হাজার বার পারি। কানাকড়ির মুরোদ নেই, বাপ হয়েছেন।

হাসিলাম। এ ছাড়া আর কি করিতে পারি। ঠানদি স্নেহবশে যাহাই বলুন না কেন, আমি ত বুঝি, পরের মেয়ের উপর আমাদের অধিকার কতখানি।

ঠানদি কথিয়া উঠিলেন,—হাসছিস—কিন্তু দেখে নিস বিশ্বনাথ, শুকে আমি জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব। এ কি মগের মূলুক ?

পুনরায় হাসিলাম।

ঠানদি থামিতে পারিলেন না—কালকেই তুই জেলার উকিল দিয়ে খুব কড়া এক নোটসু পাঠিয়ে দিস।

ভখনকার মত ঠানদিকে মানিয়া লইলাম। কতকগুলি যুক্তি দেখাইয়া ঠানদিকে নিরস্ত করার চেষ্টা এই পথ অবলম্বন করাই আমার কাছে শ্রেয় মনে হইল।

ঠানদি পুনরায় কহিলেন, সেদিনে কত যত্ন করে শ্রামলী আমায় রান্না করে খাওয়ালে। চমৎকার মেয়েটার হাত। খাসা রাঁধে। এ-সব কাজ কি আর পুরুষমানুষের। বলে মা-বাবা সব সময় চোখে চোখে রাখেন, নইলে তোমায় চাট্টি রান্না করে খাওয়াতে আমি রোজ পারি দিদিমা। মেয়েটা একটু রোগা হয়ে গেছে। আহা এমন মিষ্টি ওর কথা-কণ্ঠ।

একটু থামিয়া ঠানদি অল্প প্রসঙ্গে উপস্থিত হইলেন,—একটি ভাল পাত্র জোগাড় করতে পারিস ? মেয়েটার একটা গতি করে দিতাম। ওর বাপ এর বেলায় আপত্তি তুলবে না, সে তুই দেখে নিস।

কিন্তু দেখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই। এ-কথা আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি। শ্রামলীর জন্য উপযুক্ত পাত্র তন্মাস করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সেদিনকার মত ঠানদির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার অবসর আমি পাইলাম না। আমার দীর্ঘ চার বছরের অবকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে। সপ্তাহবানেকের মধ্যেই আমাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে। কথাটা ঠানদিকে সর্বপ্রথম জানাইয়াছি। বুঝিলাম না, আমার তিরোধান তাঁহার কতখানি বাজবে। তবে এ-কথা ঠিক, এই দীর্ঘ চার বছরে ঠানদিকে যতটা জানিতে পারিয়াছি

তাহাতে আমার মনে হয় যতখানি হাহাকার লইয়া পুনরায় কর্মক্ষেত্রে চলিয়াছি তার চেয়ে ঠানদি কিছু কম অল্পভাব করিবেন না। আমি তাঁর মধ্যে পাইয়াছি আমার মাহেদ্র। বিকাশ—আমার মায়ের রূপ।

ঠানদি আর আমার সহিত একটি কথাও বলিলেন না গ্রামত্যাগের পূর্বে শ্রামলী একবার আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমায় প্রণাম করিতে গিয়া পায়ের উপর করেক ফোঁটা চোখের জল কেলিল। এই কি কম পাওয়া। তার দু-খানি হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, ঠানদির দোড় গোড়ায় অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও তার সাড়া পেলাম না। একবার দেখা পর্যন্ত হ'ল না।

আমি চূপ করিলাম, শ্রামলী নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠানদির আজিকার এই প্রকাশ অবহেলা আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল, আমাকে জোর করিয়া পিছনে টানিতে লাগিল। পুনরায় কহিলাম, আজ এই কটা বছরে বেশ বুঝতে পেরেছি তুই ঠানদিকে ভালবাসিস, আমার কথা আলাদা শেকড় কোথাও গাড়ল না। রইলি তুই, রইল ঠানদি। তাঁর যত্ন নিতে চেষ্টা করিস, তোর ভাল হবে বোন।

ঝোঁকের মাথায় কথা-কটা বলিয়া চোখ তুলিয়া দেখি, চোখের জলে শ্রামলীর বুক ভাসিতেছে। আর অপেক্ষা করিলাম না। যাত্রা আমার শুরু হইল। একদিন যেমন অকস্মাৎ এদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম আজ আবার তেমনি অকস্মাৎ এদের ছাড়িয়া চলিলাম। কিন্তু এই আলাদা যাওয়ার কত প্রভেদ।

গ্রামকে কোনদিনই ভালবাসি নাই। আজও হৃৎ-গ্রামের প্রতি ততটা আকর্ষণ নাই। তবুও যেন মন কথিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছে “ফিরে চু”। ফিরিয়া যাওয়া হইল না, কিন্তু বুকের মধ্যে আঁকিয়া লইলাম শ্রামলী ও ঠানদিদিকে ঠিক পাশাপাশি। যদি কখনও ফিরিয়া আসি তা কেবল এদেরই জন্ত।

গ্রাম উচুনিচু রাস্তা ধরিয়া গুরুর গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া আমার গ্রামের জীবনযাত্রার একটা হিসাব করিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম শ্রামলীর কথা, ভাবিতেছিলাম ঠানদির কথা। এমনি করিয়াই মাসব্যাপী সংসারকে ভালবাসিয়া কেলে।

চোখ তুলিয়া চাহিলাম। বিস্মিত হইলাম না। বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করিলাম। অদূরে বটগাছতলায় যেখানে শ্রামলী দাঁড়াইয়াছিল তাহার পাশে ঠানদিও আসিয়া জুটিয়াছেন। হায় রে অন্ধশ্রম!

হাত নাড়িলাম—শ্রামলীর হাতখানাও নড়িয়া উঠিল। ঠানদি তার হাত দুখানা কোষ করিয়া চোখের উপর ধরিয়া এই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী বাকের মুখে অদৃশ হইয়া গেল।

ভাবিয়াছিলাম আর হয়ত ফিরিব না কিন্তু আমার ভাড়া স্বাস্থ্য আর জোড়া লাগিল না। টানাইচাড়া করিয়া আরও গোটা-দুই বছর চাকুরী করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পেন্সন লইয়া গ্রামে ফিরিলাম, কিন্তু এখন ভাবিতেছি কেহ আমার সার্থক হয় নাই।

কিছুদিন হইতে খুঁড়োই আমার কুঁড়েখানি দখল করিয়া বাস করিতেছিলেন। আমার আগমনে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে দখল ছাড়িতে হইল। কিন্তু যে-আগ্রহ লইয়া আমি গ্রামে ফিরিয়াছিলাম তাহার এক কণাও আর

মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। ঠানদি নাই। বছরখানেক হইল তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রাব অবগান হইয়াছে। শ্রামলী করিয়াছে আত্মহত্যা। অনেকের মুখে অনেক গুজব শুনিলাম, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করি নাই—ভয় হইল, কি জানি কি রূঢ় সভ্য আবিষ্কৃত হয়।

কিন্তু গুদের কাহাকেও আমি মন হইতে বিদায় দিতে পারি নাই। ঠানদির শূন্য ঘবের দিকে চাহিলেই একসঙ্গে আমার চোখের সম্মুখে দুইখানি ভিন্ন আকারের মুখ ভাসিয়া উঠে। রাস্তাব পাশেব বটগাছটার পাশ দিয়া চলিতে গেলেই আমার বুকের মধ্যে হাহাকার করিয়া ওঠে—চোখের সম্মুখে শ্রামলী ও ঠানদি আসিয়া দাঁড়ায়। মনে পড়ে বিদায়ক্ষণের একখানি জীবন্ত ছবি।

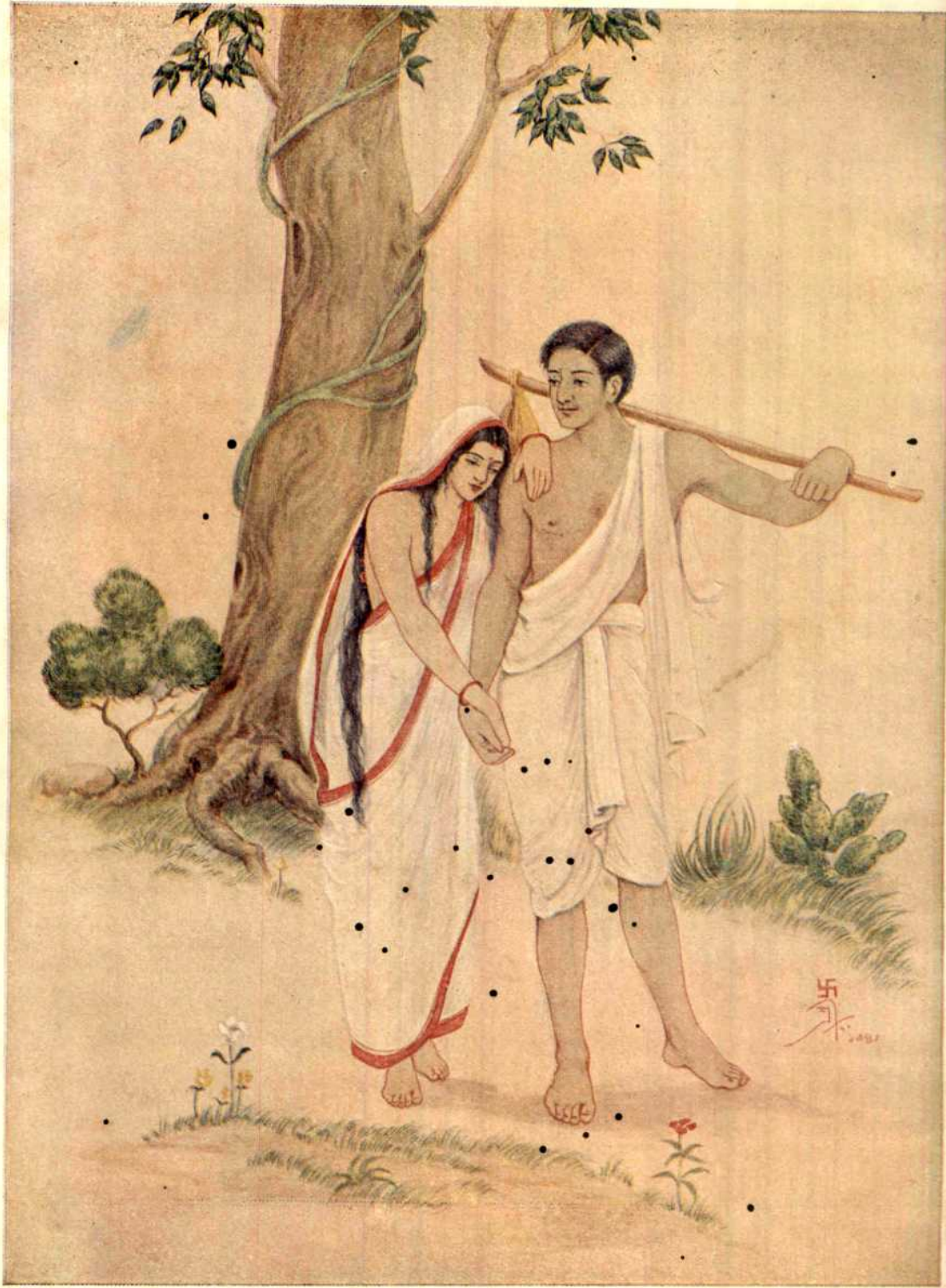
যারা ছিল তারা নাই! এই গ্রাম হইতে নিশ্চিহ্নে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে তাহারা অক্ষয় অমর হইয়া রহিয়াছে। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব আমার চেতনার সহিত উহারা নিবিড় ভাবে জড়াইয়া থাকুক—এর চেয়ে বড় কামনা আপাততঃ আমার নাই।

একদা

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক দিন এসেছিলে নিকটে আমার,
সেদিন দৌহায় যেন স্বপন-আবেশে
এক হয়ে মিশেছিছ; কত কৈদে হেসে
কেটেছিল কত দিন; কত বেধনার
রসধন অনুভূতি, কত যন্ত্রণার
কেমন সহজে ভাগ কত ভালোবেসে
নিয়েছিছ হৃ-জুয়ার। আজ অবশেষে

দলিত কুসুম মাত্র জাগে স্মৃতি তার।
হেমন্তের হিমে হেথা ভরেছে বাতাস
ঝর-ঝর শতদলে শিশির শিহরে;
দিকে দিকে জাগিতেছে বেদনা-আভাস
ধূল অঁকাশে আর পত্র-মরমরে।
এই পূর্ণ পরিকাপ্ত অবসাদ মাঝে
জানি না কিরিছ তুমি কোথা কোন্ সাজে।



চলতি পথে
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা .



খাঁপছাড়া—শ্রীবীজনাথ ঠাকুর বিরচিত ও চিত্রিত। মূল্য—কাগজের মলাট ৩৯, কাগজের মৃদুস্থ বাঁধাই ৩৯, এবং রামসংস্করণ শোভন বাঁধাই ৫৯। বিবর্তনীয় গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

এই অপূর্ণ বহিধানিতে ছড়া-জাতীয় নানা ছন্দে রচিত কবির ১০০টি সরল কবিতা ও তাঁহার আত্মজীবনিক ১০০টি তাঁহারই আঁকা ছবি আছে। কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য—তবে অবশ্য বাঁহারী দ্রুতগা-ক্রমে অবিস্মৃত অটল গাভীরের অধিকাংশী তাঁহার। এগুলির রসে বঞ্চিত হইলেও হইতে পারেন। কতকগুলি কবিতার রস ছোট ছেলেমেয়েরা পুরাপুরি সম্ভোগ করিতে না পারিলেও সেগুলিরও ধনি তাহাবিশ্বকে আনন্দ দিবে।

মেহাল-পল্লিকার ছবির রসগ্রাহী ও উক্ত এবং ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের বিজ্ঞপিকাঙ্ক বিজ্ঞ সমালোচকেরা কবির আঁকা সর্বশ্রেণীবিভাগের বহিষ্ঠুত ছবিগুলি বৃষ্টিতে পারিবেন না। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ও বয়স্কদের মধ্যে বাঁহারী শিশুরির ধার ধারেন না তাঁহার। এইগুলির রসে মগন হইতে পারিবেন।

মনে করিয়াছিলাম, নমুনা-সংকলন একটু কিছু উদ্ধৃত করিব; কিন্তু কোনটু যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিতে পারিতেছি না। বাহা ইউক, যে কবিতার কবি বহিধানি শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর বসুকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

“যদি দেখে খোলসটা

খসিয়াছে বুদ্ধের,

যদি দেখে চপলতা,

এলাপেতে সফলতা

বলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের,

যদি ধরা পড়ে সে যে নর একান্তিক

যোর বৈদান্তিক,

দেখে গভীরতায় নয় অন্তঃসান্তিক,

যদি দেখে কথা তার

কোনো মনে সোন্দার

হয়তো থাকে না ধার, মাথা উল্কাস্তিক,

মনখানা পৌছয় ক্যাপাসিবি প্রান্তিক,

তবে তার শিক্ষার

দাও যদি শিক্ষার,

স্বধাব বিধির সুখ চারিটা কী কারণে।

একটাতে দর্শন

করে বাগি বর্ষণ,

একটা ধনিত হয় কে উচ্চারণে।

একটাতে কবিতা

রসে হয় আবিতা

কাজে লাগে মনটার উলটনে মারণে।

নিশ্চিত জেনো তবে,

একটাতে হো হো রবে

পাপলানি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছাসিয়া।

তাই তারি ধাক্কা

বাঞ্ছা কথা পাক ধায়,

আওড় পাকতে থাকে মগ্নজ্ঞেতে আসিয়া।

চতুর্ধকের চেলা কবিতার বলিলে

তোমরা বতই হাসো, রংবে সেটা দলিলে।

দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,

অনাশ্রিতে ভবু বোঁকটাও অল্প না।”

কবি ‘সে’ নামক আর একখানি বহি ছাপাইতেছেন। তাহা বৈশাখে তাঁহার জন্মদিনের উৎসবে প্রকাশিত হইবার কন।

পুরানো কথা—শ্রীচাক্ষুঃ দত্ত প্রণীত। মূল্য ২৯। বিবর্তনীয় গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা।

এই সুযুক্তিত সুখপাঠ্য ও কৌতুহলোদ্দীপক বহিধানিকে প্রস্তুতকারে আশিক আশ্রয়িত বা জীবনস্থতি কলা বাইতে পারে। গল্প বলিয়া আসির জমাইবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে। বহিধানিতে ইতিহাসের, কিংবদন্তীর, আরও কত-কির টুকরা ছড়ান আছে। কুচবহারেব মহারাণা পুণ্ড্রনারায়ণ সম্বন্ধে ইহাতে অনেক গল্প আছে। একটি উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সমস্ত বহিধানির পাতা তাড়াতাড়ি উন্টাইয়া সেটি খুঁজিয়া পাইলাম না। একটি সূতী থাকিলে হয়ত আমার এতটা ভ্রমস্থ বুধা বাইত না।

‘ঘরের মারী—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ২২০ ডি নং আপার চিংপুর রোড, কলিকাতা, নবজীবন সংঘ হইতে শ্রীশ্রীশ্রীকুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই।

এই সুযুক্তিত বহিধানি নবদীপ হইতে কলিকাতা কিরিনা আসিবার সময় পাইয়া রেলপাড়ীতে বসিয়াই পড়িয়া ফেরিয়াছিলাম। ভাল লাগিয়াছিল বলিষা পড়িতে ‘বিলম্ব হব নাই। লেখকের ভাষা নদী প্রান্তের মত। বৃষ্টিতেও কোন কষ্ট হয় না।

বহিধানিতে ঘরের মারী, ভালোবাসার বাত, ভালোবাসা না অত্যাচার, মা ও বড়, ঘরের ট্রাজেডি—এই পাঁচটি প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেকটিতেই পুরুষ ও নারীদের স্মরণ করিবার, স্মরণে রাখিবার, ভাবিবার বিস্তৃত কথা আছে। বাঁহারী সার্বজনিক কাজ, দেশহিতের কাজ করিতে চান না করেন বলিষা মনে করেন, তাহাদের ইহা পড়া উচিত। বাঁহারী গুণ গৃহস্থালী করেন বা করিতে চান, তাহাদেরও প্রতিবন্ধ ও জ্ঞাতব্য জিনিষ ইহাতে আছে।

অনেক দিন আগে পড়িয়াছি বলিষা এখন বহিষ্টতে আলোচিত দুটি বিষয়ের কথাই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে।

লেখক বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের সম্মান ও গৃহস্থ্যগের উল্লেখ করিয়া বহিধানির আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে যাহা

লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনা আমি করিতেছি না; তাহাতে বোটাটমুট আমার মন সায় দিয়াছিল। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইয়াছিল, এমন কি হইতে পারে না ও কখনও হইবে না, যে, বিধবানবের সেবার জন্য পুরুষ সেই নারীকে ছাড়িয়া যাইবেন না বিবাহকালে ঝাঁহার চিরসঙ্গী থাকিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ঝাঁহাকে বাধ দিয়া তিনি ধর্ম্মাচরণ না-করিয়া তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিয়া বিব্রম-প্রসূত বিবসেবা রূপ ধর্ম্মাচরণ করিবেন? স্ত্রীকে তাগণ না করিলে কি অনাকিল বিব্রম হইতে পারে না? দাম্পত্য সম্বন্ধের সহিত আবিলতা কি অবিক্রম্য বন্ধনে জড়িত?

আমার মনে এই সকল প্রশ্নের উত্তর হইয়াছিল।

“মা ও বধু” প্রবন্ধটিতে লেখক পুত্রের প্রতি মাতার প্রতিদ্বন্দ্বী-অসহিষ্ণু মমতাকে পুত্রবধুর প্রতি ঈর্ষাব ও বধুনির্বাচনের একটা প্রধান কারণ বলিয়া লিখিয়াছেন, এইকণ মনে পড়িতেছে। ইহা বহু হুসেই অসত্য নহে। শ্বেত্রক মনঃসমীক্ষণ (সাইকো-এনালিসিস) অবলম্বন করিয়াছেন এক লরেন্সের একখানি উপন্যাস হইতে নিজ মতের সমর্থক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

সে দিন একখানি আমেরিকান কাগজের এক জন প্রবীণ সম্পাদকের এই উক্তিটি আমার চোখে পড়ে—“It is an unhappy fact that bad news is more striking than good news,” “এটা একটা দুঃখের তথ্য যে, মন্দ খবর ভাল খবরের চেয়ে বেশী চমকপ্রদ।” সেই জন্ত বধুনির্বাচনের ও বো-কাটিক শাশুড়ীর অনেক কাহিনী খবরের কাগজে বাহির হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে সমর্থ হয় যে, বধুকে খুব ভাল-বাসেন ও আশ্রয় দেন এমন শাশুড়ী অনেক আছেন, এমন বউও অনেক আছেন যিনি পতিপ্রাণা আবার শাশুড়ীর প্রতিও সন্তোষ প্রকাশিত। মনঃসমীক্ষণ-বিজ্ঞাবিদগণ এইকণ বহু ও বধুদের মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন জানি না।

মানভূম জেলার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত—ঐবিবলা-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., বি-এল প্রণীত। মূল্য ৮শ আনা। প্রাপ্তি-স্থান বি সি চ্যাটার্জি, মুম্বাই, পুণে।

এই বহিখানি মানভূম জেলার বিভাগের বাস্তবিকভাবে জড়িত লিখিত। কিন্তু ইহা মানভূম জেলার প্রাপ্তবয়স্ক লোকদেরও পড়া উচিত। ইহা হইতে তাঁহারা ঐ জেলা সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিবেন, যাঁহা তাঁহারা এখন জানেন না। ইহা ২৮ খানি ছবিও তাঁহাঙ্গিককে এ বিষয়ে সাহায্য করিবে। আমি ইহা হইতে আমার অজ্ঞাত অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি।

বহিখানি যে শুধু মানভূমের লোকদেরই পড়া উচিত, তাহা নয়। অজ্ঞাত হইলেও যে-সব বাঙালী সম্প্রদায়ের বৃত্তিতে চান, প্রধানতঃ বাংলাভাষী বাঙালীর বাসস্থান নৈসর্গিক সম্পৎশালী একটি ভূখণ্ডকে বাংলা হইতে কাটিয়া বিহারের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদেরও ইহা পড়া উচিত।

অতীতের ছবি। পরলোকগত হুমায়ূর রায় বচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১০। ইহাতে সহজ কবিতায় লেখক ব্রাহ্মসমাজের অতীতের স্মরণ ছবি আঁকিয়াছেন।

র. চ.

পশ্চিম প্রবাসী—ঐনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক, দ্বি নিউ বুক ষ্টল, ২ নং রমানাথ মহম্মদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন কোয়ার্টার্স, ২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

লেখক অল্প দিন ইউরোপের নানা স্থানে ঘুরিয়া তাঁহার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা

এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই যে তিনি ভবিষ্যৎ ইউরোপ-ভ্রমণকারীকে এই গ্রন্থের সাহায্যে অনেক অপরিচিত স্থান এবং ব্যাপারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে চান। কিন্তু অতি অল্পকাল নানা স্থানে ছুটাছুটি করিয়া সে উদ্দেশ্য সাধন করার কতকগুলি বাধা আছে। প্রথমত নতুন বিশেষে গিয়া বিশ্বাসের দৃষ্টি কাটে না; দ্বিতীয়ত কোন স্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। কিন্তু স্পষ্টতই লেখক সে সময় পান নাই। অভিজ্ঞতা লাভ না হইলে অনেক স্থানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা দুঃসাধ্য; অবশ্য অভিজ্ঞ লোকের লেখা বই পড়িয়া সেই লেখার পুনরুক্তি করা চলে, কিন্তু তাহার জন্ত দেশ-বিদেশে ঘুরিবার প্রয়োজন হয় না। লেখক প্যারিস, বার্লিন, রোম, কোপেনহাগেন, প্রভৃতি শহরের নামগুলি স্থানীয় উচ্চারণে পারী, বেলিন, রোম, কোপেন-হাগেন প্রভৃতি লিখিয়া কর্তব্য শেষ হইল মনে করিয়াছেন। কারণ ইহা ছাড়া আর কোন জিনিষেরই নাম তিনি কোন দেশেরই প্রচলিত-উচ্চারণে লিখিতে পারেন নাই।

গার ডি ইনভ্যালিডস্, নেপোলিওঁ, চ্যাপেল ডি ইনভ্যালিডস্, আর্ক ডি ব্রায়ান্স, সাজে এলিভ, দ্যাস দি কোর্দ, মোরে দী, প্যালে দি জাষ্টিস্, চেরাবাক, ফ্রেডেরিক স্ট্রাশে, রাউকার (roucher), ইত্যাদি কোন দেশেরই উচ্চারণ নহে। ইহা ছাড়া তিনি স্যান্ডভিগের শি বা স্কি-কে ফ্রেটিং-এর সঙ্গে গোলমাল করিয়াছেন। শির বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন ইহাই ফ্রেটিং এবং ফ্রেটিং-এর বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন ইহাই শি বা স্কি। রোমের জয়কাহিনী তিনি রোমে বসিয়া তাঁহার আমেরিকান বাস্তবের নিকট প্রথম অনিলেন এবং তাহারই উপর নির্ভর করিয়া রোমের প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করিলেন, ইহা আমরা ইউরোপ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বলিয়া মনে করিতে পারি না, কারণ এই বর্ণনার ভুল আছে। এক স্থানে পডিয়া, “প্রথম ল্যাটিনরা এখানে বাস করে তখন এর নাম ছিল কোরাডোলা (Quadrula) ...”

অপরিচিত নৃত্যসঙ্গিনীকে ইংরেজীতে ‘Fianco’ বলে না, ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীকে Fianco বলে। লেখক লগনে বসিয়া একপ ভ্রম করিলেন, এক গ্রন্থ লিখিবার সময়েও তাহা খেয়াল করিলেন না ইহা আশ্চর্য।

প্রায় প্রতিদেশেই লেখকের বাস্তবী-সাধারণ সোভাগ্য হইয়াছে এবং তাহাদের অনেকেই তাঁহার চেহারা এবং বিশেষ করিয়া চোখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে; কেহ কেহ তাঁহার প্রশংসায় হইতেও চাহিয়াছে। কিন্তু ইহা বার-বার এত বিস্তারিত ভাবে লেখা স্বকটিন্দত হয় নাই।

গ্রন্থে জানিবার বিষয়গুলি অনভিজ্ঞতা-প্রসূত বলিয়া মূল্যহীন। তবে অনেক উপদেশপূর্ণ কথা আছে, কিন্তু তাহা স্বদেশে বসিয়াও লেখা চলিত। ইহা ছাড়া অনেক কথাই আছে যাঁহা নিতান্ত ব্যক্তিগত—নিজের এবং পরের।

ঐপরিমল গোস্বামী

খোলাধুলা—ঐবিজয়চন্দ্র মহম্মদার প্রণীত। প্রকাশক—ঐকেশবরান্য চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী কাছালায় ১২০১২ আপার মাহু লার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা। পৃষ্ঠা ১০০।

ঐবৃত্ত বিজয়চন্দ্র মহম্মদার মহাশয়ের সাহিত্যজগতে পরিচয় নিম্নবোধন। প্রবীণ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের হৃদয়পূর্ণ লেখনী-প্রসূত কোড়কোচ্ছল কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধের সমষ্টি এই নিপুণতা বইখানি অতি উপায়ের হইয়াছে। কবিতা, গল্প এবং প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি কেবলমাত্র শিশু-মনোরঞ্জন উপযোগী কোড়কোচ্ছল অনাবিল বসেই ভরপুর নব,—বিবর-বস্তুর শিকড়ের তথ্যও পরিপূর্ণ। পাখীর গল্প, কলের ঝাঁক, ফুলের

সাজি, জীবের দেশ, দুখে জন্ত, মিষ্টমুগ জীবের দেশ, আলগা জোড়া শব্দ, প্রভৃতি কবিতাগুলিতে অকারাদি বর্ণক্রমে পাখী, ফল, ফুল, জীব, জন্ত প্রভৃতির সহিত ছেলের পরিচয় হইবে। 'কল্পই কোল' গল্পটিতে কোল জাতির আচার-ব্যবহারের পরিচয় সুকোশলে লিখিত হইয়াছে। আদি বাহু, বৌ গল্প দুটি অনুকূল হৃদয় এবং তথ্যপূর্ণ। প্রবন্ধগুলিও গল্পের মতই হৃদয় এবং কোমলোদ্দীপক। শিশুসাহিত্যস্রষ্টার নামে আজকাল যে 'বার বাহা মন' সৌহের পুস্তকের অভিধান আরম্ভ হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন একখানি সর্বদাসহৃদয়ের বই পাইয়া বড়ই তৃপ্তি হইল। বইখানির ছবিগুলিও হৃদয়—প্রচ্ছদের ছবিখানি চমৎকার। কাগজ, ছাপা, বাঁধাই খুব ভাল।

শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যবাবিকী— শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ। পোঃ শান্তিপুর, জেলা নদীয়া।

শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য-সম্মেলন', 'পূর্ণিমা-সম্মেলন' নামক মাসিক অধিবেশন ও অন্ত্যস্ত সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং পরিষদের বিশ্বে বর্ষে বর্ষে সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণ লইয়া এই গ্রন্থ গঠিত। গ্রন্থমাধ্য প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ ভাল। প্রাচীন বা প্রায় সাহিত্য লইয়া বাঁধায়া আলোচনা করিয়া থাকেন 'সেকালের গীতিকাব্য', 'সাহিত্যে শান্তিপুরের দান' প্রভৃতি প্রবন্ধ তাঁহাদের কাছে সাগিবে। কিন্তু গ্রন্থের বিষয়, এই জাতীয় পুস্তকের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ সকল সময় অনুসন্ধানস্থ ব্যক্তিবর্গেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারায় লেখকের শ্রম সার্থক হয় না। বস্তুতঃ, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনগুলিতে যে-সমস্ত প্রবন্ধাদি পঠিত বা উপস্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে যেগুলি ব্যাপক আলোচনার অমূলক উপ-করণে পূর্ণ সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ সেগুলি দেশের কোন এসিদ্ধ পত্রিকার প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রচার ও আলোচনার সুবিধা হয়—সম্মেলনের উদ্দেশ্য সকল হয়—লেখকগণও পরিশ্রম কল্পিয়া প্রকৃত ভাল প্রবন্ধ লিখিবার জন্ত যত্নবান হন। সম্মেলনের কার্যবিবরণে পঠিত প্রবন্ধের নাম ও প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রকাশ-স্থান প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেই চলিতে পারে। এইরূপে কার্যবিবরণ সংক্ষিপ্ত হওয়ার যে অর্থ উৎসৃষ্ট হইবে সম্মেলনের উদ্দেশ্যের অমূলক বিবিধ কার্যে তাহা ব্যয়িত হইলে সম্মেলনের গৌরব ও উপযোগিতা বর্ধিত হইতে পারে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

গীতগোবিন্দ—অম্ববাদক শ্রীবিলাসচন্দ্র দাশ। প্রকাশক—শ্রীশ্রী শ্রীশ্রী এণ্ড কোং, ১১, কলেজ কোয়ার্টার। দাম—দুই টাকা।

জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দ যে রসের পরিবেশক, মূল হইতে তাহার আশা এই প্রণয়ন করিতে শিকিত বাঙালীরা অসুবিধা হয় না বলিয়া মনে করি। আলোচনা কাব্য-অম্ববাদ প্রবন্ধ লেখক মূল পুস্তকের ভাব ও হৃদয় যথাসাধ্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সোটিমুটি মন হয় নাই।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

আলো-সাঁধারি—কবিতাপুস্তক। শ্রীসম্বদীকান্ত দাস। প্রকাশক—রজন্য পাবলিশিং হাউস, ২৫১২, মোহনবাগান রো। দাম—দুই টাকা।

কবি হিসাবে সম্বদীবাবুর খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই আছে, তাঁহার অম্বদা-প্রকাশিত 'রাজহংসের' সমালোচনা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন পত্র এই প্রসঙ্গের ক্ষেত্র এখনও চলিতেছে। কিন্তু এখনও পড়ি—

শ্রীমার বাটের কোঠাখানি আঁকে ছবে
মিনতি করিছে, ধানো ধানো নদী কীর্তিনাশ।

পশ্চিমে রবি ঘুম-জড়া চোখে চাহিছে পূবে;
তটের বেড়িয়া পান্সল নদী কি ভালবাসা।

বৃহৎ শ্রীমার, ছোট ডিঙা যেন জলের তোড়ে,
কা কা করে কাঁক, মিছা ডাকে আর মিছাই ওড়ে;
মাটির শিশুরা যতই শুনিছে স্বপন

নদীর ডায়া,

চরের মতন ডোবে জাগে বুকে তাদের শাশা।" (২৮ পৃ.)

অথবা "প্রাচুর্য নিশার আকাশের গাশী ভূতলে নামে,
পিতা বহুদেব ইষ্টের নাম চপেন ভয়ে,
দেবকী মাতার কোলের কাছেতে সে আলো ধামে,
আলোর মতো ভেসে গেলে চলে নন্দালয়ে,
হাসে শিশুটি, তবু কোল খালি যশো। মার,
এবার ওপার ছপারে যশো অন্ধকার।" (৭৭ পৃ.)

তখন সম্বদীবাবু যে কবি, একথা স্বীকার করিতে বিধা হয় না। নির্দোষ হৃদয়ের উপর তাঁহার জয়গত অধিকার। তবে আদিকের বর্তমান সংগ্রহের কবিতাগুলির উপর বহিঃ-প্রভাব সম্পূর্ণ।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীমদীশ ঘটক

বিজ্ঞান প্রবেশিকা— শ্রীস্বকুমার বসু, বি. এস-সি (কলিকাতা ও ডারহাম) প্রণীত। রজন্য পাবলিশিং হাউস। ২৫১২ মোহনবাগান রো। কলিকাতা। ১৯৩৬; পৃঃ ২৯১+৩। মূল্য ১৮/০।

প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীদের বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় মাতৃভাষায় পড়াইতে হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্মতি এই নতুন ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে কতকগুলি বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি তাহাদের অন্ততম। পুস্তকে জ্যোতিষ, ভূবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিকবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের অবজ্ঞাজাত্যব মূল তথ্যগুলির আলোচনা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনানুসারেই পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট হইয়াছে। এতদিন বাংলার বিজ্ঞানপাঠ নামে যে-সকল পুস্তক পরিচিত ছিল তাহার অধিকাংশই নীরস দুর্বোধ এবং প্রথম শিক্ষার্থীর অযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থখানি সহজ ও অতি সুস্পষ্ট হইয়াছে। কোথাও ভাষা বা ভাবের আড়ম্বর নাই। বিভাগের ছাত্র ব্যতীত পাঠক সাধারণেরও বিজ্ঞানজিজ্ঞাসা এই পুস্তকে পবিত্র হইবে। জ্যোতিষের—বিশেষ ভারতীয় জ্যোতিষের—এমন সুরল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখি নাই। যে লেখা পড়িলে বর্ণিত বিষয় স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে জানিতে আগ্রহ জন্মে সেই লেখাই সার্থক। স্বকুমারবাবুর জ্যোতিষ-বিবরণে এই গুণ আছে। শারীরবিজ্ঞান ব্যাখ্যানও অল্পমাত্র হইয়াছে। গ্রন্থকার জ্যোতিষের যত বিশদ আলোচনা করিয়াছেন রসায়ন প্রভৃতি ততটুকু করেন নাই। আপাতদৃষ্টিতে ইহা বৈষম্যমোহন বলিয়া মনে হইবে। বিভাগের পাঠ্যপুস্তকের গঠন মধ্যে নির্দিষ্ট প্রত্যেক বিজ্ঞানের সম্যক ব্যাখ্যা অসম্ভব, সেজন্য গ্রন্থকারকে হয় মূল তথ্যগুলি মাত্র উল্লেখ করিয়া সকল বিজ্ঞান সমান গৌরবে দিতে হয় নচেৎ কোন একটির বিশদ আলোচনা করিয়া বাকিগুলি সংক্ষেপে সারিতে হয়। ছাত্রের বিজ্ঞানবুদ্ধি উৎসাহ করিতে হইলে বিস্তারিত সরস বিবরণ অপরিহার্য। এক্ষণে দ্বিতীয় পঞ্চা অকলখনই সমীচীন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের বহুবিধ তথ্য আরম্ভ করা অপেক্ষা শিক্ষার্থীর পক্ষে বিজ্ঞানদৃষ্টিলাভ অধিক বাঞ্ছনীয়। বাহার বিজ্ঞানে কোমল জাগিয়াছে সে মনোমত যে কোন বিজ্ঞান

সহজে শিখিতে পারে। প্রথম উদ্ভিবে, প্রথম শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকে কোন বিজ্ঞানকে প্রাথমিক দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানালোচনার ইতিবৃত্ত বিচার করিলে দেখা যায় যে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ভূবিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার বহুপূর্বে প্রাচীন মানব সমাজে জ্যোতিষের আলোচনা আরম্ভ হয়। আদিম মানবের মনে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষিক জ্ঞতি কৌতুহলের বস্তু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অল্পবয়সেই মনোবিকাশেও এই প্রাচীন ধারাব অনুবর্তন দেখা যায়, এমনকি তাহাদেব শিক্ষার প্রথম প্রাথমিক বিজ্ঞান হিসাবে বালকবুদ্ধিগ্রাহ্য সরল জ্যোতিষের উপযোগিতা প্রেষ্ঠ। গ্রন্থকার কি উদ্দেশ্যে জ্যোতিষের প্রাথমিক দ্বিগাহন জানি না কিন্তু ইহাতে তাঁহার পুস্তকের পৌরব বুদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে করি। একপ পুস্তক বাংলা ভাষার সম্পদ। লোকে এই পুস্তকের সমাদর করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীগিরীশশেখর বসু

আবরণ মোচন—শ্রীকৌমাৰ্য দাস প্রণীত। শ্রীবিষ্ণুমাধব দাস কর্তৃক গাইবান্ধা হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫০। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

লেখকের মতে জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ; ইহার মূলোচ্ছেদ বা আমূল পরিবর্তন না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নাই। পুস্তিকাখানিতে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

তুণ্যখণ্ড—“বনফুল” রচিত। কলিকাতা, রজন প্রকাশালয় ২৫-২ মোহনবাগান রো হইতে প্রকাশিত।

তুণ্যখণ্ড কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি। লেখক ডাক্তার ও কবি; ডাক্তার-কবি তাঁহার জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি জীবনের একটা সুস্পষ্ট সঙ্গত অর্থ, একটা লজ্জিকের সন্ধান করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তাই তাঁহার মনে হইয়াছে জীবনের স্রোতাবর্তে তিনি একটি তুণ্যখণ্ড মাত্র, ভাসিয়া বাইতেছেন; সে ভাসার মধ্যে কোন নীতি, কোন ছন্দ, কোন পৌর্যপর্ষই নাই; সংসারের সুখদুঃখের, হাসি-কান্নার আলোছাওয়ার ছকের মধ্যে ছায়াশব্দের কোন বিধানই চলে না। আজ বাহাকে অজ্ঞান বলিয়া নিন্দা করিতেছি কালই মুক্তকণ্ঠে তাহাকে অভিনন্দন করিয়া লইতেছি, পরের মধ্যে বাহাকে নিন্দনীয় বলিতেছি নিজের মধ্যে তাহারই একটা সদৃশ অর্থ ও বুদ্ধি খুঁজিয়া পাইতেছি; আজ বাহা মিথ্যা কাল তাহা সত্যের আকারে দেখা দিতেছে। ইহাই জীবন। ইহাই মহাপ্রাণের স্রোতাবর্ত, ইহাই জগৎ বাহা অহরহ পরিবর্তনের ভিতর দিবা নব নব রূপে চলিতেছে। ছাত্র অজ্ঞানের কোন স্নাতন মানদণ্ডে ইহাকে বিচার করা যায় না। মাহাত্ম্যের বুদ্ধি ও দৃষ্টি যেখানে একান্ত সীমাবদ্ধ, যেখানে মানুষ কোন কিছুই শেষ কথা জানিতে পারে না, শেষ রূপ দেখিতে পায় না, সেখানে নিন্দা করিব কাহাকে, মিথ্যা বলিব কাহাকে? কোন মূঢ় অভিমানে বিচারকের আসন গ্রহণ করিব? যদি সে আসন গ্রহণ করি তবে নিজেই দেখিব যে পদে পদে ভুল করিতেছি। ইহাই তুণ্যখণ্ডের মূলকথা। কিন্তু লেখক দার্শনিকও নহেন, নীতিকথা প্রচার করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তিনি রসিক কবি; সংসারের লজ্জিকহীন দুঃখের প্রতি তাঁহার সুগভীর সহানুভূতি আছে; সেই ভাবেই তিনি জীবনকে নানারূপে দেখিয়াছেন এবং তাহারই কথা কিছু এখানে প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাক্তারের জগৎ রোগীর জগৎ; সে জগতে বীভৎস রসের প্রকাশ অতি সহজে হয়; তুণ্যখণ্ডের কয়েকটি চিত্রে বীভৎস বসের ইঙ্গিত যে নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে লেখকের মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি অপরিসীম সমবেদনা ও দরদ। কিন্তু সে দরদের মধ্যে

ছাফা নাই, তাহা অকারণে অসময়ে অশ্রবিসর্জন করিয়া নিজেকে ভাবমুক্ত করিতে চাহে নাই; যে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছে তাহা লেখকের বুকোই মধ্যে, চোখে ফোটে নাই। বরং স্থানে স্থানে লেখক সিনিসিজ্‌য়ের ভান করিয়াছেন। কিন্তু সে ভানও টিকে নাই, তাঁহার অন্তরের কণ্ঠাসমূহে মানুষটি গ্রন্থেব সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জাপানী এক চিত্রকরের স্বদীর্ঘ একটি ছবি দেখিয়াছিলাম; তাহা খণ্ডে খণ্ডে অঙ্কিত; প্রত্যেক খণ্ডই একটি বস্তুই ছবি; কিন্তু একটি সুন্দর বোঙ্গমুখ এই খণ্ডগুলিকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং শেষ ছবিটিতে প্রথম ছবিটি পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তুণ্যখণ্ড পড়িতে পড়িতে সেই ছবির কথা মনে হইল। সেই জন্মই ইহাকে উপভাস না বলিয়া ছবি-সমষ্টি বলিয়াছি।

সকলের তুণ্যখণ্ড পড়িয়া ভাল লাগিবে কিনা জানি না, আমার তো লাগিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহার রিথালিজম্‌ স্বপ্নিকের প্রকৃত মনকে-রূঢ় আঘাত দিবে; কিন্তু জীবনই যে সেই রকম; ইহার রিথালিজম্‌ বাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া দিল সে জীবনের সমগ্র রূপ দেখিল না, কিন্তু যে দেখিল সে ধন্ত হইল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ছন্দ-বীণা (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাস। রজন পার্লিশিং হাউস ২৫১২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা; মূল্য এক টাকা; পৃষ্ঠা ৪০।

এই গ্রন্থের কবিতাগুলিকে মোটামুটি চাব শ্রেণিতে ভাগ করা চলিবে—ছন্দ-প্রধান কবিতা, রস রসেব কবিতা, পল্লীকবিতা ও প্রেমের কবিতা।

মাতন, সাত মাইল ১৯৩৩, ১৯০০ দ্বিটাবস্, ছন্দ-প্রধান কবিতা। এই কবিতাগুলিতে ছন্দের লীলা এমন বহুল ও মাবলী যে কবি ভাষাকে লইয়া যথেষ্ট ব্যবহাব কবিবাহন, বিদেশী ও দেশী শব্দের যুগল অব্যবহালাকমে চালাইয়াছেন। সাধারণ পাঠকের এই কবিতাগুলি ভাল লাগিবে—ইহা নিঃসংশয়ে কথা যায়।

আবিসিনিয়া, স্বপ্নান রূপ বসের কবিতা। জগতের অত্যাচারিত-উৎপীড়িতদের প্রকৃত কবিব দবদ কাব্যমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে; রূপ রসের সঙ্গে রূপ রসের বিশ্রাণ ঘটয়াছে; কবিতা দুটিতেও ছন্দেব ঐক্য আছে।

পল্লী বর্ষা, ধান ক্ষেত, কৃপণের ব্যাধি ও বববার পল্লীকবিতা। শান্তি বাবু প্রথমত পল্লীকবিতা গিয়া কাব্যজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কোন পল্লীকবির স্থায় সেই ধানই ধামিয়া বান নাই। পল্লী ছাড়াও অল্প দশটা বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ আছে; দশটা বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ আছে বলিয়াই তাঁহার পল্লীকবিতাও সার্থক হইয়াছে।

আবিসূতা, উৎকণ্ঠা, পলাতক, ভূমি আর আমি, সন্দেহ, অন্ধকার, আবেদন, প্রেমের কবিতা। এই গ্রন্থেব নাম ছন্দ-বীণা হইলেও ছন্দেব তার অপেক্ষা প্রেমের তারে বেশী স্বরার উঠিয়াছে। ইহার শান্তি বাবুকে পল্লীকবি বলিয়াই জানেন তাঁহার এ সব কবিতা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন; আমরা হই নাই।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীমত শান্তা দেবী রবীন্দ্রনাথের “পান্ডিত্য ভ্রম” বহিঃ সমালোচনার লিখিয়াছিলেন, যে, “ইউরোপ প্রবাসীর পক্ষে” সেই গল্পটি বার পড়িয়াছে, বাহাতে এক ইংরেজ মহিলার শয়নকক্ষের বাহিরে দাঁড় করাইয়া রবীন্দ্রনাথকে বেহাগ রাগিণীর গান গাওয়াইবার কথা আছে। ইহা ভুল। গল্পটি “জীবনস্মৃতি”তে আছে। সেখানকা এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আমাকে সিদ্ধাপুর হইতে চিঠি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে চিঠি লিখিয়া ইহা জানাইয়াছিলেন।

—প্রবাসীর সম্পাদক

বীমাসংক্রান্ত নূতন আইন

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

কয়েক বৎসর পূর্বে হইতে ভারতীয় জীবন ও সাধারণ বীমা-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিদেশীয় সমব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিযোগিতাবশত, ভারতে বীমাকার্যসংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তন করিবার প্রয়োজনীয়তা সর্বিশেষ অস্বত্ব হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বহু সভাসমিতি, আন্দোলন, আলোচনা প্রভৃতির ফলে গত বৎসর ভারত-গবর্নমেন্টের তরফ হইতে এক কমিটি নিযুক্ত হয় ও বর্তমান বৎসরের প্রারম্ভে একটি খসড়া আইন প্রোসেমরীতে উপস্থিত করা হয়। বর্তমানে এই বিষয়টি সিলেক্ট কমিটিতে রহিয়াছে। বীমার কার্যে সংশ্লিষ্ট সকল লোকের মতামত বাহাতে উপযুক্তরূপে প্রকাশিত হয় ও সকল দিক বিচার করিয়া নূতন আইন প্রণীত হয়, এই জন্ত বীমা বীলটি বীমা আইনে পরিণত হইবার পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত হইতে দেখা হইতেছে। এ-বিষয়ে বীমা-ব্যবসায়ীগণ যথেষ্টই সজাগ; কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে ততটা আকৃষ্ট হয় নাই। বীমা, বিশেষ করিয়া জীবনবীমা, বর্তমান জগতে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রাব অঙ্গস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের অনেকেরই সঞ্চিত অর্থ অল্পাধিক জীবনবীমার রক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত বীমার কার্যই বহু সহস্র লোকের প্রধান পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং নূতন আইন বাহাতে সর্বাঙ্গসম্মত হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই কর্তব্য। কয়েকটি বিষয়ে খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নূতন আইন আমরাই চাহিয়াছি, কিন্তু বাহাতে আমরা যাহা চাহিয়াছি তাহাই যেন ঠিক পাই সেদিকে দৃষ্টি রাখা আমাদের কর্তব্য।

সকল প্রকার বীমার মধ্যে জীবনবীমার সহিতই ভারতীয় ব্যবসায়ী, কর্মী ও জনসাধারণের অধিক সংযোগ, কারণ জীবনবীমা আজকাল বহু লোকে করিয়া থাকেন ও তজ্জন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্রই জীবনবীমার এজেন্ট অথবা

দালালের কাজ করিয়া অনেক কর্মী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন। বীমা-ব্যবসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের মূলধন এই ব্যবসাতে নিযুক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন বীমা-প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র লোক নানা কার্যে চাকুরীতেও লিপ্ত আছেন। শিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের পক্ষে এই ব্যবসায়ের উন্নতি অথবা অবনতি বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ এই ব্যবসাতে তাহাদের যে পরিমাণ মূলধন, সঞ্চিত অর্থ ও পরিশ্রম কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, অপর কোন ব্যবসাতে সম্ভবত ততটা হয় নাই। অধুনা দুই শতাধিক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান বীমার কার্য করিয়া থাকেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের হস্তে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার তহবিল মজুত আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় প্রায় ছয়-সাত কোটি টাকা হইবে। বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতে অর্জিত তহবিল ও বাৎসরিক আয় দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় কিছু কম হইলেও তাহাও প্রভূত। নূতন বীমা আইন প্রণয়নের একটা উদ্দেশ্য, এই সকল বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ ভারতীয় গবর্নমেন্টের আয়ত্তাধীন করা। অতাবধি ভারতে, ইংলণ্ড, জাপান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানী, হল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালী, অস্ট্রিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশের প্রতিষ্ঠানই শাখা ব্যবসায় খুলিয়া ইচ্ছামত ভারতীয় অর্থ অর্জন করিতেছিলেন। বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানের ভারতে অর্জিত সঞ্চিত অর্থ কোথায় কি ভাবে নিক্ষেপিত হয় তাহা তাহাদের নিজেদের প্রায় সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যবসায়-প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে তাহারা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিলে অর্থবল ও ভারতবাসীর স্বভাবস্বলভ পরমুখাপেক্ষী মনোবৃত্তির সাহায্যে নিম্ন কার্য-সিদ্ধি কবিত্তে পারিত। তাহাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও শুনা গিয়াছে যে তাহারা প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে অধিক

অর্থবল থাকায়, অস্ত্রায় প্রতিযোগিতাও কখন কখন করিয়াছে।

বর্তমানে যে নূতন আইন হইতেছে তাহার খসড়াটি আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে, গবন্মেণ্ট কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করিয়া মন নিয়োগ করিয়াছেন। যথা :—

১। বীমা প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও গবন্মেণ্টের নিকট গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ।

২। মোট তহবিলের কতটা-সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে গবন্মেণ্টের হস্তে রক্ষিত হইবে।

৩। ৩। বীমার এজেন্টদিগের কমিশনের হার।

৪। বীমার এজেন্টদিগের লাইসেন্স।

৫। বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে বিধান।

মূলধন সম্বন্ধে নূতন আইনে যাহা দেখা যায় তাহার তাৎপর্য এই যে অতঃপর কোন বীমা-প্রতিষ্ঠান এই ব্যবসাতে আসিতে হইলে প্রচুর মূলধন না লইয়া আসিতে পারিবেন না। পূর্বে ২৫১০০ হাজার টাকা লইয়া এই ব্যবসাতে নামা চলিত এবং ক্রমশঃ টাকা জমা দিয়া গবন্মেণ্টের নিয়ম রক্ষা করা চলিত। এখন প্রথম হইতেই ৫০০০০০ টাকা জমা দিতে হইবে এবং অতি শীঘ্র টাকা জমা করিয়া দুই লক্ষ টাকা পূর্ণ করিতে হইবে। ভারতীয় বীমার ইতিহাস চর্চা করিলে দেখা যায় যে বহু বিরাট প্রতিষ্ঠান-কর্মীদের পরিশ্রমে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। অধিক মূলধন থাকিলেই যে কোন ব্যবসায়ী অধিক জায়বান হইবেন এ কথা বলে চলে না। ব্যবসাতে সততা ও কর্মক্ষমতাই প্রধান জিনিষ। বিরাট মূলধন থাকিলেও যে বহু ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ জনসাধারণকে প্রবঞ্চনা করেন তাহার উদাহরণ ভুলভ নহে। ভারতীয় বীমা ব্যবসায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিশ্রম ও আদর্শবাদের নিদর্শন। এই ব্যবসাতে যদিও বর্তমানে বণিক-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, তথাপি প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকেরাই এই ব্যবসাটি গড়িয়া তুলিয়াছেন। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া অল্পধনী-লোকেরা যে-প্রতিষ্ঠান প্রাণপাত করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সেই ব্যবসাতেই অকস্মাৎ বিরাট মূলধনকে জয়যুক্ত করিয়া দেবতার স্থানে বসাইবার চেষ্টা বিশেষ লক্ষ্যের

কথা। অস্ত্রায় কথাও। কারণ এখন বহুসংখ্যক ছোট ছোট বীমা-প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কার্য উত্তমরূপে চালাইয়া ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। নূতন আইনে এই সকল প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ক্ষতি হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে সং ও কর্মক্ষম বহু ব্যবসায়ী, শুধু স্বল্প মূলধন অপরাধে উৎপীড়িত হইবেন। বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ইতিহাসে যেগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় তাহাদেব মধ্যে অধিকসংখ্যকই যে মূলধনের অভাবে নষ্ট হইয়াছে, এ-কথা আমরা অস্বীকার করি। নির্বুদ্ধিতা ও প্রবঞ্চনা-চেষ্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশতই বীমা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি প্রধানত হইতে পারে। গবন্মেণ্টের আইনে এই যে এককালীন অধিক মূলধন রিসার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা অথবা সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করা ব্যবস্থা হইতেছে ইহার উদ্দেশ্য যদি বীমা ব্যবসায়ী অথবা বীমাকারীর স্বার্থরক্ষা হয় তাহা হইলে এই চেষ্টা ইতিহাস ও সুবিবেচনা বিরুদ্ধ। কারণ যে ব্যবসায় মূলতঃ সমবায়-জাতীয় তাহার পরিণতি মূলধনের উপর নির্ভর করে না—করে সততা ও কর্মকৌশলের উপর।

দ্বিতীয়তঃ গবন্মেণ্ট চাহিতেছেন যে অতঃপর সকল বীমা-প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ মোট তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ সরকারী সিকিউরিটিতে মজুদ রাখিবেন। যে কোন কাবসাতে তহবিল-সংরক্ষণ-নীতি চারিটি বিষয় বিচার করিয়া করা হয়।

১। নিরাপদে ও নষ্ট হইবার আশঙ্কা বর্জিত ভাবে সংরক্ষণ

২। মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাসের আশঙ্কা বর্জিত ভাবে সংরক্ষণ

৩। ইচ্ছামত নগদে পরিণত করিবার সুবিধা

৪। আয়

সরকারী সিকিউরিটি নিরাপদ সন্দেহ নাই। তাহা ইচ্ছামত নগদে পরিণতও করা যায়। কিন্তু তাহাব মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি ক্রমাগতই হইয়া থাকে। আজ ১০০ শত টাকা এই সিকিউরিটিতে গ্রাস্ত করিলে এক বৎসর পরে তাহা নগদে মাত্র ৯০ টাকা হইতে পারে। সুতরাং যে অর্থ কোন না-কোন সময় শতকরা এক শত টাকা হারে অপয়কে ক্রিয়ার্হিয়া দিতে হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ সরকারী

সিকিউরিটিতে রাখা সমীচীন নহে। এতদ্ব্যতীত সরকারী সিকিউরিটির আয় আঙ্গকাল মাত্র শতকরা ২০ টাকা। বীমার ব্যাপারে বীমাকারীদিগকে যে ভাবে টাকা দেওয়া হয় তাহাতে শতকরা ৪৫ টাকা আয় হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং কোন তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ যদি অল্প হারে গচ্ছিত থাকে তাহা হইলে বাকী দুই-তৃতীয়াংশ খুব অধিক হারে খাটাইতে হইবে, নতুবা তহবিলের মোট আয় কমিয়া ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে। এক-তৃতীয়াংশ সবিশেষ নিরাপদ রাখিয়া দুই-তৃতীয়াংশ উচ্চ লাভের আশায় লম্বী করিলে বিপদের আশঙ্কা। বিদেশী প্রতীষ্ঠানগুলিও কার্যবিধি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বীমা-প্রতীষ্ঠানগুলির সরকারী সিকিউরিটির উপর আসক্তি খুব বেশী নাই। যথা, আমেরিকার বীমা-ব্যবসায়ীগণ শতকরা মাত্র ৮৯ টাকা সরকারী সিকিউরিটিতে লাগাইয়া থাকেন। ইংরেজও এক-তৃতীয়াংশের অনেক কম এই জাতীয় সিকিউরিটিতে স্তম্ভ করেন। বীমা-ব্যবসায়ীরা মোটামুটি নির্বোধ নহেন। তাঁহারা নিজেদের ব্যবসা ভালই বুঝেন। সুতরাং আইন করিয়া তাঁহাদের হাত-পা বাঁধিবার প্রয়োজন এক্ষেত্রে নাই। ইহা ব্যতীত একথাও বলা যায় যে যদি কোন দিন ভারতীয় বীমা-প্রতীষ্ঠানগুলির মোট তহবিল এতটা বাড়িয়া যায় যাহাতে সেই তহবিলের এক-তৃতীয়াংশ প্রমাণ গবর্নেন্ট সিকিউরিটি বাজারে পাওয়াই যাইবে না, তাহা হইলে কি বীমা ব্যবসার খাতিরে সরকার বাহাদুর পুনরুদার অধিক করিয়া ঋণ গ্রহণ করিবেন? এই আইন হইলে ইহার ফলে বীমা ব্যবসার কোন লাভ হইবে না, শুধু সরকারী সিকিউরিটির বাজার তেজী হইবে মাত্র। এই কারণে শুধু সেই পরিমাণ সরকারী সিকিউরিটাই বীমার আপিসে রাখা প্রয়োজন—যাহা না রাখিলে অকস্মাৎ অধিক নগদ টাকার দবকাব হইলে কার্যের ক্ষতি হয়। এই প্রকার নগদের প্রয়োজনের একটা সীমা আছে এবং বহু শত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে বলা যায় যে বীমার কার্যে হঠাৎ নগদের প্রয়োজন উচ্চতম শতকরা ১০১২ টাকার অধিক হইতে পারে না; সুতরাং শতকরা ১৫ টাকা যদি গবর্নেন্ট সিকিউরিটিতে রাখা যায় তাহা হইলে বীমা-ব্যবসায়ী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বাকী টাক

নিরাপদ, অর্থাৎ মূল্যবান-আশঙ্কাবর্জিত উচ্চ আমদানী-দায়ক লম্বীতে রাখা উচিত।

বীমার এজেন্টদিগের কমিশন ও লাইসেন্স সম্পর্কে এই নূতন আইনে বিধান রহিয়াছে। বীমার এজেন্টগণ বর্তমানে কমিশন অর্জন করিবে বহু বৎসরের ব্যবসার গতির ফলে তাহার একটা রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই ক্ষেত্রে সরকারী দণ্ডবিধি কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এজেন্ট-নামটি বাদ দিলেই এই দণ্ডবিধিরও আর কোন জোর থাকিবে না। বীমার কার্যে সর্কাপেক্ষা অধিক পনিশ্রম এজেন্টরাই করিয়া থাকেন। জনসাধারণের মধ্যে বীমার প্রচলনও এজেন্টদের চেষ্টাতেই হইয়াছে ও হইতেছে। ম্যানেজার, অংশীদার প্রভৃতির লাভের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া শুধু এজেন্টদের রোজগার আইনের কবলে আনিয়া অত্যায়ে প্ররম্ব দেওয়া হইবে। এই আইনের জোরে নিষ্কর্মা লোকেরা আরও অধিক করিয়া প্রকৃত শ্রমিকের স্রাব্য পাওনা আত্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবে। বীমার এজেন্টদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থা বিষয়ে বিচক্ষণ ও চিন্তাশীল। আঙ্গকাল বেকর প্রভৃতি দ্রুতগতি ক্রমশঃ প্রলাপের প্রচার এদেশে হইতেছে, তাহাতে হঠাৎ একটা শিক্ষিত কর্মীসমূহের মধ্যে এইরূপ একটা আইন জারি করিলে, তাহাবিশেষ কুফল ফলিতে পারে। কুফল আরও বড় হইবে, কারণ আইনের মধ্যে ভেদাভেদ লক্ষিত হয়।

তৎপরে এজেন্টদিগের লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইতেছে। লাইসেন্স জিনিষটির নিজের কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না; কিন্তু লাইসেন্স-দাতাদের দোষ অনেক সময় জিনিষটা উৎপাদনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ধবা বাউক যে সকলকে থানায় গিয়া ক্ষম লিখিয়া সনাক্ত হইয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। ব্যাপারটা যে কিরূপ কষ্টকর হইবে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। লাইসেন্স যদি লইতেই হয় তাহা হইলে তাহা সকল বীমা-প্রতীষ্ঠান মিলিয়া কোন একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলে উত্তম হয়। তারণ ব্যবসার ক্ষেত্রে বীমার এজেন্টগণ এমন কোন অপরাধ করেন নাই যাহার জন্য তাহাদের আইনের কবলে পড়িতে হইবে। ব্যবসাগত লাইসেন্স ও সরকারী লাইসেন্সে অনেক প্রভেদ।

যে ব্যবসা ও যে সকল প্রধান কর্মীদের সহিত এজেন্টদিগের কারবার, লাইসেন্স সেই ক্ষেত্র হইতে গ্রাহ হইলে কেহ আপত্তি করিবে না। আইন, আদালত, থানা, পুলিশ, সনাক্ত হওয়া, ফি দেওয়া ও বৎসরে বৎসরে লাইসেন্স আপিসে খাতাপত্র লইয়া হত্যা দেওয়ার মজুদী বীমার এজেন্সীর কার্যে পৌঁছাইবে না।

ভারত-গবন্মেণ্টের নূতন আইনে বিদেশী বীমা ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু ভয় দেখান হইয়াছে। কিন্তু তদনুসরণ শাসন হইবে কি না এ বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই।

নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত বীমাকারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণ ও ভারতীয় বীমা-ব্যবসার ক্রমোন্নতি সাধন। আইনের খসড়াটি দেখিয়া একটি বহু পুরাতন গল্পের কথা

মনে পড়িয়া গেল। 'জর্নেক হিন্দুস্থানী' ব্রাহ্মণ অধারোহণ-আকার্জুয় উগবানের নিকট প্রার্থনা কবে। তাহার কাতর "একটো ঘোড়া দিলাদে রাম" প্রার্থনা ও প্রার্থনা পূর্ণ হইবার পরে "উন্টা বুঝলি রাম" আর্জুনার ইতিবৃত্ত সর্বজন-বিদিত। বীমা-আইন-সংস্কারের প্রধান যে দুইটি উদ্দেশ্য, নূতন খসড়া আইনে তাহার কোনটিই সাধিত হইবে না। বর্তমানে আইনের খসড়াটি সিলেক্ট কমিটিতে রহিয়াছে। আমরা আশা করি স্বাধিক বিচার না করিয়া এবং জনসাধারণ ও বীমা ব্যবসার কর্মদিগের মতামত পর্যালোচনা না করিয়া এই খসড়াটি পাকা আইনে পরিণত হইবে না। বিভিন্ন বাণ্যীয় দলগুলির উচিত এই বিষয়ে নিজ নিজ কমিটি বসাইয়া সম্যক আলোচনা করিয়া এ-বিষয়ে ভোটের বিধান করা।

চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন

বাংলা সন ১৩৩৬ সালে ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পর গত কানুন মাসে চন্দননগরে তাহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মধ্যে ছয় বৎসর অধিবেশন বন্ধ ছিল। সাধারণ ভাষে তাহার কারণ চন্দননগরের অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার অভিজ্ঞতাধীন নির্দেশ করেন। তাহা 'নৈতিক পন্থা'। এই নৈতিক পন্থার ব্যাখ্যাও তাহার অভিজ্ঞতাধীন আছে।

চন্দননগরের অধিবেশনে সমুদয় কাজ যে প্রাকৃতিক বির-বাধা সত্ত্বেও সুনির্বাহিত হইয়াছে, তাহা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ ও তাহার সহকর্মীদিগের একান্তিক সাহুযোগ্য-চেষ্টা ও শৃঙ্খলার গুণে। স্বেচ্ছাসেবিকার ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের দল এই কর্মীদের অন্তর্গত।

গঙ্গাতীরে শেঠ মহাশয়ের যে "জাহ্নবী-নিবাস" নামক বৃহৎ সৌখ্য আছে, তাহার বিস্তৃত হাতায় নবনির্মিত মণ্ডপে অধিবেশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রথম দিন সেখানেই অধিবেশন হইয়াছিল। পরে বাড়ির ঠিক মণ্ডপ ভূমিসং

হয়। পরবর্তী সব অধিবেশন জাহ্নবী-নিবাসের বৃহৎ বৃহৎ কক্ষে এবং শেঠ মহাশয়ের অন্ততম কীর্তি-মুদ্রাগোপাল স্মৃতিমন্দিরে হইয়াছিল। প্রদর্শনী হইয়াছিল জাহ্নবী-নিবাসের নীচের তলার কয়েকটি কক্ষে। তাহাতে চন্দন-নগরের সর্ববিধ প্রচেষ্টার ইতিহাস যেন মুষ্টি পবিগ্রহ করিয়াছিল। চন্দননগরের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে বাহা কিছু সংগৃহীত হইতে পারে, হরিহর বাবু নিজ বাসভবনে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার সংগ্রহ প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

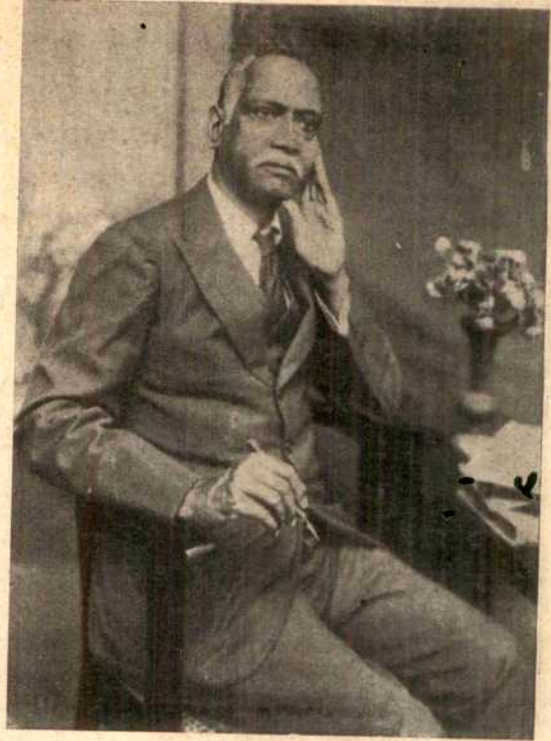
রবীন্দ্রনাথ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। তত্পলক্ষে তিনি বাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য তাহার দ্বারা সংশোধিত ও অহুমোদিত করাইয়া নীচে মুদ্রিত করিতেছি।

"আমাব শরীরের অগতুতার জন্য আমি লজ্জিত। বাবৎবার আমাকে অজ্ঞমতার কথা নিবেদন করতে হয়। এই বোধনা কোনো কালেই-স্বধকর বা গৌরবজনক নয়; কিন্তু আমার এ-বয়সে একথা আর গোপন করা সম্ভব নয়।

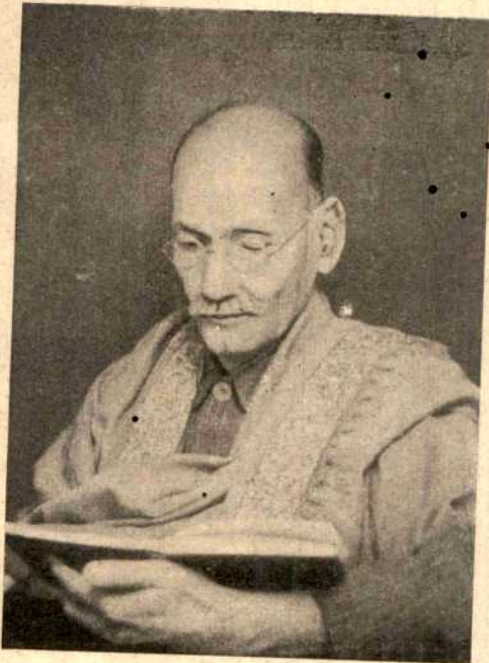
চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন



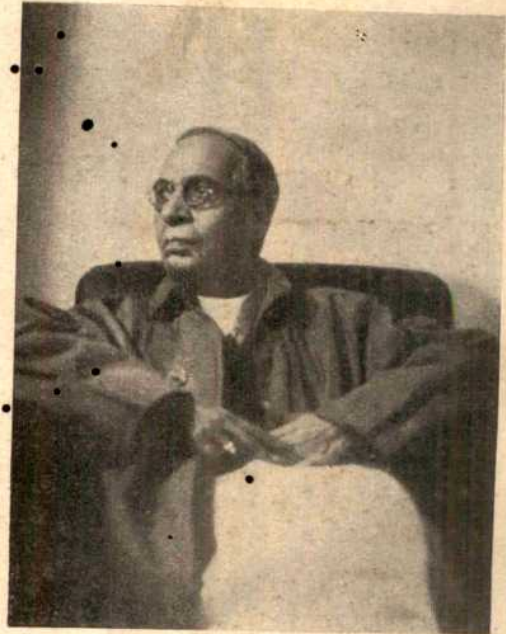
সম্মিলনের উদ্বোধনিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
[ফটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী]



ডক্টর সর্গ চট্টোপাধ্যায় সরকার
ইতিহাস শাখার সভাপতি



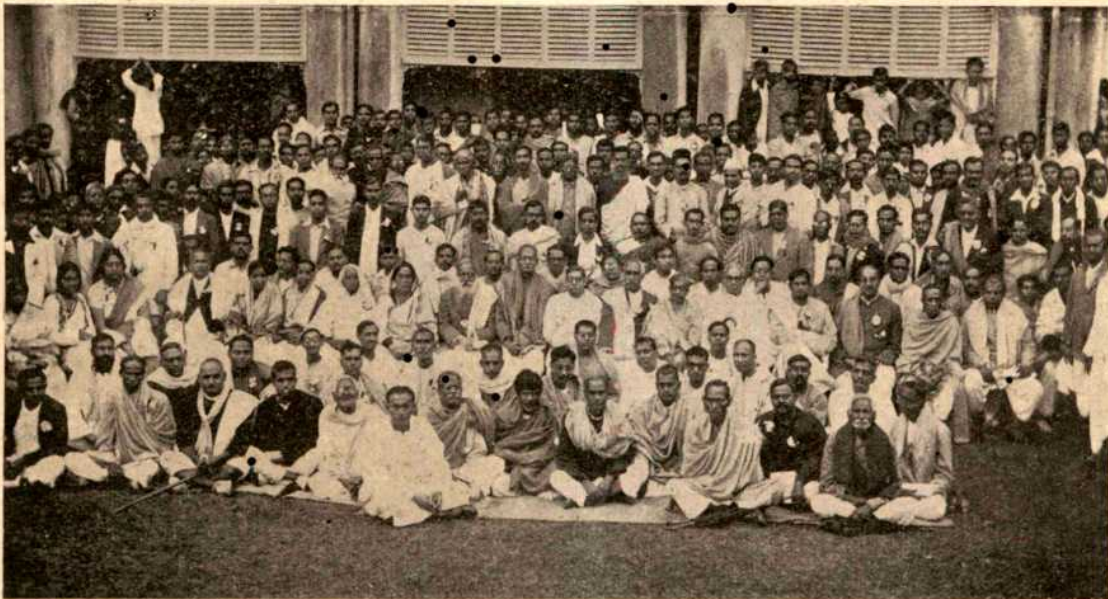
শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত
মূল সভাপতি



শ্রীপ্রমথ চৌধুরা
সাহিত্য শাখার সভাপতি



চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের কর্মপরিচালকগণ



চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিবৃন্দ, অভিযর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গ ও প্রতিনিধিগণ



শ্রীহরিহর শেঠ

গৃহস্থ যত দিন বৈভবসম্পন্ন থাকে তত দিন চার দিকের নানা দাবী সহজে ও আনন্দের সঙ্গে সে স্বীকার করে নেয়। একদিন তার তহবিল হ্রাসত ক্ষীণ হয়ে আসে, কিন্তু ঝুইরের দাবী বন্ধ হয় না; তখন সে দাবী রক্ষা করতে না পারলে রূপণতার অভিযোগ হয়। বারংবার আমার শারীরিক দীনতার কথা নিবেদন করেও নিষ্কৃতি পাই নে, তাই জীর্ণ দেহ ক্ষীণ কণ্ঠ নিয়ে পরিচিত পথে চলছি।

“এই সম্মিলনের উদ্বোধনের ভার আজ আপনারা আমার উপর অর্পণ করেছেন। ‘উদ্বোধন’ বাক্যটি শুনে আরেক দিনের কথা আমার মনে এল। একদা এই শহরের এক প্রান্তে এক জীর্ণপ্রায় বাড়ীতে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তার পর মোরান সাহেবের হস্তেও কিছুকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরেরই এক প্রান্তে আমার কাঁ-জীবনের উদ্বোধন,



ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস

চিকিৎসা শাখার সভাপতি

সেই আমার জীবনের সহজ ও সত্য উদ্বোধন। সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করি যে বাংলা দেশের নদীই বাংলা দেশের প্রাণের বাণী বহন করে। নগরের ইট-কাঠের দুর্গের মধ্যে বাল্যবয়সে ছিল আমার অবরোধ। এই অবরোধ অনেককে দুঃখ দেয় না দেখি; কিন্তু আমাকে তা সর্বদাই দুঃখ দিত, যে-চিত্ত সর্বদা আকাশকে কামনা করে তাকে করেছে অবরুদ্ধ। আমার চিত্ত সহজে সে-অবরোধ স্বীকার করে নি, মুক্তির সন্ধানে দূর আকাশের দিকে ছিল তার দৃষ্টি। তার পর একদা কলকাতায় ডেপুজিরের প্রাহৃতাবে আমাদের পেন্সনের বাগানে আনা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে স্বাধীন সঞ্চরণ আমার সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল, বাংলার নদী আমাকে ডাক দিয়েছিল। এত দিন আমার সেতার ছিল পড়ে, তার তার বাঁধা হয় নি, তাতে স্বর ওঠে নি, এই সময় আমি বিশ্বের সুরে আমার সেতারের স্বর বেঁধে নিয়েছিলাম। গঙ্গার তীরে আমি আমার জীবনের প্রথম মুক্তি পেয়েছিলাম, তাই নিজেকে আমি গাঙ্গের মনে করি।



শ্রী অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
স্বকুমার কলা শাখার সভাপতি

“সেই গেল প্রথম বয়স, তখনও বাণী ফুটে ওঠে নি, সুর লাগে নি। তার পরে মোরান সাহেবের বাগানে কিছু-কাল কাটিয়েছিলাম। গঙ্গার তীরে সেই হৃদয়ের অলিন্দে ও সর্বোচ্চ চূড়ায় অনেক রাত্রি আমি কাটিয়েছি, আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেল। মনে হয়েছিল বিশ্ব কত নিকটে এসেছে। আমার কবিজীবনের সেই প্রথম সূচনা।

“আমাদের দেশে সাহিত্যের সমাগম হয়েছে বসন্ত ঋতুর মত—কখন কি ভাবে এসেছে বসন্তের দূত তা জানি নে, তবে তা আমাদের অন্তরকে মাধুর্যে রসে বিকশিত পূর্ণ করেছে। সেদিনকার উদ্ভোধনের ইতিহাস ভাল করে লেখা হয় নি—ইংরেজী ভাষার অত্যন্ত গৌরবের দিনে, কেমন করে কোন আস্থানে কবিহৃদয়ে গান মুখরিত হয়ে উঠল, বাণী জাগরিত হয়ে উঠল, তার পরিচয় আজও হয় নি—কিন্তু সে-বসন্তসমাগম চিরবসন্ত হয়ে রইল। আমার জন্মের পূর্বেই সে বসন্তের আরম্ভ।

“প্রথম যখন সাহিত্য-পরিষদের সূচনা হয়—আমিও



ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

হয়ত তার মধ্যে ছিলাম—তখন হয়ত এর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে অনুকরণস্পৃহা ছিল। কিন্তু সে তুচ্ছতা দূরে পড়ে আছে, এর মধ্যে যা সত্য তা অনুকরণকে অতিক্রম করেছে, এইটি আমাদের পরম আনন্দের বিষয়। আমি কামনা করি আমাদের এই আয়োজন সম্পূর্ণ হোক, কৃতার্থ হোক, বিকৃতি এসে যেন একে নষ্ট না করে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সকল দেশে আদর্শ আশা-আকাঙ্ক্ষা রসপুষ্ট হয়েছে। আমাদের দেশেও তার ভূমিকা হয়েছে—বিকার যেন একে নষ্ট না করে। সমস্ত পৃথিবীর বাতাসে আজ কলুষ, পরম দুঃখে মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস হারিয়েছে। আমরা যারা সেই ধারা থেকে দূরে আছি তাদের মধ্যেও যদি সেই বিকৃতির সংক্রমণ লাগে তবে তা থেকে আমাদের মুক্তি পাবার চেষ্টাই করতে হবে। যুদ্ধের সঙ্গে বিদেশে মানুষের যে চিত্তবিকৃতি ঘটেছে তাতে তারা সাহিত্যকে নামাবার চেষ্টা করছে ভূমিতলে, যাকে বলে তারা

বাস্তবতা। কীটের যা বাস্তবতা, পশুর যা বাস্তবতা, মানুষের বাস্তবতাও কি তাই?

“সাহিত্যকে নির্মল রাখবার চেষ্টা যেন আমাদের থাকে। সঙ্কীর্ণ বা নীরসকে আমি নির্মল বলি নে, কবি হয়ে তা আমি পারি নে। বিধাতা যে সৌন্দর্য্যে যে রসে আমাদের অধিকার দিয়েছেন তা স্বীকার করে না নিলে সেই সৌন্দর্য্য ও রসের যিনি বিধাতা তাঁকেই অস্বীকার করা হয়। বিধাতার দান এই আনন্দরস উপভোগ করা যারা অজ্ঞায় বলেন তাঁদের আমি ধিকার দিই। কিন্তু সেই আনন্দরসে যেন কলুষ প্রবেশ না করে, তাতে যেন বিষ মিশ্রিত না হয়।

“এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বলি। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের কথা আজ আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে, বাহিরের সঙ্গে সেই সময় আমার যোগ হয়েছিল। সেই সময় বক্তৃতামঞ্চে অনেক বাঁধা সভাপতি ছিলেন—কোন স্বযোগে হীরেন্দ্রবাবুকে আমার কোন বক্তৃতায় সভাপতিরূপে পেলে আমার অত্যন্ত আনন্দ হ’ত। সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে তাঁকে আজ আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই।”

হরিরহরবাবুর অভিভাষণটিতে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দননগরের নানা ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে তথাকার মানচিত্র ও নক্সা, পুরাতন ও আধুনিক বহু দৃশ্য, সৌধ, দুর্গ, দলিল, এবং ঐতিহাসিক ভারতীয় ও বিদেশী ব্যক্তিগণের ফোটোগ্রাফের প্রতিলিপি মুদ্রিত হওয়ায় উহার মূল্য বাড়িয়াছে। চন্দননগরের প্রতি হরিরহরবাবুর যেরূপ কর্ণিষ্ঠ অন্বেষণ, বঙ্গের অত্র সব স্থানেরও কোন-না-কোন নাগরিকের যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশ নানা দিকে উপকৃত হইত।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিভাষণটির উল্লেখ আগেই করিয়াছি। তাঁহার অভিভাষণটির এবং অত্র সমুদয় অভিভাষণের বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারা যাইবে না—সমুদয়ই খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায় তাহা আবশ্যকও নহে। হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণের কেবল তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিব।

বাংলা বর্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্থান লাভ করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যাহা লাভ করিবে, সে বিষয়ে সব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত



শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শিশু-সাহিত্য শাখার সভাপতি

শ্রীমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তাঁহাদের চেষ্টা ও কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা হীরেন্দ্রবাবু প্রদান করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ-ভাষাকে বাঙালীদের যাবতীয় শিক্ষার বাহন করিবার চেষ্টার কিছু ইতিহাসও তাঁহার অভিভাষণে দিয়াছেন। সে বিষয়ে তাঁহার উল্লিখিত প্রথম ঘটনা এই—

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্ম যোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এক-এ পরীক্ষায় যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে বিতরিত হয়—তজ্জন্ম স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া (আমিও ঐ কমিটির এক জন সদস্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত করেন। ঐ কমিটি সসঙ্কোচে প্রস্তাব করেন—

That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate.

ঐ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তবে মহামান্য সেনেট-সভা প্রস্তাব উক্ত চূড়ায় চড়িয়া—‘দিও হে কিঞ্চিৎ, কোরো না বহুত’ এই



চন্দ্রনগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দ

নীতির অমুসরণ করিয়া এইরূপ বিধান করেন যে, “An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate.”

হীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, বিদ্যার অগ্রাগ্র ফেত্রের মত দর্শন-ক্ষেত্রেও তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই, যে, এ বিষয়ে বাঙালীদের চিন্তার যাহা কিছু উত্তম ফল, তাহা বাংলা ভাষাতেই স্ফুট করিতে হইবে। তাহার পর তিনি বাংলা দেশের আধুনিক নিম্নলিখিত দার্শনিকদের নাম করিয়াছেন,—

“অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কৈলাস শিরোমণি, রাখালদাস ঞায়রত্ন, ডাঃ ব্রজেননাথ শীল, হীরলাল হালদার, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সত্যীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাঃ স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি।”

আমার বোধ হয়, এই তালিকার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, সীতানাথ তর্কভূষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতিমোহন সেন, মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতিরও নাম নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণে লিখিত আর যে একটি বিষয়ের উল্লেখ আমি করিতে চাই, তাহা বঙ্গের তরুণ সাহিত্যিক

দল সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

বস্তুতঃ এই তরুণ দলই বাংলা সাহিত্যের ভাবী ভরসার স্থল। সেজন্ত তাঁহাদের দায়িত্ব অসীম। প্রবীণ সাহিত্যিকদিগের অনেকেরই আয়ুঃস্বর্ষ্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আর কয়দিন? বাংলা সাহিত্যের স্বস্তি ও সমৃদ্ধি এই তরুণদলের উপরেই নির্ভর করিতেছে। এই তরুণদলকে আমি বেশ প্রীতির চক্ষে দেখি। যদিও কাহারও কাহারও মধ্যে অকালপক্কতার জ্বরা ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু কয়েক জনের রচনায় প্রতিভার প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট হইয়াছে—মনে হয় কাহারও কাহারও হৃৎপদ্মে শতদলবাসিনী তাঁহার রাজ্য চরণ অর্পণ করিয়াছেন। বোধ হয় ঐরূপ তরুণদিগকেই লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আশীষবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—

“ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা,

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,

আধ-মরাঁদের যা মেয়ে তুই বাঁচ।” ইত্যাদি

অবশ্য, হীরেন্দ্র বাবু তরুণদের কেবল প্রশংসাই করেন নাই, তাঁহাদিগকে “সাহিত্যের ভূমিতে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা” সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে সতর্কও করিয়াছেন। এরূপ সতর্ক করার প্রয়োজন আছে। আরও কেহ কেহ তাহা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার উদ্বোধনে তাহা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাহা তরুণ, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ—বিশেষ কোন সাহিত্যিক দলের উদ্দেশ্য করেন নাই। হীরেন্দ্রবাবুও, তরুণ দলেরই উল্লেখ করিয়া থাকিলেও, যে দুই জন অ-তরুণ ঔপন্যাসিকের চরিত্রাভিযোজিত কোন কোন নায়িকা সম্বন্ধে নিন্দাপ্রশংসামিশ্রিত প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহাদের এক জনের বয়স ৭৫এর উপর, অগ্র জনের ৬০এর উপর।

হীরেন্দ্রবাবুর সমুদয় উক্তির ত্রাঘাত বা অত্রাঘাত সম্বন্ধে কিছু বলা বা ইঙ্গিত করা আমার অনভিপ্রেত। আমি অগ্র একটা কথা বলিব।

সাহিত্যে অঙ্গীলতার নিন্দাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে। নিন্দা অনাবশ্যক নহে। কেহ কেহ অগ্রবিধ শাস্তির প্রস্তাব এবং সমর্থনও করেন। কিন্তু আমাদের দেশে ও অগ্র নানা দেশে কোন কোন যুগে অঙ্গীলতার প্রাচুর্য্য কেন হইয়াছিল বা হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা এবং সমুচিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও আবশ্যক—হয়ত তাহাই অধিক আবশ্যক। ইংল্যান্ডে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন আরোহণের পর একবার

ইংরেজী সাহিত্যে খুব অঙ্গীলতার প্রাদুর্ভাব হয়। আবার গত মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরে ইউরোপের বোধ হয় সর্বত্র তাহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই উভয় যুগে একরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার কারণও নির্ণীত—অন্ততঃ অহুমিত হইয়াছে। আমাদের দেশের সম্বন্ধেও তাহা করিতে হইবে। মাহুঘের নানা অপরাধের জন্ত আইনে নানা দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শুধু শাস্তির দ্বারা মাহুঘের সামাজিক ও চারিত্রিক উন্নতি হয় নাই। অল্প উপায়ও অবলম্বন করিতে হইয়াছে, এবং বোধ হয় শাস্তির চেয়ে সেইগুলিই বেশী কার্যকর হইয়াছে। এ-বিষয়ে আমরা পরে কিছু লিখিব।

সব যত্ননাথ সরকার ইতিহাস-শাখার সভাপতি রূপে তাঁহার সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ অভিভাষণে, ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন না হইয়া ফরাসীর অধীন হইলে কি হইত, তাহার কিছু আভাস দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা একরূপ অনুমান করি নাই, যে, তাঁহার মতে ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া উচিত নয় বা স্বাধীনতায় ভারতবর্ষের অধিকার নাই, বা তাঁহার মনে স্বাধীনতার জন্ত কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপ অনুমান না-করিবার নিমিত্ত যত্নবাবুকে জেরা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার লিখিত এবং একাধিক বার মুদ্রিত ছত্রপতি শিবাজীর ইংরেজী জীবনচরিতে শিবাজী সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, তিনি স্বাধীনতার মূল্য বুঝেন এবং হিন্দু জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের ও রক্ষণের সামর্থ্যে বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে শিবাজী কি করিয়াছেন?

“He has proved by his example that the Hindu race can build a nation, found a State, defeat enemies; they can conduct their own defence; they can protect and promote literature and art, commerce and industry; they can maintain navies and ocean-trading fleets of their own, and conduct naval battles on equal terms with foreigners. He taught the modern Hindus to rise to the full stature of their growth.

“He has proved that the Hindu race can still produce not only *jamaiddars* (non-commissioned officers) and *chitnises* (clerks), but also rulers of men, and even a king of kings (*Chhatrapati*). The Emperor Jahangir cut the *Akshay Bat* tree of Allahabad down to its roots and hammered a

red-hot iron cauldron on to its stump. He flattered himself that he had killed it. But lo! in a year the tree began to grow again and pushed the heavy obstruction to its growth aside!

“Shivaji has shown that the tree of Hinduism is not really dead, that it can rise from beneath the seemingly crushing load of centuries of political bondage, exclusion from the administration, and legal repression; it can put forth new leaves and branches; it can again lift up its head to the skies.”

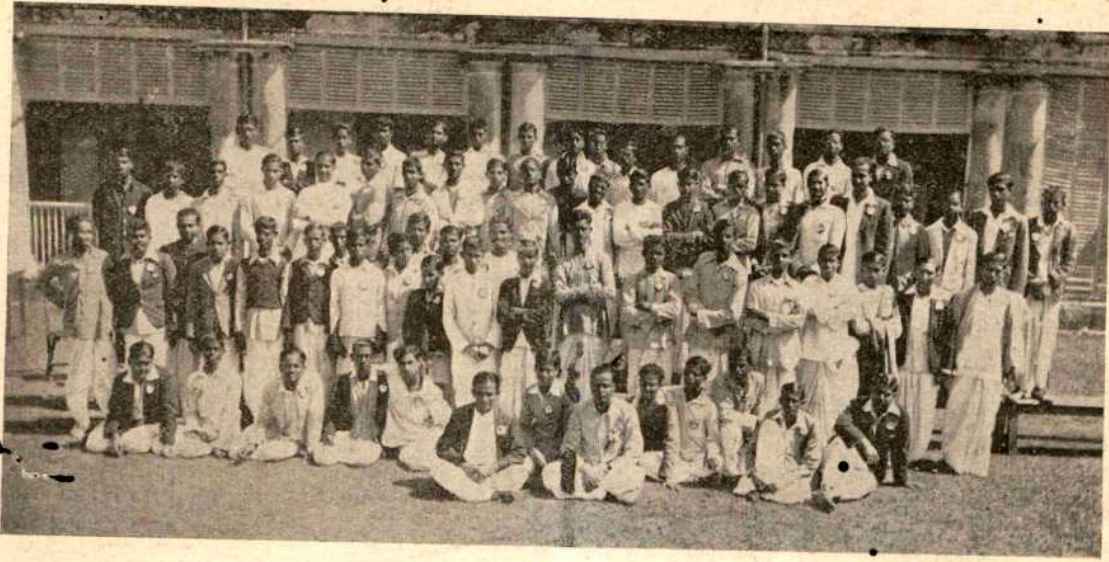
ভারতবর্ষ ফরাসীর অধীন হইলে কি হইত, সে বিষয়ে যত্নবাবুর অনুমান সর্বাংশে বা সারতঃ ঠিক কি না তাহার আলোচনা করিব না। হয়ত এ বিষয়ে—অন্ততঃ কিছু—মতভেদ হইবে। ভারতবর্ষ অধিকার করিবার চেষ্টা ইউরোপের অনেক জাতি করিয়াছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের “Rise of the Christian Power in India” (“ভারতে খ্রীষ্টিয়ান শক্তির অভ্যুদয়”) নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ভারতবর্ষ ফরাসীদের অধীন হইলে কি হইত, তাহার আলোচনা এই মূল্যবান গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৩০ ও ৩১ পৃষ্ঠায় আছে। তাহা হইতে আমরা কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিব।

“.....it does not require any stretch of imagination to conceive what India would have been like to-day, had France occupied the position which England does now in India. Had the French driven out the English, almost the whole of India would have been Frenchified by this time.”

তাহা হইলে, তাহা বোধ হয় বাস্তবীয় হইত না।

ভারতবর্ষ ফ্রান্সের অধীন হইলে কি হইত, সে বিষয়ে যত্নবাবুর অনুমান সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই হউক বা না-হউক, তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম, সভ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ফরাসী দলিলপত্র ও সাহিত্যে যে-সকল মূল্যবান উপকরণের অন্তিস্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যজ্ঞাতব্য।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রচিত প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে এবং চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যে দুটি অভিভাষণ পড়িয়াছেন, তাহা বাঙালীর মরণবাচনের সমস্ত সম্বন্ধে

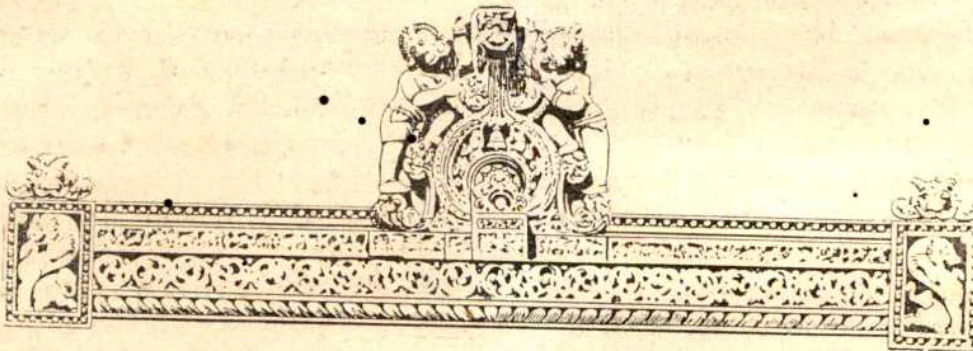


চন্দননগর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ

লিখিত। তাঁহার লিখিত বিষয়গুলির খুব আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শুধু আলোচনা নহে, বাঙালী যাহাতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং তাহার অভ্যুদয় হয় এরূপ উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করাও চাই। কিন্তু করিবে কে ?

অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা বানান সম্বন্ধে অনেক যুক্তিসঙ্গত কথা বলিয়াছিলেন। তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি চান উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান। ইহা অধৌক্তিক নয়। ইহা স্বাভাবিকও বটে। আমাকে

দুই জন শিক্ষয়িত্রী বলিতেছিলেন, তাঁহাদের অনেক ছাত্রী উচ্চারণানুযায়ী বানান করে কিন্তু পরীক্ষকেরা নম্বর কাটিবে বলিয়া তাহাদের সে সব বানান স্তব্ধরাইয়া কেতাবী বানান শিখাইতে হয় ! কিন্তু উচ্চারণানুযায়ী বানানের পথটা যে খুব সোজা, তা নয়। কারণ, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে একই শব্দের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রকম ; এবং উচ্চারণের পরিবর্তনও কালক্রমে হয় ও হইয়া আসিতেছে। অতএব, কতকটা স্থায়ী কোন এক রকম নির্দিষ্ট বানানের পক্ষেও কিছু বলিবার আছে।



নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংস্কৃতায়ন

১১

তিব্বতের মত অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত দেশ জগতে আব দ্বিতীয় নাই। ইহা ভারতের উত্তর সীমায় স্থিত, কিন্তু এ-দেশের জনসাধারণ কেন, শিক্ষিত লোকেও তিব্বতের বিষয় খুবই অল্প জানেন। আমার এক বন্ধুকে তিব্বত হইতে চিঠি লিখিয়াছিলাম পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লিখিবার জন্য ডাকে কিছু কাগজ পাঠাইতে; তিনি পত্রোত্তরে লিখিলেন, ডাক অপেক্ষা রেল পাঠাইলে মাস্তুল কম লাগিবে, সুতরাং রেলপথে ষ্টেশনের নাম পাঠাইলে ভাল হয়। এই উদ্ভবে এ-দেশ সম্বন্ধে আমাদের ইংরেজী শিক্ষা জ্ঞাত জানের অপূর্ব পরিচয় সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ তিব্বত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা কিছুই জানি না, লোকের ধারণা নাই যে, হিমাচলের পাদমূলস্থ ব্রিটিশ ভাবতীয় রেলপথে ষ্টেশন হইতে এক মাসের পথ চলিয়া বিশ হাজার ফুট উচ্চ কয়েকটি গিরিসঙ্কট পার হইলে তবে লাসা পৌঁছান যায়। কালিম্পং হইতে পথের দুই-তৃতীয়াংশ পার হইলে পর গ্যাঙ্কী; তাহাই ইংরেজের শেষ ডাকঘর, ঐ পর্যন্ত ভারতীয় ডাকমাস্তুলে চিঠিপত্র ও প্যাকেট ইত্যাদি যায়। লাসা পর্যন্ত টেলিগ্রাম ভারতীয় দুরেই যায়।

সভ্য জগতে তিব্বতের এইরূপ অপরিচিত থাকার প্রধান কারণ ইহার দুর্গমতা। দক্ষিণ ও পশ্চিমে হিমালয়ের গগনভেদী বিরাট পর্বতমালা, উত্তরে (লাসা হইতে এক শত মাইলের কিছু বেশী দূরে) বিশাল মরুভূমি; এই সকলই অতি দুর্গম। ভারত হইতে তিব্বত যাইবার প্রধান পথগুলি কান্দীর ও দার্জিলিং অঞ্চল হইতে গিয়াছে; দার্জিলিং হইতে লাসার দূরত্ব ৩৬০ মাইল। এ-দেশের অধিকাংশ স্থলই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফুটের উপরে, এইজন্য বৎসরের আট মাস এ-দেশের মাটি তুষারচ্ছন্ন থাকে। তিব্বতই জগতের সর্বোচ্চ জনপদ।

তিব্বত বিশাল দেশ। ইহা নামমাত্র চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এ-দেশের লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, কিন্তু সামাজিক প্রথাহিতে এক প্রান্তের আচার-ব্যবহারের সহিত অন্য প্রান্তের মিল নাই, তথাপি এ-দেশে ধর্মের প্রাধান্য অতি দৃঢ়। দেশের শাসক দলাই লামা ভগবান বুদ্ধের অবতার রূপে পরিচিত এবং লোকের বিশ্বাস যে নূতন দলাই লামা সিংহাসনে বসিলে তাঁহার মধ্যে বুদ্ধদেবের আত্মা আবির্ভূত

হয়। সারা দেশ বৌদ্ধ মঠে পরিপূর্ণ। লাসায় একপ তিনটি মঠ আছে, যাহার প্রত্যেকটিতে আর-পাঁচ হাজার ভিক্ষু বাস করে। ইহা ছাড়া আরও অনেক মঠ আছে নাহাতে শত শত ভিক্ষু থাকে।

প্রাকৃতিক অবস্থানের ফলে তিব্বত অল্প দেশ হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ পরিস্থিতির প্রভাবে এ-দেশীয়েরাও অন্য দেশে অধিবাসীত্ব সহিত মিশ্রণের মনোযোগ অনিচ্ছুক। তিব্বতীয় ভুলোক সাধারণতঃ শাস্ত শিষ্ট এবং আপনভাবে ভরপুর। বিদেশীয়ের সহিত সম্পর্ক বাধা ইহাভা ভাল মনে করেন না। নিজেদের প্রাচীন ধর্মে ইহাদের অসীম শ্রদ্ধা, উপরন্তু প্রাচীন পন্থায় চাষাবাস ও ক্রিয়াকর্মাদি কবিয়া সম্ভাব্যের সহিত জীবন যাপন ইহাদের সংসারের প্রধান লক্ষ্য মনে করেন। আধুনিক বিংশ শতকের সভ্যতা হইতে ইহারা যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চাহেন এবং সেইজন্যই এদেশে বিদেশীয়ের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তাহ হইলেও ইহারা বিশেষ অতিথিবৎসল।

তিব্বতীয়েরা প্রচুর চা পান বসব। নৃত্যগীতেও ইহাদের বিশেষ উৎসাহ। নৃত্য প্রধানতঃ পুরুষেরাই করে, স্ত্রীলোকের মধ্যে নৃত্যের বড় চলন নাই। এ-দেশে স্ত্রীলোকের পর্দা নাই, পুরুষের মত তাঁহারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করিয়া উপার্জনের পথ দেখে।

তিব্বতে, বিশেষতঃ লাসা অঞ্চলে, প্রবেশ করা কি কঠিন ব্যাপার তাহা তিব্বত-যাত্রা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠেই বুঝা যায়। আমি ফাস্তন স্ত্রী বধীতে ভারতসীমান্ত হইতে যাত্রারস্ত করিয়া আবারের স্ত্রী ত্রয়োদশীতে লাসায় উপস্থিত হই। আমার এই যাত্রা আত্মতৃপ্তি অথচ ভৌগোলিক অন্বেষণের জন্য হয় নাই; এ-দেশের সহিত উভয়রূপে অধ্যয়ন এবং উহা হইতে ভারতীয় এবং বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ও ধর্মনৈতিক তথ্য আহরণের জন্য আমি এ-দেশে আসি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দার আচার্য শাস্ত্ররক্ষিতের কাল হইতে আবিস্ত কবিয়া একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলার আচার্য দীপঙ্কর স্রীজ্ঞানের সমগ্র পর্যন্ত ভারত ও তিব্বতেব সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল তাহ ইতিহাসগ্রেমিক মাঝেই অবগত আছেন। ভারত তিব্বতকে ধর্ম, অক্ষর ও সাহিত্যিক ভাষা দান করেন। ভারতীয়ের এ-দেশে আসিয়া কিছু জিন্দী এবং বহু সহস্র সংস্কৃত পুস্তকের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ

করিয়াছিলেন। এই অমূল্যবাদের পরিমাণের ধারণা করিতে হইলে এখানে কংগার ও তংগার নামে যে দুইখানি বিশাল সংস্কৃতগ্রন্থাদ্বয়সংগ্রহ প্রচলিত তাহা দেখিতে হয়। এই দুইখানি সংগ্রহে বিশ লক্ষের অধিক অমূল্যপুস্তক আছে। তিব্বতীষেরা যে-বচনগুলিকে ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখনিঃসৃত বলিয়া মনে করে কংগার তাহারই সংগ্রহ; ইহা মুখ্যত যন্ত্র, বিনয় ও তন্ত্র এই তিন ভাগে বিভক্ত। কংগার এক শত বেষ্টনীতে বাঁধা, সেই জন্য ইহা শত-পুস্তক নামে কথিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সাত শত পুস্তকের সংগ্রহ আছে। কংগার-সংগ্রহের কতক পুস্তক সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অমূল্যবাদ হইতে গৃহীত। কংগারই অনেক গ্রন্থের টীকা, উপরন্তু দর্শন, সেবা, ব্যাকরণ,

জ্যোতিষ, বৈজ্ঞানিক, মন্ত্রতন্ত্রের পুস্তক প্রভৃতি কয়েক শত গ্রন্থের ভাষান্তর তংগারে আছে। এই সকল সংগ্রহ দুই শত পুথিতে নিবদ্ধ। ভারতীয় দর্শন নভোমণ্ডলের প্রথম জ্যোতিষ আর্ধ্যদেব, দিগ্‌নাগ, ধর্ম্মরক্ষিত, চন্দ্রকীর্তি, শাস্ত্র-রক্ষিত, কমলশীল প্রভৃতির মূল গ্রন্থ এই দুইখানি সংগ্রহে রক্ষিত আছে, যদিও ভারতে উহাদের কীর্তীর চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই, কেবল তিব্বতী অমূল্যবাদে তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। আচার্য্য চন্দ্রগোমীর চন্দ্র ব্যাকরণ—যন্ত্র, ধাতু, উদাদি পাঠ, বৃত্তি, টীকা, পঞ্জিকাদির সহিত এখনও বিদ্যমান। “ইন্দ্রচন্দ্র কাশিকুলঃ” শ্লোক স্মরণ্যে অষ্ট মহাবৈয়াকরণ মধ্যে চন্দ্রগোমী এক জন মহাবৈয়াকরণ ছিলেন সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তংগার-সংগ্রহে তাহার লোকানন্দ-নাটক, বাদ্যায় টীকা প্রভৃতি হইতে আমরা তাহার কাব্যে ও দর্শনশাস্ত্রে অধিকার ও ব্যাপ্তির পরিচয় পাইয়াছি। অখণ্ডোষ, মতিচিহ্ন (মাত্তেচোঁ) হরিভদ্র, আর্ধ্যশ্র প্রভৃতি মহাকবির কতনা ক্রিষ্ট কীর্্তি তংগার-সংগ্রহে কালিদাস, দণ্ডী, হর্ষবর্দ্ধন, ক্ষেমেজ প্রভৃতিব সংস্কৃতে স্থলভ গ্রন্থাদির সঙ্গে একত্রে রক্ষিত আছে। এই অমূল্য সংগ্রহেই অষ্টাঙ্গ হৃদয়, শালিহোত্র আদি বৈজ্ঞানিক-গ্রন্থ টীকা-উপটীকার সহিত রহিয়াছে, ইহাতেই মহারাজ কনিষ্কে লিখিত মতিচিহ্নের পত্র, মহারাজ চন্দ্রকে লিখিত যোগীশ্বর জগদ্রত্নের পত্র, পালবংশীয় রাজা জয়পালের প্রতি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের পত্র ও অম্বাজ বহু অমূল্য পত্রাবলী রহিয়াছে। ইহা ছাড়া একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু বৌদ্ধ যোগী অবদ্যুত বৈরাগীর বচন দোহা প্রভৃতির হিন্দী এবং অন্যান্য ভাষা হইতে অমূল্যবাদ-সংগ্রহও ইহাতে সঞ্চিত আছে।

এ দুই বিরাট সংগ্রহ ছাড়া ভোট ভাষায় নাগার্জুন আর্ধ্যদেব, অঙ্গ বহুবদ্ধ, শাস্ত্ররক্ষিত, চন্দ্রকীর্তি, ধর্ম্মকীর্তি চন্দ্রগোমী, কমলশীল, শীল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতদিগের জীবনচরিত এবং তারানাথ, বুতোল পদ্মক

পো বেতুরিয়া সেরপো, কুণ্ডাল প্রভৃতি লেখকের বহু “ছোজু (ধর্ম্ম-ইতিহাস) আছে, বাহা হইতে ভারতীয় ইতিহাসের বহু গ্রন্থের আভাস ও প্রকাশ পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়াও অনেক গ্রন্থ আছে বাহা হইতে তৎকালীন ভারতের সাক্ষ্য পরিচয় না পাইলেও পরোক্ষভাবে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রন্থরাজির অধিকাংশই কৈলাস-মানস সরোবরের নিকটস্থ খোলিং গুহা ও মধ্য তিব্বতের সকা, সময়ে গুহা প্রভৃতি বিহাবে অন্বেষিত হইয়াছিল। বিদেশীয়েরা ধ্বংস না করিলে আজও সে-সকল স্থানে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যাইত। এখনও খুঁজিলে একাদশ শতাব্দীর পূর্বের আর কিছু পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়।

* * *

সম্রাট অশোকের পুত্র যেমন সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, ভোটদেশে আচার্য্য শাস্ত্ররক্ষিত কর্তৃক তেমন ধর্ম্ম দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়। সত্য বটে শাস্ত্ররক্ষিতের আগমনের পূর্বের ভোট সম্রাট শ্রোডচন-সংগেম-পোর সময় বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই সম্রাটই (খ্রিঃ ৩১৮-৫০) নেপাল জয় করিয়া অংকুবর্ধার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন এবং চীন সীমান্তের বহু প্রদেশ নিজ সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া চীন সম্রাটের রাজকন্ডারও পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই রাণীই বৌদ্ধ ছিলেন এবং ইহাদের সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভোট দেশে প্রবেশ করে; লাসার প্রাচীনতম বৌদ্ধ মন্দিরষয় বুশেছে ও চীবে স্পোছে সম্রাট শ্রোডচনই নির্মাণ করেন। তাহা হইলেও ঐ সময়ে তিব্বতে ভিক্ষু বিহারও ছিল না বা কেহ ভিক্ষু হয় নাই, এবং বৌদ্ধধর্ম্মেরও কোন দৃঢ়স্থিতি ছিল না, সে কীর্্তি আচার্য্য শাস্ত্ররক্ষিতের; তাহার প্রতিভা ঐদেশে স্থায়ীভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ লাগে। ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত (তিব্বতী গ্রন্থের যন্ত্রে) পাঠক-দিগকে দিলাম।

মগধের পূর্বসীমান্তস্থ অজপ্রদেশ পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রসিদ্ধ, মধ্যযুগে ইহাব পূর্বাঞ্চল সহোর নামে বিদিত ছিল। ভোটেরা এই সহোরকে জহোর নামকরণ করিয়াছে। ইহার অস্ত্র নাম ভল বা ভগলরূপে পাওয়া যায়, সে নামের ছায়া ঐ প্রদেশের প্রধান নগরী ভগলপুরে আজিও পাওয়া যায়। এই প্রদেশে গঙ্গার তটে এক ছোট পাহাড়ের নীচে পালবংশীয় নৃপতি দেবপাল (খ্রিঃ ৮০০-৮৩৭) এক বিহার নির্মাণ করেন, তাহার নাম নিকটস্থ রাজপুরী বিক্রমপুরী হইতে বিক্রমশীলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহা উক্ত বিক্রমপুরীর নিকটে উত্তর দিকে ছিল। ভোটীয় সাহিত্যে বিক্রমপুরীর অস্ত্র নাম ভাগলপুব বলিয়া পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে যে উহা এক মাণ্ডলিক

রাজবংশের রাজধানী ছিল, তাহাতে লক্ষ পরিবাবের বসতি ছিল। বাহা হউক, যে রাজবংশ ভোটদেশের অন্ততম মহান ধর্মপ্রচারক দীপঙ্কর ক্রীজ্ঞান অর্থাৎ অতীশের (জন্ম খ্রীষ্টাব্দ ৯৮২, মৃত্যু ১০৫৪) আবির্ভাবে গৌরবান্বিত, সেই রাজবংশেই সপ্তম শতকেব মধ্যভাগে (অন্ত খ্রীষ্টাব্দ ৬৫০) আচার্য শাস্তরক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন।

নালন্দার ভূমি তথাগতের চরণধূল্যাম্পর্শে বহুবার পবিত্র হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধ এক বর্ষাঋতু যাপন এখানেই করিয়াছিলেন। ইহারই অতিসম্মিকে নালক গ্রাম; নালক ভগবান বুদ্ধের সর্বপ্রধান শিষ্য ধর্মসেনাপতি আর্ঘ্য সারিপুত্রকে জন্মদান করে; এখানে বুদ্ধের জীবিতকালেই প্রাবারক শেঠ নিজের আশ্রয়ন দান করিয়াছিলেন। এই স্থানের পবিত্রতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এখানে পূর্বকাল হইতেই বিহার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে তৃতীয় ধর্মসম্মতিতে (অর্থাৎ কনকারেজে) সর্বাশ্রিতবাদ আদি নিকায় (সম্প্রদায়) স্ববিষয় হইতে বহিষ্কৃত হয়, ফলে সর্বাশ্রিতবাদী ও অনুরূপ অল্প সাম্প্রদায়িকেরা নালন্দায় সভা স্থাপন করেন, সে কারণে নালন্দা সর্বাশ্রিতবাদীদিগের কেন্দ্রস্থল হয়। বৌদ্ধ মৌর্যকুলের ধ্বংস-সাধন করিয়া বৌদ্ধদেবী ব্রাহ্মণমতাবলম্বী শুদ্ধবংশ ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধ সিংহাসন অধিকার করিলে, দেশের বিপরীত পরিস্থিতিব ফলে সবস বৌদ্ধনিকায় মগধ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কেন্দ্রসমূহ দেশদেশান্তরে স্থাপিত করেন। সর্বাশ্রিতবাদীরা মথুরার সন্নিকটে গোবর্দ্ধন পর্বতে কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং এই সময় তাঁহারা নিজের পিটক সংস্কৃতে রূপান্তরিত করিয়া তৎকালীন সর্বাশ্রিতবাদ ইতিহাসে “আর্ঘ্য সর্বাশ্রিতবাদ” নামে পরিচিতি হয়। পরে মহাকুশাণ রাজকুল ইহাতে বিশেষ প্রভাবশীল হওয়ায় ইহাদের কেন্দ্র মথুরা হইতে কাশ্মীর-গঙ্গাবে স্থানান্তরিত হয়। কাশ্মীর-গঙ্গারের সর্বাশ্রিতবাদই মূল সর্বাশ্রিতবাদ নামে খ্যাত। সম্রাট কনিষ্ক এই সম্প্রদায়ের পক্ষে দ্বিতীয় অশোক ছিলেন। তিনিই তক্ষশীলায় ধর্মরাজিকা রূপে “আচার্যগণ্য সর্ব-তত্ত্ববদিনি পরিগাহে” শব্দ অঙ্কিত করিয়া উহা মূল সর্বাশ্রিতবাদের নামে উৎসর্গ করেন। কনিষ্কের সংরক্ষণকালে চতুর্থ মহতী বৌদ্ধধর্মপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে মূল সর্বাশ্রিতবাদ অনুসারে ত্রিপিটকের বিস্তৃত টীকা প্রস্তুত হয়। এই টীকার নাম বিভাষা হওয়ায় মূল সর্বাশ্রিতবাদের নামান্তর “বৈভাষিক”।

এই মূল সর্বাশ্রিতবাদ হইতেই মহাযানের উৎপত্তি, তাহাতে বৈপুল্য (পালি—বৈভুল্ল) অবতংসক আদি সূত্র নিজ সূত্রপিটক রূপে আসে, কেবলমাত্র বিনয়পিটক রূপে সর্বাশ্রিতবাদের বিনয়ই থাকে। মহাযান হইতে বজ্রযান এবং ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের ভরাডুবি-মুগের সহজযান (১২শ শতক খ্রী:) নামক বোর বজ্রযান উদ্ভব হইলে পরেও:

নালন্দা, বিক্রমশীলা, উদয়পুরী আদি মহাবিহারে মূল সর্বাশ্রিতবাদের বিনয়পিটক স্বীকৃত হইত। ভোটীয় ভিক্ষুরা আজও ইহাকে মানেন এবং অতি গর্বের সহিত বলেন যে তাঁহারা মূল সর্বাশ্রিতবাদের বিনয়, বোধিসত্ত্ব (মহাযান) ও বজ্রযান এই তিনেরই শীল ধারণ করেন। এই উক্তির অর্থ অল্প লোকের পক্ষে বোধগম্য হওয়া কঠিন, কেননা যদিও যে কোন লোক এক সঙ্ঘ প্রকার শীল ধারণ অনায়াসেই করিতে পারে তথাপি পরস্পরাবিরোধী আলোক ও অন্ধকার কি প্রকারে এক স্থানে বিরাজ করিতে পারে তাহা ঐরূপ শীলধারণগণ প্রকাশ বরিয়া বলেন না। বলা বাহুল্য, বিনয় ও বজ্রযান নিরতিশয় পস্পরাবিরোধী।

শাস্তরক্ষিতের সময় নালন্দার মহিমা দিগন্তবিস্তৃত ছিল। উহার অল্প দিন পূর্বেই য়ুয়ন-চ'ং ঐ স্থানে বিজ্ঞান করিয়া গিয়াছেন। তখন এখানে বজ্রযান বা তন্ত্রযানের প্রভাব। শাস্তরক্ষিত এখানেই গৃহত্যাগ করিয়া আচার্য জ্ঞানগর্ভের নিকট মূল সর্বাশ্রিতবাদ বিনয় মতে প্রব্রজ্যা ও উপসংপদা (অনুমান ৬৭৫ খ্রী:) ও শাস্তরক্ষিত নাম গ্রহণ করেন। নালন্দাতেই তাঁহার গুরুব নিকট সাঙ্ঘোপাঙ্গ ত্রিপিটক অধ্যয়নের পর তিনি বোধিসত্ত্ব মার্গায় (মহাযানিক) অভিসময়ালঙ্কার আদি পাঠ করিবার আচার্য বিনয় সেনের নিকট উপস্থিত হন। আচার্যের নিমিত্ত নিকট তিনি মহাযান মার্গের বিস্তৃত ও গভীর উভয় ক্রমের সহিত আর্ঘ্য নাগার্জুনের * মাধ্যমিক সিদ্ধান্তও পঠ করেন। উহারই উপর পরে তিনি সটীক মধ্যমকালঙ্কার নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

চীনা ভিক্ষু হু-চ'ও নালন্দায় শাস্তরক্ষিতের সমসাময়িক ছিলেন—খ্রী: ৬৭১-৭৫এর মধ্যেপ্রণীত তাঁহার পুস্তকে কিন্তু অল্প অনেক পৃষ্ঠান্তের নাম থাকা সত্ত্বেও শাস্তরক্ষিতের কোনও উল্লেখ নাই। বোধ হয় তখনও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন নাই। পাঠ সমাপনান্তে শাস্তরক্ষিত নালন্দাতেই অধ্যাপনকার্য আরম্ভ করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে হরিভদ্র ও কমলশীল পরে যশস্বী লেখক হন। মূল ভাষায় লুপ্ত হইলেও ভোটীয় অনুবাদরূপে তন্ত্রের তাঁহাদের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। আচার্য শাস্তরক্ষিতের অনেক দার্শনিক গ্রন্থও ঐ সংগ্রহে ভাষান্তর রূপে পাই; সংস্কৃতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, কেবল অল্প পুস্তকে তৎসংগ্রহ বা উল্লেখরূপে তাহা বিদ্যমান থাকে গোচরীভূত। আচার্য তন্ত্রেরও অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন

* নাগার্জুন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেব মধ্যভাগ দক্ষিণ কোশস (ছত্তিশগড়ে) আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি অতি মহান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ভারতীয় দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি অনেক নূতন বিচার ও তথ্যের প্রচলন করেন। তিনি মহাযানের প্রবর্তক।

যদিও মূল সংস্কৃতে এখন মাত্র দুইখানি পুস্তক পাওয়া যায়—
তত্ত্বসংগ্রহ-কারিকা ও জ্ঞানসিদ্ধি।

ঐ সকল কার্য আচার্য্য শাস্তরক্ষিতের ভারতবাসকালের
কীর্ত্তি। ভোটদেশে তাঁহার ধর্মপ্রচারের কাহিনী অতি
আশ্চর্য্য। ৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে ভোট সম্রাট শ্রোঙ্ক-সুগেমের
পঞ্চম উত্তরাধিকারী খ্রী-শ্রোঙ্ক-সুগেম সিংহাসন আরোহণ
করেন, তিনি তখন বালকমাত্র। এই সম্রাটই তিব্বতের
ধর্মশাসক। সে-সময় চীন ও ভোটদেশে ঘনিষ্ঠ বৈবাহিক
সম্বন্ধ ছিল এবং লাসায় ঐ কারণে অনেক চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুর
সমাগম হইত। সম্রাটের ধর্মলিপ্সা তাহাতে তৃপ্ত না হওয়ায়
তিনি ধর্ম্মে ও ধর্ম্মগ্রন্থে জ্ঞানবান কোন আচার্য্যকে আনিবার
নিমিত্ত ভারতে লোক পাঠান। ভোট রাজদ্বত প্রথমে বজ্রাসন
ধর্ম্মাবলম্বী গিয়া সম্রাটের দক্ষ পূজা নিবেদন করেন, পরে
নালন্দায় যান। আচার্য্য শাস্তরক্ষিত নেপালে আছেন,
সেখানে এই সম্মান পাইয়া নেপালে গিয়া তিনি আচার্য্যের
সম্মুখে সম্রাটের ভোট রাখিয়া রাজ্যের প্রার্থনা নিবেদন
করেন। আচার্য্য স্বীকৃত হওয়ায় বহু সম্মানের সহিত লাসায়
আনীত হন। সেখানে তাঁহার উপদেশ যথেষ্ট ফলপ্রসূ
হয়, বিশেষতঃ তরুণ রাজা অত্যন্ত প্রভাবিত হইলেন। কিন্তু
সভাসদবর্গ ও অনেকে ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, ঐ সময়ে
দেশে পৌড়ায় ও অন্ত যে সকল উপদ্রবের প্রকোপ চলিতেছিল,
শাস্তরক্ষিতের শিক্ষার ফলে স্থানীয় দেবদেবীদের রোষই
তাঁহার কারণ বলিয়া প্রচার করেন। ইহাতে শাস্তরক্ষিত
নেপালে প্রত্যাবর্তন করেন (খ্রীঃ ৭২৪)।

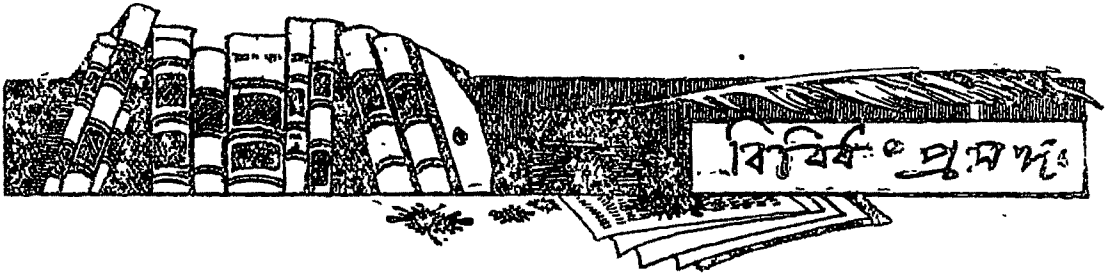
তিনি চলিয়া আসিলে চীন দেশের সভ্য প্রদেশের বহু
বিদ্বান বৌদ্ধ লাসায় আগমন করেন। দববারে তাঁহাদের
বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, রাজ্যও যথেষ্টরূপে প্রভাবিত
হন। কিন্তু কিছুকাল পরে রাজ্যের পুনর্বার বর্ষায়ান
ভাবতীয় আচার্য্যকে আনিবার ইচ্ছা হয় এবং এইরূপে রাজ্য-
নিমন্ত্রণে আচার্য্য শাস্তরক্ষিত দ্বিতীয় বার লাসায় গমন করেন
(খ্রীঃ ৭২৬)। ভোট ইতিহাসে লিখিত আছে যে, এইবার
স্থানীয় দেবদেবীর রোষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত তিনি
উড়িয়ারাজবংশোদ্ভব আচার্য্য পদ্মসম্ভবকে আনয়ন করিতে
সম্রাটকে অনুবোধ করেন। কথিত আছে আচার্য্য পদ্মসম্ভব
আসিয়া মজবলে ভোটদেশের দেবদেবী ডাকিনী-মোগিনী
যক্ষিনী-সর্পিণী ভূতপ্রেত যক্ষবেতাল আদিকে পরাস্ত
করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে সহায়তা করার প্রতিজ্ঞায় উহাদের আবদ্ধ
করিয়া ছাড়েন।

আচার্য্য তাহার পর সম্রাটের সাহায্যে লাসা হইতে দুই
দিনের পথ দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রতটে বসম্ য় (সম্-য়ে) বিহার

নির্মাণ (অগ্নি-জ্ঞী-শব্দবর্ষ=৭৩৭ খ্রীঃ) আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ
বর্ষ পবে (ভূমি-জ্ঞী-শব্দবর্ষ=৭৩৮ খ্রীঃ) তাহার নির্মাণ
শেষ করেন। সম্-য়ে বিহার উদন্তপুরী বিহারের নমুনায়
তৈয়ারী এবং ইহা দ্বাদশপ্রাঙ্গণযুক্ত; ইহাই ভোটদেশের
প্রাচীনতম বিহার। বিহার নির্মিত হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের
বহুল প্রচারের পর, তিনি ভোট দেশে ভিক্ষু-আচার্য্য কল্পে
গ্রহণ করিতে হয় দেখাইবার জন্ত দ্বাদশ জন মূল সর্বাঙ্গ-
বাদীকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মুখে জল-মেঘবর্ষে
(৭৪২ খ্রীঃ) যে শেস্ রঙ্ পো (জ্ঞানেন্দ্র) আদি সাত জন
ভোটীয়কে ভিক্ষু করেন।

আচার্য্য শাস্তরক্ষিত তাঁহার ভোটীয় শিষ্যবর্গের সহিত
কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকেবু অনুবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু দু-
একটি ভিন্ন সেগুলির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কথিত আছে,
আচার্য্য অন্তিম সময়ে শিষ্য খ্রী-শ্রোঙ্ককে ডাকিয়া বলেন যে
এদেশে অন্তর্বিবাদ আরম্ভ হইলে তাঁহার ছাত্র কমলশীলকে যেন
ভারতবর্ষ হইতে আনা হয়, তিনি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিবেন।
আচার্য্য শাস্তরক্ষিত তখন প্রায় শতবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, (আনুমানিক
৭৫০ খ্রীঃ), সে-সময় কোন দুর্ঘটনায় তাহার এই সুদীর্ঘ
ও যশোময় যাত্রা সমুদ্রেতে শেষ হইয়া গেল। তাঁহার
পবিত্র দেহাবশেষ আজও সম্-য়ের এক চৈত্রে, অতীতে
ভারতীয় পণ্ডিতদের বার্ষিক্য ও জরার প্রতি অবহেলা ও
কর্তব্যে দুর্ভাগ্যের জলন্ত দৃষ্টান্তরূপে বিরাজ করিতেছে।
তাঁহার দেহান্তের পব ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ আরম্ভ
হইলে রাজ্য আচার্য্যের উপদেশমত কমলশীলকে নিমন্ত্রণ
করিয়া আনিলে তিনি লাসায় আসিয়া শাস্তার্থ প্রচার করিয়া
বিবাদের শান্তি করেন।

আচার্য্য শাস্তরক্ষিতকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংস্থাপক বলিয়া
ভোটবাসিগণ মানিলেও, সিংহলে যেরূপ মহেন্দ্রের স্মৃতি-
পূজার উৎসব হয়, আচার্য্যের উদ্দেশ্যে সেরূপ কিছু ভোটদেশে
হয় না। কারণ খৃষ্টিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। ভোটদেশে
ভগবান বুদ্ধের স্বাভাবিকতাপূর্ণ, মধুর, সরলহৃদয়স্পর্শী স্মৃতির
ততটা সম্মান নাই, যতটা ভূতপ্রেত-বাহুস্মরণের আছে।
শাস্তরক্ষিত যদিও তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি
গম্ভীর দার্শনিকই ছিলেন, স্মৃতবাং তাঁহাতে ভোটবাসীদের
ভূতশাস্তিমন্ত্র-স্বাধার উপশম হয় নাই। পদ্মসম্ভব ও অন্ত লোক
পাইয়া বোধ হয় তাহা হইয়াছিল, এই কারণেই অতি
বৃহৎ গুহা ছাড়া অন্ত কোথাও পণ্ডিত বোধিসত্ত্বের
(শাস্তরক্ষিত) চিত্র বা মূর্ত্তি দেখা যায় না, যে-স্থলে পদ্ম-
সম্ভবের চিত্র ঘরে ঘরে আছে। [ক্রমশঃ]



রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সর্বধর্মসম্মেলন

গত শতাব্দীর মাসের অব্যাহত নৈতিক সর্বপ্রধান ঘটনা পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকীর একটি অঙ্গ সর্বধর্মসম্মেলন। ইহাকে অরাস্ট্রনৈতিক ঘটনা বলিলাম বটে; কিন্তু যে ভাবটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এইরূপ সম্মেলনে নানা দেশের লোকদের যোগ দেওয়া উচিত, সেই ভাবটি যদি সেই সেই দেশের অধিবাসী জাতিদের এবং তৎকাল রাস্ট্রসমূহের পরিচালকদের চিন্তা ও কার্যের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়াও এরূপ সম্মেলনের গুরুত্ব ও সার্থকতা কম হইবে না। সেই ভাবটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ও ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বের ভাব। রামকৃষ্ণ সমুদয় ধর্মকে সত্য মনে করিতেন বলিয়া পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি। ষাধারা তাঁহার এই মতের অনুবর্তী হইয়া সকল ধর্মকে সত্য মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে সকল ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব উপলব্ধি করা এবং জীবনকে সেই উপলব্ধির অনুযায়ী করা কঠিন নহে। ষাধারা ঐক্য ঐ মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না অথচ মনে করেন যে, প্রত্যেক ধর্মেই সত্য আছে এবং সেই সত্য তাহার সার-অংশ, তাঁহারাও সকল ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব উপলব্ধি ও তদনুযায়ী জীবন গঠন ও যাপন করিতে সমর্থ। এই উভয় শ্রেণীর লোকেরা এবং অনেকেও সকল ধর্মের মঙ্গাগত একটি ঐক্যে বিশ্বাস করেন। এই সমুদয় লোকের কাহারও পক্ষেই সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের সহিত সন্তাব রক্ষা করিয়া চলা কঠিন নহে।

এই কাজটি কঠিন কেবল সেই সকল সংকীর্ণচেতা ধর্মাত্ম ব্যক্তিদের পক্ষে যাহারা অপর সকলকে সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব মনে করে এবং কেবল আপন আপন মতকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে।

সর্বধর্মসম্মেলন দ্বারা সকল দেশে সবার ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে সন্তাব বৃদ্ধি পাইলে, সন্তাব স্থাপনের ইচ্ছা জন্মিলে ও বৃদ্ধি পাইলে, তাহা জগতের পক্ষে কল্যাণবর হইবে।

গত এক বৎসর ধরিয়া ব্যাপক ভাবে নানা নগরে ও গ্রামে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর যে অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, সর্বধর্মসম্মেলনে তাহা পরিসমাপ্ত হইল। নানা দেশের, নানা জাতির ও নানা ধর্মের লোকদের সহযোগিতায় গুটী এত বড় সর্বধর্মসম্মেলন ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই।

এই শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে একটি ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও অন্তর্বিধ প্রদর্শনীর আয়োজনও হইয়াছিল। তন্নিম্ন সংগীতসম্মেলনও হইয়াছিল।

সর্বধর্মসম্মেলনের প্রারম্ভিক বক্তৃত করেন আচার্য্য ব্রজেননাথ শীল মহাশয়। শীল মহাশয় পরমহংসদেবকে সাক্ষাৎভাবে জানিতেন এবং স্বামী বিবেকানন্দেব সতীর্ঘ ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাটি তাঁহার নির্দেশ অনুসারে সভাস্থলে তাঁহার এক জন প্রাক্তন ছাত্রের দ্বারা পঠিত হয়। এই পঠিত বক্তৃতা মডার্ণ বিভিন্নর আগামী এপ্রিল সংখ্যায় আয়োগান্ত প্রকাশিত হইবে। শীল মহাশয় নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা হইতে যাহা বলিয়াছিলেন, অংশত তাহার অল্পরূপ কথা পবে সন্ন ক্রান্তিস ইয়ংহাজব্যাপ্ত এবং আরও কেহ কুই বলিয়াছিলেন। উহা কতকটা আগাধ্য শীলের বক্তৃতা শ্রবণের ফলে হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীন চিন্তার ফলও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুদ্রিত অভিভাষণ অন্ত প্রকারের। উহা তিনি স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ধর্মবাদ দিতে উঠিয়া সন্ন ক্রান্তিস ইয়ংহাজব্যাপ্ত বলেন, যদি এই সর্বধর্ম-সম্মেলনে কেবল এই অভিভাষণটি পঠিত হইত, তাহা

হইলেও ইহার অধিবেশন সার্থক মনে করা বাইতে পারিত। পড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মূল্যিত পুস্তিকাটি অল্প কিছু সংশোধন করেন। এই সংশোধন অনুসারে তাঁহার অভি-
ভাষণটি মর্ডান রিভিউর এপ্রিল সংখ্যায় ছাপা হইবে।

সম্মেলনে সারবানু আরও কয়েকটি বক্তৃতা হইয়াছিল এবং প্রবন্ধ পাঠিত হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু দৈনিক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

সর্বধর্মসম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্ত

মহাত্মা গান্ধী সর্বধর্মসম্মেলনকে যে বাণী প্রেরণ করেন,

তাহার সঙ্গে এই প্রস্তটি ছিল বলিয়া ধবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে :—

“Are all the religions equal, as we hold, or is there any one particular religion which is in the sole possession of truth, the rest being either untrue or a mixture of truth and errors, as many believe?”

তাৎপর্য। সকল ধর্মই কি সমান, যেহেতু আমরা মনে কবি, অথবা বিশেষ এমন কোন একটি ধর্ম আছে সত্যে বাহ্যিক একচেটিয়া অধিকার আছে, এবং অল্প ধর্মগুলি হয় অসত্য কিম্বা সত্য ও অসত্যের মিশ্রণ—যেমন অনেকে বিশ্বাস করেন।”

এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গিয়া সর্ব ক্রান্তিস ইং-
হাজব্যাণ্ড বলেন :

“যেমন প্রত্যেক শিশু মনে করে তাহার মা-ই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ, ঠিক সেই রকম আমি মনে করি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজের নিজের ধর্মকে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি।”

অন্ততঃ সর্ব ক্রান্তিস প্রভৃতি গণ বৎসর লগুনে যে পৃথিবীব সব ধর্মের কংগ্রেস করেন, তাহার ফলে তাঁহার ঐরূপ ধারণা জন্মে। ঐ কংগ্রেসে বক্তারা নিজের নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস করেন বলিয়া প্রকাশ পায়, এবং সর্ব ক্রান্তিসেরও নানা ধর্মের লোকদের সহিত বাস করিয়া ঐরূপ ধারণা জন্মিয়াছে।

“I naturally consider my own religion as the best, although I endeavour to keep that impression, as far as possible, to myself.”

“যতদূরই আমি আমার ধর্মকে সর্বোত্তম মনে করি, যদিও আমি সেই ধারণা যথাসম্ভব নিজের মনের মধ্যেই রাখিতে চেষ্টা করি।”

সর্বধর্মসম্মেলনে সর্ব ক্রান্তিস ছাড়া এ বিষয়ে আর কে কি বলিয়াছিলেন, তাহা দেখি নাই, সব আলোচনার সম্পূর্ণ

রিপোর্ট কাগজে বাহির হয় নাই। তবে মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের তিনি বাহা উত্তর দিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ বাহির হইয়াছে :—

“While each one regarded his own religion as the best at the same time they strongly felt that there was fundamental unity among all the religions. And it was this fundamental unity among all the faiths that they desired in this Parliament of Religions to realise. They desired to deepen this impression and make it permanent in their mind.”

“প্রত্যেকে নিজের ধর্মকে সর্বোত্তম বিবেচনা কবে ইহা সত্য, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমরা প্রবলভাবে অনুভব কবিতেছি যে, সকল ধর্মের মধ্যে ভিত্তিগত ঐক্য আছে। এবং এই সর্বধর্মসম্মেলনে আমরা সকল ধর্মের মধ্যে এই ভিত্তিগত ঐক্য উপলব্ধি কবিতো চাই। আমরা এই ধারণাটির গভীরতা সাধন করিতে ও মনে তাহা স্থায়ী কবিতো চাই।”

মহাত্মাজী এই প্রশ্নটি এই বিশ্বাসে সম্মেলনে পাঠাইয়া ছিলেন, যে, এই প্রকার বিষয়ে সম্মেলনের মত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে সহায়ক পথপ্রদর্শকের কাজ করিবে।

সর্বধর্মসম্মেলনের ঠিক উদ্দেশ্য বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ্যকারী বলিতে পারিবেন। আমরা সেই উদ্দেশ্য বহু-
টুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয় মহাত্মাজীর প্রশ্নের মত কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার নিমিত্ত সম্মেলন আহুত হয় নাই।

এই রূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, যদি তাহা সম্ভবপর হয়ও, তাহা হইলেও তাহার জন্ত যেহেতু বহুবিষ্মত অধ্যয়ন ও শাস্ত্রধীর দীর্ঘ আলোচনা ও বিবেচনা আবশ্যক, তাহা সর্বধর্মসম্মেলনের মত একটি জনবহুল বিশাল সভার দ্বারা হইতে পারে না। মহাত্মাজীর প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রত্যেক ধর্ম সম্বন্ধে প্রথমে স্থির করিতে হইবে, সেই ধর্মের শাস্ত্রনিবদ্ধ মতগত স্বরূপ, ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠানগত স্বরূপ, তাহার উপদেষ্টাদের উপদেশের স্বরূপ ও অর্থ, এবং সেই ধর্মসম্প্রদায়ের লোকসমষ্টির চরিত্র ও আচরণ দ্বারা এ পর্যন্ত জগতের হিত ও অহিত কি হইয়াছে। কেহ যদি কোন ধর্মের কোন কোন দিক বাছিয়া লইয়া সেইগুলিকেই সেই ধর্ম বলিয়া খাড়া করিয়া তাহার প্রশংসা বা নিন্দা করেন, তাহা ঠিক হইবে না। আমরা সংক্ষেপে যে-যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি—হয়ত বিবেচ্য আরও বিষয় আছে—সবগুলিই

প্রত্যেক ধর্মসম্বন্ধে বিবেচনার মধ্যে আনিতে হইবে, এবং পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

যদি কেবল ঐতিহাসিক প্রাচীন ধর্মগুলি ধরা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার বিষয় এত আছে, যে, একটির সম্বন্ধে বিবেচনান্তর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই দুঃসাধ্য। সবগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আরও কঠিন।

প্রাচীন ধর্মগুলি ব্যতীত অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধর্মও অনেক আছে। সেগুলিকেও বিবেচনার মধ্যে আনিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, সকল ধর্ম সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্ত শুধু যে মনীষা, বুদ্ধি, অধ্যয়ন, আলোচনা, চিন্তনক্ষমতা প্রভৃতির প্রয়োজন তাহা নহে, নিরপেক্ষতাও অত্যাৱশ্যক। ইহা অতি দুর্লভ। প্রত্যেক মানুষের মনে তাহার বংশ, সংসর্গ, শিক্ষা প্রভৃতি কারণে কোন-না-কোন প্রকার সংস্কার ও ধারণা বদ্ধমূল হয়। তাহা সম্পূর্ণ অতিক্রম করা দুঃসাধ্য—হয়ত অসাধ্য। সেই জন্ত যিনি যে ধর্মে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ধর্মপ্রবণ হইলে তাহার পক্ষে সেই ধর্মের প্রতি অধিক অনুরাগ স্বাভাবিক। আবার যদি তিনি ধর্মবিষয়ে উদাসীন বা বিজ্ঞপরায়াণ হন, তাহা হইলে ত তাহার দ্বারা বিবেচনা হইতেই পারে না। যদি কেহ কোন ধর্মেই বিশ্বাস করেন না, কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে এক একটি ধর্মের ও পরে সকল ধর্মের বিচার করিতে চান, তাহা হইলেও প্রেম ও ভক্তি মানুষকে যে দৃষ্টি দেয় তাহার অভাবে তাহার বিচার সম্পূর্ণ ঠিক-না-হইবার সম্ভাবনা।

প্রাচীনধর্মাবলম্বীরা নানা শাখা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহারা নিজেদের শাখার বিশেষ মতগুলিকে সত্য ও অন্যদের বিশেষ মতগুলিকে ভ্রান্ত মনে করেন—এমন কি ভিত্তিগত বিষয়েও তাহাদের মতভেদ দেখা যায়। খ্রীষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মোহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্মসম্বন্ধে ইহা সত্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক অনেক ধর্মেরও শাখা আছে।

অতএব, কোন শাখার কোন মত ঠিক বা অঠিক, বা সবগুলির সব মতই ঠিক বা অঠিক, বলা সোজা নয়। এ বিষয়ে তাহাদের নিজেদের মধ্যেই দারুণ মতভেদ রহিয়াছে। হিন্দুধর্মসম্বন্ধে যেমন বলা হইয়াছে,

“বেদাঃ বিভিন্নঃ, স্বতন্ত্রোবিভিন্নাঃ, নানো মুনির্ভেদ মতং ন ভিন্নম্,”

অন্য বহু ধর্ম সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়।

প্রত্যেক ধর্মে যুগ-প্রভাবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, পরিবেষ্টনীর প্রভাবে, প্রাচীন কথার নূতন ব্যাখ্যার প্রভাবে, নব নব উপদেষ্টাব আবির্ভাবে, নূতন প্রচেষ্টা, নব বিবর্তন, নব অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে। আধুনিক সম্প্রদায়-সকলেও ইহা লক্ষিত হইতেছে। কোনও ধর্মের সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা এই কারণেও কঠিন।

মহাত্মা গান্ধী যে প্রত্যেক ধর্মসম্বন্ধে প্রাঙ্গ করিয়াছেন, যে, উহা সম্পূর্ণ সত্য কিনা, একমাত্র উহাই সত্য ও অন্য সব ধর্ম অসত্য কিনা, কিংবা প্রত্যেক ধর্মেই সত্যাসত্যের সমামিশ্রণ কিনা, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই স্থনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট ভাবে জানা চাই, হিন্দু ধর্ম কি, জৈন ধর্ম কি, বৌদ্ধ ধর্ম কি, জরথুষ্ট্র ধর্ম কি, ইহুদী ধর্ম কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম কি, ইত্যাদি। ইহার ঠিক উত্তর মহাত্মা গান্ধী বা অন্য কেহ যদি দিতে পারেন, তাহা হইলে সেই উত্তর পাইলে তবে তাহার পর গান্ধীজীর উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিবার চেষ্টা হয়ত পণ্ডিত ও মুনস্বী নিরপেক্ষ লোকেরা করিতে পারিবেন।

কোনও প্রাচীন বা আধুনিক ধর্মের সত্যতা অসত্যতা বা আংশিক সত্যতা ও অসত্যতার আলোচনা না করিয়া একটা কথা বলিলে হয়ত তাহা বিবেচনার অযোগ্য মনে না হইতে পারে। ঠাহারা পরস্পরে পরমাশ্রয় বিশ্বাস করেন না, ঠাহারা আপনাদিগকে প্রত্যক্ষবাদী মনে করেন, তাহারা ত দেখিতেছেন, বহিজর্গতে নিন্ত নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে এবং মনোজগতের বহু তত্ত্বও ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে—কোন জগতেরই সম্পূর্ণ জ্ঞান মানুষ নিঃশেষে এখনও পায় নাই। আর, ঠাহার পরস্পরে পরমাশ্রয় বিশ্বাসী—যেমন হিন্দু ইহুদী খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি আন্তরিক, তাহারা স্বীকার করেন, যে, তিনি অনন্ত এবং তাহার সত্য অনন্ত। অতএব তাহার স্বরূপ এবং প্রকাশও অনন্ত। সুতরাং ইহা বলিলে বোধ হয় কোন ধর্ম কোন শাস্ত্র, কোন মহাপুরুষ, কোন আচার্য্য, কোন উপদেষ্টা কোন ব্যাখ্যাচার প্রতি অবিচার করা হয় না, কাহারও প্রতি অপ্রীতি প্রকাশিত হয় না, যে, সত্যের প্রকাশ শেষ হয় নাই ও শাস্ত্র একরূপ

একটি মহাগ্রন্থ বাহ্যব শেষ খণ্ড বাহির হইতে বাকী আছে এবং অদূর ও দূর ভবিষ্যতে যেমন যেমন কিছু বাহির হইবে সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে কিছু বাকীও থাকিয়া যাইবে—শাস্ত্র বলিতে থাকিবেন, “সম্ভবামি যুগে যুগে।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক কনভোকেশনে অর্থাৎ (ববীন্দ্রনাথের ভাষায়) পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় কবিসার্কভোম বাংলায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা এই প্রথম হইল।

কবি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

“দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্ফীকার্য সত্যকেও বিরোধেব কঠে জানাতে হয়।”

বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় কনভোকেশনের বক্তৃতাকে যে একটি গৌববের বিষয় বলিয়া সাংবাদিকদিগকে ও অন্ত্র কাহাকেও কাহাকেও বলিতে হইয়াছে, “বিরোধের কঠে” সে সম্বন্ধে এই টিপ্পনী করিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের যে কোন সভায় বাংলাব্য ব্যবহার যে কর্তব্য তাহা একটি স্বতঃস্ফীকার্য সত্য, স্বতঃস্ফীকার্য সেই সত্যের অম্লসরণ অয়ধ্বনির সহিত ঘোষিত হওয়া “দুর্ভাগ্য দিনের” একটি “দুঃসহ লক্ষণ”। তথাপি, আমরাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, যে, বাহা স্বতঃস্ফীকার্য, যে বাধ্যবশতঃ তাহা এ পর্যন্ত কাণ্ডিতঃ স্বীকৃত হয় নাই, সেই বাধ্য অতিক্রান্ত হওয়া গৌরবের বিষয় এবং প্রধানতঃ যাহাদের চেষ্টায় তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারাই ধন্যবাদভাজন।

আর একটি স্বতঃস্ফীকার্য সত্য এবার কনভোকেশনে কার্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে—বাজালী ছাত্রেরা ধুতি পরিয়া পদবী-সম্মান লইতে পারিয়াছে। গাউনের পরিবর্তে দেশী কোন রকম শোভন পবিচ্ছদ ব্যবহৃত হইতে পারিলে পরিবর্তনটি পূর্ণাঙ্গ হইবে। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, কবি এই কারণে গাউন পরিতে রাজী হন নাই যে, উহাতে একটা অবাস্তবতা (unreality) আছে। তাহা সত্য।

কবি এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য আরম্ভ করেন—

এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত শিক্ষার বিস্তার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্ত্র কোনো দেশেই শিক্ষাব ভাষা এবং শিক্ষার্থী ভাষাব মধ্যে আত্মীয়তারিচ্ছেদেব অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। যুবোপীয় বিজ্ঞায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পাব হয় নি। তাব বিভাবস্তেব প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় কবতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধিব একান্ত লক্ষ্য ছিল স্বদেশী ভাষাব অধিকাৰে স্বাধীন সঞ্চবণ লাভ করা। কেননা যে-বিজ্ঞাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা কবেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ স্বেযোগপ্রাপ্ত সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিশেষেব অলঙ্কারপ্রসাধনেব সামগ্রী ব’লেই আদরণীয় হয় নি, নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে স্বী দেবে ব’লেই ছিল তাব আমন্ত্রণ। এই জন্তই এই শিক্ষাব সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষণ্যপারায়ণ শক্তিশালী জাতিদেব দম্ভ্যবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষাব সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধাব ক’রে মানবেব মহাসভায় তাকে সম্মানেব অধিকাবী কববে সেই শিক্ষাব প্রসারসাধন-চেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশ মাত্র কুপণতা করে নি। সকলেব চেয়ে অনর্থকব কুপণতা বিজ্ঞাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূবদ্ব দান কবা—ক্ষমলেব বড়ো মাঠকে বাইবে শুকিয়ে বেখে টবের গাছকে আড়িনায় এনে জলসেচন কবা। দীর্ঘকাল ধ’বে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমবা সত্ত্বয়েই স্বীকার ক’রে এসেছি। নিজেব সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিবোধ্যার্থ কবতে অভ্যস্ত হয়েছি, জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটা মাত্র জনবিবল পঙ্কিত্ত হোটে হাতাব মাগে ব্যবকুঠ পবিবেষণকেই বলে দেশেব এড়কেশন। বিভাদানেব এই অকিঞ্চিকরত্বকে পেবিবে যেতে পারে শিক্ষাব এমন উদ্যর্থ্যর বখা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহাবা-মকবাসী নেছুরিনবা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূববিক্ষিপ্ত কয়েকটা মৃত্ত ওয়েসিসেবু বাইবে ব্যাপক সক্ষমতায় তাদের ভাগ্যেব সম্মতি থাকতে পাবে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহাবা ও ওয়েসিসেবই মতো, অর্থাৎ পবিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশে বার্ষ্টশাসন এক, কিন্তু শিক্ষাব সঙ্কোচবশত চিত্তশাসন এক হ’তে পাবে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্প্র আবব তুবন্ধে প্রাচ্য-জাতীয়দেব মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতাব প্রতিকাব হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

বলা বাহুল্য, তাহার কারণ সেই সব দেশ স্বাধীন, আমাদের দেশ পরাধীন।

তাঁহার বক্তৃতার শেষে এই প্রার্থনাটি ছিল—

হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌবব দাও

দুঃসাধ্যেব নিমজ্জণে

দুঃসহ দুঃখেব গর্বে।

টেনে তোলা বসন্ত ভাবেব মোহ হ’তে

সবলে ধিকৃত কবো দীনতার ধূলায় লুপ্তন।

দূব কবো চিন্তের দাসত্ববন্ধ,

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দুব করো মুক্তার অযোগ্য পদে
মানবমৰ্যাদা-বিসৰ্জন,
চূর্ণ কবো যুগে যুগে স্ত্রীপীড়িত লজ্জারাপি
নিষ্ঠুব আঘাতে।

নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে,
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

ডাইন-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্রীমাদ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
বক্তৃতা ভাল হইয়াছিল।

চ্যান্সেলার-ক্লপী গবর্নর সর্ব জন এগার্সন একটি ছোট
রাজনৈতিক বক্তৃতায় লোককে ইহা জানাইতে চাহিয়াছিলেন,
যে, নূতন আইন অনুসারে দেশের লোক নিজেদের স্বদেশী
মন্ত্রীদের নিকট হইতেই সব কিছু প্রাপ্তব্য পাইতে পারিবেন—
ইংরেজেরা এক পাশে সরিয়া দাড়াইতেছেন। অর্থাৎ এ
অবস্থায় যদি দেশের লোকেরা প্রাপ্তব্য না পান, তাহা
মন্ত্রীদের দোষ, লোকপ্রতিনিধিদের দোষ এবং নির্বাচক
দেশী লোকদের দোষ। কিম্বাশ্রম্যমতঃপরম্।

লাটসাহেবের বক্তৃতাটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য মার্চ
মাসের মভার্ণ রিভিউতে সবিস্তার বলিয়াছি।

২৩০ জন রাজবন্দীর খালাস পাইবার সংবাদ
খবরের কাগজে এইরূপ একটি সংবাদ বাহির হইয়াছে,
যে, বাংলা-সরকার অচিরে বিনাবিচারে-বন্দী ২৩০ জন
পুরুষ ও নারীকে খালাস দিবেন, সামান্য বা কিছু সৰ্ত্ত
তাঁহাদিগকে মানিতে হইবে তাহা অতি তুচ্ছ। এই সংবাদ
যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে সম্ভাষণ প্রকাশ করিবার
পূর্বে ঐ সামান্য সৰ্ত্ত বা সৰ্ত্তগুলি কি, জানা আবশ্যিক। সৰ্ত্ত
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিলে বুঝিতে পারিব এইরূপ
সৰ্ত্তাধীন মুক্তিতে বন্দীদের সুবিধা হইবে কিনা এবং হইলে
কতটা সুবিধা হইবে। আপাততঃ মনে হইতেছে, ইহাতে
গবর্নমেন্টের সুবিধা হইবে। এই ২৩০ জনকে জেলে খাইতে
পারিতে দিতে কিংবা অন্তরীণ-শিবিরে বা স্বগৃহে বন্দী অবস্থায়
ভাতা দিতে গবর্নমেন্টের যে ব্যয় হইত, তাহা বাচিয়া যাইবে।
পুলিসেরও কৃতিত্ব দেখাইবার ইহাতে একটা সুযোগ হইতে

পারে। তাহারা মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের খোঁজ খবব-হেফাজত
উপলব্ধ করিয়া ২৩০টি গৃহস্থের এবং তাহাদের নিবাস-
গ্রামগুলির উপর নজর রাখিতে পারিবে।

উপরের কথাগুলি লিখিত হইবার পর দেবিলাম, ভারতীয়
ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব হেনরী ক্রেক বলিয়াছেন যে, ২৩০ জন
বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে, তাহার মধ্যে ১ জন নারী।
সর্বের কথা তিনি কিছু বলেন নাই।

কুমারী রেণুকা সেন, এম্-এ,র মামলা

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে বিনা বিচারে কুমারী রেণুকা
সেন, এম্-এ,কে বন্দী করা হয়। প্রথমে তাঁহাকে একটা আটক-
শিবিরে রাখা হয়। পরে তাঁহাকে তাঁহার মাতামহের
গৃহে অন্তরীণ করা হয়। মাতামহ গরীব লোক, দৌহিত্রী
ভার লইতে বরাবর অসম্মত ছিলেন। শ্রীমতী রেণুকার
উপর হুকুম হয়, যে, তাঁহাকে সপ্তাহে একদিন করিনা
নিকটবর্তী থানায় হাজির হইতে হইবে। এরূপ হুকুম
গবর্নমেন্ট যে আইনের যে ধার অনুসারে দিতে পারেন,
তাহাতে ইহাও লেখা আছে যে বন্দী বা বন্দিনীকে উপযুক্ত
ভাতা দিতে হইবে। কিন্তু মাতামহ ও দৌহিত্রীর পুনঃ পুনঃ
আবেদন সত্ত্বেও অনেক দিন পর্যন্ত সরকার ভাতার কোন
ব্যবস্থা না করায় শ্রীমতী রেণুকা এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি
আকর্ষণের নিমিত্ত গত বৎসর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় থানায়
হাজিরি দিতে বিরত হন। তাহা হইলে তাঁহার নাম
মোকদ্দমা হয় ও তাঁহার শাস্তি হয়। তিনি উদ্বিগ্ন
আদালতে ও শেষে হাইকোর্টে আপীল করেন। তাঁহার
পক্ষ সমর্থনার্থ এই একটি যুক্তি দেখান হয়, যে, যেহেতু
গবর্নমেন্ট ভাতা দেন নাই, অতএব তাঁহার স্বাধীনতা
সঙ্কোচের আদেশ আইনসম্মত হয় নাই। আপীল আদালত
দুটি এই যুক্তি গ্রহণ করেন নাই, যদিও উভা আদালত বলেন
গবর্নমেন্ট ভাতা দিতে বাধ্য।

প্রথম যে আদালতে শ্রীমতী রেণুকার বিচার হয়,
সেখানে এবং দুই আপীল আদালতে—কাথাও—সরকার
পক্ষ বলেন নাই, যে, তাঁহাকে ভাতা দেওয়া হইয়াছিল।
কিন্তু হাইকোর্টের রায় বাহির হইবার পর একটি সরকারী

জ্ঞাপনীতে বলা হয়, যে, তাঁহার ভাতা মঞ্জুর হইয়াছিল। হাইকোর্টে এই বিষয়টির শুনানীর সময় বিচারপতি কানলিফ সরকারী কৌশলিকে প্রশ্ন করেন যে ভাতার টাকা কখন পাঠান হইয়াছিল। কৌশলি বলেন তাঁহারা তাহা জানেন না। ডাকঘরে ত সরকারী বেসরকারী সব মনি অর্ডারেরই তারিখ থাকে। এক্ষেত্রে তাহা না জানিবার কারণ কি?

বিনাবিচারে-বন্দীদের ভাতা

উক্ত বিষয়টির শুনানীর সময় বিনাবিচারে-বন্দীদিগকে ভাতা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে সরকারী নীতি প্রকাশ পায়, এবং তাহা যে আইনসম্মত নহে বিচারপতি হেণ্ডারসন এই মতে প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে শুনানীর রিপোর্টের আবশ্যক অংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

“Mr. Khundkar (the Deputy Legal Remembrancer) said that the policy of Government with regard to allowance was this. When a person was dependent upon another person, when a minor dependent on his parents and guardians was ordered to be interned with the parents or guardians, Government did not order an allowance, but when a person dependent upon another had been ordered to be interned elsewhere, then an allowance was given.

“Mr. Justice Henderson remarked that this was opposed to the Act surely. That was the legal position.

“Mr. Khundkar said that he was stating certain facts.”

ইহার তাৎপৰ্য্য এই, যে, ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার মিঃ খুন্দকার বলেন, ভাতা সম্বন্ধে সরকারী নীতি এই, যে, কাহারও পোষ কাহাকেও তাহার পোষকের বাড়ীতে, নাবালককে তাহার পিতামাতা বা অল্প অভিভাবকের বাড়ীতে অন্তরীণ করিলে তাহার জন্ম ভাতা দেওয়া হয় না; ইত্যাদি। তাহাতে বিচারপতি হেণ্ডারসন বলেন, ইহা নিশ্চয়ই আইন-বিরুদ্ধ। ইহাতে মিঃ খুন্দকার কোন তর্ক না করিয়া বলেন, তিনি কতকগুলি তথ্য বলিতেছেন মাত্র।

যে-যে স্থলে গবন্মেণ্ট হাইকোর্টের মতে আইনবিরুদ্ধ এই নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহা হাইকোর্টের ও সর্বসাধারণের গোচর করা কর্তব্য।

ভাতায় বঞ্চিত নাবালক অন্তরীণদের পিতামাতা বা

অল্প অভিভাবকের। এবং বন্দী সিবিল লিবার্টিজ যুনিয়ন এই কাজটি করিতে পাবেন।

বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান

প্রায় আটশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, যুবা বয়সে ত্রিযুক্ত তারকনাথ দাস স্বদেশ ছাড়িয়া যান। তখন হইতে তিনি বিদেশে—প্রধানতঃ আমেরিকায়—বাস করিতেছেন। সেখানে তিনি দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ এবং পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন, এবং “ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি অব আমেরিকা” নামক বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুর প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে অধ্যাপকতা করিয়াছেন। তথাকার শ্রমিক ও তদ্বিধ অস্ত্রাস্ত্র দলে তাঁহার প্রতিপত্তি আছে। জার্মানীর ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতিবৎসর ম্যুনিখ ডয়েটশে আকাডেমী কর্তৃক বহু ভারতীয় ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হয়, তাহা অনেকটা তাঁহার চেষ্টার ফল। তিনি ম্যুনিখের ঐ বিশ্বপরিষদের এক জন সম্মানিত সদস্য, এবং ভারতীয় ছাত্রদের জন্য অভিপ্রেত উহার একটি বৃত্তি তাঁহার নামে দেওয়া হয়। তিনি রোমের মধ্য ও স্বদূর প্রাচ্য সমিতির সম্মানিত সদস্য। ইংরেজীতে তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। স্বাধীন দেশে বাস করেন বলিয়া তিনি সব দেশের সমসাময়িক রাজনীতি সম্বন্ধে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, আমরা চেষ্টা করিলেও তাহা করিবার সুযোগ পাই না। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতি বুঝিতে হইলে যে-সকল খবর জানা এবং কাগজপত্র পড়া আবশ্যক, তাহার অনেকগুলি এদেশে পৌঁছেই না, পৌঁছিলেও প্রকাশিত হয় না বা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

বিদেশবাসী ভারতীয়দের মধ্যে ডক্টর তারকনাথ দাস সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে এক জন বিশেষজ্ঞ এবং প্রামাণিক লেখক। এ বিষয়ে তাঁহাব ইংরেজী বহি আছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে “বিশ্বরাজনীতির কথা” নামক তাঁহার একখানি বাংলা বহি সরস্বতী লাইব্রেরী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে বাঙালী পাঠকেরা অল্প আশ্রয়ে পাশ্চাত্য ও জাপানী রাজনীতির অনেক নিগূঢ় কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সে বিষয়ে আমরা প্রবাসীর পরবর্তী কোন সংখ্যায় কিছু

লিখিব। ‘আপাততঃ আমরা “বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান” সম্বন্ধে ডক্টর দাসের মত এই পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আমাদের বড় বড় নেতারা বাঙালীর অনেক দোষ দেখাইয়াছেন। নিজের দোষ দেখা ও দেখান আবশ্যিক। কিন্তু সত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আশার কথা স্তন্যনও আবশ্যিক। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শকেরা খেলা বেশী দেখে। সে হিসাবে ডক্টর দাসের কথা প্রাধান্যযোগ্য।

বর্তমানের তুর্কি বাঙ্গালাব চেয়ে অনেক ছোট এবং উহাব জনসংখ্যা বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম; কিন্তু বর্তমানের তুর্কি বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ শক্তিশালী। গত দশ বৎসরের মধ্যে তুর্কিবাজ্যে বেলপথ বিস্তার হইয়াছে, শিল্পবিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সামরিক শক্তি, নৌ-বাহিনী ও বিমান-বহর বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুর্কিতে জ্ঞান-শিক্ষা বিস্তারিত হইয়াছে, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিবিভাগ প্রচাৰ খুব বাড়িয়াছে। আজ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বাঙ্গালী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রুশিয়া ও ইতালী—তুর্কির প্রতি সম্ভাব প্রকাশের জন্য অতিশয় ব্যস্ত।

বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায়? এই প্রশ্নটা শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন এবং কেহ বা বলিবেন যে, ‘বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের স্থান কোথায়, এ কথা বিবেচ্য; কিন্তু বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালাব স্থান কোথায়, এ কথা বাড়ুলের প্রশ্ন।’ কেহ বা বলিবেন যে আমি প্রাদেশিক ভাবে মন্ত হইয়া ভারতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বাঙ্গালাব দেশভক্তরা ভারতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, সেটা শুধের কথা, কিন্তু তাঁহারা অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, বাঙ্গালার উন্নতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে নির্ভর করে। বাঙ্গালার দায়িত্ব বড় বেশী। কাজেই, যে বোঝা বহিবে, তাহাব বাহাতে শক্তি হয়, সে সম্বন্ধে চেষ্টা করা দরকার।

ভারতের পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বাঙ্গালা একটা বিশেষ বৃহৎ স্থান অধিকার করে, এবং ভবিষ্যতে বাঙ্গালার দায়িত্ব বাড়িবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাব সঙ্গে জরুরী সঙ্গের। বাঙ্গালা ও আসামের প্রান্ত দিয়া চীনের সহিত সংস্রব। বাঙ্গালার উত্তরে তিব্বত দিয়া চীন ও কবিয়াব সহিত সম্পর্ক হইতে পারে। একদিন বাঙ্গালাব নৌ-বাহিনী ভারত মহাসমুদ্র তথা প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রে বিরাজ করিবে; কিন্তু আজ ইংরেজ রাজনীতিবিশারদেরা বাঙ্গালাব উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একটা নূতন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ (North-Eastern Frontier Province) গঠন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া মনে হয়।

ভারতবর্ষের আয়তন রুশিয়া ব্যতীত সমস্ত ইউরোপের সমান। বাঙ্গালার আয়তন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অপেক্ষা বড়। জনসংখ্যা বাঙ্গালা সমস্ত ছুনিয়াব মধ্যে বৃষ্ট স্থান অধিকার করে। কেবল চীন, রুশিয়া, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জাভানী—জনসংখ্যা বাঙ্গালার চেয়ে বড়। জনসংখ্যা বাঙ্গালা—ইংলণ্ড

ফ্রান্স ও ইতালীর অপেক্ষা বড়। বাঙ্গালার ধনশক্তি, জনশক্তি, বিভাব্যক্তি কম নয়। বাঙ্গালার সামরিক শক্তি কম নয়, কিন্তু উহা বিকাশের সুযোগ পায় নাই। বাঙ্গালার যুবকদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বিস্তার হইলে তাহারা গুর্খা বা জাপানীদের চেয়ে কোন অংশে হের হইবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

আগামী পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন হইবে এবং এই পরিবর্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ নিজের দায়িত্ব পূর্ণ করিবে বলিয়া আশা হয়; কিন্তু বাঙ্গালীদের এবিষয়ে দায়িত্ব সর্বাধিক বেশী; কাজেই বাঙ্গালার নেতাদের জিজ্ঞাস্য কবি, “বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বাঙ্গালার স্থান কোথায়?”

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি মনুষ্য থাকে, তাহা হইলে একদিন বাঙ্গালীর রাজশক্তি ফ্রান্স বা ইতালীর তুল্য হইবে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে আমায় বলিবেন যে, “আপনি প্রায় ৩০ বৎসর বাঙ্গালা ছাড়া, কাজেই বাঙ্গালাব অবস্থা জানেন” এবং আজ কি একটা স্বপ্ন দেখিতেছেন।” কথাটা সত্য—আমি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালাব স্বপ্ন দেখিতেছি। যে বাঙ্গালা একদিন বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে আপনার জাতীয় গৌরবের স্থান দখল করিবে, সেই বাঙ্গালার স্বপ্ন দেখিতেছি। হয়ত এই স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হইবে।

যখন আমি বলি যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে বা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীকে, বিশ্বরাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব লইতে হইবে, তখন কেহ যেন না মনে করেন যে, এই সময় ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে কোন প্রকারের ক্ষমতা বা গণ্ডগোল হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভ এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন অসম্ভব নয়। যত দিন ভারতবাসী শক্তিশালী না হইবে, তত দিন ইংরেজ ও ভারতের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সম্ভব নয়। ভারতের নেতারা যদি প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ছাড়িয়া জাতির প্রকৃত মঙ্গলের জন্য একত্রিত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইংরেজ রাজনীতিকেরা ভারতবর্ষের সমস্ত দাবী নিঃসঙ্কেচ মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন। দলাদলিতে দুর্বল বাঙ্গানৈতিক দুর্দর্শিতাহীন জাতির সহিত কে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে? ইংরেজ রাজনীতিকেরা দুর্খ নহেন—তাঁহারা জানেন যে ভারতবাসীর নোঁহা দ্য তাঁহাদের শিল্পবাণিজ্য, সামরিক শক্তি, বিশাল সাম্রাজ্য সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। শক্তিসেবক বাঙ্গালী, তোমাব গুরু দায়িত্ব পূর্ণ করিবর জন্য ও প্রকৃত উন্নতিব জন্য বদ্ধপবিকব হও।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের চৈত্র সাক্ষ্য

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্বাচনের ফল হইতে দেখা যাইতেছে, যে, কংগ্রেসের চেষ্টা অক্ষর হইয়াছে। এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা ব্যবস্থাপক সভার সমুদয় সদস্য-সংখ্যার অর্ধেকের

বেশী হইয়াছে। অল্প পাঁচটিতেও কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যদের সংখ্যা নগণ্য নহে। অল্প প্রদেশগুলিও বলাতে পারি না, কিন্তু বঙ্গেও কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যদের সংখ্যা খুব বেশী হইত, যদি ব্রিটিশ প্যালেমেন্ট বাংলা দেশের স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত শ্রেণীকে নানা উপায়ে হীনবল করিবার নানা বিধি নূতন ভারত-শাসন আইনে নিবিষ্ট না করিতেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভাঙ্গাধায়ে প্রধান উপায়—যদিও সে উপায় সকল প্রদেশেই অবলম্বিত হইয়াছে। বাংলা দেশে স্বাধীনতাকামী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে হিন্দু বেশী। তাঁহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হিন্দুদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের শিক্ষা, যোগ্যতা, সার্বজনিক কর্মোৎসাহ ও তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অল্পপাতে তাহাদিগকে প্রতিনিধি দেওয়া হয় নাই, এমন কি তাহাদের সংখ্যা অল্পসারে প্রাপ্য প্রতিনিধিও দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যাহারা অস্পৃশ্য বা অবনত জাতি নহে এবং অবনতদের তালিকায় যাইতে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছে, তাহাদিগকেও ঐ তালিকাভুক্ত করিয়া হিন্দুদের ৮০টি আসনের মধ্যে ৩০টি “অবনত” হিন্দুদিগকে দিয়া, “অবনত” ও “অনবনত” হিন্দুদের মধ্যে যোগ্যতম হিন্দুদের নির্বাচনে বাধা দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু, বঙ্গে ইংরেজদিগকে ২৫টি আসন দেওয়া হইয়াছে। তাহার লোকসংখ্যা অল্পসারে ১টিও পাইত না। তাহাদের প্রদত্ত রাজস্বের অল্পপাতেও ২৫টি প্রাপ্য হয় না। তদ্বিত্ত প্রদত্ত রাজস্ব অল্পসারে আসন ভাগ করিয়া দিতে গেলে বঙ্গে ২৫০টি আসনের মধ্যে ১৮৭টি হিন্দুদের প্রাপ্য হয়।

যাহা হউক, ব্রিটিশ প্যালেমেন্টের এত চেষ্টা সত্ত্বেও বঙ্গ কংগ্রেসের দলের সদস্যদের সংখ্যা অল্প নহে কোন একটি দলের সদস্যদের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে।

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে কংগ্রেসের এই কৃতকার্যতার কারণ কি ?

কারণ প্রধানতঃ দুটি। কংগ্রেস দেশকে স্বাধীনতা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু স্বাধীনতা দিবার আশা অল্প সকল দলের চেয়ে বেশী দিয়াছেন, স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা জাগাইয়া রাখিবার ও প্রবল কবিবার চেষ্টা সকলের চেয়ে বেশী করিয়াছেন, এবং নিজ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অল্পসারে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাও সকলের চেয়ে বেশী করিয়াছেন। এই চেষ্টা :

করিতে গিয়া কংগ্রেস দলের লোকদিগকে প্রভুত ক্ষতি স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে।

স্বাধীন হইবার ও থাকিবার ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত। হুতরাং যাহারা দেশকে স্বাধীন করিবার আশা দেন ও চেষ্টা করেন, তাঁহারা যে দেশের লোকদের প্রিয় হইবেন, তাহা স্বাভাবিক। সত্য বটে, কংগ্রেসের স্বাধীনতালাভচেষ্টা এখনও সফল হয় নাই ; কিন্তু কর্তা পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-লাভচেষ্টা এত অল্প সময়ে জয়যুক্ত হইয়াছে ?

কংগ্রেসপক্ষীয় কোন কোন লোকের দোষের বা সমগ্র কংগ্রেসের কোনও নীতির ভ্রমের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তদ্বিত্ত, সম্পূর্ণ নিখুঁত কোন দল ও মানুষ আছে কি ?

কংগ্রেসের লোকপ্রিয় হইবার আর একটি কারণ, গবর্নমেন্টের প্রতি দেশের লোকদের বিরাগ। দেশের দাবিত্যাগ, স্বাধীনতা, অজ্ঞতা প্রভৃতির অল্প নানা কাবণ থাকিতে পারে—তাহার আলোচনা এখন করিতেছি না। কিন্তু দেশের লোকদের ধনবুদ্ধি, উৎসাহ ধন দেশে রক্ষা, রোগেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রোগের প্রতিষেধ, গ্রাম ও নগরসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষা যথোচিত ব্যবস্থা, দেশের শোচনীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা—প্রভৃতি বিষয়ে গবর্নমেন্ট যথেষ্ট মন দেন নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। তাহার উপর আছে, গবর্নমেন্টের বছর্ব্যাপী দমননীতি—যাহার গুরুভার মানুষের মনকে অবসাদগ্রস্ত ও নৈবাশ্রপূর্ণ করিতেছে। হুতরাং গবর্নমেন্ট যে জনগণেব অপ্রিয়, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কংগ্রেস গবর্নমেন্টের সর্বাপেক্ষা নির্ভীক ও অক্লান্ত সমালোচক এবং সমালোচনা করিতে গিয়া দণ্ডিতও হইয়াছেন সকলের চেয়ে বেশী কংগ্রেসের লোকেরা। হুতরাং তাহাদের লোকপ্রিয় হওয়াটাও আশ্চর্যের বিষয় নহে।

কংগ্রেস জয়ের কি ব্যবহার করিবেন ?

কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় (যেখানে যেখানে দুটি কক্ষ আছে, তথাকার নিম্ন কক্ষে) সর্বাধিক আসন পাইয়াছেন। এই রূপ ক্ষমতা (তাহার মূল্য যাহাই হউক) লাভ করিয়া কংগ্রেস সেই ক্ষমতার ব্যবহার কিরূপ

করিবেন? কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা কি মন্ত্রিস্থ গ্রহণ করিবেন? তাহা দুই এক দিনেই মধ্যেই কংগ্রেসের নেতারা স্থির করিবেন।

কংগ্রেস বলিয়াছেন, কংগ্রেসওয়ালারা ব্যবস্থাপক সভায় যাইতেছেন, ভারতশাসন আইন অচল করিবার নিমিত্ত এবং ব্যবস্থাপক সভাগুলোকে ভাঙিয়া দিবার বা অকেজো করিবার নিমিত্ত। এখন আবার যাহারা মন্ত্রিস্থগ্রহণের পক্ষপাতী তাহারা বলিতেছেন, তাঁহারা মন্ত্রিস্থ গ্রহণ করিবেন ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু যে যে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস একাই বলবত্তম, সেখানে তাঁহারা মন্ত্রিস্থ না লইয়াও উদ্দেশ্যসিদ্ধ করিতে পারিবেন—অবশ্য, যদি তাহা সম্ভবপর হয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু স্বীকার করিয়াছেন, যে, শুধু ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে কাজ করিয়া নূতন শাসনবিধিটাকে অচল ও অকেজো করা যাইবে না। তাহার জন্ত ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে জনগণের সমষ্টিগত কাজ চাই। ইহা ঠিক কথা।

মন্ত্রিস্থ গ্রহণের সপক্ষে একটি সত্যিকার প্রবল যুক্তি আছে। দেশের নির্বাচকমণ্ডলীই কেন কংগ্রেসওয়ালার নির্বাচন-প্রার্থীদিগকেই ভোট দেওয়া উচিত, তাহার কারণ দেখাইতে গিয়া কংগ্রেসের নির্বাচন ম্যানিফেস্টোতে (election manifestoতে) কৃষকদিগকে খাজনা কমাইবার আশা দেওয়া হইয়াছিল, শ্রমিকদের কোন কোন সুবিধা কুবিয়া দিবার আশা দেওয়া হইয়াছিল, ইত্যাদি। বর্তমান আইন পরিবর্তন বা একেবারে নূতন আইন প্রণয়ন ব্যতীবেক এসব আশা পূর্ণ করা যাইবে না। কংগ্রেসওয়ালারা মন্ত্রী না হইলে স্বয়ং আইন পরিবর্তন বা নূতন আইন প্রণয়ন কবাইতে পারিবেন না। অতএব নিজের কথা রাখিতে হইলে কংগ্রেসওয়ালাদিগকে মন্ত্রীর পদ লইতে হইবে।

কিন্তু এই যুক্তিটি কংগ্রেসওয়ালারা প্রয়োগ করিতেছেন না। তাঁহারা কেবল বলিতেছেন, মন্ত্রী হইয়া আইনটা অচল করিবেন, ব্যবস্থাপক সভা ও শাসনবিধি অকেজো করিবেন ইত্যাদি, কেবল ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে কাজের দ্বারা বাহ্যিক অসাধ্যতা বা দুসাধ্যতা নেহরু মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন।

আর দু-একটা অপ্রকাশ্য কারণ থাকিতে পারে, যাহা কংগ্রেসওয়ালার বা অকংগ্রেসওয়ালার কোন মন্ত্রিস্থপ্রার্থীই

স্বীকার করিবেন না। মন্ত্রীদের বেতনটা নিতান্ত সামান্য নয়। সকলের পক্ষে না হইলেও অনেকের পক্ষে ইহা সত্য। যে, তাঁহারা এখন যাহা বোজগার কবেন, ঐ বেতনটা তার চেয়ে বেশী। তার উপর “পদমর্যাদা”টা আছে। ইংবেজীতে যাহাকে বলে পেট্রনেজ (patronage)—লোকজনকে চাকরি ও নানা রকম ঠিকা (contract) দিবার ক্ষমতা, এটাও তুচ্ছ নয়। দুর্ভাগ্যবশত লোকদের বেশ উপরিপাওনাও যে না-হইতে পারে বা কাহারও কখনও হয় নাই, এমন নয়।

এই সমস্তই নিম্ননীয় কারণ। কোন মন্ত্রিস্থপ্রার্থীরই সম্বন্ধে এরূপ কোন কারণ না থাকিলে তাহা যুগের বিষয়।

মন্ত্রিস্থ গ্রহণ না করিবার পক্ষে প্রবলতম যুক্তি এই, কংগ্রেস বলিয়াছেন, নূতন শাসনবিধি অগ্রগণ্য, সাম্রাজ্যবাদ অতি নিম্ননীয়। কিন্তু প্রবলতম ও স্বাধীনচিন্তিতম কংগ্রেস-ওয়ালারও মন্ত্রী হইলে তাঁহাকে শাসনবিধি অগ্রযায়ী কিছু কাজ করিতেই হইবে, সাম্রাজ্যবাদদুষ্ট কোন-না-কোন নীতির কিঞ্চিৎ সমর্থন করিতে হইবে—হয়ত বহুনির্দিষ্ট দমননীতির সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সমর্থন—এমন কি প্রয়োগও—করিতে হইবে। অতএব মন্ত্রিস্থ গ্রহণ করিলে কংগ্রেসের কথা ও কাজে মিল খাঁকিবে না।

মন্ত্রিস্থ গ্রহণের বিরুদ্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। কংগ্রেসের নীতি সব প্রদেশে সমভাবে প্রযোজ্য ও অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা কংগ্রেস পক্ষপাতদুষ্ট হইবেন—এখনও যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত আছেন তাহা বলিতেছি না। কংগ্রেসের পক্ষে সকল প্রদেশেই একই নীতির অনুসরণ হইতে পারে কেবলমাত্র মন্ত্রিস্থ অগ্রহণের দ্বারা—কোথাও মন্ত্রিস্থ গ্রহণ না-করিয়া।

যদি কংগ্রেস প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নীতির অনুসরণ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের কার্যে স্ববিরোধ ও অসঙ্গতি দোষ আশ্রিত। কংগ্রেস মন্ত্রিস্থ প্রাইতে পারেন ছয়টি প্রদেশে। ঐ কয়টিতে যদি কংগ্রেস মন্ত্রিস্থ গ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চয়ই কোন প্রকার সুবিধার জন্য। কংগ্রেস বলিবেন, সে সুবিধাটা ধ্বংস করিবার সুবিধা; অন্যেরা বলিবে হয় জাতিগঠনমূলক কিছু করিবার সুবিধা, নয় বেতনের, পদমর্যাদার ও মুকুর্বি হওয়ার শোভ।

ধরিয়া লওয়া যাক, কংগ্রেস মন্ত্রিস্থ গ্রহণ করিবেন ধ্বংস

করিবার নিমিত্ত। যাহা কংগ্রেস মনে করেন তাহাই ধ্বংস করিবেন। তাহা হইলে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে দেশের লোকদিগকে মন্দের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা করিবেন, বাকী পাঁচটিতে তাঁহারা মন্দের আওতায় তাহাদিগকে পচিতে দিবেন।

ধরিয়া লওয়া যাক, কংগ্রেস মন্ত্রিস্থ লইবেন ব্যবস্থাপক সভায় গঠনমূলক কিছু করিবার নিমিত্ত। তাহার অর্থ হইবে এই যে, ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস হইবেন গঠনকারী। বাকীগুলিতে কি হইবেন? বিরুদ্ধাচারী? চীৎকারকারী? না, আর কিছু? সেই কিছুটা কি?

বক্তৃত্ত: কংগ্রেস কোথাও মন্ত্রিস্থ গ্রহণ, কোথাও মন্ত্রিস্থ অগ্রহণের পক্ষপাতী হইলে কাজটা এই ইংরেজী কথাগুলার অল্পসরণের মত হইবে—

Every one for himself, and
The Devil take the hindmost.

অর্থাৎ, “চাচা, আপন বাঁচা”, এবং “সকলের পিছনের হতভাগাকে শয়তান ধরুক”।

অবশ্য, বাংলাকে শয়তানে ধরিলে কাহারও দুঃখ নাই; অথবা এই দুঃখ আছে, যে, বাংলা রসাতলে গেলে এমপ্লয়েট করিবাব সকলের চেয়ে সুবিধাজনক জায়গাটা লোপ পাইবে। কিন্তু বাংলা স্তম্ভস্থই ত আর রসাতলে ঝাইতেছে না। “After us the deluge”—আমাদের আমলের পরে “প্রলয়পয়োদিজল” আসুক না?

বঙ্গে মন্ত্রিস্থ-সমস্যা

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে ভূখণ্ডকে বাংলা প্রদেশ নাম দিয়াছেন, তাহার অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। গবর্ণমেন্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মুসলমানদিগকে অল্প প্রত্যেক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর লোকদের চেয়ে বেশী আসন দিয়াছেন। এই অল্প নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। তাহাদের মধ্যেও আবার কয়েকটি দল হইয়াছে। এই এক একটি দলকে আলাদা আলাদা ধরিলে কংগ্রেসওয়ালারা সদস্যদের চেয়ে এই দলগুলির কোনটির সদস্যসংখ্যা বেশী হয় না। যাহা হউক, জোড়াতাড়ি দিয়া এই দলগুলিকে একত্র করিয়া একটি

সম্মিলিত মুসলমান দল গঠিত হইয়াছে। ইহার সদস্যসংখ্যা অল্প যে-কোন দলের সদস্যসংখ্যার চেয়ে বেশী। সুতরাং এই দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতেই সম্ভবতঃ অধিকসংখ্যক মন্ত্রী মনোনীত হইবে। মোট কয়জন মন্ত্রী হইবে বলা যায় না। তাহা অনেকটা গবর্ণরের মঞ্জির উপর নির্ভর করিবে। সম্মিলিত মুসলমান দলের নেতা ষাঁহাদিগকে মন্ত্রী মনোনীত করিবেন, গবর্ণর যে তাহাদের সকলকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে বাধ্য থাকিবেন বা নিযুক্ত করিবেন, এমন নয়।

মন্ত্রীদের মধ্যে ক’জন মুসলমান ক’জন হিন্দু বা অল্প ধর্মের বা জাতির হইবেন, আইনে তাহা লেখা নাই। এই ভাগাভাগিও অনেকটা গবর্ণরের মঞ্জির উপর নির্ভর করিবে। তবে নানা কারণে একাধিক হিন্দুকে লইতে হইবে। তাহার কারণ, ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুদিগকে যত আসন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রতি অভ্যস্ত অবিচার হইয়াছে; মন্ত্রিমণ্ডল হইতে তাহাদিগকে বাদ দিলে অবিচার ও অত্যাচারী স্পষ্টতর হইবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ পালেমেন্টের অবস্থা চক্ষুজ্ঞা বলিয়া কোন বলাই নাই। তথাপি অপক্ষপাতিত্বের একটা অন্ততঃ ভানও ত চাই। সুতরাং একাধিক হিন্দুকে লইতে হইবে। ইহা গেল ব্রিটিশ পক্ষের হিন্দুকে একেবারে বাদ না দিবার কারণ।

সম্মিলিত মুসলমান দলের নেতা মিঃ ফজলুল হক কেন হিন্দুকে বাদ দিতে পারেন না, তাহারও কারণ আছে। তিনি যে সমস্ত নির্বাচিত হইতে পারিয়াছেন, তাহা কতকটা হিন্দুদের সাহায্যে। ভবিষ্যতেও তাহাকে হিন্দুদের সাহায্য লইতে হইবে। এই জন্য তিনি সমস্ত হিন্দুকে নারাজ করিতে পারেন না। হিন্দুদের সহিত যদি তাহার অল্প প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকে, তাহা, সাক্ষাৎভাবে না হউক, হিন্দুদিগকে বাদ না দিবার পরোক্ষভাবে একটা কারণ হইতে পারে।

যে কয়টি মন্ত্রীর পদ মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে, তাহার অল্প উমেদার অনেক। ঢাকার নবাব-পরিবারই গহিতেছেন দুটি। তাহার উপর উত্তরবঙ্গের দল বলিয়া হঠাৎ একটি দলের আবির্ভাব হইয়াছে। এই দলকে খুশি করিতে না পারিলে তাহারা মিঃ ফজলুল হককে ও অল্প সব মুসলমান দলকে কতটা অসুবিধায় ফেলিতে সমর্থ জানি না—

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে গ্রায় অন্তায় অপেক্ষা কে কত সাহায্য করিতে বা কষ্ট দিতে পারে, তাহাই অধিক বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহার পর মিঃ ফজল হকের নিজের কৃষক-প্রজন্ম আছে। তাহাদিগকেও ত কিঞ্চিৎ দিতে হইবে, একান্ত বঞ্চিত করিলে চলিবে না।

হিন্দুরা মন্দির পদ কয়টি পাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু “অবনত” শ্রেণীর নেতারা না-কি দুটি পদ চাহিতেছেন। ত্রিশটি আসনের অধিকারী তফসিলভুক্ত জাতিরা যদি দুটি পান, তাহা হইলে ৫০টি আসনের অধিকারী অন্ত হিন্দুরা অন্ততঃ ৩টি পাইবার দাবী করিতে পারেন। তাহাড়া এই ৫০টি ব্যতীত হিন্দুরা বাণিজ্যিক, শ্রমিক এবং জমিদারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আসনগুলিরও কয়েকটি পাইয়াছেন। সুতরাং অন্তঃ হিন্দুদিগকে তফসিলভুক্ত জাতিদের চেয়ে কমসংখ্যক মন্ত্রিপদ দেওয়া অস্ববিধাজনক হইবে।

এই বিষয়ের আলোচনায় আমরা গ্রায় অন্তাদের কথা তুলিতেছি না। কারণ, অন্তায়মুর্ত্তি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তি উপর নির্মিত শাসনবিধিটার মধ্যে গ্রায় মুজিয়া বাহির করা কঠিন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষে

মুসলমান সদস্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ কক্ষের ২৭ জন সদস্য নিম্ন কক্ষেব সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে, নিম্নম এইরূপ। মুসলমানেরা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, যে, নিম্ন কক্ষের মুসলমান সদস্যেরা উচ্চ কক্ষের এই সাতাইশটি আসনের প্রার্থীদের মধ্যে মুসলমানদিগকেই ভোট দিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কেহ কোন কোন হিন্দুপ্রার্থীকেও ভোট দিয়াছেন। ফলে, নিম্ন কক্ষে মুসলমান সদস্যদের যেকোন সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, উচ্চ কক্ষে সেরূপ হয় নাই। মুসলমানেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা উচ্চ কক্ষেও নিম্ন কক্ষের মত সংখ্যাধিক্য চান। শুনা যায়, তাহার অন্তঃ তাঁহারা বঙ্গের লার্টসাহেবকে এই অস্বরোধ করিবেন, যে, তিনি যেন উপযুক্তসংখ্যক মুসলমানকে উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনয়ন

করেন। ছয় হইতে আট জনকে উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনয়ন করিবার ক্ষমতা লার্টসাহেবের আছে।

নিম্ন কক্ষের কোন কোন মুসলমান সদস্য কোন কোন হিন্দু প্রার্থীকে কেন ভোট দিলেন, তাহার কারণ প্রকাশ পায় নাই, পাইবেও না। হইতে পারে, যে, তাঁহারা কোন কোন হিন্দু প্রার্থীকেই কোন মুসলমান প্রার্থী অপেক্ষা যোগ্যতর মনে করিয়াছিলেন; কিংবা অন্তঃ কারণও থাকিতে পারে। এইরূপ ভোট ঠাহারা দিয়াছেন ও পাইয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত তথ্য জানেন। বাহা ইউক, মুসলমান সদস্যেরা ক্ষমতা থাকিতেও যখন মুসলমান সমাজের বাহ্যিকরূপ যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান সদস্যকে নির্বাচিত করেন নাই, তখন তাঁহাদের বিবেচনায় বাহা বাটতি তাহা-মুদ্রণ করিতে লার্টসাহেবকে বলা অশোভন ও অস্বাভাবিক হইবে।

বঙ্গীয় উচ্চ কক্ষে তফসিলভুক্ত জাতির সদস্য

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষের মুসলমান সদস্যেরা যেমন ক্ষমতা থাকিতেও মুসলমান সমাজের বাহ্যিকরূপ যথেষ্ট-সংখ্যক মুসলমানকে উচ্চ কক্ষের সদস্য নির্বাচন করেন নাই, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্ন কক্ষের তফসিলভুক্ত জাতিদের সদস্যেরাও সেইরূপ নিম্ন শ্রেণীর যত জনকে উচ্চ কক্ষের সদস্য পদের অন্তঃ ভোট দিতে পারিতেন, তাহা দেন নাই; তাহার স্থিরবর্ত্তে কোন কোন “উচ্চ” জাতির হিন্দুকে ভোট দিয়াছেন। ফলে তফসিলভুক্ত জাতির লোকদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে শুনা যায়। তাঁহারাও নাকি গুরুত্বকে কয়েক জন তফসিলভুক্ত জাতির লোককে উচ্চ কক্ষের সদস্য মনোনয়ন করিতে অস্বরোধ করিবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অস্বরোধ করিলে তাহা অশোভন ও অস্বাভাবিক হইবে।

নিম্ন কক্ষের তফসিলভুক্ত জাতিদের কোন কোন সদস্য উচ্চ কক্ষের সদস্যপদপ্রার্থী কোন কোন “উচ্চ” জাতির হিন্দুকে কেন ভোট দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহাদের যোগ্যতরতার অন্তঃ দিয়াছেন, না অন্য কারণে দিয়াছেন, তাহা ভোটদাতারা জানেন এবং ঠাহারা ভোট পাইয়াছেন, তাঁহারাও জানেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার আংশিক ব্যর্থতা

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার একটা উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগকে ও “উচ্চ” ও “নিম্ন” জাতির হিন্দুগিকে নিজেদের গভীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা এবং ধর্মসম্প্রদায়নিরপেক্ষ ও জাতিনিরপেক্ষ দল গঠনে বাধা দেওয়া। কিন্তু ব্রিটিশ পাল্লোমেণ্টের বুদ্ধিতে এই উদ্দেশ্যসাধনের যত রকম ক্ষমী আসিগাছে, তাহা অবলম্বন সত্ত্বেও, হিন্দু মুসলমানের নির্বাসনে সহায়তা কবিয়াছে, এবং মুসলমান হিন্দুকে ও তফসিলভুক্ত হিন্দু ও অন্ত্র হিন্দুকে ভোট দিয়াছে। অন্ততঃ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত যোগ্যতা ও সামাজিক প্রভাবের জয় হইয়াছে।

অন্য কারণের যে ইঙ্গিত মুসলমান কাগজেই দেখা যায়, তাহা সত্য হইলে, কবি বায়রনের নারীদের প্রতি অবিচারিত অবজ্ঞাসূচক পংক্তি দুটির একটা শব্দ বদলাইয়া কোন কোন রকম সনস্কদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে—

“Members, like moths, are ever caught by glare,
And Mammon wins his way where seraphs
might despair.”

কংগ্রেস-কমিটি দ্বারা অকংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়ন

উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য। বুলিয়া ষাঁহাদের নামের তালিকা কংগ্রেস-কমিটি বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে কংগ্রেসওয়ালান হইলে একরূপ লোকদের স্থানপ্রাপ্তিতে নানাবিধ সমালোচনা হইয়াছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহার স্পষ্টাঙ্গাষ্ট্র জবাবও দিয়াছেন। একরূপ জবাব এক দিক দিয়া উপভোগ্য হইলেও, তাহাতে কংগ্রেসের শুধু প্রতিপত্তিই বাড়িয়াছে মনে হয় না।

যাহা হউক, কংগ্রেসওয়ালারা যে কোন কোন স্থলে নিজেদের দলের বাহিরের লোকদিগকেও মনোনীত করিয়াছেন, তাহার ভাল দিকটির উল্লেখ করা আবশ্যিক। জন্ম ও বংশগত জাতিভেদ আছে, নিবৃক্ষর ও লিখনপঠনক্ষম এই দুই জাতি আছে, বাংলানবিস ও ইংরেজীনবিস এই দুই জাতি আছে, ধনী ও দরিদ্র দুই জাতি আছে, ধর্মগত জাতিভেদ আছে, পেশাগত জাতিভেদ আছে—তাহার উপর নতুন এক প্রকার জাতিভেদের আবির্ভাব হইয়াছে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে মতভেদ লইয়া। এবং এই মতভেদ যে একান্ত ও ভিত্তিগত তাহাও নহে।

অতএব প্রত্যেক দলের লোক অন্ত সব দলের যোগ্য লোকদের যোগ্যতা মানিয়া এই জাতিভেদ ভাঙিয়া দিলে তাহার প্রশংসা করা অবশ্যকর্তব্য।

স্বাধীনতালিপ্সা বাহনীয়, কিন্তু তাহা দল-বিশেষেরই একচেটিয়া সম্পত্তি, একরূপ লোকদেখানো ভঙ্গিমা (pose) বাহনীয় নহে।

মহাত্মা গান্ধীর “স্বাধীনতা”

দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য ও সহকর্মী অধুনা লণ্ডননিবাসী সলিসিটর মিঃ পোলাক গান্ধী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যে স্বাধীনতা চান, সে কি রকম? যখন গোলটেবিল কনফারেন্সের বৈঠকে গান্ধীজী লণ্ডন গিয়াছিলেন, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও কি তাঁহার মত সেইরূপ আছে? প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, স্বাধীনতার সার অংশ শাইলে সন্তুষ্ট হইবেন, এখনও তিনি স্বাধীনতার সার অংশ শাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। তাঁহার মতে ওয়েস্টমিন্স্টার স্ট্র্যাটুট নামক আইন অমুযায়ী ডোমিনিয়ন পাইলে স্বাধীনতার সার অংশ পাওয়া যাইবে। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলি নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইংলণ্ড তাহাদিগকে তাহাদের মতের বিরুদ্ধে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধে যোগ দিতে বা তাহাদের সৈন্যদলকে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধে লাগাইতে পারে না। অবশ্য, তাহারাও ইংলণ্ডের সম্মতে অন্য দেশের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না, কিংবা ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত কোন দেশের সহিত মিত্রতা-মূলক সন্ধি করিতে পারে না। কিন্তু তাহারা স্বাধীনভাবে বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক সন্ধি করিতে ও তথায় বাণিজ্য-দূত রাখিতে পারে। ওয়েস্টমিন্স্টার স্ট্র্যাটুট অমুসারে ডোমিনিয়নগুলি আবশ্যক হইলে ও ইচ্ছা হইলে ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া, ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারেন। গান্ধীজী বিশেষ করিয়া এই অধিকারটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, যে, তিনি ওয়েস্টমিন্স্টার স্ট্র্যাটুট অমুযায়ী এই অধিকার সমেত ডোমিনিয়ন পাইলে সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে

পারি এবং তাহার গুণ অল্পভব করি। তাহার মনের ভাব সংস্কারকের মনের ভাব, যাহাকে কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক দলের লোকেরা রিফর্মিষ্ট ভাব বলেন। অবশ্য ডোমিনিয়নস্থ না-পাইলে গান্ধীজী যে একেবারে গোড়া হইতেই ইংলণ্ডের সহিত নিঃসম্পর্ক পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত ডোমিনিয়নস্থ পাইলে, দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এবং পররাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ণ-স্বাধীনতা পাইলেও, যে তাহাকে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদের দোষে কতকটা দোষী থাকিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন ইংলণ্ড তাহার অধীনস্থ দেশ-সমূহের প্রতি যে-যে বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করে না বা স্পষ্ট অনায় ব্যবহারই করে, ডোমিনিয়নগুলি হয় তাহার সমর্থন কবে, নয় প্রতিবাদ করিতে নিবৃত্ত থাকে। ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হইলে তাহাকেও এইরূপ দোষে দোষী হইতে হইবে। এই জন্য সম্পূর্ণ দোষনিমুক্ত থাকিতে হইলে পূর্ণ-স্বাধীনতাই কাম্য। কিন্তু এই প্রকার দোষ হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় ডোমিনিয়নস্থের মধ্যেই আছে। সে উপায় ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা। তাহা করিবার অধিকার গুয়েষ্টমিলিটারি স্ট্র্যাটুট ডোমিনিয়নগুলিকে দিয়াছে।

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মনের ভাবও আমরা বুঝিতে পারি এবং তাহারও উৎকর্ষ অল্পভব করি। ডোমিনিয়নস্থ পাইলে পূর্ণস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিছু কমিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিতে চান না। কিন্তু যদি ব্রিটেন ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন হইতে দেখে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটেন আর সাম্রাজ্যবাদী থাকিবে না—যদিও আরও কোন কোন ব্রিটেনের অধীন দেশ সম্বন্ধে তখনও ব্রিটিশ জাতি সাম্রাজ্যবাদী থাকিবে। ইহা অবশ্যস্বীকার্য, যে, পূর্ণ-স্বাধীনতাই সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় কাম্য অবস্থা। সেই অবস্থায় যে দেশ আছে বা পৌছে, সে দেশ স্থির করিতে পারে, অল্প কোন দেশের সহিত কিরূপ সম্পর্ক রাখিবে বা না-রাখিবে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই অবস্থায় পৌছিবার পথ দুটি—ডোমিনিয়নস্থের দিক্ দিয়া এবং বিপ্লবের সাহায্যে।

নতুন ভারতশাসন আইনের খসড়া প্যার্লিমেণ্টে উপস্থাপিত ও আলোচিত হইবার পূর্বে ইংলণ্ডের রাজা, প্রধান মন্ত্রী, ভারতের বড়লাট প্রভৃতি অনেকে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নস্থ দিবার আশা দিয়াছিলেন, অঙ্গীকার কবিয়াছিলেন। কিন্তু এই খসড়া প্রস্তুত হইবার প্রাক্কাল হইতে ভারতবর্ষে ডোমিনিয়নস্থের কথা সব ইংবেজ রাজপুরুষ পরিহান করিয়াছেন, চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং প্যার্লিমেণ্টে বিনা প্রতিবাদে বলা হইয়াছে যে ডোমিনিয়নস্থ দিবার আগেকার প্রতিশ্রুতিগুলির কোন মূল্য নাই, সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার অধিকার প্রতিশ্রুতিদাতাদের ছিল না। তাহার ফলে যদি ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক মনোভাব প্রবলিত হইয়া থাকে, তাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

কংগ্রেসওয়ালারা মনে রাখিবেন, লিবার্যাল বা নরম-পন্থীরা কংগ্রেসনেতা গান্ধীজীর মতই ডোমিনিয়নস্থ চান।

রেলওয়ে বজেট

সরকারী রেলওয়েগুলি ভারতবর্ষের মস্ত বড় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। তাহাতে ভারতবর্ষের ৮০০ কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে। রেলওয়ের বজেটটিকে এই অজুহাতে দেশের সাধারণ বজেট হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে, যে, রেলওয়ে একটা কারবার, তাহার সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, তাহা কারবারের রীতিনীতি অনুসারেই চালান উচিত। কিন্তু এই অজুহাতটাই একটা রাজনৈতিক চাল। কারবারের নীতি অনুসারে যদি ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলি চালাইতে হয়, তাহা হইলে সকলের চেয়ে বেশী সংখ্যায় সাধারণ লোকের ব্যবহার করে তাহাদের সুবিধাই আগে দেখা উচিত। তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা না-পায় ভাল গাড়ী, যথেষ্ট সবিবার গুইবার জায়গা এবং মাহুষের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী ও ব্যবহারযোগ্য পায়খানা, না-পায় ভজ ব্যবহার। ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলি ভারতবর্ষেরই। সুতরাং যাহাতে ভারতবর্ষের লোকদের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের প্রবৃদ্ধি হয়, তাহার দিকেই প্রথমে ও সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি রাখা এই রেলওয়েগুলির

উচিত। কিন্তু দৃষ্টি রাখা হয় কিসে ব্রিটিশ-বাণিজ্য ও পণ্য-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, প্রধানতঃ তাহার উপর।

রেলওয়ে বজ্জেটের আলোচনার সময় গবন্মেণ্ট বার-বার পরাজিত হইয়াছেন। তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু এই মৌখিক ও কাগজী পরাজয়ে কিবা আসে যায়?

ভারত-গবন্মেণ্টের বজ্জেট

ভারত-গবন্মেণ্টের বজ্জেট আলোচনা উপলক্ষেও গবন্মেণ্ট বার-বার পরাজিত হইয়াছেন। স্বাধীন প্রজাতন্ত্র দেশে একপ একটা পবাক্ষয় হইলেই গবন্মেণ্ট-পরিবর্তন ঘটে, দ্বিতীয় পরাজয়ের জন্ত অপেক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু এদেশে জয় পরাজয় উভয়ই গবন্মেণ্টের পক্ষে সমান।

বিনা-বিচারে বন্দীদের সংখ্যা

কয়েক দিন পূর্বে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব হেনরী ক্রেক বলেন, ১৯৩৫ সালে জেলসমূহে ১৫০০ জন বিনা বিচারে বন্দী ছিল, এখন আছে ১১০০ জন। সর্ব হেনরী কেবল জেলবাসী বন্দীদের সংখ্যা দিয়াছেন; স্বগৃহে বা অতিথ্যবক-গৃহে বা অন্তের গৃহে যাহারা অন্তরীণ আছে, তাহাদের সংখ্যা কত?

গবন্মেণ্ট এই ওজুহাতে এই সব বন্দীকে ছাঁড়িয়া দিতে চান না, যে, তাহাবা বাহিরে আসিলেই সম্ভাসক কিছু করিবে। এই জেলমুক্ত ৪০০ জন কি করিয়াছে, গবন্মেণ্ট কিন্তু তাহা বলিতে পারেন নাই।

বিনা বিচারে একুশ বৎসর বন্দী:

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গবন্মেণ্টের দমননীতির বিরুদ্ধে বধন তর্কবিতর্ক হইতেছিল, তখন শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি স্বয়ং একপ দৃষ্টান্ত জানেন-যে, মামুয় বিনা বিচারে ২১ বৎসর কারাবদ্ধ আছে।

এই বন্দীরা কি অপরাধ করিয়াছে, যে, তাহাদের প্রকাশ্য বিচারও হইতে পারে না? অপরাধের প্রমাণ থাকিলে নিশ্চয়ই বিচার হইত এবং বিচারে যাবজ্জীবন কারাবাসের বন্দী দণ্ড হইত না। যাবজ্জীবন কারাবাসের মানে কার্যতঃ

২০ বৎসরের বেশী কারাবাস নহে, অথচ যাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাবে বা যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে প্রকাশ্য বিচারই করা হয় নাই, তাহারা কুড়ি বৎসরেরও অধিক জেলে আছে।

বিনা-বিচারে বন্দীদের পিতামাতার ভাতা

যাহারা নাবালক, কিংবা নাবালক না হইলেও বিনা বিচারে বন্দী হইবার সময় উপার্জক ছিল না, তাহাদের পিতামাতাকে কোন ভাতা দেওয়া হয় না, খবরের কাগজে এইকপ পড়িয়াছি। তাহা সত্য হইলে, সরকারী খিওরি এই, যে, যে নাবালক অবস্থায় বন্দী হইয়াছে, সে কালক্রমে কখনও সাবালক ও উপার্জক হইত না, এবং যে সাবালক ব্যক্তি বন্দী হইবার সময় উপার্জক ছিল না সে পরেও কখনও উপার্জক হইত না। এই খিওরির ইহাও বোধ হয় একটা শাখা যে, কোন নাবালকই উপার্জন করে না। কিন্তু বস্তুতঃ অনেক নাবালক রোজগার কবিয়া থাকে।

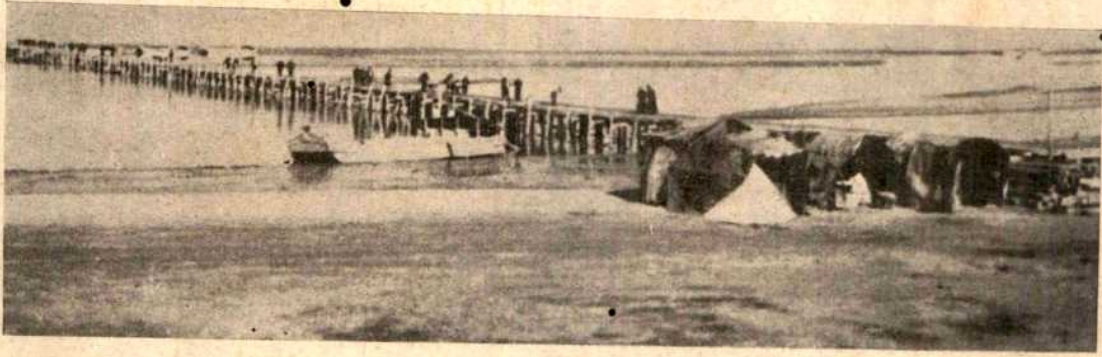
বন্দীদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক যাহাবা অনেক লেখালেখির পরও ভাতা বা তাঁহাদের চিঠির উত্তর পান না, তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে। যাহারা পান, তাঁহাবাও ভাতার মঞ্জুরী পান বহু বিলম্বে।

স্বভাষচন্দ্র বসুর স্বাস্থ্য

দেশকে ও জাতিকে নিরাপদ রাখিবার জন্তই শ্রীযুক্ত স্বভাষচন্দ্র বসুকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, গবন্মেণ্ট এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু গবন্মেণ্টের আইন অনুসারে নিকরীচিত সেই দেশ ও জাতির প্রতিনিধিরা তাঁহার মুক্তি চান এবং খবরের কাগজগুলারাতঃ মুক্তি চান। অতএব গবন্মেণ্টের মতে দেশের প্রতিনিধিরা ও খবরের কাগজ-গুলারাতঃ হয় দেশের নিরাপদ অবস্থার অর্থ বুঝেন না; কিংবা তাহা বুঝিয়াও দেশকে বিপন্ন করিতে চান। অবশ্য, এই নিরাপত্তার মানে যদি হয় আমলাতন্ত্রের নিকরদেগ আয়াম ও অ-ব্যতিব্যস্ততা, তাহা হইলে স্বভাষচন্দ্রের মুক্তি ও আরোগ্যলাভের পর তাঁহার সক্রিয়তা তাহার অন্তরায় হইতে পারে; স্বীকার করা যায়।



চীনের বিদ্রোহীদের হাতে জেনারাল চিয়াং কাই শেকের বন্দীকরণের স্থান বলিয়া সিয়ান-এর নাম সুপরিচিত হইয়াছে।
 চিয়াং কাই শেকের পঞ্চাশতম জন্মদিবসে দেশবাসীর উপহার এরোপ্লেনগুলি বিদ্রোহীরা
 তিন সপ্তাহ আটকাইয়া রাখিয়া অবশেষে মুক্ত করিয়া দিতেছে।



সিয়েন-ইয়াং সেতু—দক্ষিণে এই সীমানা পর্য্যন্ত চীনা বিদ্রোহীরা অগ্রসর হইয়াছিল



সিয়ানের অধিবাসীগণ চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লোকদিগকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে মিছিল বাহির করিয়াছে



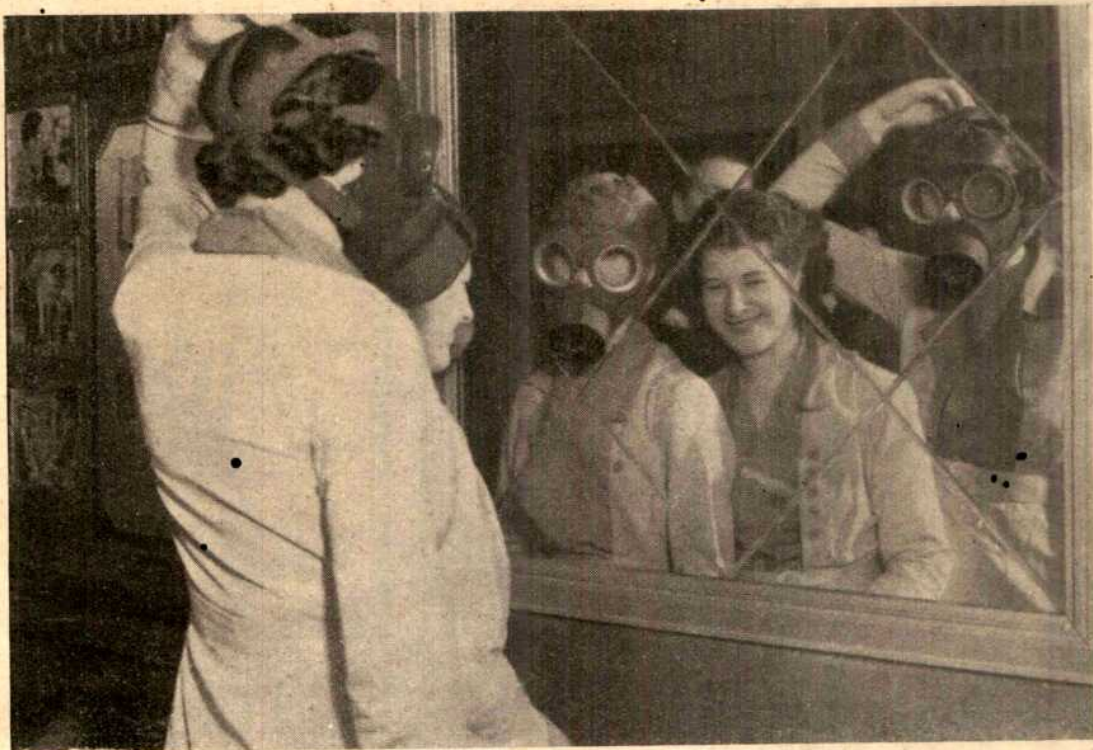
জেমি মোদী, সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণাস্ত্রে সম্প্রতি
ভারতবর্ষে ফিরিয়াছেন



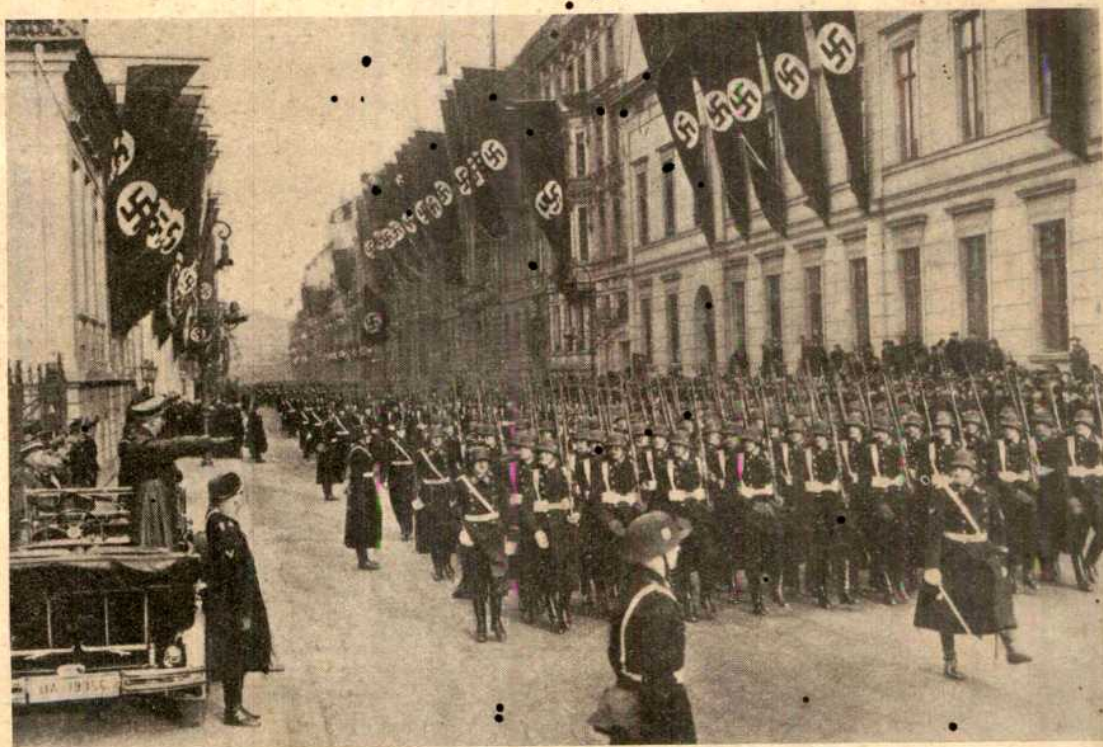
জাপানের সমরসজ্জা। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও
রাইফেল ব্যবহার করিতে শিখিতেছে



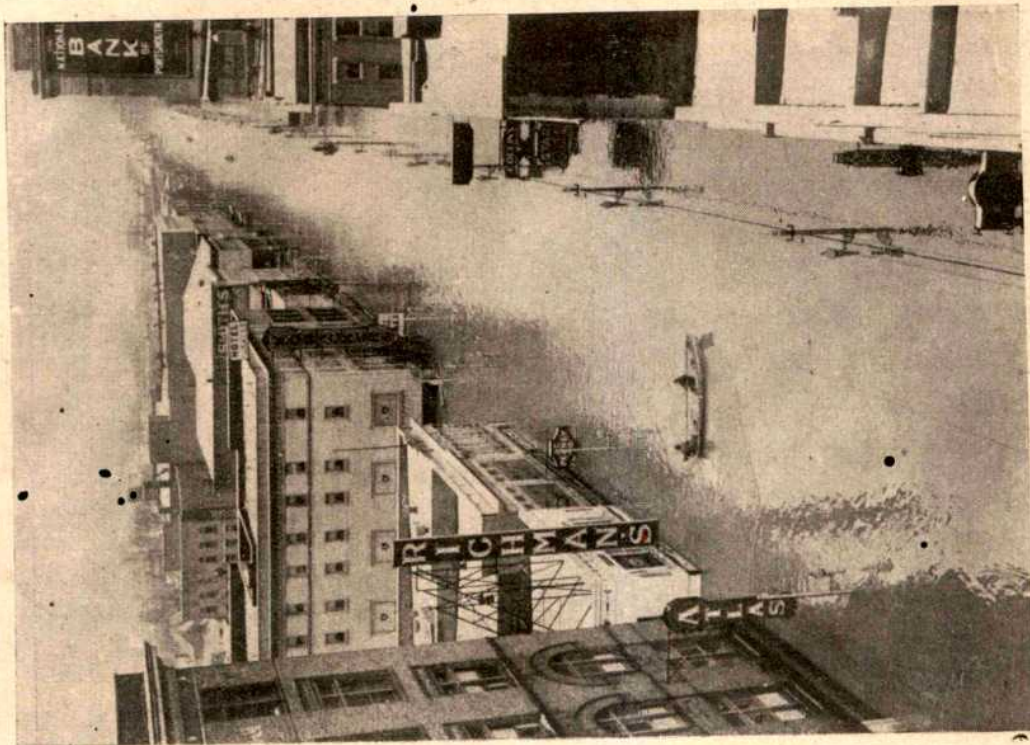
ইতালির "পার্সাত সৈন্ত" বা 'স্কি'-খেলোয়াড়ের দল



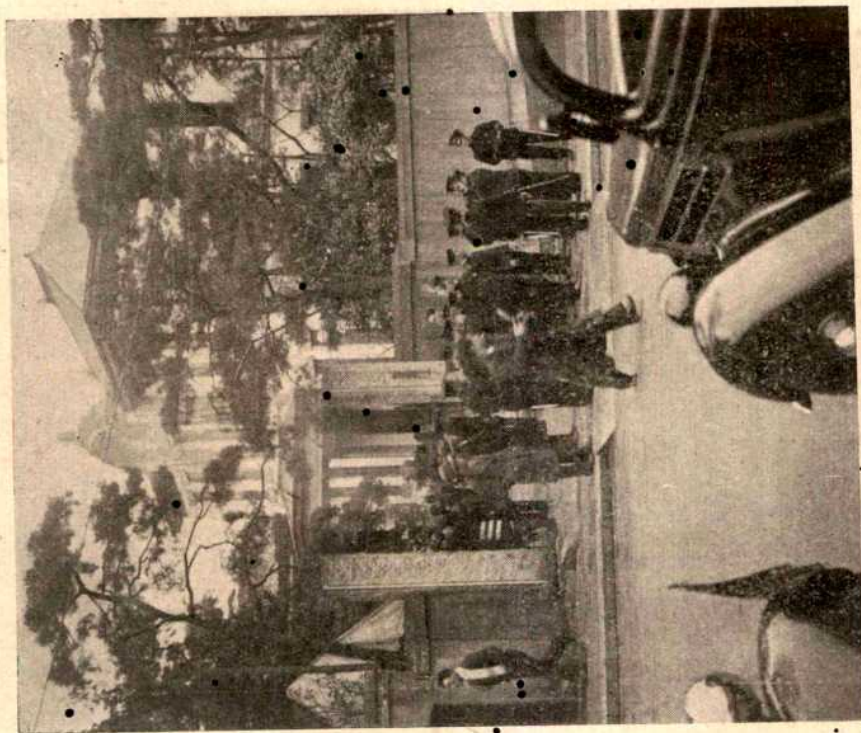
গ্যাস-আক্রমণ প্রতিরোধের আধুনিক ব্যবস্থা। ইংলণ্ডের কোন সিনেমা-গৃহে গ্যাস-মুখোঁস পরিহিত কণ্ঠ



হিটলার কুসঙ্গী পরিহিত দেশরক্ষাদিগকে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন



আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বক্তার দৃশ্য
পোর্টিসমাউথের প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র জসমগ ; ট্রামগাড়ীর
পরিবর্তে নৌকায় চলাচল হইতেছে।



জাপানের নতুন মহাসভা গঠন। মিঃ ইয়োকোয়ামার এই ভবনে
জেনারেল হায়াসির নায়কত্বে নতুন মহাসভা
সম্মেলন আলোচনা চলিতেছে।

নিরাপত্তার কি মানে হইলে কি হয়, সে বিষয়ে অল্পমান না করিয়া সহজবোধ্য দু-একটা কথা বিবেচনা করা যাক।

বন্দী অবস্থায় স্বভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাল হইতেন না, বরং খারাপ হইতেন। ভিয়েনায় তাঁহার চিকিৎসক সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বন্দী দশায় তাঁহার একুপ চিকিৎসা, পথ্য ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা হইতে পারে না যাহাতে তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলে এখন গবর্নমেন্টের বিবেচ্য এই, যে, বন্দী অবস্থায় স্বভাষচন্দ্রের ক্রমিক স্বাস্থ্যাবনতি ও তাহার ফলে অকালমৃত্যু বাঞ্ছনীয়, না তাঁহাকে মুক্তিদান ও তাহার ফলে তাঁহার আরোগ্যলাভ বাঞ্ছনীয়?

গবর্নমেন্ট কি তাঁহাকে এত বড় প্রতিভাশালী ও শক্তিমান পুরুষ মনে করেন, যে, তিনি খালাস পাইলে রুগ্ন অবস্থাতেও দেশটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতে পারেন? সরকার তাহা যদি মনে করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা একটা সান্থনার কথা হইতে পারে, যে, দুদিনেও ভারতবর্ষে এরকম সব মানুষ জন্মে আর, গবর্নমেন্ট যদি তাহা মনে না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মুক্ত অবস্থায় স্থস্থ হইয়া উঠিতে দিউন না। তিনি স্থস্থ হইবার পর প্রয়োজন হইলে গবর্নমেন্ট তাঁহাকে আবার বন্দী করিতে পারিবেন।

ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

সামান্য বেতনে সরকারী কেরানীগিরি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র নিজ বুদ্ধি, দক্ষতা ও অমলীলতার বলে সরকারী সামরিক-বিভাগের একাউন্ট্যান্ট-জেনার্যাল, ভারত-গবর্নমেন্টের শাসনপরিষদের সভা এবং শেষে লণ্ডনে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার হন। স্বাধীন দেশে জন্মিলে তিনি স্বদেশের প্রধান মন্ত্রী ও রাজস্ব-সচিব হইতে পারিতেন এবং দেশের রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় সম্বন্ধে একুপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন যাহাতে তাহার আর্থিক ক্রমোন্নতি হইতে পারে। কিন্তু পরাধীন দেশে জন্মিয়া, দেশের উপকার করিবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তিনি কেবল চাকরিই করিয়া গেলেন—সে সে চাকরি যতই উচ্চ হউক না কেন।



স্বর্গীয় সর্ব ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃষ্ণলাল দত্ত

এইরূপ আক্ষেপ উচ্চ রাজকার্য হইতে অবসরপ্রাপ্ত আর এক জন বাঙালীর সম্বন্ধে করিতে হইতেছে। তিনি কৃষ্ণলাল দত্ত। সম্প্রতি ৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনিও প্রথমে অল্প বেতনের কেরানী হন। তিনি পরে মাদ্রাজের একাউন্ট্যান্ট-জেনার্যাল, বজেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, ডাক-বিভাগের কন্ট্রোলার প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক সরকারী কাজ করেন। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি (Rise of Prices in India) বিষয়ে অল্পসন্ধান বিশেষ দক্ষতার সহিত করিয়া তদ্বিষয়ে একটি মূল্যবান রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন। এই রিপোর্টটি সম্বন্ধে ভারত-গবর্নমেন্ট বলেন যে, ভারতবর্ষের আধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজস্ববিষয়ক ইতিহাসের ইহা একটি মূল্যবান উপাদান। ("a valuable contribution to the recent economic and financial history of India.")



স্বর্গীয় কুমলাল দত্ত

তিনি মহীশূর গবর্নমেন্টের রাজস্ববিষয়ক বিশেষ কর্মচারীর কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে বিলাতে মুদ্রাবিষয়ক রাজকীয় কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্ত তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রেরণ করা হয়।

তিনি কিছুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাজ করিয়াছিলেন।

সমুদয় পদের কাজই তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে, যদিও কুমলাল দত্ত মহাশয় গবর্নমেন্টের খুব শক্ত শক্ত কাজ করিয়া দিয়াছিলেন এবং উচ্চপদে তাঁহার হইয়াছিল, তথাপি সরকার তাঁহাকে কোন উপাধি দেন নাই। এরূপ অহুমান করা যাইতে পারে, যে, তাঁহার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাহায্য সরকারকে অগত্যা লইতে হইয়াছিল, কিন্তু স্বাধীনচিত্ততার জন্ত তিনি উপরওয়ালাদের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই।

বিজয়কৃষ্ণ বসু

চিড়িয়াখানা নামে পরিচিত আলিপুরের জীবনিবাসের

ভূতপূর্ব সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায়-বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কন্ডাই তাঁহার একমাত্র সন্তান। তাঁহার এই কন্ডা ও জামাতা তাঁহার মৃত্যুকালে ইংলণ্ডে থাকায় তাঁহাদের সহিত দেখা হয় নাই।



স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ বসু

তিনি পশুচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও উপাধি লাভের পর সেই সকল বিষয়ে কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। পরে আলিপুর জীবনিবাসে তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। এই কাজ তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ধীর প্রকৃতির সদাপ্রকল্পচিত্ত মাছুষ ছিলেন। তাঁহার এইরূপ স্বভাবের প্রভাব পশুপক্ষীরাও অমুভব করিত। তাঁহার দক্ষতার জন্য তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ইউরোপের অনেকগুলি জীবনিবাস (Zoological Gardens) দেখিতে পাঠান হইয়াছিল। জামেনীর হান্সবুর্গের জীবনিবাস-উদ্যানের অধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও অহুরাগের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে একটি মূল্যবান

সোনার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁহাকে একটি স্মারক উপহার দিয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্য, নম্রতা ও অমায়িকতার জন্য তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন।

দীর্ঘতম কাল অবিরাম সাইকেল-চালন

এলাহাবাদের রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্বে, তখন পর্য্যন্ত দীর্ঘতম কাল অবিরাম সম্ভরণের যে দৃষ্টান্ত ছিল, তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ কাল সম্ভরণ করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সম্ভ্রতি তিনি, এ পর্য্যন্ত অবিরাম বাইসিকেল চালনের যে দীর্ঘতম কালের দৃষ্টান্ত আছে, তাহা অতিক্রম



দীর্ঘতম কাল অবিরাম সাইকেল-চালক

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করিতে সক্ষম করেন। এলাহাবাদের আর দুই জন ভদ্রলোকও এই প্রতিযোগিতায় নামেন। কিন্তু তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সাইকেল চালাইতে পারেন নাই। রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবিরাম ৭৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট সাইকেল

চালাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে যিনি দীর্ঘতম কাল বাইসিকেল চালাইয়াছিলেন, তিনি ৭৪ ঘণ্টা চালাইয়াছিলেন। সম্ভরণ তিন মিনিটে রবীন্দ্রের জিত হইয়াছে। এই চুয়াত্তর ঘণ্টা তিন মিনিটের মধ্যে একবার তাঁহার একটি পা মাটিতে ঠেকিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি পা তুলিয়া লইয়া আবার সাইকেল চালাইতে আরম্ভ করায় এই শক্তিপরীক্ষার বিচারক তাঁহাকে প্রতিযোগিতা হইতে নিরস্ত করেন নাই। আর একবার তাঁহার সাইকেল পথের পাশের একটা জালে জড়াইয়া যায়, কিন্তু তিনি মাটিতে না পড়িয়া গিয়া এক নিমেষে তাহা ছাড়াইয়া লগ্নেন।

আরম্ভণার পক্ষিত্ব

স্বাধীন গণতন্ত্র দেশের মন্ত্রীদের অনেক ক্ষমতা আছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ও তাঁহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকিলে স্ব-স্ব দেশের অনেক হিত করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা যদি ভাবেন যে তাঁহারাও স্বাধীন গণতন্ত্র দেশের মন্ত্রীদের মত, তাহা হইলে তাহা আরম্ভণার আপনাকে পক্ষী মনে করিয়া আত্মপ্রত্যাহার মত হয়।

পঞ্জাবে সুব সিকন্দর হায়াৎ খান প্রধান মন্ত্রী হইবেন। তিনি তৎকালের সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন, তিন বৎসরের মধ্যে তিনি পঞ্জাব হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিয়া দিবেন। তাঁহার এই স্বপ্নের তারিফ অবশ্যই করি। ইহা স্বপ্ন।

তিনি বিষের প্রতিকার করিবেন, সেই সব সাংবাদিকদিগকে শাস্তি দিয়া যাহাদের লেখা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আশ্রয় জালিয়া দেয়। যাহারা এরূপ কণ্ঠ করে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে বলিতেছি না; কিন্তু তিনি এংলো-ইণ্ডিয়ান সাংবাদিকদিগকে শাস্তি দিতে পারিবেন কি? ভারতীয় সকল সাম্প্রদায়িক অপরাধী সাংবাদিকদিগকে সমভাবে শাস্তি দিতে পারিবেন কি?

শাস্তি দেওয়ার কথাটা ছাড়িয়া দি। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারাকে ভিত্তি, কাঠামো বা মেরুদণ্ড করিয়া নূতন ভারতশাসন আইন করিয়াছেন, সেই বাটোয়ারার উচ্ছেদ তিনি করিতে পারিবেন? নতুবা সাম্প্রদায়িক

ঈর্ষ্যাধ্বেষ কেমন করিয়া যাইবে? যোগ্যতা-অযোগ্যতা-নির্বিশেষে সম্প্রদায় অনুসারে চাকারি ভাগ যে-যে সরকারী প্রতিজ্ঞাপত্র (Resolution) দ্বারা করা হইয়াছে, তাহা তিনি রদ করিতে পারিবেন কি? নতুবা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাধ্বেষ কেমন করিয়া যাইবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থাতে পর্য্যন্ত যে সাম্প্রদায়িকতা চুকিয়াছে, তাহার প্রতিকার তিনি করিতে পারিবেন কি? নতুবা সাম্প্রদায়িকতা সম্বলে নষ্ট কি প্রকারে হইবে?

ব্রিটিশ প্যারলিমেণ্টের সাম্প্রদায়িকতাপরিপোষক পক্ষপাত-দুষ্ট আইনের রূপায় যাহারা কিঞ্চিৎ উচ্চপদ পাইবেন, তাঁহারা করিকৈ সাম্প্রদায়িকতার মূল উচ্ছেদ!

ব্রহ্মদেশের ডাকমাণ্ডুল বৃদ্ধি

ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইবার পর এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও সেই দেশের মধ্যে চিঠিপত্রের ডাকমাণ্ডুল ভারতবর্ষের যে-কোন অংশের সমান ছিল। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে চিঠিপত্র পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডে চিঠিপত্র পাঠাইবার মত অধিক ডাকমাণ্ডুল দিতে হইবে। যথা, এখন ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশ ও ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে পোষ্টকার্ড পাঠাইবার খরচ তিন পয়সা। ১লা এপ্রিল হইতে তাহা হইবে দুই আনা—আড়াই গুণেরও বেশী। ব্রহ্মের ডাক-বিভাগে বার্ষিক ১৬ লাখ টাকা লোকসান হয়। সেই ক্ষতি পূরণের জন্তই নাকি ডাকমাণ্ডুল বাড়ান হইতেছে। পরচিত্ত অন্ধকার, স্ততরাং সত্য সত্যই কি উদ্দেশ্যে ইহা করা হইতেছে জানি না। কিন্তু ইহার একটা ফল এই হইবে, যে, ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষে বাহ্য বাণিজ্যের অস্ববিধা হইবে, এবং মানসিক বাণিজ্য, যাহাকে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান (cultural intercourse) বলা হয় ও যাহা বাড়াইতে লর্ড লিনলিথগো রেকমেন্ড উপদেশ দিয়াছিলেন, কমিবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রহ্ম ভারতীয়দের অস্ববিধা ও প্রভাব কমাইবার নিমিত্ত এবং আপনাদের অস্ববিধা বাড়াইবার নিমিত্ত ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়াছে। ডাকমাণ্ডুল বৃদ্ধির সহিত তাহাদের নীতির সঙ্গতি আছে।

সিংল ভারত-গবন্মেণ্টের অধীন নহে, এবং তাহা ভারতের অধিকাংশ স্থান হইতে ব্রহ্ম অপেক্ষাও দূরে। অথচ সেখানকার ডাকমাণ্ডুল পূর্বাগত এবং এখনও ভারতবর্ষের সমান।

হাবড়ার নূতন পুলের জন্ত কলিকাতায় করবৃদ্ধি

কলিকাতা ও হাবড়ার মধ্যে হইবে নূতন পুল। তাহাতে অস্ববিধা হইবে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের এবং বিদেশের বাণিকদেরও, কিন্তু তাহা নিশ্চয় করিবার জন্ত যে টাকা ব্যয় হইবে, তাহা তুলিবার জন্ত ট্যাক্স দিতে হইবে কলিকাতাকে। শুধু তাই নয়, এই ট্যাক্সটি আদায় করিয়া দিতে হইবে কলিকাতা মিউনিসিপালিটিকে—ভারত-গবন্মেণ্ট ইহা নিজের লোক দিয়া আদায় করিবেন না, বাংলা-গবন্মেণ্টও করিবেন না। তাই কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্মকর্তা উহার ১৯৩৭-৩৮ সালের বজেটের ব্যাখ্যা করিতে উঠিয়া এই আশা প্রকাশ করেন, যে, গবন্মেণ্ট অন্ততঃ এই ট্যাক্স আদায়ের খরচাটা যেন মিউনিসিপালিটিকে দেন।

এই ট্যাক্সটির সম্পূর্ণ সৌন্দর্যটি উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিতে হইলে ইহা স্মরণ করিতে হইবে, যে, হাবড়ার নূতন পুল নিশ্চয়নের বড় ঠিকাটা ভারতবাসী, বাঙালী, বা কলিকাতাবাসী পায় নাই এবং ছোট ছোট ঠিকাগুলিও কলিকাতার বাঙালী বা বঙ্গের মফস্বলের বাঙালী পায় নাই। যাহারা কলিকাতার লোকদিগকে কেবল ট্যাক্স দিবার সুমহান অধিকার দিয়াছেন, তাহারা তাহাদিগকে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ দিয়া ধন্বাদভাজন হইয়াছেন। ভূখণ্ডের বিষয়, এত বড় এই যে ধর্মোপদেশ, সে বিষয়ে গত মাসের সর্বধর্মসম্মেলনে কেহ কোন ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন না। কেহ তাহা করিলে, জগতের চারি দিক হইতে আগত ধর্মাপিপাসু ব্যক্তিগণ বুঝিয়া যাইতেন, এদেশ প্রাচীন হইলেও এখানে ধর্ম এখনও জরাগ্রস্ত হন নাই—বুঝিয়া যাইতেন, “ব্রিটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে কেন সবে আজি বলিছে জয়।”

ভারত-গব্বমেন্টের নতুন বাজেটে দেখা যায়, যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ফলে ভারত-গব্বমেন্টের আয় ৫১ লক্ষ টাকা কমিবে ও ব্যয় ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বাড়িবে। ব্যয় ত বাড়িয়াই চলিতেছে। যখন বঙ্গ বিহার আসাম উড়িষ্যা ছোটনাগপুর এক জন ছোটলাট শাসন করিতেন, তখনকার চেয়ে বহু লাট ও বহু নব্বী দ্বারা শাসিত এই সব প্রদেশের সুখ-সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য শিক্ষা কতটা বাড়িয়াছে ?

ব্যঙ্গচিত্র



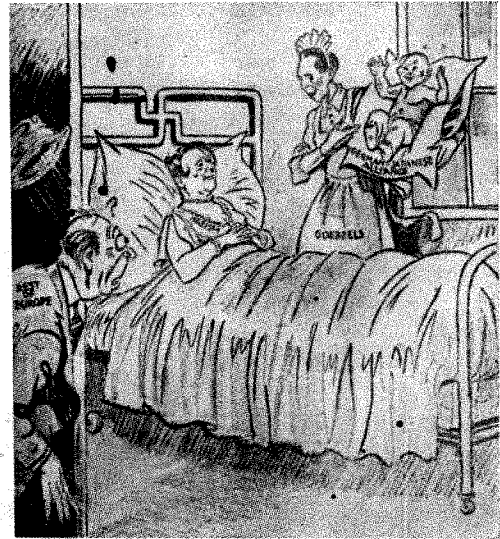
মহারথ যুদ্ধরথে চড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার কাছে
ঋণপরিশোধের অক্ষমতা জানাইতে আসিয়াছে।



বিশাল সমরসাজে সজ্জিত ইউরোপ আমেরিকাকে
বলিতেছে—আমার পকেটটা ত খুঁজে পাচ্ছি
না, তোমার টাকা দিই .কি করে?



ভিক্ষাপাত্র ও ছিন্ন বসন লইয়া ইউরোপ আমেরিকার দয়া
উদ্রেকের চেষ্টা করিতেছে ও স্বীয় বুদ্ধবর্ণ মাক চাহিতেছে।
অথচ অল্পবস্ত্রের মাণিক্যদ্যুতি ইউরোপের সর্বদানে।



জার্মেনীর “আর্য্যামি”র নূতন উপহার—আর্য্যধাত্রী
গোয়েবলস মাংসি-বাদের নবজাত সন্তান
জাপ-জার্মান চুক্তিকে ধারণ করিয়া আছে,
ইউরোপের অগ্রান্ত্র দেশ সভয়ে
উহা লক্ষ্য করিতেছে।



বিদেশ

অধ্যাপক পিটার ডেবাই

এই বৎসর রসায়নশাস্ত্রে যিনি নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন, তাঁহার নাম পিটার ডেবাই। তিনি রসায়নশাস্ত্রে পুরস্কার লাভ করিলেও তাঁহার বেশীর ভাগ আবিষ্কারই পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে তত্ত্ব এবং যন্ত্রগত জ্ঞান উভয় বিষয়েই পণ্ডিতের সংখ্যা বিরল—অধ্যাপক ডেবাই তাঁহাদের এক জন। তাঁহার অসামান্য গণিতজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের সুন্দর দৃষ্টি পদার্থবিজ্ঞানের অনেক জটিল এবং অদ্ভুত পথে আলোক আনিয়া দিয়াছে। তিনি যে কেবল নূতন নূতন হ্রস্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে, নিজের প্রস্তুত যন্ত্রের দ্বারা তিনি এই সমস্ত তত্ত্বের পরীক্ষাও করিয়াছেন।



অধ্যাপক পিটার ডেবাই

অধ্যাপক ডেবাই হল্যান্ড দেশের লোক, কিন্তু তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা সমস্ত জার্মেনীতেই হইয়াছিল। ১৯১০ সালে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে মুনিকে আসেন কিন্তু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমারফেল্ডের সম্পর্কে আসিয়া তিনি পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি পরে গটিঙ্গেন, জুরিক এবং লাইপ্‌সিগে অধ্যাপনা করিতেন। বর্তমানে তিনি বার্লিনে কাইজার উইলহেল্ম ইনষ্টিটিউটের পদার্থবিজ্ঞানের ডিরেক্টর।

অধ্যাপক ডেবাইয়ের বহু গবেষণার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করিব। ১৯১০ সালে যখন অধ্যাপক জান হিঁ দেখাইলেন যে কঠিন বস্তুর আপেক্ষিক তাপ (Specific heat of Solid) শূন্য তাপমাত্রার (Absolute Temperature) নিকট ক্রমশঃ শূন্যে পরিণত হয়, তখন অধ্যাপক ডেবাই ইহার একটি সুন্দর কারণ ব্যাখ্যা করিলেন। একটি কঠিন বস্তুর মধ্যে তাপশক্তি বিভিন্ন প্রকারের শব্দ-তরঙ্গের দ্বারা রহিয়াছে এবং প্রত্যেকটি শব্দ-তরঙ্গের একটি করিয়া বিশেষ শক্তি আছে। এই তত্ত্বের দ্বারা শুধু যে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে তাহা নহে, বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে ইহা সফলতা লাভ করিয়াছে। ডেবাই-ই সর্বপ্রথমে দেখান যে কেন বিশিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বস্তুর (Dielectric-Constant) তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। ইহা হইতে তিনি জৈব অণুর (Organic Molecules) রূপ এবং তরল অবস্থায় অণুর একত্রীভূত রূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

অধ্যাপক ডেবাই রজন-রশ্মি এবং আলোকদ্বারা অণুপরিমাণের রূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। গ্যাস এবং ফটিকময় গুঁড়া বস্তুর (Crystalline Powder) মধ্য দিয়া রজন-রশ্মি প্রেরণপূর্বক এরূপ অবস্থায় অণুর গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিয়াছেন।

একথা হয়ত অনেকেই জানেন যে জ্যোতির্বিদগণ হোয়াইট ডোয়ার্ফ নামক এক প্রকার তারকাগুচ্ছ আবিষ্কার করিয়াছেন—এই বস্তুগুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘন বস্তু প্ল্যাটিনাম অপেক্ষাও ষাট হাজার গুণ ঘন। অধ্যাপক ডেবাই এরূপ ঘন হোয়াইট ডোয়ার্ফের দ্বারা বস্তু প্রস্তুত করিবার জন্ত পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন।

শ্রীঅশোককুমার বসু

বিশ্রামের শান্তি !

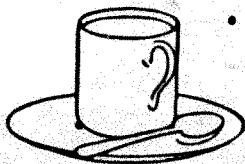


ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে খুব ভালো লাগলেও খানিকবাদে ক্লান্তি আসে বই কি ! ছোটদের শক্তি উৎসাহ যেন ফুরোতে চায় না—কিছুতেই তারা হায়রান হয় না। তারা চায় তাদের মা সব কিছুতেই যোগ দিক, কিন্তু সময় মা কি আর তা পেয়ে ওঠেন ? তাই তারা নিরাশ হয়। কিন্তু সকলে মিলে খুদী থাকার একটা উপায় আছে।

খানিকক্ষণ এক জায়গায় বসুন ; এসে কয়েক পেয়ালা চা খান। দেখবেন আপনার আশ্তি তক্ষুনি দূর হয়ে গেছে এখন আবার আপনি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে পারেন।

বিশ্রামে শান্তি দিতে ভারতীয় চায়ের তুলন নেই। চা খাওয়া অভ্যাস করলে অচিরেই তার উপকারিতা বুঝতে পারবেন।

চা প্রস্তুত-প্রণালী



- টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। প্রত্যেকের জন্য এক এক চামচ ভালো চা আর এক চামচ বেশী দিন। জল ফোটামাত্র চায়ের ওপর ঢালুন। পাঁচ মিনিট ভিজতে দিন ; তারপর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

দশজনের সংসারে একমাত্র গানীয়া—ভারতীয় চা

জাপানের সাম্রাজ্য-স্বপ্ন

জাপানের বিরাট অস্ত্রসজ্জা ও তাহার বৈদেশিক নীতি অধুনা সমগ্র বিশ্বে এক আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার অদম্য সাম্রাজ্যবাসী ইউরোপীয় জাতিসমূহকে ভীত ও সমুত্ত করিয়া চলিয়াছে। জাপান সমগ্র এশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার প্ল দেখিতেছে ও তাহা সফল করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। এই স্বপ্ন সফল করিতে হইলে প্রথমতঃ তাহাকে প্রতিবেশী চীনকে কৃৎসিত করিতে হইবে। কারণ সমগ্র চীন দি একতাবদ্ধ হয় ও রাশিয়ার সহিত সখ্য স্থাপন করে তাহা হইলে সাম্রাজ্য-স্বপ্ন সফল হওয়া দূরে থাক জাপানের টিকিয়া থাকাই দায় হইবে। চীনকে করতলগত করিতে পারিলে জাপানের অর্থনৈতিক ভিত্তিও বৃদ্ধি পাইবে।

চীনের আভ্যন্তরীণ অশান্তি, অস্ত্রবিদ্রোহ প্রভৃতি দ্বাৰা তাহা বহিঃশত্রুকে প্রলুব্ধ করে। এই সকল সুযোগের ব্যবহার করিয়া মাঞ্চুরিয়া, জেহোল, শেনদী, শানদী হোপে প্রভৃতি চীনের প্রায় সমগ্র উত্তরাংশ জাপান করতলগত করিয়াছে। ইহাতে চীন হইতে রাশিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়ার সহিত বোঝাপড়া করিবার জন্য যে জাপান প্রস্তুত হইতেছে ইহা সুস্পষ্ট। যদি সাইবেরিয়ার যুদ্ধ

বাধে এজন্য জাপান মাঞ্চুরিয়ায় আত্মরক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থার মনোনিবেশ করিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ার কমলা যুদ্ধকালে জাপানকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং তথায় তুলার চাষেরও যথেষ্ট সুবিধা বলিয়া জাপান এ-বিষয়েও স্বাধীন হইতে পারিবে।

গত মহাযুদ্ধে জাপান মিত্র-শক্তিবর্গের পক্ষে যোগদান করে ও তাহার ফলে তাহার যথেষ্ট লাভ হয়; কিন্তু ভাসাই চুক্তিতে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাকে সমকক্ষ বলিয়া মানিয়া লয় নাই। এই সকল কারণে ও বিনা বাধায় নিজেদের অভিল্য-সিদ্ধির আশায়, জাপান একে একে নয়-শক্তি চুক্তি, চারি-শক্তি চুক্তি, কেলগ-শক্তি-চুক্তি পদবলিত করিয়া রাষ্ট্রসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে ও সমগ্র এশিয়ার অধীশ্বর হইবার স্বপ্ন দেখিতেছে।

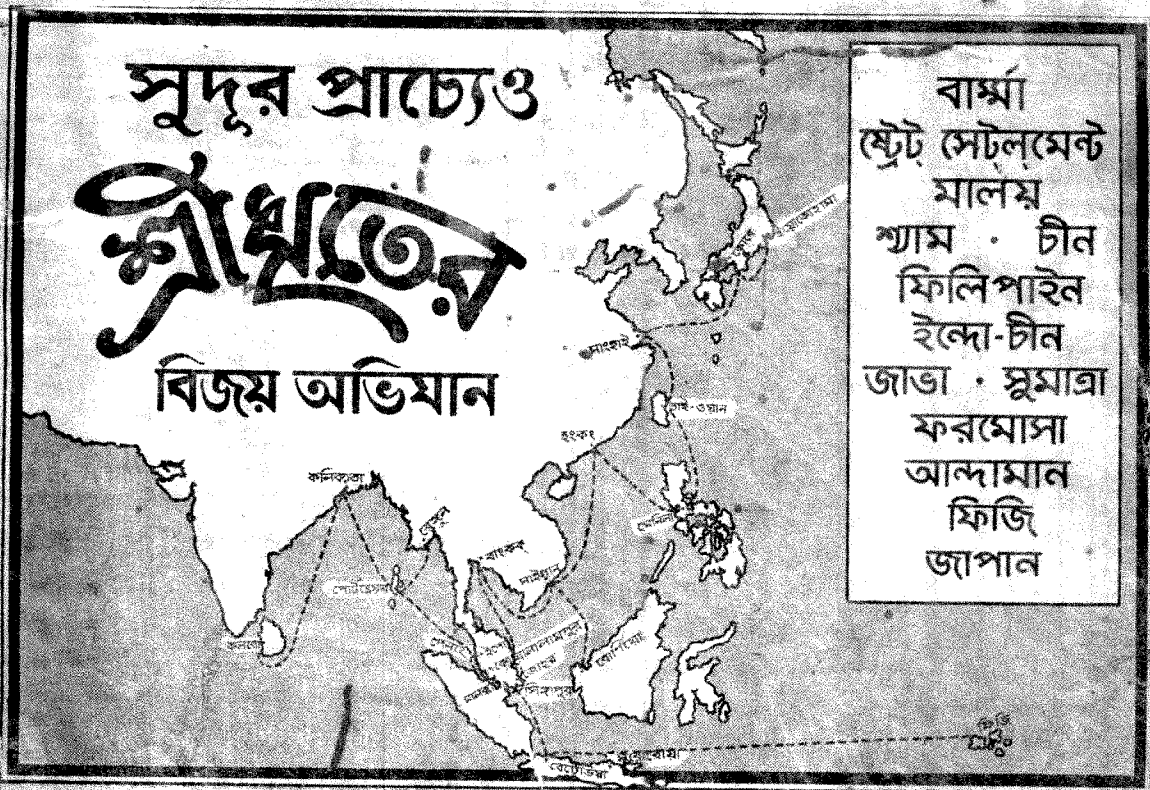
গত নবেম্বর মাসে জাপান জার্মানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে ও ইতালীর সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে। এই চুক্তি কম্যুনিজম বিস্তারের বিরুদ্ধে, প্রকাণ্ডে এই কথা বলা হইলেও, ইহার পশ্চাতে আরও কোন অভিসন্ধি আছে বলিয়া সকলে সন্দেহ করিতেছে।

শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে

সুদূর প্রাচ্যেও

ব্রাহ্মতের

বিজয় অভিযান



বাম্বা
স্ট্রুট সেটলমেন্ট
মালয়
শ্যাম • চীন
ফিলিপাইন
ইন্দো-চীন
জাভা • সুমাত্রা
ফরমোসা
আন্দামান
ফিজি
জাপান

আসন্ন গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যের সাধন মার্গো সোপ

মাথতে আরাম, গন্ধ সুমধুর ও
দীর্ঘস্থায়ী, বর্ণ উজ্জ্বলতর হয়, দেহকান্তি
কমনীয় করে তোলে চর্ম্মে মন্থনতা আনে
ও সকলপ্রকার চর্ম্মরোগ থেকে রক্ষণ করে।

দেশী ও বিদেশী সকলপ্রকার
সুগন্ধি টয়লেট সাবানের মধ্যে

মার্গো সোপই সর্বশ্রেষ্ঠ



ক্যালকাটা কেমিক্যাল
বালিগঞ্জ :: কলিকাতা



স্বাস্থ্যে ও
নিত্য প্রসাধনে
বেণুকা

(সুগন্ধি নিম্ন টয়লেট
পাউডার)

ব্যবহারে ত্বণ, মেচেতা,
ছুলি, মুখের দাগ
প্রভৃতি দূর হয়।

‘রূপ ও স্বাস্থ্য’ পুস্তিকার জন্য পত্র লিখুন।

দুই বৎসর পূর্বে যখন **বেঙ্গল ইনসিওরেন্স ও নিম্নাল প্রপার্টি কোম্পানী**র
ভ্যালুয়েশান হয় তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে বাংলার আর একটি বীমা কোম্পানী ধীরে ধীরে উন্নতির পথে
অগ্রসর হইতেছে। খরচের হার, মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ, ক্ষেত্রে লম্বী প্রভৃতি যে সব লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায় যে একটি
বীমা কোম্পানী সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে কি না, সেই সব দিক দিয়া বিচার করিয়া আমরা আনন্দিত
হইয়াছিলাম যে বীমা-ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুযোগ্য লোকের হস্তেই বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের পরিচালনা শ্রুত আছে।

গত ভ্যালুয়েশানের পর মাত্র দুই বৎসর অন্তে এই কোম্পানী পুনরায় ভ্যালুয়েশান করিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয়
দিয়াছেন। কোম্পানীর যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে অল্পকাল অন্তর ভ্যালুয়েশান কেহ করেন না। বীমা কোম্পানীর প্রকৃত
অবস্থা জানিতে হইলে অ্যাকচুয়ারী দ্বারা ভ্যালুয়েশান করাইতে হয়। অবস্থা সবদিক নিশ্চিত ধারণা না থাকিলে বেঙ্গল
ইনসিওরেন্সের পরিচালকবর্গ এত শীঘ্র ভ্যালুয়েশান করাইতেন না।

৩১-১২-৩৫ তারিখের ভ্যালুয়েশানের বিশেষত্ব এই যে, এবার পূর্ববার অপেক্ষা অনেক কড়াকড়ি করিয়া পরীক্ষা
হইয়াছে। তৎসঙ্গেও কোম্পানীর উন্নতি হইতে আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসরের জন্য ১৬ টাকা ও মেম্বারী
বীমায় হাজার-করা বৎসরে ২৪ টাকা বোনাস দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানীর লাভের সম্পূর্ণ অংশই বোনাসরূপে বাটোয়ারা
করা হয় নাই, কিয়দংশ রিজার্ভ ফণ্ডে লইয়া রাখা হইয়াছে। এই কোম্পানীর পরিচালনভার যে বিচক্ষণ ও সতর্ক ব্যক্তির
হস্তে শ্রুত আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বিশিষ্ট জননায়ক কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এটর্নী শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়
গত সাত বৎসর কাল এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি পদে থাকিয়া কোম্পানীর উন্নতিসাধনে বিশেষ সাহায্য
করিয়াছেন। ব্যবসায়জগতে সুপরিচিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কলিকাতা শাখার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়
এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ইহার জ্ঞান অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহার স্বল্প পরিচালনায় আমাদের আস্থ
আছে। স্বপ্নের বিষয় যে তিনি এই কোম্পানীতে বীমাজগতে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুদীর্ঘলাল রায় মহাশয়কে এজেন্সী ম্যানেজার-
রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ও সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই বাদালী প্রতিষ্ঠান
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিবে ইহা অবধারিত।

[বিজ্ঞাপন]

হেড অফিস—২নং চার্চ লেন, কলিকাতা।



কলিকাতা ওয়ার্কিং মেনস ইনস্টিটিউশনের দাতব্য চিকিৎসালয়

দেশে ম্যালেরিয়া আছে ॥

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ আছে ॥

এপাইরিন

সকল বিজ্ঞ চিকিৎসক অমুমোদিত

ম্যালেরিয়ার মহৌষধ।

রোগের প্রারম্ভেই সেবনীয়।

দুর্বল দেহ-মন সবল করিতে

ফস্ফো-নিউরোটোন

অব্যর্থ টনিক ॥

ল্যাড্‌কো

কলিকাতা

জ্ঞানে ও প্রসাধনে

ল্যাড্‌কো

সুগন্ধ-ক্যাণ্ডার অয়েল

কাঁ লো প ঘো গী

জ্ঞানে নিত্যব্যবহার্য

আনন্দদায়ক সুগন্ধ

সাবান—

ল্যাড্‌কো

গ্লিসারিন সোপ

প্রতি বাসে তিনখানি থাকে ॥

ভাল দোকানেই পাওয়া যায় ॥

ল্যাড্‌কো

কলিকাতা

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বাঙালী

কানপুর-প্রবাসী বায় বাহাজুর জীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৩ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। মেডো কলেজ হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাশ করেন, এবং তৎপরে এলএল-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি মনসেফের পদে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমশঃ সবজজ ও ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজের পদে প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি লন্ডো শহরে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

একটি দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান

ইরানীদিগের সামাজিক, নৈতিক ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে ২৭ বৎসর পূর্বে কলিকাতা ওয়াকিংম্যানস ইনষ্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ১৫ রাজা দীনেশ দ্বীপে প্রতিষ্ঠানের স্বীয় ভবনে ইহার প্রধান কার্যক্ষেত্র। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে কলিকাতার বিভিন্ন পণ্ডীতে নয়টি বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে সাতটি নৈশ বিদ্যালয়। প্রধানতঃ দপ্তরী, চাপরাশী, মুচি, মেথর প্রভৃতি শ্রেণীর বয়স্ক ব্যক্তিগণই এই সকল বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকে। সাধারণ জেলাপাড়া বাস্তব চিত্রশিল্পী, বই-বাণিজ্য, দল্লির কাজ প্রভৃতিও শিক্ষা বিবার ব্যবস্থাও আছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে। সম্প্রতি কলিকাতা এলবার্ট হলে জীবন্ত শ্রমোৎসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।



কীর্ত্তোগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়



মাদ্রাজে আন্তর্বিজ্ঞান জীবাণুপ্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ মহারাণী নেতু পার্কী বাদ পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন



মাদ্রাজের অধ্যাপক ডাঃ পরমেশ্বরন একটি নতুন ভারতীয় আবিষ্কার ঘোষণা করিয়া ইনি বৈজ্ঞানিক সমাজকে বিস্ময়গ্ভূত করিয়াছেন